অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

১৬ মে ১৯৭৫ ॥

মূল্য ৬৫ পয়সা

গ্রীষ্মকালে
শীতল
আরাম
ভারতী ৩৬
সাইজ ৩-৭
টপার্স ৫০
সাইজ ৫-১০
সাইজ ৩-৬,
৭-১০, ১১-১
লীজার ৫৭
সাইজ ৫-১০
Bata

১৫ বর্ষ

১ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 16th May, 1975 শুক্রবার, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	**সম্পাদকীয়**		
৭	আমার সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে যাবে	(গল্প)	শ্রীশ্রীলেখা বসু
১১	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১২	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৪	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৫	সুরের আগুনে		শ্রীসন্ধ্যা সেন
১৯	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
২১	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
২৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীজরৎকারু
২৮	গোয়েন্দা ধাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২৯	সেইসব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
৩১	কারণ আমরাই বাদু	(কবিতা)	শ্রীবিষ্ণু দে
৩২	চিঠিপত্র		
৩৪	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩৬	জীবন যেমন	(গল্প)	শ্রীঅজিত পুততুণ্ড
৪১	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত ঠিকানায় মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৪২	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৪৩	রান্না করে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪৪	রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ কি পর্তুগীজ ছিলেন?	শ্রীআনন্দ রায়
৪৫	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান	
৪৬	পুনশ্চ	শ্রীক্ষপণক
৪৭	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৫০	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৫০	আর্যভট্ট ও মহাকাশ বিজ্ঞানে পরবর্তী পদক্ষেপ	শ্রীসনৎ বিশ্বাস
৫৩	প্রদর্শনী	শ্রীদ্বিজেন্দ্র মৈত্র
৫৪	খেলার জগৎ	শ্রীঅজয় বসু
৫৬	খেলাধুলো	শ্রীদর্শক
৫৭	মাঠের নায়ক	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮	দেশবিদেশের খেলা	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৯	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৬১	চলচ্চিত্রের সাংবাদিকদের পুরস্কার	
৬৩	সিনেমাটিক টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৬	কিন্নুকণ	শ্রীনির্মল ধর
৬৮	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৯	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭০	ফ্লোর থেকে বলছি	স্টুডিও সংবাদদাতা
৭১	চিত্রসমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৭২	নাট্যমঞ্চ	মঞ্চসমালোচক
	প্রচ্ছদ :	শ্রীঅশোক চৌধুরী

একটি যুদ্ধের সমাপ্তি

গত ৩০ এপ্রিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট সরকারের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনে ভিয়েতনামী জনসাধারণের ত্রিশ বৎসরব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান ঘটল। আধুনিক কালের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র জাতির এত দীর্ঘকাল স্বাধীনতার সংগ্রামের নজীর আর দ্বিতীয় নেই। আমেরিকা প্রকাশ্যে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও গত কুড়ি বৎসর ধরে তারা সায়গনের তাঁবেদার সরকার মারফৎ অঢেল অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে নৃশংসতম যুদ্ধ চালিয়েছে। এই প্রথম মহাশক্তিশালী আমেরিকা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নিতান্ত হতমান হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হল। ক্ষুদ্র দেশ হলেই যে তার জনসাধারণের সাহস ও সংকল্প তুচ্ছ হবে তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। ভিয়েতনাম প্রমাণ করল যে জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকলে যত পরাক্রমশালী শত্রুই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব।

অনেকে হয়তো বলবেন, আমেরিকার হাতে আটম বোমা ছিল। ইচ্ছা করলেই তারা ভিয়েতনামকে হিরোশিমা নাগাসাকির মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। এর উত্তর হল এই যে আমেরিকার যদি সাহস থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তারা আটম বোমা ব্যবহার করত। কিন্তু সে জানে যে হিরোশিমায় আটম বোমা ব্যবহার করা সম্ভব হলেও ভিয়েতনামের যুদ্ধে তা সম্ভব নয়। কারণ এখন ভিয়েতনামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েট ইউনিয়নসহ দুনিয়ার সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ। পৃথিবীর শান্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষও তার পক্ষে। সুতরাং আটম বোমা ফেললে এবার আমেরিকার মাথাও রক্ষা পেত নাই অনেকের হাতেই এখন এই অস্ত্র আছে। দ্বিতীয়ত আটম বোমা ব্যবহার না করলেও অন্য সব রকম মারাত্মক বোমা ও অস্ত্র আমেরিকানরা ভিয়েতনামে ব্যবহার করেছে। সমস্ত দেশটা শ্মশান করে ফেলেছে তারা। শিল্প কারখানা সব আমেরিকার বোমায় ধ্বংস হয়েছে। দেশপ্রেমিকরা যাতে না খেতে পেয়ে মরে সেজন্য তারা বর্বরের মতো শস্য ক্ষেত্রে এমন সব গ্যাস ছড়িয়েছিল যাতে কয়েক বছর সেখানে আর শস্য না হয়। নদীর বাঁধ ভেঙে দেশ প্লাবিত করেছে তারা, জলসেচ প্রথা বিনষ্ট করেছে। গেরিলারা যাতে আত্মগোপন করে না থাকতে পারে সেজন্য গাছপালা বন পুড়িয়ে দিয়েছে। এত সব করেও ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষকে তারা দমাতে পারে নি। তার কারণ, স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই। ভিয়েতনামের মানুষ আমেরিকার অস্ত্রের ভয়ে কিংবা ডলারের লোভে স্বাধীনতা বিকোতে রাজি হয় নি। তাই কুড়ি বছরে পনের হাজার কোটি ডলার ব্যয় করে এবং ৫৬ হাজার মার্কিন সৈন্য জলাঞ্জলি দিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামকে রাখতে পারে নি এবং উত্তর ভিয়েতনামের এক ইঞ্চি জমি দখল করতে পারে নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ভিয়েতনামের মানুষের এই ঐতিহাসিক জয়কে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, মার্কিন নীতি কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তাদের এই বিপর্যয়। হো চি মিনের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমেরিকার কোনো ধারণাই ছিল না। তারা যাদের সায়গনের প্রাসাদে ক্ষমতায় বসিয়েছিল তাদের একমাত্র গুণ ছিল কমিউনিস্ট বিরোধিতা। আসলে ভিয়েতনামের যুদ্ধটা কমিউনিজমের সঙ্গে হয় নি হয়েছে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের সঙ্গে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে গণমুক্তিফ্রন্টে কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট সব দলেরই প্রতিনিধি আছে। তাছাড়া ভিয়েতনাম মস্কো বা পিকিং-এর কথায় ওঠে বসে না। তাদের স্বাতন্ত্র্য আজ সর্বজনবিদিত। তারা স্বাধীনতাপ্রিয় এবং শান্তিপ্রিয় জাতি। ভিয়েতনামের বিপর্যয়ের পর এখন যদি আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির এই জঙ্গী দিকটার পরিবর্তন না হয় তাহলে তা মার্কিন জনসাধারণের স্বার্থকেই বিপন্ন করবে। ইন্দোচীনে পরাজয়ের পর এশিয়ায় আমেরিকানরা কীভাবে চলবে তা অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করা দরকার। অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে দেশে অগণতান্ত্রিক তাঁবেদার সরকার খাড়া করে যে মুক্ত দুনিয়াকে রক্ষা করা যাবে না ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতার পর এই সত্যের উপলব্ধি কি আমেরিকার হবে? ভিয়েতনামের সামনে এখন প্রধান কাজ হল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন। এই কাজে পৃথিবীর শান্তিকামী দেশগুলোর সহায়তা এই বীর জাতি নিশ্চয়ই আশা করতে পারে।

আমার সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে যাবে?

না?

কেন?

স্বপ্ন বুঝি নিভৃতি খোঁজে? সে বুঝি শুধু সেই সব গহন কন্দরে ধরা দেয় যেখানে কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু আছো তুমি আর তোমার স্বপ্ন? আর সেখানে—সেই নির্জনে—যেন দুজনেই দুজনকে অবাক হয়ে দেখ। তাই না?

স্বপ্নের চোখে একবার দেখ তো নিজেকে কি নগ্ন তুমি—কোনো আবরণ নেই। লজ্জা করে না?—আর স্বপ্নই বা কেমন রূপে আসে। এই তো দেখ না আমারও তো স্বপ্ন আছে, যখন জেগে থাকি যখন দিনের আলোয় তাকে স্পষ্ট করে ধরবার চেষ্টা করি, তখন সে কেমন মোহন সাজে সেজে আসে? কাচে আর মার্বেলে গড়া বাড়ীতে দেখি তাকে আমার ছেলের টুলটুলে গালে সে চুমো খায়। আবার যখন গণ্ডোলায় বসে ভেনিসের এক গোলাপী সন্ধ্যায় মিশে যাই—এই আমি নই, পরম রূপৈশ্বর্যশালিনী কেউ—তখনো সে পাশে এসে বসে কান্তিমান কোনো পুরুষের রূপে আর কানে কানে কতো কথা বলে। জলের ওপরে পড়া বিন্দু বিন্দু গোলাপী আলোর মতো তা আমার মধ্যে গলে যায়, মিশে যায়?

কিন্তু যখন তাকে ডাকি না, রাত্রের অন্ধকারে, ঘুমের রহস্যের মধ্যে, সে যখন আপনি আসে, তখন? তখন কি অদ্ভুত রূপ তার? কখনো সে মৃত্যুর মতো ভয়াল, কখনো সে জ্বররোগীর প্রলাপের মতো অর্থহীন কতকগুলো হিজিবিজি রেখা, আর কখনো সে আশ্চর্য এক নির্জনতায়, কোনো গুহার আদিম অন্তরালে, অতল এক সবুজ জলাশয়? শব্দহীন, কম্পনহীন, জনহীন—তবু গভীরে লুকোনো কোনো প্রচণ্ড অস্তিত্বের অভিমানে [illegible]

এই বুঝি আলোড়ন উঠবে হ্রদের জলে, মাথা তুলবে বিরাট সরীসৃপ। লক লমন্ডের নিস্তরঙ্গ জল তোলপাড় করে উঠে আসবে অচিন্তনীয় কোনো ভয়ংকর।

আতঙ্কে নিঃসাড় অনুভূতি অথচ যেন প্রতীক্ষায় উদগ্র। কালো আর সবুজ সেই অন্ধকার, অবচেতনের অতল থেকে উঠে আসা প্রচন্ড সেই অস্তিত্বের মুখোমুখি আমি—শুধু একলা আমি।

তবে কেমন করে লোকে স্বপ্ন দেখে অনেকে মিলে? দুজনে মিলে? মিত্তি, মিত্তি মা আমার, তোকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন, তুই যেন তা ভেঙ্গে দিস না। কিংবা সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ-তরুণী যেমন বলে, আমরা দুজনে মিলে স্বপ্ন দেখছি, দুজনে দুজনের স্বপ্ন ভাগ করে নিচ্ছি। কেমন করে পারে তা? স্বপ্ন তো কাউকে সহ্য করে না। তার রাজ্যে শুধু তারই একাধিপত্য। কি ভীষণ প্রভুত্বপরায়ণ সে, কি অসংকোচ তার দাবী। দৈনন্দিনের জোড়াতালি দেওয়া মানুষটাকে নয়—অকৃত্রিম, অসজ্জিত, নিরাবরণ সত্তাটকে সে চায়, আর সেখানে সে কোনো আপোস জানে না। আর যদি তুমি একটু সেজে যাও—ইচ্ছে তো করে কখনো—তবে সে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তারপর অন্ধকারে অতর্কিতে এসে হানা দেয়। বলো তখন কি নিজেকে সমর্পণ না করে পারা যায় কখনো?

কিন্তু তবে কেন বলে ওরা—ওই প্রেমিকযুগল—আমরা একত্রে স্বপ্ন দেখছি, পরস্পরের স্বপ্ন ভাগ করে নিচ্ছি। তাই কি হয়?

না গো না, তা হয় না। যে স্বপ্ন ওরা ভাগ করে নেয়, ছোড়াছুড়ি করে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নেয়, তা ইটকাঠে গড়া কার্পেটে মোড়া স্বপ্ন। কাঁচের বাক্সে বন্দী রুপোলী মাছের মতো সেই স্বপ্নের টুকরোগুলো অগভীর জলে সাঁতার কাটে। আর আসল যে স্বপ্ন, বিশাল আর সবগ্রাসী সেই যে অস্তিত্ব, সে চুপিচুপি আসে রাত্রের অন্ধকারে। আশ্লেষে বাঁধা জুটিকে নিঃশব্দে সে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, আর তারপর যে যার স্বপ্নের সঙ্গে মিশকালো অন্ধকারের একাকে ডুবে যায়। আবার—আবার যখন আলো ফোটে তখন ফিরে আসে তাদের যুগলশয্যায়। ঘামে ভেজা। সেই বাসি শয্যা আর আমাজা মুখের বাস্তবে জেগে ওঠে। আর তারপর একজন ব্যস্ত হাতে টিফিন গুছোয়—রুটি তরকারী আর টোমাটোর টুকরো দিয়ে। আর অন্যজন জুতোর ফিতে বাঁধে, সন্ধ্যাবেলা শীঘ্র ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয়। —দৌড়োয় বা জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের সেই ছোটো ছোটো ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের সন্ধানে।

কি সুন্দর তুমি, মৃত্তিকা, কি সুন্দর তুমি।

তুমি আমার সব, জানো? তুমি আমার স্ব—ব।—

কি কপট—কি কপট আমরা। কতো ছলচাতুরির মালমশলা দিয়ে ধরে রাখি আমাদের ছোটো ছোটো স্বপ্নের নুড়ি দিয়ে গড়া এই প্রাসাদ। সমস্ত খর্বতা, শীর্ণতা আর মূর্খতাকে জীইয়ে রাখার এই কাঁদের বাকস। অথচ নিভৃততম কন্দরে আমাদের সকলের মধ্যেই আছে সেই সবুজ জলাশয় যা তোলপাড় করে উঠে আসে বিরাট কোনো অস্তিত্ব।

গভীর কোনো অরণ্যের মধ্যে লুকোনো বিশাল...বিশাল সেই মন্দির। সে কি আংকরভাটের ভাস্কর্যে গরীয়ান স্থাপত্য না কি রাজস্থানের পাষাণগাঁথা আকাশছোঁয়া সূর্যমন্দির? সেই নিশ্চিদ্র অন্ধকারে একলা আমি, বিরাট কোনো আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়—শংকায়—কম্পমান। আর তারপর কালো পাথর ফাটিয়ে মহান সেই জ্যোতির্ময় প্রকাশ। আমি সহ্য করতে পারছি না, তাকাতে পারছি

আগামী সংখ্যায় গল্প লিখবেন

ইমদাদুল হক মিলন

না, মনে হচ্ছে যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাবো। তবু—তবু সেই বিরাট গম্ভীর অগ্নিময় সত্তার সম্মুখীন হতে পেরে আমি সার্থক, তাকে আমি নতজানু হয়ে প্রণাম জানাই।

মিত্তি মিত্তি মা আমার তোকে ঘিরে আমাদের কতো স্বপ্ন দেখিস তুই যেন তা ভেঙ্গে দিস না।

কি স্বার্থপর তুমি মা! শুধু তোমারই বুঝি স্বপ্ন আছে? আমার নেই? আর তার কাছে আমি তো শুধুই আমি যেন পারিপার্শ্বিককে ছাড়ানো, স্বয়ম্ভূ কোনো সত্তা। তাকে কি বলতে পারি জন্মসূত্রে আমি বাঁধা আছি সামাজিক নিয়মের গন্ডীটুকুর মধ্যে আমার চলাফেরা? আর বলো তো সত্যি করে বলো তো তোমার স্বপ্নের চোখে আমি কতোটুকু—কোথায় আছি? তুমি তো নিজেকেই স্বপ্ন দেখেছো ভিন্ন রূপে অনন্য সাজে। আমাকে প্রয়োজনমতো এনেছো আবার দূরে ঠেলে দিয়েছো। যখন সরস্বতীপুজোর নরম ঠান্ডা সকালে আমার ছোট্ট শরীরের বাসন্তী শাড়ীখানা জড়িয়ে দালানে নিয়ে গেছ। তখন কি মা আমার হাত-ধরা নিজের সেই ঐশ্বর্যময়ী রূপটুকুই তুমি তোমার স্বপ্নের চোখে দেখনি? আর তাই-ই তো হয় যখন তুমি স্বপ্নের চোখে নিজেকে দেখ না তখনো তো তুমি তোমার চোখেই স্বপ্নকে দেখ। তাই বলছি মা তুমি ওকথা বলো না মিত্তি মা তোমার আমি তোকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখেছি' তোমার স্বপ্ন শুধু তোমাকে ঘিরেই থাকে মা তোমাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই। আর তাকে ছাড়া তুমিও নেই।

কতো সময় ভাবি কি স্বপ্ন দেখে আমার আশেপাশের মানুষরা? শুধু যে স্যুটপরা ঝকঝকে মানুষটি যে প্লেনে বসে বসেও সামনে রাখা কাগজপত্রে কলম চালাচ্ছে সে কি কখনো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের আড়ালে তার স্বপ্নকে খোঁজে? আর ওই যে শীতের ভোরে জবুথবু হয়ে দাওয়ায় বসে রোদ পোয়ানো বুড়িয়া যার দন্তহীন মুখটা কেবলই নড়ে—তার স্তিমিত চোখে কি স্বপ্ন দেখে সে? কিন্তু একথা তো কাউকে জিজ্ঞেস করা যায় না। কেউ তো বলে দেয় না কোথায় সেই নিভৃতির কন্দর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে শুধু সে আর তার স্বপ্ন?

আমার খোকা—আমার আত্মজ—তার স্বপ্ন কি আমার চেনা? যখন সে এতোটুকু শিশু যখন কোলে শুয়ে ঘুমোবার আগে আধবোজা চোখের ফাঁকে বিস্ফারিত ভাসা ভাসা তারাদুটি দেখা যেত তখন আমি ভাবতুম কেমন রূপে আসে ওর স্বপ্ন ওর কাছে? ওর তো ভাষা নেই ও তো বোঝাতে পারে না কিন্তু যদি পারতো—বলতো কি?

আঃ—সতেরো বছরের খোকা আমার হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় কি দেখছো। কি?

অপ্রতিভ হয়ে আমি বলি অসময়ে শুয়ে আছিস তাই দেখছিলুম অসুখ-টসুখ করেনি তো?

যতো বাজে—

আচ্ছা খোকা—

কি?

তুই কি—? নাঃ কিছু না।

গোপনতার কুয়াশায় ঢাকা ওর স্বপ্ন? সেখানে কারো কৌতূহলী দৃষ্টি পৌঁছয় না। আর তা তো হবেই—তাই-ই তো হয়।

এই তো দেখ না আমি যখন নিজের মধ্যে ডুবে যাই নরম বিছানায় শুয়ে বাইরের নীলাভ অন্ধকারে সমুদ্রের ওপর পাতলা জ্যোছনার ঝিকিমিকি দেখি আচ্ছা ওই কি আমি—নাকি এই ভাপসা গরমে জেগে উঠে মশারির কোণে কোণে মশা খুঁজে রাত কাটানো আমিই আমি? কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায় আমাদের জীবন যেন কেমন অর্থহীন হিজিবিজি রেখা। যাক গে সেটা তো বড়ো কথা নয় আসল কথা নয় ওই আবেষ্টনীর চাপে বাঁকাচোরা আমিটা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সেই সত্যিকারের যে আমি সে আবার কখনো জনহীন একলা পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে চলে জানো? সন্ধ্যা নেমে-আসা গেরুয়া রঙে রাঙানো সেই নির্জন সর্পিল রাস্তা। আর আমার স্বপ্ন সেখানে দূরে অপেক্ষা করে কোমল কোনো উদ্ভাসের মতো।

বরফ ঢাকা শাদা চূড়োয় যেন ছোট্ট এক মন্দির। সেই বিশাল গম্ভীর স্থাপত্য নয় ছোট্ট শাদা একটুখানি একটা মন্দির। চারিদিকে দেওয়ালও নেই তার শুধু চারকোণে চারটি থামের ওপর মন্দিরের চূড়োটুকু। ঠান্ডা হাওয়া ভোরের নরম আলো অবাধ খেলা করে যাচ্ছে আমার খোকার মতো। আর সেইখানে দাঁড়িয়ে আছি—কার জন্যে কি জানি। কিন্তু আসবে সে কোমল কান্ত রূপে। খেলাঘরের ঘন্টির মতো মন্দিরের ঘন্টাটুকু। তার মিষ্টি সুর অনুরণিত হচ্ছে

আমার জাগা না—জাগার সমস্ত অবকাশ ভরে।

সেই ঘন্টার শব্দ ছাপিয়ে ছোটো ছোটো ছেঁড়া স্বপ্নগুলো কি রকম উৎপাত করে।

এই প্রোমোশনটা হলেই সামনের ছুটিতে কাশ্মীর যাবো।

যদি মিডল ইস্টের কনট্রাকটটা পেয়ে যাই তবে ক্রীন একমাস ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায়—

ওগো আজ সন্ধ্যেবেলা সিনেমায় যাবে?

নোনাধরা রান্নাঘরে টিমটিমে আলোর নীচে বসে যে হাই তোলে আর সুগন্ধী সুবেশ নর-নারীর ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে আতস বাজির খেলা দেখতে দেখতে যে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় সে কোনোটাই যেন কেউ নয়। ওসব যেন ক্যালিডোস্কোপের নকশা ভেঙেচুরে যায় নানান রঙ ছড়ায়—বড়ো অস্থির। কিন্তু স্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়ানো যে সত্য। নগ্ন আর নির্জন—সেই তো আসল সেই তো নিশ্চিত।

তাকে কেউ দেখতে পায় না অথচ কি অহংকার মানুষের। সে যেন সকলকে চেনে যেন সে নিজেকেই চেনে।

কুড়ি বছর বিবাহিত আমরা, শরীর মনের কোন রহস্য জানতে কি আর বাকী আছে?

এই তো, এই তো দোষ তোমার...

বড়ো ভালো তুমি কি নরম তোমার মন।

এমন কেন বলি আমরা? কতো কঠিন কাউকে চেনা, তাকে কার্যকারণের সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলা। আমরা যে কে তাই তো বুঝতে পারি না। চেতন আর অবচেতনের সামনাসামনি রাখা দুটো আয়না। কতো ছায়া প্রতিচ্ছায়া অন্তহীনভাবে প্রতিফলিত তাতে। কখন যে প্রচন্ড সেই অস্তিত্ব মাথা তুলে ওঠে, ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কুড়ি বছর ধরে গড়া সৌধ। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায় আয়নাদুটো আর অদ্ভুত এক গোপন কেউ—নতুন কেউ—এসে সেই আবির্ভাবের সামনে নতজানু হয়। তাকে কি কেউ চেনে?

আমার মিস্তি শিল্পী হবে, দেখ দেখ ওর চোখদুটো।

না-না, নাচ শেখাবো ওকে আমি শরীরে ওর কি হিল্লোল।

আর ভরাভরতি হলঘরটার এক কোণে বসে আমি শুনছি।

ব্রেক, ব্রেক ব্রেক,

অন দাই কোল্ড গ্রে স্টোনস ও সী!

বাইরে অস্তরাগরঞ্জিত ঢলে-পড়া আলো আর আমার মধ্যে যেন সমুদ্রের আলোড়ন।

আপনি আমাকে চেনেন না—

হ্যাঁ চিনি তোমাকে। ওই কোণে বসে ছিলে সেদিন। ঘরভরা লোকের মধ্যেও চোখে পড়েছিল মনে হয়েছিল কবিতা ভালোবাসো তুমি। কবিতা লেখ কি?

না লিখি না, কিছু লিখি না। আমার শিল্পী বাবার মতো রং তুলি দিয়ে কিছুই ফোটাই না। সাধারণ আমি, আমার কোনো প্রকাশ নেই। কিন্তু কি তোলপাড় আমার মধ্যে কোনো ভাবার গুঞ্জরণে কোনো সুরের আবেশ কিভাবে ছড়িয়ে যায়—কূল ছাপিয়ে যায়—কেমন করে তা বোঝাই আমি?

আই ওয়ান্ট ইউ মল্লিকা আই ডিসয়ার ইউ—

স্বপ্ন যেন সেই রূপে হঠাৎ আবার ফিরে আসে। বহু বছর পরে ভিন্ন পরিবেশ থেকে উৎখাত করে নিয়ে আসে অন্য কোথাও।

এ কোন জায়গা? কোন সময়? আমি প্রশ্ন করি আমার স্বপ্নকে। সে বুঝিয়ে দেয় দেখ সেই ছোটো শহরখানি চেনা চৈত্রের পাতাঝরা ঝিমধরা উদাস দুপুর আর আমার সামনে কে? এঁকে কি চিনি আমি?

আপনি?

চেন না আমাকে?

না স্পষ্ট করে তো দেখতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে আপনি যেন চেনা—খুব চেনা—কিন্তু কে?

অতোবা—র দেখেছে। আমাকে কতো কথা বলেছো—, ভুলে গেছ কি?

না-না, ভুলিনি এই তো মনে পড়ছে সব। কিন্তু কবে কথা বলেছি? কবে দেখেছি আপনাকে? দশ বছর আগে? এক মাস আগে? জন্মান্তরে?

সেই মন্দ্রগম্ভীর স্বর ছাপিয়ে উঠছে তরুণ এক কণ্ঠ, যা নদীর মতো কল্লোল তুলে বয়ে যাচ্ছে।

মল্লিকা তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে? সত্যি যাবে? যেও না—যেও না মল্লিকা, তুমি কি জানো না তুমি আমার কতোখানি?

কিন্তু আমি যে অনেক কিছু চাই। ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভে ফ্ল্যাট চাই পাহাড়ের হিলের ঘোরানো রাস্তা বেয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে যেতে চাই। আর মিডল ইস্টের কন্ট্রাকটটা পেলে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় ক্রীন এক মাস—

তুমি চাও এসব? এই ছেঁড়া ছোঁড়া স্বপ্নগুলো চাও? তুমি?

তাই কেন মেনে নাও না? আর মেনে নিয়ে আমাকে তাচ্ছিল্য করে কেন শান্তি পাও না? কেমন করে বলবো তোমাকে যে তুমি আমার অনেক ভালোবাসার কেউ,

কিন্তু তুমি সেই স্বপ্ন নও—বিরাট বিশাল অগ্নিময় সেই আবির্ভাব নও—যার হাতে আমার ধ্বংস, আমার মৃত্যু আমি কামনা করি। যার জন্যে সবকিছু মুহূর্তে ত্যাগ করে আমি দেউলে হয়ে যেতে পারি, তাঁকে যদি না পাই তবে কেন ফেলে দেব এই টুকরো টুকরো স্বপ্নগুলো? থাক না এরা আমার চারিপাশে খেলা করুক না সোনালী মাছের মতো অগভীর জলে।

মৃত্তিকা—

ফিশ ফিশ করে কথা বলে কখনো বাতাসের মতো শব্দহীন স্বরে। কি অর্থ-হীন এই হিজিবিজি রেখা, কোনো ভৌতিক মুখ, তেপান্তরের মাঠে জেগে থাকা ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমী লাল হলুদ রংয়ের চড়া প্রলেপ। যেন প্লেনে যেতে যেতে জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া তার ডানার আগুন, ছুটোছুটি কান্না আর অর্থহীন প্রলাপ। যেন কোনো ব্রীজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে নীচে পড়ে-যাওয়া কোনো ট্রেনের কামরা। মজ্জমান...নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে চেপে ধরা সেই অবর্ণনীয় আতঙ্ক আর কষ্ট—বুক-চাপা দমবন্ধ করা কষ্ট।

টাকা। শুধু টাকা চিনেছো তুমি।

তাহলে তোমাকে বিয়ে করতুম? তোমাকে?

এও তো আমি। কলেজের এক পাঁজা খাতা হাতে ধরা, বাসের লাইনে অন্তহীন অপেক্ষার পর, সৌখীন হাতব্যাগের মধ্যে থেকে লাইলনের থলিটা বের করে, বাজার সেরে ক্লান্তপায়ে যে ফেরে—কলকাতার ধোঁয়াওঠা গলির মধ্যে, বস্তের ঘিঞ্জি পাড়ার একখানা ঘরে—সেও তো আমি। কিন্তু বলছি না? এসব কিছুই না, এসবে কিছু যায়-আসে না। যে আমি মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে চটকে চটকে অসুস্থ ছেলেকে ভাত খাওয়াই আর যে আমি ভেনিসের গোলাপী সন্ধ্যায় মিশে যাই—তারা কেউ যেন সত্যি নয়। কারণ যে-ই হোক যা-ই হোক, তারা সবাই যেন এতোটুকু পরি-সরের মধ্যে আবদ্ধ। যে নববধূ ঘোমটার আড়ালে তার পুষ্পকীর্ণ শয্যার দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয় নার্সের হাত ধরে যে প্রসূতি ছটফট করে বলে আর কতোক্ষণ—আর কতোক্ষণ লাগবে? ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যে উদাস চোখে বিবর্ণ পৃথিবীটাকে দেখে—তারা সবাই যেন ছোটো-ছোটো লজ্জা ঘেন্না। ভালোবাসার খোপে খোপে বন্দী। আর স্বপ্নের সান্নিধ্যে নিভৃত যে সত্তা?—তার কি বিপুল প্রসার আমাদের জাগ্রত মনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ফুলে ফেঁপে ওঠে সে। স্বপ্ন তাকে হাত ধরে নিয়ে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে।

শীতের ভোরে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে যেমন হঠাৎ হঠাৎ ফুটে ওঠে বাড়ীর আকৃতি, শিশিরভেজা পাতা আর কেঁপে কেঁপে ওঠা মানুষগুলো তেমনি যেন অবচেতনের মধ্যে থেকে উঠে আসে আশ্চর্য সব ইচ্ছা, রোমাঞ্চ, বাসনা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলি নিজেকে আপ্লুত হয়ে যায় আমার সমস্ত অস্তিত্ব কি অচেনা অনুভবে। নিগূঢ় সেই রসোল্লাস। —তারপর যখন হঠাৎ ফিরে আসি রোজকার জগতে, তখন টলমলে চোখে তাকাই চারি-দিকে—কোনটা সত্যি? কোনটা প্রতিবিম্বের জগৎ?—সহসা যেন বুঝতে পারি না।

তুই নেশা করেছিস? খোকা তুই এমন হয়ে গেলি?

এতো পেয়েছো—এতো পেয়েও তোমার কিসের এতো অস্থিরতা?

কি জানি। কখনো কখনো যেন জাগা না জাগার জগতে কেমন সেতু বাঁধা হয়ে যায়। মন্টিকার্লোর জুয়োর আড্ডায় বসে হঠাৎ শুনতে পাই

ব্রেক, ব্রেক, ব্রেক

অ্যাট দ্য ফুট্ অভ থাই

ক্র্যাগস, ও সী!

যেন অন্ধকার হয়ে এসেছে আকাশ। সমুদ্রের মাতাল জলে অনিবার্য ধ্বংসের ইঙ্গিত। হঠাৎ বিশাল এক জলস্তম্ভ উঠেছে জল আর আকাশকে সংযুক্ত করে। কি ভয়ংকর কিন্তু কি ভীষণ আকর্ষণীয় প্রকৃতির এই করাল রূপ। আমার এই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব—কি হাস্যকর সেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা।

আয়াম সরি ম্যাডাম, বাট ইউ ওয়েটেড দ্য ট্রুথ—দেয়ার ইজ নো কিওর—

নোনা জলে গাল ভেসে যাচ্ছে, ডক্টর, কান্ট ইউ ড সামথিং? কান্ট আই গো

আমার জাগ্রত জগৎ বিবর্ণ হয়ে যায় তার আকাশের নীল আর মেঘের শাদা মুছে যায়। কাচের বাকসে ভেসে ওঠে মৃত লালমাছ। কিন্তু আরো—আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই অন্ধকারের পৃথিবী, সবুজ অর কালো তার রং। সেই অরণ্যের গভীরে লুকোনো বিশাল সূর্যমন্দিরের ঘন্টায় গম্ভীর ধ্বনি ওঠে। এখনই আবির্ভূত হবে অগ্নিময় পুরুষ, তার প্রতীক্ষায় আমি আনত।

সেই ঘন্টাধ্বনি বেজেই চলেছে, কোনো সমুদ্রের জল আকুঞ্চিত প্রসারিত হচ্ছে—গংটর্মেন্টেড সী—আজ সেই প্রচন্ড অস্তিত্ব নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে।

মৃত্তিকা, আই ডিসয়ার ইউ—

তোমাকে চাই একান্ত করে—সম্পূর্ণ করে।

চৈত্রের উদাস দুপুরে, সন্ধ্যার আলোয় রাঙানো পাহাড়ী পথ, বরফ ঢাকা পবিত্র সেই শিশুমন্দির...সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। যাদের রূপ ধরে স্বপ্ন কখনো খেলেছিল আমার সঙ্গে তারা সবাই একে অন্যের মধ্যে লীন হয়ে যাচ্ছে, আমি ধরতে পারছি না।

কে? কে আপনি?

তুমি?

তুই?

চেন না? চেন না আমাকে? ভালো করে দেখ তো। কতোবার এসেছো আমার কাছে কতো কথা বলেছে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক তো। চিনি তো আমি কিন্তু এখনো যে মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কেমন যেন অন্ধকার, কেমন যেন কুয়াশায় ঢাকা চারিধার......

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, জন্ম থেকে জন্মা-ন্তরে—এ কি বিশাল শান্তি! মৃত্তিকা নই আমি, আমাকে ধরে ছুঁয়ে আর কোনো বিশেষ আকৃতি দেওয়া যাবে না। হাওয়ার মতো জলের মতো নিরবয়ব আমি পাহাড়ের চূড়োয় সমুদ্রের অতলে অরণ্যের গভীরে... সর্বত্র আমার উপস্থিতি। কেউ আর ডাকবে না আমাকে, মিতু, মিতু মা আমার। কেউ বলবে না মৃত্তিকা আমাকে ছেড়ে যেও না তুমি কি জানো না, তুমি আমার স-ব?

কেউ আর কোনো নামেই ডাকবে না আমাকে, তার প্রয়োজনই হবে না কারণ আর তো কেউ থাকবে না সেখানে—সেই আশ্চর্য নির্জনতায়, নীলচে-সবুজ আলোর সেই অপার্থিবতায়। সেখানে শংকায় আর ব্যাকু-লতায় কম্পমান আমি, প্রতীক্ষা করে আছি প্রচন্ড বিপুল সেই আবির্ভাবের।

জাগ্রত অস্তিত্বের সমস্ত আবরণ সমস্ত অলংকার খসে গেছে। সম্পূর্ণ উন্মোচিত আমার নিভৃত সত্তা। একান্তে আমার স্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমি—শুধু একা

লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন— একসঙ্গে, না আলাদা?

৭৬ সালের পার্লামেন্টের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের আয়োজন করা হবে কিনা, এ নিয়ে দুটো মতামত সম্প্রতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের নিয়মানুযায়ী এই রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা ১৯৭৭ সালে। সাধারণ মানুষের এখন প্রশ্ন হচ্ছে ৭৭ সালে যে নির্বাচন হবার কথা এক বছর এগিয়ে নিয়ে এসে সে ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন? তবে এই চাপ সৃষ্টির পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। রাজ্যের কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে এক প্রভাবশালী অংশ কিছু দিন আগে দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নিকট এর গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের কথা, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। সুশৃঙ্খল ক্যাডারের দিক থেকে এরা কংগ্রেস দল থেকে অনেক ভাল। আজ অবশ্য যুব কংগ্রেসের সক্রিয়তার ফলে এরা পেছিয়ে রয়েছে। কিন্তু এ অবস্থা সর্বদা নাও থাকতে পারে। আজ যদি ফেব্রুয়ারীতে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শুধু পার্লামেন্টের নির্বাচন করা হয় তা হলে ঐ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি নিশ্চিত জীবনপণ করে ৪২টি আসনের জন্য লড়বে। কারণ, সি পি এম রাজ্য বিধানসভা বয়কট করেছে। (অবশ্য বয়কট না করলেও কিছু যেতো আসতো না। কারণ তাঁরা মাত্র এগারজন নির্বাচিত হয়েছিলেন।) শুধু পশ্চিমবঙ্গের অবদানের দরুন তাঁরা লোকসভায় এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি। এই লোকসভায় ভবিষ্যতে যদি তাঁদের অস্তিত্ব লোপ পায় তা হলে পার্টির আর কিছু থাকবে না। তাই তাঁদের এই আসনগুলি রক্ষা করতে ভয়ঙ্করভাবে লড়তে হবে। কিন্তু পার্লামেন্টের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে যদি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের আয়োজন করা হয়, তা হলে শত্রুপক্ষের শক্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এবং তাহলেই কংগ্রেসের পক্ষে তাদের মোকাবিলা করা সহজ হবে। একই সঙ্গে নির্বাচনের আয়োজন করার পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে অর্থ। লোকসভার নির্বাচনে একবার প্রচুর টাকা খরচ হবে; আবার পরে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে এর পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে নির্বাচনের বিষয়ে খুব বেশী সাহায্য করতে পারবে তা মনে হয় না। কারণ ইতিমধ্যে প্রায় ঠিকই হয়ে গেছে গুজরাট, কেরালা, উড়িষ্যা বা আসামে পার্লামেন্টের নির্বাচনের সঙ্গে সেখানকার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন করান যাবে না। তাই ঐ সব রাজ্যের নির্বাচনের জন্য যে অধিক টাকা খরচ করাতে হবে তাও নেতৃবৃন্দ মোটামুটিভাবে বুঝে ফেলেছেন।

কিন্তু যাঁরা নির্বাচনটাকে পৃথক পৃথকভাবে আয়োজনের পক্ষপাতী, তাঁদেরও ঝুলিতে কম জোরালো যুক্তি নেই। তাঁরা বলছেন, এখন যে হাওয়া চলছে, তা অবশ্যই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাবে। দলের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো যায় নি আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত—এই অবস্থায় কংগ্রেস পার্টি নির্বাচনের ডাক দিলে সাধারণের রাগ বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে—আজ এ কথা পরিষ্কার বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় দিল্লীতে চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। পার্লামেন্টের নির্বাচন আগে হলে তাঁকে তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, ফলে কংগ্রেস দলের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল দানা বেঁধে উঠবে। এই কোন্দলকে মাথায় নিয়ে যিনি নেতৃত্বে আসবেন তাঁর পক্ষে নির্বাচনের মোকাবিলা করা এক দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব ৭৭ সালে নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এদিকে সিদ্ধার্থবাবু নেতৃপদ ছেড়ে দিল্লীতে চলে গেলে কে নেতা হবেন তা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে [illegible] কংগ্রেসী মহলে জল্পনা-কল্পনা চলে আসছে। আর এই জল্পনা-কল্পনাকে [illegible] পারে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ইন্ধন জুগিয়ে আসছেন। শোনা গেছে তিনি এ নিয়ে দিল্লীতে কথা পেড়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাতে রাজি হন নি। সময় নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থবাবু [illegible] চুপ করে বসে থাকার লোক নন। তিনি ইতিমধ্যে দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলে চলেছেন। কখনো কি বলছেন, [illegible] নেতৃত্ব নেবার উপযুক্ত লোক। আবার কোন কোন সময় কাউকে কাউকে শুনিয়েছেন তুমিও পারো তাঁর ওপর অনায়াসে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। শংকরের কথা [illegible] ডাঃ গোপালদাস নাগের কাছে আশার বাণী শুনিয়ে ছিলেন। গোপালবাবু এখন অবশ্য হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি [illegible] নির্বাচিত হয়ে দিল্লী চলে যেতে চাইছেন। আসল কথা হচ্ছে সিদ্ধার্থবাবুই কেবলও মন ঠিক করতে পারেন নি যে পার্লামেন্টের নির্বাচন আর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন এক সঙ্গে করবার জন্য তিনি পরামর্শ দেবেন কিনা? অথবা পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচনের আয়োজন হলে তিনি কোনটার প্রার্থী হবেন? যা হোক এ দুটো প্রশ্নের সমাধান তিনি যদি খুঁজে পান তা হলেই এই রাজ্যের কংগ্রেসীদের নির্বাচনের রাজনীতির স্ট্র্যাটেজি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। তাই সব দিক বিবেচনা করে এ কথা বলা চলে যে আসছে কয়েক সপ্তাহ এই রাজ্যের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এই দুই প্রশ্নের চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকবেন। তবে এর মধ্যে যদি জয়প্রকাশ নারায়ণ বা বামপন্থীদের কাছ থেকে আন্দোলনের হুমকি আসে তা হলে অবশ্য অন্য কথা।

কৌটিল্য

গ্রাম বাংলার ছবি

প্রথমে শোনা গেল বিধানসভার বৈঠকে, তারপর সদস্যেরা বিধানসভার বাইরেও বললেন, গ্রাম বাংলার অবস্থা শোচনীয়। জিনিসপত্র বিশেষ করে খাদ্যের দাম চড়তে শুরু করেছে। এদিকে বহু লোকের কাজ নেই। ফলে শুরু হয়েছে হাহাকার। আংশিক রেশনের দোকান থেকে যে খাদ্যশস্য দেওয়া হতো তার পরিমাণ কমে গেছে। চাল দেওয়া হতো সপ্তাহে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম, এখন দেওয়া হচ্ছে মাত্র ২০০ গ্রাম। তার সঙ্গে আছে পানীয় জলের দারুণ অভাব। এই সময়টা চাষের কাজ তেমন থাকে না, তাই ক্ষেত মজুরদের কাজ নেই। বাজারে চালের দাম কিলোপ্রতি ২৫ থেকে ৫০ পয়সা পর্যন্ত বেড়েছে। উত্তর আর দক্ষিণ বাংলার কয়েকটি জেলায় চালের দর পৌঁচেছে তিন টাকায়। এর ফলে ক্ষেতমজুরের বা ছোট চাষীরা তো বটেই, মধ্যবিত্ত বহু লোকও বিপদে পড়েছেন। অনেকে গ্রামাঞ্চল থেকে চলে আসছেন শহর এলাকায় খাদ্য আর জীবিকার সন্ধানে। এই অবস্থায় বিধানসভার সদস্যদের দাবী ব্যাপকভাবে ত্রাণের কাজ শুরু করা হোক।

রাজ্য সরকার এই অবস্থার কথা যে জানেন না তা নয়। তাঁরা এর প্রতিকারের জন্যে ব্যবস্থাও নিচ্ছেন। তবে অন্যান্য বছরে গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুর্গতির মোচনের জন্যে যেভাবে চেষ্টা করা হয় এ-বছর সরকার সে-পথে এগোতে চান না। এত দিন পর্যন্ত গ্রাম এলাকায় আকাল দেখা দিলে টেস্ট রিলিফ অথবা গ্রাটুইটাস রিলিফ দিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন, এ-বছর থেকে এই ধারা একেবারে বদলে দেওয়া হবে। রিলিফ দেওয়ার বদলে হবে উন্নয়নের কাজ। এই কাজ হবে প্রধানত দু মাস মে আর জুনে। এর জন্যে বরাদ্দ হয়েছে মোট পাঁচ কোটি সত্তর লাখ টাকা। রিলিফের সময় যে-সব কাজ হয় তাতে সাধারণত সংশ্লিষ্ট এলাকার কোনো পাকা লাভ হয় না তাই এবার স্থির হয়েছে উন্নয়নের কাজের মাধ্যমে দুর্গত মানুষের কর্মসংস্থানের। এই কর্মসূচী রূপায়ণে মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় এম এল এদের সাহায্য চেয়েছেন।

নির্বাচনের বাজনা

নির্বাচনের বাজনা এখন শুরু হতেই পারে, কারণ লোকসভার নির্বাচন হতে আর পুরো এক বছরও বাকী নেই। কিন্তু লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের বাজনাও বাজতে শুরু করেছে। গত বছরে যখন এই জল্পনা রীতিমত জমে ওঠে যে ১৯৭৫ সালের গোড়ায় লোকসভার আচমকা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে তখন এ-কথাও শোনা গিয়েছিল যে ঐ সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। আচমকা নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হলো না। কিন্তু বর্তমান লোকসভার আয়ু আগামী মার্চেই শেষ। সুতরাং তার আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে কি হবে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনও?

বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত বিধানসভার কংগ্রেস [illegible]

গুজরাটের রাজকোট জেলার তানকারা গ্রামে ত্রাণকার্য পরিদর্শন করছেন প্রধানমন্ত্রী

নিজেই এই জল্পনা আরো জোরদার করে তুলতে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেছেন, একই সঙ্গে রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভার নির্বাচন হলে প্রথমত সরকারের খরচ কিছুটা বাঁচে। দ্বিতীয়ত এক সঙ্গে নির্বাচন হলে নির্বাচনের আসরটা সরগরম হয় বেশী। সেই সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক কারণও দেখিয়েছেন। সেটা হলো, বিরোধী পক্ষ এখনও তেমন জোট বাঁধার সময় পায় নি, সুতরাং আসছে বছরের গোড়ায় বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কংগ্রেসেরই সুবিধে। অবশ্য আসছে বছরের গোড়ায় বিধানসভার নির্বাচনের কথাটা মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রস্তাব হিসেবেই রেখেছেন, বিধানসভার সদস্যদের মতামত জানতে চেয়েছেন। উপস্থিত সব সদস্য যে এই প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়েছেন তা নয়। অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ঐ সময় বিধানসভার নির্বাচন হলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশী হবে। তার একটা কারণ, কংগ্রেসের নিজের মধ্যে দলাদলি নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য সদস্যদের বলেছেন এখন আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করলে চলবে না, সামনেই নির্বাচন, সে-জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

কারাগারে গুলী

ঘটনার ধরণটা মোটেই নতুন নয়—সেই বন্দীদের কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার সময় কারাগারের প্রহরী- [illegible]

কয়েকজন জখম। শুধু ঘটনাস্থল আলাদা। এবার এই ঘটনা ঘটল হাওড়া জেলে। ৩ মে খুব ভোরের দিকে কয়েকজন বন্দী জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনা করে বলে প্রকাশ। হঠাৎ তারা জেলের এক প্রহরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তার চোখে ছিটিয়ে দেয় লঙ্কার গুঁড়ো। একজন বন্দী সেই অবসরে প্রহরীর কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে অপর ফটক খোলার চেষ্টা করে। ঐ প্রহরীটির চিৎকার শুনে অন্যান্য প্রহরীরা ছুটে আসে। তারপর বন্দী আর প্রহরীদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় সঙ্ঘর্ষ। ঐ সময় একটি বোমা ফাটে। তাতে আহত হয় একজন প্রহরী। এদিকে কয়েকজন বন্দী জেলের প্রধান গেটের কাছে পৌঁছে পালাবার চেষ্টা করছে। সেই সময় গেটের প্রহরী গুলী ছুঁড়তে শুরু করে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। গুলী এবং লাঠির আঘাতে পাঁচজন বন্দী নিহত হয়েছে। তা ছাড়া আহত হয়েছে চারজন। নিহতদের মধ্যে চারজন নাকি নকসালপন্থী। কয়েক মাস আগে তাদের আলিপুর জেল থেকে হাওড়া জেলে নিয়ে আসা হয়েছিল।

জেলের মধ্যে এইভাবে পাঁচজন বন্দী হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র পরিষদ ৫ মে তারিখে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। যুব কংগ্রেস সভাপতির মতে জেলের মধ্যে বিচারাধীন বন্দীদের হাতে বোমা-ছোরা ইত্যাদি কিভাবে পৌঁছয় তা রহস্যজনক। বন্দীদের হত্যা করার জন্যেই সরকার এই সব কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন। সমাজ-তন্ত্রী নেতা সমর গুহ এই বন্দী হত্যা সম্পর্কে তদন্তের দাবী করেন। এদিকে হাওড়ার জেলা শাসক জানিয়েছেন হাওড়া জেলে গুলী চালনা সম্পর্কে তদন্ত হবে।

শিল্পের হাল

পশ্চিম বাংলায় কয়েকটি শিল্পে যে সংকট দেখা দিয়েছে সে-বিষয়ে আলোচনা হলো রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা-পর্ষদের সভায়। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ শিল্পমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ তো বৈঠকে উপস্থিত ছিলেনই, তা ছাড়া ছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী রঘুনাথ রেড্ডি, বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। তবে এ আই টি ইউ সি আই এন টি ইউ সি এবং এইচ এম এসের প্রতিনিধিরা এই বৈঠক বর্জন করেন। এন এল সি সি নেতা লক্ষ্মী বসুকে এই বৈঠকে যোগদানে আমন্ত্রণের প্রতিবাদেই তাদের এই সিদ্ধান্ত। পাট, সুতীর কাপড় ওয়াগন, মোটর গাড়ী প্রভৃতি কল-কারখানার তৈরী পণ্যের চাহিদা পড়ে গেছে। ফলে ঐ সব কারখানায় শ্রমিকদের লে-অফ করা হচ্ছে, ছাঁটাইয়ের আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। আলোচনা হয় এই সমস্যা নিয়েই।

গোপালদাসবাবু এবং তরুণবাবু দুজনেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলেই পশ্চিম বাংলার শিল্পের এই হাল। এই রাজ্য এখনও দিল্লীর বৈষম্যমূলক নীতির শিকার। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা দেখান, গোটা দেশে কয়লা ও ইস্পাতের দর এক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার দাবী অনুযায়ী তুলোর দাম এক করা হয় নি। এর ফলে এই রাজ্যের কাপড়ের কলগুলো মার খাচ্ছে। ওদিকে রেল দফতর ওয়াগন তৈরীর কারখানাকে যথেষ্ট বরাত দিচ্ছে না। ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা মন্ত্রীদের এই অভিমতকে জোরালো সমর্থন জানান। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীরেড্ডি সব শুনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বৈঠকে ঠিক হয়, প্রতিটি শিল্পের সমস্যা বিশদভাবে পর্যালোচনা করে দেখবেন কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫।৫।৭৫ দেবদত্ত
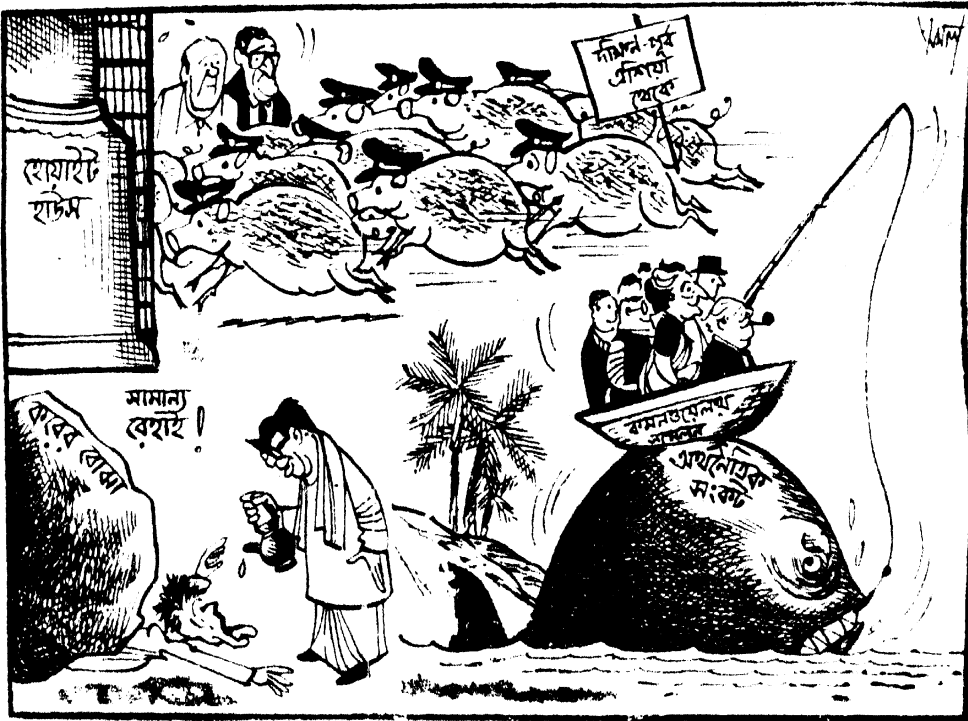
তারিখ ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল। সময় ভারতীয় ঘড়ি অনুযায়ী বেলা ৮-৯০ মিনিট স্থান সায়গন শহর। গোটা দশেক জিপ, ট্রাক ও সাঁজোয়া গাড়ি শহরের মধ্যে অবস্থিত প্রেসিডেন্টের বাসভবন ইন্ডিপেন্ডেন্স প্যালেস-এর সামনে এসে পড়েছে। প্রাসাদের ভিতর থেকে একজন সৈনিক ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল গাড়ি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রসাদচূড়ায় উড়তে দেখা গেল হলুদ তারকা খচিত নীল ও লাল রংয়ের পতাকা— দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পতাকা।

স্বভাবতই এই ঘটনা সবচেয়ে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে আমেরিকাকে। ভিয়েতনামের যুদ্ধে ৫৬ হাজার আমেরিকান সৈন্য মারা গেছে আরও ৫ লক্ষ আহত হয়েছে আমেরিকার খরচ হয়ে গেছে ১৫ হাজার কোটি ডলার। এই যুদ্ধ চালাতে গিয়ে মার্কিন সরকারকে নিজের দেশের তরুণদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক কথায় এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র দেশে এই একটি যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী, আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক [illegible] গেছে। আর এর বিনিময়ে সে দেশ কি পেল? চূড়ান্ত পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পোষা পুতুল সরকার তো ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হলই এমন কি তার নিজেকেও পালিয়ে আসতে হল নিতান্ত চোরের মত। এই চূড়ান্ত অবমাননার প্রতীক হয়ে থাকল অপারেশন টালন ভাইস-সায়গনের বাড়ির ছাদ থেকে এক হাজার মার্কিন নাগরিক ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাড়ে পাঁচ হাজার দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে হেলিকপ্টারে উদ্ধার করে নিয়ে আসার অভিযান। ভিয়েতনামের মাটি ছাড়বার সময় আমেরিকা এমন কি তার বশম্বদদের কাছ থেকেও কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে প্রচণ্ড ঘৃণা। যে ন্গুয়েন ভ্যান থিউ দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন আশ্রিত সরকারের প্রধান হিসাবে আমেরিকার পরম বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন তিনিও আজ মার্কিন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন।

আমেরিকার এই প্রকাণ্ড পরাভব এল এমন এক সময়ে যখন সেদেশ তাদের স্বাধীনতার দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে। আজকের অগৌরব যখন এভাবে ইতিহাসের গৌরবকে ম্লান করে দিচ্ছে তখন সমগ্র জাতির মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন জাগছে এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী খুব সহজ ভাষায় বলেছেন, প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের শক্তির তাৎপর্য বুঝতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভুল করেছিল বলেই তার এই দুর্দশা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব জেমস শ্লেসিঞ্জার খোলাখুলিভাবেই মার্কিন নীতির ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। মার্কিন সিনেটে সংখ্যাগুরু দলের নেতা মাইক ম্যানসফিল্ড বলেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যে যুগে পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে আমরা সৈন্য রেখেছি ও সব সমুদ্রে টহল দিয়েছি সেই যুগ অতঃপর শেষ হয়ে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ডঃ কিসিঞ্জার কিন্তু মনে করেন যে, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর পর থেকে মার্কিন সরকারের শাসন বিভাগ তার আইন বিভাগের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আইন বিভাগ পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করতে রাজি হয় নি এটাই আমেরিকার ব্যর্থতার কারণ।

অন্যদিকে ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত আমেরিকার বন্ধু দেশগুলিকে বিচলিত করে তুলেছে। কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে আমেরিকার সঙ্গে তাদের গাটছড়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুলে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। থাইল্যান্ডের ভয়, তার দেশের ভিতরকার বিদ্রোহীরা ভিয়েতনামীদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য পেয়ে এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। দেশের ভিতরকার মার্কিন ঘাটিগুলি এই বিদ্রোহ দমনে সাহায্য না করে বরং তাতে উস্কানী যোগাতে পারে। সেই কারণে থাইল্যান্ড এক বছরের মধ্যে সমস্ত মার্কিন ঘাটি ও মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার দাবী করেছে। এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেকজন এত সালের অনুগত বন্ধু ফিলিপিনসের প্রেসিডেন্ট মার্কোস ও এতখানি বেঁধে বসেছেন যে ভিয়েতনাম থেকে পালিয়ে আসা মার্কিন জাহাজ ফিলিপিনসে ভিড়লে ঐ জাহাজের আরোহী দক্ষিণ ভিয়েতনামের হোমরাচোমরা সরকারী ও সামরিক নেতাদের ফিলিপিনস সরকার গ্রেপ্তার করবেন। আমেরিকার উপর খুব বেশী আস্থা রাখতে পারছে না দক্ষিণ কোরিয়াও। তার আশঙ্কা বিভক্ত দেশকে পুনরায় এক করার জন্য উত্তর কোরিয়াও এখন উত্তর ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। সম্প্রতি ভারত সফরে এসে দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ জো কিম এই ধরনের কথাই বলেছেন।

ভিয়েতনামে মুক্তিবাহিনীর এই সাফল্যের একটা আশু ফল দেখা যাচ্ছে এই যে, আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনগুলি ভিয়েতনামের মুক্তি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। জামাইকার রাজধানী কিংস্টনে কমনওয়েলথ দেশগুলির এবারকার শীর্ষ সম্মেলনে আফ্রিকা প্রসঙ্গ একটি বড় স্থান অধিকার করেছিল। আফ্রিকার বুক থেকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকুও যখন লোপ পেতে চলেছে এবং ভিয়েতনাম যখন মুক্তিকামী মানুষদের অজেয় শক্তির প্রমাণ দিয়েছে তখন জিমবাবওয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার কালো মানুষগুলি শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব ও বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়ে রয়েছেন। কিংস্টনে আফ্রিকা ও এশিয়ার নেতারা এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, এই অবিচার আর সহ্য করা হবে না। তানজানিয়ার ডঃ জুলিয়াস নায়েরেরে রোডেশিয়ার বেআইনী ইয়ান স্মিথ সরকারকে এই বলে চরমপত্র দিয়েছেন যে, হয় তাঁরা ছয় মাসের মধ্যে সংখ্যাগুরু শাসন মেনে নিন, না হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান আফ্রিকার মানুষদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

•

সায়গনের মুক্তির কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভারত অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

এদিকে ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীসহ আমাদের দেশের কয়েকজন নেতা যে সব মন্তব্য করেছেন সেগুলি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ভারতে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম স্যাক্সবি এই বলে অভিমান প্রকাশ করেছেন যে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব রক্ষা করার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে না। মার্কিন সরকারী মহল থেকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভারতের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তাঁর প্রস্তাবিত ভারত সফর স্থগিত রাখতে পারেন।

কিংস্টনে একটি বিবৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারত-মার্কিন সম্পর্কের এই অবনতি ঠেকাবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ তার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করার চেষ্টা করে যাবে। তিনি বলেন বহিঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সময়েই বন্ধুত্বের জন্য চেষ্টা করে যেতে হয়। আমরা হয়তো কোন একটা দেশের সঙ্গে সব বিষয়ে একমত হতে পারি না, কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি আমাদের খুঁজে বের করা উচিত।

পুণ্ডরীক

সুচিত্রা মিত্র

কথার অনবদ্য অবদানই ত রবীন্দ্র-সংগীতের সম্পদ। ভাষার ভেতর দিয়ে ভাষাতীতকে কেমন করে প্রকাশ করা যায় তারই উত্তর রবীন্দ্রসংগীত।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের মত রবীন্দ্রসংগীতেরও এক বিশিষ্ট মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে শ্রীযুক্তা সুচিত্রা মিত্রের মাধ্যমে। তাঁর পদ্মশ্রী প্রাপ্তি রবীন্দ্রসংগীতের গৌরবের সিংহাসনে অধিষ্ঠান—এই কথাটিই গত বছর রবীন্দ্র-সংগীতানুরাগীদের মুখে মুখে ফিরেছে। কথাটির সত্যতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু বলব পদ্মশ্রী সুচিত্রা মিত্রর চেয়ে অনেক বড় শিল্পী সুচিত্রা মিত্র। শুধু বড়ই নন; আকর্ষণীয়াও। পদ্মশ্রী সুচিত্রা মিত্র যেন জ্বলজ্বলে নিয়ন লাইটের নীচে দাঁড়ানো এক ভি আই, পি—যাঁর কাছে এগোতে হয় সংকুচিত হয়ে। আর **'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'** গাওয়া সুচিত্রা যেন যেন মেঘলা আকাশের স্পর্শ মাখা এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার মতই শ্রোতাদের অন্তরকে হঠাৎই ছুঁয়ে ফেলেন। সুচিত্রার জড়তাহীন কন্ঠের মত তাঁর গায়কীও স্বচ্ছ, স্পষ্ট; প্রখর দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর গানের বক্তব্য যেন তীরের মত সোজাসুজি মর্মকে বিদ্ধ করে। নির্দ্বিধায় তিনি গহন রাতের আর্তি প্রকাশ করেন 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে'—স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করেন 'কার মিলন চাও বিরহী?' অনায়াসদক্ষতায় তিনি ব্যঞ্জনাময় করেন, 'ফাগুন মাসের উতলা নিঃশ্বাস' 'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে তাই সহস করে দিলাম বিদায়'। মুক্ত, দীপ্ত ঋজু ভঙ্গিতে যেন তিনিই আবার সঙ্গীতলক্ষ্মীর কাছে স্বীকার করেন 'তোমার আমার এই যে মিলন নিতান্তই এ-সোজাসুজি।'

ঝড়ের বেগে আবির্ভূতা ও নিষ্ক্রান্তা গতিচঞ্চল সুচিত্রা মিত্রের বিরামহীন কর্ম-জীবন। শুধু গায়িকাই নন; নৃত্যনাট্যের একাধারে স্রষ্টা, প্রযোজিকা, পরিচালিকা, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা; প্রায়শই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে দেশ-দেশান্তরে ভ্রাম্যমানা কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই উদ্ভাসিতা। হাজারো ব্যস্ততা ও কাজের ভীড়ে মুহূর্তের জন্য ওঁর সঙ্গে দেখা হলে অন্তরের উপচে-পড়া আনন্দের জোয়ার স্বল্পপরিচিতের অন্তরেও যেন ধাক্কা দেয়।

'এত আনন্দ কোথা থেকে পেলেন?' জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে

আনন্দময়ের গানের প্রবাহ থেকে আর কিছু সংগ্রহ করতে পেরেছি কিনা জানি না কিন্তু ঐ একটি জিনিস কেমন করে আমার সকল দুঃখকে আলো করে দিয়েছে জানতেই পারিনি।'

জানতে চেয়েছিলাম সব গান সমান দক্ষতায় পরিবেশন করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই জীবনসঙ্গীতরূপে বরণ করে নেবার কারণ কি?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কালোচ্ছলা যেন আবেগে ছলছলিয়ে ওঠেন—বাবা, মা উভয়েরই আমার গান সম্বন্ধে আগ্রহের অন্ত ছিলো না। কিন্তু ঠিক কোন গান আমার সঙ্গীতের প্রকাশবাহন হবে সে সম্বন্ধে কোনো মতামতই তাঁরা প্রকাশ করেননি। শ্রদ্ধেয় পংকজ মল্লিকের আগ্রহাতিশয্যেই শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম।

১৯৪১ সালের ২৭ আগস্ট ২০ টাকার এক স্কলারশিপ পেয়ে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনে যোগ দিলাম। তার মাত্র ২০ দিন আগে গুরুদেবের অন্তর্ধান ঘটেছে।

মনে পড়ে জোড়াসাঁকোতে কতদিন কত উৎসবে বাবার সঙ্গে কবির কাছে গেছি। গানও শুনেছি। অবাক হয়ে দেখেছি সেই ঋষিতুল্য রূপ, সাগরের মত গভীর দুটি চোখ। খুব কাছে থেকেও যেন কত দূরের মানুষ। আর দূরের বলেই হয়ত আরো আকর্ষণীয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতুম অন্য সব গানের মতই এ গানও ভালো লাগত। বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবার মত মন তখনও তৈরী হয়নি। তারপর শান্তিনিকেতনে যখন সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হোলো তখনই বুঝলাম 'মধুর তোমার শেষ নাহি যে'। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শেখাতেন ভি. ভি ওয়াজেলিয়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতাম শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর কাছে।

এঁদের সবার কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম। তবু বলব রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরপ্রবাহী রসধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন শান্তিদা। ওঁর গায়কী এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে একটা পরিবেশ যেন আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে যায়।

তখন কবি সবে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু অস্তমিত রবির আলো যেন শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে, বাসিন্দাদের মনে ছড়ানো। সে আভা আমার মনেও প্রতিফলিত হোলো বই কি।

রাগসঙ্গীত শিক্ষার পর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে গিয়ে দেখি এ গানেও রাগ আছে, সুরের আকাশচারী ভাবের বিস্তার আছে আর আছে কথা। কথাকে বাদ দিয়ে বাংলা গানের চিরকুমারব্রত গ্রহণ করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কথা এখানে সুরের পায়ে শৃংখল হয়ে ওঠেনি। হয়েছে অপরিহার্য বাহন—যার মধ্যে সুরের আকুতি পথ খুঁজে পেয়েছে।

প্রথম যখন কবির গান গাইতাম, কেমন একটা না-বোঝা ব্যাকুলতায় মনটা দুলে উঠত। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যখন পরিণত হয়ে উঠলো তখনই যেন আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে উঠলো কবির গানের অনন্য দর্শন। এর মধ্যে রাগ আছে। তবে সেটা পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্যে নয়। ভাবের অন্তরপ্রবাহী রসধারার মত তার অনুসারী রাগ যেন আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে ভাষার প্রাঙ্গণে।

'একটা কথা'—শিল্পীকে যদি বাধা দিয়ে অসংকোচে প্রশ্ন করি—'কথা যদি বাদ দেওয়া যায় তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি যা সর্বদেশের, সর্বকালের সকল মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে? যেমন ধরুন জৌনপুরী রাগের ওপর সুনন্দা পট্টনায়কের বিখ্যাত রেকর্ডটি 'শ্যামসুন্দর অব হো নেহি আয়ে।' এ গানের কথা বাদ দিয়ে শুধু সুরটিও যদি যন্ত্রে বাজানো যায় তাহলেও একটা অনির্দেশ্য ব্যথায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে কোনো পদ যেমন ধরুন 'অনেকদিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন দেলে'—এখানে কথা বাদ দিলে কেবল যদি সুরটি বাজে হবে শুধু 'গাগারেমা, গাগারেসা' স্বরধ্বনিতে কোনো ভাব মনে জাগে কি?'

'কথার অনবদ্য অবদানই ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্পদ। ভাষার ভেতর দিয়ে ভাষাতীতকে কেমন করে প্রকাশ করা যায় তারই উত্তর রবীন্দ্রসঙ্গীত। যেমন ধর 'শ্রাবণ ঘন-গহন-মোহে' গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের মায়ায় মনটা হারিয়ে যায় না কি? এবং এ শুধু কথারই যাদুতে। অথচ এ গানে সুর নেই রাগ নেই এ কথা বলা যায় না। সবই আছে। কিন্তু কিছুই আরোপিত নয়। এসেছে বাণী-বিস্তারের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে। কথা এখানে বন্ধন নয়। সুরের মুক্তি ঐ কথাতেই। অন্য একটা গানের কথা ধর। 'তুমি রবে নীরবে' এর অন্তরায়

'মম জীবন-যৌবন
মম অখিল ভুবন'

দ্যাখ 'জীবন-যৌবন'তে সুরটা ক্রমশঃ তারসপ্তকের দিকে এগোচ্ছে কিন্তু 'অখিল ভুবনে-তে' গলাটা কতটা ওপরে উঠে তা বিরাট হয়ে যেন ব্যাপ্ত হয়ে গেল। কেন? 'ভুবন' কথাটা কতবড় সেইটেই যেন বোঝাবার জন্য। সুর ও কথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে যেন বিরাটের ছবিখানি রচনা করেছে।

কথাকে কথা বলাতে সবাইত পারে না। তিনি পেরেছেন। তাই তাঁর গান বাণীসম্পদে এমন অনন্য হয়ে উঠেছে।'

'এইজন্যই কি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে একান্তভাবেই আপনার নিজের গান বলে বরণ করেছেন?'

'শুধু এইজন্যই নয়। আমাদের পরিবেশ, ঋতুবদল এবং সকাল থেকে শুরু করে রাত অবধি প্রতি প্রহরের একটা নিজস্ব মেজাজ আছে। রংও আছে। আমরা আমাদের পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টিছাড়া জীব নই। এই পটভূমিকার ভাষাকে উপলব্ধি করে তারই ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে না চললে সবই হয়ে ওঠে অবাস্তব। কাব্য ও গান রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠেছিলো [illegible] এই বাস্তববোধ সঙ্গীতেও এনেছিলেন। প্রকৃতি ও তার রূপবদলের মাধুর্যে [illegible] আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন তিনিই।

'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো' 'আমার কি বেদনা'—এসব গানে যেমন বর্ষার নিজস্ব ভাব মুখর হয়ে উঠেছে—তেমনই আবার ফাগুনের রং লেগেছে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'কিশোর ওগো' এতদিন যে বসেছিলেম এমনই আরো কত গানে। সব ঋতুর সৌন্দর্যের মর্মমূলে আর কোনো কবি এমন করে প্রবেশ করেননি, আর তার রসরূপটিও এমন অপরূপ মায়ায় মেলে ধরেননি।' দুহাত দিয়ে দুচোখের অবিরল ধারা মুছতে মুছতে—অপ্রতিভ হাসি হেসে শ্রীমতী মিত্র বললেন 'আমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল ভাই—বিশেষ করে গুরুদেবের প্রসঙ্গে। তাঁর কথা উঠলে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না। তাই সহজে এসব আলোচনার মধ্যে যাই না। খুব আপনার বলে মনে না হলে কারো কাছে মুখ খুলি না।

'এই মনের পরশটুকুই আমার উপরি

'আর কি জানতে চাও বল'—বর্ষণাসক্ত আকাশে সাতটি রঙের ইন্দ্রধনুর মতই যেন চোখের জল-মাখা রঙিন হাসি ঝরিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'রবীন্দ্রসংগীত বলতে অনেকেই বোঝেন চাপা গলার এক কৃত্রিম সুর। কিন্তু আপনার গানে ত খোলা গলার মুক্ত আবেগের জোয়ার। এই গায়কীর প্রেরণা পেলেন কোথায়?'

'শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রসঙ্গে চাপা গলার আইডিয়া লোকের মনে কেমন করে আসে বুঝতে পারি না। শান্তি-নিকেতনের মুক্ত আকাশ দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর অকৃপণ হাওয়া সবই ত প্রাণ খুলে গাইবার দুর্নিবার ইচ্ছেয় মনকে পাগল করে তোলে। ওখানের চারপাশের পরিবেশ দেখে ভাবতাম অমনই উদার ছন্দে কবে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারব? তোমার কথার ঠিক জবাব দিতে পারলাম কিনা বুঝতে পারছি না।'

'এর চেয়ে প্রাঞ্জল জবাব হয় না। এখনকার শ্রোতা ও শিল্পীদের সম্বন্ধে কিছু বলবেন?'

'আগে শিল্পীরা গাইতেন আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়। শ্রোতারাও শুনতেন নির্বিচার শ্রদ্ধায়। এখনকার শ্রোতারা বড় বিচারপ্রবণ, শিল্পীরাও তাই সচেতন হয়ে উঠছেন এবং অমার আপত্তি সেইখানেই।

কেন সব সময় অত বিচার করে, হিসেব করে শিল্পীকে চলতে হবে?

জনপ্রিয় হবার তাগিদে শিল্পী কেন শ্রোতাদের পছন্দ-অপছন্দের দিকে চেয়ে গান গাইবেন? শ্রোতাদের রুচির পর্যায়ে নেমে না এসে কেন মহৎ কল্পনার রাজ্যে শ্রোতাদের মনকে পৌঁছে দেবেন না? প্রতি-দিনের গ্লানিমলিন মনে কেন আকাশের স্বপ্ন জাগাবেন না? সকল বাধানিষেধের সীমা অতিক্রম করে শিল্পী কি একবারও শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন না? টেকনিকের মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু টেকনিক-সর্বস্ব হয়ে উঠলে গানের মধ্যে রসের ধারা শুকিয়ে যায় না কি?'

একটু থেমে চিন্তিত সুরে শ্রীমতী মিত্র বললেন 'তাছাড়া আজকের জীবন বড্ড ফাস্ট। একদিন হেমন্ত ঠাট্টা করে বলেছিলো 'এরপর সাড়ে তিন মিনিটে নয়, ১৫ মিনিটে ১৫ খানা গান গাইতে হবে'। কথাটা ঠাট্টা হলেও একেবারে মিথ্যে নয়। আজকের দিনের শ্রোতারা বড় চঞ্চল এবং স্বভাবিক কারণেই এই চাঞ্চল্যের ছোঁওয়া শিল্পীর গানেও লেগেছে।'

'শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে আপনাকে সংগ্রাম করতে হয়নি?'

'বিধাতার ইচ্ছেয় বাধা বলতে যা বোঝায় তার সম্মুখীন আমায় কোনোদিন হতে হয়নি। গান গাওয়া শুরু করতে না করতেই প্রেস থেকে শুরু করে বিদগ্ধমহল অবধি যেভাবে আমার প্রেরণা যুগিয়েছেন খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই তা জোটে। এখন শুনছি সংগীতের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও ঈর্ষার প্রশ্ন। আমার গান শুরু হবার প্রথম পর্ব থেকে এখন অবধি আমি, জর্জ, হেমন্ত মোহর সবাই একই যুগের শিল্পী হিসেবেই গাইছি। কই আমাদের মধ্যে প্রীতির বাঁধন ত কোনো দিন শিথিল হয়নি?'

'এখন সংগীত শিক্ষার সুযোগ বহুধা-বিস্তৃত। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও অনেক সহজ। তবু সত্যিকারের ভালো শিল্পীর সংখ্যা এত কম কেন?'

'বাধা না থাকলে কোনো কাজে নিষ্ঠা আসে না। তাছাড়া কার সার্থকতা কোন পথে সেটাও নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। অন্যকে নকল করে বড় হওয়া যায় না। ধর কোনো শক্তিমান শিল্পী তাঁর মৌলিক সংগীতভাবনা ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনের জোরে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনাকে জয় করে আপন সংগীত ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন তা বলে প্রতিভার অধিকারী না হয়ে অন্ধভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে গেলে কি কেউ ও-জায়গায় পৌঁছতে পারবেন? কানন দেবী, সায়গল মাত্র দু-চারখানি গান গেয়েও আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের একসপ্রেশনের অনন্যতার কারণে।'

'আপনার প্রথম হিট সং কি?'

মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। 'কৃষ্ণকলি' অনেক পরে গেয়েছি। শুনলে আশ্চর্য হবে শান্তিনিকেতনে যাবার আগেই আমি রেকর্ড করার অফার পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি রাজী হইনি। কিছু শিখিনি, কিছু জানি না। রেকর্ড করব কোন মূলধনে? কিন্তু এখনকার শিক্ষার্থীরা ভালো করে শেখবার আগেই পাবলিসিটির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার ফলে পরিণতবোধের অভাবে তাঁদের গান আবেদনহীন হয়ে পড়ে। কত প্রতিভার এইভাবে অংকুরেই বিনাশ ঘটে।'

অনেকের অভিযোগ আছে রবীন্দ্র-সংগীতের একঘেঁয়েমোর বিরুদ্ধে। বলেন, এ গান প্যানপেনে এর জবাবে কি বলবেন?

এর জবাবে এই কথাই বলব রবীন্দ্রনাথ এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাঁর কাছে সুখদুঃখ বিরহ-মিলন কোনোটাই ব্যক্তিগত হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিক হয়েও তা নির্ব্যক্তিক। সীমার মধ্যে অসীম, বাঁধনের মধ্যেও মুক্ত। সেই মুক্ত মনের ধারাকে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের গ্রন্থিতে বাঁধতে তাকে একঘেঁয়ে করে ফেলি। এ দৈন্য রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদের মনের।

আর একটা কথা। রবীন্দ্রসংগীত অথবা হিন্দুস্থানী সংগীত কোনটাকেই ভালমন্দের সীমায় চিহ্নিত করা যায় না। আমি রবীন্দ্রসংগীত গাই তবু আলি আকবরের সরোদ শুনে চোখে জল আসে। একবার সুনন্দা পট্টনায়কের গান শুনে-ছিলাম। মনে হয়েছিলো সেতারের ঝালা যেন কণ্ঠে ঝংকৃত হচ্ছে। ... স্পষ্ট এমন সুরেলা। সবকিছুই নি... করে শিল্পীর পরিবেশনার ওপর। তাই ত বলি মনটা আগে তৈরী হওয়া চাই। আধার বড় না হলে সেই বিরাটকে ধরাব কোথায়?

সন্ধ্যা সেন

ত্রয়োদশী মরিয়মের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। মধ্যে মধ্যে ওর কাছে যাই গল্প শুনতে। করতে নয় শুনতে। গল্প ও জানে অনেক আর বলার কায়দাও ওর করায়ত্ত—কণ্ঠায়ত্ত! ওর গল্পভাণ্ডারে আছে স্কুলের গল্প, বাড়ির গল্প, কোরান শরিফের গল্প। কোরান শরিফের সরস গল্পাংশ অবশ্য অল্প, যদিও—এই অমুমিন অধমের বিচারে—অধিকাংশ সুরার শীর্ষনাম একান্ত কাব্যিক ও রোমাঞ্চকর: বজ্রপাত ভূমিকম্প পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা... রজনী, উষা, অপরাহ্ন নৈশ যাত্রা মহাসংবাদ, তাঁর উত্তরীয় আবৃত। কোরানের সর্বোৎকৃষ্ট কাহিনী—কোরানেরই স্বীকৃতিতে—ইউসুফের সুরাতে মেলে। মরিয়ম শুরু করল:

হজরৎ ইয়াকুবের ছিল চার বিবি আর বারো আওলাদ—পুং সন্তান। না, মেয়ের ঝামেলা তাঁর ছিল না আর আমারও, জানেন, শুধুই ছেলে হবে তবে এক ডজন নয়! মেয়েদের সুন্দর সুন্দর জামা পরাতে যেমন আনন্দ, তেমনি ফেসাদ...আর খরচ...আর দুঃখ বিয়ে দিতে। ইয়াকুবের ছোট বিবির বড় ছেলের নাম ইউসুফ—হজরৎ ইউসুফ। ইউসুফের প্রতি বুড়ো বাপের দুর্বলতা ছিল। বৃদ্ধদের স্নেহের ধরনধারণ বোঝা ভার...এই ধরুন আমাদের বাড়ি: আমার বুবু মনোয়ারা আমার আব্বার ফেভরিট; চাচাদের বাড়িতে কিন্তু উল্টো: ওদের কনিষ্ঠ পুত্র নাসের-ই ওদের কলিজার টুকরো। ছেলেটি অবশ্য জন্মান্ধ।

সহোদর বেঞ্জামিন ছাড়া ইউসুফের যাবতীয় ভাই ইউসুফকে দেখতে পারত না। ছেলেটির দোষ? আব্বার কাছে ও চুকলি কাটত, আর তার উপর ও আবার অদ্ভুত আপত্তিকর সব খোয়াব দেখত। একদিন এক খোয়াবে ও দেখল, সূর্য চাঁদ আর এগারোটি তারা ওকে সেজদা করছে। সেজদা মানে প্রণিপাত...ও-সব আরবী শব্দ আপনারা বুঝবেন না, আমি কিন্তু ধর্মক্লাসে শিখেছি, এই ধরুন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ...অর্থাৎ আল্লা ছাড়া অন্য দেবতা নেই আর মহম্মদ আল্লার রসুল। হ্যা, হ্যা, রসুল কথাটাও বোঝেন না? রসুল মানে প্রেরিত: ইব্রাহীম হলেন নবী সিকান্দার হলেন রসুল মুসা ঈসা ও মহম্মদ নবীও বটেন, রসুলও বটেন...প্রশ্নটা পরীক্ষায় এসেছিল কিনা আর ধর্ম পরীক্ষায় আমি বরাবরই ফার্স্ট!

ইউসুফের খোয়াবটার অর্থ সহজবোধ্য; তার ভাইয়েরা বুঝলও। বুঝে স্থির করল আপদটাকে সরাতে না পারলে বাড়িতে আর শান্তি নেই। একদিন বেরিয়ে যাচ্ছিল সবাই মেষ চরাতে, ইয়াকুবকে গিয়ে তারা বলল: 'ইউসুফ এবার বড় হয়েছে; লেখাপড়া

করবে না, কাজও করবে না, সেটা কি হয়? আলস্য শয়তানের বীজ—আপনি বরং ওকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন খামারের কাজ শিখুক।' ইয়াকুব বললেন, 'আচ্ছা।'

মেষ চরাতে চরাতে তারা দেখল এক জঙ্গলময় জনমানবহীন প্রান্তরে বাঁশবনের মধ্যে জলশূন্য এক সংস্কারাতীত কূপ। ইউসুফের কোমরে এক দড়ি বেঁধে তারা ওকে কুয়োতে নামাল, কিন্তু সাবধানে, ওর কোনো হাড় যাতে না ভাঙে। শত্রুতার সীমা আছে : বেচারী না খেয়ে না দেয়ে এমনিই মারা যাবে ওর হাত-পা তারা আবার ভাঙতে যাবে কোন দুঃখে? তারপর ওরা খেতে বসল—সঙ্গে-নিয়ে-আসা নান রুটি আর সদ্য-জবাই-করা ছাগলের কাবাব। খেয়ে উঠে তারা ইউসুফের জামাটা ঐ ছাগলের টাটকা রক্তে চুবিয়ে রোদে শুকিয়ে নিল।

ঘরে ফিরে আব্বাকে তারা গিয়ে বলল : 'আপনার ঐ দস্যি ইউসুফের কি হল বুঝতে পারছি না। দুপুরে আমরা বিশ্রাম-ছলে কপাটি খেলছিলাম, ইউসুফ তো আর খেলতে জানে না, তাই একটু দূরে বসে আমাদের জামাগুলো পাহারা দিচ্ছিল। খেলার পরে দেখি আমাদের জামা-জুতো সবই ঠিক আছে, কিন্তু ইউসুফ নেই। ঝোপে-ঝাড়ে কত খুঁজলাম কোনো হদিস মিলল না, শুধু এই জামাটি ছাড়া : দেখুন দেখি সেটি আপনার ছেলের জামা কি না?' জামাটি দেখে বুক চাপড়ে ইয়াকুব হায় হায় করে উঠলেন : 'আমার ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে গো, নেকড়েয় খেয়েছে!...ইয়া হামিদ, এ-জীবনে আমার আর কোনো সুখ নেই।' তাঁর বাড়িতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না কিনা, থাকলে বুঝতেন লালচে দাগগুলো নেকড়ের নয়, ছাগলেরই রক্তের দাগ। শাহনাজ বহেন, বিজ্ঞানের ক্লাসে আমাদের ও-সব শেখান, মজা লাগে শিখতে!

ইউসুফের কিন্তু মজা লাগছিল না!! অন্ধকার তখন আসন্ন : কোন গাছে বসে ডাকতে থাকে প্যাঁচা কোন ঝোপে ওৎ পেতে আছে বাঘ...হঠাৎ মাথা তুলে চাঁদের ফ্যাকাসে আলোতে ইউসুফ দেখে কুয়োর কিনারায় বিদেশীর মতো দেখতে এক যাযাবরের মুখ। শুকনো কুয়োতে লোকটি যেই বালতি নামাতে যাচ্ছে, ইউসুফ কম্পিত স্বরে কি যেন চেঁচিয়ে উঠল। ও যে কি বলল, ওর নিজেরই অবশ্য তা খেয়াল নেই আর মানুষটিও—ভিন্নভাষী সে—কিছুই বুঝল না। বালতিটা ওখানে রেখে সঙ্গীদের কাছে এসে থর থর করে কেঁপে সে বলল, 'কুয়োতে জিন আছে।' অন্যেরা জিগ্যেস করল, 'নিজের চোখে দেখেছ?' লোকটি বলল 'নিজের কানে শুনেছি!!' ওরা তখন তাকে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে ঘুমিয়ে শুইয়ে তীর আর ধনুক, শাবল আর লণ্ঠন সঙ্গে করে সদলবলে কুয়োতে এসে হাঁকল, 'কৌন হ্যায়?' ওদের কথা না বুঝলেও কথার আমিরসুলভ সুরে ইউসুফ বুঝল, বলল 'মেহেরবানি করকে আমাকে তুলে নিন!' ইউসুফের জবাব না বুঝলেও ওরা বুঝল কথাগুলো জিনোচিত নয়। জিনেরা, জানবেন, নাকি সুরে কথা বলে।

যাযাবরেরা দেখল বিনা পয়সায় প্রাপ্ত মালটা হৃষ্টপুষ্ট আর খুবসুরত। ইউসুফকে তুলে বান্দা করে তারা ওকে বিক্রি করল মিশর দেশের ফারাওর রাজসভার এক সদস্যের হাতে। লোকটির নাম কিৎফির, বৌয়ের নাম জেলেখা। কবি গরীবুল্লার 'ইউসুফ-জেলেখা' নামে এক কাব্য আছে আব্বার লাইব্রেরীতে পাবেন। কবি ইউসুফের দুঃখ বর্ণনা করছেন, শুনুন : 'আসমান জমিন কান্দে। সূর্য আর তারা কান্দে। ফেরেস্তা ও কান্দে হুরপরী.....' ছন্দের নাম 'দীর্ঘ ত্রিপদী' মোবারক স্যার আমাদের শিখিয়েছেন......উনিও কবিতা লেখেন কিনা, তবে ক্লাসিক্যাল কবিতা নয় আধুনিক, অর্থাৎ মিল নেই ছন্দ নেই এবং (আব্বার মতে, কিন্তু বলতে নেই) মাথা-মুণ্ডু নেই।

ইউসুফ ছিল নম্র, ভদ্র, পরিশ্রমী, সেবাপরায়ণ এক কথায় আজ কালকার দিনের আব্বা-আম্মারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের যা-যা হতে উপদেশ দেন (তাঁরা একেক সময় জানেন, একঘেয়ে লাগে শুনতে) তাই ছিল ইউসুফ।

কিৎফির সাহেব—আর জেলেখা বিবিও—তাঁদের এই নতুন কেনা নম্র, ভদ্র, পরিশ্রমী ও সেবাপরায়ণ বান্দাকে খুব ভালো-বাসতেন, বিশ্বাসও করতেন। ইউসুফের কাছে থাকত বাড়ির যাবতীয় চাবি, ভাণ্ডারের চাবি, খাওয়ার ঘরের চাবি, অন্দরমহলের চাবি...

জেলেখার জন্মদিন উপলক্ষে জেলেখা তাঁর যাবতীয় বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করলেন। মিশরীয়েরা—আর মিশরীয়ারাও—সাহেবি কায়দায় খায়, কাঁটা ও ছুরি দিয়ে।

পরিবেশনরত ইউসুফকে দেখে, তার সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে মহিলারা নিজেদের আঙুল ছুরিতে এমন কাটল আর কাঁটাতে এমন বিঁধল যে কিৎফিরের বাড়ির ডেটল-এর শিশিটা ফুরিয়ে গেল। মহিলারা যেন ইচ্ছে করেই নিজেদের জখম করতে মেতে উঠল—খুবসুরৎ ইউসুফের পরিচর্যার লোভে।

ক্রমে ক্রমে ইউসুফ বুঝল, ওর মনিবের বউ ওর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। খুব সাবধানে চলতে লাগল। কিন্তু কি আর করে বেচারী? বান্দা তো : জেলেখা ডাকলে, যেতে হয়। জেলেখা ঘন ঘন ডাকতে শুরু করল। অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে। বিনা কারণে।

একদিন ইউসুফের জন্য ফাঁদ পেতে তিনি ঘরের দরজায় খিল মেরে ওর কাছে বেসরমের মতো প্রেম নিবেদন করলেন। বান্দা হলে কি হবে, ইউসুফ নবীও বটে: শান্ত কণ্ঠস্বরে বোঝাতে লাগল আল্লার দৃষ্টিতে প্রস্তাবিত পাপের জঘন্যতা, কিৎফিরের প্রতি ক্রীতদাসের নিমকহারামির কদর্যত্ব। কামদগ্ধা জেলেখা কিছু শুনলেন না, ইউসুফকে জড়িয়ে ধরতে শুরু করলেন। তাঁর বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে দরজার দিকে দৌড়োল ইউসুফ, ওর পিছনে ছুটলেন পাপিষ্ঠা। ইউসুফকে আটকাতে পারলেন না, তবে আক্রোশের প্রতিফলস্বরূপ তাঁর হাতে রইল ওর ছিঁড়ে যাওয়া জামার এক ছিন্ন অংশ। স্বামীর কাছে গিয়ে কান্নাভরা জেলেখা কাপড়টা দেখিয়ে বললেন, "তোমার বান্দার কাণ্ড দেখ : তোমার বউয়ের ইজ্জতের পর্যন্ত ওর কাছে কোনো দাম নেই!"

কিৎফির সন্দিগ্ধচিত্ত : বউকে অবিশ্বাস করতে তিনি সাহস পান না আর এছাড়া তো জেলেখার হাতে ঐ ছেঁড়া কাটা প্রমাণ... ভাবতে লাগলেন যথোচিত শাস্তি ও প্রতিশোধের কথা : শূলে, ফাঁসি, ঠিক সেই সময়ে তাঁর ভালোবাসার সেই হাসিখুশি তাঁর ছোট শালী এসে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ জানতে পেরে বলল : "ভগ্নীপতি মহাশয়, এই অধমার প্রতি বিশ্বাস করে কাপড়ের টুকরোটা একবার ভালো করে দেখে আসুন, সঠিক বিচার করতে শিখুন : সামনের দিকের কাপড় হলে বুঝবেন, আপনার বান্দা নিঃসন্দেহে আক্রমণকারী ও অপরাধী; কিন্তু পিছনের দিকের কাপড় যদি হয়, তাহলে জানবেন, সে পালাতে চেষ্টা করছিল, আপনার সহধর্মিণীর নির্লজ্জ আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, সুতরাং তিনিই অপরাধিনী।" কিৎফির গিয়ে দেখল, টুকরোটা পিছনের দিকের...

মরিয়ম একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই হল আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থের একটা গল্প। আরও যদি পড়তে চান, আব্বাকে বলুন, তাঁর লাইব্রেরিতে শরদিন্দুর এক গাদা বই আছে।"

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঝিন্নির অনুমান যে নির্ভুল তা প্রমাণিত হল পরের দিন। আউটহাউসে বসে ব্যবসার কথা শুনতে শুনতে আসল কথাটা তুললাম। চাচা নরসিংলালজী আমার মুখ থেকে কথাটুকু খসামাত্রই রাজী হয়ে গেলেন। নিজে যেতে পারছেন না বলে অসহায়ের মত সংকোচ দেখিয়ে ঝিন্নির কৃতিত্বের তারিফ করলেন। ঝিন্নি সঙ্গে থাকলে তাঁর চেয়েও যে সবদিক থেকে ব্যবস্থা ভাল হবেতা জানালেন।

তবু একবার বললাম, ডিসেম্বরে আপনাকে না হয় টানাটানি নাই করলাম কিন্তু এপ্রিল মেণ্ডে যদি নাগপুরে যাই, তখন কিন্তু আপনি না করতে পারবেন না।

চাচাজী অমনি বললেন, আলবৎ যাব। কাজকাম তখন কমতি থাকবে যাবার কোই মুশকিল থাকবে না।

রাতে আবার ঘরে এল ঝিন্নি। বলল, কিছু কথা হল চাচাজীর সঙ্গে?

গম্ভীর মুখ করে বললাম, চাচাজী রাজী হয়ে গেছেন। সামান্য কি কাজ আছে, সেটুকু এর ভেতর শেষ করেই আমার সঙ্গে বেরোবেন।

ঝিন্নির গলায় বিস্ময় ভেঙে পড়ল চাচাজী এ সময়ে বেরোবেন! আপনাকে সত্যি বললেন! একটা অসম্ভব ব্যাপার।

নিষ্প্রাণ গলায় বললাম, তাহলে কথাটা আমি বানিয়ে বলছি।

ঝিন্নি বলল, না না—তা কেন বলবেন। আমি আপনার কাছে হেরে গেলাম। সত্যি হেরে গেলাম।

শেষের দিকে ঝিন্নির গলায় আশা-ভরসার একটা ভাঙা ভাঙা ঢেউ।

বললাম, নাগপুরে তোমার বাসায় যদি তিন চারদিন থাকতে হয়, তাহলে রান্না-বান্নার কি ব্যবস্থা হবে? কেউ তো এখন সেখানে নেই।

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখ নীচু করে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল। এক সময় বলল, তাই তো ভাবছি। চাচাজী কি করে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইছেন। কোনদিন একটুখানি দুধও গরম করেন নি নিজের হাতে।

বললাম, আমি তোমার কথাও বলে-ছিলাম। বলেছিলাম, ঝিন্নির কি খুব অসুবিধে হবে আমাদের সঙ্গে যেতে?

অমনি চাচাজী বললেন, কোন্-কি-দেয়ালীতে যে কেউ একজনকে তো কোঠীতে থাকতে হবে, না হলে দীপ জ্বালাবে কে?

চাচাজীর কথা শুনে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।

ঝিন্নি আমাকে এবার সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল, নাগপুরে রোশনাই দেখবেন, মেলা দেখবেন, গান শুনবেন, ভারী ভালো লাগবে আপনার। এখানে এধরনের উৎসব তো আগে দেখেন নি। আর চাচাজী নিশ্চিত কাউকে সঙ্গে নিয়েই যাবেন। থাকা খাবার অসুবিধে কিছু হবে না।

বললাম, ডিসেম্বরের শীতে বরফের রাজ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতে হবে, সেখানে কেউ তো আর শোবার ঘরে হিটার জেলে দেবে না।

ঝিন্নি বলল, এবারের মত আমাকে মাপ করে দিন। আর আমি কোনদিন আপনাকে নাগপুরে আসতে বলব না। সত্যি আপনাকে কি অসুবিধের ভেতরেই না ফেললাম।

বললাম, মুশকিলের ভেতর ফেলেছ, এখন তার একটা আসানের পথ করে দাও।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর তার চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল। সে যে কত অসহায়, তার ছবি ফুটে উঠেছিল ওর সারা মুখে।

দেখে খুব মায়া হল। তবু মনের ভাব চেপে রেখে বললাম, তুমি তো পথ পেলে না, দেখি আমি কিছু পাই কিনা।

ও চোখ দুটো বড় বড় করে চেয়ে রইল। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ছায়া কাঁপছে ওর চোখের পাতায়।

বললাম, তুমি জেনো ঝিন্নি, নাগপুরে যদি আমি যাই তাহলে তুমিও যাবে। আর তা না হলে দুজনেরই যাওয়া হবে না।

ঝিন্নি আমার চারপাইএর কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। আকুল হয়ে বলল, দোহাই আপনার ছোটে সাহেব, এমনটি করবেন না। চাচাজী বড় দুঃখ পাবেন, তাছাড়া কিছু ভেবে বসতেও তো পারেন।

ওর বিনুনীটা কাঁধ ডিঙিয়ে বুকের ওপর লোটাচ্ছিল। ওটিকে হাতে তুলে নিয়ে

খেলা করতে করতে বললাম, চাচাজী আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবতে পারেন ঝিম্নি?

জানি না, বলেই ও ঘরে দাঁড়াতে গিয়ে বিনুনীতে টান পড়ায় আমার চারপাইএর ওপর ঘুরে এসে পড়ল।

ওকে ধরে ফেলে বললাম, ভয় নেই, চাচাজী কিছুই ভাববেন না। তিনি নিজে যেতে পারছেন না বলে দুঃখ জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর একটিমাত্র ডাকাবুকো মেয়েকে আতিথ্যের সমস্ত তদারকীর ভার দিয়ে পাঠাতে চান।

হঠাৎ কি হল, ঝিম্নি দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

কি হল ঝিম্নি, খুশি তো?

ও আর হাত নামায় না। এক সময় জোর করে ওর হাত নামাতেই দেখি, ওর চোখে সজল মেঘের ছায়া।

বললাম, তুমি কাঁদছ ঝিম্নি!

ও উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বাইরে চলে গেল। আমি খোলা দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে ঝিম্নি ফিরে এল। একেবারে অন্য চারত্র। হিটার জেলে আলো নিভিয়ে আমার পাশে এসে বসে বলল, দুজনে নাগগেরে যাব, এই সারপ্রাইজটুকু দেবার জন্যেই আমি প্ল্যান করেছিলাম।

বললাম, তোমার সারপ্রাইজ তো সফল হল, তবে এমন কাঁদো কাঁদো মুখ করে উঠে গেলে কেন?

ও বলল, আপনি প্রথম ভয় পাইয়ে দিলেন যে, আসল কথাটা তারপর যখন পাড়লেন তখন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না।

মনে মনে বললাম, তোমার চোখে জল দেখে বুঝেছি তুমি খুশি হয়েছ।

মুখে বললাম, এখনও কোলি-রি-দেয়ালীর সাত আটদিন বাকী। এখন থেকে রোজ অন্তত একবার করে আমরা ঐ উৎসবের দিনগুলোর প্ল্যানিং করতে বসব।

দারুণ খুশিতে উপচে উঠল ঝিম্নি, সারাদিন আমরা ঘুরে বেড়াব। সন্ধ্যায় কোয়ার্টারে বসে পরের দিনের প্ল্যানিং করব।

বললাম, খুব মজা হবে।

ঝিম্নি বলল কিন্তু হিটারের ব্যবস্থা তো ওখানেই নেই, আপনার যদি খুব শীত করে - যেমন শীতকাতুরে আপনি!

বললাম কিছু হবে না। লেপ তোষক কম্বল থাকলেই হলো।

ও বলল খুব দামী গরম কম্বল আছে। ভি-আই-পি-দের জন্য একসেট বিছানা তোলাই থাকে।

হেসে বললাম, কোনদিন তো ভি-আই-পি হতে পারলাম না, এখন ঝিম্নির দৌলতে যদি ভি-আই-পি-র খাতিরটা পাওয়া যায়।

ঝিম্নি বলল, গোল্ডেন অর্চার্ডের মালিক বিখ্যাত ডাক্তার পুলক মুখার্জি সাব যদি ভি-আই-পি না হন, তাহলে ভি-আই-পি-র ডেফিনেশন আজও আমার জানা হয় নি।

এক ঝলক হেসে বললাম, দুখানা ফলের বাগানের মালিক আর একজন ডাক্তারকে ভি-আই-পি-র দলে ফেললে সত্যিকারের ভি-আই-পি-দের অপমান করা হয় ঝিম্নি।

ও বলল, তা হোক, আপনি আমার কোয়ার্টারে ভি-আই-পি-র খাতিরই পাবেন। 'কোলি-রি-দেয়ালী'তে নাগগেরে আপনার চেয়ে বড় ভি-আই-পি আমার আর কেউ নেই।

সকালে নীচে নেমে দেখি আমার অপেক্ষায় একটি লোক দাওয়ায় বসে। চাচাজী তার সঙ্গে কথা বলছেন।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। আমি প্রতি নমস্কার জানালাম।

চাচাজী লোকটির আগমনের উদ্দেশ্যটুকু বুঝিয়ে যা বললেন, তার মর্মার্থ দাঁড়াল, আখরা বাজারের ডানদিকে যে পাহাড় তার ওপর ওয়াল্টার লী সাহেবের বাংলো আর বাগিচা। ওখানে কদিন ধরে বড়দিনের উৎসবের প্রস্তুতি পর্ব চলছে। একটি ছেলে কাজের সময় তাড়াহুড়োতে পাহাড়ের খানিক নীচে গড়িয়ে পড়ে পায়ে বেশ চোট পেয়েছে। রাতে ডাক্তার মেলেনি, ভোরে খবর পেয়ে চাচাজীর ডেরায় লোক পাঠিয়েছেন লী সাহেব।

বললাম, মিঃ লী কি করে আমার খোঁজ পেলেন চাচাজী?

নরসিংলালজী, বললেন, মানালীতে আমাদের বাগিচার পাশেই মিঃ বেনন-দের বাগিচা আছে তুমি জান। ওঁদের সঙ্গে আলাপও আছে তোমার বাবুজী। ওঁরা মিঃ লী-দের ফেস্টিভ্যালে এসেছেন। তাঁদের কাছে তোমার এখানকার ডেরার কথা জেনে থাকবেন।

আমি আর দেরী করলাম না। লী সাহেব আমার যাবার জন্যে একটি টাটুও পাঠিয়েছেন। লোকটি সেই টাটু আমার সামনে হাজির করার জন্যে মাকুর মত দাওয়ায় কনুই ঠুকতে ঠুকতে আউট-হাউসের দিকে ছুটল।

সার্জিক্যাল ব্যাগটা নেবার জন্যে আমি ওপরের ঘরে চলে এলাম। আসার সময় সিঁড়ি থেকে দেখলাম, ঝিম্নির সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে নীচের ঘরে খড়ের মাদুরে হাঁটু মুড়ে বসে ছেঁড়া কাপড়ের কিন্দ তৈরী করছে। ঐ বস্তুটি মাদুরের ওপর কাঁথার মত পেতে রাখতে দেখেছি বাড়ীতে বাড়ীতে।

আমার পায়ের সাড়া পেয়ে ঝিম্নি উবু হয়ে সেলাই করতে করতেই ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক দেখে নিয়ে আবার কাজে মন দিল।

আমি ওপরের ঘরে এসে পোষাকটা বদলে নিলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরুবো, ঝিম্নি প্রায় নিঃশব্দে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

ও চোখে প্রশ্ন এঁকে তাকাতেই বললাম, লী সাহেবের ওখানে ছোটখাটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাই যাচ্ছি। উনি টাটু পাঠিয়েছেন। চাচাজীর কাছে সব খবর পাবে।

আমার ব্যস্ততা দেখে ও সরে দাঁড়াল। আমি ওর পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে এলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, যতক্ষণ না আমি পথের বাঁকে মিলিয়ে যাই ততক্ষণ ওর দুটো চোখ আমাকে অনুসরণ করে চলেছে।

আমি ক্ষুদ্রাকার টাট্টুতে চড়ে চলেছি। ভারবাহী পশুটি মাঝে মাঝে দৌড়ে আর বিপজ্জনক বাঁকগুলি অবলীলায় পেরিয়ে তার সামর্থ্য ও নির্ভরযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছিল। জীবটির পরিচালক তার পেছন পেছন ছুটে আসতে আসতে [illegible] বিচিত্র অনুকার ধ্বনিতে উৎসাহিত করে চলল। কখনও বা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে লাগল অশ্ববোধ্য ভাষায়।

মিঃ লী আর বেনন-দের আমি দূর থেকেই দেখতে পেলাম। পাহাড়ের কোলে ছিমছাম সুন্দর বাংলো। ফুলের কেয়ারী। লনের ওপর ধবধবে সাদা বেতের চেয়ারে বসে উজ্জ্বল রঙের গরম পোষাক পরা গুটিকয় সাহেব মেম।

আমি বাংলোর ঠিক নীচে গিয়ে পৌঁছতেই সবাই উঠে দাঁড়ালেন। ওঁদের ভেতর এক প্রৌঢ় সমর্থ ভদ্রলোক খাড়াকাটা পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে এলেন। মনে হল, উনিই গৃহকর্তা মিঃ লী। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা।

আমার টাট্টুর লাগাম নিজের হাতে ধরে আমাকে গ্রীট্ করলেন।

টাট্টু থেকে নেমে সহিসের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, মিঃ লী আমার হাতের ব্যাগ প্রায় ছিনিয়ে নিলেন।

আমরা ওপরে উঠে এলাম। আমার পরিচিত এ অঞ্চলটির ক্যাপ্টেন বেকারের [illegible] [illegible] জন আমার [illegible]।

[illegible] লেগেছে।

[illegible] চিহ্নিত [illegible] এ [illegible] পাহাড়ী। [illegible] দিকে [illegible] করেছে। [illegible] পায়ের আঙুলে। ওপর থেকে পরীক্ষা করে বোঝা গেল আঙুলের হাড় ভেঙেছে। বাঁ পায়ের পাঁচটা আঙুলই বিশ্রী রকম ইনজিওরড্‌।

লী সাহেব যা বললেন, তাতে জানা গেল কাজ করতে গিয়ে ছেলেটি ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে নি, একটা ভারী পাথরই হঠাৎ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন ও সান্তাক্লজের হাঁসখটানা রথের কাছে বসে তন্ময় হয়ে দেখছিল। সবাই পাথর গড়াতে দেখে সরে এলেও ও বেচারা আর সরে আসতে পারে নি। ওর পায়ের পাতায় আঘাত করে ভারী পাথরখানা নীচে নেমে যায়।

থেঁতলানো পা-টা দারুণরকম ফুলে উঠেছিল। বুড়ো আঙুলের মাংস উঠে গেছে। হাড়ের আধখানা দেখা যাচ্ছিল।

প্রাথমিক যা কিছু করার তা করলাম। এক্স-রে নেবার কোন সুযোগ নেই এ তল্লাটে। যেখানে আছে, সেখানে গেলে ডিসেম্বরে কোন যানবাহনই চলাচল করে না। এ অবস্থায় রোগীকে নিয়ে কি করা যায় ভেবে পেলাম না।

আমার অসুবিধের কথাগুলো মিঃ লী-কে জানিয়ে বললাম, ইমিডিয়েটলি ওর একটা অপারেশনের দরকার মনে হচ্ছে।

লী সাহেব বললেন, আমারও তাই মনে হয়েছিল। হয়ত ওর আঙুলগুলো কেটে বাদ দিতে হবে। এখন দুটো সমস্যা আমাদের সামনে।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলতেই মিঃ লী বললেন, একটি জীপজাতীয় গাড়ীর সমস্যা, অন্যটি ওর মা বাবা।

বললাম, জীপের ব্যাপার বুঝলাম, কিন্তু ওর মা বাবার সমস্যাটা ঠিক বুঝলাম না।

লী সাহেব যা বললেন, তাতে জানা গেল ছেলেটি মেষচারক গাদ্দীসম্প্রদায়ের। ভেড়া চরাতে চরাতে ওরা কাংড়া থেকে চম্বা কুলু সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। গরমে আর বর্ষায় ওরা থাকে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপরে। ভেড়া নিয়ে যে সময় পাহাড়ে, পাঙ্গী এমনকি শিমলা পর্যন্ত চলে যায়। আবার শীত পড়লেই নীচে নামতে থাকে। ডিসেম্বরের [illegible]।

[illegible] জানা যায়। [illegible] বাংলোতেই কাটিয়ে [illegible]।

ভাবনায় ছেদ [illegible] এই আকস্মিক আহ্বান।

এদিকে জাগতুর মা বাবা নাকি পাহাড়ের মাথায় দেবতা কেহুলুবীরের পুজো করছে গত রাত থেকে। তাদের ধারণা কেহুলুবীর যেকোন কারণেই হোক রাগ করেছেন আর তাই তাদের ছেলের ওপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন। এখন অপারেশন করতে গেলেই ওদের অনুমতি চাই।

আমি মিঃ লী-কে বললাম, অপারেশনের ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেলে দীর্ঘ সময় ফেলে না রাখাই ভাল।

মিঃ লী বললেন, এখুনি ওর বাবা মা এসে যাবে, ওদের বোঝাতে হবে ব্যাপারটা। কিন্তু একটা কথা ভাবছি, গাড়ী জোগাড় হলেও সিমলা যাওয়া সম্ভব হবে কি? ওপরের পাহাড়ী পথ তো বরফে ঢেকে গেছে।

বললাম, অপারেশন করা যেতে পারে, কিন্তু ব্লাড চাই আর তার জন্যে পরীক্ষা দরকার। মানালীতে মোটামুটি ও অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার করা আছে। অন্তত কাছাকাছি মানালীতে পেশেন্ট সিফট করার ব্যবস্থাটুকু করুন।

জাগতুর মা বাবা এলো। তারা কেহুলুবীরের পুজোর ফুল ছেলের গায়ে মাথায় বুলিয়ে তার বিছানার তলায় রেখে দিলে। দেখলাম, হলুদ রঙের গাটচে ফুল।

তারপর [illegible] মত ঝোলা থেকে জাগতুর মা বের করল কটি পাতা। একটা নোড়ার মত পাথরে সেই পাতা কটি থেঁতো করে ছেলের থেঁতলানো পায়ে বেঁধে দিল। আমরা ওদের ব্যাপারস্যাপার দেখছিলাম [illegible] মেয়েটি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁড়াতেই মিঃ লী ওদের ছেলের পায়ের গুরুতর অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

জাগতুর বাবা বলল,

জিভ্‌ বন্‌ বসন্টী [illegible]
তিজ্‌ মান্‌ কিজা মরে।

বন গাছের পাতা [illegible] লাগানো হল। সব ব্যথা [illegible] যাবে।

[illegible] আমি জাগতুর অবস্থা গুরুতর [illegible] এখুনি মিঃ একটা কথা [illegible]।

[illegible]

দুদিন [illegible] মিঃ লী এলেন [illegible]। [illegible] বললেন, ডাক্তার [illegible]। এখুনি একবার [illegible] আসতে হয়। গাড়ীতে পেশেন্ট রয়েছে। কন্ডিশন ভাল মনে হচ্ছে না।

চাচাজীকে কথাটা বলতেই তিনি বললেন, বিপিনকো সাথ্‌মে লে যাইয়ে বাবুজী। ওহি তো বহুৎ [illegible] ছোরা।

বললাম, যা হোক্‌ [illegible] করে নেব। বিপিন চলে গেলে আপনাকে অনেক অসুবিধের পড়তে হবে।

সমস্ত মন কিন্তু চাইছিল, বিপিন চলুক আমার সঙ্গে। হাতের কাছে অনেক দরকারী জিনিস এগিয়ে দিতে পারবে।

নরসিংলালজীর কাছে আমার অসুবিধেটা এত বড় হয়ে দেখা দিল যে তিনি আমার কথার কোন উত্তর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করলেন না। ঘরের ভেতর ঢুকলেন আর অল্পসময়ের ভেতরই বিপিনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমি আর বিপিন মিঃ লী ও বেনসনের সঙ্গে রোগীকে নিয়ে প্রায় দশটায় মানালীর বাংলোতে পৌঁছলাম।

অগোছালো অপারেশন টেবিলটাকে মোটামুটি ঠিকঠাক করে নিলাম। বিপিনের ব্লাড নেওয়া হল, কারণ আশ্চর্যভাবে শুধু ওরটাই মিলে গেছে রোগীর ব্লাড গ্রুপের সঙ্গে।

সত্যি বিপিন না এলে কি যে হত!

পরের দিন অপারেশন হলো। কেটে বাদ দিতে হল জাগতুর কচি কচি আঙুলগুলো।

বিপিন যেন রীতিমতো নার্স। একটুও বিরক্তি না হয়ে আমাকে সব কাজে নিখুঁত সাহায্য করে গেল। মিঃ লী আর বেনসন পরিবারের লোকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল বিপিনের।

কটা দিন বেনসনেরা বিপিন আর আমার থাকার ব্যবস্থাই করেছিলেন ওঁদের বাংলোয়।

[illegible] (ক্রমশঃ)

সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ

গত ২৭ এপ্রিল রবিবার সরলা মেমোরিয়াল হল-এ এবারের নববর্ষের সাহিত্য পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হয়। অমৃতবাজার-যুগান্তরের পক্ষ থেকে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' দেওয়া হয় কবি ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রকে এবং 'মতিলাল পুরস্কার' লাভ করেন কথাসাহিত্যিক সতীকান্ত গুহ। 'প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হয় জগদীশ ভট্টাচার্যকে। প্রসাদ পত্রিকার পক্ষ থেকে 'সত্যেন দত্ত পুরস্কার' পান কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং গিরিশ পুরস্কার লাভ করেন নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। শৈব্যা পুস্তকালয়ের 'রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন শিশু-সাহিত্যিক রবিদাস সাহা রায় এবং মৌচাক পত্রিকার পক্ষ থেকে 'সুধীরচন্দ্র' পুরস্কার দেওয়া হয় বিমল দত্তকে।

এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবী সাংবাদিক ও সাহিত্যানুরাগীর সমাবেশ ঘটেছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'অমৃত' সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ স্বাগত ভাষণ দেন। শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে রাজ্য সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব রাখেন যে শরৎ-জন্মশতবার্ষিকীতে সরকারের পক্ষ থেকে শরৎ পুরস্কার ঘোষণা করা হক। শ্রীঘোষের ভাষণে আরও জানা গেল যে, শরৎ-শতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এবারের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত হবে। কারণ, ভাগলপুরেই শরৎচন্দ্র তাঁর বেশীর ভাগ রচনা সম্পন্ন করেন বা তার পরিকল্পনা করেন।

মান-শতবার্ষিকী :

জার্মান ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী টমাস মান-এর জন্ম-শতবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে এ-বছর ৬

ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। পাশে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।
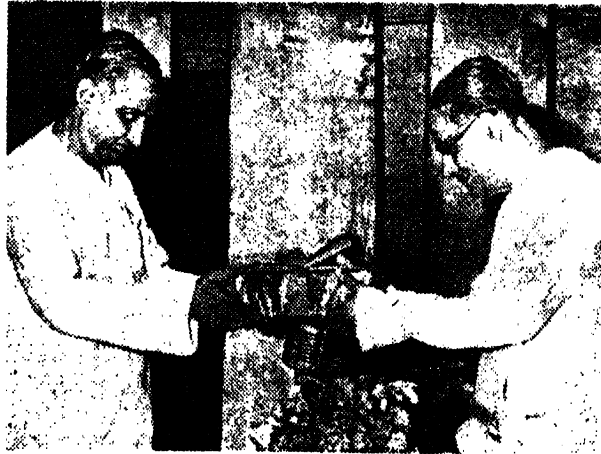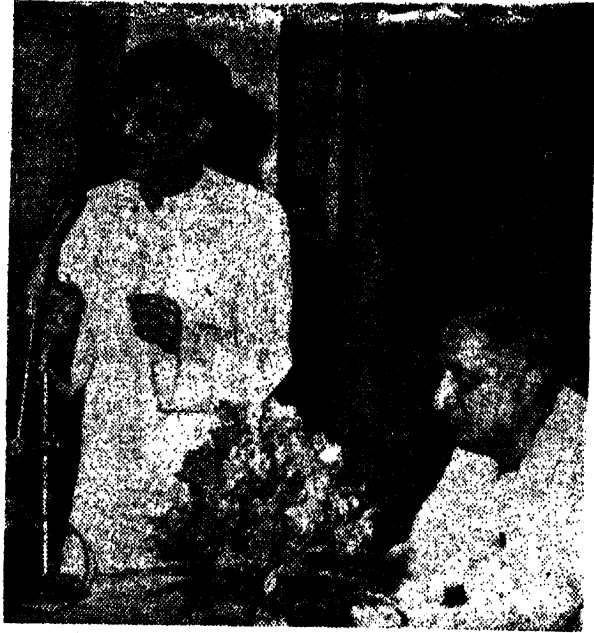
পুরস্কার গ্রহণ করছেন হরপ্রসাদ মিত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পুরস্কার গ্রহণ করছেন সতীকান্ত গুহ
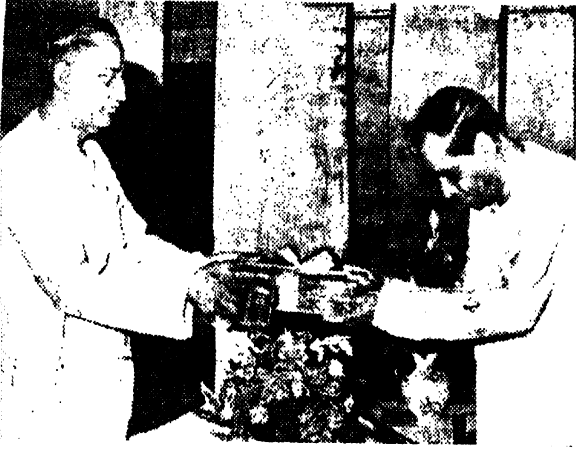
সঙ্গীত পরিবেশন করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

জন্ম। কিন্তু তার পূর্বেই দেশে দেশে মান-অনুরাগীরা তাঁর জীবন ও সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে সভা-সমিতি-আলোচনা-চক্র শুরু করে দিয়েছেন। উভয় জার্মানী, ইতালী সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি আলোচনা-চক্রের খবর পাওয়া গিয়েছে। আমাদের দেশেও এপ্রিলের শেষে এই ধরনের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতার ন্যাশন্যাল লাই-ব্রেরীতে। ম্যাকসমুলার ভবনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল একটি সুপরিকল্পিত প্রদর্শনী। অমর কথাশিল্পীর দীর্ঘজীবন, বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টা ও সাহিত্যসাধনার নানা নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন দুজন : পশ্চিম জার্মানীর কনসাল মিঃ ভন রড় ও আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধ—সব মিলিয়ে মানের প্রকাশিত বইয়ের মোট সংখ্যা একশ'র ওপর। এর মধ্যে চারখানা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—বাডেনব্রুকস, ম্যাজিক মাউন্টেন, ডেথ ইন ভেনিস ও ট্রান্সপোরটেড হেডস। নিজের পরিবারের চারপুরুষের ইতিহাস আশ্রয় করে মান তাঁর 'বাডেন-ব্রুকস' রচনা করেন। বাস্তব ও কল্পনার সীমিত সংমিশ্রণের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে এই সুদীর্ঘ উপন্যাসখানা। বিগত কয়েক দশক যাবৎ বংশধারা-ভিত্তিক উপন্যাস রচনার যে-প্রবণতা দেখা দিয়েছে, কোথায়ও প্রত্যক্ষভাবে কোথায়ও বা পরোক্ষভাবে, তা মানের 'বাডেনব্রুকস'-এর প্রভাবপুষ্ট। কাজেই এ-শতকের কথাসাহিত্যে তাঁর প্রভাব সহজেই অনুমেয়। জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

সুইডিশ প্রকাশনার সংগীত অভিধান :

স্টকহলম-এর প্রকাশন সংস্থা শল-ম্যান্‌স ফরল্যাগ পাঁচ খণ্ডের একখানা সংগীত অভিধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিন বছর আগে। সম্প্রতি এঁদের সম্পাদক-মণ্ডলী প্রথম খণ্ডের ছাপার কাজ শেষ করেছেন এবং সুদৃশ্য ও মজবুত বাঁধাইয়ের প্রথম খণ্ডটি শিগগীর বিক্রয়ার্থে পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট সরবরাহ করা হবে। প্রায় ৩৫০০ পৃষ্ঠার এই বিরাট সংগীত-কোষে সে-বিষয়ের প্রায় ১৭,০০০ রেফারেন্স পাওয়া যাবে, তাছাড়া আছে ৭০০০ চিত্র এবং প্রায় ২০০০টি নিবন্ধ। গোটা পৃথিবীর প্রায় ৮০০ জন সংগীতবিশারদ এই সুবৃহৎ সংগীতকোষ সংকলনে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিষয় নির্বাচনে সম্পাদকমণ্ডলী যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা অব-লম্বন করে তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ আধুনিক ও ক্লাসিক্যালের দ্বন্দ্ব কলহে তাঁরা আদৌ বিশ্বাসী নন। তাঁরা মনে করেন যে, সমস্ত রকম সংগীতেরই যেমন একনিষ্ঠ সাধক রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন ভক্তমণ্ডলী। তাই এই সংকলনে জ্যাজ, পপ লঘু ও লোকসংগীত থেকে শুরু করে ক্লাসিক্যাল পর্যন্ত সংগীতের প্রত্যেকটি ধারা প্রায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। শলম্যান্‌স ফরল্যাগ প্রকাশিত এই সংগীত অভিধানে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষার সংগীত অভিধানের সার সংকলিত হয়েছে বলে প্রকাশক দাবী করছেন। নানা দেশের নানা বিচিত্র বাদ্য-যন্ত্রের চিত্র এই অভিধানটির একটি বৈশিষ্ট্য। সংগীতের সার্বিক আবেদন সম্পর্কে সদা-সজাগ সম্পাদকমণ্ডলী প্রতিটি বিষয় নির্বাচন তথা তার সম্পাদনায় একটা সামগ্রিক ঐক্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন এবং বলাই বাহুল্য যে, তাঁদের সে-প্রচেষ্টা বহুলাংশে সার্থকও হয়েছে।

কবি জসীমউদ্দিনের সম্বর্ধনা :

গত ২২ এপ্রিল ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের উদ্যোগে কবি জসীম উদ্দিনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়। অন্নদাশংকর তাঁর ভাষণে জসীম উদ্দিনকে নজরুলের পরেই সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি আখ্যা দেন। এই অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু, অধ্যাপক কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের ডেপুটি হাই-কমিশনার মিঃ এ এস চৌধুরী।

বিদেশী বই কেনার সমস্যা :

গত বছর মে মাসে অল ইণ্ডিয়া বুক-সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স ফেডারেশন ডলার এবং পাউণ্ডের যে বিনিময়-হার বেঁধে দিয়েছেন তার ফলে ঐ দুটি মুদ্রার মাধ্যমে যে সমস্ত বিদেশী প্রকাশকগণ তাঁদের প্রকাশনার পুস্তকাদির মূল্য ধার্য করেন, তা কেনা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলেই জানেন যে, একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিতে ডলার এবং পাউণ্ডের কোনও স্থির-নির্দিষ্ট মূল্য নেই, অর্থাৎ তার দর ওঠানামা করে। গত এক বছরে দেখা গেছে ডলারের মূল্য ৭-৬২ পয়সা থেকে ৮-০৪ পয়সা ওঠা-নামা করেছে অর্থাৎ গড়ে ডলারের মূল্য ৭-৮৩ পয়সা। কিন্তু গত এক বছর ধরেই বইয়ের বাজারে ডলারের মূল্য স্থির হয়ে আছে ৮-৫০ পয়সা। এর ফলে ক্রেতা-সাধারণ বিশেষত পাঠাগারসমূহ, যাঁরা দামী দামী টেকনিক্যাল বই প্রচুর সংখ্যায় প্রায়ই কিনে থাকেন—তাঁদের ক্ষতির বহরটা সহজেই অনুমেয়।

ডলারের মত পাউণ্ডের বিনিময়-মূল্যও বইয়ের ব্যাপারে অত্যধিক। যেমন পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক রেট ১৮-৮৮ পয়সা, অথচ ফেডারেশন ঠিক করে দিয়েছেন ২০-০০ টাকা। হিসেব কষে দেখা গেছে যে, ডলার ও পাউণ্ডের মূল্য বেশী করে ধার্য করে রাখবার ফলে ক্রেতাসাধারণকে ৫½ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত অধিক মূল্য দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ কোনও লাইব্রেরী ১০০০ টাকার বিদেশী বই কিনলে ৬০ টাকার মতো তাঁদের অতিরিক্ত খরচ হয়ে যাবে। আজকের দিনের প্রায় সমস্ত লাইব্রেরীই সরকারী অনুদান পেয়ে থাকেন কাজেই বিদেশী বই কিনতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে সরকারী অর্থের অপব্যয় ঘটছে বলা চলে। সরকারেরই উচিত এ-বিষয়ে তৎপর হওয়া।

জরৎকারু
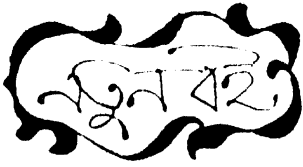
চিত্র বিচিত্র। তুষারকান্তি ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। সাত টাকা।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ একজন প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক - সাহিত্যিক। তাঁর সাংবাদিকতার তীক্ষ্ণ দীপ্ত বুদ্ধি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর সাংবাদিক মানসিকতার পাশাপাশি আর একটি যে অনুভূতিপ্রবণ মন সক্রিয়তা হল তাঁর স্বভাবনিহিত স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যভাবনা। এই ক্ষমতা তাঁর শিল্পী-মানসিকতার অন্তর্নিহিত ছিল বলেই ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'বিচিত্র কাহিনী' ও 'আরও বিচিত্র কাহিনী' গ্রন্থদুটি তাঁর স্থায়ী সাহিত্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে আজও।

তুষারবাবুর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ চিত্র-বিচিত্র। এই গ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মন্তব্য—'দিনের পর দিন দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ও রাজনীতির কচকচিতে ক্লান্তি ও অস্বস্তি বোধ করে তাঁরা (পাঠকরা) হালকা ধরনের গল্প পড়ে অনাবিল আনন্দ পেতে চান।......তাঁদেরই কথায় আমি এই 'চিত্রবিচিত্র' বইখানি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। বাস্তবিকই লঘু সরস কৌতুকপ্রদ ভঙ্গিতে অনাবিল আনন্দ দেওয়ার জন্যই যেন তুষারবাবু এই গ্রন্থের রচনাগুলি উপহার দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের কথা হল, সুন্দর বন্ধ্য আন্তরিক ভঙ্গিতে হালকা ধরনের গল্প বলার চেষ্টা রচনাগুলিতে থাকলেও আমরা একই সঙ্গে ব্যক্তি তুষারকান্তি ও শিল্পী তুষারকান্তি—এই দুই মানুষকে অবলীলায় ও গভীর মুগ্ধতায় স্পর্শ করতে পারি। আর সেই স্পর্শানুভূতির সঙ্গে যে অনাবিল আনন্দ তা হালকা ধরনের গল্প পড়ার আনন্দ আদৌ নয়, সে আনন্দ তুষারবাবুর ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে সেকাল ও একালের যে সমাজ সামাজিক সাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষ সমসময়বর্তী কালের রাজনীতি শিল্প ধর্ম পারিবারিক জীবন অর্থনীতি ইত্যাদি দিকের একটি পরিপূর্ণ তথ্যাবদ্ধরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাই।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এমন একজন মানুষ যাঁকে অধিকাংশ সভাতেই এক লক্ষণীয় বক্তা হিসেবে পাই। বক্তা তুষারকান্তি এক আশ্চর্য আকর্ষণীয় মানুষ। বড় সভায় তিনি যেভাবে বক্তৃতা দেন তা যেমন সহজ সরল সরস কৌতুকপ্রবণ তেমনি বৈঠকী। এমন অন্তরঙ্গ কথা স্মৃতিচারণে অগ্রজ ও অনুজ বন্ধুপ্রতিম-দের সম্পর্কে অবধারিত মন্তব্য করায়

ক্ষমতা তিনি রাখেন, যা থেকে বক্তা মানুষটিকে অত্যন্ত সহজে আপন করা যায়। নির্মল হাসিতে ভাসতে ভাসতে কখন যেন শ্রোতাদের আপন হয়ে যান।

এত কথা বলার কারণ 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থের রচনাগুলিতে তুষারবাবুর লিখন-ভঙ্গি যে রীতিতে চলমান, তা যেন তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার বা তাঁর কোন ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত থাকার অথবা কোন সাহিত্যসভায় সাহিত্যিক-স্মৃতির কথা শোনার অন্তরঙ্গতা স্পর্শ করে। আমাদের কথা হল প্রতিটি রচনায় মানুষ তথা ব্যক্তি তুষারকান্তি ঘোষকে নম্র নিবিড় নৈকট্যে লাভ করেছি। 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থে মোট রচনার সংখ্যা পনেরোটি। প্রতিটি রচনাই সার্থক রমণীয় ভঙ্গিতে লেখা। কেউ কেউ রম্যরচনাকে বলেছেন—'হালকা মেঘের খেলা।' তুষারকান্তিবাবুর রচনাগুলি নিশ্চয়ই রম্য রচনা কিন্তু স্বতন্ত্র স্বাদের। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই সব রচনায় ডায়েরীর অন্তরঙ্গতা যেমন আছে, তেমনি চিঠি লেখার মত হৃদয়কে উন্মুক্ত করার দিকও আছে। ডায়েরী, চিঠি, আত্মজীবনকথা—ওসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কথাকারসুলভ গল্প বলার ভঙ্গিটি।

আগেই বলেছি, তুষারবাবুর প্রত্যেকটি রচনাই স্বতঃস্ফূর্ত। যেহেতু তুষারবাবুর স্বভাব, আচার আচরণে একটি পরিশীলিত হিউমার সক্রিয় থাকে তাই এই স্বতঃস্ফূর্ত রচনাগুলির মধ্যে অদ্ভুত হিউমার স্বতোৎসারিত থেকেছে। কাউকে ব্যঙ্গ করার প্রয়াস এতে নেই। তুষারবাবু প্রবীণ মানুষ, জীবনে বহু লোকের সাহচর্য এসেছেন অনেক অভিজ্ঞতা তাঁর মনের গোপনতম ভাণ্ডারে সঞ্চিত। তাই প্রজ্ঞাঋদ্ধ মনে কিছুটা ব্যঙ্গও থাকতে পারতো। কিন্তু যা কিছু ব্যঙ্গ-কৌতুক করেছেন তা নিজেকে নিয়েই। এই এক সার্থক নিরাসক্ত ব্যঙ্গপ্রবণতা তুষারবাবুর রচনাগত বৈশিষ্ট্য ও শিল্পী মনের প্যাটার্ণ।

'এক ম্যাচে দুই টিমে খেলা' রচনায় চমৎকার হিউমার ওতপ্রোত। যেমন এক-জায়গায় বলেছেন—'যেদিকে বল মারতুম প্রায়ই সেই দিকে বলটা যেত।' এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম কৌতুকরস যে শ্লেষ—তা নির্মল শরতের আকাশে সাদা এক টুকরো মেঘের মত। তুষারবাবুর রসিকতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সুকুমার রায় মুজতবা আলির কিছু রচনা ইত্যাদির রস-রসিকতার কথা মনে পড়ে যায়। 'টেস্টে এলাউ হলাম' রচনাটি যে কোন পাঠককে না হাসিয়ে পারবে না, যেখানে লেখক বলছেন—'আমি হাত জোড় করে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললুম—আমি স্যার নিশ্চয়ই পারবো স্যার।—এই কথা লেখার পর তুষারবাবুর মন্তব্য—'আমি যে প্রতি কথায় স্যার স্যার করছিলুম তার উদ্দেশ্য হল যদি আমার ওপর তাঁর দয়া হয়।' ঠিক এই ধরনের হিউমার পরিবেশন তিনি বড় বড় সভাতেও স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে করে যান। কথাকার ও ব্যক্তিমানুষ তুষারকান্তি ঘোষ এইভাবে একাকার হয়ে গেছেন।

বস্তুত 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থের প্রতিটি রচনায় কৌতুকরসের প্রবল স্রোত থেকে গেছে। কোথাও গদ্য ব্যবহারে, কোথাও চরিত্র বর্ণনায়, কোথাও বা সিচুয়েশান তৈরীতে এই কৌতুক দীপ্ত। এই গ্রন্থের তোষামোদের রস ওষুধের গুণ একটি ভৌতিক ঘটনা, আমি কেন মোহনবাগান ছাড়লাম ইত্যাদি কয়েকটি রচনা বিশেষ ভাবে রসিক পাঠকদের পড়তে বলি। এমন অনাবিল আনন্দলাভের উপকরণ সম্ভবত খুব কমই পাওয়া যায় সাহিত্যশিল্পের জগতে।

কিন্তু আবার বলি, সর্বত্র কৌতুকরস যা তুষারবাবুর লেখায় নামাবলীর মত জড়ানো আছে, অথবা যাকে বলা যায় রচনা-গুলির সহজ বৈশিষ্ট্য সে সবের ভিতর থেকে উঠে আসে সেকালের নানান দিক। তুষারবাবু ব্যক্তিগতভাবে একজন গুণী মানুষ। গান খেলাধুলো থেকে শুরু করে দেশসেবা, সুন্দর ইংরিজি বলা, সাহিত্য জিজ্ঞাসা—সমস্ত সুকুমার চিত্তধর্ম তাঁর জীবনে বংশপরম্পরায় সমন্বিত হয়েছে। ঘোষ পরিবার যে বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবনে বিরাট অবদান রেখে গেছে তার সানন্দ স্বীকৃতি যে কোন সচেতন মানুষ সগর্বে দেবেন। তুষারবাবু সেইরকম এক পরিবারের প্রবীণ মানুষ। তাঁর আত্মকথায় তাই সেকালের বাংলা তথা ভারতের বহু তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান মেলে—কারণ ঘোষ-বংশের সঙ্গে সর্বভারতীয় বুদ্ধিজীবী মানুষের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বর্তমান গ্রন্থ 'চিত্রবিচিত্র'-র পনেরোটি উজ্জ্বল রচনায় সেই অতীতকালের অনেক কথা, অনেক মানুষের স্মৃতি হঠাৎ আলোয় ঝল-কানির মত স্বভাবী পাঠকের কাছে ধরা পড়ে যায়। এখানেই এই গ্রন্থের অনন্য স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য।

তুষারবাবুর মানবিক বোধ, সততা, গভীর বন্ধুত্ব, বৈঠকী আড্ডাপ্রিয় মানুষের মত মেজাজ, সূক্ষ্ম ভোজনরসিকতা, যথার্থ শিল্পীপ্রাণের নিরাসক্তি, অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশ ও সমাজের জন্য সক্রিয়তা, সুতীব্র আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান কারাবাসের দুঃখযন্ত্রণা, বহু দেশী-বিদেশী মানুষের সাহচর্যে আসার ফলে আন্ত-র্জাতিক বিশ্বাস, বলিষ্ঠ জীবন সমাজ ও পরিবার গঠন সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়—এসবের সুন্দর উল্লেখ, উদাহরণ, তথ্যনিষ্ঠ সাক্ষ্য প্রমাণ এ গ্রন্থে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। তাই বলছিলাম, লেখক রচনাগুলিকে হালকা ধরনের গল্প বলার প্রয়াস ইত্যাদি যাই বলুন না কেন ফলত 'চিত্রবিচিত্র' গ্রন্থটি এক পরিণত মন ও মানুষের আত্মজৈবনিক সাহিত্যকীর্তি।

বীরেন্দ্র দত্ত

গঙ্গোত্রী : বসন্ত সংখ্যা ১৯৭৫

সম্পাদনা : শান্তনু দাস। সম্পাদকীয় দপ্তর ৫।৩ বালিগঞ্জ প্লেস কলকাতা-১৯। মূল্য : দু টাকা।

বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের একটা বড় স্থান আছে। সবুজ পত্র, কল্লোল পরিচয় বা কবিতা পত্রিকার গুরুত্ব এখন ঐতিহাসিক সত্য। একেবারে হাল আমলে ছোট গল্প নতুন রীতি কিংবা কৃত্তিবাসের কৃতিত্বের কথাও আমাদের অনেকেরই মনে আছে। লেখক সৃষ্টিতে, নতুন সাহিত্য রুচির প্রসারে এবং নতুন যুগের বক্তব্যকে তুলে ধরার ব্যাপারে এই কাগজগুলির মূল্য অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

বিশেষ করে একালের বাংলা কবিতায় যে আন্দোলনটি কবিতা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল তা যে স্বর্ণপ্রসূ হয়েছে এটা আমরা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথের পর বেশ কিছুদিন ধরে রবীন্দ্রানুসারী এবং রবীন্দ্রানুকারকের চর্বিত চর্বণের ফলে বাংলা কবিতা যখন নিষ্প্রাণ হয়ে আসছিল তখন কোথায় পেতাম জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্র-নাথ দত্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বিষ্ণু দে-র মত কবিকে যদি না বুদ্ধদেব বসু অনলসভাবে চালিয়ে যেতেন তাঁর পত্রিকা। পঞ্চাশের দশকে কৃত্তিবাস, শতভিষা এবং সীমান্ত কবিতা পত্রিকাও অনেক শক্তিশালী কবিকে উপহার দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে।

একেবারে সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি কবিতার প্রতি বাঙালী তরুণদের আকর্ষণ চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ছোট ছোট অনেক কবিতার কাগজ বেরুলেও সত্যিকার বড় ও স্থায়ী কাগজ আর নেই বললেই হয়। ব্যতিক্রম শুধু গঙ্গোত্রী যা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে বাংলার তরুণতম কবির কবিতা সংকলিত করে একালের কবিতা আন্দোলনের প্রধান দায়িত্বটি পালন করে চলেছে।

গঙ্গোত্রীর সম্প্রতি প্রকাশিত বসন্ত সংখ্যাটিও হয়েছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র দিনেশ দাস দক্ষিণারঞ্জন বসু এক ধর থেকে শুরু করে মৃত্যুঞ্জয় হাজরা কমল চক্রবর্তী শান্তনু দাস এঁদের কবিতা তো আছেই সেই সঙ্গে আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টো-পাধ্যায় পূর্ণেন্দু পত্রী ও মৃণাল বসুচৌধুরী প্রমুখের কবিতা গুচ্ছ। তাছাড়া সংযোজিত হয়েছে অনন্য রায়ের একটি দীর্ঘ কবিতা। সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় বাংলা কবিতাকে কলকাতার বাইরে বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে এমনকি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে দেবার জন্য তাঁরা যে একাধিক সম্মেলনের আয়োজন করছিলেন তা কত সফলপ্রসূ হয়েছে। বাঙালী পাঠকের সঙ্গে এই নতুন যোগাযোগের দিক রচনার ব্যাপারে গঙ্গোত্রীর প্রয়াস খুবই সময়োচিত।

আলোচ্য সংখ্যাটির ছাপা প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাও বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে।

গোয়েন্দা ধাঁধা

প্যাঁকে পড়েছে পটের বিবি
শার্লক হোমস্‌
স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

মেয়েটার নাম ভায়োলেট হান্টার।

ভায়োলেট হান্টারও বাড়ী গিয়ে ছেলে-পুলে মানুষ করার চাকরী করত। কিন্তু কিছুদিন হাতে কাজ নেই।

এমন সময়ে একটা অদ্ভুত চাকরী এল হাতে। মাইনে তিনগুণ। কিন্তু কাজটা যেন কেমন কেমন। বাচ্চা মানুষ করতে হবে ঠিকই। দুবছরের বাঁদরের বাচ্চা। চটি দিয়ে চটাসচটাস করে আরশোলা মারতে ওস্তাদ। কিন্তু মাস্টারণীকে মাথার চুল কাটতে হবে কেন? কেন মনিবের মেয়ের জামা পরে এখানে সেখানে বসে থাকতে হবে?

ঝাড়ু মারি অমন চাকরীতে—বলে পালিয়ে এল ভায়োলেট। চাকরী আগে না চুল আগে? কিন্তু বাড়ী এসে ভাঁড়ার খালি দেখে মন বলল চাকরী আগে। এল শার্লক হোমসের কাছে। চাকরী নেওয়াটা কি ঠিক হবে?

আইবুড়ো হোমস বললে—মোটেই না।

আমাকে অমন করে ভায়োলেট বললে—কিন্তু আমার যে অনেকের সংসার। বরং টেলিগ্রাম দেখলে ডেকে পাঠাব। আসবেন তো?

রাজী হল হোমস।

পনেরো দিন পরে ডাক এল। অমুকদিন এগারোটায় ব্ল্যাক সোয়ান সরাইখানায় আসা চাই।

যথাসময়ে দুই বন্ধু এসে পৌঁছোলো সরাইখানায়। ভায়োলেট সাবধানে তাই মাথার চুল কেটে ফেলেছে। দিন দুয়েক ভালই কেটেছিল। মনিব ভদ্রলোক তামাটে হলেও খারাপ ব্যবহার করেননি। মনিবানি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা। প্রথম পক্ষের মেয়ে আমেরিকা চলে গিয়েছে নতুন মায়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে। বিরাট বাড়ী। নাম কপারবীচেস। একটা রাক্ষুসে ডালকুত্তা বাড়ী পাহারা দেয় সারারাত। কুকুর দেখাশোনা যার তার ওপর নাম তার টলার। ভীষণ মদ খায়।

মনিবের নাম রুক্যাসল। মিসেস কিন্তু অষ্টপ্রহর বিষাদ সিন্ধুতে ডুবে রয়েছেন। মাঝে মাঝে চোখের জলও ফেলেন।

দিন দুই পরে মিসেস মিস্টারের কানে কানে কি যেন বললেন। অমনি রুক্যাসল বললেন—যাও উঠে পড়ো। নীল পোশাকটা পরে এস। দেখি কেমন মানায়।

হুকুম তামিল করল ভায়োলেট। নিশ্চয় রুক্যাসলের প্রথম পক্ষের মেয়ের পোশাক। এসে বসল জানলার দিকে পিঠ করে একটা চেয়ারে। সামনে দাঁড়িয়ে অনেক মজার মজার কথা বলে ভায়োলেটের পেটের খিল খুলে ছেড়ে দিলেন রুক্যাসল।

তারপরের দিনও একই কাণ্ড ঘটল। নীল পোশাক পরে জানলার দিকে পিঠ করে বসে রইল ভায়োলেট। মনিবের হুকুমে এবার বই থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাতে হল। কিন্তু বেশ মনে হল পেছনে কিছু একটা ঘটছে—যা শুধু মনিব আর মনিবানিই দেখতে পাচ্ছেন।

বুদ্ধিতে ভায়োলেটও কম যায় না। তৃতীয় দিন একটা ভাঙা আয়না রুমালের মধ্যে নিয়ে বসে রইল চেয়ারে। হাসির ফাঁকে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখে নিল, পেছনের রাস্তায় ছাই রঙের পোশাক পরা একটা ছোট্ট মানুষ একদৃষ্টে তাকে দেখছে।

মিসেস রুক্যাসল তার চালাকি ধরে ফেলেছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন কর্তাকে দেখো তো কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্যাট প্যাট করে দেখছে মিস হান্টারকে।

তাই নাকি? ভায়োলেট ওকে হাত নেড়ে বলো চলে যেতে।

হাত নাড়ল ভায়োলেট। মিসেস সঙ্গে সঙ্গে পর্দা টেনে দিলেন জানালায়।

রহস্য আরো জট পাকিয়ে উঠল এরপর। বাড়ীর একটা অংশে সবসময়ে তালাচাবি লাগানো থাকত। সেই অংশেরই পেছন দিকের জানলাগুলোর একটা জানলার খড়খড়ি খোলা দেখে খটকা লাগল ভায়োলেটের মনে। বাইরে তালা ঝুলছে কেন? তারপরেই একদিন দেখা গেল নিষিদ্ধ অংশে চুপিসারে ঢুকলেন রুক্যাসল—বেরিয়ে এলেন পা টিপে টিপে কিছুক্ষণ পরেই।

অতশত না ভেবে মনিবকে জিজ্ঞেস করেছিল ভায়োলেট—জানলার খড়খড়ি কে তুলে রেখেছে? শুনেই চমকে উঠলেন চোয়াড়ে মনিব। ভুরু কুঁচকে ব্যঙ্গের স্বরে বললেন—তাই নাকি? সবদিকেই নজর আছে দেখছি! ওটা আমার ডার্করুম। বুঝেছো?

রুক্যাসলের মেয়ে আগে যে ঘরে থাকত সেই ঘরেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ভায়োলেটের। দৈবাৎ একটা দেরাজ খুলে ফেলেছিল নিজের চাবির গোছা দিয়ে। ভেতর থেকে বেরোলো একগোছা ভারী সুন্দর মাথার চুল। তারই মাথার চুল।

নিজের মাথার চুল কেটে ফেলেও সন্দেহ মিটোনোর জন্যে তোরঙ্গ খুলে দেখল তোরঙ্গে তুলে রেখেছিল ভায়োলেট। মনের যেখানকার চুল সেখানেই আছে। দেরাজের মধ্যে অবিকল একরকম চুলের গোছাটা তাহলে কার?

এতো ভারী সমস্যার ব্যাপার! ভায়োলেটের বুকের মধ্যে গুড়গুড়ুনি আরম্ভ হল সেই থেকে। এমন সময়ে একদিন দেখা গেল নিষিদ্ধ অংশের দরজায় চাবি ঝুলছে। ভুল করে ঝুলিয়ে গেছেন রুক্যাসল। বাচ্চাটাও রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর কাছে।

এই তো সুযোগ। টুক করে ভেতরে ঢুকল ভায়োলেট। লম্বা গলি শেষ হয়েছে একটা বন্ধ দরজার সামনে। পাল্লা দুটো বাইরে থেকে হুড়কো দিয়ে পাকাপোক্তভাবে বন্ধ করা। অথচ ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তির নড়াচড়া।

দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল ভায়োলেটের। দুপদাপ করে বেরিয়ে এসে পড়বি তো পড় রুক্যাসলের দু বাহুর মধ্যেই। ভদ্রলোক দাঁত কিড়মিড় করে শুধু একটা কথাই বললেন—ফের যদি চৌকাঠ মাড়াতে দেখি তো ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো বুঝেছো?

খুব বুঝেছিল ভায়োলেট। এ বাড়ীতে পা দেওয়ার পরেই রুক্যাসল খুব মিষ্টি করে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন বাছুরের মত প্রকাণ্ড ডালকুত্তাটা দেখিয়ে। রাতে বেরোলে আর নিস্তার নেই।

তাই আজ দিনের বেলায় হোমসকে ডেকে এনেছে ভায়োলেট। কর্তাকে মিথ্যে বলে এসেছে ফিরতে হবে ঘন্টার মধ্যে। সন্ধ্যায় কর্তা-গিন্নী অবিশ্যি বাড়ী থাকবেন না। টলার মদ খেয়ে বেহুঁশ। কুকুরটা ঘরে বন্ধ।

লাফিয়ে উঠল হোমস—তাই তো চাই। আপনি বাড়ী গিয়ে টলারের বউকে ঘরে পুরে শেকল তুলে দেবেন। সাতটার সময়ে আমরা আসছি।

ঠিক সাতটায় এল দুই বন্ধু। রহস্যে ঘেরা অন্ধকার পুরীতে প্রবেশ করে গায়ের জোরে সেই বিশেষ দরজাটা ভেঙে কি দেখল?

পাখী উড়েছে। স্কাইলাইট খোলা—একটা মই নেমে গেছে বাইরে।

আচমকা বজ্রনাদ করে আবির্ভূত হলেন রুক্যাসল। বাইরের লোকজন আর ভাঙা দরজা দেখেই দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলে ডালকুত্তাকে।

ফলটা হল সাংঘাতিক। দুদিনের উপোসী ডালকুত্তা খ্যাঁক করে কামড়ে ধরল মনিবের টুঁটি। ওয়াটসন গুলি করে মারল ডালকুত্তাকে। মিসেস রুক্যাসল ছুটলেন ডাক্তার ডাকতে।

শেকল খুলতেই বেরিয়ে এল টলারের তালগাছ বউ। বিরক্ত হয়ে বললে এত কাণ্ডের দরকার ছিল না। আমাকে বললেই তো হত।

জানি বললে হোমস। আপনিই আজকের নাটকের জোগাড়যন্তর করেছেন। স্বামীকে মদ খাইয়ে বেহুঁস রেখেছেন স্কাইলাইটের সামনে মই রেখে ওদের পালাতে সুযোগ দিয়েছেন।

কাদের?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৪৫ পাতায়

অদ্রীশ বর্ধন

উপন্যাস

সেই সব মানুষ

মনোজ বসু

ভবনাথের উঠোনে ধান উঠে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পুরুত ডেকে পুজো আচ্চাও হয়ে গেল। ভাটিয়াল চালের মিষ্টি ফ্যানসা ভাত গরম গরম পাতে পড়তেই বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দেবদুভিও তাদের মাঝখানে বসেছেন। একবার এর গালে একবার ওর গালে ভাত তুলে দিচ্ছেন। যেন উৎসব লেগে গেছে। এদিকে ভবনাথের বিলে যাবার তাড়া। ছেলেরা সব লায়েক হয়েছে। জলকাদা ভাঙাতে তাদের বয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে হন হন করে বিলমুখো চললেন। উঠোনে তখন বাড়ির মেয়েদের বড়ি দেবার ধুম লেগেছে। এই সময় মাঠের আর এক চেহারা মাঠে মটর গাছ দাঁড়িয়ে উঠেছে। লকলকে সবুজ লতা—শাঁটি সামান্যই ধরেছে—অফুরন্ত বেগুনি ফুল। তার ওপরেই দামাল ছেলেদের হামলা চলে। নিস্তরঙ্গ গ্রাম আবার প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে। ভবনাথের বাড়িতেও তার ছোঁয়া লাগে। ডাক পিওন এসে সেই ভাবকে যেন আরো বাড়িয়ে দিল। বিশেষ করে সে বাড়ি এবং আশপাশের বাড়ির বৌঝিদের মধ্যে।

ক্রমে সে খবর পাড়ায়ও খবর হয়ে যায় পিওনঠাকুর গাঁয়ে এসেছেন। পিওন-ঠাকুরই এখন যেন এই গ্রামের খবর। আর পিওনের দুর্বোর আকর্ষণ আছে এই গ্রামের প্রতি। এক চিঠিপাটি বিলি করে সারা বিকেলটা জমিয়ে দাবা ও পাশা খেলা এবং যাবার সময় সোনাখড়ির হাট থেকে সস্তা দরে হাটবাট করা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চুপচাপ ভবনাথ হুঁকো টানছেন। কলকে নিভে গেছে নলের মুখে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। খেয়াল পান নি ভবনাথ—টেনেই চলেছেন। বহুক্ষণ!

শ্বাধিক এসেছেন। কড়চায় কয়েকটা উশুল দেবার আছে, দপ্তর খুলে কাজে লেগে গেলেন। তাঁর নজরে পড়ল। আটল তামাকের খেতে। ভবনাথকে কিছু না বলে আটলকে হাঁক দিয়ে বললেন, কলকে বদলে দিয়ে যারে আটল, একদম নিভে গেছে।

শ্বাধিক আশ্রিত অনুগত, এ বাড়ীর ভাল-মন্দ সব ব্যাপারে আছেন। হিরুর হয়ে তিনি বলছেন, দশচক্রে ভগবান ভূত। মাতুল গুরুজন—তাঁর কথার উপর বেচারী না বলতে পারে নি।

ভবনাথ স্বগতোক্তির মতো বললেন, সম্বন্ধের চিঠি সরাসরি বাপ খুড়োর নামে। বাপকে না-ই দিল আমল—অমন বাপের মতন খুড়ো তাকে হেলা করে কোন সাহসে?

শ্বাধিক বলেন, দিনকাল বদলে যাচ্ছে দাদা। মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে—উপায় কি? কত সব কাণ্ড-কাণ্ড কানে আসে—এ তবু পদে আছে।

প্রবোধ বাক্য কানের মধ্যে বিষের মতো জ্বালা করে। ভবনাথ উঠে পড়লেন। বাইরের উঠানের এক পাশে কাঠা পাঁচেক ভুঁইয়ে তামাকের ক্ষেত। চারা পোঁতা হয়েছে—দিনমানটা কলার খোলায় ঢাকা ছিল, এখন আসন্ন সন্ধ্যায় আটল খোলা সরিয়ে গোড়ার গোড়ায় জল দিয়ে যাচ্ছে। সারা রাত্রি শিশির খাবে—সকালবেলা রোদের ভয়ে আবার খোলা মুড়ি দেবে। কিছুকাল চলবে এমনি—যত দিন না চারাদের শক্তিসামর্থ্য হচ্ছে।

ভবনাথ এসে ক্ষেতের পাশে দাঁড়ালেন। আটলকে এটা করো সেটা করো নির্দেশ দিচ্ছেন নিতান্তই অভ্যাসক্রমে—হিরুর বিয়ে মন জুড়ে রয়েছে। দিনকাল বদলাচ্ছে সন্দেহ কি। মেজ ছেলে কালীময়ের বিয়ে একদা ভবনাথের ব্যবস্থায় হয়েছিল। মেয়ে কালো রোগা—হাঁটিশুড নয়। ভবনাথ চোখ মেলেও তা দেখেন নি দেখা আবশ্যক মনে করেন নি। আত্মীয়-পড়শি হয়তো মুখ বাঁকিয়েছিল কিন্তু ভবনাথের সামনা সামনি নয়—সে তাগত ছিল না কারো। কালীময়ও কোন দিন মুখ ভার করে নি—বাপ পছন্দ করেছেন তার উপরে আবার কথা কি? ইয়ার বন্ধুরা কিছু বলতে গেলে কালী-ময়ের জবাব ছিল : দিনমানে বউ তো কাছে আসছে না, রাত্রে আসবে আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে — কালা-ধলা তখন সব একাকার।

দেখতে শুনতে যেমনই হোক ফুল-বেড়ে মাধব মিত্তিরের মেয়ে বীণাপানি—একমাত্র মেয়ে, ষোল আনা ভূসম্পত্তির ওয়ারিশান। ভবনাথ তন্ন তন্ন করে খোঁজ-খবর নিলেন — মেয়ের নয়, মাধবের ভূসম্পত্তির। তারপরে পাকা কথা দিয়ে দিলেন।

মাধব প্রশ্ন করেন : মেয়ে দেখলেন না?

ভদ্রলোকের মেয়ে কানা নয় খোঁড়া নয়—ঘটা করে দেখবার কি আছে?

তারপর মনে পড়ে গেল : মেয়ে তো দেখাই আছে বেহাইমশায়। রাত্তিরবেলা আপনার বাড়ী খেতে বসেছিলাম পাঁচ-সাতটা বেড়াল এসে পড়ল। মা-লক্ষ্মী বাঁশের চেলা নিয়ে বেড়াল তাড়াচ্ছিল।

মাধব মিত্তিরের সঙ্গে মুখ-চেনা ছিল, সেই প্রথম ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। বিবাদী গরহাজির বলে মামলা হতে পারল না কসবা থেকে ভবনাথ পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরছেন। মণিরামপুর গঞ্জে হাজরামশায়ের চালায় রান্না-খাওয়া ও বিশ্রাম। মাধবও মহাল থেকে ফিরছেন, ঐখানে আগে এসে উঠেছেন। মাধবই রাঁধাবাড়া করলেন এক সঙ্গে দুজনেই খাওয়া-দাওয়া তারপর বেশ খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে একত্র রওনা। নাগর-গোপের কাছাকাছি এসে আকাশ অন্ধকার করে এলো—দুর্যোগ আসন্ন। ফুলবেড়ে ওখান থেকে সামান্য দূর। ভবনাথকে না নিয়ে মাধব ছাড়বেন না—বললেন, আপনাকে এই অবস্থায় পথের উপর ছেড়ে গেলে লোকে আমার গায়ে থুতু দেবে। গরীবের বাড়ী চলুন, রাতটুকু কাটিয়ে সকালে চলে যাবেন। তুললেন নিয়ে বাড়ীতে। তুমুল ঝড়বৃষ্টি তার ভিতরেও পাঁঠা মারা হল। আদর-আপ্যায়নের অবধি নেই। খাওয়ার সময়টা ছোট্ট খুকী বীণাপানি থোপা থোপা চুল নাচিয়ে বাঁশের চেলা হাতে বিড়াল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল—

কনে-দেখা তাতেই চুকেবুকে গেছে, তারই জোরে ভবনাথ পাকা কথা দিয়ে দিলেন। নির্গোলে বিয়ে হয়ে গেল। ব্যাপার এমনিই হয়ে এসেছে এবারেই তফাত।

চমক খেয়ে ভাবনা হঠাৎ ছিঁড়েখুড়ে গেল। ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা — আওয়াজ। দালানের কানাচ দিয়ে পথ, উঁচু-নীচ এবড়ো-খেবড়ো পুকুর কাটার সময় মাটি পড়েছিল—কোদাল ধরে কে আবার তা সমান করতে গেছে? ভা-ভা-ভা উড়ে চল পক্ষীরাজ আমার—গাড়োয়ান গরু তাড়াচ্ছে। ঘট ঘট ঘট ঘট বদখত আওয়াজ তুলে ছুটেছে গরুর গাড়ী।

অসহ্য অসহ্য। হাঁক পাড়লেন ভবনাথঃ এইও কে রে কে যায়?

গাড়ীর মাথার দিকটা দেখা যাচ্ছে। শিশুবর হাঁড় হায় করে উঠল ঃ শয়তান গরু সুপারী চারা মুখে তুলে নিয়েছে। চিবাচ্ছে, আর ঝুলছে খানিকটা মুখের বাইরে। তিন নাড়ায় পুয়ো কাঁঠাল নাড়ায় ভুয়ো—চাষীর শাস্ত্রে বলে। পুয়ো অর্থাৎ সুপারীর চারা তিনবার তুলে তুলে পুঁততে হবে। গোড়ায় একফালি জমিতে ঠাসাঠাসি করে। চারা উঠল, বিঘত খানেক বড় বড় হল—তুলে তুলে তখন সামান্য ফাঁক করে পুঁতে দাও। চারা আরও বড় হলে আবার তুলে পাকাপাকিভাবে পোত। তবেই সুপারী ফলবে। কিন্তু কাঁঠালের বেলা বিপরীত। যেখানে চারা জন্মাল সেখানেই আমরণ থাকবে। তুলে অমান্য পুঁতলে ভুয়ো কাঁঠাল ফলবে—কাঁঠালে কোয়া থাকবে না শুধুই ভুসড়ো। দালানের কানাচে বাখারীর বেড়ায় ঘেরা সুপারীর মাদা। বেড়ার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে গরুতে চারা উপড়ে নিয়েছে। ভবনাথ দূর থেকে রে রে করে উঠলেন ঃ কে রে কে? নবীনে না তুই?

কালো কোলো ছোঁড়া গাড়ীর মাথায়—স্বয়ং বলল শ্রীনবীনচন্দ্র মণ্ডল।

ফটকের ছেলে তো তুই, ফটকের কোলে মবাসে, তাই তো জানি—নবীনচন্দ্র হলি আবার কবে? যাচ্ছে তাই হ' দিলে—গরুতে আমার গুয়োর চারা খয় কেন?

নবীন বলে, গরুতে কি বোঝে?
দিচ্ছি বুঝিয়ে—

এমনিই ভবনাথের আজ মেজাজ খারাপ—ছোট মুখের পাকা কথায় ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে উঠল। একটানে একটা শিওড়ের ডাল ভেঙে গরুকে দমাদম পিটুনী।

নবীন আর্তনাদ করে ওঠে, ডালের বাড়ি যেন তার গায়েই পড়ছে। এঁটে ধরল ভবনাথের হাতের ডাল। এত বড় আস্পর্ধা! ক্ষেপে গেলেন ভবনাথ সেই ডালে এবার ছোঁড়াকেই পেটাচ্ছেন। পেটাতে পেটাতে ডাল দু-খণ্ড হয়ে গেল। হাঁ-হাঁ করে দ্বারিক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। গর্জাচ্ছেন ভবনাথ ঃ ভিটেবাড়ীর প্রজা তিন পুরুষ ধরে চাকরান খাচ্ছে। পরে বাড়ীর মালপত্তর বয়ে বয়ে ওর বাপ ফটকের মাথায় টাক পড়ে গেল, সাত চড়ে রা করে না, আর ঐ ছেঁপো ছোঁড়া কিনা আমার দালান কাঁপিয়ে গরুর গাড়ী চালায় চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ছাড়ে মুখে, হাতের লাঠি চেপে ধরতে আসে। ঘরের চাল কেটে বসত তুলে দেবো, দেখবে সেদিন—

ভবনাথকে নিয়ে দ্বারিক রোয়াকে উঠে গেলেন। শিশুবর তামাক সেজে আনল। গরুর গাড়ী খুব আস্তে যাচ্ছে এখন। নবীন গাড়ীতেই ওঠে নি, পাশে পাশে হাঁটছে।

বড়গিন্নি বাপের বাড়ী চললেন। গরুর গাড়ীতে যাওয়া—কাঁথা দুখানা উপরে পাটি ফেলে ছই বানিয়ে দিল। পুঁটি আগেভাগে উঠে বসে আছে। সবাই গাড়ীর কাছে এসেছে ভবনাথই কেবল আগাপান্ত বাইরের কোঠায় খাটের উপর শুয়ে পড়েছেন। কিছুই তিনি জানেন না, এমনিভাবে ভাব। কালীময়ের গায়ে কড়কড়ে ইস্ত্রি-করা ডবল ব্রেস্ট কামিজ, হাতে বার্নিশ জুতো। জুতোর ফিতের ফিতেয় গেরো দিয়ে সে গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়ে দিল। বলে, জুতো পড়ে না যায় দেখো মা। ওঠো তুমি এবার দেরী করলে ওদিকেও রাত হয়ে যাবে।

বড়গিন্নির গাড়ীতে ওঠা—সে বড় চাট্টিখানি কথা নয়। উঠতে যাচ্ছেন, কয়েক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। তরঙ্গিণীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন ঃ নতুন হিম পড়ছে বউ, খোকন ঠাণ্ডা না লাগায় নজর রেখো। ছাতা কোলে চায় না কারো। মিছে মিছি ডাকেরই বা কি দরকার! টেকটুকিকে কাঁচা-ঘুম থেকে তুলে অলকা এসে দাঁড়াল। মেয়ে কেঁদে খুন হচ্ছে। দু-হাত পেতে লাড়ুকোলা করে উমাসুন্দরী নিয়ে নিলেন। জোরে জোরে দোলাচ্ছেন, আর আগডুম-বাগডুম বকছেন মুখে। শান্ত হয় না কিছুতে।

কালীময় ওদিকে হাঁক দিচ্ছে ঃ উঠবে গাড়ীতে মা, সারা বেলাটা এই চলবে? না যাবে তো বলো আমি পথ দেখি—

মেয়ের কচি আঙুলে ঈষৎ কামড় দিয়ে উমাসুন্দরী মায়ের কোলে দিয়ে দিলেন। মায়া কাটানো হল এই প্রক্রিয়ায় বাচ্চা হয়তো কান্না হবে না।

গাড়ীতে উঠে বসেছেন এবার। তরঙ্গিণীকে কাছে ডেকে হাতে হাত দিয়ে ছলছল চোখে বললেন, রইল সব। সামলানো কি সোজা—তোমার উপর বড় ধকল যাবে ছোট বউ। চিঠিপত্তোর দিও।

গলা ভারী মুখে আঁচল দিলেন।

অলকা হাসছে ঃ যাওয়া তো বাপের বাড়ী—চোখের জল কেন মা? আমাদের বললে তো নাচতে নাচতে চলে যাই।

বিনো বলল, শতেকবার চোখের জল কেন খুড়িমা? ইচ্ছে না হলে যাবে না। মাথার দিব্যি তো নেই গাড়ী ফেরত দিয়ে দাও।

উমাসুন্দরী রাগ করে বললেন, মনের ইচ্ছে তো তাই তোদের সকলের। একজনে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়লেন। আপদ-বালাই মানুষটা চলে যাচ্ছে, তা যেন চোখে দেখতেও মানা।

কমল মুখ চুন করে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। মুখ দেখে, আহা বুকের মধ্যে আনচান করে ওঠে। হাত ধরে বড়গিন্নি তাকে কাছে নিয়ে এলেন। একটুকু ম্লান হাসি হেসে বললেন, যেতে ইচ্ছে করছে বুঝি? মা ছেড়ে থাকতে পারবে তো?

সত্যি সত্যি যেন খোকনকে তুলে নিয়ে চললেন, দিয়ে সে পুঁটির একাধিপত্যে ভাগ বসাবে। হি-হি করে হেসে হাতের ধাক্কায় পুঁটি ভ্রাতাবৃন্দ একেবারে উড়িয়ে দিতে চায় ঃ দিও না জেঠাইমা—কক্ষনো না। থাকতে পারবে না রাত দুপুরে মা মা করে কেঁদে ভাসাবে।

কমলের অপমান লাগে, রাগ হয়ে যায় পুঁটির মুখে এই সব শুনে দিদি আর বলবে না তো, এবার থেকে নাম ধরে ডাকবে। জেঠাইমা বউদাদা বিনোদিদি সবাই হাসছে। এমন কি মা পর্যন্ত। নাকি মাকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব তার পক্ষে।

জেদ ধরল সে ঃ আমি যাবো, আমি যাবো। তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে।

এবং মুখের কথামাত্রই নয়, গাড়ীতে ওঠার জন্য একটা পা উঁচু করে তুলেছে। কিন্তু উমাসুন্দরী তো জুড়ে বসে আছেন [illegible] কমল কেলবে কোথা বসবেই বা কোনখানে? ছইয়ের বাইরে একেবারে সামনেটা অবশ্য ফাঁকা গাড়োয়ানের জন্য। কিন্তু গরু—ওরে বাবা, ঐ দুটো শিংওয়ালা গরু লেজখানা জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। পা অতএব মাটিতে নামাতে হল। তা বলে দোষ যাচ্ছে না ঃ যাবো আমি জেঠাইমা। থাকতে পারব, তুমি দেখো। কাঁদবো না।

উমাসুন্দরী কোলে কমলকে বুঝিয়ে বলেন বেটাছেলে তুমি কত জায়গায় যাবে—এইটুকু পথ গরুর গাড়ীতে গিয়ে কেন আর থাকতে পারবে না। তবু পুঁটি চলে যাচ্ছে তার উপর তুমিও যাও, ছোটবউ একলা হয়ে যাবে—কাকে নিয়ে থাকবে সে তখন? কাঁদবে তো সে-ই। তুমি আর কি জন্যে কাঁদতে যাবে?

কমল বলে, একলা কেন, রাঙাদিদি বড়দিদি বউদাদা সবাই তো রইল।

বড়দিদি হল বিনো রাঙাদিদি নিমি আর বউদাদা অলকা। ছোটরা বড়দের কারো নাম ধরবে না। এমন কি বিনোদিদিও মঞ্জুর নয়—বিনো নাম তো বলাই হল, তার উপরে একটা দিদি জুড়ে দিয়ে দোষ খণ্ডাবে না। নিমির ফরসা রং, সেই জন্যে রাঙাদিদি। আর অলকার বেলা বউদিদি না হয়ে বউদাদা—

গোড়ামুখি বিনোর কাণ্ড একরত্তি ছেলেকে চুপিসারে শিখিয়েছে। বারো বছরে মেয়ে অলকা শ্বশুরঘর করতে এলো কিন্তু বাপের-বাড়ী থেকে যথোচিত তালিম নিয়ে আসে নি। সন্ধ্যাবেলা কাপড় কাপড় সিদ্ধ হবে উঠানের উনুনে হাঁড়ুয়া চাপানো হয়েছে। খান কয়েক ভিজে কাঠ দিয়ে মহিন্দার কর্তব্য সেরে হাটে চলে গেছে। ফুঁ দিতে দিতে বড়গিন্নি নাজেহাল, কাঠ কিছুতে ধরে না, খালি ধোঁয়াচ্ছে। তেঁতুলের নীচে আঁটি-বাঁধা নারকেল পাতা রয়েছে, সেইগুলো টানাটানি করছেন আর গজর-গজর করে মহিন্দারকে গালি দিচ্ছেন। হেনকালে কুড়াল পড়ছে আওয়াজ আসে বাইরের দিক থেকে।

(ক্রমশঃ)

কারণ আমরাই বাবু ॥

বিষ্ণু দে

আত্মীয়বন্ধুরা আর অনাত্মীয় ভদ্রলোকেরাও
যখন বলেন তিক্ত সুরে : এই শহরে বা গ্রামে
দীনদুঃখীজন সব ইদানীং লোভী ও অসৎ!

কারণ? আমরাই বাবু, হয়তো বা নিমচাঁদী ভাষ্যে
বাব্বীও অর্থাৎ মহিলারা, আমরাই সৎ ও মহৎ!
তখন কপালজোরে দুস্থজন যে করে না ঘেরাও,—
কারণ? কপালজোরে আমরাই যে জন্ম-ভাগ্যবান!
কারণ আমরাই শুধু ভদ্রলোক স্বনামে-বেনামে
কোম্পানির কলকাতায় মফস্বলে জেলায় জেলায় গ্রামে,
সচ্ছলতা সকলের নাই থাক, বাবু হাস্যে লাস্যে।

শাহেবী যুগের কিংবা আরো আগে—নবাবী দিনের
আমরাই গরীবি ছেড়ে চাকরির নির্বিঘ্ন কল্যাণে
কেউবা বাগিয়ে বসি জমি জোতদারি হাতটানে
ভদ্রলোক আছি আজও এই মর্ত্যে যে ভাগ্যহীনের
পালের কল্যাণে তারা খেয়ে থাক আহা বেচারারা!
দমনীয় হয় শুধু যেই ভাবে তারা সর্বহারা!

সুতরাং—সুতরাং কিবা বলি রাগ মনে প্রাণে!
কোথা সে দাপট গেল আমাদেরই দীনহীন গানে?
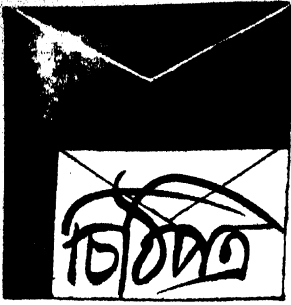
'সেইসব মানুষ' ও অমৃত প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকায় সম্প্রতি ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর সেই সব মানুষ ফেলে আসা অতীতের এক পরিচ্ছন্ন ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। ভাষার যাদুকর মনোজবাবু এই উপন্যাসের মাধ্যমে এই পরিণত বয়সেও চরিত্র চিত্রণ ও গল্প বলার সে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে হয় বয়স তাঁর দেহে জরা আনলেও চিন্তা, স্মৃতি বা পরিচ্ছন্ন লিখনশৈলীতে একটিও ফাটল ধরাতে পারে নি। তাই তাঁর 'সেই সব মানুষ' দশ বছর আগে লেখা মহৎ উপন্যাস 'ছবি আর ছবির' মিল খুঁজে পাচ্ছি।

ওঁর রচনার সবচেয়ে চমৎকার দিক—ওঁর গল্পে গ্রামের জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে। গ্রাম্য জীবনের হাজার একঘেয়েমী, হিংসা, ঈর্ষা, অসূয়া আর স্বার্থপরতার মাঝে যে সুন্দর মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া ছবিগুলোর সঙ্গে এ যুগের মানুষের পরিচয় নেই—সেই সব ছবি উজ্জ্বল রূপ বর্ণ গন্ধ ও স্পর্শ নিয়ে ফুটে ওঠে। নিনি, বিনো অলকাবৌ, জগন্নাথ দেবনাথ, উমাসুন্দরীর মুখ খুঁজে বেড়াই আমাদের চেনা-জানা পাঁচ-জনের মধ্যে। সে যুগ চলে গেছে যা আর আসবে না সেই যুগের নীড় থেকে কীর্তিটুকু পরিবেশন করে শ্রীবসু শুধু বর্তমান পাঠকদের আনন্দ পরিবেশন করছেন না—তাঁর উত্তরসূরীদের জন্যও রেখে যাচ্ছেন ফেলে আসা জীবনের এক বর্ণোজ্জ্বল মহামূল্যবান ছবি। ইতিহাসের এইসব কথা ও কাহিনী অমূল্য বলেই বিবেচিত হবে।

শ্রীবসু দশ বছর আগে ছবি আর ছবিতে লিখেছিলেন—ভবদা বেলতলা গাছের মগডাল থেকে পড়ে গেলেন। বয়স সত্তর। ও বয়সে টিকে থাক তো দুপাশে দুটি মানুষ লাগবে ধরে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিতে। তাঁর আশংকা সত্য হয়নি—এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলতে হবে। তিনি আরও অনেক-কাল কর্মক্ষম থেকে এধরনের মিষ্টি লেখা লিখে পাঠকদের পরিতৃপ্ত করবেন—এই কামনা করছি।

এই ধরনের লেখার বেশ কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও আশাপূর্ণা দেবীর লেখায় আর হাল আমলের শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের লেখায়। এই লেখার সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে অনেকে একমত নাও হতে পারেন—কিন্তু এর 'বিনোদনমূল্য' সম্বন্ধে কেউ ভিন্নমত পোষণ করবেন—এটা বিশ্বাস হয় না।

অদ্রীশ বর্ধনের 'গোয়েন্দা ধাঁধা' সাম্প্রতিক অমৃতের আর এক মূল্যবান সম্পদ। শ্রীদিলীপ রায়ের 'শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে' শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক হারিয়ে যাওয়া তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। তুলে ধরেছে—শ্রীঅরবিন্দের মহৎ মনের নানা ছবি। ফাদার দ্যতিয়েনের রোজনামচায় পাওয়া যাচ্ছে—মুসলমান পরিবারগুলির নানা বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য ছবি।

পরপর বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকের ছোট-গল্প ছাপিয়ে অমৃতের সাহিত্যমূল্য বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

অমৃতের নববর্ষ সংখ্যা সম্বন্ধে যে ঘোষণা করা হয়েছে তাতে সত্যিকারের আকর্ষণ বোধ করছি। আশা করব—এ সংখ্যা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়ে অগণিত পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করতে পারবে।

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিরাটী, কলিকাতা-৫১

*

উনিশে এপ্রিলের অমৃতে আমার লেখা টাঁড়বারো প্রবন্ধটির চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারা সম্বন্ধে ভারত বিখ্যাত বন্দুক-চালকদ্বয় সর্বশ্রী রবিকুমার দাস ও প্রণব-কুমার রায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এবং অনুযোগ করেছেন যে, ওঁদের সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগত কটাক্ষ করেছি বলে বহুলোক ওঁদের জানিয়েছেন।

এই দুই শিকারীই আমার বহুদিনের পরিচিত ও স্নেহাস্পদ এঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রীতি ছাড়া আমার অন্য কোনো বিরূপ অনুভূতি নেই। তাই বহুলোক কেন যে এতে কটাক্ষের কটুগন্ধ পেলেন জানি না। কোনো বিশেষ জঙ্গলে বা এলাকায় যে এঁরাই বহুসংখ্যক পাখি শিকার করেছেন এমন কথাও আমি লিখিনি। সে কারণই একথা জানানো প্রয়োজন মনে করি যে, সবিশেষ এঁদের প্রতি আমি কোনোই কটাক্ষ করিনি। ওঁরা না মারলেও অনেকানেক নামী শিকারী তা মারতেন এবং হয়ত এখনও মেরে থাকেন। আমার এই মন্তব্য সাধারণভাবে বহু শিকারীর বেলাতেই প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার মনোবৃত্তি আমার নয়। কারো নাম করিনি আমি, করতে চাইও না; কারণ সেটা কুরুচির পরিচায়ক। হাত ভালো বলেই যাঁরা আত্মশ্লাঘার দর্পের তাগিদে নিধন-যজ্ঞে মাতেন তাঁদের সম্বন্ধেই সাধারণভাবে কথা কটি লিখেছিলাম।

রবিকুমারের অকালে পরলোকগত দাদা নীলকণ্ঠ, সরল ও সুপুরুষ প্রভাতকুমার আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র ও বন্ধু ছিলেন। প্রভাতের সঙ্গে শিকার করে ওর লক্ষ্যভেদের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে বাঙালী হিসেবে গর্ববোধ করেছি। রবি ও প্রণবেরও হাতের তুলনা নেই। কী পরিমাণ অনুশীলন ও একনিষ্ঠতা থাকলে এরকম হাত তৈরী করা যায় তা যাঁরা কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা রাখেন এবিষয়ে, তাঁরাই জানেন। ওরা দুজন যে হাতের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে একদিনে শত পাখী মারেন নি ও মারবেন না এই ভরসা আমার আছে।

আশাকরি এই চিঠি প্রকাশিত হলে এই দুই শিকারী তাদের লাঞ্ছিত ও অস্বস্তি-পীড়িত অগ্রজকে ক্ষমা করবেন ও তাদের উষ্মার অবসান হবে।

বুদ্ধদেব গুহ ২৬।৪।৭৫

*

অমৃত—২৫ এপ্রিল সংখ্যায় "সুরের আগুন" শিরোনামে শ্রীমতী সন্ধ্যা সেনের লেখাটির জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ।

সময়মত এই নিবন্ধ প্রকাশ করে আপনারা রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগীদের কিছু বলার সুযোগ দিলেন। জনমত ও প্রগতির পথে এটার একটা বড় মূল্য আছে বলে মনে করি।

শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের গান রেকর্ড করা বন্ধ করার জন্য আমরা যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসি তারা মর্মাহত। আপনার পত্রিকার মাধ্যমে আমরা আমাদের বেদনা জানিয়ে রাখলাম।

দরদী কণ্ঠস্বরে ও পরিষ্কার উচ্চারণে তাঁর গান আমাদের মর্ম স্পর্শ করে এবং সেইখানেই দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি স্বার্থক নাম, প্রিয় শিল্পী।

বিরূপ সমালোচনা থেকে স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথও রক্ষা পান নি। তাঁকেও একবার দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়েছিল

"If there is rebirth I should not be born in Bengal again".

সুধীন্দ্রনাথকে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "মানুষের মধ্যে যে লোকটা বুদ্ধিমান তার দাবীর দিকে না তাকিয়ে যে লোক রসবিলাসী তাকে খুশী করার চেষ্টা করো"।

দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শ্রোতাদের খুশী করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এইখানেই তাঁর বড় কৃতিত্ব। হঠাৎ বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড তাঁর গান রেকর্ড বন্ধ করে দিলেন। আশ্চর্য! এতদিন তাঁরা কোথায় ছিলেন? এই ব্যাপারে বিশ্ব-ভারতী মিউজিক বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এবং এই আশা করি, আমরা যেন তাঁর রেকর্ড করা গান শুনতে পাই।

প্রণবকুমার বল,
রাজগাংপুর, উড়িষ্যা।

ঢাকা থেকে ফিরে প্রসঙ্গে

৭ই চৈত্র, ১৩৮১ সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা 'ঢাকা থেকে ফিরে' পড়লাম। সেখানে আমি কখনো যাই নি। শিল্পী নিমাই ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ—তাঁর তুলিকে ধন্যবাদ। মায়ের স্নেহ কত গভীর তা এই লেখা পড়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। বাংলা ভাষা যে কত সুন্দর, কত মিষ্টি তাও লেখক এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। শিল্পী এত স্পষ্ট আর নিখুঁত করে সেখানকার ছবি এঁকেছেন যে, আমি যেন অতি স্বাভাবিক-ভাবে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। এত অন্তরঙ্গ—এত হৃদয়গ্রাহী—এত মমতাময় লেখা খুব কমই পড়ার সুযোগ হয়েছে। সত্যিই যে ওপার বাংলার মানুষেরা দুঃখিনী বর্ণমালাকে রাজ রাজেশ্বরীর স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে তা জেনে কি আনন্দই না হচ্ছে।

পরিশেষে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে যাঁরা এই সংখ্যা 'অমৃত' আমাদের উপহার দিলেন—যার প্রচ্ছদ থেকে শেষ পৃষ্ঠাটি পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দর।

সত্যসাধন চেল
বেলবোনী, বাঁকুড়া।

অমৃত প্রসঙ্গে

আপনাদের 'অমৃত' পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে বড় আনন্দ পেলাম। সম্প্রতি এই পত্রিকার যে সংখ্যাগুলো বেরিয়েছে সেগুলো দেখলেই এটা বোঝা যায়। বিশেষ করে উন্নতি হয়েছে পত্রিকার ভেতর পৃষ্ঠার অলংকরণগুলোর। এত কম দামে এই রকম ভালো পত্রিকা পাওয়া যায়, তাও এই দুর্মূল্যের বাজারে, এটা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। আমি এই পত্রিকার প্রভূত জনপ্রিয়তা, আরও উন্নতি কামনা করে শেষ করছি।

নিশাকান্ত কুমার,
কাশিজোড়া মেদিনীপুর।

(২)

২রা বৈশাখ সংখ্যার ইন্দ্রাণী দেবীর চিঠি খুব ভালো লাগলো। মনোজ বসুর লেখা বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর লেখা পড়ে এক নতুন জীবনের, নতুন পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়। ইন্দ্রাণী দেবীর ঐ চিঠির একটি লাইন আমাকে আরো অনুসন্ধানী করে তুলেছে : "আর অরবিন্দ স্মরণে, সেতু জ্বালেই হবে।" লেখক শ্রীদিলীপকুমার রায় আমার গুরু। তাই তাঁর সম্বন্ধে ইন্দ্রাণী দেবীর কাছে কিছু জানতে আগ্রহী।

এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় আর একটি লেখা তাঁর আকর্ষণীয়। সেটি হলো সন্ধ্যা সেন লিখিত 'স্মৃতিতে দীন-শিল্পী পরেশ ভট্টাচার্য' শিল্পী জীবনের প্রতিষ্ঠায় ও স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে দিলীপ রায়ের সদা জাগ্রত সখ্য স্নেহভরা আনুকূল্য পরেশ-বাবু জীবনের প্রান্তে এসেও ভুলতে পারেন নি। অতি বড় সত্য কথা। আমি শিল্পীও নই, সাহিত্যিকও নই। আমি ওঁর (দিলীপ-কুমার রায়ের) পাণ্ডুলিপি কপি করে দিই। কিন্তু তিনি এত ভালোবাসেন যে তা প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নেই। আজ এই চিঠি লিখতে লিখতে তাঁর নববর্ষের একটি কবিতা পেলাম—কপি করবার জন্য—অপূর্ব! যখনই তাঁর চিঠির জন্য মন আকুল হয় ঠিক তখনই দেখি তাঁর চিঠি এসে গেছে। পৃথিবীব্যাপী যাঁর বন্ধুসংখ্যা তিনি এই আজকের চিঠিতেই আমাকে লিখেছেন : "তোমাকে চিঠি বেশি লিখি না বলে কিন্তু তোমার প্রতি আমার স্নেহ অটুটই আছে।" আমার কাছে তিনিই ভগবান।

পরপর দুটি সংখ্যায় সন্ধ্যা সেনের সংগীত বিষয়ক দুটি লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি এবং আরো লেখা আশা করছি।

পার্বতীশঙ্কর মোহেন্তা,
উখরা (বর্ধমান)

জানতে চাই

ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিষয় আমি জানতে চাই। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র ছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় ৬।৭ বৎসর পূর্বে "অমৃত" সাপ্তাহিকে বা অন্য কোন পত্রিকায় এবিষয় কিছু দেখেছিলাম। কোন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল আমার স্মরণ নেই। কোন সহৃদয় পাঠক এবিষয়ে আমাকে সাহায্য করলে বাধিত হব।

ব্রজেশচন্দ্র গুপ্ত,
ব্যারিস্টারস্ লাইব্রেরী হাইকোর্ট,
কলিকাতা।

বাংলা ছবির নায়ক

'অমৃত'-এর ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৫ সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে বাংলা ছবির নায়ক সংবাদ প্রসঙ্গে শ্রীদুর্গাপদ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি পড়লাম। লেখক তার চিঠিতে বাংলা ছবির দীর্ঘদিনের একটা সমস্যার কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন ও বর্তমান পরিচালকদের সেই মত ভাবতে অনুরোধ করেছেন।

বাংলা ছবির নায়ক সমস্যার আলোচনা উত্তমবাবুকে বাদ দিয়ে হয়তো করা যায় না—কিন্তু এই নায়ক আলোচনায় উত্তম-চিন্তা, উত্তম-সমস্যা বা উত্তম-ভীতির স্থান কোথায়? পরিচালক ও নায়ক শ্রী■মহেশ চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করেও প্রমথেশের শেষ দিকে এইরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর বেশ কিছুদিনের একটা শূন্যতা বা ফাঁক হয়েছিল বাংলা সিনেমায়। সেই সময়ও নতুন নতুন মুখ এসেছিল বাংলা সিনেমায় নায়ক বেশে। কিন্তু দর্শক আর একটা প্রমথেশ বা দুর্গাদাস পাচ্ছিল না। নতুন ভাবধারায়, সামাজিক আচার-আচরণে এবং যবে-সংস্কৃতির আদব-কায়দায় পুরোনো রীতি যখন প্রায় অচল হয়ে আসছিল, তখন বাংলা সিনেমায় উত্তমবাবুর প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টার পর বাংলা সাহিত্যিক-দের সাহিত্য চিন্তার (বিশেষ করে গল্প ও উপন্যাসে) যে আলোকপাত ঘটেছিল, তা অনেকখানিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক বিবর্তনের ফল। তাই দুর্গাদাস প্রমথেশ প্রমুখ নায়কদের পর উত্তমবাবুই বিশেষ করে বাংলা সিনেমায় নিজের একটা ইমেজ তৈরী করতে পেরেছিলেন। কথা হচ্ছে এভাবে আর কতদিন চলবে? উত্তমবাবুর পক্ষে এটা যত গৌরবেরই হোক—বাংলা ছবিতে যাঁরা আসছেন বা এসেছেন তাঁদের এটা ভাল করে বুঝতে হবে। শুধু একটা নায়কের সুযোগ পেলেই হবে না—বা উত্তম-বাবুকে অনুসরণ করলেই চলবে না—*নতুন ইমেজ তৈরি করতে হবে। এটা কোন ঈর্ষা বা প্রশংসার কথা নয়।* এটা একটা সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় জীবনের পরের অধ্যায়ের কথা। আমার মনে হয়, ঠিক এই চিন্তা ও প্রয়োগের বাস্তব প্রচেষ্টার অভাব থেকেই উত্তম-যুগ শেষ হয়েও এখনও চলছে। ১৫।২০ বছর আগের নরনারীর রাগ-অনুরাগের অভিনয় উত্তম-সুচিত্রাকে যেমন করতে দেখেছি, বর্তমান কোন অভিনেতা, অভিনেত্রী যদি আজকের নর-নারীর রাগ-অনুরাগের সূক্ষ্ম ভাবনা-চিন্তাকে ঠিক সেইরকম নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে দেখাতে পারেন। আজকের কায়দায়, আজকের ঢঙে তবে নিশ্চয় তা জনপ্রিয় হবে। শিল্পের মূলে কথা হয়তো বাস্তবের অনুকরণ, সেই নকলই তো আর একটা সৃষ্টি। কোন শিল্পীকে গালাগাল দিয়ে বা তাঁকে নকল করে তাঁর চেয়ে বড় হওয়া যায় না। বর্তমান পরিচালক (যাঁরা শিল্পী সৃষ্টি করতে চান) এবং অভিনেতা, প্রভৃতি তাদের প্রত্যেকেরই বর্তমান পরিবর্তিত ভাবধারা ও বিভিন্ন স্তরের আদব-কায়দার অনুশীলন দরকার। এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হওয়া দরকার। তবেই আর একটা নতুন নায়কের ইমেজ তৈরি হবে। এবং আর একজন 'উত্তমোত্তম' নায়ককে খুঁজে পাবে দর্শক।

ভাস্কর ভট্টাচার্য,
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

একটি ছোট্ট জিজ্ঞাসা

বর্তমানের বহু নামী-দামী লেখক-সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সম্মানীয়-মাননীয় প্রবীণ-নবীন ব্যক্তিদের অনেকে চিঠির শেষে নমস্কারান্তে 'ইতি' কথাটি লিখে থাকেন। উল্লিখিতদের একদল বলেন—এটা ভুল; অপরপক্ষ বলেন—এটা ঠিক। নমস্কারান্তের পর 'ইতি' লেখাটা নাকি ভুল! আমরা জানতে চাই কে সঠিক আর কে বেঠিক।

প্রবীর ঘোষ,
সম্পাদক—'বর্ণালী' বসিরহাট।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু আমার অবিশ্বাস হয়নি কারণ আমি জানতাম ও স্বভাবে গোপনিকা—reserved অভিনেত্রী হতেই পারে না। তাছাড়া ওর মুখের সে ভাবাবস্থার ফটো আছে—দেখলে কোনো দরদী দর্শকের মনেই সংশয় আসতে পারে না। অবশ্য বেদরদীর কথা আলাদা।

।।উনচল্লিশ।।

যথাবিধি গুরুদেবকে সব লিখে জানালাম—খুঁটিয়ে। তিনি চিঠিতে উত্তর দিলেন যে ওর advanced consciousness এবং এ সমাধির নাম সবিকল্প সমাধি। শ্রীমা বললেন : 'দেখো ওর সমাধির সময়ে কেউ যেন ওকে না ছোঁয় কি জাগায়। খুব সাবধান!' শ্রীমার ওর পরে স্নেহ বরাবরই সমান গভীর ও মধুর ছিল। ওকে ভালোবেসে তিনি কত যে কথা বলতেন! ...কিন্তু সে যাক ওর কথাই বলি।

বলেছি 'বরফ ভাঙল'। ও একটু একটু করে বলা সুরু করল ওর মনের প্রাণের অন্তরের কথা। তার চুম্বক হল এই : ওর কোনো অভাবই নেই আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবী সবাই ওকে স্নেহ করে অকৃত্রিম। ও-ও সবাইকে ভালোবাসে। দাম্পত্য জীবনেও স্বামীর প্রতি ওর প্রীতি অটুট। কিন্তু সব থেকেও যেন কিছুই নেই কিছুই ভালো লাগে না। অথচ ও গুরুবাদে বিশ্বাস করে না তাই চায় না কারুকে গুরু করতে। কেবল একটি জিনিস চায়—আমি ওকে পথ দেখাই বলি ওকে কী করা উচিত—কিসে এ দুঃসহ রাত পোয়াবে...ইত্যাদি।

আমি ওকে বললাম শ্রীঅরবিন্দকে গুরু বরণ করতে। ও হ্যাঁ না কিছুই বলল না। তখন সব জানিয়ে গুরুদেবকে লিখলাম। তিনি লিখলেন : 'ও যদি চায় তো আমি ওর গুরু হতে পারি।' কিন্তু ও বলল : 'না আমার গুরু যদি কেউ থাকে সে তুমি।'

আমি চমকে উঠলাম : 'তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি সাধক জিজ্ঞাসু মাত্র—তোমার গুরু হব কোন অধিকারে? তুমি মিথ্যে রোখ করে হেলায় হারিও না এ-দুর্লভ সুযোগ। শ্রীঅরবিন্দ সহজে কাউকে দীক্ষা দিতে চান না। আমাকে তো ফিরিয়েই দিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে—বলেছি তোমাকে। তুমি পরম ভাগাবতী যে আসতে না আসতেই তিনি রাজী হয়েছেন তোমার গুরু হতে...' ইত্যাদি।

হায় রে। ওর সেই এক ধুয়ো : 'না। শ্রীঅরবিন্দকে আমি গভীর ভক্তি করি। কিন্তু আমার অন্তর যদি কাউকে গুরুবরণ করতে চায় সে তুমি আর কেউ নয়।'

'অসম্ভব।'

'বেশ। তাহলে আমি ফিরে যাই—কালই।'

আমি অগত্যা ফের শ্রীঅরবিন্দকে লিখলাম—বেশ একটু বিমর্ষ হয়েই বলব—যে জনককুমারী হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে চাইছে—অবোধ ও অন্ধ বলে। আপনি ওর চোখের ঠুলি খুলে দিন—যাতে ও দেখতে পায়—ও কী পেতে পারে যদি সত্যি চায়।

শ্রীঅরবিন্দ তাতে লিখলেন : 'ইন্দিরাকে তুমিই আমাদের কাছে এনেছ তুমিই তার সহায় হয়ে এসেছ তাকে পথ দেখিয়েছ। আমাদেরকে সে মনে করে তোমার গুরু—তুমি তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছ—তার প্রয়োজনও আছে এ সাহায্যের।... আর তুমি শুধু তাকে নয় আরো অনেককে সাহায্য করেছ আমাদের দিকে ফিরিয়েছ যারা নিজে থেকে আমাদের দিকে ফিরত না। তোমার মধ্যে এই ক্ষমতা আছে অপরকে আকর্ষণ করার—শুধু ভগবান নয় প্রকৃতিও তোমাকে এ-শক্তি দিয়েছেন ভগবৎ-সেবার জন্যে।.. তাঁর দেওয়া নানা শক্তিকে যদি তাঁর কাজে লাগাও তাতে প্রত্যবায় ঘটতে পারে না যদি তুমি সে-শক্তির সুনিয়োগ করো।' (৬-১২-৪৯)

আমাকে গুরুদেব চলাফেরার স্বাধীনতা দিতেন খুবই বেশি। শুধু তাই নয় এমন অনেকেই আশ্রমে আমার অনুমতি পেয়েছে যারা বারবারই অনুমতি চেয়ে নিরাশ হয়ে আমার ঘটকালিতে আসতে পেরেছিল। এক-বার আমার এক ব্যারিস্টার দর্শনার্থী বন্ধু নাগপুর থেকে তার নানা উপলব্ধির বিবৃতি দিয়ে আমাকে লেখেন শ্রীঅরবিন্দকে দেখাতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চিঠি পড়ে বলে পাঠান—'না'। ব্যস। তার-পরেই পুনশ্চ : 'তবে যদি দিলীপ অনুরোধ করে তবে তিনি আসতে পারেন।' এমন কি কয়েকটি সমাজ বহির্ভূতাও আমার ফ্ল্যাটে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন যাঁদের অন্য কোথাও ঠাঁই হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য অঘটন ঘটল জনককুমারীর বেলায়। আশ্রমে আর কোনো সাধকই আর কাউকে শিষ্য করার অনুমতি পায়নি। জনককুমারীই প্রথম অনুমতি পেল দিলীপকুমারের মন্ত্রশিষ্যা কন্যাশিষ্যা হতে। এতে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন কিন্তু গুরুদেব লিখলেন আমাকে যে তিনি অনুমতি দিয়েছেন এই জন্যে যে জনককুমারী আমার সাধনসঙ্গিনী হলে আমার সাধনার প্রগতি হবে। শ্রীমাকেও রোজ প্রণাম করতে যেত। তিনি প্রায়ই ওকে ঘরে ডেকে নিরালায় ওর নানা দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। একবার বলেছিলেন প্রকাশ্যেই :

"She has a rare power of true vision." এই সব শুনেও বটে আর ওর সরল আন্তরিকতা ও গুরুভক্তির জন্যেও বটে—আমি ওকে শেষে হতাশ হয়ে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিলাম। তারপরেই 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'—মীরার আগমনী।

সব বলতে গেলে চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা হয়ে যাবে মীরার কাহিনী তাঁর হিন্দি ভজন, আত্মকথা, নানা ভাগবতী বাণী, মঞ্জু কণিকা ইত্যাদি। (কিছু কিছু লিখেছি এ সম্পর্কে 'শ্রুতাঞ্জলি' ও 'প্রেমাঞ্জলি'-র ভূমিকায়, পরে—সম্প্রতি আমাদের PILGRIMS OF THE STARS -এ) তাই এখানে শুধু দুচারটি কথার পুনরুক্তি করতে চাই—যা না বললেই নয়। তাছাড়া যখন অন্যত্র মীরার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কাহিনী সুরু করেছি তখন সাঙ্গ করতে হলে কয়েকটি অঘটনেরও পুনরুল্লেখ করতে হবে যদিও জানি অনেক বুদ্ধিমন্ত ক্রিটিক শুধু যে বিশ্বাস করবেন না তাই নয়—সস্তা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীরন্দাজি করতেও ছাড়বেন না। প্রসঙ্গত যৌগিক অঘটন সম্বন্ধে আমি একদা শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করেছিলাম ১৯৩৫ সালে ডিসেম্বর মাসে। * আমার মুখ্য জিজ্ঞাস্য ছিল—তিনি কেন এ সম্বন্ধে নীরব থাকতে চান। উত্তরে তিনি আমাকে যা লিখেছিলেন তা থেকে একটু উদ্ধৃত করি :

> "If I write about these questions from the yogic point of view, even though on a logical basis, there is bound to be much

that is in conflict with current opinions e.g. about miracles, the limits of judgment of sense-data etcetera I have avoided as much as possible writing about these subjects because I would have to propound things that cannot be understood except by reference to other data than those of the physical senses or of reason founded on these alone, I might have to speak of laws and forces not recognised by reason or physical science. In my public writings and my writing to sadhakas I have not dealt with these because they go out of the range of ordinary knowledge and the understanding founded on it. These things are known to some, but they do not usually speak about it, while the public view of much of those that are known are either credulous or incredulous, but in both cases without experience or knowledge".

(ভাবার্থ : আমি যদি এসব প্রশ্ন নিয়ে যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখি, যুক্তিবাদের ভিতে দাঁড়িয়ে লিখলেও এমন অনেক কিছু আমাকে লিখতেই হবে যা চলতি মতামতের সঙ্গে আদৌ মেলে না।—যথা অঘটন, ইন্দ্রিয়-বোধলব্ধ নানা বিচারের দৌড় কতদূর... ইত্যাদি। আমি এ সব সম্বন্ধে পারৎপক্ষে বেশি লিখি নি কারণ লিখতে হলে এমন অনেক ভূমিকার অবতারণা করতে হত যাদের বোঝা যায় না যদি না ইন্দ্রিয়বোধলব্ধ তথ্যের বহির্ভূত তথ্যকে—বা যে সব তথ্য ইন্দ্রিয়বোধভিত্তি যুক্তির এলাকার বাইরে তাদের না পেশ করা যায়। অর্থাৎ আমাকে বলতে হ'ত এমন অনেক শক্তি বা প্রাকৃতিক বিধানের কথা যা যুক্তি বা জড়বিজ্ঞানের দরবারে নামঞ্জুর। আমার নানা লেখায় বা পত্রে আমি এসব ব্যাপার উহ্য রেখেছি কারণ চলতি জ্ঞান বা বুদ্ধি এদের নাগাল পায় না। এ সব নিগূঢ় সংঘটন সম্বন্ধে কেউ কেউ ওয়াকিবহাল, কিন্তু সচরাচর তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন আর গণমন এসব সম্বন্ধে হয় সংশয়ী, নয় কানপাৎলা—অর্থাৎ উভয়েরই তাদের না আছে অভিজ্ঞতা না জ্ঞান।)

কিন্তু আমি আমার নানা লেখায়—প্রবন্ধে কবিতায় উপন্যাসে, স্মৃতিচারণে অঘটনের কথা লিখেছি বলে এখন আর পেছুনো যায় না—নাচতে নেমে ঘোমটা টানা বিড়ম্বনা। তাই অনেকে অবিশ্বাস করবেনই করবেন জেনেও লিখে যাব সরলভাবে লোকে বাঁকা বা অসরল হাসি হাসলেও। একদা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিলব্ধ বাণীকেও তো লোকে হিস্টিরিয়া বলে নাকচ করত। এখনো অনেক যুক্তিবাদী মনে করেন সমাধি দর্শনাদি সবই কল্পনার গল্পকথা। আমি নিজে যখন জানি আমি সত্য কথাই বলছি তখন পাঁচজনে তাকে মিথ্যা বলে দেগে দিলে আমার কী ক্ষতি হতে পারে— বিশেষ যখন আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে উপনিষদের কথা : 'সত্যমেব জয়তে—নানৃতম্'— অন্তিমে সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার না। বলতে ভুলেছি ওকে দীক্ষা দেওয়ার পরে ওর নাম দেওয়া হল আশ্রমনাম—ইন্দিরা।

হল কি, ইন্দিরার কাছে মীরা এসে গান গাইতে সুরু করলেন, পরে নানা আত্মকথা বলতে তাঁর একটুও বাধল না। দিনের পর দিন চলল এই আশ্চর্য দর্শন, কথন কীর্তন। আরো আশ্চর্য, ইন্দিরার মনে থাকত মীরার অপূর্ব ভজনাবলী—অশ্রান্ত একটানা মীরা গেয়ে যান, ইন্দিরা সমাধিতে শুনতে থাকে পরে সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে ভাবমুখে আবৃত্তি করে কী শুনেছে আর আমি টুকে নিই খাতায়। এমনি করে দেখতে দেখতে খাতার পর খাতা ভরে ওঠে ইন্দিরার আবৃত্তি মীরা ভজন—এখনো আটশোর কম হবে না। সুরু হয়েছিল গান শোনা ১৯৪৯ সালে এ বৎসর (১৯৭৪) জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দিয়েছে দুটি গান।

আর শুধু গানই তো নয়— অপূর্ব ভক্তির অমৃতধারা বয়ে চলেছে নির্ঝর-ঝংকারে! আমি এ গানগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছি 'তারাঞ্জলি' ও 'ভাবাঞ্জলি'-তে। এর পরে 'উষাঞ্জলির' ৫০টি গানের অনুবাদ করেছি—অদূর ভবিষ্যতে ছাপা হবে আশা করি। এ গানগুলি আমি যত্র তত্র গেয়ে থাকি মূলে হিন্দিতে তথা বাংলা অনুবাদে। আমার কাছে এ গানগুলি ঠাকুরের সাক্ষাৎ বরদান। কারণ—বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের পরে—এ গানগুলি আমার সাধনার সহায় তথা পথের পাথেয় হয়ে এসেছে। 'শ্রুতাঞ্জলি' ও 'প্রেমাঞ্জলি'-র ভূমিকায় আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভাই ডঃ ইন্দ্রসেন এ গানগুলির সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসেই লিখেছেন অনেক কিছু। শেষে দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের তিন তিনটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি। এখানে একটি কথা বলি : ইন্দিরার মাতৃভাষা পাঞ্জাবী। কিন্তু ওর নানা বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে উর্দুতেই কথা বলে। লেখেও উর্দু হরফে। উর্দুতে ওর কয়েকটি গান আছে— সেগুলির প্রণেত্রীও নিজে। কেবল মীরাভজনগুলি ওর দিনের পর দিন শোনা গান। তাই ওর প্রথম ভজনাবলী ছাপা হয় পণ্ডিচেরি আশ্রমে : 'শ্রুতাঞ্জলি'। দ্বিতীয় সংস্করণে 'প্রেমাঞ্জলি'-র গানগুলিও জুড়ে দেওয়া হয়। তার পরে যথাক্রমে ছাপা হয়—সুধাঞ্জলি, দীপাঞ্জলি, ভাবাঞ্জলি ও উষাঞ্জলি। এর পরে ছাপা হবে বিভাঞ্জলি। কিন্তু তার দেরি আছে। আর একটি কথা এই সম্পর্কে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগে আগে ও মীরার মুখে যে গানগুলি শুনত সে গানগুলির সুর ওর মনে থাকত না—তাই ওর আবৃত্ত গানগুলি আমিই গাইতাম সুর বসিয়ে। সম্প্রতি ও সুরগুলিও অনেক সময়েই গেয়ে শোনায়—আমি তৎক্ষণাৎ স্বরলিপি করে নিই। এগুলি আমার 'সুরাঞ্জলি' স্বরলিপি গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। * সুর ও গানগুলির আমি প্রচার চাই তাই পাদটীকায় ঠিকানা দিলাম—কোথায় প্রাপ্তব্য।

ইন্দিরার অভ্যাদয়ের পরে অঘটনের পর অঘটন ঘটতে লাগল শুধু আমার নয় আরো দশ বারোজনের চোখের সামনে। সে-সব অঘটনের কথা অন্যত্র বলেছি—আমার নানা লেখায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলেছি যে আমার কাছে সবচেয়ে বড় অঘটন ইন্দিরার এই অবিশ্রান্ত নিরবধি কাল গানের আনন্দ বিতরণ করা। এর কারণ দুর্বোধ্য নয়। বলেছি, আমি আবাল্য ভালোবেসে এসেছি কবিতা (সাহিত্য) ও গান। সারা ভূভারত একদা আমি ভ্রাম্যমাণ হয়েছিলাম গানের খবর নিতে—শুধু ওস্তাদী গানের নয়, ভজন কীর্তনেরও—বিশেষ করে মীরা-বাইয়ের গান। ১৯২৪ সালে সেসুন হাসপাতালে আমি মহাত্মাজীকে মীরাভজন শুনিয়ে ধন্য হয়েছিলাম। তারপর কত আসরে তুলসীদাস, সুরদাস, দাদু প্রমুখ মরমিয়াদের গান গেয়ে পথের পাথেয় সংগ্রহ করেছি। এ-হেন গানপাগলা মানুষকে ইন্দিরা দিল অপরূপ গানের পর গান যার পরে আর কোনো হিন্দিগানই গাইতাম না—এক তুলসীদাসের দু-একটি ভজন ছাড়া। আমার সত্যিই মনে হত ইন্দিরা প্রসাদ মীরাভজন গাইতে গাইতে যে এ সুরে আমি মীরার কৃপাপরিধির মধ্যে প্রবেশ করেছি।

(ক্রমশঃ)

---

* আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখেছিলাম যে একটু আমি ঠেকে শিখেছি যে নানা যোগ-বিভূতিকে অনেকে ব্যঙ্গ করেন নিজের মান বাঁচাতেই—বুঝতে পারছি না বলতে মগজী বুদ্ধির অভিমানে আঘাত লাগে বলে। নৈলে কি স্বামী বিবেকানন্দও প্রথম দিকে পরমহংসদেবের নানা দর্শনাদির কথা শুনে রায় দিতেন : 'ও সব কল্পনা, মনের ভুল—বাস্তব সত্য নয়।'

* প্রকাশক—সুরকাব্য সংসদ ১৯ জওহরলাল নেহরু রোড কলিকাতা ১৩। মূল্য ২০'। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স-এর ওখানেও প্রাপ্তব্য : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭।

জীবন যেমন

অজিত পূততুণ্ড

ঝুমার শাড়িটা এক গুচ্ছ ফুলের মত ঝপ করে সঞ্জয়ের কাঁধের ওপর পড়ল। সঞ্জয় তখন সামনে ঝুঁকে কী একটা আঁকছিল। ঝুমার শাড়ির পেলব স্পর্শে ওর বুকের ভেতরে মৃদু কম্পন জাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার জন্য কাগজ থেকে চোখ তুলল সঞ্জয়। কিন্তু সংগে সংগেই বাধা পেল। —'না-না-না পেছনে তাকাস না।'

উপল খণ্ডে বাধা পেয়ে ঝর্ণার জল যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল। সঞ্জয় উপভোগ করল ঝুমার কথা। কিন্তু সেই সংগে একটা প্রচণ্ড কৌতূহল ওকে ভেতর থেকে ধাক্কা দিতে লাগল। সামনে দৃষ্টি রেখেই বলল, 'কেন তাকালে কি হবে?'

ঝুমা বলল, 'আমি এখন প্রকৃতির দেওয়া পোশাক পরে আছি। ইভের অবস্থা! ইভ কথাটার মানে বুঝতে পারছিস তো? সৌন্দর্য এবং পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। বিউটি অ্যাণ্ড পিউরিটি কমবাইন্ড। কিন্তু তুই তাকালেই ব্যাপারটা অশ্লীল হয়ে দাঁড়াবে। তখন বিউটি হবে নেকেডনেস আর পিউরিটি চলে যাবে ভালগ্যারিটিতে।'

সঞ্জয় সামনের দিকে দৃষ্টি রেখেই বলল শালীনতার দারুণ ব্যাখ্যা তো?'

—ইয়া! —দাঁত চেপে ছোট্ট উত্তর দিল ঝুমা।

ঘুরে বসল সঞ্জয়। আর সংগে সংগে হিহি করে হেসে উঠল ঝুমা। ওর তখন বেল বটম পরা শেষ। গায়ে একটা কোট চাপাতে চাপাতে বলল, 'তুই কী বোকারে?'

ঝুমার দেহটা জরিপ করতে করতে সঞ্জয় বলল 'কেন বোকামির কি দেখলি?'

কাঁধে একটা দোলা দিয়ে ঝুমা বলল, 'ইমাজিনেশনের একটা চান্স মিস করলি। রোমান্স হারালি।'

—কি রকম?

—এই যেমন ধর আমার পরনের শাড়িটা তোর কাঁধে গিয়ে পড়ল। পড়ার সংগে সংগেই তোর কল্পনায় ভেসে উঠল একটি নগ্ন মেয়ের ছবি। একটা নিটোল নারী দেহ। তুই অমনি কল্পনার রঙ মিশিয়ে তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই শুরু করে দিলি। প্রকৃতির মত ছেলেমেয়ে হয়ে গেলি। কেমন মজা বল তো? তা নয়? আমাকে ...ইয়ে অবস্থায় দেখার জন্য পাগল। তুই একদম বোকা!

কথা বলতে বলতে সঞ্জয়ের কাছে সরে এসে বলল, 'দেখি কী আঁকছিস?' কাগজটা হাতে নিয়ে বলল, 'ধোৎ তোর এই সব মডার্ন আর্ট আমার ভাল লাগে না।'

—সে কী রে, ওদের সামনে যে মডার্ন আর্টের দারুণ প্রশংসা করিস?

—ওটা করতে হয়। শো। বলতে পারিস ইনটেলেকচুয়াল হবার বিড়ম্বনা।

—মাইরি তোর মত স্ট্রেট কথাবার্তা—। ব্রিয়্যালী তুই একটা—কী যে বলি।—

কথা শেষ না করেই লাফিয়ে উঠে ও'কে জড়িয়ে ধরল সঞ্জয়।

—করছিস কী? মারবি নাকি? —হাসতে লাগল ঝুমা।

ঠিক তখুনি সদর দরজায় বেলটা বেজে উঠল। থমকে দাঁড়াল দুজনেই। সঞ্জয় কেমন একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, ক্কী রে বাবা বৌদিরা ফিরে এলো নাকি?

—এলো তো কি হল? তুই যেন ভয় পেয়ে যাচ্ছিস? কাওয়ার্ড!

—ভয়ের কথা হচ্ছে না। মানে—

পর পর আরও দুবার বেল বাজল। ঝুমা নিজেই গিয়ে খুলে দিল দরজা। দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকল একরাশি উচ্ছল জীবন নূপুরে দোলা অতসী অসীম বিল্টু বাপী—কাজল এবং লিজা অ্যামেরিকান সেই মেয়েটি। ঝুমাকে দেখে ওরা সবাই প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠল আরে ঝুমা তুই-ও এখানে? খুব ভাল হল।'

—ব্যাপার কি তোদের? সব দলবল বেঁধে?

—পিকনিক। পিকনিকের প্রোগ্রাম করতে এলাম। —বাপী সিগারেটের একটা রিং ছেড়ে বলল।

ঝুমা তাকিয়েছিল লিজার দিকে। ওর পরনে সাদা ঢোলা পাজামা এবং গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী। ঝুমার চোখে চোখ পড়তেই লিজা নিঃশব্দে হাসল। হাসল ঝুমাও।

ওরা সবাই মিলে খানিকটা হৈচৈ করল। চা খেল। পিকনিকের স্পট নিয়ে আলোচনা চলল। তারপর এক সময় উঠে গেল সবাই।

ওরা চলে যেতেই ঝুমা বলল, 'লিজার পা থেকে মাথা পর্যন্ত হ্যাংলার মত খুব তো দেখলি। দেখে কী পেলি?'

বাজে কথা বলিস না। লিজার দিকে ভাল করে তাকাবার সুযোগই পাইনি। তবে যাই বলিস লিজা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। টেড ছেলেটাও খারাপ নয় সত্যি-কারের ভাল ছেলে। টেডকে তোর ভাল লাগে না?

ঝুমা একটা পেপার ওয়েট নিয়ে লোফা-লুফি করতে করতে বলল 'ভেরি সিম্পল। ওকে নিয়ে আলোচনা চলে না। বেচারা লিজার জন্য দুঃখ হয়।'

—কেন দুঃখ হয় কেন?

'স্পষ্ট কোনো কারণ নেই। এমনিই হয় বলতে পারিস।' বলে ধাঁ করে সঞ্জয়ের কাঁধের ওপর একটা চড় বসাল ঝুমা।

তারপর বলল, 'সত্যিই পিকনিকে যাবি তো? নাকি সেবারের মত করবি? কথা দিয়ে শেষ পর্যন্ত যাবি না। রাস্তায় হাঁ করে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

গতবারের কথাটা বলতেই সঞ্জয় যেন কুঁকড়ে গেল। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ছুঁচলো দাড়ি লম্বা মোটাসোটা চেহারার সেই ভদ্রলোকের মূর্তি। মিঃ বোস। ঝুমাদের কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। ঝুমা ওরই অ্যাসিসটেন্টের পোস্টে চাকরি করে। ঝুমা কথা দিয়েছে মিঃ বোসকে ধরে ওদের কোম্পানীতে সঞ্জয়ের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। বিশেষ করে ওদের যে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী আছে সেখানে সঞ্জয়ের মত আর্টিস্ট-এর একটা কিছু ব্যবস্থা হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। সঞ্জয় এতদিন সেই আশাতেই ছিল। শুধু তাই নয় তারপরেরও একটা স্বপ্ন মাঝে মাঝে ওর মনে উঁকি দিত। কিন্তু গত বছর এমনি সময়ে রাস্তায় সেই দৃশ্যটা দেখে ওর সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। দৃশ্যটা অবশ্য কিছুই নয়। বিশেষ করে ঝুমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

এখন ওর ঠিক মনে পড়ছে না তবে খুব সম্ভব রাস্তাট লিন্ডসে স্ট্রীট। সঞ্জয় কেন ওখানে গিয়েছিল সেটাও এখন মনে নেই। কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যটা দেখে ও যেন কেমন আর্তনাদ করে উঠেছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা যন্ত্রণা মুহূর্তে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠেছিল। সামনে ঝুমা আর মিঃ বোস। ঝুমার পরনে বেলবটস। কাঁধে ঝুলছে লম্বা স্ট্র্যাপওয়ালা ব্যাগ। চলার তালে তালে শ্যাম্পু করা চুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর গোটা শরীরে যেন প্রজাপতির মেলা। মিঃ বোসের বাঁ-হাতটা ওর ডান কাঁধের ওপর রাখা। দুজনে গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছে।

পেছন থেকে দৃশ্যটা দেখেই উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করেছিল সঞ্জয়। ঠিক হাঁটা নয় কী এক আতঙ্কে একেবারে উর্ধশ্বাসে দৌড়তে শুরু করেছিল। প্রচণ্ড তাপ লেগে ওর মডার্ন আর্টের চিন্তাগুলো যেন গলে গলে পড়ছিল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর মনে হয়েছিল সমস্ত মাথা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। কিছুই যেন নেই সেখানে কোনো কালে যে কিছু ছিল তাও মনে হয় না। জ্বরের ঘোর কাটবার ঠিক পরে যেমন হয় তেমনি। একটা অসাড় ভাব। এর ঠিক পরদিনই ছিল পিকনিক। কিন্তু পিকনিকের কথাটা ওর মনেই ছিল না। কাজেই পরদিন অনায়াসেই নটায় ঘুম ভাঙতে পেরেছিল।

পিকনিকের পরদিন সকালে ঝুমা এসে কেবল মারতে বাকী রেখেছিল। সঞ্জয় কিছুই বলেনি। আসলে কিছু বলার মত মনের অবস্থাই ওর ছিল না। কেবল অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'কি করব ঘুম ভাঙল যে অনেক দেরীতে?'

'সো হোয়াট? তুই কি স্পটটা জানতিস না? দেরীতেই না হয় যেতিস।' ঝুমার একথার উত্তরে মিঃ বোসের নামটা সঞ্জয়ের ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু কথাটা মনে আসতেই নিজেকে বড্ড জোলো মনে হয়েছিল। তাড়াতাড়ি কথাটা তাই গিলে ফেলেছিল। কিন্তু ঝুমা ছাড়বার পাত্রী নয়। সঞ্জয়ের চোখে চোখ রেখে বলেছিল 'তোর চোখ দেখে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। এনিথিং রঙ?' হাহা করে হেসে সমস্ত ব্যাপারটা হালকা করবার চেষ্টা করেছিল সঞ্জয়।

ঝুমার কথায় সঞ্জয় গত বছরের কথা-গুলোই ভাবছিল।

সঞ্জয়কে চুপ করে থাকতে দেখে ঝুমা বলল, 'কি হল। সত্যি সত্যি যাবি তো? নাকি এবারও ডুব মারবি? যদি না যাস স্পষ্ট করে বল।'

সঞ্জয় আবার আঁকাটা নিয়ে বসেছিল। ঝুমা ওর পিঠের ওপর ঝুঁকল। সঞ্জয় অনুভব করল ঝুমার বুকটা চেপে বসেছে ওর পিঠের ওপর। সঞ্জয়ের মাথার ভেতর কী একটা পোকা হঠাৎ কিলবিল করে উঠল। হাসি হাসি মুখে আলতো করে বলল, বাড়িতে কেউ নেই। জানিস তো এখন যা খুশি তাই করতে পারি।'

—কথা ঘোরাবার চেষ্টা করিস না। যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দে। গতবার না যাওয়ার বিশ্বাসযোগ্য কোনো উত্তর দিতে পারিসনি। এবারও যদি—।

সঞ্জয় আরও একটু ঝুঁকল। ঝুমার বুকটা আরও চেপে বসল সঞ্জয়ের পিঠের ওপর। কাগজের ওপর আঁচড় দিতে দিতে বলল, 'চাকরি-বাকরি করি না। কিন্তু ভাল লাগে না। হৈচৈ করবার মত ঠিক মুড পাই না।

—দ্যাটস এ লাই। তোর টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই। এই বাজারে ফ্যামিলি থেকে মাসে মাসে চার শো টাকা কে পায় রে? দিব্যি তো আছিস।

—আমি কিন্তু এমনি দিব্যি থাকতে চাই না। প্যারাসাইট হয়ে থাকা— নিজে কিছু না করলে ভাল লাগে?

ঝুমা হঠাৎ সঞ্জয়ের চুলের মুঠিটা ধরে একটা নাড়া দিল। 'উঃ ছাড় ছাড় ভীষণ লাগছে।' ঝুমার হাতটা চেপে ধরল সঞ্জয়। ঝুমা কিন্তু চুলের মুঠিটা ধরে রেখেই বলল উজবুক কোথাকার। আমাকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে না? বলিনি আর দু মাসের মধ্যেই তোর চাকরি হবে? প্যানেলে তোর কত পজিসন জানিস? আহাম্মক!' চুলের মুঠিটা ছেড়ে দিয়ে ঠোঁট ওল্টাল ঝুমা।

চুল ঠিক করে সঞ্জয় একটা সিগারেট ধরাল। ঝুমা ড্রেসিং টেবল-এর ওপর থেকে চিরুনিটা ছুঁড়ে দিল সঞ্জয়ের দিকে। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ওর সামনে। ঝুমার বুকের খাঁজটা সঞ্জয় এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঐদিকে চোখ রেখেই ও সিগারেট টানতে লাগল। ওর কেবলই মনে হতে লাগল একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওর মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে।

—তোর ব্যাপার কি বল তো? আজকাল ডুব এভাবে থাকিস কেন? কি হয়েছে তোর?

সঞ্জয় এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তোদের অফিসে আমি চাকরি করব না।

—জোক করছিস? —ভুরু কুঁচকোলো ঝুমা।

—না সিরিয়াসলি।

ঝুমা স্থির চোখে চেয়ে রইল। ওর শ্যামলা রঙে একটু বেগুনি ছোপ ধরল। বুকের ওপর তাড়াতাড়ি করে হাত রাখল। একটা কথাও বলল না। সঞ্জয়ের চোখের দিকে চেয়েই রইল।

—তুই কিছু মনে করিস না। তাদের কোম্পানীতে আমি নিজেকে ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারব না। মিঃ বোসকে তুই বুঝিয়ে বলিস।

—সেটা বড় কথা নয়। এখানে যদি চাকরি নাই করবি তাহলে ছেলেমানুষী করলি কেন? তোর অবস্থা ডেলিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে। প্রলাপ বকছিস। ভাল করে ভেবে কথা বল।

—একদিন দুদিন নয় ঝুমা। এক বছর ধরে ভেবেছি। ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত এই ডিসিসনে এসেছি। মিঃ বোসের আন্ডারে কাজ করা আমার পোষাবে না।

চোখ বড় বড় করল ঝুমা। ওকে দেখে মনে হল অতর্কিতে ও যেন হোঁচট খেয়েছে। বলল, 'মিঃ বোসকে বিশেষভাবে চিনিস বলে মনে হচ্ছে? ওর আন্ডারে কাজ করতে পারবি না এটা মনে হল কি করে?'

—এমনিই মনে হয়েছে। ইনটুইশন বলতে পারিস।

সঞ্জয়ের চোখের দিকে আরও একটুকাল চেয়ে রইল ঝুমা। ওকে বুঝতে চেষ্টা করল। ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল 'ইউ ডার্টি ফেলা জেলাসি? মিঃ বোসের ওপর হিংসে? তুই তাহলে মিঃ বোসের সঙ্গে ডুয়েল লড়। রাবিশ। ঠাকুর্দা মার্কা সেন্টি-মেন্ট। তোর কিসসু হবে না।'

কথা বলতে বলতে সঞ্জয়ের পায়ের ওপর ঝুমা একটা হাত রাখল। সঞ্জয়ের মনে হল ঝুমার হাতের তলা থেকে একটা গরম স্রোত তীব্র বেগে সঞ্জয়ের মাথার দিকে ছুটল। স্রোতটা ওপরে উঠেই আবার নেমে এল নীচে। এমনি করে স্রোতটা একবার ওপরে একবার নীচে নামতে লাগল। একবার মনে হল ওর মাথার ভেতর কতকগুলো লাল-নীল বুদ্বুদ উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সঞ্জয় কিন্তু নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগল।

—তুই কী দেখেছিস আমি জানি না তবে যা দেখতে পারিস সেটা বলছি মিলিয়ে নে। —পাটা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল ঝুমা।

মাঝে মাঝে মিঃ বোস আর আমাকে রাস্তায় দেখে থাকতে পারিস। হয়তো আমরা দুজনে হেঁটে চলেছি মিঃ বোসের একটা হাত আমার কাঁধের ওপর কিম্বা আমার কোমর জড়িয়ে আছে। অথবা দুজনে গাড়িতে চলেছি মিঃ বোস আমার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলছে আমার ঝুমঝুমি। তাছাড়া মিঃ বোস ওর জার্মান ওয়াইফ এবং আমি তিনজনে হাত ধরাধরি করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি এ দৃশ্যও দেখতে পারিস। কী দেখেছিস তুই ভাল বলতে পারবি। আমাদের কোম্পানীতে চাকরি না করার এটাই যদি কারণ হয় তাহলে বলবো তোর মত বুদ্ধু আর দুটো নেই। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এবার তাহলে কোনো পুঁটি রাণীকে বিয়ে করে সংসারী হ। আর্ট-ক্রাফটের চিন্তা ছাড়। পুঁটি-খেঁদির মত মেয়েদের সন্দেহ করবার কিছু থাকবে না। তোর সঙ্গে শোবে আর বছরে একটা করে বাচ্চা পাড়বে। রাবিশ।'

এক ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল ঝুমা। উঠে ওর শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ একটা একটা করে ব্যাগে পুরল। তারপর ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বলল, 'চললাম। এখনও দিন পাঁচেক বাকী আছে। পিকনিকে না গেলে আগে থাকতে জানিয়ে দিব।'

সঞ্জয় খপ করে ঝুমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'এক্ষুনি চলে যাচ্ছিস যে? আজ সারাটা দিন এখানে থাকবার কথা না?'

—মেজাজটা বিগড়ে গেছে। এই মেজাজ নিয়ে সারাটা দিন কাটানো যাবে না। আজ চলি আর একদিন দেখা যাবে। রাগ করে চলে যাচ্ছি তা ভাবিস না কিন্তু।

কথা শেষ করে সঞ্জয়ের গালে নিজের ঠোঁট জোড়া আলতো করে ছোঁয়ালো। সঞ্জয় কিছু বলবার আগেই এক লাফে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর সদর দরজা খুলে বাইরে সিঁড়িতে পা দিল। সিঁড়িতে পা দিয়ে বলল, 'কাল একটা ফোন করিস।'

তিনতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল ঝুমা। সঞ্জয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ঝুমা চোখের আড়াল হতেই সঞ্জয়ের বুকটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। নিঃসঙ্গতার মহাসমুদ্রে ও যেন নিক্ষিপ্ত হল।

সদর দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকল। একেবারে নিঃসঙ্গ। তিনতলার ফ্ল্যাটটা হঠাৎ যেন ওর কাছে ভয়ানক বেখাপ্পা বলে মনে হল। রং-তুলি নিয়ে বসবার চেষ্টা করল কিন্তু মন দিতে পারল না। উঠে কতকটা অন্যমনস্কভাবেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনিটা হাতে নিল। চিরুনির দাঁড়ায় তখনও লম্বা দু গাছি চুল জড়িয়ে আছে। ঝুমার। কী ভেবে সঞ্জয় আস্তে আস্তে আঙুলের ডগায় চুল দুগোছি জড়িয়ে নিল। তারপর আলতো করে সেই চুলে ঠোঁট ছোঁয়ালো। সঙ্গে সঙ্গে বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আয়নায় নিজের চেহারাটা ভাল করে দেখল। হাইট পাঁচ দশ লম্বা চুল ঘাড় অবধি বিরাট জুলপি ফিগারটাও স্লিমই বলতে হবে। দেখতে তো নেহাৎ খারাপ নয়। কিন্তু মিঃ বোস? মিঃ বোসের মুখটা মনে হতেই জিভটা ওর কেমন তেতো তেতো মনে হল। ধোৎ। এরকম তুলনার কোনো মানে হয় না। পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ের কোনো তুলনাই হয় না। নিজেকেই শাসন করল সঞ্জয়। তারপর গিয়ে বসল বেতের চেয়ারটায়।

বড় রাস্তার ধারে তিনতলার এই ফ্ল্যাটটা ওর দাদার এক বন্ধুর। দুখানা বেড রুমের একখানাতে ও থাকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। কিন্তু হালে ভদ্রলোক বাইরে ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। কলকাতায় ফিরে আসবার খুব চেষ্টা করছেন কিন্তু সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। যদি ওরা ফিরে না আসতে পারে তাহলে পুরো ভাড়াটা ওকেই টানতে হবে। কারণ ফ্ল্যাটটা ছাড়া চলবে না। বর্তমানে সঞ্জয়দের যা সম্পত্তি আছে তার আয় মন্দ নয়। ঐ আয়েই তিন ভাই-এর দিব্যি চলে যাবার কথা। মা-বাবা কেউ নেই। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। লায়াবিলিটি বলতে নিল। সঞ্জয় অবশ্য সম্পত্তির কিছুই দেখাশোনা করে না। যা করে ছোট ভাই। বড়দা টাটার ইঞ্জিনীয়ার। বাবা মারা যাবার পর সম্পত্তির সব ভাগা-ভাগি হলেও এখনও একসঙ্গেই চলেছে। এতে লাভ হয়েছে ছোট ভাই-এর। কিন্তু সেজন্যে বড় দুই ভাই কিছু মনে করে না। সঞ্জয় চারশো টাকা হাতে পায় এতেই খুশি। মনের আনন্দে আঁকা নিয়ে থাকে। আঁকার মাধ্যমে পয়সা আয়ের কথাও এতদিন খুব একটা ভাবেনি। এঁকে আর শুয়ে বসে পড়িয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সব যেন কেমন গোলমাল করে দিয়েছে এই মেয়েটা। ঝুমা। ওকে ছাড়া থাকতেও পারে না আবার ওর সঙ্গে চলতে গিয়েও হাঁপিয়ে ওঠে। চেয়ারে বসে চোখ বুজল সঞ্জয়।

এদিকে ঝুমা বাড়িতে ঢুকতেই ওর দাদার মুখোমুখি। বাবার কেমিক্যালস-এর বিজনেসটা এখন ওর দাদাই দেখাশোনা করে। দাদা বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল। ঝুমাকে ফিরতে দেখে হেসে বলল, 'কীরে উ[illegible]মেন লিবারেশনের লিডার, এখনই ফিরে এলি যে? নারী মুক্তি আন্দোলন শেষ [illegible]?

ঝুমা কখনও এসব কথার উত্তর দেয় না। এখনও দিল না। সোজা বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকল। বাড়িতে ঢুকতেই ওর মা বৌদি এবং ছোট বোন সোমা এসে প্রায় একসঙ্গে বলল 'কীরে শরীর খারাপ নাকি? বলে গেলি সেই রাত দশটায় ফিরবি আর এরই মধ্যে ফিরে এলি?

ঝুমা ওর হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল সোমার হাতে। সোমা সেটা ধরতে পারল না। ফলে ব্যাগটা ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। ওর মা সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, দিন দিন কী হচ্ছিস বলতো? মেয়েদের কী এতটা দস্যিপনা শোভা পায়? চাকরিটাই তোর কাল হয়েছে। চাকরির তোর কী দরকার বাপু? চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বিয়ে-থা কর।'

বৌদি হেসে বলল, 'তাহলে নারীমুক্তি আন্দোলনের কী হবে মা? পুরুষকে টাইট করতে না পারলে ওর জীবনই বৃথা।

চটিজোড়া বাইরে খুলে রাখতে রাখতে ঝুমা বলল দিন পাল্টাচ্ছে বৌদি তাকে অস্বীকার করতে চেয়ে লাভ নেই। চোখ

বন্ধ থাকলে কোনোদিনই আলো দেখতে পাবে না।

—ঠিক আছে এবার থেকে না হয় চোখ খুলে রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি ফিরে এলে কেন? আর্টিস্ট-এর দেখা মিলল না?

ঘরের ভেতরে ঢুকে ঝুমো বলল 'দেখা মিলেছে কিন্তু মতে মিলল না।'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই হেসে উঠল বৌদি বলল 'তাই বলো ঝগড়া করে চলে এসেছি। সেইজন্যেই মুখটা গম্ভীর গম্ভীর দেখছি। তাহলে ঝুমো তোমরাও আমাদের মত ঝগড়াটগড়া করো? কী যে উওম্যান লিবারেশন করছো ছাই।'

ঝুমো কোনো উত্তর না দিয়ে গটগট করতে করতে সোজা গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। বাথরুমে ঢুকবার আগে শুনতে পেল মার কণ্ঠস্বর। বলছেন, 'মেয়েটা দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। যত দোষ ওঁনার। উনিই মেয়ের মাথাটা খেয়েছেন—।'

আরও হয়তো কিছু কানে যেত ঝুমোর কিন্তু ও বাথরুমে ঢুকেই কলটা খুলে দিল। জলের শব্দে বাইরের শব্দ ঢাকা পড়ে গেল। কল খুলে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটা একটা করে গায়ের সব কিছু খুলে ফেলল একটা আরামের নিঃশ্বাস পড়ল ঝুমোর। প্রকৃতির শিশুর মত মুক্ত এখন। সঞ্জয়ের বাড়ি থেকে বেরোবার পর এতক্ষণ পর্যন্ত যে উত্তেজনার স্রোত ওর মাথার মধ্যে বইছিল গা থেকে সব কিছু খুলে ফেলতেই তা যেন অনেক শান্ত হয়ে গেল। একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ল ওর সমস্ত মনে। আর ঠিক তখনই মনের পর্দায় ভেসে উঠল সঞ্জয়ের মুখটা। বেশ লাগল। মনের আনন্দে গায়ে খানিকটা জল ঢালল। জল ঢালতে ঢালতে মনে পড়ে গেল মিঃ বোসের মুখটা। আচ্ছা সঞ্জয়টা কি পাগল? ভাবল ঝুমো। ঐ হোঁৎকা বোসের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে মিছামিছি কষ্ট পাচ্ছে। ঝুমো কোন দুঃখে বোসের সঙ্গে শুতে যাবে? আর যদি শোয়ই তাতেই বা কি এসে গেল? ও কি বোসের মত লোককে মন দিতে যাচ্ছে? আর্টিস্টরা কি একটু ব্যাকডেটেড হয়? কে জানে। ভারি ব্যাকডেটেড এই সঞ্জয়টা।

হুড়হুড় করে গায়ে জল ঢালতে লাগল ঝুমো। অনেকটা জল ঢালবার পর দেহ-মন যেন জুড়িয়ে গেল। এই জন্যেই কি লোকে বলে, স্নান করলে দেহ-মন শুচি হয়? হবেও বা!

স্নান সেরে তোয়ালে দিয়ে ভিজে শরীরটা মুছতে মুছতে মনে হল ও যেন নরম পশমের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে চলেছে। সত্যি বড় নরম ওর শরীর। নিজেকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করল ঝুমোর। কিন্তু তক্ষুনি মনে হল সঞ্জয়টা মিছিমিছি একটা ছুটির দিন নষ্ট করল। একটা ইডিয়ট! মনে মনে স্থির করল পিকনিকের আগে আর দেখা করবে না। দেখা যাক পিকনিকে ও যায় কিনা।

পিকনিকের দিন নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সঞ্জয়। সেদিনের পর এই প্রথম দুজনের দেখা। সঞ্জয়কে দেখে ঝুমো হেসে বলল 'তাহলে এসেছিস? আমি তো ভেবেছিলাম তুই এখানে না এসে মিঃ বোসের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাবি।' সঞ্জয় কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল একটু হাসল। হাসির আড়ালে একটু ক্লান্তি প্রকাশ পেল কি? ঝুমো ঠিক বুঝতে পারল না।

ওদের কথার মাঝখানেই আরও সবাই এসে পড়ল। দোলা অতসী নূপুর বিল্টু বাপী কাজল। সবাই এসে জড়িয়ে ধরল ঝুমোকে। বলল 'চল ঝুমো ওদিকে দারুণ জমেছে।' ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল ওরা পেছনে পেছনে সঞ্জয়।

—ব্যাপার কি বলবি তো?

—টেড্ কী সব বলছে শুনবি চল। ব্যাটা বোধহয় গাঁজা খেয়েছে।

পিকনিকের স্পটটা সুন্দর। একটা বাগানবাড়ি। গঙ্গার একেবারে ধারে। বাগানে ছোট-বড় অনেক গাছ। মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের মূর্তি। ভেনাসের একটা মূর্তিও আছে। ভেনাসের মূর্তির নীচেই চোখ বুজে বসে আছে। ছ ফুটের ওপর লম্বা মানুষটা টান টান হয়ে বসে আছে। চোখে রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের সেকেলে গোল চশমা। গায়ে গেরুয়া রঙের একটা আলখাল্লার মত। ওর একটু দূরেই নির্বিকারভাবে বসে আছে লিজা। ওর পরণে সেই পাঞ্জাবী আর পাজামা। টেডকে ঘিরে ওদের কয়েকজন বসে রয়েছে। টেডকে ওরা অনেক কিছু বলছে টেড কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে চোখ বুজে রয়েছে। ঝুমো এসেই টেডের গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল 'এই টেড কী করছিস? ধ্যান করছিস নাকি।

টেড চোখ মেলল। আচমকা ঘুম ভাঙলে যেমন করে চেয়ে থাকে ও ঠিক তেমনি করেই চেয়ে রইল। কাউকেই যেন চিনতে পারছে না।

—কী রে গাঁজা টেনেছিস নাকি?

ঝুমো আবার একটা ধাক্কা দিল। এবার ধীরে ধীরে ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। অমায়িক হাসি।

—ব্যাপার কি ধ্যান করছিলি নাকি?

—ইয়েস মেডিটেসন। ধেয়ানের বেস্ট ফিটিং প্লেস এটা। গার্ডেন। গঙ্গার কিনার। বিউটিফুল।

কেটে কেটে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলল টেড। বলে মিষ্টি করে হাসল। ওর কথায় কেউ কিন্তু হাসতে পারল না। কী যেন ছিল ওর কথার মধ্যে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সবাই।

লিজা তখনও অন্যদিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। ভেনাসের মূর্তির নীচে যেন আর একটা পাথরের মূর্তি। সঞ্জয় পকেট থেকে নোটবুক বার করে কখন যে লিজার ছবি আঁকতে শুরু করেছিল কেউ টের পায়নি। কয়েকটা আঁচড়ে অদ্ভুত সুন্দর ছবি এঁকে ফেলল সঞ্জয়। ভেনাসের মূর্তির নীচে প্রকৃতির সাজে সজ্জিত আর একটা নারীমূর্তি। হুবহু লিজার মুখ। সে মুখের সামনে ছবিটা ধরল। লিজা ছবিটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর লাফিয়ে উঠে সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে বলল 'ওয়ান্ডারফুল আর্টিস্ট। ইটস রিয়্যালি ওয়ান্ডারফুল।

লিজার কথায় সবাই ছুটে এসে দেখল ছবিটা। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল সত্যিই ছবিটা সুন্দর। টেড এই ফাঁকে উঠে ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল।

ইতিমধ্যে কয়েকজন রান্নার ব্যবস্থা করতে চলে গেছে। বাকীরাও এবার সেই দিকেই গেল। পড়ে রইল কেবল লিজা আর সঞ্জয়। লিজা সঞ্জয়ের হাত ধরে বলল চলো গঙ্গার ধারে।'

ওরা দুজনে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। ওখানে বাঁধানো ঘাট। অনেকগুলো সিঁড়ি ধীরে ধীরে নেমে গেছে। জল কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে আরও অনেক দূরে। বেশ খানিকটা কাদা পথ পেরিয়ে জলে নামতে হয়। টেড গঙ্গার দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছে। লিজা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বলল প্যান্ট সার্ট খুলে নাও। জলে নামব। স্নান করে আরাম পাবে।'

সঞ্জয় কিছু বলবার আগেই লিজা ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। সঞ্জয় সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা নেমে প্যান্ট-শার্ট খুলল। লিজাই প্রথমে ছুটতে ছুটতে গিয়ে নামল জলে। তারপর সঞ্জয়। জলে নেমে দুজনেই খানিকটা সাঁতার কাটল। হাসতে হাসতে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করল। ওদের হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গঙ্গার জল। আর ওপর থেকে নির্বিকারভাবে ওদের দেখতে লাগল টেড।

এদিকে ভেনাসের মূর্তির কাছে ফিরে এসে ঝুমো দেখল সঞ্জয় নেই। ওর নজরে পড়ল এক জোড়া শালিক ভেনাসের ঠিক মাথার ওপরে। আনন্দে ওর মন কলকল করে উঠল। টু ফর জয়। কিন্তু সঞ্জয় কোথায়? জোড়া শালিক দেখাতে হবে ওকে। ঝুমো ছুটে গঙ্গার ধারে গেল। লিজা আর সঞ্জয় তখন জল থেকে উঠে আসছে। লিজার শরীরের সঙ্গে ওর পোষাক লেপ্টে গেছে। দূর থেকে দেখে ঝুমোর হঠাৎ মনে হল এ্যাডাম আর ঈভ যেন জল থেকে উঠে আসছে। ওদের দেখতে দেখতে ওর মাথার ভেতরে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। ঈর্ষার আগুন। জ্বালা করতে লাগল ওর চোখদুটো। কয়েকটা মুহূর্ত। কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ছুটে গিয়ে দুটো তোয়ালে নিয়ে এল। লিজা আর সঞ্জয় ততক্ষণে সিঁড়ির ওপরে উঠে এসেছে। দুজনকে দুখানা তোয়ালে ছুঁড়ে দিল ঝুমো। লিজা হাসতে লাগল। প্রাণখোলা হাসি।

ঝুমো সঞ্জয়ের কাছে ছুটে এসে কানে কানে বলল 'আমি আর মডেলিং করব না সঞ্জয়। কালই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।'

নিঃশব্দে ঝুমোর দিকে চেয়ে রইল সঞ্জয়। ওর চোখে বিস্ময়ের ঘোর।

প্রদর্শনী ও বর্ষপালন

সম্প্রতি উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষ উদযাপিত হয়। ১৯৪৮ সালে এই পল্লী-মঙ্গলসমিতি প্রতিষ্ঠিত। সাতজন সদস্যার উৎসাহ উদ্দীপনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে মাতৃজাতি ও শিশুদের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে একদিন সে ছোট্ট সমিতির জন্ম হয়েছিল আজ তা সমাজের খুব বৃহৎ অংশের না হলেও মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সেবা করতে সক্ষম।

বর্তমানে দেশের আর্থিক অভাব, অনটনের দিনে মেয়েদের ঘরে বসে শুধু সংসারের তত্ত্বাবধান করলেই চলে না। ঘরে বসে থাকার দিন তাঁদের ফুরিয়েছে। দুর্দিনের মোকাবিলায় নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী আজ সকলকে জীবিকা অর্জনের জন্য লড়াই করতে হবে। অর্থোপার্জনে প্রত্যেকটি নরনারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের দিন এসেছে, মেয়েরা জীবনকে সংসারকে স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছল রাখতে কিভাবে অর্থোপার্জন করতে পারেন এই সমিতি সে বিষয়ে সচেষ্ট। এখানে মেয়েদের নিজ নিজ যোগ্যতার দ্বারা নানা-ভাবে তাঁদের উপায়ক্ষম করে তোলার জন্য কয়েকটি সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। যেমন নানারকম কুটীরশিল্প ও নির্মল নলিনী মহিলা শিল্প শিক্ষা সদন প্রতিষ্ঠা। সমাজ সেবিকা ধর্মপ্রাণা নির্মলনলিনী বসুর পুণ্য স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর স্বামী ডাঃ সখানাথ বসু নির্মলনলিনী মহিলা শিল্প শিক্ষা সদন প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। বর্তমানে বিভাগটি জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত। এই শিক্ষা সদন থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীরা লেডী ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা লাভ করেন তা ছাড়া রয়েছে একটি সাধারণ বিভাগ। অবসর সময়ে ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষা-লাভের জন্য সামান্য শিক্ষামূল্য ধার্য করা হয়ে থাকে। মহিলা বিভাগ পরিচালিত কয়েকটি বিভাগের জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

প্রসূতি ও শিশুদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য আন্তরিক যত্ন ও ব্যবস্থার গ্রহণ করা হয়। বিনামূল্যে ঔষধ টনিক, বসন্ত কলেরা প্রতিষেধক এমন কি ট্রিপল এন্টিজেন দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া অভাবগ্রস্তদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে কিছু দুধ ও পাঁউরুটি। পূজোর সময় ২০০ জনকে নতুন ও পুরোন জামা-কাপড় এবং শীতকালে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং একটি দৈনিক পত্রিকার তরফ থেকে পাওয়া এক দপ্তর পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে দুঃস্থা ও বয়স্কা মহিলারা ঠোঙা তৈরী করে অর্থ উপার্জন করে থাকেন।

গত ২৮ মার্চ নির্মলনলিনী বসুর ৭১তম জন্মস্মৃতি তর্পণে পুরস্কারের আয়োজন করা হয়। সে সঙ্গে ১৯৭৫ সালটি মহিলা বর্ষ হিসেবে পালন করার সংকল্পে তিনদিনব্যাপী সমিতির মেয়েদের হস্তশিল্পের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বাগবাজার বহুমুখী বালিকা বিদ্যা-লয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী অনিমা মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ অজিত পাঁজা।

এই সমিতির পরিচালনায় সংযুক্ত মহিলা পরিষদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ সেদিন উদযাপিত হয়। সভানেত্রীত্ব করেন সমাজ কল্যাণ পর্যদের চেয়ারম্যান শ্রীমতী প্রতিমা বসু। বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকরা যেমন লতিকা গুপ্ত, সুনীতি গুপ্ত শিবানী ঘোষাল, গীতা বসু, কল্যাণী সেন, ডঃ উমা রায়, সন্ধ্যা সেন, বিজলী ঘোষ মলয়া ধর, অরুণা মুখো-পাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে মীরা দেবী রচিত 'কমলমণির শহর পরিক্রমা' কৌতুক নাটিকা পরিবেশন করা হয়।

অঞ্জলি চৌধুরী

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সমবেত অতিথিবৃন্দ

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাসিন্দা আমরা, তবুও গরমকালটা যেন বিভীষিকা। রোদ, ঘাম গরম সব মিলিয়ে যেন একটা বিচ্ছিরী অবস্থা। বসন্ত তো চারিদিকে ছড়িয়েছে—আর তার পরের ঘটনা হচ্ছে মুখে গায়ে দাগ। অনেকের এই দাগ চিরকাল থেকে যেতে দেখা যায়। আবার কারুর নিজের থেকেই মিলিয়ে যায়। তবু এ সম্পর্কে সাধারণ কতকগুলি টোটকা জানাতে পারি।

মুখে বসন্তের দাগ মিলিয়ে দেবার জন্য কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন। যেমন:

(১) ডাবের জল ও শাঁখের গুঁড়ো দিয়ে মুখ ধোয়া। দিনে অন্তত ২ বার। তবে মুখে থুপে থুপে ডাবের জল ও শাঁখের গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে হবে, পরে ঠান্ডা জলে সেটা ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর হাল্কা হাতে মুখ মুছে সামান্য বোরোলীন লাগিয়ে রাখলে ভাল ফল দিয়ে থাকে।

(২) মাখন আর তুলসীপাতার রস একসঙ্গে হাতের তেলোতে ফেটিয়ে তারপর সেটা বসন্তের দাগের ওপর একটু একটু করে লাগাতে হবে। সেই অবস্থায় অন্তত ৭।৮ মিনিট থাকতে হবে। পরে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলা ভাল। এইভাবে মুখের দাগ উঠে যায়।

এছাড়া একটা কথা জানিয়ে রাখি। এই গরমে ৭ দিন অন্তর নিমপাতার রস ছোট চামচের এক চামচ খেলে এইসব রোগ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। তাছাড়া রক্ত খুব পরিষ্কার রাখার জন্য চামড়া চকচকে সুন্দর হয় আর চামড়ার কোন অসুখও সহজে হতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে ভগবানপ্রদত্ত সব্জি আমরা পাই—তার ব্যবহার করা সুতরাং উচিত। যেমন উচ্ছে পেঁপে কাঁচা ও পাকা দই-ই—বেল, লাউ ইত্যাদি খাওয়া খুব দরকার। এগুলি শরীর ঠান্ডা ও স্নিগ্ধ রাখে। আর এটাও ঠিক শরীর স্নিগ্ধ থাকলে চেহারায় লালিত্যও আসে।

সৌন্দর্যের প্রধান অঙ্গ লালিত্য। যত সুন্দর নাক মুখ চোখের সৌন্দর্য থাকুক, চেহারা লালিত্যহীন হলে সব মাটি হয়ে যায়। আমাদের খাদ্যাভ্যাস চেহারার ওপর কত যে প্রভাব বিস্তার করে তা জানা যায় না। ফলের রস কাঁচা সব্জি ও সাময়িক ফল ইত্যাদি যে শরীরের ও সেই সঙ্গে রূপ বিকাশের কত বড় সহায়ক তা বলা যায় না। পেস্তা বাটা দুধে দিয়ে খেলে রং সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়। এই কারণে পশ্চিমের লোকেদের রং সাধারণত উজ্জ্বল ও ফর্সা দেখা যায়।

আবার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি—

(১) একজন জানতে চেয়েছেন যে তাঁর নখ ভীষণ ছোট আর ভালভাবে বাড়তে চায় না—সেই নখে কি রং দেবেন?

আমি স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অনুরাগী। তাই সবচেয়ে আগে একথাই বলব যে, নখে রং না দেওয়াই সবচেয়ে ভাল। রং দিতে দিতে নখের নিজস্ব গোলাপী আভা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ওপরের চকচকে ভাবও নষ্ট হয়। বিশেষ করে ভেজালযুক্ত দেশী রং তো ব্যবহার করাই উচিত নয়। এছাড়া যাদের নখ ভিতরের দিকে ঢোকা ও ছোট তারা দয়া করে রং মাখবেন না। তাতে নখের খারাপটুকু আরও প্রকট হয়ে চোখে ফুটে ওঠে। নখ সুন্দর ও ভাল রাখতে হলে সবচেয়ে প্রথমে তাকে পরিষ্কার রাখা দরকার। দাঁত মাজার পুরোনো ব্রাস আর সাবান গরম জল দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষলে নখ পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর একটু কাঁচা দুধে হাতের নখগুলি অন্তত ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে নখ বড় হয় আর সুন্দর রং ও চকচকে হয়।

(২) জানতে চেয়েছেন ঘাম বন্ধ করা যায় কি করে।

এ এক মহাসমস্যা! ঘাম বন্ধ করার মতন ওষুধ আমার জানা নেই। তবে অতিরিক্ত ঘামলে শরীরের লবণ বেরিয়ে যায় তাই দিনে অন্তত ১২ গেলাস নুন ও লেবুর জল খাওয়া উচিত। ঘাম বন্ধ করার ব্যাপারটা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। তবে ঘামলে যাতে গায়ে গন্ধ না হয় সে বিষয়ে আগের সংখ্যায় আলোচনা করেছি, পড়ে দেখবেন।

(৩) আপনার শরীরের ওপরের অংশ অর্থাৎ বুক খুব ভারী বাকী অংশের তুলনায়। কিভাবে সাজলে ভাল দেখাবে।

দেখুন, এও এক সমস্যা। তবে যতটুকু আমার এ সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান আছে তা আমি জানাচ্ছি। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে মহিলারা নিচের জামা ছোট ও বেশী আঁট পরতে চান। কিন্তু এটা খুব ভুল। নিচের জামা ছোট ও আঁট হলে আরো চারিদিক থেকে ফুলে থাকে এবং আরো প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে নিচের জামা ঠিক মাপ মতন পরতে হবে যাতে পিঠে কোন খাঁজ না পড়ে ও বুকের অতিরিক্ত অংশ ঠেলে গলার কাছে না ওঠে। আর ব্লাউজ পরার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে ব্লাউজও ঠিক মাপ মতন হওয়া চাই। অর্থাৎ শরীরের ভাঁজের সঙ্গে বসবে, হাতা আঁট হবে। যাতে নীচের অংশ ফোলা ও ভারী হবে। আর শাড়ী পরার সময় শাড়ীর পেছনের অংশ একটু ঢিলে করে পড়তে হবে। যাতে নীচের অংশ ফোলা ও ভারী লাগে। তাহলে সামঞ্জস্য এসে যাবে। এটা করার জন্য পেটিকোটের পেছনের অংশে প্যাডিং মতন করে নেওয়া যায়। ভাল দর্জির সঙ্গে ব্যবস্থা করে সেই রকমের পেটিকোট পরলে নীচ ও ওপর একই ধরনের হলে ওপরের বেশীটা চোখে পড়ে না।

(৪) নাকছাবি পরতে হলে কি রকম নাকের দরকার?

প্রশ্নটা মজার। তবে কি জানেন নাক যাই হোক যিনি পরবেন তাঁর প্রসাধন রুচি কেশবিন্যাস সাজসজ্জা সবের ওপর নির্ভর করে নাকছাবি পরলে মানাবে কিনা। বাঁশির মতন টিকোলো সুন্দর নাকে নাকছাবি শোভা পায় যতো সুন্দর, তার এমনও দেখা গেছে ছোট্ট একটি ...ও তার অধিক সুন্দর মানাতে। তবে হ্যাঁ এক ধরনের চ্যাপ্টা ছড়ানো নাক আছে যা বসে ছড়িয়ে গেছে এমন নাকে নাকছাবি একটুও ভাল লাগে না। গোল ধরনের খোঁপার পাশে একটু ফুলে ঢলঢলে মুখ বড় চকচকে চোখ—সেখানে নাকছাবি খুবই সুন্দর। সুতরাং নাক নয় সম্পূর্ণ সাজটাই আসল।

(৫) কপাল ভীষণ চওড়া ও উঁচু। কি করলে ভাল লাগবে জানতে চেয়েছেন।

খুব সহজ উপায় হোল চুলের সামনের অংশ একটু নামিয়ে কপালের ওপর ফেলে আঁচড়ালে ভাল দেখাবে। তাছাড়া কপাল চওড়া হলে ঘাড়ের কাছে নামিয়ে ঢিলে খোঁপা করা ভাল। এ ছাড়া কপালে একটু নাক থেকে উঁচুতে মাঝামাঝি জায়গায় টিপ পরা। এগুলি একটু যত্ন করে সুন্দরভাবে করলে ভাল দেখাতে বাধ্য।

আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। এর পর নতুন দিক নিয়ে আলোচনা করবো। আশা করি আপনাদের ভাল লাগবে।

বরবর্ণিনী
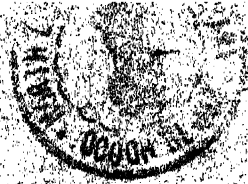
আম কাঁচা এবং পাকা

রসাল নামেই আমের আসল পরিচয়। এই ফলের মতো সুমধুর স্বাদযুক্ত ফল পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। শুধু পাকা আমই নয়, কাঁচা আমও খেতে অতি চমৎকার। নুন, লঙ্কা ও তেল মাখিয়ে আম যেমন তৎক্ষণাৎ খাওয়া চলে তেমনি আচার ও চাটনি তৈরী করে রেখে সারা বছরই খেতে পারা যায়। কাঁচা আমের পানীয় তৈরী করেও বোতলে ভরে দীর্ঘদিন রাখা যায়। কাঁচা আমের মোরব্বা ও জ্যাম এবং পাকা আমের জ্যাম ও স্কোয়াশ খেতে অত্যন্ত উপাদেয়। প্রথমে গরমের দিনে স্নিগ্ধতা-প্রদানকারী 'গ্রীন ম্যাঙ্গো ড্রিংকস' প্রস্তুত প্রণালী দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

গ্রীন ম্যাঙ্গো ড্রিংক :

উপকরণ : কুরুনি দিয়ে কোরা কাঁচা আমের শাঁস ১ কেজি, চিনি ২ কেজি জল ১ কেজি, নুন ৬০ গ্রাম, সাইট্রিক অ্যাসিড ২০ গ্রাম, জিরে গুঁড়ো ২৫, গোলমরিচ ১০ গ্রাম পেষা পুদিনা পাতা ৫০ গ্রাম, পোটাসিয়াম মেটাবাইসালফেট ৩২ গ্রাম, সবুজ রঙ।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কাঁচা আমের শাঁস একটু জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। ২। ½ কেজি জলে জিরে গুঁড়ো ও গোলমরিচ ১০ মিনিট ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। ৩। এতে আরও জল মিশিয়ে ১ কেজি করুন। চিনি নুন ও সাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে জলটা ফুটিয়ে আবার ছেঁকে নিন। ৪। সেদ্ধ করা আম বড় বড় ছিদ্রযুক্ত ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন—যাতে কোন ছিবড়ে না থাকে। আমের সঙ্গে পেষা পুদিনা পাতা বাটা মিশিয়ে রসে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। সবুজ রঙ মেশান। ৫। একটু গরম জলে সোডিয়াম মেটাবাইসালফেট মিশিয়ে সিরাপের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ৬। বোতলে ভরে সীল করে রাখুন।

আমের মোরব্বা :

উপকরণ : ১ কেজি বড় বড় টুকরো করে কাটা খোসা ছাড়ানো কাঁচা আম, চিনি ১½ কেজি, সাইট্রিক অ্যাসিড ১ চা চামচ, চুন ৫০ গ্রাম, ½ চা চামচ ছোট এলাচের গুঁড়ো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ৫০ গ্রাম চুন ২ কেজি জলে গুলে চুনের জল তৈরী করুন। ২। আমের টুকরোগুলো কাঁটা দিয়ে ফুটো ফুটো করে ওই চুনের জলে ৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। ৩। জল থেকে তুলে নিয়ে তিন চারবার ভাল করে ধুয়ে নিন। ৪। ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করুন। ৫। জল থেকে বার করে নিন এবং জল সম্পূর্ণ ঝরিয়ে নিন। ৬। ½ কেজি চিনি নিন। একটা এনামেলের গামলায় একটু চিনি ছড়ান তার ওপর আরও কিছু আমের টুকরো রাখুন, আবার চিনি ছড়ান, তার ওপর আরও কিছু আমের টুকরো রাখুন। এই রকমভাবে এক এক স্তর চিনি ও এক এক স্তর আম রাখবার পর ওপরের স্তরটি চিনির হবে। সমস্তটা মিলিয়ে ½ কেজি চিনি হবে। ৭। দ্বিতীয় দিন আমের টুকরোগুলো সরিয়ে চিনিটা বার করে নিন। চিনিটা রসের মতো হয়ে যাবে। ৮। এই রসের সঙ্গে আরও ½ কেজি চিনি দিয়ে কয়েক মিনিট ফোটান। ৯। আমের টুকরোগুলো আরও ½ কেজি চিনি দিয়ে আগের দিনের মতো স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখুন। ১০। তৃতীয় দিন চিনির রস সমেত আম আগেকার রসের সঙ্গে মিশিয়ে ফোটান। ১১। চতুর্থ দিন সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে সমস্তটা মধুর মতো ঘন না হওয়া পর্যন্ত ফোটান। ছোট এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। ঠাণ্ডা হলে স্বচ্ছ কাঁচের বোয়ামে ভরে রাখবেন।

কাঁচা আমের দিলবাহার চাটনি :

উপকরণ : খোসা ছাড়ানো কুরুনি দিয়ে কোরা আম ½ কেজি, ভাল আখের গুড় ½ কেজি কিসমিস ৫০ গ্রাম, আদা এক টুকরো, শুকনো লঙ্কা চারটি, সামান্য বীট নুন, সামান্য হিং পাঁচফোড়ন ১ চা চামচ, নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কোরানো আমে আন্দাজ মতো জল দিয়ে খুব সেদ্ধ করুন। ২। আদা থেঁতো করে ওতে দিয়ে দিন। নুন দিন। ৩। আম সেদ্ধ হয়ে গেলে গুড় ও কিসমিস দিন। বীট নুন দিন। ৪। সমস্তটা ফুটে ফুটে ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ৫। শুকনো তাওয়ায় হিং পাঁচফোড়ন ও শুকনো লঙ্কা ভেজে নিন। গুঁড়ো করে চাটনির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। এই চাটনি পাঁচ ছয়দিন ভালো থাকে।

কাঁচা আমের শোলাকা আচার :

উপকরণ : ছোট ছোট কুঁচি করে কাটা খোসা ছাড়ানো কাঁচা আম ১ কেজি নুন ২৫০ গ্রাম, মেথি ১২০ গ্রাম কালোজিরে ৩০ গ্রাম, হলুদ ৩০ গ্রাম, গোলমরিচ ৫০ গ্রাম শুকনো লঙ্কা চারটি, মৌরী ৩০ গ্রাম, সরষের তেল ২৫০ গ্রাম।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। একটি এনামেলের পাত্রে আমের টুকরো নুন মাখিয়ে চার পাঁচ দিন রোদে রাখুন। ২। টুকরোগুলো শুকনো হয়ে মজে গেলে বাকী সমস্ত মশলা শুকনো তাওয়ায় ভেজে গুঁড়িয়ে মাখিয়ে দিন ও তেল মিশিয়ে স্বচ্ছ কাঁচের জারে ভরে রাখুন। আচার তৈরী হতে দু তিন সপ্তাহ লাগবে।

পাকা আমের জ্যাম : কাঁচা ও পাকা দুরকম আমেরই জ্যাম তৈরী করা যেতে পারে। তবে পাকা পেকটিন লাগবে এবং কাঁচা আমে পেকটিনের প্রয়োজন হবে না।

উপকরণ : ১ কেজি খোসা ছাড়ানো পাকা আম কুচি কুচি করে কাটা, ১ কেজি চিনি সাইট্রিক অ্যাসিড ৮ গ্রাম পেকটিন ৫ গ্রাম একটু হলুদ বা কমলা রঙ।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। অল্প জলে আমের টুকরোগুলো সেদ্ধ করে নিন। ২। ভালভাবে শাঁসটা চটকে নিয়ে উনুনে গরম করুন। ৩। পেকটিন মেশান। ৪। চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ৫। খুব ফুটন্ত থাকলে সাইট্রিক অ্যাসিড মেশান। ৬। জমে এলে নামিয়ে নিয়ে রঙ মিশিয়ে গরম গরম চওড়া মুখের শিশিতে ভরুন। ৭। একদিন পরে মোম দিয়ে শিশি সীল করে নিন এবং মোম জমে গিয়ে ঠাণ্ডা হলে শিশির ঢাকনা বন্ধ করুন।

পাকা আমের স্কোয়াশ : কমলালেবুর স্কোয়াশ তৈরী করবার পদ্ধতি অনুসারে আমের রস, রং, সেন্ট ও পোটাসিয়াম মেটাবাইসালফেট দিয়ে আমের স্কোয়াশও তৈরী করা যায়।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ কি পর্তুগীজ ছিলেন!

আনন্দ রায়

একালের অধিকাংশ রবীন্দ্রানুরাগী ভক্ত, পাঠক-পাঠিকা এবং রবীন্দ্র-গবেষকবৃন্দ হয়ত জানেন না, সেকালের বিদেশীয় কয়েকটি পত্রপত্রিকার 'কল্যাণে' বাংলা তথা ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত' বলে প্রমাণিত হতে যাচ্ছিলেন!

খবরটা বেরিয়েছিল সিংহলের বহুল প্রচারিত 'সিলোন ডেইলি নিউজ' নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায়। তারিখ ছিল ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। সিংহলের সেই দৈনিক পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে হেড-লাইন ছিল : 'টেগোর'স পোর্তুগীজ অ্যানসেস্টর। ইন দি ফিফথ জেনারেশন।' এই শিরোনামার নীচে নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'নিউজ কামস ফ্রম লিসবন দ্যাট ইন অ্যান ইণ্টার-ভিউ গিভন টু দি ডেইলি মেইল', দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান পোয়েট, রবীন্দ্রনাথ টেগোর, অ্যানাউন্সড হিস ডিসায়ার টু ভিজিট পর্তুগাল, হোয়েন হি অ্যাকসেপটেড টু ডেলিভার এ লেকচার ইন লিসবন। ইন দি কোর্স অফ দি ইণ্টারভিউ দি পোয়েট সেইড, 'আই শ্যাল নট বি কনটেণ্ট ইন সিয়িং লিসবন অ্যালোন, বাট শ্যাল ট্রাভেল অ্যাক্রোশ দি হোল কাণ্ট্রি, হুইচ অ্যাজ দে টেল মি, ইজ এ ওয়াণ্ডারফুল ল্যাণ্ড অফ দি সান অ্যাণ্ড আই শ্যাল স্পীক অফ মাই অ্যাডমিরেশন অ্যাণ্ড জয়—জয় অফ অ্যান ইণ্ডিয়ান হু স্টিল ফিলস ইন হিস ভেইনস এ স্ট্রীক অফ পোর্তুগীজ ব্লাড। মাই অ্যানসেসটর টু দি ফিফথ জেনারেশন ওয়াজ এ সন অফ এ পোর্তুগীজ, অ্যাণ্ড আই ফীল দ্যাট দিস টাই ইজ নট সো রিমোট অ্যাজ নট টু ইভোক ইন মি এ কল টু সি এ কাণ্ট্রি সো কার্টাইল ইন অল দ্যাট ইজ বিউটিফুল অ্যাণ্ড জ্যালায়াস।'

উল্লেখযোগ্য 'সিলোন ডেলী নিউজ'-এর ঐ সংবাদটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত বংশ পরিচয়ের একটি পূর্ণাংশ চিত্র নয়। লণ্ডনের 'ডেইলি মেইল' নামক কাগজে রবীন্দ্রনাথকে অংশতঃ পোর্তুগীজবংশোদ্ভূত প্রতিপন্ন করে সর্বপ্রথম ফলাও করে এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। ডেলী নিউজের সংবাদ ছিল সেই সাক্ষাৎকারেরই অংশবিশেষ। পরবর্তীকালে জাপানের 'ইয়ং ইস্ট' নামক মাসিক পত্রিকাতেও এই সংবাদ বেশ ভালভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যও করা হয়েছিল। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় 'ইয়ং ইস্ট' পত্রিকার যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার কিয়দংশ তুলে ধরছি :

'নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত একটি সংবাদে তাঁর প্রিয় অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার মত আমরাও খুব সচকিত হয়ে আছি। ইংলণ্ডের সর্বাধিক প্রচারিত বিখ্যাত পত্রিকা 'ডেলী মেইল' প্রাপ্ত সংবাদে আমরা এ বিষয়ে অবগত হলাম। এশিয়ায় সিংহলের কাগজেও এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটা কি সত্যিই সমর্থিত সংবাদ? জাপানের জনমানসেও এ সংবাদের ঢেউ ও প্রতিক্রিয়া আজ দেখা দিয়েছে। আমরাও তাই ঐ সংবাদ সম্পর্কে বেশ চিন্তিত। ভেবে দেখেছি, ভারতীয় নাগরিক হলেও, কে জানে, রবীন্দ্রনাথের বংশে হয়ত পোর্তুগীজ রক্ত থাকতেও পারে। কখনও মনে হয়েছে কবি হয়ত ব্যাপকার্থে ও মানবতাবাদের দিক থেকেই সাক্ষাৎকার—সংগ্রাহককে আবেগের বশে ঐ কথা বলে-ছিলেন, যেটাকে হয়ত কিছুটা বিকৃত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে স্বয়ং কবিই কি বলেন?'

(অনূদিত)

খুব আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি, স্বয়ং কবিও এ সম্পর্কে বিশেষ মুখ খুললেন না। ফলে বিশ্বের মানুষের (বিশেষত যাঁরা নাকি এ সংবাদটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন) মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংশয় এবং প্রশ্ন আরও বেড়ে গেল। সকলের মনেই বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব নিয়ে তাই একটাই প্রশ্ন ঘুরতে লাগল, রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতম পঞ্চম পূর্বপুরুষ এক পোর্তুগীজের পুত্র ছিলেন?

সংবাদের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এখান-কার পত্রপত্রিকাগুলোতেও। স্বরাজ্য দলের পত্রিকা-সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় ঐ সংবাদ ও সাক্ষাৎকারের আংশিক বিবরণ প্রকাশ করলেন। এর ঢেউ লাগল 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' 'বেঙ্গলী' এবং 'মডার্ন রিভিউ' প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত পত্রপত্রিকা-গুলোতে। 'সিলোন ডেলী নিউজ' পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা লিখলেন : 'এই গাঁজাখুরি কথার উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, বলিতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা মৌখিক ও ডাকের অজস্র চিঠি দ্বারা জিজ্ঞাসা পাইয়াছি বলিয়া, ইহার উল্লেখ করিলাম। ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, সাক্ষাৎকার দ্বারা কোন কোন সংবাদাদি সংগ্রাহক কিরূপ সম্পূর্ণ অলীক কথা বানাইয়া লিখিতে পারে। উপরে উদ্ধৃত সাক্ষাৎকার বাস্তবে হইয়া-ছিল কিনা সন্দেহ।'

'বেঙ্গলী' পত্রিকা লিখলেন—'আবাভ অল, হি ইজ এ ওয়ার্ল্ড-পোয়েট, নো ওয়াণ্ডার হি (রবীন্দ্রনাথ) কমাণ্ডস উইথ হিস মিস্টিক প্যান্স, হিস জেণ্টল ফুট-ফল, হিস হুনিইড অ্যাকসেণ্টস, হিস উইয়ারড পেন, হোয়্যার আণ্ডারস আর মেকিং ভিলিউসনস অ্যাবাউট হিস ব্লাড!'

সেকালের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' 'রবীন্দ্রনাথের বংশের মিথ্যা পরিচয়' শিরোনাম দিয়ে প্রতিবাদ করলেন এই 'ভ্রান্ত সংবাদ'কে। তাঁদের সমস্ত রাগ, দুঃখ ও অভিমান কেন্দ্রীভূত হল স্বরাজ্য দলের পত্রিকা-সম্পাদককে ঘিরে।

প্রবাসী লিখলেন—'বঙ্গের স্বরাজ্য দলের যে পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে লেখা চাহিয়া লইয়া তাহার পর তাহা ছাপেন নাই, তিনিই তৎপূর্বে সাতিশয় আগ্রহ সহকারে মালয় উপদ্বীপের ইংরেজদের কাগজ হইতে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ নিন্দা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে পরে লেখা চাওয়া তাঁহার পক্ষে যেমন সুশোভন

হইয়াছিল, লেখা না পাইয়া না ছাপাও তদ্রূপে সুসংগত ও ভদ্র আচরণ হইয়াছে। তাহাও পাছে এইসব পত্রিকার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিচায়ক না হয়, এই জন্যেই বুঝি ইংলণ্ড ও জাপানের কাগজ হইতে কুড়াইয়া এই সাংবাদিকপ্রবর, রবীন্দ্রনাথের এক পূর্বপুরুষ পোর্তুগীজ ছিলেন, এই মিথ্যা খবরটি ছাপিয়াছেন।

এরূপ খবর যে বাংলাদেশের কোন বাঙ্গালী সম্পাদকের ছাপা উচিত নয় তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ উচ্চশ্রেণীস্থ কোন বাঙালী হিন্দুরই কোন পূর্বপুরুষ অহিন্দু পোর্তুগীজ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কোন মূঢ়ের এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে রবীন্দ্রনাথকে কিংবা তাঁহার কোন আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করা অত্যন্ত সহজ।...... সুতরাং এই মিথ্যা কথা উদ্ধৃত করা একমাত্র স্বজাতিদ্রোহী ক্ষুদ্রাশয় লোকদের দ্বারাই সম্ভব।'

শুধু তাই নয়; লণ্ডনের 'ডেইলি মেইল' কাগজে এই ধরনের সাক্ষাৎকার ফলাওরূপে প্রকাশের পিছনেও কি উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি এবং নিগলিতার্থ থাকতে পারে, তাও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন 'প্রবাসী' পত্রিকা। পত্রিকায় আরো লেখা হল :

'স্বজাতিদ্রোহী কথাটা ব্যবহার করিবার কারণ বলিতেছি। লণ্ডনের ডেইলি মেইল বিলাতী ভারত-বিরোধী সাম্রাজ্যোপাসক টোরীদের কাগজ। ইহারা যে কোন রকমে হউক, ভারতবর্ষকে হেয় প্রমাণ করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হয়। এই কাগজে রবীন্দ্রনাথের সহিত একটা মুলাকাতের মিথ্যা ব্যপদেশ সৃষ্টি করিয়া তাঁহারই মুখে এই মিথ্যা কথা আরোপ করিয়াছেন, যে, তিনি অংশতঃ পোর্তুগীজ বংশোদ্ভূত। তাহার মধ্যে উহ্য শ্লেষ এই, যে, 'খাঁটি ভারতবর্ষীয় কোন লোকের পক্ষে জগৎসভায় সম্মানার্হ হওয়া অসম্ভব, ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী যিনি তিনিও ইউরোপীয় রক্তের জোরে প্রতিভাশালী, এবং সেই রক্তও আবার বর্তমানে ইউরোপের অন্যতম হীন দেশ পোর্তুগাল হইতে আমদানী; অতএব হে ভারতীয়গণ, তোমরা নিজেদের কাহারও বড়াই বেশী করিতে যাইও না।'

রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়লেন সেই সাংবাদিকপ্রবর—হেনরী ম্যাসিস। অর্থাৎ যিনি নাকি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। এই 'আশ্চর্যকর সত্য' আবিষ্কারের জন্য অজস্র প্রশংসাও লাভ করলেন তিনি। আত্মপক্ষ ও তার সাক্ষাৎকারের জোরালো সমর্থন ও রবীন্দ্রনাথের বংশ-সম্পর্কিত স্ব-উক্তিকে 'সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত' করে ম্যাসিস ১৯২৭ সালে একটি বইও প্রকাশ করলেন। নাম তার 'ডিফেন্স ডি আয়োসিডেন্ট'। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'ডেইলি মেইল' তাঁদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের সত্যতা সম্পর্কে পুনরায় ঘোষণা করলেন। চারিদিকে আরো হৈ হৈ পড়ে গেল। একটা 'সত্য কিংবা অসত্য' সংবাদের উপর ভিত্তি করে মানুষের সংশয় ও প্রশ্ন আরো বেড়ে গেল। অবশেষে এর ঢেউ গিয়ে লাগল সেই পর্তুগালে—যেখানকার মানুষ নাকি রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম পূর্বপুরুষ ছিলেন। জগত্‌-জোড়া খ্যাতিসম্পন্ন কবি নাকি তাঁদেরই রক্তের, একই বংশের লোক, একথা পর্তুগালের পত্রপত্রিকাগুলো তখন খুব আত্মতৃপ্তি সহকারে ফলাও করে ছাপছে। লিসবনের অন্যতম দৈনিক পত্রিকা 'দ্য ডে ফেয়ার' এই আনন্দ সংবাদকে বেশ ভালভাবে প্রকাশ করে লিখল—'আমরা আজ অতিশয় আনন্দিত ও গর্বিত যে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী একজন কবির পূর্বপুরুষের ধমনীতে আমাদের রক্ত (কিছুমাত্রায় হলেও) প্রবাহিত হচ্ছে। আমরাও কবির গৌরব ও কৃতিত্বের অধিকারী। আমাদের দেশ ও জাতির পক্ষে আনন্দদায়ক ও গৌরবজনক এই বিরাট সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য সেই সাংবাদিককে অজস্র ধন্যবাদ। সাক্ষাৎকারে আমরা দেখলাম, কবি আমাদের দেশ ও তাঁর পূর্বপুরুষের জন্মভূমি পর্তুগাল পরিভ্রমণে ইচ্ছুক। এদেশে তাঁর পদার্পণ ঘটলে, আমরা 'আমাদের' কবিকে যথোচিত আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় সম্বর্ধনা জানাবো।'

(অনূদিত)

সুতরাং এই প্রকার সুখকর সংবাদে পর্তুগীজরাও তখন স্বভাবতই খুব আনন্দিত। শুধু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না কিছু সংখ্যক সচেতন পণ্ডিত পর্তুগীজ ব্যক্তি—যাঁরা নাকি জন্ম ও রক্তসূত্রে পর্তুগীজ হলেও মনেপ্রাণে চিন্তাধারায় ছিলেন ভারতীয়। তাঁরা সংবাদটাকে বিশ্বাসই করলেন না। তাঁদেরই মধ্যে একজন ছিলেন পর্তুগ্যালের লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অন্যতম সহকারী ডঃ সান্তোনা রোদ্রিগেজ। এই সংবাদের অসত্যতা সম্পর্কে নিজের দেশের জনসাধারণকে, শিক্ষিত নাগরিককে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে, দুঃখে রাগে অভিমানে সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চিত হবার জন্য নিজেই সুদূর লিসবন থেকে চিঠি লিখলেন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদককে। সেই চিঠিতে আমরা দেখি, একটা দুঃখপূর্ণ অভিমান এবং অবিশ্বাসের সুর। পাঠকের জ্ঞাতার্থে সেই চিঠির কিয়দংশ তুলে ধরছি :

'আই ডিয়ার স্যার, ইন সেপ্টেম্বর অফ দি কারেন্ট ইয়ার দি পোর্তুগীজ প্রেস অ্যানাউন্সড উইথ স্যাটিসফিকেশন অ্যান ইন্টারভিউ অফ দি লণ্ডন ডেইলি মেইল উইথ ঔওয়ার গ্রেট ন্যাশন্যাল পোয়েট আর টেগোর, হোয়্যার ইন হি কনফেসড দ্যাট হিস অ্যানসেসটরস হ্যাভ বীন পোর্তুগীজ। দিস নিউজ লেড টু অল ইন্ডিয়ানস অব লিসবন (বিয়িং) ভেরি ডিসপ্লীসড। ইজ দি ইন্টারভিউ ট্রু? ইজ ডঃ টেগোর অফ ইউরোপীয়ান স্টক? আই ডু নট বিলিভ, বাট আই আর্নেস্টলি বেগ ইউ উইথ গ্রেট ইন্টারেস্ট টু আস্ক ফ্রম হিম অ্যান্ড টু সেন্ড মি এ নোটিশ, অ্যাকোমপানিড উইথ অ্যান অরিজিন্যাল ফটোগ্রাফ অফ দি পোয়েট টু বি পাবলিশড ইন দি পোর্তুগীজ প্রেস।'

ডঃ রোদ্রিগেজের চিঠিটি পাঠিয়ে পর্তুগালের পত্রপত্রিকার এবং সেখানকার জনসাধারণের মিথ্যা ধারণা নিরসনের জন্য কবিগুরুর কাছে একটি প্রতিবাদলিপি এবং একটি ছবিও চেয়েছিলেন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক। উদ্দেশ্য—সেখানকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা।

সেদিনও তাঁর কথা শুনে কবিগুরু মৃদু হেসেছিলেন। সব কিছু শুনে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসে খুব শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—'তোমরা এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? অযথা একটা খবরকে এত গুরুত্ব দেওয়াও কি সমীচীন? আর সংবাদটা যদি সত্যিই হয় তাহলেও কোন ক্ষতি আছে?'

বিশ্বকবি সেদিন 'বিশ্বমানব' হিসেবে হাসতে হাসতেই উত্তরটা দিয়েছিলেন।

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

মুকাালসের প্রথম পক্ষের মেয়ে আর তার হবু বরকে। —বিয়ে করলে মেয়ের ভাগের সম্পত্তি পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই একটা দলিল সই করিয়ে নিতে চেয়েছিল রুক্যালস। চূড়ান্ত অত্যাচার করেছে—মেয়ে রাজী হয়নি। এদিকে তার হবু বরকেও ঠাণ্ডা মাথা দরকার। তাই ভায়োলেটকে দিয়ে মেয়ে পার্ট করিয়েছে জোকবাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে। কিন্তু টলারের বউ যে তলায় তলায় হবু বরের টাকা খেয়ে কাজ এগিয়ে রেখেছে তা কে জানত?

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পাদরি লঙ সাহেব বলেন, 'উহার লেখা ক্রমশঃ এমন জঘন্য হইয়া উঠিল যে, ১৭৮০ অব্দের ১৪ই নভেম্বর গভর্ণমেন্ট এক আদেশ প্রচার করিয়া জেনারেল পোষ্ট অফিস হইতে উহার প্রচলন রহিত করিয়া দিলেন, কারণ কিছুদিন হইতে উহাতে এমন কতকগুলি কদর্য প্যারাগ্রাফ্ বাহির হইতেছিল যে, তাহাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দাগ্লানি বিদ্যমান এবং তাহার লেখার ফলে উপনিবেশের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

হিকি তাহার কাগজ বিলি করিবার নিমিত্ত ২০ জন হরকরা নিযুক্ত করিলেন ও বলিলেন যে, যদিও তাঁহাকে হোমারের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথা রচনা করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে হয়, তথাপি তিনি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। এইরূপে দীর্ঘকাল বিবাদ করিবার পর তাঁহাকে কারাগারে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়।'

'ওরিজিনাল ইন্‌কোয়ারি' নামক গ্রন্থের লেখক ভারতের স্বাধীন-মুদ্রাযন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে হিকির বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্থানীয় গভর্ণমেণ্টগণের ১৭৯৩ অব্দের আইনের বিধানানুসারে নির্ব্বাসনদণ্ড দানের ক্ষমতাপন্ন হওয়ার সময় হইতে ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব মুহূর্ত্তের জন্যও ছিল না বটে, তথাপি কলিকাতার সেন্সরের পদ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে এবং উহা উঠিয়া যাইবার পর কোন কোন সংবাদপত্র-সম্পাদক সময়ে সময়ে নিজ দায়িত্বে রাজকীয় কার্য্যাবলীর ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাপার ও আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং তাহার ফলে অনেক সময় আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এইরূপ কথার প্রচার দ্বারা কখনও যে কোন বিশেষ বা স্থানীয় ভাবের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথবা তাহা বিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও হেতু দৃষ্ট হয় না।...'

বর্ত্তমান সময়ের সহিত বিচার করিয়া দেখিলে, তদানীন্তনকালের ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাসঙ্কোচক বিধিব্যবস্থাগুলি নিতান্ত কঠোর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের চরিত্র ও কার্য্যসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের আলোচনাই নিষিদ্ধ ছিল। এই নিয়মের লঙ্ঘনকারী দেশীয় হইলে তাহার প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তদানীন্তনকালের অবস্থানুসারে এই সমস্ত নিষেধবিধির আবশ্যকতা হইয়াছিল, অথবা তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের যথেচ্ছাচারিতা হইতে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, একথা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নয়। পরন্তু ইহা কৌতূহলের বিষয় যে, দেশীয়দিগের অপেক্ষা ইংরেজদিগের প্রতিই অধিক দণ্ডের প্রয়োগ হইত। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালন ভার প্রায়শঃ ইংরেজদিগের হস্তেই ছিল। কিন্তু কতিপয় বর্ষ পরে, সম্ভবতঃ ১৮১৬ অব্দে এতদ্দেশীয়েরা সংবাদপত্র-প্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

সুপ্রসিদ্ধ জেমস সিল্ক বাকিংহাম কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'কলিকাতা জার্ণাল' নামক সংবাদপত্র লইয়া জন আডাম সাহেবের বিস্তর বিবাদ-বিসংবাদ চলিয়াছিল। মাননীয় জন আডাম কিছুদিনের জন্য গভর্ণর হন। সম্পাদক অতি উদ্ধত ও বিদ্বেষময় ভাবে গভর্ণরের ব্যক্তিগত চরিত্র আক্রমণ করিয়া দোষের কার্য্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহার প্রতি যে নির্ব্বাসন দণ্ডের প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে যেরূপ কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে একমাত্র ইংরেজরাই সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন এবং তাঁহার নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন। মাদ্রাজের অধিবাসীরা উক্ত মহাত্মাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, তদুত্তরে তিনি বলেন— 'আমি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচক বিধিসমূহ অপনীত করিয়াছি এবং ভারতীয় ইংরেজগণকে মতামত প্রচারের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি, কারণ আমার বিবেচনায় উহা ইংরেজজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার।'

আর এক স্থলে উক্ত মহাত্মা বলেন, 'নিজের সাধুতার জ্ঞান থাকিলে, সাধারণের সমালোচনাদ্বারা কর্ত্তৃপক্ষীয়দের আত্মশক্তির কিছুই হ্রাস হয় না; প্রত্যুত, তদ্দ্বারা তাঁহাদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।'...

উদার হৃদয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্রের মহিমা বেশ বুঝিতেন; এমন কি সিপাহী-বিদ্রোহের সেই নিদারুণ সংকটকালেও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। উক্ত মহাত্মা বলিয়াছিলেন, 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দ্বারা যে ইষ্ট সাধিত হয়, তাহা এরূপ সুস্পষ্ট ও সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, উহার অপব্যবহার দ্বারা যে অনিষ্ট উৎপাদন হয় তদপেক্ষা ইষ্টের গুরুত্ব অধিক—অনিষ্ট ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইষ্ট চিরস্থায়ী।'

ক্রমে আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র নগরে আবির্ভূত হইয়াছিল। 'মনিটরিয়াল গেজেট' নামে একখানি সংবাদপত্র ছিল। পাদরি লঙ সাহেব বলেন, ১৭৮০ অব্দে কিয়ার্ণণ্ডার সাহেবের একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল। বর্ত্তমান প্রধান প্রধান ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে; এজন্য পশ্চাতে তাহা প্রকাশ করা গেল—

[বোল্টড্ সাহেব সেকালের সংবাদপত্রের এইরূপ একটি তালিকা দিয়াছিলেন— ইণ্ডিয়ান গেজেট (নভেম্বর, ১৭৮০); কলিকাতা গেজেট এণ্ড ওরিয়াণ্টাল এড্‌ভার্টাইজার (সম্পাদক ফ্রান্সিস গ্ল্যাড্‌উইন, ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৪); বেঙ্গল জার্ণাল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৫); ওরিএন্টাল ম্যাগাজিন (৬ই এপ্রিল, ১৭৮৫); কলিকাতা ক্রনিকল্ (জানুয়ারী, ১৭৮৬)]

জন্‌বুল—ইহাই উত্তরকালে 'ইংলিশম্যান' রূপে প্রকাশিত হয়। বাকিংহাম সম্পাদিত 'কলিকাতা জার্ণাল' নামক সংবাদপত্রের প্রভাব খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২১ অব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। বাকিংহাম সাহেব ১৮১৮ অব্দে 'কলিকাতা জার্ণাল' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদপত্রের পরিচালনার্থ প্রথমে ৩০,০০০ টাকা মূলধন নিয়োগ করা হয় কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে মূলধন যোগ করিতে করিতে কারবারটির মূল্য পরিণামে চারি লক্ষ টাকায় দাঁড়ায় এবং উহাতে বৎসরে ৬০ হইতে ৮০ হাজার টাকা লাভ হইত।

প্রথম পাঁচ বৎসরে ইহা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। সকল শ্রেণীর লোকেই ইহার গ্রাহক মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্তু তাহার পর ইহা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়ে এবং সম্পাদকের নামে একটি মানহানীর মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। বাকিংহাম সাহেবের মতে তৎকালে কলিকাতায় আর ছয়খানি সংবাদপত্র ছিল। তন্মধ্যে 'এশিয়াটিক মিরর' পাদরি জন ব্রাইসের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। বর্ণিত আছে যে মাননীয় আডামস সাহেবের সহিত তাঁহার ভয়ানক বাকযুদ্ধ ঘটে তাহাতে ইউরোপীয় সমাজ একেবারে চটিয়া যায় এবং তাঁহার কাগজ ক্রমশঃ অবনতি পাইতে থাকে।

এক্ষণে একমাত্র কলিকাতা জার্ণালই নিজ বিরাগভাজন কর্ম্মচারীদিগের প্রতিকূলে সমালোচনা করিতে লাগিল। এই সময়ে 'জন বুল' পত্র উহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইল। সৈনিক ও অসৈনিক রাজপুরুষেরাই ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উন্নতি-সাধক হইলেন। সুতরাং ইহা অচিরকাল মধ্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। অতঃপর কলিকাতা জার্ণালের সম্পাদক জন বুলের সম্পাদকের নামে মানহানির এক নালিশ উপস্থিত করেন। বোধহয় সে সময়ের ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির প্রকৃতি ও অবস্থার সহিত বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের পরস্পরের সহিত বাগযুদ্ধের তুলনা করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

ক্ষপণক

দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুনদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু বুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ছাঁরা রোগা ভাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীবব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু যূঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু। রঞ্জু সুযোগও পেল বাড়ীতে যখন গানের আসর বসিয়েছিলেন বাবা। রঞ্জু তখন তার পড়ার ঘরে যূঁইদির সামনে বসে কেষ্টনগরে যাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। তার মধ্যেই সে ফাঁক বুঝে কথাটা বলে ফেলল বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সেই রাত্রেই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুনল সে। মা চেপে ধরায় টুটুন বোটানিকেলে গিয়ে তার বাবা তারই বান্ধবী গোপাকে ছুতো করে গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল, এই কথাটা কবুল করতেই মার মুখ চোখ রাগে কঠিন হয়ে উঠলো। তাহলে বাবাকে কি মা সন্দেহ করে?

অথচ অমিয়র ধারণা সে মস্ত পুরুষ। মেয়ের বান্ধবীদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক সেটা নিছকই স্নেহের। তার পেছনে তার কোন খারাপ মতলব নেই। কিন্তু তার হাবভাব কি সেই কথাই বলে? তাহলে নির্জন দুপুরে, গোপার মা তখন অফিসে এবং একা বাড়ীতে গোপা তখন সে ওদের বাড়ি গেল কেন? সেটা কি নিছক টানের ব্যাপার?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আবার জল পড়ার ছপছপ শব্দ হয়। অমিয় হাঁ করে তাকিয়ে ওর পিঠের ও কাঁধের নরম বাঁক দেখেন। বাইরে পাখিটা আবার টি-টি করে ডাকছে। সব ধুয়েমুছে জায়গা মতন তুলে রেখে টেবিলের কাছে ফিরে এল ও। হাতে ব্যাগ। টেবিলটা সুন্দর করে মুছে ফেলল।

—পাকা গিন্নী তুমি। অমিয় আস্তে বললেন। ও শব্দ করল না। ব্যাগটা রেখে দিতে ওদিকে সরে গেল।

—ওঘরে যাবেন? ফিরে এসে ও আস্তে বলল।

—হুঁ যাব বৈকি। অমিয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু কথা হচ্ছে কি—

—বলুন।

ও আগে আগে হাঁটছিল। অমিয়বাবু পিছনে। মিসেস গাংগুলীর ছোট সাজান ড্রয়িংরুমে ফিরে এল দুজন।

—কথা হচ্ছে আমি কফিটফি খেলাম। তুমি কিছুই মুখে তুলছ না কিন্তু। এক-পাশে টেবিলে জড়ো করে রাখা কাগজের প্যাকেটগুলোর দিকে তিনি আঙুল দেখালেন।

—পরে খাব। ঘাড় নিচু করে বলল ও।

—পরে কখন? অমিয়বাবুর গলার স্বরে উদ্বেগ।

কথা বলে না ও। চুপ করে দাঁড়িয়ে হাতের নখ খোঁটে। কতকটা যেন হতাশ হয়ে অমিয়বাবু সোফাটায় বসে পড়েন। ফেমিঙ্গো একভাবে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে।

অমিয় চেয়ে চেয়ে দেখেন ওকে। যেন অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর সাবধানে প্রশ্ন করেন—সেদিন দুপুরে এসেছিলাম— মাকে বলেছিলে?

হুঁ কেন বলব না। টলটলে চোখে তাঁর মুখ দেখল ও।

—কি বলেছিলে?

—টুটুনের বাবা এসেছিলেন।

—তারপর? জিজ্ঞেস করলেন না সঙ্গে আর কে এসেছিল?

—হুঁ করেছিল বৈকি। বললাম উনি একলা এসেছিলেন। টুটুন রঞ্জু কেউ আসেনি।

যেন শ্বাস ফেলতে পারেন না অমিয়বাবু। হাঁ করে ওর মুখটা দেখেন। একটু পরে প্রশ্ন করেন—তারপর? নিশ্চয় উনি জিজ্ঞেস করলেন—টুটুনের বাবা কেন এসেছিল?

—হুঁ করেছিল বৈকি।

—কি বললে তুমি তখন?

—বললাম বেড়াতে এসেছিলেন গল্প করতে এসেছিলেন।

—আর?

—বললাম জঙ্গলের গল্প করলেন আমার সঙ্গে। পাখির গল্প করলেন। ক্যাকটাসের কথা বললেন কত।

—তারপর? আর কি বলেছিলে?

—দুজনে খুব করে লুডো খেলেছি ক্যারাম খেলেছি।

—ইস কী সাংঘাতিক মেয়ে তুমি! আর? নিশ্চয় আরো কিছু বলেছিলে।

গোপা আর কথা বলে না। কাঠের মূর্তির মতন অমিয়বাবু চুপ করে বসে থাকেন। যেন একতাল অন্ধকার তাঁর পুরু মোটা ভুরু দুটোর মাঝখানে ঝুলতে থাকে।

নিঃশব্দ ছায়া হয়ে সেই জানালাটায় দাঁড়িয়ে আমি মজা দেখছিলাম। মিসেস গাংগুলীর মেয়ে আস্তে আস্তে টেবিলটার কাছে সরে যায়। যেখানে খাবার প্যাকেট-গুলো রাখা হয়েছে। সেসব ধরে না ও। পাশেই রেডিওটা দাঁড় করান। নব টিপে ও ওটা চালিয়ে দেয়। কেউ যেন ভজন গাইছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও রেডিও বন্ধ করে দিল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ারে বসা মানুষটিকে দেখে মিটমিট হাসল। তারপর কি ভেবে আস্তে আস্তে সরে এসে ওঁর সামনে দাঁড়াল। এতক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে থাকার পর অমিয় চোখ তোলেন। গোপা ফিক করে হাসল।

—হাসছ কেন। খসখসে গলার স্বর অমিয়বাবুর। —মাকে আর কি বলেছিলে বলো।

—আর কিছু বলিনি।

—নিশ্চয় বলেছিলে। ধমক দিয়ে ওঠেন অমিয়। সোফা ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান। গোপা ভয় পায় না বা ছুটে পালায় না। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। হাসে।

—আবার হাসছ! অমিয় ওর হাত চেপে ধরেন। চাপা গর্জনের মতন শোনায় তাঁর গলার স্বর।

আর তখন ঠোঁট ছেড়ে গোপার মুখের হাসি চোখের ভিতর আশ্রয় নেয়। শেষ বেলায় গাছের আগায় রোদ্দুর যেমন জ্বলতে থাকে। হাসির আভায় ওর দু চোখ ঝিকমিক করে।

—কেমন? আবার ব্যথা দেবেন আমার হাতে—তাই না? থুতনি ঝাঁকিয়ে ও শুধোয়।

—না দেব না ব্যথা। সত্যি করে বলো মাকে আর কি বলেছিলে। অমিয় হাতটা ছাড়েন না যদিও।

—বলেছিলাম লুডো ক্যারাম খেলা সেরে আমরা ঘোড়া ঘোড়া খেলেছি। তোমার শোবার ঘরের মেঝেয় চার পা হয়ে উবু হয়ে রইলেন টুটুনের বাবা। আমি তাঁর পিঠে চেপে বসলাম। তারপর তাঁর চুল টেনে ধরে হ্যাট হ্যাট করতে আমায় নিয়ে তিনি ছুটলেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘোড়া ঘোড়া খেলেছি দুজন।

—বললে! বলতে পারলে তুমি একথা? অমিয়র গলার স্বর কেঁপে উঠল। কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মুখটা। যেন ভয়ানক দুর্বল বোধ করেন তিনি। ওর হাত ছেড়ে দিয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়েন।

আর আমি দেখলাম তখন গোপার চোখের ভিতরের সেই লাল বৈকেলী রোদ্দুরের হাসি কেমন দপ করে সকালের গোলাপী আলো হয়ে ওর গালে চিবুকে ছড়িয়ে পড়ে। বুকের কাছটাও আলোময় হয়ে যায়। সবটা শরীর ঝলমলে দেখায়। হাত তালি দিয়ে ও নাচতে থাকে। ঠাসা জমাট দুধ-রং উরুর কাছে ভায়লেট ফ্রকটা নদীর মতন থিরথির কাঁপে।

একটু পরে ও শান্ত হয়। থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় গুঁজে আছেন টুটুনের বাবা।

কপালের রগ টিপে ধরেছেন। কাঁদছেন কি ভদ্রলোক? আস্তে আস্তে ও কাছে সরে এল।

—কি হল! ভয় পেলেন?

অমিয়বাবু ঘাড় তুলে ওর দিকে তাকান। কথা বলেন না।

যেন তাঁর চেহারা দেখে গোপার কষ্ট হয়। ফিসফিসিয়ে ওঠে। —ওফ কী ভীষণ ছেলেমানুষ আপনি। একটুখানি মিছে কথা বললাম আর অমনি ভয় পেয়ে নার্ভাস হয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন।

হুঁ ভয় তো পেয়েছিই ভয় না পাবার আছে কি। অমিয় এবার শরীরটা সোজা করেন। ঘাড় উঁচু করে সহজভাবে বসতে পারেন। এত দুষ্টু হয়েছ না তুমি! একটু থেমে থেকে ফ্লেমিঙ্গোর ভুরু দুটো দেখেন তিনি। তারপর আবার বলেন, আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না এমন একটা খেলার কথা কি করে তুমি মাকে বলতে পারলে আর ভদ্রমহিলাই বা না জানি কি ভাবতে গিয়ে কি ভাবছিলেন।

—আহা, যখন বলতাম তখন মা ভাবত। ফ্লেমিঙ্গো ঠোঁট বেঁকাল। বলিনি যখন তখন আর কি। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে প্যাস্ট্রির প্যাকেটটা তুলে নিয়ে টুটুনের বাবার পাশে বসে পড়ল ও। আমি একা সব খেতে পারব না কিন্তু। আপনাকে ভাগ নিতে হবে।

—আচ্ছা ঠিক আছে। পকেট থেকে রুমাল তুলে অমিয়বাবু আগে ভুরুর অন্ধকারটা মুছে ফেলেন। এক সঙ্গে দুটো পাখি তখন টি-টি করে ডাকছে।

*

খুব ফুর্তিতে কাটছিল দিনগুলি। রঞ্জু ভাবতেই পারেনি এত ভাল লাগবে তার এখানে। কিন্তু হঠাৎ কোনদিক থেকে যেন কি হয়ে গেল।

যুঁইদির কথা ছেড়ে দাও। যুঁইদিকে তার যতটা ভাল লাগার বা তাকে এত কাছে পেয়ে যুঁইদির যতটা খুশি হবার আমোদ করার সে তো করছেই—সেসব তো ছিলই। দিন-রাত দুজনে মিলে হৈ-চৈ। খাওয়া-দাওয়া। বেড়ান। আর গল্প করা। গল্প গল্প। এর আর শেষ নেই। উঁহু এই সংসারে যুঁইদিকে কুটোটিও নাড়তে হয় না। কেনই বা নাড়তে হবে। তিন-চারটে ঝি-চাকর রয়েছে যার।

মানুষ তো মোটে দুজন। যুঁইদি আর ওর বর। ঘরদোর ঝাড়পোছ করা থেকে আরম্ভ করে ধোয়া মোছা সাজানো গোছানো— সব ওরা করছে দেখছে। স্নান করার পর যুঁইদির ভেজা শাড়ি সায়াটা পর্যন্ত ওরা ধুয়ে কেচে এনে শুকোতে দিচ্ছে। শুকোবার পর তুলে ভাঁজ করে আলনায় ঝুলিয়ে রাখছে। রান্না করছে বামুনঠাকুর। খাবার তৈরী হলে টেবিলে এনে সাজিয়ে দিচ্ছে। যুঁইদি শুধু বসে আছে। ভাতের থালায় হাত লাগিয়ে মুখে তোলা আর চিবোনোর কষ্টটুকু ছাড়া আর কিছুই ওকে করতে হয় না। সংসারের কোনো-দিকেই তাকাতে হয় না।

অদ্ভুত সুখের জীবন নিশ্চিন্ততায় জীবন যুঁইদির। আগের কালের রাণী-মহারাণীরাও এত আরামে এত সুখে জীবন কাটাতেন কিনা রঞ্জুর জানা নেই।

অবশ্য এর সবটার পিছনেই রয়েছে যুঁইদির বর এবং বরের পয়সা।

সত্যি একটা মানুষ!

—রঞ্জু যদি এখানে আদৌ না আসত —কেবল যুঁইকে তাদের ম্যান্ডেভিল-গার্ডেনস-এর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেমন দেখে আসছিল দেখে যেত তো একটা আশ্চর্য চরিত্র তার অজানা থেকে যেত।

আশ্চর্য চরিত্রই বটে গোপেনদা। গোপেন রায়। যুঁইদির বর রঞ্জুর কাছে দাদা সম্পর্কীয় ছাড়া আর কি' এখানে এসেছে অবধি গোপেনদা বলেই রঞ্জু ডাকছে। তবে কিনা যুঁইদির চেয়ে গোপেনদার বয়সটা একটু বেশি। চোখে লাগার মতন। ত্রিশ পার হয়ে গেছে। দেখতে কিন্তু আরও বেশি মনে হয়।

যুঁইদির উনিশ-কুড়ির বেশি না। তার দিদি রেবার মুখে রঞ্জু শুনেছে। কিন্তু এর মধ্যেও কথা আছে। একে তো আঁটোসাঁটো ছিপছিপে গড়ন যুঁইয়ের। গায়ের চামড়াটা অতিরিক্ত পাতলা হওয়ার দরুন পায়ের নখ থেকে মাথার চুল ঘেঁষে কপালের কিনারা পর্যন্ত একটা গোলাপী আভা শরীরের ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে চব্বিশ ঘণ্টা আয়নার মতন ঝকমকে করে রাখছে মানুষটাকে। যেন ওর চামড়া কোনো-দিন পুরোনো মলিন হবার নয়। এই জন্মে ও বুড়ো হবে না ধরে নেওয়া যায়। তার ওপর যা ওর স্বভাব। ধরতে গেলে চঞ্চল-স্বভাবটাই লাগাম ছাড়া হাসিখুশি ও চঞ্চলতা নিয়ে মেতে আছে। পাহাড়ী ঝর্ণার মতন ঝাপঝাপ উঠছে পড়ছে ছুটছে হাসছে কথা বলছে। যে জন্য আরও কম বয়সের দেখায় ওকে। যেন সবে সতেরো-আঠারোয় পা দেওয়া পি-ইউ ক্লাসের একটা মেয়ে। ইস্কুলের চৌহদ্দী ডিঙোয়নি ভাবতেই বা ক্ষতি কি।

গোপেনদা অন্যরকম। মানুষটা একটু মোটার দিকে। তার ওপর যথেষ্ট উঁচু লম্বা ফ্রেম। এই বয়সেই ভালরকম একখানা ভুঁড়ি বানিয়েছে। ময়লা রং গায়ের। চামড়াটাও বেশ পুরু ভারি। অবশ্য চামড়া ভারি বলতে অন্য অনেক কিছু বোঝায়। লোকটা কিপটে রুক্ষ হতে পারে। নিষ্ঠুর নির্লজ্জ হতে পারে। বেহায়া স্বার্থপর ভেবে নিতেও আটকায় না। কিন্তু এখানে এসে রঞ্জু যা দেখছে—এই দোষগুলির

একটাও গোপেন রায়ের মধ্যে নেই। মোটেই নির্লজ্জ বেহায়া নয়। ভীষণ ভদ্র অমায়িক। মনটা দারুণ খোলামেলা। কিপটে হবে কি! দু হাতে কেবল খরচ করার নেশা। নিজে যেমন প্রচুর ভোগ-সুখ চাইছে তেমনি অপরকেও ভোগী সুখী করতে এক ফোঁটা দ্বিধা বা কার্পণ্য নেই।

ভারি চামড়া বলতে আসলেও ওঁর গায়ের চামড়াটা তাই। বেশ পুরু মোটা। হয়তো ক্রমাগত বেশি খেয়ে দেয়ে—মাছ মাংস ঘি দুধ ছানা ইত্যাদি ভাল ভাল জিনিস অপর্যাপ্ত পরিমাণে রোজ পেটে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। ফ্যাট জমেছে আর কি।

এর আর একটা কারণও হতে পারে। রঞ্জু চিন্তা করে। কলকাতার ছেলে সে। তার চারপাশে নিত্য অনেক কিছু সে দেখছে। লোকের মুখে এবং বন্ধুদের মুখে কত কি শুনে অনেক কিছু এই বয়সেই সে জেনেও গেছে। যারা নিয়মিত ড্রিঙ্ক করে তাদের গায়ের চামড়া এমন পুরু মোটা হয়। অর্থাৎ তার বন্ধু শোভেন যেটাকে 'অ্যালকহলিক ফ্যাট' বলে। রঞ্জুদের পাড়ার মিতালী রেস্টুরেন্ট-এর প্রোপ্রাইটার শশী নন্দী এর জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। ড্রিঙ্ক করে করে কেমন একখানা চেহারা বাগিয়েছে। কেন অ.মত্রের শ্যালকের পিসেমশাই রাসবিহারী নাগকে দেখেনি রঞ্জু? ফিল্ম লাইনে আছে। দু-তিনখানা বইয়ের প্রডিউসার। ছিপছিপে রোগাপটকা চেহারা ছিল। এই দু-তিন বছরের মধ্যে দৈত্যের মতন দেখতে হয়েছে। দেদার মদ আর চিকেন রোস্ট চালিয়ে যাচ্ছে। অমিত যা বলে। বিয়ে থা করেছে ভদ্রলোক। ছেলেপুলেও আছে শ্যালকের বাড়িতে। অথচ আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকেন তিনি পার্ক স্ট্রীট। সঙ্গে একটা মেয়েমানুষ আছে।

এই এক ধরনের কতগুলি মানুষ কলকাতায় এই অসুখটা ক্রমেই যেন বাড়ছে। এত ঘেন্না পায় রাগ হয় রঞ্জুর লোক-গুলিকে দেখলে বা এদের নাম শুনলে।

যাক যে কথা হচ্ছিল। বুইদির বর গোপেন রায়। ভুঁড়টুড়ি নিয়ে কালো রঙের মুমসো বিরাট একটা ফিগার। তার ওপর যদি মাথায় টাক পড়তে আরম্ভ করে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? বুড়ো না হোক—প্রৌঢ় বলে ভদ্রলোককে অনেকেই ভুল করবে। প্রথম দিন দেখে রঞ্জুও ভুল করেছিল। বুইদি বলছে বত্রিশ। রঞ্জু ধরে নিয়েছিল অর্থাৎ চল্লিশ-বিয়াল্লিশের ওপর বয়স ওর বরের।

তা হলেও উনিশে আর বত্রিশে যে অনেক তফাৎ।

যেমন বয়স তেমনি শরীরের দিক থেকেও। এতক্ষণ যা বলা হল। পাখির মতন ছিপছিপে এইটুকুন একটা মানুষ বুইদি। আর এদিকে মোষের মতন প্রকাণ্ড চোয়াড়ে চেহারার গোপেন রায়। কিছুতেই দুটিকে স্বামী-স্ত্রী কল্পনা করা যায় না। অঙ্ক মেলাতে কষ্ট হয়। এদিনে এমন একটা জোড় কি করে সম্ভব হল ওদের দুজনকে দেখলে তিনবার ভাবতে হয়। বিশেষ করে বুইদির বেলায়। সাজ-পোশাক চালচলন চেহারায় হাবিতে এত যে আলট্রা-মডার্ন মেয়ে।

কিন্তু রঞ্জু দেখছে মিলন ঠিকই সম্ভব হয়েছে। যেন একটা অঙ্ক চমৎকার মিলে গেছে। একটা নয়া পয়সার গরমিল নেই।

আসল হল মন। বয়সটা কিছুই না। শরীরও কিছু না। এসব বাইরের জিনিস। ভিতর থেকে দুটি প্রাণের মিল থাকলে কিছুতেই কিছু আটকায় না।

তাছাড়া, ঐ যে বলা হয়েছে— ভীষণ মাই-ডিয়ার লোক গোপেন রায়।

সংশোধনী

নববর্ষ সংখ্যার সূচীপত্র থেকে নিম্নলিখিত তিনটি লেখা এবং লেখকের নাম বাদ পড়ে যাওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

১৩৯ বাঁশের বোমা—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
১৪৩ বায়েন—শ্রীমহাশ্বেতা দেবী
১৪৯ প্রশস্ত হলঘরে—
শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম রাত্রেই রঞ্জু টের পেয়েছিল। ভদ্রলোক ড্রিঙ্ক করে। এই ব্যাপারে ঢাকঢাক গুড়গুড় কিছু ছিল না যদিও। নিজের ঘরে বসেই খাচ্ছিল বুইদি বোতলের ছিপি খুলে দিচ্ছিল। গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছিল। সোডা মিশিয়ে দিচ্ছিল। হুইস্কির সঙ্গে মাংসের বাটি টেবিলে তুলে দিচ্ছিল।

ট্রেনের পোশাক ছেড়ে জলখাবার খেয়ে রঞ্জু ঘুরেফিরে বাড়িটা দেখছিল। দেখতে দেখতে এক সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। নতুন জায়গা। কলকাতার বাইরে এই তার প্রথম পা বাড়ান। পাড়াগাঁ আর কোনদিন দেখেনি সে। চারদিকে শেয়ালের ডাক ঝিঁঝির ডাক ও অফুরন্ত জোনাকির ঝিকিমিকি নিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ। প্রকাণ্ড বাড়ি। বুইদির শ্বশুর করে গিয়েছিল। বাড়িতে আর লোকজন কোথায়। শ্বশুরকুলের সব নাকি মরে-হেজে ভূত হয়ে গেছে।

এখন একমাত্র বংশের সলতে বলতে গোপেনদা। ছোট একটি ভাই ছিল। বিয়েথা করার অনেক আগে সে-ও স্বর্গে চলে গেছে। ভালই হয়েছে। বাবা যা-কিছু রেখে গেছে একলা গোপেনদার ভোগে লাগছে। দুটো ফলের বাগান মাছভরতি মস্ত মস্ত দুটো দীঘি ও বিশ-ত্রিশ বিঘে ধানী জমি সমেত চকমিলান প্যাটার্নের প্রকাণ্ড বাড়িটা যদি একমাত্র সম্পত্তি হত তবে নাকি দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। বুইদি যা বলে। চা আর কাঠের ব্যবসা করে ব্যাঙ্কে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা রেখে গেছে ওর শ্বশুর। যা দু'হাতে খরচ করে গোপেনদা শেষ করতে পারছে না। একা খরচ করে শেষ করতে পারছিল না বলে শেষ পর্যন্ত একটা বিয়ে করে ফেলল। অর্থাৎ বুইদিকে ঘরে আনল। এখন গোপেনদা ও বুইদিতে মিলে শিমুল তুলোর মতন রাশ রাশ টাকা হাওয়ায় বাতাসে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে। তবু কি ছাই ব্যাঙ্কের একাউন্টটা ছোট হতে চায়। বছর ঘুরতে এত সুদ জমা হয়ে আবার ওটা ফুলেফেঁপে ডাউল হয়ে উঠছে।

কলকাতা থেকে ট্রেনে আসতে আসতে বুইদি গল্পটা করছিল। হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রঞ্জু শুনছিল। শুনে তার তাক লেগে যাচ্ছিল। টাকা আছে বলে ওদের দুশ্চিন্তা? এ কেমন কথা! সে জানে টাকা না থাকলে দুশ্চিন্তা। সেই সঙ্গে অশান্তি খিটিমিটি ঝগড়া। যেমন তাদের সংসার। রঞ্জুর বাবা টাকা রোজগার করছে না। এই নিয়ে কী অশান্তি যাচ্ছে বাড়িতে। রঞ্জুর মা-র দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বুড়ো বঙ্কিম দত্তের দুশ্চিন্তা দুশ্চিন্তাটা তো ক্রনিক পেটের অসুখের মতন লেগেই আছে। তবু তো হাফকিলটে দাদুর পেনসনের টাকায় ও দিল্লী থেকে কাকু কিছু কিছু পাঠায় বলে মোটামুটি তাদের চলে যায়।

(ক্রমশঃ)

আর্যভট্ট ও মহাকাশ বিজ্ঞানে পরবর্তী পদক্ষেপ

৵

১৯৭৪ সালের ১৮ মে ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর এক বছর কাটতে না কাটতেই ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা আরেক চমক সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর কক্ষপথে ভারতীয় উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'কে স্থাপনা করে। সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের তৈরী এই উপগ্রহের ওজন ৩৬০ কিলোগ্রাম, যা কিনা প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী। তবে অবশ্য উৎক্ষেপণের ব্যাপারে আমাদের সোভিয়েত সাহায্য নিতে হয়েছে। তাদেরই একটি রকেট আমাদের আর্যভট্টকে তুলে নিয়ে গেছে পৃথিবীর কক্ষপথে।

আমাদের মহাকাশ পরিকল্পনার লক্ষ্য অনেক। এই উপগ্রহের সাহায্যে বেতার যোগাযোগ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান আরো সহজ হয়ে উঠবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এখন তিনটি পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চলেছেন। তার প্রথম ধাপের পদক্ষেপ আর্যভট্ট। আশা করা যায় যে দ্বিতীয়টি এই বছরের শেষের দিকে পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করবে। এর সাহায্যে ভারতের ২৪০০ গ্রামে টেলিভিশন পৌঁছে দেওয়া যায়।

তৃতীয় পদক্ষেপ হবে উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য তার বাহন রকেটের উন্নতি সাধন। তখন উৎক্ষেপণের জন্য উপগ্রহকে আর সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যেতে হবে না। ১৯৭৮ সালে ভারতের মাটি থেকে ভারতীয় রকেটই উপগ্রহকে বয়ে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেবে।

প্রথম প্রয়াসের পর ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের লক্ষ্য এমন উপগ্রহের সাহায্যে সারা দেশে বেতার যোগাযোগের জাল ছড়িয়ে দেওয়া। জাতীয় সংহতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বেতার বা টেলিভিশন যোগাযোগের যে কোন বর্তমান ব্যবস্থার থেকে এই নতুন পরিকল্পনায় খরচও অনেক কম প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এই কৃত্রিম উপগ্রহকে আবহাওয়া বিজ্ঞাগার হিসেবেও ব্যবহার করা হবে।

বিজ্ঞানের কথা

৵
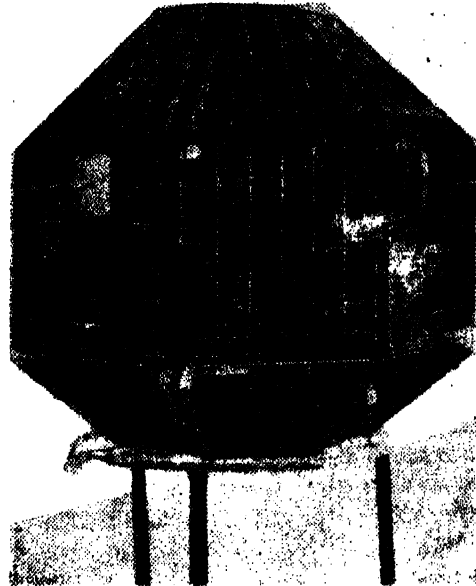
মহাকাশ-গবেষণায় ভারত

ভারতে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটার এক বছরের মধ্যেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরী একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে মহাকাশ-গবেষণায় নিযুক্ত হল। তবে ভারতীয় উপগ্রহটি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে এবং উৎক্ষেপণের স্থানও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই উৎক্ষেপণ-পর্বটি ভারতের একদল বিজ্ঞানী ও কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে ভারতীয় সময় দুপুর একটায়।

উপগ্রহটি প্রায় বৃত্তাকার একটি কক্ষে পৃথিবীর চারদিকে পাক খাচ্ছে। সবচেয়ে দূরে থাকার সময়ে পৃথিবী থেকে উপগ্রহটির দূরত্ব (অপভূ) ৬২৩ কিলোমিটার, আর সবচেয়ে কাছে থাকার সময়ে (অনুভূ) ৫৬৪ কিলোমিটার। পৃথিবীকে একবার পাক দিতে সময় লাগছে ৯৬·৪১ মিনিট।

উপগ্রহটির ওজন ৩৬০ কিলোগ্রাম। প্রথম উৎক্ষেপণেই এতবেশি ওজন অন্য কোনো দেশের ছিল না।

নিজস্ব উপগ্রহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আকাশে উৎক্ষেপণ করেছে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যেসব দেশ তারা হল : সোভিয়েত ইউনিয়ন (স্পুৎনিক-১ ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (এক্সপ্লোরার-১, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮) ফ্রান্স (অ্যাসটেরিক্স-১ ২৬শে নভেম্বর ১৯৬৫) জাপান (ওসমি ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০) চীন (২৪শে এপ্রিল ১৯৭০) ও ব্রিটেন (প্রস্পেরো ২৮শে অক্টোবর ১৯৭১)।

অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে তোলা মোটেই শক্ত কাজ নয়। এ-ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন সিদ্ধহস্ত। একমাত্র কসমস কর্মসূচীতেই (১৯৭২ সালের ১৬ই মার্চ পর্যন্ত) সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৬৭০টি উপগ্রহ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে নানা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে—যথা আবহমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে ও পৃথিবীর নিকটবর্তী স্থানে মহাশূন্যের অবস্থা নিরূপণ, ভেষজ ও জীবদেহগত অনুসন্ধান, মহাশূন্যে নীত অংশাবলীর ও ব্যবস্থার পরীক্ষাকার্য ইত্যাদি। মহাকাশের গবেষণায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিজস্ব রকেটব্যবস্থা নিয়ে বহু দেশের সঙ্গে (পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ও ফ্রান্স) সহযোগিতা করে থাকে। ভারতের প্রথম উপগ্রহের উৎক্ষেপণও এমনি এক সহযোগিতারই ফল।

•

ভারতে মহাকাশ-গবেষণা নিয়ে উদ্যোগের সূত্রপাত বলা চলে ১৯৬১ সালে। দায়িত্ব দেওয়া হয় পরমাণুশক্তি [illegible]

সমগ্র ভারতের উপরেই থাকবে এর সজাগ দৃষ্টি।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এই পদক্ষেপ ভারতকে সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক গেজেট তৈরীর ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করেছে যা কিনা মহাকাশের যে কোনো ঝক্কি ঝামেলা সামলাতে পারে। যে কোন অবস্থাতেই এই সব যন্ত্রপাতি আমাদের প্রয়োজনীয় খবরা-খবর দিয়ে যাবে। আবহাওয়া উপগ্রহগুলো আমাদের ঝড় বৃষ্টি সম্বন্ধে সতর্ক করতে পারবে, ফলে বিপর্যয় অনেকাংশে কমানো যাবে। আবার আর্যভট্টের কথায় ফিরে আসা যাক। মোট ওজন ৩৬০ কিলোগ্রামের মধ্যে শুধু উপগ্রহটির ওজন ৯০ কিলোগ্রাম, এর মধ্যে তিনটি মূল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি ছাড়া আরো অনেক যন্ত্রপাতি আছে যা আর্যভট্টকে সক্ষম থাকতে সাহায্য করছে। একে বৈদ্যুতিক শক্তি যোগাচ্ছে কতকগুলো সিলিকন সৌর ব্যাটারী ও নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারী। উপগ্রহটির চালনার জন্য এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা আছে। প্রথমটি হচ্ছে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা এর সাহায্যে বিভিন্ন খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় কিছু উপগ্রহটির বুকে যে টেপরেকর্ডার আছে তাতে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি উপগ্রহকে মহাকাশে স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করা। আগেই বলেছি উপগ্রহটির মধ্যে তিনটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি আছে। যেগুলো হলো একসরশ্মি পরিমাপক বায়ুমন্ডলের ঊর্ধ্বতম স্তরে পরীক্ষা নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি, এবং সৌর বিকীরণ থেকে ছুটে আসা নিউট্রন ও গামারশ্মির পরিচয় জানার যন্ত্রপাতি। এর মধ্যে প্রথম দুটি আমেদাবাদের ফিসিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারীর তৈরী ও তৃতীয়টি টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর তৈরী। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে আমরা জানতে পারবো একস রশ্মি উৎপত্তি ও বিভিন্ন তারকার জ্যোতির্বিজ্ঞান, বায়ুমন্ডলের ঊর্ধ্বতম স্তরের গঠন তাপমাত্রা। ঘনত্ব এবং সৌর বিকীরণের রহস্য।

এখন প্রশ্ন একটাই যে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা কি আরো জটিল উপগ্রহ বানাতে সক্ষম হবেন যা বেতার যোগাযোগ ও আবহাওয়া খবর নেওয়ার কাজে লাগবে? এই সব উপগ্রহের জন্য প্রয়োজন আরো সূক্ষ্ম আরো জটিল বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা কম্পিউটার টেলিভিসন ক্যামেরা ইনফ্রারেড যন্ত্রপাতি যা কিনা দরকার পড়লে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতে পারে।

সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে যে দেশ নানা অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত সে দেশে এতো টাকা ঢেলে মহাকাশ পরিকল্পনা কেন? এর জবাবে বলা যায় যে, এইসব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য একটাই দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই উপগ্রহই আমাদের আজকের অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করেত পারবে।

মহাকাশ পরিকল্পনার গুরুত্ব অসীম। বিশেষ করে কৃষি খনিজ সম্পদ বেতার যোগাযোগ শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে। উপগ্রহের সাহায্যে কৃষির প্রভূত উন্নতি করা সম্ভব। এই সব উপগ্রহই বেতার তরংগের সাহায্যে বৃষ্টি ঝড় মরশুম সম্বন্ধে আমাদের খবর দিতে পারবে। অদেখা অজানা খনিজ সম্পদও আর লুকিয়ে থাকবে না অবগুন্ঠনের আড়ালে। সামরিক ব্যাপারেও কৃত্রিম উপগ্রহের গুরুত্ব অসীম।

ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা আজ এই পরিকল্পনার উন্নতি সাধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রকেটেরও উন্নতি সাধনের জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একটি চতুস্তর রকেট বনানোর কাজ এগিয়ে চলছে। তার জ্বালানীও তৈরী হয়েছে।

আশা করা যায় যে এই রকেটগুলো ১৯৮০ সালে আর্যভট্টর দ্বিগুণেরও বেশী ভারী (৮০০ কিলোগ্রাম) কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে ছুটে যাবে।

সনৎ বিশ্বাস

নিজেদের উপরে। পরের বছরেই এই বিভাগ থেকে গঠন করা হয় মহাকাশ গবেষণার ভারতীয় কমিটি ডঃ বিক্রম সরাভাই-এর সভাপতিত্বে। এই বিজ্ঞানীই ছিলেন ভারতীয় মহাকাশ-গবেষণার কর্মসূচীর প্রবর্তক। তাঁর সহায় হয়েছিল তাঁরই পটিকতক ছাত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনকয়েক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রবিদ। ষাটের দশকের শেষদিকে তিনি একটি প্রকল্প খাড়া করেছিলেন। তদনুসারে ১৯৭৪ সালের মধ্যে ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি উপগ্রহ নিজস্ব উৎক্ষেপণ-ব্যবস্থার সাহায্যে কক্ষপথে স্থাপন করার কথা ছিল। কাজটা তিনি গোড়ায় ছোট মাপেই করতে চেয়েছিলেন তা সত্ত্বেও অল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি করেছিলেন যে এটুকু করতে হলেও যা থাকা দরকার দেশের তা নেই—না উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদল না উপকরণ না আর্থিক সঙ্গতি। তারপরে সত্তর দশকের গোড়ার দিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সহযোগিতার প্রস্তাব পেয়ে সানন্দে গ্রহণ করলেন। তবে তার শেষ দেখে যেতে পারেননি, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে তিনি মারা যান।

১৯৬২ সালেই ত্রিবান্দ্রমের কাছে থুম্বায় স্থাপিত হয় বিষুবীয় রকেট উৎক্ষেপণ স্টেশন। ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ-কাজে সহায়তা করে। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে থুম্বাকে আন্তর্জাতিক সুযোগসুবিধার আওতায় আনা হয়।

১৯৬৯ সালে পারমাণবিক শক্তি বিভাগের অধীনে স্থাপিত হয় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংগঠন (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে 'ইসরো')। ডঃ সরাভাই-এর মৃত্যুর পরে অধ্যাপক মেনন 'ইসরো'-র প্রধান হন। ১৯৬১ সালে অন্ধের শ্রীহরিকোটায় ১২০০০ হেকটর জমির ওপরে আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থাপনাসহ বৃহৎ একটি উৎক্ষেপণ মঞ্চের নির্মাণকার্য শুরু হয়।

১৯৭২ সালের অকটোবরে বাঙ্গালোরে স্থাপিত হয় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ প্রকল্প (ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক স্যাটেলাইট প্রোজেকট, সংক্ষেপে আই-এস-এস-পি)। দু বছরের মধ্যে একটি উপগ্রহ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই প্রকল্পের ওপরে। অতঃপর, দু-বছর না হোক, আড়াই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে, খরচ পড়েছে প্রায় ৪-৩ কোটি টাকা। এই বিপুল খরচে একটি উপগ্রহ নির্মাণের যৌক্তিকতা হিসেবে বলা হয়েছে যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিজেরাই এমন সমস্ত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা নির্মাণ করতে সক্ষম হবেন যা মহাকাশে অতি কঠিন অবস্থার মধ্যেও সক্রিয় থাকবে এবং এই জ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যতে এমন সমস্ত উপগ্রহ নির্মাণ করতে পারবেন যা সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনে সার্থক হবে। লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে—যোগাযোগ, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা, সম্পদ অনুসন্ধান ইত্যাদি। আশা করা হচ্ছে, দু-এক দশকের মধ্যেই ভারতের আকাশে এমনি নানা উদ্দেশ্যসাধক উপগ্রহ অস্তিত্ব লাভ করবে, এমনকি 'স্থির' উপগ্রহও (আসলে স্থির নয়, পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন যে-বেগে এই উপগ্রহের কক্ষ-আবর্তন সেই একই বেগে—একই দিকে এবং বেগসম্পন্ন হওয়ার দরুন একটি থেকে তাকিয়ে অপরটিকে মনে হয় স্থির)।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরী উপগ্রহটিকে চূড়ান্ত, পরীক্ষাকার্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। অতঃপর ১৯ই এপ্রিল তারিখে উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়।

এখানে বলা দরকার, ভারতের এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের কয়েকটি জরুরী অংশ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আদৌ হাত পড়েনি। সেগুলো সরবরাহ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন (সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির সংগে ১০মে ১৯৭২ তারিখে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী)। যেমন, সৌর সিলিকন সেল ও নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি সমূহের প্যানেল (এই সমস্ত সেল ও ব্যাটারির সাহায্যেই উপগ্রহের ভিতরকার বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র পৃথিবী থেকে সংকেত পাওয়া মাত্র ক্রিয়াশীল হয়), কম্প্রেসড নাইট্রোজেনের ছটি বোতল (যার ব্যবহার উপগ্রহের ঘূর্ণন তৈরি করার জন্য জেট হিসেবে), টেপ-রেকর্ডার (সংগৃহীত তথ্য মজুদ করার জন্য)।

এবং একথাও বলা দরকার, উল্লিখিত কয়েকটি অংগ বাদে উপগ্রহের আর সবকিছু 'ইস্‌রো'-র ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান- তার বিন্যাস, তার কাঠামো তার গতিপথ নিরূপণের ব্যবস্থা, তার উদ্দেশে সংকেত পাঠানোর আয়োজন ইত্যাদি সবকিছু।

উপগ্রহটি প্রায় দু-বছর কক্ষপথে টিকে থাকবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন সিদ্ধ করবে ছ-মাস পর্যন্ত।

উপগ্রহটির আকার কিন্তু সম্পূর্ণ গোলকের মতো নয়; বরং বলা চলে, বহু-দিকবিশিষ্ট বরফির মতো। মোট দিক আছে ২৬টি। কাঠামোটি তৈরী বিশেষ অ্যালু-মিনিয়ম মিশ্র ধাতুতে, তার ওজন ৯০ কেজি, উচ্চতা ১-১৭ মিটার ও তুলনীয় ব্যাস ১-৪৫ মিটার। বিষুব-তল থেকে ৫০-৪ ডিগ্রী হেলানো অবস্থায় উপগ্রহের কক্ষপথ স্থাপিত।

উপগ্রহে সৌর সেল আছে প্রায় ১,৮০০টি, মোট ৩৬৮০০ বর্গ সেন্টিমিটার স্থান জুড়ে। উপগ্রহ যতোক্ষণ পৃথিবীর আড়ালে থাকে (অর্থাৎ ছায়ার দিকে) ততো-ক্ষণ শক্তি সরবরাহ করে নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি (উপগ্রহ যখন সূর্যের দিকে থাকে তখন সৌর সেলের দ্বারা এই ব্যাটারি তড়িতাবিষ্ট হয়)। সৌর সেলে মোট শক্তি উৎপন্ন হতে পারে ৪৬ ওয়াট। উপগ্রহ যখন সূর্যের দিকে থাকে তখন তার উত্তাপ বেড়ে যেতে পারে ১১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত যখন ছায়ার দিকে থাকে তখন তার উত্তাপ কমে যেতে পারে হিমাংকেরও নিচে ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। কিন্তু উপ-গ্রহের ভিতরে উত্তাপ বজায় রাখা হয় শূন্য থেকে ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে (উপযুক্ত পেইন্ট ও বিশেষ রাসায়নিক শোধন ব্যবহার করে)।

উপগ্রহের মধ্যে দুটি প্রধান প্রাযুক্তিক ব্যবস্থার একটি হচ্ছে তথ্য প্রেরণের ও সংকেত-গ্রহণের এবং অপরটি হচ্ছে ঘূর্ণনের। প্রথম ব্যবস্থার সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য উপযুক্ত কোডের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের গ্রাহক স্টেশনে পাঠানো হয়ে থাকে। গ্রাহক স্টেশন আছে দুটি—একটি মস্কোতে অপরটি শ্রীহরি-কোটায়। উপগ্রহের প্রেরক-যন্ত্রের সক্রিয়তা ১৩৬ মেগাসাইকল-এ এবং একটি একমাত্রী অ্যানটেনার মাধ্যমে মহাশূন্যে বিকীরিত শক্তির পরিমাপ ৬০০ মিলিওয়াট। মহাশূন্যে সক্রিয় থাকার উপযোগী একটি টেপ-রেকর্ডার (এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন সরবরাহ করেছে) ৪০ মিনিট ধরে যে-সব তথ্য মজুদ করে তা ভূপৃষ্ঠের গ্রাহক স্টেশনের ওপর দিয়ে যাবার সময়ে মাত্র চার মিনিটের মধ্যে (মজুদ করার সময়ের চেয়ে দশগুণ বেগে সক্রিয় হয়ে) বিবৃত করে। এই টেপ-রেকর্ডার চালু করা হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে সংকেত পাঠিয়ে।

উপগ্রহ ও ভূপৃষ্ঠের গ্রাহক স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা ভারতে তৈরি হয়েছে।

উপগ্রহের সাহায্যে তিনরকমের বৈজ্ঞা-নিক পরীক্ষাকার্য চালানো হচ্ছে: (১) আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে নিঃসৃত এক্স-রশ্মির পরিমাপ নেওয়া, (২) উচ্চতর আবহ-মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করা এবং (৩) সূর্য থেকে উদ্ভূত নিউট্রন ও গামা-রশ্মি জাতীয় বিকী-রণ অনুশীলন করা।

আবার ম্যালেরিয়া

আমাদের দেশে যে-বছর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে সেই বছরই (১৯৭৪) গুটিবসন্তে মারা গিয়েছে দেশের ত্রিশ হাজার মানুষ। আর যে-বছর (১৯৭৫) আমাদের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে সেই বছরই আশংকা দেখা দিয়েছে—ম্যালেরিয়া আবার মহামারীরূপে দেখা দিয়ে আরো অনেক অধিকসংখ্যক মানুষের জীবন নিতে পারে। উল্লেখ করা চলে যে ভারতে একসময়ে এই রোগের কবলে হাজার-হাজার নয় লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে (১৯৫৩ সালে আক্রান্ত হয়েছিল সাড়ে-সাত কোটি, মারা গিয়েছিল আট লক্ষ)। তবে আন্তর্জাতিক সহায়তায় ম্যালেরিয়া-বিরোধী অভিযান চলার ফলে ১৯৬৫ সাল নাগাদ এ-দেশ থেকে ম্যালেরিয়া প্রায় উচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পর-বর্তী কালে ম্যালেরিয়া-বিরোধী সতর্কতা ও তৎপরতার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। অবশ্যই থাকে আরো অধিক মাত্রায়। আমাদের দেশে গত দশ বছরে এই তৎপরতার অভাব ছিল। ফলে যে-যে কারণ ঘটলে ম্যালেরিয়া আবার দেখা দিতে পারে এবং মহামারীর চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার সব-কটিই সংঘটিত হতে পেরেছে।

শ্রীহরিকোটার গ্রাহক স্টেশন

অথচ ব্যাপারটা যে আচমকা ঘটে গিয়েছে তা নয়। বছরে বছরে লক্ষণগুলো ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল। তবে আমাদের দেশে যা হয়ে থাকে 'সব ঠিক আছে' মনোভাব নিয়ে এতদ্বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির বড়ো বড়ো মাথারা মোটামুটি আত্মসন্তুষ্ট থাকতে পেরেছেন বাইরে থেকে সতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিচলিত হননি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তা ডাঃ ভি টি এইচ গুণরত্ন গতবছর সেপ্টেম্বরে তাঁর বাৎসরিক প্রতিবেদনে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এতদঞ্চলের দেশগুলি যদি ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের কর্মসূচী পুনরায় শুরু না করে তাহলে এই রোগটি বিপজ্জনক মহা-মারীরূপে দেখা দেবার সম্ভাবনা। শুধু ভারতে নয়—বাংলাদেশ, বর্মা, থাইল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা ও নেপালেও।

ভারতে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের কর্মসূচী ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা কীটনাশক ওষুধ ও যন্ত্র-পাতির সাহায্যে। ১৯৬৫ সালে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ সম্পূর্ণ হবার পর এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে শুধু প্রয়োজন ছিল সাধা-রণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার আওতায় কিছু খবরদারি ও ব্যবস্থার এবং বিশেষ করে মে থেকে সেপ্টে-ম্বরে পর্যন্ত মাসগুলিতে কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা। এবং এই ধারাবাহিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থের। কিন্তু দুয়েরই অভাব ঘটেছে—যেমন খবরদারি ও ব্যবস্থাপনার তেমনি অর্থেরও।

ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু বছরে বছরে বেড়ে চলার দিকে। ১৯৭৩ সালে ছিল ১৫ লক্ষ ১৯৭৪ সালে ২৫ লক্ষ। অর্থাৎ রোগের বিস্তৃতি অতি প্রচণ্ড। এবং বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের কর্মসূচী এক সময়ে যে-সব এলাকায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সামান্য চোখ রাখার ব্যাপার থাকলেই যেখানে আবার ম্যালেরিয়া দেখা দেবার কোনো সম্ভা-বনা ছিল না—রোগের প্রকোপ ও বিস্তৃতি বিশেষ করে সেইসব এলাকাতেই।

ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের কর্মসূচীর প্রধান তৎপরতা হচ্ছে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা। তার উপায়—কীটনাশক ওষুধ ছড়ানো। কীটনাশক ওষুধ বলতে ডি ডি টি. আগে যা বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছিল এখন আর যায় না। পেট্রোল-দাম বাড়ার পরে আন্তর্জাতিক বাজারে ডি ডি টির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে ও সেই সংগে আমাদের দেশে হয়েছে প্রস্তুত হয় তার দামও। যদিও বিদেশের বহু দেশ ডি ডি টির ব্যবহার এখন বন্ধ (কেননা ডি ডি টি পরিবেশ দূষিত করে)। কিন্তু আমাদের দেশে এই পদার্থটিরও এমন অনটন, তৎসহ সাংগঠনিক উদ্যোগের এমনই অভাব তৎসহ আর্থিক বরাদ্দের এমনই

কার্পণ্য যে সব মিলিয়ে যেন রীতিমতো আয়োজন করেই ম্যালেরিয়া মহামারীর যথেচ্ছ বিচরণের পথটি প্রস্তুত করে দেওয়া হচ্ছে।

এমনকি খাস কলকাতাতেও ম্যালেরিয়া বেশ ব্যাপকভাবেই দেখা দিতে পারে এমন আশংকা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেল তাঁরাও এই আশংকা করছেন। ম্যালেরিয়ার আশংকা দূর করার জন্য অর্থাৎ মশকবংশ ধ্বংস করার জন্য কোনো তৎপরতা তাঁদের আছে কিনা তা তাঁরা জনান নি—কিন্তু জনসাধারণকে অনুরোধ করেছেন, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ঘটলেই তাঁদের যেন জানানো হয়, তাঁরা চিকিৎসার জন্য ওষুধ দেবেন।

এ-অবস্থায় বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে অয়স্কান্তর অনুরোধ, সরকারী তৎপরতার অপেক্ষায় না থেকে নিজেরাই উদ্যোগী হোন। নিজেদের বাসস্থান ও যতোদূর সম্ভব বাসস্থানের চারদিকের এলাকা পরিষ্কার রাখুন, বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন কোথাও যেন জল জমে থাকতে না পারে। আর শোবার সময়ে, যতো গরমই হোক, অবশ্যই মশারি টাঙাবেন। মশা থেকে খুব সাবধান। হালের বিজ্ঞানীরা বলছেন, শুধু ম্যালেরিয়া নয় ফাইলেরিয়া ও আরো কয়েকটি রোগ এই মশা থেকেই হয়ে থাকে।

শেষ খবরে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশহাজার অধিবাসী ইতিমধ্যেই ম্যালেরিয়ার কবলে পড়েছে, এবং ওড়িশার তিনলক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন মশা মারবার জন্য নাকি তেল ছিটানো হচ্ছে।

—অয়স্কান্ত

দুটি প্রদর্শনী

ইন্দ্র দুগারের ছবি

গত ১১ই এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত একাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ইন্দ্রদুগারের সাম্প্রতিক রচনার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুগার মুখ্যত নিসর্গ চিত্রশিল্পী। এবারের প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে প্রাকৃতিক রূপের একটি বক্তব্যকেই দর্শকের সম্মুখে বারংবার তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রদর্শিত ষাটটি ছবির মধ্যে চল্লিশটি ছবির মুখ্য বক্তব্য গঙ্গা, আর কুড়িটি ছবি এক চন্দ্রমল্লিকা ফুলেরই রূপায়ণ।

কেন শিল্পী একই বক্তব্যকে বারংবার চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন? শিল্পী দুগারের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ শহরে যার পশ্চিমপ্রান্ত বেষ্টন করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। শিল্পীর শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের দিনগুলি এই গঙ্গাকে সম্মুখে রেখেই উন্মীলিত হয়েছে। বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার যে রূপ পরিবর্তন ঘটে, প্রত্যুষে, প্রখর রৌদ্রালোকে কখনো প্রদোষান্ধকারে সেই অসীম বৈচিত্র্যই শিল্পীর প্রাথমিক রূপদৃষ্টি গঠনে সহায়তা করেছে। শিল্পীর প্রথম জীবনের গঙ্গার প্রতি এই মোহের ফলশ্রুতি এই গঙ্গা চিত্র-স্তবক। রূপায়ণের দিক থেকে শিল্পী দুগার নিঃসংশয়েই প্রাচীন পন্থী। উন্নাসিক সমালোচকের দৃষ্টিতে নিন্দিত অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য বঙ্গীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যে তিনি বিশ্বাসী এবং সম্ভবত সেই অপসৃত ধারার তিনিই সর্বশেষ সার্থক শিল্পী। তাঁর অধিকাংশ ছবিতে জলরং-এর যে কোমল ব্যবহার, অকম্পিত সূক্ষ্মরেখার বিশুদ্ধ লক্ষ্য করা গিয়েছে যা ঐ ধারার শ্রেষ্ঠশিল্পীদের রচনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শোনা গিয়েছে যে সময়ের উত্তাল হাওয়া তাঁর শিল্পকে কোথাও স্পর্শ করেনি এবং সেই বিগত যুগের শিল্পাকারকলার মন্ত্রগুপ্তি আয়ত্ত করে শিল্পী দুগার আজো বিভোর হয়ে আছেন। নিঃসংশয়েই এটি একটি শিথিল উক্তি। কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পী দুগার যে সংহত ও পরিচ্ছন্ন ভাব জগতের সৃষ্টি করেছেন এবং ছন্দসুষমী রূপ রচনার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা এই রচনাগুলিকে স্থায়িত্ব দিয়েছে।

শিল্পী শান্তনু ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী নীলাক্ষী ভট্টাচার্যের আর্ট ও বাটিক

শান্তিনিকেতনের দুই উদীয়মান শিল্পী শ্রীশান্তনু ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী নীলাক্ষী ভট্টাচার্যের শিল্প প্রদর্শনী হয়ে গেল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। শ্রীশান্তনু ভট্টাচার্য প্রদর্শন করেছেন ষোলটি গ্রাফিক প্রিন্ট। নতুন চিন্তাধারা দেখা গেছে এর অঙ্কনশৈলীতে। ছবি দেখে মনে হয় শিল্পী পরিশ্রমী। ফর্ম ও রং-এর মিল রয়েছে।

শ্রীমতী নীলাক্ষী ভট্টাচার্য প্রদর্শন করেছেন বাটিকের কাজ শাড়ি থেকে আরম্ভ করে স্কার্ফ ছাতা ল্যাম্প-শেড প্রত্যেকটিতে তিনি নিপুণ শিল্পীর ছোঁয়া রেখেছেন। এছাড়া করেছেন কলকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রা[illegible]

—[illegible]

বডিলাইনের অভিশাপ

ক্রিকেট সংকট—এই প্রসঙ্গে আলোচনা-কালে বডিলাইন শব্দটি কতকটা অজান্তেই যেন লেখনীমুখে এসে পড়েছিল। না এসে উপায়ও ছিল না। যেহেতু ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় সংকট বিধ্বংসী ঝড়ের চেহারা ধরে মাঠে ময়দানে হাজির হয়েছিল ওই বডি-লাইনেরই কালে। ওই কালে শৃঙ্খলা-সম্প্রীতি খেলার আনন্দ ইত্যাদি মানবীয় মনোবৃত্তির মূলে সদর্পে কুড়ুলের কোপ বসানো হয়েছিল। বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল অবাধে। উত্তেজনা উঠেছিল তুঙ্গে। তখন ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এমনকি যেদিনে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য ডুবতো না সেদিনেও চিরন্তন বন্ধু ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক খান-খান হয়ে যেতে বসেছিল।

পুরনো দিনের কথা। তবে সেই কাহিনী অনেকেরই স্মৃতিতে শ্রুতিতে ধরা রয়েছে। ইতিহাসের পাতাতেও জ্বলজ্বল করছে। বাম্পারে ব্যাটধারীদের ঘায়েল করার বিষয় উত্থাপিত হলেই বডিলাইন প্রসঙ্গটি আপনা হতেই মনে এসে যায়।

বডিলাইন কি এবং কেন? বলছি। বডিলাইন পেস বোলার অনুসৃত এক ধরণের বোলিং পদ্ধতি। ব্যাটসম্যানদের শরীর লক্ষ্য করে সজোরে খাটো লেংথে বল ছাড়া হোত। সাধারণতঃ লেগ স্টাম্পের ওপর অথবা তার ইঞ্চি কয়েক বাইরে যেখানে ব্যাটসম্যানেরা দাঁড়াতেন। ব্যাটস ম্যান লেগের দিকে সরে যেতে চাইলে তাঁর অপসৃয়মাণ শারীরিক কাঠামো তাক করে বলের গতিপথও লেগের দিকে বাঁকিয়ে সরিয়ে আনা হোত। এক কথায় ব্যাটস-ম্যানকে আহত করাই ছিল বডিলাইন বোলিংয়ের মূল লক্ষ্য।

ফিল্ডিং সাজানো হোত এক অভিনব কায়দায় যাতে বাম্পারের ছোবল থেকে ব্যাটসম্যানের মুক্তি না মেলে। ব্যাটসম্যানের খুব কাছেই স্কোয়ার সর্ট সিলি লেগ অঞ্চলে জন চার-পাঁচ ফিল্ডসম্যান ওঁৎ পেতে থাকতেন। রক্ষণাত্মক কায়দায় ব্যাটসম্যান বাম্পারের মোকাবিলা করতে চাইলে ওঁৎ প্যাতা ফিল্ডসম্যানদের হাতে ক্যাচ তুলতে হোত। আর বাম্পারকে হুক করে দূরে হটিয়ে দিতে চাইলেও ব্যাটসম্যানের পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ দূরে সীমানার ধারে ফাইন স্কোয়ার লেগ অঞ্চল জুড়ে দাঁড় করানো হোত আরও দু-তিনজন ফিল্ডসম্যানকে। হুক সটের প্রয়োগ রীতিতে কণামাত্র ভুল হয়ে গেলে ক্যাচ উঠতো দূরের ওই ফিল্ডসম্যানদের হাতে।

হয় কাছে আর না হয় দূরের ফিল্ডস-ম্যানদের হাতে ক্যাচ তোলার ভয়ে অতর্কিতে লাফ দেওয়া বাম্পারকে এড়িয়ে যাওয়ারও পথ ছিল না। এড়াতে গেলেই বাম্পার ব্যাটসম্যানের পাঁজরে চোখে মুখে ছোবল বসিয়ে দিতো। ব্যাটসম্যানদের পক্ষে সে এক অসহনীয় অবস্থা। বডিলাইনের মুখে পড়ে তাঁদের সামনে দুটি রাস্তাই খোলা ছিল। হয় ক্যাচ তুলে আউট হওয়া। আর না হয় পড়ে পড়ে মার খাওয়া। শিল্প-সম্মত নন্দানন্দ ব্যাটিং রীতি বডিলাইনের যূপকাষ্ঠে পড়ে জবাই হয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল যে ক্রিকেট বুঝি কোনো খেলা নয়। রক্তক্ষয়ী নির্দয় যুদ্ধ!

মরশুম ১৯৩২—৩৩। ডগলাস জার্ডিনের নেতৃত্বে এম সি সি সেবার অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। হ্যারল্ড লারউড বিল ভোস বাওয়েস ও অ্যালেন, এই এক-গণ্ডা পেস বোলারে এম সি সি দল ছিল ঠাসা। তাছাড়া সর্বকালের এক সেরা মিডিয়াম পেস বোলার মরিস টেটও ছিলেন দলে। মরিস টেটকে অবশ্য টেস্ট ম্যাচে কাজে লাগানো হয়নি। গাবি অ্যালেনও বডিলাইন মারণযজ্ঞেও অংশ নিতে চাননি। বডি-লাইনকে হাতিয়ার করে ব্যাটসম্যানদের ঘায়েল করার চক্রান্তে বড় ভূমিকা নিয়ে-ছিলেন দলপতি ডগলাস জার্ডিন ও হ্যারল্ড লারউড এবং কিছুটা পরিমাণে বিল ভোস ও বাওয়েস।

এই চক্রান্তের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল জার্ডিনের উর্বর মস্তিষ্কে। পরিকল্পনা তাঁরই। এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করায় সহায়তা করেছিলেন লারউড ভোস প্রমুখেরা। ত্রিশের দশকে লারউডের বলের গতি ঘন্টায় নব্বই মাইল বেগে ছুটতো। কাজেই হাতিয়ার হিসেবে তাঁকে না পেলে হয়তো জার্ডিন উদ্ভাবিত পন্থা সফলও হোত না।

১৯৩২—৩৩ মরশুমে টেস্ট পর্যায়ে ডগলাস জার্ডিন বডিলাইনকেই ইংলন্ডের পরিত্রাণের একমাত্র পথ বলে ধরে নিয়ে-ছিলেন মূলতঃ ডন ব্র্যাডম্যানের কথা ভেবেই। আগেরবার ১৯৩০ সালে ইংলন্ড সফরের সুযোগে ব্র্যাডম্যান টেস্ট ম্যাচে রাণ করে-ছিলেন ১৩১ ২৫৪ ১ ৩৩৪ ও ১৪ ২৩২। মোট ৯৭৪ গড়ে ইনিংস পিছু ১৩৯-১৪। রাণ তোলার মেসিন ব্র্যাডম্যানকে অকেজো করে তুলতেই জার্ডিন বডিলাইন পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরেন।

লারউডের সহযোগিতায় জার্ডিনের পরিকল্পনা এক হিসেবে সফলও হয়েছিল। ব্র্যাডম্যান সেবার চারটি টেস্ট মিলিয়ে ৩৯৬-এর (গড়ে ৫৬-৫৭ একটি সেঞ্চুরী) বেশি রাণ করতে পারেননি। যন্ত্রমানবকে তাঁর খেলোয়াড় জীবনে ওই একবারই মাত্র সাধারণ ব্যাটসম্যান বলে মনে হয়েছিল।

জার্ডিন সেবার ইংলন্ডকে পাঁচটির মধ্যে চারটি টেস্ট জেতাতেও পেরেছিলেন। কিন্তু জোরে ধরে বিপক্ষকে বাগে আনার চেষ্টায় ক্রিকেটী সদাচারকে তিনি টুঁটি টিপে নিধন করেছিলেন।

দু পক্ষে আয়োজিত তৃতীয় টেস্টে প্রথমে অস্ট্রেলীয় দলপতি বিল উডফুল পরে উইকেটরক্ষক বার্ট ওল্ডফিল্ড আচমকা বাম্পারে মারাত্মক চোট পেতেই এডিলেড মাঠে দর্শকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম ঘটে। অনেক কষ্টে তাদের রেলিংয়ের ওপারে আটকে রাখতে হয়। কিন্তু তাদের মুখে চাবিকাঠি দেবে কে? গলা বাজিয়ে তারা একযোগে জার্ডিন ও লারউডকে গাল পাড়তে থাকে। মাঠের বাইরে উত্তেজনা পড়ে ছড়িয়ে। অস্ট্রেলিয়ান পত্র-পত্রিকায় লারউড চিহ্নিত হয়ে যান দ হ্যাংগম্যান জহ্লাদ বিশেষণে।

বডিলাইন শব্দটিও অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকদের দেওয়া। ইংলন্ডের সাংবাদিক-সমালোচকেরা অবশ্য এই বোলিং পদ্ধতিকে লেগ থিওরি বলে হালকা করে দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ানরা মোটে অল্পে খুসী হননি। তাঁদের দলপতি বিল উডফুল ইংলন্ডের ম্যানেজার স্যার পেলহাম ওয়ার্ণারের মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের শারীরিক বিপর্যয় দেখে আপনার সমবেদনা জানাবার প্রয়োজন নেই—মাঠে দুটি দল নেমেছে। তাদের মধ্যে একদলই ক্রিকেট খেলছে অন্য দল খেলছে না!

বডিলাইনকে হাতিয়ার করে ক্রিকেটের মূল্যাদর্শের সঙ্গে আড়ি পাতিয়েছে যারা তারা অ-খেলোয়াড় এই অভিযোগ তুলে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ড এম সি সির কাছে তারবার্তা পাঠায়। উত্তরে অ-খেলোয়াড় অভিযোগের প্রতিবাদে এম সি সি মাঝপথেই সফরকারী দলকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার হুমকী তোলে। ব্যাপারটা দু দেশের ক্রিকেট

নিয়ামক সংস্থার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে কোনোরকমে সেবারের সফর শেষ করা হয়। এবং অস্ট্রেলিয়ার উপকূল পরিত্যাগ করার সময় লারউডও প্রকাশ্যে বলেন যে আর যেন কোনোদিন তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় না আসতে হয়। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের এই চিহ্নিত দুশমন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার হ্যারল্ড লারউড তাঁর জীবনের শেষাংকে অস্ট্রেলিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করে সেই দেশেই এখন সন্তান-সন্ততি পরিজন পরিবৃত হয়ে সুখে কালাতিপাত করছেন।

কিন্তু সে অন্য কাহিনী। মূল কাহিনী বডিলাইনেরই কথা হোক।

জার্ডিনের দলের সফর তো শেষ হলো। কিন্তু ক্রিকেটের ক্ষত সহজে শুকালো না। বডিলাইন সাজানো কাহিনী। আসলে জার্ডিন-লারউডের লেগ থিয়োরির মুখে পড়ে অস্ট্রেলীয়রা হালে পানিনি—এই বলে ইংলন্ডের যে ক্রিকেট মহল এতোদিন ব্যাপারটাকে আমল দিতে চাননি স্বদেশের মাঠে বডিলাইনের আস্ফালন দেখে অচিরেই তাঁরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

পরের মরশুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মার্টিনডেল ও লিয়ারি কনস্টানটাইন ইংলন্ডে এসে জার্ডিন প্রদর্শিত বোলিং পদ্ধতি বডিলাইন অনুসরণ করায় ইংলন্ডের বিখ্যাত ব্যাটসম্যান ওয়ালি হ্যামন্ডের থুতনি দু ফাঁক হয়ে যায়। কাউন্টি চ্যাম্পিয়ন-শিপে লারউডের বাম্পারের ঘায়ে নাজেহাল হন ল্যাংকাশায়ারের নামী নামী ব্যাটস-ম্যানেরা। ফলে ল্যাংকাশায়ার খেলার মাঠ ও তার বাইরে লারউডের ক্লাব নটিংহামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় ক্রিকেটার জ্যাক হবস প্রকাশ্যে বলেন বডিলাইন বোলিংকে আমি ঘৃণা করি। ক্রিকেটের যা কিছু সুন্দর বডি-লাইনের চক্রান্তে তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সফরকারী জার্ডিনের দলের অন্যতম বিশিষ্ট খেলোয়াড় ওয়ালি হ্যামন্ড এবং ম্যানেজার পেলহাম ওয়ার্ণার লেখেন বডিলাইন বোলিং এক বিপজ্জনক ক্রীড়া-রীতি। বডিলাইনের ঘায়ে ক্রিকেট মাঠে এখনও যে জীবনহানি ঘটেনি এটাই পরম আশ্চর্য! খুনের দায় থেকে ক্রিকেট বাঁচাতে বডিলাইন নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া উচিত।

প্রাজ্ঞজনের এই সব সুচিন্তিত অভি-মতের টানে এম সি সির টনক নড়ে এবং তথ্যানুসন্ধানে তদন্ত কমিটি বসানো হয়। বছর দুয়েক ধরে তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনার পর এম সি সি রায় দেয় যে ব্যাটসম্যানের শরীর লক্ষ্য করে নিরবচ্ছিন্ন বাম্পার ঠোকা বে-আইনী। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে ক্রিকেটের নিয়ম সংশোধন করে নিরবচ্ছিন্ন বাম্পার ছাড়ার পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়। লেগের দিকে সর্বাধিক কতোজন ফিল্ডসম্যান দাঁড়াতে পারবে নিয়মে তার নির্দেশ জানানোর পালা সুরু হয় সেই আমলেই।

মূল পরিকল্পনা জার্ডিনেরই। অথচ সব দোষের ভাগী যেন হ্যারল্ড লারউডই এই কথা বোঝাতে চেয়ে এম সি সি কর্তৃপক্ষ পরে লারউডকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো পরিত্যাগ করেছেন। ১৯৩২-৩৩-এর পর লারউডকে আর ইংলন্ড পক্ষে দলভুক্ত করা হয়নি। মাত্র আটাশ বছর বয়সেই লারউডের টেস্ট খেলার কপাল গুঁড়িয়ে যায়। অথচ ওই ১৯৩২-৩৩ মরশুমের টেস্ট পর্যায়ে তিনি তেত্রিশটি (গড়ে ১৯ রাণ) উইকেট পেয়েছিলেন। তবে লারউডকে ছাঁটাইয়ের যূপকাষ্ঠে ঝোলানো হলেও ডগলাস জার্ডিনের হাতে কিন্তু ইংলন্ড দলের পরি-চালনার ভার সমাদরে তুলে দেওয়া হয়ে-ছিল। কে জানে কয়েক যুগ পরে দেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নতুন করে বাসা বাঁধার সময় এম সি সি কর্তৃপক্ষের অবিচার দুর্বিচার স্মরণে লারউডের মনের পুরোনো ব্যথা টনটনিয়ে উঠেছিল কিনা।

বডিলাইনের আমলে লারউড, ভোস, বাওয়েসের বাম্পারের ধাক্কায় শুধু ওল্ডফিল্ড উডফুলই চোট পান নি, আরও অনেক অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কাল-শিরার ছোপ পড়ে গিয়েছিল। বাম্পারের ছোবলের জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় অনেকেই নিরাপত্তামূলক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিলেন। সার্ট ট্রাউজারের তলায় সারা শরীরটাকে আদ্যোপান্ত পুরু গদীর প্যাডে মুড়ে রাখতে চেয়েছিলেন বেশকজন। কিন্তু তাতেও কি রেহাই পাবার জো ছিল। মাথা মুখমণ্ডল ঢাকতে পারা যায় নি। অথচ শরীরের অনাবৃত এইসব অংশের আঘাতেই মারাত্মক চেহারা ধরার আশঙ্কা ছিল সবচেয়ে বেশি।

সে আশংকা আজও যায় নি। তাই নিউজিল্যাণ্ডের চ্যাটফিল্ডের চোটের বহর দেখে আজ আবার খেলোয়াড়দের জান বাঁচাবার তাগিদে প্যাড দস্তানা, গাডের ওপর শিরস্ত্রাণ ব্যবহারের সুপারিশ জানানো হচ্ছে। শুনতে পাই যে ইংলন্ডের এক ব্যবসায়ী সংস্থা ইতিমধ্যে ক্রিকেটে ব্যবহার্য শিরস্ত্রাণ তৈরী করে তাদের প্রস্তুত সরঞ্জাম সম্পর্কে খেলোয়াড়দের অভিমত সংগ্রহ করে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে খেলোয়াড়দের সুচিন্তিত অভিমত, শিরস্ত্রাণগুলি দেখতে যেন কেমন কেমন, তবে এগুলির উপযোগিতা আছে। তাঁরা আরও বলেছেন, অধুনা নীচের দিকের ব্যাটধারীদের লক্ষ্য করে যেরকম এলোপাতাড়ি বাম্পার ছাড়া হচ্ছে তা লক্ষ্য করে বলা যায় যে ভবিষ্যতে ব্যাটসম্যানদের মাথা বাঁচাতে এই জাতীয় শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করাই শ্রেয়।

আর সারা অঙ্গে পুরু গদীওয়ালা বর্ম এবং মাথায় লম্বা চওড়া শিরস্ত্রাণ জড়িয়ে মাঠে নামতে হলে খেলোয়াড়রা কি অস্বস্তি বোধ করবেন না? তাঁদের স্বাভাবিক সহজ আচরণ জড়তাভারে কি অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে না? দৃশ্যটি দেখতেই বা কেমন লাগবে? প্যান্টপরা নির্বোধের দল, পরি-ভাষায় 'ফ্ল্যানেলড ফুলস' বলে ক্রিকেটারদের চিহ্নিত করা হলেও সহজ, সুন্দর আচরণ ও ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশেই এই 'নির্বোধের দল' মাঠে মাঠে যে দৃশ্যকাব্য রচনা করেন তা যেমন নয়নসুখকর তেমনি তৃপ্তিদায়ক। সুন্দর, স্বাভাবিক, প্রাণবান চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিকে যদি কিম্ভূতকিমাকার সাজপোশাকের আড়ালে ঢেকে ফেলা হয়, তাহলে মঞ্চমাঠের নায়কেরাই শুধু নয় আসল খেলাটির সৌন্দর্য ও আকর্ষণ অনেকটা হারিয়ে যাবে। ভাবি, যে ঐশ্বর্য রয়েছে হাতেই তার উৎকর্ষ বাড়াবার চেষ্টা না করে সে সম্পদ হারিয়ে ফেলতেই বা আজ কোমর বাঁধা হচ্ছে কেন? হায়, ওঁরা যে কি হারাতে চলেছেন, তার ঠাওর যদি পেতেন!

এই প্রসঙ্গে পুরানো দিনের একটি ছবির আভাস মনের মুকুরে ভেসে উঠছে। অনেকদিন। আগেকার সেই ছবি। মাঠে ময়দানে সেদিন ফাস্ট বোলারদের সবিক্রম আস্ফালনে যত্রতত্র বাম্পার ঠোকা হচ্ছে আর কমজোরী ব্যাটধারীরা নিয়মিত চোট খাচ্ছেন। এমন সময় একদিন ইংলন্ডের সুখ্যাত ব্যাটসম্যান প্যাটসি হেনড্রেন সারা অঙ্গে প্যাডের বর্ম এঁটে মাথায়-কানে এক অভিনব শিরস্ত্রাণ জড়িয়ে ব্যাট হাতে নেমে পড়লেন। সাজপোশাকে হেনড্রেনকে চেনবার উপায় ছিল না। দর্শকেরা সেই অপরূপ রূপসজ্জা দেখে হেসেই আকুল। খেলোয়াড় মহলেও হাসির হিল্লোল। হাসির তুফানের ধাক্কায় আসল খেলাটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবার উপক্রম। ক্রিকেটের আসর ভাঁড়ামির নাটমঞ্চে পরিণত হতে চাইলো।

জাত ক্রিকেটার প্যাটসি হেনড্রেন এমনিই এক আমুদে চরিত্র ছিলেন। হালকা হাসির আড়ালে সেদিন বাম্পারের খুনোখুনিকে ব্যঙ্গের কশাঘাত করতে চেয়েছিলেন। যাঁরা বোঝবার তাঁরা হেনড্রেনের ভূমিকার ঠিকানা জেনেছিলেন ঠিকই। প্রতিবাদের ঝড় তুলে তাঁরা সেদিন বলেছিলেন যে বাম্পারের দাপাদাপিতে যদি ব্যাটধারীরা মাঝমাঠে সাজপোশাকে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানায় প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন তাহলে ক্রিকেটের সৌন্দর্য শালীনতা ও শ্রী বলতে অবশিষ্ট থাকবেই বা কি!

পুরোনো সেই অভিমতের পুনরাবৃত্তি করে আজ তাই বলি যে বর্ম, শিরস্ত্রাণ এঁটে ব্যাটধারীদের যদি আজ মাঠে নামতে হয় তাহলে ক্রিকেটের ক্রিকেটত্ব কি নষ্ট হয়ে যাবে না? অতএব প্রস্তাব, বদমেজাজী, বেয়াড়া ফাস্ট বোলারদের আস্ফালন বন্ধ করতে তাঁদের বলা হোক নীচের দিকের ব্যাটধারীদের লক্ষ্য করে বাম্পার ঠোকা চলবে না। তারপরও সোজা আঙুলে ঘি যদি না ওঠে তাহলে আইনের বয়ান বাঁকিয়ে মতলব সিদ্ধ করা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় থাকবে না।

অজয় বসু

দর্শক

ডেভিস কাপে দঃ আফ্রিকা

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিতাড়নের জোর তোড়জোড় চলছে। এবার কোমর বেঁধে আসরে নামছে লাটিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ। আগামী জুলাই মাসে বার্সিলোনায় ডেভিস কাপ কার্যকরী কমিটির বৈঠক বসবে। এই বৈঠকে লাটিন আমেরিকার দেশগুলি একসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা থেকে তাড়াবার প্রস্তাব তুলবে। দক্ষিণ আফ্রিকার অংশ গ্রহণে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদান নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আসর দিন দিন গরম হয়ে উঠছে। মনে হয় ঝুট-ঝামেলা নিরসনের উদ্দেশ্যে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে আগামী ৩রা জুলাই বার্সিলোনার সভায় একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এদিকে কলম্বিয়া তাদের আগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বর্তমানে স্থির করেছে তারা উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলবে না। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে মেক্সিকো আঞ্চলিক সেমিফাইনালে খেলতে রাজী হয়নি। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়াক-ওভার পেয়ে আঞ্চলিক ফাইনালে উঠে যায়। কারণ হিসাবে কলম্বিয়া টেনিস সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে। রাষ্ট্রসংঘের ঐ সিদ্ধান্তে খেলাধূলার আসরে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি অনুসরণের জন্যে রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলো সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য ১৯৭৪ সালের ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠেছিল ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য নীতির প্রতিবাদে ভারত এই ফাইনালে অংশ গ্রহণ করে নি। ফলে ডেভিস কাপ কমিটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৯৭৪ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী ঘোষণ করেছিল। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে ডেভিস কাপ তুলে দেওয়ার ব্যাপারে ভারত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘ অলিম্পিক গেমস এবং পৃথিবীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা যেভাবে গলা-ধাক্কা খেয়ে চলেছে তা দেখে ডেভিস কাপ কমিটির চোখ আজও ফুটলো না।

কোন্নরসের জয় জয়কার

গত বছরের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান জিমি কোন্নরস ৬-৩, ৪-৬ ৬-২ ও ৬-৪ গেমে নিউকম্বকে হারিয়ে ৫ লক্ষ ডলার পুরস্কার লাভ করেছেন। নিউকম্ব পেয়েছেন ৩ লক্ষ ডলার। কোন্নরসের বয়স ২২ এবং নিউকম্বের ৩০ বছর। এর আগে কোন্নরস তিনবার নিউকম্বের সঙ্গে খেলে প্রতিবারই হেরে ছিলেন।

মারা হালিম কাপ

জাকার্তার মেডানে আয়োজিত মারা হালিম ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ২-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে। মেডান ৩—১ গোলে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পায়।

প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বের লীগ খেলায় মাত্র এই দুটি দেশ অপরাজিত ছিল —এ গ্রুপে ভারত এবং সি গ্রুপে দক্ষিণ কোরিয়া। ভারত তার এ গ্রুপের চারটি খেলায় জয়ী হয়ে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্বে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। দ্বিতীয় পর্বের খেলায় ভারত ০-৩ গোলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং ০—১ গোলে থাইল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠতে পারেনি। সেমি-ফাইনালে উঠেছিল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া মেডান এবং থাইল্যান্ড।

গোল্ড কাপ হকি

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওয়েস্টার্ন রেল ৪—২ গোলে মহীন্দ্র এ্যান্ড মহীন্দ্রকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ের খেলায় কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি। অতিরিক্ত সময়ে খেলার ফলাফল ছিল ১—১। শেষ পর্যন্ত টাই-ব্রেকার পদ্ধতিতে খেলার মীমাংসা হয়। এখানে উল্লেখ্য একই বছরের এই প্রতিযোগিতায় উভয় দলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা।

আন্তঃ স্কুল বাস্কেট বল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আন্তঃ স্কুল বাস্কেটবল লীগ প্রতিযোগিতায় বর্ধমান টাউন স্কুল অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মোট ৮টি খেলায় তারা ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। রানার্স আপ হয়েছে কালীঘাট ওরিয়েন্টাল একাডেমী—৮টি খেলায় ১৪ পয়েন্ট।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভলিবল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতায় হাওড়া ইউনিয়ন লীগ ও নক আউট চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে পুরুষ বিভাগের দ্বি-মুকুট খেতাব লাভ করেছে। লীগের খেলায় হাওড়া ইউনিয়ন অপরাজিত ছিল —১৩টা খেলায় ২৬ পয়েন্ট। হাওড়া ইউনিয়নের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ছাত্র সমিতি। লীগের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় হাওড়া ইউনিয়ন ১৬—১৪, ১৯—১৭ ৪—১৫ ও ১৫—১২ পয়েন্টে ছাত্র সমিতিকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য, লীগের খেলায় ছাত্র সমিতির এই প্রথম পরাজয় এর আগে তারা লীগের বারটি খেলায় জিতেছিল।

মহিলা বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে নৈহাটী এ সি।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

ভূপালে ১লা মে থেকে চল্লিশতম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এর আগে ভূপালের মাটিতে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর দুবার বসেছিল—১৯৫০ ও ১৯৬২ সালে। এবারের আসর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগামী বছর মন্ট্রিলে অলিম্পিক গেমসের আসর বসবে। এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতাটি তারই প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। তবে এবারের প্রতিযোগিতায় কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় খেলছেন না।

লরেন্স ট্রফি

বিশ্ববিখ্যাত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার গারফিল্ড সোবার্সকে লরেন্স ট্রফি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। গত বছর ইংলিশ ক্রিকেট মরশুমে তিনি দ্রুতগতিতে শত রান সংগ্রহ করার সূত্রে এই লরেন্স ট্রফি পেলেন। গত বছর তিনি নটিংহামশায়ার দলের খেলোয়াড় হিসাবে ডার্বিশায়ার দলের বিপক্ষে ৮৩ মিনিটে শতরান পূর্ণ করেছিলেন।

ইংলিশ এফ এ কাপ

১৯৭৫ সালের ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওয়েস্ট হাম ২—০ গোলে দ্বিতীয় বিভাগের ফুলহাম ফুটবল দলকে পরাজিত করে এফ এ কাপ জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় বিজয়ী দলের এলান টেলার পাঁচ মিনিটে দুটি গোল দিয়েছিলেন।

মমতাজ হোসেন

'মমু'কে মাঠের সবাই ভালবাসেন। কারণ তাঁরা সবাই ও'র নির্ভেজাল গুণগ্রাহী পরিভাষায় বলা যেতে পারে 'অ্যাডমায়ারার'। তাই 'অদব করে 'মমু' বলেই ডাকেন। না, আঁতকে ওঠার মত কিছু হয় নি মমুকে ভালবাসায়। মরুরে মাধবানীরও গোসা করার কিছু নেই কেননা এই ভাল লাগার জন, রজত পটের দেবানন্দ-রাজেশ খান্না সঙ্গিনী চিত্র নায়িকা মমতাজ বা মমু নন, নেহাৎই মাঠো নায়ক মমতাজ, জলজ্যান্ত পুরুষ মানুষ মমতাজ হোসেন। কলকাতার হকি মাঠে মমতাজ হোসেনকে চেনেন না, মমতাজ হোসেনকে জানেন না এমন লোক আছেন বলে আমার জানা নেই। অমন আত্মপ্রত্যয়ে টইটম্বুর, হকিতে আত্মনিবেদনকারী, এমন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হালের অসুস্থ, দূষিত গড়ের মাঠে বিরল।

মোহনবাগানের ব্যাক মমতাজ হোসেন। শান্ত, নম্র, লাজুক। এক কথায় মাটির মানুষ বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। নিখুঁত পজিসন আর কভারিং জ্ঞান। হাফলাইন এবং ফরওয়ার্ড লাইনের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতে যত্নশীল। পেনাল্টি কর্ণার হিট নিতে সিদ্ধহস্ত। সব চেয়ে বড়ো গুণ মমতাজ হোসেনের—নম্রতা, ভদ্রতা। হকিকে তিনি ডান্ডাবাজি মনে করেন না, মনে করেন আর্ট, একটি প্রযুক্তি কলা বলে। বলকে স্টিকের মায়াডোরে বেঁধে রাখা, মগজের সূক্ষ্ম প্রয়োগ কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হার মানানোই হচ্ছে খেলা, সেই খেলাই হচ্ছে আর্ট। স্রেফ লম্ফ ঝম্ফ, লাগাম ছাড়া চড়া মেজাজের ফলশ্রুতিতে বেপরোয়া লাঠিবাজি মমতাজের মতে হকিই নয়। পারদর্শিতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা। ওখানে ঘাটতি থাকলেই মেজাজ গরম হয়, লাঠালাঠি চলে, মাঠ হয় তপ্ত মরুভূমি। গ্যালারী ফুঁসে ওঠে, আগুণ জ্বলে।

মোহনবাগান মাঠের এক কোণে বসে মমতাজ হোসেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সরল, সাদাসিধে মমতাজের বেশভূষার বিলাসিতার লেশমাত্র নেই। বিলাসিতা শুধু তাম্বুলে। মুখে একগাল পান, লক্ষ্ণৌ জর্দার খুসবু ছড়িয়ে দিচ্ছিল সারা মাঠে। ও'র নিজের কথা জিজ্ঞেস করতেই চুপ মেরে গেল। একেবারে লক্ষ্ণৌই বিনয়ে বললেন : আমি এক অতি সাধারণ, অতি নগণ্য খেলোয়াড়। নিজের সম্পর্কে বলার কতটুকুই বা আছে ! ভাগ্যবসে এমন ঘরে জন্মেছিলাম সেখানে হকির চর্চা ছিল। পারিবারিক সূত্রেই হকির আকর্ষণে বাঁধা পড়েছিলাম একদিন শৈশবে, আজও বাঁধা পড়ে আছি, হয়তো সারা জীবনটাই বাঁধা থাকবো।

মমতাজের জন্ম ১৯৬৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের সীতাপুরে। মা ১৯৬২ সালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, বাবা মুখতার হোসেন সাহেব এখনও বেঁচে আছেন। মুখতার সাহেব শিক্ষাব্রতী। সীতাপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন দীর্ঘদিন। শিক্ষাব্রতী পিতার কাছ থেকে যে দুটি বিষয়ে মমতাজ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তার প্রথমটি হচ্ছে লেখা পড়া। কিন্তু মমতাজের মগজে বইপত্রের খুব বেশী সাড়া জাগায় নি। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ খেলাধুলা অবশ্য লেখাপড়ার ঘাটতি কিছুটা পুষিয়ে দিয়েছে। তাই ১৯৬৩ সালে সীতাপুর

স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর বইপত্তর শিকেয় উঠলো। হাতে নিলেন হকি স্টিক। ফুটবলও চালিয়ে গেলেন। সেখানেও খেলতেন লেফট ব্যাকে। উত্তরপ্রদেশে অন্ততঃ জেলা ফুটবলেও মমতাজ বেশ কয়েক বছর সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। আখলাখ, মমতাজ এবং অন্য চারভাই সকলেই খেলোয়াড়, কেউ হকি, কেউ বা ফুটবল।

মমতাজের হকির সুরু সহোদর আখলাখ হোসেন। জাতীয় হকির আসরে আখলাখ দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ছোটবেলায় মমতাজ ভাইজান আখলাখের সঙ্গে খেলা দেখতে যেতেন, খেলাতে যেতেন। বল টল কুড়িয়ে দিতেন। তারপর কোথা দিয়ে গোটা কয়েক বছর যে কেটে গেল মমতাজ তা নিজেই জানেন না। ঘরোয়া হকির গন্ডী পেরিয়ে ১৯৬৭ সালে মাদুরাইয়ে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার উত্তর প্রদেশ দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। পরের বছরও দলভুক্ত হলেন; সঙ্গে দাদা আখলাখও ছিলেন। ১৯৬৯ সালে এলেন বাংলা মুলুকে। গড়ের মাঠে প্রথম দুটো বছর কাটলো সুনামের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। ১৯৭১ সালে স্টেটসম্যানের (?) কাপে নির্বাচিত হলেন মমতাজ সেরা খেলোয়াড়। ১৯৭৩ সালে লীগের আসরেও অনুরূপ স্বীকৃতি মিললো। ঐ স্বীকৃতির মূল্যেই ১৯৭৪ সালে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলার অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন সর্ব সম্মতি-ক্রমে। অবশ্য ঐ আসরে বাংলা মূলপর্বে উঠতেই পারেনি। ১৯৭৪ সালেই নয়াদিল্লীতে নেহরু হকিতে খেললেন মোহনবাগানের হয়ে। প্রাথমিক পর্বে নর্দার্ণ রেলের কাছে ০—২ গোলে হার হোল মোহনবাগানের। হরিয়ানা একাদশের বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে জিতলেও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে ৩—১ গোলে পরাজয় ঘটলো, 'ড্র' হোল খেলা সিগন্যালসের সঙ্গে ১—১ গোলে এবং এর ফলে আসর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হোল মোহনবাগানের। নসীব খারাপ বলে কপালে হাত ঠেকালেন ব্যাচেলর মমতাজ হোসেন। মমতাজের বিশ্বাস নসীবই সব, বিশেষতঃ কলকাতার মাঠে। নসীব ভাল থাকলে অখ্যাত খেলোয়াড়ও অকস্মাৎ সংবাদের শিরোনামা হয়ে যান, আর নসীব খারাপ হলে হীরোরাও যান জিরো হয়ে।

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিক্টর বার্না
অদ্বিতীয় নায়ক

'ম্যান সে ডাই বাট দেয়ার অ্যাচিভ-মেন্টস স্টে বিহাইন্ড'। এই শ্বাশত প্রবাদবাক্যটি নতুন করে না বললেও চলত। কিন্তু কোন কোন ঘটনার অবতারণার মুহূর্তে মূল্যবান হীরে-জহরতের মত মনের মণিকোঠায় তোলা প্রবাদবাক্যগুলো অস্ফুটে উচ্চারিত হয় নিজেরই অজান্তে। টেবল টেনিসের কথা উঠলেই নদীর স্রোতের মত মনে আসে ভিকটর বার্নরের নাম। টেবল টেনিস; ভিকটর বার্না শব্দগুলো যেন মুদ্রার দু পিঠের মত একাত্ম। বার্না টেবল টেনিসের জগতে অদ্বিতীয় নায়ক। এক অনন্য চরিত্র। বার্না ব্যতীত পিং পং আলোচনা শিবহীন যজ্ঞের মত। আবার বার্না প্রসঙ্গ উঠলেই স্বাভাবিক কারণে টেবল টেনিস এসে পড়ে। কারণ টেবিল টেনিসই বার্নার জগৎ। জীবন। তার সব চিন্তা ধ্যান-ধারণা টেবল টেনিসকে ঘিরেই আবর্তিত।

বার্নার ছেলেবেলা কেটেছে হাঙ্গেরীতে। টেবল টেনিসের অনুকূল পরিবেশ। জীবন প্রভাতের আসক্তি উত্তরপর্বে সাধনায় রূপান্তরিত হয়েছে। ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত পিংপংকে আঁকড়ে ধরেছিলেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। পরবর্তী কালের অসামান্য সাফল্য এই সাধনারই ফলশ্রুতি।

বার্না ছিলেন ব্যাকহ্যান্ডে সিদ্ধহস্ত। নিপুণ শিল্পীর মত এক একটি মারের আঘাতে প্রতিপক্ষকে ভেলকীবাজীর মত বোকা বানিয়ে ছাড়তেন। ফোরহ্যান্ডে তেমন দক্ষ ছিলেন না বটে। কিন্তু কেবল জোরদার ব্যাকহ্যান্ডের জোরের যে শক্তিশালী যে কোন কোন খেলোয়াড়কে ধরাশায়ী করে বিশ্ব খেতাব জয় করা যায় বার্না তার জ্বলন্ত নিদর্শন। এই ব্যাকহ্যান্ডকে মূলধন করে বার্নার তার সমকালীন সবাইকেই ঘায়েল করেছেন সহজে। যদিও আজকে ব্যাকহ্যান্ড, ফোরহ্যান্ড—কোনটি অধিক ফলপ্রসূ তা নিয়ে দ্বিমত আছে। অনেক মতবাদ আছে।

গ্রিপ নিয়ে বিতর্ক দিনে দিনে রূপ বদলাচ্ছে। মত ঘুরেছে। বিশেষত চীনের পেন হোল্ডার গ্রিপ আবিষ্কারের পর। ফলে এখন অনেক দেশই সনাতন শেকহ্যান্ড গ্রিপের ব্যবহারকে বিদায় জানিয়েছে চীনা পিং পং-এর অভাবনীয় সাফল্য লক্ষ্য করে। বার্নার কিন্তু বরাবরই শেকহ্যান্ড গ্রিপ ব্যবহার করতেন। ব্যাটের ক্ষেত্রেও তিনি ফুটি দেওয়া রাবারের অতিসাধারণ ব্যাট ব্যবহার করতেন। তাঁর আমলে ক্রেপ বা স্যান্ডউইচ ব্যাটের বহুল প্রচলন থাকলেও তিনি সে পথে পা বাড়ান নি। বার্নার অনুসৃত রীতি-নীতি ও পথকে ঘিরে আজকে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেক দেশই চীন জাপানের সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে 'শেকহ্যান্ড গ্রিপ' ও ক্রেপ বা স্যান্ডউইচ ব্যাট ব্যবহার করছেন। বিতর্কের ঝড় যতই তীব্র হোক না কেন এবং যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা হোক না কেন বার্নার অপরাজেয় উজ্জ্বল কীর্তি আজও নীরব উত্তর হয়ে নিঃশব্দে বিরাজ করছে। যদিও আজকের যুগে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত করে বলা কঠিন ভবিষ্যতের কোন কায়দাকানুন, রীতিনীতি পিং পং টেবিলে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার জন্ম হয় ১৯২৬ সালে লন্ডনে। এই প্রতিযোগি-তায় যোগদান করে নয়টি দেশ। হাঙ্গেরী

এই আসরে প্রতিনিধি পাঠালেও বার্ণা অনুপস্থিত ছিলেন। ১৯৩০ সাল থেকে বার্ণার যুগের সূচনা। পুরুষদের সিঙ্গলসে বার্ণা পাঁচ বার (১৯৩০, ১৯৩২—৩৫) চ্যাম্পিয়ান হয়ে ব্যক্তিগত বিভাগে সর্বাধিক জয়ের রেকর্ড গড়েন। পুরুষদের ডাবলসে আটবার চ্যাম্পিয়ান আর এক নজীর। তারমধ্যে উপর্যুপরি সাতবার এখনও অম্লান রেকর্ড (১৯২৯—১৯৩৫ এবং ১৯৩৯)। বার্ণা তিন জনের জুটিতে এই রেকর্ড করেন।

মিকসড ডাবলসে দুবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন বার্ণার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাককালে ভিকটর বার্ণার হাঙ্গেরী ছেড়ে ইংল্যান্ডে আস্থানা গাড়লেও সব কটি নজীর রচনা করেছেন হাঙ্গেরী থাকাকালীন। কেবল তারই আমলে হাঙ্গেরী ছয়বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়ে সোয়েথলিং কাপ লাভ করে। সর্বাধিক মোট ব্যক্তিগত খেতাব জয়ের ক্ষেত্রে হাঙ্গেরীর সুনাম বিশ্ব টেবল টেনিসের অঙ্গনে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত। মেয়েদের বিভাগে এম রেজ্ভেনিয়ানসজকি ১৮ বার ও পুরুষদের বিভাগে বার্ণার পনের বার বিজয়ী। উপর্যুপরি সর্বাধিক ব্যক্তিগত খেতাব জয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের সিঙ্গলসে রুমানিয়ার এঞ্জেলিকা-রোজিনু ছয়বার (১৯৫০—৫৫) ও পুরুষদের ক্ষেত্রে বার্ণার চারবার (১৯৩২—৩৫) চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। আর (১৯২৭—৩১) পাঁচবার হাঙ্গেরীর দলগত খেতাব লাভ এখনও অম্লান রেকর্ড হয়ে আছে।

টেবল টেনিসের একচ্ছত্র নায়ক বার্ণার বাইরের জীবন সাংগঠনিক কর্মে ব্যস্ত ছিল। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতাকে সুসংগঠিত করার কাজে তাঁর অবদান নেহাৎ কম নয়। এই অদ্বিতীয় নায়ক ভারতে এসেছিলেন ১৯৩৮ সালে হাঙ্গেরীর অপর দুই খ্যাতিমান খেলোয়াড় জাবাডোস ও বেলাককে সঙ্গে নিয়ে। সেদিন তাদের খেলা থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ তিনি ভারতকে দান করেছিলেন টেবল টেনিসের উন্নতিকল্পে। টেবল টেনিসের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও ভারতের প্রতি এই আন্তরিকতা বার্ণারের জীবনের আর এক বড় পরিচয়।

টেবল টেনিসের অন্তরঙ্গ অনুরাগী, পরম বন্ধু, উপদেষ্টা সর্বকালের সেরা নায়ক ভিকটর বার্ণারের ১৯৭২ সালে জীবনাবসানে পিং পং জগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কালের ইতিহাসে হয়ত আরো অনেক নায়কের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান ঘটবে। কিন্তু ভিকটর বার্ণা সর্বকালের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নামে হয়ে থাকবে।

প্রশান্ত দাঁ

ভলিবলে কুশলী মায়া দে সরকার

বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী প্রচলন হয়েছে কাবাডি আর ভলিবলের। এর মধ্যে ভলিবলে আমাদের মেয়েরা মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায় বেশ এগিয়ে গেছে। এখন প্রতিদিনই গড়ের মাঠে পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল সংস্থার মাঠ জমজমাট। একদিকে চলছে ছেলেদের প্রতিযোগিতা অন্যদিকে মেয়েদের ছোট মাঠে কোর্ট মাত্র তিন চারটি। দর্শক সংকুলান হওয়াও কঠিন। খেলা চালাতে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সংস্থার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভলিবলের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গেছিলাম ফেডারেশনের মাঠে, ভলিবলে মেয়েদের খেলার মান কেমন হচ্ছে তা লক্ষ্য করতে। সেখানেই দেখা হল টালীগঞ্জ সুভাষ সংঘের চৌকশ খেলোয়াড় মায়া দে সরকারের সঙ্গে। সুভাষ সংঘের খেলা শেষ হলে ওদের সাধারণ সচিব শ্রীসর্বজ্ঞের সঙ্গে আলাপ সেরে বসলাম মায়ার সঙ্গে মাঠের একধারে।

—এপর্যন্ত জানাশোনা যত মেয়ে ভলিবল খেলছে নানা দলে তাদের মধ্যে আমিই হচ্ছি একমাত্র ন্যাটা, অর্থাৎ বাঁহাতি খেলোয়াড়। মায়া নিজের খেলা সম্পর্কে আমায় জানায়।

—আমরা টালীগঞ্জের পুরনো বাসিন্দা শাহানগর বালিকা বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই পাড়ায় ভলিবল খেলা দেখে আমার এই খেলা শেখার খুব ইচ্ছে হয়। পরের বছর অর্থাৎ '৭১ সালেই আমার খেলায় বেশ ভালরকম উন্নতি দেখা যায়। ফলে সেবার আমি স্কুল ক্রীড়ায় বাংলার ভলিবল দলে স্থান পাই। তবে আমরা ত্রিবান্দ্রমে তেমন সুবিধা করতে পারিনি। পাঞ্জাবের মেয়েদের কাছে হেরে যাই।

'৭২ সাল থেকে এ বছরের গোড়ার দিক অবধি মায়া জুনিয়ার ও সিনিয়ারে প্রায় প্রতি বাছাই দলেই স্থান পেয়ে আসছে। এবছর গোড়ার দিকে ওদের দল কেরলে কয়েকটি কেন্দ্রে ভলিবল প্রতিযোগিতায় নামে। মায়া বলে, ওখানে আমাদের সবচেয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে কেরল পুলিশ দলের সঙ্গে নাগেরকয়েলে আমরা (অর্থাৎ সুভাষ সংঘ) কেরল পুলিশকে ফাইনালে হারিয়ে ট্রফি জয় করি। আবার পালঘাটে ওরা ফাইনালে আমাদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়। ওখানকার আসরে মায়া দুবার শ্রেষ্ঠ চৌকশ কুশলী হিসাবে পদক লাভ করে। তেলিচেরীতেও মায়ারা ফাইনালে ওঠে। ত্রিপায়ারে ফাইনালে আবার কেরল পুলিশকে হারিয়ে সুভাষ সংঘ পূর্ব পরাজয়ের শোধ নেয়। ওখানেই এক আসরে খেলার সময় মায়ার বাঁকাঁধে চোট লাগায় সম্প্রতি ও বিশ্রাম নিচ্ছে।

'৭২-এ অন্তঃ জেলা ভলিবলে মায়া স্থান পেয়েছিল শ্বেত দলে। ওরা রানার্স হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল লীগে বিজয়ী সুভাষ সংঘ দলে মায়া প্রায় নিয়মিত স্থান পেয়েছে। '৭৩-এ ফেডারেশন লীগে মায়াদের ক্লাব রানার্স আপ হয় —ঐ সময় খেলার উৎকর্ষ বিচারে মায়াকে রাজ্য দলে নেওয়া হয়। সেবারও ত্রিবান্দ্রমে বাংলা দল প্রাথমিক বাছাই পর্বে বিদায় নিয়েছিল। আগের বছর অর্থাৎ '৭২-এ এবং '৭৩-এ ডালমিয়ানগরে আয়োজিত

মেয়েদের ক্লাব ভলিবল প্রতিযোগিতায় মায়া দু'বারই বিজয়ী দলের সদস্যারূপে জয়ের আনন্দ উপভোগ করে। এছাড়া দুর্গাপুরে '৭২-এ নিখিল ভারত ভলিবল আসরে এবং '৭৩-এ রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতায় মায়া যথাক্রমে রাজ্য দলে ও নিজের ক্লাবের পক্ষে খেলার সুযোগ পায়। '৭৪-এ ভিলাইয়ে ভলিবলের আসরে মায়া উপস্থিত ছিল বাংলার জুনিয়ার দলের সদস্যারূপে। ওর খেলা দেখে কর্তৃপক্ষ ওকে নেতাজী সুভাষ ক্রীড়া শিক্ষায়তনে (পাতিয়ালা) প্রশিক্ষণ দানের জন্য বাছাই করেন। সেবার বাংলাই চ্যাম্পিয়ান হয়।

মায়া এই ক'বছরেই বেশ কিছু সর্ব-ভারতীয় আসরে খেলার সুযোগ পেয়েছে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে খেলার উৎকর্ষ অব্যাহত রেখেছে। এখন ও সাহানগর স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। দিল্লীতে আয়োজিত সর্ব-ভারতীয় আসরে ওর দল সুভাষ সংঘ ৭২-এ বিজয়ী ও '৭৩-এ রানার্স আপ হয়। '৭৪ সালেও ওরা খেলেছে।

মায়ার বাবা শ্রীরাসমোহন দে সরকার বর্তমানে চাকরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত। মায়ার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বড় অফিস ভলিবলে খেলে, ছোড়দা খেলে ফুটবল ও ভলিবল। ওর তিন বোন অবশ্য খেলাধূলোয় যোগ দেয় না।

—তুমি গত বছর বাঙ্গালোর ও হায়দ্রাবাদে জাতীয় আসরে খেলনি?

—হ্যাঁ ঐ দু' জায়গাতেই আমি বাংলা দলের হয়ে গিয়েছি। এবছরও কেরলের পালাইতে জাতীয় আসরে আমি বাংলা দলে ছিলুম। এবারে ফাইনালে কেন জানিনা আমরা মেয়েরা কেরলের সঙ্গে কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারলাম না। অথচ কেরল আমাদের চেয়ে এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু আমাদের দলের কারও খেলাই খুললো না। তাইতো এবার আমরা বিজয়ী আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলাম না। মায়া অবশ্য এবারও পাতিয়ালার ক্রীড়া শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে।

সর্বভারতীয় খেলার মান সম্পর্কে মায়া বললে, কেরল ও অন্ধ্র ছাড়া অন্যসব রাজ্যের মেয়েদের খেলা খুব জোরালো নয়। বাংলার মেয়েরা আর একটু সুযোগ পেলেই ভারতীয় ভলিবলে শীর্ষস্থানে স্থায়ী হতে পারবে।

প্রধানতঃ স্ম্যাশার হিসেবে খেললেও মায়া চৌকশ খেলোয়াড়। আক্রমণে ও রক্ষণে ও সমান রপ্ত। সুভাষ সংঘের প্রশিক্ষক ও সাধারণ সচিব ওর সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর আস্থা পোষণ করেন।

কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাবে মায়া বলে, ভলিবলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট খেলার ইচ্ছাও আছে। ও এখন প্রতিদিন প্রায় তিনঘণ্টা অনুশীলন করে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয়. তাছাড়া খেলায় সপ্রতিভতা বাড়াবার জন্য নিয়মিত দড়ি লাফ, উচ্চ লম্ফন ও জিমন্যাস্টিক করতে হয়। তবে, মায়া স্বীকার করে, এত পরিশ্রমের ফলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাঠে ম্যাচ খেলার পর বাড়ী গিয়ে সেদিন আর পড়াশোনা করতে পারে না। বাবা ও দাদাদের উৎসাহে ওর মনে খেলায় উন্নতি করার সংকল্প গড়ে উঠেছে। কারণ স্কুল থেকে মৌখিক প্রশংসা ছাড়া আর কিছু পায় না। স্কুলে খেলাধূলোর কোন ব্যবস্থাই নেই, থাকলে হয়ত আরও মেয়ে খেলায় নাম করতে পারতো। পাতিয়ালার ক্রীড়া শিক্ষায়তন গত বছর এবং এ বছরের জন্য মায়াকে ক্রীড়াবৃত্তি দিয়েছেন।

মায়া বলে, আমাদের বাঙালী মেয়েদের ভলি খেলার মান গত দু'তিন বছরে বেশ উন্নত হয়েছে বলে আমার মনে হয়। আমাদের সুভাষ সংঘ '৭২, '৭৩ ও '৭৪-এ ঘরোয়া লীগে রানার্স আপ হয়েছে। জয়ী হয়েছে বিজয়ী সংঘ।

মায়ার ক্লাব উল্টাডাঙা সুভাষ সংঘই কলকাতায় মেয়েদের ভলিবল প্রথম চালু করে। এঁরা ১৯৬৭-৬৮ সালে মেয়েদের ভলিবল খেলা শেখাবার আয়োজন করেন। দলটি এখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও শক্তিশালী ক্লাবরূপে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। মায়ার মত আরও কয়েকটি কুশলী মেয়ে এই দলের সযত্ন প্রশিক্ষণের কল্যাণে জাতীয় আসরে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়।

অময়

মায়া দে সরকার

শ্রীমতী নার্গিসের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন শ্যাম বেনেগাল, সৌমেন্দু রায় এবং অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত

চলচ্চিত্রে সাংবাদিকদের পুরস্কার

বোম্বের রাজকীয় রাজেশ খন্না গত সপ্তাহে মাত্র কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। আর সেই সামান্য সময়ের মধ্যে কলকাতার দুটো বড় ফাংশন অ্যাটেণ্ড করে [illegible] ভেবেছেন [illegible] দিলেন। এসব হচ্ছে [illegible] ব্যাপার।

প্রথমে গেলেন রবীন্দ্রসদন। গিয়ে দেখি চারদিকে পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। [illegible] বসন্তের হাওয়ায় মেয়েদের চুল বাতাসে উড়ছে। ভেতরে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটা পুরস্কার বিতরণের ফাংশন চলছে। রাজকীয় রাজেশ সেখানেই উপস্থিত, উনি এসেছেন, ওঁর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর সঙ্গে কথা হলো। আরে মশাই কিছুতেই রাজেশ খান্না কলকাতায় আসতে চান না, কলকাতাকে ওঁর ভীষণ ভয়, তা আমরা [illegible] চেপেচুপে ধরাতে শেষে রাজী হলেন। হ্যাঁ, উনি এসেছেন প্রাইজ নিতে।

উনি এলেন মেয়েমহলে বেশ জানান দিয়েই তবে এলেন। আমি তখন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের বক্তৃতা শুনছি উনি এ-রাজ্যে চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকট নিয়ে বলছেন, রাজ্যপাল ডায়াস, শ্রীমতী নার্গিস চুপ করে ওঁর কথা শুনছেন, এমন সময় মেয়েমহলে গভীর চাঞ্চল্য কয়েকটি মেয়ে সাংঘাতিক উত্তেজনায় সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কাকে যেন দেখবার চেষ্টা করছে দেখে এক ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, রাজেশ খান্না শেষ পর্যন্ত এল তাহলে...

আসলে এপ্রিল মাসটা যেন ফিল্মের পুরস্কারেরই মাস। একটার পর একটা পুরস্কার দানের উৎসব চলেছে। আর এর বেশীর ভাগ প্রাইজ একা নিচ্ছেন উত্তমকুমার। স্টেট অ্যাওয়ার্ড, ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার, বি এফ জে এ পুরস্কার, প্রসাদ পুরস্কার। সর্বত্রই উনি বেস্ট, বেস্ট, দি বেস্ট।

হলে চুপটি করে বসে রাজেশ। স্মিত হাসিমুখে মুখে ডান হাত চাপা দিয়ে উনি অংকুরের নায়িকা শাবানা আজমীর পাশে বসে পেছনের সীটে বোম্বের মুকুল দত্ত, আর তার পাশে দুর্ধর্ষ পরিচালক শ্যাম বেনেগাল, ভদ্রলোক এক 'অংকুর' ছবি করেই ফাটিয়েছেন, লক্ষ্য করছি মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি ঘুরছে শুধু রাজেশের ওপরই।

এমন সময় আবার গুঞ্জন শোনা গেল। ছেলেমেয়ের দল চেঁচিয়ে উঠল—গুরু, গুরু গুরু এসেছে ..

উত্তমকুমার আসছেন দুটো চেয়ারের সারির মাঝখান দিয়ে কার্পেট বিছানো পথ, উত্তমকুমার হাসতে হাসতে সপ্রতিভ ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে পূর্ব-নির্ধারিত চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লেন। আর কোথায় ছিল প্রেস ক্যামেরাম্যানদের বিশাল এক বাহিনী, ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ, হলের মধ্যে বিদ্যুতের চমক জাগাতে লাগল ঘন-ঘন। উত্তমকুমারের সঙ্গে ঈষৎ ঝুঁকে হ্যাণ্ডশেক করছেন রাজেশ খান্না। চারিদিকে কলরব হাসি আর উচ্ছ্বাস উত্তেজনা। তখন স্টেজের দিকে কারও যেন ভ্রূক্ষেপ নেই,

বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক মৃণাল সেন এবং হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শাবানা আজমী। ফটো ঃ অমৃত

পূর্ব আর পশ্চিম ভারতের চলচ্চিত্রের দুই 'সম্রাট কিং' আজ এখানে মুখোমুখি হয়েছেন, সে আনন্দ ধরে? মেয়েদের?

•

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বললেন, আমাদের ছায়াছবির জগতে সংকট আছে ঠিকই। কিন্তু এটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা চুপচাপ বসে নেই। আমরা চলচ্চিত্রে ইতিমধ্যেই সরকারী টাকা লগ্নী করেছি বেশ কয়েকখানি বাংলা ছবিকে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমরা এই সাহায্য দিয়ে যাব। তবে একটা কথা, এখানে শুধু বাংলা ছবি নয়, হিন্দী ছবিও তৈরী করতে হবে। এখন আমাদের সর্বভারতীয় বাজারে ঢুকতে হবে। এখানে আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী ও কলাকুশলী আছেন, এঁদের সবাইকে নিয়ে আমরা যদি উদ্যোগ গ্রহণ করি তাতে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য হবে।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর বক্তৃতায় বললেন, বি এফ জে এ পুরস্কারের জন্য যেসব শিল্পী এবং কলাকুশলীদের প্রতি বছর নির্বাচন করা হয় তা চিরকাল পক্ষপাতহীন।

রাজ্যপাল এ এল ডায়াস চলচ্চিত্রে নতুন প্রতিভার সন্ধান করা এবং তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানালেন। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টদের মত রাজ্য সরকারও গত তিন বছর ধরে এই শিল্পের শিল্পী এবং কলাকুশলীদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেছে। রাজ্যপাল বলেন, বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পকে

নার্গিস - তুষারকান্তি ঘোষ - ডিজি

স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

এদিন ডি জি (ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী)কে মানপত্র দিয়ে এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। পুরস্কার দেন পদ্মশ্রী নার্গিস দত্ত। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে নতুন ভারত গড়ে তোলা সম্ভব।

শ্রীমতী নার্গিস যাঁদের পুরস্কার দেন তাঁরা হচ্ছেন, শ্রেষ্ঠ হিন্দী ছবির পরিচালক শ্যাম বেনেগাল, শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবির পরিচালক মৃণাল সেন। শ্রেষ্ঠ নায়ক উত্তমকুমার এবং রাজেশ খান্না। শ্রেষ্ঠ নায়িকা শাবানা আজমী এবং অপর্ণা সেন। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখার্জি এবং কল্যাণজী-আনন্দজী। শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায়। স্বর্গত বলরাজ সাহানীর বিশেষ পুরস্কার গ্রহণ করেন শ্রীমতী সাহানী।

উত্তমকুমার - রাজেশ খান্না ফটো

ফটো : অমৃত

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ : আরতি ভট্টাচার্য - সন্ধ্যা রায়
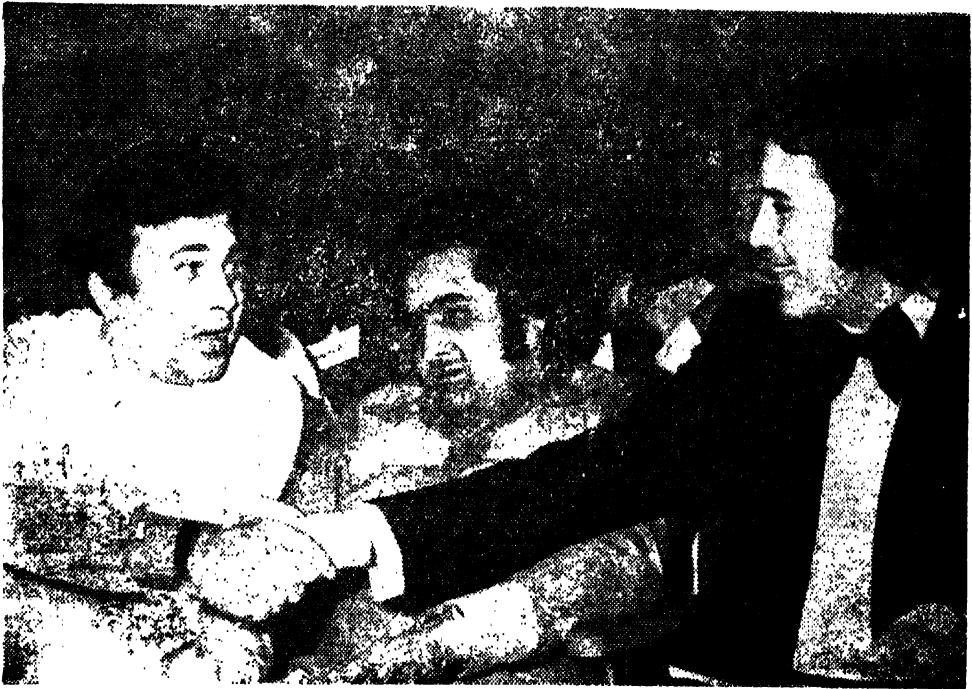
অরবিন্দ মুখার্জি'র সে-ছবির আউট-ডোর লোকেশান স্থির হয়েছিল বসিরহাটের কাছে ইটিন্ডা ঘাটে। অনাদি বাড়ুজ্যে তাই সকাল সকাল সবাইকে সেখানে পাচার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গভীর রাতে এল পার্ক সার্কাসে। উদ্দেশ্য—ফিটন গাড়ি নিয়ে যাবে। অনাদির এক সহকারী আগে ভাগে সেখানে গিয়ে সব দরদস্তুর করে এসেছিল, ফিটনওয়ালা রাজী তবে তার বক্তব্য—অত দূরের রাস্তা ফিটন তো এমনি যাবে না লরিতে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আচ্ছা বেশ, অগত্যা তাই হবে।

একটা লরি ভাড়া করা হলো। লরির মালিক সব শুনে ঠাঁই করে কপাল চাপড়ে বলল, বলেন কি স্যার লরি করে ফিটন নিয়ে যাবেন? লোকে হাসবে—

—হাসুক। যত পারে হাসুক। আমার হচ্ছে কাজ হাসিল করা নিয়ে কথা। এখন তুমি সাফ বল যাবে কি না?

লরিওয়ালা সহাস্যে বলল—আমার যেতে আর অসুবিধা কোথায়। পয়সা দেবেন আমি মাল পাচার করে দেব হ্যা—

তারপর সেদিন গভীর রাতে পার্ক সার্কাসের এক আস্তাবলে সপারিষদ অনাদি বাড়ুজ্যের আগমন। ফিটনওয়ালা সেলাম বাজিয়ে বলল, হম তৈয়ার হ্যায় বাবুজী—

এখন লরিতে ফিটন ফিট করতে গিয়েই বাধল যত গণ্ডগোল। কিভাবে তোলা হবে? এক একজন এক এক রকম ফন্দি বলে। কিন্তু কোনটাতেই তেমন যুৎ হয় না। ন'দশ ফুট উঁচু ফিটন, যেমন লম্বা তেমন চওড়া সব দেখে লরি ড্রাইভারের আক্কেল গুড়ুম। অনাদি অনেক ভেবে চিন্তে বলল—যারে কাছে তক্তপোষ মিলেগা?

—কাহে? তক্তপোষ সে কেয়া হোগা?

—হাঁ, তক্তপোষ ব্রিজ কা মাফিক লাগায়ে গা, আউর ফিটন গাড়ি সেই ব্রিজকা উপর গড়াকে গড়াকে একদম লরিকা পেট মে যা কে খাড়া হোগা, ব্যস খেল খতম—

অনাদি স্রেফ জলের মত ওদের বুঝিয়ে দিল।

তখন ওরা ছুটল তক্তপোষের খোঁজে। রাত একটায় কে আর তক্তপোষ নিয়ে বসে থাকে। সবাই তখন ভোঁস ভোঁস করে তক্তপোষের ওপর বডি ফেলে ঘুম মারছে। হাজার ডাকাডাকিতেও তাদের সাড়া মেলা ভার। অনাদি প্রেসক্রিপশন দিল ওদের ঠেলে ফেলে দিয়ে মাল নিয়ে এস ফিটন তুলতে হবে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না—

আস্তাবলের পাশে এক খাটাল। কে যেন বলল ওই গোয়ালা ব্যাটাদের অনেকগুলো খাট তক্তপোষ আছে। ওইগুলো চেয়ে আনতে পারলে কাজ হয়ে যায়।

অনাদি বলল—ঠিক আছে, ওদের গোটা-কতক গরুর বাঁধন কেটে দাও তা হলেই তক্তপোষ নিমেষে ফাঁকা হয়ে যাবে।

ফিটনওয়ালা কিন্তু সে প্রস্তাব কিছুতেই অনুমোদন করল না। এ-সব করলে হুজুর এই মাঝ রাতে রায়ট বেধে যাবে। তার চেয়ে আমি ঠান্ডা মাথায় ওদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে আনছি। লেকিন বাবু এটু খরচা আছে।

অনাদি বলল—খর্চার জন্যে কোই পরোয়া নেহি পহলে কাম হাসিল করো, পয়সা জরুর মিলে গা—

তখন গোয়ালাদের হাঁক-ডাক করে তুলে পয়সার লোভ দেখাতেই ওরা তক্তপোষ নিয়ে হৈ-হৈ করে ঘটনাস্থলে এসে পড়ল। লরির পেছনের ডালা খুলে সেখানে একটার পর একটা তক্তপোষ সাজিয়ে গড়ে তোলা হল দ্বিতীয় হাওড়া ব্রীজ। তারপর বিকট চিৎকার চেঁচামেচি করে সেই ফিটন গাড়ি সেই অর্ধকটাক কাঠের ব্রিজে তোলা হয়েছে। অনাদির হঠাৎ মনে পড়ল এই রে ঘোড়া? ঘোড়া কিভাবে নেয়া হবে? আরে ফিটন উতার দেউ উতার দেউ পহলে ঘোড়া পিছে ফিটন—

অতএব ফিটন আবার ভুঁয়ে নামিয়ে ফেলা হল। এবং প্রথমে তোলা হল ঘোড়া। সে জানোয়ার অবাক কাণ্ড কেমন নিঃশব্দে

ব্রিজ মাড়িয়ে লরিতে উঠে গেল, অনাদি ওর ব্যবহারে খুব খুশী শুধু মন্তব্য করল—হ্যাঁ এই হচ্ছে প্রকৃত ভদ্দরলোকের মত ব্যাভার খাওয়াবোথোন থেকে বেশ ভাল রকম—

প্রথমে ঘোড়া পরে ফিটন গাড়ি মাঝখানে শুধু লম্বা করে একখানা বাঁশ, মানে ডিমারকেশান লাইন রাতে দেড়টা নাগাদ গলদঘর্ম অনাদি লরির ওপরে যে ফিটন সেই ফিটনের গদিতে আরাম সে গা এলিয়ে দিয়ে বলল—চালাও গাড়ি, একদম থামবে না সোজা ইটিন্ডা ঘাট—

কিন্তু ফড়িয়াপুকুর পার হল না। রাস্তায় টহল দিচ্ছিল পুলিশের গাড়ি, তারা ছুটে এসে ক্যাক করে চেপে ধরল লরি। —এই রোখকে রোখকে......

ড্রাইভার বেচারি ভয়ে ভয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন পুলিশের জীপ থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এসে হেঁকে প্রশ্ন করল—এই লরিওয়ালা, ইসমে কেয়া হ্যায়?

লরিওয়ালা কিছু জবাব দেবার আগেই উপর থেকে অনাদি হেঁকে উঠল—সার, আমি এখানে—

অফিসার অবাক। পিছন ফিরে ভাল করে দেখে বলল—কে কোথায়? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি নে—

অনাদি তখন তার অমায়িক হাসি মুখখানি বের করে বলল—এই যে সার—

অফিসার টর্চের আলোয় ওকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল—লরিতে এটা কি যাচ্ছে?

—হেঃ হেঃ হেঃ, চিনতে পারছেন না সার একটা ফিটন।

—ফিটন? মানে ফিটন গাড়ি? ও। কিন্তু এভাবে এটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? লরি থেকে পাক্কা দশ ফুট উঁচু ট্রাফিক আইন-কানুন না মানলে পুলিশ যে অ্যারেস্ট করতে পারে এটা বুঝি জানা নেই?

—জানা নেই কি বলছেন সার, বিলক্ষণ আছে, তবে কি না শুটিং-এর জন্যে ফিটনটা লাগবে কিনা তাই সার অনেক হ্যাপা জড় করে নিয়ে চলেছি—

পুলিশ অফিসার কোন কথা শুনতে চায় না। গাড়ি যাবে না। এভাবে গেলে অ্যাকসিডেন্ট অনিবার্য। অতএব চলুন থানায়। অনাদি বলে সার থানায় গেলে আমাদের ওকম্মো ফতে হয়ে যাবে মানে শুটিং চৌপাট হয়ে যাবে। আর্টিস্টরা সব লোকেশানে পৌঁছে গেছে, বিশ্বাস না হয় আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে সরেজমিন তদন্ত করে আসবেন। আর আপনার শুটিং-ও দেখা হয়ে যাবে। কমল মিত্তির আছে স্বরূপ দত্ত আছে। দেখবেন কেমন চমৎকার একখানা গান পিকচারে তোলা হচ্ছে......

পুলিশ অফিসার চটে ফায়ার।

—মাঝরাতে আমাকে শুটিং দেখাবার লোভ দেখানো হচ্ছে! নাথিং ডুয়িং, এখন সব সমেত থানায় চলুন।

হারমোনিয়াম
সমিত ভঞ্জ / আরতি ভট্টাচার্য

অনাদির সঙ্গে অফিসারের যখন এইসব ডায়লগ বিনিময় হচ্ছে, হেনকালে ঘোড়াটা হঠাৎ তীব্র চিঁহি চিঁহি চিঁহি করে হেঁকে উঠে নিজের উপস্থিতিটা জানান দিয়ে বসল। ব্যস আর যায় কোথা ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে অফিসার রেগে একেবারে টং! —অ্যাঁ সঙ্গে আবার ঘোড়াও আছে? অসম্ভব। নির্ঘাৎ জেল। এভাবে ট্রাফিক আইন কাউকে লংঘন করতে দেয়া যায় না। আপনাদের মশাই সাহসের বলিহারি যাই শুধু এই ঢাউস ফিটন-ই নয়, সঙ্গে আবার জ্যান্ত একটা ঘোড়াও তুলেছেন লরিতে?

বলতে বলতে অফিসার লাফিয়ে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল। ঘোড়াটা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছে। অনাদি খুব চটে গেল শালা ইয়ে করার আর সময় পেলি না, দাঁড়া দিচ্ছি তোকে লাথি এক ডজন, ইয়ে কোথাকার।

অফিসারের কাছে তাড়াতাড়ি মাফ চেয়ে নিল অনাদি—সার কিছু মনে করবেন না। গায়ে লাগে নি তো?

অফিসার আরও চটিতং।

তারপর মস কোড়ে দুজনের মধ্যে কথা আরম্ভ হল। সে এক বিচিত্র সংলাপ। প্রথমে অনাদি গুজ গুজ করে অফিসারটিকে কি যেন বলল শুনে অফিসার এমন প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগল যেন মনে হল এক্ষুনি ওর মুন্ডুটা খসে পড়বে। তখন ব্যাজার ভঙ্গীতে অনাদি আর একটা কি বলল। এবারও মাথা নড়ল তবে আগেকার মত অত বেগে নয়। অনাদি এবার অসম্ভব ব্যাজার মুখে কি একটা ডায়লগ থ্রো করল। বাস, অফিসারের মুখে কুমড়োর ফালির মত এক চিলতে হাসি ফুটল তৎক্ষণাৎ। এর পর অন্ধকারে কাগজের কিছু খসখসানির আওয়াজ, অফিসারের প্রস্থান লরি আবার চলতে আরম্ভ করল।

রাত আড়াইটে।

লরিটা বেড়াচাঁপার কাছে এসেছে একজন পুলিশ অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে হুকুম দিল—এই লরি থামাও—

ঘ্যাঁচ করে লরি দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনাদি গদিতে আরাম করে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল, ব্রেকের এই হঠাৎ ঝাঁকুনিতে সে ধড়মড় করে ঠেলে উঠে বসল।

—লাইসেন হ্যায়?

ড্রাইভার বলল—হ্যায়।

—এই লরিমে চোরাই মাল হ্যায়.

—নেহি হ্যায়।

—চাউল হ্যায়?

—নেহি হ্যায়।

—তাহলে ইসমে কেয়া?

—এক ফিটন হ্যায়। এক ঘোড়া হ্যায়। এক ভদ্দর সওয়ারী হ্যায়। হাম হ্যায়। হামরা ক্লিনার হ্যায়, বাস।

অনাদি তক্কো না একটা সিঁক ছুঁড়ে দিল, কিন্তু তাতে লোকটার সেঁক গোসা—ও-সব ঘুষখোরদের দেবেন, আমায় দেবেন না, এভাবে মাল নিয়ে যাওয়া যাবে না থানায় চলুন—

—আরে ভাই কেন ফালতু হুজ্জুত করছ ভাই, আমাদের ছেড়ে দাও আমরা আমাদের কাজে চলে যাই, তুমিও তোমার কাজে যাও—

—উহুঁ, থানায় যেতে হবে, যা বলবার তখন বড়বাবুকে বলবেন—

শেষ পর্যন্ত যেতেই হল থানায়। কোথায় বড়বাবু? তিনি তখন টেনে নিদ্রা যাচ্ছেন। কনেস্টবলটা গিয়ে চীৎকার করে ডাকতে তিনি চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এলেন, বেশ বিরক্ত মুখে। —কি হয়েছে?

হুজুর, এরা গাড়িতে ফিটন তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

—তাই নাকি? এই বাজারে আবার কার ফিটনে চড়ার সখ হল? কোথায় যাবেন?

অনাদি জবাব দিল—ইটিন্ডা ঘাট।

—কেন?

—বায়স্কোপের শুটিং করতে। এই ফিটনটা দেখানেই দরকার আমাদের। ছবি তোলার জন্যে লাগবে সার।

বড়বাবু খুব খুশী। —আর কি কি লাগবে?

অনাদি অবাক। —আর কি কি মানে?

বড়বাবু বুঝিয়ে বললেন—মানে যা যা লাগবে সব এক সঙ্গে বললে তার একটা ইয়ে করা যায় মানে ফয়সালা। যাক গে, আমি মোশাই সিনেমা-টিনেমা খুব ভালবাসি আমি সকালে যাচ্ছি আপনাদের ওখানে এট্টু ভাল করে শুটিং দেখিয়ে দেবেন আমাকে, তাহলে আর কোন ইয়ে থাকবে না—

অনাদি সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে বলল—সে আর বলতে, দশজনকে দেখাবার জন্যেই তো আমাদের এই আউটডোর শুটিং। প্রোডিউস্যার আমাকে বলে দিয়েছে—যে আউটডোর শুটিং দেখতে চাইবে তৎক্ষণাং তাকে খুব খাতির যত্ন করে দেখাতে হবে। আপনি দেখবেন সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা সার হেঃ হেঃ হেঃ......

বড়বাবু প্রসন্ন মুখে সেই কনেস্ট-বলটিকে হুকুম দিলেন—এদের যেতে দাও আর যাবার সময় লক্ষ্য করো এদের যেন কোন অসুবিধে না হয়! কেমন?

বশম্বদ পুলিশটি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বড়বাবু আবার নিদ্রামগ্ন হতে চলে গেলেন। অনাদি লরিতে ওঠবার উদ্যোগ করছে, হঠাৎ সেই পুলিশ বলল, দেন—

—কি?

—যেটা দিচ্ছিলেন।

—কোনটা?

—সেই যে সিকিটা।

—বড়বাবুকে ডেকে তাহলে সাক্ষী রেখেই দিই, কি বলেন?

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশটি চুপসে গেল। বেচারি মোটা দাও ভেবে থানা পর্যন্ত টেনেছিল, এখন সে গুড়ে বালি দেখে আর কি অনুশোচনা।

যাই হোক আরও কিছু খুচরো বিড়ম্বনা সয়ে শেষ পর্যন্ত তো লরি পৌঁছাল ইটিন্ডা ঘাটে, তখন রাত নিশুতি অনাদি ভাবল এই রে ওখানে নয় খাট-তক্তপোষ দিয়ে ম্যানেজ হয়েছিল, কিন্তু এখানে? এই নির্জন নদীর ঘাটে কি করে এখন ফিটন নামাই?

ঘাটের পাশে একটা ছোট চায়ের দোকান। হাঁকডাকে তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে লোকটা এসে সব শুনে বলল—একটা উঁচু ঢিবি-টিবি দেখে লরিটা আর গায়ে ভিড়িয়ে দিন, ও ফিটন আপনার আপসে নেমে আসবে।

সংসার সীমান্তে

সন্ধ্যা রায় / শেখর চট্টোপাধ্যায়

মন্দ পরামর্শ নয়। কিন্তু ঢিবি কোথায়? লরির ড্রাইভার বলল—এক মাইল পেছনে আমি এট্টা ঢিবি দেখেছি, চলুন তাহলে ওখানে গিয়েই বরং—

—হ্যাঁ তাই চল। এদিকে ভোর হয়ে এল—

রাস্তার ধারে বাস্তবিকই এটা ঢিবি। অন্ধকারেও চোখে পড়ার মত। অনাদি খুশী হয়ে ড্রাইভারকে বলল—ভেরি গুড। অতএব আর দেরী না করে লরির পেছনটা এখানে লাগিয়ে দাও, আমরা ফিটন আর ঘোড়া নামিয়ে নিই—

ড্রাইভার ব্যাক গীয়ারে লরি লাগিয়ে দিল সেই উঁচু ঢিবিতে।

তারপর শুরু হল আনলোডিং অপারেশন। ড্রাইভার আর তার সহকারী দুজনে মিলে ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ফিটনটা ধরে মারে হ্যাঁচকা টান, আর অনাদি প্রবল জোরে ঠেলতে শুরু করল সামনে থেকে। ফলে একটু একটু করে ফিটন ঢিপির ওপর উঠতে লাগল। জোরসে মারো হেঁইয়ো, তাগদসে মারো হেঁইয়ো করতে করতে হঠাৎ বিরাট এক হ্যাঁচকা টানে ফিটনটা হুড়মুড় করে ঢিবির ওপর চলে গেল সেই সঙ্গে শোনা গেল ড্রাইভার আর ক্লিনারের প্রবল আর্তনাদ—মর গিয়া জ্বল গিয়া মর গিয়া জ্বল গিয়া—

কিরে বাবা কি হলো ফিকে অন্ধকারে অনাদি দৌড়ে গেল সেখানে আরেব্বাস সত্যনাশ এটা একটা ইঁটের পাজা। মৃত নয় জীবন্ত পাজার ভেতরে আগুন গনগন করে জ্বলছে ওরা গাড়ি নিয়ে পিছোতে পিছোতে সটান সেই আগ্নেয়গিরিতে গিয়ে পৌঁছেছে। আরে নেমে এস নেমে এসো—

ওরা লাফাতে লাফাতে নেমে এসে ভুঁয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল ওদিকে ফিটনের ল্যাজে আগুন লেগেছে দিগ্‌ভ্রান্ত অনাদি এমন চেঁচাতে লাগল যে মুহূর্তে গ্রামের লোক লাঠি-সোটা নিয়ে রে রে শব্দে সেখানে দৌড়ে এল। তাদের ধারণা নির্ঘাৎ ডাকাত পড়েছে। তারা এসে ভূতলশায়ী লোক দুটিকে এই মারে কি সেই মারে—লরিতে করে পাঁজার ইঁট চুরি করা আজ তোদের বের করাচ্ছি ভাল রকম। অনাদি ওদের আতিকষ্টে শান্ত করল, দেখ ভাই আগে ফিটনটা বাঁচাও পরে সব বলছি খুলে।

তৎক্ষণাৎ ফিটন উদ্ধার হলো। অনাদিকে গ্রামবাসীরা ইতিপূর্বে দেখেছে। কারণ লোকেশান নির্বাচনের সময় অনাদি নিজে এসে গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে গেছে ভাল রকম। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে খবর চলে গেল। অরবিন্দ মুখার্জি তার সহকারীদের নিয়ে এসে পড়লেন। ফিটন আর ঘোড়া দেখে তিনি তারিফ করলেন অনাদির ব্যবস্থাপনার। অনাদি তখন লরি ড্রাইভার আর তার ক্লিনারকে নিয়ে শহরে গেল ডাক্তার দেখাতে। উঃ সে এক পরিস্থিতি!

অনাদি এখন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতেই বেশীর ভাগ বসে। ওর পেছনে লাগার ক্ষমতার বাস্তবিক তুলনা হয় না। সেদিন হেকটিক শুটিং করতে করতে দিলীপ মুখার্জি দেখি এক ফাঁকে অনাদিকে থ্রেটন্ করছেন—ভেবেছ প্রোডিউস্যার হয়েছ বলে তুমি পার পেয়ে যাবে? তোমায় একদিন আমি এইসা টাইট দেব যে হাড়ে হাড়ে বুঝবে—

অথচ দেখুন তাতে কোন ভাববিকার ঘটল না ওর। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে থাকল।

বিরক্ত দিলীপ মুখার্জি শেষে বললেন—বাস্তবিক তুই যে কি একটা চিজ আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না আমি...

রঞ্জন মজুমদার

দীপঙ্কর দে

রোববার ছুটির দিন বা যে কোনদিন যদি যতীন বাগচি রোডে দীপঙ্কর দের বাড়ীতে যান গেটটা পেরিয়ে বসবার ঘরে ঢুকেই দেখবেন সুন্দর করে সাজানো চেয়ার আর সোফাগুলোয় কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ বসে। সকলের মধ্যে আড্ডার মৌতাত চলছে না অবশ্যই। যে যার বই আর পত্রিকা নিয়ে মুখ গুঁজে রয়েছেন। সময়টা রাত্তির হলে কাউকে হয়তো বা দেখবেন একটু ঝিমোচ্ছেন। অন্ততঃপক্ষে আমি যে কটা দিন গেছি এই ধরনের দৃশ্য নজরে এসেছে প্রতিবার।

তবে দু-একবার দেখেছি দীপঙ্করবাবুও বসে আছেন। হয়তো বা কাগজ পড়ছেন। কখনও চুপচাপ। বসে থাকা সকলের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কথার আদান-প্রদান হয় তাও খুব নীচু স্বরে। একধরনের নির্লিপ্ত নীরবতা ছড়িয়ে থাকে যেন সব সময় ঘরটায়।

এমনি এক রোববার যখন প্রায় অতর্কিতেই হাজির হয়েছিলাম ওঁর বাড়ীতে, তখন গেটটা খুলতেই দেখি জানালার পাশের সোফায় আধশোয়া অবস্থায় শুয়ে আছেন দীপঙ্করবাবু নিজে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন 'আসুন।'

ঘরে তখন বসে আছেন দীপঙ্করবাবুর স্ত্রী, ছোট্ট মেয়ে রুনিয়া। দীপঙ্করবাবুর কোলের ওপর একটা ট্রানসিস্টর রেডিও। ছড়ানো ছিটানো কিছু দৈনিক কাগজ। বসলাম ওঁরই সোফায়। ওঁর মুখ দেখে বুঝলাম আমার গতকাল রাত্তিরের টেলি-ফোন করার খবর অজানা নেই। আসব বলে একটু খবর জানানো তো দরকার আগে। তাই শনিবার রাত এগারটা নাগাদ ফোন করতে হয়েছিল। অবশ্য অন্য প্রান্ত থেকে ওঁর স্ত্রীর গলায় জবাব পেয়েছিলাম—'টিটো তো বাড়ী নেই (টিটো দীপঙ্কর-বাবুর ডাকনাম)

—কাল দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আমি যাব কাইন্ডলি ওঁকে বলে দেবেন। বলেই ছেড়ে দিয়েছিলাম লাইন।

বহুবার এলেও ঘরটাই দেখা হয়নি ভালো করে এর আগে। চোখ বোলাতে গিয়ে দেখি বেশ কিছু সুন্দর পেইন্টিংস দেয়ালে ছড়িয়ে আছে। যীশুর মূর্তিখানা তো

দারুন লিভিং। পোড়ামাটির একটা নটরাজ মূর্তিও দেখবার মতো। ঘরখানা সাজানোর মধ্যেও শিল্পরুচির ছাপ বেশ অনুভব করা যায়।

জিজ্ঞেস করলাম—'আপনাদের বাড়ীতে ছবি আঁকেন কে?' ঠিক তখনই ভেতরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে। ও'র দিকেই মুখ করে টিটো বললেন—আমার মামা—ভন্তু দে।'

ভদ্রলোকের আমাদের চোখে অভ্যস্ত শিল্পীদের মতই চেহারা বটে। এর আগে অবশ্য একদিন হাতে ব্রাশ নিয়ে একটা ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন করতে দেখেছিলাম। তেমন করে লক্ষ্য করিনি সেদিন।

যাইহোক, ঘর ছেড়ে ঘরের লোকের কাছে আসি এখন।

শিল্পী দীপঙ্কর দে নায়ক দীপঙ্কর দে এখন আমার মুখোমুখি বসে। পাতা ওলটাচ্ছেন একটা পত্রিকার।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কাজ করার ইচ্ছে ছিল দীপঙ্করের বহুদিন থেকে। 'সীমাবদ্ধ'এ একটা চান্সও পেয়েছিলেন। তবে 'তেমন কিছু নয়' বললেন তিনি।

—'জনঅরণ্য'এ তো কাজ করছেন! কেমন চরিত্র পেলেন? আশা মিটলো তো!

সাফল্যের হাসি এলো মুখে। কোল থেকে রেডিওটা নামিয়ে রেখে, কাগজপত্রগুলো সরিয়ে বললেন—'দারুন! কাজ করতেও মজা লাগছে।'

কোন চরিত্রটা করছেন জানতে চাইলে বললেন—'গল্পের সঙ্গে কোনো মিল পাবেন না। অনেক এদিক ওদিক করছেন মানিকদা।' স্বাভাবিক। লেখা আর ফিল্ম—দুটোর মিডিয়ম তো আলাদা। দুটো একরকম হবে কি করে? তায় আবার সত্যজিৎ রায় ডিরেকটর! এই নিয়ে চললো কিছুক্ষণ গরম আলোচনা। দীপঙ্করবাবু অবশ্যই ফিল্ম মিডিয়মটার ওপর জোর দিলেন বেশী। সত্যজিৎ রায়কে ডিফেন্ড করলেন। মিসেস দেও যোগ দিলেন আলোচনায়। আমি শ্রোতা ও দর্শকমাত্র।

ও'র আগামী ছবিগুলো সম্পর্কে কমেন্ট জানতে চাইলে প্রথমটায় কিছু বলতে চাইছিলেন না। নিজে অভিনয় করলেই ছবিখানা সেরা বলতে হবে—এমন কোনো উপপাদ্য কোথাও নেই। দেখলাম দীপঙ্করবাবুও এই সত্য বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মন্তব্য করতে বলায় তিনি অমন শোকি হয়ে উঠলেন কেন বুঝলাম না। অনেক পীড়াপীড়ির পর শুধু মুখ ফুটে এইটুকু বললেন যে আগামী ছবিগুলোর মধ্যে একটা হাঁ বমনে হচ্ছে মার খাবে। কোনটা তিনি কিছুতেই বললেন না। তবে জানালেন—'আমার কমপ্লিট ছবির লিস্টে আছে মোহনবাগানের মেয়ে, সেলাম মেম সাহেব, শুভ সংবাদ আর হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ। দেখে নেবেন কোনটা কি রকম হিট হয়।'

ঃ ভয়ানক চালাক লোক তো আপনি মশাই!

ইতিমধ্যে মিসেসকে দিয়ে এক কাপ চা আনিয়েছেন আমার জন্য। আলোচনা সংগত ছবি ছেড়ে গড়ালো সদ্যসমাপ্ত বেলজিয়াম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের দিকে। কোনো ছবিই ও'র তেমন ভালো লাগেনি মনে হোল।

আলোচনার গতি এবং প্রকৃতি দুটোই গেল পাল্টে যেমনি টিটোর বন্ধু মিঃ মজুমদার ঢুকলেন ঘরে। প্রথম দর্শনেই মনে হয় ভদ্রলোক খুব খোশমেজাজি। একটু মেদবহুল চেহারা। বোধহয় বিজনেসম্যান-ট্যান হবেন। তাই বাড়তি সুখ আর মৌতাতের ছাপও আছে চেহারায়। এক-ঝলক বসন্তের হাওয়ার মত ফুরফুরে আনন্দ নিয়ে মিঃ মজুমদার ঘরের আবহাওয়াটাই দিলেন পাল্টে।

দীপঙ্করবাবু আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসেছেন তখন। মিসেস দে কাছের চেয়ারে চলে এসেছেন। আমি এক জায়গাতেই। হালকা আলোচনা আর হাসিতে ভরে উঠল ঘরটা। কোন এক জাহাজী বন্ধুর কাছ থেকে একটা দুর্লভ 'আর-এস' পেয়েছেন বোতলটা কিরকম দেখতে, (আর-এস' মানে কি জানেন? রয়েল স্যালুট নামে সবচাইতে দামী ও বিখ্যাত পানীয়) ওটা কিভাবে প্রিজার্ভ করবেন, কাকে কাকে খাওয়াবেন তাই নিয়ে কয়েক মিনিট গেল। মিঃ মজুমদার বললেন—'একদিন একটা ছোটখাট পার্টি দিয়ে খাবার শেষে ছোট্ট করে সবাইকে দেব আর এসটা। শর্ত থাকবে নো সোডা নো ওয়াটার, মিনিমাম এক টুকরো বরফ পাওয়া যেতে পারে।'

কেমন তেতে পেলেন দীপঙ্করবাবু। এইসব পানীয়ের আলোচনায় দেখলাম মিসেস দেও যোগ দিয়েছেন। কোন বীয়রে নেশা হয়,

কোন ব্র্যান্ড ভালো বা মন্দ সেটাও তাঁর অজানা নয়। সফিস্টিকেটেড ফ্যামিলি, জানাটাই স্বাভাবিক। পানীয়ের প্রতি দীপঙ্করবাবুর নেশা নেই বটে, কিন্তু নিয়মিত (অবশ্যই প্রয়োজন মাফিক) পান-টান করেন মনে হলো। শরীরটা ঠিক রাখতে গেলে অবশ্যই এইসব দরকার।

মিঃ মজুমদারও কথাবার্তায় মনে হোল এই ফ্যামিলির সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। রুনিয়ার সঙ্গেও তাঁর খুব ভাব। রুনিয়া বোধহয় কোথাও নাচ-টাচ শেখে। মিঃ মজুমদার বললেন—কি নাচ শিখছ? 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে। আয়রে ছুটে আয় আয় আয়' বলতে বলতে সামনে পেছনে তালে তালে পা ফেলে নেচে দেখালেন। রুনিয়া তো হেসে লুটোপুটি। মার কোলে মুখ লুকিয়েছে গিয়ে। 'কি করছ কাকামণি' আদরের গলায় কাকাকে ব্যঙ্গ করল সে। এসব নাচ শিখতে তিনি বারণ করলেন, বললেন 'স্মার্ট হও, স্মার্ট হও—প্যানপ্যানানি ভালো লাগে না।'

আমি চুপচাপ বসে আছি। দীপঙ্করবাবু বললেন, 'আড্ডাটা আজ তেমন জমছে না তাই না! কেউই এলো না। আসবে কি করে! দীপঙ্করবাবু যে বাড়ীতে থাকবেন এটা অনেকেই জানে না। সেদিন নাকি একজন ফটোগ্রাফারের সঙ্গে তাঁর যাবার কথা ছিল ছবি তোলার জন্য। হঠাৎ সেই প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হওয়ায় দীপঙ্করবাবু বাড়ীতে। আমি সৌভাগ্যবান—দেখা পেয়ে গেলুম তাঁর, কিন্তু বন্ধুদের আসরে পেলাম না। পেলাম মাত্র একজনকে। সুতরাং আলোচনা বড় একপেশে হয়ে গেল। মিঃ মজুমদার আপারহ্যান্ড নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমিও চুপচাপ। দীপঙ্করবাবুও প্রায় স্পিকটি নট। এরই মধ্যে তন্তু মামা এসে দু-তিনবার কিছু কথা ছুঁড়ে দিয়ে গেছেন। আমরা সেইসব কথা নিয়ে লোফালুফি করেছি খানিকক্ষণ। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! তিনজন মিলে আড্ডা জমছে না জমবার কোনো লক্ষণও নেই। আরও কয়েকজন সঙ্গী দরকার, নিদেনপক্ষে 'তরল' সঙ্গী পেলেও চলতে পারে।

হঠাৎ কথাবার্তা টার্নও নিল সেই দিকে। কে যে শুরু করেছিল মনে নেই। তবে দুজনেই রাজী এটা সত্যি।

প্রথমটায় ঠিক হলো আসর বসবে বাড়ীতেই। কিন্তু দুজনে জমবে কি? এই নিয়ে মতদ্বৈত হওয়ায় ঠিক হোল 'বাইরেই চল।'

বেরোলাম রাস্তায়। জামা পাল্টে দীপঙ্করবাবু বাইরে আসতেই রুনিয়ার বায়না—'আমি যাব।' কিছুতেই আটকান যায় না তাকে। মিসেস দে এসে বোঝালেন তাকে অনেক। কিন্তু সে কি আর বোঝে! 'আমি যাব' শব্দ দুটো আর মুখ থেকে যায় না। মজুমদার বোঝাচ্ছেন অনেক আমিও।

শেষ অব্দি মা-ই নিয়ে গেলেন মেয়েকে ভেতরের ঘরে। যাবার পথে দীপঙ্করবাবুকে বললেন—'তাড়াতাড়ি ফিরো।'

হাঁটতে হাঁটতে পূর্ণ দাস রোড পেরিয়ে সামনের স্টেশনারী দোকানে ঢুকলেন দীপঙ্করবাবু। কাজুবাদাম কিনলেন আড়াইশো। পাড়ার একটা ছেলে এসে বলল—'কি টিটোদা নতুন ডিজাইনের প্যান্ট মনে হচ্ছে।' গলায় রসিকতার হাওয়া। 'কি ছবি-টবি করছো' ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছেলেছোকরা জড়ো হয়ে গেছে দেখছি। সবাই-ই পাড়ার। কে একজন উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতেই সকলের টিটোদা আর আমার-আপনার দীপঙ্করবাবু বলে উঠলেন—'কি যে বলিস কোথায় উত্তম আর কোথায় আমি।' কথাগুলো বলার সময় একটা গর্বের হাসি ছিল মুখে—বোধহয় উত্তমকুমারের সঙ্গে তুলনা হওয়ার দরুন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'দেখবেন ধরবাবু এসব কথা আবার লিখে দেবেন না যেন!'

অনুরোধ রাখতে পারিনি দীপঙ্করবাবু, কারণ আপনিও কথামত আড্ডার আসর জমাতে পারেননি। না হয় অন্যদের সামনে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা মনে আছে?

নির্মল ধর

নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী ॥ ২

পূর্ণেন্দুবাবুর মধ্যস্থতায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১০ টাকা মাসিক মাইনেতে বিনোদিনী যোগদান করেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। ভট্টনারায়ণের বেণী সংহার অবলম্বনে হরলাল রায়ের শত্রু সংহার (বেণী সংহার) নাটকে ৯ ডিসেম্বর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দ্রৌপদীর পরিচারিকা চরিত্রে বিনোদিনী সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। তখন গ্রেট ন্যাশনালে রাজকুমারী বা রাজা, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী, নারায়ণী ছিলেন।

গঙ্গার ঘাটে ভুবনমোহন নিয়োগীদের বাগানে বিহার্সাল হত। ভুবনবাবুই ছিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী। ফুটফুটে মেয়েটিকে সবাই ভালবাসতেন। ধর্মদাস সুর ছিলেন ম্যানেজার। অবিনাশ কর ছিলেন সহকারী। নাট্য শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত নট মহেন্দ্রলাল বসু।

দ্রৌপদীর সখীর মধ্য দিয়েই ভাবী-কালের নাট্যসম্রাজ্ঞী সেদিন সকলকে বিস্মিত করেছিলেন। বিনোদিনীর বয়স তখন ১১ বছর। নারীসুলভ চিহ্ন তখনও তার দেহে ফুটে ওঠে নি। তাই তাকে দ্রৌপদীর সখীর উপযোগী করে পোশাক-পরিচ্ছদ পরাতে গিয়ে বেশকারদের কিছুটা কসরৎ করতে হয়েছিল।

বিনোদিনীর সৌন্দর্য তখনই সকলকে আকৃষ্ট করে। তাদের পারিবারিক দারিদ্র্যে সকলেই সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। শীতের সময় বিনোদিনীর গায়ে দেবার মত সে রকম কোন জামা ছিল না। শ্রীমতী রাজকুমারী দুটি জামা উপহার দেন বিনোদিনীকে।

হরলাল রায়ের হেমলতা নাটকে বিনো-দিনীকে দেওয়া হল নায়িকা হেমলতার চরিত্র। হেমলতা বিনোদিনীকে নতুন জয়-মুকুট পরিয়ে দিল।

'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকেও অভিনয় করলেন বিনোদিনী।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের একাংশ পশ্চিম পরিভ্রমণে বহির্গত হলেন। মহেন্দ্র বসুর অধীনে আর এক দল রয়ে গেলেন কলকাতার স্থায়ী মঞ্চে। বিনো-দিনীকে সঙ্গে নিলেন ধর্মদাসবাবু। বিনো-দিনীর মাও চললেন সম্প্রদায়ের সঙ্গে।

হরলাল রায়ের শত্রু সংহার (বেণী সংহার) নাটকের কৃতকার্যতায় বিনোদিনীর আসর আরো বৃদ্ধি পায়। রাধামাধব কর, তার ভ্রাতা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর (ডাঃ আর জি কর) গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সর্বোপরি ছিলেন ধর্মদাস সুর।

হরলাল রায়ের হেমলতা নাটকটি ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর। জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় নাটকটি বর্ণিত। নাটকের সংখ্যা ছিল তখন কম। তাই নতুন শিল্পীদের সব নাটকের মানানসই চরিত্রের জন্যই আগে থেকে শিক্ষা দিয়ে রাখা হতো। কারণ ঘুরে ফিরে একই নাটকগুলির অভিনয় হতো বার বার।

হেমলতা নাটকের নায়িকা হেমলতা চরিত্রে গড়ে তোলা হলো বিনোদিনীকে। হেমলতার অভিনয়ে বিনোদিনী বেশী করে তাক লাগিয়ে দিলেন সকলকে। হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' মঞ্চস্থ হলো ২৬ ডিসেম্বর। বক্তিয়ার খিলজীর বাংলা জয় তথা লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত। লক্ষ্মণ সেন চরিত্রে অভিনয় করেন নটশেখর অর্ধেন্দু মুস্তফী আর দুটি

প্রধান নারী চরিত্রে থাকেন কাদম্বিনী আর বিনোদিনী।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম থেকেই গ্রেট ন্যাশনাল দলের একটি অংশকে নিয়ে ধর্মদাস সুর পশ্চিম পরিভ্রমণে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাই নির্বাচিত নাটকগুলিতে নির্বাচিত শিল্পীদের রিহার্সেল দিয়ে তৈরী করে নিচ্ছিলেন যাতে বিদেশে গিয়ে দুর্নাম কুড়োতে না হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি ধর্মদাসবাবু দিল্লী, লাহোর, মীরাট আগ্রা, বৃন্দাবন, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হন। আর কলকাতা মঞ্চে মহেন্দ্রলাল বোসের নেতৃত্বে আর একটি দল নিয়মিত অভিনয়ে নিয়োজিত থাকেন।

ধর্মদাস সুর, অবিনাশচন্দ্র কর, অর্ধেন্দু মুস্তফী, ক্ষেত্রমণি বিনোদিনী, বিনোদিনীর অভিভাবিকা হিসেবে তাঁর মা আরো অনেকেই রইলেন দলের সঙ্গে। প্রথম এঁরা দিল্লীতে আসেন। গিরিশচন্দ্র দাস ছিলেন এই পরিভ্রমণের অন্যতম উদ্যোক্তা।

মোগল সাম্রাজ্যের বিলাস-ব্যসন বৈভব ও উচ্ছৃঙ্খলতার নিদর্শনবাহী ঐশ্বর্য-সুষমামণ্ডিত প্রাসাদ, স্মৃতিস্তম্ভ ও অন্যান্য দর্শনীয় বিষয় ছাড়া দিল্লী কাউকেই আকৃষ্ট করতে পারলো না। তখন দিল্লীতে বাঙালী মুখের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। সর্বত্রই অপরিচিত মুখ। সে মুখ দেখে বালিকা বিনোদিনী ভয়ে অস্থির হতো। বিভিন্ন ধরনের পোশাকে, বিভিন্ন আকৃতির মানুষ! পুরুষগুলির দাড়ি গোঁফের বাহাদুরীই বা কত! বিনোদিনীর কান্না পেত মাঝে মাঝে। ভিস্তিওয়ালা চামড়ার ব্যাগে করে জল দিত। সে জল পান করা দূরের কথা—অনেকে স্পর্শও করতেন না। ইঁদারা থেকে নিজেরাই জল তুলে আনতো। বিনোদিনীর মায়ের গোঁড়ামী ছিল সবদের চেয়ে বেশী। তিনি নিজের রান্না নিজেই করে নিতেন।

দিল্লীতে প্রায় দু সপ্তাহ অবস্থান করে সম্প্রদায়। তবে সাত আট দিনের বেশী অভিনয় হয় না। দিল্লীর অভিনয়ে সম্প্রদায় বেশী লাভ করতেও পারে না। দিল্লীতে সপ্তাহখানেক সবাই দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে বেড়ান। গরুর গাড়ীতে করে কুতুব মিনার দেখাতে গিয়ে বাঘের পাল্লায় পড়েছিলেন সবাই। সারি সারি গরুর গাড়ী চলেছে। হঠাৎ বিকট হুংকার দিয়ে জঙ্গলের মধ্য থেকে লাফ দিয়ে এলো একটি বাঘ। চীৎকার ও কান্নার রোলে চতুর্দিক ভরে উঠলো। গাড়োয়ানরা অভ্যস্ত ছিল। তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই শেষ পর্যন্ত বাঘের মুখ থেকে রক্ষা করলো সকলকে। সঙ্গে সঙ্গে মশাল জ্বালিয়ে ফেলল। হৈ-হৈ-রব আর সমবেত কান্নার শব্দে বাঘটিই শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে নিয়েছিল।

দিল্লী থেকে সম্প্রদায় এলো লাহোরে। লাহোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। ফুল আর ফুল। যে-সে ফুল নয়। গোলাপে গোলাপে ছেয়ে ফেলা লাহোর। বিনোদিনী গোলাপের বাহার দেখে খুশীতে ডগমগ। লাহোরে প্রায় একমাস কেটে যায়। অভিনয় হয় দশ-বারো রজনী। লাহোরের সৌন্দর্য—সম্ভার সকলকেই আটকে রাখে। নটশেখর অর্ধেন্দু মুস্তফী যেখানেই যান আসর জমিয়ে নেন। গোলাপ বাগের অধিকর্তার সঙ্গে এমনি আরো অনেকের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। কলকাতার ফুটন্ত গোলাপ বিনোদিনী ভিন্ন সুবাসে লাহোরবাসীর মন জয় করে। গোলাপ বাগে এসে যখন তখন সেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতো বিনোদিনী।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

বাংলার শিল্পীকে লতা-মুকেশের প্রণাম

কলামন্দিরে গত সপ্তাহে (১৩-৪-৭৩) লতা মঙ্গেশকার ও মুকেশের একক ও দ্বৈতসংগীত এক উল্লেখযোগ্য সাংগীতিক ঘটনা। নিবেদন করলেন সংগীত-কলা মন্দিরের কর্তৃপক্ষ। পর পর তিনটি সন্ধ্যায় বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী কানন দেবী সর্বশ্রী পঙ্কজ মল্লিক ও রাইচাঁদ বড়াল। 'রেকর্ড ব্রেকিং বেস্ট আর্টিস্ট' লতা শুরু করলেন গজল ও ভজন দিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে গান শুরু করবার আগে লতা বললেন—'কাননদেবী এ আসরে অনুগ্রহ করে আমার গান শুনতে এসেছেন বলে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করছি। উনি বোধহয় জানেন না ছোটবেলা থেকে আমি ওঁর গান অভিনয় ও চেহারার কতবড় মুগ্ধ ভক্ত। দিদিজী আমায় বাংলা গান শোনাতে অনুরোধ জানিয়েছেন। খুব অফসোস হচ্ছে বাংলা গানের কোনটি জানিনা বলে। কিন্তু ওঁর আদেশ অমান্য করবার শক্তি আমার নেই। তাই স্মৃতির ওপর নির্ভর করে একটি বাংলা গান গাইছি'— বলেই আরও কিছু দিতে বাকী—শুরু করতেই সারা প্রেক্ষাগৃহে যেন রসের বন্যা বয়ে গেলো। এরপর তিনি নানা-যুগের জনপ্রিয় হিন্দী ছবির রজনীগন্ধা; পাকীজা; রোটি; মহল; বিশ সাল বাদ। গান গেয়ে গৌরবসমৃদ্ধ শিল্পীজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়কে জীবন্ত করে তুললেন। নদীর কলতানের মত প্রতিটি গানই শ্রোতাদের হৃদয়-তটকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু ঐ একটি বাংলা গানের মাধুর্যের স্মৃতি যেন অনপনেয় হয়ে রইল বাঙালী শ্রোতাদের মনে। আরাধিকা লতাকে পেলাম মীরার ভজনে।

মুকেশ তাঁর অপরূপ কণ্ঠে মিলন; সংযোগ; পূরব আউর পশ্চিম—ইত্যাদি হিট সং-এর ডালি সাজিয়ে দিলেন। কিন্তু গজল অঙ্গের গানে শিল্পী যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া গানগুলি সুরের যাদুতে যেন প্রেক্ষাগৃহকে স্তব্ধ করে রেখেছিলো।

প্রথম দিন অনুষ্ঠানের শেষে লতা-মুকেশ উভয়েই বাঙালী প্রথায় কানন দেবীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে গ্র্যান্ড হোটেলে অমৃতের প্রতিনিধির হাতে লতা তাঁর সদ্যপ্রকাশিত এল পি ডিস্ক মীরা ভজনে 'উইথ কাইন্ডেস্ট রিগার্ড টু কাননদিদিজী' লিখে ও বন্ধু ভক্তের আমলের একটি সোনার পিন কানন দেবীর হাতে পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানিয়ে বললেন 'দিদিজী যেন নববর্ষে আমার এই সামান্য প্রণামী নিয়ে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করে নেন। আমি তিনদিন ধরে চেষ্টা করেও ওঁর ফোন পেলাম না। যাবার আগে দেখাও হোলো না'— মনে হোলো শ্রদ্ধা ও স্নেহের বন্ধনে ভারতের দুই প্রান্ত দেশের মেলবন্ধন হোলো শিল্পের ক্ষেত্রে। কিংবদন্তীতুল্য যশ ও অর্থের অধিকারিণী হয়েও লতার হৃদয় কঠিন হয়ে যায়নি। হৃদয়াবেগের নরম মাটিটি আজও উর্বর।

চিত্রাঙ্গদা

সেদিন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে স্নো ফ্লেক্স ক্যাবারে'র সেটে উত্তমকুমারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনি এপ্রিল মাসে প্রায় ছাব্বিশ দিন একটানা এই ছবির সেটে শুটিং করছেন। অথচ কোন বিরক্তি নেই ঝামেলা নেই। ফ্লোরের মধ্যে এখন এই অসহ্য গরম, অসংখ্য একসট্রার উপস্থিতি টেকনিক্যাল কারণে উৎরে যাওয়া শটের হঠাৎ হঠাৎ এন জি হয়ে যাওয়া, যে কোন মানুষই এতে ক্ষেপে উঠতে পারে। কিন্তু উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে তার যেন কোন লক্ষণই নেই। নির্ধারিত সময়ে উনি ফ্লোরে আসছেন, মেকআপ করছেন, শট দিচ্ছেন, আবার প্যাক-আপ হয়ে গেলে বাড়ি যাচ্ছেন। যেন এটা রুটিন ওয়ার্ক, তার এক চুলও নড়চড় হবার উপায় নেই। আর এই অধ্যবসায় নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতাই ও'কে আজ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে, এই জনাই উনি আজ এই বয়েসে সব শ্রেণীর দর্শককে মুগ্ধ করে রাখতে পারেন।

জানতে চেয়েছিলাম—নিজে কবে আরম্ভ করছেন ছবি?

উত্তমকুমার মৃদু হেসে জবাব দিলেন—দেখি, চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি আরম্ভ করতে পারি—

—আপনি কি এবার শিল্পী-সংসদের ছবি পরিচালনা করবেন, যেমন করেছিলেন বনপলাশির পদাবলী?

—হ্যাঁ, ও'দের হয়ে একটা ছবি আমায় করতে হবে—

—কি ছবি?

উনি সামান্য চুপ করে থেকে বললেন—সংসদের সকলের ইচ্ছে যে 'সিরাজদ্দৌলা' হয়—

—আর আপনার ইচ্ছে?

উনি জবাব দিলেন না। শুধু নিঃশব্দে হাসলেন।

*

স্টুডিওর লনে একটা ফিয়াট গাড়ি এসে থামল। শেখর চ্যাটার্জি এলেন। সঙ্গে পরিচালক মৃণাল সেন এবং আর একজন ভদ্রলোক।

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলাম।

মৃণাল সেন আজকাল সহজে মুখ খুলতে চান না। পীড়াপীড়ি করতে হেসে বললেন, ভাই এবার বাংলা ছবি নয়, ভাবছি একটা হিন্দী ছবি করব...

—কালার?

—হ্যাঁ, রঙীন ছবি। তবে কলকাতায় কালার ফিল্মের তো কোন ল্যাবরেটরী নেই, ফলে সেই বোম্বের ওপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে। টেকনিশিয়ান্স অবশ্য তাঁরাই, বরাবর যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করেন—

—কবে নাগাদ শুরু হবে?

—সেটা ভাই এখুনি বলতে পারব না।

মৃণাল সেন চলে গেলেন। আসলে উনি এসেছিলেন কি-যেন একটা ছবির প্রোজেকশন দেখতে, স্কোরিং খালি না থাকায় সেটা আর হল না।

*

ইদানিং ফিল্মে যে টাকা খাটে তার সঙ্গে কালো টাকার সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই আছে, আর আছে অপরাধ চক্রের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা। বোম্বেতে যখন অ্যান্টি-স্মাগলিং ড্রাইভ আরম্ভ হলো, দেখা গেল ফিল্মের উপর তলার কিছু খ্যাতনামা (?) মানুষ সেই চক্রের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। বোম্বেতে এটা সবাই জানে, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কথা বলতে সাহস পায় না। কারণ এই চক্রের সঙ্গে এমন সব বেপরোয়া অ্যান্টি সোশ্যাল মস্তানরা জড়িত যে সামান্য বেফাঁস কথা বললে জীবন নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবার ভয় থেকে যায়। এখন কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীতে যে টাকা খাটছে, এর সঙ্গে স্মাগলারদের অনায়াস অর্জিত টাকার কি কোন সম্পর্ক নেই? নেই কি বেআইনী-ভাবে উপার্জিত টাকার কোন যোগসূত্র? ফোর-টুয়েন্টি করে আনা টাকার আত্মীয়তা?

গত সপ্তাহে স্টুডিওতে ঢুকে শুনলাম কে একজন হবু প্রোডিউস্যারকে পুলিশ অ্যাটক করেছে, তার বিরুদ্ধে নাকি স্মাগলিং-এর চার্জ, চিটিং-এর চার্জ, ফোর্জারির চার্জ ইত্যাদি। সেই প্রোডিউস্যারের সঙ্গে কলকাতার ছবির এক তথাকথিত নায়িকাও জড়িত, জড়িত একজন পরিচালক। তাই নিয়ে স্টুডিওতে উত্তেজনাপূর্ণ আলাপ-আলোচনা। কত জনের কত ধরনের রসাল মন্তব্য। ভাগ্যিস আমাকে কেউ চেনে না, তাই এমন সব কথা শুনলাম যে কানে আঙুল দিতে হয়।

বেশ কিছুদিন আগে একজন প্রোডিউস্যার পুলিশের হাতে পড়েছিলেন, তিনি নাকি পারমিটে তোলা স্টীল কালোবাজারে বিক্রী করে দু-হাতে টাকা লুটেছিলেন। তিনি তখন ফিল্মের এক তথাকথিত অভিনেত্রীকে নিজের রক্ষিতা করে রেখেছিলেন। ফলে আর একটি মেয়ে জেলাস হয়ে সেই প্রোডিউস্যারের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নাকি সব ফাঁস করে দিয়েছিল। যাই হোক, এখন সেই অভিনেত্রী, দেহসর্বস্ব মেয়েই, কলকাতায় নেই। বোম্বে না মাদ্রাজে কোথায় যেন থাকে, ফিল্মে চান্স পাবার আশায়। হায়রে গ্ল্যামারের লাইন!

*

ডাইনিং টেবিলের ওপর থালা, ক্যামেরা সেই থালার ওপর ধরা, ট্র্যাক-ব্যাক করতে শক্তিশালী মিচেল ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে উদ্ভাসিত হলো শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের একটি অধ্যায়; টেবিলে বসে খাচ্ছে নরেন। আর তার সামনের চেয়ারে বসে বিজয়া ঝালর-দেওয়া হাত-পাখা দিয়ে মৃদু মন্দ বাতাস করছে, স্মিত মুখে।

বলা বাহুল্য নরেন সেজেছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি, আর বিজয়ার রূপসজ্জা নিয়েছেন সুচিত্রা সেন। 'সাতপাকে বাঁধা' ছবির পর এই জুটি ফিল্মে আবার একত্রিত হলেন।

নরেন বলল—আজ আর কিছু বলতে পারবেন না, আজ একেবারে চেটেপুটে পরিষ্কার করে খেয়েছি—বলে নরেন দৈ-এর বাটিতে হাত লাগায়। খানিকটা খেয়ে ক্ষান্ত হয়। দেখে বিজয়া তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—একি, দৈটুকু যে পড়ে রইল, সবটা নিন—

নরেন শশব্যস্তে বলে—না না, অসম্ভব খেয়েছি, আর কিছুতেই পারব না...

বিজয়া অনুরোধ করে—তাহলে অন্ততঃ একটা সন্দেশ খান—

নরেন রাজী হয় না। উঠে দাঁড়ায়।

বিজয়া গোপাল চাকরকে ডেকে বলে—এই গোপাল, বাবু হাত ধোবেন, ওকে স্নানের ঘরে নিয়ে যাও—

নরেন গোপালের পেছন পেছন স্নানের ঘরে হাত ধুতে যায়।

এবার বিজয়া এগিয়ে যায় পাশের দেয়াল গিরির দিকে। ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যায়। বিজয়া সেখান থেকে একটা রুপোর পানের ডিবে তুলে নিয়ে এদিকে তাকায়। দেখা যায় নরেন হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে আসছে। বলছে—আচ্ছা আমি একটা কথা ভেবে খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এই যে এত যত্ন-আত্তি করে খাওয়ানো, এটা কি করে সম্ভব?

বিজয়া ওর মুখের দিকে নীরবে তাকায়। সামান্য চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলে—কেন? আপনার জনকে কেউ কি যত্ন-আত্তি করে না?

আমি সে ও সখা

প্রযোজনা : এস ডি প্রোডাকসন্স

কাহিনীর অভিনবত্বে ও
ছবি হিসাবে বিবেচিত হবে
অভিনয়ে একটি উপভোগ্য

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সুধীর, স্কুল জীবনেই চুরি করার অপরাধে ওকে বহরমপুর বোরস্টাল রিফর্মেটরীতে আসতে হোল। ঘটনাচক্রে সুধীরের প্রতিবেশী ও বন্ধু প্রশান্তর বাবা তখন সেখানকার জেলর। উনিই ওকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেন এবং ডাক্তারী পাশ করান নিজের ছেলে প্রশান্তর সঙ্গে। দুই বন্ধু সেবার লক্ষ্মৌতে বেড়াতে এসেছে, সে সময় ইতিহাসের ছাত্রী ও খ্যাতনামা লেখিকা চন্দ্রাণীও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সেখানে এসেছেন। কালক্রমে দুই বন্ধু সুধীর ও প্রশান্তর সঙ্গে পরিচয় হোল চন্দ্রাণীর। দুই বন্ধুই চন্দ্রাণীর প্রতি আকৃষ্ট হোল। কিন্তু সুধীর বন্ধু প্রশান্তকে জেনে সুযোগ করলেও সুধীর ... পিছিয়ে ... সে ... কাছে ... গেল। বাবার ... ইচ্ছায় প্রশান্ত বিলেতে গেল উচ্চশিক্ষা ... জন্যে তার সুধীর ... গেল ... দেখার জন্যে। লণ্ডন থেকে ... প্রশান্ত ... সুধীর ... নার্সিংহোম খুলল ... অপারেশন করার জন্যে প্রচুর অর্থাগম হওয়ায় আনন্দ উপচে পড়লো ওদের জীবনে। আচমকা একটা রুগীর মৃত্যু হওয়ায় পুলিশে খবর যায়। এবারেও প্রশান্তকে বাঁচিয়ে সুধীর সমস্ত অবৈধ কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব নিয়ে জেলে যায় প্রশান্ত ও চন্দ্রাণীর আনন্দের সংসারকে রক্ষা করার জন্য।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা কাহিনীর মধ্যে চমক সৃষ্টি করার মতো অনেক উপাদান আছে। পরিচালক ও চিত্র-নাট্যকার মঙ্গল চক্রবর্তী কাহিনীর বাস্তব রূপায়ণের জন্যে যে সাসপেন্স সৃষ্টি করেছেন সারা ছবির মধ্যে, সেটা সকলকেই আনন্দ দেবে। অভিনয় এ ছবির আর একটি আকর্ষণীয় দিক—অধীর ও সুধীর—দুই চরিত্রে উত্তমকুমারের অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের ও বাস্তবসম্মত। এই বয়সে এমন সুন্দর অভিনয় সচরাচর দেখা যায় না। চন্দ্রাণীর ভূমিকায় কাবেরী বসুর অভিনয় সংযত ও চরিত্রানুগ। বন্ধু প্রশান্তর ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও সুন্দর। অপর একটি নারী চরিত্রে ... ও আবেগে বেশ সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছেন আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রে ... তরুণকুমার, ... মুখার্জি, বাসবী নন্দী বনানী চৌধুরী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ... প্রভৃতি চরিত্রোচিত দাবী মিটিয়েছেন। ... বিজয় ঘোষ অন্তর্দৃশ্য ও বহির্দৃশ্য ... দেখিয়েছেন। অন্যান্য কাজ পরিচ্ছন্ন। সঙ্গীত পরিচালনায় ও ... শ্যামল মিত্র তাঁর সুনাম রক্ষা করেছেন।

—চিত্রদূত

নরেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে যেন ওই মুহূর্তে একটা প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজেছিল।

এরপর বিজয়া ওর দিকে পানের ডিবটা এগিয়ে দিয়ে হেসে বলে—নিন।

নরেন পান তুলে মুখে দেয়।

বিজয়া ওকে আহ্বান করে—আসুন—

আমরা দেখতে পাই, বিজয়াকে অনুসরণ করে নরেন ধীরে ধীরে ক্যামেরার বাইরে চলে যায়।

পরিচালক অজয় কর দৃশ্যটিকে এখানেই কেটে দিলেন।

ছবিটি অর্থাৎ 'দত্তা' প্রযোজনা করছেন বিমল দে, পরিচালনা অজয় করের। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী, দুলাল দত্ত, গৌর পোদ্দার ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সুচিত্রা সেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া এ-ছবির কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন উৎপল দত্ত, সমিত ভঞ্জ, শৈলেন মুখার্জি প্রভৃতি। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন ক্ষিতীশ আচার্য। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে এ-ছবির অন্তর্দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে।

মুজাফ্ফর

ইণ্ডিয়ান আর্টস থিয়েটার
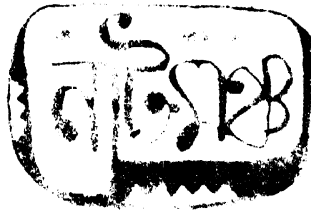
এদেশে নাট্যশালার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যাও স্বল্প। এবং আজও পর্যন্ত এই পশ্চিমবঙ্গে একটি 'জাতীয় নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এই অভাব পূরণ ও সেই সঙ্গে একটি সুসংহত নাট্যভাবনা গড়ে তোলার জন্য অতি সম্প্রতি কোলকাতায় যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির জন্ম হয়েছে তার নাম ইণ্ডিয়ান আর্টস থিয়েটার (ঠিকানা ৪৮।৯ ... কলকাতা ৬)। ... ভারতী শিল্পবিদ্যালয় ইতিমধ্যেই এই ইনস্টিটিউটটিকে অনুমোদন দিয়েছে। এখানে দু বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে।

সম্প্রতি প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীপ্রকাশ নন্দী এ সম্পর্কে তাঁদের কর্মসূচী এবং আলোচনা প্রসঙ্গে আজকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সংস্থার কর্মসূচী

বিস্তারিতভাবে নিবেদন করেন সম্পাদক স্বারিক মজুমদার।

একতারার 'গায়ক যখন নায়ক'

সাধারণত নৃত্যনাট্যকে নাটকে রূপান্তরিত করে তাকে পরিবেশন করায় কিছুটা প্রতিবন্ধক থেকেই যায়। সেদিক থেকে একতারা শিল্পী চক্রর প্রচেষ্টা সার্থক বলা যায়।

'গায়ক যখন নায়ক' এমন একটি প্রতিভার রূপান্তর ও পুনরায় প্রত্যাবর্তনের গল্প যে এক অখ্যাত গ্রামের গায়ক। গ্রামের ছেলে অধীর। প্রাণের আনন্দে গান গেয়েই দিন কাটে তার। আপনভোলা এই গায়ক যে আপনাতে আপনিই বিভোর—এক দিন সে দেখা পেল অনন্ত দাসের। বিদ্রোহের গান গেয়ে যে গ্রামের মানুষকে স্বদেশী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। তাকে গুরু মেনে অধীর যেন বৃহত্তর পৃথিবীর খোঁজ পেল। ক্রমে একদিন তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে সহরে। সে সহরের স্বার্থপর মানুষের শিকার হোল। সহরের 'আনন্দলোক' নামক একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের মালিক তার গান শুনে প্রীত হয়ে নিজের স্বার্থপূরণের জন্য তাকে দলে টেনে নিল।

সৃজন-এর মা

ম্যাক্সিম গার্কীর মার সম্পর্কে বোধকরি আজ আর কোন ভূমিকার অবকাশ নেই। বিশ্বের চিরকালীন সর্বহারা মানুষের একান্ত আপনজন গোর্কীর মা।

সেই অতুলনীয় সৃষ্টির ভাষান্তর নাট্যরূপ সম্প্রতি পরিবেশন করলেন নতুন নাট্যসংস্থা সৃজনগোষ্ঠী।

গোর্কীর মা'র অস্তিত্ব আজ প্রায় আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। এই অনুভব ও অনুভূতির আবেগ নাটকের মাধ্যমে পরিবেশন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা সৃজনগোষ্ঠী সসম্মানে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

অভিনয়ে প্রথমেই যে দু'জনের কথা দর্শকরা দীর্ঘকাল মনে রাখবেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে মা'র ভূমিকাভিনেত্রী শ্রীমতী অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রোভের ভূমিকাভিনেতা জ্যোতিপ্রকাশ (নাটকের নির্দেশক)।

এ'দের পরেই নাম করতে হয় বাসব মিত্র (পাভেল) সোমদেব বসু (আন্দ্রে) ও তপন বিশ্বাসের (ইসাই)।

আগেই বলেছি এ নাটক অভিনয় করা খুবই দুরূহ। সে কথাটা নাটক দেখতে দেখতেও একাধিকবার মনে হয়েছে। আর তখন প্রশংসা করতে হয়েছে এ'দের নিষ্ঠার। এমন আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্যই দুর্লভ।

অন্যান্য ভূমিকায় বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়চৌধুরী, কল্যাণ কর্মকার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর মিত্র, প্রতাপ বাগচী, বলরাম গাঙ্গুলী, উজ্জ্বল ঘোষ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অবনী দাস, অমিত ভট্টাচার্য, অমল সেন, আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিমল মুখোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ চক্রবর্তী, প্রদীপ সিকদার ও প্রদীপ মিত্র পরিমাণানুযায়ী এবং সুন্দর অভিনয় করেছেন। নারী চরিত্রে রাণু রায় ও নীলিমা চক্রবর্তীও সার্থক।

নাটকের সংলাপ রচনা (নাট্যরূপ বিধু চক্রবর্তী) অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। অনুবাদের জড়তা নেই বললেই চলে।

তাপস সেনের আলো নাটকের পক্ষে সহায়ক হয়েছে বলা যায়।

বাগবাজারে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

—অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনীর পরিচালনায় শিগগিরই একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ করুন —সমর সেন, সাধারণ সম্পাদক, বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী। রেজিস্ট্রার্ড কার্যালয় ৭৮ বাগবাজার স্ট্রীট (হরনাথ হাইস্কুল) কলিকাতা-৩ অথবা শিবনাথ ভট্টাচার্য, প্রধান সংগঠক, আর, পি, বি, এস; ৫৬।১ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। সময় রাত্রি ৭-৩০ মিঃ হতে ১০টার মধ্যে।
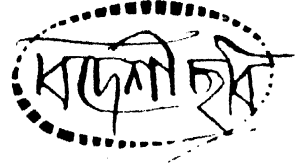
মেট্রোয় উপভোগ্য ইংরেজী ছবি

দীর্ঘদিন পরে মেট্রো সিনেমায় আবার যে ইংরেজী ছবিটি দেখানো হচ্ছে তার নাম 'দি ক্রেজি বয়েস অফ দি গেমস'। ছবিটি যেমন উপভোগ্য তেমনি দর্শনীয়।

নতুন বিদেশী ছবি কোলকাতায় এখন আসে না বললেই চলে। সেদিক থেকে এটি কোলকাতার ইংরেজী ছবির দর্শকদের কাছে বড় পাওয়া।

'দি ক্রেজি বয়েজ'—ছবির পটভূমি প্যারিসের একটি ছোট গ্রাম। এর মূল চরিত্র চারজন, যারা দেশে প্রথম পপ মিউজিক গ্রুপ তৈরী করে এবং যাদের বলা হয় 'সমস্যা'। অর্থাৎ এমনই বিভ্রান্তিকর অথচ মজাদার চরিত্র এরা। এদেরই অ্যাডভেঞ্চার এবং নির্বিকার অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই ছবিটি দেখতে দেখতে দর্শক একাধারে যেমন নির্মল আনন্দ উপভোগ করবে তেমনি পরিচ্ছন্ন ছবি দেখার তৃপ্তি অনুভব করবে। আর ছবি দেখতে বসে বিটলস দলের ও হার্ডি এবং মার্কস ব্রাদার্সের কথা মনে পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এমন স্বচ্ছন্দ অভিনয়ও দীর্ঘকাল মনে রাখবার মত। বিশেষ করে এদের অলিম্পিক গেমে অংশগ্রহণ।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন পরিবেশিত প্যারিস এশিয়া ফিল্ম—প্যাথে ওভারসীজ নিবেদিত এই ছবিটির পরিচালক ক্লড জিদি।

এ ছবিতে আবহ সঙ্গীতের প্রয়োগ যেমন সুন্দর তেমনি শ্রুতিমধুর।

ক্ষিপ্রগতি বর্ণাঢ্য এই ছবিটি কলকাতার দর্শককে প্রীত করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ছবিটির পরিবেশক গুডউইন পিকচার্স।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 16th May. 197
Phone 55-5231 (14 lines)

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১৩ জুন ১৯৭৫ ॥
মূল্য ৬৫ পয়সা

সাধনা
আমলা
সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

১৫ বর্ষ

৫ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

শুক্রবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	আদিখ্যেতা	(গল্প)	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১০	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১২	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১৩	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৪	বহুরূপীর রক্তকরবী		শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ
১৭	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৮	সুরের আগুনে		শ্রীসন্ধ্যা সেন
২০	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
২৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		[illegible]
৩০	জানলা খুললে ঈশ্বরের মুখ	(কবিতা)	শ্রীঅজিত বাইরি
৩০	বলে দাও	(কবিতা)	শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
৩০	মিষ্টি চুম্বন	(কবিতা)	ওয়াজেদ আলি

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩১	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
৩৪	চিঠিপত্র		
৩৬	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৯	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে		শ্রীদিলীপকুমার রায়
৪২	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৩	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৪৪	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
৪৫	এক জোড়া চাতক	(গল্প)	শ্রীপ্রভাসকান্তি ভদ্র
৫০	শেষ বিচার	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৫২	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৫	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৫৬	মাঠের মানুষ		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৭	দেশবিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৮	খেলার জগতে আগে		শ্রীঅময়
৫৯	সিনেম্যাটিক টক		শ্রীবুঞ্জন মজুমদার
৬০	জোর থেকে বলছি		শ্রীমুসাফির
৬৫	বোম্বাই ফিল্মের কথা		শ্রীঅভিজিৎ
৬৬	স্টুডিও সংবাদ		স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৭	চিত্রসমালোচনা		শ্রীচিত্রদূত
৬৮	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৭০	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭০	মঞ্চাবলি		নাট্যসমালোচক

প্রচ্ছদ : শ্রীপাঁচুগোপাল দে

কলকাতার ভূগর্ভ রেলের ভবিষ্যৎ

বোম্বাইয়ের প্রস্তাবিত ভূগর্ভ রেল নাকি বাতিল হয়ে গেছে। কলকাতার ভূগর্ভ রেলের কাজ চলছে ঢিমেতালে। লক্ষণ দেখে মনে হয় না যে ১৯৮০ সালের মধ্যে এর কোনো অংশ চালু হতে পারবে। ইতিমধ্যে সম্প্রতি একটি সংবাদপত্র জানাল যে, রাশিয়া থেকে প্রতিশ্রুত যন্ত্রপাতি পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় কলকাতার ভূগর্ভ রেলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং কার্যত পরিত্যক্ত। এই চাঞ্চল্যকর সংবাদে কলকাতাবাসী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু খবরটা যে ঠিক নয় এবং অনেকটা অতিরঞ্জিত তা পরের দিন অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে স্পষ্ট হল। ভূগর্ভ রেলের কাজ চলছে এবং তা বিলম্বিত হলেও পরিত্যক্ত হয়নি। কলকাতার যানবাহনের সমস্যা যে-হারে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, এ অবস্থায় ভূগর্ভ রেল পরিত্যক্ত হলে এবং বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না হলে এই শহরে আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরে কাজকর্ম অচল হয়ে পড়বে। কারণ জনবসতি বাড়বে অথচ সেই বাড়তি মানুষকে কাজের জায়গায় পৌঁছে দেবার ও বাড়ি নিয়ে আসার ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল।

কলকাতার মতো জনসংখ্যা যে সমস্ত শহরে আছে যেমন টোকিও, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, সেখানে অনেক আগে থেকেই যানবাহন ব্যবস্থা এমনভাবে পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল যে, তাদের এই দুরবস্থায় পড়তে হয়নি। কলকাতায় মানুষ যেভাবে বাসে ট্রামে ও ট্রেনে যাতায়াত করেন তা ভারতের অন্য কোনো শহরেই অবিশ্বাস্য মনে হবে। বোম্বাই শহরের লোকসংখ্যা কলকাতার তুলনায় কম নয়। সেখানে বাসে এখনও বসে যাবারই রীতি। ক'জন দাঁড়িয়ে যেতে পারবে তাও নির্দিষ্ট। কলকাতা শহরের দুরবস্থা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। যুদ্ধ, মন্বন্তর এবং দেশভাগের পুরো চাপ সহ্য করতে হয়েছে এই শহরকে। সে তুলনায় তার উন্নয়নের দিকে নজর পড়েনি। আজ স্বাধীনতার পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর কলকাতার উন্নয়নে হাত দেওয়া হয়েছে যখন তার জনসংখ্যা উপচে পড়ছে, তার রাস্তাঘাট বহু-ব্যবহারে ও অবহেলায় জীর্ণ, পয়ঃপ্রণালী সংকীর্ণ এবং নতুন রাস্তা তৈরির সুযোগও সীমাবদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ রেল কলকাতাবাসীর সামনে একটি আশা, সে আশা আমরা বিনষ্ট হতে দিতে পারি না।

আর্থিক অসুবিধার কারণে ভূগর্ভ রেলের কাজকর্মের পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। এটাই দুশ্চিন্তার কারণ। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে-কাজ করা উচিত ছিল তা পিছিয়ে দিলে আর্থিক ক্ষতি তো বাড়বেই, সমস্যাও আরও জটিল হয়ে পড়বে। রাশিয়ার কাছ থেকে যে সাহায্য প্রত্যাশিত ছিল, তা আজ হঠাৎ পূর্ণ হচ্ছে না কেন, সেটাও তলিয়ে দেখা দরকার। রাশিয়ানদের কথামতোই ভূগর্ভ রেলের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। তবে আমরা কী পরিমাণ যন্ত্রপাতি রাশিয়ার কাছ থেকে চাই তা পরিষ্কার ভাষায় আগেই জানিয়ে রাখা উচিত ছিল। কারণ, পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে কোনো দেশের পক্ষে হঠাৎ সাহায্য করা সম্ভব নয়। ভূগর্ভ রেলের জন্য স্থির করা ছিল ১৪০ কোটি টাকা। কিন্তু সময়মত কাজ আরম্ভ না হওয়ায় ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। তার ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এখনকার দ্রব্যমূল্যের নিরিখে দাঁড়াবে ২৫০ কোটি টাকা। কিন্তু কর্মসূচীর বর্তমান সময়সীমা যদি রক্ষা করা না যায়, তাহলে টাকার অঙ্ক আরও বাড়বে। সুতরাং আর টালবাহানা না করে ভূগর্ভ রেলের কর্মসূচী অবিলম্বে রূপায়ণে তৎপর হওয়া উচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক আছে। দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতাও ক্রমশ প্রশস্ততর হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে কলকাতার ভূগর্ভ রেলের জন্য প্রতিশ্রুত সাহায্য পাওয়ার পথে সাময়িক বাধা অপসারণ করা খুব কঠিন হবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের সাময়িক অসুবিধা থাকলে তা দূর হয়ে যাবে এটাই আমরা আশা করব। বস্তুত এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলে তা হবে নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ ইতিমধ্যে বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আমরা মনে করি, স্থির সংকল্প, কর্মনিষ্ঠা এবং কলকাতার সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের সত্যিকারের আন্তরিকতা থাকলে ভূগর্ভ রেলের সাময়িক অসুবিধা দূর করা মোটেই অসম্ভব নয়।

পিয়ানোর ওপর-তলাটা শেলফের মতো। সেখানে আমি শুয়ে। যাকে আমার দিদি বলে ডাকার কথা সেই দিদি দারুণ একটা বাজনা বাজাচ্ছে। বাজনা-টাজনা গান-টান আমি বুঝি না। কিন্তু এ-বাড়ির সবাই শোপাঁ-শোপাঁ, বিথোফেন-বিথোফেন, বাখ্-বাখ্ বলে পাগল। বাজনাটা নাকি বাখ্-এর। আমি অতশত জানি না। আমার কাছে বাখ্ও যা, কাকও তাই। তবে কাকদের আমি চিনি। কারণ ভোর হলেই তারা কা-কা করে ডাকে। তাদের ডাক শুনতে ভালো না লাগলেও মন আমার খুসি হয়ে ওঠে। কারণ জানি আমার দিদি ধড়মড়িয়ে উঠবে। আর তারপর ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা দুধ সবুজে একটা পেয়ালায় ঢেলে আমার জন্যে নিয়ে আসবে।

আমার খাবার সময় চুকচুক করে একটা শব্দ হয়। সেটা শুনতে শুনতে আমার যে দিদি আর তার যারা বাবা-মা—তাদের সব্বাইকার নাকি দারুণ ভালো লাগে।

কিন্তু এটা তো আদিখ্যেতা! আদিখ্যেতা টাদিখ্যেতা আমার ধাতে সয় না। বাখ্ না কাক—তাকে নিয়েও আদিখ্যেতা আমার বরদাস্ত হয় না।

কিন্তু কী আর করা যায়?

চুকচুক করে দুধ খাই। আর তারপর কালো পিয়ানোটার ওপরতলার শেলফে শুয়ে খুব সাবধানে—কোনো শব্দ-টব্দ না করে—আমার ডান থাবা দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফ আঁচড়াই। আমার বয়েস কম হলে হবে কি—মস্ত এক জোড়া গোঁফ আছে। কারণ গোঁফ নিয়েই যে আমরা জন্মাই!

গোঁফ আঁচড়াতে আঁচড়াতে আমার ঘুম পায়। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত স্বপ্নই না দেখি!

স্বপ্নগুলো ফুলঝুরির মতো। নাকি রংমশালের মতো? কে জানে!

একটা কথা প্রথমেই বলে রাখি। আমি কোনো দিন জন্মাতে চাইনি। জন্মাবার অনেক ঝামেলা। তা তো নিতাই দেখছি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমার মনের কথাটা কারুরই কানে যায় নি। যাবার কথাও নয়। আমি তো নেহাৎই একটা বেড়াল!! কে তার কথায় কান দেবে, বলো? তাছাড়া বেড়ালের ভাষাই বা কে বুঝবে? —তুমি সম্পাদকমশাই, তুমি সব লেখকদের চরিয়ে বেড়াও। সব রকম ভাষাই তোমার রপ্ত। তাই আমার জন্মের পরের কথা-গুলো তোমাকেই বলি।

সবে তখন আমার চোখ ফুটেছে। ভোরের আলো আমার চোখে এসে পড়েছে। দেখি—একরাশ এঁটো কলাপাতা, ভাঙ্গা খুরি, আধ-খাওয়া চপ-কাটলেট, ঘি-ভাত, ছেঁড়া লুচি আরো কত যেন কী সবের আঁস্তাকুঁড়ের মধ্যে আমি পড়ে আছি। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হোলো। কিন্তু গলা তখন শুকিয়ে কাঠ।

এমন সময় কারা যেন সেই বিয়েবাড়ির আঁস্তাকুড়টা হাটকাতে লাগলো।

তারপরেই শুনলাম, 'হা রাম। এতো বিল্লি—!'

'জিন্দা হ্যায়?'

'হ্যাঁ রে, চুকচুক করছে।'

'মার ডালো! মার ডালো!'

'ছি-ছি। মারিস না। ভগবানের জীব।'

'ভগওয়ান নেই খিলানেসে কোন খিলায় গা?'

'ও-সব কথা ছাড়। এটাকে ময়দানে ফেলে দিয়ে আসি?'

'আছি বাত। ময়দানেই ডাল দে—'

আবার যখন ঘুম ভাঙলো, বা জ্ঞান হোলো—যাই বল—দেখি, চাকা-লাগানো একটা সিন্দুকের মতো জিনিসের তলায় শুয়ে আছি। ভিজে ঘাসে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আর কেঁচোগুলো চারপাশে মাটি খুঁড়ে ঢিবলি বানাচ্ছে।

কে যেন হেঁড়ে গলায় বলে উঠলো, 'দোঠো ভেলপুরি দেও।'

আর তারপরেই ভারি মিষ্টি গলায় কাকে যেন বলতে শুনলাম, 'আহা রে! এখনো বেঁচে আছে—'

তখন জানতাম না—সেটা আমার দিদির গলা।

তারপর সিল্কের শাড়ির খসখস। আর তারপরেই একটি নরম দেহের গরমের আমেজে আমার সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল!

'এই রুনি! দূরে কর ফেলে দে। ডিপথিরিয়ার জার্ম—!'

'আহারে! মরি-মরি! কী সুন্দর সবুজ চোখ—'

'রুনিটার আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে। কোথাকার একটা ন্যাংলা হ্যাংলা বেড়াল-ছানা! অসুখের ডিপো—'

'রুনি! ভালো হবে না বলছি। ফেলে দে, ফেলে দে—'

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন

বীরেন্দ্র দত্ত

'কক্ষণো ফেলবো না। ফেললে মরে যাবে। একে আমি বাড়ি নিয়ে যাবো—'

'তুমিই তো আস্কারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়েছো। আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি নে!'

তখন বুঝি নি। এখন বুঝি কথাগুলো হচ্ছিলো আমার দিদি, তার দাদা আর তার মা-বাবার মধ্যে।

সেই সিন্দুকমতো চাকা লাগানো জিনিসটার তলাকার ভিজে ঘাস আর কেঁচোর ঢিবলিগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে সিল্কের শাড়ির খসখস, সেন্টের মিষ্টি গন্ধ আর নরম দেহের গা-জুড়নো গরমের মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। —থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়াই আমার ধাত।

এখন সকাল বেলায় বাথ-এর বাজনা শুনে আমি ঘুমই। তারপর মাছ-ভাত খাইয়ে দিদি কলেজে যায়। তার বিছানার মাথার বালিশের পাশে শুয়ে সমস্ত দুপুর আমি ঘুমোই। বিকেল বেলায় দুধ খেয়ে দিদিদের সঙ্গে কখনো লেকে, কখনো ময়দানে, কখনো গঙ্গার তীরে গাড়িতে চড়ে আমি বেড়াতে যাই। রাতে আবার মাছ-ভাত খেয়ে দিদির বিছানায় বালিশটার পাশে সেই জায়গায় শুয়ে ঘুমই।

বুঝতে পারি বাড়ির সবাইকারই এখন আমার ওপর বেশ খানিকটা মায়া পড়ে গেছে। এমন কি দিদির সেই দাদারও, যে নাকি ডাকসাইটে ফুটবল খেলোয়াড়। আগে সে কথায় কথায় আমাকে শুট করে বলে ভয় দেখাতো। এখন মাঝে মাঝে আমাকে শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে লোফালুফি করে।

কিন্তু দিদির সত্যি সত্যিই সবকিছুতে বাড়াবাড়ি। বাড়ির লোকেরা সেটাকে বলে দিদির আদিখ্যেতা। এই যেমন ধর কথায়-কথায় আমাকে তার ঠোঁটের ওপর চেপে চুক করে একটা শব্দ করা—সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, দুপুরে কলেজে যাবার আগে, বিকেলে কলেজ থেকে [illegible] পর আর রাতে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক [illegible]।

দিদির এই আদিখ্যেতাটার জন্যেই মাঝে মাঝে এখনো অশান্তি হয়।

দিদির মা বলে, 'বেড়াল প[illegible] তো পোষ। মুখে মুখ দিয়ে চুম[illegible] এ আবার কী ধরনের আদিখ্যেতা!'

দিদির বাবা বলে, 'রুনি—এই শেষ ওয়ার্নিং! আবার বেড়ালের মুখে মুখ দিতে দেখলে ওটাকে বোরায় ভরে গঙ্গায় ফেলে দেবো কিন্তু বলে দিলাম!!'

দিদির দাদা বলে 'এক শটে ওর বেড়াল-জন্ম ঘুচিয়ে দেবো।'

তাই দিদি এখন চালাক হয়ে গেছে। যখন কাছেপিঠে কেউ থাকে না তখনি শুধু আমাকে মুখের কাছে নিয়ে চুক করে শব্দ করে।

আর সত্যি বলতে কি—আমারও এই আদিখ্যেতাটা বরদাস্ত হয় না।—সে বাথ-এর বাজনাই বল আর দিদির চুমুই বল। আমি বাপু খাবার মানুষ, ঘুমুবার মানুষ। পিঠে গায়ে হাত বোলাও—সে এক রকম। কিন্তু মুখের কাছে মুখ আনা—ছিঃ!

যাক মোটের ওপর দিন বেশ কাটছিল। মানে বেশ ভালোই কাটছিলেম। চাকর-ঝি-দের [illegible]

শনি—পরের জন্মে যেন বেড়াল হয়ে জন্মাই!!—তবেই বোঝো দিদি কী আরামেই দিন কাটাচ্ছিলো।

কিন্তু হালে একটা উৎপাত এ-বাড়িতে হাজির হয়েছে। সে কথাটাই এবার বলি।

এই যে আচমকা উৎপাতটা হাজির হয়েছে সে বেশ লম্বা, খুব ফরসা, চোখে চশমা আর তুবড়ির মতো কথা বলে। বাড়ির ঝি-চাকররা তাকে বলে সাক্ষাৎ রাজপুত্তুর। দিদির বাবা-মা বলে হীরের টুকরো ছেলে। দিদির দাদা বলে ও-রকম ব্রিলিয়ান্ট ছেলে হয় না। জীবনে নাকি কখনো সেকেন্ড হয় নি। সাগরপারের আর্কিন না মার্কিন মুলুক থেকে অনেক সোনার মেডেল নিয়ে ফিরেছে। আবার নাকি সেখানে চলে যাবে। এ-বাড়ির কথাবার্তা শুনে বুঝেছি সবাইকার ইচ্ছে দিদিকেও সে যেন নিয়ে যায়।

দিদির ঠিক কী ইচ্ছে ঠিক বুঝছি না। তবে নতুন উৎপাতকে নিয়ে বাড়ির সবাই-কার মতো সোজাসুজি আদিখ্যেতা না দেখালেও বেশ বুঝতে পারি লোকটা এলে দিদি খুবই খুসি হয়ে ওঠে। যে দিদি কোনো দিন কলেজ কামাই করতো না সে এখন প্রায়ই কলেজ পালিয়ে লোকটার সঙ্গে সিনেমায় যায়। মাঝে মাঝে আমাকে খাবার দিতে দেরী করে ফেলে। মাঝরাতে হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে গুনগুন করে। পিয়ানোটার ডালা তুলে অন্যমনস্ক হয়ে খানিক টুং-টাং করে। তারপর বিছানায় এসে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবে। খুব আলতোভাবে আমার মাথায় হাত বোলায়। আর বড় বড় নিশ্বেস ফেলে।

আমি মটকা মেরে পড়ে থাকি। বুঝতে দিই না জেগে আছি।

কেবলই শুধু মনে হয় উৎপাতটা একলা-একলা ভালোয় ভালোয় সাগরপারের সেই মার্কিন মুলুকে বিদেয় হলে বাঁচা যায়। সেখানে যত খুসি সোনার মেডেল-টেডেল পাক—আমার আপত্তি নেই।

আজ সন্ধেয় আমি আর দিদি ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। দিদির যারা মা-বাবা তারা কোন এক বিয়ে-বাড়িতে গেলো। দিদিকেও যেতে বলেছিলো। কিন্তু দিদির খুব মাথা ধরেছে। তাই যায় নি। তার দাদা গেছে সিনেমায়। দিদিকেও যেতে বলে-ছিলো। কিন্তু দিদির তো খুব মাথা ধরেছে। তাই যায় নি।

আজ সন্ধেয় দিদির ঘরে শুধু আমি আর দিদি। পিয়ানোর ওপরতলা যেটা শেলফের মতো—সেখানে আমি শুয়ে। আর দিদি পিয়ানোর সামনে বসে আপন মনে দারুণ একটা বাজনা বাজাচ্ছে। আর আমার খুব ভালো লাগছে। বাজনা-টাজনার জন্যে নয়। শুধু দিদি আর আমি একলা আছি বলে।

এমন সময়—কথা নেই বার্তা নেই—দরজায় টকটক করে টোকা। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বন্ধ করে দারুণ চমকে দিদির দাঁড়িয়ে ওঠা। আর সেই মূর্তিমান উৎপাত—লোকটার ঘরে আসা।

আর তারপর তাদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা—

উৎপাত ঃ 'বিরক্ত করলাম?'

দিদি ঃ 'না, বিরক্ত কিসের?'

'একলা বাড়িতে কেন?'

'এমনি—মাথা ধরেছে।'

'আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিলো আজ সন্ধেয় তোমাকে একলা পাবো!'

'তাই নাকি?' (দিদির খুক-খুক করে হাসি)।

'কী ঠিক করলে?'

'কীসের কী ঠিক করবো?'

'সেই যে বলেছিলে দিন দুয়েকের মধ্যে জানাবে? আজকেই তো সেই দুটো দিন শেষ হলো?'

'নতুন কথা বলার কিছু নেই। আগেও যা বলেছি এখনো তাই বলছি—'

'মানে তোমার ছোকু-মহারাজকে ছাড়া (আমার নাম) তুমি থাকতে পারবে না?'

'ঠিক তাই।' (দিদিকে কী অসম্ভব ভালো লাগছে!)

'আমি যদি বেড়াল হয়ে জন্মাতাম—'

'তা হলে কী হোতো?' (দিদির খুক-খুক করে হাসি)।

'তাহলে ইয়ে, মানে তুমি হয়তো ভালো-বাসতে!' (উৎপাতের লম্বা নিশ্বেস)।

'হয়তো!' (আঁচলের একটা খুঁট দিয়ে ঠোঁট আড়াল করলো। মটকা মেরে কান খাড়া করে সবকিছু আমি লক্ষ্য করছি)।

'যদি বলি আমেরিকায় যাবো না। এখানেই খুব একটা ভালো চাকরির অফার পেয়েছি—?'

'তাই নাকি?' (ঠোঁট থেকে আঁচলের খুঁট সরিয়ে প্রায় লাফিয়ে গিয়ে উৎপাত-লোকটার দুটো হাত দিদি চেপে ধরলো)।

'তাহলে রাজী?'

'হ্যাঁ, ছোককু মহারাজও কিন্তু আমার সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে যাবে—'

'তা তো যাবেই—'

আর তারপর—আরে ছিঃ ছিঃ—সেই উৎপাত-লোকটার গলা জড়িয়ে দিদি কিনা চুক করে একটা শব্দ করলো!

দিদির সব ভালো। তা হলেও এই উৎপাতকে নিয়ে এমন আদিখ্যেতা কি সহ্য করা যায়?

তোমরাই বল।

রেশনে যোগ-বিয়োগ

পশ্চিম বাংলায় বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মানুষকে এই জুন থেকে খাওয়ার ব্যাপারে আরো একটু কষ্টস্বীকার করতে হবে। কারণ মাথা পিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত চাল-গম মিলিয়ে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মানুষ সপ্তাহে মাথা পিছু দু কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য পেতেন। এখন থেকে পাবেন ২৫০ গ্রাম কম। অবশ্য তা সত্ত্বেও গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিম বাংলাতেই বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় মাথা পিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ থাকবে সবচেয়ে বেশি। এতদিন পর্যন্ত মাথা পিছু গম দেওয়া হতো দেড় কিলোগ্রাম। এখন ঐ পরিমাণ হবে এক কিলোগ্রাম। তবে মাথাপিছু চালের পরিমাণ ৫০০ গ্রাম থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ গ্রাম করে এই ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য এই বাড়তি চালের জন্য বেশি দাম দিতে হবে—কিলো প্রতি সোয়া দু টাকা। কেন বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মানুষের এই রেশন ছাঁটাই? তার কারণ গ্রাম বাংলার খাদ্য অবস্থার অবনতি। গ্রাম অঞ্চলে আংশিক রেশন চালু আছে ঠিকই কিন্তু সেখানে রেশন দোকান থেকে প্রায় কিছুই মেলে না। আংশিক রেশন এলাকায় 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর কার্ডে রাজ্য সরকার জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মাথা পিছু ৫০০ গ্রাম গম দিতে চান। এর জন্য বাড়তি গম দরকার। রাজ্য সরকার এই বাবদ মাসে ২৫ হাজার টন বাড়তি গম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছিলেন। কিন্তু দশ হাজার টনের বেশি পাওয়া যাবে না। এখন রাজ্য সরকার দিল্লী থেকে মাসে ৮৫ হাজার টন গম পান। তার মধ্যে ৬০ হাজার টনই চলে যায় বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার চাহিদা মেটাতে। তাই এই এলাকার মাথা পিছু বরাদ্দ কিছুটা কেটে আর দিল্লীর কাছ থেকে পাওয়া বাড়তি গম মিলিয়ে আংশিক রেশন এলাকায় গম দেওয়া হবে। তবে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মানুষের কাছে সুখবর, জুন থেকে সুজি-ময়দা ইত্যাদির দাম কিছুটা কমবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন ময়দা কলগুলোকে যে-দামে গম যোগাতেন এখন থেকে তার চেয়ে কিছু কম দামে (কুইন্টাল) প্রতি ১৭০ টাকার জায়গায় ১৫০ টাকায় গম যোগাবেন।

পরীক্ষা নিয়ে তদন্ত

১৯৭৪ সালের বি-এ, বি-এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল নিয়ে কিছু দিন আগে যে তোলপাড় হয়ে গেছে তার কথা অনেকেই নিশ্চয়ই এখনও ভোলেননি। বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম পর্যন্ত কয়েক দিন অচল হয়ে যায়। পরীক্ষার্থীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, পরীক্ষার খাতা ঠিক মতো দেখা হয়নি, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর গুণ বিচার না-করে ঢালাও গড়পড়তা নম্বর দেওয়া হয়েছে, ফলে অনেকেই প্রত্যাশিত নম্বর পায়নি। অভিযোগের ব্যাপকতা দেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করতে বাধ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর [illegible] বসু ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। এই কমিটির রিপোর্ট সিন্ডিকেটের হাতে এসেছে এবং উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন রিপোর্টের সারমর্ম প্রকাশ করেছেন। বি-এ এবং বি-এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৪৮ হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে সাড়ে দশ হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী তাদের খাতা নতুন করে পরীক্ষার জন্যে আবেদন জানায়। সেই সব খাতা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে নিয়োগ করেন। এই সব শিক্ষক খাতা দেখে নতুন করে যে-নম্বর দেন তার সঙ্গে তুলনা করে কমিটি দেখতে পান যে, প্রথমে পরীক্ষার্থীদের যে নম্বর দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে শতকরা ৯৭টি ক্ষেত্রেই এই নম্বরের কোনো তারতম্য নেই। শতকরা মাত্র দু ভাগের কিছু বেশি ক্ষেত্রে নম্বর বেশি হয়েছে এবং শতকরা এক ভাগেরও কম ক্ষেত্রে নম্বর কমে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পরীক্ষার্থীরা তাঁদের কলেজে বিভিন্ন পরীক্ষায় যে নম্বর পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তার চেয়ে বেশি নম্বরই পেয়েছে। তদন্তের ফলে কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের প্রতি বড় রকমের কোনো অবিচার হয়নি। গত বছরের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল নিয়ে অনিশ্চয়তা এখন দূর হলো। সুতরাং চলতি বছরের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার দিন স্থির করতে অতঃপর দেরি হবে না বলে উপাচার্য জানিয়েছেন।

ব্যবসায়ে উৎসাহ

চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে না-বেড়িয়ে এই বাংলার অনেক শিক্ষিত তরুণই এখন নিজে ব্যবসায় নামছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। যেহেতু উচ্চশিক্ষিত, তাই এঁদের পক্ষে চাকরি যোগাড় করা হয়ত একেবারে অসম্ভব ছিল না। তবু সে মায়া ত্যাগ করে তাঁরা ব্যবসায়ে নামছেন। অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়েও ব্যবসায়ে নামছেন। কলকাতায় ভারত সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প সংক্রান্ত যে-সার্ভিস ইনস্টিটিউট আছে তার এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে নানা কর্মসূচী অনুমোদন করা এবং ভবিষ্যৎ শিল্পপতিদের কাজ শেখানো এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। গত দু বছরে তাঁরা বারো হাজারেরও বেশি কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। তার মধ্যে শতকরা ৩৫টি প্রস্তাবই এসেছে বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমাধারীদের কাছ থেকে। এই প্রতিষ্ঠানে এ পর্যন্ত ৩৫৫ জন গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমাধারী এঞ্জিনিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শতকরা ২২ জন নিজেরা কল-কারখানা চালু করেছেন। অন্য রাজ্যের তুলনায় এই হার দ্বিগুণেরও বেশি। অবশ্য এই উৎসাহ গত বছর দুয়েক ধরেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই সব তরুণ নিজেরা যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজে নামলে কী হবে, কায়েমী স্বার্থের তরফ থেকে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হচ্ছে না। প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কাঁচা মালের অভাব। ইচ্ছে করেই তাঁদের কাঁচা মাল যোগানের ব্যাপারে অসুবিধে সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এদিকে ব্যাংক থেকে সময়মতো টাকা পাওয়ার ব্যাপারেও অসুবিধে দেখা

দিয়েছে। এই অসুবিধে দূর করার জন্যে অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বড় কর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠক করে কথাবার্তা বলেছেন এবং সময়মতো সব আবেদনের নিষ্পত্তি করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

দুর্গাপুর প্রকল্প

দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড বা দুর্গাপুর প্রকল্প হলো পশ্চিম বাংলা সরকারের সবচেয়ে বড় শিল্পোদ্যোগ। বিদ্যুৎ তৈরি করে এই সংস্থা, তা ছাড়া তৈরি করে কোক। এখন এই সংস্থা পড়েছে মুশকিলে। কারণ এই কোকের যথেষ্ট ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। দু লাখ টনের বেশি কোক জমে গেছে, যার দাম হবে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। এত বিপুল পরিমাণ তৈরি মাল জমে গেলে কর্তৃপক্ষের ভাবনা হওয়ারই কথা। কোকের পাহাড় জমে উঠেছে কারণ ছোট-বড় প্রায় সব ক্রেতাই হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। এখন ওয়াগন শিল্পে চলেছে সংকট। রেলের কাছ থেকে যথেষ্ট অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে না বলে ওয়াগন কারখানাগুলো একরকম অচল। ঐ সব কারখানাকে যে-সব ছোট কারখানা সাজসরঞ্জাম যোগায় তাদেরও কাজকর্ম তাই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সুতরাং তারা এত দিন যে-পরিমাণ কোক নিয়ে এসেছে তার চেয়ে এখন অনেক কম নিচ্ছে। অবশ্য বড় অনেক কারখানাও কোক নেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। টাটা ইস্পাত কারখানা মাসে নিত ১৫ হাজার টন আর ইণ্ডিয়ান আয়রন নিত ২০ হাজার টন। এরা কোক নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মহীশূরের ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানা এবং অন্যান্য রাজ্যের অনেক কারখানাও আগের মতো কোক নিচ্ছে না। জমা কোকের দ্রুত একটা নিষ্পত্তি করার জন্যে রাজ্যের সরকারি উদ্যোগ দপ্তরের মন্ত্রী অতীশ সিংহ নির্দেশ দিয়েছেন।

কলেরার প্রসার

কলেরা মহামারীর আকার ধারণ করেছে কিনা সেই বিতর্কের অবসান না হলেও কলকাতায় এই রোগ যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে তা এখন সরকারিভাবেই স্বীকৃত। কলকাতা পৌর এলাকায় মোট ১৬টি ওয়ার্ডে এ-পর্যন্ত কলেরা ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে ছ'টি ওয়ার্ডের অবস্থা খুবই খারাপ বলে জানা গেছে। ২৪ মে যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে, সেই সময়ে কলেরায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭৯ জন। তারপরেও রোজই নতুন আক্রমণের খবর আসছে। গত বছরের তুলনায় এ-বছর শতকরা ২০ ভাগ বেশি লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছেন। কলেরা ঠেকাবার জন্যে রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ মিলিতভাবে অভিযান সুরু করেছেন। ইঞ্জেকশন দেওয়া, ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো ইত্যাদি কাজ আরো জোরদার করা হচ্ছে। কিন্তু এদিকে রাস্তায় জঞ্জাল ঠিকমতো সাফ হচ্ছে না। বছরের এই সময়টা আম-জাম বাজারে আসে। ঐ সব ফলের পাতা জমে জঞ্জালের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া পৌরসভা যে জল দিচ্ছেন তা কতোটা শুদ্ধ তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কলকাতা পৌর এলাকার কয়েকটি এলাকার জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। বেলেঘাটা, ট্যাংরা, খিদিরপুর প্রভৃতি এলাকার জল পরীক্ষা করে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর এই রায় দিয়েছেন।

২।৬।৭৫ দেবদত্ত

গুজরাটের পরে এই রাজ্যের ব্যাপারে নতুন 'স্ট্র্যাটেজি'। এবং তা কি?

গুজরাটের নির্বাচন শেষ হতে দিন। তারপরেই পশ্চিমবাংলার এই ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির দিকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দৃষ্টি দেবেন। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া বা অন্যান্য নেতা বড় কথা নন। স্বয়ং ইন্দিরাজী এই রাজ্যের ব্যাপারে নিজে মাথা দেবেন। অতীতেও এর নজির আছে। যদি গুজরাটের নির্বাচনে শাসক দলের পক্ষে জনমতের রায় ঘোষিত হয়, তাহলে এই এর রাজ্যের কংগ্রেস পার্টিকে সবল ও সুস্থ করে তোলার জন্য তিনি কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা যে গ্রহণ করবেন, সে-বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। আর যদি অন্যরূপ কিছু হয়, তাহলে অবশ্য রাজনীতিবিদরা এক্ষুনি হলফ করে কিছু বলতে পারেন না।

বর্তমানে কংগ্রেস দলের মধ্যে কম্যুনিস্টপন্থী এবং কম্যুনিস্টবিরোধী দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। এর ছায়া শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতে, এমনকি দিল্লীতে পর্যন্ত পড়েছে। সম্প্রতি পার্লামেন্টের কংগ্রেস পরিষদীয় দলের কর্মকর্তা নির্বাচনের ব্যাপারে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে এ-নির্বাচনে কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে ফেলেননি। তবে বস্তুতঃ দেখা গেছে, কম্যুনিস্টপন্থী দলের নেতারা পরাজিত হয়েছেন। পশ্চিমবাংলায় এখন যে ডামাডোল চলেছে, আসলে তা কম্যুনিস্ট এবং অ-কম্যুনিস্টদের মধ্যে লড়াই। কম্যুনিস্ট পার্টি যে-নীতি অনুসরণ করে চলে আসছেন, এ হচ্ছে তারই প্রত্যক্ষ ফল। তাঁরা বলে এসেছেন: কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল দলের সঙ্গে তাঁরা আছেন। তবে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি কিন্তু এই নীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাঁদের মত হচ্ছে: কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল বলে কেউ থাকতে পারে না। তাঁরা আসলে বুর্জোয়া ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ।

যা হোক, সব যদি ঠিক ঠিকভাবে চলে, তাহলে এই রাজ্যে কম্যুনিস্টপন্থী কংগ্রেসীদের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, এটা শুধু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য, তা বলা চলে না। সারা ভারতের ক্ষেত্রে এই এক দৃশ্য।

প্রধানমন্ত্রী বোধহয় কম্যুনিস্টপন্থীদের নিয়ে একটু বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছেন। প্রগতিশীলতার নাম করে তাঁরা দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চাইছেন না। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস 'বন্ধ' ডেকে, তাঁদের প্রগতিশীলতার চিহ্ন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন মাত্র। প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতি উভয়েই এই 'বন্ধ'-এর ডাক বাতিল করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু দেরীতে এই নির্দেশ এসেছে, এই অজুহাতে তাঁরা 'বন্ধ'-কে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এ-কথা সত্য, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় 'বন্ধ'-এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুদীপ বন্দোপাধ্যায় এবং ছাত্র পরিষদের সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইকম্যাণ্ডের নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তবে এও জানা গেছে, হাইকমাণ্ড এই ঘটনার বিষয়ে চুপ করে বসে নেই। নতুন 'স্ট্র্যাটেজি' গ্রহণ করে কিভাবে সব ক্রিমিনাল সরল পথে ভবিষ্যতে পরিচালনা করা যায়, তার পন্থা আবিষ্কারে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

পঃ বাংলায় অদূরভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট এক নতুন 'ফোরাম' গঠিত হতে চলেছে। এটা বলা বাহুল্য যে, এই ফোরাম শুধু কংগ্রেসেরই 'ফোরাম'। এখানে সি পি আইপন্থীদের স্থান নেই। হয়তো বা প্রদীপ ভট্টাচার্য এই 'ফোরাম'-এর নেতৃত্ব নেবেন। অর্থাৎ সুব্রত-প্রিয়রঞ্জন গোষ্ঠীর মোকাবিলার জন্য এটা হচ্ছে নতুন কৌশল। অর্থাৎ রাজনৈতিক 'স্ট্র্যাটেজি'।

কৌটিল্য

গুজরাটে নির্বাচন

গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সেটা হল, কারা রাজ্যে স্থায়ী সরকার গঠনের নিশ্চয়তা দিতে পারবে। যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মিছিল, প্রচার পত্র, শ্লোগান ইত্যাদি যে জাতীয় নির্বাচনী উত্তাপের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে আমরা পরিচিত গুজরাটে সে ধরণের কোন উত্তাপ নেই। বাড়ীর মালিকরা আপত্তি করায় সব পক্ষই প্রাচীর পত্র লাগিয়ে দেওয়াল নষ্ট করবেন না বলে কথা দিয়েছেন। মিছিল বের করার চেয়ে বরং যত বেশি সম্ভব ভোটারের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করার উপরই প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি জোর দিচ্ছে। তার ফলে বাহ্যত এই নির্বাচনী অভিযানের পরিবেশ একান্ত নিরুত্তাপ। কিন্তু এই নিরুত্তাপ পরিবেশের মধ্যেও যে রাজনৈতিক বিতর্কটি দানা বেঁধে উঠছে সেটা হল এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গুজরাটে স্থায়ী সরকার গঠন করা যাবে কিনা এবং কারা এই স্থায়ী সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঝড়ের বেগে সফর করে অসংখ্য জনসভায় তাঁর বক্তৃতা থেকে এই একটি দাবিই বারবার জোর করে তুলে ধরছেন যে, শুধু কংগ্রেসই পারে গুজরাটে স্থায়ী সরকার গঠন করতে। তিনি বলেছেন, অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নানা দল নিয়ে গঠিত মিলিজুলি সরকার টেকসই হয় না। গুজরাটের জনতা ফ্রন্টও এ-রকম একটা পাঁচমিশালি জোট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও তারা স্থায়ী সরকার তৈরি করতে পারবে না। তাছাড়া, রাজ্যে একমাত্র কংগ্রেস সরকারের পক্ষেই সম্ভব হবে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সহযোগিতায় রাজ্যের জন্য একটি শুদ্ধ উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা।

জনতা ফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে জনসঙ্ঘকেই তীব্রতম আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। জনসঙ্ঘকে তিনি সাম্প্রদায়িক দল বলে অভিহিত করেছেন। গান্ধীজীর জন্মস্থান পোরবন্দরে গিয়ে তিনি বলেছেন, গান্ধী-হত্যার পিছনে যে দলের হাত রয়েছে তার সঙ্গে মোরারজী দেশাইয়ের মতো একজন গান্ধীবাদী নেতা কি করে যোগ দেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বিচারপতি ডি পি মদনের একটি সম্প্রতি—প্রকাশিত রিপোর্টেরও উল্লেখ করেছেন। (১৯৭০ সালের মে মাসে মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্দি, জলগাঁও ও মাহাদে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে বিচারপতি মদন সম্প্রতি তাঁর রিপোর্ট দিয়েছেন। সরকারিভাবে এই রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, বিচারপতি মদন এই হাঙ্গামার দায়িত্ব থেকে কোন সম্প্রদায়, কোন রাজনৈতিক দল, পুলিশ অথবা প্রশাসনকে রেহাই দেন নি। দিল্লির একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিন্তু লেখা হয়েছে যে, বিচারপতি মদন প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাঙ্গামার জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব আরোপ করেছেন জনসঙ্ঘ ও শিবসেনার উপর। বোম্বাইয়ের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিচারপতি মদনের রিপোর্ট উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ সময়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ভি পি নায়কের সঙ্গে শিবসেনা প্রধান বাল থাকারে একটা গোপন বোঝাপড়া ছিল।)

কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় যেসব আক্রমণ চালান হচ্ছে সেগুলির জন্যও শ্রীমতী গান্ধী জনসঙ্ঘকে দায়ী করেছেন। এই সব আক্রমণের ফলে জগজীবন রাম ও বিদ্যাচরণ শুক্ল আহত হয়েছেন। দুটি জায়গায় শ্রীমতী গান্ধীকে লক্ষ্য করেও ইটপাটকেল ও জুতো ছোড়া হয়েছে। একজন কংগ্রেস প্রার্থীকে পুড়িয়ে মারারও চেষ্টা করা হয়েছে।

চিমনভাই প্যাটেলের কিষাণ মজদুর লোক পক্ষের বিরুদ্ধে শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান বক্তব্য হল, দলত্যাগীদের নিয়েও সম্পূর্ণ স্থানীয় প্রশ্নের ভিত্তিতে গঠিত এই দলের কোন ভবিষ্যৎ নেই।

গুজরাটে কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব শ্রীমতী গান্ধী সম্পূর্ণ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই প্রচন্ড গ্রীষ্মে ১১২ ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যেও বড় বড় জনসভায় গিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়ানর কাজটা প্রায় সম্পূর্ণ এককভাবেই করছেন শ্রীমতী গান্ধী।

বিরোধী পক্ষে জনতা ফ্রন্টের অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠন কংগ্রেসের নেতা মোরারজী দেশাই। অটলবিহারী বাজপেয়ী, এল কে আদবাণি, আচার্য কৃপালনি, মধু লিমায়ে, পিলু মোদি প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিরোধী নেতারাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী স্থায়ী সরকারের যে শ্লোগান তুলেছেন তার জবাবে বিরোধী নেতারা গুজরাটে ও অন্যান্য রাজ্যে নড়বড়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কেরলের পাঁচমিশালি সরকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেই বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিসভার পতনের জন্য উস্কানি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। এ-সবের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ১৯৭২ সনের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও কংগ্রেস যে গুজরাটে স্থায়ী সরকার চালাতে পারে নি তার জন্য দায়ী চিমনভাই প্যাটেল। চিমনভাই-ই ঘনশ্যাম ওঝার মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছিলেন। কেরলে সি পি আই, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের সঙ্গে মিলে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস ভাগ হওয়ার আগেকার সিদ্ধান্ত। অতীতে যেসব ভুলের জন্য কংগ্রেস সরকার মজবুত হয়নি এবার আর সেসব ভুল করা হবে না বলে শ্রীমতী গান্ধী আশ্বাস দিয়েছেন এবং তিনি নিজে রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রিসভাগুলির পতনে উস্কানি দিচ্ছেন, এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সব পর্যবেক্ষকই স্বীকার করেন যে, বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রশ্নের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল স্থির হবে না, আরও অনেক প্রশ্ন এসে যুক্ত হবে। যেমন, গুজরাটে বাদাম উৎপাদন ও বাদাম তেলের কলের মালিকদের শক্তিশালী লবি রয়েছে (স্থানীয় এলাকায় এরা 'তেলিয়া রাজা' নামে পরিচিত) রয়েছে তুলো-উৎপাদকদেরও লবি। প্রাক্তন দেশীয় রাজাদের প্রভাবের ঘাঁটি রয়েছে। এই সব দেশীয় রাজার মধ্যে আবার রয়েছে পাতিদারিক লেউয়া পাটেল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মুসলমান ইত্যাদি প্রায় সব সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি রয়েছে। ১৯৭৫ সালের নির্বাচন গুজরাটকে স্থায়ী সরকার দেবে কিনা সে-প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে এই সব নানা বিপরীত শক্তির টানাপোড়েনের উপর।

সি পি আই নেতা ভূপেশ গুপ্ত অবশ্য মনে করেন না যে, গুজরাটে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে। তাঁর মতে, কংগ্রেস বড়জোর বৃহত্তম দল হতে পারে। ভূপেশবাবু এই আশ্বাস চেয়েছেন যে, নির্বাচনের পর কংগ্রেস তার নীতি বিসর্জন দিয়ে অন্য দলের সঙ্গে হাত মেলাবে না।

এ-ব্যাপারে বরোদায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন সেটা ভূপেশবাবুকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করবে বলে মনে হয় না। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস নিজের জোরেই সরকার গঠন করতে পারবে, সুতরাং অন্য দলের সঙ্গে হাত মেলাবার প্রশ্ন ওঠে না, তবে দরকার হলে নির্বাচনের পর কংগ্রেস সেই সব সদস্যকে আমন্ত্রণ জানাবে যাঁরা কংগ্রেসের নীতিতে বিশ্বাসী।

জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির সমালোচনা করে বলেছেন যে, এর দ্বারা তিনি দলত্যাগের উস্কানি দিচ্ছেন।

পুণ্ডরীক

একটি নাটক প্রায় একই শিল্পী নিয়ে সমান গৌরব ও জনপ্রিয়তাসহ একুশ বছর (বহুরূপী প্রযোজিত রক্তকরবী) বা ২৪ বছর (বহুরূপী প্রযোজিত চার অধ্যায়) অভিনীত হচ্ছে—এ ঘটনা ভারতীয় মঞ্চে আর ঘটে নি। গত মে মাসে রক্তকরবী ও চার অধ্যায়ের দুটি করে যে শো হয়ে গেল অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস হলে, তাতে চারটি শোতেই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল এবং প্রযোজনা-মানও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

যখন এই বই দুটির প্রথম অভিনয় হয়, তখন এ জাতীয় বইয়ের প্রযোজনা অভাবনীয় ছিল।

গোটা ভারতবর্ষেই তখন নাট্যসাহিত্য দুর্বল। প্রযোজনার মানও অনুন্নত। যাঁরা উন্নতিতে আগ্রহী, তাঁরাও ব্যবসায়িকতার চাপে খদ্দের-ধরা কৌশল বিস্তারে তৎপর। এমন দুরবস্থার কালে রবীন্দ্র নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল — সমসাময়িক কালের চেয়ে অনেক এগিয়ে। এতটাই এগিয়ে যে তাকে ধারণ করবার সামর্থ্য ছিল না ভারতীয় মঞ্চের। অথচ রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙাবার ইচ্ছে পেশাদারী মঞ্চের ছিল, তাই তাঁরা লঘু কয়েকটি রবীন্দ্র নাটক লঘুতর ভঙ্গীতে অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রবোধে যেহেতু তাঁদের অধিকাংশই কারো ঈর্ষার পাত্র ছিলেন না, তাই তাঁরা তাঁদের সদাগরী গদার আঘাতে রবীন্দ্র নাটককেও দুরমুশ করে-ছিলেন।

সমালোচকরা রায় দিয়েছিলেন রবীন্দ্র-নাটক নিছক ভাবের বাহন 'ভিকল অফ আইডিয়াস মাত্র', অ্যাকশন বলে বস্তুটি নেই। অতএব নাটকই নয়, স্রেফ কাব্য। অভিনেয় নয়, পাঠ্য। সুতরাং তাঁরা রবীন্দ্র নাটকে নাট্য খোঁজেন নি, খুঁজেছেন তত্ত্ব বড় জোর কাব্য।

এমন দুর্দিনে বহুরূপী প্রযোজনা করে চার অধ্যায় (১৯৫১)। চার অধ্যায় উপন্যাস। তবে তাকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়ত খুব শক্ত নয়। কিন্তু ঢের শক্ত তার সংলাপকে আয়ত্তে আনা। এ সংলাপ অভি-নয়ের জন্যে লেখা নয়, পড়বার জন্যেই লেখা। বাক্যের বিন্যাসে বহু জায়গায় জটিলতা আছে—যা সাধারণত নাটকে থাকে না। একে সরল করে নিলে সেই নতুন হাতের ছাপ রবীন্দ্রনাথকে আবৃত্ত করে, মলিন করে বিকৃত করে এবং তাতে রবীন্দ্রনাথের রাজ-নৈতিক বক্তব্যের যথাযথ উপস্থাপনেও বিঘ্ন ঘটতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে বাড়তি সংলাপ লেখা, বা রবীন্দ্র-সংলাপকে ভেঙে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা যে কোন নাট্যরূপদাতার পক্ষেই দুরূহ, কারণ অন্য সব ঠিক-ঠিক করা হলেও শেষ পর্যন্ত একটি জিনিস কিছুতেই রক্ষিত হয় না—যে-জিনিসটিকে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্র-সৌরভ। আর এটি বাদ গেলে স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথই বাদ পড়ে যান। সুতরাং রবীন্দ্র-সংলাপ যথাযথ না রেখে উপায় নেই। কিন্তু সেই সংলাপের অর্থ স্পষ্ট করে নাট্যগতি

বজায় রেখে জীবন্তভাবে উচ্চারণ করা অতি দুরূহ। এই দুরূহ কাজটি বহুরূপী কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিল।

পরের নাটক রক্তকরবী। এর সংলাপ নাটকেরই। কিন্তু এ সংলাপে দ্যুতি আছে। এর কথা একটা ওজনকে ধারণ করেও আলোকময়। সমালোচকরা রূপক-প্রতীকের জালে এর শ্বাস রোধ করেছেন। সেই জালের ভিতর থেকে নাটকের প্রাণটাকে বার করে আনা শক্ত। তাই এমন একটি মহৎ নাটক হাতের কাছে পড়ে থাকতেও কেউ বিশেষ এগোন নি। রক্তকরবীকে লোকে রূপক-প্রতীক ইত্যাদি বলে জানত নাটক বলে জানত না। বহুরূপী জালগুলি ছিন্ন করে রক্তকরবীর নাটককে আবিষ্কার করেছিল, দর্শকদের আবিষ্কারে সহায়তা করেছিল। রক্তকরবীর দ্বিতীয় জন্ম হলো বহুরূপীর মঞ্চে। শ্রেষ্ঠ নাটক রচিত হয়ে পড়ে ছিল, মঞ্চে কেউ তাঁকে যোগ্য রূপ দিতে পারছিল না। বহুরূপী দিল সেই রূপ। আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ নাটক মঞ্চহীন, তথা প্রাণহীন ছিল। বহুরূপী ছোঁয়ালো বহু-ঈপ্সিত সোনার কাঠি। ফুটে উঠল রক্তকরবী।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী রক্তকরবী মঞ্চস্থ করবেন ভেবেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেন নি। আর শিশিরকুমার না করলে তখনকার ভারত মঞ্চে আর কে করবে! ছাপা হওয়ার আগেই শিশিরবাবু রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপির খবর জানতেন। তার পরে ছাপাও হলো। ১৯৫৪তে আসতে কেটে গেল অনেকগুলি বছর। মধ্যে দু-একটি সৌখীন প্রযোজনা যা হল তা ইতিহাসে তারিখ হিসেবে মাত্র থাকবে, তা ঐতিহাসিক তারিখ নয়। সে ঐতিহাসিক তারিখ ১৯৫৪র ১০ই মে।

রক্তকরবীর মূলে উপজীব্য একটি অতি-বাস্তব কঠিন সমস্যা। কিন্তু এর বুনুনিটা যেন আলোর সুতোয় কবিতার সুরে। সমস্যা ও সুরের এই বুনুনিটাই মঞ্চে পরিস্ফুট করাতে হবে—কোনটাকেই জখম না করে। এটাই ছিল প্রযোজকদের সমস্যা, এবং বহুরূপীর আগে কোন প্রযোজকই এর মীমাংসা করতে পারেন নি। এর জন্য যে বিপুল কল্পনাশক্তি ও বোধশক্তির প্রয়োজন ছিল তা বহুরূপী-প্রযোজনায় ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদে আজকের দেশ-কাল চিহ্নিত। আবার উক্তির দ্যুতি তাকে আরো খানিকটা ব্যাপ্তিও দেয়। এই আপাত-অসমতা অভিনয় ও প্রযোজনার জোরে মুছে যায়। আর ওটা ঠিক অসমতাও নয় অভ্যস্ত সংস্কারকে অতিক্রম করে আর এক রকম করে আরো তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাজানো মাত্র। দু-একজন গোঁড়া ব্যক্তি আপত্তি করেছিলেন বলেছিলেন—এই রকম পোশাক পরা লোক কি ঐ ভাষায় কথা বলে? তাঁদের বক্তব্য আজকের একজন মজুরের মুখের ভাষা ওটা নয়। আসলে রবীন্দ্র নাটকে অমন কালি-মাখা ছেঁড়া পাতলুন দেখতে অনিচ্ছুক তাঁরা। একটু ভাবলেই তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, যে-কালের বা যে-দেশের পোশাকই পরানো হোক না, কোন মজুরেরই মুখের কথা ওগুলো নয়, ওগুলো তাদের বুকের কথা। সেই জন্যে অধিকাংশ দর্শকেরই পোশাক ও ভাষার বিরোধের কথা মনে আসে নি। বরং ব্যাপ্ত এক দেশকালের সমস্যা এখানে যেন স্বদেশ ও সমকালকে স্পর্শ করে থাকে। ফলে বৃহত্তর তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ না করেও নাট্যবস্তু দর্শকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতে এসে দাঁড়ায়। আসলে বাস্তবের ফাঁস এই সব সমালোচকদের গলায় খুব সংকীর্ণ হয়ে বসে আছে। তবে এখন আর এ নিয়ে বাগবিস্তার না করলেও চলবে মনে হয় কারণ বিদেশে এখন হ্যামলেটও আধুনিক পোশাকে অভিনীত হয়। সুতরাং দিশী সমালোচকরা এখন বিদেশী দৃষ্টিতে বিষয়টা চট করে বুঝে ফেলবেন আশা করা যায়।

সংলাপের ক্ষেত্রে কোন স্বাধীনতা নেন নি নির্দেশক, কিন্তু কতগুলি ইঙ্গিতকে দৃশ্যত পরিস্ফুট করেছেন। যেমন সর্দারনাদের এনেছেন চন্দ্রার পাশাপাশি। 'রাজার এঁটো'র দৃশ্য। পরিকল্পনা তো অতুলনীয়। এই দৃশ্য এমন জ্বলন্ত-ভাবে দেখাতে না পারলে রক্তকরবী নাটকের ভয়াল অজগরের হিংস্র হাঁ-টাকে সঠিকভাবে বোঝাই যেত না। লাল আলোর দপদপ যেন সেই বিরাট অজগরের লেলিহান জিহ্বার লকলকানি। যন্ত্রের ধ্বনিই সেখানে আবহসঙ্গীত—যাকে মাঝে মাঝে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে এঁটোদের আর্তনাদ। কোমর থেকেই ঝুঁকে মাথাটা নীচু হয়ে গেছে, দুটো হাত অসাড় হয়ে ঝুলছে গতি শিথিল ও অসম—এই সব এঁটোরা আমাদের আশপাশের কত মুখকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এই তাণ্ডবের মধ্যে ঈশানীপাড়ার নন্দিনীর বেদনার্ত বাণী—এঁটোদের ডাকছে আঁচল উড়িয়ে—যেন ঐ ধানীরঙা আঁচলই ওর পতাকা। শুধুমাত্র এই একটা দৃশ্যে নির্দেশক যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা ভারতীয় মঞ্চে আর কোথাও আছে বলে জানি না।

আলোর এত ভাল ব্যবহারও আর কোথাও নেই। অজগরের লেলিহান রক্তিম গ্রাস, হলদে সোনা রঙের রোদ্দুর, অথবা সিঁদুরে মেঘে ভরা আকাশ—এ সবই এক একটা অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। রঙের আলো উঠে এসেছে নাটক থেকে, মিশে আছে নাটকেরই মধ্যে ছাপিয়ে উঠে বাচালতা করে নি। এক একটি মুহূর্তকে আলোর ভাষায় নিটোল করে ধরে দিয়েছে। আর যে সব মুহূর্তে রঙ নেই, যে সব মুড রংয়ে ধরা পড়ে না রঙের ছোঁয়ায় যে সব নিরঞ্জন মুহূর্ত প্রগলভ হয়ে যায়, সেই সব মুহূর্তকে ধরা আছে শুধু আলো আর ছায়ায়। বিশুর দুখ-জাগানিয়া গানের মুহূর্তটি শুধু আলো ও ছায়ায় কি বেদনাই রচনা করে!

আবহের জন্য গতানুগতিক সঙ্গীত যন্ত্র ব্যবহার করা হল না। রাজার জগতে তো সংগীত-যন্ত্র নেই আছে যন্ত্র। সুতরাং সেই লোহালক্কড় থেকেই বার করা হল সংগীত। যার ধ্বনি আলাদা তাল-লয় নেই। কতগুলি শব্দের সমষ্টি—যার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ জগৎ যেন জেগে ওঠে। অর অতিবাস্তবের চাপে যখন নাটকে গানের ব্যবহার ক্ষতিকর বলে আমরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি, তখন গানের কী আশ্চর্য ব্যবহার — নাটকেরই স্রোতের মধ্য থেকে নানা টানে এক একটা কলি উঠে আসে, আবর্তে ভেসে ভেসে যায় দূরে। সমালোচকদের আবার নতুন করে ভাবতে হল নাটকে গানের ব্যবহার সম্পর্কে।

বহুস্তর নাটকের প্রকাশে এলো বহুস্তর মঞ্চ—তাকে ব্যবহার করা হল নানাভাবে বিভিন্ন-স্তর-নির্ভর বিচিত্র কম্পোজিশন গড়ে আর ভেঙে নাটকের টেনশন রাখা হল তুঙ্গে।

রক্তকরবীর সমমানের অভিনয়ই বা কোথায় দেখা গেছে! শুধুমাত্র কণ্ঠনির্ভর রাজা নন্দিনী বিশু সর্দার গোঁসাই ফাগুলাল চন্দ্রা থেকে ক্ষুদে মেজ সর্দার পর্যন্ত প্রত্যেকটি চরিত্রই আশ্চর্যভাবে রূপায়িত।

আর এই অভিনয় আলো সেট সংগীত—এ সব কিছুকে ধারণ করে আছে এক গভীর শিল্পদৃষ্টি যা প্রযোজনাকে দিয়েছে সুষমা সামঞ্জস্য ও শক্তি। এই সামগ্রিক ব্যালান্স অধিকাংশ ভারতীয় প্রযোজনায় অনুপস্থিত। আর রক্তকরবী এরই গুণে এমন এক হার্মনির সৃষ্টি করে যা মঞ্চে দুর্লভ।

ভারতীয় প্রযোজকদের অভিযোগ—তেমন নাটক পান না তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটক—রবীন্দ্রনাটক—কিন্তু অনভিনীত থাকে। অর্থাৎ রবীন্দ্র নাটককে—যথার্থ ভাল ও গভীর নাটককে তাঁরা আয়ত্তে আনতে পারেন না। সস্তায় মনোরঞ্জনের দিকে তাঁদের ঝোঁক। গভীর নাটক প্রযোজনায় তাঁরা অনাগ্রহী, অক্ষম। আর বহুরূপী মূলতে গভীর নাটকেরই প্রযোজক।

আজকাল পলিটিক্যাল নাটক কথাটার খুব চল হয়েছে এবং কথাটার কদরও খুব। কিন্তু প্রায় সর্বদাই অতিসংকীর্ণ একটি অর্থে পলিটিক্যাল নাটক কথাটা ব্যবহার করা হয়। রক্তকরবী এবং ৮র অধ্যায়ের মত পলিটিক্যাল নাটক ভারতীয় সাহিত্যে আর কোথায়! বহুরূপী এই গভীর অর্থের পলিটিক্যাল নাটক করেছে আজ থেকে বহু বছর আগে।

বাস্তব ন্যাচারাল ইত্যাদি কথারও কদর খুব। আশ্চর্য শুধু এই আমাদের দেশের বাস্তব বা ন্যাচারাল প্রযোজনা দেখতে দেখতে অধিকাংশ সময়ই বানান বলে মনে হয়। আর রক্তকরবী দেখবার সময় প্রতিটি মুহূর্তে জীবন্ত লাগে। আমাদের বাস্তব বা ন্যাচারাল কর্মকাণ্ডের পটভূমিকায় রক্তকরবীর প্রযোজনা দেখলে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই মনে পড়ে :

অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশী ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কান্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায় মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মত বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। (অন্তর বাহির)

মিথ্যাসাক্ষীর গলদঘর্ম ব্যায়ামই যেখানে দস্তুর সেখানে বহুরূপী স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করে গভীরতর বাস্তবকে দেখাবার চেষ্টা করেছে।

বহুরূপী রক্তকরবীকে বেছে নিল কেন? বাছাইর মধ্য দিয়ে তো মানুষ একটা ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। রাজনৈতিক সামাজিক সমস্যার অসাধারণ উদ্ঘাটন নতুন ধরনের নাটক, সংলাপ মাহাত্ম্য — এ সবই নিশ্চয়ই এ বাছাই-এর কারণ। কিন্তু আরো একটা বড় কারণ আছে।

সমালোচকরা রক্তকরবীকে পাশ্চাত্য ভঙ্গীর সিম্বলিক্যাল প্লে বলে মনে করেন। কিন্তু শম্ভু মিত্র এর মধ্যে দেশজ আঙ্গিক খুঁজে পান। আমাদের যাত্রায় দুটো স্তর একই সঙ্গে মিশে থাকে—লৌকিক আর একটাকে বলা যাক অলৌকিক। এর সংমিশ্রণ একই নাটকে একই দৃশ্যে চলতে থাকে। কিন্তু বিসদৃশ লাগে না। এর ফলে নাটক প্রতীকী হয় না, বা ফ্যান্টাসিও হয় না বরঞ্চ সাধারণ গ্রামবাসীর খুব বাস্তবপ্রতিম সংলাপ থেকে প্রতীকী গভীরতা পর্যন্ত এর সহজ বিস্তার থাকে। এবং এই দেশজ আঙ্গিক গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটককে নানান বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অবাধ চলাচল করবার সুযোগ দিয়েছেন।

দেশজ আঙ্গিকের দিকে বহুরূপীর দৃষ্টি ভারতীয় থিয়েটার তার লক্ষ্য। রক্তকরবীর দেশজ কাঠামো তাই বহুরূপীকে বিশেষ করে টানে। দেশজ আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে বহুরূপীর আত্মপ্রকাশের এই প্রয়াস দেশভক্তি নয়, পশ্চাৎমুখিতা নয় জাতির অবচেতন গভীরে প্রবেশ করবার পথ।

আজ অধিকাংশ বাঙ্গালী রক্তকরবীকে দেখেন বহুরূপীর চোখে। ভিকল অফ আইডিয়াস-এর মধ্যে তাঁরা এখন নাটকের সন্ধান পান, নাট্যস্বাদ পান। কিন্তু একটা খেদ থেকে যায়—রবীন্দ্রনাথের নতুন প্রযোজক কই! শেকসপীয়রের ক্ষেত্রে একের পর এক প্রযোজক এসেছেন তাঁর নাটকের এক একটি দিগন্তকে উন্মোচিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নি। পেশাদারীদের কথা ভাবছি না, কয়েকটি নামী গ্রুপ থিয়েটার বহুরূপীর পরে রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনায় নেমেছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউ তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি।

বহুরূপী রক্তকরবীর প্রথম প্রযোজক এটা আনন্দের কথা কিন্তু তাঁরাই রক্তকরবীর শেষ প্রযোজক এটা পরিতাপের বিষয়।

রোজনামচা

ফাদার দ্যতিয়েন

প্রেয়সীর বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাওয়ার দু মাস পরে মাধব মা-বউদিকে না জানিয়ে এমীকে বিয়ে করে দোল-পূর্ণিমার সকালে আন্তর্জাতিক কোর্টে। বিয়েতে চূড়ান্ত অমত সত্ত্বেও গোয়েঙ্কাজি ও পাণ্ডেদা বন্ধুত্বের খাতিরে উপস্থিত ছিল সাক্ষী হতে রাজি হয়নি। দুজনে পালা করে এই দু মাস ধরে বাঙ্গালী বন্ধুকে রোজই শুনিয়েছিল তাদের মস্তিষ্কের সুচিন্তিত আপত্তিমালা: 'বিদেশিনীর প্রতি এতই তুমি মোহোন্মত্ত? তোমার দাদারা যাই করে থাকুক না কেন হাড়ে মজ্জায় তুমি বাঙ্গালী...নিজেও সুখী হবে না এমীকেও সুখী করতে পারবে না।'

মাধব ছেলেটি মূর্খ নয় আপত্তিগুলোর মূল্য সে বোঝে তার একজন চীনা অধ্যাপককে সমস্যাটা এমীকে সরল ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করাতে অনুরোধ করে। মেয়েটি শুনতে চায় না। ওর বান্ধবীদের কাছেও পরামর্শ নিতে সে নারাজ; বলে, 'বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার ভালোবাসার কথা কাউকেই আমি বলব না।' মাধব বলে, 'অন্তত এবার বাড়ি গিয়ে...'

একবার শুধু একবার সে বাড়ি যায়; অলজ্জ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে তার আসন্ন পরিণয়ের কথা। তাকে নিরস্ত করা অসম্ভব বুঝে তার ধর্মপ্রাণ বাবা বলেন, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, এমী; ঐ বিয়েতে তিনি যদি মত দেন আমি কে যে বাধা দেব?' মা কিন্তু এত উদারমনা নন রেগে-মেগে ফুঁসে উঠে চীনা অভিধানে বিদেশীর বিষয়ে যত চোখা চোখা বিশেষণ আছে তার এক মালা গেঁথে হবু জামাইয়ের গলায় ঝুলিয়ে এমীকে শাসান। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে তাকে অনুরোধ জানান মুক্তরাজ্যে পাঠরত দাদার পুনরাগমনের আগে কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে। মেয়েটি সম্মতি দেয় না।

বিবাহের পূর্ব রাত্রিতে গোয়েঙ্কাজি ও পাণ্ডেদা চরম উপায় অবলম্বন করে মাধবকে মদ্য খাইয়ে মাতাল করতে চেষ্টা করে... মাধবের সাময়িক অসুস্থতার দরুন বিয়ের তারিখ যদি কোনো মতে পিছিয়ে দেওয়া [illegible] কৌশল বুঝে আবেগে কম্পিত কণ্ঠে মাধব বলে: 'রিস্ক আমি নেবই...বউদি ওকে গ্রহণ করলেই ওর কোনো ভয় নেই!' মনে মনে সে ভাবে বউদি ওকে গ্রহণ করবে তো?

মাধব হঠাৎ নিজেকে প্রকৃত ভারতীয় অনুভব করল: বিয়ের দিনে সে পরল পায়জামা মাটির রঙের পাঞ্জাবী আর চাদর। এমী পরল লাল রঙের গাউন; চীনাদের বিবাহোপযোগী রং হল সাদা এমী কিন্তু আজ বাঙ্গালী হতে চলেছে...

সন্ধ্যাবেলায় বর-কন্যা এক হোটেলে প্রীতিভোজের আয়োজন করেছে: ভিতরের এক কক্ষে বসে এমী অভিনন্দনকারীদের শুভেচ্ছা ও উপহার গ্রহণ করছে; বাইরে দাঁড়িয়ে মাধব অতিথিদের স্বাগত জানায়।

পুলিশের গাড়ি ব্রেক কষে থামল হোটেলের ফটকের সামনে। দুজন অফিসার নামলেন, এমীর খোঁজ নিলেন। না, মেয়েটির ঠিক কোনো অপরাধ নেই তবে তাইপে থেকে দশ মাইল দূরে কোন এক পাড়াগাঁয়ে একটি ছেলে নাকি গত রাত্রে আত্মহত্যা করেছে বালিশের তলায় প্রাপ্ত এক চিরকুটে এমীরই নাম-ঠিকানা আছে। ছাত্রীদের হস্টেলে অনুসন্ধান করে অফিসারেরা শুনেছেন এমী এই কদিন কাটিয়েছে কোন এক বান্ধবীর বাড়িতে; সেখানে গিয়ে তাঁরা বিবাহ প্রীতিভোজের সংবাদ পেয়েছেন...অসময়ে এই অবাঞ্ছিত বিরক্তির জন্য তাঁরা দুঃখিত। মাধব বলল, 'ও তো এখন আমার স্ত্রী ওর দায়িত্ব আমারই; ভোর পর্যন্ত ব্যাপারটা স্থগিত রাখলে হয় না?' অফিসারেরা অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, শান্ত ও শিষ্টভাবে বললেন: 'না।'

খবরটা পেয়ে এমী ফুঁপিয়ে উঠল। ছেলেটিকে সে সত্যি সত্যি ভালোবাসত। ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসত। ও তাকে দিদি বলে ডাকত। এমী ওকে গান শেখাত। পাঁচ মাস হল ওদের প্রথম সাক্ষাৎ—রাস্তায়। কোন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এমী গান করতে গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের পরে এমীর জন্য ও অপেক্ষা করেছিল বলে-ছিল ওর গান শেখার আগ্রহ ওর বিধবা মায়ের দারিদ্র্য বেঁচে থাকার প্রতি ওর একান্ত বিতৃষ্ণার কথা। মাঝে মধ্যে—ছেলেটির নাম না করেই—মাধবের কাছে পয়সা চেয়ে এমী ওকে সাহায্য করেছে। ওকে বলত আশা রাখতে; বলত, রজনীর পরেই উষার জাগরণ শীতের পরেই বসন্তের আবির্ভাব...।

ছেলেটি বুঝল না। বুঝতে চাইল না। দুদিন আগে এমীকে ও বলেছিল, 'এই তিন রাত ধরে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা এক করতে পারিনি; দয়া করে দুটি ট্যাবলেট এনে দিন...একবার ভালোমতো ঘুমোতে চাই...' এমী তখন কি জানত বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষীর মারফতে, দুটি দুটি করে ট্যাবলেট আনিয়ে ছেলেটি ওর 'ভালোমতো ঘুমটার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল...?

অন্তিম চিরকুটে লেখা ছিল: 'দিদি বলেছিলেন বাঁচতে। পারি নি। ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে মরছিল।' লাসটা এমীকে দেখতে দেওয়া হল না; পুত্রহীনা বিধবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে বলল, 'আমার এই সুখের দিনের সঙ্গে আপনার এই পুত্রশোক চির-কালের মতো জড়িত থাকবে।'

চার পাতার জবানবন্দীতে এমী যখন সই করল তখন দেখল থানার দেওয়াল ঘড়িতে রাত দুটো। অফিসারেরা অতিশয় অমায়িকতার সঙ্গে অফিসেই বাসরঘর বানাবার প্রস্তাব করলেন: আলমারি সরাতে মশারি টাঙ্গাতে আর কতক্ষণ লাগে?... বর-কন্যা প্রস্তাবটা নামঞ্জুর করল।

...বাড়ি গিয়ে এমী জানায় জলজ্যান্ত জামাই এবার দুদিন পরে আসছে। মেয়ের পরিণয়ের এই প্রথম ইঙ্গিত পেয়ে এমীর বাবা জাপানী ভাষায় যা বললেন তা কেউ বুঝল না; বলার ভঙ্গি কিন্তু দ্ব্যর্থক নয় বলার ভঙ্গি জানাচ্ছে: 'কি আর করি বল; যা হবার তাই তো হয়েছে!' মা বাক্যব্যয় না করে আপন গৃহে খিল মারলেন। দিদি বলল, 'এমীর বরটা কতটা কালো দেখি; কামড়ায়-টামড়ায় না তো?...' এমী বুঝল বাবা আর দিদি ওর পক্ষে...মায়ের রাগ আর কতক্ষণ!

(ক্রমশঃ)

"আমার সব সময়ই মনে হয় আমায় আরো অনেক, অনেক ভালো গাইতে হবে। অনেক দিতে হবে। এখনও কিছুই দিতে পারিনি।"

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্ধফোটা ফুলের মত তন্বী কিশোরীর দুই চোখে বিস্ময়ের আলো জ্বলে ওঠে যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একমুঠো বাদাম-লজেন্সের সঙ্গে কুড়িটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'বুঝলি মোহর আজ থেকে তুই গানের জন্য প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে জলপানি পাবি।'

'গানের জন্য? আমি? প্রতি মাসে কু-উ-ড়ি টাকা? সে যে অনেক। ওমা সো...ওত্তাতি?' 'সো...ত্তাতি'তে যেন গানের মীড় বাজিয়ে 'গুরুদেব'কে প্রণাম করেই মা বাবাকে খবরটা দেবার জন্য উত্তরের দিকে নদীতরঙ্গের মত উচ্ছল ছন্দে ছুটে গিয়েছিল যে বিস্মিতা, প্রতিভাময়ী তিনিই আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়িকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনিই আজকের দিনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রধানা নায়িকাদের অন্যতমা, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির মধ্যগগনে উত্তীর্ণা; সঙ্গীতব্যক্তিত্বের পরিণত লগ্নে অত্মলীনা। কণ্ঠসৌন্দর্যের সঙ্গে স্বভাব ও রূপ-লাবণ্য যেন কবিতার ছন্দের মতই মিলেমিশে একাকার। কিন্তু শান্তিনিকেতনের নীল আকাশের নীচের উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটে-যাওয়া কলোচ্ছলার প্রতি মুহূর্তের বিস্ময়-চকিত চমকবিহ্বলতা? জীবনের পরিবর্তনের স্রোত তাকে বুঝি স্পর্শও করতে পারেনি।

সেদিনের সেই চঞ্চল সৌন্দর্য আজ স্থির, সংহত। স্বপ্নভরা দুটি চোখের গভীরতায় বুঝি নীলাঞ্জন ছায়া। খোঁপায় দুলে-ওঠা রজনীগন্ধার গুচ্ছ মনে হয় সৌন্দর্যময়ীর রূপকে অলংকৃত করেছে ঐ রজনীগন্ধার গুচ্ছ?

সেবার রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে অলংকার-শিঞ্জিত কণ্ঠে 'নীলাঞ্জন ছায়া'র অপরূপ মায়ায় রবীন্দ্রসদন ভর্তি শ্রোতাদের বিবশ করে দিয়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরে আসতেই সকলে যেই সমস্বরে বলে উঠলো 'কি অপূর্ব গানই না গাইলেন মোহরদি? সত্যিই ভোলা যায় না।' একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিহ্বলা বলে ওঠেন 'সো...ওত্তাতি?' স্বপ্নচ্ছায়া বিছানো চোখের শ্যামল আলো, আর খোঁপায় দোলানো

রজনীগন্ধাও যেন দুলে ওঠে ঐ কণ্ঠেরই নীরব প্রতিধ্বনির ছন্দে।

আসরে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান যতবার শুনেছি মন দুলে উঠেছে তাঁর কাশ্মীরী কঙ্কের মত সূক্ষ্ম কারুকলাসমৃদ্ধ কণ্ঠের দ্যুতিময় ব্যঞ্জনায়। মুগ্ধ হয়েছি তাঁর প্রকাশভঙ্গির লালিত্যমাধুর্যে; তারিফ করেছি শিক্ষামার্জিত কণ্ঠের ত্রিসপ্তকে স্বচ্ছন্দবিহার ও ধ্বনিমাধুর্য। কিন্তু সে যেন টুকরো আলোর দ্যুতি। তারপর দুটি অনুষ্ঠানে (একটি আদ্রিজা মুখোপাধ্যায় আয়োজিত আসর, অন্যটি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং-এ) হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা আশ্চর্য সম্পদের দীপ্ত আলোয় শিল্পীকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। প্রত্যক্ষ করলাম তাঁর কল্পনার মহত্ত্ব, অনুভবগাঢ়ত্ব অন্তর্দৃষ্টি যার প্রসাদে শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতারাও প্রবেশাধিকার পায় এক আশ্চর্য উপলব্ধির রাজ্যে। নতুন করে দীক্ষালাভ করলাম যে সত্যে সেটি হচ্ছে এই যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিস্তীর্ণ পটভূমিকা থাকলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহিমা নির্ভর করে তার ভাবের ওপর।

টপ্পা অঙ্গের গানে কণিকা খ্যাতিমানা। কিন্তু সেদিনের নির্বাচিত গানগুলি শুনে মনে হোলো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও কর্ণাটকী স্বরকম্পনের সঙ্গে কীর্তন বাউলের দুর্লভ সমন্বয়ই তাঁর গায়কীকে এমন সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছে। 'হৃদয়-নন্দন-বনে'-তে সুপদের অনিচল শান্তি ও অতি কোমল শ্রুতিতে তাঁর নিষ্পলক স্থায়িত্ব, 'বন্ধু রহো সাথে'-তে টপ্পার দানা ও ঢেউখেলানো রংবাহারী মীড়, আবার 'হে মোর দেবতা'তে খেয়ালের ঢঙে তানের জমকালো আবেদনের পথ বেয়ে যখন 'বড় বিস্ময় লাগে'-তে থামলেন—শিল্পীর সাথে শ্রোতাদের মনও যেন অতল প্রশান্তিতে সমাহিত হয়ে গেলো। আংগিক ও সাহিত্যের মিলন-সঙ্গম, বিশুদ্ধ সুর, মীড়, গমক ও মূর্ছনার আবেদনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রগত সুরের যে মায়াপুরী সৃষ্টি হয়েছিলো—তা শুধু প্রতিভাময়ীরই অবদান নয়, সৃষ্টিময়ীর স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ স্বক্ষমদীপ্তি। গানের পর সমাগত গুণী শিল্পী সকলের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন—কল্লোলের মাঝখানে শিল্পী দাঁড়িয়েছিলেন একরাশ বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে। সে দৃষ্টি যেন অবাক হয়ে বলছে বুঝি 'সো ওতাতি?' তাঁর গান স্বভাবের নারীলাবণ্য (যাকে বলে উওমেনলি গ্রেস) থেকেই এই মাধুর্যঘন রূপ অজান্তেই আহরণ করে বসে আছে।

এ হেন শিল্পীসান্নিধ্যে একদিন সারাদিনের ছুটির আনন্দ যাপন করার একফাঁকে বললাম, 'এবার কিন্তু আমার প্রশ্ন করার পালা'—'ওমা সো...ওতাতি?' যদিও ঐ কণ্ঠের মীড়ের ঝংকার এই শ্রীহীন স্বরে ফুটবে না। 'কি সত্যি সন্ধ্যা?' শিল্পীর তরফ থেকে প্রতি-প্রশ্ন আসে।

'সেদিনের গানে সকলের চিত্তে এমন আলোড়ন তুলে দিলেন। আজ এতবড় একটা কাণ্ড করেও সবারই মুখের অভিনন্দনে আপনি অবাক? সত্যিই কি বোঝেন না রসিকচিত্তকে আপনি কিভাবে দুলিয়ে দিতে পারেন?'

সন্ধ্যা, গুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি জীবনে কোনো বড় পাওয়াকেই আমি কখনও 'প্রাপ্য' বলে ভাবি না। ভাবি এ যেন 'মহাপ্রাপ্তি'। যে কোনো শ্রোতার অ্যাপ্রিশিয়েসনে আমার মনে যেন বিস্ময়ের ঘোর লাগে। মনে হয় 'এ আমি পেতে পারি না। আমার পাবার যোগ্যতা নেই। এ অমার প্রতি বিধাতার বিশেষ করুণা। আমার গান তোমাদের হৃদয়ে যদি পৌঁছে থাকে আমি ধন্য—সার্থক। বারবার তাঁকে প্রণাম জানিয়ে প্রশ্ন করি—'সত্যিই কি আমি এত ভালো গেয়েছি?' অশ্রু-আভাসে ঝিকিয়ে ওঠে ভাবময়ীর দুটি ছায়াঘন চোখ।

'সেদিন আপনার গান শুনে মনে হোলো শিল্পী কৃতার্থ হয়ে ওঠেন তখনই যখন সে সঙ্গীত আমাদের প্রাণ-মন-অন্তরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাঁর পানে—যিনি গানের ও প্রাণের পরম প্রিয়তম। সৌন্দর্যবোধের পথ বেয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও এ বোধের গভীরায়মান সত্যে শিল্পীর অন্তর অজান্তেই অনুভব করে 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।'

একমুহূর্ত দ্বিধা করেই সংশয়মুক্ত কণ্ঠে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আমার ভাবের প্রতিধ্বনি তোমার কথায় শুনতে পাচ্ছি বলেই স্বীকার করছি মাঝে মাঝে গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যেন কোন অতলে তলিয়ে যাই—যার সঙ্গে প্রতিদিনের অতিচেনা জগৎটার কোনো সম্পর্ক নেই। তখন আমার সামনে কে বা কারা বসে আছেন সে খেয়াল থাকে না। মনে হয় আমার সকল বেদনা, দৈন্য, আনন্দ গ্লানি তাঁরই চরণে নিবেদন করছি—যাঁর কাছে অযোগ্যতার জন্য লজ্জাবোধ নেই। মালিন্যের জন্য কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।'

আজকের এই উদ্ধত অবিশ্বাসের যুগেও এমন ভক্তি ছলছলভাবে ডুবে আছেন কেমন করে?

আমি গোঁড়া ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে। আমার মা, বাবা অথবা পরিবারের কেউ অর্থকে কোনোদিন বড় করে দেখেননি। ঈশ্বরে আত্মনিবেদনই ছিলো তাঁদের জীবনবেদ। এর সঙ্গে মিশেছিলো গুরুদেবের সান্নিধ্য ও আশ্রমের অনাড়ম্বর পরিবেশ।

আমি অতি ক্ষুদ্র সন্ধ্যা। কিন্তু গুরুদেবের স্নেহ, আদর আমায় যেভাবে ঘিরে রেখেছিলো ঈশ্বরের করুণা ছাড়া তা পাওয়া সম্ভব নয়। গুরুদেব মহাকবি, মনীষী কি মহামানব এসব কথা ভাববার বোঝবার অথবা উপলব্ধি করবার মত বয়স তখন হয়নি। তাঁকে দেখতাম সঙ্গীর মত। সব সময় তিনি কাছে ডাকতেন। মজার, মজার কথা বলতেন। বড়দের গান শেখাবার সময় এই ক্ষুদেটিকেও সঙ্গে নিয়ে বলতেন, 'তুইও গা'। আমার নাম ছিলো অণিমা। সে নাম পাল্টে গুরুদেবই নাম দিলেন কণিকা।

মনে আছে কারো কাছে এতটুকু বকুনি অথবা কড়া কথা শুনলেই গুরুদেবের কাছে কুটকুট করে নালিশ করতাম। নালিশের তালিকা থেকে রথীদাও বাদ যেতেন না। অম্লানবদন অভিযোগও উনি অপরিসীম ধৈর্য সহকারে শুনতেন।

কি নাটক, কি গীতিনাট্য সবেতেই বড়দের সঙ্গে আমাকেও উনি নেবেনই। 'শারদোৎসবে' ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। উনি হয়েছিলেন ঠাকুর্দা। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য করাবার সময় আমায় দিয়ে গাওয়াবার জন্যই বিশেষ করে 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়' গানটি জুড়ে দিয়েছিলেন। ও গানটা 'তাসের দেশ'এ ছিলো না।

ওঁর সঙ্গে কোলকাতায় জোড়াসাঁকোতে যখন আসি সেই আমার প্রথম বাইরে আসা। কতজন কবির কাছে আসতেন। অবাক হয়ে দেখতাম।

একবার 'ছায়া' সিনেমাতে শো হয়েছিলো। মঞ্চে গুরুদেব বসে। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেয়েছিলাম 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'। খুব ছোটো তখন, সেই প্রথম বাইরে গাওয়া কিন্তু একটুও ভয় করেনি। গুরুদেব যে পাশে ছিলেন। আমার দিকে সব সময় ওঁর দৃষ্টি থাকত। প্রথম হিন্দুস্থানে যে রেকর্ড করেছিলাম, কি কারণে মনে নেই সেটা রবীন্দ্রসংগীত নয়। তার জন্য গুরুদেবের কি কম দুঃখ। পরেরবার নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েকটি রেকর্ড করালেন। তারপরে হেম সোমের আমলে গ্রামোফোন কোম্পানীর আর্টিস্ট হলাম। জনপ্রিয় সকল গানেরই রেকর্ড হয়েছে এখানেই। পি কে সেন ও এ সি সেন রবীন্দ্রসংগীত ও নাটকে রবীন্দ্রঅনুরাগীদের ডালি ভরে দিয়েছেন

বোম্বেতেও গুরুদেব আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা সরোজিনী নাইডুর বাড়ীতে ছিলাম। খাবার টেবিলে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আরও বড় বড় নেতা। তারই ফাঁকে গুরুদেব আমায় পাশে নিয়ে বসেছেন। কাঁটা চামচের দৌরাত্ম্যে খেতে পারছি না লক্ষ্য করে উনি বললেন, হাত দিয়েই খা।'

এমনই করে ঠিক মায়ের মতই সদাসজাগ স্নেহে আমায় আড়াল করে রাখতেন সকল ঝড়ঝাপটা থেকে। শেষের দিকে যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন আমায় সব সময় গান শোনাতে বলতেন। আমি ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গাইতাম। ১৯৪১ সালে আমি ও অরুন্ধতী (দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো) একসঙ্গেই ম্যাট্রিক পাশ করি। পাশের খবর দিতেই উনি হেসে বললেন, 'তবে আর কি? তুই ত আমার চেয়েও পণ্ডিত হয়ে গেলি।'

এমনই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার পাল তুলে দিন কেটে যাচ্ছিলো। কোনোদিন এর ব্যতিক্রম হবে ভাবতেই পারিনি। গুরুদেব থাকবেন না? এ-ও কি হতে পারে? কিন্তু তা-ও হোলো। সে খবর যখন এলো মনে হোলো পৃথিবীর সব আলো যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেলো। শান্তিনিকেতনের আকাশ বাতাস প্রকৃতির বুকেও যেন এক

[illegible]

১৫ সেপ্টেম্বর
[illegible]

বুককাটা শূন্যতা কেঁদে উঠে বলেছিলো 'সে নেই।' উপচে-পড়া চোখের জল মুছতে মুছতে কণিকা যেন অস্বাগতভাবেই বলে ওঠেন 'এই দুঃখ আজ কিছুতেই ভুলতে পারি না আমি বড় হয়ে কেন তাঁকে পেলাম না?' সেই বয়সে যে তাঁর ভাবনাকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতাই হয়নি, বড় বলে ত তাঁকে কোনোদিন ভাবিনি? বন্ধু কাছের ছিলেন বলেই কি? সবই ও'র কাছে হাতে-লেখা কবিতা, গান আদায় করে নিয়ে যেতো। আমি উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতাম কখন একলা থাকেন। লোভ থাকত ও'র কাছে রাখা বাদাম-ভাজা, লজেন্স ভর্তি শিশির প্রতি। অন্তর্যামী সবই বুঝতেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়লেই 'অয়' বলে দুহাত বাদাম ও লজেন্সে ভরে দিতেন।

বেদনাভরা স্মৃতির রাজ্যে যেন থমকে দাঁড়ান স্মৃতিচারিণী।

'আর অন্তর ভরে দিতেন যে অপার্থিব রসে তাই-ই বুঝি গহন-সঞ্চারী হয়ে আপনার গানকে এমন সরস মাধুর্যে ভিজিয়ে দিয়েছে?'

একটু ভেবে কণিকা বললেন 'হতেও পারে। গানটা যেন খেলার মতই সহজ আনন্দের বস্তু হয়ে উঠেছিল। গুরুদেবের কাছে যখন-তখন গান শেখা ত ছিলই। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে ছিল তখন পুরো-পুরি আশ্রমের পরিবেশ। সকাল-বিকেল বর্ষা-গ্রীষ্মে প্রকৃতির মেজাজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে গান শেখা আর গাওয়া। উন্মুক্ত প্রান্তরের এক দিকে আমরা গাইছি, অন্য দিক থেকে গানে গানে সাড় দিয়ে উঠল আর এক দল। গানের ভাষকে চেষ্টা করে বুঝতে হত না। স্বতঃস্ফূর্ত বর্ষাধারার মত, প্রকৃতির কোল আলো করে ফুটে ওঠা অজস্র ফুলের মতই সহজ ছন্দে গান নেচে উঠত কণ্ঠে মনে প্রাণে।'

'এ তো গেল গানের ভাবের দিক। কিন্তু কণ্ঠের ঈশ্বরদত্ত আওয়াজ ছাড়াও যে বস্তু আপনার গানকে বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ করেছে তার মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা ও অনু-শীলনীর সুস্পষ্ট ছাপও রয়েছে।'

'থাকা উচিত। কারণ ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখাটা আমাদের কম্পালসারী ছিল। হেমেন্দ্রলাল রায় বি ভি ওয়াজেল্লা ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কাছে ক্ল্যাসিক্যালের তালিম পেয়েছি। গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব সারা ভারতের বড় বড় গুণী বীণকর ঘন্মী ওস্তাদ ভীমরাও শাস্ত্রী এঁরা ছিলেন শান্তিনিকেতনের নিত্য অতিথি। এঁদের গান-বাজনা শুনেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে নিজের ভাবতে শিখেছিলাম। আমি ও অরুন্ধতী ম্যাট্রিক পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত ভবনের কোর্স শেষ করি।'

এ-আলোচনার কিছু দিন বাদেই রবীন্দ্র-সদনেই একটি অনুষ্ঠানে কণিকা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গান বোধহয় কোন দিনই ভুলতে পারব না।

বিধাতার দেওয়া সনন্দ নিয়ে আসেন যে শিল্পী তাঁর গান শোনবার সুযোগ পাওয়াটা ভাগ্যের কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু এই সৌভাগ্য একটা সুখ ও বিস্ময়ের স্মৃতি হয়ে ওঠে যদি শিল্পীকে শোনা যায় ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তিনি নিজেই আপন সৃষ্টিতে বিভোর হয়ে যান।

ঠিক এই রকমই এক দুর্লভ মুহূর্তই কণিকা সেদিন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর গানে।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন অল্পাশীর কপালে সুখ নেই। অপার আনন্দের অধি-কারী শুধু সেই দুরাশী যে অপার ভূমার জন্য পারের নৌকার কাটে। এ উপলব্ধির আভাস মেলে তখনই যখন বহিরঙ্গ আনন্দের মধ্যে শিল্পী আর তেমন তৃপ্তি পান না। আর এই অতৃপ্তির পথ বেয়েই মেলে সেই বৈরাগ্যের প্রসাদ যে বৈরাগ্য গুরুর মতই শিল্পীর অন্তরালোক উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দেয় তার অভীপ্সা কোন পথে সার্থক হয়ে উঠতে পারে। কণিকা স্বধর্মে ভক্তিমতী। আর সেদিন অনুভবের দিব্য-দৃষ্টির কপাট নেই যেন তিনি পৌঁছে গিয়ে-ছিলেন তাঁরই চরণতলে যাঁর জন্য পথ চেয়ে যে কেটে গেলো (সেদিনের শেষ গান)। সঞ্চারী অংশে 'এরা সবাই কিন্ই বলে গো'-র কি-তে নিস্পৃহ বৈরাগ্যের সুর মীড়ের মোচড়ে মোচড়ে অন্তরার দিকে এগিয়ে যখন সটান পঞ্চমে এসে দাঁড়াল মনে হয়েছিল পাওয়ার চরমে তিনি পৌঁছে গেলেন। আর শ্রোতাদের অন্তরকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সেই নিস্তব্ধ লোকের দ্বারে যেখানে গান হয়ে ওঠে প্রসাদ। সেদিন মনে হয়েছিল তাঁর গান যেন অন্তরদেবতার দিকে গহন-অভিসার শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় জর্নি এ্যালোন টু দি এ্যালোন।

এ উপলব্ধির কথা তাঁকে বলেছিলাম—জন্মগত প্রতিভা শিক্ষার সুযোগ অনুকূল পরিবেশের অপূর্ব যোগাযোগ আপনার সঙ্গীত জীবনে ঘটেছে। কিন্তু আপনার গানে এ সবেরও উপরি-পাওনা হলো অনু-ভবের দিব্যদৃষ্টি।' সেই দিনই কণিকা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাছে কবুল করেছি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কথার সৌন্দর্য এবং কিছু গানে সুরের মধুরতা ছাড়া বিশেষ কিছু নেই এই রকম একটা ধারণা আমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বহুধা-বৈচিত্র্যে অভ্যস্ত মনের অগোচরে হয়ত বা ছিল—আর এজন্য অনেকটা দায়ী দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু শিল্পী—একথাও নির্দ্বিধায় বলব। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আপনার নানান গানে হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতিগুলি মীড় গমক মূর্ছনার আবেদনে যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে সকল বিরুদ্ধ ভাবের অহমিকা যেন মাথা নীচু করে বলেছিল হার মেনেছি। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব যে প্রকৃত শিল্পী-ব্যক্তিত্ব ছাড়া এ অনুভবের রাজ্যে কেউ পৌঁছে দিতে পারে না। আপনার গুরুদেবের ভাষায় আমার করুণ হাসি আসে যখন কোন তথাকথিত রবীন্দ্র সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ পাজোয়ারী সুরে বলেন আমার মত ক্ল্যাসিক্যাল আসরের শ্রোতার পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেন গানের রস উপলব্ধির ক্ষেত্রেও পার্টিশন করা গেছে, ছোট্ট চেম্বার আছে আর প্রত্যেকটাতে লেখা আছে এ অমুক রসগ্রহণের উপযোগী ও অমুক রসগ্রহণের অধিকারী। তা ছাড়া সত্যিকারের সঙ্গীতপূজারীর কোন প্রেজুডিস থাকতে পারে না।'

এতগুলি কথা বলেই অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম বুঝতে পেরে শিল্পী খুব মিষ্টি করে হেসে বললেন ভুল যে বেসেছে সেই জনে সংধ্যা প্রীতি কেমন করে অজান্তেই আমাদের সকল প্রেজুডিসের বিষদাঁত হরণ করে। তুমি যথার্থ শিল্পপূজারী তাই সৌন্দর্যানুভূতির দুয়ার তোমার কাছে বন্ধ থাকতে পারে না।

তাছাড়া ওস্তাদী গানের সঙ্গে গুরু-দেবের অহিনকুল সম্পর্ক ছিল এর চেয়ে ভুল ধারণা কিছু নেই। তাঁর কল্পনার স্ফটিক ছায়ায় নানা রাগের রং ও বাহার আপন স্বরূপে ধরা দিয়ে কথা ও সুরের এমন মিলন ঘটাস কেমন করে যদি না মনের অতলে তাদের গভীর ছাপ থাকত? শান্তিনিকেতনে এত ওস্তাদকে উনি কেন আমন্ত্রণ জানাতেন যদি তাঁদের কাছ থেকে গ্রহণীয় কিছু নেই ভাবতেন? ও'র যতখানি বিরাগ ছিল নিষ্ক

অণিমার নাম পরিবর্তন করে
কনিকা নাম দেওয়া হয়েছে, তার
পিতারও সম্মতি আছে। আশ্রমের
খাতায় এই নাম চালানো হতে পারে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রেণীর গায়ক-গায়িকার অলংকারপ্রপীড়িত সুরের হুংকারের প্রতি, ঠিক ততখানি মুগ্ধতা ছিল উচ্চ শ্রেণীর শিল্পীর তনালাপের সংযমের প্রতি।

তারপর আত্মগতভাবেই যেন বলে চললেন—কোনো গভীর রাগ তাঁর মনকে যে কিভাবে দুলিয়েছে সে কথা অনুভব করতে হলেও আর একজন রবীন্দ্রনাথের দরকার। সৌন্দর্যবোধের নানারঙা রূপের প্রত্যেকটিই তাঁর কাছে অতি-সত্য অতি-আপনার হয়ে উঠেছিল বলেই নিজের গানের ওপর তিনি অন্যের রং ফলানো বরদাস্ত করতে পারতেন না। এর জন্য অনেক আক্রমণ অনেক আঘাত ও বিতর্কের মুখোমুখিও হয়েছেন।

ও হ্যাঁ — এইপ্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি।

সম্প্রতি এক বিশিষ্ট শিল্পী মন্তব্য করেছেন যে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা সেখানকার প্রথা অনুসারে স্বরলিপি দেখে গান পরিবেশন করে থাকেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রধানত গুরুমুখী। অর্থাৎ সঙ্গীতগুরু নিজে গান করে তারযন্ত্রের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেন। স্বরলিপির সাহায্য নেওয়া হয় কেবলমাত্র সুর মনে রাখবার এবং বিশুদ্ধতা বজায় রাখবার জন্য। অন্যান্য যে কোন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপির যে ভূমিকা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার সেই একই ভূমিকা। যদি কোন শিল্পী স্বরলিপি দেখে গান পরিবেশন করেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সুবিধা বা অভ্যাসের জন্য। এই অভ্যাসের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কোন প্রথার কোন সম্পর্ক নেই।'

শিল্পী হিসেবে আপনার মনে কোন বেদনা নেই? কোন অপ্রাপ্তির ক্ষোভ?

সত্যি, গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছি **সেই ত জীবনের চরম পাওয়া।** তার বেশী কি চাইতে পারি? কি বা পেতে পারি? অন্তত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমি ত মানুষ। মানুষের মন বীণার তারের মতই। উঁচু সুরে বার বার বাঁধলেও মাঝে মাঝে সুর নেমে আসে বই কি।

গুরুদেবের ভালবাসা পেয়েছি। তারপরে কারো কাছে পাওয়া কোন অবিচারের বা আঘাতের বেদনা মনে কি বাজে নি? বেজেছে। কিন্তু সে বেদনা স্থায়ী হয় নি। যখনই নিজেকে অসহায় মনে হয়েছে নিজের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছি। ভেবেছি গান গাওয়ার আনন্দেই ত শিল্পীর আনন্দ। সে আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত নই। আর শ্রোতাদের ভালবাসা? এ দিক দিয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবতী। সেজন্য ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এ কৃতজ্ঞতাবোধ যেদিন থাকবে না সেদিন আমার গানও ফুরিয়ে যাবে।

আর একটা কথা—গান গাইবার প্রেরণা আমি শান্তিনিকেতনে যতটা পেয়েছি তার থেকে অনেক বেশী পেয়েছি শান্তিনিকেতনের বাইরে থেকে। কোলকাতাকে এজন্য বড় আপনার মনে হয়। বাংলাদেশে যখন যাই নি কিম্বা যাবার সম্ভাবনাও ছিল না তখনও ঢাকা থেকে (ঢাকা তখন বাংলাদেশ হয় নি) কত অচেনা ছেলেমেয়ে শান্তিনিকেতনে এসে আমার দেখা না পেয়ে সুন্দর সুন্দর ঢাকাই শাড়ী রেখে গেছেন।

গত বছর আমেরিকার নানা শহরে যখন গান গেয়ে বেড়িয়েছি একটা কথা বার বার মনে হয়েছে। রসিকচিত্তের কোন জাত নেই। দেশ-কাল-ভাষার ব্যবধানের অতীত এক অদৃশ্য ধর্মের বন্ধন যেন তাদের এক করে রেখেছে। গানের সঙ্গে যখনই প্রাণকে মেশাতে পেরেছি—তার সাড়া সকল শ্রোতার কাছ থেকেই পেয়েছি। তাঁদের সাড়া দেবার প্রকাশভঙ্গীর তফাৎ থাকতে পারে। কিন্তু সাড়াটা সাড়াই। আর আত্মার পরম পাওয়া ত সেইখানেই।

মানুষের দেওয়া আঘাত মনকে বিচলিত করে। তবে আগে যতটা করত এখন তার চেয়ে অনেক কম করে। আর মনের এই ক্ষণিক দ্বন্দ্বের উত্তরণ ঘটতে দেরী হয় না—হয় না হয়ত গুরুদেবের আশীর্বাদের জোরেই।

মাঝে মাঝে আপনার গান শুনলে মনে হয় যেন কোন একাকীত্বের দ্বীপে আপনার বিরহিণী মনটা ঘুরছে অথচ এমনিতে আপনি খুব মিশুকে। হৈ-চৈ করা মেয়ে।

আড্ডা হৈ-চৈ আমার নিশ্চয় ভাল লাগে কিন্তু তাঁর গান যখন গাই তখন সেই সুরের সঙ্গে কথার সঙ্গে আর প্রকৃতির সঙ্গে কোন পার্থক্য খুঁজে পাই না। কথা সুর পরিবেশ আর আমি নিমেষে এক হয়ে যাই। এ ব্যাপারটা আপনা থেকেই ঘটে যায়। তাতে আমার কোন চেষ্টা নেই। কৃত্রিম কোন কৃতিত্বও নেই। যাঁরা স্রোতোধারা তাঁরই পুজো।

গুরুদেব 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধে সুরের স্থান ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বলেছেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্গীতের স্থান সম্বন্ধেও সুচিন্তিত মত লিপিবদ্ধ করেছেন। কোনরকমের একাকার শিক্ষা প্রকল্পেই নয়। সকল কাজকর্মে গানের স্থান এখানে বর্তমান। দিনের শুরু বেদমন্ত্র আবৃত্তি ও গান দিয়ে। শেষও তাই। প্রত্যেক ঋতুর পরিবর্তন ও প্রতিটি অনুষ্ঠানের উপযোগী গান রচনা করে মনকে প্রকৃতির সঙ্গে এক করবার চেষ্টা করেছেন। তাই অতি সহজেই আমরা গানের মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছি।

সে সুযোগ কেমনভাবে গ্রহণ করেছি বলতে পারব না। মনে হয় অচেতনভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছি। এখানকার মন্দিরের বেদগান অনুষ্ঠানের মন্ত্র উচ্চারণে রোমাঞ্চিত হয়েছি। অর্থ সব বুঝিনি। কিন্তু সুর প্রতিধ্বনি তুলেছে মনে। গুরুদেবের বহু গানের অর্থ তখন বুঝিনি বা বোঝবার জন্য মাথাও ঘামাইনি। তবু সেই সুরের টানে এক অখণ্ড মণ্ডল সম্পূর্ণ জগতে যেন চলে গিয়েছি। আর বেদনাবোধ করেছি এখান থেকে আবার চলে আসতে হবে বলে। হয়ত সেইজন্যই আমায় তোমাদের দ্বীপান্তরের মানুষ বলে মনে হয়েছে।

কোলকাতার মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম অধ্যায়টা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কোলকাতাকে এত ভালবাসেন বলেই জিজ্ঞেস করছি।

সে এক উদ্দীপনার যুগ। শুভদা শান্তিনিকেতনের ধারায় কোলকাতায় একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়বার পরিকল্পনা করলেন। কোলকাতার ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে। গুরুদেবের গান সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে ভাবতেই মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। শুভদার বয়স তখন বাইশ কি তেইশ বছর। ঐ বয়সের একটা ছেলের পক্ষে এত বড় কাজে নামা কতখানি দুঃসাহসের কাজ বুঝতে পার?

গীতবিতানের প্রতিষ্ঠা হোলো। শুভদা (গুহঠাকুরতা) ও'র বন্ধু সুজিতরঞ্জন রায়ের সহযোগিতায় কাজে নামলেন। শৈলজারঞ্জন মজুমদার, কনক বিশ্বাস, অনাদিদা নীহারবিন্দু সেন আমি অরুন্ধতী

আমাদের সবাইকে নিয়ে এলেন। এই গীতবিতানের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই নিউ এম্পায়ারে শুভদা (শুভ গুহঠাকুরতা) 'মায়ার খেলা' করালেন আমাদের মানে মেয়েদের দিয়ে। নীলিমা সেজেছিলো অমর অমুন্ধতী শান্তা, আমি ছিলাম প্রমদার রেনে, বিবিদি, শৈলজাদার তত্ত্বাবধানে। হাউস ফুল। [illegible] মাণ্ডকর সাফল্য।

পরে মতান্তর হওয়ায় শুভদা গীতবিতান থেকে সরে এসে দাক্ষিণী করলেন।

আমি, সুচিত্রা, জর্জদা, হেমন্তবাবু গানের আসরে দেখা হলেই নরক গুলজার করতাম। সেই মধুর সম্পর্কে আজও ভাঁটা পড়েনি। কোলকাতায় আসার একটা বড় আকর্ষণ এটাও।

গুরুদেবকে ভালবেসেছি বলেই অন্য সুরকার ও রচয়িতাদের সৃষ্টির মধ্যে আমি তাঁদের উপলব্ধিকে অনুভব করবার চেষ্টা করি, সকল ক্ষুদ্রতা গোঁড়ামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁর 'অচলায়তন' 'তাসের দেশ'। আমার প্রথম স্কলারশিপের টাকায় যে কটি রেকর্ড কিনেছিলাম—দিলীপ রায়ের 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম', ভীষ্মদেবের একটি ঠুংরীও তাতে ছিলো। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি ভালবাসা এসব গানকে ভালো লাগার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ত। আমি অতুলপ্রসাদ, নজরুলের গান, ভজনও রেকর্ড করেছি গাইতে ভালো লাগে বলেই। অন্যের গান গাইলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হবে এ চিন্তা আমার মনে কোনোদিনও স্থান পায় নি। নিজের মা-বাবাকে ভালবেসেই ত মানুষ অন্যের মা, বাবার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হয়। সবচেয়ে বড় কথা গুণীকে শ্রদ্ধা জানাতে গুরুদেব চিরদিনই অ-কুণ্ঠিত ও অকৃপণ ছিলেন। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই বলেই অন্য সঙ্গীতের প্রতি নাক উঁচু ভাব দেখানো রবীন্দ্রধর্মের বিরুদ্ধাচরণ বলেই আমি মনে করি। যে কোনো ভালো কণ্ঠ, সুর ও রচনা আমার মনকে দোলা দেয়।

এই অবধি বলেই মোহরদি একটু আনমনা সুরে বলেন, সত্যি মানুষের সঙ্গে মানুষের এইরকম নির্মল সম্পর্ক কেন গড়ে ওঠে না? অকারণ দ্বন্দ্ব, ঈর্ষায় আমরা নিজেদেরই কত বড় আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি।"

অজান্তেই মনটা মুগ্ধ হয়ে যায়। এমন বড় মনের অধিকারিণী বলেই কি কবির গান এঁর কণ্ঠে এমন মায়াময় হয়ে ওঠে? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভাবনাকেও এত নিবিড় করে পাওয়া যায়।

মোহরদির যথার্থ দরদী মনটির আরও অনেক পরিচয় পেয়েছি তাঁর অজান্তে এবং অসতর্ক মুহূর্তেই। কত গানের আসরে। নিজের নিজের অনুষ্ঠান শেষ হলে সব শিল্পীরাই চলে যান। কিন্তু গান শেষ হওয়ার পরও মোহরদিকে দেখেছি উইংস-এর পাশে বসে খুব মন দিয়ে শুনছেন অখ্যাত তরুণ শিল্পীদের গানও। গানের শেষে সবাইকে গিয়ে অগ্রজার স্নেহে উৎসাহ দিচ্ছেন। এটা যে মহত্ত্বের পোজ নয়—তাঁর আগ্রহ ও মুখের উদ্গ্রীব অভিব্যক্তিই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়। উনি প্রায়ই বলেন—শান্তিনিকেতনে, এবং কোলকাতাতেও ছোটদের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর গলা এবং প্রতিভাও আছে। মাঝে মাঝে ভাবি সমালোচক ও সংগঠকদের মনোযোগের অভাবে এরা যদি মাঝপথে হারিয়ে যায়? কি হবে? রবীন্দ্রসংগীতকে ভবিষ্যতে রাখবে কারা?

...সন্ধ্যা এরা এত অবহেলিত যে কি বলব। একমাত্র তুমি এদের জন্য অনলস পরিশ্রম করে যাও দেখেছি। তোমাদের কাগজের কাছে এজন্য আমি এদের হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।... জাননা সন্ধ্যা দায়িত্বজ্ঞানহীন, বে-দরদী সমালোচনা মানুষের মনকে কিভাবে ভেঙে দেয়। দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

বোলপুরে প্রথম টেলিফোন পত্তনের অনুষ্ঠানে গুরুদেব বড়দের সঙ্গে আমাকেও নিয়েছিলেন। তিনি নিজে খুব সম্ভব আবৃত্তি করেছিলেন। আমি গেয়েছিলাম 'ওগো পঞ্চদশী'। রেডিওতে ব্রডকাস্টিংও হয়েছিলো। আনন্দের স্মৃতি আজও রোমাঞ্চ জাগায়।

আর একটি ঘটনা সুরেশ চক্রবর্তীর আমলে রেডিওতে। যতদিন বেঁচে থাকব এ ঘটনা তিক্ত স্মৃতি হয়ে থাকবে, আমি সারা মন প্রাণ দিয়েই গেয়েছিলাম 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে'। তখনকার বেতার জগতে সমালোচনা বেরিয়েছিল 'বিশ্রী গলা'। মনে আছে আমি পাগলের মত কেঁদেছিলাম। ভেবেছিলাম গান ছেড়েই দেব। বিশ্রী গলাই যদি হয় গাইবার দরকার কি?

"আর অন্য?"

সে-কথা ত তোমরা বলবে।

মনে হয় যত দিন যাচ্ছে আপনার গানের জৌলুষ যেন আরো বাড়ছে—যদি সত্যিই তা হয়ে থাকে তবে তার মূলে আছে সকলের চোখের আড়ালের একটি মানুষের নীরব অবদান। তোমাদের বীরেনদা যদি সকল বিরুদ্ধতার মধ্যেও তাঁর সকল সহযোগিতা দিয়ে আমায় আগলে না রাখতেন গান গাইবার এই মনটাই মরে যেতো।

এবার আমার শেষ প্রশ্ন মোহরদি 'বলিগো সজনী যেওনা যেওনা' গানটি যতবার শুনি ভালো লাগে এই কথা ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের অমন দেবতার মত রূপ, বিশ্বজয়ী প্রতিভা, তবু তাঁকেও ত বেদনার্ত চিত্তে বলতে হয়েছে

'আমায় যখন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে
কাজ কি, কাজ কি, কাজ কি সজনী
আর তারে তারে দিওনা বেদনা।'

এখানে আমাদের পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে তাঁর মনের সমধর্মিতা অনুভব করে মনটা খুশী হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার এক বান্ধবী সেদিন একথা মানলো না। বললো রবীন্দ্রনাথের অনুভব সর্বগামী ছিলো বলেই মানুষের সকল বেদনাকেই তিনি এমন হৃদয়-ছোঁওয়া রূপ দিতে পেরেছেন।

কিন্তু এ ইন্টারপ্রিটেশন মেনে নিতে আমার মন চায় না। আমার ভাবতে ইচ্ছে করে জীবনের কাছে যা চাইবার তা তিনি আমাদের মতো ব্যাকুলভাবেই চেয়েছেন, অপূর্ণতার ক্ষোভে কেঁদেছেন। ভাবতে ক্ষতি কি কোনো কাঁকন-পরা হাতের ঘা খেয়ে উদভ্রান্ত চিত্ত হয়েছেন (হোকনা সে ক্ষণিকের জন্য) খুবই হিউম্যেন। তাই খুব আপনার জন। —অমন ইম্পার্সোন্যালভাবে তাঁকে ভাবতে ভালো লাগে না। —বলেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি উত্তরের জন্য।

এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত। নিজের বেদনা দিয়েই মানুষ অপরের বেদনা বোঝে। আর কবি বলেই তাঁর স্পর্শকাতরতা আরো বেশী। পার্সোন্যাল অনুভূতির পথ বেয়েই ত মানুষ ইম্পার্সোন্যাল স্টেজে পৌঁছয়। এই ত কদিন আগে। রবীন্দ্রসদনে তুষারবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। কি মুক্ত মনের মানুষ। গানের কথা উঠতেই একটি পুরোনো আমলের টপ্পার পদ গেয়ে দিলেন

'আমারে আসতে বলে
এত অপমান করা?'

মনের কথার সহজ প্রকাশ ছিলো বলেই গানের কলিটি মনে আছে।

জান সন্ধ্যা মানুষের হৃদয়ের গহন গভীর অনুভূতি বড় লাজুক। যার তার কাছে ঘোমটা খোলে না। এইসব সুকুমার অনুভূতিগুলি অকরুণ কৌতূহলের হাতে ঘোমটা খুলতে লজ্জা পায়। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষকেও গভীর সুরে গভীর কথা বলবার আগে কাঁচুমাচু হয়ে মাথা চুলকে বলতে হয়েছে 'মনে মনে হাসবি কি না বুঝব কেমন করে?

হয়ত বা সেইজন্যই প্রথম প্রথম বাইরে গাইতে আমার বড় কুণ্ঠা আসতো। গাইবার সময় গুরুদেবের গানের একটি কথা উচ্চারণ করতে না করতেই মনটা সংকুচিত হয়ে উঠতো 'সভার মাঝে মনের কথা বলা? ছিঃ।'

'তারপর?'

গাইতে গাইতে কখন যে শ্রোতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছি বুঝতেই পারিনি। আজ গানের শেষে তোমাদের চোখে দেখি আমার হৃদয়াবেগের ছায়া। তোমাদের 'এ্যাপ্রিশিয়েসন' আমায় নতুন শক্তি নতুন প্রেরণা এনে দেয়। সব সময় মনে হয় আমায় আরো অনেক, অনেক ভালো গাইতে হবে। আরও দিতে হবে। এখনও বুঝি কিছুই দেওয়া হয়নি।

সন্ধ্যা সেন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আবার কোথা থেকে একটা ভাবনা এলো মনে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার ঘোলাটে রংয়ের মত বিষণ্ণ হয়ে উঠল মন। ঝিন্নি আমার অনেক কাছে সরে এসেছে ঠিক কিন্তু স্পষ্ট করে ও তো কখনো বলেনি যে ও আমার জীবনের সঙ্গী হতে চায়! নিজের মনের থেকেই একটা উত্তর ভেসে এল। একটি মার্জিত রুচির মেয়ে এর চেয়ে বেশী কি বলবে। ওর বাধাহীন আত্মসমর্পণের ভেতরেই তো ওর সব কথা পাণ্ডুলিপি হয়ে আছে। শুধু পাঠোদ্ধার করে নেবার অপেক্ষা।

আমাদের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে রাতের দুটো পাখি উড়ে গেল।

ঝিন্নি বলল কি ভাবছ এত?

বললাম এখুনি যে দুটো পাখি উড়ে গেল, বলতে পার ওদের কথা।

ঝিন্নি যেন কিশোরী হয়ে গেছে। বলল, কি ভাবছ একটু বল না?

বললাম ওদের দুজনের প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটা কেমন ছিল তাই ভাবছি। দুজনের দুজনকে ভাল লাগার পর কি কথা ওরা বলেছিল। মন দেয়া-নেয়ার পরের মুহূর্তগুলোতে ওদের মনে কি ধরনের রোমাঞ্চ জেগেছিল। দুজনে নীড় রচনা করে প্রথম যেদিন সে নীড়ে আশ্রয় নিয়েছিল সেদিন কি ওরা নিবিড় সান্নিধ্যের উত্তাপে পরস্পরকে সবচেয়ে সুখী মনে করেছিল।

ঝিন্নি হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল তুমি কিচ্ছু জান না ছোটেসাহেব। ওরা ডিম পাড়ার সময় এলেই বাসা বুনতে থাকে।

বললাম হয়ত তোমার কথা ঠিক। দুজনের নিবিড় ইচ্ছার সৃষ্টিকে কত সুখে কত নিরাপদে রাখা যায়, তাই ভেবেই হয়ত ওরা নীড় রচনা করতে থাকে।

ঝিন্নি আকাশের দিকে চেয়ে বলল এখুনি ঝড় উঠবে তার আগেই আমাদের কোয়ার্টারে পোঁছতে হবে।

বললাম ঝড়ের আগে পাখিদুটো তাদের বাসায় পোঁছতে পারবে তো।

ঝিন্নি হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠল। বলল জানার এই ইচ্ছাটা চিরদিনের, কিন্তু এর কোন উত্তর চাইলেই কি পাওয়া যায় ছোটে-সাহেব?

আমার মনটা আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমি ঐ পাখি দুটির নির্বিঘ্নে বাসায় পোঁছানোর জন্য জীবনের অদৃশ্য পরি-চালকের কাছে প্রার্থনা জানালাম।

মেলা অনেক আগেই ভেঙে গেছে। শূন্য মেলায় শুধু কিছু এঁটো পাতা আর ছেঁড়া কাগজ উড়ছে। আমরা মেলা পেরিয়ে কাঠের কেল্লার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে ঝড় উঠল। আমরা আত্মরক্ষার জন্য কেল্লার এপারে পরিত্যক্ত একটি গুমটি ঘরের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। ওখানে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই চোখ গিয়ে পড়ল পথের ওপারে কেল্লার একটি ঘরের ভেতর। আলো আসছিল জানালার পথে রাস্তা পেরিয়ে গুমটি ঘর অব্দি। একটি লোক সে ঘরে বসে একমনে ড্রিঙ্ক করে যাচ্ছিল। নেশার ঘোরে ঝড়ের খবরটা হয়ত পায়নি তাই খোলা থেকে গেছে জানালাটা।

হঠাৎ আমাকে ওখানে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে কেল্লার দিকে দৌড়ে গেল ঝিন্নি। বাইরে থেকে চুপি চুপি জানালার পাল্লাদুটো ভেজিয়ে দিয়ে আবার ছুটে এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

আমার সারা শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল কেন? এই সামান্য ঘটনাটুকুর ভেতর কোন অশুভ বিশ্বাস কি আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে গেল? ঐ মানুষটাই কি মদনলাল?

তাহলে ঐ মত্ত বেহুঁস লোকটাকে সাহায্য করার ইচ্ছে জাগল কেন ঝিন্নির। এই তো কয়েক ঘন্টা আগে মদনলালকে দূর থেকে দেখে নিজেকে মেলা থেকে অনেক-দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ও। আমাকে বলেছিল, মদনলাল লোকটা নাকি ভীষণ খারাপ। এখন সেই মদনলালকে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজেকে ঝড়ের ভেতর ফেলতেও দ্বিধা করল না ঝিন্নি।

কি এক অপরিচিত যন্ত্রণা আমার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে এল। তখন মনে হল, এমন করে বিষয়টাকে দেখা আমার ঠিক হয়নি। বিপদের মুখে যে কোন মানুষকে সাহায্য করাই মানুষের কাজ। আর পাহাড়ী দেশের মানুষ একটু বেশীরকমের কর্তব্য-সচেতন। তাই ঝিন্নি ছুটে গেছে তার কর্তব্য-টুকু করতে। ঐ লোকটা মদনলাল না হয়ে যদি অন্য কেউ হত তাহলেও ঝিন্নি নিশ্চয়ই এমনিভাবে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত।

আমার মনে হল, লোকটা মদনলাল নাও তো হতে পারে। আর যদি সত্যি তা না হয় তাহলে এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী ভূভারতে আর কেউ থাকবে না। এর সমাধান কে করতে পারে? একমাত্র ঝিন্নি। কিন্তু

পাহাড়ী মেয়ে

এ ঘটনায় আমার উদ্বেগের যতবড় কারণই ঘটুক না কেন আমার আত্মসম্মানকে ছাপিয়ে দিয়ে ঝিম্নিকে আমি এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই করতে পারব না।

আমি ঝিম্নির মুখ থেকেই কোনকিছু শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম।

ঝিম্নি বলল ঝড় পর পর বেড়ে উঠছে। বরফ পড়তেও পারে। তার চেয়ে কষ্ট করে এটুকু চড়াই ভেঙে কোয়ার্টারে পালিয়ে যাই চল।

আমরা অন্ধকার পথে আবার পা বাড়ালাম। পথটা ঝিম্নির মুখস্থ। ও আমার হাত শক্ত করে ধরে প্রায় টানতে টানতে আর হুঁশিয়ারী দিতে দিতে ওপরের দিকে নিয়ে চলল।

প্রচন্ড ঠান্ডায় আমার মত শীতকাতুরের পক্ষে জমে যাবারই কথা কিন্তু ঐ কেল্লার কাছ থেকে ঝিম্নিকে নিয়ে চলে আসতে পেরে আমার সোয়াস্তি এত বেড়ে গিয়েছিল যে আমি তীব্র শীতের কামড় তেমন অনুভব করতে পারছিলাম না।

আর্ট গ্যালারী সংলগ্ন কোয়ার্টারে পৌঁছে ঝিম্নি তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে ফেলে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে অন্ধকারেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বলল, আজ এখানেই থাকব ওপরে যাওয়া অসম্ভব। তুমি দাঁড়াও আমি আলো জ্বালাচ্ছি।

সুইচ অন্ করার শব্দ হল কিন্তু আলো জ্বলল না। ঝিম্নি বলল, ঝড়ে এইমাত্র কারেন্ট অফ হয়ে গেছে। একটু আগে কেল্লায় আলো জ্বলছিল। কিন্তু বিপদ যে চারদিক থেকেই এল জোটসাহেব! এখানে ইলেকট্রিক আছে বলে টর্চ কিংবা লন্ঠন কোনটাই নেই।

বললাম আপদ গেছে। এখন হাত ধরে আমায় পোশাকগুলোর কাছে নিয়ে চল আমি আধভেজা জামাকাপড়ের ঠান্ডা থেকে রেহাই পাই।

ও আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর আমার সুটকেসখানা টেনে আনল। বলল নাও আন্দাজে হাতড়ে বের করে নাও তোমার দরকারী কাপড়চোপড়।

বলেই ঝিম্নি অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আমি খুঁজে পেতে জামাকাপড় বের করে পরে নিলাম। ঝিম্নি ভেতরের ঘরে কি করছে কে জানে। ও নিশ্চয়ই এতক্ষণ বদলে ফেলেছে ওর ভেজা পোশাক।

আমি হাতড়ে হাতড়ে বিছানাটা পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়লাম শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে।

ঝিম্নির দেখা নেই। আমি কম্বল জড়িয়ে অন্ধকারে বসে আছি। বাইরে ঝড়ের একটানা গোঙানী। দমকা হাওয়ায় পেছনের পাইন বনে কান্নার রোল উঠেছে। বরফ পড়া হয়ত শুরু হয়েছে এতক্ষণে।

আমি কতক্ষণ একইভাবে বসেছিলাম জানি না হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতেই পেছন ফিরে ঝিম্নিকে দেখতে গেলাম কিন্তু কোথায় ঝিম্নি! কেউ কোথাও নেই আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই ঝিম্নি সুইচটা অন করে রেখে থাকবে, তাই কারেন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা জ্বলে উঠেছে।

আমি ঘরে বসেই ডাকলাম ঝিম্নি কোথায় তুমি?

কোন সাড়া এল না।

অমনি কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘরের সূক্ষ্ম কোন্ ছিদ্র পথে শীতের কালনাগিনী ঢুকে পড়ে আমাকে ছোবল দিয়ে গেল। একটা কঠিন কনকনে যন্ত্রণা আমার রক্তমাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

তবু ঝিম্নির সন্ধানে আমাকে ভেতরের ঘরে যেতে হল। অনুমানে সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে আলো জ্বাললাম। কেউ নেই। পাঁতি পাঁতি করে খুঁজলাম, সারা কোয়া-র্টারের কোথাও ঝিম্নি নেই। তার ভেজা পোষাকখানা না বদলেই ঝিম্নি কোথাও চলে গেছে।

একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমি যেন মূর্ছিত হয়ে রইলাম। আসার আগে নরসিংলালজী বলেছিলেন, ওপরের জংগলে মাঝে মাঝে ভালুক দেখা যায়। শীত প্রচন্ড পড়লে ওরা স্নো-লাইন থেকে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। তখন জংগলের গুহা গহবরে আশ্রয় নেয় ওরা।

পেছনের যে দরজাটা কোয়ার্টার-সংলগ্ন সব্জি ক্ষেত বা লহুরীর দিকে রয়েছে আমি সেখানে চলে গেলাম। দরজা ভেজানো ছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ নেই। আমি হাত দিয়ে [illegible]তেই বাইরের দিকে খুলে গেল। মনে [illegible] দরজাটা ভেজিয়ে ঝিম্নি একটা পাথর চা[illegible] দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে গিয়েছিল। ঐ খোলা দরজার পথে এখন ঢুকে আসছে ঝড়ো হাওয়া। আমি কোনরকমে দরজাটা আবার [illegible] নিয়ে বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার মনে এখন আর কোন [illegible]নই কাজ করছে না। শুধু ঝড়ের [illegible] কান একটি অভাবনীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত [illegible] আছি।

বাইরে করাঘাত বেজে উঠতেই [illegible]টা খুলে দিলাম।

ঝিম্নি ভেতরে ঢুকে দরজা [illegible] করে দিল। ওর হাতে একটা টিফিনকে[illegible]র।

ও কথা বলতে পারছিল না। [illegible]রের ভেতর গিয়ে টিফিনকেরিয়ারটা রেখে দিয়ে ও আমাকে বলল চারপাই এর ওপর চাদির গোছাটা পাবে আর তুমি আলনার পাশে ঐ সুটকেশটা খুলে আমার শুকনো পোষাকগুলো বের করে দাও। আমার সারা শরীর ভিজে গেছে।

ওর কথাগুলো প্রবল কাঁপুনিতে জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলে ওর নির্দেশমত পোষাকগুলো বের করে দিয়ে বাইরের ঘরে চলে এলাম।

কিছুক্ষণ পরে ঝিম্নি আমার ঘরে এল। ফায়ার প্লেসে কাঠ সাজিয়ে আগুন ধরাল। কাইল আর ঝাউ গাছের কাঠ সহজেই ধরে যায়। ঝিম্নির তাই আগুন ধরাতে বেশী সময় লাগল না।

আধ ঘন্টার ভেতরেই ছিমঘরখানা আরামদায়ক উত্তাপে ভরে গেল। ঝিম্নি চুল খুলে ফেলেছিল। ভেজা চুল মুছে দু'গাল আর পিঠের ওপর দিয়ে প্রপাতের মত বইয়ে দিয়েছিল। এখন আগুনের তাপে শুকিয়ে নিচ্ছিল সে চুলের রাশ।

আমি কথা বললাম কেন এমন দুঃসাহসের কাজ করতে গেলে ঝিম্নি?

ও এইবার চিরুনি বের করে মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছিলে তো ? ভাবছিলে লেপার্ড বুঝি তোমার ঝিন্নিকে লোপাট করে দিলে। অথবা পাহাড়ী প্যানথার হয়ত আস্ত গিলেই ফেললে মেয়েটাকে।

বললাম, যখন দেখা গেল তুমি ঘরে নেই তখন আমি কিছু ভাবতেই পারছিলাম না।

ঝিন্নি বলল, তোমাকে সুটকেশখানা বের করে দিয়েই আমি দেশলাইএর খোঁজে গিয়ে দেখি দেশলাই নেই। হঠাৎ মনে পড়ল কাল ওপরের কোয়ার্টারে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। সারারাত ফায়ার প্লেসে আগুন না জ্বেলে থাকতে পারা যাবে না। তাই ওপর থেকে দেশলাই আনতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও বেলার তৈরী খাবারগুলোও নামিয়ে আনলাম।

বললাম, ঝিন্নি আমি যদি জানতাম তুমি এ ধরনের একটা কাজ করতে যাচ্ছো তাহলে তোমাকে একপাও বাইরে বেরুতে দিতাম না।

ঝিন্নি বলল তাইতো তোমাকে কিছু বলি নি চুপিচুপি বেরিয়ে গেছি।

আমি শুধু বললাম সত্যি ঝিন্নি খুব দুঃখ পেয়েছি।

ঝিন্নি চুলে চিরুনি চালানো বন্ধ করে বলল কেন দুঃখের আবার হল কি ?

আমি আর কোন কথা বললাম না দেখে ও উঠে এল আমার পাশে। হঠাৎ আমার মাথাটা ওর বুকের ওপর চেপে ধরে বলল, তোমার জন্যে এত কষ্ট করলাম, একটু আদর করে দেবে না ? তাহলে সব কষ্টই আমার দূর হয়ে যাবে।

আলো জ্বলছে। ওর ফুলে ফেঁপে ওঠা চুলের অরণ্য থেকে জেগে ওঠা মুখখানা যেন আমার একটুখানি আদর কেড়ে নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

বললাম, তোমার ঐ অতি বাস্তব ভোজপর্বটা শেষ হোক তারপর সারারাত গল্প করে কাটানো যাবে।

ঝিন্নি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুলে বিনুনী করতে লাগল। হঠাৎ খেয়াল চাপল আমার। বললাম একটা ইচ্ছা আছে, পুরণ করবে ?

ও বলল, তোমার ইচ্ছার কথাটা শুনি আগে।

কোন ভণিতা না করেই বললাম, তোমাকে আজ খোলা চুলে কাছে পেতে চাই ঝিন্নি। এটা যে কতবড় থ্রিল তা তুমি মেয়ে হয়ে বুঝবে না।

ঝিন্নির হাত থেমে গেল। সে মাথা দুলিয়ে বলতে লাগল কি যে পাগলামী তোমার ছোটে সাহেব দারুণ দারুণ সব খেয়াল বনবন করে ঘুরছে তোমার মাথায়। চুল খোলা রেখে কি শোয়া যায় ?

ও চটপট হাত চালিয়ে বিনুনীটা কোন রকমে শেষ করে রাতের খাবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বিছানায় বসে বসে দেখতে লাগলাম, কত নিখুঁত আর গোছানো কাজের হাত ঝিন্নির। ওর কোন কিছু দেয়া নেয়ার ছন্দটি সমঝদারের চোখে ধরা পড়বেই পড়বে। একটি পরিচ্ছন্ন সুখী সংসারের ছবিগুলো যেন ফুটে উঠছে ওর প্রতিটি কাজে।

রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমি বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে দুটো হাতের পাতায় মাথা রেখে সিলিংএর দিকে মুখ করে শুয়ে আছি। আলো জ্বলছে, তাই বন্ধ করে রেখেছি চোখ। ঝিন্নি ভেতরের ঘরে কিছু করছে। মিশ্রিত কতকগুলো ছোটবড় শব্দ ভেসে আসছে আমার কানে। ফায়ার প্লেসের থেকে উঠে আসছে তৃপ্তিকর তাপপ্রবাহ। আমার লেপটিতে রয়েছে অনেক আরামের সঞ্চয়। ভেতরের ঘর থেকে শব্দের ধারগুলো ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগলো আর আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভেতর।

কতক্ষণ ঝিন্নি ঘুমন্ত পুরুষের মুখাকৃতিকে দেখেছিল জানিনা। কি অনুভূতি একটি মেয়ের জাগে যখন সে চেয়ে চেয়ে দেখে তার ভালবাসার মানুষটিকে অকৃত্রিম অচেতন অবস্থায় তা আমার জানা নেই। তবে ঝিন্নি যে সেই আলোজ্বালা ঘরে অন্তত কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তা যে কারোর পক্ষেই অনুমান করা কষ্টকর ছিল না।

আমার অবচেতন মন ঝিন্নির উপস্থিতির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিল, তাই হঠাৎ আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আর ঠিক আমার চোখের ওপর দেখলাম একটি মুখ তার রাশি রাশি ছড়ানো চুলের ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

ঝিন্নি আমার মাথার দিকে বসেছিল, আর আলো ছিল ঠিক তার উল্টো দিকে। তাই আমি ঝিন্নির উদ্ভাসিত মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে ঝিন্নি তার মুখখানা একটু ওপরে তুলে নিয়ে বলল কি ঘুম-কাতুরে মানুষ তুমি সারারাত না গল্প করে কাটাবে বলেছিলে ?

মিথ্যে করে বললাম চোখ বুজে তোমার ছবি দেখছিলাম।

ঝিন্নি আমার কপালে ওর ঠোঁট দুটো ছুঁইয়ে নাড়া দিতে দিতে বলল, মিথ্যুক কোথাকার এত কথাও বানিয়ে বলতে পার তুমি। সেই কতক্ষণ বসে আছি চেতনাই নেই।

ওর চুলে ভরা মাথাটা আমার বুকের ওপর ধরে রেখে বললাম এতক্ষণ কি দেখছিলে ঝিন্নি ?

ঝিন্নি অনুচ্চে বলল, তোমার মনে দুষ্টুমীর ছবিগুলো কেমন ফুটে ওঠে তাই দেখছিলাম।

বিছানায় পাশ ফিরে ওর থুতনি আর গোলাপী আভার নাকটা ঠোঁটে চেপে আদর করলাম।

ও শুধু বলল, তুমি অনেক লোভী হয়ে যাচ্ছ কিন্তু ছোটসাহেব শাসন না করলে বিপদ ঘটাবে।

ওকে আমার মাথার দিক থেকে টেনে আনলাম বিছানার ওপর। আশ্লেষে আদরে ভরে দিতে লাগলাম আমার ঝিন্নিকে। লুঠেরার মতো লুঠ করতে লাগলাম বহু যত্নে সংগোপনে রক্ষিত ওর দুর্মূল্য রত্নগুলি।

একসময় আমার লুন্ঠনের প্রবৃত্তি যখন দুর্দম হয়ে উঠল তখন করুণ মিনতির সঙ্গে তাকে বাধা দিয়ে ঝিন্নি বলল, আমার যা আছে এখন থেকে সে তো তোমারই হয়ে রইল। এই মুহূর্তে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিও না ছোটসাহেব। সব তোমার শুধু তুমি আমাকে সযত্নে গচ্ছিত রাখবার অধিকারটুকু দাও। কোন এক বিশেষ লগ্নে আমি আমার যা কিছু আছে অনেক শ্রদ্ধা আর ভালবাসা মিশিয়ে তা তোমার সেবায় উজাড় করে দিতে চাই।

আমি ঝিন্নির মর্যাদা রাখলাম সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও।

মেলায় তলোয়ার খেলা

বললাম তাই হবে ঝিম্নি। তোমার অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যব না। আর যদি কোনদিন বড় বেশী লোভী হয়ে উঠি তাহলে তুমি আমার সে লোভকে প্রশ্রয় না দিয়ে শাসন কোরো।

অনেক গভীর রাত অব্দি বাইরে ঝড়ের গান আর ভেতরে দুজনের বুকের ধ্বনি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে জেগে উঠে দেখি নিবিড় বিশ্বাস আর নির্ভরতায় ঝিম্নি আমাকে জড়িয়ে অচেতনে ঘুমিয়ে আছে।

রোদ্দুরের সোনা ছড়িয়ে পড়তেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম কুলুর বাংলোর উদ্দেশ্যে। রাতের ঝড়ে পথের ওপর বরফ জমে গেছে। পাইনের সবুজ ঝালরে রুপোলী লেস ঝুলছে। দূরে কাছে পাহাড়ের মাথায় বরফ বরফ আর বরফ। সারা পীর-পাঞ্জাল ধবধবে সাদা। সূর্যের আলোয় চারদিকের বরফ ঝকঝক করছে।

ঝিম্নি বলল হেঁটে যাওয়াই স্থির তবে তুমি যদি লাকি হও তাহলে গাড়ী একটা পেয়ে যেতেও পার।

বললাম লাক আমার কোনদিনই ভাল না, তবে তোমার সংগে থেকে যদি কপালটা খোলে।

আমরা কেল্লার কাছাকাছি এলে ঝিম্নি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত নীচে নামতে লাগল।

কেল্লা পেরিয়ে ঝিম্নি বলল মদনলাল আস্ত একটা শকুনি। অনেক দূরের থেকেও ও সবকিছু দেখতে পায়।

একটু থেমে আবার বলল কাল দেখলে না আমি ঝড়ের ভেতরেও চুপি চুপি গিয়ে ওর জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। জানালা খোলা থাকলে আলোর রেখা ধরেই ও আমাদের চিনে ফেলত।

বললাম, তোমার যত সব উদ্ভট ভাবনা। তবে কাল ঝড়ের রাতে কাজটা তুমি ভালোই করেছ। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা মানুষকে তুমি বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ।

মনে মনে কিন্তু আমি ঝিম্নির কথার গভীর তৃপ্তি পেলাম। মদনলালের ওপরে ওর বিতৃষ্ণা আমার মনের ওপর গেঁথে থাকা ছোট্ট কাঁটাটা তুলে দিয়ে গেল।

নাগগরের পাহাড় ছেড়ে আমরা নীচে নেমে এলাম। ঝিম্নি কুলীর খোঁজে কাছা-কাছি একটা টিকার দিকে চলল। আমি মালের পাহারায় রইলাম।

ঝিম্নি সেই যে গেছে আর পাত্তা নেই। এদিকে আমি মালের ওপর চেপেচুপে বসে আছি। হঠাৎ একটা গাড়ীর হর্ন শুনে উঠে দাড়ালাম।

ওপর থেকে আমার সামনে গাড়িয়ে এল একখানা জীপ। ব্রেক কষে দাঁড়াতেই দেখলাম গত রাতে কেল্লার ভেতর দেখা সেই মানুষটি। এই তাহলে মদনলাল! দূরে থেকে যার চেহারা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাই হয়নি, আজ তাকে মুখোমুখি দেখলাম। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ই হবে। বয়সের তুলনায় কিন্তু অনেক বেশী স্মার্ট।

গাড়ীটাকে পথের এক ধারে সুবিধেমত জায়গায় রেখে মদনলাল এগিয়ে এল আমার পাশে। প্রথমে কুলুহী ভাষায় কথা বলে আমার মুখ থেকে বিস্ময় আর মৃদু হাসি ছড়া যখন কিছুই পেল না তখন ইংরেজী-তেই শুরু করল।

মদনলালের প্রথম জিজ্ঞাসা আপনি একা একা এভাবে বসে আছেন কেন? কোথায় যেতে চান?

বললাম আমার সংগীটি বিশেষ কাজে পাশের টিকাতে গেছে তাই অপেক্ষা করছি। ও এসে পড়লেই আমরা মানালীর দিকে রওনা দেব।

ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথাটা বললাম। আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম মদনলাল কুলুর পথেই পাড়ি জমাবে। আর সত্যি কথাটা বললেই মদনলালের গাড়ীতে বন্দী হয়ে যেতে হবে কুলু।

মদনলাল বলল আপনি টুরিস্ট বলেই মনে হচ্ছে আর টুরিস্ট হলে নিশ্চয়ই দুঃসাহসী টুরিস্ট। এ সময় বেড়িয়ে বেড়ানোতে হিম্মত চাই।

মৃদু মৃদু গর্বের হাসি হাসতে লাগলাম। ভাবটা তুমি ঠিক ধরেছ মদনলাল।

মদনলালের আবার প্রশ্ন আপনি কি মেলা দেখতে এসেছিলেন? উঠেছেন কোথায়?

দেখলাম লোকটা দারুণ কৌতূহলী আর এক একবারে অন্তত দুদুটো করে প্রশ্ন করতেই অভ্যস্ত।

বললাম হাঁ, কোলি-রি-দেয়ালী উৎসব দেখতেই এসেছিলাম। আশ্রয় পেয়েছিলাম সামনের ঐ পাহাড়ী টিকায়।

মদনলাল বলল ইনফরমেশান রাখেন না তাই নইলে আপনার একটু ওপরের পাহাড়েই সরকারী বাংলো আছে। দিব্যি আরামে থাকতে পারতেন।

হেসে বললাম এখানে এসে পাহাড়ীদের সঙ্গে কাটাতেই চেয়েছিলাম। আর তাই আনন্দও পেয়েছি প্রচুর।

মনে মনে বললাম এখন তুমি দয়া করে জীপখানা চালিয়ে এখান থেকে সরে পড়লেই বাঁচি।

মদনলালের যাবার তাড়া নেই। লোকটা যেন প্রশ্নের তুবড়ি। আমার বাড়ীঘর দেশ গাঁ থেকে চতুর্দশ পুরুষের খবর নিতে লাগল আর আমিও রকেটের গতিতে গল্প বানিয়ে চললাম। ডাহা মিথ্যেগুলো বলতে মাঝে মাঝে খারাপই লাগছিল, কিন্তু লোকটাকে নিয়ে কেমন যেন খেলার নেশায় পেয়ে বসেছিল আমার।

(ক্রমশঃ)
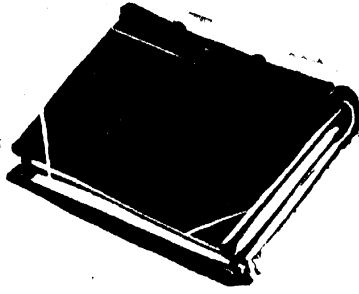
নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দুটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান : বিগত ২৩ মে মধ্য কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাগৃহে একই সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী ও শিলচরের একাদশ ভাষা-শহীদ স্মরণে বাংলা ভাষা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বকবির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের স্মরণীয় কাহিনী শুনিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দেন। সত্যেন্দ্রমোহন ভারতীয় ঐক্যের স্বার্থেই আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে বাংলার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু, পুলকেশ দে সরকার, শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং শঙ্কর রুদ্রও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। তাঁরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের 'পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার' পরিকল্পনা : জানা গেল যে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মধ্য কলকাতা অঞ্চলে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি 'পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার' স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সংস্থার চেয়ারম্যান সম্প্রতি বলেছেন যে, বর্তমানে যাঁরা নিয়মিত জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়াশুনোর জন্য যান, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই ছাত্র। কাজেই ছাত্র সমাজের সুবিধার জন্য তথা মূল গ্রন্থাগারের উপর চাপ কমাবার জন্য পূর্বোক্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠাগারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারে অন্ততঃ ৫০,০০০ বই রাখা হবে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ মধ্য কলকাতা অঞ্চলে এই পাঠাগার স্থাপনের উপযোগী বাড়ীর সন্ধান করছেন।

শোলোখভের 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধি লাভ

রুশ কথাসাহিত্যিক মিখাইল শোলোখভ স্বদেশের ডন-নদী অধ্যুষিত অঞ্চলের দুরন্ত স্বভাবের সাধারণ মানুষের কাহিনী পরিবেশন করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলা সহ পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর বহু গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। ইতিপূর্বে তিনি নোবেল পুরস্কারও লাভ [illegible] পদার্পণ করেছেন। এই জন্মতিথিতে সোভিয়েত সরকার তাঁকে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। গুণীর এই সমাদরের জন্য সকলেই খুশী হবেন সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষে মহান কথাশিল্পীকে আমরাও শ্রদ্ধা জানাই।

অবহেলিত পুরনো বইয়ের ব্যবসার জন্য আর্থিক সহায়তা

কলকাতাবাসীদের কলকাতা ভালো লাগবে এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সংস্কৃতিবান মানুষের পক্ষে কলকাতার কতকগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় দিক আছে, ঠিক যেমনটি দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজের নেই। এর মধ্যে একটি হলো কলকাতার পুরনো বইয়ের বাজার। আমরা সবাই জানি, সবাই সবাইকে বলে থাকি 'অমুক বিষয়ে অমুক সময়ের অমুক লেখকের বইখানা দরকার? সে তো বহুকাল আউট অব প্রিন্ট হয়ে আছে। ঠিক আছে চলে যান কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে খুঁজে দেখুন পেয়ে যেতেও পারেন।' এভাবে অনেক গবেষক তথা গ্রন্থবিলাসী অনেক সময় অনেক দুষ্প্রাপ্য বই কলকাতার পুরনো বইয়ের বাজার থেকে সংগ্রহ করেছেন এখনও প্রতিদিন করে চলেছেন। আমাদের পড়াশুনো এবং গবেষণায় সহায়তাকারী এমন একটি ব্যবসায় একেবারে সুরু থেকেই কেবল উদ্যোগী মানুষের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে রোদ-জল-ঝড়ের মধ্যে উৎসাহী পড়ুয়াদের সহায়তা সম্বল করে চলছিল; সম্প্রতি অন্যতম ন্যাশনালাইজড ব্যাংক—ইউকো ব্যাঙ্ক—এই ব্যবসায়ের সহায়তার জন্য এগিয়ে এসেছেন জেনে আমরা খুশী হলাম। শ্যামবাজার থেকে বৌবাজার পর্যন্ত ১৮০টি পুরনো বইয়ের দোকানের মধ্যে ১২০টিকে তাঁরা ইতোমধ্যেই আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। কৃষ্টি-ধর্মী মানুষমাত্রই এজন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাবেন সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ কোরীয় কবির দুঃসাহস

দক্ষিণ কোরিয়ার ৩৪ বৎসর বয়স্ক জনপ্রিয় কবি কিম চা-হা-কে সম্প্রতি দেশদ্রোহিতার জন্য আদালতে অভিযুক্ত করা হয়; তিনি নাকি হালে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে [illegible] অপরাধ। কবি চা-হা প্রকাশ্য আদালতেই তাঁর বিচারে নিযুক্ত জনৈক বিচারকের বিরুদ্ধে তাঁর আস্থার অভাবের কথা বলেছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে কবি চা-হা ইতিপূর্বে একবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, সেবার শেষ পর্যন্ত দেশের রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়।

নজরুল জয়ন্তী উদযাপন

গত ২৬ মে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে কবি নজরুল ইসলামের ৭৬তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়। কবি বর্তমানে ঢাকায় রয়েছেন। সেখানে হাজার হাজার মানুষ তাঁর বাসভবনে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে মনস্থ করেছেন এবং এজন্য তাঁরা একটি উপযুক্ত বাসভবনের অনুসন্ধান করছেন। জন্ম-জয়ন্তীতে কবির উদ্দেশে আমরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পাবলিশার্স গিল্ড

সম্প্রতি কলকাতার পাবলিশার্স গিল্ড নামে একটি সংস্থা সংগঠিত হয়েছে। এঁদের উদ্দেশ্য মন্থরগতি পুরনো পরিচালন ব্যবস্থার কবল থেকে প্রকাশন শিল্পকে মুক্ত করা এবং তার আধুনিকীকরণ। আমরা এঁদের সাফল্য কামনা করি।

পাভলভ ইনস্টিটিউটের রৌপ্য জয়ন্তী

কলকাতার পাভলভ ইনস্টিটিউটের রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন আলোচনা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিগত ১৮ মে এঁদেরই উদ্যোগে সাহিত্যে বিকলাঙ্গতা প্রসঙ্গে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তাতে অনেক বাঙালী লেখকও যোগদান করেছিলেন। মনোবিদগণ দুষ্টাচারকে একটি বিশিষ্ট মানসিক ধারা হিসেবে গণ্য করতে চান কিন্তু লেখকগণ বলেন যে দুষ্টাচারের মূলে সমাজ-সমস্যার গভীরে নিহিত গোটা মানুষের চরিত্র থেকে এই অবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা ঠিক নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কলকাতার পাভলভ ইনস্টিটিউট [illegible] মনস্তত্ত্ব [illegible]
ও সাহিত্যের নানা [illegible] মনোবিজ্ঞানের
[illegible] আলোচনা [illegible]

পরলোকে বারবারা হেপওয়ার্থ

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা ভাস্কর বারবারা হেপওয়ার্থ গত ২১ মে ৭৩ বৎসর বয়সে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রাণত্যাগ করেছেন। ইতালীয় মার্বেল-শিল্পী আদ্রিনি এবং স্বদেশের চিত্রশিল্পী বেন নিকলসন-এর প্রেরণায় ভাস্কর্য-শিল্পে তিনি যুগান্তর সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ইংরেজ ভাস্করের জীবন ও শিল্প-সাধনা সম্পর্কে বিশিষ্ট শিল্পসমালোচকগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

নতুন স্কুল সিলেবাস কি প্রকাশনশিল্পের সর্বনাশ ডেকে আনছে?

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ১৯৭৪ সাল থেকে পশ্চিম বাংলায় স্কুলের নতুন পাঠক্রম চালু হয়েছে। একাদশ শ্রেণী লোপ হয়েছে দশ শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কয়েক শত প্রকাশক গত বৎসর জুলাই মাসে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের উপরে মোট প্রায় ২৪০০ খানা পাঠ্য-পুস্তক মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পর্যালোচনার জন্য দাখিল করেছেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পরে এপ্রিল মাস থেকে পর্যালোচনার যে ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে তা এক কথায় ভয়াবহ। কারণ তাড়াহুড়ো করে পর্ষদ ১৯৭৩ সালের জুন মাসে যে সিলেবাস প্রকাশ করেন সেই অনুযায়ী প্রকাশকগণ মাত্র ৪।৫ মাসের মধ্যে বই লিখিয়ে তা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন এবং পর্ষদে দাখিল করেন। সিলেবাস তৈরীর ব্যাপারে যেমন তাড়াহুড়ো [illegible] সম্ভব নয় তদনুযায়ী নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক রচনাও তেমনি তাড়াহুড়ো করে কার্যত সম্ভব নয়। কাজেই এখন ত্রুটিযুক্ত পরীক্ষামূলক সিলেবাস অনুযায়ী বই লিখিয়ে এবং সে সমস্ত বই প্রকাশ করে বহু প্রকাশক কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে পর্ষদের নিকট দাখিল করা ঐ ২৪০০ বইয়ের মধ্যে প্রায় ৮০০ খানা [illegible] বলে ঘোষিত হতে চলেছে। এটা যদি সত্যি ঘটে তা হলে গড়ে ৫০০০ টাকা এক-একখানা বইয়ের জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছে ধরে নিলেও কম-বেশী ৪০ লক্ষ টাকা বাংলার প্রকাশনশিল্পের ডুবতে বসেছে ধরে নেওয়া যায়। মধ্যবিত্তের সামান্য [illegible] এই শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় পর্ষদ কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হবেন এটাই জনসাধারণ আশা করে। সিলেবাস পর্ষদ যখন নিজেদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 'রিভিউয়ারগণ'কে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিতে পারেননি। প্রসঙ্গত নবম-দশম শ্রেণীর ইংরেজী গ্রামারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সিলেবাস অনুযায়ী ঐ গ্রামারের 'গ্রামার' ও 'কম্পোজিশন' অংশে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল অথচ বহু গ্রামার রিভিউয়ারগণ পাশ করেছেন যেখানে এই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও স্মারকলিপি। সম্পাদক প্রফুল্লকুমার দাস। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা—১২। দশ টাকা।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস শিবনাথ শাস্ত্রীর আলোচ্য রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করে গবেষকদের অনেক সাহায্য করেছেন। এই গ্রন্থ প্রমাণ করে অধ্যাপক দাসের প্রাচীন সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অনুসন্ধিৎসা এবং সেই সঙ্গে তত্ত্ব অসাধারণ শ্রম নিষ্ঠা ও সততা। ঊনিশ শতকের এক কোটিতে ঐশ্বর্যের উল্লাস, আর এক কোটিতে আত্মার উল্লাস। শিবনাথ শাস্ত্রী ঊনিশ শতকের অপূর্ব উল্লাসটিকে তাঁর ধর্মচিন্তা সমাজভাবনা রাজনীতিবোধ ও সেই সঙ্গে রসচেতনার সঙ্গে সংমিশ্রিত করতে পেরেছিলেন। [illegible] মনীষার সঙ্গে [illegible] ছিল বলে বাঙালী চিরদিন [illegible] করে যাবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দাস ১৮৬৯—১৮৯০ এবং ১৮৯২—১৮৯৬ পর্যন্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর মোট ১৬টি বক্তৃতা ও স্মারকলিপি প্রকাশ করে প্রমাণ করেছেন, শিবনাথ শাস্ত্রী একই সঙ্গে ধর্ম রাজনীতি সমাজচিন্তা ও উদার ধর্মপ্রাণতায় কেমন করে এক নবযুগের সূচনা করে গেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি এই সব অপ্রকাশিত রচনা ও [illegible] অভিনব রূপের সঙ্গে পরিচিত করায় বলেই অধ্যাপক দাস গবেষক ও বুদ্ধিজীবী পাঠকদের কাছে নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য হবেন।

সায়গনের নরকে : কমল চৌধুরী। আশা প্রকাশনী, ৩৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। ১২ টাকা।

সায়গনের নতুন নাম হয়েছে হো চি মিন নগরী, আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম মুক্ত। ইন্দোচীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে [illegible] গেছে। তাদের সমর্থনপুষ্ট থিউ সরকারকে উৎখাত করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিপ্লবী সরকারের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বিজয়ের জন্য গত দুই দশক দক্ষিণ ভিয়েতনামের দেশপ্রেমিক মানুষকে এবং তাদের সহযোদ্ধা উত্তর ভিয়েতনামীদের কি অসাধারণ মূল্য দিতে

ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর সায়গনের মার্কিন তাঁবেদার থিউ সরকারের এবং তাদের প্রভু মার্কিন সৈন্যদের অকথ্য বর্বর অত্যাচারের কাহিনী বলা হয়েছে। 'ভিয়েতনামীদের ওপর এই অত্যাচারকে অমানুষিক অপরাধরূপে অভিহিত করেছিলেন মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল। বিশ্বের বিবেক ধিক্কৃত করেছিল আমেরিকাকে। হিটলার ইহুদিদের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন মার্কিন তাঁবেদার থিউ সরকারের অত্যাচার তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ভিয়েৎকং সন্দেহে যাকেই সায়গনের পুলিশ ও মিলিটারী ধরেছে তাকে সহজে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাওয়া যায় নি। যারা বেঁচে রয়েছে তারা হয় পঙ্গু নয় অন্ধ নয়তো মৃত্যুপথগামী। তিন লক্ষেরও বেশী দেশপ্রেমিককে বন্দী করেছিল তারা। আরও কত মানুষকে সম্পূর্ণ বিনাশ করেছে তার হিসেব এখনও পাওয়া যায় নি। [illegible] রাখতে তারা। গোটা [illegible] এক বৃহৎ বন্দী শিবির। কমল চৌধুরী প্রামাণিক তথ্য দিয়ে [illegible] সায়গন সরকারের এই নৃশংস বর্বরতার মুখোশ উন্মোচন করেছেন। নরক বলেছেন তিনি ঠিকই, এতে কোন [illegible] নেই। কারণ মানুষের ওপর যে এ[illegible] অত্যাচার করা যায় তা কল্পনারও অতীত। মার্কিন সরকার কি নিজের দেশের মানুষের ওপর এ রকম অত্যাচার করতে পারতেন? এশিয়ার মানুষ কি মানুষ নয়? তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া কিংবা হত্যা করে পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করা কোন সভ্য দেশের আইন? ভিয়েতনামীদের দেশপ্রেম তুলনহীন, এমন আত্মত্যাগ আর সহিষ্ণুতা ইতিহাসে বিরল। অজস্র ছবি দিয়ে বইটিকে প্রামাণ্য করে তোলা হয়েছে। নতুন ভিয়েতনাম কি মূল্য দিয়ে তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে তা জানবার পক্ষে বইটি অপরিহার্য।

—[illegible]

রূপছবি। সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। জ্যোতি প্রকাশন, ২এ নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা—৯। বারো টাকা।

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত রূপছবি নামের সদ্য-প্রকাশিত সংকলনটি একালের শিশুদের এক বিরাট ভোজের যোগান দিতে সক্ষম। এক সঙ্গে সমস্ত বড় বড় শিশুসাহিত্যিকদের সঙ্গে নবীন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনা মিলিয়ে সম্পাদক রূপছবিতে যে অভিনব রসের যোগান দিয়েছেন, [illegible]

লেখক আছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন সত্যজিৎ রায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হরপ্রসাদ মিত্র শিবরাম চক্রবর্তী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু পরিমল গোস্বামী নরেন্দ্রনাথ মিত্র বনফুল সৈয়দ মুজতবা আলি প্রবোধ সান্যাল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বীরেন্দ্র দত্ত ইত্যাদি।

অস্তিত্বে নিহিত থেকে (কাব্য সংকলন)। রণজিৎকুমার মজুমদার। স্মৃতিকণা প্রকাশনী, রাণাকুঠী বারুইপুর ২৪-পরগণা। চার টাকা।

মোট ছত্রিশটি ছোট বড় কবিতা সংকলিত করে কবি রণজিৎকুমার মজুমদার তাঁর 'অস্তিত্বে নিহিত থেকে' নামের কাব্য সংকলনটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। কবির মানসিকতা আধুনিক। বর্তমান জীবন সমাজ প্রেম বিক্ষত অস্তিত্ব নিয়ে কবি যে বিশেষভাবে চিন্তিত, কবিতাগুলিতে তার প্রমাণ আছে। ছন্দ শব্দ চিত্র রচনায় কবির কুশলতা স্বীকার্য।

স্মৃতি নিঃসঙ্গিণী (কাব্য সংকলন)। সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থগৃহ, ৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। ছয় টাকা।

শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি তরঙ্গিণীতে তাঁর বিশেষ কিছু কবি-মানসিকতার অন্তরঙ্গ পরিচয় রেখেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নানান দুঃখ-আঘাত-ব্যথাতেই তাঁকে বার বার কাব্য রচনায় অনুপ্রেরিত করেছে। স্মৃতি তরঙ্গিণীতে স্মৃতি অনুষঙ্গে দয়িতার কথা বলছেন। বলেছেন আপন অন্তরের গভীরতম বেদনার কথা। কয়েকজন পরলোকগত সম্মানীয় প্রতিভাযশা কৃতী পুরুষদের যেমন—জহরলাল বিধানচন্দ্র রায় স্বামী অসীমানন্দ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, জাকির হোসেন জামাল নাসের, কবি কুমুদরঞ্জন ইত্যাদির স্মরণে কবিতা রচনা করেছেন কবি। কবিতাগুলি সহজ সরল মনোরম ছন্দে প্রাণবন্ত।

ছায়া জন্মান্তর : রমেশ সরকার। প্রাপ্তি-স্থান সিগনেট বুক শপ কলি-১২। মূল্য তিন টাকা।

আধুনিক কবিতার পাঠকেরা যখন দূরে সরে যাচ্ছে সেই সময় এমন সহজ সরল অথচ সুগঠিত চিন্তার একগুচ্ছ কবিতা পেয়ে আমরা খুশী। প্রায় অর্ধশত বিভিন্ন স্বাদ-রূপ ও বর্ণের কবিতা নিয়ে এই সংকলন। সতর্ক শব্দ-চয়ন বিচিত্র উপমা প্রয়োগ, দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত, ছায়ার মতন স্নিগ্ধ অনুভূতির মোড়ক আবৃত কবিতাগুলির মধ্যে রাজভবনের পথে; ইতিহাস; কবিতা; একদিন আমিও যাব, বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রান্তিক সাহিত্যচক্র কবিতা প্রসার আন্দোলনে যেভাবে নতুন কবির গ্রন্থপ্রকাশ দ্বারা এগিয়ে এসেছেন তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য।
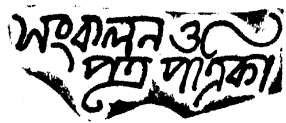
কাকলি। বিশেষ ছড়া সংখ্যা। সম্পাদনা পারুল দাস মলয়নগর পোঃ যোগেন্দ্র-নগর, ত্রিপুরা। মূল্য ২ টাকা।

কবিতার অনেক সংকলন মাঝে মাঝে দেখা গেলেও ছড়া সংকলন খুবই কম দেখা যায়। সেদিক থেকে এই প্রচেষ্টা বড় ভাল লাগল। এবং এর অনেক রচনাই মনকে নাড়া দেয়।

আসানসোল। আনন্দময়ী ভবন, নেতাজী সুভাষ রোড রাই লেন আসানসোল।

বৈশাখী সংখ্যা। সম্পাদনা অমিয়-রঞ্জন দাস। হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইল করা পত্রিকা বড় একটা দেখা যায় না। সেদিক থেকে পত্রিকাটি আকর্ষণীয়। বর্তমান সংখ্যাটিতে কয়েকটি বিভিন্ন স্বাদের গল্প স্থান পেয়েছে। লিখেছেন নির্মলেন্দু।

ছন্দিতা। নেতাজী শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা ১৩৮১ সম্পাদনা: গৌরগোপাল দাস ও হেনা চৌধুরী। মূল্য এক টাকা।

ছন্দিতার বর্তমান সংখ্যাখানি পৃষ্ঠা সংখ্যার দিক থেকে স্ফীত না হলেও নেতাজী সম্পর্কে কিছু চিঠি ও প্রবন্ধ সংখ্যাখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

এ সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধটি। এটি যেমন তথ্যপূর্ণ তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠিটি নেতাজীকে চেনার পক্ষে সহায়ক। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণটিও সুখপাঠ্য।

সন্তোষকুমার বসুর ব্রিটিশ কোর্টে সুভাষ-চন্দ্রের বিচার...প্রবন্ধটির শেষাংশ নিয়ে মত-ভেদের অবকাশ থাকলেও সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের শেষ সময়ের একটা চিত্র তাতে পাওয়া যায়। বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সুতপা চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার ও শান্তিময় গাঙ্গুলীর চোখে নেতাজী সুন্দর। হেনা চৌধুরীর সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনের বিরোধের ভিত্তিভূমিতে লেখা প্রবন্ধটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণারঞ্জন বসুর প্রবন্ধ ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর ওয়েলিংটন একটি তথ্যমূলক দলিল।

এ সংখ্যার আর একটি মূল্যবান সংযোজন হোল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আবেগ বহুল কবিতাটি। সেদিক থেকে শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ দুটি অনেকটাই উচ্ছ্বাস-মূলক।

লা পয়েজি। সম্পাদক বাসবিক রায়। বেল-গাছিয়া ভিলা, এম আই জি ব্লক—বি-১ ফ্ল্যাট-৫ কলকাতা-৩৭। তিন টাকা।

প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ কবি বীরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় সংক্রান্ত ক্রোড়পত্রসহ লা পয়েজির নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকসূচীতে কবি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে বহু প্রবীণ ও নবীন কবি আছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এর গৌরব বাড়িয়েছে। বীরেনবাবুর কিছু কবিতার ইংরাজীতে অনুবাদ বিশেষই উল্লেখযোগ্য। বীরেনবাবুর জীবনী কিছু কবির বীরেনবাবু সম্পর্কিত ও তাঁর কাব্যাদর্শ সম্পর্কিত আলোচনার ও চিঠিপত্রের জন্যই বর্তমান সংখ্যাটি মূল্যবান।

জানলা খুললে ঈশ্বরের মুখ

অজিত বাইরী

জানলা খুললে দেখতে পাবো কি ঈশ্বরের মুখ?
হসপিটালের তিন নম্বর ওয়ার্ডে
শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর স্বপ্ন দেখি—
যন্ত্রণার অনুভূতি ভিন্ন আর কোন উপলব্ধি নেই;
পৃথিবীতে এখন কোন ঋতু? মানুষেরা কি তেমন সুখী;
তেমন দুঃখী?—আমি কতকাল কবিতা লিখি নি।
বুকের ফুসফুস পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে আয়ু;
ঈশ্বর আমার ঘরে আসে না।

হসপিটালের দরজায় ছায়া ফেলে হেঁটে যায় মৃত্যুর মিছিল—
বড় মমতায় জড়িয়ে ধরে অন্তিম মুহূর্তের ভালবাসা
আজন্মের দেখা এই আকাশ, এই আলো, মাটি।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

সমাহিত ঐশ্বর্য তুমি কোথায় রেখেছো
বলে দাও, হে আমার বালক ঈশ্বর।
বলে দাও, বলে দাও,
আকাঙ্ক্ষিত, আমি আকাঙ্ক্ষিত।
অরণ্যে বা বনস্থলে,
যুবতীর সোনালী নখরে
অথবা,
তোমার কোনো পরিচিত প্রিয়তম সংসারে!

কোথায় রেখেছো বলো
অজস্র সুখের রং,
আঁশধোয়া বেনোজল, তুলতুলে সহজ সুখ,
এলানো খোঁপার ঢল, প্যাঁচার ধূসর ভুরু?
কোথায় রেখেছো বলো
আমার কাঙ্ক্ষিত সে জীবন,
নিকষ কালো এ রাতকে পরাজিত করার জীবন,
ভোরের সূর্যকে লেফাফা ফি করার
কাঙ্ক্ষিত জীবন!
সমাহিত ঐশ্বর্য তুমি কোথায় রেখেছো?
বলে দাও হে আমার তরুণ ঈশ্বর।

।। দৃষ্টি চুম্বন ।।

ওয়াজেদ আলি

কাঁচ পাতার মতো তোমার কোমল ঠোঁটে
তার দৃষ্টি এসে চুমো খায়
তুমি সেই চুমোর জোৎস্নায়
ভালবাসার স্বপ্ন দ্যাখো
আর
তোমার রূপসী বুকে
রঙিন আকাশ হলুদ ছড়ায়

তাই তোমার নিটোল মুখে
তার দৃষ্টি চুম্বনের
শিশির জমে......

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বারিক পাল পুববাড়ী ও নতুন বাড়ী গোমস্তাগিরি করেন। তাঁকে বলা ছিল, হাতে-খড়ির পর একটা নতুন কাজ চাপবে—কমলকে পড়ানো। অতিরিক্ত বেতনও সেই বাবদ। বাইরের কোঠায় তিনি অপেক্ষা করছিলেন, বই শ্লেট নিয়ে কমল গুটি গুটি সেখানে চলল। নিমি পুঁটি অলকা-বউ পিছু পিছু যাচ্ছে। দরজা অবধি গেল তারা সব, কমল ভিতরে ঢুকল। বসে ছিলেন দ্বারিক, হাত বাড়িয়ে কমলকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। বর্ণবোধ খুলে ডাকছেন : অ আ ই ঈ—। কমল পড়ে যাচ্ছে।

পুরুতের দক্ষিণা, সরস্বতী পুজো ও কমলের হাতে-খড়ি দুই কাজের দরুণ রোক দুই সিকি। আধুলী বের করতে ভবনাথ কপাপের ঘরে ঢুকেছেন, দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া শুনছেন। এক ফোঁটা ছেলে কেমন টর-টর করে পড়ে যাচ্ছে দ্বারিকের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে। কর্তার সামনে দ্বারিক একটু বাহাদুরী দেখিয়ে দিলেন—পড়ানো হতে না হতেই পরীক্ষা : এটা কি বলো দিকি কমলবাবু? কমল বলল অ—। পারবে না কেন। বই না পড়ুক, অ আ ইত্যাদি কত জনের কাছে কত শতবার শোনা। দক্ষিণার কথা ভুলে ভবনাথ চোখ বড়-বড় করে তাকালেন। দ্বারিকও তারিপ

হয়ে কমলবাবু জজ-ম্যাজিস্টার হবে বলে দিলাম। একটা মহাবীরত্বের কাজ করেছে, কমলের ভাবখানাও তেমনি। দুলে দুলে প্রচণ্ড শব্দ করে সে পড়ছে।

প্রহ্লাদ তখন কাছে নেই — পাঠশালার পণ্ডিত অম্বিক দত্ত। ঘরজামাই তিনি, মিত্তিরপাড়ার প্রিয়নাথ মিত্তিরের বড় মেয়ে দুলালকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ী কায়েমী হয়ে বসবাস করেন। প্রিয়নাথের ছেলে নেই, পর পর আট মেয়ে। ঝাড়ফুঁক কত রকম হল, মেয়ে হওয়া ঠেকায় না। শেষের দিকে নাম রাখতে লাগলেন আন্না (আর না) ঘেন্না—নামের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠী ঠাকরুনের কাছে আপত্তি জানানো। আট মেয়ের মধ্যে যমকে দিয়ে-থুয়েও পাঁচ পাঁচটি বর্তমান এখনো। বিয়ের প্রস্তাব তুলে প্রিয়নাথ অম্বিককে বলেছিলেন, ছেলে হয়ে তুমি বাড়ীতে থাকবে। যা আমার আছে, পায়ের উপর পা দিয়ে নির্ভাবনায় জীবন কেটে যাবে, নড়ে বসতে হবে না। প্রিয়নাথ যতদিন ছিলেন তেমনি কেটেছিল বটে—মারা যাবার পর থেকেই গণ্ডগোল। শাশুড়ী এবং ধর্মপত্নীর সঙ্গে তিলার্ধ বনে না—ঝগড়াঝাঁটি অকথা-কুকথা অহরহ। শালিকারা স্বামীসহ এক এক সময় হামলা দিয়ে এসে পড়ে। পিতৃ-সম্পত্তির হকদার তারাও—গাছের আম কাঁঠাল পাড়ে, গোলার চাবি খুলে দেদার ধান বিক্রি করে। ছেলেপুলেও ইতিমধ্যে দেড় গণ্ডা পুরে গেছে। নড়ে বসতে হবে না, প্রিয়নাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—তিনি নেই, কার কাছে এখন কৈফিয়ৎ নিতে যাবেন?

দায়ে পড়ে অম্বিককে রোজগারে নামতে হল। গুরুগিরি ছাড়া অন্য পন্থা চোখে পড়ে না। সে গুরুগিরি আবার অগ্রজে। ধান-কাটা অন্তে মাদায় মাদায় পাঠশালা বসানোর ধুম পড়ে যায়। বিদ্যায় কমজোরী হলে ঐ সব স্থানে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। পড়ানো-শোনাও উত্তম। নাশুমে অম্বিক অতএব ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়েন।

আরও আছে। স্ত্রী দুর্নিবার শুচি-বেয় হয়ে পড়েছে। নাইয়ে নাইয়ে মারে অম্বিককে এবং ছেলেপুলেগুলোকে—পুওয়ার ঠেলায় ডবল নিমোনিয়ার কবলে পড়ে পটল-তোলাও বিচিত্র নয়। ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ হাঁটে সে—দুনিয়ার সর্ববস্তু ও সমস্ত জায়গা অশুচি, পা কোথায় ফেলে জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না যেন। পবিত্র শুধু-মাত্র দুটি জিনিস—জল ও গোবর। আবার জলের সেরা গঙ্গাজল—এই পোড়া দেশে গঙ্গাজল দুর্লভ বলে অনুকল্প নিয়েছে তুলসী-জল।

ভবনাথের উঠোনে ধান উঠে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পুরুত ডেকে পুজো আচ্চাও হয়ে গেল। ডাটিয়াল চালের মিষ্টি ফ্যানসা ভাত গরম গরম পাতে পড়তেই বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দেবুবৌদিও তাদের মাঝখানে বসেছেন। একবার এর পাতে একবার ওর পাতে ভাত তুলে দিচ্ছেন। যেন উৎসব লেগে গেছে। এদিকে ভবনাথের বিলে যাবার তাড়া। ছেলেরা সব লায়েক হয়েছে। জলকাদা ভাঙাতে তাদের বয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে হন হন করে বিলমুখো চললেন। উঠোনে তখন বাড়ির মেয়েদের বড়ি দেবার ধুম লেগেছে। এই সময় মাঠের আর এক চেহারা। মাঠে মটর গাছ গজিয়ে উঠেছে। সকলকে সবুজ লতা—শুঁটি সমানাই ধরেছে—অফুরন্ত বেগুনি ফুল। তার ওপরেই দামাল ছেলেদের হামলা চলে। নিস্তরঙ্গ গ্রাম আবার প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে। ভবনাথের বাড়িতেও তার ছোঁয়া লাগে। ডাক পিওন এসে সেই ভাবকে যেন আরো বাড়িয়ে দিল। বিশেষ করে সে বাড়ি এবং আশপাশের বাড়ির বৌঝিদের মধ্যে।

ক্রমে সে খবর পাড়ায়ও খবর হয়ে যায় পিওনঠাকুর গাঁয়ে এসেছেন। পিওন-ঠাকুরই এখন যেন এই গ্রামের খবর। আর পিওনের দুর্বার আকর্ষণ আছে এই গ্রামের প্রতি। এক চিঠিপত্র বিলি করে সারা বিকেলটা জমিয়ে দাবা ও পাশা খেলা এবং যাবার সময় সোনাখড়ির হাট থেকে সস্তা দরে হাটবাট করা।

বাঁদা থেকে ফিরে ভবনাথ ছিরুর বিয়ের খবর পেয়ে কেমন গুম হয়ে গেলেন। চিঠি তাকে নয়, কেমন্তদের চিঠি সরাসরি বাপ খুড়োর নামে। বাপকে না-ই দিল আমল—অমন বাঘের মতন খুড়ো তাকে হেলা করে কেন সাহসে?

সাঁঝের বেলা ছয় সন্তানকে লাইন বন্দী পুকুর ঘাটে বসিয়ে পাইকারীভাবে তাদের শৌচের কাজ সারে। বাচ্চা ছেলেপুলে সব সময়ে হুঁশ করে বলতে পারে না। আর যথা-সময়ে শৌচ যদি হয়েও থাকে, বাড়তি আর একবার হলে দোষের কিছু নেই। বরঞ্চ ভাল, আরও বেশী পরিমাণে শুচি হয়ে গেল। পুকুর ঘাট সেরে তারপর ছেলে-পুলেরা ঘরের বাইরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে দিগম্বর হয়ে দাঁড়াবে সর্বাঙ্গে তুলসী জল ছিটিয়ে দুলি ঘরে ঢুকিয়ে নেবে তাদের। অম্বিকের ব্যাপারেও এমনি। সারা দিন অম্বিক বাইরে বাইরে ঘোরেন, ঘরের ধারে-কাছে আসেন না। রাত্রে না এসে চলে না। তৎপূর্বে পুকুরের জলে ঝুপুস ঝুপুস করে অবগাহন স্নান। হোক না শ্রাবণের বৃষ্টি বাদলার রাত্রি, কিম্বা মাঘের কনকনে হিমেল রাত্রি। স্নান করে ভিজে গামছা পরে ঘরের দরজায় অম্বিক তুর-তুর করে কাঁপছেন। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ না দুলি ঘুম থেকে উঠে আপাদ মস্তকে তুলসীর জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। পুকুরঘাট থেকে বাড়ী আসতে যা অশুচি স্পর্শ ঘটেছে, এইরূপে তার শোধন হয়ে গেল। দুটো গাই গরু আছে অম্বিকের, আর গোটা চারেক ছাগল। সন্ধ্যাবেলা তাদেরও তাড়িয়ে-তুড়িয়ে পুকুরে নামায়, কলসী কলসী জল ঢেলে স্নান করিয়ে তবে গোয়ালে তোলে। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে—স্নান না করে রেহাই নেই, অবোলা জীব হয়েও বোঝে তারা। তাড়না করে আর জলে নামাতে হয় না, মাঠ থেকে সোজা পুকুরে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দুলি এসে কলসী কতক জল ঢেলে দিলে উঠে তখন গুটি গুটি গোয়ালে ঢুকে যায়।

হেন অবস্থায় গুরুগিরির নামে আবাদে গিয়ে অম্বিক দত্ত রক্ষা পেয়ে যান। কিন্তু পাঠশালার আয়ুষ্কাল মোটামুটি ছয় মাস—পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ। আষাঢ়ে চাষের মরশুম আসে, গোলার ধানও ততদিনে তলায় এসে ঠেকেছে, পাঠশালা অতএব বন্ধ। অম্বিক অগত্যা শ্বশুরবাড়ী এসে ওঠেন। মাস হয়েক আবার দুলির খপ্পরে।

সোনাখড়ির পাঠশালা নিয়ে কিছু দিন খুব ঝামেলা যাচ্ছে। প্রহ্লাদ-মাস্টার ছিলেন—মাথায় তাঁর বেশী পয়সার লোভ ঢুকেছে গুরুগিরি ছেড়ে তিনি আদায়কারী—পঞ্চায়েতের কাজ নিয়েছেন। অলতাপোল গাঁ থেকে বহুদর্শী কাজেম আলি পণ্ডিতকে আনা হল। বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেছে—পড়ান তিনি ভাল, কিন্তু পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়েন। শীতকালে একদিন নতুন বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় জলচৌকির উপর খুঁটি ঠেস দিয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে পড়াচ্ছেন—ঘুম এসে গিয়ে গড়িয়ে একেবারে উঠানে। মাজায় বিষম চোট লাগল, জীবনে আবার যে কোন দিন বসে পড়াতে পারবেন মনে হয় না। কাজেম-গুরুর পর আরও তিন-চারজন আনা হয়েছে জুত হল না। তখন অম্বিক দত্তকে সবাই ধরে পড়ল : গাঁয়ের জামাই আপনি, নোনাজল খেয়ে আবাদে কেন পড়ে থাকবেন, গাঁয়ের পাঠশালার ভার আপনিই নিয়ে নিন।

মাদার ঘোষ উকিল মানুষ, সদরে রীতিমত প্রতিপত্তি। সেই কারণে বাড়ীর পাঠশালা—যেখানে গুরুর সাকিন থাকে না বছরের অর্ধেক দিন, সেখানেও সরকারী সাহায্য মাসিক দুই টাকা। ছাত্রের মাইনে আসুক না আসুক, দুই টাকা বাঁধা আছে দেয় যদিও এক সঙ্গে তিন মাস অন্তর। উপরে ধরা-চারা না হলে এ জিনিষ সম্ভবে না।

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে—কবির উক্তি। কমল আছে তো কাঁটাও আছে। দুই টাকা সাহায্যের দরুণ ইন্সপেক্টরের ঝক্কি সামলাতে হয় মাঝে মধ্যে। আবাদের মরশুমী পাঠশালায় ইন্সপেক্টরের ঝঞ্ঝাট নেই।

দেশ-ভুঁইয়ের উপর মাদার ঘোষের টান খুব, কাছারী বন্ধ থাকলেই বাড়ী চলে আসেন। বড়দিনের মুখে এসেছেন অমনি। সদর উঠানে পা দিয়েই চমক খেলেন। হারু সরকার গাঁয়ের মধ্যে মাতব্বরী করে বেড়ায়, তাকে শুধালেন : অম্বিক দত্তকে যেন চণ্ডীমণ্ডপে দেখলুম। ওখানে কি?

হারু বলল, উনিই তো পড়াচ্ছেন আজকাল।

কী সর্বনাশ!

হারু বলে, ভাল গুরু পাচ্ছেন কোথা? তা-হন্দ চেষ্টা করেছি। প্রহ্লাদ মাস্টারের বাড়ী গিয়ে পায়ে ধরতে বাকী রেখেছি কেবল। গুরু-ট্রেনিং পাশ করা হালের ছোকরা-গুরু সব বেরুচ্ছে থাঁই শুনলে পিলে চমকে যায়। তাদের দিয়ে পোষায় না।

অম্বিক নিজেই কি ইস্কুলে-পাঠশালে পড়েছে কোন দিন? ও কি পড়াবে

হারু প্রবোধ দিয়ে বলে, পড়াচ্ছে তো আজ পাঁচ-সাত বছর। পয়সা-কড়িও রোজগার করে আনে। ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয়। ইস্কুলে পড়ে না শিখুক, পড়াতে পড়াতে এখন শিখে গেছে।

মাদার ঘোষ তবু মুখ বাঁকালেন : অম্বিক পাথরও নয়, নিরেট ইস্পাত। সারা জন্ম ঘষেও হ্রাস বৃদ্ধি হবে না।

বললেন, গুরু বদলাও। সাহায্য বাড়ানোর তদ্বিরে আছি আমি। জানুয়ারীর মধ্যে পরিদর্শনে আসবে। রিপোর্ট যাতে ভাল হয় দেখো। তার পরে আমি তো আছিই।

হারু ঘাবড়ায় না। বলে, গুরু হঠাৎ পাচ্ছি কোথা? রিপোর্টের ভালমন্দ কি গুরুর বিবেচনায় হয়ে থাকে? তারও তদ্বির আছে। ভাববেন না দাদা। আপনি যেমন ওদিকে, এদিকেও আছি আমরা সব। দেখা যাক।

কোর্ট খুলতে মাদার ঘোষ চলে গেলেন। চণ্ডীমণ্ডপ ও চতুষ্পার্শ্বে ঘোর বেগে ঝাটপাট পড়ছে, শিউলিতলার বালির গাদা সরিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের কানাচে অন্ত-রালে নিয়ে রাখা হল। পথের দু ধারে জিওল গাছের ডালপালা ছাঁটা হচ্ছে। পাঠ-শালার ছেলেপুলের সঙ্গে কাটারী হাতে অম্বিক নিজেও লেগে গেছেন।

নতুন বাড়ীর ফিটফাট চেহারা পথচলতি নিতান্ত অন্যমনস্ক মানুষেরও নজরে পড়ে যায়। ছোটকর্তা বরদাকান্ত বলে, ইন্স-পেকটর আসছে বুঝি? কবে?

জবাবটা হারু দিয়ে দেয় : তারিখ দিয়েছে বাইশে মঙ্গলবার। ওদের কথা না আঁচালে বিশ্বাস নেই কাকা। গেল বোশেখে

অমনি আসবে বলেছিল, তারিখও দিয়েছিল। প্রকাণ্ড কাতলা মাছ তোলা হল পালের পুকুর থেকে, রাজীবপুরে লোক পাঠিয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা আনা হল। অপলার বউমাকে দিয়ে ক্ষীর বানিয়ে রাখলাম—আসা মাত্তোর অম আর ক্ষীর-কাঁঠাল। ফুসফাস। ছোঁড়াগুলোর কপালে ছিল, মাছ আর রসগোল্লা তারাই সব সাপটে দিল। আসবার কথা আবার লিখেছে, মাদার দাদাও বলে গেলেন আসবে নির্ঘাৎ এবারে। জোগাড়-যন্তোর করে যাচ্ছি, কার ভোগে লাগে, দেখা যাক।

না, এলেন এবারে সত্যি সত্যি। আসল ইন্সপেকটর নন—তাঁরা পাঠশালায় আসেন না হাই-ইস্কুলে যান। এসেছেন ইন্সপেকটিং-পণ্ডিত, নাম পরেশ দাস। বয়সে বৃদ্ধ। কোন তদ্বিরে এখনো চাকরী করে যাচ্ছেন, কেউ জানে না। দেহে দস্তুরমত জরা নেমেছে, এটা ওটা লেগেই আছে। পা দুটো হঠাৎ ফুলে উঠেছিল বলে তারিখ দিয়েও বোশেখে আসতে পারেন নি—কথা প্রসঙ্গে পরেশ বললেন। তা বলে ছাড়াছাড়ি নেই। মরত মরতেও দেখে যাবেন এবারে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। দেমাক করে বলেন, ইন্সপেকটরের চেয়ে খাতির সম্মান ঢের ঢের বেশী পাই আমরা। তাঁদের দশা দেখুন গিয়ে। দশটায় গিয়ে পড়েছেন তো উঠোনে রোদ্দুরের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। খাতির করে কেউ দশটা মিনিট আগে অফিসের দরজা খুলে বসাবে না। এ বয়সেও আমার এই যে তাগত দেখছেন, এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে ভালমন্দ খেয়ে বেড়োনোর চাকরীটা আছে বলেই।

নতুন বাড়ীর ফরাসে সতরঞ্চির উপর তোষক পড়েছে, তদুপরি ধবধবে ফরসা চাদর ও তাকিয়া। পথের ধকলে বুড়ো মানুষ বেশ খানিকটা কাবু হয়েছেন। হাত-পা ধুয়ে কিঞ্চিৎ জিরিয়ে লুচি-মোহনভোগ চার রকম পিঠা ক্ষীর-সন্দেশ ও ডাবের জলে পয়লা কিস্তির জলযোগ সেরে পাশ বালিশ আঁকড়ে তোষকে গড়িয়ে পড়লেন।

পাঠশালা ছেলেপুলেয় ভরে গেছে। অন্যদিন যা আসে তার ডবল তে-ডবল এসেছে আজ। হপ্তা দুই ধরে আয়োজন। ক্ষারে কাচা ফর্সা কাপড় সকলের পরনে। গায়ে জামা উঠেছে। এবং কারো কারো পায়ে জুতো। একেবারে চুপচাপ। সূচীপতন শ্রুতিগম্য হওয়ার একটা যে কথা আছে সেই জিনিস। অম্বিক মাঝে মাঝে আঙুল তুলে চতুর্দিক ঘুরিয়ে নিঃশব্দ আস্ফালন করছেন। বেত নেই—ইনস্পেকটরের নজরে বেত না পড়ে সেজন্য সেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থা বজায় রাখতে অম্বিক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন বেশিক্ষণ আর পারা যাবে না। গুটিগুটি এসে ফরাসের ধারে যুক্ত করে দাঁড়ালেন: পাঠশালা এখন কি পরিদর্শন হবে?

হাই তুলে দুটো তুড়ি দিয়ে পরেশ বললেন, এখন নয়। খাতাটাতাগুলো নিয়ে আসুন বরং এখানে সরেজমিনে বিকালে যাব। ছেলেদের ছেড়ে দেন সকাল সকাল যেন আসে বলে দেবেন।

অম্বিক ক্ষুণ্ণ হলেন—অনেক করে তালিম দেওয়া—সেই জন্যে এতক্ষণ ঠাণ্ডা রাখা গেছে। একবার ছাড়া পেলে রক্ষে রাখবে? ধুলোমাটি কালিঝুলি মেখে কাপড়-জামা লাট করে এক-একটা হনুমান হয়ে বিকেলে আসবে। মুখস্থ করে দিয়েছি যত সব জিনিস—নিজ নিজ নামগুলো পর্যন্ত। দেরি হলে ভুলে মারবে।

হারু সরকার খিঁচিয়ে উঠল অম্বিকের উপর: উল্টো দিকটা ভাবছেন? পরেশ দাসও কম নয়—সবই তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে জেরায় গড়বড় করে ফেলে যদি?

ইনস্পেকটরের শুভাগমন নিয়ে দশ-বারো দিন আজ ভারি ধকল যাচ্ছে। হাজিরা বইয়ে নতুন নতুন নাম ঢোকানো হয়েছে বিস্তর—মাদার বলে গিয়েছিলেন। ছাত্র সংখ্যা বেশি হলে সরকারী সাহায্য বাড়ানো যেতে পারবে—দুই থেকে পাঁচে তোলাও অসম্ভব নয়। তিন মাস অন্তর মবলগ টাকা—গুরুর জন্য হুডড হুডড করে বেড়াতে হবে না আর তখন ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়বে। উকিল মাদার ঘোষ কায়দাটা বাতলে দিয়ে গেছেন এবার। এক শিশু-শ্রেণীতেই এর মধ্যে আঠারোটা নতুন নাম ঢুকেছে, প্রথম মান এবং দ্বিতীয় মানেও আছে। কোন পুরুষে কেউ পাঠশালা মুখো হয়নি গায়ে বোঁটকা গন্ধ বুনো খরগোসের মতন। এমন কি ভদ্রসমাজের উপযুক্ত নামও একটা বাপ-মা রাখেনি হাবলা বোঁচা বাঁকা ট্যাঁড়শ পটোল উচ্ছে এমনি সব বলে ডাকে। নতুন নতুন নাম দিয়ে মুখস্থ করানো হয়েছে কদিন ধরে। ঝামেলা এক রকম' নামকরণের পর সে নাম বাতিল করে আবার যুক্তাক্ষর-বর্জিত নাম দিতে হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। নয়তো জিভে আসে না।

হারু বলে, পরেশ দাস মশায় ঘড়েল লোক এই কর্মে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। এই সমস্ত মালের মুখোমুখি না হন তো সব চেয়ে ভাল হয়। সেই চেষ্টা দেখুন। চিরটা কাল পরের খেয়ে খেয়ে মোলা প্রচণ্ড কিন্তু খেয়ে এখন সামাল দিতে পারেন না। জলখাবারের কখানা লুচি চিবিয়েই গড়িয়ে পড়েছেন—

সমস্যার সমাধান পেয়ে গিয়ে হারু খল-খল করে হেসে উঠল: বৈঠকখানা এই আর চণ্ডীমণ্ডপ এই—এক মিনিটের পথও নয়। পা উঠোনে না ছুঁইয়েও রোয়াকে চলে আসা যায়—তাও পেরে উঠলেন না। ভাল হয়েছে—অশুভস্য কালহরণম্। মাথাঝিমকটা সাংঘাতিক যাতে হয় দেখুন। সামনে বসে ঠেসে ঠেসে খাওয়াতে হবে খাওয়ার পর উঠে বসবার তাগত না থাকে। যাওয়ার সময় পরিদর্শন বইয়ের পাতা মেলে ধরব। উৎকৃষ্ট লিখে দস্তখত মেরে গরুর গাড়িতে উঠে পড়বেন।

খাওয়া নতুন বাড়িতে। গলদা চিংড়ি শোল আর কই—তিন রকমের মাছ। মাংসের ব্যবস্থা আগে ছিল না—শলা পরামর্শ করে অবেলায় ঐ অম্বিককেই পাঠানো হল পাড়া খুঁজে পাঁঠা একটা টানতে টানতে তিনি নিয়ে এলেন। একুনে পনের খানি পদ দাঁড়াল থালা ঘিরে পনের বাটির জায়গা হয় না। আয়োজন ফেলা যাবে শংকা হয়েছিল—কোথায়। চেটে মুছে খেলেন পরেশ উপরন্তু পায়েস ও সন্দেশ তিন তিনবার চেয়ে নিলেন। বরদাকান্ত একটু এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে গিয়ে হারুকে ধমকান: কী সর্বনাশ খাইয়ে পুঁতে ফেলবি নাকি? নরহত্যার দায়ে পড়ে যাবি যে! হারু সরকার খুশিতে ডগমগ অষুধ ঠিকমতো ধরেছে। দুয়োর-জানালা বন্ধ করে বৈঠকখানা ঘর অন্ধকার করে দিল। সামাল করে দিল কেউ ঢুকে না পড়ে ঘরে কোন রকম শব্দ সাড়া না হয়। নিদ্রা নির্বিঘ্নে চলতে থাকুক। কান পেতে শোনা গেল নাসাও ডাকছে বেশ।

(ক্রমশঃ)
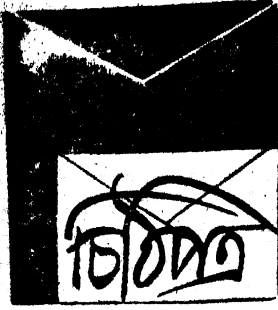
বর্তমানের ছবি নিয়ে দুটি প্রসঙ্গ

(এক) বোম্বের সেন্সার বোর্ড ঃ কার একটা লেখায় পড়ছিলাম, বর্তমানে হিন্দি ছবির প্রতি কোন ক্ষমা নেই—সস্তা মার-ধোর, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ডাকাতি, ক্যাবারে যৌনদৃশ্য সব বন্ধ। সে রকমের কোন ছবি আর ভারতবর্ষে মুক্তি পাবে না। লাইন ধরে যারা এতোদিন এসব বানিয়ে পয়সা কামাচ্ছিলেন, তাদের আজ পাল্টাতেই হবে, বড় বড় স্টারকাস্টেড হিন্দি ছবির সব হুরমুজে সেন্সার বোর্ড ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় রুচিবিরুদ্ধ কিছু থাকলেই তা কাটা যাবে। সেক্স ভাঙিয়ে সেক্স সম্বল হয়ে নিতম্ব-উরু-বুক-পেট দেখিয়ে যারা এতোদিন সদম্ভে হেভী খানাপিনা করছিলেন, কথায় কথায় জন্মদিনে মদের পার্টি দিচ্ছিলেন এবং নিত্যনতুন ফরেন কার চড়ছিলেন, তাঁদের উন্মুক্ত সর্বাঙ্গ ভারত সরকার চট কেটে ঢেকে দেবেন। মোটকথা, সেন্সার বোর্ড প্রধানের বক্তব্য হচ্ছে যে তাঁরা সমগ্রভাবেই শোধরাবেন দর্শকদের মন আর ডিস্ট্রিবিউটারদের আর্জি ও সস্তা প্রযোজকদের কুরুচি।

সাধুবাদ জানাই সেন্সার বোর্ডকে। ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে এই নীতিতে তাঁরা যেন অবিচল থাকেন। বর্তমানে বোম্বের সাধারণ ভাল প্রযোজকরা ভাল ছবি করার আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন। সুতরাং প্রত্যেককে ফিল্ম করে বাঁচতে হলে বোম্বেতে ভাল ছবি করতেই হবে, না হলে আর কোন উপায় নেই।

(দুই) বাংলা ছবির হাল ঃ আমাদের ভাবনা সব সময় সত্য হয় কৈ! আমরা আমাদের আশা নিয়ে সিনেমা হলে ঢুকি, নিরাশ হয়ে ফিরি। আমরা ভাবি এক, হয় আর। সিনেমার দর্শকরা হামেশাই তা অনুভব করেন। তবে যেহেতু স্বভাবত তাঁরা আশাবাদী তাই সিনেমা দেখারও বিরাম নেই। ভাবনা ও বাস্তবের মধ্যে যত বৈষম্যই ঘটুক, সিনেমা বাঁধা বাদ দেওয়া চলে না। সিনেমা দর্শকের উদারতা আছে। তাই তাঁরা ভাল-মন্দ মিলিয়ে সকলেই সিনেমাকে অসীম ক্ষমায় গ্রহণ করতে পেরেছেন। তবু [illegible] এরই মধ্যে বার বার উঁকি দেয়। বহুজনসুখায় অব্যর্থ কোন প্রমোদ-[illegible] বা ফরমুলা সিনেমায় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অর্থাৎ পরিচালক কিম্বা প্রযোজক এখনও নিশ্চিত জানেন না, কি পেলে দর্শকরা আর কিছু চাই না বলে আহ্লাদে আটখানা হবেন। এই বস্তুর সন্ধানে তাঁরা ব্যস্ত। কখনও ভাবেন 'এটা' পেলেই বুঝি দর্শকরা খুশী হবেন, কখনও বা 'ওটা'। কিন্তু এটা-সেটা কোনটাই সেই অমোঘ প্রমোদবস্তু নয়। কখন কোনটা উতরে যাবে তা চিত্রনির্মাতা নিজেই জানেন না। সুতরাং চলচ্চিত্র যা গণ-সংযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত—কিভাবে তা উন্নত মানে পৌঁছোতে পারে এবং দর্শকসাধারণের চিন্তার উত্তরণ ঘটাতে পারে শিল্পগুণান্বিত ছবির সংখ্যা কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে—এ সব নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা ছাড়া কারা ভাববে?

সব আর্টের মত সিনেমাও স্বাধীন হবে, তার একটি নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গি থাকবে। সিনেমা কোন উদ্দেশ্য বা প্রচারের উপলক্ষ না হয়ে নির্বিশেষ আনন্দ বা চেতনা কিংবা ভাবনার সৃষ্টির মাধ্যম হয়ে উঠবে। এবং যা-ই কিছু সিনেমা দেখাবে তার মধ্যে শিল্পের সূক্ষ্মতা ও অস্পষ্টতাও থাকবে। সিনেমা হবে ইঙ্গিতময়, স্ব-নির্ভর : এক্ষেত্রে গতানুগতিক বিধি বা রীতি বর্জনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। সেই সেই সিনেমাকে কোন সমালোচক যদি 'পিওর সিনেমা' আখ্যা দেন তাতে হয়তো বক্তব্য কিছুটা পরিষ্কার হয়। আসল ব্যাপারটা উপলব্ধির। কখন কোন মুহূর্তে আর্টের সৃষ্টি হল তা সমালোচক বা রসজ্ঞদর্শক অনুভব করতে পারেন। সব অনুভূতি কি ভাষায় বা সংজ্ঞায় প্রকাশ করা যায়? বিশেষত সিনেমার মত ললিত-শিল্পের অনুভূতি! সেটা দেখা অনুভবের বস্তু। পিওর সিনেমার দর্শক কোন দেশেই খুব বেশী নেই। বুদ্ধিমান পরিচালক অনেক সময় তা এড়িয়েও চলেন। আবার বিবেকসম্পন্ন পরিচালকরাও আছেন। তাঁরা ভাবেন প্রযোজকের কথা, যাঁর টাকায় ছবি তৈরি হয়। দর্শককে ঈপ্সিত সুখানুভূতি দানের দায়িত্বও তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে কোন কোন পরিচালক ইচ্ছা করেই আপোসের পথে যান। কেউ কেউ আবার এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। অন্তত তাঁদের ছবি দেখলে এই দ্বিধার পরিচয় মেলে।

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক 'অন্তরঙ্গ'
হুগলী

পণপ্রথা প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত (২৩ মে, ১৯৭৫) 'পণ প্রথার বিরুদ্ধে' সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভালো লাগল।

পণ দেওয়া আজকের প্রথা নয়, বহুদিন ধরেই এই অলিখিত নিয়ম চলে আসছে। আগেও অনেকে এই প্রথার নিন্দা করেছেন, কিন্তু কেউই জোরালো প্রতিবাদ করেন নি। পণ দেওয়া বাজার দরের মত ওঠা-নামা করে। ছেলে যদি উচ্চশিক্ষিত এবং চাকরির ক্ষেত্রে গণমান্য ব্যক্তি হন তাহলে ছেলের বাবা ও মায়ের গর্বের অন্ত থাকে না। তাঁরা কন্যাপক্ষর কাছ থেকে মোটা বর-পণ দাবী করেন। নগদ টাকা ছাড়াও অনেক জিনিস দিতে হয়। মনের মত বরপণ ও জিনিসপত্র না দিলে গৃহবধূর সাংসারিক জীবন সুখের হয় না। তাকে নানান রকমের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। ছেলেরা আধুনিক হলেও বিয়ের ব্যাপারে অনেকেই অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেন। শিক্ষিত এবং সুন্দরী মেয়ে হলেও বিয়ের ব্যাপারে কন্যাপক্ষকে চিন্তা করতে হয়। কন্যাপক্ষ ঋণগ্রস্ত হয়েও মেয়ের শ্বশুরবাড়ীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। এটা কি এক ধরনের ছেলে বিক্রি নয়?

নারী সমাজের স্বাধীনতা আদায় এবং রক্ষার ব্যাপারে এতদিন পুরুষ সমাজই এগিয়ে এসেছেন। এই ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী আমাদের চিরনমস্য। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রণীত হয়েছে সরকারী আইন। আজ রাজা রামমোহন রায় কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেঁচে নেই। কিন্তু বেঁচে আছে তাঁদের মহান আদর্শ। আমরা সাময়িকভাবে আদর্শভ্রষ্ট হলেও তাঁদের আদর্শ মরেনি, মরতে পারে না।

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে মহিলারা ঐক্যবদ্ধভাবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পর সরকারীভাবে আইন প্রণীত হওয়ার সংবাদ এসেছে আনন্দবহ। কিন্তু শুধু কাগজে কলমেই আইনটিকে বন্দী করে রাখলে চলবে না, এর জন্য প্রয়োজন সক্রিয় সহযোগিতা। আশা করি পুরুষ এবং নারী সমাজ একই সঙ্গে শ্লোগান দেবেন 'পণ দেবো না, পণ নেবো না।' কারণ সমস্যাটা উভয়েরই।

প্রবীরগোপাল মুখোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া-২

(২)

পণপ্রথার ওপরে আপনার 'অমৃত'তে বেশ কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পণপ্রথা নিষিদ্ধ করে এবং পণ নিলে জরিমানার ব্যবস্থা করে এই দুষ্টব্যাধি সংক্রান্ত বিলটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত হওয়ায় সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই খুশী হয়েছেন। আইনের ধারাগুলো আমাদের নৈতিক ও সামাজিক চেতনার সহায়তায় বাস্তবে রূপায়িত হলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার ও তাঁদের কন্যাদের চোখে-

মুখে অসহায়, করুণ, হৃদয়বিদারক মেঘের স্থানে প্রশান্তির, নিশ্চিন্ততার ও স্নিগ্ধতার চন্দ্রোদয় হবে। সমাজে নারীজাতির আত্ম-মর্যাদা ও সম্মানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নিলামে গরু-বাছুর বেচা-কেনার মতো এইভাবে জামাই কেনাবেচা বন্ধ হবে।

কিন্তু এর আর একটা দিকও আছে। যেমন ধরুন, এক ভদ্রলোকের একটি কুরূপা কন্যা আছে। তার রংয়ে চেহারায় হাসিতে আকর্ষণের মাদকতার বদলে রূঢ় নিষ্ঠুর বিকর্ষণের করুণ সুরই বাজে বেশি। ভদ্র-লোকের অনুরূপ কুরূপা বড়মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তাঁকে বহু দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার আঁধারে হাবুডুবু খেতে হয়েছিল। কারণ যাঁরা পণ না নিয়ে বিয়ে করেন বা করান তাঁরা চান রংয়ে, রূপে, ছন্দে, সুরে মেয়েটি একটি রজনীগন্ধার টুকরো হোক। অবশেষে ভদ্রলোক তাঁর মেয়েটিকে অর্থের নৌকায় চাপিয়ে দুর্ভাবনার সাগর পাড়ি দিয়ে শ্বশুরবাড়ির পথে পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর ছোটমেয়ের বেলাতেও রূপের ঘাটতি বৈভবের প্রলেপে ঢেকে বিয়ে দিতে হবে ধরেই নিয়েছেন। কুরূপা এই মেয়েটিকে পণ ছাড়া নেবে কে? তাহলে লাভ ম্যারেজ না হলে এই রকম কুরূপা মেয়েদের কাছে সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন কি অনাস্বাদিতই থেকে যাবে না?

সুশান্ত মুখোপাধ্যায়
আপকার গার্ডেনস,
আসানসোল,

*স্মৃতির রহস্য
*বুড়ো হওয়ার রহস্য

স্মৃতির রহস্যে অনুসন্ধান

স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন নি। সারা বিশ্ব জুড়ে এই নিয়ে গবেষণা চলছে এবং নানা দিক থেকে এই ব্যাপারটির রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা চলেছে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদের পরীক্ষামূলক ভেষজের গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতিকালে মানব-মস্তিষ্ক নিয়ে সর্বাঙ্গীণ একটি অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন। এই বিজ্ঞানীদের কাজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষা নাতালিয়া বেখতেরেভা আন্তর্জাতিক শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য গত বছর নয়াদিল্লীতে এসেছিলেন, সেখানে তিনি আন্তর্জাতিক শারীরবিজ্ঞানীদের ইউনিয়নের উপ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাদের ইনস্টিটিউটের গবেষণা-কর্ম সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায়, বিশেষ করে রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের এই গবেষণা নতুন এক যুগের সূত্রপাত করবে।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনাদের ইনস্টিটিউটে যে-সব সমস্যা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চলছে তার মধ্যে কোনটিকে আপনি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্ভাবনাপূর্ণ মনে করেন?

জবাবে তিনি বলেন, স্মৃতি নিয়ন্ত্রণ। আজ পর্যন্ত কেউই গুরুত্বের সঙ্গে অনুশীলন করে দেখেন নি যে স্বাভাবিক অবস্থা ও পীড়িত অবস্থার ক্রিয়াকলাপে স্মৃতির ভূমিকা কী। স্মৃতি সম্পর্কিত পৃথক পৃথক সমস্যা নিয়ে যেসব বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন তাদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত থেকে এই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে একদল বিজ্ঞানী কর্তৃক সমস্যাটির সর্বাঙ্গীণ অনুশীলন। লেনিনগ্রাদের ইনস্টিটিউটে বহু ক্ষেত্রে বিশেষ গবেষণা চলে। তার আছে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক বিভাগ যেখানে তত্ত্বমূলক ভেষজের বিভিন্ন দিক অনুশীলিত হয়। তার ফলে ইনস্টিটিউটে এই চিত্তাকর্ষক বিষয়টি নিয়েও সাফল্যমণ্ডিত গবেষণার অনুকূল অবস্থা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি অবশ্যই বাস্তব উদ্দেশ্যের পক্ষেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, বাস্তব ভেষজের ক্ষেত্রে এই গবেষণার তাৎপর্য কী?

জবাবে তিনি বিষয়টিকে খানিকটা বিস্তৃতভাবেই উপস্থিত করেন। মানুষের স্মৃতি একটি জটিল বিষয়। স্মৃতি বলতে সাধারণ মানুষ শুধু এই বোঝে যে কোনো একটি ধারণা মস্তিষ্ক ধারণ করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে পুনরায় তা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে যে কথাটি উপলব্ধি করা হয় না তা এই যে মস্তিষ্ক শুধু বাইরের ধারণাই ধারণ করে না, ধারণ করে গোটা শরীরের ও তার পৃথক পৃথক অঙ্গের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত অনুভবও।

দুঃখের বিষয়, মানুষের মস্তিষ্কের পূর্ণতর ব্যবহার আমরা করি না। মানুষের শরীরের এই সবচেয়ে জটিল যন্ত্রটির মধ্যে কোষ আছে ১৪০০ কোটি। তার মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটিকেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। বেশির ভাগই মজুদ বা রিজার্ভ থেকে যায়। সাধারণভাবে একটা ধারণা আছে যে মস্তিষ্কের কোনো অংশ যদি চোট পায় তাহলে তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। এই ধারণা ভুল।

এ-প্রসঙ্গে লেনিনগ্রাদ নিউরোসার্জিক্যাল ইনস্টিটিউটের একটি কেস উল্লেখ করা চলে। সেখানে একটি রুগ্ন শিশুর বাম মস্তিষ্ক-মণ্ডল সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছিল। শিশুটি কিন্তু সেরে ওঠে এবং তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক চালনাশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, এই পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভব হয়েছিল মস্তিষ্কের মজুদকে কাজে লাগিয়ে। মজুদ কাজে লাগাবার সম্ভাবনা শিশুবয়সেই যথেষ্ট বেশি। লেনিনগ্রাদের ইনস্টিটিউটে এমন একটি চাবিকাঠির সন্ধান চলছে যার সাহায্যে বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের মজুদও সক্রিয় করা যেতে পারে।

মানুষের স্মৃতিশক্তি দু-ধরনের—একটি জন্মগত (জেনেটিক) ও অপরটি বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে অর্জিত। এই পৃথক পৃথক ভাবে অর্জিত স্মৃতিশক্তিকে আমরা কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। লেনিনগ্রাদের ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মানুষের স্মৃতিশক্তির সহায়তা করছেন।

এই সহায়তা কিন্তু সবসময়ে এই নয় যে তার ফলে পুনরায় স্মরণ করার ক্ষমতা আরো জোরদার হয়, আরো উচ্চগ্রামের হয়, আরো সঠিক হয়। বরং উল্টো, স্মৃতিশক্তির ছাঁচকে মুছে ফেলাটাই কখনো কখনো সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হয়ে ওঠে।

যেমন ধরা যাক, একজন রোগী তীব্র হাইপারটোনিয়াতে ভুগছে, তার রক্তচাপ দারুণভাবে ওঠানামা করে। আরও ধরা যাক, ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে এই রোগীর রক্তচাপ কমেছে ও একটি মাত্রায় স্থির থাকছে। কিন্তু তখনো তার স্মৃতির ছাঁচে সেই আগেকার ধারণা বিদ্যমান, যখন রক্তচাপ বেড়ে যাবার ফলে নানা শারীরিক কষ্টে সে ভুগছিল। স্মৃতির ছাঁচে আগেকার শারীরিক কষ্টের ধারণাগুলো থেকে যাবার দরুন আবার তার রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। রোগীকে যদি সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলতে হয় তাহলে তার স্মৃতির এই ছাঁচটিকেও বদলানো দরকার।

যেমন ধরা যাক, একজন রোগীর হাত কাটা গিয়েছে। কিন্তু সেই হাতের কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না এবং তার দরুন যন্ত্রণা ভোগ করে। তার যন্ত্রণার উপশম করতে হলে তার স্মৃতির ছাঁচ বদলে ফেলতে হবে।

কেমন ভাবে?

এ-প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমানে এ-কাজটি করা হচ্ছে মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টির একটি পদ্ধতির সাহায্যে। এর ফলে মস্তিষ্কের কাজের সাধারণ ধারায় যেমন ঘটানো চলে পরিবর্তন, তেমনি প্রয়োজন হলে স্মৃতির সরাসরি বিবর্তনও।

এ-কাজটি করা হয় মস্তিষ্কের মধ্যে [illegible] ডি-সি পরিবাহী ইলেকট্রোড প্রবিষ্ট করিয়ে। বৈদ্যুতিক প্রবাহ হয় এমন যে মস্তিষ্কের কোষে কোনো ক্ষতিকর ক্রিয়া হয় না কিন্তু মস্তিষ্কের কোনো কোনো এলাকার কাজের ধারা পরিবর্তিত হয়।

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ককে পুরোপুরি ও সরাসরি অনুশীলন করেন ও তারই ভিত্তিতে মস্তিষ্কের চার্ট রচনা করেন। প্রয়োজন হলে পৃথক পৃথক রোগীর জন্য পৃথক পৃথক চার্ট ও তৈরি করা চলে। তা থেকে জানা যায় ঠিক কোন বিন্দুতে ইলেকট্রোড প্রবিষ্ট হয়েছে ও তার ফলে মস্তিষ্কের কোন এলাকা প্রভাবিত হয়েছে। অন্যদিকে, ইলেকট্রোড হতে পারে এমন সব তথ্য লাভের উপায় যা থেকে কোষে চালানো যোগ সঠিকভাবে নির্ণীত হওয়া [illegible] বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে কতকগুলো রোগের চিকিৎসায় ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে—যথা নিউরোসিস [illegible] পরিবর্তনের পরিচয়।

তাই বলে ভেষজকেও বাদ দেওয়া হয়নি। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা একটি ভেষজ তৈরি করেছেন (নাম, এটিমাইজল) যা স্মৃতিকে উন্নত করে, মজ্জাকে কাজে লাগিয়ে মস্তিষ্ককে উজ্জীবিত করে এবং স্মৃতির নতুন ছাঁচ সৃষ্টির সহায়তা করে।

অন্য ধরনের স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা কতখানি?

তিনি বলেন পৃথক পৃথক ভাবে অর্জিত স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যদিও সম্ভব হয়েছে কিন্তু জন্মগত স্মৃতির বেলায় কাজটি আরো অনেক দুরূহ। এখনো পর্যন্ত তা রয়েছে পরীক্ষার স্তরে। পশুদের ক্ষেত্রে জন্মগত স্মৃতির সংশোধনে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। একাজে যে প্রক্রিয়াটি তাঁরা দাঁড় করিয়েছেন তা হচ্ছে জীন্-এর জৈব সংশ্লেষণ। যদি কোনো পশুর মধ্যে জন্মগত স্মৃতিজনিত ত্রুটির লক্ষণ ধরা পড়ে তাহলে সংশ্লেষিত স্বাভাবিক জীন্-এর সাহায্যে চিকিৎসা করে সেই ত্রুটি দূর করা সম্ভব। পরীক্ষামূলক চিকিৎসায় ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন।

লেনিনগ্রাদের ইনস্টিটিউটে আরও বিশেষ ধরনের স্মৃতির নিয়ন্ত্রণ নিয়েও কাজ হচ্ছে। এই কাজ মানবজাতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে সারা পৃথিবীতে হৃৎপিণ্ডের নালিকার পীড়া ক্রমেই ব্যাপক আকারে দেখা দিচ্ছে। সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে এই পীড়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। তাঁদের ধারণা, চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিকেও এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব যার ফলে এই পীড়া প্রতিহত হতে পারে।

এই সমস্যার সমাধান হলে বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক পীড়াও পরাভূত হয়। ব্যাপারটা এখনো স্বপ্ন মাত্র কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে এই স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠতেও বিশেষ দেরি নেই।

মানুষ বুড়ো হয় কেন ?

দেখা যাচ্ছে, ক্রমে ক্রমে সব রকমের পীড়াই মানুষের কাছে পরাভূত হবে—এমনকি ক্যানসারও। তাহলে অবধারিত যে প্রশ্নটি ওঠে তা এই যে মানুষ বুড়ো হয় কেন? বার্ধক্যও তো, বলতে গেলে, এক ধরনের পীড়াই বটে। বার্ধক্যে মানুষের সবকিছু খোয়া যায়, এমনকি স্মৃতিও। বৃদ্ধের চেয়ে করুণার পাত্র আর কে আছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের এমন আশ্চর্য অগ্রগতির দিনেও এমন কথা বলা চলে না যে মানুষ বার্ধক্যকে ঠেকাতে পেরেছে। জন্মালে যেমন মরতে হয়, তেমনি বুড়ো হতেও হয়। এমনকি গত পঁচিশ বছরের মধ্যে মানুষের আয়ুও যে খুব বেশি বাড়ানো গিয়েছে—তাও নয়। সেই সত্তর বছর। খোদ আমেরিকাতেও তাই, যদিও সে-দেশে প্রতি বছর মেডিকেল পরিচর্যা বাবদ ব্যয় করা হয় ৯৪০০ কোটি ডলার কিংবা তারও বেশি।

মানুষ বুড়ো হলে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার কারণগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন তাই জোর গবেষণা চালাচ্ছেন। বুড়ো হলে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে, শুধু সেগুলোর বিবরণ নিয়েই এক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকা চলে না। বিজ্ঞানীরা নজর দিয়েছেন আরো গভীরে—কোষ ও অণুর দিকে। তাঁরা মনে করেন, এই কোষ ও অণুর পরিবর্তনের মধ্যেই বুড়ো হওয়ার কারণগুলো নিহিত। এবং এই পরিবর্তনকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে শুধু যে মানুষের আয়ু অনেক বেড়ে তাই নয়, বয়স হওয়া সত্ত্বেও বুড়ো হতে হয় না।

বুড়ো হওয়ার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আজ পর্যন্ত বহু তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়েছে। কোনোটিই এখনো গ্রাহ্য নয়, আবার কোনোটিকেই পুরোপুরি অগ্রাহ্য করাও সম্ভব হয়নি।

সাধারণ বুদ্ধিতে সবচেয়ে সরল তত্ত্ব এই মনে হতে পারে যে একটি জন্মগত উত্তরাধিকার নিয়ে জীব জন্মায়, এই উত্তরাধিকারকে বলা যেতে পারে জন্মগত সময়-সীমা। নইলে কেন এমনটি হবে যে একটা মাছি ৪০ দিনের বেশি বাঁচে না, একটা কুকুরের আয়ু ২০ বছর, মানুষের ১০০ বছর কচ্ছপের ১৮০ বছর? কারণ [illegible] নাই। একটা কচ্ছপের শরীরে কী এমন আছে যার দরুণ তার আয়ু মানুষের আয়ুর প্রায় দ্বিগুণ? বহু বিজ্ঞানী মনে করেন প্রত্যেক জীবের শরীরেই আয়ু-নির্ধারণকারী জীন আছে, সেই জীব কত বছর বাঁচবে তা নির্ভর করে এই জীনের ওপরে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানীই এই জীনের কোনো সন্ধান বা হদিশ দিতে পারেন নি।

অন্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আয়ুর সময়-সীমায় প্রত্যেকটি কোষ বাধা। সকলেই জানেন, একটি কোষ ভাগ হয়ে দুটি হয়, দুটি ভাগ হয়ে চারটি, এমনি চলতে থাকে। যতোদিন চলে ততোদিন জীবের শরীরও পুরোপুরি সতেজ। কিন্তু কোষের বিভাজন অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না, এক সময় না এক সময়ে থেমে যায়। তখনই বার্ধক্য, তখনই মৃত্যু।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কোষের বিভাজন বন্ধ হয়ে যায় কেন? নানা বিজ্ঞানীর নানা মত এখনো পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব পাওয়া যায় নি। একটি কারণ এই হতে পারে যে সীমিত আয়ু নিয়েই কোষের উদ্ভব, আয়ু ফুরিয়ে গেলে কোষ মরবেই। আবার বাইরের কারণ ও পরিবেশকেও কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। নইলে কেন এমন হবে যে বিশেষ এক-একটি ভৌগোলিক এলাকার মানুষ শতায়ু হয়?

অতএব আপাতত ধরে নিতেই হয় যে মানুষ অবশ্যই বুড়ো হবে মরবেও। তারই মধ্যে যতোটা সম্ভব ভালো থাকার চেষ্টা করা যায় মাত্র। রবীন্দ্রনাথ একাশি বছর বয়সেও বুড়ো হন নি। এবং তিনি বলেছেন, বয়স হলেই বৃদ্ধ হয়ে যে মরে সেই অভাগাকে তিনি বড়োই করুণা করে গেছেন। বুড়ো হননি আইনস্টাইনও, বয়স হওয়া সত্ত্বেও। আইনস্টাইনের এক জীবনীকার বলছেন, আইনস্টাইন সবসময়ে উচ্চচিন্তা করতেন আর সেটাই ছিল তাঁর চিরযৌবন লাভের যাদুকাঠি। আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের বেলাতেও দেখা যায়, মনের ফুর্তি নিয়ে যে থাকতে পারে, প্রাণ খুলে হাসে, সে কখনো বুড়ো হয় না। আমাদের এই কালে মনের ফুর্তি বজায় রাখার পক্ষে চারপাশের অবস্থা বড়োই প্রতিকূল। তবুও বিজ্ঞানীরা যতোদিন না স্পষ্ট কোনো হদিশ দিতে পারছেন ততোদিন মরার আগে পর্যন্ত তাজা থাকার এটাই একমাত্র মহৌষধ। সম্প্রতি কোন এক বিজ্ঞানী বলেছেন, বুড়ো বয়সে প্রেম করতে পারলে হার্টের অসুখ ঠেকানো যায়। এখানেও মূল কথা সেই একই—মনের ফুর্তি। অতএব চেষ্টা করুন আনন্দে থাকতে, ফুর্তিতে থাকতে, শিস দিয়ে হেসে জীবন কাটান—তাহলে অবশ্যই তাজা থাকতে পারবেন।

—অয়স্কান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁর চরণমূলে প্রণাম করে গাইলাম :
ধাত্রীর ধরার মাথ, অমরার প্রেম
বিলাতে তুমি
এসেছিলে স্বর্গের নন্দন।
দিশার মরুকে মর্ত ওগো
উষার জন্মভূমি,
পেয়েছিলে সাবিত্রীকীর্তন;
করলে ঘোষণ : 'বিশ্বরাজে
নাস্তি বলে যারা
হবেই তাদের দিতে বিসর্জন,
দীপ্ত প্রতিজ্ঞার শরণমন্দে আপনহারা
বরণ করে প্রাণের ধ্যানের ধন।"
"উল্লাসে গাও : আমরা সবার আগে
তাঁকে চাই
যাঁর আনন্দে ধরি এ-জীবন
চান আনন্দের তিনি—তাঁকে আমরাও
চাই তাই
তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ।"" †

All that denies must be torn out
and slain
And crushed the many longings
for whose sake
We lose the many One for whom
our lives were made.
(SAVITRI, 3/2)

Dilip.
If Heaven did not want man—man would not want Heaven. It is from Heaven that the longing and aspiration for Immortality have come, and it is the Godhead within him that carries it as a seed.
(April, 1936)

॥ উপসংহার ॥

শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের পরে প্রায় পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে। এ কয় বৎসর আমাকে অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে চলতে হয়েছে। সকলেই চলেছে একই লক্ষ্যের মোহনায়—যদিও নানা পথে, নানা ধারায়, নানা ছন্দে। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গান আমার বড় প্রিয় :
একই ঠাঁই চলেছি ভাই, ভিন্নপথে যদি...
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

যত এই অন্তর্জলীর দিন এগিয়ে আসছে—সর্বতাপহারিণী মা গঙ্গার ডাক উঠছে আমার কানে—শনৈঃ শনৈঃ আরো উজ্জ্বল, আরো মধুর, আরো আশাপূর্ণ হয়ে। প্রতিবার যখনই কান পেতে শুনি সে গম্ভীরায়মান 'আয় আয়' ডাক, মন ভরে ওঠে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্ন জাগে আমার অন্তরে রাগিণীর বাদী সুরের মত : 'কী পেলে তুমি এতদিন মহাগুরুর জ্যোতির্ময় স্পর্শ করে?' উত্তরে আমি বলি : 'পেয়েছি সব ক্ষোভ থেকে, সব ভয় থেকে সব অশান্তির ঘূর্ণি থেকে মুক্তি।' এর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলা সহজ নয়, তবু আমার মনে হয় অভয় হতে পারা একটি মস্ত লাভ। ভাগবতে একটি চমৎকার বাণী আছে—ভয়ার্ত মানুষ বলছে কৃষ্ণকে :

'নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্' অর্থাৎ, যে সংসারে আমরা পরস্পর পরস্পরের মৃত্যুর কারণ সেখানে আপনি ছাড়া আর কে আছে অভয়দাতা?

কী ভরসার কথা, অথচ কী করুণ—যেখানে মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু—তাই কেউ জানে না কোন্‌ দিক থেকে আসবে নিষ্ঠুর মৃত্যুবাণ। তবু গুরুকৃপায় পেরেছি ভয় কাটিয়ে উঠতে, তাই তো পেরেছি গাইতে নিঃক্ষোভ শান্তির মিড়ে :
ব্যথার ছায়ার কোলে আনন্দশিশু দোলে,
তাই কালো মেঘ কাঁপে আলোর গানে,
অভয়কমল ফোটে অমল প্রাণে।

শ্রীঅরবিন্দের চরণে এসেই পেয়েছি এই অভয়প্রসাদ, তাই প্রমাণ করি দিনে-রাতে সেই অতী প্রবীণকে যিনি অদূরে কাঁসর মস্তকে দেখেও নির্বিকার হয়ে নিরন্ত ধ্যানে মগ্ন ছিলেন দিনের পর দিন, না ভেবে কাল কী হবে।

তাঁর কাছে এই অভয়ের বাণীবাহ হয়ে এসেছিলেন স্বয়ং বাসুদেব যাঁর দর্শন পেয়ে তিনি লিখেছিলেন মধুর উচ্ছ্বাসে (সাবিত্রী, শেষ যন্ত্রী) :

A marvellous form responded to
her gaze
Whose sweetness justified life's
blindest pain.
The universe and its agony
seemed worthwhile.

অপরূপ মূর্তি এক ফলিল নয়নে সাবিত্রীর,
মাধুর্যে যাহার লীন হল জীবনের অন্ধতম
বেদনাও—মনে হল সার্থক বিশ্বের হাহাকার।

যত দিন যায় তত মনে হয় তিনি এসেছিলেন এ-নাস্তিক বৈজ্ঞানিক যুগে দিতে আস্তিক্যের দীপ্তিবর—সেই পরশমণি—যে সব মিথ্যার খাদকে রূপান্তরিত করে তার একটি সোনায়। যত দিন যায় তত দেখি—তিনি ধরা দিয়েছিলেন উদভ্রান্তদেরকে অমরার আবাহনে দীক্ষা দিতে।

যত দিন যায় তত দেখতে পাই এ মৃন্ময়ী পৃথিবীর মধ্যে তাঁর দিব্যনেত্র দেখেছিল এক চিন্ময়ী সত্তাকে যার দিব্য-প্রভায় তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বজনীন কালোও হয়ে গিয়েছিল আলো, তিনি ডুবেছিলেন সেই পরমানন্দে তাঁর মানসবিগ্রহ অশ্বপতির মতন :

A colonist from immortality,
A treasurer of superhuman dreams.

His soul lived as eternity's delegate,
His mind was like a fire assailing heaven,
He made of miracle a normal act.

অমরার পুরবাসী হল ধরণীর নাগরিক,
মানুষ পায় নি যার দিশা—
সেই স্বপ্নের ভাণ্ডারী,
অন্তরাত্মা তার ছিল অবিনশ্বরের প্রতিনিধি,
মন তার যেন বহ্নিশিখা সম
স্বর্গে দিত হানা,
অঘটন-ইন্দ্রজাল ছিল তার স্বভাবসাধনা।

যত দিন যায় ধীরে ধীরে চোখের ঠুলি খসে পড়ে, দেখতে পাই—আরো আলো আরো—যে, এ-দিব্য রূপান্তরের ফলে শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যান নি, ত্রিতাপক্লিষ্ট মানুষের আরো কাছে এসে সবাইকে দেখাতে চেয়েছিলেন যা তিনি নিজে চাক্ষুষ করেছিলেন : যে, জীবনের কোনো উপলব্ধির স্তরেই মানুষ থেমে যায় না—

(তাঁর LIFE DIVINE -এ তিনি ঘোষণা করেছিলেন : More is possible —আমরা আরো ফুটে উঠতে পারি যদি সত্য চাই)—জীবন পরা সিদ্ধি লাভ করে শুধু প্রেমে, কারণ কেবল প্রেমই তার শ্রীক্ষেত্রে প্রতি আর্তকে পরিবেষণ করতে চায় সেই নিত্যানন্দ যার স্বাদ পেলে মানুষ অমৃত হয়—'যে এতদ্ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি'—তাই সাবিত্রীর মাধ্যমে তিনি গেয়েছিলেন :

In me the spirit of immortal Love
Stretches its arms out to embrace mankind.

আমার প্রেম বাহু মেলি ডাকে আলিঙ্গন
করিতে বিশ্বমানবে...

কারণ

Inperfect is the joy not shared by all

...নয় নয় নিখুঁৎ সুন্দর
সে-আনন্দ—স্বাদ যার পায় নি মর্ত্যের
প্রতি জীব।

সাবিত্রীর উপসংহারে সাবিত্রী দিয়েছে এই অভয়বাণী কী মধুর প্রস্বনে :

Heaven's touch fulfils but cancels not our earth.

অধরার স্পর্শে ধরা হয় ধন্য, লুপ্ত হয় না সে।

কারণ, মর্ত্যবাসীর তীর্থযাত্রার প্রতি পদে ভগবান থাকেন তার তীর্থসাথী প্রেম-রূপে—সাবিত্রীর চিরারাধ্য প্রাণাধিপ এই সহযাত্রী ভগবান :

My God is Love and sweetly suffers all.
A traveller of the million roads of life

আমার দেবতা—প্রেম,
ব্যথায় ব্যথী সে সকলের—
জীবনের অগণন সরণির প্রতি পথে চলে।

যত দিন যায় দেখি মুগ্ধ হয়ে যে, অধরার আনন্দলোক থেকে শ্রীঅরবিন্দ অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ঈর্ষাদ্বেষ হানা-হানির অশান্তিলোকে তাকে প্রত্যাখ্যান করে শান্তিবৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে নয়—ভাগবতী করুণার দিব্যস্পর্শে ধূলিধামে প্রাণারামের এক নব সুষমা লীলায়িত করতে। তাঁর অপরূপ 'ঋষি' কবিতার শেষ স্তবকে যুগর্ষি মনুকে দিয়েছেন ধরার এই নিখুঁৎ নব-পরিণতির নিত্যসাধনারত বরণ করতে :

RISHI

Yet, King, deem nothing vain. through many veils
This Spirit gleams.
The dreams of God are truths and He prevails,
.. ..
Shrink not from life. O Aryan, but with mirth
And joy receive
His good and evil, sin and virture, till
He bids thee leave
.. ..
Love men, love God. Fear not to love O king.
Fear not to enjoy;
For Death's a passage, grief a fancied thing
Fools to annoy. ......
Seek Him upon the earth. For thee He set
In the huge press
Of many worlds to build a mighty state
For man's success,
Who seeks his goal. Perfect thy human might
Perfect the race.
For thou art He, O King. Only the night
Is on thy soul
By thy own will. Remove it and recover
The serene whole
Thou art indeed, then raise up man the lover
To God the goal.

কিছুই ভুবনে নয় নিরর্থক,
বহু আবরণ দীর্ণ করি'
আত্মজ্যোতি ভায়।
ঈশ্বরের স্বপ্ন যত সত্য সবই—
তাই তাঁর বিশ্বলীলা ধরি'
লহ বসুধায়।
- - - - - - - -
জীবনবিমুখ আর্য, হোয়ো না—
পরমানন্দে তাঁর চিহ্ন চিনি
করিও গ্রহণ
তাঁর পৃথ্বীলীলা—ভালো-মন্দ
পাপ-পুণ্য সবই—যতদিন তিনি
রাখেন জীবন।
... ...
মানবে বাসিও ভালো, বাসিও ঈশ্বরে ভালো,
কোরো না ভোগেরে
ভয় বসুধায়,
মৃত্যু শুধু তীর্থপথ, দুঃখব্যথা
মিথ্যা মায়া—শুধু অবোধেরে
তাহারা ভুলায়।
... ...
এ-ধরায়ই হবে তাঁকে খুঁজিতে।
তোমার কাছে চাহেন ঈশ্বর—
অসংখ্য বিশ্বের
মহাসঙ্ঘে তুমি নব মহাসাম্রাজ্যের
ভিত্তি রচি বীরবর,
মর্ত্য মানবের
পরম কৃতার্থতার দিবে দিশা—
মানবের শক্তিরে সাধিও
জাতির কল্যাণে।
তুমিই রাজন্ তিনি।
অজ্ঞানের অমানিশা তুমিই জানিও
স্ব-ইচ্ছায় প্রাণে
করেছ বরণ। সেই মায়া-আবরণ
করো দীর্ণ, আবাহন
করি' পূর্ণতায়
তোমার প্রশান্ত সত্তা—
পরে জীবে ঊর্ধ্বলক্ষ্যে করো উত্তরণ
ঈশ্বরের পায়।

কারণ, শ্রীঅরবিন্দের চির-বরণীয় :

I cherish God the Fire not God the Dream

আমার আদরণীয় সেই ভগবান যাঁর নাম
পাবন অনল, নন তিনি যাঁর উপাধি—স্বপন।
(সাবিত্রী ১০।২)

(সমাপ্ত)

লেডিস স্টাডি গ্রুপের আন্তর্জাতিক মহিলা-বর্ষ পালন

লেডিস স্টাডি গ্রুপের মহান উদ্দেশ্য মহিলা জগতে সকলেরই সুপরিচিত। আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে স্টাডি গ্রুপের কর্মতৎপরতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ১৯৬৬ সালে এই গ্রুপের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। প্রথম দিকে এই গ্রুপের কাজ ছিল সেমিনার ও বিতর্কসভার আয়োজন করা এবং এতে অংশ গ্রহণ করতেন গভর্নর মন্ত্রী শিল্পপতি কূটনৈতিক মহল এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতা পণপ্রথা ও সামাজিক সমস্যা। বিতর্কসভা ও সেমিনার আয়োজন করা ছাড়া এই স্টাডি মহল মাঝে মাঝে বিভিন্ন মিল ও ফ্যাক্টরীতে সদস্যাদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের কারিগরি জ্ঞানকেও বাড়িয়ে তুলতেন। নারী কল্যাণে বিভিন্ন সময় বহু অর্থ এই সংস্থা থেকে সাহায্য করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সংস্থা ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অনায়াসে সাহায্যকল্পে ব্যয় করেছে। সংস্থার অবশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য মহিলামহলের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করে তোলা। এই কাজে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই সংস্থার একটি ট্রাস্ট ফাণ্ডও তৈরী করা হয়েছে।

গত ১৯ এপ্রিল কলামন্দিরে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে এই সংস্থা একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনার উদ্বোধন করেন শ্রীমতী ডায়াস এবং সভানেত্রী হিসেবে শ্রীমতী শান্তি খৈতান কার্যভার গ্রহণ করেন। সেমিনারে বক্তা ছিলেন মাদার টেরেসা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশীলা রোহাতগী শ্রীমতী ইন্দিরা মহিন্দ্র শ্রীমতী তারা আলি বেগ শ্যামশ্রী লাল এবং বাংলার এম-পিদ্বয় শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি ও মায়া রায়। সংস্থার চ্যারিটেবল ট্রাস্টকে ভর দেওয়া হয় বিভিন্ন অসাধারণ কাজে পুরস্কারের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে। খেলাধূলা ব্যবসা ও জীবিকা সৃজনী প্রতিভা এবং সামাজিক কাজে কৃতী মহিলাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য মহিলাদের নাম বিভিন্ন স্থান থেকে সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সংস্থার তরফ থেকে দেশের বিশিষ্ট মহিলাদের নিয়ে এক বিচারকমণ্ডলী [illegible] করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য যে পুরস্কার দেওয়া হয় তা নগদে ১১ হাজার টাকা ও একটি রৌপ্যপদক।

পুরস্কার পেলেন বিজ্ঞান গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের বিশুদ্ধ রসায়নের ডিন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী। গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে বিস্মিত বালিকার মনে লতাপাতার প্রতি কৌতূহল মেটাতেন বাবা। দেশ ছিল তারকেশ্বর থেকে তিন মাইল দূরে গোপীনাথপুরে। ছুটিছাটা কাটাতে কলকাতা ছেড়ে মাঝে মাঝেই যেতেন দেশে। দেশের গাছপালার সাহচর্য তাঁকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করত, বাবা বিশ্লেষণ করতেন মেয়ের বিস্মিত প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

শিক্ষা জীবন শুরু হল বেথুন স্কুলে। আই এস সি সমাপ্ত করলেন ঐ কলেজেই। বি এস সি পড়তে ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ থেকে তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম এস সি পাশ করলেন। ছাত্রী অবস্থায় অর্জন করেছেন স্কলারশিপ ও মেডেল। ১৯৪০ সালে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা হিসেবে শুরু হল তাঁর কর্মজীবন। একে একে তিনি পেলেন নাগার্জুন পুরস্কার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি। ১৯৪৪ সালে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডকটর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করলেন। ঐ বছরই তিনি পেয়েছিলেন মোয়াত স্বর্ণপদক। ১৯৪৫ সালে অধ্যাপক বরদানন্দ চ্যাটার্জির সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। শুরু হল সংসার জীবন। বিজ্ঞান সাধনা আর বিদেশ ভ্রমণ। সুইজারল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়া হংকং মালয় জাপান জার্মানী সোভিয়েত দেশ প্রভৃতি স্থানে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। কোথাও হয়েছেন সম্মানিত অতিথি, কোথাও বা চেয়ারম্যান। ভারতের প্রতিভূ হিসেবে সভাকক্ষ বক্তৃতায় মুগ্ধ করেছেন। ১৯৭৫ সালে ৬২তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সে সঙ্গে পেলেন সম্মানিত উপাধি পদ্মভূষণ। ডঃ অসীমা চ্যাটার্জি নিরলস ভেষজ বিজ্ঞান সাধনায় রত। কলেজে ছাত্রছাত্রীর মাঝে ফাঁক পেলেই ঢুকে থাকেন তাঁর গবেষণায়।

বিশিষ্ট সমাজসেবী অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন এর প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী রমলা সিংহ স্টাডি গ্রুপের অপর একটি পুরস্কার পেলেন। বাল্যকালে বিয়ে হয়েছে সুশীল সিংহ মহাশয়ের সংগে। স্বামীর সঙ্গে ঘুরেছেন দূরদূরান্তের গ্রামে গ্রামে, গ্রামের অশিক্ষা, রোগ-শোক তাঁকে প্রতিমুহূর্তে করেছে পীড়িত। তিনি গ্রামবাসীদের প্রতি অন্যায়, অবিচার বন্ধ করতে হয়েছেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯২৮ সালে বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত করলেন মহিলা সমিতি ও একটি বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৩১ সালে গার্ল গাইডস এ্যাসোসিয়েশন-এর ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার মনোনীতা হলেন। তিনি নিরন্ন নিরক্ষর মহিলাদের ত্রাণকল্পে স্থাপিত অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন এবং অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন হোম-এর যুগ্মসম্পাদিকা হলেন স্টেট সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাডভাইসারি বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন ১৯৫৪ সালে। বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক কাজের সঙ্গে শ্রীমতী সিংহ গভীরভাবে যুক্ত।

অপর একটি পুরস্কারের অধিকারিণী ছিলেন শ্রীমতী সিরিন কনট্রাকটর। শ্রীমতী কনট্রাকটর হকি, বাস্কেটবল এবং ক্রিকেট এই তিনটি খেলায় ভারতের একজন মহিলা প্রতিনিধি, অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল হকি চ্যাম্পিয়ানশিপ এর বাংলা দলের সদস্যা শ্রীমতী কনট্রাকটর প্রথম এশিয়া হকি চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য মনোনীতা হয়ে দিল্লী গিয়েছিলেন। সর্ব ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে তৃতীয় এশীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ-এ প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ... নিজের দলের জয়কে ... ১৯৭৫ সালে ... দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে বিহার ও জয়পুরের বিরুদ্ধে করেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ-বছরের গোড়ার দিকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলায় তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ উইমেন-এর সম্মান লাভ করেন। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দুর্গাপুরের খেলায় পূর্বাঞ্চলীয় দলের হয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি বিশিষ্ট খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও আগামী দিনের খেলোয়াড়দের তৈরি করতেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী।

সমাজের বিশিষ্ট মহিলাদের নিয়ে মহিলা স্টাডি গ্রুপ গঠিত। যোগ্যতার সম্মান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মেয়েদের নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষকে উদ্‌যাপন করুক এটাই আমাদের সকলের কামনা।

অপ্রাপ্তি চৌধুরী

চোখ নিয়ে যুগ যুগ ধরে কবিরা কাব্য রচনা করেছেন প্রেমিকরা চোখের ভাষা খুঁজে না পেয়ে পাগল হয়েছেন সুন্দরীরা চোখ দিয়ে যাদু করে থাকেন। এ হেন চোখকে যত্ন করা আর সুন্দর রাখার ইচ্ছা যে কোন সৌন্দর্য পিয়াসী মহিলার একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। চোখ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন আসে। তাই আজ আবার নতুন করে এই চোখ সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করব। আমার বিশ্বাস বহু প্রশ্নের উত্তর অপনারা এই আলোচনার মধ্যে পেয়ে যাবেন।

খুব ভালভাবে সেজেও যদি চোখ ঠিক মত করে আঁকা না হয় তাহলে রূপসজ্জা অপূর্ণ থেকে যায়। মোটামুটি সাধারণ চেহারায় চোখ চোখের পাতা ভুরু ইত্যাদি একরকম থাকে। কিন্তু তাকে আরও সুন্দর আরও ভাল না করতে পারলে সৌন্দর্য বিকাশ হয় না। শুধু খেয়াল রাখতে হবে চোখের রং ভুরুর রং ও চোখের পাতা কেমন। সামান্য একটু কাজলের ছোঁয়া ভুরুতে একটু পেন্সিলের ছোঁয়া একটু আই লাইনার আর সামান্য আইশ্যাডো দিয়ে চোখের চেহারা বহু পরিমাণে বদলানো যায়। এখন বিচার করে নিতে হবে কোন সময় কি কি শ্যাডো ব্যবহার করা চলে ও কোন রং-এর চোখের জন্য কি কি রং-এর আই লাইনার ও মাসকারা ব্যবহার করা উচিত।

যদিও অনেকের মতে আইশ্যাডো দিনেও ব্যবহার করা চলে—কিন্তু আমার মনে হয় আইশ্যাডো রাত্রে বা সন্ধ্যের পর ব্যবহার করাই উচিত।

চোখের পাতায় মাসকারা ব্যবহার দিনে ও রাত্রে দুবেলাই করা যায়। আই লাইনার ও তাই দুবেলাই ব্যবহার করা চলে। সাধারণ কয়েকটি রং আমি লিখে দিচ্ছি। (১) চোখের রং কালো হলে—আই লাইনার কালো হবে মাসকারা কালো হবে আই-পেন্সিল—যা দিয়ে ভুরু আঁকা হয় তা কালো অথবা ছাই ছাই রং-এর হবে। রাত্রে আই শ্যাডো ব্যবহার করতে হলে তা হাল্কা সাদাটে নীল অথবা হাল্কা খয়েরী রং-এর ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য কি ধরণের কাপড় পরবেন সেটাও বিচার সাপেক্ষ।

(২) চোখের রং নীল হলে লাইনার হবে কালো মাসকারা সমস্তে নীল রং পেন্সিল গ্রে আর রাত্রে আইশ্যাডো নীল রূপালী বা সবজে নীল রং ব্যবহার করা চলে।

(৩) চোখের রং ব্রাউন হলে লাইনার ব্রাউন মাসকারা কালো পেন্সিল গ্রে আই শ্যাডো সবুজ বা লালচে।

(৪) চোখের রং বেড়াল চোখের মত হলে লাইনার হাল্কা নীল বা গ্রে মাসকারাও তাই আই পেন্সিল গ্রে—আর আই শ্যাডো নীল সবুজ বা খয়েরী।

এই সব রং মোটামুটিভাবে আমাদের চোখে দেখা যায়। সুতরাং এই সব রং-এর চোখে যে সব রং মানাবে তার একটা বিবরণ দিলাম। তবে সর্বদা মনে রাখবেন এর সংগে পোশাকটা যথাযথ হওয়া চাই। আমার মনে হচ্ছে বহু প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যেই পেয়ে গেছেন।

চোখ উজ্জ্বল ও চকচকে রাখার জন্য কতকগুলি নিয়ম আছে। (১) একটু জলের মধ্যে গোলাপ জল মিশিয়ে সেই জল দিয়ে নিয়মিত চোখ ধোয়া। (২) ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডা জল দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া।

এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় চোখের ধার ঘেঁষে কাকের পায়ের মতন লম্বা লম্বা কাটাকাটা দাগ হয়—এতে দেখতে খুব খারাপ লাগে। এর জন্য ঘরে তৈরী একটা সাধারণ ওষুধ আছে। পাউরুটির ভেতর থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দুধে ভেজাতে হবে তারপর তাতে সামান্য দু-তিন ফোঁটা বাদাম তেল মিশিয়ে দিতে হবে—তারপর পাতলা কাপড়ে সেই নরম রুটির দলাটা বেঁধে নিয়ে ওটা চোখের ওপরে ও পাশ-গুলিতে বোলাতে হবে। তখন চোখ কিন্তু বন্ধ রাখতে হবে। এতে খুব ভাল উপকার হয়। তবে দুধটা যেন সামান্য গরম থাকে।

আর এক রকমের চোখের সৌন্দর্য হানিকারক জিনিস দেখা যায় তাহোল চোখের নীচের কোল গোল দাগ। এর প্রতিকার গরম চায়ে তুলো ভিজিয়ে তাই দিয়ে চোখের নীচ চেপে চেপে ভেজানো।

আর চোখের পাতা সুন্দর রাখার জন্য ঘুমের আগে এক ফোঁটা করে অলিভ তেল ও দুধের সর মেখে শোয়া উচিত। এতে চোখের পাতা নরম ও সুন্দর থাকে।

চোখ ভাল রাখার জন্য কি ব্যায়াম আছে জানতে চেয়েছেন। সে সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা আগেই করেছি। তবে আবার যখন জানতে চেয়েছেন তখন আরও নতুন কয়েকটা নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি। দিনে অন্তত একবার করে এগুলি অভ্যাস করবেন।

(১) চোখ বেশ জোর করে টিপে বন্ধ করবেন ও তারপর বড় করে চোখ খুলে চাইবেন। এইভাবে অন্তত দশ-বারোবার করবেন। যখন চোখ বড় করে খুলে চাইবেন তখন খেয়াল রাখবেন যে ভুরুও যেন সমান তালে ওপরের দিকে উঠে যায়।

(২) দ্বিতীয় ব্যায়াম: চোখ দশবার পিট পিট করে পলক ফেলে তারপর চোখ কিছুক্ষণ শান্তভাবে বন্ধ করে রাখা। ঠিক এইভাবে দশবার করবেন। অর্থাৎ দশবার চোখ পিটপিট বিশ্রাম আবার দশবার চোট পিটপিট বিশ্রাম। এই ব্যায়াম দ্বারা চোখের পাতার পেশীগুলি সতেজ হয় ও চোখের আইবলটি সুস্থ থাকে।

(৩) চোখ এক কোণ থেকে সুরু করে চক্রাকারে ঘোরানো। একবার ডান থেকে বাঁয়ে আবার বাঁ থেকে ডাইনে। এবং তারপর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বিশ্রামের ভঙ্গীতে থাকা।

এছাড়া মাঝে মাঝে চোখ ঠাণ্ডা জলে ধোয়া। এইগুলি নিয়মিত করলে চোখ শুধু ভালই থাকে না উজ্জ্বল এবং সুস্থ চেহারারও হয়।

এইবারে আলোচনা করবো যাঁরা চশমা পরেন বা চোখের জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করেন তাদের কি ধরণের চশমা মানাবে: মুখের আকারের সংগে চশমার আকার ও প্রকারের সামঞ্জস্য রেখে পরাটা খুব দরকার। এতে সৌন্দর্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

(১) লম্বা ছুঁচালো সরু মুখে গোল আপেলের যে চশমার ফ্রেম থাকবে তার দু পাশ একটু ওপরের দিকে ওঠা হবে আর গালের দু পাশের হাড় থেকে চওড়া হবে অর্থাৎ চশমার শেষভাগে বেশী বেরিয়ে থাকবে।

(২) যদি মুখ গোল আপেলের মতন হয় তাহলে চশমার ফ্রেম একেবারে চৌকো হওয়া উচিত।

(৩) যদি থুতনি সরু আর মুখের আকার ত্রিকোণ হয় তাহলে বেশ সরু ও হাল্কা ফ্রেম পরতে হবে মুখের মাপসই করে।

(৪) যদি চেহারায় ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য বেশী থাকে বা চওড়া বড় মুখ হয় তা হলে বেশ বড় বড় কাঁচ চশমা পরা উচিত। ফ্রেমের ওপরের দিকটা একটু ওঠা হবে কিন্তু নিচের দিক গোল হবে।

(৫) যদি চৌকো মুখ হয় আর দাঁত কাটা চোয়াল হয় তা হলে চেহারা কমনীয়তা অনেক ফ্রেমটা একেবারে সোজা হবে ওপরের অংশ আর নিচের অংশ গোল।

(৬) যাদের চেহারা সুন্দর ইন্ডিয়ানদের মত নরম গোল ধরণের কিন্তু থুতনীর কাছটা প্রয়োজন মত লম্বা অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে ওভাল সেই রকমের মুখে ফ্রেমটা সরু পাখির ডানার মত হলে খুব ভাল দেখাবে।

মোটামুটি আপনাদের সবারই প্রশ্নের জবাব গুছিয়ে দিলাম। আশাকরি এগুলি আপনাদের উপকারে লাগবে।

বরবর্ণিনী

জন্মভূমি বঙ্গদর্শন বান্ধব প্রদীপ দেবালয় সাহিত্য নারায়ণ নব্যভারত নবজীবন প্রবাসী মানসী মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাগুলির মধ্যে ভারতীরও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ১৭৯৯ শকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম এই পত্রিকাখানি কলিকাতা হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তৎকালে এর বার্ষিক মূল্য ছিল ৩৷৷ টাকা এবং ডাকমাশুল সমেত ৪৷ টাকা। বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির সহিত কয়েকজন মহিলা কর্তৃকও সুদীর্ঘকাল পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রথম যখন প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। আসলে ঠাকুর পরিবারের আওতায় এবং তাঁদেরই পরিজনবর্গের সহায়তায় 'ভারতী' ক্রমবর্ধিত সুচিন্তিত ও সমৃদ্ধ রূপে পরিগ্রহ করে।

১৩২৩ সালে 'ভারতী' ৪০ বর্ষে পদার্পণ করে। এই উপলক্ষে উক্ত বর্ষের ৯ম বৈশাখ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিরণ্ময়ী দেবী প্রিয়ম্বদা দেবী নিস্তারিণী দেবী জলধর সেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি অনেকেই কিছু কিছু লেখেন। কিন্তু সেই অতীতকালে মহিলা দ্বারা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা পত্রিকাখানি প্রথম সম্পাদিত হয়ে যে কি পরিমাণ বিদগ্ধ সমাজে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, আজ বিশ্ব-মহিলা বর্ষে তাও এক স্মরণীয় বিষয়। সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী একসময় দীর্ঘকাল এই পত্রিকাখানি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। সেই সম্পর্কে নিস্তারিণী দেবীর রচনাটির অংশবিশেষ আমরা এখানে উক্ত সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

।। ভারতী ও ভারতী-সম্পাদিকা ।।

সে আজ বহুদিনের কথা—প্রায় ত্রিশ বৎসর, যেদিন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে পবিত্র প্রয়াগধামে আমাদের দুই বন্ধুর সম্মিলন হয়। তখনকার দিনে সাহিত্যক্ষেত্রে এখানকার মত এত বঙ্গরমণীর আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং সে সময় একজন বঙ্গরমণী মাসিক-পত্রের সম্পাদক এই সংবাদেই মন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল।...ভারতীর ভূতপূর্ব-সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী তখন এলাহাবাদে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেন, তদুপলক্ষে তিনিও কিছুদিন প্রবাসের সুখ উপভোগ করিতে আসিয়াছিলেন।

এই বিদুষী মহিলাটিকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতে মনে জাগিতেছিল কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ একদিন দৈবযোগে, পূজনীয় পিতৃদেবের বন্ধুভবনে আমরা উভয়েই নিমন্ত্রিত হইলাম। ইহার বহুপূর্ব হইতেই আমার পিতা ও ভ্রাতার সহিত ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভাগ্যে দেবী-দর্শন ঘটে নাই। জানি না সে কোন শুভলগ্ন ছিল, পরস্পরকে দেখিবামাত্র অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে গ্রথিত হইলাম। যেমন বিদ্যার প্রভা, তেমনি রূপেরও প্রভা; রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—একেবারে মূর্তিমতী। ইতিপূর্বে ইঁহার রচনার রসমাধুর্য্য উপভোগ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তখন হইতে 'ভারতী'রও ভক্ত হইয়া পড়িলাম।

সেকালে 'ভারতী'র মত পত্রিকা বড় বেশি ছিল না; এবং ভারতীর স্থান মাসিক সাহিত্যজগতে প্রধান ছিল। মহিলা দ্বারা সাহিত্য-রচনা দূরে থাক, তখন মহিলা-পাঠিকার সংখ্যা বিরল ছিল বলিলেও চলে। এমনি সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক একজন বাঙ্গালী মহিলা হইতে পারেন—একথা তখন কোনরূপ কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না।...

তখনকার সেই শিশু-সাহিত্য স্বর্ণকুমারীর মত একটি স্নেহময়ীর স্নেহ ও যত্নের অপেক্ষায় ছিল। তখন আমাদের দেশের যাঁহারা সাহিত্যগুরু ছিলেন, তাঁহারাও ত অনেক মাসিকপত্র চালাইয়াছেন কিন্তু বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই।...এত পত্র ও পত্রিকাদের মধ্যেও ভারতী যে দীর্ঘজীবী হইয়াছে সে ত স্বর্ণকুমারীর অপরিসীম যত্ন ও তাঁহার পরিপাটিরূপে পরিচালন ক্ষমতার ফলে।

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সে প্রতিভা যে অন্তঃপুরের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায় নাই ইহা আমাদের সৌভাগ্য। শুধু এ দেশ কেন, দেশ-দেশান্তরেও তাঁহার মত মহিলা সম্পাদিকা কয়জন আছেন? তিনি যখন সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন তখন বিদেশেও নামকরা কোন মহিলা-সম্পাদিকার কথা ত শুনি নাই। এ কথা থাক। বঙ্গসাহিত্যকে তিনি যে বহুমূল্য রত্নরাজি দান করিয়াছেন তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে। কবিতা বল গল্প বল উপন্যাস বল—এমনকি বিজ্ঞান-আলোচনা কোনটা তিনি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে দান করেন নাই? সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সফলতাই তাঁহার পরবর্ত্তী লেখিকাদের উৎসাহিত করিয়াছে। তিনি যে শুধু সাহিত্য-রচনার যশ-গৌরবেরই অধিকারিণী তাহা নহে—তিনি বঙ্গরমণীর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।...তাঁহার অন্তরে নারী জাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে তাহারই প্রেরণায় তিনি আমাদের দেশের নারী জাতিকে একটি প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। ইহা শক্তিমানের কাজ, স্বর্ণকুমারী সেই মহাশক্তির অধিকারিণী।

আমরা শুনি মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে উগ্র হইয়া উঠে—তাহাদের নারীত্বের কোমলতা মরিয়া যায়। স্বর্ণকুমারী এই উক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সেই জানে বিদ্যার প্রভায় জ্ঞানের দীপ্তিতে তাঁহার নারীমূর্তি আরো কেমন সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে নাই।

শিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন বলিয়াই স্বর্ণকুমারী চিরদিন স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতিনী। কিসে স্ত্রী-সমাজ সর্বপ্রকারে উন্নতিলাভ করিবে ইহাই তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে তিনি সখী-সমিতি ও মহিলা শিল্পমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন রমণীদের চিন্তা উন্নত করিবার শুধু সংস্কৃত করিবার ও বিমল আনন্দ দিবার আয়োজন তাহাতে কত ছিল। তিনি ধনী-কন্যা হইয়াও সকল শ্রেণীর রমণীর সহিত এমন সহানুভূতিতে মিশিতেন যে দেখিবামাত্র সকলে তাঁহার আপনার হইয়া যাইত। সেই সখী-সমিতি ও মহিলা শিল্পমেলার উজ্জ্বল স্মৃতি এখনো অনেকের মনে জাজ্বল্যমান আছে সন্দেহ নাই।

মনে হয় তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ এই সাহিত্যচর্চ্চা। এমন করিয়া সাহিত্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন কয়জন? বাংলাভাষা অল্পদিনের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমরা অবাক হই কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি এর মূলে তাঁহার মত কয়েকজন ভক্তের তপস্যা নিহিত আছে বলিয়াই এমনটি হইতে পারিয়াছে। বঙ্গভাষার ইতিহাসে স্বর্ণকুমারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে।

'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পড়িল—ইহা আমার কাছে বড়ই আনন্দের দিন। বিশেষ করিয়া এই জন্য আনন্দ যে, ইহা স্বর্ণকুমারীরই জয়-গান আজ বিঘোষিত করিতেছে।

ক্ষপণক

আজও অফিস আসতে আলোর দেরী হয়ে গেছে। আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে যাচ্ছে। সম্প্রতি মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম আলোকেই করতে হয়। ঘরোয়া সব কাজ চুকিয়ে রুগ্ন বাবার পথ্যাদি গুছিয়ে এবং ছোট ছোট ভাইবোন-দের স্কুলে যাবার ব্যবস্থা করে অফিস আসতে দেরী হবারই কথা। তবু তারও একটা সীমা আছে; বিশেষ করে হালে হেড অফিসে বদলী হয়ে আসায় সকলেই যখন অপরিচিত এবং তার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়—সেক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়—আলো সেসব বোঝে। বুঝেও অনেকবার হাজিরা খাতায় লাল দাগ এড়াতে পারে না। কয়েকদিন যাবত অনবরত লাল দাগের পর ওপরওয়ালার লাল চক্ষুর ভয়ে আলো আজ বেশ আড়ষ্ট ও সংকোচের সঙ্গে কাজ করছিল। একমনে টাইপ করে যাচ্ছিল। অথচ এমন ভীতি সত্ত্বেও সমর চাপরাসী এসে খবর দিল বড়সাহেবের ঘরে আপনার ফোন এসেছে।

বলে কী! আলো চমকে উঠল। মনে মনে প্রমাদ গণল। সে স্পষ্টতই বুঝতে পারল, ফোনটা কার। সম্প্রতি পার্কসার্কাস অফিস থেকে ডালহৌসী হেড অফিসে আলো বদলী হয়ে এসেছে। এখানে ওদের ঘরে কোন ফোন নেই। তবু সে বড়সাহেবের ফোন নম্বরটা একমাত্র সমুদ্রকেই দিয়ে রেখেছিল। বলেছিল তেমন কোন বিশেষ প্রয়োজন হলে তবেই ফোন করবে।

আজ অফিস আসার পথে সমুদ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু অলকেশের সঙ্গে আলোর দেখা হয়েছিল। ওরা একপাড়ায় পাশাপাশি বাসায় থাকে। চলতি পথে আলোর সঙ্গে অলকেশের টুকিটাকি কিছু কথাও হয়েছিল। সমুদ্র সংক্রান্ত তেমন কোন দুঃসংবাদ থাকলে অলকেশ নিশ্চয়ই তখন বলত। তবু আলো মনে মনে যথেষ্ট আশঙ্কিত হল। সহকর্মীদের দেখানোর জন্য চোখেমুখে কপট বিরক্তি ফুটিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। সবিশেষ সাবধানে সংকোচের সঙ্গে বড়সাহেবের চেম্বারে ঢুকতেই তিনি ফাইলে মুখ গুঁজে নিরাসক্তভাবে বললেন আপনার ফোন।

আলো টেবিলে শুইয়ে রাখা রিসিভার তুলে জিগ্যেস করল হ্যালো কে বলছেন?

ওপার থেকে উত্তর এল, আলো? আমি সমুদ্র কথা বলছি।

—হঠাৎ কী ব্যাপার?

—তোমাকে বিশেষ প্রয়োজন। জরুরী খবর আছে। ফোনে বলা যাবে না। তুমি আসবে একবার?

সমস্ত ব্যাপারটাই আলোর কাছে হেঁয়ালী মনে হল। সে কিছুটা বিব্রত ও অস্বস্তি বোধ করল। অথচ মনের এসব প্রতিক্রিয়া ফোনে বোঝানো সম্ভব নয়। সুতরাং জিগ্যেস করল, কোথায়?

—ধর্মতলার ট্রাম ডিপোর কাছে।

—কখন? খুব অস্পষ্ট ও নিম্নস্বরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

—আমি তো বেকার মানুষ। বললে এখনই যেতে পারি।

—তা কেমন করে হয়।

—তবে কখন?

বড় সাহেবের দিকে চোর-চোখে তাকিয়ে আলো নির্দিষ্ট কোন সময় বলতে ইতস্তত বোধ করল। অনেক ভেবেচিন্তে রিসিভারটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বড়সাহেবকে উদ্দেশ করে বলল স্যার বাড়ী থেকে জরুরী ফোন করছে। কী ব্যাপার ঠিক বলছে না। মা'র শরীরটা অনেকদিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না। তাই—

বাকিটা বলার আগেই বড়সাহেব ফাইল থেকে মুখ না তুলে বললেন যাবেন নিশ্চয়ই। তবে যাবার আগে হাতের বকেয়া কাজগুলো অন্য কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। বলবেন আমি বলেছি।

আলো ছুটির সম্মতি পেয়ে ফোনের অপর প্রান্তে জানিয়ে দিল আচ্ছা আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছি।

ট্রাম ডিপোর অফিস বিল্ডিং-এর নীচে সমুদ্র একা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তার পরণে আধময়লা পায়জামা কলারঅলা হ্যান্ডলুম পাঞ্জাবী। অযত্ন রুক্ষ চুল। গালময় কয়েকদিনের জমে ওঠা দাড়ি। সে উদাস দৃষ্টি মেলে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল। দূর থেকে আলোকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এল। আলো ব্যস্ততার সঙ্গে ইতিউতি তাকিয়ে বলল, কথা পরে হবে। আগে পালাই চল।

—কোথায়?

—নিরিবিলি যে কোন জায়গায়। আলো হাঁটতে হাঁটতে বলল, মা-র অসুখ বলে ছুটি নিয়ে এসেছি। কেউ দেখে ফেললে মুস্কিলে পড়বো। তোমার জন্য চাকরিটা দেখছি খোয়াতে হবে।

অল্প কথায় আলোর মনের বিরক্তিটা প্রকট হয়ে ফুটে উঠল। সমুদ্র আঘাত পেল কিনা বোঝা গেল না। আসলে সে কিছুই বুঝতে দিতে চাইল না। বরং সহজ করেই উত্তর দিল, এলে কেন? বললেই তো পারতে অসুবিধা আছে।

—তাহলে তো আবার তোমাকে খোয়াতে হয়। তোমার রাগতো। আমার অজানা নয়। আলো ইচ্ছে করেই কিছুটা ব্যবধান রেখে দ্রুত পা চালাতে চালাতে বলল, মাত্র সাত-দিন দেখা হয়নি তাতেই তোমার মনের অবস্থা এমন হলে চলবে কী করে।

সমুদ্র কিছুটা ম্লান বিবর্ণ হয়ে বলল, আমি যে সত্যিই বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে ডেকেছি তা এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না? আজকেই শেষ। আর বোধহয় কোনদিন ডাকব না।

আলো প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল, তোমাকে ডাকতে হবে না। শনিবার আমার হাফ-ডে ছুটি। এখন থেকে প্রতি শনিবার তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি দেখা করবো।

—তা বোধহয় আর সম্ভব হবে না।

—কেন?

—একটু পরেই জানতে পারবে।

কারণটা এই মুহূর্তেই আলোর জানতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেল না। ওরা দুজনে ঝটিতি একটা বার নম্বর বাসে উঠে পড়ল। বাসটায় ভীড় কম ছিল। ফলত ডবল সিটে দুজনে পাশাপাশি বসতে পারল। বাস চলতে শুরু করলে আলো ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করল আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

—জাহান্নামে। সমুদ্র অপেক্ষাকৃত বেশি নিম্নস্বরে জবাব দিয়ে তির্যক তাকাল। আলোর মুখের ভাবান্তর পরখ করল। তারপর আলতো হেসে ঝুঁকে পড়ে আলোর প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ঠাট্টা বোঝ না। আমরা এখন অফিস এলাকা এবং মানুষের ভীড় থেকে দূরে নিরিবিলিতে পালিয়ে যাচ্ছি।

পালিয়ে আসা জায়গাটার নাম প্রিন্সেপঘাট। অনেকক্ষণ হল ওরা দুজন গাছটার নীচে চুপচাপ বসেছিল। সবুজ পাতায় ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছ। থোক থোক লাল ফুলে ভরা কয়েকটা ডাল সামনে ঝুঁকে পড়ে জোয়ারের জল ছুঁই ছুঁই করছে। গাছের ডালে কিচিরমিচির ছোট্ট পাখিদের অস্থির চঞ্চল পাখনা ওড়া শব্দ। জলের ওপর উছলে পড়া রোদ্দুরের রেশ। আলো হাঁটুতে নিশ্চুপ মুখ গুঁজে এক আধটা ঘাসপাতা ছিঁড়ছিল। দাঁতে কাটছিল। সমুদ্র যতদূর হাত যায়—চারদিক থেকে ঘুরে-ফিরে ছোট ছোট ইঁটের কুচি কুড়িয়ে জলের ওপর ছুঁড়ছিল। নদীস্নাত স্নিগ্ধ হাওয়া এসে আলোর চুল এবং কাপড় নিয়ে অসভ্যতা করছিল। আলো কিছুক্ষণ বাবধানে চুল এবং আঁচল সামলাতে বিব্রত বোধ করছিল।

সমুদ্র প্রতি মুহূর্তে আলোর কাছ থেকে কিছু একটা জবাব প্রত্যাশা করছিল। আলো কোন জবাব না দেওয়ায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। তিন কাঠির প্রচেষ্টায় নতুন একটা সিগারেট ধরাতে সক্ষম হল। একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে উদ্ভ্রান্ত চুলের অরণ্যে আঙুলের আঁচড় কেটে বলল, একটা কিছু জবাব তো দেবে? তোমার মতামতের ওপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে।

আলো হাঁটু থেকে মুখ তুলল। হাতের কাছে পাওয়া ছোট্ট একটা পাথরকুচি জলে ছুঁড়ে মারল। পাথর কুচিটা জলে পড়ে টুপ করে শব্দ তুলল। সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই আলো জিগ্যেস করল তোমার বাড়ীর সকলে কী বলছেন?

—আমাদের অভাব অনটনের কথা তুমি তো সবই জানো। বাবা মারা যাবার সময় কিছু দায়-দায়িত্ব এবং দেনা ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। তাই সংসারের দিকে তাকিয়েই দু দিদি বিয়ে করেনি। ওরা চাকরি করছে ছোট ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে।

—তোমার জন্যও বটে।

—আমার কথা বাদ দাও। আমি চিরকাল উপেক্ষিত—সেই বাবা জীবিত থাকা সময় থেকেই। বাবার সেকেলে নীতিতে আমি বিশ্বাসী নয় বলে আমার ওপর বাবার কোন আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না। এখনো দিদিদের কাছে আমি হিসেবের বাইরে। ওরা আমার রোজগারের ধার ধারে না। তাছাড়া এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তোমার আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদেরকেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আলো আবার হাঁটুতে মুখ রাখল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে কী সব ভাবল। তারপর জিগ্যেস করল আমি যদি মত দেই এবং তুমি যদি কাজটা করতেই চাও তাহলে কালকেই কী জেতে হবে?

—হ্যাঁ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে তাই লেখা আছে। কালকের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট অফিসে জয়েনিং রিপোর্ট দিতে হবে। ওরা দূরে কোন গ্রামে পোস্টিং দেবে।

—গ্রামে তোমার খুব কষ্ট হবে জানি কিন্তু চাকরির বাজার যা দেখছি— বাকি কথাটা ইচ্ছে করেই আলো উচ্চারণ করল না। সমুদ্র বুঝে নিল। ঠিক এরকম মতামতের জন্য প্রস্তুত না থাকায় কিছুটা নিরাশ হল। বিমর্ষবোধ করল। কিন্তু তার মানসিক ভাবান্তর আলোকে বুঝতে দিল না। তবু নিরুপায় ভাবাবেগে বলে ফেলল আমি জানতাম তুমি মত দেবে। আমাকে তুমি দূরে ঠেলে দিতে চাও আমি তা বুঝি।

সমুদ্রের অনুমান ছিল এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে সে আলোকে অনেক কাছে পাবে। কিন্তু ব্যাপারটা বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। আলো বেশ কিছুটা রাগতভাবে বলল, তাহলে যেও না। আমার কাছাকাছি চিরটা-কাল বেকার থাক। আর সারাটা জীবন দুজনে শুধু হোটেল রেস্তোঁরা মাঠ-ময়দান করেই কাটিয়ে দিই।

সমুদ্র নতুন করে কথা বাড়াতে সাহস পেল না। বরং আলোকে শান্ত সংযত করতে কৃত্রিম হেসে জবাব দিল অমনি চটে গেলে? রসিকতাও বোঝ না। আমি কী বুঝি না যে অতি শীগগির তোমাকে কাছে পাবার জন্য চাকরিটা পেয়েও হাতছাড়া করা উচিত নয়।

—আমি কিন্তু মনে করি তোমার ভাই-বোন এবং সংসারের স্বার্থেই যা হোক একটা কিছু কাজ করা একান্ত দরকার।

—আমি তো আগেই বললাম, ওরা কেউ-ই আমার সাহায্যের প্রত্যাশা করে না। তাছাড়া সংসারের কথা ভাবতে গেলে সব দায়-দায়িত্ব চুকিয়ে কোনকালেই আমাদের বিয়ে হবে না।

—তবুও তোমার সংসারের কথাই আগে ভাবা উচিত।

—আমি ভাবতে পারি না।

—কেন পারবে না? আমি আমার বুড়ো বাবা-মা এবং ছোট ভাই-বোনদের জন্য যে সংগ্রাম করছি তা দেখেও পারবে না বলছো।

—তাহলে তো সারাটা জীবন সেই হোটেল রেস্তোরাঁ মাঠ-ময়দানে কাটিয়ে দেবার প্রসঙ্গই এসে গেল।

—বোধহয় তাই। তবু নিজেদের সুখের জন্য তোমার আমার কারও পক্ষেই বোধহয় অতটা স্বার্থপর হওয়া ঠিক হবে না।

—অর্থাৎ পিতৃ-পিতামহের সেই গাঁটি-বানান দায়-দায়িত্ব এবং দেনার বোঝা বয়ে যৌবন কাটানো। বার্ধক্যে বিয়ে এবং কয়েকটি নাবালক সন্তান বিধবা স্ত্রী ও কিছু দায়-দায়িত্ব দেনা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে টুপ করে মরে যাওয়া জীবন? অ্যাবসার্ড। এসব সেকেলে নীতিতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই।

যদিও সমুদ্রের কণ্ঠ এবং কথাগুলোর মধ্যে তীক্ষ্ণ শ্লেষ বিদ্রূপ এবং ঘৃণা মিশ্রিত ছিল আলো কিন্তু অতি সহজভাবে ফিক করে হেসে ফেলল। সমুদ্রের রাগে চোখ মুখ চিবুকের দিকে তাকিয়ে আরেক ঝলক শান্ত শীতল হাসি ছড়িয়ে বলল, এসবই তোমার রাগ ক্ষোভ এবং অভিমানের কথা। তুমি যে সমস্যার কথা বলছো এটা শুধু আমাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। চারদিকে চোখ মেলে তাকালেই দেখবে এ সমস্যা আমাদের মতো অনেকেরই। তাই বলে ভেঙে পড়বে কেন। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখবো তো সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা ছাড়া জীবনের কোন অর্থ আছে? আমি কিন্তু কর্তব্য এবং মনুষ্যত্ববোধে বিশ্বাসী। তোমার বিশ্বাসটা কোথায় বলতে পার?

সমুদ্র মনের অনেক গভীরে হঠাৎ কোথায় যেন একটা মৃদু কম্পন অনুভব করল। আলোর কথাগুলো সমস্ত শরীর জুড়ে শিহরণ জাগালো। মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেবলি ঘুরপাক খেল। মনে হল এসবই শোনা কথা। অথচ এমন গুছিয়ে স্পর্শযোগ্য করে এর আগে কেউ কোনদিন তাকে বলেনি। সে মানসিক চিন্তাধারা এবং হৃদয়গত উদারতায় আলোর কাছে হেরে যাবার একটা সূক্ষ্ম গ্লানিবোধ করল। মনের ভিতর ধিকি ধিকি একটা যন্ত্রণা অনুভব করল। আলোর প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেল না। ফলত হাঁটুতে মুখ গুঁজে দীর্ঘসময় নির্বাক বসে থাকল।

কথায় কথায় সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রোদ্দুরের রেশটুকুও মিলিয়ে গেল। গোধূলির ম্লান আলো ক্রমশই অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ করছিল।

সেই অবস্থা আলো অন্ধকারে সমুদ্র এবং আলোর নির্বাক মুখ জুড়ে ক্রমশঃ একরাশ কালকালি মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। ওদের পিঠের কাছে কখন যেন একজন চিনেবাদামঅলা এসে দাঁড়িয়েছিল। অসহ্য গুমোট নিস্তব্ধতার পর্দা সরিয়ে সে জিগ্যেস করল বাদাম দোব বাবু?

সমুদ্র ম্লান কণ্ঠে প্রশ্নটা আলোর কাছে রিলে করে দিল বাদাম দেবে?

—দাও।

বাদামঅলা বাদাম মেপে দিল। আলো নিজের ব্যাগ থেকে পয়সা চুকিয়ে দিতে সমুদ্র আরেকটা বাড়তি নুনের প্যাকেট চেয়ে নিল। তারপর আলোর দিকে বাদামের ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খাও। শেষ সন্ধ্যাটা এত সব ভেবে মন খারাপ করে মাটি করো না।

আলো বুঝতে পারল সমুদ্র তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছে এবং সে সহজ স্বাভাবিক হতে চাইছে। সুতরাং সে নিজেও আগেকার তিক্ত তর্কের রেশ কাটিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করল। হাতের তালুতে কয়েকটা বাদাম তুলে নিল। একটা বাদামে সজোরে চাপ দিয়ে বলল, তুমি এমন করে বলছো যেন এই দেখাই আমাদের শেষ দেখা।

সমুদ্র নিজের বক্তব্য প্রকাশের ত্রুটি বুঝতে পেরেও নিজেকে সমর্থন করে বলল, হতেও তো পারে। হয়তো আমি পালিয়ে বাঁচলাম। তোমাকেও বাঁচালাম।

আলো আলতো চিমটি কেটে বলল, থাক আমাকে বাঁচাতে হবে না। নিজে পালিয়ে বাঁচতে চাও-সে আলাদা কথা। কিন্তু পালাবে কোথায়? এখান থেকে মেদিনীপুর এমন কিছু দূরে নয়। গলায় গামছা দিয়ে ধরে নিয়ে আসবো না। তিন বছরের ভালবাসায় বুড়ো আঙুল দেখাবে বললেই হল।

সমুদ্র সহজে মানতে রাজী হল না। বলল দেখবো কেমন ধরে আনতে পার। আমার তো এক জায়গায় কাজ নয়। বদলির চাকরি। কখন কোথায় পোস্টিং জানাবই না।

আলো এবার পরাস্ত হল। সমুদ্রের বুকে মাথা ঠেকিয়ে অনুরোধ জানাল লক্ষ্মীটি অমন কাজ করো না। সমুদ্র পূর্বেকার পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে মুখ টিপে হাসল। আলো সে হাসি দেখতে পেল না। অনেকক্ষণ সমুদ্রের কোনরকম সাড়া শব্দ না পেয়ে ডান হাতের কনুই দিয়ে ধাক্কা দিল। বলল, কথা দাও যখন যেখানে থাকবে চিঠি দিয়ে ঠিকানা জানাবে।

সমুদ্র আলোর মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল ... করো ঠিকানা জানালাম। তুমি চিঠি ... । আমি কোন উত্তর দিলাম না। ... করবে?

—দেখবে কী ক... আলো ওর মুখটা ... বার দুয়েক সমুদ্রের ... ঘষে দিয়ে, জানিয়ে দিল হঠাৎ গিয়ে হা... হব। লোক জানা-জানি হবে। আমাকে ... আর কেউ চিনবে না। লজ্জায় তোমা... থা কাটা যাবে। তখন কিন্তু আমাকে ... দেবে না।

—আমি কী অ... রে থাকব যে হঠাৎ গিয়ে হাজির হ... সমুদ্র ভয় দেখা... বার চেষ্টা করে বলল ... না ... কো আমি এমন একটা গ্রামে যাবো ... খানে ইলেকট্রিক নেই। পাকা রাস্তা ... হাট-বাজার স্কুল নেই। সেখানে খবরের ... ও যায় না। ... রাস্তা থেকে মাইল ... টেক হেঁটে পথ কিম্বা ধানক্ষেতের অ... র পারে পৌঁছে তবে আমার আস্তানা।

আলো এহেন কাল্পনিক বর্ণনায় অর্থ বুঝতে পারল। তাই বেশ খানিকটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, হাইট হয় দেখাও না কেন ঠিকানা হাতে থাকলে খুঁজে বের করতে কষ্ট হলেও দেখবে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছি। বিশ্বাস না হয় তুমি অনায়াসে বাজি রাখতে পার।

সমুদ্র আলোর মাথা থেকে হাতটা নামিয়ে নিল। ওর মাথায় নিজের গাল ঠেকিয়ে দিল। বলল, যদি তাই হয় বাজিতে হেরেও আমি মনে-প্রাণে খুশী হব। তোমাকে পেতে আমার নিঃসঙ্গতার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে নেব।

—তাহলে কথা দিচ্ছ—চিঠি দেবে। ঠিকানা জানাবে। সমুদ্রের কোলের মধ্যকার গহ্বর থেকে আলো অস্ফুট স্বরে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করল। আলোর মাথায় ঠোঁট রেখে সমুদ্র স্বীকৃতি জানান দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ গভীরতর রোমাঞ্চকর হয়ে উঠছিল। এতক্ষণ পাশে কাছে অনেক মানুষের ভীড় ছিল। দূরে ফেরিঅলা এবং পথচারীদের আনাগোনা চলছিল।

ভিক্ষুকদের উপদ্রব ছিল। নানাজনের বাঁকা মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল। এখন সেসব কিছুই নেই। এখন শুধু ঝিরঝিরে নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া মৌন নিস্তব্ধতা এবং শান্ত নির্জনতা। এমনতর পরিবেশে আকাঙ্ক্ষিত হলেও এই মুহূর্তে এভাবে দুজনে বসে থাকা আলোর কাছে নিরাপদ মনে হল না। সে ভয়ে দুর্বল ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। সমুদ্রকে বলেই ফেলল আমার কেমন যেন ভয় করছে। চল অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

—কোথায়?

আলো ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। পরণের কাপড়টা সযত্নে গোছগাছ করতে করতে বলল, অন্ধকার হয়ে গেছে। এখন যেখানে খুশী যাওয়া যেতে পারে। কথাটা বলেই সে তার হাতে ঝুলন্ত ব্যাগ তুলে নিল। সমুদ্র উঠে দাঁড়াতে হাঁটতে থাকল। পাশা-পাশি ঘনিষ্ঠভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দুজনে বড় রাস্তায় পা ফেলল। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাতে উঠল। ফুটপাতের ধারে সারিবদ্ধ গাছ। আবছা আলো অন্ধকারে পথ চলতে চলতে সমুদ্র বলল, চল পর্দা ঢাকা কেন কেবিনে যাই।

আলো আপত্তি জানিয়ে বলল, ওসব জায়গায় বেশীক্ষণ থাকা যায় না। তাছাড়া জানাশোনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

—তবে কোথায় যাবে?

—মনুমেণ্টের সামনে মাঠে।

সমুদ্রর পছন্দ হল না। বলল, ওখানে বড্ড ভিড়। মনে হয় মেলা বসেছে। তাছাড়া বড্ড বাজে লোকের আড্ডা। তারচেয়ে বালি-গঞ্জ লেকে যাই চল।

—ওখানে আজকাল বড্ড বেশী আলো।

সমুদ্র ইঙ্গিতধর্মী কথাটার অর্থ বুঝতে পারল। সুতরাং কোন জবাব দিল না। এতক্ষণ জায়গা নির্বাচনের কাটাকাটি খেলতে খেলতে ওরা অনেকটা পথ পিছনে ফেলে এসেছে। আকাশবাণীর কাছাকাছি এসে ডান দিকের মাঠে দুজনে পা ফেলল। সবুজ ঘাসের গালিচায় পা ডুবিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘেরা মাঠের কাছে এল। খেলার মাঠের কাঠ-ঘেরা প্রাচীর দূরে নিয়নের আলো প্রতিহত করে অনেকটা জায়গা জুড়ে অন্ধকার ছড়িয়েছে। আলো সেই অন্ধকারের আড়ালে জিগ্যেস করল, এখানে বসলে কেমন হয়?

সমুদ্র চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে মন্তব্য জুড়ল, এখানে বসাটা বোধহয় ঠিক হবে না। ছিনতাই হতে পারে। তারচেয়ে বরং ভিকটোরিয়া যাওয়া ভাল।

সুতরাং ওরা দুজনে [illegible] থাকল। অনেকক্ষণ দুজনে কোন কথা বলল না। হঠাৎ এক সময় আলো তার হাতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বলল, কটা বাজে খেয়াল আছে? এখন ভিকটোরিয়া ঢুকতে দেবে না।

সমুদ্র কোন জবাব দিল না। ভাবল, কথাটা সত্যি। মনে মনে চিন্তা করল, তবে কোথায় যাওয়া যায়? কোন উত্তর খুঁজে পেল না। ফলত অনির্দিষ্ট নিশানায় অনিয়ন্ত্রিত উদ্ভ্রান্ত পা ফেলে এগিয়ে চলল।

সামনে আলো ঝলমল উজ্জ্বল রেড রোড। পায়ে হাঁটা চলন্ত মানুষের ভিড় নেই বললেই চলে। শুধু সারিবদ্ধ গাড়ীর ছুটন্ত মিছিল। সমুদ্র অন্যান্য রাস্তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এই পথ ধরে হাঁটা ভাল মনে করল। সেই মত দুজনে উদ্দেশ্যহীন অলস পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে থাকল। চলতে চলতে সমুদ্রর কেবলই মনে হল, আজকাল কলকাতার সব জায়গাতেই বড় বেশী রকম আলোর জৌলুস। এই মুহূর্তে উপচে-পড়া এত আলোর বন্যা তার দুঃসহ লাগল। এক সময় বেফাঁস বলেই ফেলল, আজকের দিনে অন্তত ইলেকট্রিক তো ফেল করতে পারত।

আলো মুখ তুলে সমুদ্রর দিকে তাকাল। চোখে চোখ মিলিয়ে ঠোঁটের কোণে এক ঝিলিক হাসি ছড়িয়ে দিল। তারপর ব্যঙ্গ করে বলল, পকেটে টর্চটা নিয়ে বেরুলেই পারতে।

সমুদ্র ম্লান হেসে বলল, ঠাট্টা করছো? আচ্ছা সত্যি করে বল তো—তোমার কি ইচ্ছে করে না আজ অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠি।

আলো এক মুঠো বিষন্ন দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে জবাব দিল, উপায় কি বল। আমি তো প্রতি মুহূর্তে তোমাকে কাছে পেতে চাই। অনেক কাছে।

সমুদ্র নতুন করে কোন জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পেল না। আলোর মনের অনেক গভীরে কান্নার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেল। হৃদয় পেতে সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করল। বিষন্নতার অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকল। কেবলই মনে হল, এই যে এত বড় শহর কলকাতা—এখানে আমাদের জন্য কোথাও একটুকু নিরাপদ নির্জনতা নেই।

ফোর্ট উইলিয়াম গেটের সামনে চৌ রাস্তায় অনেক যানবাহনের ভিড়। সমুদ্র অত্যন্ত সন্তর্পণে আলোর হাত ধরে রাস্তা পার হল। সামনে ময়দানের কোণে যুদ্ধলব্ধ ট্যাঙ্ক সারিবদ্ধ ফুলকুঞ্জ পেরিয়ে পুলিশ ওয়াচ পোস্টের কাছাকাছি এসে গেল। সামনে ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা কম বয়সী গাছ। গাছগুলোর নিরাপত্তার জন্য লোহার জাল দেয়া বৃত্তাকার বেষ্টনী। তার আড়ালে কয়েক জোড়া তরুণ-তরুণী বসে আছে। সেদিকে তাকিয়ে সমুদ্র পরম নিশ্চিন্ত বোধ করল। আলোকে উদ্দেশ করে বলল, এসো এখানে বসা যাক। কাছেই [illegible] [illegible] আছে, [illegible] ভয় নেই।

আলো নীরব

ঝোপের বৃত্ত—আড়ালে দুজনে পাশা-পাশি বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার ভরসা পেল।

ওপরে অনাবৃত আকাশ জুড়ে একরাশ শিউলির মত ছড়ানো ছিটানো তারা। এক-পাল ভেড়ার মত কয়েক খণ্ড চড়ে বেড়ানো মেঘ। নীচে সবুজ ঘাসের গালিচায় বসে আলোর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে সমুদ্র খেলা করছিল। সমুদ্রর কাঁধে মাথা রেখে আলো পরম প্রশান্তির নিঃশ্বাস ওড়াচ্ছিল। রাস্তার ধারে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দূরে নিয়নের ছিটেফোঁটা ছুটন্ত আলো তেমন কোন অসুবিধার কারণ ঘটাচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলোর ঝলকানিতে সমুদ্র চমকে উঠল। পিছন ফিরে তাকাল। অজান্তে কখন যেন রাস্তার ওপর একটা পুলিশ ভ্যান এসে চুপিসাড়ে দাঁড়িয়েছিল। চার পাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তারই সন্ধানী আলো এসে পড়েছে। সমুদ্র বিরক্ত বোধ করল। দুঃখ পেল এবং হতাশায় ক্ষুব্ধ হয়ে অনুচ্চারিত গালাগাল দিল।

কিছুক্ষণ বাদে ভ্যানের ওপরকার সার্চ লাইটা নিভে গিয়ে আকাঙ্ক্ষিত অন্ধকার ফিরে এল। পুলিশ ভ্যানটা কচ্ছপ-গতিতে দূরে দৃষ্টি সীমানার বাইরে মিলিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে সমুদ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সাময়িক দুঃখ ক্ষোভ হতাশা ভুলে আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই সে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেল, সামনে মাঠের অন্ধকার থেকে দুজন বন্দুকধারী পুলিশ এগিয়ে আসছে। ওরা ক্রমশ অনেক কাছে এগিয়ে এল। কিছুটা ব্যবধানে বসে থাকা এক জোড়া ছায়া শরীরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জুতোর হিলে ঠোকর তুলল। টর্চের আলো ছুঁড়ে ওদেরকে পরখ করল। ওরা দুজন উঠে দাঁড়াতে কি সব কথাবার্তা হল। পুলিশ দুজনকে হাত পা নেড়ে ওরা কি যেন বোঝাতে চাইছিল। —সমুদ্র কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। অন্ধ-কারে যত দূর মনে হল, পুলিশ দুজন ওদের কথা কিছুতেই মানতে চাইছে না।

এসব দেখতে দেখতে নিকট দূরে বসে থাকা সব জুটিরাই উঠে পড়ল। সমুদ্রও আলোর হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনে উজ্জ্বল রাস্তার সমান্তরাল দূরত্বে ময়দানের ওপর অলস অশান্ত পা চালাল। কেবলই পায়চারী করতে থাকল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অন্তর্লীন বিষন্ন-তার গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে আলো ভাবল, সমুদ্র কাল চলে যাবে। সমুদ্র ভাবল, আমাকে কাল চলে যেতে হবে। তারপর এক সময় নিঃসঙ্গতার বিষন্ন ভাবনায় দুজনে উন্মুখ চোখ চেয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ভাবল, এই অসহ্য গরমে অন্তত একবার যদি চারদিক [illegible] বৃষ্টি [illegible]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—রঞ্জু ভাই। গোপেন রায়ের দৃষ্টিতে কাতরতা ফুটল। বলল—যাদের কিছু নেই—উপোস থাকে ল্যাংটো থাকে গাছতলায় শুয়ে রাত কাটায় তারা আমাদের চেয়ে সুখী। তাদের দুঃখ আছে। কিন্তু তাদের বুকে অশান্তির জ্বলুনি নেই। দুশ্চিন্তা নেই।

আশ্চর্য রঞ্জু অবাক হয়। তবে তো যূঁইয়ের কথাই ঠিক। অনেক আছে বলে দুজনের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কিছু না থাকলে তারা সুখী হত। তবে কি—

মাঝপথে রঞ্জুর চিন্তা থেমে যায়। যেমন সে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল। যেমন কাগজে মাঝে মাঝে খবর বেরোয় বা লোকের মুখে শোনা যায়। মোট সাতটা চিঠি পেয়েছি এই পর্যন্ত গোপেন রায় রঞ্জুর চোখের সামনে হাতের সাতটা আঙুল তুলে দেখাল ভদ্রলোক। সেই সঙ্গে তাঁর বত্রিশ পাটি দাঁত ছোপান হাসিটা আবার হাসল। কিন্তু এবারের হাসি মেঘলা রোদের মতন কতকটা ফিকে।

উজ্জ্বলতা নেই। —বুঝলে রঞ্জু। ঝুপ করে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে গোপেন রায় বলল—প্রত্যেকটা চিঠিতে ওরা আমায় শাসাচ্ছে—এত জমিজমা এত বড় বাড়ি এত টাকাকড়ি একা ভোগ করার অধিকার নেই আপনার—

—নকসালাইট? রঞ্জু ধক করে প্রশ্ন করল।

—না, তা হবে কেন। গোপেন রায় ইচ্ছে করে মুখের হাসি নিবিয়ে দিল। —চিঠিতে বার বার ওরা আমায় মনে করিয়ে দেয়—দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরছে। অসুখ হলে পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারে না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারে না। কোনদিনই গায়ের জামা-কাপড় কিনতে পারে না। ঘরের অভাবে রাস্তায় ফেলে গাছতলায় রাত কাটায়। এই অবস্থায় আপনার এতবড় বাড়ি জমিজমা গাড়ি বাগান পুকুর মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে আমাদের বুক জ্বলে যায়। একটা মানুষ এত সুখে থাকবে কেন।

—হল না সবটা বলা হল না। যূঁই ওর রায়ের দিকে চোখ রেখে জোরে মাথা ঝাঁকাল। সুন্দরী বৌয়ের কথাটা তুমি একদম বাদ দিচ্ছ।

—হুঁ, তা-ও বটে। ওটা বাদ দিয়েছিলাম। রঞ্জুর দিকে মুখ রেখে গোপেন রায় অল্প হাসল। ওরা বলছে—আপনার বিশাল বাড়ি গাড়ি জমিজমা মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ও অত রূপসী বৌ দেখে হিংসায় আমাদের বুক পুড়ে যায়। একলা একটা মানুষকে এত সুখ-ভোগ করতে দেওয়া উচিত নয়।

রূপসী বৌ! একপলক যূঁইকে দেখল রঞ্জু তারপর গোপেন রায়ের দিকে চোখ রেখে থমকে গেল।

—ওরা কি এসে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যেতে চাইছে? ঢোক গিলে রঞ্জু প্রশ্ন করল। লুঠতরাজ করবে বলে চিঠিতে শাসাচ্ছে?

—তাই বা আসছে কোথায়। গোপেন রায় বলল, তা হলেও যে রক্ষা পাওয়া যেত। সব কেড়েকুড়ে নিয়ে গেলে ল্যাংটা হয়ে আমরা দুজনে গিয়ে গাছতলায় আশ্রয় নিতাম—তাই না যূঁই?

—এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। যূঁইয়ের মুখটা এবার একটু শুকনো দেখাল। গোপেন রায়ের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, তুমি লর্ড—তুমি যেমন বলবে আমাকে তাই করতে হবে।

—আমি লর্ড! রিয়্যালি—যূঁইয়ের তুলনা হয় না। এর চেয়ে বড় সাধ্বী স্ত্রী আর কাকে বলে বলো? এদিক থেকে যে আমি কী ভয়ানক সুখী রঞ্জু। গোপেন রায় বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। ঘাড় বেঁকিয়ে আমগাছের থোকা থোকা পাতা দেখল। তারপর রঞ্জুর দিকে চোখ নামিয়ে দরাজ গলায় বলল, ওরা আসে ভাল—সব নিয়ে যাবে—না আসে, যূঁইকে রোজ বলি—যতদিন না এল, এসো দুজনে মিলে জীবনটা ভোগ করা যাক—যতটা পারা গেল। যত বেশি পারা গেল।

—এটা ভাল বুদ্ধি কেমন যে রঞ্জু? যূঁইয়ের দু চোখ চকচক করে উঠল। আমি তাই চাই। শ্বশুরমশায় যখন আমাদের জন্য এত রেখে গেলেন, এত দিয়ে গেলেন—তুমি হুইস্কি খেয়ে ওড়াও—আমি নিত্যি নতুন শাড়ি গয়না কিনে কসমেটিকস কিনে—হি-হি.....

অস্বস্তি লাগছিল রঞ্জুর। যূঁইয়ের এই ধরনের হাসিটাসি ক্রমেই তার খারাপ লাগছিল। গোপেনদার পাশে ওকে যে কত বেশি মেকী মনে হয়। আর স্বার্থপর। উঁহু, গোপেন রায়কে সে এভাবে বিচার করে না। করতে বাধে। ভদ্রলোক হাসুক বা সময়ে মুখ ভার করে দীর্ঘশ্বাস ফেলুক—মনে হয় একটা সত্য রেখেন ভেতরে—এঁর মধ্যে ফাঁকি কিছু নেই। আসলে বেনামী চিঠিপত্তর পেয়ে মানুষটা ঘাবড়ে গেছে—কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না—এমন হয়—অদৃষ্টের ফেরে পড়ে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় লোকের। যেমন রঞ্জুর বাবা অমিয়বাবু। একদিন তিনি বিপ্লবী দলে মিশতে চেয়েছিলেন—হয়তো শহীদটহিদ হবেন এমন একটা বিরাট রকমের ইচ্ছা মনের মধ্যে ছিল। বুড়ো বঙ্কিম দত্ত সেটা হতে দিলে না। ছেলেকে উল্টোপথে চালাতে লাগল। নিজেও পুলিশ অফিসার টফিসারের সঙ্গে মিশতে শুরু করে দিল। তাতে কি হল। একটা হতাশার ভাব এসে [illegible] অমিয় দত্তর মনে। ফলে সাংঘাতিক [illegible] বিকৃতি—যাকে বলে পারভার্শন এসে যেতে পারে রঞ্জুর বাবার মধ্যে। ভাগ্যিস তা আসেনি। মনটা যে শিল্পীর। অবশ্য বিপ্লবীরাও এক একজন মনেপ্রাণে শিল্পীই। দেশকে স্বাধীন করতে চাওয়া—দেশকে নতুন করে গড়তে চাওয়া। শিল্পীর মতন রাতদিন তারা দেশের স্বপ্ন দেখে—দরকার হলে শিল্পীর আবেগ নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে এগিয়ে যায়। সেদিন বাবার বন্ধু বৃন্দেন্দু এসব কথা বলেছিল। বিপ্লবীরা শিল্পী। কাজেই রঞ্জু বেশ বুঝতে পারে বিপ্লবের পথ থেকে ছিটকে পড়লেও তার বাবার মধ্যে বাজেরকম কোনো বিকৃতি দেখা দিল না। অনেক সময় নাকি এই অবস্থায় মানুষ ইনফরমার অর্থাৎ পুলিশের স্পাইটাই হয়ে যায়। বা চুরি ডাকাতি খুন খারাবির পথ বেছে নেয়। বা মদ গাঁজার আড্ডায় ভিড়ে পড়ে। আরও অনেক খারাপ আড্ডায় মেশে। রঞ্জুর বাবা ফুলের চাষ পাখির চাষ নিয়ে মেতে রইল। আর ঐ যে—এটা যে খুব

একটা প্রশংসার জিনিস রঞ্জু তা মনে করে না যদিও—ফুলের মতন সুন্দর কচি কচি মুখের গন্ধের মেয়ে নিয়ে বুড়ো বয়সে হাটাহাঁটি। কিন্তু এমনটা না হয়ে বুঝি তার বাবার উপায়ও ছিল না। আর এই গোপেন রায়। যূথীয়ের বর। বাপের একমাত্র সন্তান। অঢেল টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি হাতে এসেছে। টাকা দিয়ে কত ভাল ভাল কাজ করতে পারত। বড় রকমের কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে নামতে পারত। নিজের গাঁয়ে থেকে চাষবাস নিয়ে নানারকম একসপেরিমেন্ট করতে পারত। কিছুই হল না। ঐযে—তোমার সব কেড়ে নেব চিঠি আসছে। ভয় দেখাচ্ছে! ভদ্রলোকের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। এখন হুইস্কির বোতল ছাড়া কিছু চিনছে না। আর সুযোগ বুঝে রোজ শাড়ি-গয়না হাবিজাবি কসমেটিকস কিনে গিন্নীটিও এন্তার টাকা নষ্ট করছে। হুঃ, এরা এভাবে টাকা ওড়ায়! আর ওদিকে—বাবার বন্ধু নৃপেন্দ্রদার মুখটা সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জুর মনে পড়ে যায়। উপোস থাকার অবস্থা ওদের। তা না হলে এত ভাল দেখতে—এমন বিউটিফুল ফিগার কুন্দর। ওকে কিনা পাঠাচ্ছে রাণাঘাটের কোন স্টেশনারী দোকানে চাকরি করতে। রঞ্জুদের বালিগঞ্জের 'অজন্তা' 'ইলোরা' স্টোর্সের মতন ফ্যাশানেবল কাউন্টার হলেও বরং একটা কথা ছিল—রাণাঘাট! ভাবতেও বিচ্ছিরি লাগে।

যূথীয়ের হাসি থামতে গোপেনদা পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার বের করল। এই প্রথম যূথীয়ের বরকে সিগারেট ধরাতে দেখল রঞ্জু। কিং সাইজ ডান-হিল। ভীষণ লোভ হল তার। এবং এটাও সে লক্ষ্য করল লাইটার জেলে গোপেন রায় যখন সিগারেট ধরাচ্ছে—যূথী এদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে। রঞ্জু তক্ষুনি চোখটা ফিরিয়ে নিল। মুখটা লাল হয়ে উঠল তার। অর্থাৎ রঞ্জু যে স্মোক করে যূথীয়ের ভাল জানা আছে। সেদিন চৌরঙ্গীর একটা রেস্তোরাঁয় যূথীয়ের সামনে রঞ্জু সিগারেট খেয়েছিল। যূথী নিজের পয়সায় বয়কে দিয়ে রঞ্জুর জন্য এক প্যাকেট উইলস কিনে এনেছিল। রঞ্জুকে এখন সিগারেট অফার করার জন্য যূথী ওর বরকে হঠাৎ বলে বসবে কিনা কে জানে। যে জন্য অস্বস্তিবোধ করতে লাগল রঞ্জু। মাইডিয়ার লোক গোপেন রায় সন্দেহ নেই। রঞ্জুর সঙ্গে খোলামেলা মন দিয়ে কথা বলতেও ভালবাসছে। কাল বিকেল থেকে তো সে দেখছে। তা হলেও ভদ্রলোক বয়সে অনেক বড়। ওঁর দেওয়া সিগারেট হাত পেতে নেওয়া বা সিগারেট ধরিয়ে ওঁর সামনেই সেটা টানা—চিন্তা করতেও তার কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল।

ভাগ্যিস যূথী কিছু বলল না। রঞ্জু বেঁচে গেল। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গোপেন রায় একটু ঢিলে হয়ে বসে রঞ্জুর চোখের দিকে তাকাল। বলল, বুঝলে রঞ্জু, কাল বিকেলে যূথীয়ের সঙ্গে তুমি যখন রিকসা থেকে নামলে—দেখে আমার এই জন্যই এত ভাল লাগল। ভাবলাম যূথীয়ের বয়-ফ্রেণ্ড—একটি ইয়ংম্যানকে কাছে পেলাম। এবার খুব হৈ-হৈ করে তিনজনে ক'টা দিন কাটান যাবে। এবং আমোদস্ফূর্তি করতে গিয়ে আমরা কোনোরকম রাখঢাখি ঢাকাঢাকির ধার ধারব না। এনজয়মেন্ট কাকে বলে আমরা দেখিয়ে দেব। একা আমাতে ও যূথীয়েতে যেন কেমন জমছিল না। তুমি এসে পড়াতে এখন সার্কিট পূর্ণ হল। হা-হা...টেনে টেনে হাসল গোপেন রায়।

রঞ্জু অল্প হাসল। একটু ইতস্তত করল। তারপর কথাটা বলে ফেলল। বলার জন্য কিছুক্ষণ ধরে সে উসখুস করছিল।

—আপনি প্রোটেকশন নিন। পুলিশকে খবর দিন। বেনামী চিঠিগুলো ওদের দেখান দরকার। (ক্রমশঃ)
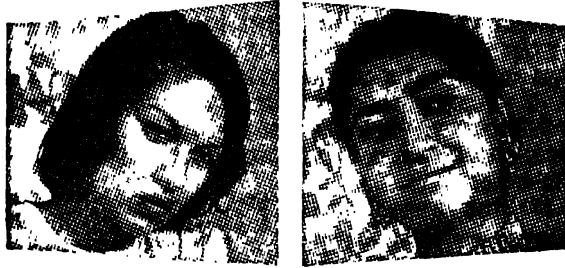
টেনিস কোর্টে টাকার খনি!

একটি খেলায় জিতেই পাঁচ লক্ষ ডলার উপার্জন। এক-একটি ডলারের দাম টাকার অংকে সাত টাকার কিছু বেশি। গাণিতিক হিসেবে একদিনের আসর মাৎ করে দিতে পারলেই পঁয়ত্রিশ লক্ষরও বেশি টাকা পকেটস্থ হয়ে যায়। পেশাদারী ক্রীড়ার এই স্বর্ণযুগে জাত খেলোয়াড়দের সামনে তাঁদের অর্থনৈতিক ভাগ্য গড়ার সুযোগ যে কতো উদার হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়!

খেলা আজ নিছক আনন্দের উপকরণ নয়। ব্যক্তিবিশেষের কাছে জীবিকা অর্জনের এক সহায়ক উপায়। তবে এ পথে সাফল্য লাভ করতে হলে ক্রীড়াগত দক্ষতার ধার ও ভার, দুই-ই বাড়াতে হবে। যার দক্ষতা বেশি অর্থভাগ্য তার ততোই সুপ্রসন্ন।

পেশাদারী ক্রীড়ার প্রচলন ঘটেছে অনেক দিন। কিন্তু সে মহলে এমন অপরিমিত অর্থের লেন-দেন হোত না ক'বছর আগেও। দিন যতো এগোচ্ছে অবাধ বন্যার মতো অর্থস্রোতও পেশাদারী ক্রীড়াঙ্গনগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাহুবলের সংগতি যার আছে, অর্থ প্রবাহের গতিপথকে সে নিজের সংগ্রহশালার দিকে ঘুরিয়ে নিতে পারছে। খেলছে, জিতছে। মাঠ থেকে মোটা অংকের মুনাফা তুলে নিজের ভবিষ্যত নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করে রাখতে পারছে। পেশাদারী ক্রীড়ার এই রমরম অবস্থা জাত খেলোয়াড়দের জীবনে যে এক আশীর্বাদ স্বরূপ, তাতে আর সন্দেহ কি!

হরেক রকম খেলাই পেশাদারী ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। তবে টাকার খনির সন্ধান পেতে হলে মূলতঃ মুষ্টিযুদ্ধের রিংয়ে, ফুটবল মাঠে, গলফ ও মোটর রেসিংয়ের সীমানায় এবং অধুনা টেনিস কোর্টের দিকে নজর ফেরাতে হয়। বক্সিং, গলফ, ফুটবল রেসিংয়ে মোটা টাকার খেলা অনেক দিন ধরেই চলে আসছিল। ওদের পদাংক অনুসরণে টেনিসও সম্প্রতি বড় বড় পায়ে এগিয়ে আসছে! একটি খেলাতে জিতে পাঁচ লক্ষ ডলার উপার্জনের যে দৃষ্টান্তের কথা আগে বলেছি, সেটি হলো টেনিস কোর্টেরই এক অত্যাধুনিক নজীর। এ নজীর অনন্যও বটে। যেহেতু একটি ম্যাচে জিতে একজন টেনিস খেলোয়াড় এতো টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে কখনো পান নি। তবে পালের হাওয়া যে ভাবে বইছে তাতে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে এ রেকর্ডও বুঝি অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। সেদিন নামমাত্র একটি খেলাতে জিতে কেউ যদি আরও মোটা

জিমি কোনরস

অংকের পুরস্কার পায় তাহলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

একটি খেলায় জিতে, এক দিনের কর্মকাণ্ডের পুণ্যে ওই পাঁচ লক্ষ ডলার উপার্জন করেছেন যিনি তাঁর নাম জিমি কোনরস্। বাইশ বছরের মার্কিন তরুণ এই কোনরসই হলেন এই মুহূর্তে স্বীকৃত মতে বিশ্বের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড়।

জিমি কোনরস গত বছরে উইম্বলেডন, ফরেস্ট হিলস ও অস্ট্রেলীয় টেনিস প্রতিযোগিতা জয় করেছিলেন। ফরাসী টেনিস তাঁকে খেলতে দেওয়া হয়নি। ফলে একই বছরে বিশ্বের সেরা চারটে প্রতিযোগিতা জিতে টেনিসে গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম পাওয়ার অধিকারে তিনি বঞ্চিত থেকে গেছেন। তবুও গত বছরের হিসেবে তিনিই যে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে অনেকেই ছিলেন নিঃসন্দেহ। শুধু সন্দেহবাতিকের দল প্রশ্ন তুলেছিল যে প্রাক্তন উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্বকে হারাতে না পারলে কোনরস অবিসম্বাদী নায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না।

গত বছরে টেনিসের বড় বড় আসরে কোনরস ও নিউকম্বের সাক্ষাতকার ঘটে নি। কারণ কোনরসের মুখোমুখি হওয়ার আগেই অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে নিউকম্ব হেরে যাচ্ছিলেন। তিন-তিনটি বড় প্রতিযোগিতা জয়ের পথে নিউকম্বকে সামনে না পাওয়ায় কোনরসকেও আক্ষেপে বলতে হয়েছে "কি করে বোঝাই যে আমি খেলোয়াড় হিসেবে নিউকম্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। নিউকম্বকে সামনে পেলে না হয় এই প্রশ্নের ফয়সালা করে নিতাম। কিন্তু নিউকম্ব যে সামনে এলেনই না!"

কোনরস না নিউকম্ব, কে বড় বা ভাল? এই প্রশ্ন ঘিরে দু পক্ষের সমর্থক মহলে বাকযুদ্ধ জমে ওঠার মুখে এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে অস্ট্রেলীয় টেনিসের ফাইনালে দু জনের মুখোমুখি মোলাকাত ঘটলে জন নিউকম্ব জিমি কোনরসকে হারিয়ে দেন। কিন্তু তাতেও কোনরস সমর্থকরা সন্তুষ্ট না হয়ে ফিরতি ম্যাচের প্রস্তাব তুলতে মার্কিন মুলুকে লাস ভেগাসে সিজার্স প্যালেসে আরও একটি খেলার ব্যবস্থা হয়।

সিজার্স প্যালেসে আয়োজিত এই খেলার নামকরণ হয়েছিল 'টেনিসে হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপ।' সর্ত ছিল, যিনি জিতবেন বিশ্বশ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি পাবেন তিনিই। সেই সংগে পাঁচ লক্ষ ডলার পুরস্কার বাবদ। সিজার্স প্যালেসের এই খেলায় (২৬শে এপ্রিল) কোনরস জেতেন ৬—৩, ৪—৬, ৬—২, ৬—৪ সেটে। সিজার্স প্যালেসের কোর্ট ছিল অপেক্ষাকৃত মন্থর। নিউকম্ব এই জাতীয় কোর্টে খেলতে তেমন অভ্যস্ত নন। তবুও খেলা শেষে কোনরসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে

মিউকম্বের দ্বিধা জাগে নি। প্রকাশ্যে বলেছেন এরপর আর কারুরও মনে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়—জিমিই বিশ্বের পয়লা নম্বর খেলোয়াড়।' হার হলেও নিউকম্ব টেনিসের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপে অংশ নেওয়ার দরুন তিন লক্ষ ডলার পেয়েছেন।

বিজয়ীর পাঁচ লক্ষ, বিজিতের তিন লক্ষ। তাছাড়া এই ম্যাচের সংগঠক কোনরসের ম্যানেজার বিল রিওরডনও এই উপলক্ষে লাখ তিনেক ডলার কামিয়ে নিয়েছেন। বাজীর অঙ্ক ছেড়ে খেলাটি ঘিরে বিশ্বের দুই শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়ের মর্যাদায় যে প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল সেটিও ততোধিক হেভি। সুতরাং সব মিলিয়ে সিজার্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত কোনরস বনাম জন নিউকম্বের খেলাটিকে যদি টেনিসের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপ আখ্যায় অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো বাড়াবাড়ি করা হয়নি।

সিজার্স প্যালেসে উইম্বলেডনের তিনবারের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান ত্রিশ বছর বয়স্ক জন নিউকম্বকে হারিয়ে জিমি কোনরস সংশয়াতীত স্বীকৃতিতে বিশ্বের পয়লা নম্বর খেলোয়াড়ের মর্যাদা পেয়েছেন। কিন্তু সিজার্স প্যালেসের কোর্টে কোনরস-নিউকম্বের সাক্ষাৎকারের আগেই সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ মহল কোনরসের শীর্ষ সংজ্ঞা মেনে নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে টেনিস বিষয়ক আন্তর্জাতিক পত্রিকা 'ওয়ার্ল্ড টেনিস'-এর প্রামাণ্য মতামতই উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৪ সালের ফলাফলের সবিস্তার বিশ্লেষণ করে ওয়ার্ল্ড টেনিস খেলোয়াড়দের গুণানুসারে যে ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করেছে সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে জিমি কোনরসের নাম। পরের কটি স্থান পর্যায়ক্রমে যাঁদের অধিকারে আছে তাঁরা হলেন: আর্জেন্টিনার গিলেরমো ভিলাস, জন নিউকম্ব, সুইডেনের বর্ন বর্গ, অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়াল, রুমানিয়ার ইলি নাসতাসে, অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার, আমেরিকার স্ট্যান স্মিথ, নিগ্রো আর্থার অ্যাস ও নেদারল্যান্ডের টম ওকার।

ওয়ার্ল্ড টেনিস-এর হিসেব অনুযায়ী গত বছরে জিমি কোনরস কুড়িটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চোদ্দটিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। বিশ্বের প্রথম দশজনের মধ্যে ছজনের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কোর্টে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। পাঁচজনকে কোনরস হারিয়েছিলেন এবং নিজে হেরেছিলেন একমাত্র স্ট্যান স্মিথের কাছে। ওয়ার্ল্ড টেনিস-এর ক্রমপর্যায় তালিকা অনুসারে ১৯৭৩-এ কোনরসের স্বীকৃতি ছিল নবম শ্রেষ্ঠের। কিন্তু একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি সিঁড়ি ভেঙে একেবারে চুড়োয় এসে দাঁড়িয়েছেন।

দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দেহের ওজন দেড়শ পাউন্ড। শক্ত সমর্থ গাঁট্টাগোট্টা শরীর নিয়ে জিমি কোনরস কোর্টের মধ্যে ক্ষিপ্র গতিতে নড়াচড়া করতে পারেন। শারীরিক সক্ষমতা সম্পর্কে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। তাছাড়া খেলায় মনঃসংযোগের ক্ষমতাও তাঁর অপরিসীম। ন্যাটা খেলোয়াড়। সজোরে ব্যাকহ্যান্ডে মারার সময় দুটি হাত দিয়েই টেনিস র‍্যাকেটটি বাগিয়ে ধরেন। ব্যাকহ্যান্ড মারেতে কোনরস এবং প্রাক্তন পেশাদার প্যাঞ্চো সেগুরা ও উইম্বলেডনের মহিলা চ্যাম্পিয়ন ক্রিস ইভার্ট এই তিনজনের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেহেতু টেনিস খেলোয়াড় কোনরসকে হাতে গড়ে মানুষ করেছেন ওই প্যাঞ্চো সেগুরা। সেগুরার খেলার ধারা শাকরেদ কোনরসের ক্রীড়ারীতির মধ্যে ধরা থাকবে বৈকি। আর ক্রিস ইভার্ট হলেন জিমির বাগদত্তা। ক্রিস আর জিমির আচরণে পারস্পরিক প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ঘটা তাই বিচিত্র নয়।

বাগদত্তা ক্রিস ইভার্টের সঙ্গে জিমির রোমান্স ক্রমশই ঘন হয়ে উঠছে। একসময় গুজব ছড়িয়েছিল যে ওঁদের বিয়ে বুঝি ভেঙে গেল। কিন্তু ভঞ্জনের সব গুজবকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে ওঁরা দুজনে আবার দুজনের কাছাকাছি চলে এসেছেন।

মাস চারেক ইচ্ছে করেই ওঁরা দূরে দূরে থেকেছেন। দেখা সাক্ষাতে বাক্যালাপও হয়নি। বিয়ে ভাঙার গুজব ছড়িয়েছিল এইসব দৃষ্টান্ত নজরে আসার পর। কিন্তু এখন জানা গেছে যে চার মাসের বিরহ ওঁদের পুরোপুরি সাজানো ব্যাপার। দূরে থাকতে কেমন লাগে বিরহ যন্ত্রণা কতো তীক্ষ্ণ! সাময়িক ছাড়াছাড়ির পর একে অন্যকে ভুল বোঝে কিনা এসব তথ্য বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যে জিমি ও ইভার্ট পরস্পরের কাছ থেকে মতলব করেই চারমাসের জন্যে সরে থেকেছেন। এসব নিতান্তই তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের লোক যুগলের গোপন পরিকল্পনা কথা টের পান নি। না পেয়ে ওঁদের ব্যাপারকে ভুলভাবে বিয়ে ভাঙার গুজব ছড়িয়েছে।

না ভাঙে নি কিছুই। বিয়ের কথা পাকা হয়েই আছে। জিমির দেওয়া অঙ্গুরীয় ক্রিসের অনামিকায়। ক্রিসের দেওয়া সরু সোনার চেন জিমির গলায় এখনও ঝলমল করছে। দুজনে হঠাৎ এক শহরে গিয়ে পড়লে সব সময়ই ওঁদের একত্রে কাটে। শহরতলীতে বেড়াতে যান। কেনাকাটা করেন। পার্টিতে নাচের সঙ্গী দুজনেই দুজনের। কথার ফাঁকে টেনিসের আলোচনাও চলে। মাঝে মাঝে দুজনে মিক্সড ডাবলস টেনিসও খেলেন। তবে সে খেলা নয় হালকা মেজাজেই। জিমি মিকসড ডাবলস খেলার ওপর এখনও গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন নি। তরুণীদের উদ্দেশ্যে সজোরে বল হিট করতে জিমির পৌরুষে যেন বাধো বাধো ঠেকে।

তবে জিমি ও ক্রিস দুজনেই এখন তাঁদের খেলোয়াড় জীবনের মধ্যাহ্নে। খেলার টানেই দুজনেই এই জেট যুগে সারা বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছেন। পেশাদারী খেলার ক্ষেত্রে মেয়ে ও পুরুষের জন্যে স্বতন্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় দুনিয়ার নানা প্রান্তে। এইসব প্রতিযোগিতায় চাহিদা মেটাতে জিমি যখন ছোটেন উত্তর দিক তখনই হয়তো ক্রিসকে পা বাড়াতে হয় দক্ষিণের দিকে। কাজেই খেলার টানে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করার ফাঁকে তাঁরা দুজনে একই শহরে একত্রে হাজির থাকার ফুরসৎ বড় একটা পান না। সান্নিধ্যের অভাব মেটাতে দূরভাষে বাক্য ও প্রেম বিনিময় করেই ওঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

তবে আপাততঃ ওঁরা যতো দূরেই সরে থাকুন যতোই যত্রতত্র ছোটাছুটি করুন না কেন বিয়ের পর ওঁরা নিশ্চয়ই অনন্য জুটি হিসেবে টেনিসে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। টেনিস কোর্টে দুজনে দুজনের পার্টনার না হওয়া সত্ত্বেও। কারণ দুজনেই আজ নিজেদের বিভাগে বিশ্বের সেরা। এমন মিলন জীবনসঙ্গী হিসেবে এমন জোট অভূতপূর্বও বটে। মিক্সড ডাবলসের পার্টনার হিসেবে না খেললেও বৃহত্তর মূল্যায়ণে ওঁরাই টেনিসের আদর্শ জুটি। শুধু টেনিস খেলেই গত বছরে ওঁরা এক একজন কতো টাকা উপার্জন করেছেন জানেন? জিমি পৌনে তিন আর ক্রিস প্রায় দু লক্ষ ডলারের মতো। তাছাড়া বিবিধ অনুষ্ঠানে এবং ব্যবসায়ী সংস্থার প্রচার পরিকল্পনায় অংশ নেওয়ার সুবাদে তাঁদের অর্থভাগ্য আরও সুপ্রসন্নও হয়েছে। তবে সেসব হিসাব একান্তই গোপনীয়।

বর্ষীয়ান এবং উঠতি নানা বয়সের খেলোয়াড়রা আজ আন্তর্জাতিক টেনিসের আসর মাতিয়ে রাখলেও ওই আসরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র হলেন জিমি কোনরস। বড় মেজাজী খেলোয়াড়। এই মেজাজের অভিব্যক্তি মাঝে মাঝে বদমেজাজের কোঠায়ও গিয়ে পড়ে। কদিন আগেও রুমানিয়ার ইলি নাসতাসেই টেনিস মহলে সবচেয়ে বদমেজাজী বলে চিহ্নিত ছিলেন। তাঁকে বলা হোত 'ন্যাসটি' নাসতাসে। কিন্তু জিমি নাকি নাসতাসেকেও ছাপিয়ে গেছেন।

খেলা পরিচালনার সময় লাইন্সম্যানের সিদ্ধান্তে ভুলচুকের গন্ধ পেলেই জিমি ফুঁসিয়ে ওঠেন। গ্যালারি থেকে কোনো দর্শক বিরূপ মন্তব্য করলে জিমির মাথায় খুন চেপে যায়। একবার তো তিনি কোর্টে নিজের র‍্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদ্রূপকারী দর্শকটিকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে গ্যালারি পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করেছিলেন। খেলতে খেলতে বিতর্কও করেন। নিজের খেলায় ভুল হলে উচ্চস্বরে চিৎকার জুড়ে নিজেকেই যা তা বলে ওঠেন। দর্শকরা তাঁর এইসব মুদ্রাদোষকে ভাল চোখে দেখেও না। তারা চুটকি মন্তব্য করলে পাল্টা মন্তব্য ছুঁড়তে জিমিও কসুর করেন না।

গত ফেব্রুয়ারীতে বর্ষীয়ান রড লেভারের সঙ্গে জিমি কোনরসের যে খেলা হয়েছিল

তাই প্রাক্তন লেভার কোর্টে আসা মাত্রই সমবেত দর্শকেরা একযোগে দাঁড়িয়ে উঠে প্রাণখোলা উচ্ছ্বাসে স্বাগত জানান। চার-বারের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন এবং টেনিসের গ্র্যান্ড স্ল্যামের কীর্তি গড়ার সম্মান এই রড লেভার টেনিসে এক ইতিহাস। চোখের সামনে ইতিহাসের সেই জলজ্যান্ত অধ্যায়কে জীবন্ত দেখতে পেয়ে দর্শকেরা স্বভাবতই আবেগে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দর্শকদের এই উচ্ছ্বাসকে জিমি ভাল চোখে দেখতে পারেননি। যতোক্ষণ দর্শকেরা লেভারকে ঘিরে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন ততোক্ষণই জিমি দর্শকদের গাল পেড়ে বকে চলেছিলেন : ঢং দেখে বাঁচি না। একটা ফসিলকে নিয়ে ওদের মাতামাতি। কেন? আমিই বা কম কিসে! আর যেমন বলা তেমনি কাজ। বকতে বকতে জিমি ওই খেলায় লেভারকে ৬-৪ ৬-২ ৩-৬ ৭-৫ সেটে হারিয়েও দিলেন।

অতোবড় একজন খেলোয়াড় তাঁর মেজাজ এমন বিসদৃশ কেন? এই কেনর জবাব খুঁজতে গিয়ে বাগদত্তা ক্রিস ইভার্ট বলেছেন যে জিমির দুটি সত্তা আছে। কোর্টের বাইরে সে ভদ্র বিনয়ী মেলামেশায় সহজ। কোর্টের বাইরের জিমি সম্পর্কে কারুরই কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু কোর্টে নামলেই জিমি অন্য মূর্তি ধরে বসে। তখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান জিততেই হবে। প্রতিপক্ষকে হার মানাতে হবে। এই চিন্তাতেই সে পাগল হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিজের পছন্দমাফিক না হলে তার পাগলামী বেড়ে যায়। তবে ক্রিসের উপলব্ধি : জিমির পাগলামী যতো বাড়ে ততোই কিন্তু সে ভাল খেলে।'

ক্রিসের উপলব্ধি যে খাঁটি জিমির নিজের সওয়ালেও তা প্রমাণিত। জিমি বলেন বলটি আমার কোর্টে ফিরে আসুক এ আমি চাই না। যতো জোরে পারি ওটিকে পেটাই। বল পিটিয়েই আমি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিরোধ দুরন্ত করে দিই। আমি জানি দর্শকেরা চায় আমি হেরে যাই। তাদের চাহিদা মিটছে না বলেই তারা আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তা তারা যতোই আমার বিরোধিতা করুন না কেন তাদের বিরোধিতায় আমি আরও কৃতসংকল্প হয়ে আরও ভাল খেলায় প্রেরণা পাই। দিনে দিনে প্রমাণিত হয়েছে যে দর্শকেরা মুখে মুখে আমার সম্বন্ধে যাই বলুক মনে মনে কিন্তু আমার খেলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই তো আমার খেলা দেখতে ওরা কাতারে কাতারে এসে কোর্টের ধারে জড়ো হয়।'

নিজের মানসিকতায় এবং অনুসৃত রীতিতেও জিমি কোনরস এক স্বতন্ত্র চরিত্র। বিশ্বের প্রথম সারির সব পেশাদার খেলোয়াড়ই আজ কোনো না কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত। কেউ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ টেনিসে, কেউ বা পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। শুধু নামী খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র জিমি কোনরসই কোনো দলে নেই। নিজের খেলার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেন টেনিস সংগঠক রিয়রডানের সহযোগিতায়। ডবলিউ সি টি এবং এ টি পি দুপক্ষই জিমিকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত করায় আগ্রহী। কিন্তু জিমি কোনো ফাঁদেই ধরা দেন নি। ধরা দেওয়া তো দূরের কথা ওই দুটি সংস্থার সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি লেগেই আছে। এ টি পির বিরুদ্ধে জিমি চার কোটি ডলারের মামলা জুড়ে দিয়েছেন এই অভিযোগে যে চাপ দিয়ে এ টি পি তাঁকে ফরাসী টেনিসে খেলতে দেয় নি। ওদিকে এ টি পি-র ডাইরেক্টর জ্যাক ক্রেমারও মানহানির অভিযোগ তুলে জিমি কোনরসের বিরুদ্ধে তিন কোটি ডলারের মামলা দায়ের করেছেন।

আমেরিকার টেনিস নিয়ামক সংস্থার সঙ্গেও জিমির ঝগড়া। মতান্তরের সূত্রে জিমি কোনরস দলগত টেনিস ডেভিস কাপে স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাঁর অভিযোগ আমেরিকার ডেভিস কাপ দল নির্বাচন ন্যায়পথে হয় না।

ডবলিউ সি টি এ টি পি এবং মার্কিন টেনিস নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে ঝগড়া করার অর্থই হল জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ বাধানো। কিন্তু এমন আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করেও জিমি কোনরস নিজেকে জিইয়ে রাখতে পেরেছেন ভালভাবেই। তার একমাত্র কারণ তাঁর ক্রীড়াদক্ষতা। জিমির ক্রীড়াগত নৈপুণ্য সম্পর্কে সবাই নিঃসন্দেহ। তাই মিত্ররা তো বটেই, শত্রুরা পর্যন্ত তাঁকে ফেলতে পারেন না। উলটে তাঁকে দলে ভেড়ানোর জন্যে বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করতে প্রতিনিয়তই তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন।

ডবলিউ সি টি ও এ টি পির সংশ্লিষ্ট বর্জিত জিমি কোনরস একাই এক প্রতিষ্ঠান। তাঁর খেলার অনুশীলনের এবং বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন টেনিসের একক সংগঠক জিমির ম্যানেজার বিল রিয়রডন।

জিমি কোনরস টেনিস খেলোয়াড় হয়েছেন জননীর চেষ্টায়। মাও টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। টেনিসে শিক্ষকতার কাজও করেছেন। কিন্তু বাবা জেমস টেনিস অনুরাগী নন। জনকের ইচ্ছা যাই থাকুক না কেন, জননীই পুত্রের হাতে একেবারে কৈশোরেই টেনিস র‍্যাকেট তুলে দিয়ে স্বহস্তে তাঁকে গড়ে পিটে মানুষ করেন। মায়ের সঙ্গে জিমির সম্পর্ক এখনও নিবিড়। জিমির বিদেশে খেলতে গেলে সবার আগে সঙ্গ নেন তিনিই।

টেনিসে প্রথম পাঠ মায়ের কাছেই। তারপর প্রাক্তন পেশাদার পাঞ্চো সেগুরা জিমির শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। বয়স যখন ষোল রেকর্ডকোর্ড হাইস্কুলের পড়ুয়া হিসেবে জিমি সেগুরার নজরে আসেন। সেগুরা তখন বিভারলি হিলস টেনিস ক্লাবের প্রশিক্ষক। এক পলকের দৃষ্টিতেই সেগুরা জিমির সম্ভাবনা আবিষ্কার করে জিমিকে তাঁর ক্লাবে নিয়ে যান। সেই থেকে জিমি কোনরস ও পাঞ্চো সেগুরা অচ্ছেদ্য গাঁটছড়ায় জড়িয়ে রয়েছেন।

এতটুকু বাচ্চা মেজাজও পরিপাটি নয়, এই সব কথা বলে অন্যেরা যখন জিমি কোনরসকে তাচ্ছিল্য ভরে উপেক্ষা করতে চেয়েছে তখনই কিন্তু সেগুরা জিমির মধ্যে ভাবীকাল চ্যাম্পিয়ানের সন্ধান পেতে ভুল করেন নি। কথায় বলে রতনে রতন চেনে। সেগুরার উপলব্ধি যেন সেই কথারই একটা প্রমাণ।

১৯৭৪ সালে স্ট্যান স্মিথ ইলি নাসতাসে জন নিউকম্ব প্রমুখকে বিশেষজ্ঞরা যখন সম্ভাব্য উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়নরূপে মেনে নিতে তৈরী ছিলেন ঠিক তখনই একমাত্র সেগুরাই বড় গলায় বলেছিলেন যে এবারে উইম্বলেডন জয় করবেন জিমি কোনরস। সেগুরা যে অহেতুক জাঁক করেন নি, তা বলাই বাহুল্য। সেগুরা জিমিকে শুধু টেনিসে উচ্চতর পাঠ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চান নি; তাঁর মেজাজের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি জেনে সঠিক পথে পরিচালিত করার সংকল্পে সব ক্ষণই শিষ্য তাঁকে পুত্রস্নেহে আগলেও রেখেছেন। সেগুরার প্রতি জিমির কৃতজ্ঞতারও শেষ নেই। প্রকাশ্যেই বলেন 'আমি তো ওঁর হাতে গড়া। ঠিক সময়ে আমি যে উপযুক্ত শিক্ষকের সান্নিধ্য পেয়েছি, এটাই পরম ভাগ্য।'

উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনীর সন্ধানও যথাসময়ে পেয়েছেন বলে জিমি আজ অকপটে : 'আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ফাউন্ড দি রাইট গার্ল।' বিয়েটা কবে হচ্ছে? কৌতূহলী অনুরাগীর প্রশ্নটির কিন্তু সরাসরি জবাব এখনও পাওয়া যায় নি। উত্তরে জিমি বলেছেন, 'ঠিক সময়েই আমরা সংসার গুছিয়ে নেবো। তাড়াতাড়ির কি আছে?'

যুগলের হয়ত তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু অনুরাগী মহলের যেন আর তর সইছে না। বিয়ে ভাঙার গুজব শুনে তাঁরা একদিন বিচলিত বোধ করেছিলেন। তাই যত শীঘ্র চার হাত এক হয়ে যায় ততই বুঝি ওঁদের স্বস্তি। শুভকাজ সম্পন্ন হলেই হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পাবেন তাঁরা।

অজয় বসু

দর্শক

জাতীয় জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতা

পুণায় জাতীয় জুনিয়র হকি প্রতি-যোগিতার ফাইনালে কর্ণাটক ৩—০ গোলে ত বছরের চ্যাম্পিয়ন ভূপালকে শোচনীয়-ভাবে হারিয়েছে। ফাইনালের তিনটি গোলই প্রথমার্ধের খেলায় হয়েছিল। কর্ণাটকের কে এই জয় মোটেই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত নয়। তারা রীতিমত ল খেলে জিতেছে। কর্ণাটকের আরও াহাদুরী যে তারা একই দিনে সেমি-াইনাল এবং ফাইনাল খেলেছিল। অপর কে ভূপাল পুরো একদিন বিশ্রাম পেয়েছিল।

কোয়ার্টার ফাইনালে কর্ণাটক ৩—০ ালে কেরল, ভূপাল ১—০ গোলে গ্রামীণ কাদশ, বোম্বাই ১—০ গোলে বাংলা এবং ল্লী ১—০ গোলে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে পাল ৩—১ গোলে বোম্বাই এবং কর্ণাটক —০ গোলে দিল্লীকে পরাজিত করে াইনালে উঠেছিল।

এবারের প্রতিযোগিতায় যোগদান-ী দলগুলি চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে থমে লীগ প্রথায় খেলেছিল। লীগের েয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ য় এই ৮টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে ঠেছিল: এ গ্রুপ থেকে গতবারের বিজয়ী পাল ও বাংলা, বি গ্রুপ থেকে বোম্বাই গ্রামীণ একাদশ, সি গ্রুপ থেকে মহারাষ্ট্র কেরল এবং ডি গ্রুপ থেকে কর্ণাটক ও ল্লী।

বাংলার খেলা

এ গ্রুপের লীগের খেলায় বাংলা ৩—২ ালে সার্ভিসেস এবং ৪—০ গোলে গুজ-টকে হারিয়ে ১—৪ গোলে ভূপালের কাছে েরে যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা —১ গোলে বোম্বাইয়ের কাছে পরাজিত ।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা শে মে থেকে শুরু হয়েছে। মোহন-ান ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং নও এই লীগ খেলার আসরে নামেনি। ল খেলা মোটেই জমেনি। গত এক তাহে (মে ২৬—৩১) মোট ১৫টি খেলা য়েছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে: জয়-জয়ের নিষ্পত্তি ১০ এবং খেলা ড্র ৫। শে মে তারিখে ঝড়-বৃষ্টির জন্যে মাঝপথে সব খেলা ভণ্ডুল হয়ে যায়। এ বছরের প্রথম বিভাগের লীগে ২২টি দল খেলছে। ১৯৭৪ সালের দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম বিভাগে এই প্রথম খেলছে। অনেক লড়াই করে শেষ পর্যন্ত কোর্টের নির্দেশে এক বছর বাদে বালী প্রতিভা প্রথম বিভাগের লীগে খেলবার অধিকার লাভ করেছে। প্রথম বিভাগের নবাগত চন্দ্র মেমোরিয়াল তাদের প্রথম খেলায় ৩—০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে ভ্রাতৃ সঙ্ঘের বিপক্ষে তাদের দ্বিতীয় খেলাটি ১—১ গোলে ড্র করেছে। গত বছরের রানার্স-আপ এরিয়ান্স দুটো খেলায় ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা প্রথম খেলায় কুমারটুলিকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে গত বছরের লীগ তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী পুলিশের বিপক্ষে দ্বিতীয় খেলাটি শূন্য গোলে ড্র করেছে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে গত ২৬শে মে। এই দিন প্রথম বিভাগের নবাগত চন্দ্র মেমোরিয়াল দলের খেলোয়াড়দের প্রণাম জানিয়ে মাঠে নামতে দেখা যাচ্ছে।

উইকেটকিপিংয়ে বিশ্ব রেকর্ড

মিডলসেকসের উইকেটকিপার জন মারে এবার উইকেটকিপিংয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। মে মাসেই তিনি দুবার আগের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙালেন। গত ৩১শে মে তারিখে কাউন্টি লীগ ক্রিকেট খেলার আসরে মারে দলের বিপক্ষে তিনটি 'ক্যাচ' ধরার সূত্রে জন মারে খেলোয়াড়-জীবনে সর্বাধিক 'ডিসমিসাল'-এর বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। তাঁর মোট 'ডিসমিসাল' সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৯৪।

এ বিষয়ে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড ছিল সারে কাউন্টি দলের উইকেটকিপার হার্বার্ট স্ট্রাডউইকের—মোট ডিসমিসাল ১৪৯৩। স্ট্রাডউইক ১৯৭০ সালে ৯০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

সাইকেল পোলো প্রতিযোগিতা

ক্যালকাটা ক্রিকেট এবং ফুটবল ক্লাব মাঠে আয়োজিত পূর্ব ভারত সাইকেল পোলো প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাজস্থান ওয়ান্ডারার্স ৮—৭ গোলে অন্ধ্র ইয়েলো দলকে পরাজিত করে। পাঁচটি চক্করের খেলায় ফলাফল সমান দাঁড়ায় (৭—৭ গোল)। ফলে সাডেন ডেথ প্রথা অবলম্বন করা হয় এবং রাজস্থান ওয়ান্ডারার্স দলের রণবজয় সিং জয়সূচক গোলটি দেন।

রাজ্য কাবাডি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কবাডি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টার্ণ রেল দল ২৩—১১ পয়েন্টে সাউথ ইস্টার্ণ রেল দলকে হারিয়ে উপর্যুপরি ১৩ বার পুরুষ বিভাগে খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

মার্চেন্টস্ সাইকেল পোলো প্রতিযোগিতা

বালীগঞ্জের ক্যালকাটা ক্রিকেট ও ফুট-বল ক্লাব মাঠে মার্চেন্টস কাপ সাইকেল পোলো প্রতিযোগিতার ফাইনালে ডানকান ব্রাদার্স ৮—৭ গোলে ম্যাকার্স দলকে পরা-জিত করে। খেলা ভাঙার এক সেকেণ্ড আগে ডানকান দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি দেন হাকিন্দর সিং।

শৈলেন [illegible]

[illegible] শৈলেন [illegible] খেলোয়াড় [illegible]। [illegible] বা পশ্চিমবঙ্গের বহু [illegible] শৈলেন ঘোষ নামটি [illegible] আজ্ঞাত [illegible] এই কারণে [illegible] মাঠে বিশেষত [illegible] মাঠে এখন [illegible] খেলোয়াড় নন।

কিন্তু তবু উয়াড়ীর শৈলেন ঘোষ নিঃশব্দ অধ্যেই মাঠের নায়ক। বাংলার হকি অঙ্গন থেকে যখন ঘরের ছেলেদের মুখগুলি অপসৃয়মান, সেই মুহূর্তে যে কটি মুষ্টিমেয় মানুষ বাংলার অস্তিত্ব জিইয়ে রাখবার সংকল্প নিয়েছেন, শৈলেন ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমার কাছে শৈলেনের পরিচয় আজ শুধুমাত্র একজন খেলোয়াড় হিসেবেই নয়, প্রকৃত একজন হকি-সংগঠনকরূপেও বটে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এন্টালীর মুখুজ্যে পরিবার এবং উয়াড়ীর শৈলেন ঘোষের মত দু-একজন লোক হকিতে না দেখলে এত দিনে বোধহয় কলকাতা মাঠ থেকে বাঙ্গালী খেলোয়াড় বিলুপ্ত হয়ে যেত। মুখুজ্যে পরিবারের মত শৈলেনেরও স্বপ্ন বাঙ্গালী ছেলেরা স্কুলে, কলেজে এবং তার বাইরে মন-প্রাণ দিয়ে হকি খেলুক এবং দেখিয়ে দিক, প্রমাণ করে দিক যে, ভেতো বাঙ্গালীও হকি খেলতে পারে। শৈলেন নিজে খেলেন হাফ ব্যাকে কিন্তু বাড়তি দায়িত্ব নেন দলের অন্য দশজন সহযোগীকে পরিচালনার। ক্ষেত্র বিশেষে দল পরিচালনা করতে অনেক সময় হয়ত নিজের ভূমিকা [illegible] করা হয়ে ওঠে না কিন্তু বিকল্প কোন রাস্তাও তো খোলা নেই শৈলেনের। নিজের খেলাটুকুই শুধু খেলে গেলে [illegible], পাশের এবং পেছনের সহযোগীদের [illegible] সতর্ক করবেন কে?

পরলোকগত পঙ্কজ গুপ্তের [illegible] এবং প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষক বাবা [illegible] ধন্য শৈলেন এখন প্রৌঢ়ত্বের [illegible] রাখার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। [illegible] [illegible] মাঠের [illegible] থেকে নিয়ে—আলগায় হয়ে পড়েন কিন্তু শৈলেনের রক্তে হকি বোধহয় প্রবহমান, তাই এক পাল আনকোরা ছেলে নিয়ে মেতে আছেন। যে কথা বলছিলাম ঃ শৈলেনের রক্তে হকি প্রবহমান। বাবা স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র ঘোষ এবং কাকা ভূপেশ ও ননী ঘোষ অবিভক্ত বাংলায় ঢাকার উয়াড়ীর ফুটবল, হকি, ক্রিকেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণায়, উৎসাহে শৈলেন শৈশবেই হকি ক্রিকেট খেলায় মেতে ওঠেন। পাগোজ স্কুল জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রবস্থায় শৈলেনের নিজেকে দলের অন্যতম হকি-ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে খুব বেশী কষ্ট হয় নি। কষ্ট হয় নি এই জন্য যে, খেলা শেখার ব্যাপারে শৈলেনের ছিল বিপুল নিষ্ঠা, অপরিমেয় আত্মপ্রত্যয়।

কলকাতার মাঠে হকি খেলছেন শৈলেন ঘোষ ১৯৫৪ সাল থেকে। গোড়ায় টাউন ক্লাবে। উয়াড়ীতে যোগ দেন পরের বছর ১৯৫৫-তে। ঐবছরই উয়াড়ী সিনিয়ার ডিভিসনে ওঠে। তার পর থেকে উয়াড়ী আর ছাড়েন নি। এখন উয়াড়ী এবং সেই বাঙ্গালী ছেলেদের নিয়ে হকি খেলাই ওঁর ধ্যানজ্ঞান। গোড়ায় ক্রিকেট খেলতেন ক্রিকেট ক্লাব অব চাকুরিয়ায় (১৯৫২)। পরবর্তী পর্বে পোর্ট কমিশনার্সে চাকরীর সূত্রে সর্বভারতীয় আন্তঃ রেলওয়ে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দিল্লীতেও খেলেছেন ১৯৫৪ সালে। গত বছর উয়াড়ী ঘরোয়া সি এ বি সিনিয়ার লীগে উঠল দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ কোঠায় শীর্ষস্থান অধিকারের সূত্রে। বলা বাহুল্য শৈলেন ছিলেন ঐ দলের অন্যতম খেলোয়াড়।

শৈলেন ঘোষ এখন আর শুধুমাত্র হকি বা ক্রিকেট খেলোয়াড়ই নন। দুটিরই রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি আজ রাজ্য হকি সংস্থার সহকারী সম্পাদক ঢাকার কাঠ বাঙ্গাল শৈলেন ঘোষ। সি এ বি'র ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন ইতিমধ্যে বছর দুই। বর্তমানে সি এ বি টুর্ণামেন্ট কমিটির অন্যতম সদস্য। ১৯৭৫ সালে ভূপালে আয়োজিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় শৈলেনের ওপরই অর্পিত হয়েছিল বাংলার ম্যানেজারের দায়িত্ব ১৯৭০ সালেও বাংলার জুনিয়ার দলের ম্যানেজার ছিলেন। জাতীয় জুনিয়র হকি আসরে—ঐ ভূপালেই।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

অনুশ্রী পাল

মফঃস্বল বাংলার মেয়েরাও যে ক্রমেই খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে—এবং সংকল্পে দৃঢ় হয়ে আত্মপ্রত্যয় নিয়েই এগিয়ে আসছে, তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন বর্ধমানের মেয়ে অনুশ্রী পাল। মফঃস্বল অঞ্চলে এমনিতে খেলাধুলোর সুযোগ-সুবিধা কলকাতার তুলনায় অনেক সীমিত। ওখানে ছেলেরাই উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পায় না, মেয়েদের তো কথাই নেই। উপরন্তু মেয়েদের বেলায় নানা রকম পারিবারিক ও সামাজিক বাধা নিষেধও কম নয়। এত রকম অসুবিধার প্রাচীর ডিঙিয়ে সর্বভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হওয়া কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। অনুশ্রী সেই বিরাট কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের অফিসার শ্রীদীপ্তি ঘোষ এই ক্রীড়া বিষয়ে আমাকে অনেক তথ্য দিয়েছেন। তার জন্য শ্রীঘোষকে ধন্যবাদ।

এ বছর ইম্ফলে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় শক্ত-সমর্থ পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে অনুশ্রী ডিসকাস নিক্ষেপে ২৬'৬৮ মিটার দূরত্ব স্পর্শ করে পশ্চিম বাংলার মেয়েদের ক্রীড়াযোগ্যতার এক অনন্য স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়। মফঃস্বল শহরের কোন মেয়ের পক্ষে এই কীর্তি রচনা কম গৌরবের কথা নয়। দীর্ঘাঙ্গী বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংশয় ও আশঙ্কা নিয়ে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত অনুশ্রী এই কঠিন পরীক্ষায় শিরদাঁড়া সোজা করেই দাঁড়িয়েছিল এবং তাই মাথা তার উঁচুই থেকে গেছে। ধন্যি মেয়ে অনুশ্রী পাল।

অনুশ্রী খেলাধুলোয় যেমন পড়াশোনাতেও তেমনি—প্রথম সারির ছাত্রী। বর্ধমান হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় থেকে ও এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থিনী। মা-বাবা দুজনেই ওর খেলাধুলোর প্রেরণার উৎস। বিশেষ করে মা—উনি বিজয়চাঁদ হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স। অনুশ্রী মাঠে এথলেটিকসে অনুশীলন করে। সাইক্লিংএও দক্ষ। তা ছাড়া বাস্কেট বলেও ক্রমেই বেশ পারদর্শিণী হয়ে উঠেছে। অবশ্য ছোটবেলা থেকে ওর এথলেটিকসেই বেশী ঝোঁক দেখা যায়। অনুশীলনে কখনও আন্তরিকতার অভাব দেখা যায় না। কারণ, অনুশ্রীর বিশ্বাস এথলেটিকসে অভ্যস্ত থাকলে মাঠের সব খেলাতেই যোগ্যতা প্রকাশের মূলধন করায়ত্ত থাকে। শক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ও ব্যায়াম করে, আর বাস্কেট বলও খেলে। এ বছর তাই এথলেটিকস ছাড়াও পশ্চিম বাংলার স্কুল বাস্কেট দলেও নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে। ইম্ফলে এবার পশ্চিম বাংলার বাস্কেট বল দল যখন অন্ধ্র স্কুলকে ৬১-১২ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়ে দেয়, তখন স্কোর বইতে দেখা গেল দলের সংগৃহীত ঐ ৬১ পয়েন্টের মধ্যে গুণে গুণে ৫০ পয়েন্ট অর্জন করেছে একা অনুশ্রী। এই দক্ষতার জন্যই পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়াশিক্ষায়তনে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য অনুশ্রীর ডাক পড়েছে বাস্কেট বল শিবিরে।

অনুশ্রী জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার আসরে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এর আগেও পেয়েছে। বাস্কেট বলেও বহুবার স্কুল দলে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া স্কুল এবং জেলার বিভিন্ন এথলেটিক প্রতিযোগিতায় অনুশ্রী চ্যাম্পিয়ান আখ্যা অর্জন করেছে।

পশ্চিম বাংলার নানা অঞ্চলে ধীরে ধীরে মেয়েদের মধ্যে খেলাধুলোর আগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু অভাব ও ব্যাঘাতেরও শেষ নেই। মেয়েদের নিয়মিত অনুশীলনের উপযোগী মাঠের অভাব, অভাব উপযুক্ত প্রশিক্ষকের, অভাব সুদক্ষ সংগঠকের। মফঃস্বল বাংলার খেলাধুলোর প্রতি নজর দেবার সময় এসেছে। অনুশ্রীর মত সংকল্পব্রতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়েরা সংশ্লিষ্ট সবার চোখে আঙুল দিয়ে এই সত্য বুঝিয়ে দিচ্ছে।

বিশ্বের খেলাধুলোর আসরে ভারতের 'অতি কাহিল' অবস্থার কথা স্মরণ করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সময়ে অসময়ে হা-হুতাশ করেন। কিন্তু কি করলে এই 'হা-হুতাশের' অবসান হবে তা স্থির করেন না বা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে চান না। আমাদের ছেলেরাই

ভাল করে খেলাধুলোর সুযোগ-সুবিধা পায় না—তা মেয়েরা। কিন্তু ভারতের মত এত বড় এক স্বাধীন দেশে বিশ্ব মানের ক্রীড়াব্রতী খুঁজে বার করতে হলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে—মায় সরকারকে পর্যন্ত উদ্যোগী হতে হবে। সারা দেশে ঢালাওভাবে খেলাধুলোর সুযোগ-সুবিধার আয়োজন করলে তবেই দেশের নানা দিকে অনুশ্রীর মত স্বাভাবিক প্রতিভাময়ী ক্রীড়াবিদদের খুঁজে পাওয়া যাবে এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ক্রীড়ামান উন্নত করা সম্ভব হবে। এ সত্য অনেকেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন (অনেকের কথাবার্তা থেকেই তা বোঝা যায়) কিন্তু যাঁরা উদ্যোগী হলে প্রকৃত কাজ হবে তাঁরাই হয় ব্যক্তিগত নয় দলীয় স্বার্থের খাতিরে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন। আর এর ফলে এই বিরাট দেশে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যতখানি সম্প্রসারিত করা দরকার, যতখানি সযত্ন এবং নিঃস্বার্থ প্রয়াস করা দরকার, তা হয়ে উঠল না আজও—স্বাধীনতা লাভের আজ ২৮ বছর পরেও!

হ্যাঁ অনুশ্রীর কথায় ফিরে আসি আবার। অনুশ্রী একেবারেই প্রচারমুখী নয়; নিজের কৃতিত্বকে সে নিজের মনে মনেই রাখতে চায়, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়সংকল্প ওর চোখে স্বপ্ন আছে, মনে আশা আছে, আর আছে দুর্জয় সংকল্প ভবিষ্যতে এথলেটিকসের আসরে আরও কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চিন্তা মনে মনে অনুশ্রী লালন করছে।

অময়

দেশ বিদেশের খেলা

দ্বৈত কীর্তিতে উজ্জ্বল

১৯৭২-এ মিউনিখ অলিম্পিক যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল। কারণ দশ হাজার মিটার দৌড়ের হিটে ফাইনালে উত্তীর্ণ ২৯ জনের মধ্যে শেষ প্রতিযোগী প্রায় জোটপেকের কাছাকাছি সময়ে এসে পড়ে। এই অলিম্পিকে দূরপাল্লা দৌড়ের মান যে খুব উঁচু ছিল তা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, হিটে সফল অ্যাথলিটরা সবাই ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে অমেরিকার বিলি মিলস-এর ২৮ মিনিট ২৪-৪ সেকেন্ডের বেড়াকে ডিঙিয়ে যায়।

মিউনিখে দশ হাজার মিটার দৌড়ের চূড়ান্ত পর্বে চতুর্থ স্থানাধিকারীও জোটপেকের চেয়ে সাত সেকেন্ড কম সময়ে সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করেন। লাসে ভিরেন জোটপেকের তুলনায় ১ মিনিট ২৬ সেকেন্ড আগে প্রতিযোগিতা শেষ করেন। অর্থাৎ স্টপ ওয়াচের কাঁটা থেমে যায় ২৭ মিনিট ৩৮-৪ সেকেন্ডে। দশ হাজার মিটারে এটি নতুন অলিম্পিক ও ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।

মিউনিখের আঙিনায় তেইশ বছরের ছেলে লাসে ভিরেনের জীবনে দশ হাজার মিটার দৌড়ে এটি ছিল সপ্তম প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ে লাসে ভিরেন কিঞ্চিৎ পেছিয়ে পড়লেও সমাপ্তি লগ্নে বিস্ময় সৃষ্টি করেন নতুন রেকর্ড রচনা করে ও বহুকাল পরে দূরপাল্লার দৌড়ে ফিনল্যান্ডের আধিপত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় লাসে ভিরেন শেষ চারশ মিটার দৌড় শেষ করেন ৫৬-৪ সেকেন্ডে। ফিনল্যান্ড দূরপাল্লার দৌড়ে প্রথম জয়লাভ করে ১৯৩৬ সালে বর্লিন অলিম্পিকে। সালনুনেন ছিলেন প্রথম পথপ্রদর্শক, তার সময় ছিল ৩০ মিনিট ১৫-৪ সেকেন্ড।

পাঁচ হাজার মিটারে লাসে ভিরেনের নয়া নজীর রচনার পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কারণ অতীত অলিম্পিকের রেকর্ড তাসের ঘরের মত সামান্য হাওয়ায় ভেঙে পড়ল মিউনিখে প্রাক ফাইন্যাল প্রতিযোগিতায়। এমন অঘটন অলিম্পিকের বা ওয়ার্ল্ড কম্পিটিসনের ট্রাক এন্ড ফিল্ডে খুবই কমই ঘটেছে।

স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত মেলবোর্ন অলিম্পিকে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে ভ্লাদিমির কুটস বিশ্ব-রেকর্ড গড়েছিলেন। এই রুশ নন্দনের সময় ছিল ১৩ মিনিট ৩৯-৬ সেকেন্ড।

কেবলমাত্র হিটেই তেরজন প্রতিযোগী কুটস-এর সময় সীমাকে ছিন্ন করে দেন অনায়াসে। তন্মধ্যে একটি বিভাগীয় হিটে চেকোশ্লাভাকিয়ার জোসেফ জানস্কি ১৩ মিনিট ৩৯-২ সেকেন্ডে নির্ধারিত পথ অতিক্রম করেন। কুটস এর চেয়ে চার সেকেন্ড কম সময় থাকলেও জোসেফ হিট থেকে ফাইন্যালে অনুত্তীর্ণ হন। কারণ তার বিভাগে অপর দুজন তার চেয়ে কম সময়ে প্রতিযোগিতা শেষ করেন। প্রতিযোগিতা কত তীব্র ছিল শুধু তা বোঝাবার জন্যেই তুলনামূলক পরিসংখ্যানটুকু বিধৃত করলাম।

চুলচেরা নিক্তির বিচারে যেখানে ফলাফল সেখানে বেগবান অশ্বের মত লাসে ভিরেন ১৩ মিনিট ২৬-৪ সেকেন্ডে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড তৈরী করেন। এই সময় মেলবোর্নে কুটস কৃত সময়ের চেয়ে ১৩-২ সেকেন্ড কম। আরও সাতটি দেশ—টিউনিসিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, বেলজিয়াম, জার্মানী নরওয়ে এবং সোভিয়েত রাশিয়া ভ্লাদিমির কুটসকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান।

লাসে ভিরেনের পরের কীর্তিও অসামান্য। তিনি বিশ্ববিশ্রুত দৌড়বীর রন ক্লার্ক প্রতিষ্ঠিত গৌরবকে অনুজ্জ্বল করে দেন। ক্লার্ক এর পাঁচ হাজার মিটারের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ১৩ মিনিট ১৬-৬ সেকেন্ডে। ভিরেন ১৩ মিনিট ১৬-৪ সেকেন্ডে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে দিগন্তের সূচনা করেন।

১৯৭২-এর অলিম্পিকে ট্রাক এন্ড ফিল্ডে ডাবল খেতাবের অধিকারী মাত্র তিনজন। পূর্ব জার্মানীর মেয়ে রেনেট স্টেচার, রাশিয়ার ভ্যালেরি বোরজভ ও ফিনল্যান্ডের পুলিসকর্মী লাসে ভিরেন।

পুরনো পাতা থেকে [illegible] যায় দূরপাল্লার দৌড়ে বিরল [illegible]বল খেতাবের অধিকারীর সংখ্যা খুবই সীমিত। ১৯১২ সালে স্টকহোলম অলিম্পিকে ২২ বছরের ছেলে হান্স কোলহেমেনেন ডাবল খেতাবের খতিয়ানে সর্ব কনিষ্ঠ। ফিনল্যান্ডের অপর নায়ক পাভো নুরমি ১৯২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে পাঁচ হাজার এবং দেড় হাজার মিটারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড গড়ে ডাবল খেতাব জয়ী। ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে এমিল জোটপেক এবং ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভ্লাদিমির কুটস অনুরূপ অনন্য কীর্তির নায়ক। ডাবল খেতাবের খতিয়ানে শেষ, কিন্তু সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম লাসে ভিরেনের। কারণ তিনিই এখন দূরপাল্লার দৌড়ের অদ্বিতীয় নায়ক। দ্বৈত কীর্তির আলোকে আলোকিত লাসে ভিরেনকে ঘিরে আমাদের চোখ এখন আগামী মন্ট্রিল অলিম্পিকের দিকে। লাসে ভিরেন ফিনল্যান্ডের পূর্বসূরীদের মত তার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারবেন তো!

প্রশান্ত দাঁ

লন্ঠনের অস্বচ্ছ আলোয় আমরা একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। উঁচু-নীচু জমি। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

মাথার ওপর অন্ধকারের আকাশ। তাতে অজস্র তারা ফুটে আছে। অদূরের পাহাড় থেকে জন্তু জানোয়ারের ডাক ভেসে আসছে। বেশ শীত করছে। তাড়াতাড়ির ফলে শুধু মাত্র একটা সোয়েটার গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। মনে হল একটা চাদর আনলে বোধহয় ভাল হত। দিলীপরঞ্জন খুব চালাক মানুষ। বিছানার চাদরটা নিয়ে এসেছে। এখন সেটাই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে ও।

—কদ্দূর চৌকিদার? পরিচালকের কন্ঠ শোনা গেল।

—নজদিগ হ্যায় সাহাব। এই মাঠ পেরিয়ে বাঁ দিকে যে টিলা—ওর ঠিক ওপরেই দত্ত সাহাবের মোকান।

এরপর কিছুক্ষণ আমাদের নীরবে কাটল। ম্যাডাম একটাও কথা বলছেন না। মাথা নীচু করে হেঁটে চলেছেন শুধু।

বেশ খানিকটা হাঁটবার পর হঠাৎ চৌকিদার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ওই যে—দত্ত সাহাবের কোঠি—

—তা দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? চল এগিয়ে।

চৌকিদার একথায় সামান্য ইতস্তত করল, বলল—হুজুর আমার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। আপনারা যান—

—কেন?

—দেখুন এত রাত্রে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি. উনি হয়ত রাগ করতে পারেন। আমি গরীব মানুষ—

পরিচালক তাড়াতাড়ি আমার কাছে জানতে চাইলেন—কী রঞ্জন, এত রাত্রে গেলে আবার বিরক্ত-টিরক্ত হবে না-তো?

• তার আমি কি জানি? দত্তবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় তো মাত্র কয়েক ঘন্টার। ভদ্রলোকের কিসে রাগ আর কিসে অনুরাগ—কি করে বুঝব?

বললাম—কি জানি, বলতে পারছি না। তবে উনি নিজেই তো পর পর কদিন আমাদের ওখানে হাঁটাহাঁটি করেছেন। আর গরজটাও ওঁরই নিজের। দেখা করতে না চাইলে বা ফালতু কিছু উল্টোপাল্টা বললে আমরা তৎক্ষণাৎ চলে আসব। ব্যস!

চৌকিদার কিছুতেই সঙ্গে যেতে রাজী হল না। তখন আমি তার হাত থেকে লন্ঠনটা নিয়ে নিলাম। এবার আমাদের পাহাড় ভেঙে খানিকটা উপরের দিকে উঠতে হবে। পথের দু' ধারে ঘন জঙ্গল। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে অন্ধকারে অদৃশ্য প্রকৃতি মুখর।

দিলীপরঞ্জন একটু ভীতু স্বভাবের মানুষ। ফিসফিস করে বলল—কোনো জন্তু জানোয়ার অ্যাটাক করবে না তো?

উদাসিন ভঙ্গীতে বললাম—করলে করুক। বায়োস্কোপের লাইনে চাকরী কর অথচ এখনও জন্তুতে ভয়? ডরপুক কাঁহিকা—

আঁকা-বাঁকা মেটালের রাস্তা বেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

অন্ধকারের মধ্যে জেগে আছে এক আধুনিক স্থাপত্য। সামনেই গ্রীলের গেট। সমস্ত বাড়িটা এখন নিঝুম।

গেটের আশে-পাশে খুঁজলাম—যদি কলিং বেলের কোন ব্যবস্থা থেকে থাকে। নাঃ। এবার চেঁচিয়ে ডাকব কিনা ভাবছি এমন সময় বাড়ির বারান্দা থেকে একটি গম্ভীর পুরুষকন্ঠ ভেসে এল—কোন হ্যায় উধার?

পরিষ্কার দত্তবাবুর গলা।

বললাম—মিঃ দত্ত, আমরা—

ও-পাশটা চুপ হয়ে গেল। তারপরই প্রশ্ন?

—আমরা মানে?

—আমরা হচ্ছি ফিল্মের ইউনিটের—মানে আপনি আজ যে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন মিঃ দত্ত, আমরা সেই বাংলো থেকেই আসছি—

অন্ধকারে সঙ্গে সঙ্গে চটির ফটফট শব্দ শোনা গেল। মোরাম আর পাথরের নুড়ি বিছানো রাস্তায় পদধ্বনি আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে কন্ঠস্বর—রামবিলাস, রামবিলাস হো—

বেশ খানিকটা দূর থেকে রামবিলাসের নিদ্রাবিজড়িত জবাব শোনা গেল—যাতা হৈ মালিক—

—গেট কি চাবি লে আ' জল্দো, তুরন্ত—

—হৈ মালিক—

বিশালদেহী রামবিলাস প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে গেটের চাবি খুলে দিল। আমাদের দেখে সে অবাক চোখে তাকাল।

ইতিমধ্যে ভবেশ দত্ত এসে পড়েছেন। গায়ে বুশ সার্ট পরনে পাজামা। মুখে

[illegible] অনুরাগ/অপর্ণা সেন

যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দের অভিব্যক্তি। দুহাত জোড় করে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন—আসুন আসুন। আমার কি সৌভাগ্য।

আমি পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। নমস্কারের পর্ব শেষ হল।

বললাম—ম্যাডাম শেষ অব্দি আপনার মেয়েকে দেখতে এলেন মিস্টার দত্ত—

ভবেশ দত্তর চোখ দুটি হঠাৎ চিকচিক করে উঠল। আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সামান্য চুপ করে থেকে ভবেশ দত্ত বললেন—আপনাকে যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছি তার জন্যে পারলে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আসলে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলেছি। আপনার সঙ্গে আমার যে দেখা হয়েছে, রত্যাকে এখনও আমি সে-কথা বলিনি। শুধু বলেছি যে এখনও পর্যন্ত কোন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি... আর বলেছি, একবার দেখা করে বললেই আপনি রাজী হয়ে যাবেন। ...শেষ পর্যন্ত আপনি যে এই দয়া করে আমার বাড়ি পর্যন্ত এলেন—আমার মেয়েকে দেখতে—এর জন্যে আমি চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

ম্যাডামের মুখে অস্বস্তির হাসি। বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন—ওসব কথা থাক। এখন চলুন—রত্যাকে দেখে আসি। এখন ঘুমোচ্ছে তো।

ভবেশ দত্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—উঁহুঁ, রত্যা আজকাল আর বড় ঘুমোয় না। ওষুধ দিলেও না। ফলে আমার চোখেও ঘুম নেই। বাপ-বেটিতে আমরা জেগেই রাত পুইয়ে দিই এক একদিন—

রামবিলাস ততক্ষণে বাড়ির সামনের আলোটা জেলে দিয়েছে। বারান্দায় ফ্লুরোসেণ্ট টিউব ল্যাম্পের একটা প্যানেল জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটা হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে। মোজাইক করা ফ্লোর। আগাগোড়া ডিসটেম্পার। অজস্র অর্থব্যয় করে যে বাড়িটা তৈরী করা হয়েছে সেটা ভালই বোঝা যায়।

ভবেশ দত্ত আমাদের পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চললেন। চারিদিকে দামী দামী আসবাবপত্র। আধুনিক গৃহসজ্জা। দরজায় ভারি ভারি পর্দা। ভবেশ দত্ত যে বেশ রুচিসম্পন্ন মানুষ এটা বোঝা গেল।

বারান্দা থেকে একটা সিঁড়ি সোজা দোতলায় উঠে গেছে। সিঁড়ির ধাপ আছে কিন্তু রেলিং নেই। ভবেশ দত্ত আমাদের উপরে যেতে ইঙ্গিত করলেন। —রত্যা উপরে থাকে। জানলা দিয়ে পূব দিকের হিল রেঞ্জটা দেখতে ও বড় ভালবাসে বলে আমি এই ব্যবস্থা করেছি।

দোতলার বারান্দায় খুব অল্প পাওয়ারের একটা নীল আলো জ্বলছে।

জীবন মৃত্যুর প্রান্তে
মানব ভট্টাচার্য ও কল্যাণী মন্ডল

এরা এক যুগ। কল্যাণ চ্যাটার্জি, সামন্ত ভঞ্জ ও শিবানী বসু

ভবেশ দত্ত একটা দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করলেন ভেতরের। তারপর মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন—সিস্টার—সিস্টার।

ঘরের ভেতরে সামান্য নড়াচড়ার আওয়াজ। তারপর চোখ কচলাতে কচলাতে একটি অল্পবয়সী নার্স বেরিয়ে এল। আমাদের দেখে তো সে রীতিমত অবাক।

—রত্যা ?

—শুয়ে আছে।

—ঘুমোচ্ছে ?

নার্স মেয়েটি চট করে একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে বলল—মনে হচ্ছে না। এই তো কিছুক্ষণ আগেও আমরা কথা বলছিলাম। এত শিগগির কি আর ঘুমোয়। দাঁড়ান দেখছি—

ভবেশ দত্ত বললেন—ওকে বল—যাঁকে দেখবার জন্যে ও ছটফট করছিল—তিনি নিজেই এসেছেন। বাইরে অপেক্ষা করছেন।

নার্স উজ্জ্বল চোখে ম্যাডামের দিকে একবার তাল করে তাকাল। বাঙালী মেয়ে সে, একবার যে ম্যাডামকে চিনতে পেরেছে। খুশী মুখে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। ভবেশ দত্ত আনচান করছেন। আমাদের জন্যে উনি কি-যে করবেন যেন ভেবে স্থির করতে পারছেন না।

ভেতর থেকে নার্সের মৃদুকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল—আসুন আপনারা। রত্না জেগেই আছে।

সবার প্রথমে ঘরে ঢুকলেন ম্যাডাম।

তারপর তাঁকে অনুসরণ করে একে একে আমরা সবাই।

অদূরে একটি বড় ডিভান। তাতে যে মেয়েটি শুয়ে আছে তার বয়স বড়জোর ষোল কি সতের। রুগ্নদেহ। কিন্তু কি আশ্চর্য ওর দুটি চোখ; যেমন বিশাল তেমনি টানা টানা। পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময় ওই দুটি বিশাল চোখের গভীরে থমকে হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরনে রাতের পোশাক। শীর্ণ হাত দুটি বাড়িয়ে রত্না প্রথমে নার্সকে ধরে উঠে বসতে চাইল। নার্স আপত্তি করল।

রত্না ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ল।

উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপছে যেন।

ভবেশ দত্ত সামান্য বিচলিত হলেন। বললেন—তুই শুয়ে থাক মা......এই তো উনি এসেছেন তোর কাছে। এবার কত ওঁকে দেখবি—দেখ—

রত্নার চোখ দুটি হঠাৎ জলে ভরে উঠল। আজ অনেক বছর সে জগৎ-সংসার থেকে দূরে [illegible]। রোগের অক্টোপাশ [illegible] তার কমনীয় কিশোরী দেহ [illegible] বলতে আর [illegible] কিছুই নেই। দিনরাত ওষুধ খাওয়া আর শুয়ে শুয়ে বই পড়া—এই হচ্ছে তার প্রাত্যহিক জীবনের রুটিন।

[illegible] তার নিঃশেষিত হতে [illegible] যাচ্ছিল। হঠাৎ নার্সের মুখে একদিন শুনল—তাদের এই শহরে কলকাতা থেকে সিনেমার কয়েকজন শিল্পী এসেছেন। কি একটা যেন ছবির শুটিং উপলক্ষে। আর তার মধ্যে রয়েছে রত্নার সব চাইতে ফেভারিট শিল্পী। এত কাছে এসেছেন উনি; ওঁকে একবার চোখের সামনে দেখা যায় না?

নার্স বলেছিল—তা কি করে সম্ভব? তুমি তো অসুস্থ শয্যাশায়ী। তুমি ওঁকে দেখতে যাবে কিভাবে?

তা বটে। রত্না প্রতিবাদ করেনি।

রত্না তখন বাবাকে বলেছিল—ওঁকে আমার কথা একটু বলবে? যে আমি অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে থাকি। যদি দয়া করে আমাদের বাড়িতে একবার আসেন—

ভবেশ দত্ত কি বলবেন? মেয়ের কোন বাসনা তিনি অপূর্ণ রাখেননি। যখন যা [illegible] মা চেয়েছে—পূরণ করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব? ফিল্মের কারও সঙ্গে তো তাঁর চেনা-জানা নেই যে ইনফ্লুয়েন্স করে রাজী করাবেন? উপায়?

সাব ডিভিশনাল অফিসার সব শুনে হেসে বলেছিলেন—অসম্ভব। আর তাছাড়া কিছু মনে করবেন না—আপনার যা রেপুটেশন মশাই রাজীই হবে না। ওরা ফিল্মের লোক। দে আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পিপল। বরং একটা কাজ করুন না। ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার মুখার্জিকে একবার বলে দেখুন না। ওঁদেরই তো গেস্ট। ওঁরা যদি রাজী করাতে পারেন বলে-কয়ে। ফর-এ সিক গার্ল!

ভবেশ দত্ত তারপর মুখার্জিকে বলেছিলেন। মুখার্জি যথারীতি পাত্তা দেয়নি। হেসে জবাব দিয়েছে—আরে ওরা ভীষণ ব্যস্ত। আমরা কত করে ডাকি তাই আসে না. আর আপনার বাড়ি যাচ্ছে! না-না আমি বলতে পারব না। আপনি নিজে বরং চেষ্টা করে দেখুন—

তারপর পর পর দুদিন বিফল হয়ে বাড়ি ফিরে এসেও ভবেশ দত্ত কিন্তু রত্নাকে কিছুটি বলেননি। শুধু একটা মাত্র কথা—দেখা হয়নি। তবে চিন্তা করিস না বুঝিয়ে বললে রাজী উনি একবাক্যেই হয়ে যাবেন। আমি কালই একবার যাচ্ছি—

অসুস্থ রত্না এই নায়িকার অনেক সিনেমা দেখেছে। তখন তো সে সুস্থ ছিল। কলকাতার সিনেমার কাগজে ওঁকে নিয়ে বিস্তর লেখাও সে পড়েছে। এই নায়িকাকে সে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। ওঁর অভিনয়ে রত্না বিস্মিত মুগ্ধ। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। রত্না সেটা মনে মনে রেখেছে। কাউকে কখনও বলেনি।

রত্নার যখন নয় বছর বয়স তখন ওর মা হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুটা নাকি অস্বাভাবিকই ছিল। ভবেশ দত্ত তখন টাকা রোজগারের নেশায় উন্মাদ। বেশীর ভাগ দিন তাকে শহরের বাইরে বাইরে থাকতে হয়—পাহাড়ে জঙ্গলে [illegible] গ্রামাঞ্চলে। এই এলাকার নাম্বার ওয়ান গভর্ণমেন্ট কন্ট্রাক্টার। দু হাতে রোজগার। সে-সব ক্ষেত্রে তখন তার ফ্যামিলির দিকে ফিরে তাকাবার সময় কোথায়? কর্তব্য তো সবই করছে। যখন যা দরকার—যুগিয়ে গিয়েছে। বাড়ি গাড়ি ঐশ্বর্য। ভবেশ দত্ত তার ফ্যামিলিকে তো অভাবে রাখেনি। কিন্তু স্ত্রী কেবল তাকে কাছে পেতে চায়। মেয়ে চায় তার বাবাকে। ভবেশ দত্ত প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। ওসব নাকি বাজে সেন্টিমেন্ট। এখন ধনলক্ষ্মী সদয় এখন যদি গুছিয়ে নিতে না পারা যায় তো চিরদিন সেই সাবেক অভাবের মধ্যেই থাকতে হবে। আত্মীয়-স্বজন কেউ তো একটা ছাঁদা পয়সা দিয়ে কখনও সাহায্য করেনি। আর করবেও না। স্ত্রীর গহনা বিক্রীর পয়সা দিয়ে যে ঠিকেদারী ব্যবসার সূত্রপাত তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। এবং যে কোন উপায়ে। অসৎ পথে হলেও। সৎ পথে আজকাল ব্যবসা হয় না।

ঐশ্বর্য আসে। সেই সঙ্গে আসে দম্ভ। অহংকার। তারপর অহংকারের হাত ধরে আসে মত্ততা। মদ আর মেয়েমানুষ। ভবেশ দত্ত জীবনের সহজ সড়ক থেকে নেমে বাঁকা পথে পা রাখে। অসামাজিক কার্য-কলাপ তখন আয়ত্তে আসে।

একদিন কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়।

ডানগর নামে একটা জায়গায় তখন বড় একটা কাজ চলছে। একটা বাঁধা মেয়েমানুষ নিয়ে ভবেশ দত্ত সেখানে এক মাস পড়ে আছে। বাড়ির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। সেদিন সকালে কাজে বেরুবে বলে সবে জিপে উঠেছে হঠাৎ টেলিগ্রাম পিয়ন এসে

দস্যু
সুচিত্রা সেন

হাজির। সরকারী কোন নির্দেশ নাকি? সই করে নিজে পড়তে গিয়েই ভবেশ দত্তর চোখের সামনের পৃথিবীটা হঠাৎ কেঁপে কেঁপে উঠল—গতরাত্রে ভবেশ দত্তর স্ত্রী মারা গেছেন। তার একবার এখুনি বাড়ি যাওয়া দরকার। সংকারের আয়োজন সম্পূর্ণ...

ভবেশ দত্তর চোখ দিয়ে তখন টসটস করে জল পড়ছিল। ভাঙা গলায় উনি বলছিলেন—মশাই এ আমারই পাপ। আর এই হচ্ছে পাপের শাস্তি। কে বলে পাপ নেই পুণ্য নেই—স্বর্গ নেই নরক নেই? আমাদের এই পৃথিবীটাই তো আস্ত একটা নরক। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারলাম না। সুখের মুখটা শুধু এক-পলক দেখেই সে চলে গেল। রেখে গেল মেয়েটাকে। কিন্তু ইদানিং তাকেও আবার হাতছানি দিচ্ছে। আর আমি অভিশপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুধু দেখে যাচ্ছি। জানি না আর কতদিন আমার এই শাস্তি চলবে...

বুকভাঙা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ভবেশ দত্ত। তারপর শার্টের খুঁটে চোখ মুছলেন। আমরা তখন এসে আছি হাসপাতালে। ঘরের মধ্যে রত্নার পাশে গিয়ে বসেছেন আমাদের ম্যাডাম। নার্স অদূরে দাঁড়িয়ে।

রত্নার বিশাল দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে দেখে ম্যাডাম তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাগ্রহে ওর হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তারপর স্নেহকোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন—তোমার কষ্ট হচ্ছে?

রত্না ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জানিয়েছে—না, তার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

আসলে এ তার আনন্দাশ্রু। এভাবে এর আগে তার কোন কামনা এমন চরিতার্থ কখনও হয়নি।

ম্যাডাম ওর পাশে বসেছেন। নিজের হাতে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন। তবে তুমি কাঁদছ কেন? ছিঃ লক্ষ্মী। আমি তোমার হাসিমুখ দেখব বলেই যে এসেছি রত্না।

রত্না এবার হাসে। আর সেই হাসিটা ক্রমে ওর সমস্ত মুখে। সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ম্যাডামের মুখেও হাসি। এই অনির্বচনীয় হাসি আমি আগে কারও মুখে দেখিনি। সিনেমায় আমাদের সামনে তো ওঁদের প্রত্যেক নাটকের অভিনয় দেখি—কিন্তু আজকের এই মুহূর্তটি—এর আগে কখনও দেখিনি। রত্না কত স্বচ্ছন্দে হাসছে। ওর শীর্ণ দুটি হাত ম্যাডামের মুঠো। কখনো সে কি-যেন অনুভব করছে। ম্যাডাম ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। একটাও কথা নয়। শুধু নিঃশব্দ অনুভূতির নিবিড় ছোঁয়া আর হাসি। সব স্মৃতি এবং মালিন্য যেন ধুয়ে মুছে যাচ্ছে নিঃশব্দে। হা ঈশ্বর জীবনের এ কোন নাটকের দর্শক করলে আমাকে? মৃত্যুপথযাত্রিনী কিশোরী আর গ্ল্যামারের জগতের পুড়তে পুড়তে ছাই হতে যাওয়া এক তারকা—এরা কার নির্দেশে হঠাৎই বা আজ মুখোমুখি?

কখন যেন ওদের মাঝখানের ব্যবধান ঘুচে গেছে। ওরা দুজনে একে অপরের মনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। রত্না মৃদু কণ্ঠে এক সময় প্রশ্ন করেছে—আপনাকে একটা কথা বললে আপনি রাগ করবেন না তো?

ম্যাডামের মুখে প্রশ্রয়ের স্মিত হাসি।—কেন রাগ করব কেন? কি জানতে চাও বলো—

রত্না জানতে চায় না জানাতে চায়। একটু ইতস্তত করে মৃদু কণ্ঠে সে বলে—আপনাকে দেখতে অবিকল আমার মায়ের মত—

হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক হানে নায়িকার ঠোঁটে।—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।... আমার মায়ের মুখের সঙ্গে অনেকটা আদল আছে আপনার। সেজন্যেই লজ্জায় জড়িয়ে যেতে থাকে রত্নার রোগ দুর্বল কণ্ঠ। ...সেজন্যেই তো আপনার অনেক ছবি আমি জমিয়ে রেখে দিয়েছি। কেউ এটা জানে না। কি অবাক কাণ্ড শেষ পর্যন্ত আপনি এখানে এলেন। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।

ম্যাডাম আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কেন জানি না—আপনি কখনও চাননি—এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি কখনও কিছু লিখি। বা কিছু বলি। কিন্তু সেদিনের যে আপনাকে আমি চোখের সামনে দেখেছি, তা আমি ভুলতে পারিনি। এটা আমার জীবনে একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা। কিছুদিন আগে আপনাকে কেন্দ্র করে আপনার পারিবারিক একটা ঘটনা নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। আমি সব শুনেছিলাম। কিন্তু কোন মন্তব্য করিনি। কারণ যারা আপনাকে চেনে আমি মনে করি আমি তাদেরই একজন। আপনি একাধারে নায়িকা জায়া এবং জননী। আপনি আপনার নিজস্ব পটভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিতা। এ কাহিনীতে আপনার পরিচয় উদ্ধার করার দায়িত্ব পাঠকের। আমি কোন ইঙ্গিতও দিইনি। অতএব এটাকে আপনি একটা নিছক গল্প হিসাবে নেবেন আশা করি। তার বেশি কিছু নয়... ম্যাডাম সোনার কিরীটে শুটিং করতে গিয়ে আমার সঙ্গে ভবেশ দত্তর হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। ওকে আমি পালাম এয়ারপোর্টে আবিষ্কার করেছিলাম। আমরা তখন খুব ব্যস্ত। হল্যাণ্ড থেকে একটা জাম্বো জেট প্লেন তখন টারম্যাকে পৌঁছে গেছে। সেই প্লেনের ভেতরে আমাদের শুটিং করার কথা। উত্তমকুমার আর অপর্ণা সেন আমাদের আর্টিস্ট। আমরা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে কাস্টমস এনক্লোজার পার হয়ে প্লেনের দিকে ছুটেছি। আমাদের সঙ্গে আর্টিস্টরাও রয়েছেন। হঠাৎ নজরে পড়ল লাউঞ্জের বাঁদিকে যেখানে এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টার সেখানে একজন আমার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রয়েছেন। ইনি সন্ন্যাসী। পরনে তাঁর গৈরিক বসন। আমি চমকে উঠেছি। এঁকে কোথায় যেন দেখেছি? হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত স্মরণ হল—এই তো সেই ভবেশ দত্ত! —আপনি কোথায় চলেছেন? চেঁচিয়ে প্রশ্ন করেছি—আপনি আমায় চিনতে পারছেন? সন্ন্যাসী শান্ত হেসে কোমল কণ্ঠে বলেছেন—চিনেছি। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

প্রশ্ন করেছি—রত্না? রত্না কেমন আছে?

উত্তর এসেছে—সে ভাল আছে। সে এখন তার মায়ের কাছে আছে। বড় আনন্দে আছে।

হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা। প্লীজ ক্লিয়ার ক্লিয়ার দা প্যাসেজ...জাম্বো জেটের ভারতীয় যাত্রীরা নেমে আসছে কাস্টমস এনক্লোজারে। সিকিউরিটির লোকেরা আমায় এগিয়ে যেতে বলছে। ওদিকে শুটিং-এর তাড়া। ভবেশ দত্ত নেই তো ওখানে। ওখানে একজন মাত্র সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। আমি হাত নাড়লাম। জবাবে তাঁর প্রশান্ত হাসি পেলাম। শেষবারের মত দেখে নিয়ে আমি ভেতরে পা বাড়ালাম। জেনে গেলাম আপনার স্নেহের রত্না এখন তার নিজের মায়ের কাছেই নিরাপদে আছে। এটা আপনি কি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন?...

ভবেশ দত্তর আদেশে রামবিলাস আমাদের জন্যে কফি তৈরী করে এনে দিয়েছে। দামী সিগারেটের টিন খুলে ধরেছে। গ্যাস লাইটার জেলে দাঁড়িয়েছে।

রাত্রি এখন তৃতীয় যামে।

ভেতরে খুট করে আওয়াজ হল। দেখি ম্যাডাম বেরিয়ে আসছেন স্মিত হাসি মুখে। তারপর ভবেশ দত্তকে বললেন—মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি এখন চলি।

ভবেশ দত্ত শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। জোড় হাতে।

ম্যাডাম বললেন—এভাবে আর অপরাধী করবেন না মিঃ দত্ত। আপনি রত্না ঘুম থেকে উঠলে বলবেন আমি কাল সন্ধ্যায় আবার আসব। হাতে সময় নিয়েই আসব। ওকে আমার অনেক গল্প বলার আছে।

কৃতজ্ঞতায় ভবেশ দত্তর চোখ আবারো ছলছল করে উঠল। অস্ফুটে বললেন—ভগবান আপনার কৃপায় রত্না...।

আমরা এবার আমাদের ক্যাম্প ফিরছি। ভবেশ দত্ত এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমরা নিষেধ করলাম। এবার রামবিলাস লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে চলেছে। লণ্ঠনের আলো ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পরিচালক যেতে যেতে মন্তব্য করলেন—এ একেবারে সিনেমার গল্প হয়ে গেল। রঞ্জন একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?

অথচ আমি কেন ভাবলাম—এতে সিনেমা হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়।

রঞ্জন মজুমদার
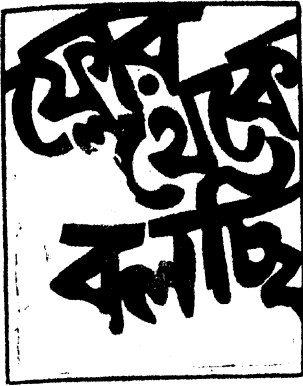
আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরে দুজন হুড়মুড় করে এগিয়ে গিয়ে ফ্লোরের দরজাটা আরও খানিকটা আলগা করে দিয়ে দাঁড়াতেই মুসাফির হতভম্ব। কি ব্যাপার? এতক্ষণ ওই দুজন তো বেশ খোশ মেজাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করছিল। সিগারেট টানছিল? হঠাৎ এমন কি কাণ্ড হলো যে অমন দৌড়ে গিয়ে ফ্লোরের দরজায় দাঁড়াতে হল?

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সামান্য মাথা নীচু করে এক ভদ্রলোক ফ্লোরে ঢুকছেন। মাথা নীচু করার কারণ—মাথার ওপর কিছু তার ঝুলছে। ওরা দুজন তাড়াতাড়ি নমস্কার করল। প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোকও নমস্কার জানালেন। ভদ্রলোকের পেছনে ঢুকলেন—হ্যাঁ, একে আমি চিনি। ইনি তরুণকুমার। ঈষৎ স্থূল দেহ। মুখে আমায়িক একখণ্ড হাসি। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে ফেলা হাতের সূক্ষ্ম কাজ করা সফেদ কাশ্মিরী চাদর। পায়ে পামশু। আর আঙুলে ছোট-বড় অনেকগুলো সোনার আংটি তাতে এক টুকরো উজ্জ্বল হীরেও শোভা পাচ্ছে দেখলাম। বেশ বিত্তসম্পন্ন মানুষ।

আর প্রথমজন বেশ গম্ভীর। অভিজাত চেহারা। পোশাক অবশ্য সেই ধুতি আর পাঞ্জাবী। পায়ে পামশু। ডান গালে ছোট্ট একটা আঁচিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

আমি আসলে 'আনন্দমেলা' ছবির সেটে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এ ছবির পরিচালক হচ্ছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। ইনি সুদীর্ঘকাল এই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। অসংখ্য জনপ্রিয় ছবিও করেছেন। কোয়ায়েট টাইপের মানুষ বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি—ইনি হচ্ছেন সেই প্রকৃতিরই মানুষ।

ওঁর দুই সুযোগ্য সহকারী—রথীশ দে সরকার এবং জয়ন্ত ভট্টাচার্য ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে ওঁর সঙ্গে শটের ব্যাপারে এতক্ষণ শলা পরামর্শ করছিলেন। এই দুই ভদ্রলোক ফ্লোরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে আলোচনায়

রত্না ফিল্ম কর্পোরেশনের দস্যু সর্দার রত্নাকর ছবির মহরতে ক্ল্যাপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার। শিল্পী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

আবার আসবো ফিরে/মহরতে আরতি ভট্টাচার্য ও ছায়া দেবী। পরিচালনা : [illegible] কাবাসী।
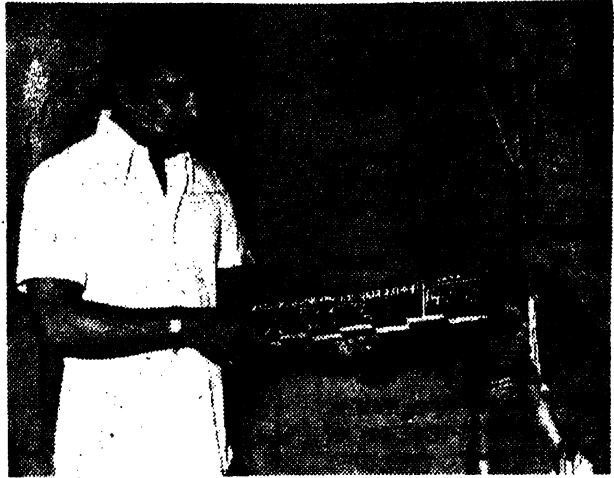
ইস্তফা দিয়ে মঙ্গল চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন সহাস্যে—এই যে এস এস--

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বিনীত ভঙ্গীতে বলল--বসুন দাদা।

আমার পাশে এক ভদ্রমহিলা। মোটামুটি সুন্দরী। উনি এতক্ষণ সেই প্রথম ভদ্রলোককে লক্ষ্য করছিলেন বিস্ফারিত চোখে। হঠাৎ তিনি অস্ফুটে স্বগতোক্তি করলেন—উত্তমকুমার উত্তমকুমার।

আরে বটেই তো। স্বয়ং উত্তমকুমার আমার চোখের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেটের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন—অথচ আমি বুঝতে পারলাম না! কান্ড বুঝুন।

পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী ততক্ষণে তাঁর ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে শটের জন্যে লাইট তৈরী করে রেখেছেন। কথা ছিল উত্তমকুমার লাঞ্চ করে ফিরলেই শটটি নিয়ে নেয়া হবে।

ফ্লোরের মধ্যে এখন চোখের সামনে যে সেটটি দাঁড়িয়ে রয়েছে—দেখে মনে হল এটা কোন সাধু-সন্তের ডেরা। জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করতে সে বলল--হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। এটা হচ্ছে একটা মেলার সংলগ্ন পঞ্চ-ম-কার বাবার অস্থায়ী আস্তানা। এই যে দেখছেন অনেক গ্রাম্য মহিলা--এরা এসেছে বাবার কাছে নানা ধরণের দৈব অনুগ্রহ পেতে। এই পঞ্চ-ম-কার বাবা নাকি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী। হিমালয়েই থাকেন। মাঝে মাঝে সমতলে নেমে এসে পাপী এবং নাস্তিকদের উদ্দেশ্যে করুণা বিতরণ করে আবার সেই দেবাত্মা হিমালয়ে ফিরে যান সাধন ভজনের জন্যে। রবি ঘোষকে এখানে বিচ্ছুকদের মধ্যে দেখতে পাবেন। উনি হচ্ছেন সেই পঞ্চ-ম-কার বাবার প্রধান শিষ্য। যত জাগতিক সমস্যা—সবই উনি সমাধান করে থাকেন।

—যেমন?

—যেমন ধরুন একজন বাঁজা বৌ। বিয়ে হওয়া ইস্তক সন্তান হচ্ছে না। পঞ্চ-ম-কার বাবা এক ছিটে ভস্মে মন্তর পড়ে মাদুলী করে দিলে ব্যস আর দেখতে হবে না। ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর দফা গয়া—

—সর্বোনাশ।

—কেন এতে সর্বোনাশের কি দেখলেন মশাই? আপনার বাতের ব্যামো আছে? হাঁপানী আছে? অম্লশূল হচ্ছে? পঞ্চ-ম-কার বাবা কৃপা করলে ওসব রোগ পালাতে পথ পাবে না। এই দৈবানুগ্রহ সর্বোনাশের কথা হল? বাই দি ওয়ে আপনি মশাই কে বলুন তো?

—আমি মুসাফির।

—অ! অসন্তুষ্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার আমায় ভাল করে দেখে নিয়ে বলল-- মুসাফির তো স্টুডিওতে কি করছেন?

—এই ভাই বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম। সিনেমার শুটিং দেখার সখ আমার অনেকদিনের তাই আর কি!

জয়ন্ত আর বাক্যব্যয় না করে দ্রুত চলে গেল। এতক্ষণ কৌতুহল বজায় রাখলো।

অপরাজিতা
রাজশ্রী বসু/নবাগত বিজয়

আমি তখন ওঁদের প্রোডাকশন ম্যানেজার রবিবাবুকে ধরলাম। উনি একটু স্বতন্ত্র ধরণের লোক। বললেন—আজ এখানে একটা মেলার দৃশ্যের শট নেয়া হচ্ছে। বাইরে এই যে এত লোকজন দেখছেন না—এরা মেলার দৃশ্যে অভিনয় করবার জন্যে এসেছে। আমরা এদের একস্ট্রা বলি।

—এদের পয়সা দিতে হয়?

—বিলক্ষণ। আজকাল বিনা পয়সায় কোন কাজ হয়। ফেল কড়ি মাখো তেল এই হচ্ছে আজকের দুনিয়া। তা আপনি কি জানতে চাইছেন?

বললাম—উত্তমকুমারকে দেখছি—উনি এই ছবিতে কি পার্ট করছেন একটু বলবেন?

রবিবাবু তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—দাদা এই ছবিতে একটা দুর্ধর্ষ উকিলের পার্ট করছেন। ছবিতে ওঁর নাম হচ্ছে সারদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল। ওঁর সওয়াল-জবাবের কাছে বহু তেএঁটে বদমাশ রীতিমত শায়েস্তা।

—আর উনি? অর্থাৎ ওঁর ভাই তরুণকুমার?

—তরুণকুমার মানে বুড়োদা করছেন এক মস্ত বড় জোতদারের পার্ট। নাম ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। সারদা উকিলের সঙ্গে বন্ধুত্ব গলায় গলায়। আর এই যে কুড়ি পঁচিশ বিঘে জমিতে মেলা বসেছে এসব জমি ওঁর নিজের। অনেক টাকার মালিক। দুই বন্ধুতে মিলে আজ মেলা দেখতে বেরিয়েছে। দেখুন না একটু পরেই সব জানতে পারবেন। আগে শুটিং আরম্ভ হোক।

আমি তখন পঞ্চ-ম-কার বাবার সন্ধানে আছি। আমি মুসাফির তো। হেঁটে হেঁটে আমার পায়ের মালাই চাকতি ক্ষয়ে গেছে। যদি ওঁর দৈবানুগ্রহে একটা কিছু হয়ে যায়। আমার হচ্ছে সেই ধান্দা।

ফ্লোরের দরজা খুলে ঢুকলেন রবি ঘোষ। রক্তাক্ত আলখাল্লা পরা। পরিচিত একজনকে বললেন—ফার্স্ট ক্লাস চিকেন চাউমিনটা এনেছিল। [illegible] আনালি বল তো? স্বোয়াদটা মুখে এখনও যেন লেগে রয়েছে। চীনেরা মাইরি এই [illegible] কালচার করে দিয়েছে। চাইনীজ [illegible] হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস। যত খাও [illegible] করবে না। চিলি চিকেন আর [illegible]—

মঙ্গল চক্রবর্তী [illegible] রবি শট রেডি—

রবি ঘোষ তাড়াতাড়ি [illegible] বললেন—ইয়েস মঙ্গলদা আমিও রেডি—

ক্যামেরা [illegible] বাইরে ফলো ফোকাস হচ্ছে। কালি মন্দিরে প্রণাম সেরে সরদা উকিল আর ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বেরিয়ে আসছেন। ওদের দেখেই রবি ঘোষ তড়াক করে একটা লাফ মেরে দে হাওয়া। আমি তো মাথা-মুন্ডু কিছু বুঝলাম না। জয়ন্তকে আবার প্রশ্ন করতে সে অপ্রসন্ন মুখে বলল--লোকটা আসলে একটা জোচ্চোর। সারদা উকিলকে দেখেই তার আক্কেল গুড়ুম। সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়েছে।

এমন সময় ফ্লোরে এলেন উৎপল দত্ত। উরিব্বাপ এ কি চেহারা। সিল্কের সবুজ রং-এর এক বিরাট আলখাল্লা। গলায় অনেকগুলো রুদ্রাক্ষের মালা। পায়ে খড়ম। দাড়ি আর গোঁফ। কপালে টকটকে সিঁদুর। ইনি কে দাদা?

—আরে ইনিই হচ্ছেন সেই প্রসিদ্ধ পঞ্চ-ম-কার বাবা। সদা জাগ্রত। সদা রহস্যময় বিভূতিতে প্রকাশিত। ত্রি-কালজ্ঞ। ব্যোম ব্যোম ব্যোম!

ভক্তবৃন্দ যেন মুখিয়ে ছিল সঙ্গে সঙ্গে

সাষ্টাঙ্গ ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম করল সবাই।

—জয়ন্ত।

রথীশ দে সরকার দুটো খালি হুইস্কির বোতলে কোকাকোলা ঢালছেন। —কি হবে দাদা? এই হুইস্কির বোতল?

উনি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন—এ দুটো হচ্ছে এই আশ্রমের স্পেশাল রিকুইজিশান। বাবা পঞ্চ-ম-কারের সেবায় লাগবে। সিনেমায় আমরা যে মদ খেতে দেখি সেটা তো আর আসল নয় কোকাকোলা। তাই কোকাকোলা ঢেলে বোতল ভর্তি করছি।

দেখলাম লাইট করার অবসরে উৎপল দত্ত, উত্তমকুমার, রবি ঘোষ আর তরুণকুমার বসে গল্প গাছা করছেন। ফ্লোর বয় এসে চা দিয়ে গেল সকলের হাতে। উত্তমকুমারের জন্যে কাঁচের গেলাসে স্পেশাল চা। উৎপল দত্ত দাড়ি-গোঁফ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে দিব্যি চা খেতে লাগলেন। এই ভদ্রলোক দুঃস্বপ্নের নগরীতে অভিনয় করেন? ভাবতেও অবাক লাগে। সেদিন কে যেন বলছিল উৎপল দত্ত নাকি শিগ্গির বিদেশে যাচ্ছেন—ওখানকার কোন একটা ইংরিজী ছবিতে অভিনয় করবেন বলে। উৎপল দত্তকে এটা [illegible] দেখতে হবে একদিন। তবে হ্যাঁ, [illegible] ইতিপূর্বে ট্যুরেন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের ছবি দি গুরু এবং [illegible] অভিনয় করেছেন—দুটিই ছিল নিখাদ ইংরিজী ছবি। অপর্ণা সেনও ছিলেন এই ছবি দুটিতে।

একটা উঁচু পাটাতনের ওপর ভেলভেট দিয়ে পঞ্চ-ম-কার বাবার বসার সিংহাসন তৈরী হয়েছে। বাবা সেখানে জাঁকিয়ে বসে ঝাড়-ফুঁক দিচ্ছেন। ক্যাশ গুনে নিচ্ছে ওঁর সহকারী রবি ঘোষ। হেনকালে সারদা উকিল এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর আগমন সেখানে। বিশেষ করে সারদা উকিলকে দেখেই পঞ্চ-ম-কার বাবার কিঞ্চিৎ ভাববিকার ঘটল। অবশ্য দু এক লহমার জন্যে। তারপরই তো মুখে ফুটে উঠল এক স্বর্গীয় হাসি।

বলা বাহুল্য এই পঞ্চ-ম-কার একটা আস্ত ফ্রড। জোচ্চোর। জেলখাটা কয়েদী। সারদা উকিলই তাকে জেলে পাঠিয়েছিল পাক্কা তিন বছরের মেয়াদে। আজ এখানে সে ভেক ধরে এসে বসেছে আর গাঁয়ের মানবের সরল বিশ্বাসকে ভাঙিয়ে বেশ টু-পাইস ইনকাম করে নিচ্ছে।

ওকে দেখেই সারদা উকিলের সন্দেহ। মনে হচ্ছে যেন চেনা চেনা লোক। গোঁফ দাড়ির পেছনে সেই লোকটির চেহারাই যেন উঁকি দিচ্ছে। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী সাদাসিধে মানুষ। বাবাকে পেন্নাম করতেই পঞ্চ-ম-কার গুরু গম্ভীর স্বরে হেঁকে বললে—জয় হোক তেমনু।

ব্যোমকেশ বলল—বাবা এই সারদা উকিলের দয়াতেই আজ আমার যা কিছু সব। তাই ওকে আজ আপনার কাছে নিয়ে এলাম......

পঞ্চ-ম-কার বাবা টিপ টিপ করে হেসে বলল—সে আমি দেখেই বুঝেছি। এর ললাটে সৌভাগ্যের জয়টিকা [illegible] করছে। আর এঁর ছত্রছায়ায় তোমার সব কালো রাস্তা আলো হয়ে আছে।

ব্যোমকেশ খানিকটা হেঁ হেঁ হে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল—যা বলেছেন। যাকগে বাবা, আমাদের এই সারদা উকিল ওর দুটো হাঁটুতে একটা পুরোনো ব্যথায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। আপনি যদি দয়া করে—

সঙ্গে সঙ্গে বাবার সশব্দ প্রতিবাদ—আমি কে রে? দয়া মা স্বয়ং করবে। কিন্তু সবার আগে চাই বিশ্বাস। এর মধ্যে পুঞ্জীভূত অবিশ্বাস বিরাজ করছে যে—

সারদা উকিল এতক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পঞ্চ-ম-কারের দিকে। ব্যাটা ধরা পড়ে গেছে। সারদা উকিলের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যাবে—এ তল্লাটে তেমন ক্রিমিন্যাল কোথায়? তবু মনের ভাব গোপন করে সারদাচরণ বলল—আমাদের আইনের প্রথম কথাই সব কিছুর প্রতি অবিশ্বাস। তারপর আইনের কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করে নিয়ে তবে বিশ্বাস......

যেন তবলায় চাঁটি। গুড় গুড় করে উঠছে ডায়লগ। পঞ্চ-ম-কার মুহূর্তে বুঝতে পারে—এই জোচ্চোর, নির্ঘাৎ ছদ্মবেশটা ধরে ফেলেছে। আজ আর তাহলে রেহাই নেই।

ছবিটা কমেডি। মূল কাহিনী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের। এখন [illegible] নামে ছবি হচ্ছে। এতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, তিলক চক্রবর্তী, মহুয়া রায়চৌধুরী, আরতি ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ, [illegible]কুমার জহর রায়, চিন্ময় রায়, তরুণকুমার, [illegible] শেফালী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ।

স্টুডিও সংবাদদাতা

বোম্বাই ফিলিমের কড়চা

চিন্টু-নীতুর ব্যাপারটা যে এই মুহূর্তে কি অবস্থায় আছে বলা মুশকিল! রফু চককরে এখনও দাড়ানো ঘুরছেতো বটেই, তবে একটু আড়ালে আবডালে। মাঝে মধ্যে দুজনের মধ্যে মান অভিমানের পালাও চলছে কম না! এই পালার পাল্লায় পড়ে অবশ্য দুজনে মাঝে মধ্যে মুখ বদলও করছে! চিন্টুর ছোকছোঁক বাইতো আর কমেনি—ওটা তো প্রায় জন্মসূত্রে পাওয়া।

নীতুও আশেপাশে কম লোক ঘুরছে না! সুযোগ পেলেই হাত বাড়ায় তারা, এইতো কিছুদিন আগে 'দুনিয়া মেরি জেব মে' ছবির মহরতের সময় হবু (?) শ্বশুরের সঙ্গে মাখামাখি কম করেনি। আশেপাশে অবশ্য চিন্টু ছিল না। কাক্কার সামনে থাকবে কি করে, লজ্জা করবে না!

শোনা যাচ্ছিল চিন্টু নাকি আর নীতুর ডাকে তেমন সাড়া দিচ্ছিল না। যেমন সাড়া দিচ্ছিল নীলম মেহরা পরভিন বাবীদের ডাকে। নীতুতো রেগে কাঁই। উচিত শিক্ষা দেবার জন্য সুযোগ খুঁজছিল সে। এই ছবির মহরতে শশী কাপুরকে পেয়ে আর দেরী করে নি। একটু বেশী ঘনিষ্ঠই হয়েছিল নীতু শশীর সঙ্গে। শশী কাপুরও সাড়া দিয়েছেন রীতিমত কারণ দিওয়ার ছবিতেই যে নীতুর ছোঁয়া পেয়েছেন। ভুলতে পারেন নি সেই দিনগুলোর কথা। নীতু একহাত এগিয়ে এলে শশী দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আসলে শশী কাপুর জানতেন না নীতুর এইরকম ব্যবহারের প্রকৃত কারণটা কি। সুতরাং গলে পড়েছিলেন প্রায়। আর নীতুও একটা ব্যাপার বোধহয় জানে না যে মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্টনাষ্টি করার ব্যাপারে বোম্বাই হিরোদের কি সুনাম! ডব্বুর বৌ ববিতার সঙ্গে রাজ কাপুর ছবি করার সময় নিশ্চয়ই তিনি মনে কিছু রাখতেন না যে তার সঙ্গে ডাব্বুর বিয়ে হবে। সে এখন বড় বউমা হয়েছে রাজ কাপুরের। অতএব নীতু শশী কাপুরের সঙ্গে যতই 'ইয়ে' করুক না [illegible] পাত্র ও ভাবছে —যা [illegible] —আমাদের [illegible] সঙ্গে কাজে— [illegible] আছে কেউ না। [illegible] প্রতিক্রিয়ায় [illegible] একটু বেসামাল হয়ে চিন্টু কারও শাড়ী ধরে টান মারে বা কারও কোমর জড়িয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে—নীতু, তোমার কোনো চিন্তার কারণ নেই। জানবে চিন্টু তোকে শুধু নাচাচ্ছেই। আর কিছু নয়।

*

ধরম-হেমার খেলাটা এখন জমেছে মন্দ না। মাঝখানে কিছুদিন বিদ্রোহিনী হয়ে হেমা মার কথাটথা তেমন শুনছিল না। রামানন্দ সাগরের 'চরস' ছবির বিদেশের আউটডোরে সে একাই গিয়েছিল। ধর্মেন্দ্র ছবির নায়ক। সুতরাং সুটিং-এর প্রথম-মধ্য-অন্তিম তিন পর্বেই প্রেমের খেলা জমেছিল খুব। 'একেবারে কবুতর মত'—'চরস' ইউনিটের একজনের মন্তব্য। মার আবার এতখানি মাখামাখি পছন্দ নয়। ধর্মেন্দ্র-হেমা ভালো জুটি, ছবিগুলো পয়সা পায়। সুতরাং দুজনে একসঙ্গে কাজ করা। প্রেম-ট্রেম আবার কি!

তাই হেমার মার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর লুকোচুরি খেলা চলছে যেন এখন। হেমাও এতে বেশ মজা পাচ্ছে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে

হেমার সব প্রোডিউসারদের ধর্মেন্দ্র বলে বেড়াচ্ছে হেমা ছবিতে থাকলে আমি ক্ল্যাপার বয় হতে রাজি।

ঠিক এমনি এক ছবি 'জিনদানে'-র মহরৎ হোল কিছুদিন আগে। দু' বছর ধরে এ-ছবি নিয়ে রগড়ঘগড়ি চলার পর সত্যিই শুরু হোল কাজ। নায়ক শশী কাপুর দ্বিতীয় নায়ক ফিরোজ খান অর সব অতিথি-অভ্যাগত ঘড়ির কাঁটায় টাইমে হাজির। ধর্মেন্দ্র হাঁপাতে হাঁপাতে (যদি ক্ল্যাপ কেউ দিয়ে দেয় সেই ভয়ে বুঝি) হাজির একটু দেরীতে। হেমার টোল-পড়া হাসি-হাসি মুখখানার জন্য তাকায় সে চারদিকে। কিন্তু কোথায় সে হরিণ-নয়নী। নেই কোথাও। আসেনি হেমা মহরতে। ধর্মেন্দ্রর তখন লজ্জায় আমসি হবার অবস্থা। যার জন্য এতদূর পথ ঠেঙিয়ে আসা সেই-ই নেই। ধরম তখন গরম। বিনা বাক্যব্যয়ে গম্ভীর মুখে মহরতটি সেরে হাওয়া। পরের ছবি মোহনকুমারের 'বাপ বেটা'র দিনেও একই অবস্থা। নায়ক শশী কাপুর প্রোডিউসার সকলেই অপেক্ষা করছেন হেমা মালিনীর জন্য। অতর্কিতে সেটের কার্টেন সরিয়ে একবার দেখা দিয়েই তিনি আবার কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। ধর্মেন্দ্র সেদিনও দেখতে পেল না প্রাণ-প্রিয়াকে। জানি না তারপর রাত্রিতে শেরাটনের কোলে লোকেশানে তাঁরা দেখা করেছিলেন কিনা!

ছায়ারূপা প্রোডাকশনের ব্যানারে সম্প্রতি 'নেগেটিভ' নামে একটি ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। এ-ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার হচ্ছেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন সামিত ভঞ্জ বঙ্কিম ঘোষ রবি ঘোষ ছায়া দেবী অমর গাঙ্গুলী সাধনা রায়চৌধুরী দিলীপ রায় গৌর শী এবং নবাগত কিশোরী শিল্পী নবীনা। চিত্রদর্শী নামে গঠিত এক গোষ্ঠীর আড়ালে ছবিটি পরিচালনা করছেন যথাক্রমে রণজিৎ সিকদার গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ এবং রাম গাঙ্গুলী। চিত্রগ্রহণ করছেন ক্যামেরাম্যান তপন বাগচী। প্রধানতঃ আউট-ডোরে এখন এই ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

•

নাট্যকার - অভিনেতা তরুণ রায়ের লেখা মঞ্চ-সফল 'পরাজিত নায়ক' নাটক অবলম্বনে সম্প্রতি 'অবতার' নামে একটি ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ করেছেন নবাগত পরিচালক সৈকত ভট্টাচার্য। আউট-ডোরে এই ছবির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন পরিচালক। এ-ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী চক্রবর্তী অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং ঈপ্সিতা রায়। চিত্রগ্রহণ এবং সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে তপন গুহঠাকুরতা ও গঙ্গাধর নস্কর।

অত্যাচার/অনিতা সিং

মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনীতে সম্প্রতি যাত্রিক গোষ্ঠী 'অধিকার' নামে যে ছবির চিত্রগ্রহণ করছেন গত সপ্তাহে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে এ-ছবির প্রযোজক অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন যে ছবির নাম পরিবর্তন করে সম্প্রতি 'মোমবাতি' রাখা হয়েছে। আসলে এই নামেই মহাশ্বেতা দেবী কাহিনীটি লিখেছিলেন। ছবির কাজ প্রায় বারো আনা শেষ। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার সুপ্রিয়া দেবী অনিল চট্টোপাধ্যায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় দিলীপ মুখার্জী নন্দিতা বসু ছায়া দেবী মাস্টার অর্ঘ অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে প্রভৃতি শিল্পী। চিত্রগ্রহণ করছেন অনিল গুপ্ত সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ।

যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত 'সেনা ফকর কাবারে' ছবির কাজ একটানা ছাব্বিশ দিন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে চলার পর মাত্র বিগত সপ্তাহে শেষ হয়েছে। এই দীর্ঘদিন শুটিং-এর ফলে ছবির প্রায় আশি ভাগ চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হল বলে ছবির উদ্যোক্তারা জানালেন। এতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার মিঠু মুখার্জী শিপ্রা মিত্র অসিতবরণ হারাধন ব্যানার্জী কুমার গাঙ্গুলী সুমিতা বিশ্বাস কল্যাণী মন্ডল গীতা দে কল্যাণ চ্যাটার্জী ছাড়া আরও অনেকে। চিত্রগ্রহণ সম্পাদনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী এবং নচিকেতা ঘোষ। নৃত্য পরিচালনা করেছেন বোম্বের বদ্রীপ্রসাদ। এ-ছবিতে মান্না দে মোট সাতখানি গান গেয়েছেন আর প্রত্যেকটি গানে ঠোঁট মিলিয়েছেন উত্তমকুমার।

শাবানা আজমি

'অঙ্কুর' আর শাবানা আজমি। এই দুটো নামকে কি আলাদা করা যায়? 'অঙ্কুর' ছবির সঙ্গে শাবানার যে সম্পর্ক তাকে দুভাগ করে কার সাধ্যি। পরিচালক বেনিগলও বোধহয় পারবেন না।

যদিও প্রথমটায় ঠিক ছিল ওয়াহিদা রেহমান এই চরিত্র করবেন, কিন্তু হঠাৎই গেল সব পাল্টে। ওয়াহিদার জায়গায় এলেন শাবনা। পরিচালক ভুল করলেন কি ঠিক করলেন সেটা তখন আর ভাববার সময় ছিল না। স্যুটিং শুরুর আর মাত্র ক'দিন বাকি, ইতিপূর্বে ইনস্টিটিউটের দু-একখানা ছোট্ট ছবিতে শাবানাকে মন্দ লাগেনি বেনিগাল সাহেবের। সুতরাং আর কিন্তু নয়। ইউনিট নিয়ে চলে গেলেন হায়দ্রাবাদ। শহর থেকে একটু দূরে এক-টানা বত্রিশ দিনে 'অঙ্কুর' ছবির কাজ শেষ করে ফিরলেন। রিলিজ নিতে যা সময় লাগলো। আর তারপরই শুরু হোল শাবানা জয়জয়কার। শ্যাম বেনিগালও কম খ্যাতি পেলেন না। কিন্তু শো-বিজনেসের ব্যাপার আর কি! শাবনার প্রশংসা আর গুণগানে ভরে উঠল ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি। 'অঙ্কুর' ছবিখানি যত না খ্যাতি কুড়োল, তার চাইতে অনেক বেশী আদর পেলেন শাবানা আজমি।

স্বাভাবিকভাবেই সু-অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসবে সেই শাবনা আজমি বি এফ জে এ-র সেরা শিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার নিতে সম্প্রতি তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। ছিলেন মাত্র কয়েকঘণ্টা। আলাদা করে দেখা করব ভেবেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই সময় বের করতে পারলেন না। দুঃখ করে বললেন—'কলকাতাই দেখা হোল না।' হরিণ চোখে হাসির ঝিলিক তুলে বললেন—'রাত্রিবেলা ডিনারে তো থাকছেন, তখনই কথা হবে।'

'তথাস্তু' বলে আমি রাজী।

ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে বেরোনোর পর একাধিক প্রোডিউসার ছবির অফার নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কাছে। কিন্তু এককথায় প্রায় সব অফার তিনি নাকচ করেছেন। মুখের ওপর পরিষ্কার ... আলতু-ফালতু চরিত্রে ... কাইন্ডলি আসবেন না ...

ইতিমধ্যে 'অঙ্কুর' ... রিলিজের আগে ... লোকই দেখেছেন ছবি। ... অনেকের দ্বিমত থাকলেও ... সকলেই এক গলায় প্রশংসা করেছেন ...

দেবানন্দ বলেছেন : এই মেয়েটিকে ... রাখুন, দারুণ অভিনেত্রী ...

শশীকাপুর : অসাধারণ একটা জিনিস আছে এই মেয়েটির মধ্যে।

শর্মিলা ঠাকুর : ভয়ানক চমৎকার ও ... মুখখানা।

রণধীর কপুর : দারুণ মেয়ে শাবানা ... ওর নিশ্চিত।

রাখী : শাবানার মুখখানা ভয়ানক ...

ওর সতীর্থরাও স্বীকার করেন যে শবানা সত্যিই একজন প্রতিভাশালী শিল্পী।

গ্রিংস হোটেলের ব্যাঙ্কয়েটে বসে ভাবছি শাবানা তো আসছে একটু বাদেই, প্রশ্ন কি করব। ওর সম্পর্কে খুব একটা জানা-শোনাও আমার নেই।

পরিচালক মৃণাল সেন এ-ব্যাপারে

আমায় সাহায্য করলেন অনেক। ও'র কাছ থেকেই শুনলাম শাবানার বাবা কাইফি আজমির গল্প। কাইফি আজমি তখন কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার। ঐ পার্টি তখন নিষিদ্ধ ভারতে। কলকাতায় এক গোপন জমায়েতে কাইফ সাহেব উদাত্ত কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা পড়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন আসর। সবে আসর জমেছে, তখনই শুরু হয়েছিল পুলিশী হামলা। ছদ্মবেশ নিয়ে লুকিয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি কলকাতা ছেড়ে। শাবানা তখন শিশু মাত্র। মৃণালবাবু শাবানাকে এসব কথা বলতে তিনি বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন 'কার মেয়ে আমি দেখছেন!'

মৃণালবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন যে শাবানা এসে আমাদের কজনার মধ্যে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। পরনে লালপেড়ে শাড়ি, কপালে টিপ, হাল্কা করে ক্রিম মাখা মুখে। ঠোঁটের লিপস্টিক একটু চড়া রংয়ের লাল। এক নজরে অঙ্কুরের লছমী হিসাবে চিনতে অসুবিধে হয় না।

আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—'নিন আপনার ইন্টারভিউ, আমি রেডি।'

ইন্টারভিউ আর নেবোটা কি! চারদিকে তখন লোক ছড়িয়ে আছে। ইন্টারভিউ নেবার মতো পরিবেশই নয়। এপাশ-ওপাশ থেকে পারম্পর্যহীন প্রশ্ন আসছে হাসিমুখে জবাব দিয়ে যাচ্ছেন শাবানা আজমি। হিন্দী আর্ট ফিল্ম—শ্যাম বেনিগালের পরবর্তী ছবি—শশী কাপুর—ইন্দু শেখর কাপুর—প্রসঙ্গই বাদ নেই।

হাজারো প্রশ্নের মুখে তিনি স্থির, নিশ্চল। মুহূর্তের জন্য অশান্ত নন। ওয়েটার এসে সরবতের ট্রে ধরাতে টম্যাটোর গ্লাসটি আলতো হাতে তুলে নিলেন। উইশও করলেন হাসিমুখে। পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এলেন আলোচনায়।

মনের মত প্রশ্ন করতে পারছি না। সময় চলে যাচ্ছে। একান্তে কিছু সময়ের জন্য কি করে যে শাবানাকে পাব ঠিক করতে পারছি না। এখানে বুফে ব্যবস্থা, সুতরাং এরকম অবস্থা তো হবেই।

ইতিমধ্যে সরবতের পালা শেষ হোল। জানলাম ডিনার রেডি। প্লেটে খাবার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চলুন, ঐ কামরাটায় গিয়ে বসি।' অনেকেই তখন খাওয়ায় ব্যস্ত। বুঝলাম এই সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ।

শাবানা আজমি লছমীর ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন আমার সঙ্গে, ধীর পদক্ষেপ। সাবধানী চোখ চারদিকে সজাগ। খাবার ভর্তি প্লেটটা সামনের টেবিলে রেখে উনি বললেন—বলুন, আপনার কি জানার আছে?

সাধাসিধে প্রশ্ন কিছুতেই মাথায় আসছে না। চলতি প্রশ্ন করেও তো আরও চলতি জবাব পাব। সুতরাং মাংসের টুকরোর কাঁটা ঢোকাবার আগে মুখ থেকে বেরোল—অভিনয় কেন করেন বলতে পারেন?

চকিতে একটু বড় চোখ করে তাকালেন আমার দিকে। হাতের খাবার হাতেই রইল। ভাবলেন একটু। মনে হোল জুতসই উত্তরটা ভেবে নিচ্ছেন, নিলেনও তাই। ভাতের চামচটা মুখে তুলে বললেন—'ইন সার্চ অফ সেলফ বলতে পারেন। নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে করতে নিজের অনেক অজানা সেলফগুলো জানতে পারি, ফিলিংসগুলো বুঝতে পারি। এগুলোতে আনন্দ কম নেই। অভিনয় করে আনন্দ পাই অনেকে বলেন, আমার মনে হয় এটাই সেই আনন্দ।'

—অর্থকরী ব্যাপারটা?

: ওটা তো আছেই। আমার কাছে অভিনয়ের ফার্স্ট ইন্টরেস্ট হচ্ছে ঐ আনন্দটা, টাকা পরে।

খুব আলতো ভঙ্গিতে কথার তালে তালে চামচটা মুখে উঠছে প্লেটে নামছে। মুখের হাল্কা প্রসাধন যাতে খারাপ না হয়ে যায় সেদিকে কড়া নজর। ন্যাপকিন দিয়ে মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটো মুছে নিচ্ছেন। চুপচাপ দেখছি, আর তৈরী হচ্ছি পরের প্রশ্নের জন্য।

—ইনস্টিটিউটের পড়াশুনো আপনাকে কতখানি সাহায্য করছে, এইসব কমার্শিয়াল ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে?

প্রশ্নটা শুনে একটু বিরক্ত হলেন মনে হোল। 'কমার্শিয়াল' শব্দটা সম্পর্কে ঘোর আপত্তি তাঁর। সব ছবিই তো ব্যবসা করার জন্য তৈরী হয়। 'অঙ্কুর'ও সেইসব কথা ভেবে করা হয়েছে। ব্যবসা সব ছবি করতে পারে না—সেটা আলাদা কথা। ওঁর আপত্তি শুনে বললাম—'ঠিক আছে, কমার্শিয়াল নয়, চলতি একঘেয়ে হিন্দী ছবির কথাই বলুন তাহলে।'

একটু শান্ত হলেন। খাওয়া চলতে লাগল। এক সময় শ্যাম বেনিগাল নিজে এসে তদারকি করে গেলেন ও'র খাবার। উত্তরে সহাস্যে বললেন—'খুব হি সমঝদারসে পহেলে।'

মুখ ফেরালেন আমার দিকে। আগামী ছবিগুলোর তালিকা দিয়ে বললেন—'প্রত্যেকটা ছবির প্রতিটা চরিত্রই আলাদা। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই।' এবং চলতি হিন্দী ছবির ধাঁচে নাকি এর একটিকেও ফেলা যাবে না। (সব হিন্দী ছবির পরিচালকরাই এখন 'ভালো' ছবি করার চেষ্টা করছেন!) খাবার প্লেটটা নীচে রেখে ন্যাপকিন দিয়ে হাত মুছতে মুছতে কাজে এলো—শাবানা বললেন : 'অঙ্কুরের সাফল্য আমাকে অনেক খ্যাতি দায়িত্ব দিয়েছে। ছবি সিলেকশনের সময় এবং অভিনয় করার সময়ও এই দায়িত্বের কথা মনে রাখতে হয় আমাকে। ইনস্টিটিউটে অভিনয়ের যেটুকু শিখেছি তার সবটাই কাজে লাগাতে চেষ্টা করি সুযোগমত।'

খাওয়া শেষ। হাতে হাতে আইসক্রীম এলো। আর এলো কয়েকজন ফটোগ্রাফার। তাঁদের হাতে তখন খাবার প্লেট নেই, ক্যামেরা। হাসিমুখে তাঁদের নির্দেশমত দাঁড়ালেন শাবানা। বসলেন। মার্গিস, শ্যাম বেনিগাল, মৃণাল সেনকে ডেকে ছবি তুললেন। ঠোঁটের হাসি মুহূর্তের জন্যও হারিয়ে যায়নি।

এই কিছুক্ষণ আগে রবীন্দ্রসদনেও তাঁকে দেখেছি একইভাবে হাজারো গুণমুগ্ধকে অটোগ্রাফ দিতে। উত্তমকুমার-রাজেশের সঙ্গে গল্প করতে। এখানেও সেই একরূপ।

বিনয়ীর চেহারা নিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ করছেন, কারও পাশে বসে হাসি-মস্করার ছররা তুলছেন। লছমী শাবানা হয়ে যাচ্ছে। আমি ঐ ভিড় থেকে সরে এসেছি। শ্যাম বেনিগালকে ফাঁকা পেয়ে একটি কথাই জিজ্ঞেস করলাম—শাবানাকে অভিনেত্রী হিসাবে কেমন মনে হয় আপনার?

জবাব এলো একটি শব্দে—সুপার্ব।

স্থিরগতির নদীর মত স্নিগ্ধ চেহারা নিয়ে শাবানা আজ তাই বম্বেতে যৌবনের ঢল নামানো নায়িকাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ। দেখা যাক কে জেতে!

নির্মল ধর

নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী

হাজারীবাগ গেছেন একবার বেড়াতে। অন্য দিন সকলের সঙ্গে যায়। এদিন কাউকে না জানিয়ে একাই আপনমনে পাহাড়ের শৃক বেয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া পথ বেয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সুষমা দেখতে দেখতে ছুটে চলেছেন। অন্যমনস্কতায় কখন যে চড়াই থেকে উৎরাইর ভিন্ন পথ বেয়ে হেঁটে চলেছেন খেয়ালও নেই। হঠাৎ উঠলো ঝড়। সম্বিত ফিরে এলো। কোন পথে বাড়ী ফিরবেন! দিশেহারার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এদিক-ওদিক তাকাতেই দৃষ্টি পড়লো পাহাড়িয়াদের বস্তির দিকে। অগত্যা আশ্রয় নিলেন তাদের একটি কুটিরে। ওরা ত সবাই বিনোদিনীকে পেয়ে খুব খুশী। আদর-যত্ন করে বসতে দিল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ তোর কোন ভয় নেই। রাত্রে থাকবি তারপর সকালে দেবো পৌঁছে।

মনে মনে বিনোদিনী ত অস্থির হয়ে উঠেছেন। ওদিকে সঙ্গী অভিভাবকেরা মশাল নিয়ে ঝড়ের মধ্যেই লোকজনদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বিনোদিনীর সন্ধানে।

ঝড় থামলো। বিনোদিনী পাহাড়ীদের বুঝিয়ে তাঁকে বাসায় পৌঁছে দিতে অনুরোধ করলেন। ওরা পৌঁছে দিল বিনোদিনীকে তার আস্তানায়।

অভিনয় করতে যেয়ে বা প্রমোদভ্রমণে এক-একবার এক একটি কান্ড করে বসেছেন বিনোদিনী। প্রমোদ-ভ্রমণের আনন্দই বেরিয়ে যেত বিনোদিনীর কাণ্ডকারখানায়।

অভিনয়ের সময়ও অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনায় পড়েছেন বিনোদিনী। বেঙ্গল থিয়েটারে থাকার সময় কৃষ্ণনগরে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে মেঘনাদ বধ নাটকেরও অভিনয় হয় আর বিনোদিনী ত অভিনয় করতেন প্রমীলা চরিত্রে। বেঙ্গল থিয়েটারে বহু নাটকে ঘোড়ায় চড়ে অভিনয় করতে হতো। শরৎচন্দ্র ঘোষ নিজেও ঘোড়ায় চড়ে অভিনয় করতেন। তাঁর সুশিক্ষিত ঘোড়া ছিল, শরৎবাবুর ঘোড়াটি এমনই সুশিক্ষিত ছিল যে, প্রতিদিন একতলা থেকে নির্দিষ্ট সময়ে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে ঠাকুরঘরের কাছে যেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। শরৎবাবুর মা পূজো করে ফুলবেলপাতা আর প্রসাদ খেতে দিলে খেয়ে তাঁকে প্রণাম করে নীচে চলে আসতো। প্রমীলা চরিত্রে একটি দৃশ্যে অশ্বপৃষ্ঠে বিনোদিনী মঞ্চে আবির্ভূতা হতেন। মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় কাঁচা মাটি ঘোড়ার পায়ে ধসে যায়। টাল সামলাতে না পেরে বিনোদিনীও পড়ে যান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। অভিনয় তখনও বাকী। পড়ে গিয়ে এমনি আঘাত পান যে আর উঠতে পারেন না। সবাই ছুটে এসে তাকে তুলে নিয়ে যান গ্রীনরুমে। ছোটবাবু ছুটে আসেন। ওষুধ খাইয়ে, ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে বিনোদিনীকে একটু সুস্থ করে তুলে চারুবাবু তার গা-মাথা হাতিয়ে মিষ্টি কথায় বাকী অভিনয়টুকু করে দিতে বলেন। চারুবাবুর অনুরোধ বিনোদিনীর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কমলীশ মুখোপাধ্যায়

বৈজয়ন্তীমালার চণ্ডালিকা ঃ আগামী ৮, ৯, ১০, ১১ ১২ ও ১৩ জুন সন্ধ্যা সাতটায় কলামন্দিরে বৈজয়ন্তীমালার চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হবে।

বিপ্লব বহ্নি

প্রযোজনা ঃ শান্তিগোপাল। তরুণ অপেরা। রচনা ঃ অনল গুপ্ত। পরিচালনা ঃ সমীর মজুমদার। সুর ঃ দুর্গা সেন। অভিনয়ে ঃ শান্তিগোপাল (রাসবিহারী বসু) গৌতম সাধুখাঁ, বিশ্বনাথ দত্ত কৃষ্ণ মণ্ডল, সত্যব্রত মুখার্জি, দুলাল দত্ত, অমর ভট্টাচার্য হিমাংশু দাস, অজিত দত্ত, সাধন চ্যাটার্জি, পঞ্চানন ব্যানার্জি শিব ভট্টাচার্য,

নন্যা নাগ, মণিমালা বসু প্রভৃতি। নব নব ৃষ্টিসম্ভারে তরুণ অপেরা পশ্চিমবাংলার াত্রাশিল্পকে নানাদিক দিয়ে শ্রীমণ্ডিত করে ুলেছেন। জীবনীনাট্যে তরুণ অপেরার বদান অনস্বীকার্য।

হিটলার লেনিন, নেপোলিয়ন, কার্ল-ার্কস, মা-ও-সে-তুং প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ্রিত্রের সঙ্গে রাজা রামমোহন ও আমি ুভাষ জাতীয় চরিত্রের নাট্যরূপ দিয়ে তরুণ অপেরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রতিটি নাটকের নামভূমিকায় শান্তিগোপালের অনন্যসাধারণ অভিনয় যাত্রামোদিদের বিস্ময়াভিভূত করেছে।

বিপ্লববহ্নি নাটকটি গড়ে উঠেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহান বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর জীবননাট্য তথা তদানীন্তনকালের বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ নিয়ে। নাট্যকার অনল গুপ্ত পরম নিষ্ঠায় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে তুলে ধরেছেন। রাসবিহারী ঘোষের চরিত্রে শান্তিগোপাল অপূর্ব দক্ষতায় মহান চরিত্র-টিকে রূপায়িত করে তুলেছেন। ইতিপূর্বে-কার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির রূপদানে চরিত্রের রূপসজ্জা তাকে সাহায্য করেছে অনেকখানি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সে সুযোগ ছিল না। এক্ষেত্রে শুধু অভিনয়-ক্ষমতা ও অভিব্যক্তি দ্বারাই শিল্পীকে মূল চরিত্র এবং ভাবধারাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিনেতার আঙ্গিক

জুলি বিক্রম। লক্ষ্মী

শক্তির পরিচয়ই বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই তাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রে অমর ভট্টাচার্য, গৌতম সাধুখাঁ, শিব ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ দত্ত, অনন্যা নাগ, মণিমালা বসু, হিমাংশু দাস সবাই স্ব স্ব চরিত্রের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। অতিরঞ্জন যতটুকু চোখে পড়েছে যাত্রাভিনয়ের পথে তা অশোভন নয়।

পরিচালনায় সমীর মজুমদার প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা দৃশ্যটি এড়িয়ে যেতে পারতেন। অন্যান্য দৃশ্যে তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। আবহসংগীত সমগ্র নাটকের ভাবধর্মকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে।

তরুণ অপেরার বিপ্লববহ্নি আজকের তরুণ সমাজের সামনে বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে নতুন করে উদ্ঘাটন করেছে। নাটকটির বহুল অভিনয় কামনা করি।

রামী চন্ডীদাস অভিনয়

প্রখ্যাত সুরকার ও বংশীবাদক গোপালচন্দ্র গোস্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাগবাজারের অন্তরঙ্গ সংস্থা তাঁরই সুরারোপিত রামী-চন্ডীদাস নাটকটি ১২ এপ্রিল নববৃন্দাবন মন্দিরে অভিনয় করেন। প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে কবি চন্ডীদাসের জীবন কাহিনী এ নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অভিনয় আরও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। ছোট ছোট চরিত্রগুলি বিক্ষিপ্ত ও নাটকের সুর ঠিক মত ধরে রাখতে পারে নি। কিন্তু কয়েকটি মুখ্য চরিত্র চন্ডীদাস দুর্লভ রায় ভূতানন্দ নিমু সুচেত সিং হারাধনের ভূমিকায় চন্দ্রশেখর দে বিজয় মুখার্জী অনিল ঘোষ সুধাংশু মুখার্জী হর্ষ রায়চৌধুরী চরিত্রানুগ অভিনয় করে সকলকে আনন্দ দেন। এছাড়া রামী নিত্যা ও চাঁপার ভূমিকায় সুনীতি দাস ও অন্যান্য মহিলা শিল্পীরা সুঅভিনয় করেন। সঙ্গীতাংশ মোটামুটি। পরিচালনা করেন শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মুখার্জী।

এই স্মৃতি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডকটর শ্যামসুন্দর ব্যানার্জী। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী গোপালচন্দ্র গোস্বামীর সাধনার ইতিহাস বিবৃত করে অমর সুরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

—নাট্যসমালোচক

নৃপতি চট্টোপাধ্যায় বিদায় নিলেন

বিগত ২৭ মে দুপুরবেলা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাংলা নাট্যমঞ্চ ও চলচ্চিত্র এর প্রবীণ কৌতুকাভিনেতা নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে টালীগঞ্জের বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। উনি তখন মৃত্যুর সংগে প্রাণপণে লড়াই করছেন। ডাক্তার সব রকমভাবে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঐ একই দিন রাত দেড়টায় সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে 'প্রভু' জীবনের অপরপারে চলে গেলেন। মৃত্যুকালে ওঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স হয়েছিল।

তিরিশের দশকের গোড়ায় প্রখ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদার নৃপতি চট্টো
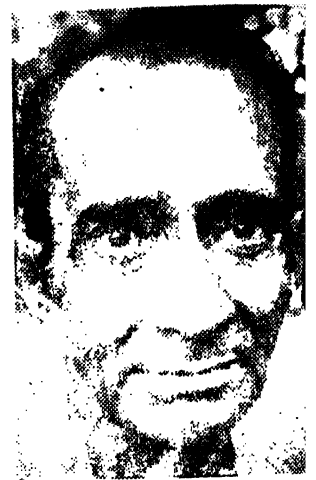
পাধ্যায়কে চলচ্চিত্র শিল্পে নিয়ে আসে। প্রথমে উনি সুশীল মজুমদারের সহকারী হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন। পরে পা... পাকিভাবে কৌতুকাভিনেতা হিসাবে ছ... ছবি ও রঙ্গমঞ্চের জগতে যোগদান ক... উনি এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক ছবিতে অ... নয় করেছেন। 'প্রভু' নামেই চলচ্চি... মানুষেরা ওঁকে আহ্বান করতেন। এই ... করণ করেছিলেন স্বয়ং ছবি বিশ্বাস। নৃ... চ্যাটার্জির মৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্রের অ... ণীয় ক্ষতি যে হল তা বলাই বাহুল্য।

অভিনেত্রী সঙ্ঘ, শিল্পী সংসদ ... রঙ্গলোকের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তরফে ... দিয়ে ওঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ... বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্মশানে উপ... ছিলেন অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখা... শেখর চ্যাটার্জি, ক্ষিতিশ আচার্য, পি... মুখার্জি প্রভৃতি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

হারমোনিয়াম ॥ শিউলি মুখার্জি ॥ ফটো : অমৃত

Regd. No. WB/NC-13
AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 13th June, 197
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
৪ জুলাই ১৯৭৫ ॥
অতিরিক্ত

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা ১

১৫ বর্ষ

৮ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 4th July, 1975 শুক্রবার ১৯ আষাঢ় ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	সেই ফুল সেই পাখি	(গল্প)	শ্রীআনন্দ বাগচী
১৪	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৬	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১৭	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৮	বিল্লু-র অসুখ	(কবিতা)	শ্রীরত্নেশ্বর হাজরা
১৮	স্টুডিওর দরজায়	(কবিতা)	শ্রীঅশোক দে
১৮	একদিন তুমিও জানতে	(কবিতা)	শ্রীঅশোক দত্ত চৌধুরী
১৯	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২২	সুরের আগুন		আশীষতরু মুখোপাধ্যায়
২৪	মৌজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
২৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীজরৎকারু
২৯	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ের পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৫	রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা	শ্রীসুশান্তকুমার মিত্র
৪০	চিঠিপত্র	
৪২	পুনশ্চ	শ্রীক্ষপণক
৪৩	মাছ (গল্প)	শ্রীচণ্ডী মণ্ডল
৪৭	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৪৮	আইরে মালরোর চোখে নারী মুক্তি আন্দোলন	শ্রীদিলীপ মালাকার
৪৯	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৫৩	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীঅজয় বসু
৫৮	খেলাধুলা	শ্রীদর্শক
৬০	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৬২	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৬৪	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা	শ্রীঅভিজিৎ
৬৫	স্টুডিও সংবাদ	
৬৬	সিনেমাটিক টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৮	নাট্যমঞ্চ	মঞ্চসমালোচক
৬৯	যুগোশ্লাভিয়ার ছবি	
৭১	চিত্রসমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৭২	অঙ্গনা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটি মানবিক সমস্যা

কলকাতায় গত সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশের মানা শিবির থেকে তিন-চার হাজার
বাঙালী উদ্বাস্তু এসে পড়ার পর সরকারী মহলে খানিকটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল।
সরকার এবং দেশবাসীও তখন জানতে পারলেন যে, প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের লাখ
খানেক উদ্বাস্তু গত প্রায় দশ বছর ধরে মানার ট্রানজিট শিবিরে বিনা কাজে, বিনা
পুনর্বাসন কেবলমাত্র সরকারী ক্যাশ ডোলের ওপর নির্ভর করে টিঁকে আছে।
এ এক আশ্চর্য সংবাদ। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় এদের দায়িত্ব
নিয়েছেন। অথচ এই মানুষগুলির স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য তাদের বিশেষ মাথা-
ব্যথা নেই। উদ্বাস্তুদের অভিযোগ, তাদের ওপর নানাবিধ জুলুম ও অত্যাচার হচ্ছে।
মেয়েদের ওপর হামলা হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে পুনর্বাসনের নাম করে কিছু লোককে
নিয়ে এমন পাথুরে ও জলহীন জংলা জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে যেখানে লাঙল
চালানো দূরের কথা, গাঁইতি শাবল দিয়েও পাথর নড়ানো যায় না।

এই সমস্ত অভিযোগ সত্যি কিনা সেটা সরকারের যাচাই করা দরকার।
কেননা নিতান্ত নিরুপায় না হলে গোটা শিবির খালি করে ৬০ হাজার মানুষ কলকাতায়
আসবার জন্য রাস্তায় এসে দাঁড়াত না। আশ্চর্যের কথা এই যে, এদের শিবির
ত্যাগে কেউ বাধা দেয়নি। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর স্টেশন চত্বরে এরা অপেক্ষা
করছিল কলকাতাগামী ট্রেনে ওঠবার জন্য। এদের সকলের চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি।
কারণ, হাওড়া স্টেশনে যারা এসেছিল বিশেষ ট্রেনে তাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া
হয়েছে। বাকী লোকগুলো যাতে পশ্চিমবঙ্গে আসতে না পারে তার ব্যবস্থাও করা
হয়েছে। এই উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে। ওরা বলেছে
যে মরতে হয় পশ্চিমবঙ্গে এসে মরব, মানা শিবিরের নরকে আর নয়।

এটা খুবই লজ্জা ও দুঃখের কথা যে, এত দীর্ঘদিন পরও বাঙালী
উদ্বাস্তুদের বকেয়া পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হয়েছেন।
তুলনামূলক বিচারে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত পাঞ্জাবী ও সিন্ধী উদ্বাস্তুরা
সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা, জমিজমা ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ
পেয়ে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই উদ্বাস্তুদের বেলায় তা হয়নি। দণ্ড-
কারণ্য প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য। এখন
সেখানেও ভাগীদার জুটেছে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের স্থানীয় আদিবাসী ও অনুন্নত
সম্প্রদায়। তার ফলে উদ্বাস্তুদের ভাগ্যে পুনর্বাসনের জমি জুটছে না। তাদের
ফেলে রাখা হয়েছে ট্রানজিট শিবিরে। এভাবে এতগুলো লোককে নিয়ে সরকার যেন
ছিনিমিনি খেলছেন। তার ফলে এরা বাধ্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসবার জন্য এমন
মরিয়া হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নিজের সমস্যার অন্ত নেই। তার নিজের ভূমিহীন চাষী
রয়েছে প্রচুর, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায়
বাড়তি লোকের দায়িত্ব গ্রহণ তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অন্যদিকে বাংলাদেশ
থেকে নিঃস্ব লোকেরা চোরাগোপ্তা সীমান্ত পার হয়ে প্রায়ই এদিকে এসে যাচ্ছে,
কিছু পাবার প্রত্যাশায়। তাই উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের আশা করতে
পারে না। তাদের জন্য অন্যত্র ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে চাষের যোগ্য জমি ও জল
আছে। ওদের দিয়ে ছোটখাটো শিল্প-প্রকল্প চালু করার কথাও সরকার চিন্তা
করে দেখতে পারেন। আরেকটি জায়গায় তাদের পাঠানো যায়—আন্দামান। আন্দামানে
আগে যে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছে তারা সেখানে সোনা ফলিয়েছে। বেশ
ভালো আছে তারা। আন্দামানে এখনও প্রচুর জমি পড়ে আছে। এদের শিবিরে
ফেলে না রেখে অবিলম্বে আন্দামানে পুনর্বাসনের কথা সরকারের চিন্তা করা উচিত।
তাতে আন্দামানের উন্নয়নে সহায়তা হবে এবং এই হতভাগ্য লোকগুলোরও একটা
স্থায়ী পুনর্বাসন হবে। সরকার এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে দেখুন।
সমস্যাটা আর ফেলে রাখা উচিত নয়।

শেষ ফোঁড়টায় ফাঁস টেনে দিয়ে সেলাইখানা মুখের কাছে তুলে আনলো শুক্লা, তারপর দাঁত দিয়ে অবলীলায় সুতোটা কেটে ফেলল কুচ করে। ফেলে কি মনে হল, রঙীন সুতোভরা ছুঁচের দিকে কৌতুকের চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক।

শুক্লার দাঁতে খুব ধার, দাঁত দিয়ে সে হয়ত অনেক কিছুই কেটে ফেলতে পারে এমনি করে। কিন্তু কাটে না। কাটতে চেষ্টা করেনি কোনোদিন। তার বাপের বাড়িতে একটা টিয়ে পাখি ছিল, দুদ্দুবার শেকল কেটে উড়ে গিয়েছিল মনে পড়ল। মনে পড়তেই ঠোঁটের ফাঁকের সূক্ষ্ম হাসিটা নতুন ব্লেডের মত ধারালো হয়ে উঠলো। প্রায় অলক্ষ্যে বিপজ্জনকভাবে ঠোঁটে ঠোঁটে খেলা করল, মুছলো না।

কদিন থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে বরেনের জন্যে রুমালটায় কাজ করছিল, এইমাত্র শেষ হল। এক গুচ্ছ ফুল, এক লাইন কথা, আজ এইটে দিয়েই চমকে দেবে বরেনকে। ছেলেমানুষের মত কানামাছি খেলবে পিছন থেকে হঠাৎ এই রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দিয়ে পালাবে। বাধ্য ছেলের মত বরেন চুপ করে বসে থেকে বাঁধন মেনে নেবে। তারপর দুষ্টুমি করে হাত বাড়াবে খুঁজবে, হাতেনাতে ধরবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তখন কোথায় কে? শুক্লা তার নাগালের এক ছিটকিনি বাইরে, বাথরুমে গা ধুতে চলে গেছে।

রুমাল খুলে বরেন কিন্তু অবাক আর খুশীই হবে। রুমালে তোলা ফুলগুলো ছেলেমানুষের মত শুঁকে দেখবে। শুক্লা সেটা জানে বলেই আগে থেকে একফোঁটা আতর দিয়ে রাখবে ওখানে। ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া হলে পর বরেন পড়বে লাইনটা প্রথম মনে মনে, পরে চেঁচিয়ে, বাথরুমের শুক্লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। 'বনে যদি ফুটলো কুসুম', লাইনটা এইটুকুই, একটা গানের ভাঙা লাইন, ভেঙে এনে যেন ফুলের ডাঁটি বানিয়েছে। রুমালটাকে ঘুরিয়ে না ধরলে লেখাটা বোঝা যায় না, মনে হয় ফুলের তোড়ার নকসা করা ডাঁটি বুঝি।

কিন্তু লেখাটা বুঝতে পারা গেলে বলা যাবে সেটা বরেনের ভুলে যাওয়া একটা গানের লাইন। বিয়ের আগে যে গানটা সে প্রায়ই গাইতো বিয়ের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত, এবং মাঝখানে একটি বিশেষ দিনক্ষণ মুহূর্তে এই গানটা গেয়ে সে ঠাট্টায় ঠাট্টায় বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। শুক্লার বন্ধুরা বাসরঘর কাঁপিয়ে একঝাঁক পাখির মতই হেসে উঠেছিল। বরেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে তখন হারমোনিয়ামের বেলো বন্ধ করছিল ডালাটা মুড়ে দিয়ে কোণের দিকের ক্লিপটা এ‍ঁটে দিচ্ছিল। গানের খেইটা অস্পষ্ট হলেও তখনো গলায় ধরে রেখেছে, মিলিয়ে যায়নি।

'মেয়েদের কোরাস হাসিটা থামলে মিত্রা বলেছিল, 'আপনি কালা-কানা নাকি, মশাই, দেখতে শুনতে পান না?'

বরেন আরক্ত মুখে জিগ্যেস করেছিল, 'কেন?'

'নইলে আমরা এতগুলো রঙীন পাখি কিচিরমিচির করছি তবু আপনি গাইছেন— নেই কেন সেই পাখি নেই কেন! একে কি বলে, মশায়?'

মিত্রা খুব মুখফোঁড় মেয়ে, জাতে বদ্যি তো! ওর মুখকে সবাই সমীহ করে চলে। কিন্তু শুক্লার আজ সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। আচ্ছা বোকা তো লোকটা! এমন একটা গান গেয়ে নিজে থেকেই মিত্রার ফাঁদে পা দিয়ে বসলো। ও এখন কি আর সহজে ছাড়বে? হোক পুরনো বান্ধবী, মিত্রার এই গায়ে চড়ও ভাবটা মোটেই ভাল লাগে না শুক্লার। বেশ হত যদি বরেন ওর মুখের মত জবাব দিয়ে দিতে পারতো!

কিন্তু ভাগ্যিস কারো মন কেউ পড়তে পারে না, নইলে শুক্লাকেও এই মুহূর্তে কম মাশুল দিতে হত না। ওরা নির্ঘাত বলতো, বিয়ে অনেককেই করতে দেখেছি বাপু, কিন্তু কাউকেই তোমার মত আদিখ্যেতা করতে দেখিনি। বাবা, একেবারে শুভদৃষ্টিতেই প্রেম। লাভ অ্যাট এ হাফ সাইট! বিয়েটাকে একটু বাসী হতে দে, ফুলশয্যাতক অন্তত গড়াক! লোকটা বোডিং প্রুফ হোক, তারপর ওর হয়ে কথা বলিস!

কাল্পনিক সংলাপেই বান্ধবীদের ওপর ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে উঠেছিল শুক্লা। বেশ করেছি দুর্বল হয়েছি, কটা মেয়ের এরকম বর দেখেছিস তোরা?

তবে সত্যি বলতে কি শুভদৃষ্টির সময়ে নয়, তারও আগে, অনেক আগে যেদিন প্রথম বন্ধুদের নিয়ে বরেন তাকে দেখতে এসেছিল সেইদিনই তাকে দেখে শুক্লা মনে মনে মজে গিয়েছিল। বরেনের চেহারায়, গলার স্বরে, হাসির কায়দায় আর চাউনিতে অবশ করে দেবার মত কিছু আছে। কি আছে শুক্লা আজও জানে না, তবে সেদিন সেই কনে দেখে যাওয়ার পরে শুক্লা নিজের ঘরে দোর দিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। কেঁদেছিল তার কারণ, সে জানতো, এ বিয়ে হবে না। শুধু আগের আগের এবং তারও আগের সব সম্বন্ধগুলোর মতই এটাও ফেঁসে যাবে, শুধু পাওনা-দেনার কথা আর জলযোগের প্রহসনেই শেষ হবে।

একটা লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলে শুক্লা আবার রুমালের কথাটার দিকে তাকাল। বনে যদি ফুটলো কুসুম—।

—হ্যাঁ গো যদি না সত্যি-সত্যি?

বরেনের ঠাট্টাভরা গলা যেন বাথরুমের ওপিঠ থেকে শুনতে পেল। দরজায় পিঠ রেখে ন্যাকা ন্যাকা গলায় শুক্লা জানতে চাইবে।

—কি যদি, কি সত্যি-সত্যি?

—এই বনে আজ ফুটলো কুসুম!

—ফুঃ! সে কি আজ ফুটেছে? তুমি অন্ধ তাই দেখতে পাওনি।

—মাইডিয়ার স্যার! যেমন আছ তেমনি বেরিয়ে এসো তো একবার, তোমাকে দেখি।

—অসভ্য!

—এই! অন্ধ হলেও দরজার এপিঠ থেকেই আমি কিন্তু তোমার সব দেখতে পাচ্ছি!

—অ্যাই অসভ্য লোকটা! ভাল হবে না কিন্তু—

—ছি, ছি! তুমি যে একেবারে ইয়ে হয়ে—

আগামী সংখ্যায় গল্প লিখবেন
শান্তনু দাস

—মোটেই না, মিথ্যুক কোথাকার। এই দ্যাখো!

বোকার মত দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই বরেন খপ করে ধরে ফেলবে ওকে। তারপর—

তারপর শুক্লার দিবাস্বপ্ন ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে টাইমপীসটা কলিংবেলের মতই বেজে চলল। এমন চমকে উঠেছিল যে বুকের ভেতরটা রবারের বলের মতই ধড়াস ধড়াস করে লাফাতে থাকলো। ইস পৌনে ছটা তো বেজে গেল। কিন্তু কই বরেন এসে তো পৌঁছালো না এখনো? অথচ পৌঁছানোর কথা ছিল বিকালের আগেই। তাহলে আজকেও বরেন কথা রাখতে পারলো না ঘরে ফেরার! না কি রাখলো না ইচ্ছে করেই? ঠিক এই দিনে এই মুহূর্তে তাদের বিয়ে হয়েছিল, একথা বোধহয় ভুলেই গেছে বরেন। মিথ্যেই ওকে চমকে দেবার জন্যে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল শুক্লা, কোনো কাজেই লাগল না।

জানালার বাইরে সূর্যাস্তের দিকে চোখ পড়াতে কেমন উদাস হয়ে গেল শুক্লা। ঢালু প্রান্তর পার হয়ে পাহাড়ী নদীটা হরিতকী আর শালের জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। প্রান্তরের মধ্যে ইতস্তত শুধু পাথরের চাঙড়, আর কাঁটা ঝোপ, ক্যাকটাস। তারপরেই ন্যাড়া পাহাড়, সেই পাহাড়ের মসৃণ গা বেয়ে সূর্য যেন সরসরি খেয়ে ওপারে নেমে যাচ্ছে।

এই দৃশ্য প্রায় প্রতিদিনের; গত দু'বছরে যেন মুখস্থ হয়ে গেছে, ওর মধ্যে এখন আর নতুনত্ব কিছু নেই। সূর্যাস্ত এখন ক্যালেণ্ডারের পাতার মত ক্লান্তিহীন ঝুলে থাকা। বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক। এই সূর্যাস্ত শুধু মনে করিয়ে দেয় শুক্লার কিছুই হল না। ঘুরন্ত লাট্টু যেন একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে গেছে এবং দাঁড়িয়ে গিয়ে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। যতক্ষণ দম আছে ঘুরবে একই জায়গায় ঘুরবে। এবং একই দিকে।

অ্যালার্ম বাজা অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুব রাগ হল শুক্লার। ও আগেই জানতো বরেন কথা রাখতে পারবে না। তাই সকালে যখন গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করছিল তখনই বাধা দিয়েছিল শুক্লা। একটা দিনও কি তোমার না বেরোলেই নয়? ছুটির দিনেও কি এত কাজ তোমার! তিনশ পঁয়ষট্টি দিনই তো কেবল কাজ কাজ আর কাজ! অফিসে যারা সপ্তাভর ফাঁকি মারে তাদেরও নীল রঙের লাল রঙের দিন আছে শনিবার রবিবার আছে। মেহনতী মানুষ যারা দমভর কলকারখানায় খাটে তাদেরও ঘরের জন্যে অফ-ডে আছে। কিন্তু তোমার? গোটা দেশোদ্ধারের দায় কি একলা তোমার কাঁধেই চাপানো?

বরেন বুঝেছিল শুক্লা আজ ভয়ানক চটেছে; নইলে এত কথা সে কমই বলে। তাই ওর শিশুর মত সর্বগ্রাসী হাসিটি হেসে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। এই হাসিটির কাছে শুক্লা আজও পরাস্ত। ওর এই দুর্বলতার খবর কি করে লোকটা, ভেতরে ভেতরে জেনে ফেলেছে। তাই সময়ে-অসময়ে আত্মরক্ষার অস্ত্রের মত এই হাসিটা ব্যবহার করে বেঁচে যায় বলা ভাল জিতে যায়।

নরম হয়ে এসেছিল শুক্লা, 'না, তুমি হাসছ! হাসির কথা নয় কিন্তু আজকের দিনটা অন্তত কাছে থাক লক্ষ্মীটি দূরে কোথাও যেও না।'

'সরকারী চাকরির মানে বুঝেছ তো অ্যাদ্দিনে? চাকরস্য চাকর। তুমি রাগ করো না শুক, সদরে আজ জরুরী মিটিং আছে, যেতেই হবে। তোমাকে কথা দিচ্ছি দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসবো।'

এগিয়ে এসে স্টিয়ারিং হুইলে বরেনের হাতের ওপর হাত রেখে প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে শুক্লা বলেছিল, 'মনে থাকবে তো, বর? না মিটিংএর পর আবার কোথাও আড্ডা দিতে বসে যাবে!'

বরেনের নামটা ছেঁটে 'বর' করে নিয়েছে শুক্লা, তার নিজের নাম বরেনের মুখে যেমন হয়েছে শুক। ঝগড়ার সময়ে শুধু তারা পরস্পরের গোটা নাম উচ্চারণ করে, অন্যথায় নয়।

বরেন জিভ কেটে বলেছিল, 'কি যে বল! আজ কখনো আর কোথাও ভুলি?'

অথচ ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা বরেনের কিন্তু খেয়ালই ছিল না দিনটার কথা! ওর মত আত্মভোলা সংসারভোলা মানুষের মনে থাকবার কথাও নয়।

প্রথমবারেই বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েছিল। এবারে অবশ্য কৌশলে সামলে নিয়েছে। খাট থেকে নেমে শুক্লা ওকে প্রণাম করতেই ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। ঠিক দু বছর আগে এই দিনটাতেই তাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের দিনটাকেও স্বামীর মত্ত কেন যে চোখে চোখে আগলে বেড়ায় মেয়েরা কে জানে! বরেন অন্তত জানে না। কিংবা হয়তো জানে। বিয়ে ব্যাপারটাই পুরুষের জীবনে ফাঁদস্বরূপ। সুতরাং চূড়ান্ত মানুষটাকে ফাঁদে ফেলার দিন তো স্মরণীয় হয়ে থাকবেই স্ত্রীর কাছে! হয়ত বরেনের ব্যাখ্যা এই রকম।

ওর প্রতিশ্রুতি আদায় করে শুক্লা খুশীতে আবদার জানিয়েছিল, 'ফেরার সময় বাজার থেকে ডজন দুই স্টিক এনোনা গো?'

গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল বরেন, থেমে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। ওর হাসিতে আহত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে শুক্লা শুধালো 'কী হল? কিছু কি হাস্যকর কথা বলেছি?'

'এ শহরকে তুমি কি ভাব, শুক?' কৌতুকের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বরেন বলল 'একি কলকাতা শহর না আসানসোল? যে রজনীগন্ধার স্টিক বিক্রী হবে দোকানে দোকানে। এখানেও তুমি স্টিক পাবে অবিশ্যি, তবে সেটা 'ফার্মস্টিক', তোমাদের কেজো বাংলায় যাকে বলে খ্যাংরা। যা তোমাদের সারাজীবনের হাতিয়ার!' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল বরেন।

'আজকের দিনেও মুখে একটু বাধলো না?' শুক্লার চোখে অভিমানে জল এসে গিয়েছিল। এদিকে ব্রেক আর অ্যাকসিলারেটারের ওপর বরেনের পা দুখানাও ততক্ষণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। মুখে তবু হাসি ধরে রেখে বলল, 'এই দাও, তুমি যে ডি ভি সি হয়ে উঠলে, শুক!'

কথাটা নতুন, শুক্লা চোখ বড় করে বলল, 'মানে?'

'মানে জল আর বিদ্যুৎ। তোমার চোখে দেখছি দুটোই একসঙ্গে মজুত; এরকম হলে এ বেচারা কিন্তু প্রাণে মারা যাবে।'

'যাও, ঠাট্টা!' কান্নামোছা গলায় শুক্লা হেসে ফেলল।

বরেন আর দেরী করল না। গাড়ি চালু করতে করতে বহু পুরনো একটা গানের লাইন শিস দিয়ে বাজাতে থাকল। এই লাইনটা আগেও কখনোসখনো আবদারের ছলে শুক্লাকে গেয়ে শুনিয়েছে। এখন শিসে বাজাচ্ছে। বরেন খুব ভাল শিস দিতে পারে, প্রায় বাঁশির মত।

পৃথিবী আমারে চায়। রেখোনা বেঁধে আমায়। খুলে দাও প্রিয়া। খুলে দাও বাহু ডোর।

শুক্লা কিছু মন্তব্য করল না শুধু এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। নিমেষ মধ্যে গলানো কথাগুলো তপ্ত সীসের মত তার বুকে এসে লাগল। জীপগাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করেছিল, এবার এঞ্জিন যেন বার দুই গলা খাঁকারি দিয়ে সিরিয়াস হল স্পীড নিল। হুইলের ওপর ঝুঁকে ঘাড় ফিরিয়ে বরেন তার হাতের আঙুল সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে নেড়ে দিল। জবাবে শুক্লা হাত তুলতে গেল কিন্তু হাত উঠল না।

স্মৃতি রোমন্থন কিন্তু বন্ধ হতে বিলম্ব হল না। বাংলোর চৌকিদার সদরে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। কে এল দেখবার জন্যে শুক্লা বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে এল। বাইরের আলো একেবারে মরে এসেছিল, ঘরের মধ্যে ছায়া জমতে শুরু করেছে।

লোকটাকে প্রথমে বাঙালী বলে চিনতে পারেনি শুক্লা। শুক্লার দোষ নেই, লম্বা চওড়া ওই চেহারার সঙ্গে গালপাট্টা দাড়ি এবং পাজামা পাঞ্জাবীর ভিনদেশী ছাঁদ যে কোনো মানুষকেই প্রতারিত করবে প্রথম নজরে। তার ওপরে হাতে কাবুলীওয়ালাদের মত মোটা বেতের লাঠি এবং মুখে উর্দু জড়ানো জড়োয়া হিন্দী!

'কি হয়েছে সুখেশ্বর, ইনি কি বলছেন?'

ইউ পি প্রদেশী সুখেশ্বর তার [illegible] বাংলায় যা ব্যক্ত করলো তার সারাংশ এই। ভদ্রলোক কি করে জানতে পেরেছেন এবাড়িতে টেলিফোন আছে, তাই ফোন করতে চাইছেন।

শুক্লা কিছু মন্তব্য করার আগেই লোকটা বলল, 'আঃ বাঁচালেন। আপনারা বাঙালী। তাহলে আপনাদের দরকারটা বোঝাতে পারবো। আসলে কি জানেন, ফটকের নেমপ্লেটে সিং টাইটেলটা দেখেই ভুলটা করেছিলাম।'

'এখানে নতুন এসেছেন?' শুক্লা হাসল, 'ভুলটা অনেকেই করে। তবে সিং পদবী বাঙালীদেরও হয়, যদিও আমরা সিং নই; সিংহ। তবে আপনার চেহারাও গোলমাল পাকাবার পক্ষে যথেষ্ট। আর তেমনি হিন্দীও বলছিলেন।'

'ও কিছু না।' ঈষৎ লজ্জিত হল আগন্তুক, 'বিহার অঞ্চলে ক' বছর ঘোরাঘুরির ফল।'

'আমি কিন্তু এই দু' বছরেও কিছু শিখতে পারলাম না। আসুন বাইরে দাঁড়িয়ে কেন। ভেতরে এসে ফোন করুন।'

সংগে [illegible] ললিতাকে যে কি বাজে আলাপ করিয়ে [illegible]! শুধু আলাপ নয় ওরকম [illegible] সংযোগ [illegible] দিন দিনের পর [illegible] অতীশ [illegible] কিছুতেই রাজী হয়নি কিন্তু [illegible] এবং মর্যাদায় বেধে-ছিল। তাই শুক্লার জেদ চেপে গেল। কিন্তু [illegible] মনের ওপরে যে তার নিজেরও কর্তৃত্ব থাকে না সব সময় একটু পরে মানুষ কি করবে নিজেই জানে না কখনো কখনো।'

কেটলিতে কখন চায়ের জল চাপিয়েছিল শুক্লা শব্দ করে জল ফুটে উঠতেই সম্বিৎ ফিরে পেল আবার। মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে এই অবান্তর অতীতের মাকড়সা জাল যেন ছিঁড়ে ফেলল সে। অতীশ মতলব করে কিছুই করেনি শুধু ধীরে ধীরে পাল্টে গেছে। ললিতাদের মত মেয়েরা হচ্ছে মায়াবিনী ওরা যে কোন পুরুষকেই কাছে পেলে পাল্টে দিতে পারে। শুক্লার স্বপ্ন যদি কেউ জেনে-শুনে চুরমার করে দিয়ে থাকে সে ললিতা। আর ললিতাই বা একমাত্র দায়ী হবে কেন বোধহয় সে নিজেই এই সর্বনাশের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

চা নিয়ে বসবার ঘরে যখন এল শুক্লা তখন সে অন্যমানুষ।

শুধু শাড়ি বদলেছে এবং সামান্য সাজগোজ করেছে তাই না মুখের হাসিটাও অন্যরকম। অতীশ তখন আর টেলিফোনের কাছে বসে নেই। ঘরের মাঝখানে সোফায় বসে সে চুরুট টানছে আর ডানপায়ের জুতোমোজা খুলে ফেলে পায়ের পাতায় আলগোছে হাত বুলোচ্ছে।

'পায়ে কি হল? নাও চা খাও।' সেন্টার টেবিলের ওপর চায়ের ট্রে নামাতে নামাতে বলল।

অতীশ একটু আড়ষ্ট হেসে বলল 'পংগুও গিরি লঙ্ঘন করে বলে শুনেছি আমার কেস কিন্তু আলাদা। গিরি লঙ্ঘন করতে গিয়েই পংগু হয়েছি। পা-টা মারাত্মক-ভাবে মচকে বসে আছি। কই এঞ্জিনীয়ার সিংহসাহেব তো এখনও এলেন না?'

শুক্লা ব্যস্ত হয়ে ওর পায়ের পাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল 'ইস বেশ ফুলেছে দেখছি। কিছু লাগাও নি?'

'ফিরে গিয়ে।' অতীশ বলল 'কালকেই পাততাড়ি গুটোবো 'এ যাত্রা সব গোলমাল হয়ে গেল।'

'এটা বেড়াবার সিজনও নয়। পুজো কিংবা শীতের সময় এদিকে এসো, ভাল লাগবে। ওদের ফেলে তুমি একা এলে কেন?'

'ওরা বাজারে গেছে। ফেরার পথে আমাকে তুলে নেবে গাড়িতে।'

শুক্লার শান্তমুখে আবার রক্তের ঢেউ খেলা করে গেল। সেই রাক্ষসীটার সঙ্গে আবার তাহলে মুখোমুখি হবে। ওই নির্লজ্জ মেয়েটার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবে দ্রুত ভেবে নিল। একদম স্বাভাবিক যেন কিছুই হয়নি শুক্লার কোনো ক্ষতিই হয়নি জীবনে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পর্যন্ত পড়েনি যেন। বরং সে কত সুখী হয়েছে এই সংসারে সেইটে জানান দিতে হবে। ছেলেপুলে হয়তো হয়নি কিন্তু সময়ও যায়নি মাত্রই তো দুটো বছর বিয়ে হয়েছে তাদের। ললিতার সেন আট বছর বিয়ে হয়েছে হয়ত ছেলেপুলেও হয়েছে একটি দুটি। জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না। থাক একটু পরেই তো চাক্ষুষ দেখতে পাবে। আসলে অতীশ আগে এসেছে তার কাছে গোপনে ক্ষমা চাইবে বলেই ট্রাংক-কলটল ওসব বাজে কথা। বউয়ের সামনে তো আর ওসব কথা বলার সাধ্য হবে না বীর-পুরুষের।

'তোমার ট্রাংক বুক করা হয়ে গেছে?'

'না।' অতীশ চায়ের কাপটা টেনে নিতে নিতে বলল 'তোমাকে শুধু শুধু বিরক্ত করলাম।'

শুক্লা একমুহূর্ত কঠিনমুখে চুপ করে থেকে আবার সহজ হল 'নাও আর ভান করতে হবে না। ফোন করতে তো আর তুমি এখানে আসনি।'

অতীশ চোখ তুলে তাকাল 'মিথ্যে কথা বলব কেন তোমাকে। এক্সচেঞ্জ জানাল লাইন খারাপ কাল বিকেলের আগে কোনো আশা নেই।'

'উঠেছ কোথায়?' শুক্লা কথা ঘোরাবার জন্যে বলল।

'তাঁবুতে আছি। নদীর ধারে পাহাড়ের তলায় তাঁবু ফেলেছি আমরা।'

শুক্লা হাঁ হয়ে গেল কথাটা শুনে ঠিক বুঝতে পারল না। অতীশ বোধহয় ওর মুখের চেহারা দেখে অন্যরকম সন্দেহ করল।

'সত্যিই তাঁবুতে আছি মিথ্যে বলিনি।'

'আমি কি বলেছি মিথ্যে বলেছ। ভাবছি ললিতাকে নিয়ে তাঁবুতে উঠতে গেলে কেন।'

অতীশ একটু ইতস্তত করে বলল 'অফিসের কাজে একা এসেছি। সংগে লোক-জন আছে।'

'ও তুমি একা?'

'হ্যাঁ একাই।' অতীশ চোখ নামিয়ে বলল।

শুক্লা কিছুক্ষণ নিজের মনে চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল 'তোমার ছেলেমেয়ে কটি জিজ্ঞেস করাই হয়নি।'

অতীশ যেন কথাটা শুনতেই পায়নি। চুরুট নিভে গিয়েছিল আবার ফ্যানের হাওয়া বাঁচিয়ে ধরালো। শুক্লা অস্বস্তি বোধ করল। আবার প্রশ্নটা করা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারল না।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অতীশ আগের মতই খুব গরম গরম চা খায়। চুরুটে টান দিতে দিতে সে চোখ তুলল। শুক্লা বুঝতে পারল ও ভেতরে ভেতরে খুব অস্বস্তি বোধ করছে ইতস্ততঃ করছে।

'কিছু বলবে অতীশ?'

'যদি পারো আমাকে ক্ষমা কর শুক্লা! আমি অনেকদিন থেকে মনে মনে ছটফট করছি। তুমি ক্ষমা করলে শান্তি পাই।'

'তুমি বারবার একথা কেন বলছ? দ্যাখ অতীশ সত্যি বলতে কি তোমাকে হয়ত আমি অনেকদিনই ক্ষমা করেছি। আমি বুঝেছি ভাগ্যের ওপরে কারো হাত নেই। যার পাওনা সে তা পাবেই। তোমার ওপরে সত্যিই আমার আর ক্ষোভ নেই সামান্য একটু অভিমান ছাড়া।'

অতীশ সাবধানে মোজা আর জুতো পরছিল। পাটা খুব ব্যথা ফুলেছেও। ডান পায়ের ফিতে খুব আলগা করে বাঁধলো।

'তুমি আমাকে বাঁচালে শুক্লা।'

'কেন এটা এত কি সাংঘাতিক কাণ্ড যে তুমি মরে যাচ্ছিলে! জীবনে এরকম কত কি ঘটে অতীশ। কত মানুষের জীবন এরকম ভেঙে যায় আবার নতুন করে গড়ে।'

'সেজন্যে নয়। আমার নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে ছিলাম।' অতীশ

একটু কি ভাবলো তারপর ফের বলল 'আমার খবর তুমি কিছুই জান না মনে হচ্ছে।'

'না। কোত্থেকেই বা জানব? আর জানতে চেষ্টাও করিনি। তোমাকে ভুলতেই চেয়েছিলাম।'

'ললিতা আর আমার সঙ্গে নেই।'

'অ্যাঁ? বল কি!'

'হ্যাঁ ডিভোর্স হয়ে গেছে। প্রায় বছর পাঁচেক হবে। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। ললিতাদের মত মেয়ে বিয়ের জন্যে জন্মায় নি।'

বিস্ফোরিত চোখে শুক্লা তাকিয়ে ছিল। বলল—'ললিতা এখন কোথায়? কি করছে?'

'কি করছে জানি না তবে বিয়ে করে বম্বে চলে গিয়েছিল বছর তিনেক আগে তার পরের খবর আর জানি না।'

শুক্লা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। পরে কি বলতে যাবে এমন সময় একটা হর্ণের হর্ণ শোনা গেল। চমকে উঠে শুক্লা দেখতে গেল বরেন ফিরেছে কিনা। একটু পরে ফিরে এসে বলল 'তোমার গাড়ি এসে গেছে তোমাকে ডাকছে। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে আর একটু বসবে না?'

'না। এবার চলি শুক্লা। অনেক কাজ পড়ে আছে পাততাড়ি গুটোতে হবে।'

শুক্লা নিজের মনের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে কি বোঝাপড়া করছিল। অতীশ উঠে দাঁড়াতেই বলল 'এক মিনিট দাঁড়াও।' বলেই ভেতরে চলে গেল।

ফিরে এল হাতে একটা আগের সেলাইকরা রুমালখানা নিয়ে। বলল 'সুভেনির হিসেবে এটা তোমার কাছে থাক।'

হাত বাড়িয়ে রুমালটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল দেখে বলল 'বাঃ আমাদের সেই গানের লাইনটা লিখেছ। চমৎকার! এটা নিলাম।' তারপর যেতে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে বলল 'জান তো অনেকের বিশ্বাস রুমাল দিলে নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।' হাসল অতীশ।

শুক্লা বলল 'ছাড়াছাড়ির চিহ্ন হিসেবেই তো এটা তোমাকে দিলাম।' কিন্তু কথাটা এত আস্তে বলল যে অতীশ কিছুই শুনতে পেল না। সে শুধু ওর চোখে জলের আভাস যেন দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল 'আচ্ছা চলি।'

তারপর গাড়িতে ভর দিয়ে ঘর থেকে যতটা সম্ভব দ্রুত বেরিয়ে গেল।

এই বাংলার খবর

২০ জুনের বনধ

সব বনধের পর যেমন হয়, ২০ জুনের বাংলা বনধের পরও তেমনই বনধের উদ্যোক্তা আর বনধের বিরোধীরা যথাক্রমে সাফল্য আর ব্যর্থতার দাবি জানালেন। ২৪ ঘণ্টার এই বনধের ডাক দিয়েছিলেন সি পি এমের নেতৃত্বে আটটি বামপন্থী দল। এই বনধের ডাকে যে তেমন সাড়া মেলেনি, সে-কথা বুঝতে অবশ্য সাধারণ মানুষকে সরকারি বিবৃতির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়নি। দিনের শুরুতে হয়ত কিছুটা অনিশ্চয়তার ভাব ছিল, কিন্তু বেলা বাড়বার সংগে সংগে বুঝতে আর অসুবিধে হয়নি যে, আরো একটি বনধ ব্যর্থ হলো। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হলো যানবাহন চলাচল। ঐ দিন কলকাতায় সরকারি ট্রাম-বাস চলেছে স্বাভাবিকভাবেই, যদিও বেসরকারি বাসের দেখা মিলেছে কম। কিন্তু মিনি বাসের কোনো অভাব ছিল না। ট্রেনও চলেছে নিয়মিতভাবে। অধিকাংশ দোকানপাটই ছিল খোলা। রাস্তাঘাটে লোকজনের সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছু কম ছিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই চুকে যায়। কলকাতায় তেমন কোনো উত্তেজনার চিহ্ন ছিল না, বরং ছিল আধা-ছুটির মেজাজ। যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্যে শ'খানেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহানগরীর দুই প্রাক্তন মেয়র, প্রশান্ত শূর ও শ্যামসুন্দর গুপ্ত। তবে কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে। কলকাতার বাইরেও বনধের ডাকে বিশেষ সাড়া মেলেনি, শুধু মেদিনীপুর বা বাঁকুড়ার মতো দু-একটি জেলা বাদ। যদিও সি পি আই বনধের ডাকের ঘোরতর বিরোধী ছিল, তবু অভিযোগ উঠেছে মেদিনীপুরে বনধের সমর্থন করেছেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল কম্যুনিস্ট কর্মী।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছেন, আর কোনো বনধ এইভাবে 'ফ্লপ' করেনি। তিনি আশা করেন, এই বনধ যেভাবে ব্যর্থ হলো তা থেকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থীরা যথোপযুক্ত শিক্ষা নেবেন। অবশ্য সি পি এমের রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত 'আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস সত্ত্বেও বনধের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি অভিযোগ করেন, প্রশাসন, পুলিশ, সি আর পি এবং সশস্ত্র গুণ্ডারা দোকানদারদের দোকান-পাট খুলতে বাধা করে। তবু সাধারণ মানুষ ভয় পাননি। বনধের আগে সতর্কতা হিসেবে কয়েক হাজার লোককে আটক করা হয়।

বামপন্থী কর্মসূচী

বনধ একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, বামপন্থীরা অবশ্য এ-কথা মানতে চাইছেন না। শহর এলাকার মানুষ তাঁদের ডাকে তেমন সাড়া দেননি, এ-কথা তাঁরা যদিও মানতে পারেন গ্রামের মানুষের সাড়া দেখে তাঁরা বেশ উৎসাহিত। তাঁরা নিজ নিজ দলের সূত্রে এই উৎসাহজনক সাড়ার খবর পাচ্ছেন। এই খবরে বলা হয়েছে, ২০ জুন গ্রাম বাংলার জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ তো বটেই, মধ্যবিত্তেরাও বনধের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। এর ফলে বামপন্থীরা উৎসাহিত হয়ে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচী তৈরি করেছেন। সেই কর্মসূচীর প্রধান কথা হবে আইন অমান্য আন্দোলন। আগস্টে কলকাতায় একটি বিরাট সমাবেশের আয়োজন করা হবে। সেই সমাবেশের পর সুরু হবে আইন অমান্য আন্দোলন। একই সংগে গ্রামাঞ্চলেও এই আন্দোলন সুরু হবে। সস্তায় খাদ্য যোগান, দুর্দশাগ্রস্ত এলাকায় খয়রাতি সাহায্য দান ইত্যাদি দাবিতে এই আন্দোলন হবে। তবে ওয়াকেবহাল মহলের ধারণা, বামপন্থীরা এই কর্মসূচী ঘোষণা করলেও তাঁরা এখনই কোনো বড় রকমের আন্দোলনে নামতে চাইবেন না। তার কারণ, এই বনধ উপলক্ষে কংগ্রেসের যুব-ছাত্রদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বনধ উপলক্ষে 'কংগ্রেসী সন্ত্রাসের যে পরিচয় পেয়েছেন, তাকে তাঁরা মোটেই শুভ লক্ষণ বলে মনে করছেন না।

মানা থেকে হাওড়ায়

দীর্ঘদিন ধরে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় থাকার পর মধ্য-প্রদেশের মানা শিবির থেকে হাজারখানেক উদ্বাস্তু পরিবার ১৭ জুন হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হন। এ'রা সকলেই সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন। ট্রেনে চেপে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর পর এই সব ছিন্নমূল মানুষ কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ছাউনি ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখান থেকে পুলিশ তাঁদের হটিয়ে দেয়। ফলে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের আশ্রয়। মানা শিবির ছেড়ে উদ্বাস্তুদের যাতে আর আসতে দেওয়া না হয়, সে-জন্যে পশ্চিম বাংলা সরকারের তরফ থেকে মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে জরুরি তারবার্তা পাঠানো হয়। রেল কর্তৃপক্ষকেও অনুরোধ জানানো হয় এই সব উদ্বাস্তুকে আটকানোর জন্যে। রাজ্য সরকার জানান, মানা শিবিরে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে যে-খবর রটানো হচ্ছে তার কোনো ভিত্তি নেই। মুখ্যমন্ত্রী ঐ সময়ে কলকাতায় ছিলেন না। মুখ্য সচিব তাঁর সংগে টেলিফোনে এ-বিষয়ে জরুরি পরামর্শ করেন। তারপর ঠিক হয়, ১৮ জুন গভীর রাতে বিশেষ ট্রেনে উদ্বাস্তুদের মানায় ফেরৎ পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে তাঁরা অবশ্য হাওড়া স্টেশনেই পড়ে থাকেন। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা কী হলো, সে-বিষয়ে সরকারের কেউই খোঁজখবর রাখেননি। তবে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এইভাবে থাকার ফলে যাতে কোনো রোগ না-ছড়ায় সে-জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৯ জুন ভোরে একটি বিশেষ ট্রেন উদ্বাস্তুদের নিয়ে হাওড়া থেকে যাত্রা করে। সব উদ্বাস্তুর জায়গা হয়নি ঐ ট্রেনে। কিন্তু ট্রেন বিহারে পৌঁছবার পর কিছু উদ্বাস্তু গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ট্রেন চলাচলে বাধা দেন। তাঁরা জানান, তাঁরা মানায় যাবেন না। অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপের পর আবার ট্রেন চলতে সুরু করে। পরে বাকি উদ্বাস্তুদের নিয়ে আরো যে একটি ট্রেন ছাড়ে তা থেকেও জামসেদপুরের কাছে একটি স্টেশনে কিছু

উদ্বাস্তু নেমে পড়েন। সর্বশেষ খবর, তাঁরা অনেকেই টাটানগর রেল-স্টেশনে রয়েছেন। ইতিমধ্যে মানার বিভিন্ন শিবিরের ৫০ থেকে ৬০ হাজার উদ্বাস্তু ঠিক করেন তাঁরা সুন্দরবন রওনা হবেন। সম্ভব হলে ট্রেনে, না হলে হাঁটা পথে। কিন্তু উদ্বাস্তুরা যাতে শিবির ছাড়তে না-পারেন সে-জন্যে মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী শিবির ঘিরে ফেলে। উদ্বাস্তু সমিতির কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তারও হন। মানা থেকে সুন্দরবন অভিযান আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

সি এ ডি পি'র টাকা

পশ্চিম বাংলায় চাষবাসের উন্নয়নের জন্যে রাজ্য সরকার যে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প (সি এ ডি পি) তৈরি করেছেন তার কথা পাঠকেরা জানেন। এ-কথাও অজানা নয় যে, টাকার অভাবে এখন এই প্রকল্পের কাজ আটকে গেছে। রাজ্য সরকার ভরসা করেছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ওপরে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু দিন আগে আভাস দেয় যে, এই প্রকল্পের জন্যে টাকা পাওয়া যাবে না। তখন দিল্লিতে দরবার সুরু হয়। তারই ফলে যোজনা কমিশনের চাষবাস বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সদস্য বি শিবরামন কলকাতায় এসে রাজ্য যোজনা পর্ষদের বিভিন্ন সদস্য এবং অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এবং রাজ্য যোজনা পর্ষদের জ্যেষ্ঠ সদস্য পান্নালাল দাশগুপ্ত দু' জনেই বলেন, পশ্চিম বাংলায় চাষবাসের ক্ষেত্রে সত্যিকার উন্নতি করতে হলে সি এ ডি পি'র রূপায়ণ অপরিহার্য। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে একটি স্বতন্ত্র কর্পোরেশন তৈরি হয়েছে, কুড়িটি এলাকা নির্বাচিত হয়েছে, একশ'র বেশি গভীর নলকূপ খনন করা হয়ে গেছে। এর পরে যদি এই প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়, তবে রাজ্য সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা খুবই ঘা খাবে। প্রতিটি নির্বাচিত এলাকায় দেশ হাজার একর জমি নিয়ে গঠিত মোট কুড়িটির দরকার হবে চার কোটি টাকা। এগ্রিকালচারাল রিফিনান্স কর্পোরেশন এই টাকা দিতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মারফৎ এই টাকা দিতে কোনো অসুবিধে হবে না। সি এ ডি পি রূপায়ণের জন্যে যে-কর্পোরেশন তৈরি হয়েছে সেই কর্পোরেশন এই ঋণ নেবেন এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি দেবেন রাজ্য সরকার। সব কথা শোনার পর শ্রীশিবরামন বলেন, সি এ ডি পি যে রূপায়ণযোগ্য সে-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। টাকার অভাবে যাতে এর কাজ আটকে না-যায় সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

ফলের হেরফের

পরীক্ষার ফল নিয়ে কেলেঙ্কারি এই বাংলায় কিছু নতুন নয়। ফল প্রকাশের পর তা পুনর্বিবেচনাও কিছু নতুন ব্যাপার নয়। হালের নজির বি-এ এবং বি-এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফলের পুনর্বিচার। তবু ১৯৭৪ সালের হাইয়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার ফল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে কীর্তিস্থের নজির রাখলেন তার তুলনা পাওয়া ভার। উচ্চতর মাধ্যমিকের বিভিন্ন শাখায় যে দশ জন প্রথম দশটি স্থান অধিকার করে তাদের নাম ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হয়। কিছু দিন পরে কৃষি ও কারিগরি শাখার প্রথম দশটি স্থান অধিকারীদের ভাগ্যের হেরফের ঘটেছে বলে পর্ষদ থেকে ঘোষণা করা হয়। খাতা আবার করে পরীক্ষার পরই এই হেরফের ঘটে। এখন পর্ষদ জানাচ্ছেন, বিজ্ঞান কলা এবং বাণিজ্য বিভাগের প্রথম দশ জনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের হেরফের ঘটেছে। সবচেয়ে হেরফের ঘটেছে বিজ্ঞান শাখায়। একমাত্র প্রথম স্থানাধিকারী ছাড়া আর সকলেরই স্থান বদলে গেছে। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এবার পুনর্বিবেচনার অনেক আবেদন পেয়েছিলেন। কারণ অনেক ছাত্রছাত্রীরই ধারণা হয়েছিল, তাদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। তবে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন, প্রতি শাখায় প্রথম ত্রিশটি স্থানাধিকারীদের সব খাতাই আবার পরীক্ষা করা হবে। তার ফলেই এই হেরফের। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, এই বছর থেকে চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগেই এই ধরনের পুনর্বিবেচনার কাজ সেরে ফেলা হবে।

২৩।৬।৭৫ দেবদত্ত

ভারতের রাজনৈতিক স্থিরতা এলাহাবাদের রায় বিঘ্নিত করেছে

রায়বেরিলী সম্পর্কে এলাহাবাদের হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীর কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের ভেতরে যে একেবারে উত্তেজনা দেখা দেয় নি তা বলা চলে না। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে পরিষদীয় দলের এক বিরাট অংশ বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করছেন। তবে তিন-চারজন ছাড়া এখন পর্যন্ত অবশ্য কেউ প্রকাশ্যে মুখ খোলেন নি। বরং বেশীর ভাগই বলছেন, শ্রীমতী গান্ধী আমাদের নেত্রী, অতএব তিনি নেত্রীপদেই থাকবেন। একথা ঠিক ১২ জুন হাইকোর্টের রায় বেরুবার পর কিছু সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মনে হয়েছিল তিনি পদত্যাগ করবেন। এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনের সময় পর্যন্ত একটা কেয়ার টেকার গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন। তবে এ কথাও ঠিক, এই অস্থায়ী সরকার পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর হাতে থাকবে, তিনি নিশ্চিতভাবে ইন্দিরাজীর লোক হবেন। কিন্তু রাজধানীর রাজনীতি এতো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল যার ফলে সে চিন্তার অবসান ঘটে গেল। এবং পার্টির অকুণ্ঠ সমর্থন পাবার পর শ্রীমতী গান্ধী স্থির করলেন, তিনিই প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। এখন দেখতে হবে, নেপথ্যে কি ঘটনা ঘটেছিল বা কি চিন্তাধারা ঘটনাকে প্রভাবিত করেছিল? পার্লামেন্টারী পার্টির একাংশের বদ্ধমূল ধারণা, সুপ্রীম কোর্টে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় নিয়ে বিচার চললেও শ্রীমতী গান্ধীর 'ইমেজ' যেভাবে নষ্ট হতে চলেছে, তাতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে শুধু নেত্রীরই নয়, সমগ্র পার্টির ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জগজীবন রাম বা চ্যবনজী অবশ্য চুপ করে বসে নেই। কিন্তু সেদিন অর্থাৎ ১২ জুন এক জটিল পরিস্থিতির সূচনা হয় এবং তা হচ্ছে, যদি ইন্দিরাজী স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ না করেন, অথবা তাঁর সংগে বিরোধিতা করে যদি অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রী হবার চেষ্টা করেন, তা হলে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী। কারণ ইন্দিরাজীর নেত্রীত্বের ওপর আস্থাশীল অনেকেই। তাঁরা চুপ করে তা মাথা পেতে নেবেন না। আর কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে আবার যদি ভাঙ্গন দেখা যায়, তা হলে কংগ্রেস চিরকালের মত শেষ হয়ে যাবে। এই জটিল চিন্তায় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত ভাবিত করে তুলেছিল। তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে চাইছেন না। তাছাড়া প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ সবাই কিন্তু চিন্তা করে একজনকে নেতা বলে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না। যেমন উদাহরণস্বরূপে বলা যায়, চ্যবনজী মনে প্রাণে বাবুজীকে (জগজীবন রাম) স্বীকার করতে পারছেন না। অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের মধ্যে দ্বিধা ছিল। এমনও শোনা গেছে, ইতিমধ্যে নেত্রীত্বের প্রশ্নে পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে সই সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি সব ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, ১২ জুনের রায়ের পর ইন্দিরাজীর কি করা উচিত ছিল? অথবা তিনি যা করছেন, তা ঠিক কিনা? অবশ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র মার্কিন দেশ ও সোভিয়েতরা এলাহাবাদের এই রায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁদের পত্র-পত্রিকায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, এগুলি সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল ব্যাপার, অতএব এ ব্যাপারে এই ধরনের রায় বাঞ্ছনীয় হয় নি। এটা সত্যি আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিক থেকে তাঁদের এই সকল উক্তি, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে দেশের ভেতরে বামপন্থী দলগুলি (সংখ্যায় বা ক্ষমতায় তাঁরা ক্ষুদ্র হলেও) এই রায়কে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য প্রাণপণে ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। আর ইন্দিরাজী যদি সরে যান, তা হলে কংগ্রেস পার্টিকে কাবু করার বিষয়ে কোন বেগ পেতে হবে না। শুধু বাম বা কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য পার্টি কেন, দেশের আপামর জনসাধারণ জানেন শাসক কংগ্রেসের এখন শক্তির মূল উৎস হলো ইন্দিরাজী।

কেউ কেউ অবশ্য মনে করছেন ১২ জুন তারিখে দলের নেত্রী হিসেবে ইন্দিরাজীর সংগে পার্লামেন্টারী পার্টির জরুরী বৈঠক ডাকা উচিত ছিল। এবং সেই বৈঠকে তিনি হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। কিন্তু পার্টি তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টারী পার্টির সেই প্রস্তাব নিয়ে রাষ্ট্রপতির সংগে দেখা করতে পারতেন। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ইন্দিরাজীকে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ২০ দিনের 'স্টে অর্ডার'-এর কথা আছে। তারপর একদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরাজী পদত্যাগপত্র পেশ করে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করতে পারতেন। তখন রাষ্ট্রপতিকে তা গ্রহণ করতে হতো। এর পর প্রধানমন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করতে পারতেন, তিনি আগামী নির্বাচনে জনগণের নিকট এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় 'ইস্যু' হিসেবে তুলে ধরলে ফল আরো ভাল হতো। তাঁর 'ইমেজ'ও অনেক বড় হতো। কিন্তু অন্য আর একাংশের ভিন্ন মত। তাঁরা মনে করছেন, শুধু বাম পার্টিরা চিৎকার করছে বলে ইন্দিরাজীকে পদত্যাগ করতে হবে কেন? সমস্ত পার্টি তাঁর পেছনে আছে।

যা হোক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় যে ভারতের রাজনীতিতে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন দিল্লীতে সব রকমের কাজ প্রায় স্তব্ধ হতে বসেছে। শুধু সর্বত্র আলোচনা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। সুযোগসন্ধানী পাকিস্থান এটাকে অজুহাত করে ভারতকে বাক্যবাণে আক্রমণ করে চলেছে। পরে তাদের ষ্ট্র্যাটেজি কি হবে, তা অবশ্য এক্ষুনি কিছু বলা যাচ্ছে না।

কৌটিল্য

রায়ের জের

আইনের লড়াই এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্টে গেছে। এদিকে রাজনৈতিক লড়াইও চলছে। একদিকে বিরোধী পক্ষ যখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রস্তুত হচ্ছেন তখন অন্যদিকে শ্রীমতী গান্ধী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিরোধীদের কথায় তিনি পদত্যাগ করতে যাবেন না। তাঁর পদত্যাগের এই দাবী নতুন কিছু নয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের অনেক আগে থেকেই বিরোধী পক্ষ তাঁকে সরাবার চেষ্টা করছেন।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে প্রতিদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে জমায়েত হয়ে তাঁর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির একটি অভূতপূর্ব সভা ডেকেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আজকের পুনর্জাগরিত ভারত ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, জাতির জন্য তাঁর নেতৃত্ব ও পরামর্শ আজ অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী প্রয়োজন। এই বৈঠকেই কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বরুয়া বলেছেন, ইন্দিরাই ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াই ইন্দিরা। তছাড়া, দিল্লীর বোট ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ১৫ লাখ মানুষ (নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির হিসাবে) লাঠি গোলী খায়েংগে, পর ইন্দিরা কো বাঁচায়েঙ্গে ধ্বনি দিয়েছিলেন। ইন্দিরার প্রতি সমর্থনের আর একটি অভিব্যক্তি রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে এসেছেন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীরা। রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁরা যে স্মারকলিপি দিয়েছেন তাতে প্রসঙ্গত বলা হয়েছে, শ্রীমতী গান্ধীকে যদি এখন পদত্যাগ করতে হয় তাহলে অস্থিরতা দেখা দেবে এবং এই অস্থিরতা শুধু জাতীয় পর্যায়েই নয়,বিভিন্ন রাজ্যেও।

শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থার এই সব ঘোষণার মধ্যে অবশ্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের উল্লেখ সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, বিচারপতি সিংহের রায়কে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সি পি আই বাদে অন্য বিরোধী দলগুলি শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে যে চাপ সৃষ্টি করছে তার মোকাবিলা করার জন্যই শ্রীমতী গান্ধীর পিছনে দলের ও বৃহত্তর জনতার এই সমর্থনের সমাবেশ করা হচ্ছে।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভা ডাকার আর একটি লক্ষ্য, অঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হল এই যে, শ্রীমতী গান্ধীর সাময়িক পদত্যাগের সুযোগ নিয়ে তাঁর ঐ পদ দখল করার জন্য দলের ভিতর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা ওৎ পেতে বসে নেই, এটা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্য কিন্তু পুরোপুরি সফল হয়েছে বলা চলে না। অন্ততপক্ষে কংগ্রেসের পাঁচজন এম-পি—চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত, মোহন ধারিয়া, রামধন ও শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্তাম্মা পার্টির বৈঠকে উপস্থিত না হয়ে এভাবে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি সমর্থন জানানোতে তাঁদের আপত্তি প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীধারিয়া এর আগে প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগ করা উচিত।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির ঐ বৈঠকে জগজীবন রামের যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে সেটাও লক্ষ্য করার মত। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনি শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি আস্থা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিচার বিভাগের মর্যাদার কথাও বলেছেন। দলের অন্য নেতারা যখন বারবার জনগণ আইন তৈরী করেন এবং সেই জনগণের নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই তত্ত্ব উচ্চারণ করছেন তখন শ্রীরামের সুর কিছুটা ভিন্ন ধরনের।

গুজরাটে ফ্রন্ট সরকার

সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, ভারতীয় সোস্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি বিরোধী দলগুলি যখন নিজেদের মধ্যে ইন্দিরা বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলছে তখন গুজরাটে তারা জোট বেঁধেছে নতুন একটি ফ্রন্ট সরকার গঠনের জন্য।

গুজরাটের সংগঠন কংগ্রেসের সভাপতি ৬৫ বৎসর বয়স্ক বাবুভাই যশভাই প্যাটেল গত ১৮ নভেম্বর বেলা পৌনে নয়টায় আমেদাবাদের রাজভবনে গিয়ে গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও বিধানসভায় নবনির্বাচিত কংগ্রেস দলের নেতা মাধব সিং সোলাঙ্কির সঙ্গে করমর্দন করলেন, নিজের রাজনৈতিক গুরু মোরারজী দেশাইকে প্রণাম করলেন তারপর গুজরাটে নতুন জনতা ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। এর কিছুক্ষণ আগেই রাষ্ট্রপতির এক ঘোষণার দ্বারা গুজরাটে ষোল মাসব্যাপী রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

কিষাণ মজদুর লোকপক্ষে যে ১২ জন সদস্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাঁরা সবাই এবং আরও ৫ জন নির্দলীয় সদস্য জনতা ফ্রন্টকে সমর্থন করবে, একথা সরকারীভাবে জানাবার পরই গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীপ্যাটেলকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

যে চিমনভাই প্যাটেলের সঙ্গে কোন রকম সহযোগিতা করবেন না বলে জনতা ফ্রন্টের নেতা মোরারজী দেশাই নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছিলেন তাঁরই নেতৃত্বাধীন কিমলোপ-এর সমর্থন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁর আপত্তি হল না, এজন্য কংগ্রেস মোরারজীর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করার পর বাবুভাই যশভাই প্যাটেল যা বলেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, চিমনভাইয়ের সমর্থন নেওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের প্রতিশ্রুতি নতুন সরকার খেলাপ করবেন না। সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, ১৯৭০ সালের পর থেকেই গুজরাটের বিভিন্ন শাসনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে।

বাংলাদেশে "দ্বিতীয় বিপ্লব"

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকসাল) নবনিযুক্ত ১১৫ জন সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন হয়ে গেল। ঐ অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, পুরাতন পচা ঔপনিবেশিক প্রথার অবসান ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের কল্যাণের জন্য নবযুগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব শুরু করেছেন। তিনি বলেন যে, বিদেশী শক্তির সাহায্য ও সমর্থনে পুষ্ট কিছু কিছু সমাজবিরোধী দেশে গোপন হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। লন্ডনে বসে যে সব পাক-সহযোগী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে এবং বাংলাদেশকে আর একটি দেশের প্রদেশে পরিণত করার জন্য টাকা ঢালছে তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে শেখ মুজিব বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এদের স্থান নেই।

বাকসালের কেন্দ্রীয় কমিটির এই সভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেছেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ে নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হবে। এই উদ্দেশ্যে গোটা দেশকে ৬০টি জেলায় ভাগ করা হবে এবং প্রত্যেক জেলার প্রশাসনের মাথায় একজন করে গভর্নর নিয়োগ করা হবে।

বাংলাদেশের জন্য নতুন একদলীয় সংবিধান প্রবর্তনের পর এই প্রথম জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন হল এবং সেখানে প্রবর্তিত নতুন প্রশাসনের ছকটি উপস্থিত করা হল।

ইতিমধ্যে আর একটি সরকারী আদেশের দ্বারা ইংরেজী দৈনিক 'বাংলাদেশ টাইমস' ও বাংলা দৈনিক ইত্তেফাকের মালিকানা বেসরকারী মালিকের হাত থেকে সরিয়ে সরকারের হাতে নিয়ে নেওয়া হল। ইংরেজী দৈনিক বাংলাদেশ অবজার্ভার ও বাংলা দৈনিক দৈনিক বাংলা আগে থেকেই সরকারী মালিকানায় ছিল।

২২-৬-৭৫ [illegible] পুণ্ডরীক

রত্নার অসুখ ॥

রত্নেশ্বর হাজরা

এখানে শুয়েছে রত্না   তার
মুখের দু'দিকে দুই বুক—
এখন শুয়েছে কেন। রত্না-র কি ভীষণ অসুখ?
চোখের উপরে রাত্রি   তার
দু' ঠোঁট ছুঁয়েছে সমতল
এখানে শুয়েছে কেন? এখানে তো ঘুমোয় ঈগল।
এখন মুখের কাছে ওর
নেমে আসে পৃথিবীর মুখ
রত্না কি ভীষণ সুখী। না—
রত্না-র অসুখ।
কোথাও গন্ধের মধ্য দিয়ে
উড়ে যায় চন্দনকাঠের ছোট ঘর—
এখানে শুয়েছে রত্না   পাশে
প্রতিমার জন্ম........

স্টুডিওর দরজায় ॥

অশোক দে

দরজার সীমারেখায় পা দিয়ে
অপেক্ষমান, সুচিস্মিতা; বলবো—
কতো মূল্য চাও?

চারুকেশ, জ্যামিতিক মুখ;
পেয়ালা থেকে উপচে পড়া তোমার যৌবন।
আমার সমস্ত মন উন্মুখ আজ।।
প্যারাডাইস লস্ট থেকে নিজেকে ফেরাবো
কোন সর্বনাশের বিনিময়ে?

একদিন তুমিও জানতে ॥

অশোক দত্ত চৌধুরী

এই কারু কাজ কাঠের বাক্সয়
ছুরি দিয়ে টানলাম, একটা ছোট টানা লাইন।
তোমার ডান কপালের কাটা দাগটা তুলে রাখলাম।
ক্রমশ ওটা হয়ে আসছে অস্পষ্ট,
হয়ত তুমিও ভুলে যাবে কোনোদিন
তোমার চব্বিশ বছর পুরনো হয়ে যাবে
আর আমি বসতবাড়ি ক'রে
কারুকাজ কাঠের বাক্স, কম্বল, জুতো নিয়ে
ঠিকেদারদের সঙ্গে চলে যাবো নর্থ বেঙ্গল।
ফিরে আসবো না, ফিরে আসবো না কলকাতা
তুমি, তোমার রূপ নাম যশ
ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়ে যাবে নিঃস্ব

সেইদিন জেনো, লাল ট্যুরিস্ট বাস
তোমার জন্য ছুটে যাবে ঘুমের মধ্যে
এই কারুকাজ কাঠের বাক্স—বেরিয়ে পড়বে চব্বিশ বছর
আমি হাত নেড়ে নিচু গলায় ডেকে উঠবো
তোমার ডান কপালের কাটা দাগ, জীবন শুরু অথবা শেষ
যে রকম কথা ছিল, একদিন তুমিও জানতে
একা, খুব ব্যক্তিগত নিরাভরণ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বগলে বই দপ্তর, ডানহাতে ঝুলানো দোয়াত—

কমল শেলেট-খাতা আর গুটানো পাটি দেখিয়ে বলে, দাও ওসব, বাঁহাতে নিয়ে নিচ্ছি।

তরংগিণী বলেন, পুটি নেবে। পাটি পেতে একেবারে তোকে জায়গায় বসিয়ে আসবে।

না, দিদি যাবে না। কেউ না—

একলা যে মানুষ মরগার রাস্তা অবধি চলে গিয়েছিল, নতুন বাড়ি তো তার কাছে ডাল-ভাত। গুপ্ত অভিমানের কথা অবশ্য খুলে বলা যায় না। নড়ে চড়ে মাটিতে দুম করে এক লাথি মেরে বলল, কেউ যাবে না, আমি একলা—

হাত তো দুখানা মাস্তোর, একলা তুই অত সমস্ত নিবি কেমন করে?

নেবে—

গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল, এক-পা এগোবে না। বিরক্ত হয়ে তরংগিণী বলেন, দিয়ে দে পুটি। এই বয়সে এমন জেদ, অনেক দুঃখ আছে ওর কপালে।

উমাসুন্দরী কোথায় ছিলেন, কর কর করে পড়লেন : আজকের একটা দিন, এমন কথাটা বললে তুমি বউ। কোন কথা কেমন ফলে পড়ে, কেউ জানে না। বলি, একটু আধটু জেদ হবে না তো বেটাছেলে হয়েছে কেন, মিনিমিনে মেনিমুখো হলেই বুঝি ভাল হত।

তরংগিণী এতটুকু হয়ে গেছেন। বকুনি খেয়ে আর তিনি রা কাড়লেন না। একদিকে জিওল-ভেরেণ্ডা-বাদুর গাছের বেড়া, রামোত্তম মোক্তারের জঙ্গলে-ভরা পোড়ো বাড়ি অন্য দিকে। মাঝে পথ-দু দিক থেকে ঘাস বনে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। পথ ধরে কমলবাবু একা একা পাঠশালায় যায়। পিছনে তাকানো হচ্ছে মাঝে মাঝে— বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ পিছন নিল কিনা। তাই বটে—দূরে দূরে আসছে তো একজন। বাদুবনের আড়াল করে দাঁড়াল কমল—আর খানিকটা এগিয়ে আসতে এক ছুটে সামনে গিয়ে পড়ল। পুটি নয়, বিনো—পুটি হলে রক্ষে ছিল না। মেরে খিমচি কেটে, দেখে নিত একবার।

বিনোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে : তুমি আসছ কেন বড়দি?

না-রে, আমি কেন যেতে যাব! আমার জন্যে আমি যাচ্ছি—কচুশাক তুলতে।

তাই যাও। এ দিকে আসতে পারবে না কিছুতে।

পাঠশালার পৈঠার ধারে এসে যত বীরত্ব উপে গেল, থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রহ্লাদকে জানে, বাড়িতে এসে কদিন আদর-টাদর করে গেছেন। পাঠশালাও দেখা আছে—পুতুল খেলতে পুটি নতুন বাড়ি আসে, দিদির সঙ্গে কমলও দু-এক দিন এসেছে—দূর থেকে তখন পাঠশালা দেখে গেছে। নিজে আজ পড়ুয়া হয়ে ঢুকতে ভয়-ভয় করছে। এবং লজ্জাও।

প্রহ্লাদ মিষ্টি করে ডাকলেন : এসো খোকন। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, উঠে এসো। আমার এই পাশটিতে বসবে। ভাল মাথা তোমার শুনেছি—অনেক বিদ্যে শিখবে, বিদ্যের সাগর হবে তুমি।

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ দুটো বইয়ের সঙ্গে যাঁর নাম, তিনিও বিদ্যার সাগর—কমলের মনে পড়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কমলও সেই রকম হবে—কমললোচন বিদ্যাসাগর।

খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে নিয়ে কমল প্রহ্লাদের পাশটিতে বসেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন প্রহ্লাদ একবার। পয়লা দিন আর কিছু নয়, অন্যদের নিয়ে পড়লেন। কমল তা বলে ছাড়ে না সকলের দেখাদেখি বইদপ্তর খুলে আপন মনে দ্বিতীয় ভাগ পড়ে যাচ্ছে।

শেলেটে অঙ্ক কষে এনেছে জল্লাদ। এক নজর দেখেই প্রহ্লাদ জ্বলে উঠলেন : এই হয়েছে! দামড়া ছেলে সামান্য বিয়ে করলিলটাও পারিস নে? এদ্দিনে শিখলি কেবল তামাক সাজতে—সেটা ভাল মতোই শিখেছিস। বলি, আর্যা মুখস্থ আছে?

হ্যাঁ, আছে। জল্লাদের তুড়ুক-জবাব : বলব?

মুখস্থ না ঘোড়ার ডিম! আঁ-আঁ করে, আর ক্রমাগত বলে, বলব? প্রহ্লাদ ধমক দিয়ে উঠলেন : বল না রে হতভাগা। একটা আর্যা বলবি, তার জন্যে পাঁজি খুলে দিনক্ষণ দেখতে হবে?

বিনো এসে উপস্থিত। কমল গোছগাছ করে দিব্যি বসে গেছে, দেখে বেশ ভাল লাগল। হাসতে হাসতে প্রহ্লাদকে বলে কমল কিন্তু একা একা এসেছে মাস্টারমশায়, আমি ওর সঙ্গে আসি নি। আমি কচুশাক তুলে বেড়াচ্ছি।

প্রহ্লাদও হেসে চোখ টিপে বলেন, বেশ করছ। মেলা কচুগাছ আমাদের মন্ডপের কানাচে। কমললোচন একা এসেছে জানি। পুরুষছেলে একা একা কত দেশদেশান্তরে বেড়াবে, পাঠশালায় আসা তো সামান্য জিনিস।

ছাট তুলে সপাং করে মাটিতে একটা বাড়ি দিয়ে প্রহ্লাদ কানখাড়া করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে নড়ে চড়ে ভাল হয়ে বসলেন। সুর করে মাথন আগে পড়ছে, জল্লাদ ও কয়েকটি ছেলে শুনে শুনে একসুরে পড়ে যাচ্ছে।

বড় বড় চোখ মেলে কমল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বেশ তো, চমৎকার।

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে।
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ
বিশ গণ্ডায় হয় কাঠার প্রমাণ—

আহা, কি সুন্দর। কেমন ব্যঞ্জনা রেজে কানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। একবার মাত্র শুনেই তো কমলের আধা-মুখস্থ হয়ে গেল।

॥ ২৯ ॥

গরুর গাড়ি যাচ্ছে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে। ধান কেটে নেওয়া বিলে চাকার দাগে লীক পড়েছে—লীক ধরে গাড়ি রাস্তার উপর উঠল। চলেছে, চলেছে, আগে আগে কালীময়—গলাবন্ধ কোট গায়ে মাজায় আলোয়ান বাঁধা, বগলে ছাতি, হাতে জুতো। শীতকালে এখন জল-কাদা নেই, চারিদিক শুকনো-শুকনো—জুতো পায়ে পথ চলা অসাধ্য নয়। কিন্তু কাদা না হলেও জুতোয় ধুলো-ময়লা লাগে জুতোর তলা কম-বেশি কিছু ক্ষয়েও যায়। তা ছাড়া পা-টনটন করে অনভ্যাসের দরুন। ভদ্রসমাজের মধ্যে জুতোর আবশ্যক কায়ক্লেশে পায়ে রাখতেই হয়, কিন্তু পথ-চলতি অবস্থায় এখন কেন অকারণ কষ্ট স্বীকার করা। জুতো জোড়া যথারীতি বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে কালীময় হনহন করে গাড়ির আগে আগে চলেছে। গাড়ির মধ্যে উমাসুন্দরী ও পুঁটি। শুভকর্ম সারা করে গয়োতলী থেকে বাড়ি ফিরছে।

উমাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল ভাইয়ের বাড়ি আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন। ভূদেবও বারম্বার বলেছিলেন কাজ চুকলেই চলে যেতে হবে তার কোন মানে আছে? জলে পড়োনি তো। কতকাল পরে বাপের ভিটেয় এলে—ভাইবোনে এক জায়গায় হলাম আমরা। বুড়ো হয়েছি কবে চোখ বুজব আর হয়তো দেখা হবে না।

কিন্তু কালীময় নাছোড়বান্দা যাবেই। ধান কাটার পুরো মরসুম। ফুলবেড়ে শ্বশুরবাড়ির জমাজমি সে ছাড়া দেখবার দ্বিতীয় মানুষ নেই। বর্গাজমির ধান—আহার-নিদ্রা ছেড়ে এই সময়টা জমিতে ঘোরাঘুরি করা দরকার। বর্গাদারে নয়তো পুকুর চুরি করবে।

মামামশায়কে বলল এই। এ ছাড়া আরও আছে সেটা মনের ভিতরের কথা মুখে বলার নয়। পাকস্পর্শ অন্তে নতুন বউ গয়োতলী থেকে বাপের বাড়ি ফিরে গেছে। হিরুও নতুন শ্বশুরবাড়ি গেছে। ভূদেবের বাড়ি এখন আর কী আছে। খালের চেলা-পুঁটি মৌরলা ক্ষেতের নতুন টিকরি কলাই আর খানা খন্দের কচুশাক ছাড়া। সে জিনিস বাড়িতেই আছে। ফুলবেড়েতেও আছে—তার জন্যে মাতুলালয়ে কেন পড়ে থাকতে হবে? বলল, যাই বরঞ্চ থেকে যান, লোক সুযোগে পাঠিয়ে দেবেন। নয়তো একটা চিঠি দেবেন মামা আমাদের ফটিক মোড়ল এসে ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে।

শ্বশুরবাড়ি প্রবেশের সম্পর্কে উমাসুন্দরীর মতি পরিবর্তন হল। ধান উঠেছে তাঁর উঠানের উপরেও—উঠান ভরে গেছে। তার উপরে কলাই-মসুরি আছে। বউ-মেয়েরা কি সামাল দিয়ে পারে? একলাটি ছোটবউ চোখে অন্ধকার দেখছে। এখন যাই দাদা জড়িয়ে এসে বাপের বাড়ির আম-কাঁঠাল খেয়ে যাবো।

আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে

ডবল এজেন্ট

১৯৪৭। কায়রোর নাইট ক্লাব......

বেলি ডান্সার। জুয়ো, মদ......

গান রানিং—চোরাই বন্দুক......

ডবল এজেন্ট

গুপ্তচর। গুপ্তচরের পেছনে গুপ্তচর......

কল্পনার চেয়েও অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য......

ডবল এজেন্ট

আনোয়ার পাশা, মধ্যপ্রাচ্যের মৃত্যুদূত......

তারই কাহিনী, লিখেছেন—

বিক্রমাদিত্য

গ্রামে ঢুকে হরিতলা। গরুর গাড়ি থামিয়ে উমাসুন্দরী নেমে মুক্তদেবতার পায়ে গড় করলেন, তলার মাটি মাথায় মুখে দিলেন। কালীময় জোর ছুটে অশোকা। পুকুরঘাটে ধরো-ধরো করল সে এতক্ষণ। পুঁটিও নেমে পড়েছে চেনা এলাকার ভিতরে এসে রয়ে গেছে আর গাড়ির চালার উপর ঘটকপুর হয়ে বসতে? দৌড়—দৌড় দিয়ে এতক্ষণে বাঁচল রে বাবা। শেষ রাত্রি থেকে গাড়িতে বসে বসে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। পশ্চিম বাড়ি, পরামানিক-বাড়ি, দাসেদের বাড়ি ছাড়িয়ে বকুলতলা চাঁপাতলা হয়ে পুকুর পাড় ধরে তীরবেগে দৌড়চ্ছে সে, ঝুঁটি বাঁধা চুল খুলে গিয়ে বাতাসে উড়ছে।

নতুন বাড়ির পাঠশালায় ছুটির আগে নামতা পড়ানো হচ্ছে। সর্দার পোড়োর গৌরব আজ কমলের উপর বর্তেছে—পড়াচ্ছে সেই। পুঁটিকে দেখল এক নজর। পৈঠা লাফিয়ে উঠানে পড়ে একছুটে দিদিকে জড়িয়ে ধরবে—কিন্তু কর্তব্য বিষম মনে যাই থাক যথানিয়ম সুর করে পড়িয়ে যাচ্ছে। আট উনিশ একশ বাহান্ন ন-উনিশ একশ একাত্তর—। এবং বারম্বার দৃষ্টি যাচ্ছে—আশশ্যাওড়া ভাটবনের গুঁড়ি পথটায় দিকে পুঁটি যার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নামতা শেষ। ছুটি। সামনের রাস্তায় গরুর গাড়ি দেখা দিয়েছে। ছইয়ের নিচে উমাসুন্দরী পিছন দিকে মুখ করে আছেন। কমলকে ডাকলেন: এসো। ছুটি হয়ে গেলো? কাছে এসো খোকন!

কমল ঘাড় নেড়ে দিল: আসবে না সে। পায়ে পায়ে তবু এসে পড়ল। উমাসুন্দরী বলেন, গাড়ি থামাচ্ছে—উঠে আয় পাশটিতে।

জোরে জোরে কমল অনেকবার ঘাড় নেড়ে দিল। উঠবে না সে কিছুতে। দুঃখ করে যায়: গাড়িতে তখন তো নিয়ে গেলে না! পুঁটি গেল আমি বাদ। এইটুকুর জন্যে এখন উঠার কথা বলছেন!

তরঙ্গিণী আর বিনোকে দেখা গেল। পুঁটির কাছে শুনে পথ অবধি এগিয়ে পড়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করছেন খবরা-খবর বলছেন। বাইরে বাড়ির উঠানে গাড়ি থামিয়ে গরু দুটো খুলে গাড়োয়ান সুপারি গাছে বাঁধল অটলের হাত থেকে কলকেটা নিয়ে ফকাফক করে টানছে। দেখতে দেখতে বেশ একটু ভিড় জমে উঠলো এবাড়ি ওবাড়ি থেকে দু-পাঁচজন এসে পড়লেন। বউ কেমন হল ও ঠাকুরঝি মা? দিয়েছে থুয়েছে কি? নতুন বউ বাপের বাড়ি রওনা করে দিয়ে এলে আমাদের একটু দেখালে না?

উঠানে এত লোক ভবনাথকে কেবল দেখা যায় না। বাড়িতেই আছেন তিনি—দক্ষিণের কোঠার মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে জমা-খরচের হিসাব দেখছেন। হিসাব বোধকরি সাতিশয় জরুরী নয়তো, উঠোনে এত

লোকের কথাবার্তা একটিও তার কানে ঢোকে না ?

উমাসুন্দরী একটা নিশ্বাস চেপে নিলেন। দুর্গোৎসবের ব্যাপারে সেবারে সারাটা গ্রাম নিয়ে কি মাতামাতি—আর বাড়ির ছেলে হিরু ছোটবাবু যাকে চোখে হারাতেন—ছেলেটার বিয়ে হল কুটুম্বের পাতে এক মুঠো ভাত পড়ল না। বাড়িতে একটা ঢোলের কাঠি পড়ল না। কপাল—তা ছাড়া আর কী বলা যায়।

কৈফিয়তের মতন সকলকে বলছেন, এক ফোটা কনে—বাপ-মা, ভাই-বোন ছেড়ে কদ্দিন থাকবে, সেইজন্য পাঠিয়ে দিয়ে এলাম। ঠাকুরপো বোশেখ মাসে বাড়ি আসবেন। নতুন বউ তখন নিয়ে আসব। নিমন্তন্ন আমোদ-আহ্লাদ সমস্ত তখন। কমলের সবুর সয় না বীরত্বের খবরটা পুঁটিকে সকলের আগে দিচ্ছে: তুই ছিলিনে দিদি একা একা আমি কোথায় চলে গিয়েছিলাম—

চোখ বড় বড় করে পুঁটি বলে কোথায় রে ? বল না কোথায়।

অনেক দূর। বলবি নে তো কাউকে ?

না কক্ষনো না। দিব্যি দিলাম করছে পুঁটি : ঘরের মধ্যে এই বন্ধন তক্তায় বসে বলছি বলব না।

তখন কমল সন্তর্পণে গুপ্তকথা ব্যক্ত করে। বাঁকা তালগাছ ছাড়িয়ে মরগার উপর দিয়ে পুঁটিদের গরুর গাড়ি গিয়েছিল—একলা কমল আড়াআড়ি বিল ভেঙে একদিন সেই অবধি গিয়ে পড়েছিল আর কি প্রায় রাস্তা অবধি—

পুঁটি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে: ঐ বুঝি অনেক দূর হল। রাস্তা অবধিও যাসনি ভাই আবার জাঁক করে বলছিস ? খোকন যেন কী—আমি ভাবলুম না-জানি কোন দূর-দূরন্তর জায়গা।

হাসির তোড়ে কমল দিশা করতে পারে না। বলে রাস্তায় গিয়ে উঠতাম ঠিক। তা ভাবলাম তোকে না নিয়ে একা-একা গেলে ফিরে এসে তুই দুঃখ করবি।

পুঁটি তাচ্ছিল্যের সুরে বলে দুঃখ করব ? আমি বলে কত কত গাঁ-গ্রামের কত শত রাস্তা ঘুরে এলাম—

কমল বলে গরুর গাড়িতে বসে সবাই অমন ঘুরতে পারে। হেঁটে তো যাসনি।

পুঁটি হাত-মুখ নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে বলে যাচ্ছে মরগার ঐ রাস্তা তো ঘরের দুয়ারে। সে কত দূর ! যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি—গয়োতলী আর আসে না। সুয্যি ডুবে গেল চাঁদ উঠল—গয়োতলী আসে না। কত ঘর বাড়ি গরু বাছুর বিল-মাঠ—গয়েতলী আসেই না মোটে—

কমলও বুঝি মনে মনে গরুর গাড়ি চেপে দিদির সঙ্গে জড়োজড়ি হয়ে বসে গয়াতলী যাচ্ছে। যাচ্ছে যাচ্ছে—কতক্ষণ ধরে যাচ্ছে যাওয়ার শেষ হয় না মোটে। পৃথিবীর একেবারে শেষ মুড়োয় গয়াতলী—আশ্চর্য সে জায়গা।

আশ্চর্য সন্দেহ কি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কমল জিজ্ঞাসা করে। দিনের পর দিন শুনে যাচ্ছে গয়াতলীর গল্পের শেষ নেই। এক-দিকে গাঙ—সেই গাঙ থেকে খাল বেরিয়ে গাঁখানার মাঝ বরাবর চিরে দুখণ্ড করেছে। গাঙ যেমন খালও তেমনি—হোগলাবন কচুরিপানা আর হিঞ্চে-কলমির ধাপে জল দেখবার উপায় নেই। কচুরিপানা বলে আবার কেউ টেফনাও বলে—কেউটে সাপে যেন ফণা তুলে উঠেছে দেখতে সেইরকম। ফণার মতন সতেজ সবজ পাতা, ফুল ফুটে তার মধ্যে শোভা করে থাকে।

কমল গাঙ দেখেনি। বিলের মধ্যে খাল আছে কয়েকটা—মণির খাল হুনোর খাল আসাননগরের খাল হামেশাই নাম শোনা যায়। বাড়ির নিচে বিল হলেও এত খালের একটাও তার চোখে দেখা নেই। গয়াতলী গিয়ে পুঁটি তো বহুদর্শিনী হয়ে গিয়েছে অবোধ শিশু-ভাইটিকে সে গাঙ-খালের বিষয়ে জ্ঞানদান করছে। গাঙ-খালের মুড়োদাঁড়া নেই—খানিকটা গিয়ে যে একেবারে শেষ হয়ে গেল ঐটুকু দূরে পায়ে হেঁটে তুমি উল্টো পাড়ে চলে গেলে সে জিনিস হবার জো নেই—

তবে ?

সাঁতার কেটে পার হয় লোকে। গয়ো-তলীতে তাও মুশকিল—শেওলা ও জঙ্গলের ভিতরে সাঁতরানো চাট্টিখানি কথা নয়। মাঝে মধ্যে সাঁকো আছে—মানে এপারে ওপারে বাঁশ ফেলা। বাঁশের উপরে পা টিপেটিপে লোক চলাচল করে পা সরে গেছে কি ঝুপ করে নিচে গিয়ে পড়বে।

কমল সভয়ে বলল, ওরে বাবা !

খালের এপারে আর ওপারে খানিক খানিক জায়গায় ধাপ কেটে সাফ-সাফাই করে ঘাট বানিয়ে নিয়েছে। চান করে বাসন মাজে কলসি ভরে জল নিয়ে যায়। এপারের ঘাটে ওপারের ঘাটে কথাবার্তা গল্পসল্প কথা-কাটাকাটি এমন কি ঝগড়াঝাঁটিও হয় কখনো-সখনো। কিন্তু যা হবার দূরে দূরেই হল— কাছাকাছি হতে পারছে না বলে কাজের খুব একটা জোর বাঁধে না।

—শেষ—

আমি মনে করি গায়কী শিল্পীর নিজের জিনিষ, জোর করে একটা পদ্ধতি প্রবর্তন করে তাকে সেই ছাঁচে ফেলার চেষ্টা না করাই ভাল।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব সত্যোপলব্ধির কথা সঙ্গীতের মাধ্যমে পেঁছে দিয়েছেন মানুষের কাছে। ধন্য করেছেন মানব সমাজকে নিজেকে করেছেন সর্বজনীন সর্বকালীন। তাঁর সংগীতজগতে যিনিই প্রবেশ করেছেন তিনিই লাভ করেছেন সেই আনন্দের আস্বাদ যা মানুষকে নিয়ে যায় প্রত্যহের তুচ্ছতা থেকে চিরকালের পূর্ণতায় খণ্ড থেকে অখণ্ডের অনুভূতিতে, মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ করে অমৃতে। রবীন্দ্রসংগীতের এই যে দুর্লভ ঐশ্বর্য এ অন্য কোথাও এমন করে পাইনি। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংগে চির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে আমার অন্তর আমার প্রতি মুহূর্তের অনুভূতি।

রবীন্দ্র উপলব্ধির কথা এমনি গভীর ভাবেই বলছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত-শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সংগীতের জগতে প্রবেশের প্রেরণা কি তা জানতে চাইলে দ্বিজেন-বাবু বললেন—রবীন্দ্র কাব্যের সঙ্গে পরিচয়ই আমার এ জগতে প্রবেশের প্রথম ও প্রধান প্রেরণা। যদিও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারাকে ছাড়িয়ে গিয়ে 'পূজায়' এসে ধরা পড়ে গেলাম। জানলুম বুঝলাম। যে সঙ্গীত চিরকালের যে সঙ্গীত চিরন্তন শাশ্বত যার কোন ক্ষয় নেই মানুষকে অপার ভূমা আনন্দে সেই অমৃতের সন্ধান দেয়। জাগতিক শোক তাপ ভুলিয়ে এক পরম শান্তির জগতে নিয়ে যায় সেই তো চিরকালীন সঙ্গীত। বেদ বলেছেন ঋষিভিঃ বহুধা গীতম।

দীর্ঘ ২৯ বৎসরের সঙ্গীতজীবনে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের অনেক স্মরণীয় মুহূর্তই এসেছে কিন্তু কোন মুহূর্তকেই তিনি ধরে রাখেননি। পেছনের দিকে ফিরে স্মৃতির রোমন্থন করাটাকে কোনদিনই তিনি তাঁর চলার পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেননি।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম শিক্ষাগুরু হলেন সুশান্ত লাহিড়ী। এই আদর্শ গুরুর কথা বলতে গিয়ে দ্বিজেনবাবু শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন—আমি তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের রাগাশ্রয়ী গানগুলি

শেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল অতি চমৎকার। অতি কঠিন গানগুলি সহজ করে তিনি কন্ঠে তুলে দিতেন।

আজকের রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে দ্বিজেনবাবুর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন—রবীন্দ্রসংগীতের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা আমাকে নিশ্চয় মুগ্ধ করেছে আবার ভীতও করেছে।

কারণ কোন মানুষকে কারোর কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে প্রথমেই তার হাত-পা ইত্যাদির বর্ণনা দেবার রীতির কথা আমরা জানি না। কিন্তু ইদানীং রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরা সঞ্চারী থেকে গান শুরু করার একটা ভয়াবহ রীতি প্রবর্তন হতে চলেছে। না-জানি কোন দিন গানের শেষ লাইনটিই না সামনে এসে দাঁড়ায় প্রথম কলি হিসেবে?

রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতা সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে কি?

নিশ্চয়ই। দ্বিজেনবাবু সোচ্চারে জানালেন—আমি নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে আজকের রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতা অনেক বেশী বোদ্ধা। অনেক বেশী রবীন্দ্রানুরাগী।

বিদেশে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে দ্বিজেনবাবু বেশ কয়েকবার বাইরে গেছেন। এ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তিনি বলেন—সুদীর্ঘ আঠারো বছর আগে রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বিশেষ কয়েকটি জায়গায় রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেয়েছিলাম ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে। ইউরোপের বুল-গেরিয়াতে, প্রায় সত্তর বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ আমাকে বললেন আমরা ধন্য হয়েছি তোমাদের কবিগুরুকে পেয়ে আমরা আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে ট্রেন থেকে কাঁধে করে নামাতে দ্বিধা করিনি।

আবার রাশিয়াতে যেখানেই গেছি ট্যাগোরেকে চেনে না এমন মানুষ দেখতে পাইনি। পৃথিবীর সেই বিশাল প্রেক্ষাগৃহ বলশয় থিয়েটারে আমার অনুষ্ঠানের সময় ছিল পাঁচ মিনিট। কিন্তু পাঁচ মিনিটে শ্রোতারা আমাকে ছেড়ে দেননি। প্রায় কুড়ি মিনিট পর্যন্ত গান করতে বাধ্য করেছিল। এটা তাঁদের ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস ছিল না। তাঁরা সত্যিকারের রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন।

আবার যখন আমেরিকা গেলাম ক্যানাডায় গেলাম সেখানেও কিছু কিছু মানুষ বিশেষ করে এক আমেরিকান দম্পতিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা এই আড়াই ঘন্টার প্রোগ্রামে কি পেলেন ভাষা

সবিনয় নিবেদন

'সুরের আগুন' বিভাগের অপরিসীম জনপ্রিয়তায় আমরা আনন্দিত। পাঠক-বর্গের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এই পর্যায়ে শেষ হলে আমরা আধুনিক গানের শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ করতে শুরু কোরব। আমরা ভরসা রাখি সেই পর্যায়ের রচনাগুলিও পাঠকদের আনন্দ দিতে পারবে।

যেখানে অন্তরায়— উত্তর—আমরা রবীন্দ্র-নাথের গীতাঞ্জলি পড়েছি তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাই সামন্যতম তর্জমা আমাদের কাছে যথেষ্ট ছিল।

রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী স্বরলিপি বা টেকনিক্যাল দিকের ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে?

আমি মনে করি গায়কী শিল্পীর নিজের জিনিস জোর করে একটা পদ্ধতির প্রবর্তন করে সেই ছাঁচে ফেলার চেষ্টা না করাই ভাল। কিন্তু স্বরলিপির কথা বলতে গেলে আমি বলব এটিও শেখার জিনিস এবং একটা শাস্ত্রসম্মত মত আছে নিজস্ব গায়কী মানে এ নয় যে খুশীমত স্বরলিপির রাজ্যে বিচরন কোরবো।

শেষ প্রশ্নের উত্তরে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বেশ জোরের সঙ্গে বলেন—রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে একথাই বলব যে মানুষের সেই অমূল্য পরম প্রিয় জিনিসটিকে ড্রইংরুমে সাজিয়ে রেখে দর্শকদের সহজভাবে আকৃষ্ট করার চেয়ে নিশ্চয়ই এটি অতি সাবধানে অন্তঃপুরের কোন বিশেষ জায়গায় রক্ষা করাই শ্রেয় বলে মনে করি। কারণ তার কৌলীন্যের প্রতি কোথাও যেন অসম্মানের ছোঁয়া না লাগে। রবীন্দ্রসংগীতকে যদি একান্ত পরম প্রিয় বলে মনে হয় তাহলে আপনারা কি সাধারণের কাছে অতি সহজ বস্তু হিসাবে বিলিয়ে দেবেন? না সাধারণকে শিক্ষা সহকারে একটা অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে যাবেন। যেখান থেকে তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতকে সত্যিকারের দেখবার বোঝবার বা বিচার করবার সুযোগ পাবেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ছাড়া আমি বিশ্বাস করি না, অন্য কোন কেন্দ্র থেকে সেই রুচিসম্মত জিনিসটিকে বোঝার ভালো ব্যবস্থা হতে পারে। কারণ স্রষ্টার কাছে তাঁর সৃষ্টি পরম মূল্যবান পরম প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনে সংগীতভবন স্থাপিত করেছেন। সেখানে শাস্ত্রসম্মত শিক্ষায় ব্যবস্থা করেছেন। ভুল করেছেন কি? মোটেই না। বরং তাঁর সেই শাস্ত্রসম্মত শিক্ষা-পদ্ধতিকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়াই হবে বেশি অন্যায়।

আশীষতরু মুখোপাধ্যায়

সংশোধন

'সুরের আগুন' কণক বন্দোপাধ্যায়ের নিবন্ধে 'মনে কি দ্বিধা' গানটি 'বেতার জগতের' পরিবর্তে অন্য কোনো একটি পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছিলো। পড়তে হবে।

সঞ্জয় সেন

হস্তরেখায় অঙ্কিত নিয়তিতে অরুণের অকম্পিত বিশ্বাস। ডান হাতের তেলোটা বাড়িয়ে সে বলল, 'দেখুন না ভালো করে।' হাতটা নিরীক্ষণ করে ছেলেটিকে সচকিত করে বললাম, 'প্রেমপত্র লিখে উঠেছ...পাঠাবে কি পাঠাবে না ভাবছ।'

—'কেমন করে বুঝলেন?'

—'তর্জনীর ডগায় ভালোমতো শুকিয়ে-না-যাওয়া বেগুনি কালির দাগ দেখে...তা মেয়েটি কে?'

—'সহপাঠিনী।'

—'সুন্দরী?'

—'সুন্দরীরা কি কলেজে পড়ার সুযোগ পায়...? না কি পড়ার প্রয়োজন অনুভব করে?'

—'মিশ্র রাগ?'

—'হ্যাঁ, তবে অনুলোম মানলে সমস্যাটা মিটে যায়...ব্যাপারটা আসলে অন্য।'

ব্যাপারটা আসলে জটিল...এতই জটিল যে প্রাতঃস্মরণীয় কীরো-সাহেবের বিদ্যার শরণাপন্ন হয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র অরুণ ঘোষাল।

সুন্দরী না হলে কি হবে, তনিমা' মেয়েটি বিদুষী খুব, উচ্চতর বিদ্যালয়ে সে স্ট্যান্ড করেছে। ওর বাবা নিজেই ডাক্তার, মা-ও উচ্চশিক্ষিতা; বাড়ি সোদপুর, অবস্থা সচ্ছল—তনিমা পৈত্রিক সম্পত্তির একচেটিয়া উত্তরাধিকারিণী। আমার বন্ধু অরুণ খড়দহের এক সৎ, পরিশ্রমী, অল্প সম্বল ব্যবসায়ীর পুত্র। বিলাসিতা বলতে সেকন্ড-হ্যান্ড কেনা গোলাপি রঙের সেই ভটভটি, সাধু ভাষায় যার নাম স্কুটার।

অবলাজাতি অরুণের জীবনে এতদিন স্বীকৃতি লাভ করেনি : মেয়েরা তো ফুটবল খেলে না, আর অরুণের যাবতীয় বন্ধু উচ্চমানের ফুটবল খেলোয়াড়। তার দেড়শটি হবু-ডাক্তার সহপাঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক পুংলিঙ্গের : অবলাদের উপেক্ষা করা যায় ফুটবলের ক্ষতি হয় না।

দমদমবাসী শেখর বসু কলেজের ফুটবল টীমের কাপ্তেন, অরুণের সঙ্গে ওর ভাব হয়েছে, দুজনে একই ট্রেনে চড়ে বাড়ি [illegible] আর ফেরে তনিমাও।

জায়গা পেলে মেয়েটি ওদের পাশে বসে; আর সেদিন—অরুণ লক্ষ্য করতে ভুলে যায় নি—ফুটবলের প্রসঙ্গ না তুলে ফুল-ব্যাক শেখর কবি সেজে রমণীমাত্রার গুণগান করে। তনিমা পাত্তা দেয় না। গোঁয়ার ছেলেটি ট্রেন থেকে নেমে গেলেই সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অরুণের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিতে পড়াশোনার কথা পাড়ে। পড়াশোনার কথা পেড়ে ডাক্তার-বাবার কথা সে বলে; বাবার কথার সঙ্গে মায়েরও কথা ওঠে নিজেরও কথা ওঠে অরুণের পরিবার সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগে।

ডাক্তারি পড়তে অনেক অনেক বইয়ের প্রয়োজন আছে, দামী বই সব—বিদেশী তথা দুষ্প্রাপ্য। অরুণের অসুবিধা বুঝে সহযাত্রিনী একদিন বলে (দমদম স্টেশন তখন অতিক্রান্ত হয়েছে) : 'বাবার লাই-ব্রেরীতে ও-সব বইয়ের অভাব নেই; প্রয়োজন হলে লজ্জা বোধ করবেন না, আমি আপনাকে ধার দেব...তারপর গলাটা যথা-সাধ্য নির্লিপ্ত করার চেষ্টা করে সে বলে, 'বইগুলো খুব ভারী, নিজে আনতে পারব না, আপনি বরং আমাদের বাড়িতে এসে নিয়ে যাবেন।' সোদপুরে নামতেই নিমন্ত্রণটা পুনরুচ্চারিত করে মেয়েটি বলল, 'আসবে কিন্তু...'

অরুণের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, অনেকক্ষণ সে ভাবল, তনিমা কি সত্যি সত্যি 'আসবে' বলেছে? অন্ত্যাক্ষরের অনুনাসিকতালোপ অতর্কিত না ইচ্ছাকৃত?... চা-ওয়ালা কুলি আর হকারদের ঐকতানে কার এমন সূক্ষ্ম কান আছে বলুন, 'আসবে' আর 'আসবেন'-এর শব্দতাত্ত্বিক পার্থক্যটা বোঝে?

তনিমার বাবা মা অরুণকে খাতির করলেন। ছেলেটির অস্থিতত্ত্বজ্ঞান দেখে ভদ্র-লোক রীতিমতো আশ্চর্যবোধ করলেন; তিনি অবশ্য বোঝেন নি যে এই নবোদ্গত জ্ঞানতপস্বীটি গত তিন দিন কন্দুকক্রীড়া ত্যাগ করে জাতীয় গ্রন্থাগারে শিরঃপীড়া বরণ করে বিদেশাগত নূতনতম গ্রন্থ ঘাটতে গিয়েছিল, শুধু সেই আশ্চর্যবোধ জাগাবার অভিপ্রায়ে। ভদ্রমহিলা উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন তাঁর আর অরুণের মায়ের চৌদ্দ পুরুষ খুলনা জেলার একই নহ-কুমার অধিবাসী, আর শুধু তাই নয়, অরুণের এক পিসী ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাঁকে সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন...। আবার আসার তিন তিনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্কুটারের ক্যারিয়ারে একগাদা বই চাপিয়ে ছেলেটি বিদায় নিল।

পরের দিন কবিশেখর ট্রেনের কামরাটাকে যেই নিরলংকৃত করল, তনিমা বলল, 'বাবা-মার তোমাকে খুব ভালো লেগেছে!' অরুণ এবার নির্দ্বিধ : মধ্যম পুরুষের সর্বনামের সম্মানচিহ্নলুপ্তিটি তাহলে স্বেচ্ছাকৃত ও প্রণয়প্রণোদিত। ক্ষীণতম সন্দেহ থাকলেও ঘুচে যেতে দেরি হল না পরবর্তী উক্তিতে : 'আমার কথা ভাবো বাড়িতে?'

অরুণ দিশেহারা হয়ে পড়েছে : সে কি কোনো ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছে? আর যদি দিয়ে থাকে, কার ষড়যন্ত্র মেয়ের না মেয়ের বাবা-মার?...ছেলেটি স্থির করল, তিন তিনবার উচ্চারিত সেই প্রতিশ্রুতি সে উপেক্ষা করবে, সোদপুরের ত্রিসীমানা সে আর মাড়াবে না। এদিকে বইগুলো চির-কালের মতো রাখা যায় না...আর তনিমার হাতে পাঠালে তার বাবার প্রতি অনর্থক ও অবাঞ্ছিত অসম্মান-প্রদর্শন ঘটে যায়। এখন উপায়

উপায় আছে! উপায়ের নাম শেখর বসু। অরুণ সোদপুরে গিয়েছে শুনে ওর হিংসে হয়েছে। তাই অরুণ স্থির করে, ওকে নিয়ে সে যাবে বইগুলো ফেরৎ দিতে : দেখি, ছোকরাটির অস্থিতত্ত্বজ্ঞান কত গভীর, খুলনা জেলার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ।

...আসর জমেছে, অস্থিতত্ত্ব ও খুলনা জেলার আলোচনা চলতে শুরু করেছে, এমন সময় তনিমা এসে জানায়, পাড়ার ছেলেরা দুষ্টুমি করে (কিংবা তনিমারই প্ররোচনায়?) স্কুটারের পিছনের চাকাটার হাওয়া বের করে দিয়েছে...তাতে অবশ্য অসুবিধে অল্প, অরুণকে সে নিয়ে যাবে ফণী মিস্ত্রির গ্যারাজে...গ্যারাজটা বেশি দূরে নয়।

বেশি দূরে নয় বটে তবে আজ (তনিমার খেয়াল ছিল কি?) বিশ্বকর্মা পুজোর দিন, যন্ত্রগুলো ঠাকুরের বেদীর সামনে রাখা হয়েছে। ফণী মিস্ত্রি বলল, 'দুঃখিত,

পাম্পটা নামানো কোনো মতেই সম্ভব নয়, আবদুল মিস্ত্রির ওখানে খোঁজ নিন…।' আবদুল মিস্ত্রির দোকান মাইল দেড়েক দূরে।

বিকল বাহনটিকে ঠেলতে ঠেলতে অরুণের সারা শরীর ঘামে গলে গিয়েছে… আর অরুণের অন্তরাত্মাও গলতে শুরু করেছে যাদুময়ী তনিমার প্রতি মমতায়। হঠাৎ রাস্তার ধারের এক দোকানে চা-পান-রত এক ছোকরাকে দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'তপন…আমার স্কুল জীবনের ব্যর্থ প্রণয়ী… বাবার চক্ষুশূল।'

থেমে দাঁড়িয়ে অরুণ সুধোয়, 'তুমি (সর্বনামটা এত সহজে উচ্চারিত হল যে নিজেই সে বিস্মিত হয়ে উঠল) ওর সংগ ছেড়েছ?'

—'দেড় বছর হয়েছে ওর সংগে কথা পর্যন্ত বলিনি।'

এরই কিছুদিন পরে দৈনিক যাতায়াতের পরিশ্রমে মেয়ের শারীরিক ক্ষতি হয় বলে মেয়ের সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও ওর বাবা-মা তনিমাকে নিয়ে রাখলেন ভবানীপুরনিবাসী ওর মেজকাকার বাড়িতে।

তনিমা আজ বিরহিনী। কাকা ও কাকিমার স্নেহ ও ভালোবাসা বাবা-মার অনুপস্থিতির ক্ষতিপূরণ করেছে বটে খুড়তুতো ভাইবোনেরাও তার প্রবাস সহনীয় করে তুলেছে, কিন্তু ট্রেনে যাপিত সেই মধুর দৈনন্দিন আধ ঘন্টার অভাব মর্মে

মর্মে সে অনুভব করে। কাউকেও জানাতে চায় না : লজ্জা করে...

বিরহবেদনা শুধু একজনের নয় : ক্লাসে ঘরে খেলার মাঠে অরুণও সেই অনাস্বাদিত যন্ত্রণায় আজ ক্লিষ্ট। দিন যায় মাস যায়... একদিন শনিবারের ক্লাসের পরে কলেজের করিডরে তনিমাকে একা পেয়ে ছেলেটি বলে, 'কাল কলকাতায় আসব, দশটার সময় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করবে...তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কথাটা এই : তনিমা তোমাকে ছাড়া আমি—দুই বাংলায় তথা সারা বসুন্ধরায়—আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। বাবা-মা ভাইবোন ফুটবল আর ডাক্তারির চেয়ে আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি। সমস্যাটা আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মনে মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অনুলোমস্থ আমাদের বাড়ির অর্ধাংশ নিজ থেকে মেনে নেবে আর অবশিষ্টাংশকে আমিই মানিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি—দিদিমা তো আসছে সপ্তাহে আমরণ কাশীবাস করতে যাচ্ছেন...। পড়াশোনা শেষ না হলে বিয়ে হচ্ছে না, জানি তবে আজ থেকেই আমরা দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বাগ-দত্ত...

কথাটা বলার সুযোগ ছেলেটি পেল না : তনিমা উত্তর দিল 'কাল তো রোববার, সকাল দশটায় গির্জে আছে...'

গির্জে প্রসঙ্গটা অরুণের পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পায়নি। পাবে কেমন করে, বলুন ?, ও কি নিজের চোখে দেখে নি তনিমাদের বাড়িতে তনিমার মাকে লক্ষ্মী-পুজো করতে ?...তবে হ্যাঁ, ওদের ঘরে খৃস্টের ছবিও আছে বটে...কিন্তু কোন্ বাঙালী ঘরে নেই, বলুন? অরুণদের বাড়িতেও কি নেই? আছে দুটো : ব্যাণ্ডেলে কেনা মাতৃক্রোড়ে-উপবিষ্ট বাল-যীশুর এক প্রতিকৃতি আর রথের মেলায় পুরস্কার হিসেবে পাওয়া একটা ক্রুশ...তা বলে অরুণেরা কি খ্রিস্তান?

তনিমার গত তিন পুরুষ খৃস্টান। তনিমার প্রপিতামহ শিবশঙ্কর দত্ত আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দীক্ষা নেন উনিশে জুন ১৮৫১ খৃস্টাব্দে, ক্রাইস্ট চার্চে : ব্যাপটিস্মের প্রমাণপত্র তনিমা নিজে দেখেছে ঠাকুরমার গয়নার বাকসে। এদিকে তনিমার বাবার যাবতীয় কুটুম্ব খৃস্টান হলেও তনিমার মা হিন্দু। মায়ের বিয়েতে দাদু-দিদার মামা-মাসীর কারও মত ছিল না, এখনও নেই : মামার বাড়ি যে কাকে বলে মামার বাড়ি নামক স্নেহনীড়ে ছুটি কাটানোর মধ্যে যে কত আনন্দ, মেয়েটি শিখেছে বান্ধবীর কাছে। ঐ মিশ্র বিবাহ ঠাকুরদাদাদের যে অমিশ্র সমর্থন লাভ করে-ছিল তা-ও না : পাদ্রিমশাই চোখ রাঙিয়ে-ছিলেন আর গ্রামের মাতব্বরেরাও চোখা চোখা কথা শুনিয়েছিলেন। পরে অবশ্য মহামান্য বিশপসাহেব সলোমন-সুলভ রায় দিয়ে সর্বপ্রকার তর্ক থামিয়ে বলেছিলেন : 'নাস্তিক হিন্দুর চেয়ে ধর্মপ্রাণ হিন্দু ঢের ভালো : বৌটিকে বাড়িতে অবাধে পুজো করতে দেওয়া হোক! ঈশ্বর ওদের সন্তান দিলে বাচ্চারা মিশনারী স্কুলে পড়ে খৃস্টধর্মের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাক!'

তা-ই হয়েছিল : ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলের বোর্ডিঙে থেকে খৃস্টধর্ম শিখে, বাড়িতে এসে তনিমা মায়ের পুজো দেখে বেশ কয়েকটা মন্ত্রও মুখস্থ করেছিল। নিজেকে সে বোঝাত সে খৃস্টানও নয় হিন্দুও নয় মানুষ। তবে একেক সময় ভিতরে ভিতরে তার যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল; বান্ধবীদের বলত, 'তোমরা তো হিন্দু আর খৃস্টান হয়েই জন্মেছ, আমি সজ্ঞানে কিছু হতে চাই!' কাউকে না বলে সে মোটা মোটা বই পড়ে তুলনাত্মক অধ্যয়ন করতে শুরু করে-ছিল...তারপর হল ভবানীপুরে প্রবাস-জীবন ও বিরহবেদনা—আর কাকিমার সস্নেহ সাহচর্য।

ওর মনের দ্বন্দ্ব বুঝতে পেরে কাকিমাও ওকে বলেছিলেন, 'জন্মগুণে তুমি যা-ই হয়ে থাক না কেন, সজ্ঞানে তোমাকে একটা কিছু করতে হবে।' তারপর মৃদু হাসি হেসে বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীও যদি হও, তাও ভালো!' একজন ভক্তপ্রাণ প্রটেস্টান্ট পাদ্রি আর একজন ভক্তপ্রাণ হিন্দু প্রব্রাজিকার সঙ্গে তিনি মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিলেন। তনিমা প্রতিটি সপ্তাহে অন্তত একবার করে ভদ্রমহিলার আশ্রমে যেতে শুরু করল। দু মাস যেতে না যেতে তনিমাকে স্তম্ভিত করে প্রব্রাজিকা বললেন 'আর তুলনাত্মক বিচারে লাভ কি? তুমি মনে প্রাণে খৃস্টান : খৃস্টীয় পথ তোমারই পথ!' সেদিন থেকে তনিমার অশান্ত অন্তর অননুভূতপূর্ব এক পরম শান্তি অনুভব করে। খৃস্টান বলে আত্মপরিচয় দেয়। রীতি-মতো গির্জেয় যায়।

কথাগুলো শুনেছিল অরুণ, ভিকটো-রিয়া মেমোরিয়ালে সেই স্মরণীয় রোববারেই, সন্ধ্যাবেলায়। শেষে বলেছিল, 'ভিন্ন বর্ণের বিবাহ যারা মানে, ভিন্ন ধর্মের বিবাহ তারা নাও মানতে পারে, তা সত্য...কিন্তু তোমার বাবা-মা যা পেরেছেন, তা আমরা পারব না কেন?'

তনিমা কম্পিত স্বরে বলেছিল, 'আমার মা বাবার পত্নী বটে, সহধর্মিণী নন : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য যতই থাকুক না কেন, দুজনের অন্তরের অন্তরতমে এমন এক বৈসাদৃশ্য থেকে গিয়েছে যার জন্য তাঁরাও ভোগেন আর আমাকে ভোগাতে ছাড়েন না...এই ধরনের বিবাহ আমি নিন্দাও করি না, বিচারও করি না, শুধু তোমাকে বলি, অরুণ নিজের কথা তথা ভাবী স্বামী ও সন্তানদের কথা ভেবে বলি, এমন বিয়ে আমি করব না...' তারপর ঠোঁট্টাচ্ছিলে—অশ্রুর বাণ অবরোধ করার ব্যর্থ প্রয়াসে—সে বলেছিল, 'আমাদের কলেজে আরও তো মেয়ে আছে, ভালো ভালো ঘরের মেয়ে সব...ভালো ভালো হিন্দুঘরের মেয়ে!'

...অরুণ কিছুক্ষণ থামল, তারপর আমার চোখের সামনে হাতের তেলোটা আরেকবার রেখে করুণ স্বরে পুনরায় বলল, 'দেখুন না ভালো করে...'

হাতটা না দেখে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'চিঠিটা লিখে বড় অন্যায় করেছ, না পাঠিয়ে ভালোই করেছ : ধর্ম ব্যবসার জিনিস নয়—বৌ কিনতে হলেও নয়!'

অপ্রেরিত পত্রে অরুণ এই চারটি শব্দ লিখেছিল : 'তনিমা আমি খৃস্টান হব।'

(ক্রমশঃ)
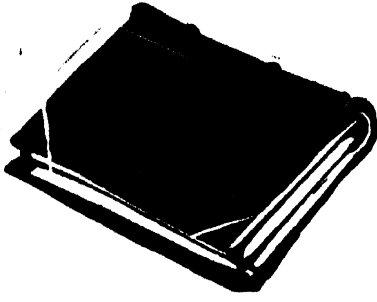
রাজধানীতে দ্বিতীয় বিশ্ব গ্রন্থ মেলার উদ্যোগ :

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে আগামী বৎসর ১৬—২৫ জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে দ্বিতীয় বিশ্ব গ্রন্থ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে বহু বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ-সম্ভার নিয়ে এই মেলায় যোগদান করবেন বলে আশা করা যায়। এই মেলায় যোগদানেচ্ছু প্রকাশকগণকে আগামী ৩০ অকটোবরের মধ্যে ট্রাস্টের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন পেশ করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সব কটি প্রকাশক সংস্থা এবং বহু প্রকাশক এই মেলায় স্টলের জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন। জানুয়ারী ৭৪ থেকে সেপ্টেম্বর ৭৫—এই সময়ের মধ্যে ভারতে প্রকাশিত শিশু ও কিশোর পাঠ্য ও পেপারব্যাক বইয়ের একটি প্রদর্শনী এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ হবে। মুদ্রিত বই ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত অনুবাদ ও পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণের স্বত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থাও এই মেলার মাধ্যমে করা হবে। নানা দেশের প্রকাশকগণ এই মেলার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা-বিনিময় করে শিল্প হিসেবে প্রকাশন শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

দেড়শ রোমান্সের লেখিকা বারবারা কার্টল্যান্ড :

এ যুগে রোমান্টিক নভেল লিখে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন যিনি তিনি একজন বৃটিশ লেখিকা—বারবারা কার্টল্যান্ড। সম্প্রতি তাঁর ১৫০তম রোমান্টিক নভেল—ফায়ার অন দি স্নো—প্রকাশিত হয়েছে। এখন তাঁর বয়স ৭৩ বৎসর। ইয়োরোপের প্রায় সব ভাষাতেই তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। ইয়োরোপের বাইরে আরবী, তুর্কী ও হিব্রু ভাষাতে তাঁর রচনা পাওয়া যায়। সব ভাষা মিলিয়ে মিস কার্টল্যান্ডের রোমান্সগুলির মোট মুদ্রণসংখ্যা প্রায় চার কোটি। পৃথিবীর নানা দেশের পটভূমিকায় কাহিনী রচনা করেন কার্টল্যান্ড এবং তা সবই উনবিংশ শতাব্দীর সময়-ভিত্তিক। কারণ লেখিকা মনে করেন যে এ শতাব্দীর পটভূমিকায় রোমান্সের কথাটা অবাস্তব হয়ে পড়বে। আজকের মানুষের নানা সমস্যা - রাজনীতিক আর্থনীতিক যৌন এবং নৈতিক—এক কথায় মানুষ আজ সমস্যার চাপে জর্জরিত। কার্টল্যান্ড এই সমস্যাক্লিষ্ট মানবসমাজকে কিছু বিমল আনন্দ পরিবেশন করা তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জনৈক বেতার ভাষ্যকার সম্প্রতি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন : কেউ যদি মনে করে যে আপনি পলায়নবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন? উত্তরে সহাস্যে কার্টল্যান্ড বলেন: ঠিকই করবেন। মানুষ যে পরিমাণ এবং যে-সব ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে বসে আছে, তার বেশীর ভাগই কোনদিনই সে সমাধান করতে পারবে না। কাজেই প্রকৃতিস্থ থাকতে হলে তাকে সজ্ঞানে পলায়নবৃত্তির আশ্রয় নিতেই হবে।

রুশ দেশে ভারতীয় সাহিত্যের জনপ্রিয়তা :

সম্প্রতি মস্কোর প্রগতি প্রকাশ ভবন থেকে স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্লড হিস্ট্রির তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। গত বছর অন্য একটি সংস্থা প্রকাশ করেন মহাকবি কালিদাসের রচনাবলী, আগামী বছর প্রকাশিত হবে 'ভারতীয় উপকথা সংগ্রহ' নামে একটি গল্প-সংগ্রহ এবং বিদ্যুৎ ও পদ্ম নামে একটি আধুনিক ভারতীয় কাব্য-সঙ্কলন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে রুশ দেশে ভারতীয় লেখকগণের লেখা বিভিন্ন বই মোট ৮২৮টি সংস্করণে ২,৮৪,০৮,০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা ২,৭৭,০৪,০০০।

নিঃ ভাঃ সম্পাদক সম্মেলন-এর নতুন সভাপতি :

মাদ্রাজের 'মেইল' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভি পি ভি রাজন সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারতীয় পত্র-পত্রিকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে :

ইন্ডিয়ান এন্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির মাসিক মুখপত্র ইন্ডিয়ান প্রেস-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেল যে ৭৩-৭৪ সালে ভারতে প্রকাশিত যে সমস্ত দৈনিক ও সাময়িক পত্রাদি বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছে তার ফলে প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা বিদেশী মুদ্রায় সংগৃহীত হয়েছে। সোসাইটি মনে করেন যে, ভারতের পত্র-পত্রিকা প্রকাশকগণ একটু সচেষ্ট হলে বিদেশে তাঁদের পত্র-পত্রিকা রপ্তানী করে সহজেই অন্তত এক কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করা যাবে। এখন পর্যন্ত যে-সমস্ত দেশে বেশীর ভাগ ভারতীয় পত্র-পত্রিকা রপ্তানী করা হয় সে দেশগুলি হল : বৃটেন কেনিয়া দুবাই কুয়েত মালয়েশিয়া বাংলাদেশ নেপাল ও ইন্দোনেশিয়া।

পরলোকে ইতিহাসবিদ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী

স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব ট্রাডিশনাল কালচারস অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ার পরিচালক অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী সম্প্রতি ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

হাওড়া স্টেশনে শরৎচন্দ্রের আবক্ষমূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনা :

হাওড়া জেলার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে শরৎ-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে তাঁরা হাওড়া স্টেশনে অমর কথাশিল্পীর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করবেন।

সাধক রামপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী উৎসব :

গত ১৫ই জুন কলকাতার রঙমহল থিয়েটার হলে সাধক রামপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে অমর সাধকের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় ও কবি-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

অলংকার
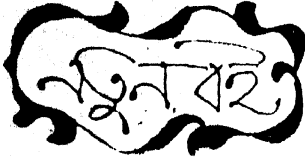
প্রীতীশ নন্দীর কবিতা : অনুবাদ : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী। ৪।১, আফতব মসজিদ লেন, কলকাতা ২৭। দাম : চার টাকা।

প্রীতীশ নন্দীর এই ইংরেজি কবিতাগুলির অনুবাদ পড়ে মনে হল বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁকে এইভাবে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা অত্যন্তই সঠিক হয়েছে। তার প্রধান কারণ প্রীতীশ নন্দী কবি এবং খুবই একজন শক্তিমান কবি। আর সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য প্রীতীশবাবু তাঁর কবিতার উপকরণ ও প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন আমাদের সমসাময়িক কলকাতার পরিবেশ থেকেই বেশীর ভাগ। কাজেই বাঙালী পাঠকের কাছে প্রীতীশবাবুকে মনে হয় খুবই ঘরের মানুষ যদিও ঘরোয়া নয় কেন না তাঁর কবিতাগুলি খুবই তীক্ষ্ণ। ঋজু, রুদ্ধ এবং কোনো কোনো সময় প্রবলভাবে পুরুষালী। সত্যি বলতে কি এই পৌরুষেই প্রীতীশবাবুর ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে মিশেছে নিপুণ একটি সৌন্দর্যবোধ এবং মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতা। বাস্তবিক আমাদের এই চলতি সময়ের অর্থহীনতা অপচয় এবং বিশৃঙ্খলার প্রতি সজাগ থেকেও তাঁর কবিতা মাঝে মাঝে মনে হয় অশ্রুসজল। সেইজন্যই আরও প্রীতীশবাবুর কবিতাকে এত আপন মনে হয়।

সুদৃশ্য এই সংকলিত অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য অনুবাদক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

সঙ্গীত সংগ্রহ : সঙ্কলন—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ বিদ্যাপীঠ, সাঁওতাল পরগণা, বিহার। দশ টাকা।

বাংলাদেশ গানের দেশ। এ দেশের ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানাবিধ ও বিচিত্র গানের সুরেই প্রোজ্জ্বল। বেদও গীত হত এবং ঋষিকণ্ঠের সেই আদিতম সঙ্গীত, তার তাল লয় থেকে নিঃসৃত যে সুরধারা তারই সূত্রে বাংলা গান নিজ মূর্তিতে রচনা করে এসেছে দীর্ঘকালের আচরণের মাধ্যমে। বাংলা গান প্রাচীনতম কাল থেকে কখনোই ধর্ম ও ভক্তিভাব থেকে বিবিক্ত হয়ে দেখা দেয়নি। এই ধর্ম ও ভক্তি ভাব এবং রসমিশ্রিত বাংলা গান একাল সৎ ও বিশুদ্ধ আশ্রমে উপাসনা সঙ্গীতে মর্যাদা পেয়েছে।

সম্প্রতি এমন একটি দীর্ঘকাল ধরে গীত বেশ কিছু গানের সংকলন প্রকাশ করেছেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ তাঁদের বৈদ্যনাথ দেওঘরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে। শ্রীশ্রীগুরুসংগীত, শ্রীশ্রীগায়ত্রী সঙ্গীত শ্রীশ্রীগণপতি সঙ্গীত সূর্য সংগীত নারায়ণ সংগীত, শিব সংগীত, সরস্বতী; কালী ও কৃষ্ণ সংগীত, অভেদ সংগীত, বুদ্ধদেব সংগীত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংগীত, সারদেশ্বরী সংগীত থেকে জাতীয় সংগীত পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার ধর্মীয় সংগীত সংকলন করে সংকলকদ্বয় সংগীত রসপিপাসুদের একত্রে পিপাসা চরিতার্থ করার আয়োজন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে।

গ্রন্থটি সংগীত বিষয়ক গবেষকদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, এক, আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক গীত অপ্রকাশিত কয়েকটি নতুন গান সংযোজিত হয়েছে। দুই, বাঙালীর প্রচলিত বহু উচ্চাঙ্গ ধর্মসংগীত এতে সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মান যথেষ্ট বর্ধিত হয়েছে। তিন প্রতি গানের সঙ্গে তাল-লয়ের উল্লেখ থাকায় একদিকে যেমন বাংলা গানের বিপুল পরিধি বোঝার সহজ রূপে ধরা পড়ে, তেমনি যাঁরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক—উভয়েই সংকলনভুক্ত গানগুলিকে কণ্ঠস্বরে রূপায়িত করে শ্রোতার মন জয় করতে পারবেন। বাস্তবিক অর্থে দেবদেবীনির্ভর বাংলা গানের একটি বড় ধরনের সংকলন গ্রন্থের অভাব আমাদের দেশে ছিল। সেই সঙ্গে ছন্দ, লয়, তাল দিয়ে যে গানের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাগের অলংকার ও বিস্তারে যে গানের বিকাশ হয়, যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁদের এই বোধ জানার সহায়ক সার্থক গ্রন্থ তেমন বাংলায় ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থটি তা অবশ্যই মেটাবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সাহিত্য অভিযান। সম্পাদক সমীরকুমার দত্ত। ২০ দাসপাড়া লেন। মোড়পুকুর। রিষড়া। হুগলী। দাম এক টাকা মাত্র।

প্রপ্রচ্ছদে কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সম্পর্কিত একটি মূল্যবান উক্তি ছাপা হয়েছে। অনামা হলেও কিছু ভালো লেখা এই ছোট পত্রিকাটির চরিত্র সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এই সংখ্যায় অমল আচার্যের গল্পটি ভালো লাগল—ভালো লাগল নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তীর তিনটি লিমেরিক। অসিতবরণ সাউয়ের কবিতাটিও ভালো। মুদ্রণপ্রমাদের দিকে নজর দিলে এবং সেই সঙ্গে সম্পাদনার বিষয়ে একটু যত্ন নিলে আশা করা যায় আগামী সংখ্যাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

আজকাল। সম্পাদক বাপী সমাদ্দার। নৈহাটি। ২৪ পরগণা। দাম আশী পয়সা।

কিছু ভালো কবিতা এবং একটি চিন্তামূলক প্রবন্ধ নিয়ে আজকাল পত্রিকার চলতি সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। পত্রিকাটি ভালো লাগল।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

বাবুজী, আমি ভাগ্তু বলতে বলতে একটা গাছের আড়াল থেকে ভাগতু বেরিয়ে এল। মোটা লাঠি একখানা দু' হাতে চেপে ধরে ব্যালান্স রাখতে রাখতে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল সে।

টাট্টু থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বললাম, তুই এখানে! এতটা পথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছিস?

ভাগ্তু মুখখানা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ওর খোঁড়া পাখানার দিকে চোখ পড়তেই দেখি, রক্ত লাল হয়ে গেছে আঘাতের জায়গাটা।

তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, ভাগ্তু জখম পাখানাতে চোট লাগিয়ে বসে আছে।

ধমক দিয়ে বললাম, কে তোকে আসতে বলেছে এখানে?

ভাগ্তু তেমনি লাঠির মাথায় দুটো হাত মুঠো করে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, ওঠ্ টাট্টুর ওপর।

ভাগ্তু আর নড়ে না। জোর করে ওকে টেনে এনে টাট্টুতে ওঠালাম। ওর লাঠিখানা হাতে নিয়ে প্রবল জোরে ঠুকতে ঠুকতে আর ওকে ধমক দিতে দিতে চললাম।

এদিকে আমার বুক ঠেলে একটা ব্যথা উঠে আসছিল। সারা জীবনের মত পঙ্গু একটা ছেলে আমার কাছে এসেছে তার জীবন কাটাবার জন্যে। এ বয়েসে যখন ছেলেরা সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে, তখন ভাগ্তু সারাদিন মুখ বুজে ছোট্ট বাংলোর সীমানাটুকুর ভেতর হয় আমার ফরমায়েস খাটছে, নয় তো বিষণ্ণ মনে বাইরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে বসে আছে।

আমরা বাঁধানো পাথরের রাস্তায় এসে পড়লাম। দু'দিকে দাঁড়িয়ে সারি সারি সিডার। ছায়া পড়েছে পথে। টাট্টুর খুরের বিশেষ শব্দটা বাজছে। এখন লাঠিখানা প্রায় টেনে টেনে চলেছি। টাট্টুর ওপর নীচু হয়ে ঝুঁকে বসে আছে শ্রীমান ভাগ্তু। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত আহত বালকবীরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাংলোর আলো দেখা যাচ্ছিল। চাচাজী কুলু গেছেন। ঠিকে রাঁধুনি মুন্সি ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাতের রান্না সেরে নিচ্ছে হয়তো।

আমার মনে হল, শিশুরা কত সহজে তার সবটুকু ভালবাসা নিঃস্বার্থভাবে উজাড় করে দিতে পারে। একটি মানুষকে যথাসময়ে ফিরতে না দেখে ভাগ্তুর শিশু-মনটিতে যে আলোড়ন উঠেছিল, তাই তাকে নিজের অক্ষমতার কথা ভুলিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছে ঐ দূরের ভ্যালিতে। ভাঙাচোরা আবছা অন্ধকারের পথ পেরিয়ে যেতে আহত হয়েছে সে, কিন্তু প্রিয়জনের বিপদের কথা ভেবে সব যন্ত্রণা লঘু হয়ে গেছে তার।

রাতে খাবারের টেবিলে বসে খাচ্ছিলাম আমি আর ভাগ্তু।

বললাম, হ্যাঁরে ভাগ্তু তুই নাগ্গরে একা একা যেতে পারবি?

ভাগ্তু প্রবল উৎসাহে মাথা দুলিয়ে বলল, খুব যেতে পারব।

আবার বললাম, কিন্তু বাস রাস্তা থেকে যে তোর দিদির কোয়ার্টার অনেকখানি উঠে যেতে হবে, তুই পারবি কি করে?

উৎসাহে টুল থেকে নেমে ওর ঐ লাঠিখানা দেখিয়ে ভাগ্তু বলল, ঐ লাঠিতে ভর রেখে ঠিক চলে যাব।

বললাম, তুই জানিস জায়গাটা?

ও অমনি বলল, আমরা ওদিকে ভেড়া নিয়ে গেছি। আর দিদি আমাকে সব বলে দিয়েছে। তুমি ছেড়ে দিয়ে একবার দেখই না বাবুজী।

বললাম, থাম্, আর বাহাদুরী করতে হয় না। এখন পা-টি আগে সারুক তো দেখি। তারপর দিদির কাছে যাওয়া।

ওর উৎসাহের আগুন দপ্ করে হঠাৎ নিভে গেল।

ভাবলাম, এখুনি যেতে বললেই ভাগ্তু ঐ খোঁড়া পাখানা নিয়ে হয়ত সারারাত নাগ্গরের পথে হেঁটে চলত।

ক'দিন ছোট্ট মানালী টাউন আর তার আশপাশ অঞ্চল সরগরম। বম্বে থেকে এসেছে সিনেমা পার্টি। ঋতুর পালা বদলের মত সারা পাহাড়ী এলাকায় হাওয়া বদল হয়েছে। গরীব কুলিরা মালপত্র গাড়ীতে ওঠানো নামানোর কাজ করে দু' পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। উঠতি বয়সের ছেলেগুলোর চোখে লেগেছে রঙ। তারা পার্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে মণিকরণ, রোটাং, কাতরেইন। ফাই-ফরমায়েস খাটছে। বিনি পয়সার মজুরী। শুধু দৃষ্টিতে।

মূল দলটি উঠেছে 'হোটেল বিয়াসে'। মানালীর সব থেকে কস্টলি হোটেল। বেননদের চারটি হোটেলের ভেতর একটি।

প্রোডিউসার ডাইরেক্টার হিরো, হিরোইন রয়েছে হোটেল বিয়াসে। বাকী সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে ওখানে। সরকারী টুরিস্ট বাংলোতেও পার্টির লোকজন মজুদ।

দশেরা উৎসবের রথ

সকালে বাজারে সিগারেট কিনতে গিয়ে দেখি ক্রীম কালারের একটা গাড়ী রোটাং-এর পথে দাঁড়িয়ে। সম্ভবত হিরো হিরোইন ডাইরেকটর প্রোডিউসাররা বসে। মনে হল শ্যুটিং-এ চলেছে। দেখলাম নীল মাছির মত এক দঙ্গল ছেলে তাদের ড্রিমল্যান্ডের আশ্চর্য মানুষগুলোকে ঘিরে ভনভন করছে।

সিগারেটের দোকানে ঢুকতেই দেখি মদনলাল। কয়েক প্যাকেট সিগারেট হাতে ধরা। একটা ছোট বাক্সজাতীয় কিছুর ভেতর প্যাকেটগুলো ভরে দিতে হবে, তাই দোকানীকে তাড়া লাগাচ্ছে। বেচারা দোকানী জিনিসপত্র উলটে পালটে চেড়ে দেখছে একটা উপযুক্ত আধার।

হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই মদনলালের চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিয়ে বলল নাগগরে দেখা হয়েছিল না?

ইংরেজীতেই বলল মদনলাল। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে কুলহী ভাষাটা আয়ত্ত করে ফেলেছি। তাই ঐ ভাষাতেই বললাম, মনে হচ্ছে।

হর্ন বাজল পথ পাহাড় কাঁপিয়ে। দোকানদারের উপযুক্ত আধার মেলার আগেই মদনলাল প্যাকেটগুলো সামলে ধরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

দেখলাম, ঐ সিনেমা পার্টির গাড়ীতেই উঠল মদনলাল। মুখ বের করে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোঁড়াগুলোকে দেশজ ভাষায় দু' একটা চোস্ত গাল দিয়ে মুখখানা আবার ঢুকিয়ে নিল। গাড়ী চলতে শুরু করল আর হিরো হিরোইনের ফ্যানেরা গাড়ীর পেছন পেছন বাই বাই ক'রে দৌড়তে লাগল।

ঠিক সেদিন রাত ন'টা নাগাদ একটা চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে এলাম। গোলমালটা মনে হল নীচে বেননদের কোয়ার্টারের দিকে অথবা তার একটুখানি ওপরে সরকারী টুরিস্ট বাংলোতেও হতে পারে।

এত ওপর থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল না, তবে কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম শুনে ব্যাপারটা যে ঘোরালো তা অনুমান করা যাচ্ছিল।

দেখলাম বাগান পেরিয়ে লাঠিখানা ঠুকতে ঠুকতে সামনে এসে দাঁড়াল ভাগতু। ও বাগানের ওদিককার একখানা ঘরে থাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবুজী বহুৎ মারপিট চলেছে! জুলিয়েন সাহেব মেরে একজন বোম্বাইওয়ালা সাহেবের দাঁত উড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম, তুই কি করে জানলি?

ভাগতু মাথা নীচু করতেই বুঝলাম ইতিমধ্যে গোলমালের জায়গাটা ঘুরে সরেজমিনে তদন্ত করে আসা হয়েছে।

আমার তখন কোন কিছু ভাববার অবস্থা ছিল না। ব্যাগে দু' একটা ওষুধ ভরে নিয়ে দৌড়লাম জুলিয়েনদের হোটেলের দিকে।

গিয়ে দেখি হোটেল বিয়াসের সামনে অনেক লোকের ভীড়। হাঁক-ডাক ইতিমধ্যে থেমে গেছে। পুলিশ ফাঁড়ি থেকে গাড়ী এসেছে। অফিসার-ইনচার্জ হোটেলের বারান্দায় বসে কি যেন লিখছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মদনলাল আর একটি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি এক হাতে মুখ ঢেকে রেখেছেন। তাঁর মাথার চুল উস্কো খুস্কো। দূর থেকে মনে হচ্ছে কেউ যেন চুলগুলো হিঁচড়ে টেনে এলোমেলো করে দিয়েছে। একটা দরজার ওপারে কাঁধের ওপর চুল লটকে ডিপ গ্রীন রঙের বেলস্ আর ইয়োলো টপ পরে দাঁড়িয়ে আছে হিরোইন। চোখে মুখে আতঙ্ক।

জুলিয়েন পাশের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল। দারুণ রকম উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। জুলিয়েনের বাবা মিঃ বেনন ছেলের সংগে এলেন হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ অফিসারটির কাছে।

আমি কাছাকাছি যেতেই মিঃ বেননের চোখে পড়ে গেলাম। অমনি মিঃ বেনন আমার দিকে পুলিশ অফিসারটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এই যে ডকটর মুখার্জী এসে গেছেন। ওঁকে দিয়ে চোপরা সাহেবের উন্ডটা একটু পরীক্ষা করিয়ে নিলে হয়।

আমি পুলিশ অফিসারটিকে আগে কখনও দেখি নি। উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বিশেষ দুঃখিত ডাক্তার মুখার্জী এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে। একটা ভুল বোঝাবুঝির দরুন এই ভদ্রলোক মুখে আঘাত পেয়েছেন। আপনি যদি ওঁকে একটু পরীক্ষা করে কোন মেডিসিনের ব্যবস্থা করেন, তাহলে বড় উপকার হয়।

মিঃ বেনন আমাকে আর পেসেন্টকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে গেলেন। জুলিয়েন স্ট্রেট দাঁড়িয়ে রইল পুলিশ অফিসারটির কাছে।

গরম জল এল। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, সত্যি ভদ্রলোক দাঁতে দারুণ রকম আঘাত পেয়েছেন। রক্ত পড়ছে তখনও। তবে দাঁতগুলো অক্ষতই আছে। নড়ে গেলেও পড়ে যায় নি।

ভাগতুর কাছে ব্যাপারটা শুনে দরকারী ওষুধ সংগেই এনেছিলাম। সেগুলো সব সদ্ব্যবহারে লেগে গেল।

আমি কাজ শেষ করে বেরিয়ে এসে দেখি, মদনলাল পুলিশ অফিসারটিকে চুপি চুপি কি সব বলছে।

কৌতূহলী লোকেরা পুলিশের তাড়া খেয়েই হোক, অথবা রাত দশটা বেজে যাবার জন্যেই হোক সব ভেগে পড়েছিল। জুলিয়েনকে কাছে পিঠে কোথাও দেখলাম না। হিরোইন অদৃশ্য। সকাল বেলার সেই রোটাংগামী গাড়ীর আরোহী আরও দুটি ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদনলালের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিতে দেখলাম।

আমি আর দাঁড়ালাম না। চলে আসার সময় অফিসারটিকে বললাম, আশা করছি কাল পরশুর ভেতর একেবারে সুস্থ হয়ে যাবেন। আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

মদনলাল একবার হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকাল। নাগগরের সেই টুরিস্ট হঠাৎ রাত ন'টায় ডাক্তার হয়ে গেল কি করে, তা তার মগজে এল না।

অফিসারটি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন।

আমি নেমে এলাম হোটেলের কম্পাউন্ড থেকে। ওপরের রাস্তায় পড়ার আগে আধো অন্ধকারে দেখা হয়ে গেল জুলিয়েনের সংগে। কটা মালবাহী কুলি তার পেছনে। ও থমকে দাঁড়াল আমাকে দেখে। বলল, যত রাত হোক আসছি তোমার ওখানে, দরজাটা খুলে রেখো।

জুলিয়েন চলে গেল। আমি পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে শুধু ডক্তারের কর্তব্যটুকু করে চলে এলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে জুলিয়েন এল। এসেই বলল, সব ক'টাকে বিদেয় করে এলাম।

বললাম, আমার ডিনার রেডি। তুমি বক্সিং লড়ছিলে, সুতরাং তোমার যে এখনও খাওয়া হয়নি, তা ধরে নিতে পারি। চল, খাবার টেবিলে খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

আমরা দুজনে খেতে বসেছি। জুলিয়েন বলল, তুমি হঠাৎ ওপর থেকে নীচে হাজির হলে কি করে?

হেসে বললাম, নীচ থেকে তোমার গলা ওপরে ভেসে এল, তাই আমাকে নীচে নামতে হল।

দেখলাম, জুলিয়েনের বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। ও কয়েক গ্রাস খাবার খেয়ে নিয়ে বলল, আসল ব্যাপারটা কিছু জেনেছ?

বললাম, বিশ্বাস কর, আসল নকল কিছুই জানতে পারিনি। ভাগতুর মুখে শুনেলাম, তুমি নাকি কার দাঁত উড়িয়ে দিয়েছ, তাই ব্যাপারটা দেখতে ছুটে গিয়েছিলাম। আর গিয়েই তোমার বাবার আদেশ পালন করলাম। লোকটা যাতে নিজের দাঁতের ওপর ভরসা রেখে আরও কিছুদিন অন্তত চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম।

জুলিয়েন গম্ভীর হয়ে বলল, একটা স্কাউন্ড্রেল! এত বড় একটা কোম্পানীর ম্যানেজার হয়ে এসেছে।

বললাম, এখন আসল ব্যাপারটা কি বল তো জুলিয়েন?

জুলিয়েন বলল ঐ স্কাউন্ড্রেলটা ক'দিন আমাদের হোটেলের কুক চাম্বিয়ালীর পেছনে লেগেছিল। তুমি জান, হোটেল কম্পাউন্ডের বাইরে রাস্তাটার ঠিক ওপারে ওদের কোয়ার্টার। লোকটা থাকত গভর্নমেন্ট টুরিস্ট বাংলোতে। রাত দশটা নাগাদ আমাদের হোটেলে আড্ডা মেরে ফেরার পথে চাম্বিয়ালীকে একবার করে জ্বালিয়ে যেত।

বললাম, ওর স্বামী নেই?

আছে বইকি তবে তাকে আগে-ভাগেই ঐ লোকটা সরিয়েছে। মণিকরণের শুটিং সাইটে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছে। সেখানে ক'টি মেয়ের ছবি নিতে হবে। কাস্তে নিয়ে গম কাটছে, এমন ক'টি যুবতী মেয়ে চাই।

বললাম, তারপর?

জুলিয়েন বলল, মেয়েটা ওর স্বামীর রোজগারের কথা ভেবে কিছু বলেনি। কিন্তু আজ লোকটা সোজাসুজি আমার হোটেলেই ওকে চরম প্রস্তাবটা দিয়েছে।

বললাম, তুমি জানলে কি করে?

মার কাছে চাম্বিয়ালী কেঁদে বলছিল, আমি ওভারহিয়ার করলাম। তারপর যা হবার তাই হল। সবার সামনে কলার চেপে ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলে স্কাউন্ড্রেলটার মুখের ওপর একটা ছোট্ট ঘুষি লাগিয়ে ছেড়ে দিলাম। তাতেই হৈ রৈ কাণ্ড বেঁধে গেল।

বললাম, ভাগ্যিস ঘুষিটা জোরে চালাও নি তাহলে ভদ্রলোককে বোম্বে ফিরেই ফলস টিথের অর্ডার দিতে হত।

জুলিয়েন পুডিং খেতে খেতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, ঐ স্কাউন্ড্রেলটাকে আবার তুমি ভদ্রলোক বলছ!

বললাম, জুলিয়েন, পুলিশ দেখলাম যে, ওদের কে খবর দিয়ে আনল?

ও বলল, টুরিস্ট বাংলোর ঐ মদনলাল নির্ঘাৎ খবর দিয়ে থাকবে। ও ব্যাটা চেয়েছিল আমার এগেনস্টে ডায়েরী করতে, কিন্তু জানে না কোর্টে নিয়ে চাম্বিয়ালীকে দাঁড় করালে ম্যানেজারের বোম্বে ফেরা ঘুচে যেত। পুলিশ অফিসারকে ও ব্রাইব করার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু চাম্বিয়ালীকে হাত করতে না পারলে সব ভেস্তে যাবে জেনে ওরা আর এগোতে চেষ্টা করেনি।

বললাম, তোমার বাবা কি বলেন?

জুলিয়েন বলল, বাবা তাঁর পুত্রকে বিলক্ষণ চেনেন। তাই আমার কাজে বাধা দেননি। ল্যাঠা চুকে গেলে শুধু বললেন, আমরা ব্যবসায়ী, কেবল এটুকু কথা মনে রেখ।

বললাম, এত রাতে কোথায় নির্বাসন দিলে ওদের?

জুলিয়েন বলল, মদনলালই মাথায় করে নিয়ে গেল টুরিস্ট বাংলোতে।

বললাম, মদনলাল লোকটা নাগগরে টুরিস্ট বাংলোতে থাকে বলে জানতাম, ও আবার এখানে এল কি করে?

জুলিয়েন বলল, সরকারী অফিসে ওর দারুণ খুঁটির জোর। ও সুযোগ বুঝে ওর কর্মক্ষেত্র পালটে নেয়।

বললাম, লোকটাকে দেখলেই মনে হয় ধুরন্ধর।

জুলিয়েন বলল ওর সঙ্গে আগে একবার আমার ভুয়োস লড়া হয়ে গেছে।

নরসিং দেবতাকে নিয়ে মেলায় চলেছে

কি রকম?

জুলিয়েন বলল একবার অকটোবরে দুটো কলেজের ছেলে দিল্লী থেকে বেড়াতে এসে বিপদে পড়ে যায়। কোন হোটেলে জায়গা না পেয়ে আমার এখানে আসে। কিন্তু তুমি জানো 'হোটেল বিয়াস' কস্টাল হোটেল। ওতে ঘর ছিল ঠিক কিন্তু ঐ দুটো কলেজ-বন্ধুর থাকবার মত রেস্ত ছিল না। আমি হয়ত ওদের ঘর দিতে পারতাম, কিন্তু তাহলে আমাকে হোটেলে নিয়ম ভাঙতে হয়। তাই একটু মুশকিলেই পড়ে গেলাম।

বললাম সে তো ঠিক।

জুলিয়েন বলল, তারপর শোন। ওদের নিয়ে গেলাম মদনলালের কাছে। মদনলাল স্রেফ বলে দিল, নো ভেকেন্সি। তখন নিজের আইন নিজে ভেঙে ওদের চারদিন রাখলাম। ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে জানলাম, মদনলালের হাতে একাধিক ঘর খালি আছে। মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ করে বসলাম। বেআইনি হলেও ওর অফিসের খাতা টেনে নিয়ে দেখলাম, ঘর খালি। ওর চোখের ওপর তুলে ধরে বললাম সরকার বাহাদুর নিশ্চয় তোমাকে এই টুরিস্ট বাংলো নিয়ে ব্যবসা চালাতে বলেন নি।

ও অপমানিত হল, কিন্তু আমাকে জানে বলে কথা বড়বার সাহস করল না।

বললাম, ছেলে দুটোকে জায়গা না দেবার কারণ কি থাকতে পারে জুলিয়েন? ওদের কাছ থেকেও তো টাকা পেত।

জুলিয়েন বলল, ব্যাপারটা তা নয়। দু' বছর আগে ও আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলাম রূঢ়ভাবে তাই রাগ।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, প্রস্তাবটা কি?

জুলিয়েন বলল, সরকারী বাংলোতে স্থান নেই জানিয়ে বিভিন্ন শাঁসালো পার্টিকে মদনলাল আমার হোটেলগুলোতে এনে তুলবে আর মোটা কমিশন লুটবে। ওর এই লোভনীয় প্রস্তাবটি আমার মত নির্বোধ নিতে পারেনি, তাই প্রতিশোধ।

আমাদের খাওয়া শেষ হতে অনেকখানি রাত হয়ে গেল।

বললাম, এত রাত্তিরে নীচে নেমে আর কাজ নেই এখানেই শুয়ে পড়।

জুলিয়েন বলল, অনেক রাতে ঘুম না এলে নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে মুখার্জী।

বললাম, বিয়ে করলেই ঘুম এসে যাবে।

জুলিয়েন বাগানে লাফ দিয়ে নেমে চলে যেতে বলল, যেমন আজকাল তোমার ঘুম এসে যাচ্ছে মুখার্জী।

জুলিয়েন চলে গেল আমার কিন্তু ঘুম এল না চোখে। আমি বিছানার ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঝিন্নিকে চিঠি লিখতে বসলাম। জুলিয়েন আমাকে এই মুহূর্তে ঝিন্নির কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেছে।

আমি চিঠি লিখছি। এ চিঠি নিয়ে চার চারখানা লেখা হল ঝিন্নিকে, কিন্তু একছত্র লেখাও ওদিক থেকে আসেনি। কুলু থেকে আসার সময় ঝিন্নি বলে দিয়েছিল, চাচাজী তোমার কাছে থাকবেন, আমি এখন মরে গেলেও তোমাকে চিঠি লিখতে পারব না। আমার হাতের লেখা ওঁর চোখে পড়লে ভীষণ খারাপ লাগবে। তুমি কিন্তু প্রতি সপ্তাহে অন্তত একখানা করে চিঠি আমার নামে নাগগরে পাঠাবে।

বলেছিলাম, চমৎকার! নিজের পাওনাটা বুঝে নিচ্ছ কড়ায় গণ্ডায় আর আমার বেলা বুঝি ঢুঁ ঢুঁ।

ও অমনি বলেছিল, চাচাজী ফসল তোলার জন্যে মাসখানেক বাদেই কলুতে ফিরে আসবেন। এখানে [illegible] পুরো দুটি মাস। সে সময় [illegible] আসলে তোমার পাওনাগুলো [illegible]। তোমার সব চিঠির জবাবই আমার সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে থাকবে, তুমি কেবল একসঙ্গে পাবে সেগুলো।

চাচাজী চলে যাবার পরই আমি নাগগরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি ঝিন্নিকে। দু-এক দিনের ভেতরেই ওর অনেকগুলো চিঠি একসঙ্গে আশা করছি। কিন্তু আজ আবার লিখতে ইচ্ছে করল। তাও এই রাত জেগে।

জুলিয়েনের আজকের ঘটনার কোন উল্লেখ করলাম না। কিন্তু ওর শেষ কথাটির উল্লেখ না করে পারলাম না।

অনেক আদরের ঝিন্নি!

এখন রাতশেষের ভাঙা চাঁদটা বাগানের পাইন গাছের শাখায় খেলনার একটা পেতলের নৌকোর মত বাঁধা পড়ে আছে। এখুনি জুলিয়েন রাতের আড্ডা শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরে গেল। ওকে আমার এখানে থেকে যেতে বলেছিলাম। ও বলল, রাতে ওর নাকি ঘুম না এলে নদীর ধারে বেড়ানোর অভ্যেস আছে।

আমি ওকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলাম, ঘুমের ওষুধ হিসেবে।

ও সঙ্গে সঙ্গে কি জবাব দিল জান, তোমার যেমন আজকাল ঘুম এসে যাচ্ছে মুখার্জি।

ও চলে যাবার পর আমার কিন্তু আর ঘুম এল না। কলম নিয়ে কাগজের ওপর আঁকিবুকি কাটতে বসে গেলাম।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রাতগুলো তোমার কাটছে কেমন? ক্ষীণ চাঁদটা হয়ত তোমার জানালার বাইরে আপেল গাছটার ডালে এখন আটকে আছে। ঐ চাঁদটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছে, আমরা কত কাছে রয়েছি।

তোমার কোয়ার্টারের পাশে ঐ আপেল গাছটার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম চাচাজীকে। চাচাজী আশ্চর্য একটি নাম শোনালেন। কি নাম বল তো? বলতে পারলে না তো! তবে শোন, 'অ্যাডামস অ্যাপেল'।

আসলে কিন্তু অ্যাডামস অ্যাপেল বলে কোন আপেলের নাম নেই। ওটা গলার সামনে ক্যারিংস-এর যে প্রোজেকসান থাকে তারই নাম। তবে প্রবাদে আছে, আদি মানবের গলার এখানে নাকি ইভের দেওয়া আপেলের একটু টুকরো আটকে গিয়েছিল। তাই ও জায়গাটার ঐ নাম হয়েছে। চাচাজীকে প্রশ্ন করে জানলাম, রোরেরিখ গ্যালারীর ঐ জায়গাটা নাকি আগে এক ইংরেজের ছিল। আপেল গাছটির নাম তাঁরই দেওয়া।

এবার শোন, তোমার ইচ্ছাগুলো দেখছি পূর্ণ হতে চলেছে, অবশ্য ধীরে ধীরে। রোগীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। বেলা এগারোটা অব্দি চেম্বারে রোগী দেখি। তারপর স্নান ভোজন সেরে খানিক সময় বিশ্রাম নিতে না নিতেই রোগীর দল

আসে। না, না, রোগী নয়, ভোগী। পাহাড়ীদের বাচ্চাগুলো দলবেঁধে বাগানের ওপার থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ভাগতু দাদার সঙ্গে ভাব জমায়। এক সময় ভাগতু ওদের মুখপাত্র হয়ে আসে আমার কাছে। ওদের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। আমার কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল পেলেই ভাগতু হাতছানি দেয়, আর অমনি লিলিপুটে ব্যাটেলিয়ানরা দৌড়ে আসে বাংলোর দাওয়ায়।

ওদের জন্যে জমা থাকে লজেন্স, টফি, চকলেট। ভাগতু একটি একটি করে বিতরণ করে যায়। ওরা একটুও গোল করে না তখন। অসীম ধৈর্যে হাত পেতে রাখে। সে সময় তুমি যদি ওদের মুখের চেহারা দেখতে, তাহলে মনে হত, মুঠো মুঠো ভোরের মিঠে রোদ যেন লুটোপুটি করছে তোমার বাগানে।

এদিকে ভাগতু নাগগয়ে যাবার জন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল মুখ থেকে স্টার্ট কথাটা খসার যা অপেক্ষা।

দেখ শ্রীমতী ঝিমি, আমি রাত জেগে জেগে কঠোর তপস্যা করে চিঠি লিখছি আর তুমি দিব্যি টেনে টেনে ঘুম দিচ্ছ, তাই মনে হচ্ছে জুলিয়েন কথাটা আমাকে না বলে তোমাকে বললেই ঠিক মানাতো।

তোমার ছোট সাহেব।

পুনশ্চ : এরপর তোমার চিঠি না এলে এদিকের কোন চিঠি নিয়ে নাগগয়ে আর ডাকপিয়ন উঠবে না।

পরের দিনই চিঠি এল। ঝিমির হাতে ঠিকানা লেখা চিঠি। অনেকগুলো টিকিট সাঁটা, অনেক ভারী চিঠি। আমি রোগী দেখছিলাম তখন। পিয়নের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে রেখে দিলাম।

রোগী দেখে চলেছি তো চলেছিই। আজ কেন জানি না মনে হতে লাগল, যে কটি রোগী দেখেছি তারা আমার একটি প্রেসক্রিপশানেই ভাল হয়ে যাবে।

গভীর একটা বিশ্বাস আমার সমস্ত চেতনার ভেতর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ অদ্ভুত এক ধরণের অনুভূতি জন্ম নিল আমার মনের মধ্যে। মনে হল ঝিমি আমার পাশেই রয়েছে। আমার প্রতিটি কাজ সে নিবিড় ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছে।

আজ রোগী দেখতে গিয়ে অন্যদিনের চেয়ে সময় কিছুটা বেশী লাগল। প্রায় বারোটার পর ছুটিছুটি শেষ রোগীটি ডাক্তারকে ছুটি দিয়ে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমার একি হল! আমি সেই মুহূর্তে কিছুতেই ঝিমির খামখানা খুলতে পারলাম না। সুন্দর একগুচ্ছ ফুল যেমন মোংরা জামা কাপড় পরে থাকলে ধরতে ইচ্ছে করে না, আমিও তেমনি সারাদিনের গ্লানি ধুয়ে মুছে না ফেলা পর্যন্ত ঝিমির চিঠিগুলো খুলতে পারলাম না। চিঠির খাম-খানা নিয়ে বিছানার বালিশের তলায় রেখে আমি স্নান সেরে নিতে গেলাম।

আপন মনে নিজের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললাম : কি ডাক্তারী শিখলে এতদিন পুষ্করবাবু। একটা হৃদয় অনেক দূরে থেকেও আর একটা হৃদয়কে ছুঁয়ে গেলে কেন সারা বুকখানা জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, কেন সম্পূর্ণ পাল্টে যায় আচার-আচরণগুলো। বল তো দেখি! এর কি ব্যাখ্যা দেবে তোমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্র? ডক্টর বার্নার্ড, আপনি তো হার্টের রিপ্লেস-মেন্টে মাস্টার, কিন্তু হদিস পেয়েছেন কি এসব হৃদয়ঘটিত প্রশ্নের?

জল ঢালতে গিয়ে হঠাৎ গান এল গলায়,

বরষে বৃষ্টি এল গুনগুনিয়ে,
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

কয়েক মগ জল হুড়হুড় করে মাথায় ঢেলে তাড়াতাড়ি তোয়ালেতে গা মুছে বেরিয়ে এলাম।

খাবার টেবিলে কখন বসলাম আর কখন উঠলাম তা বুঝতে পারলাম না। ভাগতু আমার ব্যবহারের কিয়াকলাপগুলো ছোট্ট মাথাখানা এদিকওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল।"

আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। আবার দরজা খুলে ভাগতুর নাম ধরে জোর ডাক পাড়লাম। ভাগতু কাছে এলে বললাম, শোন, তুই একবার বাজারে যেতে পারবি?

ভাগতু মহাখুশি। এতদিন সে নিজে গেছে লুকিয়ে চুরিয়ে, কিন্তু আজ কি সৌভাগ্য তার, বাবুজী নিজের মুখে আদেশজারি করছে।

ভাগতু তার ডান কাঁধে বারডিমেক ব্যাগ আর মাথা ঠুকে সিধে হয়ে দাঁড়াল। ভাব-খানা এই, সে যাবার জন্যে তৈরী।

বললাম, এ নিয়ে যা কিছু টাকা। লাড্ডু কিনে আন। ছেলেগুলো এলে আজ লাড্ডু খাওয়াবি ওদের। আর শোন তোর

জয়ের খবরে মেতে উঠে অভ্যর্থনার ব্যবস্থাই যেন বাগানে খেলা করছে।

আবদুর ঊষা নিয়ে ছাত বগলে গু্ঁজে বেরিয়ে গেল। বাগানের বাইরে গাছের আড়ালে গিয়ে সে একটা হাঁক দিলে। মুক্তোর প্রাঙ্গণে সে নিজেকে মুক্তপুরুষ বলে মনে করছে। এবার থেকে তাকে আর চুরি করে বাইরে যেতে হবে না।

এবার ঘর বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। বালিশের তলা থেকে খামখানা বের করে ছিঁড়ে ফেলতেই বেশ ক'খানা চিঠি বেরিয়ে এল।

ঝিমি প্রতিটি চিঠির মাথায় তারিখ লিখে রেখেছে। দিন রাত্রির কোন বিশেষ বিশেষ লগ্নে সেগুলো লেখা হয়েছে তারও উল্লেখ আছে।

চিঠিগুলো সাজিয়ে নিলাম পর পর তারিখ অনুযায়ী। ঝকঝকে সাদা কাগজগুলোর কোণায় রং তুলি আর পেনের আঁচড়ে ছোট্ট ছোট্ট ছবি আঁকা হয়েছে।

ছবিগুলো আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ লেখার ছত্রে চোখ পড়তেই মনে হল, প্রতিটি ছবির সঙ্গে চিঠির ভাষার মিল আছে।

প্রথম চিঠিতে ঝিমি একটা পিঙ্ক ফুলেভরা আপেলের ডাল এঁকেছে।

চিঠির শুরু হয়েছে ঃ

আমার ছোটেসাহেব!

আজ সকালবেলা কি দুষ্টুমি শুরু করলে তুমি। উঠোনে নেমেই দেখি, তোমার গার্ডেন অব ইডেনের সেই আপেল গাছটা একরাশ ফুল ফুটিয়ে ফিকফিক হাসছে। নাগাল যদি পেতাম, তাহলে আচ্ছা করে নাড়া দিয়ে দিতাম। ঐ ডাল থেকেই তো তুমি গার্ডেন অব ইডেনের শেষ আপেলটি উপহার দিয়েছিলে একটি মেয়েকে।

তুমি লিখেছ, তোমার ঠাসা দিনগুলো কেটে যাচ্ছে কাজের ভেতর। আমার কিন্তু অলস অবসরগুলো শুধু একটি ছেলের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই কেটে যায়।

যখন তুমি আসনি, তখন দিব্যি একরকম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘরের কাজগুলো গুছিয়ে তুলতেই ফুরিয়ে যেত আমার সময়। আজ সব কাজ এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে আমার দিকে চেয়ে। প্রয়োজনে অনিচ্ছায় কোনরকমে সেগুলোকে সেরে তুলি। তুমি কোথা থেকে ডেকে আনলে একটা ঝড়ের হাওয়া। আমার সবকিছু উড়ে এলোমেলো হয়ে গেল।

জান ছোটেসাহেব, ভালবাসতে খু-উ-ব ভালো লাগে, কিন্তু ভালবাসার ভার বইতে বুক ভেঙে যায়। রাতে যখন বিছানায় শুয়ে থাকি তখন ঘুম আসে না চোখে। কেবল মনে পড়ে যায় তোমার হাজারো রকমের আদরের ছবিগুলি। কত দুষ্টুমির খেলা খেলতে তুমি। কত ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা আসত তোমার মাথায়। কেউ যে আর একটি দেহকে নিয়ে খেলতে গিয়ে এমন ছবি আঁকতে পারে, তা তোমার সঙ্গে দেখা না হলে হয়ত কোনদিন জানতে পারতাম না।

অনেক সময় মনে হয় তুমি কতকিছু চেয়েছিলে আমার কাছে, কিন্তু আমি তোমাকে সবকিছু দিতে পারিনি। সে দুঃখ যে আমারও ছোটেসাহেব।

আজকাল আমার কেবলই মনে হয় কুলুর সেই শেষ রাতটার কথা। তুমি কেমন আমার কোলটিতে মাথা রাখতে চাইলে। আমি সারা রাত কাটিয়ে দিলাম তোমার মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে।

তোমার অনেক আদরের ঝিমি।

পরের চিঠিখানা John Dryden এর একটি উক্তি দিয়ে শুরু ঃ

'Pains of love be sweeter far
than all other pleasures are'.

এ পাতাতেও একটি ছবি। সেই ফুলেরই ছবি। বড় বড় পাতা হাওয়ায় ভাসিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ আকাশ-নীল রংয়ের ছোট ছোট ফুল ফুটিয়ে জেগে আছে 'ফরগেট মি নট'।

ঝিমি লিখেছে ঃ ছোটেসাহেব, আমার কুহলের ধারে গরমের হাওয়া লেগে ফুটেছে 'ফরগেট মি নট' ফুলগুলো।

শুনেছিলাম, কোন এক নাইটের মনোরমা স্ত্রী তাঁর এক দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ একটি স্রোতধারার কাছে ঐ লোভনীয় ফুলগুলো দেখে তিনি তাঁর রক্ষীটিকে পাঠালেন একগুচ্ছ ফুল তুলে আনবার জন্যে।

দেহরক্ষীটি মনে মনে ভালবাসত তার প্রভুপত্নীটিকে। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল ফুল তুলে আনতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, ফুল তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল স্রোতের ভেতর। সাঁতার জানে না, তাই সে তলিয়ে যেতে লাগল জলের গভীরে। শেষবারের মত মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে সে বলে উঠল, 'ফরগেট মি নট'।

সেই থেকে ফুলটির নাকি ঐ নাম হয়েছে।

জান ছোটেসাহেব, এই ফরগেট মি নট নামটির ভেতর কোথায় যেন কাছে মনের মধ্যে বেঁচে থাকার করুণ একটা আবেদন আছে।

তোমার আদরের ঝিমি।

একটি একটি করে সবগুলো চিঠি ওর পড়লাম। চিঠি পড়ে মনে হল, ভালবাসার বর্ণা বসন্ত পাশাপাশি ছুঁয়ে আছে ওর বুকখানা। ওর মনের সেতার এমন করে বাঁধা, যতে একটুখানি ছোঁয়া লাগলেই বেজে ওঠে।

জানালার বাইরে অন্যমনস্ক চোখ গিয়ে পড়তেই দেখি, হালকা নরম জলের মাথায় দুলছে বুলবুল ফুলগুলো। অবিরাম দুলে দুলে প্রস্ফুটিত ফুলগুলো যেন একান্ত কোন অন্তরঙ্গজনের অসার কথাটি ঘোষণা করে চলেছে।

ছেলেদের হুড়োহুড়ি কলরব শোনা যাচ্ছে। আজ ওদের খুশিটা যেন উপচে উঠেছে। ওরা কিন্তু কেউ আসছে না এদিকে। আবদুর ওদের বাগানের ওপারে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এলো একজন, যাকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা আবদুর ছিল না। আর ঘরের মালিকেরও নিশ্চয়ই তা নেই।

জুলিয়েন ডক্টার, ডাক্তার, ডাক দিতে দিতে বাগান পেরিয়ে এসে উঠল দাওয়ায়। আমি ঘরের দরজা খুলে ওর সামনে এসে দাঁড়াতেই ও অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আমি হাসছি দেখে সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েন বলল দুপুরে শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলে, কি ব্যাপার বলতো ডাক্তার। নিশ্চয় কোন সঙ্গিনী ভেতরে রয়েছে।

আমি জুলিয়েনের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলাম।

খুঁজে দেখ, আমার সুইট হার্ট-কে দেখতে পাও কিনা।

জুলিয়েনের চোখ বিছানার ওপর ছড়ানো চিঠিগুলোতে আটকে গেল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল ভালবাসার গন্ধ পাচ্ছি ডাক্তার।

হেসে বললাম, আশ্চর্য তোমার ঘ্রাণশক্তি। সঙ্গিনী দেখবে বলে ঘরে ঢুকলে, এখন বলছ ভালবাসার গন্ধ পাচ্ছ।

জুলিয়েন হা হা করে হেসে উঠল। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, আমি প্রেমে পড়ি নি বলে কি প্রেমের গন্ধও আমার নাকে এসে লাগবে না!

Love is like a beautiful flower
which I may not touch, but
whose fragrance makes the
garden a place of delight just
the same.

ওর হাত ধরে বিছানার ওপর বসালাম। তারপর একটি একটি করে ঝিমির সবকটা চিঠি ওকে পড়ে শোনালাম।

জুলিয়েন গালে হাত রেখে শুনছিল। চিঠি পড়া হয়ে গেলে ওর দিকে চাইলাম। জুলিয়েন মনে হল তন্ময় হয়ে শুনছিল। ওর ঘোর কাটতে একটু সময় লাগল।

একসময় জুলিয়েন বলল চিঠিগুলো আয়নার মত একটি মনের আসল চেহারাখানা ধরে রেখেছে।

একটু থেমে একেবারে অন্যসুরে বলল, আচ্ছা, এখন বলতো দেখি ডাক্তার, মেয়েটিকে কবে এখানে আনছ? চাচাজীর কাছে প্রস্তাবটা দেওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজনৈতিক সংবাদপত্রে কবিতার ওপর সম্পাদকীয় রচনা এক অসামান্য ঘটনা। শিশিরকুমার ঘোষ শুধু একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক নন, একজন জাতীয়তাবাদী নেতা পরাধীন ভারতবাসীর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের প্রতিভূ। তাঁর লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রাণকেন্দ্র সেন্টিমেন্টের মর্মস্থলে যে বালকের কবিতা স্থান পেতে পারে সে বালক যে দেশের ভাবী নেতৃত্ব দেবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। কারণ মর্ণিং শোজ দ্য ডে'। বলাবাহুল্য বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ এ দাবী একটু বেশিমাত্রায় পূর্ণ করেছিলেন। আর দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরাধীনতার শৃঙ্খলাঘাতে কবির নির্ভীক দৃপ্ত লেখনী গর্জে উঠেছিল, প্রত্যক্ষভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি অংশগ্রহণও করেছিলেন।

শিশিরকুমার ঘোষ ভারতভূমি কবিতাটিকে গ্রহণ করেছিলেন এর স্বদেশাত্মক ভঙ্গি লক্ষ্য করে। ভারতভূমিতে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ছয় তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের পরামর্শে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে স্বদেশীমেলা বা চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা হয় (১২ এপ্রিল ১৮৬৭, বাংলা চৈত্রসংক্রান্তি ১২৭৩)। "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়' (স্বাদেশিকতা)। ব্রজেনবাবুও স্বীকার করেছেন— "এই স্বদেশীমেলার সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে দেশানুরাগের গান রীতিমত রচিত হইতে আরম্ভ হয়" (সং সাঃ চঃ ৬ষ্ঠ পৃ ১৪)।

বালক কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বাল্যরচনার মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে শুরু করেন (৭।৮ বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতেন—জীবনস্মৃতি কবিতা রচনারম্ভ) তখন চারদিকে স্বদেশী আবহাওয়ার পরিমণ্ডল দেশাত্মবোধের জয়গান। রবীন্দ্র-অগ্রজেরাও এই পবিত্র হোমানলের প্রধান হোতা। "বালক রবীন্দ্রনাথের কাকলিও এই প্রত্যূষে শোনা গিয়াছিল, তবে তাহা অতি ক্ষীণ ও অস্ফুট" (রং জী ১ পৃ ৪৮)। বালক রবীন্দ্রনাথের 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' থেকে হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা ১৮৭৩ থেকে '৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিকাংশ রচনার বিষয় ছিল ভারতের পরাধীনতা, যার ভাব ছিল বিষাদময়। ভারতভূমি তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং যাঁদের 'পরিবারে হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল' সেই পরিবারের কনিষ্ঠ শরিকের বাল্যরচনায় অখণ্ড ভারতের পরাধীনতার দুঃখে মর্মবেদনার জ্বালা এবং অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমের বিষাদময় সুরের মূর্ত প্রকাশ যে শিশিরকুমার ঘোষের মত স্বদেশপ্রাণ সাংবাদিকের হৃদয় স্পর্শ করবে সেটাই স্বাভাবিক।

অন্যান্য তথ্য :

ভারতভূমি প্রকাশের কিছুকাল পরে অভিলাষ (তত্ত্ববোধিনী) হিং উঃ (অমৃতবাজার) প্রকৃতির খেদ (প্রতিবিম্ব ও তত্ত্ব) প্রলাপ (জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব) প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বিভিন্ন সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ যে নিয়মিত কবিতা লিখতেন এবং সেগুলি প্রকাশিত হত, এ থেকে তা প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু অলীক ডায়েরী ছাড়া ব্রজেনবাবু কি জ্যোতিষচন্দ্র সম্পর্কে এমন কোনো নজির দেখাতে পেরেছেন?

উল্লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে এবং ভারতভূমি প্রকাশের বহু আগে রচিত কবিতাগুলির (সবই লুপ্ত) মধ্যে যে 'কাঁচা হাতের মেকশ' ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন। ভারতভূমি কবিতার কাঁচা হাতের ছাপের মধ্যে রবীন্দ্র-বাল্যরচনা রূপে ভারতভূমির প্রতিষ্ঠাই স্বীকৃতি পাচ্ছে। বালকোচিত উচ্ছ্বাসের ধরনটি একজাতীয় হলেও রবীন্দ্রমানস বৈশিষ্টগুলি—আবেগ উচ্ছ্বাস অনুকরণ প্রয়াস পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি — ভারতভূমির মধ্যে সুস্পষ্ট (পরে বিস্তারিত আলোচনা আছে)।

'শৈশবসংগীত' কাব্যখণ্ড রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত কবিতার সংগ্রহ। এই গ্রন্থের কোন কবিতা কোন বয়সে রচিত তাহা নির্দেশ করা কঠিন: তদুপরি ইহা নির্বাচিত কবিতা-গ্রন্থ বলিয়া দুই-চারিটি কবিতা নিশ্চয়ই বাদ দিয়াছিলেন। সেইরূপ দুইটি কবিতা হইতেছে 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির খেদ' (রং জীঃ ১, পৃ ৪৫)। বাদ পড়া দু-চারটি কবিতার মধ্যে প্রায় তেরো বছর বয়সে রচিত ভারতভূমি বাদ পড়া কিছু বিচিত্র নয়।

'তেরো বৎসরের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ছাপার অক্ষরে নিজ নামে কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এ পর্যন্ত জানা যায় নাই' (রং জী ১, পৃ ৫৬)। ভারতভূমি রবীন্দ্র-রচনা বলে এবং তেরো বৎসর পূর্ণ হবার কিছু আগে রচিত বলে ছাপার অক্ষরে কবির নাম নেই।

'অভিলাষ' কবিতাকে ভাবে ভাষায় ছন্দে শব্দে নবীনচন্দ্র সেনের 'আশা' (পলাশীর যুদ্ধ) কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচিত বলে মনে হয় অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন এটি তাঁর বাল্যরচনা। কিন্তু ভারতভূমি পড়ে বা আবৃত্তি শুনে বিশিষ্ট বাংলার অধ্যাপক (ডঃ সুকুমার সেন ডঃ কালিদাস নাগ ডঃ অসিত বন্দ্যোঃ প্রমুখ থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞেরাও পর্যন্ত (স্বয়ং প্রভাত মুখোঃও) রবীন্দ্ররচনা বলে সন্দেহ করেন। সুতরাং এটি অবশ্যই রবীন্দ্ররচনা।

বিংশ শতকের শেষার্ধে দাঁড়িয়ে আজ আমরা একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া ঐ বয়সের কাছাকাছি আর কোনো স্বনামধন্য কবির সন্ধান পাচ্ছি না।

সেযুগে প্রতিভাবলে বালককবিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে প্রখ্যাত কবি-মনীষীদেরও মুগ্ধ করেছিলেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতভূমি প্রকাশের অব্যবহিত পরে (১৮৭৭ খৃঃ) হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথকে দেখে নবীনচন্দ্রের 'বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি একজন প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয়বাবু (সরকার) বলিলেন—

কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচামিঠে আব' (আমার জীবন, চতুর্থ ভাগ পৃঃ ২৬৫)। সুতরাং সেই প্রতিভাব দীপ্তি দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যিক এবং শিশিরকুমার ঘোষের মত সাংবাদিক যে মুগ্ধ হবেন সেটাই স্বাভাবিক।

অন্তরঙ্গের বিচার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি হলেও প্রথম প্রকাশিত রচনা ভারতভূমির মধ্যে আছে একাধারে গীতিকবিতার উচ্ছ্বাস, আখ্যানের আমেজ ও খণ্ডকাব্যের ধরন। ভারতভূমি যেন রবীন্দ্র গীতিকাব্যধারার গোমুখী—বর্ণে তাপে স্রোতে যার সঙ্গে পরবর্তী ধারার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। পলিমাটি যার স্রোত বহন করেনি, নতুন জনপদ সৃষ্টি বা উর্বর দ্বীপের জন্ম দেওয়া তার ক্ষমতার অতীত। রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনাগুলি তাই পারিপার্শ্বিক উপলখণ্ডের সঞ্চিত পদক্ষেপের আঘাতে আঘাতে নতুন পথ কেটে অগ্রসর হয়েছে। ভারতভূমির মধ্যে তাই মাইকেল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী আছেন প্রত্যক্ষভাবে আর নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য কবি শেলি প্রভৃতিরা আছেন অনেকটা ছায়াছায়া ভাব; সর্বোপরি অধরা মাধুরীর মত মিশে আছেন ভাবী রবীন্দ্রনাথ—অস্পষ্ট-সুস্পষ্ট স্ফুট-অস্ফুটভাবে। এই প্রভাবগুলির তুলনামূলক বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে পৌঁছনো যাবে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ও রবীন্দ্র-মানসধারার গোমুখী উৎসে, যেখানে ভারতভূমি আছে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবাহের সর্বপ্রথম অতুলনীয় নজির হয়ে।

হেমচন্দ্রের প্রভাব।। ভারতভূমি রচনার পূর্বে শিক্ষিত বাঙালীর নবজাগ্রত বেদনা হেমচন্দ্রের 'ভারত সংগীত' (৮ শ্রাবণ ১২৭৭—এডুঃ গেজেট) কবিতার মধ্যে দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। এর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে কলকাতা সেনেট হাউসে পঠিত ১৫ পৌষ ১৩৩৮ সনের রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাষণে—রঙ্গলালের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' আর তারপরে হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' কবিতায় দেশমুক্তি কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলীর মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শে ও আয়োজনে আমাদের বাড়ীর সকলে তখন উৎসাহিত' (প্রবাসী মাঘ ১৩৩৮ পৃঃ ৫৮০)। তাই ঠাকুরবাড়ীর দেশাত্মবোধ-পরিমণ্ডলের প্রেরণা আর হেমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতভূমিকে উদ্বুদ্ধ করা স্বাভাবিক। বিশেষত ৫, ১০, ১১ ১২ স্তবক 'ভারতসংগীতে'র প্রত্যক্ষ অনুসরণে রচিত। ভাবগত দিক থেকে 'ভারতসংগীতে'র 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'-এর সঙ্গে 'ভারতভূমি'র 'তথাপি ভারতবাসী ঘুমে অচেতন' (২২); 'অর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি'র সঙ্গে 'জাগো ভারতস্থ জন, মিথ্যা ঘুমে অচেতন' (১৩); 'হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি'র সঙ্গে 'সেই দিন ছারখার ভারত সুন্দর' (২১); 'ঘুচিয়া গিয়াছে সেসব মহিমা'র সঙ্গে 'অস্থি ভস্ম ভিন্ন আছে কি আর ভারতে'র (১০) মিল খুঁজে পাই। শুধু 'ভারতসংগীত' নয়, 'পদ্মের মৃণাল' (ফাল্গুন ১২৭৭) কবিতার 'ভারত থাকিবে কিরে চির অন্ধকার?' (৯)-এর সঙ্গে ভারতভূমির 'অন্ধকার রহিবে কি ভারত আবাসে?'র (১২) মিল আছে। এছাড়া হেমচন্দ্রের মত স্তবক শীর্ষে স্তবক সংখ্যা নির্দেশ করা (এ প্রথা সে যুগে প্রচলিত ছিল), ভারতবিলাপ, ভারতকামিনী, ভারতভিক্ষা ভারতসংগীত ইত্যাদি কবিতার অনুকরণে 'ভারতভূমি' নামকরণ করা, 'হতাশার আক্ষেপ' কবিতার চাল আর 'পদ্মের মৃণালে'র পর্ববিভাগ ভারতভূমির মধ্যে দেখতে পাই। তবে ছন্দের ব্যাপারে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী'র (১৮৭৪) প্রভাবই ভারতভূমিতে সর্বাধিক।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব।। আসলে হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতার অনুভূতিপ্রবণ নিরেট বক্তব্যের চেয়েও ভারতভূমিতে গীতিসুর মূর্ছনা ও উচ্ছ্বাস প্রবণতা অনেক বেশি। এক কথায় গীতিকবিতার অনুভূতি কল্পনা, সৌন্দর্য ও সংগীতের স্পর্শ ভারতভূমির মধ্যে অনুভব করা যায়। তাই হেমচন্দ্রের চেয়েও ভারতভূমিতে গভীর প্রভাব আছে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর যিনি কবির 'বাল্যকালে কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ', যিনি কবির 'সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন' করে তুলেছিলেন। তাই স্বতন্ত্র শিরোনামায় 'জীবনস্মৃতি'তে কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ঋণ স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহাকাব্যের সমকালে গাথাকাব্য অর্থাৎ আখ্যানকাব্যগুলি প্রচলিত হয়ে গীতিকাব্যধারাকে করেছিল ত্বরান্বিত। আখ্যানকাব্যে ছিল একাধারে মহাকাব্যের কাহিনীরস আর গীতিকবিতার রোমান্টিক কল্পনাপ্রাধান্য। ভারতভূমির সমকালে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য গ্রন্থে দেখি পাশ্চাত্য রোমান্টিক গাথাকাব্যরীতির অনুসরণ আর গীতিকবিতা ধরনের আবেগ ও কল্পনার সংমিশ্রণ। ভারতভূমি অনেকটা এই জাতীয় রীতিতে রচিত। স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতার প্রচেষ্টা হলেও মনে হয় যেন এটি কোন আখ্যানকাব্যের অংশাবিশেষ, বিশেষত ১৪ থেকে ২১ স্তবক পাহাড়কে কেন্দ্র করে কবিকল্পনা আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ গীতিকবিতাকে তখনও কবি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি। অক্ষয় চৌধুরীর উদাসিনীর প্রভাব তাই ভারতভূমিতে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে।

তাই দেখি হৃদয়ভাব প্রকাশের অন্তরঙ্গতায় উদাসিনী কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে ভারতভূমির আন্তরিক সাযুজ্য আছে। দুটোই ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত। ভারতভূমির ছন্দ উদাসিনী কাব্যগ্রন্থে কখনো কখনো ব্যবহৃত ছন্দরীতির হুবহু অনুকরণ। যেমন, দ্বিতীয় সর্গের ১৩ পাতায় আছে—

> একেলা বা কেমনেই করিব গমন!
> গভীর নিশীথ-তায়, মেদিনী মুমূর্ষু প্রায়,
> জনশূন্য পথঘাট নীরব ভুবন;
> একেলা বা কেমনেই করিব গমন।

সে যুগে বহু প্রচলিত ছন্দরীতি (৮+৬, ৮+৬, ৮+৮, ৮+৬ পর্ববিভাগ এবং ক—ক—খখ—ক অন্ত্যমিল) পরিত্যাগ করে অক্ষয় চৌধুরীর অনুসরণে পর্ববিভাগ (৮+৬, ৮+৮, ৮+৬ ৮+৬) এবং অন্ত্যমিল (ক—খখ—ক—ক) দিয়ে ভারতভূমিতে ছন্দনির্মাণে ও ভাবপ্রকাশ করা প্রতিভার পরিচায়ক। শব্দ প্রয়োগেও ভারতভূমি (পৃ ৭৪), হিমাদ্রিশিখরে (পৃ ৮০), অম্বরে (পৃ ৭৫) হুহুঙ্কারি (পৃ ৭৫) অনলকুণ্ড (পৃ ৬৮) ইত্যাদির প্রয়োগ ভারতভূমিতে পুনরাবৃত্ত দেখি। আর কি মিলিবে সুখ যুড়াবে বিদীর্ণ বুক' (পৃ ৬৯) চরণের সঙ্গে ভারতভূমির 'এ রাত্র কি না পোহাবে, এমনি রহিয়া যাবে' (১২); 'একেলা অবলা আমি অচল শিখরে'র (পৃ ৮৬) সঙ্গে 'একবার উঠেছিলে এ শিখর শিরে'র (১৮) ভাবগত ও সুরগত সাদৃশ্য আছে।

বালক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের অংকুরোদ্গম পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষত অক্ষয় চৌধুরীর প্রভাব সর্বজনবিদিত (দ্রঃ জীবনস্মৃতি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা)। এঁরা দুজনেই যখন কবিতা রচনা শুরু বা প্রকাশ করছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত বছর—কবিতা রচনার হাতেখড়ির যুগ (জীবনস্মৃতি, রচনাপ্রকাশ)। জ্যোতিদাদা ও অক্ষয় চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত কবিতার (হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত) বিষয়বস্তু ছিল স্বদেশপ্রেম। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা যে তার ব্যতিক্রম হবে না, সেটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত আঠারো বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদি 'উদ্বোধন' নামে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখতে পারেন, তবে বারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভারতভূমি লেখা অসম্ভব নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বারো বছরের ছোট ছিলেন বলে 'উদ্বোধন' ও 'ভারতভূমি' প্রায় একই সময়ে রচিত। তৃতীয়তঃ অক্ষয় চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'ভারত'। সুতরাং অন্ধভক্ত বালক কবি যে তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতার নামকরণ 'ভারতের' অনুকরণে 'ভারতভূমি' রাখবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি?

রবীন্দ্রনাথের ওপর অক্ষয় চৌধুরীর প্রভাব যে কত গভীর, সাহিত্য সাধক চরিতের ৭৬ সংখ্যক গ্রন্থে তার প্রমাণ দিয়েছেন ব্রজেনবাবু।— 'কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কিছু কিছু রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে বলিয়া রবীন্দ্রভক্তদের গোচরে আছে' (পৃ ৫)। এই প্রসঙ্গে তিনি 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র দুটি গান উল্লেখ করেছেন। অথচ ব্রজেনবাবু ভারতভূমি আলোচনাপ্রসঙ্গে অক্ষয় চৌধুরীর কোন প্রভাবের কথা উল্লেখ না করে ত্রুটি রেখে গেছেন।

ল্যাকমে
এক্সটিকা
ট্যাল্ক এক্সটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
ল্যাকমে

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন—'উদাসিনীর পংক্তি পর্যন্ত বনফুলের মধ্যে উদ্ধৃত দেখা যায়; তাছাড়া 'ইমেজারী'র মধ্যে বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য আছে' (রঃ জী ১, পৃ ৫৩)। এ থেকে অক্ষয় চৌধুরীর প্রভাব যে ভারতভূমি থেকে সূচিত তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। *হয়তো বা অক্ষয় চৌধুরীর সংশোধন করা অদৃশ্য হাতের ছাপ ভারতভূমিতে থাকতে পারে। যাই হোক, উৎসের সঙ্গে প্রবাহের চির নিবিড় যোগ রবীন্দ্রসাহিত্যে নতুন চিন্তার অবকাশ যোগাবে।*

প্রকাশকালের বিচারে উদাসিনী (১৮৭৪) ভারতভূমির কিছুদিন পরবর্তী। জ্যোতিদাদার মজলিশের মধ্যমণি অক্ষয় চৌধুরী রচিত এই কাব্য বাজারে প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা পাঠ করা সম্ভব নয়। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্টই স্বীকার করেছিলেন—'ইঁহার (অঃ চৌঃ) সদ্য রচনাগুলি সর্বদা পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।' তাই **যাঁরা ভারতভূমিকে জ্যোতিষচন্দ্রের রচনা বলে সোচ্চার হন অথবা রবীন্দ্ররচনারূপে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন—ভারতভূমি জ্যোতিষচন্দ্রের রচনা হলে উদাসিনীর (তখনও অপ্রকাশিত) ব্যাপক প্রভাব কিভাবে ভারতভূমিতে সম্ভব হয়?** সুতরাং ভারতভূমি সুনিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা।

ঠাকুরবাড়ীর প্রভাব : প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতভূমি রবীন্দ্ররচনা হলে প্রায় সমকালে রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনন্যসাধারণ রচনা 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কোন প্রভাব বিস্তার করেনি কেন? এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মন্তব্যই প্রণিধানযোগ্য—'তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধহয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালোলাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারেনি' ('কড়ি ও কোমল'-এর ভূমিকা)।

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথের 'জয় ভারতের জয়' (১৮৬৮), গণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে' প্রভৃতি গান ও কবিতা ভারতভূমিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' জাতীয় সংগীত এবং ভারতভূমির মূলভাব একসূত্রে বাঁধা। এই জনপ্রিয় বঙ্কিম-অভিনন্দিত গান বালককবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করাই স্বাভাবিক। তাই শুধু 'হিমাদ্রি' 'ভারতভূমি' ইত্যাদি শব্দই নয়, 'গাও ভারতের জয়' স্থলে 'গাইয়ে ভারত জয়' পংক্তিরও সাদৃশ্য দেখি। ভারতভূমি যেন ঠাকুর পরিবারের স্বদেশী চিন্তা-চেতনার সুরে একগ্রামে বাঁধা। কিন্তু জ্যোতিষচন্দ্রের 'স্বপন' স্বদেশপ্রেমের কবিতা হলেও ঠাকুরবাড়ীর কোন প্রভাব নেই।

বিহারীলালের প্রভাব ॥

ইংরেজী সাহিত্যের দু শতাব্দীর পালাবদলের ঐশ্বর্য বাংলাকাব্যে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাংলাকাব্যে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছিল ক্লাসিক মহাকাব্য, রোমান্টিক আখ্যানকাব্য এবং ব্যক্তিপ্রধান গীতিকাব্যধারা। এই ত্রিধারার *মধ্যে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সেদিন ছিল দুষ্কর।* তাই মহাকাব্যের দুন্দুভিধ্বনির মধ্যে অকস্মাৎ ভাবরসনিমগ্ন, আত্মচেতনায় অন্তর্লীন কবি বিহারীলালের আনন্দবেদনার সুরে বৃহত্তর অনভ্যস্ত পাঠকসমাজ মুগ্ধ না হলেও বালক রবীন্দ্রনাথের সচেতন স্পর্শকাতর কবিমন বাংলাকাব্যের সেই চিরন্তন সুরের সঙ্গে অন্তরের যোগ আবিষ্কার করেছিলেন। 'তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই (বিহারীলালের কাব্য) আমার সবচেয়ে মনহরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের ও বনের গান বাজাইয়া তুলিল।' বালকের সুপ্ত কবিসত্বাকে জাগ্রত করা এই নবীন সুর বাংলাকাব্যের পালাবদলের সন্ধিক্ষণে রচিত ভারতভূমির মধ্যে প্রকাশ বেদনায় আকুল হয়েছে।

বিহারীলালের গীতিকাব্যের প্রভাবকে অন্তর থেকে গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথই 'জীবনস্মৃতি' ও 'সাধনা' (১৩০১) পত্রিকায়। সুতরাং অন্য কোন স্বল্প প্রতিভাবান কবির **পক্ষে বাংলাকাব্যের চিরন্তন সুরপ্রবাহকে বালক বয়সে আবিষ্কার করা এবং উত্তরকালে গীতিকবিতার অমৃত ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে নবযুগের সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না।**

তবে যে সুতীব্র ব্যক্তিকে অনুভূতি ও জীবনবোধের গভীরতা থেকে গীতিকবিতার জন্ম হয় তা ভারতভূমির বালককবির কাছে আশা করা যায় না। বাংলাকাব্যে আধুনিক গীতিকবিতার তখন সূচনা হচ্ছে। তবুও দেখা যায় ভারতভূমির মধ্যে আধুনিক গীতিকাব্যের লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট না হলেও অনেকটা স্পষ্ট। উনিশ শতকের গীতিকবিতার ত্রিমূর্তি রূপকল্পের—প্রকৃতি, প্রেম ও স্বদেশ—মধ্যে ভারতভূমিতে স্বদেশ ও প্রকৃতি রূপ পেয়েছে। অনুভূতি প্রবণতা, অতৃপ্তি সৌন্দর্য-পিপাসা আনন্দময় স্বাদ ইত্যাদি থাকলেও অপরিণত চিন্তাধারায় এবং প্রকাশরীতির অপরিপক্কতায় তা সার্থক গীতিকাব্য হয়ে ওঠেনি। উনিশ শতকের গীতিকাব্যের একটি বড় লক্ষণ, জড় প্রকৃতির মধ্যে একটা পৃথক ব্যক্তিত্ব দিয়ে তার সঙ্গে চেতন কবিপ্রাণের সম্পর্ক স্থাপন, যার প্রথম স্বাদ পাওয়া গেছে বিহারীলালে এবং পরে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাগুলিতে—ভারতভূমি থেকেই যার প্রথম পদক্ষেপ। ভারতভূমি যেন মানসীযুগের মানসপ্রস্তুতি।

আজ কি আমরা এ প্রশ্ন তুলতে পারি না যে, **আখ্যানমূলক কাব্যরচনার যুগে ভারতভূমিতে এ লিরিক উচ্ছ্বাস প্রবণতা কোন্ কবির রোমান্টিকধর্মিতাকে নির্দেশ করছে, বিশেষত বিহারীলালের** প্রভাব থাকায়? বলা বাহুল্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করবার অব[কাশ] থাকে না। (এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সে[নের] উক্তি স্মরণীয়—'শুনিয়াছি, তাঁহার (রবীন্দ্র]নাথের) বিশ্বাস বঙ্গভাষায় গীতিকাব্য আর কিছুই হইতে পারে না' (আ[মার] জীবন)।

রবীন্দ্রনাথের ওপর বিহারীলালের প্র[ভাব] ব্যাপক। বঙ্গদর্শন প্রকাশের আগে 'প্রত্যু[ষ] শুকতারা' 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকা[শিত] বিহারীলালের নিসর্গসন্দর্শন ও বঙ্গসু[ন্দরী] কাব্যে কল্পনাপ্রসারতা ও গীতিকা[ব্যের] তন্ময়তায় আবিষ্ট বালককবি পেয়ে[ছিলেন] 'একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ'। এর গভীর প্রভাব [...] বয়সেও রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি (রঃ [...] ১, পৃ ৩৪) সুতরাং ভারতভূমি রচনাকা[লে] বিহারীলালের প্রভাব অস্বীকার করা বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। তাই দেখি নিসর্গসন্দর্শনের 'এখন হয়েছে মা সে মুখ মলিন!' (১৫ স্তবক)-এর সঙ্গে ভারতভূমির 'আলস্য মূর্খতা দোষে দিবসে আঁধার' (১৩); 'আর কি পোহাবে এই ঘোর বিভাবরী?। আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে?' (১৪ স্তবক) এর সঙ্গে ভারতভূমির 'এ রাত্র কি না পোহাবে এমনি রহিয়া যাবে হবে না কি সূর্যোদয় ভারত আকাশে? অন্ধকার রহিবে কি ভারত আবাসে?'—পংক্তিগুলির ভাবগত ঐক্য আছে (জিজ্ঞাসার চিহ্ন দুটিও লক্ষণীয়)।

এই সব প্রভাব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পত্রগুচ্ছে (২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯) ও কবিতা পত্রিকায় (পৌষ ১৩৫০, পৃ ১৩৭) স্বীকার করেছেন যে তাঁর তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সে রচিত কাব্য অনুকরণ—বিহারীলাল ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কবির সামনে।

মধুসূদনের প্রভাব :

'সত্যেন্দ্রনাথের মারফতে আমরা জানি যে দেবেন্দ্রনাথ মাইকেলের মস্ত সমজদার ছিলেন ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মাইকেলের সহপাঠী ও সমালোচক ছিলেন। সুতরাং মাইকেলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না।...মাইকেলের প্রভাব ভারতভূমি কাব্যে স্পষ্ট' (কালিদাস নাগ প্রবাসীর প্রবন্ধ পৃ ৪২২)।

বাংলাকাব্যের যুগসন্ধিক্ষণে নবজীবনের সামান্যতম স্পর্শ ছিল রঙ্গলালে, পরিপূর্ণ বার্তাবহ হয়ে এসেছিলেন মধুসূদন। কাহিনীর কাঠামোকে সর্বপ্রকারে ভারতীয় রেখে সাহিত্যের অন্তরে ইউরোপীয় মনোধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। আধুনিক যুগে মধুসূদন বাংলাভাষায় লিরিকের সুর সর্বপ্রথম শুনিয়েছিলেন। মহাকাব্যের কবি হলেও তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে ছিল গীতিরসের ফল্গুধারা যুগধর্মের প্রভাবে যা মুক্তি পায়নি। তাই অবচেতন মনে মধুসূদনের গীতিরসের প্রচ্ছন্ন নির্ঝর বালককবি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

ভারতভূমি বালক কবির প্রথম দিকের রচনা বলে শব্দচয়নে ও উপমা প্রয়োগে মাই-কেলের প্রভাব দেখা দিয়েছে অনিবার্যভাবে। রবীন্দ্রনাথের ওপর পূর্বসূরী মহাকবি মাইকেলের প্রত্যক্ষ প্রভাব কোন অবাস্তব ব্যাপার নয়। ভারতভূমি রচনার প্রায় সমকালে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত মেঘনাদবধকাব্যের সুদীর্ঘ বিরূপকঠোর সমালোচনা (প্রধানত চরিত্রের) এ কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে না। একথা সকলেরই জানা, বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ পন্ডিতের কাছে মেঘনাদবধ কাব্য পড়েছিলেন ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল মেঘনাদবধকাব্য। তাই কাব্য হিসেবে কল্পনা-প্রিয় বালককে মেঘনাদবধকাব্য আকর্ষণ করেনি বরং বিতৃষ্ণা জাগিয়েছিল। 'যে জিনিষটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে কাব্যের অমর্যাদা হয়। তবু রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের রচনায় অজ্ঞাতসারে মধুসূদনের ভাষার ছাপ পড়েছে কখনো বা মধুসূদনের ব্যবহৃত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগও হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুকুমার সেনের মতে রবীন্দ্রকাব্যে 'কাব্যমধ্যে parenthesis *এর ব্যবহার এবং 'যথা' 'যেমনি' ইত্যাদি শব্দ-যোগে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ মধুসূদনের অনুসরণ' (বাঃ সাঃ ইতিহাস ১ম খণ্ড ১ সংস্করণ পৃঃ ২৮)। বাল্য-কৈশোর রচনায় শুধু অনুসরণ নয় মধুসূদনের ভাষা ও উৎপ্রেক্ষার হুবহু অনুকরণও হয়েছে। যেমন ঃ

(১) 'প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলো দাও বায়ুবেগ'
(প্রকৃতির খেদ)।

(২) ঊর্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে—

সহসা করণক্ষেপে সহসা উঠেরে কেঁপে
সহসা জাগিয়া উঠে চল-ঊর্মি সবে!
(বনফুল ১ সর্গ)।

(৩) বন্ধুতার ক্ষীণজ্যোতি প্রেমের কিরণে
(রবিকরে হীনভাতি নক্ষত্র যেমন)
বিলুপ্ত হয়েছে কিরে বিজয়ের মনে?
(ঐ ৬ সর্গ)

(৪) বেষ্টিত বিতন্ত্রী-বীণা লূতা-তন্তু-জালে।
(কবিকাহিনী ৩ সর্গ)

(৫) আজি নিশীথিনী কাঁদে,
আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।
(বনফুল ২ সর্গ)।

(তুলনীয়—মাইকেলের 'নাহি তারা কবরী-বন্ধনে')।

প্রকৃতপক্ষে মাইকেলের এই প্রভাব ভারতভূমি থেকে। যেমন (২) মাইকেলের অনুকরণে চরণগঠন—কিবা শোভা মনোলোভা ভূতলে, অম্বরে (৩); বসাতলে পাঠাইব পৃথ্বী সসাগর (৫); সংপক্ষে বিস্তৃত হবি বত শিখিগণ (৬); পাড়ুলেক ইরম্মদ কালমেঘ হতে (১০)।

(২) বাক্যাংশ প্রয়োগ — অবনী সাজিল মরি, ভুঞ্জিছে অতুল সুখ আহ্লাদিত পরস্পর।

(৩) আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ—পুরন্দর ক্ষপাকর ইরম্মদ কালমেঘ কন্দরে।

(৪) 'যথা' 'যেমতি' শব্দযোগে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ—'অমরবেষ্টিত যথা দেব পুরন্দর।'

(৫) নামধাতুর ব্যবহার—উদিছে বিহারিরা দোলাইয়া উদিলেক বাখানিবে উৎধারিরা কল্লোলিয়া।

(৬) মধুসূদন প্রভাবিত শব্দগঠন—বিধৌত শ্বসন কোপানলে সুপুচ্ছ শিখিগণ গিরিগণ বিটপী প্রবাহিনী কুমুদিনী গরাবিনী নিশি-থিনী কাদম্বিনী মস্বিনী নিস্বন ইত্যাদি।

সুতরাং শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য 'রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেও অবচেতনভাবে মাই-কেলের দিকে আকৃষ্ট হন নাই'—একথা ঠিক নয় (রবীন্দ্র-বিচিত্রা পৃঃ ১৬১)।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রবাল্য রচনার একটিমাত্র অংশে মাইকেলের প্রভাব খুঁজে পেয়েছিলেন (বিঃ ভাঃ পঃ, বৈশাখ ১৩৫০)। ভারতভূমির প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রকাব্যে মাইকেল-প্রভাবের মূল্যায়ন নতুন করে সম্ভব হবে।

সুতরাং প্রথম সাহিত্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার লগ্নে মধু-হেম-অক্ষয়-বিহারীলালের অসামান্য প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতভূমির মধ্যে সুস্পষ্ট।

এছাড়া বঙ্কিম - অনুসারী চিন্তা (প্রাণভয়ে দিনু তাঁরে যবনের করে/ডুবিল হিন্দুর নাম কলঙ্ক সাগরে) নবীনচন্দ্রের ঢঙ (তুলাদেশে কত লোক করিছে ভ্রমণ/নাহি পারে তবু করে উঠিতে যতন), শেলির কল্পনাপ্রসারতা ভারতভূমির প্রভাবকে উদার করেছে। অর্থাৎ নিতান্ত বালক বয়সেই 'মহাকবিদের' প্রভাবকে অন্তস্তলে ধারণ করার মত শক্তি ও স্থান বালক রবীন্দ্রনাথের ছিল। আর সেটাই প্রতিভার লক্ষণ।

ভারতভূমিতে ভাবী রবীন্দ্রনাথ ঃ

ভারতভূমির মধ্যে বালক রবি দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট উজ্জ্বল। সমকালীন বাল্য ও কৈশোর রচনার সঙ্গে শব্দপ্রয়োগে ভাষায় ছন্দে ভাবে একাত্ম। ভাবী রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট মানসদর্শনও ভারতভূমির মধ্যে দেখা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাগুলির প্রকৃত রচয়িতা সম্পর্কে ক্ষীণ ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে ব্রজেনবাবু বলেছিলেন—'গোড়ার দিকের অধিকাংশ রচনাই তিনি (বালক রবীন্দ্রনাথ) অনামে বা বেনামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।...... সেগুলি সম্বন্ধে তিনিই প্রমাণ' (শঃ চিঃ কার্তিক ১৩৪৬)। কিন্তু বাল্যরচনাগুলির মধ্যে যেটি সংশয়াতীতভাবে রবীন্দ্ররচনা, নেই কোন সংশয় দ্বিধার অবকাশ, কবির সেই স্বনামে মুদ্রিত হিন্দুমেলায় পঠিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'-এর সঙ্গে এক বছর পরে প্রকাশিত 'ভারতভূমির' আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতভূমির স্বক নামক-ভাবে না হলেও হিন্দুমেলার উপহার কবিতাটি ছন্দে ভাষায় ও ভাবে হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীতের' ক্ষীণ অনুসরণ মাত্র। কবিতাটি হেমচন্দ্রের সুরে বাঁধা ও বিহারী-লালের ছন্দে গ্রথিত' (রঃ জীঃ ১ পৃঃ ৪৭ এবং রবীন্দ্রজীবনকথা পৃঃ ১৭)। এ সুরে আছে পরাধীনতার বেদনা ও বিষাদের রাগিণী, ঠিক ভারতভূমির মতই। দুটি কবিতাই অমৃতবাজারে প্রকাশিত হয়। ভারতভূমিতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ (হিমাদ্রি ভারতভূমি শিখর ভস্ম প্রভৃতি), প্রাকৃতিক বস্তু (চন্দ্র সূর্য প্রকৃতি ঝর্ণা বজ্র সমীর ইত্যাদি), মানসিক অনুভূতি (সুখ দুঃখ বিষাদ) হিন্দুমেলার উপহারে পুনরাবৃত্ত দেখি। তাছাড়া এ দুটি কবিতায় 'ফুলবালা' ও 'শৈলবালা' অনলকুন্ড ও অগ্নিকুন্ড প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ একই কবির মানসবৃক্ষের দুই ফসল। ভারতভূমির সঙ্গে হিন্দুমেলার উপহারের আঙ্গিকগত মিলও প্রবল। দুটি কবিতাই আয়তনে সমান (চার চরণে স্তবক এবং মোট বাইশটি স্তবকে বিন্যস্ত)। ভারত-ভূমির 'উপাড়িব হিমাদ্রিশিখর'(৫)-এর সঙ্গে হিন্দুমেলার উপহারের 'প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে'(২১); 'বিষাদসাগরে কেন উথলে তখন'(৬) কিংবা 'এ সকলে দুঃখ কেন হতেছে অন্তরে'(৩)-এর সঙ্গে 'সেদিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে/ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?'(১৯); 'ভাঙ্গিয়া ভারত মুন্ড, জ্বালি এ অনলকুন্ড'(১০)-এর সঙ্গে 'ভারতের ভস্ম আগুনে জ্বালিয়া'(১৮) ভাবগত আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এমন কি ছন্দের মাত্রাগণনার দিক থেকে যৌগিক স্বরধ্বনি ঐ-কারকে পয়ার ছন্দে দু মাত্রার ধরা হয়েছে। ভারতভূমি অন্য কোন কবির রচনা হলে এত-খানি মিল থাকা কিছুতেই সম্ভব হত না।

(ক্রমশঃ)

পণ নেব না, পণ দেব না

অমৃতের ৩০শে মে '৭৫ সংখ্যায় শ্রীমতী অঞ্জলি চৌধুরীর যুক্তিনির্ভর বাস্তবভিত্তিক আলোচনা 'পণ নেব না, পণ দেব না' পড়লাম। এই প্রবন্ধে শ্রীমতী চৌধুরী বস্তুতই সমস্যাটির সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজ-সচেতন না হলে, সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে—শুধু আইনের সাহায্যে পণপ্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব না।

আইনে তো ঘুষ নেওয়াও অপরাধ—কিন্তু কটা ঘুষের মামলা শেষ পর্যন্ত আদালতে পৌঁছায়? ঘুষের ব্যাপারে লাভ থাকে উভয়ত—দাতা ও গ্রহীতার। তাই এ নিয়ে কোন পক্ষই মামলা মোকদ্দমার সড়ক মাড়াতে চান না। যখন গ্রহীতার লোভ খুব বেশী প্রকট হয়ে ওঠে—তখনই দাতার তরফ থেকে নালিশ করার কথা শোনা যায়—নইলে নয়। অথচ ঘুষের দরুণ রাষ্ট্র তার ন্যায্য পাওনার এক মোটা অংশ থেকে বঞ্চিত হয়।

ধরা যাক কারু ন্যায্য ট্যাকস হওয়াব কথা দু লাখ টাকা। কিন্তু অ্যাসেসর যদি ট্যাকস এক লক্ষ টাকা ধার্য করেন—তাহলে ট্যাকসদাতা অ্যাসেসরকে পাঁচ-দশ হাজার টাকা দেবেন না কেন?

পণের ব্যাপারেও তাই। যাঁরা পণ দেন তাঁরা অধিকতর লাভের অর্থাৎ ভাল পাত্র কিংবা পাত্রীর আশাতেই দেন। ধরা যাক—একটি ভাল ছেলেকে জামাই করতে চান জন-পঁচিশেক মেয়ের বাপ। সেক্ষেত্রে ছেলেটিকে হস্তগত করার জন্য যদি মেয়েদের পিতা তথা অভিভাবকদের অশুভ লেনদেনের প্রতিযোগিতায় নামতে দেখা যায়—তাতে বিস্মিত হওয়ার কি? সবাই যদি সবচেয়ে ভাল জিনিসটি চান তাহলে তো জিনিসটার দাম চড়বেই।

আর আমাদের যা সমাজব্যবস্থা—তাতে ধলো-মুঠির চেয়ে সোনা-মুঠির উপর মেয়েদের কিংবা তাদের অভিভাবকদের (বিশেষভাবে মেয়েদের কিংবা তাদের অভিভাবকদের) পক্ষপাতিত্ব থাকলে কি দোষ দেওয়া যায়?

মেয়েরা যদি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসেন—'পণ দিয়ে করব নাকে বিয়ে'—তাহলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েদের অভিভাবকেরা মেয়েদের গোপন করে পণ দেবেন না এমন কথা জোর করে বলা যায় কি? তাছাড়া সব মেয়েই কি একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারবেন?

অবশ্য একটা উপায়ে সমস্যার বারো আনা সমাধান হয়ে যেতে পারে। সেটা হচ্ছে মেয়েরাই যদি ছেলেদের প্রণয়শরে বিদ্ধ করতে পারেন। 'প্রণয়তাড়িত' পুরুষকে বশ করা আর যাই হোক কঠিন কাজ নয়।

সেক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের ইংল্যান্ড আমেরিকা রাশিয়া কিংবা চীন-জাপানের মত সর্বক্ষেত্রেই অবাধ মেলামেশা ও একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।

স্কুল-কলেজে সহশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। রেজেষ্ট্রি বিয়েকে স্বাগত জানাতে হবে কিংবা সামাজিক বিয়ের খরচকে কাটছাঁট করে দু পাঁচশোতে দাঁড় করাতে হবে।

আমার দুটি আত্মীয়ার ভালবেসে রেজেস্ট্রী বিয়ে হয়েছে। তাদের অভিভাবকদের এক পয়সাও খরচ হয় নি বিয়েতে। তেমনই পাত্রপক্ষের বেঁচে গেছে বৌভাতের—তথা শাড়ী গহনা ভোজ আর ফুলশয্যার হরেক রকম খরচ।

বৌভাতের খরচ মেটানোর জন্যই অনেক ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ পণের দাবী করে থাকে। ব্যাপরটা রেজেষ্ট্রি করে চুকেবুকে গেলে এ যুক্তিটা তো ধোপে টেঁকে না।

কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা অবশ্য সবাই নন—এখনও বিয়ের নামে সমারোহের স্বপ্ন দেখেন। বিত্তবান ঐশ্বর্যবান অন্তত অর্থবান ছেলে না হলে মন ওঠে না। আবার ছেলেরা অনেকেই বিয়েটাকে একটা 'নতুন বোঝা' মনে করে খালি হাতে এই বোঝাটার দায়িত্ব নিতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন।

তাই এই অশুভ প্রথা থেকে পুরোপুরি উদ্ধার পেতে এখনও অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পথ পেরোতে হবে।

তবু আস্তে আস্তে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা প্রেম প্রণয় ও সেই সঙ্গে সমাজের মনোভাবের কিছু কিছু পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পণ প্রথাও ধীর গতিতে অপসারিত হচ্ছে।

অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রান্তিক
স্বামী বিবেকানন্দ রোড, বিরাটী

(২)

অমৃত পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (২৩শে মে ১৫ বর্ষ) 'পণপ্রথার বিরুদ্ধে' আপনার মূল্যবান মতামত পড়েছি। পণ বা যৌতুক প্রথা সম্পর্কে আমার কিছু মতামত জানাচ্ছি। বিবাহে পণ বা যৌতুকের দুরারোগ্য ব্যাধি সমাজ হতে উৎখাত করা কি আইনের দ্বারা সম্ভব? সমাজের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা এই শোষণকে কখনও সমর্থন করেন না। কিন্তু সুউপায়ী পাত্রের জননীরা? পাত্রের পিসী-মাসী ও আত্মীয়ারা? সামর্থ ও সাধ্যের বাইরে যাঁরা সোনার হরিণ শিকার করতে চান তাঁরা। (আত্মীয়স্বজনদের তুষ্টির জন্য বা স্ত্রী দেখাবার জন্য কিছু কিছু পিতা যৌতুক নামক অর্থ ও অর্থ খরচের প্রচলিত ব্যবস্থাটির জন্য কখনও কখনও পণ দাবী করতে বাধ্য হন।)

মেয়েরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পাত্র হিসাবে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অফিসার বা সুউপায়ী লোকদের কথাই শোনে। ফলে সিকিউরিটির জন্য মেয়েদের মনে একটা ইমেজ গড়ে ওঠে। কিন্তু সমাজে সুউপায়ী পাত্র শতকরা কতজন? তাই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা যৌতুক বা পণ দিয়ে সোনার হরিণ শিকার করতে বাধ্য হন। সমাজে রূপবতী গুণবতী ও শিক্ষিতা সুন্দরীই বা কজন? অসুন্দরী ও অশিক্ষিতা পাত্রীরা যদি আকাশকুসুম কল্পনা না করে, রাজপুত্র ধরার বাসনা না করে বা বাবার টাঁক না খসিয়ে (বহু পাত্রী এজন্য বাবাকে পথে বসাতে কসুর করেন না) যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ী পাত্র নির্বাচন করেন তাহলে পণের চাপ ধীরে ধীরে সমাজ হতে উঠে যাবে। নয়ত আইনকে ফাঁকি দিয়ে পণ নিতে বাধা কোথায়? অবশ্য সমাজের অশিক্ষিত দরিদ্র ও মাতালেরদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে বিরাট অংশ অন্ধকারেই থেকে যাবে।

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে শিক্ষিতা ও কর্মরতা নারীরা পারবে নাকি বেকার পাত্রকে সমান যোগ্যতা ও সামর্থ্যের পাত্রকে অশিক্ষিত পাত্রকে ও গরীব পাত্রকে বিয়ে করতে? সুউপায়ী পাত্রের জননীরা যৌতুকের লোভ ত্যাগ করতে পারবেন কি? (অর্থ গহনা সম্পত্তি ও জিনিসপত্রের উপর মেয়েদের আকর্ষণ কি কম?) শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়ারা নববধূকে পণ ও গহনার জন্য খোঁচা দিয়ে বহু সুখের সংসারে আগুন লাগান। মোট কথা পণ যৌতুক ও নানা তত্ত্বের উৎপাত হতে পাত্রী পক্ষকে রক্ষা করতে হলে পাত্রী, পাত্রপক্ষ সমাজ রাষ্ট্রনেতা বা কোন বিশেষ লোকের আন্দোলন বা সমালোচনা করে কিছু হবে না। নারী সত্তাকে জাগিয়ে নারী সমাজকে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করতে হবে। পঞ্চকন্যা শৈব্যা পদ্মা বেহুলা রাণী দুর্গাবতী পদ্মিনী ও নিবেদিতারা পুরুষ শাসনের মধ্যেই পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। নারী-পুরুষ একবন্তে দুটি ফুল। অযথা পুরুষ সমাজকে দোষী করে লাভ কি? পাঠিকারা কি বলেন?

সন্ধ্যা নন্দ গুহ
চাতরা ২৪ পরগণা।

(৩)

গত ৩০ মে অঙ্গনা বিভাগে অঞ্জলি চৌধুরীর 'পণ নেব না পণ দেব না' এবং ২৩ মে অমৃতে 'পণ প্রথার বিরুদ্ধে' সম্পাদকীয়র জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

পণ প্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ করে সত্যিকার একটি কল্যাণকর কাজ করলেও প্রশ্ন থেকে যায় কে বা কেন অভিভাবক এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন? অন্তত নিজের কন্যার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কেউই আইনের আশ্রয়ে যাবেন না। বিশেষ করে কালো মেয়েদের অবস্থা চিন্তনীয়। পয়সার খেলাতেই এদের বিবাহ বৈতরণী পার করতে হয়।

যে দেশে নারী এখনও ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায় নি বা স্বনির্ভর হয়ে ওঠে নি, স্বেচ্ছাবিবাহের পথ উদার-ভাবে এখনও প্রশস্ত নয় সেখানে চাপিয়ে দেওয়া বিবাহে পণের লেনদেন টিকে থাকবেই। অন্তত সুদূর গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালে এই কথাটাই মনে হয়। কারণ আপনাদের সম্পাদকীয়তেই তো প্রকাশিত যে 'আমাদের সমাজে বিবাহের সম্বন্ধে বর বা কনের পছন্দের চাইতে অভিভাবক-দের পছন্দ এবং তাদের মতামতেই কাজ করে থাকে। সুতরাং তরুণ-তরুণীরা ইচ্ছা করলেও সব সময় অভিভাবকদের মত অগ্রাহ্য করার সাহস দেখতে পারেন না। তার ফলে এই কুৎসিত ব্যাপারটা থেকেই যাচ্ছে।' পিতা-মাতার মুখাপেক্ষী হয়ে কন্যা-দের এবং অনেকাংশে পুত্রদেরও থাকতে হয়। তাই এই ব্যবস্থাও কায়েম থাকে। দেখা যায় বিবাহে পণের ব্যাপারে শিক্ষিত যুবক-যুবতীরাও পিতা-মাতার যথেষ্ট বাধ্য থাকেন।

সামন্ত যুগের মানসিকতা থেকেই এ প্রথার উদ্ভব। একে রদ করতে হলে প্রথমত দরকার সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবক-যুবতীদের তরফ থেকে পিতা-মাতার ব্যবসাদারী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছাবিবাহ বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন প্রথা ব্যাপকভাবে চালু করা। এরই সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন সামাজিক ও মানসিক দিক। আর দরকার বিবাহের সময় সামাজিক ভোজনের বিরাট অপচয় বন্ধ করা।

অরুন্ধতী চক্রবর্তী
ছুটিপুর (খড়দা)।

(৬)

পণ প্রথার বিরুদ্ধে আলোচনা বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে, আজও হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের সরকারেরও টনক নড়েছে এবং আইনও হয়েছে। কিন্তু ফল কতটুকু হবে?

যে বাবা ছেলের জন্য মোটা পণ দাবী করেন, সেই বাবাই মেয়ের বিয়ের সময় পণ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার। কেউ কেউ বলেন মেয়ের বিয়ের জন্যই ছেলের বিয়েতে পণ নিতে হয়। আবার কারও মত আরও পরিষ্কার। অতিথি-স্বজনকে আপ্যায়ন করার জন্যই নাকি তাঁরা পণ নিতে বাধ্য হন। আর নিমন্ত্রিত অতিথিরা বলেন উপহার দিতে দিতে প্রাণান্ত। সমাজ হতে এ ব্যাধি উৎখাত প্রয়োজন জেনেও লোক নিন্দার ভয়ে এই প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হয়।

অথচ একদিন 'অতিথি নিয়ন্ত্রণ' আইন তৈরী হয়েছিল এবং আজও তা বলবৎ আছে। কিন্তু সরকারের নাকের ডগায় সাধারণ মানুষই শুধু নন, আইন রচয়িতার মধ্যে অনেকেই সেই আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে অনিয়ন্ত্রিত অতিথি আপ্যায়ন করছেন।

পণ প্রথার ক্ষেত্রেও আইন সেই একই পথ ধরে চলবে, এতে কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন না। আইন কোনদিনই নৈতিক পরিবর্তন আনতে পারে নি। তাই 'বিধবা-বিবাহ' আজও সমাজে অচল।

এখন আমাদের চাই নৈতিক পরিবর্তনের জন্যে আন্দোলন—চাই সামাজিক বয়কট। যাঁরা পণ নেবেন, যাঁরা পণ দেবেন তাঁদের নিকটতম আত্মীয়স্বজন ভিন্ন আর যাঁরা তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করবেন তাঁদের প্রত্যেককে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। আর তখনই এই সামাজিক ব্যাধির উৎসাদন হতে পারে, আলোর স্বপ্ন দেখতে পারে শ্যামাঙ্গী বঙ্গকন্যারাও।

অমিতা চট্টোপাধ্যায়
নবপল্লী (বারাসাত)।

মেদিনীপুরে প্রাগৈতিহাসিক দ্রব্য প্রাপ্তি

গত ২৩শে মে (১৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা) 'অমৃত' পত্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রকাশিত 'মেদিনীপুরে প্রাগৈতি-হাসিক দ্রব্য প্রাপ্তি' সংবাদের গুরুতর একটি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনবোধ করছি। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তুগুলো কাদের চেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে সংবাদে তার কোনই উল্লেখ নেই। তমলুকে খনন কার্য আরম্ভ হয়েছে গত মার্চ মাস থেকে এবং তাতে এখনও তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু পাওয়া যায় নি। সংবাদে উল্লিখিত প্রত্নবস্তুগুলো সমস্তই প্রায় দু বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র'র শ্রীপ্রশান্ত-কুমার মন্ডল শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র প্রধান এবং শ্রীআশুতোষ মাইতি প্রভৃতি কর্মীদের অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সংবাদদাতা এ খবর জানেন না—এটা মনে হয় না। কারণ 'অমৃত' পত্রিকাতেই গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা-কেন্দ্র' সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। (পৃঃ ১৯)

তমলুকে বিভাগীয় খনন কার্য পরি-দর্শনকালে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পদস্থ অফিসররা সকলেই ঐ সমস্ত প্রত্নসম্ভার সংগ্রহশালার অস্থায়ী গৃহে পরীক্ষা করে দেখেছিল।

ঐ সংস্থার জয়েন্ট ডিরেকটর জেনারেল শ্রী বি এন থাপর গত ২৪ এপ্রিল ঐ প্রত্ন-বস্তুগুলো দেখে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করেন এবং বলেন, এদের মধ্যে কোন কোনটির ব্যবহার কাল নিঃসন্দেহে খৃস্টপূর্ব ২০০০ বৎসর কি তারও আগে হবে। এ বিষয়ে গত ১লা মে দি স্টেটসম্যান-এর ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংগ্রহশালার বিবরণ ও প্রত্নবস্তুর ছবি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত সম্পাদক
'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র'
তমলুক, মেদিনীপুর।

নববর্ষ সংখ্যা

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮২ অমৃত পত্রিকা পড়ে যারপরনাই খুশী হয়েছি। এই কদিন পত্রিকাটি আহারে-বিহারে অফিসে-রাস্তায় আমার নিত্যসঙ্গী ছিল। প্রতি নববর্ষেই আপনারা অগণিত লোভাতুর পাঠককুলের রসনাকে বিচিত্র রচনাসম্ভারের মাধ্যমে তৃপ্ত করে থাকেন। আমাদের মত যারা বাংলা ছোট গল্পের ধানু শিকারী তাদের যে কি উপকার করেন তা লিখে বোঝান যায় না। এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও রূপকারদের সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। বিগত বছরগুলিতে কত শত যশস্বী গল্পকার মণিমুক্তোতুল্য গল্প সৃষ্টি করেছেন যার সিংহভাগই শুধুমাত্র সাময়িকীর আঁতুড়-ঘরেই মৃত্যুবরণ করেছে—পুস্তকাকারের দীর্ঘজীবন পায়নি। আপনাদের সুচিন্তিত সম্পাদনা কৃপায় সেইসব অমূল্যরতনের কিছু কিছু আমরা উপভোগ করতে পারছি, এটা কি কম কথা? হয়ত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেছে, যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন। কিন্তু সেসব ছাড়িয়েও যা পাওয়া গেছে, এক কথায় তা অতুলনীয়।

অমিয়রঞ্জন দাস
ঘাটিগলি, আসানসোল।

'টেরাকোটা' প্রসঙ্গে

৬ই জুন সংখ্যা অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীপ্রণব রায় 'দি কনসাইজ অকস-ফোর্ড ডিকসনারি অব কারেন্ট ইংলিশ' থেকে টেরাকোটার অর্থ উদ্ধৃত করে বলে-ছেন, ইংরাজীতে টেরাকোটার বিশেষ অর্থ হোল, সৌধ বা দেবালয় অলংকরণের জন্যে পোড়ামাটির মূর্তি এবং পোড়ামাটির ফলকে অংকিত নকশা বা বিমূর্ত বস্তু।

কিন্তু শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় টেরাকোটার যে ব্যাপক অর্থ করেছেন, অপর কয়েকটি ডিকসনারিতে তার সমর্থন মেলে। টেরাকোটা অর্থে—

১। হার্ড রেডিশ ব্রাউন পটারী (ইউজড ফর ভাসেজ স্মল স্টাচুজ অর্না-মেন্টাল বিল্ডিং মেটিরিয়ালস এটছাটারা—দি আডভানসড লার্নার্স ডিকসনারি অব কারেন্ট ইংলিশ।)

২। হার্ড রেডিশ ব্রাউন আনগ্লেজড পটারী (দি পেঙ্গুয়িন ডিকসনারি অব ইংলিশ—কমপাইলড বাই গারমনসোয় উইথ সিম্পসন)।

অমলচন্দ্র কুন্ডু
কলিকাতা-৩৭

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই গল্পের রূপান্তর এলেন সকার কর্ত্তৃক আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণের গল্প এইখানে মনে করা উচিত। পঞ্চতন্ত্রে এই গল্পটি আর একভাবে দেখা যায়।

স্বভাব-কৃপণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তিনি কিঞ্চিৎ চাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উদর পূরণান্তে যাহা বাঁচিয়াছিল তাহা একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া একটি খুঁটিতে দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। এক রাত্রে আপন খাট সেই হাঁড়ির নিম্নভাগে রাখিয়া শয়ন করিলেন ও সমস্ত রাত্রে সেই হাঁড়ির দিকে দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন, এই পাত্রটি কানা পর্য্যন্ত চালে পূর্ণ। যদি এই সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় আমি উহা বিক্রয়ে শত টাকা পাইব, সেই টাকা হইতে ২টি ছাগল খরিদ করিব, ছয় মাস অন্তর তাহাদের বাচ্চা হইলে আমার একপাল ছাগল হইয়া উঠিবে, তারপর ছাগলের বদলে গাই খরিদ করিব, তাহার বাছুর হইলে বাছুর বিক্রয় করিব তারপর গাভি বিক্রয় করিয়া মহিষ খরিদ করিব, এবং মহিষের পরে ঘোড়া কিনিব, যখন তাহার বাচ্চা হইবে, আমার অনেক ঘোড়া হইবে ও ঘোড়া বিক্রয় করিলে অনেক অর্থ হইবেক, তখন ঐ অর্থে আমি চতুষ্কক্ষসংযুক্ত একটি বাটি নির্ম্মাণ করিব তাহা হইলে কোন-না-কোন ব্রাহ্মণ আপন সুন্দরী কন্যা ধন পণসহ আমায় সম্প্রদান করিবে, তাহার সন্তান হইলে আমি সোম শর্ম্মা নাম রাখিব। যখন সোমশর্ম্মা জানুতে বসাইয়া পড়াইবার উপযুক্ত হইবে, আমি পুঁথি লইয়া অস্তাবলের নিকট বসিয়া পড়িতে থাকিব। সোমশর্ম্মা তাহার মাতার ক্রোড় হইতে লাফাইয়া আমার দিকে দৌড়িয়া আসিয়া যখন ঘোড়ার পায়ের নিকট পঁহুছিবে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে কহিব ছেলে লয়ে যাও লয়ে যাও বলছি, কিন্তু ব্রাহ্মণী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যদি আমার কথা না শুনে, আমি উঠিয়া তাহাকে এমনি একটি পদাঘাত করিব, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ অনামনস্কে পা ছুঁড়িলেন। পা উঠাইতে মৃৎপাত্রে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। চাল সমস্ত ব্রাহ্মণের গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল ও তাহাকে ধবল বর্ণ করিল। সোমশর্ম্মার পিতার মত যে ব্যক্তি কল্পনায় ব্যস্ত হয়, তাহার চালের ধূলো ও ধবল ভক মাত্র লাভ হয়।

হিতোপদেশে এই গল্পটি আবার পরিবর্তিত দেখা যায়।...

নানা পথে ও নানা প্রণালীতে পঞ্চতন্ত্রের গল্পসকল এক নগর হইতে অন্য নগরে গিয়াছিল, নানা প্রকারে সেই গল্পগুলির রূপান্তর হয়, ও নীতিশিক্ষা, দেবার্চ্চনা বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিস্তার মানসে সেই গল্প সকল ইউরোপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সকল কথার আলোচনা সাধারণতঃ বিস্ময়বর্দ্ধ ও আমোদপ্রদায়ী, কিন্তু ভারতবাসীদের পক্ষে অবশ্যই গৌরবের বিষয়।

এক এক বার এমন মনে হয় যে যৎকালে আদিম আর্য্যগণ আপনাপন আদি গৃহ ছাড়িয়া নানা স্থানে উপনিবেশ জন্য গমন করেন, তখন দেবতাদের নাম, ভাষা, নীতিশিক্ষা, প্রহেলিকা, বীরগণের কাহিনীসহ কতকগুলি গল্প লইয়া যান, কিন্তু এই কথা অনুমান দ্বারা মীমাংসা হওয়া কঠিন। এই মাত্র দেখা যায় যে, কতকগুলি কথা অতি পুরাতন কাল হইতে সর্ব্বদেশে সমান প্রচলিত আছে।

'দিব' ধাতু হইতে উৎপন্ন কয়েকটি শব্দ সকল দেশেই দেবতার নাম বুঝায়। ভারতে দেবেন্দ্র ও ইন্দ্রদেব এবং গ্রীসে দেয়স ব জিয়সের সাদৃশ্য অতি চমৎকার। উভয়েই বজ্রপাণী, পর্ব্বতবাসী, উভয়েই দাম্ভিক ও বিলাস সুখ সম্ভোগে দোষান্বিত উভয়েই বারিদাতা। একজন বৃত্তাসুর-হন্তা, একজন টাইটস-দানব-হননকারী।...

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বকালীয় আর্য্যগণ, সকল জাতি অপেক্ষা কেবল প্রাচীন না হউন, তাঁহাদের প্রখর্য্য ও তীব্রতা সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের মতে বাইবেলের অনেকানেক কাহিনী আর্য্যজাতিদিগের পুরাতন গল্প ইহুদিরা সংগ্রহকারক মাত্র—আবার অল্প দিন হইল কোন লেখক কহিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে কোন কোন উপাখ্যান বাইবেল হইতে গৃহীত। এই বিষয়ের উত্তরে জেকুলেট মহাত্মার দুইটি প্রশ্ন এইখানে উদ্ধৃত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব—ইহুদি ও হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে কোনটি প্রাচীন? পুরাতনটি নূতনের নকল বলা কি সঙ্গত? যাহা হউক, এ সকল কথা কল্পনা-বায়ুর হঠাৎ উৎপত্তি বলিলেও বলা যায়; কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের গল্প সম্বন্ধে অনুমানিক তর্ক আবশ্যক নাই, পঞ্চতন্ত্রের গল্প যে প্রণালীতে অনুবাদ হইয়া দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যায় তাহা অনুমানের অধীন নহে, পরাবৃত্তের দ্বারা প্রতিপন্ন; অনুবাদকগণের নিজ লেখনীতেই স্পষ্ট প্রকাশ।

এই অনুবাদের মধ্যে সর্ব্ব পুরাতন পারসী পুস্তক 'কালিল দামিশ' (সংকরাতক দমনক)। খসরু নসেরোঁয়া বাদসা শুনিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে নীতি সম্বন্ধে অনেক পুস্তক প্রস্তুত আছে, যে সকল সংগ্রহ করিতে উভয় পারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় নিপুণ কোন ব্যক্তিকে বাছিয়া নিযুক্ত করিবার জন্য তখন আপন উজির বুজুর্গমিহিরের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করেন, তদনুযায়ী বর্জ্জয়ে নামা একজন সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন।

নীতি সম্বন্ধে ভারতের নিকট সমস্ত রাজ্য এই প্রকার ঋণী, এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি মাত্র উপাখ্যান বক্তব্য। ধর্ম্মাত্মা জোসেফট করনেল তাবৎ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের পূজ্য। উভয় পূর্ব্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বৎসর ২৬ ও ২৭ নভেম্বর তারিখে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে হুগলী নগরের নিকটবর্ত্তী বানাতগাড়ির গির্জ্জায় এই লবেনা পর্ব্বই অনেকেই দেখিয়া থাকেন। এই সাধুর সৃষ্টি কৌশল অতি কৌতুকজনক। বাগদাদের যে খলিফা আলমানসায়ের দরবারে 'করটক দমনক' অনুবাদক আবদায়া প্রতিষ্ঠিত, সেই দরবারে আর একজন সরজিয়াস নামা খ্রীষ্টীয়ান রাজকোষাধ্যক্ষ বা খাজাঞ্চি ছিলেন, তাহার জন নামে এক সন্তান ছিল। জন কোন ইতালিয়ন পাদরি দ্বারা শিক্ষিত ও ধর্ম্মনীতিতে দীক্ষিত হন। পিতার মৃত্যুর পর জন তাহার কার্য্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল পরে দামাসকাস নগরে মঠবাসী সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হন। এই সময়ে অপরাপর পুস্তক মধ্যে বরলেন ও জোসেফট সাধুদের বিবরণ জন কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, সে গল্প হল : ভারতবর্ষে এক রাজা ছিলেন, তিনি খ্রীষ্টীনদের চির শত্রু ও পীড়ক তাহার একমাত্র সন্তান ছিল। জ্যোতিষকগণ গণনা করিয়া কহিয়াছিলেন যে, সে রাজকুমার নবধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। তজ্জন্য যাহাতে কুমার পৃথিবীর দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে অন্তর থাকিয়া বিলাস-সম্ভোগেই কাল যাপন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে রাজা বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু কোন খ্রীষ্টীয়ান সন্ন্যাসী রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে রাজকুমার কেবল নবধর্ম্ম অবলম্বনে ক্ষান্ত না হইয়া ঐহিক সমস্ত অর্থ ত্যাগ করিলে পরে নিজ পিতাকেও নব ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া বনে গমন করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাই এই পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য।

এই পুস্তকের রাজপুত্র খ্রীষ্টীয় সমস্ত চর্চ্চেই সমান পূজ্য, তাহার গল্পটি প্রথমে গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়। পরে চালডিয়া, আরবী, মীশর, আরমানী ও ইহুদীদের ভাষায় পূর্ব্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে লাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ন, জার্ম্মান এসপেনিস, ইংরেজী ও আইসল্যাণ্ডের ভাষাতে পর্য্যাপ্ত অনুবাদ হইয়া বরলাম জোসেফট সর্ব্বত্র পূজ্য, সকলের সম অনুরাগভাজন হয়। আবার একজন জিষুট মিশনারি দ্বারা ফিলিপাইন উপদ্বীপের ভাষায় এই গল্পটি প্রচার হয়, এখন একবার ললিতবিস্তার বৌদ্ধদেবের কাহিনীর সহিত বারলেম জোসেফটের জীবন-বৃত্তান্ত মিলাইয়া দেখা যাউক।

(ক্রমশঃ)

ক্ষপণক

সেই কোন ছেলেবেলায়—শৈশবের সায়াহ্নে না কৈশোরের ভোরে—মনে নেই কবে প্রথম আমি ছিপ হাতে নিয়েছিলাম।

তালপুকুর নামে আমাদের একটা পুকুর ছিল। মনে আছে তালগাছ ছাড়াও তার চারপাড়ে অসংখ্য খেজুর গাছও ছিল; আর ছিল বৈঁচির ঝোপ। বর্ষায় জল ভরে উঠত তালপুকুরের কানায় কানায়। ঘাটের ধারে কলমিলতার দামে তখন কুঁড়ি ধরত। কলমির কচি পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল শোলপোনা খেলা করত সারা দুপুরে। পুকুরের মাঝখানে মাছেরা ঘাই দিত—ঢেউ-এর মালা ছড়িয়ে যেত পুকুর জুড়ে। ঢেউ থামলে আকাশ আবার নেমে আসত জলে। জলভরা মেঘের আকাশ।

এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে আকাশ আবার নীল। ভিজে রোদ ভাসে নিথর নীল জলে। টুপ-টাপ-টুপ-টাপ—বৃষ্টির পর পাতায় পাতায় কথা শুরু হয়। বৈঁচির ঝোপ থেকে টুনটুনি পাখি ডাকে টুন-টুন-টুন-টুন—। কোথায় এক ঘুঘু বসে ঘুম ডাকে।

একটা লাল ফড়িং এসে বসে ফাৎনায়। আর তখনি দুপুরের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় একটু সুরের ঢেউ এসে।

জলে কলসী ডুবিয়ে জল ভরছে বামুন-পাড়ার এক নতুন কিশোরী বৌ। পরনে লাল ডুরে শাড়ী ঘাটের শেষ ধাপে বসে সে জল তুলছে। কোন পথে কখন সে এল—দেখে মনে হয় জলের তল থেকে সে নিঃশব্দে উঠে এসেছে। নিজেই সে তার মাথার ঘোমটা একটুখানি তুলে দেয়। কলমি ফুলের মত সরল সুন্দর মুখখানি যেন আজই ভোরে ফুটেছে। মুখে তার রক্তিম হাসি ফুটে ওঠে জলভরা হয়ে গেলে কলসি কাঁখে তুলে নিতে নিতে যখন সে চেয়ে চেয়ে দেখে ওপারে চারা খেজুর

গাছের গোড়ায় বসে ছিপ ফেলছে এক সুন্দর কিশোর একা।

সংগী আমার অবশ্য ছিল একজন—ফণি। সম্পর্কে সে আমার জেঠাতুতো ভাই কিন্তু আসলে আমার বন্ধু ছিল সে। তারও ছিপ ফেলার নেশা ছিল। কিন্তু তার আসল নেশা ছিল পাখি মারা। ফাঁদ পাততে সে ছিল ওস্তাদ। ফাঁদে পায়রা ঘুঘু ডাকপাখি পাতকো এই সব পাখি ধরত আর তাদের মাংস খেত মহাসুখে। আমি পাখির মাংস খাওয়ার কথা কখনো ভাবতেই পারতাম না। মাছ খেতেও আমার আপত্তি ছিল অন্তত সে মাছ আমি ছিপে ধরতাম।

সবাই বলত, মাছ-মাংস খাস না সেই জন্যেই ত তোর গায়ে বল হয় না—দেখত ফণিকে! সত্যি সেই ছেলেবেলাতেই ফণি যাকে বলে বীরপুরুষ! ঘন্টার পর ঘন্টা কোদাল দিয়ে মাটি কাটতে তার ক্লান্তি নেই! একমণি চালের বস্তা মাথায় নিয়ে দু-তিন ক্রোশ পথ হেঁটেই যায় সে অনায়াসে।

শিকালকে ঘাড়ের ওপর নিজের মাথাটা বয়ে নিয়ে ইস্কুলের পথে অর্ধেক যেতেই আমি হাঁফিয়ে পড়ি; সেই সময় ফণি চালের বস্তা ঘাড়ে নিয়ে হাটে যায়, তার ঘাড়টা আরো মোটা দেখায়, পায়ের পেশীগুলো ফুলে ফুলে ওঠে—আমাকে ছাড়িয়ে চলে যায় ফণি। যেদিন সে ছিপ ফেলতে যায় আমি যদি সারাদিনে একটা মাছ তুলি ফণি তুলবে কম করেও তিনটে মাছ। যেদিন আমি একটা মাছও গাঁথতে পারব না সেদিনও ফণি গাঁথবে দুটো মাছ!

তবে আমিই ছিলাম ইস্কুলের সবচেয়ে ভাল ছেলে! ফণি ত ইস্কুলেই যেত না।

ফণিকে অনেকে যতটা খারাপ ভাবত আমি ততটা খারাপ ভাবতে পারতাম না। হলেই সে ভাল না হোক সে ছিল আমার বন্ধু। কিন্তু বন্ধু হলে কি হবে দুজনের মধ্যে পার্থক্য অনেক—আমি যা ফণি তা নয়। সেটা ছিল একটা দুজনের ব্যাপার যে মাছেরা ফণির ছিপেই ধরা দিতে ভালবাসত।

তবু ছিপের বিশ্বাসে আমি জেনেছিলাম আমিই শিল্পী।

ফণির সবকিছু ছিল খুব স্থূল। তার বাঁকারির ছিপটা ভাল করে চাঁচাও নয়। মোটা ডোর। লোহার বঁড়শি কালো রঙের। আর তার আদিম টোপ—কেঁচো!

মেহেদির রসে রাঙানো আমার ছিপ। সরু ডোর সংক্ষা বঁড়শি। সূক্ষ্মতার পথ আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল শুরুতেই। তখন থেকেই সূক্ষ্মতাব আর গভীর ভাবনার ধারণা হতে শুরু হয়েছে আমার মধ্যে, ছিপ ফেলার স্বাদও আমি পেয়ে গেছি।

সেই সময় আমাদের পাশের বাড়ীর অমূল্য কাকার ছেলে, আমার ছিপ ফেলার হাতেখড়ি যার হাতে সেই রজনীদার বিয়ে হল। বিয়ের দু মাসের মাথায় বৌদির সঙ্গে রজনীদার সম্পর্ক ... রজনীদার ... কুশল বাড়ী থেকে কিছু দূরে।

রজনীদা একটা স্টেশনারী দোকান করেছিল হরিণডাঙার হাটে। আমাদের গ্রাম থেকে ঠিক দুক্রোশ দূরে হরিণডাঙারহাট। হাট বলতে যা বোঝায় সপ্তায় দুদিন হাট বসত, তাছাড়াও রোজ সকাল বিকেলে সব্জির বাজার বসত; অনেক বাঁধা দোকান ছিল—চালের আড়ত, কাপড়ের দোকান, মুদিখানা ময়রার দোকান দশ-বারোটা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাট হরিণডাঙার হাট; সারাদিন খদ্দেরের আনাগোনা থাকত। রজনীদা সকালে স্নান করে বেরিয়ে যেত বাড়ী ফিরত রাতে হাটবারে হাটবারে ফিরতে রাত দশটাও হয়ে যেত।

বৌদিকে বিয়ের পর থেকেই তাই সারাদিন একলা থাকতে হত। রজনীদা একটা ট্রানজিস্টার কিনে দিয়েছিল বৌদিকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যতক্ষণ রেডিও স্টেশন খোলা থাকত বৌদির ঘরের রেডিওও ততক্ষণ খোলা থাকত।

গান শোনার উপলক্ষে আমরা যাওয়া শুরু করেছিলাম বৌদির ঘরে।

শুভ্রা নাম বৌদির। শাঁখের মত রঙ। যত সুন্দর দেখাত তারো বেশী সুন্দর। বৌদি সাজতে খুব ভালবাসত, তার ওপর নতুন বিয়ে হয়েছে—সবসময় এমন সেজে থাকত যেন কুটুমবাড়ি এসেছে। সকাল থেকেই মুখে স্নো-পাউডার মেখে থাকত। রোজ বিকেলে চুল বাঁধত—কোনদিন বিনুনী কোনদিন খোঁপা—কত রকমের খোঁপা। দুদিনেই বৌদির দারুন ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম আমরা। আমি রোজ ফুল এনে দিতাম বৌদিকে। ফণি বৌদির সঙ্গে তাস খেলত। তাস খেলা আমার একটুও ভাল লাগত না। ফণি ছিল ওস্তাদ তাস খেলায়।

অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর সন্ধ্যায় পড়তে বসা নেই গান শুনতে যাব বৌদির ঘরে। পাড়ার যেখানে রজনীদার ঘর সেই জায়গাটা একটু বেশী নির্জন। একটা পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে গেলে তারপর বাঁয়ে পড়ে একটা বাগান ডাইনে ঝোপঝাড় মাঝখানে সরু পথ—অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না দূরে বৌদির ঘরের জানালায় আলো দেখে পথ চিনে নিতে হয়।

ছুটতে ছুটতে বৌদির ঘরের দাওয়ায় পৌঁছে যাই। দেখি ঘরের দরজা ভেজানো। হুট করে দরজা ঠেলে খুলে দিই। বৌদি আর ফণি তাস খেলছে বিছানায় বসে। সেই তাস যার এক পিঠে প্রায় উলঙ্গ একটা মেয়েমানুষের ছবি।

রেডিওর গান বিষ্ঠী লাগতে থাকে। উঠে আসব যদি কেউ ... আমি কেন তবে এসেছিলাম! কাউকে কোন কথা নয় এমন এক একজনের যন্ত্রণা নিয়ে বসে থাকি। বৌদি খেলতে খেলতে দুজনের মুখে উত্তেজনায় উল্লাসে কী অদ্ভুত রূপ নেয়—চেনাই যায় না! আমি যে ঘরে আছি ওরা একেবারে ভুলে গেছে! আর না জানি উঠে পড়ি। অন্ধকার পথ হেঁটে ফিরে যাই ঝিঁঝিঁর কান্না আমাকে সঙ্গ দেয় সারাপথ।

সারারাত ঘুম আর জাগরণ দু-এর মাঝখানে এক অদ্ভুত স্বপ্নের টানাপোড়নে ছিন্নভিন্ন হতাম। শেষে ভোরবেলা সান্ত্বনা পাই—বৌদি নিশ্চয়ই আমাকেই বেশী পছন্দ করে কারণ আমি ফণির চেয়ে সুন্দর!

দিনের আলোয় রাতের মায়া খান-খান হয়ে ভেঙে যায়! আমার ওপর বৌদি কেমন করে যে এত নির্দয় হয়! পুজোর ছুটিতে রোজ দুপুরে তালপুকুরে ছিপ ফেলতে যেতাম আর প্রায় রোজই শূন্য হাতে ঘরে ফিরতাম। আমার খুব লজ্জা করত। পথ অন্ধকার হলে তবে ফিরতাম। বৌদির ঘরের পাশ দিয়ে যে পথ গেছে প্রতিজ্ঞা ছিল ও পথে যাব না! আমি না জানলেও বৌদি ঠিক জানে যে আমাকে ওই পথেই ফিরতে হবে। দেখতে পেতাম বৌদি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ফিরে যাব তখন আর তার উপায় নেই! মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে এগোতাম। বৌদির নাগালে গিয়ে পড়বামাত্র বৌদি ছুঁড়ে দিত সেই পুরোনো পচা রসিকতাটা—সারাদিন বঁড়শি হাতে সন্ধ্যে বেলা আমড়া ভাতে!' আর সেই হাসি! যেন ধারালো নখের উদ্দাম আঁচড়! আমাকে ফালা ফালা করত! আমার ভেতরটা রাগে গরগর করত।

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখতাম—এক পশলা বৃষ্টির পর আমি তালপুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। নীল আকাশ থেকে উজ্জ্বল রোদের ধারা নেমেছে জলে। জলের অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে আলো। নীলাভ জলতল যেন আকাশ। একটা মাছ লম্বা রোগাটে গড়ন রুপোলী রং তার মায়ার শরীর জলের আকাশে শুধু দু দণ্ডের জন্যে দেখা দিয়ে সে হারিয়ে যায়।

আশ্চর্য এক প্রেরণায় আমার ঘুম ভাঙে। সারা সকাল কাটে স্বপ্নের ঘোরে। দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়ি ছিপ হাতে।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। চরাচরের বিষাদ সব ধুয়ে গেল। নতুন আশায় আবার আমি চার ফেলি জলে। আমার এই চারফেলা চিরকাল বিফলে যাবে না—একদিন আসতেই হবে তাকে!

সেই প্রথম এল সে। শুভ্রাবৌদির ছোট-বোন—করবী। করবীর কুঁড়ি। যেন সে দিনের প্রথম রোদ্দুর আমার কৈশোরের কুয়াশা সরিয়ে আমাকে ছুঁয়ে দেয়। আমি নিমেষে এক আবছায়া পরিচয় থেকে আলোকিত পরিচয়ে পৌঁছে যাই। আশ্চর্য, যাকে দেখার আগে যার কথা কিছুই জানা ছিল না তাকে দেখার পরমুহূর্ত থেকে তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অনুভব করি। আকাশ বাতাস পৃথিবীর সকলের জানা হয়ে গেছে একথা—আমার সঙ্গে একজনের গোপন মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে!

বৌদির ঘরে সকাল সন্ধ্যায় দিনের মধ্যে কতবার যেতাম তখন সারাদিনে একবারও যেতে পারতাম না। একটা অদ্ভুত সংকোচ আমাকে দূরে দূরে রাখত। দূরে থেকে ভাবতাম আমি যে করবীর জন্যেই করবীর সামনে যেতে পারি না করবী নিশ্চয়ই তা

বোঝে। করবীকে আমি যে চোখে দেখেছি করবীও আমাকে দেখেছে সেই চোখে।

তবু আমার যত রহস্য আমার মত করে সে যদি না বোঝে দৈবাৎ—তাই কোন সন্ধ্যায় যেতাম বৌদির ঘরে। করবীর মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। তার মুখের দিকে না তাকিয়েও যে পৃথিবীর সব কিছু থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি তার দিকেই চেয়ে আছি আমার এই কথা করবী কি জেনেছিল?

জানি না। আমি বুঝি না এ কী রহস্য—করবী ফণির সংগে এত কথা বলে ফণির যত স্থূল রসিকতায় সাড়া দেয়। বৌদির মত করবীও ফণিকে বড় বেশী প্রশ্রয় দেয়—এ কথা মনে হলেই আমার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে।

সেই আগুন নেভে অনেক চোখের জলে।

তারপর আর কিছুই বিশ্বাস করতাম না। পৃথিবীর সব স্থূলতার ঊর্ধে ছিলাম আমি। ফণি আমার অনেক নীচে।

ফণির মত অমন পেশল শরীর আমার নয়। দেড়মণি চালের বস্তা মাথায় করে বইতে পারি না আমি! সবাই জানে চালের বস্তা উঠবে কেন আমার মাথায়—তিনটে লেটার নিয়ে ইস্কুল ফাইনাল পাস করেছি পড়তে যাব কলকাতায় কোন বিখ্যাত কলেজে।

ফিলজফিতে এম-এ পাস করেছি। নিতান্তই সাধারণ সেকেন্ড ক্লাস! ভাল ফার্স্ট ক্লাসই চাকরী জোগাড় করতে পারছে না—আমার দাবী স্বভাবতই খুব বিনীত—রাইটার্সের কেরানীগিরি বা কলকাতার কাছাকাছি একটা ইস্কুল মাস্টারী।

কলকাতাতেই থেকে যাব। জীবনের একটা ছক তৈরী করেছি। —জীবন বলতে ত জীবনের ভুক্তাবশেষটুকু! বাড়ী থেকে মাসে মাসে টাকা আসা বন্ধ হয়েছে অনেককাল আগে। আমারই এখন বাড়ীতে নিয়মিত টাকা পাঠাবার সময়। সময়ের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। ঠিক বসে নেই আমি—উত্তর পাই না পাই তবু প্রতি মাসে অন্তত একটা চিঠি লিখি চাকরীর উদ্দেশ্যে। থাকি একটা সস্তা বোর্ডিং-এ। সকাল সন্ধ্যা ছেলে পড়াই।

বন্ধু আছে কয়েকজন। বেশী নয়—তিনজন। শনিবার সন্ধ্যায় রবিবার সকালে একটা চায়ের দোকানে নিয়মিত বসি আমরা চারজন। একজন কবি—কবিতা লেখে; একজন সাহিত্যিক—গল্প লেখে; একজন শিল্পী—ছবি আঁকে। বাকী জন ও সব কিছুই করে না—দেখে—শোনে—ভাবে; সে আমি।

আমর একটা বাড়ী আছে—জন্মস্থান—আমি জন্মেছি সেখানে। —সে আমারই বাড়ী কিন্তু কোন টান নেই অন্তরে আনন্দে কাঁদি না। কলকাতাই যেন আমার চিরকালের ভিটে—জননী জন্মভূমি আমার। দেশের বাড়ীতে কখনো যদি যাই ত সে একটাই টানে—সেই মাছের নেশা এখনো মাথা থেকে যায়নি।

সেবার বর্ষার শ্রাবণের মাঝামাঝি হবে সময়টা দিনের পর দিন আকাশে মেঘ আর মেঘ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। পুরোনো দিনের কথা খুব মনে পড়ছিল। এমন এক-একটা সময় আসে জীবনে একটানা কিছুদিন থেকে থেকে শুধু পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে।—চোখের ওপর ভাসে তালপুকুর—তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে জল। নীল জলে নেমেছে সজল মেঘের ছায়া। ঘাটের ধারে সেই কলমি লতার দাম।—কলমির কুঁড়ি এতদিনে ফুটেছে নিশ্চয়।

এক বন্ধুর কাছ থেকে দশটা টাকা ধার করে বৌবাজার থেকে মাছ ধরার চার কিনলাম। উগ্রগন্ধ ঘোড়বচ্চ নয় একাধিক—তার মিঠি মধুর গন্ধে সঁপে দিলাম মন-প্রাণ। জীবনের যত জটিলতা সমস্যা ভুলে গিয়ে এক আশ্চর্য সৌরভে আবিষ্ট হলাম। তারপর এক মেঘলা বিকেলে দেখি ট্রেন থেকে নেমে আমি মেঠো পথ ধরে বাড়ীর পথে হাঁটছি।

বাড়ীর কাছাকাছি এসেছি ফণির সংগে দেখা।

গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি হতে চলেছে ফণি। শরীরটাও তার হয়েছে রীতিমত পুরুষালী। চালের ব্যবসা করে টাকা করেছে প্রচুর। গ্রামের অভাবী মানুষদের কাছে চড়া সুদে টাকা খাটায় শুনেছি। দুর্দান্ত—সাহসীও হয়ে উঠেছে যাতে সে কারো শোবার ঘরে সে নাকি ঢুকে পড়তে পারে!

ফণিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু এককালের বন্ধু! সে আমার পকেট হাতড়ায় বলে—'কলকাতার সিগারেট দে!' তারপর সে খবরটা দেয়— 'করবী এসেছে বসন্ত!'

সন্ধ্যেয় গিয়ে দাঁড়ালাম বৌদির বাড়ীর উঠোনে।

বৌদি আমাকে দেখে উল্লাসে বলে উঠল—ওমা! ঠাকুরপো!— কখন এলে। এস এস! কতদিন পরে এলে এবার! ভাবি আর বুঝি এলেই না! —এবার সত্যি করে বলতে হবে কিন্তু ঠাকুরপো সেখানে কে আছে—?

তাকে দেখলাম—। সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাকে। সেই কুঁড়ি এমনি ফুটেছে! সেদিন বুকের সবটুকু রক্ত চলকে উঠেছিল মুখে মন বলেছিল এই ফুল আমার। আজ মন বলে—এ ফুল আমি কি ছুঁতে পারব! এমন এক গাম্ভীর্যের ঐশ্বর্য মিশেছে তার সৌন্দর্যে নারীর যে রূপের সামনে কোনদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারি না আমি। কোন কিছু আরম্ভের আগেই নিজেকে আমার ব্যর্থ মনে হয়। আজ যদি করবী কৃপা করে। সে পরেছে রক্তরাঙা শাড়ী ম্যাচ করা রবিয়ার লাল ব্লাউজ—কপালে লাল টিপ। আমাকে দেখে সে রক্তিম হল—মন বলে চেনা কোন পুরুষকে অনেকদিন পরে দেখলে নারীরা যে লজ্জা পায় এ ঠিক তা নয়।

কোনদিন কোন কথা হয়নি আমাদের মধ্যে। কথা হয়ত হয়নি সত্যি তাই বলে সত্যিই কি কোন কথা হয়নি কখনো। কোন কথা না বলার মধ্যে দিয়েই ত অনেক কথা বলা হয়ে গেছে—কথা ত শুরু হয়েছে সেই কবে আজ থেকে অনেক বছর আগে। সেই কথার প্রতিশ্রুতির পথেই ত তারপর থেকে হাঁটছি—। আজ সন্ধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছি পথের শেষে দুজন দুজনের মুখোমুখি।

এখন কিছু কথা হোক—অতি তুচ্ছ লৌকিক কিছু কথা। অথবা তারই বা কী প্রয়োজন। তারচেয়ে তুমি আর একবার তাকাও আমার চোখের দিকে, যদি ভুলে গিয়ে থাকো যদি ভুল করে কখনো না দেখে থাকো—আজ দেখো নারী কী চোখে আমি দেখেছি তোমাকে।

করবী আমাকে দেখার পর সেই ঘরে গিয়ে ঢুকেছে; এতক্ষণেও সে একবারও বাইরে এল না। বৌদি রান্নাঘরে—মনে হচ্ছে বৌদির দেরী হবে রান্নাঘর থেকে বেরুতে। আমি এখন কী করি—ঘরে গিয়ে ঢুকব আর একবার দাঁড়াব করবীর মুখোমুখি।

থাক—ফিরে যাই! এত আয়োজন করে এত দূর থেকে এসে ফিরে যেতে মন চায় না। তবু নিজেকে যেন অবাঞ্ছিত মনে হয়। দাঁড়িয়েই থাকি তবে।

এমন সময় দূরে কার পায়ের শব্দ শুনতে পাই। দেখি অন্ধকার ঝাঁপিয়ে কে আসছে। ফণি।

ফণি আমাকে দেখতে পায়নি—না দেখেও গ্রাহ্য করেনি এমনভাবে সে আমার পাশ দিয়েই ঘরে গিয়ে ঢোকে। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছিল তার আলো কিছু বাইরে এসেছিল আমার দেখতে ভুল হয়নি—ফণির হাতে এক প্যাকেট তাস।

আর দাঁড়াইনি আমি। নিমেষে উঠোন পেরিয়ে অন্ধকারে গিয়ে মিশেছি।

তারপর কখন আমি তালপুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। অনেকক্ষণ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। এক সময় দেখি সামনে কালো জল। যেন ঘন কালো মেঘ জমেছে নীল আকাশে।

মাথার ওপর লক্ষ কোটি নক্ষত্রজ্বলা আকাশ। আকাশের অসীম রূপ এমন করে আগে আর কোনদিন দেখিনি। চারপাশে ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে অবিরাম, যেন গাছপালা আর মাটির বিস্ময় সুর হয়ে বাজছে—সেই সুরে মিশেছে মানুষের ব্যর্থতার হাহাকার। আমার শৈশবের কৈশোরের তালপুকুর—তাকে আমি চিনতে পারি না! তার কালো জল দূরে অন্ধকারে মিশে গেছে—তার শেষ আছে মনে হয় না—তার তল আছে কিনা জানি না!

এই অতল জলে কোথায় আমি ছিপ ফেলব!

৩২টি জোরালো অপরিহার্য্য কারণ
ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ® খাওয়ার পক্ষে
Calcium-Sandoz
৩২টি শক্ত উজ্জ্বল দাঁত
এবং মজবুত হাড়ও।
একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম প্রয়োজন তার চেয়ে দ্বিগুণ ক্যালসিয়াম-এর দরকার হয় শিশুদের দাঁত ও হাড়ের জন্য। সুস্বাদু রাস্‌বেরির স্বাদগন্ধযুক্ত ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ আপনার
মাত্র ৪-৬টি ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়ি রোজ খেলে আপনার বাচ্চার দাঁত আরো শক্ত সুন্দর এবং হাড় আরো মজবুত হবে। তাছাড়া ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়িতে পাওয়া যায় ভাইটামিন সি, ডি ও বি১২। স্যাণ্ডোজ-এর উপর নির্ভর করুন—বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে বিশ্বে পথ প্রদর্শক।
সমস্ত বড় বড় ওষুধের দোকানে ২০০ বড়ির আর ৫০ বড়ির শিশিতে এবং সিরাপ হিসেবেও পাওয়া যায়।
শরীর গঠনে ক্যালসিয়াম
বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাত্র ৬ মাসেই যে সব শিশুরা নিয়মিত ক্যালসিয়াম খেয়েছে তারা, যারা খায়নি তাদের চেয়ে দ্রুত বেড়ে উঠেছে।
ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®
প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্য
SANDOZ
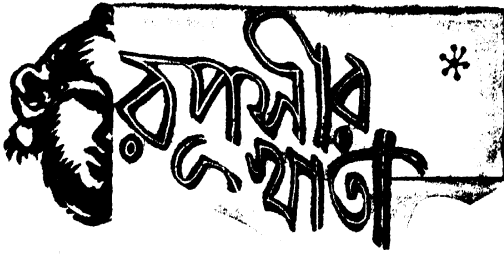
প্রথমেই ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করি। আপনাদের যতগুলি চিঠি পেলাম, সবকটিতেই আপনারা 'রূপসীর খাতা' পড়ে ভাল লেগেছে জানিয়েছেন এবং উপকার পাচ্ছেন জানিয়েছেন। এবারের সংখ্যাতে শুধু চিঠিরই উত্তর দিচ্ছি— কারণ বহু চিঠি জমা হয়ে গেছে—। এই সব উত্তরের মাধ্যমে শুধু যিনি জানতে চেয়েছেন তিনি একাই নয়, যাঁরাই পড়বেন তাদেরও অনেক কিছুই জানা হয়ে যাবে।

কলকাতা থেকে এক সঙ্গে কতকগুলি চিঠি এসেছে তাদের উত্তর প্রথমে দিচ্ছি—।

(১) মীরা সরকার জানতে চেয়েছেন— কি ছাঁদে চুল বাঁধলে তাঁকে মানাবে।—

চুলের নানা ছাঁদ ও ধরনের ওপর আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি—। যাই হোক আবার লিখছি—। মুখ লম্বা ও ছোট হলে, খোঁপা খুব বড় ভাল দেখাবে না—তাতে মনে হবে শরীরের তুলনায় মাথা বড়। এই জন্য এমন করে চুল বাঁধতে হবে যাতে মুখ গোল দেখায়। কানের দু পাশে চুল একটু ব্যাক কোম করে ফুলিয়ে গোল করে নেবেন—।কিন্তু মাথার ওপরের অংশ কখনও ফোলাবেন না। এরপর ঠিক ঘাড়ের ওপর খোঁপা করবেন—আর এমন করে বাঁধবেন যাতে মুখের দু পাশ দিয়ে সেই খোঁপার অংশ দেখা যায়—তাহলেই সুন্দর দেখাবে।

(২) স্বপ্না সরকার, জানতে চেয়েছেন কি ভাবে শাড়ী পড়লে ওকে মানাবে।— শাড়ী রোগা মেয়েরা কি ভাবে পরবে জানার আগে একটা বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে কি ধরনের শাড়ী পরলে ভাল দেখাবে। গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে এমন সব ধরনের শাড়ী পরা একেবারেই উচিত নয়—যেমন, সিল্ক, সিফন বা জর্জেট ইত্যাদি। এদের পরা উচিত সুতি শাড়ী ও ভারী ফোলা ফোলা শাড়ী। এরপর আসছে পরার ভঙ্গী: আজ কাল শরীরের ভাঁজ সুস্পষ্ট করার জন্য সবাই খুব আঁট করে শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে শাড়ী পরে থাকে। কিন্তু আপনার বেলায় তা চলবে না শাড়ী পরার সময় পেছনে একটু কুঁচি দিয়ে নেবেন—তারপর সামনে কোঁচ দেবার সময়ও কোঁচার পাশে —একটু কুঁচি দিয়ে নেবেন এবং শাড়ী একটু ঢিলে ঢালা করে পরবেন। আঁচলটাকে

(৩) ইরা সরকার জানতে চেয়েছেন যে তাঁর শরীরের রং মুখের মতন পরিষ্কার করা যায় কি করে।

মুশুরীর ডাল বেঁটে তাতে ৪।৫ ফোঁটা মধু, কাঁচা দুধ মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন তারপর তাই দিয়ে সারা শরীরে বেশ করে ঘষে ঘষে লাগান—একটু পরে সামান্য গরম জলে ধুয়ে ফেলুন— তাহলে গায়ের রং ফর্সা হতে বাধ্য। করে দেখুন, ঠিক ফল পাবেন।

(৪) মীনা মল্লিক—আপনার মুস্কিল আসান করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি বরং ডাক্তারের পরামর্শ নিন—, যতোদূর জানি ভিটামিনের অভাব থাকলে এ-ধরনের হয়ে থাকে।

(৫) জনৈক পাঠিকার নামে একটি চিঠি এসেছে—যিনি কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন রূপ-চর্চার জন্য। এর প্রথম প্রশ্ন—ইনি কি রং এর কমপ্যাক্ট বা পাউডার ব্যবহার করবেন। যার নিজের রং চাপা অর্থাৎ শ্যাম বর্ণ ধরে নিতে পারি। আমি আগেও আলোচনা করেছি—আবারও জানাচ্ছি পাউডার না ব্যবহার করলেই সবচেয়ে ভাল। পাউডারে চামড়ার ক্ষতি হয় ও মুখ খস খসে দেখায়। খুব ভাল বিলেতি কোম্পানীর পাউডার হলে তাও চলতে পারে। আধুনিকতম রূপ সজ্জার বিশেষত্ব হচ্ছে স্বাভাবিক দেখান। অর্থাৎ এমন ভাবে মেক-আপ ও সাজ করা উচিত যাতে স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল দেখায়। আগের দিনে মেক-আপ প্রকট ভাবে ফুটে থাকতো এবং সব কিছুই বেশ চড়া রূপ ধারণ করত। কিন্তু আজ কাল কার মেক-আপের আসল নিয়ম হল সৌন্দর্য বিকল্প, কিন্তু এমন ভাবে, যাতে উগ্র না দেখায় অথচ উজ্জ্বল মসৃণ দেখায়। সেই জন্য মুখের ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখার চেষ্টা সবচেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে— ও সেই সঙ্গে চোখ নাক ভুরু ইত্যাদিকে ঠিক যে-টুকু প্রসাধন দিলে ভাল দেখাবে ঠিক ততটাই করা হয়ে থাকে। কমপ্যাক্ট ও সেই কারণে ব্যবহার করতে হলে বেশ বুঝে ও হাল্কা হাতে করা উচিত। ক্রীম বেস ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল—। যে দুটি কোম্পানির কথা লিখেছেন তাদের দুজনেরই কোন একটি জিনিষ অপর থেকে বেশী ভাল বা খারাপ—। তবে ক্রীমবেস ম্যাকসে কোম্পানীরই বেশী চলন—মুখ বেশ ভাল

শুধু সামান্য একটু বোরোলীনের সঙ্গে ক্রীমবেস মিশিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে সারা মুখে, বেশ মসৃণ করে সব জায়গায়। তারপর যদি খুব ইচ্ছে হয় তাহলে আলতো করে পাউডারের পাফটা শুধু বুলিয়ে নিতে পারেন। আপনার রং হওয়া উচিত 'গোল্ডেন টোন' বা কোন খয়েরী বা চকলেট, রং-এর গাঢ় শেড।

(খ) দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন আপনি কমলা, গোলাপী ও ন্যাচারাল রং-এর লিপষ্টিক ব্যবহার করতে পারেন কিনা।

রং যাঁদের শ্যাম বর্ণ তাদের জন্য এসব রং শুধু চলে না। অর্থাৎ দুটি অথবা তিনটি রং মিলিয়ে লাগাতে হয়। ঠোঁট বেশ সুন্দর করে পরিস্কার করে মুছে তারপর লাল লিপষ্টিক হাল্কা করে লাগিয়ে নেবেন। তার ওপরে দ্বিতীয় প্রলেপ দেবেন —'ন্যাচরাল' রং-এর লিপষ্টিক দিয়ে কিম্বা গোলাপী রং দিয়ে তাহলে যে রং দাঁড়াবে তা খুব সুন্দর লাগবে। কমলা লিপষ্টিক দিয়ে তার ওপর হাল্কা হাতে ন্যাচারাল রং লাগালে খুব ভাল দেখাবে।—লিপষ্টিকের আর একটি শেড আছে তাহলে কফি-রং। সেই রং শুধু ব্যবহার করা যায় আর তা শ্যাম বর্ণ মহিলাদের পক্ষে খুব সুন্দর। অনেক সময় 'কফি'র সঙ্গে গোলাপী সামান্য ব্যবহার করলেও ভাল দেখাবে।

(গ) চুল উঠে যাওয়ার ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখতে হবে শুধু মাত্র চুলের যত্ন করলেই হবে না—।কারণ অনেক সময় দেখা গিয়েছে পেটের গোলমাল থাকলে চুল উঠে যায়। তাই আগে পেট ঠিক করে নেবেন। এছাড়া ভিটামিনের অভাব হলেও হয়—সেটা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে নেবেন। মাথায় তেল না দেওয়া সবচেয়ে ভাল। ইতালিয়ান অলিভ তেল একটু নিয়ে তা বেশ করে গরম করে রাত্রে শোয়ার আগে চুলের গোড়ায় গোড়ায় লাগাবেন। তারপর সকালে মাথা শাম্পু করে ধুয়ে ফেলবেন। এরকম সপ্তাহে অন্ততঃ ২ দিন করতে হবে। এছাড়া আর কোন তেল ব্যবহার না করাই ভাল। কেশুতি পাতার রস যেমন দিচ্ছেন দিন। আর মাসে একদিন অলিভ তেলের সঙ্গে একটা পাতিলেবুর রস সেটা মাথার চুলের গোড়ায় লাগিয়ে রাখতে হবে অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট। তারপর চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। চিরুণী পরিষ্কার রাখবেন—আর কাউকে ব্যবহার করতে দেবেন না। এম বিশ্ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই।

আর ক্রীম ম্যাসাজের নিয়ম আগে লিখেছি, সেটা ভাল করে পড়ে নেবেন— এ'কে দেখান সম্ভব নয়। তবে যদি আপনার মনে থেকে থাকে, আপনার আঁকা প্রথম চিত্রটাই ঠিক।

আজকের মত এখানেই শেষ করছি।

আঁদ্রে মালরোর চোখে নারী মুক্তি আন্দোলন

দিলীপ মালাকার

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পালনের বছর ১৯৭৫ সাল। দেশে-বিদেশে চলেছে নারী বর্ষ নিয়ে কত সভা-সমিতি। সারা বছর ধরেই চলেছে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' পালন। এই সুযোগে নারী মুক্তি আন্দোলন-কারীরা জোর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ইউরোপ আমেরিকায়।

মেয়েরা যত মুক্তি আন্দোলনই করুন না কেন তাঁদের আন্দোলন সম্পর্কে পুরুষের মতামত তাঁরাই আগ্রহে সংগ্রহ করে চলেছেন। সম্প্রতি তারই নমুনা পাওয়া গেল ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরোর এক সাক্ষাৎকারে।

আঁদ্রে মালরোর বয়স এখন চুয়াত্তর। ইনি শুধু সাহিত্যিক নন। প্রথম যৌবনে ছিলেন বিপ্লবী। এশিয়া সম্বন্ধে ওয়াকি-বহাল। কুড়ির দশকে তিনি ইন্দোচীন ও চীনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর স্পেনের যুদ্ধে ফ্যাসিস্ত বিরোধী শক্তির আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতারূপে যেমন খ্যাতি লাভ করেন তেমনি তার সাহিত্যিক গৌরব প্রকাশ পেতে শুরু করে। তিরিশের দশকে তাঁর 'লা কঁদিশিয় হুমাঁ' উপন্যাস আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান করে। সাহিত্য সেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেন আর্ট চর্চার। তার ফলশ্রুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বই লা ভোয়া দু সিলাঁস (নিস্তব্ধতার ভাষা) প্রকাশ পায় পঞ্চাশের দশকে। তাঁর আত্মজীবনী এ্যান্টি মেমোয়ার প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। এর সংক্ষিপ্ত-সার তখনই প্রকাশিত হয়েছিল অমৃত পত্রিকায়।

আঁদ্রে মালরো শুধু সাহিত্যিক নন পরলোকগত ফরাসী রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য গলের তিনি ছিলেন প্রথম প্রহরের সহচর। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত মালরো ছিলেন দ্যগল সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী। ব্যক্তিগতভাবে আমি মালরোর সঙ্গে পরিচিত। মন্ত্রী থাকাকালীন বহুবার তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলাম। পণ্ডিত নেহেরুকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। ওঁদের দুজনের মধ্যে ছিল বহু বছরের হৃদ্যতা। ভারত সরকারের নেহেরু পুরস্কার দেওয়া হয়েছে আঁদ্রে মালরোকে গত বছর।

ফরাসী সাংস্কৃতিক জগতের দিকপাল আঁদ্রে মালরোর এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি প্যারিসের 'ল্য পোয়াঁ' (বিন্দু) নামে এক জনপ্রিয় সাপ্তাহিকে। নারী মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন এক মহিলা সাংবাদিক। সাক্ষাৎকারটি বেশ দীর্ঘ। তাই সংক্ষেপে তার সারমর্ম তুলে দিচ্ছি।

মালরো শুধু নারী মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেননি। নারী-পুরুষের মানসিক পার্থক্য থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সমাজে নারীর স্থান নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। নারীকে ঘিরে প্রেম—চিরন্তন সেই শব্দ নারী রহস্যময়ী এই সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন অতি সহজ ভঙ্গীতে। যুগে যুগে দেশ-বিদেশের শিল্পীরা নারীকে কিভাবে দেখেছেন এবং এঁকেছেন তার ব্যাখ্যাও তিনি করেছেন। রহস্যময়ী নারীকে জানার জন্যেই বোধ হয় শিল্পীরা অত ছবি এঁকেছেন কিংবা প্রস্তরে সাজিয়েছেন তাঁদের প্রতিমূর্তি।

মালরো বলেছেন—নারী মুক্তি আন্দোলন নিয়ে অনেক জটিল কথাই উঠেছে। তাই বলে আমি মেয়েদের বিরুদ্ধে নই। ওদের নিয়ে আমার বহু স্মৃতি জড়িত আছে। যুদ্ধের সময় তো বহু নারী আমার পাশে পাশেই ছিল সহকর্মী হিসেবে।

বহু মহিলা কিন্তু তাঁদের সব দুঃখ-কষ্টের জন্যে কেবল পুরুষদেরই দায়ী করে থাকেন। যদিও ভোট দেবার অধিকার সবার সমান। বহু মহিলাই এই পার্থিব জগতে বহু সম্মানের উচ্চ শিখরে উঠেছেন অনেক কিছুতেই কৃতকার্য কিন্তু দেখবেন সুযোগ পেলেই তারা পুরুষের ওপর নানা রকমের দোষারোপ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না। যেন সব দোষ পুরুষদের। বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর পদবী গ্রহণ করে দশকের পর দশক কেমন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু পুরুষের আড়ালে যখনই তাদের আলোচনা শুরু হয় তখনই শুরু হয় পুরুষের নিন্দাবাদ। এতে তো মেয়েদের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকসের প্রমাণ হয়। ওরা কেন নিজেদের পুরুষের চেয়ে আরও উন্নত ভাবতে পারে না। এটা ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে। তাহলে ব্যাপারটা আরও সহজ হত এবং নারী আন্দোলন আরও দ্রুত সার্থক হত। নারী রহস্যময়ী এই কথা শুনলে আমার হাসি পায়। শুধু পুরুষের কাছে নারী থাকবে চিরন্তন নারী বা রহস্যময়ী হয়ে। নারীর কাছে তো পুরুষ রহস্যময় নয়। কেউ তো বলে না, শাশ্বত পুরুষ।

সাহিত্যিকরাই নারীকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। দোষারোপের বেলায় মেয়েদের মুখে শুনবেন অমুক ভদ্রলোক বড়ই অবুঝ। অর্থাৎ গোঁয়ার-গোবিন্দ কিছুতেই মিলে-মিশে থাকতে পারে না। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তো বলা হয় না অমুক মহিলা অবুঝ ও গোঁয়ার। পাশ্চাত্য জগতে মেয়েরা বেশ সুবিধাভোগী। তারই সুযোগ ভোগ করে পুরুষের ওপর।

পাশ্চাত্যের খৃষ্টান সমাজে নারীদের গৌরবময় ভূমিকা স্বীকৃত হয়ে আসছে মাতা মেরীর আমল থেকে। অনেক সময় মাতা মেরীর সামনে তাকে তুলে ধরা হয়। ক্যাথলিক সমাজে মাতা মেরীর মূর্তির সামনে সব পুরুষকেই নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। নারীর পক্ষে এর চেয়ে পরম গৌরবের আর কি থাকতে পারে বলুন।

১৯২৫ সালে নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয় এই প্যারিস শহরে। সেই থেকে সূত্রপাত মেয়েদের পোষাক বিলাসের পরিবর্তন। সেই থেকে একাল পর্যন্ত কত পোষাকেরই না বিবর্তন হল। মেয়েরা তখন প্রেমকে মনে করত ওটা যেন যান্ত্রিক ব্যাপার। যৌন দিকটাকেও সেইভাবে কেউ কেউ নিতে শুরু করে। কুড়ি দশকের নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম কথাই হল যৌনজীবন থেকে মানসিকতায় মুক্তি।

আমার কাছে মেয়েরা চিরকালই আদরণীয়। সব শিল্পীর চোখেই তাই। চিত্রকলা থেকে আরম্ভ করে ভাস্কর্য সিনেমা ছাপা ছবি এবং শেষ পর্যন্ত আর্ট মিউজিয়ামে নারীর সৌন্দর্য স্থান পেয়েছে। বহু লোককে দেখবেন চিত্রকলার ছবি জমায়। তার অর্থ হল এই যে পুরুষ মাত্রেই নারীকে ভালবাসে। সবাই একদিন না এক-দিন প্রেমে পড়ে। এটা কি নারীর পক্ষে কম কথা। কম গৌরবের?

মধ্য যুগের কথা একবার ভেবে দেখুন। কোনো রাজকীয় শোভাযাত্রা হলে সেই শোভাযাত্রায় যেমন সৈন্য-সামন্ত ধর্মযাজক বা অন্যরা থাকত তেমনি থাকত একটি বেশ্যার দল। ১৫৮৮ সাল পর্যন্ত এই নিয়ম ছিল। তারপর তা বন্ধ হয়। মধ্যযুগে বেশ্যাদেরও সামাজিক মর্যাদা ছিল। সে যুগে যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বেশ্যা বাহিনীও যেত।

সবচেয়ে মজার কথা কি জানেন মধ্যযুগে পাশ্চাত্য দেশে যখনই কোনো সামরিক অভিযান চালান হত তখনই সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কিছু বেড়ালকেও চালান দেওয়া হোত। কেন জানেন। বেড়াল হচ্ছে নারীর প্রতীক। ইউরোপ জুড়ে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। শুধুই কি ইউরোপ? প্রাচ্য দেশেও সেই রেওয়াজ ছিল। চেঙ্গিস খানের সময়ও সেই নিয়ম চলত। কোনো দেশ আক্রমণ করে চেঙ্গিস খান এক হাজার বেড়াল চেয়েছিলেন। এখন বোঝা যাচ্ছে যে চেঙ্গিস খান তাঁর সামরিক বাহিনীর জন্যে চেয়েছিলেন ওই বেড়াল।

নারীর নগ্ন রূপ নিয়ে এক এক দেশে এক এক রকমের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। ফ্রান্সে এক রকম জাপানে এক রকম।

মেয়েরা নিজেদের এত আলাদা করে ভাবে বলেই আজ এত আন্দোলন। পুরুষ-নারী মিলেই তো আজকের মানব সমাজ। সুতরাং মানব সমাজ থেকে নারী আন্দো-লনকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। আমি অন্তত ভাবতে পারি না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যস, এই তো বছর দেড়েকের আগের ঘটনা। টুটুনের মুখে ব্যাপারটা জানতে পেরে বাবাকে কী ভীষণ বকুনি বুড়োর। চিরকাল তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম আমর। এই জিনিস কখনো ছেলেছোকরার হাতে দিতে আছে? এটা কি খেলনা? ঘুড়ি, না লাট্টু?

অর্থাৎ—আজ রঞ্জু চিন্তা করে, একদিন তার বাবা বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে বোমা-পিস্তল নাড়াচাড়া করছে সন্দেহ করে বঙ্কিম দত্ত ভয় পেয়ে যেমন চোখে সরষে ফুল দেখেছিল, সেদিন নাতি রঞ্জুর হাতে ওই জিনিস উঠেছে জানতে পেরে আবার সাংঘাতিক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল—যেন নতুন করে চোখে সরষে ফুল দেখতে শুরু করেছিল বুড়ো। ঐ ঘটনার ঠিক দু মাস পরই বঙ্কিম দত্ত রিভলবারটা থানায় জমা দিয়ে আসে। বলা যায় কি—দেশ স্বাধীন হয়েছে—তারপর কটা বছর যেতে না যেতেই আবার যখন বিপ্লব-টিপ্লবের কথা শোনা যাচ্ছে—খবরের কাগজগুলি যেভাবে রোজই ফলাও করে নকশাল-টকশালদের খবর ছাপছে—অম্বুজ-নিলয়ের কাঁচা-কাঁচা বয়সের ঐ ছেলেটাও যে দলেটলে ভিড়ে পড়বে না বা এর মধ্যেই ভিড়ে পড়েনি তার নিশ্চয়তা কি। হয়তো আলমারি থেকে দাদুর রিভলবারটা চুরি করে নিয়েই একদিন নাতি বাড়ি থেকে পালাবে।

রঞ্জুর অনুমান করতে কষ্ট হয় না—রিভলবারের কথা যাতে সে একেবারে ভুলে যায় এই জন্য যেন বুড়ো জিনিসটা থানায় জমা দিয়ে আসার পরদিন থেকে রঞ্জুকে একটা ক্যামেরা কিনে দেবার লোভ দেখাত কেবল। ক্যামেরা অনেক বেশি সৌখীন চটকদার জিনিস যে। বোমা-রিভলবার সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। এসব জিনিস আজকালকার ছেলেদের হাতে মানায় না। একটা ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে ক্লিক-ক্লিক করে রাস্তার কত সুন্দর জিনিসের ছবি রঞ্জু তুলতে [illegible] আর বাবাও কি সেদিন তাকে বলেনি না, কালীঘাট ট্রাম-ডিপো পেরিয়ে গ্রীক-চার্চ রো-র একটা বাদাম গাছের নিচে নাগরদোলা বসেছে? রোজ বিকেলে রঙ-বেরঙের পোষাক পরা গুচ্ছের সুন্দর সুন্দর মেয়ে নাগরদোলায় চেপে বনবন করে আকাশে ঘুরেছে। ক্যামেরাটা নিয়ে সেখানে ছুটে যাবি রঞ্জু! ক্লিক-ক্লিক ছবি তুলবি।

—কথাটা মনে পড়তে বেদম হাসি পেল রঞ্জুর এখন। রিভলবারের কথা সে ভুলে থাকবে। দাদু তাকে কতদিন ক্যামেরা কিনে দেবে বলে লোভ দেখিয়েছে। আর এখানে বড়ুইদি? তাকে একটা দামী ক্যামেরা কেনার জন্য মুঠো ভরে টাকা দিত, ট্রেনে আসতে আসতেও বলেছিল—আসাহী প্যান্টাক্স। কিন্তু গোপেনদার শিল্পী কাল রাত্তিরের মধ্যেই কথাটা একেবারে ভুলে গেল। ক্যামেরা কেনার টাকার বদলে আজ দুপুরে রঞ্জুর বিছানার নিচে রেখে গেছে একটা ছ-ঘরা রিভলবার। অদৃষ্টের ছেলেমানুষী খেলা শুধু কি এটা! রঞ্জু ভাবল।

যাকগে, আর তার মাথা ঝিমঝিম করছে না। মনটা বেজায় হাল্কা লাগছে। হৃৎপিন্ডের দুবদুবিটা একেবারে থেমে গেছে।

খুব ঠান্ডা মাথা তার এখন।

ফাইন্যাল জবাবটা সে মনে মনে তৈরী করে ফেলেছে। বাইরে বড়ুইদি জানতে আসবে।

উঁহু, হাতের কাছে লোডেড রিভলবার থাকলে ট্রিগার টিপে গুলি ছোড়া তেমন কিছু শক্ত কাজ নয় বড়ুইদি। তার চেয়েও কঠিন কাজ পৃথিবীতে আছে। যেন তক্ষুনি গোপেনদার স্ত্রীকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছিল রঞ্জুর। কিন্তু এখন কি ওকে পাওয়া যাবে। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে রঞ্জু পরিষ্কার দেখতে পেল গোপেনদার ডাইনিং-হলে হ্যাজাক জ্বলছে। দুধের মতন ধবধবে আলোয় ভেসে যাচ্ছে ওদিকটা। ঐ যে গোপেনদার প্রকাণ্ড শরীরটা দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালে ছায়া পড়েছে। টেবিলে হুইস্কির বোতল সাজিয়ে বড়ুইদি ভয়ানক নিষ্ঠা নিয়ে বরকে পেটভরে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রঞ্জু উঠে দাঁড়ায়। চাকরটা এদিকে আসছে। নিশ্চয় রঞ্জুকে খেতে ডাকছে গোপেনদা। এই মুহূর্তে রঞ্জু কিছুই খেতে পারবে না। তার মোটে খিদে নেই। গাছ-গাছালির অন্ধকার ছায়া ধরে ধরে কেউ না দেখতে পায়—গোপেনদার বড় বেডরুমের পাশ কাটিয়ে পিছনের ছোট ঘরটায় চলে এল সে। তার ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল।

*

এখন সকাল। দমদম রেল-স্টেশনের প্রকাণ্ড ঘড়িটায় সাতটা বেজে দশ। আকাশটা মেঘলা। তাই জোলাটে ভাবটা কাটছে না। রোদ নেই। রোদের একটা আভা শুধু।

রাত্তিরে লাস্ট ট্রেনে কোন্নগর থেকে ফিরছিল সে। যে জন্য বাকি রাতটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে তাকে কাটাতে হয়েছে। অত রাত করে কারো বাড়ি যাওয়াটা ঠিক হত না।

তবে যা-হোক হৈ-চৈ ভিড়—প্রস্রাবের দুর্গন্ধ, আরশোলা ও মশার উৎপাতের মধ্যেও যে ওয়েটিং-রুমের বেঞ্চটায় একটু জায়গা করতে পেরে শুয়ে পড়েছিল। তারপর টুপ করে এক ঘুমে রাতটা কেমন কেটে গেল।

আপাতত একটু চা খাবে সে। স্টেশনের চা খাবে না। বরং রাস্তার পাশের একটা দোকানে ঢোকাই ভাল। তাই গাছতলার এই দোকানটায় চলে এসেছে। রিকশা দেখা যাচ্ছে। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটা রিকশা নিয়ে চলে যাবে। রিকশাওয়ালা নিশ্চয় কেশব সেনের বাড়ি চিনবে। মা-র জেঠতুত দাদা। বাগান পুকুর নিয়ে বেশ বড়সড় পাকা বাড়ি ভদ্রলোকের। আর কেশব সেনের পুকুরের ওপারেই হল গিয়ে সতীশ বাড়ুয্যের টালিছাওয়া ঘর। মামার গাছ আছে। বাবার মুখে রঞ্জু কদিনই শুনেছে। দমদম পর্যন্ত যখন এসে গেল—বাবার বন্ধু সুরেন্দুকে পেতে আর তার কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। চায়ের দোকানের দেওয়ালে একটা অরগিন ঝুলছে। মুখটা

[illegible]। [illegible] কামড় না খেয়েছে তার কপালটা দেখে বোঝা যায়। কিন্তু একটা জিনিস দেখে তার হাসি পেল। তার বিছানায় টুকটুকে লাল একটা সুজনি বিছিয়ে দিয়েছিল বাই। জামার ওপর সেটা জড়িয়ে রঞ্জু চলে এসেছে। এছাড়া উপায়ও ছিল না। কোমরে গুঁজে জিনিসটা আনার অসুবিধে ছিল। সামনের দিকে ট্রাউজারটা বিচ্ছিরি ফোলা ফোলা দেখাত। পকেটে রাখলে পকেট উঁচু হয়ে থাকত। কাজেই এই সুজনি। এখনও যেটা তার গায়ে জড়ান। আর এই জন্য তার চেহারাটাও কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে চায়ের গেলাসে চুমুক দিল সে। তবে সবটাই কেমন অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার লাগছে তার কাছে। অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া কি। বালিগঞ্জের ঘরকুনো ছেলে। কেমন একটা দুঃসাহসের কাজ করে বসল। আজ হোক কাল হোক যদুইদি ঠিক ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস-এ ছুটে আসবে। তাদের রিভলবার খোয়া গেছে। রঞ্জু চুরি করে এনেছে। অনেক কিছু বলবে ও।

বটে! রঞ্জু এই জিনিস নিয়ে এখন বাড়ি ফিরছে কিনা। যাঁর হাতে তুলে দেবার তাঁর হাতে এটা তুলে দিয়ে তবে সে নিশ্চিন্ত।

আর এক চুমুক চা গিলে সিগারেট টানতে টানতে এবং সেই সঙ্গে আরসির মধ্যে নিজের মুখটা দেখতে দেখতে অনেক কিছু ভাবল সে। একটা ভাল কাজ করেছে সে সন্দেহ কি। কাজের মতন কাজ। উঃ ভাবা যায়—এই জিনিস ঘরে থাকলে যদুইদি একদিন কী কেলেঙ্কারী করে বসত! আত্মহত্যা করতে চাইছে ও—গোপেনদার মতন একটি নিরীহ ভদ্রলোককে খুন করার স্বপ্ন দেখছে। সেকস হাঙ্গার। একটা অভিজ্ঞতার মতন অভিজ্ঞতা হল বটে রঞ্জুর এই বয়সেই। দুঃখের বিষয় তার বন্ধুদের কাছে এতবড় ঘটনাটা মুখে বলতে পারবে না সে কোনোদিন। কেমন এক ম্যাড-ওয়েম্যানের পাল্লায় পড়েছিল রঞ্জু। ম্যাড-ওয়েম্যান। ঠিক এই নামের একটা চেক ছবি দেখেছিল না সে কদিন আগে এলিটে! সেখানে মেয়েটার স্বামী তাকে বিয়ে করেছিল। যাক, আরো বেশি ভাল লাগছিল তার এখন এই ভেবে—গোপেনদার রিভলবারটা এবার সৎকাজে লাগবে। বাবার বন্ধু

রুদ্রেন্দু জিনিসটাকে একটা ভাল কাজে লাগাবেন। বুড়ো হয়েছেন। নিজে হয়তো পার্টিফার্টি করেন না। কিন্তু এককালে বিপ্লব করতেন। আজও যে তাঁর গায়ে বিপ্লবের গন্ধ লেগে আছে রঞ্জু পুরোপুরি বিশ্বাস করে। হয়তো আজও কিছু ছেলে-ছোকরা গোপনে তাঁর কাছে আসেটাসে। তাদের নিশ্চয় আর্মস-এর দরকার হয়। রুদ্রেন্দু অনায়াসে এটা তাদের দিয়ে দিতে পারবেন। খামকা এমন মূল্যবান অস্ত্রটা গোপেনদার বাকসে থেকে পচছিল। বাকসে থেকে পচছিল অথবা এখন তাঁর মাথাখারাপ গিন্নীর হাতে পড়ে একটা জঘন্য কাণ্ড ঘটত। রঞ্জু কিছুতেই যা চাইছে না।

চা শেষ করে আর সে দেরি করল না। দাম মিটিয়ে দিয়ে রিকশা-স্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটল।

—তাই তো! রিকশায় চেপে এক সময় সে চিন্তা করল—যদি রুদ্রেন্দু তাকে প্রশ্ন করেন—আমাকে এটা দিয়ে দিতে চাইছ কেন—বুড়ো হয়ে গেছি—তুমি ও তোমার বন্ধুরাই তো এই জিনিস কাজে লাগাতে পার। নতুন বয়স, তাজা রক্ত তোমাদের। দেশে দেশে চিরকাল এই বয়সের ছেলেরাই তো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে এসেছে।

রঞ্জু মনে মনে হাসল। বালিগঞ্জের কটি সুখী পরিবারের ছেলে তারা! রঞ্জুদের অবস্থা যেমনই হোক, তার বাবার জন্য তেমন একটা ঝলমলে সংসার তাদের হতে পারছে না ঠিক—কিন্তু সোমেন শোভেন পার্থ অমিত—তার বন্ধুরা সবাই বড়লোকের ছেলে, তারা যদি বিপ্লবের কথা চিন্তা করবে, তবে চায়ের দোকানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেয়ে নিয়ে, সেকস নিয়ে আলোচনা করবে কারা, লুকিয়ে সিগারেট খাবে কারা! এখন থেকেই তারা একটু একটু করে বীয়ার হুইস্কি অভ্যাস করছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে সিনেমার টিকেট কেটে নুড ছবি দেখছে! এবং প্রত্যেকেই একটি করে গার্ল-ফ্রেণ্ড জুটিয়ে প্রেম করছে। পার্থ তো এই নিয়ে দু-নম্বর গার্ল-ফ্রেণ্ড জুটিয়েছে।

না, বিপ্লবের কথা তারা চিন্তা করে না। এই জিনিস নিয়ে মাথা ঘামান তাদের নিষেধ। তাদের বাপ-কাকা-জেঠাদের আমল থেকে এটা চলে এসেছে। তাদের বাড়ির আবহাওয়া অন্যরকম। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া শিখুক। বড় চাকরি করুক। বেশি টাকা রোজগার করার জন্য ফরেন চলে যাক। গাড়ি বাড়ি করবে। এবং টাকা হলে বাকি যা যা করার সবই তারা করবে। তাদের স্বাধীনতায় কেউ বাধা দেবে না। বিপ্লব করে কারা? যারা খেতে পায় না, চাকরি পায় না।

বস্তুত রুদ্রেন্দু যদি এমন একটা প্রশ্ন করে বসেন, রঞ্জু কি ঠিক এই কথাগুলি স্বীকার করে উত্তর দিতে পারবে! তার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে যে। দেখা যাক। উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে যা বলার তখন বলবে। আপাতত একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে রিকশার গদীতে ভাল করে হেলান দিয়ে বসল সে। রোদ না থাকার দরুন সকালের হাওয়াটা মিষ্ট লাগছিল।

— তিরিশ —

—একি! যেন ঝাঁপির ভিতর থেকে রঞ্জু সাপ বের করল। সুজনির তলা থেকে রিভলবারটা বের করে রুদ্রেন্দুর চোখের সামনে তুলে ধরতে তিনি দু-পা পিছনে সরে দাঁড়ান। —আমার কাছে এটা নিয়ে এসেছ কেন! এ দিয়ে আমি কি করব!

রঞ্জু দেখল বাবার বন্ধুর চোখ দুটো গোল হয়ে গেছে। শ্বাস ফেলতে পারছেন না।

—অ্যাঁ! রঞ্জু কথা বলছে না দেখে রুদ্রেন্দু আরও অস্থির উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কে তোমাকে এই পরামর্শ দিল—কোথা থেকে তুমি তাড়াহুড়ো করে এটা নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছ শুনি? ব্যাপারটা কি!

পুকুরপাড় ক্ষেতপা পড়ার জঙ্গলের কাছে একটা ঝুপসি মাদার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। একটি আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মতন রুদ্রেন্দু বার বার চোখ ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখে নিয়ে তারপর রঞ্জুর দিকে আবার তাকাল।

—কি হে, আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন। তুমি কোথা থেকে এমন মারাত্মক জিনিস জোগাড় করে নিয়ে এসেছ আমাকে খুলে বলবে তো!

উত্তরটা রঞ্জুর মুখে তৈরী ছিল। এমন প্রশ্ন তিনি করবেন অনুমান করে রিকশায় আসতে আসতে গল্পটা বানিয়েছে সে। তার এক বন্ধুর বাবার ক্যানসার হয়েছে। এই রিভলবারটা তাঁর। অসুখটা কোনোদিন সারবার নয় টের পেয়ে ভদ্রলোক তাঁর টেবিলের দেরাজ থেকে ওটা বের করে একদিন স্যুইসাইড [illegible] গিয়েছিলেন। ভয় পেয়ে রঞ্জুর বন্ধু অস্ত্রটা আর বাড়িতে রাখেনি। রঞ্জুকে দিয়ে দিয়েছে। যদি সে কোনো কাজে লাগাতে পারে—অথবা তার জানাশোনা কেউ যদি—

—মিছে কথা! রুদ্রেন্দু ধমক দিয়ে উঠলেন। স্রেফ বানান গল্প। কোথা থেকে তুমি চুরি করে এনেছ। এখন সামাল দিতে পারবে না বুঝতে পেরে সাতসকালে আমার কাছে এটা নিয়ে ছুটে আসা হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি।

রঞ্জু চুপ। ঠিক এই কথাটার উত্তর দিতে তার দেরি হচ্ছিল।

—কোথায় থাকে তোমার বন্ধু! কি নাম। ভদ্রলোকের নামটাই বা কি। কি করেন তিনি? রুদ্রেন্দু রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করেন।

রঞ্জু এক সেকেণ্ড ভাবল। ঘামছিল সে। —ভদ্রলোকের নাম জানি না। বিড়বিড় করে বলল সে, তবে এটা জানি তিনি বিজনেস করেন। আমার বন্ধুর নাম অলক—ওরা বেহালায় থাকে।

—তুমি এখনি এটা ওদের ফিরিয়ে দাও গে। এটা তো জান, বে-আইনি অস্ত্র তোমার কাছে রয়েছে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। তারপর আর্মস-অ্যাকটে ক' বছর যে ঠুকে দেয় বলা মুশ্কিল।

রঞ্জু বড় করে একটা ঢোক গিলল। ফ্যালফ্যাল করে রুদ্রেন্দুর ফ্যাকাশে চেহারাটা দেখতে লাগল। তিনি যে এত ভয় পাবেন সে বুঝতে পারেনি।

—অ্যাঁ! রুদ্রেন্দু থামছিলেন না। হায়ার-সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিয়েছ সেদিন বললে। প্রায় গোঁফ দাড়ি গজাবার বয়স হয়েছে আমিও দেখতে পাচ্ছি—তোমার এই সাধারণ বুদ্ধিটা মাথায় এল না—এমন একটা ইললিগেল কাজ আমি করব? উঁহু, এই জিনিস কিছুতেই আমি কাছে রাখতে পারি না—

—অলক প্রথমটা এটা গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছিল। রঞ্জু আস্তে বলল, তারপর আমাকে দিয়ে দিল। তখন আমি ভাবলাম, আপনি এককালে রেভলুশনারি পার্টিতে ছিলেন—আবার যদি কোনোদিন আর্মস-এর দরকার হয়—

—আবার আমি বিপ্লব করব! রুদ্রেন্দু রীতিমত লাফিয়ে উঠলেন, দাঁত খিঁচোলেন। বিপ্লব গাছের গোটা! আমার বয়েস কত হয়েছে জান ছোঁড়া! তোমার বাবার চেয়ে আমি দু বছরের বড়। কেমন অক্কেল! দুধেভাতে খেয়ে খুব সুখে আছ কিনা! রুদ্রেন্দু চোখ তুলে মাদার গাছের পাতা দেখলেন। যেন নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন, —অ্যাঁ, আমার আমি এখন বিপ্লব করতে ঝাঁপিয়ে পড়ি? কেন? কোন দুঃখে! যখন করেছি প্রাণ দিয়ে করেছি—দেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে—ব্যস, আমাদের কাজ ফুরিয়েছে। এখন যাদের বিপ্লব করার দায় তারা করুক গে, মরুক গে। বলে কিনা রাতদিন অন্নচিন্তায় আমি সারা হয়ে যাচ্ছি। চোখে মুখে পথ দেখছি না। এদিকে না পারলাম মেয়েটার বিয়ে দিতে, না পারলাম একটা কাজেকর্মে ওকে ঢুকিয়ে দিতে। আর এই ছেলে এসেছে আমাকে বিপ্লবের কথা শোনাতে।

পাতার ফাঁক দিয়ে দু তিনবার রঞ্জু পিছনে সতীশ বাড়ুয্যের টালির বাড়ির বারান্দা ও জানলাটার দিকে তাকিয়েও সেই সুন্দর মুখখান—রজনীগন্ধার ডাঁটের মতন আশ্চর্য ছিপছিপে ফিগারটা দেখতে পেল না। রঞ্জু বুঝতে পারল—রাণাঘাটের স্টেশনারী দোকানের চাকরিটা ওর হয়নি।

—তা হলে এক কাজ করুন! রুদ্রেন্দুর চোখে চোখ রেখে রঞ্জু হঠাৎ বুদ্ধি করে বলল, আমি আর একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এটা সঙ্গে করে আপনার কাছে এসেছি।

—কি উদ্দেশ্য শুনি? গলার স্বরটা একটুও নরম করেন না রুদ্রেন্দু।

মাটির দিকে চোখ রেখে রঞ্জু বলল, আপনি এই বয়সে বিপ্লব করবেন না বুঝতে পারি—করা উচিতও নয়। তবে পার্টিফার্টি করে—বোমা রিভলবার দরকার হয় এমন কারো না কারো সঙ্গে আপনার নিশ্চয় জানা-শোনা আছে—ওদের কাছে আপনি এটা বেচে দিতে পারেন।

—কি বলছ তুমি! আকাশ থেকে পড়েন রুদ্রেন্দু। চোখ দুটো আরও গোল হয়ে ওঠে। চোরাই মাল আমি বেচতে যাব কেন! কী বুদ্ধি শেখাচ্ছ যে তুমি আমাকে!

স্বরটা নরম করে ফেলল রঞ্জু। —আপনার তো খুব অভাব যাচ্ছে—নিয়মমত ইস্কুলের মাইনেটাইনে পাচ্ছেন না। তা ছাড়া ওর রাণাঘাটের কাজটা হল না যখন। তা ছাড়া আমিও চাই না আজেবাজে জায়গায় একটা চাকরিতে ঢুকে পড়ুক ও—আমার বন্ধু তো এটা গঙ্গার জলেই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল—তাই ভাবলাম—

—অ্যাঁ! অ হো—এখন বুঝতে পারলাম। রুদ্রেন্দু মাথা ঝাঁকালেন। সেদিন স্টেশন-প্ল্যাটফরমে আমার মেয়েকে তুমি দেখেছিলে—হুঁ, ঠিক মনে পড়ল—মুখখানা মিষ্টি সুন্দর। তাই তোমার দরদ উথলে পড়ছে খুব—আজেবাজে চাকরিতে যাতে ওকে না ঢোকাই—আমার অভাবের সংসার। আমাকে হেলপ করবে। তাই একটা চোরাই রিভলবার নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছ। তাই না! রুদ্রেন্দু বিচ্ছিরি একটা ভেংচি কাটেন। এটা বিক্রী করে আমি লাখ দু লাখ পেয়ে যাব।

নিরীহ টলটলে চোখে তাকিয়ে থেকে রঞ্জু বাবার বন্ধুর বিকৃত চেহারাটা দেখল। যেন মেয়ের চাকরির কথাটা বলাতে খেপে গেছেন বেশি। চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে।

—যাও—সরে যাও এখন থেকে। রুদ্রেন্দু কাঁপছিলেন। আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখালেন। নয়তো এক্ষুনি আমি পুলিশে খবর দেব।

রঞ্জু আর দাঁড়ায় না। পুকুরপাড় ছেড়ে আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে এগোয়।

—যত সব বখাটে বদ ছেলে। তোমাদের বালিগঞ্জ টালিগঞ্জের বড়লোকের বাচ্চাদের আমি চিনি না ভেবেছ! একটা পুরোনো ভাঙা পিস্তল ঘুষ দিয়ে এখানে খাতির জমাবার মতলব। ভেবেছিল চালাকিটা মোটেই ধরতে পারব না। কী উদ্দেশ্যে তোমার এখানে আগমন কিছুই বুঝব না?

রঞ্জু শুনল। বাবার বন্ধু ক্ষেতপাড়ার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে গজগজ করছিলেন।

আর একদিন তাঁর কী মূর্তি দেখেছিল, রঞ্জুর মনে পড়ল। কত বড় কত মহৎ মনে হয়েছিল মানুষটাকে। কিন্তু তাঁর মনটা যে এত ছোট—হয়তো অভাবে অনটনে এমন হয়ে গেছে। রঞ্জু ভাবল। মনে মনে সে আঘাত পেল খুব।

আসলে তাঁকে সে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে বলেই এখানে ছুটে এসেছিল। বাবার বন্ধুকে সাহায্য করতেই জিনিসটা তাঁকে দিয়ে দিতে এসেছিল। অন্য কোনো মতলব ছিল না রঞ্জুর।

পিছনের দিকে আর একবারও তাকাল না সে। রাস্তা ধরে ক্রমাগত হাঁটতে লাগল। হেঁটে বাস-স্ট্যান্ডে যাওয়া যাবে। বেশি দূরে না। রিকশা করে আসার সময় লক্ষ্য করেছে। কিন্তু এখন তার চিন্তা—এটা সে কোথায় নিয়ে যায়। কোথায় রাখে! বাড়িতে রাখা চলবে না। আবার যে কেষ্টনগর ফিরিয়ে নিয়ে যাবে—তা-ও সম্ভব নয়। কারণ গোপেনদার বাড়ি থেকে জিনিসটা যে সে চুরি করে এনেছে—তার কোনো প্রমাণ নেই—কেউ চোখে দেখেনি। যদিও রঞ্জুকে দিয়ে সন্দেহ করবে—এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এখন যদি এটা সে ওদের ফিরিয়ে দিতে যায় তবে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? নিজের চুরি নিজের হাতে ধরিয়ে দেওয়া।

কাজেই এই ভাবনা এখন একেবারে ছেড়ে দাও। রঞ্জু নিজেকে বোঝাল। উঁহু, আর কোনো বিপ্লবীর কথা ভেবেও লাভ নেই। বাবার বন্ধুকে দিয়ে খুব শিক্ষা হয়েছে। বিপ্লব করা ছাড়াও একটা রিভলবার কাজে লাগে। লাগান যায়। একবার যখন জিনিসটা হাতে এসে গেছে—আর এটা হাতছাড়া করে কেন মূর্খ। রঞ্জু কাজে লাগাবে। একলা পারবে না। শোভনের সহায্য নিতে হবে। কালীঘাটের না যেন ভবানীপুরের দু একজন মস্তানের সঙ্গে শোভনের জানাশোনা আছে। আজই হুট করে কিছু শোভনকে প্রস্তাবটা দিচ্ছে না সে। দু একদিন অপেক্ষা করবে। তারপর সুযোগ মতন কথাটা তুলবে। শোভন ঠিক ওদের কাছে জিনিসটা বেচে দেবে। যা পাখোয়াজ ছেলে না। আর ছোরা রিভলবার পেলে মস্তানরাও সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয়। এবং যে-কোনো অ্যামাউন্ট দিতে ওরা রাজী হয় এক এক সময় শোনা গেছে। টাকাটা পেলে একদিন ভাল করে দুজনে মিলে হোটেল রেস্তোরায় খাওয়া যাবে সিনেমা দেখা যাবে —ঐ টাকা থেকে দুটো বীয়রও ম্যানেজ করা যাবে। দেখা যাক। পার্থ সোমেন অমিত —কাউকে কিসছু বলা হবে না। সে ও শোভন ছাড়া কাকপক্ষীটিও এই সম্পর্কে কিছু জানবে না।

কিন্তু এখন—এই মুহূর্তে এটা কোথায় রাখা যায়! একটা রিভলবার সঙ্গে নিয়ে

অম্বুজা-নিলয়ে ঢোকা অসম্ভব। তা ছাড়া বাপুই হয়তো দুপুরের ট্রেনেই এসে যাচ্ছে। নিজেদের গাড়ি নিয়ে যে ইতিমধ্যে এসে যায় নি তা-ই বা কে বলবে। ও এখন গুলি খাওয়া বাঘের মতন ক্ষেপে আছে। একে তো রঞ্জুকে দিয়ে মনের আশা কিছুই পূরল না—তার ওপর একটা ভীষণ দরকারী জিনিস ঘর থেকে উধাও হল।

যাক—যা খুশি ও ভাবুক।

আপাতত এমন কোনো জায়গায়—এমন কারো জিম্মায় জিনিসটি রাখতে হবে যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় এবং কারো কাছে মরে গেলেও কোনোদিন কথাটা যে প্রকাশ করবে না। এমন বিশ্বাসী কেউ আছে কি পৃথিবীতে? আছে আছে আছে। পৃথিবীর কেউ জানে না, কে সে! মুখটা মনে পড়তেই তৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। যেন বুকের ভিতর থেকে একটা লুকোনো সুঘ্রাণ উঠে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

মেঘলা ভাবটা কেটে যেতে হলুদ রোদ্রে মোড়া আশ্বিনের দুপুর ঝকমক করে এক সময় হাসতে থাকে।

পাড়াটা একেবারে নিঝুম। চারিদিকের গাছ-পালার গভীর শ্বাস তুমি শুনতে পাও। রাস্তার দু পাশে ঘরবাড়ির চেয়ে গাছ-গাছড়া বেশি। পাখির কিচিরমিচির কানে আসে। সব সময় একটা স্তব্ধতা।

ইচ্ছে করে সে এই সময়টায় এসেছে এ-পাড়ায়। এতটা বেলা অবধি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করেছে। চায়ের দোকানে বসে সময় কাটিয়েছে। বা নিরালা কোনে পার্কের বেঞ্চে শুয়ে এই গভীর নির্জনতার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

ঠিক দুপুর না হলে ওকে একা পাওয়া যাবে না যে। মিসেস গাঙ্গুলী এখন অফিসে।

কাজেই রঞ্জু নিশ্চিন্ত হয়ে এক পা দু পা করে এগোতে থাকে। আম জাম লিচুর ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট একতলা বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে আছে।

এখন ও কি করছে? এই ছুটির দুপুরে। রঞ্জু ভাবল। একদিন যেন ও বলেছিল গানটানটা কদিন বন্ধ রাখবে। ছবি আঁকবে খুব করে। পুজোর ছুটিটা ছবি এঁকে কাটাবে। পেন্টিং-এর দিকে হঠাৎ মন ঝুঁকেছে।

বুদ্ধিমতী। কিন্তু বেজায় সেন্টি-মেন্টাল। কাজেই রঞ্জুর ভয়, যখন যেদিকে মন ঝুঁকবে ওর—একেবারে নেতিয়ে পড়বে সেদিকে। ছবি আঁকার ঠেলায় না গানের চর্চাটা চাপা পড়ে যায়। এত ভাল যার গলা।

নিশ্চয় এখন ছবি আঁকছে ও। রঞ্জুর মন বলল। একলা বাড়িতে এত বড় দুপুর কি কাটতে চায়? স্কুল বন্ধ থাকলে ওর পক্ষে কত অসুবিধে—রঞ্জু কদিনই চিন্তা করেছে। সত্যি ওর যদি একটা ভাই কি বোন থাকত।

সদরের গেট ভিতর থেকে বন্ধ। স্বাভাবিক। দেখে রঞ্জু এক সেকেন্ড ভাবল। উঁহু, কড়া নড়বে না। ডাকবে না ওকে। আজ ভেবেছে এটা রঞ্জুর সারপ্রাইজ ভিজিট। কাজেই সব দিক থেকে ওকে চমকে দিতে চাইছে সে। পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকবে। ও ভেবেছে রঞ্জু এখনো কেষ্টনগরে বসে আছে। ভুল করে দুটো দিন পার না হতেই রঞ্জু যে কলকাতা ফিরবে ওর স্বপ্নের বাইরে।

বাড়ির পিছন দিকের ঝোপঝাড়ের কাছে রঞ্জু চলে গেল। সুজনিটা কোমরে জড়িয়ে নিল। তারপর একটা পেঁপে গাছের গা ঘেঁষে সাবধানে পাঁচিল টপকে টুপ করে ভিতরে নেমে পড়ল।

এটা ওদের রান্নাঘরের পিছন দিক। এর আগে রঞ্জু গোপাদের রান্নাঘরের পিছনটা কোনোদিন দেখেনি। দুটো লঙ্কা গাছ। কটা বেগুন চারা। রান্নাঘরের দেওয়াল ঘেঁষে থোকা থোকা বেঙের ছাতা গজিয়েছে। স্যাঁতসেঁতে জায়গাটা। এধারে ওধারে কিছু আগাছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

রান্নাঘরের ছোট্ট জানালাটা বন্ধ। পেঁপে পাতার ফাঁক দিয়ে কিছুটা রোদ এসে অ্যাসবেস্টাসের চালের ওপর ঝিকমিক করছে। একটা কাক বসে আছে। রান্নাঘর পিছনে রেখে পা টিপে টিপে ওদের ডাইনিং হলের কাছে রঞ্জু চলে এল। সুজনিটা আবার গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে সে। তা না হলে কোমরে গোঁজা জিনিসটা প্রথম নজরেই ওর চোখে পড়বে। আর তক্ষুনি ভীষণ ভয় পাবে ও। রঞ্জু এটা চাইছে না।

ডাইনিং-হলের একটা জানলা খোলা। আর একটা বন্ধ। এ সময় ও ডাইনিং-হলে ঢোকে না। জায়গাটা পার হয়ে রঞ্জু ওদের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। তারপর থমকে দাঁড়াল। সারি সারি তিনটে জানালার একটাও খোলা নেই। কারণ? ভুরু কুঁচকোল সে। তারপর ভাবল পশ্চিমের রোদের সবটা ঝাঁজ এদিকে এসে লাগছে। হয়তো এই জন্যই জানালাগুলি বন্ধ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তা করল—এ সময় ও বেড-রুমে থাকবে কেন। নিশ্চয় ওর ছোট্ট পড়ার ঘরে। বসে বসে মন দিয়ে ছবি আঁকছে। শোবার ঘর পার হয়ে গোপার পুব-মুখো পড়ার ঘরটার দিকে এগোতে গিয়ে কিন্তু রঞ্জুর পা সরল না। তার মনে হল শোবার ঘরের একটা জানলার পাল্লা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। হাওয়ার জন্য এটা হল কি? ভাবতে গিয়ে তার দু কান খাড়া হয়ে ওঠে। ভিতর থেকে উঁচু গলার একটা হাসি কানে আসে। বুকের ভিতর ধক করে ওঠে রঞ্জুর। কেননা তার মনে হয় হাসির গলাটা তার পরিচিত। কাজেই ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল সে। এই বাড়িতে বয়স্ক পুরুষ কোথায়। তবে কি মিসেস গাঙ্গুলী অফিসে যান নি? তাঁর কোনো আত্মীয় এসেছেন? অফিসের কেউ? তাই যদি হবে তো শোবার ঘরের সব কটা জানলা বন্ধ কেন। বড় করে একটা ঢোক গিলে রঞ্জু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। না কি দুপুর রাতের মতন এই ভয়ংকর নিরালা দুপুরে গোপার মরা বাপ ফিরে এসেছে। ভাবতে গিয়ে রঞ্জুর গায়ে কাঁটা দেয়।

তবে কি ফিরে যাবে। রঞ্জু এ-ও চিন্তা করল। কিন্তু কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার হা-হা হাসিটা বাতাসের ঝাপটা হয়ে তার কানে বাড়ি দেয়। এবার তার বুকের ভিতর হিম হয়ে গেল। কেননা তক্ষুনি গোপার হাসিও শোনা যায়। নুড়ি ডিঙোনো ঝরণার মতন ঝলক দেওয়া হালকা হাসি।

হঠাৎ কি করবে সে দিশা করতে পারছে না। একটা বন্ধ ঘরে এক সঙ্গে দুটো গলার হাসি শুনে কেমন যেন হয়ে গেল সে। যেন এই মুহূর্তে তার খুব অবাক হওয়া উচিত, অথচ অবাক হতে পারছে না, খুশি হওয়া উচিত, খুশি হতে পারছে না। আবার যে ভয় পাবে তা-ও না। হওয়ার মধ্যে হতভম্ব হবার মতন একটা অবস্থা। যেন সাড়হীন একটা মনুষ্যের মতন দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমাগত ফ্যালফ্যাল করে ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা জানালার পাল্লাটার দিকে চেয়ে রইল। গলার কাছটা তেতো ঠেকে। এর অর্থ কি! ভাবতে থাকে সে। বাবা—রঞ্জুর বাবা কি এই টুটুনকে খুঁজতে এই নির্জন দুপুরে ফ্লামিঙ্গোর কাছে ছুটে এসেছে। না কি ফ্লামিঙ্গোর সঙ্গে গল্প করতে ওদের খালি বাড়িতে চলে এসেছে। পাখির গল্প মাছের গল্প কত কি গল্পই তো বাবা করে। না কি দুজনে বসে লুডোটুডো খেলছে। হাসিটা ঠিক খেলা খেলার মতন শোনাচ্ছে না?

কি করা যায় তা হলে—রঞ্জু ভাবল। বাবাকে ডাকবে? গোপাকে ডাকবে? ফিরে যাবে সে? তার দু চোখ ছলছল করে উঠল। ঠোঁট কামড়াল। কপাল কুঁচকোলো। দাঁত দিয়ে নখ কাটল। এক মিনিটের মধ্যে দশ হাজার ঘামের ফুটকি তার কপালে জমে উঠল টুটুন দুপুরে বাড়ি থেকে সরোয় না। বাবা কি তবে ভজন শুনতে এসে গোপার সঙ্গে খেলতে শুরু করেছে।

কি খেলা? চিন্তা করার পর আর যেন সে ধৈর্য রাখতে পারল না। যেন যা-হোক-ভগবানের নাম করে জানালায় উঁকি দিয়ে অল্প ভেজান পাল্লাটা হাতের ধাককায় এক দিকে ঠেলে সরিয়ে দিল। খট করে একটা শব্দ হয়। গরাদের ফাঁকে তার মুখটা দেখল বাবা। দেখতে পেয়ে হো-হো করে হাসল। খিলখিল করে গোপাও হাসল। রঞ্জু হাসল। এক সঙ্গে তিনজন হাসল। ঐ একটা মুহূর্তে ভালই লাগল।

(ক্রমশঃ)

ফুটবল জমেছে

গোল, গো-ও-ল! দু অক্ষরে গাঁথা সংক্ষিপ্ত এক শব্দ। কিন্তু ব্যাপ্তিতে তা যে কতোখানি তার ঠাওর পেতে হলে এই মুহূর্তে এক বিকেলে কলকাতার গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা দরকার। গড়ের মাঠে কল্লোলিত কলকাতার চিরন্তন ক্রীড়াকেন্দ্র—পরিভাষায় স্পোর্টস কমপ্লেকস বল একার। পুরোনো গড়ের গা ঘেঁষে ফাঁকা জমি চারপাশে ছড়ানো। তারই মাঝে শহর কলকাতার মূল ক্রীড়াঙ্গণ সাজানো। আঙ্গিক সজ্জা হয়তো আধুনিক নয়। কিন্তু এই ক্রীড়াভূমির অস্তিত্ব প্রাণের স্পর্শে উত্তপ্ত সদাই।

হরেক রকম খেলার আসর পাতা হয় এখানে। ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল ভলি কাবাডি ব্যাডমিন্টন টেবল টেনিস কুস্তি হ্যান্ডবল জুডো কতো কি। কিন্তু মরশুমী ফুটবলের উপস্থিতিতে ময়দানে উৎসাহ, উদ্দীপনার যে জোয়ার বয়ে যায় তার তুলনা মেলা ভার। এমনিতেই ফুটবল এক জনপ্রিয় খেলা। নিয়মকানুন সরলীকৃত। তার ওপর ওই আসরে হাজির রয়েছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের মতো লোকপ্রিয় ক্রীড়া সংস্থাগুলি। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিংই হলো কলকাতার ফুটবল অনুরাগীদের নয়নের মণি। প্রাণের প্রাণ। নিজেদের হাতে সাজানো ফুটবলের দেউলের জীবন্ত বিগ্রহ। এই বিগ্রহের পায়ে মাথা কুটতে প্রাণটুকু সমর্পণ করতেই হাজার হাজার দর্শক নিত্য অপরাহ্নে হাজিরা দিচ্ছেন ওই গড়ের মাঠে। তাঁদের উপস্থিতিতে পরিমণ্ডল উচ্চকিত। উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল। কলকণ্ঠে মুখরিত।

মিছিলের শহর কলকাতা যে সভাসমিতির ডাকেই জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয় তা নয়। ফুটবল ময়দানে শহরের একধারে এ সমুদ্র নিরন্তর প্রবহমান। এর রূপ যাঁরা দেখেন নি, এর মেজাজ যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি প্রত্যক্ষে, বস্তুত প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির অভিজ্ঞতাও তাঁদের পরিণত নয়। যাঁদের অভিজ্ঞতা চাক্ষুষ তাঁরাই জানেন যে ফুটবলের মাঠে বয়স ও পরিমিতিবোধের বেড়া ডিঙিয়ে ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে হাজারো মানুষ তাৎক্ষণিকে উত্তেজনায় ও আনন্দে এবং হয়তো বা মনোভঙ্গের বেদনায় কেমন করে পাগল বনে যান।

সমর্থিত দলের জিৎ হলো তো মাঠকে মাঠ আনন্দধারায় অবগাহন করলো। আর হারলো তো বিষাদমগ্ন গ্যালারির হৃদয় থেকে উৎসারিত হাহাকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। আনন্দধ্বনি এবং হা-হুতাশ, সবই সোচ্চার। সবই নির্ভেজাল সত্য। উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসের প্রকাশ অথবা ব্যর্থ মনোরথে কপাল চাপড়ানোর চেষ্টা, সর্বত্রই ছটফটানি ও দুরন্তপনার ছাপ। কর্মবিমুখতার অভিযোগের আসামী বাঙালী জের হিসেবে যে কতোটা সক্রিয় ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর ফুটবল মাঠই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

যেকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য ডুবতো না সেইকালেই খেলায় হাত পাকিয়ে কীর্তি কৃতিত্বের ঐতিহ্য গড়ে বাঙালী ফুটবলকে আপন করে নিতে পেরেছে। অগ্রপথিক ন্যাশনাল, শোভাবাজারের মতো মুষ্টিমেয় সংস্থা। তারপরই মোহনবাগানের আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। ১৯১১ সালে শীল্ডে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক সাফল্যের সূত্রেই ফুটবল বাঙালীর তথা ভারতীয়দের জাতীয় খেলার মর্যাদা পেয়েছে। খেলার মাঠে বাঙালীর, ভারতীয়দের সেই সাফল্য বৃহত্তর জীবনযুদ্ধে ইংরাজের সঙ্গে লড়াই চালাবার অফুরন্ত প্রেরণা যুগিয়েছে সারা ভারতের মনে। ফুটবলে মোহনবাগানের এই ঐতিহ্যের ধারা স্বাধীন ভারতে সযত্নে ধরে রেখেছে কলকাতারই ইস্টবেঙ্গল দল। ইরানের প্যাস ও উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং ক্লাবকে হারিয়ে শীল্ড ঘরে তোলাও এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

স্বাধীনতাপূর্বে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের উত্থানও এক স্মরণীয় ঘটনা। নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন ও সুপরিকল্পিত সংগঠনের সূত্রে তিরিশ-চল্লিশের দশকের সন্ধিক্ষণে মহামেডান স্পোর্টিং যে জাতের ফুটবল খেলেছে তার স্মৃতিও মন থেকে মুছে যাবার নয়। তবে মহামেডানের সাফল্যের অংশীদার খাঁটি বাংলা ততোটা নয় যতোটা অন্য প্রান্তিক খেলোয়াড়েরা। যেহেতু সারা ভারত চষে ঝাড়াই বাছাই করে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে সেকালে মহামেডান দল গড়া হয়েছিল। তা যেভাবেই দল গড়া হোক না কেন, তিরিশের দশকে মহামেডানের খেলায় ফুটবলের আধুনিক রূপটি যে প্রথম প্রতিভাত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

খেলার মতো খেলে, স্মরণীয় কীর্তির আঁচড়ে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে মহামেডান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান কলকাতার ফুটবল অনুরাগীদের মন ভরিয়ে রেখেছে। প্রতিদানে তারা পেয়েছে অবিমিশ্র আনুগত্য ও ভালবাসা। কিন্তু আফসোস এই যে এই ভালবাসা সময় সময় অন্ধের মতোই অন্য সমস্ত পক্ষের, মায় আসল অনুষ্ঠান ফুটবলের দাবী দাওয়া উপেক্ষা করে নিজের কোলে ঝোল টানতে চেয়েছে। তাতে কলকাতার ফুটবলের সঙ্কটই শুধু বেড়েছে। এই সঙ্কট সাংগঠনিক। মাঠের শান্তিশৃংখলা এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রধান দলগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখার পথে এক মহাসঙ্কট। ভাবি, কলকাতার দর্শকরা শুধু দলের প্রতি ভালবাসা জানাবার বদলে সত্যিকারের ফুটবলকে যদি কথঞ্চিৎ ভালবাসতে পারতেন তাহলে কি ভালই না হোত। কিন্তু তা আর হলো কই! দলের প্রতি দৌরাত্ম্য দেখাতে গিয়ে কলকাতার দর্শকেরা সেই যে হলুদ রঙা কাচের চশমা চোখে এঁটেছেন তা আর খুলে ফেললেন না। ফলে রঙিন কাচের পরিধির বাইরের জগৎটা যে কেমন তা তাঁদের চেনাজানার বাইরেই রয়ে গেল।

দলকে ভালবাসা অন্যায় নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু একজনকে সুয়োরানী বলে কাছে টানতে গেলেই অন্য সকলকেই যে দুয়োরানীর মতো দুয়ো দিতে হবে, এই বা কেমন কথা? এই মনোভাব কি সুস্থ স্বাভাবিক? না বিকৃত? অন্য পক্ষদের দূরে ঠেলতে গিয়ে দল সমর্থকরা আজ সারা বাংলার স্বার্থকেই উপেক্ষা করে চলেছেন। কাজটা যে ভাল

জানেন,
এমন কিছু জিনিস
আছে যা
বিনীও
বদলাতে চায় না!
ভাগ্যিস!
কিছু জিনিস কখনো বদলায় না!
আজকাল স্বাভাবিক, সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত [illegible]
প্রকাশ দেখেও তৃপ্তি! আর ভাল লাগে বিনীর
অপরিবর্তনীয় উচ্চ মান।
স্থায়িত্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক — ফ্যাশানের
চূড়ান্ত — অপূর্ব সমন্বয়... বিনীর অবদান!
স্বচক্ষে দেখুন — অজস্র রঙের মেলা,
অসংখ্য ফ্যাশানের বাহার! বিনীর
টেরীন ব্লেণ্ডসের পোষাক
তৈরী করিয়ে
আনন্দ পাবেন।
ফ্যাশন দুরন্ত অথচ টেঁকসই —
এমন কাপড় যা শুধু বিনীই বানাতে পারে।
বিনী 'টেরীন' ব্লেণ্ডস্
Interpub/BB/66/76 Ban

হসা সেই ডালেই কুঠারাঘাত করার মতোই আত্মঘাতী।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া যাক।

কলকাতার ফুটবলের তিন বড় শরিক হলো ওই তিনটি ক্লাবই। গত বছরে জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফির খেলা উপলক্ষে বাংলা দল গড়ার সময় ওই তিন দলের কোনো কোনো খেলোয়াড়কে পাওয়া যায় নি। ইচ্ছে করেই তাঁরা খেলেন নি। হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থেকে তাঁরা বাংলা দলকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছেন।

বাংলার অপরাধ কি? ওইসব নামী খেলোয়াড়কে বাংলা লালন-পালন করেছে। কলকাতার ফুটবলের সাংগঠনিক সুবিধা সুযোগ আত্মস্থ করেই ও'রা ফুটবল খেলোয়াড়ের জাতে উঠেছেন। কলকাতার ফুটবল মাঠের জল হাওয়ায় ও'রা মানুষ। এখানকার অফিস কাছারিতে ও'রা চাকরী করেন এবং খেলা পাগল দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আর্থিক দিক থেকেও ও'রা আজ সচ্ছল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ও'দের অস্তিত্বের অনু-পরমাণু বাংলা তথা কলকাতার কাছে ঋণী। অথচ ঋণশোধের তাগিদে ও'রা কেউ উজ্জীবিত নন।

ও'রা নামেই ফুটবলার। কিন্তু চরিত্রে খেলোয়াড় নন। অথচ এমন অকৃতজ্ঞ চরিত্রদের নিয়েই কলকাতার ফুটবল জগৎ মাতামাতি করছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও দল সমর্থকদের কাছে ও'রাই হীরো। বাংলার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার বিচারে ও'রা অপরাধী নন। তাই সুবিধাভোগী অকৃতজ্ঞ এইসব খেলোয়াড় এখনও মাঠে ঘাঠে সামাজিক ও সম্মানিত ব্যক্তির মতোই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাংলার স্বার্থ আগলাতে যাদের এমন অনীহা, বাংলা দেশ তাঁদের মাথায় রেখে কেন পুজো করবে এ প্রশ্ন তুলে কেউই তাঁদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান নি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ, দল সমর্থক এবং নিয়ামক সংস্থা কেউই নয়। অকৃতজ্ঞ খেলোয়াড়দের না হয় বিবেক বলে কিছু নেই। তাই বলে কি অন্য সবাই-ই বিবেকের তাগিদ জলাঞ্জলী দিয়ে তাঁদের ক্ষমার চোখে দেখবেন তাঁদের যাঁরা নির্দ্বিধায় বাংলার স্বার্থকে উপেক্ষা করেছেন?

দেখবেন বলি কেন। দেখছেনই তো। দল সমর্থকেরা অবুঝ। নীতিবোধ ও মূল্যবোধের তাঁরা ধার ধারেন না। ক্লাব কর্তৃপক্ষরা স্বার্থপর। এবং নিয়ামক সংস্থা ভীরু। কলকাতার ফুটবলের তিন বড় শরিকের গায়ে আঁচড় কাটার সাহস তার নেই। এক কথায় তিন শরিকের অবস্থা ফ্র্যাংকেনস্টাইনের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্র্যাংকেনস্টাইন আজ তার নিজের সৃষ্টিকর্তা নিয়ামক সংস্থা ও ফুটবল, উভয় পক্ষকেই [illegible] করতে এগিয়েছে। এ থেকে আশু মুক্তির রাস্তাও নেই। যেহেতু কলকাতায় ফুটবলের প্রশাসন অতি দুর্বল। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তার কুণ্ঠা প্রতি পদেই।

যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কলকাতার ফুটবলে দুর্নীতি যেন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে আছে। একটি দুর্নীতির প্রশ্রয়ে কলকাতার লীগ ফুটবল ছেলেখেলায়, এক নকল প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। এই দুর্নীতি হলো লীগে ওঠানামা ব্যবস্থা রদে এবং খেলার নামে না খেলে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির চক্রান্ত ঘিরে।

যে সব দল নেপথ্য চক্রান্তে সিদ্ধকর্মা তারা নিজেদের মধ্যে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি করে লীগের ওপরতলায় নিজেদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখে। আর তাতেও যখন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তখন জোটবেঁধে সভাসমিতিতে হাজিরা দিয়ে লীগে ওঠানামা প্রথা রদ করে দেয়। ওঠানামা বন্ধের এবং পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির এই খেলা প্রায় বাইশ তেইশ বছর ধরে চলে আসছে। তারই ফলে প্রথম ডিভিশনে নয় নয় করে বাইশটি দল আজ ঢুকে পড়েছে এবং যোগ্য অযোগ্যের ভীড়ে মুড়ি মিছরির দর সমান হয়ে গেছে।

আমরা বলি যে খেলাধুলা মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু কলকাতার লীগ ফুটবল চরিত্র গড়া তো দূরে থাকুক বাড়ন্ত ছেলেদের চরিত্র হননেই উৎসাহ যোগাচ্ছে। লীগ ফুটবলের হাতছানির টানে যে সব ছেলে গড়ের মাঠের ধারে আসছে তারা প্রতিযোগিতার নামে নকল খেলায় রপ্ত হচ্ছে। ফুটবলে সাচ্চা লড়াইয়ের স্বাদও তারা পাচ্ছে না। না পাওয়ায় তাদের লড়িয়ে মেজাজ যেমন গড়ে উঠছে না, তেমনি আসল ছেড়ে খেলার নকল অভিনয় করতে গিয়ে তারা চরিত্র ধর্মও হারিয়ে ফেলছে। আজ যারা খেলছে উত্তরকালে তারা সংসার ও সমাজে প্রবেশ করবে। তখন মাঠ থেকে কি শিক্ষা যে তারা নিয়ে যেতে পারবে তা ভাববার বিষয়।

ভাল ফুটবল আমরা না খেলতে পারি। তাতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না। কিন্তু খেলতে এসে যদি পদে পদে বিবেক ও চরিত্র বিকিয়ে দেওয়ার কুশিক্ষা পাই তাহলে একদিন কিন্তু সত্যিই সমাজের মাথায় বিধাতার অভিশাপ নেমে আসবে। আফশোষ ও লজ্জার কথা এই যে লীগ খেলার নাম করে নকল খেলার এই যে অভিনয় তার সাক্ষী সবাই—দর্শকবৃন্দ ও ফুটবলের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কেউ দেখেও দেখতে চাইছেন না। এমন কি রাজ্য সরকারের ক্রীড়াদপ্তরও নয়। পরিণামে কলকাতার লীগ ফুটবলের মাঠে এসে এক নতুন প্রজন্ম তার চরিত্র হারিয়ে বসছে। অন্য দেশে এমনটি ঘটলে সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে ফুটবল মাঠ নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা গবেষণায় বসতেন এবং তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী ক্রমপর্যায়ে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হোত। কিন্তু এদেশ বড়ই বিচিত্র। এখানে নীতি শিক্ষা দানের বিকল্পে চরিত্র হননে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে দুনিয়ার খোলা দৃষ্টিরই সামনে।

ভারতীয় ফুটবলে বাংলা দেশই পথিকৃৎ। জাতীয় বা আন্তঃরাজ্য ফুটবলের আসরে বাংলার আসন সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে আসনও বুঝি ক্রমশঃই টলমল করছে। এককালে জাতীয় ফুটবলে বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে তেমন কেউ ছিল না। কিন্তু গত দু বছরের একবারও বাংলা জাতীয় ফুটবলে শীর্ষসম্মান লাভ করতে পারে নি। পারবে কি করেই বা। গোঁজামিলে ভরা নকল লীগ খেলতে যাঁরা অভ্যস্ত, সাচ্চা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁদের তো পিছিয়ে পড়ারই কথা। এই নকল লীগের আয়োজনে কোনো কোনো অযোগ্য দলের প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞা যদিও বজায় থাকছে তবুও বাংলার ফুটবলের ভেতরটা এই অনুষ্ঠান কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে। রাজরোগাক্রান্ত রোগীর যে অবস্থা, বাংলার ফুটবলের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম।

এক কথায় কলকাতার ফুটবলের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটে নি। খেলা চলছে সেই সাবেকী আমলের ধারা অনুসরণে। আদ্যিকালের কাঠের পাটাতনে ঘেরা মাঠ। গ্যালারি থেকে ইট পাথর ছুঁড়ে যখন তখন খেলা বন্ধ করে দেওয়ার সুযোগও পর্যাপ্ত। এমন সুযোগ সদ্ব্যবহারে ওস্তাদ যারা তারা প্রতি অপরাহ্নেই ইট পাথর ছুঁড়ে খেলাধুলার মূলে আদর্শের কপাল পুড়িয়ে দিচ্ছে।

এ এক অসহনীয় অবস্থা। বিশেষতঃ সেইসব দলের পক্ষে যাদের পেছনে জনসমর্থন নেই। ইট পাথরের আওতা থেকে খেলার মাঠকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে এবং ফুটবলের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের সহায়তায় উদ্দেশ্যে গড়ের মাঠে বড়সড় একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার দাবী কতোভাবে এবং কতো দিন ধরেই তো পেশ করা হলো। কিন্তু কর্তাদের কানে জল ঢুকলো কই! কর্তারা আগে যেমন ছিলেন, এখনও রয়েছেন তেমনি। পরিপূর্ণ নির্বিকার ভাব। দারুভূত জগন্নাথের সামিল। সেই ইংরাজ আমল থেকে এই স্বাধীন কালে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তা ও পরিকল্পনার নানান প্রতিফলন ঘটলেও কলকাতার ফুটবল মাঠের গা থেকে সাবেক আমলের কৌপীনটা শিথিল হয়নি। কলকাতার ফুটবল নিয়ে আমরা যতোই গর্ব করি না কেন, তার লজ্জা ঢাকার উপায়ই বা কোথায়! ভারতীয় ফুটবলের নীল ফিতের রং যে [illegible] ফিকে হয়ে পড়ছে।

চারিদিকে এতো সমস্যা, সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জমাট জঞ্জাল এবং ছেলেদের চরিত্র হননের এমন চক্রান্ত সত্ত্বেও কলকাতা তার ফুটবলের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। মাঠে মাঠে ভীড় জমছে। আশা নিরাশার খেলা চলছে। উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহে সারা মাঠ ভেসে যাচ্ছে। ফুটবলের এমন উজ্জ্বল প্রাণময় পরিচিতি বুঝি তুলনারহিত।

কি পাচ্ছি এবং কি যে হারাচ্ছি কেই বা তার ঠিকানা জানতে চায়। এই পরিস্থিতিতেই চলতি ফুটবল মরশুম জমে উঠেছে। জমজমাট নাটকের মধ্যমণি সেই ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং। কানু বিনা গীত যেমন নেই, তেমনি এই তিন দল ছাড়া কলকাতার ফুটবলও নেই।

গত পাঁচবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্ট-বেঙ্গলের আশু লক্ষ্য এবারেরও লীগ জয় করে ঘরোয়া খেলার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় জুড়ে দেওয়া। একটানা পাঁচবার চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে লীগে প্রথম রেকর্ড করেছিল মহামেডান স্পোর্টিং। তাদের লক্ষ্য নতুন কীর্তি গড়ায় ইস্টবেঙ্গলকে প্রতিহত করা। আর মোহনবাগানের সংকল্প গত ক বছরের ব্যর্থতার বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে নিজের ভাবমূর্তিকে আবার উজ্জ্বল করে তুলে ধরা। এক কথায় চূড়ান্ত সাফল্যলাভের সংকল্পে তিন শরিকই যথারীতি কোমর কষে বেঁধেছে। সেই উদ্দেশ্যে যে যেভাবে পেরেছে দলের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছে।

এই চেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল কি?

মাত্র ক'দিনের দেখা, তবু বলতে পারি যে ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগে এবার কিছুটা ঘাটতির লক্ষণ। হাবিব-আকবরের অনুপস্থিতির ফাঁক অন্যদের সাহায্যে পূরণ করা কঠিন। তবে এই দলের মেরুদণ্ড পরিভাষায় হাফলাইন রীতিমতো সুবিন্যস্ত। মূল শক্তির উৎস সেইখানেই। চার ব্যাকও শক্ত প্রতিরোধের খুঁটি। মনে হয়, এই খুঁটির জোর কমে নি। কমেছে কিনা, স্বল্প কদিনের অবকাশে তা যাচাইয়ের সুযোগও ঘটেনি। কারণ, অন্য কোনো প্রতিযোগী এখনও পর্যন্ত এই খুঁটির মূলে সবলে টান কষাতে পারেনি।

মহামেডানের ফরোয়ার্ড লাইনে অবশ্যই বাড়তি সামর্থ্য সঞ্চিত হয়েছে। লতিফুদ্দিন হাবিব আকবর ও সাজ্জাদের মিলিত শক্তির জুড়ি মেলা ভার। অনুমান দিনে দিনে এই ফরোয়ার্ড লাইন আরও উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে। অনুপাতে হাফ লাইন নিষ্প্রভ। যতোই কেন না বাইরের নামডাকওয়ালা খেলোয়াড় আনিয়ে ওই অঞ্চলটি সাজানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকুক। আর ফুল ব্যাকদের আচরণ গতি মন্থরতার আবেশ ছিঁড়ে ফেলতে পারবেন কিনা কে জানে!

মোহনবাগানের সেরা সম্পদ উলগানাথন। দলে তিনিই একমাত্র জাত ফরোয়ার্ড। কিন্তু হাফ লাইন কমজোরি। মেরুদণ্ডের অগোছালো অবস্থায় ফরোয়ার্ড লাইনকে সচল করায় সাহায্য করবে না এবং রক্ষনব্যবস্থায় সংকটও ডেকে আনতে পারে। এই সংকট ত্রাণে ফুলব্যাকরা কতোটা উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন, উত্তরপর্বে সেইটিই হবে লক্ষ্যনীয়।

এক পলকের প্রত্যক্ষ দর্শনের এই উপলব্ধি। মরশুম গড়িয়ে গেলে এই উপলব্ধি হয়তো আরও পরিণত হতো। অথবা নতুনতর উপলব্ধির ক্ষেত্র হোত প্রসারিত। এই এক পলকের দেখার সূত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিন প্রধান শরিকের মধ্যে কেউ বুঝি অন্যের চেয়ে শক্তিধর ও উপযুক্ত। কিন্তু তা বলে এতো তাড়াতাড়ি কোনো একটি দলকে সম্ভাব্য বিজয়ী বলে মনে করে অন্য পক্ষদের খারিজ করার উপায় নেই। তিন পক্ষের একপক্ষকে এখনই বিজয়ীর আসনে বসাতে চাইলে ভুল করা হবে। জেনেশুনে এমন ভুল কেই বা করতে চায়! তাই বলি যে তিন শরিকের যে কোনো একপক্ষই লীগ জয় করতে পারে। খেলা চলবে তিন-চার মাস ধরে। একটানা মেহনত সত্ত্বেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবে যে পক্ষ তার নিজের আচরণে জয়লক্ষ্মী তার কপালেই তিলক এঁকে দেবে।

নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ছাড়াও স্নায়ুযুদ্ধের চাপের প্রভাবও এই ক'মাস জিয়ানো থাকবে। তিন প্রধানের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্নায়ুও এক বড় পক্ষ। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলায় স্নায়ু চাপ ততোটা বড় হয়ে দেখা দেয় না। কিন্তু বড়রা যখন নিজেদের মুখোমুখি হয় তখন স্নায়ুর লড়াই-ই সবচেয়ে জমে ওঠে। স্নায়ুর চাপে যে দল মুষড়ে পড়ে যোগ্যতা দক্ষতা সত্ত্বেও তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠা তখন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই স্নায়ুর চাপের কথা চিন্তা করে বলা যায় যে বাস্তববাদীগণ অবস্থা বিচারে কোন পক্ষই ফেলনা নয়। চরম পরীক্ষার লগ্নে যে দল স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারবে সেই দলই লীগ জয়ের জটিল প্রশ্নের জট দেবে খুলে। গত ক বছরের মূল্যায়নে বলা যায় যে ইস্টবেঙ্গলের মনোবল এমনিতেই বৃদ্ধি পেয়ে আছে। যেহেতু এই দল নিরন্তর জয়ধারায় গা ভাসিয়ে রয়েছে। তবে মোহনবাগান বেশ ক' বছর আত্মবিস্মরণের অবক্ষয় বয়ে বেড়াবার পর সম্প্রতি ডুরাণ্ড কাপ জয় করে উজ্জীবিত মানসিকতার ঠিকানা কিছুটা জেনে নিতে পেরেছে বৈকি। তাদের পাশে মহামেডানের ভূমিকা বুঝি ডার্ক হর্সেরই মতো।

আর লীগ বিজয়ের পটভূমিকায় আসল খেলাই তো ওই তিন দলের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অন্য খেলাগুলির চ্যালেঞ্জ কতোটুকুই বা! প্রথম ডিভিশনের বাইশটি প্রতিযোগীর বেশিরভাগই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। জান বাঁচানোর, ওপর তলায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার তাগিদের ভ্রূকুটিতেই তারা শশব্যস্ত। তাদের সঙ্গতি কম। মূলধন সীমাবদ্ধ। তার ওপর প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধাচারণও তাদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ। এতো সব অসুবিধার বেড়াজাল ডিঙিয়ে তাদের পক্ষে বড়দের সামনে শক্ত হ[illegible] দাঁড়ানোই সমস্যা। কাজেই দৃষ্টি আপা[illegible] ওই তিন প্রধান শরিকের দিকেই নিবদ্ধ থাক। দেখা যাক, কে বাজীমাৎ করে মাঠের ফসল এবার ঘরে তুলতে পারে।

খেলাধুলা

দর্শক

ক্লাইভ লয়েড
অধিনায়ক—ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে প্রথম বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭ রানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে 'প্রুডেন্সিয়াল কাপ' জয়ী হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৯১ রানের উত্তরে (৮ উইকেটে এবং ৬০ ওভারে) অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় ২৭৪ রানের মাথায় (৫৮-৪ ওভারে)। খেলাটি খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল—অস্ট্রেলিয়ার যখন শেষ উইকেটটি পড়ে, তখন ৬০ ওভারের খেলা পূর্ণ হতে ৮টি বল খেলতে বাকি ছিল এবং অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে ১৭ রান দূরে ছিল। এই ফাইনাল খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ২০০ পাউন্ডের 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' পুরস্কার লাভ করেন। খেলা শেষে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ওরা কি সাংঘাতিক ফিল্ডিংই না করেছেন। তিনি বিশেষ করে রিচার্ডসের ফিল্ডিংয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের জয়লাভের আশা রিচার্ডসের ফিল্ডিংয়ে চুরমার হয়ে যায়। তাঁর নিখুঁত থ্রো নিক্ষেপের ফলেই টার্নার, ইয়ান চ্যাপেল এবং গ্রেগ চ্যাপেল রান আউট হন। অস্ট্রেলিয়ার যেখানে এক উইকেটে ৮০ রান ছিল, সেখানে ৩টে উইকেট পড়ে ১৬০ রান দাঁড়ায়। অস্ট্রেলিয়ার সবশুদ্ধ ৫ জন রান-আউট হয়েছিলেন। কি কড়া ফিল্ডিং। লয়েড নির্মমভাবে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের বল পিটিয়ে দলের পক্ষে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের খেলা সম্বন্ধে লয়েড বলেন, একদিনের ক্রিকেট খেলায় তাঁর সেরা খেলাগুলির মধ্যে এই খেলাটিও নিঃসন্দেহে অন্যতম। তিনি দলের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল টসে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে প্রথমেই ব্যাট করতে দেন। ১৮ ওভার খেলার পর দেখা গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গীন অবস্থা—তিনটি উইকেট পড়ে মাত্র ৫০ রান। এই অবস্থায় লয়েড এবং কানহাই ৪র্থ উইকেটে জুটি বেঁধে নিজেদের দিকে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। লয়েড রুদ্রমূর্তিতে পিটিয়ে খেলতে থাকেন। লিলির প্রথম ওভারে তিনি ১১টা রান করেন, তার মধ্যে ছিল একটা বিরাট ছক্কা। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান দাঁড়ায় ৯১ (৩ উইকেটে)। লয়েড ৮২টি বল খেলে ১০০ মিনিটে নিজস্ব শত রান পূর্ণ করেন। ১০৮ মিনিট খেলে তিনি ১০২ রান করে খেলা থেকে বিদায় নেন। তিনি ১২টা বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার বাউন্ডারী করেছিলেন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং কানহাই দলের অতি মূল্যবান ১৪৯ রান তুলেছিলেন ১০৮ মিনিটের খেলায়। লর্ডসের দর্শকরা বিপুল জয়ধ্বনি দিয়ে লয়েডকে বিদায় অভিনন্দন জানান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কানহাই ৫৫ রান করেছিলেন ১৫৬ মিনিটে। অস্ট্রেলিয়ার গিলমোর ৫৮ রানে ৫টা উইকেট পান। খেলার এক সময় তাঁর বোলিংয়ের গড় ছিল—১১টা বল খেলে মাত্র ৫ রানে ৩টে উইকেট।

চা-পানের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল—১০৭ (২ উইকেটে। ২৫ ওভারে)। জয়-

প্রুডেন্সিয়াল কাপ—বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার।

জেতার জন্যে তখনও বাকি ৩৫ ওভারের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার আরও ১৮৫ রান করার প্রয়োজন ছিল। অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেট দুটি (টমসন এবং লিলি) অতি মূল্যবান ৪১ রান যোগ করেও শেষ পর্যন্ত দলকে জয়যুক্ত করতে পারেননি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৯১ রান (৮ উইকেটে। ৬০ ওভারে। লয়েড ১০২, কানহাই ৫৫ এবং জুলিয়ান নট আউট ২৮। গিলমোর ৫৮ রানে ৫, টমসন ৪৪ রানে ২ এবং লিলি ৫৫ রানে ১ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২৭৪ রান (৫৮-৪ ওভারে। ইয়ান চ্যাপেল ৬২, টার্ণার ৪০, ওয়াল-টার্স ৩৫ রান। বয়েস ৫০ রানে ৪ এবং লয়েড ৩৮ রানে ১ উইকেট)

সেমি-ফাইনাল খেলা

লিডসে অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই জয়লাভে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বল্পখ্যাত ২৩ বছরের চৌকস খেলোয়াড় গ্যারী গিলমোর। তিনি মাত্র ১৪ রানের বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডের ৬টা উইকেট নিয়েছিলেন এবং দলের সংকটকালে দৃঢ়তার সংগে ব্যাট করে উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (নটআউট) ২৮ করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের ইনিংস মাত্র ৯৩ রানের মাথায় (৩৬-২ ওভারে) শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ২৭ রান করেছিলেন অধিনায়ক মাইক ডেনেস। ইংল্যাণ্ডের ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে দুজন গোল্লা করেছিলেন এবং দু অংকের ঘরে রান তুলেছিলেন মাত্র এই দুজন—মাইক ডেনেস (২৭ রান) এবং আরনল্ড (নট আউট ১৮ রান)।

অস্ট্রেলিয়াকেও ইংল্যাণ্ডের বোলাররা এক সময়ে খুবই কোণঠাসা করেছিল। ইংল্যাণ্ডের যেমন ৩৬ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়েছিল অস্ট্রেলিয়ার তেমনি ৬ষ্ঠ উইকেট পড়েছিল ৩৯ রানের মাথায়। অস্ট্রেলিয়ার এই সংকটকালে ৭ম উই-কেটের জুটি ওয়ালটার্স এবং গিলমোর পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে দলকে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত করেছিলেন। তাঁদের অসমাপ্ত ৭ম উইকেটের জুটিতে ৫৫ রান উঠেছিল। ওয়ালটার্স ২০ রান এবং গিলমোর ২৮ রান করে অপরাজিত থেকে যান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ৯৩ রান (৩৬-২ ওভারে। ডেনেস ২৭ রান। গিলমোর ১৪ রানে ৬ ওয়া-কার ২২ রানে ৩ এবং লিলি ২৬ রানে ১ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৯৪ রান (৬ উইকেটে। ২৮-৪ ওভারে। গিলমোর নটআউট ২৮ এবং ওয়ালটার্স নটআউট ২০ রান। ওল্ড ২৯ রানে ৩ এবং স্নো ৩০ রানে ২ উইকেট)।

দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে-ছিল।

টস জিতেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাট করবার ভার নিউজিল্যাণ্ডকে ছেড়ে দেয়। উদ্দেশ্য দক্ষতার বাল্ড বোলারদের প্রাণবন্ত পিচের সুযোগ দেওয়া। নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস ১৫৮ রানের মাথায় শেষ হয়। এর পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৫৯ রান তুলে দেয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যাণ্ড : ১৫৮ রান (৫২-২ ওভারে। টার্ণার ৩৬ এবং জি পি হাওয়ার্থ ৫০ রান। জুলিয়েন ২৭ রানে ৪, রবার্টস ১৮ রানে ২ এবং হোল্ডার ৩০ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১৫৯ রান (৫ উইকেটে। গ্রিনিজ ৫৫ এবং কালিচরণ ৭২ রান। কলিঞ্জ ২৮ রানে ৩ উইকেট)।

লীগ পর্যায়ের খেলা

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় এ গ্রুপ থেকে ইংল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ড এবং বি গ্রুপ থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। লীগের সমস্ত খেলায় জিতেছিল এ গ্রুপে ইংল্যান্ড এবং বি গ্রুপে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ভারত এ গ্রুপে এবং পাকিস্তান বি গ্রুপে ৪র্থ স্থান পেয়েছিল।

লীগের খেলা

ক বিভাগ :	খেলা	জয়	হার	পয়েন্ট
ইংলণ্ড	৩	৩	০	১২
নিউজিল্যান্ড	৩	২	১	৮
ভারত	৩	১	২	৪
পূর্ব আফ্রিকা	৩	০	৩	০
খ বিভাগ :	**খেলা**	**জয়**	**হার**	**পয়েন্ট**
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩	৩	০	১২
অস্ট্রেলিয়া	৩	২	১	৮
পাকিস্তান	৩	১	২	৪
শ্রীলঙ্কা	৩	০	৩	০

ম্যাঞ্চেস্টার ভারত তার তৃতীয় খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ৪ উইকেটে পরাজিত হলে সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা হারায়। সাতটা বলের খেলা বাকি থাকতে নিউজিল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে দেয়। যেখানে নিউজিল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্যে ২৩১ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা ৫৮-৫ ওভার খেলে ৬ উইকেট খুইয়ে ২৩৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ২৩০ রান (৫৯-৫ ওভারে। গাইকোয়াড় ৩৭ এবং আবিদ আলী ৭০ রান। আর হেডলি ৪৮ রানে ২ ডি হেডলি ৩৬ রানে ২ ম্যাকেঞ্জি ৪৫ রানে ৩ এবং হাওয়ার্থ ৪৮ রানে ২ উইকেট)।

নিউজিল্যাণ্ড : ২৩৩ রান (৬ উইকেটে। ৫৮-৫ ওভারের খেলায়। গ্লেন টার্ণার নট-আউট ১১৪ রান। মদনলাল ৬২ রানে ১, বেদী ২৮ রানে ১ এবং আবিদ আলী ৩৫ রানে ২ উইকেট)।

এজবাস্টনে ইংল্যাণ্ড তাদের তৃতীয় খেলায় ১৯৬ রানে পূর্ব আফ্রিককে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ২৯০ রান (৫ উইকেটে। বি উড ৭৭, ডি অ্যামিস ৮৮ এবং হেজ ৫২ রান। জুলফিকার ৬৩ রানে ৩ এবং জুলফিকার ৬৩ রানে ৩ এবং ফুলীশ ৫৫ রানে ২ উইকেট)।

পূর্ব আফ্রিকা : ৯৪ রান (৫২-৩ ওভারে। রমেশ শেঠ ৩০ রান। স্নো ১১ রানে ৪, লেভার ৩২ রানে ৩ এবং গ্রেগ ১৮ রানে ২ উইকেট)।

ওভালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের তৃতীয় খেলায় ৭ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

অস্ট্রেলিয়া : ১৯২ রান (৫৩-৪ ওভারে। রস এডওয়ার্ডস ৫৮ এবং মার্শ নট-আউট ৫২ রান। রবার্টস ৩৯ রানে ৩ বয়েস ৩৮ রানে ২ রিচার্ডস ১৮ রানে ২ জুলিয়ান ৩১ রানে ১ এবং হোল্ডার ৩১ রানে ১ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১৯৫ রান (৩ উইকেটে। ৪৬ ওভারের খেলায়। ফ্রেডারিকস ৫৮ এবং কালিচরণ ৭৮ রান। লিলি ৬৬ রানে ১, ওয়াকার ৪১ রানে ১ এবং ম্যালেট ৩৫ রানে ১ উইকেট)।

ট্রেন্ট ব্রিজে পাকিস্তান তার তৃতীয় খেলায় শ্রীলঙ্কাকে ১৯২ রানে পরাজিত করে। কিন্তু সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করতে পারেনি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ৩৩০ রান (৬ উইকেটে। সাদিক মহম্মদ ৭৪, মজিদ খাঁ ৬৪ এবং জাহির আব্বাস ৯৭। ওয়ারনাপুরা ৪২ রানে ৩ এবং ওপাথা ৬৭ রানে ২ উইকেট)।

শ্রীলঙ্কা : ১৩৮ রান (৫০-১ ওভারে। তেনে-কুন ৩০ রান। ইমরান খাঁ ১৫ রানে ৩ উইকেট)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত দু'সপ্তাহে (জুন ৯—২২) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ২৭ এবং খেলা ড্র ৯।

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহ-মেডান স্পোর্টিং—এই তিন দলের লীগ খেলায় আসরে আবির্ভাবের ফলে মাঠের আবহাওয়া উত্তেজনায় বেশ গরম হয়ে উঠেছে। ৯ই জুন মহমেডান স্পোর্টিং, ১০ই মোহনবাগান এবং ১১ই জুন ইস্টবেঙ্গল তাদের লীগের প্রথম ম্যাচ খেলেছে। গত দু' সপ্তাহে মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং চারটে করে ম্যাচ খেলে প্রত্যেকে ৮ পয়েণ্ট এবং ইস্টবেঙ্গল তিনটে ম্যাচ খেলে ৬ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে।

হ্যাটট্রিক

গত দু'সপ্তাহে প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় হ্যাট-ট্রিক করেছেন এই চারজন খেলোয়াড় : মহমেডান স্পোর্টিংয়ের আকবর (বিপক্ষে স্পোর্টিং ইউনিয়ন) ও মহম্মদ হাবিব (বিপক্ষে চন্দ্র মেমোরিয়াল) কুমার-টুলীর পিনাকী মুখার্জি (বিপক্ষে কালী-ঘাট) এবং মোহনবাগানের উলগানাথন (বিপক্ষে উয়াড়ী)।

খেলার জগতে মেয়ে

কাবাডি কুশলী ভবানী সাধুখাঁ

—অন্য প্রায় সব রাজ্যের মেয়েরাই গায়ের জোরে খেলে। আমরা খেলি বুদ্ধির জোরে। মহারাষ্ট্র দলের কাছে এবছর আমরা জাতীয় আসরে ফাইন্যালে হেরে গেলাম সুধু ওদের মেয়েদের গায়ের জোরের জন্য। আমাদের খেলোয়াড়দের কলাকৌশল ভালই কিন্তু ঘাটতি ঐ শারীরিক শক্তির।

কথাগুলি বলছিল বাংলার কাবাডি দলের সহ-অধিনেত্রী ভবানী সাধুখাঁ সেদিন বিকালে পশ্চিমবঙ্গ কাবাডি এসোসিয়েশনের ময়দানস্থ তাঁবুতে ওদের কার্যকরী সমিতির সদস্য অশোক বিশ্বাস আমার সঙ্গে ভবানীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভবানী চন্দননগর থেকে আসে এখানে খেলতে।

—আমাদের চন্দননগরে কাবাডির খুব চলন আছে। এখানে যেমন পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট-ফুটবল খেলে ছেলেরা, আমাদের ওখানে তেমনি জনপ্রিয় এই কাবাডি খেলা। আর হবে না-ই বা কেন বলুন? কাবাডিই ত আমাদের দেশের, বিশেষ করে বাংলার নিজস্ব খেলা।

—তুমি কতদিন যাবৎ কাবাডি খেলছ?

—এই এসোসিয়েশনের অধীনে খেলছি ১৯৭২-এর শেষ দিক থেকে।

শ্রীবিশ্বাস এই সঙ্গে জানালেন, ১৯৭১-৭২ মরশুমেই পঃ বঙ্গ কাবাডি সংস্থা প্রথম মেয়েদের কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু করে। তখন চলছিল নক আউট ভিত্তিতে, কারণ দলের সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু ক্রমেই মেয়েদের মধ্যে কাবাডি খেলার ঝোঁক বেড়ে গেছে। তাই এ-বছর নক আউট ছাড়াও ১২টি দল নিয়ে লীগ খেলারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকেও দল আসছে।

ভবানী প্রথমবার নক আউটে খেলে ৭২-৭৩ মরশুমে চন্দননগর কাবাডি এসোসিয়েশন দলের হয়ে। পরের বছর থেকেই ও এরিয়ান্সের মেয়েদের কাবাডি দলে যোগ দেয়। সেই থেকে বেশ সুনামের সঙ্গেই খেলে চলেছে।

—খেলার কোন দিকটা তোমার বেশী ভাল লাগে, রক্ষণ, না আক্রমণ অর্থাৎ হানা দেওয়া?

—আমার হানা দিতেই বেশী ভাল লাগে। বিপক্ষ কোর্টে হানা দিয়ে একজন-না-একজনকে 'মোড়' করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি আক্রমণ করি। হানা দিতে ভাল লাগার আরও কারণ হচ্ছে—একদিকে যেমন বিপক্ষদের 'মোড়' করতে চাই, সেই সঙ্গে ওরা যাতে আমায় ধরে না ফেলতে পারে সেদিকেও কড়া নজর রাখি। ওরা আমার বিরুদ্ধে কি করতে চাইছে, মনের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তা-ও বিচার করি। একসঙ্গে দু'-দুটো তড়িৎগতি চিন্তা ও কাজ করতে হয় বলে আমার খুব ভাল লাগে। নিজের মধ্যে শক্তি ও সক্ষমতা অনুভব করি।

পশ্চিমবাংলার মেয়েরা জাতীয় আসরে খেলছে ৭১-৭২ থেকে। ভবানী এখানে কাবাডি খেলা শুরু করেই নিজ দক্ষতার মূল্যধরে ৭২-৭৩-এ জয়পুরে আয়োজিত জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলা দলে স্থান পায়। সেবার বাংলা সেমি-ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠে বিদর্ভের কাছে হেরে যায়। পরের মরশুমে (৭৩-৭৪) জাতীয় আসর বসে আসানসোলে। বাংলাদল দোর্দণ্ড প্রতাপে খেলে রানার্স হয়। শক্তিশালী মহারাষ্ট্র দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বিজয়ী হয়।

এখানে [illegible] মহারাষ্ট্রের মেয়েরা [illegible] জাতীয় কাবাডির [illegible] রেখেছে। ক্রিকেটে [illegible] মেয়েদের সবাই মহা-রাষ্ট্রের মেয়েদের কাবাডিতেও এক অনন্য কৃতিত্ব। এ-বছর অর্থাৎ ৭৪-৭৫ মরশুমেও পশ্চিমবাংলাকে ঐ মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দলের সহ-অধিনেত্রী ভবানী এবারের খেলা সম্পর্কে বলে [illegible] সংগে সংগে এবার আমরা বিজয়িনী হবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দৈহিক শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত আমাদের নতি স্বীকার করতেই হল।

•

—অন্যান্য রাজ্যের সংগে আমাদের খেলায় কি কোন পার্থক্য আছে?

—হ্যাঁ আছে। ঐ যে বললাম প্রায় রাজ্যের মেয়েরাই গায়ের জোরকে মূলধন করে খেলে। কিন্তু আমরা অনেক সময়েই বুদ্ধির কৌশলে ওদের হারিয়ে দিই। গত বছর দেখলাম অন্যান্য রাজ্যের মেয়েরাও আমাদের মত বুদ্ধি ও রক্ষণকাজে দলগত কৌশলের ওপর বেশী জোর দিচ্ছে। মানে ওরাও এখন বাংলার 'কায়দা' রপ্ত করতে লেগেছে বলা যায়। ধরা বা হানা দেওয়ার সময় একদিকে যেমন দলগত সংহতি, শক্তি এবং সপ্রতিভতার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে তেমনি বিপক্ষ দলের কলাকৌশল ঠিক-ঠিকভাবে আন্দাজ করে নিজেদের কৌশল বদলে নিতে হয়। দল এবং ব্যক্তির দক্ষতার এমন সম্মিলন আর কোন খেলায় এত বেশী করে প্রয়োজন হয় না বলা যায়। শ্রীবিশ্বাসও ভবানীর এই মত সমর্থন করলেন।

ভবানী স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় সট-পুট, বর্শা ছোঁড়া, দীর্ঘলম্ফনেই বিশেষ-ভাবে যোগ দেয়। তাছাড়া রোজ প্রায় দেড়-[illegible] কাবাডি অনুশীলন করে; [illegible] মাঝামাঝি [illegible] ও নিয়মিত [illegible]। কাবাডি খেলোয়াড়দের [illegible] ভালই হয়। খেলোয়া [illegible]। কিন্তু মেয়েদের জন্য এখনও তা [illegible] ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষারও অভাব রয়েছে বলে শ্রীবিশ্বাস জানালেন।

—খেলার জন্য পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে না?

—না। আগে নীচের ক্লাসে র‍্যাংক পেতাম। এখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বেশী নম্বরই পাই, তবে র‍্যাংক পাইনি।

প্রসঙ্গতঃ কাবাডিতে সরকারী সাহায্যের কথা উঠল। শ্রীবিশ্বাস বললেন, সরকারী সাহায্য কিছু কিছু পাওয়া গেলেও তাতে কুলিয়ে ওঠা যায় না। এই ছোট মাঠে এখন খেলা দেখার জন্য খুব ভিড় হয়। সরকার থেকে কিছু বসবার বেঞ্চি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে ভিড় সামলান যায় না। খেলার বড় বিঘ্ন হয়। ছোটখাট একটা স্টেডিয়াম হলে অনেক সুবিধা হয়। কারণ, খেলো-য়াড়ের সংগে সংগে দর্শক-সংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে। কয়েকজন মেয়ে পতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়াশিক্ষায়তনের ক্রীড়াবৃত্তিও পাচ্ছে। তবে ভবানী এখনও তা পায়নি।

ওদের প্রশিক্ষক হলেন, কেশব দত্ত. তাছাড়া নির্মল রায় ও ননী বসু এঁরাও প্রশিক্ষণ দেন। সম্প্রতি এই মাঠে প্রশিক্ষক-দের প্রশিক্ষণ শিবির বসান হয়েছিল। এরা মফঃস্বল অঞ্চলে কবাডির খুঁটিনাটি বিষয় ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেবেন।

বাংলার নিজস্ব এই খেলা রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হলে বহু ছেলেমেয়ে খেলার চর্চার সংগে সংগে স্বাস্থ্যোন্নতির সুযোগ পাবে। এ-খেলা ব্যয়বহুল নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সাধ্যায়ত্ত এই কবাডির বহুল প্রচারের জন্য পঃ বঙ্গ [illegible] কাবাডি [illegible] করেছে।

[illegible] কাবাডি খেলা [illegible] শ্যামলী [illegible]। এর পিছনে যেমন রয়েছে [illegible] ও ক্রীড়া-প্রতিভার অবদান রয়েছে, তেমনি ভবানী সাধুখাঁর নামও উল্লেখযোগ্য। [illegible] মজবুত চেহারায় মেয়ে ভবানী চন্দননগরের প্রাচীন পরিবারের মেয়ে। ওর বাবা শ্রী[illegible] সাধুখাঁ ওখানকার এক মিলে চাকরী করেন। ভবানীর ছোট বেলাও কাবাডি খেলতো। ওরা পাঁচ বোন, এক ভাই। ভবানী বলে, বাবা ও দিদিরা আমায় খেলায় খুবই উৎসাহ দেন। কিন্তু মা বড় রাগারাগি করেন। একবার খেলতে গিয়ে আমার হাতে চোট লাগে, তখন মায়ের কি রাগ! মেয়ে-ছেলের হাত ভাঙলে আর রক্ষা আছে? তবে তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছি।

ভবানী আগে ভলিবল আর দেশে ক্রিকেট কিছু কিছু খেলত। কিন্তু কাবাডির ওপর এমন একটা আকর্ষণ অনুভব করে যে, অন্য খেলায় মন দিতে ওর আর ইচ্ছা করে না। উন্নতিও করেছে খুব তাড়াতাড়ি। চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির-এর ছাত্রী হিসাবে নিয়মিত কাবাডি খেলেছে। নবম শ্রেণীতে থাকার সময় ও জেলার আন্তঃ স্কুল কাবাডিতে খেলার সুযোগ পায়। এবং সেবার ওদের স্কুলই রানার্স-আপ হয়। ভবানী এবার স্কুল ফাইনাল দিয়েছে। ওর ইচ্ছে জোর দাপটে কাবাডি খেলা চালিয়ে যায়।

ভবানী বললে, আমার ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল সব খেলাই দেখতে খুব ভাল লাগে। প্রায়ই খেলা দেখতে যাই।

অময়

মৃণাল সেন

রেডিওতে দুপুর একটার খবরে প্রথম শুনলাম খবরটা। ছোট্ট খবর। মৃণাল সেনের 'কোরাস' বছরের সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পেয়েছে।

মৃণালবাবুকে আমি ফোন করেছিলাম সাড়ে বারোটা নাগাদ। উনিই জিজ্ঞেস করেছিলেন—'ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের কোনো খবর-টবর পেলে?'

বলেছিলাম—না।

তার আধঘণ্টা বাদেই এই খবর। মৃণালবাবু নিজে রেডিওতে শোনেননি। মিউজিক ডিরেক্টর আনন্দশংকর রেডিওর খবরটা শুনে ফোন করেছিলেন মৃণালবাবুকে একটা দশ নাগাদ।

সবচাইতে মজার ব্যাপার আনন্দশংকর তখনও নিজে জানতেন না যে 'কোরাস'-এর মিউজিক ডিরেক্টর হিসাবে তিনিও সেরা সঙ্গীত পরিচালকের পুরস্কারটি পেয়েছেন। সে খবর আমার মারফৎ বি-ঝা ফোন করে জানালেন আনন্দশংকরকে বেলা সাড়ে চারটা নাগাদ।

ততক্ষণে কলকাতার প্রায় সব টেলিপ্রিন্টারেই অ্যাওয়ার্ডের বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। সত্যজিৎ রায় সেরা পরিচালক. সৌমেন্দু রায় সেরা ক্যামেরাম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যে ছটা। মৃণালবাবুর বাড়ীতে যাব কি যাব না ভাবছি। আমাদের পত্রিকার এক শুভানুধ্যায়ী আমাকে বললেন—'চলো যা ওখানে।' যদিচ মৃণালবাবু ফোনে আমায় দুপুরবেলা বলেছেন—'কাল ফোন করে এসো, এখন থাকব না।'

ভাবলাম—এই পুরস্কারের সংবাদ পাবার পরও কি তিনি বাড়ীর বাইরে থাকবেন! মিনিটে মিনিটে টেলিফোন আসবে। বন্ধু-বান্ধব আর শুভেচ্ছাথীদের আনাগোনায় এতক্ষণে বাড়ী নিশ্চয়ই সরগরম। সুতরাং মৃণালবাবু নিশ্চয়ই থাকবেন।

তবুও সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে যখন চার নম্বর মতিলাল নেহরু রোডের বাড়ীতে ঢুকতে যাব দোতলার ব্যালকনিতে চোখাচোখি মৃণালবাবুর সঙ্গে স্নান সেরে বেশ ফ্রেস হয়েছেন সবেমাত্র মনে হোল। পরনে পাঞ্জাবী পাজামা। ওখানে দাঁড়িয়েই বললেন—'কি ব্যাপার, তোমার তো কাল ফোন করে আসার কথা!'

—এমন গুড নিউজ পাবার পর কাল আসার কোনো মানেই হয় না। বলতে বলতে আমি ওপরে উঠে গেছি। মৃণালবাবু দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন।

—এস।

বসবার ঘরে কেউ নেই। এক ধরনের নীরবতা বিরাজ করছে সারা ঘরটায়। পাশের ঘরটায় গীতা বৌদি কি কাজ করছেন।

—এসো, বাইরে এসে বসি চলো।

চলে এলাম ব্যালকনিতে দুটো গদি-মোড়া টুল নিয়ে।

—তুমি খবরটা পেলে কোথায়?

: আমাদের এন-কে-জি বললেন। আমাদের সিটি অফিসে গিয়েছিলাম দুপুরবেলা। এন-কে-জি আমায় দেখে বললেন—কি গো বি-এফ-জে-এ-রই রিপিটেশন হচ্ছে তো দিল্লীতে। উনিই তখন খবরটা দিলেন।

—কি ব্যাপার দেখো! এন-কে-জিকে তো আমিই ফোন করেছি আনন্দর কাছ থেকে নিউজটা পেয়ে।

সঙ্গীত করতে না করতেই পিপের মত কপে চা। যে বসবার ঘরটা 'এই কিছুক্ষণ আগে অব্দি ছিল নীরব এখন তা আনন্দ-উচ্ছ্বাস-হাসি আর গল্পে মশগুল। আলোচনার বিষয় অবশ্যই মৃণালবাবুর 'কোরাস' আর আনন্দশংকরের সাফল্যে উচ্ছ্বাস।

এত হৈ-চৈর মাঝেও দেখতে পাচ্ছি মৃণালবাবু বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এই পুরস্কার আর 'কোরাস' এর খামতি নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন। 'কোরাস' চলেনি। কেন চলেনি ভেবেছেন কখনও? জিজ্ঞেস করতে বললেন—ত্রুটিতো আমার নিশ্চয়ই কিছু আছে, উপরন্তু বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কে যে অনীহার সৃষ্টি হয়েছে সেটাও অনেকটা দায়ী। তবে একটা কথা বলি, দর্শকদের কাছাকাছি যাবার দায়িত্ব যেমন আমার, তেমনি দর্শকেরও দায়িত্ব আমার কাছাকাছি আসার। দায়িত্বটা উভয়তঃ নয় কি?'

পরের ছবিতে এসব ত্রুটি যাতে না থাকে তার চেষ্টা তিনি নিশ্চয়ই করবেন। বললেনও সেইরকম।

হঠাৎ মৃণালবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তোমায় তো যেতে হবে অনেক দূর, চলে যাও, রাততো হোল।' বাড়ী যে আমার অনেক দূরে একথা মনে আছে দেখছি ওঁর। ভেবে ভালো লাগল। গীতা বৌদি আনন্দশংকরও বললেন সেই কথা।

বেরিয়ে পড়লাম। পেছনের দরজাটা বন্ধ করার মুহূর্তেও কানে এলো ভেতরের ক'টি লোকের আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের ঢেউ তখনও সমান তালে চলছে। চলবেও হয়তো আরও কিছুক্ষণ।

নির্মল ধর

ভারতের হলিউড বলা হয় বোম্বাইকে। কথাটা একবারে অসত্য নয়। সম্প্রতি সেই সাগরপারের হলিউডের সঙ্গে পাল্লা দেবারও চেষ্টার অন্ত নেই। ক্ষমতা থাক বা না থাক 'আমরাই বা কমতি কিসে' এমনি মনোভাব এখানকার তারক-তারকা-প্রযোজক আর ফিল্ম স্মাগলারদের। 'সাউন্ড অফ মিউজিক' থেকে পরিচয়, ডার্টি হ্যারি থেকে খুন খুন বা গড ফাদার থেকে ধর্মাত্মা অন্য কথা বলবে না। এটা তো গেল আইডিয়া বা গল্প চুরির ব্যাপার। রিলকে রিল ফিল্ম যখন চুরি হয়ে চলে আসে এই বোম্বাইয়ের কোনো এক আকাশচুম্বী হোটেলের কোনো এক নম্বর ঘরে, ষোল মিলিমিটারের প্রেজেকটর দিয়ে যখন দেয়ালে বা সাদা

আবিষ্কার
শর্মিলা/রাজেশ

পর্দায় ফুটে ওঠে সুইডেনের কোনো নিষিদ্ধ ছবি বা ব্লু ফিল্মের লোম খাড়া হয়ে ওঠা কোনো দৃশ্য—তখন সত্যিই মনে হয় হলিউডেই আছি আমরা।

বোম্বাইয়ে স্মাগলড হয়ে আসে বেশীর ভাগই ব্লু-ফিল্ম। কোলাবা আর পেডার রোড আজ ব্লু-ফিল্মের স্বর্গ। এখানকার বাধিষ্ণু বেশ্যালয়ে এইসব ছবি নিয়মিত দেখানো হয়। দর্শনী ছবির দৈর্ঘের উপর নির্ভর করে। 'মাল' কতটা আছে ছবিতে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাধারণত পঞ্চাশ থেকে একশ টাকা দক্ষিণা। বাইরের লোককে অবশ্যই ঢুকতে দেওয়া হয় না। দালালদের সঙ্গে পরিচিত থাকলেই প্রবেশপত্র মিলবে।

কিন্তু তথাকথিত অভিজাত পাড়ায় যখন ঘর অন্ধকার করে এইসব ছবির প্রদর্শনী চলে তখন সেখানে দেখা যায় বোম্বাইয়ের সব দিগ্গজ পরিচালক-প্রযোজক-তারকাদের। একা অবশ্যই নয়, সঙ্গিনী থাকে সকলের। আর সঙ্গিনী থাকলে উত্তেজক পানীয় কিছু থাকতেই হয়। ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মধ্যেও 'উত্তেজনা' বাড়ে। বাড়লে ক্ষতি নেই। প্রশমনের মালমশলা তে আনাই থাকে। প্রচণ্ড খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হয় প্রদর্শনী।

এরাই যখন ছবি করেন আগের দিন দেখা ছবির কথা কল্পনা করেই নায়িকা বা ভ্যাম্পের পোশাক আর ক্যামে[illegible] অ্যাঙ্গলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন [illegible] ব্লু ফিল্মের প্রভাবে বুক আর হিপের [illegible] আছড়ে পড়তে চায় এ[illegible]র ক্লোজ-আপ ফ্রেমগুলো। যুক্তি বুদ্ধির কোন বালাই নেই। বোম্বাই তাই সত্যি এখন হলিউড হতে চলেছে। চেষ্টা চলছে আরও বেশী এগিয়ে যাবার। তবে কথায় আছে না—আসলের চাইতে নকলের দর বেশী। তাই না হয়ে যায়।

•

পতির পুণ্যে সতী[illegible] পুণ্য কথাটা নার্গিস-সুনীলের বেলা[illegible] বুঝি খাটে না। নার্গিসের জনপ্রিয়তা আরব আটলান্টিক পেরিয়ে সুদূর সাগর পারেও বিস্তৃত বলা যায়। তুলনায় সুনীল [illegible] নো-হোয়্যার। এই তো ক'দিন আগে পর্যন্ত প্রায় পাত্তাই পাচ্ছিলেন না দত্ত সাহেব। রেশমা আউর শহেরা হিট হওয়ার পর কপাল খুললো ওঁর। অবশ্য পত্নীর পুণ্যে তিনি ইতিমধ্যে পদ্মশ্রী খেতাব পেয়ে গেছেন। কিন্তু ফিল্ম কেরিয়ারে পদ্মশ্রীর তকমা খুব একটা কাজে আসে নি।

এখন মোড় ঘুরেছে সুনীল সাহেবের। একের পর এক ছবি করে যাচ্ছেন। সব থেকে মজার ব্যাপার বেশীর ভাগ ছবিতে তিনি নায়িকা পাচ্ছেন একেবারে কাঁচা বয়সের মেয়েদের। প্রায় মেয়েরই বয়সী সেই মেয়েরা মৌসুমী জরিন ওয়াহাব মল্লিকা সরাভাই [illegible] রায়—বয়স এদের আর কত হবে। ইচ্ছে থাকলেও খুব বেশী দূর এগোতে [illegible] এদের সঙ্গে। পেছনে আবার রক্ত-[illegible] নার্গিস [illegible] আছেনই। পরাভিন বাবীর [illegible] পার্টিতে একটু [illegible] ফেলেছিলেন নাকি। তাই

হোমফ্রন্ট নাকি একেবারে ফায়ার। অনেক কষ্টে মুখ কাঁচুমাচু করে সেবার তিনি ম্যানেজ করেছিলেন। এখন আবার মহাগুরু প্রেমনাথের পাল্লায় পড়ে সুনীল নাকি সাবেক রাস্তায় ফিরে যাবার চেষ্টায় আছেন। মদে ডুবে থাকছেন সারাদিন। স্যুটিংয়ে যেতে দেরী করছেন, কখনও যাচ্ছেনই না। অর্ধেক কাজ করে নাকি কেটে পড়ছেন। মদের নেশায় মশগুল থাকলে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই ঘটছে এখন সুনীল সাহেবের।

বাজার যখন ও'র এই রকম রমরমে তখনই রিলিজ হোল হিমালয় সে উঁচে। নায়িকা নতুন মেয়ে মল্লিকা সরাভাই। হাউসগুলোর ভেতরের রিপোর্ট বলছে ছবি লাগে নি। সুনীল সাহেব সে জন্য ভেঙে পড়েন নি বিন্দুমাত্র, বরং উল্টে নিজের ডাকু ইমেজ ঠিক রাখার জন্য পোশাক আর ব্যবহারে সাচ্চা ডাকু বনতে চাইছেন। হাতের কাছে যে মেয়েকেই পাচ্ছেন দু-এক হাত দেখে নিচ্ছেন তাদের।

ক বছর বাদে সুনীল দত্তের হঠাৎ এই দুর্নামপ্রিয়তার মূলে দুর্মুখেরা বলছে বেটার হাফ নার্গিসই নাকি অনেকটা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। হবেও বা। দেশে-বিদেশে নানা মহলে লেডী হিসাবে নার্গিসের সুনাম কম নেই। সেই সুবাদে পতির জন্য দু-একজন প্রোডিউসারকে টানা মোটেই কঠিন নয়। তবে পত্নীর পুণ্যে পতি কত দূর এগোয় দেখা যাক।

*

সম্প্রতি এক উপলক্ষে আসরাণী আর বিন্দুকে ইন্টারভিউ করা হয়েছে। ইন্টারভিউয়ার যেমন রসিক তেমনি প্রসঙ্গো উত্তরও। ঐ সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :—

প্রশ্ন :—আসরাণীজী আপনি যদি বিন্দুকে কাছে পান আপনি কি করবেন?

আসরাণী :—আত্মহত্যা ছাড়া কোন গতি থাকবে না আমার, কেন বুঝতেই পারছেন।

প্রশ্ন : বিন্দুজী আসরাণী যদি আপনার শয্যাসঙ্গী হয় কি করবেন?

বিন্দু :—আমি তো হেসেই অস্থির হয়ে যাব। আসরাণীকে দেখলে আমার খালি জেরি লুইসের কথা মনে পড়ে। জেরি লুইসই কোনদিন আমার কাছে এলো না, আসরাণী আসবে কি করে, তবুও যদি এসে পড়ে এক বোতল দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব, দুষ্টুমী করতে দেব না।

প্রশ্ন : বিন্দু কি আপনার কাছে আকর্ষণীয়?

আসরাণী : না, মোটেই না। কারণ তার অস্তিত্বের সর্বত্র আমি পৌঁছতে পারব না।

প্রশ্ন : আসরাণী কি আপনাকে টানে?

বিন্দু : না। ও তো আমার বুক অব্দিও আসবে না। লম্বা মানুষ ছাড়া আমার ভালোই লাগে না।

প্রশ্ন : কি নিয়ে দুজনে দুজনার সঙ্গে কথা বলবেন?

বিন্দু : কথাই বলব না আমি। ওর মুখে একটা দুধের বোতল গুঁজে দিয়ে ঘুম পাড়ানী গান শোনাব শুধু।

আসরাণী : স্বাভাবিকভাবেই ভূগোল আর শরীরতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব—এগুলোই তো ওর আসল সাবজেক্ট।

প্রশ্ন : ওকে সন্তুষ্ট করতে আপনি কি করবেন?

আসরাণী : আমি কেন কেউই ওকে খুশী করতে পারবে না। সুতরাং পালানো ছাড়া আর উপায় কি?

বিন্দু : বুঝতেই পারছেন আসরাণী আমার কাছে কি চাইবে। এবং চেষ্টাও করবে। পারবে না কিছু করতে। আমি তখন ওকে হাসাতে চেষ্টা করব।

অভিজিৎ

সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে 'এরা এক যুগ' নামে একটি ছবির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। কাহিনী এবং চিত্রনাট্যরচনা করেছেন অর্চন চক্রবর্তী। ছবিটি পরিচালনা করছেন চিত্রদূত গোষ্ঠী। সংগীত পরিচালনা করছেন যুগ্মভাবে প্রবীর মুখোপাধ্যায় এবং ওয়াই এস মুলেকী। অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায় নমিতা ভঞ্জ চিন্ময় রায় জয়শ্রী রায় কল্যাণ চ্যাটার্জি পিনাকী চ্যাটার্জি শেখর চ্যাটার্জি রবি ঘোষ শিবানী বসু দিলীপ বসু অজয় ব্যানার্জি এবং জ্ঞানেশ মুখার্জি।

তারাশঙ্করের কাহিনীতে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে নির্মীয়মান 'জটায়ু' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ। এই ছবি পরিচালনা করছেন 'উত্তরসূরী' গোষ্ঠীর অন্তরালে একদল তরুণ কলাকুশলী। আলোকচিত্রগ্রহণ সংগীত পরিচালনা এবং সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় কালিপদ সেন ও প্রশান্ত দে। ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন তপেন চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রচিত্রণে আছেন উৎপল দত্ত রবি ঘোষ চিন্ময় রায় দিলীপ বসু সন্তু মুখার্জি মধুমিতা অনামিকা সাহা মানিক রায়চৌধুরী এবং পরিতোষ রায়।

বনশ্রী বসু (একটি মন্ত্রের নামে নাম) একটি নতুন ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে টালিগঞ্জের স্টুডিওতে। পরিচালনা করছেন জ্ঞানেশ মুখার্জি। অভিনয় করছেন অনিল চ্যাটার্জি দীপঙ্কর দে সুমিত্রা মুখার্জি রবি ঘোষ এবং শেখর চ্যাটার্জি। ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন সুধীন দাশগুপ্ত। আলোকচিত্রগ্রহণ করছেন দীপক দাস।

সুদূর নীহারিকা ছবিটির এখন স্যুটিং চলছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী; চিত্রনাট্য লিখেছেন শ্যামল গুপ্ত। ছবির গানগুলিও উনিই লিখেছেন। সংগীত পরিচালনা করছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ শিল্প-নির্দেশনা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে কানাই দে প্রসাদ মিত্র এবং কমল সেন। অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সোমা দে দীপ্তি রায় চিন্ময় রায় রবি ঘোষ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণকুমার সুমিত্রা মুখার্জি। ছবির গানগুলি প্লে-ব্যাক করেছেন হেমন্ত মুখার্জি মান্না দে আরতি মুখার্জি এবং সন্ধ্যা মুখার্জি।

যাত্রিক পরিচালিত 'নগর দর্পণে' ছবিটি এখন মুক্তির অপেক্ষায়। কাহিনীকার হচ্ছেন আশুতোষ মুখার্জি। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। ছবির প্রধান ভূমিকাতে আছেন উত্তমকুমার কাবেরী বসু দিলীপ মুখোপাধ্যায় কৌশিক বসু নন্দিতা বসু ও ছায়া দেবী। নচিকেতা ঘোষ নগর দর্পণের সংগীত পরিচালনা করেছেন।

পীযূষ বসুর পরিচালনায় প্রফুল্ল রায়ের কাহিনীতে 'বাঘবন্দী' ছবির কাজ সমাপ্ত। এটিও শীঘ্র মুক্তি পাচ্ছে। এ ছবির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার সুপ্রিয়া দেবী পার্থ মুখোপাধ্যায় মহুয়া রায় চৌধুরী অসিতবরণ এবং গীতা দে। দীপঙ্কর চ্যাটার্জি ছবির সংগীত পরিচালক।

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'রাগ-অনুরাগ' ছবিটিও এখন মুক্তির অপেক্ষায়। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ছবির কাহিনীকার। এই কৌতুকচিত্রের প্রধান চার-চরিত্রে অভিনয় করেছেন অপর্ণা সেন রঞ্জিত মল্লিক সুমিত্রা মুখার্জি ও অনুপকুমার। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

প্রমোদ লাহিড়ী প্রোডাকসন্সের 'সূর্য-কন্যা' ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রচেষ্টা। ছবিটির স্যুটিং সম্প্রতি চট্টগ্রামে শেষ হয়েছে। পরিচালনা করছেন বাংলাদেশের পরিচালক আলমগীর কবীর। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন রাজশ্রী বসু জয়শ্রী রায় অজয় ব্যানার্জি বুলবুল আহমেদ আহসান চন্দনা ও সুমিত্রা দেবী।

চামচাদের কাছে ক্রমাগত গ্যাস খেতে খেতে জনৈক সুপুরুষ ধনী গুণে নায়কের সহসা গ্যাস্ট্রিক আলসার হবার উপক্রম হতে সে স্থির করল—নাঃ, আর গ্যাস খাব না। গ্যাসের গুঁতোয় প্রচুর টাকা পয়সা এবং পাঁজশন নয়-ছয় হয়ে গেছে। কাজ-কারবার লাটে চড়েছে। আত্মীয়-স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে শুনেছে সবাই ছ্যা ছ্যা করছে। অতএব নো মোর গ্যাস। আজই মোসায়েবদের মানা করে দিতে হবে।

যা ভাবা সেইমত কাজ।

সেদিনই সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলে স-পারিষদ বসে ভাল-মন্দ খেতে খেতে নায়ক আচমকা ঘোষণা করল—দেখ, একটা কথা আজ তোমাদের স্পষ্ট করে বলছি—আমাকে অতঃপর আর কেউ গ্যাস দিতে চেষ্টা করো না। কারণ আমি স্থির করেছি—আমি আর গ্যাস খাব না।

শুনে চামচাদের তো মাথা খারাপ হবার দাখিল! এ আবার কী ধরনের অলক্ষুণে কথা? বড়লোকের নাদুস ছেলে গ্যাস ছাড়া আর কী খাবে? পৃথিবীতে ওর চেয়ে উপাদেয় খাদ্য কী আছে? চামচারা ভাবল—গ্যাস ছাড়া তাদের তো আর কিছু খাওয়াবারও নেই। তাদের চাকরীই হচ্ছে সময়ে অসময়ে মালিককে ধরে কিছু না কিছু গ্যাস খাইয়ে দেওয়া। এখন খোদ, ইনিই যদি সেই গ্যাস গিলতে অস্বীকার করেন, তাহলে তো কেলেঙ্কারী। চাকরী নট। কি হবে?

দুর্ভাবনায় পানীয় আর নামে না গলা দিয়ে। চিলি চিকেন জিভে বিস্বাদ লাগে। এখন হয়েছে কি, বড় চামচা যে, ফিল্ম লাইনের ঘাঘু, সে এক পলক চিন্তা করে বলল—নাঃ, তোমরা কেউ আর গ্যাস দেবার চেষ্টা করো না। উনি আর গ্যাস খাবেন না। কিছুতেই না। তোমরা হাজার চেষ্টা করলেও না।

শুনে নায়ক খুশী। মুখে হাসি ফুটল তার। আর সেই হাসি দেখে হেড চামচা আরও খুশী। যাক, ওষুধ ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবারো বলল—কখনো না, উনি ওঁর সিদ্ধান্তে অটল গ্যাস আর খাবেন না। খাবেন না, খাবেন না। দেখি কে ওঁকে গ্যাস দেয়—

চামচাবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠল— ঠিক ঠিক, দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে ওঁকে আজ গ্যাস দেয়! উনি কিছুতেই আর গ্যাস খাবেন না। ঠিক বলেছি কিনা বলুন স্যার?

নায়ক ঘাড় নেড়ে সহাস্যে অনুমোদন করলেন—কারেক্ট। আমি জীবনে আর গ্যাস খাব না। দিতে এলেও না।

হেড চামচে সঙ্গে সঙ্গে বলল—দিতে আসবে মানে? তাহলে আমরা এতগুলো মানুষ রয়েছি কোন কম্মে? গ্যাস আপনি খাবেন না, আজ থেকে এটা ফাইন্যাল। এর আর নড়চড় হবে না।

সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ যেন পাকা হয়ে গেল।

তারপর আবার কিছুক্ষণ খানা-পিনায় কাটল। চকুম-চুকুম ঠং-ঠং আওয়াজে ব্যাপারটা স্থগিত রইল।

এরপর একজন ইনফিরিয়র চামচা কি যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। হেড-চামচা তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠল—নো নো, গ্যাস দেবার কোন রকম চেষ্টা করো না বৎস। উনি গ্যাস আর খাবেন না। নাথিং ডুইং!

নায়ক গম্ভীর মুখে বলল—কারেক্ট।

হোটেলের বেয়ারা বিল নিয়ে এসে নায়ককে হাসিমুখে কি একটা বলবার উপক্রম করতেই চামচারা হৈ হৈ করে উঠল—উঁহু, উঁহু, একদম না। গ্যাস দেবার কোন রকম চেষ্টা করবে না। উনি আর ওটি খাবেন না মনস্থ করেছেন। অতএব তুমি এখন কেটে পড়—

বেয়ারা হতভম্ভ। সে বলতে এসেছিল অমুক হিরোইন একটু আগে ফোন করে জানতে চাইছিলেন যে উনি ওখানে আছেন কিনা! সে ভাবল—মরুকগে ছাই, আমার আবার অত কথায় কি কাজ! আমি বিল ধরাতে এসেছি। ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়ি—

চামচারা সেই বেয়ারাকে সেলাম বাজাতেও দিল না। ওটা নাকি এক ধরনের গ্যাস। ক্যাশ খসিয়ে নিয়ে যায়। স্যার আপনি ওটা একেবারে খাবেন না…।

এরপর আর কি! চামচারা ঘুরছে ফিরছে আর ঘাড় নেড়ে বলে চলেছে—উঁহু, উনি আর গ্যাস খাবেন না। দিতে এলেও না। ঠিক বলেছি কিনা স্যার?

সহাস্যে অনুমোদন পাওয়া যায় নায়কের—কারেক্ট। এনি থিং বাট নো মোর গ্যাস—

এরপর এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তখন আর চামচারা নয়, নায়ক নিজেই লোকজন ডেকে বলে দেয়—গ্যাস দেবার চেষ্টা করো না, আমি আর কিছুতেই গ্যাস খাব না। ফাইন্যাল।

আর সংগে সংগে চামচাবাহিনী বলে ওঠে—ঠিক বলেছেন স্যার ভদ্দরলোকের ছেলের এক কথা—গ্যাস আর খাব না।

অনেক দিন বাদে সেবার বোম্বে গেছি। দাদর স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজছি। হঠাৎ সেই নায়কের সংগে দেখা হয়ে গেল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। নায়কের সংগে আমার বরাবরই ভাল সম্পর্ক। আমরা বহু ছবিতে একত্রে কাজ করেছি। ও মাঝে মাঝে আমায় ওর থিয়েটারেও টেনে নিয়ে যেত। আর চেষ্টা করতো—খাব গে। এই নায়ক কলকাতায় এক সময় খুব চালু ছিল। নায়িকারাই ওর নাম সাজেস্ট করত। মানে প্রযোজক-পরিচালকরা যাতে সেই ছবিতে ওকে নায়ক নেয়। সত্যি ছিল তো! নায়িকারা বাংলায় এখনও হিরো সাজেস্ট করে না। এ নায়ক অভিনয়ে বিদায় পারদর্শী ছিল, বিশেষ করে বায়োস্কোপের নায়িকাদের তুষ্টি বিধানে ওর জুড়ি ছিল না বললেই চলে। সে অবশ্য অন্য ব্যাপার।

দাদর স্টেশনে দেখে প্রশ্ন করলাম—কি কেমন আছ?

—নেই।

—নেই মানে? শুনলাম তুমি এখানে দু-একখানা ছবি পেয়েছো।

বিরস হেসে নায়ক বলল—শুধু দু-খানা নয়, অনেকগুলোই পেয়েছিলাম। কিন্তু বরাতে টিকল না। ক্যান্সেল হয়ে গেল।

—কেন? আমি রীতিমত অবাক। —ছেড়ে দিলে নাকি?

—না। ছাড়িয়ে দিল। চামচারা। গ্যাস খাব না স্থিরই করেছিলাম, কিন্তু পরে বুঝলাম আসলে ওটাই গ্যাস। ওরা বললে ওই থার্ড গ্রেড হিরোইনের সঙ্গে কাজ করলে তোমার মার্কেটে ডিম্যান্ড কমে যাবে। আমি ভাবলাম তাই বুঝি বা! কলকাতায় টপ হিরোইনদের সংগে কম্মো করে এখন এসব আনপড় মেয়েদের সংগে এ্যাকটিং করা বাস্তবিক বিলো দা ডিগনিটি—ফট করে ছেড়ে দিলাম। হয় স্যারা (সায়রা) দাও নতুবা ফুটে যাও…। ওরা ফুটেই গেল।

—আর চামচারা?

—চামচারা রয়ে গেল। ওরা আর কোথায় যাবে!

আমি জানতাম।—এঃ, এভাবে নিজের পায়ে কেউ কুড়ুল মারে কখনও দেখিনি। এখানে এসে আমাকেও চামচা জোটালে?

—কই জোটালাম? ওরা তো কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো। আমি আর বারণ করি কি করে। আফটার অল অ্যাম্বিনের সঙ্গী, ফেলে তো আর দিতে পারি না—

—তোমার খরচপত্র সব চলছে কি ভাবে?

গম্ভীর মুখে নায়ক এবার বলল—চামচারাই চালিয়ে দিচ্ছে। আমি ওদের অ্যাম্বিনের সঙ্গী, ওরা ফেলে তো আর দিতে পারে না।

—চামচরাই বা জোগাড় করছে কোত্থেকে?

—কেন, ওরা এখন নতুন হিরো পাকড়াও করছে যে। সেই সঙ্গে আমার জন্যেও প্রাণপণে চেষ্টা করছে। তবে আমি তো জানি আমি পড়তি—আমাকে চট করে তোলা খুব শক্ত। তারপর পুণা ইনস্টিটিউট লাইনে যা ছাড়ছে বছর বছর, এখন একটা সাব-হিরোর কাজ জোটাতে পারলেই বর্তে যাই।

এখন এই নায়ক কে হতে পারে আপনারা ভাবতে থাকুন। একটু চেষ্টা করলেই ধরে ফেলতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আর একান্তই যদি না পারেন, পরের কয়েকটি সংখ্যা ফলো করুন, আমি জলজ্যান্ত উপস্থিত করে দেব একে।

মেয়েটিকে দেখতে এমন কিছু নয়, কিন্তু দারুণ সেকসস্যাটিং। ফিল্মে যেটা বেশী প্রয়োজন। শো বিজনেসে শো-টাই হচ্ছে বড় কথা। এসেছিল আচমকা। স্টুডিওতে। একসট্রার পার্টের জন্যে। এক্সট্রার এক শিফটের পারিশ্রমিক দশ টাকা। সাপ্লায়ার তা থেকে কমিশন কেটে হাতে দেয় সাত টাকা। আর সুপার এক্‌স্ট্রা পায় বিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। যেমন রেট তেমন কমিশন।

এ-মেয়েটি সুপার। বিয়ের সেটে বা কলেজে নায়িকার সঙ্গিনী দারুণ মানায়। তখন ওখানে একজন জহুরী ঘোরাঘুরি করছিল। মেয়েটি হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল। সাবাশ! একে খেলিয়ে তুলতে পারলে তো অল্প দিনের মধ্যে হিরোইন করা যায়। ব্যাস, অমনি সে কাজে লেগে পড়ল।

—আপনি ছবিতে কাজ করবেন?

সামান্য একটু দ্বিধা, তারপরই মেয়েটি—হ্যাঁ।

—আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলেছে?

—কথা বলেছে মানে? মেয়েটি অবাক।

—মানে ছবিতে নামানোর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে এর আগে কারও কথাবার্তা হয়েছে?

—কই না-তো। মেয়েটির বিস্মিত উত্তর।

—আপনি আজ এই প্রথম স্টুডিওতে এলেন? না এর আগেও কখনো কখনো এসেছেন।

—না। আমি আজ এই প্রথম এলাম।

...আপনি কে? ...

—আমি...আমি এখানে কাজ করি। ফিল্মের লোক। আপনি কোথায় থাকেন?

মেয়েটা চতুর।—কেন বলুন তো?

—এইজন্যে যে আমি হয়ত আপনার উপকারে আসতে পারি। আপনি ফিল্মে নামতে চাইছেন, আমি চেষ্টা করলে আপনাকে ভাল ছবিতে যোগাযোগ করিয়েও দিতে পারি—

কথাগুলো খুব সতর্ক ভঙ্গীতে লোকটি মেয়েটিকে বলল। ধীরে সুস্থে ওজন করে করে।

এ খেলার যা নিয়ম!

—আমি থাকি বেহালায়।

লোকটি কি করে আন্দাজ করল যে মেয়েটি বিবাহিত? শাঁখা নেই সিঁদুর নেই, নাট কোন কিছু। অথচ সটান প্রশ্ন করল—আপনার স্বামী কি করেন?

মেয়েটি চমকাল। সামলে নিয়ে বলল—আমার বিয়ে-ই হয়নি।

টিপটিপ করে হাসল লোকটি। যেন ধূর্ত শেয়াল হাসছে।—কেন চেপে যাচ্ছেন? যাকগে। বাড়ির দিক দিয়ে কোন আপত্তি আসবে না তো?

—নাঃ।

—গুড। তাহলে ফিফটি ফিফটি হবে কিন্তু আপনার সঙ্গে।

—মানে? ভ্রূভঙ্গি করল মেয়েটি।

—অর্থাৎ আপনার যা দর ঠিক হবে আমি তার আধেক ক্যাশ নিয়ে নেব। তখন গাঁই-গুঁই করলে হবে না কিন্তু।

মেয়েটি একটুও ভাবল না। বলল—টাকার আমার দরকারই নেই। যা হয় নেবেন। কিন্তু ভাল পার্ট না হলে করব না কিন্তু।

লোকটি নিঃশব্দে মুখ টিপে শুধু একবার হাসল।

আপনি এখন কোথায়? কলকাতা বোম্বে না মাদ্রাজে? আপনি আমার লেখা পড়ছেন কি? শুধু খেয়াল করতে থাকুন, আমার এই যে স্টেটমেন্ট—আসলে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আপনিই যেটা আমায় দিয়েছিলেন, সেটা হুবহু মিলে যাচ্ছে কিনা? না মিললে, যখন দেখা হবে সংশোধন করে দেবেন।

না আপনার কোন দোষ নেই। ফিল্মে সবাই তো কোম্পানীর কাজে আসে। আপনিও এসেছিলেন। মেয়েদের এখনকার আখড়া যে আমার কুইন—টস-ও তো এক দক্ষিণ ভারতীয় টাইকুনের হাতফেরতা। ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিল। এখন সরকেও রয়েছে। থাকবেও কিছুকাল। কিন্তু আপনি অত অস্থির হয়ে পড়ছেন কেন? গোটা কতক লোক

আপনাকে দাগা দিয়েছে বলে? সে তো জানা কথা ছিল। শো বিজনেসে কে কবে উঁচু ডালে উঠতে পেরেছে নীচের ডালে পা না রেখে? আপনি বরং ভাবুন না—ওরা নীচের ডাল। তাহলেই জ্বালা কমবে। জীবনে শান্তি আসবে। আর ভাবুন সেই সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে ওদের নালিশের কথাও। আপনি তো ওদেরও দাবার ঘুঁটি হিসবে কিছুকাল চেলেছেন।

আপনার খামখেয়ালিতে মদত দিতে গিয়ে ছকুলালের শেষ পর্যন্ত কি হাল হয়েছে সেটাও আপনার ভোলা উচিত নয়। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেছেন ওই শয়তান-টার হাতের টিপ সেদিন অব্যর্থ হলে অ্যাসিড বাল্বটা আপনার মুখেই ফাটতো—ছকুলালের মুখে নয়! গত বছর চৌরঙ্গীতে ছকুলালকে এক পলকের জন্যে দেখেছিলাম। উঃ। ওর মুখের দিকে তাকাতেই আমার ভয় করেছিল, আপনার তো ভীষণ ভীষণ ভয় করবে। ভয় নেই, সে-কথায় আসব না।

•

গ্ল্যামারের জগতে দর্শনধারী ব্যাপার-টাই সর্বাগ্রগণ্য। সব সময় একসাইটমেন্ট চাই এখানে। উত্তেজনা না থাকলে এখানে কেউ বাঁচতে পারবে না—বাঁচা সম্ভব নয় বলেই। এটা কোন মাছি মারা কাজ নয়, এখানে দুর্দান্ত ক্রিয়েটিভ যা কিছু হয়। অর্থ আর অনর্থ এখানে তাই পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে! (দেখুন, দেখুন ফাঁকতালে রঞ্জন কেমন জ্ঞান দিচ্ছে—ভাই, মোদ্দা কথায় এস—তারপর কি হল এখন তাই বল...)

তারপর সেই দুধর্ষ শিল্পপতি, তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এখানে যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর মিটিং চলছে। সুন্দরী স্টেনো শর্ট হ্যান্ড নোট নিচ্ছে। তার বুকের আঁচল আলগা হয়ে নেমে গেছে। ডিরেক্টর হঠাৎ পাউন্ড শিলিং পেন্সে আটকে আছেন। পরের কথাটা তাঁর মগজে আসছে না।

টাউটটি সসম্ভ্রমে—স্যার!

অর্ধস্ফুট ইঙ্গিত—ইউ মে গো নাউ—

টাউট আউট। বাইরে দরজার ল্যাচ পড়ার মৃদু শব্দ।

—বস।

—তুমি কি হতে চাও? ...সিনেমার অ্যাকট্রেস? না এয়ার হোস্টেস? দুটোই এক-সাইটিং জব। হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার মোস্ট?

পুরো সেকসাইটিং ব্যাপারটা নড়ে-চড়ে ওঠে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মেয়েটি যেন মৃদু মৃদু ঘামতে আরম্ভ করে। সে কি চাইলে এখনি লিজ টেলর হতে পারে? চাইলে রিচার্ড বার্টনের কল্পলক্ষ্মী হতে পারে? সেঞ্চুরী ফকসের ফাইভ মিলিয়ন ডলার কন্ট্রাক্টে সই করে কাগজে হেড লাইন হিট করতে পারে? না পাখি হয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো জেটে বোম্বে-লণ্ডন-প্যারি-নিউইয়র্ক বাই-উইকলী ফ্লাইট নিতে পারে? সমস্ত ব্যাপারটা যেন অখণ্ড একটা খেলা মোশান মন্তাজ প্রোজেকশান।

মেয়েটির চোখে জল এসে গেল।—আমি সিনেমার নায়িকা হতে চাই, খুউব বড় নায়িকা—

বেকুফ স্বামীটি একদিন স্টলে দাঁড়িয়ে থরে থরে সাজানো কাগজে সেক্স দেখছিল, হঠাৎ তার চোখটা যেন ঠিকরে গেল। একি? এই মেয়েটি কে? এই যে মারাত্মক একটা সেকসাইটিং পোজে সেন্টার স্প্রেড ব্লো-আপ ছবিতে মুখে এক টিমটি নটোরিয়াস হেসে দাঁড়িয়েছে। এ যে... এ যে...

তার হাতের ব্যাগটি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। সুখের পাখি অনেক অনেক দূরে। বহু দূরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডানলোপিলো নরম শরীরে সে তখন সাঁতার কাটছে কেরিয়ারের সফেন সমুদ্রে। আর নেপথ্যে ফিল-হারমোনিক অর্কেস্ট্রা অন্তত। আড়াইশো হাণ্ডে চার্জ হয়ে যাচ্ছে বাতাসে বাতাসে। ইয়াঃ!

•

পরিচালক জানত—এ কে।

শুধু দুঃখ করে তার সহকারীকে বলে-ছিল—সারা জীবন জঞ্জাল সাফ করেই গেলাম। ফিল্ম লাইনে না এসে আমার কর্পোরেশানে যাওয়াই উচিত ছিল। ওর জিভের এখনও আড় ভাঙে নি—আর এই রকম একটা ডিফিক্যাল্ট রোলে ও অভিনয় করবে? অসম্ভব।

মেয়েটি জানত আসলে কি সে? কিছু না জেনে ক্যামেরার সামনে এলে ক্যামেরা রেহাই দেয় না।

টাউট ফিস ফিস করে বলে দিল—ম্যানেজ করে নাও। উনিই সব।

সেকসাইটিং আবার নড়েচড়ে বসে। মাথার ওপর জ্বলছে দশ কিলোওয়াটের চড়া আলো। এতে অন্ধকার অনেকটা কেটে গেছে। অনেক দূরের রাস্তার কিছুটা দেখা যাচ্ছে। অতএব বাকি পথটা যাওয়ার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

আপনার আর কতটা যেতে বাকি আছে? না না মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই. সত্যি করে বলুন তো। বোম্বে মাদ্রাজ কলকাতায় ঘুরে এ প্রশ্নের সমাধান পাবেন না। পেলে এখানেই পাবেন। যেখানে আপনার শুরু। এখন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করুন।

রঞ্জন মজুমদার

সূত্রধারের পটভূমি দৃশ্যমান

অনেক সময় এমন হয় ওপর থেকে আমরা আমাদের নিজেদের চিনতে পারি না; আমাদের অস্তিত্ব এবং রিপু কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে তার সঠিক হদিশ পাই না।

সেই চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যিনি সাধা-রণত নিয়ে থাকেন যাঁর আয়নায় নিজেদের চরিত্রের প্রতিফলন আমরা দেখতে পারি তিনি অবশ্যই একজন নাট্যকার।

আমাদের আজকের জীবনে তাই একজন সমাজ সচেতন নাট্যকারের ভূমিকা অনেক-খানি।

অগ্নিমিত্র সুখ্যাত নাট্যকার। তাঁর এই নাটকে যেসব চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে তারা আজকের সমাজের কোন না কোন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করছে। লেখক সাংবাদিক নেতা প্রযোজক অফিসার আশ্রম পরিচালক তথা-কথিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ইত্যাদি যে চরিত্র-গুলি এই 'পটভূমি দৃশ্যমান' নাটকে উপ-স্থাপিত করা হয়েছে তাদের অস্তিত্ব আজকের সমাজে অমূলক বা অনুপস্থিতও নয়।

কিন্তু নাটকে যেভাবে তাদের উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তাদের যে গতিবিধি এবং মুখে সংলাপ আরোপিত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। তা হোল সব চরিত্রগুলিই কি আক্ষরিক অর্থে সত্য অতিরঞ্জনের একটা ঝোঁক কি নাটকের কোথাও নেই?

নাটকে কিছু স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব চরিত্র আছে। কিন্তু তাদের শিকার চরিত্র আছে এবং কিছু সৎ থাকার প্রচেষ্টাকে যে বাঁচিয়ে রেখেছে এমন চরিত্রও আছে। কিন্তু কেন যেন মনে হয়েছে এরা যেমন সর্বৈব সত্য নয় তেমনি সঠিক অর্থে সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রও নয়।

নাট্যকার এ সম্পর্কে একটু ভাবলেই বোধহয় কথার সত্যতা অনুভব করতে পারবেন।

গ্রামের নিরীহ মানুষের সরলতার এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এক জাতের মানুষ আগেও যেমন এখনও তেমনি নিজেদের স্বার্থ

পুষণ করে থাকে। তারা নীরবে পড়ে মার খায় এবং অশাক হয়ে মুখোস পরা ভালো মানুষদের দেখে। কিন্তু একদিন তারা বিদ্রোহ করবেই।

এই পর্যায়ে নাটকে হাবা চরিত্রের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। (প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অন্য একটি নাটকে ইতিপূর্বে এ ধরনের চরিত্র চিত্রণ ঘটেছে এবং সে চরিত্রটি সেই নাটকে বিস্ফোরণের মতই কাজ করেছে বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। নাটকটির নাম 'কৃষ্ণপক্ষ'। তবে সে চরিত্রের সংগে বর্তমান নাটকের হাবার নীতিগত মিল থাকলেও উপস্থাপনা ভিন্ন। কিন্তু এর মত সেও একদিন বিদ্রোহ করেছিল।) হাবা যেন পড়ে পড়ে মার খাওয়া আজকের সমাজের সেইসব সৎ অথচ অক্ষম মানুষের প্রতীক। যে চিরকাল বঞ্চিত হয়েও একদিন সহসা মুখ ফুটে উঠে প্রতিবাদ জানায় অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে। কোন বর্বর শক্তিই তখন তাকে দমাতে পারে না। পটভূমি তখনই সত্যিকারের দৃশ্যমান এবং কমবেশী কম্পমান হয়।

এ নাটকের কুশীলবদের সবারই গতিবিধি মোটামুটি স্বাভাবিক। তবে তার মধ্যে হাবা (সলিল গঙ্গোপাধ্যায়) নির্লেপানন্দ (রঞ্জিত দত্ত) এবং তমসা (অর্পিতা মজুমদার) দর্শকদের মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছে। কোন কোন দৃশ্যে বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে তমসা সত্যই সুন্দর।

দিব্যেন্দু রায় (কিনু) শিশির রায় (অজয়) রমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেংগা) অভিজিৎ ঘোষাল (অনঙ্গ) শচীন ভট্টাচার্য (সুদর্শন) সুনীল ঘোষাল (অঘোর) গঙ্গারাম পাল (ভুলু) ও শম্ভু পাল (নিশাকর) চরিত্রানুযায়ী। তবে এদের মধ্যে কারুর কারুর অভিনয়ের দিকে আরও একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। যে অভাবটুকু এ নাটকে চরিত্রবিশেষে লক্ষ্য করা গেছে। সেই সংগে নাট্যকার যদি নাটকটিকে আর একটু সম্পাদনা করেন তাহলে নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

মঞ্চ পরিকল্পনায় দৈন্য লক্ষ্য করা গেছে। এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে সচেতন দৃষ্টি আশা করি। আলোর কাজ নাটকের পক্ষে মোটামুটি সহায়কই হয়েছে। আবহ-সংগীত (প্রশান্ত দত্ত) স্থান বিশেষে একেবারে কাজ করেছে।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন নাট্যকার স্বয়ং। এমন একটি ভাববার মত নাটক উপহার দেবার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

নাট্য সমালোচক

'পটভূমি দৃশ্যমান' নাটকে শিশির রায়/অর্পিতা মজুমদার

যুগোশ্লাভিয়ার ছবি

বয়সের দিক থেকে যুগোশ্লাভিয়ার ছবি খুব প্রাচীন না হলেও চলচ্চিত্র শিল্পের আধুনিক ব্যাকরণ প্রকরণ ও ধারার সংগে যে সম্যক পরিচিত এটা প্রমাণিত হয়ে গেল সদ্য সমাপ্ত উৎসবের সাতখানি ছবি দেখার পর। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ছবিতে যে আদর্শবাদ ও মানবিকতার ছোঁয়া থাকে যুগোশ্লাভিয়ার ছবিও তা থেকে মুক্ত নয়। তবে কট্টর প্রচারধর্মিতা কোনো ছবিতেই নেই। একটা দেশের সামগ্রিক চেহারাটা দু-একটা তুলির আঁচড়ে জানার পক্ষে এই ছবিগুলোই যথেষ্ট।

সাতদিনের এই ছবির মেলা যুগোশ্লাভিয়া দেশটার একটা ছোট্ট পরিচয় আমাদের কাছে এনে দিয়েছে। আমরা জানতে পারলাম তাঁদের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা চেয়ারম্যান টিটোর যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষতার গল্প। সবচেয়ে মজা লাগল এটা জানতে পেরে যে ওদেশেও প্রভাবশালী লোক ছাড়া চাকরীও আজকাল নাকি পাওয়া যায় না।

যেহেতু এই উৎসব ভারত-যুগোশ্লাভ সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর অঙ্গ—সুতরাং ছবির নির্বাচনে জন সন্তুষ্টির দিকেই লক্ষ্য ছিল বেশী নইলে পেত্রোভিক বুলোজিক বা মাকাভেজের ছবি অন্তত থাকত। এঁদের ছবির অনুপস্থিতি উৎসবকে ম্লান করেছে বলছি না তবে উৎসব আরও জনপ্রিয় হ'ত পারত আর কি। যাই হোক দেখা ছবির কথাতেই আসি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পার্টিজান মুভমেন্ট কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো স্বাভাবিক কারণেই তিনখানা ছবির উপজীব্য ছিল। মানবিক আবেদনে ও নাট্যগ্রন্থনায় ওয়াল্টার ডিফেন্ডস সারাজিভো (হাজরুদিন ক্রুভাক) তিনটির মধ্যে সেরা ছবি। জার্মাণ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে ওয়াল্টারের রোমহর্ষক গুপ্তচর বৃত্তির কাহিনী নাকি যুগোশ্লাভদের কাছে রূপকথার গল্পের মত। পরিচালক সেই চরিত্রকে অত্যন্ত বাস্তবতার সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুখজেংকা (স্টিপ ডেলিক) সম্পর্কে যে ধরণের প্রশংসা ও সমালোচনা আগেই কানে এসেছিল—ছবি দেখার পর মন তেমন

অভিনীন। অবশ্য দীর্ঘমান হয়েছে ছবিটিকে। মূল গল্পের শাখা-প্রশাখা বিস্তারে চেয়ারম্যান টিটোর চরিত্র যেন ঠিকমত প্রকাশিত হয়নি। দৃশ্যবিন্যাস ও গ্রহণে মুন্সিয়ানার ছাপ আছে বটে কিন্তু আসল গল্পটাই যে হারিয়ে গেছে মাঝে মাঝে। সুৎজেস্কা দখলের মরণপণ সংগ্রামের ওপর এটি একটি বিখ্যাত দলিল চিত্রের মর্যাদা নিশ্চয়ই পাবে কারণ সেই যুদ্ধের পরিচালক স্বয়ং চেয়ারম্যান টিটো। এর বেশী কিছু নয়। আর রিচার্ড বার্টনের অভিনয়। মিওমির স্টামেনকোভিক পরিচালিত হার্ট টু ডাই পার্টিজান আন্দোলনের ওপর প্রথম দিককার ছবি। দুই যোদ্ধার স্বার্থহীন আত্মত্যাগের গল্প এখানে বিধৃত। এই জাতীয় কাহিনী নিয়ে একাধিক ছবি হয়েছে বটে কিন্তু পরিচালনগত সৌকর্য ও অভিনয়ে এ ছবি স্মরণীয়। ছোট ছোট ডিটেলের কাজ চোখ ভরে দেখার মত।

উৎসবের অন্য চারটি ছবির মধ্যে পেরো এন্ড হিজ কম্প্যানিয়নস (ভ্লাদিমির তাদেজ) একটি শিক্ষামূলক উপভোগ্য শিশুচিত্র। বাকি তিনটি ছবি চরিত্রে ও চেহারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ছবি তিনটি থেকেই আজকের যুগোশ্লাভিয়ার কিছু পরিচয় আমরা পাই। ওদেশের সমস্যা যুবক-যুবতীদের মানসিক গঠন জাতীয় চরিত্র ইত্যাদির আভাষ আছে এই ছবিগুলিতেই। স্বাভাবিক কারণেই এই

হোয়েন লিও কামস ছবির একটি দৃশ্য
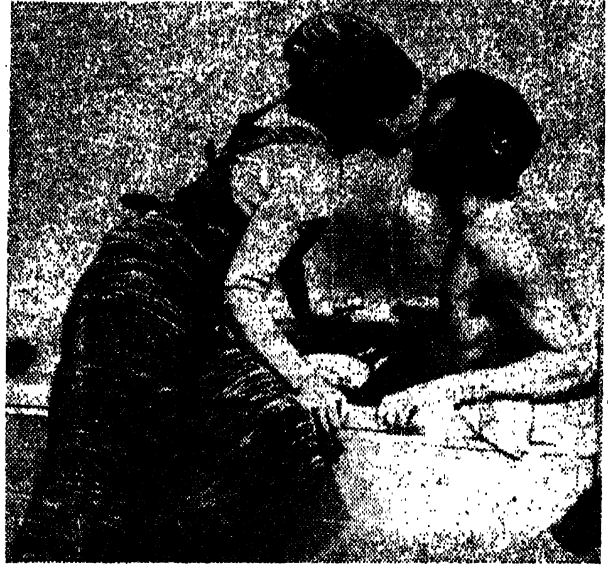
ছবিগুলো তাই সাধারণের কাছেও প্রশংসিত হয়েছে।

উন্নতিশীল দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা যে কত প্রকট এবং সেই কারণেই মানবিক সম্পর্কগুলো যায় ভেঙ্গে—একথাই বলা হয়েছে টু লিভ বাই লভ (ক্রিসো গোলিক) ছবিখানিতে। প্রেমিকের পড়াশুনোর খরচ চালাবার জন্য নিজের লেখাপড়া ছেড়ে দূর গ্রামে চাকরী নিয়ে চলে যায় প্রেমিকা। জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে দুজনেই বুঝতে পারে জীবনের জটিলতা কি! প্রেমিকার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা হয় ক্ষোভ প্রেমিক পড়াশুনো ছেড়ে দেয়। দুজনার পথ যায় আলাদা হয়ে। পরিচালক বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতেই ছবিটিকে তুলে ধরেছেন। আজকের যুবসমাজের ছায়া আছে চরিত্র দুটিতে।

বোগ্‌ডান হুদিক পরিচালিত হোয়েন লিও কামস এক নয়ন-ম্যানিয়াগ্রস্ত অস্থির যুবকের কাহিনী। জন্ম তার সিংহ লগ্নে নামও লিও। আচার ও চরিত্রে সে তাই সিংহ হয়ে উঠতে চায় শেষ অব্দি তার এই অস্থিরতাই জীবনের দুঃখের কারণ হয়। দুদুটো মেয়েকে ভালোবেসেও সে তাদের কাউকে আপন করে নিতে পারল না। সিংহ ফোবিয়াক্রান্ত লিও শেষ পর্যন্ত চিড়িয়াখানার এক সিংহকে ঘরে নিয়ে এল। পরিচ্ছন্ন একটি কমেডি চিত্রের বেশী মর্যাদা এ ছবি পেতে পারে না। কারণ এ ছবির মধ্য দিয়ে তেমন কোনো গভীর বক্তব্যও রাখতে পারেননি।

উৎসবের সেরা ছবি ছিল অবশ্য দূর গ্রামের এক নির্জন পাহাড়ী এলাকার—পটভূমিতে তিনটি চরিত্রের (বাপ ছেলে আর পুত্রবধূ) এক জটিল আত্মিক সংকটের কাহিনী। ছবির নাম উই আর বিউইচড আইরিন। পরিচালক—কোলে অ্যাঞ্জেলোভস্কি। ছেলে যুদ্ধে চলে যাওয়ায় বাবা আর পুত্রবধূ রয়েছে বাড়ীতে। নির্জন পাহাড়ী পরিবেশে পারস্পরিক নির্ভরশীল জীবনযাপন সমস্ত সংস্কার আর পাপবোধের কথা ভুলিয়ে দিয়ে যৌবনের তাড়না একদিন দুজনকে কাছে টেনে আনে। মিলিত হয় পুত্রবধূ আর পিতা। ছেলে ফিরে এসে এই ঘটনা জানার পর প্রতিশোধ নেয় স্ত্রীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। বাবাকেও হত্যা করে নিজেও আত্মঘাতী হবে ঠিক করে। কিন্তু তার আগেই [illegible] মেরে ফেলে প্রায় উন্মাদ স্বামীকে। চরিত্রগুলির মানসিক তীব্র সংকট ও তার বিশ্লেষণ সুন্দর। পরিচালক অত্যন্ত নিপুণভাবে নাটকটিকে তীব্রতম সীমায় নিয়ে উপস্থিত করেছেন। আর অভিনয় তো তুলনারহিত। বাবা জিভো-জিনোভিকের অভিনয় শুধু এ ছবিতেই নয় সুৎজেস্কা ও ওয়াল্টার ডিফেন্ডস সারাজিভোতেও মনে রাখার মতো। এই অল্প কখানি ছবিতে যুগোশ্লাভিয়ার ছবির যে চেহারা পেলাম তাতে ঐ দেশের আরও বেশী ও আরও ভালো ছবি দেখার তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিল। আশা করব ভারত সরকার ও ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া এ ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা করবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই উৎসব উপলক্ষে কলকাতার যুগোশ্লাভ কনস্যুলেটের সহযোগিতায় সিনে সেন্ট্রাল একটি সুদৃশ্য তথ্যবহুল পুস্তিকাও বের করেছিল।

[illegible]

অগ্নীশ্বর

বনফুল রচিত কাহিনীর সার্থক চিত্ররূপ!

পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

যে ডাক্তার জীবনের শুরুতে কামনা করেছিলেন, তিনি যেন ভারতের মাটিতে আর না জন্মগ্রহণ করেন; মৃত্যুর পূর্বে তাঁকেই বলতে শোনা যায় যেন সহস্রবার এদেশে জন্মাই। এই ডাক্তারের নাম অগ্নীশ্বর মুখার্জী। চিত্রটিতে ডাক্তারী জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর চরিত্রের মহানুভবতা, দেশাত্মবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদির পরিচয় মেলে। অগ্নীশ্বরের আরও পরিচয় তিনি সাহিত্যিক এবং চিত্রশিল্পী।

পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অগ্নীশ্বর বিহারের রেলওয়ে হাসপাতালে কাজে যোগ দেন এবং সারাজীবন তিনি নীচতা, লোভ স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। বিরাট কর্মজীবনে যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুছন্দা (সুমিত্রা), সরমা (কাজল গুপ্ত) ও খগেন (দিলীপ রায়)। রায়সাহেবের মেয়ে সুছন্দাকে দেখা যায় নিজের দেহ বিক্রীর অর্থে রিভলবার সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতে। বৃদ্ধ স্টোরবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সরমার পতিভক্তি ও সৎ ছেলেমেয়েদের প্রতি তার মাতৃস্নেহ অগ্নীশ্বরকে মুগ্ধ করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বিপ্লবী খগেনকে অগ্নীশ্বর পালাতে সাহায্য করাতে তার দেশাত্মবোধেরও পরিচয় মেলে। উদারচিত্তে গরীব রোগীদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা, অসুস্থ অবস্থায় নিজের রক্ত দিয়ে সাহায্য ও আরও অনেক মহৎ গুণের সঙ্গেও দর্শকদের পরিচয় মেলে। এ ধরনের চরিত্র আজ দুর্লভ।

দেশ স্বাধীন হবার পর ছেলেও ডাক্তার হয়। অগ্নীশ্বর ছেলের অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি করেন নি, কিন্তু ধনী শ্বশুরের দেওয়া ধন-সম্পদ নেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে তিনি বিবাহ-মণ্ডপ ত্যাগ করেন। পরে পুত্র সব ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে পিতার কাছে আশ্রয় নেয়। পুত্রের দাম্পত্যজীবন পাছে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ভেবে অগ্নীশ্বর নিরুদ্দেশ হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

বনফুল রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর মার্জিত প্রয়োগ কর্মের মধ্যে দিয়ে ছবিটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। কিছু অতিনাটকীয়তা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি সুন্দর চিত্র দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

এ ছবির বিশেষ সম্পদ অগ্নীশ্বরের ভূমিকায় উত্তমকুমারের অভিনয়। চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর অভিনয় মনে রাখবার মত। এ ছবিতে সকলেই সুঅভিনয় করেছেন। বিশেষ ভাল লাগে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও মাধবী চক্রবর্তীকে। একটি ছোট চরিত্রে প্রেমাংশু বসুর (রমজান) অভিনয় সুন্দর।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অসিতবরণ, অসীমকুমার, পার্থ মুখার্জি, ভবেশকুমার, জহর রায়, সুব্রতা, সুলতা তপতী প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ছবির আরম্ভে আগুনের শিখার সঙ্গে নেপথ্যে আগুনের পরশমণি রবীন্দ্রসঙ্গীতটির সুর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গানগুলির প্রয়োগ (বিশেষ করে হেমন্ত-কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলালের ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা) সুন্দর। অন্য দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত (তবু মনে রেখ, পুরানো সেই দিনের কথা) সুগীত। আর একটি বিশেষ সম্পদ এ ছবির সংলাপ।

চিত্রবিদ

বিক্রম প্রিয়দর্শিনী

তুফান

অভিনয়ে, পরিচালনায় ও আঙ্গিকে

একটি উপভোগ্য ছবি !!!

প্রযোজনা—সরগম পিকচার্স

নামে মাত্র রাজা, আসলে রাজ্য শাসন করেন কুচক্রী মন্ত্রী, প্রজাদের উপর অত্যাচার করে কর আদায় করেন। একদা কর আদায় করতে গিয়ে রাজার অনুগত এক রাজকর্মচারীর উপর অত্যাচার করে। সেই রাজকর্মচারীও প্রতিশোধ নেয় রাজার একমাত্র পুত্র সুরজকে চুরি করে। মন্ত্রীর অত্যাচারের সমুচিত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তাকে তালিম দেওয়া হয়। রাজপুত্র সুরজ হয় বাদল, জনতার কাছে অবশ্য সে তুফান। সুযোগ পেলেই তুফান রাজার ধনরত্ন অপহরণ করে প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

একদিন রাজপ্রাসাদে গিয়ে মন্ত্রীর মতলব আর রাজার দুরবস্থার কথা জানতে পারে। জানতে পারে তাঁর আসল পরিচয়। নাটক মোড় নেয় এই ঘটনার পর থেকেই।

মন্ত্রীও তুফানের আসল পরিচয় পেয়ে তাকে নানাভাবে হত্যার চেষ্টা করে। পুত্র দীপককে সিংহাসনে বসানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তুফান ওরফে বাদল ওরফে রাজপুত্র সুরজ বীরবিক্রমে সব সমস্যার সমাধান করে বাবা-মাকে সিংহাসনে বসায় আর নিজেও ফিরে পায় হারানো বাবা-মাকে। প্রেমিকা বরখাও পেল তার প্রেমিককে।

কাহিনীতে নতুন কোন উপাদান নেই, এই ছবির কাহিনী রবিন হুড এবং কাসিকান রাদাসের আধুনিক সংস্করণ বলা যায়। পরিচালক কেদার কাপুর পর্দায় নতুন কোন চমক সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবে অভিনয়ে ও আঙ্গিকে কিছু উপভোগ্য ঘটনাকে উপস্থিত করেছেন। অভিনয়ে—বাদল, সুরজ ও তুফানের ভূমিকায়—বিক্রম এবং বরখার ভূমিকায় নবাগতা প্রিয়দর্শিনী, অনুরক্ত রাজকর্মচারীর ভূমিকায় সজ্জন, রাজার ভূমিকায় জয়রাজ, রাণীমার ভূমিকায় ঊর্মিলা ভাট, জুগনুর ভূমিকায় জগদীশের অভিনয় সাবলীল। অন্যান্য ভূমিকায়—ত্রিলোক কাপুর, বি এম ব্যাস, রাজেন কাপুর, জীবন, রূপেশকুমার, মীনাক্ষী, রঞ্জন হুমায়ুন প্রমুখ চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন।

চিত্রদূত

ঋষিণ মিত্রর সুরে আধুনিক কবিতা : গত ১৪ জুন সরলা মেমোরিয়াল হলে ত্রিসপ্তকের পরীক্ষামূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান 'আধুনিক কবিতার গীতিরূপ' (দ্বিতীয় অধিবেশন) অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশিত হয়। অর্ধশতাধিক কবিতার সুরস্রষ্টা ঋষিণ মিত্রর পরিচালনায় একুশটি কবিতার গীতিরূপে এই অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল। অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন ধরনের স্বাদ ও বৈচিত্র্যের কবিতার নির্বাচনে ও সুরের বৈচিত্র্য অনুযায়ী গানের ক্রম নির্ধারণে। উপযুক্ত নির্বাচনের জন্যই শ্রোতাদের মনে বেশ কয়েকটি গান গভীর রেখাপাত করেছে। সর্বশ্রেণীর শ্রোতাদের কথা চিন্তা করে শ্রীমিত্র দুর্বোধ্য কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন না করে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সঙ্গীতের মাধ্যমে সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে আধুনিক কবিতার প্রচার।

সঙ্গীতাংশে ছিলেন মুখ্যকণ্ঠে ঋষিণ মিত্র। তিনি বলিষ্ঠ উদাত্তকণ্ঠে পরিবেশন করেন কবি শান্তনু দাশ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শঙ্খ ঘোষ, রত্নেশ্বর হাজরা, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার গীতিরূপ। হৈমন্তী শুক্লা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করেন কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতার গীতি রূপ। অশোক দত্ত ও অপরাজিতা দাশ যথাক্রমে পরিবেশন করেন কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও কবিতা সিংহের কবিতার গীতিরূপে। কবি মণীন্দ্র রায়ের কবিতার গীতিরূপে দ্বৈতভাবে পরিবেশন করেন ঋষিণ মিত্র ও অপরাজিতা দাশ। সম্মিলিতভাবে পরিবেশিত হয় কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, দিনেশ দাস, বিষ্ণু দে, নরেশ গুহ অজিত দত্ত তারাপদ রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার গীতিরূপ। শ্রোতাদের সুবিধার জন্য প্রতিটি গানের পূর্বে নির্বাচিত কবিতাটিও পাঠ করা হয়। পাঠ করেন অভিজিত ঘোষ ও কেদার ভাদুড়ী। অনুষ্ঠানের দুর্বল অংশ ছিল যন্ত্রসঙ্গীতাংশ। তালযন্ত্রে খোলের ব্যবহার খুব সুন্দর হলেও তবলা সঙ্গত আশানুরূপ হয়নি।

রবীন্দ্র-নজরুল যুগের পরবর্তীকালের কবিদের কবিতার গীতিরূপায়ণের যে ব্যাপক পরিকল্পনা ত্রিসপ্তক শিল্পী গোষ্ঠী গ্রহণ করেছেন তা সর্বস্তরে প্রশংসার দাবী রাখে।

সারা বাংলা আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা : রাজবল্লভপাড়া বাগবাজার সমিতি ও শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিভাগ পরিচালিত সারা বাংলা আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে গত ২৫ মে ও ১ জুন অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তিতে বিচারকের কাজ করেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অমিয়কুমার গুহ, প্রশান্ত বসু চৌধুরী, প্রভাতকুমার ঘোষ ফকিরচন্দ্র ঘোষ ও অমল ভট্টাচার্য এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করেন সঙ্গীতজ্ঞ অনাথনাথ বোস, বিজয় চক্রবর্তী, কালিদাস দে ও ফটিক গাঙ্গুলী। উভয় প্রতিযোগিতায় প্রচুর সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। ফলাফল : আবৃত্তি (সুকান্তর ব্ল্যাক মার্কেট) ১ম ঈশিতা মুখার্জী ২য় তন্ময় ঘোষ ৩য় কোয়েলিয়া ঘোষ। (রবীন্দ্রনাথের ১৪০০ সাল) ১ম—সুবীর ব্যানার্জি ২য় শ্রাবণী সরকার ৩য় মিতা দে। (জীবনানন্দের বনলতা সেন) ১ম—বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ ২য়—যূথিকা ঘোষ, ৩য়—স্বপন গাঙ্গুলী। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (১৮বৎ পর্যন্ত ক বিভাগ (খেয়াল) ১ম নবনীতা লাহিড়ী কলি-৬ ২য় রত্না রায় চৌধুরী কলি-২; ৩য় অপালা ব্যানার্জি হালতু ২৪ পরগণা; ভজন: ১ম সোনালী দাস সাঁকরাইল, হাওড়া; ২য়—চিত্রলেখা ব্যানার্জী, হালতু ২৪-পরগণা; ৩য় নবনীতা লাহিড়ী, কলি-৬। (ঠুংরী) ১ম—নবনীতা লাহিড়ী কলি-৬। (১৮ বৎ উর্ধে খ বিভাগ) খেয়াল—১ম আলপনা ঘোষ ভাটপাড়া; ২য় নির্মল দে কলি-৬ ভজন ১ম আলপনা ঘোষ ভাটপাড়া অঞ্জনা ভট্টাচার্য সোদপুর ২৪-পঃ। ক বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন (ফার্স্ট ক্লাস)।

রূপ রম্য, বীণা : কলকাতা ১ আষাঢ় ১২৩-৬-২এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটস্থ (কলকাতা-৪) অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা বসুর গৃহে রূপ-রম্য-বীণা সাংস্কৃতিক সংস্থার মাসিক সভা ও প্রীতি সম্মিলনে সভ্য ও সভ্যারা মিলিত হন। সুধাহাসি বসুর বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও প্রার্থনা দিয়ে সভার কার্য আরম্ভ হয়। ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনার পর বর্ষা আহ্বান অনুষ্ঠানে সভ্য ও সভ্যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রখ্যাত শিল্পী সলিলকুমার মিত্র বেহালায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর পরিবেশন করেন। আলোচনা ও একক সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সুধাহাসি বসু। সলিল মিত্র, মায়ারাণীমোহন ঘোষ নমিতা ঘোষ আশিস রায় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় খনা রায়চৌধুরী সুনন্দিতা বসু, বরুণকিশোর মল্লিক, গোপাল পাল, নমিতা ব্যানার্জি বিশ্বনাথ মুখার্জি।

অশোক চ্যাটার্জি ও সুচন্দ্রা বসু সমগ্র অনুষ্ঠানটি আন্তরিকতা ও মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সুরবাহারের সঙ্গীতানুষ্ঠান : সুর-বাহার সংগীত শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে কসবায় রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। কণ্ঠসঙ্গীত ও বিবিধ যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সুরবাহারের নবীন শিল্পী শিক্ষার্থীরা। কৃষ্ণ সমাদ্দারের নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সংকলিত গান ও অতুলপ্রসাদ-সিংহের পদাবলীর গীতিনাট্য রূপ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুনীল সাহা। তাল যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেন দেবব্রত বসু, গৌতম দাস ও তপন বিশ্বাস।

দুঃস্থ শিল্পীর চিকিৎসার্থে ছন্দনীড়ের প্রয়াস : আগামী ৮ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে জহর রায়ের যোজনে 'ছন্দনীড়' তাদের সুর বাহারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গীত আসরের আয়োজন করেছেন। এঁদের সহায়তা করতে থাকবেন রাধাকান্ত নন্দী নির্মল বিশ্বাস অমর দত্ত রজত নন্দী ও কুমুদ ঘোষ। এই অনুষ্ঠানের উপার্জিত সকল অর্থই দুঃস্থ শিল্পীর চিকিৎসার্থে দেওয়া হবে।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।
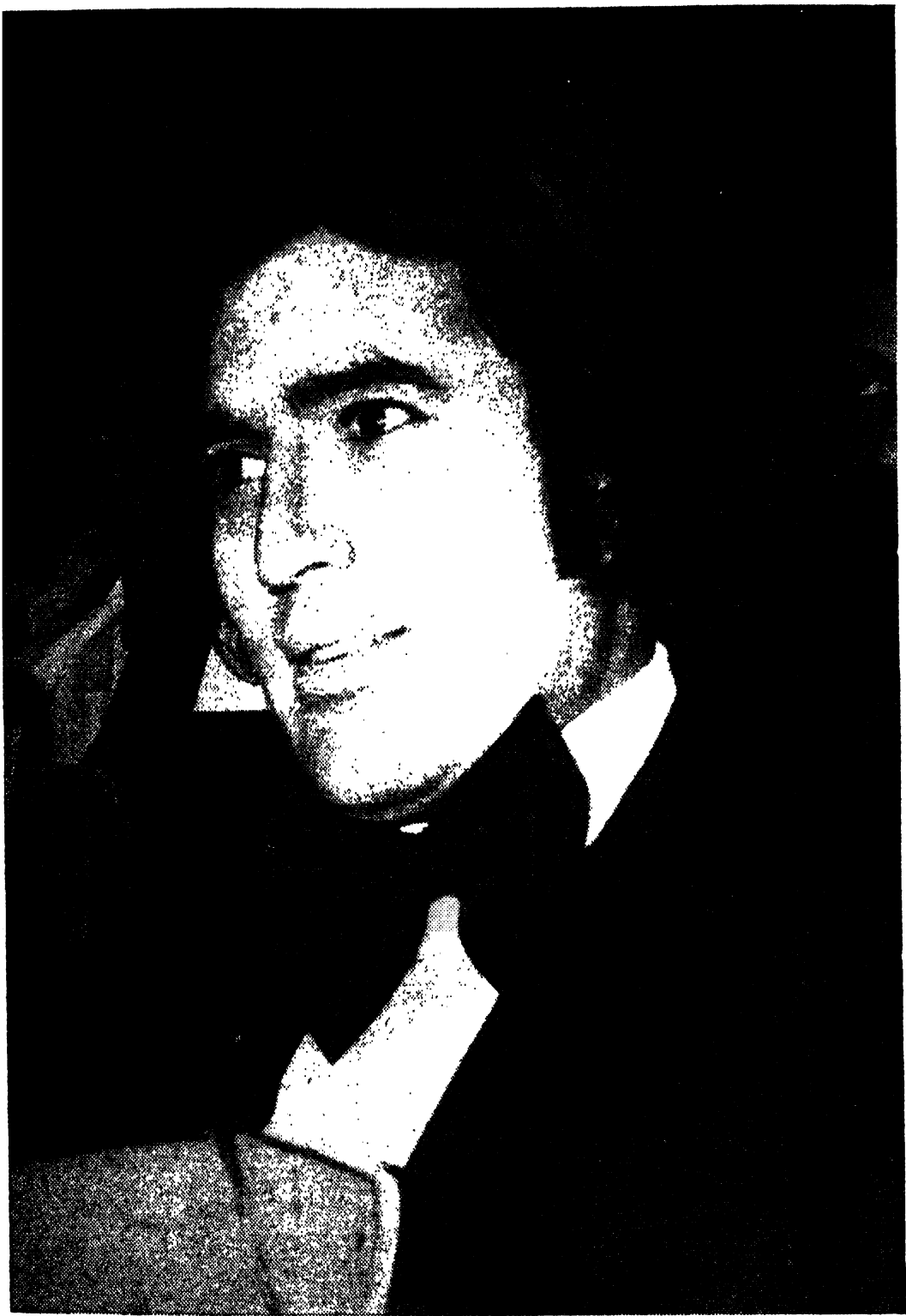
রাজেশ খান্না ॥ অমৃত ফটো

Regd. No. WB/NC-13
Gram: AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 4th July, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইন্‌ক্রিমিন* দিয়ে
ছেলেবেলার দিন— হেসে খেলে ঠিকমত বেড়ে ওঠার দিন! এই সময়ে ওকে ইন্‌ক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি হয়ে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে! ইন্‌ক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
ওরে বাবা... দেখেছো! টপাটপ খাচ্ছে ঝপাঝপ বাড়ছে
Incremin syrup

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৩	চিঠিপত্র		
৩৫	অলীক শব্দের ভিতর	(গল্প)	শ্রীবিমান চট্টোপাধ্যায়
৪২	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪৩	অপনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৪	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৭	দোষ বিচার	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৫১	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৪	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৫৫	দেশ বিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৬	সিনেমাটিকটক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৮	স্টোর থেকে বলছি		শ্রীমুসাফির
৬১	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা		শ্রীঅভিজিৎ
৬৩	নাট্যমঞ্চ		মঞ্চ সমালোচক
৬৬	বিদেশী ছবি		শা র চ
৬৮	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৭০	বাংলাদেশের ছবি		আনোয়ার আহমেদ
৭১	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীইন্দ্রাণী চৌধুরী

শান্তনু দাস
পুত্রেষ্টি

কলকাতার ঘুম নেই। প্রথম প্রহরে যখন ঘুমিয়ে পড়ে মহানগর তখন পাশাপাশি জেগে ওঠে আরেক কলকাতা। এই কলকাতার ক্লান্ত দেহের ওপর যখন জামিনী রাত উপুড় হয়ে আছে, তখন শহরের এক কোণে এক নার্সিংহোমের ছোট ঘরের জানলায় শার্সিতে আছড়ে পড়লো কান্নার শরীর ছড়িয়ে পড়লো করিডরে, চিৎ হয়ে পড়ে থাকা পাশের অ্যাসফল্টে। তার হাতে পড়লো দড়ির গায়ে টিকিট অচেতন মায়ের দেহটার পাশ থেকে বুকে তুলে নিলো মাসী জন্ম হল পৃথিবীর নতুন একটা নম্বর। নতুন শৈশব। যার মালিক এখন অতনু।

রাত প্রায় হাল্কা হয়ে আসছে।

সারাদিন ঝড়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে করতে ক্লান্ত নাবিকের মতো তীরে তরী ভিড়িয়ে নীরব নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে ডুবে আছে তপতী। পাশের ঘেরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে অতনু দু' মুঠোয় মাথার চুলটা টানটান করে ঘুম ভাঙা বেড়ালের মতো ছাড়িয়ে নিল শরীর। বড়ো ক্লান্তি। ক্লান্তিকর একটা তৃপ্তিস্রোত কেমন একটা ঘুমের আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। এত রাতে কোথায় যাবে অতনু? এটুকু রাত দেখতে দেখতে পুইয়ে যাবে। প্রথম বাস শহরে কখন বেরোয়? অতনু আন্দাজ করার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে হুড়ুম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডাক্তার। ঐ করিডরটুকু পেরিয়ে দোতলা থেকে একতলার সিঁড়ি ভাঙতেই তার কপালে বিন্দু ঘাম জমে গেছে। রুমাল দিয়ে চোখ কান মুখ ঘষতে ঘষতে গাড়ির স্টিয়ারিং এ হাত রেখে কথা ছুঁড়লো ডাক্তার—বাড়ি যান নি?...

—এই যাবো। এবার অতনু একটু তুতলিয়ে জিজ্ঞেস করে—ও কেমন আছে ডক্টর চ্যাটার্জী। সিগ্রেটে আগুন লাগিয়ে কাঠিটাকে নাড়াতে নাড়াতে এক টোককায় ছুঁড়ে ফেলে ডাক্তার বলে—ওককে—ওককে... বেশ আর কোয়াইট ওককে মিঃ মিত্র, বায় দা ওয়ে আমি ওষুধপত্তরের চার্টটা সিস্টারের হাতে দিয়ে এসেছি ইচ্ছে হলে কিনে দিতে পারেন তা না হলে নার্সিংহোমই কিনে নিয়ে পরে বিলে অ্যাডজাস্ট করে দেবে। কাল

নিয়েছেন আগাম। হর্টিকালচারাল ফেরত একবার ক্লাউডের দিকে যাবো থাকবেন। অতনু বিনয়ী কাজের মত মাথা হেলালো। হ্যাঁ ভালো কথা অদেক-এর ব্যবস্থা করুন। আর যা যা লাগবে স্যালী ঠিক দেবে। গুড, নাইট. ব্যায়...। লোকজনের লাল চোখ আলো জ্বলতে জ্বলতে ঝকঝকে ফিয়াটটা কম্পাউন্ড পেরিয়ে চলে যেতেই এক অখন্ড নিস্তব্ধতার মুখোমুখি হল অতনু।

ঘড়ির ডায়ালে চোখ এসে থেমে গেল। রাত যেন আর শেষ হয় না। দরজার গেট দারোয়ান বিমোচ্ছে। ওর চোখ এসব দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত। অতনু দু চারবার এলোমেলো চিন্তাগুলো ঝেড়ে দিল নিজের দিকে। কি করবে অতনু। থাক বাকী রাতটুকু লাগোয়া ভিজিটার্স রুমে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো। শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে অতনু এবার একটা সিগ্রেট ধরালো। সিগ্রেট ধরিয়ে অতনু স্মৃতির পায়ে পায়ে কখন চলে গেছে ভেতরে: তপতীর যন্ত্রণার শব্দ যেখানে এখনো ছড়িয়ে রয়েছে। ওকে ওরা শবদেহের মতো বয়ে নিয়ে গেল। তপতীর চোখের কোল বেয়ে গড়ানো জলের রেখা তখনো মিলোয় নি। অতনুর ইচ্ছে হচ্ছিল সবাইকে সরিয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। অনেক রাত জেগে, অনেক পরিধি পেরিয়ে এখন ক্লান্ত শরীরটাকে ঘুমের বিছানায় মেলে দিয়েছে তপতী। তবুও যেন ও কাকে খুঁজছিলো। অতনু? না ষোল নম্বর? কেমন যেন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়ে পড়ে অতনু। যেন নিশ্চিন্ত ভাগ থেকে এক ভাবনায় ওর ভালবাসাটা ভাগ করে নিয়ে গেল কেউ।

কে সে?

সে তো অতনুরই একজন। তবু সব কিছু ছেড়ে এক ছুটে তপতীর ঘরে যেতে ইচ্ছে করছিল অতনুর। অন্তত একবার ওর পাশে গিয়ে একটু বসে আলতো পালকের মতো ওর কপালে হাত বুলিয়ে দেওয়া। বড়ো ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু নিয়ম নেই। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পৃথিবীর সমস্ত বিধি-নিষেধের বেড়াজালগুলো ভেঙেচুরে নিজেকে ইচ্ছে মতো সহজ সরল করে ছড়িয়ে দিই। অতনু ভাবছিলো। ভাবতে ভাবতে মনে হল থাক, ওতো ভালোই আছে। ভালোই আছে ওরা।

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
সুধাংশু ঘোষ

ভালো আছো তো তপতী?

ভালো আছি। তোমরা?

ভালো থেকো।

কেমন দেখতে হয়েছে ষোলো নম্বর? নিজের দিকে তাকিয়ে একবার প্রশ্ন ছুঁড়ে মনে মনে একবার আন্দাজ করার চেষ্টা করলো। না, মনে পড়ছে না, কিছু মনে পড়ছে না। নার্সের কোলে কেঁপে থাকা অ্যাপ্রনে জড়ানো নরম তুলতুলে মাংস-পিণ্ডটার চোখ মুখ অবয়ব, কিছুই মনে পড়ছে না। সব কিছু মিলিয়েই তখন ছিল অতনুর এক উত্তেজনা. নতুন এক স্বাদ, শিহরণ, নতুন এক অনুভূতি যা প্রবলপ্রতীম হয়ে ঢেকে রেখেছিল অতনুকে। অথচ সে শিশু সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে তখন তীব্র প্রতিবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো বাতাসে।

তার কান্না ছিল প্রখর আলোর মত স্পষ্ট। না, অতনু ওকে ভালভাবে দেখেনি, সে মুহূর্তে অবকাশও হয়তো ছিল না। এখন চেষ্টা করেও ষোলো নম্বরের মুখের আদল অতনুর মনে হল না। হয়তো কারুরই আসে না। সিগ্রেটটা শেষ হতে হতে আঙুলের কোনায় এসে ছ্যাঁকা দিতেই অতনু ফিরে এলো আবার ভিজিটার্স রুমের চার দেয়ালের ঘেরাটোপে।

ভিজিটার্স রুম ঘরটা বাইরে কিছু লাগোয়া, একেবারে ঢোকার দরজার গা ঘেঁষেই। অন্যদিন হয়তো অতনুর মতো কতো বিনিদ্র চোখ রাতের প্রহর গোণে। আজ অতনু একা। হয়তো কেউ কেউ উৎকণ্ঠিত মুখে, কেউ আনন্দের বোঝা বয়ে নিয়ে, কেউ হয়তো আগামীকালের। এখন সেই ঘর নিঃস্পন্দ, নিঝুম। অখণ্ড নীরবতা চারপাশ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সিলিং-এর এর ওপার থেকে ঝোলানো তারে মাথার একটা গোল শেড দেওয়া ডুম বাতাসে দুলছে, দুলছে। দুলছেতো দুলছেই। যেন চারপাশে গাঢ় অন্ধকারের ব্যূহকে সে প্রবল বিক্রমে অভিমন্যুর মতো সরিয়ে দিচ্ছে আবার অন্ধকার চারপাশ থেকে তাকে গ্রাস করতে চাইছে নেকড়ের মতো। একবার সরায়, আবার ওর আসে, সরে যায়, আসে। যেন এ-সংগ্রামের শেষ নেই। অতনু তাকিয়েছিল আলোর দিকে। সিগ্রেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সিলিং-এ গিয়ে জড়ো হচ্ছে। একটা ঘুম ঘুম ক্লান্তি ক্রমশই জড়িয়ে ধরছে অতনুকে। বন্ধ দরজার ওপার থেকে টক-টক টকটক ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তুলে আবার কোথায় মিশে যাচ্ছে সিপাইয়ের শব্দ। শব্দটা কান পাতলে আরো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। রাস্তার ওপারে সেই কখন থেকে গোঙাচ্ছে একটা কুকুর। রাতের কান্না এত নির্মম, এত অসহায়।

বাইরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এ-বাড়ির তলার ঘর থেকে একসঙ্গে অনেক কান্নার ঐকতান ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। ষোলো নম্বর কি জেগে? এখনো জেগে আছে ষোলো নম্বর? কান পেতে ঠাহর করার চেষ্টা করলো অতনু। কিছুই চেনা মনে হচ্ছে না। তবু মনে হল ওদের মধ্যে হয়তো কেউ ষোলো নম্বর। যেন সমস্ত কান্নার স্বর ষোলো হয়ে অতনুর মাথায় এসে ঘা মারছে।

একবার।

দুবার।

বারবার। ওফ ভগবান। অতনু চীৎকার করে উঠলো—সিস্টার...নার্স...কে আছ. কি সবাই এই ঘুমিয়ে রয়েছে? তোমাদের এ-ঘুম কি আর কখনো ভাঙবে? না? কথাগুলো একসঙ্গে অতনুর কণ্ঠনালী পরিক্রমা করে নেমে আসে। শব্দ হয় না। শুধু দরজার ওপার থেকে ঠুক ঠুক...ঠক ঠক সিস্টারের জুতোর আওয়াজ ঘড়ির কাঁটা ছুঁয়ে মিলিয়ে গেল। সিলিং-এ তখন ধোঁয়া জমে

[illegible]

—কেন মনে? [illegible]

—[illegible]।

—ডাক্তার, সিস্টার, আয়া, ডাক্তার তোমরা সবাই কোন অন্ধকারের চাদরে মুড়ে আছো। দ্যাখো, বেবিরুম থেকে বোলো নম্বর ফেরায়। তোমরা বেঁচে-আছো তো? আমি বেঁচে আছি? অতনু নিজের শিরায় নৃশংসভাবে চোখ বসিয়ে দিল।—বাবা। অতনুর মুখোমুখি হল ষেলো। চিনতে পারছো?—হ্যাঁ, হ্যাঁ কেন পারবো না? অতনুর গলার স্বর জড়িয়ে আসছে। কেন, কেন চিনতে পারবো না বাবা? তুমি আমাদের রক্তেমাংসে গড়া ভালবাসা, স্বপ্ন, অশোক জীবন...।

ভালবাসা? চৌদিক কাঁপিয়ে শিশু হেসে উঠলো। তোমাদের অমন ভালবাসার আস্তরণ আমায় জড়িয়ে থাকলে কেন আমার শরীরে এত জ্বালা? পুড়ে যাচ্ছে, ছাই হয়ে যাচ্ছে আমার দেখা পৃথিবী। দ্যাখো, যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছে শরীর। এক প্রচণ্ড নিয়মের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছি। বাবা, কেন আনলে আমাকে? তোমাদের ভালবাসা কি অমনই প্রতীক্ষায় ছিল?

কেন নয়? অতনু এবার ওর মুখোমুখি হল।—কেন নয় বাবা, দূরে দ্যাখো, ঐ জানলার আড়ালে তোমার মা ক্লান্ত অচেতন শরীর নিয়ে তোমার স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে তার প্রতিটি শিরায়। একটু একটু করে নিজের রক্ত, ক্ষুধা, অশ্রু দিয়ে গড়ে তুলেছে তোমার শরীর। তুমি দ্যাখোনি জীবনের সব অবলম্বন ছেড়ে শুধু তোমাকেই বুকে রেখে সে এখন পেরোতে পারে উজান। কার প্রতীক্ষায়? কার জন্যে প্রতি পল সময়ের কাছে গুণে দেওয়া, সে কি তুমি নয়?

না।—কেঁপে উঠল শিশুর স্বরে কম্পিত স্বর, দুলে উঠলো আলো, ভেঙে গেল পালঙ্কভরা। না। এই আমি আমার জন্যে, একান্তভাবে এই আমার জন্যে নয়। সে যে কোনো মানুষ, যে কোনো শরীর নিয়ে তোমাদের ভালবাসার সাক্ষী হতে পারে। একান্ত আমার জন্যে এই আমিকে তোমরা চাওনি। কেউ চায় না। শুধু একটা ঘটনার ফলের জন্যে বিনীত ভীরু, অসহায় ছাত্রের মতো অপেক্ষা, তোমরা অপেক্ষা কর। তা একান্তভাবে এই আমার নির্দিষ্ট স্পষ্ট শরীর নয়। আমার আসলে অন্য কেউ অথবা অন্য কারো বদলে এই আমি। যদি বিকলাঙ্গ, কানা, অদ্ভুত শরীর নিয়ে এলে কি তোমাদের একই মায়া-মমতা এবং তোমার ঐ ভালবাসা কি একইভাবে অটুট হয়ে থাকতো? একইভাবে বুকে টেনে নিতে পারতে বিকলাঙ্গ লুব্ধ আদরে? পৃথিবীতে তাও তো হয়। তার জন্যে অনন্তকালের পাপ বয়ে নিয়ে চলে এই নম্বর-মাপা শরীর। জিওল মাছের মতো ঘেরাটোপে অনন্তকালের দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকতে হত। —বলো বাবা, আমার এই হাতে কটকটে বোলো নম্বরের টিকিটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঐ নির্মম ভিড়ে মিশে গেলে তোমরা কি আমায় খুঁজে নিতে পারবে? যদি ছিঁড়ে ফেলি।

না আ আ। অতনু চীৎকার করে ওঠে। অতনুর আর্তনাদ, নাকি কান্না। জলভরা মেঘের মতো আকাশে গুড়গুড় করে ওঠে —না বাবা, ঐ কবচকুণ্ডল তুমি ছিঁড়ো না। ওই তোমার পরিচয়, আমাদের নিজস্ব দুঃখ, সত্তা, অস্তিত্বের একান্ত অধিকার-নামা। যার অপেক্ষায় আমরা ব্রতচারী ছিলাম।

সেতো যে কোনো মানুষের অপেক্ষায় তোমরা থাকতে। এই একান্ত আমারই জন্যে নয়। আমরা কেউ কাউকে চাইবো বলে চাই না। আমাদের সবার মনে যে স্বর্গ খেলা করে, তাই পেতে চাই। আমরা কোনো চেনা অদলে আসি না। এসে পড়ি ঘটনায়। জারজের মতো।

—কিন্তু দ্যাখো, তোমার মা কিভাবে তোমার রক্তের মধ্যে লালন করেছে। তোমার নক্ষত্রের শব্দ কান পেতে অনুভব করেছে। অন্ধযোগে তোমার হৃৎপিণ্ডের তালে নিজেকে উষ্ণ করেছে। তুমি যখন এক নিশ্ছিদ্র আশ্রয়ের মধ্যে থেকে, তখন তোমার প্রতীক্ষায় তোমার জননী। তোমার আসার পদশব্দে সে প্রহর গুণেছে। দিন থেকে রাত, রাত থেকে দিন, সকাল গড়িয়ে আসেছ দরজায়।

সে শিশু কখন যেন অতনুর মাথার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। অতনুর চোখে চোখ রেখে সে বললো—বাবা, সে তো কর্তব্যবোধ। ধর্ষিতা রমণীও কি তার অবাঞ্ছিত সন্তানের মমতায় শিউরে ওঠে না? সমস্ত রমণীই পুরুষের কাছে এক নৈবিদ্য, আর সমস্ত পুরুষ তার আদিম নারীর কাছে নতজানু। সব বাবা মা-ই আগে স্ত্রী-পুরুষ, নর ও নারী। আমরা একটা ঘটনার সাক্ষী। এভাবেই আমি, এভাবে তুমি, এভাবেই আগামীকাল অবাঞ্ছিত পৃথিবীর ভার বইবে।

শিশু ক্রমশই আরো আরো বড় হয়ে উঠছে। অতনুর মাথা ছাড়িয়ে কড়িকাঠের দিকে।

—কি আশ্চর্য, তুমি এত বড় হয়ে উঠছো কেন? অতনু তার হাঁটুর কাছ থেকে মাথা উঁচু করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ওঠে—সিস্টার...।

—বাবা তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছো? কথাগুলো হাওয়ায় গম গম করে ভেসে আসে...।

না, না। অতনু চীৎকার করে বলে উঠলো। না, তোমাকে ভয় পাই না, কারণ তুমিই আমার সেই গোপন নদী, যা আমাদের বুকের মধ্যে অহরহ বয়ে চলেছো। কারণ এভাবেই পৃথিবী, মানুষ, সৃষ্টি, স্থিতি লয়। এই বিরাট ঢেউয়ের গর্জনে আমরা অসহায়। অতনু আস্তে আস্তে কখন ছোট শিশু হয়ে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠে। সেই শিশু কড়িকাঠে মাথা ঠেকিয়ে তলার মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মেঘের গুরু গুরু শব্দ ছড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়—

—বাবা, আমিও অসহায়। ক্লান্ত এক জীবনের ভার বয়ে আমি চলেছি। আমার সামনে সময় কালো পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে। আমাদের দুহাতে নিংড়ে ফেলেছে বিষাদ। ভয়াবহ জীর্ণতার মুখোমুখি এক স্থাবর মাটির উপর দাঁড়িয়ে এই আগামী, এই আমি, অনাগত কাল।

সে শিশু কড়িকাঠ ফুঁড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে।

অতনু বেবিরুমের অনেক শিশুর মতো তার গোড়ালির পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে—কিন্তু বাবা তোমাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি যে তোমার মুখ দেখছি না।

কড়িকাঠের ওপার থেকে সে শিশুর শব্দ হাওয়ায় ফিরে আসে—বাবা, আমিও তো তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। শুধু অন্ধকার।

মানুষের কান্না যেন ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো।

সেনের ভাষায় বলতে পারি—'কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে 'ফুলবালা'র যুগ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়।' ভারতভূমির 'ফুলবালা' শব্দের প্রয়োগ দেখি রুদ্রচণ্ডে এবং শৈশবসঙ্গীতের 'গান', 'ফুলবালা' ও 'দিকবালা' কবিতায়।

'ফুলবালা'র মত ভারতভূমির 'উথলে' 'পৃথ্বী' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ উত্তরকালে রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে বহুবার পেয়েছি। যেমন, উথলে—প্রঃ খেঃ ১, ২ পাঠে, ভারতীবন্দনা, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, গীতবিতান ইত্যাদিতে। উথলিত—প্রঃ খেঃ। উথলিয়া—কবিকাহিনীতে। উথলিছে—ভগ্নহৃদয়ে। পৃথ্বী—ভারতভূমি, প্রঃ খেঃ, অবসাদে; হিঃ উপঃ-এ 'পৃথ্বীরাজ' এবং লুপ্ত কাব্য 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'। এ ছাড়া ভারতভূমির 'ভূধর' (প্রলাপ ১ বহুবার, বনফুল, শৈঃ সঃ), ছারখার আগার উদিল (ভগ্নহৃদয়), অস্থিভস্ম (রুদ্রচণ্ড), স্তব্ধ (হিঃ উঃ, প্রঃ খেঃ), দুখের আগার-এর অনুকরণে 'সুখের আগার' (অভিলাষ), এ তিন ভুবন—'আকাশ পাতাল পৃথ্বী' (১৬ প্রঃ খেঃ)। এবং চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার ব্যঞ্জনা বাল্য ও উত্তরকালের রচনায় বহুবার প্রয়োগ দেখি।

রবীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস বলেছেন—'শব্দচয়ন বিষয়ে তাঁর সব চাইতে স্বাতন্ত্র্য এই যে তিনি সেই নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই আমাদের চলতি ভাষার শব্দভাণ্ডারে খুব বেশি করে নির্ভর করেছেন; দেশজ বা অপাঙক্তেয় শব্দকে তিনি অতি উচ্চবর্ণ সমাজে সাদরে স্থান দিয়েছেন; চলতি ও সাধু, কঠিন ও গম্ভীর ও হালকা-লঘুর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে দুই বিপুল স্রোতো নদীকেই মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর ছন্দবোধ এবং সুরবোধ অর্থাৎ তাঁর কানই হয়েছে তাঁর সহায়' (রবীন্দ্রনাথ—জীবন ও সাহিত্য, পৃঃ ১৫৫)। বাল্যরচনা ভারতভূমির মধ্যেও চলতি ও দেশজ শব্দের প্রয়োগ দেখি—

ছারখার দুঃখী পাপ যত। অন্ধকার ছায়া, দোষ, ঘুমে, ভাসে, হই, সারি সারি; দুখের আগার, কিছু, সুখ, ডাকে ঘন, একবার উঠেছিল, মনে করি, ভাল লাগে, অস্ত যায়, উথলে তখন ইত্যাদি। আর দেখি চলতি-সাধু, কঠিন-গম্ভীর ও হালকা-লঘু শব্দের অপূর্ব সমন্বয়—'গাইয়ে ভারত জয়, আরোহ গিরিরে' (১৮), 'শুন প্রস্রবণ ঝরে, কলকল নাদ করে' (২১), 'হইয়া অশক্ত কায়, আর না উঠিতে পায়' (১৫), 'আবার শিখর দেশে, করে আরোহণ।—ভারতবাসীরা কেন না করে তেমন।।' (১৭)।

ভারতভূমিতে ব্যবহৃত 'পড়িলেক' 'উদিলেক' ক্রিয়ার অনুসরণে অভিলাষে দেখি মুহূর্তেক (২২), করিবেক (২৭) ইত্যাদি।

।। ভারতভূমির ছন্দে ভাবী রবীন্দ্রনাথ ।।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দবোধের উন্মেষ বাল্যকালে, [illegible] পুস্তকের [illegible] নয়। ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পেছনে ছিল বৈষ্ণব-অনুবাদ প্রভৃতি পদকর্তাদের এবং ভারতচন্দ্র-ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কবিদের আদর্শ, আর সামনে ছিল রঙ্গলাল-মধুহেম - বিহারীলাল - দ্বিজেন্দ্রনাথ - অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির বিচিত্র ও বিবিধ আদর্শ। নিজস্ব ঢঙের উপযোগী ভাষা ও ছন্দ আবিষ্কার না করা পর্যন্ত বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ পূর্বগামীদের ছন্দ-ভাব-ভাষার অনুকরণ করেছেন। সেই অনুকরণের যুগে ভারতভূমির ছন্দ এক দুর্লভ ব্যতিক্রম। সে যুগের বহু কবির ব্যবহৃত বহু প্রচলিত ছন্দ, বিশেষত হেমচন্দ্রের প্রিয় ছন্দের (৮+৬, ৮+৬, ৮+৮, ৮+৬ পর্ববিভাগ এবং ক-কখখ-ক অন্ত্যমিল) পথ পরিত্যাগ করে মাত্র বারো বছর বয়সে সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতিতে ছন্দ বিন্যাস (৮+৬, ৮+৮, ৮+৬, ৮+৬ পর্ববিভাগ এবং ক-খখ-ক-ক অন্ত্যমিল) করেছেন, যার তুলনাস্থল অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদাসিনী কাব্যগ্রন্থের ২য় সর্গে (পৃঃ ১৩) কদাচিৎ ব্যবহার করা ছন্দ। প্রকাশকালের বিচারে ভারতভূমি উদাসিনীর সামান্য পূর্ববর্তী। তাই এই বিশেষ রীতির ছন্দকৃতিত্ব বালক রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। ভারতভূমির স্তবকের অভিনব বিন্যাস—যা সমগ্র জীবনব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হয়ে উঠেছে নিজস্ব শ্রী ও ছন্দে গরীয়ান, ভাবের উপযুক্ত বাহন—বোধকরি ভারতভূমি থেকেই তার সূচনা। ভারতভূমির স্তবক বিন্যাস একটা বিশিষ্ট ভাব ও উপলব্ধির প্রতীক, গঠনকৌশল ও গতি একটা বিষাদময় স্বদেশপ্রেমানুভূতির দ্যোতক। ভারতভূমির ছন্দসাফল্য অসামান্য! বিষয়বস্তুর প্রয়োজন মহিমা ও মর্যাদা অনুসারে ছন্দকে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত করেছেন। শেষ দুটি চরণে অন্ত্যমিল থাকায় বিষাদ দুঃখ ক্রোধ অভিমান ইত্যাদি সঞ্চারী ভাবগুলি গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের অনুকরণে ছন্দ বিন্যস্ত হলে ভাবের উপযোগী ছন্দ উৎকর্ষ ঘটতো না। অর্থাৎ 'আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয় (ছন্দ পৃঃ ৪)—একথা তিনি বাল্যকালেই উপলব্ধি করেছিলেন।

দ্বিতীয় চরণটি (৮+৮) ত্রিপদীর ঢঙে লেখা এবং পর্বান্তে মিত্রাক্ষর থাকায় এদের স্বতন্ত্র দুটি চরণ হিসেবে গণ্য করা যায়। স্বপ্নপ্রয়াণে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবেই লিখেছিলেন।

চরণান্তিক উত্তম মিলের জন্যে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বিচিত্র শব্দচয়ন করেছেন (পূর্বে আলোচিত)। ভারতভূমির মধ্যে তারই সূচনা দেখি। অন্ত্যমিল বজায় রাখতে অনেক সময় তিনি মধুসূদনের অনুকরণে শব্দ আহরণ করেছেন। যেমন—পুরন্দর-কুলাকর; নিশিথিনী-মন্দিনী; নিস্বন-এমন ইত্যাদি।

বাংলা ছন্দের বন্ধন মুক্তির নতুন পথ দেখা গেছে 'মানসী'তে ছন্দের নানা খেয়ালের মধ্যে। এই পথেই যুক্ত-ধ্বনি অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ধ্বনি প্রধান ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন। ভারতভূমি পয়ার ছন্দে রচিত বলে অনুস্বার-বিসর্গ-খণ্ড-তকে শোষণশক্তি গ্রাস করেছে—দুঃখ দুঃখী জ্যোৎস্না বংশী-কে দুমাত্রার ধরা হয়েছে এবং সেটাই সংগত। কিন্তু ভারত ভূমি পয়ার ছন্দে রচিত হলেও যৌগিক স্বরধ্বনি ঐ-কারকে একমাত্রার বদলে দু-মাত্রার ধরা হয়েছে ২ ১৪ ২০ ২১ স্তবকে। জানি না সে যুগের আর কোন কবি সচেতনভাবে পয়ার ছন্দে মাত্রাগণনায় এই ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন? 'সচেতন' বলছি এই কারণে, ব্যতিক্রম শুধু ভারতভূমিতে পাঁচ বার নয়, ব্যতিক্রম অভিলাষে এগারো বার ২ ৫ ৬ ১৪ ১৯ ২১ ২৪ ২৫ ২৬ স্তবকে)। সুতরাং ব্যাপারটি কাকতালীয় নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে 'হিন্দুমেলায় উপহার' থেকে এই ভুল সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছিলেন এবং ঐ-কারের বদলে ও-কার ব্যবহার করেছিলেন (তখনও হাসি ও বেশ ইত্যাদি)। আরো পরবর্তী রচনায় ঐ-কারকে ভেঙে 'অই' বা 'ওই' পথ ধরে পয়ার ছন্দের মাত্রাগণনা অগ্রসর হয়েছে। যেমন, প্রঃ খেঃ ১ পাঠে 'ওই' দ্বিতীয় পাঠে 'অই' প্রলাপের ১ম পাঠে 'অই' দিল্লি দরবারে 'তাঁয়' 'অই' এবং 'ওই' এবং বলা বাহুল্য এগুলিকে দু-মাত্রার ধরা হয়েছে। এই সচেতন প্রয়াস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, বাংলা ছন্দের 'বন্ধন-মুক্তির' পূর্বে কবিমনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয় জেগেছিল বাল্যকালে ভারতভূমি থেকেই, পয়ারের লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ মাত্রাগণনা পদ্ধতির অন্তঃস্তল থেকেই। পয়ার ছন্দে যৌগিক-স্বর ঐ-কারের এই দুমাত্রিক [illegible] ধারা থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ [illegible] বাংলা বানানের স্বরূপটি প্রকাশ পাচ্ছে বাল্যরচনাগুলিতে।

'বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন—'তানপ্রধান ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পূর্বে প্রায় প্রত্যেক কবিই যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে গিয়া মাঝে মাঝে ছন্দের সৌষম্য নষ্ট করিতেন এ দোষ রবীন্দ্রনাথের রচনায় অতি বিরল' (বাংলাছন্দের মূলসূত্র পৃঃ ২২৫)। ভারতভূমির অপরিণত কবি শব্দ সচেতন ছিলেন বলে ছন্দের সৌষম্য কোথাও নষ্ট হয়নি—একমাত্র 'জ্যোৎস্না সত্ত্বেও মলিনী' ছাড়া। প্রতিটি স্তবকে বা চারটি চরণে গড়ে তিনটির বেশি যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি। ছেলেবেলা থেকেই কবির কান অতি সচেতন ছিল বলেই উত্তরকালে তিনি বাংলাছন্দের বন্ধন-মুক্তি ঘটিয়ে বাঙলার নিজস্ব মাত্রাযুক্ত ছন্দের রীতি আবিষ্কার করেছিলেন।

।।ভাবগত দিক থেকে ভাবী রবীন্দ্রনাথ।।

ভারতভূমির পরবর্তী রচনা অভিলাষের ৩, ৪ প্রভৃতি স্তবক মনে করিয়ে দেয় ভারতভূমির 'পর্বত আরোহণ' ও 'বংশী ধ্বনির কথা।

পর্বত শিখরোপর, বলে হে ভারত নর,
ঐ শুন মৃদুমন্দ হয় বংশীধ্বনি।
গিরির উপরে সবে আইস এখনি।'
ঐ শুন পর্বতেতে হয় বংশীধ্বনি।।

ভারতভূমির এই ২০ স্তবকের সঙ্গে অভিলাষের ২-৩-৪ স্তবকের ভাবগত একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়

•

চলিল মানব দেখ বিমোহিত হয়ে
পর্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া।
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

ভারতভূমির সঙ্গে হিন্দু মেলার উপহারের সুস্পষ্ট ভাবগত মিল পূর্বেই দেখানো হয়েছে। এই কবিতার ১৫ স্তবকে ভারতভূমির মর্মার্থটি পুঞ্জীভূত হয়েছে। 'ভারতভূমি' ও 'প্রকৃতির খেদে'র চিন্তাগত নৈকট্যও প্রবল। যেমন 'রসাতলে পাঠাইব পৃথবী সসাগর' আর 'আয়রে প্রলয় ঝড়। স্বর্গমর্ত্য রসাতল হোক একাকার' (১৭)। ভারতভূমির ৯ ১৩ প্রভৃতি স্তবকে প্রকাশিত ভাবটি জমাট বেঁধেছে প্রকৃতির খেদ ১ পাঠের ২২ স্তবকের একটি চরণে—'সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ।' ভারতভূমির পরাধীনতার নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে মাতৃর 'আকুল প্রার্থনাটি উদ্বেল হয়ে উঠেছে—'হবে না কি সূর্যোদয় ভারত আকাশে?। অন্ধকার রহিবে কি ভারত আবাসে?' আর প্রকৃতির খেদ ১ পাঠের ২৭ স্তবক যেন তারই পরিপূরক—'কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি/ আর কি হবে না ভোর/...অনন্তকালের মত / সুখ-সূর্য অস্তগত / ভাগ্য কি অনন্তকাল রবে এই রূপে।' হিন্দুমেলার উপহারে কবি প্রশ্ন তুলেছেন—'আর কি সেদিন আসিবে ফিরে?' এই ভাবটি আবার কাকু বক্রোক্তির ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে 'দিল্লী দরবার' কবিতায়—'ভারতে আজি কি সুখের দিন?' প্রথম যুগে রচিত গান —'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু-রাশি'তেও এই ভাবই ব্যক্ত হয়েছে—'সেদিন যখন গিয়াছে চলি/তখন ভারত কাঁদিরে।' 'ভারতী' কবিতায় (ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ) তাই প্রশ্ন জেগেছে—'এ ভারতভূমি জাগিবে কিনা।' আবার ভারত-ভূমির প্রথম চরণ—'কতদিন দিবাকর উদিছে গগনে'-এর সঙ্গে শৈশব সঙ্গীতের অপ্সরা প্রেম কবিতায় 'উদিছে তপন উদয় শিখরে' এবং প্রলাপ-১ এর 'কনক সোপানে উদিছে তপন'-এর মধ্যে একই কবিমনের স্পর্শ রয়েছে। ভারতভূমির 'জ্বলিছে চন্দ্রের ছায়া নদীর উপরি' চিত্রটির আর একভাবে প্রতি-ফলিত হয়েছে প্রলাপ-১এ—'ছড়িয়ে ছড়িয়ে সোনার বরণ / তুষারে মিশিয়ে নদীর জলে' (২২)। প্রথম যুগের বাল্য ও কৈশোর রচনায় এই রকম আরো অনেক মিল ভারত-ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে তুলনা করে দেখানো যায়।

সুতরাং শব্দ ছন্দ ভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করে ভারতভূমিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে অস্বীকার করা কি সংগত?

।।ভারতভূমিতে রবীন্দ্রমানস বৈশিষ্ট্য।।

বাঁশি পথ অসীমের ব্যঞ্জনা ইত্যাদি রবীন্দ্রকাব্যধারার তথা রবীন্দ্র মানসিকতায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জনাগুলি প্রথম যুগের রচনায় বিশেষত ভারতভূমিতে অস্পষ্ট নয়।

ভারতভূমির শেষ তিনটি স্তবকে দেখি বাঁশির স্বর 'ঘুমে অচেতন' ভারতবাসীকে চক্ষু মেল' বলে আহ্বান জানিয়েছে। এ আহ্বান বিধাতার আহ্বান সমগ্র জাতিকে শীর্ষে আরোহণ করবার আহ্বান। 'মৃদুমন্দ হয় বংশীধ্বনি' (২০) 'শুন বংশী প্রতি-ধ্বনি' (২১), বংশীর নিস্বন' (২২) এক অসীমের উন্মাদনা জাগিয়েছে— যেমন জাগিয়েছে পরবর্তীকালে ভানু সিংহের পদাবলী, রবীন্দ্রকাব্যের বহু কবিতা। ভারত-ভূমির পরবর্তী কবিতা অভিলাষের ২ ৪ ১৫ ১৬ স্তবকে দেখি 'ব্যাধের বাঁশি', শুনি মোহময়ী বাঁশির স্বর'। কিন্তু হিন্দুমেলার উপহার থেকে বাঁশির বদলে এসেছে 'বীণা' প্রসংগ। হিন্দুমেলার উপহারের ১ ৪ ১৬ স্তবকে 'কবিতার শ্লোক বীণার তারেতে' শুনি। প্রকৃতির খেদ ১ পাঠে দেখি 'কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝংকারিত' (১৬), প্রলাপ-১এ 'বাজাইব বীণা আকাশ ভরিয়া' (২৮) বাসনা। শৈশবসংগীতের 'ফুলবালা' 'পাগল' কবিতায় এসেছে বীণা প্রসঙ্গ। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার বাঁশির ব্যঞ্জনা ফিরে পেয়েছে রবীন্দ্রকাব্য। তাই বনফুলের ৩য় সর্গে এবং কবিকাহিনীর ১০ সর্গে দেখি বাঁশির প্রসঙ্গ। দৃষ্টির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিবৈচিত্র্যে শতরূপে শতবার তা আমাদের 'মানসো সুরধুনী পারে' নিয়ে গেছে। কিন্তু সদ্য কবিপ্রাণে অসীমের আহ্বান ভারত-ভূমির বাঁশির স্বরেই প্রথম জেগেছিল।

'পথ' রবীন্দ্রকাব্যে দেখা দিয়েছে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনসাধনের অন্যতম সেতু-রূপে। ভারতভূমিতে আছে দুর্গম পথের আহ্বান—'হে ভারত নর, গিরির উপরে সবে আইস এখনি।' কবির বিশ্বাস—পথপ্রদর্শকের নেতৃত্ব উত্তরকালে 'বাখানিবে এ ভুবনে নব হিন্দু বীরে' (১৮)। অভিলাষেও পথের প্রসঙ্গ আছে ৮ ১১ ১২ ১৪ ১৮ ২৪ ৩৭ ৩৮ স্তবকে। এ পথের ব্যঞ্জনা রবীন্দ্র সরণির মত প্রশস্ত নয়, মেঠো পথের মতই সংকীর্ণ। এ পথে চিরন্তন পথিকের ডাক নেই, আছে মাটির মায়ের বিপন্ন আহ্বান।

রবীন্দ্রকাব্যে সীমাকে অতিক্রম করেই অসীমের প্রকাশ। ভারতভূমিতে তাই বাসনা —'চলি যাবে আনন্দেতে দেখ নিকেতনে' (১৯)। অভিলাষে অসীমের ব্যঞ্জনা জাগিয়েছে আশা—'চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম/ কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়/ বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি' (৪) প্রলাপ-১-এর কবি 'জ্যোতির্ময়ী ছায়া স্বরগীয় মায়া'-র (১৩) সন্ধান পেয়েছেন। তাই কবি 'পৃথিবী ফিরিয়া জগত ফিরিয়া/ হরষে পুলকে দিবস রাতি' (৩৪)/ 'অবসাদে'র কবি শুনেছেন 'বাজে সদা আনন্দের গীত', দেখেছেন 'পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া।' ভারতভূমি রবীন্দ্ররচনারূপে সংযোজিত হলে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে ভ্রূণাবস্থায় প্রকাশে 'বাঁশির স্বর' 'পথ' ইত্যাদি অসীমের ব্যঞ্জনাগুলি কবিমনে কীভাবে ক্রমবিকশিত হয়েছিল, সেই বিবর্তনের প্রথম স্তরটি এতকাল পর সুস্পষ্ট হবে বলে আশা রাখি।

(ক্রমশঃ)

প্রীতিভাজনেষু ॥

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সিউড়ি থেকে উড়ে এল ৭৩ ছত্রী পত্রে কুশল সংলাপ ঃ
তুমি কী রকম আছ? তুমি কী রকম আছ? কেমন এখন?
বন্ধুর উৎকণ্ঠা যেন সটান তর্জনী কিংবা সঙিনের ভর্ৎসনা,
যেন তীক্ষ্ণতম আলো নিদ্রাতুর চক্ষুর সম্মুখে—
চোখ জ্বলে ওঠে, স্পষ্ট তাকানো যায় না।
অন্তর্গত-যন্ত্রণা-অনুতাপবোধে সমস্ত শরীর-স্নায়ু-শিরা
সেতারের মতো বাজাতে চায় ঃ
ভালো নেই, ভালো নেই, কোনোদিন ছিলাম না ভালো।

দিনলিপি ॥

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কাঁটার বেড়া চারিদিকে, তবুও গোঁয়ার্তুমির শেষ নেই,
বাইরের অন্ধকার ওৎ পেতে আছে, খুবলে খাবে
ভেতরটা; যতক্ষণ কান্না, ততক্ষণ অপেক্ষা,
তারপর
দিনের খবর পৌঁছাবেনা পাতালের কোঠায়।
ক্রমাগত টানাপোড়েনে রাত বাড়ে, দিন বহুদূরে।
পাখির ডানার ঝাপটানিতে আকাশ
ছেঁড়ে না, কিন্তু দুঃখের কান্নায় ঝাঁঝরা
হয়, সুখ কোন গাছে ফলে কেউ জানে না।
ওদিকে পাদনখের ক্রিয়া সমানে চলতে থাকে,
ছিটে বেড়ার আড়ালে কচিকন্ঠের কান্না বাড়ে,
পাতালের কলিজা কুঁকড়ে আসে।
গভীর রাতে ক্লান্ত কণ্ঠের হরিবোল শোনা যায়;
সকালের সূর্য রক্তচক্ষু নিয়ে তেমনই উঠেছে।

শব্দের শিকল ছিঁড়ে গেল॥

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

শব্দের শিকল ছিঁড়ে পড়ে যায় শব্দময় ক্ষণ
অন্তরে বিন্দুকে খোঁজে মুক্তো
হাতড়ে নাও সবুজ সকাল আর মরা জ্যোৎস্না
খিঁচিয়ে উঠেছে শব্দের রক্ত শাদা
দুহাতে মেখে নাও চটচটে ঔদাসীন্য
তারপর আত্মস্থ তুমি নির্বাক প্রতিমা
শিকল ছিঁড়েছো অদ্ভুত হিংস্রতায়
তোমার নারীত্বের ঐশ্বর্য নিয়ে
প্লাস্টিকের আলমারিতে তুলে রাখ
আলতো ছুঁয়ে মাঝে মধ্যে
শব্দের শিকল ছেঁড়ে বাসনার উন্মাদে
এগিয়ে এসে তুলে নাও কুড়িয়ে সব কিছু,
টুকরো কণাগুলো আতঙ্কিত শূন্যতায়
বিষাদে কাতর
ছিঁড়ে যেন নির্বাক আরণ্যক জীব
শব্দের শিকল ভেঙে গেলে
সবুজ রোদ উঠবে এক
প্রত্যাশিত সকালে।

ডবল এজেন্ট

বিক্রমাদিত্য

বাজারে ওর নাম ছিল আনোয়ার বে।

নাইট ক্লাবের মেয়েরা ওকে আদর করে ডাকত আনোয়ার পাশা কখনো কখনো ছোট নাম ধরে ডাকত : পাশা।

বিদেশী সিক্রেট সার্ভিসের খাতায় ওর নাম লেখা ছিল : লাকি স্ট্রাইক।

শুধু তাই নয়। সিক্রেট সার্ভিসের কর্তারা আরো কয়েকটি কথা আনোয়ার পাশার জীবন সম্বন্ধে লিখে রেখেছিলেন।

: আনোয়ার পাশা ছদ্মনাম লাকি স্ট্রাইক বয়স পঁয়ত্রিশ জন্ম এবং কোন দেশের লোক সঠিক জানা যায় না। তবে বাজারে গুজব হোল যে আনোয়ার পাশা হোল বাসটার্ড। অর্থাৎ জন্ম বাপ-মা'র সঠিক খবর এবং পরিচয় জানা যায় না। ওর মা ছিলেন বেলী ড্যান্সার আর বাবা ছিলেন ফরাসী ট্যুরিস্ট। মিশর দেখতে এসে ওর মায়ের নাচ দেখে বাবা মুগ্ধ হলেন। ব্যস তারপর এক রাত্রে আনোয়ার পাশার জন্ম হোল।

সিক্রেট সার্ভিসের খাতায় আরো দুটি কথা লেখা ছিল।

: আনোয়ার পাশা—কখনো একে বিশ্বাস করাব না। ইজিপ্টের সিক্রেট সার্ভিস আনোয়ার পাশাকে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। ওদের কাছে খবর ছিল যে আনোয়ার পাশা হোল ডবল এজেন্ট। কিন্তু প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের এবং অন্যান্য আরব ন্যাশানলিস্ট দল বিশ্বাস করতো যে আনোয়ার পাশা হলো সি আই এ এজেন্ট। ১৯৭০ সালে জর্ডনের ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর ঘটনার পর বাজারে আরো একটি গুজব রটলো যে আনোয়ার পাশা হোল

ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিস মোসাদের এজেন্ট। এই অভিযোগ একেবারে মিথ্যে ছিল না। কারণ ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিসের কর্তারা আনোয়ার পাশার কথা উঠলেই হেসে বলতেন : ও আনোয়ার হী ইজ আওয়ার ম্যান ইন আম্মান।

আনোয়ার পাশার জীবনের আর একটা সৌরচন্দ্রিকা দেয়া প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালে আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ হোল। এই যুদ্ধে আনোয়ার পাশা ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে আর্মস এবং ইউনিফর্ম বিক্রী করলো। যুদ্ধে পরাজিত হবার পর আরব নেতারা অভিযোগ করলেন যে আনোয়ার পাশা যে সব হাতিয়ার আমাদের কাছে বিক্রী করেছিলেন সেগুলো ছিল বাজে মাল। অকেজো যুদ্ধের কোন কাজেই আসে নি।

আর ইউনিফর্মগুলোর কথা না বলাই ভালো। গায়ে পরবার সঙ্গে ইউনিফর্মগুলোর সুতো খুলে গেল। আর্মি বিভাগ অভিযোগ করলেন : আনোয়ার পাশা আমাদের ঠকিয়েছেন।

হয়তো আরব নেতারা একটি কথা জানতেন না। আর সেই কথাটি হোল যে সব হাতিয়ার আনোয়ার পাশা ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে বিক্রী করেছিল সেগুলো সাপ্লাই করেছিলেন ইস্রাইলী সিক্রেট সার্ভিস : শেন বেত। আনোয়ার পাশা ছিলেন মিডলম্যান অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ভাষায় বলতে হবে : ডিলার। কমিশন নিয়ে আনোয়ার পাশা এই আর্মস ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে বিক্রী করেছিল। তার এই কমিশন থেকে বেশ মোটা একটা অংশ দিয়েছিল ইজিপ্টের সম্রাট ফারুককে এবং তার সেক্স বম্ব শাব্ববী নাদিয়া সুলতানকে।

তারপর এলো প্রেসিডেন্ট নাসেরের যুগ।

আনোয়ার পাশা ভোল পাল্টালো। নাসের নেগুইবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো। ইজিপ্টের বিপ্লবের দিন রাত্রে আনোয়ার পাশা বিপ্লবী দলের পুরোভাগে ছিল।

কিন্তু একটি গোপন কথা নাসের নেগুইব জানতে পারলেন না।

এই বিপ্লবের সময় আনোয়ার পাশা সি আই এ'র মধ্যপ্রাচ্যের বড় কর্তা কেরমিট রুজভেল্টের এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। তার এই গোপন কাজকর্মের খবর আরব নেতারা জানতেন না।

এই সময়ের আরো একটি ঘটনা বলা দরকার।

১৯৫১-৫২ সালে আনোয়ার পাশা হেরোইন স্মাগলিং করতে সুরু করেছিল। আর তার হেরোইন স্মাগলিং-এর প্রধান ঘাঁটি ছিল মার্সাই এবং বেরুট।

এক বছর বাদে নেগুইব নাসেরের বন্ধুত্বের ফাটল ধরলো।

১৯৫৬ সালে বৃটেন এবং ফ্রান্সের সেনাবাহিনী ইজিপ্ট আক্রমণ করলো। প্রকাশ্যে আনোয়ার পাশা ইজিপশিয়ান আর্মির সাপ্লায়ার হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু তার গোপন কাজ ছিল ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসের কাছে ইজিপশিয়ান আর্মির গোপন খবরাখবর দেয়া। আনোয়ার পাশার গোপন খবর পাচার করবার একটি বিশেষ কারণ ছিল।

মার্সাই শহরে হেরোইন স্মাগল করতে গিয়ে আনোয়ার পাশা ধরা পড়ে। হয়তো পুলিশ আনোয়ার পাশাকে জেলখানায় পুরতে পারতো। কিন্তু ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসের কর্তারা আনোয়ার পাশাকে বললেন, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করো তাহলে আমরা জেলখানায় পাঠাবো না। বরং আমাদের সঙ্গে কাজ করলে মোটা পুরস্কার পাবে।

আর সেই পুরস্কার হোল : হেরোইন এবং হাসিস।

তাঁরা আনোয়ার পাশাকে এই দুটি মাদক দ্রব্য মার্সাই শহর থেকে আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্মাগলিং করতে সাহায্য করলেন।

বেরুট শহরে আনোয়ার পাশা স্মাগলিং-এর এক মস্ত বড় ঘাঁটি বানালো। বেরুট শহর থেকে ট্রাক এবং লরী করে হেরোইন হাসিস আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হোত।

জর্ডানের রাজধানী আম্মানে বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাছে আনোয়ার পাশা হেরোইন এবং হাসিস বিক্রী করতো।

তার হাসিস বিক্রী করবার আরো দুটি বড় বাজার হলো : মিশর এবং সৌদী আরবিয়া।

বহুদিন ধরে মিশরের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার হাসিস খেতো। তার প্রধান কারণ হলো সম্রাট ফারুকের আমলে কাউমসের আইন কানুন শিথিল ছিল।

আনোয়ার পাশা এইসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে হাসিস বিক্রী করতে সুরু করলো। আর হাসিস বিক্রী করবার সময় এইসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতো।

আর এইসব গোপনীয় খবরের কিছুটা সি আই এ কিছুটা এস ডি ই সি ই'র কাছে এবং বাকিটা ইস্রাইলী ইন্টেলীজেন্স মোসাদের কাছে বিক্রী করতো।

আনোয়ার পাশা সে যুগের আরব দেশের ধনী ব্যক্তিদের কাছে বিক্রী করতো হেরোইন। আর হেরোইনের সঙ্গে সঙ্গে বড়-লোকদের কাছে আর একটি আকর্ষণীয় জিনিস সাপ্লাই করতো। এই জিনিসটি হোল : 'দ্য প্যাকেজ' অর্থাৎ মেয়েমানুষ।

তেলের পয়সার অভাব নেই। আনোয়ার পাশা এইসব ধনী লোকদের কাছে হেরোইন বিক্রী করতে সুরু করলো। কিন্তু হেরোইনের নেশা জমাবার জন্যে সুন্দরী নারীর প্রয়োজন।

আনোয়ার পাশা এবার শিল্পের কাজ অর্থাৎ মেয়ে সাপ্লাইয়ের কাজ করতে সুরু করলো।

কেউ এই মেয়ে সাপ্লাইয়ের কথা উল্লেখ করলে আনোয়ার পাশা ভুরু তুলে তাকাতো। হাসতো। প্রতিবাদ করে বলতো, আমি পিম্প নই। আমি নাইট ক্লাব ক্যাবারের জন্য আর্টিষ্ট সাপ্লাই করি। আর এইসব আর্টিষ্টরা যদি বড়লোকদের সঙ্গে প্রেম করে তবে দোষ কী আমার?

আর একটা কথা বলা দরকার।

ফ্রান্স, সুইডেন, জর্মানী এবং ইংল্যাণ্ড থেকে এইসব মেয়ে আর্টিষ্ট যোগাড় করা হোত।

আর এই মেয়ে সংগ্রহ করতে বিদেশী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস বিশেষ করে সি-আই-এ এবং ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস আনোয়ার পাশাকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করতো। সাহায্য করবার কারণ ছিল। তারা তেলের খনির কনসেশন আদায় করবার জন্য এইসব মেয়েদের আরবদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতো। কখনও কোন অঞ্চলে আরব সরকারের কোন আমলা যদি বিদেশী তেল কোম্পানীকে বিপদে ফেলতো কিংবা তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতো অমনি আনোয়ার পাশা এক সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ঐ সরকারী আমলার কাছে হাজির। আমলার মন ভিজে যেত। সুন্দরী মানুষের জয় সর্বত্র।

১৯৬০ সালে ইয়েমেনের যুদ্ধের সময় আনোয়ার পাশা আর একটি নতুন ধরনের কাজ সুরু করলো। এই নতুন কাজ হোল : গান রানিং......কিংবা সোজা ইংরাজী ভাষায় বলা যায় আর্মস সাপ্লাই।

আনোয়ার পাশা ইয়েমেনের ইমামের কাছে গোপনে বহু আর্মস সাপ্লাই করেছিল। তার এই আর্মস সাপ্লাইয়ের কথা দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্ট নাসের কিংবা সালাল এবং ইজিপশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস জানতে পারেন নি।

১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধের পর জানা গেল যে আনোয়ার পাশা হল সি-আই-এর এজেন্ট। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের কর্তারা অভিযোগ করলেন যে আনোয়ার পাশা হল একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি অর্থাৎ ডেঞ্জারাস ম্যান। তাকে খুন করা একান্ত আবশ্যক। নইলে আরবদেশ কখনই ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না। আনোয়ার পাশা কোনো কোনো বড় আরব নেতাকে হেরোইন হাসিস এবং মেয়েমানুষ সাপ্লাই করে বশ করছে। এঁরা নাকি আনোয়ার পাশার বুদ্ধি-পরামর্শানুযায়ী কাজ করে থাকেন। তাদের বক্তব্য হোল যে যতদিন আনোয়ার পাশা জীবিত থাকবে ততদিন আরব সৈন্যবাহিনী ইস্রাইলী সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না।

আরব গোয়েন্দা বাহিনী পরপর তিনবার আনোয়ার পাশাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হোল। আনোয়ার পাশাকে খুন করা গেল না। বরং আরব গোয়েন্দা বাহিনীর নেতাদের মৃত্যু হোল। এইসব নেতাদের

মধ্যে বিখ্যাত প্যালেস্টাইনিয়ান সাহিত্যিক এবং পলিটিক্যাল লীডার গাসান কানাফানির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই হোল আনোয়ার পাশার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

এবার এই বৈচিত্র্যময় রঙিন জীবনের কিছু গল্প বলা যাক।

এই কাহিনী আনোয়ার পাশার ভাষায় বললে গল্পের আসর জমবে।

ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসে চড়ে আমি যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেয়োগাদে যাচ্ছিলুম। বেয়োগ্রাদ শহরে আফ্রো এশিয়ান দেশের নেতাদের একটি রাজনৈতিক মিটিং ছিল। আমি যাচ্ছিলুম ওখানে কয়েকজন আফ্রিকান নেতার সঙ্গে দেখা করতে। আমার উদ্দেশ্য ছিল এইসব আফ্রিকান দেশগুলোর বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং এদের কাছে হাতিয়ার বিক্রী করা।

এবার হয়তো আপনি জিজ্ঞেস করবেন, আমি কে?

আমার নাম আনোয়ার খালদুন। কিন্তু বাজারের লোকের কাছে আমি আনোয়ার বে নামে পরিচিত। কিন্তু আমার সুন্দরী বান্ধবীরা আমাকে আনোয়ার পাশা বলে ডাকতো। শেষ পর্যন্ত বাজারে পাশা নামটি প্রচলিত হয়ে গেল।

সাধারণত আমি য়ুরোপ যাবার সময় ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চেপে যাই। এই
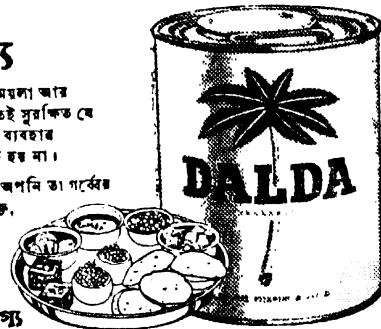
ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের রহস্যজনক কাহিনী হয়তো ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। সারা দুনিয়ার সবাই জানেন যে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের খ্যাতি হোল খুন, ডাকাতির ও স্পাইর কাজকারবারের জন্যে। আমি এই ট্রেনে চেপে যাতায়াত করি, কারণ আমি এই ট্রেনে বিস্তর ক্লায়েন্ট পাই। বিদ্রোহী, বিপ্লবী, স্মাগলার ওরাও এই ট্রেনে চেপে য়ুরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আসেন। ওদের সঙ্গে এই ট্রেনে আলাপ পরিচয় হয়, ব্যবসা নিয়ে ডিল করি।

স্টেশনে আমাকে তুলে দিতে লুলু এসেছিল।

লুলু আমার বান্ধবী, গার্ল ফ্রেন্ড। লুলুর সঙ্গে যদি আপনারা আলাপ পরিচয় করেন তবে বলবেন যে আনোয়ার পাশার রুচি আছে। আর আমার রুচি খুবই শৌখিন।

লুলু তিলোত্তমা সুন্দরী। তার কারণ সে হলো প্যালেস্টাইন গার্ল। দুধে আলতায় রং, স্নিগ্ধ চোখ......আমি অনেকবার আমার বন্ধু বান্ধবদের বলেছি, পৃথিবীর কোথাও যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে তাহলে ওদের জন্মস্থান হোল প্যালেস্টাইন।

লুলু প্যালেস্টাইনের মেয়ে একথা আমি অনেকদিন জানতে পারিনি। আজ ট্রেনে উঠবার আগে তার আভাষ পেলুম। তাই ট্রেনে উঠবার সময় যখন টের পেলাম যে লুলু ফরাসী মেয়ে নয়, সে হলো প্যালেস্টাইনিয়ান তখন আমি চিন্তিত হলুম।

পরবর্তীকালে আর একটি খবর জানতে পেরেছিলাম যে লুলু আসলে হোল প্যালেস্টাইনিয়ান গেরিলা কমাণ্ডোর একজন কর্মী। কিন্তু এই খবর অনেক পরে জানতে পেরেছিলুম। আর সেই কাহিনী পরে বলা যাবে।

ট্রেনের ডাইনিং কারে বসে ভাবছিলুম যে, সুন্দরী মেয়েরা কেন গেরিলার কাজ করে? তখনও বুঝতে পারিনি যে এই প্যালেস্টাইনিয়ান ছেলেমেয়ের দল দেশের জন্যে সব করতে পারে। হাজার হাজার তরুণ-তরুণীরা দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে। কেন জীবন দিচ্ছে আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কারণ আমি ছিলাম ভিন্ন জাতের ভিন্ন রুচির লোক।

ডাইনিং কারের ওয়েটারকে ডেকে বললাম, 'কালভাদো সিল ভুপলে'। এইখানে বলে রাখি, আমি অনেক ভাষায় কথা বলতে পারি। আমার মুখে ফরাসী ভাষা শুনলে আপনি বলতে পারবেন না যে আমি দ্যগলের বংশধর নই।

আমার বাবা ছিলেন ফরাসী আর মা ছিলেন ইজিপশিয়ান বেলী ডান্সার। পরে শুনেছিলুম যে আমার জন্ম আদৌ আইনসম্মত ছিল না। আমি ছিলুম আপনারা যাকে বলেন বেজন্মা মানুষ।

ওয়েটার আমার অর্ডার শুনে হকচকিয়ে গেল।

ওকে বোঝাবার জন্যে আমি আর একবার জোর গলায় বললাম : কালভাদো সিল ভুপলে।

হয়তো ওয়েটার এবার আমার কথা বুঝতে পারলো। অর্ডার নিয়ে চলে গেল। এবার আমি একটি হাভানা সিগার ধরালুম। আজকাল আমি সিগারেট খাইনে—সিগার খাই। কারণ আজকাল মেয়েরা সিগারেট খেয়ে থাকেন।

ওয়েটার কালভাদো নিয়ে এলো। কালভাদো খুব কড়া নেশার ফরাসী ড্রিংক। আমি কালভাদোর গ্লাসে চুমুক দিলুম। তারপর আবার লুলুর কথা ভাবতে লাগলুম।

'লুলু হোয়াট এ গার্ল......ওঃ লা-লা, অমন সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। ভারী মিষ্টি স্বভাব। আমার সঙ্গে এত সহজে সরলভাবে প্রেম করতো যে লুলুর প্রতি আমার একটা স্নেহ মায়া হয়েছিল।

হয়তো প্রেম মানুষকে অন্ধ করে। কিন্তু আনোয়ার পাশা তো কোনদিন প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়েনি। তবে আজ লুলুর প্রতি এই দুর্বলতা কেন?

আমি ভাবতে লাগলুম আজ ট্রেনে উঠবার সময় আমি সারাটা বিকেল লুলুর সঙ্গে বসে গল্প করেছিলাম। বিবিধ ধরনের গল্প, আমার জীবন কাহিনী.....।

সর্বনাশ : আমি লুলুকে বেশ কিছু গোপন কথা বলেছিলুম। আমি লুলুর কাছে কেরমিট রুজভেল্টের কথা বলেছিলুম। শুধু তাই নয়। আমি যখন লুলুকে বলেছিলুম তখন লুলু তার মুখটি আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো। তারপর মিষ্টি ভিজে গলায় বলল : কিস মী।

আমি লুলুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। লুলুকে জড়িয়ে ধরলুম। তারপর চুমু খেলুম।

সর্বনাশ : আমি এই চুমু খাবার সময় বলেছিলুম যে আমি ১৯৪৮ সালে ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে কতগুলো বাজে হাতিয়ার বিক্রী করেছিলুম।

জীবনের দুর্বল মুহূর্তে তার কাছে যেসব কথাগুলো বলেছিলুম আজ সেই কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

আমি লুলুকে বলেছিলুম......

*

১৯৪৭ সাল, আলকাহেরা।

সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু সুরু হয়েছে আরব ইস্রাইলী ঝগড়া বিবাদ......

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক আকাশে ছিল কেমন একটা থমথমে ভাব। এই আবহাওয়া দেখে কারু বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এই অঞ্চলে শিগ্গিরই একটা লড়াই হবার সম্ভাবনা আছে।

কবে এবং কোথায় এই যুদ্ধ সুরু হবে এইটে নিয়ে সবাই আলোচনা করতে লাগলো।

ইংরেজ শাসনকর্তারা তখনও প্যালেস্টাইনে কায়েমী হয়ে বসে আছেন। প্রতিদিন তাঁরা ইস্রাইলী বন্ধুদের উস্কানি দিচ্ছেন : লড়াই সুরু কর। নইলে আরবরা তোমাদের এই দেশ থেকে তাড়াবে।

বিভিন্ন উপায়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এবং শাসনকর্তারা ইস্রাইলীদের সাহায্য করতেন।

প্রত্যেকটি আরবদেশ ইস্রাইলী স্পাইতে গিস গিস করতো।

ইস্রাইলী স্পাই কায়রোতে ছিল। এদের মধ্যে কিছু ছিল মেয়ে স্পাই। এই মেয়ে স্পাইদের মধ্যে নাদিয়া সুলতানের নাম উল্লেখযোগ্য। ভদ্রমহিলার বাবা ছিলেন ফরাসী ইহুদী আর মা ছিলেন আরব...।

নাদিয়া সুলতান ছিলেন ইজিপটের সম্রাট ফারুকের বান্ধবী। কায়রোর বাজারে খবর ছিল যে নাদিয়া সুলতান হলেন সম্রাটের মিসট্রেস কিংবা রক্ষিতা।

কিন্তু বাজারের এই অপবাদ নিন্দায় ফারুক একটুও কান দিতেন না। কারণ ফারুকের জীবনে মেয়ে বান্ধবীর অভাব ছিল না। কিন্তু নাদিয়া সুলতানকে হয়তো সবচাইতে বেশী ভালোবাসতেন।

•

ফারুকের চরিত্রের এই দুর্বলতার কথা আমি জানতুম। কিন্তু তবু আমি কোনদিন সম্রাট ফারুক কিংবা তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে মাথা ঘামাইনি কিংবা তাঁদের চরিত্রের কলঙ্ক নিয়ে কারু সঙ্গে কখনও আলাপ আলোচনা করিনি। কিন্তু তবু জীবনের এমনি ভাগ্যচক্র যে আমি নাদিয়া সুলতান এবং ফারুকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম। কী করে, সেইটে আমাকে বলতে হবে। কিন্তু তার আগে আমার আর ফারুকের আর এক বান্ধবীর কথা বলতে হবে। এই বান্ধবীর নাম ছিল আনি বারিয়ার। আমি যখন নাদিয়া সুলতানের জীবনের সংস্পর্শে এলুম তখন একদিন আনি বারিয়ার আমাকে একা পেয়ে বললো : পাশা, তুমি আগুন নিয়ে খেলো করছ। একটু সাবধানে থেকো, নইলে এই আগুনে পুড়ে মরবে। ...

আমি আনি বারিয়ারের সে কথায় কান দিইনি। কারণ আমি অল্প বয়েস থেকে ছিলুম অতি ধুরন্ধর সেয়ান। নিজের জীবনে উন্নতি লাভ করবার জন্যে কার মন ভেজাতে হবে আমি জানতুম। আমি খবর পেয়েছিলুম যে আজকাল সম্রাটের বান্ধবী হলেন নাদিয়া সুলতান। কিন্তু আনি বারিয়ার আমাকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে ওটা ওর আসল নাম নয়। নাদিয়া সুলতান হলেন ইহুদী এবং তার আসল নাম হল লিলি কোহেন।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিদিন ইহুদী বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে প্রবল এবং তীব্র হচ্ছিল। সম্রাট ফারুকও বুঝতে পেরেছিলেন যে কিছু কালের মধ্যে ইহুদীরা এই অঞ্চলে কায়েমী হয়ে বসবে। তাই সম্রাটও প্রতিদিন ইহুদী বিদ্বেষী বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু রাত হলেই সম্রাট ভুলে যেতেন যে তিনি একজন ইহুদী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন। আর এই মেয়ে

শুধু মাত্র ইহুদী নয়, এ হল ইস্রাইলী ইন্টেলীজেন্সের অভিজ্ঞ স্পাই।

নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে আমার কী করে আলাপ পরিচয় হল সেই কথা বলবার আগে আমাকে আনি বারিয়ারের কথা বলতে হবে।

ঃ আনি বারিয়ারও সম্রাট ফারুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ফরাসী। কায়রোর স্কারাবে নাইট ক্লাবে গায়িকার কাজ করতেন। গায়িকা হিসাবে আনি বারিয়ারের যশ ছিল না, কিন্তু নাইট ক্লাবের খদ্দেরদের কাছে আনি বারিয়ারের আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল তার দেহ-সৌন্দর্য।

আমিও আনি বারিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম কিন্তু ভিন্ন কারণে। আমি ছিলাম স্কারাবে নাইট ক্লাবের বার-ম্যান। আমি শুধু বারের পাশে দাঁড়িয়ে মদ মেশাতুম না। আমার আর একটি কাজ ছিল। আর সেই কাজ হলো ঃ কারিয়ারের কাজ। যেসব খদ্দেরেরা আনি বারিয়ারের সঙ্গে চিঠিপত্রাদি কিংবা প্রেমের আলাপ আলোচনা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করতো আমি তাদের এই কাজে সাহায্য করতুম। আর প্রতি কাজের জন্যে কমিশন আদায় করতুম।

আমি জানতুম যে আনি বারিয়ার ছিল খুবই অভিজ্ঞ প্রেমিকা। বাজারে তার স্তাবকের অভাব ছিল না। নাইট ক্লাবের কাজে সই করবার আগে আনি বারিয়ার দুবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু তার দৈহিক প্রেমের আকাঙ্খা এত তীব্র ছিল যে কোন বিয়েই ধোপে টেকেনি।

একদিন স্কারাবে নাইট ক্লাবে আলোড়ন সুরু হল।

দুপুর বেলায় শুনলুম সেদিন রাত্রে সম্রাট ফারুক নাইট ক্লাবে আসবেন। আর তার সঙ্গে আসবে তার অগুণতি মোসাহেবের দল। সম্রাট ফারুক কখনও মদ্য পান করতেন না, কিন্তু অতি বিশ্বস্ত অনুচর আনতানিও পুলি শ্যামপাইন ছাড়া কিছু পান করতেন না। স্কারাবে নাইট ক্লাবের মালি বিকেল চারটে থেকে কয়েক ডজন শ্যামপাইন ফ্রিজে ভরলেন। শ্যামপাইন রীতিমত ঠাণ্ডা হওয়া চাই। নইলে সেই মদ পান করে আস্বাদ পাওয়া যাবে না।

আমাদের হিসেবে একটু ভুল ছিল। কারণ আমরা জানতুম না যে সেদিন রাত্রে সম্রাট ফারুক আনি বারিয়ারের গান শুনতে কিংবা কোকাকোলা পান করতে নাইট ক্লাবে আসছেন না। তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হল আনি বারিয়ারকে তাঁর শয্যা-সঙ্গিণী করা। ফারুক দেশের সম্রাট হলে কী হবে? প্রেমের কাজকর্মে তিনি জাতধর্ম এবং সে কোন দেশের মেয়ে তার বাছ বিচার করতেন না। শুধু তাঁর একটি কামনা ছিল ঃ মেয়ে সুন্দরী অপ্সরা হওয়া চাই। আনি বারিয়ার সামান্য গরীব ঘরের মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু কায়রোর নাইট ক্লাবে তার মত আর কোন রূপসী ছিল কিনা সন্দেহ।

নাইট ক্লাবের গান শেষ হবার পর আনতানিও পুলি আমাকে তলব করলেন। আমি কী ধরনের কাজ করতুম একথা আনতানিও পুলির অজানা ছিল না। তিনি কোন ভনিতা করলেন না। সোজাসুজি আমাকে বললেন...হিজ ম্যাজেস্টি আনির সঙ্গে দেখা করতে চান।

এই বলে আনতানিও পুলি আমার হাতে দুটো দশ পাউণ্ডের নোট গুঁজে দিলেন।

সম্রাট আমার পানে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালেন। এই বাঁকা নজরের কী মানে তা আমি জানতুম। এর অর্থ হল ঃ সাই বয়, এ কাজে ভুল-ত্রুটি করো না। তাহলে তোমার গর্দান থাকবে না।

আমি এবার হাতের মুঠোর পানে তাকালুম।

দুটো দশ পাউণ্ডের নোট কখনও এক সঙ্গে দেখিনি। তাই লোভে আমার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। আমি এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললুম ঃ ইয়েস, ইয়োর ম্যাজেস্টি...আপনার আদেশ রক্ষায় কোন ত্রুটি হবে না।

ওদের দেখা সাক্ষাতের জন্যে নাইট ক্লাবের পেছনের একটি ঘর বন্দোবস্ত করলুম। নির্জন ঘর, এই দিকটায় খদ্দেররা বড় কেউ আসতো না। তাই ভেবেছিলুম যে এই নির্জন ঘরে বসে ওরা নিশ্চিন্ত মনে প্রেমালাপ করতে পারবেন।

দু-মিনিটের মধ্যে ওদের দুজনের প্রেমালাপ বেশ জমে উঠলো। ওদের আলাপ আলোচনা ও প্রেমালাপ শুনলে কে বলবে যে ওরা স্বামী স্ত্রী কিংবা বহু পুরাতন প্রেমিক প্রেমিকা নয়।

সম্রাট ফারুকের ছিল বিচিত্র শখ। তিনি এবার আনি বারিয়ারের কাছে প্রস্তাব করলেন ঃ না, এই ছোট নাইট ক্লাবের ঘরে বসে আমি তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে পারবো না। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চলো, আমরা গাড়ী করে নির্জন কোন এলাকায় বেড়িয়ে আসি।

আনি বারিয়ার এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করেনি। বরং উৎসাহ দেখিয়েছিল। স্কারাবে নাইট ক্লাবের বাইরে ফারুকের ক্যাডিলাক গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভারকে ফারুক ছুটী দিলেন। তারপর আনি বারিয়ারকে নিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলেন। আনি বারিয়ার আমাকে চোখের ইশারায় বললেনঃ এই গাড়ীর পেছনে তুমিও এসো।

ফারুকের গাড়ীর পেছনে আর একটা গাড়ী ছিল। এ গাড়ীর ভেতর ছিল আনতানিও পুলি এবং ফারুকের বডিগার্ড। আর একটা গাড়ীতে ছিলুম আমি।

ফারুক খুব জোরে গাড়ী চালাতে ভালবাসতেন। এবারেও তিনি গাড়ী নিয়ে কায়রোর শহরতলী প্রান্তে হেলিওপলিসের দিকে গেলেন।

হেলিওপলিসের পাশেই হল আলমাজ পল্লী। এইখানে একটি ছোট রাস্তা ছিল। নির্জন নিরালা সন্ধ্যা হলেই এই রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে ছেলেমেয়েরা প্রেম করতো। তাই এই রাস্তার নাম হয়েছিল ঃ লাভার্স লেন।

ফারুক লাভার্স লেনে গাড়ী দাঁড় করালেন। ঠিক গাড়ীর পেছনে আমি আমার ছোট গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর আমার পেছনে রইলো আনতানিও পুলির গাড়ী।

তার পরবর্তী কাহিনী ব্যাখ্যা করে লাভ নেই। সে হল স্রেফ কামসূত্রের গল্প। আমি দূরে থেকে দাঁড়িয়ে আনি বারিয়ার এবং ফারুকের প্রেম দেখতে লাগলুম।

ফারুক আনিকে বেশ জোরে চেপে ধরেছেন। আনিও ফারুকের আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পাবার কোন চেষ্টাই করেনি। বরং পর পর আরো দুটো এমন কাণ্ড করে বসলো যে ফারুক আরো উত্তেজিত হলো।

এমন সময় দেখতে পেলুম দূরে থেকে একটি পুলিশের ভ্যান আসছে।

আমি এবং আনতানিও পুলি উদ্বিগ্ন হলুম। হঠাৎ এই মাঝ রাত্রে পুলিশের ভ্যান লাভার্স লেনের দিকে আসছে কেন?

আনতানিও পুলি আমার দিকে তাকালেন। ওর দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থ বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হল না। বিপদ এসেছে?

বিপদ? ফারুকের আবার বিপদ কী। উনি হলেন দেশের শাহানশা, বাদশা। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলুম যে আজকের এই ঘটনার ভেতর বিপদ ছিল বৈ কী?

(ক্রমশ)

রবীন্দ্রসংগীতকে আমি জনপ্রিয় করেছি একথা ভাববার স্পর্ধা আমি রাখি না। তাঁর গান গাইবার এবং শেখাবার অধিকার যাঁরা আমাকে দিয়েছেন এ গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য।

পংকজ মল্লিক

সংগীতে রবীন্দ্রযুগ নামে যে উজ্জ্বল অধ্যায়টিকে আজ চৈতন্যযুগের সেই প্রেমে মাতোয়ারা স্রোতে বহে ধারা'-র সংগে অনায়াসেই তুলনা করা যায়, সে-অধ্যায়ের স্রষ্টা একমেবাদ্বিতীয়ম পংকজ মল্লিক। এ-কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। ইনি একাধারে রবীন্দ্রসংগীতের গুরু, সাধক, যথার্থ ভাবধারক। 'সুরের আগুন' তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন দীনাতিদীনেরও প্রাণে এবং সেই কারণেই 'সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে'। অমৃতের 'সুরের আগুন' শুরু হওয়া উচিত ছিলো তাঁর মত যুগস্রষ্টা শিল্পীকে দিয়েই। অনিবার্য কারণে যা হয়ে ওঠেনি, তার জন্য সহৃদয় পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং তাঁদের ধৈর্যের প্রতি সম্মান জানিয়েই সংগীতগুরুর যথা-সম্ভব পূর্ণাংগ চিত্র মেলে ধরার চেষ্টা করছি। শুধু শিল্পীই নয়, এমন সরস অন্তঃকরণের অধিকারীর দর্শন কমই পেয়েছি। কারণ, তিনি হলেন সেই যুগের শিল্পী, যে-যুগে গায়ক গাইতেন আত্ম-প্রকাশের দুর্বার প্রেরণায়। অকারণ পুলকের অজস্র দাক্ষিণ্যে শ্রোতাদের প্রাপ্তির কর্ণ-পুট পূর্ণ করে দিতেন। ব্যবসায়িক কারণে ইনি সংগীতকে গ্রহণ করেননি। গান গেয়েছেন, না গেয়ে পারেননি বলে।

অন্তহীন বাধা, দারিদ্র্যে দেওয়া লাঞ্ছনা (কারণ গান-গাওয়া মানুষ সে-যুগের সমাজের ওপরের মহলে ছিলো অন্ত্যজ) সকল কাঁটাকে উপেক্ষা করে বিকশিত শত-দলের মত দল মেলেছিলো যে অপরূপ সংগীত-ব্যক্তিত্ব তিনিই তুলনাহীন শিল্পী পংকজ মল্লিক।

বাংলা কাব্য সংগীতের অনন্য শিল্পী পংকজ মল্লিক সংগীতজগতের এক স্বর্ণ যুগের প্রতিভূ। দুর্লভ কণ্ঠসম্পদে ইনি কিংবদন্তী তুল্য, অতুলনীয় সুরস্রষ্টা, রবীন্দ্রসংগীতের ভাবগৌরব ও সুরের ঐশ্বর্যের সংগে বাঙালীর তথা জগতের পরিচয় যাঁরা ঘটিয়েছেন সেই সব দিকপাল সংগীতজ্ঞদের অন্যতম একজন এ খবর জানা ছিলো। কিন্তু এ সবের চেয়েও অনেক অনেক বড় তাঁর গভীর ভাবের ভাবুক

মনটির খবর অজানাই থেকে যেতো যদি না ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে কয়েক বার তাঁর বাড়ী হানা দিয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁকে জানবার সুযোগ ঘটতো।

প্রথম দিনের কথা একটু না বলে পারছি না। কারণ ব্যক্তি স্বরূপের পট-ভূমিকা জানা থাকলে—জনমানসের দেউলে তাঁর রবীন্দ্রচেতনার লক্ষ প্রদীপ জ্বালানোর যাদুকরী ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করা সহজ হবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রসংগে পংকজবাবু যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। আত্মগত ভাবে বলে চললেন, ঊনবিংশ শতাব্দী সবদিক দিয়েই ভারতের গৌরবময় যুগ—হোক না সেটা পরাধীন ভারত। সে যুগেই বিরাট মনীষী নাট্যকার, সমাজসংস্কারক দেশপ্রেমিক তপস্বীর আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটেছে—। এবং এই যুগেই ভাবকের রবি-র জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের টাইটেল কি ছিলো জানো?'

ঠাকুর।'

'সে অনেক পরে। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন কুশারী—এই কুশারীরাই হলেন ঠাকুর। আর এই ঠাকুর পরিবারের কুলোত্তম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি হলেন ভানু সিংহ—যিনি সরল মনের মধুর আবেগ দিয়ে পদাবলীর গহন-কুসুম-কুঞ্জ মাঝে মধুর বাঁশী বাজিয়েছেন।

এতক্ষণ যা বললাম শুধু এই-টুকুই বোঝাতে যে, রবীন্দ্রনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রেম তাঁর মজ্জায়। তাই গাছপালা, আকাশ, বাতাস, সবু—সবকিছুর উপরেই তাঁর এত প্রেম, এত ভালবাসা। এদের ভাষা তিনি শুনতে পেতেন। এরা তাঁর কাছে দারুণ জীবন্ত ছিল। বিশ্বপ্রেমিক? উঁহু, বিশ্বপ্রেমিক বললে কিছুই বলা হয় না। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণুর সংগেও তিনি একাত্ম। তাই সকলের বেদনা এমন বাস্তব হয়ে উঠেছিলো তাঁর অনুভবলোকে। আর এই অনুভবেরই আশ্চর্য প্রকাশ হয়েছে তাঁর গানে, কারণ কথা ও সুরের এমন মিলন কবি ও সুর-কারের এমন সমন্বয় 'রবীন্দ্রনাথ' না জন্মালে আমাদের ধারণায় আসত না।'

শান্ত, মুক্ত, করুণাঘনর কাছে ধরণী-তলকে কলংকশূন্য করার কাতর প্রার্থনায় তিনি কতবার কতভাবেই না উচ্ছল হয়ে উঠেছেন—সেই বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথকে এই মরমী শিল্পী চিনেছিলেন শুধুই দুর্লভ শিল্পচেতনা ও কল্পনার মহত্ত্বেই নয়। যদিও তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের একটা বিরাট অংশ অধিকার করে আছে এই দুটি বস্তু। কিন্তু তারচেয়েও বড় হোলো যে সত্যটি, সেটি হোলো, এই যে, পংকজবাবু নিজে বৈষ্ণব এবং সেইজন্যই অনুভবের এই দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী। কিসে মনে হোলো? তারই উদাহরণ দিচ্ছি তাঁর সংগে দেখা হওয়ার প্রথম দিনের একটি ঘটনার ছবি দিয়ে।

বলেছিলাম আমায় 'আপনি' বলবেন না।

সরস মানুষটি অমনই মুখর হয়ে ওঠেন 'জান মা একদিক দিয়ে বিচার করলে 'তুমি'র চেয়ে আপনি বেশী আপন। ইংরিজিতে সুবিধে আছে 'ইউ' বলতে তুমি আপনি দুই-ই বোঝায়। কিন্তু বাংলাতে দুটোর তফাৎ আছে। শোভাবাজারে রাজা অসীমানন্দর ওখানে একদিন সবাই বসে আড্ডা দিচ্ছি। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা উঠলো। উনি হঠাৎ বলে উঠলেন 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' বলছ কেন? কৃষ্ণবাবু বলতে পারছ না? তার কি একটা সম্মান নেই? ওঁর গম্ভীর ভংগিতে কথা বলার ধরণে সবাই হেসে উঠলাম। সত্যিই দেখ, বাড়ীর ছোট ছেলের নাম যদি 'গোপাল' হয়, তোমরা ত তাকে আদর করে 'গোপালবাবু' বলেই ডাকি। অতএব বলতে পারি হয়েও তোমায় 'আপনি' বলে বেশী আপন করে ভাবছি এটা বা কেন মনে করছ না?—বলেই তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে দিলেন। এ-হাসির ধ্বনিতে ওঁরই গাওয়া কোন একটি গানের সুরের মিল খুঁজে পেলাম। কোন গান? কোন গান? মনে পড়েছে—

'সে সোনার আলো
শ্যামলে মিশালো
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো?'

মনে হোলো এঁর সংগে যেন কতকালের চেনা।

বড় শিল্পীর সংস্পর্শে যখনই এসেছি, অনুভব করেছি তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেন কি এক অদ্ভুত অবস্থাগণী শক্তি আছে যা অপরিচয়ের দূরত্বকে এক লহমায় উড়িয়ে দেয়। মানুষের মনকে কাছে টানার শক্তি নিয়ে জন্মান বলেই কি এঁরা শিল্পী? না, শিল্পীকে মানুষ সহজেই আপনার ভাবতে পারে? কে জানে?

...যাক যা বলছিলাম, নিজে যথার্থ বৈষ্ণব মনের অধিকারী বলেই পংকজ মল্লিক বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথকে চিনেছিলেন এবং সেই কারণেই কবির গানের আনন্দ-বেদনার নিবিড় সুর তাঁর গানে এমন 'গভীর রবে' বেজেছে। আর সেই কারণেই আজকের দিনের শ্রোতারাও তাঁর কাছে শ্রদ্ধায় নত-জানু। এই ত গত রবিবারের কথা। রবীন্দ্র-সদনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে সেদিনের গানের আসরে শেষে শিল্পী পংকজ মল্লিক আসেননি বলে শ্রোতাদের কি মনস্তাপ। আর দুর মশাই, পংকজ মল্লিক আসবেন না আগে বলেনি কেন? তাহলে এতক্ষণ বসে থাকতাম না।'

...প্রশ্ন করলেন কি জানতে চাও মা? লাইফ স্কেচ?'

'না, না—ওসব নয়। শিল্পী-হৃদয়ের আনন্দ-বেদনার দোলা, এককথায় আই ওয়ান্ট টু নো জাস্ট দি ফিলসফি অফ ইওর মিউজিক।'

'ফিলসফি অফ মিউজিক'—কথাটা মন্ত্রের মত কাজ করলো। ঐ একটি কথাতেই তাঁর হৃদয়ের আবেগ যেন সহস্রধারে ঝরে পড়লো। মানুষটি শুধু গানই গান না। সংগীতশাস্ত্র এমন গভীর অভিনিবেশের সংগে অধ্যয়ন করেছেন, বেদ-পুরাণের অতলে মনটা এমনভাবে ডুবে আছে যে কাছে না এলে টের পেতাম না। সেই প্রসংগে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললেন। আর সেই আত্মহারা মানুষটিই তাঁর স্বরূপকে যেন ছবির মত চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সকাল দশটা থেকে বেলা একটা অবধি তিনি বলে গেলেন কত কথা, কখনও গানে, কখনও সংস্কৃত শ্লোকে, আবার কখনও আবৃত্তিতে। কারোরই হুঁশ ছিলো না। জীবনে এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন মানুষের অন্তরলোকের সেই ঘুমন্ত সত্তাটি যেন জেগে ওঠে, প্রতিদিনের চেনাজানা অতিপরিচিত মানুষটার চেয়ে সে আলাদা। পংকজবাবু শুধু শিল্পী নন। সংগীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিতও, কিন্তু সেদিনের হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আলোয় তাঁর সেই শিল্পী-মানস যেন রঙে, রসে উচ্ছল হয়ে উঠলো তাঁর সবকিছুকে, এমনকি পাণ্ডিত্যকেও ছাপিয়ে।

সেসব কথা তেমন করে বলবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই। শুধু তার মর্মবস্তুকে যতটা সম্ভব মেলে ধরবার চেষ্টা করব। অ-ধরাকে ধরার আকূতিই ত সুন্দরের আরাধনা।

'বড় ভাল কথাটা বলেছ মা? কিন্তু হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন মনে জাগল?'

'জাগলো এই জন্য যে, আপনি এবং আপনার ট্রেনিংএ কতদিন আগে আপনার সতীর্থ শিল্পীরা গেয়েছেন যেসব গান, সেইসব গানের রেকর্ড শুনলে মনটা আজও দুলে ওঠে। মনে হয় গানের কাছে মানুষ যা চায় তা পাওয়া গেলো। সেইসব রেকর্ড হবার পর কত বছর কেটে গেছে। টেক-নিকের কত উন্নতি হোলো। শিল্পীরা সেদিনের চেয়ে আজ কত বেশী সম্মানিত!

শিক্ষার কত সুযোগ, আত্মবিকাশের বহুধাবিস্তৃত ক্ষেত্র শিক্ষিত সুকণ্ঠেরও অভাব নেই। তবু কই, মন ত তেমন করে ভরে না? সে-ছন্দটি ত তেমন করে মনের তারে বেজে ওঠে না—যেমন বেজে উঠত আপনাদের গানে?'

সংগে সংগে যুক্তকরে নমস্কার করে তিনি বললেন, 'আমাদের মত সামান্য শিল্পীদের তোমরা নবীন যুগের মানুষরা মনে রেখেছ, সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তুমি প্রশ্ন করলে—তাই বলছি, আমায় যেন কেউ ভুল না বোঝেন, গানের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ, যার অভাবে গান হয় নিষ্প্রাণ। এই সৌন্দর্যবোধ বস্তুটি কি? না, কথার ভাবের সংগে সুরের যথাযথ মিলন ঘটিয়ে দিয়ে সেই অনুভবকে শ্রোতার মনে পৌঁছে দেওয়া। গানকে রঞ্জিত করতে সেটি লক্ষ্য রাখা। এই লক্ষ্যটি আয়ত্তে এলে গানে প্রাণ আসবেই। ধর, একবার কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে একটা গান শেখাতে চাই 'মাতৃমূর্তি চারুশীলা, মাতৃ-ময়ী মানমানদানন্দা'। তাঁরা যখন সুর তুলছেন তখন তাঁদের গলার সূক্ষ্মতা, কাজ আমায় এত মুগ্ধ করেছিলো যে, মনে হয়েছ-

ছিলো আমি কি শেখাবো? আমিই ত এ'দের কাছে বসে শিখতে পারি। কিন্তু কথার দিকে কারো লক্ষ্য নেই। তার ফলে গানটিতে যথাযথ রসসঞ্চার হচ্ছে না। আমি কত বোঝাচ্ছি—কথাটা হচ্ছে মানম+অনিদানম—কিন্তু এই সহজ অর্থটা কারো চোখেই পড়ছে না। এইটুকু যদি ঘটতো, তবে গানের চেহারাই বদলে যেতো। তাই এ'দের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, এ'রা শুধু সুরের দিকে মনকে নিবিষ্ট না রেখে কথার অন্তরে প্রবেশ করবার দিকেও যেন মন দেন। অন্ততঃ গান যিনি রচনা করবেন তিনি যেন গানের ভাববস্তুটি এ'দের মর্ম-গোচর করেন। গানের বক্তব্য তাঁর পক্ষেই পরিস্ফুট করা সম্ভব যিনি গান রচনা করেন। আমাদের শাস্ত্রে একটি শ্লোক আছে—

কবিতারসমাধুর্যম্ কবিবেত্তি
ন তৎ কবি
ভবানী ভ্রূকুটিভঙ্গি ভবর্বেত্তি
ন তৎ ভূধর।

ভবানী-ভ্রূকুটির অর্থ একমাত্র তাঁর কান্ত শঙ্করই বোঝেন। ঠিক তেমনই কোনো কবিতার রসমাধুর্য তার স্রষ্টারই উপলব্ধির বস্তু—অপরের নয়।'

তারপর 'সায়গল এবং কানন দেবীর শিল্প বোধের যে চিত্তগ্রাহী চিত্র মেলে ধরলেন সে-সব তাঁদের প্রসংগে বলব—পরে,—যথাস্থানে। অপ্রাসংগিক হবে না বলেই একটি কথার উল্লেখ করছি—শাস্ত্রে বলে 'নমন্ত্রম অক্ষর নাস্তি'—এমন কোনো অক্ষর নেই যা দিয়ে মন্ত্র রচনা হতে পারে না। অপেক্ষা শুধু যোগাযোগের। এই যোগাযোগ কাননের শিল্পী জীবনে ঘটেছে। তারপর আত্মগত ভাবে বলতে লাগলেন 'সঙ্গীত জিনিসটা এমন যে, সত্যিকারের সংগীত মানুষের স্বভাব, প্রবৃত্তি বদলে দিতে পারে। একটা মজার গল্প শোনো—

একবার এক ব্যাধ হরিণবধ করবার জন্য এক হাতে বীণা, আর এক হাতে তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়েছে। তার বীণার সুরে আকৃষ্ট হয়ে হরিণ যেই না তার কাছে এলো অমনই ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে তাকে বধ করলো। মরণাহত হরিণ তখন ব্যাধকে বলছে—

'ঘর, ঘর, ঘর, ঘর পাত্ত ছিলে
ওড়ি সিংহল দ্বীপ,
তেরে বীণাকি রবসে
মেরা শির কিয়া বখশিস।
শির কাটো কাটারা বানাও
গোস মেরা খাও,
তুম মেরা মৃগচর্মপর বৈঠকে
হরদম বীণা বাজাও।'

চকিতের মধ্যে ব্যাধের ভেতরটা যেন তোলপাড় হয়ে গেলো। মৃগয়ার মত্ততা রূপান্তরিত হোলো বিষম বৈরাগ্যে। সে বললো—

'কেয়া বজায়েংগে বীণা
টুট গয়ে সব তার,
যব ঐসে শুনলেওয়ালা চল গয়ে
কেয়া বীণা বাজায়েংগে আর।'

এই হোলো সংগীত আর এই আমার **[illegible]।'**

'সংগীতের ওপর অনুরাগ জন্মালো কেমন করে? তখনকার দিনে ত সংগীতের এমন বহুধা-বিস্তার ছিলো না!'

'তখন স্কুলে পড়ি। গান ভালো লাগত। রেকর্ড থেকে, এখান-ওখান থেকে গান তুলতাম, গাইতাম। সবাই জানতো এ ভালো গায়।'

'পাবলিকের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে গাইলেন কবে?'

'সে লজ্জার কথা বোলো না মা। এখনও মনে মনে গ্লানি আসে। পঞ্চম জর্জের জুবিলী উৎসবের সময়। স্কুলের এক পণ্ডিত বোধহয় রাজাকে খুশি করবার জন্যই গান রচনা করলেন—'হে ভারত আজি রাজার চরণে ভক্তি করহে দান।' ছিঃ ছিঃ! কত বড় মূর্খতা দেখেছ? মাকে বলছি বিদেশীর পায়ে ধরতে। সে লজ্জাকর অধ্যায় স্মরণে আনতেও কষ্ট হয়।'—বলার পর অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে রইলেন স্পর্শকাতর শিল্পী।

সুরসৃষ্টির প্রেরণা এলো কেমন করে?—মৌনতা ভেঙে আমিই আবার প্রশ্ন করি।

'যখন রথের সময় রথ বেরোতো সবাই মিলে আনন্দ করে তার সংগে যাওয়া হোতো। সেই সময় নানারকম কথা ও কবিতার মালা গেঁথে উচ্ছ্বসিত আবেগে গাইতাম। তার কাব্যমূল্য কতটা ছিলো জানি না। সংগীত-শিক্ষা শুরু হয়েছিলো শ্রীদুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের (চলচ্চিত্র-শিল্পী কিন্তু নন) কাছে, তেরো বছর বয়স থেকেই......'

'মনে হচ্ছে আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলেন। সুরসৃষ্টির প্রেরণার খবরটা ঠিক পেলাম না।'

মৃদু হেসে বললেন, 'ধরেছ। প্রেরণা বলতে যা বোঝায় সে ত এক দৈব যোগাযোগ। সেই শুভলগ্ন জীবনে এসেছিলো একবার। তখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি। একদিন দুপুরে গণেশ পার্কের কাছে বসে আছি, হঠাৎ—' উনি একটু থামতেই আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। কিন্তু উনি থেমে গেলেন। কি ভেবে বললেন, 'না, সে-কথা বলবার সময় এখনও আসেনি মনে হচ্ছে। বলব একদিন, ঠিক বলব। সময় আসুক।'

জোর করলাম না। যে শুক্তি ছোট্ট একটি মুক্তোকে অন্তরের গভীরে লুকিয়ে রাখতে চায়, কৌতূহলের তাড়নায় তাকে ভেঙে সেই মুক্তোটিকে টেনে বার করে দেখবার নির্মম প্রবৃত্তি হোলো না। পরে সময় এসেছিলো। আমায় বলেওছিলেন (১৯৬৯-এ)। সে-কথা আমার জানানোর সময় এলো আজ।

কিন্তু সে প্রসংগে পরে আসছি। তার আগে বলি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান শিল্পীর জীবনে এলো কেমন করে।

'তখন প্রধানত গানের টানেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে আমার যাতায়াত ছিলো। সেইখানেই 'পদপ্রান্তে রাখ সেবকে', 'চরণ ধরিতে দিওগো'—গানগুলি শুনে শুনে আপনমনে গাইতাম। কিন্তু মন ভরতো না। ইচ্ছে করতো খুব ভালো করে রবি ঠাকুরের ভালো ভালো গান (তখনও রবীন্দ্রসংগীত পরিভাষার সৃষ্টি হয়নি) শিখি। কিন্তু শিখি কার কাছে? কে তাঁর রত্নভাণ্ডারের দুয়ার খুলে আমায় সংগে করে নিয়ে কবির সেই আশ্চর্য সৃষ্টির সংগে পরিচয় করিয়ে দেবে?

তখনই এই মহলের ওয়াকিবহাল লোকদের কাছে শুনলাম দীনুবাবুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নাম। কি করে তাঁর সংস্পর্শে এলাম? সে এক মজার ঘটনা।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ। শিশিরবাবু নাট্যসংস্থা খুলেছেন। ইডেন গার্ডেনেরই এক কোণে অভিনীত হচ্ছে তাঁর 'সীতা' নাটক। এই 'সীতা' দেখতেই একদিন বাড়ীর সবার (মা, বাবা, কাকা) সংগে গেলাম ইডেন গার্ডেনে। 'সীতা' নাটকে অনেক সুন্দর, সুন্দর গান ছিলো। গানগুলি জনপ্রিয়ও হয়েছিলো। 'অন্ধকারের অন্তরেতে', 'জয় সীতাপতি' ইত্যাদি অনেক গান।

সুরস্রষ্টা হিসাবে নাম দেখলাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—দেখতে দেখতে চোখ পড়ল দীনু ঠাকুর নামটির ওপর। যে গানটির সুর তিনি দিয়েছিলেন সেটি হল **মঞ্জুল মঞ্জুরী নব সাজে**। সর্বদা মনে মনে জপ করতাম দীনু ঠাকুর, দীনু ঠাকুর। রবিঠাকুরের গানের ভাণ্ডারী তিনি, তাঁর কাছে পৌঁছলে কবির গান পাওয়া যাবে অঞ্জলি ভরে। সেই আকর্ষণেই বোধহয় মন দিয়ে গানটি শুনলাম এবং তুলেও নিলাম। স্বপ্ন দেখা কিশোর মন। ঐ গানের সুরকারকে ঘিরে কত কল্পনার জাল বুনে চললো।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে খবর পেলাম দীনুবাবু এসেছেন এবং জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আছেন। নিজের মনের সংগে অনেক যুদ্ধ করে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে হাজির হলাম। সামনে দাঁড়িয়ে ধাঁধায় পড়ে গেলাম। তিনটি বাড়ীর কোনটিতে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন? দরোয়ান দেখিয়ে দিল। বলল উপরমে। ঠাকুরবাড়ীর নামেই মনের মধ্যে একটা স্বপ্নলোক রচিত হয়ে উঠেছিল। ও-বাড়ী হল রূপের রাজত্ব। বুক দুরু দুরু করছে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দোতলার বারান্দায় পৌঁছলাম। বারান্দার মাঝখানেই একজন বসে। ঠাকুরবাড়ীর মানুষের সম্বন্ধে মনে আঁকা ছবির সংগে তাঁর কোন মিল নেই। তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে একবার দেখা হতে পারে কি?'

কি দরকার? বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের জবাব এলো।

তখন ভয়ে, লজ্জায় গলা বুজে আসছে। কপাল দিয়ে আবার টপ টপ করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। প্রাণপণ শক্তিতে মনে সাহস এনে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়মুখ মুছে ঢোক গিলতে গিলতে বললাম আজ্ঞে আমি গান, মানে রবিঠাকুরের গান শিখতে চাই।

তুমি গান গাও?

উত্তরে কি বলব ঠিক বুঝতে পারলাম না। কি বললে খুশী হবেন, কি বললে রাগ করবেন কে জানে? চটে গেলে যদি গান শেখাটা মাঠে মারা যায়?

গম্ভীর কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হল শোনাও একটা গান?

আজ্ঞে হার্মোনিয়ম?

ওঃ হার্মোনিয়ম ছাড়া বুঝি গাইতে পার না?

পারি, তবে—

—গাইলাম। ও'রই সুর দেওয়া মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে—গান শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করলেন—এ গান কোথা থেকে শিখলে?

আজ্ঞে সীতা নাটক দেখতে—

তুমি থিয়েটার দ্যাখো? প্রায় গর্জে ওঠেন দীনুঠাকুর। তখনকার দিনে ছোটদের থিয়েটার দেখা কেউ ভাল চোখে দেখতেন না। আমার চোখের সামনে যেন অন্ধকার নেমে এল। এইরে! তীরে এসে বুঝি তরী ডুবল। আমি শশব্যস্ত হয়ে বললাম—আজ্ঞে আমি যাই নি। মা-বাবা দাদার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেখানেই।

মানে ঐ থিয়েটার দেখতে গিয়েই সেখানের কোন দৃশ্যে গান শুনেই ত তুলেছ?

হ্যাঁ...তবে আমি যাই নি আবার কাঁচুমাচু হয়ে বলি মা-বাবা দাদার সঙ্গে—অন্তরাল থেকে নারী কণ্ঠে খিল খিল হাসির শব্দ শোনা গেল। কাছে-পিঠে কোথাও রমা দেবী বোধহয় ছিলেন আর পুরো দৃশ্যটি উপভোগ করছিলেন কৌতুকভরে। সেই হাসি শুনে আমি আবার ঘামতে শুরু করলাম।

তারপর দীনুঠাকুরের নির্দেশে রমা দেবীই গীতাঞ্জলি নিয়ে এলেন। গীতাঞ্জলিখানা খুলে ধরে একটা কবিতা আমায় পড়তে বললেন। 'তোমার অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে।' পড়লাম। কিন্তু কেমন পড়েছিলাম, কিম্বা আদৌ পড়তে পেরেছি কিনা—সে সম্বন্ধে আজও আমি সন্দেহমুক্ত নই। শুনেছিলাম ঠাকুরবাড়ী পরীর রাজত্ব। সেই কথাটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি নি। পড়তে পড়তে কেবল মনে হচ্ছিল অন্তঃপুর থেকে ডানাকাটা পরীরা সব মুখ টিপে হেসে আমার কম্পিত কণ্ঠের আনাড়ি উচ্চারণের পাঠ শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন।

পড়া শেষ হল। দীনুবাবু জিজ্ঞেস করলেন ভুবন মানে কি?

আমার তখন স্মৃতি একেবারেই বিলুপ্ত। ভুবন মানে বলতে পারলাম না। অপরূপা অন্তঃপুরিকাদের কল্পিত কৌতুকী হাসির হুল অনুভব করে কান গরম হয়ে উঠল।

এর পর ঐ গানটিই শেখাতে শুরু করলেন। একবার গেয়ে বললেন—গাও—

'আজ্ঞে...এ' মাথা লুকোচ্ছি।

থিয়েটারে ত শুনে শুনেই মঞ্জুল মঞ্জরী শিখেছিলে? না কি?'

আমি আবার ব্যাকুল হয়ে বলতে থাকি আজ্ঞে থিয়েটারে আমি যাই নি। মা-বাবা দাদার সঙ্গে...

'থিয়েটারে গানটা কবার শুনেছিলে?

আমি প্রায় নতজানু হয়ে আবার বলি আজ্ঞে সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন আমি থিয়েটার দেখতে যাই নি। মা-বাবা দাদার সঙ্গে...

এতক্ষণে বোধহয় ও'র করুণা হল। এবার নরম সুরে বললেন আমি মানছি। বুঝতে পেরেছি তুমি মা-বাবা দাদা-দিদির সঙ্গেই গেছ। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ওখানে তুমি গানটা কবার শুনেছিলে আর কত দূরে থেকে?

এবার একটু ভরসা পেয়ে বললাম আর একবার শুনলেই গাইতে পারব।

এর পর একবার নয়। বেশ কয়েক বারই উনি গাইলেন। তারপর আমিও গাইলাম। সেই প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা এবং যথার্থ গুরুর কাছে। এর পর থেকে উনি যখনই কোলকাতায় আসতেন—খবর দিতেন—আর খুব যত্ন করে আমায় কবির গান শেখাতেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আগে অন্য গানও ত গাইতেন এবং পরেও গেয়েছেন। সব গানই আপনার কণ্ঠে যেন আশ্চর্য মায়ালোক হয়ে উঠেছে। তবু সব ছাপিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতই আপনার হৃদয় জুড়ে রইল কোন সম্পদে?

'আকাশচারী ভাবের ঐশ্বর্য।'

রবিঠাকুরের গান শোনবার বা গাইবার আগে যেসব গান গাইতেন তার মধ্যে ঐশ্বর্য ছিল না?

ঐশ্বর্য নিশ্চয়ই ছিল তবে এ ঐশ্বর্য ছিল না।

এ ঐশ্বর্যের খবরটাই ত আপনার মত ঐশ্বর্যবানের কাছে শুনতে চাই। কোন অনুভব কোন ধ্যান আপনার ভাবুক চিত্তকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পথে টেনে নিয়ে গেছে?'

তখন গান হত সাধারণত নাটক-থিয়েটার এসব থেকেই। আসরের গান বলতে বেশীর ভাগই ছিল নিধুবাবুর টপ্পা। তিনি প্রচণ্ড শক্তিমান প্রতিভা—এবং বিশেষ পরিবেশ, বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতার কাছে তাঁর মধুর রসাশ্রিত গান জমে উঠত। আর নাটকে নজরুলের গান ভক্তিমূলক এই সবই চলত। বেশীর ভাগ গানই বিশেষ অর্থবহ এবং বিশেষ উদ্দেশ্যেই গাওয়া হত। কাজেই বাঁধাধরা সীমার মধ্যেই তার প্রয়োজন এবং আয়ু শেষ হয়ে যেত। এই সীমাবদ্ধতা এতটুকু গণ্ডীর মধ্যে ঘোরাফেরার সংকীর্ণতা মনকে বড় পীড়া দিত। গান গেয়ে তৃপ্তি হত না, সব সময় এতটুকু সীমার পরিসর অতিক্রম করে সীমাহীন ভাবের আকাশে মুক্তি পাবার জন্য মনটা ছটফট করত।

কিন্তু একটি কথা বলে রাখি মা আমাকে যেন কেউ ভুল না বোঝেন—আমি কোন গান বা তার রচয়িতাকে ছোট করছি না। সকলেই সুন্দরের পূজারী। আমার মনটা সংকুচিত হয়ে যেত এসব গানের উদ্দেশ্য-বহুতার কারণে। কারণ বেশীর ভাগ নাটকের প্রয়োজনেই লেখা তা বুঝেছ?

বোধহয় বুঝেছি। কবির নিজের ভাষাতেই রয়েছে এর উত্তর:—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে
বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে।
অবিরত রাত্রি-দিন।
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ
তা হয়ে আসে ক্ষীণ।
ধূলি ছাড়ি একেবারে
ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে
সঙ্গীতের মতন স্বাধীন।

ঠিক হয়েছে?

একেবারে ঠিক। খুশীতে শিল্পীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে **সঙ্গীতের মতন স্বাধীন** কথাটা লক্ষ্য করেছ মা? যে স্বাধীনতা মানুষ প্রতিদিনের জীবনে পায় না, সমাজে পায় না, সংসারে পায় না সেই স্বাধীনতা খোঁজে সঙ্গীতে। এখানে স্বাধীনতা মানে মুক্তি। তথাকথিত স্বাধীনতার অধিকারী হয়েও আমাদের মনটা নিজেরই গড়া নানান বন্ধনে জড়িয়ে থাকে। সকল বন্ধন-মুক্ত হয়ে এক অন্তহীন আনন্দের আকাশে—মেঘের দোসর হয়ে 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' বলবার কল্পনাও কি করতে পারতাম যদি এই ভারতেই এমন সর্বগামী মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ না জন্মাতেন? মানুষ, প্রকৃতি, জীব সব কিছুতেই ভালবেসেছেন বলেই সব কিছু থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন। এই প্রেমিক ও মুক্ত মন নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন এবং পরিণত বয়সে পৌঁছবার আগেই তাঁর মন পরিণতির তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল। একটি উদাহরণ দিই শোন। তাঁর এই বৈষ্ণব মনকে মহর্ষি চিনেছিলেন। তাই একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে সংস্কৃত রসশাস্ত্র পড়াবার জন্য। তখনও কবি বয়সে কিশোর। একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে। তখনও পণ্ডিত এসে পৌঁছন

নি। জোড়াসাঁকোর বারান্দায় বসে সেই স্বপ্ন-বিভোর কিশোর একমনে আবৃত্তি করে যাচ্ছে—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে,—
পততি পতত্রে...পততি পতত্রে

ক্রমাগত মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে যাচ্ছে। ঐ কটি শব্দের ধ্বনিমাধুর্যের মধ্যে যে সঙ্গীত আছে, যে হৃদয় ছোঁওয়া ব্যঞ্জনা আছে তারই মধ্যে ভাবীকালের মহাকবি যেন ডুবে গেলেন। তাঁর চারপাশের জগত, জীবন ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে কোন হুঁশ নেই। হঠাৎ কাঁধের ওপর কার টোকার স্পর্শে চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখলেন দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এক বুক স্নেহ নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকক্ষণই দাঁড়িয়েছিলেন। দেখছিলেন এবং শুনছিলেনও সেই মন্ত্রোচ্চারণের মত আবিষ্ট আবৃত্তি। তারপর যেন আপন মনে নিজেকেই উদ্দেশ করে বললেন এই জন্যই বাবামশাই এই বয়সেই তোকে গীতগোবিন্দ পড়বার ব্যবস্থা করেছেন। বুঝলে মা এই সব কাব্যে নায়িকার রূপ বর্ণনায় দেহগত বাসনা কামনার বিহ্বলতাকে অতিক্রম করে একটা অপার্থিব স্বপ্নলোকে পৌঁছবার মত মন তাঁর সেই বয়সেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কারণ এ মন তাঁর এই এক জন্মের নয়। জন্মজন্মান্তরের। সে সাধনার সম্পদই হোক আর বিধিদত্তই হোক এই মন নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই আপনার সীমিত আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ যেটুকু দেখতে পায় তিনি তারচেয়ে অনেক বেশী দেখতে পেতেন। আর তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির প্রসাদেই গড়ে তুলেছিলেন এমন এক মহাবিশ্ব যার মধ্যে মানুষের কোন অনুভব আবেগ ও হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম স্পন্দনও হারায় না।

বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের চারটি করে পর্যায় এবং তার চারটি করে সাবডিভিশনের সব কটিতেই ছিল তাঁর মানসবিহার। সেই জন্যই যে যা চায় সবই পায় তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে। আর তাঁর ধ্যান কল্পনার চরম বিকাশ তাঁর গান। তাই ত তাঁর অন্তর্ধান ঘটবার পর তাঁর গানই হয়ে উঠল এমন সর্বব্যাপী।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা, বেদনার অনুভূতিকে ইমপার্সোন্যাল বলে মনে করেন। কিন্তু এ ধরনের কথা শুনলে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ নন। যেমন ধরুন—আজ তোমাদের দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে গানটিতে সুন্দর একটা হিউমেন টাচ আছে না? যার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বেশ নিজের লোক, নিজের লোক মনে হয়? কিন্তু ইম্পার্সোন্যাল ইত্যাদি কথাগুলো যেন সেই ধারণাকে আঘাত করে। এর কি করা যায়?'

আঘাত পাবার কোন কারণ নেই। তিনি কোন অনুভব, কোন রসেরই বাইরে নন। তিনিই রস, সঃ এব রস। রসের মধ্যে ডুবে থাকতেও জানেন আবার রসোপভোগের মধ্যেও নিস্পৃহ হতে জানেন। তিনি যে ভগবান। তাই তিনি পার্সোন্যাল হয়েও ইমপারসোন্যাল আবার ইমপারসোন্যাল হয়েও পারসোন্যাল। ভাব হতে রূপে তাঁর অবিরাম যাওয়া-আসার লীলাই ত তাঁর সৃষ্টি।

কিন্তু অসীম অনন্তে উত্তরিত হয়েও তাঁর মনে একটা অশান্তি ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর জগৎ তাঁকে ভুলে যাবে। তাই তিনি নির্মোহ হয়েও পৃথিবীর কাছে চেয়েছিলেন একটি মাটির তিলক।

তাই ত চাইবেন। ভগবানের ত কোন কিছুরই অভাব নেই মা। তবু ত বার বার এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসেন। কখনও বা কলসীর কাণার আঘাত পান। কখনও ক্রুশবিদ্ধ হন। ত্রিভুবনের অধীশ্বর মানুষের কাছে ভালবাসার মুষ্টিভিক্ষা চান। কারণ মানুষ যে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

আপনি লোকচক্ষুর আলোয় এলেন কেমন করে?

রেডিওর মাধ্যমে। এখনকার এ আই আর শৈশবে ছিলো। ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী। এই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর চার-পাঁচ মাস বয়স থেকেই আমি রেডিও অফিসে যোগদান করেছিলাম।'

'আপনিই ত ছায়াছবি ও সংগীত শিক্ষার আসরের মাধ্যমে কবির সুরের আগুনকে সবখানে ছড়িয়ে দিলেন—সেই অধ্যায়ে একটু দাঁড়ান না? আপনার মুখে সেই কাহিনী শোনবার জন্য অমৃতের সুরের আগুনের পাঠকরা উৎসুক হয়ে রয়েছেন।'

'আমি জনপ্রিয় করেছি একথা ভাববার স্পর্ধা আমি রাখি না। তাঁর গান গাইবার এবং শেখাবার অধিকার যাঁরা আমাকে দিয়েছেন, এ-গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য।

হ্যাঁ, ১৯২৯ থেকে সংগীতশিক্ষার আসরে যোগ দিলাম। বললে অহংকার মনে হবে, কম্পিটিশন ইত্যাদির তাগিদে সাধারণের মধ্যে গানের প্রেরণাও জাগলো। কিছু শিল্পীও তৈরী হোলো। আজ সংগীত-শিক্ষার আসরের বয়স ৪৬ বছর। ১৯৩২ সালে প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে চৌত্রিশ-খানা গান নির্বাচন করি বিভিন্ন শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ানোর জন্য। তখন রবীন্দ্র-সংগীতের সংগে তবলা বাজতো না। আমি জিদ করে তবলা ও পাখোয়াজের সঙ্গতে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার প্রথা প্রচলন করলাম। রবীন্দ্রনাথ হলেন ছন্দের সম্রাট অথচ তাঁরই গানের সংগে তবলা বাজবে না? এ আবার কোন সৃষ্টিছাড়া কথা?'

'তালবদ্ধ গান গাওয়া হোতো না কেন?'

'জোড়াসাঁকোর কাছাকাছি ছিলো চিৎপুরের কুখ্যাত পল্লী। সেইসব জায়গায় তবলা বাজিয়ে গান গাওয়া হোতো। সেইজন্য তবলার সংগে গান গাইতে ঠাকুর-বাড়ীর মেয়েদের আপত্তি ছিলো।...

যাই হোক ঐ চৌত্রিশখানা গানের মধ্যে চৌত্রিশখানা গান তবলা এবং পাখোয়াজের সংগে বিভিন্ন শিল্পীরা গেয়েছেন। শুধু কনক বিশ্বাস তবলার সংগে গাইতে রাজী হননি। তিনি বিনা সংগতেই গেয়েছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী নাম দেওয়া হয়েছিলো বলে রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন কবি আসেননি। এসেছিলেন তার পরের দিন। এ-ধরনের আত্মপ্রচারে তাঁর রুচি ছিলো না।

'কবিগুরুর সংস্পর্শে এলেন কেমন করে?'

'দীনুবাবার কৃপায়। ১৯১৮ সাল সেটা। আনন্দ পরিষদ বলে একটা প্রতিষ্ঠান প্রথম রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস মঞ্চস্থ করে। 'চোখের বালি' বই হবে। তারই একটি গানে 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'—আমি সুর দিয়েছিলাম। দীনুদা বললেন, 'চল, গুরু-দেবকে শুনিয়ে আসবি।' ওঁরই সংগে গেলাম শোনাতে। গুরুদেব চুপ করে শুনলেন—তারপর আপনমনে একটি গানের সুর ভাঁজতে লাগলেন। আমরা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরেও আরেকবার গেছি ছায়াচিত্রে কবির গান প্রয়োগের অনুমতি ভিক্ষা করতে।'

'বলুন না সেই কাহিনী।'—

'মুক্তি' শুরু হয়েছিলো ১৯৩৪-এ। নিউ থিয়েটার্স তখন তিন বছরের। এই তিন বছরে যে কয়েকখানা ছবি হয়েছিলো, আমি সুর দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু আমি মিউজিক ডিরেকটর ছিলাম না, আমার নাম প্রকাশিত হোতো না।

এ-অবিচার বড়ুয়া দেখেছিলেন। 'মুক্তি' করবার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এক-দিন আমায় ডেকে বললেন, 'সিনারিও শোনো একেবারে পুরো মিউজিক ডিরেক-টর হিসেবে।' শুনতে শুনতে কি খেয়াল হোলো নিজের মনেই সুর করে গাইতে শুরু করে দিলাম—

'কে সে মোর কেই বা জানে?
কিছু তার দেখি আভাস
কিছু পাই অনুমানে
কিছু তার বুঝিনা বা।'

বড়ুয়া শুনে চমকে উঠলেন, 'এটা কার গান?'

'কার গান? আরে বাবা স্বয়ং ভগ-বানের গান।'—সিনারিও পড়া বন্ধ করে উনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর কেমন যেন অন্যমনস্কভাবেই বললেন, 'আজ থাক।'

'থাকবে কেন?'

'আমি এ সিনারিও পাল্টাবো।' পরের দিন আবার ডাকলেন। সিনারিও শুনতে শুনতে আমি তেমনই আপন মনে গেয়ে উঠলাম।

'ফুলের বাহার নেইকো যাহার
ফসল যাহার ফললো না
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়

বড়ুয়া—আবার তাঁর উদাস চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করলেন—এটা গাইলে কেন?'

'জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন—এক উদাসী চিত্তের বিষণ্ণতার সুর পেলাম প্রশান্তর স্বেচ্ছা নির্বাসিত জীবন ধারায়—তাই ঐ কথাগুলোই কেমন করে মনে এসে গেলো—ঠিক ঐ সুরেই?'

'ঐ গান আমার চাই এ ছবির জন্য।'

'অসম্ভব, কবি অনুমতি দেবেন কেন? তাঁর গান। আমি সুর দিচ্ছি—আবার সিনেমাতে প্রয়োগ করব। এতখানি স্পর্ধার কথা তাঁর সামনে মুখে আনব কেমন করে? আর তিনিই বা এতখানি অত্যাচার সহ্য করবেন কেন?'

'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। যেমন করে হোক—অনুমতি আদায় করতেই হবে।'

রথীদাকে সব কথা বললাম। উনি বললেন বাবামশায় যখন কোলকাতায় আসবেন শোনাতে হবে। কিছু দিনের মধ্যেই উনি এলেন। সে দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে। রথীদা, দীনুদার সংগে গেলাম। গুরুদেব ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী। আমি গান সুরু করলাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। যেখানে আমি বসে তার ঠিক ২০ ফিট দূরে উনি বসেছিলেন। উনি যখন সেখানে বসতেন সামনে ছোটো একটি টেবিলের উপর খাতা, কলম রাখা থাকতো।

গান শেষ হতে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম আমরা সকলেই। শুধু একজন ছিলেন এবং এইটেই নিয়ম ছিলো। উনি যখন বসে বসে লেখতেন, কাছাকাছি একজন কেউ থাকতো। ওঁর যদি কোনো দরকার হয়।

'কিন্তু অনুমতির কি হোলো?'

'দিয়েছিলেন—শুধু তাই নয়, উপরি-পাওনা হিসেবে **'আজ সবার রঙে'** ও **'তার বিদায়বেলার মালাখানি'**—ঐ ছবিতে প্রয়োগ করবার পরামর্শও তিনিই দিয়েছিলেন। আর যে ব্যাপারটা আমাদের সবাইকে নতুন প্রেরণায় মাতিয়ে তুলেছিলো, সেটা হোলো এই যে, আমার সংগীত পরিচালনায় প্রমথেশ বড়ুয়ার ঐ ছবির নাম 'মুক্তি' তিনিই দিয়েছিলেন। ওঁর পরামর্শ দেওয়া গানদুটি কাননকে দিয়ে গাইয়েছিলাম (এ প্রসংগ এর পরে কানন দেবীর নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে)।

এরপরেও অনেকবার গেছি ছায়াচিত্রে কবির গান প্রয়োগ করবার অনুমতি ভিক্ষা করতে। কবি স্নেহ করতেন, তাই অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মনে হয় আমি কি মূর্খ, কি আহাম্মকি করেছি। 'মুক্তি' ছবিতে সরাইওয়ালার মুখে কবির গান জুড়ে দিয়েছি। ছিঃ ছিঃ! কি মতিভ্রম!'

"মতিভ্রম কেন বলছেন? এই জুড়ে দেওয়ার ফলে কত বড় কাজ হয়েছে। ঐসব কথাচিত্রের মাধ্যমেই ত রবীন্দ্রসংগীত এত জনপ্রিয় হয়েছে। কবির কাছে গান শোনবার বা শেখবার সুযোগ কজনের হয়েছে? ফিল্ম ও রেকর্ডের জন্যই ত তাঁর গান লোকের মুখে মুখে ফিরেছে।'

'তা হয়তো হয়েছে। তবে তখন ওসব কিছু ভেবে ত করিনি। তাই এখন মাঝে মাঝে মনে হয় কবির প্রতি অবিচার করিনি ত?'

'কবিকে যিনি ভগবান মনে করেছেন, তিনি কখনও তাঁর প্রতি কোনো অবিচার করতে পারেন না। রেকর্ড করার যোগাযোগ ঘটলো কিভাবে?'

'চণ্ডীবাবু (হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাকটসের স্রষ্টা চণ্ডীচরণ সাহা) রেকর্ডিং শেখবার জন্য জার্মানী গেলেন। ফিরে এসে অক্রুর দত্ত লেনে কোম্পানী খুললেন। গেলাবল সাহেব আগেই শুরু করেছিলেন। আমি রেডিও অফিস ফেরৎ অক্রুর দত্ত লেনে যেতাম। ওখানের একতলায় বসে অর্গ্যানে বাজিয়ে গান গাইতাম। ওধারে চণ্ডীবাবু রেকর্ডিং রুমে বসে বসে হাত পাকাচ্ছেন।

আগেই বলেছি গেলাবল সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৩ সালে এখনকার কলাম্বিয়া তখন কলাম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী নামে রেকর্ডিং সেন্টার খুলেছিল ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং-এর একতলা ভাড়া নিয়ে। আমার বরাবরই গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করবার সখ ছিলো। ও কোম্পানীর রিহার্স্যাল-রুম ছিলো ভবানীপুরে বিষ্ণুভবনে। ওদের ট্রেনার ছিলেন জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেব, বিমল দাশগুপ্ত ও ধীরেন দাস। আমি রেকর্ড করবার আবেদন নিয়ে অনেকবার ওখানে যাতায়াত করলাম। জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের সময় নেই। দু তিন বছর ঘুরিয়ে উনি বললেন, ধীরেনবাবুর কাছে যাও। ধীরেনবাবুর কাছে আর যাওয়া হয়নি।

গেলাবস সাহেবের আমন্ত্রণে কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগ দিলাম। ট্রেনার হিসাবে ছিলাম আমি ও তুলসী লাহিড়ী। এখানে প্রথম রেকর্ড করেছিলাম বাণীকুমারের গান 'নমো নমো হে রুদ্র সন্ন্যাসী'। রবীন্দ্রসংগীত করবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে পারমিশন ইত্যাদি আনতে দেরী হবে বলে হোলো না।

ওদিকে হিন্দুস্থান কোম্পানীতে চণ্ডীবাবু তখন 'তোমার আসন শূন্য আজি' ও 'প্রলয়নাচন নাচলে যখন' বন্দ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর পারমিশন ইত্যাদির ব্যবস্থা দীনুদাই করে দিয়েছিলেন।'

'রবীন্দ্রসংগীতে সুর দেবার প্রেরণা এলো কেমন করে? এ-সংবাদটা অনেকদিন আগে যখন এসেছিলাম বলবেন বলেছিলেন। আজ ওভার-ডিউ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

তখন 'আনন্দ পরিষদ' ছিলো আমাদের একটা মস্তবড় আড্ডার জায়গা। ওখানে শরৎচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সবাই আসতেন। ওখানে যাবার আগে একদিন একটা বই খুলতেই হঠাৎ চোখে পড়লো **'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'** —কথাগুলি এতো ভালো লাগলো যে, নিজের মনেই সুর দিয়ে গাইতে শুরু করলাম, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'—গাইতে গাইতে মনের মধ্যে কেমন একটা ভাবের আবেশ ছড়িয়ে গেল। অজানতেই নির্জনতা-প্রেমিক মনটার তাগিদে চলে গেলাম গণেশ অ্যাভিনুতে। সেই সন্ধ্যায়, মুক্ত আকাশের নীচে বসে 'তারার পানে চেয়ে চেয়ে' মনে হয়েছিলো ওরা যেন আমার কত আপনার। আকাশ আর পৃথিবী যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য এক হয়ে উঠলো। অনুভব করলাম আমি আকাশ থেকে পৃথিবীতে আসছি আবার যাচ্ছি আকাশে এক শুভ্র আলোর সেতুপথ দিয়ে। এ অনুভূতি জীবনে একবার দুবারই আসে...

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানিনা। সম্বিৎ ফিরে আসতে আনন্দ-পরিষদের দিকে এগোলাম। ও অনুভব ত আর ফিরে আসবে না। অন্ততঃ সুরটা যাতে না হারিয়ে যায় সেই জন্যই হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে লাগলাম 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন'। গাইছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলল 'একটু তফাৎ হচ্ছে—'। চেয়ে দেখি লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র দাঁড়িয়ে। আমি বললাম 'তফাৎ হচ্ছে মানে? এ সুর ত আমার দেওয়া—।'

'ভাগ।—গুল মেরো না। এ গানের সুর আছে এবং এই রকমই। তোমার একটু অন্যরকম হচ্ছে বলেই বললাম। দেখে নিও।'

পরে দেখলাম সত্যিই ঠিক ঐ রকমই সুর। এক অভূতপূর্ব আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তবে কি আমি কবির উপলব্ধি লোকের দ্বারের কাছাকাছি পৌঁছেছি—তাই অজানতেই আমার মনের সুর ওঁরই সুরে বাঁধা হয়ে গেছে?'

আমিও হতবাক। এই জন্যই কি নিজের গানকে সুরে সুরে রূপময় করবার অধিকার কবি তাঁকে দিয়েছিলেন? গান সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা—ত কতভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আজকালকার অনেক রেডিও গায়কও অহংকার করে বলে থাকেন তাঁরা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি পরের গানের উন্নতি সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি উপদ্রব করতেই হয় তবে হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের নামের জোরে করাই ভালো।'

সেই মানুষের অনুমতি পাওয়া তাঁরই গানে সুর দেওয়ার? এতো [illegible]-সাধনা!

'কি করে কোন যোগ্যতায় আমার মত মহামূর্খ যে তাঁর স্নেহ পেলো? জানেন মা 'মরণের মুখে' গানে

'আঁধার আলোর পারে
খেয়া দিই বারে বারে

নিজেরে হারায়ে খুঁজি — এখানে আমি শুদ্ধ ধা দিয়েছি। আবার

'ফুলের বাহার নেইকো যাহার'—এসব জীবনের শেষ প্রহরের গান। অথচ এখানে—সকালবেলার সুর দিয়েছি। তাও কবি আপত্তি করেননি।

তার কারণ সকালবেলার সুরেই বেলাশেষের রেশ আছে। এখনকার রবীন্দ্রসংগীতের ধারায় জনপ্রিয়তার যে বিপুল উচ্ছ্বাস, তার মূলে ত প্রধানতঃ আপনিই রয়েছেন। তাই এ সম্বন্ধে আপনার মতামতটা জানতে ইচ্ছে করে।'

'দ্যাখ মা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি তিনি ভগবান। তিনি ইচ্ছে করেছিলেন তাঁর গান জনপ্রিয় হোক, তাই হয়েছে। আমি কখনও কোনো 'কিছুর লোভে এতবড় কথা বলতে পারি না যে আমি তাঁর গান জনপ্রিয় করেছি। তবে এখনকার রবীন্দ্রসংগীতের ধারা সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি যে এমন অপূর্ব কণ্ঠ এখনকার শিল্পীদের। কিন্তু একটু যদি অভিনিবেশের সঙ্গে গাইতেন স্বরলিপি অনুসরণ করে! কোনোরকমে গাওয়াই কি সব? যেমন ধর না 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানটির কথাই। যতীন দাস হাংগার স্ট্রাইক করেছিলেন লাহোর জেলে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ পেয়েই তিনি রিহার্সাল বন্ধ করে দিয়ে এই গানটি লিখেছিলেন পরে 'তপতী'তে এ-গান যুক্ত হয়। এখানে কবি প্রার্থনা করছেন—

'দূর কর মহারুদ্র
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ
প্রাণের উৎসাহ'

কিন্তু একবার এক গানের আসরে ঐ গানটি শুনলাম কোথায় সেই মহাভৈরবের কাছে বলিষ্ঠ মনের তেজ ও শক্তির প্রার্থনার সুর? এত দ্রুত লয়, কথার উচ্চারণ এত অস্পষ্ট যে, মনে হচ্ছে একদল লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে। পথ জানে না। উঁচু-নীচু রাস্তায় পা পড়ে হোঁচট খাচ্ছে।

আর একবার চিত্রাংগদা নৃত্যনাট্য দেখতে গেছি। সেই চিত্রাংগদা-রূপমুগ্ধ অর্জুনের গান 'অশান্তি আজ হানল এ কি দহনজ্বালা?'—শুরু হোলো অমনি কাড়া-নাকড়া জোরে জোরে বেজে উঠলো, আর অর্জুনের ভূমিকাভিনেতা স্টেজে এসে এমন দাপাদাপি শুরু করলেন—তার সংগে সংগে লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলো এমন বেগে নাচতে লাগলো যে মনে হোলো ভূমিকম্প হচ্ছে।

অথচ 'অশান্তি আজ হানলো'—গানটি অর্জুনের মনের কোন অবস্থায় গাওয়া? তপশ্চর্যারত অর্জুন সুন্দরী চিত্রাংগদার রূপ দেখে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলেন—আর সংগে সংগেই অন্তরে জাগলো একটা অশান্তি বোধ। কারণ এ-চাঞ্চল্য তখনকার ব্রহ্মচর্যের প্রতিকূলে। এই দ্বন্দ্বের গাম্ভীর্য, ভাবান্তর গাওয়ায় যদি না ফুটে ওঠে তাহলে ও গান গাওয়াটাই নিরর্থক। আমি শুনতে শুনতে ভাবছিলুম গুরুদেব যদি এ-গান শুনতেন, নিজের সৃষ্টির এহেন রূপ দেখে তাঁর কি মনে হোতো? হাউ উড হি ফিল?'

'আবার মুগ্ধ হলাম কবির গানের অন্তরে প্রবেশের—এ দুর্লভ দিব্যদৃষ্টিতে। আমার শেষ প্রশ্ন ছিলো এ-দিব্যদৃষ্টি কি কবির সহজাত, না গুরুদেবের কাছে প্রাপ্ত?'

'নিজের মধ্যে কিছুটা হয়ত ছিলো। তারপর চোখ খুললো যখন দীনদা 'হেরি অহরহ' গানটি শেখাবার আগে আমায় দিয়ে চারবার পড়িয়ে নিলেন এবং 'ভুবন' কথাটির মানে জিজ্ঞেস করলেন। এ-বোধ মর্মে গেঁথে দিলেন স্বয়ং কবিগুরু। ঠিক খেলার মত সহজ করে, মধুর করে একটি গানের অর্থ, ব্যঞ্জনা ও অসংগতি বুঝিয়ে দিয়ে। সে গান ওঁর নিজের নয়। কিন্তু আমার হাত ধরে সেই গানের পথে হাঁটিয়েই যেন কবি শিখিয়ে দিলেন কেমন করে সকল গানের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হয়।'

কিভাবে? একটা বলুন না? বারবার ত বিরক্ত করতে আসব না?

'দেশের মাটি বই-এ একটা গান ছিলো পরে অবশ্য সেটা বাদ দিয়েছিলো। তাতেও লেখা গান—'লোহার লাঙ্গল পরশ পাথর ধুলায় সোনা ফলে'। কবিকে শোনালাম। কবি মুচকি হেসে বললেন বুঝিয়ে দাও। তখন অল্পবয়েসের দোষে জ্যাঠামশাইগিরি করবার লোভটা খুব। বোঝাতে লাগলাম লোহার লাংগলে ফসল ফলানো হোলো। ঘরের মেয়েরা সযত্নে ঘরে তুলে রাখলেন।

কবি চোখ বড় করে তাঁর সহজাত মিষ্টি মিহি সুরে বললেন —'ও-ও। তাহলে চাষবাসের খবর রাখা হচ্ছে? তারপর?'
সোনার দরে সোনার ধানের দামটি
নেব চেয়ে।

'বাব্বাঃ আবার ব্যবসার দিকেও লক্ষ্য আছে। সোনার দরই চাই। সোনার দরের বদলে অন্য দাম চলবে না। বাঃ! বাঃ! বেশ। তারপর?'

'মায়ের কোলে হাসবে ছেলে
বোনের কোলে ভাই
লক্ষ্মী মায়ের পায়ের সিঁদুর
মাথায় রাখি তাই।'

হ্যা হ্যাঁরে পায়ে আবার মা কবে থেকে সিঁদুর পরছেন? সিঁদুর ত পরে সিঁথিতে পায়ে থাকে অভ্র। যাক—তারপর?

(এখানে সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দিলেন সুন্দর গানটির মূর্তিটুকু)
সূর্যঠাকুর তোমায় বলি দিও মিঠে রোদ
মাঘমণ্ডল ব্রতে হবে তোমার দেনা শোধ।

তোর দেশ কোথা? কুমিল্লা?
'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'তাই ত বলি কুমিল্লাবাসী নইলে এমন কথা আর কে বলবে? হিরণ্যকশ্যপ তপস্যা করে দেবতাকে তুষ্ট করলেন। যা বর চাইলেন দেবতা বললেন তথাস্তু। তোমরা ওসব তথাস্তুর অবলিগেশনে যেতে চাওনা—ধার চাও। মাঘমণ্ডলে শোধ দেবে। আচ্ছা বেশ। তারপর?

'ধার শোধের ব্যাপারটা [illegible] মা? কুমিল্লাতে মাঘ মাসে এক মাস ধরে সূর্য-পূজো হয়। তখন [illegible] এক মাস বাজার খরচ [illegible] না। [illegible] পারছিলেন বলেই কি আজও ওঁর কথা-বলার ভংগীটি [illegible]?

তারপর শেষটা শোনো—
রূপোর ঝাঁপি হাতে নিয়ে লক্ষ্মী [illegible] এসো
[illegible] না [illegible] ভালোবেসো।

এক বছর শেষ হোলো [illegible]
বর্ষের [illegible] একেবারে [illegible] আমাকে ও অজয়াকে লক্ষ্য করে বললেন।

দাখো গানে যখন [illegible] করেছিলাম—এত কথা [illegible]। কবি বলার পর [illegible] সংগে [illegible]।

[illegible] যা করেছি তার কিছু [illegible]।

কথাটি বড় ভালো বলেছ! তারপর শোনো। [illegible] বললাম কবি [illegible] ও আমাকে [illegible] বলেছেন। [illegible] শীগগির তোর কোন কানটা কার দিকে ছিলো?

'বাঁ-কানটা।' ও চট করে ওর কানটা আমার কানে লাগিয়ে বললো কবির কথামৃত এই কান থেকে আমার কানে চলে আসুক চলে আসুক চলে আসুক। বলেই নাচতে লাগলো। সে সব আনন্দের দিন মনে হলেও রোমাঞ্চ জাগে।'

উনি থামলেন। বাইরে তখন অজস্রধারায় আকাশ ভেংগে পড়েছে। বাদলা-আলোয় ধারাযন্ত্রের গুঞ্জরণে যেন অতীতের কাহিনীরই কানাকানি। এক সময় বৃষ্টি থামলে চলে এলাম। আমায় উনি সহৃদয় স্নেহে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিলেন। এক বিচিত্র অনুভূতিতে মনটা ভরে রইলো। মনে হোলো ইনি শুধু বড় শিল্পীই নন। একটা গৌরবময় যুগের সাধনা তার সমস্ত আনন্দ বেদনা নিয়ে এঁর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। সেই ঐশ্বর্যে মনটি এমন করে ভরে আছে বলেই সমস্ত বৈদগ্ধ ও মধুরতা দিয়ে এমন কয়েকটি সোনার মুহূর্ত রচনা করতে পারলেন।

সন্ধ্যা সেন

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

লেখক সমবায় গ্রন্থ বিপণির বর্ষপূর্তি

সমবায় পদ্ধতিতে বিশ্বাসী কয়েকজন শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগীর প্রচেষ্টায় ষোলো বৎসর পূর্বে লেখক সমবায় সমিতি নামে একটি প্রকাশন সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা যে গ্রন্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন সংখ্যার দিক থেকে তা অধিক না হলেও গ্রন্থগুলি সুনির্বাচিত সন্দেহ নেই। লেখকগণের তালিকায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু নীহাররঞ্জন রায় ক্ষিতিমোহন সেন বিষ্ণু দে গোপাল হালদার প্রমুখ স্বনামধন্য চিন্তাবিদ ও লেখকগণের নাম থেকেই বোঝা যায় এই সংস্থা পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে কতো সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান সংগীত ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে এঁদের প্রকাশনা এখন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে এঁরা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও গ্রন্থাদি প্রকাশ করবেন বলে জানা গেল। মধ্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে এক বৎসর পূর্বে সমিতি যে গ্রন্থ বিপণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গত ২১ জুন শনিবার তার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। কবি-সাংবাদিক-শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র (উদ্বোধক), সমবায় মন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদিন (প্রধান অতিথি) ও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান শ্রীসত্যরঞ্জন বাপুলি। প্রত্যেক বক্তাই এই বিশেষ ধরনের সমবায় সংস্থার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। রাজ্য সমবায় উন্নয়ন তহবিল থেকে সমিতিকে অনুদান হিসাবে ৬০০০ টাকার একটি চেক এই অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়।

বোধিপীঠের রজত-জয়ন্তী

জড়বুদ্ধির ছেলেমেয়েদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের উপযোগী করার খুব বেশি সংস্থা আমাদের দেশে নেই। এরকম অল্প কয়েকটির মধ্যে অন্যতম হরিনাথ দে রোডের বোধিপীঠ। সম্প্রতি এ সংস্থার রজত-জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাংবাদিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ। ডঃ অজিত দেব অধ্যাপক এস কে বসু ডঃ কে ঘোষ ডঃ ডি এন নন্দী ডঃ পি কে বসু ও সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দেন ও সমস্যার গুরুত্ব উল্লেখ করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বনফুল সম্বর্ধনা

সাহিত্যতীর্থ গত ১ আষাঢ় প্রবীণ সাহিত্যসেবী বনফুলকে সম্বর্ধনা জানান। পাথুরিয়াঘাটা মল্লিকবাড়ির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রমেন্দ্রনাথ মল্লিক বাণী রায় কুমারেশ ঘোষ ও আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। সম্বর্ধনার উত্তরে বনফুল জানান যে এখনো প্রত্যহ তিনি কিছু না কিছু লেখেন (আগামী ৪ শ্রাবণ তিনি ৭৭-এ পড়বেন); জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৃষ্টিধর্মী রচনায় নিযুক্ত থেকে তিনি যেন মানুষকে আনন্দ দিয়ে যেতে পারেন এইটেই তাঁর একান্ত কামনা।

ভারতীয় ভাষা পরিষদ

ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাষার বিনিময়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভাষা পরিষদ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংস্থার প্রথম অধি-বেশন কবি-সম্মেলন হিসেবে গত ১৫ জুন সুসম্পন্ন হয়েছে। কয়েকজন কবি বাংলায় তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনানো হয়। আমরা এঁদের প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ

সম্প্রতি কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ-এর বার্ষিক উৎসবে কয়েকজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীবিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রী। এই উপলক্ষে শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী অনূদিত রবীন্দ্র-নাথের 'মুক্তধারা' নাটকটি সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে অভিনীত হয়।

শরৎচন্দ্রের বাস্তুভিটা রাজ্য সরকার কিনে নিয়েছেন

দেবানন্দপুরে অমর কথাশিল্পী শরৎ-চন্দ্রের বাড়ি তথা তাঁর জন্মগৃহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিনে নিয়েছেন বলে জানা গেল।

২৪-৬-৭৫ জরৎকারু

কান্তে। দিনেশ দাস। নওরোজ প্রকাশনী কলকাতা-২৭। দাম তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত দিনেশ দাস প্রতিষ্ঠিত কবি এবং কেবল তাই নয় তিনি আমাদের ভাষার একজন প্রধান কবি। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কবিতা লিখছেন তিনি। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও রচনার নিজস্বতার গুণে তিনি বাঙালী পাঠকের মনে একটি মর্যাদার আসন করে নিয়েছেন অনেক আগেই।

তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বই 'কাস্তে' আসলে একটি সংকলন গ্রন্থ। বাংলাভাষায় সম্প্রতিকালে যে কয়টি কবিতা এমন কি সাধারণ পাঠকেরও মুখে মুখে ফেরে 'কাস্তে' কবিতাটি তারই অন্যতম। ঐ কবিতাটির নামে এই বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে প্রধানত এই কারণে যে অন্য কবিতা-গুলিও মোটামুটি সমধর্মী। ইংরেজ আমলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আবহাওয়ায় রচিত কবিতাগুলির ভেতর একই সঙ্গে ছিল দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী বিদেশী শাসনের প্রতি ধিক্কার এবং যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব। স্বভাবতই এর সঙ্গে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও ছিল প্রবল ধিক্কার।

বলাই বাহুল্য দিনেশ দাস একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলেই এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চেহারা হয়েছে কাব্যিক। এবং সেই কারণেই আরও বেশি সার্থক। এমনিতে মৃদুভাষী এই কবি স্বদেশ এবং মানুষের

প্রীতি ভালোবাসায় যে কতখানি দাপ্ত হতে পারেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পদরত্নাবলী—সম্পাদনা : সতী ঘোষ। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬ বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম দশ টাকা।

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সংস্কৃতির এক মহান ঐতিহ্য হলেও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন গ্রন্থগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। এইসব ক্ষুদ্র কবিতা যা এক একটি গান হিসাবে সমাদৃত তা আজ কেবলমাত্র ছাত্র শিক্ষাক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে বৃহৎ পাঠক সমাজ আজ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। বৈষ্ণব পদাবলী গীতি কবিতা নয়; কিন্তু গীতিধর্মিতাই এর প্রধান গুণ। সেই কবে জয়দেবের যুগ থেকে আটশ বছর ধরে অসংখ্য বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছে যার সাহিত্য মূল্য আজও অম্লান। বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশের ধারায় তিনটি যুগ স্পষ্ট—চৈতন্যপূর্ব চৈতন্য সমসাময়িক এবং চৈতন্য পরবর্তী। সর্বকালের পদগুলির মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব-কথা। ব্যাখ্যা ছাড়া যা উপলব্ধি করা অসম্ভব একালের মানুষের পক্ষে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই ডঃ ঘোষ 'বৈষ্ণব পদরত্নাবলী' গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছেন একালের পাঠকের জন্য। প্রাক চৈতন্য যুগ ও শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক কবিকুলের মধ্যে জয়দেব চন্ডীদাস বিদ্যাপতি নরহরি সরকার মুরারি গুপ্ত বাসুদেব ঘোষ গোবিন্দ ঘোষ মাধব ঘোষ শিবানন্দ সেন রামানন্দ বসু বংশীবদন দাস এবং পরমানন্দ গুপ্তর নির্বাচিত পদ স্থান পেয়েছে। শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী পদকর্তাদের শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও অভিসার বাসক সজ্জিকা উৎকন্ঠিতা এবং বিপ্রলব্ধা খন্ডিতা মান এবং কলহান্তরিতা প্রেমচিন্তা রূপানুরাগ আক্ষেপানুরাগ রসোদ্গার মাথুর ভাব সম্মেলন ও শরণাগতি বিষয়ক বেশ কিছু পদ সংকলিত। বৈষ্ণব পদগুলি যেহেতু গান সে জন্য সম্পাদক প্রতিটি পদের সঙ্গে রাগ পরিচয়ও দিয়েছেন। গ্রন্থ শেষে সুদীর্ঘ শব্দার্থ সংযোজন করে সম্পাদক মূল্যবান কাজ করেছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত শিক্ষার অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য পরিবেশন করে নবীন পাঠকদের উদ্দীপ্ত করবার পথ প্রশস্ত করেছেন। ডঃ ঘোষের পূর্ববর্তী গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশের ক্রমানুসারে সম্পাদনা করেছেন বর্তমান গ্রন্থ।

সুদীর্ঘকাল বাদে একখানি সার্থক বৈষ্ণব পদ সংকলন হাতে পেয়ে সুধী পাঠক তৃপ্তি পাবেন।

শরৎচন্দ্র—কানাইলাল ঘোষ। দি প্রকাশনী। ৮২ গোপী মোহন দত্ত লেন। কলকাতা-৩। দাম পনের টাকা।

এ বছর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকখানি বইও বেরিয়েছে। একালের পাঠক শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে জানতে যে কত গভীরভাবে আগ্রহী তার পরিচয় শরৎচন্দ্রের বিপুল গ্রন্থ বিক্রয়ে বোঝা যায়। শরৎচন্দ্রের জীবনীমূলক রচনা সংকলন বর্তমান গ্রন্থখানির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশে তা আরও প্রমাণিত হল।

বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে পরিণত বয়স পর্যন্ত শরৎ প্রসঙ্গে যে সব স্মৃতি-চিত্রণ করেছেন সমসাময়িক অন্তরঙ্গ সুহৃদেরা গ্রন্থকার অসামান্য নৈপুণ্যে তার কালক্রমিক সংকলন করেছেন এই জাতীয় বই খুব কমই চোখে পড়ে। অতীতের মত বর্তমানেও সমাদৃত হবে বইটি।

শবরীর তিয়াষ (উপন্যাস) চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত। ভোলানাথ প্রকাশনী ৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

বৃহৎ এ উপন্যাসের পটভূমি গড়ে উঠেছে মানভূম - পুরুলিয়ার ছোট গ্রাম তিয়াসির খুব সাধারণ নিরহংকার মানুষ ভূমিজদের নিয়ে। লেখক পুরুলিয়ার ছেলে। ব্যক্তিগত জীবনের বিরাট সময় ঝাড়গ্রামের আদিবাসী কল্যাণ দফতরের দায়িত্বে কেটেছে। তাই নিজের চেনা খুব পরিচিত গ্রামকে লেখার প্রয়োজনে বেছে নেওয়াটা ভুল হয় নি। বরং তাঁর অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। স্থানীয় ভাষার ওপর তাঁর যে যথেষ্ট দখল রয়েছে তাও বোঝা গেল বিভিন্ন মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত কথোপকথনে।

প্রতি মুহূর্তে পরিচিত প্রেম-ভালবাসা আচার ব্যবহারের ওপর লক্ষ্য রাখতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাই মাতব্বর ঈশ্বরী সিং দ্বিজপদ রক্তবিহারী উদাসী ওরফে কানু দাস ওর আখড়া বা নাচনীওয়ালী কাজলী জোয়ান ছেলে নীলকন্ঠ আর পদ্ম মালতীর মতো গ্রামীন সব স্বচ্ছ চরিত্র আমাদের চিনে নিতে ভুল হয় না।

ঝরঝরে ভাষায় লেখা এ উপন্যাস পাঠকের মনে দাগ কাটতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে অসংখ্য বানান ভুল চোখকে অবশ্যই পীড়া দেয়। প্রচ্ছদে লেখা 'তিয়াষ' বানানের সঙ্গে ভেতরে ব্যবহৃত 'তিয়াস' বানান যেমন।

অনিষ্ট। পাঠ বিষয়ক সংকলন। সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৯।১।৯এ লক্ষ্মী দত্ত লেন। কলকাতা-৩। দশ টাকা।

"শিল্পের বোধধারা যখন এক বাক্যেই শেষকথা জানিয়ে দিয়েছেন—কেবল অপেক্ষা সেই মাহেন্দ্র ক্ষণের, কখন তাবৎ পটুয়ার দেহে কালো পোষাক পরিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হবেন, এ-হেন সময় সহসা এই বিশেষ 'পাঠ সংকলন' পাঠকের কাছে কিছুটা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। কোন সংকলনের কৈফিয়ৎ হিসেবে নয়, আমরা যথার্থই বিশ্বাস করি পাঠ শিল্পের মৃত্যু-রটনা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—অনেকটা সেই জীবিত মানুষকে ধরে বেঁধে খুন করে শহীদ করার মতো।" সম্পাদকের উপরোক্ত জোরালো বক্তব্য নিয়ে অনিষ্ট পত্রিকা বিশেষ 'পাঠ বিষয়ক সংকলনটি' প্রকাশিত হয়েছে। পাঠচিত্র এবং তার শিল্পসমাজ সম্পর্কিত। বেশ কিছু তথ্যপূর্ণ রচনা এই বিশেষ সংখ্যাটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। 'পটুয়া শিল্প' 'আধুনিক চিত্রশিল্পে পটের প্রভাব' 'বাংলার পাঠ', 'কালীঘাট শৈলীর রূপমানস' শীর্ষক রচনাগুলি সংশ্লিষ্ট শিল্প বিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনা। রজনী চিত্রকরের আত্মজীবনীটি সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যমূলো মূল্যবান। পাঠশিল্প সংক্রান্ত পুস্তকাকারে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার তালিকা এবং গ্রন্থসূচী। এমন একটি সুসম্পাদিত সংকলন উপহার দেওয়ার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ—সম্পাদক : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈতানিক। ৪ এলগিন রোড। কলকাতা-২০। দাম চার টাকা।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গের বর্তমান সংখ্যাটি সংরক্ষণযোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র নন্দগোপাল সেনগুপ্ত অমিতাভ চৌধুরী শ্রীমতী ঠাকুর নির্মলকুমার মহলানবীশ অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণ কৃপালনী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দিতা দেব সেন রবীন্দ্র প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিপত্র ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথের কবিতায় চিঠিপত্র বেশ আকর্ষণীয়।

সারস্বত—সম্পাদক : অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম দু টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক সারস্বত পত্রিকাটি এই কাগজ সংকটের দিনেও যে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে তা যথেষ্ট প্রশংসার্হ। গল্প কবিতা প্রবন্ধ গ্রন্থ-সমালোচনায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি উচ্চমানের এবং অত্যন্ত সিরিয়াস। বর্তমান সংখ্যায় ভারতের ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদী চিন্তার অগ্রগতির ধারা সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন হারানচন্দ্র নিয়োগী। রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতা প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনা করেছেন বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। আর একটি আলোচনা করেছেন দিলীপ মজুমদার। গল্প আর কবিতা লিখেছেন নন্দদুলাল সাহা সুদেব সানা, বিজয় পাল সুশান্ত বসু অজিত বাহরী এবং অরুণা মুখোপাধ্যায়। ভূদেব চৌধুরীর গ্রন্থসমালোচনা সংখ্যাটির অন্যতম সম্পদ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বললাম সবেমাত্র শুরু হয়েছে দুজনের জানাজানি। তৃতীয় আর একজন এখন জেনে ফেলেছে সে আমার পাশেই বসে। চাচাজীকে বলতে গেলে সুযোগ চাই। কারণ লোকাপবাদের ভয় ওঁর বড় বেশী। চাচাজীর যদি মনে হয় আমাদের বিয়ে হলে লোকে বলবে নরসিংলাল মল্লিকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করল তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাবে। তাই ঝিল্লির কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল না পাওয়া অব্দি চাচাজীর কাছে ব্যাপারটা একেবারেই প্রকাশ করা যাবে না।

জুলিয়েন বলল, এ তো আবার এক ফাসাদ। দেহে মনে মিলে গেল, হাতে ধরাধরি করে চলে এলাম তা নয়। ফাদার মাদার গ্রান্ড ফাদার-মাদারদের জিজ্ঞেস কর। তাঁরা কৃপা করে অনুমতি দিলেন—ভাল, না হয় বুক চাপড়ে মর।

বললাম ঝিল্লি তার পিতাজীকে শুধু ভালই বাসে না মা মারা যাবার পর গভীর একটা টানেও জড়িয়ে পড়েছে। তাই পিতাজীকে অস্বীকার করে চলে আসা ওর পক্ষে খুব সহজ নয়।

জুলিয়েন অধীর হয়ে বলল, এ-সব যদি জানতে মুখার্জী তাহলে ভালবাসতে গেলে কেন?

হেসে বললাম,

Love really has nothing to do with wisdom or experience or logic. It is the prevailing breeze in the land of youth.

জুলিয়েন বলল দারুণ একখানা কথা বলেছ তো মুখার্জী। ভালবাসাটা তারুণ্যের ধর্ম বলেই দুজনে দুজনকে ভালবাসে। যুক্তিতর্কের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ওকে আশ্বস্ত করে বললাম ভাবনার বিশেষ কোন কারণ নেই জুলিয়েন। ঝিল্লি এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব নিজের ওপরেই তুলে নিয়েছে।

জুলিয়েন যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বললাম কি হল এখনি চলে যাচ্ছ?

জুলিয়েন বলল হোটেল ছাড়তে একটি জার্মান তাকে মাকে কাল ডাক-বাংলোতে। চারটের ওদের গাড়ী। টিকেটগুলো বুক নিতে হবে।

জুলিয়েন বেরিয়ে গেল। আমি জুলিয়েনের মেজাজ মর্জি সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম। নিজের পছন্দ-মাফিক কাজ করে জুলিয়েন। প্রকৃতিতে অর্ধ যাযাবর। দুনিয়ায় কারো তোয়াক্কা রাখে না নিজের বিপদ হতে পারে জেনেও নয়। বন্ধুত্বের টান তার কাছে প্রবল ও অকৃত্রিম।

ভাগৎ এসে দাঁড়াল সামনে। বললাম কি খবর?

ও বলল দোস্তো লাডড়ু বেশী হয়ে গেছে বাবুজী।

বললাম ও দুটো ভাগত্‌রাম খাবে। ভাগতের মুখে খুশি ঝলকে উঠল।

পাহাড়ী ছেলেবুড়ো সবাই দেখেছি বড় সৎ আর বিশ্বাসী। ও দুটো লাড্ডু ভাগৎ নির্বিকার মুখে পুরে হজম করে ফেলতে পারত। কিন্তু যা তার প্রাপ্য নয় তাকে অগোচরে নিয়ে নিতে কোথায় যেন তার স্বভাবধর্মে বেধেছে।

বিকেল চারটে নাগাদ বেড়াতে বেরোলাম টাট্টুতে চড়ে। ক'দিন আলস্যেমিতে বেরোনো হয় নি। আজ ভেতরের তাগিদেই বেরোতে হল। পকেটে ঝিল্লির চিঠিগুলো পুরে নিয়ে চলেছি। নির্জনে বসে পড়ব। চিঠি নয় এগুলো। একটা মন তার সব দুঃখ সুখ তৃপ্তি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বাঁধা পড়ে আছে এই চিঠির ভেতর। উপকথার পাথরপুরীর অন্তঃপুরে পাথরের মূর্তি হয়ে থাকা মেয়েটির মত। আর একটা মনের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভাঙবে তার। অমনি ভোরের রোদের মত হেসে উঠবে সে। বৃষ্টির ফোঁটার মত টিপ টিপ করে ঝরাবে কান্না। আর বাদল দিনের ফোটা কদমের মত শিউরে শিউরে উঠবে তার প্রিয়-মিলন সমুৎসুক দেহ।

টাট্টুটা প্রায় খাড়া পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সরু রাস্তাটা ধরে অবলীলায় নেমে এল ভ্যালিতে। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ স্থির নিশ্চিত। দুর্গম পথে ওরাই যথার্থ ভয়কে জয় করেছে। চড়াই উৎরাই করতে গিয়ে এই প্রাণীগুলির পদস্খলন হয়েছে এমন খবর কোন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখেও শোনা যাবে না।

আজ ভ্যালির বুকে ছোট স্রোত ধারাটি পেরোতে গিয়ে চোখে পড়ল দুটি ছোট ছেলেমেয়ে গাছের আড়ালে বসে কি যেন করছে। জল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে দেখি দুটিতে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরছে।

কাছে গিয়ে বললাম কি মাছ ধরলে?

বছর আটেকের মেয়েটি ভারী মিষ্টি দেখতে অমনি মুখে আঙুল রেখে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল।

নিবিষ্টচিত্ত বছর বারো বয়েসের বীর শিকারীটি দেখতে না দেখতে একটি কুনি মাছ গেঁথে তুলল বঁড়শিতে।

এতক্ষণে মেয়েটি তার মাছের সঞ্চয় আমাকে দেখাতে লাগল। গর্টিকয় গুলগুলি আর দুটি মাত্র মোরি মাছ ধরা পড়েছে। ঐ ক'টি মাছ নিয়ে মেয়েটির গর্বের যেন আর শেষ নেই। সে তার দাদাটির দিকে আঙুল তুলে বারবার দেখাতে লাগল।

ছোট্ট দাদাটি কিন্তু নির্বিকার। সে তার শিকার সন্ধানে তখনও অনন্যমনা।

বেশী কথা বলে ক্ষুদে শিকারী দুটির নিবিষ্টতা নষ্ট না করে পাইন বনের ভেতর দিয়ে ওপারের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম। নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে এসে টাট্টুটিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে এসে বসলাম পাথরখানার ওপর।

কিন্তু সেই মনে হল ওপরের গম ভানাব চাকীর আওয়াজ পাচ্ছি না কেন!

আকাশে তখনও আলোর ফোয়ারা বন্ধ হয়ে যায় নি। স্বাভাবিক কৌতূহলে ওপরের দিকে চাইলাম। চাকী ঘরে দেখি মেয়েটি কুলুপ লাগাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে গমের ব্যাগ মাথায় আর একটি মেয়ে। ওদের দুজনের কারো মুখই দেখা যাচ্ছিল না।

আমি আবার ভ্যালির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলাম। এত আলো থাকতে কোনদিনই এখানে আসি নি। আজ যেন সব কিছুই ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে। বাঁদিকে পীর পাঞ্জালের তুষার পাহাড়টা তার বরফের সাদা চাদরখানা অনেক ওপরে তুলে নিয়েছে। নীচে পোড়া ঝামার মত পাথরের গায়ে দেখা যাচ্ছে বার্চ-এর বিচ্ছিন্ন সারি।

নীচের সেই ছোট্ট স্রোতধারাটির দিকে চোখ পড়তেই চোখ দুটো যেন সীমাহীন জ্যোতিতে ভরে গেল। জলের তরল দেহের একটা অংশ লক্ষ্য করে আকাশ থেকে কেউ যেন ছুঁড়ছে ঝাঁক ঝাঁক রুপোলী তীর। ঝিলিক মেরে উঠছে রুপোলী তীরের ঝকঝকে ফলাগুলো। আশ্চর্য এক চোখের উৎসব।

বাবুজী আপনি একা একা এখানে বসে?

চমকে নদীর জলের থেকে চোখ তুলে চাইলাম আমার পাশে দাঁড়ান মেয়েটির মুখের দিকে।

আরে তুমি কি ব্যাপার? গম ভাঙাতে এসেছিলে বুঝি?

মেয়েটি মাথার ব্যাগটা পাথরের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, হাঁ বাবুজী তবে আজ ভাঙানো হল না।

বললাম কেন বল তো? আজ দেখলাম চাকী ঘরের ঐ মেয়েটি কুলুপ এঁটে সকাল সকাল চলে গেল।

কম্পাউন্ডার বাবুর মুখে সে সময় এই মেয়েটির কি যেন একটা নাম শুনেছিলাম অনেক চেষ্টায় সেটা আর মনে আনতে পারলাম না।

মেয়েটি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, আকাশে আজ ইল্ পাখি উড়ছে দেখছেন না।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা চিল প্রসারিত ডানায় রোদ্দুরের সোনা মেখে ভ্যালির ওপর চক্কর দিয়ে ঘুরছে। কে যেন একটা সোনালী ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আকাশে।

বললাম তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

ও বলল আজ শুক্রবার এমনিতেই 'গাল লাগদি' ভায়েদের বিপদের দিন তার ওপর ঐ অশুভ ইল পাখিটা টিকার ঘুরে ঘুরে ওর ছায়া ফেলে ফেলে উড়ছে।

বললাম আজকের দিনটা বুঝি ভায়েদের পক্ষে অশুভ?

ও সঙ্কোচের সঙ্গে নিজের এলোচুল দেখিয়ে বলল আজ চুল বাঁধতে নেই। এলো চুলেই রয়েছি।

ওর সংস্কার দূরে করার কোন চেষ্টাই করলাম না। সীমান্তে অঞ্চলে পাহারায় নিযুক্ত সৈনিক ভাইটির মঙ্গলের জন্যে মেয়েটি তার রেশমের মত নরম বাদামী চুলগুলোকে খোলা রাখে রাখুক।

শুধু বললাম আজ ইল্ উড়ছে তাই বুঝি ঐ চাকী ঘরের মেয়েটিও চলে গেল তাড়াতাড়ি?

ও বলল আজ বড় কেউ একটা আসবে না, তাই ও আর বসে থেকে কি করবে। তালা বন্ধ করে চলে গেল, তাছাড়া ইল্ দেখার পর ও নিজেও আর কাজ করতে চাইছে না।

অন্য কথা পাড়লাম তোমার পিতাজী কেমন আছেন বালু?

হঠাৎ করে ওর নামটা মনে এসে গেল।

মেয়েটি বলল এখন কিছুটা ভাল আছেন বাবুজী। তবে হাঁটাহাঁটি আর করতে পারেন না।

বললাম আচ্ছা একদিন পণ্ডিতজীকে দেখে আসব।

বালু হঠাৎ করে বলে বসল বাবুজী এই টিকা থেকে আমার বাড়ী খুব কাছে। আপনি শহর ঘুরে যান তাই দূর মনে হয়। আজ দয়া করে আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন?

দেখলাম কথাটা বলে ফেলেই বালু কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রত্যাখ্যানের কথা ভেবে হয়ত লজ্জায় ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল।

বালুকে এমন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রোদ্দুরের জলে স্নান করতে কোনদিন দেখি নি। ওর আঠারো উনিশটি বসন্তের ছোঁয়া লাগা মুখখানা বড় সুন্দর কিন্তু লজ্জা সংকোচের ছোঁয়ায় সে মুখ অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বেড়াতে বেরিয়েছি এখন কাজ তো কিছু নেই চল দেখা করে আসা যাক তোমার পিতাজীর সঙ্গে।

বালুর মুখ থেকে লজ্জার লাল আভাটুকু মিলিয়ে গেল। খুশির ঝিলিক লাগল চোখে মুখে।

বালু চলেছে আগে আগে টাট্টুর লাগাম ধরে টানতে টানতে। পেছনে সরু ভাঙাচোরা পাহাড়ী পথে ওকে অনুসরণ করে চলেছি আমি।

কিছু পথ ওপরে উঠে টিকার শেষ। ওপারের পাহাড়ের সঙ্গে এপারের পাহাড়ের একটা সংকীর্ণ শৈলশিরার মাধ্যমে যোগাযোগ আছে। বালু অবলীলায় পেরিয়ে গেল। নির্ভীক টাট্টু তার পেছন পেছন ঠিক চলে গেল। আমি কখনো বসে কখ[illegible], দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বুকে পার [illegible]ম। নীচের খাদের দিকে তাকালে এটুকু পথ পার হওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। ভ্যালির ওপর যে বিরাট বিরাট পাথরগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন এক একটা অন্ধ দৈত্য। কোন জীব ওপর থেকে পিছলে তার ঘাড়ে পড়লেই সে মুহূর্তে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

একটা পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে পণ্ডিতজীর ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম।

আমি এই পাহাড়ের পথ ধরে ভ্যালি পেরিয়ে বাজার ঘুরে যাতায়াত করতাম পণ্ডিতজীর অসুখের সময়। বালুদের ছোট্ট ঘরের কাছে পিঠে কোন বাড়ী নেই।

ওপরে তাকিয়ে দেখি উঠোনে সোনালী গম বিছানো রয়েছে। বালু আগে উঠে টাট্টুকে বেঁধে ফেলল একটা পাঙাড় গাছের কাণ্ডের সঙ্গে। আমি উঠোনে উঠেই শুনতে পেলাম তুলসী দাসের রামচরিত মানস থেকে কেউ যেন কিছু পাঠ [illegible]

মনে হল [illegible]

বালু ঘরের দাওয়ায় তাড়াতাড়ি একখানা পুরোনো খোবি পেতে দিলে। আমাকে তার ওপর বসতে বলতেই আমি বললাম, বসছি কিন্তু তুমি এখন ঘরের ভেতর যেও না। আমি বাইরে বসে তোমার পিতাজীর পাঠ শুনব।

বালু আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাতে লাগল। সে বোধহয় ডাক্তার মানুষটির খেয়ালীপনায় একটু অবাকই হচ্ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছাকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই ছিল না তার।

আমার মাসীদের বাড়ীর পাশেই থাকত এক রাজস্থানী দোকানদার। রোজ ভোর চারটেতে সেই মানুষটি রামচরিত মানস থেকে কিছু অংশ পাঠ করত। প্রথম প্রথম ভোরবেলাকার ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে উঠলেও পরে রামায়ণ শোনাটা এক রকম যেন নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ অনেকগুলো দিনের পরে রামায়ণ কথা শুনতে পেয়ে মনটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

পন্ডিতজী পাঠ করে চলেছিলেন :

'মাতু পিতা ভগিনী প্রিয় ভাঈ।
প্রিয় পরিবারু সুহৃদ সমুদাঈ।।
সাসু সসুর গুরু সজন সহাঈ।
সুত সুন্দর সুসীল সুখদাঈ।।
জহঁ লগি নাথ নেহ অরু নাতে।
পিয় বিনু তিয়হি তরনিহু তে তাতে।।
তনু ধনু ধামু ধরনি পুররাজু।
পতিবিহীন সবু সোক সমাজু।।
ভোগ রোগ সম ভূষণ ভারু।
যম জাতনা সরিস সংসারু।।
প্রাণনাথ তুম্হ বিনু জগ মাহীঁ।
মো কহুঁ সুখদ কতহুঁ কছু নাহীঁ।।
জিয় বিনু দেহ নদী বিনু বারী।
তৈসিঅ নাথ পুরুষ বিনু নারী।।
নাথ সকল সুখ সাথ তুম্হারেঁ।
সরদ বিমল বিধু বদনু নিহারেঁ।।

এবার পন্ডিতজী নারীর কাছে পতির মাহাত্ম্য সুন্দর কুলুহী ভাষায় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। সীতা বনে যেতে চান, কিন্তু রাজবধূর বনবাস যাত্রায় সবাই বাধা দিতে লাগলো। তখন সীতা বললেন, মাতাপিতা গুরু পুত্র পরিজন কাছে থাকলেও স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের কোন কিছুই ভাল লাগে না। ঐশ্বর্য ধন রাজ্য দেহধর্ম ঘর সর্বকিছুই পতিহীনার কাছে পীড়াদায়ক। একমাত্র স্বামীই নারীকে দিতে পারে সুখ। দেহ থেকে প্রাণ ছেড়ে গেলে কিংবা নদী থেকে জল শুকিয়ে গেলে যে অবস্থা হয়, পতিহীনা নারীর অবস্থা ঠিক তাই।

আর বেশীক্ষণ বোধহয় বালুকে এমনি চুপচাপ দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না ভেবে বললাম, বালু, তোমার পিতাজী রোজ এ সময় বসে রামচরিত মানস থেকে পাঠ [illegible]

বালু একটু এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল ওপারের টিকা থেকে প্রায় রোজ মেয়েরা এ সময় পিতাজীর কাছে রামচরিত কথা শুনতে আসে।

বললাম, তুমি শোন না?

ও মাথাটা আস্তে কাৎ করে জানাল, সেও শোনে।

বললাম, এ সময় তোমার পিতাজীকে আমার আসার কথা জাননোটা বোধহয় ঠিক হবে না বালু।

সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল, ওতে কি আছে আপনি কিছু ভাববেন না। পাড়ার মাঝে কাজ পড়লেই বাবাকে পড়া ছেড়ে খঠতে হয়। আর তাছাড়া চাকরী ঘরে যাবার সময় পাঠ শুরু হয়েছে। এখন পাঠ ভেঙে যাবারই কথা। বেশীক্ষণ পড়লে পিতাজী হাঁপিয়ে ওঠেন। আগের মত দম রাখতে পারেন না।

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল বালু।

সামান্য সময়ের ভেতর দেখলাম, একটি একটি করে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের টিকার দিকে চলে যেতে লাগল। যাবার সময় ওরা কোন কথা না বলে আমার দিকে ফিরে একটি করে নমস্কার করে গেল। আমি দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানাতে লাগলাম।

ওরা চলে গেলে বালু ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আসুন।

আমি বালুর পেছন পেছন অবুরীতে এসে পড়লাম। শোবার ঘর কাম স্টোররুম এই অবুরী। পাশেই এক চিলতে রসুই ঘর দেখা যাচ্ছে। জানালার ফাঁকে চোখ পড়তেই দেখলাম, ঘোরালের ভেতর একটি গরু দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে।

একটা চারপাইএর ওপর থেকে নেমে দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করলেন পন্ডিতজী। আমি প্রতি নমস্কার জানালাম।

লক্ষ্য করলাম, পন্ডিতজীর দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। পা দুটো কাঁপছে। বৃদ্ধ মানুষটির কাছে গিয়ে হাত ধরে বসালাম চারপাইএর ওপর।

বললাম, আমি বাইরে থেকে আপনার রামচরিত পাঠ শুনছিলাম।

উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বাবুজী, আপনি পাঠ শোনার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন?

কুলু মেলার পথে গাদ্দী মেয়েরা

ফিরে তাকালাম বালুর দিকে। ও লজ্জায় নীচু করে মেঝের ওপর চোখ পেতে দাঁড়িয়েছিল। কোন কথা বলল না।

আমি বললাম আপনার মেয়ে কিন্তু আদরের কোন ত্রুটিই রাখেনি। আসন পেতে আমাদের বসার সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল।

অন্তরে একটা ছবি ফুটে উঠল বাপের মুখে। পণ্ডিতজী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আমাকে তাঁর পাশটিতে বসতে অনুরোধ জানালেন।

আমি বসে ওঁর হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ী দেখলাম। হাত নামিয়ে রেখে বললাম, বেশ সুস্থই তো রয়েছেন দেখছি।

পণ্ডিতজী বললেন, রঘুনাথজীর কৃপায় আমার কোন কষ্ট নেই বাবুজী। দেহে যাতনা হলে তাঁর নাম করি। অমনি সব ভুলে যাই।

আমি পণ্ডিতজীর সংগে অসুখের কথা ছাড়া নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

ডাক্তারী করতে গিয়ে ধীরে ধীরে একটা অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি। কোন পরিচিতের বাড়ীতে বিনা কারণে গিয়ে পড়লেও আর সব কথা বাদ দিয়ে রোগের কথাই উঠবে সেখানে। ডাক্তার ছাড়া মানুষ হিসেবে আমার যেন আর কোন পরিচয়ই নেই। সাধারণ কথার স্বাদ নেবার অধিকার যেন ডাক্তার হয়ে আমি হারিয়ে বসে আছি।

কিন্তু এই একটি জায়গায় দেখলাম বার্ধক্যের সবকটি অসুস্থতা সংগে নিয়েও মানুষটি একবারের জন্যে রোগের কথা ওঠালেন না।

কথায় কথায় বললাম, পণ্ডিতজী, অপনারা কি কুলু অঞ্চলেরই মানুষ?

পণ্ডিতজীর মুখে সরল একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। বললেন কেন বলুন তো বাবুজী?

বললাম, কুলুতে যখন রয়েছেন ঘরবাড়ী করে, তখন কুলুর লোক তাতে সন্দেহ কি। তবে আপনার কিংবা আপনার মেয়ের পোষাক পরিচ্ছদে একটু তফাৎ লক্ষ্য করেছি, তাই কথাটা তুললাম।

ঠিক ধরেছেন বাবুজী, বললেন পণ্ডিতজী; আমরা আসলে রাজপুত। জয়পুরে ছিল আমাদের আদি বাস। আমার পিতামহ এসে এখানে বসতি পত্তন করেন।

বললাম, আপনাদের পৈতৃক কিছু কি ব্যবসা ছিল?

আগে ছিল ক্ষেতখামার, এখন ওসব কিছু নেই বাবুজী। রামজীর কৃপায় দিন চলে যাচ্ছে। সামনে এক চিলতে যে ক্ষেতি দেখলেন, ওতে গম আর মকাইএর চাষ হয়। কোনরকমে দুটো প্রাণীর চলে যায় ওতে।

লক্ষ্য করে দেখেছি, বেশ অভাবের ভেতরই এঁদের দিন গুজরান করতে হয়, কিন্তু একটা পরিচ্ছন্ন আভিজাত্যের ছাপ লেগে আছে এঁদের আচার আচরণে।

আমাদের কথার ফাঁকে বেরিয়ে গিয়েছিল বালু। আমি লক্ষ্য করিনি। আবার যখন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ঝকঝকে কাঁসার থালায় দুটি বেসনের লাড্ডু আর কটি তিলৌড়ী সাজিয়ে এনেছে। সোনার মত ঝিলিক দেয়া চুমকিতে জল টলটল করছে।

বালু মেঝেতে পিঁড়ি পেতে তার ওপর ওগুলো সাজিয়ে রেখে আমার দিকে চাইল।

পণ্ডিতজী এতক্ষণ কথায় মেতেছিলেন। এবার জলযোগের থালার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার হাতখানা ধরে বললেন, সামান্য একটু মুখে দিতে হবে বাবুজী।

আমি উঠে গিয়ে বসলাম মেঝের ওপর পাতা ছাগলোমে তৈরী থোবির ওপর।

তিলৌড়ী মুখে দিয়ে বললাম, এটি খেতে কিন্তু আমি খুব ভালবাসি। তুমি দেখছি মনের কথা জানতে পার বালু।

এবার সলজ্জ হাসি ফুটল বালুর মুখে।

হঠাৎ করে ও ভেতরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে দেখে আমি বলে উঠলাম, আর নয় কিন্তু। শেষ বেলায় খাবার অভ্যেস নেই, শুধু তোমার দেওয়া জিনিসগুলোর লোভ ছাড়তে পারছি না বলেই খাচ্ছি।

বালু ফিরে দাঁড়াল।

পণ্ডিতজী বললেন, একটা মকাই খাবে বাবুজী? বালুর সেঁকা মকাই খেতে খুব ভাল লাগবে। ও বেটী নিমক মরিচা মাখিয়ে এমন মকাই সেঁকে দেবে, যার সোয়াদ জিভে লেগে থাকবে বহুৎ দিন।

বললাম, তাহলে তো খেতে হয়। কিন্তু অসময়ে আবার আগুন জ্বালতে হবে, তার চেয়ে থাক্ অন্য আর একদিন খাওয়া যাবে।

(ক্রমশঃ)

'সুরের আগুন' প্রসঙ্গে

অমৃত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, সুরের আগুন সংযোজনার জন্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কথা এবং চিন্তা-ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারছি, সন্ধ্যা সেন এবং অমৃত কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায়। অমৃতের উৎকর্ষ বাড়াতে এ ধরনের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রয়োজনীয়।

সুর কথাটার মধ্যে সঙ্গীতের বহুমুখী ধারা অন্তর্নিহিত। জানি না এই সংযোজনটি শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে কিনা। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর নজরুল অতুলপ্রসাদী এবং আধুনিক গানের শিল্পীদের কথাও যদি এই বিচিত্র ফিচারে সংযোজন করা হয় তাহলে সাপ্তাহিকের জগতে 'অমৃত' এক নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাস্বর হয়ে থাকলে এবং এই ফিচারটি অনেক দিন প্রকাশিত হবার পাথেয় খুঁজে পাবে। আশা করি অমৃত কর্তৃপক্ষ আমাদের পাঠকদের আগ্রহ উপলব্ধি করবেন এবং অমৃতকে নিত্যনতুন বৈচিত্র্যে ভরপুর করে তুলতে প্রয়াসী হবেন।

বাঙালীদের কলঙ্ক হচ্ছে, আমাদের সংস্কৃতির পথিক রবীন্দ্রনাথকেই আমরা ভাল করে জানি না, জানার আগ্রহও নেই। অথচ সুদূর রুমানিয়ায় রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য সেখানকার অনেকেই আজ বাংলা ভাষা শিখছে। আর আমরা ঘরের মানুষ আমাদের পরম রত্নটির দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি না। এটাই বোধহয় আমাদের চিরন্তনী বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাববার, বোঝবার সার্থক মাধ্যম। আমাদের যুব মানস তাদের আগ্রহের একাংশও যদি এদিকে নিয়োজিত করতেন তাহলে. ক্রমশ মহাকবির অমূল্য সৃষ্টির তাৎপর্য বোঝার প্রয়াসী হতেন। কিন্তু চটুল হিন্দী এবং আধুনিক বাংলা গান শোনার জন্য অধি-কাংশ বাঙালীর যে আগ্রহ তার ছিটে-ফোঁটাও নেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য। 'বিপিনবাবুর কারণ সুধা' শুনতে যতটুকু আগ্রহ তার একটুও যদি থাকত 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান' শোনার জন্য [illegible] সংস্কৃতির আজ অবক্ষয়ের পথে নেমে যেত না। আমাদের বাঙালীদের আজ এ বিষয়ে জানবার সময় এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে দিন দিন রবীন্দ্রনাথকে জানবার আগ্রহ বাড়ছে। এর পেছনে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবদান। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনমানসে পৌঁছে দিয়ে সাড়া জাগানোর পেছনে দেবব্রত বিশ্বাস হেমন্ত মুখো-পাধ্যায় চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন মুখো-পাধ্যায় সাগর সেন সুচিত্রা মিত্র কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সুমিত্রা সেন এবং আরো অনেক শিল্পীর অবদান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমশ ব্যাপ্তির সঙ্গে তাঁরাও সংশ্লিষ্ট। আমি বিশেষ করে বলব, নিজস্ব গায়কী ভঙ্গী এবং গাম্ভীর্য-মণ্ডিত ভরাট গলায় অনুপম স্বর নিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত দিনের পর দিন শ্রোতাদের ভীষণ আকর্ষণ করে চলেছে। হেমন্তবাবুর প্রতি অনুরাগ, অনেক শ্রোতাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে। যেহেতু হেমন্তবাবু আধুনিক গানেরও গায়ক এবং যাঁর প্রসার ব্যাপক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের মত জনপ্রিয় আধুনিক গানের শিল্পীরা যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন তখন তাঁদের অনুরাগীদের মধ্যে এই গানের প্রভাব পড়ছে। আধুনিক গানের অন্যান্য জনপ্রিয় শিল্পীরাও যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে এগিয়ে আসেন, তাহলে আরো বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতাকে তাঁরা আকর্ষণ করতে পারবেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি এবং ফলত রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিরাজ হয়ে থাকবে এবং বাংলা সংস্কৃতি বেঁচে থাকার ক্ষীণ প্রয়াস অন্ততঃ পাবে।

পরিশেষে শিল্পীদের প্রসঙ্গে একটা কথা বলব। অনেক শিল্পীর অভিমত সুরের আগুনের মাধ্যমে জানলাম এবং আমরাও জানি, কথা হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এবং মূলধন। সুরের প্রভাবে যদি কথা হারিয়ে যায়, তাহলে এই গানের বৈশিষ্ট্য রইল কোথায়? হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন নি এবং বিশ্বভারতীতে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর উৎকর্ষ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে গাইবার যে প্রচেষ্টা, বিশ্বভারতী ফেরৎ অনেক শিল্পীর পক্ষে তা শিক্ষণীয়।' কি গাব আমি কি শুনাব, আজি আনন্দধামে—এই গানটি আমি অনেকের গলায় শুনেছি। কিন্তু আমাকে বিশেষ ভাবাতে পারে নি। যা হোক যেদিন এই গানটি আমি হেমন্তবাবুর গলায় প্রথম শুনেলাম, সেদিনই এই গানটি আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে এবং গানের অন্ত-র্নিহিত ভাব এবং কথাকে ভাববার অবকাশ পেয়েছি। এখানেই হেমন্তবাবুর বৈশিষ্ট্য। তাঁর গানে সুরের প্রভাবে কথা হারিয়ে যায় না, যা অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। শিল্পীদের এ বিষয়ে ভাবা উচিত। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসুলভ নম্রতা, তাঁর প্রতি শ্রোতাদের শ্রদ্ধাবান করে তুলেছে। অনেক শিল্পীর মধ্যে অহং ভাবটা ফুটে উঠতে দেখা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী-দের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঐতিহ্যের মূল্যায়ন আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি?

'সুরের আগুন' ফিচারটি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠুক কামনা করি।

শুভেন্দু চক্রবর্তী
হাইলাকান্দি কাছাড় (আসাম)।

॥ ২ ॥

'অনাদি ঘোষ দস্তিদার মহাশয় বলে-ছিলেন যে শুধুমাত্র স্বরলিপি দেখে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া যায়; রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া যায় না। শ্রীঘোষের মত বিশেষজ্ঞদের কথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ধারণা করা যায়। সব শিল্পীই কিন্তু একই কথা বলেছেন বলছেন দেবব্রত বিশ্বাস হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পী। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বীকার করেছেন যে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র স্বরলিপি দেখে গান শেখান হয় না। তাহলে আসল দোষটা কোথায়? যে কারণে বিশ্বভারতী কোন কোন সময় কোনও শিল্পীর গান রবীন্দ্রনাথের ধারণার সামঞ্জস্যহীনতার সূত্র ধরে বাতিল করে দেয়। আমরা সাধারণ মানুষ, রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে বিশ্বভারতী যা করছে তাতে আমরা হতবাক। বিশ্বভারতী যে কি বলতে চাইছে, আর কি কারণ দেখাতে চাইছে কিছু স্পষ্টও নয় পরিষ্কারও নয়। কোন স্পষ্ট যুক্তিও নেই সেজন্য চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত কোন অকর্মণ্য দাম্ভিকের ক্ষমতা প্রদর্শনের হাতিয়ার হওয়া উচিত নয় যথার্থ। —কিন্তু বাস্তবে তো তাই ঘটছে। রবীন্দ্রনাথ গেল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেল ইত্যাদির রক্ষার নাম দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই প্রসারকে সীমিত করতে বিশ্বভারতী প্রশাসন ক্ষমতা প্রদর্শনের যে হাতিয়ার নিয়েছেন সেটা শুধু ভারত-বাসীরই লজ্জার কথা নয়, সারা বিশ্ব লজ্জায় মাথা নত করবে। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলবে 'হায় রবীন্দ্রনাথ! আজ তুমি যদি থাকতে!'

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডই দেখবে? আর কিছু নয়? বৈজয়ন্তীমালা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যে অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসদনে করলেন, রবীন্দ্রা-নুরাগী সুধিবৃন্দ নিশ্চয়ই মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'এ কোন চিত্রাঙ্গদা? রবীন্দ্র-নাথের আধুনিক চিত্রাঙ্গদা? একটা নয়, কয়েকটা অনুষ্ঠান। বিশ্বভারতী তখন কি করলেন? বিশ্বভারতী প্রশাসন নিজের রক্ষাকর্তা হয়ে বসে আছেন?

অমৃতানন্দ [illegible]
কলকাতা—৯।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৌদ্ধের পিতাও রাজা ছিলেন। বৌদ্ধের জন্মের প্রাক্কালে জ্যোতির্বেত্তারা শুনিয়া বলেন যে, তিনি গৌরবান্বিত হইবেন, হয় মহারাজা হইবেন, নচেৎ রাজসিংহাসনত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া সর্ব্বজ্ঞান লাভ করিবেন। তিনি যাহাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী না হন রাজা তাহাই চেষ্টা করেন ও তাঁহাকে বিলাস সম্ভোগী করিবার জন্য রম্য উদ্যানে স্থিত করেন, কিন্তু পরে তিনি মানব দুঃখ দর্শনে জীবনের অসারত্ব দেখিয়া রাজ্য ত্যাগ করেন ও বৌদ্ধ হন।

গল্পের সহিত আরো সাদৃশ্য এই উভয় জোসেফট ও বৌদ্ধ আপন আপন পিতাকে নব ধর্ম্মাবলম্বী করেন ও উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া মানবমণ্ডলীতে পূজ্য হন।...যেমন পেরেট নাম্নী গোপিনী ভারত-প্রজাত নীতি-কথা হইতে উৎপন্ন, তেমনি জোসেফেট বৌদ্ধ অবতারের প্রতিরূপ—খ্রীষ্টীয়ানদের মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করা উচিত। বুদ্ধদেবের মত এরূপ অকৃত্রিম স্বর্গীয় পুরুষ আর কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? প্রকৃত দয়ার সাগর সত্য-নিষ্ঠ শাক্যসিংহের ন্যায় অন্য কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়? মানব-জাতির উদ্ধার হেতু তাঁহার মত যৌবন-সুখ, রাজ্য-সুখ, সংসার-সুখকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিয়া 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' প্রচারের সন্ন্যাসাশ্রম আর কে গ্রহণ করিয়াছেন? কোন সাধুর চরিত্রে ও জীবনে এই রাজকুমার সন্ন্যাসী এবং সাধুর সহিত তুলনা হইতে পারে?

পুরাবৃত্তের এই উপন্যাসটি ভারতবাসীদের প্রকৃত গৌরবস্থল। প্রতি বৎসর ২৭শে নভেম্বর নবেনা উৎসবে এই ভারতক্ষেত্রে বেণ্ডেল প্রভৃতি গিরজা-প্রাসাদে স্থানে স্থানে যে শত শত দীপ চঞ্চল-শিখায় জ্বলিয়া থাকে তাহা ভারতের প্রদীপ্ত গৌরব-শিখা বলিয়া সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের স্বীকার করা উচিত বোধহয়।

•

জগতে অবিমিশ্র সুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখের সঙ্গে দুঃখ এবং দুঃখের সঙ্গে সুখ নিরন্তর মিশাইয়া আছে। দরিদ্রের কুটীরে ও রাজার অট্টালিকায় খুঁজিলে এই দুই-ই মিলিবে। তবে অবস্থাভেদে বেশী কম মাত্র। অনেকের সংস্কার আছে দারিদ্র্য-দুঃখে অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর বিষয় আর নাই। কিন্তু তাহা ভ্রম। চিন্তাশীলতা পরদুঃখানুভাবকতা সহিষ্ণুতা দয়া মমতা প্রভৃতি যে সকল গুণে মানব মন ও মানব হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে তাহা রাজার অট্টালিকা অপেক্ষা দরিদ্রের কুটীরেই অধিকতর বিকাশমান।

যে নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদ পাইয়াই সতত ব্যস্ত তাহার ভাবিবার অবকাশ কই; যে অভাব কাহাকে বলে কখনও অনুভব করে নাই সে পরের দুঃখে কাতর কিরূপে হইবে? মনে উদিত হইবামাত্র যাহার ইচ্ছা পূরণ হইয়াছে সহাগুণে তাহার পরিপুষ্টি হইবে কিরূপে? দয়ার শান্তিজলে যাহার হৃদয় কখন বিধৌত হয় নাই সে দয়া প্রকাশ করিতে জানিবে কিরূপে?

যে পাশ্চাত্যবাসীদের সুখ-দুঃখে বাহ্য-বস্তুর উপরে নির্ভর করে তাহারা কখনই প্রকৃত সুখী নহে। রাজসিংহাসনে বসিয়াও রাজমুকুট পরিয়াও তাহাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান। এই জনাই ভারতীয় নীতি বাহ্য-বস্তুতে অনাস্থা শিক্ষা দিয়াছিল।*

•

প্রকৃতির উপর জয়লাভ করাই প্রকৃত রাজত্ব। সে রাজত্ব রাজার অদৃষ্টে ঘটে না। কারণ রাজার অভাব অনন্ত। যে মহাত্মা অভাব সংকোচ করিয়া প্রকৃতির দাসত্ব হইতে উন্মুক্ত হইতে পারেন তিনিই প্রকৃত রাজা। ও রাজত্বের গৌরবে ভারতীয় আর্য্যোরাই বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। এই জন্যই আর্য্য তপস্বেরা সংসার ছাড়িয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে গিয়া যোগসাধনা করিতেন। তাঁহাদিগের আত্ম-সংযমে মুগ্ধ হইয়া অনেক নরপতি তাঁহা-দিগের চরণে লুণ্ঠিত হইতেন।...

অভাবের প্রসারবৃদ্ধিই বর্ত্তমান ইউ-রোপীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি। প্রাকৃতিক অভাব-মোচনের চেষ্টাতেই শিল্প-বিজ্ঞানের আবির্ভাব। বিজ্ঞানবলে মানব প্রকৃতির উপরে অন্য প্রকার প্রভুতা লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান মানবকে অনেক পরিমাণে ঐশী-শক্তিসম্পন্ন করে। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতির আধিপত্য সহিতে না পারিয়া ক্রোধে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ দমিত বা নির্ম্মূল করিয়াছিলেন আধুনিক ইউরোপীয়েরা প্রকৃতিকে দমিত না করিয়া তাহাকে আজ্ঞা-ধীন দাসী করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতিকে তাঁহাদিগের উন্নতিপথে কোন অভাব-কণ্টক রোপিত করিতে দিতেন না; আধুনিক ইউরোপীয় তাহাতে আপত্তি না করিয়া প্রকৃতি দ্বারাই সেই কণ্টক উত্তোলিত করিয়া লইতেছেন। দুই অবস্থাতেই সুখ আছে বটে, কিন্তু একে সুখ নিজায়ত্ত, অপরে সুখ প্রকৃতি-সাপেক্ষ। যে সুখ নিজ-সাপেক্ষ তাহাই অমূল্য; তাহাই অধিকতর প্রার্থনীয়। সে সুখে ধনীরা সাধারণতঃ বঞ্চিত।...

ভারতের সৌভাগ্য-দিনে পারলৌকিক সন্ন্যাসীগণের প্রোজ্জ্বল চরিত্রগৌরবে ভারত উদ্ভাসিত হইয়াছিল; তাহাদিগের আত্ম ত্যাগের মোহিনী শক্তিবলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ আত্মস্বার্থ জাতীয়স্বার্থে বলি দিতে শিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তখনকার রাজাগণের অনেকেই এই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদিগের প্রেম সর্ব্বজীবে পরিব্যাপ্ত ছিল। সিংহ ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুরাও সেই প্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত। তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমের মোহিনী শক্তিবলে তাহারা আপন আপন হিংস্র প্রকৃতি ভুলিয়া যাইত। ঋষিগণের আশ্রমে ব্যাঘ্র হরিণে ও ভেক সর্পে একত্র জলপান করিত। এ গল্প নয়, কবি কল্পনা নয়, প্রকৃত ইতিহাস।

চরিত্র-গৌরবে নৈতিক শক্তিতে ও আত্ম-ত্যাগের মোহিনী শক্তিবলে জগতকে যে করতলগত করা যাইতে পারে এ প্রত্যয় বিশ্বাস ও নিদর্শন একমাত্র ভারতেই প্রত্যক্ষীভূত হতে দেখা যায়। প্রতীচ্যে এ ধরনের অনুভব বোধ ও জ্ঞানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠের কথায় রামচন্দ্র প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সীতাকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বিশ্বামিত্র রাজসিংহাসন ও রাজকীয় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী প্রেমময়ী ভার্য্যা ও শশাঙ্কপ্রতিম পুত্রের দিকে না তাকাইয়া জগতের দুঃখ মোচনার্থ শাক্যসিংহের রাজসিংহাসন পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে ভারত ব্যতীত অন্যত্র বিরল। সে কারণ ভারতের নীতি গৌরব উচ্চাদর্শের কাহিনী ও তার প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ করে আমাদের গর্ব্ববোধ করা কিছু অযৌক্তিক নয়।

* অনাস্থা বাহ্যবস্তুষু—'কুমারসম্ভব'

রূপদক্ষ

অলীক শব্দের ভিতর

বিমান চট্টোপাধ্যায়

—জ্ঞান ফিরেছে আজ?

—হ্যাঁ, কাল ব্রেন অপারেশন হবে।

—স্পষ্ট কাউকে চিনতে পারছে?

—না।

—কিভাবে হল? ক্রেনের চেন ছিঁড়ে?

—হ্যাঁ।

দোতলা কোয়ার্টারের ছাদ থেকে অসময়ে হঠাৎ এইসব করুণ কথাবার্তা কানে এলো। অসময় বলছি কারণ, উপেনবাবু তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় বোতলের প্রথম রাউন্ড আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন, আমরা, এটা জানা ... কড়া জাতের। আগেরটাই পেতাম্বী যদিও।

দুঃখের কথাবার্তাগুলো গড়িয়েই যাচ্ছিল।

...অপারেশন না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার কোনো ভরসা দিচ্ছে না...ওর স্ত্রী খুব কান্নাকাটি করছে...ঠিকই তো...।

পাশের বাড়ীর আকাশের লোকটা মাটির লোকটাকে বলছিল তার উঁচু করা হাত নাড়িয়ে, যেখান থেকে ফুলের টবে জল ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। যেন ঠাণ্ডা জল গাছের শিকড় ছুঁয়ে, লম্বা দেওয়াল বেয়ে নীচের লোকটাকে ... ছোঁবে। নিভিয়ে দেবে ওর দুঃখ-টুঃখের আঁচ।

উপেনবাবু ভুরু নাচিয়ে বললেন, কেমন বুঝছেন?

আমি তেহাই দিয়ে বললাম, আরও স্ট্রং।

উপেনবাবু খুশী হয়ে হাসলেন।

নাছোড়বান্দা মাছির মত কথাবার্তাগুলো বারবার উড়ে এসে বসছিল আমাদের মেজাজের ওপর। বিয়েলী ভাইর ব্যাপার, এতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে...আর্নিং মেমবার বলতে তো ও একলাই...কাল যাব হসপিটাল।

উপেনবাবু বললেন,—ওৎ পেতে না থাকলে এসব জিনিস পাওয়া যায় না।

একেবারে দু চুমুকে মগজে মহল বানিয়ে দেব। বুঝলেন কিনা।

সবকিছু শুনে এবং বলে, নীচের লোকটা ওপরে উঠে গেলে এবং ওপরের লোকটা নীচে নেমে এলে, উপেনবাবু জদাগোলা রক্তে চোবানো দাঁতগুলো মেলে খোক খোক করে হাসতে লাগলেন।

আমরা বসেছিলাম উপেনবাবুর কোয়ার্টারের দোতলার ব্যালকনিতে। আমাকে পেলে জায়গাটা ও'র খুব পছন্দ। বলেন, বছর দুয়েক আগে উনিই নাকি আমাকে আবিষ্কার করেন, আপনি লেখক? বলেই, আশ্চর্যের ভঙ্গী করেছিলেন।

কোলকাতা থেকে অফিসের কাজে মাঝে মাঝে আমায় এখানে আসতে হয়। সেই মাধ্যমেই আলাপ। এবং এখানে এলেই উপেনবাবু পাকড়াও করেন, থাকুন থাকুন, আজ রাতটা থেকে যান। সুখ-দুঃখের ব্যাপার-ট্যাপার নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। —বুঝলেন কিনা, এই রট ইনডাসট্রিয়াল লাইফ। সত্যি বলছি, হেল হয়ে গেলাম।

চুমুকগুলো ঠিকমত চালাতে থাকলেও এই ভর সন্ধেয়, ওপর নীচের বয়ে-যাওয়া কথাবার্তাগুলোয় আমার একটু খারাপই লাগছিল। একটা সংসারী লোককে নিয়ে যমে-ডক্তারের এই টাগ-অব-ওয়ারটা আমাদের সান্ধ্যবৈঠকটাকে একটু ধাক্কাই দিয়েছে। সত্যিই এতবড় বিপদ, একই শপে উপেনবাবুর সঙ্গে কাজ করে, একই জায়গায় থাকে। অথচ, দুঃখের সুতো ছাড়ার ব্যাপারে উপেনবাবু কেন যে এমন কৃপণ।

এসব ভাবনা পেটের তরল আগুনে ঠিকমতো থিতোবার আগেই ঘনিষ্ঠতার মাপকাঠি হিসেবে কথাটা বলেই ফেললাম, কি মশাই, অচ্ছা দরদছাড়া লোক তো আপনি? শুনলেন, আপনার রিপিভারের সিরিয়াস অবস্থা।

উপেনবাবু আবার সেই খোক খোক হাসি মটকিয়ে বললেন, মশাই, আমরা হচ্ছি স্টীল-প্ল্যান্টের টেমপার-করা হৃদি। দুঃখ-টুঃখ এমনিই একটু কম।

তারপর একটু থেমে, দুঃখ করবেন না। কাল সারারাত ওর কেবিনে ছিলাম। নিজের রক্তও দিয়েছি। কারণ এখন আর লোকটার মৃত্যুতে কারুর কোনো লাভ নেই। আমি চাই ও বেঁচেই থাক। আর ওই যে পাঞ্জাবি-পরা মোটামত লোকটা? সবকিছু শুনে কুমড়ো হাতে থপথপ হেঁটে গেল? আমি চাই ও জীবিতও বেঁচে থাক। দুই ছেলে-মেয়ে আর রুগ্না-বউ নিয়ে ও ব্যতিব্যস্ত। এবং আমি জানি, ও চায় আমিও বেঁচে-বর্তে থাকি।

বলে, উপেনবাবু আবার খোক খোক করে বিচিত্র ভঙ্গীতে হাসতে লাগলো। কি ভাবছেন? নেশা জমে গেছে? মোটেই না।

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে, যেন এক-মুখ 'গাম্ভীর্যতা' খেয়ে ফেলেছেন এমন ভঙ্গীতে বললেন, ওই যে স্টীল প্ল্যান্টটা দেখছেন?

ছ' মাইল দূরে কালো অস্পষ্ট চিমনি আর ব্লাস্ট ফার্নেসের খাঁজে লাল বাতিকে বিঁধে আমার দৃষ্টি লম্বা হলে, মাঝখানে আটকে গেল টাউন শপের সীমানা ছাড়া কিছু লক্ষজ্বলা গ্রাম, তার শেষে শালের নিশ্চুপ জঙ্গল, আর তাকে ছুঁয়ে ঝাঁ-ঝাঁ জিটি রোড। উপেনবাবুর কারখানা ওটা।

বললাম, হ্যাঁ, কি হয়েছে?

ওটা তখনও পুরোপুরি চালু হয়নি। সবে ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে রোলিং মিল পর্যন্ত গড়িয়েছে। বলে, উপেনবাবু তলানিটুকু এক চুমুকে শেষ করে মাথা ঝুলিয়ে একটু বসে রইলেন। যেন মাথা থেকে চুঁইয়ে বুকে কোনো বিশেষ অনুভূতি না নামা পর্যন্ত কথাটা বলা যাচ্ছে না।

বললাম, আপনি ও কথা বললেন কেন?

—কি কথা?

—ও চায় এখন আপনি বেঁচেবর্তে থাকুন। মানুষটা দুঃখ পাক খুব হয়ত ওর শয়তানি ছিল বলতে পারেন, কিন্তু বেঁচে থাক তো চাইবেই? সবাই চায়।

উপেনবাবু এবার অন্য এক ধরনের হাসি হাসলেন। যেন হাসিটায় ঠাসা অনেক অজানা কথা আছে।

বললাম, হাসছেন কেন?

উপেনবাবু বললেন, আচ্ছা, পাপ-সংঘটিত করা আর পাপ-সংঘটিত করার মানসিকতায় মন-শরীরকে ভরিয়ে ফেলার মধ্যে তফাত কতটুকু বলতে পারেন?

—খুব বেশী নয়। শুধু করাটুকুর অপেক্ষা। কিন্তু তাতে কি?

উপেনবাবু এবার গা ঝাড়া দিয়ে বললেন, যাক, ওসব ছাড়ুন। প্ল্যান্টের একটা গল্প বলি শুনুন। সাহিত্যের মাল-মশলা পেয়ে যেতে পারেন।

বললাম, দূর মশাই, জিনিসটা ভালই। আপনাকে পেঁচিয়ে ধরেছে মনে হচ্ছে।

উপেনবাবু কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল, শুনুন—শুনুন—।

—বলুন।

বছর দশেক আগে কারখানাটা তখন হু-হু করে এগোচ্ছে।—

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। উপেনবাবু বলে চললেন—

কনট্রাকটরদের এক একটা সইতে রাতারাতি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে শালের একশ বছরের ঘন জঙ্গল। ক্যাটারপিলার চলছে, বিশাল স্ট্রাকচারের মাথায় শেড উঠছে, মেশিন বসছে। মানুষগুলোর তখন কি উৎসাহ আর তেজ। জঙ্গল ফেঁসে বাঘ বেরিয়ে পড়লে তালি মেরে বাঘ তাড়াচ্ছে লোকগুলো। তখনও এত কোয়ার্টার আর জলের ট্যাঙ্ক হয়নি।

এই পর্যন্ত শুনেই, আমার মনের মধ্যে 'শিল্পনগরীর একাল-সেকাল' জাতীয় একটা ছবি তৈরী হয়ে গেল। এখন উত্তাল দামোদর আর জিটি রোডের মাঝের ধু-ধু প্রান্তরটা আর নেই। সেটা জুড়ে অসংখ্য শেড-চিমনি ও মেশিনের ছড়াছড়ি। অন্যদিকে ছবির মত সাজান রাস্তাঘাট, আর বাগানওয়ালা কোয়ার্টারগুলোয় আধবয়সী মানুষের সংসারী মুখ। কোম্পানীর ফাঁকা রাস্তায় কোম্পানীরই বাস চলছে, লোক হাঁটছে।

উপেনবাবু বলে চললেন : আর বুঝলেন কি না, তখন বিদেশ যাওয়া? এখন তখন ব্যাপার। কার কপালে যে কখন জুটে যাবে ঠিক নেই। কোনো কোনো মেশিনের কাজে অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি জায়গা থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে হচ্ছে। কোনো কোনোটা শুধু জাপান।

জোয়ান ব্যাচেলর ছেলেগুলোর তখন দু চোখ ভরে শুধু সাগরপাড়ির স্বপ্ন। গোপনে নিজের ট্রেডের ওপর খোঁজ নেওয়া। এ ব্যাপারে সিক্রেসী রাখতে কোম্পানীর মুঠো খুব কড়া ছিল। শুধু সময়মত দড়াম করে চিঠি ছেড়ে বিস্ফোরণ ঘটাত। মাঝে মাঝে এর ফল হয়ে উঠত খুবই দুঃখপূর্ণ। যেমন ধরুন, জনা দু-তিন ছেলে। একই মেশিনের জন্যে তিন সিফট-এর রিক্রুট হয়েছে। কিন্তু বিদেশে যাবে মাত্র একজন। কে যাবে—কে যাবে সাসপেন্স!

হঠাৎ একদিন একজনের ডাক এল লটারীর মত অপ্রত্যাশিতভাবে। সাতদিনের মধ্যেই স্যুটে-টাই পরে দমদম ছেড়ে উড়ে। বাকি দুজন হয়ত খুব সেন্টিমেন্টাল, মাঝ রাত্তিরে বালিশে মুখ গুঁজে শুধু ফুঁপিয়ে চলল—ক্ষয়ে গেল।

উপেনবাবু ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে যেন টেলিভিশনে কিছু দেখছেন ভঙ্গীতে আমার দিকে চাইলেন। শক্ত চোয়াল, এবার শক্ত কিছু বলবে।

কিন্তু যারা সেন্টিমেন্টাল নয়? লড়ে নিতে চায়? যেমন ধরুন সত্য, বীরেন, অনিমেষ। ওরা তিনজনেই জানত, কেউ একজন ওদের মধ্যে সেই স্বপ্নরাজ্যে পাড়ি দেবে। কারণ সেই একমাত্র কানাঘুষো খবর পেয়েছিল। অন্তহীন ভাব ছিল তিনজনের। কারণ মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হলে মানুষকেই ভরসা করে। বুকে বুকে বেড়ে যায় তখন ভাব।

রাউরকেল্লায় বছর দুয়েকের ট্রেনিং-এ গিয়েছিল তিনজনেই।

তিনজনের বুকে বুকে বাঁধা আশার দড়িটা আরও শক্ত হয়েছে। নিজের কোম্পানীতে ফিরে এসেও ওরা ষড়-দিন কোয়ার্টার পায়নি একই কোয়ার্টারে থাকত। দাবা খেলত, তাস খেলত। মেসে খেত। বীরেনের বাবার অসুখে সাত চিন্তিত হল না অনিমেষের টাকা ধারালে বীরেন টেনে নিয়ে যেত ওর দায়িত্ব।

সেই কোয়ার্টার। বলে একটু দূরে ইউক্যালিপটাস গাছের আড়ালে নীলবাতি-জ্বলা একটা কোয়ার্টার দেখাল উপেনবাবু।

এতক্ষণ আমি ফাঁকি দিয়ে পাশাপাশি দুটো চিন্তাকেই সেয়ানা লোকের মত টেনে আনছিলাম। উপেনবাবুর কথাও শুনছিলাম আবার অ্যাকসিডেন্ট হওয়া লোকটা সম্বন্ধে টুকরো টুকরো কথাগুলোকেও জোড়া দিয়ে একটা জীবনী খাড়া করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। এবং তাতে ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছিল, তা অনেকটা এইরকম : হতভাগ্য মানুষটা উপেনবাবুরই শপে কাজ করে, অ্যাসিসট্যান্ট ফোরম্যান জাতীয় পোস্ট, তিনটি শিশু সন্তানের 'বাবা' ডাক শুনতে হয় রোজ, বৃদ্ধা মা নানান ব্যাধিতে সংসার কাঁপিয়ে পৃথিবীর চৌকাঠের দিকে ক্রমশই, কোলকাতায়ও বিধবা বোন বা অন্য কাউকে অর্থকরী সাহায্যের সুতোয় বেঁধে রেখেছেন। দিন তিনেক আগে চল্লিশ টন ওভার-হেড ক্রেনের চেন স্লিপ করে ওঁর ওপর ছিটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে, দাঁত ও হাত ভেঙে যায়। ব্রেনে ইনটারনাল হ্যামারেজ ও তিনদিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে টানাপোড়েন চলছে। কাল অপারেশন হবে। নামটা বোধহয় ধীরেনবাবু বা ওইরকম আর কিছু।

উপেনবাবু কোয়ার্টারটা দেখাতে, এবার মনের মধ্যে ধীরেনবাবুর প্রবেশের জানলাটা বন্ধ করে দিলাম

ওই কোয়ার্টারটায় ওরা তিনজন থাকত। নীরেনবাবু থাকত পাশেরটায়। নীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়।

চোখের কুয়াশা কাটিয়ে আমি পাশের কোয়ার্টারটাকে লক্ষ্য করতে গেলে, উপেনবাবু বলল, উঁহু, এখন থাকে না। এখন উনি বোকারো স্টীলে চলে গেছেন। দিলদার এবং ভারী হল্লোড়বাজ লোক ছিলেন।

উনি সিনিয়র অফিসার ব্যাচে, সবে তখন কানাডা থেকে ফিরেছেন। ফাঁক পেলেই পালিয়ে আসতেন থ্রি-মাসকেটিয়ার্সদের আড্ডায়: দারুণ পাগলা লোক। সত্য, বীরেন, অনিমেষদের কাউকে পেয়ে গেলেই হল—সাজাও, সাজাও ঘুঁটি সাজাও।

মাঝে মাঝে অনিমেষরা বলত, নীরেনদা, আজ নয়। আজ কানাডার গল্প বলুন। নীরেনবাবু হেসে বলত, হ্যাঁ, তা তো বটেই। তোমাদের তো আবার সোকিং পিট থেকে একজনকে যেতে হবে। ভাল করে শুনে টুনে নাও।

কথাটা শোনামাত্র থ্রি-মাসকেটিয়ার্সদের তিনজনে তিনজনের দিকে তাকাত। কেউ কথা বলত না রসিকতা করত না। যেন তোমাদের তো একজনকে আবার যেতে হবে কথাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে বাউন্ডারী লাইনের বাইরে। প্রকাশ্য দিবালোকে সেই বুকে বুকে উত্তাপ দাঁড়াত হঠাৎ ... এমন কি ... কপালে জোটে দাদা? তাতে হয়ত কেউ হাসত কি হাসত না।

নীরেনবাবু যেন স্বর্গের সিঁড়ির কথা বলতেন—বুঝলে, প্যারিসে আইফেল টাওয়ারের অত ওপরে বার দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। কি প্যানোরমিক ভিউ! কি রাস্তাঘাট! মানুষগুলোর লাইফে যেন প্রবলেম নেই কোনো। স্পিডি লাইফ—বল্গা ছাড়া হয়ে শুধু ছুটছে। এক ফুর্তি থেকে আর এক ফুর্তিতে। মেয়েরা স্কাইডিভিং-এ পাল্লা দিয়ে জিতে যাচ্ছে। একই রাস্তায় তিন সারিতে গাড়ী চলে। একশ', নব্বই আর মিনিমাম স্পীড আশি মাইল।

আর চুমু খাওয়া? রাস্তায় ঘাটে হরদম। হাসাবার জন্যে বলতেন, উইলো'র জঙ্গলে, বরফের ওপর অ্যানি বলে একটি যুবতী মেয়ের হাত ধরে ছুটতে গিয়ে একবার কেমন জব্বর আছাড় খেয়েছিলেন। মেয়েটি নীরেনবাবুকে তুলে হঠাৎ একটা চুমু খেয়েছিল। নীরেনবাবু গরম না হয়ে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। কাশি আর তোতলামি বেড়ে গিয়েছিল।

এইরকম একদিন পিচবোর্ডের ময়দানে দু পক্ষই লড়াই থামিয়ে একটু গল্পগুজব করছে হঠাৎ দরজায় টোকা! অনিমেষ উঠে দরজা খুলে দিতেই নারীকণ্ঠের 'জামাইবাবু আছেন?' জিজ্ঞাসা। মেয়েটি নীরেনবাবুকে সাবলীল বকতে লাগল, 'বেশ আক্কেল বাব্বা আপনার! বারটা বাজে, দিদি ভাত নিয়ে বসে আছে।

নীরেনবাবু প্রাণ-মাতানো হাসিতে বললেন, বারটা কার বাজে? তোমার না আমার?

তারপর আলাপ করিয়ে বললেন, আমার শ্যালিকা রিতা। আমার গিন্নিরও বস। কাল এসেছে।

থ্রি-মাসকেটিয়ার্সদের পরিচয় দিলেন, ছোটভাই খেলুড়েরা সব।

এই পর্যন্ত বলে উপেনবাবু চুপ করলেন। ব্যালকনির চৌকো, অন্ধকারে উপেনবাবুর চোখ দুটো ডুবে গিয়েছিল। রাত এগোচ্ছে। আশপাশের শব্দগুলো কমে আসছে। দূর থেকে প্ল্যান্টের গ্যাসপাইপ আর সান্টিং-এর শব্দ ছিটকে আসছে। শেয়ালের ডাক উঠল কোথাও।

বললাম, তারপর?

আপনি সাহিত্যিক। তিনজোড়া জোয়ান চাহনির মধ্যে তারপরে রিতা কি করে একটা লাল বলে পালটে গেল নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না?

প্রথম প্রথম দুঁদে খেলোয়াড়ের মতই 'স্পোর্টিং স্পিরিট' বলে, একটা আইনকে আলগাভাবে মানত তিনজনেই। আর খুব বেশী করে মানত রিতা নিজে। তিনজোড়া চোখের প্রত্যেকটাতে চোখ রেখেই হাসিতে কোনো কার্পণ্য করত না। সাতদিনের মধ্যে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর চৌকাঠ মুছে গেলে, রিতা যেন এক চলন্ত ফুল।

তারপর এই শব্দটা 'স্পোর্টিং স্পিরিট' ক্রমশই অস্পষ্ট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল। আর খেলাটা হয়ে উঠল তখন—প্লে টু ডেথ। অর্থাৎ প্লে টু ডেথ অব রিতাজ ভার্জিনিটি।

অথচ আশ্চর্য মেয়ে এই রিতা! মোমের মত নিখুঁত চিবুক অনিমেষের বুকের কাছে ধরে, পরে থাকা অনিমেষের পাঞ্জাবিতে এই বোতাম লাগাচ্ছে তো সুডোল হাত দুটো দিয়ে সত্যর রুমালে ফুল তুলে দিচ্ছে। নয়ত বীরেনের কাছ থেকে আব্দারাধ হাসা-

হাসিতে গোলাপ ফুল কেড়ে নিচ্ছে। খুব সুন্দর দেখতে ছিল রিতাকে। ইচ্ছে করলে কথাবার্তাও খুব সার্প বলতে পারত। রিতার নির্যাসের সমান ভাগ পেয়ে তিনজনেই কেমন গুলিয়ে ফেলত। মাঝে মাঝে রিতা কোলকাতায় চলে গেলেও নোঙর ফেলা ছিল এখানে। কারণ প্রাইভেট এম-এ দেবার চেষ্টা করছিল ও তখন। ইতোমধ্যে থ্রি-মাসকেটিয়ার্সদের মধ্যে এক ধরনের খেলা সুরু হয়ে গিয়েছিল।

শুধালাম,—কি রকম?

উপেনবাবু একটু থেমে যেন সামান্য গুছিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—কি রকম? এই যেমন ধরুন, অনিমেষ একদিন ড্রিংক করে এল, রিতা কিভাবে যেন জেনে গিয়েছিল তা। অথবা, সত্যর পিঠে অমূলক বা মূলক একটা সাদা দাগ ফুটে উঠলে, রিতার কাছে সে খবর অন্যভাবে পৌঁছত। কিংবা বীরেনের দাদু মারা যান ক্যানসারে, বাবাও তাতেই ভুগছেন, বীরেনের স্বাস্থ্য-শরীর অবশ্য বাইরে থেকে খারাপ নয়। তবুও—ইত্যাদি খবর পেয়ে যেত রিতা।

আর ভয়ংকর আশ্চর্য করে, এক তুখোড় চালাক মেয়ে নয়ত ভীষণ সরল নাবালিকার মত হৈ-চৈ করে এসব কথা বলে ফেলত রিতা: সত্যদা, আপনি একবার ডাক্তারকে দেখান, নয়ত, বীরেনদা, ক্যানসারটা কি হেরিডিটিক্যাল? শুনে প্রত্যেকেই একসাথে রাগে ফেটে পড়তে গিয়েও কোথায় যেন বিশ্রী দুর্বল হয়ে পড়ত। মনে মনে হিসেব করত কি ঘটছে এবং কেন?

খাবার টেবিলে বা রাত্রিরে ঘুম না এলে পাশাপাশি খাটে শুয়ে ওরা আর আগের মত খুঁটিনাটি নিয়ে গল্প বা ইয়ার্কি-ঠাট্টা করত না। এমন কি রিতাকে নিয়ে এতোদিন পর্যন্ত যে রসিকতাটা হত সেটাও বন্ধ। কিন্তু বাইরের লোকজন নীরেনবাবু বা রিতা এদের ওয়াগানের আংটার মত জোড়া হয়ে যেত তিনটে অস্তিত্ব।

ফরসা রং, টিকলো নাক, ছিপছিপে চেহারার অনিমেষ সব কিছুর মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে কেমন উদাসীন। আর তাই হয়ত ওর সম্বন্ধে রিতা হয়ে পড়ত একটু বেশীই মনোযোগী। বলত অনিমেষদা সোয়েটার না নিয়েই প্ল্যান্টে চলে গেছ তুমি ঠান্ডা লেগেছে। অথবা আর কিছু।

সত্য ছিল কালো একটু গোলগাল পয়সা জমাতে ভালবাসত আর খুঁতখুঁতে। বীরেন শ্যামলা রঙের বেশ লম্বা বুদ্ধিদীপ্ত মুখ চোখ আক্রমণ করে কথা বলতে ভালবাসে এবং অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

উপেনবাবু মাঝে মাঝে থামছিলেন। হয়ত অনেক দিনের পুরোনো বন্ধুর স্মৃতি মগজের কন্দর থেকে সাবধানে তুলে আনছিলেন মনের পর্দায়। কিম্বা নেশাটা হয়ত একটু জমে উঠেছে। কিন্তু তাই বা বলি কি করে। উপেনবাবু তো গল্পটা বলতে গিয়ে ক্রমশই সিরিয়াস হচ্ছেন। নেশা করেছেন বোঝাই যাচ্ছে না।

অবশ্য ছত্রিশ বছরের উপেনবাবুর রসবোধটা বরাবরই বেশ প্রখর, গুছিয়ে বলতে পারেন বেশ।

আমি বললাম থামলেন কেন? তারপর বলুন? চতুর্ভুজীয় প্রেমের সবে তো মুসাবিদা হল এটা।

উপেনবাবু হাসলেন না আলগা হলেন না। বললেন, একজ্যাকটলি সো। তারপর ইজিচেয়ারে আন-ইজি মনে আবার সুরু করলেন।

আপনি তো দার্শনিক। আপনিই বলুন না যেখানে নারী তার সুষমাকে এমন ইকোয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে অথচ শেষ পর্যন্ত তিনজনের মাত্র একজনকেই তাকে ভাল ছেঁড়া করে নিতে হবে যেখানে কানাডা ফেরতের ওপরই যে তার শেষ জায়ামাটা ছেড়ে দেবে এটাই স্বাভাবিক কি না? এবং থ্রি-মাসকেটিয়াস ও তাই-ই জানত।

বললাম সেকথা বলা মুশকিল। নারী চরিত্র ভগবানেও জানে না।

উপেনবাবু বললেন সত্যই তাই। রিতা তিনজনের সবাইকেই বলত তোমাদের মধ্যে যে-ই কানাডা যাও না কেন আমার একটা [illegible] রেকর্ড [illegible] কিনে [illegible] [illegible] [illegible] আমার ভীষণ [illegible] [illegible]।

অনিমেষ বলত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনো [illegible] নেই।

সত্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনো [illegible] নেই।

বীরেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অথচ সবসময়েই তীক্ষ্ণ [illegible] [illegible] থাকত সব সময়। যেন মুহূর্তের অসাবধানে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে। ব্যালান্সের খেলায় সবাই সাবধানে হেঁটে চলছিল সময়ের ওপর দিয়ে। কেউ যেন না পা শিলপ করে। এই সময় হঠাৎ একদিন তিনজনকেই পার্সোনাল সেকসনে ডেকে পাঠান হল। যদি তোমাদের কোম্পানী ট্রেনিং-এর জন্য বিদেশ পাঠায়, যেতে আপত্তি আছে কিনা? যদি না থাকে একটা সই করে রাখ।

বাস্! এর পর থেকেই গল্প ঘুরে গেল।

তিনটে যুবক মনের অণু-পরমাণুতে কি যে ভাঙচুর হল নতুন আকার নিল, যাতে তাদের বাইরের চেহারার এতটুকু অদলবদল হল না।

একদিনের কথা। তিনজনেই তখন একই সিফটে ডিউটি করছে। ভয়ংকর একটা আগুনের খাদের মত ফার্নেস জ্বলছে ওপরে। তার আন্ডার-গ্রাউন্ডে অদ্ভুত সব শব্দ করে ব্লোয়ার চলছে মটর ঘুরছে। নীচে গ্যাস পাইপ ও মাথার ওপর বিশাল ক্রেনের গড়িয়ে যাবার ঘড় ঘড় শব্দে পাশের লোকের কথা শোনা যায় না। আন্ডার-গ্রাউন্ডে একটা চিমে বাল্বজ্বলা গলির মত জায়গা সেখানে থার্মোকাপল্-এর কিছু কাজ ছিল।

বীরেন অনিমেষকে বলল, চল একটু থার্মোকাপলটা সেট করে আসি।

অন্ধকার জায়গাটায় তখন কি একটা ইলেকট্রিক্যাল কাজ চলছিল। হাই ভোল্টেজ নেকেড তার ঝুলছিল ওপর থেকে আর যন্ত্রপাতি মেঝেতে ছড়ানো। বিশেষ কারণে নেকেড তারটায় তখন কারেন্ট ছিল ৪৪০ ভল্টেজ। সাংঘাতিক বিপদজনক অবস্থায় মাথার ওপর ঝুলছিল সেটা। সামনে মড়ার খুলি আঁকা ডেঞ্জার [illegible] অন টাঙাও ঝোলানো ছিল। তারে [illegible] ঠেকলে মাত্র দশ সেকেন্ডেই পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে!

বীরেন ও অনিমেষ কথা বলতে বলতে সে জায়গাটায় এসে পৌঁছাল। তারপর তারের ছ' ইঞ্চি আগে যখন অনিমেষের কপালটা—আর একটু এগোলে, সঙ্গে সঙ্গে লাইফের সর্ট-সার্কিটে মুহূর্তে নিভে যাবে ওর চোখের আলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ওখানকার কাজ করা লোকটা তীব্র ধাক্কায় পাশে ঠেলে দিল অনিমেষকে। অনিমেষ মেঝেতে ছিটকে পড়ল। মৃত্যুর কালো থাবা এক মুহূর্তের জন্যে বেঁচে গেল।

লোকটা চিৎকার করে উঠল, ডেঞ্জার টাঙাটা কি চোখে দেখনি রাসকেল? অনিমেষ দারুণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কিন্তু মনে হল, ও আর বীরেন তো পায়ে পায়েই হেঁটে আসছিল। ওই জায়গাটার এসে অন্যমনস্কভাবেই যেন বীরেন হাত [illegible] সরে গিয়েছিল ওর কাছ থেকে। [illegible] অনিমেষের এই [illegible] বীরেনের দারুণ [illegible] খুব একটা অকৃত্রিম মনে হচ্ছিল না কেন।

মাত্র এক মিনিটেই সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে গেল।

অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে উপেনবাবুর চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা, টানা নিশ্বাস পড়ছে। বোধহয় আমিও উত্তেজিত। তাই ঘন ঘন বলছি তারপর—তারপর?

উপেনবাবু বোধহয় চোয়াল চেপে শক্ত কিছু চিবোচ্ছে। — তারপর? আরও আছে, শুনতে চান? পৃথিবীর সমস্ত কারখানাতেই হাঁটাচলায় একটা বিশেষ ভাষা আছে। সেগুলো সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার।

যেমন ধরুন, আপনি আমি শপফ্লোর ধরে হেঁটে যাচ্ছি। মাথার ওপর বিশাল ইস্পাতপিণ্ড বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্রেনগুলো। নিরাপত্তার আইনে নিয়ম তার নীচে না যাওয়া। কারণ অনেক সময় কর্মীদের অক্ষমতাতেই হোক বা দ্রুততার জন্যেই হোক চেনবাঁধাটা ঠিকমত নাও হতে পারে। গতির একটু এদিক-ওদিক হলেই খুলে নীচে পড়তে পারে ঝোলান জিনিসটা। ফলে একতাল রক্ত-মাংসও তখন কারখানার আর এক প্রোডাকট হয়ে দাঁড়ায়।

যন্ত্রপাতির মানুষগুলো কিন্তু অদ্ভুতভাবে অভ্যস্ত এই ঝুলন্ত চেনের নীচ থেকে সরে যেতে অথবা অপরকে সরিয়ে নিতে। কারণ অন্যের হয়ত কোন কারণে মন খারাপ বা অন্যমনস্ক থাকতেই পারেন। এই অভ্যাসটা এত বেশী যে, সে চেতন মনে ক্রেনের নীচে এসে পড়লেও সিকস্থ সেন্স-এর 'এক তীব্র গতি তাকে সরিয়ে নেবে কিম্বা অপরকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করবে। করবেই।

কিন্তু সত্যর তা হয় নি। 'বাবার অসুখ ভীষণ বেড়েছে' চিঠি পেয়ে বীরেন সেদিন ছিল দারুণ অন্যমনস্ক আর চিন্তিত। ফল হিসেবে বিপজ্জনকভাবে ঝুলন্ত একটা বিলেটের নীচে এসেও ওর সিকস্থ সেন্স কাজ করল না। বিশাল বিশাল গার্ডের একটা কোণায় কোন রকমে চেনটা লেগেছিল একটু জার্ক লাগলেই খুলে পড়বে। পড়বে বীরেনের কানাডার স্বপ্ন তৈরী করা মাথায়।

ঠিক এই সময়ই সত্য বীরেনকে এলার্ট করতে ভুলে গিয়ে জুতোর ফিতেটাকে নতুন করে বাঁধতে বসে পড়ল। শুধু এক অনিমেষের হুঁশিয়ারীতেই মাত্র বীরেন ছিটকে সরে এল। তার পঞ্চাশ সেকেন্ড বাদেই গন্ধমাদন পর্বতের মত বিশাল বিলেটটা ফ্লোর কাঁপিয়ে খুলে পড়ল।

আমি আঁতকে উঠলাম। কি সাংঘাতিক!

উপেনবাবু বানানো হাসি হাসলেন।

কি হল! ভয় পেলেন? মাটি কাঁপল কিন্তু কেউ ফিরেও তাকাল না। যদি এই অ্যাকসিডেন্টগুলো ঘটতই কিম্বা লোক মরতই, তো কি? কারখানার কামড়ে মরা—শেডের মাথায় কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে দশ মিনিটের দুঃখ নামত সারা কারখানায়। তারপর আবার যে কে সেই। মানুষও মেশিন।

অথচ সেদিন রাতেই তারা একই বিছানায় অন্তরঙ্গ হয়ে বসে আলোচনা করেছে...কুকটা খুব চুরি করছে...জাড়িয়ে অন্য একজন কিভাবে...ইত্যাদি। তার একটু পরেই নীরেনবাবু আসত। কানাডার গল্প বলত। বলত—কনটিনেন্টাল ট্যুর দেবার সময় বুঝবে, তোমরা রোমে অবশ্যই নামবে।...খটখটে রোদে সকালবেলায় এই প্লেনে চাপবে? কয়েক ঘণ্টা পরেই সন্ধ্যে, স্যুট টাই-পরা অজস্র সাদা চামড়া, অন্য ভাষা, অন্য রীতি। ইউনিভার্সের সোলার সিস্টেমটা যে কি বিস্ময়কর একমাত্র তখনই বুঝলাম। আর শোনো, তোমরা যদি নাইট ক্লাব ফলিবার্জের-এ যাও তো বেশী করে জামা-কাপড় পরে যেও। কেননা ছোট ছেলে তো সব—?

বলে নীরেনবাবু নিজের রসিকতায় নিজেই প্রাণ খোলা হাসি হাসতেন। কিন্তু বাকীরা হাসত না। বদলে তিন জোড়া আর্ত পা তখন ছুটতে শুরু করত পৃথিবীর কর্কট ক্রান্তি থেকে মকর ক্রান্তি, উত্তর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধ। ছুটতে ছুটতে অনিমেষ এসে পড়ত ডিসটেম্পার করা একটা ঘরে, যেখানে খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে, চার্চের মাথায় অজস্র তুষার ঝরছে, সাদা রঙের নাম-না-জানা পাখি দূরে সুইজারল্যান্ডের কি একটা লেক বরফে ঢাকা। সে তাদের দেশের সামনে বসে একটা চিঠির শারেটা বার বার কাটছে—প্রিয়তমাসু রিতা। প্রিয়তমা আমার...

সত্য কুইবেকের কোন বাজারে ছোটাছুটি করছে, আকাশী রঙের একটা টেপ-রেকর্ডারের জন্যে! না খেয়ে ও ডলার জমিয়েছে।

বিরক্তিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বীরেন আসল ফরাসীদের কাছেই ফরাসী ভাষা শিখছে।

উপেনবাবু বলে চললেন জানেন, প্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য থাকলে মেয়েদের শরীরে একটা জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে। রিতারও তখন এক একদিনের শাড়ীতে ফুটে যাচ্ছে এক-একটা পাপড়ির ভাঁজ। কিন্তু কে এই প্রিয় পুরুষ! এই রহস্যভেদে তখন রক্তে আগুন ধরিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তিনটে যুবক।

যেমন করে দেখছেন, রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মানুষ বার্নারে ধাতু পুড়িয়ে নিশ্চিত জেনে নেয় তার চরিত্র? ঠিক তেমনি করেই নির্জন দুপুরে নয়ত অন্ধকারের আড়ালে কখনও একা পেলে রিতাকে সত্য-বীরেন-অনিমেষ নিজেদের ঠোঁটের আগুনে পুড়িয়ে দেখতে চেয়েছিল রিতার বুকের কম্পোজিশন। কিন্তু কেউই পারে নি। 'ভারী অসভ্য' কথাটা বলতে বলতে দশ মাইল দূরে পালিয়ে যেত গোলাপী ঠোঁট দুটো। আর তখন রহস্য এবং জ্বালা যেত বেড়ে আরও বহুগুণ।

কিন্তু আশ্চর্য! তার পরের দিনই হয়ত একই থালা থেকে তিন রকম ভাগ্যরেখা আঁকা তিনটি হাত মুড়ি তেলেভাজা খাচ্ছে। নয়ত দাড়ি কেটে গেলে একের নিখুঁত চিবুকে অপরে ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছে ব্যথিত চোখে।

কিন্তু এক রকম নয়। অনেক রকম ব্যথা মিশেই এই 'ব্যথিত চোখ'।

উপেনবাবু আবার থামলেন। চেয়ে চেয়ে দেখলেন, দূরে শালগাছের ফাঁকে দশ মাইল লম্বা কারখানাটাকে। শেডের আড়াল থেকে কারখানার নিজস্ব সূর্য উঠেই ডুবে গেল। রোজই ওঠে। রাতের আকাশটাকে এক মিনিটের জন্য লালে লালে রাঙিয়ে দিয়েই হারিয়ে যায়। উপেনবাবু বললেন, এর নাম 'স্ল্যাগ-ডাম্পিং'। ইস্পাতের বাতিল অংশের তাল তাল আগুন ঢেলে দেওয়া হয় কোন পুকুরের মত গর্তে। তাতেই মুহূর্তের জন্যে লালে ভরে যায় কারখানার আকাশটা। ঘুমের ঘোরলাগা কোন লোককে আগুনটা হঠাৎ দেখালে ভাববে বুঝি নতুন সূর্য উঠছে। কিন্তু আসলে ওটা তো ক্ষণিকের এবং পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলারই আগুন।

সত্য, বীরেন, অনিমেষদের কেউই ওই আগুনটাকে চিনতে পারে নি, বুঝলেন? তখন প্রায় প্রতি মাসেই বিদেশ থেকে কেউ-না-কেউ ফিরছেই এবং কেউ-না-কেউ যাচ্ছেই। যারা ফিরছে ফিরেই প্রমোশন পাচ্ছে জীবনে আরও উঠছে। উঠছে তো উঠছেই। উঠতে তো হবেই। লাইফে র‍্যাঙ্ক, স্টেটাস, মানি—কার না কাম্য বলুন?

সত্য, বীরেন, অনিমেষরাও জানে, পাবে এই লিফট, স্টেটাস। ওরাও বিস্ময়ে দেখবে গল্প শোনা সেই নায়াগ্রা-ফলস প্যাশান-ফ্লাওয়ার বা দি কানাডা নামে সেই হটমালার দেশে একবার পা ছোঁয়াতে পারে। কিন্তু পোস্ট যদি একটা হয়?

তাহলে কে হবে সেই চাঁদের মেঘে ছুঁয়ে আসা দুঃসাহসী ভাগ্যবান? ওরা নিজেরা আর আলোচনা করে না এই কথা। আগে করত। কোথায় যেন এক ভীষণ দুর্বলতা।

আর তাই সত্য যেদিন কাশতে গিয়ে বেসিনে রক্ত ফেলল অনিমেষ চোরা চোখে দেখে ফেলেও চুপচাপ রইল। যদিও সত্য মুহূর্তে জল দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিল তা প্রাণপণে স্বভাবিক হয়েছিল। কিন্তু অনিমেষ বাথরুমের বাইরে থেকেও আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখে ফেলেছিল, পাকা নির্বিকারত্ব এনেছিল মুখে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন রক্তে তোলপাড়, উত্তেজনার দপদপানী! মাথার মধ্যে অংককষা—মেডিকেল

...ভয় পাওয়া রোগ...ট্রিটমেন্ট...চাকরীতে অনুপস্থিতি...এ্যাব্রোড ট্রেনিং-এর ফাইলে একটা ছোট্ট চিঠি—মেডিকেল আনফিট।

সত্য ছুটল কোম্পানীর হাসপাতালে একস-রে'র জন্যে। অনিমেষ জানত ও তা যাবেই। আর তাই একস-রের পর সত্যর আগেই অনিমেষকে দেখা গিয়েছিল; সত্যর রিপোর্ট জানতে। এবং জেনেছিল ভয়ের কিছু নেই। কোন প্যাচ নেই লাংসে, কাশতে কাশতে নিতান্তই গলা চিরে যাওয়া।

অনিমেষ আনন্দিত হয়েছিল কি হয় নি, যা হোক একটা কিছু।

উপেনবাবু থামলেন। আমি তখন চতুর্ভুজীয় প্রেমের মুসাবিদা থেকে রক্তাক্ত বিস্ময়ের বৃত্তে ঢুকে পড়েছি। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা—মেয়েটি? সে কি তাহলে তিনটে ছেলেকেই ইকোয়ালি ভাল-বাসত?

উপেনবাবু বললেন রিতা হয়ত 'বড় কোন গ্রহের' মত নিজের কক্ষপথেই ঘুরে যেত। থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স শুধু কাছাকাছি হলেই মেখে নিত তার আলো। কিন্তু এক-বারই হয়েছিল এই গ্রহ-সম্মেলন।

দূরে রিসারভয়ার আর কুলিং টাওয়ারের জমি ছেড়ে ফার্ণেসের আলো-লাগা স্থানীয় আকাশটাও বুঝি তখন শুরু হয়ে গেছে নাইট শিফট। জায়গা বদল করছে তারারা। ঘুরে যাচ্ছে গ্রহ-উপগ্রহের মিছিল।
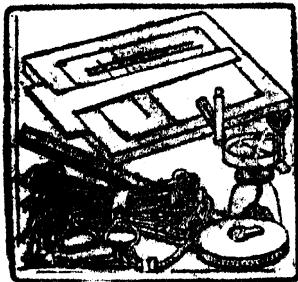
বললাম, গ্রহ-সম্মেলন? তাতে তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার কথা।

উপেনবাবু বললেন, জানি না, হয়ত হয়েছিল, হয়ত হয় নি।

বললাম, কি রকম?

নীরেনবাবু এসে একদিন বলল, হ্যালো থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স, কাল ছাব্বিশে জানুয়ারী, আমরা সেলিব্রেট করব। দামোদরের ধারে পিকনিক হবে। রাজী?

হৈ-চৈ উঠল—অফকোর্স। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই?

পরের দিন বিকারহীন নীল আকাশের নীচে জনা-আটেক নারী-পুরুষ। টাউনশীপ সভ্যতার বাইরে হাসিখুশী। সামনে গৈরিক দামোদর। টানের জল ঢালের দিকে বয়ে যাচ্ছে। দু পাশে বালির পাড়। তার পেছনে শাল-মহুয়ার হাল্কা জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে আদিবাসীদের দু-একটা কুঁড়ে ঘর। আধ মাইল দূরে ব্যারেজের স্লুইস গেটগুলো দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে কারখানার চিমনি-গুলো, আকাশে কালো রেখা।

সতরঞ্জির ওপর একটা টেপ-রেকর্ডারকে ঘিরে বসে হাসিখুশী মানুষগুলো ব্রেক-ফাস্ট সারছে। নীরেনবাবুর এক বন্ধু-দম্পতিও এসেছেন। মিস্টার ও মিসেস বোস।

রিতা বলল কি সুন্দর জায়গাটা না?

অনিমেষ রিতার কানে কানে বলল শুধু জায়গাটাই কি? আর মানুষগুলো?

রিতা চোখ টিপে বলল একদম বাজে।

শীতের রোদে একটু বাড়তেই চিত্রটা সামান্য পাল্টে গেল। নীরেনবাবু, মিস্টার বোসের সঙ্গে শালের জঙ্গলে আড়াল হল। হয়ত একটু আধটু পান করবেন তাই কি। মিসেস বোস আর নীরেনবাবুর স্ত্রী রান্না নিয়ে পড়লেন। আর পাড় ধরে এলোমেলো পায়ে হেঁটে চলল থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স। মাঝ-খানে কখনও রিতা কখনও তার ছায়া। কিন্তু তবু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের মত অমোঘ হয়ে উঠতে থাকে রিতা। কারণ নির্জন প্রকৃতির ভেতর নারীর একটা আলাদা রূপ ফোটে। ফোটে কি না বলুন?

বললাম, ঠিক।

একটা জায়গায় বীরেন পৌঁছে বলল, আমরা এখানটায় স্নান করব। সবাই জামা-কাপড় খুলে সর্টস পরে নাও।

নদী এখানটায় বেশ চওড়া। সব সময় জলে অসম্ভব টান। বিশাল জলস্তম্ভ পাক খেয়ে খেয়ে ছুটে যাচ্ছে। দুজন জেলে মাছ ধরতে সরলরেখায় এপার-ওপার করতে গিয়ে সরে গেল প্রায় পঞ্চাশ গজ। টিলমাটাল স্রোত গিয়ে আছড়ে পড়ছে স্লুইসের কঠিন টপ্পাতে। লাফিয়ে উঠছে সাপের ছোবলের মত সাদা ফেনা। গভীরের স্তরে স্তরে স্রোত হয়ত আরও বেশী, অজানা রহস্য!

রিতা রসিকতা করল। দূরের চিমনি-গুলো দেখিয়ে বলল ওই তোমাদের কানাডার কারখানাটা, আর এই তোমাদের নীল সমুদ্রের সাতসাগর। পাড়ি দিয়ে চলে যাও যে পার।

কথাটাকে পালাতে না দিয়ে বীরেন আস্টে-পৃষ্ঠে চেপে ধরল : তুমি বাজি ধরলে আমি তাও পারি।

সত্য বলল, রিতা তোমার চোখে ভুল রঙ। জলের রঙ নীল কোথায়? এ তো গৈরিক?

রিতা বলল সময় হলে আপনিই শুধরে যাবে।

এসব কথাবার্তায় তিনজনই ভেতরে ভেতরে কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। একই বিছানায় অন্তরঙ্গ বসে, বুকের ভেতর যে গোঁয়ার জন্তুটাকে এতদিন শাসন করে এসেছে সবাই, সেটা যেন এই জঙ্গলের পরিবেশে নিজের আদিমতায় ফিরে যেতে চাইছে। শুধু নদীকে সাক্ষী রেখে পয়েন্ট-আউট করে দিতে চাইছে শত্রুকে।

অথচ সেদিন সকালটা কি সুন্দর, আকাশটা পরিষ্কার নীল বুকের ভাঁজ স্পষ্ট করে রিতার হৃদয়ে আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। রিতা হয়ত হিপনোটিজম জানে, এপারের মাটিটাকে কানাডা বানিয়ে দিয়েছে।

বীরেন জিদ ধরল, কি রিতা, জবাব দিলে না? ধরবে বাজি?

কি বাজি?

বীরেন ইঙ্গিতময়তায় বলল, সে তো তুমি জানই।

রিতার শাসন করা হুঁশিয়ারী—খবর-দার পেরোবে না। ভীষণ স্রোত।

বীরেন মাতালে হাসি হেসে বলল হোঃ! তুমি কি আমাকে এই ভীতু দুটোর মত ভেবেছ?

অনিমেষ সত্য জানত বীরেন ভাল সাঁতারু। কিন্তু তবুও কথাটায় কি একটা তীব্র জ্বালা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে দুজনেরই শরীরে। রক্তের সেই গোঁয়ার জন্তুটা হয়ত লাফিয়ে ওঠে বেড়ে যায় মগজের উত্তাপ।

সত্য বলে, তুই নিজেকে খুব বীর-পুরুষ ভাবিস, না?

বীরেনের গর্বিত জবাব : তা তো ভাবিই। তোরাও হয়ে দেখ না? বলে হাসে।

অনিমেষ ফুঁসে ওঠে, দরকার হলে তাও হব।

বুকের ভেতর কি যেন ভেঙে পড়ে, বীরেন নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। রিতার সামনেই অশ্লীল হয়ে বলে রিতার আঁচলের তলায় নাকি?

কথাগুলোর দ্বিতীয় মানে রিতা হয়ত বোঝে না।

হঠাৎ সত্য বলে, অনিমেষ আয় তো? শালার হিম্মত দেখি!

অনিমেষ যেন তৈরীই ছিল। ছিটকে আসে। মুহূর্তে কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়। পলকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্পিল তিনটে শরীর।

পেছন থেকে রিতার আর্তস্বর! এই, একি! একি! তোমরা কি আরম্ভ করলে।

ততক্ষণে জলজ প্রাণীর মত তিন জোড়া হাত কুটিল স্রোত কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। টারবাইনের [illegible] মত শরীরের [illegible]

ঝপাং ঝপাং ঘুরে যাচ্ছে জলের গতি। পায়ের নীচে পাতাল! সামনে লক্ষ ফণার ইলিবিলি! তিনজনই তিনজনকে দেখতে পাচ্ছে—তির তির এগোচ্ছে। ঠিক যেন একটা ত্রিভুজ। শীর্ষ বিন্দুতে বীরেন, নীরেন-বাবুরা তখন অন্য দিকে শালের জঙ্গলে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বালিহাঁস। নির্জন আশপাশ, খানিক দূরে পাতাল ফুঁড়ে উঠেছে বিশাল ইস্পাতের স্লুইস। তার সামনে বিরাট এক প্রলয়। জল প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে দরজার গায়ে। দেখলে মনে হয় যেন সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দেবে।

উপেনবাবুর গল্প এক দারুণ ক্লাইম্যাক্সে উঠে গেছে। আমার রক্তের ভেতরেও বেড়ে গেছে ওঠা-পড়ার গতি। বললাম, তারপর!

তখনও মাঝ দরিয়া আসে নি। অনিমেষ দেখে, এর মধ্যেই ওপারের তাক করে থাকা গাছটা সরে গেছে অনেকখানি। বুকের মধ্যে থেকে একটা টান উঠে আসছে। ভয় পেয়ে গেল। তবে কি দম ফুরিয়ে আসছে! আর কত দূরে! নদী সরে যাচ্ছে একটু একটু। এবার বুঝি মাঝদরিয়া। অনিমেষের চোখে আতঙ্ক। কারণ স্লুইসের দরজাগুলো বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। বাতাস কমে যাচ্ছে, পেশীতে টান, হাত ঘুরছে না। মনে হচ্ছে জলের টান ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

সামনে তখন মাত্র একটাই কালো মাথা। হয়ত বীরেন। কিংবা জেলেদেরও কেউ হতে পারে। জলটা কি ঠাণ্ডা! অনিমেষের শীত করছিল। অসাড় হয়ে আসছে হাত পা।

হঠাৎ আমার উত্তেজনা উপেনবাবুকে থামিয়ে দিল : আচ্ছা, স্লুইসের টানে পড়ে যাওয়া মানে তো অবধারিত মৃত্যু?

নিশ্চিত মৃত্যু!

বললাম, সত্য? সত্য তখন কোথায়?

কোথায় সত্য? সত্য জলের ওপর ভেসে নেই তখন। অনিমেষ ভাবল সত্য হয়ত ডুব সাঁতারে এগোচ্ছে। আবার ভাবল, জলে যদি ঘূর্ণী থাকে! মুহূর্তে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা নেমে যায়। প্রাণপণে টেনে যায় অনিমেষ। চোখের সামনে পাল্টে যাচ্ছে জলের রঙ। ইস্পাতের দরজাগুলো এগিয়ে আসছে! আগের কালো মাথাটা রাক্ষসে স্লুইসের অনেক কাছাকাছি। ওর বুকের হয়ত হাওয়া শেষ। কি দ্রুত ও তখন এগিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর ফাঁদের দিকে। লোকটা কে বোঝা যাচ্ছে না। অনিমেষ স্রোতের উল্টো দিকে কোণাকুণি হাত টেনে যায়। কালো মাথাটা স্লুইসের আরও কাছে। সত্য নেই জলের ওপরে। পাড়টা যেন অনেকটা কাছে। এতক্ষণে বীরেনকেও চোখে পড়ছে না। অনিমেষ ভাবে, বীরেনও কি ডুব সাঁতারে এগোচ্ছে? জলের ওপর সত্য নেই, বীরেন নেই। অনিমেষের মাথার মধ্যে শূন্যতা! শুধু চোখ দুটো ছুঁয়ে আছে ওপারের মাটি। দেহটা এগোচ্ছে। এবার [illegible]।

অনিমেষ মৃতবৎ। বালির বিছানা এগিয়ে আসছে। অনিমেষের পা জলের নীচে কি যেন ছুঁল। মাটি হয়ত। রক্তে রক্তে শিউরে ওঠে আনন্দ। অনিমেষ সম্পূর্ণ মাটির ওপর। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে।

প্রথমেই ওপারে তাকায়। হলুদ শাড়ীর আঁচল তখন হাওয়ায় উড়ছে, ছোট্ট দেখাচ্ছে মিতাকে। চোখে দেখা যাচ্ছে না, চোখের ভাষাও পড়া যাচ্ছে না। রক্তের অণুতে অণুতে তখন কি উচ্ছ্বাসের ঢেউ। যেন একাই কথা বলছে অনিমেষ—রিতা আমি কানাডায় পৌঁছে গেছি। উঃ! কি ভয়ংকর—রিতা প্রিয়তমা আমার!

উপেনবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করলেন ওপারে মিতা এপারে অনিমেষ।

আমি বললাম, ওপারে রিতা এপারে অনিমেষ, মাঝখানে তখনও সত্য আর বীরেন সাঁতার কেটে চলেছে?

উপেনবাবুর গলার স্বরটা কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। বললেন, না।

তবে?

মাঝখানে শুধু জল।

আমি দারুণ বিস্ময়ে শুধোলাম, আর ওরা?

উপেনবাবু চুপ। তার মুখে আর ভাষা নেই।

আশেপাশের কোয়ার্টারগুলোর যেন এইমাত্র আলো নিভে গেল। শুধু শালগুলোর মাথায় আলো ছড়াচ্ছে স্টেনলেসের কস্তা দূরে, অন্ধকারে ব্লাস্ট ফার্নেসের লাল চোখ।

কি হল? বলুন ওরা কোথায়!

উপেনবাবু সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। [illegible] হঠাৎই যেন বললেন, দুজনেই তলিয়ে [illegible]। বলেই উপেনবাবু বিচিত্র শব্দে হাসলেন। হাসতেই থাকলেন...হাঃ...হাঃ...। কেমন অদ্ভুত অচেনা হাসি। কি বলুন? গল্প হয় না এ থেকে? হয় না?

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললেন বীরেন-সত্য তলিয়ে গেল ঠিকই—তবে জলে নয়। সংসারে।

অবাক হয়ে বললাম সে কি!

উপেনবাবু সহজ হাসির অভিনয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, ওই যে মোটামত ময়লা পাঞ্জাবি গায়ে লোকটা—কুমড়ো কিনে ঘরে ঢুকল? ও সত্য।

চমকে উঠলাম।

উপেনবাবু যেন মজা করছেন। বললেন, হ্যাঁ। তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে যে, যাকে কাল রক্ত দিয়ে এলাম? ও বীরেন।

ভয়ংকর বিস্ময়ে ফিসফিসিয়ে শুধোলাম আর অনিমেষ?

উপেনবাবু অন্ধকারে দেশলাই জেলে সিগারেট ধরালেন। তারপর জ্বলন্ত কাঠিটা নিজের মুখের সামনে ধরলেন। ধরে রইলেন যতক্ষণ না নিভে গেল।

আমার অস্ফুট স্বর বেরোল—আশ্চর্য! আর রিতা?

উপেনবাবু একটানা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, যেন কথা বলতে ভুলে গেছেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন জানি না। রাত হয়েছে। আসুন, লাস্ট পেগটা সেরে নিই।

চায়ের আসরে চটপটা

চাট হল উত্তর প্রদেশের একটি জনপ্রিয় খাদ্য। অবশ্য এর জনপ্রিয়তার পরিধি আজ আর শুধু উত্তর প্রদেশেই সীমাবদ্ধ নেই কলকাতার এসপ্ল্যানেডে, গঙ্গারঘাটে, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে বিকেলে ও সন্ধ্যায় এর জমজমাট আসর। তৈরী করাও বিশেষ কিছু শক্ত নয়, খেতেও খুব মুখরোচক। জলখাবার হিসেবে বিকেলে চায়ের সঙ্গে খাওয়া চলতে পারে—বেশ পেটও ভরে, খরচও তেমন কিছু বেশী পড়ে না। চাট ছাড়াও বিকেলে চায়ের সঙ্গে আরও অনেক কিছু পরিবেশন করা যেতে পারে—যেমন এগরোলস, পী বা মটরশুঁটি রোলস, প্রনটোস্ট, ফিশ রোলস ইত্যাদি। আজকে চায়ের সঙ্গে চটপটার আসর। সেই জন্যে প্রথমেই চ্যাটের সঙ্গে ব্যবহার্য তেঁতুলের চাটনি কি করে তৈরী করতে হয় এবং ফুচকার জিরাজল কিভাবে তৈরী করতে হয় বলে নিই।

তেঁতুলের চাটনি বা সোঁঠ :

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম পাকা তেঁতুল, ১৫০ গ্রাম গুড় বা চিনি, ৫০ গ্রাম আদা, অর্ধ চা চামচ বীটনুন, এক চা-চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, অর্ধ চা-চামচ শুকনো তাওয়ায় ভাজা জিরের গুঁড়ো, নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। প্রথমে তেঁতুল আন্দাজ মতো জলে ভিজিয়ে রাখুন—মনে রাখবেন চাটনিটা ঘন ঘন হবে। ভাল করে ভিজে গেলে হাত দিয়ে চেপে চেপে সমস্ত শাঁস বার করে নিন। বিচি ও ছিবড়েগুলো ফেলে দিন। সমস্ত কাইটা ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন। ২। আদা মিহি করে বেটে নিন, বীটনুনও মিহি করে পিষে নিন। ৩। উপরে লিখিত সমস্ত মশলার গুঁড়ো এবং চিনি অথবা গুড় তেঁতুলের কাইয়ের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। চিনি অথবা গুড় গলে গেলেই চাটনিটা পরিবেশন করা চলবে। [illegible] আদাকে হিন্দীতে সোঁঠ বলা হয়। উত্তর প্রদেশে টাটকা আদার বদলে শুকনো আদা ব্যবহার করা হয় বলে এই চাটনির নাম সেখানে 'সোঁঠ'।

জিরাজল :

উপকরণ : ১০০ গ্রাম তেঁতুল, অর্ধ চা চামচ শুকনো তাওয়ায় ভাজা ও মিহি করে গুঁড়োনো জিরে, অর্ধ চা চামচ বীটনুনের গুঁড়ো, আট দশ গাছি তাজা পুদিনা পাতা, ½ চা চামচ লাল লংকার গুঁড়ো, গুড় এবং নুন স্বাদ অনুযায়ী।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ছয় কাপ জলে তেঁতুলটা আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন তারপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। ২। পুদিনা পাতা এবং অন্যান্য উপকরণ মিহি করে পিষে নিন। ৩। সব কিছু তেঁতুল জলে মেশান। ইচ্ছে করলে পানীয় হিসেবেও বরফ দিয়ে ঠান্ডা করে পান করা যেতে পারে। গরমের দিনে শরীর ঠান্ডা রাখে।

ফুচকা :

উপকরণ : অর্ধ পোয়া আটা বা ময়দা, অর্ধ পোয়া সুজি, ফুচকা ভাজার জন্যে তেল বা বনস্পতি ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। আটা ও সুজি একসঙ্গে মিশিয়ে শক্ত করে মাখুন। ২। বড় বড় কয়েকটি লেচি কেটে পাতলা করে বেলে নিয়ে ছোট গোল ঢাকনি দিয়ে সমান মাপের ছোট ছোট গোল করে রুটিটা কাটুন। ৩। খুব গরম ছাঁকা তেলে বা ঘিয়ে লাল করে ভেজে নিন। ৪। সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত বাইরে রাখুন। তারপর কোন কাঁচের জারে ভরে রাখুন। ৫। যে ফুচকাগুলো ফুললো না সেগুলো সোঁঠ পাপড়ি হিসেবে তেঁতুলের চাটনি ও ফেটানো দই-এর সঙ্গে পরিবেশন করুন। ৬। ভাল ভাবে ফোলাগুলোর মাঝখানে আঙুল দিয়ে একটু ফুটো করে আলু বা মটর সেদ্ধ সহযোগে জিরা জলের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

টিকিয়া :

উপকরণ : আলু অর্ধ কেজি, ছাড়ানো মটরশুঁটি (মটরশুঁটির অভাবে শুকনো সবুজ মটরও চলতে পারে) ১৫০ গ্রাম, একটুখানি আদা, কিছু পুদিনা পাতা, একটু আমচুর বা পাতিলেবুর রস, একটু বেসন, কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা, একটু পেষা গরম মশলা, ভাজার জন্যে বাদাম তেল বা বনস্পতি ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। আলু সেদ্ধ করে শিলে পিষে নিন শুধু একটি আলু আস্ত রাখুন। ২। বেসন ও নুন পেষা আলুর [illegible] মেখে নিন। [illegible] মটরশুঁটি বা [illegible] মটর সেদ্ধ করে নিন। ৪। মটরশুঁটির সঙ্গে সেদ্ধ করা আস্ত আলুটি হাত দিয়ে চটকে নিন। ৫। সবুজ লঙ্কা, পুদিনা ও আদা কুচিকুচি করে কাটুন। ৬। আলু ও মটরশুঁটির মিশ্রণে এগুলি মেশান এবং এই মিশ্রণে আন্দাজ মতো নুন, পেষা গরম মশলা আমচুর বা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। ৭। পেষা আলু লেচি করে কাটুন এবং প্রতিটির ভিতরে মটরশুঁটির পুর দিন। ৮। হাত দিয়ে চেপে চেপে গোল করে নিন। ৯। তাওয়ায় ঘি গরম করে টিকিয়াগুলো সেঁকে সেঁকে ভাজুন—ছাঁকা ঘিয়ে ভাজবেন না। ১০। এক পিঠ বেশ ভালভাবে সেঁকা হয়ে গেলে তার চারপাশে ঘি ছড়িয়ে ধারালো খুন্তি দিয়ে উলটে দিন। ১১। দুদিকই বেশ লাল মচমচে হয়ে গেলে নামিয়ে ছুরি দিয়ে আধখানা করে টিকিয়াটা কাটুন—এমনভাবে কাটবেন যাতে মাঝখানটা জোড়া থাকে। ১২। ওপরে তেঁতুলের চাটনি, ফেটানো টক দই, নুন, লঙ্কা ও জিরে ভাজার গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

মটর : ২৫০ গ্রাম সাদা মটর আগের দিন রাত্রি থেকে জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন একটু সোডিবাইকার্ব দিয়ে ভাল ভাবে সেদ্ধ করুন। এমনভাবে সেদ্ধ করতে হবে যাতে জল অবশিষ্ট না থাকে। দু-একটা আলু সেদ্ধও এর সঙ্গে মেশাতে পারেন। তেঁতুলের চাটনি ফেটানো টক দই জিরে ভাজার গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং কয়েকটা না-ফোলা ফুচকা হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে প্লেটের মটরের ওপরে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

বৈগনী: দহিবড়া প্রস্তুত প্রণালী আপনারা সকলেই জানেন—তাই একটু ভিন্ন ধরনের দহিবড়া প্রস্তুত প্রণালী বলছি, বেগুন দিয়ে তৈরী হয় তাই একে বলা হয় বৈগনী।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। টক দই ফেটিয়ে একটু জল মিশিয়ে পাতলা করে তাতে আন্দাজ মতো নুন, চিনি, বীটনুন, জিরে ভাজা গুঁড়ো ও লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে রাখুন ২। বেগুন লম্বালম্বি বা চাকা চাকা করে কেটে বেসনের গোলায় ডুবিয়ে বেগুনী ভাজুন। ৩। ভেজে দইয়ের গোলায় ডুবিয়ে দিন। ৪। ঠান্ডা হলে দই থেকে তুলে নিয়ে তেঁতুলের চাটনি সহযোগে পরিবেশন করুন।

পাঁউরুটির পাকোড়া :

প্রস্তুত প্রণালী: ১। স্লাইস করা পাঁউরুটি লম্বালম্বিভাবে কাটুন। ২। বেসনের গোলায় ডুবিয়ে ভাজুন। ৩। তেঁতুলের চাটনি ও ফেটানো দই সহযোগে পরিবেশন করুন।

[illegible] মুখোপাধ্যায়

বিবাহ ঃ পণ ঃ আইন

খবরে প্রকাশ যে ১৭, ১৮ ও ১৯ জুন আগরওয়াল সমাজসেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি সমষ্টিগত বিয়ের আয়োজন করা হয়। এই বিয়েতে কমপক্ষে একসঙ্গে বারোজন পাত্র ও বারোজন পাত্রী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিয়ের দায়দায়িত্ব ও ব্যয় বহন করে ঐ সমাজসেবা সঙ্ঘ। পাত্র পাত্রীরা উত্তরপ্রদেশ বিহার মধ্যপ্রদেশ পশ্চিমবাংলা এবং দিল্লীর অধিবাসী। বিয়েতে কারো কোনরকম পণ নেবার কথাই ছিল না। যথাসম্ভব অল্প খরচে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করতে হয়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এধরনের বিয়ের ব্যবস্থা। অবশ্য এই বিয়েকে অভিভাবকেরা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করবেন তা এখনো জানা যায় নি। তবে একথা ঠিক পণকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের কর্তৃত্ব বিয়ের ওপর অনেকটা কমে আসবে। অভিভাবকদের শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রী তার পুত্র বা কন্যার উপযুক্ত কিনা এটুকু বিচার করার অধিকার নিশ্চয়ই থাকছে। এই সংস্থা পাত্রপাত্রী নির্বাচনে অভিভাবকদের মতামত গ্রহণ করলেও পাত্র-পাত্রীর সরাসরি যোগাযোগ জড়িত বিয়েকে কোনমতেই উড়িয়ে দিতে রাজী নয়।

ছেলেমেয়েদের এই জাতীয় কোন সংস্থার মাধ্যমে তাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার মধ্যে সামাজিক কোন আইন লঙ্ঘন করার দোষ নেই যদি উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

খবরে আরও প্রকাশ যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বহু শিক্ষিতা মেয়ে বিধবা মহিলা এবং অবিবাহিত পুরুষ সংস্থার কাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা বহুসংখ্যায় এই জাতীয় সংস্থার কাছে আবেদন করেছেন যাতে তারা বিনা-পণে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পণপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করতে পারেন। শুধুমাত্র আগরওয়ালা সংস্থার প্রচেষ্টায় সারা ভারত থেকে এই কুপ্রথা দূর করা যাবে না। অন্যান্য সমাজকল্যাণ সংস্থাকেও এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ [illegible] আমরা যতই বিদ্রোহ করি না কেন এই কুসংস্কার হাজার হাজার বছর ধরে যেভাবে আমাদের সমাজে শিকড় এঁটে বসে আছে রাতারাতি তাকে দূর করা যাবে না। পার্লামেন্টে বা রাজ্যের আইনসভায় আইন পাশ করেও এই প্রথা পুরোপুরি তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আইনে ন্যায় জিনিস লিপিবদ্ধ থাকলেও অনেকক্ষেত্রে ব্যবহারিক জগতে তা লঙ্ঘন করা হয়। তাই আগরওয়াল সঙ্ঘের মত অন্যান্য সঙ্ঘকেও আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে বিচার ও শাস্তিপ্রদানের ব্যাপারে সরকার ও দেশের বিচার বিভাগের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করে চলতে হবে।

অন্য আরেকটি খবরে জানা যায় যে নগদ টাকা বা জিনিসপত্রে পণ দেওয়া বা নেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে বিহারসহ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে। এইরূপ অপরাধ দণ্ডবিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় এমনকি জামিনের অযোগ্য। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিহারে পণপ্রথা খুব বেশী রকম সচল ও তীব্র এবং উচ্চবর্ণের লোকেদের প্রায় সবাই বহুদিন থেকে পণ নিতে ও দিতে অভ্যস্থ এবং অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে এ প্রথা মেনে চলেন। পাত্র যদি ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনীয়ার হন তবে তো আর কথাই নেই। বিয়ের বাজারে তাঁর দাম কখনো কখনো ধার্য হয় পঞ্চাশ হাজার থেকে দেড় লাখ পর্যন্ত। পণের টাকা সবচেয়ে বেশী নিয়ে থাকেন রাজপুত ও মিথিলার ব্রাহ্মণসম্প্রদায়। কায়স্থদের মধ্যে দাবীদাওয়া তুলনামূলকভাবে কিছু কম। এমনকি শিক্ষার প্রসারেও পণের দাবীর খুব একটা হেরফের হয় নি। আমাদের আশা এই নতুন আইন প্রণয়নের পর পণপ্রথা বিশেষভাবে হ্রাস পাবে তবুও কবে এবং কিভাবে যে এই প্রথা বিলুপ্ত হবে তা এখনও চিন্তা করা কষ্টসাধ্য।

সারা বিশ্বে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনে বিবাহ প্রথারও নানারূপ আইনকানুন দেখা যায়। আন্তর্জাতিক আইনে বিবাহে পণপ্রথার কোন স্থান নেই--এমনকি উল্লেখও নেই। যদি এক দেশের ছেলে অন্য দেশের মেয়েকে [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] করে শুধুমাত্র বিয়ের তাগিদেই বিয়ে করে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়। এই বিয়েতে যে জিনিসটি খুঁটিনয় দেখা হয় পাত্রপাত্রীর নাগরিকত্বে কোন দোষত্রুটি আছে কিনা। এই বিয়ে বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হলেই সিদ্ধ। শুধুমাত্র দেখা হয় যেদেশে এই বিয়ে সম্পন্ন হবে সে দেশের স্থানীয় আইনের সঙ্গে তার কোন বিরোধ না থাকে। ভারতে বিয়ে যেমন একটি সংস্কার, ইউরোপ বা আমেরিকায় সেটা সংস্কার নয়। সেখানে বিয়ে একটা চুক্তি। এই চুক্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এনে দেয় কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্যবোধ। ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানী ও আমেরিকায় বিবাহ খৃষ্টীয় আইন দ্বারা সীমিত এই আইন বহু বিবাহের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। ভারতে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী বহু বিবাহ আইনতঃ দণ্ডনীয়। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের মত পণপ্রথাও বর্তমান আইনে অনুরূপভাবে পালন করতে সকলেই কঠোর হবেন তো?

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষকে পালন করতে জি ডি আর-এর ডাক কর্তৃপক্ষ তিনটি ডাক-টিকিটের প্রচলন করেছেন। সারা বিশ্ব সমাজে নারীদের গুরুত্ব এই ডাকটিকিটের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

দশ ফেনিক দামের ডাকটিকিটে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের নারী কুড়ি ফেনিকে সমাজতন্ত্রের নারী ও পঁচিশ ফেনিক-এ রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সন্তানসহ চিলির এক নারী।

অঞ্জলি চৌধুরী
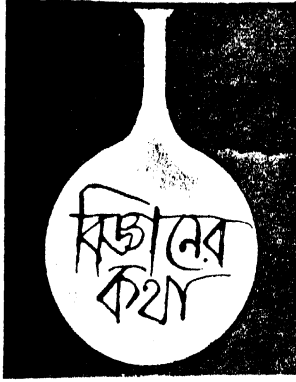
গোলমালের কথা

বিশেষ করে আমরা যারা শহরে বাস করি, অনিবার্যভাবেই তাদের কতকগুলো গোলমাল সহ্য করে চলতে হয়। ট্রাম-বাসে চলতে গিয়ে গোলমাল, অফিসে কাজ করতে গিয়ে গোলমাল, এমনকি বাড়িতে ঘুমোবার সময়েও গোলমাল। টেলিফোন ছাড়া আমাদের চলে না, অতএব টেলিফোনের গোলমাল সহ্য করতেই হয়, তেমনি টাইপরাইটারের এবং আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত ও সম্পর্কিত অজস্র বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির। গোলমালে অবশ্যই আমাদের বিরক্তি আসে, গোলমালে অবশ্যই আমাদের কাজের ক্ষতি হয়—কিন্তু শুধু কি তাই? গোলমালে আমাদের শোনার ক্ষমতাও কমে, গোলমালে আমাদের জীবনযাত্রার উৎকর্ষে হানি ঘটে।

এই গোলমাল কিন্তু আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। আমরা মানুষেরা এই পৃথিবীতে বাস করছি গত প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে। কিন্তু অতি সম্প্রতিকালের শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত আমরা এমন কিছু করতে পারিনি যাতে পরিবেশের বদল ঘটতে পারে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরে দেখা গেল, যে-জল আমরা পান করি তা দূষিত, যে-বাতাস আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে নিই তা দূষিত, এককথায় গোটা জৈবমন্ডলটিই দূষিত। এখন তার ওপরে জুটেছে গোলমাল, যা দূষিত জল-বাতাসের মতোই সমান ক্ষতিকর।

দূষিত করে কে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির একটি কমিটির মতে, তা হচ্ছে সেই জিনিস যা আমাদের বাতাস, আমাদের জমি ও আমাদের জলের ভৌতিক রাসায়নিক বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যে এমন অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের জীবন বা কাম্য কোনো প্রজাতির জীবন বা শিল্পগত কোনো প্রক্রিয়া বা জীবনযাপনের অবস্থা বা সংস্কৃতিক সম্পদ বা কাঁচামালের উৎস।

সাধারণভাবে বলা চলে যে-শব্দ আমরা চাই না তাই হচ্ছে গোলমাল। আমাদের সমাজে গোলমালের উৎপত্তি শিল্পগত তৎপরতার অনুষঙ্গ হিসেবে। তার মানে কি এই যে যখন কলকারখানা ছিল না তখন কোনো গোলমালও ছিল না? তখনো ছিল—ছিল পাখির ডাক বাতাসের গর্জন ও প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত আরো বিবিধ শব্দ। কিন্তু সেইসব শব্দের সঙ্গে মানিয়ে চলতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, সেইসব শব্দ আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতাম না। একারণে সেইসব শব্দ গোলমাল হিসেবে গণ্য নয়। শব্দ তখনই গোলমাল হয়ে ওঠে যখন তা বিরক্তিকর ও কাজের পক্ষে বাধাস্বরূপ। বাধা তিনদিক থেকে—আমাদের শোনার ক্ষমতায়, আমাদের শারীরিগত ক্রিয়ায়, আমাদের সামাজিক আচরণে।

গোলমাল হলে পরে আসলে ব্যাপারটা কী ঘটে? বায়ুমণ্ডলের চাপের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এবং এই বিঘ্ন শব্দের গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার কম্পনের মাত্রা শ্রবণযোগ্য কয়েক হার্ৎস থেকে শ্রবণাতীত কয়েক কিলোহার্ৎস পর্যন্ত। বিস্তারের দিক থেকেও গোলমালের শব্দ-চাপ বিস্তর বিভিন্ন প্রকারের—প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এক ডাইন-এর ভগ্নাংশ থেকে কয়েক হাজার ডাইন পর্যন্ত। সাধারণ অবস্থায় মানুষের কান যেমন অতি ক্ষুদ্র মাত্রার চাপে সাড়া দেয়, তেমনি অতি মহৎ মাত্রার চাপেও। কম্পনের দিক থেকে সাড়া দেয় ২০ হার্ৎস থেকে ২০ কিলোহার্ৎস পর্যন্ত এলাকায়। যদিও গোটা এলাকা জুড়ে সাড়া সমান মাপের নয়। সাড়া জাগাটা এত ব্যাপক বলেই সাধারণত শব্দের তীব্রতার পরিমাপ নেওয়া হয় লগারিদ্‌মের এক বিশেষ মাত্রার সাহায্যে। এটি একটি তুলনামূলক পরিমাপ—মূলে থাকে কানের কাছে শ্রবণযোগ্য সর্বনিম্ন চাপের শব্দ, এক কিলোহার্ৎসের মাত্রায়। তুলনায় শব্দ পরিমাপটিকে বলা হয় ডেসিবেল। কয়েকটি পরিচিত শব্দের বেলায় চাপের স্তর এইরকম:

শান্ত গ্রামাঞ্চলে গাছের পাতার খসখসানি: ১০ থেকে ২৫ ডেসিবেল।

ফিসফিস কথা: ১৫ থেকে ২০ ডেসিবেল।

নিচু আওয়াজের রেডিও: ৩৫ থেকে ৪৫ ডেসিবেল।

স্বাভাবিক কথাবার্তা: ৫৫ থেকে ৬৫ ডেসিবেল।

রেস্তোরাঁর গোলমাল: ৬০ থেকে ৭০ ডেসিবেল।

ট্রাম-বাসের গোলমাল: ৭০ থেকে ৮০ ডেসিবেল।

প্রপেলার-চালিত বিমান (৩০ মিটার দূরে): ১১০ থেকে ১২০ ডেসিবেল।

আমাদের আধুনিক জীবনে গোলমাল তৈরি হয় তিন ভাবে—(১) কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি থেকে, (২) ভূপৃষ্ঠের যানবাহন ও আকাশের বিমান থেকে এবং (৩) প্রমোদ-অনুষ্ঠান ও বারোয়ারী কার্যকলাপ থেকে। আমাদের চারদিকের বাতাসের মধ্যে দিয়ে এই গোলমাল আমাদের কাছে পৌঁছয়।

কলকারখানার গোলমাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে স্থানীয়। ফলে, যদিও কলকারখানার গোলমালটাই অন্যান্য গোলমালের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক হয়ে থাকে, তা সীমাবদ্ধ ছোট একটি এলাকায় ও অল্প কয়েকজন লোকের মধ্যে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে সকল ক্ষেত্রেই এই গোলমাল কমানো সম্ভব।

যানবাহনের দরুন যে গোলমাল তা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক এলাকা জুড়ে এবং লক্ষ লক্ষ নগরবাসী তার আওতায় পড়ে যায়। এটি এমনই এক গোলমাল যা কিছুতেই এড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলার মাত্রা দশ বছরে প্রায় ১০ ডেসিবেল। বিশ্বের বড়ো বড়ো শহরে যানবাহনের দরুন গোলমালের মাত্রা কোথাও কোথাও ৯০ ডেসিবেল বা তারও বেশি (কলকাতায়, যেখানে এত বেশি লরঝরে গাড়ি চলে, সেখানে অবশ্যই আরো অনেক বেশি)।

লন্ডনের একটি সমীক্ষায় কিছু লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনারা যে-সব অবস্থার মধ্যে কাজ করেন তার মধ্যে থেকে একটি বিষয়ের নাম করুন যার পরিবর্তন আপনারা চান। সবাই একবাক্যে জবাব দিয়েছিলেন, গোলমাল। শুধু লন্ডন কেন, যে-কোনো বড়ো শহরের অধিবাসীরা একই জবাব দেবেন। কলকাতার অধিবাসীরা তার সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ করতে পারেন, পুজো-পার্বণের মাইক ও ট্রানজিস্টর।

অবস্থা এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে-কোনো বড়ো শহরের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দুই ব্যক্তির কথোপকথন এখন এক অসম্ভব ব্যাপার।

তদুপরি যাঁরা বিমানবন্দরের আশেপাশে থাকেন তাঁদের এক মর্মান্তিক দুর্ভোগের কারণ হয়ে ওঠে বিমানের গর্জন। একটি যাত্রীবাহী বিমান থেকে যে গোলমাল তৈরি হয় তার জোর প্রায় ১০ কিলোওয়াট (১০০০ ওয়াটে এক কিলোওয়াট)। আমাদের কান এমনভাবে তৈরী যে এক ওয়াটের বেশি জোর তার কাছে সহনীয় নয়। রেডিওর শব্দের জোর সাধারণত এক ওয়াটের দশ ভাগের এক ভাগ, তবুও এই সামান্য মাত্রাতেই অনেকের কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তাছাড়া সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানের চেয়েও আরো দুঃসহ একটি উৎপাত আবির্ভূত হবার জন্য তৈরি হচ্ছে—সেটি শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান। এই বিমানের গতিবেগ যে-মুহূর্তে শব্দের গতিবেগ অতিক্রম করে, প্রচন্ড একটি বোমা-ফাটার মতো আওয়াজ পাওয়া যায়। এমনই প্রচন্ড এই আওয়াজ যে তার ধাক্কায় জানলার শার্সি ও পোর্সেলেনের বাসন ঝনঝন করে ভেঙে পড়তে পারে। এই আওয়াজকে বলা হয় সোনিক বুম বা ব্যাঙ্গ। ১৩০ থেকে ১৬০ কিলোমিটারব্যাপী একটা বেড় দিয়ে এই বুমের ধাক্কা পৌঁছয়।

আর প্রমোদ-অনুষ্ঠান ও বারোয়ারী [illegible] উদ্ভূত গোলমাল [illegible]

মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আশ্চর্যের কথা এই যে একজনের পক্ষে যা আনন্দ, অপরের পক্ষে তা ক্লেশ। এও একমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে একের ভালো সকলেরই ভালো। মানুষের বেলাও যদি তাই হত!

গোলমাল যদি একটানা ৯০ ডেসিবেলের চেয়েও বেশি মাত্রায় থেকে যায় তাহলে শোনার ক্ষমতা কমতে পারে। এমনকি দেখা গিয়েছে, ক্ষণিকের জন্য হলেও যদি অচমকা ১৫০ ডেসিবেলের চেয়েও বেশি মাত্রার গোলমালের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে স্থায়ী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

তাহলে যখন বলা হয় যে ৯০ থেকে ১৩০ ডেসিবেল মাত্রার গোলমালের মধ্যে পড়লে শোনার ক্ষমতা কমে যেতে পারে—তখন কিন্তু আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। পঁচিশ বছর বয়স পার হলে সব মানুষেরই শোনার ক্ষমতা কমতে থাকে—বিশেষ করে উচ্চতর কম্পনের শব্দের বেলায়। আবার মেয়েদের চেয়ে বেশি কমে পুরুষদের। উচ্চতর কম্পনের শব্দ শোনার ক্ষমতা মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশি মাত্রায় ধরে রাখতে পারে। (ফিসফিস কথায় উচ্চতর কম্পনের শব্দই বেশি, এ-কারণে সব বয়সের মেয়েদের সঙ্গেই ফিসফিস করে কথা বলাটাই সবচেয়ে সুবিধার।)

গোলমালে যে শরীরগত ক্রিয়ার হানি ঘটাতে পারে তার কিছু কিছু প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। একটি হচ্ছে পাগল হয়ে যাওয়া বা মনের স্থৈর্য হারানো। আধুনিক পদ্ধতিতে বন্দীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য অনেক সময়ে বন্দীকে একটানা প্রচণ্ড একটা গোলমালের মধ্যে ফেলে রাখা হয়।

আর গোলমালের মধ্যে থাকতে হলে মানুষ বিরক্ত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, ভিন্ন আচরণ করতে শুরু করে, তার প্রমাণ তো আমাদের আশেপাশে বহু, এবং অনেক সময়ে আমরা নিজেরাও।

আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, সেই ফাঁকে একটা মস্ত উপদ্রব হানা দিয়ে বসেছে। এই উপদ্রবের নাম গোলমাল। আধুনিক জীবন-যাত্রায় অনেক কিছুই আমরা বাদ দিতে পারি না—বাদ দিতে পারি না রেডিও, টেলিফোন, (সঙ্গীতবাদ্য) ওয়াশিং মেশিন, এয়ার-কন্ডিশনার, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি কামরার মধ্যে এই যন্ত্রগুলো হাজির করলেই বোঝা যায় গোলমালের ডেসিবেল কতখানি বিপজ্জনক মাত্রায় চড়ে গিয়েছে।

ভারতের কোনো শহরেই এখন আর শান্ত পরিবেশ পাওয়া সম্ভব নয়। বরং শহরবাসীরা পছন্দ করে বাজার ও ট্রাম-বাসের রাস্তার কাছাকাছি থাকতে, নিত্য-যাত্রীরা স্টেশনের কাছাকাছি। শহরের দালানগুলোর ওপরের তলায় দেয়াল হয়ে থাকে পাতলা ফলে গোলমাল ঠেকাবার পক্ষে অনুপযুক্ত।

যদিও ভারতের কোনো শহরেই গোল-মালের মাত্রা এখনো ১২০ ডেসিবেলে পৌঁছয় নি (বিশ্বে এমন শহরও আছে যেখানে এইমাত্রার গোলমাল চলে), কিন্তু তার থেকে খুব বেশি দূরেও নেই। বোম্বাই ও দিল্লী শহরে গোলমালের মাত্রা চড়োয় থাকার সময়ে ৯০ ডেসিবেল, নিচে থাকার সময়েও কদাচ ৬০ ডেসিবেলের কম। কলকাতার অবস্থান সম্ভবত দুই দিকেই আরো অনেক উঁচুতে।

ভারতে গোলমাল নিয়ে এখনো বিশেষ গবেষণা শুরু হয় নি। কিন্তু যে মাত্রায় গোলমাল চড়ছে তা বিপর্যয়কর হয়ে ওঠার আগেই সমস্যাটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। ফলত, গোলমাল কমাতে পারলে অন্য অনেক গোলমাল থেকেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

•

স্বনামখ্যাত ডঃ অ্যালবার্ট শোয়াইৎসার তাঁর আফ্রিকার লাম্বারেনের উপনিবেশে একবার একটা নতুন ঘর তুলছিলেন। এমন সময়ে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা দেখা দিল। অবস্থা এমন যে তক্তা কাঠ ইত্যাদি ঘর তৈরির উপকরণগুলো যদি বাঁচাতে হয় তো সেগুলো তক্ষুনি নিরাপদ আড়ালে সরিয়ে ফেলা দরকার। ডঃ শোয়াইৎসার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন। সাদা শার্ট পরা স্থানীয় একজন লোক বসে বসে ডকটরের কর্মকলাপ লক্ষ্য করছিল, ঝড় ওঠার আগেই কাজ শেষ করার জন্যে ডকটর তার সাহায্য চাইলেন। লোকটি কিন্তু বসেই রইল, নড়ল না, বলল, 'আমি বুদ্ধিজীবী কাঠ বওয়া আমার কাজ নয়।' তিনবার ডকটরেট ও একবার নোবেল পুরস্কার পাওয়া মনস্বীটি তেমনি কাজ করে যেতে লাগলেন, মুখে শুধু বললেন, 'আমিও চেয়েছিলাম বুদ্ধিজীবী হতে, কিন্তু পারিনি।'

('সায়েন্স টুডে' পত্রিকায় প্রকাশিত আর এল থাম্বান 'হালকা মুহূর্তে' থেকে)

•

পেনিসিলিনের আবিষ্কারক আলেক-জান্ডার ফ্লেমিং একদিন সকালে তাঁর বল্টিমোর হোটেলের কামরা থেকে বেরিয়ে প্রাতরাশ সারতে যাচ্ছেন, দেখলেন সিঁড়ির মুখে দুজন সাংবাদিক দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখে ওরা বিনীতভাবে বলল, 'আপনি এখন কী ভাবছেন বলুন তো? বিরাট একজন বিজ্ঞানী প্রাতরাশে যাবার আগে কী ভাবেন সেটা আমরা জানতে চাই।' আলেকজান্ডার ফ্লেমিং মুখখানাকে যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর করে জবাব দিলেন, 'তা যদি বলেন, একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে এই মুহূর্তে আমি ভীষণ ভাবিত। তা এই যে প্রাতরাশে আমি একটা ডিম খাব, না দুটো।' (উৎস—ঐ)

•

বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসু

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু ২রা জুন তারিখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই বছর। বিগত শতাব্দীর শেষপাদে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে বাংলায় তথা ভারতে বিজ্ঞানের যে স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছিল, দেবেন্দ্রমোহন বসু ছিলেন তারই মহত্তম ঐতিহ্যবাহী। তাঁর মৃত্যুতে বিরাট একটি ছেদ সৃষ্টি হল।

তাঁর জন্ম ২৬ নভেম্বর, ১৮৮৫। আদি বাড়ি মৈমনসিংহে। পিতা মোহিনী-মোহন বসু, আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। মাতা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠা ভগিনী। কাকা আনন্দমোহন বসু, প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস এবং কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট (১৮৯৮)।

শিশুকাল থেকেই বহু মনীষীর সংস্পর্শে এসেছিলেন—যথা, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লোকেন পালিত, সরলা দেবী, চারুচন্দ্র দত্ত, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ।

একুশ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এম, এস-সি পাশ করেন। তারপরে কেমব্রিজে যান, সেখানে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জে জে টমসনের সঙ্গে কাজ করেন। পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়াল কলেজ অব সায়ান্স থেকে বি এস-সি ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফেরেন ও অধ্যাপনা শুরু করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে—এই সময়ে, ১৯১৩ সালে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা ছিলেন বি, এস-সি পরীক্ষার্থী এবং ডঃ ডি এম বসু ছিলেন তাঁদের পরীক্ষক।

১৯১৪ সালের গোড়ায় যান জার্মানিতে। তারপরে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফলে জার্মানিতেই অন্তরীণ থাকেন। কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যেও বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্কের ইনস্টি-টিউটে কাজ করার সুযোগ পান। বিজ্ঞানের জগতে জার্মানি তখন শীর্ষস্থানীয়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক কোয়ানটাম বলবিদ্যার নিয়মকানুন সূত্রবদ্ধ করেছেন। আইনস্টাইন উপস্থিত করেছেন বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (১৯০৫) ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব (১৯১৪)। এই এই জার্মানিতেই পাঁচ বছর বিজ্ঞান গবেষণায় কাটাবার পরে থিসিস সম্পূর্ণ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

তারপরে বিবাহ, ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যার সঙ্গে। দুই ছেলে তাঁর, দুজনেই বিজ্ঞানী।

১৯৩৫ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের 'ঘোষ অধ্যাপক', অধ্যাপক সি ভি রামন চলে যাবার পরে 'পালিত অধ্যাপক' (১৯৩৪-৩৮)।

১৯৩৭-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে। একদিকে পদার্থের মৌলিক কণা ও মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেছেন, অন্যদিকে আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে জৈব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানেও নানারকম কাজ করেছেন।

তাঁর একটি গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটি আয়নিত কণা সম্পর্কিত। এই গবেষণার জন্য তাঁকে যেতে হয়েছিল দার্জিলিং-এর চেয়েও অনেক উঁচুতে—সান্দাকফুতে। এটি এক অসাধারণ কাজ এবং এই কাজেরই ধারা অনুসরণ করে পরবর্তী কালে অধ্যাপক পাওয়েল নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

ফটোগ্রাফিক ইমালসনের সাহায্যে নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি মিউ-মেসন কণার ভর নির্ণয় করেন। এই কৃতিত্বের কথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে।

বিজ্ঞানকে সাধারণ্যে প্রচার করার জন্য তিনি প্রচুর প্রয়াস করেছেন, এবং যেটা তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা—বহু হ[illegible] তৈরি করে গিয়েছেন।

'ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস' রচনার জন্য গঠিত কমিটির তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

নব্বই বছর বয়সেও তাঁর উপস্থিতি ছিল মস্ত এক প্রেরণা। তাঁর তিরোধানে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়।

জয়ন্তকান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু পর মুহূর্তে আবহাওয়াট দারুণ থমথমে হয়ে গেল। স্বাভাবিক। রঞ্জু দেখল —গোপার মুখটা হঠাৎ ছাইয়ের মতন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যেন ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে ও ভাবছে—এই মুহূর্তে এভাবে জানলার কাছে দাঁড়ান রঞ্জুর উচিত হয় নি। রঞ্জু দেখছিল কালো কুচকুচে সাপের মতন বেণীটা কাঁধ বেয়ে ওর বুকের মাঝখানে এসে লুটোচ্ছে। মিনি পোশাক পরা। এত ছোট পোশাকে রঞ্জু আগে ওকে কোনদিন দেখেনি। ওর দুধসাদা উরু দুটো কত মোটা বিশাল দেখাচ্ছিল—ফ্রকপরা থাকলে যা মোটেই মনে হয় না। বাবার পিঠের ওপর চেপে বসে ছিল ও। যেন চার পা হয়ে বাবা মিসেস গাঙ্গুলীর মোজায়াক করা ঠান্ডা তকতকে মেঝের ওপর ঘোড়া সেজেছিল। জানালার দিকে চোখ পড়তে ঝপ করে বাবা সোজা হয়ে দাঁড়াল। গোপা একপাশে সরে দাঁড়াল।

—রঞ্জু তুই এখানে?

—হুঁ। অল্প করে হাসল রঞ্জু। বাবাও আর একটু হাসল। তবে এবার আর তেমন হো-হো শব্দ হল না হাসির।

—আমায় খুঁজতে এসেছিলি?

—হুঁ।

—কেষ্টনগর থেকে এত সকাল সকাল চলে এলি কেন!

—ভাল লাগছিল না।

—আমি জানতাম তোর ভাল লাগবে না। বাবা মাথা ঝাঁকাল। আমাকে ছেড়ে—তোর মা-কে ছেড়ে টুটুনকে ছেড়ে সেখানে তোর ভাললাগা মুশকিল ছিল। তাই না?

—হুঁ। হাতের পিঠ দিয়ে রঞ্জু কপালের ঘাম মুছল। একটা ফড়িং তার কপালের কাছে উড়াউড়ি করছিল।

—আয় ভেতরে আয়। ক্রেমিংগে রঞ্জুকে ডাকো।

গোপা চুপ করে থাকে। ওর দিকে না তাকিয়েও রঞ্জু টের পায় ফ্যাকাসে ভাবটা কিছুতেই কাটছে না মুখের। বাবার চোখে চোখ রেখে রঞ্জু মাথা নাড়ল।

—আমি ভেতরে যাব না। আমি চললাম।

—কোথায় চললি! বাবার চোখে মুখে উদ্বেগ দেখা দিল।

—বাড়ী। রঞ্জু অন্য দিকে তাকাল।

—আমিও তো বাড়ী যাব। না কি আমি বাড়ী ফিরব না? ছোট করে ধমক লাগল বাবা।

—তুমি খেলা করো।

—এই দ্যাখো কি পাগল ছেলে। অমিয় কাতর চোখে ছেলেকে দেখেন। রঞ্জু জানলা থেকে সরে যায়। ওদিকের দরজা ঘুরে তার বাবা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রঞ্জু ঘাড় গুঁজে ফটকের দিকে এগোয়। ছেলের পিছু পিছু হাঁটল অমিয়।

—এই শোন!

—কি বলো? রঞ্জু ঘাড় ফেরায় না।

—আমার ওপর তুই রাগ করছিস মনে হয়। অমিয় দুঃখের গলায় বললেন।

—কি বিচ্ছিরি সন্দেহ! রঞ্জু ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকাল না। রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, তোমার ওপর রাগ করতে আমার বয়ে গেছে কিনা!

অমিয় কথা বলেন না।

গেট পার হয়ে দুজন রাস্তায় চলে এলেন।

—দাঁড়া রিকশা ডাকছি। অমিয় বললেন, এই রোদ্দুরে হাঁটা যাবে না।

—তুমি রিকশা নাও। আমি হেঁটে চলে যাব।

—রঞ্জু, অবাধ্য হয়ো না। এই রিকশা! যেন রাগ করে অমিয় একটা রিকশাওয়ালাকে ডাকেন।

—মুশকিল! অসহায় চেহারা করল রঞ্জু। তবু তুমি আমাকে রিকশায় টেনে তুলবে।

—আরাম করে বাপ-বেটায় এক সঙ্গে বসে যাওয়া যাবে।

—তুমি আমার হাত ছাড়ো। আমি রিকশা চড়তে জানি। আড়াই বছরের শিশু না।

ছেলের হাত ধরতে যাচ্ছিলেন অমিয়। রঞ্জু হাত ছাড়িয়ে নিল। দুজন রিকশায় চাপল। রিকশা ঠুনঠুন এগোয়।

—তোর কি মন খারাপ রঞ্জু?

—না তো। রঞ্জু কপাল কুঁচকালো। কোথায় তুমি আমার মন খারাপ দেখছ।

—বাঁয়ে যাও রিকশাওয়ালা। ম্যান্ডেভিল-গার্ডেনস মালুম হ্যায়!

—হ্যাঁ বাবু।

—অমবুঝা নিলয়।

—হ্যাঁ, বাবু।

—রঞ্জু, তোর কি শরীর খারাপ করেছে? অমিয় আবার প্রশ্ন করল।

—আঃ কেন আমায় বিরক্ত করছ! রঞ্জু ভুরু কুঁচকোয়। আমার শরীর খারাপ হতে যাবে কোন দুঃখে।

—মুখটা শুকনো দেখছি।

—আমার মুখ সব সময় শুকনো।

—কপালটা দেখি। চোখ দুটো কেন ছলছল করছে। ছেলের কপাল ধরতে অমিয় হাত বাড়াল।

—এই খবরদার! তুমি আমার কপালে হাত দেবে না।

—কেন, আমি কি তোর কপালে হাত দিতে পারি না? আমি তোর বাবা। দেখি মনে হয় তোর গা গরম হয়েছে।

—আমার গায়ে হাত দিলে ঘুষি মেরে তোমার নাক ফাটিয়ে দেব।

—ইস! কি ছেলে হয়েছিস আজকাল তোরা সব।

—হুঁ, খুব বাবা হয়েছ আজকাল তোমরা সব। রঞ্জু গজগজ করে উত্তর করল।

আঘাত দেবার মতন কথা। অমিয় কি খুব আঘাত পেলেন? ফ্যালফ্যাল করে ছেলেকে দেখেন। কিন্তু ছেলে আর তাকায় না। দু হাতে মুখ ঢেকে ঘাড় গুঁজে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

—এই খোকা! অমিয় স্তব্ধ। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই কি হয়েছে আমার বল তো। বাবাধন— লক্ষ্মী ছেলে! আমার দিকে তাকা! কেষ্টনগর থেকে খুঁইয়ের সঙ্গে ঝগড়া-টগড় করে চলে এসেছিস? কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল শুনি?

রঞ্জু শব্দ করে না, ঘাড় তোলে না।

—দেখি—ইস কি ভীষণ ঘেমেছিস! ছেলের মাথার পিছনে অমিয় হাত রাখেন।

—আবার আমার গায়ে হাত দিচ্ছ! মুখ থেকে হাত সরিয়ে জলজলে চোখে রঞ্জু বাবাকে দেখল। ঘাড় সোজা করে বসল।

এবার অমিয় ঘাবড়ে যান। এক সঙ্গে ছেলের চোখে জল ও আগুন দেখতে পান। চুপ করে কিছু ভাবেন। তারপর বিড়বিড়

করে বলেন,—গায়ে যখন জ্বর দেখছি না—এই গরমে সুজনিটা জড়িয়ে আছিস কেন—কেবল ঘামছিস।

—আমার ভাল লাগছে। ঘাড় ফিরিয়ে রঞ্জু রাস্তা দেখে। একটুখানি দেখার পর আবার বাবার দিকে চোখ ফেরায়। তারপর আকাশের দিকে চোখ তুলে শক্ত গলায় বলে আমার ভাল লাগছে না তবু এটা আমাকে গায়ে জড়িয়ে রাখতে হবে।

—কি পাগল ছেলে দ্যাখো! অমিয়র চোখ মুখে আঘাত পাওয়ার কষ্টটা লেগে আছে। তবু হাল্কা গলায় হাসেন। দে আমার হাতে দে ওটা—ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখি। সুজনিটা সুন্দর। ভোরবেলা শীত করছিল বুঝি গায়ে চাপিয়ে দিয়েছিল? তারপর ওটা আর ছাড়া হয় নি।

—হুঁ এটার নীচে একটা রিভলবার লুকোনো আছে।

—অ্যাঁ! আঁতকে উঠতে গিয়ে অমিয় কুলকুল করে হেসে ওঠেন। রিভলবার পেলি কোথায়? মস্তান হয়েছিস তুই? বাবার সঙ্গে রগড় করা হচ্ছে—বাবাকে ভয় দেখান হচ্ছে। তাই না?

ঠোঁট ও চোয়াল শক্ত করে রাখে রঞ্জু।

—অম্বুজা-নিলয়ের ছেলে। নাক টিপলে দুধ গলে। অমিয় আবার বলেন, তোর কাছে রিভলবার। হেসে বাঁচিনে।

—যখন বের করে দেখাব তখন টের পাবে তখন বুঝবে।

—রিভলবার দিয়ে কি করবি শুনি? অমিয় আদরে গলায় শুধোলো।

—যে পাপ করে তাকে খুন করব। রঞ্জু এক নিশ্বাসে উত্তর করল।

—আমি পাপী আমাকে খুন করবি! তোর মন তাই বলছে? নাকের শব্দ করে অমিয় হাসেন। বাবাকে খুন করতে তোর হাত উঠবে?

রঞ্জু কথা বলে না। কাঠের মতন শক্ত হয়ে থাকে।

—এই রিকশাওয়ালা। অমিয় চেঁচিয়ে ওঠেন। গলার স্বরে তিক্ত ঝাঁজ। রোখো!

রাস্তার পাশে অম্বুজা-নিলয়। লোহার গেট জুড়ে মাধবীলতার সবুজ বাহার। অমিয় এ-পাশ দিয়ে রিকশা থেকে নামেন। রঞ্জু লাফিয়ে উল্টো দিক দিয়ে নেমে পড়ল।

—থোকা একটু দাঁড়া। রিকশার দামটা মিটিয়ে দেই। তোর সঙ্গে ভীষণ দরকারী কথা আছে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে অমিয় ত্রস্ত আঙুলে পয়সা তোলেন গোনেন। তারপর রিকশাওয়ালাকে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান। রঞ্জু কিন্তু দাঁড়ায় না। গেট পার হয়ে ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

অসহায় চোখে অমিয় সেদিকে চেয়ে থাকেন। হঠাৎ কেমন দুর্বলবোধ করেন। মুখটা অতিরিক্ত শুকনো দেখায় কালো দেখায়। বিড়বিড় করে নিজের মনে কিছু যেন বলেন। তারপর ঘাড় নিচু করে মাধবী ঝোপের তলা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকেন।

জুতোর ঠুক ঠুক শব্দ কানে আসে। সিঁড়ি বেয়ে রঞ্জু ওপরে উঠে যাচ্ছে। হরিণের মতন তীব্র গতি। কিছুতেই তাকে ধরা গেল না। চিন্তা করে আরও বেশী হতাশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন অমিয়। যেন দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে তাঁর পা উঠছিল না। কপালের দুটো রগ টিপটিপ করছিল। বুকের মধ্যে অসম্ভব ঢিবঢিব আওয়াজ।

•

—এই যে অমিয়। বঙ্কিমবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তোমার জন্য বসে আছি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

—কি ব্যাপার! অপ্রস্তুত হয়ে অমিয় থমকে দাঁড়ান।

—এই দ্যাখো এই দ্যাখো। হাতের কাগজটা ছেলের চোখের সামনে মেলে ধরেন বুড়ো। লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া জায়গাটা আঙুল দিয়ে টিপে ধরেন। অমিয়র চোখের পলক পড়ে না। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার রেজাল্ট। রঞ্জু তিনটে লেটার পেয়েছে। তার রোল-নাম্বারের পাশে তারকা চিহ্ন।—তার মানে রঞ্জু ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে গেল! অসম্ভব ভাল ফল করেছে ও দেখছ। যা আশা করা যাচ্ছিল না। অমিয়র মুখে হাসি ফুটল।

—তুমি আশা কর নি। আমি বরাবরই এমনটা আশা করেছি। আহ্লাদে বঙ্কিম দত্ত প্রায় নাচতে থাকেন। আমার নাতি—অম্বুজা-নিলয়ের সন্তান। আমার এই সাজান বাগানের একটি ফুলও ব্যর্থ হবে না। একটি ফল নষ্ট হবে না। অনেক দিন তোমায় বলেছি, আমার দাদু রঞ্জু অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করবে—আমি প্রথম থেকেই জানতাম। শ্বশুরের গলা শুনে নীহার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল। সঙ্গে টুটুন। টুটুন ছুটে এসে অমিয়র হাত ধরল।

—সারাদিন কোথায় ছিলে বাবা! টুটুনের মুখে হাসি ধরছিল না। দাদা স্টার পেয়েছে। ফিজিকস অঙ্ক আর বায়োলজিতে লেটার। একটু আগে খবরটা পেয়েই দাদু ছুটে গিয়ে গেজেট কিনে এনেছে।

—আমি এই মাত্তর বৌমাকে বলছিলাম। বঙ্কিম দত্তর রুদ্ধশ্বাস ভাবটা কাটছিল না। অমিয়র চোখে চোখ রেখে জোরে মাথা ঝাঁকালেন। আজই এখনই কেষ্টনগর একটা টেলিগ্রাম করে দাও। রঞ্জু চলে আসুক। এসে তার রেজাল্ট দেখুক।

—হুঁ টেলিগ্রাম। ঢোক গিলে অমিয় তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, টুটুনকে দেখলেন তারপর বুড়োর দিকে চোখ রেখে মাথা নাড়লেন। না। না টেলিগ্রাম কেন। কথা বলার সময় অমিয়র ঠোঁট কাঁপল।

—কোথায় ও! নীহার চমকে উঠল। টুটুন পিটপিট করে বাবার মুখটা দেখল। বঙ্কিমবাবু অবাক।

—তুমি কি করে জানলে আমার দাদু কলকাতায় ফিরেছে। কার কাছে শুনলে? বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করলেন।

—শুনবে কেন! অমিয় হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। আমার সঙ্গে ওর রাস্তায় দেখা। এই মাত্তর দুজনে একসঙ্গে বাড়ী ঢুকলাম। আমার আগে আগে ও ওপরে উঠে এসেছে। তোমরা কি দেখ নি? এই তো দু মিনিটও হয় নি।

সে কি কথা! বঙ্কিমবাবু পুত্রবধূর দিকে তাকান। আমি যে সেই তখন থেকে বারান্দায় বসা। কৈ. দাদুকে দেখলাম না তো।

—আমিও তো পাঁচ মিনিট আগে আপনার হাত থেকে গেজেটখানা নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। শ্বশুরের দিকে চোখ রেখে উদ্বেগের গলায় নীহার বলল, আমি রঞ্জুকে দেখি নি।

—আমি কিন্তু জুতোর শব্দ শুনেছি। টুটুন বলল এই তো একটু আগে।

তবে বোধ করি বারান্দার ওধার দিয়ে ঘুরে দাদু তার পড়ার ঘরে ঢুকেছে। ত্রস্ত গলায় বঙ্কিমবাবু বললেন, এসো।

বঙ্কিমবাবু আগে আগে হাঁটেন। পিছনে নীহার। তার পাশে টুটুন। অমিয় সকলের শেষে। ক্লান্ত ভারী পা। যেন হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

—দাদু! দাদু নাতির পড়ার ঘরের দরজায় পৌঁছে বঙ্কিমবাবু চেঁচিয়ে ডাকেন। পাল্লার গায়ে হাত রাখেন। দেখেন ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। সাড়া-শব্দ নেই। দাদু! তিনি আবার ডাকেন। তারপর নিরস্ত হন। ব্যাপার কি! বৌমা তুমি ডাকো তো।

—রঞ্জু! এই রঞ্জু নীহার চেঁচিয়ে ডাকল। হাত দিয়ে জোর দরজায় ধাক্কা দিল। দুবার কড়া নাড়ল।

—এই দাদা! গলা ফাটিয়ে টুটুন ডাকল। তোর রেজাল্ট বেরিয়েছে—তুই তিন সাবজেকটে লেটার পেয়েছিস। ফিজিকস অঙ্ক ও বায়োলজি—শিগগির বেরিয়ে এসে দ্যাখ। এই তো দাদুর হাতে গেজেট রয়েছে।

—অমিয়! বঙ্কিমবাবু ছেলের দিকে ঘাড় ফেরান। রঞ্জু ... কেষ্টনগর থেকে রাগ-টাগ করে চলে এসেছে! রাস্তায় তোমাকে কিছু বলছিল?

—নাঃ। নিস্পৃহ উদাস ভঙ্গী অমিয়র। আস্তে মাথা নাড়েন। সেই ধরনের কিছু বলে নি আমাকে।

—আচ্ছা, তুমি একবার ডাকো। আমার মনে হয় তোমার ডাক শুনলে আমার দাদু ঠিক দোর খুলে বেরিয়ে আসবে। তোমাকে ও ভালবাসে। বঙ্কিমবাবু দরজা থেকে সরে দাঁড়ান।

—আমার মনে হয় না আমার কথা শুনবে। আমি ডাকলেই রঞ্জু বেরিয়ে আসবে। হতাশ গলায় অমিয় বললেন। বলে ফ্যাল ফ্যাল করে খিল আঁটা দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—কেন, একথা বলছ কেন? নীহার ভুরু কুঁচকে স্বামীর মুখটা দেখল। যেন কিছু একটা সন্দেহ তার মনে উঁকি দিয়েছে। তুমি কি রাস্তায় খোকাকে কিছু নিয়ে গালমন্দ করেছিলে?

অমিয় ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকেন।

—রঞ্জু এই রঞ্জু দরজার দিকে তৎক্ষণাৎ

সকলের
মুখে মুখে !
WILLS
VIRGINIA
WILLS
W.D.& H.O.WILLS
WILLS
VIRGINIA
FILTER
HT-WYF-8J68 2
উইলস্-এর নামডাক যেমনি
২ টাকায় ২০টা, ১ টাকায় ১০টা স্থানীয় কর সাপেক্ষ,
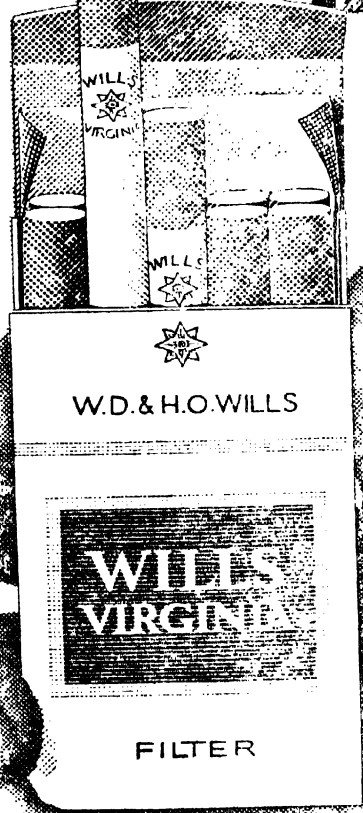
ঘুরে দাঁড়িয়ে নীহার অস্থির উদ্বেল গলায় আবার ছেলেকে ডাকল। লক্ষ্মী সোনা আমার, বাবা—বেরিয়ে আয়—এসে দ্যাখ তুই কত ভাল রেজাল্ট করেছিস পরীক্ষায়। তোর দাদু গেজেট কিনে এনেছে।

—রেজাল্ট দেখে আমার কি হবে। ভিতর থেকে রঞ্জু উত্তর করল, এই প্রথম তার গলার স্বর শোনা গেল। রেজাল্ট দেখতে আমার একটুও ভাল লাগছে না মা।

—সে কি! একথা বলছিস কেন? নীহারের দু চোখ ছলছল করে উঠল। কি হয়েছে আমায় সত্যি করে বল তো বাবা। আমি তোর মা। আয় বেরিয়ে আয়। আমি সব শুনব।

আর সাড়া নেই।

—দাদু দাদু বঙ্কিমবাবু ডাকলেন। বন্ধ দরজার সামনে ঝুঁকে কড়া নাড়লেন। তোমাকে একটা দামী ক্যামেরা কিনে দেব বলেছিলাম—মনে আছে ভাই। আমি আজই কিনে দেব ওটা। বিকেলে চা খেয়েই তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তুমি দোরটা খুলে দাও।

—ক্যামেরা আমার দরকার নেই। উদাস গলা রঞ্জুর।

—কেন তুই এমন করছিস। কারণটা কি? কান্নার মতো শোনায় নীহারের গলা। আয়, বেরিয়ে আয় মানিক—আমি তোকে রিস্ট-ওয়াচ কিনে দেব—ভাল সুট বানিয়ে দেব। কলেজে যাবি। স্কলারশীপ পাওয়া ছেলে—তোকে দিয়ে আজ আমার কত গর্ব!

—কলেজে পড়া আর আমার হল না মা।

—ইস, কেন এসব বলছিস—কেন মিছি-মিছি আমার মাথা গরম করছিস। কেষ্টনগরে যূঁইয়ের সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েছিল? ও তোকে কিছু বলেছে?

—না।

—তবে?

—আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না মা।

—ওফ! আমি পারছি না — আপনারা ওকে ডাকুন, বুঝিয়ে বলুন। শ্বশুরের দিকে চোখ রেখে নীহার আর্তনাদ করে উঠল। আমার দুধের বাচ্চার মুখে এ-কথা কেন। রঞ্জু! দরজায় গায়ে চোখ ঠেকিয়ে নীহার আকুল গলায় আবার ডাকল, তোর এতটা দুঃখ পাবার কারণ কি। কিসের অভি-মান তোর মনে আমার কাছে খুলে বল। আমি তোর মা।

—বাবাকে জিজ্ঞেস করো। বাবা সব বলবে।

—অ্যাঁ! নীহার চমকে উঠল। বঙ্কিম-বাবু স্তম্ভিত। টুটুন খুঁটিয়ে অমিয়-বাবুকে দেখতে লাগল।

—এই শুনছ! স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল নীহার। কঠিন দৃষ্টি। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। সত্যি করে বলো খোকা এ বলছে কেন? একটা কথাও আমার কাছে গোপন করতে পারবে না।

—না, গোপন করব না। অমিয় দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন। বারান্দার রেলিংয়ের দিকে চোখ রেখে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কাঁকুলিয়া রোড মিসেস গাঙ্গুলীর বাড়ীতে আমার সঙ্গে ওর দেখা। কেষ্টনগর থেকে ফিরে দুপুরে রঞ্জু সোজা সেখানে চলে যায়।

—তারপর? রুদ্ধশ্বাস নীহার প্রশ্ন করল। দুজনে ওখানে গিয়েছিলে কেন।

অমিয় চুপ করে থাকেন। আর কিছু বলেন না।

—রঞ্জু! অধৈর্য হয়ে নীহার আবার দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর কি হল শুনি?

—বাবা বলবে, বাবা জানে। ওকে জিজ্ঞেস করো।

—বাবা কিছু বলছে না। চুপ করে আছে তুই কি শুনছিস না। নীহারের গলায় তিক্ততা ফুটল।

—তুই বল দাদা। বাবা একেবারে মুখ খুলছে না। এবার টুটুন চেঁচিয়ে উঠল।

—দাদু তুমি বলো। বঙ্কিমবাবু দরজার সামনে ঝুঁকে দাঁড়ান। হুঁ, মিসেস গাঙ্গুলীর বাড়ি, তারপর কি হল শুনি?

—আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে মা? ভিতর থেকে রঞ্জু কেমন করে যেন হাসল। আমার উত্তর শুনলে তোমরা সুখী হবে?

—নিশ্চয়। একশবার। নীহারের দু' চোখ চকচকে হয়ে উঠল। তোর কথাই তো সব মাণিক। তোর উত্তর শুনলে আমার বুক ঠাণ্ডা হবে।

—হ্যাঁ, তুমি বলো দাদু। তুমি আমাদের জানিয়ে দাও। বঙ্কিমবাবু গাঢ় নিঃশ্বাস ফেললেন।

—আচ্ছা তবে তাই হবে। বাবা যখন কিছু বলবে না আমাকেই উত্তরটা দিতে হবে।

তিনজন বাইরে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ঘাড় গুঁজে অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে অমিয় হাতের নখ খোঁটেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রঞ্জুর ছোট পড়ার ঘরে প্রচণ্ড শব্দ হল। যেন বাজ ভেঙে পড়ল। ছাদ দেওয়াল সিঁড়ি বারান্দা দরজা জানালা নিয়ে অম্বুজা-নিলয়ের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী থর থর কেঁপে উঠল। এক সেকেণ্ড। তারপর সব চুপ। তারপর শ্মশানের স্তব্ধতা নিয়ে বাড়ীটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে। কেবল ছোট্ট ঘরটার ভিতর একটা ক্ষীণ গোঙানীর শব্দ হয়। দরজার বাইরে দাঁড়ান চারটি মানুষের মুখ কাগজের মতন সাদা হয়ে যায়। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারে না। তাদের হৃৎপিণ্ডের ধড়াস ধড়াস থামতে অনেক দেরী হয়। এমন সময় নীচে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা সিঁড়ি বেয়ে এক সময় দোতলার বারান্দায় উঠে আসে। রেবার ননদ যূঁই।

—রঞ্জু এসেছে? একসঙ্গে চারটি মুখের দিকে চোখ রেখে যূঁই প্রশ্ন করল। রঞ্জু কোথায়?

কারো মুখে শব্দ নেই। কেউ উত্তর দেয় না।

—রঞ্জু কি ভয়ানক কাণ্ড করেছে আপনারা জানেন না! চাপা ত্রাসের গলা যূঁইয়ের। আমাদের রিভলবারটা নিয়ে সে পালিয়ে এসেছে।

—এবার চারজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। এখন আর মুখগুলি কাগজের মতন সাদা নেই। কালো হয়ে গেছে।

—আশ্চর্য। যূঁইয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছিল, আপনারা কেউ কথা বলছেন না। ডাকাতি করে ছিনতাই করে এমন সব দলে রঞ্জু মিশে যাচ্ছে আপনারা টের পাচ্ছেন না।

—নো নেভার! এতক্ষণ পর বঙ্কিম-বাবু মুখ খুলতে পারলেন। এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমার নাতী আমার বংশধর...

—তা হলে আমি বলব নকশালদের দলে ভিড়েছে ও। উত্তেজনায় যুঁই কাঁপছিল। না হলে রিভলবার চুরি করবে কেন। বিপ্লব করতে চাইছে আপনাদের ছেলে।

—না না না! সকলকে অবাক করে দিয়ে অপ্রকৃতস্থের মতন হেসে ওঠেন অমিয়। জোরে মাথা ঝাঁকান। রঞ্জু আমার বিচার করতে চাইছিল যূঁই—হুঁ এক হিসেবে বিপ্লবই—মহাবিপ্লব — বাপের অপরাধের বাপের পাপের বিচার...

চার জোড়া বিস্ফারিত চোখ তাঁর কাণ্ড-কারখানা দেখতে থাকে। রেলিংয়ের ওপর দিয়ে শরীরটা নীচে ঝুঁকিয়ে দিতে অমিয় হুমড়ী খেয়ে পড়েন।

—এই এই অমিয়! ব্যাপারটা বুঝতে এক সেকেণ্ড দেরী হয় না বঙ্কিমবাবুর। ছুটে গিয়ে দু হাতে ছেলেকে জাপটে ধরেন। এ তুমি করছ কি?

—খোকা আমাকে শা[illegible] দিতে পারল না বাবা, আমারি বিচা[illegible] এখন আমি করছি হি-হি। বাগানে লাফিয়ে পড়ছি।

—আমি দেখব। আমি বিচারক। কে কতটা দোষ করল অপরাধ করল সেটা আমি বুঝব। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল বঙ্কিম-বাবুর। থর-থর করে কাঁপছিলেন। তুমি রেলিঙ থেকে সরে এসে। হিসহিস করে বলেন তিনি।

হো হো হো। এবার আরও জোরে হেসে ওঠেন অমিয়। দেখা যায় হাসির সঙ্গে তাঁর দু চোখ জলে ছপছপ করছে।

—তুমি কোর্টের বিচারক ছিলে বাবা। আদালতের জজ। এখানে অম্বুজা-নিলয়ের একটা বিরাট গাছ। ভাল কথায় বনস্পতি। হুঁ, দূষিত বনস্পতি—বিষবৃক্ষ। তার ফল আমি—আমরা।

জোর করে বুড়োর হাতের বেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অমিয় আবার রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়েন।

ঘরের ভিতরে যন্ত্রণার অস্পষ্ট গোঙানিটা তখন একেবারে থেমে গেছে।

— শেষ —

লর্ডসের লর্ড

ক্রিকেটের অন্য নাম 'লর্ডস গেম' রাজার খেলা, বিত্তবান সম্প্রদায়ের অবসর যাপনে এক আনন্দ অনুষ্ঠান— কথাগুলি অনেককাল ধরেই আমরা শুনে আসছি। একই কথা নানা কণ্ঠে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হওয়ায় উচ্চারিত অভিমতগুলি যেন বিশ্বাসযোগ্য চেহারাও ধরে নিতে পেরেছে।

কিন্তু সত্যিই কি ক্রিকেট শুধুমাত্র ইংলন্ডের লর্ড সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, না আজও আছে? রাজা ও রাজকুমারেরা প্রতিনিয়তই কি মহানন্দে এই খেলা খেলতেন অথবা অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা জানাতে এগিয়ে আসতেন? প্রশ্নগুলির উত্তর হাতড়াতে গেলে মাঝে মাঝে অবাক হতে হয়।

ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাস কতো খেলোয়াড়ের নামই তো সযত্নে তার অঙ্কে ধারণ করে রেখেছে। কিন্তু কই সেখানে লর্ডদের অস্তিত্ব কোথায়! ইতিহাসের পাতায় পাতায় অবিস্মরণীয় ক্রিকেটারের অভিধায় যাঁরা অভিনন্দিত তাঁদের প্রায় সবাই সাধারণ মানুষ অথবা স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। নামমাত্র দু-একজনই ব্যতিক্রম যা। প্রথম যুগে গড়ে ওঠার ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ইংলন্ডের গ্রামে গঞ্জেও ক্রিকেটের আসর পাতা হয়েছে। নাক উঁচু শহরে মন সেগুলিকে গ্রাম্য ক্রিকেট বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও গ্রামীণ ক্রিকেটও যে সেকালের পটভূমিকায় সত্যিকারেরই ক্রিকেট ছিল তাতেই বা সন্দেহ কি।

ইংলন্ডের কজন রাজা বা রাজকুমার ক্রিকেটে হাত পাকিয়েছিলেন, অকাতর ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রিকেটের সুষ্ঠু আয়োজনের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন জানি না। তবে একথা জানি যে ক্রিকেটের নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে দেশের তরুণ সম্প্রদায় যাতে সমর বিদ্যাভ্যাসে অনাগ্রহী হয়ে না ওঠে তার জন্যে একদা রাজাজ্ঞায় ইংলন্ডের মাঠে মাটিতে ক্রিকেট খেলা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

তবু ক্রিকেটের পরিচিতি লর্ডস গেম বলেই। কেন? সেই কথাটিই আজ বুঝে নেওয়া যাক।

লর্ডেরা খেলেন বা খেলতেন বলে নয়, আসলে লর্ডস মাঠে ক্রিকেটের রাজ্যপাট সাজানো হয়েছে বলেই খেলাটির সংজ্ঞা লর্ডস গেম। লর্ডস মাঠই ক্রিকেটের তীর্থভূমি ও ধাত্রীগৃহ। লর্ডসের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, তার পরিচিতি ব্যাপক। আদিকাল থেকেই এই মাঠ ক্রিকেটকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করে আসছে। ক্রিকেটের প্রসার ও প্রচারে এবং উন্নয়নে লর্ডসের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

লর্ডস মাঠের নামকরণ কোনো বিত্তবান লর্ড পরিবারের প্রতিনিধির স্মৃতিরক্ষায় নয়, ইংলন্ডের এক সাধারণ নাগরিকের অবদানকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সংকল্পেই। এই মাঠ ছিল যাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিনি ছিলেন প্রকৃত ক্রিকেট প্রেমিক। তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি যাতে চিরন্তন ক্রিকেট মাঠ হিসেবেই টিকে থাকে তার জন্যে তাঁকে বহুতর পরিস্থিতির এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই চালাতেও হয়েছে। বিবিধ সংকটের বেড়াজাল টপকে তিনি মাঠটিকে ক্রিকেটীয় ক্রীড়াঙ্গনরূপে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন বলেই ভদ্রলোক ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয়।

এই ক্রিকেট প্রেমিকের নাম টমাস লর্ড। জন্ম ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে আজ থেকে দুশ কুড়ি বছর আগে। ক্রিকেটের তীর্থভূমির নামকরণ হয়েছে তাঁরই স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে। লর্ডের নামাঙ্কিত মাঠই ক্রিকেটের দেবালয়। ক্রিকেটও লর্ডস গেম, যেহেতু খেলাটি হলো সাধারণ মানুষ টমাস লর্ডের মানসপুত্র, আপনজন। লর্ড সম্প্রদায়ের কারুরই তেমন আত্মজ নয়। টমাস লর্ডের নামের সঙ্গে বিত্তবান লর্ড সম্প্রদায়ের আত্মীয়তা নিবিড় করে ফেলা হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রেই।

টমাস লর্ড নিজে খেলতেন কিনা জানা যায় নি। তবে ক্রিকেট যে ভালবাসতেন তাতে আর সন্দেহ কি! ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ডরসেট স্কোয়ার অঞ্চলে তিনি প্রথম খেলার মাঠ গড়ে ক্রিকেটারদের মাঠটি ব্যবহারে অনুমতি দেন। পরে মাঠটিকে সরিয়ে নিয়ে যান নর্থ ব্যাঙ্ক সীমানায়। বছর পাঁচেক নর্থ ব্যাঙ্কস্থ মাঠে খেলা চলার পর ১৮১৪ সালে টমাস লর্ড ক্রিকেট মাঠটিকে আবার স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। কারণ ওই সময় রিজেন্টস খাল কেটে নগর কর্তৃপক্ষ নর্থ ব্যাঙ্ক অঞ্চলকে ফালাফালা করে দেন। ১৮১৪ সাল থেকে লর্ডস মাঠ বর্তমান জায়গায় রয়েছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব এই মাঠের স্বত্ব কিনে নিয়ে লর্ডসেই ক্রিকেটের সদর দপ্তর স্থাপন করেন।

ক্রিকেটের প্রয়োজনে মাঠটিকে বাঁচিয়ে রাখতে টমাস লর্ডকে এক সময় আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছে। অর্থ সংকট মোচনে হয়তো তাঁকে লর্ডসের ভূমি স্বত্ব অন্যের হাতে তুলেও দিতে হোত যদি না ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের উইলিয়াম ওয়ার্ড পাঁচ হাজার পাউন্ডের একটি চেক ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে টমাস লর্ডের হাতে তুলে দিতেন। তখন বড্ড টানাটানি টমাসের। কিন্তু মাঠ গেলে ক্রিকেটের সর্বনাশ হয়ে যাবে এই ভাবনাতেই উইলিয়াম ওয়ার্ড বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিয়ে ক্রিকেটের পরম উপকার করে গেছেন।

রাজ সম্মানে সম্মানিত কোনো চরিত্র নয়, আসলে ইংলন্ডের এক ছাপোষা নাগরিক টমাস লর্ডই হলেন লর্ডস মাঠের প্রকৃত লর্ড। তবে যে উদ্দেশ্যে টমাস লর্ড তাঁর সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন সেই উদ্দেশ্যসাধনে সফল ক্রিকেটাররা লর্ডস মাঠে নায়কের ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে অন্য অর্থে লর্ড নামে অভিহিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠাতা টমাস লর্ড লর্ডসের চিরন্তন লর্ড। আবার নিজেদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নে অন্যেরাও লর্ডসের লর্ড। ক্রিকেটের মহলে কৌলিন্য গর্বে গর্বিত এমনি এক লর্ড-চরিত্রকে আমরা অতি সম্প্রতি আবিষ্কার করে খুসী হয়েছি ওই লর্ডস মাঠেই। দেখে, সন্তুষ্ট ও তৃপ্তবোধ করে সমকালীন ইতিহাসও তাঁকে লর্ডসের লর্ড নামে অভিহিত করেছেন। এর নাম ক্লাইভ লয়েড। অন্য মুলুকের মানুষ। তবু তিনি আমাদের পরম পরিচিত।

লয়েডের কথায় পরে আসছি। তার আগে স্মরণ করে নিই সেইসব পূর্বসূরীদের যাঁরা নিজেদের দক্ষতার প্রকাশে এবং প্রতিভাত ব্যক্তিত্বে কালে কালান্তরে লর্ডস মাঠে লর্ডের মতোই বিচরণ করেছেন।

স্মৃতিমন্থনের কাজ সহজ নয়। লর্ডস সুপ্রাচীন ক্রিকেট মাঠ। অনেকেই খেলেছেন সেখানে। লর্ডসের ঘাসে ঘাসে অনেক কীর্তির স্বাক্ষর আজও জ্বলজ্বল করছে। কীর্তিমান সকলকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় সীমায়িত করা সম্ভবও নয়। নামোল্লেখ করলে অনেকেই বাদ পড়ে যেতে পারেন। বাদ পড়ার ভয় সত্য। তবু কয়েকটি দৃষ্টান্ত ভোলবার নয়।

যথা জ্যাক হবসের অপরাজিত ৩১৬ রাণ। ১৯২৬ সালে কাউন্টি লীগের খেলায়

সান্দ্রের হবস এই রাণ করে আগের বছরে ইয়র্কশায়ারের পার্সি হোমস প্রতিষ্ঠিত লর্ডসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড (অপরাজিত ৩১৫) ভেঙ্গে দেন। দূর অতীতে ওইদিনে লর্ডসে হবসকে দেখে, তাঁর ক্রীড়াকৃতির মূল্যায়নে সাংবাদিক সমালোচকরা কি লিখেছিলেন জানি না। তবে অনুমান করতে পারি যে বিশ্ব কাপ ক্রিকেট ফাইনালে ক্লাইভ লয়েডকে সে লেখনী লর্ডসের লর্ড বলে অভিহিত করেছে সেই লেখনী হবসের বেলাতেও নিশ্চয়ই নিরুচ্চার থাকে নি।

হবস আর হোমস ছাড়া লর্ডসে আর কেউই বোধহয় তিনশ রাণ করতে পারেন নি, তবে কাছাকাছি এগিয়েছিলেন আরও একগণ্ডা ব্যাটসম্যান। যথা অস্ট্রেলিয়ার বিল পনসফোর্ড (অপরাজিত ২৮১ এম সি সির বিরুদ্ধে) স্যার ডন ব্রাডম্যান (২৭৮ এম সি সির বিরুদ্ধে) এম সি সির ডবলিউ ওয়ার্ড (২৭৮ রফোকের বিরুদ্ধে) এবং মিডলসেক্সের প্যাটসি হেনড্রেন (অপরাজিত ২৭৭ [illegible] বিরুদ্ধে)। লর্ডসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বোচ্চ স্কোরের নজীর [illegible] ক্লাইভ ওয়ালকটের অপরাজিত ১৬৮। তাছাড়া [illegible] হেডলিও ক্রিকেটের তীর্থভূমিতে একবার একটি টেস্টের উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছিলেন।

লর্ডস মাঠে স্মৃতি চারণের প্রয়াসে ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীরাও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন। কারণ এই মাঠে এক ভারতীয় ক্রিকেটার একদিন অভিজাত ক্রিকেটারদের কৌলীন্যকে বুক ফুলিয়ে দুনিয়ার দৃষ্টি নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর নাম ভিনু মানকদ।

স্মরণ করুন ১৯৫২ সালের সেই কাহিনী।

সেই মরশুমের প্রথম [illegible]

[illegible]

এক ভিনু সেই [illegible] ৭২ ও ১৮৪ রান [illegible] ছিলেন মাঠে। হয় [illegible] বোলার অথবা [illegible] হিসেবে। মোট পঁচিশ ঘণ্টার খেলায় কুড়ি ঘণ্টা তিনি নিজে পরিশ্রম করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে লর্ডসের সেই আসরে ভিনু ছিলেন অবিসংবাদী লর্ড। তাঁর এই ভূমিকা ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেটের গর্বেরও শেষ নেই যেন।

তারও আগে ভারতীয় ক্রিকেটের পরম পুরুষ সি কে নাইডুকে আমরা ১৯৩২ সালে লর্ডস মাঠে প্রথম আবির্ভাব লগ্নে এম সি সি-র বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করতে দেখেছি। [illegible] পিবলসের বলে এক ডজন বাউন্ডারী এবং ওভার বাউন্ডারী হাঁকিয়ে যিনি সেদিন ১১৮ করার পর মাত্র একত্রিশ রানে এম সি সির চারজনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেই সি কে নাইডুও ছিলেন তাৎক্ষণিক মূল্যায়নে সেদিনের লর্ডসের আর এক লর্ড।

ক্রিকেটের নড়োরা তীর্থভূমি লর্ডসে কালে কালান্তরে নিজেদের মহিমায় বিরাজ করেছেন। তাঁদের অভিজাত ক্রীড়াশৈলীর

স্পর্শে ক্রিকেটের ঐশ্বর্য বেড়েছে। তাঁদের প্রাণময় ব্যক্তিত্বের উষ্ণ ছোঁয়ায় ক্রীড়ানুষ্ঠানও প্রাণবান হয়েছে। এক কথায় সুপ্রাচীন ক্রীড়াভূমি লর্ডসকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করায় ক্রিকেটের লর্ডেরাই মহনীয় নায়কের ভূমিকা নিয়ে নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। এই ইতিহাসই ক্রিকেটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মন ও প্রাণ মাতানো সম্পদ। এই সম্পদ না পাওয়া গেলে ক্রিকেট তো নিছক এক খেলাতেই পর্যবসিত হয়ে যেতো। রূপে রসে বর্ণসম্ভারে সেজে এমন বিচিত্র সৌন্দর্যের হাতছানি জাগাতে পারতো কি!

ক্রিকেটের লর্ডকুলের জনকয়েক পূর্বসূরীদের আমরা স্মরণ করেছি। এবার অতি সাম্প্রতিক এক দৃষ্টান্তের দিকে নজর ফেরানো যাক। এই দৃষ্টান্ত গড়ে উঠেছে একালের এক সমর্থ ক্রিকেটার ক্লাইভ লয়েডকে ঘিরে, তাঁর ক্ল্যাসিকাল ক্রীড়ারীতির বর্ণময় শোভাকে কেন্দ্র করে।

লর্ডসে সেদিন প্রুডেনসিয়াল বা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা। একদিনের মেয়াদী খেলা। এক একটি ইনিংস ষাট ওভারে সীমাবদ্ধ। ষাট ওভারে যে দল বেশি রান করবে বিশ্বকাপ বিজয়ীর সম্মান তিলক সেই দলের কপালেই আঁকা হয়ে যাবে। খেলতে নেমেছে লয়েড পরিচালিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইয়ান চ্যাপেলের নেতৃত্বাধীনে অস্ট্রেলিয়া দল।

আগের সপ্তাহে এই প্রতিযোগিতার বিভাগীয় লীগে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান কালীচরণের ব্যাটের ধাক্কায় অস্ট্রেলীয় আক্রমণ ছত্রখান হয়ে গিয়েছিল। এবারে কি হয়? খেলা আরম্ভের মুখে ক্রিকেট অনুরাগীদের মনে এই প্রশ্নই ছিল সোচ্চার।

আগের সপ্তাহে যাই ঘটে থাকুক না কেন প্রতিশোধ নিতে অস্ট্রেলিয়া যেন এবারে জান মান কবুল করতে তৈরী ছিল। আরম্ভের আরম্ভেই তাই অস্ট্রেলীয় আক্রমণ চমক জাগিয়ে ঘটনা ঘটাতে শুরু করে দিল। প্রাথমিক আক্রমণ শানিয়েছিলেন অস্ট্রেলীয় পেস বোলার জিলি টমসন ও গিলমোর। তাঁরা জনে জনে এক একটি খুঁটি নড়িয়ে দিতেই পঞ্চাশ পূরণের আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিনজন ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

দলের অবস্থা যখন এমন সঙ্কটাপন্ন তখনই লয়েড তাঁর পরিকল্পনা ছকে নিয়ে কাজে নেমে পড়েন। নিরুচ্চার প্রতিজ্ঞা তাঁর। আক্রমণের জবাবে আরও উদ্ধত পাল্টা আক্রমণ শানাতে হবে। জোর বলকে পিটিয়ে দুরস্ত করতে হবে অরও জোরে ব্যাট হাঁকিয়ে। রক্ষণাত্মক রীতি নয় আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় এই আপ্তবাক্যে ভরসা রেখে লয়েড চাকা ঘোরাতে চেষ্টা করেন।

তাঁর পরিকল্পনায় ও প্রয়াসে বস্তু ছিল। কব্জীতে ছিল জোর। মনে ছিল সাহস। এতো সব শক্তির মিলিত প্রয়োগে লয়েড মারের ঘায়ে মাঠকে মাঠ তাতিয়ে মাতিয়ে দিলেন। বাউন্ডারীর পর বাউন্ডারী। ছক্কার পিঠে ছক্কা। রানের ওপর রান। লয়েডের ব্যাটের সবিক্রম আস্ফালনের মুখে অস্ট্রেলীয়া আক্রমণ পিঠ দেখাতে বাধ্য হলো। খেলার গতি হলো ভিন্নমুখী। একটু আগে অস্ট্রেলীয় আক্রমণ রুদ্ধশ্বাস ফাঁসের মতো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কণ্ঠনালিকে জড়িয়ে ধরেছিল সেটি হলো শিথিল। উল্টে লয়েডকে রোখাই যেন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

অস্ট্রেলিয়া সে সমস্যা সমাধানে পথ খুঁজে পায় নি। বিরাশীটি বল খেলে এক ডজন বাউন্ডারী ও জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে লয়েড যখন ফিরে গেলেন তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ভাগ্য অনেকটা নিশ্চিতভাবে গড়ে উঠেছে। পিচ থেকে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়ার মুখে লয়েডকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনায় অভিনন্দন জানানোর সংকল্পে লর্ডস মাঠে সমবেত পঁচিশ হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে জয়ধ্বনি তুলে জানালেন এই মুহূর্তে লয়েডই হলেন লর্ডসের লর্ড। এই স্বীকৃতিই সাংবাদিক সমালোচকদের লেখনীমুখে আরও প্রচারিত হলো সোচ্চারে।

লয়েড সেদিন একটি ছক্কা হাঁকিয়ে লর্ডসে হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেছিলেন। ব্যাটের ঘায়ে বলটি মাঠ পেরিয়ে গ্যালারি ডিঙিয়ে লর্ডসের সরাইখানার মধ্যে গিয়ে পড়লে পানরত সদস্যদের মধ্যে পালাই পালাই রব ওঠে।—লর্ডস মাঠে এতোবড় হিট সাম্প্রতিক কালে আর দেখা যায় নি। তবে শুনেছি যে সুদূর অতীতে সেই ১৮৯৯ সালে এম সি সি-র অ্যালবার্ট ট্রট এমনি এক বড় হিট করে ক্রিকেটের তীর্থভূমিকে চমকে দিয়েছিলেন। ট্রট সেদিন অস্ট্রেলিয়ার মন্টি নোবলের একটি বলকে সজোরে পেটালে বল প্যাভিলিয়ন টপকে পাশের বাড়ীর পেছনে হারিয়ে যায়। লর্ডসে খেলতে খেলতে আর কেউই ট্রটের মতো এতোবড় হিট করতে পারেন নি। জানি না এক হিটে ক্লাইভ লয়েড ট্রটের রেকর্ডের কতো কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।

ক্লাইভ লয়েড যে জাতের ব্যাটসম্যান তাতে মনে হয় যে বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল উপলক্ষে লর্ডসে তিনি যে সংহার মূর্তি ধরেছিলেন অনাগত ভবিষ্যতে অন্য মাঠেও তিনি অবিকল এই মেজাজে ফেটে পড়তে পারবেন। কারণ অপরপক্ষকে শায়েস্তা করায় উগ্র উদ্ধত মেজাজ ধরাই তাঁর ক্রিকেট জীবনের মূল দর্শন। খুটে খুটে করে ব্যাট চালাতে তিনি অভ্যস্ত নন। ব্যাটের ঘায়ে বিপক্ষের বিষটুকু নিংড়ে নেওয়াই তাঁর স্বভাব।

গত মরশুমে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টের কথা স্মরণ করা যাক। বাঙ্গালোরে আয়োজিত সেই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসের লয়েড তো এবারের লর্ডসের লয়েডেরই আর এক সংস্করণ। মাত্র ১৪৯টি বল খেলে ১৬৩ রান করার সময় ব্যাঙ্গালোরে লয়েড লর্ডসের মতোই উদ্ধত মেজাজ ধরে বসেছিলেন। প্রসন্ন বেদী ভেঙ্কটরাঘবনের শক্ত ধরানো বোলিংকে ব্যাটের ঘায়ে বশীভূত করে লয়েড সেদিন নিজের দলকে বিজয় পথের মোহনায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

দিল্লীতে দ্বিতীয় টেস্টেও লয়েড একই মেজাজ ও মূর্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পাল্টা আক্রমণের হাঁক তুলে ভারতীয় শিবিরে সত্যিই আতঙ্ক জাগিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহী এই খেলোয়াড়টির প্রভাব ভারতীয় বোলাররা যে মুহূর্তে ডিঙিয়ে যেতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র সেই মুহূর্তেই ভারত সুদিনের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু যখন লয়েড আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছেন তখনই ভারতীয় আক্রমণকে সভয়ে সেলাম ঠুকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বোম্বাইয়ে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম বা শেষ টেস্ট ম্যাচ। ওই ম্যাচে একা লয়েড অপরাজিত ২৪২ করে টেস্ট পর্যায়ের রাবার ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান।

ক্লাইভ লয়েডের ব্যাটিং সাফল্যের ধারা আজ অপ্রতিহত। খেলোয়াড় জীবনে আজ তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যের মতোই ভাস্বর। এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের যথাযথ মূল্যায়ন করলে স্বীকার করতেই হয় যে ক্লাইভ লয়েড শুধু লর্ডসের লর্ড নন বুঝি সমকালীন ক্রিকেট জগতেরই লর্ড। সোবার্স উত্তরকালে তিনি তাঁর নিজের যুগের সূচনা ঘটিয়ে দিয়েছেন।

অজয় বসু
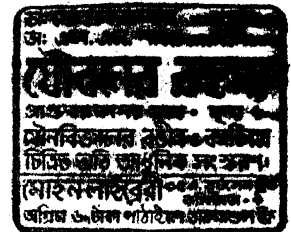
দর্শক

ফিলিপাইন মুক্ত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

সেবু শহরের অ্যাবেলানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত (জুন ২০-২২) ফিলিপাইনের জাতীয় মুক্ত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ভারত সর্বাধিক স্বর্ণ পদক (১২টি) জয়ের সঙ্গে চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে যথাক্রমে তাইওয়ান (স্বর্ণ ৯) এবং জাপান (স্বর্ণ ৬)। এই প্রতিযোগিতায় সাতটি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল।

ভারতের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭—স্বর্ণ ১২, রৌপ্য ১১ এবং ব্রোঞ্জ ৪। পুরুষদের ডিসকাস থ্রোতে ভারত তিনটি পদকই পেয়েছিল—স্বর্ণ পদক পারভিন কুমার, রৌপ্য পদক বাহাদুর সিং এবং ব্রোঞ্জ পদক রঘুবীর সিং। ভারতের মহিলা অ্যাথলীট অনসূয়া বাই তিনটি পদক পেয়েছিলেন—ডিসকাস থ্রোতে রৌপ্য, সটপাটে ও ১০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক।

এখানে উল্লেখ্য, এই জুন মাসেরই দ্বিতীয় সপ্তাহে (জুন ৯-১৪) দ্বিতীয় এশিয়ান অপেশাদার অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় জাপান ১ম (স্বর্ণ ১৫) ভারত ২য় (স্বর্ণ ৯) এবং তাইওয়ান ৩য় (স্বর্ণ ৫) স্থান পেয়েছিল। ফিলিপাইন মুক্ত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় জাপান তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামেনি, দ্বিতীয় শ্রেণীর অ্যাথলীট নিয়ে তারা তৃতীয় স্থান পায়।

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ভারত	১২	১১	৪
তাইওয়ান	৯	৯	৯
জাপান	৬	৪	৭
ফিলিপাইন	৩	৭	১১
সিঙ্গাপুর	৩	২	৭
কুইত	১	৪	০
ইরান	০	০	১

ভারতের পক্ষে স্বর্ণ পদক জয়

৪০০ মিটার : আর উদয় প্রভু
সময় : ৪৭-৪ সেঃ

৮০০ মিটার : শ্রীরাম সিং

১৫০০ মিটার : শ্রীরাম সিং
সময় : ৩ মিঃ ৫৪ সেঃ

৫০০০ মিটার : শিবনাথ সিং
সময় : ১৪ মিঃ ১৭-৮ সেঃ

১০,০০০ মিটার : হরিচাঁদ
সময় : ৩১ মিঃ ৮২-৪ সেঃ

৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ : হরবল সিং
সময় : ৯ মিঃ ৩৯-৪ সেঃ

৪×৪০০ রীলে : ভারত
সময় : ৩ মিঃ ১২-৬ সেঃ

ডিসকাস : প্রভীন কুমার
দূরত্ব : ৫২-৩৩ মিটার

সটপাট : বাহাদুর সিং
দূরত্ব : ১৮-২০ মিটার

লং জাম্প : মোহনন

ট্রিপল জাম্প : মহীন্দর সিং গীল
দূরত্ব : ১৫-৯৯ মিটার

হ্যামার থ্রো : রঘুবীর সিং
দূরত্ব : ৫৬-৯৭ মিটার

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭৫ সালের বাছাই তালিকা

বাছাই তালিকায় পুরুষদের সিঙ্গলস বিভাগে যে ৮ জন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আমেরিকার তিনজন এবং অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, আর্জেন্টিনা, রুমানিয়া ও মেকসিকোর একজন করে খেলোয়াড়। মেয়েদের সিঙ্গলসেও বাছাই তালিকায় আছেন অস্ট্রেলিয়ার ৩ জন, আমেরিকার ২ জন এবং একজন করে চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের।

পুরুষদের সিঙ্গলস

১ম জিমি কোনর্স (আমেরিকা), ২য় কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া), ৩য় বি বর্গ (সুইডেন), ৪র্থ জি ভিলাস (আর্জেন্টিনা), ৫ম ইলি নাস্তাসে (রুমানিয়া), ৬ষ্ঠ আর্থার এ্যাস (আমেরিকা), ৭ম স্ট্যান স্মিথ (আমেরিকা) এবং ৮ম আর রামীরেজ (মেকসিকো)।

মেয়েদের সিঙ্গলস

১ম ক্রিস ইভার্ট (আমেরিকা), ২য় মার্টিনা নভরাতিলোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া), ৩য় বিলি জিন কিং (আমেরিকা), ৪র্থ ইভান গুলাগং (অস্ট্রেলিয়া) ৫ম মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া), ৬ষ্ঠ ভার্জিনিয়া ওয়েড (ইংল্যাণ্ড), ৭ম ওলগা মোরোজোভা (রাশিয়া) এবং ৮ম কেরি রীড (অস্ট্রেলিয়া)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় মোহনবাগান বনাম ভ্রাতৃসঙ্ঘের খেলার একটি দৃশ্য

আদর্শ খেলোয়াড়ের প্রতীক

ইংল্যাণ্ডের ফুটবল মাঠে কালে কালে বিলি রাইট, ষ্ট্যানলী ম্যাথুজ প্রমুখ যে সব গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছে ববি চার্লটন তার মধ্যে অন্যতম। অন্যতম বললে চার্লটন সম্পর্কে অনেক কথা বাকী থেকে যায়। [illegible]

হয়ত চার্লটন [illegible] থেকে যায়। [illegible] নিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না [illegible] ববি চার্লটনকেও যেন [illegible] ঠিক ঠিক বোঝান যায় না।

ফুটবল খেলোয়াড় সম্পর্কে যে প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে ববি চার্লটন-এর চরিত্র তার বিপরীত। কোমল স্বভাব। মাঠের ভেতরেই হোক বাইরেই হোক সদা সর্বদাই হাসিখুশী। শান্ত মেজাজ। আচার আচরণেও আছে সৌজন্য ও সংযম। মিষ্টি মধুর আন্তরিক ব্যবহারে তিনি ভেতরের মানুষকে অতি সহজে আপন করে নিতে পারতেন। এইটেই তার ব্যক্তিগত ও খেলোয়াড়ী চরিত্রের সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় দিক। আর এই জন্যেই মাঠের ভেতরে ও বাইরে তিনি ছিলেন সকলের কাছের মানুষ।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৬৬ সালের বিশ্ব কাপের সেমি ফাইন্যাল খেলা চলছে ইংল্যান্ড বনাম পর্তুগালের মধ্যে। জয়সূচক গোলটি করে চার্লটন যখন স্বস্থানে ফিরে আসছিলেন তখন সতীর্থরা ছাড়াও পর্তুগালের খেলোয়াড়েরা তাঁকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন। প্রতিপক্ষের কাছেও এমনই জনপ্রিয় ছিলেন চার্লটন তাঁর সহজাত সুন্দর স্বভাবের জন্যে।

১৯৫৮ সাল চার্লটন-এর জীবনে স্মরণীয় বছর। তিনি খেলতেন ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবে। ঐ বছরের এক সময় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাব জার্মানী থেকে ইউরোপীয়ান কাপ প্রতিযোগিতার খেলা শেষ করে বিমানে লণ্ডন ফিরছিল। রানওয়ে থেকে টেকঅফ করার [illegible] যান্ত্রিক গোলযোগে বিমানটি বিধ্বংস হয়। এই বিমান দুর্ঘটনায় ক্লাব—কর্মকর্তা খেলোয়াড় সবাই প্রাণ হারায়। কেবলমাত্র ববি চার্লটন অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। এমন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া [illegible] যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা ইংল্যাণ্ডে। লোকের মুখে মুখে [illegible] চার্লটন-এর নাম। [illegible]

ঐ দুর্ঘটনায় [illegible] ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের [illegible] চার্লটন-এর কাছে [illegible] কত কঠিন কাজ তা অনুরাগীরাই কিছুটা অনুমান করতে পারেন। এই অবস্থায় ববি চার্লটন-এর ঐকান্তিক চেষ্টায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কেবল সুসংবদ্ধ শক্তিশালী দল গঠনই করেনি, এফ এ কাপের ফাইন্যালে উঠে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। বলাই বাহুল্য এই কৃতিত্বের অনেকখানিই পাওনা চার্লটন-এর। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি। ১৯৫৮ সালে চার্লটন-এর জীবনে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বদেশের জাতীয় দলে সসম্মানে ঠাঁই পাওয়া।

সারা জীবনে ববি চার্লটন তাঁর প্রিয় ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-এর পক্ষে ৬০০ অধিক খেলায় অংশ গ্রহণ করে ২০০র বেশী গোল করেছেন। এক সময় এই গোল সংখ্যা ইংল্যান্ডের জাতীয় রেকর্ড ছিল। আর স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ১৩৬বারের বেশী। উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে ইংল্যান্ড ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বিলি রাইট স্বদেশের পক্ষে ১০৫বার প্রতিনিধিত্ব করে রেকর্ড গড়েছিলেন। অনেকদিন ঐ রেকর্ড অক্ষুণ্ণ ছিল। বিলি রাইট একবার খেদ করে বলেছিলেন—আমি এমন একজনকে দেখতে পেলে খুশী হব যিনি আমার নজীর ভাঙবেন। চার্লটন রাইটের সে প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। স্বদেশের পক্ষে শততম প্রতিনিধিত্ব করতে রাইটের সময় লেগেছিল তের বছর। চার্লটন-এর সময় লেগেছিল বারো বছর। আর বর্তমান অধিনায়ক ববি মুর ১০ বছর ৮ মাসে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রতিনিধিত্বে সেঞ্চুরী করেছেন। স্বদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচে চার্লটন-এর গোলসংখ্যা সম্ভবতঃ ৪৮-এর চেয়ে বেশী হবে। এবং ৩০-এর অধিক জাতীয় দলের বিপক্ষে খেলেছেন।

সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে চার্লটন এক নতুন ক্রীড়া আঙ্গিকের প্রবক্তা। ফুটবলের অতিরিক্ত গা-জোয়ারি ধস্তাধস্তিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নিজে খুব পরিচ্ছন্ন খেলা খেলতেন। গায়ে গা [illegible] লাগাতেন না। নমনীয় দেহে সাবলীল পায়ের কারুকার্যে স্বচ্ছন্দে বল নিয়ে ঢুকে পড়তেন প্রতিপক্ষের গোল সীমানায়। অনেক সময় অসম্ভব অ্যাঙ্গেল নিয়ে গোল করে আকস্মিকভাবে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতেন ভেল্কীবাজীর মতন।

চার্লটন-এর চৌদ্দ বছর পেশাদারী ফুটবল জীবনের শেষভাগে আনুমানিক বাৎসরিক আয় ছিল কুড়ি হাজার পাউণ্ডের মত। একবার ইতালীর বারসেলোনা ক্লাব চার্লটনকে বছরে তিরিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে তাদের দলে খেলার আমন্ত্রণ জানায়। চার্লটন ঐ বিরাট অঙ্কের অর্থের লোভ সংবরণ করে বলেছিলেন—আমি খেলার জন্যে খেলি। অর্থের জন্যে নয়। আর আমি আমার প্রিয় ও পুরোনো ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলতে বেশী পছন্দ করি।

লোভ ও মোহমুক্ত এই মানুষটি ছিলেন ঘরে বাইরে আপন স্বাতন্ত্র্যে চিরউজ্জ্বল। নম্র, বিনয়ী এবং শান্ত মেজাজের। এখন বয়স ৩৮ বছর। ঘোরতর সংসারী মানুষ।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে সস্তা বাহবা নেবার যুগে ববি চার্লটন প্রচারবিমুখ। একবার এক সম্বর্ধনার উত্তরে চার্লটন বলেছিলেন—'আমি প্রচার পছন্দ করি না। এবং আমাকে নিয়ে হৈ চৈ করাতে আমি অস্বস্তিবোধ করি।'

কিন্তু চার্লটন ভুলে যান যে চার-দেওয়ালের আবরণে কি ফুলের সৌরভকে আটকে রাখা যায়।

প্রশান্ত দাঁ

খোদ উত্তমকুমারকেও যদি প্রশ্ন করা হয় হ্যাঁ মশায় আপনি গপী বাড়ুজ্জেকে চেনেন? তো উনি মুচকি হেসে জবাব দেবেন—চিনি বৈকি, নিশ্চয় চিনি। সত্যজিৎ রায়কে জিগ্যেস করুন। উনিও মৃদু হেসে বলবেন, চিনি। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে গপী বাড়ুজ্জেকে চেনে না এমন লোক নেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীতে। মানুষটির এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আগেকার মত আর খাটা-খাটুনি করতে পারে না। কিন্তু ডায়লগ? বাপ্‌রে, বয়স যত বাড়ছে, দিন দিন ওটা যেন ততই ধারাল হচ্ছে। রসাল হচ্ছে। কলকাতার আদি বাসিন্দাদের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ যেমনটা, গপী বাড়ুজ্জেরও অকৃত্রিম তাই।

মানুষটির পেশা হচ্ছে ফিল্ম লাইনে হরেক জিনিস সাপ্লাই দেওয়া। একটা ছবি তৈরী করতে তো পার্থিব জগতের প্রায় সব কিছুরই প্রয়োজন পড়ে। মানুষজন থেকে শুরু করে এনি থিং অ্যান্ড এভরি থিং। আর গপী বাড়ুজ্জের সাপ্লাই হচ্ছে—ছবির স্পেশাল রিকুইজিশান। রান্নাঘরের মালপত্র। দেয়ালে ঝোলাবার ছবি। নানা ধরণের কিউরিও। পোশাক-পরিচ্ছদ। তীর-ধনুক গাদা বন্দুক রাইফেল পিস্তল মশাল গহনাগাটি হীরে মণি মাণিক্য জহরৎ কাপ প্লেট ডিনার সেট—এভরিথিং। সবই অবশ্য নকল। গপী বাড়ুজ্জেকে অবশ্য নকল কথাটা বলার উপায় নেই। ওর মতে সবই আসল মানে ওর স্টকে যা যা আছে। নকল হচ্ছে ফিল্ম লাইনের বদমাশ লোকজন। কারও কোন বাক্যের ঠিক নেই। বিলের টাকা দেবে বলে এই যে দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছে—এটা জোচ্চুরি নয়? আমি দুনিয়ার জিনিস দিয়ে তোমার বায়োস্কোপের সেট অমন চমৎকার সাজিয়ে দিলাম আমার সাপ্লাই দেওয়া অলঙ্কার পরে তোমার সিনেমার হেরো-হেরোইনরা নেচে কুঁদে শুটিং করল, আমার দেওয়া বড় বড় অয়েল পেন্টিং সেটের দেয়াল সাজিয়ে তুমি বেস্ট আর্ট ডিরেক-টরের প্রাইজ নেবে বলে তাখন থেকে পাঁয়তাড়া কষছো—অথচ বিলের টাকার কথা শুনলেই মুখ ব্যাজার? গপী বাড়ুজ্জের সাফ কথা—ফেলো কড়ি মাখো তেল—তুমি কি আমার পর? সারা ইন্ডিয়ার অকশান হেঁটে এইসব এসপেশাল জিনিসপত্তর কিনে এনেছি, এসব বুঝি ফোকটে সাপ্লাই দেবার জন্যে? বায়োস্কোপ করছ চাট্টি পয়সা রোজ-গারের জন্যে, তবে বাপু আমার পয়সাটা সময় মত না দেওয়া কেন? গপী বাড়ুজ্জের মাল না নিয়ে বায়োস্কোপ করলেই তো পারতে, পায়ে তো আর ধরতে যাইনি তোমাদের...

গপী বাড়ুজ্জের ভবানীপুরের দোকানে যদি কখনও যান তাহলে ওর ব্যাপার দেখে প্রথমেই আপনার আক্কেল গড়ুম হবে। মাল চাই বললেই হবে না, আপনি লোকটি কে এবং কেমন এটা আগে ও ভাল ভাবে খতিয়ে নেবে। তারপর আলাপ-সালাপ। দর-দস্তুর এবং মালের আদান-প্রদান।

বহু দিন আগে আমি একবার গিয়ে-ছিলাম একটা স্পেশাল রিকুইজিশানের সন্ধানে। বিগত শতকের একটা টেবিল ল্যাম্পের প্রয়োজনে। সময়টা দুপুর বেলা। পুর্ণ সিনেমা ছাড়িয়ে একটা গলির মধ্যে গপী বাড়ুজ্জের দোকান। একজনকে জিগ্যেস করতে সে বললে, গপীদার মিউ-জিয়াম? সোজা চলে যান। বাঁ হাতে যেখানে আপনার নাকটা ঠেকে যাবে, সেটাই হচ্ছে—

পেল্লায় বাড়ি। গিয়ে দেখি ভেতর থেকে বন্ধ। এদিক-ওদিক চেয়ে কাউকে পেলাম না। অগত্যা হাঁক দিলাম—গপীবাবু ও গপীবাবু—

ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ভাবলাম, কিরে বাবা, রং নাম্বার নয়তো?

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ। চমকে তাকিয়ে দেখি খালি গায়ে খাটো একটা গামছা পরে গপী বাড়ুজ্জে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। —কি চাই?

—গপী বাড়ুজ্জেকে চাই প্রথম—

আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে গপী বললে, আমি-ই। চিনতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

হেসে বললাম—এই কস্টুমে তো ইতি-পূর্বে কখনও দেখি নি, তাই ভাবছিলাম যমজ ভাই-টাই কিনা—।

—চটপট বলে ফেল তো এখন কী চাই? আমি এখন লাঞ্চে বসব।

লাঞ্চ।

শুনেই আমার চক্ষু স্থির।

গপী বলল, কেন? আমার বুঝি লাঞ্চ করা নিষেধ? গত নিলামে এক সাহেব-বাড়ির মালপত্তর তুলেছি। খাঁটি এইটিনথ সেঞ্চুরীর। আর আর ডিনার সেট নিয়ে এসেছি সব। আজকাল তাতেই লাঞ্চ আর ডিনার সারছি! হেঁ হেঁ হেঁ....

দেখি গপী বাড়ুজ্জের পোষা একদঙ্গল কুকুর এসে ওকে ঘিরে ধরেছে। গপী তাদের একটাকে আদর করে বলল যাচ্ছি, যাচ্ছি, একেবারে যেন তর সইছে না। লঞ্চ টাইমের একটু [illegible] আর তো নেই। সাহেববাড়ির কুকুর তো। নুখ্রের এদেরও সেই সাথে কিনে নিয়ে এলাম। ছবির জন্যে দরকার হলে বলো, অল্প খরচায় সাপ্লাই দেব...

গপী বাড়ুজ্জের দোকানে আপনি কি চান? সিরাজদ্দৌলার [illegible] [illegible] নবাবী আমলের [illegible] নন্দকুমারের ফাঁসি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেটা? সব আছে। লর্ড [illegible] পোশাক। গপী সব [illegible] করে রেখে দিয়েছে নাকি। ঐতিহাসিক [illegible] তুলতে গেলে এসব লাগবে না? নিশ্চয় লাগবে। ওরিজিন্যাল মাল পাওয়া গেলে কে আর ডুপ্লিকেটের ধান্দা করে! কিন্তু ভাড়াটা কিন্তু সেই অনুসারী হয় এই হচ্ছে গপীর কথা। অ্যান্টি পার্টির লোকজন বলে—যতসব আষাঢ়ে গপ্প সিরাজদ্দৌলার নাগরা না হাতি! ওসব ও কোত্থেকে পাবে? না পাওয়া যায় কখনও? কিন্তু এই কথাটি যদি একবার গপীর কানে যায় তো বিচ্ছিরি কেলেঙ্কারী হবে নির্ঘাৎ একটা। গপী তার বাপান্ত করে ছেড়ে দেবে। এই বুড়ো বয়েসে এই অকশান হাউস সেই অকশান হাউস ঘুরে মালপত্র চিনে চিনে কেনা—এমন লোক এক গপী বাড়ুজ্জে ছাড়া কলকাতায় আর দ্বিতীয় কেউ আছে নাকি? পুরোনো মাল যদি সবাই চিনতে পারত তো কথা ছিল না। পারে না বলেই তো গপীর ডাক পড়ে। লোকে গপীকে আদর যত্ন করে এই যে ডেকে-ডেকে নিয়ে যায়—সেটা কেবল তার পাকা জহুরীর মত নজর আছেই বলে না!

গপী বাড়ুজ্জে আগে ঘন-ঘন স্টুডিওতে যেত। ইদানিং বয়স হয়েছে বলে আর

তেমন থেতে পারে না। তবে যখন যায় তখন স্বাভাবিক একটা মজা হয়। পুরোনো আমলের টেকনিশিয়ান এবং শিল্পীরা ওকে পেলে বসায় শ্রেফ ভালবাসে শোনবার লোভে। ছবি বিশ্বাস যা সাহগল সে আমলে কি করতেন না করতেন— সেসব গল্প এত সরস ভঙ্গীতে গপী বাঁড়ুজ্যের কাছে শোনা যায় যা সত্যিই অতুলনীয়। হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে হয়। অথচ গপী কখনও এক চিলতে হাসে না। বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার গুল মেরে যাচ্ছে, অথচ বলার সময় তার কোন হদিশ ওর মুখে পাওয়া শক্ত।

এই রকম গপী বাঁড়ুজ্যের এবার একটা মজার গল্প শোনাই আপনাদের। কলকাতায় একজন প্রযোজক, মহা তিকড়মবাজ লোক, সেবার একটা ছবি শেষ করেছেন। টাকা পয়সা বিশেষ কাউকে দেন নি। যত রকম ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে—তিনি প্রায় সবটাই করেছেন। অথচ মুখে কিন্তু দারুণ অমায়িক। হাসিমুখ ছাড়া মুখে খাক্যটি নেই।

ছবি শেষ অথচ কলাকুশলীরা সবাই টাকা পাবে—এই পরিস্থিতিতে সকলেই হতভম্ব। চাইতে গেলে প্রযোজক বলছেন—আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, সামনের হপ্তাতেই তো রিলিজ, হাউস থেকে টাকা পাওয়া মাত্রই আপনাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাওনা টাকা পাই পয়সা অবধি মিটিয়ে দিয়ে আসব। এখন বিশ্বাস করুন একটা পয়সা নেই। এ ছবিতে এত ফালতু খরচা হয়ে গেল যে কি বলব, সবই তো জানেন...

এরপর আর কি কথা। পাওনাদাররা আমাস মুখে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু গপী বাঁড়ুজ্যে বলল—না, না, আমার মাথায় টুপি পরানো চলবে না। আমার পাওনা টাকা রিলিজের আগেই চাই। ও আমি কিছুতেই ছাড়ব না। পাক্কা হাজার টাকা এখনও পাব আমি—

সবাই চ্যালেঞ্জ করল, গপীদা, অসম্ভব। ও আর তোমায় টাকা দিয়েছে!

গপী হেঁ হেঁ হেঁ হেসে বলল, আচ্ছা, দেখা যাবে আমার পাওনা না মিটিয়ে কিভাবে ও ছবি রিলিজ হয়!

গপী রিলিজের আগের দিন ছবির সেই প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করল। প্রযোজকমশাই ওকে দেখেই বিরক্ত।—কী চাই?

—টাকা।

—টাকা? কিসের টাকা?

গপী বলল,—এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? সারা ছবিতে রিকুইজিশনে সাপ্লাই করেছি। মোট দু হাজার টাকার বিলের মধ্যে এক হাজার টাকা পেয়েছি। আপনিই দিয়েছেন। হার বেঞ্চ, ভাঙাচোরা খোঁড়া কোট। [illegible] আমার মত ক্যারেক্টার জায়গা হয়ে গেছে। সে যাই হোক—আমার বাকি হাজার টাকার কি হবে?

প্রযোজক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললেন—হাজার দিয়েছি, যথেষ্ট দিয়েছি। আর দিতে পারব না।

চিন্ময় জুঁই-এর বিয়ে হল
প্রীতি অনুষ্ঠানে জুঁই ব্যানার্জি ও চিন্ময় রায়। অমৃত : ফটো

—কেন? আমার জিনিসগুলো যে ছবিতে খাটালেন, সেটা ফালতু?

—দেখ গপী, আমি রিলিজ নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত আছি। এখন তোমার সঙ্গে বক বক করার মত সময় নেই। তুমি এখন এসো—

গপী এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল—আসব মানে, কোথায় আসব? এসেই তো আছি আপনার কাছে—

প্রযোজক চটে ফায়ার। —ন্যাকামো করো না গপী। এসো মানে কেটে পড় বললাম। যাওসব—

—পাওনা টাকা না নিয়েই?

—বললাম তো তোমার পাওনা আর কিছু নেই। সব শোধ।

—বটে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ এখন বিদেয় হও—

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে গপী বাঁড়ুজ্যে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আর একটা কথাও বলল না। না ভাল না মন্দ—কিছুই না।

ছবি হাউসে রিলিজ হচ্ছে। হাউস শুরু থেকে তাক ফুল-টুল ব্যানার ইত্যাদি দিয়ে জমজমাট সাজানো হয়েছে। ভাল অ্যাডভান্স বুকিং হয়েছে। প্রথম শো হাউস ফুল। প্রযোজক ভদ্রলোক গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী আর ফরাসডাঙার কোঁচানো ধুতি পরে হাসিমুখে হাউসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে দু-একজন চামচাও আছে। তারা সেই লোকসপ্রেস গুড়াচ্ছে একটার পর একটা। আর মাঝে প্রযোজককে অফার দিচ্ছে। বলছে—দাদা এটা সুপার ডুপার হিট ছবি এটা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। প্রযোজক ভদ্রলোকও খুব কনফিডেন্ট। ছবি করতে তার ঘরের ক্যাশ বিশেষ ইনভেস্ট করতে হয়নি। সবই প্রায় টুপি পরিয়ে পরিয়ে সেরেছেন। সুতরাং ছবিটা ফ্লপ না হলে তাঁর বড় কোন রিস্ক নেই এতে।

হঠাৎ দেখেন গপী হাউসের বাইরে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। গায়ে চাদর জড়িয়ে। কাকে যেন খুঁজছে। প্রযোজকের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাজার হয়ে গেল—এঃ, ব্যাটা শুভদিনে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছে?

আর এমনই বরাত যে গপীর সঙ্গে তখনই প্রযোজকের চোখাচোখি হয়ে গেল। গপী বো করে এগিয়ে এসে বলল—আপনাকেই খুঁজছি স্যার—

—কেন? এত কাজ থাকতে আমাকে কেন?

—টাকার জন্যে স্যার। পাওনা টাকা—

প্রযোজক ভদ্রলোক যেন আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। কড়া একটা ধমক দিয়ে বললেন—আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? বলেছি তো এক পয়সাও দেব না। আবার ঘ্যান ঘ্যান করছ কেন?

গপী বলল—তাহলে আর আপনাকে আমি বাঁচাতে পারলাম না—আপনি সর্বস্বান্ত—

—সর্বস্বান্ত? হোয়াট ডু ইউ মীন? প্রযোজক ওর কথা বলার ভঙ্গীতে হঠাৎ কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন—তোমার মতলবটা কি বলতো?

—আছে এটা মতলব। বিনা মতলবে কি আর রিলিজের দিন হাউসে এসেছি। এখনও বলুন টাকা দেবেন কি না?

প্রযোজক এবার যেন চিন্তিত।—কটে!

—হ্যাঁ। ইয়েস অর নো।

—বলেইছি তো নো।

ব্যাস গুপী বাঁড়ুজ্যে ফট করে চাদরের তলা থেকে একটা মড়ার খুলি বের করে ফেলল। খুলির মাথায় কড়া করে সিঁদুরের প্রলেপ। দেখেই তো প্রযোজকের চক্ষুস্থির।

—এটা কী?

হেঁ হেঁ হেঁ করে গুপী কিছুটা বিকট হাসল প্রথমে। তারপর রীতিমত হিংস্র ভঙ্গীতে বলল এটা মন্ত্রপূত খুলি! আমি তন্ত্রমতে যে সাধনা করি—এটা বুঝি জানতেন না? এখন দেখুন কি করি। সব্বোনাশ করে তবে ছাড়ব—

প্রযোজক ভীষণ নার্ভাস। গুপী তার চোখের সামনে যেভাবে ওই মড়ার খুলি নাচাচ্ছে তাতেই তার ওকম্মো ফতে। তারপর গুপীর চীৎকার—'এই মন্ত্রপূত খুলি একটি-বার হাউসের গায়ে ঠেকিয়ে দেব—বাস ছবি একেবারে থান ইটের মত ফ্লপ হয়ে যাবে--বলে গুপী ছুটে গেল হাউসের গায়ে মড়ার খুলি ঠেকিয়ে দেবার জন্যে। দেখে প্রযোজক ভদ্রলোক হাউমাউ করে দৌড়ে গিয়ে হাত-বাড়িয়ে গুপীকে জাপটে ধরলেন—আরে কর কি কর কি গুপী বাঁড়ুজ্যে—দাঁড়াও দাঁড়াও-

কোন কথা নয় এই ঠেকিয়ে দিলাম।

প্রযোজক ওকে তখন তাড়াতাড়ি শান্ত করতে আরম্ভ করলেন—ঠাট্টা করে-ছিলাম ভাই—টাকা দেব নিশ্চয় দেব।

—এখুনি দাও—নইলে—

ময়না
রঞ্জিৎ মল্লিক। জয়শ্রী রায়

হাউসের দেয়াল থেকে মড়ার খুলি তখন মাত্র দেড় ফুট দূরে। প্রযোজক প্রাণপণে ঠেলে রেখেছেন—ক্ষান্ত দাও ভাই ক্ষান্ত দাও। দিচ্ছি তোমার টাকা। ছবি ফ্লপ হলে আমার কে মরে দাঁড় পড়বে ভাই গুপী। আরে আরে কর কি কর কি......

—এক্ষুনি চাই হাজার—

—চেক লিখে দিচ্ছি—

—চেক চলবে না। ক্যাশ চাই।

—আচ্ছা তাই দিচ্ছি—বলে একটা চাপরাশিকে চেঁচিয়ে ডাকল—হারু ছুটে যা ম্যানেজারবাবুকে আমার এই বিপদের কথা বুঝিয়ে বলে হাজারটা টাকা নিয়ে আয়। নো নো গুপী আর এগিও না ভাই—এই এনে দিল বলে। হারুর যেতে আসতে যেটুকু সময়—

গুপী তখন তন্ত্রের মন্ত্র ঝাড়ছে ওং বং চং সহকারে। বলছে—মড়া জেগে উঠেছে আজ আর রক্ষে নেই। সব্বোনাশ আজ হবেই। তবে টাকাটা হাতে পেলে আমি পাল্টা দিতে পারি সে মন্তরও আমার জানা আছে...

ভোঁ করে ক্যাশ এসে গেল।

পুরো হাজার টাকার একটি বাণ্ডিল। হাতে গুঁজে দিতে তবে রক্ষে। গুপী মড়ার খুলি সম্বরণ করে চাদরে ঢেকে রাখল। তার-পর অট্ট হেসে বলল—খুব বেঁচে গেলেন আজ। আচ্ছা চলি স্যার। আপনার ছবি এবার শুরু হচ্ছে যান এখন ঠান্ডা মাথায় হাউসে বসে দেখুন গে...

রঞ্জন মজুমদার
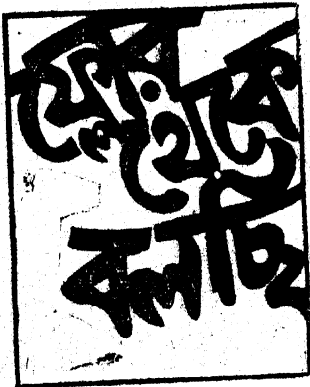
একটুও বিচলিত হবেন না: রেহেনা সুলতান এখন 'ঘাম' চাইছেন। আর খেয়াল করুন—তিনি এটা চাইছেন কলকাতায়--টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। কারণ তিনি এখনই একটা শট দেবেন। সে জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। এখন তাঁর যৌবন-পুষ্ট দেহকে ঘিরে চারদিকে আলো জ্বলছে। রেহেনা সুলতান একসসাইটিং অভিনেত্রীও বটে। আমি দেখছি—একটা শক্তিশালী মাইক্রোফোন তাঁর মাথার ওপর স্থির অ্যাণ্ডবং ঝুলছে—সাউন্ড ট্র্যাকে এখন রেহেনা সুলতানের প্রতিটি নড়াচড়ার আওয়াজ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। ও-পাশে অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে নায়িকার দিকে কড়া নজর রেখে তাকিয়ে রয়েছে ক্যামেরাম্যান দীপক দাস। তার পাশে পরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। এবং তাঁর ও-পাশে ছবির অন্যান্য কলা-কুশলীরা। সকলেই এদিকে তাকিয়ে। রেহেনা

সুলতান ঘাম চাইছেন ঘাম! মেক-আপম্যান তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে এক টুকরো বরফ তুলে দিল। কপালে গালে হাতে বুকে সেই কঠিন-ঠান্ডা বস্তুটিকে কয়েক বার ঘসে নিয়ে রেহানা কৃত্রিম ঘাম সৃষ্টি করলেন দেহে। ওঁর পরণে শাড়ি ঘাঘরা। সংক্ষিপ্ত কাঁচুলী। উগ্র যৌবন যাতে ছাই চাপা না পড়ে অন্তত পর্দা সেগুলো হুবহু দেখা যায় পোশাক-পরিচ্ছদ রচনার সময় সেগুলো স্পেশালি দর্জি খেয়াল করেই করেছে! হোলই বা 'দস্যু রত্নাকর' একটি পৌরাণিক ছবি কিন্তু তা বলে কি বায়োস্কোপ কখনও অ পিউরিটান হয়? না হতে দেয়া উচিত বাল্মীকির যুগে রাজন্য পরিবারের প্র দর্শন মেয়েরা তাঁদের অঙ্গে কি পোষ ব্যবহার করতেন তার ছবি আঁকা, অ বিভিন্ন গুহার ফ্রেসকোতে। কিন্তু অ সাধারণ চাষী পরিবারের বধূ-কন্যারা? ত কি পরত? গাছের বল্কল? না সুতি ক

মুসাফির ভাবতেও পারে।

রেহানা সুলতান এখন ক্যামেরার সামনে তৈরী হচ্ছেন একটি ধর্ষণ দৃশ্যের জন্যে। দস্যু সর্দার রত্নাকরের প্রধান সহকারী ভুজঙ্গ এই সুন্দরী অপহৃতা রমণীকে দেখে তার সংযম হারিয়ে ফেলেছে। সে এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একদিন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই যুবতীর ওপর। কুটিরে তখন সকলেই অনুপস্থিত। অসহায় রমণী আর্তনাদ করে উঠেছে। ভুজঙ্গ তখন পাশব শক্তি নিয়ে আক্রমণ করেছে। রমণী সাধ্যমত প্রতিরোধ করছে, কিন্তু পারছে না। কিছুতেই পারছে না......

একটু আগে স্বল্প পাওয়ারের সেট লাইটের আলোয় আমি দেখছিলাম পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জী রেহানা সুলতানকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন হাউ টু ডু থিংস অ্যান্ড ইন হোয়াট ওয়ে...... রেহানা চমৎকার ইংরেজী বলেন। ফ্লোরে ওঁর সঙ্গে অনেকেই দেখলাম ইংরেজীতে কথা বলছেন। পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ছাত্রী রেহানা। কল্যাণ চ্যাটার্জিদের সঙ্গে একই বছরে বোধহয় পাশ করে বেরিয়েছেন। কল্যাণকে দেখছিলাম ওঁর সঙ্গে। ফ্লোরে মোড়ায় বসে মুখোমুখি ওঁরা দীর্ঘ সময় ধরে গল্প-গুজব করছিলেন। হাসি ঠাট্টা মায় ইয়ার্কিও চলছিল। অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধবরা অবসর পেলে যা করে থাকেন—এটাও তাই।

রেহানা সেটের মধ্যে বিছানায় শুয়ে। জ্ঞানেশ মুখার্জি ঝুঁকে পড়ে দেখাচ্ছিলেন বলছিলেন—ইউ গীভ ফুল রেজিসট্যান্স টু দ্যাট স্কাউন্ড্রেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে স্কাউন্ড্রেলটির খবর করলাম। জ্ঞানেশ মুখার্জির সহকারী উদয় বলল, ও পার্টটা রবীন ব্যানার্জি করছেন। ফ্লোরে ঢোকবার মুখে রবীন ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক পোষাক পরে উনি আর শম্ভু ভট্টাচার্য বসে বসে গল্প করছিলেন। সবাই এক দলের দলী। রত্নাকরের অনুচর। তা তখন বুঝি নি যে নাটের গুরু স্বয়ং রবীন ব্যানার্জি। রেহানা সুলতানকে অ্যাটেম্প করবে বলে তৈরী হচ্ছে।

ঘাম তৈরী হয়ে যাবার পর রবীন ব্যানার্জি এসে জ্ঞানেশ মুখার্জির শূন্য স্থানে বসে পড়ল। এটা করতে হবে সেটা করতে হবে একচোট নির্দেশের পর রবীন ব্যানার্জি পজিশন নিলেন। বড় উঁচু মানের শিল্পী এই মানুষটি। অভিনয়টা ওঁর রক্তে আছে। 'দস্যু সর্দার রত্নাকর' ছবিতে একটা মামুলী ভিলেন (খলনায়ক লিখব?) চরিত্রে পার্ট করছেন। শুনলাম ক্যান্টার করেছে 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে। সেখানেও অবশ্য খলনায়ক। শম্ভু ভট্টাচার্য মুচকি হেসে মন্তব্য করল—শুধু খল নয়

মুসাফির—খলখলে নায়ক। ও ছবির কাজ আমি তো দেখেছি।

অল লাইটস বলতে রবীন ব্যানার্জি হঠাৎ একটা ভয়ংকর অভিব্যক্তি নিয়ে ঝুঁকে পড়ল রেহানা সুলতানের দিকে। উত্তেজনায় ঘৃণায় এবং আক্রোশে রেহানা সুলতান তখন যেন থর থর কাঁপছে আর পশুর মত নিরেট নির্লজ্জ-বেহায়া দেখাচ্ছে রবীন ব্যানার্জিকে। মেয়েটিকে আন-ড্রেস করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভুজঙ্গ। আর মিমালি তাকে—না না না, ওরে ফেলব—উঃ আঃ ইত্যাদি একসটেম্পোতে বাধা দেবার চেষ্টা করে চলেছ সারাক্ষণ।

ক্যামেরা ক্রমাগত নামা-ওঠা করছে দুজনের সমান সমান অভিব্যক্তি ক্যাচ্ছে ধরবার জন্যে। জ্ঞানেশ মুখার্জি যেমন যেমন নির্দেশ দিচ্ছেন দীপক দাসকে—ও হুবহু সেইভাবে অপারেট করছে। চারিদিকে সবাই যেন রুদ্ধশ্বাস। কিন্তু জ্ঞানেশ মুখার্জি অনিবার্য পরিণতিতে পৌঁছাবার আগেই

নিশিমৃগয়া। অপর্ণা সেন

এই শাটটা কেটে দিলেন। রবীন উঠে চলে গেলেন। আর নিজের আগোছাল পোষাক সামলাতে সামলাতে উঠে বসলেন রেহানা সুলতান। তারপর ধীরস্থির হাঁটতে হাঁটতে ফ্লোরের বাইরে চলে গেলেন। মনেই হলো না—একটু আগে উনি হাঁসফাঁস করছিলেন—শয়তান ভুজঙ্গর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে।

'দস্যু সর্দার রত্নাকর' ছবিতে রেহেনা সুলতান ঝিমলি নামে এক চাষীর কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সদলবলে ডাকাতি করতে বেরিয়ে রত্নাকর একদিন যখন এক ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ দেখে অপরূপা একটি মেয়ে মাঠে বসে কাজ করছে। যে-কোন উপায়ে একে আমার চাই। ঝিমলি কিন্তু এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারল না। এর কিছুদিন পর ঝিমলির বিয়ে। রাতে যখন সেই বিয়ে হতে যাচ্ছে হঠাৎ রত্নাকর সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই উৎসবের মাঝখানে। এবং চোখের নিমেষে ঝিমলিকে জোর করে বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। কেউ একবার বাধা দেবার সময় পর্যন্ত পেল না।

রত্নাকর ঝিমলিকে নিয়ে এল গহীন অরণ্যে তার ডেরায়। বলল—এখান থেকে বেরুবার কোন রকম চেষ্টা করলে কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য। হুঁশিয়ার।

ঝিমলি অসহায় হয়ে পড়ে। খায় না দায় না সারাক্ষণ মনমরা। রত্নাকর তাই কিছুদিন যেতে বুঝল—না গায়ের জোরে এই মেয়েকে বশ করা যাবে না। প্রেম প্রণয়ের ক্ষেত্রে হৃদয়েরই অবদান বেশী গায়ের জোরের নয়। এটা প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করে রত্নাকর একদিন ঝিমলিকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে বলল—ঠিক আছে তুমি যা চাও তাই হবে। আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। তুমি এখন ইচ্ছে করলে নিজের দেশে তোমার বাবা-মার কাছে আবার ফিরে যেতে পার। তারপর এখানে যে ছেলেটিকে তুমি ভালবাস—ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করে এখন তুমি সুখের সংসারও করতে পার......

মুক্ত বিহঙ্গী, ঝিমলি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেদিনই ওই ভয়াবহ জঙ্গল পার হয়ে তার আপনজনের কাছে ফিরে গেল। তারপর সেখানে খবর নিয়ে দেখল—সেই ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেছে। অতএব তার কোন উপায় নেই। মন ভেঙে গেল ঝিমলির। তখন তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল দস্যু রত্নাকরের কথা। মানুষটি নিশ্চয়ই তাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু কখনও বলপ্রয়োগ করে নি। বরং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিল ঝিমলির মন পাবার জন্যে। এটা উপলব্ধি হতে ঝিমলি সঙ্গে সঙ্গে তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। সে ফিরে গেল সেই গহীন ভয়াবহ অরণ্যে—রত্নাকরের কাছে। বলল—আমি এবার স্বেচ্ছায় এসেছি তোমার কাছে। তুমি আমায় গ্রহণ করো...

কবে কোন সুদূর অতীতে যখন 'রামায়ণ' মহাকাব্য সৃষ্টি হয় নি—তখনও মানুষ একটা নিখোঁজ বস্তুর সন্ধান করে ফিরেছে হৃদয়ের পথে পথে—তার নাম ভালবাসা। প্রেম। প্রণয়। ঝিমলি তার হৃদয়ের অলক্ষ্যে সেই জিনিসটিই উপহার দিয়েছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক দস্যুকে—যার নাম রত্নাকর পরে যিনি বাল্মীকি হয়ে পৃথিবীকে শুনিয়েছিলেন অপার্থিব এক জীবন সাধের জয়গান....

শেখর চ্যাটার্জি এ-ছবিতে সেজেছেন কঠিন হৃদয় রত্নাকর আর ঝিমলি বলাই বাহুল্য—রেহানা সুলতান। 'চেতনা' ছবিতে অভিনয় করে এই অভিনেত্রী সারা ভারতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। আর 'দস্তক' ছবিতে অভিনয় করে পেয়ে গেলেন রাষ্ট্রপতির 'উর্বশী' পুরস্কার। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই স্বীকৃতি খুব কম শিল্পীর ভাগ্যে ইতিপূর্বে জুটেছে।

শেখর আর রেহানা কিছুক্ষণ আগে ফ্লোরে একটা রোমান্টিক দৃশ্যে অভিনয় করলেন। ঝিমলি প্রশ্ন করেছে—একটা কথা রাখবে?

—কি?

—তুমি এসব ছেড়ে দাও—

রত্নাকর জবাব দেয়—কি সব?

—এই খুন জখম ডাকাতি।

রত্নাকর সস্নেহে ঝিমলিকে তার দু' হাতের আলিঙ্গনের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জবাব দেয়—পাগল! ডাকাতি না করলে তোমায় পেতাম?

—এখন তো আমাকে পেয়েছো—এবার ওসব ছেড়ে দাও!

হঠাৎ রত্নাকরের চোখ ক্রোধে যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে—রাজার কাছে জমি ভিক্ষা করতে হবে? যারা ভিক্ষে দেয় তাদের আমার ভাল লাগে না...আমি ওদের শেষ করব—সেই জন্যেই আমি ডাকাত হয়েছি ডাকাতি আমাকে করতেই হবে......

বলে সহসা ঝিমলিকে নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নেয় (সেকসার্ড সেকসার্ড)...

ঝিমলি বাইরে অনিচ্ছুক অথচ ভেতরে খুশিই...বাধা দিতে দিতে বলে—এই কি করছো?

—ডাকাতি......
—না, ডিক্কে?
—না ডাকাতি......
—উহু ডিক্কে ডিক্কে......

রেহানা সুলতান এসব দৃশ্যে কি করতে পারেন আর কতটুকু—সেটা দর্শকদের কল্পনার ওপরই ছেড়ে দিয়ে মুসাফির জো-হাত্তা হয়ে যেতে চায়। এবং গেলও।

'দস্যু সর্দার রত্নাকর' ছবিটি টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। চিত্রনাট্য করেছেন শেখর চ্যাটার্জি। জ্ঞানেশ মুখার্জি পরিচালক। এতে অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন রবি ঘোষ চিন্ময় রায় সুলতা চৌধুরী রবীন ব্যানার্জি শম্ভু ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পী। রত্না চ্যাটার্জি ছবিটি প্রযোজনা করছেন। সংগীত নচিকেতা ঘোষ।

মুসাফির

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

[illegible] । রেখা

বম্বের ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী 'ড্রিম গার্ল' ছবির শুটিং-এর জন্য এখন আমেরিকায়। ঘটনাটা কাকতালীয় কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—ঠিক এই সময়ই ধর্মেন্দ্রও গেছেন আমেরিকায়। কোনো ছবির শুটিংয়ে নয়, প্রায় বিনা কারণেই। (বিনা কারণে পি-ফরম, ফরেন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি জোটে কি করে কে জানে।) এখানে তিন শিফটে কাজ করে করে ক্লান্ত, তার ওপর পানাহারের অত্যাচার তো আছেই।

মেজাজি লোক হিসাবে ধর্মেন্দ্র বম্বের ওয়ান অব দি নাম্বার ওয়ানস্ বলা যায়। 'ম' কারান্ত কয়েকটি শব্দের প্রতি তাঁর দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। নতুন আর্টিস্ট পেলে তো কথাই নেই, বন্ধুত্ব করার জন্য খুব একটা সময় নষ্ট করেন না তিনি। খুউব অল্প সময়েই 'গভীর' বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তবে একবারে আনকোরা শিল্পীর সঙ্গে ধর্মেন্দ্র কাজ করেন খুব কম। হেমা-জীনত-রেখা-পরভিন যাঁরাই এখন তাঁর নায়িকা। 'গভীর' বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ব্যাপারে একমাত্র হেমা ছাড়া আর কারও কাছ থেকেই তিনি সহজ আলোর সংকেত পান নি। অন্যান্যরা সকলেই লাগসই 'বন্ধুত্ব' পাতিয়ে ফেলেছেন অন্যান্যদের সঙ্গে।

তবে মুডে থাকলে অন্য কথা। হাতের কাছে যাকে পান ক্ষণিকের সঙ্গী করে নেন। আর নতুন মেয়েদের তো কথাই নেই। তাদের ধর্মেন্দ্রর নাম শুনলে শিহরণ জাগারই কথা। তিনি সেই সুযোগের অপব্যবহার কখনই করেন না!

হেমার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর সম্পর্ক আলাদা ধাতুতে গড়া। জীতেন্দ্র-সঞ্জীব বহু ঝড়-ঝাপটা তুলেও এদের দুজনকে এখনও আলাদা করতে পারেন নি। এমন কি হেমার মাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

তবে দুজনার প্রায় এক সঙ্গে এই আমেরিকা যাবার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকছে। মা মেয়েকে আগলে রাখার প্রচণ্ড চেষ্টা করবেন জানি, কিন্তু পারবেন কি? ধর্মেন্দ্র যখন এখানকার দশ-বারোজন প্রোডিউসারের কাছ থেকে প্রায় হাতে-পায়ে ধরে ক'দিন ছুটি বার করে নিয়ে গেছেন—সেই ছুটি যে একেবারে বিফলে যাবে তা মনে হয় না। ধর্মেন্দ্র সে রকম মানুষই নন। ছুটি কিভাবে উপভোগ করতে হয় সেটা তাঁর ভালো জানা আছে। উপরন্তু সঙ্গী হিসাবে যদি হেমা মালিনীকে পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। এই লেখা বেরোবার সময় হয়তো ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী আমেরিকার কোনো সবুজ পরিবেশে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে 'সুগভীর' বন্ধুত্ব পাতানোর মহড়া চালাচ্ছেন।

রাত প্রায় দুটো।

ভিলেন জীবনের বাড়ীর কলিং বেল বেজে উঠল। ক্রি-রিং...ক্রি-রিং...রাত দুপুরে অনাহুতের ডাকে স্বাভাবিকভাবেই জীবন বিরক্ত। শুধু জীবন বলি কেন, অনাহুতের হুঙ্কার চিৎকারে প্রতিবেশী দু-চারজন উঠে পড়েছে ততক্ষণে।

কে এসেছে, কে এসেছে কল্পনা করতে করতে দরজা খুলে দাঁড়ালেন স্বয়ং জীবন।

অনাহুতের মূর্তি দেখে তো জীবনের প্রায় মৃতাবস্থা। মেজাজী রেখা এক পায়ে দাঁড়িয়ে। অদূরে গলায় বলল—কিরণ আছে? জীবনের তখন জবাব দেবার ক্ষমতা নেই। পর্দার ভিলেন তখন নিজে আসামি। রাত দুপুরে তার ছেলের খোঁজ করতে এসেছে। ব্যাপারটা কি, কিরণের সঙ্গে রেখার আশনাই-এর খবর তাঁর অজানা নয় অবশ্য। কিন্তু এতদিন ওসব ঘটনাকে গল্প-গুজব ধরে নিয়ে আমল দেন নি জীবন। সেদিন অমন সুসময়ে রেখাকে কিরণের খোঁজ করতে দেখে বাবার বুঝি দিব্যজ্ঞান হোল।

তাহলে বলি শুনুন, রেখা শুধু ঐ দিনই নয়, প্রায়ই আসে কিরণকুমারের কাছে। দুজনেই খুব নিঃসঙ্গ তো! সঙ্গী হতে এসে দুজনে দুজনার। কাগজ-পত্তরে যে সব

গুলজারের খুশবু ছবিতে হেমা মালিনী

হাইপার্স দেখা হয়, ওসব বন্ধ দিন। আসলে জীবনের হীরের টুকরো ছেলে কিরণকে দেখার একটু পছন্দ। একটু বেশীই পছন্দ হয়ত। সুতরাং দুজনে যদি 'মেলামেশা' করতে গিয়ে দু-চার ঘণ্টা একসঙ্গে না কাটালো তাহলে চলে কি করে! চুপি চুপি হেমা দেখা আর কিরণকে অনেক জায়গায় দেখতে পাবেন। যে কোনো ছুটির দিন দুপুরে বান্দ্রার দিকে চলে যাবেন, দেখবেন ওরা দুজনে আছেই। কি অবস্থায় দেখবেন সেটা বলা মুশকিল!

•

ভারতের সুপার স্টার রাজেশ খান্না সবতাই সুপার। ছবি সিলেকশন, লোকেশান নির্বাচন, স্ক্রিপ্ট লেখা (নিজের সুবিধেমত পাল্টানোর আদেশ দেওয়া), হিরোইন বেছে নেওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারেই সুপার। এসব গুণগুলো না থাকলে অবশ্য নাকি সুপার স্টার হওয়া যায় না।

তারকা হওয়ার প্রধান শর্তই হোল মাপালের বাইরে যাওয়া। সাংবাদিক এবং স্টুডিওকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে হবে যখন তখন। ঠিক সময়ে স্যুটিংয়ে এলেছো কি তারকা নাম বদলে গেল। তারকার স্ট্যাটাস আর থাকল না। প্রোডিউসাররা যদি এবেলা-ওবেলা 'জী হুজুর' না করলো তাহলে আর স্টার হওয়া কেন! তায় স্টার যদি সুপার হয় তাহলে তো কথাই নেই! আদরে সোহাগে তো মাথায় তুলে রাখতেই হবে।

রাজেশ খান্না সুপার স্টার হবার পর শর্তগুলো বেশ নিয়ম করে মেনে চলছেন। প্রোডিউসার-ডিরেকটররাও বুঝেছেন ছবিকে সুপার হিট করাতে গেলে সুপার স্টারকে নিয়ে কম-বেশী কিছু সুপার ট্রাবল তো পেতেই হবে। এটা উপরি পাওনা। কিন্তু পর পর তিন-চারখানা ছবি ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবার পর রাজেশ খান্না এখন একটু থমকে দাঁড়িয়েছেন যেন, প্রেম আলমানীর প্রোডিউসার-ডিরেকটার ব্রজ খোসলাকে শুটিং-এর ব্যাপারে যে রকম নাস্তানাবুদ করিয়েছিলেন এখন ঠিক সমান ভোগান্তি হচ্ছে তাঁর নিজের কপালে।

কিন্তু ঐ যে কথায় আছে না, নেশাই মানুষকে খায়। রাজেশের বেলায়ও ঘটেছে তাই। শুটিংয়ে যাবার ব্যাপারে একটু-আধটু পাংকচুয়াল হলেও সুপার স্টারের অহংকার এখনও যায় নি। এখনও নিজেকে তিনি নাম্বার ওয়ান হিরো বলেই বুঝি মনে করেন। অমিতাভ বচ্চন-ঋষি কাপুর যে মাঝখানে এসে ওঁর বাজার খারাপ করে দিতে পারেন সেদিকে হুঁস নেই।

ঠাণ্ডা মাথায় বসে আলাপ-আলোচনা, নিজেকে অ্যানালাইজ করবেন তা নয়, ছুটির দিন পেলেই হোল—অমনি শুরু হোল আড্ডা। প্রথমটায় মেহফিল বসত ওঁর বাড়ীতে, আশীর্বাদের দোতালায়। ডিম্পলের তাড়া খেয়ে এখন সেই আড্ডা ঘর ছাড়া। নরেন্দর বেদী, আসরানী ইত্যাদিদের বাড়ীতেই এখন আড্ডা জমছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই রয়েল স্যালুট বা হোয়াইট হর্সকে বগলদাবা করে চলে গেলেন কোথাও। সারাটা দিন চলল নাচা-গানা। এদিকে বাড়ীতে ভাবী-জননী ডিম্পল একা। আর তাঁর দু বছরের শিশু টুইংকল বাপী, বাপী করে আয়াদের কোলে কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাপী তখন কোথায়?

•

মমতাজের বিয়ে হয়ে গেলেও ফিল্ম লাইনের মোহ এখনও ছাড়তে পারেন নি। পারবেনই বা কি করে? রাজেশ-জীতেন্দ্রর মত বন্ধুদের কি সহজে ভোলা যায়। বোধ-হয় ওঁরা দুজনও মমতাজকে ভুলতে পারেন নি। মমতাজ তাই মাসে অন্তত একবার লণ্ডন থেকে বোম্বাইয়ে আসবেনই। আর মমতাজের আসার খবর কানে যাওয়ার শুধু অপেক্ষা! হয় কোনো হোটেলে কিম্বা কোন পার্টিতে রাজেশ-জীতেন্দ্রর মমতাজের সঙ্গে দেখা করা চাই-ই-চাই।

এই তো কিছু দিন আগে মুনি ধাওয়ানের বিবাহ বার্ষিকীর পার্টিতে যাবার জন্য শুটিং শেষ না করেই তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসেন। কারণ ঐ পার্টিতে মমতাজ আসবেন। মমতাজ অবশ্য এবার একা আসেন নি, ময়ূরে সঙ্গে ছিলেন। জীতেন্দ্রও একা যান নি পার্টিতে, অসুস্থ শরীর নিয়ে শোভা সিপিও সঙ্গী হয়েছিলেন স্বামীর। উনিও খবর পেয়েছিলেন মমতাজ পার্টিতে থাকবেন। সুতরাং স্বামীকে তো একা ছাড়া যায় না।

যথারীতি দেখা দুজনার। মমতাজের সঙ্গে পরিচয় করানো হোল শোভার। দুজনে দুভাবে হাত বাড়িয়ে উইশ করলেন দুজনকে তাতে মনে হোল দুজনে দুজনকে বোধ হয় প্রথম দেখছেন। মমতাজ শোভা আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিয়ে শোভাকে অভি-নন্দন জানাতে শোভা প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি। পাল্টা অভিনন্দন তিনিও জানিয়েছেন। কিন্তু মুনি ধাওয়ান এসে যখন বললেন—শোভা, তোমাকে নয়, মম-তাজ তোমার পেটের বাচ্চাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

তখন শোভা লজ্জে লাল। তবুও শোভার রাগ কমে নি। মমতাজকে একটু বাদেই জিজ্ঞেস করেছেন—কবে লণ্ডন ফিরছো? জীতেন্দ্র তখন আড়চোখে মমতাজ আর শোভাকে দেখছেন।
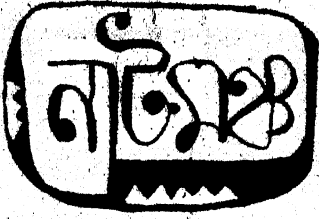
অভিজিৎ

নিস্তরঙ্গ সমুদ্র নাটকে রীতি গাঙ্গুলী ও শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র'

আসিফ করিমভয়ের দি ভলট্রামস পড়িনি এবং মহারাষ্ট্রে নিষিদ্ধ সেই নাটকটিও দেখিনি। আর কেন নাটকটি সেখানে নিষিদ্ধ তাও জানা নেই।

তবে বাংলায় রূপান্তরিত 'ভলট্রামস' অবলম্বনে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র দেখেছি এবং দেখে বিস্ময়বোধ করেছি এর বলিষ্ঠ বক্তব্য ও প্রয়োজনার জন্য। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যে এমন দুঃসাহসিক নাটক বোধহয় এদেশে একমাত্র আমাদের এই বাংলায়ই পরিবেশন করা সম্ভব। বাস্তবকে মেনে নেবার এমন ঔদার্য ও দুঃসাহস একমাত্র বাঙ্গালীই রাখে।

মঞ্জরী নিবেদিত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের চরিত্রলিপি দীর্ঘ নয় সাকুল্যে হয়তো দশটি। তার মধ্যে প্রধান চারটি চরিত্র। দুটি নারী দুটি পুরুষ। সমগ্র নাটক এবং বক্তব্য এদের ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে।

এ নাটকের গল্প সাধারণভাবে কাহিনী-ভিত্তিক না হলেও এর সমস্ত বক্তব্যটাই দাঁড়িয়ে আছে চরিত্রগুলির সংলাপের (বঙ্গানুবাদ এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়) ওপর। যে সংলাপ দর্শক-শ্রোতাকে একাধারে চমকিত ও মুগ্ধ করবে। এখানে স্বীকার করে রাখা ভাল যে এমন গভীরতায় চিহ্নিত সংলাপ আমরা সচরাচর মঞ্চে শুনতে অভ্যস্ত নই। এমন নিঃশঙ্ক এবং ধারালো সংলাপ উপহার দেবার জন্য আসিফ করিমভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। বাংলায় তার সার্থক প্রয়োগের জন্য শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। বিশেষ করে জোর মুখের সংলাপগুলির যেন তুলনা নেই। সদ্য পি এইচ ডি প্রাপ্ত একজন অধ্যাপক যে জীবনের আর এক অর্থের অন্বেষণে সততই অস্থির এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন সময়ে বিভ্রান্তও বটে যে নারী এবং পুরুষকে তাদের স্বতন্ত্র সত্ত্ব, তাদের প্রেম লালসা ইত্যাদিকে কোন মাপকাঠির মধ্যে ধরে রাখতে পারে না বলে যার সমস্ত ধারণাই পলকে পলকে মত বদলায়—সেই সব অংশের সংলাপ বস্তুবাদী জগতে জড় এবং সজীব পদার্থের মধ্যে যে প্রায় সময়ই কোন অর্থ বা পার্থক্য এবং মানুষ এবং পশুর মধ্যে রিপুর ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না—সেই সব ভাষাগুলি বুদ্ধি-জীবী চিন্তাশীল দর্শককে অবশ্যই ভাবতে বাধ্য করবে। সেই অর্থে এ নাটক যেমন সাধারণ আনন্দাভিলাষী দর্শকদের জন্য নয় তেমনি বাংলা ভাষায় এমন নাটক এ যাবৎ খুব বেশী যে পরিবেশিত হয়নি সেকথাও স্বাচ্ছন্দেই বলা যায়। এ নাটক সেদিক থেকে যে বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত দর্শকদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং তাতে বিদগ্ধ বাঙ্গালী দর্শকরা লাভবানই হবেন।

রীটা এমন এক নারী চরিত্র যে একটি ভালোবাসার পুরুষকে জড়িয়েই বেঁচে থাকতে চায় তাকে নিয়েই সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখার বাসনাকে মনে মনে পালন করে। তাই সে বেকার প্রেমিককে নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে সন্তর্পণে লালন করতে চায় দুঃস্বপ্নে ও স্বেচ্ছাচারিণী হবার চিন্তা মনে স্থান দেয় না। কিন্তু তার বেকার সঙ্গীতজ্ঞ প্রেমিকের (টনি) কাছে নারীর ভালোবাসা বা তার দেহের চেয়েও বড় তার ক্ষুধা। সে ভাল খাওয়া পরার জন্য যে কোন কিছুর পিছনে ছুটতে পারে তার জন্যে সে তার ভালোবাসার মানুষকেও অবহেলা করতে কুণ্ঠিত নয়। লীজার মত মেয়ে তাই সহজেই তাকে আকর্ষণ করতে পারে। সে টনিকে ক্রীড়নকের মত ব্যবহার করে রীটার মনে অশান্তির সৃষ্টি করে।
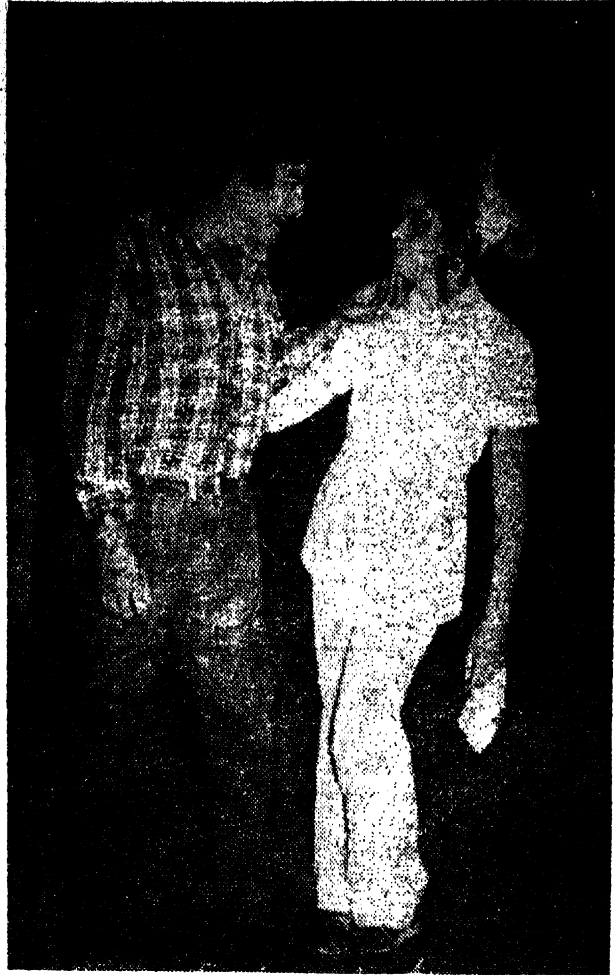
লীজা মানসিকতায় রিটার বিপরীত। তার অনেক পুরুষ বন্ধু আছে সে তাতেই আনন্দ খুঁজে পায়। দেহ এবং যৌবনকে যে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার ও উপভোগ করতে চায়। সে যেন পুরুষকে খানিকটা পোষা

দুধুয়ের প্রয়ত্ন ব্যবহার করে আনন্দ পায়। তাতেই তার চরম সুখ। তার জন্যে সুনিয়ন্ত্রিত সুখের খাঁচা ভেঙ্গে দিতেও পেছপা নয়। তাই সে টনিকে প্রকাশ্যেই আকর্ষণ করে জোড় জিনিষের প্রলোভন দেখায়। এবং টনিও তাতে পরম উৎসাহ অনুভব করে—রিটার মানসিক যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও।

লীজা শুধু হার স্বীকার করে অস্থির-চিত্ত অধ্যাপক জোর কাছে। পলকে পলকে যার মানসিকতা বদলায় যে কখনও নারীর প্রতি আকর্ষণে উদ্দাম কখনও বা ঘৃণায় তাদের কীটের মত মনে করে—এবং উভয় ক্ষেত্রেই সে অকপটে তার নিজের কথা স্পষ্ট করে বলে।

জো এবং টনির মধ্যে এখানেই পার্থক্য। একক্ষেত্রে দুজনে যেন দুই মেরুর অধিবাসী। অথচ তাদের মধ্যে এত বৈপরীত্য সত্ত্বেও তারা অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। কখনও তারা একত্রে আনন্দ করে আর কখনও বা স্বচ্ছন্দ-দুঃখে লিপ্ত হয়। এবং উভয় ক্ষেত্রেই অক্লেশেই সেটা হয়।

এই চারটি চরিত্রের জটিল মানসিকতাই বলা যায় এ নাটকের মূল উপজীব্য। এবং সেদিক থেকে কোন চরিত্রকেই আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়।

অভিনয়ে জোর চরিত্রে নির্মল ঘোষ (এ নাটকের পরিচালকও) অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যেন মনে হয় চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম।

টনি চরিত্রে শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়াংশে সংযত অভিনয়ের ক্ষেত্রে সুন্দর। প্রথমার্ধের চাপল্য ঠিক তাকে মানায় নি। এটা বয়সের তারতম্যের জন্যও হতে পারে।

দীপ্তি গাঙ্গুলীর রিটা দৃশ্যবিশেষে রীতিমত বিস্মিত করেছে। এমন স্বচ্ছন্দ এবং সংবেদনশীল অভিনয় বিশেষ করে দ্বিতীয়াংশে শ্রীমতী গাঙ্গুলী যে পাকা অভিনেত্রী তাই প্রমাণ করে।

লীজা চরিত্রে শিবানী ভট্টাচার্যকে মানিয়েছে সুন্দর। অভিনয় করেছেনও ভাল। তবু চরিত্রটি ফোটানোর ব্যাপারে কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে গেছে।

বিবর

শিয়ালদহস্থিত সেতাজী মঞ্চে 'বিবর' নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। কাহিনী—সমরেশ বসু। নাটক—সমর মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত—আনন্দশংকর। আলো—কলিম্ব সেন। মঞ্চ—শৈলেন দে। অভিনয়ে ঃ অসিত-বরণ সুব্রত সেন, রবি ঘোষ, হারাধন ব্যানার্জি, প্রমোদ গাঙ্গুলী, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, সমর মুখার্জি সমরেশ ব্যানার্জি, দিলীপ ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার, অতীন ভট্টাচার্য গৌরীশংকর ব্যানার্জি, জয়শ্রী রায়, গীতা দে, রত্না ঘোষাল, ছন্দা দেবী গীতা মিত্র আরো অনেকে।

ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক অভিনয় সঙ্গীত ও আলোকসম্পাত এবং মঞ্চকৌশল বিবর নাটকটিকে নাট্যামোদিদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। একসঙ্গে এতগুলি শিল্পীর সমাবেশ এবং তাদের অভিনয় প্রচেষ্টা দর্শকেরা উপেক্ষা করতে পারবেন না। মূল উপন্যাস আর নাট্যরূপে পার্থক্য থাকলেও বক্তব্যে পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে গ্রন্থনায়।

নাট্য সমালোচক

বিবরের শিল্পীই চরিত্রানুযায়ী বিস্ময়-কর অভিনয় প্রতিটি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে-ছেন। কিন্তু কয়েকটি চরিত্রের সার্থকতা যেমন উপলব্ধি করতে পারা যায় না, তেমনি চরিত্রের বিশ্লেষণও পীড়া দিয়েছে। সমগ্র নাটকে যে যে চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সেগুলি হল নায়কের বাবা (সুব্রত সেন) মা (গীতা দে) ছোট ভাই পল্লব (গৌরীশঙ্কর) এবং আরো দু-একটি অনুল্লেখযোগ্য চরিত্র। পল্লব চরিত্রটি নাট্যকারের একটি সার্থক সৃষ্টি। পল্লব চরিত্রে নবাগত গৌরীশঙ্কর যে যোগ্য-তার পরিচয় দিয়েছেন—তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশাবাদী। নায়ক পলাশ বিবর-এর আবর্ত থেকে মুক্তির জেহাদ ঘোষণা করলেও বিবরের মধ্যেই তাকে আবর্তিত হতে দেখা যায়। নবীন চিন্তা-ধারায় আমৃত্যু অবিচলিত থেকে পল্লব জ্যেষ্ঠের সামনে যে দৃষ্টান্ত রেখে যায়—তাতে প্রভাবান্বিত হওয়াতে নায়কের চরিত্র অন্ততঃ কিছুটা সংশোধিত হয়েছে। নায়ক পলাশ চরিত্রে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় তার মঞ্চজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পরিচয় দিয়ে-ছেন। নায়িকা চরিত্রে জয়শ্রী রায়ের প্রথম মঞ্চজীবনকে স্বাগত জানাই। দারিদ্র্যের হাহা-কার থেকে মুক্তি পাবার জন্য নায়ক দুঃখ থেকে যখন মানব সংগ্রাম করে—তখনই তারা মানুষের সহানুভূতি লাভ করে। দুর্নীতির সঙ্গে যারা হাত মেলায়—কোন সময়ই তারা মানুষের সহানুভূতি লাভ করতে পারে না। নায়িকা সম্পর্কেও একথা

প্রযোজ্য। অসৎ উপায়ে নায়কায় অর্থোপার্জনের দৃশ্যে পিতাকে উপস্থিত করায় নাট্যকারের এবং পরিচালকের নাট্যবোধ সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। চিন্ময় রায়, রবি ঘোষ, ছন্দা দেবী এবং এমনি আরো চরিত্রগুলি শুধু অবান্তর নয়—অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতগুলি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি মেনে চলতে হয়—নাট্যকার তা চলেন নি। নাট্যকার অভিনীত গৃহভৃত্যা বোম্মা সম্পর্কেও একথা বলা চলে। অথচ চরিত্রানুযায়ী সবাই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীতে আনন্দশঙ্কর মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আলোর ক্ষেত্রে কণিষ্ক সেনকেও প্রশংসা করবো।

বিবরের বিষয়বস্তু আধুনিক নয়। সাহিত্য ও নাটকের মধ্য দিয়ে যাঁরা বিপ্লবের কথা বলেছেন—একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে মূলত বিপ্লব সম্পর্কে তাঁদের কোন ধ্যানধারণা নেই। এবড়ো-খেবড়ো কয়েকটি গোলা-বারুদ জোড়, যেমন বিপ্লবাত্মক কাজের নজির নয় তেমনি কতগুলি কথার ফুলঝুরি দিয়েও বিপ্লবের ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় না। বৃহত্তর মানবিকতা বিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থান্ধ মনোভাব বা কার্যকলাপের বৈজ্ঞানিক পথে পরিবর্তন সাধন বা সাধন প্রচেষ্টাই বিপ্লব। বিপ্লবের মধ্যেই নিহিত থাকে সৃষ্টির বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। ও নিহিত থাকবে দৃষ্টির আভাস।

বিবর তবু নাট্যামোদীদের ভাল লাগবে। ভাল লাগুক তাই আমরা কামনা করি।

শীলভদ্র

শুভম নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়

জোড়াসাঁকো নেতাজী জয়ন্তী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবস গত ২৮ জানুয়ারী শুভম নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত 'রাজযোটক' (অ্যান্টন চেকভ-এর দি প্রপোজাল অবলম্বনে রমেন লাহিড়ী রচিত) নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটির প্রয়োগ পরিকল্পনায় মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর রাখেন তপন ধর।
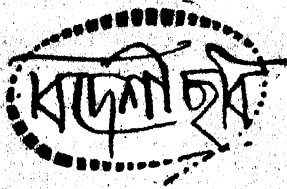
ফ্যাসিজম বিরোধী ছবির উৎসব

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পৃথিবীর শান্তিকামী জনগণের জয়লাভের ৩০তম বিজয় উৎসবের বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গোর্কী সদনে সোভিয়েট রাশিয়ার 'ব্যাটল ফর বার্লিন', পোল্যাণ্ডের 'ফার্স্ট ডে অব ফ্রিডম', পূর্ব জার্মানীর 'ইউ এ্যান্ড ইয়োর পাল', বুলগেরিয়ার 'কোয়ায়েট শোর' চেকোশ্লোভাকিয়ার 'দি ডে হুইচ ডাজ নট ডাই' এবং হাঙ্গেরীর 'ডার্কনেস ইন ডে টাইম' বিভিন্ন দিন দেখানো হয়। প্রায় প্রতিটি ছবির আগেই সেকালের যুদ্ধের ওপর তথ্যভিত্তিক ডকুমেণ্টারী ছবিও দেখানো হয়।

ডকুমেণ্টারী ছবিগুলি হিটলারের নির্যাতনের যেন প্রামাণ্য দলিল। ছবিগুলি দেখলেই অনুমান করা যায় কমিউনিস্ট দেশগুলির সংঘবদ্ধ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত হিটলারের জার্মান কি অমানুষিক অত্যাচার করেছিল ঐসব দেশের জনগণের ওপর।

সেই দিক থেকে ঐ তথ্যচিত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। উৎসবের সূচনা হয় রাশিয়ান ছবি 'ব্যাটেল ফর বার্লিন ছবিটি দিয়ে। এই যুদ্ধ চিত্রটি নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালের সেই রক্তক্ষয়ী মরণপণ লড়াই আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেলেও সেই ভয়াবহ দিনগুলিকে আজও পৃথিবীর সভ্য দেশগুলি স্মরণ করে থাকে। এই ছবিটি সেই যুদ্ধের ব্যাপকতা, ভয়াবহতা এবং হিটলারের খেয়ালখুশীর ফলে কত মানুষকে যে জীবন দিতে হয়েছিল স্বদেশ রক্ষার জন্য—তার একটা আপাত দলিলের কাজ করেছে যেন।

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বসে দেখতে হয় ছবিটি। বলতে কি, যুদ্ধের পটভূমিতে তোলা এমন ছবি বড় একটা দেখা যায় না। ছবিটির পরিচালক উরি ওজেরভ।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের ছবি পোল্যাণ্ডের 'ফার্স্ট ডে অব দি ফ্রিডম'। একেবারে ভিন্ন ধরনের যুদ্ধের ছবি। যেন আরো বাস্তব, আরো জীবনভিত্তিক। তার সঙ্গে পাশাপাশি আছে নির্মমতা ও কোমলতার স্পর্শ। সৈন্যদের মুখে একটা গান আছে, যার সবটাই কাব্যমণ্ডিত। তবে পোলিশ ছবির অতি বাস্তবতার ছাপ এ ছবিতেও বর্তমান। যা অবশ্য অনিবার্য-ভাবেই এসে পড়েছে। সেই বিভ্রান্ত বিকৃত রুচির কাছে নারীর প্রাধান্য। দুটি তেমন দৃশ্য অংশত আছে। কিন্তু দৃশ্য দুটি তাৎপর্যপূর্ণ।

ছবিটির পরিচালক আলেকজাণ্ডার ফোর্ড। সঙ্গীত এ ছবির একটি প্রধান অঙ্গ।

তৃতীয় দিন দুখানা জি ডি আর-এর ছবি দেখানো হয়। এর মধ্যে একখানা শর্ট ফিল্ম। নাম 'মিউজিক প্যারেড'। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিটির নাম 'ইউ এ্যাণ্ড ইয়োর পাল'। ছবিটি পুরোপুরিই ডকুমেণ্টারী। এ ছবির সময় কাল ১৮৯৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ কাইজারের আমল থেকে হিটলারের পতনকাল পর্যন্ত। এই ছবির সঙ্গে এমন কিছু মূল্যবান রীলও দেখানো হয়েছে যা দেখলে এখনও যুদ্ধের বিভীষিকা মনকে বিষণ্ণ করে তোলে।

বুলগেরিয়ার ছবিটির নাম 'কোয়ায়েট শোর'। সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তার ছবি। যা মনকে ভাবায়, নাড়া দেয়। এই সঙ্গে একটি শর্ট ফিল্ম দেখানো হয়। জীবনভিত্তিক।

পঞ্চম দিনের ছবি চেকোশ্লোভাকিয়ার 'দি ডে হুইচ ডাজ নট ডাই।' ফাসিস্ট জার্মানীর হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য একটি সুখী, পাহাড়ী গ্রামের আত্মত্যাগের কাহিনী। ছবিটি যেমন গতিশীল তেমনি আকর্ষণীয়। আর রঙিন ছবিটি প্রাকৃতিক দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়।

এ ছবিতে সবচেয়ে যেটা বেশী করে লক্ষ্যণীয়, সেটা হোল, দেশাত্মবোধের ব্যাপারে একটা গোটা জাতির সামাজিক সচেতনতা এবং সে বিষয়ে সে দেশের নারীর ভূমিকা।

এ ছবির নায়ক জ[…]নীর স্বপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার বি[…]দ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী নয়। বস্তুত সে কারুর বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরতে চায় না। সে শান্তিপ্রিয় মানুষ। সংসারেই সুখী থাকতে চায়। যার জন্যে সেনাদল থেকে পালিয়ে এসেছিল নিজের গ্রামে, নিজের সংসারে।

পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামের এক চৌকি-দারের কাছে খবর পেয়ে জার্মান সৈন্যরা সেই লোকটি এবং অন্যান্য পলাতকদের খোঁজ করতে এসে তার স্ত্রীকে যখন গুরুতর আহত করে যায় তখন সে আত্ম-গোপন করে ছিল। খবর পেয়ে আবার সে অস্ত্র ধরে এবং সেই জার্মান সৈন্যকে খুঁজে বের করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এক সময় কয়েকটি জার্মান সৈন্য তাদের হাতে ধরা পড়ে যার মধ্যে সেই জার্মান সৈন্যটিও (অফিসার) ছিল। কিন্তু তার সম্পর্কে কিছু জানা না থাকায় সে তাকে চিনতে পারে না।

জানীয়,
জন্টু মুখার্জি ও মধুমিতা দেব রায়

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এক সময় আশ্চর্য সে সেই সৈন্যটির হাতেই ধরা পড়ে এবং তাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। তখনই তার মনে হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছে না থাকলেও শান্তিপ্রিয় মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য, স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরতে হয় এবং সেটা বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

কাহিনীর মধ্যে তেমন কোন সাহিত্য মূল্য না থাকলেও এর একটা আলাদা মানবিক আবেদন আছে, যা মনকে স্পর্শ করে।

ছবিটির পরিচালক মার্টিন তাপকা উৎসবের শেষ ছবি হাঙ্গেরীর 'ডার্কনেস ইন ডে-টাইম'। যেটি সম্ভবত উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি।

এ ছবির কোথাও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন পরিবেশের উপস্থিতি নেই—শুধু একবার সাইরেনের আওয়াজ ও একবার মাত্র জার্মান সৈন্যের উপস্থিতি ছাড়া।

গল্পের শুধু বর্তমানের পটভূমিতে। প্রধান সমস্যা উপলক্ষ। যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন এবং ধ্বংসের দিনগুলি পেরিয়ে আজকের হাঙ্গেরীর জীবনযাত্রা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক তার প্রমাণ দৃষ্টিতে সমগ্র উপলক্ষে [illegible] আছে জানাবার জন্য।

সেখানেই একজন প্রবীণ ভদ্রলোক এমন একজন পুরনো পরিচিত লেখককে আবিষ্কার করে যার সহায়তায় একদিন উক্ত ভদ্রলোক (তখন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল) জার্মান সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদ গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হতে পেরেছিল।

কিন্তু লেখক তাকে চিনতে পারলেন না ইচ্ছাকৃতভাবেই। নির্জনতাপ্রিয় লোক তিনি, তাই প্রথম কিছু সময় তাকে এড়িয়েই গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা দিতে হোল নিজের অজ্ঞানতেই এবং কিছুটা বা কর্তব্য-কারণেই।

মূল গল্পটি ফ্ল্যাশ-ব্যাকে বলা হয়েছে।

স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর মেয়েকে হোস্টেলে রেখে (মেয়েটি তখন লেখাপড়া করে) নিজে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন লেখক ভদ্রলোক। নির্জনতা এবং সাহিত্যই তখন তার একমাত্র সঙ্গী।

ঠিক এই সময়েই এমন একটি মেয়ের সঙ্গে সে পরিচিত হয় যে নিজের মা-কে ছেড়ে এক ছোট শহরের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে অতি সাধারণ একটা কাজ করে।

এক বৃষ্টির দিনে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। যেন কাঁচপোকার মত সে তাকে আকর্ষণ করে। অথচ মেয়েটির বয়েস প্রায় তার মেয়েরই মতন।

তবু তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এক সময় জানতে পারেন যে, মেয়েটি

ইহুদি। মাত্র একদিনের জন্য সে বিবাহিত হয়ে এক জার্মান সৈনিকের সঙ্গে ঘর করে। (পরদিনই স্বামীটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়) যার তখন একমাত্র বাসনা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে রাজধানীতে গিয়ে মা-র সঙ্গে দেখা করা। আর দ্বিতীয়ত তার বড় ভয়, পাছে সে জার্মান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে যায়। কারণ, সে জন্মসূত্রে ইহুদি।

লেখক মেয়েটিকে জার্মান সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এক সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়। দেশে তখন প্রত্যেক পরিবারের আত্মপরিচয় মূলক সরকারী পরিচয়পত্র রাখা বাধ্যতামূলক। লেখক তার মেয়ের পরিচয়-পত্র দিয়ে তাকে আড়াল করতে চায়। এবং সেটাই হয় তার কাল। লেখকের কন্যার গোপনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। যেটা জার্মান সৈন্যরা জানতে পেরে খুঁজতে খুঁজতে তাকেই এসে গ্রেপ্তার করে। এবং মেয়েটিও নিজেকে লেখকের কন্যা বলে পরিচয় দেয় ও তাকে বাবা বলে সম্বোধন করে। এখানেই গল্পের চমক ও বিশেষত্ব।

ছবিটি দেখতে বসে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। আর নিবিষ্ট হয়ে দেখতে হয় লেখক এবং ইহুদী মেয়ে ভূমিকাভিনেত্রীর অভিনয়।

যুদ্ধবিরোধী এবং মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ ছবি তৈরীর এ এক নতুন প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই।

এই উৎসবের অন্য যে দুটি ছবি দর্শকদের ভাল লেগেছে এবং ভাবিয়েছে, তা হোল পোল্যাণ্ডের 'ফার্স্ট ডে অব ফ্রিডম' এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার 'দি ডে হুইচ ডজ নট ডাই'।

শ-র-চ

কিছুক্ষণ

মহুয়া রায়চৌধুরী

হারমোনিয়াম : কাজল গুপ্ত

দরজার বাইরে কলিং-বেলটায় যখন হাত রেখেছি, পাশের ফ্ল্যাটের রেডিও থেকে তখন মীরা গুপ্তের রবীন্দ্রসংগীত কানে আসছে। তার মানে আটটার একটু আগেই এসে পড়েছি। যাক, এবার আর লেটলতিফ বদনাম কেউ দেবে না আমায়।

ঘণ্টার 'টিং-টিং' শব্দটা শেষ না হতেই সামনে দরজা খুলে দাঁড়ালেন মহুয়ার বাবা। ওঁর চেহারা আর চোখমুখে সদ্য ঘুম থেকে ওঠার ছাপ। বুঝলাম এ-বাড়ীতে এখনও সকাল হয়নি। ডাইনিং স্পেসটাতেই বসতে হোল তাই।

একটু আড়ামোড়া ভেঙে গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন—কাল খুব ধকল গেছে টুটুন শুয়েছেও অনেক রাত্তিরে। বসুন, ডাকছি।' সামনের ঘরটাতেই শুয়েছিল টুটুন মানে মহুয়া রায়চৌধুরী, আজকের নতুন জেনারেশনের নতুন নায়িকা।

ডাকতে আর হয়নি বাবাকে। আমাদের কথাবার্তায় ঘুম বুঝি ভেঙে গিয়েছিল ওর। স্লিপিং গাউনে মোড়া ছোট্ট নরম ঘুমে জড়ানো দেহটাকে আড়াল করে পাশের ঘরে যাবার সময় এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে গেল মহুয়া। হাসিতে মেয়েলী লজ্জাও ছিল।

বসবার ঘরে গিয়ে বসে সামনে রাখা কাগজটায় হাত রাখতে যাব, অমনি দেখি বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন কফির কাপ নিয়ে। 'টুটুন তো আসছে ততক্ষণে একটা খান।' উনিও বসে পড়লেন আমার সামনে। ওঁর কাছ থেকেই শুনলাম গতকাল বাবা-মেয়ে তারকেশ্বর গিয়েছিলেন কি-একটা নতুন সিনেমা হলের উদ্বোধন করতে। সেখান থেকে বিকেলে ফিরে ইন্দ্রপুরীতে ছুটতে হয়েছিল স্যুটিং করতে। তারপর রাত্রে

নৃত্যনাট্য হচ্ছে, তারই মহড়া। সুতরাং সব সেরে বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারটা। আর আজ তাই ঘুম থেকে উঠতে লেট। এদিকে সকালেই নাকি আবার লেক টাউনে 'জীবন মরুর প্রান্তে' ছবির আউট-ডোরের কাজ আছে। যে-কোনো মুহূর্তে মেক-আপ-ম্যান চলে আসতে পারে, আসার সময় নাকি পেরিয়েও গেছে। তাঁরই অপেক্ষা করছেন তিনি। কফির কাপও শেষ।

মহুয়া এই সব কথার ফাঁকে আরেকবার দরজার পর্দা সরিয়ে আমায় ডেকে বলে গেছে—'আমি একটু চানটা সেরেনি, অ্যাঁ?'

—ঠিক আছে করুন না।

চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে 'মাফ-চইবার-হাসি' নিয়ে বলেছে 'আপনি রাগ করছেন না তো?'

—না, না। আপনি চান করুন।

বুঝতেই পারছেন মেয়েদের চান করতে কিরকম সময় লাগে। জানি না কেন মেয়েদের এই স্নানবিলাস! মহুয়া তো আবার আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ে নয়, রূপোলী পর্দার অভিনেত্রী। সুতরাং তার স্নানপর্ব শেষ করতে একটু সময় লাগবে বৈকি।

বসবার ঘরটা ততক্ষণে পরিচিত পরিচালক রণজিৎ সংকাম, মেক-আপ-ম্যান মোনাদা আর কজন অপরিচিতের ভিড়ে জমজমাট। কথাবার্তা ছোঁড়াছুড়ি চলছে। কোনো প্রসঙ্গ নেই তাই কথার দাঁড়ি-কমাও নেই। সাইরেন বাজছে কিছু দূরে।

সাইরেন শেষ হতে না হতেই ঘরে ঢুকলো এসে মহুয়া। আলগা চুলগুলোকে রঙীন রুমাল দিয়ে গোড়া থেকে বাঁধা। পরনে তাঁতের শাড়ী, ভুরুতে পেন্সিলের ছোঁয়া বেশ স্পষ্ট। মুখে কোনো প্রসাধন নেই, চুলেও নেই কোনো গন্ধ। বেশ দর্পিত পদক্ষেপে আমাকে পেরিয়ে গিয়ে বসলো সে আমারই সমকোণে ডানদিকের চেয়ারে।

: অনেক দেরী হয়ে গেল, না? চোখের তারা নাচানোর ভঙ্গিতে লজ্জার ছোপ। গালের টোলেও একই ভঙ্গী।

আমার সেই একই সহাস্য উত্তর।

—আমায় তো বলেছিলেন আজ আপনার অফ-ডে। কিন্তু অন্য কথা শুনছি যে।

আমার কথায় মহুয়া একটু বিব্রত যেন। কি বলবেন ভাবছেন।

:-কাজ তো ছিল না, হঠাৎ এঁরা ধরলেন —কি করি বলুন? বলতে বলতে তাকালেন মোনাদার দিকে। হাসলেন মোনাদা।

পরিচালক রণজিৎবাবু মহুয়াকে বললেন লেকটাউনে তো কাজ করছো। দুপুরবেলা খাবার নেমন্তন্ন তাহলে আমার বাড়ীতে রইল। উনি চলে গেলেন। বিশ্ব-জিতের সঙ্গে নাকি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সাড়ে দশটায়।

মহুয়ার হাঁকাহাঁকিতে ইতিমধ্যে আমার সামনের টেবিলটা ভরে উঠেছে বিস্কুট, চানাচুর রসগোল্লা-সন্দেশের প্লেটে। এতো খাবার দেখে তো আমি হতভম্ব।

খাবে?

আগেও যে কবার এসেছি মহুয়ার মা মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়েননি। অতিথি-বৎসল হিসাবে এঁদের সুনাম আছে যথেষ্ট। তাই আপনি ইন্দ্রপুরী অন্য যেখানেই যান না কেন সবার কাছেই শুনতে পাবেন এই কথা। মাকে সেদিন অবশ্য দেখতে পেলাম না। মর্ণিং ডিউটিতে তিনি নাকি অফিস বেরিয়ে গেছেন।

হাত-পা নেড়ে তখন গল্প চলছে গতকাল তারকেশ্বর যাবার। চরচরে মার্কা এক-খানি গাড়িতে করে যেতে আসতে ওর তো প্রাণপাখী প্রায় উড়ে যাবার দাখিল হয়েছিল। সিনেমা হলের উদ্বোধন করতে গিয়ে সে নাকি আর এক হুলস্থুল কাণ্ড। স্থানীয় ছেলেরা চাকরীর দাবীতে হল ঘেরাও করেছিল। তাদের দাবী ছিল যতক্ষণ না হল-মালিকরা স্থানীয় বেকারদের চাকরীর দাবী মেনে না নিচ্ছেন, ততক্ষণ হলের উদ্বোধন হতে দেওয়া হবে না। অবশেষে থানা-পুলিশ ইত্যাদি করে ছেলেদের দাবীর কাছে কিঞ্চিৎ মাথা নুইয়ে হলের উদ্বোধন বেলা বারোটা থেকে পিছিয়ে হোল বেলা দুটোয়।

: আমি তো খুব ভয় পেয়েই গিছলাম। মাধবীদি ছিলেন, গুরুদাসবাবু ছিলেন, তাই কিছুটা সাহস পেয়েছিলাম। চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে মনে হোল এখনও ভয়টা বুঝি তাকে তাড়া করছে।

বয়সও বেশী নয় মহুয়ার। এই তো মাত্র আঠারো হতে চললো। কিন্তু চেহারায় তেমন গ্ল্যামার না থাকায় পরিচালকরা এখনও ওকে টিন-এজ হিরোইন হিসাবেই পছন্দ করছেন। 'আনন্দমেলা' 'বাঘবন্দী' 'রাজা' ইত্যাদি ছবিতে সেই রকমই রোল। রোমান্টিক বা ফুলফ্লেজেড হিরোইন হিসাবে ছবি না পাওয়ার জন্য তার খেদ আছে মনে হোল। কথাটা অবশ্য সে সরাসরি বলেনি। বলেছে—'ভাল রোল তেমন পাচ্ছি না।'

কথাটার অর্থ বুঝেই আশ্বাসের সুরে বলেছি—সাধারণ বাংলা ছবিতে হিরোইন বলতে যে বয়স আর চেহারার মেয়ে দরকার, আপনার এখনও তার কোনোটাই আসেনি। অধৈর্য হবার কিছু নেই, সময়ে পাবেন সব। কিন্তু মহুয়া বুঝি আর বেশী অপেক্ষা করতে পারছে না।

সলিল দত্তের 'সেই চোখ' ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে মহুয়ার অবশ্য রোমান্টিক রোল আছে কিন্তু তাও আবার শেষ পর্যন্ত টিকবে না। উত্তমকুমার কিন্তু অন্য দুটো ছবিতে মহুয়ার শ্বশুর এবং মামাশ্বশুরের রোল করছেন। শ্বশুর এবং রোমান্টিক দুটো চরিত্রে উত্তমবাবুর সঙ্গে অভিনয় করতে অবশ্য তার খুব মজা লাগছে।

ভঙ্গ। 'সেই চোখ' ছবিতে রোমান্টিক অভিনয় করার সময় প্রেমের চোখা চোখা সংলাপগুলো আধো আধো সুরে ওঁকে বলতে শুনে মহুয়া খুব অবাক হয়েছিল। কারণ, শ্বশুরের চরিত্রে কি দাপট নিয়ে কদিন আগে বাঘবন্দীতে মহুয়ার সঙ্গে অভিনয় করেছেন এই উত্তমকুমার। তাই সে অবাক হয়ে যখন উত্তমবাবুকে বলেছিল—'উত্তমদা', আপনি এমন কচি কচি সুরে কথা বলছেন কি করে?'

জবাবে উত্তমবাবু মহুয়ার গালটা ধরে একটু নাড়িয়ে বলেছিলেন—তুই যে আমার কচি তোর সঙ্গে তো কচি হয়েই কথা বলতে হবে আমাকে।

'আনন্দমেলা' ছবির ভুবনেশ্বর আউট-ডোরেও উত্তমবাবু নানাভাবে অভিনয়ে সাহায্য করেছেন মহুয়াকে। 'সিনাটের সিংহভাগ উত্তমকুমারই নিয়ে নেন'—এই বদনাম যাঁরা দেন মহুয়া তাঁদের দলে নয়। তার মত বরং উল্টো।

টিন-এজ হিরো হিসেবে বাংলা ছবিতে মহুয়ার সঙ্গে পার্থ মুখার্জির একটা সুন্দর জুটি হয়েছে। সৃষ্টিছাড়া বাঘবন্দী ছবিতে আছেন এঁরা দুজনে। অফ দি সেট পার্থ সম্পর্কে তাঁর মত—আমার সম্পর্কে ও উল্টোপাল্টা অনেক কথা বলছে, এগুলো কেন করছে বুঝতে পারছি না। ও আমার হিরো, তাই বলে যা-নয়-তাই বলে বেড়াবে এটা বরদাস্ত আমি করব না। একবার দেখা হোক ওর সঙ্গে, দেখবেন কি বলি! একটু ক্ষোভের সুর গলায় খানিকটা উত্তেজিতও। সামনে রাখা হরলিকসের গ্লাসটা মুখে তুলতে ভুলে গেছেন মনে হোল। মোনাদা মনে করিয়ে দিতে কথা থামিয়ে চুমুক দিলেন গ্লাসে।

দু-একটা কাগজে তাঁকে নিয়ে যেসব রসাল লেখা সংবাদ বেরোচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কেও মহুয়া বিরক্ত মনে হোল। ঘটনাগুলো নাকি সবই মিথ্যে। অবশ্য তিনি কোনো প্রতিবাদ এখনও করেননি।

ইতিমধ্যে 'জীবন মরুর প্রান্তে' ছবির প্রোডাকশনের গাড়ী এসে গেছে তাঁকে লোকেশানে নিয়ে যাবার জন্য। মোনাদা বললেন—আর নয়, এবার রেডি হতে হবে। শুরু হোল রং মাখা। মহুয়া বদলাতে শুরু করলেন। পুরু মেক-আপের আড়ালে দেখতে পাচ্ছি মহুয়া বদলে যাচ্ছেন। ছবির নায়িকায় মোড়িয়া হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মেয়ে মহুয়া আড্ডাবাজ মহুয়া, বাড়ীর সকলের টুটুন, পাড়ার মহুয়া বা বন্ধুদের (ছেলেবন্ধুও তাঁর কম নয়।) অন্যতম ইয়ার্কির পাত্র মহুয়া—তিনি কি বদলাবেন? বোধহয় না।

নির্মল ধর

ভাড়াটে বাড়ী : উজ্জল - কবিতা

।। জীবন নিয়ে জুয়া ।।

শিবলী সাদিক পরিচালিত ছবি 'জীবন নিয়ে জুয়া' বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ছবির নায়ক-নায়িকা ববিতা ও বুলবুল আহমদ। অন্য অন্যান্য চরিত্রে আছেন বেবী জামান কাজী এহসান মিনু রহমান শর্বরী আশীষকুমার খলিল নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

এ ছবির সংগীত পরিচালক আলী হোসেন। চিত্রনাট্য ও সংলাপ আবদুল্লাহ আল মামুদ। চিত্রগ্রহণ আবদুল লতীফ বাচ্চু। সম্পাদনায় আমিনুল ইসলাম মন্টু।

'জীবন নিয়ে জুয়া' ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনা বনলতা চলচ্চিত্র।

।। ফেরারী সূর্য ।।

উত্তরণের পর জনাব ফজলুল হক এবার 'ফেরারী সূর্য' ছবিটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

তার পরবর্তী দুটি ছবির নাম যথাক্রমে 'মন এক শ্বেত কপোতী' ও এক তারা।'

।। তাল-বেতাল ।।

আজিজুর রহমান পরিচালিত 'তাল-বেতাল' ছবির নায়ক-নায়িকা ফরহাদ ও সুচরিতা।

অন্য অন্যান্য চরিত্রে আছেন যথাক্রমে শুভ্রা রোজী রাজ্জ বাবর প্রমুখ। ছবিটির সংগীত পরিচালক সত্য সাহা।

।। ভাড়াটে বাড়ী ।।

আমরা কতিপয় পরিবেশক ও এজাজ খান পরিচালিত ছবি ভাড়াটে বাড়ী বর্তমানে মুক্তির দিন গুণছে।

কিন্না চিত্রকল্প নিবেদিত উজ্জল ও কবিতা অভিনীত এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন সাইফুদ্দীন সুমিতা হাসমত প্রমুখ।

লাঠিয়াল :

মিতা পরিচালিত 'লাঠিয়াল' ছবিটি বর্তমানে মুক্তির দিন গুনছে। এ ছবির নায়ক-নায়িকা ফারুক ও ববিতা।

ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন রোজী সামাদ আনোয়ার হোসেন নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

ছবির সংগীত পরিচালক সত্য সাহা। পরিবেশনায় মিতালী ছায়াছবি।

পিঞ্জর :

শাহজাহান চৌধুরী পরিচালিত 'পিঞ্জর' এখন মুক্তির দিন গুনছে। নায়ক নায়িকা উজ্জল ও কবিতা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মোস্তফা আনোয়ারা হাসমত সুভাষ দত্ত প্রমুখ।

ছবির কথা থাক। এবার অন্য কিছু খবর শুনুন।

রোজীর স্বপ্ন

চিত্রাভিনেত্রী রোজীর হাতে বর্তমানে পনেরোটি ছবি রয়েছে। রোজী বলেন 'এ বছরে অনেক ব্যতিক্রম চরিত্রে আমি অভিনয় করছি।'

রোজী স্বপ্ন দেখেন, তিনি যেন আমরণ অভিনয় করে যেতে পারেন। রোজী বলেন 'অভিনয় করতে করতে যেন আমার মৃত্যু হয়।'

রাজ্জাকের শপথ

'আমার প্রথম পরিচালিত ছবিতে আমি কোন আপোষ করবো না।' বলেছেন রাজ্জাক।

রাজ্জাক আরো বলেছেন, 'আমার পরিচালিত অনন্ত প্রেম ... ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য রয়েছে। এ ছবি ... ভাল ছবি হবে বলে আমি আশা করি।'

রাজ্জাক আরো বলেছেন, 'ছবিটি নতুন আঙ্গিকে তৈরী হচ্ছে। দর্শক এ ছবি দেখে নতুন স্বাদ পাবে।'

চারটি ভাষায় বাদশা ডাব হচ্ছে

সালমা কথাচিত্র নিবেদিত ও আকবর কবীর পরিচালিত রঙ্গীন ছবি 'বাদশা' রুশ ইংরাজী পার্সী ও আরবী এই চারটি ভাষায় ডাব করা হবে বলে সংস্থার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

রুশ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে ছবিটি রপ্তানী করার জন্য ছবিটিকে উপরোক্ত চারটি ভাষায় ডাব করা হবে।

পনেরো লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইস্টম্যান কালারে নির্মীয়মান এ ছবিতে রাঙ্গামাটি চট্টগ্রামের মনোরম নৈসর্গিক বৈচিত্র্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আনওয়ার আহমদ

[illegible]

গ্রামোফোন কোম্পানী অন্যান্য বারের মত এবারও কবিপ্রণাম জানিয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে সুন্দর সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত উপহার দিয়ে। ক্লান্তিবিহীন খুনস্থুটোমোর খেলায় কোনো শিল্পীরই শিথিলতা নেই। ই পি ডিস্কে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের চিত্তরূপ কণ্ঠে চারটি গানই সমান আকর্ষণীয়। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু', 'কেন আমায় পাগল করে যাস', 'ওগো অকারণে চঞ্চল'—বারবার শুনেকে ইচ্ছে করে আড়ম্বরহীন পরিবেশনার কারণে। এ-ডিস্ক কোনোদিনই পুরনো হবার নয়।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' ও 'স্বপন যদি ভাঙিলে' প্রভাতী সুরে যেন ভক্তিগত প্রার্থনার আকৃতি শোনা গেলো। বিশেষ করে 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানটিতে কড়ি-মধ্যম ও শুদ্ধ মধ্যমের দ্রুতিরেশ অফুরণে মাধুর্যে প্রাণে বাজে।

ছন্দের দোলে রঙিন হয়ে উঠেছে 'এবার রাঙিয়ে তোলো'। সুচিত্রা মিত্র কতদিনের শিল্পী, কত গানও শুনিয়েছেন। কিন্তু গাইবার আনন্দ ও ওজসে অম্লান তাঁর এবারের গাওয়া গরব মম হয়েছে, 'আঁধার রাতে একলা পাগল', 'ঘাটে বসে আছি আনমনা' ও 'আমি যে সব নিতে চাই।'

নীলিমা সেন বিনম্র-মাধুর্যে ভরে দিয়েছেন চারটি গানে এ কি করুণা করুণাময়', 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর', 'কাছে যবে ছিলো এবং 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগলো জোয়ার. শিল্পীর আত্মলীন ভাবটিতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় কই?

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের রঙিন মনের আবেগে দুলে উঠেছে চারটি মধুর প্রণয়-গীতি হৃদয়ের মণি আদরিনী মোর', 'ডাকিলো মোরে জাগার সাথী', 'হৃদয় বসন্ত-বনে যে মাধুরী বিকাশিলো' ও 'বিদায় যখন চাইবে তুমি'।

মায়া সেনের সেই পরিচিত ধ্রুপদী ভঙ্গীটি মন ভরে দেয়। শিল্পীর এবারের গাওয়া গানগুলি হোলো 'সন্ধ্যা হোলোগো', 'দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে', "ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে', 'গানের বেলা-অবেলায়'।

এবারের ডিস্কের তালিকায় একটি সংযোজন গীতা সেনের কণ্ঠের চারটি গান—'যারা আছে আসে তারা কাছে থাক', 'আমায় ছয়জনায় মিলে পথ দেখায়', 'কি ফুল ঝরিলো বিপুল আঁধারে' এবং 'পূর্বাচলের পানে তাকাই'। শিল্পী অনেকদিনের এবং অনেকদিন বাদেই ডিস্কে তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল—স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে।

ঋতু গুহর মুক্তকণ্ঠে 'দেখা যদি দিলে', 'নিভৃত প্রাণের দেবতা', 'সংশয় তিমির মাঝে' ও 'ও আমার ধ্যানেরই ধন'—গান-গুলির বক্তব্য স্বচ্ছ ও চিত্তগ্রাহী।

বনানী ঘোষের গাওয়া 'তোমায় চেয়ে আছি বসে'—গানটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সমান উচ্চ মানে পরিবেশিত অন্য তিনটি গানও 'আজি এনেছি তাঁহারি আশীর্বাদ', 'তারে দেখতে পারিনে' ও 'এ ত খেলা নয়'।

সুশীল মল্লিক স্ব-স্থানেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন চারখানি সুনির্বাচিত গানে 'কেন চেয়ে আছ গো মা', 'ফল ফল ফলাবার আশা আমি' 'আজি সাঁঝের যমুনায় গো' ও 'আজি আঁখি জুড়ালো'।

অনেক গানের মেলায় আপন কণ্ঠের দীপ্তিতেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সুচিত্রা গুহঠাকুরতা। কিশোর শিল্পীর ভাবালুতায় অভিমান মধুর হয়ে ওঠে উচ্চগ্রামের আকৃতিতে ধ্বনিত 'মা আমি তোর কি করেছি', যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে' গানদুটিতে। ঐ একই ডিস্কে শর্মিলা রায়ের মধুর কণ্ঠে শোনা যায় 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' ও 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজ'।

অদিতি সেনগুপ্ত ও গৌতম মিত্রের ৪খানি সুনির্বাচিত গান একটি ডিস্কে সংকলিত। অদিতি সেনগুপ্ত তাঁর স্বভাবগত সুসংবদ্ধ ভঙ্গীতে গেয়েছেন 'এমন আর কতদিন চলে যাবে রে' ও 'হাসিরে কি লুকাবি লাজে'। গৌতম মিত্রর গাওয়া দুটি গানে 'আমি কেমন করিয়া জানাব' ও 'ঝর ঝর ঝর ঝরে' শিল্পীর ক্রম-বিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করবার মতই।

বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত নির্বাচন ও পরিবেশন এবারেও সকলের প্রশংসা আদায় করে নেবে 'মুখপানে চেয়ে দেখি' ও 'আনমনা আনমনা'।

যথার্থ শিক্ষা ও অনুশীলনের ছাপ রয়েছে কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা পরিবেশিত দুটি গানে 'পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জ বনে' 'কোথা হতে শুনতে যেন পাই'।

সুপারসেভেন ডিস্কের সেরা আকর্ষণ সাগর সেন ও সুমিত্রা সেনের একক ও দ্বৈত কণ্ঠের ছয়টি গান। সাগর সেনের সুগম্ভীর কণ্ঠে শোনা যায়—'আজি প্রণাম তোমারে' ও 'আমার হিয়ার মাঝে'। সুমিত্রা সেনের স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ পরিবেশনায় যেন ছবির মতই [illegible]

[illegible]

[illegible] পূরবী মুখোপাধ্যায় সুবীর সেন ও শ্রীলা সেনের গায়কীর বৈশিষ্ট্য তাঁদের গাওয়া গানগুলিকে উপভোগ্য করেছে 'দেবতা জেনে দূরে রই ও ধরা দিয়েছিলে' (পূরবী) 'আমি তোমার থাকি শুধু' ও 'তুমি ত সেই যাবেই চলে' (সুবীর সেন), 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ' ও 'আমি তোমার মাটির কন্যা (শ্রীলা সেন)।

আর একটি সুপারসেভেন ডিস্কে গেয়েছেন পূর্বা দাম ('অমল কমল সহজে জলের কোলে' ও 'আমি ফিরব না রে') স্বপন গুপ্ত ('গায়ে আমার পুলক লাগে' ও 'আমি ফিরব নারে') এবং স্বপ্না ঘোষাল ('জগতে আনন্দযজ্ঞে' ও 'কোন গহন অরণ্যে')। প্রতিটি গানই মন দিয়ে শোনার মত।

শিশিরকণা ধরচৌধুরীর আসর—

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরীর একক বেহালা বাদনের আয়োজন করেছিলেন সুর সত্তাম্‌। শিল্পী প্রথমে আলাপ, জোড় ঝালা বাজান ভীমপলাশীতে। ভীমপলশ্রীর উদাস ভাবটির রূপায়ণ অনেকদিন মনে থাকবে। 'সপ্ত তুরগরবি' তখন অস্তাচলে। চলে-যাওয়া দিনের মঞ্জীর ধ্বনিই যেন বেজে উঠেছিল ভীমপলশ্রী রাগে।

ভীমপলশ্রীর পর শিল্পী বাজালেন ইমন—বিলম্বিত ও দ্রুত। ইমন ভারী রাগ কিন্তু শ্রোতাদের কাছে এ রাগ ভার হয়ে দাঁড়ায় নি শিল্পীর কলাসৌষ্ঠবের জন্য। ভীমপলশ্রীর পর ইমন শুনে মনে পড়লো কবিগুরুর একটি উপমা 'যেন তারার আলোর দিনের আলোর ছুটি'।

মিত্র শিবু বাজিয়ে শিশিরকণা সেদিন তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন। মিত্র শিবুতে যেন ইন্দ্রধনুরেখার অপরূপ সমাবেশ ঘটেছিল। বাগানে এসেছিল সুষমা, কীর্তনের সুরে এনেছিল দোলা। নতুন করে মনে পড়ল—বর্ষালায় শিশিরকণা আজও তুলনাবিহীন।

শ্রীকানাই দত্তের সংগত প্রশংসনীয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় সহযোগিতার মাধ্যমেই পাওয়া যায় শিল্পীদের পরিচয়। শ্রীদত্তের বাজনা সেই পরিচয়কেই বহন করছে।

কথক নৃত্যে একটি প্রতিভা

সম্প্রতি বিড়লা একাডেমীতে ইতিকথা সংস্কৃতি সংস্থা কলারসিক মহলকে পরিচিত করেন একটি নতুন প্রতিভার সঙ্গে—দীপিকা দাস।

নৃত্যানুষ্ঠানের আগে গুণী সংবর্ধনা সভার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় যথাক্রমে বিমলচন্দ্র ঘোষ, বাণী রায় ও সাধক সাহিত্যিক তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীকে। সঙ্গে একটি নৃত্যমানসও দীপিকা গড়ে তুলেছেন।

এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। সভা পরিচালক রবীন ভদ্র সুললিত ভাষণে বলেন বর্তমান কতটা অগোছালো—সেই মূল্যায়নের জন্যই অতীতকে জানা দরকার। এই প্রেক্ষণে কল্পনায় বিহংগ বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিদগ্ধা লেখিকা বাণী রায় ও ধর্মপ্রাণ তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীকে সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রধান অতিথি দক্ষিণারঞ্জন বসু অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাহিত্য সাধনার ঐতিহ্যবহী কবি বিমল ঘোষ বাণী রায় এবং অধ্যাত্ম সাধক শ্রীব্রহ্মচারীকে অভিনন্দন জানান।

এর পরেই ছিল শ্রীমতী দীপিকা দাসের কথক নৃত্য। শ্রীমতী দাসের প্রথম গুরু মণিশংকর। এ ছাড়া পণ্ডিত রামগোপাল মিশ্রের কাছেও ইনি শিক্ষা নিয়েছেন এবং নৃত্যধারণার পরিধি বাড়িয়েছেন বন্দনা সেন ও বেলা অর্ণবের সংস্পর্শজাত অভিজ্ঞতায়।

নৃত্যপ্রভাকর ও নৃত্যপ্রজ্ঞা উপাধির সঙ্গে একটি নৃত্যমানসও দীপিকা গড়ে তুলেছেন। সেদিনের নৃত্যে টুকরা ভাও পরণ কায়দা চক্করের শিল্পীর অনুশীলন ও শিক্ষার পরিচয় সকলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। আরো জমে উঠত যদি ব্যবস্থাপনায় একটু সুশৃংখলা হত। লক্ষ্ণৌ এবং জয়পুর দুটি ঘরাণার তালিমই এঁর আছে। তবে কোনটি এঁর নিজস্ব হয়ে উঠবে সেটা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। শিল্পীর সঙ্গে সুযোগ্য সংগতে ছিলেন তৃপ্তিময় দত্ত।

ভারত-নেপাল মৈত্রী সম্মেলন

রবীন্দ্র জয়ন্তী : গত ১৬ মে নেপালী কনসুলেটের পক্ষ থেকে এক উৎসব সভার আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করাই ছিল এ উৎসবের উদ্দেশ্য। মৈত্রীবন্ধনের বিশেষ স্বাদ ও সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করে তোলে।

সভার উদ্বোধক শ্রীসুকান্তকান্তি ঘোষ তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে বলেন ভারতীয় দর্শন ধর্ম বেদ মন্থন করে এক রসের সাগর সৃষ্টি করেছেন মন্ত্রদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনকে তিনি মহাতীর্থে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং পরিকল্পনায় তাঁর প্রধান সহায়ক হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। জীবনকে রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে যান নি। তার সৌন্দর্যচেতনার পরশমণিতে সৃষ্টি করেছেন এক আশ্চর্য জগৎ—সাহিত্যে কাব্যে গানে। আর জীবনের নানা অসংগতির বেদনার আভাস রয়েছে তাঁর আঁকা ছবিগুলিতে।

শ্রীঘোষের পর ভাষণ দেন নেপালের কনসুলেট জেনারেল শ্রীথাপা। তিনি বলেন সারা বছর নানা উৎসবের মাধ্যমে নেপাল ও ভারত পরস্পরের কাছাকাছি এসে প্রাচীন আত্মীয় বন্ধনকে দৃঢ়তর করে তুলছে। এইখানেই এ প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুরু হয় অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গান দিয়ে 'জাগো জাগো হে'। গানটি সুন্দর—শিল্পী গেয়েছেনও সুন্দর করে।

নৃত্যানুষ্ঠানে পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়ের দুটি একক নৃত্যে শিল্পী আবেগ উচ্ছ্বাসে অকৃপণ ছিলেন। কিন্তু আশার অতিরিক্ত পেয়েছি শ্রীমতী পূর্ণিমার সংগে দুটি দ্বৈতনৃত্যে (কোন আলোতে এবং তুমি যে সুরের আগুন)। শ্রীমতী সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের নৃত্যে ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দের দোলা এক প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। উপযুক্ত সংগীত সংগতে শিল্পীদের সহায়ক হয়েছেন আশিস সেনগুপ্ত ও অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য ও সংগীত পরিচালনা করেছিলেন পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়। গান ও নাচের মাঝখানটি আবৃত্তি দিয়ে পূরণ করেন জ্যোতির্ময়ী।

সংস্থার পক্ষ থেকে অতিথিদের স্বাগত জানান সংঘ সচিব পি কে চ্যাটার্জি।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়
শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।
SADHANA
Beauty Snow
সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫
SBS-3/70

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 11th July,
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১৮ জুলাই ১৯৭৫ ॥
মূল্য ৬৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

সাধনা দশন | **সাধনা টুথপেস্ট**

লক্ষ লক্ষ লোক আজ সাধনা দশন ব্যবহার করেন কারণ অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন ব'লে এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য সাধনা দশন বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর লাভ করে আসছে। সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

SD.5/70

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

১৫ বর্ষ

১০ সংখ্যা

'ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য'

Friday, 18th July, 1975 শুক্রবার ১ শ্রাবণ ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
৮	চিঠিপত্র		
৯	কয়েকরকম খুন	(গল্প)	শ্রীসুধাংশু ঘোষ
১২	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৪	তিনটি লাজুক জুঁই	(কবিতা)	শ্রীবটকৃষ্ণ দে
১৪	দেবমূর্তি	(কবিতা)	শ্রীঅরুন্ধতী সেনগুপ্ত
১৪	তাকে দেখার আগে	(কবিতা)	শ্রীদেবাঞ্জন চক্রবর্তী
১৫	বিতর্কিত উপন্যাস ফুলমণি ও করুণার বিবরণ		শ্রীভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়
২০	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
২১	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীজরৎকারু
২৫	ডবল এজেন্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিক্রমাদিত্য
৩০	সুরের আগুন		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৩	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩৭	রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা		শ্রীসুশান্তকুমার মিত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা লেখককে ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩০.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৫.০০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৭.৫০	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৩৪-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪১	মৃত্যু এবং মৃত্যু	(গল্প)	শ্রীমানস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৩	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৪	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৪৫	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪৬	চাবি	(গল্প)	শ্রীপ্রভাতী গঙ্গোপাধ্যায়
৪৯	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫২	খেলাধুলা		শ্রীদর্শক
৫৪	মাঠের নায়ক		শ্রীঅমর
৫৬	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৭	দেশবিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৯	ফেয়ার থেকে বলছি		শ্রীমুসাফির
৬২	চিত্র সমালোচনা		শ্রীচিত্রদূত
৬৪	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৬৬	শ্রদ্ধাঞ্জলি, রূপোলী শিল্পীর প্রতি		শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৬৮	নাট্যমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৭০	বিবিধ		

প্রচ্ছদ ঃ　শ্রীরঞ্জকুমার বসাক

প্রধানমন্ত্রীর নতুন ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী যে একুশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তা দেশের বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত প্রত্যাশিতই ছিল। এই কর্মসূচীর সবগুলি অবশ্য নতুন নয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এর অনেকগুলিই ইতিপূর্বে নানাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এবারের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে এই কর্মসূচী রূপায়ণের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, এর অনেকগুলিই অনেক আগে করা উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেলেও সরকার যদি এখন কঠোর সংকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা কার্যকর করতে এগিয়ে আসেন তাহলে সেটা দেশের অগণিত মানুষের পক্ষে হবে চিরবাঞ্ছিত আশীর্বাদ।

সমাজের নিচুতলায় যারা রয়েছে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা দুর্বল ও অনগ্রসর প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ সহানুভূতি তাদের দিকে। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের ও বঞ্চনার এক মর্মন্তুদ চিত্র অনাদিকাল থেকে তুলে ধরেছে। বহুবার এদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা হয়েছে। জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার আইনও পাশ হয়েছে কিন্তু কার্যত দরিদ্র চাষী ক্ষেতমজুর বা বর্গাদারদের ভাগ্যের পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয়নি। নানান জটিলতার মধ্যে আইন তৈরি পথ করে নিলেও গরিব চাষী সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি সকল ক্ষেত্রে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত কর্মসূচীতে তাই ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন চাষীদের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ এই সমস্যা সমাধান করতে পারলে ভারতবর্ষের একটা বড় সামাজিক সমস্যার অবসান ঘটবে। কৃষকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মহাজন সুদখোররা তাদের আজন্মের মতো ঋণপাশে আবদ্ধ করে রাখে। এই ঋণ ক্ষেতমজুর বা ভূমিহীন চাষী কেউই জীবনে শোধ করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই ঋণ আইন করে মকুব করে দেওয়া হবে।

কৃষকদের ঋণের অভিশাপ থেকেই জন্ম নিয়েছে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে দাসশ্রম প্রথা ও বেগার খাটার মধ্যযুগীয় পদ্ধতি। এটা খুবই লজ্জার কথা যে আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে এই মানবতাবিরোধী প্রথা রহিত করতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় এই দাসশ্রম প্রথা বিলোপের সংকল্প সেকারণেই অভিনন্দনযোগ্য। একই সঙ্গে হাত দেওয়া হবে চাষযোগ্য জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমাকে কার্যে রূপায়ণে ও উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনে। এই দুটি কাজ তাড়াতাড়ি করা দরকার। আমাদের মূল সমস্যাই হল ভূমি সংস্কার। জমির বণ্টনের মাধ্যমেই আমাদের সামাজিক অসাম্য অনেকটা দূর করা যায় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ভিত্তি শক্ত করে গড়ে তোলা যায়। নতুন কর্মসূচীতে ভূমিহীন ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই করার জন্য জমির ব্যবস্থাপন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করার সংকল্প প্রকাশ করাতে এ আশা জাগে যে এবারকার কর্মসূচী নিয়ে শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না। ক্ষেতমজুরদের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে এখনও ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দেওয়া হয়নি। দু একটি রাজ্য অবশ্য তা করেছেন। ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট না থাকায় গরিব ক্ষেতমজুর চিরকালই শোষিত ও বঞ্চিত। তার দুবেলা খাবার জোটে না, তার পরণে কাপড় থাকে না, অসুখ হলে বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু ঘটে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এদের ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট হলে বহুদিনের অভাব দূর হবে।

সাধারণ মধ্যবিত্তদের চড়া দ্রব্যমূল্যের বাজারে সীমাবদ্ধ আয় নিয়ে হিমসিম খেতে হয়। বর্তমান ঘোষণায় বার্ষিক আট হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড় দিয়ে মধ্যবিত্তদের প্রতি বিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ছাত্রদের বই খাতা ও হোস্টেলে খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহ করার সিদ্ধান্তও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে একটা বড়রকমের সুসংবাদ। একদিকে গরিব ও মধ্যবিত্তদের প্রতি সহানুভূতি এবং অন্যদিকে চোরাকারবারী, কর ফাঁকিদাতাদের প্রতি কঠোরতা প্রধানমন্ত্রীর নতুন কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কালো টাকা এমনভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে, তা আমাদের অর্থনীতিকে বারবার আঘাত হেনে দুর্বল করে দিচ্ছে। এই কারণেই চোরাচালানকারী শহরে সম্পত্তি নিয়ে ফাটকা কারবারী ও খাদ্যদ্রব্যের মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দেশের স্বার্থে আমরা সকলেই চাইব প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা অবিলম্বে একুশ দফা কার্যসূচীর মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করুক।

চাষের জরুরী কর্মসূচী

পশ্চিম বাংলায় খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্যে এক বিশেষ কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। এই কর্মসূচী রূপায়ণে মোট বরাদ্দ সাত কোটি টাকা। এই টাকাটা রাজ্য সরকারের বাজেট থেকেই যোগানো হবে। দেশজুড়ে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরি হয়েছে এই পাঁচ-দফা কর্মসূচী। ছোট চাষীদের আমন ধানের উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হবে এর অন্যতম উদ্দেশ্য। পাঁচ লাখ ছোট এবং কোনো রকমে-টিঁকে-থাকা চাষীকে একটি করে বীজ-সার-কীটনাশক ওষুধ ভর্তি থলে দেওয়া হবে। তাতে থাকবে দুই কিলোগ্রাম উচ্চ ফলনশীল বীজ, দুই কেজি ইউরিয়া সার এবং ২০০ গ্রাম কীটনাশক ওষুধ। এর জন্যে মোট খরচ পড়বে এক কোটি টাকার মতো। কিন্তু ফলন বাড়বে প্রায় ছ লাখ মণ, যার দাম হবে প্রায় তিন কোটি টাকা।

এই কর্মসূচীর মধ্যে আরো রয়েছে চার হাজারের বেশি অগভীর নলকূপ খনন। যে-সব এলাকায় বিদ্যুৎ মিলবে সেখানে এই ধরনের নলকূপের সঙ্গে বিদ্যুৎচালিত পাম্পও লাগানো হবে। ফলে বাড়তি তিরিশ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। বোরো ধান এবং গম চাষের সময় এর সুফল পাওয়া যাবে। বাড়তি ফলন হবে প্রায় ৩৩ শ' টন। সরকারের যে-সব খাস জমি রয়েছে সেখানে পাঁচশ পুকুর কাটা হবে। ছ' শ কুয়োও খোঁড়া হবে।

বিধান স্মরণে

পশ্চিম বাংলার রূপকার স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো পয়লা জুলাই। ঐ দিনটি অবশ্য তাঁর মৃত্যুদিনও। দিনটি প্রতিবারই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়, তবে এ-বছরের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল উল্টোডাঙ্গায় বিধান শিশু উদ্যানের উদ্বোধন। বিধানচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে এই উদ্যান। এখনও শেষ হয়নি এর সব কাজ। যখন হবে তখন এটি 'শিশুদের একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব' হয়ে উঠবে বলে উদ্যোক্তাদের ধারণা। এখানে থাকবে ছেলেমেয়েদের নানা ধরনের খেলাধুলোর ব্যবস্থা, জিমনাসিয়াম, লেক, সুইমিং পুল প্রেক্ষাগৃহ এবং জন্তু-জানোয়ার। বিধানচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন হয়েছে বিধান মেলার। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের তৈরি মডেলের সাহায্যে বলা হয়েছে বিধানচন্দ্রের দীর্ঘ জীবনের আকর্ষণীয় কাহিনী। সেই সঙ্গে আছে আরো কয়েকজন নেতার জীবনকাহিনী। এছাড়া আছে নানা মণ্ডপ। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ আমন্ত্রণ করে মেলা দেখাতে নিয়ে আসা হচ্ছে। একদিন যখন পনের হাজার কিশোর-কিশোরী এসে হাজির হলো সেদিন মেলার রীতি-মতো জমজমাট চেহারা। পরে অবশ্য আরো বেশি ছাত্রছাত্রী আসে। বিধানচন্দ্রের জন্মদিনে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মুখ্যমন্ত্রী একটি স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। বৃটিশ আমলে ডাঃ রায় যে-ঘরে বন্দী ছিলেন সেই ঘরের দেওয়ালেই ফলকটি লাগানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এই দিনটি পালনের জন্যে বিশেষ কর্মসূচী নেন। দিনটি পালিত হয় 'চিকিৎসক দিবস' হিসেবে। এই উপলক্ষে উল্টোডাঙ্গায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন হয়।

হাওড়ার উন্নয়নে

সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর চালু হয় বিভিন্ন জেলায় গিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠানের রেওয়াজ। এই ধরনের বেশ কয়েকটি বৈঠক হওয়ার পর কিছু দিন তা বন্ধ ছিল। ৩ জুলাই আবার মন্ত্রিসভার বৈঠক বসলো কলকাতার বাইরে। এবার বৈঠকের স্থান ছিল হাওড়া জেলার বাগনান। ঐ দিন সকাল থেকেই মন্ত্রীরা হাওড়ায় চলে যান। তাঁরা জেলার নানা ব্লক ঘুরে দেখেন। তারপর তাঁরা বাগনানে মিলিত হন। বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করেন তাঁরা। হাওড়া জেলার উন্নয়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বরাদ্দের পরিমাণ ৫৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এর মধ্যে প্রধান অংশ নিয়োজিত হবে গ্রামে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে। সেই অঙ্ক ৩৫ লাখ টাকা। এই টাকায় পুকুরকাটা হবে, ছোটখাটো সেচ প্রকল্প রূপায়িত হবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা হবে। হাওড়া শহরে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তৈরি হবে একটি শরৎ সদন। তার জন্যে খরচ হবে তিন লাখ টাকা। পানিত্রাসে শরৎচন্দ্রের বাসভবন অধিগ্রহণ ও সংস্কারের জন্যে বরাদ্দ ৫০ হাজার টাকা। দু লাখ টাকা খরচ করে একটি পাঠ্যপুস্তক ব্যাঙ্ক তৈরি হবে। হাওড়া পৌর এলাকায় কয়েকটি বাজারও তৈরি করা হবে। উন্নয়নের কাজে এই সব বরাদ্দ ছাড়াও হাওড়া জেলার জন্যে স্বাস্থ্য দপ্তর বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করেছেন। হাওড়ায় সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে একটি হাসপাতাল হবে। বাগনানে হবে একটি হাসপাতাল। তাছাড়া জেলায় ৩৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হবে।

জিনিসপত্রের দাম

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরেই কেন্দ্রীয় সরকার যেসব নির্দেশ জারি করেন তার মধ্যে একটি হলো, খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের দোকানে অত্যাবশ্যক পণ্যের মজুতের পরিমাণ এবং দামের তালিকা টাঙিয়ে রাখতে হবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিম বাংলায়ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব বিনয়রঞ্জন গুপ্ত জানান, অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনু-যায়ী এই ধরনের আদেশ বেশ কিছুদিন ধরেই এই রাজ্যে বলবৎ আছে। তবে এত দিন পর্যন্ত মোট ১৫টি পণ্যের মজুতের পরিমাণ ও দামের তালিকা টাঙিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন ঐ আদেশ সংশোধন করে আরো ১৮টি (অর্থাৎ মোট ৩৩টি) পণ্যকে এই আদেশের আওতায় আনা হয়েছে। এই আদেশ ঠিক-মতো পালন না করলে সাজা পেতে হবে বলে দোকানীদের হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর অন্যান্য অনেক রাজ্যের মতো পশ্চিম বাংলায়ও নানা জিনিসের দাম নিম্নমুখী। সরষের তেল, বনস্পতি, চিনি, লবণ প্রভৃতি জিনিসের দাম ইতিমধ্যেই কমেছে।

৭।৭।

'সুরের আগুন' প্রসঙ্গে

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ অমৃত সংখ্যায় সুরের আগুন শীর্ষকে শ্রীস্বপন গুপ্তের সঙ্গে শ্রীমতী সন্ধ্যা সেনের সাক্ষাৎকারটি অত্যন্ত সময়োচিত ও হৃদয়গ্রাহী। তরুণ শিল্পী শ্রীগুপ্ত সংগীতমহলে বর্তমানের একটি উল্লেখযোগ্য নাম এবং ভবিষ্যতের আশাজাগানো শিল্পী ঘটনাচক্রে তাঁর সহপাঠী হওয়ার সুযোগে আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম এবং তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা যে কত বিস্ময়কর তা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। দৃষ্টিহীন্ এই সঙ্গীতশিল্পীর সমস্ত দুঃখ বোধকার ভুলিয়ে দিয়েছে তাঁর সংগীতপ্রীতি যার প্রতিফলন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কয়েকটি ছত্রে সুস্পষ্ট। অনেকের মতে তাঁর গানে আজ বিশ্বাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, সুযোগ্য শিষ্য হতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুকে অনুসরণ করতেই হবে এবং প্রাথমিক পর্যায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুপ্ত প্রতিভা আপন বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবেই। শ্রীগুপ্তের গানের সমালোচনা যতই হোক, সেই সমালোচনার মধ্য দিয়েই শিল্পীর যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। স্বপন গুপ্ত যে একটি উদাত্ত ও পুরুষালী কণ্ঠের সংগীতনিবেদিত প্রাণ, দেশে-বিদেশে ইতোমধ্যেই তার স্বীকৃতি মিলেছে। শ্রীমতী সেন শ্রীগুপ্তের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে কথাগুলি বের করে নিয়েছেন, তা একটি সঙ্গীত-সমর্পিত প্রাণের অন্তরের আকুতি এবং এই আন্তরিক প্রতিবেদনই শ্রীগুপ্তকে সঙ্গীতজগতে স্মরণীয় করে রাখবে। পরিশেষে অমৃত পাঠকগোষ্ঠীর কাছে শ্রীগুপ্তের বিশদ পরিচয় তুলে ধরার জন্য শ্রীমতী সেনকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী
ডায়মণ্ডহারবার।

(২)

কিছুকাল ধরে আপনারা 'সুরের আগুন' বিভাগে রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়ে একটি অন্তরঙ্গ আলোচনার ধারা খুলে দিয়েছেন। এর দরকার ছিল। কেননা এত দিন পর্যন্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে যা দেখা যেত, বিশেষ করে পত্র-পত্রিকায় তা সবই সমালোচনা জাতীয়। কিন্তু এই প্রথম গায়ক-গায়িকার নিজস্ব মতামত জানা যাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে তাঁদের কারুর মতই কোনদিন জানা যায় নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কেউ কেউ রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের মতামত এর আগেও জানিয়েছেন। কিন্তু এমন পর্যায়ক্রম এবং সুপরিকল্পিতভাবে গায়ক-গায়িকার নিজস্ব মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে বলে আমার অন্তত মনে পড়ে না। ব্যাপারটা সত্যি যেন একটি সমীক্ষার চেহারা নিচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতের দলিল হিসেবেও এই সব আলোচনা উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। এ জন্যে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

তাছাড়া আরো একটা কথা। রবীন্দ্রসংগীতকে কোন গায়ক কিভাবে দেখেন সেটা জানার ফলে আমাদের উপলব্ধিরও নতুন স্তর উন্মোচিত হচ্ছে। যেমন ধরুন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র বলেছেন 'কথার অনবদ্য অবদানই তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্পদ। ভাষার ভেতর দিয়ে ভাষাতীতকে কেমন করে প্রকাশ করা যায় তারই উত্তর রবীন্দ্রসংগীত।' এই উক্তির সঙ্গে শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত—'ভাবগভীরতা ও সুরের বৈচিত্র্য রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ক্লাসিক আর্টের পর্যায়ে ফেলা যায় বলে আমি মনে করি।'—এই উক্তির কোন মৌলিক বিরোধ নেই তা সত্যি। কিন্তু তবু কি মনে হয় না, সুচিত্রা দেবীর প্রধান ঝোঁক হয়তো কবিতার দিকে এবং অশোকতরুবাবুর আগ্রহ সুরের দিকে? কিংবা শ্রীস্বপন গুপ্ত যখন বলেন, 'আমি সব সময় চেষ্টা করি বুঝে গাইতে। নিজে যদি না বুঝি অন্যকে বোঝাবো কেমন করে। উপলব্ধি না হলে তো কমিউনিকেশন সম্ভব নয়।' তখন নিশ্চয়ই তিনি লিরিকের কথাই প্রধানত মনে রাখেন। এবং শ্রীমতী সুমিত্রা সেন যখন বলেন—'রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে কোন বিশেষ থিওরী প্রমাণ করতে না যাওয়াই ভাল। রবীন্দ্রনাথ রসের সাগর—আমার কাছে এইটুই হোক তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অনুভব।' —নিশ্চয়ই তখন তিনি সুরের দিকেই বেশী নজর দেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এ ধরনের বিতর্কের অবকাশ আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমি দেখেছি অনেক নামকরা সমালোচক রবীন্দ্রসংগীতের কথার দিকে বেশী জোর দেন। এমন কি গীতবিতানকেও পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, সে তো কথার দিকে নজর রেখেই। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে রবীন্দ্রসংগীত যখন হিন্দী ইংরাজী ইত্যাদি ভাষায় গাওয়া হয় তখন কি সুরের দিকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয় না? কেননা কবিতার অনুবাদ যদিও বা সম্ভব গীতি কবিতার অনুবাদ প্রায় অসম্ভব বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। কেননা তা বিশেষভাবেই শব্দ ও মনোভাবের সূক্ষ্ম অনুষঙ্গের ওপর নির্ভর করে। অথচ অবাঙালী বা অভারতীয় শ্রোতাকেও অনূদিত রবীন্দ্রসংগীত শুনে আমি নিজেই তো কতবার মুগ্ধ হতে দেখেছি। কেমন করে তা সম্ভব হয়?

প্রশ্ন আরো আছে। এই সব প্রশ্নের চটপট কোন জবাব পাওয়া সম্ভব কিনা বলা শক্ত। কিন্তু সুরের আগুনের আলোকচ্ছটায় অনেক নতুন দিক যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে সেটাই বড় কথা।

আরেকবার ধন্যবাদ জানাই।

বিদ্যুৎ চৌধুরী
কসবা, কলকাতা।

বহুরূপীর 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে

বহুরূপীর রক্তকরবীর লেখক শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। আলোচনায় তিনি আজকের দিনের সঙ্গে সেদিনের অভিনয়ের সংলাপের সঙ্গীতের কঠিন সমস্যার পার্থক্যটাই দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যথার্থ ভাল ও গভীর নাটককে তাঁরা আয়ত্তে আনতে পারেন না। সস্তায় মনোরঞ্জনের দিকে তাঁদের ঝোঁক, গভীর নাটক প্রযোজনায় তাঁরা অনাগ্রহী অক্ষম। আর বহুরূপী মূলত গভীর নাটকেরই প্রযোজক।

তাঁর এইসব ক্ষোভ যথার্থ। রবীন্দ্র নাটকের নতুন প্রযোজক কই। শেকসপীয়রের ক্ষেত্রে একের পর এক প্রযোজক আসছেন, তাঁর নাটকের এক একটি দিগন্তকে উন্মোচিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় না।

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক : অন্তরঙ্গ,
বেগমপুর, (হুগলী)।

ডাক্তার করগুপ্তের চেম্বার থেকে বেরোতে প্রায় সন্ধ্যে হল। আরো দেরি হতে পারত। বড় ডাক্তার। নামের পাশে দু-তিনটে বিলিতী ডিগ্রী। তেমনি অঢেল রুগী। বাইরের ঘরটার বড় জংশন ইস্টিশনের ওয়েটিংরুমের মত ভিড় করে বসে থাকে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় গেছে। কার্ড পাঠিয়ে দেবার পরও সুশান্ত কতক্ষণ বসে রইল। মন্দিরের পুণ্যার্থীর মত ডাক্তারের চেম্বারে এমনি ধর্ণা দিতে বিশ্রী লাগে অথচ উপায় নেই। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরি। ডাক্তার করগুপ্তের উপর অনেকখানি ভরসা। অমন জমাট প্র্যাকটিশ। পশার দেখলে সুশান্তরও হিংসে করে। ইচ্ছে করলে কলমের আঁচড়ে তাদের কোম্পানীর ওষুধের কাটতি কত বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর তাহলেই সুশান্তর সুনাম,—সামনের মাসেই একটা ইনক্রিমেন্ট অনায়াসে দাবি করতে পারে।

মার্চ মাস। সন্ধ্যার আকাশ ঠিক নীল নয়, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাকাশে মুখের মত বিবর্ণ। ধীরে ধীরে ফুল ফোটার মত একটি দুটি নক্ষত্র দেখা দিচ্ছে। হাতের পোর্টফোলিও ধাঁচের ব্যাগটার ভিতরে নানা ধরনের ওষুধের স্যাম্পল আর লিটারেচার। বেশ ভারী। এদিক ওদিক তাকিয়ে সুশান্ত তাই একটা রিকশার খোঁজ করছিল।

হঠাৎ মনে হল তার ঠিক পিছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটি মেয়ে। সাধারণ আটপৌরে শাড়ি পরণে। মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। বয়স তেইশ-চব্বিশ অথবা কম-বেশী হতে পারে।

এই মফঃস্বল শহরে প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সুশান্তর একটু অস্বস্তি লাগছিল। মেয়েটি কি বলতে চায়? এমন নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াবার অর্থ কি? করগুপ্তের বাড়ির এদিকটা নির্জন। হঠাৎ চিৎকার করে তাকে কোনো ফাঁদে ফেলবার মতলব নেই তো?

সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে সে অনায়াসে পরিষ্কার গলায় বলল,—'আমাকে চিনতে পারছ না শান্তদা?'

কণ্ঠস্বর শুনে ওকে চেনা সহজ হল। সুশান্ত লজ্জিতভাবে বলল, 'তুমি প্রতিমা না?'

—'ওমা! চিনতে পেরেছ তাহলে?' মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। ফের বলল,—'আমি ভাবলাম, এতদিন পরে বুঝি নামটাই ভুলে গিয়েছ।'

নামটা ভুলবার নয়। সুশান্ত তা জানে। প্রথম প্রেমের রং ফ্যাকাশে হয়, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয় না। অনেকটা দুর্ঘটনার ক্ষত-চিহ্নের মত। অন্তরালে মনের কোণে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে। প্রতিমা কি সেই কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে?

সুশান্ত অপরাধীর মত ভাঙা গলায় বলল, 'মানে অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাইনি।'

একটু থেমে ঈষৎ গাঢ়স্বরে ফের বলল, —'সাত-আট বছরে তুমি অনেক বদলে গেছ কিন্তু।'

—'তাই নাকি?' প্রতিমা ফিক করে

াসল। 'তা এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথনও থা হয়? আমার বাড়িতে চল।—'

সুশান্ত ভালো করে ওকে দেখল। সেই তিমা,—কুসুমপুর থেকে ওরা চলে গেল স বছর মাঘ মাসে। তারপর সাত-আট ছর কেটে গেছে। এখন প্রতিমার সিঁথিতে ন্দুর। এই পুরুলিয়া শহরে নিশ্চয় ওর শুরবাড়ি হবে। আশ্চর্য! প্রতিমা তাকে খানে যেতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে? কিন্তু ই ভর সন্ধ্যাবেলায় ওর শ্বশুরবাড়িতে শান্ত কোন্ সুবাদে গিয়ে হাজির হবে?

যেতে যেতে প্রতিমা অনেক গল্প করল। লল,—'ডাক্তারবাবুর ওখানে তোমাকে দেখেই নতে পেরেছি। কিন্তু কি করব? ঘরভর্তি াকজন। তবু একবার ভাবলাম কাছে গিয়ে তামার নাম ধরে ডাকি। তারপর ভয় হল। যকালে যদি আমাকে না চিনতে পার।'
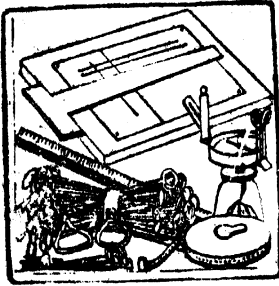
সুশান্ত হেসে জিজ্ঞাসা করল,—'চিনতে না পারলে তুমি কি করতে?'

—'কী আবার করব?' প্রতিমা ভুরু কুঁচকে কেমন রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল। বলল,—'মনকে বোঝাতাম। কুসুমপুরে যে মানুষটার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, সে নেই। অনেকদিন আগে এই পৃথিবীতে হারিয়ে গেছে।'

বাড়ির কাছে এসে প্রতিমা তাকে অভয় দিল। বলল,—'তোমার চিন্তিত হবার কারণ নেই। আমি এখন একা আছি। কিছুদিনের জন্য উনি বাইরে গেছেন।'

আগামী সংখ্যায় গল্প লিখবেন সমীর রক্ষিত

সুশান্তর মনে একটা ছোট্ট সন্দেহের মেঘ তৈরি হচ্ছিল। ভদ্রলোক বাড়িতে নেই। কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছেন? তার কি অর্থ হয়? পরে ভাবল, হতেও পারে। হয়তো তার মতো ট্যুরের চাকরি। একবার বেরোলে ঘরে ফিরে আসতে বেশ কিছুদিন কেটে যায়।

বাড়ির দরজা খুলে প্রতিমা সুইচ টিপল। আলো জ্বলতেই মনের সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব রোদ্দুর ওঠার পর কুয়াশার মত কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মোটে দেড়খানা ঘর। পিছন দিকে ছোট্ট একটু বারান্দার মত। চোখ বুলিয়ে দেখছিল সুশান্ত। প্রতিমার অবস্থা তেমন ভালো নয়। ময়লা বিছানা। ঘরে একটা আলমারি পর্যন্ত নেই। আলনায় রাখা তার মলিন অন্তর্বাস, শাড়ি জামা অতি সাধারণ। দেওয়ালে একটা ছবি দেখে সুশান্ত ওর স্বামীকে চিনতে পারল। পাশাপাশি ওদের দুজনের ছবি। প্রতিমার তুলনায় ভদ্রলোকের বয়স যেন অনেক বেশী। রঙ কালো ঈষৎ কুঁজো চেহারা। গাল দুটো এই বয়সেই শুকনো—বৃদ্ধের মত তোবড়ানো বলা যায়। এক নজর তাকিয়ে সুশান্তর মনে হল প্রতিমার মত সুন্দরী মেয়ের পাশে মানুষটা বড্ড বেমানান।'

হঠাৎ প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল,—'তুমি ওষুধের কোম্পানীতে বড় চাকরি কর, তাই না সুশান্তদা?'

—'হ্যাঁ, চাকরি করি।' সুশান্ত হেসে জবাব দিল। 'তবে বড় চাকরি নয়। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ মানে ওষুধের ক্যানভাসার বলতে পার। কিন্তু তুমি কেমন করে আন্দাজ করলে?'

—'বারে! আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বসে তুমি ঐ ব্যাগটার ভিতর থেকে কতরকম ওষুধের শিশি বের করলে। পাঁচ-সাতটা শিশি উনি তো রেখে দিলেন। তারপর ডাক্তারবাবুর হাতে কী সব ছাপা কাগজপত্র দিয়ে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলে।'

সুশান্ত ঈষৎ হাসল। মেয়েদের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। প্রতিমা তার উপর প্রায় গোয়েন্দার মত নজর রেখেছিল। নিশ্চয় সে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রতিমাও তার পিছু পিছু রাস্তায় এসে থেমেছে।

কিন্তু চাকরি, ওষুধপত্র কিম্বা ঘর-গেরস্থালীর কথা নয়। সুশান্তর ইচ্ছে করছিল প্রতিমার কাছে কুসুমপুরের কথা জানতে। এতদিন পরে সুশান্তকে হঠাৎ এই পুরুলিয়া শহরে দেখে তার কি সেই নির্জন দুপুরগুলোর কথা মনে পড়ছে না? গ্রীষ্মের বন্ধে কিম্বা কলেজের ছুটি থাকলে সুশান্ত বাড়ি আসত। সে জানত দুপুর হলেই প্রতিমা ঠিক আসবে। প্রথমে তার মায়ের কাছে। পরে পা টিপে টিপে চুপ চুপি তার পড়ার ঘরে। সুশান্তর কাছে বই চাইত প্রতিমা। গল্পের বই। একদিন ওর হাতে একটা উপন্যাস দিয়ে সুশান্ত বলল, 'খুব ভালো বই। ঠিক তোমার মত একটা সুন্দরী মেয়ের গল্প আছে এতে।'

—'তার মানে?' 'প্রতিমা বঙ্কিম ভুরু তুলে সুন্দর একটি ভঙ্গি করল।

—'হ্যাঁ।' সুশান্ত প্রায় মুগ্ধনয়নে ওর টানা টানা আঁখিপল্লবের দিকে তাকিয়ে বলল,—'মেয়েটি একটি ছেলেকে ভালবাসল। দুজনে গভীর প্রেম। তারপর কি হল শুনবে?'

—'ধ্যাৎ।' প্রতিমা সলজ্জ [illegible]তে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

কী মনে হতে সুশান্ত এগিয়ে গিয়ে ওর নরম তুলতুলে ফর্সা গাল দুটো ঈষৎ টিপে আদর করে বলল—'যা বলছি সব সত্যি। তুমি আজ পড়ে দেখ।'

—'যাও।' প্রতিমা আরক্তমুখে তার দিকে প্রায় কটাক্ষ হেনে দৌড়ে বই নিয়ে পালাল।

গ্রীষ্মের সেই নির্জন দ্বিপ্রহরে শনশনে হলকা বাতাস বইত। ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুনের মত রোদ্দুরের আঁচে সর্বাঙ্গ পুড়ে যায়। তবু পা টিপে টিপে প্রতিমা ঠিক তার কাছে আসত। দরজা-জানালা বন্ধ প্রায়ান্ধকার ঘরে সে একদিন মেয়েটার চুমু পর্যন্ত খেয়েছিল। হঠাৎ সেই কথা মনে পড়তে সুশান্ত তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো আলতোভাবে নীচের ঠোঁটে বুলিয়ে কী যেন অনুভব করবার চেষ্টা করল।

প্রতিমা বলল,—'ইচ্ছে করলে, তুমি নিশ্চয় আমাকে কয়েকটা ওষুধ দিতে পার।'

—'ওষুধ?' সুশান্ত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। কি ওষুধ চায় প্রতিমা? কুসুমপুরের সেই দুপুরগুলোর স্মৃতির জ্বালা ভুলতে তার কোনো ওষুধের প্রয়োজন নাকি?

প্রতিমা একটু কুণ্ঠিতভাবে জানাল, —'বেশী নয়। মোটে চার-পাঁচটা ওষুধ। তুমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। তাই ভাবলাম হয়তো ফ্রি স্যাম্পল্স জোগাড় করতে পারবে।'

—'কেন পারব না?' সুশান্ত তাড়াতাড়ি বলল। 'কি ওষুধ চাই তোমার?'

কোথা থেকে একটা ভাঁজ-করা ময়লা কাগজ খুঁজে নিয়ে এল প্রতিমা। ওষুধগুলোর নাম ওতেই লেখা আছে। সুশান্ত চোখ বুলিয়ে দেখল। তিনটে ফাইল তাদের কোম্পানীর প্রোডাক্ট। বাকি দুটো অন্য জায়গা থেকে জোগাড় করতে হবে।

সে আশ্বাস দিল—'ঠিক আছে। দিন-সাতেকের মধ্যেই তোমার ওষুধ পাবে। তাহলেই হবে তো?'

—'সাতদিন? আর একটু আগে পাওয়া যায় না?' প্রতিমা প্রায় অনুনয় করল।

—'দেখি চেষ্টা করে।' সুশান্ত মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল। ভাঁজ-করা ময়লা কাগজটা সে সযত্নে পকেটে রাখল।

প্রতিমা নিজেই বলল—'কুসুমপুর থেকে হঠাৎ চলে এলাম। বাবার বদলির অর্ডার এল। সাতদিনের মধ্যে যেতে হবে। তবু আশা করেছিলাম শান্তদা, হয়তো যাওয়ার আগে তুমি এসে পৌঁছবে।'

সুশান্ত দোষ লুকোবার চেষ্টা করে বলল, —'আমি খবর পাইনি প্রতিমা। মাসখানেক পরে ছুটিতে কুসুমপুরে এসে জানলাম, তোমরা চলে গিয়েছ।'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। তারপর সুশান্ত ফের বলল,—'কুসুমপুরের কথা তোমার এখন মনে পড়ে না প্রতিমা?'

—'বারে! মনে পড়বে না কেন? আচ্ছা, মাসীমা কেমন আছেন?'

—'মার শরীর ভাল নয়।' সুশান্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

—'তোমার নিজের কথা বুঝি কিছু বলবে না?' প্রতিমা মুচকি হেসে তাকাল। 'বউ কেমন হয়েছে? আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী, তাই না?'

সুশান্ত গম্ভীর মুখে জবাব দিল,—'এখনও বিয়ে করিনি প্রতিমা।'

—'তাই বুঝি?' প্রতিমার চোখের তারায় হঠাৎ খুশির আলো বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে তেমনি হেসে জিজ্ঞাস করল,—'এখানে উঠেছ কোথায়?'

—'একটা হোটেলে। ইস্টিশনের কাছে—'

—'ওমা! তা হোটেলে কেন? ইচ্ছে করলে এখানেই রাত্তিরে থাকতে পার।' প্রতিমা ভ্রূ কুঁচকে কেমন রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল। ফের বলল,—'আদরযত্ন করতে পারি তেমন সামর্থ্য নেই। কিন্তু রেঁধে-বেড়ে দুটি ঝোলভাত ঠিক দিতে পারব।'

এই সন্ধ্যায় হয়তো স্নায়ুর স্বাভাবিক উত্তেজনা কিম্বা অন্য কোনো কারণে সুশান্তর শরীরটা হঠাৎ শিরশির করে উঠল। সাত-আট বছর আগে যেমন পা টিপে টিপে প্রতিমা আসত, ঠিক তেমনি প্রায় নিঃশব্দে শিকারী মার্জারের মত ধীর গতিতে কুসুমপুরের সেই নির্জন দুপুরগুলো এগিয়ে আসছে না? সম্ভবত আরো কিছুক্ষণ পরে কালপুরুষ মধ্যগগনে পৌঁছলে ওরা এই ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হবে। তখন অন্ধকারে সে আর প্রতিমা দুজনে। ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়া অজানা মহাসাগরের শীতল জলস্রোতের মত কী একটা বস্তু বিদ্যুৎ তরঙ্গের গতিতে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বয়ে গেল।

সুশান্ত তাড়াতাড়ি বলল.--'না না। সে কেমন করে হয়? হোটেলে জিনিসপত্র ফেলে এসেছি। বরং আর একদিন দেখা যাবে'—

—'ওমা! এখনি উঠবে নাকি?'

—'হ্যাঁ।' যেন অনেক কাজ বাকি আছে এমনি একটা ব্যস্ত ভাব করে সুশান্ত বেরিয়ে এল।

তবু এক সপ্তাহ নয়। ঠিক তিন দিন পরে সুশান্ত আবার সেই বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। এই কদিন কী যেন একটা ঘোরে কেটেছে তার। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। শনশনে হলকা বাতাস বইছে। তেমনি নির্জন দ্বিপ্রহর। দরজা জানালা বন্ধ বলে ঘরের ভিতরে আলো কম। বোধহয় এতক্ষণ আদুড় গায়ে শুয়ে ছিল প্রতিমা। দরজায় শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি জামা-টামা পরে শালীনতা ফিরিয়ে এনেছে।

—'ওমা! এত রোদ্দুরে এসেছ? বোসো বোসো। দাঁড়াও একটু পাখা করি।' তাকে নিয়ে প্রতিমা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠল।

সুশান্ত একদৃষ্টিতে দেখছিল ওকে। এই ক' বছরে আরো সুন্দরী হয়েছে প্রতিমা। এখন আটপৌরে সাজে চমৎকার লাগছে ওকে। গরমে কপালে টলটলে স্বেদবিন্দু। পানের রসে ঠোঁট দুটি লাল। বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই চোখ ঈষৎ ফোলা।

—'অমন হাঁ করে কি দেখছ?' প্রতিমা মিষ্টি হেসে শুধোল।

সুশান্ত গাঢ়স্বরে বলল—'তোমাকে'।

মুহূর্তে প্রতিমা আরক্ত হয়ে উঠল। ভ্রূ শাসন করে বলল,—'ধোৎ! ফের দুষ্টুমী হচ্ছে?'

সুশান্তর ইচ্ছে করল ওর নরম ফর্সা গাল দুটো টিপে একটু আদর করতে তারপর ওকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। ঠিক কুসুমপুরের সেই নির্জন দ্বিপ্রহরের মত। প্রতিমা নিশ্চয় আপত্তি করবে না। তাহলে সেদিন এই বাড়িতে তাকে রাত কাটাতে আমন্ত্রণ জানাবে কেন?

হঠাৎ প্রতিমা চঞ্চল হয়ে জিজ্ঞাসা করল --'এই আমার ওষুধ কোথায়? সেদিন যা আনতে বলেছিলাম।'

এই প্রথম সুশান্ত হাত বাড়িয়ে ওর বাম বাহু স্পর্শ করল। বলল—'আমার ব্যাগটা এনে দাও। ওষুধগুলো দিচ্ছি।'

টেবিলের উপর শিশিগুলি সাজিয়ে রাখল সুশান্ত। প্রতিমা যা চেয়েছিল তার চেয়েও দুতিনটে ফাইল বেশী। তারপর সে ঠিক ক্রেতার মত ভঙ্গিতে বলল—'ওষুধ পেলে তো? কই এবার এদিকে এস।'

আশ্চর্য। ঠিক তখনি আকস্মিক দুর্ঘটনার মত ঝরঝর কান্নায় ভেঙে পড়ল প্রতিমা। সুশান্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল—'এই কি হয়েছে তোমার? অমন করে কাঁদছ কেন?'

নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতিমা বলল—তুমি যা উপকার করলে আমার। এই ওষুধগুলোর জন্যে আজ দশদিন হন্যে হয়ে ঘুরেছি। কোথাও জোগাড় হয়নি। অথচ কিনতে পারি তেমন সামর্থ্য নেই। আবার ওষুধগুলো না পেলে মানুষটা সেরে উঠবে কিনা তাই কে বলতে পারে?

সুশান্ত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'কে সেরে উঠবে? তুমি কার কথা বলছ প্রতিমা?

শাড়ির আঁচলের কোণে চোখের জল মুছে প্রতিমা ধরা গলায় কথা কইল। 'আমার স্বামীর কথা বলছি শান্তদা। আজ দু মাস হল তাকে রাঁচীর হাসপাতালে ভর্তি করেছি। তেমন পয়সাকড়ির জোর নেই যে ভালো করে চিকিৎসা হয়। এই ওষুধগুলোর আশাতেই সেদিন তোমার পিছু পিছু ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে দৌড়ে এসেছিলাম।

সুশান্ত একটি কথাও বলতে পারল না। সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ব্যাগটা হাতে নিয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বলল—'ওষুধগুলো তুলে রাখ প্রতিমা। যদি প্রয়োজন থাকে আমি আবার জোগাড় করে দেব।'

পিছন থেকে প্রতিমা বলল—'এই রোদ্দুরে বেরোবে কেন? আর একটু বসে যাও।'

কিন্তু সুশান্ত থামল না। তার পোর্টফোলিও ব্যাগটা নিয়ে সে রাস্তায় পা দিল। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহর। হলকা বাতাস। যেন জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত পৃথিবীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস বইছে। তবু সুশান্তর ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন তার মনে এক আশ্চর্য অনুভূতি।...

...কুসুমপুরের সেই কামনাতপ্ত দ্বিপ্রহর নয়—ছায়া সুনিবিড় ভালবাসার এক নতুন সরোবর সে আবিষ্কার করেছে।

ফাদার দ্যতিয়েন
রোজনামচা

(২৩)
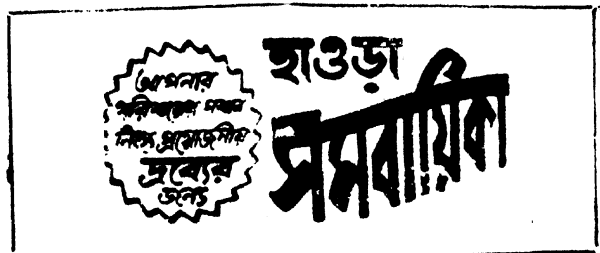
শিখার সঙ্গে আমার আলাপ হয় আকস্মিকভাবে। মেয়েটি বেরিয়েছিল কোন এক কেশপ্রসাধক খুস্কিনিরোধক শ্যাম্পু-র দোর-থেকে-দোর বিক্রয়াভিযানে। না সম্ভাব্য ক্রেতার ফিরিস্তিতে আমার নাম ছিল না ; শিখা আমাদের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিল হঠাৎ-আসা বৃষ্টি থেকে নিজেকে—আর শ্যাম্পু-ভর্তি ঝুলিটাকে—বাঁচাবার অভিপ্রায়ে। সারা সকাল ভালো বিক্রি নাকি হয় নি আর তা ছাড়াও কোন এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে অপমানিত বোধ করেছিল সে ; তাকে নিচের ঘরে বসিয়ে তিন তিন বার উপরতলা থেকে ঝি পাঠিয়ে শ্যাম্পু-সম্পর্কীয় নানাবিধ প্রশ্ন করার পর আধ ঘণ্টা বাদে ওরা জানিয়েছিল ; দুঃখিত। বাড়ির গিন্নীমা কিম্বা বউ ঝিউড়ীর কারোরই শ্যাম্পুর প্রয়োজন নেই। মেয়েটির আরও খারাপ লেগেছিল এই কথা শুনে যে সেই পরিবারের কর্তা তার একজন প্রিয়—আর পুরস্কারপ্রাপ্ত— ঔপন্যাসিক।

সাহিত্যিক সম্মানের মান রক্ষার দায়িত্ব বুঝে পরির মাকে আমি বলেছিলাম চায়ের বন্দোবস্ত করতে। কয়লা ভেঙে উনুন ধরিয়ে জল ফুটিয়ে চায়ের পাতা আনিয়ে দুধের গুঁড়ো গুলিয়ে পাশের বাড়ি থেকে এক চামচ চিনি ধার করে এনে পরির মা যখন ধূমায়িত নিঃস্বাদ চা নিয়ে এল, দেখল থেমে-যাওয়া বৃষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মেয়েটি ওর চব্বিশ বছরের আত্মজীবনীর বর্ণনায় মশগুল।

শিখার দৃঢ় বিশ্বাস তার এক ফাঁড়া আছে। পঁচিশ টাকা খরচ করে এক জ্যোতিষীর কাছে রিষ্টির নিদান জেনে এসেছে সে। ভদ্রলোক বলেছেন দক্ষিণ হস্তের মধ্যমায় গোমেদ আর বাম হস্তের অনামিকায় কৃত্রিম নীলা (আসল নীলা নাকি ওর সহ্য হয় না) রূপোতে ধারণ করে গ্রহদোষ কাটানো যায়। তা-ই করেছে শিখা, আর শুধু তা নয় নীল শাড়ী আর নীল ব্লাউজ নীল তোয়ালে আর নীল চাদর ব্যবহার করতে শুরু করেছে সে। ভদ্রলোক অবশ্য আরও বলেছিলেন কোন এক আঙুলে সাড়ে সাত রতির এক প্রবাল পরিধান করতে; মেয়েটি যে এখনও প্রবালালংকৃত হয় নি তার কারণ আর কিছু নয় ; প্রবালের দাম—কুড়ি টাকা করে রতি।

শিখার হস্তরেখাঙ্কিত নিয়তি এই যে, ওর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বত্রিশ থেকে বেয়াল্লিশের মধ্যে। গৃহযোগও আছে। আর বিয়ে?... বিয়ে তো আকাশে নির্ধারিত—স্বয়ংবর বাংলায় যাকে বলে লাভ্ ম্যারিজ। প্রেম ইতিমধ্যে দু' দু-বার মেয়েটির হৃদয়-দুয়ারে কলিং বেল টিপেছিল। একজন প্রার্থীর নাম সোমনাথ ভাট; শিখার স্বীকারে কালোর উপর সুন্দর দেখতে। ছোকরাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রীতিমতো প্রেম নিবেদন করেছিল; মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল : 'প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই... কোনোদিন আসে যদি সর্বাগ্রে আপনার কথা স্মরণ করব!' সত্যি কি এটাই মনের কথা ছিল মেয়েটির? কিন্তু মনের কথা চাঁচাছোলাভাবে কবে কোন্ মেয়ে বলতে পেরেছে? এদিকে প্রাণ চাইলেও মনের আসল কথাটা বলার আর সময় হল কৈ? একদিন মহুয়া নাম্নী এক বান্ধবীর সঙ্গে কফি-হাউসের এক টেবিলে বসে আছে শিখা। বসে আছে সোমনাথও হলের এক কোণে, গুণগ্রাহী বন্ধুবৃন্দের বিন্দু হয়ে। কাম-শর-পীড়িত সোম সোজসাঁর পদার্থ-টিকে—আর তার পাশে এক শূন্য আসন—দেখেই গাত্রোত্থান করে জনতার ঢেউ ভেঙে এগিয়ে এল। এসে দেখল সীটটা আর খালি নয়, সীটটা মধুসূদন নামক এক গোয়ালা ছেলের দখলে ; বুঝল না হায়, মহুয়ারই মধুর সূদন ঐ মধুসূদন। সেই দিনেই সোমনাথের সঙ্গে শিখার লাস্ট ... আর সেই দিনেই ওর নিজের এক ... আছে বুঝে মেয়েটি জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়।

প্রণয়প্রার্থী নাম্বার টু খুব একটা কেউকেটা নয় ; 'বড়লোকের এক আজামাথির পুতুল...লালিমা পাল (পুং) আমার মতেই শর্টহ্যান্ড শেখে... ওকে দেখলে বাৎসল্য রস আসে!'

হ্যাঁ শর্টহ্যান্ডও মেয়েটি শেখে। স্কুলে যায় বাড়িতে প্র্যাকটিস করে না। বি-এ-ও পড়েছিল পরীক্ষা দেয় নি। স্বীকার করতে সে নির্দ্বিধ যে পরীক্ষকেরা তাতে কোনো অনাস্বাদিত রসের আস্বাদনে বঞ্চিত হন নি। বঞ্চিত হয়েছেন শিখার পিতৃদেব। শুধু বঞ্চিত নয় বিরক্ত ক্ষুব্ধ ও মনঃক্ষুণ্ণ। তাঁর সেই বিরক্তি ক্ষোভ ও মনঃক্ষুণ্ণতা প্রচ্ছন্ন রাখার তিনি প্রয়োজন বোধ করেন না। চেষ্টাও করেন না। বাপে বেটীতে বনে না।

জ্যোতিষী মেয়েটিকে বলেছেন বাবার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে। মেয়েটি করেছেও তা-ই। বাবার প্রতি ওর আক্রোশ এই যে মায়ের সঙ্গে উনি ভালো ব্যবহার করেন না। কথার সুযোগও উনি পান কম ;

মা তো বেশির ভাগ সময় কাটান বাপের বাড়িতে। সেখানে শিখার দুই দাদু আর দুই মাসীর কাছে তিনি আদর পান। বরাবরই তিনি আদুরে মেয়ে ছিলেন স্কুলে পড়েন নি তাঁর জন্য ঐ বড়লোকের বাড়িতে গৃহশিক্ষক রাখা হয়েছিল। কিন্তু হায় বিদুষী—আর সুন্দরী—হলে কি হবে স্বামীর মনোমতো তিনি হতে পারেন নি। কারণ অবশ্য আছে : সংসারী মেয়ে যাকে বলে তিনি তা নন; হতেও চান না। আর তাঁর মেজাজখানিও কমতি নয়; লোকে বলে তিনি নাকি স্নায়বিক রোগে ভোগেন...। পতিদেবতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তির আতিশয্য নেই। পতিদেবতার অসামাজিকতা ও কার্পণ্য তাঁকে পীড়া দেয়। আতিথেয়ই তাঁর মানবিকতার বিকাশ গিন্নীপনার সার্থকতা। বাড়িতে ছোট ননদ এলে কত যত্ন করে তিনি তাকে আপ্যায়িত করেন তার সঙ্গে মিষ্টালাপ করে আনন্দ পান... এদিকে তাঁর কর্তা সহোদরার প্রণাম গ্রহণ করে তার কুশল সংবাদ পর্যন্ত নেন না...

ঐ ননদকে নিয়েই পারিবারিক মনোমালিন্যের প্রথম বিস্ফোরণ। শিখার চোখের সামনে দৃশ্যটা এখনও ভাসে...মাঝে মাঝে সে ভাবে : মা যদি সহ্য করতেন সহ্য করতে চেষ্টা করতেন...ধৈর্য তো সংসারী মেয়েদের ধর্ম।... আর এদিকে জিগ্যেস করি : বাবার কি কোনো প্রয়োজন ছিল ও'র নিজের বোনের সামনে ও'র নিজের সন্তানদের সামনে মাকে এমনভাবে অপদস্থ করার? কথাগুলো শিখার কানে এখনও বাজে : 'চলে যাও...বাড়ি ছাড়...' বলে বাবা মাকে এক ধাক্কা মেরে সিঁড়িতে ঠেলে দিয়েছিলেন। না মায়ের লাগল না। শরীরে লাগল না লাগল অন্তরের অন্তরতমে। ক্ষতটা আজও শুকোয় নি।

সেই দিনেই আহতপ্রাণা মহিলার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন। ফিরেছিলেন নয় মাস পরে শয্যাশায়ী ছোট ছেলের সেবা করতে। ছেলেটি যেই ভালো হল—হ্যাঁ যেদিন আরোগ্যপ্রাপ্তিতে গরম জলে স্নান সেরে ভাত খেল সে—সেইদিনেই স্বামীর কাছে পুনর্বার আঘাত খেয়ে মহিলাটি পতিগৃহ পুনর্বার ত্যাগ করলেন।

মায়ের অনুপস্থিতিতে সংসার চালায় শিখার দিদি। শিখার দিদি বাপের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি : এক বছর হয়েছে বোনের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছে সে, ওর বিরুদ্ধে ছোট ভাইয়ের মন বিষাক্ত করে তোলার চেষ্টা করতে ছাড়ে না। শিখার দোষ? ও তো ঠিক ওর মায়ের মতো অকর্মণ্য অমিতব্যয়ী...ফালতু বান্ধবীদের আপ্যায়ন করতে ভালোবাসে বাপের কষ্টোপার্জিত টাকা উড়িয়ে...মেয়েটি আবার একগুঁয়ে একরোখা মুখের উপর উত্তর দেয়।... শিখা নিজেই অভিযোগের যৌক্তিকতা অস্বীকার করে না : পুতু পুতু মেয়ে সে নয়, কারও কথা মতো সে চলতে চায় না......

তবুও আসল কথা এই যে তার পরিবারের প্রতি শিখা মেয়েটি মোটেই বিতৃষ্ণ নয়; এমন কি মাকে যেমন ছোট ভাই বাচ্চুকেও তেমনি সে প্রাণের মতো ভালোবাসে। বাসত। বাচ্চুর চোখের জল সে দেখতে পারত না : ছেলেটি কোন এক বন্ধুর কাছে মার খেয়ে এলে মুখের গ্রাস ফেলে রেখে উঠে যেত শিখা অন্যায়কারীকে বের করে বলত ভাইকে মেরেছিস কেন?... বাচ্চুর এক খেলা ছিল সে ভিখিরি সেজে আওড়াত : 'বাবা নেই মা নেই একটা পয়সা দাও দিদি...' শিখা কেঁদে ফেলত : বাবা-মা থাকলেও বাচ্চুর কি সত্যি সত্যি বাবা-মা নেই?... মনে মনে বলত : এই শান্তিহীন পরিস্থিতিতে আমিই ওর মা, আমিই ওর বাবা হব...বিয়ে না করে আমিই ওকে মানুষ করব...

বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত জ্যোতিষীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা : বড়লোকের বাড়িতে শিখার বিয়ে হবে...চার বছর পরে...গৃহযোগও আছে। ভাবত : কোথায় সে?...কেমন দেখতে?... ওর মা-বাবার ঝগড়ার জন্য ওকেও কি ভুগতে হচ্ছে? ওর কি অন্তত প্রকৃত বন্ধু কেউ আছে?...

শিখার অবচেতন মনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আরেক প্রশ্ন : 'আমার কি কোনো প্রকৃত বন্ধু আছে?' বন্ধুদের বাড়িতে কত যায় সে।... মাঝে মাঝে ওর দুঃখ হয় ওর অজস্র অনুরোধ সত্ত্বেও তারা অনেকেই ওর বাড়ির চৌকাঠ ভুল করেও মাড়ায় না। ওর বাবাকে আর দিদিকে তারা নাকি ভয় পায়...কিন্তু তারা কি জানে না শিখা নিজেই কি তাদের বার বার বলে দেয় নি—বাবার অফিস টাইম আর দিদির কলেজের রুটিন?... মাঝে মাঝে ওর সত্যি সত্যি রাগ ধরে...কিন্তু রাগ করে ও থাকতে পারে না : দুদিন পরে বন্ধুদের সঙ্গে আবার ভাব জমায়। বন্ধুরা শিখার এই দুর্বলতার সুযোগ নেয়, প্রতিলিপি করিয়ে নেয় জামা সেলাই করিয়ে নেয় দোকান থেকে জিনিস আনায়... মেয়েটি একেক সময় একটু একটু প্রতিবাদও করে, কিন্তু...ওর যে এত ভালো লাগে অন্যদের জন্য কোনো কাজ করতে...

অকাজের যত কাজ।...হ্যাঁ দিদি ঠিকই বলেছে : অর্থকরী কোনো কিছু না করে শিখা শুধু শুধু সময় নষ্ট করে...সে জ্ঞানপাপী তার অপরাধ বোধ এসেছে...সেই অপরাধ বোধের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যই ঐ শ্যাম্পু-বিক্রয়াভিযানে শিখার অবতরণ। শুধু অর্থোপার্জনের জন্য নয়, বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের আশায়। অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছে বটে : শিখেছে দাক্ষিণাত্যের ভারতীয়েরা শ্যাম্পু নেয় না শিখেরা নেয় মারোয়াড়িরা বরং দই ও বেসন ব্যবহার করে—কিম্বা রিঠে-ভেজানো জল...। আর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল শিখার—নিজের কলেজের একজন অধ্যাপিকার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা! কী লজ্জা করেছিল শিখার! ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, 'ও-সব আমি ব্যবহার করি না...কিছু খাবে?'... মেয়েটি কিছু শুনছিল না, শুধু ধরিত্রীর দ্বিধা হওয়ার অপেক্ষায়...

একেক দিন ওর মনে হয় কাজটা বাজে জাতও গেল পেটও ভরল না...তবে সত্যি কথা বলতে মালিককে আর মালিকের লোকে ওর খুব ভালো লেগেছে। অল্পবয়সী। বড়লোকের সন্তান। বন্ধুরা অবশ্য বলে লোকটির বিষয়বুদ্ধি আছে...ওর অমায়িকতা এক মুখোস মাত্র...ওকে বিশ্বাস করতে যেয়ো না...'

কিন্তু শিখার যে মানুষমাত্রকেই বিশ্বাস করতে ভালো লাগে! এমন কি দিদিকে আর বাবাকেও...দিদি অবশ্য ওকে দেখেই মুখ ফেরায়...কিন্তু বাবা...মাঝে মাঝে সেই অত্যাচারী বাবার অসাবধানে উচ্চারিত কোনো কথার মধ্যে হঠাৎ ভেসে-ওঠা এক চাউনির মধ্যে শিখা যেন আবিষ্কার করে—কিম্বা কল্পনা করে—এক স্নেহের আমেজ...তখন ওর দুষ্প্রতিরোধ্য ইচ্ছা করে বাবার বাহুবন্ধনে নিজেকে নিক্ষেপ করতে, গতদিনের যাবতীয় কিছুর জন্য ক্ষমা চাইতে...সঙ্গে সঙ্গে সে দেখে পিতৃনামক পূর্ববৎ সেই হিম-নিস্তাপ প্রস্তরমূর্তি...

—'এখানে বসে বসে গ্যাঁজাচ্ছ? কাজ নেই বুঝি? তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম...'

—'অণিমাদি আমাদের টীমের লীডার...' বলে পরির মায়ের চায়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শিখা উঠে গেল।

...মেয়েটির সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হয় নি; তবে আজ আমাদের সেই আকস্মিক আলাপের চতুর্থ বার্ষিকীতে আমি শুধু ভাবি : জ্যোতিষীর কথা ফলেছে কি? মেয়েটির ফাঁড়া কেটেছে তো? প্রতিজ্ঞাও প্রতীক্ষিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ মিলেছে এতদিনে?... না, বিবাহনিমন্ত্রণ আমি পাই নি, কিন্তু ক্ষতি কি? মেয়েটির গৃহযোগ তো আছে; দেখবেন গৃহপ্রবেশে আমার ডাক পড়বে। চিঠিতে লেখা থাকবে : '...আর জানেন মায়ের সঙ্গে আর আমাদের সবার সঙ্গে বাবার এবার ভীষণ ভাব হয়েছে।'

(ক্রমশঃ)

তিনটি লাজুক জুঁই ॥

বটকৃষ্ণ দে

একদিন কোনোদিন
সবাই ত চলে যাবে; কোনোদিন, একদিন।
দিগন্তে ছুটেছে পথ, সমুদ্রে মিলেছে নদী স্রোতে, মত্ততায়
দক্ষিণের হার্দ্য হাওয়া, সম্মোহিত সুখের সংলাপ, রঙীন
মুহূর্তের মুগ্ধতা, নিবিড় বক্ষের তাপ, নির্বন্ধ নারী-ও—
রয় না কিছুই।
কিন্তু রয়ে যায়, একদিন গন্ধে ভরেছিল
তিনটি লাজুক জুঁই।

হৃদয় উজ্জ্বল রোদ আজ। শরীরে সম্রাট সজ্জার আল্পনা।
রাত্রে খুব ঝড় উঠেছিল, ভোরে নাবিকের চোখে
কারুকৃত দিগন্তের ছবি।
আকাশে পালানো মেঘে অজস্র উল্লাসের জল বোনা।
সব এই সব একদিন সন্ধ্যায় নিঃশব্দ একাকারে
ছন্দহীন অন্ধকারে ম্লান হবে—
রবে না কিছুই, কেন না রয় না কিছুই—
অথচ নিশ্চিত থাকে দূর স্মৃতি,—
কী, বলো তো, বলেছিলো
এক গুচ্ছ কিশোরী মাধবী :
কী সে গন্ধ দিয়েছিল
তিনটি লাজুক জুঁই।

দেবমূর্তি ॥

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

তোমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করা
বিপজ্জনক নয়—
একথা ভেবেই নতজানু হই।
সূর্যের মুখ দেখবো বলে
ছিনিয়ে নিয়েছিলাম—আমার ঈশ্বরকে
জীর্ণ প্রাচীর থেকে
গোপন অন্ধকারকে উপেক্ষা করে।
বসিয়েছিলাম আমার ঈশ্বরকে
এই বুকের মধ্যে।
ভালবাসার রক্তে ঘটেছিল চিরশুদ্ধি।
সেদিনই সেই দেবমূর্তি জেনেছিল
কিভাবে শত্রুতা করেছে
ইতিহাস—দীর্ঘদিন ধরে

তাকে দেখার আগে ॥

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

কে জানতো
সে এত ধারালো—
পাহাড় কেটে বের হয়,
পাথর মসৃণ করে।
কে জানতো
সে এত স্বচ্ছ হয়
কম্পমান দর্পণের মতো।
কে জানতো
সে এত লাজুক হয়
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়।
কে জানতো
সে এত নাচ জানে,
গান জানে?
কে জানতো
সে এত অশান্ত?
তীর ভাঙে আর চর গড়ে।
নদী দেখার আগে
[illegible]?

বিতর্কিত উপন্যাস

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নানা জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে,—অতীতে এবং অধুনা-ও। অনেকগুলির সমাধান হয়েছে, অনেকগুলি কালে কালে বাতিল হয়েছে, কিছু আজও আমাদের চিন্তাকে মাঝে মাঝেই নাড়া দেয়। শেষোক্ত সমস্যাগুলির অন্যতমটি হচ্ছে বিতর্কিত একটি উপন্যাস। বিতর্কের প্রথম প্রশ্ন,—রচনাটিকে উপন্যাস বলা চলে কি-না, দ্বিতীয় প্রশ্ন এর মৌলিকতা নিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত উপন্যাসটির পক্ষে গেলে, এটিই হবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। নাম, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ। লেখিকা বিদেশিনী, হানা ক্যাথেরিন মুলেন্স, প্রকাশকাল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ।

"আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হইবার ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। কাহিনীর মৌলিকতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং চরিত্র চিত্রণের কুশলতায় ইংরাজ মহিলা বিরচিত এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর সৃষ্টি।"

হানা ক্যাথেরিন মুলেন্স বিরচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থটি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলে সম্পাদক গ্রন্থটির ভূমিকায় যে কথা বলেছেন তারই নির্গলিতার্থ উদ্ধৃত কথাগুলি গ্রন্থের মলাটের নামপৃষ্ঠায় মাঝখানে মুদ্রিত হল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটির পরিচিতি লিখলেন।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের অগোচরে ছিল না। দেশী-বিদেশী প্রায় সকল সমালোচক মুলেন্সের গ্রন্থটির নামোল্লেখ করেছেন। রেভারেণ্ড লং, ওয়েংগার, মারডক প্রভৃতির বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকায় ফুলমণির নাম আছে। রাখালরাজ রায় ও যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের বাংলা সাহিত্যের পত্রিকায় (১৯১৫ খৃঃ) গ্রন্থটিকে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক ইংরাজী [illegible] অংশে এটিকে [illegible] বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ইংরাজী গ্রন্থে মুলেন্সের গ্রন্থটির পরিচিতি আছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারায় ফুলমণি ও করুণার আলোচনা স্থান পেয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন গ্রন্থটি সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সময় থেকে লেখিকার মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমকালের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় রচনাটি প্রশংসিত হয়েছে। এমন কি খৃষ্টান ট্র্যাক্ট সোসাইটির প্রতিবেদনে হানা ক্যাথারিন মুলেন্স সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাকে ফুলমণি ও করুণার বিবরণের সম্মানিত লেখিকা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'জার্নাল অব দি ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিস্ট মিশন', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি তৎকালের

THE HISTORY

OF

PHULMANI AND KARUNA;

A BOOK FOR

NATIVE CHRISTIAN WOMEN.

ফুলমণি ও করুণার

বিবরণ,

স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত।

CALCUTTA

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY [illegible] BAPTIST, AT BISHOP'S COLLEGE PRESS

[illegible] 1852. [3000 copies].

মূল সংস্করণের নামপত্র

দি উইক গ্রন্থের দুটি পাতা

6 THE LAST DAY

Dear! Mary, you always turn what one says into something grave . when you say in that way. "God said," it always gives me a pain at my heart, as if I'd heard some bad news. I can't stay any more ; will you lend me your brush and your pail, for I hav'n't begun to clean yet?

O dear, dear, Nanny, that's a pity ; then you'll be all in a hurry before night, and you are sure to have something undone . here, take the brush and pail, and make as much haste as you can, and perhaps you may "redeem the time" saying which, she took them out of a little closet under the stairs, and Nanny took them with a half smile, saying,

"Redeem the time!" what queer words she always speaks! So she went away. And as in talking she had forgot to keep on the mat, she had left a great many dirty foot-marks , for she had on a pair of ragged list shoes, which had sucked up the wet, as she crossed the street : but Mary again went to the little closet, and took out an old bowl, which had her house-cloth and sand in it, and soon made it as clean as it was before; and she had scarcely sat down again, before Nanny again came to beg some sand ; for, said she, I wasn't up when the sand-man came by. Mary supplied her but as Nanny went back, and strode over the flower-pots at the door, the hem of her petticoat, which was torn and hung down in a loop, caught the head of the wallflower, and threw it down! Mary flew out to save her flower, but too late; for

OF THE WEEK. 7

Nanny's haste made her give a pull to get disentangled, and the main stem of the flower was broken off.

O my wallflower! said Mary, the colour coming into her face, and the tears into her eyes.

Nanny was evidently sorry, and said, Well, Mary, I wish I had not done it, I know how you loved that wallflower and watched it for Fanny's sake; I wish I could mend it again ; this is all you've got for lending me your things

Mary was soothed by the expression of Nanny's sorrow, and wiping away the tear, said, Never mind ; I know you did not do it on purpose ; and as it reminds me of another thing God spake, I won't be sorry any more

Now, Mary, I should like to hear that word which stops your sorrow.

Well then, it is this, "All flesh is grass ; and all "the goodliness thereof is as the flower of the "field. The grass withereth, the flower fadeth, "but the word of our God shall stand for ever."

Now, said Nanny, you have given me another pain at my heart ; but I deserve it ; I'd no business to break Fanny's flower! And away she went.

All this passed in a very little time, for you know things are sooner done than described I could not sit still any longer ; but as Mary seemed now to wish to take in her pretty plants, and it continued to rain, I could not but go to help her as soon as they were replaced on their stand, she

বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে ফুলমণি ও করুণার বিবরণ যথেষ্ট প্রশংসিত এবং লেখিকা সম্মানিত হয়েছেন। গ্রন্থপ্রকাশের কাল থেকেই এইভাবে মুলেন্স সর্বত্র উল্লেখ্য লেখিকা। এক শতাব্দী যাবৎ উপেক্ষা করা হয়েছে বলে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিমত প্রকাশ করেছেন (ভূমিকা, পৃ ॥/৹, তা যথার্থ নয়। কেবল মাঝখানে গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পুনর্মুদ্রিত হলে (জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থটির বিস্তৃত আলোচনা পথ সুগম হল।

তিনটি কারণে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রথমতঃ, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপুল খৃষ্টীয় গদ্য সাহিত্যে কাহিনী-মূলক রচনার ক্ষেত্রে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় রচিত খৃষ্টীয়-অখৃষ্টীয় যাবতীয় গদ্যরচনার মধ্যে মুলেন্সের গদ্যভঙ্গী সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বাংলা গদ্য ধারার মূল স্রোতের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তৃতীয়তঃ, এর কাহিনীতে বিষয়বস্তুর মৌলিকতা ও উপন্যাসের রস কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছেন, একে বাংলায় রচিত প্রথম উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন।

প্রথম দুটি কারণ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, সৌষ্ঠব ও গৌরবের বিষয় এবং পৃথকভাবে আলোচনার যোগ্য। তৃতীয়টি অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে বিচার্য, যেহেতু এতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য এই সিদ্ধান্তটি।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থের নবতম সংস্করণের সম্পাদক ভূমিকায় লিখেছেন, "বিষয়বস্তুর মৌলিকতার জন্যও ফুলমণি ও করুণার দান অবশ্যই স্বীকৃতি লাভ করবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। এর ছয় বৎসর পূর্বে ফুলমণি ও করুণা প্রকাশিত হয়েছে। এর কাহিনীর মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের কতকগুলি লক্ষণ সুস্পষ্ট।...'ফুলমণি ও করুণা' এখন থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে মর্যাদা পাবে।" (ভূমিকা, পৃঃ ॥/) যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় তাঁদের সম্পাদিত সাহিত্য পঞ্জিকায় (১৩২২ বঙ্গাব্দ) ফুলমণি ও করুণাকে প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন। রচনার মৌলিকত্ব ও উপন্যাস হিসেবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশের দাবীই 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'কে বিতর্কিত ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এতখানি গুরুত্ব দান করেছে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গ্রন্থটিকে প্রথম বাংলা মৌলিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চাইছেন, তখন তাঁরই সম্পাদিত গ্রন্থের 'পরিচিতি' অংশে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবারের জন্যও একে উপন্যাস বললেন না, পরিবর্তে উপন্যাস শব্দ প্রয়োগের সম্ভাব্য স্থলগুলিতে 'এই ধরনের বই', 'বাঙ্গালায় এই যে উপাখ্যান', 'এই পুরাতন বইখানির'—লিখলেন। এরূপ সতর্কতার একটিই কারণ হতে পারে—তিনি এর মধ্যে 'উপন্যাস' খুঁজে পান নি। সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ সংস্করণে ফুলমণি ও করুণার বিবরণকে অনুবাদ-গর্ভ রচনা বলে মন্তব্য করেছেন। এ-বিষয়ে ভূমিকায় তিনি ডাঃ সবিতা দাশের লেখা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রের উল্লেখ করলেন। বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থের ঐতিহাসিকদের আরো অনেক উক্তি উদ্ধৃত করা যায়, যেখানে কাহিনীটির আলোচনায় উপন্যাস শব্দটিকে সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'কে উপন্যাস বলতে আমাদের সাহিত্য-ইতিহাস এখনো দ্বিধা বিরাজিত।

উপাখ্যানটিতে উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ সত্যই বিদ্যমান। করুণা-রাণী-সুন্দরীর গার্হস্থ্য জীবনচিত্রে সম্ভাব্য উপন্যাসের অস্ফুট রসধ্বনি শোনা যায়। দারিদ্র্য ও নীচাশয়তা থেকে করুণার উত্তরণ, রাণীর বিবাহ, স্বামীর মৃত্যু ও পুনর্বিবাহের মধ্যে নিহিত প্রচ্ছন্ন চারিত্রিক সংস্কার ও সুন্দরীর সরল পূর্বরাগ ও বিবাহচেতনা কাহিনীকে উপন্যাস [illegible] প্রান্ত করেছে। আলালের ঘরের দুলালের ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত এবং এর পূর্বে প্রকাশিত এরূপ অন্য কোনো রচনা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত না হওয়ায় ফুলমণি ও করুণার বিবরণই আমাদের প্রথম উপন্যাস। এই সিদ্ধান্তে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু রচনাটির মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে এই দাবী টেকে না। এবং ফুলমণি ও করুণার বিবরণ মোটেই একটি মৌলিক রচনা নয়। এর সর্বাঙ্গে সর্বৈব অনুবাদ। বাক্যে-বাক্যে, শব্দে-শব্দে অনুবাদ। চরিত্রে অনুবাদ, ঘটনায় অনুবাদ। কাহিনী রচনার আদর্শ, মৌল উপাদান ও লক্ষ্যটি পর্যন্ত অন্য একটি গ্রন্থ থেকে সযত্নে যথাযথ চয়িত। এরূপ অবস্থায় ফুলমণি ও করুণাকে আমরা বাংলায় অনূদিত উপন্যাস সমূহের আদিসৃষ্টিসুন্দরী বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস বলতে পারি না। আমাদের প্রথম মৌলিক উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল।

(৩)

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' 'দি উইক' গ্রন্থের অনুবাদ।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই মুলেন্স কিন্তু মূল রচয়িত্রীর সম্মান পেয়ে আসছেন। তাঁর গ্রন্থের উৎস সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি, যে ট্রাক্ট সোসাইটি গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে বা অন্যত্র কোথাও এ-বিষয়ে কোনো আলোকপাত নেই। কোন গ্রন্থ তালিকায় অনুবাদ বা অনুবাদগর্ভ রচনা বলে এর উল্লেখও নেই। একালের মত সেকালেও গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে ও পরে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা বাহির হত। খৃষ্টীয় যাজক-মণ্ডলীর মুখপত্রে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থরাজির বিস্তৃত বিবরণ থাকত। একই গ্রন্থের প্রশংসা এবং নিন্দাবাদ একইকালে প্রকাশিত দুটি পৃথক গোষ্ঠীর পত্রিকায় গ্রন্থান্বেষী

পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত আজো যেমন মাঝে মাঝে জাগায়। পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনার এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হবার সমকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজতে খুঁজতে আকস্মিকভাবে এর একটি রিভিয়্যু আবিষ্কৃত হয়। রিভিয়্যুটি ফুলমণি ও করুণা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছে—

> "The idea of the work and to a considerable extent, its plan and materials are borrowed from a well known little English book entitled 'The Week'. The model characters are Robert and Mary with their children Fanny, Willy, Hannah and baby are reproduced in Bengali costume as Premchand and Phulmani and their children Sundari, Sadhu, Satyabati and the infant Priyanath .... Incidents and conversations which give live to the narrative are also freely borrowed from 'The Week'. .... Story of an ideal christion family".
> (Tract, The Oriental Baptist Mission, August, 1852)

উদ্ধৃত অংশটি আমাদের বিতর্কিত উপন্যাসের উপাদান, উৎস ও চরিত্রের ইঙ্গিত দিয়েছে। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র উপাদান একটি আদর্শ খৃষ্টীয় পরিবার, কাহিনীর উৎস 'দি উইক' নামে একটি বহু পরিচিত ক্ষুদ্র ইংরাজী গ্রন্থ, এবং 'ফুলমণি ও করুণা' চরিত্রে অনুবাদ পর্যায়ভুক্ত।

বহু অনুসন্ধানের পর 'দি উইক' গ্রন্থের সন্ধান মিলল। রচয়িতার নাম নেই। 'দি উইক'—গ্রন্থটির সংক্ষেপিত নাম। সম্পূর্ণ নাম—'দি লাস্ট ডে অব দি উইক: দি ফার্স্ট ডে অব দি উইক; দি উইক কমপ্লিটেড'—তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম প্রকাশ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান সান-ডে স্কুল ইউনিয়ন কর্তৃক, ফিলাডেলফিয়া থেকে।

নূতন সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ। প্রকাশক আর, বি, শেলী এণ্ড ডব্লু-বার্ণসাইড লণ্ডন।

এখন মূলের সঙ্গে 'ফুলমণি ও করুণা'কে মিলিয়ে দেখলেই হানা ক্যাথেরিন মুলেন্সের কৃতিত্ব ও মূল থেকে তার ঋণের পরিমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(৩)

মূল কাহিনীটি ইংলণ্ডীয় পরিবেশে রচিত। ইয়র্কশায়ারে একটি বাজার-কেন্দ্রী ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে বসবাস করে একটি আদর্শ খৃষ্টান পরিবার, কর্তা রবার্ট গৃহিণী মেরী আর তাদের ছেলেমেয়ে। বড়টি মেয়ে নাম ফ্যানী, পরেরটি ছেলে উইলিয়াম, তৃতীয়টি মেয়ে হ্যানা, সব ছোটটি শিশু। বড় মেয়ে একটি ধর্মপ্রাণ পরিবারের সঙ্গে অন্যত্র থাকে। সে একটি [illegible] হিসেবে মা-[illegible] কাছে রেখেছে। যে বাড়ীতে সে থাকে সেখানে একটি বাগান আছে, মালী ফ্যানীকে বড় স্নেহ করে। সে-ই গাছটি দিয়েছিল। কম আয় রবার্টের। তাই দিয়েই মেরী ঘর-সংসার চালায়, বড় সুন্দর করে হিসেব করে চালায়। ঘর-দুয়ার ঝকঝকে তকতকে। সকলের জামা কাপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। রবার্ট ও মেরী পরোপকারী, তাদের প্রভাবে ক্রমে পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই প্রভাবিত। ন্যানীর মত কদর্য, অপরিচ্ছন্ন, রূঢ়ভাষী, লোভী ও মিথ্যা-ভাষিণী রমণীর চরিত্রেও পরিবর্তন এসেছে। অবশ্য মাঝখানে লেখক এসে এসে ন্যানীকে উপদেশ দিয়ে গেছেন। লেখকও কাহিনীতে একটি বিশিষ্ট চরিত্র, তার ভূমিকা উপদেশকের, সহানুভূতিশীল যাজকের। ন্যানীর স্বামী থমাস মদ্যপ ও অমিতব্যয়ী, ছেলেরা পীটার ও টম দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অখৃষ্টীয় স্বভাবের। এরাও পরিবর্তিত হয়েছে। এই কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে আর দুজনা বৃদ্ধা,—নেলী আর মিসেস ব্রাউন, পরস্পর বিপরীত কোটির চরিত্র। নেলী ধর্মপ্রাণা শান্ত সমাহিত, ব্রাউন অনুশোচনাতপ্ত দগ্ধ ও জীবনের প্রান্তে এসে খৃষ্টের শরণাপন্ন। কাহিনীর সকল ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত তিনজন—রবার্ট, মেরী ও লেখক।

কাহিনীটির পটভূমি আদর্শ খৃষ্টান পরিবারের সাপ্তাহিক নৈষ্ঠিক জীবন-যাত্রা ও কর্মপ্রণালী; এরি মধ্যে খৃষ্টীয় মনন, সততা, পাপ, পুণ্যবোধ, বাইবেলের শিক্ষা, যীশুর অমৃতবাণী ও তদনুরূপ জীবনাচরণ প্রভৃতির চিত্র, ব্যাখ্যা ও বর্ণনা।

হানা ক্যাথেরিন মুলেন্স কাহিনীটিতে বঙ্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন গল্পটির এখানে সেখানে যৎসামান্য পরিবর্তন করে এবং নামগুলি পাল্টে। মূলে কাহিনী এক, চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি এক, ঘটনাবিন্যাস, সংলাপ, বাইবেলের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা এমনকি চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি পর্যন্ত হুবহু এক,—কেবলমাত্র

ভাষান্তরিত। রবার্ট, মেরী ন্যানী, থমাস, ফ্যানী, হ্যানা, উইলিয়ম, পীটার ও টম 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে প্রেমচাঁদ, ফুলমণি, করুণা, করুণার স্বামী, সুন্দরী, সত্যবতী, সাধু, বংশী ও নবীন হয়েছে। নেলী চরিত্রটির বাংলা নাম প্যারী। 'দি উইক'এর লেখক চরিত্রটির বঙ্গীয় সংস্করণ লেখিকা স্বয়ং। এতদূর উভয়গ্রন্থে হুবহু এক। ইংরাজী গ্রন্থের মিসেস ব্রাউন চরিত্রের প্রথম জীবনে স্বামীস্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বামীর মদাশক্তি ও মৃত্যু বাংলা কাহিনীতে রাণী ও মধুর দাম্পত্যজীবন এবং মধুর মৃত্যু কাহিনীর উপজীব্য (দ্রষ্টব্য) মূল পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫)। পীটার ও বংশী একই চরিত্র, ফুলমণির লেখিকা মিসেস ব্রাউনের মত পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা ও জুয়ার প্রতি অদম্য আকর্ষণ বংশীর উপর আরোপ করেছেন। স্বামী পুত্রহীনা বৃদ্ধা মিসেস ব্রাউনের অনুশোচনা মুলেন্স করুণার মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন দ্রঃ মূল পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭ ফুলমণি ও করুণা—পৃষ্ঠা ৮৩)। সুন্দরীর পূর্বরাগ ও বিবাহ-ভাবনা মিসেস ব্রাউনের পরিণয়-পরিণামী পূর্বরাগের সগোত্রীয়। তবে বিস্তৃত ও পল্লবিত। রাণীর সন্তান-প্রসব ব্যাপারটি মূলে কাহিনীতে নেই, এ-ছাড়া বঙ্গীয় গ্রাম পরিবেশ পরিকল্পনায় মুলেন্স মূল থেকে মাঝে মাঝে সরে এসেছেন।

উল্লিখিত দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে 'দি উইক' গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুকরণের এরূপ একান্ত বিশ্বস্ত সর্বাঙ্গব পরিণামই ফুলমণি ও করুণাকে অনুবাদ-গর্ভ বা অনুবাদাত্মক রচনা না করে সুস্পষ্টভাবেই অনূদিত গ্রন্থের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করছে।

(৩)

অনুবাদের কয়েকটি। মাত্র দৃষ্টান্ত ও তার বৈচিত্র্য প্রদত্ত হল। ইংরাজীতে 'দি উইক' গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং তার নীচেই 'ফুলমণি ও করুণা'য় সেই অংশের অনুবাদ পৃষ্ঠাঙ্কসহ সাজান হল।

(ক) বাইবেলের অনুবাদ প্রতি পৃষ্ঠায় একাধিক আছে, আমরা মাত্র দুটি উদ্ধৃত করলাম।

1. The grass withereth, the flower fadetn, but the word of our God shall stand for ever. page 9.

তৃণ শুষ্ক হয়, ও পুষ্প ম্লান হয়, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য নিত্যস্থায়ী। পৃষ্ঠা ৮

2. He that eaten my flesh and drinketn my blood dwelleth in me and I in him. page 40.

যে ব্যক্তি আমার মাংস ভোজন করে এবং আমার রক্ত পান করে সে আমাতে বাস করে, এবং তাহাতে বাস করি। পৃষ্ঠা, ৪৯।

(খ) কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বাক্যানুবাদ। এরূপ অনুবাদও অনেক, বাহুল্য ভয়ে দুটি মাত্র উদ্ধৃত হল,

1. I know how you loved that wallflower and watched it for Fanny's sake. page 9.

তুমি ঐ গাছটিকে তোমার সুন্দরীর নিশানা স্বরূপে জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভালবাসিতা, তাহা আমি জানি। পৃষ্ঠা ৮।

2. Then you are welcome, Sir; In entertaining strangers, the Bible says, we may entertain engels unawares! page 39.

যদি এমত হয় তবে মেম সাহেব আপনি বসুন; কেননা ধর্মপুস্তকে লেখা আছে, আতিথ্য ব্যবহারেতে কেহ কেহ না জানিয়া দিব্য দূতগণকেও অতিথি করিয়াছে। পৃষ্ঠ ৪৮

(মূল গ্রন্থের স্ত্রী অনুবাদে মেম সাহেব হয়েছে)

(গ) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বঙ্গানুবাদ। এরূপ অনুবাদ প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি চরিত্রে ও ঘটনায় অজস্র। মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত হল।

1. I was about to speak, when the door was rather rudely pushed upon by a woman of bold and idle appearance, her cloths being very dirty and her hair falling in forlorn strings over her face .. page 6

এমন সময় আর একজন স্ত্রীলোক বহির্দ্বারে শব্দরূপে আঘাত করিয়া ভিতরে আইল। তাহার কাপড় বড় ময়লা, এবং চুল বাঁধা না থাকাতে মস্তকের চতুর্দিগে পড়িতেছিল। পৃঃ ৫

2. If keeping the Sabbath holy, is going to Church, how can I, when I have no cloths decent?

Going to church is certainly a part of your duty, but there is much more than that necessary, you have to pray, to hear and to learn. As to clothes I know it is right to wish to be decent, but after all to get your soul cured from sin and dressed by putting on Jusus, is much more than the clothes of the body? page—67-68.

আমার একখানিও ভাল কাপড় নাই, এই জন্য গীর্জায় যাইতে লজ্জা করি। সকলে রবিবার দিনে ভাল কাপড় পরিয়া আইসে, কেবল আমি কি মলিন বস্ত্র পরিয়া যাইব?

প্রভুর গৃহে পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া যাওয়া উচিত বটে, তথাচ যদি কোনপ্রকারে এমন বস্ত্র যোগাইতে না পার তবে গীর্জা ত্যাগ করা অপেক্ষা সামান্য বস্ত্র পরিয়া যাওয়া ভাল; কেন না শরীর একপ্রকার তুচ্ছনীয় বস্তু, আত্মা অতিশয় দুর্লভ, অতএব তোমার আত্মা যেন খৃষ্টের পবিত্রতাতে ভূষিত হয়, এমত চেষ্টা কর। পৃঃ ৯৮-৯৯।

(ঘ) কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনায় মূলানুগ অনুবাদ।

1. As Nanny went back, and strode over the flowerpots at the door, the hem of her petticoat, which was torn and hung down in a loop, caught the head of the well flower, and threw it down? page. 8.

অনন্তর করুণা ফুলমণির পশ্চাতে ঘরের মধ্যে যাইতেছিল, এমত সময়ে তাহার আঁচলে একটি বড় ছিদ্র থাকাতে সেই উক্ত চীন গোলাপের গাছে জড়িয়া ধরিল; তাহা করুণা না দেখিয়া অঞ্চলটিকে বলপূর্বক টানিয়া লওয়াতে চারাটি প্রায় মূলে পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল। পৃষ্ঠা—৭।

২। 'দি উইক' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৬, চরণ ৩—১০-এর সঙ্গে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৬ চরণ ৬—৯-এর ঘটনায় মিল রয়েছে।

৩। রবার্ট ও মেরীর পারিবারিক খরচ-পত্রের একটি দীর্ঘ বিবরণ 'দি উইক' গ্রন্থের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। তারই বঙ্গীয় সংস্করণ প্রেমচাঁদ ও ফুলমণির সারা মাসের হিসেবনিকেশ 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

খরচের কয়েকটি মিল নিম্নরূপ—

The Week. 1, a penny for the Church Missionary Society, 2, two pence towards Willy's Bible.

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—

১। মিশনারী সোসাইটির মাসিক চাঁদার নিমিত্তে দুই আনা।

২। সাধুর নিমিত্তে বড় ধর্মপুস্তক কিনিবার কারণ যে দুই আনা।

৬

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে 'দি উইক' গ্রন্থের কাহিনীবিন্যাসের পরিচ্ছেদক্রম পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ লেখিকা, ফুলমণি, করুণা ও ফুলমণির ছেলে-মেয়েদের বিশেষ করে সুন্দরীর স্মৃতি-চিহ্নবাহী পুষ্পবৃক্ষের বিবরণ ইংরাজী মূলের প্রথম পরিচ্ছেদের লেখক, মেরী, ন্যানী ও মেরীর ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে ফ্যানীর স্মৃতিচিহ্নবাহী পুষ্পবৃক্ষের বিবরণ থেকে যথাযথ চয়িত। বর্ণনা, সংলাপ, চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি, ক্রিয়াকলাপ, বাই-বেলের উদ্ধৃতি—সবই এক। কেবল সুন্দরীর বর্ণনায় মুলেন্স সামান্য পল্লবিত। মূলের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'ফুলমণি ও করুণা'য় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত। তৃতীয় পরিচ্ছেদটি সামান্য পল্ল-বিত। এমনিভাবে 'দি উইক' গ্রন্থের আটটি পরিচ্ছেদকে মুলেন্স দশটি পরিচ্ছেদে বিস্তৃত করেছেন।

'ফুলমণি ও করুণা'-তে অনুবাদের এমনি নানা বৈচিত্র্য ও রূপ অজস্র অজস্র ছড়িয়ে আছে প্রতি পৃষ্ঠায়। যে সামান্য উদ্ধৃত হয়েছে তার সকল ক্ষেত্রেই বক্তা ও শ্রোতা ও পরিবেশ এক, কেবল নামের পার্থক্য, যেমন—মেরীর স্থানে ফুলমণি, ন্যানীর জায়গায় করুণা, নেলীর পরিবর্তে প্যারী প্রভৃতি। আর বিস্তৃত আলোচনা না করেও এখন আমরা সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসতে পারি যে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' হানা ক্যাথেরিন মুলেন্সের মৌলিক রচনা নয়। এটি অনুবাদাত্মক বা অনুবাদ-গর্ভ নয়, কোনো গ্রন্থের নিবিষ্ট অনু-বাদিকা অনুবাদকালে যেটুকু স্বাধীনতা গ্রহণ করে থাকেন, মুলেন্স তার বেশী কিছু করেননি। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' 'দি উইক' গ্রন্থের এমনিই আদ্যন্ত অনুবাদ।

মৌলিকত্ব' থেকে বঞ্চিত হয়ে গ্রন্থটি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম হবার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হল, সে-গৌরব প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' অনূদিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলায় প্রথম। আশা করি অতঃপর এই বিতর্কিত রচনাটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তার যথার্থ পরিচয়েই প্রতিষ্ঠিত হবে।

'দি উইক' গ্রন্থটির সাতনব্বইটি পৃষ্ঠা, দুটি নামপত্র, একটি ছবি বন্ধুবর ডঃ সরোজকুমার নস্কর বৃটিশ মিউজিয়ম থেকে ছবি করে প্রবন্ধ-লেখককে পাঠিয়েছেন। গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণের। আলোচনায় এই গ্রন্থটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে আলো-চনা পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতিতে শ্রীযুক্ত চিত্ত-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এক সময় বাংলাদেশে **কবিগানের** বিশেষ **প্রচলন** ছিল। প্রচলন ছিল বললে সঠিক বলা হয় না বরং বলা উচিত সমাদর ছিল। জনসাধারণ বিশেষভাবে উপভোগ করতেন এই **কবিগান** এবং এক সময়ে বঙ্গসমাজে এই কবিগানের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে নিধুবাবুর পর কবিওয়ালাদের প্রাদুর্ভাব **দেখা** যায় এবং রাম বসু হরুঠাকুর রাসু নৃসিংহ **ও পরবর্তীকালে** পরাণ দাস উদয় দাস নীলমণি (নীলমণি পাটুনি) নীলু ঠাকুর রামপ্রসাদ ঠাকুর ভোলা ময়রা চিন্তে ময়রা আণ্টুনি সাহেব প্রভৃতিদের **বিশেষ খ্যাতি হয়।**

এই কবিগান সম্বন্ধে একসময়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অবজ্ঞাসূচক উক্তি করলেও ঈশ্বর গুপ্ত **বলেছিলেন** 'যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস বাংলা **কবিতায়** রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু।'

স্বর্গত কেদার **বন্দ্যোপাধ্যায় এই** কবিগানের **একজন প্রখ্যাত সংকলক** ছিলেন। তাঁর 'লুপ্ত রত্নোদ্ধার' গ্রন্থখানি **আজ** দুষ্প্রাপ্য হলেও সেকালের কবিগানের একটি **মূল্যবান সংগ্রহ-পুস্তক ছিল।**

হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় **সম্পাদিত বঙ্গভাষার লেখক**' গ্রন্থের ১ম ভাগে **কয়েকজন বিশিষ্ট কবিওয়াল** সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় **ও তাঁদের** রচনার কিছু নির্দশন দেওয়া **হয়েছে।** আমরা **উক্ত** গ্রন্থ থেকে আণ্টুনি সাহেবের বিষয় যে রচনাটি আছে তা এখানে **পুনশ্চ** মুদ্রিত করে দিলাম।

আণ্টুনি

কবিগানে আণ্টুনি খুব **প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি** পর্তুগীজ ব্যবসা **কর্ম উপলক্ষে বঙ্গদেশে** আগমন **করেন**—ফরাসডাঙ্গায় **ইঁহার প্রথম অধিবাস।** এই স্থানেই **ইনি** এক **ব্রাহ্মণ-যুবতীর** প্রেমে পড়েন। শেষে যুবতীকে **লইয়া গরীটির** নিকট গিয়া বাস **করেন। তাঁহার** বিস্তৃত বাগান-বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি তথায় দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'সেকাল ও একাল' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'আমার কোন আত্মীয় বলেন—আণ্টুনি সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে চিরজাগরূক আছে। উহা ফরাসডাঙ্গার নিকট **গরীটির** বাগানে **ছিল।** রেল রোড **হইবার পূর্বে** বাটী যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা সর্ব্বদাই গরীটির বাগানের নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং **আণ্টুনি** সাহেবের **ভগ্নবাটী সর্ব্বদা** আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত। কিছুদিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যুদলের **আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিল।'**

আণ্টুনি যৌবনকালে ফরাসডাঙ্গার **কয়েকটি দুষ্ট** লোকের সংসর্গে **পড়িয়া** নষ্টচরিত্র হন। ইনি প্রথমে একজন হিন্দু-কবিওয়ালার দলে **প্রবিষ্ট** হন; পরে নিজেই দল করেন। ইহাঁর প্রেমিক ব্রাহ্মণকন্যা ম্লেচ্ছ-স্পৃষ্টা হইলেও হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবতী ছিলেন দুর্গোৎসবাদি করিতেন। পূজায় তাঁহার বাটীতে কবি হইত। বাঙ্গালী **ব্রাহ্মণকন্যার সম্পর্কে থাকিয়া** সাহেব উত্তমরূপে **বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন—কবির** গান বেশ বুঝিতে **পারিতেন। ক্রমে তাঁহার কবির** নেশা জমিয়া গেল; তিনি সখের দল করিলেন। প্রেমে পড়িয়া ইতিপূর্বে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। এক্ষণে যা কিছু সঞ্চিত বিত্ত ছিল সখের কবির দলে তাহাও নিঃশেষ করিলেন। কাজেই তখন সখের দলকে পেশাদারী করিতে **হইল।** দলের পসার বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল—অর্জ্জিত অর্থে তাঁহার সচ্ছন্দে চলিতে লাগিল।

গোরক্ষনাথ ঠাকুর প্রথমতঃ **ইহাঁর** দলে গান বাঁধিয় দিতেন শেষে ইনি নিজেই উত্তম উত্তম গীত রচনা করিতে লাগিলেন। একবার ঠাকুরদাস সিংহের দলে রাম বসু আণ্টুনিকে বলেন—

> 'কও হে এণ্টুনি!
> আমি এইটি শুনতে চাই।
> এসে এ দেশে এ বেশে,
> তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই।।'

আণ্টুনি উত্তর দিলেন—

> 'এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে
> আনন্দে আছি।
> হয়ে ঠাকুরে সিঙ্গীর বাপের জামাই
> কুর্ত্তিটুপী ছেড়েছি।'

ইহাতে বুঝা যাইতেছে সাহেব সাহেবী বেশ—কোর্ত্তা টুপী পরিতেন না; তৎকালীন বাঙ্গালীর ন্যায় **ধুতি-চাদরই** ব্যবহার করিতেন।

আর একবার নিজের দলে থাকিয়া রাম বসু আণ্টুনি সাহেবকে বলেন—

> 'সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
> ও তোর পাদ্রির সাহেব শুনতে পেলে
> গালে দেবে চুন-কালি।'

আণ্টুনি জবাব দিলেন—

> 'খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু,
> প্রভেদ নাইরে ভাই!
> শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে
> এও কথা শুনি নাই।।
> আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে—
> ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,—
> আমার মানব জনম সফল হবে
> যদি রাঙ্গা চরণ পাই।।'

একবার দুর্গোৎসবের **সময়** চুঁচুড়ায় কোন ধনবান লোকের বাড়ী আণ্টুনির দলের বায়না হইয়াছে। গোরক্ষনাথ ঠাকুর তখন সাহেবের দলের বাঁধনদার। গোরক্ষনাথ আণ্টুনিকে বলিলেন **আমার** সংবৎসরের মাহিনা **এই পূজার আগে শোধ** করিয়া দিতেই হইবে না দিলে ত নূতন আগমনী বাঁধিয়া দিব না।' সাহেব এবার বড়ই রাগিয়া উঠিলেন। তিনি আর গোরক্ষনাথের তোয়াক্কা রাখিলেন না—নিজের আগমনীর নূতন গান বাঁধিয়া লইলেন। এই গানের **দুই ছত্র** এইরূপ—

> 'আমি ভজন-সাধন জানিনে মা!
> নিজেতে **ফিরিঙ্গী।**
> যদি দয়া করে কৃপা কর হে
> শিবে মাতঙ্গী।।'

একটি বিপক্ষ দল আণ্টুনি সাহেবকে বলেন—

> আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কফন চোর।
> ভাগে রাত হলে সব মোড় গোর।।
> টাটকা গোরে শুটকা ভূতের রব—
> —একি অসম্ভব—
>
> এ হুমুকি দিয়ে বস্তু লোটে সব,
> —এর ঠায়-ঠিকানা গেল জানা;
> মাসুর হলো তিন সহর।'

ক্ষপণক

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কমল হেসেই কুটিকুটি ঃ একজন এখানে এই পারে আর একজন হুই সেখানে—কাছে যেতে পারে না, হাঁক পেড়ে তাই গল্প করছে। ভারি মজা তো!

গড় বলে এক জলা জায়গা—দীর্ঘ, দূরে বাস্ত। কোন এক রাজার রাজবাড়ি ছিল, রাজবাড়ি ঘিরে গড়। গড়ের পাশে উঁচু ঢিবি ও জংগল লোকে রাজবাড়ি বলে দেখায়। মেলা মাছ পড়ে, খাল-বিল থেকে এসে জমে। ভূদেব মজুমদারের জায়গা ওটা, জেলেরা জমা নিয়েছে। মজুমদার-বাড়ি নিত্যদিন খাবার মাছ দেবার চুক্তি। খালুই নিয়ে গোমস্তা-মশাই যান, সেই সংগে পুঁটিও যেত। হাপরে মাছ জিয়ানো—হাপর ডাঙায় তুলে ধরলে মাছ খলবল করত, সে বড় দেখাতে মজা। জেলে বলত, কি মাছ খাবা খুকিঠাকরুন? পুঁটি আঙুল দেখিয়ে বলত, ঐটে ঐটে—উঁহু, চ্যাং মাছ কে খাবে, ওদিককার ঐই বড় কইটা—

মেলা টিয়াপাখি, বিশেষ করে রাজবাড়ির জংগলে গড়পাড়ায়। এখানে যেমন কোয়েল-শালিক, গয়াতলীতে টিয়াপাখি তেমনি: ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় গাছে বসে, মাটির উপরেও বসে। গড়ের ধারে বেদেরা এসে টোল ফেলেছিল। বেলা ডুবুডুবু—সেয়ানা ছেলেপুলে ঘোড়া-খচ্চর ছাগল-মুরগী একপাল এসে পড়ল। মানুষরা এলো কতক পায়ে হেঁটে, কতক বা ঘোড়ার পিঠে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র মায় হাঁড়িকুড়ি অবধি। সকালবেলা দেখা গেল, হোগলার এক এক কুঁড়ি তুলে পুরোদস্তুর পাড়া জমিয়ে নিয়েছে, গাছতলায় উনুন ধরাচ্ছে, নাওয়া-খাওয়া করছে গড়ের জলে। আবার বেলায় মেয়েরা পাড়ায় ঢুকে 'বাত ভালো-ও-ও—' বলে হাঁক পাড়ছে ঃ বাত ভাল করতে পারি, দাঁতের পোকা বের করতে পারি। হরেক ব্যাধির চিকিৎসা পুরোনো কাপড় কিম্বা দুটো-চারটে পয়সার বিনিময়ে। পুরুষরাও বেরিয়ে ভানুমতীর খেলা অর্থাৎ ম্যাজিক দেখাচ্ছে। আর পাখি ধরছে—নলের মুখে আঠা লাগিয়ে। টিয়াপাখি ধরে ধরে তারের খাঁচায় পুরছে। কত যে ধরল, লেখাজোকা নেই। টিয়া ধরার মতলব নিয়েই বেছে বেছে এইখানটা আস্তানা নিয়েছে—গয়াতলীর মানুষে বলাবলি করে।

না গিয়েও কমল গয়াতলী গ্রাম চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে—এমনি ধারা পুঁটির গল্পের গুণ। গাঙের কিনারে প্রাচীন বটগাছ—ঝুরিগুলো হুবহু মুনি-ঋষির জটাজালের মতো। কালীমন্দির সেখানে। মন্দিরের পাকা চাতালে ভস্মমাখা ত্রিশূলধারী লম্বাচওড়া দশাশই এক সাধু-পুরুষ থাকেন। লাল টকটকে বড় বড় চোখ। নিশিরাত্রে মা-কালীর বিগ্রহ নাকি কথাবার্তা বলেন তাঁর সংগে। বাড়িসুদ্ধ একদিন সবাই সাধুর কাছে গিয়েছিলেন—নতুন বউ ছিল, পুঁটিও ছিল। পুঁটির দিকে তাকিয়ে পড়লেন, ভয় পেয়ে পুঁটি ছিটকে সকলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

কমল তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ধুস, কী তুই, আমি হলে সাধুর একেবারে কাছে গিয়ে বর চাইতাম।

পুঁটি প্রশ্ন করে ঃ কী বর চাইতিস?

মুহূর্তমাত্র না ভেবে কমল বলল, একটা টিয়াপাখি চাইতাম বিনি খাঁচায় যে গায়ের উপর বসে থাকবে, উড়ে পালাবে না।

পুঁটি এক তাজ্জব বস্তু দেখেছে যার নাম রেলগাড়ি। চোখে ঠিক না দেখলেও নতুন বউয়ের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত শুনেছে যে, সে একরকম দেখাই। গয়াতলী থেকে ক্রোশ দুই দূরে রূপদিয়া নামে স্টেশন। সেখানে লোহার পাটির উপর দিয়ে রেলগাড়ি আসে আর যায় দিন-রাত্রি অনেক বার। আওয়াজ বাড়ি থেকে স্পষ্ট কানে পাওয়া যায়। তাই-বা কেন, হৃদয়-নমাদের ছাতে উঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলীও দেখে এসেছে—এই এখানটা ধোঁয়া, কতদূর গিয়ে আবার ধোঁয়া, আরও খানিকটা গিয়ে

অনবধানতাবশত ৮ম সংখ্যায় 'শেষ' ছাপা হয়েছিল।

আবার। রাতদুপুরে একটা গাড়ি আসে। জেঠাইমার কোলের মধ্যে শুয়ে পুঁটির ঘুম ভেঙে যেত এক-এক রাত্রে। যেন এক দংগল দৈত্য রাগে বেরিয়ে পড়ে চতুর্দিক লণ্ডভণ্ড করে বেড়াচ্ছে' সে কী ভয়ানক আওয়াজ রে খোকন! কাঁপুনি লাগত, জেঠাইমাকে এঁটেসেঁটে ধরতাম। কলের ব্যাপার তো কিছু বলবার জো নেই। হয়তো বা ইস্ক্রুপ-টিস্ক্রুপ খুলে লাইন ভেঙে মজুমদার-বাড়ি এসে পড়ে সবসুদ্ধ চুরমার করে দিয়ে গেল। রক্ষে এই আওয়াজটা বেশীক্ষণ থাকত না। গাড়ি চলে গিয়ে আবার সব ঝিমিয়ে পড়ে। ঝিঁঝিঁ ডাকে, তক্ষক ডাকে।

রেলগাড়ি বস্তুটা কমলও জানে। 'পদ্যপাঠে' পড়েছে। 'ছয় দণ্ডে চলে যায় ছ' মাসের পথ'। কিন্তু বইয়ে পড়াই শুধু, তার অধিক কিছু নয়। নতুন বউ, সেজবৌদি হয়েছেন যিনি, তাঁর কী কপালজোর। রেলগাড়ি চক্ষের পলকে তাঁকে রূপদিয়া স্টেশনে এনে নামিয়ে দিয়েছিল। আর দিদিটাও খুব যে কম যায় তা নয়—আস্ত রেলগাড়ি চোখে না দেখুক, ধোঁয়া দেখেছে, দিনমানে ও রাত্রে গাড়ির গর্জন শুনেছে।

পুঁটি বলল, সেজবৌদির নাম সরসীবালা। খাসা নাম—না রে? মানুষটাও খুব ভাল। খুব আস্তে আস্তে কথা বলে ফিসফিস করে। গায়ের উপর বসেও সব কথা শুনতে পাইনে, জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়। তোর কথা জিজ্ঞাসা করত, এ-বাড়ির সকলের কথা জিজ্ঞাসা করত। তোকে বলত ঠাকুরপো—হি-হি-হি, তুই খোকন-ঠাকুরপো হয়ে গেছিস।

এতগুলো দিন শ্বশুরবাড়ি ছাড়া। এসে পড়েছে তো আর দেরি করে। ফুলবেড়ে আজই যাবে, কালীময় ধরল। ফসল ওঠার সময় জামাই বিনে একলা শাশুড়ি-ঠাকরুন চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। বর্গাদারে পুকুরচুরি করছে।

উমাসুন্দরী বলেন, পথঘাট ভাল না। যাবি তো পড়ে পড়ে ঘুমুলি কেন সন্ধ্যে অবধি?

ভোর থাকতে বেরিয়েছি, ঘুমের কি দোষ মা?

কথা কানে না নিয়ে ম্যাচ-ম্যাচ করে সে বেরিয়ে পড়ল। সংগীও জুটে গেল অম্বিক দত্ত। অম্বিকের আদিবাড়ি ফুলবেড়েয়—জ্ঞাতিভাইরা আছে এবং সামান্য জমাজমি। বৃন্দাবনে এইবার পাঠশালা খোলার মরশুম—ছ-সাত মাসের মতো অম্বিক চাকরিতে বেরুবে তৎপূর্বে জমাজমি সম্পর্কে ভাইদের কিছু বলে যেতে চায়।

সম্মুখে আঁধার রাত্রি, ঘাসবনে আচ্ছন্ন শুঁড়ি-পথ। হেন অবস্থায় হাতে লাঠি চাই, এবং অপর হাতে লণ্ঠন যদি থাকে তো আরও ভাল—সে-বিলাসিতা অবশ্য সকলের ট্যাঁকে কুলোয় না। আর চাই মুখের সশব্দ কথাবার্তা। আজকে মূর্তিমান একটি দোসর রয়েছে। কিন্তু সঙ্গী না থাকলেও একা একা মুখ চালাতে হবে—সাপখোপ সরে যাবে পথ থেকে, ঘাড়ে পা পড়ার সম্ভাবনা কমবে।

কথাবার্তা চলছে। হিরন্ময় বিয়েই আজকের বড় কথা। অম্বিকের অনুযোগ ঃ ভাইয়ের বিয়েয় নিজে গিয়ে ভোজ সেঁটে

এলে, গ্রামের কেউ জানতে পারল না। এক মুঠো ভাত পড়ল না কারো পাতে।

ঘোড়ার ডিম! সেটেছে না আরো কিছু!

কালীময়ের ব্যথাটা ঠিক এইখানে। বিয়ের সব অনুষ্ঠান নিখুঁতে হল, খাওয়ার ব্যাপারে গন্ডগোল। শুরু থেকেই। বর যাচ্ছে বরযাত্রীর দল সঙ্গে নিয়ে—সেই পাথের উপর থেকেই। সবিস্তারে কালীময় বলতে বলতে যাচ্ছে।

গড়িয়াতলি থেকে আড়াই ক্রোশ গিয়ে রেল স্টেশন, ঝঞ্ঝাটের পথ। বরের কিছু নয়—সে তো পালকির মধ্যে গাঁট হয়ে পড়ে আছে। মরতে মরণ বরযাত্রীগুলোর—খানা-খন্দ বন জঙ্গল আর মাঠ ভেঙে চলেছে। বুড়োমানুষ, ছেলেমানুষ জনা দশেক দলের মধ্যে—টিগটিগ করে যাচ্ছে তারা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না—তাদের ফেলে এগোনো যায় না। স্টেশনে এসে দেখা গেল, পয়লা ঘন্টা পড়ে গেছে—পান-টানের উপরে সেখানে কিছু হয়ে উঠল না। এতগুলো নিয়ে গাড়িতে ওঠা, আবার ঝিকরগাছা-ঘাট স্টেশনে দেখে শুনে গনাগনতি করে এদের নামিয়ে নেওয়া—গায়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। ঝিকরগাছা থেকে নৌকা—নৌকোর ব্যবস্থা মেয়ে-ওয়ালাদের মাঝি তাড়াচ্ছে তাড়াতাড়ি উঠে পড়বার জন্য। সন্ধ্যার মুখে বর-বরযাত্রী গ্রামের ঘাটে হাজির করে দেবার কথা, গড়িমসি করলে সেটা সম্ভব হবে না। এমন কি লগ্ন ফসকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ভেবে গিয়েছিল, রেঁধেবেড়ে মজা করে খাওয়া যাবে ঝিকরগাছায়। সেখানকার দোকানে দোকানে ব্যবস্থা আছে, উনুন, রান্নার কাঠ কোন-কিছুর অসুবিধা নেই, বাসনকোসন ভাড়া পাওয়া যায়, বাটনা-বাটা, জল তোলার বাবদে ঝি-ও প্রচুর মেলে। কিন্তু সময়ে কুলচ্ছে কই? অগত্যা কালীময় অন্নপূর্ণা হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলল। বত্রিশজনে খাবে, ফাস্টোকেলাসের খাওয়া দিতে হবে—রেট বাড়িয়ে জন-প্রতি সিকি সিকি, বত্রিশজনে আট টাকা।

বলতে বলতে কালীময় যেন ক্ষেপে যায়। হোটেলের সেই দুর্ভোগ মনে উঠে অন্তরাত্মা জ্বলা করে। নররূপী রাক্ষস পুরো একগন্ডা জুটেছিল তাদের বরযাত্রী-দলে। সেকালের ডাকসাইটে খাইয়ে রঘুবর—রঘুবরকে-রঘুবর যাঁকে বলত, তাঁরই ভাত-ব্যঞ্জনে দৈনিক তিন মণের কাছাকাছি টানেন—তাঁরই সাক্ষাৎ নাতি ঋষিবর যাচ্ছে। এবং ঋষিবরের সাঙ্গোপাঙ্গ আরও তিনটে। কেউ কম যায় না— এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। হোটেলওয়ালার সঙ্গে কথা-বার্তা চলছে—ক্ষিধেয় ওদিকে ঋষিবরদের নাকি মাথা ঘুরতে লেগেছে। চারটে পিঁড়ি পাশাপাশি নিজেরাই ফেলে—অমন কবুতরের চোখের মতন কপোতাক্ষীর জল, তাতে একটা ডুব দিয়ে আসারও সবুর সইল না—পিঁড়িতে বসে হাঁক পাড়তে লেগেছেঃ ভাত নিয়ে এসো ও ঠাকুর—

ঋষিবরের ঠাকুরদাদা রঘুবর। রঘুবরের নামে লোকে আজও ধন্য ধন্য করে। খাওয়া দেখিয়ে নড়ালের জমিদারমশাইদের কাছ থেকে মোটা পারিতোষিক আদায় করেছিলেন তিনি। বাড়ি এসে সেই টাকায় জাঁকিয়ে দুর্গোৎসব করলেন। দেনার দায়ে একবার রঘুবরের দেওয়ানি জেল হল। দেওয়ানি জেলের নিয়ম: থাকে বটে সরকারী জেল-খানায়, কিন্তু খোরাকি-খরচা বাদিকে দিতে হয়। এক আনা করে সাধারণ একবেলার বরাদ্দ। রঘুবর আপত্তি করে জানালেন, এক আনায় কি হবে—নিদেনপক্ষে এক টাকা। সাহেব কালেকটর অবাক হয়ে বললেন, মাত্র দু-বেলায় পারবে এক টাকা খেতে? রঘুবর বললেন, দিয়ে দেখুন। দারোগা নিজে সঙ্গে গেলেন রঘুবরের বাজার করার সময়। চাল কেনা হল পাঁচ সের দু-সের ডাল দুটো রুই মাছ—ওজন সের পাঁচেক করে দাঁড়াবে।

সাহেব খাওয়া দেখতে এসেছেন—কড়মড় করে রুইয়ের মুড়ো চিবানো ভঙ্গি দেখে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে পালালেন। ডিক্রিদার গতিক বুঝে মামলা তুলে নিল—এই পরিমাণ খোরাকি দিয়ে নিজেই যে ফতুর হয়ে যাবে। রঘুবর মুক্ত।

এহেন ঠাকুরদাদার উপযুক্ত নাতি ঝিকরগাছার অন্নপূর্ণা হোটেলে আহারে বসে গেছে। রসুই ঠাকুর ভাত ঢালতেই পাতা খালি। হোটেলের লোকজন কাজকর্ম ফেলে হাঁ করে দেখছে। মালিক যথারীতি ছোট তক্তাপোষে হাত-বকসের সামনে বসে খদ্দেরদের পানের খিলি দেওয়া ও পয়সা-কড়ি গুনে নেওয়ার কাজে ছিলেন। ঝি ছুটে এসে বলল, খাবার ঘরে আসুন একবার কর্তা, দেখে যান।

মালিক বলে, দেখব আবার কি? কেউ কম খায়, কেউ চাট্টি বেশি খায়। পেট ছাড়া তো ঢাকাই-জালা নয়—কত আর খাবে? পেট চুক্তি যখন, দিয়ে যেতে হবে। ওসব নিয়ে বলাবিনে কিছু তোরা, হোটেলের নিন্দে হবে।

ঝি বলল, ঢাকাই-জালাই ঠিক। চারজনে পাশাপাশি বসে পাটাচ্ছে। দেখবার জিনিস—চোখ মেলে একবার দেখে যান, তারপর বলবেন। হাঁড়িতে যে লজনের ভাত—পুরো হাঁড়ি কাবার করে এখনো 'দাও-দাও' করছে।

সর্বনেশে কথা। মালিক ছুটল। ফিরে এসে কালীময়ের কাছে হাতজোড় করে: রক্ষে করুন মশায়। যা হবার হয়েছে—আর কেউ খাবেন না আমার অন্নপূর্ণা হোটেলে। আরও আটাশজন বসলে ব্যবসা গণেশ উলটাবে—ছা-পোষা মানুষ মারা পড়ব একেবারে। ঐ চারজনের পয়সা দিতে হবে না। ভালোয় ভালোয় বিদেয় হয়ে যান। তবু জানব, অপেন্দ্র উপর দিয়ে গেল।

কালীময় বিস্তর বোঝানোর চেষ্টা করে: ঘাবড়াচ্ছেন কেন, সবাই কি আর ঋষিবর? রেট চার আনার জায়গায় না-হয় ছ-আনা হিসাবে দেওয়া যাবে।

কোন প্রস্তাব হোটেলওয়ালা কানে নেবে না। হাত জড়িয়ে ধরেছে, হাত ছেড়ে দিয়ে পা ধরতে যায়। কালীময় অগত্যা অন্য হোটেলের খোঁজে ছুটল। কিন্তু ছোট গঞ্জ ঝিকরগাছা—ভোজনের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে সর্বত্র—চাউর হয়ে গেছে। কোনো হোটেল রাজি—নয়। বিস্তর সময় ক্ষেপ হয়েছে। বাঁধা বাড়া আগে যদিই বা সম্ভব ছিল, এখন আর উপায় নেই। কিছু চিঁড়ে বাতাসা কিনে নৌকোয় উঠে পড়ল, সারা দিনমান ঐ চিঁড়ে চিবিয়ে ও নদীর জল খেয়ে কাটল। সবাই ঋষিবরকে দোষে, এদেরই জন্যে এতগুলো লোক উপোসী হয়ে যাচ্ছে। মুখপাতে কেন ওরা বসতে যায়, উচিত ছিল সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর সর্বশেষে কথা। হোটেল-ওয়ালার তখন আর প্রতিহিংসা নেবার উপায় থাকত না।

সন্ধ্যাবেলা নৌকো গিয়ে পৌঁছল। মেয়ে-ওয়ালারা পাল্কী-বেহারা বাজি-বাজনা মজুত করে রেখেছে। ঘাটে নামতে না নামতেই তোলপাড় পড়ে যায়। বিয়েবাড়ি অমান্য দূরে, দালান-কোঠা নজরে আসছে। কিন্তু টুক করে যে উঠে পড়বে, সেটি হচ্ছে না। সারাটা দিন বলতে গেলে কাঠ-কাঠ উপোস গেছে। খিধেয় নাড়ি পট পট করছে—তাহলেও তল্লাটের মানুষকে দেখানোর জন্য আয়োজন, বাড়ি উঠলেই তো ইতি পড়ে গেল। তিন-তিনটে গ্রাম পুরো-দস্তুর চককোর দেওয়ালে ঘণ্টা তিনেক ধরে ঢোল কাঁশি-সানাই বাজছে, গেঁটে বন্দুক ফুটছে, হাউই বাজি আকাশে তারা কাটছে। নারকেল তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে মশাল বানানো—বরযাত্রী, কন্যাযাত্রীদের হাতে হাতে সেই মশাল। চতুর্দিক একেবারে দিনমান হয়ে গেছে।

কমল এতদিন একলা ছিল। সন্ধ্যার দিকে বড় কাউকে পাওয়া যেত না। মেয়েগুলো বলত, এক ফোঁটা ...—তেঁদের সঙ্গে আবার খেলা। সম-বয়সি ছেলেদের মধ্যেও ভাল ছেলে বলে কমলের বদনাম ছিল। উপর থেকেও নিষেধ—পটলার বাপ একদিন তো ছেলের কান টেনে ঠাই-ঠাই করে চড়: গাছ বাঁদর তোর কিছু হবে না—কিন্তু যার হবে তার ঘাড়ে কি জন্য গিয়ে লাগিস।

পুঁটি আসার সঙ্গে সঙ্গে ঢেল-বদল—চারি সুধি বেউলো ফুল্টি, টুনি আবার সব আসতে লেগেছে—সন্ধ্যার আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসে। মেয়েই প্রায় সব? নিরীহ ছোটছেলে দু-একটা নেওয় যেতে পারে। পদা-জল্লাদ রাখাল ইত্যাদির মতো দুরন্ত ও ধেড়ে ছেলে কদাপি নয়। ধান উঠেছে বলে উঠোন লেপে পুঁছে দেবমন্দিরের মতো করেছে, সিঁদুরটুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

'মাইকেলেঞ্জেলো' স্মারক ডাকটিকিট

ফ্লোরেন্সের অমরশিল্পী মাইকেলেঞ্জেলোর জন্মের পাঁচশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার সম্প্রতি এক নতুন ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন। টিকিটটি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ, কিন্তু আবার প্রতিটি খণ্ড পৃথকভাবেও ব্যবহার করা চলবে। গোটা টিকিটখানির মূল্য দু' টাকা।

মুলকরাজ আনন্দ-এর বিদেশ যাত্রা

স্বনামধন্য লেখক শ্রীমুলকরাজ আনন্দ সম্প্রতি বিদেশ যাত্রা করেছেন। মাসাধিক-কালের জন্য পরিকল্পিত এই সফরে তিনি রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশ ভ্রমণ করবেন এবং ঐসব দেশের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের ৭৬তম জন্মদিন উদযাপন

ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের উদ্যোগে, বহু প্রবীণ ও নবীন লেখক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবীর উপস্থিতিতে সম্প্রতি নাট্যকারের বিবেকানন্দ রোডস্থিত রসভবনে তাঁর ৭৬তম জন্মদিন পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু। সুধী বক্তাগণের সম্বর্ধনার উত্তরে নাট্যকার শ্রীরায় বলেন যে, 'মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি, তাতেই আমি তৃপ্ত। আমার নাট্যসাহিত্যের বিচার করবে মহাকাল।'

পশ্চিমবঙ্গ পি, ই, এন,

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পি ই এন-এর যে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে তা নিম্নরূপ : সভাপতি—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, সহঃ সভাপতিদ্বয়—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীসুশীল রায় ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুধীর বেরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রামপুর লাইব্রেরী

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার লক্ষ্ণৌ-এর রামপুর লাইব্রেরীর পরিচালনভার সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিখ্যাত 'হামিদ মঞ্জিল' ও 'রঙ্গমহল'-এর সঙ্গে আরো কয়েকটি বাড়ি যুক্ত হয়ে রামপুর লাইব্রেরী অচিরেই দেশের একটি প্রধান পাঠাগারে রূপান্তরিত হবে বলে আশা করা যায়।

রাশিয়া ভ্রমণান্তে ভারতীয় লেখকগণ

১৯৭৪ সালের জন্য সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার-বিজয়ী পাঁচজন ভারতীয় লেখক সম্প্রতি পক্ষকালব্যাপী রাশিয়া ভ্রমণের পরে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, হিন্দী কবি ও বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীশিবমঙ্গল সিং (সুমন), উর্দু লেখক জান নিশার আখতার, লছমন ভাটিয়া ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়।

গঙ্গোত্রী জামশেদপুর কবি সম্মেলন

সম্প্রতি বেঙ্গল ক্লাব প্রেক্ষাগৃহে গঙ্গোত্রী পরিষদ জামশেদপুর শাখার উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ কবি সম্মেলন হয়ে গেল। কবি সম্বর্ধনা, কবি পরিচিতি করেন—মৃণাল বসুচৌধুরী। অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন—পূরবী মুখোপাধ্যায়। গঙ্গোত্রীর মূল সম্পাদক শান্তনু দাস এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা ও পূর্বাঞ্চলে কাব্য প্রসারে ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

কবিতা পাঠ করেন—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, তারাপদ রায়, অমিতাভ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, শান্তি সিংহ, কবিরুল ইসলাম, অনন্য রায়, বারীন ঘোষাল, মতি মুখোপাধ্যায় গৌতম গুহ পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী, হরিপদ দে, প্রদীপ রায়চৌধুরী, মৃণাল বসুচৌধুরী ও শান্তনু দাস প্রমুখ পূর্বাঞ্চলের ৪০ জন কবি।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডঃ মাধুরী মুখোপাধ্যায়, অমর লাল, সুদক্ষিণা লাল। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন—তরুণ রায়চৌধুরী।

জয়ৎকারু
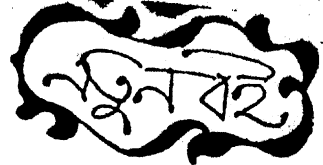
আমার পৃথিবী—প্রাচীন দেবতার অন্বেষণে। এরিক ফন দানিকেন অনুবাদক : অজিত দত্ত। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ ৫৭/সি কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২। কুড়ি টাকা।

এরিক ফন দানিকেনের বাংলায় অনূদিত চতুর্থ গ্রন্থ 'আমার পৃথিবী—প্রাচীন দেবতার অন্বেষণে'।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বহু তথ্য উদাহরণ এবং আলোকচিত্রের সাহায্যে এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে সারা পৃথিবীর প্রাচীন গ্রন্থেও যে সমস্ত দেবযান বিমান বা আকাশরথের উল্লেখ আছে তা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালের অন্য সৌরজগত থেকে আগত

উন্নতপ্রাণীদের মহাকাশযান যে যান ওই সমস্ত প্রাণী ব্যবহার করেছিল বিশ্ব পরিক্রমার কারণে। এই দেবযানের স্মৃতি থেকে রচিত চিত্র আছে তাসিলির গুহায় মায়াদের সমাধি প্রস্তরে সংখ্যাতীত প্রাচীন ছবিতে লিপিতে ও ভাস্কর্যে। আর তার বর্ণনা আছে বিভিন্ন পুরাণে ধর্মগ্রন্থে ও প্রাচীন রচনাদিতে। দানিকেন প্রাচীন পৃথিবী থেকে এমন সব নজির আমাদের উপহার দিয়েছেন যার সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞাননির্ভর পৃথিবীর সাদৃশ্য অভাবনীয়। এসব দিয়ে দানিকেনের প্রমাণের বিষয় হল—আমাদের সমস্ত আবিষ্কার হল নব আবিষ্কার অতি প্রাচীন কোন প্রজ্ঞার নবতর আত্মপ্রকাশ প্রাচীন যুগের বিগত মহাকাশচারীদের ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ।

দানিকেনের চিন্তার এই অভিনবত্ব স্বীকার করেও কিছু কথা বলার থেকে যায়। তাঁর চিন্তায় কিছু কষ্টকল্পনার পরিচয় স্পষ্ট নয়। তথ্য ও চিত্রের ব্যাখ্যাও সবসময় সংশয়াতীত নয়। বেশ কিছু তথ্য অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যাত না হয়ে কল্পনানির্ভর মিস্টিসিজম-এ মোড়কে ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। তথ্যের ব্যাখ্যাগুলি মতবাদ-নিরপেক্ষ বৃহত্তর সিদ্ধান্তের পরিপোষক হতে পারত। লেখক এবং সম্ভবত অনুবাদকও আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর মতবাদে সংশয়ীদের লক্ষ্য করে কিছু ধৈর্যহীন বিরূপতা প্রকাশ করেছেন—যা যুক্তিহীন গোঁড়ামি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছেন যা বৈজ্ঞানিক নয়। এগুলিকে PSEUDO-SCIENCE এর পরিপোষক বলাই বিধেয় যেমন খোরানা বংশজ তথ্যবাহক 'জীন' তৈরী করেছেন (পৃঃ ১১) বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে—'অত্যুচ্চ বেগে আন্তর্নক্ষত্র যাত্রাকালে...... মহাকাশযানের অভ্যন্তরে সময় বয়ে চলে শম্বুক গতিতে' (পৃঃ ২৯)। বিজ্ঞানের এটি একটি সম্ভাব্য কল্পনা প্রমাণিত সত্য নয়; এবং এই মতবাদের বিরুদ্ধ বক্তব্যও যুক্তিসহ অনেক বৈজ্ঞানিক রেখেছেন। লেখক বলেছেন গাছ 'টেলিপ্যাথিক্যালি' মানুষের মনের কথা জেনে কাজ করছে (পৃঃ ৭৯)। এজাতীয় মন্তব্য পাঠককে বিভ্রান্ত করে। অনুবাদ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় এবং শ্রীঅজিত বত্ত যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন এ ব্যাপারে। কিন্তু একথাও ঠিক দানিকেনের এই গ্রন্থের বেশীর ভাগ পূর্বেতন গ্রন্থের বক্তব্যের তথ্যের ও চিত্রের পুনরাবৃত্তি!

ধীরেন্দ্র দত্ত

পূব সাগরের পার হতে (ভ্রমণ)—সবিতা ঘোষ। অ্যালফাবিটা পাবলিকেশনস। ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, তেতলা, কলকাতা—৭০০০১২। দাম বার টাকা।

ভ্রমণকাহিনী হলেও শ্রীমতী সবিতা ঘোষ 'পূর্ব সাগরের পার হতে' বই-এ এক নতুন স্বাদের রচনাশৈলির পরিচয় তুলে ধরেছেন। পুরান দিনের ইতিহাসের সঙ্গে চলমান বর্তমান আর নিতান্ত তুচ্ছ প্রাত্যহিক ঘটনা এসেছে স্বচ্ছন্দে। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল লেখিকা পূর্ব এশিয়ার সেইসব দেশ সম্পর্কে লিখেছেন, যে দেশের কাহিনী আমরা সচরাচর কমই জানবার সুযোগ পাই এবং লেখাও বিশেষ হয় না। ব্যাংকক, থাইল্যান্ড বার্মা তাইওয়ান জাপান কোরিয়া, হংকং, মালয়েশিয়ার যেসব ছবি লেখিকা তুলে ধরেছেন তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। বই-এর মধ্যে অনেক ছবি আছে।

ভারত পথিক রামমোহন ও রাধানগর—কল্যাণ ব্রহ্মচারী। রামমোহন প্রচার সভা। ৬বি রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা—৫। দাম দশ টাকা।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার রাধানগরে ভারত পথিক রাজা রামমোহনের জন্ম। শ্যামল শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে আছে রামমোহন স্মৃতি মন্দির। রাধানগর ও রামমোহনের জীবনকে কেন্দ্র করে বহু মনীষী, কবি, সাহিত্যিক, লেখক সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, ধর্মনেতা যা লিখেছিলেন বর্তমান গ্রন্থকার সেই সব মূল্যবান রচনা সংকলিত করেছেন। গ্রন্থকারের আলোচনা অংশও তথ্যপূর্ণ। অসংখ্য ছবি বইটির মূল্যবান সম্পদ।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

পর্ণপুট—সম্পাদক : সরল দে এবং প্রদীপ ছাজেড়। ৩৫।১ পিয়ারীমোহন মুখার্জি স্ট্রীট। বেলুড়, হাওড়া।

কবিতা লিখেছেন কবিতা সিংহ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অরুণকুমার সরকার শুদ্ধসত্ত্ব বসু শক্তি চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণ ধর বাণিক রায় সুশান্ত বসু এবং আরো অনেকে।

সংলাপ—সম্পাদক সুশীল মিত্র, ২৯৫ সার্কুলার রোড, হাওড়া—২। মূল্য ১ টাকা।

বর্তমান সংখ্যাটি সাহিত্য সংকলনরূপে চিহ্নিত। নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এতে লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, বীরেন্দ্র দত্ত রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রদোষ দত্ত ইত্যাদি।

সারস্বত অর্ঘ্য—সম্পাদক প্রদীপ পাল, ১, কাঁড়রপুকুর লেন, হাওড়া—১।

এ সংখ্যায় লিখেছেন রাম বসু, সাধনা মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কমলেশ সেন, রবীন সুর, আশা দেবী, শংকর মিত্র, ডঃ রমা চৌধুরী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ইত্যাদি।

নবীনা—সম্পাদক অসীমকুমার ঘোষ। কালনা বর্ধমান। মূল্য ৫০ পয়সা।

পত্রিকাটি ছোট হলেও প্রচেষ্টা ভাল লেগেছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন ঝর্ণা ঘোষ, গোপালচন্দ্র ঠাকুর, জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পরিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন দাস, রতন বিশ্বাস ইত্যাদি।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—কোচবিহার ১৩৮১ স্মারক গ্রন্থ। সম্পাদনা বিনয়ভূষণ সেন।

সম্প্রতি কোচবিহারে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের যে অধিবেশন হয় সংখ্যাটি মূলত তারই মুখপত্রস্বরূপ। এ ছাড়া কোচবিহার সম্পর্কে প্রবন্ধ, এবং কিছু কবিতাও স্থান পেয়েছে।

উষালোক—নববর্ষ সংকলন। সম্পাদনা সমরেন্দ্র রায় ও কার্তিক রায়। যোগেন্দ্র ভবন, ইমাম বাজার রোড, হুগলী। মূল্য ৭৫ পয়সা।

এ সংখ্যার লেখকসূচীতে আছেন অমিতাভ গুপ্ত, অনিন্দবরণ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তারাপদ রায় হরপ্রসাদ মিত্র, তুষার চক্রবর্তী ইত্যাদি।

কিংশুক—বসন্ত সংখ্যা, সম্পাদক প্রদীপ পাল, হাওড়া।

৩য় সংকলনের (কাব্য) সূচীতে আছেন মৈত্রেয়ী দেবী, সুধীর করণ, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, রাম বসু, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, জামাল আখতার, সাধন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

শুভ্রজ্যোতি। সম্পাদক সমীর পালচৌধুরী মাকড়দহ, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। মূল্য ৭৫ পয়সা।

ডবল এজেন্ট

বিক্রমাদিত্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বেশ কিছুদিন হোল কায়রোর কাগজগুলো এই লাভার্স লেনের প্রেমের কাজকারবার নিয়ে কঠোর মন্তব্য করছিল। তাই পুলিশের লোক এই লাভার্স লেনের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল।

আজকের এই পুলিশ ভ্যানের ভেতর একজন প্রেস রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার বসেছিলেন। ও'রা ছিলেন কায়রো 'আল মুসাওয়ার' পত্রিকার রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার। পুলিশের সংগে ঘুরে বেড়াবার ব্যাপারে ওদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লাভার্স লেনে কী ধরণের প্রেমের কাজকারবার হয় সেইটে জানা এবং উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা দেখতে পেলে তার ছবি তুলে নেয়া।

পুলিশের গাড়ী এবার ফারুকের গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

আনি বারিয়ার এবং ফারুক তখন প্রেমে মশগুল।

আমি হঠাৎ এবার একটা কান্ড করে বসলুম। আমার কাছে একটি ছোট রিভলবার ছিল। আমি শূন্যে আকাশে গুলি ছুড়লুম। ব্যস পুলিশ এবং ফারুক সজাগ হলেন।

পুলিশ বুঝতে পারলো যে তারা বেশ বড় শিকার ধরতে পেরেছেন। আর ফারুক উপলব্ধি করলেন যে কায়রোর পুলিশ তার পেছু নিয়েছে।

পুলিশের গাড়ী দেখে ফারুক প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সামলে নিলেন। তার গাড়ীর পেছনের সীটে একটি ষ্টেনগান ছিল তিনি এই ষ্টেনগান নিয়ে পুলিশের গাড়ীর দিকে গুলী ছুড়তে লাগলেন।

পুলিশ এবং প্রেস রিপোর্টার হকচাকিয়ে -ল। কী ব্যাপার? এই লাভার্স লেনে পুলিশের গাড়ীর দিকে গুলি ছুঁড়ছে কে? স্পর্ধা তো কম নয়?

হঠাৎ পুলিশের গাড়ীর হেড লাইট রুকের গাড়ীর উপর পড়লো। আনি রিয়ার এবং ফারুক তখন অর্ধনগ্ন। ড়ীর আলো ফারুকের চোখের উপর ড়বার সংগে সংগে তিনিও চিৎকার করে চলেন। গাড়ীর ড্রাইভার বুঝতে পারলো আজ লাভার্স লেনে যিনি গাড়ীতে বসে টি মেয়ের সংগে প্রেম করছেন, তিনি লন মিশর দেশের সম্রাট।

সর্বনাশ!

গুলীর এবং সম্রাটের ভয়ে ড্রাইভার তার ড়ীর কন্ট্রোল হারালো। সামনেই একটা ট গর্ত ছিল। পুলিশের গাড়ী গিয়ে ই গর্তের ভেতর পড়লো।

ফারুক এবার হুংকার দিয়ে পুলিশের ড়ীর কাছে গেলেন। এই মিশর দেশে র এমনি আস্পর্ধা যে সম্রাটকে 'ফলো' র।

গাড়ীর ভেতর থেকে পুলিশ ইন্সপেক্টর রয়ে এলেন। ড্রাইভার অবাশ্য সম্রাটকে তে পেরেছিল, কিন্তু পুলিশ সপেকটর চট করে ঘটনা ঝ উঠতে পরেন নি। তিনি অন্ধ- র এই রাত্রে লাভার্স লেনে একটি গাড়ী খ বুঝে ছিলেন যে একটি বড় শিকার করেছেন। আর ছোট গাড়ী দামী মিজাক যখন, তখন এই শহরের গণ্যমান্য উ হবে। কিন্তু ফারুক যেই এসে তার হ হুমকি দিয়ে দাঁড়ালেন আমনি তিনি য় কুঁকড়ে গেলেন।

ইয়োর ম্যাজেস্টি.......

পুলিশ ইন্সপেকটরের মুখ দিয়ে যেন বেরোয় না।

ফারুক ক্রুদ্ধ বাঘের মত চিৎকার করতে গলেন। তারপর 'আলমুসাওয়ার' সংবাদ- ত্রর ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে ক্যামেরাটি নয়ে নিয়ে সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে দলেন।

এবার আমার বীরত্ব দেখাবার পালা। ম তাড়াতাড়ি দৌড়ে ঘটনাস্থলে এলুম। করে দেখলুম, আনি বারিয়ার গাড়ীতে কাঁপছে। সে অর্ধনগ্ন......

আমি প্রেস রিপোর্টারকে গিয়ে ধাক্কো য় মাটিতে ফেলে দিলুম... আর ফটো- গ্রাফের গায়ে লাথি মারতে লাগলুম।

ফারুক আমাকে দেখে অবাক হয়ে- লন।

কিন্তু আনতানিও পুলি তার বিস্ময় লো: আনি বারিয়ারের খাদদাম-- দাম মানে চাকর।

খাদদাম। আমার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট এই তিনটি শব্দ আবার বেরুল। আমি আনি বারিয়ারের খাদদাম কিংবা চাকর। আমি হলুম স্কারাবে নাইট ক্লাবের ম্যান। আজ আনি বারিয়ারের অনু- রোধে তার সঙ্গে এই লাভার্স লেনে এসে- ছিলুম। এখানে এসে যে এত কান্ড দেখতে পাবো কখনই কল্পনা করিনি।

কিন্তু আজ আমি আন্তানিও পুলির কথার কোন প্রতিবাদ করলুম না। সম্রাটের মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে আছে। বেশী কথা বললে তিনি আরো রেগে যেতে পারেন।

ফারুক আর কোন কথা বললেন না। এবার তিনি আনি বারিয়ারকে নিয়ে আবদীন প্যালেসে চলে গেলেন। না, লুকিয়ে লাভার্স লেনে গাড়ীর ভেতর বসে একটি মেয়ের সংগে তিনি প্রেম করতে চান না।

নাইট ক্লাব গার্ল আনি বারিয়ার সম্রাটের প্রাসাদে ঠাঁই পেলো।

আমারও ভাগ্যের উন্নতি সুরু হোল।

•

সেদিন লাভার্স লেনের কীর্তি কায়রো শহরে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়লো।

দেশের বাদশা যে উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করছেন একথা কারুর অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু লাভার্স লেনের ঘটনায় সঙ্গে দুজন সাং- বাদিক জড়িয়ে ছিলেন। তাই এবার বাজারে সবাই ফারুকের উচ্ছৃংখল জীবন নিয়ে বিশ্রী মন্তব্য করতে লাগলো। আর সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো: আনোয়ার পাশা কে? এতদিন সবাই সম্রাটের খাস, অনুচর, আন্তানিও পুলির কথা শুনেছিল। সবাই জানতো যে আন্তানিও পুলি ফারুককে দুষ্টু পরামর্শ দিচ্ছে......সম্রাটের দেহের খিদে মেটাবার জন্যে বিভিন্ন নাইট ক্লাব থেকে মেয়ে ধরে আনছে।

কিন্তু এবার থেকে সবাই বলতে লাগলো: আর এক শয়তান সম্রাটের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আর এই শয়তানের নাম হল আনোয়ার পাশা।

বাজারের বিশ্রী মন্তব্যের কথা আমিও শুনেছিলাম, কিন্তু এই নোংরা মন্তব্যে আমি কান দিই নি। বরং খুশী হয়েছিলুম।

আমার খুশী হবার অবিশ্যি কারণ ছিল। যদিও প্রকাশ্যে সবাই আমাকে গালমন্দ দিত, তবু গোপনে বিস্তর লোক আমাকে এসে অনুরোধ করতো: আনোয়ার আমার একটা কাজ করে দেবে ভাই। শুনেছি তুমি নাকি রাজার ডান হাত। তুমি যদি একবার ফারুককে আমার কথা বল তাহলে আমার উপকার হবে।

এই বলে তারা তাদের নিবেদন আবেদন বক্তব্য আমার কাছে পেশ করত। সবারই একটা না একটা কিছু চাই। কেউ চায় পদোন্নতি, কেউ চাকুরী। এমনি ধরনের বিভিন্ন আর্জি আমাকে প্রতিদিন শুনতে হতো।

আমি অবিশ্যি এইসব আর্জি শোনবার আগে প্রত্যেকের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা আদায় করতুম। কাউকে বলতুম, এত অল্প টাকায় আপনার এই কাজ করতে পারবো না। কাউকে বলতুম, আপনার কাজটা বেশ সিরিয়াস। আর একটু বেশী টাকার দরকার।

এমনি করে আমি বিস্তর লোকের কাছ থেকে গোপনে টাকা আদায় করতে লাগলুম।

আমার এই গোপন ব্যবসার কথা অনেকেই জানতে পারলো। আনি বারিয়ারও টের পেলো আমি কাজ করে দেবার ছুতো দিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করছি।

আনি বারিয়ার সুন্দরী ছিল বটে কিন্তু বুদ্ধিমতী ছিল না।

আমাকে ডেকে বলল: পাশা, বাজারের লোকগুলো তোমাকে নিয়ে কী কথা বলছে জানো?

আমি বাজারের গুজব ও মন্তব্যের কথা জানতুম। তাই কথা গোপন করবার চেষ্টা করলুম না। একটু হেসে বললুম: ইয়েস ম্যাম......আমি জানি বাজারের লোক কে কি বলছে। ওরা আমার নিন্দে করছে। ওরা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে। আমার নিন্দে তো করবেই। সবাই জানে যে আপনি আমাকে স্নেহ করেন।

আমার কথা শুনে আনি বারিয়ারের মন ভিজলো। হেসে জবাব দিল: যা বলেছ পাশা। তোমাকে আমার ভারী ভালো লাগে। আর আমি যে তোমাকে পছন্দ করি আনতানিও পুলি তা একদম পছন্দ করে না। ওর মনেও ভারী হিংসে......

আমি এবার একটু সাহস করে বললুম: ম্যাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

আনি চোখ তুলে আমার পানে তাকালো। মিষ্টি চোখ ......

কী?

ফারুক আপনাকে ভালোবাসেন?

আমার প্রশ্ন শুনে আনি হেসে উঠলো: বলল: তোমার কথা শুনে আমার ভারী হাসি পাচ্ছে। অতবড় একটা কুমীর কী কাউকে ভালবাসতে পারে? তবে লোকটার একটা মস্ত বড় গুণ আছে। প্রেম করবার সময় সে আমাকে অনেক জিনিসপত্র উপহার দিয়েছে। আর ফারুক কি করে জানো? প্রেম করবার সময় বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। নাম জিজ্ঞেস করবার সময় স্প্যানিস ভাষায় জিজ্ঞেস করে: উস্তাদ আবল্য এ[illegible] দে ণ ......চুমু খাবার সময় ফরাসী ভাষায় বলে শেরী...আর ব্রাসিয়ারের বোতাম খুলবার সময় জর্মান ভাষায় বলে মাইনে লাইবে ইস লাইবে দিস...তারপর প্রেমটা যখন জমে ওঠে তখন ওর মুখ দিয়ে আরবী ভাষায় বেরোয় ......হাবিবী ......আলবী আনা, আহিবক ......গিদদং......ইথতির......এই দেখ না কাল প্রেম করবার সময় আমাকে কী জিনিস প্রেজেন্ট দিয়েছেন।

এই বলে আনি আমাকে একটি ডায়মন্ডের নেকলেস দেখালো।

আমার এই নেকলেস ছড়া দেখে চোখ দুটো চক চক করে উঠলো। আমি এই নেকলেস সেটের দাম জানতুম। কারণ পরশু দিন আমি নিজে গিয়ে সারিরা সুলেমান পাশার একটি জুয়েলারী দোকান থেকে এই নেকলেস সেট কিনে এনেছিলুম। দোকানী আমাকে বলেছিল যে এই নেকলেস সেটের দাম কুড়ি হাজার পাউন্ড। প্রত্যেকটি ডায়মন্ড অসম্ভব দামী......

আজ এই ডায়মন্ড সেট আনি বারিয়ারের কাছে দেখে আমার প্রচণ্ড লোভ হোল।

কোন প্রকারে যদি এই নেকলেস সেট আনি বারিয়ারের কাছ থেকে আদায় করতে পারি তাহলে পনের হাজার পাউন্ডে আমি এই সেট বাজারে বিক্রী করতে পারবো।

পনের হাজার পাউন্ড অনেকগুলো টাকা।

আমি জানতুম যে নেকলেস সেট জোগাড় করতে ফারুকের কম বেগ পেতে হয় নি।

প্রতি শুক্রবার রাতে ফারুক আনি বারিয়ারের সংগে প্রেম করতে আসতেন। আর প্রতিবার দেখা করবার সময় তিনি বেশ দামী কিছু প্রেজেন্ট আনতেন। নিশ্চয় গতকাল এই দামী নেকলেস সেট আনি বারিয়ারকে দিয়েছেন।

গতকাল ছিল শুক্রবার ইয়োম ইল গমোহ্ ......জুম্মাবার। কায়রো শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফারুকের আনি বারিয়ারের কথা মনে পড়লো। আজ তার আনি বারিয়ারের সংগে দেখা করতে হবে।

আনি বারিয়ারের জন্যে তিনি কি জিনিস প্রেজেন্ট নিতে পারেন।

হঠাৎ তার মনে পড়লো যে আনি তার কাছে ডায়মণ্ডের নেকলেস চেয়েছিল। হাঁ, আনিকে তিনি এমনি একটি নেকলেস দেবেন যা দেখলে আনির চোখ ঝলসে যাবে।

এমনি ধরনের নেকলেসের সেট কোথায় পাওয়া যায়?

কায়রোর ফ্যাসনেবল এলাকা হলো সারিয়া সুলেমান পাশা। ঐ তল্লাটে বিস্তর জুয়েলারের দোকান আছে।

ফারুক আনতানিও পুলিকে তলব করলেন।

আমার একটি ভালো ডায়মন্ডের নেকলেস সেট চাই। দামের জন্যে চিন্তা কোরো না।

আনতানিও পুলি চিন্তায় পড়লেন। আজ শুক্রবার শহরের দোকানপাট বন্ধ। কিন্তু ফারুকের মুখ থেকে যখন একবার হুকুম বেরিয়েছে তখন সে হুকুম তাকে পালন করতেই হবে।

আনতানিও পুলি আমাকে ডেকে পাঠালেন।

পাশা, সারিয়া সুলেমান পাশায় মেট্রো সিনেমার পাশে একটি জুয়েলারী দোকান আছে। দোকানীর নাম জ্যাকব রবীন। লোকটা ইহুদী। ঐ দোকান থেকে সব চাইতে ভালো ডায়মন্ডের নেকলেস নিয়ে আসবে।

আমি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম। বললুম : ইম্পসিবল। আপনি বলছেন কী? আজ শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ।

জ্যাকব রবীনের বাড়ীতে আমি পুলিশ পাঠাচ্ছি। পুলিশ জ্যাকবকে ধরে নিয়ে আসবে। তুমি এক্ষুনি সারিয়া সুলেমান পাশাতে চলে যাও। ওর দোকান থেকে নেকলেস সেট নিয়ে এসো।

আমি জ্যাকব রবীনের দোকানে গেলুম। পুলিশ তাকে ধরে এনেছিল। বেচারা ভয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপছিল। একে ইহুদী, তারপরে আবার ফারুকের হুকুম। হোক না আজ শুক্রবার। রাজার বান্ধবী ডায়মন্ডের নেকলেস চেয়েছেন। আর সেই নেকলেস দেবার জন্যে দোকান খোলা চাই।

আমি যথাসময়ে এই নেকলেস আ তানিও পুলির হাতে তুলে দিয়েছিলুম।

এইখানে বলে রাখা দরকার যে আ তানিও পুলি এই নেকলেসের দাম বা কুড়ি হাজার পাউন্ড জ্যাকব রবীনকে দে নি।

এই খবর আমি পরে জানতে পে ছিলুম। কী করে জানতে পারলুম এ সেই কথা বলা দরকার।

আজ আনি বারিয়ারের হাতে এই ডায়মণ্ডের নেকলেস সেট দেখে আমার চোখ দুটো বেশ বড় হোলো।

আমি নিজের হাতে এই নেকলেস কিনে এনেছিলুম, কিন্তু আজ কিনা এই হার আনি বারিয়ারের গলায় ঝুলছে। আমি মনে মনে ঠিক করলুম, এই হার আমাকে বাগাতেই হবে।

আমার মনের কথা আনি বারিয়ারকে বুঝতে দিলুম না। শুধু একটু মিষ্টি হেসে বললুম : হারটা কিন্তু আসল নয়। ঐ ডায়মণ্ডগুলোও নকল।

আমার কথা শুনে আনি বারিয়ার রেগে উঠলেন। আমি বলছি কি? নকল ডায়মণ্ড! ইমপসিবল! স্বয়ং ফারুক নিজে হাতে তার গলায় এই নেকলেস পরিয়ে দিয়েছেন। তিনি কি নকল ডায়মণ্ডের নেকলেস তার বান্ধবীকে দিতে পারেন? অসম্ভব।

আনি বারিয়ার আমার কথার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল।

আমি বললুম : তোমার ঐ ডায়মণ্ড নেকলেস দেখে খুব লোভ হচ্ছে। তাই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছো না। হ্যাঁ, ওটা নকল ডায়মণ্ডের। এ খবর শুধু আমি জানি, আর কেউ নয়। কারণ আমি নিজের হাতে ঐ নেকলেসটি জ্যাকব রবীনের সারিয়া সোলেমান পাশার দোকান থেকে কিনেছি। বিশ্বাস না হয় তুমি চল আমার সঙ্গে জ্যাকব রবীনের কাছে। আমাকে এই নকল ডায়মণ্ডের নেকলেসটি দিয়ে জ্যাকব রবীন বলল : পাশা খবরদার আমি যে জাল মাল দিচ্ছি এই খবর কিন্তু সম্রাটকে দিও না। এর জন্যে অবিশ্যি জ্যাকব রবীন আমাকে মোটা বখশিস দিয়েছিল।

এই রকম ধরণের দুচারটে কথা আমি বললুম। আনি বারিয়ার আমার কথা বিশ্বাস করল।

তাহলে এই জাল ডায়মণ্ডের হার নিয়ে আমি কী করবো পাশা?

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। আর মুখের এমন ভাব করলুম যে তার কথা ভাবছি। কিন্তু আমার আসল মন কী করে ঐ দামী হারটি বাগাবো।

একটা ফন্দী আমার মাথায় এসেছে।

কী? বেশ শান্ত কণ্ঠে আনি বারিয়ার আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

এই নকল হারটি তুমি জ্যাকব রবীনের কাছে বিক্রী করে দাও। আমার মনে হয় হারের জন্যে আমি বেশ ভালো টাকা ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারবো।

আনি বারিয়ার হয়তো আমার কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেল। কিংবা ভাবল হারটি বিক্রী করে ফারুককে বলবেন : হায় হায় হারিয়ে গেছে। আর একটি চাই।

আমি এবার হার নিয়ে আবার জ্যাকব রবীনের দোকানে গেলুম।

আমার কাছে ঐ ডায়মণ্ডের হার দেখে জ্যাকব রবীন বিস্মিত হোলো।

কী ব্যাপার? ঐ হার বুঝি সম্রাটের পছন্দ হয় নি?

জ্যাকব রবীনের এই প্রশ্নের ভেতর চিন্তার সুর ছিল।

না না এ হার তো ফারুক তাঁর নিজের গলায় পরবেন না। এই হার কেনা হয়েছিল সম্রাটের বান্ধবীর জন্যে।

সম্রাটের বান্ধবী! জ্যাকব রবীন আমার কথাটি আবার পুনরুচ্চারণ করলো।

আনি বারিয়ার, উনি হলেন ফারুকের বর্তমান বান্ধবী। বাজারে তো সবাই এ কথা জানে।

আমি জানতুম সেই রাত্রে আলমাজার ঘটনা বাজারে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। সাংবাদিক মহলে এই নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা কেউ ছাপতে সাহস করেনি।

আমার কথা শুনে জ্যাকব রবীন হাসলো। তারপর জিজ্ঞেস করল বল তুমি কি চাও?

টাকা।

টাকা? তুমি কি হারটি বিক্রী করতে চাও? জ্যাকব রবীন যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না।

দ্যাটস রাইট : তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ। আনি বারিয়ারের টাকার দরকার। তিনি ঐ হার বিক্রী করে কিছু ক্যাশ টাকা চান।

জ্যাকব রবীন আপত্তি করল না। বরং সানন্দে ড্রয়ার খুলে আমার হাতে পনের হাজার পাউণ্ড দিল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : হোয়াট ইমপসিবল : এই হারের দাম ছিল কুড়ি হাজার পাউণ্ড। আর তুমি আমাকে দিচ্ছ পনের হাজার পাউণ্ড। বাকী টাকা কোথায় গেল?

জ্যাকব রবীন আমার কথা শুনে হাসলো, ব্যবসায়ীর হাসি। বলল : পাশা তোমাকে একটা কথা আদৌ বলিনি। আমি সম্রাটের কাছ থেকে আজ অবধি ঐ হারের দাম পাইনি।

হোয়াট। ননসেন্স। আমি জানি ফারুক ঐ টাকা আনতানিও পুলিকে দিয়েছেন। আমার সামনে ঐ টাকা দেয়া হয়েছে।

আবার শুকনো হাসি হাসলো জ্যাকব রবীন। বলল : তাহলে এই টাকা কোথায় গেছে তুমি বুঝতে পারছো। আনতানিও পুলি এই টাকা মেরে দিয়েছে। না পাশা তুমি ঐ পনের হাজার পাউণ্ড নিয়ে চলে যাও। এর চাইতে আর এক পয়সাও বেশী তুমি পাবে না।

আমি আর কথা বাড়ালুম না। কারণ আমার মনে মনে একটা ভয় ছিল। যদি সম্রাট কিংবা আনতানিও পুলি জানতে পারেন যে আমি গোপনে সম্রাটের বান্ধবীর হার বিক্রী করছি তাহলে আমার বিপদ হবে।

আমি পনের হাজার পাউণ্ড নিয়ে ফিরে এলুম।

এই টাকা থেকে মাত্র দুই হাজার পাউণ্ড আনি বারিয়ারকে দিলুম। আনি বারিয়ার এই সামান্য টাকা পেয়েও খুশী হোল।

হাজার হোক পয়সা দিয়ে তো আর ঐ হার কিনতে হয়নি।

•

কিছুদিন পরে সম্রাটের আর একটি নতুন বান্ধবী জুটলো।

এই বান্ধবীর নাম লিলি কোহেন।

কিন্তু লিলি কোহেন তার নাম পাল্টে নতুন নাম রাখল নাদিয়া সুলেতান।

আমি নতুন মনিব যোগাড় করলুম। বুঝতে পেরেছিলুম যে আনি বারিয়ারের মোসাহেবী তাবেদারী করে কোন লাভ হবে না। তাই আমি এসে নাদিয়া সুলতানের দলে যোগ দিলুম।

নাদিয়া সুলতানের রূপের বর্ণনা দিয়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত করবো না। কারণ আরব মেয়েদের সৌন্দর্যের পুরো বিবরণ দিলে আপনারা বলবেন : পাশা তুমি হলে সেকস ম্যানিয়াক।

কিন্তু তবু ছোট একটি কথা বলবো যে নাদিয়া সুলতানকে দেখলে চোখ ঝলসে যাবে।

সম্রাট ফারুকেরও হয়েছিল। তিনি নাদিয়া সুলতানের প্রেমে পড়লেন। কিন্তু ফারুক একবারও জানবার চেষ্টা করলেন না সে এই নাদিয়া সুলতান কে? তার আসল পরিচয় কী।

তার নাম যে লিলি কোহেন এবং সে যে জাতে ইহুদী একথাও তার কাছে একেবারে অজানা রইল।

কিন্তু নাদিয়া সুলতানের আসল পরিচয় আমি জানতুম। কারণ আমিই নাদিয়া সুলতানকে ফারুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম। আর এই নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কায়রোর বিখ্যাত নাইট ক্লাব 'অবারজ দা পিরামিড'।

কয়েকটা ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আমার অ্যানি বারিয়ারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। কারণ ডায়মণ্ডের নেকলেস বিক্রীর পর আনি বারিয়ার আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। কে তাকে বলেছিল যে আমি নাকি ওর কাছে মিথ্যে কথা বলেছি। আসল ডায়মণ্ডের নেকলেসকে জাল বলে বাজারে বিক্রী করেছি। তার মোটা টাকা আমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছি।

আমি আনি বারিয়ারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলুম। স্কারাবে নাইট ক্লাবে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে অবারজ দা পিরামিড নাইট ক্লাবে যোগ দিলুম। আর অবারজ দা পিরামিড নাইট ক্লাবের কর্তারা যেই জানতে পারলেন যে আমি হলুম সম্রাট ফারুকের মোসাহেব অমনি আমার আদর যত্ন বেড়ে গেল।

এইখানে আমার লিলি কোহেনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোল।

(ক্রমশঃ)

সুরের আগুন

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে গানের ভেতর ঢুকতে হবে, কথার মানে তলিয়ে বুঝতে হবে, রাগ-রাগিণীর জ্ঞানও থাকা দরকার। রবীন্দ্র সাহিত্যে, ব্যক্তিত্ব ও পট ভূমিকা অনেক কিছু জড়িয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীত।

মায়া সেন

মায়া সেনকে দেখেছিলাম—'মায়া সেন' রূপে চেনবার অনেক আগেই। দেখেছি কোনো শিল্পী হয়ত কোনো ফাংশনে গাইবেন অথবা গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করবেন। সঙ্গে নেই হার্মোনিয়ম বাজাবার অথবা তানপুরা ছাড়বার কেউ। তাইত! উপায়? শিল্পী যখন চোখে অন্ধকার দেখে প্রায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম ঠিক সেই সময় অকূলে কাণ্ডারীর মত আবির্ভূতা হলেন সদাপ্রসন্না, অপরের সুযোগ সুবিধার প্রতি সদা-সজাগ এক মহিলা, যাকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে অসহায় শিল্পী আবার মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে বসেন। কোনো উৎসবে হয়ত নির্ধারিত শিল্পী অনুপস্থিত। 'কি হবে?' উদ্যোক্তারা চিন্তাকুল। সেখানেও হাল ধরে শংকাসাগর পাড়ি দিতে দেখেছি ঐ একই নিরভিমানী মহিলাকে।

পরে জেনেছি ইনিই মায়া সেন। রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষিকা, রবীন্দ্রভারতী এবং আরও অনেক সংগীত প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপিকা, গ্রামাফোন কোম্পানীর ট্রেনার, বহু রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের সংগীত পরিচালিকা বার গায়িকাও। রেকর্ড, রেডিও এবং বহু সংগীতাসরেও এঁর গান শুনেছি। তারিফ করেছি এঁর গাওয়া 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনীর'। তবু মনে হয়েছে আপন শিল্পী খ্যাতি অর্জনের জন্য ইনি ততখানি ব্যস্ত নন, যতখানি আগ্রহী তরুণতর শিল্পীদের শিল্পীসত্তা উন্মোচনে তথা সহায়কতার কাজে।

সেদিন আমার অতি ছোট্ট এলোমেলো বৈঠকখানায় মূর্তিমতী শ্রীমণ্ডিতার মতই এসে দাঁড়ালেন শ্রীমতী মায়া সেন। সঙ্গে ওঁর ফ্রেন্ড, ফিলসফার এ্যান্ড গাইড ত্রিদিব সেন একটি সন্ধ্যা যাপনের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

সেইদিনই নানান আলোচনায় জানলাম ওঁর শিক্ষার বিস্তৃত পট-ভূমিকা। গানের প্রতি সহজাত অনুরাগ ও প্রবণতা নিয়ে উনি জন্মেছিলেন ঢাকার (অধুনা বাংলাদেশ) এক সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ পরিবারে। বিপ্লবী শহীদ দীনেশ গুপ্ত এঁর কাকা—ওঁর নামে এঁদের বাড়ির রাস্তার নাম

হয়েছে দীনেশ গুপ্ত রোড। মা গান গাইতেন খ্যাতির জন নয়, গানের প্রতি ভালোবাসার জন্যই। মার এই গুণ মেয়েতে বর্তেছে তাঁরই শিক্ষা ও তাগিদে। মারই ইচ্ছেয় ছোট্ট মায়া নিতাইগোপাল বর্মণের কাছে গীত, ভজন ও গজল এবং পরেশ সেনের কাছে সেতার শিখতে শুরু করেন।

কিন্তু বাবার ইচ্ছে মেয়ে আমার বিদুষী হবে। অতএব স্কুলের পড়া শেষ করে কোলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হতে হয়। সেখানে কিন্তু তার পড়ার চেয়েও বেশী ভালো লাগতো শান্তিনিকেতনের মেয়ে সহপাঠিনী চালিহার কাছে শান্তিনিকেতনের গান, ফুল, আকাশ ও রাবীন্দ্রিক পরিবেশের গল্প শুনতে আর কলেজ ফাংশনে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের গান ও অভিনয়ে যোগ দিতে। সুচিত্রা মিত্র তখন ও'র হিরোইন।

এই শান্তিনিকেতনপিয়াসী মনের তাগিদেই হঠাৎ একদিন ধাঁ করে হাজির হলেন শান্তিনিকেতনে। সেটা হোলো ১৯৪৯ সাল।

ওখানে ভর্তি হবার জন্য ইন্টারভ্যু দিলাম। গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দেখলাম এক সুদর্শনা মহিলা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। শুধুই কি সুন্দরী? কি লাবণ্য তাঁর চাউনী কথা ও ভঙ্গিতে। কেউ ডাকছে 'মোহর' কেউ ডাকছে 'মোহরদি'। পরে শুনলাম ইনিই গুরুদেবের পরম আদরের 'কণিকা'। দেখে মনে হোলো ধন্য হলাম। কেবলই চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিলো। এক লহমায় যেন ২৬ বছর আগে ফিরে গেলেন শিল্পী।

'ওখানে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে একাধারে সেতার এস্রাজ খেয়াল রবীন্দ্রসংগীত সবই শিখলাম। প্রথম দু' বছর শিখেছি মোহরদির কাছে। থার্ড ইয়ার থেকে শৈলজাদা। বিদ্যাভবনে শান্তিদা বিবিদি। এ'দের সবার শিক্ষাই আমার গায়নশৈলী গড়ে তুলেছে। তবে ট্রেনার হিসেবে শৈলজাদার তুলনা হয় না। শিক্ষকতার কাজে আমার যে দক্ষতার কথা তুমি প্রায়ই বলে থাক তার মূলে আছে শৈলজা'দার শিক্ষাপদ্ধতি।'

আপনার আওয়াজ গায়নশৈলী ও এক্সপ্রেশনের সঙ্গে সুচিত্রাদির দারুণ মিল। এবারই রবীন্দ্র জয়ন্তীর রেকর্ডে আপনার গাওয়া 'সন্ধ্যা হোলো গো ওমা'—শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো সুচিত্রাদি গাইছেন। আবার 'সন্ধ্যা হোলো গো'র পর 'ওমা'-তে আসবার আগে—স্বল্প যতি মীড় লাগাবার ভঙ্গি শুনে মনে হয় যন্ত্রসংগীতেও বোধহয় আপনার দখল আছে।'

'দুটি অনুমানের কোনোটিই ভুল নয়। সুচিত্রাদি ছোটোবেলা থেকেই আমার হিরোইন সে ত আগেই বলেছি। ও'র স্পষ্ট সুরী জড়তাহীন প্রকাশভঙ্গি আমায় আকৃষ্ট করে। আর যন্ত্রসংগীত? হ্যাঁ অশেষদার কাছে এস্রাজ শিখতাম। উনি গতই শুধু লিখে দিতেন। আর প্রতিটি রাগের সঙ্গে তার কাছাকাছি রাগগুলির তফাৎ এবং মিল দুটিই দেখিয়ে দিতেন। তারপর প্রতিটি রাগের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে নিজে নিজেই তান বিস্তার তৈরী করে এক্সটেম্পো বাজাতে হোতো।'

'বাঃ। এ রকম শিক্ষা রাগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা মৌলিক সৃষ্টিশীলতাও গড়ে ওঠার খুব সহায়ক।'

'সত্যিই তাই। এ শিক্ষা না থাকলে পরে যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলাম কোন রাগ তাঁর কোন গানকে কিভাবে স্পর্শ করে গেছে তাঁর বর্ষার গানে মল্লারের কোমল গান্ধারের চাপা সুর অন্তরপ্রবাহী গুঞ্জন হয়ে উঠে অবিকল বারিঝরার আবেশ সৃষ্টি করেছে—এ রহস্য অজানাই থেকে যেতো।

মায়া সেন শুধু নামী শিল্পীই নন—সব দিক দিয়েই যাকে বলে 'ব্রিলিয়ান্ট' তাই। শান্তিনিকেতনের পরীক্ষায় এস্রাজ খেয়াল রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রথম হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। এবং স্কলারশিপও পেয়েছেন।

বাবার সঙ্গে বেনারসে থাকবার সময় ডাগর ব্রাদার্সের কাছে ধ্রুপদ শিখেছেন—ভয়েস থ্রোয়িং-এর টেকনিকও এ'দেরই শিক্ষা।

এরই মধ্যে শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হোলো। প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার প্রবোধ বাগচী। গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে এম-এ পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং থিসিস লেখাও চলত এবং এই অমানুষিক পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার যোগফল আজকের মায়া সেন যিনি শুধু শিল্পীই নন—সঙ্গীত শিক্ষকারূপেও শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতমা। আর শেষেরটির প্রতিই ও'র আগ্রহ বেশী। কেন? তার মূলে আছে পরিশীলিত সংস্কৃতিসমৃদ্ধ চিত্তের নির্মম আত্মবিশ্লেষণের তাগিদ। সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হবার পর শিল্পীর জীবন মোড় নিলো শিক্ষকতার দিকে। একাডেমী অফ ডান্স ড্রামা ও মিউজিককে রবীন্দ্রসংগীত শেখবার দায়িত্ব এলো।

'এই সময়েই রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে। রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি থেকে বিরাট করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব হয়েছিলো তারই প্রভাতী আসরে সুন্দর পরিবেশে আমার প্রথম গান করা যেন প্রথম ফুলের প্রসাদ পাওয়া। এই প্রসঙ্গেই বলি ওখানে বনানী আমার প্রথম ছাত্রী।'

'উঃ—আবার সেই মাষ্টারী প্রসঙ্গ। এ আর আপনি ভুলতে পারছেন না—আমি কিন্তু আপনার শিল্পীজীবন সম্বন্ধেও আগ্রহী।'

'আমি নিজেকে শিল্পী বলে মনেই করি না—কাজেই 'শিল্পী-জীবন' কথাটা আমার ক্ষেত্রে মানায় না। —বলতে পার কর্মক্ষেত্র গড়ে ওঠার জীবন।'

'তাই সই।'

'রেডিওতে গাইতে সুরু করি অনেক পরে। রেকর্ড করবার ইচ্ছে থাকলেও কাউকে বলতে বড় সংকোচ হোতো। অবশেষে সুচিত্রাদিই আমায় সর্বপ্রথম হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করতে নিয়ে যান। প্রথম রেকর্ডের গান দুটি হোলো 'প্রেম এসেছিলো' ও 'দিয়ে গেনু'। দুটি গানই হিট করেছিলো। এখান থেকেই সন্তোষদা (সন্তোষ সেনগুপ্ত) আমায় গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনার করে নিয়ে যান—'

'উঃ কমুনী নেহী ছোড়তা। ঘুরে ফিরে সেই ট্রেনার হওয়ার কাহিনী—'

'কি করব? আমার জীবনে ঐটেই যে প্রধান?' মায়া সেন হেসে বলেন।

'তবু বলুন সিন্ধুপ্রমাণ শিক্ষকতার জীবনে অন্ততঃ বিন্দুপ্রমাণ শিল্পী হওয়ার খবর।'

'আমার গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ডের গান 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী' ও 'আমার হৃদয়ের কথা।'

'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী' গানটি দারুণভাবে এ্যাপ্রিশিয়েটেড হয়েছিলো। তার একটি কারণ আপনার আগে যে কজনের কাছে গানটি শুনেছি সবাই তালবিহীনভাবে গেয়েছেন। আপনি সসংগতে গাওয়ার গানটিতে ভারী সুন্দর একটি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়—'

'তোমার কথার শেষের অংশ কতটা সত্যি জানি না। কারণ ওটা তোমাদের বিচার্য। কিন্তু প্রথমাংশ একেবারে নির্ভেজাল সত্যি। 'বসন্তী হে ভুবনমোহিনী' তালে গাওয়া হয় না। কিন্তু দাক্ষিণ ভারতীয় যে গানের সুর নিয়ে গুরুদেব এ-গান রচনা করেছেন, দেখলাম সেই 'মীনাক্ষী মে মুদম' গানটি আগাগোড়া তালেই নিবদ্ধ। তারপর, স্বরলিপিটিতেও দেখলাম গানটি তে সেই ভাগ করা আছে।

সেই দেখে প্রথমে খানিকটা এক্সপেরিমেন্ট হিসেবেই তালে গাইতে শুরু করলাম। আর প্রায় একটা নতুন দেশ আবিষ্কারের মতই মনে রোমাঞ্চ জেগেছিলো যখন দেখলাম এইভাবে গাইতে শুধু আমারই ভালো লাগছে না, যাঁরা শুনছেন তাঁদেরও শুনতে ভালো লাগছে। এই রেকর্ডটাই অন্যদিকে ছুঁয়ে কেন এগিয়ে ভালর দিকে, তারপরেও রেকর্ড কেউ কারো মন থেকে না ও 'কেন্দ্রে চাঁদ ফিরে'। পরে বছর তিন বিস্ময় লাগে ও 'দেখো সখা ভুল করে' দারুণ হিট সং হয়েছিলো। এবারের চৌদ্দটি গানের মধ্যে 'ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে', 'প্রাণের ভেলা বেলা অবেলায়' ইতিমধ্যেই সব অ সাদে অনুরোধের তালিকায় 'অবশ্য' গান হয়ে উঠেছে।

এছাড়াও গ্রামোফোন কোম্পানীতে 'শাপমোচন' থেকে শুরু করে প্রতিটি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যে সহকারী সংগীত-পরিচালিকারূপে সন্তোষদার সঙ্গে কাজ করে আসছি।'

'শিল্পীজীবনের চেয়ে শিক্ষকতার প্রতি আপনার এত আকর্ষণই বা কেন?'

'ঠিক এই সময়টা রবীন্দ্রসংগীতের স্বর্ণযুগ। মোহরদি, সুচিত্রাদি, জর্জদা, হেমন্তদা, সুবিনয়দা, অশোকবাবু ও

আছেনই—তাঁদের পরের যুগের তরুণ শিল্পীদেরও একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যাঁরা ওঁদের সমমানের শিল্পী না হলেও, মোটামুটি ভাল মানেরই। রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীর অভাব নেই। তাই শিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এটুকু বুঝি যে শিল্পী হিসেবে এঁদের চেয়ে বড় কিছু বা নতুন কিছু আমার দেবার নেই। কখনও কোনো গান কোনো বিশেষ আবেগে বা পরিবেশে একটা ইমপ্যাক্ট সৃষ্টি হয়ত করে। এরকম মুহূর্ত ত সব শিল্পীর জীবনেই অল্পবিস্তর আসে। সে দরজা ত খোলা রইলই। কিন্তু যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য আজ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে অনাহত রাখতে হলে ভাল ট্রেনারের বড় দরকার। এইটের অভাব দেখেছি বলেই ইচ্ছে করে এই দিকটিতে আত্মনিয়োগ করি।

'শিল্পীরা সবাই ব্যস্ত। ঠিক যতখানি সময় চিন্তা ও পরিশ্রম দিয়ে ভালো ছাত্র-ছাত্রী তৈরী করা যায়, এ-কাজে নিজেদের অতটা কেন্দ্রীভূত করাটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ সুকণ্ঠ ও প্রতিভার অভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেই। কিন্তু যথার্থ পথে পরিচালিত করে এঁদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে কে? আমিই যে পারব তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?'

'নীলিমাদি একটা কথা বড় ভালো বলেছেন—এখনকার রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনায় পিওরিটি বনাম পপুলারিটি—এই দুটি ধারা চলেছে যেন পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে। এখানে যেন ফারাকটা না হয়। পিওরিটি এবং পপুলারিটির তারতম্য বিচারে কথাটি বলেছেন। এ দুটি বস্তুর মিলন কি সম্ভব নয়?'

'পিওরিটি বজায় রেখে গানকে পপুলার করতে সময় লাগে। কিন্তু কিভাবে করা যায় ধৈর্য ধরে সেটারই পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে হয়। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে পিওরিটি জিনিসটা কি? ধরলাম, নোটেশনের শুদ্ধতা' আর্টিস্টিক সবকিছু মিলিয়েই শুদ্ধতা বা পিওরিটি। এসব বজায় রেখে একসঙ্গে শোনানো দেওয়া কঠিন আবার সহজও। অনেক সময় অত্যন্ত কাজের জিনিসও সামান্য ভেবে আমরা অবহেলা করি অথচ এই "সামান্য" তারতম্যে যে গানের চেহারা কিভাবে বদলে যায়! অনেক সময় দেখেছি অনেক শিল্পী বুঝতে পারেন না, কোন গান কোন লয়ে ধরতে হবে—কোনখানটায় জোর দেওয়া উচিত—কোনখানে ভল্যুম কমানো অথবা বাড়ানো উচিত। তার ফলে অনেক সুন্দর গানেরও আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন ধর 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল কতদিনের রাত' গানটি। প্রথম থেকে শেষ কথাটি যদি একইভাবে কেউ গেয়ে চলে—কোনো ঘাত না রেখে তাহলে গানটির মর্ম রূপ ফোটে কি?—'পথ চেয়ে যে কেটে গেল'-র পর একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে দুটি কথায়—'কত দিনের (?) রাত কত দিন?' [illegible] একটু থেমে যদি প্রশ্নের [illegible] ধীরে ধীরে গাওয়া যায়, তাহলে গানের রূপই আলাদা হয়ে যায়। বড়রা যখন গান, এইগুলি লক্ষ্য করতে হয় প্রতিটি শিক্ষার্থীদের। তাতে গানের রসসৃষ্টি করা অনেক সহজ হয়।'

'রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী সম্বন্ধে অনেক বিভ্রান্তিকর মন্তব্য শোনা যায়। আপনি চিন্তাশীল এবং শিক্ষা দেওয়া নিয়েও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত বলেই এ-বিষয়ে আপনার মতামতটা জানতে ইচ্ছে করে?'

'দেখ গায়কী-র কোনো বাঁধাধরা কোড বা ডগমা রবীন্দ্রসংগীতে থাকতে পারে বলে আমি অন্ততঃ মানি না। এক এক শিল্পীর মানসিকতা কণ্ঠ এবং তার স্বরক্ষেপণ এক এক রকম। উপলব্ধির স্বরূপেও তাঁরা আলাদা। এইসব মিলিয়েই তাদের গায়কী গড়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে কোনো সাধারণ নিয়ম চালু করা সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কণ্ঠ, বুদ্ধি, হৃদয়—এই তিনটি বস্তুর মধ্যে কার মধ্যে কোনটি প্রবল, সেইটে লক্ষ্য করেই শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর একটা কথা নিজের ধারণা ও গায়ন-পদ্ধতিকে চরম বলে ভাবার মত ভুল কিছু নেই। আমিই যে অভ্রান্ত তারই বা প্রমাণ কি? অনেক সময় অনেক কমখ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীর গানেও অনেক কিছুর নির্দেশ পাওয়া যায়। চোখ-কান খোলা রেখে জিজ্ঞাসু হয়ে শুনলে নিজেরই লাভ। অন্যদের সম্বন্ধে নাক-উঁচু ভাব নিয়ে চলাটা অগ্রগতির অন্তরায়।'

'রবীন্দ্রসংগীতের সম্বন্ধে এখনকার শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস, এ কি ক্ষণস্থায়ী?'

'উচ্ছ্বাসটা এখন এত বেশী যে, এর মধ্যে কতটা গানের প্রতি সত্যিকার টান আর কতটা গ্ল্যামারাস আর্টিস্টদের খ্যাতি দীপ্তির প্রতি মুগ্ধতাবশতঃ। শিখতে আসা সেটাও ভাববার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি শেখবার চেয়ে, বোঝবার চেয়ে কি করে তাড়াতাড়ি রেকর্ড করবে কাগজে নাম, ছবি বেরোবে—সেইদিকেই তাঁদের প্রবণতা বেশী। এঁরা শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে আসতে চান। আপন আপন 'হিরো' বা 'হিরোইনের' নকল করে গেয়ে প্রথমটায় কেউ হয়ত কিছুটা বাহবা পেলেন। কিন্তু সংগীতবোধ পরিপক্ব না হওয়ার দরুণ গায়কীতে কোনো স্বকীয়তা আসে না, আসতে পারে না। এই স্বকীয়তা আনতে না পারলে টিকে থাকা মুস্কিল। গাইতে গাইতে অভিজ্ঞতার মূলধন জমলে তবেই গান একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয়। গায়কী সম্বন্ধে এই আমার ধারণা।'

'রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনা সম্পর্কে শিক্ষিকা হিসেবে আপনার কোনো অভিমত নেই?'

'অবশ্যই আছে। যা এখনই বললাম, সাধারণভাবে অনেক অভিজ্ঞতার বনিয়াদ না থাকলে শুধু রবীন্দ্রসংগীত কেন কোনো সংগীতের দক্ষতাই স্থায়ী হয় না। আমার কথাই ধর না, যখন প্রথম কর্মক্ষেত্রে এলাম, শিক্ষা সমাপ্ত করেই ত এসেছিলাম? তবু আগের গাওয়া এবং এখনকার গাওয়ায় অনেক তফাত। রবীন্দ্রসংগীত গাইতে হলে গানের ভেতর ঢুকতে হবে, কথার মানে তলিয়ে বুঝতে হবে, রাগ-রাগিণীর জ্ঞানও থাকা দরকার। রবীন্দ্র-সাহিত্য, ব্যক্তিত্ব ও পটভূমিকা অনেক কিছু জড়িয়েই রবীন্দ্র-সংগীত। এতগুলি বস্তুর মিলন না ঘটলে রবীন্দ্রসংগীতের যথাযথ রূপটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। যেমন ধর 'কোথা যে উধাও' এবং 'রিমঝিম ঘন ঘনরে' যদি পাশাপাশি গাওয়া যায়, অনেকটা যন্ত্র-সংগীতের আলাপ ও গতের আইডিয়া আসে না? একটিতে ব্যাপ্তি আছে বিস্তার আছে উধাও নীচের পর্দা থেকে উঁচুতে যাওয়ার একটা ক্রমবিস্তৃত ভাবঘন নিবিড়তাও আছে। বর্ষণের আগের পর্যায় আবার রিমঝিমে আছে বর্ষাঝরার ছন্দ।

শুধু স্বরলিপি অনুসরণ করে এ রূপসৃষ্টি সম্ভব নয়। আবার স্বরলিপির প্রতি আনুগত্যও দরকার সুরের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য। জজদা ভারী সুন্দর একটি কথা বলেন, 'কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন' গানটি এমনভাবে স্বরলিপিতে আছে যেন 'কুসুমের' ওপর লাইথ মারছে। তার মানে ফুলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে আলতো-ভাবে যেমন ভাবতে পা ফেলার যে ভঙ্গি সেই কোমলমধুর ভঙ্গিতেই এগান গাইতে হবে। কিন্তু এবোধের জন্য যে চিন্তা ও সাধনা দরকার, সেটা আহরণ করবার ধৈর্য আছে কজনের? এঁদের এই ধৈর্যের ওপরই রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শিক্ষিকা হিসেবে এইটেই আমার বক্তব্য।'

'যাঁরা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন, তাঁদের সম্বন্ধে?'

'এঁদের কথা ভাবলে আমার মত আশাবাদীরও হতাশা আসে। ভালমন্দ, যোগ্য-অযোগ্য মিলিয়ে রবীন্দ্রগীতি গাইয়ের সংখ্যা এত বেশী যে, এর মধ্যে সত্যিকারের প্রতিশ্রুতিকে খুঁজে বার করা শক্ত—সমালোচক, সংগঠক উভয়ের পক্ষেই। এত সময়ই বা তাঁদের কই? ধৈর্যই বা থাকবে কেমন করে?

আবার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলব গেলো গেলো রবেও আমি বিশ্বাসী নই। অনেক শিল্পীর অনেক রকম পরিবেশনায় রূপ পাল্টাতে পারে, তবে কবিগুরুর গানের ধন লুপ্ত হবার নয়।

হ্যাঁ, আরও একটা কথা সম্প্রতি আমাদের অত্যন্ত অপমানজনকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এই বলে যে, আমরা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথকে ভাঙিয়ে খাচ্ছি। এর উত্তরে এই কথাই বলব —**জীবন থাকলেই জীবিকার প্রয়োজন সকলেরই আছে** (এমনকি, এই উক্তির বক্তারও)। এক্ষেত্রে যে বিদ্যা যে আহরণ করে, সেই বিদ্যাই মায়ের মত তাকে পালন করে থাকে। জীবনের এই স্বভাবিক দাবীও রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীদের থাকবে না—এটা কোনো যুক্তির কথা নয় এবং এ-কথার মধ্যে কোনো বৈদগ্ধ্য নেই।'

সন্ধ্যা সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বালু এবার আর আমার কথা শুনল না। রসুই ঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি তিল আর মুগের তৈরী মিষ্টি খেয়ে আবার এসে বসলাম চারপাইএর ওপর। কিছু ক্ষণের ভেতর মকাই সেঁকে একটা পাত্রে আমার হাতে এনে ধরে দিল বালু।

মকাইএ কামড় দিয়ে মনে হল জিভের কাছে এর যথেষ্ট আবেদন আছে। একটুও বাড়িয়ে বলেননি পণ্ডিতজী।

বললাম যদি জানতাম তুমি এত ভাল মকাই সেঁকতে পার বালু, তাহলে তোমার পিতাজীর অসুখের সময় ওষুধের দামটাও দিতে হত না। মকাই খেয়ে ও দাম উসুল করে নিতাম।

বালু বলল, আপনি টাকা নিলেন কই। না নিলেন নিজের ফি, না কম্পাউণ্ডারবাবুর। কত ওষুধ ডিসপেনসারি থেকে বিনি পয়সায় দিয়ে দিলেন। বাজার থেকে ওষুধ তো দাম দিয়ে কিনতে হবে বাবুজী।

পণ্ডিতজীর দিকে তাকিয়ে বললাম আজ তাহলে উঠতে আদেশ করুন পণ্ডিতজী। বেলা পড়ে এসেছে যেতে হবে অনেকখানি।

পণ্ডিতজী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবুজীকে তুমি বাজারের পথ অব্দি পৌঁছে দিয়ে এসো বালু।

আমার দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে বললেন, আসতে বলতে সংকোচ হয় এ কোর্ঠিতে। তবে এদিক কোনদিন এলে কৃপা করে আসতে ভুলবেন না বাবুজী।

পণ্ডিতজী চারপাইএর ওপর উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন দেখে ওঁকে হাত ধরে বসালাম। বললাম, বালুর হাতের তৈরী খাবার লোভে আবার আসতে হবে অপনার কোঠীতে।

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমি বালুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশ জুড়ে সে এক বিচিত্র ছবি আঁকার খেলা সুরু হয়েছে। সূর্যাস্তের মরা হলুদ আর আবীর রঙে রাঙগানো আকাশ। টুকরো টুকরো এক দঙগল মেঘ লাল হলুদ জামা গায়ে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওপারের পাহাড়ের আড়াল থেকে তখনও আধখানা ডুবন্ত সূর্য দেখা যাচ্ছে। এদিকে পূবের আকাশে ঝকঝকে চাঁদ।

আমি টাট্টুতে না উঠে ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে নীচের ভ্যালির পথে সাবধানে নামতে লাগলাম।

ভ্যালিতে নেমে এসে দেখি, পশ্চিম আকাশে রক্তের ঢেউ ইতিমধ্যে ঘন কালো জমাট হয়ে উঠেছে। পূবের দিকে চেয়ে দেখি চাঁদ থেকে একটা তরল সাদা জ্যোৎস্নার ঢল গড়িয়ে আসছে পাহাড় বনের গা ভাসিয়ে ভ্যালির মধ্যে। দুটো পাইন গাছ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা জ্যোৎস্নার ঢেউতে স্নান করার ইচ্ছা নিয়ে।

পাশে ফিরে দেখলাম, বালু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আমার চলার অপেক্ষায়। বললাম, এ পথ আমার অচেনা নয় বালু। তুমি ফিরে যাও তোমার পিতাজী একলা রয়েছেন।

বালু চমকে মুখ তুলে বলল, না বাবুজী, আপনাকে বাজারের রাস্তায় পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরব না। পিতাজী বলে দিয়েছেন।

বললাম, বাজারের পথ, সে তো অনেকখানি দূর। তুমি একা একা ফিরবে কি করে?

বালু বলল, দরকার পড়লে রাতে ভিতে আমি একাই তো কোঠী থেকে বাজারে যাওয়া আসা করি বাবুজী।

বললাম, তোমার ভয় করে না?

বালু বলল, ভয় কিসের বাবুজী, কিছু থেকে আমার ভয় নেই।

বালুর সঙ্গে এই আধা জ্যোৎস্নার মায়াময়তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভাল লাগছিল। বললাম, বালু, তোমার যদি খুব একটা তাড়া না থাকে তাহলে একটুখানি বসবে এখানে?

বালু মাথা নীচু করে কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আচ্ছা থাক, অনেক রাত হয়ে যাবে তোমার বাড়ী ফিরতে।

ও মুখ তুলে বলল, না না, আমার তো কোন তাড়া নেই। আসুন না, এই গাছের তলায় পাথরটার ওপর বসি।

বালু গাছের সঙ্গে টাট্টুর লাগাম বেঁধে পাথরের পাশে এসে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আমি বসে আছি তাই পাশাপাশি সে সংকোচে বসতে পারছিল না।

বললাম, তুমি পাথরের ওপর উঠে ব বালু, সংকোচের কোন কারণ নেই।

ও তবুও অনেক সংকোচে আমার থেকে বেশ খানিক দূরত্ব বাঁচিয়ে পা ওপর আধবসার ভংগীতে বসল।

কেউ কোন কথা বললাম না চাঁদের আলোয় গাছের তলায় ছা ফুটে উঠেছে।

এক সময় বললাম, বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু দেখ, ভ্যালির ভেতর বাতাসটা কেমন খেলে বেড়াচ্ছে।

বালু বলল, দক্ষিণের পাহাড়ী অঞ্চলে গরমের সময় বেশ কষ্ট হয়, কিন্তু ভ্যালির ভেতর বাবুজী মাঝে মাঝে ঠান্ডা একটা হাওয়ার খেলা চলতে থাকে। এখানকার এই দস্তুর।

বললাম, আজকাল দুপুরে পাহাড়ের মাথাগুলোও কেমন যেন অস্পষ্ট অস্বচ্ছ বলে মনে হয়। দূরের দৃশ্যগুলো ভাল করে দেখা যায় না।

বালু বলল, পিতাজী বলেন, ওটা হালকা ধূলির ওড়না। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠে। তউঁদির সময় এটা প্রায়ই হয়।

আমার বেশ ভাল লাগছিল। মুখে লজ্জা আর মিষ্টি একটা সারল্য মাখা থাকলেও বালু যে প্রকৃতির লীলারহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নয়, একথা জেনে ওকে আরও বেশী ভাল লাগল।

অন্য কথায় এলাম। বললাম, সারাদিন তোমাকে কি কাজ করতে হয় বালু?

বালু বলল, আমার সংসার তো দেখলেন বাবুজী, কত ছোট। কিন্তু সারাদিন কাজের কি শেষ আছে। এখন গম ঝাড়াই বাছাই-এর কাজ চলছে। অবশ্য যখন শরৎকাল আসবে, তখন মকাই উঠবে ঘরে।

বললাম, আমি যখন প্রথম মনালী আসি তখন মকাই তোলা হয়ে গেছে। পাহাড়ী টিকার প্রায় প্রতিটি ঘরের ছাদে মকাই শুকোচ্ছে। যেদিকে তাকাই সেদিকে পাকা সোনার ঝিলিক। সে ছবি এত সুন্দর যে এখনও চোখের ওপর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে।

বালু বলল, সারা দেশটা ছবি, বাবুজী। শরৎকালের শেষে গাছ থেকে যে পাতা ঝরবে, তার রঙেও সোনার চমক।

বললাম, তোমরা রাজপুত, তাই না বালু?

ও মাথা নাড়ল।

বললাম, প্রতিটি জাত তাদের নিজের নিজের দলের লোকজন নিয়ে একসঙ্গে থাকে, কিন্তু তোমরা ঐ নির্জন পাহাড়ে দুটি প্রাণী থাক কি করে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বালু। এক সময় কিছুটা সংকোচের সঙ্গে বলল, আমরা রাজপুত বাবুজী, তবে পতিত হয়ে আছি।

বললাম, তোমরা পতিত কিসে?

বালু বলল, মিয়ান রাজপুত ছিলাম আমরা। লোকে আমাদেরও এক সময় 'জয় দিয়' বলে চলতে ফিরতে সম্মান দেখাত। কিন্তু আমাদের ক্ষেতিতে এক সময় কাজ করত একটি মানুষ। তার কাজে সাহায্য করতে আসত তার কিশোরী মেয়েটি। মেয়েটি কৃষক কানেতের বাড়ীর হলে কি হবে, রূপে যেন তার পাকা ফসলের মত আলো করে থাকত সারা ক্ষেত।

একটু থেমে চোখদুটো আমার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বালু বলল, তিনি আমার মা বাবুজী, আর তাই আমরা এক ধাপ নীচে নেমে গেছি।

বললাম, তোমরা এক ধাপ উঁচুতে উঠে গেছ বালু। তোমার পিতাজী শুধু পন্ডিতই নন, তিনি সত্যিকারের মানুষ।

বালু উৎসাহে আমার মুখের ওপর তার চোখ রেখে বলল, আমাদের জাতের মেয়েদের পর্দা মেনে চলতে হয় বাবুজী, কিন্তু এখন এক ধাপ নেমে যাওয়ায় আমরা আর ওসব মানি না। পিতাজী মাকে এনে ঐ নির্জন পাহাড়ে সংসার পাতেন। মা মারা গেলে আমার দাদা বাজারে কোঠী বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু পিতাজী ও জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি। শুধু বলেছিলেন, তোমরা নতুন দিনের মানুষ, বাজারের আনন্দে মেতে থাকতে চাইছ, আমি বাধা দেব না। তবে আমি এই ঝোপড়িতে তোমার মায়ের স্মৃতি নিয়ে থাকব শেষ কটা দিন।

বলুন তো বাবুজী, এরপর আমি আমার বুড়ো পিতাজীকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? আর তাছাড়া এখন তো উনি একেবারে নড়চড়ার বাইরে।

বললাম, তোমার দাদা সেই থেকে মিলিটারীতে চলে গেল বুঝি?

বালু বলল, ঠিক ধরেছেন বাবুজী। তারপর থেকে আর এমুখো হয়নি।

বললাম, বালু, তুমি আর কিছু কাজ কর?

ও বলল, মরশুমে আপেল পাকলে আমি আপেল তোলার কাজ করি বেনন সাহেবদের বাগানে। তারপর পথের ধারের দোকানে ফলের রস তৈরী করার কাজে লেগে যাই। ফলের মরশুমে যারা বেড়াতে আসে বাবুজী, তারা আপেলের রস খেতে চায়।

বললাম, জুলিয়েন বেননকে চেন তুমি?

বালু মাথা দুলিয়ে জানাল, জুলিয়েন তার চেনা।

বললাম, কেমন মানুষ?

বালু বলল, বহুৎ খেয়ালী। ওকে বহুৎ ডর করে সব্বাই।

বললাম, খেয়ালী কি রকম?

বালু বলল, আমরা দল বেঁধে ওদের বাগানে আপেল তুলতে যাই। একবার একটা মেয়ে বাগানে ফল তুলতে তুলতে একটা আপেলে কামড় দিয়েছিল। পড়বি তো পড় জুলিয়েন সাহেবের চোখে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরী খতম।

বললাম, এটুকু দোষে চাকরী হারাতে হল?

হাঁ বাবুজী, বলল বালু; তবে ও মেয়েটি আবার ভাল কাজ পেয়ে গেছে।

বললাম, কি কাজ?

বালু বলল, তাঁত বোনার কাজ। আর কাজটা ঐ জুলিয়েন সাহেবই যোগাড় করে দিয়েছে।

হেসে বললাম, তাহলে তো দারুণ সাচ্চা মানুষ বলতে হয়।

বালু বলল, কি রকম খেয়ালী জানেন বাবুজী? ঐ মেয়েটাকে কাঁদতে দেখে জোর ধমক লাগিয়ে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলে। তারপর সন্ধ্যেবেলা ওর বাড়ী বয়ে একঝুড়ি বাগানের সেরা আপেল দিয়ে এল। আবার ভাল চাকরীও জুটিয়ে দিলে কিন্তু বাগানের কাজে আর ফিরিয়ে আনল না।

বললাম, ও মানুষটা ঐরকমই বালু।

চাঁদের আলোয় দুজনে কতক্ষণ বসে বসে ছোট ছোট সুখদুঃখের গল্প করলাম। আমার কাছ থেকে একটুখানি সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে বালুর মনের রুদ্ধ জানালাটা ধীরে ধীরে অভাবিত এক আলোর দিকে খুলতে লাগল।

এই নির্জন প্রকৃতির বিরাট নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হতে লাগল বালু ঠিক এই নৈশ প্রকৃতির মতই একান্ত নির্জনে নির্বাসিত। সব ঐশ্বর্য সব শ্যামল সমারোহ থাকা সত্ত্বেও সে এক মহা গতিহীন অভিশাপে বাঁধা পড়ে আছে। তার ভরা যৌবনের বাসনাগুলো রাতের ঝিঁঝিঁদের মত যেন বুক কুরে কুরে অবিশ্রাম কান্না ঝরিয়ে চলেছে।

কখনো বা উপত্যকার বসন্ত বাতাস পথ-চলতি বালুকে ছুঁয়ে যায়। লাল ঠোঁটে তোতাপাখি চেরী ফল নিয়ে সবুজ ডানা ভাসিয়ে ওড়ে। ফুলেভরা বন্য আপেলের শাখায় কোয়েল নিজের কালো দেহখানা বন্য আপেলের আকুল-করা সুরের আগুনে জ্বালাতে থাকে। বুকখানাকে একেবারে উদাস করে দিয়ে কখনো বা বৈশাখী দুপুরে দূরে বনে ঘুঘু ডাকে। সাদা তগরের ফুল নাকের কাছে আলতো করে ছুঁইয়ে তার করুণ গন্ধটুকু শুঁকতে শুঁকতে শূন্যে চেয়ে থাকে বালু। যে হিসেব কোনদিন মিলবে না, জীবনের সেই হিসেবগুলো মেলাবার চেষ্টা করতে করতে একসময় একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাল ছেড়ে দেয় সে। আবার নিজের কাজ। কাজে বিলম্বের বৈশিষ্ট্য মনে মনে খাড়া করতে করতে কঠিন পাথরের পথে আঘাত খেতে খেতে ছুটে চলা।

একসময় যখন বালু তার নিঃসঙ্গ জীবনের অনেক কথা স্বগতোক্তির মত শুনিয়ে গেল তখন আমি এক অবসরে বললাম একটা ছোট্ট কাজ আছে করবে বালু?

ও আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল।

বললাম একেবারে সম্মতি দিয়ে দিলে? আগে কথাটা শোন ভেবে দেখ পিতাজীর সঙ্গে পরামর্শ কর—তারপর সম্মতি অসম্মতির প্রশ্ন আসবে।

বালু কোন কথা না বলে আমার মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল।

বললাম ডোলজারীর কেস এলে অনেক সময় বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। এসব

পাহাড়ী অঞ্চলে বড় বেশী সংকোচ আর সংস্কার আছে। আমার হঠাৎ কিছু দরকার হয়ে পড়লে বাড়ীর মেয়েদের কাছে সাহায্য পাওয়া দায় হয়ে ওঠে। তোমার যদি এসব কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে কোন সংস্কার না থেকে থাকে, তাহলে আমাকে বোলো। এখুনি বলার দরকার নেই ভেবেচিন্তে বললেই হবে। কাজটা প্রতিদিনের নয় তাই রোজ তোমাকে ব্যস্ত থাকতেও হবে না। দরকার পড়লেই আমি তোমাকে ডেকে নেব।

কথাগুলো বলে প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে চাঁদের আলোয় ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বালু বলল আমার কোন সংস্কার নেই। আপনি যদি মনে করেন আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব তাহলে আমি খুব রাজী আছি।

বললাম তোমার পিতাজীর সংগে একবার আলোচনা করে নাও।

ও বলল, ফিরে গিয়েই পিতাজীকে বলব। তবে উনি কি বলবেন তাও আমার জানা আছে। তাই আপনাকে সংগে সংগে কথাটা দিতে পারলাম।

রাত সত্যি অনেকখানি হয়ে গিয়েছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বালুকে বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে অনেক বোঝালাম কিন্তু ওর সেই এক কথা—পিতাজী বলেছেন আপনাকে বাজারের রাস্তা অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসতে।

সংগে সংগে ঝিনির কথা মনে পড়ল। সেও একদিন এমনি পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিল আমাকে যোগনীর হাত থেকে বাঁচাতে।

বালু ফিরে গেল নির্দিষ্ট সীমানা ছুঁয়ে। আমি টাট্টুতে চড়ে বাঁধান রাস্তা ধরে বাজারের পথে এগোতে লাগলাম। রাস্তার ধারের বড় বড় সিডার গাছগুলো পেরিয়ে চলেছি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে উপত্যকা।

হঠাৎ কি মনে হল টাট্টু থেকে নেমে দাঁড়ালাম। গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলাম ভ্যালির দিকে।

জ্যোৎস্নায় একটি ছায়ামূর্তি দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আমি জানি সে বালু। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ওর নামধাম পরিচয়ের পার্থিব সত্যগুলো ভুলে গেলাম। আমার মনে হল সৃষ্টির শুরু থেকে একটি তরুণী কুমারী রহস্যময় জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে একাকী অনন্ত পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে। সমস্ত বিশ্বচরাচরকে সে তার যৌবনের মহিমায় মূক স্তব্ধ রুদ্ধশ্বাস করে রেখেছে।

রাত তখন প্রায় দশটা। খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে 'দ্য রা-এক্সপিডিশানস' বইখানার পাতা ওল্টাচ্ছি। কেমন করে পেপাইরাসের তৈরী নৌকোয় আধুনিক যুগের মানুষ দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে, তার ছবি দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। হঠাৎ জানালার বাইরে থেকে লম্বা একখানা হাত ঢুকে আমার বইটা টেনে নিতেই আমি লাফ দিয়ে মেঝেতে উঠে দাঁড়ালাম।

জানালার দিকে তাকিয়েই কিন্তু হেসে উঠলাম।

জুলিয়েন বাইরে থেকে বলল, চটপট ড্রেস করে বাইরে বেরিয়ে এসো মুখার্জি। দরকার আছে।

জুলিয়েনকে কোন প্রশ্ন করা বাহুল্য। ও মর্জি হলে কথার জবাব দেবে নয়ত নিঃশব্দে মেনে চলে যাবে। শুধু বললাম দরজাটা কি ভেজিয়ে রেখে যাব?

ওপাশ থেকে ভারী গলার শব্দ ভেসে এল না। ভাগতুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বল। আর তুমি যে বাইরে বেরিয়েছ একথা যেন ও কাউকে না বলে।

দশ মিনিটে কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলাম। বাইরে নেমে দেখি, চাঁদ ডুবছে পাহাড়ের আড়ালে। চারদিকে ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে।

অস্পষ্ট আলোয় কিন্তু অদ্ভুত দেখাচ্ছিল জুলিয়েনকে। পুলিশ অফিসারের ড্রেস পরে টুপি মাথায় হাতে ব্যাটন নিয়ে দাঁড়িয়ে।

বললাম এ কি রূপে দিলে দরশন।

জুলিয়েন লম্বা পা ফেলে চলতে চলতে বলল ক্রমশ প্রকাশ্য।

নির্জন পথ। আমরা চলেছি বাজারের দিকে। জুতো থেকে একটা ভেজা সপসপ শব্দের মত আওয়াজ উঠেছিল।

বাজারের কাছাকাছি এসে জুলিয়েন বাঁদিকের সিডার জংগলে ঢুকে পড়ল। আমি ওকে সাবধানে অনুসরণ করে চললাম। অনেকখানি পথ বনের ভেতর ঠাওর করে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু চেনা পথ দুজনেরই তাই একসময় জংগলটা পেরিয়ে আসতে পারলাম।

এখন আমরা নদীর জলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ আমার মুখে ওর হাতখানা চেপে ধরে জুলিয়েন চাপা গলায় বলল খবরদার শব্দ কোরো না যেন।

তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে বলল, ঐ দূরে একটা কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্ধকারে ততক্ষণে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। বললাম, বেশ বড় আকারের একটা কিছু দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

জুলিয়েন ফিসফিস করে বলল, একখানা লরী। এখন যা বলি, তাই কর। চুপচাপ নদীর ধারের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব। দেখো পাথরটাথর গড়িয়ে শব্দ করে বোসো না যেন।

আমি জুলিয়েনের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। নদীর জলপ্রবাহ এত তীব্র আর শব্দতরংগ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে একখানা পাথর গড়িয়ে পড়লেও অতিরিক্ত কোন শব্দের সৃষ্টি হত বলে মনে হয় না।

আমি সাবধানে নীচের রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে যতটুকু সময় নিয়েছিলাম তারই ভেতর জুলিয়েন নিশ্চয়ই কিছু কাণ্ড করে থাকবে। আমি ঐ লরীর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি দুটো চোখে আগুন ছড়িয়ে লরীটা আমার দিকে ছুটে আসছে।

আমি রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালাম। লরীটা আমার পাশে এসে থেমে গেল। জুলিয়েনের চাপা গলার আওয়াজ জলের শব্দকে ছাপিয়ে বেজে উঠলো উঠে এসো তাড়াতাড়ি।

আমি বাক্যব্যয় না করে গাড়ীতে উঠে পড়লাম। আর অমনি লরীখানা বন পাহাড় কাঁপিয়ে ছুটে চলল সামনের পথ ধরে।

জুলিয়েনের মুখে কথা নেই। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে সে ম্যাজিক কার্পেটের মত গাড়ীখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বেশ খানিক পথ যাবার পর জুলিয়েনই প্রথম কথা বলল চোরের ওপর বাটপাড়ি করলাম মুখার্জি।

বললাম এতক্ষণ গোলকধাঁধায় রয়েছি এখন দয়া করে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল তো দেখি।

জুলিয়েন বলল, নদীর ধারে সরকারী লগ হাউস তৈরী হচ্ছে। মধুর খবর পেয়ে মদনলাল যথারীতি এখানে এসে হাজির হয়েছে। এখন নদীর স্রোতে টিম্বার মার্চেন্ট-দের যে লগ ভেসে যাচ্ছে তাই চুরি করে ও ঘর বানাচ্ছে। এদিকে কন্ট্রাকটরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কাঠ সাপ্লাই-এর বিলটা তুলে নিচ্ছে সরকারী তহবিল থেকে।

বললাম নদীর জলে ভেসে আসা লগ-গুলো এতদূরে না ধরে লগ হাউসের পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময়ে তো ধরতে পারত। তাহলে কন্ট্রাকটরের লরী ওঠানোর হাঙ্গামা থাকত না।

জুলিয়েন বলল, ওপরের পাহাড়ে এখন বরফ গলছে। জানুয়ারীতে যেখানে জলের অ্যাভারেজ ফ্লো সাড়ে চার হাজার কিউসেক সেখানে এখন প্রায় পনেরো হাজার কিউসেক জল নামছে। ভেবে দেখ, জলের স্রোত কত প্রবল। লগ হাউসের কাছে নদীর স্রোত ঝড়ো হাওয়ার মুখে ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে। ওখানে লগ ধরে সাধ্য কি। তাই পিছিয়ে গিয়ে নদীর বাঁকে যেখানে লগগুলো মাঝে মাঝে আটকা পড়ে যায় সেখান থেকে লরীতে তুলে নিয়ে পালিয়ে আসছে।

বললাম গাড়ীতে কেউ ছিল না?

জুলিয়েন বলল আমি যতটুকু ইন-ফরমেশান পেয়েছিলাম তাতে রাত একটা নাগাদ চাঁদের আলো ফুটলে ওরা মরা জ্যোৎস্নায় নদী থেকে কাঠ তুলে লরী বোঝাই করার তাল করছিল। গিয়ে দেখি, লরীতে শুধু ড্রাইভার ভেজা বেড়ালের মত একলা বসে।

বললাম, পুলিশ অফিসারের পোষাকটা তাহলে অকারণেই চাপালে বল?

জুলিয়েন বলল, নিশ্চয়ই নয়। আমাকে এই পোষাকে দেখেই তো ড্রাইভার লাফ দিয়ে ভেগে পড়ল।

লরী গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে।

একসময় বললাম জুলিয়েন এখন কোথায় চলেছি দয়া করে তার যদি একটু হদিস দাও।

জুলিয়েন বলল, ঐ প্রশ্নটি করলেই কিন্তু গাড়ী থেকে সোজা ঠেলে ফেলে দেব। চুপ-চাপ বসে থাক। যেখানে নামাবো সেখানেই নামবে।

হেসে বললাম তোমার হাতে যখন পড়েছি তখন চালাও দোস্ত। যেখানে ঠেকাবে সেখানেই ঠেকব।

রাত প্রায় একটার কাছাকাছি। নদী পাহাড় বন কাঁপিয়ে জুলিয়েনের বাটপাড়ি-করা লরী যেখানে এসে দাঁড়াল রাতের অন্ধ-কারে সে জায়গা আমার অচেনা। জুলিয়েন গাড়ী থেকে নেমে বলল, চিনতে পার জায়গাটা?

বললাম না।

একেবারেই না?

বললাম আমার চেনা জায়গা বলে তো মনে হচ্ছে না।

জুলিয়েন বলল তাহলে গাড়ীতে ওঠ। যেখান থেকে এনেছি সেখানে পেঁছে দিয়ে আসি।

বললাম সত্যি জুলিয়েন ধাঁধায় পড়ে গেছি।

জুলিয়েন বলল কপালে তোমার দুঃখ আছে মুখার্জি।

বললাম দুঃখ যদি থাকে তবে খন্ডাবে কে!

জুলিয়েন বলল চল এখন ওপরে ওঠা যাক্। রাত প্রায় একটা বাজে। চারটের আগেই কিন্তু এখানে ফিরতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় কুলু থেকে মানালী যে বাস যাবে সেটা ধরতে হবে আমাদের। লরী এখানেই পড়ে থাক্।

জুলিয়েনের হাতে জোরে একটা চাপ দিয়ে মনের আবেগ জানালাম। আমার কাছে সব এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বললাম তুমি সত্যি নাগগরে নিয়ে এলে আমাকে?

মুখার্জী তোমায় ঝিমির কাছে নিয়ে এলাম।

আমরা টর্চের আলোয় পথ চিনে ওপরে উঠতে লাগলাম।

নিরন্ধ্র নাগগর ঘুমিয়ে আছে। ঝিমির কোয়ার্টারের সামনে দুজনে এসে দাঁড়ালাম। জুলিয়েন বলল, তুমি আর্ট গ্যালারীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও। আমি দরজায় নক্ করছি।

আমি গ্যালারীর দিকে চলে গেলাম। কানে এসে বাজতে লাগল জুলিয়েনের দরজা ধাক্কানোর শব্দ।

কে? কে?

ভেতর থেকে ঝিমির গলা বেজে উঠল। ঘুমে আর শংকায় জড়ানো সে কন্ঠস্বর।

জুলিয়েনের গলা শোনা গেল ভয় নেই, আমি কুলুর পুলিশ স্টেশন থেকে আসছি।

ভেতরে আলো জ্বলে উঠেছে। দরজা খুলে দিয়েছে ঝিমি। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম জুলিয়েন কিন্তু তেমনি বাইরে দাঁড়িয়ে।

ঝিমি দরজা ধরে বাইরে মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার বলুন তো?

জুলিয়েন ভারী গলায় বলল মিস শর্মা। আপনাকে এত রাতে ডিসটার্ব করার জন্যে সত্যি দুঃখিত কিন্তু এ সময় ছাড়া সেই ভদ্রলোকের নাগাল পাবার কোন উপায় নেই।

ঝিমির গলা জড়িয়ে এসেছে কি বলছেন আপনি? এখানে দ্বিতীয় কোন মানুষ তো নেই।

ইতিমধ্যে উত্তেজনায় ঝিমির হাত লেগে পুরো দরজাটাই খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো আর্ট গ্যালারীর দেয়াল ছুঁয়ে আমার ওপর এসে পড়ল।

ঝিমির চোখ মুহূর্তে আমাকে চিনে ফেলল। সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল তুমি ওখানে ছোটে সাহেব!

জুলিয়েন হতাশভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল সব প্ল্যানটা ভেস্তে দিলে তো মুখার্জি।

ঝিমির দিকে তাকিয়ে দেখি ও ততক্ষণে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম কি হল ঝিমি?

ও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

বেশ খানিক পরে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে যখন ও ঘরে ঢুকল তখন মুখে সলজ্জ একটা হাসি লেগে। সে যে দারুণ-রকম বোকা বনেছে চোখে মুখে তারই ছায়া।

জুলিয়েন বলল আমি অপরাধী এখন শাস্তিটা আমাকেই দিন।

ঝিমি বলল, বসুন। অপরাধটা আমারই। বলতে পারেন অকৃতজ্ঞ আমি। ভাগ্নের অপারেশনের সময় আপনাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করেছি কতবার কিন্তু আজ আপনাকে চিনতেই পারলাম না।

জুলিয়েন অমনি বলল টুপিতে মাথা ঢাকা পুলিশের ইউনিফর্ম গায়ে কেমন করেই বা চিনবেন আমাকে।

জুলিয়েন আর বসল না। আমার দিকে চেয়ে বলল ঠিক চারটেতে নাগগরের বাস রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াবে এখন আমি চললাম। ঐখানেই দেখা হবে।

ঝিমি বলল অসম্ভব। রাতে আমার ঘুম ভাঙালেন এখন আপনাকে ছেড়ে দেব ভেবেছেন। শেষ রাতটুকু গল্প করেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

জুলিয়েন বলল আর একদিন বিরক্ত করব মিস শর্মা আজ নয়। চোরাই একখানা গাড়ী আছে রাতে ওটাকে পাহারা দিয়ে আগলে বসে থাকতে হবে। ভোরবেলা ওটাকে কুলু পেঁছে জঙ্গলে বিসর্জন দিয়ে মানালীর ফার্স্ট বাস ধরেই রওনা দেব দু বন্ধুতে।

বললাম তাহলে চল জুলিয়েন আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এক যাত্রায় পৃথক ফল ঠিক নয়।

জুলিয়েন বলল আমার কথার ওপর কথা চালাতে যেও না মুখার্জি তাহলে মানালীতে তোমার বাংলোয় আর জুলিয়েনকে কোনদিন দেখতে পাবে না।

বললাম আজ তোমার দিন জুলিয়েন আমি হার মানছি।

ঝিমি বলল ছেড়ে দেবার আগে আপনাকে অন্ততঃ এক কাপ চা খাইয়ে তবে ছাড়ব।

জুলিয়েন টেবিলের কোণায় উঠে বসে বলল রাজী।

ঝিমি ভেতরে চলে গেল। আমরা গল্প করতে লাগলাম। এক সময় ঝিমি এল দু হাতে দু কাপ চা নিয়ে।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতভূমিতে রবীন্দ্রপ্রিয় প্রসঙ্গ :

ভারতভূমির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় প্রসঙ্গগুলি প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথের দুই প্রিয় ঋতু—নববর্ষা (দেখি নব-জলধর) ও বসন্ত (বসন্ত শ্বসন), ময়ূরের নৃত্য (৬); দেশকে জননী কল্পনা করা (ভারতমাতা), ভারতবাসীর অধঃপতনে দুঃখ (প্রাণভরে দিন তারে যবনের করে), অতীত গৌরব স্মরণ (একবার উঠেছিলে এ শিখর শিরে) আশায় উদ্বেল (বাখানিবে এ ভুবনে মন হিন্দুবীরে), ভারত বিধাতার আশীর্বাদ-পুষ্ট (সৃজিয়াছিলেন ধাতা ভুবনে ভারত-মাতা) ইত্যাদি। এই বিশেষ কবিমানসিকতা ভারতভূমিকে রবীন্দ্ররচনার স্বপক্ষেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

রবীন্দ্ররচনারীতির প্রতিফলন :

আবার এই মানসিকতারই ভিন্নমুখী প্রকাশ ঘটেছে ভারতভূমির শব্দের অনুপ্রাসে, এক বা একাধিক পর্বের পুনরাবৃত্তিতে। এটি রবীন্দ্রবাল্যরচনারীতির এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। কল্পনাবেগের জন্যেই হোক বা যুগপ্রভাবের ফলেই হোক ভারতভূমিতে অনুপ্রাসের ঘনঘটা কিন্তু রসহানি ঘটায়নি। এই অনুপ্রাসের নীহারিকা ভারতভূমির শেষাংশেই পুঞ্জীভূত। সেখানে কবি কল্পনা প্রবণ, ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত। অনুভূতির সঙ্গে অনুপ্রাসের ছন্দ মিশে গিয়ে ভারত-ভূমির শেষাংশকে গতিমান করেছে, আর সামগ্রিকভাবে করেছে আশার সঙ্গে নিরাশার, কল্পনার সঙ্গে সত্যের, অবাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত। যেমন ঘন ঘন ডাকে (২২) কলকল নাদ করে (২১) ডাকে ঘন ঘন ডাকে (২২)। আবার, ঘুমে অচেতন (২২) ও ঘুমাবে এমন (২২) দুটি চরণের অন্ত্য-মিলের অনুপ্রাস। গিরিগণ্ড (২২), গিরির উপরে (২৩) গিরি আরোহণে (১৯) গিরিবর (১৪)—এই জাতীয় প্রয়োগ শুধু ভারতভূমিতে নয়, অভিলাষেও দেখি। অভিলাষে ছটি স্তবকে (২৬—৩১) সুখ শব্দের ব্যবহার হয়েছে পনেরোবার। প্রলাপ-১ এও দেখি ভারতভূমির অনুরূপ অনুপ্রাস —তলে তলে তলে; ফুলে ফুলে ফুলে; হেসে হেসে হেসে; ছিঁড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি; ফিরি ফিরি ফিরি; ধীরে ধীরে ধীরে। প্রকৃতির খেদ ১ম পাঠে ঘন ঘন (৫), ঢলে ঢলে (৩)। বনফুলের ৩য় সর্গে শত শত শত। রবীন্দ্রবাল্যরচনারীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—একই স্তবকের পর পর দুটি বা যেকোন দুটি চরণের শুরুতে একই শব্দ বা একই পর্বের প্রয়োগ। ভারতভূমির এগারো স্তবকের প্রতিটি চরণের শুরু সেইদিন শব্দ দিয়ে, আর ২১ স্তবকে 'শুন' দিয়ে শুরু হয়েছে তিনটি চরণ। আবার দুটি স্তবকের তিনটি বিক্ষিপ্ত চরণের সূচনায় ভারতভূমির মূলসুর ধুয়ার মত বেজেছে—ঐ শুন মৃদুমন্দ (২০), ঐ শুন পর্বতেতে (২০) ঐ শুন কল্লোলিয়া (২১)। ঠিক এই জাতীয় প্রয়োগ অভিলাষেও দেখা যায়। যেমন—ঐ দেখ ছুটিয়াছে (৫ ১৪ ২৪) ঐ দেখ পুস্তকের (৬) ঐ দেখ আঁকিয়াছে (১৯) ঐ দেখ গুপ্তহত্যা (২৫) ঐ দেখ ঐ দেখ (২৬)। এই কবি-মনেরই বৃহত্তর প্রকাশ—'নাহি জানে তারা ইহা, নাহি জানে তারা' চরণটির পাঁচটি স্তবকের (৮ ৯ ১০ ১১ ১৩) চরণরূপে পুনরাবৃত্ত। হিন্দুমেলার উপহারে দেখি—'এখন তা নয়, এখন তো নয়' (৮), 'কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!' (১৫)। একটি চরণ পর পর দুবার প্রায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে ৬ ও ১১ স্তবকে। কিন্তু একটি চরণ পুনরাবৃত্ত হয়েছে ১০ ১১ ২১ এবং ১৫ ১৭ স্তবকে। দুটি চরণ পুনরাবৃত্ত হয়েছে ১ ২০ স্তবকে এবং ৮ ২১ স্তবকে। একই পর্বের পুনরাবৃত্তির অসংখ্যের বহু নমুনা দেখি।

এছাড়া কবিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ উক্তি (ইনভার্টেড কমা দিয়ে) ভারতভূমির মত অন্যান্য বহু রচনায় দেখা যায়—অভিলাষ ও প্রকৃতির খেদের বহু স্তবকে দেখি।

ভারতভূমির রচনাকাল নির্ণয় :

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও গদ্যরচনাগুলির মধ্যে ভারতভূমি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসাহিত্যে সর্বপ্রাচীন। প্রকাশকালের দিক থেকে ভারতভূমির প্রাচী-নত্বকে কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত রচনাকালের বিচারেও ভারতভূমি নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম। রবীন্দ্র-নাথের প্রথম যুগের সাহিত্যের অন্তরঙ্গ মানসপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং তৎকালীন বাংলা সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার প্রভাব বিচার করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য ও গদ্য বলে স্বীকৃত যাবতীয় রচনাই রবীন্দ্রনাথের হিমালয় ভ্রমণের (১৮৭৩ মার্চ থেকে জুন) পরে রচিত বলে প্রমাণিত। ব্যতিক্রম ছিল তিনটি ক্ষেত্র—বাঁধানো নীলখাতা, লেটস ডায়েরী এবং হিমালয় যাত্রাপথে বোলপুরে রচিত 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্য। বলা-বাহুল্য ঐ তালিকা রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া এবং এগুলি চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে বলে তাঁরই স্বীকার করা। সুতরাং হিমালয় ভ্রমণের পূর্বে রচিত কবিতা থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার সন্ধান পাওয়া আজ আর কোন মতেই সম্ভব নয়। জীবনস্মৃতিতে স্মৃতি থেকে যে কয়েকটি লুপ্ত কবিতার চরণ রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত কৌতুকবশত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে বালকের কবিতা রচনার ক্ষমতা প্রমাণিত হলেও বালক রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, রবীন্দ্র-প্রতিভা আবিষ্কার তো দূরের কথা। সেদিক থেকে ভারতভূমি রবীন্দ্রকাব্যে তথা বাংলা সাহিত্যে এক অসামান্য সংযোজন। ভারতভূমির আবিষ্কার রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের এতদিনের সন্দেহ দ্বিধা দূর করবে—জোড়াতালিদেওয়া বর্তমানের প্রচলিত সিদ্ধান্তকে ভেঙে নতুন সত্যে প্রতিষ্ঠা করবে।—রবীন্দ্রমানস প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারাটিকে করবে সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক সমস্ত কবিতা-গুলিই ছিল স-মিল। এর প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথ লুপ্ত নীল বাঁধানো খাতা থেকে যে চারটি কবিতার চরণ বা মিত্রাক্ষর শব্দ (পদ্মের ওপর কবিতা, 'মীনগণ হীন হয়ে', 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি', ভারতমাতা সম্বন্ধীয় কবিতা) জীবনস্মৃতিতে স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে-ছিলেন, সেগুলি ছিল সমিল ছন্দে রচিত। অথচ প্রথম মুদ্রিত কবিতা বলে এ পর্যন্ত স্বীকৃত অভিলাষ অমিল পয়ার ছন্দে রচিত কেন, তার সদুত্তর আজও পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র

সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক সবগুলি কবিতাই সমিল ছিল বলে মনে হয়। মিল দেবার দুঃসাধ্য প্রয়াসে 'ভারতমাতা'য় তিনি কিভাবে 'নিকট' শব্দের সঙ্গে 'শকট' টেনে এনেছিলেন তা আমরা দেখেছি। পরবর্তীকালে বাংলা পদ্যে মিল-স্থাপনের রীতিতে তিনি কি অজস্র বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন তাও সর্বজনবিদিত। সেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতাটি (অভিলাষ) যে অমিল পয়ার ছন্দে রচিত...' ইত্যাদি (রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, পৃঃ ৬৫১)। এ সন্দেহ শুধু প্রবোধবাবুর একার নয়, প্রত্যেক রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও রবীন্দ্রানুরাগীর। আসলে এতকাল ধরে অভিলাষ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে আমরা প্রথম রবীন্দ্রনাথকে নয়, খণ্ডিত বালক রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি, কিন্তু হিমালয় ভ্রমণের প্রাক্কালে বালক কবির যে প্রতিভা 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' জাতীয় পূর্ণাঙ্গ কাব্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, সেই কবিত্বশক্তির ক্ষমতা ও স্বরূপ আজও রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এদিক থেকে হিমালয় ভ্রমণের পূর্বে রচিত ভারতভূমি কবিতাটি নিঃসন্দেহে আলোর সন্ধান দেবে, পথ দেখাবে—'কোন পুরাতন প্রাণের টানে, ছুটেছে মন মাটির পানে', সর্বোপরি অখণ্ডের সাধনায় রবীন্দ্রজীবন ও প্রতিভাকে করবে পূর্ণতম, পূর্ণাঙ্গ—সত্য-শিব-সুন্দরের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

প্রকাশকালের বিচারে ভারতভূমি রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রাচীনতম। কিন্তু রচনাকালের বিচারেও যে ভারতভূমি সমমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তার আরো প্রমাণ দেবার আগে এ পর্যন্ত প্রাচীনতম বলে স্বীকৃত অভিলাষের রচনাকালটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাক।

অভিলাষের রচনাকাল প্রসঙ্গে ব্রজেনবাবু বলেছেন—অভিলাষ 'মুদ্রণকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর সাত মাস, ইহা তাঁহার আরো এক বৎসর পূর্বের রচনা' (শং চিঃ অগ্রঃ ১৩৪৬, পৃ ৩০০ এবং রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয় পৃ ৬৬)। অর্থাৎ অভিলাষ ১৮৭৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত হলে এর রচনাকাল দাঁড়াচ্ছে ১৮৭৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোঃ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও ডঃ কালিদাস নাগ এ বিষয়ে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে একমত। প্রভাতবাবু রবীন্দ্রজীবনী ১ খণ্ডের 'প্রত্যাবর্তনের পরে' অধ্যায়ে লিখেছেন, হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর অভিলাষ রচিত (পৃ ৪৫) এবং ৪৫ পাতার পাদটীকায় স্পষ্ট করে বলেছেন—'খুব সম্ভব উহা ১২৮০ শীতকালে রচিত হয়।' অর্থাৎ ১৮৭৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর (প্রমাদবশতঃ তিনি 'রবীন্দ্রজীবনকথা' গ্রন্থের ১৭ পাতায় 'এগারো বৎসর বয়েসে লেখা অভিলাষ... বলেছেন)। প্রবোধবাবু সিদ্ধান্ত টেনেছেন—'সুতরাং এটির (অভিলাষ) রচনাকাল হচ্ছে ১৮৭৩ সালের শেষার্ধে' (বিঃ পঃ ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা পৃ ৬৫১)। ডঃ কালিদাস নাগের মতে—'কিন্তু কবিতাটি তার অন্তত এক বছর আগে লেখা' (প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪৯)।

হিমালয় প্রত্যাবর্তনের পরে রচিত বলে অভিলাষ এবং তার পরবর্তী প্রত্যেকটি কবিতায় দেখি সুমহান হিমালয়ের প্রতিচ্ছবি, তার সমুচ্চ মহিমা ও ভারতের অভ্রভেদী ইতিহাস-ঐতিহ্য। কিন্তু একমাত্র ভারতভূমিতে পাহাড়ের কথা থাকলেও এ সবের একান্ত অভাব। হিমালয়ের প্রভাবকে অস্বীকার করা স্পর্শকাতর বালক কবির পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই অভিলাষে অনিবার্যভাবে এসেছে—'হিমক্ষেত্র, জনশূন্য কানন, প্রান্তর', 'গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন।' তাই 'অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা। তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।' হিন্দুমেলার উপহারের প্রথম চরণেই 'হিমাদ্রিশিখরে শিলাসন' পরি।' 'পূর্ণিমা রাত, চাঁদের কিরণ। রজত ধারায় শিখর, কানন'—এ বর্ণনা সম্ভবত কাল্পনিক নয়। এছাড়া 'পর্বত শিখর কানন', 'নিস্তব্ধ অচল', 'হিমালয়' প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগ প্রত্যক্ষদর্শনজাত। প্রকৃতির খেদ ২য় পাঠের সূচনায় দেখি 'বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা/অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে'। প্রথম পাঠেও আছে—'অদূরেতে দেখা যায়/উজল রজত কায়/গোমুখী হইতে গঙ্গা ওই বহে যায়।' 'উচ্চশির হিমালয়', 'গর্বভরা হিমালয়', 'তুষার মুকুট শিরে কীর পরিধান', 'জাহ্নবী উন্মত্ত পারা'—এ সব বর্ণনাও হিমালয়ের প্রত্যক্ষদর্শীর মানসফসল। 'প্রলাপে'র শুরুতেও তাই 'গিরির উরসে নবীন নিঝর'। ১১ ২৪ স্তবকেও আছে হিমালয়ের ব্যঞ্জনা। 'দিল্লি দরবারে' দেখি 'হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে', 'সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে', 'শুধাই তোমারে হিমালয় গিরি', 'হে গিরি অমর', 'ওগো হিমালয়' ইত্যাদি। আসলে হিমালয় সম্পর্কে বালক রবীন্দ্রনাথ যে গভীরভাবে জেনেছিলেন তারও প্রমাণ ১৪ আষাঢ় ১২৮০ (২৭ জুন ১৮৭৩) 'বক্রোটাশিখর' থেকে রাজনারায়ণকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়—'রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি' ইত্যাদি। প্রভাতবাবু স্বীকার করেছেন—'এই (হিমালয়) ভ্রমণের মধ্য দিয়া তিনি কি আহরণ করিলেন তাহা বলা সুকঠিন; কিন্তু অল্পকাল পরে তিনি যে সব কাব্যোপন্যাস বা কাব্যনাটক রচনা করেন, তাহার মধ্যে এই হিমালয় ভ্রমণের এই নির্জন বনের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে' (রেঃ জীঃ ১ পৃ ৪১)। কবিকাহিনী বনফুল ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ড—এই চারটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যেটি সর্বাগ্রে রচিত, সেই বনফুলের রচনাকাল হিমালয় ভ্রমণের পর। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন—'পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'বনফুল' নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম' (বিঃ পঃ, কার্তিক—পৌষ ১৩৫০)। তাই হিমালয়ের প্রভাব এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। সমুচ্চ হিমালয়ের মতই ভারতের অভ্রভেদী ইতিহাস ঐতিহ্যও উপরোক্ত রচনাগুলিতে স্বমহিমায় প্রকাশিত।

পক্ষান্তরে ভারতভূমিতে দেখি গিরি, ভূধর, শৃঙ্গ, পর্বত ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু হিমালয়ের স্বরূপ ও তার ভাবময়ী মহিমা ব্যঞ্জনা বা উপলব্ধির প্রকাশ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, ভারতভূমির হিমালয় যাত্রার পূর্বে রচিত। তাই 'ভারতভূমিতে পাহাড়ের স্বপ্ন আছে, পর্বতের অভিজ্ঞতা নেই, নেই 'উচ্চশির হিমালয়ে'র ছবি, অভ্রভেদী ভারতঐতিহ্যের মহিমা। তবে ভারতভূমির রচনাকাল কখন?

আমার ধারণা, ভারতভূমির ১৪ থেকে ২০ স্তবকে যে পাহাড়ের স্বপ্ন আছে তা সম্ভবত পিতা মহর্ষির হিমালয় ভ্রমণের সদ্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে শোনা এবং কবিকল্পনার দৃষ্টিতে দেখা। (১২৭৯ সালের শীতকালের প্রারম্ভে (১৮৭২ শেষভাগে) দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়-ভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন—কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে' (রেঃ জীঃ ১ পৃ ৩৭)। মহর্ষির ওপর হিমালয়ের প্রভাব ছিল ব্যাপক গভীর, আকর্ষণ ছিল দুর্বার। তাই প্রত্যাবর্তনের তিন মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় তিনি হিমালয় ভ্রমণে যাত্রা করেন। পিতার প্রভাব পুত্রে সংক্রামিত হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হিমালয় যাত্রার পেছনে মহর্ষির কোন আন্তরিক উৎসাহ বা উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য যে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং কল্পনার প্রসার ঘটানো, তা রবীন্দ্ররচনায় সমর্থন মেলে। কিন্তু পুত্রদের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার এবং মহর্ষির পুনর্যাত্রার পেছনে কোন্ উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করেছে? মহর্ষির তরফ থেকে পুত্রকে ভারতবর্ষ জানানো দেখানোর মনোভাব যেমন ছিল, তেমনি পুত্রের তরফের কোন আন্তরিক আগ্রহ, উৎসাহ বা কামনাও নিশ্চয় ছিল এবং সেটি উদগ্র হয়েছিল মহর্ষির ভ্রমণান্তের বর্ণনা শুনে—ভারতভূমির ১৪ থেকে ২০ স্তবক যার প্রতিফলন। অতএব এই সিদ্ধান্ত টানা অসঙ্গত হবে না যে, ভারতভূমির রচনাকাল ১৮৭২ সালের শেষভাগ থেকে ১৮৭৩-এর প্রথম তিন মাসের মধ্যে—অর্থাৎ হিমালয় দর্শনের পূর্বে।

আমার এ অনুমান যে নিছক কল্পনা নয় বিজ্ঞানসম্মত সত্য তা প্রমাণ করেছে বঙ্গদর্শন পত্রিকার কিছু সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ এগারো বছর বয়স থেকে বঙ্গদর্শন পড়তেন এবং পরবর্তী সংখ্যার জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতেন—'মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম।' তাঁর এ প্রতীক্ষা বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্যে হলেও তিনি তখন প্রধানত কবিতাই লিখতেন। সুতরাং

বঙ্গদর্শনের কবিতার প্রতি তাঁর দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক এবং যেহেতু এই সময়টিতে রবীন্দ্রনাথ 'মকশ' করে হাত পাকাচ্ছিলেন তাই প্রিয় বঙ্গদর্শনের কবিতাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া 'আষাঢ়ের নবজলধারার' সিঞ্চনে বালক কবির তৃষিত কবি মনে সৃষ্টি সুখের উল্লাস জেগে ওঠা খুবেই স্বাভাবিক। বাস্তবক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বঙ্গদর্শন শুরু থেকে প্রথম ন মাসে (বৈশাখ-পৌষ ১২৭৯ এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ১৮৭২ খৃঃ) প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতার শব্দ চরণ রীতি ও ভাবের দ্বারা ভারতভূমি প্রভাবিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রাবণের 'উষা'র ভাব (কবে ভারতের এ দুখ শর্বরী। হবে অবসান, হে সুর সুন্দরী) ভাদ্রের 'দেবনিদ্রা'র শব্দও চরণ (দেবপুরন্দর দিবাকর শশধর অবনী; জ্বলিছে তপন গগন প্রাঙ্গনে; ছিঁড়িতে বন্ধন শৃংখল তার') কার্ত্তিকের 'বায়ু'এর শব্দ ও রীতি (পর্বতকন্দর চলঢল চলচল) অগ্রহায়ণের 'সাবিত্রী'র শব্দ (নিস্বনে) ও রীতি (১১ ও ১২ স্তবকে পুনরাবৃত্তি) এবং পৌষের 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা'র সর্বাধিক প্রভাব—বিষাদের সুর অন্ধকারে আলোর পিপাসা স্বাধীনতার আস্বাদ বাঁশির ব্যঞ্জনা—'ফিরে কি আবার সেদিন হবে', 'নাহি সে বসন্ত' 'বাজে না সে বীণ বাজে না বাঁশি', 'আর কি উহারে পাবি না ফিরে' ইত্যাদি। কিন্তু পরের মাস (মাঘ) থেকে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কোনো কবিতা ভারতভূমির ওপর প্রভাব বিস্তার করেনি। তাই মনে হয় পৌষ বা মাঘ মাসেই (অর্থাৎ ১৮৭২ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ খৃঃ) ভারতভূমি রচিত হয়।

ভারতভূমি রচনাকাল সম্পর্কে আমার এই সিদ্ধান্ত ডঃ সুকুমার সেনের অনুমানকে নিশ্চিত বলে প্রমাণ করতে সহায়তা করে—'অনুমান হয় দ্বিজেন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রকাশার্থ বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়াছিলেন' (বাঃ সাঃ কথা '৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন')। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

হিমালয় ভ্রমণের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশ প্রেমের কবিতা রচনা করতেন তার সুনিশ্চিত প্রমাণ—'ভারতমাতা' ও পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং সেই স্বদেশীয়ানার যুগে 'ভারতভূমি' রচিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

বাল্যরচনায় মিল ও অমিল ছন্দ।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর রচনাগুলি মিল ও অমিল ছন্দের বিবর্তনের দিক থেকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নীলখাতা ও লেটস ডায়েরীর যুগে মিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার। (২) হিমালয় ভ্রমণের পর কিছুকাল অমিল পয়ার ছন্দে অনুবাদ বা কাব্যরচনা। (৩) পুনরায় মিত্রাক্ষরে কবিতা রচনা। (৪) অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষরে একই সঙ্গে কাব্য রচনা।

ভারতভূমি প্রথম যুগের রচনা বলে মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। অভিলাষ দ্বিতীয় যুগের রচনা বলে মিলহীন পয়ারে রচিত। সুতরাং **রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত প্রথম রচনা "অভিলাষ' কেন মিলহীন পয়ারে রচিত—মিত্রাক্ষরে নয় ভারতভূমি প্রতিষ্ঠাই সেই সন্দেহকে দূর করবে, খণ্ডিত রবীন্দ্রকাব্য সূচনা প্রবাহকে করবে অখণ্ড।**

কিন্তু একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও অস্পষ্ট। হিমালয় ভ্রমণের পরে কেন রবীন্দ্রনাথ মিলহীন পয়ার বা অমিত্রাক্ষরে কাব্যরচনা শুরু করেন? এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ওপরে মধুকবির প্রভাবের মাত্রা তথা ভারতভূমির রচনাকালের সঠিক সময় নির্দেশ।

এ সম্পর্কে আমার ধারণা—ন' বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ বধ কাব্য পড়তেন (জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি) এবং এই কাব্যের প্রতি তাঁর মন ছিল বিরূপ। কিন্তু হিমালয় প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরেই ২৯ জুন বালক কবি প্রত্যক্ষ করলেন বাংলার পঙ্কজ রবি গেলেন অস্তাচলে। জনপ্রিয় ধূমকেতু কবির প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি সেদিন কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তৎকালীন প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে তা জানা যাবে (দ্রঃ—'শতবর্ষ আগে দুই বাংলার চোখের জলে ভেজানো একটি দিনের স্মরণে' দৈনিক যুগান্তর ২৯ জুন ১৯৭৩)। তার চেয়েও বড় কথা—পিতা দেবেন্দ্রনাথ যাঁর সমর্থক রাজনারায়ণ যাঁর সহপাঠী ও সমালোচক (কালিদাস নাগের প্রবাসীর প্রবন্ধ পৃঃ ৪২২) তাঁর বিয়োগ ব্যথা ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলে নিশ্চয়ই পৌঁচেছিল বালক কবির হৃদয়কে করেছিল স্পর্শ। বালক কবির চোখে মধুসূদন দেখা দিলেন ব্যাকরণবিহীন রসদৃষ্টিতে। তাই ভারতভূমিতে শুধু মধুসূদনের শব্দ চরণ ইত্যাদির প্রভাব ছিল, অমিত্রাক্ষরের আন্তঃমহিমা এবার তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করলেন। তাই এই সময় ম্যাকবেথের অনুবাদে বালক কবি অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করলেন (দ্রঃ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃত দুটি পংক্তি এবং বিঃ পঃ ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা পৃঃ ৬৫৫)। অমিত্রাক্ষরকে কুমারসম্ভবের উপযুক্ত বাহন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কুমারসম্ভবের মদনভস্ম এবং অভিলাষ রচিত হল মিলহীন পয়ারে অনেকটা একজাতীয় ভঙ্গিতে। হিন্দুমেলার উপহার আংশিক মিল আংশিক মিলহীন। বলা বাহুল্য এর পর অন্ত্যমিলের দুর্নিবার আকর্ষণে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তিপরীক্ষায় পরাজিত হয়ে (ভারতী ১২৮৮ মাঘ—গৌরিশছন্দ সমালোচনা) তিনি মিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যাবর্তন করেন বটে কিন্তু সময়টি ভারতভূমি প্রকাশের পরবর্তীকালে। এ থেকে প্রমাণিত হয় **রবীন্দ্র ছন্দরীতির ক্রমবিবর্তনের ধারায় ভারতভূমির স্থান অভিলাষেরও আগে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ** পরীক্ষারও বহু আগে।

এ সমস্ত যুক্তিকে অস্বীকার করে কেউ যদি প্রমাণের চেষ্টা করেন যে ভারতভূমি অভিলাষের পরে রচিত তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন—ভারতভূমি প্রকাশকালের বড়জোর দু-তিন মাস আগে অভিলাষ রচিত হয় একথা রবীন্দ্রসমালোচকরা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। তাহলে ভারতভূমি কবিতাটি যদি প্রকাশের মাত্র দু মাস বা এক মাস আগে রচিত হত তবে কবিতাটি বঙ্গদর্শন মাঘ ১২৮০ সংখ্যায় প্রকাশ করা কোন মতে সম্ভব হত না। কারণ মাঘের শুরুতে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তা মুদ্রণ, 'কোন কোন স্থানে সংশোধন' বাঁধাই ইত্যাদি কারণে বঙ্কিমচন্দ্র আরো কিছু সময় নিয়েছিলেন। সুতরাং **স্বচ্ছদৃষ্টিতে রচনাকালের বিচারে ভারতভূমির স্থান সন্দেহাতীতভাবে রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম।**

।। **সিদ্ধান্ত** ।।

অভিলাষের 'অনন্ত অপার' 'বন্ধুর পথ' 'পান্থশাল' অতিক্রম করে 'হিমক্ষেত্র জনশূন্য কানন প্রান্তর' পেছনে ফেলে পর্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া' 'ভারতভূমি'র সন্ধান পাওয়া গেছে—যেখানে—'কতদিন দিবাকর উদিছে গগনে রক্তিম বরণ ধরি।' কিন্তু সে রবির সন্ধান কে রাখে? 'প্রথম আলোর চরণধ্বনিতে যা রক্তিম প্রথম প্রকাশের সলজ্জ বেদনায় যা আরক্ত সেই রবি শতাব্দীকাল ধরে পরিক্রমারত। 'রঞ্জন করেছে যত ভারত সন্তানে।' শুধু সেই ভারতেরই সন্তান একমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেই সূর্য নাহি লাগে মনে?' ভারতভূমির প্রথম স্তবকে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তা যেন আমাদের দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর সত্য হয়ে আছে আজও। জানি না বালক কবির কাছে এও সেই এন্ড্রুজ-কথিত 'তারহীন বার্তা'র মত ছিল কিনা।

ভারতভূমিকে রবীন্দ্ররচনারূপে স্বীকৃতি দিলে অবিশ্বাস করতে হয় ব্রজেনবাবুর প্রমাণবিহীন মন্তব্যকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ব্রজেনবাবুর দুরূহ সাধনা ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এমন কিছু প্রমাণের কথা শুনেছি এবং দেখেছি যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ব্রজেনবাবু তাঁর রচনার সত্যকে বিকৃত করেছেন অথবা যা লিখেছেন তা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—ব্রজেনবাবু অমৃতবাজার পত্রিকার ১০ জুন ১৮৭২ তারিখে গৌহাটি নাট্যালয়ের ওপর একটি সংবাদ প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' (চতুর্থ সংস্করণ ৬৯ পাতা)। কিন্তু ঐ তারিখে সাপ্তাহিক অমৃতবাজারের কোনো সংখ্যাই

প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছিল তিন তার চারদিন আগে এবং তিন দিন পরে। কিন্তু গৌহাটি নাট্যালয়ের কোনো খবর উনিশ শতকের মধ্যে কোনদিনই অমৃত-বাজারের পাতায় প্রকাশিত হয়নি সে সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত।

ভারতভূমির স্বীকৃতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয় বাংলা সাহিত্যেও তার প্রভাব হবে ব্যাপক। 'কবিতাটি অসন্দিগ্ধভাবে বালক রবীন্দ্র-নাথের বলে প্রমাণ হলে এর মধ্যে পাব বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর সহানুভূতি ও অন্ত-দৃষ্টির পরিচয়।' সে যুগের কবিদের কড়া সমালোচক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁর পত্রিকায় প্রথম কবিতা ছাপার তাৎপর্য নতুন করে গবেষণার দাবী রাখে। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় বলা যায়—'রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে।'

শুধু সাহিত্যে নয় সংবাদপত্রেও। প্রখ্যাত সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতভূমির স্বদেশপ্রেমের তৎকালীন রাজনৈতিক মূল্য বিশেষ তাৎপর্যময়। কবিতার উপর সম্পাদকীয় রচনা সর্বযুগে সর্বকালের এক অভিনব নজির। অমৃতবাজারে মুদ্রিত ভারতভূমি কবিতাটি বঙ্গদর্শন থেকে নেওয়া প্রথম সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি। এ থেকে অমৃতবাজার ও বঙ্গদর্শনের শত বিরোধের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে সম্পাদক শিশির-কুমার ঘোষের সার্বভৌম দৃষ্টি ও মহত্ত্বের পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতভূমি থেকে সাহিত্যিক বঙ্কিমের রস-দৃষ্টি ও সম্পাদক বঙ্কিমের মনোভাব এবং সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের সাহিত্যিক দৃষ্টি ও সম্পাদকরূপে পরাধীন দেশ ও জাতির প্রতি নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম উষার প্রথমচ্ছটায় অপরূপ রবিকে চিনে নিতে সত্যদ্রষ্টা সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষের একটুকু দেরী হয়নি! আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মত শুধু বালকের রচনা বলিয়া তিনি সম্পাদকীয় রচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমার ঘোষেরও প্রথম অপূর্ব আবিষ্কার!!

ভারতভূমির কাব্যমূল্য হয়তো সামান্যই কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও ভারত ইতি-হাসের প্রেক্ষাপটে ভারতভূমিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিলেন যুগ-প্রতিভূরা—বিশ্বকবির 'কাঁচা হাতের প্রথম আলপনার' যোগ্য সমাদর বটে। 'কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসে এই কবিতাটির আসন সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক'—অভিলাষ প্রসঙ্গে ব্রজেনবাবুর এই মন্তব্য (শঃ চিঃ অগ্রঃ ১৩৭৬) আজ ভারতভূমি প্রসঙ্গে মর্মান্তিক সত্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রকাব্যধারায় ভারতভূমির সাহিত্যিক মূল্য প্রসঙ্গে বলা যায়—'কাঁচা বয়সে পরের লেখা মকশ করে আমরা অক্ষর ফেঁদে থাকি বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ পেতে থাকে' (সূচনা সন্ধ্যা-সংগীত)—সেই স্বাভাবিক ছাঁদের রাবীন্দ্রিক ঢঙ কি আমরা ভারতভূমির মধ্যে পাই না?

সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষের অন্ধকারে রবীন্দ্র-লেখনীর উৎসমুখ থেকে যে ভাবমন্দাকিনী ধারা ঝরে পড়েছিল, তা অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় একদিন বাংলাসাহিত্যকে ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রবনস্পতিকে জানতে হলে চিনতে হবে তার মূল বা শিকড়কে, বুঝতে হবে সুপ্ত বীজের অন্তর্নিহিত ক্রিয়াকলাপ। সন্ধ্যাসংগীতকে যদি 'কাঁচা আমের গুটির' সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে ভারতভূমিকে বলা যায় আমের বোল। ফল ধরেনি বলেই তার সাহিত্যের বাজারে দাম কম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-সাধনা যদি অখণ্ড ও সত্যের সাধনা হয়, তবে প্রথম প্রকাশিত রচনা ভারতভূমিকে 'কাপিবুক' বলে দূরে সরিয়ে রেখে রবীন্দ্র-জীবনচর্যার খণ্ডিত ভগ্নাংশ ও অসম্পূর্ণ-তাকে নিয়েই বা কেন আমরা গৌরব করবো? রবীন্দ্রজীবনীকার তো রবীন্দ্র-বিরোধিতা করে স্পষ্টই বলেছেন—'সাহিত্য সৃষ্টির এই অরুণযুগকে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা হইতে বর্জন করিবার অধিকার আমাদের নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভা উন্মেষের সূচনা হয় এই যুগেই।' ভারতভূমি আরম্ভের আরম্ভ রবীন্দ্র-রচনাবলীর নেপথ্য ভূমিকা, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্বে নেপথ্যবিধান। রবীন্দ্রনাথের এই সর্বপ্রথম রচনাকে কেন্দ্র করে যে ধোঁয়া ও কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে, তার সঠিক সমা-ধান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে প্রথম গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছেন (রচনা প্রকাশ পৃঃ ৭৪-৭৫)। কিন্তু প্রথম প্রকাশিত কবিতার কথা কবি কোথাও বলেননি। সুতরাং ভারতভূমিকে প্রথম প্রকাশের গৌরব দিলে অ-রাবীন্দ্রিক কিছু করা হবে না, বরং রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে ছন্দের বিবর্তন, মহাকবিদের প্রভাবের ক্রম, রবীন্দ্র-মানস বিবর্তন ধারা ইত্যাদির যেমন নব-মূল্যায়ন হবে, তেমনি হিমালয় ভ্রমণের পূর্বে রচিত বলে গণ্ডীবদ্ধ বালক-কবির মানসিকতা, স্বদেশ চিন্তায় বাড়ীর প্রভাব, কবিতারচনার ক্ষমতা ও বাল্যপ্রতিভা ভাষা-ছন্দের ওপর আধিপত্য ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। সর্বোপরি একটি অজ্ঞাত তথ্যের শূন্যস্থান পূর্ণ হবে, সত্য হবে সুপ্রতিষ্ঠিত, 'ভাবের ঘরে ডাকাতি' করা সম্পত্তির পুনঃসমর্পণ করা হবে।

'ভারতভূমি'র শতবর্ষপূর্তি বছরে দ্বাররুদ্ধ-করা সঞ্চিত ভ্রমের আবর্জনারাশির মধ্যে থেকে রবীন্দ্র-বনস্পতির অঙ্কুরোদ্গমের অজ্ঞাত ইতিহাসের রহস্য ব্যক্ত করেছি। শতাব্দীর জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে মনে জাগে শুধু একটি প্রশ্ন—ভারতভূমিরই একটি স্তবক—

এ রাত কি না পোহাবে,
এমনি রহিয়া যাবে,

হবে না কি 'সূর্যোদয়' ভারত আকাশে?
অন্ধকার রহিবে কি 'ভারত আবাসে'?

আশা করি সত্যের প্রবেশ[illegible] উন্মুক্ত হবে—শিব ও সুন্দর তার [illegible] হবে কিনা জানি না।

সমাপ্ত

গত ৪ জুলাই সংখ্যার নিবন্ধের শেষাংশে যৌগিক স্বরধ্বনি ঐ-কার প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা 'অভিলাষ' প্রসঙ্গে পড়তে হবে, 'হিন্দুমেলার উপহার' প্রসঙ্গে নয়। —লেখক

মৃত্যু এবং মৃত্যু

মানস বন্দ্যোপাধ্যায়
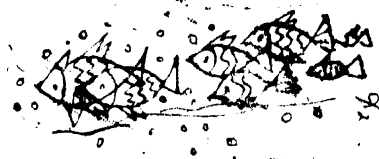
প্রায় [illegible] আগের কাহিনী। লন্ডন শহরের একটি জনবহুল এলাকা। শীতের সকাল। চারিদিক ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন।

ওয়েস্টমিনস্টার ব্রীজের ওপর একটি ছাই রঙের গাড়ি এসে দাঁড়াল। তারপর ধীরগতিতে ব্রীজ ছাড়িয়ে ওপারে একটি দোতলা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে থামল। যে লোকটি গাড়ি থেকে নেমে এল তার পরনে লং কোট, মাথায় টুপি। এদিক ওদিক চেয়েই লোকটি একতলার দরজায় কলিং বেলের ওপর হাত রাখল অনেকক্ষণ—কোন সাড়া এল না। তারপর চাপা স্বরে 'অ্যামিস' বলে দুবার ডাকতেই এক সুন্দরী স্বর্ণকেশী বেরিয়ে এল। কয়েক সেকেন্ড কথোপকথন চলল। তারপর দুজনেই ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। লন্ডনের সময় তখন সকাল সাড়ে সাতটা। আধঘন্টা পরেই লোকটি আবার বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে মোটরে উঠল। ঘন কুয়াশা ভেদ করে গাড়িটি ছুটে চলল। সমস্ত ঘটনাই খুব দ্রুত এবং রহস্যজনকভাবেই ঘটে গেল। কেউ জানতে পারল না

কি ঘটল। শুধুমাত্র এক দরিদ্র রুটি বিক্রেতা ছাড়া। খানিকটা দূরে থেকে সে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করছিল। একটা অস্ফুট আর্তনাদও তার কানে পৌঁছেছিল। ভয়ে তার সমস্ত শরীর হিম হয়ে যাবার উপক্রম। প্রচণ্ড শীতে টেমস নদীর জলও যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। রুটিবিক্রেতা কিন্তু ভয়ে এ ঘটনার কথা কাউকে বলতে পারলো না। পরদিন প্রত্যুষে ও পথ দিয়ে যাবার সময় তার কৌতূহল হল। ধীরে দরজা ঠেলে সে ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। তারপরই অকস্মাৎ একটি বিরাশি সিক্কার ঘুঁষিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের চলাচল শুরু হলো। পুলিশ টেমস নদীর ধারে জমাটবাঁধা বরফের ওপর জনের মৃতদেহ দেখতে পেল। জনের অপর এক পাটি ছেঁড়া জুতো পাওয়া গেল মিস অ্যামিসের বাড়ির দরজার সম্মুখেই। দরজার কাছে খানিকটা জায়গা রক্তে ভেজা। সন্দেহক্রমে পুলিশ ভেঙে ফেললো অ্যামিসের বন্ধ দরজা। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র এদিক ওদিক ছড়ানো। ইতস্তত রক্তের দাগ বাথরুম পর্যন্ত চলে গেছে। বাথরুমে পুলিশ আবিষ্কার করলো একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারী মৃতদেহ। অ্যামিসের ডান হাতে সামান্য ক্ষত। মুখের ভেতর এক টুকরো কাপড় গোঁজা। স্তন দুটির ওপর খানিকটা আঁচড় কাটার দাগ। হত্যা করার পূর্বে জোর করে তার দেহ ভোগ করার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

কিন্তু হত্যাকারী কে? হত্যার পেছনে তার উদ্দেশ্য কী? এ চিন্তা ভাবিয়ে তুললো পুলিশকে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অনুসন্ধান চালাল। মিস অ্যামিসের বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে শুধু রক্তমাখা কোষ সমেত একগোছা চুল পাওয়া গেল। আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণ তেমন খুঁজে পাওয়া গেল না। অ্যামিসের মুখে গোঁজা কাপড়ের টুকরো (রুমালটি) পুলিশ নিয়ে গেল। পুলিশের ও সাধারণ লোকের ধারণা হয়েছিল রুটি বিক্রেতা জনই হয়তো খুন করার পর আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু জনের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেল তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। তাছাড়া অ্যামিসের গৃহের রক্তমাখা কালো চুল পরীক্ষা করে দেখা গেল সে চুল জনের নয়।

জনের গলার আঙুলের ছাপ তুলে নিলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। চুলেরও অনুসন্ধান চললো। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা জানালেন হত্যাকারী স্থানীয় লোক নয়। কালো কোঁকড়ানো তার চুল। ডান হাতের তর্জনীর ডগায় ক্ষত। সে নিজে হয় কোন ময়দা কারখানার মালিক নয়তো শ্রমিক। চারিদিকে পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনুসন্ধান চললো। ময়দা কারখানাগুলোতে পুলিশের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হোল।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা চুলের কোষে মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষায় ময়দার ক্ষুদ্রাংশ দেখতে পেয়েছিলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হোল। সমস্তে বর্ণনা হুবহু মিলে গেলেও আঙুলের ছাপ কারো সঙ্গেই মেলানো গেল না।

পুলিশ রুমালের চিহ্ন নিয়ে শহর ও শহরতলির সমস্ত লন্ড্রী মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। অবশেষে ওয়েস্টমিনস্টার শহরেই ঐ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু লন্ড্রী মালিক এ সত্ত্বেও হত্যাকারীর কোন হদিশ দিতে পারলো না।

আট মাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল, ওয়েস্টমিনস্টার শহরের সেই লন্ড্রী মালিক খুন হয়েছে। তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল এক কুখ্যাত পল্লীর অন্ধকার গলিপথে এক সরাইখানার প্রবেশপথে। সন্ধ্যে থেকেই গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ছুটেছিল দমকা হাওয়া। ধস্তাধস্তির ফলে মৃতদেহ কর্দমাক্ত। পুলিশ এখানে অপরাধীর জুতোর ছাপ আবিষ্কার করলো। সম্পূর্ণ গলিপথেই পাশাপাশি ডান ও বাঁ পায়ের একটি করে দুরকম ছাপ পাওয়া গেল। এই ছাপ পুলিশকে ভাবিয়ে তুললো। হত্যাকারী তাহলে দুজন? কিন্তু সম্পূর্ণ গলিপথেই ডান পায়ের একই ধরনের একটি ও বাঁ পায়ের ভিন্ন আকারের অপর একটিমাত্র ছাপ কেন? ডান পায়ের সমআকারের বাঁ পা এবং বাঁ পায়ের সমআকারের অপর একটি ডান পা কোথায়?

বিশেষজ্ঞরা জানালেন হত্যাকারীর একটি পা ত্রুটিপূর্ণ। বাঁ পায়ের জুতোর ছাপ গভীর ও স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁরা জানালেন হত্যাকারীর বাঁ পা খানিকটা ছোট এবং সে বাঁ দিকে ঝুঁকে চলে।

দুদিন বাদেই অপরাধী ধরা পড়লো। ওয়েস্টমিনস্টার থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক গ্রামে। ডেভিডের ডান হাতের তর্জনীতে ক্ষত পাওয়া গেল। আঙুলের ছাপ চুল হুবহু মিলে গেল। ডেভিড অপরাধ স্বীকার করে। সে নিঃসংকোচে জানায় মিস অ্যামিস তার প্রেমিকা ছিল। তার নিঃসঙ্গ জীবনে অ্যামিসের আবির্ভাব মাত্র দু বছর হল। বিবাহের চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েও অ্যামিস পরবর্তীকালে তার খোঁড়া পায়ের জন্য তাকে প্রত্যাখান করে। ইতিমধ্যে অ্যামিস বহু ধনী-সন্তানকে প্রেম ও দেহ বিলিয়েছে। তাই সমস্ত অপমানের সে নির্মমভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে। একমাত্র সাক্ষী রুটিবিক্রেতা জন-এর খুনকেও সে স্বীকার করে। খুনের পরেই সে গা ঢাকা দেয় এবং প্রায় ছ মাস পর আবার সে স্বস্থানে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে তার শহরতলীর ময়দার কারখানা জলের দামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে। পঁয়ত্রিশ বছরের এই ইহুদি যুবক আরো জানায়, কাপড় কাচার ব্যাপারে বহুদিন পর আবার লন্ড্রী মালিক পিটারের সংস্পর্শে এলে তার ওপর পিটারের সন্দেহ জাগে। এর পর অযাচিতভাবে পিটার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করার চেষ্টা করলে ডেভিডের সন্দেহ হয়। এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে পিটারের আড্ডাস্থল সরাইখানায় সে ছদ্মবেশে অপেক্ষা করে এবং পিটার মত্ত অবস্থায় কাউন্টারে টাকা চুকিয়ে দিয়ে গেলে ডেভিড সরাইখানা থেকে বেরিয়ে অন্ধকার গলিপথে ওৎ পেতে থাকে। তারপর......

তিনটি খুনের আসামী ডেভিডকে কিন্তু আদালত শাস্তি দিতে পারেনি। রায় ঘোষণার অপেক্ষা না রেখেই ডেভিড কাঠগড়ায় ঢলে পড়ে। বিবৃতি শেষ হবার পূর্বেই সে ঘাড় কাত করে জামার কলার মুখ দিয়ে চুষতে থাকে। তারপর তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর কোলে আছড়ে পড়ে।

নারীর প্রগতিতে জার্মানী

মহিলাদের প্রতি সমদৃষ্টি কোন দাবী নয়, সরকারের কাছে এটা কোন প্রার্থনাও নয়; এটা একটা অধিকার—ডঃ ক্যার্থরিনা ফাকে সরবে ঘোষণা করেছেন ফেডারেল জার্মান সরকারের যুব, পরিবার ও স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডঃ ফোকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষকে উদ্‌যাপন করতে গিয়ে প্রথমে ঘোষণা করেছেন জার্মানী ও সমগ্র বিশ্বে মহিলাদের অবস্থার উন্নতিসাধনে সরকার, স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই উন্নত মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রীমতী ফোকে আরও বলেছেন, মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের শক্তিকে জোরদার করতে পারলে পুরুষদের অনেক বেশী উপকার হবে। সমাজে যেসব ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে মহিলারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছেন সেসব ক্ষেত্রে সমাজের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। তাঁর চিন্তাধারাতে আরও প্রকাশিত হয়েছে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পেয়ে মহিলারা বেশী আত্মবিশ্বাসী এবং পুরুষেরাও হয়ে উঠেছেন অধিক চিন্তাশীল। আমাদের একত্র জীবনধারায় এই আত্মবিশ্বাস ও চিন্তাশীলতার সম্প্রসারণের ফলে সহযোগিতা, অধিকতর অংশীদারিত্বমূলক মনোভাব অনেক বেশী মানবিক হয়ে উঠেছে।

ফেডারেল জার্মান সরকার মহিলা ও পুরুষের সুযোগ-সুবিধায় সমতা রাখতে আগ্রহী। সমতার আইন অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও শিল্প সংস্থায়, সমাজে এবং রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী বিভিন্ন সংস্থায় মহিলারা এখনও অনেক কম সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পুরুষ কর্মীদের তুলনায় মহিলা কর্মীরা এক-তৃতীয়াংশ কম উপার্জন করেন এবং প্রশিক্ষণ লাভের ব্যাপারেও পিছিয়ে থাকেন.

জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করতে হলে মহিলাদের সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব নয়: পুরুষের পাশাপাশি অধিকাংশ কাজেই মেয়েরা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। কেবলমাত্র নির্মাণকারী শিল্পেই ২৯ লক্ষ মহিলা নিযুক্ত আছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে ১৭ লক্ষ ও পরিসেবামূলক শিল্পে ২০ লক্ষ মহিলা কাজ করছেন ভবিষ্যতে মহিলাদের শ্রমের এই চাহিদা আরও বাড়বে। ১৯৯০ সালে প্রায় ১২ লক্ষ মহিলাকর্মীর সংখ্যা আরও বাড়বে এরকমই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

জার্মানীর অর্থনীতির উন্নতিতে মহিলাদের স্থান যত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভারতেও অর্থনৈতিক মান উন্নতিসাধনে মহিলাদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। যদিও জার্মানীর মত এদেশের মহিলারা অত সংখ্যায় কর্মে লিপ্ত নন। পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল রাখতে অথবা পুত্র-কন্যাদের যথাযথ শিক্ষাদান করে সুস্থ সংসারজীবন পালন করতে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা আমাদের দেশে অনেক সংসারেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন আরও বাড়বে এটাই মনে হয়। শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে আমাদের মেয়েরা পিছপাও নন তবুও কর্মস্থানের সঙ্কটের জন্য পুরুষের মতো মহিলারাও বেকার হয়ে পড়ছেন। কর্মস্থানের সঙ্কটের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও মহিলা-কর্মীদের মধ্যে একটা সমতা রক্ষার প্রচেষ্টা করতে হবে। সমতারক্ষার প্রস্তাব যদিও এরি মধ্যে উঠেছে আইনে। আমাদের দেশে জার্মানীর মত পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সহযোগী মনোভাব কর্মক্ষেত্রে ও সংসার-জীবনে গড়ে উঠতে পারলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব। আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষে—এই সহযোগী মনোভাবকে আরও জোরদার করে আমাদের সামগ্রিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে মোট ১৬০ কোটি চাকুরীজীবীর মধ্যে ৫৬-২ কোটি মহিলা। ২০০০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা রক্ষণশীল গোষ্ঠীর হিসাব অনুসারে বেড়ে দাঁড়াবে ৮৫ কোটি মহিলা যাঁরা বিশ্বের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার কার্যকলাপে ও উন্নতিসাধনে নিয়োজিত থাকবেন।

গত ৯ জানুয়ারী বন-এ ফেডারেল প্রেসিডেণ্ট শীল আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের উদ্বোধনী সভায় ঘোষণা করেছেন আজকের দিনে গণতান্ত্রিক চেতনায় পুরুষ বা স্ত্রীর মধ্যে কোন লিঙ্গবিশেষের পার্থক্য থাকবে না। মানব সমাজে এমন কোন শুভ কাজ নেই যা মহিলারা করতে পারেন না এমন ধারণায় নিশ্চিন্ত হতে হবে।

ফেডারেল শ্রম দপ্তরের প্রধান ইয়োসেফ সিটংগার নতুন নতুন চিন্তাভাবনার আবিষ্কার করে মহিলাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলাকে একটি মহৎ কাজ বলেছেন। এ ব্যাপারে জার্মানীতে কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। জার্মানীর ২৬টি মহিলা অ্যাসোসিয়েশনের 'ছাত্র সংস্থা', 'মহিলা পরিষদ' —বহু অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে।

আনমেরী রেনগার বুন্দেসটাগের (জার্মান লোকসভা) সভাপতি জার্মানী মেয়েদের কৃতিত্বের কথায় বলেছেন অচাকুরীজীবী গৃহস্থ বধূদের বৃদ্ধবয়সের ভাতার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। সন্তানের অসুস্থতায় বেতনসহ বাবা-মায়ের একজনকে ছুটি দিতে হবে। একজন যদি ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর নাগরিক ও পিতামাতার আরেকজন যদি বিদেশী হন সে ক্ষেত্রে জাতীয়তা নির্ণায়ক আইনগুলিকে নবজাতকের ক্ষেত্রে উদার করতে হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে বৈবাহিক তথা পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করে স্ত্রী পুরুষের মধ্যকার প্রভেদবৃদ্ধিকারী ধারাগুলির সম্পূর্ণ অবসান করতে হবে।

আগামী অক্টোবরে জি ডি আরের রাজধানী বার্লিনে নারীবর্ষের বিশ্ব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। শান্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রামে নতুন নতুন শক্তি যুক্ত করে সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই বিশ্ব কংগ্রেসের লক্ষ্য।

উইমেন্স কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল প্রযোজিত আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষের সাধারণ সভা গত ১৭ জুন শ্রীমতী রেণুকা রায়ের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদিকা শ্রীমতী মীরা নাগ কার্যবিবরণী রিপোর্ট থেকে সংক্ষিপ্তভাবে কার্যাবলীর বিবরণ দেন।

এবছরের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষের উদ্বোধনী সভায় এই সংস্থা অসহায় বৃদ্ধ মহিলাদের জন্য একটি আবাসগৃহ স্থাপিত করার ও গ্রামীণ উন্নয়নের যে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এই সকল ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে ২১ জুলাই একটি চ্যারিটি শো-এর আয়োজন করা হয়েছে। সংগৃহীত সমস্ত অর্থ বৃদ্ধদের আবাসগৃহ ও গ্রামীণ উন্নয়নের পরিকল্পনায় ব্যয় করা হবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রীমতী লীলা রায় এবং শ্রীমতী উষা থাম স্মারক গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ও অর্থ-সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন। এই সংস্থার সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রীমতী বিজয়া রায়ের (শ্রীসত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী) উদ্যোগে অভিনেত্রী সন্ধ্যা 'রাজকুমারী' নাটকটি বিনাপারিশ্রমিকে মঞ্চস্থ করে অর্থসংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন।

পল্লী অঞ্চলে ইতিমধ্যে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জেলায় জেলায় এই সংস্থা কয়েকটি কমিটিও গঠন করেছে। গ্রামকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকটি শিবির স্থাপনের আয়োজন করা হচ্ছে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর নেতৃত্বে মহিলা কর্মচারীর সমস্যা সম্বন্ধে একটি সভা আগামী ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

জয়া চৌধুরী

আমার 'রূপসীর খাতার' পাঠিকাদের ধন্যবাদ। আপনাদের 'রূপসীর খাতা' পড়ে ভাল লাগছে ও উপকার পাচ্ছেন জেনে খুশী হলাম। আপনাদের বহু প্রশ্ন আমার কাছে জমা হয়েছে। কিন্তু একসঙ্গে বেশী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না বলে কিছু মনে করবেন না। আমি যেমন যেমন পারি তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। তবে এর মধ্যে এমন অনেক প্রশ্ন এসেছে যা হয়তো একটু আধটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু-তিনজন করেছেন। সেই ক্ষেত্রে আমি বারে বারে একই উত্তর আর দিচ্ছি না। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে নেবেন। এছাড়া আরও এমন প্রশ্ন আসে যার সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা আগে করা হয়ে গেছে। সেগুলি যদি একটু দয়া করে পড়ে নেন তাহলে ভাল হয়।

এবারে চিঠির উত্তর দিচ্ছি। প্রথম চিঠি অলকা দত্তের চব্বিশ পরগণা থেকে লিখেছেন। আপনি জানতে চেয়েছেন কি করলে আপনার মুখের রঙ দেহের চেয়ে ভাল হয়—এবং চোখের চারপাশে ও থুতনীর নীচের দিকে কালো তেলতেলে হয় তা কিভাবে ওঠানো যায়।

প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়। শশা গোল গোল করে কেটে মুখের ওপর লাগিয়ে শুয়ে থাকুন তারপর আস্তে আস্তে গোল করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করুন। চোখের নীচে ও থুতনীর নীচে বিশেষ করে শশা চেপে রাখুন ও শশা ঘষুন। এভাবে পাঁচ-সাত মিনিট করে তারপর মুখ ঠাণ্ডাজলে ধুয়ে ফেলুন। এরপর যেটা সবচেয়ে সহজ সেই পদ্ধতিটা লিখছি। মুশুরীর ডাল বাটা তাতে দু-চার ফোটা মধু ও দুধের সর দিয়ে ফেটিয়ে সেটা বেশ করে মেখে মুখ পরিষ্কার করে নিন। তারপর সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। তারপর কোন ভাল মুখ পরিষ্কার করার মিল্কে তুলো ডুবিয়ে তা দিয়ে বেশ করে মুখ মুছে ফেলুন এবং শেষে গোলাপ জলে তুলো ভিজিয়ে মুখের ওপর থুপে থুপে দিয়ে মুছে নিন। দেখবেন এতে মুখ কতো মসৃণ ও সুন্দর লাগে। তবে শীতকালে জেরোলীন সহযোগে মেক-আপ করে নিলে আরও ভাল হয়।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল চুল নিয়ে। চুল পাতলা আর কোঁকড়া তাছাড়া ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে—কি করা যায়।

আপনার চুলের যা বিবরণ দিলেন তাতে মনে হচ্ছে চুলের জাত বিশেষ রকমের খারাপ। প্রতিদিন রাত্রে অলিভ তেলে একটু অর্থাৎ বড় চামচের দুই চামচ অলিভ তেলে অন্তত গোটা পাঁচ-সাত মেথি ফেলে গরম করে নেবেন। তারপর সেটা চুলের গোড়ায় বেশ করে ম্যাসাজ করে চুল টেনে বেঁধে নেবেন। পরে কালো চওড়া ফিতে দিয়ে বিনুনী করে জড়িয়ে নেবেন। সেটা এমন-ভাবে করবেন যাতে একটাও চুল বাইরে না থাকে। সকালে চুল খুলে বেশ করে পরিষ্কার চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে নেবেন। তারপর মাথা শ্যাম্পু করে ভেজা চুলে তোয়ালে জড়িয়ে সোজা করে রেখে দেবেন। কিছুক্ষণ পরে চুল খুলে চিরুণী দিয়ে বা ব্রাশ দিয়ে টেনে টেনে চুল আঁচড়ে নেবেন। এইভাবে একদিন অন্তর করুন তারপর সপ্তাহে একদিন করে—মনে হয় এতে ভাল ফল পাবেন। এছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ মত ভিটামিন ট্যাবলেটও খেয়ে নেবেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমার সঠিক জানা নেই তবে শুনেছি সাঁতার কাটলে লম্বা হওয়া যায়। চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

বাণী রায় হাওড়া। আপনার প্রশ্নের উত্তর উপরের উত্তর থেকেই নিশ্চয় পেয়ে গেছেন। উপকার পেলে জানাবেন।

রেখা মুখোপাধ্যায় আমহার্স্ট স্ট্রীট কলকাতা। আপনার বয়স অল্প সুতরাং আপনার এটা কোন সমস্যা নয়। অনেক সময় দেখা যায় কারুর শরীরের বিকাশ একটু দেরীতে হয়ে থাকে। যাই হোক এই ব্যাপারে একটু নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়। যেমন প্রতিদিন স্নানের সময় হাতের চেটো দিয়ে বুকের দুটি অংশের নীচের দিকে চেপে ধরতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে গোল করে ওপরের দিকে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করতে হবে। হাতের চেটোতে অবশ্য একটু তেল লাগিয়ে নেবেন। এভাবে অন্তত আট-দশ মিনিট নিয়মিত করতে হবে। পরে গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে সেই তোয়ালে বুকের ওপর চেপে চেপে ধরতে হবে আর ঠাণ্ডা জলে ভেজানো একটি তোয়ালেও পাশাপাশি রাখতে হবে—যা গরমের পরই বুকে চেপে দিতে হবে। এইভাবে একবার গরম ও একবার ঠাণ্ডা দিতে হবে। এতে ফল আশাপ্রদ হতে পারে।

পুতুল মুখার্জি বেহালা কলকাতা আপনি যে সুন্দর ভাষায় আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার জন্য আমি সত্যিই আনন্দিত। আপনাদের রূপসীর খাত[illegible] পড়ে উপকার হচ্ছে এবং আপনারা এর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন জেনে সুখী হলাম। 'লেনোলিন' পার্ক স্ট্রীটে সাহে[illegible] সিং-এর দোকানে ও মার্কেটের বিভিন্ন ভা[illegible] কসমেটিকের দোকানে কিনতে পাবেন লেনোলিন বাদ দিলেও উপকার হবে তবে তেমন বেশী নয়। এই লোশনটা ঠাণ্ড[illegible] মেসিনে রাখলে তিন-চার দিন খুব জো[illegible] কিন্তু এমনি রাখলে একদিন।

মেয়েদের যোগ ব্যায়াম কেন্দ্র সম্বন্ধে আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি লে[illegible] স্টেডিয়ামের ভেতরে যে অফিস আ[illegible] সেখানে খবর নিলে সব জানতে পারবেন

সরমা ঘোষ কলকাতা। আপনি জান[illegible] চেয়েছেন যে আপনার খুব ঘন কালো চোখ ও চুল। আপনার কি শেডের পাউড[illegible] ও লিপষ্টিক ব্যবহার করা উচিত।

পাউডার ব্যবহারের সময় গায়ের [illegible] সম্বন্ধেও যথেষ্ট নজর রাখবেন। গায়ের [illegible] উজ্জ্বল শ্যাম বা ফর্সা ঘেঁষা হলে [illegible] রকমের হবে আবার ফর্সা হলে আর [illegible] রকমের এবং বেশী কালো হলে সম্পূ[illegible] ভিন্ন রকম হবে। আমি ধরে নিচ্ছি আপন[illegible] রং ফর্সা। কারণ রং-এর বিবরণ আপ[illegible] দেননি। এই রং-এ বা উজ্জ্বল শ্যাম [illegible] আপনি গোল্ডেন বেইজ শেড ব্যব[illegible] করবেন। লিপষ্টিক কমলা ও ন্যাচার[illegible] মিশিয়ে এবং বেইজ শেড ব্যবহার করবে[illegible] তবে গালে কোন রং না দেওয়াই ভাল [illegible] অবশ্য গালে কোন বিশেষ ভাঁজ না [illegible] থাকে। চোখের ওপর মাসকারা ও [illegible] পেন্সিল সবই একেবারে কালো ব্যব[illegible] করতে হবে।

আপাততঃ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া [illegible] করছি। পরের সংখ্যায় আমি সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে নতুন করে কিছু আলোচনা কর[illegible] আশাকরি আপনাদের সেগুলি উপক[illegible] আসবে।

স্রবর্ণি

পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী রান্না

পাঞ্জাবী ও কাশ্মিরীদের রান্না স্বাদের দিক থেকে অতি উপাদেয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের রান্না থেকে এগুলির উপাদান পৃথক। পাঞ্জাবী ছোলে বা ছোলা রাজধানী দিল্লির একটি জনপ্রিয় জলখাবার। এটি সাধারণত কুলচা বা বাটোরা নামের একরকম লুচি জাতীয় জিনিস সহযোগে খাওয়া হয়। এছাড়াও পাঞ্জাবী রান্নার মধ্যে সর্ষের শাক, শাক পনীর, মটর পনীর, তন্দুরী রুটি, নান, তন্দুরী মুর্গ, মটন পালং খুব বিখ্যাত। আমিষ এবং নিরামিষ দু ধরনের কাশ্মিরী রান্নারই খুব নামডাক। কাশ্মিরী-দের প্রসিদ্ধ মাংস রান্নার নাম হল কাশ্মিরী রোগান জুস। অভিজাত কাশ্মিরী রান্নায় জাফরান গুচ্ছি প্রভৃতি দুর্মূল্য জিনিস-গুলি ব্যবহার করা হয়। পাঞ্জাবী রান্না স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। আজ কয়েকটি সহজ পাঞ্জাবী ও কাশ্মিরী রান্নার রন্ধন-প্রণালী বর্ণনা করব।

পাঞ্জাবী ছোলা

উপকরণ : ½ সের কাবলী (সাদা) ছোলা সামান্য ঘি, ২টি পেঁয়াজ, ৫ কোয়া রসুন, আন্দাজ মতো আদা, ২০০ গ্রাম পাকা তেঁতুল, কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা, একটু ধনে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, একটু খাওয়ার সোডা, কয়েকটি বড় এলাচ, আন্দাজ মতো নুন।

প্রস্তুত প্রণালী:—১। কাবুলী ছোলা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সোডা মিশিয়ে রাত-ভোর জলে ভিজিয়ে রাখুন। ২। সকাল-বেলা একটু নুন ও আদাকুঁচি দিয়ে ভাল-ভাবে সেদ্ধ করে নিন। ৩। এবারে ছোলার বাড়তি জলটা বার করে নিন এবং সেদ্ধ ছোলার ½ ভাগ পিষে নিন। ৪। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, এলাচ সব পিষে নিন—কিছু আদা পাতলা পাতলা লম্বা লম্বা করে কেটে নিন। ৫। কোন অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেনলেস স্টীলের ডেকচিতে ঘি দিয়ে এইসব পেষা মশলা এবং ধনে ও গোলমরিচ গুঁড়ো একটু কষে নিন। ৬। ওতে আদার কুঁচি এবং পেষা ছোলা মিশিয়ে কিছুক্ষণ ভাজুন এবং ওতে নুন ও আধখানা করে চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন এবং বাকি ছোলাটাও মেশান। ৭। আগে যে সেদ্ধ ছোলার জলটা বার করে রাখা হয়েছিল সেটা একটু একটু করে ছোলায় দিতে থাকুন এবং একটু একটু ঝোল থাকতে থাকতে নামিয়ে রাখুন। ৮। কোন এনামেল বা অ্যালুমিনি-য়ামের গামলায় তেঁতুলের কাথ বার করে রাখুন এবং ওতে সামান্য গরম মশলা মিশিয়ে নিন। ৯। সেদ্ধ ছোলা ওই কাথের ওপর ঢেলে দিন এবং ভালভাবে মিশিয়ে নিন। ১০। ওপর থেকে চাকা চাকা করে কাটা পেঁয়াজ ও আধখানা করে চেরা লঙ্কা ছড়িয়ে দিন।

বৈগুন ভুরতা বা বেগুন পোড়া

উপকরণ : কয়েকটি নরম বেগুন ২ কাপ টক দই, ১ টেবিল চামচ ঘি, একটি বড় পেঁয়াজ, একটি টোম্যাটো, দুটি কাঁচা লঙ্কা, নুন, ধনেপাতা কুচোনো।

রন্ধন প্রণালী : ১। বেগুন ভাল করে পুড়িয়ে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং খুব ভাল করে চটকে নিন এবং দই মেশান ও ফেটিয়ে নিন। ২। এতে আন্দাজ মতো নুন, হলুদ ও লঙ্কা মেশান। ৩। পেঁয়াজ সরু করে কুঁচিয়ে নিন কড়ায় ঘি দিয়ে পেঁয়াজ ভাজুন, টোম্যাটো কুচি ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভাজতে থাকুন। ৪। বেশ বাদামী হয়ে এলে বেগুনের মিশ্রণটা ছেড়ে দিন। ৫। একটু একটু করে ঘি ছেড়ে আস্তে আস্তে ভাজুন—ভাল করে ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে ধনে পাতা কুচি দিন। ইচ্ছে করলে ভাজার সময়ে এতে মটরশুঁটি সেদ্ধও দেওয়া চলতে পারে।

কাশ্মিরী রোগান জোশ

উপকরণ : ১ কেজি মাংস, ৩ চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, একটু হিং, একটু জাফরান, খানিকটা গরম মশলা গুঁড়োনো (এলাচ লবঙ্গ, দারচিনি), ঘি, আন্দাজ মতো নুন, একটু হিং এক কাপ টক দই, ½ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ শুকনো আদা বা সোঁঠের গুঁড়ো, ২ চা চামচ মৌরী।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ঘি গরম করুন এবং তাতে হিং ফোড়ন দিন। ২। মাংসের টুকরো ছেড়ে বাদামী করে ভাজুন। ৩। দই মেশান এবং জল শুকোনো পর্যন্ত ভাজুন। ৪। জাফরান ছাড়া সব মশলা একসঙ্গে পিষে নিন এবং সব মশলা মাংসে মিশিয়ে দিয়ে একটু কষে জল দিয়ে দিন। ৫। মাংস সুসিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত উনুনে রাখুন। ৬। সেদ্ধ হলে নামিয়ে জাফরান একটু দুধে গুলে মাংসয় ছেড়ে দিন।

খোয়া মটর

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম খোয়া ক্ষীর অর্থাৎ শুকনো ক্ষীর, ২৫০ গ্রাম ছাড়ানো মটরশুঁটি, দুটি টোম্যাটো, ১৫০ গ্রাম ঘি, হলুদ, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা, একটু হিং, জিরে, আদা, কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা, আন্দাজ মতো নুন।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ঘি গরম করে হিং, আদা কুচি ও কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিন এবং ঘিয়ে খোয়া দিয়ে অল্প আঁচে ভাজতে থাকুন। ২। একটু লাল হলে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ও কুচিয়ে কাটা টোম্যাটো দিন। ৩। একটু ভাজা হলে মটরশুঁটি দিন এবং গরম মশলা ধনের গুঁড়ো দিয়ে ভাজতে থাকুন। ৪। ভাজা হলে আন্দাজ মতো জল দিন। ৫। জল শুকিয়ে এলে একটু ঘি দিন ও একটু ভাজা ভাজা করুন। ৬। নামিয়ে ধনে ধনেপাতা কুচি মেশান।

মেথি-চমন

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম মেথির শাক, ২৫০ গ্রাম জল ঝরানো ছানা, গরমমশলা, নুন, হলুদ, আদা, লঙ্কা তেল বা ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। প্রথমে মেথির শাক বেছে নিয়ে ধুয়ে সেদ্ধ করে মিহি করে শিলে পিষে নিন। ২। ছানার চৌকো চৌকো টুকরো কাটুন এবং ঘি বা তেলে ভেজে একটু গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন। ৩। কড়ায় তেল বা ঘি দিয়ে হিং, শুকনো লঙ্কা, আদা ও গরম মশলার গুঁড়ো ফোড়ন দিন। ৪। পেষা মেথির শাক ওতে দিয়ে দিন এবং ঢিমে আঁচে ভাজতে থাকুন। ৫। মেথির শাক ভাজা হয়ে গেলে পেষা ধনে একটু লঙ্কা ও কয়েকটি তেজপাতা ওতে মিশিয়ে দিন এবং একটু নাড়াচাড়া করে আন্দাজ মতো জল দিন ও ছানার টুকরো-গুলো দিন। ৬। ঢাকা দিয়ে রাখুন ও একটু ঝোল থাকতে নামিয়ে নিন এবং ঘি গরম মশলা দিয়ে সাঁতলে নিন।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

সদরে কলিংবেল বেজে উঠল। রেবা নিজেই গেল দরজা খুলতে। বাড়ির কাজের লোকেরা প্যাকিং-এ ব্যস্ত। কাল ভোরে প্লেন। অনেক ঝামেলা বাকী রয়ে গেছে এখনও। এমন অসময়ে কে আবার জ্বালাতে এল? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল একদল ছেলেমেয়ে, সায়েন্স কলেজের ছাত্রছাত্রী বোধহয়। হাতে কিছু উপহারের বাকস ও প্রচুর ফুল। —স্যারকে একটু ডেকে দেবেন?' ঠাণ্ডা চোখে সকলকে একবার জরিপ করে নিয়ে ভেতরে চলে গেল রেবা। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সুবিনয়। পেছনে দাঁড়িয়ে একটু শ্লেষের সুরে বলল, 'যাও, যাদের ধ্যানে এতক্ষণ মগ্ন ছিলে, তারা এসেছে।'

গোছগাছের কাজ প্রায় সমাপ্ত। বাইরের ঘরে এসে রেবা দেখল, ছাত্রছাত্রীরা চলে গেছে। অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এসেছেন দেখা করতে বিদায়ী অধ্যাপক ডঃ সু রায়ের সঙ্গে।

'এই যে মিসেস রায়। উইশ ইউ এ ট্রিপ।'

'ধন্যবাদ।'

ডঃ রায়। আগামী পুজোয় কি আপনাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হ —বললেন তরুণ অধ্যাপক বিমল দত্ত।

সুবিনয় মুখ খুলবার আগে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই। আমরা সেপ্টেম্বরেই ফিরছি।'

টুকরো টুকরো কথা ও হাসি চল লাগল। বেশীর ভাগ কথাই ক সংক্রান্ত। তাই সে-সব আলোচনায় যোগ দিতে পারছিল না। ইতাবসরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সুবিনয়ের কর্মসঙ্গীদের। যে তিনজন অধ্যাপিকা এ

ছিলেন, তনুশ্রী তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং স্বল্পভাষিণী। মেয়েটি দেখতে ভারী সুশ্রী। চা এসে গেল। তনুশ্রী উঠে এল : 'মিসেস রায়, আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি?' তার দিকে না তাকিয়েই শুকনো গলায় রেবা বলল, 'দরকার নেই।' থতমত খেয়ে তনুশ্রী নিজের জায়গায় ফিরে গেল। অধ্যাপিকা জয়ন্তী সাহা বললেন, 'আপনাদের প্যাকিং শেষ হয়েছে?' রেবা এবার কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, 'আর বলবেন না। সব ব্যবস্থা তো একলা আমাকে করতে হল। কেনাকাটা, প্যাকিং—কোন্ ব্যাপারে আপনাদের ডঃ রায় থাকেন বলুন? উনি বাড়ী ফিরেও কলেজের ধ্যানেই মগ্ন থাকেন।' কথাটা বলে আড়চোখে তনুশ্রীর দিকে একবার তাকাল রেবা। লাল হয়ে উঠল তনুশ্রীর সুন্দর মুখখানা। ঘরের আবহাওয়াটাও ভারী হয়ে উঠল। কথাবার্তা আর তেমন জমল না। একটু পরে একে একে বিদায় নিয়ে গেলেন সবাই। তনুশ্রী সবার আগে বিদায় নিতে এল। তার মুখখানা তখনও থমথমে। নিরীহ গলায় রেবা বলল, 'অত মন খারাপের কি আছে, ভাই? ডঃ রায় তো সেপ্টেম্বরেই ফিরছেন।' কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল তনশ্রী। সবাই চলে গেলে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুবিনয়ের দিকে ফিরল রেবা : 'মেয়েটাকে এভাবে না কাঁদিয়ে আমার বদলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই তো পারতে।' অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুবিনয়। রেবা কাপ-ডিস গোছাতে গোছাতে বলে চলল : 'যাকগে, এখানকার বৃন্দাবন-লীলা তো কিছুদিনের মত ইতি হল। আবার নতুন জায়গায় গিয়ে রসায়নের প্রোফেসর কি নতুন রসের লীলা ফেঁদে বসবে, কে জানে?'

আজকাল রেবার কোন কথারই জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করে না সুবিনয়। চুপ করেই রইল সে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যেত তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর গরম কফি খাওয়া সুবিনয়ের বরাবরের অভ্যাস। রেবা দু-কাপ কফি টেবিলে নামিয়ে রাখতেই সুবিনয় বলল, 'নীচের দরজায় যেন কি আওয়াজ হল না?'

'আওয়াজ? ঝি-চাকর চলে গেলে তুমি দরজা ঠিকমত বন্ধ করেছিলে? নিশ্চয়ই করনি। কতদিক আমি সামলাবো বল তো? একটা কাজও কি দায়িত্ব নিয়ে করতে পার না?'

গজর গজর করতে করতে রেবা নেমে গেল। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই উঠে পড়ল সুবিনয়। আলমারীর পিছনে থেকে একটা ছোট শিশি নিয়ে খানিকটা তরল পদার্থ একটা কাপের কফিতে মিশিয়ে দিয়ে শিশিটা লুকিয়ে ফেলল। তারপর অপর কাপটা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসে চুমুক দিল।

রেবা ঘরে ঢুকল। ড্রয়ার থেকে চাবির গোছা নিয়ে স্টীলের দুটো আলমারী খুলল। ভিতরে কিছু জিনিস পড়ে নেই, একদম ফাঁকা, দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল সোফায়। কফির কাপ হাতে তুলে নিয়ে স্বগতোক্তি করল : 'বাব্বাঃ। কাজ যেন আর ফুরোয় না।' তারপর আদেশের সুরে বলল, 'যাও। আর রাত না বাড়িয়ে দয়া করে শুয়ে পড়গে। ভোর চারটায় এলার্ম দিয়ে রেখেছি।' বাধ্য ছেলের মত সুবিনয় চলে গেল। কিন্তু তখনই শুতে গেল না। দশ-বার মিনিট এটা-সেটা নাড়াচাড়া করে যখন এ-ঘরে ফিরে এল, দেখল যা ভেবেছিল, তাই হয়েছে। সোফার ওপরে এলিয়ে পড়ে আছে রেবা। শূন্য কাপপ্লেট কোলের ওপর। গালের কষ বেয়ে কফির ধারা নেমে এসেছে। রেবাকে একটু পরীক্ষা করল। না, দেহে প্রাণ নেই। এবার খুবই ক্ষিপ্র হাতে বাকী কাজটা শুরু করল সুবিনয়। আলমারী দুটো খালি, আগেই দেখে রেখেছে। একটার পাল্লা খুলে রেখে একটা শিশি থেকে বেশ খানেকটা সাদা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিল আলমারীর ভিতরে। তারপর রেবার শাড়ীটা একটানে খুলে ফেলে দেহটাকে তুলে নিয়ে আলমারীর ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। পা দুটো দুমড়ে কোনরকমে দেহটাকে ভিতরে ঠেসে দিয়ে পাল্লা বন্ধ করতে যেতেই কিসে যেন আটকে গল। আবার পাল্লা খুলে দেখে ডান হাতখানা ঝুলে পড়েছে। হাতখানা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আলমারী বন্ধ করল। হঠাৎ কলিং-বেল বেজে উঠল। ধড়াস করে উঠল সুবিনয়ের বুকের ভিতরটা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আবার বেজে উঠল বেল। পায়ে পায়ে নীচে নেমে এল সুবিনয়। বাইরের ঘরে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু সামলে নিল। কপালটা ঘামে ভিজে উঠেছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছে নিল কপালটা। আলোটা জ্বালল। তারপর দরজা খুলে দেখে পাশের বাড়ীর রামগতি ভট্টাচার্য, সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে আছেন। রেবার পাতানো কাকাবাবু-কাকীমা।

'কি বাবা! গোছগাছ হয়ে গেছে সব?'

'হ্যাঁ, কাকাবাবু।'

'তোমাদের দোতলায় আলো জ্বলছে দেখে তোমাদের কাকীমা বললেন, বৌমা ছেলেমানুষ। বোধহয় একলা সব পেরে উঠছে না। চল, একটু দেখে আসি। তাই—। তা বৌমা—।'

'ও ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব খাটুনী গেছে তো!'

'আহা, ঘুমোক। তুমিও ঘেমে নেয়ে উঠেছ, বাবা। যাই আমরা। তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও। কিছু মনে কর না, বাবা, এত রাত্রে এলাম।'

'না, না, ঠিক আছে।'

দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে একটু দাঁড়াল সুবিনয়। বুকের ভিতরকার ধড়াস ধড়াস শব্দটা কান পাতলে এখনও শোনা যায়। আস্তে আস্তে উপরে উঠে এল। তারপর কাজ সমাপ্ত করার দিকে মন দিল। ড্রয়ার থেকে চাবির গোছা নিয়ে একটার পর একটা লাগিয়ে দেখা গেল চতুর্থ চাবিটায় আলমারী বন্ধ হল। রেবার স্যুটকেশ ও জিনিসপত্র অন্য আলমারীটায় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল সুবিনয়।

ভোরে শুধু একটা স্যুটকেশ ও অ্যাটাচী কেস নিয়ে যখন সে বেরিয়ে পড়ল, তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। প্রতি-বেশীদের কারো সঙ্গেই দেখা হল না। একলা যাওয়ার জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ত তাহলে। সদ্য গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসা মন্থরগতি ট্যাক্সিটা হাত দেখাতেই থেমে গেল।

প্লেনে উঠে আর একবার সব খতিয়ে ভাববার চেষ্টা করল সুবিনয়। ঘরগুলো এবং সদরে তালা দেওয়া হয়েছে। বাড়ীর অন্যান্য ব্যবস্থাপনা রেবা যা করেছে, তাতে বৎসরান্তে এসে শুধু বাড়ীটার সংস্কার করে রেবার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ রটিয়ে দিলেই চলবে। রেবার বাপের বাড়ীতে বেঁচে খবর নেবার মত কেউ নেই। সুবিনয়ের তরফে তো রেবার প্রতি সহানুভূতি, বা তার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক কারোরই থাকবার কথা নয়।

এবার মীনা—মীনা কাপুর। চার বছরের সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মনে মীনা যেন শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ। বোম্বাইয়ে দু-দিন মীনার কাছে কাটিয়ে ওকে নিয়েই প্লেনে উঠবে সুবিনয়। পৃথিবীর আর এক প্রান্তে তাদের নতুন জীবন শুরু হবে।

কলকাতায় এক-একটা দিনকে চব্বিশ-ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশী বলে মনে হত। কিন্তু দুটো সপ্তাহ যে কোথা দিয়ে চলে গেল, বুঝে উঠবার আগেই সুবিনয় দেখল, ক্লিভল্যাণ্ড শহরে পেঁছে গেছে সে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগ দেবার দু-একদিন বাদেই একখানা চিঠি এল। ভারত থেকে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি তাদের কুশল নেবার জন্য কে ব্যস্ত হয়ে উঠল? একটু হাসি খেলে গেল সুবিনয়ের ঠোঁটের কোণে। ধীরে-সুস্থে খামখানার মুখ খুলে চিঠিটার নীচের দিকটা আগে দেখে নিল। রেবাকে লিখেছেন প্রতিবেশী রামগতি ভট্টাচার্য—

কল্যাণীয়াসু বৌমা,

আশা করি নিরাপদে পৌঁছিয়াছ। তুমি ফিরিবার পূর্বেই বাড়ী রং করার কাজ শেষ করিবার জন্য দিন তিনেক হইল ইয়াসিন মিস্ত্রীকে নিয়োগ করিয়াছি। স্টীলের আলমারী দুইটি রং করিবার জন্য ইউ-নাইটেড স্টীল কোম্পানীর সহিত বন্দো-বস্ত করিয়াছি। ডুপ্লিকেট চাবিসহ আল-মারী আজই তাহারা লইয়া যাইবে। অন্য সব চাবি তোমার কাকীমার কাছে আছে। তুমি কোন চিন্তা করিও না।...ইত্যাদি।
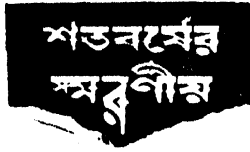
নাট্য সম্রাজ্ঞী বিনোদিনী ॥

বেঙ্গল থিয়েটারের দিনগুলি বিনোদিনীর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। অভিনেত্রী জীবনের খ্যাতির ব্যাপ্তিও এখানে। নারী-হৃদয়ের ঘুমন্ত সত্ত্বা মধুর প্রেমের স্পর্শে এখানেই প্রথম শিহরিত হয়ে ওঠে। স্নেহ-মায়া-মমতার রূপ ধরে এখানেই পুরুষ ভিন্ন এক রূপ ধরে বিনোদিনীর সামনে উপস্থিত হন। এই পুরুষ শরৎচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ চারুচন্দ্র ঘোষ। সবাই যাঁকে ছোটবাবু বলে ডাকতেন। বিনোদিনীও ডাকতো ছোটবাবু বলে। কিন্তু অন্যের ডাকের চেয়ে বিনোদিনীর ডাকে পার্থক্য ছিল বৈকি! কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখে কেদার চৌধুরী মুগ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্রও বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় দেখেই বিনোদিনীকে নিজের থিয়েটারে নিয়ে আসেন।

বেঙ্গল থিয়েটার ছাড়ার সময় ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন : হ্যারে বিনোদ! আমাদের থিয়েটার ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না?

অভিভূতা বিনোদিনী অস্ফুটস্বরে শুধু বলেছিলেন : হ্যাঁ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুলাই মঞ্চস্থ হলো রাবণ বধ। রাবণ বধ নাটকেই গৈরিশ ছন্দের সর্বপ্রথম প্রবর্তনা বলে অনেকে মনে করেন। নাটকটির সার্বিক প্রশংসায় চতুর্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে। থিয়েটারে তিলার্ধ স্থান থাকতো না। বিনোদিনী অভিনয় করেন সীতা চরিত্রে।

অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ আগস্টের সংখ্যায় ১২৮৮ সালের মাঘ সংখ্যার ভারতীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয় সরকার এবং আরো অনেকেই রাবণ বধের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন।

এলো সীতার বনবাস। বিনোদিনী লব আর খোঁড়া কুসুম কুশ চরিত্রে বিস্ময়াভিভূত করলেন। অমৃতবাজার সাধারণী সোম প্রকাশ ভারতী তদানীন্তন কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আর বিশিষ্ট সুধীজন সীতার বনবাস নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। সীতার বনবাস নাটকে লব-কুশ এতই অভ্যর্থিত হয় যে প্রতাপ জহুরী পরবর্তী নাটকে গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করে বলেন : বাবু উহি দোনো বালককো লাগায়ে দাও। গিরিশচন্দ্র তখন লিখেছিলেন মহাভারতের কাহিনী নিয়ে অভিমন্যু বধ। মহাভারতের কাহিনীতে যে লব-কুশের চরিত্র ঢোকানো যায় না প্রতাপ জহুরীকে একথা বোঝাতে গিরিশচন্দ্রকে হিমসিম খেতে হয়েছিল। অভিমন্যু বধ-এ বিনোদিনী উত্তরা চরিত্রে অভিনয় করেন। সীতার বনবাসের মতই নাটকটি অভিনন্দিত হলো। কিন্তু প্রতাপ জহুরীর মাথা থেকে লবকুশ যায় নি। গিরিশচন্দ্র উপহার দিলেন লক্ষ্মণ বর্জন। বিনোদিনী আর খোঁড়া কুসুম লব আর কুশ চরিত্রে নতুন করে মাতিয়ে নিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সীতার বিবাহ ব্রজবিহঙ্গ রামের বনবাস সীতাহরণ ভোট মঙ্গল মলিন মালা ও মাধবীকঙ্কনের অভিনয়ে বিনোদিনী রামের বনবাসে কৈকেয়ী সীতা হরণে সীতা এবং মাধবীকঙ্কনে হেমলতা চরিত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

১৮৮৩। ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। দ্রৌপদী রূপে চমৎকৃত করলেন বিনোদিনী। এই সময় এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সেগুলির পারস্পরিক যোগ সামগ্রিক ভাবে বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসকে নতুন রূপে রূপায়িত করে তোলে।

তখন পেশাদার রঙ্গশালার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদার ও ধনিক সম্প্রদায়। এদের সবাই যে নাট্যশিল্পের অনুরাগী হিসেবে থিয়েটারে আসতেন, তা নয়। থিয়েটার ছিল অনেকের কাছে স্ফূর্তির অন্যতম উপাদান। অভিনেত্রীদের রূপ-যৌবনের আকর্ষণে অনেকে থিয়েটারে আসতেন। রূপ-যৌবনের সাগরে সাঁতার কাটতে কাটতে থিয়েটারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়তেন। দর্শক আসনে বসে অভিনেত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণে নানাভাবে সচেষ্ট থাকতেন। অভিনয়ের সময় ফুল ছুঁড়ে—গিনি ছুঁড়ে—রুমাল ছুঁড়ে মারতেন ঈপ্সিত অভিনেত্রীকে লক্ষ্য করে। আবার ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে নির্দিষ্ট বক্স বা সামনের আসনে জাঁকিয়ে বসে নিজের প্রতি অভিনেত্রীকে আকৃষ্ট করাতে নানান পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। অনেক সময় এই পদ্ধতিগুলি শালীনতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেলেও থিয়েটারের পরিবেশে অবাঞ্ছিত ছিল না। বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকদের কাছে এইসব দর্শকরা থিয়েটারের-কাপ্তেন নামে অভিহিত ছিলেন।

কাপ্তেন দর্শকদের চলনা গৃহে প্রত্যাগমনের সময় অভিনেত্রীদের অনুসরণ করতেন। সুযোগমত প্রস্তাব পেশ করতেন সব স্ব কাপ্তেনদের। কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে সরাসরি নিজেরা যোগস্থাপনে ব্যর্থ হলে থিয়েটারের সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কারোর মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করতেন, কামনা-বাসনার তাগিদেই নয়—সাধারণ গুণগ্রাহী হিসেবেও দর্শক-আসন থেকে অনেকে শিল্পীদের লক্ষ্য করে ফুল, রুমাল, অর্থ বা এমনি উপঢৌকন ছুঁড়ে মারতেন।

গুরমুখ রায় থিয়েটারের একজন কাপ্তেন দর্শকই ছিলেন। বছর কুড়ি তখন বয়স ধনীর ছেলে। রূপোর চাকতী যাদের পকেট ভরা—রূপকুমারীদের প্রতি তাদের সহজাত আকর্ষণ একদিন না একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়বেই। থিয়েটার দেখতে আসেন সেই আকর্ষণের তাগিদে। আর সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন বিনোদিনীর রূপ লাবণ্যে। স্বভাবতঃই বিনোদিনীর সংগে ব্যক্তিগত যোগ স্থাপনে তৎপর হন। বন্ধুত্ব করলেন অমৃত মিত্র, অমৃত বসু আরো কয়েকজনের সংগে। গুরমুখের মনোভাব এদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন হলো না। একটু টোকা দিয়েই এরা গুরমুখদের চিনে নিতে পারতেন।

প্রতাপ জহুরী ছিলেন পুরো ব্যবসায়ী। থিয়েটার নিয়ে ব্যবসা করতেন। তার ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল। ছিল না—অন্য ব্যবসা আর থিয়েটার ব্যবসায়ের পার্থক্য-জ্ঞান। এই পার্থক্য কিছুতেই তিনি বুঝতে চাইতেন না। গিরিশচন্দ্র বোঝাতে চাইতেন, তবু না। ফলে ধীরে ধীরে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলো। শিল্পী ও কর্মীরা অভিযোগ করতে লাগলেন গিরিশচন্দ্রের কাছে। গিরিশচন্দ্র নিজেও ভুক্তভোগী ছিলেন। নাট্যশালার সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি প্রতাপ জহুরীর বহু অন্যায় এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই আর ধামা চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না।

বিনোদিনী একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক মাসের ছুটি নিয়ে বাইরে যেতে চান। নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করায় বিনোদিনীর খুবই পরিশ্রম হতো। থিয়েটারের খাটুনীতেই বিনোদিনীর শরীর ভেঙ্গে পড়ে, অনেকেই পরামর্শ দিলেন কিছু দিন ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরের হাওয়া খেয়ে আসতে। প্রস্তুত হলেন বিনোদিনী। ছুটি দিতে চাইলেন না প্রতাপ জহুরী। কাছে এক মাসের। পনেরো দিনের বেশী ছুটি দিতে চাইলেন না। প্রতাপ জহুরী। বিনোদিনীর অনুপস্থিতি থিয়েটারের পক্ষে সমূহ ক্ষতি। সে ক্ষতি স্বীকার করতে প্রতাপ জহুরী রাজী নন। শেষ পর্যন্ত পনেরো দিনের ছুটি নিয়েই বিনোদিনী কাশী যাত্রা করলেন। ওখানে গিয়ে শরীর আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে একমাস কেটে যায়। কলকাতায় ফিরেই থিয়েটারে যোগদান করেন। মাইনের তারিখ এগিয়ে আসে। প্রতাপ জহুরী গিরিশচন্দ্রকে একদিন বললেন : যে আমি বিনোদের এ মাসের মাইনে দেবো না। গিরিশচন্দ্র বিস্ময়ে উত্তর দিলেন : সে কি? কেন?

প্রতাপ জহুরী বললেন : কাজ করলে না তো মাইনে দেবো কেন? হামিত্ত পনেরো দিনের ছুটি দিয়েছিলাম। তার মধ্যে তো আসে নি!!

(ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব কাপের বাঁচার গ্যারান্টি

প্রুডেন্সিয়াল কাপের বরাত ভালো। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই অনুষ্ঠান দীর্ঘজীবনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। প্রুডেন্সিয়াল কাপ বা নির্দিষ্ট ওভারে সীমাবদ্ধ বিশ্ব কাপ ক্রিকেট আরম্ভ হওয়ার মুখে এই প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল, প্রাথমিক অনুষ্ঠানের সাফল্যের সূত্রে সে সংশয় দূর হয়েছে। এখন নিশ্চিন্তে বলা যায় যে ভবিষ্যতেও প্রুডেন্সিয়াল কাপের খেলা নিয়মিত হবে।

অনেককাল আগে সেই ১৯১২ সালে ত্রি-দলীয় প্রতিযোগিতার আসর বিছিয়ে যখন বিশ্ব ক্রিকেটের প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছিল তখন নানা কারণে ইংল্যন্ডের ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ দরাজ মেজাজে এই প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে আসতে পারেন নি। ফলে আর্থিক সংকটের চাপে পড়ে প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পরই ত্রি-দলীয় প্রতিযোগিতা তথা বিশ্ব ক্রিকেটের পাট গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। এবারে কিন্তু সেইসব সংকটের বালাই নেই। উল্টে প্রুডেন্সিয়াল কাপের খেলা উপলক্ষে মোটা অঙ্কের আর্থিক লাভই হয়েছে যা থেকে অন্যূন দু লক্ষ পাউন্ড প্রতিযোগী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেওয়া সম্ভব হবে। সুতরাং অসংকোচে বলা যায় যে প্রুডেন্সিয়াল কাপ এক বছরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দীর্ঘায়ু হওয়ার গ্যারান্টি পেয়ে গেছে।

প্রুডেন্সিয়াল কাপ বা বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান কবে কোথায় হবে? এর উত্তর এখনও জানা যায় নি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলন বিষয়টি স্থির করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ কমিটির ওপর রিপোর্ট তৈরীর ভার দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের পরবর্তী বৈঠকেই বিশেষ কমিটির রিপোর্ট ঘিরে আলোচনা হবে। হয়তো সেই অধিবেশনেই পরের তারিখ ও অনুষ্ঠানকেন্দ্র চিহ্নিত হবে। তবে এই ফাঁকে নিজের দেশে বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সংগঠনের অধিকার চেয়ে ভারত আবেদন পেশ করেছে।

গন্ডা দুয়েক বিদেশী দলকে নিজের দেশে আনিয়ে প্রুডেন্সিয়াল কাপের ব্যবস্থা করা রীতিমতো ব্যয়সাপেক্ষ। নানাবিধ পুরস্কার দেওয়া ছাড়াও খরচ খরচা বাবদ এবং লভ্যাংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতিযোগীদের দিতে হয় বলেই ব্যয়ের পরিমাণ অপরিমিতপ্রায়। তবে ভারতের সুবিধা এই যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট উপলক্ষে অধুনা এখানকার মাঠ ময়দান জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। কাজেই দর্শকানুকূল্যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে বলে মনে হয় না। তবে এই প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক প্রয়োজনে মোটা অঙ্কের বিদেশী মুদ্রার দরকার পড়বে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুরে ভারত সরকার সম্মত হলে তবেই ভারতের মাঠে বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের আসর সাজানো যাবে। অন্যথায় নয়।

বিশ্ব কাপ ভারতে হওয়াই যদি শেষপর্যন্ত সাব্যস্ত হয় তাহলে প্রশ্ন দেখা দেবে যে ভারতের কোন অঞ্চলে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে? সেক্ষেত্রে অনুমান এই যে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বিভিন্ন পর্যায়ের খেলা হতে পারে এবং নেপথ্য রাজনীতির প্রভাব যদি বড় হয়ে না দেখা যায় তাহলে কলকাতার ইডেনেই অন্যান্য খেলা ছাড়া প্রতিযোগিতার মূল ফাইনালও অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেহেতু ইডেন হলো এক ঐতিহ্যশালী ক্রিকেট মাঠ এবং এখানকার গ্যালারি সুবিস্তৃত। এতো দর্শক ভারতের অন্য কোনো ক্রিকেট মাঠে আঁটে না। মোটা অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করতে হলে বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগম ঘটানো দরকার। সেদিক থেকে ইডেনের সুবিধা অন্যসব মাঠের চেয়ে বেশি।

তবে ক্রিকেটী ঐতিহ্যসমৃদ্ধ কলকাতার ইডেনকে বছর বছর যেভাবে ফুটবল বুটের স্টাড দিয়ে বর্ষাকালে চষে ফেলার ব্যবস্থা হচ্ছে তা দেখে ভয় হয় যে ইডেনের ক্রিকেটী বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় থাকবে তো! ইডেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হলে এখানে টেস্ট ক্রিকেট সংগঠনের অধিকার কলকাতার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

বালিবর্জিত বাছাই করা মাটি দিয়েই ইডেনের মাঠ তৈরী করা হয়েছে। এক পশলা বৃষ্টি নামলে ক্রীড়াভূমি রীতিমতো পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। এই নরম পিচ্ছিল জমির ওপর এগারো জোড়া বুট সদর্পে দাপাদাপি করলে সযত্নে গজিয়ে তোলা দূর্বাদল নষ্ট হয়। জমানো মাটি সরে গিয়ে মাঠের হয় অপূরণীয় ক্ষতি। এ সম্পর্কে অতীতের অভিজ্ঞতা যেমনই প্রত্যক্ষ তেমনই তিক্ত। অথচ বছর বছর ঘুরে ফিরে ফুটবল ঘোর বর্ষায় ইডেনে জাঁকিয়ে বসছে। কাজটা রীতিমতো বে-হিসেবী। এই বে-হিসেবী কাজে ফুটবলের স্বার্থ আগলাবার সদিচ্ছা থেকে গেলেও ক্রিকেটের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

শহর কলকাতায় একটি প্রমাণ সাইজের ফুটবল স্টেডিয়াম থাকলে ফুটবলকে এভাবে বারে বারে ক্রিকেট উদ্যানে টেনে আনার দরকার পড়তো না। কিন্তু যুগ যুগ ধরে স্টেডিয়ামের আন্দোলনে মাথা খুঁড়ে মরেও কলকাতা অভিপ্রেত ক্রীড়াঙ্গনটিকে হাতের কাছে আর পেল কই! কাজেই স্টেডিয়ামবিহীন কলকাতার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবার রাস্তা গোঁজামিল দিয়েই পড়ে রাখাই শ্রেয়ঃ বলে বিবেচিত হওয়া ছাড়া অন্য উপায় আপাততঃ নেই।

চলতি মরশুমেই ক্রিকেট উদ্যান ইডেনে ফুটবলের পাট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবার শুনেছি যে ১৯৭৫-৭৬এর সন্ধিক্ষণে পাকিস্থান ক্রিকেট দলের ভারত সফরের কথাবার্তাও চলছে। পাকিস্থান যদি আসে এবং তার আগেই ভরা বর্ষায় যদি ইডেনকে ফুটবল বুট দিয়ে চষে ফেলা হয় তাহলে অবস্থাটা যে কি রকম দাঁড়াবে তা ভাববার বিষয়। কিন্তু কেই বা তা ভাবছে। শুধু কিছু ক্রিকেটপ্রেমী এবং রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাই যা এ বিষয়ে চিন্তিত উদ্বিগ্ন। অন্যপক্ষদের সে দুশ্চিন্তার বালাই নেই। তাঁরা ভবিষ্যতের সংকটের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাইছেন না। তাঁদের বাস্তব বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে বুঝি বাস্তবের আরও শক্ত ধাক্কারই প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতায় টেস্ট ক্রিকেট বন্ধ হয়ে গেলেই সেই ধাক্কা ক্ষমাহীন মূর্তি ধরে অবিবেচনা ও বে-হিসাবকে শায়েস্তা করতে চাইবে। সে দিনটি হবে সত্যিই ভয়ঙ্কর। প্রার্থনা কাব সেই ভয়ঙ্কর লগ্নটি কলকাতার জীবনে যেন কোনোদিন এসে না হাজির হয়।

বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সংগঠনের অধিকার পেতে ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশ এখনও আগ্রহ দেখায় নি। তবে মনে হয় নিরুচ্চার থেকে গেলেও ইংলন্ড বোধহয় বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের আসরটিকে নিজের দেশেই স্থায়ীভাবেই সাজিয়ে রাখতে চায় বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের সদর দপ্তর ইংলন্ডেই চিরকালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুক, যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সদর দপ্তর রয়েছে সেই দেশে এই মনোভাব ইংলন্ডের পক্ষ থেকে এখনও

[illegible] বললেও বটে। তবে অস্ট্রেলিয়ার মুখ দিয়ে অবিকল ওই কথাটি বলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

জানি না শেষপর্যন্ত কি স্থির করা হবে। তবে দেশবিদেশ না ঘুরে প্রুডেনসিয়াল কাপ যদি কোনো একটি দেশে চিরদিনের জন্যে স্থিত হয়ে থাকে তাহলে এই প্রতিযোগিতার ব্যাপক প্রসার লাভের সম্ভাবনা হারিয়ে যাবে। অনেককাল আগে অনুষ্ঠানের জনক হিসেবে গ্রীস তার চৌহদ্দির মধ্যেই অলিম্পিক ক্রীড়াকে বেঁধে রাখতে চেয়ে যে ভুল করতে চলেছিল চিন্তানায়ক ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবার্তিন তাতে সায় দেন নি। ফলে কুবার্তিনের পরিকল্পনা অনুসারেই অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে দেশে দেশে ছড়িয়ে এর সর্বজনীন রূপ ও চরিত্রকে সুঠাম হাতে গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যারণ কুবার্তিনের চিন্তার বস্তু ছিল। সেই বস্তুর যথাযথ মূল্যায়ন করেই ক্রিকেট জগতের চিন্তানায়কদের বিশ্ব কাপকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া ভাল।

আর তা না হয় তো কেবলমাত্র বিশ্ববিজয়ী দলের হাতেই পরবর্তী আসর সাজাবার অধিকার তুলে দেওয়ার স্থায়ী নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। তাতে এক ঢিলেই দুটি পাখী বধ করার প্রত্যক্ষ তাগিদ থাকবে। সাংগঠনিক অধিকার পেতে হলে স্বচ্ছন্দের পরিচয়ে বিশ্ব কাপকে আগে ঘরে তুলতে হবে এমন একটি প্রাক সর্ত থেকে গেলে নিজস্ব ক্রীড়ার মানোন্নয়নে প্রতিযোগীরা সচেষ্টও হতে পারবেন। তাতে খেলার উৎকর্ষও বাড়বে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে অর্থ চিন্তাকে পথের কাঁটা ভেবে বিশ্ব কাপ বিজয়ীদের কেউ কেউ হয়তো পরের অনুষ্ঠান সংগঠনের অধিকার নিতে কুণ্ঠাবোধ করতে পারে। যেমন কুণ্ঠা দেখা গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মনোভাবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট অনুরাগ যতোই সাচ্চা হোক না সে দেশে খেলা দেখতে তেমন ভীড় হয় না। বেতার ও টেলিভিসন অনুষ্ঠান বাবদ সংগঠকদের হাতে তেমন পয়সা আসেও না যার বিনিময়ে বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের মতো এক বায়বহুল প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়। কাজেই যেসব দেশে ক্রিকেটের পয়সা ওঠে সেইসব দেশেরই পক্ষে এই অনুষ্ঠান সংগঠনে সুবিধা বেশি। বড় ক্রিকেট উপলক্ষে অধুনা ভারতেই সবচেয়ে বেশি ভীড় জমে। আর ইংলন্ডের ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি খেলাটির পৃষ্ঠপোষকতায় সদাই তৎপর। কাজেই মনে হয় যে পরের অনুষ্ঠান সংগঠনের ভার গিয়ে পড়বে হয় ভারতের কাঁধে। আর না হয় আবার ওই ইংলন্ডেরই হাতে।

বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের প্রথম অনুষ্ঠান উপলক্ষে শুধু যে মোটা অঙ্কের মুনাফাই এসেছে তা নয়। খেলাও কিন্তু খেলার মতো হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্ট্রেলিয়া পাকিস্থানের খেলোয়াড়দের দক্ষতায় আসর সত্যিই জমেছিল। হারজিত চ্যালেঞ্জ ও পাল্টা চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতার মেজাজ চড়া পর্দায় বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। এই মেজাজের মধ্যেও বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের বেঁচে থাকার সুস্পষ্ট গ্যারান্টি পাওয়া গেছে।

ক্রুরধার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঁচে শুধু ইংলন্ডের প্রত্যক্ষদর্শীদেরই নয় সেই সঙ্গে সুদূরের অনুরাগীদেরও দগ্ধ হতে হয়েছে। ধরা যাক মূল ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলাটির কথা। দুদলেই নামী নামী পেস বোলার ও ব্যাটসম্যান ছিলেন। খেলা জমার যে প্রতিশ্রুতি ছিল আরম্ভের আরম্ভেই খেলা শুরু হতেই সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তব হয়ে উঠতে লাগলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন তিনটি উইকেট হারিয়ে বসলো মাত্র পঞ্চাশের মধ্যে। তারপরই শক্ত হাতে হাল ধরলেন ক্লাইভ লয়েড। দেখতে দেখতে ক্রিকেটী নাটকের গতি হলো ভিন্নমুখী। প্রথমে পতন, পরে উত্থান—দুটি বিপরীতধর্মী ঘটনার সমাবেশে অনুষ্ঠানের মেজাজও গেল চড়ে।

লয়েডের ব্যাট উদ্ধত ক্ষমাহীন। প্রতিশোধ গ্রহণে নির্দয়। ব্যাটের ঘায়ে অস্ট্রেলীয় আক্রমণকে ছত্রখান করে দিয়ে নিজের দলকে তিনি নিশ্চয়তার তটভূমিতে টেনে নিয়ে গেলেন। তবু কি নিশ্চিত হওয়ার জো আছে! ব্যাটিংয়ের সময় অস্ট্রেলিয়ার শেষ জুটি টমসন ও লিলি শেষাংকে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুজনের কেউই ব্যাটধারী হিসেবে স্বীকৃত নন। তবুও দলের স্বার্থ আগলাবার তাগিদে শেষ উইকেটে তাঁরা একচল্লিশটি মূল্যবান রান জুড়ে দিতে কসুর করেন নি। দুজনে মিলে আর ১৭টি রান করতে পারলেই অস্ট্রেলিয়া জিততো।

নির্দিষ্ট ওভারের খেলা। সময়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নিতে না পারলেই পরাজয়। অবস্থার তাগিদে খেলোয়াড়দের ঘড়ির কাঁটার আগে ছুটতে হয়েছে। ছোটাছুটির ফাঁকে একে অন্যকে ভুল বুঝে রান আউটের শিকার বনেছেন। এক আধজন নন, অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ পাঁচজনকে সেদিন 'গরুর গাড়ীর চাকায়' চাপা পড়তে হয়েছে। ওৎপাতা ফিল্ডসম্যান রিচার্ড ভুল বোঝাবুঝির সুযোগগুলি কৃতজ্ঞচিত্তে সদ্ব্যবহার করতে ভোলেন নি। এতোসব কান্ড যখন লর্ডসে ঘটছিল তখন নাটকীয় উত্তেজনা যে তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছেছিল তাতে আর সন্দেহ কি! উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তার টানাপোড়েনে ক্রিকেট যে সেদিন সত্যিই বিচিত্র সুন্দর কাজে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল স্বচক্ষে না দেখলেও আমরা দূরে বসেও উপলব্ধি করতে পেরেছি।

ফাইনাল ছাড়াও প্রুডেনসিয়াল কাপের আরও কয়েকটি খেলাও উপভোগ্য হয়েছিল। একটির স্মৃতি তো এখনও জ্বলজ্বল করছে। ওই খেলাটি হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্থানের মধ্যে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে।

পাকিস্থান? না ওয়েস্ট ইন্ডিজ? জিতবে কে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে কৌতূহলী ক্রীড়ানুরাগীদের খেলার শেষ ওভার পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। আর মাত্র দুটি বল বাকী থাকতে জয়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্যাভিলিয়নে ফিরতে পারে। তার আগে পরাজয়ের ভ্রূকুটিই তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সামনে।

এই ম্যাচের অবিসম্বাদী হীরো হলেন সাদাসিধে ব্যাটসম্যান ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট রক্ষক ডেরেক মারে। কালীচরণ লয়েড ফ্রেডেরিকস রিচার্ডস প্রমুখ দলের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানেরা যখন ফিরে যান তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান আট উইকেটে ১৬৬। জেতার প্রয়োজনে দরকার আরও ১০১টি রানের। অবশিষ্ট ব্যাটসম্যান বলতে টিঁকে আছেন শুধু ই মারে। বাকীরা যথা হোল্ডার ও রবার্টসের তো ব্যাটসম্যানরূপে কোনো স্বীকৃতিই নেই।

পাকিস্থানের সরফরাজ নাওয়াজ বারো ওভার বল করেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে ধ্বস নামিয়ে দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেতা কঠিন। অথচ সেই কঠিন কাজ কতো সহজেই না মারে সম্পন্ন করে তুললেন। ১৬৬ থেকে দলের রানকে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন ২৬৭র মাথায়। শেষ উইকেটে অ্যানাডি রবার্টসের সহযোগিতায় মারে ৬৪টি মূল্যবান রান যোগ করে দিলেন। ফলে প্রায় হারাপার্টি সেদিনের আসরে বাজীমাৎ করে দিতে পারলো। প্রুডেনসিয়াল কাপের খেলার প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা ছিল না। না থাক। এই খেলাটি ঘিরে সেদিন মাঠে যে রুদ্ধশ্বাস নাটক সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে মায় টেস্ট খেলার আসরে তেমন নাটকীয়তার স্বাদ কবারই বা মিলেছে।

এক পর্যায়ের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দু দুবার অস্ট্রেলিয়া [illegible] পাকিস্থান ও নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে। ভারত ও ইংলন্ডের সঙ্গে তাদের মোলাকাৎ হয়নি। হলে কি হোত তা সহজেই অনুমেয়। যাকে পেয়েছে সামনে তাকেই হারিয়েছে। সুতরাং নিজের কীর্তির মূল্যায়নে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে বর্তমানে যোগ্যতম দল হিসেবেই ক্রিকেট দুনিয়ার অধীশ্বরের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তাতে আর সন্দেহ কি।

অন্যান্য প্রতিযোগীর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্থান যে চোয়াল কষে সাজা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পেরেছিল তা অনস্বীকার্য। একদিনের প্রতিযোগিতায় পাকিস্থান যে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল তা নয় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একসময় কষে পাঞ্জা লড়ায় কার্পণ্যও করে নি। পাকিস্থানের দুর্ভাগ্য যে প্রাথমিক লীগে তাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করতে হয়েছে। লীগে অপর বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করার সুযোগ পেলে পাকিস্থান বোধহয় সেমিফাইনাল পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারতো।

একদিনের নির্দিষ্ট ওভারের খেলায় অভ্যস্ত নয় বলে প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে যাঁরা অস্ট্রেলিয়াকে খারিজ করতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বয়স্কন্ধ ক্রিকেটারেরা ভুল ধরিয়ে তাঁদের লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন। অভ্যাস না থাকলেও জাত ক্রিকেটাররা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কি গুরুভার দায়িত্ব পালনে সক্ষম অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা বিশেষভাবে তেইশ বছরের তরুণ গ্যারি গিলমোরই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ন্যাটা সিম বোলা গিলমোর দুরন্ত পেস বোলার জুটি টমসন-লিলির আকাশছোঁয়া ছায়ার আড়ালে আত্মগোপন করে ইংলন্ডে এসেছিলেন। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে খেলার সুযোগ সদ্ব্যবহার করে তিনি আপন হাতে নিজের যে প্রতিচ্ছবি এঁকে দিয়েছেন তার পাশে বহুল প্রচারিত টমসন-লিলির ভাবমূর্তিও যেন ম্লান হয়ে গেছে। শুধুই বলেই নয় ব্যাটেও গিলমোর নির্ভেজাল দক্ষতার ছাপ রেখেছিলেন। গিলমোর ব্যাটটিকে শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরতে না পারলে প্রুডেনসিয়াল কাপের সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ইংলন্ডকে টেক্কা দিতে পারতো কিনা কে জানে। পূর্বসূরী এলান ডেভিডসনের হাতে গড়া গ্যারি গিলমোর চিন্তায় ও কর্মে গুরুর পথের অনুসারী। মনে হয় নিজের কর্মনৈপুণ্যে তিনি অনেক-দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর মাতিয়ে রাখতে পারবেন।

প্রুডেনসিয়াল কাপের খেলা আরম্ভের আগে অনেকেরই স্থির বিশ্বাস ছিল যে ইংলন্ডই বুঝি শেষপর্যন্ত বিজয়ীর সম্মান পাবে। কারণ একদিনের বা নির্দিষ্ট ওভারের খেলায় ইংলন্ড রীতিমতো অভ্যস্ত। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার আর্থানুকূল্যে গত কয়েক বছর ধরেই ইংলন্ডে নির্দিষ্ট ওভারে সীমা-বদ্ধ নানাবিধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এইসব প্রতিযোগিতায় নিয়মিত খেলার সুযোগে ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের একদিনের ক্রিকেট সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও পরিণত হতে পেরেছে। তাছাড়া পরিচিত পরিবেশ পিচ ও আবহাওয়া। এই অবস্থায় দুনিয়ার যাবতীয় সুবিধেই ছিল ইংলন্ডের পক্ষে। ইংলন্ড আরম্ভও করেছিল অনেক আশা জাগিয়ে। কিন্তু চিরন্তন শত্রু অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হতেই ইংলন্ড কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়ে। গত বছরে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ইংলন্ডকে টেস্ট পর্যায়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। প্রুডেনসিয়াল কাপের খেলায় সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগও এসেছিল ইংলন্ডের সামনে। কিন্তু গিলমোর বাদ সাধলেন। ফলে সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ইংলন্ডকে এ যাত্রায় বিদায় নিতে হয়।

অন্যান্য প্রতিযোগীদের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের হাঁকডাক তেমন ছিল না। তবু সেমিফাইনাল পর্যন্ত এগিয়ে নিউজিল্যান্ড তার ক্রিকেটী দক্ষতার পরিচয় রেখেছে। লীগ পর্যায়ে ভারতকে হার মানানো নিউজি-ল্যান্ডের পক্ষে এক কীর্তি বিশেষ। আসলে নিউজিল্যান্ড না ভারত কোন দল শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে ওঠে তা জানতেই যেন ভারতীয় ক্রিকেটের শুভাকাঙ্ক্ষীরা উদ্গ্রীব হয়ে ছিলেন। ভারতীয় দলের ব্যর্থতায় তাঁদের নিরাশ হতে হয়।

লীগ পর্যায়ে ভারত-নিউজিল্যান্ডের খেলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তথা উপভোগ্য হয়েছিল। মাত্র সাতটি বল বাকী থাকতে খেলার হারজিতের ফয়সালা হয়ে যায়। এই একটি খেলায় উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়া ছাড়া ভারতীয় দল আর কোনো কৃতিত্বের দাবী জানাতে পারে না। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ভারত যেভাবে খেলেছে তাতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের চরম ব্যর্থতার পরিচয়ই প্রকট হয়ে পড়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলার দিনেই ইংলন্ড এই প্রতিযোগিতায় রেকর্ড রান (ষাট ওভারে ৩৩৪) করে। আর ভারত ১৩২ রানেই আটকে থাকে।

ইংলন্ডকে ৩৩৪ রান করতে দেওয়ার পর জয়লাভে ভারতের কোন আশাই ছিল না। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা দ্রুত রান তোলায় কেন চেষ্টা করলেন না? গাভাস-কারের রকমসকম দেখে মনে হয়েছিল যে একদিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর যেন কোন ধারণাই নেই। রানের পেছনে ছুটতে তাই তাঁর ছিল প্রবল অনীহা। তিনি যেন নিজের উইকেটটি আঁকড়ে ধরেই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন।

গাভাসকার ছিলেন দলের সহ-অধিনায়ক। অথচ ব্যাট করতে নেমে তিনি চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় রেখে দেন। গাভাসকারের এই অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক আচরণ দেখে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। দলের ম্যানেজার স্বয়ং রামচাঁদও স্থির থাকতে পারেন নি। দলের স্বার্থ আগলাবার চেষ্টা না করে তিনি যেন ব্যাটিং অনুশীলনেই মন দিতে চেয়েছিলেন। মূলতঃ তাঁর নিষ্ক্রিয়তার জের মিটোতে গিয়েই ভারতীয় দলকে নাম ও মর্যাদা সবকিছুই হারাতে হয়েছে।

একদিনের খেলায় দ্রুত রান তোলাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। গাভাসকার সেই লক্ষ্য সম্পর্কে উজ্জীবিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁকে ডেকে ফিরিয়ে আনা হয় নি কেন? দলপতি ভেঙ্কটরাঘবন গাভাসকারকে ফিরে আসার ডাক না দিয়ে যে ভুল করেছেন তার জন্যেও তাঁকে বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ইংলন্ডের সঙ্গে খেলার দিনে বেদীকে দলভুক্ত না করা এবং ইঞ্জিনীয়ার, আবিদ পাঠানোর কোনো কৈফিয়ৎ থাকতে পারে পাঠানোর কোনো কৈফিয়ৎ থাকতে পারে না। না। তবে শোনা গেছে যে ইঞ্জিনীয়ার নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। তাই যদি হয় তাহলে ইঞ্জিনীয়ারকে কেনই বা খেলানো হয়েছিল?

সব মিলিয়ে প্রুডেনসিয়াল কাপে ভারতের ভূমিকা নৈরাশ্যজনক। সাধারণ হিসাবে আগের আগের টেস্ট পর্যায়ের মূল্যায়নে ভারতকে নিউজিল্যান্ডের চেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করা হোত। ভারত যদি নিউজিল্যান্ডকে টপকে সেমিফাইনাল পর্যন্ত এগোতে পারতো তাহলে কিছু সান্ত্বনা মিলতো। কিন্তু ভারত সেটুকুও কপে তুলতে পারে নি।

একদিনের বা নির্দিষ্ট ওভারে সীমা-বদ্ধ খেলার সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটের অনেক তফাৎ। দুটি অনুষ্ঠানের চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল ভারত যে তত্ত্ব অনুধাবন না করেই বিনা প্রস্তুতিতেই ইংলন্ডে গিয়ে হাজির হয়। ফলে যা অবশ্যম্ভাবী ভারতের ক্ষেত্রে তাই ঘটে গেছে।

ভারতীয় ক্রিকেটাররা এক দিনের খেলায় অভ্যস্ত নন বলেই ইংলন্ড যাত্রার আগে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে এক দিনের কয়েকটি খেলার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই অপ্রস্তুত দলটিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাতে ফল যা হবার ঠিক তাই হয়েছে।

বিনা প্রস্তুতিতে এইভাবে বিদেশী আসরে দল পাঠানো কোনো কাজের কথা নয়। বিদেশ সফরের সূত্রে ভারতীয় ক্রিকেটকে বারবার ঠকতে হচ্ছে। অথচ গঠনাত্মক কোনো কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে না। আগেরবার পূর্ণাঙ্গ ইংলন্ড সফরকালে বোঝা গেছে যে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যদি প্রাণবন্ত পিচে খেলার সুযোগ না পান তাহলে বিদেশের সপ্রাণ উইকেটে খেলতে নেমে তাঁদের নাকাল হতেই হবে। দেশের মাঠে প্রাণবন্ত পিচ গড়তে পারলে সিম ও পেস বোলিংয়ে ভারতীয়দের দক্ষতাও বাড়বে। তবু এখনও ভারতের ক্রিকেট মাঠে তৃণাচ্ছাদিত প্রাণবান পিচ গড়ায় তৎপরতা দেখানো হয়নি।

অভিজ্ঞতা অতি প্রত্যক্ষ। অথচ সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে কোনো চেষ্টা করা হচ্ছে না দেখে প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করে যে ভারতীয় ক্রিকেটের লক্ষ্য কি শুধু বিদেশ সফরের আয়োজন করা? না বিদেশে গিয়ে জাতীয় দল যাতে সুনামের সঙ্গে খেলতে পারে তার জন্যে গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা?

জাতীয় ক্রিকেট দলের উজ্জীবনে কোন্ পথটি যে সুস্থ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যতো তাড়াতাড়ি তা উপলব্ধি করতে পারেন ততোই মঙ্গল। সফর বিনিময় বিশ্ব কাপ সংগঠনের অধিকার পেতে বোর্ডের পক্ষ থেকে যে আগ্রহ দেখানো হচ্ছে তার কিছুটা যদি জাতীয় ক্রিকেটের মানোন্নয়নে নিয়োজিত হোত তাহলে বোধ হয় বর্তমান অবস্থা ভালোর দিকেই বদলে যেত।

অজয় বসু

দর্শক

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা

লণ্ডনের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের ঐতিহাসিক উইম্বলেডন শহরতলীতে অল ইংল্যাণ্ড টেনিস ক্লাবের উদ্যোগে প্রতি বছর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসে থাকে। এই প্রতিযোগিতাটি বে-সরকারীভাবে বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতার মর্যাদা লাভ করেছে। বিভিন্ন দেশের বাছাই করা খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এ বছরের ৮৯তম আসরে অনেক অঘটন ঘটে গেছে এবং নতুন নজির সৃষ্টি হয়েছে। গত বছরের মত এবছরও আমেরিকার খেলোয়াড়রা পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। আমেরিকার খেলোয়াড়রা এ বছর প্রতিযোগিতার প্রধান পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে খেলে পাঁচটি খেতাব জয়ী হয়েছেন—পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস, পুরুষদের ডাবলস, জাপানের খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় মেয়েদের ডাবলস এবং অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় মিকসড ডাবলস খেতাব। গত বছর আমেরিকা পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে খেলে চারটি খেতাব পেয়েছিল।

পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ৬নং বাছাই নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস এবং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ৩নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং। আর্থার অ্যাসের আগে কোন অশ্বেতকায় খেলোয়াড় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পাননি, এমনকি ফাইনালেও উঠতে পারেন নি। সুতরাং অ্যাস পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করলেন। এর আগে অ্যাস দুবার (১৯৬৮ ও ১৯৬৯) সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুত রড লেভারের কাছে হেরে যান। এবারে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে আমেরিকারই দুজন খেলোয়াড় খেলেছিলেন। এইভাবে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে আমেরিকার দুজন খেলোয়াড় শেষ খেলেছিলেন ১৯৪৭ সালে। সেবারের ফাইনালে জ্যাক ক্রামার ৬-১, ৬—৩ ও ৬—২ গেমে টম ব্রাউনকে হারিয়েছিলেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে প্রবীণ খেলোয়াড় অ্যাস ৬-১, ৬—১, ৫—৭ ও ৬—৪ গেমে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ১নং বাছাই জিমি কোনর্সকে হারিয়ে প্রমাণ করলেন পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। অ্যাসের বয়স ৩১ এবং কোনর্সের বয়স ২২—দুজনের মধ্যে বয়সের অনেক তফাৎ। যোগ্যতার দিক থেকে টেনিসের পণ্ডিতেরা বাছাই তালিকায় কোনর্সকে শীর্ষস্থান দিয়েছিলেন অপরদিকে অ্যাস পেয়েছিলেন ৬ষ্ঠ স্থান। এখানে উল্লেখ্য, এ বছরের বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতায় অ্যাস চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

উইম্বলেডনের টেনিস আসরে আমেরিকার নিগ্রো মহিলা খেলোয়াড় অ্যালথিয়া গিবসন উপর্যুপরি দু বছর (১৯৬৮-৬৯) মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সঙ্গে অশ্বেতকায় পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রথম এবং সর্বাধিকবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন। সুতরাং আমেরিকার এই দুই নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড়—অ্যালথিয়া গিবসন এবং আর্থার অ্যাস সারা পৃথিবীর অশ্বেতকায় জাতির মুখ রক্ষা করেছেন।

এ বছরের মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে ৩নং বাছাই আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং ৬—০ ও ৬—১ গেমে সদ্যবিবাহিতা অস্ট্রেলিয়ার ইভন কলেকে (কুমারী জীবনে গুলাগং) হারিয়ে দেন। এই নিয়ে শ্রীমতী বিলি জিন কিং উইম্বলেডন টেনিস আসরে ৯ বার মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে খেলে মোট ৬ বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলেন।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ১৯৭৫ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিঙ্গলস পুরস্কার হাতে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। এই আসরে তিনি মোট ৬ বার মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয় করলেন। উইম্বলেডন টেনিস আসরে তাঁর খেতাব জয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১৯টি—সিঙ্গলস ৬, ডবলস ৯ এবং মিক্সড ডাবলস ৪।

আর্থার অ্যাশ (আমেরিকা) : ১৯৭৫ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান।
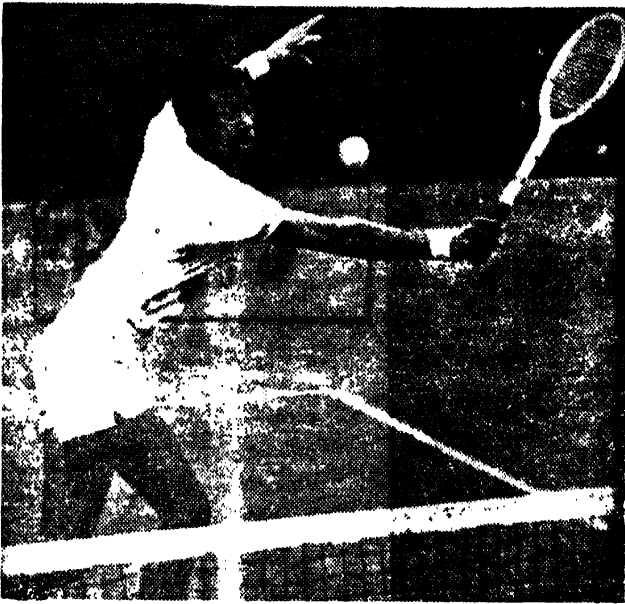
তিনি সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ১৯৬৬-৬৮ (উপর্যুপরি ৩ বার), ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৫ সালে। তাছাড়া তিনি এই বছরের আসরে সিঙ্গলস ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে ত্রিমুকুট সম্মান লাভ করেছেন দুবার (১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে)। শ্রীমতী কিং উইম্বলেডন টেনিস আসরে মোট ১৯টি খেতাব জয় করেছেন—সিঙ্গলস ৬, ডাবলস ৯ এবং মিকসড ডাবলস ৪। এই ১৯টি খেতাব জয়ের সূত্রে তিনি আমেরিকারই কুমারী এলিজাবেথ রিয়ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১৯টি খেতাব জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করলেন। এলিজাবেথ রিয়ন এবং শ্রীমতী বিলি জিন কিং ছাড়া অর কোন পুরুষ বা মহিলা ১৯ বার খেতাব জয় করেন নি। কুমারী রিয়ন কিন্তু একটিও সিঙ্গলস খেতাব পাননি। তিনি ১২টি ডাবলস এবং ৭টি মিকসড ডবলস খেতাব পেয়েছিলেন। উইম্বলেডন টেনিস আসরে পুরুষ ও মেয়েদের পক্ষে সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব (৮টি) পেয়েছেন আমেরিকার কুমারী হেলেন উইলস মুডী (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী রোয়ার্ক)। অপরদিকে শ্রীমতী বিলি জিন কিং পেয়েছেন ৬টি সিঙ্গলস খেতাব।

শ্রীমতী ইভন কলে (কুমারী জীবনে গুলাগং) সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন মাত্র একবার ১৯৭১ সালে। ১৯৭২ সলের ফাইনালে বিলি জিন কিংয়ের কাছেই তিনি ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে হেরেছিলেন।

পাথর চাপা কপাল

অস্ট্রেলিয়ার ৩৩ বছরের প্রবীণ খেলোয়াড় কেন রোজওয়ালের সত্যিই পাথর চাপা কপাল। তিনি এবারের ৪র্থ রাউণ্ডে ১৬নং বাছাই স্বদেশের টনি রোচের কাছে ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট প্রাণপণ লড়ে হেরে যান। রোজওয়ালের দুর্ভাগ্য উইম্বলেডন আসরে তাঁর সিঙ্গলস খেতাব জয় এবারও হল না। উইম্বলেডনের সিঙ্গলস খেতাব ছাড়া তিনি বিশ্বের অপরাপর সেরা প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। উইম্বলেডনের আসরেই রোজওয়াল চারবার ফাইনালে খেলে হেরেছেন—১৯৫৪ সালে ড্রবনি, ১৯৫৬ সালে লুই হোড, ১৯৭০ সালে নিউকম্ব এবং ১৯৭৪ সালে জিমি কোনর্সের কাছে। রোজওয়াল তাঁর ১৭ বছর বয়সে উইম্বলেডনের টেনিস আসরে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সেমি-ফাইনাল

পুরুষদের সেমি-ফাইনালে ১নং বাছাই এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান জিমি কোনর্স (আমেরিকা) ১১নং বাছাই রেসকো ট্যানারকে (আমেরিকা) এবং ৬নং বাছাই আর্থার অ্যাস (আমেরিকা) ১৬নং বাছাই টনি রোচকে (অস্ট্রেলিয়া) হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন। সেমি-ফাইনালে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে আমেরিকারই ছিল তিনজন এবং আর্থার অ্যাস ছাড়া বাকি তিনজন ছিলেন ন্যাটা খেলোয়াড়।

মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে আমেরিকার দুজন এবং অস্ট্রেলিয়ার দুজন খেলোয়াড় ছিলেন। এবং এঁরা পরস্পর স্বদেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলেছিলেন। ৩নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ২—৬, ৬—২ ও ৬—৩ গেমে ১নং বাছাই এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ক্রিস ইভার্টকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। অপরদিকে ৪নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী ইভন কলে (কুমারী জীবনে গুলাগং) ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে ৫নং বাছাই শ্রীমতী মার্গারেট কোর্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

প্রবীণদের জয়-জয়কার

টেনিসের পণ্ডিতেরা এবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন গত বছরের মত এবারও তরুণ-তরুণী সিঙ্গলস খেতাব জয় করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তাঁদের জায়গায় প্রবীণ-প্রবীণা সিঙ্গলস খেতাব হস্তগত করেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী আর্থার অ্যাসের বয়স ৩১ এবং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়িনী শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের বয়সও ৩১ বছর।

নগদ পুরস্কার

এবারের উইম্বলেডন টেনিস আসরে মোট নগদ পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ১১৬,৭২৫ পাউণ্ড। পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান আর্থার অ্যাস (আমেরিকা) নগদ ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার পেয়েছেন। অপরদিকে মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) পেয়েছেন ৭,০০০ পাউণ্ড।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৬নং বাছাই আর্থার অ্যাস (আমেরিকা) ৬—১, ৬—১, ৫—৭ ও ৬—৪ গেমে ১নং বাছাই এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ান জিমি কোনর্সকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : ৩নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ৬—০ ও ৬—১ গেমে ৪নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী ইভন কলেকে (কুমারী জীবনে গুলাগং) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : স্যাণ্ড মেয়ার এবং ভিটাস গেরুলাইটিস (আমেরিকা) ৭—৫, ৮—৬ ও ৬—৪ গেমে কলিন ডাউডেসওয়েল (রোডেসিয়া) এবং অ্যালান স্টোনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : অ্যান কিয়োমুরা (আমেরিকা) এবং কাজুকো সোয়ামাতসু (জাপান) ৭—৫, ১—৬, ৭—৫ গেমে বেটি স্টোভ (হল্যাণ্ড) এবং ফ্রাঁসোয়া দ্যুরকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : ১নং বাছাই মার্টি রিসেন (আমেরিকা) এবং শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং বেটি স্টোভকে (হল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

অনেকের ধারণা আমি নাকি—মেজাজী মুডি আমি নাকি আবেগপ্রবণ সেন্টিমেন্টাল। হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আমি হয়তো কাউকে চিনতে ভুল করেছি অথবা কেউ হয়তো আমার বুকের অন্তরটা দেখেন নি। তবে হ্যাঁ আমি আবেগপ্রবণ। আমার বিশ্বাস আবেগবর্জিত মানুষ মানুষই নয় স্রেফ কাঠের পুতুল।

—তরুণ বসু

তরুণ বসু

'জীবনটা পুতুল খেলা নয়। খেলায়ও ছেলে খেলা নয়। বাস্তব জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ আমার ঐ উপলব্ধিই হয়েছে। খেলাধুলো বিশেষতঃ ফুটবল এখন বিকেলের বিলাস বা অবকাশ রঞ্জনের সামগ্রী নয়। সব ব্যাপারটাই সিরিয়াস। রুক্ষ জীবনযাত্রার মতই সিরিয়াস'।

সেদিন সকালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে বসে বসে ভারতের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক তরুণের মুখ থেকে ঐ কথাই শুনছিলাম। সকাল সাতটা থেকে ঘন্টা দুই কড়া কোচ প্রদীপের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করে ফিরে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছছিলেন তরুণ। বললেন : 'আজ আর সুখের খেলা নেই। এখন সব সিরিয়াস। রেশন কার্ডের মত বাস্তব সত্য। অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে লড়তে হবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। দুঃখের কথা এই উপলব্ধি আজও আমাদের অনেকেরই হয় নি, আর হয়নি বলেই মাঠে এসে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সবার অলক্ষ্যে—নায়কের প্রস্থান ঘটছে। এই দেখুন কি সব বলে ফেললুম। ভাবছেন হয়তো যে ছেলেটা জ্ঞান দিচ্ছে'।

পঁচিশ বছরের শক্ত সমর্থ যুবক ইস্টবেঙ্গলের সর্বভারতীয় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন তরুণ বসু ওখানেই থেমে গেলেন। তরুণ অসাধারণ চটপটে নিজের দায়িত্ব

সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। অসীম সাহস অফুরন্ত উদ্যম। নিখুঁত গ্রিপিং। চোখের পলকে দেহটাকে বাঁকিয়ে এক পোস্ট থেকে আর এক পোস্টে নিয়ে যেতে পারেন। ফুটবল অভিজ্ঞ মহলের অনেকের ধারণা—তরুণ থঙ্গরাজের সার্থক উত্তরসূরী। এই দৃঢ়তা একাগ্রতা লক্ষ্য করেই প্রখ্যাত প্রদীপ (ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল কোচ) তরুণকে ১৯৭৫ সালে দলে টেনেছেন। মধ্যাহ্ন সূর্যের মত ছিলেন মস্তবড়ো মোহনবাগান অঙ্গন আলো করে, ছিলেন জনপ্রিয়তা শীর্ষে বিরাট এক রাজপ্রসাদের উজ্জ্বল এক চরিত্র হয়ে। ইস্টবেঙ্গলে এসে কিন্তু ঐ চরিত্র একটুও ম্লান হোল না, পরন্তু প্রদীপের স্নেহে যত্নে মায়ায় মমতায় কর্মকর্তা ও সমর্থক-দের আদর আপ্যায়নে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। এক কথায় বলতে গেলে তরুণ এখন গোটা ইস্টবেঙ্গলের প্রথম পুরুষ।

উত্তর কলকাতায় কাঁটাপুকুরের (বাগ-বাজার) ছেলে তরুণ। এখন আরও খানিকটা উত্তরাঞ্চলে সরে গেছেন—পাইকপাড়ায়। খুব অল্প বয়সেই তরুণ তাঁর বাবাকে (কালিদাস বসু) হারান। বাবার ছিল শেয়ারের ব্যবসা। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত মা (শ্রীমতী শেফালী বসু) দ্বৈতভূমিকা পালন করছেন। তরুণের ভাষায় বলতে গেলে 'মা শুধু আমার মা-ই নন, আমার বাবাও। বাবার কাছে আজ যা পেতে পারতুম, মা তা পুষিয়ে দিচ্ছেন ষোল আনা। মা আছেন, বড় ভাইয়েরা আছেন আমার স্ত্রী (শ্রীমতী জয়শ্রী বসু) আছেন প্রদীপদা আছেন, ফুটবল আছে হিন্দুস্থান লিভারের চাকরী আছে; সব নিয়ে আমি এখন মোটামুটি ভালই আছি। সকাল বেলা বাড়ী থেকে মাঠ। সেখানে প্রাকটিস, প্রাকটিসের পর ফেয়ারলি প্লেসের অফিসে অফিস থেকে আবার মাঠ এবং মাঠ থেকে সোজা বাড়ী। আমি বেশ ভালই আছি।

উত্তর পর্বে উত্তর কলকাতায় সরে এলেও গোড়ায় কিন্তু তরুণ ফুটবল খেলেছেন বা ফুটবল খেলতে সুরু করে-ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার ন্যাশনাল স্কুলে। এখন মুখ বদলাবার জন্য অফিস লীগের খেলায় মাঝে মাঝে রাইট আউট-এ খেললেও ফুটবলে জীবনের গোড়ার দিক থেকে তরুণ বসু গোলকীপার। ন্যাশনাল স্কুলে এবং তারপর পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ স্কুলে পড়ার সময় ফুটবল টীমের প্রথম নামটি বরাবরই ছিল তরুণের। ১৯৬৮ সালে কুমার আশুতোষ থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করার আগে অন্ততঃ স্কুল ফুটবল খেলেছেন অনেকবার [illegible] মাঠে

প্রথম পদক্ষেপ চন্দ্র মেমোরিয়ালের মাধ্যমে। চন্দ্র মেমোরিয়াল থেকে ইয়ংবেঙ্গল-এ। ইয়ংবেঙ্গল থেকে ১৯৬৮ সালে বালী প্রতিভায় (সিনিয়ার ডিভিসন)। তারপর পর্যায়ক্রমে এবং চাহিদা অনুযায়ী রাজস্থান খিদিরপুর মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলে। মাঝখানের এই আট বছরে তরুণ প্রায় উল্কার মত আকাশছোঁয়া খ্যাতি পেয়েছেন নিজের অনন্য ক্রীড়াদক্ষতার দৌলতে। সন্তোষ ট্রফি (জাতীয় ফুটবল) প্রতি-যোগিতায় তরুণ প্রথম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন ১৯৭২ সালে গোয়ায়। ৭৩ সালে এর্ণাকুলাম ও ৭৪ সালে জলন্ধরেও তিনি ছিলেন বাংলার পয়লা নম্বর গোলকীপার। ১৯৭১ সাল বোধহয় তরুণের জীবনে সব-চেয়ে স্মরণীয় কারণ ঐ বছরই তিনি প্রথম-সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পান রাশিয়া সফর-কারী জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে। রাশিয়া সফরে তরুণ তিনটি ম্যাচ খেলেছেন সোচি, বাকু ও লেনিনগ্রাডে। '৭২ সালে প্রাক ওলিম্পিক ফুটবলেও (রেঙ্গুনে) তরুণ ছিলেন ভারতের এক নম্বর গোলকীপার।

ফুটবলে যা কিছু স্বীকৃতি, যা কিছু সাফল্য তার সবটুকুর জন্য তরুণ কৃতজ্ঞ সর্বশ্রী অচ্যুত ব্যানার্জি অরুণ সিংহ অরুণ ঘোষ এবং প্রদীপ ব্যানার্জির কাছে। তরুণ ও'দের কথা স্মরণ করে বললেন : 'ও'রা আমার দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েই শুধু আমি ও'দের চরণ ছুঁতে পারি।'

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

ফুটবলের কথায় বাঙালীর রক্তে দোলা লাগে। ফুটবলকে বাঙালী সমাজ ভাল-বাসেন পরিচর্যা করেন উৎসাহ দেন। মূলতঃ এই সর্বজন স্বীকৃতি সার্বজনিক স্নেহলাভের কল্যাণেই সমগ্র বাংলায় ফুটবল এতো গভীরে শেকড় পাঠাতে পেরেছে। বাংলার জাতীয় জীবনে ফুটবলের গুরুত্ব আজ কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়।

ভারতে ফুটবলের প্রথম প্রকাশ এই কলকাতার গড়ের মাঠে। প্রথম ভারতীয় নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর সযত্ন সেবায় ইংরেজদের উৎসাহে এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় দুখীরামবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় যে ফুটবল একদিন বাংলা তথা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সেই ফুটবলের জন-প্রিয়তা এখন গগনচুম্বী। স্বীকার করতে বাধা নেই বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বিচারে ভারতের ফুটবল এখনও ন্যূনতম মানেও পৌঁছাতে পারে নি। কবে পারবে বা আদৌ কোনদিন পারবে কিনা তা বিতর্ক সাপেক্ষ। সাম্প্রতিক মান যে বিন্দুতেই থাক না কেন ভারতবর্ষ বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলায় ফুটবলের জন-প্রিয়তা অনস্বীকার্য। অপরিসীম সেই জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ রেখে অমৃত পাঠকদের সামনে আবার নিয়ে আসা হচ্ছে ফুটবল মাঠের নায়কদের।

খেলার জগতে মেয়ে

কাবাডি খেলায় গৃহস্থ বধূ রমা পাত্র

"বিকেলে মাঠে খেলতে না গেলে সেদিন শরীর ও মনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি। সবুজ মাঠের আকর্ষণ যে কি তা আমি আপনাকে কথায় বলে বোঝাতে পারব না।

কথাগুলি বলছিল শ্রীমতী রমা পাত্র। স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ মজবুত শরীর এই মেয়েটির। হাওড়া কাবাডি এসোসিয়েশনের নিয়মিত খেলোয়াড়। রমা বিবাহিতা। এই প্রথম একজন বিবাহিতা গৃহস্থ বধূর সন্ধান পেলাম যে সাংসারিক কাজকর্ম পুত্রের দেখাশোনা করার পরও খেলার সময় করে নিতে পারছে। এর আগে আর এক বিবাহিতা রাইফেল কুশলী শ্রীমতী রীতা সিংহের কথা মেয়েদের খেলা-ধুলার পাতায় জানিয়েছি। শ্রীমতী রমার কাছেই শুনলাম কাবাডিতে শীঘ্রই আরও বিবাহিতা তরুণীর দেখা পাওয়া যাবে।

রমা দৌড়ঝাঁপ বা এথলেটিক ক্রীড়ায় যোগ দিচ্ছে বালিকা বয়স থেকেই। বালীর ম্যাকড়বি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরূপে ৫৭—৫৮ সালে একশ ও দুশ মিটার দৌড় এবং রিলে রেসে যোগ দিয়ে রমা বালীর আন্তঃ স্কুল ক্রীড়ায় বিজয়িনী হয়। কাবাডিও খেলছে প্রায় ঐ সময় থেকে রমার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল ও খো-খো খেলা-তেও দক্ষ। রমার বিয়ে হয় ১৯৬৭ সালে বালীরই শংকরপ্রসাদ পাত্রের সঙ্গে। বালী বিদ্যাবাগীশ লেনের শ্রীবেচু কাঞ্জিলালের তিন পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে বড় রমা ছাড়াও পরের বোন বীথিকাও কাবাডি খেলায় জেলার প্রতিনিধিত্ব করে। রমার স্বামী চাকরী করেন হিন্দ মোটরসে। ছেলেবেলার খেলার সূত্র ধরে রমা ৭২ সালে নিয়মিত কাবাডি অনুশীলন করতে থাকে এবং ঐ বছরই গ্রামীণ বাংলাদলের হয়ে সর্বভারতীয় গ্রামীণ ক্রীড়ায় যোগ দেয়। দলের অধিনেত্রী ছিল ছোট বোন বীথিকা। সেবার পশ্চিম বাংলার মেয়েরা কাবাডি ফাইন্যালে রানার্স-আপ হয়—বিজয়ীর সম্মান পায় রাজস্থানের মহিলা দল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নকআউট কাবাডিতে—রমা ৭২-৭৩ সাল থেকে হাওড়া দলের হয়ে খেলছে। সেবার ওদের দলই বিজয়ী হয়েছিল। ৭৩-৭৪এ রমাদের দল রানার্স-আপ হয়। ৭৪-৭৫ এর ফাইন্যাল খেলায় রেফারীর সিদ্ধান্ত ঘিরে মাঠে যেসব গোলমাল হয়েছিল দৈনিক সংবাদপত্রে তার বিবরণ প্রকাশ হয়েছে। রাজ্য কাবাডি কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত হাওড়া দলকে রানার্স-ঘোষণা করে।

১৯৭৪-এ সর্বভারতীয় মহিলা কাবাডি দলে রমা স্থান পেয়েছিল—সেবার আসান-সোলে আয়োজিত এই আসরে মহারাষ্ট্রের কাছে পশ্চিম বাংলা ফাইন্যালে হেরে যায়।

রমা বলে আমাদের ওখানকার কাবাডি প্রশিক্ষক লতিকা চ্যাটার্জিই (এখন চক্রবর্তী) আমাকে কাবাডি খেলায় টেনে আনেন। তার আগে খো-খো আর এথলেটিকসের ওপরই আমার বেশী ঝোঁক ছিল।

—জানেন আমি একান্নবর্তী পরিবারের বড়বৌ। ছেলে এখন স্কুলে পড়ে। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। অন্য অনেকের শ্বশুরবাড়ীর মত আমাকে কিন্তু খেলা-ধুলায় যোগ দিতে কেউ [illegible] করেন নি। বরং আমি খেলাধুলো[illegible] [illegible]তে জেনে এঁরা বিশেষ করে শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামী আমাকে উৎসাহই দেন। তাই বাড়ীর দিক থেকে আমি খেলাধুলার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধায় পড়িনি। মাঝে মাঝে বাইরের লোককে বলতে শুনি—'বড় বড় মেয়েরা এইভাবে সর্ট-প্যান্ট পরে খেলার আসরে নামছে—জাতজন্ম কিছু আর রইল না।' তবে সেসব কথায় আমি বা আমাদের কেউই কান দিই না। এদেশে মেয়েদের খেলাধুলায় এখনও নানা বাধা আসবেই। ওসবে কান দিলে চলে না। আর খোড়াতেই বলেছি প্রতিদিন বিকেলে মাঠে অন্তত কিছুক্ষণ না খেললে যেন অস্বস্তি লাগে আমার।

অন্যান্য রাজ্যের কাবাডি খেলার ধরন-ধারণ তোমার কেমন লাগল?

—দেখুন পাঞ্জাব, দিল্লী বা রাজস্থানের মেয়েরা তুলনায় আমাদের চেয়ে বেশী দৈহিক শক্তি ধরে। কিন্তু পাঞ্জাবের মেয়েরা [illegible] বিপক্ষ [illegible] [illegible]

করার চেষ্টা করে। ধরা পড়লে আঁচড়ে কামড়ে পর্যন্ত দেয়। তবে সে তুলনায় দিল্লী ও রাজস্থানের ক্রীড়াপদ্ধতি খুব পরিচ্ছন্ন। রাজস্থানের রক্ষণব্যবস্থা বেশ জোরালো এবং মজবুত। দিল্লীর মেয়েদের দৈহিক শক্তিসামর্থ্যই সবচেয়ে বেশী কিন্তু বাংলার মেয়েদের কৌশলের কাছে তাদের নতি স্বীকার করতে হয়েছে। পাঞ্জাবও গায়ের জোরে আমাদের কাছে জিততে পারেনি। আর ১৯৭৪-এ আসানসোলে মহারাষ্ট্রের যা খেলা দেখলুম তাতে আমার ধারণা সর্বভারতীয় আসরে মহারাষ্ট্রের মেয়েদের গায়ে যেমন জোর আছে—ওদের কলাকৌশলও তেমনি পরিণত। সবচেয়ে বড় কথা মহারাষ্ট্রের মেয়েদের মত অমন স্পোর্টিং দল আর দেখিনি। বিদর্ভের মেয়েদের কোর্ট আগলানোর পদ্ধতি খুবই চমৎকার।

—আচ্ছা পশ্চিম বাংলা দলের খেলা সম্পর্কে তোমার মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়েছে?

—প্রথম কথাই হচ্ছে পশ্চিম বাংলার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকুশলী মেয়েদের রাজ্য দলে বা জেলা দলে নিতে হবে। সর্বভারতীয় আসরে সাফল্য লাভ করতে হলে শ্রেষ্ঠ মেয়েদের দ্বারা গঠিত দলটিকে বেশ ভালভাবে নিয়মিত অনুশীলন করাতে হবে যাতে এদের মধ্যে দলগত সংহতি এবং কে কোন জায়গায় খেলবে সেটা গোড়া থেকেই ঠিক হয়ে যায়। আমি দেখেছি যে মেয়ে পাশে খেলতে অভ্যস্ত তাকে মাঝে খেলতে বাধ্য করা হল। তাছাড়া রক্ষণ বা আক্রমণের (হানা) ব্যাপারেও যথেষ্ট আগে থেকে উপযুক্তভাবে দলগত বোঝা-পড়া থাকা দরকার। কে কখন কাকে ধরবে আর সে সময় অন্যেরা কিভাবে তাকে সাহায্য করবে সেটা অনুশীলনের সময় ঠিকঠিকভাবে বোঝান হলে দলের পক্ষে প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করার সুবিধা হয়। আমি দেখেছি এব্যাপারে আমাদের মধ্যে দলগত বোঝা-পড়ায় বেশ ত্রুটি আছে।

রমা বলে জানেন সংগঠনের ত্রুটির জন্য অনেক সময় পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়—প্রকৃত দক্ষ খেলোয়াড় বাদ পড়ে যায়—সেখানে দুর্বল খেলোয়াড় স্থান পায়।—ফলে দলেরই ক্ষতি হয়। ঠিকঠিকভাবে দল বাছাই করার ওপর আমি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিই।

রমা সংসারে সব কাজকর্ম করার পরও নিয়মিত অনুশীলন এবং কাবাডির আনুষঙ্গিক ব্যায়াম করার সময় করে নেয়।

—খেলার দক্ষতা বুদ্ধি নির্ভর করে শরীর পুষ্টির ওপর। তবে কি জানেন আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিদিন যা খাদ্য পাওয়া যায় তাতেই চলে যায়। খুব একটা বিশেষ ধরনের খাবার পাওয়াও তো এ বাজারে বেশ দুষ্কর। রমা শেষকালে বলে ছেলেবেলায় শ্রীনারায়ণ ব্যানার্জি আমাকে খেলাধুলো মানে দৌড় ইত্যাদি শিখিয়েছেন। আমার মনে হয় ছেলেবেলা থেকেই বাঙালী মেয়েদের খেলাধুলো চর্চার ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সপ্রতিভতাও বাড়বে। তাছাড়া ছোট বয়স থেকে খেলা শিখলে পরে তাতে দক্ষতা অর্জনও সহজ হয়। এখন আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার অনেক ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রত্যেক অফিস বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উচিত তাদের কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদেরও খেলাধুলায় উৎসাহিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা। সমস্ত শিল্পনগরী বা উপনগরীতে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্য বিশেষভাবে ক্রীড়াঙ্গন ও প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

—সংসারধর্ম করার মাঝে তুমি কতদিন খেলবে?

—আমার ইচ্ছা যতদিন পারব ততদিন খেলব। তারপর ছেলেমেয়েদের খেলা শেখাব। রমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কাবাডি এসোসিয়েশনের মাঠ থেকে ফিরে আসি।

অময়

জার্মাণ আইডল

ফুটবল জগতের এক উজ্জ্বল তারকার নাম ইউ সীলার। ষাট দশকের শেষভাগে বিদায়ী ফুটবলারদের মধ্যে অবশ্যই এক উল্লেখনীয় নাম। যার ক্রীড়াখ্যাতি দেশের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বিদেশের আকাশ বাতাসকে মুখর করেছে এক যুগেরও অনেক বেশি সময় ধরে। জার্মানীর ফুটবল অনুরাগীচিত্তে ইউ সীলারের মত এত বেশী জায়গা জুড়ে আর কোন স্বদেশী ফুটবল খেলোয়াড় থাকেনি। সীলার আর এক [illegible] নাম। এক স্মরণীয় ক্রীড়া শৈলীর নজীর।

ঘরে বাইরে ইউ সীলার কতটা জনপ্রিয় ছিলেন দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তা সহজ করে বলি। ১৯৭০ সালে ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর সাংবাদিকদের বিচারে ফুটবলার অফ দি ইয়ার পুরস্কার পান। মেকসিকো অলিম্পিকে ফেয়ার প্লে পুরস্কার দানের জন্যে গৃহীত মোট ৬৮৭ ভোটের মধ্যে সীলারের পক্ষে পড়ে সর্বোচ্চ ৫৫৬ ভোটপত্র। আর জার্ড মুলারের স্বপক্ষে যায় ১২৩টি ভোট। বলা বাহুল্য এ বছর (১৯৭০) মেকসিকো অলিম্পিকে ১০টি গোল করার সুবাদে ব্যক্তিগত গোল-দাতার খতিয়ানে মুলারের নাম ছিল সর্বাগ্রে। আন্তর্জাতিক আসরে খ্যাতির শিখরে থেকেও মুলারের মত জনপ্রিয় খেলোয়াড়কেও ভোটপত্রের নিরিখে শোচনীয়ভাবে হারতে হয়েছে সীলারের বিরুদ্ধে। জনমানসে এমনই জনপ্রিয় ছিলেন ইউ সীলার। ১৯৭০ ছাড়াও ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালেও সীলার ফুটবলার অফ দি ইয়ার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিন-বার খেতাব পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ শেষবারে সোনার ফুটবল সীলারের হাতে চিরকালের জন্যে তুলে দেন। এই বর্ষশ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে

জার্মান সরকার ফেডারেল অর্ডার অফ মেরিট উপাধিতেও ভূষিত করেন ১৯৬৫ সালে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি বলতে গিয়ে সীলার সম্পর্কে সেই সুপ্রাচীন প্রবাদ বাক্যটি উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হয়—'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'। সারা পৃথিবীর গুণমুগ্ধ ফুটবল খেলোয়াড়েরা সীলারকে মনে প্রাণে কতটা ভালবাসত তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে তার বিদায় দিনের শেষ খেলায়। ১৯৭২ সালের মে দিবসে হামবুর্গে আয়োজিত এই খেলায় এসেছিলেন ইংল্যান্ডের ববি চার্লটন জিওফ হার্স্ট পশ্চিম জার্মানীর জার্ড মুলার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার হাঙ্গেরীর মেসজারস উত্তর আয়ারল্যান্ডের জর্জ বেস্ট পর্তুগালের ইউসিবিও প্রমুখ স্বনামধন্যরা এই কৃতি খেলোয়াড়কে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা জানাতে। এই খেলায় বাছাই ইউরোপ ৭—৩ গোলে জিতেছিল। জয় পরাজয়ের চেয়েও দর্শকদের কাছে অধিক অভিনন্দিত হয়েছিল সীলারের দেওয়া দুটি আকর্ষণীয় গোল।

প্রতিপক্ষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জালে বল জড়িয়ে দিতে সীলার ছিলেন বাজিকরের মত দক্ষ কারিগর। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন গোল করাই একজন সেন্টার ফরোয়ার্ডের জীবনে সবচেয়ে সার্থক এবং সফল নিষ্পত্তি। একটি গোলের জন্যে সীলার সারা মাঠ চষে বেড়াতেন। তাঁর সমগ্র জীবনের সংগ্রহও নেহাৎ কম নয়। হামবুর্গের এইচ এস ভি ক্লাবের সদস্য হিসেবে আটশোটি ম্যাচে সীলার গোল করেছেন ৭০০। আর বাহাত্তরটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনি ৪৩টি গোল করেছেন। ১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপের খেলায় সুইডেনের বিপক্ষে পশ্চিম জার্মানী হালে পানি পায়নি। অবশেষে সীলারের গোলেই জয়লাভ করে পশ্চিম জার্মানী মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার অধিকার অর্জন করে। ১৯৭০ সালের মেকসিকো অলিম্পিকে পশ্চিম জার্মানী দলের কর্ণধারের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় বর্ষীয়ান সীলারের কাঁধে। যদিও সীলার এই দায়িত্বভার নিতে অস্বীকার করেছিলেন হয়ত বা নিজের শারীরিক অক্ষমতার জন্যে। কারণ তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ। কিন্তু অসংখ্য অনুরাগীদের অনুরোধ শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারেন নি স্নেহপ্রবণ সীলার। কিন্তু ঐ বয়সেও সীলার ছিলেন যে কোন উঠতি তরুণের মত গতিময়, ক্ষিপ্র ও প্রাণবান। এক সাংবাদিকের মন্তব্যে আমার কথা আরও স্পষ্ট করে বলি—দিস টাইম ইউ সীলার এট থার্টি থ্রী দি ওলডেস্ট ম্যান অন দি ফিল্ড বাট এট দিস স্টেজ স্টীল স্প্রিনটিং লাইক এ টীনেজার। মেকসিকো অলিম্পিকে সীলার মোট তিনটি গোল করেন। মেকসিকো অলিম্পিক নিয়ে সীলার চারবার বিশ্বকাপে স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন গৌরবের সঙ্গে।

জার্মানী প্রথম চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছিল ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৮তে চতুর্থ ১৯৬৬তে দ্বিতীয় ও ১৯৭০এ তৃতীয় স্থান লাভ করে। মাঝে ১৯৬২তে প্রাপ্তির ঘর শূন্য থেকে গেছে। গত বিশ বছরে অর্থাৎ ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত (১৯৬২ বাদ দিলে) অনায়াসে পশ্চিম জার্মানীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারটি দলের অন্যতম বলে বিবেচিত করা যায়। জাতীয় দলের এই আন্তর্জাতিক কৃতিত্বে ইউ সীলারের অবদান আকাশছোঁয়া বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ক্ষিপ্রগতি আক্রমণ ও নিখুঁত স্যুটিং সীলারের বড় সম্পদ। চিন্তাশীল উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে আক্রমণ রচনার পথ সুগম করতে সীলার দক্ষ শিল্পী। পেনাল্টি সীমানার মধ্যে তাঁর পায়ে বল পড়ার অর্থ নির্ঘাত গোল। পশ্চিম জার্মানীর আক্রমণভাগে সীলার ছিলেন সবচেয়ে ধারালো।

সীলারের জন্ম ১৯৩৬ সালের ৫ নভেম্বর। পিতা আরউইন সীলার ছিলেন একজন সামান্য ডক কর্মী। তবে তিনি খেলাধূলো ভালবাসতেন। এবং নিজেও ছিলেন একজন সৌখীন ফুটবলার। ইউ সীলারের খেলোয়াড়ী জীবনের সাফল্যের অন্তরালে তাঁর বাবার অনুপ্রেরণা কাজ করেছে অনেকখানি।

খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকের হার এক-যুগ আগেও আজকালকার মত ছিল না। তবুও সীলার কম পয়সা রোজগার করেন নি। সঠিক অঙ্কটি গোপন থাকলেও ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা মাসে কয়েক হাজার মার্কের কম নয়। বিদেশের নানান জায়গা থেকে বারে বারে ডাক এসেছে তাদের দলে খেলার জন্যে মোটা টাকার বিনিময়ে। ইন্টারন্যাশনাল মিলান সীলারকে ১,১০০০০০ মার্ক দিতে চেয়েছিল। স্বদেশ প্রেমিক সীলার এই বড় সড় অঙ্কের লোভ স্বচ্ছন্দে প্রত্যাখ্যান করে থেকে গেলেন হামবুর্গের এইচ এস ভি ক্লাবে। সীলারের অর্থোপার্জনের অন্যপথ ব্যবসা। তিনি খেলার সাজসরঞ্জাম ও পাদুকা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। শোনা যায় তাঁর পেট্রল পাম্প থেকেও লাভ হত প্রচুর।

পরিশ্রম আর চেষ্টার দ্বারা মানুষ কতদূর এগোতে পারে সীলার যেন তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অনমনীয় মনোবল সীলারকে অনেকক্ষেত্রেই চালিত করেছে অসাধ্য সাধনে।

পশ্চিম জার্মানীর মাঠে সীলারের পর ফ্রানজ বেকেনবাউয়ার জার্ড মুলার উলি হোয়েনস প্রমুখ আরও অনেক খ্যাতিমান এসেছেন ও আসছেন। কিন্তু দর্শকচিত্তে জার্মান আইডল ইউ সীলার এখনও স্বস্থানে অবিচল।

প্রশান্ত দাঁ
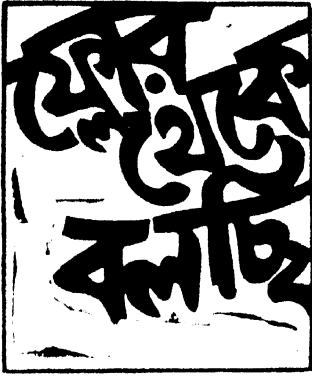
আমি এখনে এক্ষুনি একটা ক্রাইমের গন্ধ পাচ্ছি। আজ ফ্লোরের মধ্যে অসহ্য গরম। প্রায় প্রত্যেকেই দরদর করে ঘামছেন। এবং তাতে আরও ইন্ধন যোগাচ্ছে সেটের বড় বড় পাঁচ দশ কিলো ভোল্টের আলোগুলি। বাতাসের আর্দ্র ভাবটাকে নিমেষে শুষে নিচ্ছে। তারপর হাত বাড়াচ্ছে মানুষের শরীরে লবণাক্ত স্বেদ কণিকার দিকে। রক্ত জল হয়ে আসছে যেন।

'বহ্নিশিখা' নতুন ছবি। আজ সদ্য শুরু হল। তাই স্টুডিওতে কত মানুষজন এসেছে। বাতাসে ইন্টিমেটের গন্ধ ভাসছে। দামী শাড়ির খসখসানি। বেল-বটস পরা 'মড' মেয়েদের ভাসাভাসা দৃষ্টি—'মডেস্ট' ছেলেদের দিকে। উত্তমকুমারকে চোখের সামনে হঠাৎ রক্ত-মাংসের শরীরে দেখতে পাওয়া কিছু মেয়ের বিহ্বল চাউনি। রঞ্জিত মল্লিকের সপ্রতিভ হেঁটে যাওয়া ওদিকে যেন চিকন হাসির ঝর্ণা নামা। ঠাণ্ডা কোকাকোলার বোতলের ছিপি খোলার এক টানা কিউরিয়াস শব্দ। মিন্টের প্যাকেটগুলো রকেটের মত উড়ে যাওয়া। ক্যামেরাম্যানের মুখে বিরক্তির ভ্রূকুটি। পরিচালকের অর্ধ-স্ফুট হাসি—সব [illegible] একটা আর্কেস্ট্রা—ফ্লোরের সিলিং-এ [illegible] এক সময়—সাইলেন্স সাইলেন্স। এক দমকায় সবাই চুপ। কেবল জেগে থাকে [illegible] নিঃশব্দ পা টিপেটিপে চোখের চোরা [illegible] আর টোল ফেলে [illegible] হাসা।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ফ্লোর অনেক [illegible] নীরব সাক্ষী। মুসাফির সে-কথা [illegible]। [illegible] সময় আসে সময় যায় কেবল [illegible] নিয়ে যায় স্মৃতি। সে-স্মৃতি কখনও আনন্দ-মধুর। কখনও বিষণ্ণ করুণ। এইভাবে জীবন চক্রবৎ [illegible] [illegible] হচ্ছে।

'বহ্নিশিখা' ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্তর লেখা গল্প। গল্প যা হোক আসলে চলচ্চিত্রে সব সময় তার নবজন্ম হয়। ভারতের [illegible] শো-ম্যান উত্তমকুমার এ-ছবির নায়ক। [illegible] এটাই বড় কথা ; হয়ত বা অদ্বিতীয় [illegible]।

আমি এখন শুটিং দর্শনেচ্ছু [illegible] পেশা বাঁচিয়ে একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখের সামনে ভি-আই-পি-দের একটা সলিড স্তর। এঁরা এখন [illegible] মনোরঞ্জিত হচ্ছেন। চারদিকে গুঞ্জন। [illegible] দরজা দিয়ে একঝাঁক মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের শিল্পী অলি—উঁহু উঁহু ওলিভিয়া সেটে ঢুকলেন [illegible]—তাকে

এখন দেখছে। অন্যেরা দেখছে বৈশিষ্ট্যগুলি। ছেলেরা দেখছে—এ কেমন রমণী যৌবনের মাতাল-ম্যামভ্রেকস স্বপ্নের সঙ্গে মেলে কিনা বা চোখে চোখ রেখে কতক্ষণ নীরবে এর সঙ্গে বসে থাকা যায়?

সিনেমা এখন আধুনিক যৌবনের আসল লীলা-নিকেতন। উগ্র দুর্দর্শ এবং অপ্রতিরোধ্য। সিনেমার নায়ক নায়িকারা তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। এই সত্য কে অস্বীকার করে? ওলিভিয়ার কতই বা বয়স। ঋজু, সুঠাম চেহারা। মুখে নিষ্পাপ হাসি। চলনে সপ্রতিভতা। বলনে স্বচ্ছ সাবলীল। ওলিভিয়া ক্রমশ এগিয়ে উত্তমকুমারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্যস আর যায় কোথা। ফ্লোরে ঘন ঘন যেন বিদ্যুতের চমক জাগলে। অজস্র ফটোগ্রাফার তাদের ক্যামেরা সাক্ষাৎ রিকয়েললেস রাইফেলের মত বাগিয়ে আক্রমণ শুরু করল। ফ্লাশ ফ্যাশ স্মাইল স্মাইল প্লীজ স্মাইল...... কাম অন দিস ওয়ে.....ওফ বেবী প্লীজ প্লীজ।

এরা কি ইতালীর সেই নটোরিয়াস ফটো-সংস্থা পাপ্পারোশিওর স্টাফ? যারা দিনের পর দিন লুকিয়ে ব্রিজিট বার্দোর ন্যূড ছবি তুলেছিল এক পরিত্যক্ত সাগর-দ্বীপে? বা জ্যাকুলিন কেনেডির সম্পূর্ণ নগ্ন ছবি যখন মহিলা মিসেস ওনাসিস নামে গ্রীসের এক নির্জন দ্বীপে হঠাৎ-ই গা-ধুতে সাগরের জলে নেমেছিলেন? এই ফটোগ্রাফাররা কি চায়? সিনেমার নায়িকাদের কাছ থেকে? পাঠক-পাঠিকাদের দোহাই দিয়ে? লোকাকীর্ণ আনন্দের হাটে-বাজারে?

সংসার সীমান্তে
কালী ব্যানার্জী ও অন্যান্য শিল্পী

এই গরমে সর্দিগর্মি হয়ে যাবারই কথা। আমার ঘ্রাণ শক্তির উৎস সিলড হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু তবু আমি এখানে একটা নির্ভেজাল ক্রাইমের গন্ধ পাচ্ছি? এই ভদ্রলোক যাকে দেখতে সুদর্শন অভিজাত। মাথায় কোঁকড়া চুল। মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। চোখে সেলুলয়েড ফ্রেমের মত স্পেক্ট। হাতে সিগার। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাউনি ইনি—কাম অন জয়ন্ত টেল মী দি নেম—কুইক ইয়েস মিস্টার সিনহা—থ্যাঙ্ক যু থ্যাঙ্ক যু জয়ন্ত. বাঙ্কির দিকে তাকিয়ে কেন বলছ—তাহলে আমার কাছ থেকে জেনে রাখ—ছেলেটি কাজ করে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে—

শার্প কাট-ট্রু বাক্কি। ক্যামেরার পঞ্চাশ মিলিমিটার লেন্সে ওলিভিয়ার বিস্মিত প্রতিক্রিয়া। সিনহা বলে চলে—শুধু তাই নয় আমার দলের সমস্ত গোপন কার্যকলাপ খুঁজে বের করবার দায়িত্ব পড়েছে ওর ওপর—

সুজন সিনহা এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় বাক্কির দিকে। ওকে জরীপ করে নেয়। তারপর বলে—এরপরও কি আর ওর জন্যে—

বাক্কি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বলে—না। আর দেখা হবে না।

সুজন সিনহা যেন এবার আনন্দে হয় কিছুটা। বলে—এটা আমি জানতুম। তুমি এইরকমই একটা উত্তর দেবে। গুড গার্ল—

সুজন সিনহা উঠে দাঁড়ায়। কে? হাজি মস্তান? বাখিয়া? নারাণ ফোনদার? যারা এদেশের টপ স্মাগলার? সমগ্র ইস্টার্ন কোস্ট জুড়ে যাদের জাল বিছিয়ে আছে বেআইনী আমদানীর এবং অপরাধের? সিনহা কি এদেরই আপনজন? পুলিশ হন্যে হয়ে সিনহাকে খুঁজছে। কত কত চার্জ। কিন্তু পাঁকাল মাছের মত এই ক্রিমিনাল কেবলই পিছলে পিছলে যাচ্ছে। মৃদু মিষ্টি হাসি হেসে হেসে। ফলে পুলিশ আরও ক্ষিপ্ত। সিনহা আরও বেপরোয়া। হাঃ।

এটা ডবল-রোল নয়—এই 'বাঙ্কিশিখা' ছবিতে উত্তমকুমার যে চরিত্রে অভিনয় করছেন। এটা বরং বলা যেতে পারে একটা সংশ্লিষ্ট পার্সোনালিটির চরিত্র। চরিত্রের উজ্জ্বল দিকে রয়েছেন তরুণ আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার বিলাসবিহারী। আর অন্ধকার-প্রান্তে কুখ্যাত কিডন্যাপার স্মাগলার মিস্টার সিনহা। একই বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে ক্রিমিনাল চরিত্রের [illegible] আর সারফেসে বিলাতফেরত ব্যারিস্টারের অফিস। এ-এক অদ্ভুত সমন্বয়।

লতিকা নামে একটি মেয়েকে বিলাসবিহারী তার যৌবনের প্রথম প্রেম উৎসর্গ করেছিল। কথা ছিল বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে বিলাসবিহারী লতিকাকে বিয়ে করবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে খবর হল—সবের পাদ্রীদের কাছে মানুষ হওয়া বিলাসবিহারীর জন্ম সন্দেহ-দোষে-দুষ্ট। সে পিতৃপরিচয়হীন মানুষ। লতিকা স্তব্ধ। তার বাবা-মা তখন একরকম জোর করেই লতিকার সঙ্গে অন্য একটি পুরুষের বিয়ে দিয়ে দিল। লতিকার কোন আপত্তিই সেখানে গ্রাহ্য হলো না।

বিলাসবিহারী কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফিরে দেখে লতিকা এখন অন্যের ঘরণী। বিলাসের অপরাধ? সে নাকি জারজ সন্তান। লতিকার তখন একটি মেয়েও হয়েছে। ব্যস্, দুর্নিবার প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে বিলাসবিহারীর মধ্যে

একটি অসামাজিক মানুষ সহসা জন্ম নিল—তার নাম সুজন সিনহা। সুজন সিনহা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের শিশু-সন্তানদের চুরি করে নিয়ে আসতে লাগল। সে যখন নিজে জারজ তখন সে-ও এদের শিশুদের জারজ পরিচয়ে বড় করে তুলবে—লোকচক্ষুর অন্তরালে। এভাবেই সে প্রতিশোধ নেবে সমাজের বিরুদ্ধে। সেই সুজন সিনহা একদিন লতিকার মেয়েকে কিডন্যাপ করে বসল। করলও আরো অনেক অভিজাত ঘরের শিশুকে। বহুদূরে এক পাহাড়ী উপত্যকায় গড়ে উঠল একটা অরফ্যানেজ। একে একে সেখানেই জমা পড়তে লাগল এই শিশুরা।

বহ্নি হচ্ছে সেই মেয়ে, লতিকার কন্যা—যাকে সুজন সিনহা নিজের মেয়ের মত মানুষ করে তুলেছে। রূপে যৌবনে সে এখন অতুলনীয়া। যাকে পাবার লোভে আর এক অসামাজিক চরিত্র লম্পট কুমারবাহাদুর নেকড়ের মত ঘুরছে। কিন্তু সুজন সিনহার বাঘের আস্তানায় হাত দেবার সাহস নেই যে তার!

কাট্-টু-কাট ফ্লোরে দেখি: আন্ডার-গ্রাউন্ডের সুদৃশ্য এই গোপন অফিসঘরে মুখোমুখি বসে আছে বহ্নি আর সুজন সিনহা। বহ্নি আজ মরিয়া হয়ে বলছে সেই শয়তান কুমারবাহাদুরের কথা—পথেঘাটে যে তাকে দেখলেই নানা প্রলোভন দেখায়। অশালীন প্রস্তাব করে। বহ্নি উত্যক্ত।

বহ্নি: নিশানগড়ের কুমারবাহাদুর রাস্তায় কোথাও দেখলেই আমার পিছু নেবে। জোর করে কথা বলার চেষ্টা করবে!...এমন অসভ্যের মত ব্যবহার করে যে—

সুজন সিনহা তার প্রতিপক্ষ কুমার-বাহাদুর সম্পর্কে সব খবরাখবর রাখে। দুচোখ বুঁজে সে বলে (এখানে উত্তম-কুমারের স্টাইলাইজড্ অ্যাক্টিং দেখার মত দাঁড়াচ্ছে): এর জন্যে আমি দুবার কুমার-বাহাদুরকে ওয়ার্নিং দিয়েছি।...তুমি যদি চাও আর সাবধান করব না। শাস্তি হয়ে যাক্।

মুসাফির জানে—ক্রিমিন্যালের কোডে এ-শাস্তি মানে অপরাধীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।

বাংলাদেশের রূপসী নায়িকা অলিভিয়া এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে: সে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে সুজন সিনহা বহ্নিকে একবার দেখে নেয়। বলে—ওয়েল, শোন, তোমাকে যে জন্যে ডেকেছি। তোমার সঙ্গে একটি ছেলের বন্ধুত্ব হয়েছে—এক বছর—নাম প্রদ্যোৎ ঘোষ?

কাট্-টু-কাট্ বহ্নির সলজ্জ দৃষ্টি। সে মাথা নীচু করে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে—হাঁ।

সেই চোখ
বাসবী নন্দী
পরিচালনা: সলিল দত্ত

—তুমি ছেলেটির পরিচয় জানো?

বহ্নি বলে—বলেছিল ছোটবেলাতেই বাবা-মা মারা গেছে। তারপর থেকে কোন এক দূরসম্পর্কের কাকার কাছে মানুষ। ভাল ছাত্র ছিল। এখন সরকারী কাজ করে।

সিনহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। —আর কিছু জানো?

বহ্নির সরল স্বীকারোক্তি—না।

ধারাল ছুরির মত ডায়লগ এবার সিনহার কণ্ঠে। যেন অমোঘ বিধান ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ—তাহলে আমার কাছ থেকে জেনে রাখ—ছেলেটি কাজ করে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে...

শঙ্কায় থরথর করে ওঠে বহ্নি। প্রদ্যোৎ পুলিশের লোক? কই কখনও তো মনে হয় নি! অমন অকপট শিশুর মত সরলতা যার প্রতিটি ব্যবহারে......

দেয়ালে একটি বোতাম। টিপতেই একটা আলমারির পাল্লা খুলে যায়। সিক্রেট ডোর। সুজন সিনহা সেই গুপ্ত দরজা দিয়ে সামান্য এগিয়ে যেতেই আরও একটা দরজা খুলে যায়। দেখা যায় উপরে ওঠার সিঁড়ি রয়েছে সেখানে।

উত্তমকুমার সেই সিঁড়ির ধাপ ভাঙতে ভাঙতে উপরের দিকে উঠতে থাকেন......

এ-ছবির পরিচালক হচ্ছেন পীযূষ বসু। সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্র গ্রাহক, শিল্প-নির্দেশক এবং সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, সূর্য চ্যাটার্জি ও বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি। এতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, রঞ্জিৎ মল্লিক, তরুণকুমার, শিবানী বসু; মন্টু ব্যানার্জি এবং অলিভিয়া।

মুসাফির

ঋষি কাপুর। নীতু সিং

খেল খেল মে

অবাস্তব কাহিনীর উপভোগ্য চিত্ররূপ!

প্রযোজনা রোজ মুভিজ

অজয় কলেজে ভর্তি হবার পর বিক্রম ও নিশার মতো সঙ্গী পেল। ওরা তিনজন মিলে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ হোল, যাতে সহজেই কলেজের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই অংশ গ্রহণ করতে পারতে।

একদিন তিনজনে মিলে খেলাচ্ছলে মজা করার জন্যে এক পরিকল্পনা করলো, জুয়েলার ঘনশ্যাম ভীষণ কৃপণ ব্যক্তি, ওকে ভয় দেখিয়ে বেশ কিছু অর্থ আদায় করার জন্যে ওরা মিথ্যে একটা চিঠি টাইপ করে, নির্জন স্থানে এক ডাস্টবিনের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আসবার জন্যে ধমক দিয়ে চিঠি দিল। চিঠি পড়ে, ঘনশ্যামদাস জীবনের আশংকা দেখে, নির্দিষ্ট স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে এল। বিক্রম, অজয় ও নিশা সেখান থেকেই টাকা সংগ্রহ করলো। সম্পূর্ণ টাকা বিক্রম রেখে দিল, সময় হলে ওরা সম্পূর্ণ টাকা ঘনশ্যামকে ফেরত দিয়ে দেবে। সেই রাতেই ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হোল ঘনশ্যামের। এক ফটোগ্রাফার আচমকা অজয় ও নিশার ছবি ঘনশ্যামের মৃত্যুর সাক্ষী হিসেবে তুলে [illegible] রহস্য জালে বন্দীভূত হয়। বিক্রমও এক মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। পরিস্থিতির নজর পড়লো অজয় ও নিশার প্রতি। ওরা ওদের চোখে চোখ রাখল। আসল আততায়ীর খোঁজ পাওয়া গেল না, আততায়ীই পুলিশের ছদ্মবেশে অজয়কে ধমক দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার গোপন রহস্য [illegible] চেষ্টা করেছিল। আচমকা বিক্রমের বন্ধবী আসল আততায়ী সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এবার রহস্যভেদ করার জন্যে পুলিশ অফিসার এলো, আততায়ীর সঙ্গে অজয়ের লড়াই হয়, ওদের দলকে ঘায়েল করার ব্যাপারে নিশা এবং কলেজের সঙ্গীরা ওদের সাহায্য করলো। এভাবে খেলাচ্ছলে রহস্যভেদ ঘটে।

লেখক শৈলেন্দ্রের গল্পের দুর্বলতা, শচীন ভৌমিকের চিত্রনাট্যের মধ্যেও আছে, হিন্দী ছবির তথাকথিত গতানুগতিক ভাবকে উনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি।

পরিচালক রবি ট্যান্ডন একটি সাধারণ তরুণ-তরুণীর প্রেম-প্রণয়ের ছবির মধ্যে, একটি রহস্য কাহিনী পরিবেশনা করার চেষ্টায় একেবারে ব্যর্থ হন নি। ছবির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত রহস্যের চমৎকার দেখাবার চেষ্টা করেছেন, পরিচালক হিসাবে উপভোগ্য রহস্য কাহিনীতে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করেছেন। অভিনয়ে—অজয় (ঋষি কাপুর), বিক্রম (রাকেশ রোশন) ও নিশা (নিতু সিং) মন্দ নয়। অন্যান্য ভূমিকায়—সত্যেন কাপ্পু, ইফতিকার, জগদীশ রাজ, অরুণা ইরানী, ললিতা পাওয়ার, দেবকুমার ও প্রীতি গাঙ্গুলী চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। আর ডি বর্মণের সংগীত-পরিচালনা উপভোগ্য। কলাকৌশলের কাজ বেশ পরিচ্ছন্ন।

নগর দর্পণে

পরিচালনা : যাত্রিক

চাকরির জোগাড় করে অনুপম মা ও দুই ভাইকে নিয়ে কলকাতায় আসে এবং লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। তারই চেষ্টায় অভাবক্লিষ্ট সংসারে সুখ ফিরে আসে। মেজভাই অজিতেশ (দিলীপ) পুলিশের বড়কর্তা হয়। ছোটভাই অমিয়কে (কৌশিক) অনুপম বিলেত পাঠায়। কিন্তু সুখ ও শান্তি বেশীদিন থাকে না। ওপরওয়ালার অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদে অনুপম চাকরি ছেড়ে দেয়; প্রকাশকেরা তার লেখা প্রত্যাখ্যান করে। স্ত্রী শ্রীলেখা (কাবেরী) তার অফিস বসের ঘনিষ্ঠ হতে থাকে; রাত্রে শ্রীলেখা অনুপমকেও প্রত্যাখ্যান করে। পরীক্ষায় ফেল করে অমিয় দেশে ফেরে; অজিতেশের স্ত্রী শুক্লার (নন্দিতা) সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অজিতেশেরও নির্মমতা অনুপমকে পীড়া দেয়। এইসব সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুপম গর্জে ওঠে। কিন্তু তার প্রতিবাদে কোনো সাড়া মেলে না। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে; শেষে পাগল প্রতিপন্ন করে জোর করে গারদে পাঠায়। পরে সকলেই নিজেদের ভুল বোঝে। অনুপমকে ফিরিয়ে আনতে হাসপাতালে ছোটে—কিন্তু তখন সে সত্যিই পাগল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেন যাত্রিক শিল্পীগোষ্ঠী। ছবির প্রথম পর্বের কাজ বেশ ভাল। কিন্তু বিরতির পর চিত্রনাট্যটি যেন টেনে টেনে বড় করা। গতিও মন্থর। ছবিটি এত দীর্ঘ না করলেও পারতেন। কলাকুশলীদের কাজও আরও ভাল হতে পারত। কেবল ক্যামেরার কাজ ভাল। তবে এ ছবির প্রাণবিন্দু অবশ্যই: অনুপম চরিত্রে উত্তমকুমার। এমন উঁচুদরের প্রাণবন্ত অভিনয় সচরাচর দেখা যায় না। ছবির যা ত্রুটি বা অভাব তা তিনি একাই পূরণ করেছেন। কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর অভিনয় মনে রাখার মত। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন দিলীপ মুখার্জী, গুরুদাস ব্যানার্জী, হারাধন ব্যানার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, কাবেরী বোস, নন্দিতা বোস ও ছায়া দেবী। একটি ছোট চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয় সুন্দর। নচিকেতা ঘোষের আবহসংগীত ভাল। ছবিতে গান একটি ('আমার পরাণ কোথা যায়'—অতুলপ্রসাদ)। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই গানটি ছবির একটি সম্পদ। দৃশ্যটিও সুন্দর। তবে রাগাশ্রিত গানটিতে গীটারের প্রয়োগ সত্যই বেমানান।

উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া

উমনো ও ঝুমনো

প্রযোজনা : সোমেন চট্টোপাধ্যায়

চলতি বছরে এটাই বোধহয় একমাত্র ভক্তিমূলক ছবি। ভাল ভক্তিমূলক ছবির চাহিদা বাংলা ছবির দর্শকেরা বরাবরই অনুভব করে। সেই চাহিদা পূরণে সোমেন চিত্রমের ভক্তি অর্ঘ্য—'উমনো ও ঝুমনো'। কার্তিক সংক্রান্তির ইতুপূজার ব্রতকথাকে কেন্দ্র করে এই ছবির চিত্রকাহিনী রচিত।

উমনো ও ঝুমনোর পিতা বগলাচরণ স্ত্রী সর্বজয়ার মৃত্যুর পর নয়নতারাকে বিবাহ করে। একদিন পিঠে খাওয়া উপলক্ষ্য করে নয়নতারার প্ররোচনায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ বগলাচরণ দুই কন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বনে ফেলে পালায়। দেবতার আশীর্বাদে তারা রক্ষা পায়। পথে রাধার সঙ্গে তাদের পরিচয়। রাধারই পিতৃগৃহে তারা বড় হতে থাকে এবং শুরু করে ইতুপূজা। সূর্যদেবের আশীর্বাদে রাজকুমার জয়দ্রথের সঙ্গে উমনো এবং কোটাল পুত্র পুণ্ডরীকের সঙ্গে ঝুমনোর বিবাহ হয়। স্বামীগৃহে যাত্রার দিন উমনো তাচ্ছিল্যে ইতুঘট ছুঁড়ে ফেললে সূর্যদেব রুষ্ট হন। এর ফলে উমনোর জীবনে নামে দুর্যোগ। স্বামী রাজ্য হারাতে বসে; রাজ্যে অশান্তি, পিতৃকলহ ও পরে পিতার মৃত্যু ইত্যাদি অমঙ্গলজনক ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকে। এমনকি স্বামীর মন থেকে তার প্রতি ভালবাসা চলে যায় এবং জল্লাদকে ডেকে উমনোর শিরচ্ছেদের আদেশ করে। জল্লাদ রাণী উমনোকে পালাতে সাহায্য করে। পরে উমনো নিজের ভুল বোঝে এবং প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বোন ঝুমনোর শরণস্থ হয়। অপরদিকে ঝুমনোর ইতুভক্তিতে দেবতা আশীর্বাদ করেন এবং তার সংসার অত্যন্ত সুখময় হয়ে ওঠে। স্বামীর ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি দিনে দিনে বাড়তে থাকে। অবশেষে ঝুমনোর ভক্তিতেই উমনো মুক্তি পায় ও শুরু করে ইতুপূজা। ফলস্বরূপে তার জীবনে সুখ ও শান্তি ফিরে আসে।

ত্রয়ী পরিচালিত ছবিটি আরও অনেক উপভোগ্য হতে পারত। এ ধরনের প্রামাণিক কাহিনীকে সফলভাবে চিত্রায়িত করবার জন্য আরও উন্নতমানের কলাকুশলীদের কাজের প্রয়োজন ছিল। ছবিটি অনর্থক দীর্ঘ। চিত্রনাট্যও দুর্বল। ক্যামেরার কাজ মোটামুটি। বেশীর ভাগ অভিনয় মঞ্চঘেঁষা। উমনো এবং ঝুমনোর ভূমিকায় পাপিয়া দাস ও কল্যাণী মণ্ডল এবং মধুমিতা দেবরায় ও রূপা চৌধুরীর অভিনয় ভাল। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন মৃণাল মুখোপাধ্যায় (বগলাচরণ), কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায় এবং পদ্মা দেবী। ভাল লাগে সর্বজয়ার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে (অতিথি)। একটি দৃশ্যে স্বর্গত নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও সুন্দর। সন্তোষ মুখোপাধ্যায় এ ছবির সংগীত পরিচালক। মোট সাতখানি গানের মধ্যে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে 'ভবের খেলা সাঙ্গ করে' গানটি এবং মান্না দে, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়-এর গানগুলি সুখশ্রাব্য।

—চিত্রবিদ

আনওয়ার হোসেন

ফিল্মের হিরো বলতে যেমন মাখন মাখন চেহারার যেরকম একখানা মুখ ভেসে ওঠে সবার মনে এবারের লেখায় যাঁকে হাজির করতে চলেছি তাঁকে সেই ইমেজের ধারে কাছেও আনা যাবে না। চেহারাটা বরং একবারে উল্টো বলা যায়। পুরুষালি গড়ন লম্বায় পাঁচ ফুট আট-দশ ইঞ্চিতো বটেই মুখে গ্ল্যামার জাতীয় বস্তুটির চিহ্নমাত্র নেই। টান টান ছিলার মত সোজা হয়ে দাঁড়ালে ব্যক্তিত্বের গভীরতা বাড়ে সেই সংগে চোখে মুখে ফুটে ওঠে নায়কের চেহারা।

হলিউডের অ্যান্ডার্সন কুইন বা চার্লটন হেস্টনের যৌবনের চেহারা যেমন ছিল অনেকটা সেইরকম ধাঁচে গড়ন আনওয়ার হোসেনের চেহারা। ভদ্রলোক এই মুহূর্তে আমার সামনে বসে ডিমের পোচ খাচ্ছেন। ওঁর সতীর্থ বন্ধু কানু ভৌমিকও (ইনিও ঢাকায় অভিনয় করেন) বসে নেই। তিনিও মুখ চালাচ্ছেন। ব্রেকফাস্ট শেষ হলো ফটোগ্রাফার আর আমি কাজ সুরু করার অপেক্ষায়।

আমাদের একটু যেতে দেরী হয়েছে। ইতিমধ্যে আনওয়ার সাহেব চানটান করে রেডি। অবশ্য প্রথমদিন দেখার সময়ই উনি বলেছিলেন—'ভোর চারটে হলে আমি আর বিছানায় থাকতে পারি না।' এই অভ্যেসটাও যথাযথ নায়কোচিত নয়। নায়ক মানেইতো অনেকের ধারণা রাত তিনটে-চারটেয় ঘুমোনো আর বেলা এগারটায় উঠে লেট করে টএ্যুডিওয় যাওয়া। এসব অভ্যেস আনওয়ার সাহেবের নেই। আর সেইজন্যই বলছি চেহারায় চরিত্রে মেজাজে তিনি খাঁটি অ্যান্টি-হিরো।

কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন এই অ্যান্টি-হিরোর ইমেজ নিয়েও আনওয়ার সাহেব প্রায় পঞ্চাশখানা ছবিতে রোমান্টিক নায়ক সেজে প্রেম করেছেন কবরী চৌধুরী রোজী চিত্রা সিনহার সংগে। এখনও মাঝে মধ্যে রোমান্টিক নায়ক তাঁকে সাজতে হয় না—এমন নয় তবে ক্যারেক্টর অ্যাক্টিংয়েই তিনি এখন সুইচ ওভার করেছেন বলা যায়। হাতে প্রায় খান বারো-তেরো ছবিও রয়েছে।

কলকাতায় এসেছেন তিনি রথীশ দে সরকারের 'শংখবিষ' ছবিতে কাজ করার জন্য। যোগাযোগ কিভাবে হলো তার চাইতে বড় কথা কলকাতার দর্শক এক নতুন শিল্পীকে পেলেন। এর সব কৃতিত্বটাই অবশ্য রথীশবাবুর প্রাপ্য।

এখানে আনওয়ার সাহেবের একখানা ছবিই মাত্র দেখানো হয়েছে। 'জীবন থেকে নেওয়া'। জহির রায়হানের ছবি। বাংলাদেশ যুদ্ধ ও তৎকালীন সময়ে এ ছবির ইমপ্যাক্ট কি রকম হয়েছিল তা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। ঐ একখানা ছবিই তাঁকে দর্শকের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে জাতশিল্পী হিসাবে।

ওঁর কাছেই শুনলাম এ ছবি দেখার পর নাকি অনেকেই ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরিয়ে আনন্দে উত্তেজনায় চুমু খেয়েছে আদর করেছে। শিল্পী এর চাইতে আর বেশী কি প্রশংসা আশা করতে পারেন।......

ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট শেষ। পা তুলে খাটের ওপর বসেছেন হাতে ফাইভ-ফিফটি ফাইভ জ্বলছে। ফটোগ্রাফার ছবি তোলবার জন্য রেডি হচ্ছেন দেখে চুলটা একটু আঁচড়ে নিলেন। দিনটা রোববার শুটিং ছিল না। তাই বোধ হয় দাড়িও কামাননি। ফটোগ্রাফার [illegible] দাড়িটা কামিয়ে নিন না, ক্যামেরার ছবি নেবো।

—কি দরকার? পুরুষ মানুষ দাড়িতো থাকবেই। আর ভাল্লাগ্‌লে না দাড়ি কামাতে।

সব ব্যাপারেই সেই অ্যান্টি-হিরোর মত কথাবার্তা। ফটোগ্রাফার আর কি বলবেন। তবে তাই হোক। আমাদের কথার ফাঁকে ফাঁকে আলো জ্বলে উঠতে লাগল। ছবি উঠছে।

ঃ অভিনয় করছেন কেন?

এ প্রশ্নের জবাব আমি জানতাম। আর পাঁচজন অভিনেতার মত তিনিও বলবেন—অভিনয় করে আনন্দ পাই আর একটু বেশী স্বাভাবিক হবার ইচ্ছে থাকলে কেউ হয়তো বলেন—বেঁচে তো থাকতে হবে! অভিনয় আমার পেশা।

কিন্তু না এরকম কোনো জবাবই আমি পাইনি। প্রচন্ড কেটালিস্টের মত তিনি বলে উঠলেন—'অভিনয় করতে হবে এটা আমার ভাগ্যে লেখা ছিল—তাই অভিনয় করছি অন্য কিছু করতে পারছি না।'

—এ আপনি কি বলছেন!

বেশ জোরের সঙ্গে আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিকই বলছি। আমার ভাগ্যের লিখন ছিল অভিনেতা হবার অন্য কাজ আমি করব কি করে?' আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে উঠলেন—'এই যে আজ এই সময় আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এটাও পূর্ব নির্ধারিত। আপনি হয়তো বলবেন আমি যদি এখনই চলে যাই কিন্তু তা হবে না আপনি যেতে পারবেন না। সব ঠিক করা আছে কখন কোথায় কি হবে বা হবে না কেউ তা বদলাতে পারবে না। বদল যেটা হয় সেটাও আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। আমরা হয়ত আপাতঃদৃষ্টে কারণগুলো ঠিক লোকেট করতে পারব না কিন্তু এটা নিশ্চিত যে চারদিকে যা হচ্ছে হয়েছে এবং হবে সবই ঠিক হয়ে আছে।

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলতে বলতে তিনি খুব ইমোশন্যাল হয়ে পড়ছিলেন। থামলেন খানিক।

ভাগ্যের প্রতি তিনি অন্ধবিশ্বাসী হলেও একেবারে হঠাৎই তিনি অভিনেতা হয়ে গেছেন ঘটনাটা মোটেই তেমন নয়। কলেজে পড়বার সময় নিয়মিত নাটক করতেন। একদিন সেই নাটক দেখেই পরিচালক মহিউদ্দিন সাহেব আনওয়ার সাহেবের কাছে অফার নিয়ে এলেন ছবি করার। সালটা তখন উনষাট। প্রথম ছবিতেই নায়কের চান্স তিনি ছাড়েননি। ছবি তৈরী হোল নাম—'তোমার আমার'। মহিউদ্দিন সাহেবের আগের ছবির মতোই এ ছবিও চলল না। সেজন্য তাঁর কোনো অসুবিধে হয়নি। একের পর এক ছবি করে গেছেন। হিট করলো 'সিরাজদ্দৌল্লা' সুপার হিট। এক নাগাড়ে ঢাকায় প্রায় ত্রিশ সপ্তাহ চলেছিল ছবিখানা। আনওয়ার হোসেন এই ছবি থেকেই খ্যাতি পেলেন জনপ্রিয় হলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মহলে। তাঁর অভিনয় জীবনের জয়যাত্রা শুরু হোল। বিভিন্ন পুরস্কার আর সম্মানে আজ তিনি ঢাকার অন্যতম সেরা শিল্পী। বছরে একটা না একটা পুরস্কার তাঁর প্রায় বরাদ্দই বলা যায়।

বরাতজোরে অভিনেতা হয়েছেন বলে অভিনয় সম্পর্কে তাঁর পড়াগুলো কম নেই। যখন জিজ্ঞেস করলাম—'অভিনয় করতে গিয়ে চরিত্রের সঙ্গে কতখানি আপনি ইনভলভড হয়ে পড়েন?' জবাব পেলাম—'চরিত্রের সঙ্গে পনভলভড হয়ে শুধুমাত্র অভিনয় করার সময়টুকু তারপর আমি আমি হয়ে যাই। চরিত্রের সঙ্গে খুব বেশী ইনভলভড হয়ে পড়াতো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অভিনয় করার আগে প্রিপারেশনের সময়টুকুতেই ইনভলভড হওয়া চলে বাস আর কি দরকার?

থিয়েটার অভিনয়ের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা সেখানে অভিনয় চলাকালীন সব সময়ই চরিত্রটাকে মনে রাখতে হবে। 'পাহাড়ী ফুল' নামে একটা নাটকের উদার এক নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে যেমন আনন্দ পেয়েছেন তা নাকি আর কখনও তিনি পাননি। চরিত্রটা তাঁকে বেশ ভাবিয়েছিল।

ফিল্মে অভিনয় করতে গিয়ে সেই ধরনের স্যাটিসফেকশন আসে বলে তিনি মনে করেন না কারণ অভিনয়টাতো সেখানে ঠিক ক্রনোলজিক্যালি আসে না শুটিং-এর বিরতির জন্য ছেদ ঘটে।' তবুও 'রাজা সন্ন্যাসী' ছবিখানা করে তিনি যেমন তৃপ্তি পেয়েছেন তা এখনও তিনি ভোলেননি। তাছাড়া সব চরিত্রে কি আর অভিনয় করে তৃপ্তি পাওয়া যায় বলুন না! কতখানি সিনসিয়ারিটি দিয়ে আর আমরা অভিনয় করতে পারি? নানা ঝামেলা থাকে। এমন স্ট্রেটকাট কনফেশন কজন আর্টিস্ট করেন জানি না।

সব দিক থেকেই ভদ্রলোক একেবারে আলাদা ধাঁচের। হিরো সাজবার বিন্দুমাত্র কোয়ালিটি। নেই একমাত্র অভিনয় ক্ষমতা ছাড়া। চলনে-বলনে কোথাও গ্ল্যামার নেই। সঙ্গী কানুবাবুর কাছে শুনলাম—'আমাদের আনওয়ারভাই চিরদিনই এইরকম একেবারে সাদামাটা মানুষ। ঢাকায় ওর বাড়ীতে গেলেও বুঝতে পারবেন কি ধরনের সাধাসিধে লাইফ লিড করেন উনি।'

প্রমাণ আমি কলকাতায় বসেই পেয়েছি। 'শংখবিষ' ছবির প্রোডিউসার ওঁকে প্রথমে গ্র্যান্ডে রাখতে চেয়েছিলেন উনি রাজী হননি বলেছেন—'অত পয়সা খরচ করবেন কেন ছোটখাট হোটেল দেখুন না।' তখন প্রায় আনওয়ার সাহেবের চাপে পড়েই মধ্য কলকাতার একটি মাঝারি হোটেলের এক কামরার ঘরে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। ফিল্মের অনেক নায়কদের কাছে যে ঘর একজন ছোটো রোলের অভিনেতাও থাকারও উপযুক্ত নয় হয়তো।

ছবিতে কাজ করাটা তাঁর কাছে কাজের চাইতে বেশী কিছু নয় গ্ল্যামারে তিনি বিশ্বাসই করেন না। তাই বুঝি স্টারের পদমর্যাদায় তিনি উঠতে পারলেন না। আনওয়ার সাহেবের তেমন কোনো ইচ্ছেও নেই।' ছেলেমেয়েদের সামনে তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় বাবা হিসাবে। ফিল্ম স্টার হিসাবে নয়। বাইরের চটকদারি থেকে তাই তিনি চিরদিনই দূরে। থাকবেনও তাই। এই ধরনের মনোবৃত্তি খুব কমই চোখে পড়ে।

কথায় কথায় ভারত-বাংলাদেশ ছবি বিনিময়ের কথা আসতে তিনি পরিস্কার বললেন—'দেখুন দাদা নানা কারণে ছবির বিনিময় সম্ভব হবে না ওসব নিয়ে আলোচনা করে লাভও নেই। তার চাইতে বরং দু দেশের মধ্যে যাতে কো-প্রোডাকশন করা যায় তার চেষ্টা করাই ভালো। দু দেশেই ছবিগুলো রিলিজ হতে পারবে টাকা দু'দেশই পাবে। একবারে বাস্তববর্দীর মত কথা। কোনো প্রিটেনশন নেই। কলকাতা শহর বাংলা ছবি বাংলা নাটক সম্পর্কেও তাঁর মতামত একইরকম। নতুনত্ব তেমন কিছু চোখে পড়েনি। একবারে হাঁ হয়ে যাবার মত কিছু নেই কলকাতায়।'

ঢাকা থেকে তো মাত্র আধ ঘন্টার রাস্তা। সুতরাং পার্থক্য কিইবা হবে। জল হাওয়াও এক। যেটুকু পার্থক্য তা মানুষগুলোর ব্যবহারে। কলকাতা বড় শহর যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে বেশী তাই মানুষগুলোও খুব মেকানিক্যাল হয়ে পড়েছে—এই যা। ঢাকায় নাকি এখনটি এখনও হয়নি। কোনদিন হলেও আনওয়ার সাহেব কি বলবেন? বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস পাঁচ বছর বাদে দেখা হলেও তিনিই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবেন—'কি দাদা কেমন আছেন?' আমিই হয়তো অবাক চোখে তাকাব।

নির্মল ধর

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ধ্রুপদী শিল্পীর প্রতি

'একে একে নিভিছে দেউটি'—গত কয়েক বছরে ভারতীয় সংগীত জগতের এক একজন দিকপালস্বরূপে গুণীদের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। এঁদের এক একজনের অন্তর্ধান সংগীতলোকের এক একটি স্তম্ভ খসে যাবার মতই সর্বনাশা ঘটনা। এ ক্ষতি-পূরণ হবার নয়। কিন্তু কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জীবনাবসান শুধু জাতীয় ক্ষতিই নয়—এর সঙ্গে এই লেখিকার ব্যক্তিগত ক্ষতি এমনভাবে জড়িয়ে আছে—এমন অসহায় করে দিয়েছে যে লিখতে হাত সরছে না। সবই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আজ অনুভব করছি ভাষার শক্তি কত কম।

যখনই তাঁকে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করেছি শিশুর মত অধীর আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন 'ভালো ভালো খুব ভালো'। আমি নিজেকে ভালো রাখি। এক্সারসাইজ ... রেওয়াজ মেডিটেশন একদিনও কামাই দিই না। খারাপ থাকব কি করে?'

সেই মানুষ সকল ভালোমন্দের বাইরে চলে গেলেন—এটা বিশ্বাস করা যতখানি কঠিন, তার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন বিশ্বাস করে স্বাভাবিক থাকা।

১৯৬৫ অব্দে যখন কুমার বীরেন্দ্রকিশোর সংগীত নাটক একাডেমীর ফেলোশিপ পেলেন সংগীতসমাজের সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছিলেন—যোগ্য ব্যক্তি সম্মানিত হওয়ার জন্য। কারণ ইনি শুধু মস্তবড় সংগীতবিদই ছিলেন না কি শিক্ষাক্ষেত্রে কি খেলাধুলো, কি নৃত্যসংগীত তথা কলা-শিল্পে বংশানুক্রমে এঁদের অবদান একটা ইতিহাস হয়ে আছে। স্বদেশী যুগে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সহায়ক (যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি) এঁরই পিতা সর্বখ্যাত দানবীর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আমলে গৌরী-পুর স্টেট সংগীতশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক[তা] করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতকে বাঁচি[য়ে] রেখে বাংলাদেশে এক সংগীতানুরা[গী] গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছেন। আজকের শিল্পী সমাজের ও সংগীতসম্মেলনের প্রাচু[র্য] তারই ফলশ্রুত। বাংলাদেশের সংস্কৃতি[র] ইতিহাসে ঠাকুরবাড়ী, বড়ল পরিবা[র] ভূপেন ঘোষের বাড়ীর মতই এই জমিদা[র] পরিবারেরও একটি বিশেষ স্থান ও দা[ন] আছে।

পিতা ব্রজেন্দ্রকিশোরের আম[লে] গৌরীপুরের উদার মুক্ত আবহাওয়া[য়] ভারতের শ্রেষ্ঠ কলাকার ও গুণীবৃন্দে[র] সাহচর্যে বীরেন্দ্রকিশোরের শৈশব কৈশো[র] ও যৌবন কেটেছিল। এরই এক ফাঁ[কে] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হয়[ে] গেলেন (১৯২৪ সালে)। এখনকার ম[ত] শিল্পীদের তখন এমন রাজসমাদর ছি[ল] না সকলের কাছে। সাধারণ সমাজে আ[ত্ম]প্রকাশ করার জন্য অতীতে রাজা ও জমিদার শ্রেণীর আনুকূল্যের প্রয়োজ[ন] হত। পিতা ব্রজেন্দ্রকিশোর অসাধারণ গুণ-গ্রাহী ছিলেন সে কথা প্রথমেই বলেছি[।] কি কণ্ঠসঙ্গীতে, কি যন্ত্রসংগীতে যাঁরা এখন বরেণ্য গুরুস্থানীয়, তাঁদের অনেকে[র] কর্মজীবনের উন্মেষলগ্ন অতিবাহি[ত] হয়েছে গৌরীপুর স্টেটে। আচার্য আ[লা]উদ্দিন খাঁ ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ পণ্ডি[ত] বিশ্বনাথ রাওয়ের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সর্বোপরি মিঞা তানসেনের বং[শ]ধর রবাবী ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁ ও পরবর্তীকালে সংগীত নায়ক উজ[ির] খাঁর পুত্র সগীর খাঁ ও পৌত্র দবীর খাঁ সাহেবকে তিনিই কলকাতায় প্রতিষ্ঠি[ত] করেন। পিতার এই গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরে বর্তেছিল। শিল্পী সান্নিধ্যের রংমহলে কেটেছে এঁর আশৈশব সেই সংস্কার তাঁর মজ্জায় গেঁথে গিয়ে[] ছিল বলেই বোধহয় মনের সরস নবীনতা ও রংগীন মাধুর্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল, যেমন মনের উদার বিস্তৃ[তি] তেমনই সংবেদনশীল অন্তর।

কুমার বীরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে প্রথ[ম] পরিচয় হল সুপরিচিতা নৃত্যশিল্পী সাধন[া] বসুর মাধ্যমে। সেতার বাজাতাম। কিন্তু তথাকথিত কয়েকজন গুরুর সংকী[র্ণ] ব্যবসাদারী মনোভাবে মর্মাহত হয়ে সেতারটিকে আবৃত করে যথাস্থানে তুলে রেখেছি। শ্রীমতী বসু আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন 'সাধন আই ক্যান সাজেস্ট পি[ওর] পারসন অন হুম ইউ ক্যান ডিপেন্ড' সেদিন বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি যতখানি, বিস্মিত হয়েছি তা[র] চেয়ে বেশী। ছোটবেলা থেকে এঁর কথা শুনে এসেছি কত সংগীত জার্নালে পড়েছি এঁর সম্বন্ধে কত কথা। মস্ত বড় গুণী বীণ, রবাব, সেতার ও সুরশৃংগারে অগা[ধ] পাণ্ডিত্য, রেডিও থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের একজ[ন] প্রাণপুরুষ। কিন্তু সামনে বসে দেখলে ম[নে]

হয় সৌম্য, শান্ত, নিরীহ এক ভদ্রলোক। যেমন ভদ্র তেমন নম্র। অমায়িক বোধহয় তার চেয়েও বেশী। সাধনাদি হেসে বললেন এই সন্ধ্যা, সম্পর্কে আমার ছাত্রী, বটে সি ইজ মোর দ্যান মাই ডটার। পেশাদারী ওস্তাদদের চালচলন দেখে হতাশ হয়ে সেতার ছেড়েছে, ও যা শিখতে চায় ঠিক তার উল্টোটি ওরা শেখান।'

কি রকম, কি রকম? উৎসুক হয়ে ওঠেন সদালাপী আনন্দময় মানুষটি।

আমি যদি চাই জৌনপুরী শিখতে ওরা জেদ ধরবেন ভূপালীর জন্য যে রাগকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না।

উনি হাসলেন, তারপর বললেন ওসব রাগ প্রথমের দিকে শেখা দরকার হাত তৈরী করবার জন্য। যাই হোক তুমি যে রাগ শিখতে চাইবে আমি তাই শেখাব। সঙ্গীতে যাতে অনুরাগ জন্মায় তার জন্য পছন্দমত শ্রুতিমধুর রাগ শেখা ভাল প্রথমে। তার পর একবার যখন এর রস মনে পৌঁছে যাবে তখন সব রাগকেই ভাল লাগবে। যেমন ধর বিয়ের পরে মনে যদি স্বামীকে একবার ভালবাসল তাহলে দেওর ননদ শ্বশুর শাশুড়ী-ননদ সবার সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নেয়।

যত বড় গুণী ঠিক ততখানিই অনেক প্রতি সম্ভ্রমশীল অনাড়ম্বর। হয়ত এসব গুণ না থাকলে এঁদের মত বড় হওয়া যায় না। আপন মনুষ্যত্বকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করায় মানুষ যে উদার ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন আজকের এই অনুভবহীন জগতে কটা মানুষের মধ্যে তা আছে? সেতার শিখতে যাওয়া হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধন কোন দিন শিথিল হয় নি। সঙ্গীত বিষয়ে কোথাও কোন সমস্যায় পড়লে গুরুর মত পথ দেখাতেন ইনি। হায়! গুরুবাবার মত এমন দিশারী আর পাব না।

একবার আলি আকবর খাঁ সাহেবের বাড়ীর এক আসরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম অনুগত ব্যক্তিবেষ্টিত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাশ দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বললেন না। ক্ষুণ্ণ হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এক সময় খাঁ সাহেব ডেকে পরিচয় করিয়ে দিতে চিরশিশুটি অধীর হয়ে বলে ওঠেন আরে তুমি আমাদের সন্ধ্যা? অনুক্ষণ দেখা কর নি কেন? (তখনও কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আসি নি)। অভিমানে বললাম আপনি তো আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। তবু চিনতে পারলেন না।

না না, তা নয়। একেবারেই তা নয়। আমার চোখে গ্লোকোমা হয়েছিল। সম্প্রতি অপারেশন হয়েছে। তাই এখনও সব ঠিক দেখতে পাই না, এখন বুঝলে তো কেন চিনি নি? আর কোন দুঃখ নেই তো— মানুষটি অস্থির হয়ে পড়লেন যাতে তাঁকে রূঢ় মনে না করি। 'কাকাবাবুকে ভুলে যেও না। সময় পেলেই এসো। তোমাদের দেখলে বড় আনন্দ হয়।

—ঘটনাটির উল্লেখ করলাম এই জন্য যে শুধু ভদ্র অন্তঃকরণেরই অধিকারী ছিলেন না এমন সজ্জন ব্যক্তি অতি অল্পই দেখেছি। ইনি শুধু গুণীই ছিলেন না সমাজের উঁচু মহলের মানুষ—কিন্তু আমাদের মত অতিসাধারণের কাছেও অনিচ্ছাকৃত অবহেলা প্রকাশের জন্য কৈফিয়ৎ দেবার কি ব্যাকুলতা।

সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খবর সর্বজনবিদিত। কিন্তু সে পাণ্ডিত্য যে কতখানি সে কথা তাঁর সংস্পর্শে না এলে ধারণাও করতে পারতাম না। ইনি ছিলেন মস্ত বড় ধ্রুপদী ভারতের সকল রকম যন্ত্রসঙ্গীতে এঁর দখল, জ্ঞান প্রবাদ-প্রচারেই সামিল। তখনকার দিনের এমন কোন পণ্ডিত বা ওস্তাদ নেই যাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। এই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অনন্যসাধারণ স্মরণশক্তি। সঙ্গীত রত্নাকরের কোন পৃষ্ঠার কোন অনুচ্ছেদে কোন বিষয়ের আলোচনা আছে চোখ বুজে বলে দিতে পারতেন। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা কমেছিল তবেই ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছিল এই বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি।

তাঁর সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময় ছিল রামপুর ঘরানার এবং ধ্রুপদী রীতির একান্ত অনুগত শিল্পী হয়েও অপরাপর ঘরানা সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ বা অনাদর ভাব পোষণ করতেন না। আচার্য আলাউদ্দিন দবীর খাঁ সাহেব আলি আকবর বা রবিশংকরের ওপর আমার কোন লেখা দেখলেই বলতেন রামপুরে। এঁদের কথা যখনই লিখবে—রামপুর ঘরানার উল্লেখ করবে। এঁরা সব রামপুর ঘরানার গুণী।

আপন ঘরানার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ যেন দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলির প্রণতি। তবু অন্যান্য ঘরানা সম্বন্ধে এতটুকু অনাদর বা ঔদাসীন্য দেখি নি কোনদিন। যখনই যে ঘরানার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি আগ্রহভরে তার বৈশিষ্ট ও মাধুর্য কোথায় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও দলাদলির যুগে আপন ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার মত মহৎ প্রশান্তি সত্যিই দুর্লভ। এই জন্যই তিনি অজাতশত্রু। ধ্রুপদী সঙ্গীতধর্মের মতই মর্যাদামণ্ডিত তাঁর এই আভিজাত্য নির্মল স্বভাব, এই মানুষটি সদানন্দময়। কখনও কোন আঘাত তা যত বড়ই হোক না কেন, এঁর হাসিখুশী ভাবকে ম্লান করতে পারত না। ইনি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যই শুধু ছিলেন না তাঁর দর্শনের মন্ত্রও ছিল এঁর অন্তরের গভীরে।

মানুষের পশু স্বভাব হিংসা দ্বেষ সবই একদিন মহৎ পরিণতিতে রূপান্তরিত হবে এ বিশ্বাস তিনি রাখতেন। উনি প্রায়ই বলতেন মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখ। তবে তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করতে পারবে। কারো সম্বন্ধে মস্ত কিছু ভেবে বসলেই ঘা খেতে হবে। মানুষ মাত্রেরই কতকগুলো লিমিটেশন আছে তার ওপর ওঠা সহজ নয়। সন্ধ্যা আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় কারো কাছে কিছু আশা করি না। তাই কেমন আছি মুখে জিজ্ঞেস করলেও আনন্দ হয়।

যদি জিজ্ঞেস করতাম অমুক কেমন লোক?

সঙ্গে সঙ্গে বলতেন কে কেমন লোক সে চিন্তা ছাড়। তুমি কাকে কিভাবে নিজের ব্যবহার দিয়ে ইমপ্রেস করতে পার সেইটে দেখ।

১ বৈশাখ আর বিজয়ায় ফোন বেজে উঠত এই নিরভিমান মানুষটির আশীর্বাদ বহন করে। আর কোনদিন বাজবে না।

'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান' 'রাগসঙ্গীত' ছাড়াও অমৃত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সুরের সুরধুনি তাঁর অন্তহীন সঙ্গীতবিদ্যার স্বাক্ষর বহন করেছে। সঙ্গীতরসিকের এগুলি মূল্যবান নজীর।

বহু শিল্পীর সঙ্গে গৌরীপুর স্টেটে একই বাড়ীতে থাকার দরুণ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা হয়েছে। তাঁদের সম্বন্ধে কত রসাল গল্প কত আশ্চর্য কাহিনী কি সুন্দর করেই না বলতেন। গুরু আলাউদ্দিন একদিন গৌরীপুর বাগানে প্রাতঃকালীন রেওয়াজে বসেছিলেন। অর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী সুরের অমোঘ আকর্ষণে তাঁর গায়ে এসে বসেছিল। এ গল্প বীরেন্দ্রকিশোরের কাছেই শোনা।

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের গ্রামের মসজিদ নির্মাণকল্পে ব্রজেন্দ্রকিশোর চুন বালি সিমেন্ট পাঠিয়েছিলেন নৌকা করে। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব নিজের হাতে লিখে বহু সঙ্গীত ও গতের স্বরলিপি রেজিস্টার্ড পোস্টে তাঁকে পাঠিয়ে দেন, সে সব এখনও তাঁর গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। কোন এক ওস্তাদ ভাং খেয়ে অপূর্ব বীণ বাজাতেন। তাঁকে মেওয়া পাড়া সিদ্ধি খাইয়ে সেই সব ভুর্নাবস্তু তুলে নিয়ে অন্য এক ওস্তাদ কি করে নাম করেছিলেন এমনই কত বিচিত্র কাহিনী। শুনতে শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, হুঁশ থাকত না।

এসব কাহিনী আর শোনা যাবে না। বীরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সঙ্গে এক গৌরবযুগ স্তব্ধ হয়ে গেল।

চিত্রাঙ্গদা
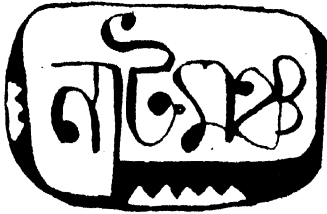
নাটক অভিনয় এবং তার সঙ্গে তার বক্তব্য বলতে বাধা নেই দুই বিষয়েই সোদপুরের 'ক্রান্তিকাল' নাট্য গোষ্ঠী বিস্মিত করেছে।

এরা গত ১৮ জুন দুটি একাংক নাটক উপহার দিলেন দর্শককে।

প্রথম একাংক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বৃত্তের বাইরে' ইতিপূর্বে একাধিক বার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় একাংক নভেন্দু সেনের 'সমবেত সওয়াল জবাব'-এর এটিই প্রথম রজনী। এবং প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, প্রথম অভিনয়েই কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ক্রান্তিকালের অভিনেতারা তাঁদের সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্যে নাট্যকার পরিচালক (দুটি নাটকেরই পরিচালক) নভেন্দু সেনকে ধন্যবাদ।

ক্রান্তিকালের দু'টি বলিষ্ঠ একাংক

'বৃত্তের বাইরে' প্রতীকী নাটক (মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় নাটকই প্রতীকীতে চিহ্নিত এবং তাতে ফ্যান্টাসীর মেজাজ লক্ষ্য করা গেছে)। বলাই বোধহয় ঠিক।

এ নাটক যেন পাক খেতে খেতে যা জটিল জীবনের বৃত্তে অবিরত বিভ্রান্ত ক্লান্ত উৎক্ষিপ্ত এবং কিছুটা পিষ্ট যাতনার বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আসার নিশানা দিচ্ছে দর্শককে।

এ নাটকে ধারাবাহিক কোন গল্প নেই। একটা প্রতীককে মাঝখানে রেখে চক্রাকারে হিজ হাইনেস। স্মাগলার লোকটি শিক্ষক বৃত্তাকারে ঘুরপাক খেয়েছে। ছেলেটা যায় বাইরে। সে কি তবে অন্য সবার চেতনা?

এ নাটকের প্রধান সম্পদ এর টিমওয়ার্ক দ্বিতীয় বিস্ময় ছেলেটার ভূমিকায় মং শম্ভুর আশ্চর্য অভিনয়। এর চোখেমুখে হাসি মজা অনুভব ... ভাব এবং নির্বিকার ভাব এমন স্বচ্ছন্দ ... না দেখলে বোঝানো কঠিন। এমন পরিণত অভিনয় প্রতিভা স্টেজে প্রায় দেখাই যায় না। এর অভিনয় দেখতে দেখতে চার্লি চ্যাপলিনের বিশ্ব বিখ্যাত ছবি 'দি কিড'-এর সেই ছোট্ট ছেলেটিকে বাস্টার কীটন যার নাম মনে পড়ে যাচ্ছিল।

এর পরেই যে দুজন অভিনেতা নাটককে মর্যাদায় চিহ্নিত করেছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে মৃণাল মুখোপাধ্যায় (হিজ হাইনেস) ও অশেষ চট্টোপাধ্যায় (শিক্ষক)। তবে প্রথমোক্ত জনকে কার্টুনের ভঙ্গীমায় উপস্থাপিত করা হলেও কোথাও কোথাও তার অভিনয়ে অতি নাটকীয়তার ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে। সেদিক থেকে কিন্তু শিক্ষক চরিত্রের অভিনেতা প্রায় ক্লাইমাক্সে তাঁর কণ্ঠস্বরের হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন গতিবিধি চোখ মুখের এক্সপ্রেশন প্রমাণ করে দেয় যে তিনি একজন জাত অভিনেতা। আর বোধহয় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রটিই (ছেলেটি বাদে) দর্শককে বেশী আকর্ষণ করেছে।

চোরি মেরা কাম
জীনৎ আমন/শশীকাপুর

পাগলার (দুলাল চক্রবর্তী) এবং লোকটি রমানাথ মুখোপাধ্যায় সেই তুলনায় কিঞ্চিৎ ম্লান। এঁরা অভিনয় করেছেন ভাল সমবেতভাবে এঁদের ভালও লাগে। তবে কিছুটা অতি উচ্ছ্বাস এঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।

একটা ঝোঁক অবশ্য শিক্ষক এবং ছেলেটি ছাড়া অন্য তিনটি অভিনীত চরিত্রে রয়েই গেছে। সেটা হোল নাটকের চড়ায় এবং চলাফেরার মধ্যে একটা ভঙ্গিং গতি সৃষ্টি করে অভিনয় করা। এটা নাটকের পক্ষে হয়তো সহায়ক, কিন্তু শেষের দিকে নাটক ঝুলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এতে।

আর একটা কথা। নাটকে প্রায় আগাগোড়াই একটা জিমন্যাস্টিক টেণ্ডেন্সী কাজ করেছে। এতটা কি খুবই প্রয়োজন? দর্শকের ভাল লাগার মধ্যেও তো একটা ক্লান্তি আছে। (দ্বিতীয় নাটকেও কিন্তু এর ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে)।

স্টেজ চমৎকার। আলোক-সম্পাত (বিক্রম দাশগুপ্ত ও সূর্য ভট্টাচার্য) নাটককে গতিশীল করেছে। (কোন কোন দৃশ্যে তো খুবই ভাল) আবহ সঙ্গীতের (মিলন চক্রবর্তী) প্রয়োগও ব্যঞ্জনাময়।

সমবেত সওয়াল জবাব

'খাঁচের বাইরে' একাধিকবার অভিনীত নাটক, কিন্তু 'সমবেত সওয়াল জবাব' এই প্রথম অভিনয় হোল। অথচ বিশ্বাসই হচ্ছিল না দেখতে বসে। এ জন্য অবশ্যই পরিচালকের ধন্যবাদ প্রাপ্য। 'সমবেত...' ভিন্ন বক্তব্যের নাটক হলেও মেজাজে মনে হয়েছে দুটি নাটকের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য মিল রয়ে গেছে। এখানেও প্রতীক ব্যবহার এবং আঙ্গিকে রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তবু বক্তব্য এবং কাহিনী অনেকটা স্বচ্ছ। ঈশ্বর ব্যাপারী মতলবী সাহেব প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি এখানে শোষক শাসিত এবং কমন পিপলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গানেন এদের বক্তব্যের পরিপূরক বলা যায়।

সংলাপ কখনো কখনো অবাক হয়ে শুনতে হয়। সংলাপের গভীরতা বক্তব্যে পাকা বাঁধুনি মনকে অনেক সময়ই নাড়া দিয়েছে। তবে মনে হয়েছে কোথাও কোথাও যেন সংলাপে পুনরাবৃত্তি থেকে গেছে। পরবর্তী অভিনয়ের পূর্বে নাট্যকার পরিচালককে কথাটা ভেবে দেখতে বলি।

আর যে সব সামান্য ত্রুটি রয়েছে যেমন দৃশ্যান্তরে যাবার সময়কার ফাঁক একাধিক বার ফিতুজের ব্যবহার (যেটা পর পর দুটো নাটক দেখার ক্ষেত্রে দর্শকের কাছে ক্লান্তিকর মনে হতে পারে) পূর্বের নাটকের মত দৈহিক কায়দা দেখাবার ঝোঁক ইত্যাদি, সেগুলো সম্পর্কেও সচেতন হবার অবকাশ রয়ে গেছে।

এ সম্পর্কে সচেতন হলে ক্রান্তিকাল গোষ্ঠী এই দুটি একাঙ্ক দিয়েই কলকাতাকে কামাল করে দিতে পারবে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

নাটকের শুরুটি বড় ভাল। (মাঝে মাঝে বাস্তবানুগ করার দিকে ঝোঁক বলতে সে স্ল্যাং ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার কি খুব একটা প্রয়োজন আছে?) কিন্তু তারপরই মাঝে মাঝে কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হয়েছে যদিও অভিনয় দিয়ে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।

এ নাটকের বড় সম্পদ মিউজিক এফেকট (দেবাশিষ দাশগুপ্ত-কৃত)। নাটককে যে অনেকখানি প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সেই অনুপাতে আলোক-সম্পাত ম্লান। অথচ প্রথম নাটকে আলো যেন পাল্লা দিয়ে চলেছিল নাটকের সঙ্গে। (এ নাটকের আলোক-সম্পাত বিক্রম দাশগুপ্ত ও বিমল দত্ত-কৃত)। মৃণাল মুখোপাধ্যায় যে শক্তিমান অভিনেতা তার প্রমাণ তিনি পূর্বের নাটকের মত এ নাটকেও রেখেছেন। তবে তিনি আরো একটু স্বীয় অভিনয় ক্ষমতার প্রতি নিষ্ঠাবান হবেন ভবিষ্যতে আশা রাখি।

দুলাল চক্রবর্তীর মতলবী সাহেব দু-এক জায়গায় আটকে যাওয়া ছাড়া

সুন্দর। জয়ন্ত বোস ও হিমাংশু গুহর অভিনয়ে নিষ্ঠা লক্ষ্যণীয়। তবে মাত্রাজ্ঞান ঠিক পারফেকশনে পৌঁছয় নি। অসিত ঘোষের ঈশ্বর ব্যাপারী অভিনয়ে সুন্দর কিন্তু উচ্চারণে কিছুটা জড়তা থেকে গেছে।

অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের গায়েন ভাল। তবে গান এবং কন্ঠ-ক্ষেপণ সম্পর্কে তাঁর আর একটু সচেতন হবার অবকাশ আছে। (গানের সুরে কিন্তু অন্য গানের সুরের রিপিটেশন লক্ষ্য করা গেল। এটা না থাকাই উচিত)।

নাট্য সমালোচক

রাধাকুঞ্জে বিরাট বাউল সম্মেলন : পরকিয়া রাধাকুঞ্জে তিন দিনব্যাপী শ্রীশ্রীসদানন্দ (দাস) স্বামীর তিরোধান ও ২৮ মার্চ '৭৫ পর্যন্ত শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী বিরজা ভারতীর (শ্রীশ্রীক্ষেপা মনোহর ঠাকুর) নেতৃত্বে এক বিরাট বাউল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রায় ২০০ বাউলের সমাগম হয়। এদের মধ্যে বোলপুরের শ্রীবিশ্বনাথ দাস (বাউল) সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে স্বীকৃতি পান। শ্রীদাসের গানগুলির ভাব ব্যাখ্যা তিনি এত সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন যা সত্য সত্যই এই অনুষ্ঠানের দর্শকমণ্ডলীদের বেশ কিছু দিন মনে থাকবে। আমরা এই শিল্পীর উজ্জ্বল ভাবীকালের আশা পোষণ করি। অপরাপর বাউলদের মধ্যে সনাতন দাস দীলিপ ব্যানার্জি পঞ্চানন মুখার্জি ও দীনবন্ধু দাসের বাউল সঙ্গীতগুলি সুগীত হয়। এই উৎসবে বহু গুণীজনেরা এসেছিলেন—তাঁদের মধ্যে আমেরিকার ক্যারোল ও মিঃ রিচার্ড সোলেমন (ভারতীয় বাউল গান শিক্ষার্থী) দিল্লী আকাশবাণীর মিঃ যতীন দাস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী মঃ এস পি গড়াই দীনেন মুখার্জির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব : গত ১৯ জুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সদর দপ্তর কর্মী প্রমোদ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 'কলামন্দিরে' বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রমোদ সংস্থার সভাপতি ভূতনাথ চৌধুরী সকলকে স্বাগত জানান। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বিমলেন্দুনাথ বন্দোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সম্পাদক সাগর সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর তারাশংকরের 'গণদেবতা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিয়ে রতন ঘোষ খুব সুন্দর পরিচালনা করে প্রত্যেকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। আলো, মঞ্চসজ্জা ও আবহসঙ্গীতের প্রয়োগের প্রথা ছিলো নিখুঁত। নাটকটিতে সাবলীল অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন—মমতা চট্টোপাধ্যায় (দুর্গা), অনিমেষ চক্রবর্তী (দেবু ঘোষ), রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (ন্যায়রত্ন), তাপেন্দ্রমোহন চৌধুরী (শ্রীহরি চৌধুরী), শিবদাস চক্রবর্তী (দারোগা), বরুণ বন্দোপাধ্যায় (যতীন), হরিসাধন চৌধুরী (ছিরু পাল), মানিকলাল শূর (অনিরুদ্ধ), বটকৃষ্ণ কুণ্ডু (জগন ডাক্তার), সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (দাসজী), উৎপল চট্টোপাধ্যায় (বিশ্বনাথ), নির্মল দাস (হরেন), হরিশ (সমীর দাসগুপ্ত) তিনকড়ি (বিমল দাস ও পদ্ম ও বিলুর চরিত্রে সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু দত্ত।

বনশ্রী বাপ্পু

সুমিত্রা মুখার্জি/অনিল চ্যাটার্জি। পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখার্জি। অমৃত ফটো

মোটারয়্যাক্ট ক্লাবস (ডিস্ট্রিক্ট ৩২৫ আর, আই) আয়োজিত 'পূর্ব ভারত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা' সম্প্রতি ১৬ থেকে ১৮ জুন ৭৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অডিটোরিয়ামে'। অনুষ্ঠানে বারোটি বিভিন্ন নাট্য সংস্থা বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করেন।

বিভিন্ন আঙ্গিক, বক্তব্য, উপস্থাপনার গুণে সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বিশেষত ডাইনোসেরাস নাটকটি বিগত ও আধুনিক সমাজের আবহমান শোষণ ব্যবস্থার এক রূপক। নাটকটির সমগ্র টিম ওয়ার্ক প্রশংসনীয়। এছাড়াও উল্লেখ করার মতো নাটক 'ছেদবিন্দু,' 'মাদারিকাখেল', 'চিড়িয়াখানা প্রথমোক্ত নাটকের ফকিরবেশী অলোক চ্যাটার্জির অভিনয়ে পরিমিত বোধ লক্ষণীয়। এছাড়া চিড়িয়াখানা নাটকে অনিলরূপী শেখর নিয়োগী, 'মাদারীকা খেল' নাটকে মা চরিত্রে মিনু সাহা, আত্মহত্যা (হিন্দী) নাটকে অশোক, লাড ও 'সওদাগরের দেশে' নাটকে শিশুশিল্পী শান্তি চরিত্রে শর্মিষ্ঠা মুখার্জি সু-অভিনয়ের জন্য প্রশংসনীয়।

প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন—

শ্রেষ্ঠ নাটক (জে এস ট্রফি বিজয়ী) 'ডাইনোসেরাস' (সান্তায়ন), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—অলোক চ্যাটার্জি 'ছেদবিন্দু' (অলোক ধারা) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—মিনু সাহা 'মাদারীকা খেল' (সৌভ্রাতিক), শ্রেষ্ঠ পরিচালক—স্বপন গুহ (সান্তয়ন) বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন—প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজন মৈত্র, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, পূর্ণেন্দু পত্রী বাগীশ্বর ঝা, নিয়াজ আমেদ খান।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের অনুষ্ঠান

জনপ্রিয় তরুণ সেতারবাদক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য গত ২১ জুন বীরেন্দ্রশংকরের (সংস্কৃতিকী, লণ্ডন) তরফ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে যুক্তরাজ্য ফ্রান্স, রোম, প্যারিস, সুইজারল্যান্ড এবং পরিশেষে আফ্রিকাতেও সাংস্কৃতিক সফরের জন্য যাত্রা করেছেন। শিক্ষাবিভাগও এ বিষয়ে শ্রীশংকরের সহায়তা করেছেন।

কোলকাতা থেকে তবলিয়া সন্দীপ দেব এবং বোম্বাই, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ থেকেও কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের শিল্পীরা যাচ্ছেন।

১৯ জুন এক ঘরোয়া আসরে ইন্দ্রনীল সাংবাদিক ও সঙ্গীতরসিকদের একঘণ্টার অনুষ্ঠানে মোটামুটি একটি আন্দাজ দিলেন বিদেশে নানা অনুষ্ঠানের মাঝে ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কিভাবে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান রচনা করবেন।

বর্ষণমুখর সন্ধ্যার সঙ্গে সংগতি রেখে

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

ইনি ধরেন 'দেশমল্লার'। স্বল্পপরিসরেই আলাপের সকল অঙ্গ ধ্রুপদী বিস্তারে পরিবেশিত। ওস্তাদ এনায়েৎ খান এবং গুরু আলাউদ্দিন খান দুটি ঘরানার তালিমই (অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য এবং গুরু আলাউদ্দিনের শিক্ষায়) এঁর থাকার দরুন বাজনায় রং ও গাম্ভীর্য উভয়েরই আকর্ষণীয় সমাবেশ ঘটেছে। তানের সঙ্গে খেয়ালিয়ার সূক্ষ্ম কারুকার্যে মীড় ও

বন্দী বিধাতা : কণিকা মজুমদার / অনিল চ্যাটার্জি

গমকের ওপর তাঁর দক্ষতা আশ্চর্য শিল্প-কৃতির সৃষ্টি করেছিলো। তৈরী হাত, কল্পনাধর্ম মনোহারীত্ব সব মিলিয়ে প্রথম থেকে শেষ অবধি ইনি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে রাখেন

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই সংস্কৃতি-চক্র বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিখ্যাত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আরতি মুখোপাধ্যায় ও বটুক নন্দীর অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রখ্যাত নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত পরিচালিত ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যবিচিত্রা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাংলা চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার

বাংলা চলচ্চিত্র প্রসার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ১৯৭৪ সনের মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছায়াছবির মধ্যে দর্শকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি শিল্পী ও কলাকুশলীদের পুরস্কার দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল। শ্রেষ্ঠ চিত্র—কোরাস কাহিনীকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (আলোর ঠিকানা) চিত্রনাট্যকার পূর্ণেন্দু পত্রী (ছেঁড়া তমসুক) পরিচালক মৃণাল সেন (কোরাস) সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (ফুলেশ্বরী) নায়ক উত্তমকুমার (অমানুষ) নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী (যদি জানতেম) সহঃ নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায় (অমানুষ) সহঃ নায়িকা সুমিত্রা মুখো-মুখোপাধ্যায় (সুজাতা) চরিত্রাভিনেতা সন্তোষ দত্ত (সোনার কেল্লা) সুব্রত চট্টো-পাধ্যায় (সুজাতা) আলোকচিত্র শিল্পী দীপক দাস (একদিন সূর্য) সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজন সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (বিকেলে ভোরের ফুল) সম্পাদক অরবিন্দ ভট্টাচার্য (ছেঁড়া তমসুক) শিল্প নির্দেশক প্রসাদ মিত্র (আলোর ঠিকানা) রূপসজ্জায় অনন্ত দাস (সোনার কেল্লা) গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফুলেশ্বরী) সংগীত পুরুষ কণ্ঠ—মান্না দে (আলো ও ছায়া) নারীকণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (সুজাতা) শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসংগীত—পুরুষকণ্ঠ—সাগর সেন (যে যেখানে দাঁড়িয়ে) নারীকণ্ঠ রবীন্দ্র-সংগীত—আরতি মুখোপাধ্যায় (বিকেলে ভোরের ফুল) প্রচারবিদ—শ্রীপঞ্চানন (দাবী)।

বিশেষ পুরস্কার—নবাগতা নায়িকা রাজশ্রী বসু (প্রান্তরেখা) সংগীত পরিচালক বিজন পাল (আলো ও ছায়া) আবহ-সংগীত হিমাংশু বিশ্বাস (যদি জানতেম)।

মেচেদায় সংগীতানুষ্ঠান

গত ২৮ এবং ২৯ জুন মেদিনীপুর জেলার মেচেদার শ্রীধর মিলন মন্দির পাঠাগারের পঞ্চম বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীত এবং নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে সভা-পতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সংগীত পরি-বেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা। আশাবরী শিক্ষায়তনের ছাত্রী ছবি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ম্লান আলোকে ফুটলি কেন নজরুল গীতিটি গাওয়ার গুণে শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করেছে। গানটি প্রাণ পেয়েছে এই তরুণী শিল্পীর কণ্ঠে, [illegible] মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া [illegible] গানটি [illegible] আসর জমিয়েছে। এক কিশোরীর গান শুনে [illegible]। [illegible] সামন্তের গলায় [illegible] আধুনিক গানও [illegible] মণ্ডলের লোকসংগীতে ঐ বিশেষ গানের মেজাজ খুঁজে পাই নি। গানগুলি খুব কৃত্রিম কণ্ঠে গাওয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী অমর পালের লোকসংগীতের অনুষ্ঠান। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। আশাবরী শিক্ষায়তনের শিক্ষক সুরেন মাইতির গাওয়া শরৎ-প্রণামটি গভীরভাবে দাগ রেখেছে মনে। তবে শিক্ষায়তনের শিল্পীদের গাওয়া লোকগীতির সম্মেলক অনুষ্ঠানটি ব্যর্থ হয়েছে। অনু-ষ্ঠানটির পরিচালনা এবং পরিকল্পনায় যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত নির্বাচন খুবই সুপ্রযুক্ত হয়েছে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই দুরূহ গানটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন রেণুকা মুখোপাধ্যায় এবং ছবি মুখো-পাধ্যায়। তবলা সঙ্গতে রথীন পাল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলি-কাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ফিল্মের অভিনয় ছাড়ছি না রাজশ্রী বসু ॥ অমৃত ফটো

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 18th July, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

১৫ বর্ষ

১১ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নেউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 25th July, 1975 শুক্রবার ৮ শ্রাবণ ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	আত্মরক্ষার অধিকার	(গল্প)	শ্রীসমীর রক্ষিত
১২	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৩	বিদেশের কথা		শ্রীপুণ্ডরীক
১৪	টমাস মান		শ্রীবিজয় দেব
১৮	চিঠিপত্র		
১৯	জকল এজেণ্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিক্রমাদিত্য
২৩	সৌজন্যমত		ফাদার দ্যতিয়েন
২৬	তিনি চলেছেন	(কবিতা)	শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ
২৬	যার যা তার তার	(কবিতা)	শ্রীস্বদেশরঞ্জন দত্ত
২৬	সংশয়ে সৈকতবাস	(কবিতা)	শ্রীশৈলেন শেঠ

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন
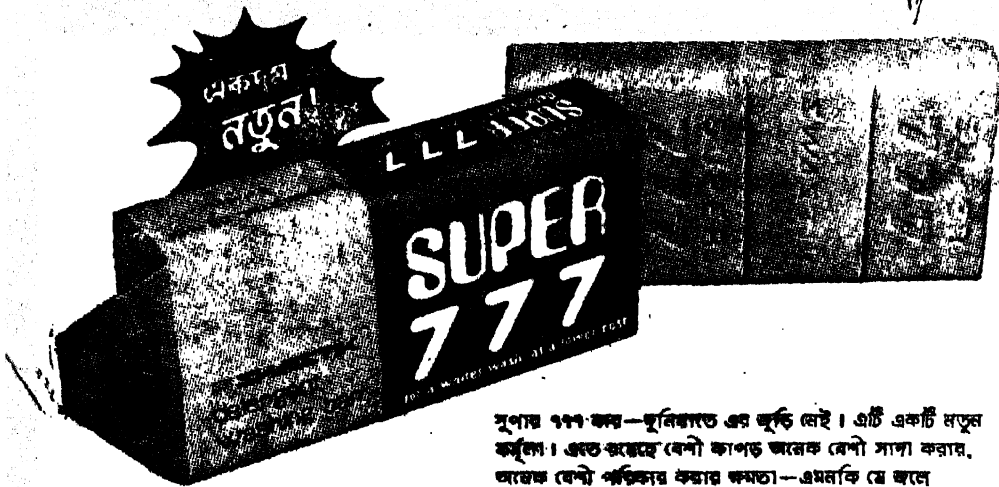
সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মুলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাবানেতে একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ [illegible] দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার !

shilpi hpma 6A/73 BEN

একটি অবাঞ্ছিত প্রথা

কেন্দ্রীয় সরকার কলেজ হস্টেলে ছাত্রদের র‍্যাগিং বা অত্যাচার করা নিষিদ্ধ করে একটি কুৎসিত প্রথা থেকে আমাদের তরুণদের মুক্ত হবার সহায়তা করেছেন। সিংহল সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থা নিয়েছেন। সেখানে র‍্যাগিং সম্পর্কে এমন মারাত্মক অভিযোগ আসতে থাকে যে সরকার এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন বসান। সেই কমিশনের রিপোর্ট দেখে সকলের চক্ষুস্থির। সিংহল সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে র‍্যাগিং কমিশনের রিপোর্ট তাঁরা দশ হাজার কপি ছাপিয়ে বাজারে ছাড়বেন। এই রিপোর্টে এমন সব ঘটনা আছে যা পড়লে মনে হবে যেন কোনো যৌনগ্রন্থের অংশবিশেষ। সিংহল সরকার ছাত্রদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে র‍্যাগিং বন্ধ না হলে তাঁরা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ করে দেবেন। জনসাধারণের পয়সায় বিশ্ববিদ্যালয় চলে। সরকার তরুণদের শিক্ষার জন্য দেশের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করছেন। এই নোংরামি তাঁরা আর বরদাস্ত করবেন না।

র‍্যাগিং একটা বিদেশী প্রথা। মূলত বৃটিশ। হস্টেলে নবাগত ছাত্রছাত্রী এলে তাদের পরখ করে নেবার অছিলায় গোড়াতে নিছক কৌতুক আমোদ দিয়ে এই প্রথার শুরু। নতুন ও পুরাতনদের মধ্যে পরিচয় ঘটানোই হয়তো এর উদ্দেশ্য ছিল। এর দ্বারা হস্টেলে আগন্তুক নতুন ছেলের জড়তা বা মুখচোরা লাজুক ভাব হয়তো কেটে যেত। কিন্তু সেটা ক্রমে ক্রমে মারাত্মক রসিকতায় ও দৈহিক পীড়নের রূপ নেয়। অতি সম্প্রতি পুণার কাছে খড়কভাসলা ডিফেন্স একাডেমির একজন পাশ-করা ক্যাডেট জুনিয়র ছাত্রদের র‍্যাগিং-এর চোটে প্রাণ হারিয়েছে। অপর একজন ক্যাডেট হাসপাতালে। এক্ষেত্রে দেখা যায় নতুনরা পুরাতনদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতেই নাকি র‍্যাগিং রীতিমত একটা নিপীড়নের আর্টে পরিণত হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলগুলোও পিছিয়ে নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে যারা সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে এবং যাদের পড়াশোনার জন্য সরকার জনসাধারণের পয়সা অকৃপণভাবে ব্যয় করছেন তারা সতীর্থদের ওপর কৌতুক করার নামে এমন জঘন্য ইতরামি করতে পারে? র‍্যাগিং-এর মারাত্মক খবর খুব সামান্যই বেরোয়। যারা র‍্যাগিং-এর চোট খেয়ে টিকে যায় তারা আর এসব বলে বেড়ায় না। তারা পরবর্তী নবাগতদের ওপর তার প্রতিশোধ নেবার জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু যখন কোনো ছাত্র বা ছাত্রী দৈহিক দুর্বলতা বা মানসিক কোমলতাবশত র‍্যাগিং সহ্য করতে না পেরে মারা পড়ে তখনই কিছু কিছু খবর অভিভাবকদের মারফৎ পাওয়া যায়।

আমরা [illegible] ওপর ভরসা করে আছি। এই কুৎসিত বিদেশী প্রথার অনুকরণ করে কয়েকজন একগুঁয়ে সতীর্থদের জীবন অতিষ্ঠ করছে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? [illegible] ওপর দেশের অনেকখানি ভরসা আছে। কিন্তু কিছু ছাত্রের এই [illegible] নিশ্চয়ই [illegible]। এতে শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষতিই তারা করছে না, আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকেও কলঙ্কিত করছে। সরকার আইন করে এটা নিষিদ্ধ করে ভাল কাজ করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আইনের জোরেই যেন আমরা ভুলে না থাকি। এই কুপ্রথা বর্জনের জন্য ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো নিজেরাই এগিয়ে আসবেন আশা করি। আমাদের [illegible] বলতে হবে। [illegible] ওপর। সমাজ যাদের কাছে এত প্রত্যাশা করে তারা কি নিজেদের [illegible] ও [illegible] [illegible] নিচে [illegible] হতে দেবে?

ডকটর মুখার্জির গভীর স্টার্ট নেবার শব্দ বোম বিস্ফোরণের মত জোরালো নয়, তবু ল্যাবরেটরীর ভেতরে বসেই অসীম সে শব্দ স্পষ্ট শুনতে পায়। এবং চোখে না চেয়েও নিখুঁত টের পায় ডকটর বর্ধন ফিরে এসে নিজের কিউবিকলে ঢুকছে। এখন যে বর্ধন সাহেবের মুখে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত বাঁকা একটা হাসি ফুটেছে। এটাও অসীম হলফ করে বলতে পারে।

কারণ বর্ধন সাহেবের কৌশল সার্থক। অসীম যাতে ডকটর মুখার্জির সঙ্গে দেখা না করতে পারে এজন্য বর্ধন সাহেব এতক্ষণ তাকে আগলে রেখেছিল। অসীম কোন সুযোগই পায় নি কাছে ঘেঁষবার।

অথচ ডকটর মুখার্জি অসীমের শেষ আশা শেষ অবলম্বন। তাঁর হাতটা পেলে অসীম খড়কুটোর মত জড়িয়ে ধরতে পারে, নয়তো ভাসতে হবে অসীমকে, ডুবতে হবে।

পৃথিবীতে সবারই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। এবং সে বাবদে নিরুপায় মানুষ খুন করলেও তার ক্ষমা আছে। বর্ধন সাহেব অসীমের হাতের শেষ খড়কুটোও টেনে নিচ্ছে।

কোন কিছুতেই আজ উত্তেজিত হবে না স্থির করেছিল অসীম, কিন্তু ডকটর বর্ধন কিউবিকলে ঢোকার মুহূর্তে পেছন ফেরানো তার পেশীবহুল স্কন্ধ কাঁধটা অর্জুনের চোখে পাখির মাথার মত ঝলসে ওঠে, অসীমের [illegible] ওঠে. তার হাতে ধনবাণ [illegible] থাকতে পারত। [illegible] এই রিসার্চ লেবরেটরীর [illegible] একটা অন্তিম আর্তনাদ শোনা [illegible] বা ইঁদুরের রক্ত নয় মনুষ্য [illegible] প্রথম স্বাদ পেত এই ঝকঝকে মেঝে। মানুষ কী করতে চায় আর কী করে বসে?

হাতে ধরা টেস্ট টিউবকে উত্তেজিত মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধরে অসীম। টেস্ট টিউব ভেঙে যায় কিছু কাঁচের কুচি টুপ করে গড়িয়ে পড়ে।

প্রণব ছুটে এসে বলে—কী হল? এটা কী করছিস—

টেস্ট টিউবটা ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অসীম রক্তাভ চোখে তাকিয়ে বলে—কিছু হয় নি। যা ভাগ—

অসীমের চোখ এমনিতে লাল নয়, বরং অন্যমনস্কতায় ঈষৎ নীলাভ। প্রণব ফিরে যায়। যাবার আগে তার চোখে পড়ে অসীমের মধ্যমায় বোর্জিনের গা ফুঁড়ে কয়েক বিন্দু রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। সর্বংসহার মত, অসীম দেখেও দেখে না। এই যেন রক্তপাতের শুরু, এমন অবহেলায় তোয়ালে দিয়ে নীরবে মুছে ফেলে তারপর আরেকটা টেস্ট টিউব হোল্ডারে আঁটে

নিখুঁতভাবে। উত্তেজিত না হবার প্রতিজ্ঞা তার ভেসে যাচ্ছে; অসীম নিজেকে তবু আত্মস্থ করবার চেষ্টা করে। ফের বেঞ্জিন ঢালে টিউবে—ঘ্রাণ নেয় তীব্রভাবে। কোন একটা মনোরম স্মৃতির দিকে মুখটাকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

আর ঠিক তখনই বেঞ্জিনের গন্ধটা সহসা একদম উবে যায়। তবু সমস্ত শরীর মন অকস্মাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। একাগ্র। সূচীমুখের মত। এবং সে তীব্রভাবে অনুভব করে সিঁড়ি দিয়ে ইলোরা উঠে আসছে। কখনো কখনো এরকম হয় অসীমের। কোন সামনের ঘটনা সম্বন্ধে তার অনুমানশক্তি হঠাৎ অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইলোরার আসাটা সে এমনিভাবে অনেক দিন টের পেয়েছে।

এর একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে ইলোরার। সে হেসে অসীমকে বলে—তুমি তো আমাকে একদম অপছন্দ কর, চান্স পেলেই কড়া কথা শোনাও, কাজেই আমি যখনই আসি তোমার অবচেতন মন একটা রি-অ্যাকশন মানে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া—

প্রণব ঠাট্টা কম বোঝে এবং অসীমের যে কোন নিন্দা অপছন্দ করে। সে প্রতিবাদ করে বলে—ইটস নট দ্যাট। আসলে ওর সাবকনসাস মাইণ্ডে সব সময়ই তুমি আছ কাজেই এরকম হয়। কিম্বা ওর ইনটুইশান অত্যন্ত পাওয়ারফুল—

অসীম দুজনকেই হেসে উড়িয়ে দেয় —বোগাস, এ সব কাকতালীয় অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এ নিয়ে মাথা ঘামবার কিছু নেই!

অন্য কোন দিন হলে ইলোরার আসা নিয়ে মাথা ঘামাত না অসীম। কিন্তু আজ ঘামায়। মনে-প্রাণে চায় ইলোরা যেন না আসে। আজ কিছু একটা এসপার ওসপার হবেই, এর মধ্যে যেন ইলোরা না থাকে। অবশ্য কথা দিয়েও গত দু দিন ইলোরার সঙ্গে দেখা করে নি অসীম। আর ইলোরার অনুমানশক্তিও এতটুকু ভোঁতা নয়। তাকে এড়ানো করা সহজ কথা নয়।

ফলে অজান্তেই দরজার দিকে চোখ চলে যায় অসীমের। একটা বেঢপ পায়ের শব্দ কানে আসে, পরমুহূর্তে বেয়ারা নগেনকে ঢুকতে দেখে সে। নগেন ডকটর বর্ধনের ঘরের দিকে চা নিয়ে হেঁটে যায়। ওর একটা পা সামান্য খোঁড়া।

খোঁড়া পায়ের হাঁটা দেখেই হয়তো অসীমের ভ্রূ কুঁচকে যায়। কিম্বা হয়তো ইলোরা এল না বলেই, মানুষের মন বড় বিচিত্র; কোনটা চাইতে গিয়ে কোনটা চায় তার কোন সরল অঙ্ক নেই।

ঠিক এ সময় কোণের টেবিল থেকে প্রণব ডাকে—অসীম।

অসীম দেখে প্রণবের চোখ দরজায়, হাসিতপূর্ণ মুখে হাসছে সে।

ব্যাকভর্তি শিশি-বোতলের ভিড়ের ভেতর দিয়ে অসীম ইলোরাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। যথারীতি বাঁ কাঁধের শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝুলছে, একটা প্রিন্টের নীল শাড়ী পরণে আর মুখময় উদ্বেগ আর আতঙ্কের অকীর্ণ রেখা। ইলোরার এই মুখচ্ছবি স্পষ্ট বলে দেয় সে সব জেনে গেছে। আজও একবার সে ফোন করেছিল, অসীম ধরে নি। প্রণবকে পাঠিয়েছিল। প্রণব বড় ঠোঁট পাতলা।

সঙ্গে সঙ্গে অসীমের মন কাঁট হয়ে ওঠে। কেউ তার জন্য উদ্বেগ কিম্বা অনুকম্পা দেখালে সহ্য করতে পারে না অসীম। এরকম জটিল অসীমের স্বভাব। তার ধারণা উদ্বেগের মধ্যে করুণা থাকে। করুণা করলে মানুষকে ছোট করা হয়। সে কারো কাছে কখনোই ছোট হতে রাজি নয়। হোক সে ইলোরা। উদাসীন ভঙ্গিতে চোখ ফিরিয়ে নেয় অসীম। একটা টেস্ট টিউবে পেট-ইথার ঢালে।

এরকম সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্য দেখে অভিমান করে ফিরে যাবে এমন নরম মেয়ে ইলোরা নয়। তাছাড় অসীমকে তার চেয়ে বেশী আর কে জানে? আজ তাকে না-দেখার ভান করা কেন, তারচেয়েও গুরুতর অনেক কিছু করতে পারে অসীম। আজ যে সে এখনো ল্যাবরেটরীতে রয়েছে এটাই আশ্চর্য। এখনো কী অসীম ডকটর বর্ধনের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধায় নি? ইলোরা স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকে পড়ে। এখানকার কোন কিছুই তার অচেনা নয়। এক বছর আগে সে এখানে স্কলার হিসেবে কাজ করে গেছে।

ইলোরা নিঃশব্দে অসীমের টেবিলের পাশে দাঁড়ায়।

অসীম চোখ না তুলেই বলে—কী হল? হঠাৎ?

—হঠাৎ মনে! —ইলোরা হাসে।

অসীম হাসে না, ভ্রূ কুঁচকে বলে—একেবারে এখানে?

গভীর গলায় ইলোরা বলে—না এসে উপায় কী বল?

ছোট্ট কথা। কিন্তু ভারী তাৎপর্যপূর্ণভাবে উচ্চারণ করে ইলোরা।

অন্যকোন দিন হলে অসীম এই কথাটা নিয়ে নির্ঘাৎ পরিহাস করত। প্রণবকে ডেকে বলত—শোনছে পনু, ইলা কী বলছে—আমার কাছে না এসে নাকি ওর উপায় নেই?

এতে যে ইলা কুণ্ঠিত হত এমন নয়, সে সতেজ গ্রীবা অবলীলায় বাঁকিয়ে বলত—পনু, কী শুনবে, মিথ্যে তো বলি নি কিছু?

কিন্তু তেমন মনোরম কিছুই ঘটে না, অসীম কিছুই বলে না।

ইলোরাই বলে—পরশু যাবে কথা ছিল গেলে না। কালও না। আজ ফোন করলাম—কিন্তু—

—তুমি আমার জন্য খুব ভাবো ইলোরা, তাই না? —অসীম বুনসেন বার্নারের জবলায়, তার কণ্ঠস্বরেও ব্যঙ্গ মেশানো জ্বালা।

—আমাকে অনেক কিছুই ভাবতে হয়—বলে ইলোরা আরো ঘনিষ্ঠ হয় শক্ত হয়ে বলে—বাইরে চল তো একটু, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সাঁ সাঁ করে বার্নার ফুঁসে ওঠে, তীব্র স্বরে অসীম বলে—তুমি বললেই আমাকে যেতে হবে। শানানো ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ কথা ইলোরার গায়ে লাগে কিন্তু বিদ্ধ করে না। অসীমের নিষ্ঠুরতার ধরনই এই, রাগ হলে সে সবচেয়ে আপনজনকে সবচেয়ে বেশী আঘাত করে। এটা কী ইলোরার অজানা? এম-এস-সির ফাইনাল ফোর্থ পেপার খারাপ দিয়ে আর পরীক্ষায় বসবে না স্থির করেছিল অসীম।

ইলোরা নাছোড়ের মত বলেছিল—একটা পেপার খারাপ দিয়েছ তো কী হয়েছে? পাগলামী না করে পরীক্ষা শেষ কর তো। ড্রপ দেবার মতলব ছাড়ে। এরকম করে বহুবার জোর তখন থেকেই পেয়ে গেছে ইলোরা।

সেদিনও অসীম এমনি নিষ্ঠুর মুখে বলেছিল—তুমি বললেই আমাকে পরীক্ষায় বসতে হবে?

সেদিন আঘাত লেগেছিল ইলোরার। মুখ কালো হয়েছিল। গোপনে মেঘ ভার হয়েছিল বুকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসেছিল অসীম।

পরে সেই কথা নিয়ে কতদিন হাসাহাসি করেছে দুজনে। ইলোরার মনে পড়ে। মনে পড়ে গোপনে সযত্নে করে রাখা পুরোনো কিউরিওর মত দুর্মূল্য সেই স্মৃতিকথা।

জেদী গলায় ইলোরা বলে—তোমাকে কিন্তু রিসার্চ পেপার কমপ্লিট করতেই হবে। কোন আজেবাজে প্ল্যান—

তার কথার মাঝখানেই ইস্পাতের পালিশ ঝলসে ওঠে অসীমের ঠোঁটে—তোমার খুব ভয় ইলা না যদি আমি এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিয়ে চলে যাই কিম্বা হাঙ্গামা বাধাই।

—তোমাকে কিছু বিশ্বাস নেই।

—যদি ছাড়িও তাহলে তোমার ক্ষতি কী?—এতক্ষণে সোজা তাকিয়ে অসীম।

চোখ সরিয়ে নেয় না ইলোরা। চোখের পলক ফেলতে সে ভুলে যায়। বুকের ভেতরে যেন এক কলসী জল গড়িয়ে পড়ে। হয়তো তার একটি নিঃশব্দ ধারা চোখের দিকে গড়াতে থাকে।

সব কথা সব সময় মুখ ফুটে বলা যায় না। এ বড় যন্ত্রণা। সত্যি কথা বলতে গেলে এখন বড় নাটুকে শোনায়। একথা কী ইলোরা বলতে পারে—তুমি কিছু করবে বলেই তো অপেক্ষায় আছি অসীম। আমি রিসার্চ ছেড়ে চাকরী নিয়েছি তোমার জন্য?

সেসব অনেক কথা, নানা দিনের নানা টুকরো টুকরো কথা। অথচ সব মিলিয়ে তার একটা স্পষ্ট অবয়ব আছে, তার কিছু সৌরভ আছে।

তাদের দুজনের বোঝাপড়া শেষ। আর সব ঠিক শুধু কোন এক সুদিনের অপেক্ষায় তাদের রেজিস্ট্রেশন তোলা রয়েছে।

অসীমের ইচ্ছে এখান থেকে পি-এইচ-ডি করে কোন বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডকটরাল ফেলোশিপ নেবে। তার আগে তাদের রেজিস্ট্রেশন নয়।

তারপর তুমি কী হবে? ডকটর খেরানা?—ঠাট্টার স্বরে বললেও ইলোরার গলায় ব্যথা ছিল।

অসীম সিরিয়াস মুখে বলেছিল—লজ্জা দিচ্ছ? অত উঁচু সখ নেই আমার। আমার দৌড় আমি জানি। ছোট্ট করে ভাইরলজির ওপর একটা রিসার্চ করব। ব্যাস। আর কোন এ্যাম্বিশন নেই আমার।

—এটা খুব ছোট্ট ব্যাপার কিন্তু ততটা দৌড় আছে তো? যথার্থ ঠাট্টা ছিল ইলোরার ভঙ্গিতে।

—অতটা হেলাফেলা করো না ম্যাডাম, ডকটর মাইতি কী বলেছেন জানো? আমি যা কাজ করেছি তাতে পি-এইচ-ডি নয় ডি-এস-সি হয়ে যায়।

—প্রফেসর মাইতি তোমাকে খুব বেশী ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলে ভেব না উনি তোমার আমার দুজনের বিদেশ যাবার প্যাসেজ মানি দেবেন। যতটা শব্দ করে হাসলে হাসির শব্দ দূরের জলপ্রপাতের শব্দের মত শোনায় ততটা শব্দেই হেসে-ছিল ইলোরা।

অবুঝ মুখ অসীমের—কেন, তুমি তো সেজন্যই চাকরী করছ শুনতে পাই, পাবলিক বলছে—

জলপ্রপাত অসীমের বুকের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ইলোরা বলেছিল—ও তাই নাকি? অচ্ছা তাহলে হানিমুনটা কবে কোথায় হচ্ছে? বিদেশের মাটিতে নাকি?

—অফকোর্স। নিঃসন্দেহ অসীম তুড়ি মেরে বলেছিল—বিদেশে তুষার-ঝড়ের মধ্যে আমাদের হানিমুন উদযাপিত হবে। তোমার হাতে থাকবে সদ্য দস্তানা মাথায় ফারের টুপি আর গায়ে ফারের কোট। তবু তোমাকে আমি নিয়ে নেব আমার ওভার-কোটের ভেতরে—আমার মাথায় থাকবে মাংকি ক্যাপ—

—মাংকি ক্যাপ! গ্র্যান্ড—জলপ্রপাতের তোড়ে দুজনেই নেয়ে উঠেছিল।

সেসব বড় অন্তরঙ্গ কথা, গোপনে বলা কথা। দশজনের মধ্যে উচ্চারিত হলে তার সব রঙ ঝরে যায়, সব আলো নিভে যায়।

ফলে সে সব কিছুই উচ্চারণ করে না ইলোরা। শুধু স্মৃতিজড়িত স্তিমিত কণ্ঠে বলে—আমার কী ক্ষতি? কারোরই কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু তোমার এ্যাম্বি-শানের কথাটা কী আমি একটুও জানি না অসীম? —কথাগুলো এত আস্তে বলে ইলোরা যেন সে আপনমনে কথা বলছে।

—এ্যাম্বিশান! উচ্চাশা! কথা দুটো অসীমের মুখ থেকে দুটো পাথর হয়ে যেন পূতিগন্ধময় নর্দমায় ছিটকে পড়ে। বলেই অসীম এমন ভঙ্গিতে ঠোঁট মোছে যেন পাঁকের ছিটে লেগেছে মুখময়। তেমনি দুর্বৃত্ত মুখ নিয়ে, আর একটি কথাও না বলে, অসীম সোজা চলে আসে এ্যানিম্যাল রুমে। যেখানে ইঁদুর গিনিপিগ মুরগীর পরীক্ষা-গার।

কখনো কখনো মানুষকে একলা হতে হয়, দশজনের চোখের আড়ালে যেতে হয়। চোখে জল আসবে এমন দুর্বল মন নয় অসীমের তবু তো কদাচিৎ কখনো অদৃশ্য অশ্রু পর্দার আড়ালে ঝরে যায়। নিজের কাছে তো নিজেকে লুকনো যায় না। মুখে আর কতটুকু বলা যায়, বুকের ভেতরে তারও বেশী কথা থাকে, নিজস্ব স্বপ্ন থাকে সব মানুষের। তার সবটা কী অন্য কারুকে দেখানো সম্ভব? ইলোরাকে কী সব বলা গেছে?

অক্ষমের স্বর্গাকাশে হাস্যকর প্রতিভা-বানের ময়। কিন্তু যারা এর মাঝামাঝি, শুধু ইচ্ছার জোর খাটিয়ে যারা খানিকটা এগোবে তাদের কাছে স্বপ্নটাই শাস্তি।

এ রকম শাস্তি অংকুর ফাটিয়ে শেকড় চালিয়ে দিয়েছিল অসীমের বুকের ছোট্ট জমিতে। তার গোটা দুয়েক পেপার বেরিয়েছে বিদেশী জার্নালে। অবশ্য তার নামের সঙ্গে ডকটর বর্ধনের নাম জুড়ে দিতে হয়েছিল। এ-জন্য অসীমের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কিন্তু এখন যখন শেকড় আরো গভীরে নামছে, অসীম টের পাচ্ছে ভয়ংকর কীটের দংশন। অসীমের বুকের জমিতে বর্ধন সাহেবের তীক্ষ্ণ নখ ডুবে যাচ্ছে।

ইঁদুরটা ঝিম মেরে পড়ে আছে। নিষ্প্রাণ প্রতিবিম্ব নয়, সত্যিকারের ইঁদুর। খোঁচা খেয়েও নড়তে পারছে না। এগিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। চারটে পা-ই কাঁপছে থরথরিয়ে। বিবশ হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি শিরা পেশী। সূঁচ ফুটিয়ে ব্যাক-টেরিয়া ঢোকানো হয়েছিল, তার ফল ফলতে শুরু করেছে। অবিকল সেই মানুষগুলোর মত। সস্তার ভেজাল তেল খেয়ে যাদের পঙ্গু হয়েছে। বিকল হয়েছে যাদের সমস্ত শরীর। কোনদিন এই পৃথিবীতে সুস্থ স্বভাবিক মানুষের মত হাঁটাচলা করবে না আর তারা। ওল্টানো মত উচ্ছিষ্টের মত তারা পড়ে থাকবে যত-দিন না মৃত্যু এসে তাদের চিরকালের জন্য ঝাঁট দিয়ে নিয়ে চলে যায়।

মানুষ এমনি অসহায়। মানুষের হাতেই মানুষ শিকার হচ্ছে। মানুষের হাতে হাতে গোপন গহ্বরে তৈরী হচ্ছে বিষ বিষাক্ত জীবাণু, ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষে মানুষে, শিরায় ধমনীতে চলছে অন্তিম বিষক্রিয়া। পঙ্গু হচ্ছে, বিবশ হচ্ছে মানুষ।

সেই বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া খুঁজে বের করার গবেষণাই অসীমের। রোগের কিছু বিশদ লক্ষণ আর রক্ত সংগ্রহের জন্য গিয়ে মানুষের চোখে চোখে জল দেখেছিল অসীম। তাদের জিভ বিবশ হয়নি কিন্তু ওরা নির্বাক মূক হয়েছিল। মানুষের কাছে যেন কোন প্রত্যাশা নেই তাদের। তবু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল অসীম, বলে-ছিল—একবার যদি ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়ে তাহলে প্রতিষেধকও কিছু একটা বের হয়ে যাবে। কারোর মুখরেখায়ই কোন ভাবান্তর দেখেনি। শুধু জ্বলে উঠেছিল এক যুবক।

শণ শনের মত মাথাভরা চুল, দীর্ঘ সময়ের আঁকবাঁকেতে আকীর্ণ মুখমণ্ডল, কোটরগত দীপ্ত চোখ জ্বেলে উঠেছিল, বলেছিল—প্রশংসা দিচ্ছ? কটা ব্যাকটেরিয়া বার করবে তোমরা, কটা প্রতিষেধক?

হোঁচট খেয়েছিল অসীম, বিনা কারণে কাশির দমকে গলা সাফ করে বলেছিল—যতটা পারি।

—কিছু হবে না, তোমরা একটা বের করবে ওরা দশটা বানাবে। মানুষ আর সুস্থ হয়ে বাঁচতে পারবে না। —রুগ্ন বুকভরে দম নিয়ে কথাটা ফেলিয়ে বলেছিল—সেই খোঁজ ব্যাকটেরিয়াগুলোকে বের করতে পারবে যারা সমাজটাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে?

অসীম হেসে বলেছিল—সেটা তো আমার গবেষণার বিষয় না দাদু?

বুড়োও হেসেছিল—সে গবেষণা করতে বুকের পাটা লাগে, তোমাদের মত ছিঁচকে কেরিয়ারিস্টদের দিয়ে সে গবেষণা হয় না। যাও—ভাগো।

ঘৃণার ছিলা টান হয়ে উঠেছিল, আত্ম-সম্মানের অহঙ্কারী ফণা তুলে ছিল অসীম দাদু কী শুয়ে শুয়ে সেই গবেষণাই করছেন নাকি?

দু চোখ ভয়ঙ্কর শীতল, স্থির মুখে বুদ্ধ শুধু একটি কথাই পুনরুচ্চারণ করে-ছিল—বেরিয়ে যাও, আর একদণ্ড আমার সামনে দাঁড়িও না, ভাগো—

শ্বেতচন্দনের জলো ফোঁটার মত পুঁচকে ফেণা ইঁদুরের সুঁচালো মুখে। চোখে স্বচ্ছ টপটপে জলবিন্দু। পায়ের নখ থেকে কপাল পর্যন্ত এমন ঝড় বয়ে যায় নি কোন দিন অসীমের রক্তের ভেতরে।

কাঁধে প্রণবের হাত পড়তে চমকে ওঠে অসীম। প্রণব বলে—তুই এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চল—

সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরের দিকে চোখ পড়তেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে প্রণব—আরে এই ত এটা প্যারালাইজড হতে শুরু করেছে।

ছোট্ট করে অসীম বলে—কী লাভ?

—কেন লাভ নেই কেন? ডকটর বর্ধনের কথাই কী শেষ কথা নাকি? তুই ডকটর মুখার্জিকে সব খুলে বল—একথাটা প্রণব দু দিন ধরে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে যাচ্ছে।

খুব শক্ত গলায় অসীম বলে—ডকটর মুখার্জি কী তার রিসার্চের ব্যাপারে মাথা ঘামান? সায়েন্টিফিক এ্যাসিস্টেন্টরা তো ওকে তেলিয়ে পেস্তল করে দিচ্ছে—স্কলারদের পেপারে ওরও নাম থাকছে। আর কী চাই?

—এস-এরা ওকে তেল দেয় পাঁচ বছরের আগেই প্রমোশন পাবার জন্য কিন্তু তাই বলে যা খুশী তাই তো চলতে পারে না। ন্যায় অন্যায় বলে একটা কথা আছে—মানুষ কত নীচে নামতে পারে?

প্রণব অসীমের পিছু হাঁটে।

ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে ঢুকতে অসীম বলে—নীচে নামতে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে কে? আমিও এর শেষ দেখতে চাই প্রণব, আমার কেরিয়ারের প্রশ্ন। যদ্দূর যেতে হয় আমিও যাব—

অসীমের চোখ যত না জ্বলে ওঠে, ইলোরার চোখ তারও বেশী। অসীমের এই জেদ আর গোঁয়ার্তুমিতে কী যে বিদ্যুৎ! সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে।

ইলোরাকে অতীত এসে আক্রমণ করে মনে পড়ে বি-এস-সি'র এক টার্মিনাল পরীক্ষায় অধ্যাপক মিত্র অসীমকে পঞ্চাশ দিয়েছিলেন।

ও'র ক্লাসে অসীম প্রায়ই হলাফিল রিসার্চের রেফারেন্স টেনে আনত, বহুকাল আগের তৈরী সাইক্লোস্টাইল করা নোটের বাণ্ডিলের ওপরে উবু হয়ে তেরছা চোখে অসীমকে দেখতেন মিত্র। বলতেন—ডোন্ট ট্রাই টু বি টু ক্লেভর। প্লিজ ডোন্ট ইন্টারাপ্ট—

কিন্তু অসীমকে ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। শেষ পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টাল হেড আরো দুজন অধ্যাপক আর অধ্যাপক মিত্রকে নিয়ে প্যানেল হয় পুনর্বিবেচনায় অসীমের নম্বর ঠেলে ওঠে সত্তরের ঘরে। ইলোরা যেন ঢেউয়ের মাথায় দুলে ওঠে, অসীমের দু হাত ধরে ইলোরা বলে—তুমি এক্ষুনি ডকটর মুখার্জির কাছে চলে যাও অসীম। মিট হিম এ্যান্ড সেটল। আর এক মুহূর্তও দেরী নয়।

এ সময়ে বার্থ কন্ট্রোলের সুব্রহ্মানিয়াম ওদের পাশ কাটিয়ে একটা ধেড়ে টিকটিকির মত চলে যায়। সব টেপরেকর্ড হয়ে চলে যাবে বর্ধন সাহেবের কানে। প্রণব সতর্ক হয়ে ওঠে। ওদিকে দুজন জুনিয়ার স্কলার মৈত্র আর ঘোষালেরও কান খাড়া।

প্রণব হাল্কা গলায় বলে—ডিরেকটর তো লাঞ্চে গেছে।

ইলোরার উদ্বেগ—এই মরেছে। লাঞ্চে গিয়ে তো উনি আবার কোন কোনদিন ফেরেনও না। বিদেশী জার্নাল-টার্নাল স্টাডি করতে হয় ও'কে—তোমাদের গবেষণার উন্নতির জন্য—

প্রণব বলে—এবং তখন ও'র স্ত্রীকে খুব কাছাকাছি থাকতে হয় কম্পানি দেখার জন্য, নয়তো ও'র ব্রেন ওয়ার্ক করে না।

ইলোরা সশব্দে হেসে ওঠে। প্রণবও।

ডকটর বর্ধনের কলিং বেলটা ফায়ার এ্যালার্মের মত বেজে যায় এসময়। নগেন খোঁড়া পায়ে দৌড়য়। ঘরের ভেতরে পেট-ইথার আর ইথাইল অ্যালকহলের গন্ধে ভারী বাতাস টাটাফটা হয়ে যায়। আর তখন সবাইকে সচকিত করে দিয়ে প্ল্যান্ট কেমিস্ট্রির মিস শুক্লা সান্যাল ডকটর বর্ধনের কিউবিকল থেকে বেরিয়ে আসে। হাসির উৎস সন্ধানেই হয়তো। ওর বাঁকা দৃষ্টি চিরুনির মত সবাইকে আঁচড়ে দিয়ে যায়। সুব্রমানিয়মের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কী যেন কথা হয়।

অসীমের দু'চোখ দুটো বার্নারের মত দপ করে জ্বলে ওঠে সহসা।

এতদূরে থেকেও কী অসীমের চোখের সে আগুন কী ছ্যাঁকা দেয় শুক্লাকে? আড়চোখে অসীমকে দেখেই ফের দ্রুত ঢুকে যায় শুক্লা কিউবিকলে। এরকম ত্রস্ত ভঙ্গিতেই ইঁদুর পালায় নিজের গর্তে।

কিউবিকলের দরজা ফের বন্ধ। দরজার ওপরে পিপ-হোল জুড়ে ভেতরে ডকটর বর্ধন কিম্বা মিস সান্যালের অ্যাপ্রন সারাক্ষণ ঝুলে থাকে। হয়তো বাইরের কৌতূহলী দৃষ্টি কিম্বা অবাঞ্ছিত আলো গবেষণায় বিঘ্ন ঘটায়।

চোখের পলক না ফেলে কেউ দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকতে পারে না। ফলে অসীমেরও পলক পড়ে, চোখে ক্লান্তির মেঘচ্ছায়া ঘনায়। অলস হাতে সে অ্যাপ্রনটা খুলে ফেলে, ইলোরাকে বলে—বাইরে যাবে বলছিলে না চলো।

ইলোরা দ্বিধান্বিত—ডকটর মুখার্জি যদি এসে পড়েন?

—আসুন। আমিও আছি, পালিয়ে তো যাচ্ছি না।

বাইরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘের ভারে আকাশ নতজানু। হাওয়া উন্মদ। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইলোরার চোখে পড়ে এসব। তুলোর আঁশের মত পাতলা বর্ষণ।

ইলোরা আপন মনে বলে—মুংকি ক্যাপ!

অসীম সিঁড়ি দিয়ে এমন উদাসীন ভঙ্গিতে নামছে যেন তার কাছাকাছি কেউ নেই।

এগিয়ে গিয়ে ইলোরা বলে—বাইরে তুষার ঝড় হচ্ছে, দেখেছ?

নিরুত্তরে অসীম নেমে যায়।

ইলোরা হেসে বলে—আমার হাতে থাকবে সাদা দস্তানা, মাথায় ফারের টুপি গায়ে ফারকোট—তবু তোমার সহসা ইলোরাকে চমকে দিয়ে বিদ্যুৎ ঝলকের মত মুখ ঘোরায় অসীম, ফ্যাসফ্যাসে চাপা গলায় রুখে ওঠে—স্টপ ইট!

ইলোরা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ে। সময় স্থির অনড় হয়ে থাকে দুজনের মাঝখানে। ইলোরার দুচোখে ঘন বাষ্প জমা হতে থাকে। আর অসীমের দুচোখ পাথরের মত দৃষ্টিহীন।

তবু ফের রক্তস্রোতে [illegible] অনুশোচনা গড়িয়ে আসে, অসীমের [illegible] হাত এগিয়ে আসে ইলোরার দিকে—[illegible] ডোণ্ট মাইণ্ড। আমি ঠিক খেয়াল কা[illegible]—

ইলোরা চমকে ওঠে, অসীমের হাতের শীতলতার জন্য নয়, ঠিক এসময় পিঠের ওপরে অজস্র জলবিন্দু নিয়ে ডকটর মুখার্জির ফিয়াট এসে দাঁড়ায় ক্যানপির তলায়।

উজ্জ্বল আশার মত দরজা খুলে যায়। মুখার্জি নেমে আসেন, সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে বলেন—আরে ইলোরা! কেমন আছ?

ইলোরা হেসে মাথা হেলায়। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মুখার্জি বলেন—অসীম তো সাঙ্ঘাতিক কাজ করছে শুনেছ তো!

অসীম বলে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল স্যার!

—তুমি কাজের ছেলে কাজ কর আবার কথা কিসের—মস্ত হেসে মুখার্জি ওপরে ওঠেন।

দৌড়ে এসে অসীম পিছু নেয়—একটা খুব দরকারী কথা।

বেয়ারা জীবন দরজা খুলে ধরে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হাওয়ায় এতটুকু আড়ষ্ট বোধ করে না অসীম।

ভূমিহীনদের জন্য ভূমি

প্রধানমন্ত্রী যে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ভূমিহীনদের ভূমিদান। চাষের জমি আর বাস্তুজমি, দু ধরনের জমি দেওয়ার কথাই ঐ কর্মসূচীতে বলা হয়েছে। এই কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পশ্চিম বাংলার ১৫ লাখ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরকে বাস্তুজমি দেওয়ার এক খসড়া পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। একটি ভূমিহীন ক্ষেতমজুর পরিবারকে কমপক্ষে দু কাঠা জমি দেওয়া হবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকার এই কাজটা শেষ করে ফেলতে চান। তবে কাজটা শেষ করা যে খুব সহজ নয় তা সরকারি মুখপাত্রেরাও অস্বীকার করতে পারছেন না। অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমির অভাব হবে না বলে মনে হয়। ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত অনেক জমি সরকারের আওতায় এসেছে। এর মধ্যে চাষের জমি তো আছেই। তা ছাড়া আছে চাষের কাজে লাগে না এমন জমি এবং চাষের কাজের অনুপযুক্ত জমি। এইসব জমিই বাস্তু জমি হিসেবে বিলি করা হবে। কিন্তু তার আগে একটা বড় কাজ করতে হবে। সেটা হলো গোটা রাজ্য জুড়ে ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের তালিকা তৈরি। বিভিন্ন এলাকায় ভূমি সংস্কার সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। সেই সব কমিটি যে তালিকা তৈরি করবে তা অনুমোদনের দায়িত্ব দেওয়া হবে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের। অতিরিক্ত জেলা শাসকেরা এ ব্যাপারে বি ডি ওদের পরামর্শ দেবেন। বিভিন্ন জেলার জুনিয়ার ল্যান্ড রেকর্ডস অফিসারেরা বিলি করার উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করবেন। তারপর আগস্ট থেকে জমি বিলি শুরু হবে।

নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ফরাক্কায় একটা বড় আকারের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজি হয়েছেন। এই প্রকল্পটি এখন খসড়া পঞ্চম যোজনার অন্তর্গত করা হয়েছে। প্রথমে এখানে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা হবে। তবে পরে এই কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ বাড়িয়ে এক হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত করা যেতে পারে। ফরাক্কায় এই বিরাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে তা দিয়ে উত্তর বাংলা ও পূর্ব বিহারের চাহিদা তো মেটানো যাবেই, সেই সঙ্গে দক্ষিণ বাংলা বা দক্ষিণ বিহারের চাহিদাও মেটানো যেতে পারে। তবে উত্তর বাংলার ডালখোলায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আর একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবে যোজনা কমিশন রাজি হন নি। কথা ছিল প্রথমে ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে এমন দুটি ইউনিট ডালখোলায় বসানো হবে। তারপর আরো দুটি। কালীগঞ্জ থেকে কয়লা আর মহানন্দা থেকে জল পাওয়া যাবে। তবে এই জল পাওয়ার ব্যাপারে যোজনা কমিশন মোটেই নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। তাছাড়া রাণীগঞ্জ থেকে যদি ফরাক্কা দিয়েই কয়লা ডালখোলায় নিয়ে যেতে হয় তাহলে ফরাক্কাতেই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে যোজনা কমিশন পরামর্শ দিয়েছেন। তবে ডালখোলায় রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে ছোট-খাটো একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে পারেন। কোলাঘাটে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বসাবার প্রস্তাবটি অবশ্য অনুমোদিত হয়েছে। পঞ্চম যোজনার মধ্যে ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন করতে পারে এমন একটি ইউনিট চালু করার ব্যবস্থা হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ জানিয়েছেন, টাকাকড়ি ঠিকমতো পেলে ১৯৭৯ সাল নাগাদ প্রথম ইউনিটটি চালু হয়ে যাবে।

নতুন পাঠ্যক্রম

আমাদের স্কুল-কলেজের পড়াশুনার ধরণটা যে নিছকই কেতাবী, একথা অনেকেই বলে থাকেন। ভবিষ্যৎ জীবনে বিদ্যালয়ের বাইরে এসে ছাত্ররা তাই অনেকেই কোন্ পথে এগোবে তা স্থির করতে পারে না। তাই পশ্চিম বাংলার দু বছরের নতুন মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে বৃত্তি শাখার সন্ধান পেয়ে অনেকে খুশি হবেন। স্কুল-কলেজের পড়ার ধরণটা আবার বদলোচ্ছ। এগার ক্লাসের হাইয়ার সেকেন্ডারির বদলে চালু হয়েছে দশ ক্লাসের নতুন স্কুল ফাইনাল। তারপর দু বছরের নতুন হাইয়ার সেকেন্ডারি, তারও পরে তিন বছরে ডিগ্রি কোর্স। পুরোনো হাইয়ার সেকেন্ডারির শেষ পরীক্ষা হবে আসছে বছর। নতুন স্কুল ফাইনালের প্রথম পরীক্ষাও হবে ঐ সময়ে। তারপর ছেলেমেয়েরা ভর্তি হবে নতুন হাইয়ার সেকেন্ডারি ক্লাসে। এই নতুন হাইয়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়েছে। সেই পরিষদ সম্প্রতি এই পরীক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরির কাজটা শেষ করেছেন। এই পাঠ্যক্রমের বড় বৈশিষ্ট্য, বৃত্তি শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে (নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যে) ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। সাধারণ শাখার মতো বৃত্তি শাখাতেও মোট নম্বর থাকবে ৯৫০। বৃত্তি শাখায় যারা যেতে চাইবে তাদেরও সাধারণ শাখার ছাত্রদের মতো দুটো ভাষা শিখতে হবে। সেই সঙ্গে শিখতে হবে অর্থনীতি এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। তাছাড়া চাষবাস, পশুপালন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্যে থেকে দুটি বিষয় বেছে নিতে হবে। সাধারণ শাখায় দুটি ভাষা নিতে হলেও ইংরাজি আবশ্যিক হবে না। একটি ভাষা নিতে হবে সংবিধানে স্বীকৃত ১৪টি ভাষা এবং ইংরিজির মধ্য থেকে। দ্বিতীয়টি ইংরাজি, ফরাসি, রুশ জার্মান ইত্যাদি ভাষা থেকে বেছে নিতে হবে।

ত্রাণের কাজ

দুর্গত মানুষের ত্রাণের জন্যে টাকা খরচ করতে হয় রাজ্য-সরকারকে প্রতি বছরেই। তবে এ-বছরে এই ত্রাণের কাজে কিছুটা নতুনত্ব আনা হয়েছে। এ-বছর থেকে এই ত্রাণের কাজের মধ্য দিয়ে গ্রাম এলাকায় উন্নয়নের কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। জুলাইয়ের গোড়া পর্যন্ত এই খাতে রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা বীরভূম মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় ত্রাণের কাজ চলছে। টেস্ট রিলিফ এবং 'কাজের বদলে খাদ্য', এই দুটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রথমটি অনুযায়ী প্রায় ৬৫০ এবং দ্বিতীয়টি অনুযায়ী ৬৩০ জায়গায় কাজ চলছে। এই দুটি কর্মসূচী অনুযায়ী এ পর্যন্ত দু লাখ ১৪ হাজার সক্ষম লোককে কাজ দেওয়া হয়েছে। জুলাই মাসে চার লাখ ১৭ হাজার লোককে গ্র্যাচুইটাস রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে। ১১।৭।৭৫ [illegible]

ভুট্টোর বিপদ

জুলফিকার আলি ভুট্টো ছলে-বলে-কৌশলে সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বর চাপা দিয়ে পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেছেন। বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জাতীয় আওয়ামি পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি তাঁর পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। সর্বশেষে 'আজাদ কাশ্মীর'-এ তিনি তাঁর দলের মনোনীত প্রার্থী সর্দার ইব্রাহিমকে নাম-কে-ওয়াস্তে একটা নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে সেখানকার তথাকথিত 'প্রেসিডেন্ট'-এর পদে বসিয়েছেন। 'আজাদ কাশ্মীর' তাঁর দলের শাসনাধীনে আসার পর পাকিস্তানের সবগুলি অঙ্গরাজ্যই এক দলের কব্জায় এল। (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবশ্য মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট বেঁধে পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে শাসন চালাতে হচ্ছে। কিন্তু ভুট্টো মুসলিম লীগের দল ভাঙিয়ে ইতিমধ্যে তাকে বেশ দুর্বল করে তুলেছেন।)

সারা দেশে এই একাধিপত্য বিস্তার করতে ভুট্টো সাহেবকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। পাকিস্তানের সংবিধান চালু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মৌলিক অধিকারগুলি মুলতুবি রেখে বিরোধী দলগুলিকে শায়েস্তা করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগুরু দল জাতীয় আওয়ামি পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঐ দলের নেতা ওয়ালি খাঁ-কে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি তাঁকে বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে আসা হলে তিনি আদালত-কক্ষ থেকে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে গেছেন। বেরোবার আগে একটি বিবৃতিতে তিনি বলেছেন 'আমাদের হাত বাঁধা, আমাদের জিভ বাঁধা, আমাদের পা বাঁধা।' ওয়ালি খাঁ-র ৮৩ বছর বয়স্ক পিতা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফুর খানকে তাঁর নিজের গ্রাম চারসদার বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। দেশ-বিভাগের পর সীমান্ত গান্ধী বহুদিন আফগানিস্তানে ছিলেন। ভুট্টোর আমলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, এই ভরসায় তিনি পাকিস্তানে ফিরে এসেছিলেন। এখন হতাশ হয়ে তিনি আবার আফগানিস্তানে চলে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু ভুট্টোর সরকার তাঁকে সেই অনুমতি দেননি। ওয়ালি খাঁ-র বড় ছেলে ইসফানদিয়ার ওয়ালিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হায়াত মহম্মদ খাঁ শেরপাও-এর হত্যার সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে।

বালুচিস্তানে জাতীয় আওয়ামি দলের নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউল্লা খাঁ মেঙ্গলকেও কারারুদ্ধ করা হয়েছে। সেখানকার গবর্নর আকবর খাঁ বুগতিকে তাঁর নিজের গ্রামে অন্তরীণ করা হয়েছে ও তাঁর ভাই বালুচিস্তানের ভূতপূর্ব মন্ত্রী উপমদ নওয়াস বুগতিকে করাচীতে তাঁর নিজের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে। বালুচিস্তানের আরও অনেক উপজাতীয় প্রধান এখন ভুট্টোর জেলে বন্দী।

পাঞ্জাবে মার্শাল আসগর খাঁর তেহরিক-এ-ইস্তিকলাল দলের হাজার তিনেক সমর্থককে জেলে আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ।

শুধু বিরোধী দলগুলি ও তাদের নেতাদেরই নয়, বিরোধী সংবাদপত্রগুলিকেও ভুট্টো দমন করেছেন। 'অনগুকার' নামে সর্বশেষ যে ভুট্টো-বিরোধী সংবাদপত্রটি করাচী থেকে বেরিয়েছিল, সেটির প্রকাশও সম্প্রতি অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।

নিরপেক্ষ স্বাধীনচেতা সরকারি অফিসারদের বশে আনার জন্য ভুট্টো যেসব পন্থা অবলম্বন করেছেন, তার একটি নমুনা হল, সম্প্রতি একজন জেলা ও দায়রা বিচারপতি বিরোধী দলের একজন সদস্যকে জামিনে ছাড়ার আদেশ দেওয়ার পরই ঐ বিচারপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সমস্ত বিরোধিতা এভাবে নির্মূল করেও ভুট্টো কিন্তু নিরাপদ হননি। সম্প্রতি তাঁর সামনে যে নতুন বিপদ এসেছে, সেটা দেখা দিয়েছে তাঁর নিজেরই দলের ভিতর থেকে এবং তার চেয়েও বড় কথা, যে-দুটি প্রদেশ তাঁর ও তাঁর দলের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশেই তাঁকে মুশকিলে পড়তে হচ্ছে।

গত মার্চ মাসে গোলাম মুস্তাফা খর পাঞ্জাবে গবর্নর হয়ে ফিরে আসার পর সেখানে পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে সংকট দেখা দিয়েছে। এই গোলাম মুস্তাফা খর এক সময়ে ভুট্টোর খুব বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং ভুট্টোর পর তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে একটা ধারণাও চালু ছিল। কিন্তু সম্ভবত হাতের চেয়ে আম বড় হয়ে যাওয়ায় তাঁকে গত বছর মার্চ মাসে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সম্প্রতি তিনি গবর্নর হয়ে পাঞ্জাবে ফিরে আসার পর থেকেই ঐ প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হানিফ রামাইয়ের সঙ্গে পুরনো বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন। পার্টিতে খরের সমর্থকেরা দক্ষিণপন্থী এবং রামাইয়ের সমর্থকেরা বামপন্থী বলে পরিচিত। এই দুই দলের সংঘর্ষে এখন পার্টির যে সংকট দেখা দিয়েছে, তাতে পরিণামে ভুট্টোর অবস্থাই বিপন্ন হতে পারে।

পাকিস্তানের অন্য প্রদেশের তুলনায় তাঁর নিজের প্রদেশ সিন্ধুর উন্নয়নের দিকেই ভুট্টো বেশি নজর দিচ্ছেন—এমন এক অভিযোগই প্রবল ভুট্টোকে আজ বিড়ম্বনায় ফেলেছে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে পাঞ্জাবের ভোটকে অগ্রাহ্য করে ভুট্টোর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। আট ৭ কোটি ২০ লক্ষ পাকিস্তানীর মধ্যে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাঞ্জাবী এবং পাকিস্তানের অন্য তিনটি প্রদেশের মোট ভোটার-সংখ্যার তুলনায় একমাত্র পাঞ্জাবের ভোটার সংখ্যা বেশি। সেই কারণে ভুট্টোকে জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে সিন্ধুর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অস্বীকার করতে হয়েছে। পাঞ্জাবী জনমতকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি বলেছেন, 'আমি পাঞ্জাবের মানুষের জন্য আমার শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দেব। আমি তাদের পাকিস্তানের মর্মকেন্দ্র ও অগ্রযাত্রী রক্ষক বলে গণ্য করি, তারা আমাদের আবার ভোট দেবেন।'

সিন্ধুতে গোলযোগ বেধেছে জুলফিকার আলির সম্পর্কিত ভাই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মমতাজ আলি ভুট্টোর সঙ্গে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মুস্তাফা খাঁ জাটোই-এর। ১৯৭৩ সালের শেষে জাটোই যে মমতাজ আলি ভুট্টোকে সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে সরিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস মমতাজ আলি ভুলতে পারেননি। তাই সিন্ধুতে এখন পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে প্রকাশ্য ফাটল।

এদিকে স্বতন্ত্র সিন্ধু দেশের আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই আন্দোলন যে জাটোইয়ের সরকারকে কতটা বেগ দিয়েছে তার একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এক কুড়ির বেশি সিন্ধী পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্যে।

শাসক দলের মধ্যে সংকটের আর একটি খবর পাওয়া গেছে ইসলামাবাদ থেকে। সেখানে সম্প্রতি একদল লোক পদত্যাগী মন্ত্রী খুরশীদ হাসান মিরের বাড়িতে গিয়ে চড়াও হয়। মির ছিলেন শ্রম ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং শাসক দলের ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল। সম্প্রতি তিনি মন্ত্রিত্ব ও দল ছেড়ে দিয়ে জাতীয় পরিষদে নির্দলীয় সদস্য হিসাবে বসছেন।

ভুট্টো মিরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে যে, জুলফিকার আলি ভুট্টো হয়তো অবস্থাটা আরও জটিল হওয়ার আগেই নির্বাচনে নেমে পড়তে পারেন। এমনিতে তিনি ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে পারেন, কিন্তু কোনো সময়, আর বেশী দিন অপেক্ষা না করে আগামী বছরের গোড়ার দিকেই তিনি নির্বাচনের ডাক দেবেন।

১১।৭।৭৫

পর্যবেক্ষক

টমাস মান

বিজয় দেব

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ ঔপন্যাসিক টমাস মান ১৮৭৫ সালের ৬ই জুন লুবেকের প্রাচীন হ্যান্সিয়াটিক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন এক বিত্তবান প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান। প্রপিতামহ ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। পিতামহ উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে খুবই পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি নেদারল্যান্ডের কনসাল হিসেবেও কিছুকাল কাজ করেন। পিতা হাইনরিখ মান সিনেটার এবং মেয়র হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সেই সংগে উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি ছিলেন এমিল জোলার একজন সহৃদয় পাঠক। পরবর্তীকালে অবশ্য টমাস মানকে বলতে শোনা যায় 'যখন আমি নিজের বংশ এবং আমার ইতিবৃত্ত নিয়ে চিন্তা করি প্রশ্ন করি তখনই আমি স্মৃতিচারণে জড়িয়ে পড়ি। এবং সত্যি সত্যি আমি যেন তৎক্ষণাৎ আনন্দসাগরে ভাসতে থাকি। মনে করিয়ে দেয় গ্যেটের সেই বিখ্যাত ছোট্ট কবিতাকে।... প্রসঙ্গত মায়ের দিক থেকে আমি লাভ করেছি শিল্পীসুলভ সহজাত ভাবনা এবং ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান।' টমাস মানের মাতা ছিলেন খুবই আবেগপ্রবণ। সেই সংগে তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী রোমান্টিক এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী। টমাস মান কখনো ভুলতে পারেননি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাইনরিখকে। তাছাড়া একদা ছোট ছোট বোনদের নিয়ে প্রাসাদোপম বাড়ীতে টমাস মানের দিনগুলো সুখেই কাটছিলো। সেই সব স্মৃতি বিজড়িত পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে একদিন রচিত হয় ঐতিহাসিক বাডেন ব্রুক হাউস।

ছাত্রজীবনে টমাস মান পল টমাস ছদ্মনামে কবিতা নাটক প্রবন্ধ রচনা করেন। তখনই তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েন। ১৮৯৩ সালের মে মাসে স্প্রিং স্টর্ম-এ তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তখনই পিতা জোহান হঠাৎ পরলোকগমন করেন। এর ফলে তাঁদের শতবর্ষের ঐতিহ্যপূর্ণ ব্যবসা দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে। অট্টালিকা সদৃশ বাড়ীও বিক্রি হয়ে যায়। টমাস মান মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে একদিন বহু কালের স্মৃতি বিজড়িত শহর লুবেক পরিত্যাগ করেন। তারপর তিনি সবুজ শোভার স্নিগ্ধ জগৎ ম্যুনিখে এসে বাস সুরু করেন। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত টমাস মান ম্যুনিখেই ছিলেন।

১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মাণীর সর্বময় কর্তৃত্বে আসার পরই টমাস মান ছুটি কাটাবার উদ্দেশ্যে সুইৎজারল্যান্ড পাড়ি দেন। কিন্তু সেখান থেকে পুনরায় ম্যুনিখে ফিরে আসতে চাইলে আত্মীয়স্বজনরা বাধা দান করে। তখন কিছুদিন তিনি সুইৎসে বাস করতে থাকেন। এবং প্রায়ই আমেরিকা যাওয়া-আসা করতে থাকেন। পরে ১৯৩৮ সাল প্রিন্সটন এবং ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়ার আমেরিকার নাগরিক হিসেবে বসবাস করেন। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য টমাস মান ১৯২৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৯৪ সালে টমাস মানের প্রথম গল্প সংগ্রহ ডার ক্লাইন হের ফ্রিডেম্যান প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে মূলত ১৮৯০ সালের মধ্যবিত্তদের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে। তাই মানুষের মনুষ্যত্বের গভীরতায় [illegible] হয়ে ওঠে [illegible]-

হাউয়ার হবাগনার এবং নীটসের প্রভাব। মান অবশ্য এঁদের কাছে তাঁর জীবনব্যাপী অপরিসীম ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। গল্পগুলো শিল্পীর সমস্যা এবং অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিলো।

টমাস মানের বয়স যখন মাত্র ২৫ তখন তাঁর প্রথম উপন্যাস বাডেন ব্রুকস (১৯০০) প্রকাশিত হয়। মেজাজের দিক থেকে তিনি তখন রোমান্টিক। তাই এই গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে স্মৃতির আবেশ। এখানে চার পুরুষের এক জর্মন সওদাগর পরিবারের অবসরকে প্রতীকের স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্ষয় এবং মৃত্যুর চেতনা যেন উপন্যাসকে এক অনিবার্য পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। বিখ্যাত শস্য সওদাগর জোহান বাডেন ব্রুক বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের বংশের একমাত্র ব্রত হলো জীবনে সফলকাম হওয়া। তাই তার চারপাশে গড়ে উঠেছিলো সমৃদ্ধ এক জগৎ। সেইসঙ্গে তিনি মনে বিত্তের সঞ্চয় প্রবণতা এবং সন্দেহে ছিলেন অনুক্ষণ আবিষ্ট। তারপর একদিন পুত্র টমাস উত্তরাধিকারী সূত্রে বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন থেকেই সুরু হয় অবক্ষয়। টমাসের কাছে ব্যবসা হলো পারিবারিক দিক থেকে কর্তব্যমাত্র। কারণ সে তখন সাহিত্য শিল্প এবং দর্শনের ভাবনায় অনাপগামী। ভ্রাতা ক্রিশ্চিয়ান মানসিক অস্থিরতায় ব্যাধিগ্রস্ত। বোন টনির বিয়ে তখন ভেঙে গেছে। এমনি অবস্থার মধ্যে তখন বাডেন ব্রুকসের সমৃদ্ধির জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ফাটল। শৃঙ্খলা এবং বনেদী শোভনতা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। টমাস পারিবারিক দুশ্চিন্তায় পীড়িত। তারপর দেখা যায় তার মধ্যে স্নায়বিক দুর্বলতা। এবং পরিশেষে হৃদরোগের আক্রমণেই টমাসের মৃত্যু ঘটে। বাডেন ব্রুক পরিবারের ধ্বংস তখন শেষ পর্যায়ে। সংগীতের জগতে প্রতিভাধর বালক হ্যানো টাইফাস রোগের যন্ত্রণায় মৃত্যুর কোলে শায়িত। সমৃদ্ধ পরিবার ক্রমে যেন একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেলো। টমাস মান শোপেনহাউয়ারের দর্শনকে এখানে এড়িয়ে যেতে পারেননি। জীবনের অনিবার্য পরিণতি এবং সার্থকতা হলো মৃত্যুতে। যা অনন্ত সৃষ্টির সঙ্গে বিলয় হয়ে যায়। টমাস মান অন্যদিকে এই গ্রন্থের সঙ্গে এবং জর্মান সাহিত্যের সঙ্গে রীতি সচেতনভাবে হবাগনারকে সংযুক্ত করে রেখেছেন। সওদাগর পরিবারের চারপুরুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে একসময়ে যুক্ত হয়ে পড়ে শিল্পের প্রবণতা যার ফলে ব্যবসার স্থান ক্রমশ হয়ে উঠেছে নিতান্ত গৌণ। তাই টমাস মান এক প্রাচীন সওদাগর পরিবারের নৈতিক উৎকর্ষের জন্যে রচনা করেন এক আবেগপ্রবণ শোক সংগীত।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় এসময়ের বিখ্যাত ধ্রুপদী উপন্যাস ম্যাজিক মাউন্টেন। ধারাবাহিকতা এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় না। প্রথমেই দেখা যায় উত্তর জর্মণীর এক তরুণ ইঞ্জিনীয়ার হ্যান্স ক্যাণ্টরপকে। সে ডাভোসের সন্নিকটবর্তী সুইৎজারল্যাণ্ডের এক স্যানাটোরিয়ামে নিজের আত্মীয় জোয়াচিম জিমেসেনকে দেখার জন্যে এসে হাজির হয়েছে। সে এখানে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে যাবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু এখানে সে ক্রমশ ক্ষয়ের দৃশ্যে একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যেন মহাকালের অনুভূতিতে সে তীব্রভাবে আসক্ত। যার ফলে অসহায়ভাবে পর্বত শিখরদেশে সে অনুভব করলো যেন এক ঐন্দ্রজালিক জীবন তাকে আঁকড়ে ধরেছে। ধীরে ধীরে সে আবিষ্কার করে এক মারাত্মক রোগের উপসর্গকে। তারপর একদিন দেখতে পেল যে এরই মধ্যে দীর্ঘ সাতটি বছর যেন কি করে কেটে গেছে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় সুরু। কাহিনীতে ক্যাণ্টরপের শিক্ষা এবং আত্মবিকাশের পর্যায় যেন পর পর ঘটে গেছে। কিন্তু বুদ্ধিগত দীপ্তিতে সে যেন সমৃদ্ধ নয়। বরং সে অতি সাধারণ মানুষ। কাহিনীর উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে ছিলেন ইতালীয় উদারপন্থী এবং মানবতাবাদী সেটেমব্রিনি মধ্যযুগীয় নিও থোমিস্ট জেসুইট নাফটা এবং ক্ষমতাশালী বাস্তববাদী মাইনহির পীপারকর্ন। যদিও সেখানে জনৈকা খেয়ালী আকর্ষণীয় রুশ মহিলা ক্লাভদিয়া চোশোকেও দেখা যায়। তিনি অবশ্য এই ঐন্দ্রজালিক পর্বত শিখরে অবস্থানকালে হ্যান্সের প্রেম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে আবার দেখা যায় নায়ক যুদ্ধরত সৈনিকদের [illegible] এক [illegible] প্রান্তরে [illegible] করে রেখেছে।

ম্যাজিক মাউন্টেন কাহিনীর মধ্যে সংশয়ের যেন অধিকতরভাবে জটিলতাকেই প্রকাশ করেছে। তাই স্বাভাবিকভাবে কাহিনীর প্রতি মোহও বৃদ্ধি পেয়েছে। উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটেমব্রিনি ও নাফটা। সেটেমব্রিনি যেমন মানবতা এবং গণতন্ত্রের অধিবক্তা তেমনি অন্যদিকে প্রতিক্রিয়ায় জ্ঞান ও সংস্কার প্রসারে অন্তরায় স্বরূপ বলে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে নাফটা। ছিন্নপ্রায় পোশাকেই সবসময় সেটেমব্রিনিকে দেখা যায়। কখনো সে পোশাক বদল করে না। বরং আত্মপক্ষ সমর্থনে তাতে সর্বশ সেটেমব্রিনিকে চ্যাপলিনের মতোই মনে হয়। পাঠককে তাই অনুক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়। বস্তুত টমাস মানের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে এই চরিত্র উল্লেখযোগ্যভাবে অতিমাত্রায় সহানুভূতিশীল। যদিও প্রথম থেকেই সে প্রায় উপহাসাস্পদ হিসেবে চিহ্নিত। ব্যাপক পড়াশোনার ফলে দেখা যায় সে মানব প্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রয়োগ করতে সদা সতর্ক। সংস্কার মুক্তি যুক্তিবাদ এবং মানব সংক্রান্ত বিদ্যার প্রতি সেটেমব্রিনির অগাধ বিশ্বাস। যাকে বলা হয় সভ্যতা। তার এই ধরণের বিশ্বাসও অবশ্য খাঁটি নয়। সেখানে দেখা যায় মানুষের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মধ্যে বিরাট ফাটল ধরেছে। সেই সঙ্গে শক্তি এবং ন্যায় অত্যাচার এবং স্বাধীনতা কুসংস্কার এবং জ্ঞানের মধ্যেও সেই ফাটল প্রসারিত হয়ে আছে। তার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হ্যান্স ক্যাষ্টরপ অবশ্য সেটেমব্রিনির মধ্যে যে যুক্তির প্রবণতা রয়েছে তার প্রতি নিজের মনোযোগ প্রয়োগ করতে পারে না।

হ্যান্স কাষ্টরপের চরম অভিজ্ঞতার আয়তনে দেখা যায় সে যেন যুক্তি এবং ঐশ্বরিক করুণার স্পর্শলাভ করেছে। এবং এই বোধের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। জোসেফ গ্রন্থাবলীর শেষ উপন্যাস জোসেফ দি প্রোভাইডার-এ পাপ এবং মৃত্যুর গহ্বর থেকে মুখ্য চরিত্রের উত্থান ঘটেছে। জীবনের সঙ্গে যুক্ত গ্রীগরের অংশটুকু যেন দি হোলি সিনার-এর পরম মুহূর্তের ঐশ্বরিক করুণাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ম্যাজিক মাউন্টেনেও যেন ক্যাণ্টরপের জীবনের ওপর পাপ এবং মৃত্যুকে কেন্দ্রীভূত করে রাখা হয়েছে। প্রথম থেকেই ক্যাণ্টরপকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত বলে মনেই হয় না। সেত্তেমব্রিনি তার সম্বন্ধে বর্ণনা করে একমাত্র প্রতিভা ছাড়া কোনমতেই সে সর্বোচ্চ সীমার জন্য যোগ্য নয়। এখানে সর্বোচ্চ সীমা বলতে জীবন এবং মৃত্যুকেই বোঝায়। এই ধরণের জীবন এবং মৃত্যুর প্রতি উপলব্ধি যেন টমাস মানের অন্যান্য উপন্যাসে ছড়িয়ে রয়েছে। ক্যাণ্টরপের জীবনের প্রথম পর্যায়ে তার সঙ্গে মৃত্যুর পরিচয় ঘটেছিলো এবং তা এখন স্বর্গস্নান উদ্ভাসিত। একদা সেই অতীতদিনে ক্যাণ্টরপেরও জীবনের লক্ষ্য ছিলো নিষিদ্ধ জগৎ এবং রহস্যময় অজানাকে উদঘাটিত করা। এবং তার জন্য প্রয়োজন ছিল একান্তভাবে দুঃসাহসিক অভিযান। বার্গফ পেন্সীর একঘেয়ে বন্ধনহীন হয়ে সে জীবন মৃত্যু এবং নৈতিকতার দিকে বিরাট এক প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছে। তখন অতি সহজেই সেটেমব্রিনি নাফটা পেপারকর্ন এবং ক্লাভদিয়ার কাছে নিজস্ব পরিভাষায় তা ধরা পড়েছে ক্যাণ্টরপ অথচ অবস্থায় তাদের কিছুই গ্রহণ করবে না বরং সে প্রত্যেকের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাই একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় অনুসন্ধানে রত থেকে সেই মন নিয়ে অনুক্ষণ পথ চলছে। এখানে অবশ্য ক্যাণ্টরপের নৈতিক দুঃসাহসিকতা মাদাম চচোটের চেয়ে ভিন্ন। বিশেষ করে অনুসন্ধান পর্যায়ে। ক্যাণ্টরপ আলস্যবশতঃ ডেভোসের স্যানোটরিয়ামে সময় কাটাতে চায় না এমন কি তার একান্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার জন্যে ও মাদাম চচাটের মতো থাকতে রাজী নয়। রোগ এবং মৃত্যুর কাছে তার আত্মসমর্পণের অর্থ হলো পাপের প্রান্তে জীবনের নৈতিকতার অবস্থান। এখানে ক্যাণ্টরপের পরিসমাপ্তিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যা জীবনের অর্থের তীব্র অনুসন্ধান সদৃশ।

প্রথমে জীবনের অর্থ নিরূপণে যে সংকট ক্যাস্টরপের জগতে এসে দেখা দেয় তখন সে বই-এর জগতে একান্তভাবে আবিষ্ট। তার সম্মুখে তখন বিরাজ করছে দৈহিক গঠনতন্ত্র, শারীরবিদ্যা, জীববিদ্যা, জার্মান, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষা। আবার অন্যদিকে 'জীবন কি ছিলো' এই অনুসন্ধান পর্যায়ে সে জানতে পেরেছে তার ব্যাপক গবেষণার কথা, যা কেউ জানে না। সে জীবনকে দেখতে পায় বস্তুর অসুস্থতা রূপে। যার অনিবার্য কারণ হিসেবে দেখা যায় 'অভিলাষ এবং মৃত্যুর প্রতি অমঙ্গলের প্রথম পদক্ষেপ'। মৃত্যুর ধারণা ক্যাস্টরপের কাছে অপরিবর্তনীয়। সে অবিরাম মৃত্যু-পথযাত্রী এবং জীবনাসক্ত মানুষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে। ক্যাস্টরপের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে স্বপ্নের ঘোর নেমে আসে। ধরা পড়ে অনুসন্ধানের দ্বিতীয় সংকট। সেখানে মানবতাবাদ অনুভূতিপ্রবণতা এবং কমেডির মিশ্রণ ঘটে। বস্তুতঃ সে তখন বিপদের সম্মুখীন।

পরিশেষে মানবিকভাবে ক্যাস্টরপ তার জনগণের জন্যে নিজের জীবন এবং সেবাকে উৎসর্গ করে। টমাস মান তখন যেন এই ধ্রুপদী রচনায় এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি স্থাপন করেন। এবং তার আলোয় প্রত্যক্ষ করেন সমগ্র য়ুরোপের নিয়তিকে ও চরম সিদ্ধান্তকে। প্রসঙ্গত গ্যয়টের 'হিক্সহেম থিয়েটার'-এর পর এ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তাছাড়া এই উপন্যাসে ছড়িয়ে রয়েছে বিশ শতকের সব ধ্যান-ধারণা। মনোবিশ্লেষণ থেকে আপেক্ষিকবাদ। প্রাচ্যের গোঁড়ামী থেকে প্রতীচ্যের উদারতা। বস্তুত 'ম্যাজিক মাউন্টেন' আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যে এক মহৎ কীর্তিস্বরূপ।

'জোসেফ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স' টমাস মানের বিস্ময়কর গ্রন্থের অন্যতম। এই রচনায় ব্যবহৃত গদ্য মহাকাব্য সদৃশ। বাইবেলে বর্ণিত জোসেফের কাহিনীর আধুনিক ভাষ্য মাত্র। জেকবের পুত্র জোসেফকে তার ঈর্ষাতুর ভ্রাতৃগণ মিশরে বিক্রয় করে চলে আসে। ঘটনাচক্রে সে একদিন মিশরের খাদ্যবিভাগের প্রশাসনে রাজকীয় সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' কুড়ি পৃষ্ঠায় যে কাহিনী বিবৃত হয়ে আছে টমাস মান এখানে তার জন্যে ব্যবহার করেছেন দু হাজার পৃষ্ঠা। এই উপন্যাসে যুক্ত হয়ে রয়েছে 'জোসেফ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স' ইয়ং জোসেফ, জোসেফ ইন ইজিপ্ট এবং জোসেফ দি প্রোভাইডার। মিউনিখে অবস্থানকালে তিনি প্রথম এই রচনার ভাবনায় আবিষ্ট হন। তখন ১৯২৫ সাল। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেল। ১৯৪৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় যখন টমাস মান বাস করছেন, তখন এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। প্রসঙ্গত এই উপন্যাসে আত্মজীবনীর উপাদান বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ডে। জোসেফের মিশরে নির্বাসন যেন লেখকের সুইৎজারল্যান্ড থেকে আমেরিকায় আগমনের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করেছে। জোসেফ মিশরের প্রশাসনে এক বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে। যার ফলে কৃষির উন্নতিসাধনে সরকার সচেতন হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে রেশনিং, কর প্রস্তাব, ব্যবসা এবং বিত্তের সমতা রক্ষা যেন নতুন আলোকে 'জোসেফ ইন ইজিপ্ট'কে উদ্ভাসিত করে রাখে। এখানে টমাস মানের সহজাত শিল্প-সুষমাও যেন সঞ্চারিত হয়েছে। আবেগপ্রবণ বুদ্ধিবাদী জোসেফের সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছে দীর্ঘকালের শিল্পীসুলভ মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্যের। এবং এই সব লক্ষণের জন্যে রচনা মহাকাব্য সাদৃশ হয়ে উঠেছে। অতি-কথার উৎস এবং বিভিন্ন চরিত্রের সার্থক রূপায়ণও প্রসঙ্গত লক্ষণীয়। তাছাড়া এই রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'মনোথীস্টিক ধর্ম' 'নৈতিক আইন' এবং অহং বোধ। কনান থেকে মিশরের দীর্ঘ পথ যেন প্রাগৈতিহাসিক ও আনুশাসনিক দিক থেকে সরলতা বর্জিত ব্যক্তিত্বের পথ; যা' মানবতার প্রতীকীতে রচনাকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত ডকটর ফস্টাস আত্মজীবনীর আঙ্গিকে রচিত। এখানে প্রাচীন জার্মান লোককথাকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা হয়েছে। ডঃ ফস্টাস ডেভিলের সঙ্গে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তাহলো জ্ঞান এবং পার্থিব সুখ উপভোগ করার বিনিময়ে জীবনের পরম সম্পদ ডেভিলের হাতে তুলে দেওয়া। ১৯৪৩ সালে এই উপন্যাস রচনা সুরু হয়। টমাস মান তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবনকাহিনীকে সতর্কভাবে এখানে লিপি-বদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত সুরশিল্পী আদ্রিয়ান লেভারকুয়েহন। ১৯৪০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সমসাময়িক দৃশ্যের ওপর একান্ত নিষ্ঠাবান অধ্যাপকের মন্তব্য যেন গ্রন্থে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে যুক্ত হয়েছে দিনলিপি, চিঠিপত্র এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা। সৃজনশীল প্রতিভা উৎসারিত হয় লেভারকুয়েহনের ট্র্যাজিক এবং নিঃসঙ্গ জীবন থেকে। এখানে সেই প্রতিভা অনুপ্রেরণার পরিবর্তে মানবিক ভালবাসাকে অস্বীকার করে। তরুণ ছাত্র হিসেবে সুর-শিল্পী সিফিলিস রোগে আক্রান্ত। জীবনের শেষ পর্যায়ে সে তখন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভগ্নচিত্ত নিয়ে দিন অতিবাহিত করে। লেভারকুয়েহনের কাছে তার যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা যেন উন্মত্ত বলে মনে হলো। মনে হলো এ যেন স্বেচ্ছা আরোপিত ঘটনা মাত্র। এখানে শয়তানের কার্যাবলী অপরিহার্য ঘটনাগুলোকেই সমর্থন জানায়। ধ্রুপদী ভাষার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সেরেনাস জিয়েটব্লুম যখন তার বন্ধুর জীবনী সমাপ্ত করেন তখন অক্ষশক্তি ব্যাভেরিয়ার দিকে এগোতে থাকে। বস্তুত লেভারকুয়েহনের পরিসমাপ্তি যেন সমস্থানিকভাবে জার্মেনীর সর্বনাশকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

টমাস মানের এই উপন্যাস একদিকে নিয়তি এবং অন্যদিকে জার্মেনির আকাঙ্ক্ষার প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। এর ফলে প্রত্যক্ষ করা যায় জীবনব্যাপী প্রবাহিত এক বিতর্ককে। সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে শিল্পী বনাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। লোক-কথা ফাউস্টের কাহিনীর আধুনিক ভাষ্যকেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে লোক-কথা এবং গ্যয়টের নায়কের সঙ্গে এই উপন্যাসের নায়কের এক অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরিশেষে সঙ্গীতের চিরায়ত আত্মা, রোমান্টিসিজমের ব্যাধি এবং নীটশের অনুনাদে যেন লেভারকুয়েহনের জীবনের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

'মারিও অ্যান্ড দি ম্যাজিসিয়ান' ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। টমাস মান এই গ্রন্থে ইতালীর সমুদ্র তীরবর্তী আবাসে এক পঙ্গু যাদুকর এবং ট্র্যাজিক ঘটনাবলীর বিবরণ তুলে ধরেন। যাদুকর কোন এক তরুণ কৃষককে সম্মোহিত করে রাখে, তখন যেন কাহিনী একটি সাদৃশ্য রূপকে স্থির থাকে। এবং সেই রূপকে যে প্রতিমা ভেসে ওঠে তাহলো তৎকালীন ইতালীর জনসাধারণের ওপর ফ্যাসিজমের প্রভাব বিস্তার।

১৯১২ সালে প্রকাশিত এ শতকের উল্লেখযোগ্য গল্প 'ডেথ ইন ভেনিস' শিল্পীর ট্র্যাজিক সংকটে আচ্ছন্ন। মুখ্য চরিত্র গুস্তাফ অ্যাশেনবাক একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর রচনার শৃঙ্খলা তাঁর স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং সৃজনীশক্তিচ্যুত শিল্পীকে অনুক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ভেনিসে তিনি এলেন ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে। তাই বিশ্রাম প্রয়াসে মগ্ন। তারপর দেখা যায় মহানগরীতে যেমনি রোগ অনতি-বিলম্বে বিস্তারলাভ করে তেমনি অ্যাশেনবাক সমকামিতার আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি রূপবান পোলিশ কিশোর তাদজিওর জন্যে নিজের প্রতিষ্ঠা, এমনকি পারিবারিক জীবনকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না। ভেনিস দর্শনে এসে তার সঙ্গে তাদজিওর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তখন তার রূপে আত্মহারা। ভেনিস মূলত সৌন্দর্য এবং বিশুদ্ধ শিল্পের প্রতীক বলে চিহ্নিত। হঠাৎ নগরী প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অ্যাশেনবাক সেই পীড়িত নগরী পরিত্যাগ করতে তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তিনি মৃত্যুর ভাবনায় আবিষ্ট, বরং এখানে আদর্শকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার চেয়ে জ্বরে পীড়িত হয়ে মৃত্যু যেন তাঁর কাছে একমাত্র কামনা, একমাত্র ভাবনা। মৃত্যু এবং এরোস-এর প্রতীক যেন রচনায় অনায়াসে পরস্পর বিজড়িত। টমাস মান প্রুস্ত এবং আঁদ্রে জিদের মত এক চিরায়ত জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে 'ডেথ ইন ভেনিস'কে ধ্রুপদী সাহিত্যে উন্নীত করে রেখেছেন।

১৯৩৯ সালে রচিত 'লট ইন হবাইমার'-এ লট ক্যান্টনার যেন গ্যয়টের দি সরোজ অব ইয়ং হেন্বর্টারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই রচনায় জোসেফ গ্রন্থাবলীর মতো পরিবেশ যেন তাঁর সমরকালের পক্ষে বহুদূরবর্তী।

সেখানে অবশ্য টমাস মন মানবসভ্যতার অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য উৎসের যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণে অবিরাম অনুসন্ধানে রত। 'লট ইন হ্বাইমার' আত্মজীবনীমূলক রচনা। এখানে এক প্রতিদানহীন প্রেম এবং রোমাণ্টিক হতাশার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লট বৃদ্ধ বয়সে হ্বাইমার পরিদর্শনে এসে একদা প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। সেই প্রেমিক এখন বিখ্যাত। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গায়টে এখানে এ সময়ে যেন বহু দূরে অবস্থান করতেই চান। কারণ অতীতের জগতে পুনঃ প্রবেশে তিনি এক তীব্র অনীহাবোধ করছেন। তাছাড়া এখানে লট যে শিক্ষা লাভ করেন তাহলো মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। যা কালের দাবীকে অনুক্ষণ স্বীকৃতি দানে তৎপর হয়ে ওঠে।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে টমাস মানের জীবন ও রচনাবলীকে সব সময় এক নৈরাশ্যময় পরিবেশ আচ্ছন্ন করে রাখতো। তখন তিনি প্রায়শঃই হ্যামলেট থেকে উদ্ধৃতি প্রয়োগ করতেন : 'তুমি এসো এক সন্দেহজনক রূপকথা নিয়ে'। পাশাপাশি গ্যয়টেকেও তুলে ধরতেন : 'যেমন করেই হোক এই ছিলো সেই পথ। যে কোন লোকই তা অনুকরণ করতে পারে। তবে সে যেন ঘাড় ভেঙে না মরে যায়।

টমাস মান কালের গতিস্রোত এবং সময়ের আবর্তন সম্বন্ধে সদাসতর্ক ছিলেন বলে তাঁর বিস্ময়কর রচনাবলী তাঁর প্রতিভাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ কার প্রতিভা বেশী ?

অবিস্মরণীয় দুই মহাপুরুষ মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জিজ্ঞাসাটা হোলো, উভয়ের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কার প্রতিভা ও জ্ঞান বেশী? কেউ বলেন—রবীন্দ্রনাথ, কেউ বলেন—মাইকেল; আর একদল এই ছোট্ট অথচ গম্ভীর প্রশ্নটার কোনো সরাসরি জবাব দিতে চান না বা দেন না। দুজনের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি রেখে, ভাবাবেগে প্রভাবিত না হয়ে এবং প্রশ্নটি এড়িয়ে না গিয়ে, এ সম্পর্কে যদি কোনো ব্যক্তি তথ্যনিষ্ঠ-যুক্তিপূর্ণ এবং সর্বোপরি নিরপেক্ষ বক্তব্য রাখেন, তাহলে নিরতিশয় খুশী হবো। তবে উভয়ের জীবিতকালের সময় পরিবেশ সামাজিক অর্থনৈতিক (ব্যক্তিগত ও) অবস্থা, বেঁচে থাকার বয়স, লিখতে পারার সময় চরিত্র ও ভাবমূর্তি ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদি ইত্যাদির কথা—যা প্রতিভা প্রকাশে কম-বেশী জড়িত—এসব কথাও মনে রেখে উত্তর দিতে অনুরোধ করি।

প্রবীর ঘোষ,
সম্পাদক 'বণালী', বসিরহাট।

পণপ্রথা প্রসঙ্গে

অমৃতয় (১৩ জুন, ১৯৭৫) প্রকাশিত পণপ্রথা প্রসঙ্গে শিবপুর নিবাসী শ্রীপ্রবীর-গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। জাতির এক কলঙ্কিত সামাজিক প্রথার অবসানকল্পে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে সরকারী এবং বেসরকারীভাবে প্রচেষ্টা সত্যই শুভসূচক। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য পণপ্রথা মানবিক ঘৃণায় পর্যবসিত না হলে কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হবে না।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে যে পাত্রপাত্রীর স্বনির্বাচিত বিবাহ শহর ও শহরতলীতে শুরু হয়েছিল, তা অনেক ক্ষেত্রেই উদারমানবিক আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আশ্চর্য! আজ মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহ মাত্রেই পণের প্রচণ্ড ধাককায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা শঙ্কিত। অবশ্য একথা ঠিকই যতদিন না যুবসমাজে নানেতম অর্থ-নৈতিক স্থায়িত্ব দেখা দিচ্ছে ততদিন বাজারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মত 'বর' বা 'হবু স্বামী'দের দর হু-হু করে বেড়ে যাবে। আমরা এমন একটা সর্বগ্রাসী অভাবী জীবনযাপন করি যেখানে শুধু পণপ্রথা কেন, কোন 'দাঁও'এর লোভই ত্যাগ করতে পারি না। মনীষীদের চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টাকে বাদ দিলেও একথা অনস্বীকার্য যে এই কুপ্রথা অবসানের জন্য আজ

আমাদের মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে সর্বাগ্রে।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে কার্ল মার্কস থেকে গান্ধী পর্যন্ত সকল থিওরি ও প্রাকটিস-এর আলোচনায় এই পশ্চিমবাংলার শহর-শহরতলীর যুবক-যুবতীরা শহীদ মিনারে বা খেলার মাঠে বহু বিকালকে রাত করে দিয়েছেন; অথচ নিজেদের বিবাহ ব্যাপারে কত বেশী 'দাঁও' মারা যায় তার চেষ্টায় মশগুল।

কলেজ, ইউনিভার্সিটির আধুনিকারা স্ব স্ব বিয়ের ক্ষেত্রে যদি একটা সুস্থ উদাহরণ খাড়া করতে পারেন তাহলে আইনের চেয়েও তা অনেক ফলপ্রসূ হবে। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে। মেয়ের বা বোনের বিয়ের সময় আমি হঠাৎ প্রগতিশীল বা পণপ্রথা বিরোধী হলেই চলবে না, একটা মানবিক প্রিন্সিপল হিসাবে সমাজের নর ও নারীর উভয়ের এটাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা এই প্রথা আরও সর্বগ্রাসী হবে ও এ বিষয়ে আলোচনা কাগুজে আড্ডায় পরিণত হবে।

ভাস্কর ভট্টাচার্য,
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

বিভূতিভূষণ

দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি বিভূতিভূষণের সাহিত্য প্রতিভা বা জীবন-দর্শনমূলক যে কোন আলোচনাই শেষ পর্যন্ত প্রায় অনিবার্যভাবে 'পথের পাঁচালী' কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অবশ্য 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ঐ মন্থর-সঞ্চারী চিত্রধর্মী তার প্রধান উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করে তখনই রসিকজন প্রথম দর্শনেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে-ছিলেন। সে আকর্ষণ এখনও যথেষ্ট নিবিড় ও নস্টালজিয়া-মিশ্রিত। তবু বিশ্লেষণ-পন্থী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে, প্রকৃতি বর্ণনার অনন্যতায় কি 'আরণ্যক' 'পথের পাঁচালী'র থেকেও আর তীব্র আবেদনময় হয়নি? তেমনি, জীবনদৃষ্টির গভীরতায় ইছামতী কিশোর মনস্তত্ত্বের জটিলতা বিন্যাসে দৃষ্টি প্রদীপ যেন আরও সূক্ষ্ম, আরও পরিণত। অথচ এখনও কেন বিভূতি-ভূষণ বলতে আমরা শুধু 'পথের পাঁচালী'র লেখককেই খুঁজি?

আরও এক কথা। বিশিষ্ট ইংরাজ কবি ও শিল্পসমালোচক হারবারট রীডের জীবন-ধ্যান ও রস-দৃষ্টির সঙ্গে আস্বাদন পন্থী সহৃজিয়া বিভূতিভূষণের কোথায় যেন খুব মিল আছে। উভয়েই স্বপ্ন-বিধুর শৈশব-স্মৃতির আবর্তে প্রায় আজীবন আবর্তিত। উভয়েরই সাহিত্য চর্চার মৌল প্রেরণা Sensitive childhood! দুজনেই যেন পিটার প্যানের মত চিরকিশোর অথচ দার্শনিক!

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ,
২৪ পরগণা।

যতীন দাস ভারতের জাতীয় আন্দোলন

অমৃতের গত ৬ জুন (১৯৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যতীন-দাস ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম।

সুভাষবাবু এই ক্ষুদ্রপরিসরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং পুরানো দলিলপত্র ঘেঁটে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যতীনদাস সম্পর্কে যে অজানা তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এজন্য তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। সেই সঙ্গে এইরূপ একটি সুন্দর তথ্যবহুল লেখা প্রকাশ করার জন্য অমৃতের পরিচালক-মণ্ডলীকেও আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আপনারা যদি আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক অমৃতের মাধ্যমে এই ধরনের লেখকদের আরও উৎসাহিত করেন তবে হয়ত দেশের বর্তমানের বিভ্রান্ত যুব সমাজ সত্য পথের সন্ধান পাবে।

সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়,
কলিকাতা—৫৬।

খেলাধুলো প্রসঙ্গে

বর্তমানকালে বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তায় অমৃতের স্থান সর্বোচ্চে। কিন্তু খেলাধুলো বিভাগে লেখাগুলির জন্যই আরো অমৃতকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। অজয় বসুর মাঠ থেকে বলছি, অময়ের খেলার জগতে মেয়ে, বিপুলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাঠের নায়ক ও প্রশান্ত দাঁর দেশবিদেশের খেলা পর্যায়ে লেখাগুলি সত্যি সত্যিই তুলনাহীন। আমরা বিশেষত আমি শুধু এই লেখা কটির জন্যই নিয়মিত অমৃতের পাঠক। আমরা নিয়মিত এই বিভাগগুলি অমৃতে দেখতে চাই। কোনমতেই এগুলিকে বাদ দেওয়া চলবে না।

অমল ত্রিবেদী,
সম্পাদক : খেলাধুলো, আদ্রা, পুরুলিয়া।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবারজ দ্য পিরামিড নাইট ক্লাবে লিলি কোহেন এসেছিল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। এই ভদ্রলোকের নাম ছিল এলিয়াস এনড্রুজ। এলিয়াস এন্ড্রুজ ছিলেন এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর সেক্রেটারী। অতি ধুরন্ধর লোক। পরবর্তী কালে আমি এলিয়াস এন্ড্রুজ আনতানিও পুলি ফারুককে য়ুরোপ থেকে যুদ্ধের জন্যে আর্মস কিনতে সাহায্য করেছিলুম। শুধু তাই নয়, আমার এবং এলিয়াস এন্ড্রুজের পরামর্শে ফারুক জুয়ো খেলতে শুরু করলেন। আর এই জুয়ো খেলা তাস এবং শেয়ার মার্কেট এবং দুটি খেলাতে সম্রাট প্রচুর টাকা হারতে লাগলেন। কিন্তু সম্রাটের জুয়ো খেলায় হার মানে আমার এবং এলিয়াস এন্ড্রুজের ভাগ্য পরিবর্তন। কি করে সেই ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছিল এবার সেইটে বলবো।

এই ঘটনার সময় আমি একবারও জানতে পারিনি যে, এলিয়াস এন্ড্রুজ ছিলেন সি আই এ-র কাট-আউট এবং সি আই এ-র মধ্য প্রাচ্যের বড়কর্তা কেরমিট রুজভেল্টের ডান হাত। আর লিলি কোহেন ছিলেন ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা ইসার হেরেলের অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আমি পরে জানতে পেরেছিলুম যে ইসার হেরেল সম্রাট ফারুককে বশ করবার জন্যে লিলি কোহেনকে কায়রোতে পাঠিয়েছিল। এলিয়াস এন্ড্রুজ এবং লিলি কোহেনের প্রথম কাজ হোল আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। কারণ তাদের কাছে [illegible] জীবনকাহি[illegible] জানা ছিল।

সেদিন রাত্রের কথা আমার আজো মনে আছে। আমি গেস্টদের খাবার ও ড্রিঙ্কের তদ্বির তদারক করছিলুম। এমনি সময়ে লিলি কোহেনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলিয়াস এন্ড্রুজ ঘরে ঢুকলেন এবং ঠিক ফ্লোরের সামনেই একটা ছোট টেবিলে বসলেন।

আমি এলিয়াসকে দেখে বুঝতে পেরে-ছিলুম যে লোকটা বিদেশী। কিন্তু তার বান্ধবীটিকে?

লিলি কোহেনের রূপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মেয়েটিকে আরো ভালো করে জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হোল। মেয়েটি কে? আরব না য়ুরোপীয়? না চেহারা দেখলে বুঝবার উপায় নেই।

আমি ওদের টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় বললুম: সিলভু প্লে ম'সিও...

আমার ফরাসী উচ্চারণ নিখুঁত ছিল। এলিয়াস এন্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু আমার কথার জবাব দিলেন লিলি কোহেন বিশুদ্ধ আরবী ভাষায়। শুনলেই মনে হয় মেয়েটি সিরিয়ার।

মরহবা হাবিবী...কীফক্ হাল...ডার্লিং ...তুমি কেমন আছ?

লিলি কোহেনের মুখে আরবী শুনে আমি প্রথমে হকচকিয়ে গেলুম।

তাহলে আমার অনুমান ও আন্দাজ ভুল। মেয়েটি আরব।

এবার এলিয়াস এন্ড্রুজ জবাব দিলেন ফরাসী ভাষায়। শ্যামপাইন সিলভু প্লে। এক বোতল পেরিয়ার জুয়ে......

ভদ্রলোকের উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারলুম লোকটি ইংরেজ। তবে ভাঙা ভাঙা ফরাসী ভাষা বলতে পারেন। হয়তো ভদ্রলোক আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন।
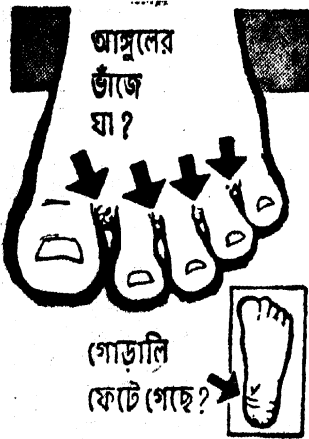
আমার নাম এলিয়াস এন্ড্রুজ বিজনেস-ম্যান। শেয়ার মার্কেট এক্সপোর্ট ইমপোর্ট। আর আমার বান্ধবী নাদিয়া সুলতান। সিরিয়ান বেরুটের একজন খ্যাতনামা বেলী ড্যানসার।

নাদিয়া সুলতান।

কেন জানিনে আমার মনে একটা আপ-শোস হোল। কী মারাত্মক ভুল করেছিলুম। এই বিখ্যাত বেলী ড্যানসারকে ভেবেছিলুম যে সে য়ুরোপীয়! অনেক পরে আমি জানতে পেরেছিলুম যে লিলি কোহেন নাদিয়া সুলতান নাম ভাঁড়িয়ে কায়রো শহরে ঢুকেছিল। তাই আমরা সেদিন লিলি কোহেনের আসল পরিচয় জানতে পারিনি।

নাদিয়া সুলতান, ইয়েস প্লিজ ম্যাম। আমি আপনার নাম শুনেছি।

আমি ইচ্ছে করে মিথ্যে কথাটা বললুম। নাদিয়া সুলতানের নাম আমি কস্মিন-কালেও শুনিনি। তবু চেনবার ভান করলুম। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে আমি একটা ভুল করছি।

শ্যামপাইন এলো।

এলিয়াস এন্ড্রুজ বলল: খাবে এক গ্লাস?

আমি মুচকি হেসে বললুম: না স্যার, আমি এখন কাজ করছি।

এই বলে আমি অন্যত্র চলে যাবার ভান করলুম।

কিন্তু নাদিয়া সুলতান আমায় যাবার সুযোগ দিলে তো?

: বসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি বসলুম না। বললুম: সরি ম্যাম...আমার কাজ আছে।

নাদিয়া সুলতানও ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন আমি বেলী ড্যানসার। বেরুটে মনসুর নাইট ক্লাবে কাজ করতুম। ভাবছি এবার থেকে কায়রোর কোন নাইট ক্লাবে কাজ করবো। আমাকে তুমি সাহায্য করবে?

কথাটা বলে নাদিয়া সুলতান আমার মুখের দিকে তাকালেন। ভারী মিষ্টি চোখ দুটো ও'র। ঐ চোখ দেখলে দেহে এবং মনে উত্তেজনা আসে।

হায় ছলনাময়ী নারী! তুমি আমাকে বশ করেছ।

জানিনে কেন আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে, নাদিয়া সুলতানকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। শুধু তাই নয়, আমি ঠিক করলুম যে এক ঢিলে দুই পাখী মারবো। একবার যদি ফারুক নাদিয়া সুলতানকে দেখতে পান তবে এই মেয়ের পেছনে উনি লাগবেন।

আমি আরো জানতুম যে সম্প্রতি ফারুকের সঙ্গে আনি বারিয়ারের মন কষা-কষি হয়ে গেছে। ফারুক জীবন উপভোগ করবার জন্যে নতুন মেয়ে খুঁজছেন।

আর নাদিয়া সুলতান হোল এই নতুন মেয়ে।

আমি ভাবতে শুরু করলুম, নাদিয়া সুলতানের কী হবে? এন্ড্রুজ কী তুমি বান্ধবীকে ত্যাগ করতে রাজী হবেন? হয়তো এলিয়াস এন্ড্রুজ আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন: কী ভাবছো পাশা?

পাশা!

আমাকে যে এই নাইট ক্লাবের সবাই আদর করে পাশা বলে ডাকে এ কথা এলিয়াস এন্ড্রুজ জানতে পারলেন কী করে? এই কথা নিয়ে যখন সাত পাঁচ চিন্তা করছি তখন এলিয়াস এন্ড্রুজ হেসে বললেন: পাশা, তোমাকে এই কায়রোর নাইট ক্লাব মহল্লার সবাই জানে। তুমি হলে 'গিগলো'।

: গিগলো?

আমি যেন এলিয়াস এন্ড্রুজের কথা-গুলো বুঝতে পারিনে।

হ্যাঁ সবাই বলল যে পাশা মেয়েদের পয়সায় খায়। আর যারা মেয়েদের পয়সায় খায় আমরা তাদের বলি 'গিগলো'।

আমি ঢোক গিললুম।

কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। হঠাৎ আবার শুনতে পেলুম এলিয়াস এন্ড্রুজ বলছে: শোন পাশা, তোমাকে আমাদের দরকার।

তাঁর কথা শুনে আমি খানিকটা হক-চকিয়ে গিয়েছিলুম।

: বলুন আমাকে কী করতে হবে? আমি বেশ একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: তুমি ফারুকের মোসাহেব...এলিয়াস কথাটা বলে বেশ খানিকটা হাসলো।

: মোসাহেব নই আমি হলুম ওর ফ্রেন্ড। বন্ধু...

: লায়ার। এবার নাদিয়া সুলতান যেন জোর গলায় বলে।

তাঁর মন্তব্য শুনে আমার চোখ মুখ লজ্জায় রক্তিম হোল।

আমি মিথ্যেবাদী? আমার মুখের ওপর এমন কথা বলতে কেউ সাহস করেনি। মেয়েটির বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

: শোন পাশা, আমার একটা উপকার করতে হবে। নাদিয়া সুলতানের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুর ছিল যাতে আমার সমস্ত রাগ নিভে গেল।

: বলুন কী করতে হবে। আমি আপনার যে কোন সেবা করতে প্রস্তুত আছি। আপনার সেবা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

: আমি ফারুকের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

: আপনি?

আমি এত জোরে এই কথাটা বললুম যে পাশের টেবিলের লোকগুলো বিস্মিত হয়ে আমার মুখের পানে তাকালো।

: হ্যাঁ, আর সম্রাটের সঙ্গে এই দেখা-সাক্ষাৎ করবার বন্দোবস্ত করবে তুমি। আবার বেশ জোর গলায় নাদিয়া সুলতান কথা-গুলো বললেন।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে অসহায় মনে হোল। নাদিয়া সুলতানের কোন কথায় প্রতিবাদ করবার মত সাহস সেদিন আমার ছিল না।

: আপনি যা হুকুম দেবেন তা আমি নিশ্চয় করবো।...কথাটা বলার সময় আমার গলার সুর যেন মিনমিনে শোনালো।

: বেশ তাহলে ফারুকের সঙ্গে আমাদের কবে দেখা হচ্ছে! এলিয়াস এন্ড্রুজ জিজ্ঞেস করলেন।

আমি কোন জবাব দেবার আগে একবার নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকালুম।

না, উনি সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। ওর দিকে একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। আমি জানতুম একবার যদি ফারুক নাদিয়া সুলতানকে দেখতে পান তাহলে কায়রোর নরক আমার কিছুদিনের জন্যে গুলজার হবে।

: আপনি তাস খেলেন? আমি এলিয়াস এন্ড্রুজকে জিজ্ঞেস করলুম।

এলিয়াস এন্ড্রুজ আমার প্রশ্ন শুনে কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকালেন। হয়তো উনি পুরো ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন। কারণ আমরা সবাই জানতুম যে ফারুক ছিলেন জুয়াড়ী। তাস বলেট শেমা দ্য ফেয়ার (একরকম তাস খেলা) খেলার বড্ড বাই আছে। প্রতিরাত্রে তিনি হাজার হাজার পাউন্ড তাস খেলার বাজীতে হারেন। তাই নিয়ে বাজারের চলতি কথা ছিল যে ফারুকের দুটো শখ আছে—মেয়েমানুষ আর জুয়ো খেলা।

: আমি ভালো তাস খেলা জানিনে তবে শিখে নেবো। এলিয়াস এন্ড্রুজ ছোট জবাব দিল।

: মঁশিও আমি আবার ফরাসী ভাষায় বললুম, আপনি ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলছেন। আর এই জুয়ো খেলার প্রারম্ভে বাজীতে হেরে গেলেন।

: কী রকম? নাদিয়া সুলতান এবং এলিয়াস এন্ড্রুজ একসঙ্গে বেশ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

: প্রথমে আপনি যেদিন ফারুকের সঙ্গে দেখা করবেন সেদিন থেকে মাদামকে হারাবেন। না একবার যদি ফারুক ওকে দেখতে পান তাহলে ওঁকে আর কখনও দেখতে পাবেন না। উনি হবেন ফারুকের সম্পত্তি। আর ফারুকের সঙ্গে তাস খেলতে বসা মানে বিস্তর টাকা গচ্চা দেয়া......

আমার কথা শুনে নাদিয়া সুলতান এবং এলিয়াস এন্ড্রুজ খুব জোরে হেসে উঠলেন। পাশের টেবিলের লোকগুলো আবার বিরক্তির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো। আমি অপ্রস্তুত বোধ করলুম।

নাদিয়া সুলতান এবার মিষ্টি গলায় বলল : পাশা, আমি এই নাইট ক্লাবে বেলী ড্যানসারের চাকরী চাই। আর আমাকে এই চাকরী দিতে পারেন একমাত্র সম্রাট...তাই আমি ফারুকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

নাদিয়া সুলতানের কথা শুনে আমি বিচলিত হলুম। কারণ এই সময়টা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সাল। ইজিপ্টের বিখ্যাত সুন্দরী বেলী ড্যানসার তাহিওব কারিওকা এবং সামিয়া গামাল কায়রো শহর মাতিয়ে রেখেছিলেন। আর ওরা দুজনেই ছিলেন 'অবারজ দ্য পিরামিড' নাইট ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ। ওদের সরিয়ে নাদিয়া সুলতান এই নাইট ক্লাবের প্রধান বেলী আকর্ষণ হতে চান। ইমপসিবল...অসম্ভব।

কিন্তু নাদিয়া সুলতানের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলুম যে এই মেয়ে সব কিছু করতে পারবে।

: হ্যাঁ পাশা, তুমি শুধু একবার আমাকে ফারুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। বাকী কাজটা আমি করিয়ে নেবো।

আমি মনে মনে ভয় পেলুম বটে কিন্তু তবু প্রকাশ্যে না বলতে সাহস পেলুম না।

দুদিন পরে নাদিয়া সুলতান সম্রাট ফারুকের দেখা পেলেন।

আর এই দেখাসাক্ষাৎ-এর বন্দোবস্ত আয়োজন আমিই করলুম।

•

আলেকজান্দ্রিয়ার রাস এল তিন প্রাসাদ থেকে ফারুক আমাকে ডেকে পাঠালেন। আনতানিও পুলি বললেন : পাশা ফারুক তোমাকে ডেকেছেন।

ফারুক কেন আমাকে তলব করেছেন তার কারণ আমি জানতুম। তিনি নতুন শিকার খুঁজছেন। আনি বারিয়ার আজ তার কাছে পুরনো। বাসন্দী হয়ে গেছেন। নতুন মেয়ে চাই। আর আমার কাজ হোল আবার নতুন সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বের করা।

আজ আমার মেয়ে খুঁজে বার করবার জন্যে কষ্ট করতে হোল না। কারণ আনতানিও পুলির কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে নাদিয়া সুলতানের কথা মনে হোল।

আমি এবার গিয়ে এলিয়াস এন্ড্রুজ আর নাদিয়া সুলতানকে বললুম : চলুন আমার সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ায়। ফারুক আপনাদের ডেকেছেন।

নাদিয়া সুলতান আমার কথা শুনে উৎসাহিত হোল। তুমি ওকে আমাদের কথা বলেছ?

: বলিনি। কারণ ফারুক কারুর কথায় বিশ্বাস করেন না। উনি নিজের চোখে যা দেখেন তা বিশ্বাস করেন। আর উনি জানেন যে পাশা কায়রো থেকে তার জন্যে খালি হাতে আসবে না। তার জন্যে ডার্লিং নিয়ে যাবো......

নাদিয়া সুলতান বললেন : আর আমি হলুম সেই উপহার। ভালো বলেছ। না আমার ফারুকের বান্ধবী হতে আপত্তি নেই। কারণ আমি কায়রো শহরের প্রধান নাইট ক্লাবের বেলী ড্যান্সার হতে চাই। আর একবার যদি ফারুক বলেন যে আমি 'অবারজ দ্য পিরামিড' নাইট ক্লাবে কাজ করবো তাহলে কেউ কোন আপত্তি করতে পারবে না।

আমি বিপদের আশঙ্কা করলুম। বুঝতে পারলুম ফারুক যদি জোর করে নাদিয়া সুলতানকে ঐ ক্লাবের প্রধান বেলী ড্যান্সার করেন তাহলে কায়রো শহরে এই নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা সমালোচনা হবে। সবাই আমাকে দুষবে। বলবে : পাশা ফারুককে কুপরামর্শ দিচ্ছে...কিন্তু আজ আমার নাদিয়া সুলতান কিংবা এলিয়াস এন্ড্রুজকে 'না' করবার মত সাহস ছিল না।

আমি কথা বাড়ালুম না। আমরা তিনজনে আলেকজান্দ্রিয়া শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলুম।

•

কায়রো শহর থেকে আলেকজান্দ্রিয়া শহর প্রায় সোয়া দুশ কিলোমিটার। আমরা গাড়ী করে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে যখন পৌঁছলুম তখন রাত প্রায় আটটা।

আমাকে দেখে আনতানিও পুলি চীৎকার করে উঠলেন : বাহ্ জোস্ত পাশা! আজ বিকেল থেকে ফারুক তোমার খোঁজ করছিলেন।

তারপর একবার নাদিয়া সুলতান আর একবার এলিয়াস এন্ড্রুজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : এরা কে?

: ফ্রেন্ডস। আমি ছোট জবাব দিলুম। আনতানিও পুলির সঙ্গে বেশী কথা বলতে চাইনে, বড় ধূর্ত লোক। কখন যে ও আমাকে লেংগি দেবে বলা যায় না।

তারপর এলিয়াস এন্ড্রুজের পানে তাকিয়ে বললুম : উনি ইংরেজ ব্যবসায়ী। ইংরেজ কথাটি শুনে আনতানিও পুলির মুখ গম্ভীর হোল। কারণ আমরা সবাই জানতুম যে ফারুক ইংরেজদের দুচোখে দেখতে পারেন না।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম : আহা ইংরেজ কথাটা বলবার প্রয়োজন কী? যদি বলি উনি হলেন ফরাসী...

আনতানিও পুলি বেশ একটু ধমকের সুরে বললেন : ফারুকের চোখে তুমি ধুলো দিতে পারবে না পাশা। মনে রেখো উনি সাতটি ভাষা অনর্গল বলতে পারেন। আর ফরাসী ভাষা তো প্রায় ওর মাতৃভাষা।

এবার নাদিয়া সুলতান আলোচনায় যোগ দিলেন। বললেন : এলিয়াসের জন্যে তোমরা কোন চিন্তা কোর না। ওর দায়িত্ব আমি নিলুম।

এলিয়াস এন্ড্রুজ হেসে বলল : আমি ব্যবসায়ী। শেয়ার মার্কেট ব্রোকার। আর শুধু তাই নয় আর্মস ডিলারও।

: আর্মস ডিলার! উত্তেজনায় আনতানিও পুলির চোখ দুটো বড়ো হোল।

আমরা সবাই জানতুম যে বেশ কিছুদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক হাটবাজার বেশ গরম হয়ে উঠেছে। সবার মুখে একই কথা : আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে। আর এই যুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে ফারুক অস্ত্র কিনবার পরিকল্পনা করছেন। আনতানিও পুলি তার মনের উত্তেজনা দমন করল। শুধু হেসে বলল : ওয়েলকাম টু আলেকজান্দ্রিয়া মিস্টার এন্ড্রুজ।

আমার মনের দুশ্চিন্তা দূর হোল। একটা ফাঁড়া কাটল।

আনতানিও পুলি বলল : পাশা আজ মামুরা প্রাসাদে তাস খেলা হবে। তুমি আসবে। আপনি তাস খেলেন?

(২৭)

আনতানিও পুলি এলিয়াস এন্ড্রুজকে জিজ্ঞেস করল।

: হ্যাঁ অল্প বিস্তর। এলিয়াস এন্ড্রুজ ছোট জবাব দিল।

: বেশ তাহলে পাশা, তুমি এলিয়াসকে সঙ্গে করে আনবে। আর আপনি? আনতানিও পুলি নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকাল। তারপর আবার বলল তাস খেলার পর আমরা সবাই নটি গার্ল নাইট ক্লাবে যাব। ঐ নটি গার্ল নাইট ক্লাবে ফারুক আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি ফ্লোরের সামনের একটি টেবিলে একা বসে থাকবেন। খবরদার, আপনার টেবিলে যেন আর কেউ বসে না থাকে। ফারুক বড্ড জেলাস প্রকৃতির লোক। উনি কোন পুরুষকে সহ্য করতে পারেন না।

নাদিয়া সুলতান হাসলেন।

আনতানিও পুলি এবার গলার স্বর খুবই নীচু করলেন। তার কথা আমার কানে একেবারে গেল না। শুধু দুটো কথা শুনতে পেলুম : একটা কথা আপনাকে বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। ব্রাসেয়ার পারবেন না। যে সব মেয়েরা ব্রা পরেন, ফারুক তাদের একেবারে দু চোখে দেখতে পারেন না।

আমি জানতুম ফারুক হলেন সেকস ম্যানিয়াক। তাই আজ আমার ফারুক আনতানিও পুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। কারণ আমিও ছিলুম সেকস পাগল।

আনতানিও পুলির কথা শুনে আমার হাসি পেল। কিন্তু একটি কথা আমি সেদিন বুঝতে পারি নি কিংবা উপলব্ধি করি নি যে আমার জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।

আমি ছিলুম নাইট ক্লাবের বারম্যান।

এবার থেকে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হোল। আমি হলুম স্পাই, গান রানার...স্মাগলার।

সেদিন মামুরা প্রাসাদের তাস খেলার কথা কখনও ভুলব না।

আজকের তাস খেলার আসরে অনেক বড় বড় মহারথীরা ছিলেন। এঁরা প্রায়ই ফারুকের সঙ্গে তাস খেলতেন। এঁদের মধ্যে আলবেনিয়ার আহমদ জগের নাম উল্লেখযোগ্য।

আহমদ জগের সঙ্গে ফারুকের রক্তের সম্পর্ক ছিল। যুদ্ধের আগে আহমদ জগ আলবেনিয়ার সম্রাট ছিলেন। কিন্তু লড়াইর পর তাঁর সিংহাসন গেল। তিনি এসে মিশরে আশ্রয় নিলেন।

আহমদ জগ প্রায়ই ফারুকের তাস এবং রুলেট খেলায় যোগ দিতেন। তিনি অবিশ্যি ফারুকের মত বেপরোয়া জুয়াড়ী ছিলেন না। হিসেব করে খেলতেন।

সেদিন আমরা সবাই মামুরা প্রাসাদের বারান্দায় তাস খেলছিলুম। সামনেই সমুদ্র...ভূমধ্যসাগর। দূর থেকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের বাতিগুলো দেখা যায়। সমস্ত শহরকে আজ রুপোলী চাঁদের মত দেখাচ্ছিল। আমি প্রথম থেকে বাজীতে হারছিলুম। এলিয়াসও বেশ কিছু টাকা হেরেছিল। বিশেষ করে যখন এলিয়াস এবং ফারুকের সঙ্গে বাজী হোত তখনই এলিয়াস এন্ড্রুজ বাজী হারত। আমার মনে হল এলিয়াস এন্ড্রুজ ইচ্ছে করে বাজী হারছে।

অনেকগুলো টাকা বাজী জিতে ফারুকের মন খুশীতে ভরপুর ছিল।

: আপনি কী করেন? তাস খেলতে খেলতে ফারুক এলিয়াস এন্ড্রুজকে জিজ্ঞেস করলেন।

: বিজনেসম্যান। শেয়ার মার্কেটে ব্যবসা করি।

: শেয়ার মার্কেট!

উত্তেজনায় ফারুকের চোখ দুটো বড় হোল। তিনি যেন টাকা রোজগার করবার একটা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন।

: দ্যাটস রাইট। আমি শেয়ার মার্কেটে শেয়ার বেচা-কেনা করি। ডিল আপনার ইয়োর ম্যাজেষ্টি...

এলিয়াস এন্ড্রুজ বোর্ডের টাকাগুলো ফারুকের হাতে তুলে দিলেন।

ফারুক মৃদু হাসলেন। বুঝতে পারলুম ওঁর মন খুশিতে ভরে উঠেছে।

: নট ইয়োর ম্যাজেষ্টি মাই বয়...আমার নাম ফারুক, আজ থেকে আমরা বন্ধু।

এত অল্পক্ষণের মধ্যে এলিয়াস এন্ড্রুজ যে সম্রাট ফারুককে বশ করতে পারবেন এ-কথা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। রাত প্রায় বারোটা, আমি বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। নাদিয়া সুলতান নিশ্চয় আমাদের জন্যে নটি গার্ল নাইট ক্লাবে প্রতীক্ষা করছে।

ফারুক আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন : আজ কী প্রেজেন্ট এনেছো পাশা।

: ইয়োর ম্যাজেষ্টি...

আমার কথা শুনে আবার ফারুক আমাকে ধমক দিয়ে উঠলেন। নট ইয়োর ম্যাজেষ্টি...আমার নাম ফারুক...

তাস খেলার পর আমরা নটি গার্ল নাইট ক্লাবে যাবো।...আমি বললাম।

আমার ইঙ্গিতের কথা ফারুক বুঝতে পারলেন। উনি এবার খেলা থেকে উঠবার চেষ্টা করলেন। আজ তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। হয়তো নটি গার্ল নাইট ক্লাবে আরো ভালো কিছু পাবেন।

কিন্তু আহমদ জগ বাধা দিলেন সেদিন তাস খেলায় উনি বেশ মোটা টাকা হারছিলেন। আরো এক ঘন্টা খেলা যাক।

: কিন্তু আপনি তো একেবারে খেলছেন না। একশো পাউন্ডের উপর কখনই বাজী রাখছেন না। ফারুক বেশ একটু ঠাট্টার সুরে বললেন : ইয়োর ম্যাজেষ্টি আপনার কী টাকা পয়সার অভাব চলছে...আই মীন এনি ফিনানসিয়াল ট্রাবল?

(ক্রমশঃ)

(২৫)

কৃষ্ণা মেয়েটি পোড়ারমুখী। জন্ম থেকেই পোড়ারমুখী। না' ওর মাকে কোনোমতেই দোষ দেওয়া চলে না। নিটোল সুডৌল সর্বাঙ্গ সুন্দর এক পুংসন্তানের আশায় গর্ভবতী মহিলাটি মেনেছেন প্রতিটি সংস্কার ও বিধি-নিষেধ: উল বোনেননি আনারস আতাফল কিংবা কচ্ছপের মাংস কোনোটাই খাননি সন্ধ্যার পর একদিনও বেরোননি তাঁর আপন জননীর মৃতদেহকে পর্যন্ত তিনি দেখতে যাননি... ত্রিধাতুর মাদুলি আর বেজোড় গেরোর ডোর কত-কি না পরেছিলেন তিনি...আর সেই চন্দ্রগ্রহণের বেলায় সুদীর্ঘ তিন ঘন্টা শুধু পায়চারি করেছিলেন...তবে হ্যাঁ দুয়েকবার অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করে পাঞ্জিকার নির্দেশ মতো তিনি এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে মুখ করে সটান শুয়েছিলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাই আজও তিনি ভাবছেন তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কোন জনকে তিনি—তাঁর কোন অসাবধানতার দরুন—অপ্রসন্ন করে জন্ম দিলেন শুভ্রবর্ণ বংশধরের নয় কৃষ্ণবর্ণা বংশধরার।

কত আশা নিয়ে কাউকে না জানিয়ে ছোট্ট একটি আংটি তিনি গড়িয়েছিলেন।... মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হলে জহুরির দোকানে আংটিটি ফেরৎ পাঠিয়ে চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রুমোচন করে তিনি বলেছিলেন 'শুভ্রা' নামটা মুছে দিয়ে 'কৃষ্ণা' নামটা মিনা করতে। আংটির অলক্ষুণে ঐ কান্ডটার কথা শুনতে পেয়ে শাশুড়ী রাগ করেছিলেন।

মেয়েটি বাড়তে লাগল সহপাঠিনীদের লাল স্যাটিনের জামা হিংসা করতে শিখল। মা ওকে রোদে খেলতে দেন না দুধের সর আর লেবুর রস ওর মুখে না মাখিয়ে ছাড়েন না শিবরাত্রি ওকে কাটাতে হয় নিরম্বু উপবাসে। না মা আজ ত্রিধাতুর মাদুলি কিংবা বেজোড় গেরোর ডোর আর পরেন না—কৃষ্ণাকেই পরান। মেয়েটি লম্বা ও ঢিলে আস্তিনের জামা পরিধান করে ওর সমস্ত সন্ন্যাসী দেওয়া কবচ ও ফকির-দেওয়া তাবিজ সহপাঠিনীদের কৌতূহলী দৃষ্টিতে যাতে না পড়ে। আংটির কলেকশন অবশ্য প্রচ্ছন্ন রাখার উপায় নেই।

বাড়ির বিষাক্ত পরিস্থিতি সহজ-সহ্য হয়ে উঠেছে অবনীমাধব নামে পিতৃপ্রতিম এক বৃদ্ধ গৃহশিক্ষকের উপস্থিতিতে: কৃষ্ণাকে তিনি শিখিয়েছেন তার স্ত্রীলিঙ্গত্ব আর চর্মকৃষ্ণতা অবলীলাক্রমে বয়ে চলতে। মেয়েটি মৃদু-স্বভাবা পড়ে ভালো খেলে ভালো আবৃত্তির জন্য পুরস্কার পায়। ওর নিজেরই জবানীতে কথা বলি: 'এই সব মিলিয়ে সুন্দর স্বচ্ছন্দ দিনগুলো পাল তোলা নৌকার মতো জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছিল...।'

একদিন—কৃষ্ণা তখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী—স্কুল থেকে ফিরে সে দেখে এক অপরিচিতা প্রৌঢ়া মহিলা আর জনা ছয়েক ছোকরা বৈঠকখানায় বসে মায়ের হাতে পরিবেশিত জলযোগের আস্বাদনে মশগুল। তাঁদের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিতে কৃষ্ণার মা তাঁদের দেখাতে ভুললেন না তাঁর আত্মজার নিজের হাতে বোনা সোয়েটারটা হপ স্টেপ অ্যান্ড জ্যাম্পের আন্তর্বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত কাপটা 'আশাবরী' স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 'দীঘায় পাঁচদিন' প্রবন্ধটা...

অপরিচিতা মহিলাটি 'বাঃ বাঃ কি সুন্দর!' মূল্যায়নাত্মক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে চললেন। তাঁর কৌতূহল নিবারণ করে কৃষ্ণার মা তাঁকে জানালেন মেয়েটি সুন্দর গান করে সুন্দর সেলাই করে সুন্দর সুক্তো রাঁধতে জানে...। মহিলাটি তখন কৃষ্ণার চুল পরীক্ষা করতে চাইলেন।

পরীক্ষা অবশ্য নামমাত্রই—বঙ্গভূমির ভবিতব্য-শ্বশ্রূসুলভ শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্য রক্ষণার্থে। আসলে মেয়েটিকে তাঁরা এই কদিন ধরে স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় দেখেছেন; ওকে তাঁদের পছন্দ হয়েছে। এদিকে ছেলেটির শিক্ষা আছে দীক্ষা আছে অবস্থাও ভালো কাজেই কৃষ্ণাদের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলার প্রশ্ন ওঠে না: 'প্রজাপতয়ে নমঃ...' পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ মার্জনীয় ছাপলেই হল।

আর রং? অনেকদিন হয়েছে রঙে বিশ্বাস না করতে তাঁরা শিখেছেন ঠেকেই শিখেছেন: ভদ্রমহিলার পরিজনমন্ডলে শুভ্রবর্ণা বধূমাত্রই আত্মাভিমানী আত্ম-ঘাতিনী ও বন্ধ্যাগর্ভা: তাঁর এক শুভ্রবর্ণা খুড়শাশুড়ী বিয়ের কুড়ি বছর পরেও একবারও মা হতে পারলেন না তাঁর এক শুভ্রবর্ণা পিসশাশুড়ী ফুলশয্যার ফুল না শুকোতেই কুয়োতে লাফ দিয়েছেন...আর তাঁর নিজের শুভ্রবর্ণা ননদের দেমাক দেখলেই যম পালায়।

কৃষ্ণার মা বুঝলেন স্বর্গপুরীবাসিন্দারা এতদিন তাঁর স্তূপীকৃত পুণ্যের প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

এদিকে কৃষ্ণা ভাতের থালা আর ঝোলের বাটি ছুঁড়ে ফেলে অবনী মাস্টারের [illegible] জেহাদ জাহির করল; দ্ব্যর্থকতা-বিরহিত ভাষায় বোঝাল জননীদেবীর কন্যাদায়মুক্ত করার জরুরিয়ত সে কোনোমতেই মানতে প্রস্তুত নয় কলেজে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেই তবে সে বিয়ের কথা ভাববে।

সহৃদয় মাস্টারের বিদগ্ধ মধ্যস্থতায় প্রস্তাবিত সম্বন্ধটা ভেঙে যায় ঠিকই, তবে কৃষ্ণার মা ঘোষণা করলেনঃ এক এক চূড়ান্ত অপমানের পরে জীবনে তাঁর আর কোনো স্পৃহা নেইঃ শুধু দৈবদোষে যদি জীবিত থাকা তাঁর একান্ত আবশ্যক হয় তাহলে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে অবনীবুড়োর অলক্ষুণে হাঁড়িমুখটা ভুল করেও তিনি আর দেখতে চান না।

মেয়েটি যথাসময়ে উচ্চতর বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় বাংলায় নাকি সারা [illegible] মহকুমার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর তোলে—ফলাফল যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রেতাত্মাকে ঈর্ষান্বিত করার মতো ছিল না। সে তখন পড়তে আসে কলকাতার এক অনামী কলেজে। কলেজ-জীবন রোমাঞ্চহীন যাবতীয় স্টাফ স্ত্রীজিতের দরোয়ান মেথর আর সংস্কৃতের মাস্টার ছাড়া। কৃষ্ণার দিন নির্বিঘ্নে কাটে; মায়ের সাহচর্য যেই ছেড়েছে

কবচ আর আংটিগুলিকে ফেলে দিয়ে অনেকটা হাল্কা ও আলগা সে বোধ করেছে। অধ্যাপিকাদের এবং এমন কি 'সুপারদির'ও স্নেহপাত্র হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বর্ষের গ্রীষ্মাবকাশের পরে কৃষ্ণার রুম-মেট হয়ে অঞ্জলি নামে এক নবাগন্তুকা হস্টেলে পদার্পণ করে। মেয়েটি নাকি দুষ্টুঃ দোলযাত্রার সুযোগ নিয়ে ওর পূর্বতন কলেজের অধ্যক্ষার ধবধবে সাদা কুকুরের গায়ে লাহার দোকানে কেনা আধ কেজি অনপনীয় রং ঢালার অপরাধে উক্ত কলেজে তার উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় বলে ঘোষিত হয়েছে। স্যুটকেস খুলে এক মুঠো নারকোলের নাড়ু বের করে 'বাড়িতে তৈরি... খাও!' বলে কৃষ্ণার সঙ্গে মেয়েটি সই পাতাল। সেই থেকে শান্তশিষ্ট কৃষ্ণা হয়ে উঠল দুরন্ত অঞ্জলির নব নব অ্যাডভেঞ্চারের নিত্যসঙ্গিনী।

এক ছুটির অপরাহ্নে কৃষ্ণাকে অঞ্জলি বলে 'চল ক্ষুধিত পাষাণ দেখে আসি।' সুপারদির আর যত দোষ থাকুক সাহিত্য-বোধরহিত তিনি নন অনুমতি দিলেন শুধু বললেন সোজা ফিরে আসা চাই। মাণিক-জোড় আসলে ব্র্যাকে টিকিট কেটে কাইশ বীজের এক হিন্দী ফিলিম দেখতে যায়। ফেরে যখন—দুটো ইন্টারভালের পরে—তখন বাজে সাতটা।

গেট খুলে দরোয়ান বলল, 'দিদি দেখা করতে বলেছেন।' দুরুদুরু বক্ষে কাঠগড়ার আসামীর মতো হাজির হল মাণিকজোড় সুপারদির কাছে। মহিলাটি যেন কত স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের সঙ্গে ছবির কথা জিগ্যেস করছেন। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটা কে না পড়েছে। বলুন? মেয়েরা হাঁপ ছেড়ে চটপট করে বানাতে লাগল। ওদের থামিয়ে তিনি যা বললেন তার সংক্ষিপ্তসার এইঃ এক তিনি ছবিটি দুবার দেখেছেন দুই অনর্থক অজুহাতে বেরিয়ে অনর্থক ছবি দেখে তারা অনর্থক কৈফিয়ৎ দিচ্ছে; তিন তাদের অভিভাবকদের কাছে এ ব্যাপারে চিঠি যাবে...। সঙ্গে সঙ্গেই আসামীদের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল' ডান হাতের তর্জনীর অভ্রান্ত ভঙ্গিতে সুপারদি বোঝালেন দুজনের দীর্ঘায়িত উপলব্ধির অপ্রয়োজনীয়তা।

সেদিন কৃষ্ণার ঘুম হল না। পরের দিনও না। মেয়েটি শুধু ভাবছে সুপারদির চিঠি পেলে বাবা-মা কত দুঃখ পাবেন! বাবা—এমন কি মাও বোধহয় প্রথম ট্রেন ধরে হস্টেলে আসবেন মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইবেন; কৃষ্ণা তখন কোন সাহসে তাঁদের সামনে দাঁড়াবে?...তৃতীয় দিন সে বিছানা ছাড়ল না বেহুঁশ অবস্থায় কি সব বকতে শুরু করল। অঞ্জলি অভিভাবক বলতে যার আছে শুধু এক দূর সম্পর্কীয় কাকা—সুপারদির বকুনিতে অতিমাত্রায় মাথা ঘামায় নি; নিশ্চিন্তে সে বান্ধবীর শুশ্রূষা করছে।

এতদ্দণ্ডে মুসকিল আসান করে অণিমাদেবীর প্রবেশ। অণিমাদেবী কৃষ্ণার মায়ের এক বাল্য বান্ধবী; তাঁর ননদ কৃষ্ণাদের কলেজের আপিসে কাজ করে। কৃষ্ণার অসুখের সংবাদ পেয়ে মহিলাটি ওকে বাড়িতে নিয়ে আসেন প্রতিটি রোববারে নিয়ে আসার অনুমতি পান। অণিমাদেবীর বিমল নামে এক দেওর আছে। ছেলেটি সবেমাত্র চাকরিতে ঢুকেছে—সুখী সংসার পাতার অপেক্ষায়।

উপসংহার দ্রুতবেগঃ কৃষ্ণাকে ছেলেটির লাগল বেশ ছেলেটিকে কৃষ্ণারও অপছন্দ হল না কৃষ্ণার মা আর ছেলেটির ভ্রাতৃবধূ আসন্ন সুখের পূর্বাস্বাদনে মনে মনে শাঁখ বাজাতে শুরু করেছেন।

...বসিরহাটের পিতৃগৃহের রন্ধনশালায় কৃষ্ণা মেয়েটি পায়েস বানাচ্ছে মা আর বাড়ির যাবতীয় নারীসমাজ ঘসে-মেজে প্রস্তুত হচ্ছেন সর্বদা ব্যস্ত বাবাও ছুটি নিয়েছেনঃ আজ কৃষ্ণার পাকা দেখার দিন আজই ওরা আসবে মেয়েটিকে আশীর্বাদ করতে। ঘসতে ঘসতে মাজতে মাজতে কৃষ্ণার মা তাঁর ইষ্টদেবতাকে ডেকে বলেন, 'ঠাকুর আমাদের এই পোড়ারমুখী মেয়েকে তুমি এ যাত্রায় সত্যি সত্যি পার করে দাও!'

দীর্ঘাপেক্ষিত ফোন বাজল। স্প্রিং-এর মতো উঠে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা এ'টো হাত ঝুলিয়ে বাঁ-হাতে রিসিভার ধরল। কলকাতা থেকে বিমল ফোন করছেঃ সবাই প্রস্তুত গাড়িও এসেছে গাড়ির চালক বিলেত-ফেরৎ মেজো জামাই আনুমানিক দেড় ঘন্টার মধ্যে বসিরহাটে ওরা পৌঁছবে কৃষ্ণার পায়েসটা যেন দিনটাকে চিরস্মরণীয় করে তোলে। মেয়েটির স্পষ্ট মনে আছে 'তাহলে ছেড়ে দি বলে হবু জামাই এক পুনশ্চ জুড়েছিল ওষ্ঠাধরের এক ইঙ্গিতময় শব্দ শুনিয়ে।

দেড় ঘন্টা মানে নব্বই মিনিট—যুগে যুগে ধন্য সেই হিন্দী ফিলিমের অর্ধাংশ যার কল্যাণে অণিমাদেবীর অবিবাহিত দেওরের সঙ্গে কৃষ্ণার প্রথম আলাপ হয়। মেয়েটির শিশুসুলভ ইচ্ছা হয় দেওয়াল ঘড়িকে ঝাঁকুনি দিয়ে তার গতি বাড়িয়ে বিমলের আগমন ত্বরান্বিত করে দেয়; মনে মনে বিলেত-ফেরৎ জামাইকে সে উস্কিয়ে দিয়ে বলে 'জলদি চালাও...' তার গাড়ির আঁচলে সে বেঁধেছে এক আংটি প্রাইভেট টুইশন করে স্বোপার্জিত টাকা দিয়ে কেনা বিমল-নামাঙ্কিত এক আংটি।

দেড় ঘন্টা অতিক্রান্ত হল অধীর অপেক্ষায়। কোনো গাড়ির শব্দ শুনলেই বৈঠকখানায় উপবিষ্ট সবার চোখে আশা জ্বলে—আর নিভে যায়ঃ লরির অবিশ্রান্ত মিছিল কৃষ্ণাদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যায় নির্দিষ্ট গতিতে।

নিঃশব্দতা ভেদ করে বাবা বললেন, বেচারীদের টায়ার বার্স্ট করেছে নিশ্চয় চাকা বদলাতে সময় লাগবে...মা বললেন গাড়িটা মাঝপথে বিগড়ে গিয়েছে বেচারীরা ফোন করতে পারছে না...কৃষ্ণা বলল, 'আর যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়?'

রাত দশটায় ফোন বাজল। অনেকক্ষণ কেউ উঠল না, অলুক্ষুণে সংবাদের বাহক হতে কেই বা চায়? কৃষ্ণা নিজেই কম্পিত হস্তে ফোন ধরলঃ অণিমাদেবী কোন হাসপাতাল থেকে ফোন করছেন 'ঠাকুরপো' বলে বিলাপ করছেন। বিস্তারিত খবর তারা পেল পরের দিনের দৈনিকপত্রে। বিলেত-ফেরৎ জামাইটিকে বিমলও বলেছিল, 'জলদি চালাও!'

সরু পাড়ের এক শুভ্র শাড়ি পরে রুগনা মেয়েটি আমাকে এসে বলল, 'আমার বিয়ে তো আর হবে না আর যদি বা কোনোদিন হয় আংটিটা থেকে 'বিমল' নামটা আমি মুছে দিতে পারব না; আপনি বরং ওটা বিক্রী করে ওর দামটা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিন...আর ওদের বলুন এই পোড়ারমুখীর জন্য ঠাকুরের কাছে একটু প্রার্থনা করতে।'

তিনি চলেছেন ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

জংলা পাহাড়ের মাথায় তুষার
যেন মহাদেবের দেহের উপর চিরকালের সতী
ছায়াবহ দ্বিপ্রহরে
বাঁধের ছায়ামণ্ডপে উৎসর্জিত বেদীর সমক্ষে
গরীব পাড়াগাঁ—দীনের কুটিরের দুয়ার হাট করে খোলা
অসীমের দিকে চলে-যাওয়া বড়ো সড়কের উপর

ভরা-ভীত বসন্তপূর্ণিমার আসর
আলোর গরিমা এসে পড়েছে তাঁর নিস্পন্দ মুখে
পিছনে দেখছে ঘিরে-থাকা জন-মণ্ডলী
যাচ্ছেন চলে তিনি রূপের গহনে
ডুব দিলে উঠে আসে মুক্তাফল
যেখান থেকে আর ফেরা নেই

সংশয়ে সৈকতাবাস ॥

শৈলেন শেঠ

সৈকতে অসংখ্য ঝিনুক প্রতি ঢেউয়ে আসে যায়,
দুহাতে কুড়োবে কত। কত ঢেউ গোনা যেতে পারে
একক জীবনে!!
ঢেউ দীর্ঘশ্বাস হয়ে দেখো মুহূর্তেই মুছে দেয়
পায়ের পাতার ছাপ, আশৈশব ছড়ানো স্মৃতিরা;
তাই বলি—বারবার সংশয়ে ফিরে যাওয়া,
এভাবে তো আজীবন ছেলেখেলা ঠিক নয়;
যদিও সাগরে থাকে বুক-জোড়া ঢেউ আজীবন
কোলাহলে ঢেউ তোলে বাতাসের বুকের ওপর।

তার চেয়ে ঢেউয়ের গভীরে ফিরে এস,
কোলাহল থেকে দূরে হৃদয়ের কাছে;
এইখানে সমস্ত বুকের জুড়ে একটাই ঢেউ,
ঢেউয়ের ভেতরে আছে—প্রতীক্ষায় ঝিলমিল ঝিনুকের মা
মাও হয়ে তার যেন বা রোদ্দুর;
তাই বলি—আজীবন সংশয়ে সৈকতে জীবন
ঠিক নয়। বরং নেমেই এস ঢেউয়ের গভীরে,
কোলাহল থেকে দূরে হৃদয়ের কাছে;
যদিও এ জীবনের বুক-জোড়া স্মৃতি আজীবন
[illegible] ওপর

যার যায় তার যায় ॥

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

যার যায় তার যায়;
অথচ নিঃশব্দে, যার
যায় সে জানে না।

মাঝে মাঝে দৌড়ে যায় ফাঁক পেলেই
দরজা খুলে দে ছুট, শৈশবের মাঠে
যা যা ফেলে এসেছে সে
কদিন আগেই পুরনো বাড়িতে;
পুরনো বাড়ি যা রাখে তা রাখে সে
দেয় না [illegible]।
বাড়ি বদলের সঙ্গে কিছু কিছু থেকে যায়
দেয়ালে চৌকাঠে ধুলোয় নিঃশ্বাসে

মাঝে মাঝে দৌড়ে যায় নদীতে নৌকোয়,
মাঠে কবেকার লাটাই লাটিম
দুহাতে সে খোঁজে দুপুরে পুকুর হাঁস
সাঁতার কাটার বেলা
কুড়িয়ে আনতে ছোটে ফুলের পাপড়ি
সকালের রঙ
যা ফেলে এসেছে ঘাসে, আরেক উঠোনে
তাদের মুখের হাসি
ফিরিয়ে আনতে ছোটে
সে জানে না, যা থাকে তা থাকে সেখানেই
ফিরিয়ে দেয় না।
যার যায় তার যায়
দারুণ নিঃশব্দে; যার
যায় সে জানে না।
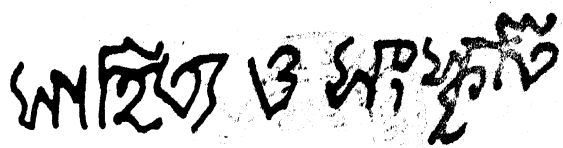
ক্রোধের বলি হয়েছে বহু নিরীহ নর-নারী। তারই জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখক আদিগন্ত উপন্যাসে। পীরসাহেবকে আমরা দেখি ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে। মেহের সরজা নরোদম সারদা সবাই সেই ক্ষমতার শিকার। ধর্মের ওপর ঠাঁই দিয়েছে দুই তরুণ চরিত্র মানবতাবাদকে। তারই করুণ দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক জয়েন-উদ্দিন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপন্যাসের প্রথম পর্বের কাহিনীর তুলনায় শেষ পর্ব তেমন জমাট বাঁধে নি। শেষের দিকে সাহিত্যের রসের চেয়ে রিপোর্টিং বেশী স্থান পেয়েছে। শরিফার চরিত্র শেষের দিকে অব্যক্ত রাখা হয়েছে। যাই হোক উপন্যাসটি একালের পাঠকদের নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবে। ছাপ ও বাঁধাই ভাল।

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চতীর্থে সংস্কৃত ভাবধারা: সুনীত রায়। পুঁথিঘর ২২ বিধান সরণী কলকাতা-৬। নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীসুনীত রায়ের বাংলা সাহিত্যের পঞ্চতীর্থে সংস্কৃত ভাবধারা গ্রন্থটির লেখককে ধন্যবাদ। গ্রন্থটির মূল লক্ষ্য—বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত প্রভাবের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য দেখানো। প্রয়াসটি অবশ্যই গ্রাহ্য। লেখক অত্যন্ত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন। বিদ্যাসাগরের ও মধু কবির অধিকাংশ রচনার উদ্ধৃতির পাশাপাশি সংস্কৃত লেখকদের রচনার প্রসঙ্গ উদাহরণস্বরূপ রেখে বক্ষমান গ্রন্থকার উৎসাহী পাঠকদের উপকার করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য বৈদিক ভাবধারা রচনাটি সুলিখিত, তবে গ্রন্থটিতে অজস্র ছাপার ভুল সচেতন পাঠককে বিপর্যস্ত করে।

এক আকাশ: সোমনাথ মুখোপাধ্যায় শঙ্কর চক্রবর্তী। প্রকাশক — এই মুহূর্তের কবিতা প্রকাশনী, ১৩ সান্যাল লেন শ্রীরামপুর হুগলী। চার টাকা।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের ২০টি ও শঙ্কর চক্রবর্তীর ২২টি কবিতা নিয়ে এই যুগলবন্দী কাব্যগ্রন্থটি, সোমনাথ তাঁর কবিতায় কোথাও অস্থির কোথাও এই সমাজ সংসারকে দেখে বিদ্রূপে হেসে উঠেছেন কোথাও আবার অতীতের সকরুণ ডাকে শিহরিত।...প্রতিটি অনুভূতিই স্পষ্টায়িত। কয়েকটি কবিতায় দারুণ কিছু পংক্তি উপহার দিয়েছেন সোমনাথ।

রোম্যান্টিক মুডের পাশাপাশি কোথায় যেন একটু ধার মিশে থাকে শঙ্করের কবিতায়। অনেকাংশেই বেদনার্তও তিনি। তাঁর প্রতিটি অনুভূতির সঙ্গেই পাঠক একাত্ম হবেন। কাব্যময়তার জন্যেও শঙ্করের কবিতা পাঠককে আরো বেশী করে টানবে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন।

মাটি এক মায়া জানে (উপন্যাস)—মহীতোষ বিশ্বাস। নন্দীমুখ সংসদ, ৪।৮, শহীদনগর, কলকাতা-৩১। বারো টাকা।

একটি কৃষক পরিবারকে অবলম্বন করে লেখক শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস গ্রামবাংলা, তার মাটি, মানুষ, প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণ এবং সুস্থ সবল জীবনবাসনার কাহিনী শুনিয়েছেন তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস 'মাটি এক মায়া জানে'-র মাধ্যমে। বলরাম এক কৃষক পরিবারের সন্তান এবং আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক। পদ্ম সেই গ্রামেরই মেয়ে এবং এর সঙ্গে বলরামের গভীর প্রেম গড়ে ওঠে ছেটবেলা থেকে। পদ্মের বাবা ভজহরিও একজন কৃষক। এই দুই কৃষক পরিবারের মধ্যে আসে নীলমণি মোড়ল—যে বয়স্ক পুরুষ এবং যার সঙ্গে ভজহরি পাঁচ বিঘে জমির লোভে মেয়ে পদ্মর বিয়ে দিতে চায়। বলরাম দরিদ্র চাষী, পাঁচ বিঘে জমি কেনার মত পয়সা নেই, পদ্মকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলেও গাঁয়ের মাটির আকর্ষণে যেতে পারে না, পদ্মও নীলমণি মোড়লের স্ত্রী হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পরও বলরামকে ভুলতে না পেরে পদ্ম দেখা করে বলরামের সঙ্গে। এর ফলে নীলমণির তীব্র সংঘাত। কাহিনীর দুর্বার গতির সঙ্গে আসে সুখলাল মেয়ে সুবাসী নীলমণির মৃত্যু-ঘটনা বলরামের সন্তান নরেন। বলরামের জীবনে একদিকে স্ত্রী সুবাসী আর একদিকে প্রেমিকা বিধবা পদ্ম। পদ্মর গর্ভেও বলরামের সন্তান আসে এক সময়। বলরামকে বাঁচাবার জন্য পদ্মর আত্মহনন বলরামের দলবন্ধ হয়ে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে গমন, পুত্র নরেন মৃত্যু আবার গ্রামের টানে ফিরে এসে সুবাসীকে বুকে নিয়ে মাটির আকর্ষণে বুক বাঁধার সুন্দর কাহিনী উপহার দিয়েছেন লেখক। উপন্যাসটি পাঠকদের ধরে রাখে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অনুভব। সম্পাদনা জয়ন্তকুমার। ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (আন্ডার গ্রাউন্ড)। কোলকাতা-১২। দাম ষাট পয়সা।

সম্প্রতি 'অনুভব' পত্রিকার অষ্টম এবং নবম সংখ্যা দুটি একত্রে হাতে এলো। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে দুটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। জয়ন্তকুমারকে লেখা খোলা চিঠিতে গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং 'কবিতা সম্পর্কে' সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পরেশ মণ্ডল কবিতা সম্পর্কিত কিছু অন্তরঙ্গ কথা বলেছেন। তুলসী মুখোপাধ্যায়ের 'অনতিক্রম্য আধুনিক' লেখাটি বেশ জেরালো। কবিতা লিখেছেন : হরপ্রসাদ মিত্র, কবিরুল ইসলাম, পরেশ মণ্ডল, শিশির ভট্টাচার্য, মৃণাল বসুচৌধুরী, সত্য গুহ এবং আরও অনেকে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

শিস। স্বপন চক্রবর্তী এবং সমর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১০।১ দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট। দাম একটাকা।

লিখেছেন রবীন সুর, বিপ্লব চন্দ, প্রদীপ আচার্য, নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। প্রচ্ছদ এবং ছাপা খুবই ভালো।

শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্য। (দ্বিতীয় সংকলন) সম্পাদনা অশোক চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল। ২৮ কিষণ লাল বর্মন রোড। সালকিয়া। হাওড়া ৭১১২০৬। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্যের এই সংকলনটিতে লিখেছেন, সুব্রত সেনগুপ্ত, তাপস চৌধুরী, সুনীল নাগ অমল চন্দ, রমানাথ রায় এবং পরেশ মণ্ডল।

কল্পবাণী। কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক মিত্র এবং গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১২ তেলিপাড়া লেন, কলকাতা—৪। দাম এক টাকা।

সতীদাহ প্রসঙ্গে জার্মান গ্রন্থকার : নব বিশ্লেষণ শীর্ষক নিবন্ধটি এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। এ ছাড়া শিল্প-সাহিত্য নাটক চলচ্চিত্র এবং খেলাধুলো সম্পর্কিত নিবন্ধগুলিও মন্দ নয়। আশা করব আগামী সংখ্যাটি আরও আকর্ষণীয় হবে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ ভালো।

প্রগতি। (রবীন্দ্র স্মরণ সংখ্যা)। সম্পাদক মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। ৩৯ [illegible]ভেন্ট মিশন রোড, কলকাতা—২৩ [illegible]ম পঁচাত্তর পয়সা।

কবিতা লিখেছেন দক্ষিণরঞ্জন বসু, কৃষ্ণধর এবং গোপাল ভৌমিক। অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ।

খসড়া। চন্দন সিংহরায় সম্পাদিত। ৩১বি ললিত মিত্র লেন, কলকাতা—৪। পঁচাত্তর পয়সা।

কবিতা লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্য রায় চন্দনকুমার সিংহরায় এবং আরও অনেকে।

নৈবেদ্য। সম্পাদনা সুধীরকুমার দে ও শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায়। ৪৭ রাজবল্লভ সাহা লেন। রামকৃষ্ণপুর। হাওড়া। মূল্য ৪০ পয়সা।

এ সংখ্যায় লিখেছেন পার্থসারথী চৌধুরী শিশিরকুমার মাইতি অনিলকুমার দলুই হরিহর দে এবং আরও অনেকে। সু-সম্পাদিত পত্রিকাটি পাঠকের ভাল লাগবে।

উপন্যাস

সেই সব মানুষ

মনোজ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ঘাসের একটুকু অঙ্কুর উঠেছে দেখলে খুঁটে তুলে ফেলে দেয়। খেলার এমন বন্দ জুত। পুববাড়ির দুই শরিক—উত্তরের অংশ বংশীধর ঘোষের, দক্ষিণের অংশ ভবনাথের। খেলার ব্যাপারে শরিকী ভাগ-ভাগি নেই। কুমীর-কুমীর খেলা, দুই উঠান জুড়েই জল। চারিদিককার ঘর-দুয়ার দাওয়া-পৈঠা সমস্ত ডাঙা। কুমীর হয় একজন সারা উঠোনে চক্কোর দিচ্ছে। অন্য সবাই মানুষ। এঘরের দাওয়া থেকে ও-ঘরের দাওয়ায় যাবে উঠান রূপ গাঙ পার হয়ে সে উঠান-গাঙে শিকার ধরবার জন্য কুমীর হন্তদন্ত হয়ে ঘুরছে, যাচ্ছে মানুষ মাঝ উঠান দিয়ে, দু হাত নেড়ে সাঁতারের ভঙ্গীতে—গাঙের এপারের ঘাট থেকে ওপারের ঘাটে যাচ্ছে যেন। মাঝে মধ্যে মুখে মুখে বলছে ঝাপ সুঝুপুস অর্থাৎ গাঙের গভীর স্রোতে মনের সুখে ডুব দিচ্ছে। কুমীরও আছে তক্কে তক্কে—ওকে খানিক তাড়া করল, কিন্তু আসল তাক একটার উপরে—আড় চোখে লক্ষ্য রাখছে। এক দৌড়ে হঠাৎ তার কাছে গিয়ে চড়াৎ করে পিঠে এক থাপ্পড়। কুমীর যে ছিল সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষ, আর যাকে মারল সে কুমীর হয়ে গেল।

কোনদিন বা কানামাছি খেলা। কাপড়ের মুড়োয় আচ্ছা করে চোখ বেঁধে একজনকে উঠানে ছেড়ে দিল। চোখ ঢাকা কানামাছি সে। কাছাকাছি সব—দূরে কেউ যাবে না নিয়মই তাই। আন্দাজে একমুখো দৌড়ে কোন একজনকে ধরেই কানামাছি নাম বলে দেবে। বলা ঠিক হয়েছে তো তাই এবার চোখ বাঁধতে হবে। আগের জন চোখের বাঁধন খুলে ফেলল।

বাপের বাড়ী যাবার সময়েই উমাসুন্দরী সম্মুখ উঠোনে কিছু ধানের পালা দেখে গিয়েছিলেন। আগম ফলন সে-সব ধানের সম্মুখ পিছন সব উঠোনেই এবার ধান এসে পড়ছে। ফি বছরই আসে এই রকম—গাঁয়াতলীতে ভাইয়ের কাছে এই জন্যে তাঁর সোয়াস্তি ছিল না। মাঠ ছেড়ে আঙিনার উপর মা-লক্ষ্মীর শুভ আগমন—হেন সময় বাড়ির গিন্নি গরহাজির, কেমন করে হয়?

ধান সমস্ত পেকে গেছে। ধান কাটার পুরো মরশুম এখন। জন-মজুরের দুনো তেদুনো দাম—কোন কোন অঞ্চলে এমন কি পুরো টাকা অবধি উঠে গেছে। ঝাটপাট দেওয়া, নিত্যি সকালে গোবর মাটি নিকান, ঝকঝকে তকতকে উঠান, সাধ মিটিয়ে [illegible] ইচ্ছে করে।

ধান এসে এসে পড়ছে, সদর-অন্দর কোন উঠোনেই জায়গা আর খালি থাকছে না। সারা দিনমান বিলে মাঠে ধান কাটে সন্ধ্যাবেলা বাঁকে বয়ে আঁটি এনে এনে ফেলে। আদুরে ছেলেপুলে কাঁধে তুলে নাচায় না—তেমনি ঢঙে বাঁকের এ-মাথায় আর ও-মাথায় আঁটিগুলো নাচাতে নাচাতে নিয়ে আসে। কাঁচা ধানের সোঁদা সোঁদা গন্ধ—গ্রামের সুঁড়িপথ ধরে আসে, চারিদিক গন্ধে আমোদ করে দেয় নাক টেনে টেনে সেই গন্ধ বেশী করে শুঁকতে ইচ্ছে করে।

ধান কাটার আরও জোর এবারে। পাকা ধান ক্ষেতের কাদা মাটিতে ঝরে লোকসান না ঘটে। লোক লাগান হল বেশী—অনেক বেশী—আঁটি বওয়া এখন আর বাঁকে কুলোয় না, গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে বিল থেকে আসছে। মাঝ বিলে এখনও জল—কাদায় জলে চাকা বসে যায়, গরুতে টেনে পারে না তো মানুষে টেনে আনে ধানের গাড়ী। গ্রাম পথে বোঝাই গাড়ীর কাঁচকোঁচ আওয়াজ—পারিনে আর এক বোঝা বয়ে আর পারিনে, আর পারিনে এমনতর যেন আর্তনাদ। উঠোনের উপরে এসে বোঝা খালাস—আঁটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। যেখানে থাকুন ভবনাথ এই সময়টা ঠিক এসে দাঁড়াবেন : কোন ধানটা নিয়ে এলে নিতাই? তোমার কোন ধান পাঁচু সর্দার? অর্থাৎ কোন জমির উৎপন্ন ধান কোন গাড়ীতে এলো, সেই জিজ্ঞাসা। বলছেন এই ধানে ঐ ধানে মিশে না যায় দেখো। জমির [illegible] নাম শুনে শুনে কমল যেন এটুকু ছেলেরও সব মুখস্থ হয়ে গেছে : বড়বন্দ, ছোটবন্দ, তেলিপাচক, ঘুঘুর চর, মোল্লার ভুঁই, কুয়ার পাড় ইত্যাদি।

আঁটির পর আঁটি পড়ে এক একদিকে গাদা হয়ে যায়। এর পরে পালা সাজান। গোল করে সাজিয়ে যাচ্ছে মাটি থেকে উঁচু হয়ে উঠছে ক্রমশ। একজন পালার উপর, আর একজন ধানের আঁটি হাতে তুলে দিচ্ছে। পালা আরও উঁচু হল তো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে তখন।

বেশ রাত হয়েছে। টেমি জ্বলছে দাওয়ায়। গল গল করে ধোঁয়াই উঠছে, আলো আছে কি নেই। জোনাকী উড়ছে, আকাশে তারা। বিলের হাওয়া আসছে হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। ভাই-বোনে এক পিঁড়িতে—কমলের দোলাইখানা দুজনেই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। খাসা ওম লাগছে। হাট করে রান্নাঘরের দাওয়ায় হাটবেসাতি এনে নামাল, কাজকার্মের বস্তু ধর্ম—মাছ [illegible] তরিতরকারি কোটা। আর ভাই-বোনে এদিকে দোলাই গায়ে জড়িয়ে মগ্ন হয়ে ধানের পালা দেওয়া দেখছে। সন্ধ্যায় নিজেরা খেলাধুলো করেছে, এ যেন চাষীদের আলাদা এক খেলা। খেলা দেখাতেও মজা খুব। শিশুবর কি অটল তামাক খেতে খেতে এসে কলকে বাড়িয়ে ধরছে : দু-টান টেনে নাও গো, জাড়ের ভাবটা কেটে যাবে। কলকে টানতে টানতে গগন সর্দার বলে, গায়ের ঘাম মরে গেছে, তা বলে জাড় তো পাচ্ছিনে। অটল বলে, কাজে আছ, টের পাচ্ছ না। বাড়ি যাবার সময় ঠেলাটা বুঝো।

হাই উঠছে ভাই-বোনের। তারপরে এক সময় গিয়ে বিছানায় পড়ে। তরঙ্গিনীর বিছানায় ঘুমিয়ে জড়াজড়ি হয়ে আছে। রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে সবাই শুতে এলেন ঘুমন্ত পুঁটিকে খানিকটা জাগিয়ে তুলে দুই ডানা ধরে উমাসুন্দরী নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন। কোন দিন হয়তো পুঁটিকে বেশি ঘুমে ধরেছে,—তুলে ধরছেন, গড়িয়ে পড়ছে আবার সঙ্গে সঙ্গে। উমাসুন্দরীর করুণা হল : মেয়ে আজ তোমার এখানেই থাক ছোটবউ। ছোটবউ তরঙ্গিনীর কিছু আপত্তি : আমার এখানে কেন আনবে দিদি? খোকার শোওয়া খারাপ। পেটের উপর ঠ্যাং চাপিয়ে দেবে, রাত দুপুরে শুম্ভু-নিশুম্ভুর যুদ্ধ বেধে যাবে।

ঘুমন্ত মেয়ের এলিয়েপড়া অসহায় করুণ মুখের দিকে চেয়ে উমাসুন্দরী চটপট উঠলেন : কেন দিচ্ছ কেন? এই অবস্থায় টেনে নিয়ে যাই কেমন করে? পেটে জায়গা দিয়েছ একটা রাত পাশে একটা জায়গা দিতে পারবে না।

কিন্তু আরও যে আছে। উমাসুন্দরী নিজেই সারারাত্তির এপাশ-ওপাশ করবেন, কোল খালি-খালি ঠেকবে। তরঙ্গিণীর সেটা ভাল-মতন জানা। হাসলেন তিনি জায়ের কথার উপরে সেদিন কিছু বললেন না। সয়ে-টয়ে রইলেনও উমাসুন্দরী—কিন্তু মেয়ে ঘুমের মধ্যে ঠাহর পেয়েছে, জেঠাইমা নেই। বায়না ধরল : দিয়ে এসো জেঠাইমার কাছে। হবেই দিতে, নয়তো কেঁদেকেটে অনর্থ করবে। তরঙ্গিণী তখনকার [illegible] শোধ নিলেন : বলেছিলাম না দিদি?

মেয়ের রকম-সকম দেখে উমাসুন্দরী হাসলেন। তরঙ্গিণী বললেন, ঘুমিয়ে পড়ুক আর যাই হোক তোমার সোহাগী মেয়ে তুমি নিজের কাছে নিয়ে নেবে। রাত দুপুরে আমি ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারব না।

অম্বিক দত্ত চাকরিতে চললেন। ধান-চাল উঠেছে—সারা অঞ্চলের লোকের হাতে-গাঁটে পয়সা, মনে স্ফূর্তি। [illegible] যা চলে সে সমস্ত তাদেরও অল্পবিস্তর

ছাই বইকি। এক জিনিস পাঠশালা—যত্রতত্র এখন পাঠশালা বসাচ্ছে। মরশুমি পাঠশালা—জ্যৈষ্ঠ, অবধি খাসা চলবে। বর্ষার সঙ্গে চাষবাসের তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে। গোলাআউড়ির ধানও ওদিকে তলায় এসে ঠেকেছে—পাঠশালা এবং ভদ্রজনোচিত অন্যান্য ব্যাপারগুলো মুলতুবি আপাতত। মা-লক্ষ্মী মেনে দেন তো সামনের শীতে আবার দেখা যাবে। সেই শীত এসে গেছে, ছাতা ও পুঁটলি বগলদাবায় নিয়ে অম্বিক চললেন।

বয়স হয়েছে, বাদা অঞ্চলে পড়ে পড়ে নোনাজল খাবার মোটেই আর ইচ্ছে ছিল না। গ্রামে থেকে বউ-ছেলেপুলে নিয়ে সংসার ধর্ম করবেন ভেবেছিলেন। পাঠশালার কাজটাও জুটে গিয়েছিল। দিব্যি চলছিল—নচ্ছার ইনস্পেকটররা এসে সমস্ত গড়বড় করে দিল। যেতে হবে অতএব, না গেলে পেট চলবে কিসে? ছাতা ও চটিজোড়া ইতিমধ্যে তালিতুলি দিয়ে ঠিক করে নিয়েছেন। পাঁজিতে যাত্রা শুভ দেখে নিয়ে দুর্গা দুর্গা বলে প্রহর রাত্রে অম্বিক ঘর থেকে যাত্রা করে বেরুলেন। মন ভারী পা দুটো আর চলতে চাইছে না। পাকে এখন চলতে বলছেও না কেউ। পুবপোতার পাঁচচালা ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তর পোতার দোচালা ঘরে ওঠা—বুড়ি শাশুড়ির যে ঘরে স্থিতি। শাশুড়ি আজকের রাতের মতন পাঁচচালা ঘরে মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে শোবেন। ভোরে অম্বিক চলে যাবার পর নিজস্থানে ফিরবেন আবার।

ভোরবেলা বড় কুয়াসা। একহাত দূরের মানশযটাও নজরে আসে না। বুড়ো থুথুড়ে শাশুড়ি কাঁপতে কাঁপতে তারই মধ্যে কোলের মেয়েটা এনে তুলে ধরলেন। এই একফোঁটা বাচ্চা বাপের বড় ন্যাওটা। সবে কথা ফুটেছে, বা-বা-বা-বা করে, অম্বিককে দেখলেই হাত বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ কোলে তুলে নাও। শাশুড়ি বাচ্চার একটি হাত অম্বিকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন অম্বিক একটা আংগুল মুখের ভিতর দিয়ে আলগোছে দাঁত ঠেকালেন। দাঁতের কামড়ে মায়ার বন্ধন কেটে দিলেন যেন। এই প্রক্রিয়ার পর বাপের অদর্শনে মেয়ের শক্ত রোগপীড়া হবার ভয়টা গেল। শীত করছে বলে অম্বিক মোটা সুতি চাদরটা পিরহানের উপর জড়ালেন, পুঁটলি আর ছাতা বগলদাবায় নিয়ে নিলেন। পুঁটলির মধ্যে গমছা, হাতচিরুনি, অতিরিক্ত কাপড় একখানা এবং চটিজোড়া। পরনে আছে কাপড় ফতুয়া ও পিরহান। পিরহানের পকেটে খুচরা আট আনা পয়সা। সর্বসাকুল্যে এই নিয়ে যাচ্ছেন। অধিক আর কিসে লাগবে, দিচ্ছেই-বা কে? এই সম্বলেই, কপালে থাকলে আষাঢ়ের গোড়ায় ফিরে আসবেন ডিঙিগর খোল ধানে বোঝাই করে পিরহান ও ফতুয়ার পকেট টাকায় বোঝাই করে। নতুন নয়, এর আগেও ফিরেছেন রণ জয় করে আসার মতন। তবে বয়স খানিকটা বেড়ে গেছে, এই যা। শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে দুর্গা দুর্গা করে অম্বিক উঠান পার হলেন। রাস্তায় পড়ে হনহন করে চললেন। ছেলেপুলেগুলো ঘুম থেকে ওঠেনি। বউ বেড়ার উপর চোখ দিয়ে রয়েছে, না দেখেও বুঝতে পারছেন। চার ক্রোশ দূরে কানাইডাঙগার ঘাটে হাজির হবেন জোয়ারের জল থমথম হবার আগেই।

এসে গেছেন ঠিকঠাকে, দেরি হয়নি, বাদা অঞ্চল সকলের বড় হাট কুমিরমারি। হাটবার কাল সকাল থেকে সমস্ত দিন হাট চলবে। খান পনেরো হাটুরে ডিঙি ছাড়ি-ছাড়ি করছে। একহাঁটু কাদা-মাটি মেখে অম্বিক ঘাটে এসে পড়লেন: আমি যাবো—

এই কানাইডাঙগার ঘাট থেকে হাটুরে নৌকোয় আরও কতজন উঠেছেন। গুরুমশায় বলে অনেকেই চেনে অম্বিককে। ডিঙিতে উঠবেন জিজ্ঞাসাবাদের কিছু নেই— যেটায় খুশি উঠে পড়লেই হল।

হাটুরে নৌকোয় ভাড়া বলে কিছু নেই। মালপত্র বিক্রি হয়ে যাক, একটা কিছু তখন ধরে দিও। নানান সওদা নিয়ে ব্যাপারিরা হাটে যায়—যখনকার যে জিনিস। এই এখন যেমন নিয়ে যাচ্ছে খেজুরগুড় ডালকলাই তরিতরকারি আখ তামাক ইত্যাদি। কিনে আনবে ধান। অম্বিকের মালই নেই, অতএব কিছুই লাগবে না, একেবারে মুফতে যাওয়া। তবে একটা নিয়ম, চড়ন্দারকে বোঠে বেয়ে দিতে হবে। অম্বিক পিছপাও নন—চাদর পিরহান ফতুয়া খুলে বোঠে হাতে নিলেন। দিয়েছেনও দুটো চারটে টান—মাঝি হয়ে পাড়ানে বসেছে, সেই লোক হাঁহাঁ করে উঠল: আপনি কেন? বসুন ভাল হয়ে। বিদ্বান গুরুমশায়—মান্যে—বোটে মানা কি আপনার সাজে?

গলুই থেকে এক ব্যাপারি রসান দিয়ে উঠল: জানোনা তাই। বোঠে মারারও গুরুমশায় উনি। হাতে ধরে এ-বিদ্যেও শিখিয়ে দিতে পারেন।

মাঝি জেদ ধরে বলল, বোঠে কেন ধরবেন, আপনি গুরুমশায় তামাক ধরুন। নিজে খান, আমাদের সকলকে একটু একটু প্রসাদ দেন।

অর্থাৎ, তামাক সাজার দায়টা অম্বিকের উপর। গাংগের কনকনে হাওয়ায় শীত ধরেছে দস্তুরমতো চাদরে কুলোচ্ছে না। অতঃপর যতবার ইচ্ছে খুশীমতন তামাক সেজে নেওয়া যাবে। এদের তামাক দা-কাটা—অতিশয় ভালোক, গাঁজার দোসর। এ-তামাকের ধোঁয়ায়, শীত তো শীত, বাদাবনের বাঘ অবধি পালাতে দিশা পায় না। ছোট্ট ডিঙির দু-পাশ দিয়ে দশ-বারোখানা বোঠে পড়ছে সমতালে। জলে আলোড়ন। গাং ক্রমশ ভয়াল হয়ে উঠল? এপার-ওপার দেখা যায় না। হাটুরে ডিঙিগুলো এক ঝাঁক পানকৌড়ির মতন জলের উপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে।

ডিঙি অনেক রাতে কুমিরমারি পৌঁছল। পুবে আর দক্ষিণে অকূল গাং, আর দুইদিকে আদিগন্ত আবাদ। উভয় নদীর পাড় ঘেঁসে উঁচু ফালি জমির উপর অগণ্য চালাঘর। হপ্তার মধ্যে একটা দিন শুধু হাট। হাটের আগের রাত্রি থেকে লোক জমে। লোক চলাচলের একমাত্র উপায় নৌকো-ডিঙি—পায়ে হাঁটার পথ যৎসামান্য। গাংগের ঘাটে অতএব নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ—সে এমন, একহাত জায়গা কোথাও পড়ে নেই। এক নৌকোর গা ঘেঁসে অন্য নৌকো। তারপরে নৌকো আর মাটিতেই কাছি করতে পারে না। অন্য নৌকোর গুড়োয় সঙ্গে বেঁধে রাখে। সেই নৌকোর সঙ্গেও আবার অন্য নৌকো। এমনি করে করে প্রায় মাঝ গাং অবধি নৌকোয় নৌকোয় এঁটে যায়। নামবার সময় এ-নৌকো থেকে সে-নৌকো, সেখান থেকে ও-নৌকা—নৌকো পালটে পালটে এগোয়। হাটের দিনটা এইরকম। হাটঅন্তে সন্ধ্যা থেকে নৌকোরা সব ঘরমুখো ফেরে, ভিড় পাতলা হতে থাকে। পরের সকাল থেকে হাট শূন্য, বিশাল প্রান্তরের মধ্যে চালাগুলো খাঁ-খাঁ করে। হাটবার না আসা অবধি এক নাগাড় এইরকম চলল।

হাটুরে ডিঙিতে ছই থাকে না। ছইয়ে বাতাস বেধে গতি বাধা পায়। চতুর্দিক ফাঁকা, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অম্বিকের হাতে হাড়ে ঠকঠাক [illegible] [illegible] শীত

মানায় না। অমবস্যার কাছাকাছি সময়, কিন্তু অন্ধকার হলেও ঝাপসা ঝাপসা সবই নজরে পড়ে। তোলা-উনুন নৌকো থেকে উপরে তুলে নিয়ে এসেছে অনেকে, অথবা শুধুমাত্র তিনটে গোঁজা পুঁতে উনুন বানিয়েছে। উনুন ঘিরে আহার্থীরা গোল হয়ে বসে আছে, চালটা খানিক ফুটে গেলেই পাতে পাতে ঢেলে দেবে। অম্বিকও ঘোরাঘুরি করছেন উনুনের ধারে ধারে। ভাতের জন্য খায়—গামছার মুড়োয় বেঁধে কিছু চিঁড়ে এনেছেন; নৌকোয় বসে তারই চাট্টি জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিয়েছেন। উনুনের ধারে কাছে একটু গরম জায়গা খুঁজছেন তিনি। কিন্তু সূচাগ্র জায়গা কেউ দেবে না। উনুনে ভাত রাঁধবে এবং উনুন ঘিরে শুয়ে পড়বে—হাটখোলায় যত্রতত্র উনুন ধরিয়েছে এইজন্য। হাঁটছেন এ-উনুনের কাছ থেকে সে-উনুনে—জোর হাঁটনায় শীত কম লাগে। সম্ভব হলে শীতের রাত্রি এমনি হাঁটাহাঁটি করে পুইয়ে দেবেন। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে—ক্লান্ত হয়ে একসময় কেওড়াগাছের গোড়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে পড়লেন। সকালবেলা হাটের হৈ-চৈ-এর মধ্যে ধড়মড় করে উঠে দেখলেন, একটা কুকুর তাঁর মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে পায়ের দিকে।

বেলা বাড়ল। লোকারণ্য। পিঁপড়েখালির মাতব্বরটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—কী নাম যেন—গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পরপর দুই মরশুম অম্বিক ঐ গ্রামে পাঠশালা করে এসেছেন। মাতব্বর কলরব করে উঠল ঃএই যে গুরুমশায়। ধান-চাল উঠে গেল—কত গুরু কত ডাক্তার-বাদ্যি হাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো— চক্কোর মারতে লেগেছেন আমাদের অম্বিক গুরুমশায়ের দেখা নেই। ভাবলাম ভুলেই গেছেন বা।

সে কী কথা অম্বিক গদগদ হয়ে বললেন, গাঁয়ে-ঘরে ছিলাম প্রাণটা মাতব্বর মশায় সর্বক্ষণ কিন্তু আপনাদের কাছে পড়েছিল।

মাতব্বর বলে, এমনি ডুব মারলেন—খোঁজখবর কত করেছি এ-দিগরেই আর পদধূলি পড়েনি।

আসতে দিল না যে! চেষ্টার কসুর করিনি। গ্রামবাসী সব আটকে ফেলল। বলে, গাঁয়ের ছেলেপুলে মুখ্য হয়ে থাকবে আর তুমি কাঁহা কাঁহা মুল্লুক বিদ্যেদান করে বেড়াবে। কিছুতে সেটা হবে না। এরকম নজরবন্দী করে রাখা—কী করব বলো। মণ্ডপে বসে বসে পাঠশালা করি, আর তোমাদের কথা ভাবি—

ইতিমধ্যে এ-গ্রাম সে-গ্রামের আরও দশ-পাঁচটি চতুর্দিকে জড় হয়েছে। অম্বিক গলায় বাড়ানো কথা বলছেন আর [illegible] দিয়েছেন গোকুলগঞ্জের [illegible]

বলছেন, এবারে আট-ঘাট বেঁধে কাজ করছি। মনের মতলব ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হতে দিই নি। রাত দুপুরে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছি।

পিঁপড়েখালির মাতব্বর বসে খাসা করেছেন। চলেন আমাদের নৌকোর গোল-কাড়ের ঐ খানটা নৌকো।

তালডাঙা ধরাধরি করছে ঃ সেই একবার গিয়েছেন গুরুমশাই, আমার ক্ষেতের কালজিরে-ধান দিয়েলাম, খয়েধান দিয়েলাম, মনে পড়ে না? আয়েন্দা সন আসবানে, জনে জনেরে করে আইলেন—তা ওঃ মুখো মোটে আর হলেনই না। ধরিছি আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই।

গোকুলগঞ্জের লোকটি নাছোড়বান্দা। বলে উঠাত গপ্প আমাদের। নতুন পাঠশালা পাব, মেঝে, টিনের ছাউনি।

মৃণাল রায়

বক্রেশ্বর কুণ্ডের সম্ভাবনা

বক্রেশ্বরের উষ্ণ কুণ্ডগুলির নানা সম্ভাবনা নিয়ে আবার আলোচনা হচ্ছে। ভূগর্ভের তাপকে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার, হিলিয়াম ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় বিরল গ্যাসের সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকল্প রচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বিষয়গুলি জটিল, আরও অনেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দরকার যা সময় ও খরচের ব্যাপার। সে অনুসন্ধানের সবগুলিই ঠিক রাজ্য সরকারের নিজস্ব আওতায় নেই। অনেকগুলিই একটি জাতীয় নীতি অনুযায়ী চালাতে হবে। কিন্তু এই কুণ্ডগুলির একটি সহজ আশু সম্ভাবনার দিকে সাধারণের দৃষ্টি পড়লে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপারে ও বেকার সমস্যার সমাধানের কাজে কিছু সুরাহা হতে পারে।

উন্নত অনেক দেশে শীতল ও উষ্ণ জলের কুণ্ডগুলি জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। সেগুলির জলে রোগ নিরাময়ের গুণ সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও জনশ্রুতি কুণ্ডগুলিকে প্রসিদ্ধ করে তুলেছে। তারপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল সেই বিশ্বাস ও জনশ্রুতিকে এমন একটা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে যে কুণ্ডগুলির কাছে এমন বড় বড় নিরাময় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং কুণ্ডগুলির জল লক্ষ লক্ষ বোতলে ভরে শুধু নিজের নিজের দেশেই নয় বিদেশেও বিক্রির জন্যে চালান করা হচ্ছে। দেশী বিদেশী অসংখ্য স্বাস্থ্যান্বেষী এইসব নিরাময় কেন্দ্রে আসেন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া বোতলে-ভরা বিশেষ বিশেষ কুণ্ডের জল পান করেও নানা ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পান অনেকে। জার্মানির Trinquelle Marienquelle Appollinaris ফ্রান্সের Aix-les-Bains, Vichy দক্ষিণ আমেরিকার Aronduck কলোরেডোর Maniton ক্যালিফোর্নিয়ার Taylor spring সুইডেনের Mog পর্তুগালের Caria. ইটালির Roman well ইত্যাদির জল সীলকরা বোতলে নানা দেশে ঔষধ হিসাবে দোকানে দোকানে কিম্বা নিছক পানীয় জল হিসাবে হোটেল রেস্তোরায় পরিবেশিত হয়। বিদেশে বড় বড় হোটেলে পানীয় বলতে সুরা ব্যতীত শুধু কুণ্ডের খনিজ ঘটিত জলেরই প্রচলন দেখা যায়। ভারতেও ইংরেজ আমলে নামকরা হোটেলগুলিতে এবং বড় বড় বিভাগীয় বিপণিতে ও ঔষধের দোকানে বিদেশী কুণ্ডের জল বিক্রী হত প্রচুর পরিমাণে। অবশ্য সে সবের ব্যবহার বিদেশী ট্যুরিস্ট ও দেশী অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আমদানীর নানা অসুবিধার জন্যে সেগুলির ব্যবহার কমে গেছে। তবুও দিল্লী ও বোম্বইয়ে খুব বড় বড় হোটেলে এখনও কিছু পরিমাণে বিদেশী কুণ্ডের জল রাখা হয় শৌখীন খরিদ্দারদের ব্যবহারের জন্যে।

পানীয় ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত কুণ্ডের দুটি দিক আলোচিত হয়েছে। একটি বিশেষত্ব খনিজ-লবণ ঘটিত, অন্যটি তেজস্ক্রিয়তাজনিত। এমন অনেক প্রসিদ্ধ কুণ্ড আছে যাদের জলে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ লবণ (ও গ্যাস) এবং তেজস্ক্রিয়তা, দুইই আছে। এক সময় এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রাকৃতিক কুণ্ডগুলির রোগ নিরাময় ক্ষমতা কেবল তেজস্ক্রিয়তার জন্যই সম্ভব হয়। এখন অবশ্য সবাই স্বীকার করেন, তেজস্ক্রিয়তা প্রাকৃতিক কুণ্ডগুলির অনেক গুণের মধ্যে একটি, এবং তেজস্ক্রিয়তা না থাকলেও অনেক কুণ্ডের জলের নিয়মিত ব্যবহার অনেকের পক্ষেই স্বাস্থ্যপ্রদ হতে পারে। দ্রবীভূত খনিজ লবণের বা অন্য গ্যাসের প্রকৃতি ও অনুপাত অনুযায়ী কুণ্ডের জল কোথাও অম্ল, কোথাও ক্ষার, আবার কোথাও বা গন্ধকপ্রধান বলে পরিচিত হয়। গুণাগুণেরও তারতম্য ঘটে। অনুরূপভাবে তেজস্ক্রিয়তাজনিত জলের গুণ ও দ্রবীভূত তেজস্ক্রিয় লবণ বা গ্যাসের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী কম-বেশি

হয়। তেজস্ক্রিয় লবণ জলে দ্রবীভূত থাকলে সে তেজস্ক্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু অধিকাংশ কুণ্ডের জলেই তেজস্ক্রিয়তা স্বল্পস্থায়ী। এগুলির তেজস্ক্রিয়তার উৎস হল রেডন গ্যাস যা মাটির অনেক নীচে রেডিয়াম বা অন্য ধাতুর লবণসমূহ শিলাস্তরের ফাটল থেকে আণবিক বিভাজনের ফলে নিঃসৃত হয়। এক উৎস থেকে আসা কুণ্ডের জলের ধারা যখন ঐ সমস্ত ফাটলের পাশ দিয়ে আসে তখন সে জলে সহজেই মিশে গিয়ে কুণ্ডের জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

বক্রেশ্বরে যে আটটি কুণ্ড আছে, তাদের জলের তাপমাত্রা, তেজস্ক্রিয়তা ও দ্রবীভূত খনিজ পদার্থের প্রকৃতি ও অনুপাত একরকম নয়। যেমন শ্বেতগঙ্গা ও জীবন কুণ্ডের জলের তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের মত এবং তেজস্ক্রিয়তা প্রায় নগণ্য। অথচ ক্ষারকুণ্ড ও অগ্নিকুণ্ডের জলের তাপমাত্রা যথাক্রমে ৬৬ ডিগ্রি ও ৬৭ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড এবং তেজস্ক্রিয়তা জলের প্রতি লিটারে ৫-৭৮ ও ৭-৩ মিলি মাইক্রোকুরি। ভৈরবকুণ্ডের জলের তাপমাত্রা ৬১-৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড ও তেজস্ক্রিয়তা ১০-২ মিলি মাইক্রোকুরি। এত কাছাকাছি থাকা কুণ্ডগুলির জলের প্রকৃতি বৈষম্য বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময়ের কারণ। কুণ্ডগুলির উৎস একই কিনা এ সম্বন্ধেও আজ সন্দেহের অবকাশ আছে। মেঘমুক্ত রাত্রির শেষে ভোরের দিকে সৌভাগ্যকুণ্ডের জল দুধের মত শাদা দেখায়, অথচ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা স্বচ্ছ হয়ে যায়। এও এক দুর্বোধ্য ব্যাপার।

কিন্তু সে যাইহোক, সাধারণভাবে এটা বলা যায়, বক্রেশ্বরের কুণ্ডের জল মৃদু ক্ষারধর্মী। প্রধানত সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়ামের কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট আয়ন, এবং সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস জলে বর্তমান আছে। ধর্ম অনুযায়ী এই কুণ্ডগুলির জলকে ফ্রান্সের vicliy কুণ্ডের জলের তরলায়িত সংস্করণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লিখিত খনিজ দ্রব্যের গুণের কারণে বক্রেশ্বরের জল যকৃতের পীড়া, রক্তাল্পতা, জণ্ডিস, বাত, অস্থি ও পেশীর বেদনা, অম্লশূল, একজিমা, নানা চর্মরোগ অথবা ফুসফুসের পুরানো শ্লেষ্মা ইত্যাদির চিকিৎসায় সুফল দেয়।

জলে তেজস্ক্রিয়তা অন্তত কত পরিমাণ থাকলে শরীরের কোন উপকার সম্ভব, কিম্বা কত পরিমাণের ঊর্ধ্বে গেলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে সে সম্বন্ধে গবেষণা এ পর্যন্ত প্রচুর হলেও এখনো মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবুও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল আলোচনা করে পণ্ডিতেরা মনে করেছেন অন্তত লিটার প্রতি জলে ১০ মিলিমাইক্রোকুরি তেজস্ক্রিয়তা না [illegible] উপযুক্ত — জলে আছে না। এ তথ্য মেনে নিলে ভৈরবকুণ্ডের জলকে উপযুক্ত তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন বলে ধরা যায়। বলা হয়েছে উপযুক্ত তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন কুণ্ডের জল স্নায়ুর উত্তেজনাকে প্রশমিত করে, ব্যথার উপশম আনে, কোষ্ঠ রসায়ন বিক্রিয়াকে সাহায্য করে সুনিদ্রা ঘটায়, এবং হজমশক্তি বাড়ায়। বক্রেশ্বরের কুণ্ডের জলে তেজস্ক্রিয়তাজনিত যে ধর্ম তার সুফল পেতে হলে কিন্তু জলের ব্যবহার সংগ্রহের দশ দিনের মধ্যে করতে হবে, কেননা তারপর এ জলে তেজস্ক্রিয়তা আর থাকে না। কিন্তু খনিজ পদার্থঘটিত জলের যে গুণ তা বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকতে পারে। যদি অবশ্য উপযুক্ত আধারে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় জলকে রাখা যায়।

উক্ত জলের কুণ্ডগুলির রোগ নিরাময়ক্ষমতা তিনটি উপায়ে কাজে লাগানো যেতে পারে,—অবগাহন, ঘ্রাণ ও পান। প্রথম দুটির জন্য বক্রেশ্বরে যাওয়া বা থাকা দরকার, কিন্তু তৃতীয় উপায়টি পরিবহণযোগ্য। নির্দোষ জীবাণুমুক্ত পরিবেশে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুণ্ডের জল উপযুক্ত মাপের বোতলে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত করা গেলে সহজেই সেগুলি বিভিন্ন স্থানে ট্রাকযোগে বা ট্রেনযোগে পাঠিয়ে বিপণন ব্যবস্থার দ্বারা সাধারণের মধ্যে বিতরিত হতে পারে। সংগ্রহণের কারখানা ও লেবরেটারিতে কর্মসংস্থান ছাড়াও পরিবহণ ও বিপণন কাজে অনেক লোক জীবিকা অর্জন করতে পারে। প্রকল্পের সার্থক প্রসার ঘটলে বক্রেশ্বরে একটি বোতল তৈরির কারখানাও তৈরি করা যেতে পারে। এবং শুধু টুরিস্ট লজ নয় ভাল একটি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের কথাও চিন্তা করা যেতে পারে। খনিজ উন্নয়ন ও ঔষধশিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের মালিকানায় আজ দুটি পৃথক কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। স্বল্প মূলধনে এরূপ একটি ব্যবসায়িক প্রকল্প রচনা হয়ত খুব কঠিন কাজ নয়।

ভারতে আজ ৩০০টিরও বেশি প্রসিদ্ধ কুণ্ড দীর্ঘদিন ধরে রোগ নিরাময়ের গুণসম্পন্ন জলের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু একটিও আজ পর্যন্ত কোন ব্যবসায়িক প্রকল্পের আওতায় আসেনি। পশ্চিমবাংলায় এর সূচনা হলে ভারতে একটি নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। নানা কারণে আজ শহরাঞ্চলের পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থাগুলি বিপর্যস্ত, শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, গুণের দিক থেকেও। ফলে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলগুলিতে সাধারণের মধ্যে পেটের নানা পীড়ার প্রকোপ দেখা যায়। বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলি সম্বন্ধে নানা বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দীর্ঘদিন ধরে চলছে, দেশের, বিদেশের বহু বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক এর জল নিয়েও গবেষণা করেছেন। বক্রেশ্বরের জলের খনিজ লবণ, গ্যাস ও তেজস্ক্রিয়তার বিশ্লেষণের ফলাফল আজ অনেকেরই জানা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রণী গবেষকগণ যদি প্রকাশিত এই তথ্যগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করে এই জল কি কি রোগে কি পরিমাণে এবং কেন ব্যবহার করা সমর্থনযোগ্য তা সাধারণকে জানবার সুযোগ দেন ভালো হয়। বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলি ঘিরে নানা ধরনের কিম্বদন্তী ও বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে, সেগুলির একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব হয়। এবং তা হলে একটি ব্যবসায়িক প্রকল্পেরও সফল্য সুনিশ্চিত হতে পারে।

(আলোকচিত্র ইন্দিরা শিক্ষায়তনের সৌজন্যে)

জীবনকে গানের মধ্যে দিয়ে এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন রচয়িতার গানে আমার হয়নি।

সাহানা দেবী

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগের শিল্পী-দের প্রধানাদের অন্যতমা সাহানা দেবী শুধুমাত্র খ্যাতিমানা গায়িকাই ছিলেন না। তিনি কবির অতি অন্তরঙ্গ মহলের মানুষ এবং গানের রূপায়নের ক্ষেত্রে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের মানস-কন্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর গানের সম্বন্ধে কবির অকুণ্ঠ সাধুবাদের দীপ্ত স্বাক্ষর আছে একটি ঐতিহাসিক চিঠিতেঃ—

'তুমি যখন আমার গান করো শুনে মনে হয় আমার রচনা সার্থক হয়েছে—সে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি তুমিও আছো—এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্য রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে।'

আর সাহানা দেবীর নিজেরই ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম ও প্রাণের কথা হোলোঃ—

'শৈশব হতে তব গীতসুধাপানে
শুনেছি গানের মর্মের কথা কানে,
শিখেছি তাহার গভীর প্রাণের ভাষা,
চিনেছি সুরের চেতনার মাঝে
কি তার নিভৃত আশা—

গানের প্রসঙ্গে সাহানা দেবীর কাছে তাঁর প্রথম প্রেরণার উৎসটির খবর জানবার আগ্রহ প্রকাশ করতেই বললেন 'আমি ছেলেবেলায় মামার বাড়ীতে মানুষ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমার মামা। মাসীমা অমলা দাস ছিলেন সুগায়িকা। তাঁর গানের রেকর্ডও তখন ছিলো। কণ্ঠে সুর আমার সহজাত। তার জন্য কোনো প্রয়াসও করতে হয়নি। মাসীমার গান শুনে শৈশবে গানের প্রেরণা বোধহয় স্বাভাবিক-ভাবেই আমার মধ্যে জেগে থাকবে।

কৈশোরে আমার গানের শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য গায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। রবীন্দ্র-নাথই তাঁর কাছে গান শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুরেনবাবুর কাছে শিখে-ছিলাম হিন্দী রাগসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের গান।

রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন আমাদের মামার বাড়ীতে। শৈশবে সেখানেই তাঁকে প্রথম দেখি। প্রথম দর্শনেই আমার শিশু-মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। সুন্দর চেহারা কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি চোখে টেঁপা-চশমা, চশমার প্রান্তসংলগ্ন কালো ফিতে সাদা পাঞ্জাবীর ওপর ঝোলানো, মাথার চুল চোখ মুখ নাক সব মিলে একটা

অপরূপ সুষমা। মাসীমাই একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। সেদিন সেই বালিকা বয়সে মাসীমার শেখানো একটি গান রবীন্দ্রনাথকে আমি শুনিয়েছিলাম। গানটি কার রচনা আমি জানি না। গোড়ার লাইন দুটি ছিলো—

'ঘুরেফিরে এমনি করে ছড়িয়ে দেবে
ফাগের রাশি
গালে লাল হবেরে ভাই, রাঙ্গা হবে
মোহন বাঁশি।'

সেদিন থেকে রবীন্দ্রনাথ যখনই মামার বাড়ীতে আসতেন, আমার খোঁজ করতেন। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে আমারও যাতায়াত শুরু হোলো। আমার ১৫ বছর বয়সে ঠাকুরবাড়ীতে মাঘোৎসবের দিন (১১ মাঘ) রবীন্দ্রনাথের 'কেন প্রেম দিলে না প্রাণে' ও 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' গান দুটি গেয়েছিলাম।

একবার মনে আছে খুব বড় গায়ক রাধিকা গোস্বামীকে দেখেছিলাম জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে গান গাইতে। সে অবশ্য বহুদিনের কথা। আমার বয়স তখন অল্পই। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বোধহয় সবে যাওয়া আসা শুরু করেছি, রাধিকাবাবুকে দেখে মনে হোলো তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁর মুখে সেদিন 'রামকেলী' রাগে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'স্বপন যদি ভাঙ্গালে' গানটি শোনবার সৌভাগ্য লাভ করি। দেখলাম কবি আমার গানের বিষয় কিছু বলে আমার সম্বন্ধে ওঁর বেশ একটা ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিলেন। এখনও কানে বাজে 'স্বপন' এর 'ন' এর উপর ওঁর সেই দানাবাঁধা গিটকিরির কাজ। আর মনে পড়ে 'ভাঙ্গালে' এর 'ভা' এর উপর মীড়ের ঠিক আগেই ঝোঁকটি ফেলার কায়দার কথা। এই গানটি কারো মুখে শুনলেই রাধিকাবাবুর কণ্ঠে শোনা গানটির সেইসব স্মৃতি ভেসে ওঠে। কি সব উদাত্ত পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠস্বরই ছিলো তখন। এখনও হয়ত আছে ওস্তাদ মহলে, কিম্বা অন্যত্রও, জানি না। কিন্তু আমরা আজকাল সাধারণত যেসব শিল্পীর গান শুনতে পাই, তাদের গলা শুনে আমাদের মন ভরে না। আমি বলছি বিশেষ ছেলেদের কথা। তাদের কারো কণ্ঠেই ওজস, পৌরুষ—এসব পুরুষোচিত শক্তিসম্পদের যে আবেদন তার কোনো পরিচয়ই পাই না। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় শক্তিহীন, দুর্বল, শুধু মিষ্টত্বেরই যেন পূজারী। অথচ গাইয়ে তারা সত্যই ভালো। সে বিষয়ে বলার কিছুই নেই। এখনকার এইসব চাপা, চাপা অস্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে আমাদের—যারা আজীবন স্বাভাবিক খোলা গলার গান গেয়ে এসেছি, প্রাণ এক এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে। মাইক আমাদের একদিক দিয়ে যেমন উপকার করেছে, তেমন এদিক দিয়ে কত যে ক্ষতি করেছে তাই ভাবি। মাইকের যুগে স্বাভাবিক গলায় কেউ আর বড় গায় না, তার মূল্যও কেউ ধরে বলে মনে হয় না। মাইকে আবার সকলের গলা সমান আসে না। কারও কারও খুবই ভালো আসে অন্যদের তুলনায়। এইজন্য প্রায়ই বলতে [illegible] ভালো মাইকের গলা' কিম্বা 'অমুকের মাইকের গলা নয়'। কারোরই আসল গলা শোনা আমাদের ভাগ্যে হয় না।

'আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিখেছেন—না অন্য গুরুর কাছে?'

'সুরেনবাবুর কথা ত আগেই বলেছি। দিনদার (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) কাছ থেকেও অনেক গান শিখেছি। স্বয়ং কবিও শিখিয়েছেন অনেক গান। দু-একটি ঘটনার কথা বলি—

...১৯১৭ থেকে ১৯২২—এই পাঁচ বছর আমি কাশীতে ছিলাম। সেই সময় একবার রবীন্দ্রনাথ কাশীতে এসেছিলেন। সে সময় তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলাম 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'গানের ভিতর দিয়ে যখন', 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়', 'সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই' 'কেনরে এই দুয়ারটুকু' 'আকাশ জুড়ে শুনিনি' 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান', 'কবে তুমি আসবে বলে' 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়' এই গানগুলি। কেবল শেখাই নয়—গানগুলি তাঁকে শুনিয়ে উত্তীর্ণ হতেও হয়েছিলো। আরো অনেক ক্ষেত্রে অনেক গান শেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো কবির কাছ থেকে।

দিনদাও শিখিয়েছেন অনেক গান। একটি মজার ঘটনা ঘটেছিলো একবার। জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোনে দিনদার ডাক পড়লো গান শেখবার জন্য। আমি রয়েছি ভবানীপুরে মামার বাড়ীতে। কিন্তু জোড়াসাঁকো যাবার কোনো যানবাহন মিললো না সেদিন। কাজেই টেলিফোনেই গান শেখা আরম্ভ হোলো। এখনকার ছেলেমেয়েরা হয়ত বিশ্বাস করবে না সেদিন দিনদার কাছ থেকে আমি টেলিফোনে গোটাদুই গান শিখেছিলাম।'

একটু থেমে আত্মগতভাবেই যেন বলে চললেন 'সে সব উদ্দীপনার অনুভূতি আজকের দিনের মানুষদের কাছে অবাস্তব বলেই মনে হবে। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা কত বেড়ে গেছে। ঘরে ঘরে এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। সর্বত্রই তার চাহিদা, তার আদর। আমাদের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এতটা প্রচলন ছিলো না সুধীসমাজে বিশেষ কোনো গোষ্ঠীতে, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলো তার সমাদর। তখনও জনসমাজ তাকে এইভাবে নিতে পারেনি। বোধকরি রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঠিক এমনটি দেখে যেতে পারেননি। আজ দেশব্যাপী তাঁর সঙ্গীতের প্রচলন দেখে একদিকে যেমন আনন্দ বোধ করি অন্যদিকে আবার নিবিড় বেদনা বোধ করি যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে গান দিয়ে গিয়েছিলেন, সে গান আর নেই, যা শুনি তাতে খুশী হতে পারি না। এ সত্য গোপন করব না। সবচেয়ে দুঃখ পাই স্বরলিপির নিগড়ে বাঁধা তার এই বন্দীদশা দেখে। চারিদিকে আঁটঘাট বেঁধে তাকে এমন করে রাখা হয়েছে যে গায়ক তার নিজের অনুভূতিকে ফোটাবার কোনো স্বাধীনতা পায় না। গানে গায়কের এ স্বাধীনতা অস্বীকার করা যায় না। নিজেকে না দিতে পারলে, নিজেকে না ফোটাতে পারলে গানও ফোটে না। গান ত শুধু স্বরলিপির মুখস্থ বুলি বা তার অনুকরণ মাত্র নয়। গানে গায়কের নিজেরও কিছু দেবার আছে।'

'আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া হিন্দী গানও গাইতেন ত?'

'গাইতাম বৈ কি? আমার হিন্দী গানের রেকর্ডও সেকালে বার করেছিলো গ্রামোফোন কোম্পানী। রবীন্দ্রনাথও সময়ে সময়ে আমার কাছ থেকে হিন্দী গান শুনতে চাইতেন। একদিন তাঁকে 'মহারাজা কেওয়াড়িয়া খোলো' আর 'প্রেম ডগরিয়া মেন করো' গান দুটি শুনিয়েছিলাম। শুনে খুব খুশী হয়ে কবি তখনই ঐ দুটি হিন্দী গানের সুরে দুটি বাংলা গান লিখে ফেললেন। 'মহারাজা কেওয়াড়িয়া'র সুরে লিখলেন 'খেলার সাথী' গানটি; আর প্রেম ডগরিয়া রূপান্তরিত হোলো যাওয়া আসারই একি খেলায়। ১৯২৩ সালে 'বসন্ত' উৎসবে কবি এ গান দুটি আমায় দিয়ে গাইয়েছিলেন।

বসন্ত বর্ষামঙ্গল শারদোৎসবের মতোই অনেকটা সংগীতবহুল ঋতু বর্ণনা। কাব্যাংশ কবি আবৃত্তি করতেন আর সঙ্গীতাংশে একক ও কোরাসে বিভিন্ন শিল্পীদের দিয়ে গানগুলি গাওয়ানো হোতো। কবির 'বিসর্জন' নাটকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। 'বিসর্জন' সেবারে তিনদিন অভিনীত হয়েছিল এম্পায়ার থিয়েটারে ১৯২৩-এর ২৫, ২৭ ও ২৮ আগস্টে। জয়সিংহের ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আর রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মূলে 'বিসর্জন' নাটকে ছিলো মাত্র পাঁচটি গান। কিন্তু আমাকে দিয়ে গাওয়াবার জন্য তিনি আরো পাঁচটি গান যোগ করেছিলেন সেবারের 'বিসর্জন' নাটকে। গানগুলি এই : 'তিমির দুয়ার খোলো', 'আমি একলা চলেছি এ ভবে', 'আঁধার রাতে একলা পাগল', 'আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে' আর 'দিন ফুরালো হে সংসারী'। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি আমার মাসীমা অমলা দাস একটি নহবৎ পার্টিতে সানাই-এ ভীমপলশ্রী রাগের বাজনা শুনে এসে সেই সুরবৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথকে শোনান। কবি সেই সুরের ওপর কথা বসিয়ে গানটি রচনা করেন। আমি মাসীমার কাছ থেকেই গানটি শিখি।'

'কবির সম্পর্কে কিছু স্মরণীয় ঘটনা, তা সুখেরই হোক বা দুঃখেরই হোক—বলুন না?

'আমার পরম সৌভাগ্য—ঐকান্তিক স্নেহের অপরিসীম দাক্ষিণ্যে কবি আমাকে ধন্য করেছেন। সুখের দিনের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; দুঃখের দিনের কথাই বলি। ১৯২৬ সালে আমি ক্ষয়রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখনকার দিনে এ ব্যাধি যেমন ভয়াবহ তেমনই মারাত্মক। একান্ত আপনার জনেরাও এই সংক্রামক ব্যাধির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। এই দারুণ সঙ্কটের দিনে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে তাঁর বাসগৃহে কোনার্কের পাশের বাড়িতে আমায় স্থান দিয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে নিজে চিকিৎসা করতেন। প্রত্যহ কপালে হাত দিয়ে দেহের তাপ নির্ণয় করতেন। আমাকে প্রফুল্ল রাখবার জন্য কত কথাই না বলতেন। জীবনে হতাশ না হবার জন্য তিনি ভগবৎকৃপার কথা শোনাতেন। বলতেন 'আমরা যখন হাল ছেড়ে দিই তিনিই তখন হাল তুলে নেন।' সে দুঃখের দিনে আমি দেবতার আবির্ভাব দেখেছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক অমূল্য সম্পদের মধ্যে একটি হোলো তাঁ ভগবানের বিষয় রচিত গানগুলি। গভীরতার অতলস্পর্শী এই গানগুলির মধ্যে আমার দুঃখের দিনে সেই দেবতাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে যেন বারবার নতুন করে খুঁজে পাই। যখনই শুনি যতবারই গাওয়া যায় ততবারই প্রতিটি গানই নতুন করে প্রেরণা দেয়। গাইতে গাইতে এমন হয় যে গান তখন আর গান মনে হয় না, হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আজও যখন গাই—

'যেদিন গেছে তোমা বিনা
তারে আর ফিরে চাহি না
যাক সে ধুলোতে,
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।'

দেখি গাইতে গাইতে তলিয়ে গেছি। প্রাণের ভেতর থেকে শুধু ঐ প্রার্থনাই ধ্বনিত হচ্ছে। এমন একটা আকুলতা জেগে ওঠে যে তন্ময় হয়ে ঘুরেফিরে কেবলই গাইতে থাকি

'কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনও যে আছে বাকি
মনের গোপনে
আমায় তার লাগি আর ফিরায়োনা
তারে আগুন দিয়ে দহ।'

ভগবানের উপর বিশ্বাসের পাল তুলে দিয়ে জীবনতরীতে বসে কবি গানের পর গান গেয়ে গেছেন—আর সেই গানের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরি আলো, তাঁরই আনন্দ।'

এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের সম্বন্ধে সাহানা দেবীর মতামত জানতে চাইলে বলেন, 'আমি এখনকার নামকরা রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের গান প্রত্যক্ষভাবে বড় একটা শুনিনি। যা কিছু শুনেছি রেডিওতে বা গ্রামোফোন রেকর্ডে। সমনা-সামনি না শুনে কারো সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা ঠিক হবে কি? তবে রেডিওতে বা গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনে মনে হয়েছে প্রায় সকলেরই সুরেলা কণ্ঠ, গাইবার দক্ষতাও অনেকের আছে। হয়ত শ্রুতিমধুর হয়, কিন্তু আদৌ প্রাণস্পর্শী হয় না। সুরের সৌকর্য আছে কিন্তু ভাবের বিকাশ নেই। গানের অন্তর্নিহিত ভাবের বিকাশ না ঘটলে রবীন্দ্রসঙ্গীত রসোত্তীর্ণ হয় না—এই আমার বিশ্বাস। ভাবের অভাব ঘটলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিগ্রহই রূপ পরিগ্রহ করে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না তাতে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে আমার অভিমত ব্যক্ত করেছি।'

যদি অপরাধ না নেন একটি প্রশ্ন করব—আপনাদের যুগে বিশেষ এক সংস্কৃতিমান সমাজেই রবীন্দ্রসংগীত সীমাবদ্ধ ছিলো। এ গান জনসাধারণের গান হয়ে উঠতে পারেনি কেন?

সংগে সংগেই উত্তর এলো যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে একটি বিশেষ সমাজে রবীন্দ্রসংগীত সীমাবদ্ধ ছিলো সেরূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাববশতঃই রবীন্দ্র-সংগীত সেকালের জনসাধারণের গান হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া আরও একটি কারণ ছিলো দেশের এক শ্রেণীর সমালোচক সেকালে জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের পক্ষে একটা প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন। দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সংগে সংগে এ ভাবটা যেমন যেমন অন্তর্হিত হয়েছে রবীন্দ্র-সংগীতও তেমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপ রায়ের গানও আপনার কণ্ঠে যেন স্ব-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত অথচ রবীন্দ্রসংগীতের সুরের ধারার সংগে এঁদের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। এঁদের কোন বৈশিষ্ট্য আপনার মনকে স্পর্শ করে?

ভাবের ঐশ্বর্য—কথার মাধুর্য ও সুরের সৌন্দর্য এই তিনের মিলন ঘটেছে যেখানে সেই সব বাংলা গানই আমার ভালো লাগে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কীর্তন বাউল ও রামপ্রসাদী গানও আমার প্রিয়। দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের গানের ধারা রবীন্দ্রসংগীত থেকে স্বতন্ত্র হলেও ঐ গুণগুলির জন্য তাঁদের গান আমার মনকে স্পর্শ করে।

আর রবীন্দ্রসংগীত?

রবীন্দ্রসংগীত সংগীত জগতের একটা নতুন দিকের দ্বার খুলে দিয়েছে। সংগীত জগতে রবীন্দ্রসংগীত একটা যুগ। এই সংগীত অন্য পর্যায়ে পড়ে। এর জাত আলাদা অভিব্যক্তি অন্যভাবের উপাদান ভিন্ন গঠন গায়কী সবই তার বৈশিষ্ট বহন করে। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের নিয়ে যায় এমন এক জায়গায় এমন এক জিনিসের আস্বাদ দেয় যে মনে হয় কি এক অনভূতির মধ্যে বাস করি যেন—ভরে যায় সব এসব ব্যক্ত করার নয় বোঝানও যায় না শুধু অনুভব করার যে পারে সেই পারো। রবীন্দ্রসংগীতেই বোধহয় প্রথম প্রতিভাত হয় কথা সুর ও ভাব কিভাবে এক হয়ে যায়। আর ব্যক্ত করে এই এক হয়ে ওঠাকে। তাঁর গানের বৈশিষ্টাই এইখানে। এই হোলো রবীন্দ্র-সংগীতে তার পরিচয়ের বিশেষ দিক। এই এক হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই ধ্বনিত হয় রবীন্দ্রসংগীতের ভিতরকার আসল সুর আর তার মাঝে ধরা পড়ে সুরের অতীত যা তাই যার স্পর্শে মুক্তি পায় রবীন্দ্রসংগীত এবং মূর্ত হয়ে ওঠে তার সৃষ্টি। সেই-জন্যেই রবীন্দ্রসংগীতকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে এক হয়ে সে কি হয়ে উঠেছে সেইটি ঠিকমতন দেখতে পারলে তাকে অন্তরে গ্রহণ করা যায় সহজেই। আমার মনে হয় আমাদের মনে যতক্ষণ প্রশ্ন যাওয়া আসা করে ততক্ষণ কোনো কিছুরই আসল মর্ম গ্রহণ বা উপলব্ধি করা যায় না।

শুধু ভক্তিভাবের গানেই আপনি সমর্পিতা না অন্য গানও গেয়েছেন?

এককালে অন্য গান যথেষ্ট গেয়েছি। এখন সাধারণতঃ ভক্তিভাবের গানই বেশী গেয়ে থাকি।

এখন কি জীবন ও গান এক হয়ে গেছে?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। তবে এই মাত্র বলতে পারি—এখনকার জীবন অধ্যাত্ম সাধনার জীবন আর গান আমার সে সাধনার অন্যতম সহায়। যখন সাধন সংগীত গাই তখন গানের সংগে একাত্ম হয়েই গেয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথের পূজার গানগুলি আমার এই অনুভূতির দিশারী হয়ে ওঠে। এসব গান আগে কতই গেয়েছি আজও গাই। আজ আরও গভীর-ভাবে তার মর্ম উপলব্ধি করি আরও গভীরতার স্পর্শ পাই। আমাদের ভিতরের চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে এসবের আবেদনও আমাদের কাছে কতই না বদলে যায়। তাই এখন যখন গাই—

'হৃদয় যাহার শতখানে ছিলো
শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে
বাঁধিলে ভক্তি বাঁধনে।'

বুঝতে পারি কেন চোখের জল বাধা মানে না। লুটিয়ে পড়ে হৃদয় কার চরণতলে। বুঝতে পারি কোন অবস্থায় পৌঁছলে এই কথা এমন করে বলতে পারা যায়—

> তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে
> তাহা মাথায় তুলিয়া লব।

মানুষের সাধারণ জীবনের যতদিক আছে আর তার যতরকম অবস্থার অভিজ্ঞতা হতে পারে সে সমস্ত সম্বন্ধেই গান আছে রবীন্দ্রনাথের। বাদ পড়েনি তার একটিও। প্রত্যেকটিকে দেখা যায় যথা সময় এবং যথাস্থানে। তাই আমাদের মন সচল অবস্থায় আশ্রয় পায় তাঁর গানে। জীবনকে গানের মধ্য দিয়ে এমন করে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা আর কোনো রচয়িতার গানে আমাদের হয়নি। আমাদের যুগে আমাদের জীবনে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা গান সম্বন্ধে তিনি আমাদের ধারণা বদলে দিয়েছেন। তার গানে বার বার শুনি সেই ডাক যে ডাকে অন্তরের অজানা ঘরের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায় প্রকাশ দেখি অপ্রকাশের... এমনতর আরও কত কত যে আছে! তাঁরই গানের চরণ তুলে দিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—

> 'শেষ নাহি যে শেষ কথা
> কে বলবে?'

সন্ধ্যা সেন

এক আঁজলা স্মৃতি বিষ

ধীরেন হোম

জগৎ জয়কর লিমিটেড আয়োজিত সর্ব-ভারতীয় সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা বোম্বাইয়ের নাগরিক জীবনে এক বাৎসরিক আনন্দ কোলাহল।

একবার তাতে যোগ দিতে আসে এক বাক-প্রিয় ষোড়শী। বেঙ্গালোরবাসিনী রীতা কামাত। সে প্রতিযোগিতায় হেরে যায় কিন্তু তার কৌমার্য-মধুর প্রগলভতায় উল্লাসিত উৎসব মঞ্চ থেকে সে কথা-বলা পুতুল খেতাব পায়।

রীতাকে সর্বদাই দেখা যেতো কোন না কোন অত্যাধুনিক বেশ-ভূষায়। কিন্তু ঐ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল মেয়েদের অভ্যর্থনার্থে ডাকা এক ঝলমলে নৈশভোজে সে আসে শাড়ি পরে। সেটা তাকে খুব মানায়ও। কে একজন বললেন কথা-বলা পুতুল আজ শাড়ি পরে যে?

রীতার পাশেই ছিলেন তার বোম্বাইবাসী সলিসিটর কাকা সহদেব কামাত এবং তাঁর স্ত্রী অলকা কামাত। রীতা মাথা নাড়িয়ে তাঁদের দেখিয়ে জবাব দেয় এঁরা সঙ্গে যে। এঁদের পুতুল খেলার শখ যে আর নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে লুটোপুটি খায়—হেলেদুলে হাত নাড়িয়ে।

সহদেব এবং অলকা কামাতও হেসে ফেলেন। যে সমস্ত অভ্যাগতরা রীতার প্রসিদ্ধির আকর্ষণে এসে ভিড় জমিয়েছিলেন তাঁরাও হাসেন।

অন্য কে একজন মন্তব্য করেন রীতা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যদি তুমি শাড়ি পরে আসতে জিতে যেতে।

কিস্যু হতো না। পুতুল ভাবা হয়ে পাশ-কাটা হয়েই থাকতুম। দেখুন না ভোজসভায় আমাকে না খাইয়ে রাখে তো বাঁচি। আমি বড্ড পেটুক।

এবার অলকা কামাত তেড়ে ওঠেন। রীতা! কি সব বলে যাচ্ছ? এটা বাড়ি নয়।

রীতা বৃত্তাকারে দাঁড়ানো ভদ্রমন্ডলীর দিকে এক চোখে ইশারা করে বলে দেখলেন তো আমার কাকা-কাকী পুতুল খেলার দিনগুলোর কথাও ভুলে গেছেন।

আশপাশে আবার হাসির রোল ওঠে।

একজন মানুষ কিন্তু হাসেটাসে না। মহার্ঘ সান্ধ্য-বেশধারী জগৎ জয়কর লিমিটেডের সর্বেসর্বা জগৎ জয়কর নিজে। তার এক হাতে বগলদাবা অন্য হাতে আধা-পোড়া সিগারেট মুখে অর্থবহ অন্যমনস্কতা কিন্তু দৃষ্টি রীতার ওপর। তবে একটু দূর থেকে। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সেও সে অকৃতদার। কেন তা কেউ জানে না, বোঝে না। সবাই ভাবে ওটা ওর আইবুড়োমী। কারণ তার জীবন-পটের সুপরিচিত অংশটা মেয়ে-ছায়ায় জর্জরিত।

রীতা হঠাৎ জগৎ জয়করের খুব কাছ ঘেঁষে চাপা সুরে বলে পাশ কেটে থাকা হচ্ছে যে? শাড়ি-পরা পুতুল ভাল লাগছে না?

জগৎ জয়করের পেশল দুগাল রেখা-কোমল হয়ে ওঠে এক মন-কাড়া হাসির ছটায় আর অমনি তার চুলের ঝাঁকে সাদা সাদা লাইনগুলোতে ফোটে স্থিত যৌবনের ঝিলিক। পাশ কেটে থাকছিলেন শাড়ি-পরা পুতুল দেখার আনন্দ কুড়োচ্ছি।

রীতার মুখের ওপর দিয়ে খেলে যায় এক তরঙ্গ প্রশংসা-তৃপ্তি। কিন্তু সে ছল-করা রাগ দেখিয়ে বলে কথা বলতে গেলেই হার মানাতে হয়। আমি পালাই।

জগৎ রীতাকে টেনে ধরে বলে যে হেরে যায় তার ইচ্ছেমতো পালাবার স্বাধীনতা থাকে?

রীতার যৌবন-ছোঁওয়া মুখশ্রীতে এবার ফোটে উল্লাস আদিম উত্তেজনার বর্ণালী। রাঙা মুখ নুইয়ে সে বলে, কেউ শুনে ফেলবে। ভোজসভায় মাও রয়েছে কিন্তু। আচ্ছা এখন পালাই পরে কথা হবে।

রীতার কথায় ফুলঝুরি ছিল না। তার বাবা সদাশিব কামাত অধ্যক্ষ এবং মা মানসী কামাত শিক্ষয়িত্রী। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দুজনেই। মাত্র কিছুকাল আগেই তাঁরা মেয়াদবদ্ধ আমন্ত্রণে আমেরিকার এক বিদ্যা-কেন্দ্রে দু বছর শিক্ষকতা করে এসেছেন। ছেলেমেয়েরা সঙ্গেই ছিল। রীতা সে সুযোগে অত্যাধুনিকতা-আশ্রিত লেখাপড়া করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গুণও কুড়িয়ে এনেছিল; যথা পপ ডান্স। নৈশ-ভোজে তারও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। জগতের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে রীতা নাচের এক মহড়া দেয় অনাস্বাদিত আদিম উত্তেজনার অভিনবত্বে আত্মহারা হয়ে।

নৃত্যরত রীতাকে কয়েক লহমা দেখে জগৎ চলে যায় হলের এক কিনারায় হেঁটে এড়িয়ে আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন কয়েক-জন অভ্যাগত-অভ্যাগতার দলে। এঁদের এক-জন রীতার মা মানসী কামাত। তাকে জগৎ বলে আপনার মেয়ের ছেলেমানুষীতে মন গলবে না লোক কল্পনা করাই যায় না কিন্তু মিসেস কামাত।

মানসী কামাতের বয়সও চাল্লিশের ওপর। চুলও পাকধরা। কিন্তু তিনি স্থিত-যৌবনা এবং অপরূপ সুন্দরীও; মা মেয়ে পাশাপাশি হলে কার ব্যক্তিত্ব-প্রভায় কে হৃত-দীপ্তি হবে কল্পনা করা দুরূহ ব্যাপার। জগতের মন্তব্যে তাঁর মুখে স্বাভাবিকতা-সুন্দর হাসির আভা। বড় হয়ে গেলে তবে মেয়েদের ছেলেমানুষী ভাল লাগে। তবে ও দুবছর আমেরিকায় ছিল কিনা? ওর পাকামিতে একটা বিদেশীপনা এসে গেছে। সেটা ওকে মানায়ও।

জগৎ জয়কর যেন ঠিক যে ধরনের জবাব আশা করেছিল তা পায়নি। একটু ইতিউতি করে সে সরে যায়।

হলভর্তি অভ্যাগতদের অনেকেই জগৎ-রীতা-মানসী সংশ্লিষ্ট পার্শ্বনাটিকাটি দেখে যাচ্ছিলেন রসাল ঔৎসুক্যে। কারণ ইতিমধ্যে শহরে গুজব উঠেছিল পক্ককেশ আইবুড়ো জগৎ জয়কর শেষকালে দৌহিত্রী-তুল্যা এদেশের রীতা কামাতের প্রেমে পাগলপারা হয়ে গেছে।

গুজবটা ছিল অংশত সত্য। রীতার অনাবিল প্রাণপ্রাচুর্য এবং বাকপটুতা জগৎকে অভিভূত করে ফেলে প্রথম দেখাতেই। সে তার অভিজ্ঞতা-শাণিত ব্যবহার-নৈপুণ্যের দৌলতে মেয়েটির অবাধ সান্নিধ্য-প্রসাদও জয় করে ফেলে ঝড়ের বেগে। কিন্তু এখন সে সমস্যা-স্তব্ধ আবক্ষবাস্য কারণে। সে আসলে একজন হতাশপ্রেমী। ছাত্রজীবনে এক সহপাঠিনীর প্রেমবন্দী হয়ে প্রতারিত হওয়ার ধাক্কাতেই সে প্রাক-পঞ্চাশ বছর বয়সেও আইবুড়ো। ভোজসভায় রীতার সঙ্গে তার মা-বাবাও আসায় জগৎ দেখতে পায় তার সেই সহপাঠিনীই মানসী কামাত। কুমারী-জীবনে যাঁর নাম ছিল মানসী সামন্ত।

নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল একটা পাঁচ তারকাযুক্ত হোটেলে। গেট ওয়ে অব ইণ্ডিয়াতে। জগৎ অলক্ষ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নৌকো করে জল-ভ্রমণে চলে যায় বিভ্রান্ত চিত্তে।

॥ ২ ॥

মহারাষ্ট্রের এক পাণ্ডব-বর্জিত এলাকার গ্রামে জগৎ জয়করের জন্ম। নামাকরণ হয় রমাকান্ত কার্ণিক। বাড়ি থেকে শ-দুই মাইলের দুর্গম দূরত্বে ছিল এক কলেজ-ওয়ালা শহর। সেখানে বি-এ পড়বার সময় সে প্রেমে পড়ে যায় মানসীর সঙ্গে।

ত্রিশ দশকের শেষার্ধ তখন। দেশে জাগরণ-প্লাবনের থই থই। কিন্তু বিয়ের আগে প্রেম-ট্রেম তখনও অনুমোদন-বঞ্চিত বিদেশীপনা। প্রায় সর্বত্রই। ঐ মুল্লুক আবার নিশুতি-সুপ্ত, ঐ শহর আধা-জাগো।

কিন্তু কার্ণিক এবং সামন্ত দুপক্ষই সারস্বত ব্রাহ্মণ। মানসীর বাবা কেশবরাও সামন্ত ঐ শহরের এর বড় ব্যবসায়ী। তাঁর মাথায় এক ফন্দী আসে। যুগ পাল্টাচ্ছে। এদের গাঁটছড়া করে দিতে পারলে কেলেংকারীটার ওপর একটা হালফ্যাশানের ছাপ পড়বে। পণের ব্যাপারেও কিছু সুরাহা হতে পারে।

সেই কাজে নামানো হয় এক ধুরন্ধর ঘটককে অতিশয় গোপনে এবং সতর্কতা আশ্রয়ে। সরাসরি কথা পাড়তে গেলে মানসীর সম্পর্কে গুজবটা স্বীকৃতি-পুষ্ট হবার ভয় ছিল। কিন্তু ঘটক প্রবর সরেজমিনে নেমেই ছুটে ফিরে আসে এক ভয়ংকর সংবাদ নিয়ে। রমাকান্ত অস্পৃশ্য।

বৃত্তান্ত মোটামুটি এই। রঘুনাথ কার্ণিক নামক এক গরীব ব্রাহ্মণ সন্তান ছেলেবেলা থেকেই খুব বুদ্ধি-চঞ্চল এবং উদ্যোগ-প্রবণ ছিলেন। গ্রামীণ সমাজের সীমাবদ্ধ উপার্জন ব্যবস্থা তাঁর মনে জাগায় অভিযান-তাড়না। তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে এক শহরে কিছুদিন একজন অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার হয়ে কাজ করার সুবাদে গ্রামে ফিরে বিলিতি বদ্যি হয়ে ব্যবসা ফাঁদেন। চিকিৎসায়ও ওষুধেরও। বুদ্ধির সঙ্গে ভাগ্যেরও নাকি সমাবেশ ঘটে। তিনি নিজে কিন্তু সেটার ওপর নির্ভর না করে আস্তে আস্তে একটা লগ্নী কারবারও জেঁকে নেন। এই ত্রৈমার্গিক উপার্জন-অভিযান তাঁর জীবনে গ্রহস্পর্শ না হয়ে মাহেন্দ্র যোগ ঘটায়। কালে তিনি খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। তখন তিনি একজন রক্ষিতা নেন। গ্রামে নয় নিকটতম উপ-শহরে। পয়সার জোরে বেছে নেওয়া রক্ষিতাটি সব দিক থেকেই খুব পছন্দসই ছিল। দেখতে নাদুস-নুদুস বয়েসে না খুব কাঁচা না খুব পাকা। বুদ্ধিসুদ্ধিও ছিল বেশ। হেসে হাসিয়ে সঙ্গ-সুখ সাত্ত্বিকতা-মধুর করতে পারতো। আপশোস জনক খুঁত ছিল তার মাত্র একটিঃ সে জাতিতে ছিল চর্মকার। যার নীচে মহারাষ্ট্রে আর কোন জাত খুঁজে বার করা কঠিন। রমাকান্ত এই রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তান। তবে রমাকান্তর প্রতি রঘুনাথের খুব টান। তার কার্ণিক পদবী এবং একটা কলেজওয়ালা শহরে হোটেলে থেকে বি-এ পড়া এই টানের প্রমাণ। তবে তাকে থাকতে হয় কার্ণিক পরিবারের সংস্রব-পরিধি থেকে দূরে। তার জন্মস্থান এবং পঠনস্থলের মধ্যে দুর্গম্য দুশো মাইলের ব্যবধান সে কারণেই।

জাত-জন্মের ব্যাপারে রমাকান্ত মানসীকে ধোঁকায় রাখেনি কিন্তু। প্রেম স্বীকৃতি ধন্য হতেই সে তাকে এক চিঠি লেখে। তাতে বৃত্তান্ত-ঠাসা আবেগ-গম্ভীর এবং আবেদন-সংযত। তার মূল বক্তব্য: সে অচ্ছুত কিন্তু মানুষ। ভালবাসা হৃদয়-ধর্ম। এতে জাতবিচারের স্থান নেই। কারণ হৃদয়কে ধরাও যায় না ছোঁওয়াও যায় না। তাছাড়া আমি জাতিভেদ মানি না। কেনইবা মানবো? অস্পৃশ্যার গর্ভজাত জারজ সন্তানের পিতা হওয়া যায় কিন্তু বৈধ সন্তানের নয়, এ কি রকম বিধি? সে যা হোক তোমার জাত মেরে আমি আমার নাস্তিক্য জাহির করবো না। আমাকে ভুলে যেও, পার তো ক্ষমা কোরো।'

উত্তরে মানসী লেখে: 'বিকেলে দেখা করো। কথা আছে।'

সেদিন মানসীর প্রস্তাবে তারা স্থির করে চুপচাপ বি-এ পরীক্ষাটা পাশ করে বিয়ে করে যা ঘটিতব্য তার মোকাবিলা করবে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে।

কেশবরাও সামন্ত রমাকান্তের জাতের খবরটা জেনে যাওয়ায় তাদের সে সিদ্ধান্ত ভেস্তে যাবার জোগাড়। দুজনের মধ্যে যোগা-যোগও কেটে যায়। কারণ মানসীকে ইতি-মধ্যে গৃহবন্দী করে ফেলা হয়। এ সমস্যার একটা মাত্র সমাধানই সম্ভব: অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলা; এবং তাই তারা ঠিকও করে মানসীর প্রস্তাবে। দুর্ভেদ্য বন্দীত্বের এক ফাঁকে পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র-নকশা সে-ই রমাকান্তর কাছে পাঠায়।

রমাকান্তর ক্ষেত্রে এই ষড়যন্ত্র ছিল এক ভয়ঙ্কর দামিত্ব। সে অস্পৃশ্য। ব্রাহ্মণ কন্যাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার পথে ধরা পড়ে গেলে তার প্রাণবধ নিশ্চিত ছিল—ঐ মুলুকের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই ঐ শহরেও। তবু সে মানসীর নির্দেশ মত সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলে। কিন্তু পালিয়ে যাবার সময় নির্ধারিত স্থানে মানসী আসে না। সারা রাত প্রাণ-হাতে বৃথা অপেক্ষায় রাস্তায় কাটিয়ে সে পরের দিন খবর নিয়ে জানতে পারে মানসী তাদের দেশের বাড়ীতে চলে গেছে জোর-জেলায়।

ঘটনাস্রোত সেখানেই থামে না। সেদিন বিকেলে মানসীর বড় দু-ভাই দলে ভারী হয়ে রমাকান্তকে ঘিরে আক্রমণ করে। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসা ছাত্র গোষ্ঠীর একটি দল তাকে প্রাণে বাঁচায়। কিন্তু তাকে যমের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয় প্রায় দশ দিন ধরে হাসপাতালে পড়ে পড়ে। ভাল হয়ে সে চলে আসে বোম্বাই জগু—অর্থাৎ জগন্নাথ-রাও জয়কর নাম নিয়ে। তার মন তখন মানসীর স্মৃতি-বিষে বিষাক্ত। কিন্তু তখন তখনই সেটা দেখাবার পথ পায় না সে। মনের ঝাল মেটায় সে নাম বদলে প্রাক-বোম্বাই জীবনের ওপর এক বিস্মৃতি-পর্দা টেনে দিয়ে।

বোম্বাই এসে সে সৎ-পিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসায়ে নামে কেউকেটা হয়ে আত্মমূল্যায়ণ ঘাটতি-মুক্ত করার জন্যে অভিমান-ক্ষিপ্ত হয়ে। সে চেষ্টা বৃথা হয় না। এখন বোম্বাইর বাণিজ্যজগতে সেও এক দিকপাল আজ। এখন তার কি না আছে? বাড়ি গাড়ি প্রতাপ সবই। নাই শুধু হৃদয়-সুখ। মানসীর প্রতি জাতিভেদ অভিশপ্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তার আজও জমাট ঘৃণা। তাই সে একা তাই সে অকৃতদার।

॥ ৩ ॥

জগু জয়কর জল-ভ্রমণে এসেও শান্তি পায় না। মানসীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবার জন্যে নয়। মানসী তার জীবনে স্রেফ জমাট ঘৃণা বিষের প্রতীক। ওতে সংশ্লিষ্ট সামান্য খুঁটিনাটি স্মৃতিতেও তার মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে তার চিন্তা শক্তি পঙ্গু হয়ে যায়। ও নিয়ে সে তাই ভাবে না ভাববেও না। তার অশান্তির কারণ সে যা চায় তাই পেতে গিয়ে হারানোর সুস্পষ্ট সম্ভাবনা। রীতাকে সে এখন ইচ্ছা করলেই বিয়ে করে ফেলতে পারে। এখন স্রেফ প্রস্তাব করার অপেক্ষা। সেটাও সে সেরে নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত। হয়তো ভোজ-সভায়ই সে প্রস্তাব করতো। কিন্তু রীতা মানসীর মেয়ে জেনেও কি তা সম্ভব বা উচিত?

এ বিয়ে হয়ে গেলে সে রীতা এবং মানসী এক শক্ত বাঁধুনির কাঠামোতে কায়েম হবে। অতীতের সেই হতাশ প্রেমের কাহিনী তখন যে কোন মুহূর্তে জানা হয়ে যেতে পারে। না হয়ে যাবে। রীতা তখন কি ভাববে? বিয়ের প্রস্তাব করবার আগেই রীতাকে সে কাহিনী বলে দিলেই কি কোন ফল হবে? সে কথা জেনে রীতা নিশ্চয় তাকে আর বিয়ে করতে চাইবে না। তখন তার কি হবে? আইবুড়ো থেকেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে যাবে? আর যদি পুরনো বৃত্তান্ত শুনেও রীতা এ বিয়েতে রাজি থাকে তবে সে নিজেই কি তাতে সুখী হবে? রীতার হৃদয়ধর্ম সম্বন্ধে সে সন্দিহান হবে না? সে তো জানে দেহধর্ম আর হৃদয়-ধর্ম এক নয়। তার জন্য দেহ-ধর্মের বশ হৃদয়ধর্মের ফলে সে আইবুড়ো।

জগুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় মানসীর কাছে লেখা সেই প্রথম প্রেমপত্রটার কথা। ওটা নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হতো। তারা দুজনেই তখন ভাবতো দেহধর্ম প্রকৃতির সৃষ্টি হৃদয়ধর্ম মানুষের। তাই হৃদয়ধর্মের জয়ে মানুষের জয় আর দেহ-ধর্মের জয় প্রকৃতি-দাসত্ব। মনে পড়ে যায় জগুর একটা ঘটনাও। একদিন এক নিভৃত মিলনের তৃপ্তিতে সে বলেছিল, জান মানসী দেহধর্ম জীবনের গদ্যাংশ হৃদয়ধর্ম পদ্যাংশ। মানসী জগুর বুকে মুখ লুকিয়ে জবাব দিয়েছিল তোমার ভুল। দেহধর্ম মর্ত্য হৃদয়ধর্ম স্বর্গ।

চার আরোহীবহ ছোট্ট মোটর বোটটা একা জগুকে নিয়ে স্রোতের বুক চিরে চলে এসেছিল তীর থেকে অনেক দূরে। সাগর-উপসাগরের সংগমের কাছাকাছি। জগু এখনও ফিরবার নির্দেশ দিচ্ছে না। মাঝিটি আশ্চর্য। একটু উদ্বিগ্নও। তাই সে শুধোয় এবার ফিরব সাব?

জগু নিরুত্তর। মাঝি নিজের বুদ্ধিমতে ফিরে আসতে আরম্ভ করে। জগু তবুও নীরব। সে তখন মানসীর কথা ভাবছিল। প্রথমবার স্রেফ সে ব্যগ্রেই নয়, বহু বছরে। কিন্তু চিন্তা পরিধি বদ্ধ থাকে বর্তমান-বৃত্তে। রীতার দেওয়া অগোছালো পরিবার পরিচিতি থেকে সে এখন জানে মানসী এম-এ বি-টি পাশ শিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষা-বিদ। শিশু শিক্ষার ওপর তাঁর লেখা দুটো বা তিনটে বই শিক্ষাক্ষেত্রে খুব সমাদৃত দেশে-বিদেশে। তার আর রীতার মধ্যে প্রেম হচ্ছে দেখে তিনি কি ভাবছেন সেটা অনুমান করতে সে হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা অনুমান সে করতে পারে না। নৌকাটা তখন তীরের কাছ ঘেঁষেই এদিকে সেদিকে ঘোরাঘুরি করছিল।

নৈশ-উৎসব তখন খাওয়ার পর্যায়ে। বুফে রীতির বন্দোবস্ত। সবাই খাচ্ছে। কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোথাও বা বসে বসে—চক্রাকারে ছোট বড় দল বেঁধে। কদাচিৎ একা একাও। কিন্তু আহার উৎসাহ সর্বত্রই এই উঁচু পর্দায়। একটা নিরিবিলি-বেষ্টিত কোণ ছাড়া। এখানে একটা সোফায় বসে আছে রীতা। গালে-হাত। তার নাকি নাচতে নাচতে মাথা ধরে গেছে। তাই সে খাচ্ছে না সাহচর্য কিম্বা সহানুভূতি সহ্য করতে [illegible] পুনরাবির্ভাবেই সে সজীব হয়ে ওঠে তার দু-চারটে ব্যথা-বচন শুনে সেও ক্ষুধার্তও বোধ করে এবং তারপরেই হুকুমতি নিমন্ত্রিতদের উৎসব-চেতনায় কিরণ-সম্পাত হয়।

খাওয়ারত রীতাকে একটা দলে সামিল করিয়ে দিয়ে জগু চলে যায় মানসীর কাছে। তিনি ছিলেন মিতাহারী। স্বাস্থ্যের কল্যাণে। তাই তিনি তখন খাওয়া শেষ করে ভোজন-রত জা দেওর স্বামী বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখ যোগাচ্ছিলেন। বিশেষ কথা থাকার কারণ দেখিয়ে জগু তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। অভ্যাগতরা আর একবার চাঞ্চল্য তাড়িত হন।

জগু জয়কর থাকতো ওভেলে। গেটওয়ে থেকে গাড়িতে এক-আধ মিনিটের রাস্তা। মানসীকে নিয়ে সে চলে যায় সেখানে এবং তার অফিস ঘরে অর্গলবদ্ধ হয়ে বলে সব জেনে গিয়েও নির্বিকার হয়ে আছ যে মানসী?

উত্তেজিত হবার মত কিছু দেখতে পেলে নিশ্চয় উত্তেজিত হ[illegible]।

মানে? রীত[illegible] আমার মধ্যে ব্যাপার কদ্দুর গড়িয়ে গেছে ঐ ভোজসভার সকলে দেখতে পেয়েছে আর তুমি দেখতে পাওনি তা কি সম্ভব?

কিন্তু এক্ষেত্রে যে এমন একটা বিশেষ দিক আছে যা কেউ দেখতে পাচ্ছে না বা পাবে না—তুমি আর আমি ছাড়া।

তোমার আমার অতীত সম্বন্ধ?

না। আমারই মেয়েকে বিয়ে করার মতো কদর্য কাজ তোমাতে অসম্ভব, এ সত্য। আমাকে তুমি যাই ভাব তুমি নিজে কেন ঘৃণ্য কাজ করবে না। নইলে কি তোমাকে কোনদিন ভালবাসতে পারতাম রমাকান্ত?

খবরদার জগু ধমকে ওঠে। ও নাম মুখে এনো না। ককখনো কোন কারণেই না।

মানসী প্রথমত থতমত খেয়ে যান। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর ডাগর চোখ জোড়া ছলছল করে ওঠে। কিন্তু তিনি কেঁদে ফেলেন না। আত্মসংবরণ করে মাথা নুইয়ে দুজনের মাঝখানে অবস্থিত বিরাট আকৃতির আফিস টেবিলের কাচে ঢাকা জমিনের ওপর আঙুল দিয়ে অলক্ষ্য হিজিবিজি এঁকে যেতে থাকেন। ঘর নিস্তব্ধ।

কিন্তু মাত্র কয়েক লহমার জন্যে। জগুও আত্মসংবরণ প্রয়াসী ছিল। কিন্তু তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। সে প্রথমে ধীরে কিন্তু পলকে পলকে উত্তেজিত হয়ে যেতে যেতে বলে যায় রমাকান্ত মরে গেছে। বহু বছর আগে এক হাসপাতালে। জগু যা বলে যায় তাতে থাকে ঘৃণ্য গালা-গাল নয়। আর থাকে নানাবিধ অজানা খবর। পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র পন্ড হওয়াতে তো নয়ই আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাতে যাওয়াতেও সে মানসীর ভালবাসায় সন্দিহান হয়নি। সে তো জানতো তাদের প্রেমে অন্তরায় ছিল জাতিভেদ প্রথা যার তুল্য অনতিক্রম্য সামাজিক বাধা আর কিছু [illegible]

বার বার উর্ভিপরে গিয়ে মানসী তাকে প্রেম-ধন্য করে রেখেছিল। সেই উদাহরণের মহিমা এবং মাধুর্য কজন মানুষের ভাগ্যে ঘটে সে জানতো এখনও জানে। তাই বা সে পারনি তার আঘাতে যা সে পেয়েছিল তার মাধুর্যে আপ্লুত মহত্ত্ব ভুলবার মত স্বার্থান্ধতা তার ছিল না। সে হতাশাবিদ্ধ হতে আরম্ভ করে মানসীর কাছ থেকে কোন বিদায়-বার্তা বা সান্ত্বনা-সন্দেশ আসছে না দেখে। হাসপাতালে পড়ে পড়ে যমের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জয়ী হওয়ার তাগত তাকে জুগিয়ে ছিল তার জীবন মোহ নয়। যম হেরে যায় কিন্তু নিজের ভায়েদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে জীবন-মৃত্যু অবস্থায় পড়ে থাকা রমাকান্তকে মানসীর মনে পড়ে না। মিনিট গুনে কাটানো দিনগুলো সপ্তাহে পরিণত হয় সপ্তাহ পক্ষে পক্ষে পুরো একটা মাসে কিন্তু আশায় থাকা সান্ত্বনা-সন্দেশ মানসী পাঠায় না। সেই হতাশায় রমাকান্তের মৃত্যু হয় অকালে। 'রমাকান্তকে কেউ মনে করে না তাকে মনে করবার কেউ নেইও। কিন্তু আমিও তো তাকে ভুলে যাইনি। আমি জানি সে মানসীর ভালবাসা পাওয়াটাকে জীবনের কি এক অমূল্য স্মৃতি-সম্পদ হিসেবে তার বুকে লুকিয়ে নিয়েছিল। হেঁচকা টানে বুক চিরে সেটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলার বাধা সে সইতে পারেনি। কিন্তু মৃত্যুই তার মুক্তি। কারণ বেঁচে থাকার অর্থ হোতো তিলে তিলে মরা।

বলতে বলতে জগুর স্বর ধরা ধরা শোনায়। মানসী মুখ তুলে চেয়ে দেখেন সে কর-মুষ্টিতে কপাল রেখে চোখ বুজে চিন্তা মগ্ন হয়ে যাচ্ছে। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে তিনিও মাথা নইয়ে আবার টেবিলের কাঁচের ওপর আঁকিজুকি করে যেতে থাকেন। কিন্তু দুজনেই মন তখন অতীতের আলিঙ্গনে যুগলবন্দী।

॥ ৪ ॥

এক বিকেল। কলেজ প্রাঙ্গণে মিটিং। কি একটা বিশেষ উপলক্ষে। অন্যান্য উদ্যোগ-চঞ্চল ছাত্র-ছাত্রীদের মত মানসী এবং রমাকান্ত দুজনেই ভীষণ ব্যস্ত। এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটির অন্ত নেই। তারই এক ফাঁকে মানসী রমাকান্তর হাতে গুঁজে দেয় একটি চিরকুট। প্রথম নিরালা সাক্ষাতের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করে।

রমাকান্তর শিরায় শিরায় বয়ে যায় এক তরঙ্গ পুলক-প্লাবন। কিন্তু তার আশাপট কালো হয়ে ওঠে ভীতি ছায়ায়।

তাদের মধ্যে এক অনিশ্চয়তা মধুর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল কিছুদিন থেকেই কলেজ জীবনের সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। কারণ দুজনেই অনুষ্ঠান উৎসাহী ছিল। খেলাধুলো পুজো-পার্বণ কলেজের বাৎসরিক দিবস। প্রভৃতি উপলক্ষে আয়োজিত যে কোন কাজেই তারা উৎসাহ পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো। দুজনেই খেলতে-টেলতে এবং গানটান গাইতে পারতো। ফলে তারা প্রায়ই দায়িত্ব বন্দী হয়ে পাশাপাশি হতো, প্রতিযোগিতা-বদ্ধ হয়ে মুখোমুখিও। প্রেম অঙ্কুরিত হয় সেই সূত্রেই।

রমাকান্ত পরিণাম-চেতনা ভুলে যায় না। ভুল যাওয়া সম্ভবই ছিল না। সে অস্পৃশ্য। ব্রাহ্মণ তনয়াকে জাত সম্বন্ধে ফাঁকিতে রেখে প্রেমে ফাঁসিয়েছে জানাজানি হলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা অনিবার্য হবে। ঐ মফস্বলের যে কোন অংশে তো বটেই। অর্ধজাগ্রত শহরেও। কিন্তু পরিণাম-চেতনা তাকে বল্গাবদ্ধ রাখতে পারে না। মানসীর উপস্থিতি-আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যায় যেখানেই সে সাহচর্য সীমায় না হোক দৃষ্টি সীমায় থাকে। কলেজে এবং অন্যত্রও। কারণ সামীপ্য-প্রসাদে মানসীর একটা নীরব এবং নিষ্ক্রিয় আস্কারা অনুভব করতো সে। ঐ চিরকুট তার নির্ভুল মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রমাণ হয়। কিন্তু এর পরিণাম?

রমাকান্ত শিউরে ওঠে। কিন্তু সাফল্য সুখের খিচুনি কেটে ওঠা অসম্ভব হয়। বস্তুত তখন থেকে তারা নিরালাতেই মেলামেশা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

একদিন একটা জঙ্গল অধ্যুষিত জায়গায় তারা আচমকা আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে যায়। কখন যে যুক্ত ওষ্ঠ আদিম আনন্দের আতসবাজী হয়ে ওঠে তারা তা টেরও পায় না। কিন্তু হঠাৎ মানসীকে এক ধাক্কায় দূরে ফেলে দিয়ে রমাকান্ত দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

মানসী হতবুদ্ধি। কি হলো রমাকান্ত? কাঁদছ কেন?

রমাকান্ত নির্বাক। ধীরে ধীরে তার ফুঁপিয়ে কাঁদা ক্রমে নীরব অশ্রুপাতে পরিণত হয়। মানসীর মনে হয় মূক ব্যথার এমন করুণ ছবি কল্পনাতীত। কিন্তু তার মনে জাগে একটা সুপ্ত সন্দেহ। প্রশ্ন করে তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে?

রমাকান্ত মুখ থেকে হাত সরিয়ে মানসীর দিকে চেয়ে বলে ব্যাপার তার চেয়ে হাজার গুণে জঘন্য। আমি অস্পৃশ্য। জাবজও।

শুনে মানসীর মুখ সাদা হয়ে যায়। সে পড়েই যাচ্ছিল। রমাকান্ত তাকে ধরে ফেলে। মানসী শিউরে ওঠে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে আমি বাড়ি যাব।

রমাকান্তর আত্মপরিচিতির তাৎক্ষণিক ঝাঁকুনিটা কেটে উঠতে মানসীর তিন-চার দিনের প্রয়োজন হয়। সে কদিন সে বাড়িতেই থাকে। শরীর না ভাল লাগার অজুহাতে শুয়ে বসে সময় কাটায়। যেদিন থেকে সে আবার কলেজে যেতে আরম্ভ করে সেদিনই ঘটে তাদের মধ্যে সেই দুর্ভাগ্য-অধ্যুষিত পত্র-বিনিময়। যার ফলে মানসীই আজো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও অকৃতদার রমাকান্তর প্রণয়িনী।

*

ঘরে আবার নেমে আসে নিস্তব্ধতা যে দীর্ঘস্থায়ী এবং অত্যন্ত বিষাদবহ হয়ে উঠছে সে সম্বন্ধে দুজনেই সচেতন হয়ে ওঠে। মানসী মাথা না তুলেই বলেন একটা কাজ করবে রমাকান্ত!

কি?

আমার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াবে?

জগু জয়কর কথা রাখে। দুজনের নৈকট্য ছোঁয়াছুঁয়ির সীমানায়। যুক্ত-জীবন হলে যে আশীর্বাদ জগুর অসীম সুখের উৎস হতো সে কল্পনায় তার মন আর একবার বিষাদনত হয়।

কিন্তু ক্ষণিকের তরে। মানসী তাঁর পিঠ অনাবৃত করছিলেন। নুইয়ে সামনা বাঁচিয়ে। কিন্তু জগুর বহুবাঞ্ছিত দৃষ্টি লোলুপ হয়ে ওঠে। কিন্তু তা পলকের জন্যে। জগুর শিরায় ধক্ করে জ্বলে ওঠে আদিম ক্ষুধার আগুন। হেঁচকা টানে মানসীকে বুকে চেপে ধরার তাগিদে তার শোণিত-স্রোত ক্ষিপ্ত। কিন্তু অশোভন কিছু না ঘটিয়ে ফেলে সে বিড়বিড় করে বলে ওঠে ওটা কি?

বলছি নিজের আসনে ফিরে যাও আগে।

যা দেখে জগু বিস্ময়ে সচকিত হয়ে উঠেছিল সেটা ছিল একটা দাগ। কাঁধের একটু নিচে পিঠের এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত ছড়ানো। তুলতুলে নরম এবং আঙুলপ্রমাণ পুরু। মোটা শিক-টিক জ্বলন্ত অবস্থায় চেপে ধরলে যেমন হয়ে থাকে।

জামা-কাপড় ঠিক করে নিয়ে মানসী বলল বহু বছর আগে সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত রাতে কুমারী মানসী সামন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। সেই অপরাধে তাকে যে শাস্তি দেওয়া হয় তার নিদর্শন এই দাগ।

মানসী! জগু ডেকে ওঠে। সে উঠে মানসীর কাছেও আসতে চায়। কিন্তু পারে না। নিজীবতার এক প্রবল ঢেউয়ে সে চেয়ারের পিঠে এলিয়ে পড়ে: মূর্ছিতের মত।

মানসী তবুও বলে যান প্রস্তাব ছিল মানসীকে প্রাণে মেরে ফেলার। কিন্তু তার আগে অস্পৃশ্য রমাকান্ত কোথায় অপেক্ষা করে আছে জেনে নেবার চেষ্টা হয়। শেষ-পর্যন্ত তাকে না পেলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে এই অমানুষিক অত্যাচার করে। কিন্তু সে মুখ বুঁজে দু-হাত মুঠো করে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেও সে অত্যাচার সহ্য করতে পারে না। একসময় অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে জানতে পারে শেষ মুহূর্তে মা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন।

এককালে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে 'গান' ছিল একটি বিশেষ অংগ এবং সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথমেই স্থান পেত। অর্থাৎ তাদের মর্যাদা দেওয়া হত কবিতার চেয়ে অধিক পরিমাণে। এই গানের সংগে স্বরলিপি প্রকাশের প্রচলনও ছিল, কিন্তু বর্তমানে নানাবিধ সংগীতের প্রচলন বৃদ্ধি পেলেও পত্রিকাগুলির সম্পাদকরা সে সম্বন্ধে আগ্রহশীল নয় বলেই হোক, অথবা গীত রচনাকারেরা সেগুলি প্রকাশে অমনযোগী হওয়ার জন্যই হোক, অধুনা সংগীতের প্রকাশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ইদানীন্তন কালে কবিতার দুর্দম প্রাদুর্ভাবে সে স্থান আজ লুপ্ত হতে বসেছে কিনা কে যানে।

প্রাচীন পাক্ষিক পত্র 'অনুসন্ধান'-এ নানাবিধ গান মর্যাদার সংগে প্রথমেই প্রকাশিত হত। উক্ত পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ (১২৯৭-৯৮) থেকে কয়েকটি সংগীত এখানে আমরা পত্রস্থ করলাম, এই সংগীতগুলির রচনাকারদের পরিচয় কিন্তু পত্রিকায় মুদ্রিত হয়নি।

।যুগল-রূপ।।

মন হের রে শ্যামের বামে রাই
পলকে পলকে ওরূপ চলকে,
ত্রিলোকে তুলনা নাই।।
ঘন ঘন ঘন তড়িত জড়িত
নীল নভে মণিখানি বিলম্বিত,
চম্পকের মালা কালিন্দ-বেষ্টিত,
নিন্দিত দেখতে পাই।।
চাঁদে চাঁদে মিলে চন্দ্র-দর্প নাশি,
ছাঁদে ছাঁদে জিনে কৌমুদীর রাশি,
উৎফুল্ল নলিন লাজ গ্রাসি ত্রাসী,
চরণে পতিত তাই।।
নবগোপবালা মালায় বেষ্টিত,
প্রেমভক্তিরস পদে উচ্ছলিত,
কাহে রসে হয়ে রসিক আদ্রিত,
রূপে বলিহারী যাই।।

*

।বিবাহে সখীদের গান।

১ম। সুখেতে অবশ প্রাণ
ধর-ধর সুখ-গান
দেখ দেখ চেয়ে, সখীর মুখপানে
কিবা সরমের ভাণ!
ঠোঁটের হাসিটি লুকোইতে গিয়া,
লুকাইতে গিয়া—দেখলো চাহিয়া,
কেমন পড়িছে ধরা!
মুখ-পানে বালা চায়না চাহিতে,
চপল দিঠিটি চায় লুকাইতে
কিবা দুখ মন-গড়া!
(দেখ গো ওগো দেখ গো)
২য়। চিকুর জড়ান ফুলে
গলে ফুল-মালা দুলে;
চিকণ দুকূলে ঢাকা দেখখানি,
ঘোমটা পড়িছে খুলে।
নূপুর বাজিছে পায়,
আঁচলা লুটিয়া যায়;
সখীর (ও) হাসিটি পারে না সহিতে
সরমে মরিতে চায়।
বলো না গো অত কথা,
এখনি পাইবে ব্যথা;
হাসিতে হাসিতে ফেলিবে কাঁদিয়া
নুইয়া পড়িবে মাথা।
(থাম গো ওগো থাম গো)
৩য়। মুখেতে পড়েছে চাঁদের হাসি,
উথলি উঠিছে রূপের রাশি,
বল দেখি তোমা এ মুখানি দেখি
কে পারে থাকিতে ভাল না বাসি?
১ম। দেখ বুকে হাত দিয়া
কাঁপিছে সখীর হিয়া!
বহিলে বায়ুটি কাঁপিলে পাতাটি,
উঠে কেন চমকিয়া?
তবে না সরলা বালা
জান না কিছুরি জ্বালা?
কেটে যেত দিন হাসিয়া কাঁদিয়া
গাঁথিয়া ফুলের মালা

।আমার আবাহন।

(গান

ডাকি ডাকি মনে করি,
ডাকা তো কই হয় না!
ডাকতে গেলেই এসে পড়ে
যত কিছু ভাবনা।।
অন্নচিন্তা বস্ত্রচিন্তা—যত চিন্তা
ভয়ংকরা
একে একে গ্রাসি মোরে
করে ফেলে দিশেহারা;
আমি ডাকতে গিয়ে ডা[illegible] যাই মা,
রসহীন হয় র[illegible]।

*

।।পাপীর ক্রন্দন।।

(১)

ভেঙ্গে ফেল নাথ! এ খেলা তোমার,
অতীত-সমুদ্রে ডুবে যাই।।
এ জীবনে যদি এত দুঃখ-জ্বালা
এ-জীবনে তবে কাজ নাই।
কেড়ে নাও এই অসার বাসনা
ফেলে দাও ছুড়ে আশার ছলনা,
মানব-জন্মের অশেষ যন্ত্রণা
ঘুচে যাক—নাথ! ত্রাণ পাই।।

(২)

তব চরণে যেন মম মন রয়।
হেন বল দেহ চিতে করি চিরজয়।।
দেহ প্রভু অভিলাষ,
শান্তি ও ধাদরী মম,
দেহ আঁখি [illegible]

বৃত্ত

অঞ্জনাভ দত্ত

আঁচলে চায়ের গেলাস ধরে চামচ নাড়তে নাড়তে ঘরে ঢুকতেই শিপ্রার পা আটকে গেল। সুধাকর উপুড় হয়ে তোষক জাপটে ধরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সকালের বাঁধা-ধরা কাজগুলো শিপ্রা একটার পর একটা নির্বাধে করে যায় সেই পারম্পার্যে ছেদ পড়ায় ওর শরীর শিথিল হয়ে পড়ল। এত বেলা পর্যন্ত সুধাকর কখনও ঘুমোয় না। আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেসে অবিবাহিত জীবন কাটাবার পরও এক ধরণের নিয়ম-নিষ্ঠা রয়ে গেছে। কিন্তু ঘুম সম্বন্ধে ওর অস্বাভাবিক স্পর্শকাতরতা। ও বলে দিয়েছে পৃথিবী রসাতলে গেলেও কখনও যেন ওকে জোর করে তোলা না হয়।

[illegible] ওপর

রেখে পোস্টকার্ড চাপা দিল। নারীর হাত, অগোছালো কিছুর সামনে এলে স্পর্শ না করে যেতে পারে না। আলগা হাতে ও টেবিলের বইপত্র ঝাড়-পোঁছ করে নিল। তারপর আলনাটাকে নিয়ে পড়ল। ঘর গোছানোর কাজে ও একধরণের সুখের স্বাদ পায়। কারণ এতে একলা—বাউণ্ডুলে স্বামীর জীবনে ওর অপরিহার্যতার কথাই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গোছাবেটা কি? যাতেই হাত দিতে যায়, চোখ পড়ে সুধাকরের ওপর। বিশাল খাটটা জুড়ে কি পরিমাণ বিশৃঙ্খলা! দু' হাতে চাদরটাকে আঁকড়ে ধরে কি ভীষণ এক ভয়াবহ ঘুমে হাবুডুবু খাচ্ছে। দুপাশে চাদর সরে গিয়ে লাল তোষকটা বালি খসে যাওয়া দেওয়ালের মতো দেখাচ্ছে। অন্য কিছুতে হাত দিতে গিয়ে কেবলই মনে

হচ্ছে সর্বাগ্রে ওর উচিত বিছানাটা ঠিক করে দেওয়া।

কিন্তু উপায় নেই। অগত্যা শিপ্রা ঘর ছেড়ে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি হাত চালাল। শাশুড়ির ফটোটা সোজা করে দিয়ে বেরুতে যাবে, হঠাৎ চোখ পড়ল ক্যালেন্ডারে। আজকের তারিখ ২৩ সংখ্যাটার চারপাশে লাল পেনসিল দিয়ে কে গোল দাগ কেটে রেখেছে। আগে তো খেয়াল করে নি! এবার ওর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল. কেন সুধাকর এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে। নিশ্চয়ই ও আজ অফিস যাবে না, অন্য কোনো কাজ আছে, সেটা মনে রাখবার জন্য দাগটা কেটে রেখেছে। একটা পুরো দিন স্বামীকে ঘরে পাওয়া যে কি, ভাবতেই শরীরে শিহরণ খেলে গেল। ঢুলঢুলে চোখে সুধাকরের ঘুমন্ত মুখটা দেখে নিয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে কলতলার দিকে এগিয়ে গেল। কলে সোঁ সোঁ আওয়াজ আসছে এইবার জল আসবে। জলের কলকল শব্দটা শুনলে ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন আনচান করে ওঠে। ইচ্ছে হয় চুল উড়িয়ে পাগলীর মতো ছুটে যায়। সুধাকর এ নিয়ে ওকে ঠাট্টা করে। বলে কলকল শব্দের মধ্যে এখনও তুমি উলুধ্বনি শুনতে পাও কিনা, তাই তোমার এত নাচন।

শিপ্রা বাথরুমে ঢুকে পড়ল। তা বিয়ের মাত্র এক বছর সবে পূর্ণ হয়েছে উলুধ্বনি কান থেকে মুছে না যাবারই কথা, শিপ্রা সর্বাঙ্গে উলুধ্বনি নিয়ে এক স্বর্গীয় সুখানুভূতির সাবলীল প্রবহমানতায় ভেসে চলল। ভেসেই চলেছিল, এবার গামছাটা টেনে নিল—নাঃ ওকে তুলে দেওয়াই উচিত। না হয় একটু বকুনিই খাবে, কিন্তু কে জানে কি কাজ আছে, সেখানেও তো দেরী হয়ে যেতে পারে।

পায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই সুধাকর ধড়মড় করে উঠে বসল। মুখটার তখনও বোধহয় ঘুম ভাঙেনি—সারা মুখ জুড়ে আঠালো বোধহীনতা মাখানো। শিপ্রা বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করল। তারপর কৌতুকে চোখ নাচালো—'কি মশাই আজ অফিস-টফিস নেই নাকি?'

যেদিক থেকে কথাগুলো আসছিল, সুধাকর সেদিকে তাকালো। কে যেন হাত মুখ নেড়ে কি সব বলছে। কথাগুলো শোনার বেশ কিছুক্ষণ পর ও মানে বুঝল—এখনই ওকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। ও খুব অসহায় বোধ করল। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরার মতো হাতড়ে হাতড়ে ও সিগারেট-দেশলাই মুঠোয় ধরল। তারপর শিপ্রার প্রশ্নের উত্তরে সিগারেট ধরিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

শিপ্রা নিশ্চিন্ত হল, তাহলে সত্যিই ও অফিস যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে গর্বিতও—ও তো জানেই, ওর কাছে স্বামীর কোনো কিছুই অজানা থাকবে না কখনও। ও রহস্য করে চোখ পাকাল—আজ সাহেবের কাজটা কি শুনি?

এবার সুধাকর শিপ্রাকে চিনতে পারল। চোখ আটকে গেল গালের আঁচিলটায়। সেখান থেকে দৃষ্টি গেল কানের পাশে—চুলের ডগায় কতগুলো জলের ফোঁটা নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, কটা বাজে?

সাড়ে সাতটা। তা একটু দেরীতেই নয় বাজারে গেলে আজ তো অফিস যাচ্ছ না!—গভীর রহস্য জেনে ফেলার আনন্দে পুলকিত হয়ে শিপ্রা মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। চুলের ডগায় মুক্তোবিন্দুগুলো প্রবলভাবে দুলে উঠল। উৎকণ্ঠিত হয়ে সুধাকর দেখল, শেষ পর্যন্ত ওগুলো পড়ল না। এবার ও ঝাঁঝিয়ে উঠল—কি হয়েছেটা কি? কি ফালতু বকছ! খামকা অফিস যাব না কেন? নিদর্শনস্বরূপ ও খাট থেকে নেমে কলঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

শিপ্রার থুতনিটা ভারী হয়ে এল। চোখের কোলের চামড়া থিরথির করে কেঁপে উঠল। নীচের ঠোঁটটা ফুলে উঠতেই সেটা দাঁতে কামড়ে ও দুপদাপ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তেই স্থির হয়ে গেল, অন্তত সকালে ওদের মধ্যে কোনো কথা হবে না। কথা যাতে না হয়, তার জন্য শিপ্রা চা, খবরের কাগজ, বাজারের থলি সব সঠিক সময়, যান্ত্রিক কুশলতায় স্বামীর হাতে তুলে দিতে লাগল। যখন ও চাল বাছতে বসল তখন দৃষ্টিতীক্ষ্ণ যাতে একটাও কাঁকর স্বামীর মুখে না পড়ে। অসহযোগ বহালই ছিল, কিন্তু শেষের দিকে শিপ্রা ভেতরে ভেতরে শিথিল হয়ে পড়ল। প্রতিজ্ঞা হয়তো ভেঙেই যেত, কিন্তু খাওয়ার পর যখন সুধাকর একটু জিরিয়ে নিতে বসল শিপ্রা রীতিমত চমকে উঠল।—যে মানুষটা নটা বাজতে না বাজতেই পড়ি-কি-মরি করে ছোটে, সাড়ে নটা বাজতেও গা করবে না, এ কেমন কথা! তবে কি সত্যিই অন্য কোথাও যাওয়ার আছে? কিন্তু সে কথা বলাতে ও ক্ষেপে উঠল কেন? কেন ওর কাছে গোপন করল? শিপ্রার ভ্রূযুগলের মাঝে ছায়া পড়ে রইল। তারপর ও যখন দেখল, সুধাকর হেলতে দুলতে গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, বুকটা হঠাৎ কেমন খালি হয়ে গেল। জানলার গরাদে গাল ছুঁইয়ে ও একেবারে শেষ পর্যন্ত মানুষটার গতিপথ অনুসরণ করল। দেখল সুধাকর ওর অনতিক্রম্য বৃত্ত ছেড়ে এক রহস্যময় অজানা জগতে নিঃশব্দে হারিয়ে গেল। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন শুধু কয়লার দোকানের দাঁড়িপাল্লা মাটিতে পড়ার ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ।

হঠাৎ দারুণ আফশোষে শিপ্রার মন ভরে গেল—ক্যালেনডারে দাগ কাটার কারণটা কেন ও সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে নিল না? কেন বোকার মতো অভিমান করতে গেল? শিপ্রা জানে ব্যাপারটা হয়তো মামুলি কিছু, কিন্তু একবার যে সন্দেহ ঢুকে গেছে, তা যে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যাবে না। ধমকে ওঠার সময় যে সুধাকরের চোখ অদ্ভুতভাবে জ্বলে উঠেছিল তা যে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। হঠাৎ স্বামীর ওপর তীব্র অভিমানে মন ভরে গেল—কেন এ সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল? খাটে এলিয়ে পড়ে ও সজোরে বিছানা আঁকড়ে ধরল। মুখ ঘষতে ঘষতে অস্ফুট স্বরে বলে চলল, একি করলে তুমি আমার? এ কি করলে?—ঘন ঘন নিশ্বাসে জল-শুকিয়ে-যাওয়া টিউবওয়েল টেপার অনুভূতি নিয়ে ও বিছানায় ছটফট করতে লাগল।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটিয়ে হঠাৎ ও ধড়মড় করে উঠে পড়ল। বুঝতে পারল, এতক্ষণ ধরে ও মিথ্যেই কাঁদবার চেষ্টা করছিল। আসলে ততটা দুঃখ ওর হয় নি। বস্তুত স্বামীকে সন্দেহ করার জন্য অপরাধ বোধ ঠিক ওর দুঃখের কারণ ছিল না, আসলে স্বামীকে সন্দেহ করেও যে ওর কোনো গ্লানিবোধ [illegible] ওর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে [illegible]। কিন্তু সে যাই হোক, সন্দেহ [illegible] ঢুকে গেছে একবার, [illegible] না [illegible] শান্তি নেই। প্রথমে ও [illegible] দেখবার চেষ্টা করল, আজ [illegible] বিল জমা দেওয়া, রেশন কার্ড রিনিউ করা জাতীয় কিছুর দিন কিনা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুকটা ধক করে উঠল—আজই বোধহয় লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম ভরার শেষ তারিখ, এবং সেই জন্যই দাগটা। ওর স্বামী ভুলে যায়নি তো? দাগটা কি দেখেছে ও? শিপ্রা তাড়াতাড়ি একটা দেরাজ খুলে কাগজটা খুঁজতে লাগল। তারপর আরেকটা দেরাজ। এবং এক সময় কখন আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে দেরাজ, আলমারী ইত্যাদি গুছিয়েই সকালটা কাটিয়ে দিল।

একা হলেও সাধারণতঃ শিপ্রা বেশ পরিপাটি করে গুছিয়ে খেতে ভালবাসে। আজ দেরীতে বাজার আসায় তাড়াহুড়োয় কিছু হয়নি। ডালের হাতায় ভাত তুলতে গিয়ে হঠাৎ ও আবিষ্কার করল যত্ন করে খাওয়ার চেয়ে হেলাফেলা করে খেয়ে দুঃখ পাওয়া অনেক সুখের। আহা আমায় কেউ দেখবার নেই—এ [illegible] কথা ভাবতে ভাবতে

ওর গলা ধরে এল, চোখ ছলছল করতে লাগল। কিন্তু দুঃখটা বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারল না। ছোটবেলা থেকে মামার বাড়িতে অযত্নে-অলক্ষ্যে মানুষ। আজ নিজস্ব একটা সংসার পেয়ে ও সত্যিই সুখী। নিজেকে নিঃসহায় ভাবতে গিয়ে সেই সুখটাই বার বার ফিরে এল। সুখে মন জারিয়ে নিতে নিতে হঠাৎ ও সতর্ক হয়ে উঠল—এ আমার ভুল নয়তো? আমি মূর্খের স্বর্গে আছি এমন নয়তো?

বিয়ের আগের অবহেলিত জীবনে শিপ্রর কোনো কিছুই অনায়াসলব্ধ ছিল না। যা কিছু পেত তা আদায় করে নিতে হত বলে পাওয়া বা দেওয়া ওর কাছে লেন-দেনের সামর্থক হয়ে রয়েছে। তাই কোনো ফাঁকির আভাষ দেখলে ও যুদ্ধের আমন্ত্রণ পায়। ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় সূচাগ্র হয়ে উঠল—আমি ঠকছি না তো? দেরী করে ওঠা বা ক্যালেনডারে দাগ কাটা নেহয় তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু এ দুটো একই দিনে ঘটল কেন? প্রশ্নটা ও ওর মর্মমূলে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই বিশেষ ভাবিত হতে পারল না।

এবার ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল—'আহা আমি কত সরল। আমার মধ্যে কোনো ঘোর-প্যাঁচ নেই কোনো অশান্ত চিন্তা মনে আসেই না—। আবেগে ওর গলা ধরে এল। এক ব্যথাময় সুখানুভূতি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ও ঠিক করে নিল এই প্রবঞ্চনাময় পৃথিবীতে যদি বারবার ঠকাতেও হয় ঠকবে, কিন্তু কখনও বিশ্বাস হারাবে না, মন নিষ্কলুষ রাখবে—। ভাবতে ভাবতে নেশা ধরে গিয়েছিল, হঠাৎ খেয়াল হল স্বামীকে অবিশ্বাসনীয় অশ্রদ্ধেয় করে গড়ে তুলে, অনেক নীচে নামিয়ে দিয়ে ও স্বার্থপরের মতো নিজেকে ঘিরে একটা পৃথক বৃত্ত সৃষ্টি করে নিষ্পাপ থাকতে চাইছে। স্বামীর সেই প্রবঞ্চক রূপ চোখে ভেসে উঠতেই ওর বুক টনটন করে উঠল। বন্ধুদের কাছে দিনরাত স্ত্রৈণ বলে অকথ্য গালি খাবার সময় মানুষটার লজ্জায় কুঁকড়ে ওঠা মুখের মধ্যে যে নির্ভুল অসহায়তা ফুটে ওঠে, তা যে শিপ্রার বিরাট সম্বল। শিউরে উঠে ও দ্রুত মাথা নাড়ল—না না না স্বামীকে ছাড়া ওর আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। না নেই। থাকতে পারে না। কখনওই থাকতে—

হঠাৎ পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেল। ও যেন গভীর কুয়োয় ঢিল ফেলেছিল শব্দ শোনার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রইল। নিশ্বাস ফেললেও যেন সে শব্দ চাপা পড়ে যাবে।

অনন্তকাল পরে স্তব্ধতা ভাঙল। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু দাঁড়ি-পাল্লা মাটিতে পড়ার 'ঝনাৎ ঝনাৎ' শব্দ।

শিপ্রা আর দেরী করল না। অনেকক্ষণ ধরে একটা তীব্র ইচ্ছাকে ও ঠেলে দিয়ে [illegible] নিয়ে

নিল—এই মুহূর্তেই একবার অন্তত স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

টেলিফোন বুথের দরজা বন্ধ করতেই ভারী ঠান্ডা হাওয়া শিপ্রার বুকে এসে ধাক্কা মারল। চকিতে ও দেখল একটা অন্ধকার খুপরির মধ্যে ও আবদ্ধ। দরজার ফাঁকে একটা আলোর ফালি কাঁপছে। আলোর কাঁপুনি থামা পর্যন্ত ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শিহরণ মিলিয়ে যেতে এবার ও হাতটা চোখের খুব কাছে নিয়ে এল। তালুতে লেখা সুধাকরের অফিসের নম্বর! ও মুখস্থ করে নিল। তারপর শান্তভাবে রিসিভার তুলে নিয়ে দৃঢ় হাতে একের পর এক নম্বর ঘুরিয়ে চলল। তীব্র শব্দে রিং বেজে উঠতেই সংগে সঙ্গে ও মুঠোর ভেতর পয়সাগুলো সজোরে চেপে ধরল. ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তারপর মুঠো আলগা করল। পয়সাগুলো দু' আঙুলে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকে রিং বেজেই চলেছে। বেশ কয়েক বার বাজতেই আবার ওর মুঠো শক্ত হয়ে এল। পয়সাগুলো ও বকসের ওপর রেখে বার কয়েক হাত কচলাল। শাড়িতে ঘাম মুছে নিল। তারপর আবার পয়সাগুলো তুলে নিল।

রিং বেজেই চলেছে। শিপ্রা পয়সাগুলো আবার বকসের ওপর রাখল। তারপর ক্ষিপ্রভাবে রিসিভারটা বাঁ-কান থেকে ডান-কানে নিয়ে এল। তারপর পয়সাগুলো তুলে নিল।

রিং বেজেই চলেছে। শব্দটা ক্রমশই যেন তীব্রতর হচ্ছে। হঠাৎ শিপ্রা হাঁটু দুটো কেমন যেন দুর্বল বোধ করল। আস্তে আস্তে ও একটা পায়ে মাটিতে চাপ দিতে লাগল। শব্দটা বেড়েই চলেছে। ক্রমশই যেন ওকে অধিকার করে ফেলছে। শিপ্রা চাপ বাড়িয়েই চলল। বাড়াতে বাড়াতে শেষে সমস্ত শক্তি দিয়ে পা মাটিতে চেপে ধরেও ও শব্দটাকে দাবিয়ে রাখতে পারল না। প্রতিরোধ দ্রুত ভেঙে পড়ল। তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ সারা শরীর জুড়ে ঝনঝন করতে লাগল। শিপ্রা অস্থির হয়ে পড়ল...জানলা ঠেলে বৃষ্টি আসার মতো চারদিক থেকে কিছু যেন একটা ঢুকে পড়ছে...ও বাধা দিতে পারছে না...সে কি কোনো বিপদ?... কিছুই বুঝতে পারছে না ও...শুধু মনে হচ্ছে কোথাও ভয়ঙ্কর কিছু একটা দানা বেঁধে উঠছে...কিছু যেন ঘটতে চলেছে...ও

কি প্রয়োজনীয় কিছু ফেলে এসেছে?...ওর হাতে কি একটা যেন ছিল না?...না না না পয়সা নয়...অন্য কি একটা...হাতটা বড্ড খালি খালি লাগছে...শিপ্রা অস্থিরভাবে হাত কচলে চলল...কি যেন একটা...কি যেন একটা...

হঠাৎ আঁচলে চাবিটা ঝনঝন করে উঠতেই বুকটা হিম হয়ে গেল—আসবার সময় দরজার তালাটা ও শেষ পর্যন্ত লাগিয়েছিল তো?..

উঁহু...লাগায় নি বলেই যেন মনে হচ্ছে...

শিপ্রা বড় অসহায় বোধ করল। চাবি লাগাবার অনুভূতিটা মনে করবার চেষ্টায় ও আঙুল দুটো সেই ভঙ্গিতে সমানে ঘুরিয়ে চলল। শিপ্রা অস্থির হয়ে পড়ল—শুধু তালা নয়...খিড়কির দরজাটাও যেন ও খোলা দেখে এসেছে. জমাদার যাবার পর কি ও বন্ধ করেছিল?...আর তাছাড়া...

কিছুই মনে পড়ে না। ধোঁয়ার মতো কিছু যেন একটা ওর বোধ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শুধু আবছাভাবে মনে হচ্ছে কোথায় যেন বিপুল আয়োজনে নিলাম ডাকা হচ্ছে। শিপ্রা মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে. হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল গ্যাসের ওভেনের চাবিটা কদিন ধরে লিক করছে তলা থেকে সিলিন্ডারের চাবিটা আজ বন্ধ করা হয় নি। এ ব্যাপারে শিপ্রা আর সন্দেহ রাখল না। রিসিভার নামিয়ে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি গিয়ে পৌঁছল।

কিন্তু সিলিনডারের নবটাকে একটুও নড়াতে পারল না। সাবধানী সুধাকর রোজকার মতোই অফিস যাবার আগে এঁটে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। জোর করে ঘোরাতে গিয়ে সুধাকরের দৃঢ় মুষ্টির চাপটাই যেন শিপ্রার হাতের তালুতে ফিরে এল—একটা শিহরণ হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। দীর্ঘ ঘন নিশ্বাসে হাওয়ার প্রতিটি স্পর্শ বুকে নিয়ে শিপ্রা পূর্ণ উন্মীলিত চোখে তাকাল। মুখ ফেরাতেই এঁটো-কাঁটার মধ্যে একটা বেড়াল করুণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল। শিপ্রা চকিতে দুধের ডেকচিটা দেখে নিল। ঢাকনার ওপর নোড়া চাপানো। দেখল ডাল-তরকারী কিছু নেই বোয়েমগুলো তাকে—ওর জগৎ সুসংরক্ষিত। শুধু জালের আলমারীটা একটু ফাঁক ছিল ও পুরোপুরি

টেনে দিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। দালানে পা দিয়েই ও চমকে উঠল—পায়ের কাছে কি একটা চকচক করছে। কিন্তু তুলেই আবার ফেলে দিল—কিছু না সিগারেটের রাংতা। এবার ও খিড়কির দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বন্ধই ছিল তবুও ও শেকলে লাগানো গজালটা আরো একটু ঢুকিয়ে দিল। তারপর বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু—না সব ঠিকই আছে। কলটা আরো এক প্যাঁচ এঁটে দিয়ে ও শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঢুকতেই পা দুটো সামান্য আড়ষ্ট হয়ে এল। ঘরের ভেতর হাওয়া জমাট বেঁধে থমথম করছে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ছিটে-ছাঁটা রন্দুর এসে ঢুকেছে। আয়নায় ঠিকরে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। দেওয়ালে বিচিত্র সব নকসা। হাওয়ায় ঠান্ডা হাতের স্পর্শ। এক ফালি রোদ সেলাই কলের ঢাকনায় এসে পড়েছিল শিপ্রা ঘরের সাবয়ব স্তব্ধতা একটুও বিঘ্নিত না করে পর্দাটা একটু টেনে দিল। জলের গেলাসটা টেবিলের ধার ঘেঁষে ছিল সরিয়ে রাখল। নড়বড়ে আলনাটা হেলে পড়েছিল পেছনে ঠেলে দিল। কিন্তু আরো কি একটা যেন করবার আছে না?... আলমারীর হাতলটা ধরে ও টানল—না লক করাই আছে। আর?... আর?...একটা কিছু সত্যিই করবার আছে...কোথায় কি একটা যেন পড়ে থাকতে দেখেছিল না?...একটা ব্লেড...কিম্বা আরশির টুকরো...না কি একটা...ও ব্যস্তভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল...শূন্য কুলুঙ্গি...ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে আসা টিকটিকির খাঁজ কাটা ল্যাজ... সিলিং ফ্যানের জন্য কড়িকাঠে ঝোলানো শূন্য আংটা...ক্যালেন্ডার...বৃত্তের মধ্যে একটি তারিখ...একটি দিন...দেওয়ালে আরশোলা টেপাব দাগ—অস্থিরভাবে ওর দৃষ্টি ঘোরাফেরা করতে করতে হঠাৎ সুইচ বোর্ডে পড়তেই বুকটা ধক করে উঠল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ও প্লাগটা খুলে নামিয়ে রাখল। কিন্তু পরক্ষণেই হাত শিথিল হয়ে পড়ল—প্লাগটা ইস্ত্রির নয় নিরীহ নাইট ল্যাম্পের। কিন্তু চোখ আটকে গেল নীল ডুমটায়—কেমন যেন আলগাভাবে ঝুলছে না?...একি?.. এতদিন খেয়ালই করে নি।...এতো যে কোনো মুহূর্তে খুলে পড়তে পারে! শিপ্রা তাড়াতাড়ি একটা টুল টেনে আনল। উঠতে যাবে হঠাৎ প্লাগের ভেতর ও ডুমের পিনটা আটকানো দেখতে পেল। কিন্তু উৎকণ্ঠা তবুও গেল না। আসলে এসব কিছুই না... অন্য কি একটা যেন ফাঁক রয়ে যাচ্ছে...যা দিয়ে ভীষণ বিপদ ঢুকে পড়তে পারে...ভীষণ বিপদ...কি তা ও বোধহয় জানে...কিন্তু এখন কিছুতেই মনে করতে পারছে না...কি একটা যেন ব্যাপার...তাতে কালো চামরের মতো কি একটা যেন জড়িত.. আর...আর.. হ্যাঁ একটা 'ল' অক্ষর আছে তাতে কিন্তু কিছুতেই ও ধরতে পারছে না..একটা ভারী হাওয়া ক্রমশ ঘর ভরে তুলতে লাগল কি যেন ঘনিয়ে আসছে..কি যেন ঘটতে চলেছে.. প্রবল অস্বস্তিতে শিপ্রা অস্থিরভাবে চারপাশে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ও থমকে দাঁড়াল—কোথা থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ আসছে না? শিপ্রা সচকিত হয়ে উঠল। খুব সন্তর্পণে ও টেনে শ্বাস নিল।

এবার ও আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারল—তখন গোলেমালে গ্যাসটা আবার খোলা রয়ে গেছে। ও তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ছুটল।

কিন্তু অকারণই। গ্যাস বন্ধই আছে।

শিপ্রা বিহ্বল হয়ে পড়ল। গন্ধ যে সত্যিই একটা পাচ্ছে ও। সেটা কি গ্যাসের নয়? তবে কিসের? সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে ও আবার শ্বাস নিল—হ্যাঁ খুব হালকা একটা গন্ধ আছে...ভ্যাপসা...যেন কোথাও পচ ধরেছে.. সকালে যে দেরাজ-আলমারী ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তার থেকেই কি কিছু বেরিয়েছে... মরা ইঁদুরটিদুর?... কিম্বা... না না না ইঁদুর নয়. কেমন যেন গা-মেশানো গোছের গন্ধ... তাহলে কি মাচার পারনো লেপ তোষক থেকে আসছে?.. কিন্তু এ রকম গন্ধ তো পাওয়া যায় ঠাকুর ভাসানের ঘাটে তবে গন্ধটা কি পচা ফুলটুলের?...

গন্ধের খোঁজে রান্নাঘর ছেড়ে বেরোতেই আবার গ্যাসের গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রার চোখ দুটো ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে—ও বোঝে ওর মুক্তি নেই। ও চলতে শুরু করে—দালান থেকে শোবার ঘর শোবার ঘর থেকে ভাঁড়ার ঘর ভাঁড়ার থেকে বাথরুম আধতলার ঘর—সারা বাড়ি তোলপাড় করতে থাকে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গন্ধের উৎস খুঁজে ও পায় না। কিন্তু প্রত্যয় কিছুতেই হয় না। কেবলই মনে হয় কি যেন বাকি রয়ে গেছে কোনখানটা যেন ভাল করে দেখা হয় নি। একই জায়গায় ও আবার ফিরে আসে। বারবার ফিরে আসে। ছোট বৃত্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে।

যে স্বাদ
সকলের
মুখে মুখে !
WILLS
VIRGINIA
WILLS
W.D.& H.O.WILLS
WILLS
VIRGINIA
FILTER
উইলস্‌-এর নামডাক যেমনি স্বাদও তেমনি
সর্বাধিক মূল্য ২ টাকায় ২০টা, ১ টাকায় ১০টা

রূপচর্চার সময় একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, মেক-আপ করা মানে নিজের চেহারা একেবারে বদলে ফেলা অর্থাৎ নিজেকে কোন অভিনেত্রীর মতন করা কিম্বা কোন সুন্দরীর ছবির মতন করা। স্টেজে বা সিনেমায় কোন অভিনেত্রীকে অপরূপা দেখাতে পারে, কিন্তু তাকে ওই সব আলো ছাড়া সামনে থেকে দেখলে নিরাশ হবেন। সুতরাং এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে যা বিশেষ এক অবস্থায় বিশেষ একজনকে ভাল লাগতে পারে তা আর একজনকে নাও লাগতে পারে। সেই জন্য সাজটা বিভিন্ন চেহারার সঙ্গে বদলাতে থাকে ও বদলানো উচিতও। একটা বিশেষ রূপসজ্জায় একজনকে অপরূপা দেখাতে পারে কিন্তু ঠিক সেই রকম ওই একই রূপসজ্জায় দ্বিতীয়জনকে রীতিমত কুরূপা লাগতে পারে। সুতরাং সাজবার সময় কিছুটা চিত্রকর আর কিছুটা ডাক্তারের ভূমিকা আমাদের সবাইকে গ্রহণ করতে হয়। কারণ এই দুই চরিত্রই ঠিক ঠিক বলে দিতে পারবে—কোন চেহারায় কোন ত্বকে কোন সময় কি রকমের রং বা সামগ্রী ব্যবহার করা দরকার। সুতরাং সাজার সময় এগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে সাজা উচিত।

তার ওপরে আছে যিনি সাজবেন তার বয়স। বয়স আর একটা বিশেষ ব্যাপার যার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হওয়া দরকার। একজন অষ্টাদশী তরুণীর সাজ বা যে রং চলবে তা চল্লিশ বছর বয়সের মহিলার পক্ষে চলে না। তবে হ্যাঁ সাজ বা রূপের যত্ন কিন্তু সব বয়সের জন্যই। রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দোষের নয় বরং যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। আর আধুনিক যুগে এতে প্রাধান্য বা গুরুত্ব বাড়ে বই কমে না। অনেক সময় দেখা গেছে যে চিত্র তারকাদের বা চলতি ফ্যাশান-এর নকল অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু এটা ভুল করলে চলবে কেন যে বিশেষ কেশ বিন্যাস কোন বিশেষ মুখের মাপের সঙ্গেই কেবল-মাত্র চলে। তাই চলতি ফ্যাশানের স্রোতে ভেসে নিজেদের চেহারাটা একটা মুখোশের মত তৈরী করে রাখা শুধু মাত্র রুচিরই বিকৃতি ঘটায় না এটা সময়ে সময়ে খুব হাস্যকরও হয়ে থাকে। তাই আমার অনুরোধ বিচার

ত্বকের যত্ন করার ব্যাপারে আমরা ঘরের তৈরী এবং বড় বড় কোম্পানীর তৈরী বহু জিনিসের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি। এর সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার আছে তা হোল খাদ্য। খাদ্য ত্বকের সৌন্দর্য ও তাকে তাজা রাখার ব্যাপারে বহু পরিমাণে সাহায্য করে থাকে। ত্বক ও তার খাদ্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আলোচনা আজ করবো। (১) শুকনো খসখসে ত্বকের জন্য সবচেয়ে বড় ওষুধ হোল ভিটামিন। কাঁচা সবজি খাওয়া অভ্যাস করতে হবে। কারণ কাঁচা সবজিতে আসল ভিটামিন পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় সবজি রাঁধতে হলে তেল ঘি কম দেওয়া উচিত এবং প্রেসারে রাঁধলে আরও ভাল। খাঁটি দুধ ডিমের নরম সেদ্ধ মাখন মেটে মাছ টমেটো গাজর বিন সবুজ সবজি ও ফলের মধ্যে কমলা বাতাবি লেবু ও কলা। এগুলি খেলে খসখসে ভাব চলে যায় এবং একটা নরম স্বচ্ছ ভাব আসে চেহারায়।

(২) তেলতেলে ত্বক হলে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে তৈলাক্ত খাদ্য চলবে না। শুধু তাই না—খুব বেশী চর্বি জাতীয় খাদ্যও তার পক্ষে ভাল নয়।

লেটুস পাতা শশা কমলা আনারস আপেল চিজ ইত্যাদি খাওয়া যায়। অবশ্য সবুজ তাজা সবজি সব রকম ত্বকেই চলবে কারণ ওটা পেট ও রক্ত পরিষ্কার রাখে। ফলে ত্বকও সুন্দর হয়। মধু মেটে কড়াই-শুঁটি পেঁয়াজ (কাঁচা বেশী ভাল) ফুলকপি বাঁধা কপি ও ওল—এই সব দিয়ে অল্প মশলা ও নামমাত্র তেল ঘিয়ে রান্না করে খেতে হবে। পাতি লেবুর রস সকালে ও যে কোন খাদ্যের মধ্যে দিয়ে খাওয়া সব রকমের ত্বকের জন্য ভাল।

নুন খুব বেশী খাওয়া ভাল নয়। আর যাদের ত্বকের নীচের রোমকূপের ছিদ্রগুলি বেশী বড় তারা কফি এলকোহল ও বেশী মশলা এবং তেলের রান্না খাবেন না। মধু এদের জন্য ভাল।

কাঁচা সবজির স্যালাড খেতে পারলে তা ত্বকের পক্ষে খুব ভাল। যেমন একটি ডিমের কুসুম ভাল করে ফেটিয়ে তাতে কমলা লেবুর (এক কাপ) রস দিয়ে তার সঙ্গে লেটুস শশা গাজর কড়াইশুঁটি ও টমেটো ছোট ছোট করে কেটে মিশিয়ে নিয়ে খেলে খুব উপকার হয়।

এসব খেলে ত্বক শুধু উজ্জ্বল হয় তাই নয় বহু বয়েস অবধি যৌবনের লাস্য শরীরে রেখে দেয়। (৩) যাদের বয়স তিরিশের কোঠা ছাড়িয়েছে তাঁদের কতক-গুলি খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে বেশ সচেতন হওয়া দরকার যেমনঃ—(ক) প্রতিদিন পাঁচ-ছয় গেলাস জল খাওয়া দরকার প্রতিবার খাওয়ার সময়ের মাঝখানে।

(খ) প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস গরম জলে একটি পাতি লেবুর রস দিয়ে খাওয়া উচিত।

(গ) রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে এককাপ গরম দুধ খাওয়া উচিত।

(ঘ) প্রতিদিন কাঁচা সবজির স্যালাড খাওয়ার সময় তা বেশী করে খাওয়া।

(ঙ) চর্বি ছাড়া মাংস বা মাছ সেদ্ধ করে কাঁচা পেঁয়াজ ও সস দিয়ে খাওয়া। টমেটো ইত্যাদি দিয়েও খাওয়া চলে। সেটা নিজের রুচি অনুযায়ী তৈরী করে নিতে হবে।

(চ) সবজি সামান্য কালোজিরে ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে রান্না করে খাওয়া।

(ছ) ফলের রস প্রতিদিন এক গেলাস নিশ্চয়ই খাওয়া দরকার তবে তাতে চিনি পড়বে না।

এই রকম খাদ্য খেয়ে দেখুন রং ফর্সা হবে আর সেই সঙ্গে মুখের চেহারা অনেক উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখাবে।

এমন কি চুল চোখ ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও চাই ঠিক মতন খাদ্য।

(১) চুল। চুল ভাল ও মজবুত রাখার জন্য গাজর তাজা ও কাঁচা সবজি ও আপেল খাওয়া খুব উপকারী। আর একটা জিনিস চুলের [illegible] প্রয়োজন তাহোল আইওডিন। এই আইওডিন পাওয়া যায় রসুন আনারস কাঁকড়া ও কডলিভার তেলে। সুতরাং এগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়া ভাল।

(২) চোখ। চোখের সুস্থতার জন্য চাই ভিটামিন 'এ ও দুগ্ধজাত খাদ্য। বিট গাজর পাতি লেবু এবং কমলা লেবুও ভাল।

(৩) দাঁত। দাঁতের জন্য চাই ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। দুধ বেশী করে খাওয়া ভাল। কারণ দুধ হচ্ছে গলিত ক্যালসিয়াম। দই খয়ের পাতা অবশ্যই। এছাড়া সপ্তাহে একদিন অন্তত এমন মাছ খাওয়া উচিত যাতে ফসফরাস আছে।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন সৌন্দর্য রক্ষা করতে হলে সবচেয়ে বেশী দরকার দেহের ত্বক চুল চোখ ও দাঁতের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য। এবং সেগুলি ঠিক রাখতে হলে দরকার উপযুক্ত খাদ্য। উপরের খাদ্য তালিকা মোটামুটি ব্যবহার করে দেখুন ভাল ফল পেতে বাধ্য।

সুবর্ণপর্ণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জুলিয়েন টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাপটা হাতে ধরে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল।

ঝিন্নি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলতেই জুলিয়েন বলল চায়ের কাপ হাতে গল্প শুরু করলে কাল আর বন্ধুকে নিয়ে মানালী পৌঁছতে হবে না। চোবাই গাড়ীর খোঁজে পুলিশ অফিসার আর দুজন কনস্টেবলকে এখন থেকেই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে। তখন মিস শর্মা আজ রাতের অভিনয়টাই সত্যি হয়ে দাঁড়াবে।

জুলিয়েন তাড়াতাড়ি করে কয়েক চুমুকে চাটুকু গলার ভেতর চালান করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমিও তার সঙ্গে বাইরে আসতে আসতে বললাম অন্তত নীচের রাস্তা অব্দি তোমার সঙ্গে যেতে দাও।

জুলিয়েন বলল যেতে আসতে অকারণে আধ ঘন্টারও বেশী সময় কেন মিথ্যে আমার পেছনে নষ্ট করবে নুখার্জি. তোমরা আধ ঘন্টা বেশী গল্প করলে আমি বন্ধু হিসেবে বরং আরও বেশী খুশি হব।

বিদায় নেবার জন্য জুলিয়েন হাত তুলল তারপর পথের ওপর টর্চের ঝলক দিতে দিতে নীচের দিকে নেমে গেল।

আমি উঠে এসে দেখি ভেতরের দরজায় হাত রেখে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরের দরজা আমিই বন্ধ করলাম। ঝিন্নি কোন কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি ওর পাশে গিয়ে বললাম ঝিন্নি কত বছর তোমাকে দেখি নি।

ও আরও কিছুসময় অনামনস্ক হয়ে রইল। এক সময় বলল এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ছোটসাহেব! একটু পরে তুমি যখন চলে যাবে তখন মনে হবে আমি সত্যি স্বপ্ন দেখেছি।

ওর হাত ধরতেই ও আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় ওর মুখখানা আমার বুকের ওপর থেকে তুলে নিলাম আমার দু' হাতের পাতায়। একটি ফুটে ওঠা ম্যাগনোলিয়া যেন তার অতি কোমল লাবণ্য আর গন্ধ নিয়ে আমার অঞ্জলিতে বাঁধা পড়েছে।

ফুলটির দিকে চেয়ে দেখলাম দু' ফোটা ভোরের শিশির সেখানে টলটল করছে।

ছোট্ট এইটুকু মুখ কিন্তু অনেক সময় মনে হয় সে মুখ এতবড় বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও ধরে রাখা যাবে না। তার আনন্দের ভার অকুল বিশ্বকে প্লাবিত করে উপচে পড়বে যেন।

আমি ঝিন্নির মুখখানাকে হৃদয়ের গভীরে ধরে রাখতে গিয়ে দেখলাম আমার সমস্ত মন ভাদ্রের ভরা দীঘির মত টলমল করছে।

ঝিন্নি চোখ তুলে বলল, ছোটসাহেব ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা বলব না, তোমাকে কোন চিঠিও লিখবো না কোনদিন।

আমি অবাক হয়ে ঝিন্নিকে টেনে নিয়ে এলাম ওর বিছানার ওপর। ওকে আমার পাশে বসিয়ে বললাম, কি অপরাধ আমি করেছি ঝিন্নি, যাতে তুমি এতবড় শাস্তি দেবে?

ঝিন্নি বলল, তোমার শেষ চিঠিখানা তুমি কেন এমন করে লিখলে? আমার মনটা কি পাথরপাষাণ যে তুমি ক্রমাগত আঘাত করে যাবে আর আমি বন্যার মত চোখের জল ঝরিয়ে যাব?

আমার মনে পড়ল শেষ চিঠির কথা-গুলো। চিঠির একটি অংশে আমি লিখেছিলাম :

আজ আমি একটি তুষারঝড়ে আক্রান্ত পর্বত-অভিযাত্রী তরুণকে ছ' ঘন্টা অন্তর হেপারিন ইনজেকসান দিচ্ছি। থ্রমবোসিস অথবা গ্যাংগ্রিন হবার সম্ভাবনা আর নেই। রোটাং পেরিয়ে লাহুলের দিকে যাবার সময় হঠাৎ সে ভয়ংকর তুষারঝড়ে পড়ে যায়। রোটাং-এ ইগলুর মত যে ছোট্ট ঘরখানা রয়েছে, সেখানকার একটি লাহুলী মেয়ে ওকে টেনে নীচের পাহাড়ে নামিয়ে আনে। ভাগ্যিস একটি মিলিটারি জীপ সে সময় এসে পড়েছিল। ওরা তরুণটিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

শুনলাম, রোটাং-এ নাকি গ্রীষ্ম আর শরতের শুরুতে প্রায়ই তুষারঝড় বয়।

ছেলেটি শুয়ে আছে বেডে। ও একটু আগে বলেছিল, ডাক্তার সাব, আর যা করুন দয়া করে আমার পা-টা কেটে বাদ দেবেন না। তাহলে আর কোনদিন পাহাড়ে উঠতে পারব না।

আমাদের দেশে এমন পাহাড়-প্রেমিক ছেলে আছে জেনে দারুণ ভাল লাগছে।

আজ ওকে ইনজেকসান দিয়ে আমি কিছু সময়ের জন্যে ভ্যালির দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ ঝড় শুরু হল। ভ্যালির ভেতর বয়ে এল একটা কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। অদ্ভুত সাদাটে একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ মাটি দিক-বিদিক ছুঁয়ে। চলে আসার জন্যে আমি টর্চের আগামটাও

খুলে ফেলেছিলাম, কিন্তু এ দৃশ্য চোখ ভরে না দেখে এক পাও নড়তে পারলাম না।

আমি তাকিয়ে রইলাম দূরে তুষার-পাহাড়ের দিকে।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি যেন মেরু-অভিযাত্রী ক্যাপটেন স্কটের তাঁবুতে রয়েছি। চারদিকে মৃত্যুশীতল তুষারঝড়ের হাহাকার বাজছে। আমার হাতে পায়ে তুষার-ক্ষত। আমি দ্রুত চলার শক্তি হারিয়েছি। আমাকে ফেলে ক্যাপটেন যেতে পারছে না।

সেই মুহূর্তে আমি কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। তীব্র তুষারপ্রবাহের ভয়াবহ মৃত্যুর ভেতর নিজেকে সঁপে দিলাম। হারিয়ে যেতে যেতে আমি ক্যাপটেন স্কটের ভাষায় বলে উঠলাম, আমি চলে যাচ্ছি, হয়ত আবার কোনদিন তোমাদের ভেতর ফিরে আসব।......

চিঠির কথাটা মনে পড়তেই বললাম, অস্বাভাবিক কল্পনার একটা অসুখ আছে আমার ভেতর। পরে যখন ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করি তখন নিজেকে পাগল ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না। তোমাকে যখন ভ্যালি থেকে ফিরে এসে সেদিন চিঠি লিখি, তখনও আমার মনকে ঐ কল্পনার ঘোর পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

ঝিম্নি বলল, বল, তুমি আর কোনদিন এমন চিঠি লিখবে না?

একটু হেসে বললাম, বেশ, তোমার কথাই মেনে চলার চেষ্টা করব।

ঝিম্নি এবার আমার একখানা হাত ওর দু' হাতের ভেতর ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বললাম, দেখ তো কত সহজে আমাদের সন্ধি হয়ে গেল।

ঝিম্নি আমার হাতখানা ওর মুখের ওপর ঢেকে শুধু খুশি খুশি চাউনি মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল। ওকে বুকের কাছে টেনে এনে বললাম, আমার হারিয়ে যাবার এই একটিমাত্র জায়গাই তো আছে।

ঝিম্নি ওর মুখখানা ক্রমাগত আমার বুকে ঘষতে লাগল। কোন কথা বলল না।

এক সময় ও ওর বিনুনী খুলতে শুরু করল। কিছু পরে কি ভেবে আবার খসানো বিনুনী বেঁধে ফেলল।

বললাম, কি হল? চুল নিয়ে হঠাৎ খেলা শুরু করলে?

ও বলল, আর কিছু পরেই তো তোমার সঙ্গে নীচে নামব, তখন খোলা চুল বেঁধে তুলতে অনেক সময় লাগবে। ভেবে দেখলাম, চুল বেঁধে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই।

বললাম, কি করে এখানে এলাম জান ঝিম্নি?

ও অমনি আমার মুখে ওর নরম আঙুলগুলো চেপে ধরে বলল, দোহাই তোমার ছোটেসাহেব, কৃপণের ধনের মত আমার একটুখানি সময় আজ আর কেড়ে নিও না। চিঠিতে সব ঘটনা অনেক বড় করে জানিও. শুধু এই ক'টা মুহূর্ত তোমাকে একটু দেখতে দাও।

ওকে আমার বুকের ভেতর টেনে এনে বললাম, তুমি আমার এই বুকের পাঁজরের ওপর কান পেতে শোন তো ঝিম্নি, কোন কথা শুনতে পাও কিনা?

ও কান পাতল। তারপর বলল, তুমি দারুণ লোভী আছ ছোটেসাহেব। খালি তোমার বুক বলছে, দাও দাও দাও দাও।

প্রবল আকর্ষণে ঝিম্নি সেই মুহূর্তে আমার বুকের খাঁচায় একটা ভীরু পাখি হয়ে গেল।

বালু বাড়তি কিছু কাজ করে দিচ্ছে আমার। কম্পাউন্ডার ওষুধ তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকলে বালু সকালে রোগীর ভীড় ঠেকায়। আমার নির্দেশমত লাইনে দাঁড় করিয়ে পর পর স্লিপ ধরে রোগীদের ডাক দিয়ে আনে আমার কাছে।

এতদিন এ কাজ কম্পাউন্ডার একাই করত ওষুধ তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এখন রোগীর ভীড় বেড়েছে তাই বালুর দরকারটা বেশ বুঝতে পারি।

ও বেচারা প্রতিদিন সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে কাজের ধান্দায়। কোথাও কাজ জুটলে ভালো, নয়তো বনে বনে ঘুরে লকড়ি এক বোঝা পিঠে বেঁধে নিয়ে চলল।

আজকাল আমার কাছে ও প্রায়ই আসে। কাজে যাবার আগে ভোরবেলা একবার হাজিরা দেয় আমার ডিসপেন-সারিতে। কোন কথা বলে না ও। আমার রোগী দেখার ঘরে টেবিলের ওপর ফুল রাখার অভ্যেস। বালু ওটা জেনে ফেলেছে। ও দু' একদিন বাদে বাদে ফুলপাতা নিয়ে এসে ফ্লাওয়ার ভাসটা সাজিয়ে দিয়ে যায়। কোথা থেকে যে ও ফুল আনে তা আমি জানি না. তবে আমার বাগানের ফুল তুলে বালুকে কোনদিন ফুলদানি সাজাতে দেখি নি।

আমি ওপরের বারান্দায় বসে আকাশ পৃথিবী জুড়ে ভোরের আয়োজন দেখি। দূরের পাহাড়ের মাথায় যেখানে সিডার বন গহন ঘন হয়ে আছে, তার আড়ালে সিঁদুরের টিপের মত টকটকে লাল সূর্যটা উঁকি দেয়। আমি কিন্তু তাকে দেখতে পাই না। আমি দেখি বন আর পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা দু'-এক টুকরো মেঘ হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠছে। আকাশের যেখানে যেখানে মেঘ সেখানেই আবীর ছড়িয়ে পড়ছে।

বাঁ দিকে নীল আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পীর পাঞ্জালের তুষারচূড়ো। ভ্যালিতে কুয়াশার চাদর বিছানো মেঘ। পীর পাঞ্জালের শৈলশিখরে কখন শুরু হয়ে যায় রঙের খেলা। গোলাপী আভা ধীরে ধীরে সোনালী হয়ে ওঠে।

কোন কোনদিন দেয়েলের ঝাঁক তীরের ফলার মত শৈললক্ষ্মীকে গার্ড অব অনার দিতে দিতে উড়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের ঠান্ডায় ভ্যালিতে জমে যাওয়া মেঘগুলো রোদ্দুরে গা সেঁকার জন্যে ওপরের দিকে উঠতে থাকে।

এবার আমার নীচে নামার পালা। দু' একটি করে রোগী জমতে সুরু করেছে ততক্ষণে।

বালু বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কথা বলে না। কোনদিন হয়তো ভাগতুর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাতে থাকে, তাও নীচু গলায়।

আমি নীচে নামি। ও আমার জুতোর আওয়াজ পেলেই বাগানের ছড়ানো মোরাম-গুলোর ওপর চোখের দৃষ্টি নামায়। আমি ডিসপেনসারির দাওয়া থেকে যদি বলি, আজ তোমার কাজে গিয়ে কাজ নেই বালু, ও অমনি বাকী ইঙ্গিতটুকু বুঝে নেয়। রোগী-দের নামগুলো পর পর স্লিপে লিখতে থাকে। ওর খুশি খুশি ভাবটা তখন আমি ওর স্বচ্ছন্দ চলার ভেতর থেকে ধরতে পারি।

ডেলিভারী কল এলে বালু সারাদিন ব্যস্ত থাকে আমার কাজে। আমি যাই টাট্টুতে চড়ে বালু আগেভাগে আমার ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে চলে যায় পেশেন্টের বাড়ী। পথের লোক, আশপাশের দু'-পাঁচ-খানা টিকার লোক আমাদের চিনে ফেলেছে। বালুকে ব্যাগ হাতে যেতে দেখলেই ওরা জানে এবার টাট্টুতে চড়ে ডাক্তার আসছে। বালুর সঙ্গে আমার অ্যাসোসিয়েশনটা যেন লোকের মনে গাঁথা হয়ে গেল।

কাজ শিখে ফেলেছে বালু। ও সরল কিন্তু নির্বোধ নয়। বলার চেয়ে চুপচাপ সব কথা শুনে যেতেই ওর আগ্রহ বেশী। তারপর নিখুঁত দক্ষতায় ওর ওপর দেওয়া কাজটুকু করে দিয়েই ও খুশি।

কোন কোনদিন আমাদের দূরে টিকা থেকে ফিরে আসতে [illegible] হয়ে যায়। সেরকম সম্ভাবনা [illegible] টাট্টু নিয়ে বেরোই না। চাঁদের আলোয় অথবা টর্চ জেলে বালু আমাকে পথ দেখিয়ে আনে। যত রাতই হোক আমাকে বাংলোতে পৌঁছে দিয়ে বালু ভ্যালি পেরিয়ে বাড়ী ফিরে যায়। আমি কোন কোনদিন ওকে এগিয়ে দিয়ে আসার প্রস্তাব তুললে ও দ্রুত মাথা নেড়ে আমাকে বারণ করে।

অনেকসময় বাধা না শুনে আমি এগোই ওর সঙ্গে। গল্প করতে করতে কখন ওর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। বালু উঠতে থাকে পাহাড়ের ওপর। আমি নীচ থেকে দেখি। একটি নিঃসঙ্গ ছায়ামূর্তি ভাঙাচোরা উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ বেয়ে চলতে থাকে। সারাদিনের শ্রান্তির পর সামান্য আহার আর বিশ্রামের জন্যে ঘরে ফেরা। তারপর ভোর না হতেই কাজের সন্ধানে আবার পথ চলা।

পন্ডিতজীর জন্যে হয়ত লেঙ্গরাতে খাবার তৈরী করে রেখে দেয় বালু। কাজে বেরোবার আগে খোয়াড় থেকে গরুটিকে বাইরে এনে বেঁধে খাবার আর জল দিয়ে যায় সে। দুপুরে একবার ফিরে আসে।

পিতাজীকে খেতে দেয় পরিচর্যা করে। সংসারের দুচারটে কাজ করে আবার বেরিয়ে পড়ে।

ফিরে আসতে আসতে ভাবি, কতদিন এমন করে কাটাবে বালু! একদিন হয়ত দেখবে, বুড়ো পিতাজীর সেবা করতে করতে তার জীবনের অনেকগুলো বসন্ত-দিন কখন নিঃশব্দে পার হয়ে গেছে। তখন কোন প্রিয়জনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে গেলেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসবে তার বুক ঠেলে।

কোনদিন ফিরে চলার পথে হঠাৎ পেছনে তাকালে দেখতে পাই, বালু চাঁদের আলোয় উঠোনের সামনে ফসল রাখা পেরুর গায়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে। মনে মনে কষ্ট হয়। জীবনের এ সময়টিতে কাউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটাই তো স্বাভাবিক। কি পাব আর কি পাব না, তার হিসেব কষে মানুষ কোনদিনই ফাগুনদিনে স্বপ্ন দেখে না। বালু হয়ত মনে মনে কোন অতিথি-সমাগমের স্বপ্ন দেখে।

নির্জন পথে দিনের পর দিন চলতে চলতে বালু একসময় আমার মনের অনেক কাছে সরে এল। এখন ওকে আর অনেক দূরের মানুষ মনে হয় না। আমরা টুকরো টুকরো কথা বলে নির্জন পথ চলার ভার-টুকুকে লঘু করে তুলি।

এক সন্ধ্যায় ভ্যালি পেরিয়ে ওর বাড়ীর পথে যাচ্ছিলাম। আমি ঘোড়ার ওপর, বালু ঘোড়ার লাগাম ধরে আগে আগে চলেছে। চাঁদ উঠেছে পাইন গাছের মাথায়। ভরা চাঁদের দিন দেখেই টাটুটাকে এনেছি সঙ্গে। ফেরার পথে একা যখন ভ্যালি পেরিয়ে যাব, তখন এই অতি বাধ্য জীবটিই আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে। আমি চোখ বুজে থাকলেও ও আমাকে অতি বিশ্বস্ত পদচারণে পৌঁছে দেবে আমার বাংলোতে। আমার পথ-পরিক্রমার মানচিত্রখানা ওর যেন মুখস্থ।

আমি বালুর পাশে পাশে হেঁটে যেতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু বালু কোন কথা শোনে নি। আমাকে প্রায় জোর করেই টাটুর ওপর উঠিয়েছে। আমি টাটুতে না উঠলে সে একটি পাও আর নড়বে না। এই হুঁসিয়ারীকে মান্য করেই আমি টাটুতে উঠেছি। বালু নিজের হাতে লাগাম ধরে ভ্যালির সমতলটুকু যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। সারাদিনের ক্লান্তির পর সে যেন মেতে উঠেছে খুশির খেলায়।

এক জায়গায় এসে টাটু থেকে নেমে পড়লাম। চড়াইতে লাগাম ধরতে হবে। নেমেই বললাম, বালু এসো আমরা এখানটায় বসে একটু গল্প করি।

বালু টাটুর লাগাম ছেড়ে দিল। বাধ্য সেবকের মত জীবটি দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। আমরা একখন্ড পাথরের ওপর বসে পড়লাম।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণাঙ্গ চ্যাম্পিয়ন

নিগ্রো তরুণ আর্থার অ্যাস তাঁর স্বপ্নের জগতে পৌঁছে গেছেন।

টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে উইম্বলেডন জয়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আত্মগতভাবেই তিনি বলতেন 'টেনিসের মহত্তম প্রতিযোগিতা উইম্বলেডন। বিশ্বের এক প্রধান ও সুসভ্য শহরে এই প্রতিযোগিতার আসর পাতা হয়। এই প্রতিযোগিতা জয় করতে না পারলে টেনিস খেলা নিরর্থকই হয়ে যাবে। কাজেই এই মেহনত ও অনুশীলনকে সার্থক করে তুলতে উইম্বলেডন জয় করা চাই-ই চাই। সেই সংকল্পকেই আর্থার অ্যাস আজ বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।

বয়স বত্রিশের কোঠায়। একালের নিরিখে এই বয়সে পৌঁছলে টেনিস খেলোয়াড়েরা বুড়িয়ে যান। অবসর গ্রহণের তাগিদই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু অ্যাসের ক্ষেত্রে বয়স যে কোনো বাধা হয়ে উঠতে পারে নি তারই প্রমাণ দেখা দিয়েছিল সিংগলস ফাইনালে প্রায় বছর দশেকের ছোট প্রতিদ্বন্দ্বী জিমি কোনরসের মোকাবিলার কালে।

কোনরস শুধু বয়সেই তরুণতর নন। ক্রীড়াগত যোগ্যতার মূল্যায়নে চলতি বছরের বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং প্রতিযোগী মহলে শীর্ষ বাছাই। গণভোটের রায়ে শতকরা পঁচানব্বই জনই কোনরসকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলে মেনে নিয়েছিলেন। যারা সেই রায় মাথা পেতে নিতে চাননি আর্থার অ্যাস তাঁদেরই অন্যতম। ফাইনালে অভাবনীয় উজ্জীবিত মূর্তি ধরে নিজের বাহুবলের প্রত্যাঘাতে নবীন প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত সংগতি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অ্যাস ছাই করে দেন।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন জিমি কোনরস এবার ফাইনালে ওঠার পথে নামমাত্র একটি সেটও হাতছাড়া করেন নি। এক এক পর্যায়ে তাঁর দুরন্ত গতি জয়লাভে উদগ্র নেশা ও মারের বহর দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা কোনরসকে টেনিস-মেশিন বলে ডাকতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ সেই নিখুঁত যন্ত্রটিকে চার সেটে বাগ মানিয়ে আর্থার অ্যাস সারা বিশ্বের সুনিশ্চিত অভিমতকে অনিশ্চিত করে দেন। অ্যাসের জোরালো সার্ভিস এবং ফোরহ্যান্ড ভলি সেদিনের ফাইনালে যন্ত্রবৎ নিখুঁতত্বে পৌঁছে গিয়েছিল। কোনরস শত চেষ্টা করেও অ্যাসের প্রভাবের ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন নি।

টেনিস বিষয়ক বিখ্যাত-পত্রিকা ওয়ার্ল্ড টেনিসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের গুণানুসারে রচিত ক্রম পর্যায় তালিকায় কোনরসের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। আর অ্যাসের নবম সিঁড়িতে। এই হিসেবের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাসের চূড়ান্ত সাফল্য অন্যদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁর নিজের কাছে সম্ভাব্য সাফল্য তেমন অভাবনীয় ছিল কি? বোধহয় না।

উইম্বলেডন আরম্ভের আগে তিনি বলেছিলেন 'হয়তো আমি এখনও ফুরিয়ে যাই নি। উইম্বলেডনে জিততে হলে শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই দুটি সম্পদ জোগাড় রাখতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।' সেই প্রয়াসের পথে অ্যাস উইম্বলেডনের আগে প্যারিসে ফরাসী টেনিসে খেলতে না গিয়ে ইংলন্ডে চলে আসেন বেকেনহাম নটিংহাম প্রভৃতি অপ্রধান প্রতিযোগিতায় খেলার উদ্দেশ্যে।

প্যারিসে ফরাসী টেনিস খেলা হয় ক্লে কোর্টে। আর উইম্বলেডনে তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গনায়। তৃণাচ্ছাদিত কোর্টের সঙ্গে আরও রপ্ত হওয়ার সংকল্পেই আর্থার অ্যাস ইংলন্ডের বেকেনহাম নটিংহাম প্রতিযোগিতাকে বেছে নেন ফরাসী প্রতিযোগিতাকে উপেক্ষা জানিয়ে। তাঁর পরিকল্পনা যে নিশ্ছিদ্র ছিল উত্তরপর্বে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্লে থেকে গ্রাস কোর্টে ফিরতে গেলে প্রাথমিক জড়তা ও অনভ্যস্ততার বাধা বড় হয়ে দেখা দিতে পারতো। তাই তিনি ক্লে কোর্টের দিকে পা বাড়ান নি। [illegible] থাকতে চেয়েছেন তৃণাচ্ছাদিত পরিবেশেই।

উইম্বলেডন শুরুর ঠিক আগেই আর্থার অ্যাস আর একটি প্রধান প্রতিযোগিতা জয় করেছিলেন। ডালাসে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ টেনিসরূপে খ্যাত। বিশ্বের প্রথম সারির পেশাদাররা এতে অংশ নেন। নবীন প্রতিভা সুইডেনের বর্ন বর্গকে হারিয়ে ওয়ার্ল্ড টেনিসে শীর্ষ সম্মান পাওয়ার পরই অ্যাস যেন আত্মবিস্মরণের কাল পেরিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। তারপরই উইম্বলেডন বিজয়। পর পর দুটি বৃহৎ প্রতিযোগিতা জয়ের সুবাদে এই বছরেই যে আর্থার অ্যাস তাঁর খেলোয়াড় জীবনের মধ্যাহ্নে পৌঁছে গেছেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

উইম্বলেডন ফাইনালে অ্যাস বনাম কোনরসের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মীমাংসা হয়ে গেছে তাঁদের পুরানো একটি ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়েছে টেনিস কোর্টে। তবে এখনও আর একটি ঝগড়ার ফয়সালা হতে বাকী। সেটির মীমাংসা হবে আদালতে। গত বছরে প্যারিসের সংগঠকেরা জিমি কোনরসকে ফরাসী টেনিসে খেলতে অনুমতি দেন নি। সংগঠকদের এই কাজের সমর্থনে পেশাদার টেনিস সংস্থার সভাপতি আর্থার অ্যাস এমনকিছু মন্তব্য করেছিলেন যা কোনরসের বিবেচনায় তাঁর পক্ষে মানহানিকর। মানহানির অভিযোগ তুলেই কোনরস তাই আদালতের শরণাপন্ন

হয়েছেন। বিচারের আর্জি যা ঘটার তাতো ঘটেই গেছে। এখন দেখা যাক আদালতের লড়াইয়ে কোন পক্ষ জেতেন।

আর্থার অ্যাস এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলীয় টেনিসে চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেলেও উইম্বলেডনে বড় জোর দুবার (১৯৬৮ ১৯৬৯) সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। এবার আরও দু ধাপ অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক টেনিসে নতুন অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন. কারণ তাঁর আগে আর কোনো কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ উইম্বলেডনে শীর্ষখ্যাতি লাভ করতে পারেন নি। ১৮৭৭ সাল থেকে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। প্রায় শতবর্ষের ইতিহাসে কৃষ্ণাঙ্গ চ্যাম্পিয়নরূপে অ্যাসই একমেবাদ্বিতীয়ম। তবে কৃষ্ণাঙ্গ টেনিস খেলোয়াড়দের উচ্চাশা সর্বপ্রথম পূর্ণ করেছিলেন অ্যাসের আগে কুমারী অালথিয়া গিবসন। ১৯৫৮ ও ৫৯ পরপর দু বছর উইম্বলেডন টেনিস কোর্টে তিনিই ছিলেন নায়িকা।

খেলাধুলার নানা বিভাগে কৃষ্ণাঙ্গ সামর্থ্যের কথা সর্বজনবিদিত। অ্যাথলেটিক্স মুষ্টিযুদ্ধ ক্রিকেট ফুটবল বাস্কেটবল ইত্যাদি নানান খেলার আসরে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীড়াবিদদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার কথা কে না জানে। জ্যাক জনসন জো লুই মহম্মদ আলি রে রবিনসনেরা সর্বকালের সেরা মুষ্টিযোদ্ধাদের গোত্রভুক্ত। জেসি ওয়েন্স বব হেজ কিপচো কিনো বব বিমোন উইলমা রুডলফ রাফের জনসন এবং আরও কতো কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলিটের কীর্তির স্বাক্ষরে অ্যাথলেটিক ইতিহাসের পাতা সমৃদ্ধ হয়ে আছে। হারলেম গ্লোব ট্রটার্স নামে নিগ্রো বাস্কেটবল দলটিও ছিল সমকালীন দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ। পেলে ভাভা সানটোস ইউসেবিও এবং জর্জ হেডলি কনস্ট্যানটাইন উইকস ওরেল ওয়ালকট সোবার্স হল লয়েড প্রমুখ কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়ের তো ফুটবল ও ক্রিকেটে সাড়া জাগানো নাম। এঁদের পাশাপাশি মানানসই হয়ে দাঁড়াতে পারেন এমন টেনিস খেলোয়াড়ের সংখ্যা সত্যিই সীমিত। বড়জোর দুটি—আলথিয়া গিবসন ও আর্থার অ্যাস।

শারীরিক সক্ষমতা যাঁদের প্রশ্নাতীত এবং খেলাধুলায় দক্ষতা যাঁদের সহজাত সেইসব কৃষ্ণাঙ্গ টেনিস কোর্টের দিকে ঝুঁকতে চান না যে কেন সেইটেই আশ্চর্য। মনে হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে সঙ্কুচিত কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ খাস মার্কিন মুলুকেও টেনিস খেলার বড় একটা সুযোগ পায় না। অন্য অনেক দেশের মতোই হয়তো আমেরিকাতেও টেনিস খেলা বিত্তবান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ধনী ও অভিজাতদের নিজস্ব ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশাধিকার বুঝি কৃষ্ণাঙ্গদের নেই। তাই তাঁরা সংকোচের বেড়া টপকাতে এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি।

আর্থার অ্যাসের সাম্প্রতিক সাফল্য সম্ভবতঃ সেই সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে দিতে সহায়তা করবে। প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের দিকে তাকিয়ে তাই অ্যাস স্বয়ংই বলেছেন 'আজকের জয় আমার ব্যক্তিগত নয়। সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের জয়।......আমরা আর ছোট নই।' কৃষ্ণাঙ্গরা যে ছোট নন বহু দিকপাল ক্রীড়াবিদের জীবন চরিতেই তা প্রমাণিত। আলথিয়া গিবসন ও অ্যাসও সেই প্রমাণিত সত্যেরই এক একটি প্রতীক। তবে অ্যাসের আত্মপ্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য কৃষ্ণাঙ্গরা টেনিস কোর্টের দিকে ধেয়ে আসতে পারবেন কিনা কে জানে। যেহেতু বৃহত্তর মার্কিন সমাজ কৃষ্ণাঙ্গদের সবরকম সুযোগ সুবিধে দিতে এখনও কুণ্ঠিত। সে সমাজে শ্বেত ও অশ্বেতদের সর্বত্র সমানাধিকারের ভিত্তিতে অভিন্ন আসনে বসানো হয়েছে এমন কথা হলফ করে বলার উপায় নেই।

যে সমাজে বর্ণ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক বৈষম্য রয়েছে সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের উদ্দেশ্যে টেনিস খেলার সুযোগ সুবিধা প্রসারিত ছিল না। তবে আর্থার অ্যাসের ভাগ্য ছিল এ ব্যাপারে কিছুটা প্রসন্ন। কারণ ব্রুকফিল্ড পার্কে অ্যাস পরিবারের বাড়ীর খুব কাছেই ছিল একটি টেনিস কোর্ট। বালক র‍্যাকেট হাতে নিয়ে সংকুচিত চিত্তেই অ্যাস একদিন সেই কোর্টে হাজির হতে শ্বেতাঙ্গ ছেলের দল তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। প্রাথমিক সংকোচ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর টেনিস নিয়ে মেতে উঠতেই একদিন অ্যাস নিগ্রো সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী ডাঃ ওয়াল্টার জনসনের নজরে পড়ে যায় এবং হালকা পাতলা দীর্ঘাকৃতি ছেলেটিকে ভাল লাগতে ডাঃ জনসন তাকে গড়ে পিটে মানুষ করার দায়িত্ব নেন স্বেচ্ছায়।

দশ বছর বয়সে আর্থার অ্যাস ডাঃ জনসনের কাছে টেনিসে প্রথম পাঠ নেয়। পরে অবশ্য পাঞ্চো গনজালেস জর্জ ম্যাকল জে ডি মরগ্যান প্রমুখ নামী কোচেরা ক্রীড়া উন্নয়নে অ্যাসকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ডাঃ জনসন অ্যাসের প্রথম গুরু। পরে নামধাম হওয়ার পর দুনিয়ার যত্রতত্র ছোটাছুটি করতে গিয়ে আর্থার অ্যাস ডাঃ জনসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ হারিয়ে ফেললেও মনের টানে তাঁরা কিন্তু এখনও খুব কাছাকাছি রয়ে গেছেন। প্রথম গুরু জনসন এখনও সোচ্চারে বলেন সে আর্থারের মতো চরিত্রবান মানুষ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। সবাই যদি আর্থারের মতো হতে পারতো তাহলে এই দুনিয়ায় বৈষম্য বলে কিছুই প্রশ্রয় পেত না।

মানুষ হিসেবেও অ্যাস অনন্য। বিনয়ী শিক্ষিত বিদগ্ধ এবং চিন্তাশীল। অনেকের ধারণা আত্মভিমানেই মনুষ্যত্ব সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত করে বিদেশে পাঠাবেন। বন্ধুরা মানুষেরা আর্থারকে 'দি স্যাডো' বলে আদর করে ডাকে।

স্যাডো কেন? স্যাডো এইজন্যে যে বাইরের আকৃতি নিছকই এক ছায়া। ভেতরের মানুষকে আড়াল করে রেখেছে। ওপরে ওপরে যাই হোন না কেন আসল মানুষটি কিন্তু অন্তর্মুখী। ওপর ওপর দেখলে মনে হবে যে অ্যাস বুঝি নিছকই একজন খেলোয়াড়। হারজিৎ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো চিন্তাই নেই। কিন্তু অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ভেতরের সন্ধান পেলে জানা যাবে যে খেলা ছাড়া অ্যাস নিরন্তর চিন্তা করছেন কেমন করে মানুষ হিসেবে তাঁর নিজস্ব প্রতিভাবিকাশ আরও উজ্জ্বল করে তুলে ধরা যায়। খেলা খেলার অন্তরে মনের জগৎ সেটাতে অ্যাস নিরন্তর নিয়োজিত। বই হাতে তাঁর অবসর কাটে। দুনিয়াকে জানতে তিনি যেন চিরন্তন কৌতূহলী এক ছাত্র। কোর্টের অ্যাস সুদক্ষ কার্যক্ষম অতি দক্ষ খেলোয়াড়। কিন্তু নিজস্ব মুহূর্তে তিনি চিন্তা করেন দেখেন স্বপ্ন। নিজের অনুভবের কথা বাজিয়ে নিয়ে বুঝতে চান যে সত্যোপলব্ধির দোরগোড়ায় তিনি পৌঁছতে পারছেন কিনা। কথায় কথায় বলেন অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই আমার জীবনাদর্শ। অন্যেরা আমায় শ্রদ্ধা করে কিনা তা জানার আমার আগ্রহ নেই।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক অবিচারের বিরুদ্ধে আর্থার অ্যাস লড়াই করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাই বলে মহম্মদ আলির মতো হম্বিতম্বিতে তাঁর মত নেই। তাঁর অভিমত, হৈ-চৈ, প্রচারের প্রয়োজন কি? সত্য একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরে থাকাই তো ভাল। তাতে শোভনতাও বজায় থাকে।

আর এক নিগ্রো চ্যাম্পিয়ন আলথিয়া গিবসনও (১৯৫৭ ১৯৫৮) ছিলেন এমনি এক অনমনীয় চরিত্র। দারিদ্র্য ও সামাজিক অবিচারের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই তিনি সামনের দিকে এগিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের এমনই চাহিদা যে স্কুলে থাকার বয়সেই নির্ধন পরিবারের সাহায্যার্থে আলথিয়াকে নানা জায়গায় চাকরী নিতে হয়েছিল। কখনো দোকানে, কখনো হোটেলে। কখনো তিনি কারখানার শ্রমিক।

এমনি সব হাজারো কজের ফাঁকে ফাঁকেই আলথিয়াকে টেনিসের এ-কোর্ট ও-কোর্টে ছোটাছুটি করতে হয়। তাও কি টেনিস কোর্টের সর্বত্র উপস্থিত থাকার যো

ছিল। পঞ্চাশের দশকে আমেরিকার প্রথম সারির টেনিস কোর্টে নিগ্রোদের উপস্থিত থাকার অধিকার ছিল না বল্লেই হয়। আলথিয়া গিবসনের আগে মাত্র একজনই কৃষ্ণাঙ্গ ডাঃ রেজিন্যাল্ড ওয়েব এই অধিকার হাতে পেয়েছিলেন। সেই অধিকার পেতে আলথিয়াকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। তবে প্রথম সারির কোর্টে আসার সুযোগেই আলথিয়া তাঁর ক্রীড়া সম্ভাবনার এমন সুনিশ্চিত প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাবার প্রয়োজন ঘটেনি। সেদিন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির টেনিস প্রতিযোগিতার সংগঠকদের তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিজেদের কোর্টে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

১৯৫৫ সালেই আলথিয়া জীবনপথে এক নতুন মোহনার মুখে এসে দাঁড়ান, সেই বছরেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে এশিয়া সফরে পাঠান। প্রাচ্যের ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে মার্কিন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অটুট রাখতে পারবেন এই আলথিয়া গিবসন এই বিশ্বাস মার্কিন সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ছিল।

তাঁরা অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করেননি। প্রাচ্য সফরে আলথিয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কলকাতায় উডবার্ণ পার্কস্থ সাউথ ক্লাবের কোর্টে তাঁকে দেখার সুযোগ ঘটেছিল। সেই সুযোগে মার্কিন মুলুকে শ্বেত-অশ্বেতদের বিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করা মাত্র বুদ্ধিমতী আলথিয়া বিচক্ষণ কূটনীতিকের মতো যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আজও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আলথিয়ার উত্তর 'আমেরিকায় এ-জাতীয় একটি সমস্যা আছে বটে। তবে কোন দেশ সমস্যা-বর্জিত বলুন তো? একদিন-না-একদিন এ-সমস্যার সমাধান হয়ে যাবেই।' ভারী চমৎকার জবাব, শুনে বিশ্বাস হলো.. আলথিয়া সত্যিই তাঁর দেশের যোগ্য ক্রীড়াদূতী।

দাড় সমর্থ, মস্তো চেহারা। যেমন দীর্ঘাঙ্গী তেমনি বলশালী। আলথিয়া খেলতেন পুরুষদের ঢং-এ। মারে জোর পড়তো এমনই যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলের গতির কাছে দিশেহারা বোধ করতেন। মারের মতো গায়েও জোর ছিল বেশ।

জোরের কথা উঠতেই আলথিয়ার বাবার একটি রসিকতার বিষয় মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক ছা-পোষা মানুষ। রুজি-রোজগারের ধান্দায় সদাই ব্যস্ত। বড়লোকদের খেলা বলে টেনিসের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না। হঠাৎ যেদিন শুনলেন টেনিস খেলে তাঁর মেয়ের বেশ নামডাক হয়েছে সেদিন চোখ কপালে তুলে বলে ফেল্লেন 'সেকি! ও টেনিস খেলছে। টেনিস যে কি জিনিস তা আমি নিজেই জানি না। আমার ইচ্ছে ছিল ওকে একজন মেয়ে-মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে গড়ার। এক জোড়া দস্তানাও কিনে দিয়েছিলাম।'

তবে বাপের মনে যাই হোক না কেন মেয়ে কিন্তু মুষ্টিযোদ্ধার মতো একাগ্রতা ও মনের সাহসকে পুঁজি করেই টেনিস নিয়ে সাধনা করে গেছেন। আর সেই সাধনার ফল পেয়েছেন হাতে নাতেই। উইম্বলেডনের মতো বিশ্ব শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনিই প্রথম ব্যতিক্রম—প্রথম নিগ্রো চ্যাম্পিয়ন।

উত্তরসূরী আর্থার অ্যাসের মতোই আলথিয়া গিবসনও ছিলেন চারিত্রিক ঔদার্যে আকর্ষণীয়। ছেলেবেলায় পেট ভরে রুটি জোটে নি। বড় টেনিসের আসরে প্রথম খেলতে আসার মুহূর্তে বাইরে পরে যাওয়ার মতো পোষাক আসাকও আলথিয়ার ছিল না। এক শুভানুধ্যায়ীর স্ত্রী তাঁর নিজের পোষাকে আলথিয়াকে সাজিয়ে দেন।

এমনি গরিবিয়ানার মধ্যে যাঁর দিন কেটেছিল সেই আলথিয়া গিবসন যেদিন উইম্বলেডন জিতে স্বদেশে ফিরে আসেন সেদিন নিউ ইয়র্কবাসীরা মোটর মেলায় শোভাযাত্রা সাজিয়ে তাঁকে নিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়ান। সিটি হলে মেয়র তাঁর জন্য পৌর সম্বর্ধনার আয়োজনও ঘটান।

সব মিলিয়ে সে এক অভূতপূর্ব সম্বর্ধনার ব্যবস্থা। মোটরে বসে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের মেজাজের নাড়ী টিপতে টিপতে আলথিয়া সেদিন আবেগে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। হাজারো মানুষের জয়ধ্বনির উত্তরে প্রত্যাভিবাদন জানাতে গিয়ে সেদিন আলথিয়াকে মাঝে মাঝে চোখের জলও মুছতে হয়েছিল।

সিটি হলে বক্তৃতা করার সময় আলথিয়া কেবলই বলতে থাকেন যে এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যেভাবে আমায় সম্বর্ধিত করা হচ্ছে তা আমার কল্পনার বাইরে 'আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও উৎসাহ পেয়েই আমি টেনিস কোর্ট জিতেছি। আপনারা আশীর্বাদ জানালে ও ঈশ্বরের করুণা পেলে তবেই আমি বিজয়ীর মুকুটের সম্মান ও মর্যাদা ধরে রাখতে পারবো। আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

তাঁর কথা শুনে নিউইয়র্কের মেয়র রবার্ট ওয়েগনার সেদিন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে আলথিয়া শুধু একালের সেরা টেনিস খেলোয়াড়ই নন চারিত্র গুণে মনুষ্য সমাজেরও শোভা। মেয়র ওয়েগনার বলেন আলথিয়ার মতো আরও কজনকে যদি আমাদের মধ্যে পাওয়া যেতো তাহলে সমাজের চেহারা যেতো বদলে। এবং সে সমাজ হতো সুস্থ সুন্দর ও আদর্শ।'

কোনো সন্দেহ নেই যে কৃষ্ণাঙ্গ চ্যাম্পিয়ন আর্থার অ্যাস ও আলথিয়া গিবসনের হলেন খেলোয়াড় কূলে কুলীন এবং বৃহত্তর মানব ইতিহাসে স্মরণীয় চরিত্র।

অজয় বসু

হাওড়া স্টেশনে সমবেত মেয়েদের প্রথম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ান বাংলা দলের খেলোয়াড়বৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী বিজয়ী দলকে সম্বর্ধনা জানাতে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

খেলাধুলা

দর্শক

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের দক্ষতা বিচার করে তাদের নামের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশের প্রথা অনেক দিনের। এই তালিকা তৈরী করেন টেনিস খেলার প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরা। এই ক্রমপর্যায় তালিকা কিন্তু অভ্রান্ত নয়—অনেক সময়ই দেখা গেছে তালিকার ওপরের দিকের বাছাই খেলোয়াড়রা নীচের দিকের বাছাই খেলোয়াড় অথবা অবাছাই খেলোয়াড়দের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গেছেন। খেলায় এরকম ফলাফলকে অঘটন বলা হয়—ইংরাজিতে বলা হয় 'আপসেট'। প্রতিযোগিতার ফাইনালে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় ২নং বাছাই খেলোয়াড়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হলে যাঁরা বাছাই তালিকা তৈরী করেন, তাঁদের পাণ্ডিত্যের গর্বে বুক দশ হাত বেড়ে যায়। তা নাহলে বিপরীত সমালোচনা নিঃশব্দে মাথায় পেতে নিয়ে ঘাড় হেঁট করতে হয়।

সদ্য সমাপ্ত এ-বছরের উইম্বলেডন টেনিস আসরেও অনেক অঘটন ঘটে গেছে। পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে যে ৮ জন খেলোয়াড় উঠেছিলেন, তাঁরা সকলেই বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন ১নং ২নং ৩নং ৬নং ৮নং ৯নং ১১নং এবং ১৬নং। তবে ২নং বাছাই কেন রোজওয়েল ৪র্থ রাউণ্ডে ৫নং বাছাই ইলি নাস্তাসে ২য় রাউণ্ডে এবং ৪নং বাছাই ও ১৯৭২ সালের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান স্ট্যান স্মিথ ১ম রাউণ্ডের খেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিয়েছিলেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন ১নং বাছাই ও গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান জিমি কোনর্স (আমেরিকা) ৬নং বাছাই আর্থার অ্যাস (আমেরিকা), ১১নং বাছাই রেসকো ট্যানার (আমেরিকা) এবং ১৬নং বাছাই টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া)। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ৩নং বাছাই দুর্ধর্ষ বর্গকে (সুইডেন) পরাজিত করেন ৬নং বাছাই আর্থার অ্যাস এবং ১১নং বাছাই রোসকো ট্যানার পরাজিত করেন ৪নং বাছাই জি ভিলাসকে (আর্জেনটিনা)। ফলে বাছাই তালিকার প্রথম পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র ১নং বাছাই জিমি কোনর্স সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে ৬নং বাছাই আর্থার অ্যাসের কাছে ১নং বাছাই ও গত বছরের চ্যাম্পিয়ান জিমি কোনর্সের পরাজয় রীতিমত নাটকীয় ঘটনা। যাঁরা বাছাই তালিকা তৈরী করেছিলেন তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

এর পর মেয়েদের সিঙ্গলস খেলার আলোচনায় আসা যাক। মেয়েরা কিন্তু বাছাই তালিকা প্রস্তুতকারী পণ্ডিতদের মুখ রেখেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন বাছাই তালিকার প্রথম সাতজন বাছাই খেলোয়াড় এবং একজন অ-বাছাই খেলোয়াড়। ৮নং বাছাই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেননি। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ২নং বাছাই মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা অপ্রত্যাশিতভাবে ৫নং বাছাই মার্গারেট কোর্টের কাছে হেরে যান। সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন ২নং বাছাই বাদে বাছাই তালিকার প্রথম পাঁচজন—১নং বাছাই ও গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ক্রিস ইভার্ট (আমেরিকা), ৩নং বাছাই বিলি জিন কিং (আমেরিকা), ৪নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার ইভন কলে (কুমারী জীবনে গুলাগং) এবং ৫নং বাছাই মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)। সেমি-ফাইনালে ১নং বাছাই ও গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ক্রিস ইভার্ট (আমেরিকা) অপ্রত্যাশিতভাবে ৩নং বাছাই বিলি জিন কিংয়ের কাছে পরাজিত হন। অপরদিকে ৪নং বাছাই ইভন কলে স্বদেশের মার্গারেট কোর্টকে (৫নং বাছাই) পরাজিত করেন। যেখানে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলা হয়েছিল ১নং বাছাই ও ৬নং বাছাইকে নিয়ে সেখানে মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে উঠেছিল ৩ নং বাছাই এবং ৪নং বাছাই খেলোয়াড়—বাছাই তালিকায় কি নিদারুণ 'আপসেট'।

পুরুষ এবং মেয়েদের ডাবলস খেলার ফাইনালে কোন বাছাই জুটিই উঠতে

পারেননি। মিকসড ডাবলসে ১নং বাছাই জুটি শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং মার্টি রিসেন (আমেরিকা) চ্যাম্পিয়ান হয়ে বাছাই তালিকার মর্যাদা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেন।

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ

কোয়ালালামপুরে মারদেকা ফ্রিডাম স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৫ রাউন্ডের মুষ্টিযুদ্ধে আমেরিকার নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলি (ওরফে ক্যাসিয়াস ক্লে) ৭৫—৬৫ পয়েন্টে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন জো বাগনারকে হারিয়ে হেভিওয়েট বিভাগে তার বিশ্ব খেতাব অক্ষুন্ন রেখেছেন। জো বাগনারের জন্ম হাঙ্গেরীতে, কিন্তু তিনি ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে এই লড়াই শেষ হয়। সুতরাং বাগনারের এই পরাজয় খুব অগৌরবের হয়নি। তিনি এই লড়াইয়ে জিতলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার ব্যাপার হত না। মোট ১৫ রাউন্ড লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত ফলাফল : আলির জয় ১০ রাউন্ড, বাগনারের জয় ৩ রাউন্ড এবং লড়াই সমান সমান ২ রাউন্ড। এই নিয়ে আলি ৫০ বার পেশাদারী লড়াইয়ে নামলেন। প্রথম নামেন ১৯৬০ সালের ২৯শে অকটোবর। ১৯৬৪ সালে সনি লিস্টনকে হারিয়ে তিনি হেভিওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব পেয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জো ফ্রেজারের কাছে তিনি পয়েন্টে পরাজিত হয়ে বিশ্ব খেতাব হাতছাড়া করেন এবং দু বছর পর ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে জর্জ ফোরম্যানকে হারিয়ে আলি তাঁর হারানো বিশ্ব খেতাব ফিরে পান। হেভিওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব হারিয়ে তা পুনরুদ্ধার করার নজির এই দ্বিতীয়।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ তারিখে বাগনার পয়েন্টে আলির কাছে হেরেছিলেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা বেশ জমে উঠেছে। গত শনিবার (জুলাই ১২) গত পাঁচ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে তার অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে হারিয়ে একটা মস্ত বাধা অতিক্রম করেছে। এ বছরের লীগের খেলায় মোহনবাগানের এটা প্রথম পরাজয় এবং মোহনবাগানের বিপক্ষে প্রথম গোল। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এই জয়সূচক গোলটি দেন শ্যাম থাপা প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার সাত মিনিট আগে। এই খেলায় উভয় দলই গোল করার একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করে। মোহনবাগানের এই পরাজয়ের ফলে প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় বর্তমানে অপরাজিত রইলো মাত্র ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং। বর্তমানে লীগ খেলার তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে মহমেডান স্পোর্টিং—৯টা খেলায় ১৮ পয়েন্ট এবং গত বছরের রানার্স-আপ

শ্যাম থাপা (ইস্টবেংগল) মোহনবাগানের বিপক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন।

এরিয়ান—১১টা খেলায় ১৮ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল ৮টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট এবং মোহনবাগান ৯টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

লীগের তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মহঃ স্পোর্টিং	৯	৯	০	০	২৯	০	১৮
এরিয়ান	১১	৮	২	১	১৮	৫	১৮
ইস্টবেঙ্গল	৮	৮	০	০	২২	০	১৬
মোহনবাগান	৯	৮	০	১	১৮	১	১৬

মেয়েদের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

লক্ষ্ণৌতে আয়োজিত মেয়েদের প্রথম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ২—০ গোলে বিদর্ভকে হারিয়ে 'টিংকোনা ট্রফি' জয়ী হয়েছে। বাংলার পক্ষে লেফট আউট শান্তি মল্লিক এবং লেফট ইন দীপ্তি মল্লিক গোল করেন।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

এজবাস্টন মাঠে ১৯৭৫ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৮৫ রানে ইংল্যান্ডকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিয়েছে। এজবাস্টন মাঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইংল্যান্ডের পরাজয় এই প্রথম। পাঁচদিনের এই বরাদ্দ খেলা চতুর্থ দিনেই শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার তিন ফাস্ট বোলার—লিলি, ওয়াকার এবং টমসন সংহার মূর্তিতে খেলে ইংল্যান্ডের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন। চারদিনই বৃষ্টি নেমে খেলায় অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক মাইক ডেনেস টসে জিতে ভারী বাতাস এবং মেঘে ভরা আকাশ দেখে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠান।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৪৩ রান সংগ্রহ করেছিল। ম্যাককস্কার (৫৯ রান) এবং টার্ণার (৩৭) প্রথম উইকেটের জুটিতে ৮০ রান তুলে খেলার ভিত শক্ত করেছিলেন। কিন্তু খেলার এক সময় অস্ট্রেলিয়ার ৩টে উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে গেলে ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলা ঘুরে যায়। শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে মার্স (৪৭ রান) এবং এডওয়ার্ডস (২২ রান) দৃঢ়তার সংগে খেলে দলের ৫৭ রান তুলে পতন রোধ করেন।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৫৯ রানের মাথায় শেষ হয়। শেষ ৫ উইকেটে তারা ১১৬ রান সংগ্রহ করেছিল। এরপর ইংল্যান্ড ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮৩ রান করেছিল।

অস্ট্রেলিয়ার দুই পেস বোলার—লিলি এবং ওয়াকার ইংল্যান্ডের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। লিলি ১৩ রানে ৩ এবং ওয়াকার ৩৫ রানে ৪টে উইকেট পান।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ১০১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৩৫৯ রানের থেকে ২৫৮ রানের পিছনে পড়ে ফলো-অন করে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসের খেলাতেও সুবিধা করতে পারে নি—৫ উইকেটে মাত্র ৯৩ রান সংগ্রহ করেছিল। ফলে ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যান্ডের আরও ১৬৫ রানের দরকার ছিল।

কিন্তু চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ১৭৩ রানে শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৮৫ রানে জিতে যায়। দ্বিতীয় ইনিংস ইংল্যান্ডকে পর্যুদস্ত করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার টমসন (৩৮ রানে ৫), ওয়াকার (৪৭ রানে ২) এবং লিলি (৪৫ রানে ২)। ইংল্যান্ডকে ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে যাঁরা রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নটের অবদানই বেশী। তিনি ৩ ঘণ্টা ৭ মিনিট উইকেটে কামড়ে থেকে ৩৮ রান করেছিলেন। এবং স্নো আক্রমনাত্মক খেলে ৩৪ রান করেন।

(সংক্ষিপ্ত স্কোর)

অস্ট্রেলিয়া—৩৫৯ রান (ম্যাককস্কার ৫৯ ইয়ান চ্যাপেল ৫২, এডওয়ার্ডস ৫৬, মার্স ৬১ এবং টমসন ৪৯ রান। আরনল্ড ৯১ রানে ৩, স্নো ৮৬ রানে ৩ এবং ওল্ড ১১১ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ১০১ রান (এডরিচ ৩৪ রান। লিলি ১৫ রানে ৫ এবং ওয়াকার ৪৮ রানে ৫ উইকেট)

ও ১৭৩ রান (ফ্লেচার ৫১ নট ৩৮ এবং স্নো ৩৪ রান। লিলি ৪৫ রানে ২, ওয়াকার ৪৭ রানে ২, টমসন ৩৮ রানে ৫ এবং ম্যালেট ৩৪ রানে ১ উইকেট)

মাঠ থেকে বেরুলেই ঐ এক চিন্তা, চিন্তা আমায় পেয়ে বসে। সংসার, সংসার। মস্তবড়ো এক সংসার। গোল সামাল দেওয়ার চাইতেও আজকের এই মুহূর্তে আমার পক্ষে ঐ বিরাট সংসার সামাল দেওয়াই কঠিন। মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ তাই বড়ো হতে চাইলেই বড়ো হওয়া শক্ত। কিছু পেতে হলে তা শক্ত পাঞ্জা কষেই পেতে হবে ঃ ভাস্কর ॥

ভাস্কর গাঙ্গুলী

ছোট্ট ছেলের কথায় কি তেজ, কি আত্মপ্রত্যয়, কি উচ্চাকাংখা। মোহনবাগানের কিশোর গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি সেদিন বার বার বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিলাম। ওঁর বুকের মধ্যে কি অনেক না পাওয়ার, অনেক বঞ্চনার আগুন জ্বলছে? হয়তো বা।

গড়ের মাঠের বড়ো ফুটবলের আসরে একদিন অকস্মাৎ ভাস্করের উদয়। এবং বলা যায় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সোরগোল, প্রতিষ্ঠা। সেই যে ঐতিহাসিক তিনটি রোমান শব্দ আছে, ভিনি, ভিডি, ভিসি (এলাম দেখলাম জয় করলাম) ভাস্করের ক্ষেত্রে নির্দ্ধিধায় ঐ শব্দগুলি প্রয়োগ করা চলে। একেবারেই অপরিচিতের [illegible] থেকে প্রতিষ্ঠিতদের পংক্তিতে অধিষ্ঠানের এমন অসামান্য নজীর কলকাতার বিচিত্র গড়ের মাঠে এর আগে আর কখনও ঘটেছে বলে মনে পড়ে না।

ভাস্কর গাংগুলী মোহনবাগানের নতুন গোলরক্ষক। মোহনবাগানে খেলার আগে নিজের স্কুল ছাড়া আর কোথাও খেলেননি, এমনকি, ছোট কোন ক্লাবেও না। সরাসরি এত বড়ো ক্লাবে যে খেলতে পাবেন, সেকথা জীবনে ভাবেনও নি। স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা। ভাস্করের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ইলিয়ট রোডে মোহনবাগান মেসে বসে। সময় দুপুর। উলগানাথন, শিশির গুহ দস্তিদার, চিন্ময় চ্যাটার্জি খাওয়া দাওয়ার পাট সেরে বিশ্রাম রত। ঘরের একদিকে খাটে লম্বা হয়ে নিদ্রামগ্ন বিশাল বপু বিজয় দিকপতি। ওপাশে নিমাই গোস্বামী। আস্তে আস্তে কথা হচ্ছিল আমাদের পাছে ওদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। ভারী লাজুক ছেলে ভাস্কর। কথাবার্তায় অত্যন্ত সংযত। মুখের হাসিটি পার্মানেন্ট। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখে আগামী কালের বিরাট প্রতিশ্রুতি, বর্তমানের সুকঠিন সংকল্প। বোধ হয় ঐ চোখ দুটি দিয়েই ভাস্কর কাছের মানুষদের গ্রিপ করেন, তেমনভাবে গ্রিপ করেন দুরন্ত বলকে। ভাস্করের গ্রিপিং, ভাস্করের ফিস্টিং, ভাস্করের তাৎক্ষণিক বিচারবুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত সাম্প্রতিক কালে গড়ের মাঠে সাড়া জাগিয়েছে। এক

নিঃশ্বাসে এখন সবাই বলেন : তরুণ, ভাস্কর, বিশ্বজিৎ, শিবাজী।

ভাস্করের জন্ম ১৯৫৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর দমদম ক্যান্টনমেন্টের নালতায়। বাবা শ্রীনিত্যগোপাল গাঙ্গুলী মশাই রেলের চাকুরে (ইস্টার্ণ রেলওয়ে, কয়লাঘাট, আর পি এফ)। রিটায়ার করার আর মাস ছয়েক বাকী। শরীর ভাল নয়। তাই ভাস্করের (ঘরোয়া নাম গৌতম) এখন সবচেয়ে বড়ো চিন্তা সংসার। গোল সামাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারটাও সামাল দিতে হবে। গৌতম (ভাস্কর) এখন রীতিমত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। নিত্যবাবুর আদি বাড়ী ঢাকার বিক্রমপুরে। চার ছেলে (ভাস্কর সর্বকনিষ্ঠ তিন মেয়ে। তিনটিই অবিবাহিতা। সুতরাং ভাস্করের দুর্ভাবনা মোটেই অযৌক্তিক নয়। বড় বোন রীতা বি-এ পাশ করেছেন। বিয়ে সামনের আগস্ট মাসে। ভালোয় ভালোয় সব চুকে গেলেই ভাস্করের স্বস্তি।

মেসের বদ্ধ ঘরে ভাস্কর যেন হাঁফিয়ে ওঠে। বিছানা থেকে নেমে সামনের জানলার কাছে গিয়ে প্রাণভরে মুক্ত বাতাস বুকে ভরে নিয়ে বলেন : 'সংসারের কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। ও কথা থাক। ফুটবলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না? তাই শুনুন। "বাচ্চা বয়স থেকেই ফুটবল আমার সঙ্গী, ফুটবল আমার একান্ত আপনার। ফুটবলে হাতে খড়ি বেলঘরিয়া ফুটবল ক্লাবে, দমদম বৈদ্যনাথ ইনস্টিট্যুশন থেকেই ১৯৭২ সালে কমার্স নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেছি। এখন আমি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সান্ধ্য বিভাগে কমার্সের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বাবা এবং মা (শ্রীমতী দুলালী গাঙ্গুলী) দুজনের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি, পেয়েছি প্রাণ ঢালা আশীর্বাদ। ও'দের আশীর্বাদ, ক্রীড়ানুরাগীদের স্নেহই আজ আমার জীবনের পাথেয়। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম।

ফুটবলের মাস্টার মশাই সুধাব্রতবাবু ১৯৭১ সালে আমাকে নিয়ে এলেন কলকাতায় ভেটেরেন্স ক্লাবের ট্রেনিং সেন্টারে। সেখানে পেলাম সর্বশ্রী পরিতোষ চক্রবর্তী, সুশীল ভট্টাচার্য, শিবদাস বসাক, বলরাম, অরুণ ঘোষ, অবনী বসুর মত ফুটবল অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পরিচর্যা, স্নেহ, মায়া, মমতা। পরিতোষ চক্রবর্তী এবং সুশীল ভট্টাচার্য আমাকে সন্তান স্নেহে দেখেছেন। বলরামদা, অরুণদা, শিবদা, অবনীদা দেখেছেন ছোট ভাইয়ের মত। এ'দের কাছে আমি ঋণী। ১৯৭৩ সালে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করি। ঐ বছর আই এফ এ শীল্ডেও খেলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে। ১৯৭৪-এ জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় (কোয়েম্বাটুর) বাংলার হয়ে খেলেছি। বাংলা সেবার ঐ আসরে সর্ব-ভারতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালে এশীয়া জুনিয়ার ফুটবল উপলক্ষে (কুয়েত) ভারতীয় দলের নির্বাচনী ট্রায়ালে জলন্ধরে ডাক পেয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ্যদের মধ্যে স্থান পাই নি। অবশ্য সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই। যোগ্য হলে নিশ্চয়ই দলে স্থান পেতাম।"

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগাসনে রুমা বসু

খুব ছোট্ট বয়স থেকেই আমি বাড়ীতে মা বাবা আর দাদুর দেখাদেখি যোগাসন করতে থাকি। তবে নিয়মমত যোগাসন শিক্ষা আরম্ভ হয় প্রায় ছয়-সাত বছর বয়স থেকে।

কথাগুলি বলছিল স্বর্গত বিষ্টু ঘোষের দৌহিত্রী এবং বুদ্ধ বসুর কন্যা রুমা বসু। গত পয়লা জুলাই গিয়েছিলাম ওদের গড়পাড়ের বাড়ীতে। পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে রুমা আমাকে জাপানে পাওয়া বিজয়ীর ট্রফি দেখাল। ১৯৭৪-এ ওরা অর্থাৎ ঘোষেজ কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন ও যোগ ইনস্টিটিউটের সদস্যরা জাপানে গিয়েছিল। সেখানে ব্যায়াম ও যোগাসন প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতায় নেমে দলটি জাপানকে ১৫৩—১৪৭ পয়েন্টে হারিয়ে গোল্ড ক্রাউন ওয়াইড স্পেশাল গ্রুপ ট্রফি এবং প্রতি-যোগীরা ব্যক্তিগত ট্রফি লাভ করে। মস্ত বড় সুদৃশ্য ট্রফিটি দেখিয়ে রুমা বলল, জাপানের দলে ছিল পনেরজন আর আমাদের ৭। দু পক্ষই নয়টা করে খেলা দেখাই সময়ের মেয়াদ ছিল ৪৫ মিনিট। আমি এতে যোগাসন ও [illegible] দেখাই।

—আমি আমার দাদু বিষ্টু ঘোষের কাছেই প্রথম যোগাসন শিখতে শুরু করি। জানেন তো উনিই প্রথম এদেশে যোগাসন সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি বাবার কাছে যোগাসন অভ্যাস করতে থাকি। রুমা এবার রামমোহন কলেজ থেকে বি-কম পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়েছে।

রুমা জানালো এর আগে ১৯৭০ সালেও দলের সঙ্গে আমি জাপানে গিয়ে-ছিলাম। সেবার অবশ্য সারা দেশে যোগাসন ও অন্যান্য ব্যায়াম প্রদর্শনী দেখাই।

—যোগাসনের কতকগুলি আসন খুবই উত্তেজনাকর। তাই আমরা প্রদর্শনীতে ব্যায়ামের কলাকৌশলের সঙ্গে ভারতীয় নাচও দেখাই। জাপানে আমাদের দেশের এই প্রাচীন যোগাসনকে অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে।

—যোগব্যায়ামের যে সব প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাতে যোগ দাও না?

—দেখুন যোগ ব্যায়াম কথাটা ঠিক নয়। প্রকৃত শব্দটি হচ্ছে যোগাসন। ব্যায়াম করতে দেহের ভিতরকার পেশীর সঞ্চালন এবং একনাগাড়ে অনেক সময় [illegible] দেহের ব্যায়াম বার বার অনুশীলন করা হয়। কিন্তু যোগাসনে [illegible] না একস্থানে কিছুক্ষণ থাকতে হয়। পরে আবার অন্য অবস্থান বা আসন করা হয়।

—জাপানে [illegible] দল কাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল?

—এখানকার সমস্ত [illegible] দলের সঙ্গে। জাপানে এখন অনেকগুলো যোগ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আমার [illegible] ওখানে একটি কেন্দ্রে আছেন।

—তুমিতো বহুদিন যোগাসন করছ। যোগাসনে কি ধরনের বৈশিষ্ট্য তুমি উপলব্ধি করছ একটু বলবে?

—যোগাসন মূলতঃ দেহের ভিতরকার পেশীর ব্যায়াম বা সুপুষ্টিতে সাহায্য করে। যারা নানা রকম খেলাধূলা করে বা ভারী কাজকর্মে যুক্ত তাদের উচিত যোগাসন করা। যোগাসনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এই ব্যায়াম (ব্যায়ামই বলি) শরীরকে

এক বিশিষ্ট ঘরাণার ঐতিহ্যবাহী

সঙ্গীত ঘরানার মত খেলাধূলোতেও ঘরানা আছে। তবে তার সুর খুব নীচু তালে বাঁধা। সঙ্গীত ঘরানার মত কোন বিশেষ ক্রীড়াশৈলী পুরুষ পরম্পরায় প্রবাহিত হয় না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিককরণের ফলে সে শৈলী আধুনিকীকরণের গলা বেয়ে বইতে থাকে অন্য খাতে। ভিন্ন ধারায়। নতুন সুরে।

তবুও একই 'স্ফুলিং'-এর হুবহু প্রতিধ্বনি উত্তর পুরুষের মধ্যে প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে পশ্চিম জার্মাণীর জার্ড মুলারের কথা ধরা যাক।

যিনি পশ্চিম জার্মাণীর 'ফুটবল আইডল' ইউ সীলারের খেলা দেখেননি তিনি অনায়াসে তাঁকে খুঁজে পেতে পারেন জার্ড মুলারের মধ্যে। একই আঙ্গিকের খেলা। অবিকল একই প্রকরণের প্রয়োগ। যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ।

সীলারের মত সেই একই রকম আক্রমণাত্মক ঢং, অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও পেনাল্টি সীমানার মধ্যে গোল করার বা হেড করার অসীম দক্ষতা। সমালোচকদের মধ্যে ও অনেকেই মুলারকে সীলারের 'কারবন কপি' বলে অভিহিত করেছেন। সত্যিই সীলারের ছায়া দেখা যায় মুলারের মধ্যে।

১৯৭০ এর বিশ্ব কাপের প্রাক্কালে পশ্চিম জার্মাণীর ফুটবল কর্মকর্তারা মুস্কিলে পড়েছিলেন উঠতি প্রতিভা মুলারকে নিয়ে। যদিও সীলারের তখন পড়ন্তবেলা তবুও তাঁর দক্ষতায় তেমন ঘাটতি ছিল না। এমত অবস্থায় তাঁর জায়গায় মুলারের কথা ভাবাই যায় না। বিচক্ষণ দলপতি সীলার সমস্যার সমাধান ঘটিয়েছিলেন নিজের আসনটি মুলারকে ছেড়ে দিয়ে নিজে পিছিয়ে এসে।

নবম বিশ্বকাপ ফুটবল পশ্চিম জার্মাণী দলে মুলারের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বড়। বাছাই পর্বের খেলায় সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে মুলার একাই চারটি গোল করেন। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অন্তিম মুহূর্তে মুলারের গোলেই পশ্চিম জার্মাণী জেতে।

মূল প্রতিযোগিতাতেও মুলার ছিলেন একাই একশ। দলের মোট ১৭টি গোলের মধ্যে মুলারের অবদান ছিল ১০টি। মরক্কোর বিরুদ্ধে ১টি বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ৩টি গোল করেন। পশ্চিম জার্মাণী মরক্কোর বিরুদ্ধে ২—১ ও বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ৫—২ গোলে জিতেছিল। পেরুকে হারায় ৩—১ গোলে। ৩টি গোলই করেন মুলার। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ক্ষুরধার। ২—২ গোলে যখন খেলার ফলাফল অনিশ্চিত তখন জয়সূচক গোলটি করে মুলার পশ্চিম জার্মাণীকে আর এক ধাপ এগিয়ে দেন। ইতালীর বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মাণীর মান বেঁচেছে মুলারের দেওয়া ২টি গোলে। এই খেলায় পশ্চিম জার্মাণীর হার হয় ৪—৩ গোলে।

মেকসিকো বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত গোলদাতার খতিয়ানে জার্ড মুলারের নাম ছিল সর্বাগ্রে। ৬টি খেলায় তিনি গোল করেন দশটি। কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের জন্যে ফিরতি খেলায় উরুগুয়ের বিরুদ্ধে মুলার গোলদানে বিরত ছিলেন। অন্য ৫টি ম্যাচেই তিনি গোল করেন।

সেবার সর্বাধিক ব্যক্তিগত গোল করার প্রতিযোগিতায় মুলারের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ব্রেজিলের ডাকসাইটে খেলোয়াড় জাইরজিনহো। বাটাফোগো ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড জাইরজিনহোর মধ্যে ব্রেজিল ফুটবলের 'আইডল' গারিনচার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। খেলার ধরন ধারন হুবহু এক। ঘুরে ফিরে সেই ঘরানার কথা এসে পড়ল প্রসঙ্গক্রমে। ক্রীড়া পদ্ধতির দিক থেকে জাইরজিনহোকে অনায়াসে গারিনচার অনুসারী বলে চিহ্নিত করা যায়। যাই হোক আসল কথায় ফিরে আসি। গোল দেওয়ার প্রতিযোগিতায় জাইরজিনহোকেও হার মানতে হয়েছে মুলারের হাতে। সেবার জাইরজিনহো ৭টি গোল করার সুবাদে ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ। আর ফুটবলের রাজা পেলে ৪টি গোল করার সূত্রে ছিলেন চতুর্থ স্থানে। অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার বিসোভেটসও ৪টি গোল করে দাঁড়িয়েছিলেন পেলের সমান্তরালে।

বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিল রেকর্ড জয় লাভ করলেও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পশ্চিম জার্মাণীর স্থান প্রথম সারিতে। ১৯৫৪ সালে চ্যাম্পিয়ান। ১৯৬৬তে রাণার্স। ১৯৩৪ ও ১৯৭০ সালে তৃতীয়। ১৯৫৮ সালে চতুর্থ। পুনরায় ১৯৭৪ সালে আবার বিশ্বশ্রেষ্ঠ। মুলারের ব্যক্তিগত গোল সংখ্যা ৪। প্রাথমিক পর্বে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১টি গোল ও মূল প্রতিযোগিতায় যুগোশ্লাভিয়ার বিপক্ষে ১টি গোল করেন মুলার। প্রাক চূড়ান্ত পর্বের খেলায় পোল্যাণ্ড আর পশ্চিম জার্মাণীর মধ্যে টাগ অফ ওয়ার সুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুলারের দেওয়া গোলে দড়ি টানাটানি শেষ হয়। পশ্চিম জার্মাণী ১—০ গোলে জিতে ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায়ও মুলারের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পেনাল্টি কিকে হল্যাণ্ডের নিসকেনস গোল করে ১—০ গোলে স্বদেশকে এগিয়ে দেন। অল্পক্ষণ পরে নাটকীয়ভাবে পেনাল্টি সটেই পশ্চিম জার্মাণীর ব্রিটনার গোলটি পরিশোধ করেন বটে কিন্তু জয়সূচক ঐতিহাসিক গোলটি দিয়ে জার্ড মুলার পশ্চিম জার্মাণীকে বিশ্বের সেরা দল হিসেবে প্রতিপন্ন করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে স্বদেশীয় দলে তাঁর স্থান যে কত অপরিহার্য তারও স্বাক্ষর রাখলেন আর একবার নতুন করে। আগেই বলেছি মুলারের মিউনিখ অলিম্পিকে সংগ্রহ ৪টি গোল। সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় সেবার ছিল পোল্যাণ্ডের লাটোর নান। তার গোলসংখ্যা ছিল ৭।

বেঁটেখাটো, মোটাসোটা আকৃতির ছেলে মুলারের জন্ম নর্ডলিঙ্গার নামক জার্মাণীর এক শহরে। মাত্র ছ বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলতে সুরু করেন। এগার বছর বয়সেই স্থানীয় এক ক্লাবের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আরম্ভ করেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিম জার্মাণীর ঐতিহ্যসম্পন্ন ক্লাব বায়ার্ণ মিউনিখ ক্লাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে ইউরোপীয় ফুটবলে বর্ষশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছেন মুলার। ৩৬টি আন্তর্জাতিক খেলায় গোল করেছেন ৪২টি। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে মুলার সীলারকৃত নজীরকে ডিঙিয়ে যাবেন। সীলার ১৬ বছরে ৭২ বার আন্তর্জাতিক আসরে স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করে মোট ৪৩টি গোল করেছিলেন।

জীবনের সেরা খেলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মুলার সহাস্যে বলেন—মেকসিকো বিশ্ব কাপে পেরুর বিরুদ্ধে ৩টি গোল আমার জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়। বলা বাহুল্য, ঐ খেলায় পশ্চিম জার্মাণী পেরুকে ৩—১ গোলে হারিয়েছিল।

সীলারের ক্রীড়া ঐতিহ্যকে সযত্নে লালন করে মুলার এখন মধ্যগগনে। এই সীলার ঘরানাকে স্বযত্নে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এর পর আর কোনো জার্মাণ তরুণকে দেখা যাবে কি?

প্রশান্ত দাঁ

'এরা এক যুগ' ছবির ফ্লোরে ঢুকে দেখি ভেতরে রীতিমত কমোশান। জয়শ্রী রায় ঈষৎ কাতর ভঙ্গীতে কি-যেন বলছেন। ইস্যুটা কি ভাই? একজন বিরক্ত কণ্ঠে বলল—আরে মশাই এই ছয় নম্বর ফ্লোরে কি-না-কি এক ধরনের বিষাক্ত সব পোকা বেরিয়েছে, একেবারে রায়ট লাগিয়ে দিয়েছে।

—রায়ট? বলেন কি মশাই? পোকাগুলো তাহলে কোন কমিউনিটির? মুসাফিরের উদ্বেগ কুল প্রশ্ন।

—ধাৎ। এ সে রায়ট নয়—বক্তার বিরক্তি যেন চরমে উঠল—বাইটিং রায়ট। মানে ঝপাঝপ কামড়ে দিচ্ছে। আজ এ রেজাল্ট—গায়ে সঙ্গে সঙ্গে চাকা চাকা দাগ দেখা দিচ্ছে—আমবাত দেখেন তো? সে[illegible] বাতের মত খানিকটা। আর দাপাদাপি করছে।

সত্যনাশ।

আর্টিস্টরা সবাই সবার মুখ সামলাচ্ছে! কুট করে কামড়ে দিলেই সর্বনাশ! ক্যামেরার সামনে অমবাতোলা মুখ নিয়ে শট দিতে হবে নাকি? এক দেখলাম সমিত ভঞ্জ ভোল্ট কেরালু-ডাব নিয়ে পায়চারী করছে ফ্লোরময়। মানুষের কথার কামড় যদি হজম হয় তো পোকার কামড়ও হবে। তা বলে সারাক্ষণ পোকা বেছে বেড়াতে হবে নাকি?

চিন্ময় বলল—জয়শ্রীকে কামড়েছে তো? তাহলে আমি নিশ্চিন্ত। ও নির্ঘাৎ মেল পোকা। নইলে ফিমেল কামড়াতো না। পার্টিকুন্তলী সুন্দরী ফিমেল।

জয়শ্রী কপট ক্রোধে একলা—হুঁ, তাই বুঝি!

ফ্লোরের ক্যাটওয়েতে সারি সারি আলো বসেছে। ক্যামেরাম্যান দীপক দাস খুব তড়িৎ কণ্ঠে সেই আলো তৈরী করছে পরবর্তী শটের জন্যে। ক্যামেরাম্যানদের এটা একটা কুকিং-আপ ব্যাপার। কোথা থেকে কোন লাইট নায়িকা পাবে আর সেই আলোয় তার মুখশ্রী ঝলমলিয়ে উঠবে—সেদিকে ওঁদের খুব কড়া নজর। দুনিয়ার সব ক্যামেরাম্যানই নায়িকাদের প্রথম সুযোগেই ফেভারিট হতে চায়। খোদ দীপক দাস এই লাইনে খেলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই কুপোকাৎ। তারপর সেই হিরোইনকে বিয়ে করে এখন গোবেচারা স্বামীর ভূমিকায় তাকে পার্মানেন্ট চাকুরে হতে হয়েছে। তবু স্বভাব যায় না মলে। ফ্লোরে হিরোইন থাকলে দীপকের উদ্যম এখনও যেন দ্বিগুণ [illegible] বাড়ে, [illegible] দেখে না। [illegible] এত বুঝেন, ভাল করে কিছু [illegible] না। পার্টিং-এর পর পরেশ।

এখন আমার চোখের সামনে সিক্স ইমুং-মান মুরছে। সমিত ভঞ্জ কল্যাণ চ্যাটার্জী আর শিল্পী সেনগুপ্ত। ছবির পরিচালক অর্চন চক্রবর্তী প্রথম করেছিলেন—এঁরা তিনজন হচ্ছেন আমার এই ছবির কেন্দ্র-ক্যারেক্টার। আর মেয়েদের মধ্যে কিছু দিচ্ছেন সন্ধ্যা রায়।

স্টুডিওতে সমিত ভঞ্জ 'দুদু' নামেই পরিচিত। অর্চন বলছেন, ছবিতে সমিতের নাম সুন্দর, কল্যাণের নাম শান্তনু, আর শিল্পী সেজেছে শ্যাম। আর সন্ধ্যা রায় যে চরিত্রটিতে অভিনয় করছেন তার নাম রীণা......

গল্প শুরু হয়েছে কোর্টরুমের দৃশ্য দিয়ে। সেখানে দেখা যাচ্ছে—চুরির অপরাধে সুন্দরের সাজা হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে কাট-টু-কাট সুন্দর জেলের সেলের মধ্যে শুয়ে তার নিজের অতীতের কথা ভাবছে। শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট ছেলে সে। চাকরীর জন্য দোরে দোরে ঘুরেছে। কিন্তু কোথাও কোন চাকরী পাওয়া দূরে থাক—কারো কাছে সামান্য একটা সহানুভূতির কথাও শুনতে পায়নি। শেষে নিজের ওপরেই একটা ধিক্কার এসে গেছে সুন্দরের। বাড়িতে বিধবা মা তখন মর-মর অবস্থায় শয্যাশায়ী। অথচ সুন্দর তাঁর চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করতে পারেনি। ডাক্তার যে ওষুধের প্রেসক্রিপশান দিয়েছেন তা না দিতে পারলে হয়ত শেষ পর্যন্ত মা-কে বাঁচানোই যাবে না। সুন্দর তখন ডেসপারেট। ওষুধের দোকানে সোজা হামলা। জোর করে ওষুধ নিয়ে পালানো অবশ্য তার আর হয়ে উঠল না, মাঝপথে পুলিশ, তারপর হাজত-আদালত। সেখান থেকে এখন এই জেলে।

এখানেই সুন্দরের সঙ্গে শান্তনু আর শ্যামের সঙ্গে আলাপ। এর মধ্যে শ্যাম হচ্ছে পাকা ক্রিমিন্যাল। ও-সব মনুষ্য বিবেক-বিবেকের বালাই নেই তার। আর শান্তনু এসেছিল উত্তেজনার মুহূর্তে একটা জটিল অপরাধের শিকার হয়ে।

সন্ধ্যা রায় ফ্লোরে ঢুকলেন। এটা একটা হোটেলের শট। কলকাতা থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে এরা পালাতে পালাতে এক সমুদ্র শহরে এসে পৌঁছেছে এইমাত্র। ক্যামেরা মিড-লং শটে বসানো। ওরা হাঁটতে হাঁটতে এসে প্রথমে রিসেপশান কাউন্টারে দাঁড়াচ্ছে। ম্যানেজারের সঙ্গে মামুলী কথা-বার্তা বলে গটগট করে হাঁটতে হাঁটতে উঠে যাচ্ছে হোটেলের দোতলায়। ম্যানেজার সঙ্গে লোক দিয়ে বলছে—যাও, ওঁদের [illegible] নম্বর ঘরটা খুলে দে—

আর তারপরই সদা বিরাট[illegible] [illegible] বেমানান চেহারা নিয়ে কমেডিয়ান চিন্ময় রায়ের আগমন। সঙ্গে অমন সুন্দরী

এরা এক যুগ/চিত্রদূত পরিচালিত
ছবিতে সমিত ভঞ্জ, সন্ধ্যা রায়, মীনাক্ষী সেনগুপ্তা অভিনীত ছবি।
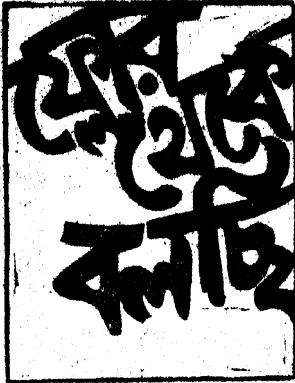
রাজেশ খান্না/শর্মিলা

আবিষ্কার

কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয়ে ও আঙ্গিকে বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে বিবেচিত হবে।

[প্রযোজনা—আরোহী]

অমর ও মানসী আধুনিক দম্পতি। প্রেম করেই ওদের বিবাহ। বাবার অমতে মানসী অমরকে বিবাহ করেছিল। যখন অমর অফিসের চাকুরে মানসী কলেজের ছাত্রী, তখন থেকেই ওরা বিবাহের স্বপ্ন দেখছিল। অমর এক বিজ্ঞাপন সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও মানসীর বাবা ওদের বিবাহে মত দিতে পারেন নি। কারণ তার ধারণা বিজ্ঞাপন সংস্থায় যারা চাকুরী করে, তারা ঠিক চরিত্রবান নয়।

পিতার অমতেই ওরা (অমর ও মানসী) এক সুখী নীড় গড়ে তুলল। ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে এল অপূর্ব কীর্তিমান এক সন্তান। আনন্দের মধ্যে দিয়েই ওদের দিন কাটছিল। কখনও কখনও অমরের বন্ধু সুনীল, নানাভাবে ওদের আনন্দে মাতিয়ে রাখতো; বিশেষ করে বিবাহ বার্ষিকীর রাত্রে সুনীল ফুল নিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতো।

আচমকা দেখা গেল কালো মেঘ। স্বামী ও স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক সন্দেহের বিষাক্ততায় দূষিত হল। সামান্য কথায় ওদের ঝগড়া, বিবাদ লেগে যায়। অমর ও মানসীর সুখের সংসার ধ্বংসের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল। আজকাল বাড়ী ফিরতে অমরের প্রায়ই রাত হয়ে যায়। সুনীল ওদের দুঃখে মনমরা হয়ে থাকে। অফিসের এক মহিলা সহকর্মীর প্রতি, অমর এখন আকর্ষণ বোধ করে, কারণ সেও বিবাহিতা হয়েও ভীষণ একা।

কালো মেঘ কেটে উদয় হল সূর্যের। অমর মানসী খুঁজে পেল তাদের হারান প্রেম।

পূর্বেকার দুটি বিশিষ্ট ছবি 'তিসরী কসম' ও 'অনুভব'র চেয়েও বাসু ভট্টাচার্যের 'আবিষ্কার' আরো পরিণত ও বুদ্ধিদীপ্ত। পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যের শক্তিশালী সৃজন ক্ষমতার পরিচয় আরও বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত তাঁর এই নতুন ছবিতে। কয়েকটি শট রীতিমত প্রতীকধর্মী, শব্দের ব্যবহার এখানে একটি নতুন ডাইমেনসন যোজনা করেছে। তেমনি নীরবতার ব্যবহারও অত্যন্ত শিল্পসম্মত।

আঙ্গিকের কাজ এক কথায় অপূর্ব, নন্দু ভট্টাচার্যের আলোকচিত্র গ্রহণ, এস কে চক্রবর্তীর সম্পাদনা এবং কানু রায়ের সুর সংযোজনা ও নেপথ্য সঙ্গীত ছবির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। শব্দগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশনার কাজও উচ্চাঙ্গের। অভিনয়—মানসী ও অমরের ভূমিকায় রাজেশ খান্না ও শর্মিলা ঠাকুর স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়—মীনা জোহর, দীনা পাঠক, সত্যেন্দ্র কাপুর, মহেশ শর্মার অভিনয় চরিত্রানুগ। সব মিলিয়ে ১৯৭৫-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি।

—চিত্রদূত

বিনোদিনী :
ভ্রান্তি নিরসন

নাট্য-সম্রাজ্ঞী বিনোদিনীকে বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় বিকৃত করে তুলে ধরা হয়েছে। সেই বিকৃতি থেকে পাঠক-সাধারণকে তথা বিনোদিনীকে মুক্ত করার জন্যই 'অমৃত' পত্রিকায় শতবর্ষের স্মরণীয় নিবন্ধে বিনোদিনীর ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশ করা হচ্ছে। একটি সংখ্যায় গৃহপুরের জমিদারের বন্ধুকে বিনোদিনী অ-বাবু বলে অভিহিত করেন নি স্থানে ভুলক্রমে 'করেন' মুদ্রিত হওয়ায় দুঃখিত। অবশ্য এ বিষয়ে শেষাংশে বিস্তারিত আলোচনায় প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাবে।

পুস্তকাকারে বিনোদিনীর 'আমার কথার' একটি সংকলন কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনে সম্পাদকদের বহু ভ্রান্তি সম্পর্কে পাঠক সাধারণ অবহিত আছেন। এই সংকলনে বিনোদিনীর রেকর্ড অভিনয় ও রেকর্ড সংগীত সম্পর্কে মারাত্মক ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। নাট্য-সম্রাজ্ঞী বিনোদিনী 'বিল্বমঙ্গল' বা অন্য কোন রেকর্ড নাট্যে অভিনয় করেননি, সংকলন সম্পাদকরা বিনোদিনী (হাঁদি) নাম্নী অমর দত্ত প্রযোজিত ক্লাসিকের জনৈকা অভিনেত্রীকে বিনোদিনী বলে ভুল করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সংকলনে নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী গীত বলে যে ছয়টি রেকর্ড সংগীতের কথা উল্লেখ করেছেন তার পাঁচটি গেয়েছিলেন সংগীত শিল্পী বিনোদিনী দাসী আর একটি গেয়েছিলেন শ্রীমতী বেদানাবালা দাসী। 'রেকর্ড কাকলী' বা বীণার ঝংকার-এ এই তথ্যই পাওয়া যায়।

১। ধীরে ধীরে কর পার। ২। কার প্রেমে অনুরাগে। ৩। তাকে ভোলা হল এ কি দায় ৪। নমস্তে নমস্তে শারদে। ৫। বালিকা বয়সে ছিলাম—এই পাঁচটি গান গেয়েছিলেন সংগীত শিল্পী বিনোদিনী দাসী—ইনি গিরিশ শিষ্যা বিনোদিনী নন। ১। চাই না-চাই-না চাই-না গানটি গেয়েছিলেন বেদানা দাসী—সংগীত শিল্পী বিনোদিনী দাসীও নন।

ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস অফ ইন্ডিয়া পরিচালিত বিধান সংগ্রহশালায় নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর বিভিন্ন রূপসজ্জায় গৃহীত পনেরো (১৫) খানা প্রতিকৃতি সংগৃহীত আছে। সেই সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন ছবি অমৃত পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া একই সংখ্যায় নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী সংগীতশিল্পী বিনোদিনী দাসী এবং ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনেত্রী বিনোদিনী (হাঁদির) প্রতিকৃতি ভ্রান্তি নিরসনের জন্য প্রকাশ করা হল।

—লেখক

নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমৃত মিত্র বললেন, বিনোদ এখন বেশী গোল করো না। কিছুদিন চুপচাপ থাকো। একজন মাড়োয়ারী এসেছেন অনেক টাকা নিয়ে। থিয়েটার করতে চান। যত টাকা লাগে তিনি খরচ করবেন। আমরা সব সেখানে যাবো।

শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। নতুন থিয়েটার সম্পর্কে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে এই সংঘাতের সুযোগ নিয়ে গুর্মুখ রায়কে গিরিশ শিষ্যরা উপস্থিত করলেন বিনোদিনীর সামনে। তখনও মূল প্রস্তাব দেননি। থিয়েটারের প্রস্তাব নিয়েই আলাপ-পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে সমাপ্ত হলো।

এক একটি ঘটনার মূলে বিভিন্ন কার্যকারণ নিহিত থাকে, বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশেই বৃহত্তর শুভ-অশুভ সঙ্ঘটিত হতে দেখা যায়। বিনোদিনীর রূপসমুদ্রে অবগাহন-আনন্দে বিভোর অ-বাবুর ভালবাসা ছিল মোহগ্রস্ত। মোহগ্রস্ত অবস্থায়ই বিনোদিনীর চারপাশে অ-বাবু নানান স্বপ্নজাল বিস্তার করতেন। অ-বাবুর প্রতি বিনোদিনীর ভালবাসায় কোন মোহ ছিল না, অ-বাবুর স্বপ্নজালে বিনোদিনী আটকা পড়ে যান। পতিতা নারীর বেড়াজালের মধ্য থেকে নারীর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পতিতা নারীর সংস্কারবদ্ধ মন প্রথম দিকে তাই সন্দেহ দোলায়িত ছিল। বিনোদিনী তার সংস্কারকে কাটিয়ে উঠলেও অ-বাবুর পক্ষে সংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হল না—তাই তিনি দেশে গিয়ে সেখানে বিয়ে করেন। সংকোচবশতঃই বিয়ের সংবাদ লুকিয়ে রাখেন বিনোদিনীর কাছে। অমৃতবাবুরা এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে গুর্মুখের দাবী পেশ করলেন। বিনোদিনী তাতেও দমলেন না। পতিতা নারীর ভাগ্যকে মেনে নিতেই অভ্যস্তা হয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অ-বাবুর কতগুলি মর্মান্তিক ব্যবহার অন্তত সাময়িকভাবে বিনোদিনীর মন বিষিয়ে তুলল। নারীর সহজাত প্রতিহিংসা-পরায়ণ তাও যে কাজ করল না—এমন নয়। তাছাড়া মনে ধিক্কারও এল খানিকটা। জীবিকার জন্য নিছক দেহ বিক্রীর ওপর নির্ভর না করে অভিনেত্রীর জীবনকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করাই স্থির করলেন।

সহকর্মীরা এই দুর্বল মুহূর্তে অনুরোধ-উপরোধ নিয়ে ঘিরে ফেললেন বিনোদিনীকে। লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করলেন। বিনোদিনী যদি গুর্মুখের [illegible]

সংগীতশিল্পী বিনোদিনী দাসী

দু'টি প্রাণ গীতিনাট্যে মঞ্চোপরি—সীতাফলওয়ালী (ভুবনমোহিনী); ডাইনে মিহিদানাওয়ালী (বিনোদিনী)

সম্পূর্ণ ঘর করতে রাজী হয় তবে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেনই অধিকন্তু একটা থিয়েটার করতে দেবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। যে থিয়েটার বিনোদিনীর নামে নামাঙ্কিত হবে। যে থিয়েটারের সর্বময়ী কর্ত্রী হবেন বিনোদিনী। অ-বাবুর প্রতিজ্ঞা পালিত। বিনোদিনী। অ-বাবুর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ আর প্রতাপ জহুরীর গোলামী থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি। তবু দ্বিধাগ্রস্তা বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের অভিমত চাইলেন।

বললেন তিনি : থিয়েটার থেকেই তোমার উন্নতি, থিয়েটার থেকে তোমার যশ-খ্যাতি। তোমার শক্তি আছে। তোমাকে আমি আরো শিক্ষা দিয়ে আরো যশের অধিকারিণী করে তুলবো।

উৎসাহিত হলেন বিনোদিনী। তবু ভুলতে পারলেন না অ-বাবুর কথা। শেষে নিজেই তিনি বিশ্বাসঘাতকতার পাপে জড়িয়ে পড়বেন না তো?

নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দেন : বিশ্বাসঘাতকতা তিনিই করেছেন। তিনিই বলেছিলেন, তুমিই আমার একমাত্র ভালবাসার বস্তু। আজীবন সে ভালবাসা থাকবে, তিনি সদবংশজাত। তিনিই যখন ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারলেন না— আমি কেন তার জন্য ভাববো! আমি ত পতিতা নারী। ছলাকলা ত আমাদের সহজাত।

কঠিন হয়ে উঠলেন বিনোদিনী। সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে গুরমুখের প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন। জয়মালা দিলেন গুরমুখের গলায়।

বিনোদিনীর ভাষায়ই বলি :

থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম। কেন করিব না? যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই-ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরবশীভূত তাহারাও সেই কথা বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সংকল্প দৃঢ় হইল গুরমুখ বাবুকে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম।

একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের চিরপ্রথা হইলেও এ অবস্থায় আমার বড় চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছিল। হয়ত লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে, আমাদেরও আবার ছলনায় প্রত্যবায় বোধ বা বেদনা আছে। যদি স্থিরচিত্তে ভাবিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী হৃদয়ের সকল কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই। যে কোমলতায় একদিন হৃদয় পূর্ণ ছিল তাহা একেবারে নির্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তান পালন করা। পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? অ-বাবু ছিলেন অভিজাত জমিদার সন্তান। বিনোদিনীর প্রতি তাঁর দুর্বলতা সেহসীমা অতিক্রম করলেও তদানীন্তন সামাজিক পরিবেশের কথা মনে করেই বিনোদিনীকে স্ত্রীরূপে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি যা পারতেন—তা হলো বিবাহিত জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা। তাও তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় নি, তাই তাঁর ভালবাসা মোহমুক্ত ছিল বলে মনে করা সমীচীন নয়। গুরমুখের আশ্রয় গ্রহণে ক্ষিপ্ত হয়ে অ-বাবুর বিনোদিনীকে বাধা-দানের সম্মতি কর্মতৎপরতার মধ্যে ছিল জমিদারের আভিজাত্য বা ধনী পুরুষের আত্মাভিমান। সর্বোপরি শক্তির দম্ভ। দুর্জয় শক্তি নিয়ে বাধা দিতে এলেন। আয়ত্বাধীন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হতে দেবেন কেন? জমিদারী থেকে লাঠিয়াল আনিয়ে বিনোদিনীর বাড়ী ঘিরে ফেললেন। গুরমুখ রায়ও হার মানবার পাত্র নন। তিনিও বাছাই করা গুণ্ডা এনে সম্মুখে নামালেন। মারামারি, থানা-পুলিশ। জীবন সঙ্কটাপন্ন। এমনি অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটলো কিছুদিন। তবুও মিটলো না।

(ক্রমশ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

রেহানা সুলতান

মাসখানেক আগে যদি একবার টেকনি-সিয়ানস দু নম্বর ফ্লোরে যে কোনো দিন ঢু মারতে পারতেন, দেখতেন হোগলা আর নারকেল পাতায় ছাওয়া একটা কুঁড়ে ঘরে আলোর হাট বসেছে। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাম্যান দীপক দাস কয়েক হাজার ওয়াট আলোতো জ্বালিয়ে ছিলেনই।

রেহানা সুলতান কলকাতায় এসেছিলেন সপ্তাখানেকের জন্য। রত্না চ্যাটার্জির ছবি 'দস্যু সর্দার রত্নাকর' ছবিতে তাকে রত্নাকরের এক বৌ ঝিমলি সাজতে হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি একটানা কাজ করেছেন প্রতিদিন। স্টুডিওতেই একদিন প্রোডিউসার মিসেস চ্যাটার্জিকে রেহানার ইন্টারভিউর কথা জানাতে তিনি বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—নিশ্চয়ই ও ইন্টারভিউ দেবে। একদিন হাতে একটু সময় নিয়ে লাঞ্চ-টাইমে চলে আসুন।

—স্টুডিওতে কাজের মধ্যে ডিসটার্ব হবে নাতো?

মিসেস চ্যাটার্জি বলেছিলেন—না না ওসব কোনো অসুবিধে হবে না। চলে আসুন।

সেইমত এক বিষ্যুৎবারের বারবেলায় হাজির রেহানাজীর মেক-আপ রুমে। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরে ঢুকে দেখি উনি একমনে মেক-আপ করছেন। হেয়ার ড্রেসার পাশে দাঁড়িয়ে। মিসেস চ্যাটার্জি'র সোফায় আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

পরিচয় প্রথম দিনই হয়েছিল। তাই ভূমিকা না করে সোজাসুজি খাতা-কলম নিয়ে রেডি হলাম। মনে হোল রেহানাজীও প্রশ্ন শোনবার জন্য উদগ্রীব। মেক-আপরত চঞ্চল হাত দুটোকে থামিয়ে আয়না থেকে মুখ সরালেন আমার দিকে। দস্যু রত্নাকর-এর সময়ে মেয়েদের হেয়ার-স্টাইল কেমন হতো তা আমার জানা নেই, তবে এই মুহূর্তে আমার সামনে ঝিমলি চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যে ছাঁদে কবরী বাঁধা হয়েছে রেহানাজীর তাঁকে এক কথায় সুন্দর বলে দেওয়া যায়। দু বিনুনীতে চুলগুলো ভাগ করা। আর মাথার ওপরে বড় একটা খোঁপা। (উইগও হতে পারে) চিক চিক করছে জরির ফিতে।

চেহারাতেও ঝিলিক মারছে ছাব্বিশ বছরের যৌবন। পোষাক একই। সংক্ষিপ্ত কাঁচুলি। তাতে চুমকি লাগান। সারা দেহে মেক-আপ করতে হয়েছে। গায়ে আর কাঁধের কাছে রং সরে যাওয়ায় আবার ব্রাশ করছেন। আমার দিকে ফিরে একটা তোয়ালে দিয়ে দেহের অনাবৃত অংশগুলো ঢেকে নিলেন।

বললাম—প্রশ্ন করার মত কোনো প্রশ্ন নিয়ে তো আসিনি। আপনার কথা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

১৯৭৪ সালের সেরা ক্যামেরাম্যানের জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন (রঙীন) সৌমেন্দুবাবু 'সোনার কেল্লা'র জন্য। চোখ ঝলসানো রঙীন ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর এই পুরস্কার বিজয় অনেকের কাছেই ঈর্ষার বিষয় হয়েছে। গত বছর এপ্রিল মাসে লস এঞ্জেলস ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম একসপোজিসান ও আমেরিকান সোসাইটি অফ সিনেমাটোগ্রাফারস-এর সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার দুর্লভ সম্মান তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য গুরু শ্রীসুব্রত মিত্রও ছিলেন সঙ্গে। এত পুরস্কার সম্মান আর খ্যাতির অধিকারী হয়েও মানুষ হিসাবে সৌমেন্দুবাবু বন্ধুবৎসল সদা উৎফুল্ল এবং আত্মপ্রচারবিমুখ। প্রাণময় এই মানুষটিকে দেখলে মনেই হবে না ক্যামেরায় হাত দিলে জাদুকর হয়ে যেতে পারেন তিনি। জাদুকরী শক্তি তাঁর চোখ আর মনের ভেতর। যে শক্তির কথা হয়তো বা তিনি নিজেই জানেন না।

নিরীক্ষক

সৌমেন্দু রায়

একজন বিখ্যাত পরিচালক বলেছিলেন—ফটোগ্রাফি ইজ দি এসেন্স অব সিনেমা আর্ট। কথাটা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি তা যেকোনো খ্যাতনামা পরিচালকের ছবি দেখলেই বোঝা যায়। এবং সেই কারণেই বোধহয় পরিচালকের সঙ্গে ক্যামেরাম্যানের শিল্পমানসের একাত্মতার প্রয়োজন। বহু বিখ্যাত পরিচালক তাই নির্দিষ্ট একজন বা দুজন ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে কাজ করেন।

আমাদের এখানে তেমনি যে দুটি নাম সহজেই মনে আসে তা হোল সত্যজিৎ রায় ও সৌমেন্দু রায়। 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১) ছবিখানিতে প্রথম স্বাধীনভাবে কাজ করেছিলেন শ্রীরায় এবং তারপর থেকে প্রায় সব ছবিগুলোতেই তিনি কাজ করে আসছেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। ফটোগ্রাফী সম্পর্কে সৌমেন্দুবাবুর আগ্রহ দেখা দিয়েছিল স্কুল কলেজে পড়ার সময় থেকেই। তখন তাঁর বয়স কত? বছর আঠারো-উনিশ হবে (জন্ম : ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী)। ইস্টার্ণ পলিটেকনিকের ফটোগ্রাফি শেখবার জন্য ভর্তি হন। সেখানে অধ্যাপকের কাছে শুরু করলেন হাতে-কলমে শিক্ষানবিশী। সুব্রত মিত্রের সহকারী হিসাবেও সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন। তারপর 'রবীন্দ্রনাথ', তারও পরে 'তিনকন্যা'। বাংলার গ্রামকে তিনি এই ছবিতে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা তুলনারহিত। তবে সৌমেন্দুবাবুকে খ্যাতি দিল পরবর্তী ছবি 'অভিযান'। এই ছবির জন্যই তিনি ফটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার পেলেন ১৯৬৩তে।

তাঁর সাফল্যের ধারা শুরু সেদিন থেকেই। এখনও চলছে। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' 'অশনি সংকেত', 'সোনার কেল্লা'—প্রতিটি ছবির জন্যই তিনি বি-এফ-জে-এ থেকে পেয়েছেন সেরা ক্যামেরাম্যানের পুরস্কার। তরুণ মজুমদারের 'বালিকা বধূ'ও তাঁকে দিয়েছে আর একটি সম্মান। ১৯৭৩য়ে তিনি জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হলেন 'অশনি সংকেত' ছবির জন্য। আর সবচেয়ে আনন্দের খবর এ-বছরও তিনি

পঁচিশ বছরের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খুব কম পার্টিতেই তিনি যান। প্রায় যান না বললেই চলে।

সুতরাং তাঁর ছবির সংখ্যাও কম। রেহানাজীর আগামী ছবির তালিকায় আছে 'দিল কি রাহে', 'আজ কি রাধা', 'টিঙ্কু' 'এক কড়ুক বদনাম সি', 'কিসসা কুরসিকা' ইত্যাদি। আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে মিসেস চ্যাটার্জি বলে উঠলেন—সেকি, আমার ছবির নাম বাদ কেন। লিখে দিন 'দস্যু সর্দার রত্নাকর'। পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জি, হিরো মানে প্রধান ভূমিকায় শেখর চ্যাটার্জি। বলেই পানভরা টুকটুকে ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

রেহানাজীও মুচকে বললেন—হ্যাঁ, আপকা পিকচার তো হ্যায়হিই। আই অ্যাম ওয়ার্কিং অলসো ইন এ বাংলা পিকচার। টেক ইট অলসো ইন দি লিস্ট।

হাসির জোয়ার থামতে না থামতে প্রোডাকশনের লোক তাগাদা দিয়ে গেলেন তাঁকে রেডি হবার জন্য।

মুখ ঘুরিয়ে আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখলেন। মধুকুরের প্রেমিকা কিম্মলির চেহারা আর সাজ-সজ্জায় নিখুঁত হয়েছে কিনা পরখ করতে লাগলেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। কখনও মাথা ঘুরিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে। বুকের তোয়ালেটা সরিয়ে গায়ের মেক আপে আলতো করে পাফ আর ব্রাশটা বুলিয়ে নিলেন নিজেই।

ঝটিতি রেহানাজী 'কিম্মলি' বনে যাচ্ছেন, শুধুমাত্র মেক-আপ নিয়ে নয়। মনে মনেও প্রস্তুত হচ্ছেন মনে হোল। একটু গম্ভীর হয়েছেন। কথা বলছেন কম।

আমাকে চুপচাপ দেখে অবশ্য উনিই নীরবতা ভাঙলেন। বলে উঠলেন—'কি হোল, কিছু জিজ্ঞেস করছেন না?'

—না, মানে আপনি বোধহয় এখন কিম্মলির দিকে কনসেনট্রেট করছেন, তাই ডিসটার্ব করছিলাম না আর কি?

একথা শুনে বোধহয় ভাবলেন কিছু। আয়নার মধ্য দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'সেরকম মনে হচ্ছিল আপনার?'

নিরুত্তর আমার সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে আবার বললেন,—'অভিনেত্রী তো আমরা, এই জন্যই একই সঙ্গে দুটো সত্তাকে নিয়ে কাজ করাতে পারি। বলুন, আপনার কি প্রশ্ন আছে, দেখুননা ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারি।'

রেহানজীর মুখে এই কথা শুনে মনে হলো পুণা ইন্সটিটিউটের ট্রেনিং সত্যিই তাঁর জীবনে কাজে লেগেছে। অভিনয়ের আসল মেজাজটাই তিনি ধরে ফেলেছেন। একই সঙ্গে দুটো সত্তার কাজ করাতে পারাটাই তো অভিনয়। অভিনয়কে এমন কজন ফিল করে আজকের কজন শিল্পী?

ইনস্টিট্যুট অ্যাকটিং কোর্স বন্ধ করে দিয়েছেন শুনে উনি বেশ ক্ষুব্ধ। 'এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না'—বলে একরাশ অভিযোগ করলেন তিনি।

ইতিমধ্যে ফ্লোরে যাবার ডাক এসে গেছে আরেকবার। তাই উঠবার আগে শেষ প্রশ্নটা ছুঁড়লাম—প্রেম আর বিয়ে নিয়ে কিছু ভাবছেন?'

মিসেস চ্যাটার্জির দিকে চেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলেন রেহানাজী। ওঁকেই বললেন—দেখিয়ে রিপোর্টার সাব ক্যা পুছ্‌তা হ্যায় হামকো?' আবার হাসি।

—দিস ম্যাটার ইজ স্ট্রিক্টলি প্রাইভেট এন্ড কনফিডেনসিয়্যাল। ইটস নট টু ডিসক্লোজ।

নির্মলা ধর

হিন্দী অমানুষ চিত্র
শর্মিলা/উত্তম

নরেশ কুমারের 'দো জাসুস' এখন সারা ভারত চষে বেড়াচ্ছে। জবরদস্ত হিট হয়েছে ছবিখানা। ইতিমধ্যে পরিচালক নরেশ কুমার নতুন ছবির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। পেপার ওয়ার্ক মোটামুটি রেডি। শুটিং শুরু হচ্ছে আগস্ট মাসে। 'দো জাসুস'-এ তিনি রাজ কাপুরকে পরিচালনা করেছিলেন। এই নতুন ছবি 'মামা ভানজা'তে তিনি পরিচালনা করবেন শাম্মী কাপুর ও রণধীর কাপুরকে। প্রযোজক বীরেন্দ্র কুমার ডিম্পল এন্টার প্রাইজের ব্যানারে ছবিখানা তুলছেন। এ ছবির নায়িকা চরিত্রে সম্ভবত দেখা যাবে পরভিন বাবীকে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে রাজেশ রোশনের ওপর।

•

রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'গীত গাতা চল' ছবির কাজ শেষ। ছবিখানা এখন সম্পাদকের টেবিলে কাটছাঁটের অপেক্ষায়। তাড়াতাড়ি রিলিজও করবে ছবিটা। চেষ্টা চলছে যাতে পনেরই আগস্ট ছবিখানা রিলিজ দেওয়া যায়। তারাচাঁদ বড়জাতিয়া প্রযোজিত এই ছবি পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ। শ্রীনাগের পরিচয় কলকাতার দর্শকদের কাছে দেবার প্রয়োজন নেই আশা করি। তিনি ইতিপূর্বে একাধিক হিট ছবি তৈরী করেছেন বাংলায়। 'গীত গাতা চল' তাঁর প্রথম হিন্দী ছবি। এ ছবির দুই প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে দুটি নতুন মুখ। নাম শচীন ও সারিকা। অন্যান্য ভূমিকায় থাকছেন মদন পুরী, উর্মিলা ভাট, মনোহর দেশাই, লীলা মিশ্র। পাম্মা খান্না, ইর্মতিয়াজ, আগা প্রমুখ। রবীন্দ্র জৈনের সুরে গান গেয়েছেন কিশোরকুমার, লতা মুঙ্গেশকর।

•

'খেল খেল মে' ছবির অসামান্য সাফল্যের 'খেল' শব্দটি নিয়ে একাধিক ছবির নামকরণ রাখা হয়েছে। এমনি এক ছবির নাম 'খেল খিলাড়ী কা'। পরিচালক অর্জুন হিঙ্গোরানি কদিন আগে শ্রীসাউন্ড স্টুডিওতে

স্যুটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন নায়িকা শাবানা আজমি, ধ্রুব, সুনীল কাপুর, পলসোক অশোক কুমার, রবি অসীমা, শেটি রমেশ দেশাই বীরবল ও মোহাম্মদ জুনিয়র। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরকৃত এই ছবির গানগুলো লিখেছেন রাজেন্দ্র কিষণ।

•
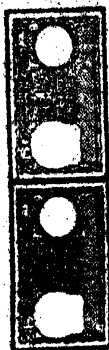
আর্ট ডিরেক্টর এস এস সিংধ এক বিরাট ঝলমলানো সেট ফেলেছিলেন রণজিৎ স্টুডিওতে। একটানা প্রায় কুড়িদিন স্যুটিং হোল 'ধর্মবীর' ছবির। চোখ ঝলসানো কাঁচের তৈরী আসবাবপত্র সুন্দর সুন্দর মূর্তি আর খিলান প্রাসাদে এক রাজকীয় সেট বলা যায়। সুভাষ দেশাই প্রযোজিত এই ছবি পরিচালনা করছেন মনমোহন দেশাই। এই সেটের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ধর্মেন্দ্র, জীনত আমন, জীতেন্দ্র, নীতু সিং, সুজিত কুমার প্রাণ ইন্দ্রাণী মুখার্জি ইমতিয়াজ চাঁদ ওসমানি প্রমুখ। জীবন কে বি পাঠকের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবির চিত্রগ্রহণ করছেন এন শ্রীনিবাস ও জি এম শ্রীনিবাস।

হিন্দী ছবিতে নাচ-গান নেই একথা এখনও ভাবা যায় কি! নিদেনপক্ষে হেলেন-মিনা টির একখানা নাচ আর সেই সঙ্গে আশা ভোঁসলের গান না থাকলে ছবি জমবেই না। এই রীতি চলে আসছে বহুদিন থেকে। ছবির চরিত্র বদলে সবকিছুর পরিবর্তন হলেও এই চলতি রীতির এখনও পরিবর্তন হয়নি। হবেও না হয়তো। হিন্দী ছবির সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। সুতরাং পরিচালক অশোক রায় ট্রাডিশনের বাইরে তো কিছু করতে পারেন না। তাঁর নতুন ছবি 'চক্কর পে চক্কর'-এর জন্য এক লম্বা নাচ-গান তিন টেক করলেন হোটেল কিংস ইন্টারন্যাশনালে। অংশ নিয়েছিলেন রেখা ও আমজাদ। এ ছবির নায়ক অবশ্য শশী কাপুর। তিনি এই দৃশ্যে কাজ করেন নি। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আবার স্যুটিং শুরু হবে। সেই সময় তিনি কাজ করবেন। অমিতাভ...কল্প নিয়ে এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন...মহেন্দ্র কর, সংলাপ রচয়িতা চরণদাস শোখ। ছবি তোলার দায়িত্ব আছে নন্দু ভট্টাচার্যের ওপর। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন আসরানি, প্রাণ, তরুণ ঘোষ ও বিন্দু।

•

লেখক-পরিচালক পি ডি সিনহা সম্প্রতি একোশ স্টুডিওতে তাঁর নতুন ছবি 'তেরে মিলন কি বাদ'-এর একটানা আটদিন স্যুটিং করলেন। ললিত এন্ড মহেন্দ্র কমবাইনস-এর এই ছবিতে নায়ক-নায়িকা চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন রীতা ভাদুড়ী ও নবাগত বিনয় কুমার। রীতা ভাদুড়ীও নায়িকা হিসাবে নবাগতা বলা চলে। 'জুলী' ছবিতে ওঁর অভিনয় দর্শক সব মহলেই প্রশংসিত হয়েছে। এই ছবিতে ওঁর চরিত্র নাকি খুব আকর্ষণীয়। এই কদিনের স্যুটিংয়ে ওঁরা দু'জন ছাড়া অংশ নিয়েছিলেন মণি কাপাগ, কমল কাপুর, কমল রাই, ব্রহ্মচারী। নিজের লেখা গানের সুর দিয়েছেন রবীন্দ্র জৈন।

—প্রতিনিধি

যাদের বোধ শক্তি কম যারা জড়ত্বের শিকার এমন সব জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে-মেয়েরা স্বচ্ছন্দ এবং প্রাণবন্ত অভিনয় করছে একথাটা স্বাভাবিকভাবে ভাবা যায় কি?

কিন্তু সেই দুর্লভ ব্যাপারটাই সেদিন প্রত্যক্ষ করে হরিনাথ দে রোডের 'বোধিপীঠ' প্রতিষ্ঠানের ছাদে ম্যারাপের নীচে ছোট্ট আসরে বসে।

[illegible] সম্পর্কে বাচ্চারা অভিনয় করে দেখালো রবীন্দ্রনাথের '[illegible]'। যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত তাদের অভিনয়।

ছোট্ট নাটিকা। মাত্র কয়েকটি দৃশ্য। তাই পর পর এবং প্রায় অনায়াস ভঙ্গীতেই পরিবেশন করে গেল তারা। অথচ কতই বা বয়েস তাদের। বড়জোর আট থেকে বারো কি চৌদ্দ?

দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদেরই অভিনীত নাটক দেখছি যেন।

এ জন্যে যাঁর কৃতিত্ব সেই নাট্য পরিচালিকাকে (?) ধন্যবাদ জানাই। তিনি একটি দুরূহ পরীক্ষায় সসম্মানে এবং সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর পরিশ্রম সার্থক।

নাটকের গানও এরাই গেয়েছে। বিস্ময়ের কথা কন্ঠস্বরে সুরের অভাব থাকলেও আবেগ এবং ছন্দ সম্পর্কে এরা আশ্চর্য সচেতন। বিশেষ করে একটি নাচ ও তার গান।

নাটক ছাড়াও এরা আবৃত্তিও পরিবেশন করেছে।

'বোধি পীঠ' প্রতিষ্ঠানের এখানে বর্তমানে ৪০টি মেয়ে এবং ৪১টি ছেলে আবাসিক আশ্রমে থেকে চিকিৎসিত ও শিক্ষিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠান থেকে পরবর্তী পর্যায়ে এদের পুনর্বাসনেরও পরিকল্পনা আছে। স্ব-নির্ভর যাতে হতে পারে এবং তার জন্য প্রতিষ্ঠান এদের নানা রকমের হাতের কাজের শিক্ষাও দিয়ে থাকে। তার নমুনা দেখলাম প্রদর্শনীতে। যেখানে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের হাতে আঁকা ছবি মাটি এবং কাপড় দিয়ে পুতুল গড়া থেকে সুঁচের কাজ উলের কাজ বয়ন ইত্যাদি দেখে অবাক হতেই হয়। প্রদর্শনীটি

বোধিপীঠের দু'টি নাটক

উদ্বোধন করেন সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

বোধি পীঠের শ্রীমতী শ্রীলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মঞ্জু বসাক এবং সেক্রেটারী শ্রীমতী রেখা ঘোষ প্রদর্শনী ঘুরিয়ে দেখানোর ফাঁকে তাঁদের প্রচেষ্টার কথাও দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেন।

সুবর্ণ জয়ন্তীর এটা ছিল দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শেষ দিনের অনুষ্ঠান।

আগের দিন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের চিকিৎসা ও রোগের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে সারা দিন নানা আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের নাট্যায়িত 'হারিয়ে যাবার আগে' নামক একটি নাটকও অভিনীত হয়। নাটকের বিষয়বস্তু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন রোগীদের সমস্যার ওপর ভিত্তি করে রচিত। একটি ছেলে বোধিপীঠে এসে কি করে সে সুস্থ জীবনের আস্বাদন পেল নাটকে তাই দেখানো হয়েছে।

নাটকটি দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। অভিনয় করেছেন প্রায়শই ডাক্তার কিম্বা এই সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও নারী। এঁরা কেউই পেশাদার তো ননই, এমন কি সাধারণত নাটক করেও থাকেন না।

অভিনয় করেছেন ডাঃ শংকর সেন ডাঃ মিলন মজুমদার ডাঃ বাণীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ডাঃ গোরাচাঁদ বড়াল মাস্টার রাজর্ষি ঘোষ ডাঃ সুনীল গুপ্ত কবিরাজ ডাঃ পবিত্র ঘোষ শ্যামাপদ দত্ত তপেশ্বর মিশ্র গৌরী চট্টোপাধ্যায় শাশ্বতী রায় রেখা ঘোষ সুষমা দে ও রিঙ্কু গুপ্ত কবিরাজ।
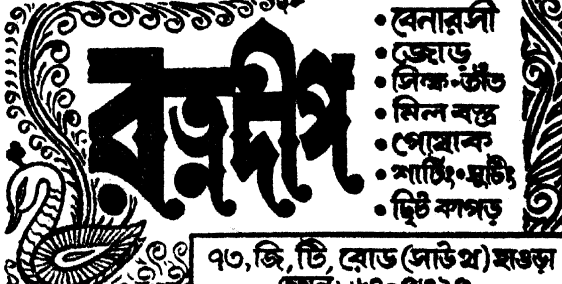
নাটকটির প্রযোজক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ নন্দী ব্যবস্থাপক ডাঃ গোরাচাঁদ বড়াল এবং পরিচালনা করেন ডাঃ মিলন মজুমদার।

হাজারীবাগে একাংক নাটক প্রতিযোগিতা

হাজারীবাগের 'মহুয়া' প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ৬ থেকে ৯ জুন সর্বভারতীয় একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হোল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হাজারীবাগের ডি সি শ্রীঃ কে বসু। ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দেবনারায়ণ গুপ্ত ও প্রকাশ নন্দী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন দিন যে সব সংস্থা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত দক্ষ নাটক অভিনেতা-অভিনেত্রী ইত্যাদিকে গুণানুসারে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

প্রযোজনা : ১ম—জিয়োডার্নো ব্রুনো (চেনা অচেনা) চন্দননগর। ২য়—রাজরক্ত হুগলী ড্রামাটিক ক্লাব। ৩য়—কেননা মানুষ সানিক দক্ষিণেশ্বর। পরিচালক : সমর দত্ত

(জ্যোৎস্না অচেনা)। অভিনেতা : ১ম—শ্রীকুমার রায় (নটতীর্থ) (সজল) বিপ্লবের গান। ২য়—মির্জা মহঃ আলি হুগলী ড্রামাটিক ক্লাব। তৃতীয়—নিমু ভৌমিক (বিনয়) (প্রবাসী) চতুর্থ সন্তান।

অভিনেত্রী : ১ম—তৃপ্তি রায় (রাজরক্ত) অয়েটি। ২য়—কল্পনা পালিত (চতুর্থ সন্তান) বিনয়ের মা। মেক-আপ কস্টিউম : জিয়োভার্নো ব্রুনো। সেট : ১ম—জিয়োভার্নো ব্রুনো ২য়—বিপ্লবের গান। আলোপাত : ১ম—সঞ্জয় ঘোষাল (গভীর জলের মাছ) ২—এস এন ভট্টাচার্য (যাদুকর) ৩—এম ধাড়া (কেননা মানুষ) ৪—এস জেনরায় (জীবনটাই তো নাটক)।

নাট্য সমালোচক

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্মিকী প্রতিভা বিদগ্ধ মহলে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে পরিবেশনার অনন্যতার কারণে। সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে পরিবেশিত ঐ একই গীতিনাট্য পূর্বমানেই অনাহত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। এবারের উপস্থাপনা আরো পরিশুদ্ধ ও মার্জিত।

অপেরাধর্মী গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকে শেষ অবধি অক্ষুণ্ণ এবং গানের ধারা স্বতঃস্ফূর্ত নদীস্রোতের মতই নাট্যবস্তুকে সরস করে রেখেছে। গানে গানে সংলাপ, কিন্তু কৃত্রিমতায় আড়ষ্ট নয়। এ বস্তু সম্ভব হয়েছে মূল চরিত্র (বাল্মিকী) রূপায়ণের দায়িত্ব অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ছিলো বলে। গানের নাটকীয়তা, অভিনয়ে এবং সুরে যেমন জীবন্ত করেছেন তেমনই চিত্রগ্রাহী তাঁর ব্যক্তিত্ব। উন্নতদেহ, ভাবুক ভঙ্গি, বিশাল দুটি চোখের উদাসী দৃষ্টি সব কিছু মিলিয়ে তিনি বাল্মিকী হয়ে উঠেছেন।

বাল্মিকী ও বালিকার ভূমিকায় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নন্দা চৌধুরী

বাল্মিকী জীবনের তিনটি পর্যায়ই (দস্যু রত্নাকর, তার ভাবান্তর এবং বাল্মিকীতে রূপান্তর) অশোকবাবু আশ্চর্য দক্ষতায় মেলে ধরেছেন কিন্তু মানিয়েছে বেশী বাল্মিকীতেই।

পরিচালনায়ও তাঁর কল্পনাসমৃদ্ধ মনের স্বাক্ষর ছিলো। মাইক্রোফোনগুলি লতাগুল্মে মণ্ডিত হয়ে অরণ্যের অংগ হয়ে ওঠে। লাল আলোর দ্যুতিতে মা-কালীর ভয়ংকর রূপাভাস রক্ষা করবার মত। 'নাম নাম রে ভারতী' গানটি দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব-মুহূর্তে কোরাসের সঙ্গে রোংপূর্ণ অংশগুলি অশোকবাবুর উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বেশ জমকালো পরিবেশ সৃষ্টি করেছে অথচ ভাবগাম্ভীর্য এতটুকুও অনাহত হয়নি।

'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী'

গানটির সঙ্গে ঢাক ঢোল সঙ্গতে দেবী পূজার যথার্থ আবহাওয়া অনুভূত আর এই ছন্দ দোলায় দোলায়িত গানটি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলো অপরিণত বয়সেও পাশ্চাত্য সুরের সমন্বয়ে তিনি সুরের মধ্যে কি নিপুণ শিল্পচেতনা এনেছেন।

বালিকার ভূমিকায় শ্রীনন্দা চৌধুরী চরিত্রানুগ। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দস্যুর ভূমিকায় দীপেন মুখোপাধ্যায়, সুভাষ বসু ও আলোক ঘোষ বেশ জমিয়েছিলেন। ব্যাধদ্বয়ের ভূমিকায় স্বপন ঘোষ ও সবিত চক্রবর্তী স্বাভাবিক। লক্ষ্মীর ভূমিকায় সুপূর্ণা চৌধুরীও যথাযথ। লক্ষ্মী মানিয়েছিল। সরস্বতীর ভূমিকায় গোপা ঘোষকে।

একক নৃত্যে বনদেবীর ভূমিকায় সুনন্দা চৌধুরী কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য নৃত্য ও সংগীতশিল্পীরা টিমওয়ার্ককে সুন্দর পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন।

আলোকসম্পাতে তাপস সেনের আলো চলা নিষ্প্রয়োজন। নৃত্যপরিকল্পনায় অসিত চট্টোপাধ্যায় ও যন্ত্রসংগীত পরিচালনায় ভাস্কর মিত্র যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সাংস্কৃতিকীর বর্ষা উৎসব

বালিগঞ্জ পার্ক রোডে কলকাতায় সাংস্কৃতিকীর সম্পাদক প্রদীপ গুহঠাকুরতার ব্যবস্থাপনায় সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে বর্ষা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। সংগীতাংশে রুণা চট্টোপাধ্যায়, অরূপ ভট্টাচার্য, শিখা চক্রবর্তী, সন্ধ্যা চক্রবর্তীর গানগুলি এবং সুচন্দ্রা বসু ও গীতা ব্যানার্জীর রবীন্দ্রসংগীত (বাংলায় এবং ইংরাজীতে সকলের প্রশংসা অর্জন করে। পরিতোষ গুহঠাকুরতা রবীন্দ্রনাথের নব বর্ষা কবিতাটি আবৃত্তি করেন। অঞ্জনা দাস ও মঞ্জু দেব রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে নৃত্যানুষ্ঠানগুলি বিশেষ উপভোগ্য হয়।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

মূল্য ৬৫ পয়সা

অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

অস্পৃশ্য পায়খানা!

ভাবতে কথাটা বলতেও ঘেন্না। কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়।

অধিকাংশ লোক তাঁদের পায়খানা সত্যিই রকম অপরিষ্কার রাখেন। বাড়ীর অন্যান্য ঘরের তুলনায় সবচেয়ে কম নজর শুধু এই পায়খানার বেলায়। ভাবটা—না দেখলেই মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু মাথা ঘামবে কারণগুলো দেখলে :

ময়লা পায়খানা শুধু দেখতে বিশ্রী আর দুর্গন্ধময় তাই নয়—তা যেমন অস্বাস্থ্যকর আর স্বাস্থ্যবিধির প্রতিকূল তেমনি দারুণ বিপজ্জনক।

এটাই হল সরল সত্য কথা। একটুও কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। তাহ'লে আপনার নিজের মনকেই জিগ্যেস করুন তো…

আপনার পায়খানা আপনি যেমন পরিষ্কার চান সেই রকম কি ?

উত্তরটা ভাল ক'রে জেনে রাখা দরকার একজনার—আপনার।

রোজ সকালে পরিষ্কার করার জন্য মেথর রাখলেও সে কি ঠিক মত কাজ করছে, না নম-নম ক'রে কাজ সেরে পালাচ্ছে ? উত্তরটা আপনার যদি খারাপ লাগে একটা জিনিসের বিষয় জেনে রাখলে আপনি সুখী হবেন…স্যানিফ্রেশ

স্যানিফ্রেশ জিনিসটা কি ?

স্যানিফ্রেশ হল পায়খানা পরিষ্কার করার পদার্থ যা সব ময়লা সাফ ক'রে পায়খানা ঝকঝকে রাখে। প্রথমে পায়খানায় জল ঢেলে দিন। তারপর পায়খানার গামলার মধ্যে প্রচুর স্যানিফ্রেশ ছিটিয়ে দিন। ২-৩ ঘন্টা তাকে কাজ করতে দিন। আরও ভাল হয় যদি একরাত্ত অবধি রেখে দেন। তারপর আবার জল ঢেলে দিন। তাতে যদি ভাল পরিষ্কার হচ্ছে না দেখেন, তাহলে একবালতি জল জোরে ঢেলে দিন। বস্‌! আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখার সব ঝামেলা দূর।

স্যানিফ্রেশ ৩ ভাবে কাজ করে

১. স্যানিফ্রেশ পুরোপুরি পরিষ্কার করে।

এতে রয়েছে অত্যন্ত কার্যকর পরিষ্কার করার পদার্থ যা দারুণ শক্ত দাগও উঠিয়ে দেয়। ব্রাশ যেখানে পৌঁছয় না সেখানেও স্যানিফ্রেশ সাফ করে।

২. স্যানিফ্রেশ বিপজ্জনক রোগজীবাণু বিনাশ করে।

পায়খানায় রোগজীবাণু অজস্রে থাকে ; তাতে অসুখবিসুখের সম্ভাবনা খুব বেশী। যে কাজ সাধারণ 'ফিনাইল' করতে পারে না সে কাজ স্যানিফ্রেশ করে—আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাই আপনার পায়খানা যে একেবারে নিরাপদ সেবিষয়ে আপনি একদম নিশ্চিন্ত।

৩. স্যানিফ্রেশ বিরক্তিকর দুর্গন্ধ দূর করে

কখন কখন পায়খানার দুর্গন্ধে প্রাণ অস্থির। পায়খানায় হাওয়াবাতাস খেলার পথ না থাকলে দুর্গন্ধ আটক থাকে আর তখন যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোড়া! স্যানিফ্রেশে এমন দুর্গন্ধনাশক পদার্থ আছে যা সব বদগন্ধ দূর ক'রে বাতাস নির্মল ক'রে তোলে।

স্যানিফ্রেশ কতবার ব্যবহার করা দরকার ? পায়খানা পরিষ্কার রাখার গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—প্রত্যেক দিন।

স্যানিফ্রেশ সব ময়লা দূর ক'রে আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখে ঃ

বালসারা
BALSARA

১৫ বর্ষ

১২ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 8th August, 1975 শুক্রবার, ২২ শ্রাবণ, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	বৃষ্টির শব্দ	(গল্প)	শ্রীফণিভূষণ আচার্য
১২	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৩	বিদেশের কথা		শ্রীপুণ্ডরীক
১৪	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৬	অসুস্থ	(কবিতা)	শ্রীতরুণ সান্যাল
১৬	রাত্রি	(কবিতা)	শ্রীঅজয় নাগ
১৬	অসমাপ্ত	(কবিতা)	শ্রীঅর্পিতা মজুমদার

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৭	[illegible]	(উপন্যাস)	শ্রীবিক্রমাদিত্য
২১	কাঁদিতে পারিলাম না		শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫	[illegible]		শ্রী[illegible] সেন
৩১	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীঅভয়ংকর
৩৩	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
৩৮	চিঠিপত্র		
৩৯	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৪৪	[illegible]		শ্রী[illegible]
৪৫	তখন সিরাজ	(গল্প)	শ্রী[illegible] রায়
৫০	রান্না করে দেখুন		শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৫২	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৬	খেলাধূলা		শ্রীদর্শক
৫৯	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬০	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅভয়
৬৩	বয়সভিত্তিক সংক্রমণ সম্পর্কে দু-চার কথা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৬৫	সিনেম্যাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৮	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৭০	নেপথ্যে		শ্রীনিরীক্ষক
৭২	স্টুডিও সংবাদ		

প্রচ্ছদ : নিতাই ঘোষ

লেখাপড়ার ওপর নজর

আমাদের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া ঠিকমত চলছে কিনা তা দেখবার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই প্রথম স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। খবরটা শুনে সবাই একটু আশ্চর্য হবেন বৈকি। এতদিন তাহলে কি স্কুল পরিদর্শনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না? ছিল, তবে সেটা নমো নমো ভাবে সারত সরকারী শিক্ষা বিভাগ জেলা স্কুল পরিদর্শকদের মারফৎ। কিন্তু এই পরিদর্শন লেখাপড়ার ওপর যতটা না ছিল তার চেয়ে বেশি এবং প্রধানত ছিল সরকারী অর্থ অনুদান, শিক্ষক নিয়োগ অনুমোদন ও অন্যান্য প্রশাসনিক ঝ ঝামেলা নিয়ে। তার ফলে স্কুলে মাস্টারমশাই ও দিদিমণিরা ঠিকমতো পড়াচ্ছেন কিনা, স্কুলের সিলেবাস বছরের শেষে বাকি থাকছে কিনা এসব নিয়ে খোঁজখবর করবার সময় তাঁরা পেতেন না। যেমন চলছে স্কুল তেমনি চলে আসছিল। শিক্ষকরাও নানাভাবে বঞ্চিত থাকায় সরকারের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করবার জন্যই আগ্রহী। স্মারকলিপি, আন্দোলন, অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদি লেগেই ছিল গত দুই দশক ধরে।

সুখের ও আশার কথা শিক্ষা নিয়ামকদের খানিকটা টনক নড়েছে। বহু বছর পর তাঁরা স্কুল পরিদর্শনে যাচ্ছেন। শিক্ষাব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য চলছে তার জন্য শুধু ছাত্রদের ওপর দোষ চাপিয়ে বসে থাকলে চলবে না। শিক্ষকরা তাঁদের কর্তব্য করছেন কিনা সেটাও যাচাই করে দেখা দরকার। সম্প্রতি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ব্যাপক ছাত্র ফেল দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, স্কুলগুলোতে ঠিকমত পড়াশোনা চলছে তো? ছাত্ররা উচ্ছৃংখল হয়ে গেছে কিংবা তারা নকলের ওপর ভরসা করে থাকে এটা হল আংশিক চিত্র। চিত্রের অন্যদিক হচ্ছে শিক্ষকসমাজের একটা অংশের গাফলতি শিক্ষাদানে অনুৎসাহ এবং অযোগ্যতা। ডিগ্রী থাকলেই শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষাকে আমাদের দেশে ব্রত বলা হয়। মনের তাগিদ না থাকলে এবং ছাত্রদের প্রতি মমতা ও ভালবাসা না থাকলে শুধু বিদ্যার গুণে বিদ্যাদান করা যায় না, আদর্শ শিক্ষকও হওয়া যায় না। শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা যা আছে সেটাও শুধু কোনোরকমে একটা ডিগ্রী অর্জন করবার জন্য। ডিগ্রী না থাকলে চাকরিতে উন্নতি হয় না, মাইনে বাড়ে না, তাই ডিগ্রীর জন্য এত কাড়াকাড়ি। প্রকৃত শিক্ষক নিজেকে প্রতিনিয়ত ছাত্রের অনুসন্ধিৎসায় যোগ্যতর করে তুলবেন। জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, নিত্যনতুন সিলেবাস হচ্ছে, কিন্তু তার সংগে সমান তালে চলার আগ্রহ কি শিক্ষকসমাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে? গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং একটা আহত মর্যাদা নিয়ে শিক্ষকদের একটা প্রধান অংশ জীবিকার দায় নিষ্পন্ন করছেন।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই কমবেশি একই চিত্র। শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি এবং সেই দলাদলিতে ছাত্রদের টেনে আনার ঘটনাও হামেশাই দেখা যায়। পড়াশোনা এই আবহাওয়ায় কিভাবে ভাল হতে পারে? ছাত্ররা তাদের সামনে যদি আদর্শ শিক্ষক পেত তাহ'লে ছাত্র বিক্ষোভ এমনভাবে বিপথগামী হতে পারত না। শিক্ষারও আজ এই হাল হত না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, শিক্ষকদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করতে। শিক্ষকদের জন্য নতুন বেতনক্রম চালু হবার সংগে সংগে শিক্ষকরা যাতে এই আচরণবিধি মেনে চলেন তা দেখতে হবে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকরা অবশ্য বঞ্চিত হয়ে আসছেন দীর্ঘদিন। তাঁরা সরকারের কাছে সে কারণেই একটা ভদ্রগোছের বেতন দাবি করে আসছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজ শিক্ষকদের সংগে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদেরও বেতন হার সংশোধন করেছেন। শিক্ষকদের তাঁরা ন্যায্য মাইনে দিন। এবং শিক্ষকরাও তাঁদের যথাসাধ্য শক্তি ও মেধা প্রয়োগ করে আমাদের স্কুল-কলেজগুলোকে আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করুন। শিক্ষাকে এভাবে তলিয়ে যেতে দেওয়া যায় না।

ফণিভূষণ আচার্য

ওর চোখের সামনে শুধু একটা আগুনের গোলা হুশ করে নেমে এসেছিল। তাছাড়া আদুরীর আর কিছু মনে নেই। এক পলকে কী যে ঘটে গেল, তা বুঝে ওঠার আগেই তার অনুভূতিগুলো হঠাৎ ঝিম মেরে গেল। খিড়কির পুকুরটা যেমন ছিল, তেমনি আছে, তাতে একটা জলঢোঁড়া সাঁতার কাটছিল, সেও তেমনি সাঁতার কাটছে। গড়ানে ঘাটের কাছের তালতাগাছের পাতায় একফোঁটা-দুফোঁটা বৃষ্টি টুপটুপ করে পড়ছে, করমচার ঝাড়, তার পাশে অহঙ্কারী তালগাছটা, ওর পাতায় বাবুইয়ের বাসা, নিচে শ্রীমন্ত—সব ঠিক আছে, ঠিক আগে যেমনটি ছিল। কিন্তু এক পলকে সব কেমন যেন বদলে গেল। টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আদুরীর অনুভূতিতে আর কিছু আসছে না। বাতাসে কেমন একটা গন্ধ—প্রথম বৃষ্টিতে পৃথিবীর গায়ের তাপের সঙ্গে বারুদের গন্ধের একটা মাখামাখি—শুকনো শিলনোড়া কিছুক্ষণ ঘষলে কিংবা হাতে দু টুকরো পাথর নিয়ে বগড়ালে যেমন গন্ধ হাওয়ায় ভেসে ওঠে, ঠিক তেমনি।

আদুরী কিছু ঠাহর করতে পারছে না।

পুকুরের কোণে জলঘাসের আড়াল থেকে একটা ডাহুক ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তালগাছের পেছন দিকের ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে অনেকগুলো ডাহুক ওর ডাকে সাড়া দিল। কিছুক্ষণ চললো সেই ডাকহাঁক—তারপর সব চুপ।

আদুরীর গায়ে কাঁটা দিল। কেমন ভয় করছে ওর। একটু আগে আক আলো ছিল। দেখতে দেখতে সেই আ ঝিমিয়ে আসছিল। সারাদিন বাঁশগা পাতাগুলো পালকের মতো হাওয়ায় ঝা মারছিল, ওগুলোও হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়ে এখন শ্রীমন্ত যদি আসে, সে তার পা শব্দ শুনে বলে দিতে পারবে, শ্রীম আসছে। শ্রীমন্তর পায়ের শব্দ ওর চ এমন অহঙ্কারী পায়ের শব্দ এ গাঁয়ের কারো নয়। সবাই বলে, শ্রীমন্ত হাঁটে ঠিক মিলিটারি। গত যুদ্ধের সময় গাঁ শেষ সীমানায় একটা মিলিটারি ছা পড়েছিল। ছেলেবুড়ো সবাই ওদের চলাফে হাঁ করে চেয়ে দেখতো। যুদ্ধের পর

[illegible] উঠিয়েছে [illegible] [illegible] শব্দ পায়।

[illegible] বসে [illegible] গেছে। আজ [illegible] আদরীর [illegible] কাজে মন ছিল না। [illegible] জিনিস হাত থেকে খসে পড়ে [illegible] মাটিতে। একটা কাচের গেলাস মাটিতে পড়ে ভেঙে গেছে, সহদেবের জন্যে [illegible] জলের ওপর উল্টে পড়েছে। [illegible] শাশুড়ী খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠেছে—আজায় কি ভাবলি?

আদরী মনে মনে হেসেছে। সে বুঝতে পারছে, ভুল হয়ে যাচ্ছে তার, হাতের মুঠোয় তার জোর নেই। কোনদিন এমন হয় না। [illegible] বছর সহদেবের সঙ্গে ঘর করছে সে। কোনদিন ঘরের কাজে তার এমন ভুল হয় না। মনে হয় আজ শ্রীমন্ত আসবে।

কিরণশশী দাওয়ায় বসে পাট কাটছিল। উঠোনে একেবারে চোখের সামনেই ওর [illegible] আমের ডালিগুলো রোদ্দুরে বুক চাতিয়ে পড়েছিল। ওদিকে খিড়কির পুকুর-পাড়ের শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাথায় কখন কাঠ-[illegible] রঙের মেঘেরা জট পাকাতে শুরু করেছে, কিরণশশী তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। উঠোনের রোদ্দুরের রং একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল, বুড়ির ঝাপসা চোখে তাও ধরা পড়েনি। বিকেল থেকে শুধু চারদিক কেমন যেন একটা গুমোট করে রেখেছিল, বাতাস নড়ছিল না একেবারে, আলাদা পাটের আঁশগুলো ধরে সহজেই ওর হাতের মুঠোয় ধরা পড়ছিল আজ। ঠিক তখনই গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠলো।

আদরী ঘরের ভেতর বাসনকোসনগুলো গুছিয়েগাছিয়ে রাখছিল প্রতিদিনের মতো। বুকের নিচে শব্দটা এসে আচমকা ধাক্কা দিল। দাওয়া থেকে কিরণশশীর ডাক ছুটে এলো—বউ, অ বউ—

—কি বলছো?

—আমের ডালিগুলো ঘরে তোল—

আদরী হাতের বাসনগুলো মাটিতে ফেলে রেখে উঠোনে শুকোতে দেওয়া আমের ডালিগুলো তুলে আনতে গেল। সে ভুরু কুঁচকে একবার আকাশে তাকালো। আকাশে রোদ্দুর ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে, মেঘ জমছে, বৃষ্টি আসবে, মনে হয়। যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে শ্রীমন্ত কি আজ আসবে না? বৃষ্টিতে (যদি বৃষ্টি জোর হয়) কি করেই বা সে আসবে? মনটার ওপরে আকাশের মেঘের ছায়া গড়িয়ে পড়ে।

—হাতদুটো তোর পরিষ্কার আছে তো বউ?

আদরী কিরণশশীর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—সাবধানে তুলিস। মাটিতে ফেলিস নে। তোর হাত লাগলেই যে সব আমার—

কিরণশশীর হাতের ছোঁয়া আর মুখের [illegible] সমানে চলতে থাকে। তাতেই ফাঁকে আদরী বুড়ির আমের ছিম, ডালিগুলো ঘরে [illegible] এবং তার একটু মুখে পুরে কিছুক্ষণ [illegible] ভেতর বাসনগুলো টুনটাং [illegible]।

[illegible] যে কিছুতেই আর [illegible] পারছিল না—যদি শ্রীমন্ত এসে ফিরে যায়!

খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই নিস্পলক পুকুরটা ওর চোখের ওপর আছড়িয়ে পড়লো। শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাথায় ওর মনের ভেতরটার মতো মেঘগুলো কেমন যেন ঘোর হয়ে উঠেছে। পুকুরের জলে আলো আছে তখনও—খুব মিহি ময়লা ন্যাপড়ের মতো একটা আলো। তালগাছের পাতায়, বাবুইয়ের বাসায় তখনো একটু আলো থমকে থেমে আছে। আসলে, বেলা আছে, কিন্তু ঘর-হয়ে-আসা শ্যাওড়ার জঙ্গলের দিকে একটু একটু করে দিন ফুরিয়ে আসছিল।

একজোড়া বেউলি শ্যাওড়ার জঙ্গলের দিক থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক খুব

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন

অদ্রীশ বর্ধন

ভয়ে ভয়ে তাকালো, তারপর পিলপিল করে ছুটতে ছুটতে তালগাছের পেছনে বুনো গাছগাছালির ঝোপের ভেতরে হঠাৎ ডুবে গেল।

আদরীর বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠলো একবার। ওটা থিতিয়ে আসবার আগেই একটা মানুষের পায়ের শব্দ ওর কানের পর্দার ওপর হিসহিস করে কাঁপতে লাগলো। সমস্ত গা-টা ওর কাঁটা দিয়ে উঠলো।

—ঠিক আসবো, তুই দেখিস; ঠিক সন্ধ্যেবেলা—

হঠাৎ শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাথার ওপর আকাশটা ওর দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালো। এখন শ্যাওড়ার জঙ্গলটাকে ওর কেমন যেন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে লাগছে। ওদিকে তাকাতে ওর গা-টা এখন ছমছম করে ওঠে।

পুকুরের কালো জলে একটা মানুষের ছায়া হিলহিল করে কেঁপে উঠলো। চালতার গাছের আড়াল থেকে সে বেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়ালো। মাথার ওপর ঝুঁকে-পড়া পাতাগুলোর আড়াল সরিয়ে লোকটার মুখটা দেখবার জন্যে ওর সমস্ত মন হানটান করছিল। আদরী দু-পা এগিয়ে গেল। পাতায় আড়াল সরে যেতেই সে মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে পিছিয়ে এলো। নাহ্ শ্রীমন্ত নয়, আদরীর ভাশুর—বাসুদেব; বোধহয় আকাশে মেঘ দেখে খুব দ্রুত কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে।

আদরী মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে জোরে একটা শ্বাস নিল। তারপর ইতিউতি তাকিয়ে নিজেকে চালতার গাছের নিচে ঝুঁকেপড়া পুরনো ছায়াটার মধ্যে গুটিয়ে আনলো। ঠিক তখনই তালগাছের নিচে বেউলিদুটো বেরিয়ে এসে আদরীকে সরা-সরি দেখতে পেয়ে হুড়মুড় করে [illegible] ঝাড়ের ভেতর নিজেদের সেঁধিয়ে দিল।

চারদিক এখন ভীষণ থমথম করছে। আদরীর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটাই এখন [illegible] ওর কানের পর্দার ওপর জোরে জোরে আছড়িয়ে পড়ছে।

শ্যাওড়ার জঙ্গলের মাথার ওপরে জোট-বাঁধা মেঘ একবার ওর দিকে দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচি কাটলো। আদরী ওদিকে তাকালো একবার। আকাশের মেঘগুলো ধীরে ধীরে চারদিকের সমস্ত আলো শুষে নিচ্ছে। এরপর সব কিছু খুব অস্পষ্ট হয়ে যাবে—ঠিক মতো কিছু চেনা যাবে না।

পুকুরের জলে মেঘের ছায়া ঘোর হয়ে উঠছিল। ওখানে আর একটা কালো মেঘ চুপিচুপি এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো, চারদিক তাকাতে লাগলো চোখ নামিয়ে। আদরী ঠিক তখনই ওর বুকের ভেতর একটা মাছের ঘাই মারার শব্দ শুনতে পেল।

আসলে শ্রীমন্তই। শ্রীমন্তর গায়ের রং কালো। মাজা চেহারা। মাথায় লম্বা চুল—ঘাড়ের ওপর টাল-খেয়ে-ওঠা। এই চেহারাটা আদরীর অনেকদিনের চেনা—যখন সে গায়ে শাড়ি জড়িয়ে পুরোপুরি মেয়েমানুষ হয়ে ওঠেনি, তারও অনেক আগে—তখনও গায়ের শাড়িটা সে ঠিকমতো পরতেও শেখেনি। তিনকুলে কেউ ছিল না শ্রীমন্তর। প্রায় বারো বছর বয়সে যখন ওর মা মারা যায়, বাপ গাঁ ছেড়ে কোথায় চলে গেল সেই থেকে শ্রীমন্ত একা। তখনও শ্রীমন্ত কিংবা আদরী কিছুই বুঝতে শেখেনি। একসাথে গাছে চড়ে আম পেড়ে ভাগাভাগি করে খেতে গিয়ে ওরা দুজনে কতদিন মারামারি করেছে রেল কালভার্টের নিচে মাছ ধরতে গিয়ে দুজনে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে ভূত সেজে যে যার ঘরে ফিরে এসেছে।

আদরী মেয়ের জাত বলে একটু আগে-ভাগেই বুঝতে শিখেছিল সব কিছু। তখনই সে বুঝে নিয়েছিল শ্রীমন্ত বড়ো একা। বড়ো মায়া হতো ওর ওপর। একদিন না দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন হানটান করতো ওর। কিন্তু শ্রীমন্তকে এসব বলতে গেলেই কিংবা ওকে একটু মায়ামমতা দেখাতে গেলেই হতো মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখমুখ পাকিয়ে মাটিতে অহংকারী পা ফেলে ও রেললাইনের দিকে উধাও হয়ে যেত। সারাদিন ওকে আর ধারেকাছে কোথাও দেখা যেত না।

আদরীদের ঘরের উঠান থেকে বেতের ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে নিশিন্দার বেড়া-দেওয়া শ্রীমন্তর কুঁড়েঘরটা দেখা যেত। আদরী যখন তখন উঠোনে নেমে ওদিকে তাকিয়ে দেখতো—দরজা বন্ধ। মনে মনে ভীষণ রাগ হতো ওর।

—অত দেমাক ভালো নয়।

নিজের মনে গজরাতে গজরাতে আদরী ঘরের ভেতর হারিয়ে যেত।

তার ঠিক কয়েক বছরের মধ্যেই আদরীর বাপ অবদাসপুরের [illegible] ঠিক-কুষ্ঠী সহদেবের সঙ্গে আদরীর বিয়ে দিয়ে পাশের গাঁ লোহাগুড়িতে পাঠিয়ে দিল। সহদেবের রোজগারপত্তর ভালো। বাড়িঘরপুকুর ইত্যাদি যা থাকলে গাঁয়ের মানুষের চলে যায়, সহ-

হৃদয়ে এখন ওর কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। হাত সরিয়ে এনে ওর মুখের দিকে অবোধ চোখে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কালো মসৃণ অহংকারী চেহারা, ঘাড়ের ওপর টাল-খেয়ে-পড়া একমাথা চুল, দুচোখে টানটান হাড়-পাঁজরে বুক—শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত? তুই সত্যি সত্যি আর বেঁচে নেই? সত্যি মারা গেছিস?

দিন চলে গেল, ঝাওড়ার জঙ্গল থেকে খুব সরে, হয়ে মাটিতে অন্ধকার ঝাঁপিয়ে নামছে। এখন শ্রীমন্তর দিকে তাকাতে আদুরীর ভয় করছে। আবার একটা আলোর রেখা ছিলহিল করে ওর চোখের সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেল। সেই তেজালো আলোয় সে মৃত শ্রীমন্তর ঝলসানো মুখটা খুব অনিচ্ছায় দেখে ফেলেছিল। আর সে ওখানে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলো না। আকাশের বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবার আগেই সে দু চোখে একরাশ অন্ধকার নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে খিড়কির দরজা ঠেলে ঘরের মেঝের ওপর হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো।

কিরণশশী হাতের ট্যারা তুলে রেখে মাজা সিধে করে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতর অন্ধকারে এসে কিছু দেখতে না পেয়ে চেরা গলায় জিজ্ঞেস করে—অ বউ, ধারে-কাছেই কোথাও পড়লো, না রে?

আদুরীর সারা গা কাঁপছিল। সে মাটি ধরে উঠে দাঁড়ালো।

অন্ধকারে কিরণশশী গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে—সহদেবের আসার সময় হয়েছে?

আদুরী এ কথারও কোন জবাব দিল না। কেন, সহদেব কখন আসে, বুড়ি জানে না?

—আকাশ গজরাচ্ছে দেখেও শাঁখটা বাজাতে পারছিস না তুই? কানে থিল এঁটে রেখেছিস নাকি, অ্যাঁ?

আদুরী ভুলে গিয়েছিল, মেঘ ডাকলে শাঁখ বাজাতে হয়: তাহলে রাগী আকাশ একটু শান্ত হয়। দেয়াল ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে আদুরী কুলুঙ্গি থেকে শাঁখটা পেড়ে আনে। শাঁখ হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ বাজাতে ভুল হয়ে যায়। খিড়কির পুকুরের পাড়ে তালগাছের নিচে শ্রীমন্ত একা দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো সে আজ সারা রাত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারারাত ভিজবে। আর সে ওর কাছে কিছুতেই যেতে পারবে না, কোনদিন যেতে পারবে না।

কিরণশশী রাগে গজরালো—বউ, শাঁখটা এখনো তুই বাজাতে পারলি না?

আদুরী এক ঝটকায় শাঁখটা তুলে এনে ঠোঁটের ওপর বসালো। ফুঁ দেবার জন্য জোরে একটা শ্বাস নিল। শাঁখ বাজালো না। তার আগেই কান্নায় ওর গলার ভেতরটা যেন একেবারে ছিঁড়ে পড়লো।

আবার আলো চমকালো। মেঘ ডাকলো। কিরণশশীও গজরালো খনখনে গলায়। আদুরী আর কিছুতেই শাঁখে ফুঁ দিতে পারলো না।

একটু পরেই আকাশ দাপিয়ে ওদের ঘরের চালের ওপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামলো। কিরণশশী শান্ত হলো—আকাশ আর ডাকবে না। বৃষ্টি নামলে আকাশের রাগ পড়ে যায়।

মাঝরাত্তিরে বৃষ্টি থামলে সহদেব তাড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরলো। এ অবস্থায় সে মুখে কিছু দেয় না। আজও দিল না। হাতড়াতে হাতড়াতে বিছানায় উঠে কাটান শুয়ে পড়লো।

আদুরীর চোখে ঘুম ছিল না। বুকটা সারাক্ষণ ঢিপঢিপ করছিল ওর। ঘরের ভেতর তাল-তাল অন্ধকার দেয়ালের পিঠ দিয়ে মাঝে মাঝে হিসহিস শব্দ করে উঠছিল। আদুরী দু হাতে চোখ চেপে কিছুক্ষণ বিছানার এক পাশে পড়ে রইলো। ওর দু চোখের ভেতরেও অন্ধকার জট পাকাচ্ছে, আর একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস ওর শিরার ভিতর দিয়ে হুহু করে বয়ে চলেছে।

সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সহদেবকে এ ব্যাপারে কিছু জানতে দেবে না। সে যদি জানতে পারে, জানতে সে পারবেই, নিজের থেকে জানুক। সহদেব পাশ ফিরে শুয়ে আছে, এভাবেই সে শুয়ে থাকুক। কিন্তু আদুরী আর পারলো না। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে সে ডাকলো—এই, শুনছিস—

সহদেবের সাড়া দিল না। আদুরী এবার ওর পিঠে হাত ছোঁয়ালো। সহদেবও শ্রীমন্তর মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে না তো? সে ওর পিঠে চিমটি কেটে দেখলো।

—এই—

—উঁ?

সহদেব বেঁচে আছে, আদুরী আশ্বস্ত হলো। কিন্তু ওকে আদুরী কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সহদেব জোরে একটা হাই তুললো।

—এদিকে ফের—

—কেন?

সহদেব ভারী বাবুরে, আর ফিরতে সময় লাগে। হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙে সে খুব অনিচ্ছায় ওর দিকে পাশ ফিরলো।

—কি?

—আমার কেমন ভয় করছে—

—কেন? কি হয়েছে?

—জানি না। আমার ভীষণ ভয় করছে আজ—

আদুরী অন্ধকারে সহদেবের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠলো। সহদেব কিছুই বুঝতে পারলো না, সে কান পেতে শুনলো, আকাশ নাক ফাটিয়ে মেঘ ডাকছে, আর ঘরের চালে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির শব্দে।

এই বাংলার খবর

পিছিয়ে পড়া জেলায় শিল্প

সাধারণ বিচারে পশ্চিম বাংলা শিল্পোন্নত বলেই গণ্য, কিন্তু সে-বিচারে একটা বড় রকমের ভুল থেকে যায়। গোটা রাজ্যকে শিল্পোন্নত বললে মোটেই ঠিক বলা হয় না। কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-বর্ধমান বাদ দিলে কল-কারখানার বিস্তার এ-রাজ্যে তেমন ঘটে নি। কয়েক বছর হলো, এই বৈষম্যের দিকে নজর পড়েছে এবং পিছিয়ে-পড়া নানা জেলায় নতুন কল-কারখানা বসাবার চেষ্টাও হচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ যে-বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, এই চেষ্টা এখন বেশ কিছুটা সফল হচ্ছে। পিছিয়ে-পড়া জেলাগুলোতে মোট ৫১টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। তার মধ্যে ১৭টি হলো নতুন শিল্প-প্রকল্প। মোট লগ্নীর অংক প্রায় ৯০ কোটি টাকা। এই সব প্রকল্পে কাজ পাবেন সাড়ে ছ হাজারের মতো লোক। উত্তর বাংলায় চা-বাগিচা ছাড়া যে তেমন কোনো শিল্প গড়ে ওঠে নি, এ-কথা শিল্পমন্ত্রী অস্বীকার করেন নি। এ-ব্যাপারে উত্তর বাংলার মানুষের ক্ষোভ অন্যায় নয়, এই তাঁর মত। উত্তর বাংলায় নতুন কল-কারখানা বসানোয় প্রধান বাধা বিদ্যুতের অভাব। সেই বাধা দূর করার জন্যে সরকার চেষ্টা করবেন।

পশ্চিম বাংলায় সাধারণভাবে শিল্পে লগ্নীর অবস্থার বেশ উন্নতি দেখা দিতে সুরু করেছে। আগে যে-সব প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে তা ছাড়া আরো অনেক প্রকল্প এখন রূপায়ণের পথে। ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে রাজ্যে যে-সব কোম্পানি রেজিস্টার্ড হয়েছে তার মোট অনুমোদিত মূলধনের অংক ৪৮৭ কোটি টাকা। তার আগের পাঁচ বছরে এই অংক ছিল মাত্র ১২৮ কোটি টাকা।

অর্থকষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সংকটের কথা এখন সকলেই জানেন। সবচেয়ে যে বড়—শুধু রাজ্যের নয়, গোটা দেশের—অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাই তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, এই হলো উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেনের মত। তিনি এমন অভিযোগও করেছেন যে, রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়ও কলকাতা উপেক্ষিত। সে যাই হোক, উনিশ-বিশ ফারাক হলেও অবস্থা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভালো নয়। তাই এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে রাজ্যপাল ডায়াস উপাচার্যদের এক বৈঠক ডেকেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীও হাজির থাকবেন ঐ বৈঠকে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে যে-কথা জানিয়েছেন [illegible] করা নি। কমিশন আগামী পঞ্চম পাঁচসালা যোজনাকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে মোট তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর মধ্যে এক কোটি টাকা বাড়ি তৈরি এবং বাকি দু' কোটি টাকা বইপত্র, গবেষণাগারের সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি কেনার জন্যে খরচ করা চলবে। কিন্তু কমিশন একটা শর্ত দিয়েছেন। সেটি [illegible] কমিশন যে-পরিমাণ টাকা [illegible] টাকা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

পাস-ফেল

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময় কেলেংকারির কোনো অভাব হয় নি। এখন ফল প্রকাশের পরে দেখা গেল, পাস-ফেলের হার কত একটা কেলেংকারির পর্যায়ে যেতে পারে। এক লাখ মধ্যে ষাটজনের বেশিই অকৃতকার্যের দলে। গত বছর এই হার ছিল কম, শতকরা ৫৩ জনের মতো। অকৃতকার্যের হারটাই উল্লেখ করা হলো, তার কারণ তাতে অবস্থাটা বুঝতে সুবিধে হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মতে ব্যাপকহারে ফেলের কারণ, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। প্রায় প্রতি তিনজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দু'জনই প্রাইভেট। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেখানে এক লাখ ৯৭ হাজারের কাছাকাছি, সেখানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৬৮ হাজারের মতো। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে একশ'জনে মাত্র ৩৬ জন। তাই সব মিলিয়ে পাসের হার এত কমে গেছে। তবু এটাকেও বোধহয় পুরো ব্যাখ্যা বলা যায় না। কারণ দেখা যাচ্ছে, কৃতকার্যদের মধ্যে মাত্র ১৫৭ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ৫৯০৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে। আর বাকি সকলেই হয় তৃতীয় বিভাগে, অথবা শুধুই পাস। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা কেন এমন ব্যাপকহারে অকৃতকার্য হচ্ছে সে-বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ। এ-বছর স্কুল ফাইনালে প্রথম দশটি স্থান কারা পেয়েছে তা এখনও জানানো হয় নি। কারণ প্রথম ২৫ জনের খাতা আবার পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আরো সুন্দর দার্জিলিং

এই বাংলায় পর্যটকদের কাছে সেরা আকর্ষণ দার্জিলিং। সেই দার্জিলিং যাতে আরো বেশি আকর্ষক হয়ে ওঠে তার জন্যে রাজ্য সরকার চেষ্টা শুরু করেছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দার্জিলিং যেতে বিদেশীদের বিশেষ অনুমতি লাগতো। সেটা ছিল পর্যটকের সংখ্যাবৃদ্ধির পথে একটা বড় বাধা। কয়েক মাস আগে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় এই বাধা দূর হয়েছে। এখন দার্জিলিংকে এবং তার আশপাশে পর্যটকদের আকর্ষণের জন্যে নতুন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। প্রথম দরকার অবশ্যই পর্যটকদের থাকার জায়গা। তাই সরকারি ট্যুরিস্ট লজগুলো সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। তা ছাড়া তৈরি হচ্ছে একটি ইয়ুথ হস্টেল। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এটি তৈরি হচ্ছে। পুজোর আগেই এটি চালু হয়ে যাবে মনে হয়। অন্যান্য লজ বা হোটেলের তুলনায় এখানে থাকতে খরচ হবে কম। টাইগার হিলে গিয়ে সূর্যোদয় দেখা পর্যটকদের একটা অবশ্যকর্তব্য। টাইগার হিলের অবজারভেশন প্যাভিলিয়নটি এখন সরকারই দেখাশোনা করছেন। এটির নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। টাইগার হিল ট্যুরিস্ট লজটিতেও এখন আরামের আরো বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কর্মসূচী হলো নেপাল সীমান্তে মিরিক হিলসে একটি লেক তৈরির প্রকল্প। ৮০ লাখ টাকা খরচ হবে এর জন্য। সেচ দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতায় লেক তৈরির কাজ সুরু হয়ে গেছে। আসছে বছর মার্চ থেকে পর্যটকরা সেখানে যেতে পারবেন বলে আশা করা যায়। লেকে নৌকা চালাবারও ব্যবস্থা থাকবে।

ভারত মেক্সিকো সম্পর্ক

ল্যাটিন আমেরিকা নামে পরিচিত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যে অল্প কয়েকটি দেশে দীর্ঘকাল ধরে স্থিতিশীল সরকারের সুশৃঙ্খল শাসন চলছে মেকসিকো তাদের অন্যতম। ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের মত মেকসিকো থেকে যখন-তখন অভ্যুত্থান ও প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাত হওয়ার খবর আসে না। এক সময়ে যুদ্ধ, রক্তপাত, রাজনৈতিক হত্যা ইত্যাদি এই দেশের উপর দিয়ে কম যায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শক্তিশালী প্রতিবেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার অর্ধেক এলাকা খোয়াতে হয়েছে। কিন্তু ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গৃহীত যে সংবিধান অনুসারে সেদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সংবিধান ল্যাটিন আমেরিকার এই তৃতীয় বৃহত্তম দেশকে এমন একটা স্থায়িত্ব দিয়েছে যেটা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে দুর্লভ বলা চলে।

শুধু সরকারের স্থায়িত্বের জন্যই নয় জনকল্যাণমূলক নীতি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যও মেকসিকো অন্যান্য দেশের নজরে এসেছে। যদিও সেদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত রয়েছে, তাহলেও গত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ সেখানে প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে আছে একটি দল, স্প্যানিশ ভাষায় যার নাম 'পার্তিদো রেভলিউশনারিও ইনস্টিটিউশনাল' (সংক্ষেপে পি আর আই) ইংরাজিতে বলা হয় ইনস্টিট্যুশনাল রেভলিউশনারী পার্টি। এই দল একটা প্রগতিশীল নীতিতে দেশের শাসন চালিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহসংস্থান, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি দিক থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের সাফল্যের একটি বড় প্রমাণ হল, ১৯৪০ সালে মেকসিকোবাসীদের গড় আয়ু যেখানে মাত্র ৩৯ বছর ছিল সেখানে ১৯৬৮ সালে গড় আয়ু দাঁড়িয়েছে ৬৭ বছর।

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে লুই একেভেরিয়া আলভারেজ মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তাঁর [illegible] মেকসিকো বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইস্পাত, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে সে যেমন একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর তার অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে তেমনি সে বিশ্বের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপন করে নিজেকে আমেরিকার রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ১৯৭৩ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়া ক্যানাডা, বৃটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন সফর করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মেকসিকোর স্থান সুচিহ্নিত করে নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়ার এই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রয়াসের দুটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। এক, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে একটি সনদ পাশ করাবার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। এই সনদে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি উন্নত দেশগুলির কর্তব্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে। দুই, ল্যাটিন আমেরিকাকে পারমাণবিক বোমা থেকে মুক্ত রাখা হবে বলে একটা আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়া সংশ্লিষ্ট সব দেশকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এরকম একটা দেশের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। দুই দেশই দরিদ্র, ঔপনিবেশিক শোষণে দীর্ঘকাল ধরে জর্জরিত এবং এখন বৃহৎ শক্তির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একটা বিকাশশীল আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। মেকসিকোর আয়তন ভারতের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম এবং তার লোকসংখ্যা ভারতের এক-দশমাংশেরও কম। দুই দেশের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধানও অনেক। কিন্তু উভয় দেশের সমস্যা ও সেসব সমস্যা সমাধানের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দুই দেশের ভিতর অনেক মিলও আছে। ভারতের মত মেকসিকোও দরিদ্র দেশ এবং সেই দারিদ্র্য সবচেয়ে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে গ্রামের ভিতর। আমাদের মত মেকসিকোকেও তাই গ্রাম ও কৃষির সমস্যার উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। সেদেশে এক ধরনের যৌথ খামার আগে থেকেই ছিল। অন্যদিকে ছিল বড় বড় জমিদারদের বিরাট বিরাট খামার। ঐ সব বড় বড় খামার রাষ্ট্রায়ত্ত করে প্রায় ১৬ কোটি একর জমি ঐ সব যৌথ খামারের মধ্য দিয়ে কৃষকদের বিলি করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্ত রাখার জন্য ১৯৭৩ সালের আগষ্ট মাসে যে ১৬ দফা কর্মসূচী তাঁরা গ্রহণ করেছেন তার অনেক আমাদের মুদ্রাস্ফীতি-নিবারণ কর্মসূচীর অনেকখানি মিল আছে। কৃষির ফলন বাড়াবার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেঁটে জাতের যে সংকর গম তৈরী করে কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ নরম্যান বোরলগ তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন সেই গম এই মেকসিকোতেই প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল।) গ্রামে গ্রামে পাঁচ হাজার দোকান খুলে নিত্যব্যবহার্য জিনিস যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন মেকসিকো সরকার। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন বিদেশী মূলধন ও বিদেশের কারিগরী জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বিদেশী পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে দেশের অর্থনীতিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার সমস্যা নিয়ে মেকসিকোর সরকার আমাদের সরকারের মতই বিব্রত। সেদেশেও শিল্পের ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে।

মেকসিকোর সঙ্গে ভারতের আত্মীয়তার আর একটি প্রায়-বিস্মৃত সূত্র নিহিত রয়েছে দুই দেশের অতীত ইতিহাসের মধ্যে। স্পেনীয়রা মেকসিকোতে আসার আগে সেখানে যে মায়া সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল তার সঙ্গে সেকালের ভারতীয় সভ্যতার মিল অত্যন্ত লক্ষণীয় এবং মায়াদের তৈরী নগরী ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে আজও সেই সব সাদৃশ্যের লক্ষণ চোখে পড়ে। অনুমান করা হয় যে, সেকালে ভারতীয় নাবিকরা হয়তো সমুদ্র পার হয়ে ঐ অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

৫৩ বৎসর বয়স্ক প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়া সস্ত্রীক ভারত সফর করে গিয়ে দুই দেশের মধ্যে এই বন্ধন আর একটুখানি ঘনিষ্ঠতর করে দিয়ে গেলেন। ১৯৬৮ সালে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে সফর করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর ঐ দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের যে সূত্রটি তৈরী করে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট একেভেরিয়ার এই সফরের মধ্য দিয়ে সেই সূত্রটি আরও দৃঢ় হল। গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই দুই রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক চিন্তায় যে সাদৃশ্য আছে এবং বিকাশশীল দেশ হিসাবে তাদের উভয়ের সমস্যাগুলি ও সেগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে তারা যে পরস্পরের কত কাছাকাছি তা এই সফরের মধ্য দিয়ে আর একবার প্রমাণিত হল।

পুণ্ডরীক

২৫-৭-৭৫

ফাদার দ্যতিয়েন
রোজনামচা

ধীরেনবাবুর অবশ্য সচ্ছল ব্যবসা আছে, কর্মশালা, ক্ষুদ্র হলেও সমৃদ্ধিশালী। এই সেই দিন ভদ্রলোক ক্যাস মেমো-র মাথায় ছাপিয়েছেন : 'ধীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক অ্যান্ড সন্স, যাবতীয় লোহার সামগ্রী।' যাবতীয় বলতে বালতি—আর বালতি-গোছের চুলো।

ধীরেনবাবুর ইচ্ছা ছিল না, তাঁর ছেলেকে তিনি তাঁর উন্নীয়মান কারবারের অংশীদার করেন। তাঁর আত্মজের জন্য তাঁর স্বপ্ন ছিল আকাশচুম্বী। ধীরেনবাবুর চোদ্দ পুরুষ, বর্ণভেদের সৃষ্টি কর্তার আশীর্বাদে বংশপরম্পরায় ক্ষৌরকার। চুল কাটতেন, দাড়ি কাটতেন, আঁতুড় ঘরে নখ কাটতেন, বিবাহ বাসরে ছড়া কাটতেন...। কাটতেন না কাটত। ধীরেনবাবু নিজের বংশের প্রথম 'বাবু' তাঁর বাবা কালী পরামানিক ঠাকুরদা শম্ভু পরামানিক প্রপিতামহ শংকর নাপিত, ওরফে শংকু পাগলা। ধীরেনবাবু নিজের বংশের প্রথম সাক্ষর। পাঠশালায় পড়েছেন, বৃত্তির পরীক্ষায় ফেল করেছেন; যোগ আর বিয়োগ তিনি পারেন, গুণে-ভাগে তাঁর গুলিয়ে যায়। বিলেতি বর্ণমালার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক্ষীণ, তবে প্রয়োজন হলে ইংরেজিতেও তিনি সই করেন।

ধীরেনবাবুর ছেলের নাম অশোক—কিম্বা খোকন, কিম্বা নেড়ু। আজকাল অবশ্য ঠাকুরমা ছাড়া নেড়ু সম্বোধনটা কেউ বড় একটা ব্যবহার করে না। ডাক-নামটার এক ইতিহাস আছে। অশোক তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। উকুনের আক্রমণ থেকে ওকে বাঁচানোর অভিপ্রায়ে কালী পরামানিক নাতির কেশমুণ্ডন করেছিল। সহপাঠীরা, এমন কি সহপাঠিনীরাও, ছেলেটিকে এত টিটকিরি মেরেছিল যে দু-সপ্তাহে সে স্কুলের চৌকাঠ মাড়াতে রাজি হয় নি। অভ্রংলিহ স্বপ্নের ভূলুণ্ঠনের সম্ভাবনায় উদ্বেলিত হয়ে ধীরেনবাবু এক হাত-ঘড়ির উৎকোচ-দানে আত্মজের অধ্যয়নোদ্যম [illegible] জাগালেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বংশানুক্রমে-অনভ্যস্ত মস্তিষ্ক-কোষ চালিত করে বিদ্যান্বেষণে মন দিল অশোক। পর পর দু' বছর ফেল, তৃতীয় বছরে গ্রেস-মার্কসের কল্যাণে ক্লাসে ওঠা—এইভাবেই চলে তার স্কুল-জীবন। পরিশ্রমান্তে দু-দু'বার অনুত্তীর্ণ হয়ে ম্যাট্রিকের পরীক্ষায় সফল হয়; তখন শুধু গোঁফের কেন, দাড়িরও দেখা দিয়েছে রীতিমতো ঘনঘটা।

সার্টিফিকেটটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে লম্বোদর গজানন বিনায়কের পাদপ্রান্তে ঝুলিয়ে অশোকের শুভানুধ্যায়ী গৃহশিক্ষকের পরামর্শ অমান্য করে ধীরেনবাবু কলেজের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। ছেলেটি কিন্তু পিতৃদেবের গগনস্পর্শী স্বপ্নতরুকে নির্মম কোপে ছেদন করে সাড়ম্বর ও দ্ব্যর্থকতাহীন-ভাবে ঘোষণা করল : বীণাপাণির সেবা এখানেই ইতি। ধীরেনবাবু বললেন, 'পাশ করতে বলছি না, শুধু ভর্তি হও...' অশোক বলল, 'না।' ধীরেনবাবু বললেন, 'তোমাকে একটা ট্রানজিস্টার কিনে দেব... কিম্বা সাইকেল।' অশোক বলল, 'না।'

সেদিন থেকে অশোক হল পিতৃদেবের যাবতীয় লোহার সামগ্রীর কারখানায় সক্রিয় ও সম্মানিত পার্টনার। সেদিন থেকে পানওয়ালা মহাদেব অশোককে যে জন্মাবধি দেখছে, ধীরেন্দ্রনন্দনকে অশোকবাবু বলে সম্বোধন করতে শুরু করল। সেদিন থেকে টেঁপীর মা, যার স্বামী বাধ্য দাস উপনয়নার্থীদের মুণ্ডিতকেশনে, প্রসূতিদের নখকর্তনে অশৌচান্ত ক্ষৌর কার্যে ঈর্ষণীয়ভাবে উপার্জনশীল অশোকের মায়ের কর্ণকুহরে আত্মজার গুণগান গাইতে লাগল। অশোকের মা অবশ্য অনেক দিন থেকেই রাখাল মান্নার পৌত্রী সুস্মিতার দিকে পক্ষপাতগ্রস্ত দৃষ্টিপাত করে এসেছেন। রাখাল মান্নার জমি আছে বিঘে দশেক, আর এছাড়া তো মুসলমান পাড়ায় কোনো সালিশ হলে ওর উপস্থিতি এক রকম অনিবার্য; বিজ্ঞের পাখা দুলিয়ে স্ফীত পকেটে বাড়ি ফিরে যায়।

টেঁপীর কিম্বা মিতার (অর্থাৎ সুস্মিতার) প্রসঙ্গ উঠলে, কথাটা উড়িয়ে দিয়ে অশোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে, বলে, 'বিয়ে আর ব্যবসা হল যেন জল আর তেল—মেশে না।'

বাড়ি থেকে কর্মশালায় যাওয়ার পথে এক ধ্বস্তপ্রায় বাড়ির উঠোনে, এক বুড়ো বটের কৃপণ ছায়ায় এক জলের কল আছে। ধ্বস্তপ্রায় বাড়িটার দোতলায় ভটচাজ বৌয়ের আস্তানা। ভটচাজ বৌ আসলে আর বৌ নন : গত আশ্বিন মাস থেকে তিনি বিধবা। ভটচাজ বৌয়ের মেজো মেয়ের ডাকনাম মঞ্জু। নামটি সুন্দর, আর মেয়েটিও সুন্দরী। বিচারটা আমার নয়, অশোকের। মঞ্জুর আসল নাম অশোক জানে না, জানতে চায় না, বানাতে ভালোবাসে : মঞ্জরি, মঞ্জুষা, মঞ্জিমা, মঞ্জুলিকা...।

ঘড়িতে নটা বাজলেই অশোক বেরোয়। নটা চারে ধ্বস্তপ্রায় বাড়ির পাশ দিয়ে যায়। একেক দিন সে দেখে, কলসি কাঁখে করে মেয়েটি জল তুলতে এসেছে। তখন মন্দীকৃত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে সে—কিম্বা থামে জুতোর ফিতে অহেতুক বাঁধে, জামার ধুলো অহেতুক ঝাড়ে, মাথার চুল অহেতুক আঁচড়ায়...এবং সেই অবকাশে দেখে, পিপাসু দৃষ্টিতে দেখে, অসতর্ক নায়িকার দেহ গড়ন ও লাবণ্য : সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে হৃদয়ঙ্গম করে স্কুল জীবনে শেখা রমণী দেহ কান্তিবর্ণনাত্মক অলঙ্কারের যথার্থতা : কমললোচনা, রম্ভোরু, হরিণাক্ষী, গজগামিনী...

মুশকিল এই যে মঞ্জুদের আর অশোকের ঘড়ি, মনে হয়, একতালে চলে না। কতবার মেয়েটিকে দেখতে না পেয়ে, কলতলায় গিয়েছে অশোক, মুখ ধুয়েছে ধীরে ধীরে, কালনাশের অভিপ্রায়ে...কিম্বা পানের দোকানে বিড়ি কিনেছে, ধ্বস্তপ্রায় বাড়িটার দোতলার জানালার দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকিয়ে। কতবার, নব নব কৌশলের উদ্ভাবনে ব্যর্থমনোরথ হয়ে, দীর্ঘায়িত প্রতীক্ষাকে সন্দেহজনক বুঝে, কর্মশালার অভিমুখে পা বাড়িয়েছে, রাস্তার মোড়ে শেষ বারের মতো মুখ ফিরিয়ে নৈরাশ্যব্যঞ্জক নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে বুঝিয়েছে : আর কি হবে, [illegible]

[illegible] কিভাবে [illegible]

[illegible] ...খানিকতলার পোল...। পাবকের অবশ্য এক সাইকেল আছে। সেদিন মঞ্জুর অদর্শনে মনঃক্ষুণ্ণ অশোক নিজের আন্তর সমস্যা বাৎলিয়ে পাবকের সহানুভূতি ও পরামর্শদান ভিক্ষা করে। অশোকের মানসিক বৈকল্যের নিদান বুঝে পাবক ওকে সক্রিয় ও নির্ভীক পন্থাকে অবলম্বন করতে বলে, বোঝায় যে বসুন্ধরা নিতান্তই বীরভোগ্যা। ফীজ হিসেবে সে নেয় এক ভাঁড় দই আর গোটা দুই দরবেশ।

পরের দিন মঞ্জুকে একলা পেয়ে অশোক বলল আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি কি? মুখ না তুলেই মেয়েটি বলল, 'অজানা ছেলের সঙ্গে আমি কথা বলি না।'

পাবক-প্রস্তাবিত দুঃসাহসিক পদ্ধতি অবলম্বনের এই অপ্রত্যাশিত পরিণামে মর্মাহত, হতমান অশোক সারাদিন কর্মশালায় প্রতিশোধস্বরূপ আত্মহননের পরিকল্পনা ভাঁজতে থাকল : পরের দিন, কিম্বা—সেদিন বৃষ্টি হলে—পরের দিনের পরের দিন 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়...ভটচাজ-গিন্নীর মেজো মেয়ে ছাড়া' ধরনের এক চিরকুট প্যান্টের পকেটে পুরে ঐ কলতলায় দাঁড়িয়ে পাষাণহৃদয়ার সামনেই অবজ্ঞাত প্রণয়ী হারাকিরি করবে!... ধীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক অ্যান্ড সন্‌-এর কারখানায় ধারালো যন্ত্রপাতির অভাব নেই।

পর পর তিন দিন বৃষ্টি পড়ল, অনবরত মুষলধারায়। অশোক কারখানায় গেল না। ঘরে বসে আত্মহত্যার নতুন নতুন কায়দা উদ্ভাবন করতে থাকল। তৃতীয় দিনে মায়ের মুখরোচক খিচুড়ি পরিপাক করতে করতে সে হঠাৎ বুঝল বসুন্ধরায় এত উৎকৃষ্ট উপভোগ্য সামগ্রী থাকতে শুধুমাত্র এক বরমুখীর অসভ্যতার জন্যে উদরচ্ছেদ করে নিজেকে বঞ্চিত করার কোনো মানে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, মেয়েটির আসা-যাওয়া কত মিষ্টি, ময়নাগড়ের কত মিষ্টি মাসিকাব্দের কত মিষ্টি... সবেরই প্রতিটি অক্ষরই মধুময়। শুধু রসনা ছাড়া। এবার মনে, কৌলীন্যের দেহাবয়ব কমনীয় যার, সর্বাঙ্গীণ শান্তি কি তার প্রাপ্তব্য? মঞ্জুর রসনা-ই একমাত্র যখন অপরাধী তখন অশোকের অপাপবিদ্ধ মেয়েটির হৃদয়যুগকে দণ্ডিত করায়, হৃৎযন্ত্রকে বিগড়িয়ে দেওয়ায়, শিরাগুলি জাগিয়ে তোলায়, প্রয়োজনটা কি? [illegible]

[illegible] থাকুক।

[illegible] অশোক [illegible] স্বামী থেকে [illegible] কল্যা মাধুরী [illegible] করেন। অশোকের পরিবারের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওর ঠাকুরদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ঘটে এক বাঁধুর বৌবাজারে : শঙ্কর সেদিন কলের বাড়ি থেকে মাথায় করে জালা-ভর্তি জল নিয়ে এসেছিল।

অশোকের সমস্যাটা শুনে (সমস্যার শ্রবণই তার অর্ধ সমাধান) কলকাতার নাগরিক-সংখ্যার প্রতি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝালাম যে, উক্ত নাগরিক-সংখ্যা থেকে যাবতীয় অনধিকারী পুরুষ ও সধবাকে বাদ দিলেও অশোকের সম্ভাব্য প্রণয়িনীর সংখ্যা কোনো মতেই নৈরাশ্য-জনক নয়। আরও বোঝালাম যে অপ্রতিভ মেয়েটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যে-বিশেষণটা ব্যবহার করেছে, সেটা বোধহয় অশোকের প্রতি তার সঠিক মনোভাবের যথাযথ বহিঃপ্রকাশ নয়। ছেলেটিকে পরামর্শ দিলাম এক মাস ধরে ঘুর পথে—অর্থাৎ বটতলার ছায়াচ্ছন্ন জলকল ও ধন্বন্তরীর বাড়িটার দর্শন এড়িয়ে—কর্মশালায় যাওয়ার। সেগুন কাঠে নির্মিত না হলে মেয়েটি অশোকের এই দীর্ঘায়িত অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে অনুদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে পারবে না; বান্ধবী-দের কাছে তার স্বতঃস্ফূর্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে সে বাধ্য...

এক সপ্তাহ যেতে না যেতে পাবকের ছোট বোন জানাল যে, মঞ্জুদের বাড়িতে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে সে লক্ষ করেছে অশোকের প্রসঙ্গ উঠলেই মেয়েটি কৌতূহল প্রকাশ করে, আর শুধু তাই নয়, কৌতূহলটা সে কৌশলী চাতুর্যে প্রচ্ছন্ন রাখার অপটু চেষ্টা করে।

কালক্রমে অশোক মঞ্জুর হৃদয়েশ্বর হয়ে ওঠে। ভটচাজের বৌ ছেলেটিকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান, মঞ্জুর দস্যি ভাইটি মেজদিকে জ্বালাতে ছাড়ে না। 'অশোকবাবু, জামাইবাবু...।'

একদিন ভটচাজের বৌ সদ্য-কাচা একটা থান পরে অশোকদের বাড়িতে গিয়ে অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে সতর্কভাবে প্রস্তাবটা পাড়লেন। সকলেন উনি তো উদারচেতা ছিলেন খুব, জাত মোটেই মানতেন না: [illegible]

[illegible] টাকা নেই, তবে [illegible] আছে দশ কাঠা জমি...আপনারা যদি রাজি হন...'

ধীরেনবাবু কালা নন, আর তাঁর গিন্নীরও চোখ আছে। বেশ কিছুদিন থেকেই তাঁরা বুঝেছেন, টেপী আর মিত্তা যা পারে নি, পেরেছে মঞ্জু : অশোকের মাথাটি লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভটচাজের বৌয়ের নম্র ব্যবহার দেখে—এবং ওঁর মুখে তাঁর আত্মজের প্রশংসা শুনে—ধীরেনবাবু মুগ্ধ হলেন : কোনোদিনই তিনি ভাবেন নি সেই বাড়ি থেকে প্রস্তাব আসতে পারে। এদিকে এটাও তিনি জানেন, কোনো মতেই ঐ বিয়েতে তিনি সম্মতি দেবেন না। জাতের অভিমান তাঁর নেই, তবে জাতে তিনি বিশ্বাসী : বংশানুগত বৃত্তি তিনি ত্যাগ করতে পারেন, ছেলেকেও ত্যাগ করতে বলতে পারেন রক্তের সংমিশ্রণ কিন্তু তাঁদের দ্বারা সম্ভব হবে না। যে রক্ত তাঁর পিতার কাছে তিনি পেয়েছেন, তাঁর পৌত্রকে তিনি তা-ই দান করে দেবেন। টেপী কিম্বা মিত্তা না হোক, আপন জাতের বাইরে কোনো বৌকে তিনি ঘরে আনবেন না।

ভদ্রলোক একটু থামলেন, তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অশোক অবশ্য সাবালক। ওর স্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করব না। সমাজ ও পৈতৃক আদেশ ও যদি মানতে রাজি না হয়, তবে বাড়ি ও কর্মশালার অংশীদারি ত্যাগ করে জনকের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যে-কোনো সঙ্গিনীর সঙ্গে আপোষে কোনো ভিটেয় গিয়ে সংসার পাততে পারে...'

ছ' মাস পরে অশোকের বৌভাতে নিমন্ত্রিত হয়ে টেপীর হাতে এক বাইবেল উপহার দিতে গিয়েছিলাম। ঘরে ফিরে শুনলাম, ভটচাজের বৌ খবর পাঠিয়েছেন ও বাড়ি থেকে বলেছেন : মঞ্জুর নাকি এখন-তখন অবস্থা। না হারাকিরি নয়, বিষই খেয়েছে [illegible] [illegible] পিল।

(ক্রমশ)

অসুস্থতা ॥ তরুণ সান্যাল

অসুস্থতা, ঘন বনে বৃষ্টি পড়ে, অরণ্য ছনালো ঘনমেঘ,
কী সবুজ কী কোমল, অথচ হিংস্র তীব্র লোলিহান পাতায় উদ্যত,
চিত্রপরম্পরা বয়ে বৃষ্টি পড়ে ঝরে আসে ক্রমে বৃষ্টিবেগ,
নদী ও নির্ঝরে, একা অরণ্য আয়নায় মুখ দেখে গা আদুল বন মেঘ,
অসুস্থতা শরীরের বিপুল জটিল সংকুল শিরার জঙ্গলে
বয় নির্জন গহনে,
মাতাল নৌকার মতো ঢেউয়ের গড়ানে যায়, মাঝিহীন চলাচল হয়,
জনু হতে স্রোতোপথে বহে যায় কী রক্তচ্ছটা অর্ধঘুমজাগরণে
সে কী শুধু শ্রান্তি, শুধু রক্তের প্রহারে বড়ো দুঃসময়
হয়ে দুঃখময়!

যেন বৃক্ষ, নাকি মৃত্তিকার তলে, ঢের নিচে অধঃলোকে যেখানে
ঘুমায় প্রাণবীজ
চলে যায় ধীর পায়ে সেখানে জীবন?
যেন ঊর্ধ্বে উঠে যায়, ঢের ঊর্ধ্বে, যেখানে সমস্ত গাছ—
ওষধি বা বনস্পতি
মাথা তুলে যেতে চায়, সেখানে কী জমায় আষাঢ়?
না কেবল অস্তিত্ব অস্থির হবে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গে ধীরে শুকায় প্রপাত?

অসুস্থতা, ঘন বনে, নাকি শিরাপুঞ্জে বৃষ্টি বহে আনে বুকভারি
মেঘে কোনো বীজ, বীজপত্রের ভুবন?
অসুস্থতা, প্রতি কোষে কম্বায় ক্ষরণ, প্রতি উপল পেশীতে ঠিকরে
আছড়ে পড়ে উত্তাপ উৎসার

কোনো বেদনার মধ্যে, অরণ্যের সুঁড়িপথে ত্রস্ত পা হরিণী, নাকি
করুণ শুশ্রূষা নয় যেনবা প্রকৃতি নিজে
মানুষীর বড়ো স্নিগ্ধ হাত।।

রাত্রি ॥ অজয় নাগ

পৃথিবী আদিম স্থলজ চলে গেছে
বৈজ্ঞানিকেরা স্থান নির্ণয় করে
আমাদের প্রত্যেকের সাড়ে তিন হাত জায়গা চাই
অথচ হাতের পাঁচ তো একই মাপের নয়
একটা গোটা দিন ফুরিয়ে যায়
অথবা ছিন্ন হয় বিহ্বলতায়
কেউ কেউ হা-হুতাশ করে
প্রত্যাশিত ভাবনার
কেউ হাসে
গাছের ফাঁকে চাঁদের টুকরো উঁকি মারে
[illegible] ব্রহ্মাণ্ড পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়...
[illegible] সমারোহে একদিন
ক্রমশ পায়ে নামে রাত্রি

অসমাপ্ত ॥ অর্পিতা মজুমদার

পরিশ্রান্ত দিনের সীমান্তে
একটি নিভৃত মুহূর্ত পেয়েছিলাম।
শান্ত আকাশের মধুর গোধূলি রঙ
ভাল লেগেছিল চোখে।
বহুদিন পরে জন্ম নিল মনে
একটি আশীর্বাদী সময়।
ভাবলাম পাষাণী অহল্যার
মুক্তি হল বুঝি।
রূপসী ধরণীর দিকে বহুবছর পরে
এইবার সব চোখ মেলে চাইবে।
সহসা [illegible] এল কুয়াশা
[illegible]
কেড়ে নিল নীলিমায় [illegible] সিঁদুর।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফারুকের শেষ কথাগুলোর ভেতর বিদ্রূপের সুর ছিল। কারণ তিনি জানতেন যে আহমদ জগের আজকাল রোজগার নেই। আহমদ জগের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। না না আমার টাকা-পয়সার অভাব-অনটন নেই। আমি এখনও বড়লোক...

: তাহলে আপনি বড় স্টেকে বাজী খেলছেন না কেন?

: তার কারণ ইয়োর ম্যাজেস্টি... এবার আহমদ জগের ঠাট্টা করবার পালা। তার কারণ ইয়োর ম্যাজেস্টি আমার টাকা আছে, আর এই টাকা আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। জুয়ো খেলে আমার গরীব হবার ইচ্ছে নেই।

আহমদ জগের শ্লেষ কণ্ঠ শুনে ফারুকের মুখ গম্ভীর হোল। তার সঙ্গে কেউ রসিকতা করে, তিনি তা একেবারেই পছন্দ করেন না।

ইতিমধ্যে একটা ডিল শেষ হয়ে গিয়েছিল, আহমদ জগ তার তাস দেখালেন। বড় তাস, এই ডিলের টাকা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি টাকা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। কিন্তু ফারুক তাঁকে বাধা দিলেন। বললেন... না, এই ডিলের টাকা আমার প্রাপ্য।

: আপনার কী তাস আছে? বিস্মিত হয়ে আহমদ জগ জিজ্ঞেস করলেন।

: আপনার তাস দেখান আগে। ফারুক বেশ রুক্ষ স্বরেই কথাগুলো বললেন।

: এই তো দেখুন—তিন দশ আর এক টেক্কা, আপনার?

: তিন রাজা...

: ইয়োর ম্যাজেস্টি, আপনার হাতে আছে মাত্র দুটি রাজা, আর আহমদ জগ

তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। ফারুক তাঁর কথায় বাধা দিলেন।

: হ্যাঁ এই দুটি তাস দুই রাজা। আর আমি হলুম তিন রাজা। না এই ডিলের টাকা আমার প্রাপ্য।

এই কথা বলে ফারুক বোর্ডের সব টাকা পকেটে পুরে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : পাশা, চলো। আহমদ জগ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এমন ধরনের কান্ড তিনি এর আগে কখনও দেখেন নি।

ফারুক হয়ত আহমদ জগের মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি দিন পাল্টাচ্ছে...রাজত্বের বদল হবে, শুধু মনে রাখবেন একটি কথা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন শুধু পাঁচজন রাজা। না আমরা সবাই যাবো। কিন্তু ঐ পাঁচ রাজার ধ্বংস নেই।

: পাঁচজন রাজা? আহমদ জগ মুখ খুলবার আগে বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। : এই পাঁচজন রাজা কে? ইয়োর ম্যাজেস্টি...

ফারুক তাসের খেলার আসর থেকে উঠে বসেছেন। এবার তিনি মুখে একটি লম্বা হাভানা সিগার পুরলেন। তারপর একরাশ ধোঁয়া বের করে বললেন : পাঁচ রাজা; হ্যাঁ, এই পাঁচ রাজা কে জানো? কিং অব ডায়মন্ডস কিং অব স্পেডস কিং অব হার্টস, কিং অব ক্লাবস, আর...

আবার ফারুক সিগারে এক লম্বা টান দিলেন। তারপর মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বের করে বললেন : আর পাঁচ নম্বর রাজা হলেন : কিং অব ইংল্যান্ড।

'নটি গার্ল' নাইট ক্লাব সমুদ্রের ধারে আনফুসী এলাকায়। আনফুসীতে জেলেদের বসবাস। তাই রাত বারোটার সময় আমাদের গাড়ী যখন নাইট ক্লাবের কাছে এসে দাঁড়াল তখন সামনে লোকের ভিড় দাঁড়িয়ে গেল।

আজ বাজীতে অনেকগুলো টাকা জিতে ফারুকের মনটা খুশী ছিল। তিনি রাস্তার জনতার দিকে তাকালেন না, সোজা নাইট ক্লাবের ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর এলিয়াস এন্ড্রুজও ঢুকলাম।

বেলী ড্যান্স তখনও শুরু হয় নি। ফারুক এক বোতল কোকা কোলার অর্ডার দিলেন। কোকাকোলা ছিল তাঁর অতি প্রিয় ড্রিঙ্ক। তারপর এলিয়াস এন্ড্রুজের সঙ্গে ব্যবসা, শেয়ার মার্কেট নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আমার দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। নাদিয়া সুলতান কোথায়?

নাদিয়া সুলতান ফ্লোরের কাছেই একা বসেছিল। তার টেবিলে কেউ নেই। আমি দূরে থেকে নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলুম। নাদিয়া সুলতান মিষ্টি হাসলেন।

ফারুক ইতিমধ্যে এলিয়াস এন্ড্রুজের সঙ্গে ব্যবসার আলাপ-আলোচনার আসর জমিয়েছেন। এন্ড্রুজ ফারুককে বোঝাচ্ছিলেন লন্ডন শেয়ার মার্কেটে শেয়ার বেচা-কেনা করলে সম্রাট প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারবেন। এই শেয়ার বেচা-কেনার টাকা দিয়ে তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন।

আলোচনায় বাধা পড়ল। নটি ক্লাবের বেলী ড্যানসার হিকমত ফাহামী স্টেজে এলেন। দর্শকের আসরে গুঞ্জন ধ্বনি শুরু হোল। এই গুঞ্জন ধ্বনি কারণ শুধু হিকমত ফাহামীর রূপ নয়—আসলে গত যুদ্ধের সময় হিকমত ফাহামী ছিলেন জেনারেল রোমেলের গুপ্তচর।

ফ্লোরের বাজনা বাজতে শুরু করেছে। পেছনে ভায়োলিন বাজছে আর একটা লোক ডুগডুগি বাজাচ্ছে। অন্ধকার ঘর, মৃদু আলো মনে হোল ঘরের ধোঁয়ার ভেতর তামাটে গন্ধ আর এই ধোঁয়া কিসের আমি জানতুম হাসিসের।

এলিয়াস এন্ড্রুজ একটি হাসিসের সিগারেট ফারুককে দিলেন। আমি একটা সিগারেটে আগুন ধরালুম।

হিকমত ফাহামী তাঁর গান শুরু করলেন।

: ইয়া হাবিবী আলবী ইয়া বিনত আনা মা সুফক মিন জামান...হে প্রেয়সী সুন্দরী কতদিন তোমাকে দেখি নি...

দর্শকেরা হিকমত-এর গলার সুরের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গাইতে লাগল...ইয়া হাবিবী, আলবী, ইয়া বিনত...

কিছুক্ষণের মধ্যে আসর জমে উঠল। পুরুষদের মন ভোলাবার ক্ষমতা হিকমত ফাহামী জানে। তা নইলে কি বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর কাছ থেকে গুপ্ত খবর বার করতে পারতো?

হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম ফারুক নাদিয়া সুলতানের পানে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারলুম ওষুধ ধরেছে।

: পাশা, ফারুক আমার কানে কানে মৃদু স্বরে বললেন : ঐ মেয়েটি কে?

: কোন মেয়েটি? আমি না চিনবার ভান করলুম।

: ঐ যে ফ্লোরের পাশে একটা টেবিলে একা বসে বসে শ্যাম্পাইন খাচ্ছে।

এবার এলিয়াস এন্ড্রুজ তার মুখ খুলল। বলল : মেয়েটি সিরিয়ান, নাদিয়া সুলতান, বেলী ড্যান্সার। আমি তাকে চিনি...

এলিয়াস এন্ড্রুজের কথা ফারুকের কানে গেল কিনা জানি নে, কারণ ইতিমধ্যে ফারুক আমাকে ডেকে বললেন, পাশা, ঐ মেয়েটিকে আমার টেবিলে আসতে বল।

আমি মৃদু আপত্তির সুর তুললাম হয়ত উনি কারু সঙ্গী হবেন। ওর কর্তা একটুখানি সময়ের জন্যে বাইরে গেছেন।

আমি শুধু ফারুককে নাচাবার জন্যে এই কথাগুলো বললুম, কারণ আমি জানতুম যে মেয়েঘটিত ব্যাপারে ফারুক কারও বাধা বিপত্তি মানবেন না, মেয়েটির বাপ, স্বামী যেই থাকুক না কেন, ফারুক তাকে ছিনিয়ে নিজের কাছে নেবেন।

: ওকে এখানে নিয়ে এসো। এবার ফারুকের গলায় আদেশের কণ্ঠস্বর।

আমাকে নাদিয়া সুলতানের টেবিলের কাছে যেতে হোল না। কারণ আমাদের পানে নাদিয়া সুলতান আড়চোখে তাকিয়ে ছিলেন। হয়ত তিনি আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয় বস্তু বুঝতে পারলেন। এলিয়াস এন্ড্রুজও তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আর এই হাসির অর্থ হোল : চলে এসো।

নাদিয়া সুলতান ফারুকের টেবিলের কাছে চলে এলেন। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে মাথা নীচু করে বললেন : ইয়া মালেক, আনা নাদিয়া সুলতান মিন সিরিয়া...সম্রাট, আমি নাদিয়া সুলতান, সিরিয়া থেকে এসেছি।

আলবী, আনা মিস মালেক...আনা ফারুক...প্রেয়সী, আমি সম্রাট নই, আমি হলুম ফারুক। বসো।

নাদিয়া সুলতান সম্রাটের পাশে বসলেন। ফারুক নাদিয়া সুলতানের কাঁধে হাত দিলেন। ক্ষণিকের জন্যে নাইট ক্লাবের সবাই ফারুক এবং নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নাচের ফ্লোরে হিকমত ফাহামী তখনও এক সুরে গাইছেন : ইয়া হাবিবী, ইয়া আলবী...

কিন্তু ফারুক যে নাদিয়া সুলতানের গলা জড়িয়ে ধরে আছেন আর নাইট ক্লাবের সবাই তার পানে তাকিয়ে আছে একথা বুঝতে হিকমত ফাহামীর অসুবিধে হোল না। আমি হাসিসের সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দেখতে পেলুম যে হিকমত ফাহামী বক্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর এই বাঁকা দৃষ্টির অর্থ হোল আমিই হলুম এই অশান্তির মূল কারণ।

কিছুক্ষণ পরে ফারুক নাদিয়া সুলতানকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। ওরা দুজনে কোথায় যাচ্ছেন আমি জানতুম। সিদি বিশর' বলে একটি সী বীচ আছে। ঐখানে ফারুকের একটি ছোট বাংলো ছিল। প্রায়ই ফারুক নতুন বান্ধবীদের নিয়ে ঐ জায়গায় যেতেন। আনতানিও পুলি ফারুকের সঙ্গে গেল। আমি আর এলিয়াস এন্ড্রুজ 'ডম পেরিনো' শ্যাম্পাইনের বোতল খুলে বসলুম। আজ সত্যিই উৎসব করবার রাত্রি। এলিয়াস এন্ড্রুজের মুখের ভাব হোল: ভিনি ভিডি ভিসি...এলুম, দেখলুম জয় করলুম। আর আমার মুখের ভাব ছিল: আমি তোমাকে নতুন শিকার ধরতে সাহায্য করেছি। আমার বখড়া কত?

দু-একদিনের মধ্যে কায়রো শহরে নতুন কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল: ফারুক এক নতুন বান্ধবী যোগাড় করেছেন। এই নতুন বান্ধবীর নাম হোল নাদিয়া সুলতান। আর আমি আনোয়ার পাশা হলুম ফারুকের নতুন মোসাহেব কিংবা বলা যায় পিম্প।

কায়রোর গেজিরা ক্লাব, স্পোর্টিং ক্লাবের সবার মুখে একই কথা, এই নাদিয়া সুলতান কে? মেয়েরা বলতে শুরু করলেন যে, ফারুক তাকে কত হাজার পাউন্ডের গহনা কিনে দিয়েছেন।

আর শুধু তাই নয়। প্রতিদিন সারিয়া সুলেমান পাশা, খান খালিলীর জুয়েলারী দোকানের মালিকরা এসে আমাকে বিভিন্ন ধরনের ডায়মণ্ডের নেকলেস, হীরের আংটি দেখাতেন। বলতেন: পাশা, আপনি এই গয়নাগুলো নাদিয়া সুলতানকে দেখান। উনি নিশ্চয় এগুলো পছন্দ করবেন। আর দামের জন্য আমরা চিন্তা করছিনে।

আমি জানতুম যে প্রতিটি গহনা বিক্রীর ডিল থেকে মোটা কমিশন পাব। আর আনতানিও পুলিকে হাতে রাখবার জন্যে আমি এই কমিশন থেকে কিছু বখরা ওকে দিতুম।

ইতিমধ্যে এলিয়াস এন্ড্রুজ ফারুকের বিজনেস পার্টনার হয়েছেন। পেপসী কোলা কোম্পানীর জন্যে এন্ড্রুজ আবেদন করলেন। আবেদনে বলা হোল তাদের আলেকজান্দ্রিয়াতে ফ্যাক্টরী বানাতে দেয়া হোক। ফারুক এই কোম্পানীর মোটা শেয়ার নিলেন। কিছু দিন পরে আলেকজান্দ্রিয়া ওয়াটার ওয়ার্কস সম্বন্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ শোনা গেল। ফারুক আবার এলিয়াস এন্ড্রুজের শরণাপন্ন হলেন। ওয়াটার ওয়ার্কসের কাজকর্ম একাউন্টস তদন্ত করবার জন্যে এক তদন্ত কমিশন বসল। এন্ড্রুজ হোল এই কমিশনের চেয়ারম্যান। আর আমি হলুম কমিশনের একজন মেম্বার। আমাদের দুজনকে নিয়ে বিরোধী কাগজগুলো অনেক বিশ্রী মন্তব্য করল। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন: নাইট ক্লাবের বারম্যানকে এনকোয়ারী কমিশনের মেম্বার করা হয়েছে কেন?

ওয়াটার ওয়ার্কসের মালিক ছিলেন বিদেশী। তাঁরা আমাদের দুজনকে বেশ মোটা টাকা ঘুষ দিলেন। আমি আর এন্ড্রুজ আমাদের টাকার অংশ থেকে একটা মোটা টাকা ফারুককে দিলুম।

এবার এলিয়াস এন্ড্রুজ ফারুককে বললেন: আপনি দেশে তামাকের ব্যবসা করুন। তামাকের পাতা স্টক করুন। তারপর আমদানী কর বাড়িয়ে দিন। বাজারে তামাকের পাতার দাম হু হু করে বেড়ে যাবে। পরে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী চড়া দামে এই পাতা বাজারে বিক্রী করতে পারবেন।

প্রস্তাবটি ফারুকের মনঃপুত হোল। তিনি প্রথমে আমদানী করের হার কমিয়ে দিলেন। বাজারে তামাকের দর কমে গেল। যেই তামাকের দর কমে গেল অমনি ফারুক প্রচুর তামাক কিনলেন। আবার আমদানী করের হার বৃদ্ধি করা হোল। তামাকের বাজার চড়া হোল। বাজারের এই ব্যবসার লেনদেনে ফারুক প্রচুর টাকা রোজগার করলেন।

তিনি এবার সরকারের জন্যে ইয়োরোপ থেকে জিনিস কিনবার জন্যে প্রচুর টাকা আদায় নিলেন। কিন্তু বাজার থেকে এই সব জিনিস কেনা হোল না।

এমনি করে বিবিধ উপায়ে ফারুক দেশের কোষাগার থেকে টাকা আদায় করতে লাগলেন।

টাকা নেবার প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রতিদিন ফারুক তাস খেলা, রুলেট এবং শেয়ার মার্কেটের বাজী হয়েছিলেন।

তার প্রধান চিন্তা হোল টাকা, টাকা... এই টাকা রোজগার করবার জন্যে ফারুক এক নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন।

এই নতুন পথ হোল: গান রানিং...কিংবা আরো সহজে বলা যায় আর্মস ডিল।

আর এই গান রানিং কিংবা আর্মস ডিলের প্রধান নায়ক ছিলুম আমি আর নায়িকা ছিলেন নাদিয়া সুলতান।

•

কয়েক দিনের মধ্যে নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে ফারুকের প্রেম বেশ কুলপী বরফের মত জমে উঠলো।

[illegible] [illegible] দ্য পিরামিডের প্রধান বেলী ড্যান্সার। আর এই ব্যাপার নিয়ে আতিষ্ঠ [illegible] তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হোল। কারণ এই সময়ে অবারজ দ্য পিরামিডের প্রধান বেলী ড্যান্সার ছিলেন সামিয়া গামাল।

সামিয়া গামাল শুধুমাত্র সুন্দরী নয়, তার দেহ, চোখের মাদকতা দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখত। প্রতিদিন রাত্রে আরব দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু আরব গণ্যমান্য অতিথি সামিয়া গামালকে দেখবার জন্যে ভিড় করে থাকত।

সামিয়া গামালের পরিবর্তনে আমি মনে মনে খুশী হয়েছিলুম। তার প্রধান কারণ ছিল যাঁরা সামিয়া গামালকে দেখতে আসতেন তাঁরা অবারজ দ্য পিরামিডের বারম্যান আনোয়ার পাশার জন্যে একেবারে তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু যেদিন থেকে নাদিয়া সুলতান হলেন অবারজ দ্য পিরামিডের প্রধান বেলী ড্যান্সার সেদিন থেকে আমার পসার সম্মান বেড়ে গেল। কারণ সবাই জানত যে আনোয়ার পাশাকে খুশী না করলে বেলী ড্যান্সার নাদিয়া সুলতানের সুন্দর মুখ দেখা যাবে না।

আরো একটু খুলে বলা দরকার। নাদিয়া সুলতানের নাচ দেখবার জন্যে আমি অতিরিক্ত পয়সা আদায় করতুম। অর্থাৎ কেউ যদি আমাকে পয়সা টিপস না দিত তাদের বলতুম : সরি, টেবিল নেই।

আর বাজারের সবাই জানত নাদিয়া সুলতান হলেন রাজার গার্ল ফ্রেন্ড, রাজার গার্ল ফ্রেন্ডকে দেখা ছিল একটা ফ্যাসান।

ফারুকের সঙ্গে নাদিয়া সুলতানের হৃদ্যতা দৃঢ় হোল, আর আমিও নাদিয়া সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলুম। দু-এক দিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলুম আমাদের একের অন্যের প্রয়োজন আছে। শুধু তাই নয়, আরো কয়েক দিন পরে উপলব্ধি করলুম যে, নাদিয়া সুলতান আমাকে ভালোবাসেন। আর আমার কথা নাই বা বললুম। মেয়েদের প্রতি আমার কোন মোহ কিংবা অন্ধ ভালোবাসা ছিল না। আমি জানতুম যে, জীবন উপভোগ করবার প্রধান জিনিস হল টাকা। আর এই টাকার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারতুম।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ফারুক এসে আমাদের নাইট ক্লাবে ধর্ণা দিতেন। তারপর বাকীটা সময় নাদিয়া সুলতানকে নিয়ে কাটাতেন। অনেকদিন এর জন্যে নাদিয়া সুলতান স্টেজে নাচবার সুযোগ পান নি। দর্শকেরা চিৎকার হল্লা করত, অবারজ দ্য পিরামিডের কর্তারা রুষ্ট হতেন কিন্তু কারু মুখ ফুটে বলবার সাহস ছিল না : ইয়োর ম্যাজেস্টি, নাদিয়া সুলতানকে ছেড়ে দিন। নাচের সময় হয়েছে।

একদিন আমি বারে বসে ককটেল বানাচ্ছিলুম। নাচের আগে নাদিয়া এই ককটেল খাবে। ফারুক হয়ত আরো ঘন্টা [illegible] [illegible] [illegible]। তাই নাদিয়া [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] নাদিয়া সুলতানের খাদেম (চাকর) এসে আমাকে বললে : মাদাম আপনাকে ডাকছেন।

নাদিয়া সুলতান হঠাৎ ডাকলেন কেন। সাধারণ ফারুক আসবার আগে আমি কখনও নাদিয়া সুলতানের ঘরে গিয়ে দেখা করিনে। এই সময়টা বিপজ্জনক। যদি ফারুক এসে দেখেন আমি নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে প্রেম করছি তাহলে আমার গর্দান যাবে।

কিন্তু সেদিন নাদিয়া সুলতান ছিলেন বেপরোয়া। কারণ আমি নাদিয়া সুলতানের ঘরে গিয়ে দেখলুম উনি পোষাক পাল্টাচ্ছেন। কারণ একটু বাদেই নাচ শুরু হবে, ব্যান্ড বেজে উঠবে, শ্রোতাদের দল চিৎকার করে উঠবে।

প্রথমে আমি নাদিয়া সুলতানের দিকে তাকাতে লজ্জা পেলুম। কারণ নাদিয়া সুলতান ছিলেন বিবস্ত্রা। নগ্ন দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে উনি একটুও লজ্জা পেলেন না। শুধু তাই নয়। উনি তাঁর ব্রেসিয়ার পরছিলেন। আমাকে ব্রেসিয়ারের বোতাম দুটি দেখিয়ে উনি বললেন : লাগিয়ে দেবে পাশা?

আমার বুকের কাঁপুনি বাড়ল। সর্বনাশ করছি কী?

একবার যদি ফারুক আমাকে ঘরে এই অবস্থায় নাদিয়া সুলতানের সঙ্গে দেখতে পান তাহলে যে আমি বিপদে পড়ব। আমি সম্রাটের মোসাহেব, তাঁবেদার, ওঁর লবণ খেয়েছি, আমি কী ওঁর বান্ধবীর সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে পারি? নাদিয়া সুলতান আবার ধমকের সুরে বললেন : চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন পাশা? যা বলছি তাই কর।

আমি ব্রেসিয়ারের বোতাম দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। কী করব ভেবে পেলুম না। আমি কী আগুন নিয়ে খেলা করব? বুকের কাঁপুনি বাড়ল।

বাইরে নাচের ব্যান্ড জোরে বেজে উঠেছে। এক্ষুনি নাদিয়া সুলতানকে স্টেজে যেতে হবে। কিন্তু নাদিয়া সুলতান তাঁর ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখালেন না। বরং উল্টে আর একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। নাদিয়া সুলতানের নরম ঠোঁটের দু-তিনবার চুমু খেয়ে আমি উত্তেজিত বোধ করলুম।

নাদিয়া তুমি করছ কী? যদি—আমার গলার স্বর মিহি এবং ভেজা ছিল, আমার কথা শেষ করতে পারলুম না।

নাদিয়া সুলতান আমার মুখে হাত দিলেন। : নো, নো ডার্লিং আমার নাম নাদিয়া সুলতান নয়, লিলি। লিলি কোহেন।

: লিলি কোহেন? আমি এই নাম শুনে বিস্মিত হতবাক হলুম। কী ব্যাপার? লিলি কোহেন যে ইস্রাইলী নাম। তাহলে এতোদিন উনি করছেন কী? শুধু ছদ্মবেশ ধারণ [illegible] করছেন কেন?

কী উদ্দেশ্য? অনেকগুলো চিন্তা এসে আমার মাথায় জড়ো হোল।

নাদিয়া সুলতান আমাকে বেশ জোর করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এখন ছাড়বার কোন লক্ষণ দেখালেন না।

আমি ভীত কণ্ঠে বললুম : লিলি, যদি ফারুক আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পায় তাহলে আমি বিপদে পড়ব।

মিষ্টি হাসলেন নাদিয়া সুলতান। বললেন : আমাকে তুমি লিলি বলে ডেক না। তাহলে ওরা জানতে পারবে আমি কে? ওদের মনে সন্দেহ ঢুকবে। না আমি লোকের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনে। আর তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছি কেন জানো?

: কেন? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: কারণ যদি ফারুক কিংবা তার শনি আনতোয়ান পুলি আমাদের দুজনকে এই অবস্থায় দেখতে পান তাহলে কী হবে জানো?

: কী?

: ফারুকের মনে জেলাসি হবে। আমি ফারুকের মনে জেলাসি সৃষ্টি করতে চাই। কারণ ফারুক যদি একবার জেলাস হন তাহলে উনি আমার কথানুযায়ী কাজ করবেন। আর আমি কী চাই জানো পাশা?

: কী? আমার গলার স্বর ছিল মিষ্টি নরম?

: আজ ফারুকের অর্থের প্রয়োজন, সম্প্রতি উনি লণ্ডনের শেয়ার মার্কেটের লেনদেনের ব্যাপারে প্রচুর টাকা লোকসান দিয়েছেন। আমার বন্ধু এলিয়াস এণ্ড্রুজ ফারুককে পরামর্শ দিয়েছেন যে পয়সা করবার সব চাইতে [illegible] উপায় হোল অস্ত্র বেচা-কেনা। এই অস্ত্র বেচা-কেনা থেকে উনি প্রচুর পয়সা রোজগার করতে পারবেন। আর শুধু ফারুক নন এলিয়াসও এই আর্মস ডিল থেকে পয়সা বানাবে। আমি এই ব্যবসার একটা মোটা অংশ চাই। আর এই কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

আমি এবার নাদিয়া সুলতানের বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়ালুম। কারণ নাদিয়া সুলতানের কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলুম। প্রথমত জানতে পারলুম যে লিলি কোহেন নামে নাদিয়া সুলতান হলেন ইস্রাইলী স্পাই। দ্বিতীয়ত বুঝতে পারলুম যে ফারুক এবং এলিয়াস এণ্ড্রুজ আর্মস কিনবার পরিকল্পনা করছেন। আর এই বেচাকেনা ব্যবসা থেকে দুজনেই বেশ মোটা টাকা লাভ করবেন, তৃতীয়ত নাদিয়া সুলতানও এই ব্যবসা থেকে বখরা চান। আর তার লক্ষ্য : আমি হব নাদিয়া সুলতানের বিজনেস ম্যানেজার। আমাকে কী করতে হবে?

(ক্রমশঃ)

ক্ষমিতে পারিলাম না

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

।।এক।।

আত্মহত্যার মতো ব্যক্তিগত ব্যাপার আর কিছু নেই। এবং যদিও আমরা নরওয়েজীয় লেমিং নামক জন্তুদের কয়েক বৎসর পর পর আত্মনিমজ্জনের কাহিনী শুনেছি; তবু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে: আত্মহত্যা একান্তই মানবিক ঘটনা। বেঁচে থাকাকে যে-প্রাণী অনুভব করেই ক্লান্ত হয় না; বেঁচে থাকাকে যে বিশ্লেষণ করতে চায়; খুঁজতে চায় বেঁচে থাকার মানে—সে-ই আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারে—জটিলতাকে দুর্মোচনীয় গূঢ় ভেবে। সে প্রাণী মানুষ।' যখন বাঁচাকে মনে হয় মরার থেকে বেশি যন্ত্রণাময়; তখনই মানুষ পা বাড়িয়েছে আত্মনাশের পথে। সমাজ রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান—কেউই মানুষের এই আত্মনাশা স্বাধিকার স্বীকার করে না। তাই আত্মহত্যার মুহূর্তে মানুষ একা—একেবারেই একা। যে 'বিপন্ন বিস্ময়' তার রক্তে খেলা করে সেই বিপজ্জনক শেষ শান্তিহীন অপরাধ-সাফল্যের প্রাক্‌-মুহূর্তে তার কেউ নেই; স্ত্রী; কন্যা; পুত্র; বন্ধু তো নেইই; তার আর তখন সমাজ নেই; ভগবান নেই; সে তখন আর কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক নয়।'

কিন্তু আত্মনাশ মানেই আত্মহত্যা নয়। ভারতীয় সাধক সন্ন্যাসী যখন জরাজীর্ণ নশ্বর দেহটাকে সাধনার ক্ষেত্রে অক্ষম ভেবে; দুর্গম গিরি চূড়া থেকে নিজেকে নিক্ষেপ করেছে কায়া পরিবর্তনের জন্য; সে ভৃগুপাতকে আত্মবিনাশ বলা গেলেও: তা আধুনিক অর্থে আত্মহত্যা নয়। দধীচির আত্মদানকেও এ আলোচনার অন্তর্গত করা যাবে না। আবার কৃত্তিবাসী রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে লক্ষ্মণের সরযূতে আত্মবিসর্জনের সে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়—

> পাত্রমিত্র প্রতি বীর কহিলা মেলানি।
> চাহিয়া সবার পানে চক্ষে বহে পানি ।।
> রত্নকাঞ্চন দিয়া কৈল তুষ্ট সর্বজন।
> সরযূ নদীর তীরে করেন গমন।।
> প্রদক্ষিণ করেন তারে করিয়া প্রণাম।
> অযোধ্যায় প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম।।
> সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
> লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ।—

তাকেও আধুনিক অর্থে আত্মহত্যা বলা যাবে না। যদিও: চাহিয়া সবার পানে চক্ষে বহে পানি—এ বর্ণনার লক্ষ্মণের মানব-স্বরূপকে বেশ ভালোই চেনা যাচ্ছে; তথাপি যে-আত্মহত্যায় অচিরে গোলক-গমনের পথ প্রশস্ত হয় সে-আত্মহত্যা ঠিক আত্মহত্যা নয়; বড় জোর লীলা সম্বরণ। ভবিষ্যতের লিপি পড়ে মহাপ্রভু যখন বুঝলেন লীলা সম্বরণ করার সময় এসেছে; তখনই তিনি অপ্রকট হলেন। আধুনিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে এসকল ঘটনার বিচার করতে না যাওয়াই ভাল।

গীর্জাসমূহের প্রাথমিক অধ্যায়ে আত্ম-হত্যা সম্বন্ধে পোষিত হয়েছে এক বিস্ময়কর নিরপেক্ষতা। একজন প্রাথমিক 'ফাদার' যিশুর মৃত্যুতেও একধরণের আত্মহত্যা বলে মনে করেছেন। সে সব বিষয়ও আমাদের বর্তমান আলোচনায় বাঞ্ছনীয় নয়।

মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে যে-সব আত্মবিসর্জন ঘটেছে যেমন জহর ব্রত সতীদাহ সেগুলিকেও আমাদের বর্তমান আলোচনায় টেনে না-আনাই ভাল। সেগুলি আত্মহত্যা নয় এ কারণে যে ব্যক্তির কোনো একান্ত নিজস্ব সংকট থেকে ঘটনাগুলি ঘটে নি। ঘটনার পাত্র পাত্রীরা ঘটনাক্রমে যদি অন্য ধর্মাবলম্বী হত তাহলেই এমন আত্মবিনাশের ঘটনা এভাবে ঘটতে পারত না। ওলড্ টেস্টামেন্টে চারটি আত্মহত্যার কথা আছে কোনোটির জন্যই দোজখ নাজেল হয়নি। জুডাসের আত্মঘাত তার পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু পরবর্তী নীতিশাস্ত্রীরা নাকি জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা তার আত্ম-হত্যাকেই বেশি পাপাত্মক বলে ভেবে-ছিল। ব্যক্তিগত আত্মহত্যাকারীর প্রতি ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের মমতাহীন এবং সহানুভূতিহীন মনোভাবের কথাটিও এখানে স্মরণ করি। আত্মহত্যাকারীর জন্য শোকও নিষিদ্ধ ছিল স্মার্ত রঘুনন্দন তার জন্য কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও রেখে যান নি। 'তাদের গতি হয় না' ভারতীয় হিন্দু কল্পনায় এই ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা শ্রুতি বা সামাজিক নীতিবাদেরই নির্দেশ-সম্ভূত। ইংল্যাণ্ডের এক সময়ের সেই আইনটির কথা তুলনাথেই আমরা স্মরণ করতে পারি—'আত্মহত্যাকারীর সমস্ত সম্পত্তি রাজা বাজেয়াপ্ত করে নেবেন।'

ব্যক্তির অনিবার্য ভবিতব্য কেন তাকে ঠেলে দেয় এ পথে সমাজতাত্ত্বিকেরা নানা গবেষণা করেছেন তা নিয়ে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে জানি প্রত্যহ এক হাজারের মতো মানুষ নিজের হাতে যবনিকার দড়ি ধরে টানে। টেকনোলজির উৎকর্ষ যত জীবনকে অধিকৃত এবং বশীভূত করেছে যত জীবন বাইরের দিক থেকে সফল হতে হতে ভেতরের দিক থেকে অনুভব করেছে এক দুর্বহ অকৃতার্থতা—যতই আলোক-সজ্জা সব হয়ে উঠেছে অন্ধকারের ছদ্ম এবং ব্যর্থ আবরণ এই ব্যাধি এই প্রবণতা তত বেড়েছে। মানুষের সব থেকে বড় সমস্যা একটাই—সেটা তার মনুষ্যত্ব। মানুষ যত মনে করে যে তার মনুষ্যত্ব খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে তত তার এ প্রবণতা বাড়তে থাকবে। বিশেষ করে এ সমস্যা তার যার কল্পনা আছে কিন্তু কল্পনা মুক্তির কোনো পথ জানা নেই। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকেরা অন্য কথা বলেন; তাঁরা বলেন এ জগৎ অব্যাখ্যেয়। অপর ব্যক্তি কাছে চিরদিনের জন্য খিল এঁটে আছে এ জগৎ: আমরা জানি স্বেচ্ছামৃত্যুর একটি বিশেষ ধরণ আমাদের এই বাংলাদেশেই জীবনের গরিমায় প্রতীক হয়ে রয়েছে অগ্নিযুগের বীর যুবকদের মৃত্যু বরণের মধ্যে। সেটা কিন্তু খিল-আঁটা দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়। বরং কোনো আত্মহত্যায় যদি আধুনিক অর্থে লজিক থাকে তবে তা এখানেই আছে। আত্মা অপরাজেয় হলেও রক্ত মাংস শিরা স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। টেগার্টী নির্যাতন যদি দলের ক্ষতি করে তাই অ্যাকশন সমাধা করে আত্মবিনাশের ভিতর দিয়ে দলকে বাঁচিয়ে গেল সে যুবক। এখানে মৃত্যু নয় জীবনই ছিল সাধ্য-সাধন। আমাদের আলো-চনায় এসব কথা কিন্তু আপাত প্রাসঙ্গিক আমাদের মূল প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যে আত্ম-হত্যার ব্যবহার। তা বলে আমরা বাংলা সাহিত্যে আত্মহত্যার একটা পূর্ণ পরিসংখ্যা হাজির করতে চাই না।

।।দুই।।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্ম-প্রণয়ী আত্মহত্যার কর্তিয়তা বঙ্কিমচন্দ্র—

[illegible] ... [illegible] জলকে ব্যবহার করে মর্মবাণী জানিয়ে গেল তার জীবনের অন্তে। জল সেই অশান্ত জীবনের চিরশান্তির প্রতীক। বিষ আত্মহত্যায় বাজারে সব থেকে জনপ্রিয় আশ্রয়। তা দেহকে জল বা আগুনের মতো বিকৃত করবে না—কষ্টও পৌঁছে দেবে ত্বরিতে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসেছে কৌশলের বৈচিত্র্য। টেকনোলজির উৎকর্ষের কালে পিস্তল, ব্লেড, হাতের শিরা-কাটা, এবং ঘুমের ওষুধ, বিষের জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আট বছর আগে একদিনের নায়ক সেক্ষেত্রে এমন এক পদ্ধতি অনুসরণ করল গলায় দড়ি দিয়ে যা কাব্যখ্যাত নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিটিই এই কবিতায় বড়ো প্রয়োজনীয় ছিল। ঘরের মধ্যে বিষ বা ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকলে এ মৃত্যু তার যোগ্য পটভূমিকা পেত না। প্রথমে লোকটা ছিঁড়েছে বৌ এবং ছেলের বাঁধন। কোনো পিছুটান সেখানে সে অনুভব করেনি। তারপরে সে এসে দাঁড়িয়েছে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে, সেখানেও পঞ্চমীর চাঁদ, শিশির, জোনাকির ঝাঁক, গাছ এদের কারো কাছ থেকে সে কোনো প্রতিবাদ পায়নি শোনেনি। এই বিমূঢ় করে-দিতে-পারে এমন ভবিতব্যটি স্পষ্ট হত না, যদি না লোকটি ঘর থেকে উঠে আসতো। যে-অ্যাংগুইশকে ইঙ্গিত করে—(জানিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম অবিরাম ভার সহিবে না আর')—সেই মহাশূন্যতা, উটের গ্রীবা যার নিস্তব্ধতার উপমান তার জন্যই ঘরের বাইরের পরিবেশটির প্রয়োজন আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।

অপিচ উনবিংশ শতকের জের-টানা নাটকীয় আত্মহত্যা তখনও বিদায় নেয় নি। তারাশঙ্করের গল্পে এরকমের আত্মহত্যার ঘটনা দুর্লভ ঘটনা নয়। 'পিতাপুত্র' গল্পের শশিশেখরের রেললাইনে ট্রেনের তলায় আত্মবিনাশের ঘটনাটি স্মরণীয়। কিন্তু এ নাটকীয়তা তখন বাস্তবজীবনে প্রায় অবান্তর হয়ে গিয়েছে। অস্তিত্বের স্বরূপের জটিলতাই তখন অচ্ছেদ্য বন্ধনের আকার নিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর' উপন্যাসে হীরেনের মরার পদ্ধতি ও কারণ দুই-ই এখানে উল্লেখ করার মতো। ক্ষুর গলায় বসিয়ে সে নিজেকে শেষ করে। ক্রন্দন ছিল তার জীবন, ক্রন্দন তার মৃত্যুও। তাকে [illegible]

[illegible]

[illegible] ... কাছে যেতে যেতে ভাবল, এমন শান্ত ঠাণ্ডা শরীর জুড়োনো ডাক আর কোনোদিন সে মীরার কাছে পায় নি।

হীরেনের রুগ্নতার ফ্রেম হিসাবে খাওয়া ঘিয়ে ভাজা গরম পরটা ফুলকপি ভাজা, সবে বেরুনো মটর শুঁটি দিয়ে, নাম মাত্র মশলার তৈরি আলুর দম বা ডিমের কুসুমের সোনালি-মাখা ভাত বা ভাতের থালা গরম ঘি, আলু কইয়ের ঝোল, চাটনি দইয়ের বিবরণ। হীরেনের অসুস্থ অক্ষমতাকেই আরো বেশি প্রকট করে এই বর্ণনা। পরিশেষে শতাব্দীর জটিলতম কারণে হীরেন নিজেকে হত্যা করে—রক্তের নদীতে হীরেন ঢলে পড়েছে। দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাঁ-করা ক্ষত গলায়। জীবন তো বটেই মৃত্যুও কত অসুন্দর হতে পারে হীরেন তার প্রমাণ। একটা রোগা বোবা নদী আপন অক্ষমতায় একটি, বা ঐ শিল্পী ছেলেটিকে ধরলে দুটি, বেগবান নদী-নদের পাশে বালুকায় মাথা গুঁজে মরল। বুদ্ধদেব বসুর 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর নায়ক সোমেনের জীবনেও এক মীরা। 'মীরার দুপুর' ও 'নির্জন স্বাক্ষর'-এ দুজন মীরাকে দেখে সন্দেহ হয় মীরা বোধহয় আবহমানকালের দাম্পত্য-গোলমালের নামপ্রতীক। আমি অবশ্য একথা মানতেই পারি না। বুদ্ধদেব কবি। 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর নায়কের অন্তিম মুহূর্তটিও কবিত্বময়—দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসে আছে খাড়া পিঠে। সামনের টেবিলে কাঁচের গেলাশ গলা অবধি ভর্তি। ঘন রঙের জল; লাল মদিরার মতো রক্তের মতো লাল।—এরই সামনে দাঁড়িয়ে আনা কারেনিনার আনা-র রেল লাইনের চলতি ট্রেনটির সামনে যেমন মনে পড়ে গিয়েছিল জীবন-কথা, সোমেনেরও মনে পড়ে গেল—যৌবনের দিন। ছেলেবেলা কোনো এক দুপুর রাতে ঘুম ভেঙে বৃষ্টি শোনার সুখ। এই মৃত্যুতে জীবনের কথাই বেশি মনে পড়ে। মৃত্যু অনিবার্য, জীবন অপ্রতিরোধ্য, একথা কেই সোমেন থামিয়ে দেয়—যদি কোনো আশ্চর্য উপায়ে এখনি ফিরে আসে মীরা, এখনই এই মুহূর্তে যদি পায়ের শব্দ শোনে সিঁড়িতে, একটু পরেই কচি গলার ডাক, 'বাবা'—তাহলে কী হত তা আমরা জানি না।

[illegible]

[illegible] ... ক্ষমতা তার আর নেই, [illegible] আত্মভাবনাকেই সর্বস্ব করে তুলেছে। তার এই ব্যক্তি-নিবদ্ধ জগৎ থেকেই সে জগৎ-জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে বলে তার মুখোচ্ছে সবই নিরর্থক। বড় বড় শব্দের হুকভরা ব্যথা। উদ্যমের উদ্যোগের অস্পষ্টতা মানুষ ক্রমেই হারিয়ে ফেলে। তাই এই মানুষের কাছে মৃত্যুর কোনো অন্তিম আলোকচ্ছটা নেই। মরার ইচ্ছে জাগতে পারে কিন্তু না মরলেও চলে। যেমন না বাঁচলেও চলে, তবু বাঁচতে হয়। দেখা যায় এ সময়ের লেখায় চরিত্রেরা মরতে গিয়েও মরতে পারে না। বেঁচে অথবা মরে কিছুই যখন প্রমাণ করা যায় না, দুই-ই যখন সমান অফলপ্রদ তখন একটার বিকল্পে আর একটা বেছে লাভ নেই। 'আত্মপ্রকাশে'র নুরজাহান একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পারে নি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এ যুগের মানুষের মনোভাবটিকে ফুটিয়েছেন চমৎকার :—

> আর একদিন সে হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে ডানহাতের চকচকে একটা সুন্দর ব্লেড কণ্ঠনালির ওপর রাখল। সামান্য একটু চাপ দিল। বড় আরাম! কিছুক্ষণ পরে সরু রক্তের কয়েকটা রেখা তার গেঞ্জীর ওপর নেমে বুক ভাসিয়ে দিল। ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে সে হেসে বলল থাংক ইউ নাটুকে। তারপর তোয়ালে দিয়ে গলা মুছে ডেটল লাগাল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল রাস্তায় জীবন্ত মানুষজন চলাফেরা করছে। ক্ষতের ওপর ভেজা তুলো চেপে সে চোখ বুজলো। আঃ! বড় আরাম!

গলায় ব্লেড চেপে ধরেও 'বড় আরাম' আবার ক্ষতের ওপর ভেজা তুলো চেপে ধরেও 'বড় আরাম'। 'আরাম' একান্তই আপতিক ভাবে বলা। না-মরার কারণটি আরো হাল্কা। 'থ্যাংক ইউ নাটুকে'—না হলে হয়তো দেখা যেত। না-মরাটা এখানে মরার চেয়েও জটিল।

এই জটিলতাই বুঝি অতাধিক মধ্যবিত্তকে নিত্য জানায় এক গঞ্জনা। তবু কামু বলেন, দি পয়েন্ট ইজ টু লিভ।

কানন দেবী

অমৃতে 'সুরের আগুন'-এর একটি স্ফুলিঙ্গ হবার আমন্ত্রণ জানাতে কানন দেবী সজোরে মাথাই শুধু নাড়েননি; স-সংকোচে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন 'রবীন্দ্রসংগীতের এমন সব সম্রাট, সম্রাজ্ঞী-তুল্য শিল্পীদের পাশে আমি স্থান পাবার যোগ্য নই। আমায় এর মধ্যে জুড়ে দিয়ে এমন সুন্দর ফিচারটির মর্যাদা নষ্ট কোরো না। কি হিসেবে আমায় এর মধ্যে টানছ? আমি সবশুদ্ধ বাইশ তেইশখানা মাত্র রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছি। এখনকার মত আসর, জলসার রেওয়াজ আমাদের সময়ে ছিলো না। কাজেই সাধারণ সভায় গাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। আর আমার কোনো শিষ্য শিষ্যাও নেই কারণ সংগীত বিষয়ে শিক্ষার্থীদশার ঊর্ধ্বে কোনোদিন উঠতে পেরেছি বলে আমি মনে করি না। তবে? রবীন্দ্রসংগীতে আমার কন্ট্রিবিউ-শনটা কোথায় যার জন্য 'সুরের আগুনে'র মত এমন একটা ঐতিহাসিক নিবন্ধগুচ্ছে আমার স্থান হতে পারে?

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথের জবাবেই বলব, 'ইতিহাস ত মধুর কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না' তাছাড়া, যদিও আপনার বিনয় আপনার কণ্ঠখ্যাতির মতই জনবন্দিত।'

'মোটেই বিনয় নয়। আমি সত্যি কথাই বলছি।'

এ যেন সত্যকথন আপনার মত মনীষীরই উপযুক্ত ভূষণ। সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়েও আপনার সম্বন্ধে কিছু দুর্বলতা থাকার সুনাম অথবা দুর্নাম এ অধমের আছে। অতএব নিজের কোনো মতামত প্রকাশ করবার আগে দেশের বিদগ্ধমন্ডলীর স্বীকৃতির উদাহরণগুলিই স্মরণ করছি। রবীন্দ্রমেলা, রবীন্দ্রসদন, সম্প্রতি মার্বেল প্যালেসের রবীন্দ্রসংগীতের আসরে তুষারবাবু, শৈলজাবাবু, সুবিনয় রায়ের সংগে আপনার সম্বর্ধনা এবং মনে-না-পড়া আরো অনেক রবীন্দ্রসংগীতের আসরে সম্বর্ধনা ছাড়াও গান্ধর্বীতে পংকজবাবু ও বিড়লা একাডেমীতে আপনার প্রধান অতিথি হবার ঘটনা ত বেশীদিনের নয়। কিন্তু এই রাজ্য।

এইতো সেদিন। শান্তিদেববাবু ও রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের আলোচনা প্রসংগে ছায়াচিত্রে আপনার গুরু পংকজবাবু ছাড়াও আপনার ও সায়গলের কথা বললেন। কিছুদিন আগে মোহরদি অধুনাকালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতমা নায়িকা হয়েও রেডিওতে অতীত স্মৃতি আলোচনায় রবীন্দ্রসংগীতের পর্যায় আসতে শ্রদ্ধেয় পংকজবাবুর ও আপনার দুটি গান 'প্রলয় নাচন' ও 'আজ সবার রঙে' বাজিয়ে শোনালেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন 'পরো, পরো, পরো তবে' উচ্চারণের কথা—যে উচ্চারণ অনুভবের আলোরেখার আন্ডারলাইনের মতই গানটির মর্ম সত্যকে যেন মূর্ত করে তুলেছে। শুনেছি শান্তিনিকেতনের সবাই তাঁর এ নির্বাচন খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করেছেন। তাছাড়া এবারে ২৪ বৈশাখ রবীন্দ্রসদনে কবির মর্মর মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে পূর্তমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন মহাশয় স্টেজ থেকে অডিটোরিয়মে নেমে এসে করজোড়ে আপনাকেই অনুরোধ জানালেন একটি রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য। তাঁর অনুরোধের সংগে যুক্ত হয়েছিলো সেদিনের সভায় অংশগ্রহণকারী অধুনাকালের সেরা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন) আবেদন।

এতগুলি যথার্থ গুণী ও সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষের মতামত তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব আপনার যুক্তির কোনোটিই মানা যাচ্ছে না। আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি 'সুরের আগুন'-এ সংগীত-গুঞ্জরিত ঐ মধুর নামটির সংযোজন।'

অগত্যা আত্মসমর্পণ না করে উপায় কি? কানন দেবীর মুখে ফুটে ওঠে সেই ঝলমলে হাসি, আজ তা স্নিগ্ধ আশ্বাসের মতই। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক রসিকমণ্ডলীর কাছেই শুনেছি এ হাসি ছিলো সাহিত্য ও কাব্যের সেই সুপ্রসিদ্ধ হাসি যা দেখে 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।'

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে কানন দেবীর প্রথম ও প্রধান এবং সংগীতের ক্ষেত্রে যথার্থ গুরু পংকজ মল্লিকের ভাষায় 'কানন ইজ দি ফার্স্ট সিংগিং স্টার ইন নিউ থিয়েটার্স।'

'ফার্স্ট সিংগিং স্টার'—এইজন্য যে অভিনয়ের মধ্যে গান হয়ত আগে গেয়েছেন অনেকে, কিন্তু সত্যিকারের গায়িকা বলতে যা বোঝায় সে পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে কেউ পড়তেন না। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে নামী ও দামী শিল্পীর লোভনীয় তালিকা আজ ছায়াছবির অন্যতম আকর্ষণ। যে কোনো সংগীতপ্রধান চরিত্রও সংগীতহীনার পক্ষে রূপায়ন করাটা আজ আর মায়াসরসীর মত অবাস্তব নয়। কিন্তু কানন দেবী যে যুগের নায়িকা সে যুগে চলচ্চিত্রশিল্পীকে একাধারে অভিনয়, সংগীত, নৃত্য সবই আয়ত্ত করতে হোতো। কারণ ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক তখনকার মানুষের কল্পনাতেও আসেনি। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভিনীত চরিত্রের শিল্পী নির্বাচন সীমিত হয়ে পড়তো। কারণ কাজ চালানো দু-একখান গান গাওয়া অন্যদের পক্ষে সম্ভব হলেও সংগীত যে চরিত্রের অপরিহার্য অংগ সেখানে নির্বাচিত শিল্পী সত্যিকারের সংগীতশিল্পী না হলে রূপায়িত চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়বে এবং চিত্ররচনার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে। আর ভূমিকাতেই অদ্বিতীয়া ছিলেন কানন দেবী।

ঐ একটি নাম একটি যুগকে প্রতিনিধিত্ব করছে সাধে? কানন দেবী সৌন্দর্যময়ী, অভিনয়শিল্পে অনন্যা, দীপ্তিময়ী ব্যক্তিত্ব—এ সবই সত্য। কিন্তু আমার কাছে এ-সবের চেয়ে অনেক বড় তাঁর সংগীতপ্রতিভা। সংগীতপ্রতিভা বলতে যা বোঝায়, সুরেলা আওয়াজ, সংগীতের অনুভব, ধারণা, শিক্ষিত কণ্ঠ, সূক্ষ্ম কারুকাজ, প্রতি পদায় শ্রুতিমাধুর্য—এতগুলি সুদুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিলো তাঁর কণ্ঠে। সংগীতময়ী কানন দেবীর জুড়ি সে যুগে ত কেউ ছিলেনই না এ যুগেও তাঁর কাছাকাছি পৌঁছবার মত কোনো সংগীতশিল্পী চলচ্চিত্র জগতে সম্ভবত কেউ নেই।

আজকের যুগে বাংলার চিত্রজগতে কত যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে, কতো বিস্ময়কর গৌরব পেয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র। কতো শক্তিমান প্রতিভার আবির্ভাবে আজ বিশ্বের দরবারে বাংলার চিত্রশিল্প আজ আভনন্দিত। কিন্তু এমন কোনো সুকণ্ঠীর আবির্ভাব ঘটলো না যিনি কানন দেবীর সংগীতপ্রতিভার দীপ্তিকে এতটুকুও ম্লান করতে পারেন। তাই কানন দেবী কানন দেবীই। আপন মহিমায় ভাস্বর।

একদিন সংগীতাচার্য পংকজবাবুর সংগে আলোচনা করতে করতে প্রশ্ন করেছিলাম—'একটা জিনিস আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। একান্তভাবে রবীন্দ্রসংগীতেই সমর্পিতা শিল্পী কানন দেবী নন; জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েও তিনি রবীন্দ্রসংগীত গাননি। গেয়েছেন অল্প কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত (সকলুল্যে বাইশ কি তেইশখানি) তাও ছবির প্রয়োজনে। তবু সেই কটি গানের স্মৃতিই রসিকচিত্তে কেমন করে এমন অনপনেয় ছাপ ফেলতে পারলো? কেন ঐ কটি গানের নামের সংগে কানন দেবীর কণ্ঠ এমনভাবে মিশে রইলো যে অন্য কারো কণ্ঠে এসব গান শোনার কথা ভাবাই যায় না?' সবার রঙে রং মেশাতে হবে' ঐ একটি গানই বোধহয় রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা একশ বছর এগিয়ে দিয়েছে। এটা আমার ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের কথা নয়। সকল শিল্পী, শিল্পরসিক এমন কি রবীন্দ্রসংগীতের গুরুরাও (যদিও যাঁর কাছে বলছি তিনিও রবীন্দ্রসংগীতের একজন কিংবদন্তীতুল্য শিল্পী এবং যথার্থ গুরু) এ বিষয়ে একমত। কেন?'

সাধক শিল্পী শ্রদ্ধেয় পংকজবাবু তার উত্তরে বলেছিলেন, তার কারণ এটাকে সে বীজমন্ত্রের মত করে নিয়েছিলো। শাস্ত্রে আছে 'অমন্ত্রম অক্ষরং নাস্তি'—এমন কোনো অক্ষর নেই যা দিয়ে মন্ত্র রচনা করা যায় না। অপেক্ষা কেবল যোগাযোগের। এই

অনুকূল যোগাযোগের দুর্লভ লগ্ন কাননের শিল্পীজীবনে এসেছিলো।' 'প্রতিভা যাহা স্পর্শ করে তাহাই সোনা হইয়া ওঠে।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটি কাননের ক্ষেত্রে আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। সে কখানা রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছে অথবা কি উদ্দেশ্যে গেয়েছে সেটাই তার গান সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা নয়। যে কটি গান সে গেয়েছে তার ওজন, মর্মগ্রাহিতা একসপ্রেশনের অনন্যতা সে গানে এমন একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা সৃষ্টি করেছে যাকে না মেনে উপায় নেই। এ স্বাতন্ত্র তার অনন্যসাধারণ প্রতিভাজাত সম্পদ। হীরকদ্যুতিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে কি? সে দ্যুতি ছোট্ট একখন্ড হীরেরই হোক কিংবা মস্তবড় হীরে থেকেই বিচ্ছুরিত হোক না কেন। 'কানন দেবীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম দীক্ষা আপনারই কাছে ত—তাই এ বিষয়ে আপনার ধারণা ও মতামত দিয়েই এ নিবন্ধ শুরু করতে চাই।

'মুক্তি কথাচিত্রের সময় কাননকে গান শেখানোর সুযোগ আসে আমার। তার আগে অবশ্য একটা রেকর্ড ও আমার সুরে করেছিলো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা তার সেই সময় থেকেই। সেই সময় তার শিল্পী-জীবন সার্থকতার দিকে মোড় নিচ্ছে। তার মানসপদ্মের পাপড়িগুলি যেন একটি একটি করে দল মেলছে। ও গ্রহণ করতে পেরেছিলো। মেয়েদের মধ্যে **সী ইজ দি ফার্স্ট সিংগিং স্টার ইন নিউ থিয়েটার্স**— এই হিসেবে যে ওর অনুভব ছিলো, গানের শিক্ষা ছিলো, অতুলনীয় কণ্ঠ ছিলো..... সবার ওপর ছিলো শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি। কবির কাছে 'দিনের শেষে' গানটি নিজের সুরে গাইবার অনুমতি ভিক্ষা করতে যখন যাই উপরি-পাওনা হিসেবে তিনিই **'আজ সবার রঙে'** ও **'তার বিদায় বেলার মালাখানি'** গান দুটি ঐ ছবিতে ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন। এবং উনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ ছবির নামকরণ করলেন 'মুক্তি'।

এ দুটি সংবাদ পঙ্কজবাবুর—নিবন্ধে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। পুনরুল্লেখ করলাম এই কারণে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিধাতাই হয়ত চেয়েছিলেন কানন দেবীর কণ্ঠে এ সঙ্গীত ধ্বনিত হোক তা না হলে এ হেন যোগাযোগ ঘটলো কেমন করে?

শ্রদ্ধেয় পঙ্কজবাবু আরও বলেছিলেন, এ দুটি গান প্রয়োগের অনুমতি পেতেই আমার কাননের কথাই মনে এলো'— পঙ্কজবাবু বলে চললেন 'আমি যখন ওকে বোঝাতাম 'আজ সবার রং-এ রং মেশাতে হবে' হোলির গান নয়, পূজার গান। মনে কর প্রশান্ত তোমার স্বামী ('মুক্তি' চিত্রে) সে একজন শিল্পী। তার তুলি থেকে সাতটি রঙের যে রং ফুটবে সেই রংয়ের উত্তরীয়খানি দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল। তুমি যে তার সহধর্মিণী, তাই তার শিল্পী-সত্তার নানা রংয়ের বিকাশেই তোমার আনন্দ। **'সেই রাতের স্বপন ভাঙা—আমার হৃদয় হোকনা রাঙা' কেন রাঙা হবে? না, 'তোমার রংয়েরই গৌরবে'।**

কানন খুব মন দিয়ে শুনতো। ওর বিরাট দুটি চোখ যেন স্বপ্নে ভরে উঠতো, সেই মন নিয়ে গাইতো। তাই আজও সেইসব গান তোমাদের মন ভরাতে পারে।

শিল্পীমন বলে একটা কথা আছে। কানন সেই মনের অধিকারী। কোনো গান শেখবার আগে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান প্রশ্ন করে সে গানের মর্মের ভাষা বুঝতে চাইত। এমন জিজ্ঞাসু মন আমি দেখিনি আর কেমন করে শিখতে হয় সেটা আমি কাননের কাছে শিখেছি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিহারের ভূমিকম্পের সময় একবার এক চ্যারিটি শোতে ওকে আমি স্টেজে গাইতে বললাম। ও ছোটো মেয়ের মত কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'এখানে আমি কি গাইব?' আমি বললাম, 'তোমার ঐ সুন্দর প্রশ্নটির মধ্যে তোমার সদাজাগ্রত শিল্পীমন কথা বলেছে।' ও তো ইচ্ছে করলে কোনো ফিল্মের গান গেয়ে অনায়াসলব্ধ হাততালি নিয়ে চলে আসতে পারত? কিন্তু ঐ যে ওর মনে হোলো এই পরিবেশে, এই পট-ভূমিকায় আমি কি গাইব? এখানে ত ফিল্মের গান চলবে না। এইখানেই ও প্রকৃত শিল্পী।

এইত গেলো ওর প্রকৃতির খবর। তাছাড়া প্রথমের দিকে ভালো ওস্তাদের কাছে শিক্ষার দরুন ওর গলার বেস ছিলো দারুণ। উচ্চারণও ছিলো স্পষ্ট এবং সুন্দর।

কানন দেবীর গানের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষও বলেছিলেন 'ও'র শিক্ষা হয়েছে ভালো লোকের কাছে। সেই শিক্ষার গুণটা ও'র গানে পাওয়া যায়।

তারপর কতদিন, কি নিভৃত মুহূর্তে কি কোলাহলের মধ্যে কানন দেবীর রেকর্ড শুনেছি আর ভেবেছি কি যাদু আছে ও'র গানে? ও'র পূর্ণকণ্ঠের (ফুলথ্রোটেড ভয়েস)। শিক্ষার গুণ? না দরদ? যখনই যে গান গেয়েছেন রসোত্তীর্ণ ত হয়েইছে এবং সে রস যেন গহনসঞ্চারী প্রাণরসের মত মর্মের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এক অনাস্বাদিত মাধুর্যে মন ভরে দিয়েছে। 'আমি বনফুল গো'র মত ছড়াজাতীয় গানও যেন ও'র কণ্ঠের সোহাগস্পর্শে প্রাণ পেয়েছে।

একদিন ও'র রেকর্ডের স্তূপ নিয়ে শুনতে বসেছিলাম আধুনিক, চিত্রগীতি, ঠুংরী, দাদরা থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-সংগীত সব গানই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবমাধুরী কানন দেবীর তুলনাবিহীন কণ্ঠে যে উতলা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো তারই রেশ আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে শ্রোতাদের মনে। **'আজ সবার রংএ'** কি সবার মনে এমন রং ছড়াতে পারতো যদি না ঐ যাদু কণ্ঠে অনুরণিত হোতো? 'বিদায় বেলার মালাখানি' 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', 'তোমার সুরের ধারা' 'আমার বেলা যে যায়', 'সেদিন দুজনে' এমনি কত গান ভাবে সুরে, অনুভবের গভীরতায় মনকে যেন কোথায় নিয়ে যায়? 'তার বিদায় বেলার মালাখানি'র কথাই ধরি। গান শুরু হোলো যেন জমাট স্তব্ধতার মধ্যে। সযত্নরুদ্ধ নিভৃত বেদনাকে ব্যক্ত করায় সসংকোচ মাধুর্যে। তারপর আত্মহারা চিত্ত অজান্তে কখন কোন মীড়ের সূক্ষ্ম শ্রুতিতে, অস্ফুট গুঞ্জনের ভাষায়, (বুকের কাছে পলে পলে) কোথায় কোন পর্দায় ওপর আলতো ছোঁয়া লাগিয়ে কোথাও জোর দিয়ে ব্যঞ্জনায় বিস্তারে (গন্ধ তাহায় ক্ষণে ক্ষণের পরই জা-আ-গে স্তে) উদ্গত অশ্রুরোধের ক্ষণবিরতি। পরমুহূর্তেই যখন তার সপ্তকে (ফাগুন সমীরণে) পৌঁছয়, মনে হয় যেন কত রংবাহারের ঝিকিমিকি, আলো, রং, ছায়া মিলে লক্ষ ঝাড়ের নানারঙা আলো, ছড়িয়ে দিয়েই মিলিয়ে গেলো। কানন দেবীর গান যতবারই শুনি **'ক্যালিডোস-স্কোপিক বিউটি'** কথাটা মনে আসে। সে কি তাঁর ডাইনামিক একসপ্রেসনের কারণে?

ক্ল্যাসিক্যাল গানের কোনো এক শীর্ষ-স্থানীয় শিল্পী কানন দেবী ও লতা মঙ্গেশকারের গলার তুলনা করে বলেছিলেন দুজনের একজাতের গলা। কিন্তু লতার গলার যে লিমিটেশন আছে কানন দেবীর কণ্ঠে তা অতিক্রম করে অলংকৃত হয়ে উঠেছে। দুজনের গলাই উঁচু সুরে বাঁধা। কিন্তু কানন দেবীর কণ্ঠে সুর যেন মহামূল্য বেনারসী সাড়ীর মত জমকালো। লতার গলা একটু পাতলা। কিন্তু কানন দেবীর ভরাট এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। লতা মঙ্গেশকরের গলা সময়ে সময়ে একটু শ্রিল শোনায়, যদিও সেটা শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু এই শ্রিলনেস কানন দেবীর গলায় স্মুথ হয়ে যেন পালিশের মত ঝকমক করছে। আর কি অরনামেনটেশন।

এই 'অরনামেনটেশন' কথাটি আমার মনকে খুব স্পর্শ করেছিলো। যখন গান বুঝতাম না তখনও একটা নাম-না-জানা ভালো লাগার দরজায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম ও'র গান। [illegible] মনে হোতো প্রতি চরণের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে অলক্ষ্যে যেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মত নানা যন্ত্রের অর্কেস্ট্রা বেজে উঠছে। সে কি ঐ অরনামেনটেশনের ফলশ্রুতি?

কানন দেবীর কণ্ঠে আবেগের তীব্রতা ফুটে ওঠে পংকজবাবুর ভাষায়। হীরক-দ্যুতির মত, তবু মাধুর্যের অভাব ছিলো নাত। খোলা গলা, কিন্তু কাঠিন্য নেই এতটুকু! 'এতদিন যে বসেছিলেম গানটির অন্তরায়

'গন্ধে উতল হাওয়ার মত

উড়ে তোমার উত্তরী
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী'—

কানন দেবীর দীপ্ত অগ্নিশিখার মত কণ্ঠস্বর কি রসিক শ্রোতা কোনোদিন ভুলতে পারবে? না ভুলতে পারবে 'মঞ্জরী' কথাটির উচ্চারণের সৌন্দর্য? মন্+জরী— এখানে ব্যাকরণের ভাষায় বিপ্রকর্ষ হয়ে গেছে। তাতেই যেন 'মঞ্জরী'র দোদুল্যমান রূপটি ফুটে উঠেছে।

এই রকম ছোট্ট কাজ, সূক্ষ্ম শ্রুতিতে যেমন গীতিকাব্যের মধুরতা—আবার ওপরের

পর্দায় পৌঁছলে সেতারের সাতটি তার বেজে ওঠার শব্দন-মাদকতার সমন্বয় ঐ একটি কণ্ঠেই মেলে। রেঞ্জ এবং ভল্যুমে দুটি সম্পদেই তিনি ঐশ্বর্যময়ী।

ওস্তাদ আল্লা রাক্কো, কৃষ্ণচন্দ্র দে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, রাইচাঁদ বড়াল, দীলিপকুমার রায়, অনাদি দস্তিদার, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখ গুণীদের শিক্ষায় পরিমার্জিত তাঁর বিধিদত্ত কণ্ঠ, সুরের আবেগ, উচ্চারণ, সর্বোপরি শিল্পীর আপনহারা অনুভবে ডুবে প্রত্যেকটি গানই যেন রং ও রসের সমুদ্রে স্নান করে উঠেছে।

'সবার রঙে' ও 'বিদায়বেলার মালাখানি' দুটি বিপরীতধর্মী ভাবের গান তাঁর কণ্ঠে যেমন গভীর মাধুর্যে লীলায়িত, তেমনই 'আমার বেলা যে যায়' ও 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে'র একটিতে আত্মসমর্পণের আবেগ ফুটে ওঠে। অন্যটিতে দার্শনিক ভাবের ধ্যানস্তব্ধতার অতল মৌনতা গোধূলির রাঙা আলোয় রহস্যমধুর হয়।

'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'-এর মত হাল্কা মেজাজের গানে প্রেমিকার অন্তরে ও বাইরে বিপরীত ভাবের রূপবর্ণনায় কৌতুকের সূক্ষ্ম সুরটি অনুভব করা যায়। 'মর্মে যে ক্রন্দনধ্বনি'-তে মন্দ্রসপ্তকের প্রান্তে অস্ফুট স্বরে আত্মগোপনের বিরতির পরই পূর্ণ আবেগে 'মালা যে দংশিছে হায়'-এর উচ্চগ্রামে পৌঁছেছে (যে পর্দায় যাওয়া রীতিমত আয়াসসাধ্য)। আবার 'শয্যা যে কণ্টকশয্যা'-তে যখন নেমে এলো মনে হোলো সুরের লীলাবিহারিণী যেন খেলার ছলেই এক লাফে আকাশ ছুঁয়ে এলো। গলার ওপর কতটা দখল থাকলে এ-বস্তু সম্ভব—সংগীতরসিক মাত্রেরই তা জানা।

'রবীন্দ্রসংগীতকে এমন একান্তভাবে ভালবাসতে পারলেন কেমন করে?'—'সুরের আগুন'-এর জন্য সাক্ষাৎকারে এইটেই ছিলো কানন দেবীর কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন।

'একান্তভাবে কথাটা আমার ক্ষেত্রে খাটে না। অন্ততঃ যখন রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলাম, তখন একথা বলা চলত না। বরং এখন এই মুহূর্তে বলতে পারি—ক্লাসিক্যাল গান বাদ দিলে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া শোনবার যোগ্য গান নেই। অবশ্যই নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের মত কয়েকজন মরমী স্রষ্টার গান ছাড়া।

'এখন গানের জগৎ থেকে ছুটি নেবার পর যে-কথা বলতে পারেন—দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করবার সময় সে-কথা বলতে পারতেন না কেন?'

'সে-প্রশ্নের জবাব পরে দিচ্ছি। তার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখি সংগীতের ক্ষেত্রে আমি **একেশ্বরবাদীয়ে বিশ্বাসী নই**. এখানে আমি বহুবল্লভী। সংগীত যদি একটা সমুদ্র হয়, তবে প্রতিটি ঢেউ-এর দুরন্ত উচ্ছ্বাসে দোলায় দুলতে আমার যতখানি ভালো লাগে, ঠিক ততখানিই ভাল লাগে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের শান্তরূপের অতলে তলিয়ে যেতে। জোৎস্না রাতে যখন সমুদ্র থেকে বেলাভূমি অবধি আলোয় ভেসে যায়, তখন সমুদ্রতীরে বসে থাকতে ভাল লাগে না কার? কিন্তু জ্যোৎস্নাহীন রাতে আঁধার-কালো প্রকাণ্ড ঢেউগুলো যখন আলোর মুকুট পরে নাচতে নাচতে এসে তীরের বুকে ভেঙে পড়ে—আমার যে কি দারুণ থ্রিলিং লাগে বলতে পারি না। আর ঢেউ-এর এই ওঠাপড়া, অন্ধকারের জোয়ার আলোর নূপুর বাজানো জ্যোৎস্না-রাত—এই সব মিলিয়েই মহাসমুদ্র।

সংগীতের ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্রসংগীত গাইতে আমার ভালো লাগতো নিশ্চয়ই: কিন্তু সে-সময় অন্য যেসব গান গাইতাম সে-সব গানের ওপরও আমার কিছু কম আকর্ষণ ছিলো না। মুক্তির কথাই ধরনা! এ-ছবিতে পপুলার হয়েছিলো 'আজ সবার রং-এ'। কিন্তু আমার গাইতে অনেক বেশী ভালো লাগতো 'ওগো সুন্দর' (সজনীকান্তবাবুর লেখা)। ও-গানটা যেন আমায় হন্ট করতো......

কানন দেবীর কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশ্রুতিতে যেন বেজে উঠলো—

'আঁধারে আলোকে যুগ যুগ ধরি প্রিয়
বিরহমিলনে চিরদিন জানাজানি'

এখানে বিরহের 'র'-তে জোর দিয়ে দিয়ে 'মিলন'-কে আলতোভাবে ছুঁয়ে 'জানাজানি'র শেষে ছোট মীড়ের উদ্দাম টানে যে উদাসী ব্যাকুলতার যে চকিত আভাস ঝলকে ওঠে, তার তুলনা কই?

কিন্তু এখানে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। 'ওগো সুন্দর' গানটির বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কি কোনো তফাৎ আছে?' ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা'-র বার্তা নিয়েই ত রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্য। অন্য গান বলতে যদি আধুনিক বা ভাবসংগীতকে বোঝান—তবে তার নাম দেওয়া যাক 'সমসাময়িক কালের গান'। রবীন্দ্রনাথ ত তার বাইরে নন।'

'আমিও ত সেই কথাটাই বলতে চাই, এঁরা সবাই মিলে একটি পরিবার—রবীন্দ্রনাথ তাদের গুরু। তোমরাই রাবীন্দ্রিক অমুক, তমুক বলে গানের জগতে পার্টিশন করা ছোট ছোট ঘর তুলে—সিভিল-ওয়ার বাঁধিয়ে তুলতে চাও। আমি সামান্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধি কোনোটাই নেই। শুধু এইটুকুই বুঝি আলাগোছে সবার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চারদিকে স্বতন্ত্র দেয়াল তুলে—নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজা উড়িয়ে তিনি চলতে চাননি। 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে' সেই ঘরই সারাজীবন ধরে খুঁজেছেন। নানা রাগ, নানান ছাঁদের গানের অচিনলোকে ছিলো যেন তাঁর অবাধ আনাগোনা। তাবই পুলক রোমাঞ্চ আবেশ ও আনন্দ ছড়ানো কবির গানে।

'এই ত বেশ বলছেন। তাহলে এতক্ষণ ধরে এ অধমের সংগে ছলনা করছিলেন কেন যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আপনার বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিলো না?'

'ছলনা ঠিক নয়—মানুষ অনেক সময় অনেক গোপন বেদনার তাগিদে অনেক কথা বলে ফেলে যায়—সবটা সত্যি নয়। কারণ—এ অনুভূতি সম্বন্ধে সে নিজেও সবসময় সচেতন নয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক—'

'থাকবে কেন—কবির গানকে ভালবেসেছেন—সে কথা স্বীকার করতে এত কুণ্ঠা কিসের?'

'কুণ্ঠা হয় কি সাধে? মনে আছে ভুলাদা ('প্রশান্ত মহলানবিশ) একবার আমারই আব্দারে কবির একখানি ছবি তাঁর অটোগ্রাফ করে এনে দিয়েছিলেন। তাই নিয়ে উঁচু মহলে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিলো—কেন একজন চিত্রাভিনেত্রীর কাছে কবির নিজের হাতে স্বাক্ষরিত ছবি থাকবে? কোলকাতা থেকে অনেকে ট্রাংক কল করেও তাঁকে উত্ত্যক্ত করেছেন। সেই প্রথম নিজের ওপর ধিক্কার এসেছিলো—আমি অতবড় মানুষটার অশান্তির কারণ হলাম। তাক না তা সাময়িক। চলাম তো? ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিলো—রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান আমার মত সামান্য মানুষের জন্য নয়। ও সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানের জন্য। যা আমার নয় তার জন্য লোভ করবার দরকার কি? তারচেয়ে গরীবের ভাগ্যে যেটুকু ক্ষুদ কুড়ো জোটে তাই নিয়ে খুসী থাকাই ভালো।'

'তারপর?'

'তারপর—এক-একটি ছবির জন্য যখন মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে হোতো তখন নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলতো। একটা—অনামী অভিমানে সারা হৃদয় ছেয়ে আসত। এ অভিমান কেন? কার ওপর? তাও ঠিক বুঝতাম না। অথচ এ গান গাইব না—এমন কথা ত বলা যেতো না। কারণ সেটা স্পর্ধার মতই শোনাবে। —অতএব গাইতে হোতো। সে এক মজার অনুভূতি! যেই না গাইতে সুরু করতাম—অমনই বিদ্রোহী মনের রুক্ষ-ভাব উদ্ধত অভিমান কোন মন্ত্রবলে যেন গলে যেত

অশ্রু মেঘে। জোম এক আশ্চর্য দেশে যেন ঋত্বিকের জন্য প্রবেশাধিকার পেতাম।' মনে হোতো আমার মনের কথাটিরই কি আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ। আমার কথাটির মধ্যে কেউ যেন আবার ইগোইজমের ম্যালাসি করে না বসেন। আমি বলতে চেয়েছি—আমাদের সকলের মনের কথা। গান গাইবার সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। এই প্রসংগে মনে পড়ছে 'এই লভিনু সংগ তব' গানটি। 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর'—গাইবার সময় গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠতো।' জীবনে আচম্বিতেই এক-একটা বৈপ্লবিক চেতনা আসে। উপলব্ধির সেই পূর্ণিমা-লগ্নে মনে হয় যেন অন্তহীন বেদনা-পাথার পেরিয়ে এক জ্যোতির্ময়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এতপথ এক জনমে পার হওয়া যায় না—তবু যে হলাম একো তাঁরই করুণা। শিখর ও গহ্বর যেন হাত ধরাধরি করে চলে এই করুণারই প্রসাদে।...আবার গান শেষ হবার পর সম্বিৎ ফিরে এলেই চমকে উঠতাম এ কার গান গাইলাম? এ গান ত আমার গাইবার অধিকার নেই। তাহলে এত অভিভূত হলাম কেন?—নিজের সংগে যেন লুকোচুরী খেলা চলতো।'

এবার অন্যমনস্ক হবার পালা আমার' এমন ভক্তিনত চিত্ত বলেই কি 'তিমির দুয়ার খোলো' 'আমাদের যাত্রা হোলো সুরু' 'তোমার সুরের ধারার' গানগুলি তাঁর কন্ঠে এমন অনুপম মাধুরীতে বিকশিত? যে কোনো রবীন্দ্রসংগীতে যখনই তাঁর কন্ঠে শুনেছি মনে হয়েছে এ যেন একান্তভাবে কানন দেবীরই গান। তবু তিনি বলছেন—রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কাছে একমেবাদ্বিতীয়ম নয়?

'আপনার নিজের প্রোডাকশনেও ত আপনি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন। তবু এ গানের ওপর এত অভিমান?

'প্রোডাকশন করবার অনেক আগেই আমার অভিমানের বদলে তাঁর আশীর্বাদের মালা পাওয়া হয়ে গেছে।'

'কেমন করে?'

'সে এক স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে রবীন্দ্রনাথ রেকর্ড করাতে আসছেন শুনে অগণিত মানুষের ভীড় জমেছিলো। দর্শনার্থীদের মধ্যে আমিও একজন। ভুলদার ভাই বুলদা আমায় সংগে করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রণাম করতেই চিবুক ধরে আদর করে বললেন 'কি মিষ্টি মুখখানিগো তোমার? তুমি গান গাইতে পার?' ওখানেই অনেকে বলে উঠলেন 'গুরুদেব ছবিতে আপনার একটি দুটি গান গেয়ে ও চারিদিক মাতিয়ে তুলেছে?' উনি হেসে বললেন 'তাই নাকি? আমাকে একদিন তোমার গান শোনাও।' তারপর ভুলদার ভাইকে ও অনিলদাকে (চন্দ) বললেন, 'একে একবার শান্তি-নিকেতনে নিয়ে এস। খুব ভাব করে নেব।' সেই মহাপুরুষের স্নেহ-ঝরা দৃষ্টি ও স্পর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো যেন—আলোর সমুদ্রে স্নান করছি—'

এরপর মনের মধ্যে আর কোনো অভিযোগ অভিমান কিছুই ছিলো না। মনে হোলো তিনি আকাশ আর সে আকাশ এতই উঁচুতে যে কোনোরকম মালিন্যের মেঘ সেখানে পৌঁছতেই পারে না। অন্তর্যামী বলেই বুঝি। আমার মত নিরাভিমানীদেরও কাছে এসেছিলেন সকল দুঃখকে শুভ্র করে দিতে। এ ঘটনার পর তাঁর গান গাইতে গেলেই মনে হোতো'...

'থামলেন কেন?'

'নাঃ থাক। বড্ড সাজানো কথা বলে মনে হবে।'

'আপনি সাজানো বাঁচানো পোজের ধার ধারেন না—আপনার ভক্তমাত্রেরই এ খবর জানা। তবু যদি কেউ ভাবেন সে দায়িত্ব আপনার নয়।'

'মনে হোতো যেন তাঁকেই শোনাচ্ছি। অবশ্য এরকম ধারণার মূলে পংকজবাবুর অবদানও বড় কম ছিলো না। রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম দীক্ষা ওঁরই কাছে। আর ওঁরই কাছে আমার প্রথম শেখা গান 'আজ সবার রং-এ'। শেখাবার সময় কি সুন্দর করে যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের দর্শন বুঝিয়ে দিতেন। এছাড়া উনি সব সময় আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন মনে রেখো মুক্তি কথাচিত্রেই তুমি প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শোনাবে অগণিত মানুষকে আর শোনাবে সেই গান যে গান স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কবি উপহার দিয়েছেন এ ছবিতে গাইবার জন্য। এতবড় অধিকারের অমর্যাদা যেন না ঘটে। মনে রেখো তোমার জন্যই কবি এই গান দুটি দিয়েছেন।'

'আমার জন্য কেন বলছেন?'

'নইলে তোমায় দিয়ে গাওয়াবার কথাই বা আমার মনে এলো কেন?'

'পংকজবাবু শুধু বড় শিল্পীই নন শিল্পী ছাড়াও শিল্প সম্বন্ধে যে বাস্তববোধ থাকলে—একাধারে গান গাওয়া ও শিক্ষা দানের নিশ্চিত সার্থকতায় পৌঁছানো যায় সেই বাস্তববোধ ছিলো বলেই পংকজবাবুর গাওয়া এবং শেখানো প্রতিটি গান যুগের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। রবীন্দ্র-সংগীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলাম বোধহয় পংকজবাবুর বারংবার উচ্চারিত সাবধান-বাণীর দরুনই। নিখুঁত উচ্চারণ সুরের প্রতিটি শ্রুতির স্পষ্টতা ছাড়াও গলার স্বরের বিভংগ কোন পর্দার কি সেন্টিমেন্ট এসব দিকেও ওঁর সদাসজাগ দৃষ্টি থাকত।'

এখনই যে বাস্তববোধের কথা বললেন, সেটা কি রকম? আর গান গাইতে গেলেই কবি শুনছেন মনে হবার লিংকটা আর একটু স্পষ্ট করুন না?'

শ্রদ্ধেয় পংকজবাবু বলতেন কোনো গান গাইতে হ'লে সে গানের রচয়িতা কি বলতে চাইছেন বুঝে নিতে হবে। মনে কর কবি এ গান দুটি দিয়ে যে কথা বলতে চান—তা তোমারই জন্য। দুজনের এই আন্ডার-স্ট্যান্ডিংটা নিবিড় না হলে গানে রং ফোটে না। গানের বক্তব্য যা বলছে সে বোঝে আর যাকে বলবে সে। উনি ভারী সুন্দর একটা গল্প বলতেন। একটি গ্রামের মেয়ে বেশ কিছুটা লেখাপড়া শিখে শ্বশুরবাড়ী গেছে। সে যে লেখাপড়া জানে একথা তার স্বামী ছাড়া কেউই জানেন না। একবার স্বামী গেছেন বিদেশে। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেছেন পক্ষকাল বাদে ফিরবেন। পক্ষকাল গেলো। কিন্তু তিনি ফিরলেন না। মেয়েটি তখন দুই পংক্তির একটি কবিতা লিখে শ্বশুরকে দিয়ে বলল—'বাবা দেখুন ত এটা ওঁর খুব দরকারী কাগজ অথচ নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। আসতে যখন দেরী হচ্ছে পাঠিয়ে দিন। কাগজে লেখা ছিলো—

'মন পাব বলে মন সঁপেছিনু তোমা পদে
বেদ পক্ষহীন তুমি নাহি জানি স্বপনে।'

শ্বশুর পড়ে কিছু বুঝলেন না। কোনো দরকারী কাগজপত্র ভেবে ছেলের কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি পড়েই স্ত্রীর মনের কথাটি বুঝে নিলেন। তারপর মৃদু হেসে উত্তর পাঠালেন—

'ভুবনে ভুবন দিয়া বাণে-চন্দ্র মিশাইয়া
রস তাহে নিঙাড়িয়া ভালবাসি বয়ানে।'

'বেদপক্ষহীনের অভিযোগের' উত্তর ছিলো।

'বানে চন্দ্র মিশাইয়া—কিন্তু এই উত্তর প্রত্যুত্তরে ভাষা যে বলছে সে বোঝে আর যাকে বলছে সে।

পংকজবাবুর এই গল্পটি আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো। তারপর থেকে গাইবার সময় অনুভব করবার চেষ্টা করতাম—কি বলেছেন এ গানের স্রষ্টা? এ গানের মধ্যে এমন কি কথা আছে যা আমার উদ্দেশ্যে লেখা?'

'কি বুঝতেন?'

'গান দিয়ে যদি সে কথা বোঝাতে না পেরে থাকি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার বিড়ম্বনার মধ্যে না ঢোকাই ভালো।' —কানন দেবীর কন্ঠে অভিমানের সুর।

'বক্তৃতার প্রশ্ন নয়। আপনার উপলব্ধিতে আমাদের ভাবকল্পনাকেও একটু শানিয়ে নেবার ক্ষীণ আশায় বলছি।'

আমার কথা বোধহয় কানেই গেলো না—অন্যমনস্কভাবে তাঁর অপরূপ আলোছায়া-ভরা কন্ঠে বলে গেলেন 'অধিকাংশ সময় কিছুই বুঝতাম না। সেই অক্ষমতার বেদনাকে গোপন রাখবার জন্যই হয়ত বড় বেশী তীব্র হয়ে পড়তো এক-একটা এক্সপ্রেশন।'

'আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তার উল্টো' অন্তরবাসী দেবতা চোখের সামনে আবির্ভূত না হলে এ আবেগ কন্ঠে আসতে পারে না।'

'যদি এসে থাকেন তাঁর করুণাতেই এসেছেন—আমি তাঁর যোগ্য নই।

যখনই রবীন্দ্রসংগীত গাইতাম মনে হোতো রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস রচয়িতার আলোকসম্ভব এস্থেটিক সেন্স এমন একটা অপার্থিব সৌন্দর্যচেতনা যার তুলনা নেই। এই কথাটা যখন ঠিকমত ভাবতে পারি তখনই বুঝি আমাদের কত সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি। নৈলে এমন আকাশ ছোঁয়া কল্পনাকে ভাষায়

রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

[illegible] সুরের বন্ধন [illegible] বৈচিত্র্য রয়েছে। তার মধ্যে [illegible] একটা ছাপ থাকবে। এইটেই তাঁর গায়কী আর আমি মনে করি যেহেতু রবীন্দ্রনাথ থাকেন সুরের মত কথারও একটা গায়কী আছে এই দুইটিকে মিলিয়েই রবীন্দ্রসংগীত। এই দুটিকে যিনি যতবেশী বলিষ্ঠ করে তুলে রবীন্দ্র উপলব্ধির দ্বারে শ্রোতাদের মনকে পৌঁছে দিতে পারবেন তিনিই ততখানি সুকণ্ঠী-রূপে গায়কী সৃষ্টির গৌরব অর্জন করবেন। রবীন্দ্র গায়কীর এই বৈশিষ্ট্য ঠিক কি সেটা বুঝিয়ে বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। মুক্তির পর রবীন্দ্রসংগীতে আকৃষ্ট হয়ে অনাদিদাদার কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখতে সুরু করি।

পংকজবাবুর কাছে নয় কেন ? তিনিই ত এ ক্ষেত্রে আপনার পথদ্রষ্টা ?

পংকজবাবু তখন ছবির কাজ, রেডিও রেকর্ড-এর পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। আলাদা করে শেখাবার মত অবকাশ তাঁর ছিলোনা। যাইহোক অনাদিবাবু আমায় খুবই স্নেহ করতেন আর শেখাতেনও ভারী যত্ন করে। —মনে পড়ে উনি কোনো গান শেখালে সে গান গাইতে গিয়ে যদি ভাবাবেগে অত্যধিক মীড় বা অলংকার লাগিয়ে ফেলতাম উনি হেসে বলতেন এটা করেছ সুন্দর কিন্তু এখানে এ জিনিষ চলবেনা।”

“কেন চলবেনা বুঝিয়ে দেবেন ?” অল্প বয়সের অহমিকার ফেরেই তর্ক তুলতাম। সব গানেরই একটা নিজস্ব জাত আছে তাকে বাঁচিয়ে গাওয়া কর্তব্য।

এ কথা উনি বলেছিলেন আবার অনেক পরে যখন আরও অনেক বেশী অলংকরণ করে গেয়েছি উনি তারিফই করেছেন। আমি প্রশ্ন করেছি “আমি এত কাজ দিয়ে গাইলাম আপনি আপত্তি করলেন না ?”

উনি বললেন এসব কাজ গানের ভাবের সংগে এত সুন্দর সংগতি রেখেছে যে আপত্তি করবার কোনো উপায় নেই। তোমার গানে এখন অসম্ভব ম্যাচুরিটি এসেছে। আর যা বলেছিলেন না বলাই ভালো। কারণ তিনি এখন নেই। এসব কথা বানানো বলে মনে হতে পারে। যাক যা বলছিলাম আমি আগেও যতখানি নিষ্ঠার সংগে গাইতাম তখনও তাই। কিন্তু এই ম্যাচুরিটি কখন কিভাবে গানে এসে আগের গানের সংগে তখনকার গানকে আলাদা করে দিলো সে রহস্য সেদিনও যেমন বুঝিনি আজও বুঝি না। তাই গায়কী রবীন্দ্রিক —এসব নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন না করাই ভালো। আমার কাছে ও সবের কোনো অর্থ নেই।

সকলে এত শ্রদ্ধা ও আগ্রহে আপনার গান শুনতে চান আপনি তাঁদের নিরাশ করেন কেন ?

ঐ শ্রদ্ধা ও আগ্রহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই।”

[illegible] ?

সব শিল্পীরই উচিত নিজের [illegible] থেকে [illegible] শিল্পীদের [illegible] সুরটিকে [illegible] বর্তমানে [illegible] এগোলে সে ছবি অনাহত থাকবে সকলের মনে আশা থাকবে। অতীত গৌরবের প্রতিধ্বনি হয়ে বেঁচে থাকায় আমার কোনো লোভ নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে আমি অনন্ত যৌবনের ভাবনাতেই বিশ্বাসী।

এই প্রসঙ্গেই বলি এখন যদি গাইতাম সে গানে আগেকার রং, আবেগ মাদকতা কখনই ফুটে উঠতে পারত না। কিন্তু বিদগ্ধ-শ্রোতারা আমার* বয়সের প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে বলতেন 'বাঃ কানন দেবী এখনও কি সুন্দর গান।' তোমারাও ভদ্রতা করে কাগজে সুখ্যাতি করে দু-পাঁচ কথা লিখতে। আর সেইটেই হোতো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি। শিল্পীকে শ্রোতাদের সৌজন্যবোধের উপর নির্ভর করে গাইতে হয়—এমন স্টেজে পৌঁছবার আগেই তাঁদের আসর থেকে সরে আসা উচিত। ক্ষমতার শেষপ্রান্তে এসেও মঞ্চ আঁকড়ে পড়ে থাকার সখ প্রৌঢ়ের লালসার মতই ভয়াবহ ও ঘৃণ্য।

শুনেছি আজকাল অনেক শিল্পী কাগজের কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন কেন তাঁর চেয়ে অন্যকে বেশী কমপ্লিমেন্ট দেওয়া হলো অথবা তাকে কেন যথেষ্ট পাবলিসিটি দেওয়া হোল না। শুনে এত লজ্জা করে। এঁরা ত আমারই আত্মার তুল্য। কেন এঁরা ভুলে যান গান শুনে গুণগ্রাহীরা গুণের প্রতি সম্মান দেখিয়ে জয়মাল্য পরিয়ে দেওয়ায় যতখানি গৌরব ঠিক ততখানি অগৌরব কলহ দিয়ে জোর করে প্রশংসা আদায় করে নেওয়ায় ? 'অপরাজিত' গল্পের কবি রাজসভার অবিচার নীরবে মেনে নিয়ে চলে এসেছিলেন বলেই মরণমুহূর্তে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছিলো স্বয়ং রাজকুমারীর হাতের বরণমালায়।—এসব কথার উত্তর কবি কতদিন আগেই রেখে গেছেন তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে।' একটু থেমে আত্মগতভাবেই শিল্পী বলে চলেন, 'তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে বহুমুখী প্রতিভা না বলে সর্বতোমুখী প্রতিভা বলাই ভালো। তাঁর সীমাহীন দাক্ষিণ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রাজপথগুলিকেই নয় অলিগলিকেও আলোকিত করে গেছেন। সমৃদ্ধ করে গেছেন তাঁর রসালো ফুলে ফলে পাতায়।'

আপনি যে যুক্তিই দিন আপনি শোনবার মত গান এখনও গাইতে পারেন না—একথা আমরা বিশ্বাস করি না।'

'একমাত্র গান আপনমনে গাইবার ছাড়া জোর [illegible]কে (ও'র স্বামী) শোনানো যায়। আসর নয়'। তারপর একটু হেসে বললেন, 'এখন এত শক্তিশালী শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে যে এ অভাব খুব অধিক [illegible] যদি [illegible] নীলিমা, [illegible] এবং [illegible]—[illegible] দিয়ে [illegible] করেছেন। [illegible] শিল্পীদের হয়ে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের [illegible] পৃষ্ঠপোষকতে আপনার অনুজ সহকর্মীকে নিজেদের [illegible] স্বাধীনতা দেবার জন্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যান্য অনেক অবদানের মত এ অবদানও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

'রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ ?'

শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই। মানুষ প্রকৃতিতে বহুমুখী। একই বিষয়ে চিরদিন অটলপ্রতিষ্ঠ থাকতে পারে না। মানুষ মুখী রুচির তৃষ্ণা মেটাবার তাগিদেই হয়ত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কিছুদিন সরে যেতে পারে। ক্ষনবিরতির পরই আবার নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের রসগ্রহণে আগ্রহী হবে। 'তোমার নূতন করে পাব বলে হারাই ক্ষণেক্ষণ।'

এই বিষয়ে আর একটি বক্তব্য, প্রথম সারির শিল্পীদের বাদ দিলে পরবর্তী শিল্পীরা সত্যিই বড় অসহায়। এ সম্বন্ধে কণিকা ও মায়ার সংগে আমিও একমত।

পরবর্তী যুগের শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজে সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসুন। অর্থ-সামর্থ্য সম্বরণ আনুকূল্য দিয়ে এদের উদ্যমকে সার্থক করে তুলুন। নিজেদের চেষ্টায় অনেক বাধা ঠেলে তারা এতদূর এগিয়ে এসেছেন বাকীটুকু আপনারা করলেই বা।

গত সপ্তাহে [illegible]মন্দির ও রবীন্দ্র-সদনের দুটি আসরে ঋতু ও সুমিত্রার (সেন) গান শুনলাম। দুজনেই অপূর্ব। একজনের উচ্চগ্রামের খোলা গলা যাকে বলে সর্বালংকারভূষিতা। দাপটে, বিভবে একেবারে ঝলমল করছে। সুমিত্রা তার বিপরীত। শুনে তুলনা দিতে ইচ্ছে করছিলো কবিরই একটি কবিতার চরণ দিয়ে 'এসো সুন্দর নিরলংকার'। অলংকৃত সুন্দর কিন্তু কি মধুর আর ভাবসিক্ত। এমনই আরো কত রত্ন নিশ্চয় আছে বনানী, বাণী, গীতা ঘটক। সেদিন , শর্মিলা রায়ের গানও ভারী ভালো লাগলো। সবাইয়ের গান তো সব সময় শোনা হয় না। অর্ঘ্যর গান খুব প্রাণবন্ত, সুশীলের গান একবারই শুনেছি। আরো শুনতে ইচ্ছে করছিলো। ঈশ্বর এঁদের সকলের প্রচেষ্টাকে সার্থক করুন। কোনো অবাঞ্ছিত বাধায় এঁদের তারুণ্য যেন বিড়ম্বিত না হয়। এঁদের মধ্যেই ত আমরা বেঁচে থাকব।'

[illegible]

প্রাচীন জার্মানীর ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য ঃ

প্রাচীন রোমের স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ টাসিটাসকে ইয়োরোপের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য লেখক মনে করা হয়। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর কলোন শহরের এক প্রদর্শনীর কয়েকটি দ্রষ্টব্য বস্তু দেখে আজকের অনেক ইতিহাসবিদ টাসিটাস লিখিত তথ্যের সারবত্তা সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়নের কথা বলছেন। টাসিটাস লিখে গেছেন যে প্রাচীন জার্মানরা ভাস্কর্য শিল্পের সন্ধান জানত না; এবং মাটি, পাথর বা কাঠ—কোনো মাধ্যমেই তারা কখনো কোনো মূর্তি তৈরি করে যায়নি। কিন্তু কলোনের প্রদর্শনীর দুটি কাঠের মূর্তি অন্ততঃ ২৫০০ বছর আগের তৈরি বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন। মূর্তি দুটি দেব-দেবীর। জার্মানীর এক জলাভূমি অঞ্চলে মূর্তি দুটি পাওয়া যায়। একই সংগে তিনটি মমিও পাওয়া গেছে। সেগুলিও কমবেশী ২৫০০ বছর আগের। এই প্রাচীন বস্তুগুলি শ্লেসউইগ-হল্‌স্টিন মিউজিয়মের।

ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক পাঠ্যবই প্রকাশের আয়োজন ঃ

১৯৭০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগ ও অর্থানুকূল্যে প্রায় ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যবই প্রকাশ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে আশা করা যায় যে ভারতীয় লেখক কর্তৃক লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের অন্ততঃ তিনশখানা বই প্রকাশ করা যাবে। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, এঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি-বিজ্ঞান ও ভেষজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বইগুলি এই পরিকল্পনায় প্রকাশের অগ্রাধিকার পাবে বলে জানা গেল। এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণের জন্য বাঙালী লেখক এবং প্রকাশকগণ নিশ্চয়ই তৎপর হবেন।

পুরনো পত্রিকার প্রদর্শনী ঃ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়মের উদ্যোগে সম্প্রতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে এ-রাজ্যের পুরনো সাময়িক পত্রাদির একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী হয়ে গেল। [illegible] প্রদর্শিত নিদর্শন, কবি ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাটি, (বৈশাখ ১২৮০) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট, ধর্মতত্ত্ব, বালক, ভারতী, সাহিত্য, হিতবাদী, সাধনা, মানসী ও মর্মবাণী, বিচিত্রা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকা।

পরলোকে প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক

প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতে পাঠকের একটি পরিচিত নাম। গত ৮ জুলাই তিনি লণ্ডনে পরলোকগমন করেছেন। কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবন ছিল বিচিত্র এবং বৈশিষ্ট্যময়। এক সময় তিনি আসামের সুবর্ণসিঁড়ি সাব-ডিভিসনের এক চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'সুবর্ণসিঁড়ি' উপন্যাসটি রচনা করেন। 'কাকীয়াৎ' নামে গল্পসংগ্রহটিও তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ঐ দুটি রচনাই 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অমৃতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছেন। সাহিত্য ছাড়াও সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগ ছিল।

জরৎকার,

সিকিমের আদিবাসী লেপচা—অরুণ মৈত্র। এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। আট টাকা।

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল হল সিকিম। দার্জিলিং জেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এই সিকিম অঞ্চল বহুতুত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানে যে আদিম লেপচা জাতির বাস, তাদেরই জীবনাচার, সমাজ-সংস্কার শিক্ষা, সভ্যতা, বিশ্বাস, ধর্মবোধ, আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ—এইসব দিক নিয়ে শ্রীযুক্ত অরুণ মৈত্র তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'সিকিমের আদিবাসী লেপচা' নামের গ্রন্থটি রচনা করেছেন। লেপচারা শুধুমাত্র সিকিমে নয় ভুটান নেপালেও বহু সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে।

লেপচারা হল পশ্চিমবাংলার একটি উপজাতি এবং তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত।

[illegible]

উপজাতিদের ধর্ম, সংস্কার, পাল-পার্বণ, সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি মন দিয়েই দেখতে হয়। তা না হলে ব্যক্তিবিশেষ ও তার সমাজ পরীক্ষা অসম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক থেকে যায়। অরুণবাবুর সাফল্যও এক্ষেত্রে খুবই প্রশংসার যোগ্য। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন নিরাসক্তি নিয়ে একটি বিশিষ্ট উপজাতির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর কঠিন শ্রম ও মৌলিক সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

ইতিপূর্বে বিদেশী বহু জাতিতত্ত্ব গবেষক—যেমন ড্যালটন, মরিস, রিজলে, বিউভেয়ার, এডকার, ওয়াডেল প্রভৃতি লেপচাদের জীবনচর্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের কাছে আলোকপাত করেছেন। তাদের ভাষা সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন গ্রীয়ারসন, মেইনওয়ারিং ইত্যাদি। বেশ কিছু বাঙালী অনুসন্ধিৎসু উপজাতি গবেষক কিছুকাল আগে পর্যন্ত লেপচা জাতির বাইরের দিকের খবর আমাদের শুনিয়ে গেছেন। শ্রীযুক্ত অরুণ মৈত্রর গ্রন্থটি সেখানে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এই কারণে যে, এতে লেপচা জাতির একেবারে ঘরের কথার কিছু নূতন তথ্য আছে যা ইতিপূর্বে কেউ খোঁজ পাননি।

শ্রীযুক্ত মৈত্র গ্রন্থের সামগ্রিক বিষয়কে মোট আটটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। লেপচা জাতির উৎপত্তি ও বর্তমান অবস্থিতি, তাদের দৈহিক গঠন গৃহনির্মাণ ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পেশা, লেপচাদের ভাষা, সমাজব্যবস্থা, ধর্মাচার, লোকজীবন-স্বভাব, হস্তশিল্প ও চিত্রকলা এবং সিকিমে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—এই বিষয়গুলিই প্রধানত অধ্যায়গুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রন্থ মধ্যে বেশ কিছু আলোকচিত্র মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থের গবেষণানুগ মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অরুণবাবুর রচনাভঙ্গি গ্রন্থটির সুখপাঠ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত, সহজ সরল গদ্যে অথচ নিরাসক্ত বর্ণনাভঙ্গিমায় বিষয়বস্তু বর্ণিত হওয়ায় উপজাতি জীবনকথাটি মনোজ্ঞ হয়েছে। ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব একত্রিত হওয়ায় গ্রন্থটি লেখকের রচনা কৃতিত্বের ধারক হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সার্থক পর্যবেক্ষণশক্তি, জাতি সম্পর্কে তীব্র অনুসন্ধিৎসু মন এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক মননসমৃদ্ধ গবেষকের শ্রম ও সততা থাকায় শ্রীযুক্ত অরুণ মৈত্র

[illegible]

[illegible] ঠিকানা (উপন্যাস)। [illegible] পাধ্যায়। জ্যোতি প্রকাশন, [illegible] কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। সাত টাকা।

লেখক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সদ্যপ্রকাশিত নতুন ঠিকানা উপন্যাসে চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কালোবৌদি, তার স্বামী শঙ্কর, আর শঙ্করের সঙ্গে রাগিণীর প্রেম শেষে রাগিণীর সঙ্গে শঙ্করের কাটালপুরের নদী ধরে তিনমোহানার জল-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এক অজানা নূতন জীবনের দিকে অভিযাত্রা এ কাহিনীর চমৎকার অন্তিম পরিণতি। কিন্তু চমৎকারিত্ব শুধু বর্ণনায় বা কাহিনীর ইচ্ছাপূরণ জাতীয় পরিণতি চিত্রে নয়, আছে রাগিণীর সর্বশেষ অন্তর্দ্বন্দ্বে। শঙ্করের শেষ উপহার কালোবৌদির অতি প্রিয় চন্দ্রহার রাগিণীকে দেওয়ার পর রাগিণীর যে মানসিক জ্বালা এবং সেই জ্বালা থেকে মুক্তি তথা বড় জীবনে স্বামী নিয়ে নতুন বিশুদ্ধ জীবনে উত্তরণের যে চিত্র লেখক এঁকেছেন তা চমৎকার।

উদ্ভ্রান্তের ডায়েরী—উদভ্রান্ত। প্রকাশক—রামায়ণী প্রকাশ ভবন। ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা—৯। তিন টাকা।

লেখকের মোট তেত্রিশটি লেখা গ্রন্থটিতে ঠাঁই পেয়েছে। এর মধ্যে টুকরো টুকরো ফিচার 'জোক' ছাড়া সব কিছুই আছে। লেখাগুলি খুবই ছোট ছোট হলেও বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন করাবে পাঠককে। বর্তমান সমাজ সংসার দেশকালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিঠে-কড়া স্বাদের কখনও বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিমায়, কখনও বিষণ্ণ ভঙ্গিমায় এই লেখাগুলি। ভাষা ঝরঝরে। প্রচ্ছদ সুন্দর।

অবক্ষয় : বিভূতিভূষণ কুন্দগ্রামী। প্রকাশক : বিমল কুন্দগ্রামী, মহেশতলা, ২৪ পরগণা। চার টাকা।

একটি শিল্পনগরীর পটভূমিকায় এই কাহিনীর বিন্যাস। কাহিনীতে অনেকগুলিই চরিত্র এসেছে, বিভিন্ন ধরনের। কেউ স্থানীয় কেউ কেউ বহিরাগত। প্রত্যেকটি চরিত্রকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখানো হয়েছে। কোনটিই সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েনি। এখানেই লেখকের ব্যর্থতা। শেষটাও যেন হঠাৎই আসে। লেখকের লিখনকুশলতা আছে। কোথাও কোথাও বৈচিত্র্যেরও স্বাদ পাওয়া গেছে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ ভালোই।

[illegible]

[illegible]। জীবনময় [illegible] সম্পাদিত। ৩। ১২৪ [illegible] কলেজী। [illegible] ৯০। [illegible] একটাকা।

বিহার থেকে প্রকাশিত বাংলা ত্রৈমাসিক 'সপ্তদীপা'র জানুয়ারী—মার্চ সংখ্যাটি সম্প্রতি হাতে এলো। এই সংখ্যায় লিখেছেন, পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অলোক ভট্টাচার্য, কাবেরী চৌধুরী, বিশুকুমার পাল, আনন্দ দাশগুপ্ত এবং তাপতী চৌধুরী।

অহংকার। সম্পাদনা ভগবতী রায়চৌধুরী। ৩৫-বি চারু এভিনিউ। কলকাতা-৩৩। দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মণীন্দ্র রায়, তারাপদ রায়, কৃষ্ণ ধর এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ভালো লাগল। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার ইংরেজী অনুবাদগুলিও উল্লেখ করার মতো। গল্প লিখেছেন সম্পাদিকা নিজেই।

চিত্রজগৎ। হিরন্ময় দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কোলকাতা-৯। একটাকা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বেশ কিছু লেখা রয়েছে যা প্রত্যেক চলচ্চিত্রানুরাগীরই চিন্তার বিষয় হতে পারে। ছাপ ভালো। প্রচ্ছদে অবিস্মরণীয় অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি।

সারস্বত অর্ঘ্য : সম্পাদক : প্রদীপ পাল। ভূদেব স্মৃতি সঙ্ঘ, ১ কাতার পুকুর লেন হাওড়া থেকে প্রকাশিত।

এই সংকলনটিতে গল্প কবিতা খেলাধুলা প্রভৃতি সব বিভাগেরই লেখা আছে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ডঃ রমা চৌধুরী আশা দেবী, রাম বসু, সাধনা মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ বসু, নির্মলেন্দু ঘোষাল অলীক দাস ও আরও অনেকে।

উচ্চারণ (প্রথম সংখ্যা) : সম্পাদনা : অরুণাভ সেনগুপ্ত এবং শরৎ বসু। ২৩ই শাঁখারীটোলা স্ট্রীট। কলকাতা ১৪। দাম : এক টাকা।

গুটিকয়েক কবিতা, দুটি গল্প, একটি প্রবন্ধ এবং একটি ব্যঙ্গরচনা নিয়ে 'উচ্চারণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম সংখ্যার লেখকসূচীতে রয়েছেন মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, আমল সেনগুপ্ত, প্রভাতবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিকু ব্যানার্জি এবং আরও কয়েকজন। বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়লো—এ বিষয়ে একটু যত্ন নিলে ভালো হয়।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

॥ ২১ ॥

শ্বারিক সংবাদ নিয়ে এলেন : চাল কেটে বসত ওঠাবো—রাগের মাথায় সেই যে বলেছিলেন, নিজে থেকেই সত্যিসত্যি বসত উঠিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়ী মানুষের কতজনের সঙ্গে কত রকমের বিরোধ—ভবনাথের তত মনে পড়ছে না। বললেন, কার কথা বলছ?

শ্বারিক ছড়া কাটলেন : কচুর বেটা ঘেচু বড় বাড়েন তো মান। ফটিক আমাদের গুঁড়িকচু, তার বেটা নবনে হয়েছে মহামানী মানকচু। মানে ঘা পড়েছে—আপনাদের শরিক বংশীধর কোনাখোলায় কিনু সর্দারের দরুন জমিটা দিয়ে দিলেন, সেইখানে সে ঘর তুলবে।

ভবনাথ অবাক হয়ে বলেন, বলো কি হে। মামলায় মামলায় অঢেল খরচা করে অনেক কষ্টে জমি খাস করে নিয়েছে, খাসা ফলসা জমি, আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারি —দিয়ে দিল সেই জমি?

বিনি সেলামিতে, আধেলা পয়সাটি না নিয়ে।

ভবনাথ বললেন, আমি তো কিছু জানিনে—

কেউ জানত না, চুপিসারে কাজ হয়েছে। বাঁশ কিনে এনে জমির উপর ফেলল তখনই জানাজানি হয়ে গেল।

ভবনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। শ্বারিক আবার বলেন, বাঁশও বোধহয় বংশীধর কিনে দিয়েছে। শরিক জব্দ করতে ও-মানুষ সব পারে।

ভবনাথ শুধান : ওর বাপ ফটিক কি বলে? কথাবার্তা হয়েছে তার সঙ্গে?

শ্বারিক বলেন, তার তো কেঁদে ফেলার গতিক। হুটকো গোঁয়ার বলে ছেলেকে গালিগালাজ করতে লাগল। বলে, বংশীবাবু এসে রাতদিন ফিসির ফিসির করেন—

ভবনাথ বিরস কণ্ঠে বলেন, দিনকাল বদলাচ্ছে বলছিলে না শ্বারিক, সত্যি সত্যি তাই। নইলে তিনপুরুষে চাকরান প্রজা ভিটে ছেড়ে বংশীর জমিতে ঘর তুলছে—

শ্বারিক বলেন, খুঁটোর জোরে মেড় লড়ে। বংশীধর যে খুঁটো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সে তো হবেই। ওরা আমাদের জব্দ করার ফিকির খুঁজে বেড়ায়, আমরাও খুঁজি। নতুন কিছু নয়। কিন্তু নবনে টক্কর দিয়ে বাস ওঠাবে—অন্যাটে তা হলে মুখ দেখাতে পারব না, আমাদেরও কোনা-[illegible] তুলতে হবে।

নিভু নিভু লণ্ঠনের আলোয় দুজনের মাথায় মাথায় বসে উপায়-চিন্তা হল। পাঁচ-সাত কলকে তামাক পুড়ল। তারপর রাতদুপুরে একলা শ্বারিক চুপিসারে বেরুলেন। চলে গেলেন কোনাখোলায় কিনু সর্দারের দরুন সেই জমিতে। জমির উপর বাঁশ ফেলে রেখেছে। বাঁশ গণলেন শ্বারিক—এক কুড়ি তিনটা। দু-তিনবার গণে নিঃসংশয় হয়ে এলেন।

পুববাড়ির অনেক বাঁশঝাড়। গাঁয়ের বাইরে গোয়াল বাথান নামে দ্বীপের মতন একটা জায়গা—কতক জমিতে পাট ও আউশধান আজায়। তা ছাড়া আছে খেজুর বাগান, পাঁচ-সাতটা ডোবা এবং ঠাসা বাঁশবন। দিনমানে শ্বারিক সেই বাঁশবনে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন, রাত্রে শিশুবর অটল আর একজোড়া কুড়াল নিয়ে ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঝাড় থেকে বাঁশ কাটার সময় গোড়ার দিকে খানিক খানিক পড়ে থাকে। কবে বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে—শ্বারিক গোড়া পছন্দ করে দিচ্ছেন, শিশুবর আর অটল ছ-আঙুল আট-আঙুল এক-বিঘত কখনো বা এক হাত নিচে কেটে ফেলছে। ফাঁকা বিলে জ্যোৎস্না ফুটফুট করে, ঝাড়ের মধ্যেও জ্যোৎস্নার ফালি এসে পড়ায় কাজের পক্ষে জুত হল খুব। কিন্তু ছোট ছোট বাঁশের টুকরো কোন কাজে লাগবে, মাহিন্দারদের বোধে আসে না। বাড়িতেও নিল না যে উনুনে পোড়ানোর কাজ হবে। ডোবার জলে সমস্ত ছুঁড়ে দিয়ে খালি হাতে সকলে ফিরল।

বুঝল পরের দিন, ভবনাথের কর্মচারী হিসাবে শ্বারিক যখন গঞ্জের থানায় গিয়ে এজাহার দিলেন : নবীন মোড়ল কোনা-খোলায় ঘর তুলবে, তার যাবতীয় বাঁশ রাত্রিবেলা ভবনাথের গোয়ালবাথানের ঝাড় থেকে চুরি করে কেটেছে। দারোগা এসে পড়ল, কোনাখোলায় গিয়ে জমির উপর বাঁশ দেখল। গোয়ালবাথানের ঝাড়েও গেল—সদ্য বাঁশ কেটেছে, গোড়া দেখে যে-না সেই বুঝবে। গর্তিতে ভজে গেল—ঠিক ঠিক তেইশ। এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কি হবে। যদিই বা কিছু হতে হয়, ভবনাথ চোরাগোপ্তা সেটুকু সেরে দিয়েছেন। চুরির দায়ে নবীনের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে তুলল। নবীন কাকুতি-মিনতি করে, দু-চোখে জলের ধারা বয়—ভবনাথ দেখতে পান না, কানেও শোনেন না। পরের দিন নবীনের কচি বউ এসে বড়-

দিব্যি পায়ে আবার হেঁটে পড়ার মত হয়ে এলো খানদানিরা। ভবনাথ শতিয়ে অর্থাৎ বললেন, তোমাদের দোষ নেই আ-কথাণী—তোমরা কোনরকম কষ্ট না পাও, আমি দেখব। নবনেটা মাস ছয়েক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক। গায়ে বড্ড তেল হয়েছে, তেল কিছু শুকোনোর দরকার।

তার পরের দিন খোদ ফটিক এলো। নবীনকে সদরে চালান দেয়নি, এখন অবধি সে থানায়। বাপে-ছেলেও সামান্য দেখা হল। ছোঁড়াটা খুব ঘাবড়ে গেছে। ইহজন্মে আর গোঁয়াতুর্মি করবে না, মানীর মান রেখে চলবে—

ভবনাথ পরিতৃপ্তির সঙ্গে শুনেছেন। বললেন, ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা দেখি তবে—কি বলো? সর্বদা তুমি শাসনে রাখবে, কথা দাও ফটিক।

ফটিক বলে, কাউকে আর লাগবে না কর্তা। দুটো দিনেই শিক্ষা হয়েছে খুব। চেহারা সিকিখানা। কান মলছে, নাক মলছে : কক্ষনো আর বংশীবাবুর কথায় নাচবে না।

কিসে কি হল—থানা থেকে ছাড়া পেয়ে রাত্রিবেলা নবীন বাড়ি এসে উঠল। কয়েকটা দিন তারপরে বেরুলই না ঘর থেকে।

কৃষ্ণময়ের নামে চিঠি এসে গেছে। এক-জোড়া—একটা এস্টেটের তরফ থেকে, একটা দেবনাথ নিজে লিখেছেন। কলকাতায় ফেরবার জোর তাগাদা।

ভবনাথ বললেন, পড়লে তো চিঠি?

কৃষ্ণময় বলল, পড়তে হয় না— কি আছে, না পড়লেও বলা যায়। বাড়ি আসার কথা উঠল, সেরেস্তার ভিতর তখন থেকেই চিঠির বয়ান তৈরি হচ্ছে। দুর্গা দুর্গা—বলে আমি বেরুলাম, চিঠিও সঙ্গে সঙ্গে ডাকবাক্সে পড়ল। বাড়ির উঠোনে পা ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই চিঠি এসে হাজির।

বেজার মুখে সে বলে, আশ্চর্যের খোঁচাখুঁচি জুড়ে দেবেন তো টেলিগ্রাম পাঠানো কেন? দিব্যি তো ছিলাম সেখানে।

ছিল তাই বটে—মিথ্যা নয়। কৃষ্ণময়ের স্বভাব এই। গেল কলকাতায় তো পারাপুরি পরিবার তুমি কার কে তোমার—এই গোছের ভাব তখন। একবারও এনতেজার কিসে কাউকে চিঠি লিখবার পিত্তেশ নেই। বলে, জমিদারির হরদম চিঠি যাচ্ছে, তাতেই তো টের পাচ্ছে বেঁচেবর্তে রয়েছি আমরা। খুঁটি করে আলাদা আমার কি

[illegible] ? মরলাকেলে ছেলের কথা [illegible] একবারও বলো, এক পয়সায় তিনখানা কচুরি আর এক পয়সায় হালুয়ায় [illegible] কিনেকো ভরপেট হয়ে যায়, সে পয়সা [illegible] কেন গবর্মেণ্টের ঘরে দিতে যাই? বল দেখি।

আবার সেই মানুষ বাড়ি যদি এসে গেল, নড়ানো আর সহজ কর্ম হবে না। পাড়ার এ-বাড়ি, ও-বাড়িও নড়তে চায় না। দিনরাত ঘরের মধ্যে—লোকে বলে, বউয়ের আঁচল ধরে থাকে। চিঠি সবে তো দু-খানা এসেছে—হয়েছে কি এখনো, গাদা-গাদা আসবে। এক নজর চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণময় কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়, ভিড় জমতে দেয় না। চিঠির মেজাজ চড়া হতে থাকবে ক্রমশ, শেষটা খোদ বড় মনিবের সইযুক্ত নোটিশ আসবে : অমুক তারিখের মধ্যে হাজির না হলে নতুন লোক নিয়ে নেওয়া হবে, অনাদায় তহশিলের এত ক্ষতি বরদাস্ত করা যাচ্ছে না।

অলকা-বউ ঘাবড়ে গেছে। বলে আর দেরি নয়—চলে যাও তুমি।

তাড়িয়ে দিচ্ছ?

চাকরি গেলে আমাকেই লোকে দুষবে।

কৃষ্ণময় অভয় দিয়ে বলে, চাকরি কেন যাবে রে পাগলি? যেতে পারে না।

কিন্তু একে স্ত্রীলোক তায় কমবয়সী—সহজে সে প্রবোধ মানে না। বলে, জমিদার বাবু নিজে লিখেছেন—

লিখুন গে যে বাবু হোন। আমারও কাকামশায় রয়েছেন—যাই হোক, পাঁজি দেখানো উচিত এবারে। ভট্টাচার্য্যবাড়ি বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে বলল একটা ভাল দিন দেখে দিন জ্যেঠামশায়। কলকাতা হল পশ্চিম দিক এখান থেকে—

উঁহু, পশ্চিম ঠিক নয়—দক্ষিণ ঘেঁসে পড়ছে। মোটামুটি কোণ মোটামুটি।

ডাঁটি-ভাঙা চশমা নাকের উপর তুলে গোপাল পাঁজির পাতা উলটাতে লাগলেন। ক্ষণ পরে চোখ তুলে বললেন, মঙ্গলবার ঘণ্টা ১১টা ২৩ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড গতে। উত্তরে নাস্তি, তা কলকাতা বরং দক্ষিণই ঘেঁসে যাচ্ছে।

তিথি-নক্ষত্র কেমন?

অষ্টমী তিথি, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। মন্দ হবে না।

যোগিনী?

ঈশানে। খারাপ নয়।

মাহেন্দ্রযোগ?

নেই। অমৃতযোগও নেই। সিদ্ধিযোগ—চলে যাবে মোটামুটি।

পাঁজি কৃষ্ণময় নিজ হাতে টেনে নিল। বলে, যাত্রা মধ্যম দেখছি জ্যেঠামশায়।

যাত্রানাস্তি তো নয়—ঘাবড়াচ্ছ কেন?

না, জ্যেঠামশায়। বিদেশ-বিভুঁয়ে যাওয়া—দিনটা সর্বাংশে যাতে উৎকৃষ্ট হয় আপনি তাই দেখুন।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলে ফেললেন অত খুঁতখুঁতুনির এখন কি গরজ—এই গোড়ার দিকে? কতবার যাত্রা ভাঙবে, তার লেখাজোখা নেই। পেট কামড়াবে, জ্বরজ্বার হবে, মেয়েটা হাঁচবে হয়তো একবার-দুবার—কত রকমের কত ভণ্ডুল ঘটে যাবে। যাত্রা করে আলাদা ঘরে কাটিয়ে যাত্রা ভেঙে আবার আপন ঘরে ফিরে আসবে। জানি তো তোমায় বাবা—

স্পষ্টভাষী গোপাল মিথ্যে বলেননি। এমনি সব ব্যাপার বরাবর হয়ে আসছে। এবারও হবে, সন্দেহ কি। কৃষ্ণময়ের বিদেশযাত্রা চাট্টিখানি কথা নয়।

কৃষ্ণময় রাগ করে বলে, মিথ্যে খবর কেমন করে যে রটে যায় বুঝিনে। আপনি ভাল দিন দেখে দিন, যাই-না-যাই তখন দেখতে পাবেন।

কলকাতার চাকুরে বলে কৃষ্ণময়ের জন্য উঠানের পশ্চিম দিকে পৃথক একটা ঘর—তাই শেষটা কেলেঙ্কারীর কারণ হয়ে উঠল। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পাট সেরে তরঙ্গিণী তাকের উপর থেকে মহাভারত নামাতে যাচ্ছেন, বিনো এসে ফুসফাস করে বৃত্তান্ত বলল : কাণ্ড দেখগে ছোট খুড়িমা দুয়ারে খিল এঁটে দিয়েছে।

গোড়ায় তরঙ্গিণী ধরতে পারেননি। জিজ্ঞাসা করলেন : কে খিল আঁটল?

আবার কে! তোমাদের চাকরে ছেলে আর তার বউ।

তরঙ্গিণী এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রইলেন। বিনো হাত ধরে টানে : সত্যি না মিথ্যে দ্যাখসে এসে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তরঙ্গিণী বলেন, ছেড়ে দে বিনো। ওদিকে না গেলাম আমরা, চোখে না-ই বা দেখলাম—

বিনো বলছে, তোমার শাশুড়ি—আমাদের বুড়ো ঠানদিদি গো—বলতেন, তিন ছেলের মা হয়ে গিয়েও স্বামীকে কোনদিন মুখ দেখতে দিইনি। রাতদুপুরে আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে তবে ঘোমটা খুলতেন। সেই পুববাড়িতে ভরদুপুরে এই বেলেল্লাপনা—দিনদুপুরে সর্বচক্ষুর সামনে দড়াম করে হুড়কো এঁটে দিল।

তরঙ্গিণী আমল দেন না : ওদের কথা ধরতে নেই। কেষ্ট বিদেশ-বিভুঁই-এ পড়ে থাকে। ক'দিনই বা একসঙ্গে থাকতে পায়। গাঁয়ের বারোমেসে মানুষের বেলা যে নিয়ম, ওদের উপর সে-নিয়ম খাটাতে গেলে হবে না।

বিনো করকর করে উঠল : বিদেশ-বিভুঁয়ে কাকামশায়ও তো থাকেন। ওদের যা, তোমাদেরও ঠিক তাই। কই, তোমাদের তো কেউ কখনো বেহায়াপনা দেখেনি।

আমরা বলে বুড়ো হয়ে মরতে গেলাম—আমরা আর ওরা! বিনো ছাড়ে না : আজ নাহয় বুড়ো, চিরদিন তো বুড়ো ছিলে না। তোমাদের নিয়ে কোনদিন তো কথা ওঠেনি।

তরঙ্গিণী বললেন, দিনকাল বদলেছে রে বিনো, এদের কাল আলাদা। অসহ্য ঠেকে তো তোরাই চোখ বুজে থাকবি।

খানিকটা কড়াকেও ছিলেন : বাড়ির কথা বাইরে না যায়। নিমিকেও ভাল করে সমঝে দিবি তুই।

একটা রাস্তা বিল থেকে সোজা গাঁয়ে এসে উঠেছে। রাস্তা মানে বর্ষায় হাঁটুজল, কোথাও বা কোমরজল। নিম্নে অন্তত কাদা। সেই কাদা কার্তিক অবধি। তারপরে শুকনো। কাদায় জল, বরঞ্চ চলাতে ভালো শুকনো পথ সমান পথ নয়। কাদার মধ্যে দিয়ে মানুষ হেঁটেছে, গরু হেঁটেছে, ধান বওয়ার গরুর গাড়ি সব আসা-যাওয়া করেছে—কাদা শুকিয়ে সারা পথ গর্ত-গর্ত হয়ে আছে এখন। পা ফেলে সুখ নেই, পায়ের তলায় খোঁচা লাগে, গর্তের মধ্যে পা পড়লে প্রাণ বেরিয়ে যায়। কাদা-জলের পথ দাও, লোকে হেলতে-দুলতে দশ ক্রোশ পথ চলে যাবে, কিন্তু বিল থেকে গ্রাম অবধি এইটুকু আসতে-যেতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

তা প্রাণ থাকল কি গেল, এখন দেখতে গেলে চলবে না। বছর-খোরাকি ধান গোলায় উঠে যাক, গাঁট হয়ে বসে প্রাণ ও মান-সম্মানের কদর কি বজায় আছে, বিবেচনা করা যাবে। পুববাড়ির বড়কর্তা ভবনাথকে সকাল বিকাল ঐ বিলের পথ ভাঙতে হচ্ছে। ধান কাটতে বাকি আছে কিনা, কাটা-ধান ক্ষেতে পড়ে আছে কিনা আল ঠেলে আধ হাত জমি কেটে নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে কিনা — বিলের এদিক-সেদিক তদারক করে বেড়ান। বসতে পিঁড়ি দিল কিনা, দৃকপাত নেই—উঠোনে দাঁড়িয়ে

কাকুতি-মিনতি ও আর্জানো ফসল ইঁদুরে-বাঁদরে খাওয়াবে নাকি ও কুঞ্জ? নড়চড়া দাও একটু তাড়াতাড়ি—

বিলের রাস্তা গ্রামে পৌঁছেই দু-দিকে দুই মুখ হয়ে গেছে। তেমাথার উপর বিশাল কাঠবাদাম গাছ। মস্ত মস্ত পাতা। সবুজ পাতা পেকে লাল হয়ে যায়, লাল টুকটুকে করে, কেউ আলতায় চুবিয়ে দিয়েছে। দিবারাত্রি পাতা ঝরে। এ-পাতা জাল পোড়ে না বলে কুমোরে অথবা ময়দারে কুড়োতে আসে না। তলায় কাঁড়ি হয়ে পড়ে থাকে। বিল ভাঙতে পায়ের তলায় ব্যথা হয়ে গেছে—পথিকজন সেই সময়টা বাদামতলা পেয়ে বর্তে যায়, আচমকা যেন গদির উপর উঠে গেছে। পাতার গাদায় পা বসে বসে যাচ্ছে—ইচ্ছাসুখে দু-পায়ে ছড়িয়ে দেয়, টুকটুকে পাতা তুবড়ি বাজির মতো চতুর্দিকে উঁচু হয়ে ওঠে।

ছেলেপুলেরা এক একসময় গিয়ে বাদামতলা হাতড়ায়, পাতার গাদার ভিতরে দুটো-চারটে বাদামও মিলে যায়। আম জাম জামরুলের মতন গাছে চড়ে কষ্ট করে পাড়বার বস্তু নয়। কঠিন পুরু খোলা, শাঁস যৎসামান্য—খোলা ভেঙে সে-অবধি পৌঁছনোর সাধ্য পাখি-পশুর নেই। মানুষের পক্ষেও সহজ নয়, কাটারি কুপিয়ে কুপিয়ে তবে খোলা ভাঙে। কাকে বাদুড়ে উপরের ছাল ঠুকরে ঠুকরে খায়, বোঁটা ভেঙে তখন টুপ করে ফল পড়ে পাতার মধ্যে ঢেকে।

হন্তদন্ত হয়ে ভবনাথ বাড়ি ফিরছেন—বাদামতলায় দেখতে পেলেন কমল আর পুঁটি গাদা গাদা বাদামপাতা দু-হাতে তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ ঠিক দুপুরে কেউ কোথাও নেই দেখে বাদাম খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুঁটিরই মাথায় আসে এসব—তাড়া দিতে দুটিতে দুড়-দুড় করে পালাল।

কয়েকটা দিন পরে ভীষণ ব্যাপার। বাদামগাছের লাগোয়া গো-ভাগাড়—মরা গরু ফেলে যায়, শিয়াল-শকুনে খুবলে খুবলে খায়। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, বাদামতলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেদিনও ভবনাথ বিলের দিক থেকে ফিরছেন, দেখলেন একটা লোক পাশের পগারের মধ্যে কি যেন করছে। চোর-চোর ভেবেছেন উনি—বিল অঞ্চল থেকে গ্রামে উঠে আত্মগোপন করে আছে, খানিকটা রাত্রি হলে পাড়ার মধ্যে ঢুকবে।

কে ওখানে? উঠে আয় বলছি—

আসে না, শব্দ সাড়াও দেয় না। ভবনাথ কাছে চলে গেলেন। তড়াক করে সেই লোক উঠে দাঁড়াল। ওরে বাবা—লম্বায় হাত দশেক, গাট্টা-গোট্টা চেহারা রস-জ্বালানো জালায়ার মতন বিশাল মাথা, বাতাবিলেবুর সাইজের চোখের মণি অবিরত পাক খাচ্ছে অক্ষি-গোলকের ভিতর। পগারের মধ্যে হাড়গোড়—নরাকার ঐ জীব মজা করে হাড় চিবাচ্ছিল আজনে-ডাঁটার মতো।

বুঝে ফেলেছেন ভবনাথ, উচ্চৈস্বরে রাম-রাম করছেন। চর্বণ ছেড়ে তক্ষুনি সে চোঁচা দৌড়। পলকে অদৃশ্য। বাড়ি ফিরে ভবনাথ হৈ-চৈ লাগালেন: ছুটে যা শিশুবর, বাঁকবকুশি হেমন্ত ঠাকুরের কাছে। আমার নাম করে বলবি। দোয়ার আর খোল-করতাল নিয়ে যে অবস্থায় থাকেন চলে আসুন। একপালা গাইতে হবে আমার উঠোনে।

কি, হল কি হঠাৎ?

ভবনাথ বললেন, ভাগাড়ে আজ গরু পড়েছে। মুচিতে চামড়া খসে নিয়ে গেছে, শিয়াল-শকুনে খেয়েছে সারাদিন ধরে। গোভূত সন্ধান পেয়ে হাড় চিবোতে বসেছিল। আমি একেবারে মুখোমুখি পড়েছিলাম। কষে রাম-নাম এখন, ভূত অঞ্চল ছেড়ে পালাবে।

নির্মি ও রাজি দুই চক্ষুশূলে এরা। মেয়েরা সই পাতায়, এরা নতুন কিছু করেছে—সইয়ের বদলে চক্ষুশূল পাতিয়েছে। ও ভাই চক্ষুশূল—বলে এ-ওকে ডাকে। দুজনে ওরা মাঝের কোঠায় ভুটুর-ভুটুর করছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে রাজি সদ্য এসেছে, শ্বশুর-শাশুড়ি ভাসুর-দেওর জা-ননদের কথা এবং বরের কথা। কথা অফুরান—ফুরুলে ছাড়ছে কে? রাজি ছাড়লেও শ্রোতা নির্মি তো ছাড়বে না।

ধানের পালার অধিকাংশ মলা-ডলা হয়ে গেছে, উঠান প্রায় ফাঁকা। একদিকে তাড়াতাড়ি গোটাকয়েক মাদুর-সতরঞ্চি পেতে ফেলল। মেইকাঠের সঙ্গে একফালি বাঁশ বেঁধে তার গায়ে লণ্ঠন ঝোলাল। ঘরের চালে আর আড়ের খুঁটিতে চারকোণা বেঁধে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিল—মাথার উপরের চন্দ্রাতপ। আর কি চাই—পুরোদস্তুর আসর। হেমন্ত ঠাকুরও এসে পৌঁছলেন। শুধু একচোট খোল পেটাচ্ছেন, লোক যাতে জমে যায়।

রাজি বলে, উঠি ভাই চক্ষুশূল—

নির্মি টেনে বসাল। বলে, তাড়া কিসের? সবে তো সন্ধ্যে। দু-দিনের তরে বাপের বাড়ি এসেছিস, তোকে কেউ কুটোগাছটিও ভাঙাতে বলবে না।

রাজি বলে, সেজন্যে নয়। রাত্তিরবেলা জঙ্গলে পথ ভেঙে যাওয়া, তার উপর কী সব দেখে এলেন জ্যেঠামশায়—

তুইও যেমন! কী দেখতে কি দেখেছেন, হয়তো বা ভয়-দেখানো কথা—

উঠানে গান। আরম্ভে আসর-বন্দনা। চামর দুলিয়ে হেমন্ত ঠাকুর উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম চতুর্দিকে চক্কোর মারছেন। নির্মি বলল, একটুকু শুনে তো যাবি। আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

রান্নাঘরের দাওয়ায় অন্ধকারে দু-জনে গিয়ে বসল। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা। নির্মি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কন্না আসে কেবলই। রাজিকে বলে, যাবি তো এক্ষুনি ওঠ। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়ে গেলে হয়ে গেল মা—বেঁচে না ওঠা পর্যন্ত আসর ছেড়ে ওঠা যাবে না।

উঠান-ভরা লোক। দুজনে টিপি-টিপি বেরিয়ে পড়ল। রাম-লক্ষ্মণ মাথায় থাকুন—তাঁদের পুণ্যকথা হেলা করে নিজেদের সামান্য কথায় মশগুল। কথা যত-কিছু,

রাজিরই—নিমি কান খাড়িয়ে শুনতে যায়। বড়দিনের সময় বাড়ি এসে বর এক কাণ্ড করেছিল, সে কারণে কথা বন্ধ সারা বিকাল এবং রাত্রের শেষ যাম পর্যন্ত। শেষকালে—কাউকে বলিস নে ভাই চক্ষুশূলে, পা জড়িয়ে ধরতে যায়—তখন মাপ করে দিই। রাতে তো ঘুমোনোর জো নেই—কিছু উশুল করে নিচ্ছিলাম দুপুরে ঘুমিয়ে। শাশুড়ি উঠানে মাদুর পেতে রোদ পোহাচ্ছেন। ঐ তো বাঘের মতন শাশুড়ি—তারিই পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে এসে ঘরে ঢুকেছে। জাগানোর চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য—অথচ তিল পরিমাণ শব্দ সাড়া করার জো নেই, এতে রাজি জাগতে যাবে কেন? দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে বর তখন সারা মুখে চিত্রকর্ম করল। সুপুষ্ট একজোড়া গোঁফ দিয়েছে ঠোঁটের উপর, থুতনিতে চাপদাড়ি। দু-পাশের গাল দু-খানাও বাদ রেখে যায় নি। এত সমস্ত করে চোরের মতন বেরিয়ে গেছে। বড়-জার সকলের আগে নজরে পড়ল, সে-ই খানিকটা রক্ষা : ওরে ছোট, গোঁফ-দাড়ি উঠে গেছে যে তোর! আয়না ধরে হাসি কি কাঁদি, ভেবে পাইনে।

দত্তবাড়ির সামনে এসে পড়েছে। গল্প থামিয়ে রাজি বলে, আসি তবে ভাই—

নিমি বলল, বাঃ রে, আমি বুঝি একলা যাব?

তবে?

তোকে এগিয়ে দিলাম, তুই দে আমায়। পুরো না দিস, খানিকটা দে।

চলল আবার। রাজির মুখে খই ফুটছে। বর হয়ে গিয়ে তারপর শাশুড়ি নিয়ে পড়ল। এবং বড় জা। শাশুড়ি দজ্জাল। বড় বউ কিন্তু সোনার বউ—জগদ্ধাত্রীর মতন রূপ। বাপ মা তুলে শাশুড়ির এত গালিগালাজ, বড় বউ রা কাড়ে না, চুপচাপ কাজ করে যায়। এককাঠি নাকি বাজে না—কথাটা কত বড় মিথ্যা, শুনে এসো একবার রাজির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে। কাঠির মতন রোগা শাশুড়িঠাকরুণ একখানি মাত্র মুখে একলাটি অবিশ্রান্ত জবর রকম বাজিয়ে যাচ্ছেন—যে এমন ঘরের চালে কাক বসতে ভরসা পায় না। বড় বউয়ের সুখ্যাতি সকলের মুখে মুখে কেবল ঐ শাশুড়ি ছাড়া। শাশুড়ির দলে সম্প্রতি আর এক'ট জুটেছে—বলতে পার কে? বলো দিকি। আমি রাজবালা, বাড়ির নতুন বউ—কেননা কাণ্ডবণ্ড আমি এক সকালবেলা দেখে ফেলেছিলাম, বড় দিদি গো, খুরে তোমার শতেক নমস্কার!

মুখে আর কথা বেরোয় না, হাসিতে ফেটে পড়ছে। হাসে আর বারম্বার নত হয়ে দূরবর্তিনী বড় জায়ের উদ্দেশে মাটিতে হাত ঠেকায়। বলে, ধন্যি বউরে বাবা! খুরে নমস্কার।

এসে গেছে তারা পুববাড়ি। হেমন্ত ঠাকুর ঘোর বেগে চালিয়েছেন। নিমি বলে, বাড়ি এলাম।

তা তো এসেছিস। আমি এখন একলা ফিরব নাকি?

নিমি বলে, চল দিয়ে আসি তোকে।

অতএব নিমি চলল আবার রাজিকে পৌঁছতে। গল্পের সেই মোক্ষম জায়গা, যার জন্য রাজি ধন্য ধন্য করে পরম শান্ত বড় বউকে টিটকারি দিচ্ছে। জানলায় হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়ে উঠানের কায়দাটা দেখে ফেলেছিল রাজি। শাশুড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় গোবরমাটি লেপছেন, বড় বউয়ের ঘর থেকে বেরুতে আজ কিছু বেলা হয়ে গেছে—তাই নিয়ে শাশুড়ি কলি যুগ ধরে গালিগালাজ করছেন, শোলোক পড়ছেন।

বড় বউ জবাব দেয় না। ঝাঁটা হাতে নিঃশব্দে উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। নতুন বউ দেখতে পাচ্ছে জানলা দিয়ে। বকতে বকতে বুড়ো শাশুড়ি ক্রমশ ঝিমিয়ে এলেন, থেমে যাবার গতিক। হঠাৎ সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে তুমুল কণ্ঠে বড় বউয়ের মৃত চৌদ্দ পুরুষদের নামে এই দিনের আরম্ভে বিবিধ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে লাগলেন, বিশ দিন নিরম্বু থেকেও মানুষ যা মুখে তুলতে নারাজ। বড় বউয়ের দৃকপাত নেই না-রাম না-গঙ্গা রা কাড়ে না। বাক্য বিনা কাজ হচ্ছে তো কোন দুঃখে গলাবাজি করতে যাবে? নতুন বউ জানলার পথে সমস্ত দেখে নিয়েছে। ঝাঁট দিতে দিতে একবার বা ঝাঁটা তুলে শাশুড়ির পানে ঈষৎ নাচিয়ে দিল। অথবা দু-পাটি দাঁত মেলে মুখভঙ্গিমা করল রান্নাঘরের দিকে চেয়ে। ব্যস, আর রক্ষা নেই। নিপাট ভালমানুষ বড় বউ দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দিয়ে পরম মনোযোগে আবার নিজ কর্ম করে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দত্তবাড়ি পৌঁছে গেছে তারা। নিমি বলল, ঘরে উঠলে হবে না চক্ষুশূলে, আমার সঙ্গে চলো।

নিমি রাজিকে দত্তবাড়ি পৌঁছে দেয়, দত্তবাড়ি থেকে রাজি আবার নিমিকে পুববাড়ি নিয়ে আসে। কতবার যাতায়াত, গুনতে গেছে কে? অবশেষে পালা শেষ—শক্তিশেলে নিহত লক্ষ্মণ বিশল্যকরণীর গুণে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। হরিবোল দিয়ে আসরের মানুষও উঠে পড়ল। যে যার বাড়ি যাচ্ছে। রাজি এবার তাদের একটা দলে ভিড়ে পড়ল।

ভবনাথের উল্লাসটা এবার দেখবার মতো। লোভী গোভূত মরাগরুর খোঁজে খোঁজে গ্রাম অবধি ঢুঁ মেরেছিল, তার দুর্গতি মনের চোখে যেন স্পষ্ট দেখছেন। রাম-নাম তাড়া করেছে—শালের খুঁটির মতন বড় বড় পায়ে বিল ভেঙে ধপধাপ করে ভূত পালিয়ে যাচ্ছে। নাস্তিক অবিশ্বাসী কেউ কেউ তো আছে—তারা বলে, বড়কর্তার ভয়-দেখানো কথা। ছেলেপুলে যখন তখন গিয়ে পড়ত, এমনি কায়দা করলেন, ইতরভদ্র কেউ আর বাদামতলা মুখো হবে না।

সে যাই হোক, পুঁটি-কমল ও তাদের সঙ্গী-সাথীদের সত্যিই বাদাম সংগ্রহ বন্ধ। নিতান্ত যদি লোভ ঠেকাতে না পারে, যবে দিনমানে দস্তুরমতো দলবল জুটিয়ে। জল্লাদ ছেলেটাই শুধু ভ্রূভঙ্গি করে উড়িয়ে দেয় : বাজি রাখো, আমি যাবো। ভাগাড়ে যে দিন গরু পড়বে, একলা রাত্তিরে গিয়ে আমি বাদাম কুড়িয়ে আনব। যদি বলো তো বাদাম দিনের বেলা কুড়োনো, রাত্তিরবেলা গাছের গায়ে গোটাকয়েক দায়ের কোপ দিয়ে আসব, সকালে গিয়ে দেখতে পাবে।

তা পারে হয়তো জল্লাদ—দুনিয়ার মধ্যে ও-ছেলের অসাধ্য কিছু নেই শুধুমাত্র পড়া ও লেখা ছাড়া।

মলনের কাজ সারা। মেইকাঠ আছে এখনো, যদ্দিন থাকে থাকুক না। সন্ধ্যাবেলা ফ্যান খাওয়াতে গরু ভিতর-উঠানে নিয়ে আসে। সেই কাঠে বাঁধা থাকে তখন। কমল-পুঁটিদেরও কাজে লাগে—মলনের গরুর মতন সেই কাঠ ধরে ওরা গোল হয়ে ঘোরে। খাসা মজা।

উঠান জুড়ে ইঁদুরে কি করেছে দেখ। গর্ত, গর্ত, গর্ত—মাটি তুলে তুলে ডাঁই করেছে। ধানের পালায় ঢাকা ছিল বলে তেমন নজরে পড়ত না, পালা উঠে গিয়ে ফাঁকা উঠান তো গুণমণি এসে পড়ল পাত্র-কোদাল নিয়ে। ইঁদুরের গোষ্ঠিকে বাপান্ত করে, আর জোরে জোরে কোপ ঝাড়ে গর্তের উপর। কোপ কি ইঁদুরের ঘাড়ে? যমের ঘাড়েই বা নয় কেন, গুণোর ছেলেগুলো কেড়ে নিয়েছেন যিনি। ইঁদুরে ধান নিয়ে তুলেছে গর্তের ভিতর—খেয়ে কতক তুষ করেছে, কতক বা ভাঁড়ারে সঞ্চয় করেছে। গর্তের জায়গা কুপিয়ে গুণমণি ধান-মাটিতে ঝুড়ি বোঝাই করে, পুকুর ঘাটে নিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ধোয়। মাটি ধুয়ে গিয়ে ধান ঝিকমিক করে ওঠে। পুরো এক ঝুড়ি মাটি ধুয়ে মুঠো দুই-ধান। সমস্তটা দিন ধরে গুণমণি এই করছে—ধান এনে এনে রোদে দিচ্ছে উঠানের উপর, শেষ পর্যন্ত পরিমাণে নেহাৎ মন্দ হল না; দু-তিন খুঁচি তো বটেই। গুণমণি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে : ধান উঠানে পড়ে রইল, তোলা পাড়ার নাম নেই। খুব যে ঠ্যাকার হয়েছে ঠাকুরুণ।

উমাসুন্দরী বলেন, ইঁদুরের মুখ থেকে কেড়ে ধড়ে বের করেছিস, ও ধান তোর। তুই নিয়ে যা গুণো।

তা গুণমণি এমনি এমনি নেবার লোক নাকি? উঠান পিটিয়ে দুরমুশ করে গোবর-মাটি লেপল ক-দিন ধরে।

ধান নিয়েছে, তার মূল্যশোধ।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত।

যে স্বাদ
সকলের
মুখে মুখে !
WILLS VIRGINIA
W.D.& H.O.WILLS
WILLS
VIRGINIA
FILTER
উইল্‌স-এর নামডাক যেমনি স্বাদও তেমনি
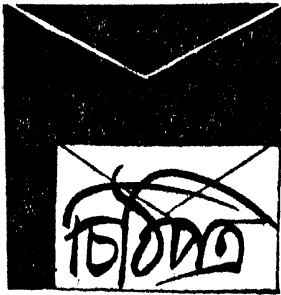
পঙ্খের কাজ প্রসঙ্গে

১৮-৪-৭৫ তারিখের অমৃতে পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'পঙ্খের কাজ' নামের প্রবন্ধটি কয়েকজন সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রথম সমালোচনা-বিশেষজ্ঞ শ্রীদ্বৈপায়ন দেবশর্মার ২৩-৫-৭৫ তারিখের চিঠির কয়েকটি অংশ এইরূপ : '...বিষয় সম্পর্কে লেখকের অজ্ঞতা দেখে অবাক হলাম' 'অমিয়বাবু...কোনটাই বুঝে উঠতে পারেন নি' : 'চূণের (এই বানানই আছে) প্রলেপের আরেকটি (এইভাবেই মুদ্রিত) মহাগুণ সম্পর্কে লেখকের কোন ধারণা নেই দেখে অবাক হলাম' : 'বাংলার পুরাকীর্তি সম্পর্কে অমিয়বাবুর ধারণা কতটা জানি না' ; 'এই আবোল-তাবোল তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? ইত্যাদি ইত্যাদি

'বঙ্গদর্শনে'র কাল থেকে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীসমাজে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের সযত্ন পরিচর্যায়, ব্যক্তিগত চাঁদমারির পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক ও বিষয়মুখী বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য অজ এতদূরে পুষ্টিলাভ করেছে যে, এ অধীনের পক্ষে সে শিষ্ট ও মার্জিত ঐতিহ্য কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত (সৌভাগ্যও হতে পারে), আমার শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ অতি দীর্ঘকাল এমন স্তরে দৃঢ়নিবদ্ধ যে, সহসা দ্বৈপায়নবাবুর মানসিকতা ও ভাষার স্তরে অবতরণ করে তাঁর বোধগম্যভাবে কিছু লিখতে এ অধম একেবারেই অপারগ।

আলোচ্য সমালোচনা-বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে কিছু কটকাটব্য পেলেও, ভারতের একেবারে প্রথম শ্রেণীর মনীষীদের দেওয়া কিছু ফুলের তোড়াও পেয়েছি। সব জান্তাদের সেসব জানবার কথা।

দ্বিতীয় সমালোচনা-বিশেষজ্ঞ প্রণব রায় যে তর্কযুদ্ধের আসরে ছদ্মনাম গ্রহণ করে নৈতিক মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয় দেননি সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা—১৯

(২)

অমৃতে পত্রিকার গত ৪১ সংখ্যায় (তার ১৮-৪-৭৫) প্রকাশিত শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'পঙ্খের কাজ' প্রবন্ধটি এবং শ্রীপ্রণব রায় ও শ্রীদ্বৈপায়ন দেবশর্মা কর্তৃক পূর্বোক্ত প্রবন্ধের আলোচনা দুটি পড়বার সুযোগ আমাদের হয়েছে। মূল প্রবন্ধ এবং তার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করছি।

(১) অমিয়বাবু চলন্তিকায় উল্লিখিত 'পঙ্ক' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন 'বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহৃত পঙ্ক কথাটি মুদ্রণ প্রমাদ বলে মনে হয় তা না হলে পূর্বগামী পঙ্খ ও তার ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না।' কিন্তু অমিয়বাবু তাঁর বহুল পঠিত, আলোচিত ও প্রশংসিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে 'পঙ্খ' শব্দটি মাত্র একবারই ব্যবহার করেছেন 'ঘটগোড়িয়া' এন্ট্রিতে, অন্যত্র 'পঙ্ক' শব্দটিই বজায় রেখেছেন। যাইহোক, পূর্বোক্ত লেখক এবং আলোচকদ্বয় পঙ্ক শব্দ এবং তজ্জাত ব্যাখ্যা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার প্রত্যুত্তরে জানাই—চলন্তিকায় মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেনি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'পঙ্ক' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে চতুর্থ অর্থটি নিম্নরূপ : '(বাঙলায়) অট্টালিকার ভিত্তিতে বা তদ্দেশে লেপনার্থ দৃঢ় কল্কবিশেষ।' 'পঙ্খ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : পঙ্খ অর্থ পঙ্ক (৪)। —অর্থাৎ পঙ্ক এবং পঙ্খ বা পঙ্খ সমার্থক শব্দ। সুতরাং অমিয়বাবুর মন্তব্যানুসারে চলন্তিকায় মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেনি এবং প্রণববাবু ও দ্বৈপায়নবাবু যা নিয়ে বিতর্ক করেছেন তার অবসান এখানেই ঘটল বলে আমার ধারণা।

(২) 'পঙ্ক' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রণববাবু তাঁর দীর্ঘ পত্রে (৬।৬।৭৫ তারিখে অমৃতে প্রকাশিত) প্রশ্ন তুলেছেন : 'পঙ্খ শব্দটি যদি মূলে সংস্কৃত শব্দ থেকে জাত হয় তাহলে পঙ্কের কাজ বলতেই বা ক্ষতি কি? —ব্যাকরণগত বা অর্থগত দিক থেকে ক্ষতি হয় না, তথাপি শিল্প শাস্ত্রে বা এতৎ সম্পর্কিত আলোচনায় পঙ্খ শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় কারণ যে কোন শব্দ প্রচলিত হওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হোল (ক) শব্দটির ধ্বনি মাধুর্য বা শ্রুতি-মাধুর্য আছে কি না, (খ) শব্দটির উচ্চারণে বা ভাবানুষঙ্গে কোনপ্রকার চিত্রকল্প বা ইমেজ আমাদের জাগছে। একথা বলা বাহুল্য পঙ্খ শব্দটির ধ্বনি সাম্যিতা অনেক বেশী তার পঙ্ক শব্দের উচ্চারণ সাধারণভাবেই আমাদের মনে জাগে জলাশয়ের তলদেশে সঞ্চিত এক ধরনের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা যাকে সাদা বাংলায় বলে পাঁক। বাস্তুবিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষায় বলা হচ্ছে : Black Cotton Soil সুতরাং চিত্রকল্পের দিক থেকেও পঙ্ক শব্দ তেমন গুরুত্ব পায় না—বিশেষত শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রণববাবু যে মন্তব্য করেছেন ... পাঁকের ওপর কোন পঙ্খ ..., নকশা অঙ্কিত করলে তা যেমন সহজ নকশাটি এবং আসলের ন্যায় অবিকল মনে হয়.....' অথবা—সর্বোপরি পাঁকের পেলবতার সঙ্গে......' ইত্যাদি অংশ যুক্তিবাদী মন হাস্যোদ্রেক করায় মাত্র।

আমার মনে হয়, পঙ্খ শব্দের সঙ্গে শঙ্খ শব্দের অর্থগত বৈষম্য থাকলেও ঝঙ্কার ধ্বনি বা শ্রুতিমাধুর্যের সাজুয্যবশত তা আমাদের মনে শঙ্খের শ্বেতশুভ্র কান্তির আভাস এনে দেয়। এ ধরনের সাযুজ্য ব্যাকরণসম্মতও বটে। শুধু তাই নয়, পঙ্খ শব্দে শঙ্খের শুভ্রতা ও কাঠিন্য এবং কান্তি ও কমনীয়তা—এই চতুর্বিধ গুণেই প্রকাশ পাচ্ছে এবং এই চতুর্বিধ গুণের সঙ্গে শৈল্পিক দক্ষতা যুক্ত হলে তা যে আমাদের নয়নলোভন হয়ে ওঠে সে কথা সকলেই মানবেন। এইসব দিক দিয়ে বিচার করলে পঙ্খ শব্দ শিল্পশাস্ত্রে অধিকতর কাম্য।

(৩) প্রণববাবু টেরাকোটা শব্দের বিস্তৃত আলোচনায় প্রশ্ন তুলেছেন : তৈজসপত্র যে কি করে টেরাকোটার অন্তর্ভুক্ত হয় তা বুদ্ধির অগম্য', এখানে আমার মনে হয় প্রণববাবু প্রাথমিকভাবে অমিয়বাবুর ভাষার প্রয়োগটা ধরতে পারেন নি। অমিয়বাবু লিখেছেন : '......পোড়ামাটি বা তার তৈরি যে কোন জিনিস তা সে মন্দির অলংকরণই হোক বা হাঁড়িকুঁড়ি বা অন্য তৈজসপত্র হোক'—এই হাঁড়িকুঁড়ি বা তৈজসপত্র অবশ্যই মাটির তৈরী। অমিয়বাবু কি এখানে ধাতব তৈজসপত্রের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেছেন? আর বৃহত্তর অর্থে প্রাথমিকভাবে পোড়ামাটির জিনিসপত্র কি টেরাকোটা-প্রসঙ্গে অন্তর্গত নয়? 'Terra শব্দটির অর্থই হোল মৃত্তিকা বা মৃত্তিকা নির্মিত। তথাপি পোড়ামাটির হাঁড়িকুঁড়ি বা তৈজসপত্রাদিকে পটারি এবং পটস্যাড্স দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে—বৈজ্ঞানিকভাবে নির্দিষ্ট অর্থে বা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে একটি বিষয়কে বোঝানোর জন্য। টেরাকোটা—শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে

Fine Hard brownish red pottery used as ornamental building Material for statuettes & vases, a work of art made in it its colour . . . .

ইত্যাদি। এখানে

It-baked earth. (The Pocket oxford Dictionary of current English-compiled by Fowler & Fowler. 1939)

সুতরাং বৃহত্তর অর্থে সাধারণভাবে পোড়ানো ইট বা পোড়ামাটির গার্হস্থ্য সামগ্রীকে টেরাকোটা বলা যায় না কি? আমার ধারণা অমিয়বাবু কৌতূহলী জনসাধারণের জন্য সহজপাঠ্য প্রবন্ধ লিখেছেন—তাই তাঁর প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রয়োগ করতে চান নি। যদি প্রণববাবু শিল্পশাস্ত্রে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ যথা টেরাকোটা, পটারি, পটস্যাড্স ইত্যাদির বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করে প্রয়োগ পার্থক্য এবং অর্থপার্থক্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পারতেন তবে তাঁকে নির্দ্বিধায় অভিনন্দন জানাতে পারতাম।

খিরোদ মান্না,
নিজবালিয়া হাওড়া।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বালু হাঁটুতে থুতনি গুঁজে বসে আস্তে আস্তে শরীরটাকে দোলাচ্ছিল বললাম, তুমি এই পাহাড়ী দেশে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেছ নিশ্চয়ই ?

বালুর হাল্কা দুলুনিটা থেমে গেল। ও হাঁটুর ওপরে রাখা মুখখানা কাৎ করে আমার দিকে চেয়ে বলল, অনেক।

বললাম, বিয়ের ভেতর তো অনেক অনুষ্ঠান থাকে কোনটি তোমাকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দেয় বালু ?

ও তার হাঁটুতে তেমনি মুখ গুঁজে বসে রইল। সোজা হয়ে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি বলবে তাই বোধহয় ভাবতে লাগল। এক সময় বলল, বর আসবে তাই সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বর আসছে অনেক দূরের থেকে। এই সময়টা বাবুজী আমার খুব ভাল লাগে। তারপর বর কাছে এলে সবাই যখন তাকে ঘরের ভেতর ডেকে নেয় তখন মনে হয় সে মানুষটি যেন বাড়ীর সকলের অনেক অনেক দিনের চেনা। এ ব্যাপারটাও বাবুজী আমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগে।

হেসে বললাম, এ সবই তো বিয়ের আগের ব্যাপার দেখছি।

বালু বলল, তাহলে শেষের কথা শোনাই। সে বড় দুঃখের বাবুজী। মেয়ে কোঠী ছেড়ে চলে যাচ্ছে এতদিনের সব খেলাধুলো ফেলে। 'বেটী কি বিদাই' শুরু হয়ে গেল। সবার চোখে তখন জল নেমেছে।

বললাম, কি রকম সে অনুষ্ঠান, বালু ?

ও বলল, মেয়ে তার পিতাজীর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে তোমার ঘরের ভেতর আমার পুতুল ছেড়ে যাচ্ছি।

তেরেয়া মহলাঁ দে অন্দর জী

বাবা মরিয়া গুড়িয়া রহিয়া।

পিতাজী তখন মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন, তুমি বাড়ী যাও মা, আমি তোমার পুতুলগুলো তোমার নতুন ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব।

তেরিয়াঁ গুড়িয়াঁ দিংগে পক্কাঈ

ধীয়ে ঘর জা আপনে।

বললাম, বালু, তোমার যখন বিয়ে হবে তখন তোমার পিতাজীকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে তাই না ?

ও প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর এক সময় বলল, বাবুজী, আপনি ডাক্তার আপনি তো সবই জানেন। পিতাজীকে ছেড়ে কোন জায়গায় যাওয়া আমার পক্ষে কি আর সম্ভব ?

কথাটা বলেই ও আবার ওর মুখখানা হাঁটুর ওপর রেখে অন্যদিকে চেয়ে রইল। আমি ওর কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। সহজ লঘু ছন্দে শুরু করেছিলাম কথা কিন্তু কথাটা যে এমন একটা নির্মম সত্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে তা ভাবতে পারি নি।

একটি মেয়ে তার অসহায় বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে পারছে না, অথচ তার যৌবন স্বামীপ্রার্থনায় কুঁড়ির ভেতরে অবরুদ্ধ গন্ধের মত গুমরে গুমরে কাঁদছে, এ ছবি আমাকে বিহ্বল করে তুলল।

এক সময় বললাম, বালু, জীবন কখনো সাজানো ছকে ঘর গুনে গুনে চলে না। কোথা দিয়ে কখন কি ঘটে যায় তা কে বলতে পারে ! তুমি যা ভেবেছ বা আর কেউ যা ভাবছে, তার সবকিছুকে ভণ্ডুল করে দিয়ে ঐ ওপরওয়ালার ভাবনাই কাজ করে যায়।

বালু আমার দিকে হঠাৎ ওর মুখখানা ফিরিয়ে উদাস চোখে চেয়ে রইল।

আমি পরিস্থিতিটাকে লঘু করে দেবার জন্যে বললাম, দেখি তোমার হাতখানা, বালু।

ও হাঁটু থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল। আমার দিকে নিঃসঙ্কোচে ওর হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরেই বুঝলাম, বালু উত্তেজনায় কাঁপছে।

আমি ওর হাতের পাতাখানা আমার হাতের ওপর রেখে চাঁদের আলোয় রেখা-গুলো পড়তে লাগলাম। খুব বিজ্ঞের মত অনেকক্ষণ এদিকওদিক মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললাম, হুঁ !

পৃথিবীতে যে ব্যাপারগুলো মানুষের কৌতূহল সবচেয়ে বেশী জাগিয়ে তোলে, তার ভেতর হাতদেখা অদ্বিতীয়। এব্যাপারে নারীপুরুষের আগ্রহে কোন ভেদ নেই। তবু, আমার কেন যেন মনে হয়, মেয়েদের আগ্রহ এব্যাপারে সীমাহীন।

বালু এতক্ষণে একেবারে ঘুরে বসেছে আমার দিকে। আমি হুঁ বলতেই ও ওর বড় বড় চোখের পরিপূর্ণ চাউনি মেলে ধরল আমার মুখের ওপর।

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললাম, কোন সময় একটা বড় রকমের অসুখে পড়েছিলে বালু ?

হাঁ, বাবুজী।

দেখলাম বালুর গলায় উত্তেজনা কাঁপছে। আমি যে একজন [illegible] হাত-দেখনেওয়ালা, ওতে ওর [illegible] আর কোন সংশয়ই নেই।

বললাম, তোমার হাতের রেখা তাই বলছে বালু। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই তুমি কোন কঠিন অসুখে ভুগেছিলে।

আপনি ঠিকই ধরেছেন বাবুজী। কি একটা অসুখে ভুগতে ভুগতে আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম। এক আঙরেজ ডাক্তার ছিলেন তখন, তাঁর চিকিৎসায় ভাল হয়ে যাই।

বালুর ছেলেবেলার অসুখের ব্যাপারটা আমি কথায় কথায় একদিন পণ্ডিতজীর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। আজ ওটা দিয়েই আমার হাতদেখা বিদ্যেতে পাসমার্ক পেয়ে গেলাম।

আমার দ্বিতীয় কথা আর বালুর অতীতকে নিয়ে নয়, কারণ সেখানে আর কোন পুঁজি নেই আমার। এখন ওর বর্তমানকে নিয়ে বিজ্ঞের মত একটা চাল চেলে বসলাম।

বললাম, বালু, দারুণ একটা অশান্তি আজকাল মাঝে মাঝে তোমার মনটাকে বড় চঞ্চল করে তোলে, তাই না? তার থেকে তুমি বেরিয়ে আসার জন্যে খুবই চেষ্টা কর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পথই খুঁজে পাও না।

বালু মাথা নেড়ে বলল, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বাবুজী, আপনার কথা শুনে। আমার মনটা একেবারে আয়না ধরে আপনি দেখে নিয়েছেন।

মেয়েটির যৌবনের পাখিটা রঙীন পাখা মেলে উড়ছে। কোন উত্তপ্ত নীড় থেকে হয়ত তার কাছে আসে আভাসে ইঙ্গিতে আমন্ত্রণ। তার সারা দেহমন সে ডাকে সাড়া দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা কঠিন কর্তব্যের সুতো ঘুড়ির মত তার সব ইচ্ছাকে টেনে টেনে নামিয়ে আনে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর।

বালুর মত তরুণী মনের অবদমিত ইচ্ছার কথাটা আমার অজানা নয়, তাই ওর বর্তমান নিয়ে ঐ ধরনের একটা মন্তব্য করা আমার পক্ষে কোন ভাবনার ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু বালু! কি সহজ আর গভীর বিশ্বাসে এই মিথ্যাচারী মানুষটার সব কথা নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নিচ্ছে।

এবার ওর ভবিষ্যতের ওপর কিছু বলতে হবে। আমি বালুর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের ওপরই কিছু মন্তব্য করতে চেয়েছিলাম। আর তাই ওর বিশ্বাসটাকে পাকা করে নেবার জন্যে অতীত আর বর্তমানের অবতারণা করেছিলাম।

বললাম, বালু, আশ্চর্য তোমার হাতের রেখা। তুমি খুব সুখী হবে একদিন। এখন যত কষ্ট, তখন তত সুখ। চাঁদের আলোতেও তোমার হাতের ভাগ্যরেখাটা তারার মত জ্বলজ্বল করছে।

বালু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অমনি আমার মনে হল, তউন্দির দিন কুলুর পাহাড়ঘেরা তপ্ত ভ্যালিতে হঠাৎ এক একটা হাওয়া কোথা দিয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর সেই হাওয়া স্তব্ধ পাইনের পাতা কাঁপিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে আবার কোথায় চলে যায়। ক্ষীণ আশার একটা আভাস জাগিয়ে গভীর নিরাশার ভেতর ফেলে দিয়ে যায়।

বালুর দীর্ঘশ্বাসে সেই নিরাশার সুর বেজে উঠল। সেখে বললাম, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো বালু। সব হতাশার মেঘ একদিন তোমার বুকের ওপর থেকে কোথায় উড়ে চলে যাবে, তুমি জানতেও পারবে না। আমার কথা মিথ্যে হবে না বালু।

শেষের বাক্যটা আমার মন যেন একটা সত্যের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করল। আমি বুঝতে পারলাম না, এতক্ষণ মিথ্যার অভিনয় করতে গিয়ে কেন হঠাৎ একটুখানি সত্যের জন্য আমার সমস্ত প্রাণ এমন প্রার্থনার মত বেজে উঠল।

বালু কিন্তু আমার হাত থেকে ওর হাতখানা তুলে নিয়ে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

আমি বললাম, কান্নার এতে কি আছে বালু। আমি এ বয়সে যতটুকু দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতায় বলতে পারি ভাগ্য দীর্ঘদিন কাউকে দুঃখে বা সুখে ফেলে রাখে না।

কিছুক্ষণ পরে আবেগটুকু উপচে পড়ে মনটা যখন স্থির হয়ে এল, তখন জ্যোৎস্নার মত নরম গলায় বালু বলল, বাবুজী, সুখ যদি আসে সে আমার ভাগ্য। তবে সেই দুরাশার ছবি কোনদিনও আমি দেখি না।

আমি বললাম, তুমি যেমন সহজ তেমনি সুন্দর। তুমি তোমার চারদিকে বিপদ ওৎ পেতে থাকবে বালু। কিন্তু তুমি তোমার নিজের শক্তিতেই সব বিপদআপদের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

বালু এ কথার কোন জবাব দিল না।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলাম, আমার এ ধারণা কত ভুল। একটি মেয়ের সরলতা আর সৌন্দর্য তার কতবড় শত্রু হতে পারে, সে প্রমাণ পেয়ে শিউরে উঠেছিলাম। কস্তুরী হরিণীর মত সে কখন শিকার হয়ে পড়ে যে কোন সুচতুর লোলুপ ব্যাধের।

বাহাদুর ভাগতু একা গিয়েছিল নাগগরে। কদিন কাটিয়ে ফিরে এল। এবার একা নয়, সঙ্গে এলো যে তাকে সন্ধ্যার আবছায়ায় চিনতে পারি নি। সে আপেল গাছের ডালভরা সবুজ ফল আর পাতায় তলায় সন্ধ্যার ধূসর আলোয়ানখানা গায় জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইদানীং ডেলিভারী কেসগুলোতে ডাক পড়ছে প্রায়ই। প্রথম প্রথম কিছু কিছু সঙ্কোচ আর সংস্কার ছিল পাহাড়ীদের মনে। এখন বালু সঙ্গে থাকায় সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে আর সময় লাগছে না। তাছাড়া অনিবার্য প্রয়োজন মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার সংস্কারের ঢাকাখানা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

আমি বাংলোর পাশ দিয়ে যখন বালুর সঙ্গে ভ্যালির দিকে কিছু পথ এগিয়ে চলছিলাম তখন আকাশে শেষ আলোর ছাই ছাই ভাব। বালু আমার টাট্টুর লাগাম ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছিল। আমরা কিছু পথ একসঙ্গে [illegible] আমার [illegible]। বাংলোর কাছে দিলাম আমার [illegible]। ও ভ্যালিতে নেমে গেল আমি বাঁধানো রাস্তা ধরে ফিরে এলাম টাট্টুতে চড়ে।

বাংলোর সামনে টাট্টু থেকে নেমেই যে মানুষমূর্তি দেখলাম তাকে ঐ সন্ধ্যার আলোয় চেনা সম্ভব ছিল না। সে যে আমার রাঁধুনী মংলী নয় তা আমি জানতাম। কারণ মংলী কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার মেয়ে নয়। সে স্বভাবে ক্ষিপ্র। দ্রুত কাজ সেরে সে সরে যায়। একটি পলকও সে কাজের বাইরে তাকিয়ে অকারণে খরচ করে না।

তবে মেয়েটি কে। কোন কথা বলছে না সে। মনে হল আমার দিকেই চেয়ে আছে। আমিও কোন কথা না বলে টাট্টুটাকে টেনে নিয়ে এসে বেঁধে রাখলাম যথাস্থানে।

সামনে এসে দাঁড়াল ভাগতু। মিটি মিটি হাসছে।

বললাম তুই কখন এলি?

আমার গলার স্বরে আনন্দের উত্তেজনাটুকু চেপে রাখা গেল না। ভাগতুর উপস্থিতির ভেতর তখন নতুন একটা জগতের ছবি দেখছিলাম আমি।

ভাগতু বলল এসেছি সেই দুপুরবেলা। তখন সবে আপনি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লাম। সারা দুপুরের ক্লান্তির পর আমি একটু বিশুদ্ধ ঝরঝরে হতে চাই। তারপর ভাগতুকে পাশে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেব আমার ঝিন্নির কথা।

স্নান সেরে পোশাক বদলে বেরিয়ে আসতেই ভাগতুর মুখোমুখি হলাম।

ভাগতু বলল খাবার ঘরে যান আপনার চা দেওয়া হয়েছে।

ঢুকে পড়লাম ডাইনিং রুমে। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে কিছু ডালমুট দুখানা ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট। মুখ নীচু করে কাপে চা ঢালছে ঝিন্নি।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম ঝিন্নি তুমি!

ও মুখ তুলে শান্ত গলায় বলল এসো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ কিছু খেয়ে নাও।

আমি পলকে ঝিন্নির পাশে গিয়ে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম ঝিন্নি একটু তফাতে সরে গিয়ে বলল অ্যা কি হচ্ছে ভাগতু বাইরে দাঁড়িয়ে না?

চেঁচিয়ে ডাকলাম ভাগতু।

ভাগতু কাছেই ছিল এসে দাঁড়াল। বললাম দিদি এসেছে মেঠাই আনিসনি বোকারাম। বুদ্ধি খরচ করে একটু তো করতে হয়। যা এখুনি বাজার থেকে নিয়ে আয়।

আমি এই মুহূর্তে ভাগতুটাকে ঘর থেকে ভাগাতে চাইছি।

কিন্তু এবারও বাদ সাধল ঝিন্নি। বলল কোন দরকার নেই ওর বাজারে [illegible] মেঠাই [illegible]

ঝিম্রি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা কৌটো এনে রাখল খাবার টেবিলে। কৌটো খুলে একটা লাড্ডু বের করে আমার প্লেটে রেখে বলল নাও খাও।

দমে গেলাম। আমি যেন সত্যি লাড্ডু খেতে চাইছি।

বেশ খানিকটা অভিমান নিয়ে ডালমুট চিবুতে চিবুতে আমি চা খাচ্ছিলাম। পাশের একটা চেয়ারে বসে ঝিম্রি তার চায়ের কাপ ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিল। কোন কথা হচ্ছিল না আমাদের ভেতর। এখন আমি প্রতি মুহূর্তে ঝিম্রির মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে কান পেতে ছিলাম।

ঝিম্রি কথা বলল আর কিছু দেব?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথার উত্তর নিজেই তৈরী করে নিয়ে বলল এখন বেশী কিছু খেলে তো আবার রাতের খাবার খেতে চাইবে না। তার চেয়ে থাক।

বললাম আমি যখন বাংলোতে ঢুকি তখন তুমিই কি বাগানের আবছায়ায় দাঁড়িয়েছিলে ঝিম্রি?

ঝিম্রি সঙ্গে সঙ্গে বলল সে অন্য কোন মেয়ে।

বললাম কে সে ঝিম্রি?

ও বলল কি দরকার তার খবর জেনে? আর খোঁজ নেবার দরকার থাকলে বাংলোতে ঢোকার আগেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে

বললাম ক্ষমা চাইছি ঝিম্রি। আমি অন্ধকারে তোমাকে চিনতে পারি নি।

ঝিম্রি অমনি বলল বললাম তো আমি নই।

আমার কোন সন্দেহই ছিল না যে আপেল গাছটার তলায় সন্ধ্যার আবছায়ায় ঝিম্রিই দাঁড়িয়েছিল। ওকে কোন প্রশ্ন করি নি তখন তাই তীব্র একটা অভিমানে ও নিজেকে কঠিন করে তুলেছে।

আমি চা খাওয়া শেষ করে শুধু বললাম তুমি আজ তোমার ঘরে এসেছ ঝিম্রি কারো ডাকের অপেক্ষা রাখনি। তাই বলছি এ ঘরের সুবিধে অসুবিধে সুখ দুঃখ সবই তোমার।

ঝিম্রি কোন কথা বলল না। কেবল দু-একবার আমার দিকে চোখের কোণে তাকাল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বললাম আজ আমার উৎসবের রাত ঝিম্রি তুমি সেই উৎসবের দীপ জ্বালাবে মনালীর বাংলোতে।

কথাটা বলে আমি চলে এলাম আমার বসার ঘরে।

ঝিম্রি একটু পরেই আমার পাশ দিয়ে চলে গেল আমার শোবার ঘরের দিকে।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল. ঝিম্রির আর দেখা নেই।

আমি পায়ে পায়ে শোবার ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আধভেজানো দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখলাম আমার বিছানায় সুন্দর কাজকরা একটি বেডকভার পাতা রয়েছে। বুঝলাম ঝিম্রির হাত পড়েছে বিছানায়।

ঝিম্রি কিন্তু ওখানে নেই। আমি আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। ঘরের এককোণে টিপয়ের ওপর রাখা ফুলদানির ফুলগুলো একমনে দেখছে ঝিম্রি।

বললাম অগোছালো ঘরখানার চেহারা একদম পাল্টে ফেলেছ দেখছি।

ঝিম্রি এবার আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল ফুলদানির এ ফুলগুলো কোথায় পেলে? আমাদের বাগানে তো নেই।

বললাম বালু কোথা থেকে এনে সাজিয়ে রেখে গেছে।

ঝিম্রি ওখান থেকেই বলল বালু কে?

বললাম ত্যালিঘ ওপারে এক পণ্ডিতজী থাকেন তাঁরই মেয়ে। বড় অসহায় তাই ডাক্তারখানার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

ঝিম্রি পায়ে পায়ে সরে এল আমার পাশে। আমার মুখের ওপর ওর স্থির দুটো চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল তুমি তো কোনদিন বালুর কথা আমাকে জানাও নি।

ঝিম্রির গলার স্বরে কি ছিল আমি জানি না ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমি কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম। যাকে ভালবাসা যায় তার কাছ থেকে বুঝি কোন কিছু গোপন করে রাখতে নেই। এই সত্যটা এতদিন মনে জাগে নি বলে দারুণ একটা লজ্জা জন্মাল নিজের ওপর। আমি সহজভাবেই

[illegible] অন্যায় অবস্থার কিছুটা সমাধান [illegible] চেয়েছিলাম কিন্তু সেটা যে আর [illegible] জানানো দরকার তা আমি কোন-দিন ভাবিনি। ঝিমির কাছে তাই বালুর [illegible] অনুক্তই থেকে গেছে।

ঝিমির কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললাম তোমাকে বালুর কথা না জানিয়ে খুব অন্যায় করে ফেলেছি ঝিমি। আমি ভাবতেও পারি নি যে এমন একটা তুচ্ছ ঘটনা তোমাকে জানানো আমার উচিত ছিল।

ঝিমি বলল তুচ্ছ ঘটনা বলছ কেন। তোমার আমার ভেতর ছোটবড় বলে তো কিছু থাকতে পারে না। দুজনে আমরা দুজনের কাছে সব কথা খুলে বলব তা যত তুচ্ছই হোক না কেন।

বললাম ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ঝিমি।

হয়ত আমার গলার স্বরে একটা অভি-মান বেজে উঠে থাকবে ঝিমি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ঘরের সুইচটা অফ করে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আমার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। সেই মুহূর্তে কোন কথা বলে মিথ্যে ওর কান্না থামাতে চেষ্টা করলাম না।

একটা সন্দেহের কীট সূক্ষ্ম কোন ছিদ্র-পথে ঢুকে পড়েছে ঝিমির মনের মধ্যে। সে কীট ইতিমধ্যেই তার ধ্বংসের কাজ শুরু

করে দিয়েছে। বিশ্বাসের বাতাসে ভরা বুক-খানাকে সে ঘুরে ঘুরে ঝাঁঝরা করে চলেছে।

আমার কেন জানি না মনে হল দুটি সূত্র থেকে বাল্লুর খবর পেয়েছে ঝিমি। ভাগতু যখন নাগপুরে ছিল তখন কৌতূহলী ঝিমি আমার প্রতিদিনের কাজকর্মের হিসেব নিয়েছে ভাগতুর কাছ থেকে। আর এটাই তো তার দিক থেকে স্বাভাবিক। সরল ভাগতুর মুখে সহজেই এসে পড়েছে বাল্লুর নাম আর তার প্রতিদিনের ক্রিয়া-কর্মের কথা। আমার সঙ্গে কাজের ভেতর দিয়ে তার সংযোগ। ডাক্তারীর ব্যাপারে আমাদের দিনেরাতে একই সঙ্গে বাইরে ঘোরাফেরা।

এই ব্যাপারই ঝিমিকে টেনে এনেছে নাগপুর থেকে মানালীর বাংলোতে। এখানে এসে মনে হয় সে দেখেছে বেলাশেষের পথ ধরে বাংলোর পাশ দিয়ে আমাকে আর বাল্লুকে এগিয়ে যেতে।

ঝিমিকে বুকে ধরে রেখে বললাম এক বুকে দুজনের কি করে জায়গা হয় ঝিমি?

ও সঙ্গে সঙ্গে আরও জল ঝরাল আমার বুকে। কেঁদে কেঁদে একসময় কিছুটা শান্ত হল। আমি বুঝতে পারলাম দারুণ একটা ব্যথা ও বুকে বয়ে এনেছিল নাগপুর থেকে!

আমি ওর হাত ধরে টেনে এনে বসালাম বিছানার ওপর। বললাম আসা অব্দি আমার ঝিমির মুখখানা ভাল করে দেখতে পাই নি আমাকে একটু দেখতে দাও।

বলতে বলতে আমি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে সুইচটা অন করে দিলাম। অমনি ঝিমি হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফেলেছে।

ঘরের উত্তর দিকের জানলাটা কেবল খোলা। ওদিকে প্রসারিত ভ্যালি আর তার ঠিক পরেই পাহাড়ের বুকে পাইন সিডারের অরণ্য। সবার পেছনে ঝকঝকে তুষারপাহাড়।

আজ চাঁদ ওঠে নি। আমি ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঝিমির দিকে তাকালাম। ওর মুখখানা ঢাকা। আমি শুধু ওর আলোয় ভাসা আঙুলগুলো দেখতে পেলাম। বাল্লুর সঙ্গে ওর আঙুলের তফাতটা চোখে পড়ে। ঝিমি শিল্পী আর বাল্লু কর্মী। সারাদিন কাজের চাকায় ঘুরছে বাল্লুর দুখানা হাত। কিছুটা শক্তির রুক্ষতা সে হাতের আঙুলে। আর ঝিমি সব কাজের ভেতর থেকেও শিল্পীর হাতের সুষমাটুকু বাঁচিয়ে চলেছে।

ওর হাতের আংটিতে বড় একটা হলুদ পাথর। আলো পড়ে ভারী কোমল একটা আভা ছড়াচ্ছে। ওর নিটোল কনকচাঁপা রঙের আঙুলগুলো ঠিক যেন জাফরীর মত ঢেকে রেখেছে অন্দরমহলের রহস্য।

আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম তোমার সুন্দর আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে আশ্চর্য লাগছে মুখখানা। ঠিক যেন রহস্যজড়ানো কারুকার্য।

ঝিমি আঙুলের ফাঁকগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় করে ফেলল আর অমনি ওর মুখের [illegible]
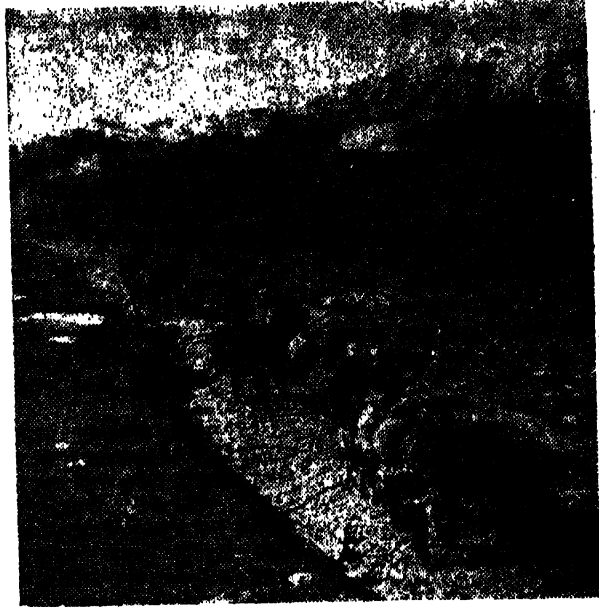
ওর পাশে বসে ওকে আমার বুকের ভেতর টেনে নিলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ওপর ওর দু-হাতের আঙুলে দুটো চাঁপাফুল ফুটিয়ে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখল মুখখানা।

আমি আর ওর মুখ দেখতে চাইলাম না। ওর বাদামী চুলে ভরা মাথার ওপর আমার থুতনিটা আলতো করে চেপে ধরে চুপচাপ ওকে অনুভব করতে লাগলাম।

খাওয়া হয়ে গেলে ভাগতু বাগান পেরিয়ে চলে গেল বাইরের ঘরে শুতে। আমি শোবার ঘরে আসার পথে দেখলাম রসুই-খানার পাশে অবরীতে আর একখানা বিছানা পাতা। থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম ঝিমি কি তাহলে এখানে শোবার আয়োজন করেছে!

ঝিমি নীচে গেছে ভাগতুর সঙ্গে। চাঁদটা কোথায় যেন গাছের ডালে পাতায় আটকে আছে তার আলো এসে পড়েছে বাগানে। আমি শোবার ঘরে গিয়ে বসলাম। ভ্যালিটা চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে পাতলা দুধে ভরা। ভ্যালির উত্তরের পাহাড়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ফোটে নি তখনও। তবে তার ওপারে পীর-পাঞ্জালের চূড়োর সাদা বরফ চাঁদের আলোয় বেশ ফুটে উঠেছে।

আমার শোবার ঘরের আলো নেভানো। কাচের জানালায় আলো জ্বলছে। আমি ভ্যালির দিকে চেয়ে বাল্লুর ঘরখানার অবস্থিতি আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু অনেক দূরের আর একখানা কোঠী দিনের আলোতেই স্পষ্ট দেখা যায় না রাতের আব-ছায়ায় সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

এখন বাল্লু কি করছে? সারাদিনের শ্রান্তির পর ঘরের মেঝেতে বিছানো খিলের ওপর শুয়ে পড়েছে। হয়ত এখন অচেতনে ঘুমোচ্ছে সে। হয়ত বা সে আদপেই ঘুমোচ্ছে না। ফোকরার রন্ধ্রপথে আমারই মত চেয়ে আছে ভ্যালির দিকে। এমনও হতে পারে আমারই মত বাল্লুও খুঁজছে একখানা ঘর, যে ঘরখানা ভ্যালির রহস্যসাগরের পরপারে।

বাল্লুর ভাবনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই তার কাজের সঙ্গে আমার পরিচয়। সে কম কথা বলে। আমার ইঙ্গিতগুলো সে সহজে ধরে নিয়ে কাজ করে যাবার মত বুদ্ধি রাখে। ডাক্তার হিসেবে ওতেই আমি খুশী। কিন্তু একটি তরুণীর ভাবনা কল্পনা নিশ্চয়ই শুধু তার কর্তব্যের সীমানাতেই শেষ হয়ে যায় না, চাঁদের আলোর মত জীবনের রহস্যময় অন্ধকারকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়াতেই তার সুখদুঃখ। রাতের একটি তগরের ফুলের গন্ধ নিতে নিতে কেন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তা সে জানে না। বসন্তের উতলা হাওয়া যখন ফুলেভরা আপেলের ডাল ছুঁয়ে বয়ে যায় তখন কেন সে চলতি পথে স্থির হয়ে দাঁড়ায় তাও তার কাছে অজানা। তবু এই অচেনা আধোচেনা জগতটাই তার ভাবনার রাজ্য। এ রাজ্যের পথে পথে সে উদাসী পথচারিণী শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। [illegible] এ রাজ্যের চলার রীতি।

(ক্রমশঃ)

সাধারণতঃ রচনার নানা বিষয়কে আমরা সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত করে থাকি। তার মধ্যে প্রধানতঃ কবিতা, গল্প-উপন্যাস, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রভৃতিকে ধরা হয়ে থাকে অবশ্য কবিতার মধ্যে আবার যেমন লেমেরিক, সনেট, গাথা প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ আছে তেমনি গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যেও আছে নানা শ্রেণী। মূলতঃ 'কাব্য-সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্যই (গল্প-উপন্যাস) আমাদের সাহিত্যের উপাদান এবং এই সকল বিষয়গুলিই আমরা নিজে-দের রুচি অনুযায়ী পাঠ করে থাকি।
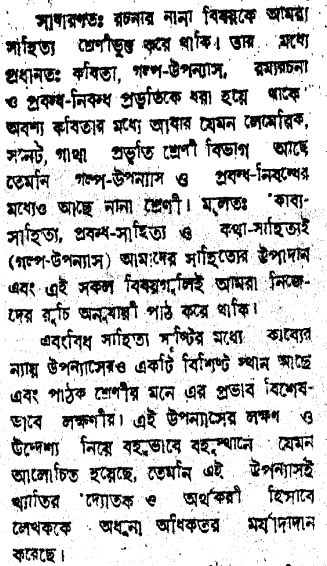
এবংবিধ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কাব্যের ন্যায় উপন্যাসেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং পাঠক শ্রেণীর মনে এর প্রভাব বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। এই উপন্যাসের লক্ষণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বহুভাবে বহুস্থানে যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি এই উপন্যাসই খ্যাতির দ্যোতক ও অর্থকরী হিসাবে লেখককে অধুনা অধিকতর মর্যাদাদান করেছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'উপন্যাস' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি বর্তমান কালের উপন্যাস লেখকদের মনে যেমন আলোকপাত করবে, তেমনি নূতন রচনায় যাঁরা উদ্যোগী তাঁদেরও পথনির্দেশে উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই।

।। উপন্যাস ।।

উপন্যাস-বিচারে দুইটি বিষয় প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখিতে হয়—উপন্যাসের উদ্দেশ্য ও উপন্যাসের শিল্প-নৈপুণ্য (আর্ট)। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে উপন্যাসের উদ্দেশ্য বা বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাহি।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য যদি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয়, তবে অর তাহা পৃথক করিয়া ভাবিতে হইবে কেন? সব উপন্যাসের উদ্দেশ্য যখন একই হইল, তখন উপন্যাস-বিচারে সে উদ্দেশ্য নূতন করিয়া ভাবিবার আবশ্যকতা কি? বিচার তো তুলনা দ্বারা? তবে যাহা সকল গ্রন্থেই এক, বিচারকালে সেটি তো ভাবিবারই দরকার নাই—এইরূপ প্রশ্ন সহসা মনে উঠিতে পারে। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি যে উপন্যাসের উদ্দেশ্য, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বলি যে, 'সৌন্দর্য্য' এইখানে ইহার বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কথার অর্থ লইয়া কলহ [illegible] তাহা

আমরা [illegible] প্রস্তুত নহি। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই সকল প্রকার চরিত্রের, সকল প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এই সৌন্দর্য্য যখন একটা বস্তু, তখন ইহার বিভাগ অসম্ভব; সুতরাং স্বীকার করি সকল প্রকার উপন্যাসেরই উদ্দেশ্য একই প্রকার। কিন্তু এই বস্তুটি অবশ্য কোনও কিছুতে এবং এই কোনও কিছুর সহিত যোগেই ইহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে সেই সৃষ্ট পদার্থটির প্রকার ভেদ থাকা সম্বন্ধে তর্ক না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাস বা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের উদ্দেশ্য বা বিষয় আছে, এ কথাও নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে। ফলত ইহাই প্রকৃত কথা। উপরের কথা ভুল না হইলেও হয় অতি স্থূল, নহিলে অতি সূক্ষ্ম। শুদ্ধ সে কথা বলিলে কিছুই বলা হয় না।

বিবিধ প্রকার ভাবাদিগত চরমোৎকর্ষ সৃজনই উপন্যাস-চরিত্র-স্রষ্টার সাক্ষাৎ লক্ষ্য। কিন্তু গৌণভাবে আরও একটি লক্ষ্য আছে। সেটি পাঠকবর্গের চিত্তশুদ্ধিবিধান। পাঠকের চিত্তকে সৌন্দর্য্য অনুভব করাইয়া ইহার চিত্তশুদ্ধি বিধানই কাব্যের ধর্ম্ম। আমরা 'কাব্য' কথার অর্থ গোলে না পড়িয়া বলিব—উপন্যাসের ধর্ম্ম। কাব্যের অন্যাংশ আমাদের আলোচ্য নহে।

উপন্যাস এই দুইটি লইয়া—সৌন্দর্য্য ও চিত্তশুদ্ধি। কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, এই সৌন্দর্য্য প্রেমমূলক—শুধু তাহাও নহে, রমণী-প্রেমমূলক, কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন, নীতি বা ধর্ম্মতত্ত্ব হইলে, তথায় সৌন্দর্য্যের অবস্থান অসম্ভব ব্যাপার। প্রচলিত অর্থ হইতে বিভিন্ন অর্থযুক্ত অথবা বিস্তৃত বা অনির্দ্দিষ্ট অর্থযুক্ত কথার ব্যবহারে প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ একটা ফল দাঁড়ায়। আমরা বুঝি, যে চরিত্র লইয়া উপন্যাস, সেই চরিত্রে যাহা কিছু আছে, ধর্ম্ম হউক অধর্ম্ম হউক, পাপ হউক পুণ্য হউক তদ্দ্বারাই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা সম্ভব। যাঁহারা পাপ চরিত্র-দ্বারা আবার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কি, বুঝেন না, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই উপন্যাসের উদ্দেশ্য এ কথা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু পাপ-চরিত্রে যে পুণ্যচরিত্রেরই সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, উপন্যাস পাঠককে একথা বলিতে হইবে না। পাপ চরিত্র পুণ্য চরিত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। কেবলমাত্র ইহা লইয়াও উপন্যাস হইতে কোন বাধা দেখি না। ইহাও পাঠের সৌন্দর্য্য অনুভব করাইয়া চিত্তশুদ্ধি বিধানে সমর্থ।

হৃদয়ের স্থায়ী ভাবমাত্রই লোকের নীতি হইতে পারে। চরিত্র তো এই স্থায়ী ভাব লইয়া? তবে উপন্যাস নীতিমূলক বলিতেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? নীতির উল্লেখ অবশ্য উপন্যাসের কার্য্য নহে—নীতির ব্যাখ্যা বা তাহার কার্য্যাকার্য্য প্রদর্শনই উপন্যাসের কার্য্য। বঙ্কিমবাবু একস্থলে লিখিয়াছেন, কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যামাত্র। কাব্য অর্থ যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সংজ্ঞাও কিছু [illegible]-বিপরীত আবশ্যক; কিন্তু

[illegible] আলোচ্য উপন্যাস [illegible] ও উদ্দেশ্য।

উপন্যাস [illegible] অনায়াসে ব্যাখ্যা যায়। কঠিন বা সহজ উপন্যাসের বিচারকালেই [illegible]—উপন্যাস এই [illegible] লইয়া। যাহাকে আমরা সমাজের নীতি বলি, সেই নীতি এই ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্র। এই নীতিতে যত্ন হইয়াই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্ট হয়—উপন্যাস সৃষ্ট হয়। নীতিকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তাই সহজে দেখিতে তাহা পরিস্ফুট হয় না। উপন্যাসের নীতি-ব্যাখ্যা অনাবশ্যকীয় কার্য্য নহে। কারণ ইহা বুঝিলে 'আর্ট' ভাল বুঝা যায়। চিত্র ও চরিত্র এ সম্বন্ধে একরূপ নহে। চিত্রে ফুটাইতে 'আর্ট' নিয়োজিত হয়, চরিত্রে প্রচ্ছন্ন রাখিতেই 'আর্ট' ব্যবহৃত হয়। কারণও বড় সুন্দর, কিন্তু তাহা বলিবার এ স্থান নহে।

উপন্যাসের এই যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হইল, উপন্যাসের প্রকৃত বিচারে তাহা নিতান্তই দ্রষ্টব্য বিষয়। এই উদ্দেশ্য বল, সমস্যা বল, নীতি বল, তত্ত্ব বল, ইহা না বুঝিলে, শিল্প-নৈপুণ্য বুঝা যায় না। এই 'সাবজেক্ট' না বুঝিলে তৎপ্রতি নিয়োজিত 'আর্ট' বুঝা যায় না। এই আর্টের মাত্রা না বুঝিতে পারিলে, উপন্যাসের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইল না এবং তাহা না হইলে উপন্যাসের বিচারই অসম্ভব।

দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দুইটি চিত্রকর দুইটি চিত্র অঙ্কন করিল। একটি সরল রেখার—অপরটি মনুষ্যমূর্ত্তির। প্রথমটি নিষ্কলঙ্ক হইল দ্বিতীয়টির স্থানে স্থানে কিছু কলঙ্ক দেখা গেল। ইহা দেখিয়া কি কোন বিচারক বলিতে পারেন যে, এই সরল রেখার চিত্রকর মনুষ্যমূর্ত্তির চিত্রকর অপেক্ষা ভাল চিত্রকর? কখনই নহে। প্রথম একটির বিষয় অতি সহজ, অন্যটির বিষয় অপেক্ষাকৃত অনেক কঠিন। আবার মনে কর, একটি অতি সুন্দর ভাবযুক্ত ছবি ও অপর একটি বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণরাজী বিভাসিত অনর্থযুক্ত ছবি তুমি একটি বালকের সম্মুখে ধরিলে। বালক ইহার কোনটি লইবে। অবশ্যই শেষেরটি। কেন? না, প্রথমটি অপেক্ষা সে শেষেরটিতে অধিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। কেন পায়? না, সে প্রথমটির 'আর্ট' বুঝিতে পারে না, সুতরাং সৌন্দর্য্যই বুঝিতে পারে না।

কেহ যদি এইরূপ বলিতে চাহেন, 'অত কথায় কাজ কি? যাহা আমার নিকটে সহজে ভাল লাগিবে, তাহাই ভাল বলিব, যাহা ভাল লাগিবে না, তাহাই মন্দ বলিব।' আমরা তাঁহাকে বলিব যে, এ তাঁহার বিচার হইল না। সৌন্দর্য্য দ্বারা বিচার করিতে হইবে বলিয়াই যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা নেই এরূপ নহে। উপন্যাস বিচারকালে তাঁহাকে ধীরভাবে উপন্যাসের বিষয় ও তাৎপর্য্য প্রভৃতি 'আর্ট' ভাল করিয়াই দেখিতে হইবে, নহিলে সুবিচার অসম্ভব।

[illegible]

পৃথিবী তখন আলোর স্বল্পতায় ভুগছে। সূর্য ডুবছে। চাঁদ উঠতে বেশ দেরী। পাখিরা ফিরছে। মানে বেশ একটা পরিবেশ। ঠিক তখন আমি তার শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়ালাম। সে অলসগোছে শুয়ে কি পড়ছিল অন্যমনস্ক হয়ে।

আমার প্রথম ডাকে সে সাড়া দিল না। দ্বিতীয় ডাকে ধড়মড় করে বিছানায় সোজা দাঁড়াল। পাখিরা যেমন ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। গলা ডুবিয়ে মাটি মাখে। টানটান ডানা মেলে ঠোঁট নখ দিয়ে সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলত। তেমনি সেও শাড়ীর অবিন্যস্ত ভাঁজটাকে ঠিকঠাক করে একটি মেয়েলি মুদ্রাদোষ সারল। অর্থাৎ বুকের কাপড় একটু টেনে দিয়ে আলতো করে বসে বলল—'সত্যিই আসবেন, ভাবিনি।'

আমি ছোট্ট একটা অমায়িক হাসিতে পরিবেশ আয়ত্তে। মনোরম করে বললাম, 'বলেই তো রেখেছিলাম।'

আমার একটা স্বভাব, সবাই জানে, বসবার সুবন্দোবস্ত থাকলেও শুতে পেলে ছাড়ি না। অবশ্য সটান শুয়ে পড়া নয়। বাম কাতে বাম পা লম্বা করে বিছানায় রেখে। তারই ওপর ডান পা কৌণিকভাবে আলতো ছুঁইয়ে বাম হাতের তালুতে মাথাটার ভর রেখে থাকি। আর ডান হাত সর্বদাই মুক্ত থাকবে, এই কারণে, যেন আমার বক্তব্যে সর্বশেষ ভূমিকা নিতে পারে। মানে বেশ একটা ইয়ার্কি মাখা আসন বলা যায়।

যাই হোক, এইভাবে শয্যা নিয়ে ওর সামনে আমার লেখাটা তুলে ধরলাম। আপাত উদ্দেশ্য, আমার গল্পের নায়িকাকে নিয়ে একটা মুস্কিলে পড়া গেছে। যেহেতু সেও নারী অবশ্যই সে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে বলে দেবে নায়িকার কোন অবমাননা করে ফেলেছি কিনা। তার মতামত পেলে তবেই আমার নায়িকাকে ওভাবে এগুতে দেব। এ-সময়ে কাঁধে একটা প্রবল চাতুরীর ঝাঁকি দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটাকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—'এই হল, ধরো, অমলেন্দুর শয্যা।'

সে এতক্ষণ ফুলের মিষ্টি সুবাস হয়ে বসেছিল। যেন সব পাপড়িগুলো মেলে দিয়ে ফুল। কিন্তু আমার প্রশ্নে একটু নড়েচড়ে যথাসম্ভব চোখ দুটোকে ভু সিন্ধ রেখে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে

রইলো। যেন ঐ শয্যায় অমলেন্দুকে স্পষ্টই সে দেখতে পাচ্ছে।

'ধরো এই হল অমলেন্দুর দরজা'—বলে দেশলাই বাকসকে সিগারেটের প্যাকেটের অদূরে রেখে আবার বললাম—'এই দরজার কাছে সুষমা দাঁড়িয়ে, বিশেষ একটা দাবী নিয়ে। আর নিদ্রিত অমলেন্দু হঠাৎ শব্দে জেগে অবাক।'

মনে হল এবার সে একটা কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাবে। তার প্রস্তুতি হিসেবে শরীরের হাড়গুলোকে একটু শক্ত করে এনে দুই হাঁটুর ওপর থুতনি ছুঁইয়ে বলল—'বলে যান, শুনতে পাচ্ছি।'

এই ফাঁকে আমিও আমার সেই ইয়ার্কি-মাখা ভঙ্গিকে একটু বদল করে ফেললাম। এবার পা দুটোকে সামান্য মুড়ে সমান্তরালে ফেলে রাখলাম। আর বাম কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঠতেই দুটো চোখ বিদ্যুতে পিছলে গেল। তার সামনের দিকে ঝুলে থাকা শরীরের শাড়ী জামা শিথিল। বুকের ওপর আলতো হয়ে লেগে থাকা ভারী রঙ্গীন স্বপ্ন দুটো নিশ্বাসে উঠছে-নামছে। ভোরের কুয়াশার রং-মাখা সেই স্বপ্ন দুটোর ভাঁজ আমার চোখকেও নিবিড় মোহময় করে তুলছে। আমি যেন তার সুগন্ধও পেয়ে যাচ্ছি। এবার ওর আরো গভীরে প্রবেশ করতেও আমার আর কোন লজ্জা থাকছে না। সেই সাহস আমি অর্জন করে ফেলছি। আসল প্রসঙ্গে আসতে আমার যা কিছু লজ্জা বাকী ছিল তা কাটিয়ে উঠছি। ওর কাছে আরো সহজ হয়ে পড়ছি, এই ভাবটা এসে পড়তেই বলে ফেললাম—'কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ। তার আগে ভূমিকা হিসেবে বলে রাখা ভাল—অমলেন্দু সুষমার স্বামী সৌমেনের বিশেষ বন্ধু। ওদিকে, ফুলশয্যার রাতে লজ্জায় এবং সংকোচে সুষমা এবং স্বামী সৌমেনের মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। অথচ তারই পরদিন বিশেষ কেনাকাটা করতে গিয়ে শহরে দুর্ঘটনায় সৌমেন মারা যায়।

এই সময়ে, সৌমেনের আকস্মিক মৃত্যুকে সে সহ্য করতে পারছিল না। মনে হল তার নাভিমূলে মোচড় দিয়ে উঠে বুক বেয়ে এসে নাক দিয়ে একটা সমবেদনার শব্দ 'উহ' বেরিয়ে এল।

আমি কিন্তু আমার গল্পের নায়িকার স্বামীর হত্যাকাণ্ডকে গ্রাহ্যই করলাম না। দুটো রক্তিম চোখে আমি কশাই হয়ে গেছি। সৌমেন সেখানে তুচ্ছ। নাটকের ক্লাইম্যাকসে অমলেন্দুকে এনে ফেলতেই আমি ব্যস্ত।

তাই মুক্ত সেই হাতটাকে সজোরে নাড়িয়ে বললাম—'তবু ঐ সময়ের মধ্যে সৌমেনের মুখে অমলেন্দুর নাম বহুবার সুষমা শুনেছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে—ধরো, অবশ্য গল্পে যেভাবে লিখেছি—গ্রামের খামার বাড়িতে সৌমেনের বাবা একা থাকতেন। সেখানেই সদ্য-বিধবা সুষমা থেকে যাবে। শ্বশুরের জন্যই। ফিরেও সে যেতে রাজী নয়। অথচ থেকে যেতেও কষ্ট। কারণ, এদিকে বিরাট খামার বাড়ি। শ্বশুর মারা গেলে একা। অবলম্বনহীনা। অন্যদিকে নারীর চিরন্তন মাতৃত্ববোধ। সব মিলে এক ব্যাকুল যন্ত্রণা।'

ঠিক এই সময়ে ওর বোন চা দিয়ে গেল। প্লেটের মধ্যে বিস্কুট ফস্কুট থাকতে পারে। আমি ওদিকে চাইছি না। আসলে আমি ওর বোনকে এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আদৌ সহ্য করতে পারছি না। কারণ ওর দিদির সঙ্গে একটু বাদেই একটা যৌন প্রশ্ন এসে যাবে। তারই ভূমিকা হিসেবে একটা নরম রসে ভাব তৈরি করে ফেলেছি। এটুকু নষ্ট হয়ে যেতে দিতে চাই না। তাছাড়া এটাও যাতে প্রকাশ না হয়ে যায়, অন্ততঃ রাজী নই যে আমার মনের উঠোনে যে অরণ্যানি, তাতে এলোমেলো যে হাওয়া সেই অরণ্যকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়, সে কে, কাউকে বুঝতে দিতে চাই না। সেই অরণ্যের আনাচে-কানাচে সেই হাওয়া ছাড় আর কোন কীটকেও প্রবেশ করতে দিতে চাই না। তবু স্বাভাবিক সৌজন্যে এবং একটা যেন মমত্ববোধ ওদের সারা পরিবারের জন্য, এই ভাবটা ফুটিয়ে ওর বোনকে বললাম—'কি কেমন, বেশ ভাল তো?'

কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই আসল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে ওর দিদির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়লাম—'কি যেন বলছিলাম!'

আসলে আমি চাইলাম, এই ফাঁকে যেন ওর বোনটি চলে যায়। দেখলাম সেই বোনটি সামান্য একটু হাসি ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

ভেতরের অস্বাচ্ছন্দ্যের ঘামটা শুকিয়ে আসতে ব্যাহত গল্পের সূত্র ধরে ওকে বললাম—'ওদিকে অমলেন্দু তার বন্ধু সৌমেনের বিয়েতে আসতে পারেনি। কাজে আটকে পড়েছিল। বিয়ের দিন কুড়ি বাদে হঠাৎ চমকে দেবে ভেবে সেই গ্রামের বাড়িতে এসে শোনে সৌমেন মৃত। অমলেন্দুর মনে হবে যেন এই মাত্র একটা ডিনামাইট ফেটেছে। সামনের যা-কিছু সব মুহূর্তে ছিন্ন, উৎক্ষিপ্ত, দলিত। তার জ্ঞান ফিরেছিল সুষমা যখন ঘরে প্রবেশ করে।'

এই সময় সে তার বসার ভঙ্গি সামান্য পাল্টে ফেলল। আঁচলের খুঁটে কপালের ঘাম মুছে দেয়ালের দিকে তাকাল। বিশেষ কিছু ভেবে আমিও তাকালাম। দেখি একটা টিকটিকি আক্রমণ ঠেকাতে দ্রুত পালাতে গিয়ে মেঝেতে থপ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাতেই চমকে গেলাম। মনে হল যেন কোন শিল্পী ধৈর্যের বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে রোমাঞ্চের শিখা ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর স্থবির মুখে। অনিচ্ছা, অনীহার এই স্থাপত্যকে শিল্পীর যেন পছন্দ নয়। একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতেই শিল্পী ব্যস্ত। আর সে, সেই আঘাতে আঘাতে ক্রমশঃ মসৃণ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমি যেন তারই ইঙ্গিত দেখতে পেলাম।

'হ্যাঁ'—আমি বললাম—'এইবার আমার আসল প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছি।' বলেই ভাবলাম, আসলে এটাই কি আমার আসল প্রশ্ন? আমার উঠোন প্রাঙ্গণে যে অরণ্য, তাতে একটু ঝড় উঠুক। কেঁপে-টেঁপে উথাল পাথাল হয়ে ঝড়ুক পাতাগুলো। আসলে এই সবই কি চাইছি না মনের গভীরে? কিন্তু আসলে আমি ভীরু। ঝড়ের সত্যকে স্বীকার করতে পারছি না। তাই ফাঁদা গল্পের মুখোস এঁটে সগর্বে তাকে বললাম—'সুষমার সুপ্ত সত্তায় মাতৃত্বের যে বোধ ঘুমিয়েছিল, তা অমলেন্দুকে দেখেই জেগে ওঠে। অমলেন্দু সম্পর্কে স্বামীর কাছে যা শুনেছিল তাতে করে একটা শ্রদ্ধা তৈরি হয়েই ছিল। অমলেন্দুকে দেখে তৈরি হয়ে গেল একটা আকর্ষণ, পাবার একটা আকাঙ্ক্ষা। আর এমন অদ্বিতীয় সুযোগ ফিরে নাও আসতে পারে এই জন্য যে, স্বামীর মৃত্যু সংবাদে অচেতন্য অমলেন্দুকে যে-ঘরে শোয়ান হয়েছে, স্বভাবতই তার দরজা খোলা। সুষমা অনায়াসে সেই ঘরে প্রবেশ করে অমলেন্দুকে জাগিয়ে বোঝাতে পারবে যে, অন্ততঃ এই রাতের জন্য শুধুমাত্র মিলিত হতে চায়—মা হবার জন্যই।'

আমি সিগারেটের প্যাকেট দেখিয়ে বললাম ওকে—'এখানেই অমলেন্দু শুয়ে। আমি পুরুষের বিচারে বলে দিতে পারি যে, এ-ধরনের আকস্মিক প্রস্তাবে অমলেন্দু যতই অবাক, হতচকিত বা বিহ্বল হয়ে যাক, তবু সে পুরুষ। একজন পুরুষের

অবাধে বেরিয়ে আসে, উঠে যায় না—
আফগান নেল এনামেল। দিনের পর
দিন মনে হয় যেন সদ্য লাগানো হয়েছে।
২৪টি রঙে—প্লেন আর ফ্রস্টেড।
আপনার শাড়ী আর পোশাকের সঙ্গে
খুব সুন্দর মানায়।
আফগান
নেল এনামেল
নখে হিরা-মুক্তার মত
ঝকঝক করে
AFGHAN
ই. এস. পাটনওয়ালা
বোম্বাই-৪০০০৮৬
সৌন্দর্যে, সুষমায়, সুরুচিতে...
আপনার সাথী
আফগান
নেল
এনামেল
ES/75 BEN

জাগছে গভীর রাতে একাকিনী; যার সর্বাঙ্গ যুবতীর। যে দেহ থেকে ঝকঝকে রং আর রূপের আগুন ঝরছে এবং কেরোসিনের আলোকের স্বল্পতায় মধ্যেও যা খুব স্পষ্ট, তা ওর চোখ দুটি। চিকচিক করছে। একেই কি বলে কামনা? মানে ন্যায়-অন্যায়, বিবেক-বিবেচনা ইত্যাদির শব্দ অমলেন্দুর মনে যতই আসুক, হেরে যেতে হবেই, মানে সে হেরে যাবেই। যেহেতু প্রস্তাব সে আগেই পেয়ে গেছে।'

একটানা এতক্ষণ মনের ভাবটা প্রকাশ করে ফেলতে পেরেছি ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সেই সঙ্গে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওর দিকে চাইতেই চমকে উঠলাম। মনে হল ওর চোখ-মুখ অসম্ভব রকমের লাল। জ্বর এসেছে নাকি। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম — কি হল শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

সে সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ উত্তর দিল ঠোঁটের কষ আঁচলে একটু ঘসে—না কিছু না এই এমনি।'

'যাক আমি ভাবলাম কিছু বুঝি'—বলে ভাল করে তাকিয়ে ওকে দেখলাম। বেশ বুঝলাম এতক্ষণ যে যৌনতা দিয়ে ঘরের পরিবেশ গরম করে রেখেছিলাম তার উত্তাপ ওর গাল থেকে এখনও মিলিয়ে যায় নি! কানের লতি এখনও বেশ রক্তিম।

এও মনে হল এটাই হয়ত ঠিক সময় আমার উত্তর পাবার। এই ভেবে একটু সাহসী হয়ে উঠে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এইবার তুমি নারীর বিচারে বলে দাও যে সুষমা ঐভাবে সন্তান কামনায় অমলেন্দুর কাছে পৌঁছুতে পারে কিনা। বা আমার গল্পে সুষমাকে ঐভাবে দেখিয়ে নারী চরিত্রের কোন অবমাননা করে ফেলেছি কিনা?'

সে তার বসে থাকার অলস ভঙ্গিকে ঝেড়ে শরীরে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিল, চুলের গোড়া থেকে ডগা অবধি একবার হাত বুলিয়ে বলল—'কি বলব?'

অথচ দেখে মনে হচ্ছিল তার মনে বলবার মত অনেক কথা জমে আছে। সব তৈরি শুরু করতে পারলেই গলগল করে বের হবে। এবার আমি মৃদু অথচ কপট উষ্ণ রাগে বলে উঠলাম—'কি বলব মানে? এতক্ষণ যা বলে গেলাম তারই জবাব দেবে।'

এবার সে তার মেদহীন হাল্কা অথচ যেখানে যেমন সব ঠিকঠাক দেহটার দিকে একবার তাকিয়ে বলল—'আমার মতে বিয়ের অন্তিম ফলশ্রুতি সন্তান। সুষমার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই স্বামীকে হারায়। শ্বশুর কুল বলতে অবশিষ্ট শ্বশুর। দ্বিতীয় কেউ নেই। তার অবর্তমানে দীর্ঘ একাকীত্ব। অথচ পিতৃগৃহেও ফিরবে না।'

'ঠিক কথা আমি এটাই তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি'—অকারণ ওর কথার মধ্যে প্রবেশ করে আবার বললাম—'তারপর?'

সে বলল—'এক্ষেত্রে তার মানে সুষমার সন্তান কামনায় অমলেন্দুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে সংকোচ বা দ্বিধা নাও আসতে পারে।'

একটু থেমে সে আবার বলতে থাকল—'তাছাড়া সাহিত্যে এমন নজির নেই এমন নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সুষমা চরিত্রের অবমাননা করে ফেলেছেন বলে আমি মনে করি না।'

উত্তরে আমি আত্মহারা হয়ে—'বাঃ ঠিক তাই'—বলে খুশীর আমেজে আরো একটা সিগারেট ধরিয়ে ওকে একটু ছুঁয়ে ফেলব কিনা তাই ভাবছি। ঠিক সেই সময়ে আবার সেই বোন এসে উপস্থিত। হাতে মিষ্টির প্লেট। রেখেই চলে গেল।

আঃ। বাঁচা গেল। সবে আমার খুশীর পালে সুবাতাস বইতে শুরু করেছিল। এই সময়ে কোন বোন-ফোন, কোন রকম প্রতিকূলতাই আমি সহ্য করব না। এখনই তরতরিয়ে বেয়ে চলব। যেতে যেতে কোন অজানা দ্বীপে পৌঁছে যাব। সেই দ্বীপে এবার মনোরম পাখিদের, সমুদ্রের দুর্লভ জীবেদের আমি দেখব, সোনালী ঝিনুক আমি কুড়িয়ে নেব। তারা কি করে প্রিয়তমার কাছে এগিয়ে যায়, ঘনিষ্ঠ হয়, দৃষ্টি দিয়ে আস্বাদন করে, এই সব আমি ভাবব। আকাশের নীল তারাদের দিকে তাকিয়ে দেখব তারা কি করে ছুটে যায়। এই সব। আরো কিছু।

এইসব অনেক কিছুর ভাবনা মিশ্রিত মায়াময় চোখে তার দিকে তাকালাম। সেও কি এসব ভাবছে? তার দেহের প্রতিটি ভাঁজে কোন রোমাঞ্চের ঢেউ খেলে যাচ্ছে কি এখন? তার চোখের অতলে যে সাগর সেই সাগরের অতলে যে অমৃত; তা কি আমারি দৃষ্টির রোমন্থনে উঠে আসবে? যা আমি দেখতে পেয়ে যাব? হয়ত হচ্ছে। উঠে আসছে। এসে গেছে। সে এখন আগের থেকে অনেক বেশী উচ্ছল অনেক বেশী প্রগলভ। আগের মত আড়ষ্ট আর সে নয়। অনেক সহজ হয়ে এসেছে সে আমার কাছে।

এই তো কি সুন্দর আমার কষ্টের দিকে তাকাচ্ছে। তার মাথার বালিশ আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। দেহের আর বিছানার সঙ্গে লেগে থাকা অংশের তলায় ওটা দিয়ে যাতে আমি আরাম করতে পারি। সেই বালিশের ঢাকনা থেকে ওর চুলের মৃদু সৌরভ আমি পেয়ে যাচ্ছি। এতক্ষণ এই বালিশ বুকে চেপে অমলেন্দুর শয্যার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই বালিশ থেকে এখন আমি তার নরম বুকের মিষ্টি স্নিগ্ধ স্পর্শও পেয়ে যাচ্ছি। এবার সে আমার আহারের দিকে তাকাচ্ছে। প্লেটের সবটুকুই যাতে খেয়ে নিই তার জন্য বারম্বার চাপ দিচ্ছে। যেন স্নেহের প্রতিমূর্তি। সবটুকুই আমি একা খেতে পারি না। কষ্ট। সেটা জানানোতে যেন দৃষ্টি দিয়েই শাসন করতে পারছেই নারীর বিচিত্র রূপ ওর দেহে একযোগে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় মোহিনী হয়ে উঠতেই লজ্জায় এতটুকু হয়ে বলে ফেলল—'আহা! ওইটুকু তো খেয়ে নিন না।'

একা খাওয়াতে কোন আনন্দ নেই। সুখ নেই। স্বার্থপরের মত খেয়ে ফেলা। তার থেকে আধাআধি ভাগাভাগি। যেন সব কিছুতেই তাই। চামচে দিয়ে মিষ্টি কেটে ওকেও দিতে চাইলে প্রথমে প্রবল আপত্তি। কিন্তু করুণ করে তাকিয়ে বারবার অনুরোধ করতে সে যেন একটু নরম হয়ে এলো। তাতেই আরো সাহসী হয়ে ওর দেহের গন্ধের কাছাকাছি গিয়ে চামচের মিষ্টিটা তুলে ধরে রেখেই বললাম—'নাও ধরো। টলছে পড়ে যাবে।'

আমার ইচ্ছার কাছে সে হেরে গেল। কিম্বা ইচ্ছাকে সে করুণা করল। বুঝলাম না। কিন্তু মিষ্টি নিল হাত পেতে। একবার নয়। মিষ্টির রকম ফের তিন টুকরো।

এবার আমার ওঠা উচিত। আমার গল্পের জটিলতা যা আমারই সৃষ্টি; মানে যাকে জটিল মনে ভেবে এখানে আসতে চেয়েছি তা ফুরিয়ে গেল। মানে জট ছাড়িয়ে দিয়েছে। তবু এই নিয়ে বেশ খানিক সময় কাটিয়ে দেওয়া গেছে' অর্থাৎ আমার সেই অরণ্যে যা আমার মনের উঠান জুড়ে মোটামুটি একটা অনুকূল বাতাস বয়ে গেছে। অবশ্য ঝড়ের কোন সম্ভাবনা দেখছি না। আপ্যায়ন পর্বও শেষ। অগত্যা উঠতে হয়।

কিছুদিন আগে কবে যেন? হ্যাঁ মনে পড়েছে। গত বৈশাখে সে এসেছিল। অপ্রয়োজনীয় অনেক কথার পর একটি প্রয়োজনের কথা বলেছিলাম। আমার দৃষ্টির অভ্যাসের প্রতিটি আসবাবপত্র মানে খাট আলমারী বাকস ইত্যাদি অর্থাৎ যারা আমার নিত্যসঙ্গী; তাদের কাছে পেয়ে সাহসী হয়ে বলতে পেরেছিলাম—সে আমার প্রেরণা। কিন্তু আমার এতবড় একটা বুক ভাঙা শব্দেও তার মনের বা দেহের তটে কোন তরঙ্গ খেলেছিল বলে মনে পড়ে না। বরং

[illegible] সে [illegible] ছিল [illegible] ভাবলেই [illegible] কোন কাজেই সে লাগাতে পারে না। অন্ততঃ আমার সেই ইচ্ছার [illegible] পেয়েছিলাম। আমার [illegible] ছোট্ট শীল থেকে তাকে যত্ন [illegible] আলোয় তুলে নিয়ে এসেছিলাম।

আজ আর সেদিনের মত কোন কথা বা ইশারায় নিয়ে যদিও কেউ তৈরি তবু উলটেলে এই ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দিতে চাইলাম না। এখনই উঠব? না আরো একটু থাকি। এই স্বচ্ছন্দে তখনও বিছানা আঁকড়ে আছি।

ঠিক তখনই সে বলে উঠলো—'আপনার লেখার সঙ্গে ঠিক হুবহু এক না হলেও অন্ততঃ প্রথম দিকে মিল আছে এমন একটা গল্প পড়েছিলাম।' এই বলে সে পড়া গল্পে যতটুকু অমিল তার বিস্তারে চলে গেল।

আর আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ শব্দ করে নড়ে উঠল। যেন ঝড়ের সংকেত আমি দেখতে পাচ্ছি। এক্ষুনি সেই অরণ্য কাঁপিয়ে তছনছ করে দেবে। কারণ আমি থাকছি। আমাকে থাকতেই হচ্ছে আরো কিছুক্ষণ ওর কাছে। মানে বালিশ থেকে ভেসে আসা ওর চুলের সুবাস বুকের সুগন্ধের কাছে। একটি জীবিত সত্তার কাছে। যে বলে যাচ্ছে। অন্ততঃ বলে যেতে পারছে। সে বলছে তার পড়া গল্পে—নায়িকার স্বামী ফুলশয্যার রাতেই মারা যায়। তারপর থেকে কোন পুরুষ বাড়িতে এলেই ফুলশয্যার রাতে যে শাড়ী গয়না ইত্যাদি পরেছিল সেগুলোই পরে অতিথির ঘরে প্রবেশ করত। আর শ্বশুর টের পেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতেন। বোঝাতে হত এ অন্য পুরুষ। অতিথি বুঝতেন মহিলার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। এই সব। সে বলে যেতে থাকল।

আর আমি? আমার সব অনুভূতি দিয়ে টের পেয়ে গেলাম সে আমাকে মিথ্যা বলেছিল। সে মৃতা নয়। তার শোক আছে আছে আনন্দ ব্যথা ঈর্ষা মায়া মমতা। সবই আছে। নেই এমন হলে এভাবে ওসব কথা বলে যেতে পারত না। বুঝতে পারছি ছিল না শুধু ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবার অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছে দেবার কেউ।

সে বলেই চলেছে। যেন বিরাট একটা কর্মযজ্ঞের মধ্যে পড়ে গেছে। আমি সেখানে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছি ক্রমশঃ। যাকে এতদিন একটি নিষ্প্রাণ খোল ঝিনুক শামুক বলেই মনে হয়েছে তা যেন হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তার হাঁ মুখ বিরাট থেকে বিরাটতর গহ্বর সৃষ্টি করে ফেলছে। আর আমি সেই গহ্বরের মুখে বসে ক্রমশই ছোট্ট হয়ে যাচ্ছি। একদিন একটা কিছু [illegible] অন্ধকারের মধ্যে মন্থমুখের হাঁস তৈরি হয়ে যেতে পারি।

হঠাৎ করে ফেললাম অত্যন্ত সাহসী হয়ে সেই কাজটা। আমার মুখ সেই হাতটা যা আমার আধখোলা বিশেষ ভঙ্গির সাহায্যকারী হিসেবে মুখে রেখে আছে। তা দিয়ে আমি ওকে ছুঁয়ে ফেললাম।

মুহূর্তে মনে হল যেন হাঁ মুখের তালা দুটি বন্ধ হয়ে গেল। আর তারই দুই প্রান্তে দু ফোঁটা কষ ঝুলছে। আমার চরম পাওয়া হয়ে গেল। তৃপ্তিতে ভরে গেল দেহমন। একটা বিমুগ্ধ আবেশে বিবশ হয়ে গেলাম।

আর সে? একটা নিটোল পরিতৃপ্ত আবেশে ছিল এতক্ষণ। কিন্তু হঠাৎ ছোঁয়া পেয়ে কী যেন হয়ে গেল। যেন কোন মৃত্যুপথযাত্রীকে সোনার কাঠির আশ্বাসে এতক্ষণ জাগিয়ে রেখেছিলাম ছুঁইয়ে দিলেই ফিরে প্রাণ পেয়ে যাবে। অথচ ছুঁইয়ে দেবার সময় সোনা ভ্রমে রূপোর কাঠিটি!

না, আর নয়। এবার ফিরতে হয়। তাই—'এবার উঠি'—বলে বিছানা ছেড়ে সটান মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে অমন হয়ে গেল কেন? আকস্মিক স্ট্রোকের চোখ মুখ ওর। এবার যেন সত্যি দেখতে পেলাম ওর ঠোঁটের দুই প্রান্তে দু' ফোঁটা কষ জমেছে। ওপর ঠোঁট নীচের ঠোঁটকে ছুঁয়ে এক রাখতে পারছে না। চোখ দুটোও যেন লবণ জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। সামান্য নড়ে আমাকে বিদায় জানাবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

মুহূর্তে মনে হল আমি একটা কাঁচের পাত্র হয়ে গেছি। সেই পাত্র ভরা জল। সে জল আমার সমস্ত রকম অনুভূতির। আর সে তার ইচ্ছাগুলোর রসে অপেক্ষার জন্যে মিছরী শক্ত। প্রতিবন্ধকতার ছাকনীতে [illegible] হবে [illegible] নেই [illegible] অসাধ্য। কিন্তু কাঁটাগুলো তার [illegible] আর আমার পায়ের [illegible] সেই কাঁটাগুলো [illegible] ফুটিয়ে দিয়েছে।

ফিরতে পারলাম না। আবার বিছানায় এসে শুতে হল। [illegible] থাকতে পারি না। আবার সেই [illegible] ভাবনা। কিন্তু এবার সেই ভাবনা পেয়েই আমি হঠাৎ কঠিন হয়ে গেলাম। মনে হল আমি সিরাজ হয়ে গেছি। এটা জলসা ঘর। গালিচার এক কোণে সে ফৈজী হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ওজনের নীচে ছোট্ট দেহখানি ঢেকে যেখানে যেমন সব ঠিকঠাক মনোরম ফৈজী। আমি এতক্ষণ তারই নাচকলা দেখে চলেছিলাম। সব কলাকলা শেষ। এবার নিবেদনের পালা। অথচ এখানেই সে তার পার্ট ভুলে গেছে। আমি সিরাজ। আমি নবাব কোন রকম ক্ষমা এক্ষেত্রে আমি মানি না। কোন সহনশীলতা আমি জানি না। এই মুহূর্তে আমি আদেশ দিয়ে দিলাম ফৈজীকে পাষাণ প্রোথিত করা হোক।

এখানে আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। জলসাঘর এবার ত্যাগ করে চলে যাব। উঠে দাঁড়ালাম। ঘর ছেড়ে সোজা উঠোনে নেমে এলাম। উঠোন ছেড়ে সোজা রাস্তায়। এক্ষুনি চলে যাব। কী যেন এক মায়ায় তবু একবার পিছন ফিরে তাকালাম। দেখি প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে সে।

মনে হল এইমাত্র যাকে প্রস্তর খণ্ডের কবরে রেখে এসেছি সেই কবরের ওপর কেউ একজন একটি দীপশিখাও জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই আলোকে যেন প্রস্তর খণ্ডগুলি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। দূর থেকে অন্তঃস্থিতার সবটাই দেখা যাচ্ছে। তারই ভেতরে সে আপ্রাণ কিছু বলতে চাইছে। আমি কিছুই শুনতে পারছি না। তবু যেন মনে হল সে বলতে চাইছে—বলুন জনাব দিন কোন অপরাধে কার অপরাধে তার এই শাস্তি।

কিছু দক্ষিণ ভারতীয় পদ

দোসা ইডলি উপমা সম্বর ইত্যাদি দক্ষিণ ভারতীয় রান্না আজকাল খুবই জনপ্রিয়। এগুলি তৈরী করতে খরচ বেশী পড়ে না অথচ এগুলি খেতে খুব ভাল লাগে। অনেকেই এইসব খাবার হোটেলে বা রেস্তোরায় কিনে খান। এগুলি খেলে পেটও ভরে খুব। এগুলি গরম গরম খেতেই বেশী ভাল লাগে। যদিও এগুলি রান্না করতে খাটুনি একটু বেশী পড়ে তবুও একবার সড়গড় হয়ে গেলে করতে আর বেশী ঝামেলা আছে বলে মনে হবে না।

মশালা দোসা :

উপকরণ : ২ কাপ চাল ১ কাপ কলাইয়ের ডাল ½ কেজি আলু ২৫০ গ্রাম পেঁয়াজ ৬টি কাঁচা লঙ্কা এক চা-চামচ আস্ত সর্ষে কারি পাতা একটু হিং ½ চা-চামচ হলুদ আন্দাজ মতো নুন বাদাম তেল বা ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী :

মশালা : ১। আলু সেদ্ধ করে ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কুটে নিন। ২। পেঁয়াজ ও লঙ্কা কুচিকুচি করে কেটে নিন। ৩। একটু ঘি বা তেল গরম করে তাতে হিং সর্ষে কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে হলুদ দিয়ে পেঁয়াজ ও লঙ্কার কুচি দু-তিন মিনিট ভাজতে থাকুন। ৪। আলু ও নুন দিন। মাখা মাখা হলে নামিয়ে নেবেন।

দোসা : ১। চাল ও ডাল আলাদা আলাদা করে ১০ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। ২। ডাল ভাবে শিলে বেটে নিন। ৩। চাল ও ডাল বাটা মিশিয়ে নিয়ে এক টেবিল চামচ দই দিয়ে ভাল করে ফেঁটিয়ে নিন। মিশ্রণটা বেশ পাতলা হবে। ৪। এক চা-চামচ জিরে মিশিয়ে দিন। ৫। তাওয়ায় একটু ঘি গরম করে নিন। ৬। দু টেবিল চামচ মিশ্রণ তাওয়ায় দিয়ে একটা বাটির পেছন দিক দিয়ে গোলভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোসাটা গোলাকার করে নিন। ৭। দোসার জলীয় ভাবটা শুকিয়ে এলে মাঝখানে আলুর তরকারির পুর দিয়ে পাট করে থালায় নামিয়ে রাখুন।

উপমা :

উপকরণ : ১ কাপ সুজি ১ চা-চামচ মুগের ডাল ১ চা-চামচ ছোলার ডাল এক চা-চামচ কলাইয়ের ডাল ½ চা-চামচ সর্ষে একটু হিং এক টেবিল চামচ কাজু ১টি পাতি লেবু ২টি কাঁচা লঙ্কা ½ চা-চামচ চিনি আন্দাজ মতো নুন ২ টেবিল চামচ ঘি বা বাদাম তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। তিন রকম ডাল ½ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে নিন। ২। একটা পুরু তলাদেশ দেওয়া ডেকচিতে শুকনো খোলায় সুজি একটু বাদামী করে ভেজে নিন। ৩। এক টেবিল চামচ ঘি গরম করে তিন রকম ডালই বাদামী করে ভেজে নিন। সর্ষে কারিপাতা কাঁচা লঙ্কা ও কাজু ডালের মতো বাদামী করে ভাজুন। ৪। ভাজার মধ্যে সুজি মেশান এবং ওতে দু কাপ গরম জল দিন। ৪। লেবুর রস মেশান। ৬। যখন মিশ্রণটি পাত্র থেকে আলাদা হয়ে উঠে আসবে তখন এক টেবিল চামচ তেল বা ঘি দিন। ৭। নামিয়ে নিয়ে কুচোনো ধনে পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

বড়া :

উপকরণ : দুই কাপ কলাইয়ের ডাল, ৩টি কাঁচা লঙ্কা এক টুকরো আদা এক চা-চামচ জিরে এক চিমটে খাওয়ার সোডা নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কলাইয়ের ডাল এক রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। ২। জল ঝরিয়ে শিলে মিহি করে পিষে নিন। ৩। আদা ও লঙ্কা পিষে নিয়ে মেশান। আন্দাজ মতো নুন দিন। জিরে ও সোডা মিশিয়ে খুব ভাল করে ফেঁটিয়ে নিয়ে অর্ধ ঘন্টা মিশ্রণটি রেখে দিন। ৪। গরম তেল বা ঘিয়ে বাদামী করে বড়া ভাজুন। এই বড়াগুলি ভাজবার আগে সাধারণত মাঝখানে একটি ছিদ্র করে নেওয়া হয়—দেখতে অনেকটা মোটা বালার মতো হয়।

রসম :

উপকরণ : ½ কাপ অড়হর ডাল, ২৫০ গ্রাম টোমেটো ½ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো ৩টি কাঁচা লঙ্কা ১ চা-চামচ সর্ষে অল্প হিং এক চা-চামচ গোলমরিচ ১টি পাতি লেবু কারিপাতা এক টেবিল চামচ ঘি বা বাদাম তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ডাল জলে সেদ্ধ করে নিন এবং সেদ্ধ হওয়ার পর ডালে আরও ৬ কাপ জল মেশান। ২। লঙ্কা চিরে নিন ও টোম্যাটো টুকরো টুকরো করে কেটে নিন ও জলে মেশান। ৩। তেল বা ঘিয়ে সর্ষে হিং ও কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে ডালটা ছেড়ে দিন এবং নুন, হলুদ ও গোলমরিচ মেশান। পনেরো কুড়ি মিনিট অল্প আঁচে ফুটতে দিন। খাওয়ার আগে সুপ হিসেবে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্বর : সম্বর রান্না করতে হলে সবচেয়ে আগে চাই সম্বর মশলা। সেইজন্যে সম্বর মশলা কিভাবে তৈরী করতে হয় সেটা আগে বলে নেওয়া দরকার।

সম্বর মশলার উপকরণ : দুই কাপ ধনে সিকি কাপ লঙ্কার গুঁড়ো এক টেবিল চামচ ছোলার ডাল এক টেবিল চামচ অড়হর ডাল এক চা-চামচ গোলমরিচ এক চা-চামচ সর্ষে এক চা-চামচ মেথি এক চা-চামচ হলুদ একটু হিং।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রতিটি মশলা আলাদা আলাদা করে ঘি মাখান তাওয়ায় ভেজে নিন এবং একসঙ্গে শুকনো শিলে পিষে নিন। এই মশলা শুকনো ভাল ঢাকনা টিনে বা শিশিতে অনেকদিন পর্যন্ত রাখা চলে।

সম্বরের উপকরণ : এক কাপ অড়হর ডাল দুইটি বড় আলু দুইটি পেঁয়াজ দুইটি বেগুন এক টেবিল চামচ সম্বর মশলা অন্যান্য উপকরণ রসমের অনুরূপ।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রস্তুত প্রণালী রসমের অনুরূপ—শুধু তরকারীগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে ও তেলে বা ঘিয়ে সাঁতলে নিয়ে মেশাতে হবে। নামাবার আগে সম্বর মশলা ও এক টেবিল চামচ গুড় মেশাতে হবে।

সবজী দেওয়া ডাল :

উপকরণ : এক কাপ ছোলার ডাল ½ কেজি বীন (ফরাস বীন) বা যে কোন তরকারী চারটি শুকনো লঙ্কা ধনে পাতা কারিপাতা হিং দুই টেবিল চামচ নারকোল কোরা ½ চা-চামচ হলুদ একটি পাতিলেবুর রস একটু সর্ষে দুই টেবিল চামচ ঘি বা বাদাম তেল নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রস্তুত প্রণালী রসমের জলে ভিজিয়ে রেখে আধ বাটা করে নিন। ২। তরকারী কুটে নুন জলে ভাপিয়ে নিন যাতে প্রায় আধ সেদ্ধ হয়ে যায়। ৩। তেল বা ঘিয়ে হিং সর্ষে লঙ্কা ও কারিপাতা ফোড়ন দিন। ৪। ঘিয়ের মধ্যে ডাল বাটা দিয়ে বাদামী না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। ৫। এইবার ডালে তরকারী লেবুর রস এক টেবিল চামচ নারকোল কোরা দিন। ৬। কম আঁচে ঢাকা দিয়ে বসিয়ে রাখুন। ৭। নামিয়ে নিয়ে কুচোনো ধনে পাতা ও নারকোল কোরা সহযোগে ভাত বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সাধনা মুখোপাধ্যায়
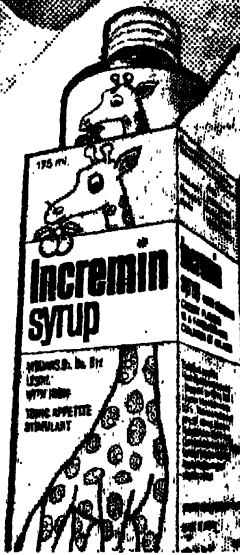
বাচ্চাদের বড়সড়
করে গড়ে তুলুন
ইনক্রিমিন*
দিয়ে
ওরে বাবা...
দেখেছেন!
টপাটপ খাচ্ছে
ঝপাঝপ বাড়ছে
ছেলেবেলার দিন—হেসে খেলে ঠিকমত বেড়ে ওঠার দিন! এই সময়ে ওকে ইনক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন তো দূরের কথা, খেতে গিয়ে যেমন খুশি করে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে। ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
Incremin
syrup
TONIC APPETITE STIMULANT
ইনক্রিমিন* টনিক
ড্রপস্—৩ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ—১২ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে
বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে
ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম— Lederle
সায়নামিড ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ *আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

লীগ মরশুমের বড় ফুটবল

গত ১২ জুলাই ফুটবলের আসর ভাঙার পর ইডেন থেকে বেরিয়ে আসার মুখে দোরগোড়াতে দেখা জনকয়েক নামী প্রবীণ ফুটবলারদের সঙ্গে। দল বেঁধে ওঁরা লীগ মরশুমের বড় খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। দেখার পালা শেষ করে দল বেঁধেই ফিরছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে একযোগেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন "এই কি একটা খেলা হলো? স্ট্যান্ডার্ডের কি হালই হয়েছে! তোমরা লিখতে পারো না। বড়দের বড়ত্ব গেল কোথায়!"

যেন অপরাধ আমাদেরই, যারা কলম ধরি। যাঁরা খেলেন, যাঁরা খেলান তাঁদের নয়!

তোপের মুখে পড়ে তাৎক্ষণিক জবাব দেবার মতো পুঁজি খুঁজে পাই নি। আমতা আমতা করে সেদিক পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। কিন্তু ওঁদের অভিযোগ যে মনকে নাড়া দেওয়ার মতো এক অভিমত তা অস্বীকারই বা করি কি করে।

সত্যিই তো বড়দের বড় কাজের নমুনো কোথায়? স্ট্যান্ডার্ডের যা ছিরি তা তো ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশেই দেখতে পেলাম। নামী নামী দল, দামী দামী খেলোয়াড়। আয়োজন ঘিরে সোরগোলেরও অন্ত ছিল না। জল্পনা-কল্পনার বিশেষজ্ঞদের সোচ্চার মত ঘিরে কতো কথাই না ছড়িয়েছিল খেলা আরম্ভের আগে। কিন্তু আসলে খেলা [illegible] হলো, যে জাতের ফুটবল হলে পরিবেশিত তার কৌলীন্য মর্যাদা কি অটুট ছিল? কেমন যেন জোলো অনুষ্ঠান। উত্তেজনার আঁচ যতোটা ছিল দর্শক আর খেলোয়াড়দের মনে তার সিকি ভাগের স্পর্শেও আসল খেলাটি উষ্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

জাত ফুটবলের মূল সম্পদ হলো তার প্রাণবন্ত মেজাজ। বুদ্ধির ছোঁয়ায় যা দীপ্ত: গতিতে উজ্জীবিত। ফুটবলের কাঠামোয় এই প্রাণ সঞ্চারিত হয় খেলোয়াড়দের সক্রিয়তায়। এই সক্রিয়তার উৎস শুধু দৈহিক সংগতিই নয়। মস্তিষ্কের প্রেরণাও বটে। ফুটবলের সক্রিয়তা মানেই অর্থপূর্ণ কিছু ক্রিয়াকলাপ। একপক্ষ বাধা দেয়। সেই বাধার অচলায়তন ভেদ করার দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের সমন্বয় ঘটিয়ে প্যাঁচ ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়ার কৌশলেই সক্রিয়তার যোগসূত্র রাখতে হয়। নইলে শুধু ছোটাছুটি, লাফালাফি করলে তা নিরর্থক পণ্ডশ্রমেই পর্যবসিত হয়ে পড়ে।

যাঁরা অর্থ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত তাঁরাই পারেন ফুটবলকে জাতে তেলে

[illegible]। যাঁরা নিরর্থক হাত-পা ছোঁড়ার দাস, তাঁরা উজাড় করা প্রাণশক্তির বিনিময়েও মূল অনুষ্ঠানকে অনুরূপ মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। শনিবারের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে দুঃখের সঙ্গেই আজ স্মরণ করতে হচ্ছে যে ওই অনুষ্ঠান প্রাণের উত্তাপে প্রাণময় হতে পারেনি। নিরর্থক ক্রিয়া-কলাপের পরিণামে মাঝমাঠে অবক্ষয়ের শূন্যতাটাই ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠছিল। মেহনত করতে করতে হয়তো অনেকে বেদম হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু সে সবই বুঝি উদ্দেশ্য-বিহীন, নিরর্থক হয়রানির ফলশ্রুতি।

আমরা যতোই বলি না কেন যে ফুটবল শক্ত, সমর্থ জোয়ানদের খেলা, আসলে মস্তিষ্ককে ছাঁটাই করে শুধু দৈহিক সম্পত্তিকে আঁকড়ে ধরলে ভাল ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। শুধু ফুটবলই বা বলি কেন। সব খেলা উপলক্ষেই এই কথাটি বেদবাক্যের মতো ধ্রুব সত্য। মন-মাথা চলে আগে। তাদের টানে দেহ এগোতে শুরু করে পরে। বলতে দ্বিধা নেই যে শনিবারের ওই আসরের নায়কদের অনেকেই মনের দিক থেকে আগে-ভাগে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের প্রতিবর্তী ক্রিয়া ছিল জমাট-বাঁধা বরফের মতো শীতল। সম্ভাব্য পরিস্থিতি আন্দাজে তাই দীর্ঘ-সূত্রতা প্রশ্রয় পেয়েছে। দেখে মনে হয়েছে যে কেউ কেউ বুঝি মাঠে নেমেছেন খেলা দেখতে। খেলতে বুঝি নয়। হঠাৎ তাঁর কাছে বল আসা মাত্র কিছু করতেই হবে এই ভাবনার তাগিদে অকস্মাৎ সক্রিয় হতে চেয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ কিছু করতে গেলে সব কাজকে গুছিয়ে করা সম্ভব হয়? না, তা করে তোলায় অযাচিত সুযোগ বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা তাঁদের উপহার দেন? অপরপক্ষকে যাঁরা নির্বোধ ভাবেন, তাঁরা নিজেরা কি সত্যিই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ?

সবচেয়ে নিরাশ করেন দুপক্ষের ফরোয়ার্ডেরা। একালের সুসংগঠিত ক্রীড়া প্রথা-প্রকরণের কল্যাণে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা আরও আটোসাঁটো রক্ষণব্যূহ গড়ার মন্ত্র জেনে ফেলেছেন। এই মন্ত্রগুপ্তির দৌলতে তাঁরা ওপক্ষের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের নিত্য নতুন সমস্যার মুখে ঠেলেও দিচ্ছেন। এই সমস্যা সমাধানে ফরোয়ার্ডদের আগের চেয়ে আরও বেশি পরিমাণে ক্রীড়াগত উৎকর্ষের মূলধন যোগাড় রাখতে হয়। উজ্জীবিত হতে হয় সৃষ্টিধর্মিতায়। কিন্তু বাড়তি তো দূরের কথা, অতি সামান্য মূলধন যোগাড় করতেই যেন সেদিন ইস্টবেঙ্গল ও মোহন-বাগানের ফরোয়ার্ডদের হিমসিম খেতে হয়েছে। যার ফলে দু পক্ষের বেশির ভাগ ফরোয়ার্ডদের আচরণ ঘিরে তেমন কোন আশার ছবি ফুটে উঠতে পারে নি।

ফরোয়ার্ডেরা খেলাতে পারলে, নিজেদের দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকলে, সৃষ্টি-ধর্মিতার তাগিদে দেহেমনে সমন্বয় ঘটাতে পারলে খেলায় গোল হয়। অথবা গোলের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। ওই শনিবারে কটি গোল হয়েছে? এবং কথায়ই বা গোল করার অনুকূল পরিস্থিতি ফরোয়ার্ডেরা গড়তে পেরেছেন?

গোল হয়েছে নামমাত্র একটি। আর ফরোয়ার্ডদের সামনে গোলের সুযোগ এসে পড়েছে বার তিন-চার। সত্তর মিনিট ধরে ঘর্মাক্ত কলেবর চেষ্টার সূত্রে এই কটি কাজ ফরোয়ার্ডেরা করতে পেরেছেন। এ থেকে কি বোঝা যায় যে দু পক্ষের ফরোয়ার্ডেরা নিজেদের নাম ডাক, অর্থমূল্য এবং দর্শক-দের প্রত্যাশার প্রতি সুসমঞ্জস থাকতে পেরেছেন?

আর গোল করার সহজ সুযোগ হেসে-খেলে উড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তগুলিকেও কি ভাল খেলার নমুনা বলে তারিফ জানাতে হবে না কি? গোলের জন্যেই খেলা। গোল করার চেষ্টাতেই এতো পরিশ্রম, মন বোঝা-বুঝি, বুদ্ধির প্রয়োগ এবং ক্রীড়া প্রথা প্রকরণ অনুসরণ। আর সেই গোলের সুযোগ যখন আসে তখন বিত্তবান পরিবারের বাউন্ডুলে ছেলের মতো সেই সুযোগ অকাতরে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া নিশ্চয়ই ভাল খেলার পরিচায়ক নয়। দৃষ্টান্তগুলিকে নিছক ভাগ্যের কারসাজি বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যেহেতু যে কোনো খেলার আসরে ভাগ্যের ভূমিকা যতো থাকে তার চেয়ে শতগুণে বেশি থাকে খেলোয়াড়দের নিজেদের কর্মকাণ্ডের প্রভাব! খেলায় ভুল করলে দৃষ্টান্তটি 'ব্যাড লাক' বলে তাচ্ছিল্য জানানোর অর্থই হলো ভুলচুকের যথাযথ মূল্যায়ন না করা। একের অপরাধের বোঝাটিকে হালকা করার উদ্দেশ্যে আজগুবি এক কৈফিয়ৎ খাড়া করা। ব্যাড লাক আর ব্যাড প্লের মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়ে গেছে। দুটি জিনিষ যে এক নয়, একথা কি বলে বোঝাবার দরকার পড়ে?

দু শরিকের ক্রীড়া স্বচ্ছন্দের অবকাশে বিক্ষিপ্ত লগ্নে ফরোয়ার্ড হিসেবে নজরে পড়েছেন শ্যাম থাপা ও উলগানাথন। বাকীরা খরচের খাতায় তাও থাপা বা উলগা, কেউই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আকর্ষণীয় নন। উলগা বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর পায়ের কাজ সূক্ষ্ম, শরীর দুলিয়ে প্রতিপক্ষকে ভুল বোঝাতে জানেন। কিন্তু মনের ভয়কে তাড়িয়ে [illegible] নিজেকে [illegible] মেলতে [illegible] তরাসে মনের [illegible] বেশি সঙ্কুচিত। সেদিনের থাপা গোল করার লগ্নে মস্তো এক স্ট্রাইকার। শরীর দুলিয়ে পায়ের এক একটানে তিনি তিন-তিনটি বাধা অনায়াসে টপকে গিয়ে একার সামর্থ্যেই নিজের দলের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন এবং বিপক্ষের কপাল দিয়েছেন গুঁড়িয়ে। কিন্তু অন্য মুহূর্তে তিনি নিছকই এক মেহনতী কারিগর। সৃষ্টি-শীল শিল্পী নন। শিল্পকর্মে অবিচল থাকতে পারলে শ্যাম থাপা সেদিন ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগকে সচল রাখতে পারতেন। যেমন রেখে দিতেন মহম্মদ হাবিব। কিন্তু হাবিবের ছায়ার প্রতিফলন ঘটেনি শ্যাম থাপা বা সতীর্থদের অস্তিত্বে। কাজেই ইস্টবেঙ্গলের পুরোভাগের গতিপথ বারেবারে হোঁচট খেয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে ফরোয়ার্ডদের আচরণগত ত্রুটির জের মেটাতে গিয়ে শুধু ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের নয়, সেই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের মানের গতি নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। আগের অনুপাতে রক্ষণভাগের খেলার মান অনেকটা উন্নত। যেহেতু একালের রক্ষণভাগ পরিপাটী বিন্যাসের আশীর্বাদপুষ্ট। ডিফেন্সের কাজ কিছুটা সীমায়িত ও নির্দিষ্ট। স্বল্প মূলধনের কার-বারীরাও এই সীমিত ও নির্দিষ্ট কাজ করে তুলতে পারেন। তবে রক্ষনব্যবস্থা উন্নততর বলেই ফরোয়ার্ডদের সামনে আরও বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের তাগিদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই দায়িত্ব পালনে যে পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন তা অনেকেই সংগ্রহ করতে পারছেন না। তাই চাওয়া ও পাওয়ায় এমন গরমিল দেখা দিচ্ছে।

আজকাল প্রশিক্ষণের যুগ। অর্থব্যয়ের হিড়িক চলেছে। অপরিমিত অর্থ ব্যয় ও প্রশিক্ষণের আয়োজনের সূত্রে হাতে কি পাওয়া যাচ্ছে তার মূল্যায়ন হওয়া উচিত। শুধু নাম কা ওয়াস্তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও অঢেল অর্থ ব্যয় করা নিরর্থক মানসিক বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই দেখা দরকার যে একালের চিরায়ত ত্রুটি

সংশ্লেষনে অর্থব্যয় ও প্রশিক্ষণের আয়োজন সহায়তা করছে কিনা। না করে থাকলে যাঁরা দু হাতে টাকা ছড়াচ্ছেন এবং যাঁরা খেটে-খুটে ছেলেদের খেলা শেখাচ্ছেন, দু পক্ষেরই নতুন করে ভেবেচিন্তে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা বিধেয়। খেলেন যাঁরা তাঁদেরি মতো যাঁরা খেলান তাঁদেরও ক্রীড়া মানোন্নয়নে দায়দায়িত্ব রয়েছে।

যাঁরা খেলোয়াড়দের খেলান, মাঠের বাইরে থাকলেও যাঁদের ভূমিকা প্রকৃতই অর্থবহ, সেই প্রশিক্ষকদের সম্পর্কেও আমার কিছু নিবেদন আছে। তার আগেই বলে নিই যে ইস্টবেঙ্গলের প্রদীপ ব্যানার্জি ও মোহনবাগানের অরুণ ঘোষ, দুজনেই ভারত-বিখ্যাত প্রশিক্ষক। কৃতজ্ঞচিত্তেই স্বীকার করি যে ওঁদের ক্রীড়ানিপুণতার আমি গুণগ্রাহী। তাঁরা কেউ আমায় ভুল বুঝবেন না এই বিশ্বাসে প্রশ্ন রাখতে চাই যে ইস্টবেঙ্গলের কোচ একজন স্টপারের বদলে আর একজন তাজা খেলোয়াড়কে এবং মোহনবাগানের কোচ একজন স্ট্রাইকারকে বদলে নতুন একজনকে মাঠে নামিয়ে পরখ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা কি সত্যিই উপলব্ধি করতে পারেন নি? পরীক্ষামূলক রীতি অনুসরণে এই সংকোচ কেন? পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই তো সত্যের স্বরূপ চেনা যায়। আমার ধারণা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এক বিকল্প ফরোয়ার্ডকে মাঠে নামানো এবং মোহনবাগানের তরফে কাউকে না নামনোর মধ্যে অর্থবহ কেনো চালের ঠিকানা ছিল না। অদলবদল করা এবং না করা, সবটাই যেন নিয়মমাফিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ওই শনিবার রক্ষণভাগের সামগ্রিক ক্রীড়ামানের অবস্থাই বা কি রকমটিতে দাঁড়িয়েছিল? একটানা পাঁচবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দলের রক্ষণব্যূহের মাঝখানটি ছিল নিতান্তই নড়বড়ে। দুই স্টপার খেলার টানে যে কতোবার বেওয়ারিশ ভূখণ্ডে সরে এসেছিলেন তার ঠিক ঠিকানা কি! তাঁরা বেওয়ারিশ জায়গায় সরে যাওয়ার ফলে মাঝখানের ফাটল মেরামত করতে ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষককে এগিয়ে এসে অবস্থা সামলাবার চেষ্টায় বারদুয়েক ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে হয়। ওই দুটি ক্ষেত্রেই যদি দলের বিরুদ্ধে গোল হয়ে যেতো তাহলে মূল অপরাধের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে হোত স্টপারদেরই। অন্য কাউকে নয়।

মোহনবাগানের রক্ষণভাগের অবস্থাও আশাপ্রদ ছিল না। তবে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণধারা বহুবার শূন্যে পরিচালিত হয়েছিল বলেই মোহনবাগানের দীর্ঘাকৃতি স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্য লাফিয়ে আরও উপরে উঠে পরিস্থিতি মোকাবিলায় অযাচিত সুবিধা পেয়ে যান। অবস্থা অনুসারে সুব্রতর খেলা মন্দ হয় নি। প্রশান্ত মিত্রের সহযোগিতায় সুব্রত মোহনবাগানের রক্ষণব্যূহকে কিছুটা নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন। শ্যাম থাপা বা ইস্টবেঙ্গল যখন সুব্রতকে হার মানাতে পারে ঠিক তখনই গোলের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। গোলরক্ষক প্রশান্ত মিত্রের বরাতটাই মন্দ। বেচারী সেদিন ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। যতোদূর মনে পড়ে, এর আগেও একদিন ইডেনের ফুটবল আসরে তিনি আছাড় খেয়েছিলেন। ইডেনে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে সুখকর নয়।

দু দলের রক্ষণব্যবস্থার সামগ্রিক অগোছালো চেহারার পাশে একা সুধীর কর্মকারই ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে অটল। কাজের কাজ করে তোলায় সিদ্ধকর্ম। তাঁর প্রতিবর্তী ক্রিয়া তীক্ষ্ণ। বল কাড়ায় এবং সতীর্থদের বল যোগান দেওয়ার ব্যাপারে নিয়তই মুন্সীয়ানার পরিচয় রেখে খেলোয়াড় হিসেবে তিনি তাঁর যোগ্যতার অবিমিশ্র স্বাক্ষর রেখে দিয়েছিলেন। হার মেনেও তিনি হাল ছাড়েন নি। উলগানাথন বার দুয়েক তাঁকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরও নাছোড়বান্দা সুধীর আবার মুখোমুখি ফিরে এসে উলগার পা থেকে ছোঁ মেরে বলটি কেড়ে নিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে সেদিনের আসরে সুধীরের আত্মনির্ভর ভূমিকা নিজের দলকে যেমন নিয়তই ভরসা যুগিয়েছিল, অপরপক্ষে তেমনি বিপক্ষের চলার পথে অনতিক্রম্য বাধার পাঁচিল তুলে রেখেছিল। সামগ্রিক নীচু মানের খেলার পটভূমিকায় সেদিনের সুধীর ছিলেন মস্তো এক ব্যতিক্রম। সত্যিকারের আশাজাগানো ছবি এই ছবির পাশে মানানসই হয়ে কেউই দাঁড়াতে পারেন নি। অমন যোগ্য পরিশ্রমী ও পরিপাটি মেজাজের গৌতম সরকারও নন। সেদিনের মূল্যায়নে সুধীরই ছিলেন সারা মাঠের সরা। বরাভয় মূর্তিতে সুধীর উজ্জ্বল না করলে হয়তো প্রাণবন্ত ফুটবলারের সন্ধানে সেদিন আমাদের গৌতমের দিকে নজর ফেরাতে হোত। কিন্তু সুধীর সে অবকাশ কাউকে দেননি।

ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলাটি হয়েছে বর্ষণক্লান্ত ইডেনে। খেলার আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় ইডেনের এঁটেল মাটির পিচ্ছিলতা বেড়ে যায়। খেলোয়াড়েরা দৌড়োদৌড়ি আরম্ভ করতেই বুটের সঙ্গে চাপচাপ নরম মাটি এবং গোছা গোছা দুর্বাঘাস গোড়া থেকে উপড়ে আসতে শুরু করে। বর্ষণসিক্ত এঁটেল মাটিতে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে দ্রুতগতিতে তো দূরের কথা, দুলকি চালে ফুটবল খেলাই কঠিন। হয়তো এমন পরিস্থিতিতে খেলতে হয়েছে বলে খেলোয়াড়েরা তাঁদের ক্রীড়ামানের আশ্বাসজনক ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। দোষ-ত্রুটি তাঁদের ছিলই। তার ওপর মাঠের এই প্রতিকূলতা। সব মিলিয়ে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার জ্বালার মতোই।

কলকাতার বড় বড় দলের খেলোয়াড়দের পরম দুর্ভাগ্য এই যে বর্ষাকালে যে মাঠে ফুটবল প্রায় অসম্ভব, সেই মাঠেই অধুনা তাঁদের পরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ পরীক্ষায় পাশ করা শক্ত। যাঁরা ফেল করছেন তাঁদের দুষছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। অথচ যাঁরা ব্যবস্থাপনার পাণ্ডা তাঁরা আড়ালেই থেকে যাচ্ছেন। কর্তাব্যক্তিদের আড়াল থেকে প্রকাশ্যে টেনে আনার জন্যে ওঁদের একদিন ভিজে সপসপে ইডেনে ফুটবলের প্রদর্শনী খেলা খেলতে আহ্বান জানালে কেমন হয়। খেলোয়াড়েরা দল বেঁধে ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্যে এই চ্যালেঞ্জটুকু ছুঁড়ে দিতে পারেন না?

বর্ষায় ইডেনে ফুটবলের আয়োজন ঘটায় খেলোয়াড়দের যতো অসুবিধে হয়ে থাকুক না কেন, দ্বিগুণসংখ্যক দর্শক গ্যালারিতে বসে এই খেলা দেখার সুবিধে পেয়েছেন। ইডেন ফুটবলের প্রতিকূল। বর্ষাকালে এখানে ফুটবল খেলা হলে ক্রিকেট উদ্যানের সর্বনাশের রাস্তাও পাকা হয়ে যায়। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে হাজার পঁয়ষট্টি মানুষ ইডেনের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখার সুযোগ পান। এমন সুবিস্তৃত গ্যালারিযুক্ত একটি বড় ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ের মাঠে গড়া গেলে
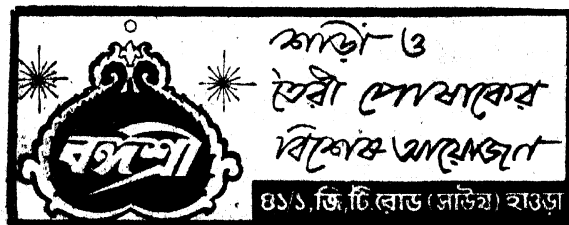
ক্রিকেট উদ্যানকে বাঁচিয়ে সবদিক রক্ষা করা যেতো। কিন্তু কলকাতার ভাগ্যে সে স্টেডিয়াম আর জুটলো কোথায়। স্টেডিয়াম নির্মাণে এই অক্ষমতা ঢাকার জন্যেই তো ইডেনে ফুটবল খেলানোর এই ব্যবস্থা। এ তো জেনেশুনেই এই গোঁজামিলে হাত পাকানো হচ্ছে।

ইডেনে বড় ফুটবল স্থানান্তরিত হওয়ায় জনতা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সুবিধে হয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখায় পুলিশ যথেষ্ট চেষ্টাও করেছে। সেই চেষ্টা প্রশংসনীয়। তবু বিক্ষিপ্তভাবে দু একবার মাঠের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার নজীরগুলি দুর্ভাগ্যজনক।

খেলা আরম্ভের আগেই আকাশবাণী ভবনের দিকে এক গ্যালারিতে একদল দর্শকের মধ্যে হাতাহাতি, ছাতা পেটাপেটি, ইট ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হতে বেশ কজন আহত হয়ে পড়েন। অনুমান আহতদের মধ্যে নিরীহ দর্শকেরাও ছিলেন। খেলার শেষদিকে এক টুকরো ইঁটের ঘায়ে একজন লাইন্সম্যানের মাথাও ফাটিয়ে দেওয়া হয়। কেন? তাঁর কি অপরাধ? খেলা পরিচালনায় রেফারী ও লাইন্সম্যানেরা, কোনো পক্ষই অযোগ্যতার পরিচয় দেন নি। বরং নিজেদের দায়িত্ব পালনে তাঁরা প্রশংসনীয় ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন। তবু অকারণ রোষে ফেটে তাঁদের রক্ত দেখতে চাওয়ার এই উল্লাস কেন? যাঁরা অকারণে কিনা প্ররোচনায় মাঠে মাঠে এমনসব উপদ্রব বাধাতে থাকেন, তাঁদের মন বোঝা ভার। তবে তাঁরা যে কলকাতার ফুটবল মাঠে বাস্তব এক সমস্যা সেকথা অনস্বীকার্য।

এঁদের অপকর্মের প্রতিবাদে আহত লাইন্সম্যান সেদিন মাঠ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর অবসরে হাতের কাছে যদি অন্য লাইন্সম্যানকে না পাওয়া যেতো এবং যদি রেফারী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করতেন তাহলে অসময়ে খেলা ভাঙার দায়দায়িত্ব কি অসহযোগী লাইন্সম্যানের ওপর না যিনি ইঁট মেরে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন তাঁরই ওপর চাপানো হোত? কলকাতার মাঠে ইঁটের ঘায়ে যাঁরা নিয়তই খেলাধুলোর আদর্শের অবমাননা ঘটাচ্ছেন, খেলা ভাঙাচ্ছেন আর না হয় অসমর্থিত দলের স্নায়ুর ওপর প্রভাব খাটাচ্ছেন, তাঁরা কিন্তু চিরদিনই পার পেয়ে যাচ্ছেন। দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে না বলেই উচ্ছৃংখলতার জোয়ারে জনসমর্থিত দলের খেলার আসরে অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপক্ষদের পিছু হটতে হচ্ছে। এ এক অসহনীয় অবস্থা। কোনোদিনই কি এর সুরাহা হবে না? খেলা হয় দলে দলে। দল ও খেলোয়াড়েরাই সেন মুখ্য। গৌণ ভূমিকা দর্শক ও সমর্থকদের। দর্শক ও সমর্থকেরা যদি ক্রীড়ানুষ্ঠানে সহায়তা না করেন, উল্টে ব্যাঘাত ও বিশৃঙ্খলা জড়ো করতে থাকেন তাহলে দর্শক-সমর্থকদের বাদ দিয়েও যে খেলার ব্যবস্থা করা যায় সেকথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলার সময় কি এখনও হয় নি? অন্য দেশ কিন্তু এই সার কথা অনেক আগেই সোচ্চারে বলে ফুটবল মাঠে ঝামেলা এড়াবার পথ তৈরী করে রেখেছে।

এই শনিবার ইডেনে ইস্টবেঙ্গল সতর্কভাবেই খেলা আরম্ভ করেছিল। প্রাথমিক দর্শনের অভিজ্ঞতায় বোঝা গিয়েছিল যে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা স্নায়ুর চাপে ভুগছেন না। গঠনাত্মক ক্রিয়া কলাপে তাঁদের মন রয়েছে। দেখে আশা জেগেছিল যে খেলার মানকে উঁচুতে তুলে ধরে ইস্টবেঙ্গল তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হয় নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল খেলার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে ফেলে এবং একগোলে এগিয়ে থাকায় ব্যবধানের ওই সংক্ষিপ্ত সূত্রটিকে এক নরী হারের মতো নিজের গলায় জড়াতে চেয়ে আত্মরক্ষণে মন দিয়ে বসে। ফল হয় উলটো।

আরম্ভে মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা স্নায়ুর চাপ ও মানসিক উত্তেজনা উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই সেই লগ্নে যততত্র অস্থিরপদে বিচরণ করছেন। পরে নিজেদের অনেকটা সামলে নিতেই খেলার গতি নিয়ন্ত্রণের কিছুটা অধিকার তাঁদের হাতে এসে যায়। তারই সূত্রে তাঁদের সামনে গোলের সুযোগ আসে।

সব মিলিয়ে খেলা হয়েছে প্রায় সমানে সমানে। গোড়ার পর্বে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণাত্মক চেষ্টায় প্রতিশ্রুতি যদি থেকে থাকে তাহলে শেষার্ধে মোহনবাগানের গোল পরিশোধের প্রয়াসে ছিল সংকল্পের ছায়া। আর গোলের সুযোগ পেয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি, মোহনবাগান দলই।

তবে সুযোগ পাওয়া আর সুযোগ সদ্ব্যবহার করার মধ্যে যে দুস্তর তফাত থেকে যায় সেই তথ্যই প্রকাশ করে দিয়েছেন শ্যাম থাপা। একদল সুযোগ পেল। আর একদল গোল করলো। ফলে প্রায়োগিক মূল্যায়নে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো সেই পরিস্থিতিতে বিজয়ী বেশে মাথা উঁচু করে একদল মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। আর অন্যদলকে বিমর্ষ, বিষণ্ণচিত্তে আনত থাকতে হলো। গোলই যে ফুটবলের অনেকখানি, এই খেলাই তার নিশ্চিত প্রমাণ।

তবে একথাও ঠিক যে গত পাঁচ বছর ধরে যে ইস্টবেঙ্গলকে আমরা কলকাতার মাঠে দেখে আসছি, যে দল অন্য প্রতিযোগীদের শংকার কারণ সেই দলের ক্রীড়াশক্তি মূলধনে দশাতঃই ঘাটতি ঘটে গিয়েছে। মনে হয়, নতুন শক্তি সঞ্চয়ের তাগিদই এখন বড়। আত্মতুষ্টি ঝেড়ে ফেলা ইস্টবেঙ্গলের এখন উচিত আত্মসমীক্ষায় হাত দেওয়া। কারণ পালা বদলের আভাস বুঝি স্পষ্ট হয়েই উঠছে।

পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গলের জয়ধারাকে প্রতিহত করতে না পারলেও মোহনবাগান অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। লড়তে লড়তে প্রতিপক্ষের মনে ভয়ও ধরিয়ে দিয়েছিল। কে জানে সত্যোপলব্ধির কল্যাণে মোহনবাগান আত্মবিস্মৃতির কাল পেরিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে ফিরে যাবার মতো মনোবল এই একদিনের অভিজ্ঞতায় সংগ্রহ করতে পারবে কিনা। তবে মোহনবাগানের এই রূপান্তরিত মূর্তি দেখে ইস্টবেঙ্গল যে নতুন চিন্তার উপকরণ খুঁজে পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

গত ক'বছর ধরে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এবারে মোহনবাগানই যেন ইস্টবেঙ্গলকে ভাবনায় ফেলতে এগিয়ে আসছে।

অজয় বসু
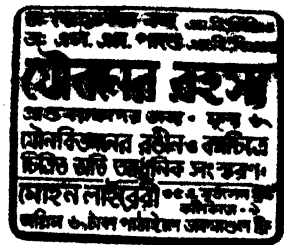
খেলাধুলা

দর্শক

আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

আফ্রিকার নাইজিরিয়ার রাজধানী লাগোসে আয়োজিত দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় মৈত্রী টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশ বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। প্রতিযোগিতার মোট সাতটি খেতাবই এশিয়া মহাদেশের তিনটি দেশ এইভাবে জয় করেছে—চীন ৪টি জাপান দুটি এবং উত্তর কোরিয়া ১টি। চীন পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের খেতাবের সঙ্গে পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাবও পেয়েছে। জাপান পেয়েছে পুরুষদের ডাবলস ও মিকসড ডাবলস খেতাব এবং উত্তর কোরিয়া মেয়েদের ডাবলস খেতাব। প্রতিযোগিতার সাতটি বিভাগের মধ্যে ছটি বিভাগেরই ফাইনালে কেবল এশিয়ার খেলোয়াড়রা খেলেছিলেন। পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে জাপানের বিপক্ষে খেলেছিল নাইজিরিয়ার খেলোয়াড়রা। চীন ৬টি বিভাগের ফাইনালে খেলে ৪টি খেতাব পায়। মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে চীনের খেলোয়াড়রা পরস্পরের সঙ্গে খেলেছিল। জাপান ৪টি বিভাগের ফাইনালে খেলে খেতাব পেয়েছিল দুটি। উত্তর কোরিয়া দুটি বিভাগের ফাইনালে খেলে একটি খেতাব পেয়েছিল।

লাগোসের এই টেবল টেনিস আসরে ৮৫টি দেশের ১৮০০ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিল। এশিয়ার ৩৩টি, আফ্রিকার ২৯টি এবং লাতিন আমেরিকার ২৩টি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল।

ডিসকাস নিক্ষেপে বিশ্বরেকর্ড : আমেরিকার জন পাওয়েল ৬৯-০৮ মিটার দূরত্বে ডিসকাস নিক্ষেপ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড করছেন।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

দলগত বিভাগ

পুরুষ বিভাগ : ১ম চীন, ২য় জাপান ৩য় উত্তর কোরিয়া এবং ৪র্থ ইন্দোনেশিয়া।

মহিলা বিভাগ : ১ম চীন, ২য় উত্তর কোরিয়া, ৩য় জাপান এবং ৪র্থ ভিয়েৎনাম।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই লিয়াং কো লিয়াং ২১—১১, ২২—২০, ১৯—২১ ও ২১—১৪ পয়েন্টে মিত্সুরো কোনোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : চাং লী (চীন) ২১—১৭ ২২—২০ ১৭—২১ ও ২১—১৭ পয়েন্টে স্বদেশের চো সিয়াং-উনকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : মিত্সুরো কোনো এবং কাত্সুজাকি আবে (জাপান) ২১—১ ২১—১৬ ২১—২৩ ও ২১—১২ পয়েন্টে নাইজিরিয়ার ওবিসানয় এবং সুনেসোলাকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : পাক ইয়ং ওক এবং ......চা মী (উত্তর কোরিয়া) ২১—১৩ ৯—২১ ২১—১২ ও ২১—১৯ পয়েন্টে চীনের চ্যাং লী এক চয়াং সী-পিংকে পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : মিত্সুরো কোনো এবং সাচিকো ভুকোকো (জাপান) ১৭—২১ ২১—১৯, —১৩ ও ২১—১৬ পয়েন্টে চীনের চ্যাং লী এবং সিয়াং-উনকে পরাজিত করেন।

ডেভিস কাপ

আমেরিকান জোন ফাইনাল

আমেরিকান জোন ফাইনালে চিলি শোচনীয়ভাবে ৫—০ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, গত বছর ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠেছিল ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। খেলাধুলার আসরে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাদে ভারত গত বছরের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলতে রাজী হয় নি। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ডেভিস কাপ জয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

ইউরোপীয় জোন সেমি ফাইনাল

এ গ্রুপের সেমি-ফাইনালে সুইডেন ৩—১ খেলায় রাশিয়াকে এবং স্পেন ৩—২ খেলায় রুমানিয়াকে পরাজিত করে।

মায়েরা !
এক বেবীফুডে ডাক্তাররা যা যা চান তাঁরা সে-সবই পান আমূলস্প্রেতে

আমূলস্প্রেতে ভিটামিন, খনিজ-পদার্থ আর প্রোটিন রয়েছে যা আপনার শিশুকে সুস্থ আর সবল ক'রে গ'ড়ে তোলার পক্ষে দরকার।

ভিটামিন সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আর খিদে বাড়াবার জন্য, সুস্থ স্নায়ু, মাড়ি, চোখ আর দাঁতের জন্য। নিয়াসিন হজম শক্তি আর পরিপাক ক্রিয়া সবল ক'রে তোলার জন্য, সুস্থ ত্বকের জন্য, ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাসের মত খনিজ পদার্থ হাড়ের গঠন স্বাভাবিক ক'রে তোলার জন্য। আয়রণ সাহায্য করে রক্ত গঠনে।

প্রোটিন কোষ গ'ড়ে তোলা আর পুষ্টিতে সাহায্য করার মূল উপাদান। আর আমূলস্প্রেতে আছে উঁচুমানের পর্য্যাপ্ত প্রোটিন।

আমূলস্প্রে কয়েক দিনের শিশুও হজম করতে পারে

প্রতি বিন্দু দুধ শুখিয়ে চমৎকার মিহি পাউডারে পরিণত করা হয়। ফ্যাটটাও সেভাবেই ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এটি হজম হয় সহজে।

আমূলস্প্রে চটপট এবং সহজেই তৈরী ক'রে নেওয়া যায়

আমূলস্প্রে স্প্রে ড্রাইং পদ্ধতিতে অত্যন্ত মিহি পাউডারে পরিণত করা হয় বলে এটি গলেও খুব তাড়াতাড়ি আর সহজে। এর ফলে, বোতলের নিপলে জমাট বেঁধে যায় না, আর শিশুকেও অনেকটা বাতাস গিলে ফেলতে হয় না।

বালআমূল এবং বাড়ন্ত শিশুরা
৩ মাস বয়স থেকে শিশুকে আমূলস্প্রে ছাড়াও শক্তের আহার বালআমূল খাওয়াতে শুরু করুন।
আরও মাতার তথ্য জানবার জন্যে বিনামূল্যে আমূল পুস্তক—মাতৃত্ব ও শিশু পালন
বিনামূল্যে আমূল পুস্তক মাতৃত্ব ও শিশুপালন পেতে হ'লে এই ঠিকানায় চিঠি দিন—পোঃ বঃ নং ১০১২৪, বোম্বাই ৪০০ ০০১। সঙ্গে ৫০ পঃ ডাক টিকিট এবং আপনার পুরো ঠিকানা দেবেন।

আমূলস্প্রে

মায়ের দুধের আদর্শ বিকল্প

Indian Standards Institution

বাজারে ছেড়েছে :
গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ, আনন্দ।

ASP-AS

বি গ্রুপের সেমিফাইনালে ফ্রান্স ৩—২ খেলায় ইতালীকে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ৪—১ খেলায় হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে।

ইউরোপীয় জোন ফাইনাল

এ গ্রুপের ফাইনালে সুইডেন ৩-২ খেলায় স্পেনকে এবং বি গ্রুপের ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ৩-২ খেলায় ফ্রান্সকে হারিয়ে ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে সুইডেন খেলবে চিলির সঙ্গে এবং অপর দিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে খেলবে অস্ট্রেলিয়া।

বিশ্ব রেকর্ড

লং বীচ-এ আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে সান জোসের পুলিশ কর্মচারী জন পাওয়েল ৬৯-০৮ মিটার ২২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি) দূরত্বে ডিসকাস নিক্ষেপ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ডিসকাস নিক্ষেপে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৬৮·৪৬ মিটার (২২৪ ফুট আট ইঞ্চি)—দক্ষিণ আফ্রিকার জন ভ্যান রেকনান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

গত ১৬ই জুলাই হাম্পসায়ার বনাম গ্লামর্গ্যান দলের গিলেট কাপের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যান গর্ডন গ্রিনিজ হাম্পসায়ার দলের পক্ষে ১৭৭ রান করার সূত্রে নির্দিষ্ট একদিনের ক্রিকেট খেলায় স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন। পূর্বের রেকর্ড ছিল ১৭৩ রান (১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত)।

এই খেলাতেই হাম্পসায়ার দল ৩৭১ রান (৪ উইকেটে) করে নির্দিষ্ট একদিনের ক্রিকেট খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেছে। এ বিষয়ে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড— প্রথম বিশ্ব ক্রিকেট কাপ খেলায় ভারতের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৩৩৪ রান।

আমেরিকার স্টিভ উইলিয়ামস ৯-৯ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে দ্বিতীয়বার এই বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। প্রথম করেন গত বছর। তাঁকে নিয়ে ৭জন অ্যাথলীট ১০০ মিটার দৌড় ৯-৯ সেকেন্ডে শেষ করলেন।

রাশিয়া বনাম আমেরিকা

কিয়েভে ১৯৭৫ সালের রাশিয়া বনাম আমেরিকার দ্বৈত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ ও মহিলা—উভয় বিভাগেই প্রথম স্থান লাভ করেছে। রাশিয়া পুরুষ বিভাগে ১২৯—৮৯ পয়েন্টে এবং মহিলা বিভাগে ৯৬—৪৯ পয়েন্টে আমেরিকাকে পরাজিত করে। রাশিয়ার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান ভ্যালেরি বোরজভ পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় ১০ সেকেন্ডে শেষ করে প্রথম হন। ১৯৭২ সালের অলিম্পিকে ভ্যালেরি বোরজভ ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন।

রাশিয়া বনাম আমেরিকার এই দ্বৈত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯৫৮ সালে। এ পর্যন্ত ১৩ বার এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এই ১৩ বারের আসরে পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে আমেরিকা ৯ বার এবং রাশিয়া ৪ বার। অপরদিকে মেয়েদের বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে রাশিয়া ১২ বার এবং আমেরিকা ১ বার। পুরুষ এবং মেয়েদের বিভাগে সংগৃহীত মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে প্রথম হয়েছে রাশিয়া ১০ বার, আমেরিকা ২ বার এবং একবার (১৯৭১ সালে) দুই দেশেরই মোট পয়েন্ট সমানে সমান হয়েছিল। পয়েন্টের ভিত্তিতে একই বছরে উভয় বিভাগেই প্রথম স্থান লাভ করেছে রাশিয়া ৪ বার (১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৩ ও ১৯৭৫) এবং আমেরিকা ১ বার (১৯৬১ সালে)।

একই বছরের আসরে মোট ২০০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে রাশিয়া ৩ বার (১৯৭০ সালে ২০৩ ১৯৭৩ সালে ২১৬ ও ১৯৭৫ সালে ২২৫ পয়েন্ট)। অপরদিকে একটি আসরে আমেরিকার সর্বাধিক মোট পয়েন্ট ১৯৫ (১৯৬৯ সালে)।

বিশ্ব তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা

দলগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : আমেরিকা
মহিলা বিভাগ : রাশিয়া

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ : ১৮ বছরের ড্যারেল রেশ (আমেরিকা) নতুন বিশ্ব রেকর্ড পয়েন্টে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

মহিলা বিভাগ : রাশিয়ার জোবিলিংশো রুস্তামোভা নতুন বিশ্ব রেকর্ড পয়েন্টে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। গত-বছরের চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার লিন্ডা-মেয়ার্স এবার ৫ম স্থানে নেমে গেছেন।

ভিডমার দাবা কাপ

আন্তর্জাতিক ভিডমার দাবা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভের সূত্রে রাশিয়ার ২৪ বছরের বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান আনাতোলি কারপোভ ২০০০ পাউন্ডের নগদ প্রথম পুরস্কার ও ভিডমার কাপ লাভ করেছেন। মোট পনেরটি খেলার মধ্যে কারপোভ সাতটি খেলায় জয়ী হন এবং আটটি খেলা ড্র করে মোট ১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে মাত্র এক পয়েন্ট বেশী পেয়েছিলেন।

উইম্বলেডন আসরে ভারতের ভূমিকা

১৯৭৫ সালের উইম্বলেডন টেনিস আসরে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়রা মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি, সবচেয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়ের মধ্যে মাত্র দুজন — বিজয় অমৃতরাজ এবং আনন্দ অমৃতরাজ সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন। বাকী শশী মেনন, জসজিৎ সিং, প্রেমজিৎ লাল ও শশী মেনন, আনন্দ অমৃতরাজ এবং যে ক'জন খেলোয়াড় বাছাই পর্ব খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র জয়দীপ মুখার্জী আগের পর্ব থেকে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। জয়দীপ মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে প্রায় তিন ঘণ্টা প্রাণপণ লড়ে খেলে শেষ পর্যন্ত হল্যান্ডের টিবলড্ ক্লিকারকে হারিয়ে দেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনি চিলির জেইমি ফিললের কাছে ৩-৬, ৬-৩, ২-৬ ও ৩-৬ গেমে হেরে যান। বিজয় অমৃতরাজ দ্বিতীয় রাউন্ডে গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এক নম্বর বাছাই জিমি কোনর্সের কাছে হেরে যান ৮-৯, ০-৬ ও ৬-৮ গেমে। আনন্দ অমৃতরাজ পরাজিত হন প্রথম রাউন্ডেই রাশিয়ার আলেকস মেট্রেভেলীর কাছে স্ট্রেট সেটে।

ডাবলসের খেলাতেও ভারতীয় খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। পুরুষদের ডাবলসে আনন্দ এবং বিজয় অমৃতরাজ দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিলেন এবং মিকসড ডাবলসে বিজয় অমৃতরাজ এবং আমেরিকার ক্যাথি মে ৩য় রাউন্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন।

প্রাক অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা

মন্ট্রিলে আয়োজিত প্রাক-অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৩-২ গোলে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। এখানে উল্লেখ্য, এই আসরেই লীগ পর্যায়ের বিভাগীয় খেলায় পাকিস্তান ভাবে ১-৫ গোলে এই পাকিস্তানেরই কাছে হেরেছিল। গত মার্চ মাসে মালয়েশিয়ার তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে কিন্তু [illegible] জার্মানী শোচনীয় ভাবে ০-৫ গোলে এই পাকিস্তানেরই কাছে হেরে যায়। ১৯৭৫ সালের তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় ভারত স্বর্ণ, পাকিস্তান রৌপ্য এবং পশ্চিম জার্মানী ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল।

সদ্য সমাপ্ত মন্ট্রিলের প্রাক অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় এই আটটি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল—পশ্চিম জার্মানী, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আর্জেন্টিনা, গ্রেটবৃটেন, কানাডা, কেনিয়া এবং মেক্সিকো। ১৯৭৫ সালের তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারত এই আসরে অংশ গ্রহণ করে নি। এই প্রাক অলিম্পিক হকির সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৪-১ গোলে আর্জেন্টিনা এবং পাকিস্তান ৫-২ গোলে হল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম পশ্চিম জার্মানী, ২য় পাকিস্তান, ৩য় হল্যান্ড ৪র্থ আর্জেন্টিনা, ৫ম গ্রেট বৃটেন, ৬ষ্ঠ কানাডা, ৭ম কেনিয়া এবং ৮ম মেক্সিকো।

'হাতে সময় ছিল বড়ো জোর সেকেন্ড কুড়ি। এগিয়ে যাওয়ার পথ দুর্গম, পিচ্ছিল। সামনে গোল। হঠাৎ এক অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি আমার ওপর যেন ভর করলো। এক, দুই, তিন—চারজনকে অবলীলাক্রমে কাটিয়ে বলটা জালে ঠেলে দিলাম। ইডেনে বিস্ফোরণ ঘটলো। ইডেনের ঐ মুহূর্ত-কটি আমার ব্যক্তিগত জীবনেরও ছবি বটে। অনেক বাধা পার হয়েই তো আজ আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছি। আজ আমি সুখী, আমি ধন্য।

—শ্যাম থাপা

শ্যাম থাপা

বারোই জুলাইয়ের ক্লান্ত, অবসন্ন দিনটির সমাপ্তি ঘোষণা করে সূর্য যখন পাটে নামছিল, গোটা ইডেন আর গঙ্গার বুকে লাল হলুদের ছায়া ফেলে—তখন কথা হচ্ছিল সেদিনের মাঠের নায়ক গোর্খা যুবক শ্যামবাহাদুর থাপার সংগে সাজঘরে বসে বসে। শ্যাম তখন ক্লান্ত, শ্রান্ত। দলের সাফল্যে উদ্বেলিত। বাইরে ইস্টবেঙ্গলের বিজয়োল্লাসে সারা ইডেন থরথর করে কাঁপছে। উল্লাস নিতান্তই স্বাভাবিক। সেই চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে হারানো তো কম কথা নয়!

শ্যাম থাপার সংগে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় দীর্ঘদিনের। সাজঘরে আমায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখেই—শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন।

'ছিটো আই গ দাজু ছিটো আই গ। মারি হালেয়ো, মারি হালেয়ো। মলয় তিমিলে ভণে কো থিও, গোল করন, হোস গোল করে কো ছুন।' নেপালী ভাষায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে শ্যাম খানিকটা দম নিয়ে নিলেন। তারপর দেখি মিট মিট চোখে আমার আর সহযোগী বন্ধু বাহাদুরের দিকে চেয়ে হাসছেন। শ্যামের নেপালী কথার অর্থ হোল: 'এসো দাদা শিগগির এসো। আজ কাজ ফতে করে দিয়েছি। তোমায় বলেছিলাম গোল করবো গোল করেছি।'

বুক ফুলিয়ে অমন কথা বলতে পারেন বইকি দেরাদুনের ছেলে শ্যাম থাপা। ইডেনে ঐ অবিস্মরণীয় গোলের পথে প্রতিবন্ধক ছিল অনেক। পায়ের নীচের কর্দমাক্ত জমি, প্রতিপক্ষের [illegible] বেড়া। ঠিক যেমন বেড়া পা [illegible] জীবনে ঐ [illegible] [illegible] করে দাঁড়িয়ে! [illegible] কথা বলতে

কি—এবারের মরশুমটা শ্যাম থাপার মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। খেলতে পারছিলেন না আশানুরূপ। কিন্তু ইডেনের এই ছবির মত গোলের পর তাঁর মাথার ওপর থেকে হতাশার কালো মেঘ কেটে গিয়ে—নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ফিরে পেয়েছেন আত্মবিশ্বাস। নিজেকে নতুন করে যেন আবিষ্কার করেছেন তিনি। উপর্যুপরি ছ' বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন করতেই হবে যে ইস্টবেঙ্গলকে।

এই আত্ম-আবিষ্কারের অনেক আগেই কিন্তু ফুটবল খেলোয়াড় শ্যাম থাপাকে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর বাবা শ্রীবিক্রম থাপা এবং মা হীরা দেবী। উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখে তাঁরাই শ্যামকে একেবারে শৈশবেই পাঠিয়েছিলেন দেরাদুনের ফুটবল মাঠে। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ওখানেই শ্যামের জন্ম। বাবা সেনাবাহিনীতে জুনিয়ার কমিশনড অফিসার ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। শ্যাম ঘরের সবচেয়ে বড়ো ছেলে। মেজো ভাই—অর্থাৎ ও'দের নেপালী হিসেবে মায়লা চাকরী করে বাপের মত সেনাবাহিনীতে। বাকী দুটি ভাই এবং একটি বোন স্কুলে পড়ছেন দেরাদুনে।

ঘরের কথা বলতে বলতে শ্যাম যেন ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে যান। মন ভেসে যায় বোধহয় দেরাদুনের সেই বাড়ীটিতে। ছোট্ট বাড়ী, কিন্তু কি বিরাট স্বস্তি, কি নিবিড় শান্তি! গোর্খা স্কুলে পড়ার সময় ১৯৬৩।১৯৬৪।১৯৬৫ তিন বছর শ্যাম থাপা রাজধানীর সুব্রত কাপে খেলেছেন। ১৯৬৫ সালে ওখান থেকেই পাশ করেছেন স্কুল ফাইনাল। ১৯৬৫ সালে দিল্লীতে খেলা দেখে ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা ও'কে নিয়ে আসেন কলকাতায়। ৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গলে খেলার পর ফিরে যান দেরাদুনে সামরিক বাহিনীতে চাকরী নিয়ে (কোর্পোরেল ৬১ গোর্খা ব্রিগেড)। শ্যাম বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেক পজিসনেই খেলতে পারেন। ইনসাইড, লেফট উইং এবং ব্যাকেও। গত ক'বছর বম্বের মফৎলাল মিলসের হয়ে নিয়মিতভাবে ব্যাকে খেলেছেন। এবার ইস্টবেঙ্গলে প্রদীপ আবার শ্যামকে পুরোভাগে টেনে আনলেন। ১৯৬৮ সালে সেনাবাহিনীতে কাজ করার সূত্রে প্রথম খেললেন জাতীয় ফুটবলে বাঙ্গালোরে (কর্ণাটক চ্যাম্পিয়ন)। পরের বছর আসামের নওগাঁওয়েও শ্যাম ছিলেন সার্ভিসেস দলের অন্যতম খেলোয়াড়। সার্ভিসেস সেবার রানার্স আপ হয়েছিল ফাইনালে বাংলার কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়ে। ১৯৭০ সালে ফিরে এলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। বাংলার হয়ে খেললেন জলন্ধরে অনুষ্ঠিত জাতীয় শীল্ড প্রতিযোগিতায়। তারপর '৭১ সালে শ্যাম চলে গেলেন বম্বে। ৭২, ৭৩, ৭৪ সালে খেললেন মফৎলালের হয়ে হারউড লীগে। ৭২ সালে মফৎলাল হারউড লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং নাদকার্ণী কাপ রানার্স আপ। ইতিমধ্যে ১৯৭০ সালে নিজের ক্রীড়াকৃতির সূত্রেই শ্যাম থাপা কোয়ালালামপুরগামী (মারদেকা ফুটবল) ভারতীয় দলে স্থান পেলেন। স্থান পেলেন এশীয় ক্রীড়ায় (ব্যাংকক)। রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় ফুটবল দলেও শ্যাম ছিলেন অন্যতম ফরওয়ার্ড। সুতরাং ৭১ সালে মারদেকা দলেও বাদ পড়লেন না। পেস্তা সূখান প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগও ঘটলো। ১৯৭৪ সালে তেহেরাণ এশীয় ক্রীড়ায় শ্যামকে ভারতীয় ফুটবল দল থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। খেলেছিলেন ইরাক ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে।

চলতি বলে ব্যাক ভলি করতে বা মুহূর্তে শূন্যে শরীর বাঁকিয়ে হেড করতে, ইন সাইড, আউট সাইড ডজ করতে শ্যাম থাপার জুড়ি নেই হালফিল কলকাতার মাঠে। গতিবেগ ক্ষিপ্র, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুখোড় তিনি। প্রয়োজনে [illegible] ... লীগের পাট চুকলেই ধরমশালার পথে ছুটবেন শ্যাম। ছুটে যাবেন কাঞ্চন আর সুনুর কাছে।

শ্যাম থাপা বিবাহিত। দেরাদুনের প্রায় কাছাকাছি কাংগ্রায় (ধরমশালা) মেয়ে কাঞ্চনকে বিয়ে করেছেন তিনি। দেড় বছরের ছোট্ট মেয়ে সুনুকে নিয়ে কাঞ্চন এখন ধরমশালায় পিতৃগৃহে। শ্যাম থাকেন কলকাতার কার্লটন হোটেলে। খেলার অবসরে শ্যামের কাঞ্চনকে মনে পড়ে, মনে পড়ে টুকটুকে সুনুকে।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্বতারোহণে ভারতী দুবে

বিশ্ব মহিলাবর্ষ উপলক্ষে ভারতীয় মেয়েদের একটি পর্বতারোহী দল ৩১ মে কুলু-হিমালয়ের ১৯৯১০ ফুট বা ৬০৭৫ মিটার উঁচু মাকারবে শৃঙ্গ জয় করেন। এই দলে ছিলেন, অধিনেত্রী উমা চারী, সহনেত্রী ভারতী ব্যানার্জি (দিল্লী), রাণী পুরী (দিল্লী), ভারতী দুবে (কলকাতা) নাজনিন কাত্রিক (বোম্বাই) এবং থ্রিটি বাড়ি (বোম্বাই)। এই সঙ্গে ডাঃ কুমুদিনী পুত্রাণা ছিলেন দলে মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে।

কলকাতার মেয়ে ভারতী দুবের সঙ্গে দেখা করলাম এই মাকারবে শৃঙ্গ জয়ের কাহিনী তার কাছে শোনবার উদ্দেশ্যে। ভারতী হল পরলোকগত শ্রমিক নেতা বিশ্বনাথ দুবের মেয়ে। ওর মা বীণাপানি দুবে ছিলেন সেযুগের বিপ্লবী দলের সদস্য। নিজে ছুরি লাঠি জুজুৎসু প্রভৃতিতে পারদর্শিনী। মেয়ের মনের এই নির্ভীক আচরণ মার কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

যাই হোক, ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা মাকারবে শৃঙ্গ কেন ঠিক করলে ?

—ঐ শৃঙ্গটা আমরা ঠিক করিনি। দিল্লী মাউন্টেনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সভাপতি মেজর এইচ পি এস আহলুওয়ালিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে উক্ত সংস্থা মহিলা অভিযাত্রীদের অভিযানের জন্য এই শৃঙ্গটি বেছে নেন।

কুলু-হিমালয়ে অবস্থিত এই শৃঙ্গটি ১৯২৩ সালে কর্ণেল ব্রুসের নজরে পড়ে। তারপর বহুবার এটিকে জয় করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৭তে জিওফ্রেহিল দুজন শেরপা পেম্বা ও সুরেশকুমার সহ এই শৃঙ্গের পায়ের কাছে প্রাণ হারান। বৃটিশ অভিযাত্রী দলের তিনজন ও শেরপা ওয়াংদিল ১৯৬৮তে এই শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে শেরপা ওয়াংগিল ও বৃটিশ সদস্য অ্যাশ বার্ণার মাকারবে শৃঙ্গে উঠতে সক্ষম হন। এটি মানালি শৃঙ্গের পরেই অবস্থিত, তাছাড়া ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া অভিযানের পক্ষে প্রচণ্ড প্রতিকূল। তাই '৬৮র পর থেকে কেউ আর মাকারবে অভিযানে যান নি।

এবার বিশ্ব মহিলা বর্ষে মেয়েদের জন্য এই শৃঙ্গটিই নির্বাচন করা হল। ভারতী এর আগে শূলুনিয়াতে বেসিক রক ক্লাইম্বিংয়ের পাঠ শেষ করে। হিমালয়ান এসোসিয়েশনের অ্যাডভান্সড রক ক্লাইম্বিং

ভারতী দে

ও প্রশংসাপত্র লাভ করে। পরে ওকে '৭৩এ
নালিতে ওয়েস্টার্ণ হিমালয়ান মাউন্টে-
য়ারিং ইনস্টিটিউটে যোগ দিতে হয়
সিক মাউন্টেনিয়ারিং-এর পাঠ নেবার জন্য।
এখানেও ভারতী প্রশংসাপত্র ও বৃত্তি লাভ
করে। ভারতী শ্রদ্ধার সঙ্গে 'সুজয়া গুহের
নাম করে। বলে উনিই আমার প্রেরণার
উৎস। ভারতী লেডিস অ্যাডভেঞ্চারার্স
ক্লাবেরও সদস্যা।

পর্বতারোহণের পথে তোমাকে কে
আনলেন ?

—হিমালয়ান এসোসিয়েশনের দীপালী
সিংহ। উনিই প্রথম আমাকে ঐ অ্যাসো-
সিয়েশনে নিয়ে যান।

—শৃঙ্গ আরোহী দলে তুমি ছিলে ?

—হ্যাঁ। আমাদের অধিনেত্রী উক্ত
অভিযানের জন্য দলটিকে দুটিভাগে
ভাগ করেন। প্রথম দলে ছিল ভারতী
বানাজী, প্রীতি বাড়ৈ, শেরপা নওয়াং,
পানাম ও তাসি। ৩১ মে প্রথম দলের
মাকারবে শৃঙ্গে পৌঁছানোর খবর চার নম্বর
শিবিরে আসামাত্র দলনেত্রী (১ জুন)
দ্বিতীয় শৃঙ্গাভিযাত্রী দলের সদস্যদের
নাম ঘোষণা করলেন। এই দলে আমি,
রাণী পুরী ও নাজনিন কাত্রিক স্থান পেলুম।
আমরাও সঙ্গে সঙ্গে মাকারবের উদ্দেশ্যে
যাত্রা করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আবহ-
হাওয়া সে সময় হঠাৎ ভীষণ খারাপ হয়ে
গেল। প্রচণ্ড তুষারপাত আর কুয়াশার ফলে
আমরা সামনের দিকে কিছুই দেখতে
পাচ্ছিলাম না। তিনদিন ধরে দুর্যোগ একই
রকম রইল। এরই মধ্যে আমরা মানালিতে
ফেরা পার হবার জন্য যাত্রা করলাম।
মানালিতে উঠতে সক্ষম হলেও, এই সময়
অনেকের এমনি অসুস্থতা হয়ে উঠল যে,

দ্বিতীয় দলের আমরা আর মাকারবে শৃঙ্গে
পৌঁছোতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে মাকারবের
পায়ের কাছ থেকেই আমাদের ফিরতে হল।
তবে এতে আমাদের দুঃখ নেই, কারণ
আমাদের সতীর্থরা অর্থাৎ প্রথম দলনেতা
প্রায় অজেয় মাকারবে শৃঙ্গ জয় করে
ফিরেছে।

—তোমার এই পর্বতারোহণই কি প্রথম
বার ?

—হ্যাঁ। প্রশিক্ষণ নেবার পর সত্যি সত্যি
পর্বতারোহণ আমার এই প্রথম বার।

—তাহলে তোমার অভিজ্ঞতার কথা
কিছু বল তো।

—ব্যবসায়িক পর্যটন সংস্থার সাহায্যে
দিল্লী পর্বতারোহণ সংস্থার উদ্যোগে এই
অভিযান স্থির হবার পর আমি এই দলে
স্থান পেলাম। আমাদের প্রত্যেকেরই পর্বতা-
রোহণের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও
পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়া - পরিচিত
হয়েছিল। পনেরই মে আমরা সরকারীভাবে
দিল্লী থেকে রওনা হলাম। সেই দিনই
চণ্ডীগড়ে পৌঁছলাম। পরদিন পৌঁছলাম
মানালিতে। এখান থেকেই আঁচ পেলাম
আবহাওয়া বিরূপ। চারিদিকে ক্রমেই একটা
কালো পর্দা যেন ঘিরে ধরছে আমাদের।
আকাশও ঝাপসা। এই সঙ্গে শুরু হল
প্রচণ্ড বৃষ্টি। পর্বত দেবতা যেন আমাদের
ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সারা পথ আমাদের
তীব্র আক্রোশে আঘাত করে চলেছেন। আসল
কথা, আমরা রওনা হবার আগে জীবন বীমা
আর পর্বত পূজা করেছিলাম।

মানালিতে অনেকেই আমাদের নিরাশ
করতে লাগলেন। সবাই বলেন, মাকারবে
ওঠার চেষ্টা না করাই ভাল ও বড় দুর্গম

শৃঙ্গে। বরং মানালি শৃঙ্গ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এস। কিন্তু দলনেত্রীসহ আমরা সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মানালীতে এসে আমরা স্থির করলাম বিতস্তার উৎসমুখে বিতস্তাকুণ্ডে 'আরম্ভ শিবির' বসাব। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার ভাষা আমার জানা নেই। এক কথায় বললে বলতে হয়—অপূর্ব—অনবদ্য। এই পথে আরও দুটি স্থান সোলাং নালা ও ধুন্দিতে শিবির বসানোর উপযোগী চমৎকার জায়গা ছিল। সোলাং নালায় প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আমাদের এখানে দু দিন অপেক্ষা করতে হল। এখানেই আমাদের গুজরাটের একটি অভিযাত্রী দলের সংগে দেখা হল। তাঁরাও মাকারবে শৃঙ্গ জয় করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির নিদারুণ প্রতিকূলতায় তাঁদের সে সংকল্প ত্যাগ করে ফিরে আসতে হয়। এখানে নেচে-গেয়ে দু দিন কাটিয়ে আমরা বিতস্তা কুণ্ডের দিকে এগোতে আরম্ভ করলাম। কিছুকাল পরেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন চোখে পড়ল, সমগ্র নিসর্গ দৃশ্যে কোথাও কোন গাছপালা, তৃণলতা বা সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। সামনের দিকে পর্বতের গায়ে যা বিস্তীর্ণ সমতলে কেবল শুভ্র তুষার। সারা প্রকৃতি শ্বেত তুষারের আবরণে আচ্ছাদিত। বিতস্তা কুণ্ডে পৌঁছুলাম। পশ্চিম দিকে ১৯,৪৫০ ফুট উঁচু হনুমান টিব্বা যেন সমগ্র অঞ্চলের সামন্ত নৃপতি রূপে বিরাজ করছেন। পথ ধরে এগোতে লাগলাম আমরা। কত ছোট-বড় নালা, স্রোতস্বতী পেরিয়েছি, তুষার সেতুর ওপর দিয়ে, তার হিসাব নেই। পথের দিশায় সামান্য এদিক-ওদিক হলে প্রচণ্ড স্রোতে কোথায় হারিয়ে যেতুম। ছোট ছোট স্রোতস্বিনী কিন্তু বেশ গভীর। পর্বতের বুক কেটে বয়ে চলেছে। কয়েক জায়গায় কেবল আলগা পাথরের ওপর পা দিয়ে দিয়ে জল পার হতে হয়। বিতস্তা কুণ্ডের মূলে শিবিরে পৌঁছে দেখি আমাদের আসার আগেই এক বিরাট হিমবাহ এসে গেছে। ২৪ মে আবহাওয়া আবার অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। ঐ প্রচণ্ড শীতের মধ্যে প্রবল শিলাবৃষ্টি ও তুষার ঝড় শুরু হল। আমরা একটু 'হালুয়া' তৈরী করে নিয়ে প্রকৃতি দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম যদি তাঁর কৃপায় আবহাওয়া অনুকূল হয়। আশ্চর্যের বিষয় শিবিরে পৌঁছে দেখি আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সংক্ষেপে বলি, প্রথম শিবির স্থাপনের জন্য প্রায় তিনশো মিটার এগিয়ে যাবার পর আমাদের চক্ষুস্থির। সামনে ভয়াবহ আকারে বরফ আর তুষার জমাট বেঁধে রয়েছে। হিমবাহ পেরিয়ে তুষারের ওপর দিয়ে আমাদের পর্বতের ঢালুতে উঠতে হবে। আমরা ঐ জায়গাতেই তাঁবু গেড়ে থাওয়া সারলুম। পরদিন নীচের তাঁবু থেকে এক নম্বর তাঁবুতে জিনিসপত্র আনা হল। আমাদের উনুন খারাপ হওয়ায় ঐ ঠাণ্ডায় আরও কঠিন অবস্থা হয়েছিল। ২৭ মে দিনটি ভাল ছিল। কিন্তু এর আগে মাকারবে শৃঙ্গ লাডাকি শিখি দার পর্বতের আড়ালেই ছিল। এবার আমরা মাকারবে এবং মানালি দুটি শৃঙ্গই দেখতে পেলাম। ২৮ মে তুষারপাতের জন্য বিশেষ কাজ হল না। আমরা মানালির পায়ের কাছে তিন নম্বর তাঁবু বসালাম। ২৯ তারিখে আবহাওয়া মেঘলা হলেও খুব খারাপ ছিল না। তাই আমরা মানালি শৃঙ্গে উঠতে লাগলাম। কঠিন খাড়া উঁচু পাহাড়ের গায়ে দড়ির সাহায্যে একে একে উঠছি। ১৯৬৫র এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের শেরপা নওয়াং আমাদের এখন পথ প্রদর্শক। মাঝে মাঝে পর্বতের গায়ে যেখানে পা রাখছি সেখানে আলগা পাথর পড়ে যাচ্ছে। কখনও বা তুষারে পা দিলে পা ভুস করে ডুবে যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। যে কোন মুহূর্তে পা একটু ফসকালে বা দড়ি থেকে হাত আলগা হলে একেবারে হাজার ফুট গভীর খাদের ভিতর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত-পা চালাচ্ছি যেন কলের মত। মস্তিষ্কের যেন কোন চিন্তা করার শক্তি নেই। মাঝে মাঝে শেরপার হুঁসিয়ারী ক্ষীণভাবে শুনতে পাচ্ছি। তবু উঠছি—এগোচ্ছি। দু নম্বর তাঁবু থেকে প্রায় এক ঘণ্টায় তিন নম্বর তাঁবুতে আসা যায়। আমরা টিনের খাবার আর কাজু বাদাম নিয়ে আবার পর্বতে ওঠা শুরু করলাম। ৩০ মে বেলা সাড়ে দশটায় পর্বতের চূড়ায় কিনারায় উঠে সেই সামান্য জায়গায় চার নম্বর তাঁবু পাতা হল। জায়গাটা এতই ছোট যে দু ফুট সামনেই অতলস্পর্শ খাদে সমাধি। ৩১ মে আবহাওয়া পরিষ্কার হবার জন্য আমরা প্রার্থনা করতে লাগলাম। ঐ দিন সকাল সাড়ে ছটায় ভারতী ব্যানার্জি ও প্রীতি বার্ড দলনেত্রীর নির্দেশে শেরপা নাওয়াং সোনাম ও ভাসিকে নিয়ে আমাদের লক্ষ্যস্থল মাকারবে শৃঙ্গের দিকে উঠতে শুরু করল।

আগেই বলেছি প্রথম দল শৃঙ্গে পৌঁছুবার পরদিন আমি রাণী ও মাজানিনও উঠতে আরম্ভ করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চারিদিক এমন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে, আমাদের অভীষ্ট আর সিদ্ধ হল না। ১০ জুন আমরা দিল্লী ফিরলাম। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী স্বয়ং আমাদের উৎসাহিত করলেন।

—শৃঙ্গের থেকে ভারতী ব্যানার্জিরা কিছু আনেন নি।

—হ্যাঁ। '৬৮ সালের অভিযাত্রীরা মাকারবে শৃঙ্গে যে নাইলনের দড়িটি বেঁধে রেখে এসেছিলেন, ও'রা সেটি নিয়ে এসেছেন।

—পর্বতারোহণের পর এখন কেমন লাগছে ?

—অপূর্ব লাগছে। দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় আর যোগমায়া কলেজের বি এস সির ২য় বর্ষের ছাত্রী আমি এই ভারতী দুবে যে মাকারবে শৃঙ্গ বিজয়ী দলের একজন একথা ভাবতেও চমৎকার লাগছে।

—এবার কি করবে ?

—পড়াশোনা। আরও পর্বতারোহণ আর স্কিক খেলা অনুশীলন।

—অনেক শুভেচ্ছা রইল।

অমর

শ্রীপর্ণা ব্যানার্জী

বয়সভিত্তিক সন্তরণ সম্পর্কে দু'চার কথা

মৌসুমী রায়
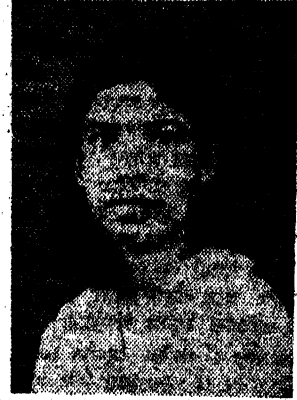
জলক্রীড়ায় পশ্চিম বাংলার রবরবা আজ কোন নতুন ঘটনা নয়। বয়সভিত্তিক দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ তার সেই অতীত সুনামকে অক্ষুন্ন রেখেছে অক্ষরে অক্ষরে।

এদেশে বয়সভিত্তিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ১৯৭৪ সালে। পশ্চিম বাংলার অনুপস্থিতিতে গতবছর মহারাষ্ট্র ছিল একাই একশো। এবার পশ্চিমবঙ্গের সাঁতারুদের নৈপুণ্যের কাছে প্রতিযোগী সব রাজ্যকেই সহজেই হার স্বীকার করতে হয়েছে।

বালকদের চারটি বিভাগ ছাড়াও বালিকাদের চতুর্থ বিভাগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসিপের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পশ্চিমবঙ্গকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। কেবলমাত্র বালিকাদের প্রথম ও তৃতীয় বিভাগে মহারাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় বিভাগে রাজস্থান বাংলার হাত থেকে চ্যাম্পিয়নসিপ ছিনিয়ে নিয়েছে।

মন্দাক্রান্তা দাসচৌধুরী

বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালেও বালক বিভাগে বাংলার কৃতিত্ব বড় বেশী করে চোখে পড়ে। প্রথম গ্রুপে আশিস দাস তৃতীয় গ্রুপে বিশ্বজিৎ দে চৌধুরী ও চতুর্থ গ্রুপে সিদ্ধার্থ বসু সেরা সাঁতারুর স্বীকৃতিতে উজ্জ্বল। অবশ্য তৃতীয় গ্রুপে ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলা যুগ্ম বিজয়ী।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপের মহিলাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে পশ্চিম বাংলা একটি আসনও কব্জা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্র তিনটে বিভাগে জয়ের পতাকা সগৌরবে উড্ডীন রেখেছে। এরা তিনজন হলেন করুণা মীরচন্দানী (প্রথম গ্রুপ), শর্মিলা বরুয়া (তৃতীয় গ্রুপ) ও আল্পনা অধিকারী (চতুর্থ গ্রুপ)।

আশিস দাস

বালিকাদের দ্বিতীয় গ্রুপের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপে রাজস্থানের গোলন্ডা ডিসুজা এক অঘটন ঘটিয়েছে বলা যায়। দশটি স্বর্ণপদক সঞ্চয়ের সুবাদে ডিসুজা গোল্ডেন গার্ল। ডাইভিং-এ দশটি ইভেন্টের দশটিতেই সেরা। গত বছরের সাতটি রেকর্ড ম্লান করেছে। চারটি ইভেন্টে তার দক্ষতা সিনিয়ার গ্রুপকেও ছাড়িয়ে গেছে। ডাইভিংএ ডিসুজা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি পশ্চিমবঙ্গ ডাইভিং-এ অংশ গ্রহণ করেনি। ডাইভিং-এ উৎসাহী প্রতিযোগীর সংখ্যা এখানে এত সীমিত যে প্রায় হাতে গোনা যায়। এর মূল কারণ দুটি। একটি ডাইভিং বোর্ডের অভাব। হেদুয়া বা কলেজ স্কোয়ারে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। বেলেঘাটার ডাইভিং বোর্ডটি আধুনিক কায়দায় তৈরী আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃত হলেও জলের পরিমান হাঁটু সমান। অবস্থিত শহরের এক প্রান্তে বলে শিক্ষু বা অনুশীলনে ইচ্ছুক অনেকেই এটি ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত ডাইভিং শিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অভাব। সমস্ত বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ পারদর্শিতা দেখালেও ডাইভিং প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিতি প্রধান সাফল্যের অন্তরালে পরাজয়ের বেদনার মত রয়ে যাচ্ছে।

পদক জয়ের প্রাপকতালিকায় ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা বিচার করতে গেলে ডিসুজার পর মহারাষ্ট্রের করুণা মীরচন্দানীর (গ্রুপ এক) নাম করতে হয়। সাতটি সোনা, রুপো ছাড়াও একটি রেকর্ড গড়েছে করুণা। পশ্চিম বাংলার আশিস দাস (গ্রুপ এক) চারটি সোনা সমেত তিনটি বিষয়ে জাতীয় রেকর্ড রচনা করেছে। চতুর্থ গ্রুপে পশ্চিম

বাংলার একনিষ্ঠ মেয়ে বুলা নাথ চারটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জসহ তিনটি ইভেন্টে নতুন রেকর্ড তৈরী করে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে।

আশিস ও বুলা দুজনেই এসেছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। দুজনকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিবন্ধকতার বেড়া ডিঙিয়ে। কোলকাতার বুকে গোষ্পদের মত সীমিত পুষ্করিণীতে অনুশীলনের জন্যে আশিসকে রোজ ছুটে আসতে হয় বালী থেকে। চাকরী পাবার আশায় মুহূর্ত গোনে সে। অভিভূত হয়ে উঠেছে। চাকরী না পেলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাকে সাঁতার ছাড়তে হবে। বুলা নাথ আটজনের সংসারে কনিষ্ঠতমা। বাবা পোর্ট এন্ড টেলিগ্রাফের সামান্য মাইনের মোটর ড্রাইভার। দৈন্যভারে অচল সংসারে বুলা তার বাবার কাছে আলোকবর্তিকার মত। সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রী বুলা তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এই প্রস্তরকঠিন দৃঢ়তা অভাবের তাড়নায় জল হয়ে গলে না যায়।

দিল্লীর এন আই এস পুলে অনুষ্ঠিত বয়স ভিত্তিক দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় সন্তরণে মোট ৬৩টি নতুন রেকর্ড রচিত হয়েছে। তার মধ্যে ৪৭টি ফাইন্যালে ও ষোলটি রেকর্ড হয়েছে হিটে। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলার সাঁতারুরা ২২টি রেকর্ড গড়েছে. এবং ৩৭টি সোনা, ২৯টি রৌপ্য ও বারোটি ব্রোঞ্জ জয় করেছে।

আশিস ও বুলা ছাড়া যারা রেকর্ড তৈরী করেছে তাদের মধ্যে আছে গৌর পুরকায়েত (দ্বিতীয় গ্রুপ), বিশ্বজিৎ দে চৌধুরী ও সিদ্ধার্থ বসু সুশীল ঘোষ। মেয়েদের বিভাগে ইলা পাল (তৃতীয় গ্রুপ), মৌসুমী রায় (দ্বিতীয় গ্রুপ) ও মন্দাক্রান্তা দাসচৌধুরী (চতুর্থ গ্রুপ) নতুন রেকর্ড স্থাপনের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

এদের অধিকাংশই সাঁতার সুরু করেছে

বুলা নাথ

দু এক বছর আগে। অনেকেরই প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সপ্তম শ্রেণীর এক ফোঁটা মেয়ে মন্দাক্রান্তা প্রতিযোগিতায় এই প্রথম আবির্ভাবেই দুটি রেকর্ড করেছে। বাড়ীতে এখনও সে প্রত্যহ পুতুল খেলে ও তাদের বিয়ে দেয়। মৌসুমীর জলের সঙ্গে পরিচয় এক আধ বছর আগে। স্কুলে পড়ে। চেহারা বড়সড় হলেও বয়স অল্প। এখনও লাটাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়ায়। জাতীয় সন্তরণে প্রথম আবির্ভাব লগ্নেই সে আগে ভাগে দুটি নজীর রচনা করে ফেলেছে।

দলনেত্রী শ্রীপর্ণা ব্যানার্জীকে নিয়ে আমাদের আশা ছিল আকাশছোঁয়া। কিন্তু তার ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। ২০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোকে মেয়েদের প্রথম গ্রুপে শ্রীপর্ণাকে হারিয়ে পাঞ্জাবের গভিসা গিল (৩ঃ ২৩-১) প্রথম হয়েছে। অথচ ২০০ মিঃ প্রথম ব্রেস্ট স্ট্রোকে অল ইণ্ডিয়া এশেন চ্যাম্পিয়ানশিপে শ্রীপর্ণার রেকর্ড (৩ঃ ২২-২) এখনও অম্লান রয়েছে। ১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোকেও শ্রীপর্ণাকে হার মানতে হয়েছে পাঞ্জাবের এই গভিসা গিলের কাছে (১ঃ ৩৩-৫)। ব্যর্থতার কথা জিজ্ঞেস করতে শ্রীপর্ণা বলল সে এ বছরে অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছে অল্প। মাস সুইজেশন সম্মুখে দীর্ঘদিন জলে নামতে পারেনি। দিল্লির বিশ্রাম জলেও তার বেশ কিছু সময় গেছে কাজে কাজে। তার ওপর দ্বিতীয় আবহাওয়ায় বাদ সেধেছে। জল পাতে পারেনি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় রেজাল্ট খারাপ হয়েছে।

শ্রীপর্ণাকে ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের মেয়েরা মহারাষ্ট্রের প্রতিযোগিতায় হারাতে পারল না কেন? এক কথায় শ্রীপর্ণা বলল—অনুকূল পরিবেশে জন্মে ও ওদেশের মেয়েরা প্রায় সারা বছর অনুশীলনের সুযোগ পায়। সেই অনুপাতে আমরা বছরে তিন মাসের বেশী জলে নামার সুযোগ পাই না। তার ওপর দিল্লীর নতুন পরিবেশকে আমরা কেউই মানানসই করে নিতে পারিনি। প্রত্যেকেই কোন না কোন শারীরিক অস্বস্তি ও অসুস্থতায় ভুগেছে। বালক বিভাগের দলনেতা আশিসের মন্তব্যও প্রায় একই ধরনের। নানা অব্যবস্থা ও গোলযোগ না থাকলে আমাদের ছেলেমেয়েরা আরও ভাল টাইমিং করতে পারত।

নিম্নে রেকর্ডধারীদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

বালক বিভাগ

নাম	গ্রুপ	ইভেন্ট	রেকর্ড সময়
আশিস দাস	প্রথম	১০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক	১ঃ ১০-৮
আশিস দাস	প্রথম	১০০ মিঃ ফ্রি স্টাইল	১ঃ ০২-৬
আশিস দাস	প্রথম	৪০০ মিঃ মেডলি	৫ঃ ৫২-৫
এস গোস্বামী	তৃতীয়	২০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	৩ঃ ১৬-২
স্বদেশ সরকার	চতুর্থ	১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	১ঃ ৩৪-৬
গৌর পুরোকায়েত	দ্বিতীয়	৪০০ মিঃ মেডলি	৫ঃ ৫৯-৮
পল্লব হালদার	প্রথম	৪০০ মিঃ ফ্রি স্টাইল	৫ঃ ২২-১
সিদ্ধার্থ বসু	চতুর্থ	১০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক	১ঃ ২৬-৮
সিদ্ধার্থ বসু	চতুর্থ	২০০ মিঃ মেডলি	৩ঃ ৮-৬
সুশীল ঘোষ	চতুর্থ	১০০ মিঃ বাটারফ্লাই	১ঃ ২৯-৩
আশিস দাস (জুনিয়ার)	তৃতীয়	১০০ মিঃ বাটারফ্লাই	১ঃ ২৮-৩
বি দে চৌধুরী	তৃতীয়	১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	১ঃ ২০-৮
বি দে চৌধুরী	তৃতীয়	২০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক	৩ঃ ০১-৩

বালিকা বিভাগ

নাম	গ্রুপ	ইভেন্ট	রেকর্ড সময়
বুলা নাথ	চতুর্থ	১০০ মিঃ বাটারফ্লাই	১ঃ ৫২-৮
বুলা নাথ	চতুর্থ	১০০ মিঃ ফ্রী স্টাইল	১ঃ ২৫-২
বুলা নাথ	চতুর্থ	২০০ মিঃ মেডলি	৩ঃ ৪১-৩
ইলা পাল	তৃতীয়	২০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	৩ঃ ২৫-৬
ইলা পাল	তৃতীয়	১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	১ঃ ৩৪-৩
মৌসুমী রায়	দ্বিতীয়	১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	১ঃ ৩৬-৩
মৌসুমী রায়	দ্বিতীয়	২০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	৩ঃ ২৩-৫
মন্দাক্রান্তা দাসচৌধুরী	চতুর্থ	৫০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক	৪৭-৬
রিনা চক্রবর্তী	চতুর্থ	১০০ মিঃ ব্যাক স্ট্রোক	১ঃ ৪৫-০

আর যারা একাধিক সোনা পেয়েছে তাদের মধ্যে বুলা নাথ, মন্দাক্রান্তা দাসচৌধুরী, সিদ্ধার্থ বসু, সুশীল ঘোষ, আশিস (জুনিয়ার) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ওয়াটারপোলোর প্রসঙ্গ টেনে আলোচনার আজকের মত ইতি করা যাক। পশ্চিমবঙ্গ চূড়ান্ত খেলায় মহারাষ্ট্রের কাছে ৮-১ গোলে হেরে রানার্স হয়ে যায়। প্রতিযোগিতার কনক ঘোষের ধারণা ফলাফল ক্রীড়াধারা অনুযায়ী যথাযথ হয়েছে।

প্রশান্ত

স্থান হিমালয়। হৃষিকেশের শান্ত
াহিত আকাশ সেদিন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে
ল সেই আহ্বানে—হিউম্যান লাইফ ইন
জার. হিউম্যান লাইফ ইন ডেঞ্জার.
উম্যান লাইফ ইন ডেঞ্জার...
একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী হৃষিকেশের
ই ওংরাই পথ ধরে ছুটছেন আর
লপণে চেঁচাচ্ছেন—হিউম্যান লাইফ ইন
জার...

পিনাকী মুখার্জি আমাকে গল্পটা
ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগেকার
। পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জির সঙ্গে
া সেবার হৃষিকেশে গেছেন 'বন্ধন'
র আউটডোর শুটিং করবার জন্যে।
া রায়, অনিল চ্যাটার্জি, দীপক
র্জি, জীবেন বসুরাও আছেন সেই
টডোরে। আর আছেন একদল
কুশলী।

এখন হয়েছে কি—অর্ধেন্দু মুখার্জি
এই হৃষিকেশে-লছমনঝুলার আউট-
রর স্কীমটা করেছেন, কোথায় ছিল
দের সনন্দা (খ্যাতনামা সুনীল রায়-
রী, এঁর কথা পাঠকদের স্মরণ
তেও পারে), অমনি এসে অর্ধেন্দু-
কে প্রায় পাঁজাকোলা করে ধরে বসে
—দাদা, তাহলে আমাকেও তোমাদের
নিয়ে চল, তীর্থটা করেই আসি এই
গে—

অর্ধেন্দু মুখার্জির তখন টর্চারিং
থা। কোন গতিকে ছবিটা শেষ করে
ক দিলে তবে বাঁচোয়া। পয়সাকড়ি
বিশেষ নেই। হঠাৎ সনন্দার এহেন
রে অর্ধেন্দু মুখার্জি ঈষৎ চটে
ন—আরে আমরা যাচ্ছি শুটিং করতে,
র নগদ টাকা খরচা করে, আর তুমি
র কথা বলছ? আচ্ছা পাষণ্ড হে
!

এসব বাক্যে টলিত হবার পাত্র সনন্দা
ত নয়। হেসে বললে—পাষণ্ড বলেই
যেতে চাইছি দাদা। যদি তীর্থগুণে
ন্ম হয়।
—তা বলে মাগনায়?
—আহা, মাগনায় কেন? তোমাদের
এ কজকম্মাও করে দেব গতর
তার জন্যে আমার কোন পারিশ্রমিক
হবে না, আমি পেটে-ভাতে থাকতেই

বলে ওই বিশাল বপু ফেলে বসে
রইল। নড়বার লক্ষণ নেই। ঘুরে ফিরে
ওই এক কথা—নিয়ে চল দাদা আমায় নিয়ে
চল...। শেষে অর্ধেন্দু মুখার্জি, যদিও
তিনি সনন্দাকে বিলক্ষণ স্নেহ করেন-
ক্ষেপে গিয়ে বলেই ফেললেন—'চল তোরে
দিয়ে আসি সাগরের জলে—'। সুনন্দার
কি হাসি! চটাতে পারলেই কার্যোদ্ধার,
এটা কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীতে কে-না
জানে!

সনন্দা শীতকাতুরে। সুনন্দার বড
ভূতের ভয়ও। কনফার্মড ব্যাচেলার। অথচ
রাজপুত্তুরের মত চেহারা, জমিদার বাড়ির
ছেলে। এখনও গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি
আর চুনট করা ধুতি পরে মাজা দিয়ে
সুনন্দা একটিবার টান টান হয়ে দাঁড়ালে—
অনেক মেয়েরই বুক-ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।
তবে সুনন্দা প্রেমের লাইনে বেশী হাঁটাহাঁটি
করে নি। যৌবনে নিশ্চিত কোথাও বড়
রকম একটা দাগা খেয়েছে। তাই এহেন
ব্যাচেলার অবস্থা। সাবিত্রী চ্যাটার্জির
সঙ্গে সুনন্দার বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের—মনে
হয় সাবিত্রী অনেক গোপন কথা সুনন্দার
ইয়ের ভেতর থেকে টেনে বের করেছে।
আর সুনন্দা কার না বন্ধু! উত্তমকুমার
বলুন বা সুচিত্রা সেন—সবাই বন্ধু। সুনন্দা
সর্বত্র হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে গিয়ে হাজির!
ব্যাস একবার জমিয়ে বসলে কোথা দিয়ে
যে দিনমান কেটে যাবে কেউ হদিশও
করতে পারবে না। মজলিশি গল্পে সুনন্দার
কোন জোড়া নেই, আর মাঝে মাঝে
পান জর্দা আর এক-আধটা দামী সিগারেট।
এই রকম চরিত্র বিরল—পরোপকারী, বন্ধু-
বৎসল, হৃদয়বান সজ্জন মানুষ। জমিদারি
চোপাট, কিন্তু মেজাজটা এখনও আছে।
মাঝে মাঝে নানা হাঁকে ডাকে আমরা
স্টুডিওতে তা বিলক্ষণ অনুভব করতে
পারি। আপাতত মানুষটি 'ভোলা ময়রা'
ছবিটি কনট্রোল করছে। সেদিন স্টুডিওতে
দেখা হতে শুনলাম, ল্যাবরেটরীর স্কোরিং
চেম্বারে ও ছবির গান রেকর্ডিং হচ্ছিল।

হৃষিকেশে চলেছে পুণ্যকামী সুনন্দা.
সম্বল একখানি কম্বল। পিনাকী
মুখার্জিকে গোপনে বলল—হ্যাঁরে পানু,
গরম জামা কাপড় নিয়েছিস তো?

—নিয়েছিই তো, শীতের দেশে শুটিং
করতে যাচ্ছি...
—খুব ভাল করেছিস।

পিনাকী মুখার্জির কেমন যেন সন্দেহ
হ'ল। জানতে চাইল—কেন, তুমি নাও নি?
সুনন্দা সহাস্যে—বিলক্ষণ, কম্বল
নিয়েছি একখানা। কুলিয়ে যাবে না?
—সে তো রাতের বেলা। আর দিনের
বেলায়?
সনন্দা অক্লেশে বলল—তীর্থ করতে
বেরিয়েছি তো, তাই লটবহর নিলাম না।
আমার সাইজ দেখে দিস একখানা পুলো-
ভার বা সোয়েটার, গায়ে দেবাক্ষণ।
বলেই পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সুনন্দা
একই নিঃশ্বাসে বলল—কী আর এমন
একটা শীত! যদি খুউব বাড়াবাড়ি দেখি,
নিয়ে নেব অখন তোর আর একটা শাল বা
আলোয়ান যা বলিস্—
পিনাকী মুখার্জি সুনন্দার কথা শুনে
যেন স্তম্ভিত।
—তাহলে আমি কি গায়ে দেব?
—কেন, আমার কম্বলখানা—ভাল
ব্ল্যাঙ্কেট, বিলিতি, রোঁয়া কুট কুট করে না—
—বঃ, উনি আমার আলোয়ান উড়িয়ে
কাপ্তেনী করবেন আর আমি ওঁর চাউস
কম্বল চাপা দিয়ে দিনমানে হৃষিকেশের
পথে পথে ঘুরব! ভাল ভেবেছো কিন্তু
সুনন্দা, তোমার জবাব নেই—
—কেন, কম্বলটা খারাপ হলো কিসে?
—না, খারাপ হবে কেন! খুউব ভাল।
তবে ওটি আমি গায়ে দিতে রাজী নই
এবং তোমাকেও আমার আলোয়ান দিয়ে
কৃতার্থ হতে রাজী নই। সাফ কথা।

সুনন্দারও তৎক্ষণাৎ সাফ কথা— ও
আমি নেবই। শীতে আমার বড় ভয়, আর
ভূতে ভয়। বাস, এ-দুটি ছাড়া আমি
বেপরোয়া—

ফিল্ম ইউনিটের জন্যে হৃষিকেশে যে
বাড়িটি ভাড়া করা হয়েছিল, কে একজন
বেমক্কা রটিয়ে দিল—বাড়িটি ভূতের
বাড়ি। মানে হন্টেড হোম। হৃষিকেশে মরে
যারা এ-অব্দি ভূত হয়েছে, তারা সবাই
নাকি ও-বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে। রাতের
বেলায় ওঁদের কারবার। সন্ধ্যে নাগাদ
নৃত্য গীত শুরু হয়ে রাত দুপুরে তা
নাকি রীতিমত কাজিয়ায় পরিণত হয়।

শুনে আমাদের সনন্দার তো ধাত
ছেড়ে যাবার দাখিল। —হ্যাঁরে পানু, এসব
কি শুনছি? এটা নাকি ভূতের বাড়ি—

পানুদা অট্ট হেসে বলল—বাড়ি কি
বলছ? বল প্রাসাদ! তবে তোমার চিন্তার
কিছু নেই। যত বড় ভূতই হোক না কেন
তারা, বায়োস্কোপের লাইনের লোকের
কাছে খাপ খুলতে আসবে না। হলেও
ভূত, প্রাণের মায়া আছে তো!

আসলে পিনাকী মুখার্জি এটা
বুঝতে পেরেছিলেন, সুনন্দাকে কেউ ভয়
দেখাবার জন্যে গল্পটি ফেঁদেছে।

তবুও সুনন্দার খুঁতখুঁতানি যায় না।
ধর্ম্ম করতে এসে শেষে কি ভূতের খপ্পরে
প্রাণ যাবে! পানু-টানুর কথায় বিশ্বাস
কি? ওদের তো হুট বললেই ছুট,

ইন্‌টেলেকচুয়াল, রক্ত টগবগে, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস নেই। তা বলে সুনন্দা তো অবিশ্বাস করতে পারেন না। ঘাড় মটকে দিলে তখন তো আর কিছু করার থাকবে না।

বলতে গিয়েছিল অর্ধেন্দু মুখার্জিকে—হ্যাঁ দাদা, কি-সব শুনছি—

অর্ধেন্দু মুখার্জি তখন লোকেশন শুটিং-এর বিলি বন্দোবস্ত করতেই জেরবার, হঠাৎ সুনন্দর আগমনে তিনি প্রথমে অবাক, পরে বিরক্ত।

—কি শুনেছ?

—সবে লোকে বলছে এটা নাকি এটা হন্টেড হৌস—

—কী হৌস?

—হন্টেড।

—মানে?

—আঃ, মানেটা বুঝলে না? হন্টেড মানে হন্টেড। ইয়ের বাড়ি মানে ভূতের বাড়ি—

বাস। অর্ধেন্দু মুখার্জি রাগে বোমার মত ফেটে পড়লেন—সুনন্দ, যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমার, এখন আর ভূতের ভয় দেখাতে এসো না আমাকে।

কাঁদোকাঁদো সুনন্দা বোঝালেন—আমি ভয় দেখাব কেন? শালারা উল্টে আমাকেই দেখাচ্ছে। বলছে রাত্রে বিছানা থেকে তুলে গঙ্গায় চুবিয়ে চুবিয়ে খতম করবে। এই শীতের রাত্রে—

—তুমি থামো—তাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে অর্ধেন্দু মুখার্জি বললেন—যদি তেমন চেষ্টা কেউ করে, তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে যেও। আমি তার চাবকে চামড়া তুলে নেব—

সুনন্দা চমৎকৃত। তার বলছে দাদা! ভূতে আমায় গঙ্গায় চোবাতে নিয়ে যাবে আর তখন আমি সেই ভয়ঙ্কর ভূতকে ধরে নিয়ে যাব দাদার কাছে আচ্ছা করে চাবকে খাওয়াবার জন্য! বলিহারি কথা! এ কার কাছে আমি মনের দুঃখের কথা, ভয়-ভীতির কথা বলতে এলাম।

—আর এখন তুমি যাও। আমি এখন লোটির ('বন্ধন' ছবির ক্যামেরাম্যান) সঙ্গে শুটিং-এর ব্যাপারে ডিসকাশন করছি। তোমার কোন প্রবলেম থাকলে ওঘরে শানু আছে, জীবেন আছে, তুমি ওদের সঙ্গে ডিসকাস করোগে।

এর পর আর কথা চলে না।

সুনন্দ একবার করুণ মুখে অর্ধেন্দুদার দিকে তাকিয়ে গটগট করে বেরিয়ে পড়লেন।

অর্ধেন্দু মুখার্জি ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করে মন্তব্য করলেন—

[illegible]

যত্তসব। আমায় এসেছে ভূতের ভয় দেখাতে। আর আমি অমনি ভয় পেয়ে এই চমৎকার বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে সব্বার হাত ধরে হৃষিকেশের গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াই—হুঃ!

পাশের ঘরে জীবেন বসু আর পিনাকী মুখার্জি বসে চিত্রনাট্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। সেখানে শুকনো মুখে সুনন্দার আগমন। জীবেন বসু সোৎসাহে বললেন—এসো সুনন্দ এসো। বসো।

বসলেন।

ওর মুখের ভাব-ভঙ্গী দেখে এক সময় জীবেন বসু প্রশ্ন করলেন—তোমার কী হয়েছে বলত সুনু? মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে!

সুনন্দা বিরস বদনে বললেন—জীবুদা, অর্ধেন্দুদা আমাদের খতম করার প্ল্যান এঁটেছে।

জীবেন বসু অবাক। —খতম? তার মানে?

অমনি সুনন্দা ঝেঁজে উঠলেন—আর ন্যাকা সেজো না জীবুদা, জানো অথচ ন্যাকা সেজে যাচ্ছো, কালাচাঁদ (অর্ধেন্দু মুখার্জির ডাক নাম) ভয়

—না, বিশ্বাস কর সুনন্দ, আমি কি জানি না। ব্যাপারটা কি একবার খোলসা করে বলতো?

—আর দাদা, শুটিং করতে এসে শেষ পর্যন্ত বেঘোরে না প্রাণ যায়!

—আঃ কি হয়েছে বলবে তো।

—ভূত!

—ভূত?

—হ্যাঁ, এটা হন্টেড হৌস, খবর রাখো? আচ্ছা জীবুদা, হন্টেড হৌস কারেক্ট বাংলাটা কি বল তো?

জীবেন বসু স্খলিত কণ্ঠে বললেন—ভূতের বাড়ি।—ওরে এটা কি বাস্তবিক হানাবাড়ি? আমার আবার এটা ইয়ে আছে, হার্টের ব্যামো। উল্টোপাল্টা কিছু দেখলে আমি কিন্তু প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে পড়ি—

পিনাকী মুখার্জি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে ...লে গেল। তখন সনন্দাতে আর জীবনদাতে ...ংলাপ শুরু হ'ল। দুজনেই ভূতের ভয়ে ...তর।

—জীবনদা, রাত্রে তুমি কোথায় বডি ফেলছো?

—আমি ভাবছি ক্যামেরার ঘরে থাকব। ...রা অনেকগুলো লোক। ওদের মধ্যে ...ছানা পেতে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে ...ড়ব। ক্যামেরার লোকদের টপকে ভূত-...প্রেত আমার কাছে আসতেই সাহস পাবে ...। তুমি কি বলো?

সনন্দা আপ্রাণে বলল। —হ্যাঁ, সেটা ...দ নয়। কিন্তু আমাকে দোতলায় থাকতেই ...বে। পানুর সংগে।

—কেন? তুমিও ক্যামেরার ঘরে চলে ...সো।

—উপায় থাকলে আসতুম। কিন্তু ...মি নিরুপায়, অসহায়।

—কেন কেন?

—আর বল কেন। আসার দিন তাড়া...ড়োয় সব ফেলে চলে এসেছি। বাকস, ...ডিং এভরিথিং—

—আর মানি ব্যাগ?

—ওটা তো তুমি জানো দাদা, ওটা ...ল আসতে আমি ভীষণ ভালবাসি। ...টিকুলারলি কোন ভাবির আউটডোরে। ...ক্টার অল আমার ব্লাড ওয়াটার করা ...সা নিয়ে পার্টমারেরা বেগুল টানবে, ...আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

—তা কি এনেছ সংগে?

—একটি কম্বল। এবং তোমাদের।

—উফ... সনন্দা, তুমি একটি ক্যারেকটার। ...ই হোক। যাই হোক, আমি তোমায় ...মার একটা বালিশ লোন দিতে পারি। ...কসট্রা আছে।

—ব্যাস ব্যাস, ওতেই চলবে। পানুর ...ছানায় শুয়ে পড়ব। উঃ, কি বেজায় শীত ...খানে জীবনদা। গংগায় ডুব দেব কি করে ...ই ভাবছি। তারও ওপর শুনেছি, ভূতেরা ...লে নাকি গংগায় চুবিয়ে......

বলা শেষ হলো না। অর্ধেন্দু ...খার্জি ঘরে ঢুকলেন। আর সংগে সংগে ...নন্দা স্পিকটি নট। —চলি জীবনদা, তুমি ...র এ-বিষয়ে—বলে চোখে ইঙ্গিত ...রলেন—যেন কালাচাঁদকে বাড়ীতে বেও ...। ভীষণ ক্ষেপচুরিয়াস হয়ে আছে।

জীবেন বললেও ইঙ্গিতে—আরে তুমি ...পেছো। কালাচাঁদকে আমায় আর ...নাতে হবে না—

সনন্দা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়াতে হল অর্ধেন্দু মুখার্জির কথায়—কোথায় চলেছো?

—অ্যাঁ, মানে দোতলায়—

—এট্টু বাজারে যাবে দয়া করে! আমার সংগে—

সনন্দা তৎক্ষণাৎ—নিশ্চয় নিশ্চয়। আমার এট্টু বেড়ানোও হবে। চলো! এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক। জীবনদা যাবে নাকি? চলই না এট্টু শরীরের জট ছাড়িয়ে আসা যাক।

•

দু' পাশে পর্বতশ্রেণী আর ঠিক তার মাঝখান দিয়ে একটা খাতের মধ্যে দিয়ে পবিত্র বাহিনী গঙ্গা বয়ে চলেছে। গংগায় নামলে মনে হবে—দু' পাশে কে যেন থাকে থাকে দেয়াল তুলে দিয়েছে গগনচুম্বী।

দিনের বেলায় আলো ঝলমল, সূর্যের কিরণে গংগার জল চিকচিক করছে, কিন্তু সূর্য যেই পশ্চিমে হেলেছে আর যায় কোথা। কোথায় ছিল ঠান্ডা হাওয়া, হু হু হু শব্দে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে হৃষিকেশের ওপর। কি প্রচন্ড তার গর্জন আর কি অসম্ভব শীতল। হাড় কাঁপিয়ে দেয়।

লোকেশান মানে সন্ধ্যার পর বাড়ীটির গায়ে যখন সেই হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল আর সংগে সেই ভয়ঙ্কর উঁ উঁ উঁ শব্দ—তখন সবাই মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন হয়ে গেল। ক্রমেই যেন হন্টেড হৌসের চেহারা নিচ্ছে এই বাড়িটা। সাক্ষাৎ যেন এডগার এলেন পো-র সেট আপ! নিভুল এবং নির্মম।

সনন্দার মুখে আর রা-টি নেই। রাত্রে কোনগতিকে নাকে মুখে গুঁজে পানুর বিছানা নেবার আগেই সনন্দা ঢুকে পড়েছে এবং বিছানার সিংহভাগেই দেহরক্ষা করেছে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে সনন্দা শুনেছে ক্ষুধিত আত্মারা উত্তর দিক থেকে ক্রমেই হৃষিকেশের দিকে এগিয়ে আসছে। বাতাসে তাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সনন্দর ভীষণ ভয় করতে লাগল।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

অনিল চ্যাটার্জী

ঘরখানায় ঢুকলেই বদলে যায় মনটা, চোখটা ইতিউতি যেন ঘুরতে চায়। কিছুতেই বাগ রাখা যায় না। তার ওপর যদি কারও বই-টইএর বাতিক থাকে—তা হলে তো সোনায় সোহাগা। বইএর আলমারির দরজায় হাত না দিয়ে উপায় নেই। সেখানে কি নেই! রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ রচনাবলী থেকে শুরু করে আচার্য চতুরসেন—ধরমবীর কাপুরের সদ্যপ্রকাশিত হিন্দী উপন্যাসটি পর্যন্ত মজুত। ফিল্মের বইতো আছেই।

টেবিলটার ওপর অগোছাল হয়ে সাজসরঞ্জাম। কলম থেকে শুরু করে ছবি আঁকার তুলি আছে। অন্যদিকে রাখা আছে ফ্রেমে বাঁধানো একখানা ছবি। যার মধ্যে দেখা যাবে বিখ্যাত দুই অভিনেতা [illegible] স্টিগার ও [illegible]-এর সঙ্গে এক সারিতে [illegible]—অর্থাৎ অনিল চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে। (ছবিখানা বার্লিনে তোলা)।

কাছে গিয়ে দেখি ওটা ছবি নয়, একটা পেনসিল স্কেচ। দারুণ ছবিখানা। অনিলবাবু বললেন—'এটি এঁকেছে আমারই এক ছাত্র।'

ছোটবেলা থেকেই অনিলবাবুর শিল্পী-মন ছবি আঁকা আর লেখার মধ্য দিয়ে স্ফুরণের পথ করে নিচ্ছিল। অবশ্য সেই পথে তিনি বেশীদিন এগোননি। পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জির হাত ধরে একদিন রুপোলী পর্দার জগতে চলে এলেন। তাও অভিনেতা হয়ে নয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটর হয়ে।

কিন্তু শিল্পীমন তাঁর বেশীদিন ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে অপরের অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। মন চেয়েছে অভিনয়ের জগতে হারিয়ে যেতে। আর এই বাসনার কথাটুকু মুখ ফুটে বলার পরই অভিনয়ের পথে তাঁর জয়যাত্রার গাড়ী চলতে শুরু করল। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটরী ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু পুরনো ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় অনেক মূল্যবান সময় হারিয়ে যাবে। বন্ধুবৎসল, সদাহাস্যময়, অনেকের মাই-ডিয়ার অনিলদাকে চিনতে গেলে অতীত ইতিহাস ঘাঁটার দরকারও নেই।

যে কোনোদিন যে কোনো সময়ে যে কোনো স্টুডিওয় পাঁচ মিনিটের জন্য আনাগোনা করলেই অনিলবাবুকে চিনতে পারা যাবে। মুখভর্তি পান আর দোক্তার [illegible] নিয়ে দেখবেন কারও না কারও সঙ্গে তিনি গল্প করছেন। স্টুডিওর সামান্য ক্যান্টিন বয় থেকে শুরু করে দুঁদে পরিচালক অবধি সবার সঙ্গে তাঁর সমান ঘনিষ্ঠতা। অনেক দিন বাদে দেখা হলে খপ করে জিজ্ঞেস করে বসবেন—'কগো, তোমাদের আর টিকিটি দেখা যায় না যে! অনিল চ্যাটার্জিকে ভুলে গেলে নাকি?'

যাকে উদ্দেশ করে এই কথা বলা সে বেচারী তো তখন কাচুমাচু। সত্যিই হয়তো সে কিছুদিন কলকাতায় ছিল না। যখন তাঁর কাছ থেকে জবাব পেলেন—'না দাদা, দেশে ফ্যামিলি রয়েছে তো, গিয়েছিলুম ক'দিনের জন্য দেখে আসতে।' অমনি অনিলবাবুর সুর যাবে পাল্টে, এগিয়ে এসে কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে হয়তো বলবেন—

'কেমন? বাড়ীর সব ভালোতো? কি করে থাকো ছেলেমেয়ে ছেড়ে এতদূরে?'

•

ক'দিন আগে ও'র বসার ঘরটায় বসে যখন ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি নিয়ে নানারকম কথা হচ্ছিল তখন তিনি, বেশ ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন—'দুঃখের কথা কি আর বলবো বলো? ইন্ডাস্ট্রিতে সেই আগেকার সুইট রিলেশনটাই এখন নেই। এখন সবাই যেন কিরকম নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে!'

ক্ষোভটা অসত্য বা অকারণ নয়। কর্মব্যস্ত স্টুডিওগুলো ঘুরলেই অনিলবাবুর কথাটা বুঝতে দেরী হবে না। তাই জিজ্ঞেস করলাম—'এই আত্মকেন্দ্রিকতার কারণটা কি ভেবেছেন কখনো?'

—নিশ্চয়ই ভেবেছি। কিন্তু সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে জানো তো—অপ্রিয় সত্য কথা বলা উচিত নয়। তাই বলতে চাইছি না। বলে কিছু শব্দ বাড়িয়ে কি লাভ? তাছাড়া অপ্রিয় সত্যগুলো বলে তো আমি অবস্থার কোনো চেঞ্জ করাতে পারবো না!

•

বছর দুই আগে পর্যন্ত অনিল চ্যাটার্জির হাতে ছবি ছিল অনেক কম। বাজার বেশ মন্দা যাচ্ছিল তাঁর। এখন অবশ্য অবস্থার বদল হয়েছে। ভালো অভিনেতা হিসাবে খ্যাতি পেলেও মাঝখানে কয়েকটা বছর প্রোডিউসাররা বুঝি অনিল চ্যাটার্জিকে ভুলে গিয়েছিলেন। এখন আবার সবার মনে পড়েছে তাঁকে। একের পর এক ছবি করছেন। অনেকে বলছেন—'অমানুষ' হিট হবার পরই নাকি প্রোডিউসারদের ভুল ভেঙেছে।

এই মন্তব্যের জের টেনে তাই জিজ্ঞেস করলাম—'অমানুষ' আপনার ফিল্ম কেরিয়ারকে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে ভেবেছেন কি? এখন যে আপনার হাতে এতো ছবি——এগুলো কি 'অমানুষ'এর সাফল্যের ফসল নয়?'

অনিলবাবু এতক্ষণ আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। প্রশ্নটা শুনে উঠে বসলেন। বেশ ধীর স্থির হয়ে বসে বললেন—'অমানুষ'-এর আগে আমার কোনো ছবি কি হিট করেনি বলতে চাও? একটু উত্তেজিত যেন তিনি।

—না, তা বলতে চাইছি না। তবে এইটির কেনো ইমপ্যাকট আপনার কেরিয়ারে আছে কি না জানতে চাইছিলাম আর কি।

উত্তেজনা একটু প্রশমিত করে বললেন—'কাজ আমি সবসময়ই করেছি সমান সিনসিয়ারিটি দিয়ে। বই চলেনি সেটা অন্য ব্যাপার। আর এখন এত ছবি করছি—এটাকে 'অমানুষ'-এর ফল কখনই বলব না।'

ভাল পছন্দমত চরিত্র তেমন তিনি পাননি বলেই নাকি কিছুদিন ছবির সংখ্যা কম ছিল।

আর এখন ষাট বছরের বৃদ্ধ থেকে (রাজা) ছত্রিশ বছরের যুবক (বনশ্রী বাসু বা অবতার) পর্যন্ত সব চরিত্রেই কাজ করছেন।

'আমার এই সময়টাকে তুমি জীবনের সেরা সময় বলতে পারো। এই বিরাট স্প্যানের চরিত্র নিয়ে একই সময়ে কাজ করা ক'জন অভিনেতার জীবনে ঘটে বলো!'

কথাটা সত্যিই। একই সঙ্গে বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করা একজন অভিনেতার পক্ষে সবচাইতে দুর্লভ সুযোগ বলা যায়। সাধারণত দেখা যায় রোমান্টিক নায়ক একাদিক্রমে রোমান্টিক রোলেই কাজ করে যান, বা ক্যারেকটার অ্যাকটর একই ধরনের টাইপ চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু একজন অভিনেতা একই সঙ্গে রোমান্টিক নায়ক, কোনো টাইপ চরিত্র বা সিরিয়াস চরিত্রে কাজ করে যাচ্ছে—এমন ঘটনা খুব কমই দেখা যায়।

অনিল চ্যাটার্জির ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ঘটছে এখন। সম্রাট, বনশ্রী বাসু, বন্দী বিধাতা, অবতার, রাজা হারমোনিয়াম সব্যসাচী, ফুলশয্যা, গুমটিঘর — এর প্রত্যেকটা ছবিতেই তাঁকে পাবেন বিভিন্ন ভূমিকায়। এবং প্রতিটি চরিত্রেই তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন শিল্পীর অভিনয়-ক্ষমতা কতখানি সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

—'অবতার' এবং 'সম্রাট' ছবি দুটোয় দেখো আমার কাজ। প্রচন্ড ডায়নামিক আর ফোর্সফুল চরিত্র। গর্ব করে বলার কিছু

নেই। বলছিও না।' কথা শুনে মনে হোল এই ছবি দুটো সম্পর্কে ও'র প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। থাকতেই পারে।

: বহুদিন হোল আপনাকে সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি না। কি ব্যাপার?

প্রশ্নটা শুনে প্রথমটায় কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—'জানো—একটা সময় গেছে যখন সত্যজিৎবাবু চিত্রনাট্য করার সময় আমার কথা মাথায় রাখতেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় আমার চরিত্র তো উনিই তৈরী করেছিলেন। জানি না কেন আজকাল আর তেমন যোগাযোগ ঘটছে না। আর তাছাড়া সত্যজিৎবাবু তো সবসময়ই চরিত্রের সংগে মিলিয়ে অভিনেতা সিলেক্ট করেন। এখন পর্যন্ত আমায় নেবার মতো চরিত্র হয়তো তাঁর ছবিতে নেই। হলে নিশ্চয়ই ডাকবেন।'

: আর মৃণালবাবুর ছবির ব্যাপার ....'

মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন—'ঐ একই ব্যাপার। মাঝে মধ্যে দেখা হলেই মৃণালবাবু আমাকে বলেন—আপনাকে নিয়ে কাজ করার খুব ইচ্ছে যোগাযোগ হচ্ছে না।'

একসময় অনিল চ্যাটার্জি ঋত্বিক ঘটকের প্রায় প্রতিটি ছবিতেই কাজ করেছেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি ঐসব ছবিগুলোতেই (অযান্ত্রিক, কোমল গান্ধার, মেঘে ঢাকা তারা) তাঁর অভিনয়ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিল দর্শক। এখন তো ঋত্বিকবাবু প্রায় ছবিই করছেন না। সুতরাং সে প্রসঙ্গ আর তুলিনি।

রাত বাড়ছিল। বৌদি এসে খাবার দিয়ে গেছেন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুরবস্থা—শিল্পী সংসদ তাঁর বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে অগোছাল আলোচনা চলছে। বক্তা অনিল চ্যাটার্জি শ্রোতা আমি। ইতিমধ্যে দুটো ফোন অ্যাটেন্ড করে এসেছেন। ঘরটার চারদিক চোখ বোলাতে গিয়ে দেখি ঠিক দরজার ওপরে খুব সুন্দর একটা অয়েলপেন্টিং।

ফোন ছেড়ে ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলাম—'ওটা কার আঁকা?' বেশ সলাজ উত্তর এলো—'আমারই প্রথম আঁকা ছবি ওটা। দাঁড়াও, এ ছবির একটা মজা আছে—তোমায় দেখাই' বলে তিনি পটপট করে ঘরের সব আলোগুলো নিভিয়ে দিলেন। জ্বালিয়ে রাখলেন শুধু একটা জিরো পাওয়ারের হাল্কা লাল আলো। দারুণ দেখাচ্ছিল ছবিখানা। পাহাড়ী এলাকায় কুয়াশা-ঢাকা একটি দৃশ্য। কুয়াশার এফেক্ট এসেছে একবারে ন্যাচারাল।

: এতো সুন্দর আঁকতেন তা ছবি আঁকা ছাড়লেন কেন?

প্রশ্নটা শুনে নেশা ত্যাগের ব্যথা বুঝি জাগল মনে। একটু চুপচাপ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'আজিন ঠিক, এখনও ছেলের সংগে ছবি আঁকি মাঝে মাঝে।'

'ঐতো দেখো না' বলে আঙুল বাড়িয়ে উল্টো দিকের দেয়ালের আরেকখানা ছবি দেখালেন—'ছেলে অরুপের আঁকা।'

অরূপ এখনও আঁকে।

শিল্পীর ছেলে খাঁটি শিল্পীমন নিয়েই গড়েছে।

রাত আরও বেড়েছে। উসখুস করছি ওঠবার জন্য। শেষ বাস বোধহয় চলে গেছে। আর বেশী দেরী হলে বোধহয় ট্যাক্সিও পাব না। বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা। তাই বলে উঠলেন—'কি, তোমার লেখার মশলা পেলে তো?'

হাসি ছাড়া উত্তর দেবার মত কথা আসছিল না। মনে মনে বললাম—'আপনার সংগে কিছুক্ষণ আড্ডা দিলেই অনেকখানের মশলা পাওয়া যায়! একজন শিল্পীর কথা বলার ধরনই তো সেরকম হবে। নইলে লোকদেখানো ফর্ম্যাল হয়ে থাকলে কি আর জীবনমুখী অভিনয় করা যায়?

নির্মল ধর

শক্তি সেন

কথায় আছে নটুয়ার কাজ নাকি—'রং মেখে সং সাজা।' নটুয়া সং সাজেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর রং মাখার কাজটা সারতে হয় বেশির ভাগ সময়েই অন্যজনকে। নাম তাঁর রূপসজ্জাকর, চলতি কথায় মেকআপম্যান।

'সিনেমার যতগুলো ডিপার্টমেণ্ট আছে তার মধ্যে মেকআপ ও ক্যামেরার কাজ সবচাইতে কঠিন এবং সৃষ্টিমূলক'—কথাগুলো বললেন আজকের কলকাতার অন্যতম সেরা রূপসজ্জাকর শ্রীশক্তি সেন। অ্যাকাডেমির লনে বসে কথা হচ্ছিল সেদিন ও'র সংগে। 'কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন, এই কঠিন আর ক্রিয়েটিভ আর্টকে এখনও পর্যন্ত যোগ্য সম্মান কেউ দিচ্ছে না।' গলায় বেশ ক্ষোভের সুর।

থাকাটাই স্বাভাবিক। যিনি প্রায় পঁয়ত্রিশটা বছর ধরে সিনেমার এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির সেবা করছেন সেই বিভাগটির প্রতি অবহেলা দেখলে ক্ষোভের পাহাড় জমা অযৌক্তিক নয় নিশ্চয়ই। শক্তিবাবুর ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল ছবি আঁকার। একসময় পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ঢুকেছিলেন ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে।

আই-পি-টি-এতে অভিনয়ও করেছেন বহুদিন। আর্ট ডিরেকটর হবেন এমন বাসনা ছিল, কিন্তু পরিচালক দেবকী বসু ও'কে বলেছিলেন—'মেকআপ লাইনে লোক খুব কম—তুমি এই লাইনে এসো।'

এবং দেবকীবাবুই তাঁকে প্রথম সুযোগ দিলেন 'কৃষ্ণলীলা' ছবিতে স্বাধীনভাবে কাজ করার। এর আগে টুকটাক কিছু কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল শক্তিবাবুর। এডুয়া সাহেবের নিজস্ব মেকআপম্যান রামুর (রহমান) সঙ্গে স্টুডিওয় যাতায়াত শুরু করেছিলেন কয়েক বছর আগে থেকেই। 'কৃষ্ণলীলা'র পর করলেন 'চন্দ্রশেখর'। এই [illegible]

ইতিমধ্যে টালিগঞ্জে আই-পি-টি-এর লোকেরা আসতে শুরু করেছেন। ঋত্বিক ঘটক 'অযান্ত্রিক' ছবিতে নিলেন শক্তিবাবুকে। এই ছবিতে তিনি কাজ করে প্রচণ্ড সন্তুষ্ট। তারপর তিনি একের পর এক কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায় (অপুর সংসার, জলসাঘর, পরশপাথর, তিন কন্যা, রবীন্দ্রনাথ, দেবী), মৃণাল সেন (নীল আকাশের নীচে, পুনশ্চ) তপন সিংহ (লৌহকপাট, আতিথি, আপনজন, এখনই, রাজা, হারমোনিয়ম), তরুণ মজুমদার (নিমন্ত্রণ, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ঠগিনী ফুলেশ্বরী) আর ঋত্বিক ঘটকের (মেঘে ঢাকা তারা, বাড়ী থেকে পালিয়ে) সঙ্গেতো বটেই।

একসময় বিশ্বরূপা থিয়েটারে দশ বছর কাজ করেছেন। এখন আছেন নান্দীকর দলে। রবীন্দ্রভারতীতে পার্টটাইম লেকচারও দেন।

আয়নার সামনে নটুয়াকে বসিয়ে রং মাখাতে যখন বসেন শক্তিবাবু, তখন তাঁর অন্য রূপ অন্য চিন্তা। নটুয়ার মুখ ইণ্ডি মুখটা তাঁর ক্যানভাস। রং তুলির আঁচড়ে কখনও সেই ক্যানভাসকে করে তুলছেন আশী বছরের বুড়ো, বা যক্ষ্মাক্রান্ত যুবক। একটা ছবির আসল চেহারাটাই রূপ পায় তাঁর হাতে। 'নীল আকাশের নীচে' অযান্ত্রিক' বা 'দেবীর' মুখ্য চরিত্রগুলোর মেকআপ দেখলেই বুঝতে পারবেন আমার কথাটা কতখানি সত্যি! আর শক্তি সেন কতবড় শিল্পী!!

নিরঞ্জিৎ

ভাগ্যলক্ষ্মী চিত্রমন্দিরের
জয় সন্তোষী মা
শুক্রবারের ব্রতকথা

সংসার সীমন্তে ছবিতে সন্ধ্যা রায়

১৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা

'ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য'

Friday 15tn August, 1975 শুক্রবার, ২৯ শ্রাবণ, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	চোখে চোখে গল্প	(গল্প)	শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
১৪	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৫	বিদেশের কথা		শ্রীপুণ্ডরীক
১৬	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৭	ডবল এজেন্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিক্রমাদিত্য
২১	সুরের আগুন		শ্রীসন্ধ্যা সেন
২৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীঅভয়ংকর
২৮	চিঠিপত্র		
২৯	ভাসান	(গল্প)	শ্রীচন্দন ঘোষ
৩২	অধিকার	(কবিতা)	শ্রীমৃণাল বসুমল্লিক
৩২	বিষহরি	(কবিতা)	শ্রীহেনা হালদার
৩২	কেউ কি রেখেছে বিশ্বাসের ফুল	(কবিতা)	শ্রীহরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৩	প্রদর্শনী		শ্রীরূপদক্ষ
৩৪	পলেশচ		শ্রীক্ষপণক
৩৫	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩৯	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৩	অপনয়		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৪	স্বাধীনতা	(গল্প)	শ্রীশিশির দাস
৪৯	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৪	খেলাধুলা		শ্রীদর্শক
৫৫	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅময়
৫৬	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৫৮	নেপথ্যে		শ্রীনিরীক্ষিৎ
৬২	সিনেম্যাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৫	ফ্লোর থেকে বলছি		শ্রীমুসাফির
৬৭	নাট্যমঞ্চ		শ্রীনাট্য সমালোচক
৬৮	চিত্র সমালোচনা		শ্রীচিত্রদত্ত ও শ্রীচিত্রবিদ
৭০	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭১	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীপাঁচুগোপাল দে

ভারতের প্রত্নশিল্প সংরক্ষণ

প্রত্নশিল্প সংরক্ষণের জন্য সরকারী বিধি থাকলেও ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের ওপর শিল্পচোরদের আক্রমণ কমে নি। প্রাচীন শিল্পকর্মের অর্থমূল্য অসাধারণ। কোনোরকমে তা বিদেশে পাঠাতে পারলে লক্ষ টাকা দিয়ে তেমন শিল্পদ্রব্য কেনবার লোকের অভাব নেই। ভারতবর্ষের সর্বত্র পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়ানো। বহু শতাব্দীর সাক্ষী এই মন্দিরগুলো দেশ-বিদেশের শিল্পরসিক, পণ্ডিত, পুরাতাত্ত্বিক ও সাধারণ পর্যটকদের প্রতি বৎসর ডেকে নিয়ে আসে। রোদ বৃষ্টি ঝড়ে এমনিতেই অনেক মন্দিরের গায়ে সময়ের চিহ্ন ধরা পড়ে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললে দেখা যায় নানা কারণে এদের ওপর হানাদারদের আক্রমণও হয়েছে বহুবার। সেই কালাপাহাড়ী অভি-যানের পরও ভারতে পুরাতাত্ত্বিক শিল্পনিদর্শন যা আছে তা যে কোনো জাতির ঈর্ষণীয়। তাই আমরা দেখতে পাই সরকারী বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী শিল্পচোর ভারতের প্রত্নসমাগ্রী বিদেশে পাচার করছে।

সম্প্রতি বোম্বাই শহরে প্রত্নশিল্প দ্রব্য অপহরণ ও বিদেশে বেআইনীভাবে পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। 'কালিম্পং আর্ট হাউস' নামে বোম্বাই শহরে এই ব্যক্তির যে শিল্পসামগ্রীর দোকান আছে তাতে বাইরের লোককে ধোঁকা দেবার জন্য আধুনিক শিল্পসামগ্রী বিক্রী হলেও নেপথ্যে এদের কারবার ছিল ভারতের প্রাচীন মন্দিরের সুপ্রাচীন বিগ্রহ ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য চুরি করা এবং তা বিদেশী খদ্দেরদের কাছে ডলারের বিনিময়ে বিক্রী করা। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের মন্দির থেকে মূর্তি চুরি যাবার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ এই চোরাকারবারীর হদিশ পায়। এর চুরির ধরণটা অভিনব। প্রাচীন মূর্তির হুবহু নকল মূর্তি তৈরি করে সেটি মন্দিরে বসিয়ে আসল মূর্তি হস্তগত করা হত। এই কাজটি অবশ্য করা হয় মন্দিরের লোকেদের সঙ্গে যোগসাজসেই, দেবতার সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মনে এ জন্য কোনো ধর্মভয় দেখা দেয় না। আসল বিগ্রহ পাড়ি জমায় সপ্ত সমুদ্রের ওপারে কোনো শিল্পসংগ্রাহকের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় অথবা কোনো শিল্পব্যবসায়ীর মারফৎ চলে যায় ওখানকার কোনো মিউজিয়মে। এটা যে চোরাই মাল তা জানবার উপায় কি মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের?

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাদের সংগ্রহশালা থেকে অপহৃত পালযুগের একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রায় দশ বছর পর ফিরে পেয়েছে বস্টন মিউজিয়ম থেকে। মিউ-জিয়ম কর্তৃপক্ষ অবশ্য বহু টাকা দিয়ে একজনের কাছ থেকে মূর্তিটি কিনেছিলেন। ওটা যে অপহৃত মূর্তি তা তাঁরা জানতেন না। বিশ্ববিখ্যাত নটরাজ মূর্তিও দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দির থেকে কয়েক বছর আগে চুরি যায়। সেটি লণ্ডনে ধরা পড়েছে। কিন্তু স্বদেশে এখনও আনা যায় নি মামলা চলছে বলে। প্রত্যেক দেশই তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের মন্দিরগুলো সংরক্ষণে অবহেলা ও অযত্নই তার শিল্পভাস্কর্য নষ্ট হবার অন্যতম কারণ। এই সুযোগে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেশের অনুপম শিল্পসামগ্রী অপরের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ বা কাস্টমসের সতর্ক চক্ষু এড়িয়ে এই শিল্পসংহার ও বিদেশে পাচার নির্বিবাদে চলছে। এ সম্পর্কে সরকারের তো বটেই জনসাধারণের সতর্ক ও সজাগ হওয়া প্রয়োজন।

জনসাধারণকে প্রত্নসামগ্রীর মূল্য সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার ওপর জোর দিতে হবে এই কারণে যে, তাহলে তারা এই কালাপাহাড়দের দেশের স্বার্থবিরোধী, ঐতিহ্যবিরোধী কাজ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষকেও সজাগ হতে হবে যাতে প্রাচীন মূর্তির চেহারা দেখলেই তাঁরা বুঝতে পারেন এর মূল্য। শিল্পচোরদের ধরবার জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশ বা ইন্টারপোলের সাহায্যও সরকার নিতে পারেন। এই শিল্পচোরদের একটি আন্তর্জাতিক চক্র আছে যারা সিস্টিন চ্যাপেলই হোক, আবু সিম্বেলের মন্দিরই হোক কিংবা অজন্তা গুহাই হোক সর্বত্র জাল পেতে রেখেছে কখন কোথা থেকে একটি অমূল্য শিল্পনিদর্শন সংগ্রহ করতে পারবে। বিদেশেই এদের বাজার, বিশেষ করে আমেরিকায়, যেখানে লক্ষ লক্ষ ডলার প্রাচীন শিল্পের জন্য ব্যয় করার লোকের অভাব নেই। দরিদ্র দেশে অর্থলোভী অসৎ লোক নিজের দেশকে বঞ্চিত করে এভাবে প্রত্নশিল্পনিদর্শন চালান দিচ্ছে বিদেশে। এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হচ্ছে, এটাই সান্ত্বনার কথা।

লোড শেডিং।

অন্ধকার ঘরে ভূতের মত বসে ইন্দ্রনাথ। দেখা যাচ্ছে কেবল জ্বলন্ত সিগারেটের একচক্ষু দীপ্তি।

"বাবু," দোরগোড়া থেকে ডাক দিল মেস-সেবক পাঁচকৌড়ি।

"কি রে?"

'একজন স্ত্রীলোকঅ আসি অছন্তি।'

"পাঠিয়ে দে।"

'ঘর তো অন্ধকার। স্ত্রীলোকঅ কিপরি অন্ধকার ঘরকু যিব?'

তাও তো বটে। কাজের লোকের হাতে কাজ না থাকলে যা হয় আর কি। হাত বাড়িয়ে মোমবাতি জ্বালতেও ইচ্ছে যায় নি এতক্ষণ।

পাঁচকৌড়ির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। অন্ধকারেই দেখা যাচ্ছে দেহরেখা। ইন্ড-টিজর-দের ভাষায় টম্যাটো-টাইট ফিগার। ৪৮-২৭-৪০।

ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে মোমবাতির আলো। উধাও হয়েছে পাঁচকৌড়ি। নরম আলো থিরথির করে কাঁপছে মেয়েটির দামাল বুক আর কোমল চেহারার ওপর।

উগ্র প্রসাধন। তেলতেলে মুখশ্রী। সুর্মাকালো মোহিনী চোখ। লিপস্টিক রাঙা রক্ত ঠোঁট। ফিনফিনে পাতলা ঘন কালো সাড়ি এমনভাবে ফেলা আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ওপর যে চিলতে চোলির কল্যাণে সাতাশ ইঞ্চি কোমরের ওপর নীচ পর্যন্ত সুস্পষ্ট—নাভির নীচে অজন্তা ঢঙে শাড়ি পরায় বাহার আরো খুলেছে।

অসঙ্কোচে এগিয়ে এল মেয়েটি। বসল চেয়ারে। কালো ভ্যানিটি ব্যাগ রাখল টেবিলে। সেই সঙ্গে দুই কনুই। ঈষৎ ঝুঁকে বসতেই বুকের মরূদ্যান স্পষ্ট হল ব্যাচেলরের চোখের মাত্র দেড় ফুট সামনে।

মোমবাতির জ্বলন্ত জোড়া-প্রতিবিম্ব জেগে উঠল কামিনীর দুই চোখে।

বলল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—'হাঁ করে দেখার কিছু নেই। আমি একজন কল গার্ল।'

কল গার্ল!

পাতালপুরীর ভাষায় যার নাম কাতলা মাছ। অভিজাত গণিকা।

ভাল করে চেয়ে দেখল ইন্দ্রনাথ। কাতলা ছেড়ে মাতলা করার মতই চেহারা বটে। মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত সমাজের আনাচে-কানাচে আজ গেরস্ত-গণিকা। বাণিজ্যিক চাহিদাও প্রচন্ড। রাঘববোয়াল ঘায়েল করতে হলেই ডাক পড়ছে কাতলা মাছদের।

কিন্তু এ-মেয়েটি ঠিক সে-ধাঁচের নয় এর কর্ণে, কণ্ঠে, মণিবন্ধে ব্রোঞ্জের অলঙ্কার—উন্নত রুচির পরিচয়। শ্যাম্পু করা ডগা-ছাটা চুল কাঁধের ওপর দিয়ে বুকে ছড়ানো। অনেকটা হিপি মেয়েদের মত মুখে যেন ভেসলিনের প্রলেপ। যৌবনের ওপর কামনার পালিশ।

চোয়াল ঈষৎ চওড়া। তাই চুল ছোট করে ছেঁটে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে কানের নীচ দিয়ে চোয়ালের ওপর। মানিয়েছে *সুন্দর। ডান কানের পাশে পাতাবাহারের একটা পাতা। রূপ আর লাস্য তাতে আরো* বেড়েছে।

গণিকা হলেও উঁচু মহলের গণিকা। এ-সাজসজ্জা পার্ক স্ট্রীট পাড়ার সাজসজ্জা। তার মানে, বিদেশী খদ্দেরই বেশী। এ-জাতের মেয়েদেরই বলা হয় এ-পি, অর্থাৎ অ্যারিস্টোক্র্যাটিক প্রসটিটিউট।

মৃদুকণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ—'রেগে বলছেন কেন? আমি কি কটাক্ষ করেছি?"

মেয়েটির সাদা চোখে রক্তরেখা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ঈষৎ চোখ কুঁচকে বললে সে—'আপনার চোখে এক জোড়া ছুরী দেখলাম তো। মাংস চিরে ভেতর দেখতে চাইছিলেন। তাই আগেই আত্মপরিচয় দিলাম। বাজে কথা থাকুক। আমার একটা গল্প আছে। শুনবেন?'

নরম চোখে চেয়ে বলল ইন্দ্রনাথ—'বলুন।'

উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল এ-পি। প্রায় অন্ধকার ঘরে ইন্দ্রনাথের মুখোমুখি বসে খসখসে গলায় শোনালো একান্ত গোপনীয় সেই কাহিনী। রোমাঞ্চকর! শ্বাসরোধী! উৎকণ্ঠাময়!

আমার নাম হিমানী। ডাক নাম হিমি। এককালে ভালো নাচতাম। ম্যাড্রাসী মাস্টারের কাছে ভারতনাট্যম শিখেছিলাম। নানা ফাংশনে প্রায় প্রোগ্রাম থাকত। আমার আলারিপ্পু, জাতিস্মরম্, ভর্ণম, পদম আর থিল্লানা নাচ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন আমি কি দরের নর্তকী।

সাহেবসুবো মহলে মেলামেশার শুরু তখন থেকেই। এইভাবেই আলাপ হল পংকজের সঙ্গে—ফ্রেঞ্চ কালচারাল সেন্টারের একটা ড্যান্স রিসাইটালে।

পংকজ একটা বিদেশী দূতাবাসে কালচারাল অফিসার ছিল। আমাকে দেখে খুব তাড়াতাড়ি পটে গেল। নর্তকীদের দেখলে জিভ লকলক করে সব ব্যাটাছেলেরই। কিন্তু পংকজের মধ্যে একটা রিজার্ভেশন লক্ষ্য করলাম। ফলে, আমি ঠকে গেলাম। আমি ভাবলাম, ভাল মাছ গেঁথেছি। কিন্তু ঘটল ঠিক তার উল্টো। ছিপ ফেলে আমাকেই টেনে তুলল পংকজ।

বিয়ের পর আঁচ করলাম পংকজের আসল কারবার। বকবৃত্তিই তার পেশা। আমি হলাম তার ফুসমন্তর।

বুঝলেন? পংকজের মত বকধার্মিক কলকাতা শহরে আর দুটি ছিল না। কোনোদিন আমাকে বাঁশডলা শাসন করেনি। কিন্তু সাপ খেলানোর মন্ত্র যেন তার রক্তে ছিল। তাই তার বাঁদুরে বুদ্ধির বাহন হয়েছি আমি। কলকাতার ইনটেলেকচুয়াল মহলে আমাকে দিয়ে সে খবর সংগ্রহ করতে লাগল নানারকমের।

এখন বুঝেছেন তো? সাদা কথায়, পংকজ ছিল স্পাই। খবরের কাগজ, বুদ্ধিজীবির আড্ডা, সাহিত্যিক মহল, সাহেবপাড়া, পলিটিক্যাল লীডার—সর্বত্র ছড়ানো ছিল তার জাল। হামেশা ককটেল পার্টি বসত বাড়ীতে। ফুসমন্তর ছিলাম আমি।

আমার কাজ ছিল পথ মসৃণ করে দেওয়া—পংকজ কাজ হাসিল করত তার পরে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কোনোদিন জানতে পারিনি কেন বউকে দিয়ে সে বন্ধকৃত্য করে। ভাবতাম সে স্যাডিস্ট। আসলে আমিই স্যাডিস্ট। পংকজের হিসেবে ভুল হয়নি' তাই চুটিয়ে কাজে লাগাল আমার যৌন-বিকারকে।

একদিন জানতে পারলাম তার কুকীর্তি। রক্ত হিম হয়ে গেল। কিন্তু আর সময় পেলাম না।

ঠিক কিভাবে তার টেলিফোনের শলা-পরামর্শ কানে এল, তাতে ডিটেলস বলার দরকার নেই। যা শুনলাম, তার সারাংশ এই :

ইণ্ডিয়ার পারমাণবিক পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
সতীকান্ত গুহ

কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র। ফরেন পাওয়াররা চায় না ইণ্ডিয়া আর মাথাচাড়া দিক। আর পরমাণু বোমা বানাক।

বৃটিশদের টিটকিরিই সব চাইতে বেশী। জেনিভায় বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধির লম্ফঝম্পের পরেই লণ্ডনের নির্ভীক পত্রিকা 'নিউ সায়ান্টিস্ট'-য়ে মেড়ে কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতকে।

রাজস্থানের অ্যাটমিক বস্তুটি নাকি ১৫,০০০ টি-এন-টি'র সমান। অর্থাৎ আকারে প্রায় নাগাসাকি বোমার মতই। প্লুটোনিয়াম ভস্মও অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঘোষিত উদ্দেশ্য যদিও খনিজ ও তেলের অনুসন্ধান, কিন্তু ভারতের মতলব অন্য। নিউক্লিয়র বিস্তৃতিরোধ চুক্তিতে সই করতে ভারত রাজী নয় সেই ১৯৬৮ সাল থেকে। সম্প্রতি ভারত নাকি রাশিয়ার কাছ থেকে সুখোই—২০ বোমারু-ফাইটার আর মিগ—২৩ চেয়েছে। সারা বিশ্বে তাই আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ইজরাইল, পাকিস্তান, জাপান, ইরান, মিশর, ব্রাজিল এবং আরও কয়েকটা দেশ সিরিয়াসলি ভাবছে অ্যাটম বোমা বানাবে কিনা।

সুতরাং আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ভারতের নিউক্লিয়র ড্রীম অংকুরেই বিনাশ করতে হবে। তাই ঠিক হয়েছে তারাপুর ইউনিট আর রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরের চুল্লী দুটিকেই উড়িয়ে দেওয়া হবে আগামী দেওয়ালীর দিন।

এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে দশজন ঘর শত্রু বিভীষণ। ভারতের পঞ্চান্ন কোটি লোক এক ডাকে চিনতে পারে তাদের। দশজনের ডালপালা ছড়ানো রয়েছে সমাজের দশটি শাখায়। *এদের একজন নয়াদিল্লীর ওপর মহলের একান্ত বিশ্বাসভাজন।* আর একজন সাক্ষাৎ কুবের—ইণ্ডিয়ার *অর্থনৈতিক খুঁটি। অন্যান্য আটজনের মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন পুরুষ।*

আমি কারো নাম শুনিনি। শুধু শুনলাম এদের প্রত্যেকের ইচ্ছে বর্তমান সরকারের গণেশ উল্টে যাক। এক-একজনের এক-একরকম স্বার্থ। অর্থ এবং মদৎ জোটাচ্ছে ফরেন পাওয়াররা।

একটা মাইক্রোফিল্মে পুরো পরিকল্পনা আর এই দশজনের নাম লেখা আছে। মাইক্রোফিল্মটা রয়েছে একটা সুদৃশ্য কাঁচের ছিপির মধ্যে। সেইদিনই ছিপিটা পাচার করবে পংকজ নগদ দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে।

পংকজ ছিপি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোতেই আমি পিছু নিলাম। ও গেল ট্যাকসিতে। আমি ফিয়াটে। বিশেষ একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল পংকজ। আর বেরোলো না। জায়গাটা কলকাতার উপকণ্ঠে।

সাতদিন অপেক্ষা করলাম। পংকজ ফিরল না। বহুবল্লভা হলেও আমি মেয়েমানুষ। ঘরের মানুষকে তাই পর ভাবতে পারি না। সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি যেতে হয় বলেই দাম্পত্য প্রণয় এত মধুর।

সাতদিন পর আর বসে থাকতে পারলাম না। পুলিশে খবর দেওয়ার সাহসও হল না। নিজেই গেলাম সেই তল্লাটে। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, বাড়ীটা লোকেশ নন্দীর। কলকাতায় আরো দুটি বাড়ী আছে। দুর্ধর্ষ লোক। বিয়াল্লিশের মুভমেণ্টে ট্রাম পুড়িয়েছিল, গভর্ণমেন্ট স্টোর লুঠ করেছিল, জেল খেটেছিল। তারপর থেকেই ফ্রি-ইণ্ডিয়ায় ইলেকশনের সময় কালো টাকার মহিমায় সে ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

এছাড়াও অনেক সন্দেহজনক ব্যবসা তার আছে। শোনা যায়, চালের ট্রেন চালিয়ে এক-একদিনে তিরিশ হাজার টাকা সে রোজগার করে। এগুলো বে-আইনী কারবার। আইনের চোখে সে অন্য একটা কারবারের মালিক। তার দরজায় বড় বোর্ডে লেখা আছে :

'পাবলিক রিলেসন্স কাউন্সেল অফ ইণ্ডিয়া'

হিন্দীতে লেখা আছে তার তলায় :

'ভারতীয় জন-সম্পর্ক পরামর্শদাতৃ সমিতি'

সমিতির কাজ হল কোটিপতি কারবারীদের স্বার্থ নিয়ে পার্লামেণ্টে ঘোল ঘেঁটে দেওয়া, এম-পি'দের হাত করা, এমন কি ক্যাবিনেট মিনিস্টার থেকে সেক্রেটারী পর্যন্ত সবাইকে পাখী পড়িয়ে লাইসেন্স বের করে নেওয়া, নয়তো কোটিপতির স্বার্থে লোকসভায় আলোচনা শুরু করে দেওয়া। এক-একটা ধর-পাকড় অর্থাৎ লবিইং ওয়ার্কের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত

অ্যাগ্রিম ভর্জ করে লোকেশ নন্দী। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নাকি ভারতে আর দুটি নেই। সংক্ষেপে দিল্লীকে কুক্ষিগত করে বসে আছে এককালের পলিটিক্যাল প্রিজনার দাঙ্গাবাজ লোকেশবাবু।

এত খবর একদিনে পাই নি। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ভদ্রলোকের স্বরূপ জানবার পর বুঝলাম কেন পংকজ তার কাছেই গিয়েছে। সরকার বিরোধী এতবড় চক্রান্তের লিপ্ত থাকার জন্যে পংকজের ওপর ঘৃণায় গা রি-রি করে উঠল। সেই সংগে ভয়-ও হল। পংকজ এখন কোথায়? আমাকে না জানিয়ে সে গা-ঢাকা দিল কেন?

যা থাকে কপালে, হানা দিলাম লোকেশের ডেরায়। লোকটার বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। কাঁচা-পাকা ছাগুলে দাড়ি। ফর্সা রং। কপাটের মত চওড়া বুক। ভীষণ পাওয়ার ফুল লেন্সের চশমা। ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে। অকৃতদার। বাড়ীতে মেয়েছেলের পাট নেই।

আমার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল লোকেশ। পংকজ? কই, সে তো আসে নি। ভুল খবর পেয়েছি আমি। কিন্তু আমি যে নিজের চোখে দেখেছি তাকে এ-বাড়ীতেই ঢুকতে। চোখ টিপে বলল লোকেশ—'দেখেছেন ঠিকই। সে-ও দেখেছে আপনাকে। তাই এ-বাড়ী ঢুকে ধোঁকা দিয়েছে আপনাকে। আপনি চলে যেতেই সে-ও চলে গেছে। দেখুন কোনো খাপছু মেয়ের ঘরে পড়ে আছে কিনা।'

বলে—, পাওয়ারফুল লেন্সের আড়ালে ফের চোখ টিপল লোকেশ। নোংরা ইঙ্গিত। টেনে চড় কষিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হল। কিন্ত পারলাম না। সেদিন চলে এলাম। বুঝলাম, পরমাণু বোমা তৈরীর প্ল্যান বানচাল না হওয়া পর্যন্ত পংকজ লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু কোথায়? লোকেশের ঘরে নয় তো?

পরের দিন তাই ছেনালীর ভূমিকা অভিনয় করলাম। লোকেশের শোবার ঘরে ঢুকতে বেশী সময় লাগল না। কিন্তু কোনো ঘরেই দেখলাম না পংকজকে।

গেলাম পরের দিন। জিদ চেপে গিয়েছিল আমার। লোকেশ অবশ্য আমাকে দেখলেই মিটিমিটি হাসত। মুখে কিছু বলত না। কিন্তু হিতোপদেশের সেই শ্লোকটা জানেন তো?

আকারের ইঙ্গিতের গত্যা চেষ্টয়া
ভাষণে ন চ।
নেত্র বক্ত্র বিকারৈশ্চ লক্ষ্যতে অন্তর্গতম্
মনঃ।

অর্থাৎ আকার ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, কথা, চোখ মুখচ্ছবি আর বিকার দিয়েই মনের ভাব আঁচ করতে হয়। শুধু ভাষায় কি সব বলা যায়?

লোকেশের মনের ভাবও বুঝলাম ঐ সাতটি লক্ষণ দেখে। ভাবলাম দেখাই যাক না টোপ ফেলে। শয্যাসঙ্গিনীর কাছে নিশ্চয় মন উজাড় করবে লোকেশ।

কিভাবে লোকেশ আমাকে নিংড়ে রস চুষে খেল, সে কাহিনী আর নাই বা শুনলেন। কিন্তু সব দিয়েও কিছু পেলাম না। লোকেশ শুধু অফার দিয়ে রাখল, তার কোম্পানীতে জয়েন করলে আমি নাকি লাখোপতি হয়ে যাবো। নারী মাংসের বাজার এখন গরম। রাতারাতি রাণী বনে যাব। দেশের মাথা-মাথা লোকরা কুকুরের মত ঘুরবে আমার পেছন পেছন।

কিন্তু আমি বাজারের বেশ্যা নই ইন্দ্রনাথবাবু। আমারও চরিত্র আছে। নিজের সর্বনাশ করতে পারি, দেশের নয়। তাই পণ করলাম, পংকজ না ফিরতে চায় না ফিরুক। কিন্তু তার ফন্দী আমি বানচাল করবই। ইন্ডিয়ার অ্যাটমি পাওয়ার তৈরী বন্ধ করার ক্ষমতা হাজারটা লোকেশ নন্দীরও নেই।

ইন্দ্রনাথবাবু, তাই আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। পুলিশের এলেম সবাই জানে। কিন্তু আপনার ভেতর দেশাত্মবোধ আছে। 'মোমের হাত' মামলার বৃত্তান্ত কে না জানে বলুন।

আমাকে ফেরাবেন না, দোহাই আমাকে ফেরাবেন না।

টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল হিমানীর তেলতেলে গাল বেয়ে।

বারবনিতারাও মানুষ হয়। তাদেরও চরিত্র থাকে!

ঠিক এই সময়ে অবসান ঘটল লোড-শেডিংয়ের। দপ করে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ বাতি।

নিঃশব্দে কাঁদছে হিমানী। জল মোছবারও চেষ্টা করছে না। জলের আস্তরণের ভেতর দিয়ে করুণ চোখে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথের পানে।

বলছে কান্নাভেজা গলায়—'আপনাকে টাকা অফার করব না। আমার দেহটাও অফার করব না। শুধু মিনতি করব। ইন্দ্রনাথবাবু, আমি যা পারি নি, আপনি তা পারবেন। খুব দেরী এখনো হয় নি।'

সম্মোহিতের মত এতক্ষণ বসেছিল ইন্দ্রনাথ। সিগারেট ধরাতেও ভুলে গিয়েছিল। মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল তথাকথিত গণিকার মুখের দিকে। নিজেকে গণিকা আখ্যা দিতে যার তিলমাত্র দ্বিধা নেই। দেহকে অশুচি করতেও যার গ্লানি নেই। কিন্তু বিবেককে পাশ কাটাতে সে রাজী নয় কোন মতেই।

অশুচি করবে না মনকে। তবুও সে বারবনিতা। সমাজের চোখে ঘৃণ্য নারী।

অশ্রুর ছুরে উঠেছিল হিমানীর আঙুল-গুলো। টপটপ করে জল পড়ছে টেবিলের ওপর।

চঞ্চল হাত দুটোকে দুই মুঠির মাঝে তুলে নিল ইন্দ্রনাথ।

বলল গাঢ় আর্দ্র কণ্ঠে—'বোন আমি তোমার সমস্যার ভার নিলাম। তুমি শান্ত হও।'

হিমানী চলে গিয়েছে।

সিগারেটে শানায় নি, চুরুট বের করেছে ইন্দ্রনাথ। ঘন ধোঁয়ায় একশ ওয়াটের বিদ্যুৎ বাতিটা একাদশীর চাঁদের মত টিমটিম করছে মাথার ওপর।

ধোঁয়া ইন্দ্রনাথের মাথার মধ্যেও। বড় শক্ত ঘাঁটিতে হাত দিতে চলেছে সে। বিপজ্জনক কেস। এ বড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত, প্রাণ জিনিসটার কোনো দাম নেই তাদের কাছে।

এই মুহূর্ত থেকে প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়েছে ইন্দ্রনাথেরও। হিমানী অনভিজ্ঞা। তাই সে জানে না, লোকেশ নন্দী কি ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল। কাঁচা ছেলে সে নয়। ঘাগু লোক। হিমানীর পেছনে চর মোতায়েন না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকবে না সে। এতদিন চুপচাপ আছে শুধু ঐ কারণেই। চরের মুখে খবর পেয়েছে, হিমানী এখনো পুলিশ পর্যন্ত দৌড়োয় নি। তাই সুতো ছেড়ে রেখেছে। বেগড়বাই দেখলেই সুতো কেটে দেবে—ধরণী থেকে মুছে যাবে হিমানীর অস্তিত্ব।

ইন্দ্রনাথও আর নিরাপদ নয়। এতক্ষণে নিশ্চয় খবর চলে গেছে লোকেশের কাছে। জল্লাদও বোধহয় বেরিয়ে পড়েছে। লোকেশকে সে চেনে। পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না। নির্দয়, নিষ্ঠুর, নির্মম তার প্রকৃতি। এ-শহরের বহু কুকাণ্ডের মূলে হোতা সে। মাকড়শার মত জাল ছড়িয়ে বসে আছে সারা দেশে। নিজে কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই কলকাতা শহরেই দিনদুপুরে বহু ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। লোকেশকে কেউ সন্দেহ করতে পারে নি। পারলেও, ধরতে পারে নি।

টক্কর শুরু হল সমাজের দুষ্ট ব্রণ সেই লোকেশের সঙ্গেই। ইন্দ্রনাথ একা। লোকেশের পেছনে অসংখ্য মাইনে করা গুপ্ত ঘাতক। পারবে কি ইন্দ্রনাথ?

দেখা যাক। জীবনের চেয়ে কর্তব্য বড়। ব্যাচেলর ইন্দ্রনাথও ধূপের মত পুড়ে মরতে চায়—সুবাস ছড়িয়ে দিতে চায় আপামর জনসাধারণের মধ্যে। একটা জীবনের বিনিময়ে বহু জীবনের যদি কল্যাণ হয় তো হোক।

শত্রুর চোখ এখন থেকে তার ওপর। সুতরাং হুঁশিয়ার হতে হবে সেইভাবেই।

উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। বড় কাঠের আলমারীটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পাল্লা খুলতেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো নকল চুল, চোখ, দাড়ি, জামা, লাঠি কুঁজ। ক্লাচ ইত্যাদি। রাশি রাশি রং আর ছদ্মবেশ ধারণের বিবিধ সরঞ্জাম।

এই হল বহুরূপীর চেম্বার—ইন্দ্রনাথের ভাষায়। এককালে গো অ্যাজ ইউ লাইক প্রতিযোগিতায় নাম কিনে ছিল। খেলার ছলে যা শিখেছিল, আজ তা জীবনের পাথেয়।

পরদিন সকালবেলা ইন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন বাঁশিওলা। পরণে সবুজ হাফ সার্ট, খাটো পাজামা। পিঠে ঝোলায় অনেকগুলো বাঁশের বাঁশি। যে বাঁশিটি বাজাবে বলে হাতে রেখেছে, সেটি প্রায় এক গজ লম্বা বিশাল বাঁশি। সাধারণ বাঁশি নয় মোটেই। দেড় ইঞ্চি মোটা বাঁশের শেষ প্রান্তে একটি ছোট্ট চেম্বারে লুকোনো আছে একটা ক্ষুদে ক্যামেরা। আট মিলিমিটার ফিল্ম।

মেসের জানলা খোলা, সার্সি ভেজানো। যেন ইন্দ্রনাথ ঘরেই আছে। পাঁচকোড়িকেও তাই শেখানো আছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থাও সে করবে।

মেস থেকে লুকিয়ে বেরোনোর একটা রাস্তা আছে। ইন্দ্রনাথের আবিষ্কার আর কেউ জানে না। এই রকম পরিস্থিতির জন্যে তৈরী সে বহু আগে থেকেই। এই পথেই দু' খানা বাড়ী বাদ দিয়ে তৃতীয় বাড়ীর পাশের গলি দিয়ে বেরিয়ে এল বাঁশিওলা। যা মোটা বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে চলল আশা ভোঁসলের গাওয়া সেই গানটা :

'ফুলে গন্ধ নেই এ তো ভাবতেও পারি না'

মেসের সামনে আসতেই চোখে পড়ল। ল্যাম্প পোস্টের তলায় ছেঁড়া কাপড় পেতে বসে একজন ভিক্ষুক। মাথাটা কাঁকরোলের মত। চোখ দুটো করমচার মত। শরীরে এক রত্তি মাংস নেই। হাড় পর্যন্ত গোনা যাচ্ছে।

কিন্তু ও চোখের দৃষ্টি বাঁশিওলা চেনে। ঝুলি হাতরালে যে এখুনি একটা গুলী-ভরা রিভলবার পাওয়া যাবে, তাও জানে।

লোকটার করমচা চক্ষু নিবদ্ধ ইন্দ্রনাথের ঘরের জানলার ওপর।

অথচ জানতেও পারল না স্বয়ং ইন্দ্রনাথ বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে গেল সামনে দিয়ে।

ফিরল সন্ধ্যায়। সারা দিনে কাজ কিছু হয় নি। একনাগাড়ে বাঁশি বাজিয়ে বুকে পিঠে ব্যথা হয়ে গেছে। লোকেশ নন্দীর বাড়ীর ধারে কাছে ঘুর ঘুর করেছে। বাড়ীর মধ্যেও ঢুকেছে। লোকেশের গৃহ ভৃত্য পরামাণিকের ছবিও তুলেছে বাঁশি-ক্যামেরায়—কিন্তু আলাপ জমাতে পারে নি। বাড়ীটার প্রবেশ পথ, সিঁড়ি, চাতাল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর ফটোও তুলেছে, কিন্তু লোকেশকে ক্যামেরার ফোকাসের মধ্যে আনতে পারে নি।

পুরো বাড়ীটা প্রচ্ছন্নভাবে সুরক্ষিত। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু সিঁড়ির তলায় নেপালী দারোয়ানের চেহারাচরণ দেখে ইন্দ্রনাথ বুঝেছে, হুকুম ছাড়াও গুলী চালাতে আপত্তি নেই তার। গ্যারেজের ওপরে মেজানিন ফ্লোরের বন্দোবস্ত দুর্জনের রকম সকমও ভাল নয়।

বাড়ীটা তিনতলা। একতলায় অফিস। দোতলায় পরামর্শ কক্ষ। অর্থাৎ মন্ত্রের আড্ডা। তিন তলায় লোকেশ নন্দী থাকে। একা। ঊর্ণনাভের মতই নিঃসঙ্গ। বিশাল জালের কেন্দ্রে সে দোসর রাখতে রাজী নয়। পরামাণিক তার একমাত্র সেবক। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ একা হাতে সারে।

প্রতি রোববার দুপুরবেলাটা দোতলায় থাকে লোকেশ নন্দী। সারা দুপুর বিয়ার খায়। তিন তলায় ওঠে রাতে।

পরের দিনই সেই রবিবার।

মেসের মধ্যে পা দিতেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এল পাঁচকোড়ি।

'বাবু, বাবু সর্বনাশ হই গলানি!'

গোঁড়ির মত চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল পাঁচকোড়ির। প্রমাদ গুণল ইন্দ্রনাথ। বাঁশিওলার বেশেই ওকে টেনে নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

'কি হয়েছে?'

হাউমাউ করে পাঁচকোড়ি যা নিবেদন করল, তার সারাংশ এই :

সন্ধ্যের সময়ে ইন্দ্রনাথের নির্দেশ মত ঘরে আলো জ্বালাতে এসেছিল পাঁচকোড়ি। সার্সির ঘষা কাঁচের ওপর তার ছায়া পড়েছিল আলো জ্বলতেই। সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে ভেঙে গিয়েছিল জানলার কাঁচ। জগন্নাথের দিব্বি গেলে বলতে পারে পাঁচকোড়ি, রাস্তা থেকে কেউ গুলী করেছিল ছায়া লক্ষ্য করে। এক রকম বন্দুক আছে নাকি 'সাইলেন্সার' লাগানো—আওয়াজ হয় না। সেই বন্দুকের গুলী। ভাগ্যিস ছায়ার লাইনে ছিল না পাঁচকোড়ি—তাই প্রাণে বেঁচে গেছে।

শুনে ক্রূর হাসল ইন্দ্রনাথ। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল অবতীর্ণ হ[illegible] আসরে! ভাল! লোকেশ নন্দী প্রা[illegible]ল মানুষ। সময় নষ্ট করতে রাজী নয়।

নির্ঘোষ মনস্থির করে ফেলল ইন্দ্রনাথ। গুপ্তঘাতকের পুলিশে [illegible] যাওয়ার আগেই টান মারবে মাকড়শার জালের মূল সুতোয়।

হানা দেবে রবিবারে। লোকেশের আপন আলয়ে। বুনোওলের ওষুধ যে বাঘা তেঁতুল, তা টের পাইয়ে দেবে কালকেই—রবিবারের দুপুরে।

ইন্দ্রনাথের এতখানি সাহস কল্পনাতেও আনতে পারবে না লোকেশ। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। মাইক্রোফিল্ম পাওয়া না গেলেও লোকেশকে পাওয়া যাবে তো!

বসল না ইন্দ্রনাথ। গোপন পথেই ফের নেমে এল রাস্তায়।

রাস্তার মুখেই বেঞ্চিতে বসেছিল রঙ-বাজরা। ইভ-টিজার্স। ফুটপাত দিয়ে নিতম্ব-নৃত্য দেখিয়ে চলেছে এক উঠতি-যৌবনা। লম্বা চুল। ঝোলা-গোঁফ একটি ছোকরা তাই দেখে লাফিয়ে উঠল বেঞ্চি ছেড়ে। দুহাত কোমরে রেখে রক-এন-রোল নৃত্যের তালে তালে গেয়ে উঠল গলা ছেড়ে :—

'কি দিবি কি নিবি.....'

তৎক্ষণাৎ উর্ধ্ববাহু হয়ে আরেকটি রঙবাজ। ল্যাট্রু-ড্যান্স নেচে নিয়ে ছাড়ল গানের গিটকিরি।

ঠিক এই সময়ে বাঁশিওলাবেশী ইন্দ্রনাথ এসে দাঁড়াল সামনে।

শুধু বলল—আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বৌণ্ডশুদ্ধ রঙবাজ। উঠে দাঁড়াল তক্ষুণি।

বলল—'কোমাথা এ জামাচ্ছেন দাদা?

সন্তান ভাষা—মানে—কোথায় যাচ্ছেন দাদা?

ইন্দ্রনাথ বলল—পূর্ণ কোথায়?"

পকেটে,. অর্থাৎ আস্তানায়।

কোন্ পকেটে? শুধোল ইন্দ্রনাথ।

'আসুন।'

প্ল্যান যত অল-প্রুফই হোক না কেন, ভুলচুক থাকেই। যদিও মিনিট মেপে ক্যামেরায় তোলা ছবি অনুসারে আসর সাজিয়েছিল ইন্দ্রনাথ, ভয় ছিল শেষ মুহূর্তে উটকো উৎপাতে চিৎপাত না হতে হয়। কোথায় কতক্ষণ কিভাবে দাঁড়াতে হবে, কাকে-কাকে টার্গেট করতে হবে, কি পোশাক পরতে হবে এবং কি ধরনের ক্রিচ (দু-মুখ ধারালো ছুরি), লমপো (পিস্তল) আর কোউটো (বোমা) সঙ্গে রাখতে হবে, সমস্ত পাখী পড়িয়ে রেখেছিল পূর্ণর দলবলকে। পই-পই করে বলে রেখেছিল, খুনখারাপী যেন মোটেই না হয়। সঙ্গে আছে লোহার ডান্ডা, ক্লোরোফর্ম আর নাইলন দড়ি। মারো। বন্দ করো। বেঁধে ফেলে রাখো। তার বেশী কিছু না।

তবুও ভয় ছিল কিন্তু এত সহজে কাজ হাসিল হবে কে জানত।

দুপুর ঠিক একটার সময়ে একটা ঝর-ঝরে উইলিজ জীপ এসে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার মোড়ে। আটজন তরুণ নেমেছিল হেলতে-দুলতে। পান চিবেতে চিবোতে আটজনেই ছড়িয়ে গিয়েছিল এদিকে-সেদিকে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একে-একে আটজনেই ফিরে আসছে বিশেষ সেই বাড়ীটার দিকে।

তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল ঠিক পাঁচ মিনিট।

বিদ্যুৎবেগে দুজন ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে। তিরিশ সেকেন্ড পরে একজন মুখ বাড়িয়ে ইসারা করতেই আরো চারজন দুলকি চালে অন্তর্হিত হল ভেতরে। দু-জন সিগারেট টানতে লাগল দোরগোড়ায়।

পাঁচ মিনিট পরে অনামনস্কভাবে ফুট-পাতের ওপর হাঁটতে দেখা গেল একটি মূর্তিকে। ফুলবাবুর মত সাজ। মুগার পাঞ্জাবী। চুনোট-করা ধুতি। টুক করে নন্দী-ভবনে প্রবেশ করল মূর্তিটি।

দেখল, ভেতর দিকে মু-হাত-পা বাঁধা নেপালী দারোয়ানকে। মেজ্ঞানন ক্লোরেও ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা দুজন ক্লোরোফর্মের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে বেহেস্তের। তিনতলার রান্না-ঘরে পরামাণিকের অবস্থাও তাই।

দাঁত বার করে হাসল পূর্ণর সাগরেদরা। অনেকদিন পরে মনের মত কাজ মিলেছে। রোমাঞ্চ ছাড়া কি দিন চলে?

প্রতি চাতালে দাঁড়িয়ে দুজন। মোট ছ'জন তিনটে তলায়।

দোতলার ঘরে এয়ারকণ্ডিশনড বারে কোনো শব্দ ঢোকেনি। লোকেশ নন্দী এখনও সুরার সাধনায় মত্ত।

শুরু হল তল্লাসী।

এ-ব্যাপারেও প্ল্যান আছে ইন্দ্রনাথের। মূল্যবান জিনিস লুকোনো থাকে দুভাবে। হয় খুব গোপন স্থানে, নয়তো সবার সামনে—চোখের ওপর।

ইন্দ্রনাথ খুঁজতে এসেছে একটা কাঁচের ছিপি। সুদৃশ্য ছিপি। কাঁচের ছিপি সারাধণত থাকে অ্যাসিড বা কেমিক্যালের বোতলে। কিন্তু সে-ছিপি সুদৃশ্য হয় না। সুদৃশ্য কাঁচের ছিপি দেখা যায় কিছু কিছু বাহারি মদের বোতলে।

মদের বোতলের অভাব নেই দোতলায়। সুতরাং......

কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে গোপন সিন্দুক বা আলমারীর অভ্যন্তর। তাই তিনতলায় উঠে গেল ইন্দ্রনাথ। আধঘণ্টার মধ্যে তছনছ করে ফেলল লোকেশের শোবার ঘর, বসবার ঘর, লাইব্রেরী ঘর। পাইখানার সিসটার্ন পর্যন্ত খুলে দেখল। কিন্তু কোথাও নেই কাঁচের ছিপি। সিন্দুকজাতীয় কিছুই নেই। তাও কি হতে পারে?

চোখ জ্বালা করছে ইন্দ্রনাথের। অভি-যানের আয়োজন করতে গিয়ে কাল সারা-রাত ভাল ঘুম হয়নি। তার ওপর আজকের এই উৎকণ্ঠা। গোপন সিন্দুক এখনো নিপাত্তা।

দেওয়ালে একটি মাত্র ছবি। গান্ধীজীর। ছবিটা টেনে নামাল ইন্দ্রনাথ। না, পেছনেও গুপ্ত চেম্বার নেই।

সময় হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। আর কেন? শুরু হোক এবার নাটকের শেষ দৃশ্য। যা থাকে কপালে!

দোতলার এয়ারকণ্ডিশনড মদ্যশালায় বসে লোকেশ নন্দী কিন্তু কিছুই টের পায়নি। লাল গালায় মোড়া বার-কাউণ্টারে সারি-সারি সাজান বিলিতি মদের বোতল। কাটগ্লাসের পাত্র। ডায়মণ্ড প্যাটার্ণ কাচের ছিপি লাগানো অনেকগুলো ঝিকিমিকি বোতলে।

নরম আলো, এয়ারকণ্ডিশনারের মৃদু ফুর-ফুর শব্দ। এবং মাঝে মাঝে গেলাস নামানোর ঠুন-ঠান আওয়াজ। ঘর তো নয়, যেন একটা স্বপ্নপুরী। মায়াময়। মোহময়।

পট্যাটো চিপ চিবুতে গিয়ে কড়মড় শব্দ হওয়ার জন্যেই বোধহয় দরজা খোলার শব্দটা শুনতে পায়নি লোকেশ নন্দী। চমক ভাঙল ভেলভেট-কোমল কণ্ঠে :

'আমি এসেছি।'

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত সোফা থেকে ছিটকে গেল লোকেশ নন্দী। গ্যাসপোস্ট ডিজাইনের ব্র্যাকেট-ল্যাম্পের প্রতিফলন দেখা গেল চোখের হাই-পাওয়ার চশমার লেন্সে। পাথর-কঠিন মুখ। ছাগুলে দাড়িতে নিঃসীম ঔদ্ধত্য।

খুব মিষ্টি করে হাসল লোকেশ নন্দী। বলল—'আই সী। কালা কুত্তা।'

'কালা নয়—সাদা। আমি সরকারের নুন খাই না। তাই খোক্কস আমার ডাকনাম। ছিপিটা কোথায়?'

কালো নলচের পানে তাকিয়ে রইল লোকেশ। জবাব দিল না।

জবাবের অপেক্ষা রাখল না ইন্দ্রনাথ। এগিয়ে গেল। কাচের ছিপিগুলো বোতল থেকে খুলে নিয়ে জড়ো করল টেবিলের ওপর। ডান হাতে রিভলবার উঁচিয়ে বাঁ হাতে একটা ছিপি তুলল চোখের সামনে। পেছনে মোমের পলস্তারা। নখ দিয়ে খুঁটতেই পুরো ছালটা উঠে গেল। মাঝে একটা ফুটো। মোম দিয়ে বন্ধ। কড়ে আঙুলের নখের খোঁচায় বন্ধ মুখ উন্মুক্ত হতেই ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ল খানিকটা সাদা গুঁড়ো।

একে-একে সবগুলো ছিপিই খুঁটে দেখল ইন্দ্রনাথ। সবার পেছনেই মোমের দাগ এবং ভেতরে শ্বেত রেণুর ডিপো।

মিটিমিটি হাসছিল লোকেশ। কুঁচ-কোনো চোখে প্রচণ্ড কৌতুক। ইন্দ্রনাথ যেন একটা সঙ বিশেষ। জবরজং কেরামতি দেখতে বড্ড ভাল লাগছে। ভ্রূক্ষেপ নেই পিস্তলের নলচের দিকে।

এখন বলল—'বহুৎ সুক্রিয়া। এখন বুঝেছেন তো কেন ছিপি-অন্ত প্রাণ আমার? কালো মালের ব্যবসা করি মশায় ...কোকেন...কোকেন, বেশ হৃদ্যকণ্ঠ লোকেশের' 'শুনুন ইন্দ্রনাথবাবু, রফায় আসুন। ধরাই যখন পড়েছি, আর গোপন করব না।'

চোখের পাতা পড়ল না ইন্দ্রনাথের। পুরো তিরিশ সেকেণ্ড। মনের অশান্ত ঘূর্ণি মূর্ত হল চোখের তারায়।

তারপর সব শান্ত হয়ে গেল। যেন ঝড় থেমে গেল, মেঘ কেটে গেল, রোদ উঠল।

বলল মখমল-মসৃণ কণ্ঠে—'কত?'

'শুধু আপাতত।'

মানে, দশ হাজার, এখুনি।

নিকষ কালো রিভলবারটা নেচে নেচে উঠল তালুর ওপর। একপাক ঘুরেও এল তর্জনীর ওপর ভর করে।

ঈষৎ ছোট হল একটি চক্ষু। বলল—'রাজী। একটি সর্তে।'

ফুর-ফুর করে চলছে এয়ারকণ্ডিশনার। আর কোন শব্দ নেই।

সোফায় দেহভার ন্যস্ত করল লোকেশ—'কী?'

'পঙ্কজবাবু কোথায়?'

আবার সেই হাসি। যেন বিশ্বের বিপুলতম রঙ্গবাক্য উচ্চারিত হয়েছে ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে।

'জেনে লাভ কী?'

সব চুপ। ইন্দ্রনাথের চোখে জ্বালা। অনেকক্ষণ পর—'বুঝেছি। লাশ কোথায়?'

অত খবর রাখলে আমার চলে কি?' নিঃসীম তাচ্ছিল্য লোকেশের কণ্ঠে। 'লোক রেখেছি কিসের জন্যে?'

'জানতাম', ইন্দ্রনাথ এবার নির্বিকার। 'আরো দশ দিতে হবে। মুখ বন্ধ রাখার জন্যে।'

পুরু লেন্সের আড়ালে পিটপিট করে উঠল লোকেশ নন্দীর শার্দুল-চক্ষু। কণ্ঠে ঝরল কিন্তু অমৃত—গরল নয়। বলল মিছরী-চটচটে হাসি হেসে—'যাক, লাইনে এলেন তাহলে। খুব সহজেই রাজী হয়ে গেলেন কিন্তু।'

অর্থাৎ, ইন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করেনি লোকেশ। ইন্দ্রনাথও কি করেছে?

ফুর-ফুর করে চলছে ঘর ঠাণ্ডা রাখার মেশিন।

ইন্দ্রনাথ নিথর। হীরক-চক্ষু আশ্চর্য প্রদীপ্ত। রক্তবহা নলিকাগুলো বুঝি ফেটে পড়তে চাইছে চোখে-মুখে-মস্তিষ্কে।

লোকেশ নন্দী কিন্তু হাসছে। দাঁতের সারি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছুঁচোলো কুকুর-দাঁত বড্ড বেশী ছুঁচলো মনে হচ্ছে—ড্রাকুলার দাঁতের মত। সমাজ-ভ্যাম্পায়ার লোকেশ নন্দী। ১৯৭২ সালে পুনর্জীবিত ড্রাকুলার ছবি এই সেদিন দেখে এসেছে ইন্দ্রনাথ। ক্রিস্টোফার লী-র রক্তঘন সেই চাহনি ভোলবার নয়। লোকেশ নন্দীর চোখ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। লেন্স তো নয়, আতস কাচ। চক্ষুপল্লব অর্ধমুদ্রিত। ড্রাকুলার মত লোকেশের চোখও কি রক্তাভ?

আচমকা খান খান হয়ে গেল নৈঃশব্দ।

গুলি চলছে, বোমা ফাটছে। কাঁপছে সারা বাড়ী।

লড়াই লেগেছে একতলায়।

বিদ্যুৎ চমকাতে যেটুকু সময় যায়, তার মধ্যেই শব্দ-রহস্য স্পষ্ট হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের মগজে।

হিমানী অবাধ্য হয়েছে। সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হতে বসেছে।

হিমানী যে পেছনে ঘাতক নিয়ে ঘুরছে। ইন্দ্রনাথ তা বলেনি। খামোকা ভয় পাইয়ে লাভ কী?

শুধু বলেছিল, রবিবার তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। ফোন করবে ইন্দ্রনাথ। ফোন না পেলে যেন মৃগাঙ্ক রায়ের বাড়ী যায়। মৃগাঙ্ক বাড়ী না থাকলেও কবিতা-বৌদি থাকবে। দুজনের কাউকেই ইন্দ্রনাথ জানায়নি তার আজকের বিপজ্জনক অ্যাড-ভেঞ্চারের বৃত্তান্ত। জানালেই আর বেরোনো যেত না।

হিমানী যেন তাদের সব কথা খুলে বলে। মৃগাঙ্কই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার অবনী চাটুয্যের সঙ্গে কনট্যাক্ট করে যা করবার করবে।

কিন্তু হিমানী নিশ্চয় তার কথা রাখেনি। নিশ্চয় সটান অবনী চাটুয্যের কাছে গেছে—তিনটে বাজবার আগেই।

তাই এই বিপত্তি। হিমানী কি এখনো জীবিত? পুলিশ-ঘাঁটিতে হিমানীকে ঢুকতে দিয়েছে কি গুপ্তঘাতক? কে জানে!

তবে হিমানীর অভিপ্রায় আঁচ করেই নিশ্চয় সে ছুটে এসেছে লোকেশ নন্দীর বাড়ীতে। হয়ত হিমানী-নিধনের সংবাদ নিয়েই এসেছিল। বাধা পেয়েছে দোর-গোড়ায়। ফলে, চলছে গুলি, বোমা।

নিমেষ মধ্যে চিন্তা শেষ। লোকেশ তার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে সোফা থেকে।

চীৎকার, হট্টগোল দোতলায় উঠে আসছে সাপের মত সূচাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লোকেশ। দু-হাত ঈষৎ উঁচিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

আচম্বিতে আর একটা নতুন শব্দ শোনা গেল রাস্তায়।

পুলিশের বাঁশি।

মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল ইন্দ্রনাথ।

মানুষ-ড্রাকুলা লোকেশ নন্দীর পক্ষে ঐটুকু সময়ই যথেষ্ট। চিতাবাঘে মত ছুটে এসেই লাফিয়ে পড়ল ইন্দ্র[illegible] ওপর।

শূন্যপথে ধাবিত [illegible] আচমকা শরীরের ওপর আছড়ে পড়ায় ছিটকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। রিভলবার ঠিকরে গেল দেওয়ালের দিকে।

গুলবাঘের মত ফের লাফ দিল লোকেশ নন্দী—এবার রিভলবারের দিকে।

ইন্দ্রনাথের ননীর শরীর নয়। নিমেষ-মধ্যে রবারের বলের মত সে-ও ছিটকে গেল রিভলবারের দিকে।

কিন্তু তার আগেই রিভলবার তুলে নিল লোকেশ।

এবং গুলি করল ইন্দ্রনাথকে। একবার... দুবার... তিনবার!

মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে গড়িয়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দুটি গুলি পাশ কাটাল ইন্দ্রনাথ। পারল না তৃতীয়টি। লাল হয়ে গেল বামবাহু। চতুর্থ গুলিতেই নিপাত হত ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

কিন্তু চতুর্থ গুলিটা উড়ে এল দোর-গোড়া থেকে—উড়িয়ে নিয়ে গেল লোকেশের হাতের রিভলবার।

দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অবনী চাটুয্যে। হাতে ধূম্রায়িত রিভলবার। চোখে ভর্ৎসনা। কণ্ঠে বিরক্তি।
ব্যাড, ভেরি ব্যাড! হঠকারিতার ফল হাতে-হাতে পেলেন এখুনি। ইচ্ছে করছে এক্ষুণি এক ডোজ 'স্যামো' গিলিয়ে দিই আপনাকে।

ডানহাতে বামবাহু চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। রক্ত গড়িয়ে পড়ল আঙুলের ফাঁক দিয়ে। বলল ক্লিষ্ট হেসে—'এখনো হোমিওপ্যাথি?'

'নিশ্চয়। মেয়েটা মরল তো আপনার বোকামির জন্যেই।'
চোখ কুঁচকে গেল ইন্দ্রনাথের—'হিমানী? মারা গেছে?'

'এক গুলিতেই এফোঁড়-ও-ফোঁড়। পেছন থেকে। গেট পেরোতেও পারে নি। ভ্যানিটি ব্যাগে একটা মুখবন্ধ খাম। ওপরে লেখা—হঠাৎ আমার কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দয়া করে এই খামটি পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছে দেবেন। খাম খুলেই তো মশায় চোখ চড়কগাছ। এসব কি শুনছি?'

ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে তখন ভাসছে একটি মুখ। কামনা-মদির বহুবল্লভার মুখ। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে দুই চোখ বেয়ে।

ইন্দ্রনাথ তাকে অভয় দিয়েছিল। বলেছিল—'বোন, তোমার সব সমস্যার ভার আমি নিলাম। তুমি শান্ত হও।'

সত্যিই শান্তি পেয়েছে অভাগিনী। বিধবা হওয়ার সংবাদ অন্তত শুনে যেতে হল না। নিঃশেষে দান করে গেল আপন প্রাণ দেশের স্বার্থে।

ভ্রষ্টা, না? সমাজে উপেক্ষিতা?

কিন্তু বৃথা যাবে কি তার প্রাণদান? নিষ্ফল হবে আত্মাহুতি? নরশোণিতের ধারা বইতে শুরু করেছে যা নিয়ে, যার অন্বেষণে একটি কলঙ্কিত মেয়ে নিষ্কলুষ রুধির স্বেচ্ছায় ঢেলে দিয়েছে ফুটপাতের পাথরে, এখনো কি তা নিপাত্তা থাকবে?

একটি সূত্র অবশ্য রয়েছে এখনো... অতি ক্ষীণ সূত্র। কাছ থেকে ছবি তুলে ব্লো-আপ করলে হয়ত ধরা যেত। কিন্তু নজর এড়ায় নি আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে। ইন্দ্রনাথের মুখের অতি সন্নিকটে মুখ এসে পৌঁছেছিল লোকেশের—সেই সঙ্গে হিংস্র চাহনি—চকিতের জন্যে হলেও অদ্ভুত বৈসাদৃশ্যটা মনে গেঁথে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথের।

অত্যন্ত অপলকা সূত্র। অতি ক্ষীণ সন্দেহ। কিন্তু তার শেষ ভরসা।

শুষ্ক চোখে লোকেশের পানে তাকাল ইন্দ্রনাথ। সোফার হাতলে বসে তখনো হাঁপাচ্ছে শয়তান শিরোমণি। পায়ে পায়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। চোয়ালের হাড় কঠিন, কঠিন চোখের তারকা। সুচোগ্র চোখে চেয়ে রইল লোকেশের চোখের দিকে।
চড়টা নেমে এল পরক্ষণেই। ডান হাতের প্রচণ্ড চপেটাঘাত। এক চড়েই চশমা ঠিকরে গেল চোখ থেকে।

বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ধরাগলায় লোকেশ শুধু বলল—'চশমাটা দিন!'

ইন্দ্রনাথবাবু বলল—'অবনীবাবু টর্চ আছে? দিন।' বলে রক্তাপ্লুত বাঁ হাতে লোকেশের দাড়ি খামচে মুখটা টেনে তুলল নিজের দিকে—ডান হাতে টর্চের আলো ফোকাস করল পর্যায়ক্রমে বাঁ চোখে আর ডান চোখে।

বাঁ চোখে মদ্যপানের রক্তচ্ছাস। উত্তেজনায় ঈষৎ বিস্ফারিত চক্ষুতারকা। রক্তাভ এবং প্রাণময়।

ডান চোখ কিন্তু শান্ত, উত্তেজনারহিত, রক্তোচ্ছাসহীন এবং নিষ্প্রাণ।

ক্রূর হাসল ইন্দ্রনাথ—'অবনীবাবু কি দেখছেন?'

'চোখ।'

'দৃষ্টিশক্তি যার লোপ পায়, হোমিওপ্যাথি তাকে কি ওষুধ দেয়?'
'অ্যাকোনাইট ত।'

আপনি খান। অন্ধ নাকি? দেখতে পাচ্ছেন না?'

বলে, ইন্দ্রনাথ টর্চ ছুঁড়ে ফেলল সোফার ওপর; ডান হাতের তর্জনী সটান ঢুকিয়ে দিল লোকেশের ডান চোখের অক্ষিপুটের ফাঁক দিয়ে চক্ষু কোটরের মধ্যে।

তারপর ওপর হড়কে নেমে এল একটা কাঁচের চোখ—কৃত্রিম অক্ষিগোলক।

মেঝেতে ফেলে গোড়ালির চাপ দিতেই গুঁড়িয়ে গেল স্ফটিক-চক্ষু। এক ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি সাইজের একটা ছোট্ট 'রোল' কুড়িয়ে নিল মেঝে থেকে।

মাইক্রোফিল্ম!

পরের দিন সব কটা খবরের কাগজে বেরোলো এই খবরটা :

শহরের উপকণ্ঠে টেকসাসের দৃশ্য! দুই দলে গুলি বিনিময়! প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র আহত! অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অবনী চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সাহসিকতায় কোকেনের ঘাঁটি আবিষ্কার!

মাইক্রোফিল্ম সম্পর্কিত খবরটি? নাঃ, সে সম্বন্ধে কিছু জানানো হয়নি পুলিশ রিপোর্টে।

তেলের সন্ধানে

পশ্চিম বাংলায় মাটির নিচে তেলের সন্ধানের চেষ্টা হয়েছিল বছর সাতেক আগে, ক্যানিংয়ের কাছে বোদরায়। সে চেষ্টা যে সফল হয়নি তার একটা কারণ, খুব গভীর পর্যন্ত খোঁড়ার উপযুক্ত সরঞ্জাম পাওয়া যায় নি। ইতিমধ্যে তেলের সন্ধানের গুরুত্ব বেড়ে গেছে দুনিয়া জুড়েই। তাই দেশের অন্যান্য জায়গার মতো এই রাজ্যেও মাটির নিচে এবং সমুদ্র উপকূলে তেলের সন্ধান নতুন করে সুরু হচ্ছে। কলকাতা থেকে মাইল পঞ্চাশ দক্ষিণে ২৪ পরগণার অখ্যাত বকুলতলার নাম এখন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। নতুন করে তেলের সন্ধানের কাজ শুরু হচ্ছে সেখানেই। জুলাইয়ের ২৩ তারিখে ভূমি পূজার মধ্যে দিয়ে সেই প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজও সুরু হয়েছে ৩১ জুলাই। এখানে ড্রিলিং রিগ এবং অন্যান্য সব সরঞ্জাম বসানো হয়েছে। এই রিগটিই ব্যবহৃত হয়েছিল বোদরায়। তারপর এত দিন নানা যন্ত্রাংশ খুলে রেখে দেওয়া হয়েছিল। মাত্র মাস চারেকের মধ্যে আমাদের প্রয়োগবিদেরা এটিকে আবার খাড়া করেছেন। তেল অনুসন্ধানের ব্যাপার খোঁজখবর করার জন্যে যে সব রুশ বিশেষজ্ঞ কলকাতায় এসেছিলেন তাঁরা প্রয়োগবিদদের এই কৃতিত্বে খুব খুশি। বকুলতলায় পনের একর জমি জুড়ে এই প্রকল্পের কাজ সুরু হয়েছে। উদ্যোগপর্বের সুরু সেই জানুয়ারীতে। ইতিমধ্যে যন্ত্রপাতি বসানো ছাড়াও তৈরি করতে হয়েছে কর্মীদের জন্যে সাময়িক বাসগৃহ। বিদ্যুৎ আর জলের ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। বকুলতলায় সাড়ে তিন কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত খোঁড়া হবে। এই এলাকায় যে তেল পাওয়া যেতে পারে এমন আশাপ্রদ ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গেছে। আর মাস কয়েকের মধ্যে বর্ধমানের গলসি সহ রাজ্যের আরো কয়েক জায়গায় তেলের সন্ধান সুরু হবে। এদিকে পশ্চিমবাংলার উপকূলে তেলের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল বলেও প্রাথমিক সমীক্ষায় জানা গেছে।

যুক্ত কর্মসূচী

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে প্রধানমন্ত্রী যে নতুন ২১-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস এবং সি পি আই একযোগে কাজ করবে বলে ঠিক করেছে। এই ধরনের যুক্ত কর্মসূচী নেওয়ার প্রস্তাব আসে সি পি আইয়ের তরফ থেকে। ঐ দলের সম্পাদক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে একটি চিঠি দেন। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় প্রস্তাবটি বিবেচনার পর ঠিক হয়, দুই দল একযোগে কাজ করবে। এ ব্যাপারে দুই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বৈঠকে গৃহীত হয়েছে পাঁচ-দফা কর্মসূচী। রাজনৈতিক দিক থেকে সেই কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ হলো রাজ্যের সর্বত্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চ্যালেঞ্জের পটভূমিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার কারণ ব্যাখ্যা করা। তাছাড়া অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভূমি সংস্কারের কাজ তদারকির জন্য দুই দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতি অঞ্চলে তৈরি হবে একটি করে কমিটি। জমি বন্টন, জরিপের কাজ চলার সময় উদ্বৃত্ত জমি খুঁজে বার করা, গৃহহীনদের বাস্তু জমি দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ঐ কমিটি সাহায্য করবে। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও এই সহযোগিতা প্রসারিত হবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সব বাধা দূর করা এবং ছাঁটাই লে অফ, লক আউট, ক্লোজার, অন্তর্ঘাতের চেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। জিনিসপত্রের দাম যাতে না বাড়ে তার জন্য এবং ব্যাপক সরকারি বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যেও দুই দলের প্রতিনিধিরা আলোচনা চালাবেন।

ট্রাম-বাসের ভাড়া

আগস্ট থেকে কলকাতায় ট্রামের ভাড়া বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পশ্চিম বাংলা সরকার। প্রথম এবং দ্বিতীয়, দুই শ্রেণীতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভাড়া বেড়ে যাবে বেশ কয়েক পয়সা করে। পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন, কলকাতা ট্রাম কোম্পানি বছরের পর বছর লোকসান দিয়ে আসছে। গত তিন বছর ধরে লোকসানের অংক তিন কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নানা খাতে ট্রাম কোম্পানির খরচ বেড়ে গেছে। দশ হাজার কর্মচারীর মাইনে বাবদই খরচ বেড়েছে বছরে সোয়া দু কোটি টাকার বেশি। এত দিন রাজ্য সরকার টাকা দিয়ে কোনো রকমে ঠেকা দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু এই বোঝা দীর্ঘ দিন বহন করা সম্ভব নয়। ট্রাম কোম্পানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করার পর আট বছরে রাজ্য সরকারকে এইভাবে এগার কোটি টাকা দিতে হয়েছে। তা ছাড়াও সরকার এবং সি এম ডি এ-র মতো নানা সংস্থা আরো দশ কোটি টাকা দিয়েছেন। টাকার অভাবে নতুন ট্রাম কেনা যাচ্ছে না, পুরনো ট্রাম মেরামত করা যাচ্ছে না। তবে যে-হারে ট্রামের ভাড়া বাড়ছে তাতেও ট্রাম কোম্পানির ঘাটতি পুরোপুরি মিটবে না। আগস্ট থেকে কলকাতায় বাসের ভাড়াও বাড়ছে। বাসে সর্বনিম্ন ভাড়া হবে বিশ পয়সা। ওপরের স্তরে অবশ্য ভাড়া বাড়ছে না।

কর আদায় বেড়েছে

গত বছর তিনেক ধরে এই রাজ্যে বিক্রয় কর বাবদ সরকারের আয় বেশ বেড়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে এই খাতে আয় যেখানে ছিল ৭৪ কোটি টাকার মতো সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে আয় হয়েছে ১১৯ কোটি টাকা। এই আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে বিক্রয় কর বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তদন্ত ব্যুরো একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিক্রয় কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা এক ধরনের ব্যবসায়ী বরাবরই করে থাকে। সন্দেহভাজন ব্যবসায়ীদের কার্যালয় অথবা বাড়িতে হানা দিয়ে তদন্ত ব্যুরো অনেক কাগজপত্র আটক করে। ১৯৭২ সাল থেকে এই বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় আট শ' জায়গা থেকে কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এই সব হানার সময় অনেক 'দু নম্বর' হিসেবের খাতা ধরা পড়ে। কর ফাঁকির বহু ঘটনা ধরা পড়ে। অনেক ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায়ও নিজেদের কর ফাঁকি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। এইভাবে স্বেচ্ছা ঘোষণার ফলে বাড়তি বিক্রয় কর আদায় হয়েছে ৫২ কোটি টাকা। তদন্ত ব্যুরোয় রয়েছেন রাজ্য সরকারের কমার্শিয়াল ট্যাকস অফিসার এবং পুলিশের লোকজন। এই অভিযান এখন আরো জোরদার করা হচ্ছে।

দেবদত্ত

নাইজিরিয়া ঃ পটপরিবর্তন

নাইজেরিয়া হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে জনবহুল ও সবচেয়ে ধনী দেশ। এই প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশের প্রধানতম প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে পেট্রোল। পেট্রোল বিক্রি করে সে প্রতিদিন আনুমানিক ২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার উপার্জন করে। বৃটেন যে তেল ব্যবহার করে তার দশ শতাংশের জন্য সে নাইজেরিয়ার উপর নির্ভরশীল। তেল বিক্রি থেকে নাইজিরিয়ার আয়ের যে টাকা এখন বৃটেনে লগ্নী করা রয়েছে তার পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং। তেল ছাড়া তার অন্য যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলি হল কফি, কোকো, টিন ইত্যাদি।

১৯৬০ সালে নাইজিরিয়া বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু সেদেশে অশান্তি লেগেই আছে। তার প্রধান কারণ হল, এই দেশে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেশের এক একটি অঞ্চলে এক একটি উপজাতির প্রাধান্য। এই উপজাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে মিল নেই। তারা সর্বদাই একে অপরকে দাবিয়ে রাখার অথবা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।

নাইজিরিয়ার প্রধান যে দুটি উপজাতির রেষারেষি সে দেশে বারবার প্রতিষ্ঠিত সরকারের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে সে দুটি উপজাতির একটি হল হাউসা আর একটির নাম ইবো। হাউসারা থাকে দেশের উত্তরাঞ্চলে। ইবোদের বাস দেশের পূর্বাঞ্চলে। হাউসারা মুসলমান। ইবোরা খৃষ্টান। হাউসারা সংখ্যায় ভারি, ওদিকে আবার ইবো-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিই প্রাকৃতিক সম্পদে বেশি সমৃদ্ধ।

এই হাউসা আর ইবোদের বিবাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে নাইজিরিয়াকে। সেদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্যার আবু বকর তাফাওয়া বালেওয়া খুন হয়েছেন, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে উৎখাত হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট নামদি আজিকোয়ে, ঐ বছরেই জুলাই মাসে আর একটি সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল আগুইয়ি আয়রনসির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল ইবাদান শহর থেকে দূরে একটি গ্রামে।

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসের ঐ সামরিক অভ্যুত্থানের নবম বর্ষপূর্তি দিবসে আবার উৎখাত হয়ে গেলেন আয়রনসিকে সরিয়ে যিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই জেনারেল ইয়াকুবু গোওয়ন।

হাউসা-ইবো বিরোধে জেনারেল গোওয়নের স্থানটা ছিল একটু গোলমেলে ধরনের। তিনি দেশের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী হলেও তিনি সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর মতো হাউসা উপজাতির মানুষ ছিলেন না। তিনি বিরোম নামে একটি অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু উপজাতির মানুষ। ধর্মেও তিনি মুসলমান নন, খৃশ্চান—যদিও দুই পুরুষের ধর্মান্তরিত খৃশ্চান। জেনারেল ইয়াকুবুর বাবাই আসলে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মেথডিস্ট ধর্মযাজকের কাজ করেন।

১৯৬৬ সালে মেজর জেনারেল গোওয়ন যখন ক্ষমতায় আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩১ বছর। যদিও ইবো-জাতীয় আয়রনসিকে সরিয়ে তাঁকে ক্ষমতায় বসাবার পিছনে সক্রিয় ছিলেন হাউসা নেতারা তাহলেও গোওয়ন তাঁর নয় বছরের শাসনকালে বিভেদপন্থীদের প্রশ্রয় না দিয়ে নাইজিরিয়ার জাতীয় সংহতি দৃঢ় করে তোলার চেষ্টা করেছেন। ১২টি অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত নাইজিরিয়ায় কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। ইবোরা বায়াফ্রা নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করছিল সেটা যেমন জেনারেল গোওয়ন কঠোরহস্তে দমন করেছেন তেমনি হাউসাদের পৃথক হয়ে যাওয়ার চেষ্টায়ও বাধা দিয়েছেন। বৃটিশ শিক্ষাপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার জেনারেল গোওয়ন সাদাসিধেভাবে চলাফেরা করেছেন। তিনি সিগারেট বা মদ, কিছুই খান নি। নাইজিরিয়ায় অন্যান্য ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা যখন বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেশের মানুষের সমালোচনা কুড়িয়েছেন তখনও জেনারেল গোওয়ন সম্পর্কে এ ধরনের কোন কথা ওঠে নি।

ইদানীং নানা ব্যাপারে জেনারেল গোওয়নের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন রাজ্য গঠনের দাবী আসছিল। ১৯৭৩ সালের জনগণনার রিপোর্টে কারচুপি করে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি সম্প্রদায়ের সংখ্যা ভারি করে দেখান হয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছিল। আগামী বছর দেশে সামরিক বাহিনীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে এর আগে জেনারেল গোওয়ন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গত অক্টোবর মাসে এক বক্তৃতা দিয়ে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নেন। তাতে দেশে ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। ধর্মঘট চলতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গোওয়নের পায়ের তলা থেকে যে মাটি সরে যাচ্ছিল সেটা টের পাওয়া গেল দেশে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সামরিক বাহিনী আর একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেওয়ায়।

আফ্রিকান ঐক্য-সংস্থার অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য জেনারেল গোওয়ন গিয়েছিলেন উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায়। সেখান থেকে তাঁর নিজের দেশের রাজধানী লাগোসে ফেরার আর সুযোগ হল না তাঁর। তার আগেই খবর এল, সামরিক বাহিনী বিনা-রক্তপাতে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। এর আগে ঘানার প্রেসিডেন্ট এনক্রুমা ও উগান্ডার প্রেসিডেন্ট মিল্টন ওবোটে বিদেশে সফর করতে গিয়ে নিজের নিজের গদি হারিয়েছেন। আফ্রিকার এই নজীরগুলির সংগে আরও একটি যুক্ত হল।

প্রথমে মনে হয়েছিল, এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করেছেন প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান ৩৩ বছর বয়স্ক কর্নেল জোসেফ গরবা। তিনিই লাগোস বেতারে এই অভ্যুত্থানের কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং কাম্পালায় গোওয়ন স্বীকার করেছেন যে দেশ ছাড়ার আগেই তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল যে কর্নেল গরবা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, এই অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন ৩৮ বছর বয়স্ক বিগ্রেডিয়ার মুরতালা রফাই মহম্মদ। জেনারেল গোওয়নের মতো বিগ্রেডিয়ার মুরতালাও উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু তিনি একজন হাউসা। শুধু তাই নয়, তিনি এক সময়ে উত্তরাঞ্চলকে নাইজিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন। জেনারেল গোওয়ান তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঐ আন্দোলন ছেড়ে দিতে রাজি করিয়েছিলেন। কর্নেল মুরতালা পরে জেনারেল গোওয়নের সরকারেও যোগ দিয়েছিলেন এবং জেনারেলের একজন ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা হয়েছিলেন।

কর্নেল মুরতালা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সেদেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে তাঁর নীতি ঘোষণা করেছেন। একটি হল এই যে সেদেশের রাজ্যগুলি পুনর্গঠনের প্রস্তাব, বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হবে। দ্বিতীয় ঘোষণাটি হল এই যে ১৯৭৩ সালের জনগণনার রিপোর্ট বাতিল করা হবে।

পুণ্ডরীক

৩১-৭-৭৫

(২৭)

নন্টু আমাকে এসে বলল, 'জান, কালকে না আমার মা মামার সঙ্গে দেখা হয়েছে... দিদিমা কতবার বলেছে পুরীতে যেতে... বাবা-মা নিয়ে যায় না কেন, বল তো? মা বলে, অনেক দূর, অনেক খরচ লাগে... কিন্তু জান, আমার লক্ষ্মীর ভাঁড়ে অ-নেক পয়সা জমেছে! বাচ্চুরা তো মামার বাড়ি যায়, ক-ত মজা করে প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে...আমি যাই না কেন, বল বল...'

কালকে ছিল নন্টুর সেজো মাসীর ছোট মেয়ের মুখে ভাত। সেখানেই নবমবর্ষীয় নন্টু তার মামাকে আবিষ্কার করল। প্রথমে সে জানত, মামার বাড়িতে তার কেউ নেই। তারপর ক্রমে ক্রমে তার দিদিমা আর পাঁচটি মাসী লুকিয়ে লুকিয়ে তার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। না, দাদুকে নন্টু এখনও চেনে না বড় মেসোকেও না। বড় মেসো দাদুর মতোই গোঁড়া। বড় মাসীর বিয়েতে দাদু তো জানিয়েছিলেন, তাঁর পাঁচটি মেয়ে আর একটি ছোট ছেলে আছে—কল্পনার অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে। সেই কল্পনাই নন্টুর মা। নন্টুর মা আপন পিতামাতার নিষেধ অমান্য করে পাড়ার ছেলে শ্যামলকে বিয়ে করেছে। কল্পনার বাবামার মতে শ্যামলেরা 'দো-আঁশলা'।

কল্পনারা ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ নয়, রাজবংশীয়। ছোট থেকেই বাপের মুখে মেয়েটি শুনে এসেছে ঃ 'রাজরক্ত তোমাদের গায়ে আছে!' কল্পনা অবশ্য কেয়ার করে না রাজবংশ, কেয়ার করে না রাজরক্ত।

কল্পনাদের জমিদারি ছিল পূর্ববঙ্গে। দেশ থেকে ওরা কিছু নিয়ে আসে নি, শুধু হলদে-হয়ে যাওয়া ছবির অ্যালবাম আর এক কস্তা হাতির দাঁত ছাড়া। ছবিগুলো আমি দেখেছি ঃ অট্টালিকা ছিল বিরাট, ক্ষেত্রায়তন ছিল অত্যধিক, চাকর-বাকর ছিল বায়ান্নো।

বংশের প্রতিপত্তির উদ্ভব এইরূপ ঃ একদা শাহানশাহ আকবর পূর্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করতে এসে পথভ্রষ্ট হয়ে তাঁর বজরা ও লস্কর শুদ্ধ এক জলাভূমির নলখাগড়ার বনে আটকে যান। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাদশাহকে উদ্ধার করে তা কুটিরে নিয়ে এসে আপ্যায়ন করেন। কৃতজ্ঞ আকবর দরিদ্র ব্রাহ্মণটিকে এক তাবিজ উপহার দেন। তাবিজের সঙ্গে সেই অঞ্চলের গ্রামের মালিকানাও। দয়াবান এই ব্রাহ্মণটি কল্পনাদের পূর্বপুরুষ। আকবরের সেই অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকারের সময় থেকেই চার শো বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন পুরুষ-পরম্পরায় কল্পনাদের শিরায় ও ধমনীতে রাজরক্ত বয়ে এসেছে। বয়ে যাচ্ছে। বয় না শুধু নন্দকিশোর রাজার এক দৌহিত্রীর গাত্রে।

এদেশে এসে অবশ্য নন্দকিশোর রাজা কপর্দকশূন্যপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। এখানে —পশ্চিমবঙ্গে ইতস্তত এবং পুরীতে—তাঁর যা জমি আছে, সবই দেবোত্তর। দামী কাঠের আসবাবপত্র, মর্মর পাথরের মূর্তি ও ফুলদানি বিক্রি করতে করতে নন্দকিশোর রাজা তখন তাঁর কলকাতার সংসার চালাতেন। চালাতেন না, অমলাদেবীকে চালাতে দেন।

বাড়িতে যেদিন সামগ্রী বলতে থাকল শুধু রান্নার হাঁড়ি আর শোবার ঘরের খাট, নন্দকিশোর প্রস্তাব করলেন, এবার গয়নাগুলো বিক্রি হোক! অমলাদেবী কিন্তু রুখে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আমার ছ-ছটি মেয়ে আছে ঃ গয়নাগুলিতে হাত না দিলেও চলবে: আমি একটা উপায় বের করব।'

অমলাদেবীর ঐ ছ-ছটি মেয়ে পড়ত পী মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ে। স্কুলের বিদেশিনী অধ্যক্ষা ওদের খুবই স্নেহ করতেন, সকৌশলে আর্থিক সাহায্যও করতে ছাড়েন নি। নন্দকিশোর রাজাকে তিনি স্কুলেই চাকরি দিতে চেয়েছিলেন ঃ ভদ্রলোকের রাজকীয় অভিমানে বাধল। রাজমহিষী তাই স্কুলের মেয়েদের জন্য টিফিন প্রস্তুত করে বিক্রি করে কিছু উপার্জন করতে শুরু করলেন।

একদিন সপ্তম শ্রেণীর দিদিমণি কল্পনাকে তার বন্ধু চন্দনার সঙ্গে কাছের দোকানে পাঠিয়ে দেন একটা তুলি কিনতে। ফেরপথে আসার সময়ে এক যুবককে দেখিয়ে চন্দনা বলে 'ছেলেটিকে আমি চিনি ঃ ওদের রান্নাঘরে ঠিক তোমাদের বাড়ির মতো বড় বড় হাঁড়ি আছে।' ছেলেটির নাম শ্যামল; গানের স্কুলে তার বোনদের নিয়ে যাচ্ছিল। শ্যামলদের পরিবার একান্নবর্তী পরিবার।

সেদিন থেকে কল্পনার একমাত্র চিন্তা ঃ কেমন করে শ্যামলের সঙ্গে আলাপ করে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাঁড়িগুলো দেখা যায়!

হাঁড়ি দেখা হল না, তবে আলাপ হল বটে। ছেলেটি পাড়ার মাতব্বর; কোনো অনুষ্ঠান হলে টিকিট জোগাড় করে কল্পনাকে দেয়। একটা টিকিট দেয় না, ছয়টা দেয়—নইলে খারাপ দেখায়; নিজেও দেয় না, দেয় চন্দনার হাতে। কল্পনার বাবা-মা জানেন চন্দনা-ই দিয়েছে।

ধীরে ধীরে আলাপ-কুঁড়িটা বন্ধুত্ব-কুসুমে বিকশিত হয়। চন্দনার মারফতে মেয়েটিকে ছেলেটি বলে দেয়, কোন্ দিন কোন্ সময় ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে সে যাবে। সেই দিন সেই সময়ে দোতলার বারান্দার জানালার পরদার অন্তরাল থেকে শ্যামলকে কল্পনা দেখে, হাসে, ইশারা করে।

নন্দকিশোর রাজার রাজবংশের মেয়েদের বিয়ে হয় ছোট বয়সে। ওদের বসিয়ে দেখানো হয় না। পুজোতে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে কল্পনার রাজকীয় লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে একাধিক রাজোপযোগী দম্পতি ওকে পছন্দ করে ঘরে আনতে চান। মেয়েটি শুধু বলে, 'বিয়ে করব না, পড়ব।'

দশম শ্রেণীতে উঠে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে কল্পনা মে মাসের শেষ সপ্তাহ কাটাতে যায় দার্জিলিংয়ে। যাওয়ার আগে শ্যামলের অনেক দিনের অনুরোধে সায় দিয়ে মেয়েটি ওকে একটা ফটো উপহার দেয়; দার্জিলিং থেকে ওর কাছে এক সচিত্র পোস্টকার্ড পাঠায়। সাবধানের মার নেই জেনে চিঠিতে চন্দনাকেও সে সই করতে বলে।

ইতিমধ্যে আই এস সি পাশ করে পড়াশোনায় ইতি টেনে শ্যামল দুর্গাপুরে চাকরি করতে যায়। একদিন, পুজোর ছুটিতে, চন্দনার দৌত্যে কল্পনার হাতে এক চিরকুট আসে ঃ 'আমাদের বিয়ে হলে তোমাদের বাড়িতে তোমার বাবা কি ধরনের কুরুক্ষেত্র বাধাবে, সে কথাটা তুমি জান। ভেবেচিন্তে দেখ ঃ বিয়ে করতে চাও তো সম্পর্ক রাখ; নইলে সম্পর্কটা এখানেই ছিন্ন হোক!' ফেরৎ ডাকে উত্তর আসে ঃ 'তোমাকে বিয়ে করব।'

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নাদিরা সুলতান এবার তাঁর পরিকল্পনা আরো একটু স্পষ্ট করে বললেন : শোন পাশা, আজ আমি তোমার সঙ্গে যে প্রেমের অভিনয় করছি, এর ফল শিগগিরই দেখতে পাবো। আমি ফারুকের মনে হিংসের বেশ সৃষ্টি করতে চাই। আর একবার যদি ফারুক হিংসে করতে শুরু করেন তাহলে উনি আমার জন্যে সব কিছু করবেন। তুমি জানো ফারুক প্রতিদিন তাঁর পোষাক পাল্টান, আর পরিবর্তন করেন তার মেয়ে বান্ধবী। আমি জানি যে শিগগিরই ফারুক আর একটি নতুন বান্ধবী যোগাড় করবেন। মনে রেখো, তোমার বন্ধু আলতানিও পুলি আমাকে দু চোখে দেখতে পারেন না। তাই সময় থাকতে আমার ফারুকের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধে আদায় করতে হবে। এবার আমার প্রস্তাব শোন পাশা। আজ রাত্রে প্রেম করবার সময় আমি ফারুককে বলব যে এলিয়াস এন্ড্রুজকে দিয়ে এই হাতিয়ার বেচা-কেনার অনেক অসুবিধে আছে। আলেকজান্দ্রিয়ার ওয়াটার অ্যার্সেনের হিসেব-পত্র এবং অস্ত্রের বেচা-কেনা নিয়ে দেশে যে স্ক্যান্ডাল হয়েছে এই নিয়ে সবাই কথাবার্তা বলছে। সবাই জিজ্ঞেস করছে যে, এলিয়াস এন্ড্রুজ লোকটি কে? উনি নিশ্চয় ইজরাইলী স্পাই? না, এলিয়াস কোন দেশের স্পাই নয়, স্রেফ ব্যবসাদার। টাকার লোভে আজ ফারুকের ব্যবসায় পরামর্শদাতা হয়েছে। আমার সঙ্গে ওর দামাস্কাসের নাইট ক্লাবে পরিচয় হয়। আমার আসল পরিচয় এলিয়াস জানে না। কিন্তু আজ তোমার কাছে আমার আসল পরিচয় খুলে বললুম। আমার সঙ্গে কাজ করলে তুমি প্রচুর টাকা পাবে। আমরা

ম্যাজেস্টি বলে ডেকো না। এবার শোন আমার কী ধরনের হাতিয়ার চাই। পয়ত্রিশ টনের ট্যাঙ্ক, বোম্বার প্লেন, ফিল্ড গান এবং সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। আমার কথা তুমি বুঝেছ?

আমি হেসে বললুম ঃ ইয়েস, আমি আপনার কথা বুঝেছি। আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব আমি পালন করবো।

ফারুক আবার বলতে লাগলেন ঃ না, সোজাসুজি ব্রিটিশ কিংবা ফরাসী সরকার আমার কাছে হাতিয়ার বিক্রি করবে না। কারণ ওরা ইস্রাইলী বিরোধী কোন কাজ করতে প্রস্তুত নয়। তাই তোমাকে গোপনে এই মাল বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানী থেকে কিনতে হবে।

এই বলে ফারুক একটি কাগজে কতকগুলো কোম্পানীর নাম ঠিকানা লিখে দিলেন। আমি এইসব কোম্পানীর নামগুলো দেখে মনে মনে হাসলুম। কারণ কিছুদিন আগে নাদিয়া সুলতান এই কোম্পানীগুলোর নাম আমাকে দিয়েছিলেন।

পরের দিন থেকে অস্ত্র কিনবার কাজ সুরু করলুম।

অর্ডিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের চীফ ইন্সপেকটর জেনারেল ছিলেন জেনারেল হোসেন। আর উনি ছিলেন আমার ডান হাত।

আসলে জেনারেল হোসেন কোনদিন যুদ্ধ করেননি। এমনকি ইজিপ্শিয়ান সৈন্যবাহিনীর অর্ডন্যান্স বিভাগের চীপ ইন্সপেকটর হবেন এ ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে।

আমার সুপারিশে জেনারেল হোসেন এই কাজ পেয়েছিলেন।

আসলে হোসেন ছিলেন ফারুকের ক্যাডিলাক গাড়ীর ড্রাইভার। একদিন হোসেনের সঙ্গে আমি ওর বাড়ীতে গিয়েছিলুম। সেখানে হোসেন আমাকে তার বোনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিল। বোনের নাম বুলবুল।

আমি বুলবুলকে দেখা মাত্র ওর প্রেমে পড়ে গেলুম।

হোসেন আমার মনের দুর্বলতার কথা বুঝতে পারলো। বলল ঃ পাশা, তুমি সুপারিশ করলে আমার চাকুরীতে উন্নতি হবে।

আর হোসেনকে সুপারিশ করবার একটা মৌকা মিলে গেল।

একদিন আমি আর হোসেন ফারুকের গাড়ী করে আলমাজাতে আর্মি ক্লাবে গিয়েছিলুম। আমি সিভিলিয়ান, কাজেই ক্লাবে ঢুকতে আমার কোন বাধা ছিল না, কিন্তু হোসেন ছিল আর্মির সামান্য সার্জেন্ট। অথচ হোসেনের বড়ো গর্ব হোল সে ফারুকের ড্রাইভার। সূর্যের চাইতে বালির তাপ বেশী। হোসেন ক্লাবের বারে গিয়ে সট করে একটা বিয়ারের অর্ডার দিল।

সেদিন হোসেনের কপাল ছিল খারাপ। ক্লাবে সেদিন আর্মির বড়কর্তা জেনারেল আজিজ আল মাশরী ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে হোসেন বারে বসে বারম্যানদের উপর হম্বিতম্বি করছে। লোকটা কে? উৎসুক হয়ে জেনারেল আল মাশরী জিজ্ঞেস করলেন।

ফারুকের ড্রাইভার। কে যেন ছোট জবাব দিল।

জবাব শুনে জেনারেল আজিজ আল-মাশরী রেগে আগুন হলেন ঃ মিশমুমকিন! অসম্ভব। ফারুকের ড্রাইভারের এত বড় আস্পর্ধা যে আমাদের বারে বসে মদ খায়! বের করে দাও ওকে।

হোসেনকে ক্লাবের বার রুমের বাইরে বের করে দেয়া হোল।

আমি অবিশ্যি এই গোলমালে কোন অংশ গ্রহণ করিনি। দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলুম। মুখ কালো করে হোসেন গিয়ে ফারুকের কাছে আমি ক্লাবের কর্তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করল। আমি ফোড়ন কাটলুম। বললুম ঃ ঠিক বলেছে হোসেন। আর্মি ক্লাবে ওকে অসম্মান করা উচিত হয়নি।

ঃ কী করা যায় বল। হাভানা সিগারে লম্বা টান দিয়ে ফারুক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ঃ উপায় একটা আছে। আমাদের জেনারেল আজিজ হলেন সামান্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। আপনি যদি হোসেনকে মেজর জেনারেল পদে প্রমোশন দেন তাহলে আর্মি ক্লাবের বারে বসে ও যত খুশি বিয়ার গিলতে পারবে।

আমার প্রস্তাব ফারুকের মনের পছন্দসই হোল। তিনি আমার কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠলেন। তুমি আমাকে চমৎকার আইডিয়া দিয়েছ পাশা। জেনারেল আজিজকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আজ থেকে হোসেন হবে মেজর জেনারেল আর ওকে দেখলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যালুট করবে।

এর পরে হোসেন মেজর জেনারেলের উর্দী পরে আর্মি ক্লাবে গিয়ে বসলো। সবাই হোসেনের উর্দী এবং জেনারেলের স্টার দেখে বিস্মিত হোল। কী ব্যাপার? একী সম্ভব? সামান্য সার্জেন্ট রাতারাতি কিনা হোল মেজর জেনারেল? কেউ যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। কিন্তু সেদিন হোসেনকে বারের বাইরে বের করে দেবার সাহস হোল না।

জেনারেল আজিজও সেদিন ক্লাবে এসেছিলেন। তিনি এসে দেখলেন যে সেই পুরোন ড্রাইভার হোসেন বারে বসে মদ গিলছে। কিন্তু যেই তিনি দেখতে পেলেন যে হোসেন তার চাইতে আর একটি বেশী স্টার পড়েছে অমনি তার চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল।

সম্রাট ফারুকের আমলে সব কিছুই সম্ভব।

হোসেনও ছাড়বার পা[illegible] নয়। জেনারেল আজিজকে দেখে ফ[illegible]সী ভাষায় বলল ঃ ম'সের আমি এদিকে এসো।

ঃ ইয়েস।

ঃ শুধুমাত্র ইয়েস নয়, বলতে হয় ইয়েস স্যার। মনে রেখো আমি হলুম মেজর জেনারেল হোসেন।

ঃ ইয়েস স্যার, বেশ কষ্ট করে জেনারেল আজিজ 'স্যার' কথাটি উচ্চারণ করলেন।

কিন্তু মনে মনে ঠিক করলেন যে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

আমার সুপারিশে প্রমোশন পেয়ে হোসেন আমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

ফারুক আমাকে এবং জেনারেল হোসেনকে য়ুরোপে অস্ত্র কিনতে পাঠালেন। আমার কাছে নাদিয়া সুলতানের দেয়া কোম্পানীর নামগুলো ছিল। এর মধ্যে দুটো কোম্পানী ছিল বেলজিয়ামে লিয়েজ শহরে। এইসব কোম্পানীতে ফিল্ড গান, অ্যামুনিশন তৈরী করা হোত।
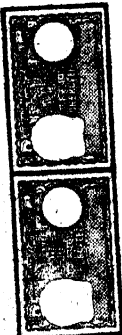
(ক্রমশঃ)

সুরের আগুন

পংকজদা, রাইদা আমায় তোমরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতে দাও। দেখো আমি কথার প্রতি অবিচার করব না।

কে এল সায়গল

(কে এল সায়গলের সঙ্গীতমানসের ছবিটি মেলে ধরায় যাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি তাঁরা হলেন—প্রধানত শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল হিন্দুস্থান কোম্পানীর নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কানন দেবী। বহুদিন আগে অমৃতের জনাই এক সাক্ষাৎকারে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারও এবিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। সায়গলের সঙ্গীতপ্রতিভা বহুমুখী। এখানে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকটিই তুলে ধরা হল। অন্য প্রসঙ্গ আধুনিক গানের পর্যায়ে আলোচিত হবে।)

১৯৩১ সালের কথা। নিউ থিয়েটার্সের তখন জমজমাট অবস্থা। কোনো ছবি রিলিজ হতে না হতেই তার গান ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে। শুধু নায়ক-নায়িকার মুখের গানই নয়। পার্শ্বচরিত্রের গানগুলিও হয়ে ওঠে জনসঙ্গীত, যাকে বলা যায় পিপলস সং। তখন ঠিক সঙ্গীত-পরিচালক (এখনকার পরিভাষায়) কেউ ছিলেন না। কিন্তু চিত্রসঙ্গীতে ব্রতী ছিলেন দুটি মানুষ—পঙ্কজ মল্লিক ও রাইচাঁদ বড়াল। এঁরা ছিলেন জাতশিল্পী। এবং সেইজন্যই বক্স অফিসের দিকে না তাকিয়ে খুঁজতেন ভাল-গলা, যথার্থ শিল্পপ্রতিভা। আর এঁদের প্রাণঢালা শিক্ষা ও কারিগরী-শিল্পের প্রসাদে তাঁরাই হয়ে উঠতেন বিস্ময়। এইভাবেই বাংলা ছায়াছবির পথ বেয়েই বাংলার সঙ্গীতজগতে এলেন কে এল সায়গল।

তখন 'পুরাণ ভকত' ছবিতে এক গাইয়ে রাজার এক পারিষদের রোলের জন্য এক সুকণ্ঠ অভিনেতার দরকার। এই চরিত্র-চিত্রণের মত কেউ ত নেই। তখনও প্লে-ব্যাক সিস্টেম কারো কল্পনায় আসেনি। গান গাওয়ার রোল করতে হলে অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীকেই গাইতে হোত।

এই সময়েই (খুব সম্ভবত ১৯৩১ সাল) নিউ থিয়েটার্সের তখন অন্যতম সুরস্রষ্টা রাইচাঁদ বড়াল একদিন অল ইন্ডিয়া রেডিওর কাজ সেরে স্টুডিও যাবার পথে গাড়ী থামিয়ে একটি দোকানে সিগ্রেট কিনতে গেলেন। [illegible] হঠাৎ [illegible] এক [illegible] কণ্ঠ-

নিমগ্নচিত্ত গজল গানের সুর। শুধু কি সুর? সুরের রেখায়, রঙে আঁকা হয়ে যাচ্ছে গুলেবাগিচায় গোলাপ হাতে বসে আকাশের পানে উদাসী চোখে তাকিয়ে থাকা বিরহিণীর ছবিখানি। সুরের ধারা অনুসরণ করে তিনি হাজির হলেন কোণের দিকের চেয়ারে-বসা একটি তরুণের কাছে। বয়স জোর ছাব্বিশ। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে মুগ্ধ চোখে দেখলেন নিজের সঙ্গীতজগৎ দিয়ে রচিত একান্তবাসী সেই শিল্পীকে। সামনে-রাখা ভাঁড়ের চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। হুঁশ নেই। দু-আঙুলে ধরা সিগ্রেট পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। ধরসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে—সে খবরটাও জানে বলে মনে হচ্ছে না। ভীড়ের মধ্যেও সেই একা মানুষটিকে মুহূর্তেই বড় আপনার মনে হয়। সঙ্গীত-পরিচালক নিজে গুণী তাই জাত-শিল্পীকে চিনতে ভুল হোল না। অপেক্ষা করলেন গান শেষ না হওয়া অবধি। ছড়িয়ে পড়া সুর যখন গুনগুনানীর মীড়ে থামলো সেই অনামী শিল্পীর কাছে গিয়ে সোজাসুজি সামনের চেয়ারে বসলেন তুমি এত সুন্দর গজল জানো? কার কাছে শিখেছ?

'আমি গান গাইতে ভালবাসি তাই গাই। শিখিনি কারো কাছে।' চোস্ত উর্দুতে জবাব এলো।

কথায় কথায় জানা গেলো নাম তার কুন্দনলাল সায়গল। রেমিংটন কোম্পানীতে সেলসম্যানের চাকরী করেন এবং সেই সূত্রেই মাঝে মাঝে কলকাতায় আসা-যাওয়া করতে হয়—'এ ছাড়া আমি টাইপরাইটার মেরামত করতেও পারি"—সলজ্জ হাসির সঙ্গে নিজের গুণপনা জাহির করেন সায়গল। যেন ছোট ছেলেটি।

বেশী কথা বলার সময় ছিলো না—। 'আমার সঙ্গে দেখা করেই'—বলেই একটি ঠিকানা লেখা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে রাইবাবু চলে গেলেন।

রাইবাবুর বাড়ীতেই থাকতেন সঙ্গীত শিল্পী হরিপ্রসাদ বাজী। তিনি অনেক মিনতি করে বলেছিলেন—'জালন্ধরের একটি ছেলে আছে। বড় ভালো গায়। তাকে যদি ছবিতে একটি কাজ দ্যান।'—

'না দেখলে বলব কি করে? আপনি যখন বলছেন মানলাম তার গলা ভালো; কিন্তু ছবিতে কাজ করতে হলে চেহারা, কথা বলার সপ্রতিভতা অনেক কিছু দরকার।'

'আপনি মেহেরবাণী করলে সবই সম্ভব।'

'আগে আনান ত। তারপর দেখা যাবে।'

চৌরঙ্গীর ঐ ঘটনার পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বাইরে বেরোবার সময় দেখলাম বাইরের ঘরে হরিপ্রসাদের সঙ্গে শুয়ে আছে একটি ছেলে। পা থেকে মাথা অবধি মুড়ি দেওয়া। একটু পরে দেখলাম বাথরুমে দাঁতন করছে। হরিপ্রসাদ কাছে আনতেই নমস্কার করলো। মুখ দেখে আমি ত অবাক 'আরে এ-ই ত কালকের সেই ছেলেটি। এর গলা শুনেই ত মুগ্ধ হয়েছি। বললাম নাস্তা করে তৈরী হয়ে নাও। তোমার স্টুডিওতে নিয়ে যাব।' —রাইবাবুর হাসিতে যেন ৪৪ বছর আগের সেই মুহূর্তটির আবিষ্কারের রোমাঞ্চ লাগে। স্টুডিওতে গেলাম।

'কিন্তু বাদ সাধলো চেহারা। আমি বললাম 'আমি ত ওকে হিরোর রোল দিতে বলছি না। কোনো সাইড রোলে ওর অমন অপূর্ব কণ্ঠটি একসপ্লয়েট করা হোক না?'

বন্ধুবর নীতিন বসু বললেন, 'ও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে আমার ক্যামেরার লেন্স ফেটে যাবে'—

যাইহোক অনেক বাদানুবাদের পর পরচুলো পরিয়ে মেক-আপ দিয়ে ওকে দিয়ে কাজ করানো হোলো। এই সায়গলই পরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রোলে অভিনয় করেছে এবং ন্যাচারাল অ্যাকটিং-এ সবাই-এর চিত্ত জয় করেছে। আর গান? সে বিচার করবার জন্য রয়েছে তার অজস্র রেকর্ড।'

পুরাণভক্তকে তাকে দিয়ে গাওয়ানো হোলো। তখনকার দিনে প্লে-ব্যাক সিস্টেম ছিলো না। ছবির সঙ্গেই গান টেক করা হোতো। গানটা দারুণভাবে উতরে গেলো। সেই গানটি তখনকার হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে (এখনকার হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাকস) রেকর্ড করা হোলো। গানটির প্রথম চরণ 'মজু মে তে' রেকর্ড নম্বর এইচ ৫৯।

১৯৩১-৩২ অবধি কোনো ফিল্মের গান রেকর্ডের মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি। রেশীর ভাগই থিয়েটারের গান রেকর্ড করা হোতো। সায়গলকে দিয়েই ফিল্মের গান রেকর্ড করা শুরু হোলো।

কিন্তু তার আগেই শচীন দেববর্মণ সায়গলকে হিন্দুস্থান কোম্পানীর ফাউন্ডার-ডিরেকটর শ্রীচণ্ডীচরণ সাহার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর একটি নন-ফিল্ম ডিস্ক মুক্ত করেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। এখন শুধু এইটুকুই বলতে চাই—সায়গলকে সঙ্গীতজগতে পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষের রসিকসমাজের হিন্দুস্থান কোম্পানীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

নীরদবাবু উজ্জ্বল চোখে বললেন—'সেই গান ও রেকর্ড দুই-ই হিট। সায়গল ১২৫ টাকা মাইনেতেই নিউ থিয়েটার্সের চাকরীতে বহাল হয়ে গেলেন। তখনকার দিনে এ টাকার মূল্য অনেক।'

এই হিন্দুস্থান কোম্পানীরই প্রথম গানের রেকর্ড ছিলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান 'তবু মনে রেখো' ও 'আমার পরাণ লয়।' দ্বিতীয় গানের রেকর্ড অতুলপ্রসাদের স্ব-কণ্ঠের গান, 'জানি জানি তোমায় রংগরাণী' ও 'মিছে তুই ভাবিস মন'।

'এই দুটি গান রেকর্ড করা হয়েছিলো উদ্বোধন ও রবীন্দ্রনাথের কারণে। তখনকার যুগে সাধারণ মানুষের মধ্যে সঙ্গীতরুচির বিকাশ হয়নি। ইন্টেলেকচুয়াল অথবা উঁচু-মহলে ক্লাসিক্যাল গানের সমাদর ছিলো। বাংলা সঙ্গীতের অন্যান্য ধারাগুলির ছিলো অবহেলিত। বাংলা গানে কীর্তনের প্রচার ও প্রাবল্য ছিলো' নীরদবাবু আত্মবিভোর উচ্ছ্বাসে বলে চলেন (যেন অতীতকে সামনে দেখতে পাচ্ছেন) 'বাংলা গান কোনো নির্দিষ্ট রূপ না নেওয়ার দ্বিতীয় কারণ অধঃপতিত শ্রেণীর মেয়েরা গাওয়ার দরুন এ গানের প্রতি রক্ষণশীল দলের অনীহা ছিলো।

'এই সময়ই বাংলার সংস্কৃতিকে গানে গানে রূপ দিয়ে সাধারণের মধ্যে বাংলাগানের একটা উঁচু মান সৃষ্টি করবার জন্য এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তরুণ চণ্ডীচরণ সাহা, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, বিভূতি সেন। উপরোক্ত দুটি গান ছাড়াও কান্তকবির গান সরী মিঞার টপ্পার বাংলা অনুবাদ নিধু-বাবুর টপ্পা রেকর্ড করেন হর্ষদেব রায় (৩নং রেকর্ড) 'পূজিব তোমারে'। তিন নম্বরে ছিলো রেণুকা সেনগুপ্তের 'পাগলা মনটারে।'

বাংলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের সঙ্গীতধারাও এসে পৌঁছলো গানের সভায়। এলেন ত্রিপুরার রাজকুমার শচীন দেববর্মণ এবং অনুপম ঘটক। গোটা ভারত চমকে চমকে উঠলো উচ্চাংগ ও লোকসংগীতের অপরূপ মিলনে—যা এর আগে কখনও ঘটেনি কিন্তু যখন ঘটলো মনে হোলো এই অভূতপূর্ব মিলনের জন্যই বুঝি সঙ্গীত-পিপাসুরা অগোচরেই প্রতীক্ষা করছিলেন।

কুমার শচীন দেববর্মণই একদিন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে এসে বললেন, 'চণ্ডীদা নিউ থিয়েটার্সে একটি ছেলে যা গাইছে! একবার শুনুন না।'

যথাসময়ে ছেলেটিকে নিয়ে শচীন দেববর্মণ হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে হাজির হলেন। এইচ ২৭-এ একটি নন-ফিল্ম হিন্দী ভজন রেকর্ড হোলো। কর্তৃপক্ষ দেখলেন অকল্পনীয় কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারী এই তরুণ শিল্পী। সুন্দর চেহারা বলতে যা বোঝায় তা নয়। কিন্তু কি অসামান্য উজ্জ্বলতা তাঁর বিরাট চোখ দুটিতে। চলতি বাংলায় যাকে বলে গলাটা একটু খনা কিন্তু শিল্পীর পৌরুষকণ্ঠের আবেগের সঙ্গে মিলে এ বস্তুও যেন এক আকর্ষণীয় আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে। আর কি বিনয় ও নিষ্ঠা।

সংকোচজড়িত কেবলই বলে যায় 'আজ্ঞে আমি ত কারো কাছে শিখিনি, শুনে শুনে যেটুকু পারি, গাই। এতে কি হবে?'

রেকর্ড হোলো, সেই সায়গলের প্রথম রেকর্ড, নন্‌ফিল্ম সং। পরিবেশন করলেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর ম্যানেজার চণ্ডীচরণ সাহা এবং এ কোম্পানীতে সায়গলকে নিয়ে এলেন আরেক শিল্পী শচীন

অবদান। শুধু বাংলা নয় ভারতের সর্বত্রই জনপ্রিয় এই এক রহস্যময় কন্ঠ। কারণ কানন দেবীর ভাষায় শুধু সাধারণ শ্রোতার কাছেই নয়, ওস্তাদ মহলেও গজল গাইয়ে সায়গলের দারুণ সমাদর ছিলো।'

এই সময় দশের বেশী রেকর্ড তৈরি হোতো না। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সে রেকর্ড যেতো। হঠাৎ সকলের বিস্ময়কে ছাপিয়ে লাহোরের মেসার্স জানকীনাথ কুমার এ্যাণ্ড ব্রাদার্স-এর কাছ থেকে এক-সঙ্গে পাঁচ হাজার কপির অর্ডার এলো। তখনকার দিনে এটাই ছিলো রেকর্ড সেল।

গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সেখানে খবর নিয়ে জানলেন সত্যিই তাঁরা পাঁচ হাজার কপি চান। কে এই শিল্পী? সেগল। তখন এই নামেই সবাই তাঁকে জানতো। পরে বাঙালীর মুখে এই সেগলই হয়েছিলেন অতি আদরের শিল্পী সায়গল। শোনা যায় হিন্দুস্থান কোম্পানীতে রেকর্ড করবার আগে গ্রামোফোন কোম্পানীর অডিশনে (দিল্লী ব্রাঞ্চে) সায়গল বাতিল হয়েছিলেন ঐ ন্যাজাল বায়াসের দরুন। ওদিকে নিউ থিয়েটার্সে চণ্ডীদাসের ডবল ভার্সন হচ্ছে। তার আগে একটা ছোট্ট চরিত্রে সায়গল এত দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে চণ্ডীদাস কথাচিত্রে (হিন্দী) তিনিই হলেন হিরো।

রেকর্ডের মাধ্যমে ফিল্মের ভালো গানের যে বহুল প্রচার হতে পারে সেই চিন্তাটা চণ্ডীবাবুর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিলো এবং বি এন সরকারের সঙ্গে তাঁর একটা চুক্তিও হয়ে গেলো। তখনকার দিনে প্লে-ব্যাক-সিস্টেম কল্পনার বাইরে। হিন্দুস্থান কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ নিজের খরচেই রেকর্ড করতেন। নিউ থিয়েটার্সকে প্রতি রেকর্ড পিছু চার আনা করে রয়ালটি দেওয়া হোতো। আর এন টির রেকর্ডের জন্য স্পেশাল লেবেল তৈরি হোতো। এই হোলো ভারতবর্ষে ফিল্ম রেকর্ড প্রচলিত হবার প্রথম অধ্যায়।

বোম্বের গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কুপার হিন্দী ছবির গান রেকর্ড করবার নির্দেশ দিলেন এবং ভারতীয় চিত্রগীতিতে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের সৃষ্টিও তখন থেকেই। এই চিত্রগীতির পথেই সায়গলের কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীত এসে পৌঁছলো জনসাধারণের দ্বারে।

১৯৩৫ এর খুব সম্ভব সেপ্টেম্বরে আমি রেকর্ডিং করা শিখেছি। তখন মোমের থালা রেকর্ডিং মেশিনের ওপর চাপিয়ে রেকর্ডিং করা হোতো। একদিন শুনলাম আজ রেকর্ডিং হবে হিন্দী দেবদাসের একটি গান। শিল্পী কে এল সায়গল। সেই সময় তিনজন সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। এন, টি ১ নম্বরে রায়চাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিক এবং ২ নম্বরে তিমিরবরণ। তাঁরাই নিয়ে রেকর্ড-

ডিং করাতেন। রেকর্ডিং হচ্ছে শুনতে এলাম। সত্যি সায়গল যে কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন সে কণ্ঠ জনসাধারণকে শোনাবার সুযোগ পাওয়া যায়নি সেকালের যান্ত্রিক অসুবিধার জন্যে।' নীরদবাবু আক্ষেপের সুরে বললেন।

এই দেবদাস ছবিতেই সায়গলের রবীন্দ্রসংগীতে হাতেখড়ি। সায়গলের অসাধারণ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিলো রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ওপর। হিন্দী বাংলা গানে যখন সারা ভারত জয় করে নিয়েছেন তখনও তাঁর মনের দুর্বার বাসনা ছিলো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার। প্রায়ই তিনি স্টুডিওতে আমাদের কাছে দুঃখ করে বলতেন পঙ্কজদাকে এত করে বলছি আমায় দিয়ে একটা অন্তত রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াতে তা ও'র কোনো গা-ই নেই। জানি না এ জীবনে আর কোনোদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার সুযোগ পাব কিনা। বলছিলেন কানন দেবী 'এই জাতশিল্পীর ওপর অগ্রজের মতই অগাধ স্নেহ ছিলো পঙ্কজবাবুর। উনি হেসে বলতেন, 'সায়গল তোর জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত আমি ফিল্মে দেবই দেব। তোর শিল্পীসত্তা দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের যে রূপ ফোটাবি কোনো বাঙালী তা ভুলতে পারবে না। কারণ না জেনে, না বুঝেই তুই রবীন্দ্রনাথকে এমন করে ভালবেসেছিস—

'দেবদাস পুরোপুরি রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় —রবীন্দ্রনাথের গানের একটি লাইন ব্যবহার করা হয়েছিলো 'কাহারে যে জড়াতে চায় দুটি বাহুলতা'—সেই গানটি আমি সায়গলকে দিয়ে গাইয়েছিলাম। কিন্তু ও প্রথমটায় খুশী হয়নি—একটু ক্ষুন্নই হয়ে ছিলো—বললেন পঙ্কজ মল্লিক।

'কেন?'—

'গানটি ওকে গাইতে হয়েছিলো চন্দ্র-মুখীর ঘরে। ও খুব অভিমানভরে বলেছিলো 'পঙ্কজদা এতদিন বাদে যাও বা একটু রবিঠাকুরের গান গাইতে দিলে তা-ও বারাঙ্গনার ঘরে।'

আমি বোঝালাম 'ওরে, তুই বুঝতে পারছিস না ঠিক ঐ মুহূর্তে, ঐ ভাবে ঐ চরিত্রের ইন্টারপ্রিটেশন করেছি। কবি কখনও কোনো দেহগত বাসনার মধ্যে তাঁর ভাবকে বন্দী করে রাখেননি। এখানে চন্দ্রমুখীর মনের ওপর কল্যাণবোধের জন্য প্রতিক্রিয়া হচ্ছে'।

'কিরকম?' সায়গলের চকচকে চোখ আরো চকচকে হয়ে ওঠে।

এখানে জড়ানোর ইচ্ছাটা সম্ভোগ-কামনা থেকে জন্মায়নি। যে গাইছে সে যেন অসহায় আর্তিতে কোনো স্নেহভরা আলিঙ্গনের দুয়ার চায়, চায় নির্ভরযোগ্য আন্তরিকতা। আর এ আশ্রয় যে দেবে তাকেও স্বার্থহীন প্রেমের সবটুকু দিয়েই শরণাগতকে কাছে টেনে নিতে হবে। ঠিক এই আবেদনটি চন্দ্রমুখীর কাছে পৌঁছলো। এই মন নিয়েই সে দেবদাসকে দেখেছিলো বলেই দেবদাসের এমন করে সেবা করতে পেরেছে তার জীবনকে শোচনীয় পরিণাম থেকে বাঁচাতে চেয়েছে।

সায়গল শুনেই লাফিয়ে উঠে আমার পা-দুটো চেপে ধরে বললো, 'দাদা পায়ের ধুলো দাও। তুমি না থাকলে এমন করে রবীন্দ্রনাথকে আর কে বুঝিয়ে দিত?'

ওর বড় বড় দুটি চোখ জলে ভরে উঠতো। ভারী দিলখোলা আর স্পর্শকাতর মানুষ ছিলো সায়গল। হো-হো করে হেসে উঠতেও যতক্ষণ সময় লাগতো, চোখ ছল-ছলিয়ে উঠতেও ততক্ষণ। সায়গল যখন খুব হাসিখুশীর মেজাজে থাকতো তখনও ওর চোখ দুটি ছলছল করতো। খুব আবেগপ্রবণ ছিলো কিনা।'

পঙ্কজবাবুর নিষ্ঠা ও সযত্ন শিক্ষার প্রসাদেই সায়গল প্রথম দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন 'জীবন-মরণ' কথাচিত্রে। গান দুটি হোলো 'তোমার বীণায় গান ছিলো' ও 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান।'

করবেট জন্ম-শতবার্ষিকী

জিম করবেট এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্র শিকারী হিসেবে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত। কিন্তু তাঁর বইয়ের পাঠকেরা জানেন যে, নিছক 'শিকারী' বলতে যা বোঝায়, করবেট তাই ছিলেন না। বন্য প্রাণীর সঙ্গে তথা অরণ্যের সঙ্গে কেমন করে যেন তাঁর একটা অন্তরের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। অরণ্য এবং তার শ্বাপদ যেমন করবেটকে বুঝতো করবেটও তেমনি তাদের বুঝতে পারতেন। তাছাড়া হিমালয়ের পাদদেশের সাধারণ মানুষ, অনিশ্চয়তা এবং দারিদ্র্য যাদের চিরসাথী তাদেরও করবেট তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে একটা স্বাভাবিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ম্যান-ইটারস অব কুমা'ও-এ ছোট একটি ঘটনা আছেঃ একদিন করবেট একটি বাঘের সন্ধানে ব্যস্ত, কখনো তাকে চোখে পড়ছে, কখনো সে লুকোচ্ছে, এমন সময় তাঁর কানে এলো একটা ক্ষীণ ঘন্টা ধ্বনি। দেখলেন ছোট একটি মেয়ে একটা গরু নিয়ে প্রায় ছুটে চলেছে। কি ব্যাপার? মেয়েটি জানালো যে, সে গরু চরাতে বেরিয়েছে, না হলে কাকা বকবে। অগত্যা করবেট শিকারের কাজ বন্ধ রেখে মেয়েটির সঙ্গে গরু চরাতে লেগে গেলেন। ঘন্টা দুই পরে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেন, তারপর আবার ফিরে এলেন বাঘটির সন্ধানে। করবেট লিখেছেনঃ ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দিতে পেরে সেদিন যে আনন্দ পেয়েছিলাম, গোটা জীবনে সে রকম আর কিছু কখনো অনুভব করিনি। এ কি নিছক একজন শিকারীর কথা! করবেটের জন্মস্থান নৈনিতাল (২৫-৭-১৮৭৫) বিগত ২৫ জুলাই নৈনিতালে করবেটের স্মৃতিসভায় উত্তর প্রদেশের করবেট ন্যাশনাল পার্কের উন্নতিবিধান, তাঁর স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশ এবং নৈনিতালে একটি যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়।

কথাশিল্পী মনোজ বসুর জন্মজয়ন্তী

কথাশিল্পী মনোজ বসু ৭৪ বৎসর বয়সে পৌঁছেছেন। এই উপলক্ষে সম্প্রতি ব্যারাকপুর ক্লাব-এ তাঁকে সম্বর্ধনা জানান দেশের অনেক জ্ঞানী-গুণী-চিত্রশিল্পী সাহিত্যসেবী এবং সাধারণ মানুষ। ডঃ অজিত ঘোষ পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র। অন্নদাশঙ্কর রায়, তুষারকান্তি ঘোষ, বনফুল, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দেবেশ দাস প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। মনোজ বসুকে এই উপলক্ষে একখানি মানপত্রও দেওয়া হয়।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমনোজ বসু যে ভাষণ দেন, তার মধ্যে মনোজ-সাহিত্যের মূল সুরটি আশ্চর্যভাবে ধরা দিয়েছে: 'বনমর্মর' বা 'মাথুর'-এর স্রষ্টার নিকট মানুষের জীবনের রহস্যময়তা ও প্রেমের আত্মিক দিকটা প্রচ্ছন্ন থাকাই সম্ভব। কিন্তু আসলে তিনি দরদী মানুষ, মানুষের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য তাঁর অন্তর সদাই ব্যাকুল। তাই এক সময় লিখেছিলেন 'কুম্ভকর্ণ'। এ গল্প সে যুগে বহু মানুষেরই নিদ্রা ভঙ্গ করেছিল সন্দেহ নেই। 'ভুলি নাই' থেকে এই দেশপ্রেমিক দরদী শিল্পীর কলম চলতে লাগলো একটা নতুন পথে—পুরোপুরি সাহিত্য হয়েও যার মধ্যে পাঠক পেয়েছেন দেশ, কাল, মনুষ্যত্ব ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে দুঃসাহসী বিশ্লেষণ, কখনো বা পথ-নির্দেশ। চল্লিশের দশক সুরু হতেই মনোজ বসু বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটা অঘটন হতে চলেছে—দেশ বিভাগ হতে চলেছে। মহান শিল্পীর দুর্লভ দূরদর্শিতা ভিন্ন ভবিষ্যৎকে কেউ এভাবে বুঝতে পারে না। পরিশেষে যা ঘটবার তা ঘটলো। তিনিও সুরু করলেন নতুন যাত্রা, 'নবীন যাত্রা' দিয়ে। এতো বহু বিচিত্র বিষয় মনোজ বসু লিখেছেন, যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের বিস্ময় উদ্রেক করবে।

নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় বর্তমানে নয়াদিল্লীর কালীবাড়ীতে অবস্থিত। ভারতের সর্বত্র বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা, তথা বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে একটা সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার সাধনায় এই সম্মেলনের কর্মোদ্যোগ ইতোমধ্যেই সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সম্মেলন-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের একটি নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু দিল্লীর মতো জায়গায় এই ভবন নির্মাণ খুবই ব্যয়সাধ্য তাই, এই উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সম্মেলনের সভাপতি সাহিত্যিক, সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটি আবেদনে জানিয়েছেন যে, এই মহৎ উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য যে কোনও দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে। সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, কালীবাড়ী, মন্দির মার্গ, নয়াদিল্লী—১।

পরলোকে কবি অরুণাচল বসু

'পলাশের কাল' রচয়িতা সুকান্ত-সুহৃদ কবি অরুণাচল বসু গত ২৪ জুলাই পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১। তাঁর রচিত সুকান্ত-জীবনী 'কবি-কিশোর সুকান্ত'ও একখানি উল্লেখ্য গ্রন্থ।

শিশু সাহিত্য পরিষদের ১৩৮২—৮৩ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি

সম্প্রতি শিশু সাহিত্য পরিষদের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৩৮২—৮৩ সালের নতুন কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়েছেঃ

সভাপতি শ্রীমতী লীলা মজুমদার, সহ-সভাপতিঃ যথাক্রমে উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রলাল ধর ও শৈল চক্রবর্তী। সম্পাদকঃ কুঞ্জবিহারী পাল ও সুকুমার ভট্টাচার্য। সহ-সম্পাদকঃ ভবানী দে ও ধূর্জটি দত্ত। কোষাধ্যক্ষঃ ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার। সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ সৌরীন্দ্রকুমার দে এবং প্রচার সম্পাদকঃ অজিতকুমার দাস।

এছাড়া অমরশঙ্কর রায়, শিশিরকুমার মজুমদার, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জিল সেন, অলোক চট্টোপাধ্যায়, রেবন্ত গোস্বামী, জয়ন্ত দাশগুপ্ত, অনিল মিত্র ও শঙ্কর ভট্টাচার্য কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৬ টাউনসেণ্ড রোড কলকাতা—২৫ ঠিকানায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় সদস্যগণ মিলিত হন।

[illegible]
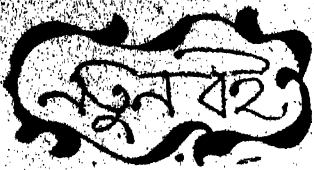
আমার কর্ণ আমার দুর্যোধন (উপন্যাস)। শৈলেন রায়। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাত টাকা।

'আমার কর্ণ আমার দুর্যোধন' উপন্যাসটি দুই কিশোরের কৈশোর অভিজ্ঞতার এক মধুর কাহিনী। প্রতিষ্ঠিত লেখক শ্রীশৈলেন রায় হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কিশোর মানু ও তার ছোড়দার সম্পর্ক, তাদের সুখ-দুঃখের মানসিক দিনলিপিটি নিটোল কাহিনী আশ্রয়ে রূপ দিয়েছেন।

কাহিনীর উত্তমপুরুষ নায়ক মানবেন্দ্র ওরফে মানু। মহাভারতের কাহিনী শুনে তার ছোড়দার সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা খেলতে অভ্যস্ত মানু। এইভাবেই দুই ভাইয়ের প্রীতিপূর্ণ মন ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এই রেঙ্গুণ প্রবাসী দুই কিশোরের জীবনে আসে পোস্টমাস্টার কালীকিঙ্করবাবুর মেয়ে ইন্দুমতী, আসে মা-থিন। রাজীবের জন্মদিনে মা-থিনের ঘনিষ্ঠ হয় মানু। এতে ইন্দুমতীর মনে জাগে ঈর্ষা। এই ঈর্ষার পরিণতি মানুর ছোড়দার সঙ্গে ইন্দুমতীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা। যে মানুকে ছোড়দা একদিন খেলার ছলে মারতে মারতে জখম করলে ইন্দুমতী সেবা করে তার ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, সেই মানু আর ইন্দুমতীর বাড়ি যায়নি ছোড়দার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হতে দেখে। এই কিশোরের জীবনে আরও এক মানুষ আসে ম্যাজিসিয়ান কুগানকাকা। সেই কুগান-কাকাকেও একদিন তার মিথ্যের ব্যবসা থেকে টেনে এনে সৎপথে বসায় মানুর ছোড়দা। উপন্যাসের শেষে মানু থেকে যায় রেঙ্গুণে, বড়দা মেজদার সঙ্গে ছোড়দা চলে আসে কলকাতায় পড়াশুনা করতে। তখন দুজনে বড় হয়ে গেছে।

শৈলেন রায় সুন্দর নির্মল কৌতুক আশ্রয় করে অনেকটা আত্মজীবনীর ভাষায় দুই কিশোরের আত্মবিশ্লেষণ করেছেন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শৈলেনবাবু যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এই যথার্থ শিল্পীসুলভ ক্ষমতাই তাঁর আলোচ্য উপন্যাসের অপরিসীম সাফল্যের চাবিকাঠি।

স্বয়ং স্বর্গপাত (কাব্য সংকলন) প্রণব মাইতি। সম্প্রতি প্রকাশ, অলতাচক কাঁথি মেদিনীপুর। সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীপ্রণব মাইতি যে ভাল কবিতা লিখতে জানেন স্বয়ং স্বর্গপাত গ্রন্থটি তা প্রমাণ করল। 'পুরনো কালের মেঘ, আর ভুলা এক কথা নয়, নীল দেহ ক্লান্তিময় কলার মান্দাসে', 'বাড়ছে বয়স বৃক্ষের মত শেষ চিঠিটি লিখতে বাকি' ইত্যাদি কাব্যিক চরণ ও চিত্রকল্প, মর্মপ্রাণ অথচ গভীর, সহজে বেজে ওঠার মত শব্দ ও শব্দপুঞ্জ উপহার দিয়ে কবি প্রমাণ করেছেন তিনি আধুনিক সচেতন, সতর্ক এবং আন্তরিক। তাঁর অভিজ্ঞতার জগত মনোময়, কিন্তু বাহিরকে কবি ভুলতে পারেননি। বহির্জগতে কবিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে—প্রমাণ পাওয়া যায় কবির বিষয় ভাবনায়। কবির মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি ও ক্ষমতা আছে—ছন্দে শব্দে চিত্রকে বর্ণনা ও অনুভূতির সচ্ছল প্রকাশের মধ্যে। কবি তরুণতম কবিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে। এটাই গৌরবের।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

মহাদিগন্ত। সম্পাদনা উত্তমকুমার দাশ এবং মৃত্যুঞ্জয় সেন। বারুইপুর। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

মহাদিগন্ত পত্রিকার এক এবং দু নম্বর সংখ্যায় একত্রে হাতে এসেছে। 'আমাদের সাহিত্যিকদের জন্য মৃত্যুঞ্জয় সেনের লেখা নিবন্ধটি ভালো লাগল। উত্তমকুমার দাশ এবং রমাপদ গায়েনের গল্পে শক্তির পরিচয় আছে। শঙ্খ ঘোষ এবং পরেশ মণ্ডলের কবিতা দু'নম্বর সংখ্যার উল্লেখযোগ্য কবিতা। ছাপা এবং প্রণবেশ মাইতির আঁকা মলাটটিও উচ্চমানের।

শিলালিপি। সম্পাদক মৃণাল বসুচৌধুরী। (গাঙ্গোত্রী জামসেদপুর কবি সম্মেলন স্মারক পত্র)।

'বিশেষ কোন আন্দোলন নয় কবিতার প্রসার গ্রামে শহরে সর্বত্রই কবিতা সম্পর্কে সকলকে উৎসাহিত করাই গঙ্গোত্রী সম্মেলনের উদ্দেশ্য—এই উদ্দেশ্যেই আসানসোল, পুরুলিয়া, মালদহ, আসানসোলের পর জামসেদপুরে গঙ্গোত্রীর বিশেষ কবি সম্মেলনীর বিশেষ কবি সম্মেলন। এই উপলক্ষেই শিলালিপি পত্রিকার এই বিশেষ সংকলন। মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত এই পরিচ্ছন্ন সংকলনটিতে প্রতিষ্ঠিত কবি ছাড়াও শক্তিমান তরুণ কবির রচনাও আছে অনেক। সত্যি কথা বলতে কি এদের সংখ্যাই বেশি। প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তারাপদ রায়ের কবিতা ভালো লাগল। তরুণদের মধ্যে অনন্য রায়ের কলমে জোর আছে। শান্তি সিংহের কবিতাও ভালো লেগেছে। ছাপা ঝরঝরে। প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। সম্পাদনা উচ্চমানের।

আলাপ। সম্পাদক ফাদার দাঁতিয়েন। ৩৪এ, তেলিপাড়া লেন, কলকাতা-৪। প্রথম সংকলন, জুলাই ১৯৭৫। দাম তিরিশ পয়সা।

কোলকাতা এবং মফঃস্বল বাংলার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারা স্কুলে পড়ে সেই সব ক্ষুদে ক্ষুদে লেখক-লেখিকাদের লেখা নিয়ে ফাদার দাতিয়েন যে পরীক্ষা শুরু করেছেন তাঁর 'আলাপ' পত্রিকায় তা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট কাজ। এর মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের মহীরুহ।

এই প্রথম সংকলনে প্রায়শই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন লেখা স্থান পেয়েছে। উৎসাহ দেবার জন্য কিছু ছবিও ছাপা হয়েছে ছেলেমেয়েদের।

পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা রইল।

টেরাকোটা সম্পর্কে

'অমৃতে'র ৬ জুন, ১৯৭৫ (১৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা) সংখ্যায় 'পংখের কাজ ও টেরাকোটা সম্পর্কে' আমার যে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে গত ৪ জুলাই ১৯৭৫ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীঅমরেন্দু চক্রবর্তীর 'টেরাকোটা সম্পর্কে' নামে একটি ছোট্ট চিঠি পড়লাম। চিঠির মধ্যে বিশেষ কিছু না থাকলেও শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন চিঠিতে টেরাকোটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য যে আলো দেখেছে পাঠকেরা তা যেন বিস্ময় বোধ করছি। উক্তালীর টেরাকোটা শব্দের অর্থ 'বেকড' আর্থ না। পোড়ামাটি এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ইংরেজিতে সংকুচিত অর্থে যে তার ব্যবহার, অর্থাৎ 'টেরাকোটা' বলতে পোড়ামাটির কাজকে বোঝায় সে কথাই আমি বলতে চেয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ 'রিক টেম্পল' ও 'টেরাকোটা টেম্পল'-এর অর্থগত পার্থক্যও উল্লেখ করেছি। ইংরেজি অভিধান থেকে শ্রীচক্রবর্তীর উদ্ধৃতিতেও এর প্রমাণ মেলে। এ ব্যাপারে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে গত ৬ জুনের চিঠিতে 'পংকের কাজ' সম্পর্কে আমি যা বলেছি তার সমর্থনে আমি আরও দুয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে দিতে চাই। নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষে' (৯ম ভাগ ১৩০৫ সাল) কথাটিকে 'পঙ্ক'ই বলা হয়েছে। এর অন্যতম অর্থ বলা হয়েছে ভেন্ন ও কয়াইতক'র। মন্দির ও সৌধে পংকের কাজের অন্যতম উদ্দেশ্যও হোল গাত্রের ভঙ্গুরতা ও ক্ষয় রোধ করা। বঙ্গীয় শব্দকোষের পৃঃ ১৭১৪-তে (বাংলায়) ভাট্টালিকার ভিত্তিতে বা তল-দেশে লেপনার্থ দৃঢ় কর্দমাশয়ক 'পংকের কাজ' বলে স্পষ্ট বলা হয়েছে। কথাটি যে 'পঙ্ক', 'পংখ' নয় এ সম্পর্কে কথাসাহিত্য থেকে আরও একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'মেঝেটি জমানো খোয়ার—উপরে পংক-চুনের পালিশ। মেঝের উপর পুরু গালিচার আসন।' ('খাঁচা': তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য় সং পৃ—২১)

অতএব কথাটি যে 'পংকের কাজ'—'পংখের কাজ' নয় তা ওপরের উদ্ধৃতিগুলির [illegible]। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত 'পংখের কাজে'র উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রণব রায়
চুঁচুড়া, হুগলি।

রূপসীর খাতা প্রসঙ্গে

কয়েক সপ্তাহ আগে আপনি 'রূপসীর খাতায়' অবাঞ্ছিত লোম দূর করার ব্যাপারে 'কোল্ড ওয়াক্স ট্রিটমেন্টের' কথা লিখেছিলেন। আর একথাও লিখেছিলেন কোন স্যালো সেলুনে গিয়ে বললে ওরাই ঠিক করে দেবে। কিন্তু সব মেয়ের পক্ষে তেমন সেলুনে যাওয়া সম্ভব নয় বিশেষ করে মফস্বলবাসিনীদের পক্ষে। তাই 'কোল্ড ওয়াক্স ট্রিটমেন্ট' কি করে করতে হয় তা যদি 'রূপসীর খাতায়' আপনি লিখে জানান তবে অনেকেই ব্যাপারটা জানতে পেরে সে অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে আর একটি কথা। কোল্ড ওয়াক্স ট্রিটমেন্টের ফলে লোম জন্মান চিরতরে বন্ধ হয় না, কিছুদিন পরে আবার গজায়।

বিজয়া বাগচী
পোঃ মদনপুর, নদীয়া।

সুরের আগুন

'অমৃত' সাপ্তাহিকের 'সুরের আগুন' সংযোজনা নিঃসন্দেহে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। নিঃসন্দেহ এই সংযোজনা 'অমৃত'কে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে।

রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করার মূলে রয়েছে কয়েকজন শিল্পীর অনবদ্য অবদান। এই সব শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা তাঁদের আবেগ কণ্ঠ প্রভৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুর ও বাণীকে একাকার করে দিয়ে কবির ইচ্ছাকে রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী তৈরী করেছিলেন কিন্তু বিশ্বভারতী (অধুনা) মানেই রবীন্দ্রনাথ নন। সুতরাং বিশ্বভারতীর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষপাতপূর্ণ মতামতে আমাদের বিব্রত বোধ করা ঠিক হবে না।

পরিশেষে আশা করবো আপনারা আরো বিভিন্ন বিষয় পত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশন করে প্রচারিত দ্বিতীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'অমৃত'কে অনন্য করে তুলবেন।

সুনীলকুমার পাল
ষষ্ঠীতলাপাড়া, বাণাঘাট।

মহিলা নাট্যকার সুকুমারী দত্ত

'শতবর্ষের [illegible]' শিরোনামার কথনীতে যে সমস্ত অভিনেত্রী-অভিনেত্রী ও নাট্যকারদের জীবনী, তাঁদের কর্মকুশলতা এ অভিনয় [illegible] সম্বন্ধে বিবরণ শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় বলিষ্ঠ তথ্যের সাহায্য বিস্মৃতপ্রায় অতীত থেকে বর্তমানের আলোর সামনে তুলে ধরছেন, এতে নাট্যপ্রিয় বাঙালী মাত্রেরই কাছে তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পাত্র। যে সমস্ত বিবরণ, পরিশ্রম প্রসূত হয়ে অতি সহজেই পাঠকবর্গের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে সক্ষম হয়েছে, নাট্য-সাহিত্যের সুবৃহৎ গ্রন্থ পাঠে ধৈর্য রেখে পাঠকরা তা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে একটি বিনীত আবেদন কালীশবাবুর কাছে রাখতে চাই। সেটি হলো বাংলা রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় মহিলা অভিনেত্রী ও প্রথম মহিলা নাট্যকার শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত সম্পর্কে তিনি যেন বিস্তৃত তথ্য দিয়ে অমৃত-এ কিছু লেখেন। কারণ এককালের ঐ প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ও নাট্যকার বর্তমানে প্রায় হারিয়ে গেছেন বললেই চলে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উৎসবে উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মহিলা নাট্যকারদের সম্পর্কে সাড়ম্বর আলোচনা হলেও সুকুমারী দত্ত সম্পর্কে কাউকে একটা পাতাও খরচ করতে দেখলাম না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংবাদপত্রে সেকালের কথা ও রমেন দাস তাঁর 'বাংলার মহিলা কবি' শীর্ষক গ্রন্থে সুকুমারী সম্পর্কে কিছু কিছু আলোকপাত করলেও তা এতই সামান্য যে, তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কোন অভিনেত্রী কিংবা নাট্যকারকে ভালোভাবে চেনা ও বোঝা মুস্কিল। শ্রদ্ধেয় কালীশবাবুর কাছে আমাদের আবেদন তিনি যেন বিস্তৃতভাবে সুকুমারী দত্ত সম্পর্কে আলোচনা করে আমাদের অনুসন্ধিৎসা সার্থক করেন।

বিমলকান্তি ভট্টাচার্য
আমড়া, পুরুলিয়া।

ঘাসের বুকে ছড়িয়ে থাকা শিশিরের মত ভিজে ভিজে মন ছিল কমলেশের। ব্যাপক গভীরতা নিয়ে কিছুটা সময়ের জন্য ছড়িয়ে পড়ত খোলা আকাশের নীচেয়। লতানো গাছ যেমন বুকেই হেঁটে চলে, তেমনতর সহজ আলসেমির মধ্যে একটা আলগা খুশি নিয়ে কাটত ওর সময়।

এই ভিজে মনের চারপাশে ছড়ানো থাকত হলুদ হলুদ ঠাসা সর্ষের ক্ষেত, আল পেরিয়ে আদিগন্ত মাঠ, মাঠের কোল ঘেঁষে পাড় ভাঙা নদীর ব্যাকুলতা। এই ভিজে মনের আরো কাছে এমনতর গ্রাম ঘেরা ছোট্ট মফস্বল টাউনে ওর শৈশব কাটছে। ওদের বাড়ির এক ফালি বারান্দায় তাল-পাতার চাটাইয়ের উপর যখন রাত নেমে আসে টুক করে, তখন কমলেশকে ভেসে যেতে হয় পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দূরান্তে কখনো দিগ্বিজয়ী রণক্লান্ত সৈনিকের বেশে, আবার কখনো অতলান্ত সমুদ্রের বুকে ডুবুরীর সাজে মুক্তোর সন্ধানে। এই বয়স, এই মনেরই কাছাকাছি।

এখানে সব আছে। ছোট ছোট আঁট-কোঠার মাঝে সেনেদের বনেদী বাড়ি, পিচের রাস্তা, দোকান, বাজার, বাড়ির ছাদে এরিয়েলের তার, পাকা পাকা সব—সবকিছু। রোজ সকালে রিকশা করে স্টেশনে ছোটে মানুষ, মানুষের সঙ্গে আনাজপত্তর দূর দূরান্তে। ঝিম ধরা দুপুরে শিশু গাছের ছায়া নিবিড় পথ পেরিয়ে ওকে এমনতর দৃশ্যের মাঝে রোজ রাস্তায় বেরুতে হয়। বাজারের কাছে ওদের কাটা কাপড়ের দোকান—এক ফালি টিনের ছাউনি দেওয়া। দুপুরে ওকে রোজই বাবার খাবার নিয়ে যেতে হয়। এই সময় ওর মন পেরিয়ে চলে পরি-দৃশ্যমান কতকগুলো পথ, পরিবেশের উপর আলতো করে হাত ছুঁয়ে। সেই পথ, পথের পাশে শিশুগাছের বিশাল দেহ, লাইট পোস্টের গায়ে সিনেমার ছবি, পানের দোকান, টালির ছাউনি দেওয়া বাড়ি ঘর, রেডিও থেকে ভেসে আসা গান। ওকে রোজই এইসব দৃশ্যের মাঝে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ভেসে যেতে যেতে সেনবাড়ির সামনে এসে ক্ষণিকের জন্য থেমে যেতে হয়। কয়েক যুগের জমিদারীর যথেচ্ছ সম্পত্তির রেশ টেনে এক বুক দম্ভ নিয়ে মাথা উঁচু করে সেনেদের দালানবাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরাট বিরাট থামওয়ালা দোতলা বাড়ির কার্নিশ ফাটা অলিন্দ, রঙিন পর্দা ঘেরা জানালা, কার্নিশের দু প্রান্তে ফুলওলা জোড়া মানুষের মূর্তি। কমলেশের কাছে এ বাড়ি সমুদ্রের গভীর তলদেশের মত বিস্ময়-কর। কখনো কখনো জানালার পর্দার ফাঁক পেরিয়ে ফর্সা মোমবহুল কয়েকজন রমণীর দ্রুত চলাফেরা চোখে পড়ে। সেনবাড়ির গেটের পাশে ঠাসা মাধবিলতা গন্ধ গেটের দুপাশ বেয়ে উপরের ঝুলবারান্দার অ্যান-সেটকে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মাধবিলতা ফুটে থাকে সব সময়। আর ঠিক এই দুপুরে রোজই ঝুলবারান্দায় মাধবিলতা ফুল আর সঙ্গে ছায়া ঘেরা রোদের রেণু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এ বাড়ির বড় ছেলের ছোট মেয়ে বকুল। কিংবা তার বয়স। কমলেশের থেকে ছোটই হবে হয়তো। তবুও পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো, ফিকে গোলাপি শাড়ি পরনে, হাতের কনুই অবধি ঢাকা ফুল কাটা ব্লাউজ। টানা টানা দুটো চোখ, ঈষৎ চিকন চিবুক, মৃদু হাসি ছড়ানো মুখের আদল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝুলবারান্দার এক পাশে কনুই দুটো ঠেকিয়ে রেখে, উদাস চোখে ও কি দেখে। মাঝে মাঝে অজান্তে ঝাঁকড়া মাধবিলতা থেকে টুক টুক করে ফুল তুলে এমনিই ফেলে দেয় নীচের

কমলেশ রোজই সেনবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ায়, বাঁ দিকে ফেরে। চোখ চলে যায় গেটের নীচে গাছের গোড়ায়। অসংখ্য ফুল ছড়িয়ে থাকে। সেই সময় একটা জানলার আড়াল ওর চোখের পরিধি জুড়ে স্থির থাকে। ও বোঝে মেয়েটি নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ বারান্দায়। চোখ তুলতেই চোখাচোখি হয়। সেই মৃদু হাসি ছড়ান মুখ। মুহূর্তের জন্য এইসব স্মৃতি নিয়ে কমলেশ ভেসে চলে। বাকি পথ কোথা দিয়ে কেটে যায় খেয়ালই থাকে না। একটা অদ্ভুত ভাল লাগা ভাব ওর মনের আনাচেকানাচে ঘোরাফেরা করে, আর এই ভাললাগা ভাব ওকে করে তোলে অসম্ভব সাহসী।

নদীর পাড় বেয়ে কলঘাটের দিকে যেতে যেতে দু পাশের নির্জন ক্ষেত্র খামার, বাবলা গাছ, অড়হড় ক্ষেত, খেজুর গাছের ফাঁকে ষষ্ঠীকে ও বুকুকে যেন দেখতে পায়। মনে হয় ওপারে নদীর ধার দিয়ে একই ভাবে বুকুও বুঝি মৃদু হেসে ওকে অনুসরণ করে চলেছে। সেই সময় নদীর জলে ওর চলমান ছায়াগুলো সে দেখতে পায়। কমলেশের ভাল লাগে, অসম্ভব ভাল লাগে। এক সময় কলঘাটে পৌঁছে যায়। বড় বড় পাইপ নদীর পাড় থেকে জলের মধ্যে নেমে গেছে। চারদিক নির্জন নিথর। একটা যান্ত্রিক ঘট ঘট আওয়াজ কেবল নির্জনতাকে বাঁচিয়ে রাখে। পাড়ের ওপর বহু পুরনো ইঁটের ঘর। জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যেকার মেশিনপত্তর দেখা যায়। মনে হয় যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কঙ্কাল মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ছাদ ফুঁড়ে একটা চিমনীর মত পাইপ উঠে গেছে ওপরে। মাঝে মাঝে হুস হুস করে ধোঁয়া বের হয়। চারপাশে কলাগাছের ক্ষেত। কমলেশ নদীর কোল থেকে ওপর দিকে উঠে আসে। হাঁক দেয় : ষষ্ঠি, তুই কোথায়।

ডান দিকের আবডাল থেকে উত্তর আসে :—এই তো এখানে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ। কোথা থেকে হরিয়াল, ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। আশসেওড়ার ঝোপঝাড় পেরিয়ে ও এগোয়। এরই মধ্যে কথা ভেসে ওঠে, কি রে, এত দেরী করলি কেন? কখন মাটি নিয়ে যাব।

কমলেশ মুহূর্তে ভুলে যায় সব কিছু। নদীর পাড় বেয়ে কিছুটা গিয়ে লাফ দিয়ে নামে।

কমলেশ মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। ভাবে ষষ্ঠি কি করে এই মাটির দলা থেকে সুন্দর সুন্দর পুতুল বানায়। ষষ্ঠি লেখাপড়া করে না। থাকে রেজেস্ট্রী অফিসের কাছে জেলপাড়ায়। ওদের বাড়ির পেছনে একটা আমবাগান আছে। রোজ দুপুরে কমলেশ আর ও কলঘাটের কাছে আসে। এখানে নাকি ভাল এঁটেল মাটি পাওয়া যায়। ষষ্ঠির মুখে শুনেছে এঁটেল মাটিতে নাকি ভাল পুতুল হয়। এখান থেকে চাল নেওয়া ফালিজল লেখায় মরগুলোর যে কোন একটা ওরা ইচ্ছে মত বেছে নেয়। ছুটি না থাকলে আমবাগানে। ঝোপঝাড় সরিয়ে একটা পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে। মাটি ছানে। তাতে কাঠের গুঁড়ো মেশায়। তারপর তাল তাল মাটির চাঁই ও এগিয়ে দেয় ষষ্ঠির দিকে। এই অবধি ও ষষ্ঠির সঙ্গে কথা বলে। দূর থেকে রেজেস্ট্রি অফিসের গুঞ্জন ভেসে আসে। কখনো সখনো গ্রাম থেকে আসা চাষীদের গরুর গাড়ির ছেড়ে দেওয়া গরুগুলো চলে আসে এপাশে। কমলেশকে উঠে ওগুলোকে তাড়াতে হয়। এই সময় রেজেস্ট্রি অফিসের সামনে মণ্ডদের ছোট্ট চায়ের দোকান থেকে তেলেভাজা নিমকি ভাজার গন্ধ ভেসে আসে। গন্ধে জায়গাটা ম ম করে। লোকজন ভাঁড় হাতে করে চা নিমকি ডুবিয়ে খায়। কমলেশ সব কিছু লক্ষ্য করে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে ষষ্ঠি ছোট্ট কাঠের ওপর মাটি লাগিয়ে সমান করে দু আঙুল দিয়ে একটা পেটমোটা মানুষের ধড় তৈরী করেছে। পেটের মাঝে দুটো কাঠির কাঠি দিয়ে ওর গায়ে মাটি লাগাচ্ছে। বুঝতে পারে ও মাকালীর মূর্তি গড়ছে। দেখে অবাক হয়ে যায়। ভাবে, কিভাবে ষষ্ঠি ওর মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে একদলা মাটিকে ক্রমশ রূপান্তরিত করছে একটা পরিচিত ছবিতে। এই সময় সে একটু দূরে বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে এনে থুতনি রেখে কাদা মাখা শুকনো হাত আড়াআড়ি করে বেড় দিয়ে বসে থাকে। এক সময় ওর চোখের সামনে থেকে পরিদৃশ্যমান জাগতিক অনুভূতি দূরে সরে যায়। পরিবর্তে ভেসে ওঠে ঝিম ধরা দুপুরে শিশুগাছের ছায়াঘেরা পথ, পথের পাশে বিশাল একটা বাড়ির ফুল বারান্দা আর মাধবীলতা ফুল। স্বপ্নের মধ্যে কমলেশকে ভাসতে হয়। কে যেন ফুল বারান্দা থেকে ওকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে। লক্ষ্য করে, সেই ফর্সা তুলতুলে মেয়েটি। দাঁড়ায়। বাতাসের অলিন্দ বেয়ে নিঃশব্দে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যায়। এক সময় ও অনুভব করে কে যেন ওর হাত ধরে চুপি চুপি আবদার মেশান গলায় বলছে : চল ছুটে যাই।

: তুমি কোথায় যাবে।

: যেখানে তুমি রোজ যাও।

: আমি তো নদীর পাড়ে যাব।

: আমিও যাব।

: তুমি গিয়ে কি করবে?

: তুমি যা করবে।

: আমি তো ষষ্ঠির সঙ্গে মাটি তুলব।

: আমিও।

: কাদা ছানাছানি করবো।

: আমিও।

: তবে চল।

এক সময় ওরা যেন ছুটে চলে নদীর পাড় ধরে। হাওয়ায় উড়ন্ত থাকে মেয়েটির চুল, আঁচল। পেছনে পড়ে থাকে সরষের ক্ষেতের হলুদ রং, বাবলাগাছ, অড়হড় ক্ষেতের সোনালি, খালের শিষ, শালিক পাখি আর নদীর বাতাসের উদাসীন হাওয়া।

কমলেশ মুখ তুলে মৃদু হাসে।

: চল যাই।

পাড় বেয়ে টাউনের দিকে ফেরার সময় হারান মণ্ডলের ক্ষেতের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এতটা পথ হেঁটে হাঁপিয়ে পড়েছে। একটু জিরিয়ে নিতে চায়। নদী থেকে জল তোলার জন্য এখানে একটা মেশিন আছে। কেউ কোথাও নেই। একটা গরু জাবর কাটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মেশিনের বিরাট চাকার সঙ্গে লাগান ছোট ছোট কৌটো থেকে জল পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। কমলেশ চাকার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আঙুল দিয়ে চুঁইয়ে পড়া জলের স্পর্শ নিয়ে হঠাৎই আপন মনে বলে ওঠে : তুই তো এত সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাস, আমায় একটা বানিয়ে দিবি?

ষষ্ঠি মাটির ঝুড়ি মাথায় রেখে ওর দিকে ফিরে চায়।

: তোকে তো দিতেই বলি। তুই-ই তো কোন দিন নিলি না। আজ যাওয়ার সময় নিয়ে যাস।

একটা নাম না জানা পাখি ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। কমলেশ মুখ ফিরিয়ে দেখে ওটা কোথাও বসে কিনা। পাখিটা ওপারে কোথাও বসে না। গাছের মাথার ওপর দিয়ে অলস ভঙ্গিতে ডানা দোলাতে দোলাতে দূরে মিলিয়ে যায়।

: না না, তোকে আমি ওসব পুতুলের কথা বলছি না। সত্যিকারের পুতুল।

ষষ্ঠি অবাক হয় : সত্যিকারের পুতুল। সেটা আবার কি। পুতুল তো পুতুলই।

কমলেশ বোঝাতে পারে না। : তুই সেনবাড়ি চিনিস?

: না চেনার কি আছে।

: তুই বুকুকে দেখেছিস?

: দেখেছি, দারুণ সুন্দর দেখতে। কি ফর্সা।

দুধ উথলে ওঠার মত কমলেশের মনও উথলে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলে, হ্যাঁরে, ঠিক বলেছিস আমার বুকুর মত দেখতে একটা পুতুল বানিয়ে দিবি? ঠিক যেন অবিকল বুকুর মত হয়। ষষ্ঠি কি যেন ভাবে। তারপর বলে, দূর তাও কখনও হয় নাকি। কাউকে সামনা-সামনি না দেখলে কি করে বানাই। ঠাকুরের মূর্তি করা যায়। জীবন্ত মানুষজনকে কেমন করে না দেখে তার মূর্তি গড়া যায়। সামনাসামনি পাওয়া গেলে হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কমলেশ নিভে যায়। দুপুরের রোদ নিস্তেজ হতে থাকে। ষষ্ঠি উঠে পড়ে বলে, আজ বড্ড বেলা গেল, আজ আর হবে না রে, বুঝলি কমলেশ। কাল বানাব এ মাটিগুলো দিয়ে।

কমলেশ কোন কথা বলে না। ভাবতে থাকে কি করে বুকুকে ষষ্ঠির সামনে বসিয়ে দেওয়া যায়। কোন কূল কিনারা পায় না। কমলেশকে স্বপ্নের মধ্যেই বুকুর পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াতে হয় নিরুপায় হয়ে।

কমলেশদের বাড়ির পিছনে একটা বহু-

সংলগ্ন একটা পোড়ো বাড়ি। বাড়ির চারিপাশে নানা রকমের বাহারি ফলের গাছ সংস্কারবিহীন হয়ে পড়ে আছে। চারিদিকে ঝোপঝাড় ওরই মাঝে ভাঙা ভেনাসের মূর্তি। শোনা যায় জগৎ শেঠের বংশের কোন এক পুরুষের বাগানবাড়ি ওটা। পুকুরে পাড় ঘিরে সুপুরী গাছের বাহারি দেওয়াল। জায়গাটা কেমন যেন থমথমে। স্নানঘাটের পাশে বাঁধানো বেদী ছুঁয়ে চাঁপা ফুলের গাছ। একটু হাওয়া দিলেই ওর থেকে হলুদে হলুদে চাঁপা ফুল ঝরে পড়ে। এই অঞ্চলের বাড়ির বউ-ঝিরা রোজ দুপুরে এখানে নাইতে আসে। শোনা যায় এ পুকুরের জল নাকি গঙ্গার জলের মত পবিত্র।

সেদিন দুপুরে কমলেশ রান্নাঘরের দাওয়াতে বসেছিল। সকাল থেকে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল আজ আর নিশ্চয় ষষ্ঠি নদীর পাড়ে যাবে না। ও শেঠ পুকুরে নাইতে গেছে। বড্ড দেরী করছে আজ। মন চলে যায় বড় রাস্তায় সেনবাড়ির গেটের কাছে। বুকু নিশ্চয় আজ আর বড় বারান্দায় দাঁড়াবে না। এত ঝড়-বৃষ্টি। আজ আবার ইতু পুজোর দিন। মেয়েরা সব পুজো নিয়েই ব্যস্ত। গতদিন ষষ্ঠির কথায় ওর মন ভেঙে গিয়েছিল। ভেবেছিল সেনবাড়ির মেয়েটার মত একটা মূর্তি গড়ে নেবে ষষ্ঠির কাছ থেকে, তা আর হোলো কৈ। ষষ্ঠির দেশী বাড়াবাড়ি। কাউকে সামনাসামনি না দেখলে মূর্তি গড়তে পারে না। একটা চাপা অভিমান জমা হয় ওর মনে। বেড়ার পাশে কার গলা মনে হচ্ছে? উঠে পড়ে ও। কার সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে মা। আরে, লোকটা পুকুরের দিকে ছুটে গেল না? কমলেশের কেমন যেন খটকা লাগল। দাওয়া থেকে উঠে বেড়া টপকে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শুনতে পেল, : 'হায় হায়, কি সর্বনাশ হলরে খোকা। শেঠ পুকুরে একটা মেয়ে ডুবে গেছে।'

: সেকি!

: হ্যাঁ রে, কি আক্কেলের বাবা বড় লোকদের দু ঘণ্টা আগে জল নিতে এসেছিল ঘাটে সবাই, তারপর যে মেয়েটা বাড়ি ফিরল না, তা কারও হুঁস নেই।

কমলেশের বুক যেন ক্রমশ অস্থির হয়ে পাড়ভাঙা নদীর ব্যাকুল আর্তনাদের মত আছড়ে পড়তে চাইল।

: বড়লোক? বড়লোক বলতে তো সেনদের বোঝায়। মার কাছে সরে এসে দাঁড়াল কমলেশ। 'কোন বাড়ির মেয়ে?' কিন্তু কে কার কথা শোনে : ইস, কি সর্বনাশ, অতটুকু ফুটফুটে মেয়ে। হা-হুতাশ করতে করতে মা কমলেশের দিকে ফিরে কি যেন বোঝাতে চাইল। : 'সেনেদের বড় তরফের ছোট মেয়ে বুকু।'

কমলেশের চোখের আলো হঠাৎ নিভে আসে। হু-হু করে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মধ্যে ও ছুটতে থাকে পুকুর পাড়ের দিকে। পিছনে পড়ে থাকে লোকজন, গরুকল, পুকুর ফেরত রমণীদের বিলাপ। এক সময় খেয়াল হয় সে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কমলেশের বয়সী কয়েকটি ছেলে পাড়ে দাঁড়িয়ে আঁতি-পাতি করে জলের ওপর চোখ বোলাচ্ছে। কারা যেন জেলে পাড়ায় গেছে টানা জাল আনতে।

'এখনও সময় আছে কমলেশ, এখনও সময় আছে। নেবে পড় জলে। তোমার, ভাসিয়ে দেওয়া মানস প্রতিমা ডুবে যাওয়ার আগে তুলে নাও তুমি।' কে যেন ওর ভেতর থেকে বলে ওঠে।' : চল জলে নেবে আমরাও খুঁজি।

কমলেশ ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যায় বেদীর দিকে। তারপর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় সব কিছু—সেই নির্জন ঝিম ধরা দুপুর, ভাঙা ভেনাসের মূর্তি, চারপাশের বাহারী ফলগাছ। কেবল ভেসে ওঠে কালো জলের গভীরতা। কেশ খানিকটা জলে ডুবে যায় তারপর ক্রমশ ওপারের দিকে ভুস করে উঠে আসে। এক বুক দম নিয়ে বাঁদিকে ফিরে দেখে ওর সঙ্গের ছেলেগুলো বাঁশ ডোবানো শাপলা ফুলের জটলার কাছে এগিয়ে গেছে। ও ডানদিকের জায়গাটা বেছে নেয়। ওখানে কলমি লতা আর ঝাঁঝির ঝোপ। সেই দিকেই ও এগোতে থাকে। ঝাঁঝিগুলো তাকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে। জলে আলতো করে ভেসে থেকে হাত বাড়িয়ে সেগুলো পট পট করে ছিঁড়ে ফেলার সময় সে এক অদ্ভুত প্রার্থনা করে বসে। 'হে ভগবান, আর কারো হাতে মেয়েটা যেন না ওঠে।'

আবার ডুব দেয়, অন্ধের মত হাতড়ায় 'হে মা কালী, আমি যেন বুকুকে পাই।' আবার ডুব দিতে গিয়ে নাকে মুখে জল ঢোকে। তবু সে এগোয় আর ভাবে 'হে সাতভেয়ে কালী ঠাকুর, আমার হাতে যেন বুকুর দেহ স্পর্শ পায়। আমার হাতে ও যেন ওঠে।'

ওর চোখ জ্বালা করে। তবু ডুব দেয়। তারপর এক সময় হঠাৎই হাতে কি যেন ঠেকে। মনে হয় শাড়ির আঁচলের অংশ। শরীর ভেসে উঠতে চায়। তবুও জোর করে ডুবে ডুবে ও শাড়ির অংশটা ধরে এগোতে থাকে। এক সময় মাথার চুলে হাত ঠেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দম নেবার জন্য জলের ওপর মাথা তুলে চিৎকার করে ওঠে আশ্চর্য এক আনন্দে।......'পেয়েছি, আমি বুকুকে পেয়েছি।' একটা আর্ত চিৎকারের মত ওর গলার শব্দ খান খান করে দেয় নির্জন নিস্তব্ধ জায়গাটাকে। পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্তব্ধ লোকেদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। কেউ এসে পড়ার আগেই কমলেশ জলের মধ্যে থেকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে পাড়ের দিকে ... কাঁদছে কেন?

...প্রাণ' দেহটা। তারপর আলতো কোলে করে ওকে তুলে ঘাটের দিকে এগোতে থাকে। পায়ের তলায় পিষ্ট হতে থাকে পরিত্যক্ত পাড় থেকে লোকজন ছুটে আসে। কমলেশ পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে, 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না কেউ।'

দৌড়ে আসা লোকগুলো থমকে দাঁড়ায়।

একটা অদ্ভুত পবিত্রতা ওর সারা শরীরের চারধারে-ঘিরে থাকে। গাছের মাথায় ঝড়ো হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ ওঠে। বেদীর ওপর অসংখ্য চাঁপাফুল ছড়িয়ে থাকা জায়গাটায় কমলেশ বুকুকে শুইয়ে দেয়। তারপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। এ যেন জল থেকে তুলে আনা প্রতিমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আকুল প্রার্থনা। সেই চোখ, সেই সরু চিবুক, মুখে মৃদু হাসি,, হাতদুটো মুঠো করা। ওর মনে হয় মেয়েটি বুঝি ডুবে যাওয়ার আগে মাধবি-লতা ফুল তুলে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে চারপাশে। বুক থেকে ... স্বর্ণ কমল বুকের ... হাঁটুর উপর ... ছোট পায়ের পাতায় এখনও একটা ... ফুটে আছে।

কমলেশের শরীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অর্ধমগ্ন এক কিশোরী মেয়েকে বেদীর ওপর শুইয়ে দিয়ে ওরই পায়ের পাতার কাছে হঠাৎ হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে সে। এক সময় বুকের মধ্যে উথালি পাথালি শব্দ হয়। বাইরের ঝড়ো হাওয়া ক্রমশ তার বুকের মধ্যেও বইতে থাকে। ও হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। তারপর—পায়ের পাতার ওপর মুখ গুঁজে কান্না চাপতে গিয়ে বার বার একটা নির্জন নদীর পাড়, আম-বাগান, সরষের ক্ষেত, অড়হড় গাছের দোলানির মধ্যে ও বুকুকে দেখতে পায়। মনে হয় ও যেন বলছে 'ধরো, ধরতো দেখি আমায়।'

ঠিক তখনি ওর চোখের সামনে ষষ্ঠির মুখ ভেসে ওঠে। ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে ওর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়। মন উন্মনা হয়। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে, 'এই ষষ্ঠি—দেখে যা, তুই বুকুকে দেখে যা। তুই তো বলেছিলি সামনাসামনি না দেখলে মূর্তি গড়তে পারিস না। এই দেখ ওর মুখ, সরু চিবুক, টানা টানা চোখ, শাঁখের মত বুক, নখ—সব কিছুই খোলা মেলা তোর সামনে। এবার বল ষষ্ঠি, তুই পারবিতো আমায় এমন একটা মূর্তি গড়ে দিতে?'

ক্রমশ কমলেশ সেই কান্নার মধ্যেই এক সময় দেখতে পায়, কারা যেন একটা শাড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঢেকে দিচ্ছে বুকুর অর্ধনগ্ন শরীরটা।

এই ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে আরো লোক ছুটে আসছে পুকুর পাড়ে। তারা এসে বকবকি করবে আর অবাক হয়ে ভাববে, এই চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলেটা শরীরের কাঁটাকোপ, ভাঙা শামুকের ...।

অধিকার ॥

মৃণাল বসুমল্লিক

জলের ভেতর থেকে পরিশুদ্ধ মাটি
অধিকারে
কিছু বেশী
পরিস্ফুট ইলিশ
ছিন্নমূল
নিঃসঙ্গ শালুক
কিম্বা
যথার্থ ভূমিকাহীন শব

যেমন চেয়েছো ঠিক
বাড়িঘর
চালচিত্র
নারী ও কাহিনী
অধিকারে তারও বেশী
খানাখন্দে পড়ে থাকা আয়ু
পুরনো সিন্দুক
আর
মাটির ভেতরে এক
মর্মান্তিক আড়ষ্ট এঞ্জিন

কেউ কি রেখেছে বিশ্বাসের ফুল ॥

হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেক দিয়েছিল ধার,
মানুষ কতটা উজান বাইতে পারে
কতটা অহম সভ্যতাকে নিয়ে যাবে আত্মকেন্দ্রিক বিজয়ে,
ঈর্ষার মশালে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কার মুখ
তুমি কি কারচুপি করছো?
প্রতিবেশীকে প্রতারিত করে নিরুদ্বেগ কে জীবন যাপন করছে
আমি কাকে কি বোঝাবো?
ছায়াপথ, নক্ষত্ররাত
গভীরতায় একবার বুক রাখো
হাত ধরে পৌঁছে দাও মমতাকে উপলব্ধির তোরণে।
হাতের নিবিড়ভাবে আটকে রেখেছো সিনবাদের পাষণ্ড ঈগল
তাতে কি লাভ হয়েছে?
[illegible] উজ্জ্বলতার মাঠ আরো বেশী দীর্ঘ করছে পৃথিবীকে
হাসিকান্নায়,
জমিতে কেউ কি রেখেছে বিশ্বাসের ফুল?

বিষহরি ॥

হেনা হালদার

ছোবলে ছোবলে বিষ তবু মানুষের
শরীরেই বিষহরি মন্ত্র আছে। মানুষই পেরেছে
অমৃতকে ফিরে যেতে যে-কোনো নিশ্বাসে।
সপসপে ইচ্ছেগুলো খেলা করে শরীরে সবার
সৌখীন মাছের মত ঘরে ঘরে বহু ভেঙ্গে
জ্যামিতিক ছবি আঁকে মোছে।
শৈশবের নীলাকাশ পিছে ফেলে যৌবনের
সবুজ অরণ্যে হেঁটে হেঁটে...স্তরে স্তরে মাটির ভেতর থেকে
মানুষ-ই এনেছে তুলে গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা।
মানুষই উদ্ভিদ থেকে প্রাণদ ওষধি খুঁজে আনে
মেঘ থেকে জলধারা, ছায়ার ভেতর থেকে
রোদ। মধুধরা তার থেকে নিংড়ে আনে
সুরের মৌচাক। মানুষই প্রয়োগ মন্ত্রে বিষকে
অমৃত করে। ছুঁতে পারে ফণার মানিক।

ক্ল্যাসিকাল ঢঙে আঁকা ছবি

সম্প্রতি আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস কর্তৃপক্ষ সুধাংশু বসু রায়চৌধুরীর একটি একক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। দীর্ঘ এগার বছর পর তাঁর প্রদর্শনী আবার কলকাতায় দেখা গেল। গত কয়েক মাস আগে প্রদর্শিত ইন্দ্র দুগারের পর সমগোত্রীয় এই চিত্রপ্রদর্শনী দেখে একটি কথাই মনে হয়, যে প্রাচ্য ঢঙে ছবি আঁকার রীতিটা এখনও প্রতীচ্যের পাশাপাশি কাঁধে হাত রেখে দিব্যি এগিয়ে চলেছে। এখনও যে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ওরিয়েন্টাল স্কুলের শেষ রেশটুকু বর্তমান শিল্পাবহাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি, সুধাংশুবাবু সেকথা আর একবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি একজন প্রবীণ শিল্পী ও অবনীন্দ্রনাথের এককালীন ছাত্র ছিলেন। তাঁর ছবি দেখতে দেখতে কেবলই বোধহয় প্রকৃতি বুঝি এখনও আমাদের হৃদয়ের গভীরে কোন অর্গল খুলে দেয়। গাছগাছালি, লতাপাতা ফুল, পশু-পাখি এবং সমস্ত কিছুর ভিতরে ছড়িয়ে থাকে সহজ, স্বভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার এক গভীর বোধ যা আমাদের এক অপার সৌন্দর্যময় নিসর্গ লোকে ভ্রমণ করিয়ে আনে। সুধাংশুবাবু নিঃসন্দেহে একজন ন্যাচারালিস্ট, যা দেখেছেন তাই এঁকেছেন। অতিসতর্ক ও সুনিপুণভাবে রেখার সঙ্গে রেখা রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়েছেন, হুবহু প্রকৃতির রূপ ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এঁকেছেন দুর্গম অরণ্য বন্য পশু প্রাণী রং-বেরংয়ের পাখি বিশেষত ময়ূর নাম-না-জানা অজস্র গাছ; আকাশ আলো করে দাঁড়িয়ে থাকে হরেক মরশুমী ফুল সূর্য অস্ত যায় পড়ে থাকে সুদূর বিস্তৃত বেলাভূমি অথবা পিছন ফিরলে দেখা যায় ভগ্নপ্রায় ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি। এক একটি বিশেষ ভাব ও ভঙ্গিমায় যেন এসব আটকে রাখার চেষ্টা করেছেন। বিশেষত বার্ডস সিরিজের আঁকা ছবিগুলি দেখতে গিয়ে সেকথা মনে হয়। জলরঙের এই ছবিগুলির বেশীর ভাগ দিল্লী, জয়পুর ও উত্তর বাংলায় আঁকা। প্রসঙ্গত 'বার্ডস স্যানকচুয়ারী' 'ওল্ড রাইনো অফ কাজিরাঙা' 'নাইট ইন দি ফরেস্ট' 'পিকক অফ নর্থ বেঙ্গল ফরেস্ট' 'অম্বর প্যালেস' প্রমুখ কয়েকটি ছবি মনে রাখার মতো। ছবিগুলিতে সূক্ষ্ম রেখার সাবলীল গতির ভিতর আশ্চর্য সজীবতা এবং ঈষৎ চাপা নীল গোলাপী ও হলুদ রঙের বহু ব্যবহারে এক প্রচ্ছন্ন রোমান্টিকতা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি পারস্পেকটিভ তৈরীর ক্ষেত্রে তিনি যে সিদ্ধহস্ত একথা বলতে দ্বিধা নেই। অংকনরীতির দিক থেকে তাঁর ছবি দেখতে গিয়ে কেবলই অতীতে ফিরতে ইচ্ছা হয়: মনে হয় কোথায় যেন সেই অজন্তা রাজপুত ছবি মুঘল মিনিয়েচারের আভাস মেলে।

জলহস্তী : শিল্পী সুধাংশু বসু রায়চৌধুরী

দিলীপ মুখার্জির ছবি

চলমান শিল্প গোষ্ঠীর চতুর্থ শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে দিলীপ মুখার্জির ৮টি ছবি মোহনদাস করমচাঁদ সন্নিকটস্থ 'গ্যালারী-এ'-তে প্রদর্শিত হচ্ছে। স্কেচ ধর্মী এই সব ছবি গুলির প্রধান বিষয় বস্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়, হতাশা ও মৃত্যু ভয়। সব লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে মধ্য বয়স্কা নারী রাস্তায় স্নান করে (স্ট্রীট বাথার), কোন এক যুবতী প্রৌঢ়কে সঙ্গদান করে (দি ডেমন এন্ড শি), তার ভিতরে কোথাও জেগে থাকে এক অকারণ ভয় (ফিয়ার)। তবু বিপর্যস্ত রেখার ভিতরে দেখা যায় এক গভীর আত্মবিশ্বাস, বলিষ্ঠ ও দৃঢ়। জীবন দুর্দান্ত প্রাণবান হয়ে ধরা দিয়েছে অশ্বের প্রতীক রূপে।

প্রসঙ্গত মনে হয় 'গ্যালারী-এ' র পরিবর্তে একটি স্থায়ী নাম দিলে ভাল হয় না কি? তদুপরি যদি কিছু আলোর সুবন্দোবস্ত হয়। প্রতি শনি ও রবিবার প্রদর্শনী দেখা যাবে।

নীল গাই : শিল্পী—সুধাংশু বসু রায়চৌধুরী

'হিন্দুজাতি ও শিক্ষা' উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একখানি প্রাচীন বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্যন্ত ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্বন্ধে কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকালী ঘোষ, ৫৬নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা হতে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন ১৮৪৭ সালে।

গ্রন্থখানির ১ম খণ্ডের সূচীপত্রে যে বিষয়গুলি ছিল, তা হল : ১। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মিশনারিগণ (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৮২০ সাল পর্যন্ত)। ২। শ্রীরামপুর কলেজ, ৩। গবর্ণমেন্ট ও শিক্ষা (ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ১৮২০ সাল পর্যন্ত), ৪। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, ৫। বাঙ্গালীরা ও শিক্ষা (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৮২০ সাল পর্যন্ত), ৬। সরকারী সাধারণ শিক্ষা সমিতি, ৭। হিন্দু কলেজ (১৮২০-৩০) ৮। মিশনারীগণ ও শিক্ষা (১৮২০-৩০), ৯। বাঙ্গালীরা ও শিক্ষা (১৮২০-৩০)।

এই মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থখানি থেকে পরবর্তীকালে বহু গবেষক ও গ্রন্থকার তাঁদের শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক রচনায় বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। আমরা আলোচ্য গ্রন্থের 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটী' নামক পরিচ্ছেদটির অংশবিশেষ এখানে পুনশ্চ প্রকাশ করা হল।

৭। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী ৭।

১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবে তাহা স্থির হয়। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের চেষ্টায়, তাঁহাদের উদ্যোগে ও তাঁহাদের অর্থে এ কলেজ স্থাপিত হইল। এই কলেজের সহিত পাদ্রীগণ অথবা ইংরেজ কর্মচারীদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। পাদ্রীগণ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা লইয়া আসেন ও স্থানে স্থানে প্রবর্ত্তন করেন। এদেশ মধ্যে যাহাতে তাঁহাদের আধিপত্য অন্ততঃ তাঁহাদের পরিচালিত ও পরিদর্শিত স্কুল হয় তাহাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল। অনেক কারণে সে ইচ্ছা বিশেষ ফলবতী হইল না। বাঙ্গালীরা নিজেরাই শীঘ্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বিতরণ নিমিত্ত স্কুল খুলিলেন। উপরন্তু ইংরেজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজেরা কলেজ খুলিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা সরকারী শিক্ষা, শিক্ষা কমিটীর (মাদ্রাসা কমিটী) সদস্য ছিলেন, তাঁহারা তখন প্রাচীন ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতি ছিলেন। ইংরেজী শিখিবার প্রয়োজন স্বীকার করিতেন না। অথচ দেশের লোকে তখন ইংরেজী শিখিতে নিজেরাই অনেক স্কুল খুলিতে ছিল। আরমেনিয়াম অথবা ফিরিঙ্গীদিগের স্কুলে শত শত বাঙ্গালী বালক ইংরেজী পড়িতেছিল। অনেক বাঙ্গালী তখন ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। দেশে তখন শিক্ষার অভাব বাঙ্গালীরা অনুভব করিয়াছিল। সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত নিজেরাই চেষ্টা করিতেছিল। এই সময়ে জনকতক ইংরেজ কর্ম্মচারী ও পাদ্রীগণ মিলিয়া তৎকালীন লণ্ডন সহরের 'চিপ বুক সোসাইটীর' অনুকরণে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী' গঠন করেন। সে সময়ের শাসনকর্ত্তা মারকুইস অফ হেষ্টিংসের পত্নী মারশনেস অফ হেষ্টিংসের আগ্রহে এই সোসাইটী গঠিত হয়।

এই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী সম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধহয় বাহুল্য হইবে না। স্কুল বুক সোসাইটী দেশের এক সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি অভাব পূরণ করে। যাহা বাঙ্গালী দের করা উচিত ছিল, যাহা তাঁহারা করে নাই, যাহা করিবার ক্ষমতা বোধহয় সে সময় তাহাদের ছিল না, সেই সব কার্য্য অন্ততঃ বৎসর কতক এই স্কুল বুক সোসাইটীর দ্বারা সাধিত হয়। যে কারণেই হউক তখন বাঙ্গালীরা পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিল। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, বাঙ্গালা ভাষায় তখন [illegible] অবস্থা ছিল না। ভূগোল, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক তখন কে [illegible] স্কুল বুক সোসাইটী তখন সেই কাজ করিত।

পরবর্তীকালে, প্রধানতঃ পাদ্রী ও ইংরেজ কর্মচারীগণ এইরূপে পুস্তক প্রকাশ [illegible] অধিকারী হইলেন। তাঁহারা যেরূপ পুস্তক প্রকাশ উচিত বিবেচনা করিলেন, সেইভাবেই পুস্তক ছাপা হইতে লাগিল। [illegible]দের জ্ঞান, তাঁহাদের নীতি, তাঁহাদের [illegible], তাঁহাদের মনের ভাব, তাঁহাদের [illegible] সাধনের পন্থা এই সব লইয়া [illegible] বালকদের পাঠ্যপুস্তক রচিত [illegible] ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতির মনের গঠন [illegible]দের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইল। ইহার ফলে নূতন বাঙ্গালী জাতি সৃষ্ট হইল কিনা বলা যায় না; তবে এই স্থানে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মন এক নূতন ছাঁচে ঢালাই হইবার সূত্রপাত ও আয়োজন হইল। এই কারণে সোসাইটীর কার্য্যাবলী একটু বিস্তারিতভাবে লিখিলাম।

১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী স্থাপিত হইল। ২৪ জন সদস্য লইয়া পরিচালিত সমিতি গঠিত হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে ১৬ জন ইংরেজ, ৮ জন হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন। ষোলজন ইংরেজের [illegible] ৫ জন সৈনিক কর্ম্মচারী, ৩ জন [illegible] ও বাকী ৮ জন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইষ্ট, সদর দেওয়ানী কোর্টের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন, বাটারওয়ার্থ বেলী শেষোক্তগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৮ জন দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে চারিজন ছিলেন মুসলমান ও চারিজন হিন্দু। তারিণীচরণ মিত্র, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, এই চারিজন হিন্দু। প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এই কমিটির অধিবেশন হইত।

•

পরিচালনা সমিতি গঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই কার্য্যের সুবিধার জন্য সোসাইটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম বিভাগ ইংরেজী ভাষা, দ্বিতীয় বিভাগ আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু, তৃতীয় বিভাগ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার নিমিত্ত গঠিত হইল। তারিণীচরণ মিত্র শেষোক্ত বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

কপালক

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার ভাবনার পথ কিন্তু এখন একটি নির্দিষ্ট রাস্তাকে সিঁথির মত ভেদ করে চলে গেছে। তার দুধারের শোভা আর সম্পদ আমি আলো আর হাওয়ার মত স্পর্শ করে আছি।

ঝিমি কখন এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে জানতে পারি নি। হঠাৎ উত্তরের উপত্যকা থেকে বয়ে আসা একটা হাওয়া আমার ভাবনাকে এলোমেলো করে দিয়ে গেল। সেই বাতাসের সংগে খেলায় মেতে ওঠা ওর দোপাট্টার ছোঁয়া লাগল আমার মুখে।

ঝিমির দিকে ফিরে বললাম স্টোররুমে বিছানা পাতা দেখে এলাম। তাই এতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম ক্লান্ত হয়ে তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঝিমি কোন কথা না বলে ইজিচেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার চুলে বিলি কাটতে লাগল।

আবার বললাম ভাগতুকে ঘুম পাড়িয়ে এলে নাকি?

ঝিমি এবারও কথা বলল না। শুধু চুলগুলো মুঠো করে ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ছেড়ে দিল। বুঝলাম উল্টোপাল্টা কথা বলার জন্যে ঝিমি আমাকে মৃদু তিরস্কার করল।

কয়েক মুহূর্ত পরে ও নিজেই কথা বলল আমি কাল দুপুরের গাড়ীতে চলে যাচ্ছি।

এবার আমি কোন কথা বললাম না।

ও হঠাৎ ওর দুটো হাত দিয়ে কান দেবার ভঙ্গীতে আমার কানের কাছে ধরে উঠে বলল আমি কাল চলে যাচ্ছি।

বললাম তুমি নিজের ইচ্ছেতেই যখন এসেছ তখন যাবার সময়েও যে নিজের ইচ্ছাতেই যাবে তা তো জানা কথা।

ঝিমি বলল এতক্ষণের ভেতর একটি-বারও আমাকে থাকতে বলেছ তুমি?

বললাম আশ্চর্য কথা বললে ঝিমি। তোমার ঘরে তুমি এসেছ আমি তোমাকে থাকতে বলব কোন দুঃখে। লোকে জানি অতিথিকেই থাকবার অনুরোধ জানায়।

ঝিমি বলল আমার খুব খারাপ লাগছে ছোটেসাহেব। কাল চলে যেতে হবে একথাটা যতবার মনে পড়ছে ততবারই ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, তাহলে সময় নষ্ট না করে চাচাজীকে বলে থাকবার একটা পারমানেন্ট ব্যবস্থা করে ফেল।

ঝিমি বলল চাচাজীকে বলার সময় এখনো আসে নি। অকটোবরে আপেল তোলা শেষ হয়ে গেলে যখন চাচাজীর মন খুশীতে ভরে উঠবে ঠিক তখনই চাচাজীর অনুমতি চাইব। তারপর ডিসেম্বরের শেষে কোলি-রি-দেয়ালীর দিনে তোমার পথ চেয়ে থাকব। সেদিনটি মনে থাকবে তো?

ওর হাত ধরে নিজের কোলের ওপর টেনে এনে বললাম সব ভুলে যেতে পারি কিন্তু যে বিশেষ দিনটিতে ঝিমির বুকের উত্তাপ প্রথম পেয়েছিলাম সেদিনের কথা কি ভোলবার?

ঝিমি আমার কোলের ওপর বসে আমার বুকের ভেতর ওর হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল তুমি রোগা হয়ে গেছ ছোটেসাহেব।

তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বললাম কক্ষনো না।

ঝিমি বলল সত্যি বলছি আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। নাগগর থেকে আসার পর তুমি যেন খুব তাড়াতাড়ি রোগা হয়ে গেলে।

হেসে বললাম, তাহলে নিশ্চিত তোমার ভাবনা ভেবে।

ঝিমি আমার হাসিতে যোগ না দিয়ে বলল, বড্ড খাটুনি যাচ্ছে তোমার। সারাদিন পাহাড়ী টিকায় ঘুরে ঘুরে কাজ। ঠিকমত খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নেই।

বললাম, এ সব ইনফরমেশান শ্রীমান ভাগতুর কাছ থেকে সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই।

ঝিমি ধমকের সুরে বলল, তুমি আসল কথা বড্ড এড়িয়ে যাও ছোটেসাহেব। আমার কথাটা দয়া করে একটু শোন। দরকার পড়লে লোকেরা রোগীকে বয়ে আনবে হাসপাতালে, তুমি এখানে বসেই চিকিৎসা করবে। কোথাও তোমাকে যেতে হবে না।

বললাম, ছেলেমানুষী করো না ঝিমি। সব সময় ঘরে বসে কি ডাক্তারী করা চলে?

ও অমনি বলল, বেশ তুমি যাবে কিন্তু কথা দাও আমি যতদিন তোমার কাছে না আসি ততদিন একেবারে দরকার না পড়লে ডিসপেনসারি ছেড়ে বাইরে চিকিৎসার জন্য কোথাও যাবে না।

বললাম, [illegible] ঝিমি [illegible] না পড়লে আমি আমার [illegible] যাব না।

ঝিমি চুপচাপ [illegible] তারপর আমার [illegible] ফুল নাড়াচাড়া করতে [illegible] আমার তোমাকে [illegible]

[illegible] সারাজং।

বললাম, কথাটা জানি। এসেছে আমার [illegible] ঠিক বুঝতে পারি নি।

ঝিম্নি আমার কোলের ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বিছানার ওপর। বলল, খেয়ে ঘুমিয়ে শরীরটা বড্ড হেভি হয়ে যাচ্ছে তাই না?

বললাম, মোটেও না। তোমার শরীর নিয়ে কথা বলে কার স্পর্ধা। এমন একখানা দর্শনীয় ফিগার বিশখানা টিকা চুঁড়লেও মিলবে না।

আমার কথায় ঝিম্নি যে খুশী হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম ঝিম্নির কথান্তরে যাওয়া দেখে।

ও বলল, লোকে তোমাকে নরসিং বলে কেন জান? নরসিং দেবতা পাহাড়ী মেয়েদের সুস্থ সন্তান দেন আর সব রোগ সারিয়ে তোলেন।

বললাম, তোমাদের হাজারটি দেবতা আর অপদেবতার ঠেলায় গেলাম।

ঝিম্নি আমার মুখে সপ্তপর্ণীর পাতার মত তার হাতখানা চাপা দিয়ে বলল, এ্যাই, দেবতাকে নিয়ে খবরদার কথা বলবে না বলছি।

ও এক সময় হাত নামিয়ে নিলে আস্তে আস্তে বললাম, তুমি অশিক্ষিত পাহাড়ী নও ঝিম্নি। আধুনিক শিক্ষা পেয়েছ, সবকিছু বিচার করে দেখবার ক্ষমতা আছে তোমার। অকারণ কতকগুলো সংস্কার থাকবে কেন তোমার ভেতর?

ঝিম্নি চুপচাপ বসে রইল।

আমি বললাম, কিছুদিন আগের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি তোমাকে। রোগী দেখে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা টিকার পাশ দিয়ে আসার সময় দেখলাম, অনেকগুলো লোক জড়ো হয়েছে, কান ফাটিয়ে ড্রাম বাজছে। একটা ভেড়াকে চোখের সামনে বলি দেওয়া হল।

টাট্টু থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

[illegible]

[illegible]:

[illegible]
[illegible]
উদয়ে [illegible]
[illegible] হামারা
সম্পত্তি আরে
হামারা [illegible] আরে
হামারা কম [illegible] আরে......।

আরও অনেক মন্ত্র বলে গেল লোকটা। দ্বিতীয় দিন আমি পেশেন্টকে দেখে ফেরার পথে লোকটাকে ক্রমাগত তেমনি মন্ত্র পড়ে যেতে দেখলাম। বান্দুর মুখে শুনলাম, লোকটাকে নাকি চেলা বলে। ও সিন্দুবীরের আত্মাকে ডাকছে। রোজ একশো একবার লোকটা ঐ একই মন্ত্র পড়বে। এমনি একুশ দিন মন্ত্র পড়া আর পুজো চলবে। তারপর শাদ্দীর পোষাক পরে হুইসিল দিতে দিতে নাকি সিন্দুরী আসবেন। তিনি যত নষ্টের দেবতা। তাই তাঁকে শান্ত করার জন্যে এই চেষ্টা।

ঝিম্নি বলল, আমি উগ্র বীরেদ পোঁ সিন্দুবীরের কথা জানি ছোটে সাহেব।

বললাম, কিন্তু ঐ চেলার পরিণতির কথাটা তুমি জান না।

ঝিম্নি আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, একদিন একটা লোককে আমার ডিসপেন্সারিতে কয়েকজন পাহাড়ী মিলে বয়ে নিয়ে এল। দেখি সেই চেলা যে সিন্দুবীরের মন্ত্র আওড়াচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, কোন এক টিকায় লোকটা গিয়েছিল গণৎকার হয়ে। সেখানে ওর ওপর নাকি কোন দেবতার আত্মা ভর করে। সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের হাতে ধরা লোহার কড়া দিয়ে আঘাত করতে করতে শরীরটাকে রক্তাক্ত করে ফেলে। মুখে কিন্তু ক্রমাগত বাণী উচ্চারণ করে যায়। শেষে ঘণ্টাদুয়েক কাঁপতে কাঁপতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

ঝিম্নি বলল, ওর ওপর নরসিং দেবতার ভর হয়েছিল। দেবতার ভর না হলে ওরা

[illegible]

[illegible]
হয়েছিল ওর?

বললাম, [illegible] লোহার কড়া দিয়ে [illegible] করা ওদের অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ঐ করতে গিয়ে লোকটা [illegible] টিটেনাসে।

ঝিম্নি বিস্ময়ের একটা শব্দ করে উঠে বলল, মারা গেল?

বললাম, ওকার মৃত্যু সাপের হাতে আর এইসব লোকেদের মৃত্যু ওদের নিজেদের তৈরী মন্ত্রতন্ত্র আচার অনুষ্ঠানের হাতে।

দেখলাম, ঝিম্নির ঘোর তখনও কাটে নি। বললাম, চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তখন উপায় বড় একটা হাতে ছিল না। টিটেনাস স্টার্ট করে গিয়েছিল।

ঝিম্নি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, জানো, আমি বেশ বুঝি এসব বড় পুরনো সংস্কার এতে মানুষের ক্ষতিই হয়। তবু সংস্কারগুলো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারি না।

হেসে বললাম, এগুলোও এক ধরনের রোগ ঝিম্নি। তুমি যখন আমার কাছে একেবারে চলে আসবে তখন প্রথমেই তোমার সংস্কারগুলো সারিয়ে নেব। তারপর দুজনে মিলে ঐ সংস্কারগুলোকে সাফ করার জন্য টিকায় টিকায় বিজয় অভিযান চালাব।

ঝিম্নি হঠাৎ ওর দুহাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, তুমি দারুণ অবিশ্বাসী ছোটেসাহেব। তোমার কিছু হলে দেখো আমি মরে যাব।

বললাম, তোমাকে মরতে দিচ্ছে কে? বেকার ডাক্তারী শিখিনি। তাছাড়া অত সহজে তোমার ছোটেসাহেবের কিছু হবে না ঝিম্নি, নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমি আলো নিভিয়ে দিলাম। এ জগতে আমি আর ঝিম্নি ছাড়া কেউ নেই এখন। জানালার বাইরে সেই রহস্যময় উপত্যকা চাঁদের আলোয় আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মনে হল যে-তরুণীকে আমি বুকের ভেতর জড়িয়ে বসে আছি, সে ঐ সুপ্রাচীন পর্বতের মতই পুরোনো, ঐ রাতের উপত্যকার মতই চির রহস্যময়।

মনে মনে ভাবলাম, আমরা সবাই সংস্কারকে দূর করতে চাই, কিন্তু নিজেরা সৃষ্টির শুরু থেকে একটা অচ্ছেদ্য সংস্কারের বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছি। তাই আজ এই রাতে ঝিম্নির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল, ও ঝিম্নি নয়, ও একটি তরুণী যাকে আমি মনুষ্যসৃষ্টির আদি থেকে বুকে নিয়ে বসে আছি।

[illegible]

[illegible]

[illegible] অনেকক্ষণ [illegible]

[illegible] মেয়েকে [illegible] খেয়েছে। সে [illegible] এক বর্ণ বিচিত্র [illegible] বুকের মাঝে টেনে নিয়েছিলাম। আজ ভোরের ঝিমি একেবারে মুক্তবিহঙ্গ [illegible]। দৌড়ে দৌড়ে খেলছে ও। কালের [illegible] এক-একবার দারুণ বেগে দোল খাচ্ছে। বিনুনী কাঁধ টপকে বুকে ঝাঁকিয়ে পড়ছে। ভাগ্নুটা সমানে এদিক-ওদিক বল ছুঁড়ে ঝিমিকে বিব্রত করে তুলছে। ঝিমি কিন্তু বসে-থাকা ভাগ্নুর কোলের ওপর নিশানা করে বল ছুঁড়ছে।

আমি ছিলাম ওদের খেলার একমাত্র দর্শক। এখন আমরা তিনজন দেখছি ওদের খেলা। পূবের পাহাড়ে গাছের ডালপাতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখছে সকালের সূর্য। আর এইমাত্র পাশের আপেল গাছের ডালে তির্‌তির্ করে উঠে গিয়ে লেজ তুলে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে একটা কাঠবেড়ালী।

ঝিমি নিজের দেহটাকে নিয়ে কি অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে আশ্চর্য বাঁকচুর করতে পারে। আমি ঝিমিকে নতুন একটা রূপে দেখছি আজ। সবচেয়ে যেটা আমার চোখ আর মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, সেটা ঝিমির নিজস্ব একটা ছন্দ। সে-ছন্দ বারে বারে উচ্ছলিত হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসছে।

এক চিলতে ভোরের রোদে ও মাখামাখি হয়ে গেল। ওপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কতকগুলো গুঁড়ি গুঁড়ি মুক্তোর দানা ওর কপালে ফুটে উঠেছে।

হুড়োহুড়ি করে ঝিমি কিছুটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমার এখুনি ওকে ওপরে ডেকে নেওয়া দরকার। আমার পাশে বসে ও গল্প করবে আর সকালের হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে ওর ঘামের কুঁড়িগুলো।

কিন্তু আমি ওকে ডাকলাম না। লোভীর মত ওর শ্রমের মূল্যবান ফসলগুলো আমি কুড়োতে লাগলাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল আমার বাগানের রাস্তায়। বালু রোজকার মত উঠে আসছে ওপরে। ও একমনে পথ চলে। এদিক-ওদিক বড় একটা তাকায় না। আমি যে এ-সময় ওপরে বসে থাকি, তা ও জানে, তবু সামান্য কৌতূহল নিয়ে ওপরের দিকে একটি দিনও তাকাতে দেখিনি বালুকে।

ওর হাতে ফুল। জানি বাগানে যাবার যে ঝোপঝাড়, তার থেকে ছোট ছোট জংলী ফুলের গুচ্ছ সংগ্রহ করে আনে ও। তারপর আমার বসার আর শোবার ঘরের ফুলদানিতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে ফুল-

[illegible]

বালু। ঝিমি [illegible] থেকে আস্তে [illegible] কোলে [illegible] দিতেই খিলখিল করে [illegible] হেসে উঠেছে ভাগ্নু।

ঝিমি তখন বালুর মুখোমুখি। দুজনে দেখছে দুজনকে। সোনালী জলে স্নান করে দুটি তরুণী যেন মুখোমুখি সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে। একজনের মুখে রাজপুত তরুণীর আদল, অন্যজনের বিশুদ্ধ নাগরকোটীয় ব্রাহ্মণের চেহারা।

একটু পরেই বালু ঝিমির ওপর থেকে তার বিস্ময়ে ভরা চোখের দৃষ্টি তুলে নিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়াল। চোখদুটো পথের ওপর, শান্ত পা ফেলে এগিয়ে আসছে। মুখখানা থমথমে। হঠাৎ ভাবনায় একটা ঢেউ লেগেছে।

ঝিমি চঞ্চল পায়ে ছুটে এল ওর কাছে। তুমি বালু?

বালু থেমে গিয়ে অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে জানাল ওর অনুমান ঠিক।

ঝিমি বলল, বাঃ ফুলগুলো তো ভারী সুন্দর। ভায়োলেট রঙের। ডাল ভরে ছড়িয়ে আছে। একদম তাজা।

বালু কি মনে করে ওর হাতে ফুলগুলো তুলে দিল।

ঝিমি বলল, চল আমরা দুজনে মিলে সাজাই।

বালু নতুন পরিস্থিতিতে কিছুটা আড়ষ্ট মনে হল। ঝিমি কিন্তু খুব স্বাভাবিক আচরণে নিজেকে ফুটিয়ে তুলল।

ওরা ঘরের ভেতর ঢুকে গেলে আমি আর ওদের দেখতে পেলাম না।

নিজেদের ভেতর ওরা কি কথা বলছে আমি জানি না। ঝিমি বুদ্ধিমতী আর

[illegible]

[illegible] হয়েও [illegible]

ঝিমি [illegible] আমার পাশে এসে চুপি চুপি [illegible] বালু মেয়েটি কিন্তু চমৎকার।

বললাম, এত তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট পেয়ে গেল? পরীক্ষায় বসতে না বসতেই ডিস্টিংশনে পাশ!

ঝিমি চলে যেতে যেতে এক ঝলক চাউনি হেসে বলল, পারবে না? আর দিয়ে দেখতে হবে তো।

বললাম, আমাকে আর এর ভেতর টানাটানি কেন? তোমাদের বোঝাবুঝি তোমরাই কর।

খাবার ঘরে ডাক পড়তে দেখি, দুজনের ইতিমধ্যে হোলি অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে। চা তৈরী করছে বালু, আর প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে ঝিমি।

ঘরে ঢুকেই বললাম, আজ কিছু ভালমন্দ ভাগ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে।

বালু মুখ তুলল না, খুললও না।

ঝিমি বলল, আজ ভাল যা কিছু লাগবে তা বালুর, আর বিস্বাদ সবটাই আমার।

বালু ঝিমির দিকে একবার শুধু অর্ধ পূর্ণ চোখে তাকাল, তারপর নিজের মনে কাপে চা ঢেলে চলল।

ঝিমির পরিচয় আমি বালুর কাছে কোনদিনই দিইনি। অকারণ একটি মেয়ের মনে অন্য একটি মেয়ে সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়ে লাভ কি। তাই ঝিমির কথা বালুর কাছে বলার প্রয়োজনই বোধ করিনি।

[illegible]

এক সময় ঝিমির গলা বেজে উঠল, আজ তোমার চেম্বার খুলবে না ছোটে-সাহেব?

দেখলাম, বালু চোখ তুলে ঝিমির দিকে চেয়ে রইল। ঝিমি আমাকে ছোটে-সাহেব বলে ডেকেছে, তার অর্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা—তাই হয়ত সে খুঁজতে লাগল ঝিমির চোখেমুখে।

বললাম, রোববারেও কি একটু জিরোতে পাব না ঝিমি। ডাক্তার বলে কি প্রাণটা পেসেন্টের হাতে উৎসর্গ করে দিয়ে বসে থাকব!

ঝিমি বলল, অনেক দূর থেকে এসেছি ছোটেসাহেব, চলে যাব দুপুরেই। অন্তত একটা রোগীকে দেখে তোমার নিয়মভঙ্গ কর। ডাক্তাররা সব সময়েই স্পেশাল কেস কনসিডার করে।

হেসে বললাম, কর্মবিরতির দিনে রোগী দেখতে গেলে কিন্তু ডাবল ফি লাগবে। তাছাড়া আমার অ্যাসিসটেন্টের ফি-ও আছে।

হঠাৎ কথাটির শেষ অংশ নিজের কানেই কেমন ঠেকল। তাকিয়ে দেখি, ঝিমির মুখখানায় কে যেন সেই মুহূর্তে একমুঠো রাঙা আবীর ঘষে দিয়েছে। ওর ঠোঁটে ঠেকানো চায়ের কাপ, চুমুক দিতে ভুলে গেছে ঝিমি।

ব্যাপারটা বালুর কাছে পরিষ্কার নয়, তাই সে চুপচাপ বসে রইল।

আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে আমি অকারণে একটু যেন রুক্ষ হয়ে উঠলাম। বালুকে লক্ষ্য করে বললাম, আজ তো তোমার কোন কাজ নেই বালু, তুমি বরং আসতে পার। আবার যখন দরকার পড়বে তখন খবর পাঠাব।

[illegible]

ঝিমি কিন্তু হাত বাড়িয়ে [illegible] বালুকে।

এখুনি পালাচ্ছ কোথায়? অ্যাসিস্ট্যান্টের ফি-ও ডবল করে দেব, ভয় নেই।

বালুকে এমন করে কাঁদতে আমি কোনদিন দেখিনি। ঠায় দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে আছে বালু। ফোঁটা ফোঁটা জল মেঝেতে পড়ে বকুল ফোটাচ্ছে।

আমি অপরাধীর মত ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। আসতে আসতে দেখলাম, ঝিমি উঠে দাঁড়িয়ে আহত বালুকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমি ওপরে আমার শোবার ঘরে চলে এলাম। সামান্য দুটো কথা দুটি মনে কি অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে তাই ভাবতে গিয়ে নিজের অবিবেচনায় নিজের ওপরই দারুণ ক্ষোভ হল।

অনেকক্ষণ আমি ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে রইলাম, কিন্তু ঝিমি অথবা আর কেউ এল না।

হঠাৎ চোখ পড়ল ভ্যালির ওপর। বালু চলে যাচ্ছে। মন্থর পা টেনে টেনে তার কোঠির পথে চলেছে সে। বিষণ্ণতার একটি মূর্তি যেন আলোকিত পথের ওপর দিয়ে ছায়ার মত সরে সরে যাচ্ছে। চারদিকে চঞ্চলতা। সবুজ বৃক্ষের সমারোহ, কুহুলের কুলুধ্বনি, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফের ঝকঝকে বিস্তার। তারই ভেতর একটি আহত হৃদয় অন্ধকারের গুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে নিয়ে চলেছে।

দূরে থেকে আমার সমস্ত হৃদয় বালুর জন্যে হাহাকার করতে লাগল। আমি কেন তাকে আঘাত দিলাম, নিজে কেন এত ছোট হয়ে গেলাম নিজের কাছে, এই অনুশোচনায় আমার সমস্ত মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

আমি অনুচ্চারিত গলায় বলে চললাম, বালু, তুমি আমার চেয়ে ছোট, তবু আমি নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোমার কাছে। আমি অন্তর থেকে চাইনি তোমাকে আঘাত করতে। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বালু। তুমি ফিরে এলে বুঝবে তুমি আমার মুগ্ধতাকে ম্লান করেছ।

ঝিমি ঘরে এসে ঢুকল, শ্যাম্পুর একটা অতি মিষ্টি মৃদু গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে। ওর দিকে চেয়ে দেখি, স্নান সেরে মাথার

[illegible]

আমিও কম আহত হইনি।

ঝিমি চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ আমার হাতের আঙুলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। একসময় আমার দিকে সোজা ওর চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, একটা কথা আজ আমাকে বলতে দেবে?

বললাম, আজ সবার ভর্ৎসনা কুড়োবার জন্যে আমি তৈরী, বল কি বলবে।

ঝিমি বলল, তোমাকে কোন দোষ দেবার কথাই আসছে না শুধু একটা সত্য তোমাকে জানাতে চাই।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, বল।

ঝিমি অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় বলল, বালু তোমাকে ভালবাসে।

সমস্ত ঘরের ভেতর ঝিমির ঐ কথা বার বার বাজতে লাগল। একসময় আমার মনে হল, ঐ শব্দগুলো এক ঝাঁক তোতার মত উড়ে চলে গেল ভ্যালি পেরিয়ে ওপারের টিলায় বালুর কোঠী লক্ষ্য করে।

আমি স্তব্ধ গাম্ভীর্যে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললাম, কারো ভালবাসার খবর রাখার অবসর আমার খুব কম [illegible]।

ও অমনি হেসে ফেলল। বলল, আমার বেলাতেও তাই নাকি?

বললাম, বালুর কথা বলে তুমি আজ একটা গুরুতর রসিকতা করে বসলে ঝিমি। তোমার এ ধরনের কথা শুনব বলে আমি তৈরী ছিলাম না। বালু যদি তোমাকে একথা বলে থাকে, তাহলে তার সাহস সীমা ছাড়িয়েছে বলতে হবে।

হয়ত ঝিমি আমার এই খর উত্তাপে ভরা কথাগুলো শুনে মনে মনে খুশিই হল। আমি যে অন্য নারীকে কোন রকমে প্রশ্রয় দিইনি, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা করতে পেরে নিশ্চয়ই ঝিমি আশ্বস্ত হয়ে থাকবে। তবু সে আমার হাতখানা তুলে ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, এত রাগ করছ কেন? তাহলে তো কোন কথাই কোনদিন তোমাকে বলা যাবে না।

আমি চুপচাপ কিছু সময় বসে থেকে বললাম, তোমার এ ধরনের অনুমানের কারণটা আমাকে জানাবে?

(ক্রমশঃ)

সোভিয়েত সয়ুজ ও মার্কিন অ্যাপোলো— পৃথিবীর কক্ষপথে ঐতিহাসিক সম্মিলন

গ্রীনিচের সময় ১৬০৯ (অর্থাৎ বিকাল ৪টা ৯ মিনিট), ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ৩৯ মিনিট। তারিখ ১৭ জুলাই ১৯৭৫। এই দিনে এই সময়ে মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে বিরাট এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল—সোভিয়েত ইউনিয়নের সয়ুজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলোর সম্মিলন, বা একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ (ইংরেজিতে বলা হয় ডকিং)। সম্মিলন পৃথিবীর মাটিতে নয়, আকাশে—দুই মহাকাশযানের পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমারত অবস্থায়। এমনিতে ব্যাপারটা নতুন নয়, ইতিপূর্বেই পৃথিবীর আকাশে কক্ষ-পরিক্রমারত অবস্থায় মহাকাশযানের সঙ্গে মহাকাশযানের (সয়ুজের সঙ্গে স্যালিয়ুৎ-এর, অ্যাপোলোর সঙ্গে স্কাই-ল্যাবের) সম্মিলন ঘটে গিয়েছে, কিন্তু তা ছিল একই দেশের দুই মহাকাশযানের মধ্যে। মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রথম দুই দেশের দুই মহাকাশযানের সম্মিলন—সোভিয়েত ইউনিয়নের সয়ুজের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলোর।

এতদিন মহাকাশ-গবেষণা চলছিল মহাকাশ-গবেষণার দুই বিরাট শক্তির দেশ থেকে পৃথক পৃথকভাবে, কিছুটা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে। অথচ মহাকাশ-গবেষণা এমনই এক বিরাট খরচের ব্যাপার যে বিপুল বিত্তশালী না হলে কোনো একটি দেশের পক্ষে এই গবেষণা সার্থকভাবে শুরু করা সম্ভব নয়। একমাত্র চাঁদে মানুষ পাঠাতে গিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খরচ করতে হয়েছে আড়াই হাজার কোটি ডলার। মহাকাশ-গবেষণার ধরনই এমন যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথেই তা সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যখন কক্ষপথে পরিক্রমা শুরু করে তখন গোটা বিশ্বকেই সে প্রদক্ষিণ দেয়—পৃথক পৃথক দেশ বিচার করে না। তাছাড়া এমন দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে যে মহাশূন্যে বিচরণকালে কোনো একটি মহাকাশযান বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তার নভশ্চরদের অবিলম্বে উদ্ধার করা দরকার—তখন কি অপেক্ষা করে থাকতে হবে যতক্ষণ বিপদগ্রস্ত মহাকাশযানটি যে-দেশের সেই দেশেরই জন্য একটি মহাকাশযান উদ্ধারকার্যের জন্য উপস্থিত হয়? এমনও তো হতে পারে সেই বিশেষ দেশে অন্য কোনো মহাকাশযান তখন তৈরি অবস্থায় নেই, অথচ অন্য দেশের মহাকাশ-যান হয়তো ছিল এবং অনায়াসেই উদ্ধারকার্যের জন্য উঠে আসতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে একদেশের মহাকাশযানের সঙ্গে অন্য দেশের মহাকাশযানের সম্মিলন বা ডকিং ঘটার ব্যবস্থাটি থাকা দরকার। সয়ুজ ও অ্যাপোলোর সম্মিলনের মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থাটির পত্তন হল। শুরু হল এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যুগ।

সয়ুজ ও অ্যাপোলোকে পৃথিবীর কক্ষপথে সম্মিলিত করাবার জন্য বহু রকমের প্রস্তুতি ও বহুবিধ সমস্যার সমাধানের [illegible] ইত্যাদি।

[illegible] অ্যাপোলোর উৎক্ষেপণের [illegible] মাসের [illegible] বন্ধ ছিল। তা [illegible] বছর ধরে সোভিয়েত ও মার্কিন [illegible] বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট ছিলেন এবং [illegible] দেশে গিয়ে পরস্পরের মহাকাশযানের ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সমস্যা যে কত রকমের ছিল ও ব্যবস্থা যে

শিল্পীর অঙ্কনে অ্যাপোলো-সয়ুজ পরিক্রমার দৃশ্য। ছবিতে দেখা যাচ্ছে উৎক্ষেপণের রকেট, পৃথিবীর কক্ষপথে সম্মিলিত দুই মহাকাশযান, পাঁচজন নভশ্চরের প্রতিকৃতি ও অভিযানের প্রতীক। এই পাঁচজন নভশ্চর হচ্ছেন (ঘড়ির কাঁটা ঘোরার দিকে, প্রতীক থেকে শুরু করে) টম স্ট্যাফোর্ড, ডোনাল্ড স্লেটন ও ভান্স ব্রান্ড (তিনজনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের), ভ্যালেরি কুবাসভ ও আলেক্সেই লিওনভ (উভয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের)।

যুক্ত হবনের সময়ে হয়েছিল সে-সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দেবার জন্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

সয়ুজ ও অ্যাপোলো তৈরি হয়েছিল দুই ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর কক্ষপথে এই দুটিকে সম্মিলিত করে যদি যৌথ অভিযান চালাতে হয় তাহলে প্রথমেই দরকার মহাকাশযান দুটি যাতে যুক্ত হতে পারে সেই ব্যবস্থা। অর্থাৎ ডকিং ব্যবস্থা। তারপরে চলাচল ও যোগাযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

স্থিরহলো ডকিং-ব্যবস্থাটি গড়ে তোলার জন্য উভয় দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সয়ুজ ও অ্যাপোলোর ডকিং ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তা ছিল যাকে বলা হয় সক্রিয় সেই জাতীয়—সয়ুজ সম্মিলিত হত স্পেস-স্টেশন স্যালিয়ুৎ-এর সঙ্গে, অ্যাপোলো সম্মিলিত হত স্পেস-স্টেশন স্কাইল্যাবের সঙ্গে। ফলে স্যালিয়ুৎ ও স্কাইল্যাব শুধুই অপেক্ষা করে থাকত, সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করত সয়ুজ ও অ্যাপোলো। আর তাই স্যালিয়ুৎ ও স্কাইল্যাব নিষ্ক্রিয়, সয়ুজ ও অ্যাপোলো সক্রিয়। কিন্তু এবারের সংযোজন সয়ুজের সঙ্গে অ্যাপোলোর—কাজেই একটির ডকিং ব্যবস্থা হওয়া চাই সক্রিয়, অপরটির নিষ্ক্রিয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি এমন হওয়া দরকার যাতে প্রয়োজন হলে সয়ুজ সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে, প্রয়োজন হলে অ্যাপোলো। সয়ুজ যখন সক্রিয় থাকবে অ্যাপোলো হবে নিষ্ক্রিয়, অ্যাপোলো যখন সক্রিয় হবে সয়ুজ নিষ্ক্রিয়। একারণে ডকিং ব্যবস্থা হওয়া চাই একই সঙ্গে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়।

এমনি অবস্থায় সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা নিজ নিজ দেশের মহাকাশযানের জন্য যে বিশেষ ধরনের ডকিং ব্যবস্থা গড়ে তুললেন তাকে বলা হয় অ্যান্ড্রোজিনাস বা উভলিঙ্গ (উদ্ভিদবিদ্যার ভাষায়)। এমন-এক ডকিং ব্যবস্থা যা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই-ই। এটিকে বলা যেতে পারে সার্বিক ব্যবস্থা, এমনি ব্যবস্থা সমন্বিত হলে যে-কোনো মহাকাশযানের সঙ্গে যে-কোনো মহাকাশযান যুক্ত হতে পারে। এমনি হলে পরেই, মহাশূন্যে অবস্থানকালে কোনো মহাকাশযান যদি বিপদে পড়ে এবং সেই মহাকাশযানের নভশ্চরদের অবিলম্বে উদ্ধার করতে হয়, তাহলে যে-কোনো দেশের মহাকাশযান আকাশে উঠে আসতে পারে এবং সার্বিক ডকিং ব্যবস্থা থাকার দরুন সেই বিপন্ন মহাকাশযানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অ্যাপোলো-সয়ুজ সম্মিলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল অ্যাপোলো।

সম্মিলনে দ্বিতীয় বাধা ছিল দুই মহাকাশযানের ভিন্ন ভিন্ন আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা। অ্যাপোলোতে আভ্যন্তরিক আবহাওয়া তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন, ২৬০ মি-মি চাপে। আর সয়ুজে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ, ৭৬০ মি-মি চাপে (পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যা স্বাভাবিক চাপ)। কাজেই অ্যাপোলোর নভশ্চরদের সয়ুজে আসতে হলে কিংবা সয়ুজের নভশ্চরদের অ্যাপোলোতে, আভ্যন্তরিক বায়ু ও চাপের ভিন্নতাই একটা মস্ত প্রতিবন্ধক। তখন স্থির করা হল যে সয়ুজের আভ্যন্তরিক বায়ুর চাপ কমিয়ে আনা হবে ৫২০ মিলিমিটারে, এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা তৈরি করবেন একটি ডকিং মডিউল (এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে যেতে হলে এই এই মডিউল পার হতে হবে এবং ভিন্ন আবহাওয়ার জন্য নভশ্চর প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারবেন)।

সমস্যা ছিল আরো বহুবিধ—যোগাযোগের সমস্যা, সংকেত পাঠাবার সমস্যা ইত্যাদি। গত তিন বছর ধরে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কখনো সোভিয়েত ইউনিয়নে এক-সঙ্গে বৈঠক করে ও বহু পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান করেছেন। আকাশে ওঠার আগে মাটিতে থেকেই দুই মহাকাশযানের মডেল বানিয়ে ডকিং ব্যবস্থা পরখ করা হয়েছে এবং দুই দেশের নভশ্চররা কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে কখনো সোভিয়েত ইউনিয়নে থেকে একে অপরের মহাকাশযানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

এই কারণেই বলা হচ্ছে, পৃথিবীর কক্ষপথে দুই দেশের দুই মহাকাশযানের মধ্যে এই যে সম্মিলন তা একদিকে যেমন মহাকাশবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি হয়তো বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রেও। রাজনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় দাঁতাত বা উত্তেজনা-প্রশমন তার সহায়ক হতে পারে মহাকাশবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুই দেশের বিজ্ঞানীদের ও প্রযুক্তিবিদদের সহযোগিতা। হাউস্টন ও বাইকোনুর-এর কল্যাণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি সম্প্রীতির আবহাওয়া প্রবাহিত হয় তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।

সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা সয়ুজ-অ্যাপোলোর সম্মিলনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কয়েকজনের মত উদ্ধৃত করা চলে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তিনজন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় বিজ্ঞানীর।

সোভিয়েত ইউনিয়নস্থিত মহাকাশের পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পরিষদ বা ইন্টারকসমস-এর সভাপতি বোরিস পেত্রোভ বলেছেন, 'মহাকাশ গবেষণাবিদ্যার অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশের দুই মহাকাশযানের ডকিং বা সম্মিলন এক নতুন পর্ব। এতে সূচিত হচ্ছে মহাকাশ গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক প্রকল্পের এক নতুন যুগ। এতে স্থাপিত হচ্ছে দুরূহ সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে হয় তার দৃষ্টান্ত।' উল্লেখ করা চলে, অ্যাকাডেমিসিয়ান বোরিস পেত্রোভ ছিলেন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদলের নেতা, যাঁরা মস্কোতে ও হাউস্টন-এ অ্যাপোলো-সয়ুজ যৌথ কর্মসূচী সম্পর্কিত সমস্ত প্রযুক্তিক প্রশ্নের মীমাংসা করেছিলেন।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান বলেছেন, 'অ্যাপোলো-সয়ুজ পরীক্ষাকার্যের প্রকল্প এক ঐতিহাসিক ঘটনা, কেননা এতে সূচিত হচ্ছে বিশ্বের দুই প্রধান মহাকাশ শক্তির মধ্যে সহযোগিতা। পরীক্ষাকার্যটি কৌতূহলোদ্দীপক শুধু এ-কারণে নয় যে এটি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম মুখ্য সহযোগিতা, এ-কারণেও যে এই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক মহাকাশ প্রকল্পের সময়ে অ-সমস্ত পরীক্ষাকার্যের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলির পক্ষে তার তাৎপর্য খুবই বেশি।' অতঃপর তিনি শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও প্রসঙ্গক্রমে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'বিজ্ঞানে বৃহদাকার প্রকল্প রূপায়িত করতে হলে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা হচ্ছে তার একমাত্র রূপ। যদি বিশ্বের দেশগুলি একত্রিত হয় ও সহযোগিতা করে তাহলে সবার আগে হ্রাস পাবে খরচ এবং বিজ্ঞানের উপকার সকলের কাছে পৌঁছবে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সবসময়েই সহযোগিতায় বিশ্বাস করে এসেছে। শিল্প সংস্কৃতিতে ও শিক্ষায় বন্ধুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে সহযোগিতা করার জন্য দুই দেশের মধ্যে রয়েছে এক ঐতিহাসিক চুক্তি। রয়েছে দুই দেশের মহাকাশ এজেন্সিগুলির মধ্যে এক বিশেষ মতৈক্য। বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে আট কি দশ বছর আগেই যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি মিনস্ক কম্পিউটর ও একটি দৃষ্টি-নিরূপণকারী হেলিকপ্টার দিয়ে আমাদের রকেট উৎক্ষেপণ স্টেশনকে সাহায্য করেছিল। তারপর থেকে উভয় দেশের বহু যৌথ উদ্যোগ কার্যকর হচ্ছে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প—এপ্রিল মাসে একটি বহনকারী সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে প্রথম ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমি এবং ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবিষয়ে একমত হয়েছে যে এই সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিত করা হবে। আমাদের পরবর্তী প্রকল্প আরেকটি কৃত্রিম উপগ্রহ, যেটি বর্তমানে নির্মীয়মান। এই কৃত্রিম উপগ্রহটিও সোভিয়েতের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত হবে।'

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ প্রকল্পের অধিকর্তা ডঃ ইউ আর রাও বলেছেন, 'সোভিয়েত ও মার্কিন নভশ্চরদের যৌথ উড্ডয়ন নিশ্চয়ই হতে চলেছে বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ও বিশেষ করে মহাকাশ-গবেষণা বিদ্যার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মহাকাশ এক অতি নিরেট ভ্যাকুয়াম যেখানে মাধ্যাকর্ষণ খুবই কম এবং প্রচুর উত্তাপ উৎপন্ন করা চলে। ভারহীন অবস্থায় সম্পন্ন করা চলে বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য। বিশ্ব বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের পক্ষে তা হবে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা অতিমাত্রায় ফল-

বর্তমান ইংরেজ মহিলা
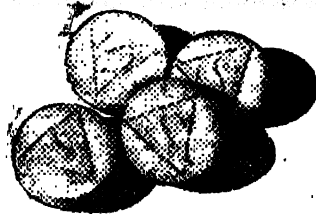
বর্তমান শতকের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার অন্য অনেক উন্নত দেশের মত নিজের দেশেও নারীকে পুরুষের সংগে সমমর্যাদা দেওয়ার জন্য নানারকম আইন প্রণয়ন করেছেন। আইন প্রণয়নের তখনই প্রয়োজন হয় যখন মানুষ কুসংস্কার ও বহুদিনের মজ্জাগত অভ্যাসকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। অবশ্য স্ত্রীলোকের রাজনৈতিক অধিকার ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে একেবারে নতুন কিছু ব্যাপার নয়। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা আগেই নানা অধিকার অর্জন করেছেন। সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেবার ক্ষমতা ১৯২৮ খৃঃ তাঁরা অর্জন করেছেন। ইংরেজ মহিলারা বর্তমানে হাউস অব কমন্স, হাউস অব লর্ডস-এ নির্বাচিত হওয়ার অধিকারিণী, মিনিস্টার অব দি ক্রাউন, মেয়র, ক্যাবিনেট মন্ত্রী, চিফ হুইপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদলাভেও তারা পুরোপুরি সুযোগ পাচ্ছেন। মিসেস বারবারা ক্যাসেল ও মিসেস শিরলে উইলিয়ামস ইংল্যাণ্ডের দুই প্রধান ক্যাবিনেট মন্ত্রী। সেখানকার প্রধান বিরোধী রক্ষণশীলদলের নেতা হচ্ছেন মিসেস মার্গারেট থ্যাচার। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলির ইতিহাসে প্রধান বিরোধীদলের মহিলা নেতা হবার নজির খুব একটা বেশী নেই।

আইনের চোখে নারীর অধিকার ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে স্বীকৃত। তারা স্বাধীনভাবে সম্পত্তি কেনাবেচা করা, চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া, ক্ষতিপূরণ দাবী করা—এমন কি স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেবার অধিকারও রাখেন। অনুরূপভাবেই আইনের চোখে মেয়েরা অপরাধী প্রতিপন্ন হলে পুরুষের সমান সমান শাস্তিই ভোগ করে থাকেন। সম্পত্তি ও সন্তানাদির ওপর স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার বর্তমান।

আইনত সমান অধিকার লাভ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে সুযোগ সুবিধা কম ভোগ করে থাকেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ধরা যাক। এসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা ব্যাঙ্ক তথা অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে নানারকম ঋণ ও সাহায্য পেয়ে থাকেন। মহিলারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে গেলে ততখানি ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পান না।

বিশ বছর আগের তুলনায় বর্তমানে মেয়েদের কর্মব্যস্ততাও অনেক বেড়েছে। আগে অনেক মহিলাকে দেখা যেত বিয়ের পর তাদের চাকরী থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছে। এখন দেখা যায় বিয়ের পর সন্তানাদি জন্মাবার আগে পর্যন্ত তাদের নির্বিবাদে চাকরী করতে কোন অসুবিধা নেই। মহিলা চাকুরীজীবীদের মধ্যে শতকরা বাষট্টি জনই হচ্ছেন বিবাহিতা। আগে যেমন স্কুল ছাড়ার পর মেয়েরা চাকরীতে ঢুকতেন এবং মা হওয়ার পর তাদের অধিকাংশকেই চাকরী ছেড়ে দিতে হতো। এখন দেখা যায় অনেক মহিলা মা হওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন চাকরী চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন সমাজব্যবস্থার সংগে স্ত্রী-কর্মী ও মালিকপক্ষ খাপ খাইয়ে উঠতে পারছেন না। তাই দেখা যায় চাকরীর ক্ষেত্রে মাইনে, উন্নতি প্রভৃতিতে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সুযোগ অনেকটা কমে আসছে। মেয়েদের অনেকেই নিম্নস্তরের কর্মী কারিগরী দক্ষতা লাভের সুযোগ তাদের মধ্যে কম। যদিও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য কিছুটা বেশী কিন্তু উচ্চমানের শিক্ষাদানে তাদের সংখ্যা বর্তমানে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। সন্তানের প্রতি যত্ন নেওয়া ও মাতৃত্বই এর কারণ।

ইংল্যাণ্ডে বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার ফলে স্ত্রীলোকের—সন্তানাদির সংখ্যা গড়ে দুইজন এবং দেখা যায় কোন মহিলার ৪৫ বৎসর বয়সের আগেই তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বয়স হয় ১৫। এই মহিলা সাধারণক্ষেত্রে আরও ৩৫ বৎসর হয়তো বাঁচেন। সেক্ষেত্রে তিনি আরও ১৫ বৎসর স্বাচ্ছন্দে, নির্ভাবনায় কাজ করতে পারেন কারণ তার সন্তান পালন ও গৃহস্থালীর কাজ তখন অনেকটা কমে যায়। যদি তিনি চাকুরী না করেন তবুও তিনি গৃহস্থালীর দিকে অধিক মনোযোগ দিতে পারেন। ফলে সংসারের অনেক খরচ বেঁচে যায়। এভাবে বর্তমান সমাজব্যবস্থা স্ত্রীলোকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

স্ত্রীলোকের বেতনের সমতারক্ষার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর এই আইন কার্যকরী হওয়ার কথা। প্রথমতঃ চাকরী পাওয়ার পর চাকরী করা কালীন অবস্থায় পুরুষ কর্মীদের মত সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া। দ্বিতীয়তঃ একই ধরনের কাজে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ হলেও উভয়ের কাজের মূল্যায়নে সমতারক্ষার প্রচেষ্টা। তৃতীয়তঃ বেতনের ব্যাপারে সমতারক্ষা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য একটি তদারকি বোর্ডের নিয়োগ করা।

এই আইন কার্যকরী হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন কোন সংস্থার পাঁচ কিংবা তার নীচে কর্মীদের কোন কারখানার কাজে নিযুক্ত করলে কোন স্ত্রীলোক সেখানে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। কতগুলি কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষদেরই পাঠানো হয়। অন্যান্য শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কোন ভেদাভেদ নেই। কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ কোন কোন বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্যে বিশেষ পুরুষ অথবা মহিলাকে সুযোগ দেওয়ার নিয়ম আছে। অন্যান্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষা এবং শিক্ষানবিশীতে সমান সুযোগ দেয়। যেখানে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি আলাদা রয়েছে তাদেরকেও একই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদের কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। যেমন চিকিৎসাক্ষেত্রে মেয়েদের নার্সিংহোম ও পৃথক ওয়ার্ড। ধর্মীয় উপাসনার বেলায় ও অনেক সময় স্ত্রীলোকের পৃথক ব্যবস্থাকে সসম্মানে স্বীকার করায় কোন আপত্তি নেই। অন্যান্য বিউটি পার্লার, ক্লাব-রুম, টয়লেট প্রভৃতি স্থানে সমান অধিকারের নামে একীভূত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। নতুন আইনে একথাও বলা আছে যে কেউ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ সাধারণ ব্যক্তির কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেন তবে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দাবী করা চলবে না।

১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী দেশের শ্রমজীবী মানুষের শতকরা ৩৭ ভাগই ছিলেন মহিলা। এই সংখ্যা ১৯২১ এবং '৫১ সালে ছিল যথাক্রমে ২৭ ও ৩১ ভাগ। মহিলা শ্রমজীবীদের মধ্যে ১৯৭১ সালের গণনা অনুযায়ী শতকরা ৬২ জনই হচ্ছেন বিবাহিতা। এই সংখ্যা ১৯২১ ও '৫১ সালে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৩ ও ৩৮ জন। আবার ১৯৭১ সালের গণনা থেকে জানা যায় শতকরা ২৪ জন মহিলা শ্রমজীবীদের বয়স হচ্ছে ৪৫ থেকে ৬৪-র মধ্যে।

মহিলাদের শ্রমের এক বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটেছে। আগে যেখানে শিক্ষাসমাপনের পর এবং মাতৃত্বের মাঝখানে তাঁরা চাকুরী করতেন আজ মাতৃত্বের বহুকাল পরেও তাঁরা তাঁদের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অর্থ উপার্জন করে চলেছেন।

পুরুষের সমান অধিকারের দাবী করতে গেলে অনেকক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক পরিশ্রমের কথাও আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। সংসারজীবনে এমন বিশেষ বিশেষ সময় আসে যেমন সন্তানাদির অতি শৈশবকাল। এই সময় অধিকাংশ মায়েদের তার কর্মক্ষেত্রের চেয়েও সন্তানাদির দিকে বেশী নজর রাখাই স্বাভাবিক। ইংল্যাণ্ডের সমাজব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মহিলাদের বিশেষ বিশেষ সময়ে পারিবারিকক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধার কথা চিন্তা করে স্কুলের শিক্ষান্তে ও মাতৃত্বের মাঝখানে এবং ৪৫ থেকে ৬০ বৎসরের মাঝখানের সময়কে মহিলাদের চাকরীর আদর্শ সময় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

অঞ্জলি চৌধুরী

স্বাধীনতা

শিশির দাস

উঁচু নিচু বনানীর উজ্জ্বল অসীমতা। ওপরে নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ। সামনে নীল সমুদ্রে রোদের ঝলকানি।

আগের রিকসাটায় পাঁচ বছরের ছেলে কঙ্কণকে পাশে নিয়ে ঈশানী পুরীর সমুদ্রকে প্রথম দেখল। গভীর বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ এক অনুভূতি ওর কাছে অনন্তের আহ্বানের মতো মনে হোল। ও রিকসার ক্যাম্বিসের পর্দা সরিয়ে পিছনের রিকসার দিকে ফিরে তাকাল। ও রিকসায় ঋতেশ আর উত্রী সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে, ঋতেশ হঠাৎ সমুদ্রের দিকে হাত তুলে উত্রীকে কিছু বলল।

ঈশানী মুখ ফিরিয়ে মনে মনে বলল, ঋতেশ আমার বর, আমি ভালোবেসে ওকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু উত্রী আমার কে!

জগন্নাথ মনে পড়ল, কুঁজির মাথায় জালপথ চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে ঋতেশ দুখানা রিকসা ঠিক করে ফেলল।

তারপর কঙ্কণকে সামনের রিকসায় তুলে দিয়ে বলল, 'ঈশা, তুমি কঙ্কুকে নিয়ে বসো।' ঈশানী ঋতেশের মুখ দেখছিল। কথা না বলে ও কঙ্কণের পাশে গিয়ে বসল। সারা রাত্রি না ঘুমিয়ে ট্রেনে কেটেছে, মাথার মধ্যে আচ্ছন্নতা আছে। তবু রিকসায় আসতে আসতে উত্রী আর ঋতেশের ঝলমলে উচ্ছকিত হাসিতে মাঝে মাঝেই এই সারাটা পথ ধরে ও চমকে চমকে উঠেছে। এখন ঋতেশ সমুদ্র দেখাচ্ছে উত্রীকে। অসীম অনন্ত সমুদ্রকে দেখে ঋতেশের বুক কেঁপে উঠল না!

হোটেলে চিঠি দেওয়া ছিল। দোতলায় সমুদ্রের দিকে একখানা 'টু-সিটেড' ঘর পাওয়া গেল। লাগাও স্নানের ঘর। সামনের বারান্দায় বসে সমুদ্রের রং-বেরংয়ের উন্মাদনা দেখে দেখে সময় কেটে যাবে। ঘরে বেডিংপত্র রেখে ওরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে গিয়ে বসল। মাঝখানে ঋতেশ, দুপাশে ঈশানী আর উত্রী, ঈশানীর পায়ের কাছে কঙ্কণ। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ওরা। প্রথমে ঋতেশ বলল, উত্রী, আমরা সুন্দর ঘর পেয়েছি, তাই না?

উত্রীর তরুণ তমালবৎ শরীর। লম্বাটে সুন্দর মুখে সরু টানা টানা চোখ, সুন্দর দাঁতের সারি। আদুরে ঝংকারময় গলায় নাকছাবি-পরা মাকে কামার্ত ঠোঁটে অদ্ভুত ভঙ্গি করে নিঃশব্দে হাসি ছড়িয়ে বলল মেয়েমানুষের সঙ্গে শুতে আমার ঘেন্না লাগে।

উচ্ছ্বসিত হেসে ঋতেশ বলল, তোমার মত মনের কথা এত খুলে কেউ বলে না।

ঋতেশ সুপুরুষ। চিবুকে, ঠোঁটে, বড় বড় চোখে, রুক্ষ চুলে সুগঠিত লাবণ্যময় শরীরে ওর পৌরুষের মাদকতা।

ঈশানী ব্যক্তিত্বময়ী, ওর শান্ত এবং বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর গড়নে একধরনের গাম্ভীর্য আছে, লাজুকে কঠোরে ও মোহময়ী।

ঈশানী হেসেই বলল, অন্যায়!

উগ্রী বলল, ঈশানী, তোমাদের সংগে আমার অসার ব্যাপারে কি করে তুমি মত দিলে?

ঈশানী বলল, মত না দিলে উপায়? তোমার [illegible]—

উগ্রী [illegible]।

—হ্যাঁ [illegible] সেরে [illegible] কাঁদতে [illegible] সেদিন [illegible] ঠিক সময়ে [illegible] না এলে তুই নাকি বাড়িতে [illegible]।

উগ্রী বলল, তারপর?

—তারপর [illegible] এদিকে নায়িকা বাড়িতে [illegible], শুনে আমার ঘর তোর মান ভাঙাতে গেল। আর আমাদের সংগে আসতে না পেলে তুই নাকি সত্যিই গরীব শুনে আমার বাপ্‌ মারা হোল।

উগ্রী বলল, এসব কথা তোমাকে কে বলল! ও?

ঈশানী ঋতেশের হঠাৎ গম্ভীর কিন্তু শান্ত হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আরে না, না। লোকে নানা কথা বলাবলি করে যে উগ্রী, বাতাসেরও কান আছে; বাতাসে নানান কথা উড়ে আসে আমার কাছে।

হঠাৎ অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল। ওরা চুপ করে সমুদ্রের মাতামাতির হু হু গর্জন শুনতে লাগল।

সমুদ্র-গর্জনের সংগে সংগতি রেখেই থেমে থেমে উগ্রী বলল, ঈশানী, আমিই ওর প্রথম। আমরা দুজনে তখন কতদিন একসংগে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি ওকে আমার ভালোবাসা জানিয়েছিলাম। ওকে জিজ্ঞেস কর, ও-ও আমাকে ভালোবাসার কথা বলেছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে উগ্রী আবার বলল, তুই পোড়ারমুখী কোত্থেকে এলি, তোর ডিগ্রী আর টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলি। একেবারে যেচে মান কেঁদে সোহাগ করে ওকে বিয়ে করে বেঁধে ফেললি, নিজের সম্পত্তি করে ফেললি; কিন্তু ও কি সেই বান্দা যে তোর শিকলি-পরা বাঁদর হয়ে থাকবে! ও পুরুষ!

ঈশানী বলল, আর তুই প্রকৃতি; এখন লোকে প্রকৃতি-পুরুষের লীলা দেখছে। এতে অহঙ্কারের কিছু নেই উগ্রী। তোর বোধ-বুদ্ধি ঠিক থাকলে লজ্জায় তুই অন্ধকারে মুখ লুকোতিস।

উগ্রী বলল, মুখ তো লুকোই নি ঈশানী। সেই কবিতা পড়িস নি, তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ', পড়িস নি, 'কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়'?

ঈশানী বলল, বেশ মেয়ে, চন্দন পরে ঘষবে, চলো দেখি চান করে আসি, এখন না ঘুমোলে হবে না।

ঋতেশ উঠে দাঁড়াল, বলল, চলো চলো, আজকেই সমুদ্রে ডুবে আসি। সমুদ্র সব দুঃখ, সব গ্লানি ধুয়ে দেবে।

ওরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

এখন সমুদ্রকে দেখে উগ্রীর বুক কেঁপে উঠল। অসংখ্য ধূসর-পিঙ্গল [illegible] [illegible] ফুঁসে [illegible] এসে [illegible] [illegible] কী [illegible] কী উন্মাদ ভীষণতা!

এক নতুন দম্পতি [illegible] দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুরুষটি স্নানের পোশাক পরে এসেছেন।

ঋতেশ জিজ্ঞেস করল, আপনি অনেক দূরে পর্যন্ত যাবেন?

—হ্যাঁ, সাঁতার আমার হবি। সমুদ্রে সাঁতার কাটা আমার নেশা বলতে পারেন।

ঋতেশ হঠাৎ বলে ফেলল, আমি কিন্তু এর আগে কখনও সমুদ্র দেখি নি। আমিও আপনার সংগে সাঁতার দেবো আজকে।

ভদ্রলোক সুগঠিত শরীরে অহঙ্কার ফুটিয়ে বললেন, ওসব করতে যাবেন না। সমুদ্র ভীষণ বিশ্বাসঘাতক, প্র্যাকটিস না থাকলে ভীষণ বিপজ্জনক।

ঋতেশ হেসে বলল, আচ্ছা দেখা যাক, কে আগে যেতে পারে।

ঋতেশ ঈশানীকে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, ঈশা, ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বলো, ওঁর স্বামীকে নিষেধ করতে, ওঁর স্বামী আমার সংগে পারবে না, নতুন বৌয়ের সামনে ভদ্রলোক অপদস্থ হবেন।

ঈশানী বলল, না, আমি বলতে পারব না। উনি বলছেন উনি সাঁতারু, তুমি কেন এসব করতে যাচ্ছ, কিছু বিপদ হলে তখন কি হবে?

ঋতেশ বলল, যা বিপদ হয়েছে, তার থেকে তো বেশি কিছু হবে না ঈশানী। আমি মরে গেলেই ভালো এখন। তুমিও তো তাই চাও।

—আমি! তোমার মৃত্যু চাইছি আমি! কে জানে।

ঋতেশ পাজামা খুলে ফেললো। জাঙিয়া-পরা ওর পেশল উরু দেখে উঠল একবার। তারপর দুজনেই [illegible] [illegible]।

প্রথমে [illegible] [illegible] এবং [illegible] চারটি [illegible] [illegible] লোককে [illegible] মিনিট পরেই দেখা [illegible] ঋতেশ এগিয়ে যাচ্ছে। [illegible] যাচ্ছে, কিন্তু [illegible] ঋতেশ [illegible] ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের তরুণী স্ত্রী ভয়ে [illegible] চীৎকার করছেন, আর যেও না, ফিরে এসো!

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের শব্দ সে আর্ত চীৎকারকে ঢেকে দিচ্ছে।

হঠাৎ ভদ্রলোক পিছন ফিরে তাকালেন, স্ত্রীকে দেখেই হাত তুলে অভয় জানিয়ে ফিরতে লাগলেন। ঋতেশ পিছন ফিরে তাকাল না, ভেসেই যেতে লাগল। এই ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনপুঞ্জে তাকে দেখা গেল, এই ঢেউয়ের আড়ালে সে হারিয়ে গেল। এমনি করে অনেক দূরে বিন্দুর মত মনে হতে লাগল ওকে।

অনেক পরে ঋতেশ ফিরে এলে ভদ্রলোক বললেন, আপনার সাহস আছে, নিজের স্ত্রীপুত্রের কথাও ভাবেন না!

ঋতেশ হাসল।

স্নান সেরে হোটেলে ফিরে আবার স্নান করে সেজেগুজে ওরা ডাইনিং রুমে খেতে গেল। খাবার সময় হঠাৎ ম্যানেজার এসে দাঁড়ালেন, ঋতেশকে বললেন, কোন অসুবিধা হলে বলবেন।

ঋতেশ বলল, মিঃ ব্যানার্জি, আমাদের আর একখানা ঘর চাই।

—আর একটা ঘর? তা আপনাদের পাশের সিঙ্গল-সিটেড রুমটা আজকেই বিকেলে ফাঁকা হবে। অবশ্য সিঙ্গল-সিটেড হলেও ও হচ্ছে 'কাপল্ রুম' আমরা ডবল সিটের ভাড়া নেবো। তাছাড়া ভালো ঘর সমুদ্রের ওপরে।

—ঠিক আছে, ঐ ঘরটাই আমি বুক করছি।

—তাই হবে। আপনার নামে এখনি লিখে নিচ্ছি।

ম্যানেজার চলে যেতে ঈশানী বলল, আবার ঘর নেবে, খরচের কথাটা ভেবেছো?

ঋতেশ বলল, [illegible] কাউকে [illegible] না [illegible]। উগ্রী এখন একা থাকতে চাইছে।

[illegible] এসে বসল।

স্যুটকেশ খুলে হুইস্কির বোতল বার করে গ্লাসে ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেলল ঋতেশ।

ঈশানী বলল, এখনই শুরু করলে?

—আরে না, না, রাত্রি জেগে এসেছি, শরীর কেমন করছে, একটু ঝরঝরে লাগবে।

ঋতেশ উগ্রীকে বলল, একটু চাখবে নাকি?

—না, ভালো লাগছে না, একটা কথা বলব, শুনবে?

—বল।

ঈশানী একটা খাটে বিছানা পেতে কঙ্কনকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। বালিশে চিবুক রেখে উবুড় হয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

উগ্রী বলল, ঋতেশদা, এসো আমরা সেদিনের নাটক থেকে খানিকটা অভিনয় করি।

—একটু শোবে না?

—না, আমি দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোতে পারি না।

ঈশানী আলতোভাবে বলল, তাহলে একটু সেজেগুজেই করো না, জমবে ভালো, আমি না হয় দর্শক হবো।

উগ্রী যেন খুশিতে ভরে উঠল, সত্যি! আর তোমার মত মহীয়সী [illegible]। নিশ্চয়ই—সেজেই অভিনয় করব, [illegible] তো এনেছি এখানে।

উগ্রী বারান্দার আড়ালে সরে গেল। আবার [illegible] খুলে [illegible] বিশাল খোঁপা বাঁধল, ভ্রু আঁকল [illegible] টেনে টেনে, চোখে কাজল আঁকল [illegible] পাখির মত কোণ তুলে, ঠোঁটে গাঢ় রঙ মাখল। তারপর ওদের সামনেই দামী কলমলে কল্কা-পেড়ে শাড়ি পরে ঠাকরুণ সেজে বসল, ধনী জমিদারের গর্বিতা প্রেয়সীর বেশ। তারপর ঋতেশকে তাঁতের ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী পরালো, নিজেই চিরুনি দিয়ে মাথার মাঝ-খানে সিঁথে চুল আঁচড়ে দিল।

নাটকের একটি বিশেষ দৃশ্যের অভিনয় শুরু হোল।

ঋতেশ বসল বেতের চেয়ারে, বেতের ছোটো টেবিলে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস।

উগ্রী প্রথমে নেচে নেচে একটি গান গাইল বিলোল কটাক্ষ ছুঁড়ে ছুঁড়ে। ঋতেশ মদে চুমুক দিতে থাকল। তারপর গান থামলে ঋতেশ গাঢ় বিলাপের কথা বলতে বলতে উঠে এসে উগ্রীর দুই কাঁধে হাত রাখল, উগ্রীকে জড়িয়ে ধরল।

ঈশানী শুয়ে শুয়ে অলস চোখে ওদের এই অভিনয়লীলা দেখছিল, হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে রাগে ফেটে পড়ল, এ কি অসভ্যতা হচ্ছে শুনি, বেহায়া মেয়ে কোথা-কার, থামো বলছি, এখানে আমার বাচ্চা ছেলে আছে জানো না? এখানে আমাকে তোমরা অপমান করতে এসেছ? আমার ছেলের মাথা খেতে এসেছ? যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ঋতেশ ঈশানীকে চিনত। উগ্রীকে ছেড়ে দিয়ে ঈশানীর কাছে গিয়ে বলল, ঈশা, কি হচ্ছে কি? থামো, প্লীজ চুপ করো। ঠিক আছে!

—কঙ্কনের কথা তোমার মনে হয় না একবার, ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি ভাবো না!

—আচ্ছা, আচ্ছা, এতো তামাসা হচ্ছে।

—তামাসা!

—আচ্ছা তা কঙ্কু তো ঘুমোচ্ছে।

ঋতেশ জামাকাপড় খুলে পাজামা পরে ঈশানীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

উগ্রী ঋতেশ আর ঈশানিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর ঋতেশের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে গ্লাসে মদ ঢেলে চুমুক দিয়ে দিয়ে খেতে লাগল। গ্লাস শেষ করে বলল, আহা, [illegible]।

উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলল, তোমরা [illegible] নাও, আমি একটু আসছি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে [illegible] ভেজিয়ে দিল।

ঋতেশ কি করবে হঠাৎ বুঝতে পারল না। শেষপর্যন্ত বাইরের বারান্দায় গিয়ে চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। সিগারেট টানতে টানতে উদাসীন রোদ-ঝকঝকে উন্মুক্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে বসে ও ভাবতে লাগল।

হঠাৎ ঋতেশের নজরে পড়ল সমুদ্রের ধার ধরে বি-এন-আর হোটেলের দিকে একা একা হেঁটে যাচ্ছে উগ্রী। পরণে ওর কল্কা-পেড়ে দামী শাড়ি, মাথায় বিশাল খোঁপা, অপরূপ শরীরের ভঙ্গী তরুণী বৃক্ষের মত, দারুণ বাতাসে ওর আঁচল উড়ছে।

বারান্দা থেকে ভিতরে ঢুকে ও দরজা খুলতে গেল। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। দরজা টানাটানি করতে লাগল, তারপর ডাকাডাকি শুরু করল, বাইরে কে আছেন? কেউ আছেন বাইরে?

বেশি চেঁচামেচি করতে বাধছিল ওর। কিন্তু নিজেকে বেশিক্ষণ ও সংযত রাখতে পারল না। দরজায় প্রচন্ড জোরে ধাক্কা দিতে লাগল।

ঈশানী বিছানায় বসল।

ভিতরের বারান্দায় জুতোর শব্দ শোনা গেল। ম্যানেজারের গলা শোনা গেল, কে ডাকছেন?

ঋতেশ বলল, কে, মিঃ ব্যানার্জি? এই ঘরের সামনে আসুন।

বাইরে থেকে শোনা গেল, কি ব্যাপার ঋতেশবাবু?

—মশাই দেখুন তো দরজাটা খুলছে না কেন?

দরজা খুলে গেল।

ম্যানেজার বললেন, কি ব্যাপার, বাইরে থেকে বন্ধ করা?

ঋতেশ বলল; কিছু না, ছেলেমানুষী আর কি!

ম্যানেজার বিস্মিত হাসি হেসে নীচে চলে গেলেন।

ঋতেশ তাড়াতাড়ি ধুতি-পাঞ্জাবী পরে নিয়ে দ্রুতপায়ে নীচে নেমে গেল।

ঈশানী গিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, অনেক দূরে উগ্রী আপনমনে হেঁটে চলেছে, ঋতেশ সমুদ্রের ধার ধরে উগ্রীকে ধরবার জন্যে ছুটছে। ঈশানী দাঁড়িয়ে

দেখতে লাগল। ঋতেশ সমুদ্রের-ধার ধরে উগ্রীকে অনেক দূরে গিয়ে ধরে ফেলল। উগ্রীকে পিছন থেকে জাপটে ধরল ঋতেশ। ওদের মধ্যে খানিকটা যেন ধস্তাধস্তির মত হল। তারপর দুজনে পাশাপাশি হেঁটেই যেতে লাগল। ফিরে এল না। একসময়ে ওরা দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল।

ঈশানী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করল। কিন্তু ঘুম এল না। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। [illegible] সমুদ্রের ফেনার মুকুট-পরা [illegible] কয়েকবার [illegible] একসময় [illegible] ঈশানী। হঠাৎ [illegible] কান্না শোনা যাচ্ছে।

—কে?

—[illegible]

ঈশানী উঠে বসল। দেখল, কঙ্কণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে জানালায় চুপ করে বসে আছে। ওর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে, কিন্তু খেতে চায় নি। ও কি কিছু বুঝতে পারছে?

ঈশানী গিয়ে দরজা খুলে দিল। ঋতেশ আর উগ্রী হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে ওদিকের খাটে বসল।

উগ্রী ঈশানীকে বলল, কিরকম মজা করলুম।

—দারুণ!

—তুমি তো কেবল ঘুমোতে এসেছ, আমরা সেই কতদূরের কাউবন থেকে ঘুরে এলাম।

—তাই নাকি! তোমাদের পালসিতে এখন জোর হাওয়া লেগেছে। আমি ঘুমিয়ে বাঁচলাম।

ওরা আর কোন কথা বলছিল না। ঈশানী কঙ্কণকে খেতে দিল, বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চুল আঁচড়াল, ধোয়া কাপড় পরল। উগ্রী আর ঋতেশ একে একে বাথরুম থেকে গা ধুয়ে এসে নতুন করে সাজ-সজ্জা করল। নিঃশব্দে বিকেলের চা-পর্ব শেষ হোল।

ঈশানী বলল, চলো আজ একবার জগন্নাথদেবকে দর্শন করে আসি।

একটু থেমে আবার বলল, শুনেছি, শ্রীক্ষেত্রে এসে ধুলো-পায়ে জগন্নাথ দর্শন করতে হয়।

ঋতেশ বলল, তা ধুলো-পায়ে যখন দেখা হোলই না।

ঈশানী বলল, তাহলেও আজকেই অন্তত দেখে আসি। প্রথম দিনেই তো দেখা উচিত।

—চলো তাহলে।

অতএব হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

বিকেল হয়ে গেছে। আকাশে আর সূর্য নেই। কিন্তু গোধূলি-আলোয় চারদিক স্নিগ্ধ হয়ে আছে। সমুদ্রের রঙ গেছে বদলে। ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস বেড়েছে আরও। গর্জন আরও যেন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

রিক্সায় উঠল ওরা।

[illegible]

গায়ের দিকে তাকিয়ে ঋতেশ অবাক হয়ে গেল। উগ্রীর সঙ্গে ওর চোখাচোখি হোল।

ঋতেশ বলল, ঈশানী, মন্দিরের গায়ে কিসব অদ্ভুত যুগল-মূর্তি দেখছো!

ঈশানী বলল, দেখছি তো।

—এসবের তাৎপর্য কি বলতো?

—আমি কেমন করে জানব। আমি জানি না। তবে খারাপ তো লাগছে না তেমন।

—খারাপ তো নয় ব্যাপারটা। এই তো প্রকৃতির সহজ লীলা। সে-যুগের মহান শিল্পীরা [illegible] কিভাবে [illegible]

[illegible] ঈশানী। [illegible] বিশাল [illegible] দাঁড়াল ওরা। আসমুদ্রহিমাচল থেকে অসংখ্য মানুষ এসেছে জগন্নাথ দর্শনে। [illegible] মন্দিরের মধ্যে কেমন যেন বিচিত্র এক অনুভূতি জাগে। একসময় ওরা জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের পাদপীঠের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। ওপরে নানা রঙের চাঁদোয়া। উঁচু পাদপীঠে তিন বিশাল স্নিগ্ধ-ভয়ঙ্কর মূর্তি, পাদদেশে ঘিয়ের বিরাট প্রদীপ ধক ধক করে জ্বলছে, জগন্নাথের ললাটের প্রকাণ্ড হীরক খণ্ড সেই প্রদীপের আলোতে সহস্র কিরণে জ্বলজ্বল করছে। ঈশানীর মনে হোল জগন্নাথের বিশাল নয়ন স্থির অকম্পিত করুণা ও গাম্ভীর্যে সাগর-সমান।

জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ শেষ হলে ওরা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারল। যখন মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। সেই প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষের নানান প্রদেশের মানুষ-বসে আছে। ঈশানীর ইচ্ছে হোল ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থাকে।

ঋতেশ বলল, আমার ভালো লাগছে না ঈশা, চলো, আজ চলো, পরে বরং তুমি এসো।

ওরা মন্দির থেকে ফিরে আবার সমুদ্রের ধারে এসে বালির উপরেই পাশাপাশি বসল। ঋতেশের পাশে উগ্রী, তারপর ঈশানী, ঈশানীর পাশে কঙ্কন। এখানে অনেকেই বসে আছেন।

সমুদ্র যেন রাতের বেলা আরও জেগে ওঠে। ঢেউয়ের সংঘর্ষ আর দাপাদাপিতে যেন আকাশ-বাতাস কাঁপছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আলোর সর্পিল শিখা জ্বলছে। বালির ওপর আছড়ে-পড়া ঢেউ ফসফরাসের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই অবিরাম মাতামাতি, এই উদ্দাম গর্জন, এই দুরন্ত হাওয়া, তারা-ভরা আকাশ পর্যন্ত অসীম বিস্তার, এই [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] পেয়েছে।

—তাহলে তোমরা বসো।

বলে ঈশানী কঙ্কণের হাত ধরে হোটেলে এলো। কঙ্কনকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ও সবে একটু শুয়েছে, ঋতেশ আর উগ্রী ফিরে এল।

উগ্রী বলল, ভীষণ খিদে পেয়েছে, চলো খেয়ে আসি ঈশানী।

নীচের ডাইনিং রুম থেকে খাওয়া সেরে এসে ওরা বাইরের বারান্দায় অন্ধকারে বসল।

[illegible]

[illegible]

[illegible] শেষ হলে ওরা [illegible] সেই [illegible] হয়ের মধ্যে [illegible]।

এতক্ষণে ঈশানী বলল, আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

ঊষ্রী বলল, আমিও আর বসে থাকতে পারছি না, চোখ জড়িয়ে আসছে। একটু থেমে বলল, ঋত্বেশদা, একা শুতে আমার ভয় করবে।

[illegible]

[illegible] খুব এসো, [illegible] বিকেল হয়েছে, শুয়ে পড়বে এসো।

ওরা দুজনে ঘরে ঢুকল। ঈশানী সুইচে হাত দিয়ে আলো জ্বালাল। ফ্যান ঘুরেছে, ঊষ্রী অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ঈশানী অন্য খাটটায় বসল। ঋত্বেশ মদের বোতল বার করে চেয়ারে বসল। সোডা মিশিয়ে মিশিয়ে চুমুকের দিয়ে খেতে শুরু করল। এক বোতল শেষ হয়ে গেল। ঋত্বেশের চোখ লাল হয়ে উঠেছে। ফ্যানের বাতাস সত্বেও কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে। ও আবার বাক্স থেকে আর একটা বোতল নিয়ে এলো।

ঈশানী বলল, আর খেও না।

—আর একটু খাই ঠিক কিক আসছে না।

—কি ব্যাপার, আজ এত মদ খাচ্ছ কেন?

ঋত্বেশ গ্লাস শেষ করে চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল ঈশানীর পায়ের কাছে। ঈশানীর মেঝেতে রাখা দুটি পা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরল, ঈশা, আমার ঈশা, শুধু আজ তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

ঈশানী চুপ করে স্থির ক্লান্ত দৃষ্টিতে ঋত্বেশের মদ-বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঋত্বেশ বলল, সত্যি বলছি আমি কিছু করব না, তুমি বিশ্বাস কর, আমি কিছু করব না, কিন্তু ও উন্মাদের মত আমাকে বলেছে আজ ওর কাছে থাকতে।

ঈশানী বলল, আমাকে তোমরা অপমান করতে নিয়ে এসেছ। আমার মর্যাদা, আমার সম্মান দু পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে ও দেখাতে চায় যে আমি ওর করুণার পাত্রী।

—না, না, অত গভীর কিছু ভাববার ক্ষমতা ওর নেই।

—তাহলে?

—জানো ঈশা, আমার ভিতরে কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, সমুদ্র তো দেখলে, আমার বুকের ভিতরে অমনি দাপাদাপি, অমনি উন্মাদনা। কি করব, আমি জানি না, আমি বুঝি না। আমার সব সম্মান, সব মর্যাদা সব তো গেছে, গলায় দড়ি দিলেও তো তার আর প্রতিকার হবে না। তবু রেহাই নেই, তবু যেন কেউ ঘাড় ধরে আমাকে নরকের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

ঈশানী বলল, অথচ তুমি একসময়ে বলতে মেয়েরা নিজে উপার্জনশীলা না হলে তারা পুরুষের ক্রীতদাসী হয়ে যায়।

একটু থেমে ঈশানী বলল, তা আমি তো উপার্জন করি। চাকরি করছি, তোমার টাকায় আমাকে খেতে হয় না। বরং তুমিই আমার কাছে কিছু কিছু সাহায্য নাও নানান সময়ে। আর্থিক স্বাধীনতা আমার আছে, কিন্তু আমি কি [illegible] পেরেছি!

[illegible]

[illegible] নিয়ে আমি [illegible]

[illegible] তোমাকে [illegible] না।

—[illegible] করি। তাতে লাভ কি কিছু হত? এই বয়সে কঙ্কুকে নিয়ে স্বামী ত্যাগ করে আমি আত্মীয়স্বজন পরিবারের থেকে কী সম্মান পাবো, লোকে আমাকে কী মর্যাদা দেবে! তাছাড়া তোমাকে তো আমি ভালোও বেসেছিলাম, তারই বা কি দাম রইল!

একটু থেমে আবার বলল, যদি তুমি বলো আমার দোষে তুমি এমন হয়েছ, তাহলেও বলব, তুমি তো জানো তা সত্যি নয়, তুমি স্বভাবে নারী-বুভুক্ষু। আমার ভালোবাসা তোমার সেই লোভ কতদিন ঠেকাতে পারত। তুমি ভালোবাসতে জানো না, সে রকম উঁচু রিফাইন্ড মন তোমার নয়। তাহলে আমার মত মেয়ের পক্ষে আর্থিক স্বাধীনতা আর পরাধীনতা তো সমানই হোল। টাকা রোজগার করেও তো আমি সেই নিরুপায় পরাধীনই থেকে গেলাম।

ঋত্বেশ টেবিল থেকে মদের বোতলটা নিয়ে দুই ঠোঁটে বোতলের মুখ চেপে ধরে ঢকঢক করে নির্জলা কাঁচা মদ গিলতে লাগল। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত বোতল শেষ করে বোতলটা বিছানার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ঈশা দেখো, আমি একেবারে আউট হয়ে গেছি, সত্যি আমার আর কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। আমাকে যেতে দাও। আজ তুমি আমাকে অনুমতি দাও। আমি পাপী, আমি মনুষ্যত্ব-বর্জিত। কিন্তু আমি পারছি না ঈশা, আমি নিজেকে সংযত করে মহাপুরুষ হতে পারব না, তাহলে আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে থাকবে না। দেখো সবচেয়ে জীবন বড়, আমাকে যেতে দাও।

ঈশানী বলল, তোমার যা ইচ্ছে কর। তুমি তো অজ্ঞান মূর্খ নও। আমার ক্ষমতা কি যে তোমাকে ধরে রাখি। গায়ের জোরে ধরে রাখলে তারই বা অর্থ কি হয়। যাও তুমি। আমাকে ঘুমোতে দাও। আমি আর বসে থাকতে পারছি না।

ঈশানী পা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে গিয়ে অন্য খাটে ছেলের পাশে বসল।

ঋত্বেশ টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

ঈশানী বলল, আমি দরজা না দিয়ে শুতে পারছি না।

ঋত্বেশ জড়ানো গলায় বলল, ঈশানী আমাকে ক্ষমা কোরো, আমি জানি আমার শেষ আশ্রয় তোমারই পায়ের তলায়, সেদিন আমাকে ঠেলে ফেলো না, আমি নরকের জীব, আমাকে তুমি উদ্ধার কোরো।

একটু থেমে বলল, আমি সিংহ হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শেয়াল হয়েছি। অন্ধকারের জীব, ধূর্ত লোভী।

বলে টলতে টলতে ও বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

ওঁরা আমাদের অহংকার

প্রচলিত ধ্যান ধারণায় আমাদের দেশে কৃষ্টি ও ক্রীড়াচর্চার মধ্যে যেন অহি নকুল সম্পর্ক। কৃষ্টি ও ক্রীড়া বুঝি ভিন্ন ভিন্ন জগতের বস্তু। তাই দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে খেলোয়াড়দের কোনো ঠাঁই নেই। কৃষ্টিবান সম্প্রদায় বলতে আমরা বিদগ্ধ জনমণ্ডলী, নট-নটী, চিত্র ও সঙ্গীতশিল্পী প্রমুখদের বুঝি! কিন্তু ভুলেও ভাবতে পারি না যে বৃহত্তর জীবনের বহমান কৃষ্টির একটি ধারা ধরা রয়েছে ক্রীড়াবিদদের সনিষ্ঠ আচরণে ও চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়া-কলাপে। তাই সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় অনেক, [illegible] স্রষ্টা নারী [illegible] সম্মানে আসন পেলেও সেই [illegible] চরিত্রবান ক্রীড়াবিদের কপালে বড় একটা জোটে না। এর কারণ খেলাধুলাকে আমরা চিরদিনই ছোট করে দেখে আসছি।

সংস্কৃতি শব্দের মর্মার্থ কি? মানুষের মানুষ হওয়ার সাধনাকে জয়যুক্ত করায় শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করা এই তো। উৎকর্ষ লাভে লক্ষ্যই বা কি? শুধু কি মানসিক উন্নয়ন? না, মন ও দেহের সমন্বয়ে সামগ্রিক উন্নয়নের সূত্রে পরিপূর্ণতায় প্রতিভাত হওয়া? কাল এগিয়ে চলেছে। মূল্যবোধ ও মননের পরিবর্তন ঘটছে। এখন সংস্কৃতি, কৃষ্টির অর্থগত উপলব্ধির নব-মূল্যায়ন প্রয়োজন।

মানুষ নানাভাবে নানাপথে নিজের বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। কেউ চায় লেখক হতে। কেউ বা বৈজ্ঞানিক। পঠন-পাঠন ও গবেষণাই তাদের কৃষ্টি। কারুর জন্য গান গেয়ে বা ছবি এঁকে নন্দনতত্ত্বের সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত রেখে নিজের [illegible] স্বীকৃত [illegible] মতে আমাদের দেশে এরা সবাই সংস্কৃতিবান।

এদেরই পাশাপাশি আছে ক্রীড়াবিদেরা নিজেদের সাধনায় আত্মনিমগ্ন। ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয়ে তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটাতে চায়। অন্য মহলের মানুষ নিজেদের শিল্প ও কর্মের উৎকর্ষ লাভে যে অনুশীলন করে, ক্রীড়া দক্ষতা অর্জনে খেলোয়াড়রাও তাই করে থাকে। তারাও উদয়াস্ত মেহনত করে। মাথা খাটায়। কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করে। উভয় সম্প্রদায়ের সাধনার পথ অভিন্ন। অথচ সংস্কৃতির শিরোপা পরাবার বেলায় এক দলকে বেছে নিয়ে, অন্য দলকে উপেক্ষা জানানো হয়। এই উপেক্ষা অবিচারেরই নামান্তর।

আভিধানিক অর্থে ক্রীড়াবিদেরাও সংস্কৃতিবান চরিত্র। যেহেতু নিজের বিষয়ে উৎকর্ষ লাভে তারাও নিরলস চর্চা করে। শিক্ষা পেতে উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। সংস্কৃতি ও মনন, দুটি শব্দই যেন সমার্থক হয়ে আমাদের মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসে গিয়েছে। মন তাই বুঝি কেবলই মানতে চায় যে ক্রীড়াচর্চা নিছকই দেহভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ক্রীড়া অনুশীলনে ও ক্রীড়াদক্ষতা অর্জনে মস্তিষ্কের প্রভাব ও প্রেরণাকে কি অস্বীকার করা যায়? যায় না। কেননা শুধু গায়ের জোর খাটিয়ে কেউ কোনদিন খেলাধুলার কোনো বিভাগেই চরম উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি। উৎকর্ষ লাভের সহায়ক [illegible]

মানসিক সম্পত্তিও। কাজেই খেলোয়াড়দের মন ও মনন, বোধ ও বোধি বলতে কিছু নেই, এই ধারণা নিতান্তই ভুল। [illegible] ক্রীড়াবিদরাও [illegible] জীবনের [illegible]

রাশিয়া, আমেরিকার মতো অন্যান্য দেশগুলি ক্রীড়াবিদদের এই ভূমিকাকে উপেক্ষা করেনি। সেইসব দেশে সাংস্কৃতিক জীবনে ক্রীড়াবিদেরা সমাদৃত। জীবনচর্চায় খেলাধুলো যে শিল্প, সঙ্গীত, রাজনীতি, বিজ্ঞান অনুশীলনের মতোই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একথা তারা মানে। আর তা মানে বলেই রুশী মার্কিনীদের পক্ষ থেকে ক্রীড়াবিদদের সফরের আয়োজন ঘটানো হয় সাংস্কৃতিক সফর বিনিময় পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই।

আমরা এখনও এমন এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ[illegible] উঠতে পারিনি। তাই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে ক্রীড়াবিদদের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে এড়িয়ে রাখার সর্ববিধ চেষ্টা করে চলেছি। জাতি হিসেবে আমরা আধুনিকশিক্ষণের পাঠ নিয়েছি যাদের কাছে সেই ইংরাজের মানসিকতায় কিন্তু ক্রীড়াবিদদের অন্য মূল্য ও মর্যাদা ছিল ও আছে। ইংরাজও মনে করে যে খেলাধুলো জীবনে অসম্পৃক্ত নয়। বরং বলে যে বিনা ক্রীড়াচর্চায় কারুরই জীবনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে দেশের সমাজে একজন রাজনীতিক বা শিল্পীর যে মর্যাদা, কোনো প্রথিতযশা খেলোয়াড়ের ভাবমূর্তি তার চেয়ে খাটো নয়। তাই খাস বৃটেনে ফুটবলার স্ট্যানলি ম্যাথুজ বা ক্রিকেটার লেন হাটন রাষ্ট্রীয় সম্মান নাইটহুডে অভিষিক্ত হন এবং অ্যাথলিট ক্রিস চ্যাটাওয়ে সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষ সমর্থনে ভোটদাতাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

এদেশে অবস্থাটা ভিন্নতর। আমাদের মূল্যবোধ বড়ই সেকেলে। তাই সাংস্কৃতিক মণ্ডপের দরজা সাধনমগ্ন ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশ্যে খুলে রাখতে চাইছি না।

তবে চিন্তার ক্ষেত্রে বরফ হয়তো গলতে সুরু হয়েছে। তাই শিক্ষাক্রমে খেলাধুলো আবশ্যিক বিষয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং অধুনা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ক্রীড়াবিদদের গলায় মালা দুলিয়ে দিতে এগিয়ে আসছেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের বিচারে খেলোয়াড়দের প্রতিচ্ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ক্রীড়াচর্চার উপযুক্ততা এবং সামাজিক কল্যাণে খেলাধুলার মূল্য স্বীকৃতি পাচ্ছে। মাঝে মাঝে কৃতবিদ্য ক্রীড়াবিদদের রাষ্ট্রীয় সম্মানেও অভিষিক্ত করা হচ্ছে। এসবই আশার লক্ষণ। দেখেশুনে আজ ভাবতেও লোভ হয় যে খেলাধুলো সম্পর্কে সাবেকী ধ্যান ধারণা বদলে হাওয়ার পালা বুঝি এবার সুরু হলো।

ক'দিন আগে রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিম বাংলার কয়েকজন প্রবীণ ক্রীড়াবিদকে এক আন্তরিক অনুষ্ঠানে [illegible] ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানানোর এই পরি-কল্পনা ছিল রাজ্য সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট। তার ওপর পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, খাদ্য-ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ অনুষ্ঠান কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ক্রীড়াবিদদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনে সক্রিয় অংশও নেন।

বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবার সময় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ক্রীড়াবিদদের রাজ্য স্তরে সম্মান জানানোর ব্যবস্থা ভবিষ্যতে প্রতি বছরেই করা হবে। অনুষ্ঠানটি একদিনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। নিরবচ্ছিন্ন চলতে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা থেকেই আশা জাগে যে ক্রীড়াবিদদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের এই আয়োজনের মেয়াদ হবে চিরায়ত। অতীতের মতো হঠাৎ আবেগের টানে দু-একদিনের জন্যে ক্রীড়াবিদদের জনসাধারণের সামনে টেনে এনে আবার তাঁদের ভুলে যাওয়ার প্রয়াস পাওয়া হবে না। অতীতেও দেখেছি রাজ্য কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে প্রবীণ খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা জানাতে ব্যবস্থা করা হোত। বছর কয়েক ধরে সে আয়োজন চলেও ছিল। কিন্তু তারপরই কেন জানি না, এ ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের উৎসাহে ভাঁটার টান পড়ে যায় এবং একদিন এই আসরের তল্পিতল্পা গুটিয়েও নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি শুনে মনে হচ্ছে যে অতীতের পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদান যাঁদের স্মরণীয়, চোখের সামনে একদিনের জন্যে তাঁদের দেখতে পেয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের সুযোগ পাবেন ভবিষ্যতেও।

পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক মঞ্চ রবীন্দ্র সদনে গুণী ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানানোর এই ব্যবস্থা হয়। বিস্মৃতকীর্তি প্রবীণ ক্রীড়াবিদদের একে একে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে নিয়ে আসেন একালের কয়েকটি সুবিখ্যাত ক্রীড়া চরিত্র। তারপর তাঁদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী মানপত্র, রৌপ্যপাত্র, ধুতি-পাঞ্জাবী, শার্ট-ট্রাউজারের কাপড় ইত্যাদি প্রতীক উপহার তুলে দেন। প্রবীণদের প্রাথমিক অভ্যর্থনা নিবেদনের ভার নবীন ক্রীড়াবিদদের ওপর অর্পণ করে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা একাল ও সেকালের রাখী বন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই পরি-কল্পনা চিন্তাপূর্ণ। উপস্থিত জনমণ্ডলী অর্থবহ পরিকল্পনার মর্মার্থ অনুধাবন করে ব্যবস্থাপকদের সাধুবাদ জানান। তাঁদের সোচ্চার করতালিতে রবীন্দ্র সদন মুখরিত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের আরম্ভে উদ্যোক্তারা এই নিবেদন রাখেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে যাঁরা গুণীজন, পশ্চিম বাংলায় [illegible] তাঁদের রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত [illegible] হিসেবে [illegible] হয়েছে। [illegible]

[illegible] পেয়ে এবং সেই আনন্দের উজ্জ্বল জ্যোতিকে উপহার দিয়ে যাঁরা [illegible] সমস্বরে প্রাণশক্তিকে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা জাতিগতভাবে কৃতজ্ঞ। প্রাণের উত্তাপে তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শীদের মন দিয়েছেন ভরিয়ে। [illegible] স্পর্শে সমকাল ও উত্তরকালকে করেছেন প্লাবিত। অনুপ্রাণিত।

কালান্তরের এই সব খেলোয়াড় বাঙালীর ক্রীড়া ও সুস্থ জীবনচর্চার এক আদর্শ প্রতীক। নিজেদের কর্মকাণ্ডের পুণ্যে ও ব্যক্তিসত্তার জোয়ারে এঁরা কুণ্ঠিত কালের বাঁধ ভেঙে দিয়ে সর্বকালের মানস মুকুরে চিরায়ত নায়কের ভূমিকা নিয়ে রয়েছেন। এঁরা জনে জনে সমুখে ইতিহাসের স্বর্ণময় এক-একটি অধ্যায়। এঁরা কিংবদন্তী। এঁরা আমাদের অহংকার।

চিহ্নিত গুণীজনের উপস্থিতির এই অবকাশে আমরা ওঁদের ঋণ স্বীকার করে বলে নিই, দিয়েছেন যতো পেয়েছিও ততোই। পাওয়ার আনন্দেই আমরা পরিতৃপ্ত। ঋণ পরিশোধের স্পর্ধিত অভিলাষের ঠাঁই আমাদের কল্পলোকেও নেই। আমরা শুধু ঋণী থাকার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি সোচ্চারে জানিয়েই আপনাদের প্রতি আনত শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকতে চাই। এরপরই সেকালের গুণী-ক্রীড়াবিদদের অভ্যর্থনা জানিয়ে একালের মঞ্চে উপস্থাপিত করেন কালান্তরের ক্রীড়াবিদ রবি রায়, প্রদীপ ব্যানার্জি, সঞ্জীব সাহা, চুনী গোস্বামী গোপাল বসু, তরুণ কর্মকার, শ্যামসুন্দর ঘোষ ও কুমারী নাফিসা আলি। মঞ্চে যাওয়ার পথে কোনো কোনো বর্ষীয়ান ক্রীড়াবিদদের বড়ই অসহায় দেখাচ্ছিল। কারুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বয়সের ভারে কারুর বা পদক্ষেপ অবিন্যস্ত। গতি শ্লথ। দেখতে দেখতে মনটা ভারী হয়ে আসছিল। ভাবছিলাম, উচ্ছল যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে যাঁরা একদিন মাঠে-ময়দানে নতুন গড়া যন্ত্রের মতো উদ্দাম হয়ে থাকতেন, প্রকৃতির শাসনে তাঁরাই আজ কতো সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছেন। পাশেই নবীন নায়ক, অভ্যর্থনাকারীর দীপ্ত, সতেজ সপ্রতিভ মূর্তিগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তবে তাতেই মিললো সান্ত্বনা। এই তো প্রকৃতির নিয়ম। একদল ছুটি নেবেন। আর একদল তাঁদেরই জায়গা জুড়ে বসবেন। সরে যাচ্ছেন যাঁরা চোখের সামনে থেকে, তাঁরা সরে গিয়েও রয়ে গেলেন ওই উত্তরসূরীদের মাঝেই। কাল থেকে কালান্তরে

এমনি [illegible] এক মহান [illegible] ঐতিহ্যের ধারা উত্তরাধিকারীর [illegible] প্রবাহমান রয়েছে।

[illegible] আটজন [illegible] হয়। [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] নতুন করে চিনিয়ে দেওয়ার দরকার পড়ে না। তবু এই অবকাশে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের আভাস জানিয়ে দিচ্ছি এই কারণে যে ইতিহাস জানা না থাকায় যদি কেউ এ'দের চিনতে না পেরে থাকেন তাহলে তাঁর সত্যোপলব্ধি ঘটবে।

আটজন গুণী ক্রীড়াবিদ হলেন:—

সর্বশ্রী পরেশলাল রায়, গোষ্ঠ পাল, সন্তোষ মজুমদার, প্রফুল্ল ঘোষ, রমণী মুখার্জি, আবু ইউসুফ, বেরি সর্বাধিকারী ও লালা ব্যানার্জি।

পরেশলাল রায় (জন্ম ২০ ডিসেম্বর ১৮৯৩) ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধের জনক হিসেবে অভিনন্দিত। প্রথম মহাযুদ্ধেরও আগে কেমব্রিজে অধ্যয়নকালে তিনি বক্সিং রিংয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা ও রিংয়ে নামার সুরু ইংলণ্ডে থাকতেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সেনাবাহিনীর অফিসার পরেশলাল আন্তঃ সেনা মুষ্টি-যুদ্ধে সুনাম অর্জন করেন। যুদ্ধশেষে দেশে ফিরেও অনেক নামী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন এবং তাঁকে দেখেই এদেশের তরুণেরা সংকোচ কাটিয়ে মুষ্টিযুদ্ধের রিংয়ের দিকে এগোবার সাহস পান। পরেশ-লালের চেষ্টাতেই ১৯২৮ সালে বেঙ্গল অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি নিজে হাতে করে অনেক মুষ্টিযোদ্ধাকে গড়েছেন। ছাত্রদের কাছে পরেশলাল যেন দ্রোণাচার্য। যেমন খেলোয়াড়োচিত মনোভাব, তেমনি জনপ্রিয় আচরণ। এবং ততোধিক দক্ষ প্রশাসক। কর্মজীবন কেটেছে রেলের বড় অফিসার হিসাবে। উত্তর জীবন কাটাচ্ছেন নবীন বাংলাকে মুষ্টিযুদ্ধে দীক্ষিত করতে।

গোষ্ঠ পাল (জন্ম ২২ আগস্ট ১৮৯৬) চিহ্নিত হয়ে আছেন ফুটবলে 'চীনের প্রাচীর' হিসেবে। এই পাঁচিল ডিঙোনো ছিল তাঁর কালের খেলোয়াড়দের অসাধ্য প্রায়। ১৯১২ থেকে ১৯৩৫ দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর কাল কলকাতার ফুটবল মাঠে তিনিই ছিলেন অবিসম্বাদী সম্রাট। গোরা ইংরেজরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতো যেমন ভয়ও করতো তেমনি। সুস্বাস্থ্যের প্রতি-মূর্তি খেলোয়াড়ী মনোভাবের প্রতীক এবং স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত গোষ্ঠ পালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল আদর্শ ও অনু-করণীয়। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের দৌলতে গোষ্ঠ পালের ক্রীড়াশৈলীর মধ্যে আভি-জাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে সমকালীন খেলোয়াড়কুলের বিশিষ্টের আসনে বসিয়ে রেখেছিল। অনেকদিন খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। ইদানীং মাঠে যাওয়া আসাও প্রায় বন্ধ। তবুও তাঁর মাঝমাঠে

এখনও ময়দান উচ্চকিত হয়ে ওঠে। জীবিতকালেই গোষ্ঠ পাল কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন।

বাংলার বাইরে পশ্চিম ভারতে খেলতে গিয়েই তিনি সেখানকার গুণানুরাগীদের কাছ থেকে 'চীনের প্রাচীর' এই অভিধাটি উপহার পান। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় খেলোয়াড়ে গড়া একাদশীয় ফুটবল দল যখন সর্বপ্রথম বিদেশে পাড়ি দেয় তখন গোষ্ঠ পালই সেই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে দেশীয় ক্রীড়াবিদদের রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানোর প্রথা চালু হলে গোড়ার পর্বেই গোষ্ঠ পালকে পদ্মশ্রী উপাধি ভূষিত করা হয়। পশ্চিম বাংলার ক্রীড়াবিদদের মধ্যে তো বটেই, বোধহয় ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সম্মানের জন্যে উপযুক্ত বলে বাছাই করা হয়েছিল।

সন্তোষ মজুমদারকে (জন্ম ১ জানুয়ারী ১৯০০) লোকে চেনে ছোনে বলেই। পিতৃব্য ক্রীড়াগুরু দুঃখীরাম আদর করে ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে নামে ডাকতেন সেই ডাক নামটাই শেষ পর্যন্ত পোশাকী নামকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

ছোনে মজুমদারের ক্রীড়া প্রতিভা ছিল সহজাত। গুরু দুঃখীরামের তত্ত্বাবধানে সব নব পথে সেই প্রতিভার উন্মেষ সহায়ক হয়েছিল। যেমন ফুটবল, তেমনি হকি, তেমনিই ক্রিকেট খেলতেন। সবেতেই পাকা হাতের ছাপ। আর ফুটবলে গোল থেকে সেন্টার ফরোয়ার্ড যে কোনো জায়গাতেই তিনি ছিলেন মানানসই। সেকালের আন্তর্জাতিক ম্যাচে দরকারে তিনি নানা পজিসনে খেলেছেন। সব মিলিয়ে একজন নির্ভেজাল চৌকশ খেলোয়াড় এবং পূর্ণাঙ্গ ফুটবলার। একালের প্রশিক্ষকেরা অধুনা টোটাল বা পূর্ণাঙ্গ ফুটবলার গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। কিন্তু এর কতো আগেই তো ছোনেবাবু নিজেকে ঘিরে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে গেছেন। নগ্নপদ ফুটবলের আমলে গুরুর নির্দেশে একজোড়া ভারী ম্যানসফিল্ডের বুট নিজের পায়ে জড়িয়ে নিয়ে ছোনেবাবু তাঁর দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। বুট পরার ব্যাপারে তিনি ছিলেন যেন ভবিষ্যৎ ও সত্যদ্রষ্টা। এই বুট তাঁর পায়ে কখনও বাধার বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়নি। বুট ছিল তাঁর সহজ চলার পথে অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

প্রফুল্লকুমার ঘোষ (জন্ম ১৯০০ সালে) ছিলেন একজন চৌকশ ক্রীড়াবিদ। অ্যাথলেটিক জিমন্যাস্টিকে ঝোঁক ছিল। তবে সহজাত দক্ষতা ছিল সাঁতারে। ডাক নাম খোকা, তবে লোকে চিনতো তাঁকে জলের পোকা বলেই। জলে জলেই সারাজীবনটা কাটিয়েছেন। প্রথম পর্বে প্রতিযোগিতামূলক আসরে সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়ন। উত্তরকালে জগদ্বিখ্যাত অবিরাম সাঁতারু। অর্বাচীন সাঁতারের কৌশল দেখাতে প্রফুল্লকুমারকে দূরদূরান্তে [illegible] পর্যন্ত ছুটতে হয়েছিল। সাঁতারে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া, হাত-পা শৃংখলিত করে জলের বুকে ভেসে বেড়ানো এসব কাজে তিনি ছিলেন সিদ্ধকর্মা। সাঁতারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করলে প্রফুল্লকুমার সেই ১৯২৮ সালে লস এঞ্জেলসের ওলিম্পিক পুলে প্রতিযোগী রূপে উপস্থিত থাকতে পারতেন। পশ্চিম বাংলার তিনিই প্রথম ক্রীড়াবিদ যাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়নে কলকাতা পৌরসভা একদিন নাগরিক সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই যে সাঁতারু হিসেবে প্রফুল্লকুমারই হলেন সারা ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত চরিত্র।

রমণী ওরফে ফকির মুখার্জি (জন্ম ১৯০১) প্রথম ডিভিশনে ফুটবল খেললেও তাঁর প্রসিদ্ধি ক্রিকেটার হিসাবেই। আরম্ভ ১৯২৭ সালে এরিয়ান্সের পক্ষে। অবসর ১৯৪০-৪১ মরশুমে যখন তিনি মোহনবাগানের খেলোয়াড়। দক্ষ ফিল্ডসম্যান দাঁড়াতেন স্লিপে। প্রবাদ ছিল, তিনি থাকতে স্লিপ দিয়ে মাছি গলারও জো থাকতো না। তেমনি সুদক্ষ অফ স্পিনার। অফ স্পিনের ফাঁদে তিনি যে কতোজনকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তার হিসাব ফকিরবাবুর নিজেরও মনে নেই। তদানীন্তন প্রতিনিধিমূলক ম্যাচে অনেকবারই তিনি বেঙ্গলী স্কুলের এবং বেঙ্গল জিমখানা দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। একালের ছেলেরা হয়তো শুনলে বিস্মিত হবেন যে ফকিরবাবু সারাজীবন ধুতি পরেই ক্রিকেট খেলেছেন। তবে সেকালে ধুতি পরে ক্রিকেট খেলার রেওয়াজ ছিল। তেমন বিসদৃশ ঠেকতো না।

খোলা মাঠের খেলায় অ্যাথলেটিকসই হলো আদি বিদ্যা। অথচ এ বিদ্যা অর্জনে পশ্চিম বাংলার যেন তেমন মন নেই। সেকালেও ছিল না। আজও নেই। বিশের দশকে বাঙালী তরুণের মধ্যে যে অল্প কজন ট্র্যাক-ফিল্ডের দিকে ঝুঁকেছিলেন আবু ইউসুফ (জন্ম ১ মার্চ ১৯০৪) তাঁদের অন্যতম। শুধু ঝোঁকেনইনি রীতিমতো সাফল্যও লাভ করেছিলেন। ১৯২৫—৩৫-এর ফাঁকে আবু ইউসুফ রাজ্য এবং সর্বভারতীয় স্তরে হাইজাম্পে রেকর্ড করেন। তাঁর কৃত রেকর্ড অতিক্রান্ত হতে প্রায় বিশ বছর গড়িয়ে যায়।

১৯৩০ সালে আবু ইউসুফ ভারতীয় অ্যাথলিট দলের প্রতিনিধি হিসেবে টোকিওতে যান এবং চার বছর পর দিল্লীতে পশ্চিম এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান হলে হাইজাম্পে ব্রোঞ্জ পদকও পান। বাঙালী অ্যাথলিটদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় পদক পান।

খেলাধুলার সুযোগ বঞ্চিত মহিলাকুলের সঙ্গে যেকালে খেলাধুলার বিশেষ সম্পর্কই ছিল না সেইকালেই লীলা ব্যানার্জি (কুমারী জীবনে চ্যাটার্জি) কস্টিউম এঁটে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তারপর শিক্ষা শেষ করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেই লীলার মহিমা প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সাল এই পাঁচ বছরে তিনি ছিলেন মহিলাকুলে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী। গঙ্গার দূরপাল্লার সাঁতারে (ত্রিশ মাইল) ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও তিনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। সারা ভারত থেকে সাঁতারু এসে সেদিন গঙ্গাবক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। আবহাওয়া ছিল প্রতিকূল। ঝড়-জলের চ্যালেঞ্জ ডিঙিয়ে অনেকে কূলেই ভিড়তে পারেননি। কিন্তু অল্পবয়সী লীলা অবলীলাক্রমে সেই পথের বাধা ডিঙিয়ে যায়।

লীলার [illegible] পশ্চিম বাংলার সাঁতার পরিচালিত [illegible] পুরুষদেরই খেয়াল খুশীতেই। রাজ্যপাট ছেলেদেরই। তাই নিয়ম ছিল যে কোনো মেয়ে চোদ্দ ছুঁলেই তাকে ক্লাব ছেড়ে চলে যেতে হবে। লীলাকেও তাই অকালে জলের সঙ্গে আড়ি পেতে অন্যত্র সরে যেতে হয়। তবে বছর সাতেক হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ একদিন লাহোর ও বোম্বাই সফরের আমন্ত্রণ পেয়ে আবার তিনি [illegible] ঝাঁপ দিয়ে প্রমাণ করেন যে দীর্ঘ অবসর [illegible] তাঁর সাঁতার দক্ষতায় টান পড়ে নি। ত[illegible] তিনি সারা ভারতের সেরা।

কুমারী থেকে জায়া জননী। জীবনস্রোতে ভাসতে ভাসতে বিবর্তন [illegible] এলেও লীলা সাঁতারের অভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিতে পারেন নি। ষাট সত্তরের দশকে আবার জলে ফিরে তিনি মেয়েদের হাতেনাতে সাঁতারের পাঠ পড়িয়েছেন। ইচ্ছে ছিল ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার। কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হলো কই। ভারত সরকার তাঁর অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরে রাজীই যে হলেন না।

হাতে কলম নিয়ে এবং মাইকের সামনে বসে খেলাধুলার আবেদন যাঁরা জনজীবনের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে আজীবন পরিশ্রম করছেন বেরি সর্বাধিকারী নিঃসন্দেহে তাঁদের দলে উত্তম পুরুষ। নয় [illegible] করে একশটি টেস্ট ক্রিকেট [illegible] ধারাবিবরণী তিনি সুললিত ভাষ্যে ও মধুক্ষরা কণ্ঠে শুনিয়েছেন। ভারতে এটি এক রেকর্ড। আর দেশে বিদেশে কতো খেলার বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট যে মনের আন্তরিকতায় সাজিয়েছেন তার ঠিক ঠিকানা কি।

খেলার টানেই তিনি দেশ মহাদেশ ঘুরেছেন। কখনো নিছকই খেলোয়াড়রূপে। আবার কখনো সাংবাদিক হিসেবে। যৌবনে ছিলেন ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ক্রীড়া প্রশাসক। কতকটা নিজের চেষ্টাতেই ভারতবিখ্যাত খেলোয়াড়দের জড়ো করে শক্তিশালী দল গড়ে তিনি সেই দলকে ভারতের বাইরে নিয়ে যান। উত্তরকালে হাত থেকে ব্যাট-বল ছেড়ে দিলেও ক্রিকেট তাঁকে কখনো ছাড়ে নি। জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি কয়েকটি সুখপাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছেন।

[illegible] বেরি সর্বাধিকারী সাংবাদিককুলে এক [illegible]। আমি নিজেও সাংবাদিক। বেরিবাবুর কাছ থেকে পেশাগত সংশিক্ষার কণাকিঞ্চিৎ যদি আয়ত্ত করতে পারি তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মানবো।

অজয় বসু

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব সন্তরণ প্রতিযোগিতা

কলম্বিয়ার ক্যালিতে আয়োজিত দ্বিতীয় বিশ্ব সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসরে অংশ গ্রহণ করেছিল ৩৯টি দেশ। প্রতিযোগিতায় ছিল এই চারটি বিষয়—সুইমিং, ডাইভিং, ওয়াটারপোলো এবং সিংক্রোনাইজড সুইমিং।

প্রতিযোগিতায় মোট পদক সংখ্যা ছিল ১১১—সাঁতারে ৪৭ এবং অন্যান্য বিষয়ে ২৫। পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকার শীর্ষ স্থান লাভ করে আমেরিকা—মোট পদক ৩৭ (স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ১১ ও ব্রোঞ্জ ১০) এবং দ্বিতীয় স্থান পায় পূর্ব জার্মানী মোট পদক ২৩ (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৫)। পয়েন্টের ভিত্তিতে তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করে পুরুষ বিভাগে আমেরিকা (পয়েন্ট ১৭৮) এবং মেয়েদের বিভাগে পূর্ব জার্মানী (পয়েন্ট ১৯১)। প্রতিযোগিতায় চৌকস প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিচয় দিয়েছে আমেরিকা—পয়েন্টের ভিত্তিতে পুরুষ বিভাগে প্রথম এবং মেয়েদের বিভাগে দ্বিতীয় স্থান (পয়েন্ট ১৫০) লাভ করে। আমেরিকার মোট স্বর্ণ পদক ১৬—সাঁতারে ১১, সিংক্রোনাইজড সাঁতারে ৩ এবং ডাইভিংয়ে ২। অপরদিকে পদক জয়ের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী পূর্ব জার্মানী কেবল সাঁতারেই ১১টি স্বর্ণ পদক পেয়েছিল। তাদের এই এগারটি স্বর্ণ পদক—মেয়েদের বিভাগে ১০ এবং পুরুষ বিভাগে ১। সাঁতারে সর্বাধিক স্বর্ণ পদক পেয়েছিল আমেরিকা এবং পূর্ব জার্মানী—প্রত্যেকেরই ১১টি করে স্বর্ণ পদক।

এবারের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা এবং পূর্ব জার্মানী গতবারের মত পদক পায়নি। এবার রাশিয়া এবং বৃটেন অনেক পদক তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। গতবার রাশিয়া পেয়েছিল মোট ৫টি পদক (সেই বছরে)। এবার রাশিয়া পেয়েছে মোট ১১টি পদক (এর মধ্যে স্বর্ণ ২)। গতবার সেখানে বৃটেন পেয়েছিল মাত্র ২টি পদক সেখানে
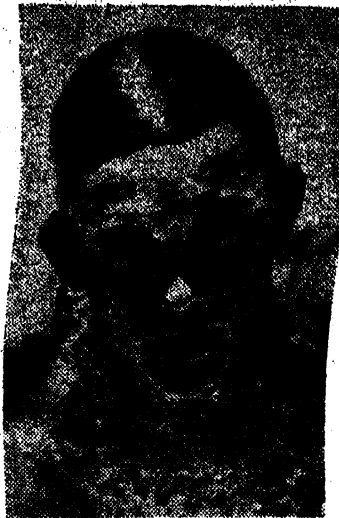
টিম শ (আমেরিকা) : দ্বিতীয় বিশ্বসন্তরণ প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক (তিনটি) স্বর্ণপদক জয় করেন।

এবার তারা ২০ জন সাঁতারু নিয়ে পেয়েছে মোট ৮টি পদক (এর মধ্যে স্বর্ণ পদক ২)। এবার বৃটেনের সাফল্য এই কারণে উল্লেখযোগ্য, তারা আমেরিকা, পূর্ব জার্মানী এবং রাশিয়া থেকে অনেক কম সাঁতারু নিয়ে ৮টি পদক পেয়েছে।

প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত তিনটি স্বর্ণ পদক পেয়েছে একমাত্র টিম শ (আমেরিকা)। [illegible] স্বর্ণ [illegible] রাশিয়ার [illegible] (আমেরিকা) এবং [illegible] এন্ডার [illegible] স্বর্ণ পদক জয় করেন।

[illegible] বছরের স্কুল-ছাত্র ব্যারি কোয়ান [illegible] বিশ্বরেকর্ড-ধারী [illegible] ৩য় স্থানে [illegible] করেন। অপরদিকে পূর্ব জার্মানীর ১৭ বছরের স্কুল-ছাত্রী কর্নেলিয়া এন্ডার ৫৮-২২ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার শেষ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড করেন।

অপ্রত্যাশিত ফলাফল

এবারের প্রতিযোগিতায় অনেক অঘটন ঘটে গেছে। যেমন পুরুষদের ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতারে বৃটেনের ডেভিড উইলকি এই বিভাগের মিউনিখ অলিম্পিক স্বর্ণপদক-জয়ী সাঁতারুকে হারিয়ে প্রথম হন। ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি সাঁতারে কুমারী ক্যাথি হেডি (আমেরিকা) এই বিভাগের বিশ্বরেকর্ডধারিণী উলরিক টৌবেরকে (পূর্ব জার্মানী) হারিয়ে দেন। মেয়েদের ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে আমেরিকার শার্লি বাবাশফ এই বিভাগের বিশ্বরেকর্ডধারিণী কোরনেলিয়া এনডারকে (পূর্ব জার্মানী) অপ্রত্যাশিতভাবে হারিয়ে স্বর্ণ পদক জয় করেন। জয়লাভের আনন্দে বাবাশফ কেঁদেই ফেলেছিলেন।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম আমেরিকা (১৭৮ পয়েন্ট), ২য় বৃটেন (৮৬ পয়েন্ট), ৩য় পশ্চিম জার্মানী (৮০ পয়েন্ট), ৪র্থ রাশিয়া (৭৩ পয়েন্ট), ৫ম পূর্ব জার্মানী (৭৩ পয়েন্ট) এবং ৬ষ্ঠ হাঙ্গেরী (৩৬ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম পূর্ব জার্মানী (১৯১ পয়েন্ট), ২য় আমেরিকা (১৫০ পয়েন্ট) ৩য় কানাডা (৭[illegible] পয়েন্ট), ৪র্থ হল্যান্ড (৪৮ পয়েন্ট), ৫ম অস্ট্রেলিয়া (৩৭ পয়েন্ট) এবং ৬ষ্ঠ পশ্চিম জার্মানী (২৭ পয়েন্ট)

ওয়াটারপোলো : স্বর্ণ রাশিয়া, রৌপ্য হাঙ্গেরী এবং ব্রোঞ্জ ইতালী। ফাইনালে রাশিয়া ৫—২ গোলে গতবারের স্বর্ণ পদক বিজয়ী হাঙ্গেরীকে হারিয়েছিল।

এশিয়ান বয়সভিত্তিক সাঁতার

সিউলে ৬ষ্ঠ এশিয়ান বয়সভিত্তিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৯টি দেশ যোগদান করেছিল। পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করে জাপান—মোট পদক ৫০ (স্বর্ণ ২৫, রৌপ্য ১৬ ও ব্রোঞ্জ ৯। দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ফিলিপাইন (স্বর্ণ ১১)।

প্রতিযোগিতায় ৮২টি বিষয় ছিল এবং ৩৯টি নতুন রেকর্ড হয়েছিল।

ফিলিপাইনের কুমারী ন্যানসি ডিক্সানো প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক স্বর্ণ পদক (পাঁচটি) জয় করেন।

খেলার জগতে মেয়ে

আর এক জিমন্যাস্ট

শিপ্রা সরকার

শিপ্রা অনুশীলন করে বহুবাজার ব্যায়াম সমিতিতে। তবে প্রতিযোগিতায় নামে দক্ষিণ কলকাতা ফিজিক্যাল কালচার ক্লাবের হয়ে। ওদের আদিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। শিপ্রার জন্ম টালীগঞ্জে প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে। ওরা তিন ভাই, তিন বোন। বোনেদের মধ্যে শিপ্রাই বড়। যাদবপুর বিক্রমগড় হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শিপ্রা ১৯৭৩-এ যুব উৎসবে যোগ দিয়েছিল। সেবার কালীঘাট ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে চালিত প্রতিযোগিতায় শিপ্রা ভল্টিং হর্সে প্রথম স্থান অধিকার করে। তাছাড়া যুব উৎসবেও ভল্টিং হর্সে প্রথম, বীম ব্যালান্সে দ্বিতীয় এবং ফ্লোর একসারসাইজে তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রথম আবির্ভাবেই সাড়া জাগায়।

লম্বা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি সেই থেকে একাগ্রতার সঙ্গে জিমন্যাস্টিক ক্রীড়া অনুশীলন করে চলেছে। '৭৩ সালেই রাজ্য প্রতিযোগিতায় ফ্লোর একসারসাইজে ও দ্বিতীয় হয়। '৭৪-এ ত্রিপুরায় আয়োজিত বাংলা দলে শিপ্রাও স্থান পেয়েছিল। কিন্তু বাড়ীর অসুবিধা থাকায় সেবার যেতে পারে নি। তবে, এ বছর রাজ্য আসরে শিপ্রা ভল্টিং হর্সে আবার প্রথম স্থান অধিকার করা ছাড়াও বীম ব্যালান্সে, [illegible] এবং ফ্লোর একসারসাইজে দ্বিতীয় স্থান দখল করে। এর আগে ৭৪-এর রাজ্য আসরে বীম ও ভল্টিং হর্সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু [illegible] উন্নতি করেছে, জিমন্যাস্টিক প্রশিক্ষক সন্তোষ ওঝাও জানালেন যে, নানা বাধা সত্ত্বেও শিপ্রা অনুশীলনে ক্ষান্তি দেয় নি।

গত বছর স্কুলক্রীড়ায় শিপ্রা বাংলা দলের প্রতিনিধিরূপে জয়পুরে গিয়েছিল। ওখানে বাংলা দলকে দ্বিতীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে শিপ্রার অবদান উল্লেখযোগ্য। পড়াশোনাতেও শিপ্রা খুবই ভাল। ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে নবম শ্রেণীতে উঠেছে।

—তুমি ত ইচ্ছা করলে এথলেটিকসে যোগ দিতে পারতে? তোমার মত মেয়ে এথলেটিকস চর্চা করলে মনে হয় বাংলার পক্ষে খুব লাভ হবে।

—এথলীট হবার ইচ্ছা আমার আছে। তবে, জিমন্যাস্টিকে বাঙালী মেয়েরা ক্রমেই বেশ কুশলী হয়ে উঠছে, তাই দেখে আমি এতে যোগ দিয়েছি। তাছাড়া বলুন, সব খেলার মধ্যে জিমন্যাস্টিক শ্রেষ্ঠ। এতে শরীরচর্চার দ্বারা দেহসৌষ্ঠও বাড়ে, সেই সঙ্গে দেহে শক্তিও হয়। এখনকার দিনে মেয়েদেরও ত শক্তিচর্চা করা দরকার।

—বাড়ীর লোকেরা তোমায় বাধা দেন না? অনেক বাড়ীতেই ত মেয়েদের ব্যায়াম চর্চায় আপত্তির কথা শোনা যায়।

—না, বরং বাবা দাদা আর মা আমার জিমন্যাস্টিক চর্চায় সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেন। তাছাড়া, আরও সুবিধা হচ্ছে, গরীব বড়লোক সবাই এই খেলায় যোগ দিতে পারে। এ খেলায় অর্থব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশী নয়।

[illegible] ক্লাবের প্রশিক্ষকও জানালেন [illegible] যে ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে অনুশীলন করান হয়, তাতে খুব আধুনিক [illegible] সম্ভব হয় না।

[illegible] খেলা। [illegible] আমার বিদেশী পত্র-পত্রিকা পড়ার অসুবিধা। তা ছাড়া এখন পত্র-পত্রিকা আসেই না। ফলে, ইচ্ছা থাকলেও জিমন্যাস্টিকে দেশ বিদেশের মেয়েরা কি রকম উন্নতি করছে তার খবর পায় না। এক ভিন্ন অলিম্পিক বা বিদেশী আসরের সামান্য খবর দেশী সংবাদপত্রে যা বের হয় তাই থেকে কিছু কিছু জানতে পারে। কিন্তু তাতে কৌতূহলও মেটে না বা নতুন খেলা শিখবার ব্যবস্থাও করা যায় না। তাছাড়া জিমন্যাস্টিকের ছবি বা প্রদর্শনী না দেখতে পেলে বিদেশের মেয়েরা কিভাবে এগোচ্ছে তা জানা কি করে সম্ভব হবে?

ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে বাংলা বা ত্রিপুরায় আস্তে আস্তে জিমন্যাস্টিক চর্চা বেশ গড়ে উঠেছে।

—জিমন্যাস্টিক করতে সাধারণ কি ধরনের খাদ্য দরকার বলে তোমার মনে হয়?

—প্রশিক্ষকদের মত অনুসারে আমরা বাড়ীর রোজকার খাবারই খাই। তবে, মাঝে মাঝে ফল, মাংসও একটু খেতে হয়।

—তোমাদের খাবার সম্পর্কে একটা তালিকা থাকা দরকার বলে মনে হয়। খাদ্যবিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের দেশে যা পাওয়া যায়, তার ভেতর থেকেই জিমন্যাস্টদের দেহ পুষ্টির উপযোগী খাদ্য তালিকা স্থির করা সম্ভব। খুব একটা চেষ্টা বিশেষ কিছু দরকার হয় না।

জিমন্যাস্টিকের ক্ষেত্রে পুষ্টির জন্য ক্রীড়া-চিকিৎসকরা এদেশের আবহাওয়ার অনুকূল, অথচ সস্তা খাবারের তালিকা স্থির করে দিতে পারেন। তাহলে একদিকে যেমন জিমন্যাস্ট ও অন্যান্য ক্রীড়াকুশলীদের সুবিধা হবে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষও পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হবে।

—একথা ঠিক। অনেক সময় অজ্ঞতাবশত ভুল খাবার খেয়ে অনেক ক্রীড়াকুশলী প্রতিযোগিতার সময় শারীরিক অসুস্থতার জন্য পেছিয়ে পড়ে। শুধু জিমন্যাস্ট কেন সবরকম ক্রীড়াকুশলীরই খাদ্য-পানীয় সম্পর্কে সচেতন থাকা খুব দরকার।

—তাহলে স্বাস্থ্যচর্চার কথা ত অনেক হল, এবার বল ত তোমার হবি কি?

—নানা রকম গান সংগ্রহ করে তা শিখে নেওয়া।

তাছাড়া—শিপ্রা বেশ ভাল আবৃত্তিও করতে পারে।

[illegible]

মাঠের নায়ক

জেনারেল সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল হোটেল এয়ারপোর্টে। সময়টা গির্জার ঘড়ির কাঁটা ঘর পেরিয়ে যেতে দেখে উঠবো উঠবো করছি ঠিক সেই সময় ওর আবির্ভাব। মুখে সলজ্জ হাসি, ব্যোধহয় দেরী হয়ে যাওয়ার কৈফিয়ৎ। আমায় দেখেই বললেন: সরি, দাদা। ভেরী স্যরি। একটু দেরী হয়ে গেল। ময়দান মার্কেটে টুকি টাকি কিনতে কিনতে আটকে পড়েছিলাম। অতঃপর চারতলা থেকে দুদ্দাড় করে নেমে গেলেন রাস্তার দিকে। উঠে এলেন দু'হাতে কোকাকোলার দুটি বোতল আর স্ট্র নিয়ে। 'প্লিজ হ্যাভ ইট'।

এঁরই নাম উলগা। অথবা নারায়ণস্বামী উলগানাথন। উলগানাথন কথাটির অর্থ বিশ্বপতি। মোহনবাগানের রাইট আউট। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা। দিব্যি ছিমছাম। গলায় সরু একটু সোনার হার। লকেটে ছবি বোধহয় ইষ্টদেবতার। উলগানাথনকে অনেকবার মাঠে দেখেছি বটে কিন্তু এতো কাছ থেকে এর আগে আর কোন দিন দেখি নি।

যে তিনটি গুণে আদর্শ খেলোয়াড় তৈরী করে সেই স্পীড, স্ট্যামিনা, স্কিল (গতি, দম, নৈপুণ্য) উলগার তো আছেই অধিকন্তু —আরও একটি বাড়তি "এস" অধিকারী তিনি। পায়ে সট্ আছে ট্রিগার টেপা বুলেটের মত। খেলার ধরণটি পরিচ্ছন্ন। ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতির মধ্যে নেই। মাথাটি ঠাণ্ডা। আত্মপ্রত্যয়ে নিটোল। উলগার জন্ম ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন বাঙ্গালোরে যে বাঙ্গালোর ভারতকে বহু দিকপাল খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে। উপহার দিয়েছে সোমানা, সত্তার, আমেদ খান, ধর্মরাজ ভরদ্বাজ ভেঙ্কটেশ, বাবু কেম্পিয়া অরুমা কামন এবং তারও আগে রহিম, রহমৎ, লক্ষ্মীনারায়ণের মত খেলোয়াড়কে। উলগার বাবা নারায়ণস্বামী অসামরিক বিভাগে চাকুরীজীবি। থাকেন বাঙ্গালোরেই পাকাপাকিভাবে। ভাই বোন মিলে উলগারা ছ'জন (তিন-তিন) উলগা মেজো। মা শ্রীমতী গোবিন্দ আম্মা। শৈশবে লেখাপড়া অস্টিন টাউনে কর্পোরেশন হাইস্কুলে (বাঙ্গালোর)। স্কুলের ইলেভেনথ ক্লাস পর্যন্ত পড়েই লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে যায় কতকটা ফুটবলের আকর্ষণে আবার কতকটা সংসারের চাপে। মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের ছেলে, দায়দায়িত্ব অনেক।

ফুটবলে হাতে খড়ি ১৯৬৮ সালে। গুরু উলগার জামাইবাবু ত্যাগরাজন। ত্যাগরাজন সন্তোষ ট্রফির আসরে মহীশূরের (অধুনা কর্ণাটক) প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গোড়ার দিকে খেলতেন স্থানীয় বাঙ্গালোর মারস দলের হয়ে 'সি' ডিভিসনে। ১৯৬৯ সালে ৫১৫ আর্মি বেস ওয়ার্কশপের হয়ে খেলেন সিনিয়ার ডিভিসনে। ১৯৭০ সালে সি আই এল দলে রাইট ইন হিসেবে (অধুনা পজিসন রাইট আউট)। মাদ্রাজের এ কর্মসূত্র তালিম পেলেন ত্যাগরাজন মহম্মদ (৫১৫ আর্মি বেসের কোচ) এবং জি এম মাধার কাছ থেকে। মহম্মদের কাছ থেকে। পরিমার্জিত হলেন, পরিশীলিত হলেন উলগানাথন।

১৯৭০, ৭১ এবং ৭২ সালে রোভার্স কাপ (বোম্বাই) এবং ডি সি এম ট্রফিতে (দিল্লী) খেলার অবকাশে নজর কাড়লেন কলকাতার জহুরীদের বিশেষতঃ শ্রীশৈলেন মান্নার এবং অরুময় নৈগমের। অরুময়ই ব্যবস্থা করে উলগাকে পাঠালেন ১৯৭৪ সালে মোহনবাগানে। ঐ বছরই ডুরাণ্ডের আসরে জে সি টি-র বিরুদ্ধে উলগা হ্যাট-ট্রিক করলেন এবং সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারালেন নিজেই গোল দিয়ে। উলগার ঐ একমাত্র গোলেই খেলার সেদিন জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ঘটেছিল। উলগার মতে ওটিই তাঁর জীবনের সেরা খেলা। ১৯৭২ সালে রেঙ্গুনে আয়োজিত প্রাক ওলিম্পিকের আসরে খেলেন ভারতের হয়ে ইস্রাইলের বিরুদ্ধে। পরের বছর মারদেকায় (কোয়ালালামপুর) এবং ১৯৭৪ সালে তেহরানে এশীয় ক্রীড়ায়। শেষোক্ত আসরে অবশ্য তিনি খেলার সুযোগ পাননি। মারদেকায় সব ম্যাচেই খেলেছিলেন।

এই মুহূর্তে উলগানাথন বিশ্বপতি নন নিশ্চয়ই কিন্তু কোলকাতার ফুটবল রসিকদের মনরাজ্যের অধীশ্বর। নিজের গুণে নিজেই মাঠের নায়ক। নিজের উত্তাপে নিজেই অগ্নীশ্বর।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

'আমরা ভুলে সবাই আমায় বললেন: ইস এমন সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলে না? জবাব দিতে পারি নি ঐ মুহূর্তে। দোষ আমারই। কিন্তু একবারও কেউ ভাবলেন না —কি অসাধারণ তৎপরতা ও ক্ষিপ্রবুদ্ধির জোরে শিউ গোলের মুখ থেকে ইভেনে সেদিন বলটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং স্পোর্টসম্যানশিপেরও তারিফ করুন.....।'

উলগানাথন

ফ্যাশন দুরস্ত অথচ টেঁকসই—এমন কাপড় যা শুধু বিনীই বানাতে পারে।

Interpub BB/54/75 Ben

অপর্ণা সেন

দোষটা আমারই। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেও রাখতে পারিনি। বাড়ীতে সকালবেলা ফোন করতে অপর্ণা সেন বলেছিলেন। স্টুডিওয় দেখা করতে। কিন্তু নির্ধারিত দিনের দুদিন বাদে যখন স্টুডিওয় পা দিলাম—তখন আশাই করিনি ওঁর সঙ্গে এমন চকিতে দেখা হয়ে যাবে। আর দেখা হলেও 'কিছুক্ষণ' সময় তাঁর কাছ থেকে অত সহজে আদায় করে নিতে পারব।

কলেজ লাইফ থেকেই পরিচিত বন্ধুদের কাছে রীনা, আপনাদের অপর্ণা সেন খুব মিশুকে আড্ডাবাজ বলেই খ্যাত। আজ তিনি ফিল্ম স্টার হয়েছেন বলে সেই চরিত্রের খুব একটা বদল হয়নি। যে কোনো মজলিশকে তিনি জমিয়ে দিতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে। আড্ডার বিষয় তাঁর কাছে কোনো ফ্যাক্টরই নয়। মার্কসের থিয়োরি থেকে রবীন্দ্রনাথ অব্দি সব দিকের সহজ যাতায়াত তাঁর। সুতরাং তিনি প্রায় আচমকাই যে আমাকে অতক্ষণ সময় দেবেন তাতে আশ্চর্য হইনি।

সৌমিত্র চ্যাটার্জি'র মেক-আপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, ভাগ্যিস ক্যাজুয়ালি ডান-দিকের ঘরটায় দৃষ্টিটা পড়েছিল। দেখি টেবিলের সামনে বসে একখানা বই পড়ছেন। রংয়ের কাজ মোটামুটি রেডি। পরদা সরিয়ে বললাম—'কি খবর? সুটিং আছে বুঝি?'

বইটা বন্ধ করে হাতের সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে রাখলেন। চোখের ইশারায় ঢুকে বসতে বললেন, বসলাম। আগের টেলিফোন—আসতে-না-পারা ইত্যাদি কথার পর বললাম—'কবে আসব বলুন, কাজ আপনার কবে নেই?'

ঝটিতি উনি বলে উঠলেন—'এখন আমার কাজ নেই। ইচ্ছে করলে এখুনি 'ইন্টারভিউ' হতে পারে। আপনি কি রাজী? ফ্লোরে যেতে আমার দেরী আছে।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছাড়াই উনি এমন দুম করে রাজী হয়ে যাবেন ভাবিনি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবলাম উনি যখন রাজী আমি আর কিন্তু করি কেন? বললাম—'না, আমার আর কি অসুবিধে?'

—শুরু করুন তাহলে—সিগারেটটা নিভে যেতে ধরিয়ে নিলেন আবার।

ঃ শুরু করার কোনো ব্যাপার নেই রীনাদি। ঠিক ইন্টারভিউ নয়তো ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ ইনফর্মাল আলোচনা—কথাবার্তা এই আর কি?

—সেকি? আমাদের সঙ্গে ইণ্টারভিউ ছাড়া আবার কি হবে? বলেই হেসে উঠলেন। 'কি বলি বলুনতো?'

ঃ বম্বে থেকে কাজ করে এলেন—সেসব কথা কিছু বলুন শুনি।

শুধুমাত্র এই ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটার জন্য বোধহয় তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

স্রোতের মত কথা বেরিয়ে আসতে লাগল পরমুহূর্তেই।

অপর্ণা সেন বম্বেতে ছবি করতে এই প্রথম যাননি। কেবল কাপুরের ছবি (নিশ্বাস) করার জন্য বেশ কয়েক বছর আগে তিনি গিয়েছিলেন ওখানে। সেবারে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে তিক্ত বিষয়ের অভাব ছিল না।

ও'র এবারের অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্য-রকম। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে এতদিনে কম অভিজ্ঞতা হয়নি। এখন তিনি বেশ সচেতন হয়েছেন। সুতরাং এবারে আর পদে পদে ঠকতে হয়নি তাঁকে। কলকাতায় বসেই হৃষিকেশ মুখার্জির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল, 'কোতোয়াল সাব' ছবির জন্য। 'হৃষিদা অনেকদিন থেকেই আমায় নিয়ে ছবি করবেন বলছিলেন।'

হৃষিবাবুর সঙ্গে কাজ করতে করতে যোগাযোগ হোল প্রোডিউসার পবনকুমারের সঙ্গে। 'ও'র ছবিতেও কাজ করছি এখন।' প্রোডিউসারের নামটা কিছুতেই মনে আসছিল না। হেয়ার ড্রেসার ও'কে মনে করিয়ে দিলেন। ছবির নাম 'পরম ঈমান।' এ ছবির কাস্টিং দারুণ। তিন নায়ক শশী কাপুর - অমিতাভ বচ্চন-সঞ্জীবকুমার। আর নায়িকা দুজন—অপর্ণা সেন ও রেখা। পরিচালক দেশ মুখার্জি। দুটো ছবিরই কিছু কাজ করে এসেছেন। আগস্ট মাসে হয়তো আবার যাবেন বম্বেতে।

কলকাতায় এত কম ছবি করছেন কেন জিজ্ঞেস করতে বললেন—'ক'টা ছবির মত ছবি হচ্ছে বলুন। আর সব ছবিতে তো আমি কাজ করতে পারি না। চারখানা ছবি এখন ফ্লোরে। (অজস্র ধন্যবাদ পালাবার পথ নেই, নিশি মৃগয়া, অসিধারা)

: তবুও আগের চাইতে তো অনেক কম?

অভিযোগটা অস্বীকার করলেন না তিনি। বললেন—হ্যাঁ, তা ঠিকই। আসলে আমি এখন ডিসাইড করেছি স্ক্রিপ্ট ভালো না লাগলে আর ডিরেকটর পছন্দ না হলে ছবি নেবো না। আগে উল্টো পাল্টা কিছু কাজ করেছিলাম, তার জন্য পস্তাতে হচ্ছে এখন। আর ওপথে না।'

কথায় বেশ প্রত্যয়ের ভাব। সিনেমায় অভিনয়টাও আর তেমন ভালো লাগছে না তাঁর। নেহাৎ বেঁচে থাকার জন্যই কাজ করছেন।

তাই বললেন—যে কাজটুকু করছি তার অনেকটাই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য।' নইলে ছবি করা সম্পর্কে তাঁর এখন বেশ অনীহা।

থিয়েটার?

একসময় যেটি ছিল তাঁর প্রাণের মত, আজ তিনি তাও ছেড়েছেন। বোধ হয় আর কোনোদিনই তিনি মঞ্চে আসবেন না। কেন? প্রশ্নটা রাখতে কোনো সদুত্তর পাইনি। খুব আলগা ভাবে উত্তর পেলাম—ভাল্লাগে না।' উত্তর শুনে মনে হোল কোথায় যেন একটা আঘাতের আভাষ আছে। অভিনেতৃ সংঘের কুশবিদ্ধ কিউবায় তিনি বোধহয় সর্বশেষ অভিনয় করেছেন।

ঠিক এই সময়ই ঘরে ঢুকলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি। আমায় বসে থাকতে দেখে অপর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'কি ব্যাপার —ইন্টারভিউ দিচ্ছ নাকি?' আমাকে দেখিয়ে বললেন—এ বড়ো উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে, সাবধানে উত্তর দিও রীনা।'

অপর্ণা তখন হাসছেন। গালে ছোট্ট টোল পড়ছে। নাটকে অভিনয় না করার কথা কানে যেতে সৌমিত্রবাবু বললেন—নাটক করবেই না—এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কেন তোমার? ধরো যদি কোনোদিন প্রচুর পয়সা হয়ে যায় তোমার, প্রয়োজনের অতিরিক্তই মনে করো পেলে। তখনও কি নাটক করবে না?

হাসির ছররা থেমে গেল অপর্ণার। একটু ভাবুক ভাবুক মুখ করে বললেন—'এখনও যা মানসিক অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছে করবো না। তবে কিনা সবই ডিপেন্ডস।'

প্রসঙ্গত বলি ইন্দ্রপুরীতে সেদিন যে ছবির স্যুটিং ছিল তার নাম 'নিশিমৃগয়া।' সৌমিত্র অপর্ণা ঐ ছবির নায়ক-নায়িকা। সকাল থেকে সৌমিত্রবাবু মেক-আপ ঘরে ধড়াচুড়ো পরে বসে আছেন। স্টুডিওর

দুলাল দত্ত

যুদ্ধ তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। কলকাতায় তখনও আঁচ লাগে নি। কিন্তু আতংকে শহরবাসীরা শহর ছাড়তে শুরু করেছে। এমনি সময় তেরো-চোদ্দ বছরের এক কিশোর কলকাতা ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছিল বম্বেতে। চোখে তখন তার পরিচালক হবার স্বপ্ন।

অনেক ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে স্বপ্ন সফল হবার সময় যখন এলো, তখন কলকাতার বাড়ীর জন্য মন আনচান করছে তার। তাই বম্বেতে সুরেন্দ্র দেশাই-এর সংগে মাত্র একটি ছবিতে (পয়গম) সহকারীর কাজ করেই সেই কিশোর চলে এসেছিল নিজের ঘরে, কলকাতায়।

এবং এসেছিল বলেই আজকের বাংলা ছবি পেয়েছে দুলাল দত্তের মত কুশলী এক সম্পাদককে। কলকাতায় ফিরে দুলালবাবু সম্পাদক অর্ধেন্দু চ্যাটার্জির কাছে হাতে-কলমে কাজ শিখলেন প্রায় ন বছর। ইতিমধ্যে বন্ধু বংশীচন্দ্র গুপ্তর মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটেছে সত্যজিৎ রায়ের সংগে। শ্রীরায় তখন সবেমাত্র 'পথের পাঁচালী' শুরু করেছেন। ঐ ছবির সকল কুশলীই তখন নবীন। দুলালবাবুও যোগ দিলেন ইউনিটে। একই সংগে সত্যেন বসুর 'ভোর হয়ে এলো' ছবিরও কাজ করছেন তখন।

আনন্দ সংবাদ, এখনও তিনি সত্যজিৎ রায়ের সংগে কাজ করে যাচ্ছেন। একটানা একজন পরিচালকের সংগে এতদিন আর কোন সম্পাদক কাজ করেছেন বলে শুনি নি। সম্ভবত এরকম জুটি বিশ্বে প্রথম।

পরিচালকের সংগে তাঁর সম্পর্ক কি রকম, প্রশ্নটা রাখতে তিনি হাতের সাউণ্ড নেগেটিভগুলো (সম্ভবত 'জনঅরণ্য' ছবির) গুছিয়ে নিয়ে একটু সময় ভেবে নিলেন। তারপর বললেন—একজন খেয়াল গাইয়ে আর তাঁর তবলচির সম্পর্ক যে রকম হয় অনেকটা সে রকম বলতে পারেন। এ ব্যাপারটা এমন জটিল যে ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না।'

—বিখ্যাত পরিচালকের সংগে কাজ করায় নাকি স্বাধীনতা থাকে না—এমন অভিযোগের কথা তুললে তিনি সরাসরি তা অস্বীকার করলেন। বললেন—'না না তা কখনই নয়, আমি তো সত্যজিৎবাবুর সংগে কাজ করছি বাইশ/তেইশ বছর হল, একদিনও সে রকম ফিল করি নি। বরং উল্টোটাই হয়। উনি প্রচন্ড স্বাধীনতা দেন আমায়। আসল ব্যাপার কি জানেন পরিচালক-সম্পাদকের চিন্তায় একাত্মতা প্রয়োজন সবার আগে।'

সম্পাদক হবার প্রধান যোগ্যতা যা অর্থাৎ সেন্স অফ ড্রামা ও সেন্স অফ প্রোপোরশন দুলালবাবুর তা দারুণ। সত্যজিৎ রায়ের ছবি ছাড়াও তরুণ মজুমদার (নিমন্ত্রণ, বালিকা বধূ), অজয় কর (মাল্যদান, পরিণীতা) বা পীযূষ বসু (অনুষ্টুপ ছন্দ) ও অসিত সেনের 'চলাচল' দেখলেই তাঁর সেই দক্ষতা প্রমাণিত হবে।

আর সব চাইতে বড় প্রমাণ তাঁর কাজের স্বীকৃতি মিলেছে বিভিন্ন পুরস্কার-প্রাপ্তিতে। হ্যাটট্রিকসহ বি-এফ-জে-এ পুরস্কার তিনি কতবার পেয়েছেন ঠিক গুণে বলতে পারলেন না। (সম্ভবত ছবার) রাজ্য সরকার তাঁকে গত বছর সেরা সম্পাদকের পুরস্কার দিয়েছেন 'সোনার কেল্লা'র জন্য।

পেশায় সাফল্য এসেছে, সেই সংগে সাংসারিক জীবনেও আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত। বেহালায় ছোট্ট একখানা মাথা গোঁজবার ঠাঁই তৈরী করেছেন, চার সন্তানের পিতা দুলালবাবু এখন ভাবছেন—মেয়েটাকে একটু গান শেখাবো। আর বন্দে যাবার কথাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মনের ফাঁকে।

—নিরীক্ষিৎ

তখনও ডাক আসেনি। আদৌ আসবে কিনা তারও ঠিক নেই। অপর্ণা কয়েকটা সট্ দিয়ে এসেছেন। একটু বাদে আবার যাবেন। বিশ্রামের ফাঁকে আমার এই অনাহূত আক্রমণ।

সৌমিত্রবাবু ইতিমধ্যে জমিয়ে বসে পড়েছেন পাশের সোফায়। সাংবাদিকদের প্রশ্ন—বাংলা ছবির অবস্থা - সত্যজিৎ রায় —এইসব নিয়ে আলোচনা চলেছে।

অপর্ণার কয়েকটা কথা শুনে মনে হোল তিনি চান না তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনো ঘটনা নিয়ে কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করুক। তিনি বোধহয় বিরক্তই হন। ক'দিন আগে নাকি একজন সাংবাদিক তাঁর সংগে স্বামীর বিচ্ছেদের ব্যাপার নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিলেন। সংগে সংগে অপর্ণা তাঁকে সাফ জবাব দিয়েছেন— 'সে পার্সোন্যাল অ্যাফেয়ার। আমার জীবনে বিবাহ বিচ্ছেদটাই একমাত্র ঘটনা নয়, আরও অনেক কিছু আছে—তাই নিয়ে প্রশ্ন করুন জবাব পাবেন, নইলে নয়।'

সেই সাংবাদিক ভদ্রলোক তারপর অপর্ণাকে কি প্রশ্ন করেছিলেন আমি আর জিজ্ঞেস করিনি। তবে 'মেয়ে এখন কার কাছে আছে? বোর্ডিংয়ে দেবেন শুনেছিলাম!' —প্রশ্ন দুটো রাখতে তিনি একটু ক্ষুব্ধ হলেন মনে হোল। গলায় একটু জোর দিয়ে বললেন—'মেয়ে আমার কাছেই আছে। আর ওকে বোর্ডিংয়ে দেবো কেন? আমার কাছেই থাকবে।

সৌমিত্রবাবু চাপচাপ

একটু বাদে [illegible] বলে উঠলেন— 'বলেছিলাম না [illegible] বড় উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে!'

নতুন সূর্য/সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপংকর দে, গীতা দে ও মাধবী চক্রবর্তী।

অপর্ণার কন্ঠে ভাবটা তখন বুঝি একটু কমেছে। সৌমিত্রবাবুর কথায় আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি।

বললেন—'না, এবারে আর তেমন প্রশ্ন করেন নি। আগের বার করেছিলেন। সেই সতীত্ব নারীত্ব নাকি সব নিয়ে অনেক প্রশ্ন।' আমায় উদ্দেশ্য করে বললেন— 'মনে আছে আপনার?'

ডায়রীর পাতা থেকে কলম আর চোখ তুলে বললাম—'মনে নেই আবার!'

সামনে রাখা কফির কাপটা যখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেয়াল নেই। অপর্ণার কাপেরও একই অবস্থা। এক চুমুকে সবটা শেষ করা গেল। অপর্ণাও করলেন।

হেয়ার ড্রেসারের সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে কমেনট কথা' সেরে নিলেন এই ফাঁকে। চুলের ক্লিপগুলো খুলে ফেললেন পটাপট। টেবিলে রাখা ওষুধের শিশি থেকে দুটো ট্যাবলেট খেলেন। আরও একটা টনিকের শিশি রয়েছে দেখলাম। এত ওষুধ-পত্র দেখে বললাম—'কি ব্যাপার? শরীর খারাপ নাকি?'

জানালেন সত্যিই খারাপ। ক'দিন আগে নাকি কোথায় ছবি তোলাতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার বলেছেন —লো প্রেসার। তাই এই ব্যবস্থা। সৌমিত্রবাবু বোধহয় অপর্ণার কথার সত্যতা যাচাই-এর জন্য ওষুধের শিশিটা তুলে তার কম্পোজিশন দেখতে লাগলেন বিজ্ঞের মত ভাব করে। তাই দেখে অপর্ণা হাসতে হাসতে বললেন— 'তুমি ডাক্তার হলে কবে?

সৌমিত্রবাবু বিজ্ঞের মত মুখ করেই বললেন— 'তুমি ইন্টারভিউ দাও—আমি আসি।'

ইতিমধ্যে ফ্লোর থেকে রেডি হবার ডাক এসেছে অপর্ণার। আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চেহারায় তিনি মনোযোগ দিয়েছেন এখন। চুল—চোখ—পোষাক দেখে নিচ্ছেন। আমার দিকে ব্যস্ত চোখে তাকিয়ে বললেন—বলুন আপনার আর কি জানার আছে? না যা শুনলেন এতেই চলবে?

জানার ছিল অনেক কিছুই, কিন্তু এই অল্প সময়ে এই ব্যস্ততার মধ্যে কি সব জানা যায়? যায় না। কিছু অনুমান করে নিতে হয়—, কিছু হাবেভাবে। তাই হেসে বললাম—'না, এতেই চলবে।'

আমার কথার স্বরে বোধহয় নিশ্চয়তা ছিল না। তাই তিনি বলে উঠলেন—চলুন না ফ্লোরের ওখানে কথা বলা যাবে।' আমি হেসে বললাম—'না, আজ যাই।'

মেক-আপ ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পথে ভাবছি অপর্ণা সেন অভিনয় ভালবাসেন বলেই জানতাম। তিনি নিজে একথা একাধিকবার বলেছেন। নাটক সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা আরও বেশী। সেই অপর্ণা সেন অভিনয় ছাড়বেন, নাটক ছেড়েছেন—একথা ভাবছেন কেন? নাকি সাময়িক মন খারাপের ব্যাপার, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে?

নির্মল ধর

সন্ন্যাসী রাজা। উত্তমকুমার / সুপ্রিয়াদেবী

সুদূর নীহারিকা / সোমা দে। তরুণকুমার

বন্দী বিধাতা/পার্থ মুখোপাধ্যায় ও বোম্বের রাহী

সিনেমাটিক টক

ভূতের ভয়ে সন্দা গুড়িসুড়ি মেরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল অঘোরে। নাকের বোম্বাস্টিক বাদ্য বাজাতে বাজাতে পান্দা শুতে এসে দেখে, যা ভাবা গিয়েছিল— সন্দা তার লেপটি জড়িয়ে দিব্য নোজাল অর্কেস্ট্রা বাজাচ্ছে। কি আর করা! ঘুমন্ত মানুষকে ডিসটার্ব করা তো ঠিক নয়। অতএব সন্দার সেই তথাকথিত বিলিতি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

উঃ, কি ভীষণ শীত। কাৎ হয়ে ফিরে শোবার উপায় পর্যন্ত নেই। ফিরলেই মনে হবে যেন বরফের ওপর শুয়ে আছি। হঠাৎ সন্দার ঘুম ভেঙে গেল। মানে প্রকৃতির আহ্বানে। রাত গভীর হয়েছে। ঘর অন্ধকার। বাইরে বাতাসের সেই একটানা শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন হাজার হাজার অশরীরী এই পাহাড়ী উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবাঃ এই অবস্থায় বাইরে যাওয়া আর যার পক্ষেই হোক না কেন, সন্দার পক্ষে অসম্ভব। লাখ টাকা দিলেও নয়। কিন্তু না যাওয়াও তো অসম্ভব।

সন্দা হঠাৎ দারুণ ক্ষেপে গেল নেচারের ওপর। যত্তসব ভিরকুটি। পান্দা পান্নালাল (পিনাকী মুখার্জির আদরের ডাক নাম) শুয়ে নিদ্রা দিচ্ছে সুখে। মনে হয় না যে এই ব্যাপারে তার কোন সহযোগিতা পাওয়া যাবে। যা বদরাগী মানুষ! ঘুম ভাঙালে হয়ত ভয়ঙ্কর চটে যাবে। তারপর কিছু বাকা দেবে। নাঃ, ওকে ডাকা উচিত হবে না।

সন্দা দুর্গা নাম জপে উঠে পড়ল।

তারপর অন্ধকারে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। তারপর সিটকিনি খুলে জানলার কপাটটা সামান্য একটু ফাঁক করতেই উরিপ্পাদার, কি কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। —সন্দা শীতের গুঁতোয় হি-হি-হি-হি করতে করতে সামনে এগোল। অবকোর্স—চক্ষু মুদিয়া।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে একতলা থেকে বিকট একটা আঁ-আঁ-আঁ-আঁ আর্তনাদ শোনা গেল। সামান্য ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাতেই সন্দার রক্ত ঠান্ডা। বিশাল লম্বা মত একটি দেহ, সাদা ধপধপে, লাফিয়ে উঠে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আর বিচ্ছিরি এক আওয়াজ করছে।

সন্দা প্রায় অজ্ঞান। বিকট আর্তনাদ করে এক লাফে পান্দার বিছানায় ঝাঁপিয়েই দিয়েছিল সম্ভবত। পান্দা লাফিয়ে উঠে দেখে সন্দা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে তার কোলের ওপর।

—এই এই সন্দা, কি হয়েছে, কি হয়েছে? পান্দা ওর কান্ড দেখে হতভম্ব —আরে বলবে তো কি হয়েছে—? এমন কাঁপছো কেন? ভয় পেয়েছো নাকি?

সন্দা কোনগতিকে উচ্চারণ করল—পান্, আমি জ্যান্ত এট্টা ভূত দেখেছি, হু— একতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম—

—যাঃ।

—মাইরি বলছি—

—তা তুমি দরজা খুলে কি করছিলে?

সন্দা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—আমি ইয়ে করছিলাম মানে দরজা খুলে দেখছিলাম বাড়িতে চোর-জোচ্চোর সেঁদুচ্ছে কিনা তাই দেখতে গিয়ে হঠাৎ ভূতটাকে দেখলাম। বিশ্বেস কর। ইয়া লম্বা। ইয়া চওড়া। ধপধপে সাদা...উঃ।

পান্দা তড়াক করে উঠে দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে এল। উঁহু। সেখানে কেউ নেই। ওদিকে সন্দার কাঁপুনী আর থামতে চায় না। পান্দা অগত্যা কম্বলটাও জড়িয়ে দিল ওর গায়ে।

দোতলায় যখন এই অবস্থা, নীচে একতলার ক্যামেরার ঘরে তখন আর এক কান্ড চলেছে। সবাই লণ্ঠন জ্বালিয়ে উঠে বসে বিস্ফারিত চোখে জীবেন বসুকে দেখছে আর শুনছে লোমহর্ষক বিবরণ।

গভীর রাত্রে বাইরে বেরোবার জন্য উঠেছিলেন জীবেনদা। ভেবেছিলেন সামনে বারান্দা দিয়েই এগোনো যাক বরং।

বিছানার সাদা চাদরটা ভাই আপাদমস্তক জড়িয়ে তিনি সন্তর্পণে দরজার খিল খুলে বাইরে এসেছিলেন। বাইরে তখন ফিকে জ্যোৎস্না।

এমন সময়, জীবেন বসু তখনও ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছেন—দোতলায় ভূত—!

শুনে একজন ক্ষেপে গিয়ে বলল—জীবুদা, ভূতটা তুমি দেখতে পেলে?

—শুধু একটুখানি, কিন্তু ঠান্ডা হাওয়া, কিছুই দেখতে পেলাম না আর—

একজন শ্রোতা গম্ভীর মুখে বলল—অদৃশ্য, অলৌকিক ব্যাপার কখনও চোখে দেখা যায়? বাপরে, শুনেই আমার কেমন যেন গা ছম-ছম করছে।

জীবেন বসু ক্ষীণ কণ্ঠে তখন বললেন সন্দ তখন চেঁচাচ্ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করে নি। এখন দেখা যাচ্ছে—ও ঠিকই বলেছে। এটা সত্যিই ভূতের বাড়ি। আর এ বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না।

—বটেই তো—সঙ্গে সঙ্গে একজন তাকে সমর্থন করে বলল—আজ দেখা দিল, কাল যদি আবার ঘাড়ে চাপে তখন? তখন কি হবে? অ্যাঁ?

অজস্র ধন্যবাদ/অপর্ণা সেন। শৈলেন্দ্র সিং। পরিচালনা: অরবিন্দ মুখার্জি।
অমৃত ফটো

একজনের এরই মধ্যে দারুণ আফশোষ। ...ইস, সেটুট মাথার ওপর ছিল, কিন্তু ...বীরুদা দেখতে পেলেন না। ভূত যে কি ...কম দেখতে মাঝে মাঝে আমার খুউব ...নতে ইচ্ছে করে...

একজন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল— ...ক আছে। এবার তোর সে কামনা পূর্ণ ...বে। মায়ের দয়ায় এখানে নানা রকমের ...তে দেখা যাবে মনে হচ্ছে—

জীবেন বসু আতঙ্কে তখনও কাঁপছেন। ...র তাঁকে ঘিরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে সবাই ...কটা একটা মন্তব্য করে চলেছে যার ...মন অভিপ্রায়। কেউ বলছে—ওটা ছিল ...টা ফ্লাইং ভূত। ব্যাটা নিশ্চিত পাইলট ...ল। অ্যাকসিডেন্টে টেঁসে গেছে।

হঠাৎ মাথার ওপর দুপদাপ আওয়াজ। ...ঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপকাটি নট। নির্ঘাৎ ...ভৌতিক কাণ্ড। এত রাতে দোতলায় কে ...বার ভারতনাট্যম নাচবে? কিন্তু উঁহু, ...র গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ...নুদা না? পানুদা চেঁচিয়ে কি-যেন বলছে ...কে। একজন সাহসী পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে ...তলায় ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ...লাফাতে নেমে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে ...ল—সর্বনাশ হয়েছে। সুনুদাও ভূত ...খেছে। তাই দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে...

জীবুদা তৎক্ষণাৎ—কিভাবে দেখল?

—দরজা দিয়ে দেখতে পেয়েছে—ভূতটা ...না চাদর মুড়ি দিয়ে ওপারের দিকে নাকি ...চ্ছিল...

বলতেই জীবুদা তড়াক করে লাফিয়ে ...ল। তারপর লোহার রড খুঁজতে ...কতে বলল—তাহলে এটা সুনুরই ...

জীবেন বসুর মত অমন শান্তশিষ্ট ...মানুষ হঠাৎ লোহার রড বার ...তে দেখে আতঙ্কে সবার মধ্যে যেন ...ঠাই পড়ে গেল। —দাদা দাদা, এ ...পনি কি করছেন! লোহার রড দিয়ে কি ...পনি ভূত ঠেকাতে পারবেন? না না, রড ...ফেলে দিন, রড ফেলে দিন...

—হাট আপ! হাম আজ কোই বাত ...হি শুনেগা। হাম আজ একটা মার্ডার ...রেগা। কাসকে ফাঁসি যায়েগা...

কেউ আর তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে ...। সবাই ভাবল দাদার মাথায় ভূতে ইয়ে ...রেছে বলে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ...আর জীবেন বসু তখন—আমাকে ...ড়ে দাও। আজ ওর একদিন কি আমারই ...দিন। ব্যাটা শেষ পর্যন্ত আমাকেই ভয় ...খালে?

হট্টগোল শুনে সবাই দৌড়ে এলো। আর সেই খবর সুনুদার কানে ...পৌঁছাতে সুনুদা আর যেন নেই। অ্যাঁ! ...টা তাহলে ভূত নয়? এ-হে-হে-হে...

অর্ধেন্দু মুখার্জি সময় মত ইন্টার... ...ন করে খুনের মামলাটা বাঁচিয়ে দিলেন ...ম পর্যন্ত। তারপর হতাশ কণ্ঠে ...নুদাকে উদ্দেশ করে মন্তব্য করলেন— ...বাস্তবিক তোমার তুলনা হয় না সুনু।

দস্যু সর্দার রত্নাকর
শেখর চ্যাটার্জী/রেহানা সুলতান
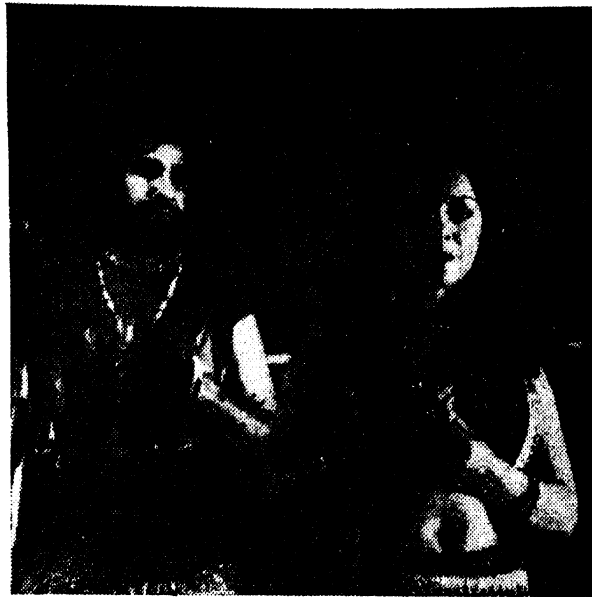
তুমিই শেষ পর্যন্ত জীবেনের দফা-রফা করছিলে? —ছি ছি ছি...!

অপরাধী সুনীল রায়চৌধুরীর তখন 'ধরণী দ্বিধা হও' গোছের অবস্থা।

যাই হোক আসল কথা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে যাই আবার।

সুদর্শন অভিনেতা দীপক মুখার্জির উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে সন্ন্যাসী ইংরিজীতে যা বললেন তাতে জানা গেল যে—ঠিক পাশের বাড়িতে এক তরুণ যুবক মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে আছে। এখন তার নাকি অন্তিম দশা। তাকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে একজন ডাক্তার দরকার। দরকার প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র। সন্ন্যাসী জানতে চাইলেন—আপনাদের মধ্যে কোন ডাক্তার আছেন?

ফিল্মে যোগদান করার আগে দীপক মুখার্জি ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে একজন অফিসার। ডাক্তারী না জানলেও সার্ভিস-রুল অনুযায়ী তাঁকে ফার্স্ট এইডের ব্যাপারটা জানতেই হয়েছে।

তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। সেই মেক-আপ করা অবস্থাতেই ছুটলেন পাশের বাড়ির দিকে। মুহূর্তে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। পানুদা আর সুনুদা পাঁড়মার তাঁকে অনুসরণ করলেন। আর সন্ন্যাসী ছুটলেন ডাক্তারের খোঁজে।

যুবকটির তখন সত্যিই অন্তিমদশা। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর একটা শতরঞ্চিতে শুয়ে আছে। নিঃস্পন্দ শরীর। সেখানে জীবনের

অন্যাত্মান/উত্তমকুমার ও জহর রায় ।পরিচালনাঃ সলিল সেন। অমৃত ফটো

কোন চিহ্ন-ই নেই। দীপক মুখার্জি ওর বুকে কান পেতে হার্টের সাউন্ড শোনবার চেষ্টা করলেন। নাঃ। কোন শব্দ নেই। দীপক মুখার্জি তাড়াতাড়ি ম্যাসেজ করতে আরম্ভ করলেন, যদি তাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

পানুদাও ওর বুকে কান পেতে হার্ট বিট শোনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হতাশ ভঙ্গীতে উঠে এলেন। তারপর মৃদু স্বরে দীপক মুখার্জিকে বললেন—তুমি অনর্থক চেষ্টা করছ। হি ইজ ডেড!

ইতিমধ্যে সেই সন্ন্যাসী হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে আরও একজন প্রবীণ সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী। তাঁর হাতে স্টেথো আর ওষুধের বাকস। দীপক মুখার্জি তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে উঠে প্রবীণ সন্ন্যাসীকে জায়গা করে দিলেন। শোনা গেল ইনি একজন বিলেত ফেরত এফ আর সি এস ডাক্তার। কিন্তু সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসব্রত নিয়ে দীর্ঘকাল এই হৃষিকেশে আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য — হৃষিকেশ, হরিদ্বারে এমন প্রচুর সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা অতীতে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কেউ ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। কেউ সাংবাদিক আর কেউ বা ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এঁরা সাংবাদিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এখন সাধন-পুজন নিয়েই আছেন। বাইরের জগতের কোন আকর্ষণই আর এঁদের টলাতে পারে না।

প্রবীণ সন্ন্যাসী রুগীকে ভালভাবে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন—এঁর মৃত্যু অনেকক্ষণ আগেই হয়েছে। ঈশ্বর...। অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগার দরুণ নিমোনিয়া হয়েছিল। আর মৃত্যুর কারণ হচ্ছে সেটাই...

আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, তবু এই দূরে বিদেশে নিঃসঙ্গ এই যুবকের মৃত্যুতে সবাই হঠাৎ কেমন যেন বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। সনুদার চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ল।

খবর পেয়ে লোকেশান থেকে অর্ধেন্দু মুখার্জিও ছুটে এসেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না।

এর পর সেই নীরবতা ভঙ্গ করে সন্ন্যাসী বলে উঠলেন—মঙ্গলময় ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে...। এবার এর শেষ-কৃত্যের আয়োজন করতে হয়। দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়—

বলে তিনি সেই চিকিৎসক সন্ন্যাসীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অগ্র অর্ধেন্দু মুখার্জিও সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলেন। কথা ছিল, আজ সকাল থেকে ছবির শুটিং যথারীতি আরম্ভ হবে। কিন্তু কাজ শুরু হবার মুখে মুখে এ কি বিপত্তি!

প্রত্যেকেরই মেজাজ খারাপ। এ অবস্থায় কি আর কাজ করা যায়। বিশেষ করে সিনেমার শুটিং!

তৎক্ষণে এক রাউন্ড চা এসে গেছে সবাই গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে এমন সময় রাস্তা থেকে তুমুল কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেল, শুনে সবাই হুড়মুড় করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন শবযাত্রা বেরিয়েছে।

সবাই অবাক। কত তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেই সন্ন্যাসীই সব ব্যবস্থা করেছেন। মৃতদেহ খাটিয়ায় তুলে কাঁধে বয়ে একদল সন্ন্যাসী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গঙ্গার পথে এগিয়ে চলেছেন। আর একদল তাঁদের অনুসরণ করে হেঁটে চলেছেন কাঁসর-ঘন্টা সাজিয়ে বাজাতে। হাতে হাতে ধূপধুনো জ্বলছে। পথ চলতি পুণ্যার্থীরা মৃতের উদ্দেশে দু হাত জড় করে প্রণাম জানাচ্ছে।

বেটেদা (ক্যামেরাম্যান) আর যেন স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে মুভি ক্যামেরা বের করে এনে সেই শোকযাত্রার ছবি তুলে নিলেন। কিছু। এক দুর্লভ ঘটনা। ধরাই থাকুক না সেলুলয়েডের ফিতেয়। নিশ্চয় একদিন না একদিন কারো কাজে লেগে যাবে। কিন্তু সে একটা কথা।

অদূরেই গঙ্গা, পুণ্যশ্লোকা, পবিত্র বাহিনী।

সন্ন্যাসীরা শাস্ত্রমতে সব ক্রিয়াকর্ম শেষ করে একখন্ড ভারী পাথরের সঙ্গে মৃতদেহকে বেঁধে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন—তুমুল কাঁসর-ঘন্টাধ্বনি আর মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে।

সনুদা এই দৃশ্য দেখে আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। ঝর-ঝর করে তাঁর চোখের জল পড়ে গেল খানিকক্ষণ। সেদিন মৃতের উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা অবলম্বন করে গঙ্গার কিনারে 'বন্দন' ছবির আউটডোর শুটিং শুরু হয়েছিল।

রঞ্জন মজুমদার

ফ্লোরের বাইরে তখন ঝমঝম করে
ষ্টি হচ্ছিল। এদিকে ফ্লোরের সেটের
ধা খটখটে রোদ্দুর—যেটা কৃত্রিম-ই
শ। ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণ চক্রবর্তী বেশ
দা করে এই রোদ্দুরটা তৈরী করেছেন
পর পর অনেকগুলো আলো জ্বালিয়ে।
নেমায় কি না হয়!

সিনেমায় সব কিছু হয় বলেই না আমি
ছবি—যার নাম 'অসাধারণ'—পরিচালক
ল সেনের অন্যতম সহকারী প্রসাদ-
কে দেখতে পাচ্ছি হাতে এক বান্ডিল
শো টাকার কারেন্সী নোট নিয়ে এখানে
ঘোরাঘুরি করছেন। বান্ডিলে কতগুলো
শো টাকার নোট আছে—অনুমান করা
দশও হতে পারে। আবার পনেরো
ও হতে পারে। প্রসাদবাবুর যেন সে-
পারে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। শুনলাম
কারেন্সী নোটের বান্ডিলটা ছবির এক
মুহূর্তে ক্যামেরার সামনে এনে ফেলা
। এই ছবির অসাধারণ যে চরিত্র, যেটা
অভিনয় করছেন, তাঁকে প্রলোভিত করার
আপাতত এই বান্ডিল। কিন্তু যাঁর
এই টাকা—এটা তাঁর কাছে নাকি
। কারণ তিনি এসব লোভের অনেক
র্ধে।

অসাধারণ এই মানুষটির নাম—
বন্ধু। আসলে জগৎবন্ধু। নিঃস্বার্থে
লের উপকার করাই হচ্ছে এই মানুষটির
জীবন ব্রত। সরল, সাধাসিধে, নির্লোভ,
রোপকারী এবং হৃদয়বান মানুষটি যেন
স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ। বাবারে, এটি থাশা
ছেন কিন্তু ইউ, কে। এ-ধরনের চরিত্র
ন যেন স্রেফ উড়িয়ে দিতে পারেন।
সম্ভব ক্ষমতা ধরেন কিনা!

সারাদিন জগবন্ধুর কত কাজ! যেচে
নুষের উপকার করা—সে তো বড় সহজ
থা নয়। দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কম-
ক্ষে বিশ ঘন্টা পরোপকারেই কেটে যায়
। কাজটাও অসম্ভব ধৈর্যসাপেক্ষ।

দাঁড়ান, একটা নমুনা শোনাই; আজ
মুহূর্তে ক্যামেরার সামনে দু'জন
ভিনয় করছেন দেখতে পাচ্ছি। উত্তমকুমার
র দিলীপ রায়। জগবন্ধু আর জেলা
শাসক।

জগবন্ধু তার ঘরের তক্তপোষে উপুড় হয়ে কি সব যেন লিখছিল একমনে। হঠাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে হাজির হলেন। জগবন্ধু ওঁকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে অভ্যর্থনা করল।

—আরে!?... আসুন আসুন স্যার... আমার আজ কি সৌভাগ্য...বসুন বসুন—

বলে জগবন্ধু একটা চাদর তাড়াতাড়ি তক্তপোষে বিছিয়ে দিল। প্রায় আসবাবহীন একখানা অতি সাধারণ অনাড়ম্বর ঘর। পাশে দুটি সেকেলে লোহার চেয়ার পড়ে ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তারই একটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন—কি করছিলেন আপনি?

জগবন্ধু বিব্রত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে জবাব দিল—এই আসছে মাসের প্রোগ্রামটা স্যার... মশক দমন—পুষ্টিবর্ধন—ফুটবলের অকাল-বোধন...

ম্যাজিস্ট্রেট এটা জানেন যে তাঁর জেলায় এই জগবন্ধুর মত এমন পরোপকারী সমাজসেবী আর দ্বিতীয়টি কেউ নেই। স্বার্থের কোন ব্যাপারই নেই লোকটির চরিত্রে। তাই মনে মনে তিনি এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করেন, সমীহ করেন।

জগবন্ধুর কথা শুনে এবার ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—এটাই বলতে এলাম যে, আমার পক্ষে আর এত মিটিং করা সম্ভব নয়। পাশের জেলার ইউনিভার্সিটির ছাত্র থেকে স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত বিগড়েছে। তাছাড়া খরার ব্যাপার—নির্বাচনের প্রস্তুতি—এসব দেখবার জন্যে আমি সামনের দুটো মাস গ্রামে গ্রামে ট্যুর করব—

জগবন্ধু যেন ঈষৎ মুষড়ে পড়ে। তারপরই সোৎসাহে বলে ওঠে—তাহলে খরার জন্যে চ্যারিটি শো করে যে চাঁদা তুলবো—চিরবাবু চেয়ারম্যানকে ওটার প্রেসিডেন্ট করি স্যার—

সংগে সংগে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে এই প্রস্তাবে আপত্তি জ্ঞাপন করেন—না না, একেবারে না। চিরবাবু আজও বন্যার রিলিফ ফান্ডের হিসাব জমা দেয়নি—

—তাহলে সনাতনবাবুকে?

—উহুঁ। ওটা এক নম্বর চোর। স্কুল-বাড়ি তৈরীর ফান্ডের টাকা মেরেছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেয়নি—

জগবন্ধু যেন আরও মুষড়ে পড়ে। বলে—ও...। তাহলে নিবারণ সাহুকেই বরং—

ওকে বাধা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বলে ওঠেন—উঃ, এ সবকটিই মার্কামারা লোক। ...আপনি এটা বুঝতে পারছেন না যে, ওরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আপনাকে কাজে লাগাচ্ছে। ওই সাহু, সনাতন আর চিরজীবেরা—আপনি মশাই—

বলতে বলতে হঠাৎ কি-যেন মনে পড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট থমকে যান। তারপর এক নজর জগবন্ধুকে দেখে নিয়ে বলেন—আচ্ছা, আপনি মশাই কার দলে? মানে সামনে এই যে নির্বাচন আসছে, আপনি কার হয়ে কাজ করবেন? সাহু, সনাতন না চিরঞ্জীবের হয়ে?

সংগে সংগে একগাল সরল হাসি হেসে জগবন্ধু হাতজোড় করে। তারপর হাতের

বনশ্রী বাসু/পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখার্জি,
অনিল চ্যাটার্জি/সুমিত্রা মুখার্জি। অমৃত ফটো।

তিনটি আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে—না স্যার, ওই তিনটি ব্যাপারে আমি একদম নেই। এক ঃ আমি কোন পলিটিকসের মধ্যে নেই। দুই ঃ কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আমি কখনও নেই। তিন ঃ পাবলিক ফান্ডের টাকা মারার ব্যাপারে আমি নেই—এই হচ্ছে আমার স্পষ্ট কথা স্যার।

শুনে ম্যাজিস্ট্রেট যেন কিঞ্চিৎ অবাকই হয়েছেন—এমন একটা ভঙ্গি করে বলেন—পাবলিক ফান্ডের টাকা আপনি মারেন না! আশ্চর্য! ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—চাঁদা তো আপনিই বরং নিজে দেন। অনাথ আশ্রমের জমি তো দেখলাম আপনারই টাকায় কেনা। তাহলে আপনার চলে কি করে?

জগবন্ধু মৃদু হেসে বিনীত ভঙ্গিতে বলে—ওই বিক্রিবাটা করে।...প্রথমে জমি-জিরেত বেচে চলেছে। সেটা ফুরোবার পর কিছুদিন চলেছে ফার্নিচার বিক্রি করে। হালে বাসন-কোসনে হাত পড়েছে। ওই তো ক'দিন আগে রান্নাঘরের জিনিস বেচেছি—

শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হতভম্ব। বলে কি লোকটা! —তার মানে এখন রান্না খাওয়া সব বন্ধ!

—নাঃ। রান্না খাওয়া বন্ধ নয় তো!

পাশের ঘরটাই রান্নাঘর। ম্যাজিস্ট্রেট সেদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে বললেন—কই, উনুনে তো আজ আগুন পড়েনি দেখছি—

জগবন্ধু একগাল হেসে জবাব দেয়—জ্বালানির অভাব বলছেন? উহুঁ! জ্বালানীর কোন অভাব নেই আমার। ওইতো—চারদিন আগে ভাত রেঁধে খেলাম।

বলে জগবন্ধু তার পেছনের জানলাটা দেখিয়ে দিল। কাঠের জানলা। তাতে দুটো ডাঁসা নেই। ডাঁসা অর্থে শিক্, কাঠের শিক্।

—জানলার চারটে ডাঁসা ছিল, তার দুটো জ্বালাতেই ভাত ফুটে গেল। আরও দুটো স্টকে আছে স্যার—

ম্যাজিস্ট্রেট এবার বিস্ময়ে হতবাক।—সেকি, চারদিন আপনি ভাত খাননি?

জগবন্ধু তৎক্ষণাৎ অক্লেশে বলে উঠল—চারদিন কি বলছেন স্যার—আমি সাত-দিন পর্যন্ত মুড়িটুড়ি খেয়ে চালাতে পারি। ওই যে—সেবার এডোয়ার্ড ক্লাবের জন্যে দশদিন একটানা নিরম্বু উপোষ করেছিলাম। তাতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। অভ্যেস আছে তো। জলও খেলাম না।—

যেন এতটা আশা করেননি ম্যাজিস্ট্রেট। মানুষ এত অসাধারণ হতেও পারে? হঠাৎ যেন ওঁর নিজেরই জল তেষ্টা পেয়ে গেল। একটু ইতস্তত করে মৃদুকণ্ঠে বললেন—আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?

জল খাবেন শুনে জগবন্ধু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। অথচ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখনও জানতেন না যে ঘরে জল নেই। কারণ জল রাখার কলসীটি মাত্র কয়েকদিন আগে জগবন্ধু বিক্রি করে দিয়ে বসে আছে। টাকাটা নিজের জন্যে দরকার হয় নি। হয়েছিল একটা টিউবওয়েলের জন্যে। পাড়ার মানুষেরা পানীয় জলের অভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। তারা সবাই এসে জগবন্ধুকে ধরেছিল—এর একটা প্রতিকার করে দিতে হবে। শুনে জগবন্ধু আর স্থির থাকতে পারেনি। টিউবওয়েল তৈরীর জন্যে সে তৎক্ষণাৎ চাঁদা আদায়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আর দাতা হিসাবে লিস্টের মাথায় উঠেছিল তার-ই নাম। তখন জগবন্ধু কপর্দকশূন্য। কি করা? হাতের কাছে ছিল পেতলের ভারি কলসীটা। জগবন্ধু সেটাই বেচে দিয়েছিল বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে। আর বিক্রির পুরো টাকাটাই সে চাঁদা হিসাবে ধরে দিয়েছিল......।

এই অসাধারণ মানুষটির তিনকুলে কেউ কোথাও নেই। অথচ কেউ নেই বলে তার কোন আক্ষেপ ছিল না। পাড়াপ্রতিবেশী নিয়েই তার সংসার। সবাই তাকে ভালবাসে। মানুষের বিপদে-আপদে কেউ না থাকুক—জগবন্ধু ঠিকই আছে। টাকা দিয়ে, শক্তি দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে ভালবাসা দিয়ে এই সাধারণ, অনন্যসাধারণ মানুষটি ক্রমে ক্রমে সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছে—আজকের এই স্বার্থসংকীর্ণ পৃথিবীতে এ-চরিত্র বাস্তবিকই দুর্লভ।

ছবির পরিচালক সলিল সেন এ-গল্প নিজেই লিখেছেন। উনি বলছিলেন—এ-রকম চরিত্র উনি দুটি একটি নিজের চোখে দেখেছেন। ভাল না দেখা থাকলে এ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। প্রতিনিয়ত যেখানে স্বার্থের হানাহানি, সেখানে এই চরিত্র আসলে যেন দেবতার চরিত্র!

জগবন্ধুর পরিচিত একজন খাঁটি রাজ-নৈতিক কর্মী, যিনি স্বাধীনতার আন্দোলনে আদর্শকে সামনে রেখে লড়াই করতে গিয়ে এককালে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করেছেন, সেই সত্যদা এখন তাঁর বিবাহযোগ্যা বোন শোভনার কিছুতেই বিয়ে দিতে পারছিলেন না। শুনে জগবন্ধু নিজে এগিয়ে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে ফেলল। ভাল পাত্র। তারা চাইল পাঁচ হাজার টাকার নগদ পণ। এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক মিলিয়ে মোট দশ হাজার টাকা। সত্যদা নাকচ করে দিতে গেলেন। জগবন্ধু তাঁকে থামালো। তারপর নিজের নামে হুন্ডি কেটে আনল সেই টাকা সংগ্রহ করে। স্থির হল—এটা হবে 'জাতীয় বিবাহ'। জজ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব থেকে শুরু করে জেলার গণ্যমান্য [illegible] বর্গের উপস্থিতিতে এই বিবাহ হবে। সেই মত সব আয়োজনও হল। কিন্তু শে[ষ] পর্যন্ত পাত্রপক্ষ এলো না। কারণ তা[রা] ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে যদি এই বিয়ে হয় তাহলে তার দেখতে হবে না—পণ নেওয়ার অপরাধে সবাইকে হাজত বাস করতে হবে।

ফলে বিয়ের লগ্ন বৃথা বয়ে যায়। কনের চোখে জল দেখা দেয়। আয়োজন সব পণ্ড হয় হয়। পরোপকারী জগবন্ধু শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল। বিয়ে করার [illegible] পরিকল্পনাই তার ছিল না কিন্তু [illegible] পরিস্থিতিতে না করা ছাড়া কোন উপ[ায়] নেই। কারণ সে-ই তো ছিল এই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা। এখন সে এই দায়িত্ব [illegible] করে এড়ায়?

আগেই বলেছি—এধরনের চরিত্র উত্তমকুমার অসাধারণ। কপালগুণে চরি[ত্রের] নামও আবার সেই 'অসাধারণ'। [illegible] আসল মুখোস খুলে যায় এই কাহিনীতে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, ভণ্ড, জোচ্চোর, নকল সমাজসেবী, স্বার্থান্বেষী [illegible] অসামাজিক কিছু মানুষ। আর এসব মধ্যে রয়েছে নিষ্পাপ ফুলের মত কয়েকটি চরিত্র সমস্ত মালিন্য ও গ্লানির ঊর্ধ্বে [illegible] বাইরে বাঁচিয়ে রেখেছে।

উত্তমকুমার এই দৃশ্যের শেষ শট [illegible] বাড়ি ফেরবার জন্য তৈরী হলেন [illegible] রায় ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা [illegible] আজকের শুটিং শেষ। [illegible] জয়শ্রী রায় [illegible] সন্তু মুখার্জি কাজ [illegible] আগেই শেষ হয়ে [illegible] ওঁরা যে যাঁর বাড়ি চলে গেছেন। এ[খন] এঁরা গেলে স্টুডিও নিঝুম হয়ে পড়[বে] [illegible] সারারাত বাতিটাই পড়বে [illegible]

আমি স্টুডিওর গেটে। [illegible] বলে [illegible] দাঁড়ান দাঁড়ান—বলছি। [illegible] থিয়েটার্স স্টুডিওতে চণ্ডিকা [illegible] ব্যানারে 'অসাধারণ' ছবিটি প্রযো[জনা] করছেন প্রণব বসু। পরিচালনা, কাহি[নী] এবং চিত্রনাট্য সলিল সেনের। সঙ্গী[ত] পরিচালনা করছেন নচিকেতা [illegible] গীতিকার হচ্ছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে [illegible] চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি, সুর্য চাটার্জি ও মহাদেব সেন। ভূমিকালিপিঃ উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য, জয়শ্রী রায়, সন্তু মুখার্জি, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, হারাধন ব্যানার্জি, দিলীপ রায়, তপেন চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, স্বপনকুমার (যাত্রা), মৃণাল মুখার্জি, [illegible] ভট্টাচার্য, জহর রায় ও ভানু ব্যানার্জি।

মুসাফির
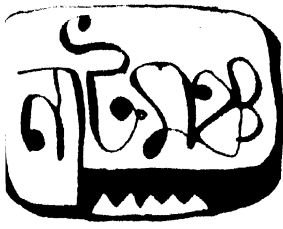
বহুরূপীর স্মরণীয় নাটক 'সুতরাং'

শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতেই বহু-
ী নাট্যসংস্থা আজ আর কোন পরিচিতির
ক্ষা রাখে না। নবনাট্য আন্দোলন ও
ক পরীক্ষা নিরীক্ষার যে ঢেউ আজ
তের অন্যান্য প্রদেশের নাট্যপ্রচেষ্টাকে
প্রাণিত ও সঞ্জীবিত করেছে তার মূলেও
ূপীর দান অনস্বীকার্য। তার কারণ
রূপী পরিবেশিত নাটকে সর্বদাই এমন
া সচেতনতার উপস্থিতি ঘটে যা বক্তব্যে,
ল্যে সহজেই নিজেকে স্বকীয়তায়
ত করে থাকে। তাছাড়া অভিনয়ে
ষ্ট ধারার প্রবর্তকও বহুরূপী, যেটা
র সম্পূর্ণ নিজস্ব। সেই ঐতিহ্যের
বহুরূপীর সব নাটকেই উপস্থিত।
ঃ তার' 'পথিক' ইত্যাদি নাটকগুলি
তারা প্রযোজনা করেন তখন বহুরূপীর
ত মধ্য গগনে। আবার পরবর্তীকালে
। অয়দিপাউস' এর মত বিস্ময়কর
যখন উপহার দেন, তখনও
হয়েছে বহুরূপী এখনও অনন্য।
বহুরূপীর নতুন নাটক 'সুতরাং' সেই
হ্যেরই ধারাবাহী হয়েও সামগ্রিকভাবে
ব্য এবং তা উপস্থাপনার দিক
আগের নাটকগুলির সঙ্গে কিছুটা
ন।

'সুতরাং' নাটকটি একেবারে হাল
লের, অর্থাৎ সদ্য সদ্য আমরা যে
পনের দিনগুলি পেরিয়ে এসেছি তার
বলা যায়। সেই দুঃসহ অতীতকে, তার
স্থিতি ও অবস্থাটা যাতে আমরা ভুলে
যাই সেই উদ্দেশ্যেই মূলত এই নাটক
। সেই সঙ্গে এক শ্রেণীর সুচতুর
ষ যুব সম্প্রদায়কে কেমন করে রাজ-
ক স্বার্থে ব্যবহার করে নিজেদের
চরিতার্থ করেছে তাও তুলে ধরা
ছে।

বহুরূপীর এই 'সুতরাং' (নাটক ও
শনা শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র) স্টেইনবেকের
বারা অনুপ্রাণিত বলা হয়েছে। কিন্তু
কবা আশ্চর্য হয়েছেন বিগত দিনের
ত একটি সময়ের পরিবেশের সঙ্গে
হুবহু মিল দেখে।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি হলেও সেই
পনের দিনগুলি ভুলতে তার বোধহয়
ক সময়ের প্রলেপ প্রয়োজন হবে। এবং
যায় এ নাটক সেদিক থেকে দর্পণের
ই করেছে।

ঘটনা ছাড়া এ নাটকের বড় সম্পদ এর
নয়। এমন প্রাণবন্ত এবং সাবলীল
অভিনয় বড় একটা দেখা যায় না বললেও
কম বলা হোল যেন। বিশেষ করে সুব্রতার
ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রর অভিনয়। এখনো যে
মঞ্চে তিনি অনন্যা তিনি তা আরো একবার
প্রমাণ করলেন এই নাটকে। অভিনয় নয়, যেন
আসল চরিত্রটিই সর্বদা বিরাজ করে গেছে
মঞ্চে। সুব্রতার ভাইয়ের চরিত্রের তিনটি
পর্যায় বা স্তর প্রথমে আদর্শবাদী, পরে
যার আদর্শ অনুপ্রাণিত সেই অনুদার রাজ-
নৈতিক বলি হওয়ার পরে প্রতিশোধস্পৃহায়
উদ্দীপিত যুবক এবং সর্বশেষে খুন হতে
হতেও প্রাণে বেঁচে যাওয়া অথচ বুদ্ধিভ্রংশ
অসহায় এবং সুব্রতার গলগ্রহ (?) ভাই--
এই তিন পর্যায়ে অরিজিৎ গুহের সত্যব্রত
সুন্দর এবং সিরিয়াস। আর অবাক করে
দিয়েছেন দেবতোষ ঘোষ তাঁর তিনটি
চরিত্রের বাস্তবঘেঁষা অভিনয়ে। চরিত্র তিনটি
প্রায় প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায়।

কুমার রায় তিনটি চরিত্রেই যেমন নিজেকে
মানিয়ে নিয়েছেন তেমনি দাপটের সঙ্গে
অভিনয় করেছেন, বিশেষ করে নারাণবাবুর
চরিত্রে।

গীতা চক্রবর্তীর সুযোগ কম থাকলেও
গোপালের মার ভূমিকায় একটি দৃশ্যে এবং
চামেলী-রূপী কয়েকটি দৃশ্যে দর্শকদের
অনেকদিন মনে থাকবে।

শংকর ঘোষের ফন্টু, অভি, কিরলিস
তিনটি চরিত্রও ভাল লেগেছে। তবে তাঁর
অভিনয়ে আর একটু জড়তা কাটিয়ে ওঠার
অবকাশ রয়ে গেছে।

অন্যান্য ভূমিকায় সমীর চ্যাটার্জি, শান্তি
দাস, অসিত দাশগুপ্ত, উৎপল আচার্য
মোটামুটি।

কুমার রায়ের ত্রিস্তর মঞ্চ পরিকল্পনায়
স্বাতন্ত্র্য আছে। স্টেজ ঘুরিয়ে দৃশ্যান্তরে
যাওয়া দর্শকদের বিস্মিত করেছে।

অসীম ব্যানার্জির আবহসঙ্গীত আরো
একটু এফেকটিভ হলে যেন ভাল হোত।
এমনিতে অবশ্য সুন্দর। দিলীপ ঘোষের
আলোক সম্পাত নাটকের পক্ষে সহায়ক
হয়েছে। কিন্তু বৈচিত্র্য তেমন লক্ষ্য করা গেল
না। মহঃ হোসিবের রূপসজ্জা ও পরেশ
(মনু) দত্তের মঞ্চ নির্মাণ তারিফ পাবার
যোগ্য।

এমন একটি পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং মনকে
নাড়া দিয়ে ভাবাবার মত নাটক দর্শকদের
উপহার দেবার জন্য বহুরূপী এবং শ্রীমতী
তৃপ্তি মিত্রকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে এমন
একটি দুরূহ এবং জটিল মানসিকতার ওপর
নাটক লেখা ও তা দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করে
বসিয়ে রাখার মত নাটকীয় পরিবেশ গড়ে
তোলা কম বিস্ময়ের নয়। শ্রীমতী মিত্র যেন
সদ্য অতীত সেই দুঃস্বপ্নময় সময়ে সত্যি
সত্যিই কিছুক্ষণের জন্যে দর্শকদের ফিরিয়ে
নিয়ে গিয়েছিলেন।

নাট্য সমালোচক

সুতরাং নাটকে গীতা চক্রবর্তী ও তৃপ্তি মিত্র

খুশবু

বিশ বছর আগের 'কুটনী'র অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখন সে কুসুম অত্যন্ত দাম্ভিক এবং স্বাবলম্বী হবার চেষ্টায় ব্যস্ত। অথচ বিশ বছর আগে জমিদারের ছেলে বৃন্দাবনের সংগে ওর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু বৃন্দাবনের বাবা (জমিদারবাবু) এই বাল্যবিবাহকে মেনে নিতে পারেন নি, তিনি তখনই 'কুটনী'কে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। কুসুম এখন নিজেকে বিবাহিত বলে মনে করে এবং সপ্তাহে একদিন উপোস করে, সিঁদুর পরে পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। বৃন্দাবনও ডাক্তারী পাশ করে গ্রামে ফিরে আসে। দিনে দিনে তার পসার বেড়ে যায়। মার ইচ্ছা, সে আবার বিবাহ করে, কিন্তু কুটনী অর্থাৎ কুসুমকে এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি, তার পিতা জেদের বশে যে অন্যায় করেছিলেন কুসুমদের সংগে, সে তার প্রতিকার করে কুসুমকে তার স্ত্রীর আসনেই বসাতে চায়। কিন্তু কুসুম সহজে রাজী হয় না। অবশেষে বৃন্দাবন মাকে পাঠায়, কুসুমকে রাজী করাতে। কুসুম মার দেওয়া 'কঙ্কন' ভাইকে দিয়ে ফেরৎ পাঠায়। পরে বেশি গরজ দেখানোর জন্যেই হয়তো, কুসুমের ভাই কুঞ্জ, ভাংগা কাচের চুড়ি পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়, ও'দের কাছে কুসুমকে বিধবা হিসাবে ভাবার জন্যে। বৃন্দাবনের মা ব্যথিত হয়ে, ছেলের জন্যে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে শহরে চলে যান। বৃন্দাবন কুসুমকে সব বুঝিয়ে বললো, পিতার আজ্ঞাতেই তাকে শহরে গিয়ে বিবাহ করতে হয়েছে, ওর প্রথমা স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানকে রেখে মারা গেছেন। আচমকা গ্রামে প্লেগ মহামারী দেখা দেওয়ায় বৃন্দাবন গ্রামে গিয়ে কুসুমকে নিয়ে আসতে পারে নি। একে একে এই মহামারীতে অনেক আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে হারিয়ে বৃন্দাবন একেবারে ভেংগে পড়েছে। ওর নিজের বাড়ীতেও বিশেষ কেউ নেই, যে ওর শিশু সন্তানের দেখা-শোনার ভার নেয়। বাধ্য হয়ে ওকে কুসুমের কাছেই রাখা হয়েছে। কুসুমের ইচ্ছা এই মহামারীর সময় বৃন্দাবনও যেন তার ওখানেই থাকে। ইতিমধ্যে মা বৃন্দাবনের বিবাহের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফিরে আসছেন। কিন্তু বৃন্দাবনও কুসুমকে নিজের স্ত্রীর স্বীকৃতি দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে যাবার আয়োজন করে ফেলে।

শরৎচন্দ্র রচিত 'পণ্ডিতমশাই'-এর কাহিনী রচিত হবার পর ১৯৩৩ সনে প্রথমে বাংলায় পরে হিন্দী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার গুলজার এ ছবিকে শরৎচন্দ্রের রচিত কাহিনীর আধুনিক সংস্করণ করে উপস্থিত করেছেন। মূল কাহিনীতে না থাকলেও উনি অতিথি তারকা হিসাবে শর্মিলাকে দর্শকের ও নায়কের সহানুভূতি পাবার জন্যেই হয়তো, এই বিশেষ চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। ছবিতে গানের খুব বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে নায়ক ও নায়িকার মুখে গান একেবারে অচল। গুলজারের পরিচালনা ও আঙ্গিকের প্রয়োগ প্রশংসনীয়।

অভিনয়ে কুসুম ও বৃন্দাবনের চরিত্রে হেমা মালিনী ও জীতেন্দ্র সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আসরাণী, শর্মিলা, ফরিদা জালাল, দুর্গা খোটে, মাষ্টার রাজু, শরিকা, লীলা মিশ্র মন্দ নয়। আবহসংগীত সুন্দর এবং আর ডি বর্মণের দেওয়া গানের সুর যথাযথ। কে বৈকুণ্ঠের অন্তর্দৃশ্য ও বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ, অজিত বন্দোপাধ্যায়ের শিল্প নির্দেশনার কাজ উচ্চাংগের, কিন্তু সম্পাদনার কাজ আরো উন্নত হতে পারতো।

কয়েদ

কাল্পনিক ও দুর্বল সাসপেন্সধর্মী কাহিনীর উপভোগ্য চিত্ররূপ!!
[প্রযোজনা — গুরুদত্ত ফিল্মস্ কম্বাইনস]

লক্ষপতি পিতার কন্যা 'প্রীতি' ওর দেখাশোনার দায়িত্ব জ্যাঠামশায় তুলসীনাথ এবং তার ছেলে রাকেশের ওপর। কলেজের এক ফ্যান্সী ড্রেস প্রতিযোগিতার জন্যে প্রীতি ঝিয়ের পোশাক বেছে নেয়। আর তার ফলে ভুল করে বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী 'জয় সাকশেনার' মা ওকে ঝি মনে করে, বাড়ীর কাজে নিয়োগ করেন। আচমকা একদিন প্রীতির জ্যাঠা অন্য ফ্ল্যাটে ওকে দেখতে পেয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। রাকেশ পছন্দ করে না, কলেজের বাইরে গিয়ে প্রীতি কারো সংগে মেলামেশা করুক। কলেজের ছুটি কাটানোর জন্যে ওকে প্যারিসে পাঠানো হল। প্যারিস থেকে বাড়ী ফিরে সেও অপরিচিত হয়ে গেল, তার মতো চেহারার একজন তরুণীকে বাড়ীর সকলে 'প্রীতি' বলে, ওকে অস্বীকার করে। এমন কী ভৃত্যরা পর্যন্ত 'প্রীতি' বলে স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়। পুলিশ এসেও প্রীতিকে আসল প্রীতি বলে স্বীকৃতি দিল না। বাধ্য হয়েই সে পরিবারের ডাক্তার ত্রিবেদীর কাছে এল, উনিও গোপনে ওকে কুচক্রী দলের হাতে উঠিয়ে দিতে উদ্যত হলেন। অবশেষে 'প্রীতি' জয় সাকসেনার বাড়ীতে ফিরে আসে। সমস্ত ঘটনা তাকে বলে, এই বিপদে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করলো।

মার নিষেধ সত্ত্বেও আসল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে বন্ধু 'বজরঙ্গী' এবং তার সেক্রেটারী জুলীকে নিয়ে রহস্য ভেদ করতে গেল। কুচক্রী দলের অন্যতম নায়কের কাছ থেকে, প্রীতির চেহারা

যে মেয়েটির, তার সঙ্গে 'হীরার' সঙ্গে কী সম্পর্ক জানার জন্যে, ওদের একটা অন্তরঙ্গ ছবি চুরি করলে গোপনে প্রীত রাগিণীর ছদ্মবেশে, হীরার কাছ থেকে কুচক্রী দলের লোকেদের খোঁজখবর, ওদের দলের এবং রাকেশের অদ্ভুত আচরণের কারণ জানতে গেলে, আততায়ীর হাতে নিহত হয় হীরা।

জয় বন্ধু বজরঙ্গীর সাহায্যে রাকেশের ফ্ল্যাট থেকে প্রীতের ছেলেবেলার ছবি আছে, এমন একটা অ্যালবাম চুরি করে আনল, আর গোপন রহস্য প্রকাশ হবার ভয়ে, রাকেশ ও কুচক্রীরা জয়ের মা ও প্রীতকে বন্দী করে রাখলো। বন্ধু বজরঙ্গী পুলিশ অফিসারের সাহায্যে রাকেশ ও তার দলের সকলকে বন্দী করলো। রাগিণী তার অপরাধ স্বীকার করে। আসলে প্রীত ও রাগিণী যমজ বোন, কালের গতিতে একজন ধনীর দুলালী ও অপরজন এক কুচক্রী দলের মনোরঞ্জনের জন্যে নিযুক্ত ক্যাবারে ড্যান্সার। জয় ফিরে পেল তার দয়িতা প্রীতকে, জ্যাঠা তুলসীনাথ তার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রীত ও রাগিণীকে পেলেন। কষ্টকল্পিত কাহিনী, দুর্বল চিত্রনাট্য এবং গতানুগতিক পরিচালনা, ছবিটিকে একটি বিশিষ্ট সাসপেন্সনধর্মী ছবি হবার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা এই সংস্থা থেকে প্রযোজক পরিচালক ও নায়ক গুরু দত্ত বিশিষ্ট ও উপভোগ্য ছবি উপহার দিয়েছেন। আর আজ কেবল সকলের মনোরঞ্জনের জন্যে ছবি নির্মিত হচ্ছে। অভিনয়ে প্রীত ও রাগিণীর ভূমিকায় লীনা চন্দ্রভারকর, 'জয়ের' ভূমিকায় বিনোদ খান্না, বজরঙ্গীর ভূমিকায় মেহমুদ এবং জুলীর ভূমিকায় জয়শ্রী টি ভালো অভিনয় করেছেন। কলা-কৌশলের কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। নীতিন মঙ্গেশের সঙ্গীতাংশ উপভোগ্য।

চিত্রদূত

লীনা চন্দ্রভারকর, বিনোদ খান্না

নতুন সূর্য

শিবনাথবাবু (কালী বন্দ্যোপাধ্যায়) বাড়ী বন্ধক রেখে কোন রকমে টাকা জোগাড় করে মেয়ে অঞ্জনার (মাধবী) বিয়ে দেন বিত্তবান মহিমবাবুর (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) একমাত্র পুত্র বিমানের (দীপংকর) সঙ্গে। বিমান কলকাতায় ভাল কাজ করে। কিন্তু মালিকের কন্যা সুচিরার (দেবিকা) সঙ্গে তার প্রেম থাকায় অঞ্জনাকে সে সহ্য করতে পারে না। অঞ্জনাকে সে নানারকমে অপমান করে— এমন কি চুরির অপবাদ দিতেও বাধে না। স্ত্রীর সঙ্গে বিমান একটাই রাত কাটায়, তাও মদ্যপ অবস্থায় অঞ্জনাকে সুচিরা ভেবে। এর ফলে অঞ্জনা অন্তঃসত্ত্বা হয়। বিমানের মা তখনও পুত্রবধূকে আশ্রয় দেয় না; সন্দেহ করে তার চরিত্রকে। অগত্যা অঞ্জনা আত্ম-হত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু নাটকীয়ভাবে তাকে ডাঃ সান্যালের নার্সিং হোমে হাজির করা হয়। সেখানে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরে অঞ্জনা সেখানে নার্সের কাজ পায়। একদিন এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় নার্সিং হোমে বিমান ভর্তি হয়। বেশী আঘাত চোখে, তাতেই চোখ বাঁধা অবস্থায় সে অঞ্জনাকে চিনতে পারে না। অঞ্জনার সেবাতেই সে সেরে ওঠে। অবশেষে নিজের ভুল বুঝে বিমান অঞ্জনাকে কাছে টেনে নেয়। অঞ্জনাও বিমানকে ক্ষমা করে।

ত্রিশ বছর আগে নির্মিত বাংলা ছবিগুলির সঙ্গে এ ছবির বিশেষ পার্থক্য নেই। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—কোন দিক দিয়েই এ ছবিকে আধুনিক বলা চলে না। তবু কিছু ঘটনা বা অতিনাটকীয়তার দিকে নজর দিলে বোধহয় ভাল হত। অঞ্জনাকে সুচিরা ভেবে রাত্রি যাপনের ঘটনাটি কেমন যেন অবিশ্বাস্য। শিবনাথবাবুর মৃত্যুর কারণ কি চুরির অপবাদ? যাই হোক মৃত্যুটা স্বাভাবিক মনে হয় না। আহত বিমানকে একবার ওষুধ খাওয়ানো ছাড়া অঞ্জনাকে কোনরকম সেবা করতে দেখা গেল না।

তবে দোষ, এটি থাকা সত্ত্বেও ছবিটি শেষের দিকে বেশ জমে ওঠে। এর কারণ মুখ্য চরিত্রগুলিতে প্রায় সকলেই সুঅভিনয় করেছেন। নায়ক চরিত্রে দীপংকর দের অভিনয় বেশ ভাল। নায়িকার তুলনায় অবশ্য তাকে ছোট মনে হয়েছে। অঞ্জনার চরিত্রটিকেও সুন্দর ফুটিয়েছেন মাধবী চক্রবর্তী। এছাড়া সুঅভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চ্যাটার্জি, পদ্মা দেবী, সুস্মিতা সান্যাল ও দেবিকা মুখার্জি। তবে সবচেয়ে ভাল লাগে একটি ছোট চরিত্রে তরুণকুমারকে। কলাকুশলীদের কাজ মোটামুটি। এ-ছবির সঙ্গীত পরিচালক দিলীপ রায়। মোট চারখানি গানের মধ্যে মান্না দের কণ্ঠে 'ভালবেসে ভুল কোরো না' গানটি জনপ্রিয় হবে আশা করা যায়।

চিত্রবিদ্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যথারীতি রাত করে রিহার্সাল থেকে ফিরেছেন বিনোদিনী। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অকাতরেই ঘুমোচ্ছেন। কখন রাত শেষ হয়ে এসেছে খেয়ালও নেই। ভোর হলো বলে।

মস-মস ঝন-ঝন ঝনাৎ শব্দে বিনোদিনীর ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা বিনোদিনীর ঘরে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ চাইলেন বিনোদিনী। তার সমনে মেঝেতে দাঁড়িয়ে অ-বাবু। ভাল করে যেন চিনতেও পারছেন না। সর্বাঙ্গে মিলিটারী পোশাক। কোষবদ্ধ তরবারী। রোষবহ্নি দৃষ্টি। অ-বাবু বলে চিনে নিতেই কষ্ট হলো। বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হলো : মেনি! বিনোদিনীকে মেনি বলেই ডাকতেন অ-বাবু।

—মেনি! কিসের এত ঘুম।

তড়িতে সম্বিত ফিরে এলো বিনোদিনীর। উঠে বসলেন বিছানার ওপর। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বসেছেন। শুধু তাকিয়ে দেখছেন লোকটিকে। কোন কথা নেই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বললেন, অ-বাবু : শোন বিনোদ। ওদের সম্পর্ক তোমায় ত্যাগ করতে হবে। তোমার জন্য এ পর্যন্ত যে টাকা খরচ হয়েছে ওদের সব আমি পুষিয়ে দেব। আপাতত এই দশ হাজার রইল। যদি আরো বেশী খরচ হয়ে থাকে—সব দেব। টাকার বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে মারলেন বিছানায়। কঠিন হয়ে উঠলেন বিনোদিনী। ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে তাকে দিয়ে কেউ কোন দিন কোন কাজ হাসিল করাতে পারে নি। লাঠিয়াল দিয়ে ব্যর্থ হয়ে আজ তরবারী দেখিয়ে হাসিল করতে এসেছেন।

বললেন দীপ্ত স্বরে : না। আমি ওদের কথা দিয়েছি। কথার খেলাপ আমি করতে পারব না। টাকার লোভ দেখিয়ে বিনোদিনীকে নরম করতে চাইলেন অ-বাবু। বললেন : টাকার জন্য হলে বলেছি ত আরো দশ হাজার দেবো!

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিনোদিনী। ভয় দেখিয়ে, টাকা দেখিয়ে তাকে বশ করতে এসেছেন অ-বাবু। পতিতা বলে।

গর্জে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন : রাখ তোমার টাকা। আমি টাকা উপার্জন করেছি। টাকা আমায় উপার্জন করে নি। ও রকম দশ-বিশ হাজার টাকা অনেক আসবে। তুমি এখনই চলে যাও।

বটে—আগুনের মত জ্বলে উঠলেন অ-বাবু। তরবারী নিষ্কাষণে উদ্যত হলেন।

বললেন : এত জেদ! ভেবেছ তোমায় আমি এত সহজে ছেড়ে দেবো? তোমায় কেটে টুকরো টুকরো করবো। তারপর ঐ বিশ হাজার টাকা যা তোমায় দিতে চাইছি, তা ব্যয় করব অন্য কাজে। কথাগুলি শেষ করেই মুষ্টিবদ্ধ তরবারী উত্তোলন করলেন। সজোরে আঘাত হানলেন বিনোদিনীর মস্তক লক্ষ্য করে। চকিতে সরে গেলেন বিনোদিনী। তরবারীর আঘাতে পার্শ্বস্থ টেবিল হারমোনিয়ামের ডালা কেটে গেল। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তৎক্ষণ হারমোনিয়মের আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন বিনোদিনী। আবার বিনোদিনীকে লক্ষ্য করে আঘাত হানলেন। এবার টুলের ওপরে আঘাত পড়ল। মুহূর্তে হারমোনিয়ামের আড়াল থেকে উঠে এসে তরোয়ালসহ অ-বাবুর হাত ধরে ফেললেন। ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন : ছিঃ ছিঃ একটা বারাঙ্গনার জন্য তুমি নিজের জীবনকে এমনি ভাবে কলঙ্কিত করবে। কাটতে হয় আমায় পরে কেটো। সময় অনেক পাবে। এখন শান্ত হও। স্থির হও।

বিনোদিনীর কথায় হাতের তরবারি ফেলে দিয়ে অ-বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন। নানানভাবে বিনোদিনীকে বোঝাতে চাইলেন। বিনোদিনীও সান্ত্বনা বাক্যে সুস্থ করে বিদায় দিলেন অ-বাবুকে। প্রেমাস্পদের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠলো তার মন। কিন্তু তখন তার ফেরার কোন উপায় ছিল না।

সংবাদটি ছড়িয়ে পড়া মাত্র চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন গুরমুখ রায় ও অন্যান্যরা। কলকাতার বাইরে বিনোদিনীকে লুকিয়ে রাখার পরামর্শ দিলেন সবাই। কখনও রাণীগঞ্জ কখনও বর্ধমান—আরো নানান স্থানে কিছুদিন লুকিয়ে রাখা হলো বিনোদিনীকে। ৬৮ বিডন স্ট্রীটের জমি লীজ নিয়ে নবনাট্য দেউলের কাজ শুরু হলো। বিনোদিনী তখন পর্যন্তও গুরমুখ রায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। তার একই কথা : থিয়েটার না করা পর্যন্ত আমায় পাবে না। থিয়েটারের কাজ শুরু করে বিনোদিনীকে বললেন গুরমুখ : কি দরকার তোমার ঐ ঝুট ঝামেলায়। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ তোমায় দিচ্ছি। থিয়েটার থাক।

এই প্রলোভনের সামনে দাঁড়িয়ে বিনোদিনী বললেন : না। টাকা আমি চাই না। আমি চাই থিয়েটার।

অনন্যোপায় গুরমুখ রায় থিয়েটারের কাজ শুরু করলেন পুরোদমে। বর্তমান বিডন স্ট্রীট আর চিত্তরঞ্জন এভেনিউর সংযোগ স্থলের প[...] উত্তর কোনে কীর্তি মিত্রের জমিটি [...]স্থিত ছিল। এখানেই গড়ে উঠলো বাংলার তৃতীয় নাট্য দেউল।

নাট্যগৃহ নির্মাণের কাজ চলতে লাগলো। একদিকে আর একদিকে নতুন নাটকের রিহার্সাল চলল পুরোদমে। থিয়েটারের কাছাকাছি বনমালী চক্রবর্তী মশায়ের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল রিহার্সেলের জন্য। নাটক ও অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে রইলেন গিরিশচন্দ্র। জওহরলাল ধরের নির্দেশে মঞ্চগৃহ নির্মিত হতে লাগলো। তিনিই হলেন মঞ্চাধ্যক্ষ। দাসুচরণ নিয়োগী হলেন সহকারী মঞ্চাধ্যক্ষ আর হিসাবরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো হরিগোপাল বসুর ওপর। অমৃতলাল বসু আর অমৃত মিত্র গিরিশচন্দ্রের সহকারী রূপে কাজ করতে লাগলেন। সর্ববিষয়ে সর্বদায়িত্ব গিরিশচন্দ্রের ওপরই ছিল। তিনি বিভিন্ন বিভাগে উপযুক্তদের নিয়োগ করে নাটক নিয়ে মেতে রইলেন। গিরিশচন্দ্র প্রমুখরা প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার পরিত্যাগ করার বহু পূর্বে অমৃত বসু ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এই সময় রসরাজ

গ্র্যান্ড হোটেলে অনুষ্ঠিত বি এফ জে-এর অনুষ্ঠানে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে মাল্যভূষিত করছেন গত বছরের সেরা অভিনেত্রী অপর্ণা সেন (সুজাতা)। অসুস্থতার জন্য শ্রীমতী সেন উৎসব অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেননি। ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীঘোষ সারগর্ভ ভাষণে বাঙলা চলচ্চিত্রের প্রসার ঘটানো যায় কিভাবে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে বলেন। অনুষ্ঠানে শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং বি এফ জে-এর অন্যান্য সভ্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অমৃতলাল বসুর ব্যক্তিজীবনের একটি ঘটনা সম্পর্কে বিনোদিনী আভাস দিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। নাট্যলোকবাসীদের মধ্যে ঘটনাটি প্রচারিত থাকলেও, ইতিহাসে তার স্থান নেই। এমনি বহু ঘটনাই ইতিহাস ধরে রাখেনি বা রাখতে পারে না। কিন্তু এই সব ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে সব সময়েই প্রভাবান্বিত করে থাকে এ-কথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

অমৃত বসু বেঙ্গল থিয়েটারে জড়িত থাকার সময় সিমলাতে জোড়া-মন্দিরের কাছে বিনোদিনীদের একটি ভাড়া বাড়ী ছিল। এই বাড়ীতে অমৃত বসু প্রায়ই আসতেন এবং রাত্রিবাসও করতেন প্রয়োজনমত। এই সূত্রে বিনোদিনীদের সঙ্গে অমৃত বসুর পৃথক এক যোগ গড়ে ওঠে। অমৃতলালের সঙ্গে বিনোদিনীর ভিন্ন ...নের ...যোগ গড়ে উঠেছিল বলে যাঁরা ...ন করেন, তাঁরা ভুল করেন। এই যোগ ...ড় উঠেছিল ভিন্ন অভিনেত্রীর সঙ্গে। ...নোদিনীর সঙ্গে নয়। বিনোদিনী তাঁর ...জীবনীতে লিখেছেন : 'সেই সময় ...ন কারণবশতঃ জোড়া-মন্দিরের পার্শ্বে সিমলাতে আমাদের একটি বাড়ী ভাড়া ...ল। সে-বাড়ীতে ভুনীবাবুও প্রায়ই ...তেন ও কার্যানুরোধে কয়েকদিন বাসও করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়দের সহিত বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস দখল করিতে পারিতেছিলেন না। আমরাই দূর দেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভুনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়া দিই। পরে যখন আমাদের নতুন থিয়েটার হইল, তখন ভুনীবাবু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দেন।'

কালীশ মুখোপাধ্যায়

(ক্রমশঃ)

বিবিধ সংবাদ

নান্দীকারের আন্তিগোনে : রঙ্গনায় ভালো মানুষের নিয়মিত অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নান্দীকার অন্যান্য মঞ্চে 'আন্তিগোনে'র অভিনয় শুরু করেছেন। আন্তিগোনের মঞ্চসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদের দায়িত্বে আছেন কুমার রায়। আলোকসম্পাত কালিপ্রসাদ ঘোষ, রূপসজ্জা শক্তি সেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, লতিকা বসু, বীণা মুখোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রজিত চক্রবর্তী, মনোজ দাস, কালীপদ সাহা, নিরঞ্জন পাল, বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী, শিপ্রা সাহা ও পরিমল মুখোপাধ্যায়। নাটকটি নির্দেশনা করেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

জলসা

সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা : ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মত অন্তহীন সঙ্গীতাসরের মধ্যে একটি সঙ্গীত-সন্ধ্যার স্মৃতি হারিয়ে যাবার নয়। সুখস্মৃতির মধুর আবেশ হয়ে রসিক-চিত্তকে স্বপ্ন-বিভোর করে তোলবার মতই গত ৮ জুলাই-এ কলামন্দিরের সেই সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যা। শিল্পী বাংলা গানের দুই দিকপাল—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এ-উৎসব প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ছন্দমাধুরী সংস্থা পরিকল্পনার গৌরব প্রাপ্য শ্রীজহর রায়ের। —বিনা পারিশ্রমিকে অজস্র গানের দাক্ষিণ্যে ভরে ওঠা সেদিনের সন্ধ্যার সংগৃহীত অর্থ দুঃস্থ শিল্পীদের চিকিৎসা তহবিলে দিয়ে উদ্যোক্তারা এ অনুষ্ঠানকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। লক্ষ্মী জুয়েলাসের পক্ষ থেকে দুই শিল্পীকে দুটি হীরকখচিত অঙ্গুরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

শিল্পীদ্বয়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে জহর রায় ও নির্মল ভট্টাচার্য—প্রাণছোঁয়া আবেদন রাখলেন শ্রোতাদের চিত্তে। তাঁরা বলেন শিল্পবোধ ও মনুষ্যত্বের দুর্লভ সমন্বয়

সংগীতজীবনে ঘটাতে পেরেছেন বলেই আজও আপনাপন সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

আসরের প্রথমার্ধে শুনলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রসংগীত, চিত্রগীতি আধুনিক— তথা জনপ্রিয়তার সবকটি প্রেক্ষণের প্রতিই শিল্পী আলোকপাত করে তাঁর অগণিত ভক্তের আনন্দের কারণ হয়েছেন—। —"পুরান সেই দিনের কথা"— সুরু করতেই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়া নিবিড় হয়ে উঠলো—। সেই গভীর পটভূমিকায় নানা রঙা আলোরেখার মতই ফুটে উঠলো এক-একটি গান—। গৌরীপ্রসন্নর চারখানি গান স্ব-সুরে— একটি নচিকেতা ঘোষের সুরে গেয়েছেন—। বাকী গীতিকার ও সুরকারদের মধ্যে ছিলেন হীরেন বসু ও অনুপম ঘটক, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, মুকুল দত্ত, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত ভট্টাচার্য, উত্তমকুমার বিমল ঘোষ।

অধিকাংশ গানেরই সুরস্রষ্টা শিল্পী নিজে। তাঁর এই গানগুলিতে সুরকার ও গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—দুটি সত্তাকেই পাওয়া গেছে। কোনটি বড় বলা শক্ত। তাঁর শিল্পকৃতির নজীর হিসাবেও এ অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ মূল্য আছে —কখনও স্মৃতিচারণের করুণ মাধুর্য (মুছে-যাওয়া দিনগুলি) রাণারের রাত্রিদিনের যতিহীন চলার ছন্দ কখনও নীরব ব্যথায় স্তব্ধ কখনও বা ছুটে চলার বেগে অধীর, এরই মধ্যে 'ও নদীরে'-র কল্লোলিনী গতি—সব মিলিয়ে এক রঙিন মায়ার কল্পলোক—যেন কঠিন বাস্তব থেকে শ্রোতাদের মনকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো—। সবশেষে "এই কথাটি মনে রেখো"—মহাকবির সেই আর্তির সংগে শিল্পীর আর্তি এসে মিশলো এক অবিস্মরণীয় ভাবছলছল মুহূর্তে।

এরপর সুরের ধারাকে প্রবাহিত রাখবার পালা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের—। —ইদানীং

ধনঞ্জয় : হেমন্ত

ভক্তিগীতির শিল্পী হিসেবেই এঁকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। —কিন্তু এই সীমারেখায় এতবড় পরিধির শিল্পীকে সীমিত করাটা যে কতবড় মূঢ়তা—সেই কথাটাই যেন নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলো সেদিনের গানগুলি। —শিল্পী এখন যৌবনের শেষ প্রান্তে—। কিন্তু যৌবনের শক্তিকেও যেন হার মানিয়েছে ধনঞ্জয়বাবুর ভাবগীতি। রাগসংগীত ও ভক্তিগীতি।

দরবারী কানাড়ার জমাট-বাঁধা বেদনায় সুগম্ভীর মর্যাদা সৃষ্টি করেছিলো—সূচনার রবীন্দ্রসংগীত "এবার নীরব করে দাও হে" (সতীর্থের গাওয়া শেষ গানটি "আমি যে গান গেয়েছিলাম" এর পরিপূরক হিসেবেই কি?)। এরপর কবি নজরুলের "চোখ গেল' 'আজো আমার মনকে দোলায়'—এর রোমান্টক রং লাগলো— দরবারী কানাড়া-সৃষ্ট স্তব্ধ পরিবেশে। যেন মহিমাদীপ্ত হিমালয়ের বুকে জাগলো কান্না-হাসিভরা নদীর কলতান।—উচ্চগ্রামী উদার ব্যাপ্তি গাম্ভীর্য, মধুরতা, রাগভিত্তিক সূক্ষ্ম কারুকার্য। সর্বোপরি আবেগ একই কণ্ঠে এতগুলি সম্পদের মিলন 'একই অঙ্গে এত রূপে'র মতই বিস্ময়কর। —"শুক্লারাতে রূপ জোয়ারে" (নির্মল ভট্টাচার্য সুরে)-তে সুরের আবেশ যেন নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাড়ি দেয়। আবার সাপট চালে ঝলকে অন্ধকার রাতে মীরাবাঈর অভিসারপথ যেন আলো হয়ে ওঠে—আর আলোছায়া বিপরীতমুখী মাধুর্যেই যেন অপরূপ হয়ে ওঠে—"সেই ধরণী ধূসর করে ফুল ঝরায়ে দেবো"-তে অন্তরায় স্বরক্ষেপণের পর সকল উচ্ছ্বাসকে মন্দ্রস্বরের নিবিড় বেদনায় সংহত করার অসামান্য শিল্পবোধ "যে দিলো মোর কণ্ঠসুধা সেই ত কেড়ে নেবে"। সত্যি ভোলা যায় না। শেষ তিনটি ভক্তিগীতি অনিল বাগচীর সুর কমলাকান্তের রচনা 'কালী সব ঘুচালি ল্যাঠা'—আহির ভৈরবের উদাত্ত আকুল আবেদনে যেন আরাধ্যার চরণে আত্মনিবেদন। নিজের সুর ছাড়াও অন্যান্য যে সব গীতিকার ও সুরকারদের গান শিল্পী পরিবেশন করেছেন তাঁরা হলেন—ভট্টাচার্য (অনিলবাবু, নির্মলবাবু, প্রফুল্লবাবু, অরূপবাবু, শান্তবাবু এবং শিল্পী নিজে), পবিত্র মিত্র, চিত্ত রায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ বাগচী, প্রণব রায়, রবীন চট্টোপাধ্যায় ও জহর মুখোপাধ্যায়। ধনঞ্জয়বাবুর মেজাজকে অনুকূল রাখবার কৃতিত্ব রাধাকান্ত নন্দীর। দাদরা ও কাহারবার উঠানগুলিতে শিল্পী যেন ছন্দের ফুলঝুরি ঝরিয়েছেন।

দুই শিল্পীর অনুষ্ঠানকে সার্থক করেছেন অন্য যে সব সংগতকার তাঁরা হলেন অমর দত্ত, নীলকান্ত নন্দী, সুনীল মুখোপাধ্যায়, নির্মল বিশ্বাস, কুমুদ ঘোষ, রথীন রায়, সমীরকুমার। ঘোষণায় ছিলেন দিলীপ ভট্টাচার্য।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 15th August, 197
Phone 55-5231 (14 lines)

সেই একই লাল টিন,
সেই একই
বিখ্যাত কীটনাশক
বদলেছে শুধু
আমার নাম-
নতুন নাম হল
ফিনিট
সারা বাড়ীর উড়ন্ত আর বুকেহাঁটা
পোকামাকড়ের কবল থেকে আপনাকে
রেহাই দেয়—নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!
ফিনিট সারা বাড়ীর মাছি, মশা, আরশোলা,
ছারপোকা ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ নাশ করে—
নিরাপদ অথচ কার্য্যকরীভাবে!
নাশ করুন সারা বাড়ীর কীট
ছড়িয়ে দিয়ে ঘাতক ফিনিট!
ফিনিট, ইনসেকটিসাইডস্ অ্যাক্ট ১৯৬৮-র অন্তর্গত
রেজিষ্ট্রীকৃত প্রথম কীটনাশকের নতুন নাম!
FINIT
HOUSEHOLD
insecticide
HP
আমার নতুন নাম
HP
নতুন যুগের প্রতীক!

১৪ সংখ্যা

Friday, 22nd August, 1975 শুক্রবার, ৫ ভাদ্র, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	কাহিনী	(গল্প)	শ্রীসতীকান্ত গুহ
১২	সাহিত্যের সাজঘরে		শ্রীশান্ডিল্য চতুর্বেদী
১৪	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৫	বিদেশের কথা		শ্রীপুন্ডরীক
১৬	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৯	রবীন্দ্রজননী সারদাদেবী	স্মরণে	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২১	ডবল এজেন্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিক্রমাদিত্য
২৫	সুরের আগুন		শ্রীসন্ধ্যা সেন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিযুক্ত গণি কমিটির সুপারিশ এখনও কার্যকর হয় নি। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া যে উচিত এ বিষয়ে দ্বিমত থাকাটাই আশ্চর্য। প্রসঙ্গটা উল্লেখ করা হল এই কারণে যে, সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এই বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক্তিয়ার ও আয়তন সংকোচনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটিও উপযুক্ত গণি কমিটির সুপারিশের অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে তাঁদের বাস্তব অসুবিধার কথাই দেশবাসীকে অনুধাবন করতে বললেন। ভারতের প্রাচীনতম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব এখন ম্লান। তার সমস্যাও প্রচুর। মাদ্রাজ বা বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। এই শিক্ষায়তনকে আগেকার গৌরবে পুনরধিষ্ঠিত করতে হলে এখনই কিছু করা দরকার। শুধুমাত্র ভাবাবেগে চালিত হলে এবং আমরা সবাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারে থাকতে চাই বললে এই প্রতিষ্ঠানকে আরও পঙ্গু করেই রাখা হবে। এবং নিজের বোঝার চাপেই একদিন তার অগ্রগতি বিড়ম্বিত হবে।

পূর্ব মহিমা নিশ্চয়ই সযত্নে স্মৃতিতে লালনের বস্তু। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, মেঘনাদ সাহা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহু গুণান্বিত অধ্যাপক এই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে খ্যাতির চরম শীর্ষে উন্নীত করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পৃথিবীর সর্বত্র নিজেদের গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি বহু সম্মানভাজন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের গবেষণালব্ধ ফলই রামনকে দুর্লভ নোবেল পুরস্কার এনে দিয়ে-ছিল। সুতরাং আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার আয়তন সঙ্কুচিত করতে হলে অনেকের মনেই হয়তো অতীতের গৌরবের কথা জাগবে। অনেকে হয়তো ভাববেন, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমাও সঙ্কুচিত হবে। কিন্তু এই ভাবাবেগ বিশ্ববিদ্যালয়কে তার গুণগত উৎকর্ষ পুনরাবিষ্কারে সহায়তা করবে না। গত ত্রিশ বছরে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাভাব, স্থান সঙ্কুলান ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যায় ক্রমে ক্রমে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। এ থেকে তার উদ্ধার দরকার। সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাও সে কারণেই অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমানে বহুলাংশে খণ্ডিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা আড়াই লক্ষের বেশী। তার অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ২৩০-এর বেশী। তার স্নাতকোত্তর বিভাগগুলোর ছাত্র সংখ্যা ১৪ হাজার। মনে রাখতে হবে যে, গত দুই দশকে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলাকা কেটে নিয়ে একে একে গড়ে তোলা হয়েছে যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। মেদিনী-পুরে একটা পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার প্রস্তাবও বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তা সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় প্রতি বছর বাড়ছে। খানিকটা নামের মোহ, কলকাতার আশে-পাশে থাকবার সুবিধা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খ্যাতির অভাব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এখনও ছাত্র গবেষক ও অধ্যাপকদের টানে। কথায় বলে মরা হাতী লাখ টাকা। শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের শিক্ষার্থীদের কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাম তাই এখনো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশী।

সিণ্ডিকেট চাইছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শ'খানেক অনুমোদিত কলেজ এবং লাখখানেক মাত্র ছাত্র। প্রতীচীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো এতো ছাত্রও রাখে না। বিশ্ববিদ্যা ঢালাওভাবে দান করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা সকলের জন্য খোলা না রেখে উপায় নেই। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ ও জীবিকার সুযোগ সুনির্দিষ্ট হলেই উচ্চশিক্ষার এই মোহ কাটবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এর পরিচালনা, পঠন-পাঠন, পরীক্ষা গ্রহণ সুশৃঙ্খল করে তোলার যে-সুপারিশ গণি কমিটি করেছেন এবং যা সিণ্ডিকেটও তার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন তাকে কার্যকর করলে হয়তো এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্তমান হৈ-হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন অর্থের অনুদান বৃদ্ধি, কলেজগুলোর পরি-চালনার ওপর কড়া নজর এবং শিক্ষাদানপদ্ধতির সংস্কার। তার সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণে যে গলদ সকলের লজ্জা ও হতাশার কারণ হয়েছে তাও দূর করা দরকার। তা হলে আশা করা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার উদ্দেশ্য ফিরে পাবে, তার অস্তিত্ব হবে সার্থক, তার গৌরব হবে পুনরুজ্জীবিত।

'প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন হয়ে গিয়েছেন?'

কথাটা কানে যেতে দিবাস্বপ্নের নিত্য-পরিচিত অধ্যায়ে ছেদ টেনে পাশ ফিরে তাকালাম। সেখানে, হোটেলের বারান্দায়, একটি বেতের আরামচেয়ারের পিঠে হাত রেখে লীলাবতী এসে দাঁড়িয়েছেন। দূরে, ঢালু মাঠের শেষে পাহাড়ী নদীর ওপারে বর্ষার অপরাহ্ণে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পটে সুউচ্চ পাহাড়ের একসার চূড়ো অস্পষ্ট হতে হতে সুন্দরের অর্থে অস্পষ্ট। রেখায় ও বর্ণে নয়। চক্ষুর ধ্যানে।

লীলাবতী ঈষৎ হেসে বললেন, 'দোষ আপনার নয়। প্রকৃতির। ব্যবধানের মাঝে বিভ্রম ঘটায়। প্রকৃতি সেই বিভ্রমের সুযোগ নিয়ে মানুষের মন ধরে টান দেয়। তাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘরছাড়া করে ছাড়ে।'

কাহিনী

সতীকান্ত গুহ

আমি একটা জবাব দেওয়া সঙ্গত বোধ করলাম। বললাম, 'প্রকৃতির ধ্যান নয়, চিন্তা। চিন্তাসমুদ্রে সাঁতার দিচ্ছিলাম।'

লীলাবতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'চিন্তা! দুশ্চিন্তা নয়তো?'

আমি এবার হেসে দিলাম। বললাম, 'আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। আপনার কাজ হাতে নিয়ে দুশ্চিন্তায় তলিয়ে যেতে আসিনি। চিন্তাসমুদ্রে সাঁতার দিয়ে অকূলে কূল পাবার দুঃসাহসে এসেছি।'

লীলাবতী গলা নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই শুধু দুঃসাহসী নন?'

আমি বললাম, 'তাহলে অনেক আগেই ইহলোক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। হোটেলের বারান্দায় আপনার পাশে বসে আপনাকে না দেখে পাহাড়ের কোনো একটা চূড়ো থেকে সূক্ষ্ম দেহে আপনাকে দেখতাম।'

লীলাবতী নীচু গলায় বললেন, 'কীসের জোরে অকূল সমুদ্রে সাঁতার দেন?'

আমি বললাম, 'জোরে নয়। আশ্বাসে। ধ্রুবতারার অভয় মন্ত্রে।'

লীলাবতী বললেন, 'ধ্রুবতারা! কোন্ আকাশের?'

আমি জবাব দিলাম, 'আপাতত হোটেলের বারান্দায় আমার পাশে খুব কাছের আকাশের। হোটেলে ঢুকতে না ঢুকতেই তার দৃষ্টি আমার অদৃষ্টজয়ী দুঃসাহসের গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়েছে।'

লীলাবতী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ আরক্ত হল। আত্মসম্বরণ করে বললেন, 'কয়েক বছর আগে এ কথা আপনার মতো একটি মানুষের মুখে শুনলে হাতে স্বর্গ পেতাম। এখন আঘাত পাই। যে-অতীত অনেকটা আমারই সৃষ্টি সেই অতীত আঘাত হানে।' একটু থেমে বললেন, 'রক্ত দেখলে আমরা শিউরে উঠি। কিন্তু মনের রক্ত চোখের আড়ালে ঝরে। স্রোত বয়ে গেলেও কে দেখবে! কে বুঝবে!'

লীলাবতী উঠলেন। বললেন, 'যাই। চা পাঠিয়ে দিই।'

এজন্য লীলাবতীর প্রস্থানের প্রয়োজন ছিল না। বেল টিপলেই হত। মনে মনে হোটেলকে প্রশ্ন করলাম, 'ওকে কোথায় টানছো? অফিসে, মস্তিষ্কের মন্ত্রণাগৃহে না অশ্রুমোচনের জন্য শয়নকক্ষে?'

আমি সখের ডিটেকটিভ। ডিটেকটিভ মহলে অর্ধোন্মাদ হিসেবে আমার খ্যাতি কিম্বা অখ্যাতি আছে। অর্ধোন্মাদ বলেই কূটরহস্যের মীমাংসা মাঝে মাঝে আমার হাতে আমার বুদ্ধি ও কল্পনা কিম্বা অনুকূল অদৃষ্ট তুলে দিয়ে যায়। আমার প্রায়ই সন্দেহ হয়, আমার মত্ততা ছদ্মবেশী প্রতিভা। এ হিসেবে নিউটনের প্রতিভার অলক্ষ্যে বোঁটা ছিঁড়ে আপেল ফেলেছিলেন। অবশ্য স্থান কাল বিচার করে। না হলে অর্থ হয়তো ছদ্মবেশী মত্ততা। একটা মিল দেখতে পাই। নিউটনের কোলেও অদৃষ্ট নিম্নগামী আপেলের পতনকাণ্ডের মর্মভেদ করার আগে নিউটন হয়তো তত্ত্বসমেত আপেলটা অম্লানবদনে ভক্ষণ করতেন। আপেল মুঠোয় পেয়ে ভক্ষণ না করা মত্ততা। স্থান কাল-এর গুণে এই মত্ততা একটা বিরাট সত্য আবিষ্কার করে প্রতিভারূপে স্বীকৃতি পেল।

সুখের বিষয় আমি কলকাতাবাসী। বোম্বাই শহরে অধিষ্ঠিত হলে হয়তো শ্রী ও পৌরুষের জোরে—কুমারদের দল ভারী করে চিত্রতারকা হতাম। বোম্বাই মার্কা ছবির ডিটেকটিভ হলে অর্ধোন্মাদ হিসেবে কীর্তিত না হয়ে সং হিসেবে ধিক্কৃত হতাম। কীর্তি একশ'পেয়ে কীটের মতো। বিরূপ সমালোচনায় শতখান হয়েও এক একটা অংশ অনায়াসে এক একদিকে চলে যায়। নানা ঠিকানায় পৌঁছয়। তিন তিনটে জটিল ব্যাপারে রহস্যোদ্ধার করার পর আমার ক্ষেত্রে জীবলোকের এই আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। দেশের নানাস্থানে আমি আলোচনার ও বিস্ময়ের বিষয় হয়ে পড়লাম। এবং যথাকালে লীলাবতীর সংক্ষিপ্ত আহ্বান পেলাম। আমি শর্ত সম্বন্ধে বৈষয়িক চিন্তার জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বেই লীলাবতীর সংক্ষিপ্ত আহ্বানের রহস্য আমার মগজে আরব্যরজনীর ধোঁয়ার মতো ঢুকলো। লীলাবতী লিখেছিলেন, 'পত্রপাঠ চলে আসবেন। টাকার জন্য ভাববেন না। কাজে বিপদ কতটা, অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়ে আসবেন।' আমি পত্রপাঠ চলে এলাম। একটা কারণ, ডিটেকটিভ, বিশেষ করে সখের ডিটেকটিভ বিপদের গন্ধ পেলে স্থির থাকতে পারে না। অন্য কারণ, দক্ষিণ ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতীয়া লীলাবতীর আহ্বান। দ্রাবিড় জাতের লীলাভূমি দক্ষিণ ভারতের আলো-হাওয়ায় কী আছে জানি না, সবকিছুই আমাকে দুর্নিবার শক্তিতে আকর্ষণ করে। তাদের মুখনিঃসৃত অননুকরণীয় ইংরাজীও। দ্রাবিড়ভূমির একটি ললনা, যিনি বিপন্না ও যাঁর নাম লীলাবতী, তিনি যে আকর্ষণের ব্রহ্মাস্ত্র হানবেন, তাতে বিস্ময়ের কী থাকতে পারে?

নাতিবৃহৎ ডাইনিংরুমে আমি রীতি-মতো সুসজ্জিত হয়ে নৈশাহারের জন্য এলাম। ডিনার স্যুট আমার ছদ্মবেশ! বোঝাতে চাই আমি সৌখীন ভবঘুরে। সখ মেটাতে টাকা ওড়াতে এসেছি। অন্য কোনো কারণে নয়। অ্যাডভেঞ্চারের ও অর্থের আকর্ষণ, এ বিষয় আমার ও লীলাবতীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। পর্দার আড়ালে রাখা দরকার।

লীলাবতী বলেছিলেন নীলগিরি হোটেল নামে হোটেল, আসলে গেস্ট হাউস। ডাইনিংরুমে ঢুকে তাঁর মন্তব্যের মর্ম বুঝলাম। বাঘের গায়ের গন্ধের মতো হোটেলেরও একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। এ গন্ধ হোটেলের সর্বত্র। বিশেষ করে ডাইনিং রুমে। শস্তাদরের সরাইখানার উৎকট গন্ধ নয়। যে-দেবতা আহারে বিরাজ করেন, ভোজনের বিলাস ব্যসনে তাঁর উপস্থিতির সুবাস। নাসিকা পীড়িত হয় না। প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত হয়। নীলগিরি হোটেলের ডাইনিংরুমে এ দেবতা অনুপস্থিত। কোনোকালে ছিলেন মনে হল না।

ডাইনিংরুম প্রায় ফাঁকা। এক কোণে একটি টেবিলে চারটি ট্যুরিস্ট নীচুগলায় কথা বলছিল। স্যুপের চেয়ে কথায় তাদের অধিক আসক্তি। একটি বয় হতাশচক্ষে একবার তাদের সম্মুখের প্রায় অস্পৃষ্ট স্যুপের ডিস নিরীক্ষণ করছে। তারা তখন কথার ইন্দ্রলোকে। বয় এবং স্যুপ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমি এদিক ওদিক তাকাতে হেডবয় সসম্ভ্রমে এসে আমার জন্য নির্দিষ্ট টেবিলে আমাকে নিয়ে চেয়ার ঈষৎ ঠেলে দিয়ে যথারীতি বসালো। পানীয় বলতে সুসভ্য অনাচারের অভিধানে যা বোঝায় তা স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করলাম। ফলে দুর্মূল্য ফলের রসের ফরমাস দিতে হল। সঙ্গে সঙ্গে স্যুপও এল। দ্রাবিড়রা রন্ধনে অপটু। রন্ধনের ঐতিহ্যও হয়তো বেশীদিনের নয়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের কিছুকাল আগে সম্ভবত সীতাদেবীর কাছে কোনো দ্রাবিড় নারীর রন্ধনবিদ্যায় হাতেখড়ি হয়েছিল। কিন্তু দ্রাবিড়রা শুধু অধ্যবসায়ী নয়, কৌশলী। ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে কোন কোন গাছের পাতার কী গুণ তারা তাদের বিগত অরণ্য জীবনে অতিসহজেই আয়ত্ত করেছে। পাতার গুণে ব্যঞ্জনে স্বাদের আশ্চর্য প্রসাদ রসনায় নেশা এনে দেয়। [illegible] এই বিষয় নিয়ে কতক্ষণ স্থানকাল বিস্মৃত হয়ে ভাবছিলাম খেয়াল ছিল না। শ্রীমতী লীলাবতীর সম্বোধনে ডাইনিংরুমে ফিরে এলাম। দেখলাম তিনিও সুসজ্জিতা। প্রসাধনের বাহুল্যের চেয়ে নৈপুণ্য বেশী লক্ষণীয়।

লীলাবতী বললেন, 'অভিনয়ে ত্রুটি না ঘটে, সতর্ক থাকা ভাল। অনেক চিন্তা করে সাজসজ্জা করলাম। আপনি ধনী ভবঘুরে। যতদিন ধরে রাখতে পারি গেস্ট হাউসের ব্যবসার পক্ষে লাভকর। সেজন্য বেশভূষার পারিপাট্য অসঙ্গত নয়।'

আমি হেসে তাঁর উক্তির সমর্থন করলাম।

লীলাবতী বললেন, 'কালই তারা আসবে। একসঙ্গে নয়। আলাদা। তারা পরস্পরের শত্রু, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সন্দেহ শুধু একটি বিষয়ে। তারা এখানে না এসেও হিসেব চুকোতে পারে। এখানে কেন আসে? আমি কি এখনও উপলক্ষ্য? না তার চেয়েও বেশী? অর্থাৎ তাদের লক্ষ্য কি আমি প্রাণান্তকর অর্থে?

আমি বললাম, 'এ বিষয় নিয়ে আজ সারারাত চিন্তা করব। দিনে আমি কাজের রাক্ষস। কিন্তু কাজের ছকটা আঁকি রাতে। স্বপ্নে নয়। জেগেই ঘরের ছাত দেখতে, দেখতে ছকের ধ্যানে চলে যাই।'

লীলাবতী বললেন, 'ডিনার খাবেন তো?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই। বিশেষ করে চিত্রতারকাদের ম্লান করে আপনি যখন পাশে এসে বসেছেন।'

লীলাবতী বললেন, 'মার্জিত পরিহাসে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ও কথা বলবেন না। মন দুর্বল হয়।'

আমি বললাম, 'হোকনা!'

লীলাবতী ইতস্তত করে বললেন, 'কেন?'

আমি বললাম, সৌখীন ভবঘুরের ভূমিকা বাস্তবকে হার মানাবে।' লীলাবতীর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'যে-ভবঘুরের অর্থের অভাব নেই, তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রেম বাদ গেলে ভবঘুরে হিসেবে সে মানে খাটো হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞ চোখ তাকে সন্দেহ করতে শুরু করে। জাতভবঘুরেরা এক অর্থে জীবনের, অর্থাৎ জীবনপ্রেমের, আসল অর্থে প্রেমের অভিসারী।'

লীলাবতী ম্লান হেসে বললেন, 'এই অর্থ অনর্থ না বাধায়!' একমুহূর্ত পরই বললেন, 'আমাকে দুর্বল করবেন না। আমি স্বভাবতই দুর্বল। বিপদে পড়ব।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'যে-বিপদ আমার সৃষ্টি নয় তা থেকে অর্থের আকর্ষণে আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি। যে-বিপদ আমার সৃষ্টি তা থেকে আপনার আকর্ষণে আপনাকে উদ্ধার করতে পারবো না?'

লীলাবতী হাসলেন। মনে হল তিনি ভীত। নীচু গলায় বললেন, 'বিপদ আমাকে নিয়ে। যে-বিপদ আপনার সৃষ্টি, তার মনোহর রূপ দেখে তা থেকে যদি উদ্ধার পেতে না চাই একটা বিপদের উপর আর একটা বিপদ চাপবে।'

আমি সহাস্যে বললাম, 'তাহলে বিপদ সৃষ্টি করব না।'

লীলাবতী বললেন, 'কেন? আপনি তো ওরকম কোনো দাসখৎ লিখে দেননি!'

আমি বললাম, 'আপনার কথার অসঙ্গতির আড়ালে যে-সঙ্গত সুস্পষ্ট এ রহস্য সম্বন্ধেও আজ রাতে চিন্তা করব। অভিজ্ঞতার নকসায় বুদ্ধির সুতোয় আমি প্রয়োজনমতো জাল বুনি। দরকার হলে চিন্তাসমুদ্রের এপার থেকে ওপার জাল ফেলব।'

লীলাবতী ভ্রূভঙ্গ করে বললেন, 'এপার থেকে ওপার?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

কখন ডিনারের দুপ্রস্থ খাদ্য শেষ করে তৃতীয় ও শেষ প্রস্থে পৌঁছেছি খেয়াল ছিল না। পুডিং ও প্রায় একসঙ্গেই কফি এসে গেল। লীলাবতী উঠে পড়লেন। বললেন, 'কথায় কথায় এত সময় কেটেছে বুঝতেই পারিনি। গুডনাইট।'

আমি প্রত্যুত্তরে শুভরাতের সম্ভাষণ জানালাম। লীলাবতীর চোখের ভাষা কী বলতে চায়? বক্তব্যের মর্ম কি কৌতূহল? আকাঙ্ক্ষা? না ভয়? ভয়ের কথা কেন আমার মনে হল নিজেকে প্রশ্ন করতে গিয়ে বিস্মিত হলাম।

ডিনারের পর একবার ঘরে ঢুকেই বার হয়ে এসে বারান্দায় বসে ছিলাম। পূর্ণিমার রাত সন্ধ্যায় মেঘের পর্দা ঠেলে মুখ দেখায় নি। কখন কোথা থেকে বায়ুর খরস্রোতে মেঘের পর্দা পাল হয়ে অন্ধকারের সপ্তমধুকের নিয়ে উধাও হয়ে দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হল, ডাইনিংরুমে বসে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়নি, তবু একেবারে বঞ্চিত হলাম না। জ্যোৎস্নায় দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ী মুলুকের প্রকৃতিকে দেখলাম। একসার আর্দ্র সাদা মেঘ তখনও পাহাড়ের চূড়োর চূড়োয় তুলিতে আঁকা বরফের মতো দেখাচ্ছে। পাহাড়ের নীচে অরণ্য। তার পরই প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে নদী। উত্তর ভারত কিম্বা বিহার অঞ্চলের পাহাড়ী নদীর মতো চঞ্চল ও তম্বী নয়। পূর্ণাঙ্গ পক্ক অভিজ্ঞ যুবতীর মতো। স্রোত চপল নয়। লক্ষ্যে স্থির। দৃঢ়বহা। গভীর নিঃশব্দ জলে একসঙ্গে একাধিক আহ্বান। নদীর আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে প্রান্তর তরঙ্গিত। কিন্তু মাটির মন্দে স্তব্ধ। নদী থেকে জমি পাহাড়ী ছন্দে উঠে হঠাৎ থেমেছে। কেন থেমেছে দূরের পাহাড়-চূড়োগুলোর পক্ষে সে রহস্য জানা অসম্ভব নয়। হয়তো এ ব্যাপারে ওদের হাত ছিল। কে জানে অতীতের কোনো প্রাগৈতিহাসিক নিশীথে ওরা একসঙ্গে তর্জনি তুলে শাসন করে বলেছিল কি শ আজো। আমাদের সম্মুখে বাধার সৃষ্টি কোরো না। দুর্গম-দুর্গমে মানুষের শহর পত্তনের কাণ্ডটা আমাদের চোখভরে দেখতে দাও।'

এই অসমাপ্ত পাহাড়ের কোমর জুড়ে যে সমতল জমি তারই উপর নীলগিরি হোটেল। তারই বারান্দা থেকে আমি বারবার পাহাড়চূড়ো দেখছি। নীলগিরি হোটেলের বিজ্ঞাপনে ফলাও করে এই

পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে। কখনো কখনো বর্ষায় যখন পাহাড়চূড়োয় কালো মেঘ ছায়া দেয়, একপাল মেঘের মতো বুনো হাতির দল পাহাড়ের গা বেয়ে অরণ্য ভেদ করে শুঁড় তুলে প্রান্তরে এসে সার বেঁধে দাঁড়ায়। তারপর তীক্ষ্ম চিৎকারে চারিদিকে সাড়া জাগিয়ে নদী লক্ষ্য করে ছুটে আসে। দ্রাবিড় আরণ্যকরা তখন মশাল জ্বেলে ঢাক কাঠি দিয়ে জবাব দেয়। হাতির পাল কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে। বারবার আকাশে শুঁড় তুলে প্রতিবাদ জানায়। প্রায়ই ফিরে যায়। কখনো কখনো এপারের ফসলের ক্ষেত ও তরকারীর বাগান লোলুপ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মরিয়া হয়ে নদীতে নেমে পড়ে। তখন ধনুকের ছিলায় বাঘের লাফের মতো একবার হেলে রাশি রাশি বিষাক্ত শর আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। গাদা বন্দুক গরম হয়ে ওঠে। তার মুখ বারবার জ্বলে ওঠে। যে-হাতি পালাতে পথ না পায়, সে আহত হয়ে নদীর স্রোতে ভেসে যায়। যে-হাতি গুলি ও শর ফাঁকি দিয়ে উঠে আসে তাকে নিয়ে প্রাণীলোকের এক নৃশংস নিধন যজ্ঞ শুরু হয়। সংগ্রাম একতরফা হয় না। শিব পদাঘাতে যে-কৌশলে গজাসুর বধ করেছিলেন সেই অব্যর্থ কৌশলে হাতি পায়ের চাপে কয়েকটা জ্যান্ত মানুষের শেষ নিঃশ্বাস বার করে তবে মরে। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শিবের নাগাল না পেয়ে তার অনুচর মানুষকে মারে।

এই দৃশ্যটা পাহাড়ী দেশের রাতের কোন যাদুতে আমার ভিতরে ঢুকে পড়ে। চমকে উঠি। এ কি ভাবী কোনো মারাত্মক হানাহানির পূর্বাভাস? না পাহাড়ী প্রকৃতির ও জ্যোৎস্নার কুহক? জানবার উপায় নেই বলেই অস্থিরতা বাড়ে। মন শান্ত করার জন্য ঘরে ঢুকে পড়ি।

শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছি। চিন্তা লীলাবতীর কাহিনী কেন্দ্র করে। হোটেলে আগন্তুকদের খাতায় নাম লিখে স্বাক্ষর করার সঙ্গে লীলাবতীর আহ্বানে তাঁর নিজস্ব ড্রইংরুমে যেতে হয়েছিল। সেখানে লীলাবতী এক নিঃশ্বাসে তাঁর কাহিনী আদ্যোপান্ত বলেছিলেন। কেন আমাকে ডেকেছিলেন এ বিষয়ে আমার কৌতূহল বলাসম্ভব মিটিয়েছিলেন। লীলাবতীর কাহিনী চমকপ্রদ নয় বলি কী করে? অসাধারণ যে তাতে তো সন্দেহ নেই। কাহিনী সংক্ষেপে এই : লীলাবতীর মা মহারাষ্ট্রের। পিতা দক্ষিণ ভারতের। লীলাবতী পিতামাতার একমাত্র সন্তান।' লীলাবতী একুশ বছরে পা দেবার পরই তাঁর পিতামাতা পরপর মারা যান। লীলাবতীর পৈতৃক বিষয়আশয় প্রচুর না হলেও গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তবু লীলাবতী কর্মখালি বিজ্ঞাপনের জবাব এবং কর্মপ্রার্থনার বিজ্ঞাপন দিতে ইতস্তত করেননি। বিজ্ঞাপনের ফলাফল যখন অদৃষ্টের মুঠোয় ছিল, অদৃষ্ট তখন আর এক হাত উবুড় করলেন। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে নিতান্ত খেয়ালে পিতামাতাকে স্মরণ করে লীলাবতী পর পর দুটি লটারির টিকিট কিনেছিলেন। দুটি টিকিটই অদৃষ্ট যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। লীলাবতী এক মাসের ভিতর দশ লাখ টাকা হাতে পেলেন। খবরের কাগজে যখন লীলাবতীকে নিয়ে সত্যমিথ্যা নানা বৃত্তান্ত ছাপা হচ্ছে এবং এক ডজন হতাশলেখক লীলাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অতিরঞ্জিত বিবরণ লিখে দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করছেন তখন পর পর দুটো বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। দ্বিতীয় লটারির জেতার পর একদিন লীলাবতীর বাড়ির সম্মুখে মস্ত একটা গাড়ি এসে থামলো। সৌখীন ভিজিটিং কার্ডখানা সঙ্কোচহলে কয়েকবার দেখে বেয়ারার হাতে দিয়ে লীলাবতী আগন্তুককে ড্রইংরুমে বসাতে বলে শয়নকক্ষে আংশিক প্রসাধনের জন্য ঢুকেছিলেন। ড্রইংরুমের পর্দা সরিয়ে ঢুকতে গিয়ে লীলাবতী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি আগন্তুককে দেখতে থাকলেন। আগন্তুক গম্ভীর অথচ মিষ্ট স্বরে বললেন, 'আসুন'। নিজের ড্রইংরুমে এভাবে আগন্তুক দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে লীলাবতী চমৎকৃত হলেন। আগন্তুকের বয়স ত্রিশের কোঠায়। পুরুষ কত সুদর্শন কত সুছন্দ হতে পারে, আগন্তুককে দেখে লীলাবতী সেই প্রথম বুঝলেন। কিন্তু আগন্তুকের শ্রী ও পৌরুষ ম্লান করে প্রকাশ পাচ্ছিলো তাঁর অতুলনীয় গাম্ভীর্য। অঘ্রাণের আকাশের মতো এ গাম্ভীর্যে শাসনের চেয়ে ক্ষমা বেশী।

লীলাবতী কম্পিতচরণে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন। অনতিদূরে একটি সোফায় হেঁট মস্তকে বসলেন। এ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আচরণ নয়। কিন্তু সেদিন রূপসী লীলাবতীর সরল ঔদ্ধত্য আগন্তুকের অপার গাম্ভীর্যের কাছে হার মানলো।

আগন্তুক বললেন, 'আমার মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের অভাব নেই। কিন্তু সৌভাগ্যের ভাঁড়ার যতটা ভরা উচিত ছিল, ভরেনি। আমি লটারির খবর পেয়ে টাকার লোভে আসিনি। আপনার ললাট পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ। এখন আপনার আপত্তি না থাকে তো আমার আসল উদ্দেশ্য খুলে বলি।'

লীলাবতী তখন স্বপ্নের জগতে। আপ্রাণ চেষ্টায় ড্রইংরুমে ফিরে এসে বললেন, 'আমার কী আপত্তি থাকতে পারে?'

আগন্তুক বললেন, 'অর্থাৎ আপত্তি নেই। আপনি একা। আমিও একা। আমি পুরুষ। আপনি নারী। আপনি ভীত হবেন না। আমি অপরুদ্ধোচিত সুযোগ নেব না।' একটু থেমে আগন্তুক বললেন, 'আপনি সৌভাগ্যলক্ষ্মী। আমি আপনাকে গ্রহণ করতে উন্মুখ। এই নিন আমার পরিচয়পঞ্জী।'

লীলাবতী কম্পিত হস্তে আগন্তুকের হাত থেকে তাঁর পরিচয়পঞ্জী গ্রহণ করলেন। দক্ষিণ ভারতের এক সুখ্যাত অর্থশালী অভিজাত বংশের ধারাবাহিক পরিচিতি। আগন্তুকের পরিচয়লিপি ও চিত্র যে-পৃষ্ঠায়, লীলাবতীর চক্ষু ও মন সেখান থেকে সংশয়ে ও অবিশ্বাসে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

লীলাবতীর বিস্ময়বিস্ফারিত দুটি চোখ শান্তদৃষ্টিতে শাসন করে আগন্তুক বললেন, 'পঞ্জী এক বছর আগে ছাপা হয়েছে। আমার পঞ্চম স্ত্রী তার কিছু পূর্বে মারা যান। এতে বিস্মিত হলে ভুল করবেন। তারপর ষষ্ঠ স্ত্রী যথাকালে অন্তঃপুরে আসেন। তিনি এক মাস পূর্বে গত হন। এতেও বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকতে পারে না। মানুষ আজ আছে, কাল নেই। আয়ু পদ্মপত্রে নীর।' লীলাবতীকে দেখতে দেখতে আগন্তুক সহাস্যে বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন মানুষের আস্পর্ধা কতদূরে যেতে পারে! আপনি সম্ভবত আমাকে উন্মাদ ঠাউরে বসেছেন।'

লীলাবতী বললেন, 'না, শুধু—'

আগন্তুক বাধা দিয়ে বললেন, 'পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী। ভাগ্যবিপর্যয়ে আমি পরাভূত হতে রাজী নই। ছবার যা পারিনি সাতবারের বার তা পারবো। অদৃষ্টের লেখা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার জীবনে সপ্তমে লক্ষ্মী। সৌভাগ্যলক্ষ্মী এবার আমার অন্তঃপুরে এসে সুখের তারে সপ্তমে ঝঙ্কার দেবেন।'

লীলাবতী মুগ্ধ। ভীত। বিস্মিত।

আগন্তুক হাসলেন। বললেন, 'পরের গাড়ি ধার করে পোশাক ভাড়া করে প্রসাধনের কারচুপিতে ধনী সুবেশ সুপুরুষ সেজে প্রহসন করতে আসি নি। অর্থের লোভে তো নয়ই।' আগন্তুক পকেট থেকে মখমলে মোড়া একটি ক্ষুদ্র কৌটো বার করে তার ভিতর থেকে একটি আংটি বার করে লীলাবতীর সম্মুখে ধরলেন। আংটি থেকে সূর্যরশ্মির মতো সহস্র ছটা বিচ্ছুরিত হল। আগন্তুক বললেন, 'এ আংটির দাম পঞ্চাশ লাখের কম হবে না। নিন। তিনদিন যে আঙুলে মানায় পরুন। তিনদিন পর আসবো। যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবু আপনার জীবনের জয়লক্ষ্মীকে অভিনন্দন জানাতে সানন্দে ঐ আংটি উপহার দিয়ে যাবো।'

আগন্তুক উঠলেন, নমস্কার জানিয়ে প্রস্থান করলেন। লীলাবতীর মনে হল তাঁর ড্রইংরুম অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁর জীবনে ঐশ্বর্য ও মহিমা কেন রহস্যের হাত ধরে আসতে চায়, লীলাবতী স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকেন। তাঁর জীবনে এ অভাবনীয় সৌভাগ্যের মূলে কি সরল যুক্তি থাকতে পারে না? ছটি মৃত নারীর অন্তিমশ্বাসের প্রয়োজন হয় কেন?

পরদিন অপরাহ্নে লীলাবতীর বাড়ির সম্মুখে আর একখানা গাড়ি ঝড়ের বেগে এসে হঠাৎ ঈশান কোণের থমকে যাওয়া মেঘের মতো থামলো। একটি সুদীর্ঘ সুসজ্জিত সুপুরুষ দ্রুতপদে গাড়ি থেকে নেমে দ্বারে করাঘাত করলেন। লীলাবতী ড্রইংরুমেই ছিলেন। তিনি কয়েক পা গিয়ে

কপাট খুলে চমকে উঠলেন। যিনি গতকাল এসেছিলেন তিনিই। কিন্তু সেদিন তিনি যেন অন্য মানুষ। তাঁর মুখে ভ্রূকুটি। দু চোখ কোন অজ্ঞাত রোষে ইস্পাতের মতো কঠিন।

আগন্তুক বললেন, 'নিশ্চয়ই বসতে পারি ?'

লীলাবতীর সম্মতি জানানোর প্রয়োজন হল না। আগন্তুক সদর্পে বসলেন। লীলাবতীর দিকে তাকালেন। এক রাতের ব্যবধানে হঠাৎ কোন দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হল? মানুষের চোখে এ দৃষ্টি লীলাবতী কখনো দেখেন নি। রাহুর দৃষ্টি কাকে বলে লীলাবতী চর্মচক্ষে দেখে মর্মে মর্মে বুঝলেন।

সাহস সঞ্চয় করে লীলাবতী আগন্তুককে প্রশ্ন করার পূর্বেই আগন্তুক লীলাবতীর হাতে একটি পুস্তিকা দিয়ে বললেন, 'এই আমার পরিচয়পঞ্জী। আমি অকৃতদার। যোগ্য পাত্রীর সন্ধানে আপনার এখানে এসেছি।' লীলাবতীর বিস্ময়বিমূঢ় মুখভাব লক্ষ্য করে আগন্তুক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'পরিচয়পঞ্জীর ষোড়শ পৃষ্ঠা দেখুন।'

বিস্ময়ে কৌতূহলে লীলাবতী পরিচয়পঞ্জীর ষোলো নম্বর পৃষ্ঠার শুরুতেই আগন্তুকের পরিচয় ও চিত্র দেখলেন। একই মুখ। কিন্তু চাহনী ও মুখভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরিচয়বিবরণী পাঠ করে বুঝলেন আগন্তুক যমজ দু ভায়ের অন্যতম। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে কনিষ্ঠ।

আগন্তুক বললেন, 'আমার বড় ভাইয়ের অন্তঃপুরে সব কটি অশুভ গ্রহ-উপগ্রহের দৃষ্টি। ভুল করবেন না। একই বংশ, একই মান। সেখানে পরীক্ষিত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে আমার অপরীক্ষিত সৌভাগ্যের উপর বাজি ধরুন। জিতলেও জিততে পারেন। কিন্তু ওখানে হার সুনিশ্চয়। এই নিন।' আগন্তুক পকেট থেকে মখমলে মোড়া অবিকল আগের দিনের মতো একটি ক্ষুদ্র কৌটো বার করে লীলাবতীর সম্মুখে একটি আংটি আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'এর মূল্যে একাধিক রূপসী নারী আত্মবিক্রয় করতে রাজী হবে। আমি শুধু একটি নারীকে চাই। যে জিততে জানে। আপনার মূল্য কম ধরিনি। তিন দিনের দিন আসবো। হাঁ না যাই বলুন আংটি ফিরিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে না।'

লীলাবতী কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই আগন্তুক একটা দমকা বাতাসের মতো কপাট কাঁপিয়ে বার হয়ে গেলেন।

তিন দিনের দিন প্রথম আগন্তুক এলেন। ড্রইংরুমে একটি সোফায় সমাসীন হয়ে নীরবে লীলাবতীকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ড্রইংরুমের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গম্ভীর বিষাদের স্বরে বললেন, 'বুঝেছি।'

লীলাবতী কথা বিজ্ঞ নন। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্ত অবিশ্রাম চিন্তা করে তিনি এই বিয়োগান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত সমীচীন জ্ঞান করেন নি। করার উপায় ছিল না। আঙুল থেকে আংটিটা খোলার উপক্রম করতে আগন্তুক বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা উপহার। প্রথম দিনই বলেছিলাম। প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে প্রত্যর্পণের কোন সম্বন্ধ নেই। অনুগ্রহ করে ঐ আংটিকে আপনার আঙুল থেকে নির্বাসন দেবেন না। ও যতদিন থাকবে আপনাকে অনুসরণ করার ও প্রত্যাশা করার একটা দাবী হৃদয়ের আইনের জোরে আমার থাকবে। আমি আশাবাদী। আপাতত প্রত্যাখ্যাত হলাম। কিন্তু আশা ছাড়লাম না।'

আগন্তুক প্রস্থান করলেন। তাঁর সঙ্গে মহাকাল যেন লীলাবতীর ড্রইংরুমে ঢুকেছিল। তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে লীলাবতী ড্রইংরুমের সংকীর্ণ জগতে ফিরে এলেন।

এক অবর্ণনীয় অবিশ্লেষ্য শোকে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। রহস্যের অর্থ বুঝতে পারলে আগন্তুককে হয়তো বলতে পারতেন, 'তোমার অন্তঃপুরে মৃত্যু অপেক্ষা করছে জানি। তবু তোমার গাড়িতে আমাকে তোমার পাশে বসিয়ে নিয়ে আমাকে তোমার সঙ্গ ও আসঙ্গের গৌরব ও উল্লাস দাও।' কিন্তু বলতে পারলেন না। তার কারণ শুধু রহস্য নয়। রহস্যের উপর প্রথম আগন্তুকের যমজ-কনিষ্ঠের অশুভ ছায়া পড়েছিল। মহাকালের রহস্যে পাতালের প্রেতনিঃশ্বাস লেগেছিল।'

কাহিনীর এতটা দূর বলে লীলাবতী থেমেছিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা এখানেই থামতো তো কোনরকমে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতাম। থাক সে দুরে থাক, ব্যাপারটা গড়ালো। আমার হৃদয় ও বুদ্ধির দিক দিয়ে কত গভীরে, কত সুদূরে বলে বোঝাতে পারবো না।'

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'এর পর কী ঘটনা ঘটল?'

লীলাবতী আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, 'কী ঘটনা ঘটল? বিশ্বাস করবেন? বই-এর পাতায় যা ঘটে, লেখকের উর্বর মস্তিষ্কের যে-অঘটন রূপ নেয়, তা যদি স্বচক্ষে দেখেন তো বিশ্বাস না করেও তো পারবেন না। যা অবিশ্বাস্য তা প্রতি রাত্রে স্বচক্ষে দেখে আমিও বিশ্বাস না করে পারলাম না।'

(আগামীবারে সমাপ্য)

সাহিত্যের সাজঘরে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

না, কুমোরটুলিতে নয়, সবার আগে পুজোর হাওয়া ওঠে পত্রিকা দপ্তরে। জুন-জুলাই থেকে শুরু হয়ে যায় বোধন। সেই শুরু, তারপর টুকটাক চলতে চলতে আগস্ট সেপ্টেম্বরে ঔপন্যাসিকদের মাথায় বাজে অষ্টমীর পুজোর বাজনা। এ এক পরিত্রাহী অবস্থা। মুখের দিকে তাকানো যায় না।

উপায় নেই।

তাই এখন সাহিত্যের সাজঘরে পুজো ছাড়া কোনো খবর নেই।

তাই ভাবছি, একটু ঘুরে আসা যাক। দেখা যাক, প্রেমেনদা কি করছেন? কদ্দুর এগুলেন!

ফোন করলুম। লাইন ডেড।

আবার চেষ্টা করলুম—রং কানেকশন। তার সঙ্গে ঢুকে গেল আরেকটা লাইন। একটা খাসমহল, একটা দুই বান্ধবীর-মিলনোত্তর। আমার চাই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে।

নয় অসম্ভব। সুতরাং হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটেই যেতে হল। তখনো প্রেমেন্দ্র মিত্র জনগণের লাইন দিয়ে বসে আছেন। বাড়ি থেকে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছেন, চুল না কেটে ঘরে ঢুকবেন না। ততক্ষণে শমন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রসাদের প্রণব বসু—জাঁকিয়ে বসলেন ডিভানে, ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হল, একটা ফয়সালা না করে উনি আজ উঠবেন না। নির্বিকার প্রেমেন্দ্র মিত্র চুলটুল কেটে যখন এলেন, তখন সূর্য সিধে, মাথার ওপর। আড়চোখে তীর্যক একবার প্রণববাবুর দিকে চেয়ে বললেন—কতক্ষণ? আর দাদা কতক্ষণ। একবার ঘুরে গেছি। তারপর একথা-সেকথা। প্রণববাবু ভোলার লোক নন, কথার মাঝখানে কথা টেনে নিয়ে বললেন—দাদা শিল্প? দুই-দুইয়ে চারের মতো সুন্দরভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। এপারের তারিখে ওঁকে যেতে হচ্ছে শান্তিনিকেতন। ওঁরা নাকি চার বছর ধরে ধরেছেন, এবার না গেলেই নয়, সুতরাং যেতেই হচ্ছে।—সর্বনাশ! থাকছেন ক'দিন?—এই ধরো দিন তিনেক।—তি-ইন দি-ই-ন...। আরে, এই তো যাবো আর আসবো। এসেই তোমারটা শেষ করবো। আজ সকালে নীরেন এসেছিলো। ওদের আবার অবস্থা। ফলে ফিরে এসেই 'আনন্দমেলা'র গল্প

গল্পটা শেষ করতে হবে। আবার যুগান্তরের আনন্দ জোর তাড়া দিচ্ছে উপন্যাসের জন্যে। ওখানে তো দিতেই হবে। আলাদা সম্পর্ক।

তারপর?

তারপর ধরো—কিশোর ভারতী।

তারপর?

তারপর অমৃত। মণীন্দ্র কি ছাড়বে? কোনোদিনই ছাড়েনি, ঠিক লিখিয়ে নিয়েছে। সবই চলবে পাশাপাশি—বুঝেছো?

ফোন এলো অমৃত পত্রিকা থেকে।—প্রেমেনদা, ক্যামেরাম্যান যাচ্ছে কাল।—কাল? কাল তো ভাই চলে যাচ্ছি, আচ্ছা, ঠিক আছে সকাল ৮টার আগে পাঠিও।

আবার বাজলো রেকর্ড—দাদা, আমার ইনস্টলমেন্টটা কি হবে। —হবে হবে, সব হবে। ইস দ্যাখো তো, শুধুমুধু তোমায় ছুটে আসতে হোলো। একটা ফোন করলেই তো কথা হয়ে যেতো।—তাতো হোতো দাদা, কিন্তু তাতে তো আমার শিল্প আসতো না। —না, না, ও তুমি ভেবো না, আসবে, ঠিক আসবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বুঝেছো শাণ্ডিল্য, —এই যে উপন্যাস। লিখতে লিখতে একটা সময়ের মধ্যে শেষ, এ যে কখনো হবে, এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। ছিলুম ফুটবলে, রাইট আউট। বিশ্বাস করো, দারুণ খেলতুম। খেলোয়াড় হবো, ক্রীড়াসনে খেলাবো—এই স্বপ্নই বুকে পুষে রেখেছিলুম, হতুমও তাই। হঠাৎ লাগলো পায়ে চোট, একটু কমজোরী হয়ে গেল পা। মাঠে আর আমাকে চালালো না, তখন লাগালুম হাত। এখন হাতই খেলে চলেছে।

তবে কি জানো, উপন্যাস ভীতি আমার বরাবর। ভাবো, সেই সময়। যখন প্রবাসীর রবরবা বাজার, তখন ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করলুম। কিন্তু পারলুম না, ইনস্টলমেন্ট দিতে যথারীতি ফেল করলাম। উপন্যাসই বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে ঠিক আমার আসে না। প্রথম উপন্যাস লিখেছি পুজোর মৌসুমীতো। তা বললুম তো, শেষ হবে? নির্ঘাৎ জেনে গেছি, এবারও ফেল করবো। সে যাত্রায় উতরে গেলাম। ব্যাস সেই হল শুরুর শুরু।

অসাধ্য সাধন করেছি 'অমৃতে'। 'পুব কাঁদলে সোনা' প্রায় দেড় বছর ধরে চালিয়েছিলাম, যেন একটা ঘোরের মধ্যে লিখেছি। একটা ইনস্টলমেন্টও ফেল করিনি, ঠিক সময়ে প্রতি সপ্তাহে লিখে পৌঁছে গেছে

সাহিত্যের সাজঘরে

শঙ্কর

সেভেন্টি বছর। এই আমার জীবনে সত্যিই একটা উল্লেখ করার মতো ঘটনা। তোমাকে যারা এখানে পাঠিয়েছে তাদের সহযোগিতাও কম ছিল না এ ব্যাপারে।

আচ্ছা, প্রেমেনদা, এই যে পুজোর উপন্যাস, আসলে কেমন হয় এগুলো? এভাবে কি লেখা যায়?

দ্যাখো, আমি অন্য লোকের কথা জানি না। তবে আমি একটা কথা মানি—কথাটা হল—'দাসীবৃত্তি করা ভালো, কিন্তু অসতী হয়ো না'। আমি অসৎ হতে পারি না। ধরো আমি যখন উপন্যাস লিখি, তার পুরো ছকটা আমার মাথায় থাকে। কিন্তু ধরো মাঝে মাঝে যখন চাপ আসে, যেমন ধরো পুজোয়, তখন আমার ত্রাণকর্তা মধুসূদন হয়—পরাশর আর ঘনাদা। অবশ্য দুজনকে নিয়েই খাটতে হয় খুব। এই রেফারেন্স, এই সাইন্স, এই তথ্য! তবে যাই বলো, বিপদে পড়লে আমায় ওরা উদ্ধার করে তো! পাঠককে ঠকাতে ইচ্ছে করে না। দ্যাখো, পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত যা উপন্যাস লিখেছি, পঁয়তাল্লিশ বছর থেকে আজ পর্যন্ত লিখেছি তার চেয়ে চারগুণ বেশী।

আমার সামনে সেই কিংবদন্তীর মতো সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, যিনি জেনারেশন গ্যাপে বিশ্বাস করেন না, বলেন—মানুষের খোলসটাই হয় পুরনো, মনটা? মনটা যার তাজা, সেই আধুনিক। শ্রীকুমার ব্যানার্জি তাঁর দীর্ঘ রচনার এক জায়গায় বলেছিলেন —ছোটগল্পের শিল্পকলায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছেন।...তাঁর জীবনবোধ সাহিত্যে বাঙ্ময় হয়ে থাকবে চিরকাল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গল্প পড়তে দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকেই। সাহিত্যের জগতে তখনো অনাগত তারাশঙ্কর এক সময় রাজনৈতিক কারণে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন লণ্ঠনের আলোয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প পড়ে কথা-সাহিত্যিক হবার প্রেরণা পেয়েছেন। ছোট গল্পে মধ্যবিত্তের বেদনা, যন্ত্রণা, যন্ত্রণা, সংসার সীমান্ত থেকে তেলেনাপোতা আবিষ্কারে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল বিস্তার করেছেন তিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্র আজো আধুনিক। সব সময় বাংলা সাহিত্যে নতুনতর চিন্তাধারার সমন্বয়ে জীবনবোধে উজ্জ্বল তাঁর সাহিত্য।
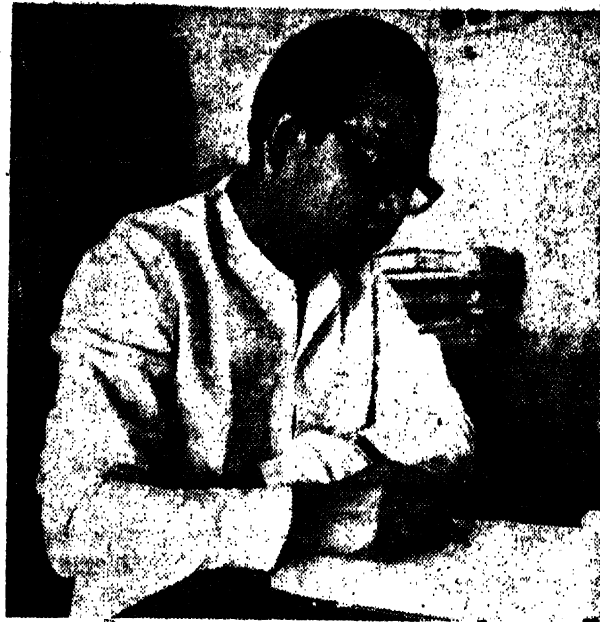
তাই পরবর্তী সময়ের অনুজেরা তাঁর কাছে এসেছেন। পড়েছেন তাঁদের লেখা। উপন্যাসের নামকরণ হয়ে যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের দেওয়া নামে। যেমন—'কত অজানারে', 'এখনই'।

বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে এই সব্যসাচী লেখকের গল্পসংকলন রুশ ভাষায় ও ইংরেজিতেও অনূদিত হয়েছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, শোনা গেল তাঁর কণ্ঠস্বর—দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা কাগজ খুঁজে পাচ্ছি না। চতুর্দিকে বই। কি নেই? বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল। যেন বইয়ের জাহাজে চেপে সাহিত্যের পথ পাড়ি দিচ্ছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে একেবারে চূড়োয় বসে থাকা আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে এভাবে সম্ভব হয় নি।

—কি, খুঁজে পেলেন?

না, কোথায় যে রেখেছি।

খুঁজে পাবেন না দরকারী কাগজপত্তর। শিশুর সারল্য আর সমুদ্রের গভীরতা নিয়ে সৎ এই প্রবীণ অগ্রজ আজো সাহিত্যে একটা কিংবদন্তী।

আজো সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অনুজদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছুঁয়ে যায় তাঁকে বারবার।

প্রেমেন্দ্র মিত্র যাই বলুন—আমি জানি—তাঁর ঘনাদা, বাংলা সাহিত্যের কি গভীরে স্পষ্ট পায়ের ছাপ রেখে চলে যাচ্ছে। কি করে পরবর্তী সবাইয়ের সাহিত্যের সব নায়কের 'দাদা' হল এই ঘনাদা। যার প্রতিটি কাণ্ডকারখানা আমাদের হাসায়, ভাবায়।

এবার কবিতা লিখছেন না?

আরে কবিতার ব্যাপারে আমি আরো সিরিয়াস। উপন্যাস তবু শেষ করা যায়। কবিতা? ও আমার ক্ষতের ওপর দিয়ে বয়ে যায় শুশ্রূষার মতো নিরবধি।

দেখেছি কবিতাই হল আমাদের শেষ আশ্রয়। ওটা জোর করে হয় না।

নাঃ, আর না। আসছে বছর দেখো, যদি বেঁচে থাকি, তবে সব উপন্যাস এপ্রিল-মে-তেই দিয়ে দেবো। এ বছর বড্ডো দেরী হয়ে গেল। আমি কিন্তু নিশ্চিত জানি, আবার এপ্রিল, মে আসবে, আবার পুজোর কাঠি বাজবে, সত্তর বছরের তরুণ সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র ঠিক একইভাবে এগুবেন—সাবলীল।

●

এবার একজন বেস্ট সেলার সাহিত্যিকের খবর জানতে ইচ্ছে হোলো।

হ্যালো...।

হ্যাঁ হ্যাঁ আছি, বাড়ি আসুন। না, না, কোনো অসুবিধে হবে না। একটা কাজ করুন—শিবপুরের ষোলো নম্বর বাস যেখানে দাঁড়ায় তারপরেই মায়াপুরী সিনেমা, পেট্রোল পাম্প, ডানদিকের রাস্তা ধরে একটু এগুলেই দেখবেন—হলদে তিনতলা।

নাঃ, পুজো বলে আমার কোনো ব্যাপার নেই। আর আমার লেখারও কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। যখন সময় পাই তখনই লিখতে বসি। তার কারণ কি জানেন? আসলে আমার উপন্যাসের নব্বুই ভাগে মালমশলা আগে থেকেই হাতে তৈরী থাকে, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে। আর দশ ভাগ সময় থাকে লেখার জন্যে। সেটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। হাতে মশলা থাকলে ভিত গাঁথতে, বাড়ি বানাতে সময় লাগে? বলুন? তাছাড়া আমরা হলাম সময়ের ভিখিরী। ভিখিরীদের আবার সময় অসময় কি। পেলেই হাভাতের মতো গিলে ফেলি।

চারদিকে বই, বই বই আর বই। বিদেশী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্র, বঙ্কিম, কি নেই। সব জড়িয়ে আছে স্রষ্টার জনপ্রিয় সাহিত্যিক শঙ্করকে ঘিরে।

দাঁড়ান—চা বলি।

একটা কথা ভাবুন তো, এই যে শিল্প সিস্টেম, এ আমাদের উপন্যাসে বোনো জলের মতো ঢুকে গেছে। আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। আমার উপন্যাসের শেষ লাইনটি পর্যন্ত লেখবার আগে আমার মাথায় থাকে। ফলে বেশী লেখা হয় না।

—এবার কী লিখছেন?

—উপন্যাস, বিশাল।

নাম?

আগে বলবো, উচিত হবে?

নামটা জিজ্ঞেস করবেন না। —নাঃ, আমি কিছু জিজ্ঞেস করবো না। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে—পটভূমিকাটা কি? হেসে বললেন, সে আমি বলবো না, তবে জেনে রাখুন, উপন্যাসটি হবে গবেষণামূলক আমার দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল। —আর নয়। —না আর না, তবে কি জানেন কেন্দ্রভূমিটা জানতে বড় ইচ্ছে করে। —কেন্দ্র উত্তর কলকাতা। এই প্রথম কলেজ স্ট্রীট পাড়া পেরিয়ে আমি উত্তরের দিকে চললুম। ভাবছি উত্তরে একটু হাঁটা যাক।

শেষ করেছেন?

হ্যাঁ, এই দেখুন সব প্রুফ। সব্বোনাশ এত বড়ো। এবার বড় লিখলাম। আর কোথায় লিখছেন? আর লিখছি গল্প। এবার আমার জীবনের প্রথম ছোটদের জন্যে লেখাও লিখছি এইবারই। বড় গল্প। যাঃ, এটা একটা খবর।

আসলে কি জানেন? ভালো বই সব সময়ই পপুলার হবে একথা আমি বলি না, তবে পপুলার বই যে ভালো, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বললুম—এটা কিন্তু একটু তর্কের ব্যাপার।

তর্ক নয়, আপনি দেখান—সত্যিকারের ভালো বই পপুলার হয়নি। ধরুন পথের পাঁচালী থেকে জীবনানন্দ দাশ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাগর থেকে ফেরা, পঞ্চাশ হাজার, সুকান্তর বই বিক্রি হচ্ছে এখনো হাজার হাজার। শরৎ গ্রন্থাবলী বৃষ্টির মধ্যে ছাতা হাতে করে লাইন দিয়ে গ্রাহক হচ্ছে। লক্ষ কপি বাজারে ছাড়বেন ওঁরা।

আমার এক হিন্দি সাহিত্যের বন্ধু বলেন—আমরা সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করি—একটা হল 'বাজারো' মানে যে লেখা বাজারে চলে। আর একটা হল সাহিত্য। বাজারের লেখা কখনো ভালো সাহিত্য হয় না। আমাদের বাংলায় দেখছি এ ব্যাপারে এখন স্বর্ণযুগ। পপুলার বইও বাজারে ভালো বলে স্বীকৃত। আমাদের পাঠক বড্ডো অদ্ভুত, এরা আই, সি, এস, ইঞ্জিনীয়ার, চাকরী, অফিসার বা ননম্যাট্রিক, কিছুই বোঝেন না। বোঝেন সাহিত্য। সাহিত্যের এরকম পাঠক কটা দেশে মেলে?

চা এলো—সঙ্গে কিছু 'টা'।

পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অরাজ শঙ্কর বললেন—আমার ইচ্ছে ছিল একটা ট্রিলজী করি। সেটা শেষ করেছি—এরা হল —সীমাবদ্ধ, জনঅরণ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা। ভারতবর্ষে নতুন যে শিল্প যুগ গড়ে উঠেছে, নতুন যে একটা কালচার তৈরী হচ্ছে এদের সঙ্গে সংযোগ তেমন স্পষ্ট ছিল না। আমি এই তিনটে উপন্যাসে সবাইকে এক ফ্রেমে আনার চেষ্টা করেছি।

ফলে ঐ যে শিল্প সিস্টেম, এতে আমার বিশ্বাস নেই।

সীমাবদ্ধ মাঝপথে আটকে ছিল প্রায় এক বছর। কেন? তাহলে গল্পটা বলি—

সীমাবদ্ধ তো পড়েছেন? যেখানে ধরুন নায়কের চাকরীজীবনের সোপানে ওঠার চরম মুহূর্তে। একটা প্ল্যান তাকে করতেই হবে। তবে আমার একটা আদর্শ ছিল, এক্ষেত্রে নায়ককে দিয়ে ইললিগাল কিছু করানো যাবে না, ইমমর‍্যাল কিছু করানো যেতে পারে। কিছুতেই কিছু হয় না, পড়ে রইলো উপন্যাস। একদিন ঘরে বসে আছি, চেনাশোনা একটি মেয়ে এলো, একটা আবেদন নিয়ে। একটা কম্পানিতে টেলিফোন অপারেটর নেওয়া হচ্ছে, আমি বললে যদি হয়ে যায়। আমি ওকে নিয়ে যাবার আগে বললুম—তোমার এই চাকরীটা তো ভালোই ছিল, ছাড়ছো কেন?

সে বললো কম্পানির একসপোর্ট অর্ডার ক্যানসেল করবে। লকআউট হবে। হঠাৎ মাথায় কথাটা যেন ঘুরতে লাগলো। তাহলে? তাহলে এরকম হয়? খোঁজখবর নিলাম। লাইনের লোকেরা বললেন—কেন হবে না, ক্যান্টিনের খাবার দিয়েই শুরু করা যায়। ব্যাস আমারও উপন্যাস শেষ হয়ে গেল।

ফলে দেখছেন, আমার সমস্ত উপন্যাসে দীর্ঘ সময় দেওয়া থাকে, মোটবই বোঝাই হয়ে থাকে মালমশলায়। 'চৌরঙ্গী' হল কী করে? শঙ্করবাবু হেসে বললেন—ঘটনাটা এত সামান্য এবং এত সূক্ষ্ম যে একটু এড়িয়ে গেলেই হয়তো চৌরঙ্গী উপন্যাস লেখা হোতো না। ব্যাপারটা বড় মজার! আমি এসপ্ল্যানেডে একটা পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। সন্ধ্যে। বৃষ্টি পড়ছে। এখান থেকে দেখা যায় ফিরপো ও গ্রাণ্ডের আলোয় মোড়া আবছায়া শরীর। একটা বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিলুম, বইটা ইংরেজী কবিতার। হঠাৎ এক জায়গায় এসে চোখটা আমার আটকে গেল। দেখলুম লেখা আছে—যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—আমরা সবাই শীতের দিনে হোটেলে এসে উঠেছি। কেউ ব্রেকফাস্ট সেরে, কেউবা লাঞ্চ সেরে চলে যাবো; রাতের ডিনারে হয়তো আমরা অনেকেই থাকবো না। কিন্তু হি-হু, গোল্ড দা সুনার, হ্যাজ টু পে দি বিল্‌স্‌। সত্যি তো, আমরা তো সবাই সরাইখানায় আছি। তাহলে হোটেলেরও তো একটা জীবন আছে। অন্তত যারা কাজ করে। ব্যাস এবার হোটেলের দিকে এগুলোম। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন, বইটা কেনার পরে আমাকে যে সাইক্লোস্টাইল করা কাগজ দিয়ে বইটা মুড়ে দিল তাও একটা হোটেল সংক্রান্ত কাগজ। যাতে লেখা আছে—কোনো একটা হোটেলের সেবায় ইউনিয়নের স্মারক—যেখানে অভিযোগ লেখা আছে—দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমাদের পায়ের শিরা মোটা হয়ে যায়। শুরু হল 'চৌরঙ্গী'।

তাই উপন্যাস লেখা আমার কাছে সোজা ব্যাপার মোটেই নয়। আর কোনরকমভাবে শেষ করাতো নয়ই। আমার 'চৌরঙ্গী' রুশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কাগজ 'বুকস অ্যাবরড'এ ভারততত্ত্ববিদ ডাঃ ল্যাচেন ভানডোমার দীর্ঘ ছ' পাতার প্রবন্ধ, বিদেশে চৌরঙ্গীকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। আমার সব কটা বই-ই—ভারত[illegible]র অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। '[illegible] আকাঙ্ক্ষা' তামিল ভাষায় এখন ধারাবাহিক হচ্ছে।

বিকেলের আলো পড়ে এলো। লতানো ঝাউয়ের গায়ে সন্ধ্যের আবির। শ্রদ্ধেয় শঙ্কর এগিয়ে এলেন রাস্তায়।

পুজোর পর বাইরে যাচ্ছেন? না। বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা আমায় সেভাবে টানে না। শঙ্কর মনে করেন—উপন্যাস লেখাটা হল প্লেনের ফ্লাইটের মতো—টেক অফ ক্লাইং এবং ল্যান্ডিং। ঠিকমতো টেক অফ হলে আর ল্যান্ডিং-এর জায়গা থাকলে উড়তে কোনো অসুবিধে নেই। ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে সে পৌঁছোবেই। —একবার একজন পাইলটকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ককপিটে তো আপনার কোনো কাজ নেই শুধু বসে থাকা। সেই ফ্লাইং অফিসার হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—শঙ্করবাবু, আমরা মাইনেই পাই টেক অফ আর ল্যান্ডিং-এর জন্যে। টেক অফে ৪ আনা, ল্যান্ডিং-এ বারো আনা।

বুঝলেন তো? এর নাম উপন্যাস।

শান্তিজ্যোতি চতুর্বেদী

পর্তুগালে গৃহযুদ্ধ

পর্তুগালে কম্যুনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের বিরোধ প্রায় একটা গৃহযুদ্ধের অবস্থা ডেকে এনেছে। দেশের উত্তর অংশে বিভিন্ন স্থানে কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। কম্যুনিস্টদের বাড়িতে বাড়িতেও হামলা চলছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগী পর্তুগীজ ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট দলের উপরও আক্রমণ চলছে। যেখানে পারছেন সেখানে কম্যুনিস্টরাও পাল্টা আক্রমণ করছেন।

পর্তুগালের ফৌজী শাসকরা এই অবস্থার সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছেন। এমনকি, ফৌজের মধ্যেও বিভেদের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

গত বছর ২৫ এপ্রিল পর্তুগালের দীর্ঘ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেদেশে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তার শেষ পরিণতি নির্ভর করছে আজকের এই বিরোধের ফলাফলের উপর। এই বিরোধে জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্টরা সেদেশে ক্ষমতা দখল করে কিনা অথবা সোস্যালিস্টদের ইচ্ছা অনুযায়ী সে-দেশে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কিনা কিম্বা কম্যুনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের এই বিরোধের ফাঁক দিয়ে ফ্যাসিজমই আবার নতুন চেহারা নিয়ে ফিরে আসে কিনা, সেদিকে এখন সারা পৃথিবীর নজর।

আর্মড ফোর্সেস মুভমেন্ট নামে সামরিক অফিসারদের যে সংগঠন পর্তুগালের পাশা বদলে অগ্রণী হয়েছিল, তাদের ভিতরেই আজকের এই সংকটের বীজ লুকানো ছিল। ঐ সামরিক বিপ্লবের তত্ত্ব যিনি দিয়েছিলেন, সেই জেনারেল স্পিনোলা প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়ে ছ'মাসও টিকতে পারেন নি। নতুন ব্যবস্থায় কম্যুনিস্টরা এতটা প্রাধান্য পাক, এটা তিনি চাননি। কিন্তু জেনারেল স্পিনোলা আর্মড ফোর্সেস মুভমেন্টের ভিতর তাঁর মত খাটাতে পারেননি। ফলে তাঁকে দেশান্তরী হয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর পর যেসব ফৌজী নেতা ক্ষমতায় এলেন, তাঁরা একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণপরিষদ ও অসামরিক সরকার গঠন করলেন। কিন্তু সে-সরকার টিকল না। ফৌজী নেতারা যখন প্রস্তাব নিয়ে এলেন যে, আর্মড ফোর্সেস মুভমেন্ট বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের কমিটি গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্য ছাড়াই সরাসরি নিজেরা জনগণের সঙ্গে সংযোগ করবেন, তখন অকম্যুনিস্ট দলগুলি প্রমাদ গনল। অকম্যুনিস্ট দল বলতে প্রধান দুটি। একটি হল সোস্যালিস্ট পার্টি যার নেতা ডঃ মারিও সোয়ারেস ছিলেন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। দ্বিতীয় দলটি হল পপুলার ডেমোক্র্যাট। নির্বাচনে সোস্যালিস্টরা পেয়েছিল ৩৮ শতাংশ ভোট আর মধ্যপন্থী পপুলার ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছিল ২৬ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ ঐ দুটি দলের ভাগে একত্রে পড়েছিল ৬৪ শতাংশ ভোট। আর সেই তুলনায় কম্যুনিস্টরা ১৩ শতাংশেরও কম ভোট পেয়ে নিতান্ত সংখ্যালঘু দলে পরিণত হয়েছিল। অকম্যুনিস্ট দলগুলি ফৌজী নেতাদের প্রস্তাবের মধ্যে এই সংখ্যালঘু কম্যুনিস্ট পার্টিকেই পরোক্ষভাবে মাথায় তোলার চক্রান্ত দেখতে পেল। কেননা, শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে কম্যুনিস্টদের ভাল প্রভাব রয়েছে। ঐ শ্রমিক সংগঠন-গুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার মানেই কম্যু-নিস্টদের স্বীকৃতি দেওয়া।

সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্রের নাম ছিল 'রিপাবলিকা'। কাগজ সোস্যালিস্ট পার্টির হলে কি হবে, ঐ কাগজের ছাপাখানার কর্মীরা কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক। তাঁরা কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। সোস্যালিস্ট পার্টি ফৌজী শাসকদের সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হল। কাগজ বের করা গেল না।

প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটল রোম্যান ক্যাথলিকদের দ্বারা পরিচালিত বেতার-কেন্দ্রটি নিয়ে। এই বেতার কেন্দ্রের কম্যু-নিস্ট প্রভাবাধীন কর্মীরা কেন্দ্রটি দখল করে নিলেন। গির্জার নেতারা বেতার কেন্দ্রের দখল ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালেন। সোস্যালিস্ট পার্টি এই দাবি সমর্থন করল। কিন্তু ফৌজী নায়করা ঐ বেতার কেন্দ্র রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিলেন।

অর্থাৎ সোস্যালিস্ট ও পপুলার ডেমো-ক্র্যাট দল এবং রোম্যান ক্যাথলিক গির্জা প্রায় একই সঙ্গে ফৌজী নেতৃত্বের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। ফৌজী নেতাদের সঙ্গে রইল কম্যুনিস্ট পার্টি ও পর্তুগীজ ডেমো-ক্র্যাটিক মুভমেন্ট।

এই অবস্থায় পর্তুগালের অসামরিক মন্ত্রিসভা চালান অসম্ভব হয়ে উঠল। সোস্যালিস্ট পার্টি ও পপুলার ডেমোক্র্যাট দল বেরিয়ে এলে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হল। তিনজন ফৌজী নেতার একটি গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হল। এই তিনজন হলেন রাষ্ট্রপতি জেনারেল দা কোস্তা গোমেস, প্রধানমন্ত্রী জেনারেল ভাস্কো ডস সাণ্ডোস গনসালভেস এবং সামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান জেনারেল ওতেলো সারাইভা দ্য কারভালহো।

সোস্যালিস্ট বিক্ষোভ জানাতে রাস্তায় নেমে পড়লেন। তাঁদের অন্যতম দাবি, কম্যুনিস্টঘেঁষা প্রধানমন্ত্রী গনসালভেসকে বিদায় নিতে হবে। ক্যাথলিকরাও বিক্ষোভ জানাতে লাগলেন। কম্যুনিস্টরা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করলেন।

পর্তুগালে কি হয় তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। পর্তুগালের প্রতিবেশী পশ্চিম ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসার আশা করছে। এদের মধ্যে আছে ইতালী, ফ্রান্স ও ঘরের পাশের দেশ স্পেনের কম্যুনিস্ট পার্টি। পর্তুগালে কম্যুনিস্টরা হারে কি জেতে তার উপর এই সব দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির ভবিষ্যতও অনেকখানি নির্ভর করছে। পশ্চিম ইউ-রোপের ঐসব দেশের কম্যুনিস্টরা পার্লা-মেন্টারি গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, পর্তুগীজ কম্যুনিস্ট নেতা আলভারো কুনহাল খোলা-খুলিভাবেই বলেছেন, 'আমরা কম্যুনিস্টরা নির্বাচনের খেলার নিয়মকানুন মানি না। না, না, না—আমি নির্বাচনের পরোয়া করি না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে আমরা নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করি না। আমাদের পথ হল বিপ্লবের পথ।' পশ্চিম ইউরোপের কম্যুনিস্টদের এই দুই মতের কোনটি শেষ পর্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হয় তার উপর ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করবে।

ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত পর্তুগাল যদি কম্যুনিস্ট হয়ে যায়, পশ্চিমী দেশগুলির এই দুর্ভাবনা এখন আর গোপন থাকছে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে এক কথায় বলে দিয়েছেন, সি আই এ'র সাহায্যে আমি যে একটা ওলটপালট করে দেব এমন ক্ষমতা আমার আর নেই, পর্তুগালে কম্যুনিস্টদের ঠেকাবার জন্য যা কিছু করার পশ্চিম ইউ-রোপের দেশগুলিকেই করতে হবে। স্টক-হোমে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী নেতাদের সম্মেলন পর্তুগীজ সোস্যালিস্ট পার্টিকে সমর্থন জানিয়েছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন রাশিয়াকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, তাঁরা যেন পর্তুগালের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন।

পুণ্ডরীক

৭-৮-৭৫

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরের দিন শ্যামল আবার লিখল : হঠকারিতা ভালো নয় : ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে বলেছিলাম! তুমি তো জান, আমার মাইনে অল্প : দুর্গাপুরে তোমাকে রাঁধতে হবে, বাসনকোসন মাজতে হবে...ও-সব কাজ তুমি কোনো দিনই কর নি...ফেরৎ ডাকে উত্তর আসে : 'যা ভাববার আমি ভেবেছি। ইতি কল্পনা।'

দুর্গাপুরে ফেরার আগে শ্যামল স্থির করেন, ওদের বেসরকারি সেই বাগদান-পর্ব ওরা উদ্যাপন করবে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে। কল্পনাকে অবশ্য স্কুল থেকে পালাতে হল। ময়দানে এসে ট্যাকসি থেকে নামতে গিয়ে কল্পনা দেখে, অনিমা দিদিমণি ট্যাকসিটা হাঁকছেন। প্রথমে সে ভাবল, এড়িয়ে চলে যাই না চেনার ভাণ করে...তবে ওর গায়ে কিনা রাজরক্ত : রাজরক্তান্বিতামাত্রই বীরসূনা, নিজেদের বাঁচাতে গিয়েও অভদ্রতা করে না! তাই সে বলল, 'গুড আফটারনুন, দিদিমণি...হ্যাঁ, এদিকে একটু কাজ ছিল।' ক্লাসের সময়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে এক সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে দশম শ্রেণীর একটি মেয়ের যে কি কাজ থাকতে পারে, শ্রীমতী সেটা ব্যাখ্যা করল না।

পরের দিন বিদেশিনী অধ্যক্ষার অফিসে ডাক পড়ল। না, অফিসে নয়, একেবারে চার তলার খাস কামরায়। কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটি নক করল দরজায়। ভীষণ লজ্জা করছিল। দুঃখও লাগছিল—ঐ স্নেহময়ী মাসীমাকে সে দুঃখ দিয়েছে বলে।

ভদ্রমহিলা কিন্তু ওকে একটুও বকলেন না, স্মিতহাসি হেসে বললেন, 'আমিও একদিন নবম শ্রেণীতে স্কুলের দেওয়াল টপকে ওনার সঙ্গে আলু ভাজা খেতে গিয়েছিলাম। ...যা বকুনি খেতে হল...তুমি বরং একদিন তোমার মেসোমশাইকে বলো গল্পটা বলতে মজা লাগবে।...এবার তোমার গল্পটি শুনতে চাই—প্রথম থেকে।'

অনেক হাল্কা বোধ ক'রে কল্পনা শুরু করল : 'একদিন চন্দনার সঙ্গে দিদিমণির জন্য একটা তুলি কিনতে গিয়ে...' গল্পটি হলে মেয়েটিকে একটা টফি খাইয়ে এমন নির্লিপ্ত সুরে মহিলা বললেন, 'ছেলেটিকে আমাকে দেখাতে পারবে?' কল্পনা বলল পারব।'

কিছুদিন পর অমলা দেবীকে ডেকে পাঠিয়ে অধ্যক্ষা-মহাশয়া পরিস্থিতিটি ধীরে-সুস্থে বোঝালেন। অমলাদেবী বললেন, 'আমি রাজি হলে কি হবে, উনি তো জীবনে রাজি হবেন না।'

নন্দকিশোর রাজা ঘোষণা করলেন, 'বেঁচে থাকতে আমি ঐ বিয়েতে মত দিতে পারব না ...তবে বাধা দেব না; শুধু জানব আমার মেয়ে মারা গিয়েছে।'

(২৮)

কল্পনাদের বাড়িতে রানা নামে এক দাদা থাকত (কল্পনা প্রথমে জানত না, রানা ওর আপন দাদা নয়, মেজো পিসীর ছেলে। ছোটবেলায় যক্ষ্মারোগে ভুগেছিল রানা। ওর বাড়িতে কেউ যত্ন নেয় না জেনে—কিংবা ভেবে—নন্দকিশোর রাজা বোনের হাত থেকে ছেলেটিকে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন নিজেই মানুষ করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

রানার এক বন্ধু ছিল—সৌমিত্র। সৌমিত্র নন্দকিশোর রাজার স্নেহের পাত্র। ঘন ঘন বাড়ি আসত। মা-রাও মনে মনে ভাবতেন : চৈতালির উপযুক্ত বর! চৈতালি কল্পনার দিদি। ইতিমধ্যে কিন্তু চৈতালি ও সৌমিত্র নিজ থেকেই প্রেমে পড়েছে। কল্পনা দিদির ভক্ত : নিত্যনূতন কৌশলে বাবামাকে সরিয়ে দিয়ে প্রণয়ীদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় সে। এদিকে অমলা দেবী জানেন, জামাতৃনির্বাচন তাঁরই এক্তিয়ার : সৌমিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক পাততে হয়, তিনিই পাতবেন। বড় মেয়েকে তিনি শাসান, পূর্বরাগ থেকে বিরত হতে বলেন। দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলে কল্পনা মায়ের হাতে কত যে মার খেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। মেয়েটি বলত, 'মায়ের মার দিদির রুগ্ন গায়ে সইবে না, দিদির থেকে আমার শরীর অনেক শক্ত...বেত হলে, খুন্তি হলে লাগে না!'

বেল্ট হলে অবশ্য লাগে। আর বেল্টই লাগাতে শুরু করেছেন মা—মারতে মারতে শ্যামলের নাম ওর মন থেকে যদি মুছে দেওয়া যায় : 'বল, ওকে বিয়ে করবি না!' 'করব।'

দিদিকে কল্পনা বাঁচাত ঠিক, কল্পনাকে দিদি বাঁচাত না, বরং চুকলি কেটে আনন্দ পেত। শ্যামলকে দূর থেকে দেখে কল্পনা স্মিত হাসি হেসেছে? হিংসুটে দিদি মাকে গিয়ে বলত, 'ওর সঙ্গে কথা বলেছে, হাসি তামাসা করেছে!'

একদিন কল্পনাকে [illegible] তালি বলে, 'আর, মর্নিং শো-তে যা[illegible] [illegible]ামলকে বল চারটে টিকিট কাটতে।' সেদিন কিন্তু—বাড়িতে কাজ ছিল বলে—সৌমিত্র যেতে পারল না। চৈতালি অত্যন্ত ক্ষুন্ন ও অপমানিত বোধ করল; স্থির করল, কল্পনা নিশ্চয় শ্যামলকে বলেছে সৌমিত্রকে না ডাকতে। সারা শো-টা প্রতিশোধের ফন্দি আঁটল।

পরের দিন সকালবেলা—কল্পনা তখন স্কুলে, চৈতালির ক্লাস নেই—চৈতালি মাকে বলল, 'জান মা, কাল আমি আর কল্পনা মর্নিং শো-তে গিয়েছিলাম। আর জান কি? কল্পনার ঐ দো-আঁশলা বন্ধুটা না ওর পাশে সারাক্ষণ বসে ছিল...'

অমলা দেবী সেদিন একটা ভুল করলেন। অমলা দেবীকে কে দোষ দেবে, বলুন? একদিকে অকর্মণ্য এক স্বামী, অপরদিকে ছটি মেয়ে আর একটি ছেলের ভরণপোষণ, স্কুলের মেয়েদের টিফিন... তারও উপর ঐ শ্যামলরূপী সর্বনাশ! তিনি

সর্বাধিক মূল্য ২ টাকায় ২০টা ; ১ টাকায় ১০টা স্থানীয় কর
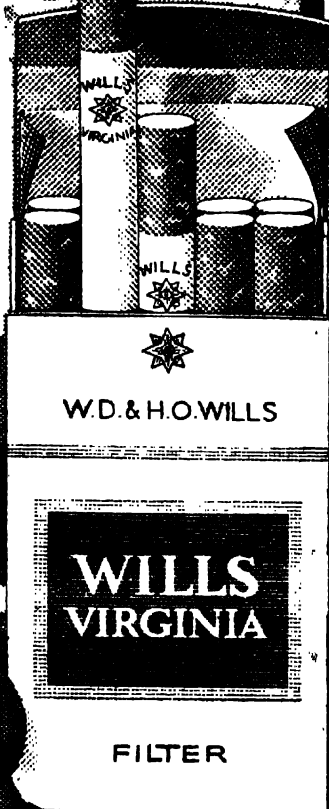
করলেন কি? স্কুল থেকে মেয়েটিকে ডেকে পাঠিয়ে ওকে অমানুষিকভাবে প্রহার করতে করতে বললেন, 'স্বীকার কর, ওকে তুই চিঠি দিয়েছিলি।' মেয়েটি এবার—এই প্রথম—প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিরোধ করল। শ্যামলকে দিয়ে সে টিকিট কাটিয়েছে বটে চিঠি কিন্তু সে দেয় নি। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে কামড়ে-আঁচড়ে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করল সে, দিদিকে কিন্তু এবারও এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায়ও বিদ্ধ করল না।

পরাজিত হতে যাচ্ছেন দেখে অমলা দেবী মেয়েটিকে ঠেলে মাটিতে ফেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বের হ, বলছি, এখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা'। নিজের ঘরে গিয়ে হাতের চুড়ি, কানের বালা, কণ্ঠের হার খুলে কল্পনা—বিবস্ত্র হয়ে বেরুনো যায় না, শুধু এই কারণে—শাড়ীব্লাউজটুকু সম্বল করে বাড়ি থেকে বের হল। হাতের ব্যাগটাও নিল না সে, নিল শুধু ডায়েরি আর ফাউন্টেনপেন—শ্যামলের উপহার।

মা অবশ্য ভাবেন নি, কল্পনা সত্যি সত্যি বেরিয়ে পড়বে; সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনে ফুঁপিয়ে উঠলেন। চৈতালি তখন ছাদে উঠে পায়চারি করছে: আপন কাপুরুষতার কথা ভেবে বিবেকদংশন অনুভব করছে; মাকে নিরস্ত করার এতটুকু প্রয়াসও পায় নি সে। আর নন্দ-কিশোর রাজা? নন্দকিশোর রাজা গুড়গুড়ির নল টানতে টানতে নিজের গ্রামের জমিদারী ও আকবর বাদশা-র স্বপ্ন দেখছেন।

চন্দনাদের বাড়িতে রাত কাটিয়ে চন্দনার মায়ের কাছ থেকে দশটা টাকা আর কিছু খুচরো ধার নিয়ে কল্পনা বাসে উঠল। জীবনে এই প্রথম তার বাস-যাত্রা। চন্দনাদের চাকর কণ্ডাক্টরকে বলল, 'একে হাওড়া স্টেশনে নামাবেন' কণ্ডাক্টর বলল, 'আচ্ছা।'

হাওড়া ব্রিজ দেখেই মেয়েটি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে নামতে যাচ্ছে, কণ্ডাক্টর বলল, 'স্টেশনে যাবেন না? দেরি আছে, বসে পড়ুন বলে দেব।' অসহায় রাজকন্যা ভাবল, লোকটিও বোধহয় দো-আঁশলা, তবে কি সুন্দর ওর ব্যবহার।

স্টেশনে নেমেছে বটে, কিন্তু কাউণ্টার কৈ?...ওকে দিশেহারা দেখে একজন যাত্রী ওকে সঠিক লাইনে দাঁড় করিয়ে বোঝায় ট্রেন কখন ও কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে, কখন পৌঁছোয়, কত ভাড়া...আটপৌরে বিশ্ব সংসারের এই প্রথম সংস্পর্শে এসে মেয়েটি মানুষের আত্মিক পরহিতৈষণায় মুগ্ধ হয়ে ওঠে।

ডায়েরি খুলে দেখে, দশ টাকার নোটটা নেই, বাসে টিকিট কাটতে গিয়ে বোধহয় পড়ে গেছে। সর্বনাশ। মেয়েটির কাছে এখন কলকাতা ফিরে যাওয়ার মতোও আর পয়সা নেই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে অপেক্ষমান বাসের ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে লাগল, ওর সেই বাসটির যদি সন্ধান পায়। মেয়েটির ভাগ্য ভাল: বাস ছিল। ওকে চিনতে পেরে কণ্ডাকটর জিগ্যেস করল, 'কি ব্যাপার, ট্রেন ধরবেন না?' কাঁপতে কাঁপতে কল্পনা বলল, 'না...' আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, উষ্ণ অশ্রু ওর গাল বেয়ে আসছে। লোকটি কাছে এসে বলল (ওরও মেয়ে আছে, আর মেয়েকে কাঁদতে দেখলে বাপের অন্তর গলে যায়), 'বল কি হয়েছে, বল তো খুকুমণি.'

সমস্যাটা বুঝে গুমটিওয়ালাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কণ্ডাকটার মেয়ের হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিল। কল্পনা অস্বীকার করাতে সে বলল, 'কেন, মানুষ তো মানুষকে সাহায্য করে!' নীতির ক্লাসে লেখা ঐ মামুলি উক্তিটা লোকটির মুখে শুনে মেয়েটি বুঝল কথাটা ঠিক—আর নন্দ-কিশোর রাজার কথা ভুল। নন্দকিশোর রাজার মতে মানবজাতি দু-দলে বিভক্ত: যারা রাজা, আর যারা রাজা নয়।

চোখের জল মুছতে মুছতে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে কল্পনা বলল, 'আমার নাম কল্পনা; আমার এই ডায়েরিতে আপনার নামটা লিখে দিন, দুর্গাপুর পৌঁছে চিঠি দেব...তারপর হঠাৎ রাজকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'টাকা ফেরৎ পাঠাব।' কণ্ডাকটার বলতে যাচ্ছিল, ফেরৎ পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু বিরত হল, বুঝল, প্রয়োজন আছে মেয়েটির—আর মেয়েটির আত্মাভিমানের—জন্যই প্রয়োজন আছে।

কামরার সহযাত্রীরাও কল্পনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করল, স্টেশনে স্টেশনে কেউ চা, কেউ কলা, কেউ বিস্কুট খাইয়ে...কিন্তু না দুর্গাপুরের [illegible] কেউ জানে না, শ্যামলের ঠিকানায় কেউ কোনো অর্থ করতে পারল না। স্টেশন থেকে নেমে অল্প-বয়স্ক একজন রিকসাওয়ালাকে মেয়েটি জিগ্যেস করল, 'ঠিকানাটা জান?' ছেলেটি বলল, 'জানি, তবে বহুৎ দূর আছে...' আশ্বস্ত হয়ে কল্পনা রিকসাতে উঠে বসল।

আধঘণ্টা যায়, একঘণ্টা যায়, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, রাস্তার দুদিকে জঙ্গল। জিগ্যেস করলে ছেলেটি শুধু বলে 'বহুৎ দূর।' উল্টো দিক থেকে আসা এক রিকসাকে থামিয়ে কল্পনা যাত্রীকে ঠিকানাটা দেখিয়ে জানতে পারে (অনেকক্ষণ থেকে সে নিজেও যা আন্দাজ করতে শুরু করেছে) বিপরীত দিকে সে যাচ্ছে। কল্পনার চালককে বিস্তর ভর্ৎসনা শুনিয়ে ভদ্রলোক ওকে বলেন, তাঁরই রিকসার পিছন পিছন আসতে। কথাটা শুনে মিনতির সুরে কল্পনা বলে, 'আপনার অসুবিধা না হলে আমার পাশে এসে বসবেন? ভয় করছে.'

এক চৌরাস্তায় পৌঁছে 'এই যে আপনার রাস্তা...'বলে ভদ্রলোক নেমে নিজের রিকসায় উঠে চলে গেলেন। আর কিছু অসুবিধা হল না: ঐ পাড়ায় শ্যামল সেন-গুপ্তকে সবাই চেনে, শ্যামল সেনগুপ্ত ইন-ডোর আউট-ডোর যত খেলার চ্যাম্পিয়ন।

নির্দিষ্ট বাড়ির আসনে এসে মেয়েটি আরেকবার জিগ্যেস করল, 'এটা কি শ্যামল সেনগুপ্তের কোয়ার্টার্স?'

'হ্যাঁ, ঐ দেখুন, উনি যাচ্ছেন...'

চোখ তুলে কল্পনা দেখল, লম্বা-চওড়া দাড়িওয়ালা, হিপি টাইপের কেশধারী এক দৈত্যকে। সারা শরীর ওর শিহরিত হয়ে উঠল: কোন শ্যামল সেনগুপ্তের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছে সে?

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্র জননী সারদা দেবী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

হিন্দুমেলার সভায় গাছের তলে দাঁড়িয়ে কিশোর রবি তাঁর 'উপহার' নিবেদন করছেন—সভাপতি চিরবন্ধু, চিরতরুণ রাজনারায়ণ বসু। সভার দ্বার উদ্ঘাটন করছেন শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব! ইনি কি নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বংশধর? যিনি মহারাজ নন্দকুমারের হত্যাকাণ্ডে মদৎ জুগিয়েছিলেন? সেখানেও দেখলাম একশো বৎসরের পরিবর্তন—সেই শোভাবাজারের রাজা উপস্থিত হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক উৎসবে। কিশোর কবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করছেন—

"হিমাদ্রিশিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।..." ইত্যাদি

সেই সভায়* সেকালের যুবক, প্রৌঢ়রা উপস্থিত ছিলেন। কবিতাটি সবারই মনকে স্পর্শ করে। দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ সেই কবিতা ছাপলেন তাঁর পত্রিকায় ১২৮১ সালের ১৪ই ফাল্গুন (১৮৭৫, ফেব্রুয়ারি ২৭) সংখ্যায়। একশো বৎসর পূর্ণ হয়েছে। 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামে এই প্রথম নিজের কবিতা প্রকাশিত হতে দেখে কিশোর কবি নিশ্চয়ই খুব খুসি হয়েছিলেন এবং পীড়িতা জননী সারদাসুন্দরীর কাছে গিয়ে নিশ্চয়ই এই কবিতা শুনিয়ে বা দেখিয়ে থাকবেন, কারণ হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে আর চাকরদের মহলে বন্দীদশায় থাকতে হয় না—এখন অন্তঃপুরে মা'র কাছে ও বৌঠাকুরাণিদের কাছে সহজ হয়ে তাঁর আসা-যাওয়া। ছাপার হরপে নাম বের হওয়াতে অন্তঃপুরের রমণীকুলের আসরে মান-মর্যাদাও বেড়ে গেছে—ইতিপূর্বে তাঁর 'অভিলাষ', 'প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হলেও তাতে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম ছিল না—ছাপা হয়েছিল অনামে। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই ১২৮১ সালের ২৭শে ফাল্গুন জননী সারদাসুন্দরীর মৃত্যু হলো!

যশোহর জেলার দক্ষিণডিহির রামনারায়ণ রায়চৌধুরীর কন্যা সারদাসুন্দরী বধূ হয়ে যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে আসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বৎসর, আর দেবেন্দ্রনাথের বয়স বারো বৎসর—তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। সেই-যে বালিকা-বধূরূপে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে প্রবেশ করলেন, তারপর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে চিরকালের মতো এই গৃহ ত্যাগ করে গেলেন — ইতিমধ্যে পিতৃগৃহের মুখ দেখেননি কখনও!

দেবেন্দ্রনাথ সুপুরুষ ছিলেন; সারদাসুন্দরীকেও যথার্থ সুন্দরী বলা যেতো। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কর্তাদিদিমা সম্বন্ধে বলেছেন—'তাঁর সেই পাকাচুলে সিন্দুর-মাখা যে-রূপ জ্বলজ্বল করছে, মন থেকে তা মোছবার নয়।'

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমত যখন পরিবর্তিত হয়, পরিবারের খুব কমজনেরই সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি; বিশেষত রমণীকুলের তো নয়ই। সারদাসুন্দরী শিশুকালাবধি হিন্দুধর্মের যে লৌকিক আচার-বিচার মেনে চলতেন, শ্বশুরবাড়ী এসে তারই বর্জিত-রূপ দেখলেন—মৌলিক পরিবর্তন শুরু হয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বহুপরে, ধীরে ধীরে। সারদাসুন্দরীর আচারবিচার পালনে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কখনও আপন মত জোর করে তাঁর উপর চাপাবার চেষ্টা করতেন না। বলা বাহুল্য, সে-স্বভাব আমরা রবীন্দ্রনাথেও লক্ষ্য করেছি। কালে সারদাসুন্দরী স্বামীর সকল পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন—স্বামীর মনে আঘাত লাগে এমন কিছু তিনি কখনই করতেন না। ভিতরের শান্তি ও বাইরের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন আপ্রাণ। এই মহীয়সী নারীকে কর্ত্রীরূপে পুত্রকন্যা, জামাতা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী আত্মীয়-স্বজন অধ্যুষিত ঠাকুরবাড়ির একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারটিকে চালনা করতে

---

*হিন্দুমেলার ৮৮ পংক্তির দীর্ঘ কবিতা। দ্রঃ পঃ বঙ্গ রবীন্দ্ররচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, সংযোজন। হিন্দুমেলার সভা হয় সাকুলার রোডস্থিত পার্সিবাগানে। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন সদ্য দ্বিভাষিক হয়েছে, তাই পত্রিকায় ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫-এ কবিতাটি মুদ্রিত হয়। কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা প্রকাশের গৌরব 'অমৃতবাজারের'।

হতো। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে নিজ পত্নীসম্বন্ধে মাত্র একবার উল্লেখ করেছেন—একথা ভাবলে অবাক হতে হয়। ঘটনাটি হলো—একবার (১৮৪৬ সাল) দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের তিন বৎসর পরে শ্রাবণ মাসে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্বালা অপনোদন করবার জন্য নদীপথে যাত্রার আয়োজন করেন তিনি—এমন সময়ে সারদাসুন্দরী ২৩ বৎসর বয়স) কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বললেন—'আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয় আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।' তখন তাঁর তিনটি পুত্র—দ্বিজেন্দ্র (ছয় বৎসর), সত্যেন্দ্রনাথ (চার বৎসর) ও হেমেন্দ্রনাথ (দুই বৎসর) দেবেন্দ্রনাথকে স্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিতে হলো। এই-বার পথে খবর পেলেন বিলেতে তাঁর পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়েছে। তারপর কীভাবে প্রত্যাবর্তন করলেন, আত্মজীবনীতে তার দীর্ঘবর্ণনা আছে — পুনোরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

"অনেককাল পরের কথা। দেবেন্দ্রনাথ সে সময় ভ্রমণে ঘুরতে ঘুরতে খবর পেলেন পত্নী খুব অসুস্থা। ফিরে এলেন মৃত্যুর পূর্বদিন। পরদিন সারদাসুন্দরীর কাছে যেতেই স্বামীকে তিনি বললেন—"আমি তবে চললাম।" এরপর আর কিছুই বলতে পারেননি। এযেন স্বামীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করা! দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী লিখেছেন—মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল, চন্দন, অভ্র দিয়া সজ্জা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, "—ছয় বৎসরের সময় এনেছিলাম, আজ বিদায় দিলাম।" সেই বিদায়ের দিন আজ থেকে একশো বৎসর পূর্বের সাতাশে ফাল্গুনে—দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন আটান্ন বৎসর; এর পর তিনি ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন—বহু শোকাঘাত পান, এমন কি রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যুসংবাদও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।

সারদা দেবী স্বয়ং বিদুষী ছিলেন না, কিন্তু বাঙলার বহু কৃতি সন্তানের জননী ছিলেন তিনি—সত্যই তিনি রত্নগর্ভা। এক মাত্র রবীন্দ্রনাথের জননীরূপেও তিনি পৃথিবীর অন্যান্য চিরস্মরণীয়া জননীদের সঙ্গে একাসনে বসবার অধিকারিণী। দুঃখের বিষয়—আজ কজনে জানে এই মহীয়সী নারী—বিশ্বকবির জননীর নাম। শতাব্দীকাল পরে এই বিস্মৃতাকে যোগ্য সম্মান দেবার কথা আমাদের ভাবতে হবে।

অবশ্য আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, তাঁর সন্তানরাও তাঁর কথা বলেননি বিশেষভাবে কোথাও। সারদাসুন্দরীর মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স চোদ্দ বৎসর। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—"প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।...কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরণার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না...এর পরে বড়ো হইলে যখন বসন্ত প্রভাতে এক মুঠো অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত; আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের ডগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে...।"

এই স্মৃতিচারণ ব্যতীত আরও দুয়েক স্থানেও তিনি স্পষ্টতঃ মায়ের কথা বলেছেন। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভাষণে তিনি বললেন—"আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বাল্যকালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কালরাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার পারের বাগান বাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন।...তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, "তুমি এসেছ!" এই-খানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।"

কয়েক বৎসর পরে ১৩২৬ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'আগমনী' বার্ষিকীতে 'মাতৃবন্দনা' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের দুয়েক স্থানেও মায়ের উল্লেখ আছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে স্পষ্টতঃ তাঁর মায়ের উল্লেখ এছাড়া চোখে পড়েনি। তবে অন্যান্য সন্তানের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও তাঁর কোনো গ্রন্থ সারদাসুন্দরীর নামে উৎসর্গ করেননি—কিন্তু কেন? রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্য কোথাও সারদাসুন্দরীর উল্লেখ না থাকলেও তাঁর কোনো স্মৃতি রবীন্দ্ররচনার উৎসরূপে কাজ করেনি—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। যে-কয়েকটা মাতৃচরিত্র বা মাতৃস্থানীয়া চরিত্র রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে এঁকেছেন তাঁদের উপর সারদাসুন্দরীর স্মৃতি পড়েছে কিনা তা গবেষণার বিষয়।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃবন্দনা' শীর্ষক কবিতাবলীর কবিতা-অংশ উদ্ধৃত করে আমরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি—

"হে জননী, ফুরাবে না তোমার যে দান,
শিরায় শোণিতে তাহা চির বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য তারা চাঁদ,
আমার জীবন সেতো তব আশীর্বাদ।"

ডবল এজেন্ট

বিক্রমাদিত্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন আমরা দুজনে আল্লার নাম স্মরণ করে য়ুরোপের উদ্দেশে রওনা দিলুম।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রথমে গেলুম মের্সাই শহরে। ঠিক করলুম সেখান থেকে আমরা দুজনে যাবো ব্রাসেলস শহরে। ব্রাসেলস শহরে কোম্পানীর প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

কিন্তু তখন কি ছাই জানতুম যে এই মের্সাই শহরে আমাদের দুজনের জন্যে এক বিরাট জাল পাতা আছে।

এই ষড়যন্ত্রের পেছনে ছিলেন লিলি কোহেন, ওরফে নাদিয়া সুলতান আর ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস শিন বেত এবং ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস—এস ডি ই সি ই।

আর এই ষড়যন্ত্র কিংবা যাকে বলা যায় ফাঁদ হোল হেরোন স্মাগলিং। আমি হেরোন স্মাগলিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার আমেরিকান ইনটেলীজেন্স সার্ভিস, সেন্ট্রাল ইনটেলী-জেন্স এজেন্সীর কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় হোলো। এই আলাপ-পরিচয় আমার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনলো। ১৯৫৮ সালে আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধের পর আমি হলুম সি আই এ-র এজেন্ট।

সময়টা উল্লেখযোগ্য।

আরব ইস্রাইলী যুদ্ধের ঘনঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন।

য়ুরোপেও শান্তি নেই।

ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে বামপন্থী নেতারা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছেন।

এই বামপন্থী নেতাদের কর্মতৎপরতা দেখে সি আই এর কর্তারা বিচলিত হলেন।

মের্সাই শহর বড় জাহাজ বন্দর। এছাড়া এই শহরে অনেক ফ্যাকটরী এবং কারখানা ছিলো। প্রতিদিনই এই শহরে বামপন্থী নেতারা ধর্মঘট ও মিছিলের আয়োজন বন্দোবস্ত করলেন। ফলে ফরাসী সরকার বিচলিত হলেন।

মের্সাইতে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ছিলো কম্যুনিষ্ট পার্টি এই দলের নাম ছিলো : এফ টি পি। আর এদের বিরোধী দল ছিলো এক কোয়ালিশন দল। এই কোয়ালিশন দলের নাম : এম ইউ আর—মুভমেণ্ট ইউনিয়ন দ্য রেসিসস্তান্স। সেই দলের একজন নেতা ছিলেন আন্তোয়ান গুরিনি। আসলে গুরিনি ছিলেন কর্সিকান এবং মাফিয়া সম্প্রদায়ের একজন নেতা। পরবর্তীকালে গুরিনি সি আই এর সংগে যোগ দিলেন।

এই গুরিনির সংগে আমার প্রথম আলাপ হোলো মের্সাই শহরে।

নাদিয়া সুলতানই আমাকে গুরিনির নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন।

মস্তো বড়ো শহর মের্সাই। বড় বড় কল-কারখানা। কারখানার চিমনি থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

আমরা যেদিন মের্সাই শহরে গিয়ে পৌঁছলুম সেদিন শহরে বামপন্থী এবং ডান-পন্থীদের মধ্যে বেশ বড় রকমের দাঙ্গা-হাংগামা হয়ে গেছে। এই দাঙ্গায় বামপন্থী শ্রমিক অনেক নিহত এবং আহত হয়েছে।

নাদিয়া সুলতান আমাকে গুরিনির ঠিকানা দিয়েছিলেন। ঠিকানা খুঁজে বাড়ি বের করতে অসুবিধে হোলো না, কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলাম যে, গুরিনি পুলিশকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু পরে দেখতে পেলুম গুরিনি আমার আগমনের কথা জানতেন। কারণ গুরিনির এক সাগরেদ আমাদের দুজনকে গুরিনির আড্ডায় নিয়ে এলো।

আড্ডার ভেতর ঢুকেই আমি এক অদ্ভুত গন্ধ পেলুম। আর এ কীসের গন্ধ বুঝতে আমার অসুবিধে হোল না। ওরা সবাই জোট বেঁধে হেরোন খাচ্ছে।

: পাশা, আমরা তোমার গল্প অনেক শুনেছি। এবার বল তোমার কী চাই ?

: আর্মস !

: আর্মস : হেরোনের সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে গুরিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর একটা সিগারেট আমাকে এবং আর একটা জেনারেল হোসেনকে দিয়ে বললেন : খাও নেশা হবে। আমি আবার নেশা না করলে সিরিয়াস কোন ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারি না।

আমি জীবনে বহুবার হাসিস খেয়েছিলুম, কিন্তু হেরোনের সিগারেটে এই প্রথম টান দিলুম। মন্দ নয়। এর ভেতর এক কড়া পাকের আস্বাদ আছে।

কিন্তু সিগারেটে দু একটা লম্বা টান দিয়ে বুঝতে পারলুম যে আমার নেশা তীব্র হচ্ছে। তাকিয়ে দেখলুম জেনারেল হোসেনের চোখ দুটো লাল রক্ত জবার মত হয়েছে।

গুরিনি আমাদের হেরোনের সিগারেটে একটানা লম্বা টান দিতে দেখে হেসে বলল, অত জোরে টান দিতে হবে না। এসো এবার আর্মস নিয়ে আলোচনা করি বল। ফারুক কী চান।

আমি পকেট থেকে একটি লিস্ট খুলে গুরিনির হাতে দিলুম। বড় লিস্ট। ফারুক হাতিয়ার কিনতে চান। তিনি মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলোর একচ্ছত্র নেতা হতে চান। হাতিয়ার না থাকলে তিনি ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন না।

এই হাতিয়ার কেনবার মাত্র একটি সর্ত ছিল : মাল যাই হোক না কেন এই কেনা-বেচার একটা বড় কমিশন ফারুকের নামে সুইস ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে।

আমার লিস্ট দেখে গুরিনি হাসলেন। বললেন : ফারুকের খাঁই তো কম নয় ! এরোপ্লেন, ফিল্ড গান, এ্যামুনিশন সব কিছুই তার দরকার। বেশ, আমরা তোমাকে মাল সাপ্লাই করবো। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর আমি কর্সিকাতে কিছু পুরনো আমেরিকান আর্মস ষ্টক করে রেখেছিলুম। এইসব মাল আমি তোমাদের দেবো।

কথাটা বলে গুরিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হেরোনের সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন। গুরিনির দেখাদেখি আমিও ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগলুম। আমার নেশা আরো প্রবল হতে লাগল।

হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল গুরিনির কণ্ঠস্বর : পাশা, আমাদের কাছ থেকে তুমি আর্মস কিনেছ এই কথা যদি কাগজ-ওয়ালারা কিংবা বামপন্থী নেতারা জানতে পারে তাহলে সবাই আমাকে গালমন্দ দেবে। তুমি বেলজিয়ামের লিয়েজ শহরে যাও। সেখানে আমাদের বন্ধুদের অ্যামুনিশন ফ্যাকটরী আছে। আমরা ওদের কাছে মালগুলো সাপ্লাই করবো। তুমি ওদের কাছ থেকে সেগুলি নিয়ে নেবে। কেউ জানতে পারবে না যে আমরা তোমাদের কাছে আর্মস বিক্রি করছি।

আমি নেশার ঘোরে বললুম : একসেলেন্ট আইডিয়া। আমরা কাল লিয়েজ শহরে যাবো।

গুরিনি আবার হেসে বললেন : খবরদার, তুমি যে আমাদের কাছ থেকে হাতিয়ার কিনছো সেটা যেন ফারুক না জানতে পারেন।

এবার জেনারেল হোসেন জবাব দিলেন। হেসে বললেন : কি যে বলেন। আমরা পুরনো ষ্টক নতুন বলে চালাচ্ছি এই কথা কি কাউকে বলতে পারি ?

: গুড বয় গুরিনির যেন জেনারেল হোসেনের কথাগুলো পছন্দ হল।

এবার আমরা উঠবার চেষ্টা করলুম। প্রথমে উঠতে পারলুম না। পা টলতে লাগলো। গুরিনি আমাদের অবস্থা দেখে হাসতে লাগলেন, বললেন : প্রথমবার খাচ্ছ তো, তাই পা টলছে। যাক, একবার অভ্যেস হয়ে গেলে আর দম দিতে কষ্ট হবে না।

এই বলে গুরিনি আবার কি জানি ভাবলেন।

: পাশা, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। মোটা টাকার ব্যবসা করবে ?

: আর্মস ডিল তো ? আমি বোকার মত প্রশ্ন করলুম।

: আরে না না, আর্মস ডিল থেকে আর কত প্রফিট থাকবে ? দশ বারো লাখ ডলার নয়, তুমি হেরোন, হাসিসের ব্যবসা করো। শোন, আমরা প্যালেস্টাইন থেকে সিনাই প্রান্ত দিয়ে প্রতিদিন বেশ কিছু পরিমাণের হেরোন এবং হাসিস ইজিপ্টে পাচার করবো। তুমি হবে আমাদের কায়রোর এজেণ্ট। একবার যদি ফারুক হেরোনের নেশা ধরেন তাহলে আর কখনও তা ত্যাগ করতে পারবেন না। আর এই হাসিস হেরোন বিক্রি করে তুমি প্রচুর টাকা কমিশন পাবে। অত টাকা তুমি আর্মস বিক্রি থেকে রোজগার করতে পারবে না।

আমি ভেবে দেখলুম যে গুরিনির প্রস্তাবের ভেতর যুক্তি আছে। চিরকাল তো এই হাতিয়ার বেচা-কেনা করতে পারবো না, কিন্তু হাসিস হেরোনের ব্যবসা বেশ একটানা অনেকদিন চালাতে পারবো।

: ডিল ? আমি হাত বাড়িয়ে বললুম।

গুরিনি আমার কথা বলবার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেললেন। তারপর বেশ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন : ডিল : কিন্তু এই ডিল করবার আগে তোমাকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমাদের কর্সিকান সমাজে একটি রীতি আছে। কেউ যদি আমাদের সঙ্গে বেইমানী করে তবে আমরা তাদের গলা কেটে নিই। আমাদের সংগে তুমি ডবল ক্রস করবার চেষ্টা করবে না।

আমাদের এই আলোচনায় জেনারেল হোসেন যোগ দেয় নি। সে নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। হয়তো তার কথা বলবার শক্তি ছিল না।

আমি জবাব দিলুম : আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। বেইমানী করা আমার রক্তে নেই। তবে বিজনেসের লাভ-লোকসান দেখতে হবে বৈকী পার্টনার।

আবার গুরিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। ফারুকের সাম্রাজ্য একজন

মোসাহেব যে তাকে পার্টনার বলে ডাকতে পারে একথা গুরিনি কল্পনাই করে নি। আমিও গুরিনিকে পার্টনার বলে ডেকে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিলুম। হয়তো আমার সাহস ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে গুরিন আকৃষ্ট হোল। হেসে বললে : পাশা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

: থ্যাংকস।

আমরা গুরিনির আড্ডাখানা থেকে বেরিয়ে এলুম। রাত প্রায় তখন একটা। রাস্তা কোলাহল মুখরিত। মের্সাই শহরে সবেমাত্র জীবন সুরু হয়েছে।

*

বলে রাখা দরকার; পৃথিবীতে হেরোন—হাসিসের সবচাইতে বড় ঘাঁটি হোল মের্সাই।

আর গুরিনি ছিলেন এই মের্সাই শহরে হেরোন-হাসিসের সবচাইতে বড় ব্যবসাদার। আর তাকে এই হেরোনের ব্যবসা করতে সাহায্য করতেন সি-আই-এ এবং ফরাসী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস এস ডি ই সি ই।

পরবর্তীকালে আমি হলুম গুরিনির ডান হাত। ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস আমার কাছে নিয়মিতভাবে হেরোন-হাসিস স্মাগল করে পাঠাতেন। আর আমি এইসব মাদক দ্রব্য ইজিপ্টের বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিক্রি করতুম। বহু বড় লোকের ছেলেমেয়েরা আমার কাছ থেকে হাসিস কিনে নিত।

কিন্তু আমার হাসিস বিক্রি করবার সবচাইতে বড় স্থান হোল ইজিপশিয়ান আর্মি। ফারুকের মোসাহেব ছিলুম বলে সবাই আমাকে খাতির-যত্ন করতো। যারা আমার কাছে তদ্বির তদারক করতে আসতেন তাদের আমি এক ছিলিম হাসিস খেতে দিতুম। পরে এইসব লোক আমার কাছ থেকে গোপনে হাসিস কিনে নিত।

এই হাসিস বিক্রি করতে গিয়ে আমার একটি মেয়ের সংগে পরিচয় হোল। মেয়েটির নাম লুলু।

লুলু হোল লাভলি, সেক্সী ডার্লিং---

কিন্তু লুলুর কথা পরে বলা যাবে। কারণ লুলুর সংগে যখন আমার আলাপ পরিচয় হোল তখন আমি ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের মধ্যপ্রাচ্যের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছি এবং আরব গেরিলা বাহিনী আমাকে খুঁজে বার করবার জন্যে প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

আমি আর জেনারেল হোসেন য়ুরোপ থেকে আর্মস কিনে ফিরে এলুম। বিভিন্ন ধরনের আর্মস। ফারুককে বললুম যে এইসব আর্মস বেলজিয়াম থেকে কিনে এনেছি। এইসব আর্মসের মধ্যে কানাডিয়ান হারভার্ড বম্বারের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বম্বার আধুনিক ছিল না। ঘন্টায় একশো ছত্রিশ মাইল স্পীডে উড়তে পারতো। এছাড়া কিছু ব্রিটিশ স্টার্লিং পেট্রোল প্লেন কিনেছিলুম। প্রতিটি প্লেনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছিল। ফারুককে বললুম এসব প্লেন বম্বার স্কোয়াড্রনে ব্যবহার করা যুক্তিসংগত হবে। আমি জানতুম যে এই প্লেন বম্বার হিসেবে ব্যবহার করা মানে আত্মহত্যা করা। কিন্তু ফারুককে সে কথা জানতে কিংবা বুঝতে দিলুম না। জেনারেল হোসেন আর্মির কর্তাদের বলল : আইডিয়াল প্লেন ফর বম্বিং।

এ ছাড়া আমরা প্রচুর ফিল্ড গান, স্টেনগান এবং অটোমেটিক রাইফেল কিনলুম। অ্যামুনিশনও কেনা হোল। কিন্তু পরে যুদ্ধের সময় দেখা গেল যে এই অ্যামুনিশন দিয়ে ফিল্ড গান কিংবা স্টেন গানের কাজ করানো যায় না। যেসব হ্যান্ড গ্রেনেড কিনেছিলুম, সেগুলো ব্যবহার করবার আগেই ফেটে যেত। যুদ্ধের সময় এই হ্যান্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে বেশ কিছু ইজিপশিয়ান মারা গেল।

ফারুক এইসব আর্মস বেচা-কেনা থেকে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন। আর এই টাকার মধ্যে আমার শেয়ার ছিল পাঁচ মিলিয়ন ডলার।

যুদ্ধ ঘনিয়ে এল।

ফারুকের আরব নেতা হবার বাসনা প্রবল, তাই তিনি যুদ্ধের স্বপক্ষে ছিলেন। আমার ছিল প্রবল অর্থের তৃষ্ণা। তাই আমি এই যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলুম। আমি জানতুম যে লড়াই হলে হাতিয়ারের প্রয়োজন হবে। আর এই হাতিয়ার কিনতে য়ুরোপ যাবো এবং সস্তা দরে মাল কিনে ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে মোটা মুনাফায় সে মাল বিক্রি করতে পারবো।

এই সব মাল বেচাকেনা এবং নাদিয়া সুলতানের মোসাহেবী করতে গিয়ে আমার কাজ বেড়ে গেল। আগে সন্ধ্যা হলেই আমি সেজেগুজে বারে গিয়ে বসতুম। কিন্তু ইদানীং নাইট ক্লাব এরিয়ায় পা দেবার সময় পেতুম না। রাত্রি হলে নাদিয়া সুলতান ফারুকের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে শুরু করতেন, আর দিন হলেই ফারুক আমাকে তলব করতেন।

আমি জানতুম এই ডেকে পাঠাবার উদ্দেশ্য কী।

নাদিয়া সুলতান সম্রাটকে নতুন কিছু যুদ্ধ পরামর্শ দিয়েছেন, আর আমাকে সেই পরামর্শানুযায়ী কাজ করতে হবে।

একদিন ফারুক আমাকে বললেন যে, তিনি শিগগিরই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন, অর্থাৎ নীল নদীর অঞ্চল থেকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী সরাতে হবে। কাজটি সহজ ছিল না।

ফারুকের ইংরেজ বিদ্বেষের কারণ আমি জানতুম। এই কাহিনী আমি আনতানিও পুলির কাছে শুনেছিলাম। পুলি বলেছিল : জানো পাশা, ইংরেজ সরকার দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় প্রতিদিন সম্রাটকে অপমান করত। একদিন কয়রোর ব্রিটিশ এম্বাসডার স্যার মাইলস ল্যাম্পসন ফারুককে হুমকী দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ফারুকের স্বাধীন মনোভাব সহ্য করবেন না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে মিশরের সিংহাসনের

গদ্দী থেকে তাঁকে সরাতে একটুও সংকোচ বোধ করবেন না।

ফারুক সেদিন ব্রিটিশ সরকারের হুমকী শুনে তার কোন প্রতিবাদ করবার সাহস পান নি। কারণ সমস্ত মিশরে তখন ব্রিটিশ সৈন্য গিস গিস করছিল। ফারুক জানতেন যদি তিনি মাইলস ল্যাম্পসনের কথার প্রতিবাদ করেন তাহলে তাঁকে আবেদিন প্যালেস ত্যাগ করে যেতে হবে।

আমি অবশ্য ব্রিটিশ এম্বাসাডারের চোখ রাঙানী দেখে ভয় পাই নি।

: মিঃ এম্বাসডার আমি বেশ কর্কশ সুরেই মাইলস ল্যাম্পসনকে বলেছিলুম : আজ আপনারা আমার সম্রাটকে অপমান করলেন, এর প্রতিশোধ উনি একদিন নেবেন। মনে রাখবেন যে এই মিশরে আপনাদের আর কোন বন্ধু নেই।

: বুঝলে পাশা, ঐ ব্রিটিশ এম্বাসডার আমার কথা শুনে কী বললেন। বললেন : আহা, পুলি তুমি রাগ করছো কেন? তোমার সম্রাট আমাদের ছাড়া একদিনও দেশের সরকার চালাতে পারবেন না। আমাকে ওর একদিন প্রয়োজন হবেই।

পুলির কথা শুনে আমি বুঝতে পারলুম যে, সুযোগ এবং সুবিধা পেলে ফারুক ইংরেজদের মিশর থেকে তাড়াবেন।

যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি প্রতিদিন ইংরেজদের গালিগালাজ করে বক্তৃতাদি দিতে লাগলেন।

ইংরেজরা এর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করল।

একদিন স্যাম্পসন বলে এক ইংরেজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এল।

স্যাম্পসন স্পষ্ট বক্তা। কোন ভনিতা না করে আমার কাছে তার পরিচয় দিল। বলল : আমি হলুম ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স সার্ভিসের আফ্রিকার। গুরিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

গুরিনি! আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম। হ্যাঁ, তোমার মেসাইর বন্ধু?

স্যাম্পসনের মুখে গুরিনির নাম শুনে একটু ভয় পেলুম। কারণ আমি মেসাই শহরে গুরিনির সঙ্গে কী চুক্তি-বন্দোবস্ত করেছিলুম একথা কাউকে জানাতে চাই নি। গুরিনিকে বলেছিলুম, খবরদার, আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ স্থাপন করবেন না। প্রয়োজন হলে আমি মেসাইতে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

এত সতর্কতা নেবার পর গুরিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন কেন? সামান্য একজন লোক নয়। একজন ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স অফিসার। যদি কোন প্রকারে ফারুক কথাটা জানতে পারেন তাহলে আমার গর্দান যাবে।

স্যাম্পসন আমাকে সাহস দিলেন। বললেন, ভয় পেও না পাশা, আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করছি একথা কেউ জানতে পারবে না। আর আমরা আজ যে আলাপ-আলোচনা করব এ হল একেবারে টপ সিক্রেট।

স্যাম্পসনের কথা শুনে আমি মনে একটু সাহস পেলুম। বললুম : বলুন আমি কি করতে পারি?

: শোন পাশা, আমরা শুনেছি তুমি হলে ফারুকের ডান হাত... ঃ

আমি স্যাম্পসনের কথার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম। বললুম : না না, আপনি ভুল শুনেছেন। আনতানিও পুলি হলেন সম্রাটের পরামর্শদাতা। আমি হলুম তাঁর সাকরেদ।

আমার কথা শুনে স্যাম্পসন হাসলেন। বুঝতে পারলুম উনি আমার এই জবাব আদৌ বিশ্বাস করেন নি। বললেন, তুমি বেশ ভাল কথা বলতে পার। তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে। ডবল এজেন্টের কাজ করবে পাশা। বলে স্যাম্পসন সিগারেটে এক লম্বা টান দিলেন।

: ডবল এজেন্ট! আপনি বলছেন কী! আমি তীব্র প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আজ প্রতিবাদ করবার সময় আমার কণ্ঠস্বর বেশ নিস্তেজ হয়ে গেল।

: না না, তুমি এই 'ডবল এজেন্টে'র কাজ করতে আপত্তি করতে পারবে না। কারণ তুমি কে এবং কি ধরনের কাজ কর তার পুরো বিবরণী আমরা গুরিনির কাছে শুনেছি। আমরা জানি যে তুমি ফারুকের সৈন্যবাহিনীর জন্যে যে হাতিয়ার কিনেছ সবই ভুয়ো মাল। পাশা, তুমি মিশরে হাসিস হেরোন সমাগম করছ একথা আমরা জানি।

বুঝতে পারলুম বড় শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি। এর হাত থেকে সহজে ছাড়া পাবো না। নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : বলুন আমাকে কি করতে হবে।

স্যাম্পসন আমার জবাব শুনে হাসলেন। বুঝতে পারলেন যে অমাকে তিনি বশ করেছেন। স্যাম্পসন ফের বলতে লাগলেন : পাশা, তুমি মুশ্লিম ব্রাদারহুডের নাম শুনেছ? এই দলের নেতার নাম হল হোসেন বান্না। আমরা টাকা দিয়ে এই দলকে তৈরী করেছি।

আমি মুশ্লিম ব্রাদারহুডের নাম শুনেছিলুম, কিন্তু এদের সঙ্গে যে ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স সার্ভিসের যোগাযোগ আছে একথা আমি জানতুম না। তাই আজ স্যাম্পসনের কথা শুনে মনের বিস্ময় প্রকাশ করবার চেষ্টা করলুম। বললুম, না, আমি মুশ্লিম ব্রাদারহুডের কথা কিছুই জানি না।

ঃলায়ার। একটু হেসে মিষ্টি গলায় স্যাম্পসন বললেন : যাক, তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে। শোন, এবার তোমাকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলছি। আমরা জানি যে ফারুক ইংরেজদের এই দেশ থেকে তাড়াবার পরিকল্পনা করেছেন। আমাদের সঙ্গে জেহাদ ঘোষণা করবার জন্যে উনি প্রতিদিন জনতাকে উত্তেজিত করছেন। আমরা যদি ফারুকের এই ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার বন্ধ না করতে পারি তাহলে শিগগিরই এই অঞ্চল থেকে আমাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে। তাই ফারুককে রুখবার জন্যে ও তার ক্ষমতাকে খর্ব করবার জন্যে আমরা এই মুশ্লিম ব্রাদারহুড সংঘ সৃষ্টি করেছি। এই দলের নেতা হাসান বান্না আমাদেরই লোক। উনি আমাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করে থাকেন। আমরা কি আশংকা করছি জানো? আমরা ভয় করছি ফারুক যদি টের পান যে মুশ্লিম ব্রাদারহুড আমাদের অর্থে পরিপুষ্ট হচ্ছে আর হোসেন বান্না আমাদের দলের লোক, তাহলে উনি ঐ দলকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করবেন। পাশা, তুমি জান আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধ আসন্ন। হয়ত আর কয়েক দিনের মধ্যে এই লড়াই শুরু হবে। মুশ্লিম ব্রাদারহুড এই সময় বে-আইনী বলে ঘোষিত হলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। তোমার...

স্যাম্পসন তার কথা অর্ধ-সমাপ্ত রেখে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এই দৃষ্টির অর্থ আমার জানা ছিল। উনি আমার সাহায্য চান? কি ধরনের সাহায্য? প্রথমে গম্ভীর, তারপর খানিকটা মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলুম : বলুন আমি কি করতে পারি?

আমার এই প্রশ্নে এমন একটা সুর ছিল যেন আমি স্যাম্পসনকে এবং তার মনিব ইংরেজ সরকারকে কৃপা বা দয়া করছি। কিন্তু আমি মনে মনে জানতুম যে আমি যে ফাঁদে পা দিয়েছি এর হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাব না। কারণ আজ তো আমি আর ফারুকের সামান্য মোসাহেব মেয়ের দালাল নই, আমি হলুম গুরিনির বন্ধু, ইস্রাইলের স্পাই এবং ব্রিটিশ ইন্টেলীজেন্স সার্ভিসের 'ডবল এজেন্ট।'

ডবল এজেন্ট! সর্বনাশ। না, অনেক দূরে এগিয়ে গেছি। আজ আর পেছোবার জো নেই।

স্যাম্পসন আমার দিকে তাকালেন। তাঁর এই চাউনি ছিল কর্কশ, নির্দয়, এবং তাতে আদেশের ইঙ্গিত।

(ক্রমশঃ)

"রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় নেই। তাঁর সংগে মিশে থাকাতেই আমাদের গৌরব।"

শুভ গুহঠাকুরতা

এতদিন অবধি অমৃতের সুরের আগুনের আনন্দযজ্ঞ দীপ্ত হয়ে উঠেছে এক একটি দীপের মতই এক একটি শিল্পী-ব্যক্তিত্বের আলোয়। শিল্পীখ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার বিপুল গৌরবের অধিকারী তাঁরা—জীবনব্যাপী সাধনার স্মরণীয় সার্থকতায় ধন্য।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোনো গৌরবের দাবী করেন না, তবু অনস্বীকার্য অবদানের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে—যিনি রবীন্দ্রসংগীতের অংগণকে সমৃদ্ধ করেছেন—তাঁর ঋণও রবীন্দ্র-সংগীতানুরাগী মাত্রেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন। গীতবিতান ও দক্ষিণীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা— রবীন্দ্র-সংগীতের এই স্বর্ণযুগের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কবিগুরুর গানকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার বিরাট স্বপ্ন তিনিই দেখেছিলেন এবং নিরলস সাধনা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দিয়ে এ স্বপ্নকে রূপায়িতও করলেন।

অকরুণ বাস্তবের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণেও তাঁর প্রাণরস ছিলো দুর্বার। অপ্রতিহত। প্রচণ্ড শক্তিতে পথের বাধা চূর্ণ করে এক মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে এটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড এ্যালোন। আমাদের জীবনে দেহের শ্রীহীন দাবী যতখানি সত্য তার চেয়ে কোনো অংশে কম সত্য নয় অন্তরের অতলের অমৃত পিপাসা।

বরিশালের এক বিদগ্ধ পরিবারের সন্তান শুভ গুহঠাকুরতা। ভাল করে চেতনা জাগবার আগেই যার কণ্ঠে অনুরণিত—রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ নজরুল সুর-সাগরের—গানের সুর চেতনায় নিবিড় হয়ে গিয়েছিল। এই গানই অলক্ষ্য তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জীবিকার দাবী যখন নির্মম আক্রমণে কৈশোরের রঙীন স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিতে চেয়েছে, রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে তার দাবীকে স্বীকার করে নিয়েও আকাশের দিকে মাথা তুলে সুরের ধ্রুবতারাকে প্রণাম জানাবার এই বিস্ময়কর শক্তিই বুঝি তাঁর সহজাত সম্পদ, বিধিদত্ত প্রতিভা।

মাত্র আঠার বছর বয়সে (সাধারণতঃ যে বয়েস শুধুই স্বপ্ন দেখার—বাবাকে হারাতে হোলো এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি সারা সংসারের দায়িত্ব বহন। অপরিণত বয়সেই পরিণত মনের দিব্যদৃষ্টিতে শুভ ঠাকুরতা বুঝেছিলেন আজকের যুগ কোলো কাঞ্চনকৌলিন্যের যুগ. নিভৃত প্রাণের দেবতাকে পূজারতি করার মত মনটাও হয়ত একদিন মরে যাবে—যদি না প্রতিদিনের লৌকিক জীবন অর্থ এবং সামর্থ্যে শ্রীমন্ডিত হয়ে ওঠে।

এবং সেই কারণেই জীবনসংগ্রামকে বীর সৈনিকের মতই বরণ করে নিয়েছিলেন সেদিনের দু্যচেতা কিশোর—[illegible] প্রজ্ঞা প্রদীপ্ত শুভ ঠাকুরতা।

জীবনের দাবীতেই জীবিকার সন্ধানে ঘুরলেও ছোটোবেলার সেই স্বপ্নদেখা মনটি ক শুভ গুহঠাকুরতা এক মুহূর্তের জন্যও হারাননি। ফুরসুৎ পেলেই চলে যেতেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে মুক্ত আকাশ, বাতাস, ফুল, গাছ-আলো-ঘেরা শান্তিনিকেতন ও তার অজস্র গানে গানে সমস্ত দ্বিধা ও সংশয়ের বাঁধ ছিঁড়ে যেত ধীরে ধীরে, অজান্তেই। যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ ছন্দে।

'এই সময়েই শৈলজাদা গ্রীষ্ম এবং পুজোর দুটি বড় বড় ছুটি আমাদের বাড়ীতে কাটাতেন। তাঁর সরস সঙ্গ ও গানের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে অন্তর ভরে দিতেন। কবির শেষ দশ বছরের গান ও সুরের সংগে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সেইসব গান ও তার পট-ভূমিকা জানবার প্রশস্ত সুযোগ মিলেছিলো সেইসময়েই। এবং সেই কারণেই কবির গান এমনই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলো—যে সে গান গাওয়া বা শোনার সঙ্গে সংগেই যেন তার পরিবেশ এবং সেইসময়ে কবির মনের গতি ও প্রকৃতি চোখের সামনে দেখতে পেতাম। এ বিষয়ে মনের মধ্যে অজান্তেই যেন একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিলো।'—শুভ গুহঠাকুরতা যৌবনের সেই রঙীন দিনগুলিতে ফিরে যান।

'আপনি ত কাজ ও পড়াশোনার অবকাশে গান গাইতেন। হঠাৎ রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়বার আইডিয়া মাথায় এলো কেমন করে?'

'এ আইডিয়াও শৈলজাদার কাছেই পাওয়া। —একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেই খাবার টেবিলে বসে কথায় কথায় শৈলজাদা বললেন—গুরুদেবের একটা বড় দুঃখ ছিলো তাঁর গান কেউ নিলো না। শান্তিনিকেতনে মুষ্টিময় কয়েকজনের মধ্যেই এতবড় একটা ঐতিহ্য সীমাবদ্ধ রইলো। অথচ তিনি সকলের জনাই সবরকম গানের ধারা দিয়ে এতবড় সম্পদ রেখে গেছেন।'

কথাটা আমার মনে বড় লেগেছিলো। বললাম 'শৈলজাদা, কিচ্ছু ভাববেন না। আগে বি-কমটা পাশ করে নি। তারপর আপনারা ত রয়েইছেন। সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগা যাবে। মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন।'

একথা যে তাঁর অবসরের আলস স্বপ্ন নয় প্রাণের নিবিড় আকূতি—আজকের সংগীতমুখর দক্ষিণী ও তার স্রষ্টার নানা-মুখী কর্মধারায় সেই কথাটিই যেন ব্যাপ্ত।

কথায় ও কাজে, স্বপ্নে ও বাস্তবে, আদর্শে ও তার রূপায়ণে কবিতার ছন্দের মত এমন মিলন কিন্তু নির্বাধ স্বাচ্ছন্দ্যেই হয় নি।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি জীবিকার জন্য শুভ গুহঠাকুরতা বেছে নিয়েছিলেন বাণিজ্যকে। পরিশ্রমে, সততায়, প্রচেষ্টায় আন্তরিকতায়—এই পথ বেয়েই ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপা উপচে পড়লো তাঁর জীবনে, সংসারে? সে-ও এক মস্তবড় সাধনার অধ্যায়। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য তাঁর সংগীতসাধনা এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত।

শুভ গুহঠাকুরতা আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 'শুভদা' হয়ে উঠেছেন শুধুমাত্র তাঁর সংগীত অথবা সংগঠন প্রতিভার কারণেই নয়। যে পরি-মিতিবোধ থাকলে সৌভাগ্যের চরম মুহূর্তেও মানুষ তার মনের ভাবসাম্য হারায় না—নিজে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেও অন্যের প্রতি উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করেন না এবং বিরুদ্ধমতের মানুষের প্রীতিও সহিষ্ণু হবার মত উদারতা রাখেন—সেই অসাধারণ মানসিক ভারসাম্যের অধি-কারী বলেই সকলেই তাঁকে আপনার ভাবতে পারে। সহজ মানুষ ও সংগঠকের এ যেন সমন্বয় বিরল।

বাবাকে হারানোর সেই অসহায় অধ্যায়ে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েই যেমন করে স্থিতধী হয়ে জীবন ও পারিপার্শ্বিককে চিনে নিয়েছিলেন—আজ ঠিক তেমন করেই নির্বিকার অবিচলিত চিত্তে কর্মক্ষেত্রের দাবী পূর্ণ করে যাচ্ছেন তাঁর শিল্পশ্রীসমৃদ্ধ রমণীয় অট্টালিকার সুখী সংসারে। আলস্যে, বিলাসে সময়ের অপচয় ঘটান না বাড়ীর একটি প্রাণীও। অনুগত সহধর্মিণী (সহমর্মিণীও) পুত্র পুত্রবধূ সকলেই রবীন্দ্রসংগীতে সুশিক্ষিত (রণো গুহ-ঠাকুরতা ত নামকরা শিল্পীই) এবং অবসর সময়ে এঁরা প্রত্যেকেই এমন কোনো কাজেই রত যার জন্য সিরিয়াস মুড দরকার।

রবীন্দ্রসংগীত শুভদার প্রাণ। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, অনুরাগ দেখে ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয় যে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীত লোকেরই বাসিন্দা। যৌবনকালে তাঁর সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিলো কোলকাতা সহরের প্রতিটি ক্ল্যাসি-ক্যাল কনফারেন্স রাত জেগে শোনা। ভীষ্মদেব, সায়গলের তখনকার দিনের একটা মস্তবড় আড্ডা ছিলো শুভদার বাড়ী। ওঁর কাছেই শুনেছি তখনকার লালাবাবু ও ভূপেন ঘোষ মহাশয়ের যুক্ত-সংগীত সম্মেলন হয়েছিলো পূরবী হলে। সেই এগার রাত জেগে তখনকার দিক্‌পাল-দের গান শোনার স্মৃতিচারণে এখনও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন তিনি। আমিও রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম যখন উনি বলছিলেন আবদুল করিম খাঁ সাহেবের কথা। প্রোগ্রামের আগে গ্রীণরুমে বসে খাঁ সাহেব সুর ভাঁজছেন। আগের আর্টিস্টের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। এবার তাঁর পালা। স্টেজ রেডী। শ্রোতারা অপেক্ষা করছেন! কিন্তু সে কথা তাঁর কানে যাচ্ছে কই? আপনমনে গেয়েই চলেছেন। অগত্যা উদ্যোক্তারা ঐ অবস্থাতেই তাঁকে ধরে স্টেজে নিয়ে গেলেন। সারেংগীবাদক চলেছেন সারেংগী ধরে তান তার সংগে গান গাইতে গাইতে স্টেজে গিয়ে বসলেন আবদুল করিম খাঁ সাহেব।

এ দৃশ্য আজ ভাবা যায়? কিন্তু ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান্ ফিকশন।

উচ্চাংগ সংগীতকে এমন করে ভাল-বেসেছেন তবু রবীন্দ্রসংগীতই হয়ে উঠলো ইষ্টমন্ত্র—?"

'এর জন্য আমি ঋণী' শৈলজাদার কাছে। গান, নোটেশন—গাইবার পদ্ধতি সবই উনি এমন করে মনে পৌঁছে দিয়েছেন যে তার অমোঘ প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। আর মুক্ত হতে চাইও না—। কারণ এমন কোনো বিষয় নেই যা রবীন্দ্র-সংগীতে প্রতিবিম্বিত হয়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে লোকসান কিছু নেই। আর সবার ওপর রয়েছে এ সংগীতের কাব্য-সৌন্দর্য যাকে বলা যায় আপন স্বরূপে আপনি ধন্য। এ আকর্ষণটাও বড় কম নয়; তবে সংগে সংগে এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রসংগীত ভাল করে গাইতে হলে উচ্চাংগ সংগীতের ভিত্তি থাকা দরকার। নইলে রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃতি, তার ক্যারেকটার এসব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয় না।'

রণো বাজিয়ে শোনালো শুভদার তরুণ বয়সের একটি রেকর্ড 'ও তার হাতে ছিলো'। তিলক কামোদ ও দেশের আলতো স্পর্শে কি মধুর হয়ে উঠেছে গানের সংবাহার। আর তেমনই মনোরম ছন্দের দোলা। এছাড়াও ছিলো 'আমার কণ্ঠ হতে', 'আমি কখন ছিলেম অন্ধ'। সব কটিই সুন্দর। কিন্তু খুব বেশী শোনা যায় না বলে কিংবা কি জানি কেন 'হাতে ছিলো' গানটি মনকে বেশী স্পর্শ করলো।

'রবীন্দ্রসংগীত প্রথম শুনেছিলেন কার কণ্ঠে?"

'তখন রেকর্ড ছিলো পংকজ মল্লিক, কানন দেবীর। সেইসব গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অনেক পরে রবীন্দ্রসংগীতের গভীরে মন প্রবেশ করেছে শান্তিনিকেতনে গিয়ে আর শৈলজাদার সংস্পর্শে এসে। সে কথা ত আগেই বলেছি। আমি যখন রেডিওতে গাইতে সুরু করি ১৯৪২ সালে তখন আমরা কজনই রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত গাইতাম পংকজবাবু হেমন্ত সুজিত দ্বিজেন চৌধুরী।

'দক্ষিণী গড়ে তুলেছিলেন কিভাবে?'

'দক্ষিণী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আট বছর আগে গীতবিতান দিয়েই আমার রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুরু। আমি চেয়েছিলাম শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসংগীত তার যথার্থ রূপে ছড়িয়ে পড়ুক। হিন্দুস্থানী গান শিখতে হলে যেমন ভাল ওস্তাদের কাছে নাড়া বাঁধতে হয়, রবীন্দ্রসংগীতও রবীন্দ্রসংগীতরূপে জানতে বা শিখতে হলে সত্যিকারের গুরুর শিক্ষা দরকার। অমাদিদা, কনক বিশ্বাস, শান্তিনিকেতন থেকে শৈলজাদা শান্তিদা মোহর অরুন্ধতী সবাইকে নিয়ে গীত-বিতান সুরু করলাম ১৯৭৯ সালের ৮ ডিসেম্বর। ১১৮ নম্বর রাসবিহারী এ্যাভি-

মুত্তে। কিন্তু প্রথম দিনেই বাধা পড়াতে সবারই মন খুব খারাপ হয়ে গেলো।

'বাধা পড়লো কিভাবে?'

'সেইদিনই ডাঃ কালিদাস নাগ এ্যারেস্টেড হলেন। সারা কোলকাতায় ইভাকুয়েশন।...... কিন্তু আমি থামিনি। এই ঘটনার ছ মাস বাদে আবার গীতবিতানের যাত্রা শুরু হোলো আশুতোষ কলেজের লাইব্রেরীর ওপরতলায়।

রাত্রে কমার্স ক্লাস করতাম, দিনের বেলা গীতবিতান ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ। সে এক উদ্দীপনার যুগ গেছে। যত কাজ করছি, কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনের বাইরে সেই প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষাকেন্দ্র। আইডিয়াটার মধ্যে একটা অভিনবত্ব ত ছিলই। তারপর দেখলাম গীতবিতানের অর্থসংগ্রহের জন্য প্রথম যখন নিউ এম্পায়ারে শো করলাম অরুন্ধতী, মোহর, নীলিমাদের নিয়ে—হাউস-ফুল। তখনকার দিনে এটা কি ট্রিমেন্ডাস সাকসেস ভাবা যায় না।

অবশ্য এসব বিষয়ে আমার প্রধান সহায় ছিলো বন্ধু সুজিতরঞ্জন রায়। তার অর্থ-সাহায্য না পেলে এতবড় কাজ এত তাড়াতাড়ি সুরু করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করার অল্প-দিনের মধ্যেই অনুভব করলাম কবির দুঃখের কোনো কারণ ছিলো না। অন্তহীন সৃষ্টির মধ্যে ডুবে থাকলেও গানই ছিলো তাঁর হৃদয় জুড়ে। এই গানটাই পরে বড় হয়ে উঠবে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই। উত্তরযুগের মানুষ যতবেশী শিক্ষিত ও মার্জিতমন হবে তত-বেশী আগ্রহে রবীন্দ্রসংগীতকে গ্রহণ করবে। আজ চৌত্রিশ বছর বাদে দেখছি রবীন্দ্রসংগীতের ধারাটিই কিভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে।'

'দক্ষিণীর জন্ম হোলো কিভাবে?'

গীতবিতানের কর্মমন্ডলীর সংগে মতান্তর হওয়ার পর এক বছর কিছু করিনি। তারপর মানে গীত-বিতান সুরু হওয়ার আট বছর বাদে দক্ষিণীর যাত্রা সুরু হোলো। আজকের দক্ষিণীর খবর ত আমার চেয়ে তোমরাই বেশী জানো—হাসি-ঝলমল চোখে শুভদা চেয়ে রইলেন।

'এই ত দু বছর আগেই দক্ষিণীর রজত-জয়ন্তী উৎসবে কোলকাতাবাসী কবি-মানসের নানামুখী রসধারার স্রোতে অব-গাহনের সুযোগ পেয়েছে। গান, নাচ, নৃত্য-নাট্য, নাটক আলোচনাচক্র কোনোটাই বাদ ছিলো না।

'অনেকদিন আগের কথা বলছি। তোমরা তখন ছোটো ছিলে, হয়ত জানো না। কিন্তু সাংবাদিকতার প্রয়োজনে জানাবার দরকার বলেই জানাচ্ছি—ক্ল্যাসিক্যাল কনফারেন্সের ঢঙে রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন দক্ষিণীর ব্যানারে আমিই প্রথম প্রবর্তন করি। এবারের রজতজয়ন্তী উৎসবের কনফারেন্সে তিন-দিনের অনুষ্ঠানে কোনো শিল্পী বাদ যায়নি। ছোটোগল্পের নাট্যরূপও (রবি-বার, রাসমণির ছেলে, নষ্টনীড়) আমাদের পরিকল্পনা। এ-ছাড়াও আলোচনাচক্রে রবীন্দ্রসংগীতের গুরু, উচ্চাংগ সংগীত-সাধক, সাংবাদিক, শিল্পী, সংগঠক অধ্যাপক ও শহরের বিশিষ্ট বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক মেলে ধরেছি যাতে জিজ্ঞাসু ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের দৃষ্টিভংগির পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারেন।

'এই প্রসংগেই একটা কথা জানিয়ে রাখি। গীতবিতান থেকে সুরু করে দক্ষিণীর আজকের যুগ অবধি প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিটি কাজে যাঁর অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি তিনি হলেন সুকমলকান্তি ঘোষ। আমার অন্তরংগ বন্ধু। যখন অন্য কোনো পত্রিকা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে চলতি বাংলায় যাকে বলে কোনো পাত্তাই দিতো না অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তরে নিয়মিতভাবে আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হোতো। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই সে দৃশ্য। গীতবিতান প্রতিষ্ঠার সময় সুকমলের ঘরে গেলাম। পত্রিকা হাউসের দোতলায়। ও পত্রিকা যুগান্তরের বিভাগীয় সম্পাদকদের ডেকে তাঁদের সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন—দীর্ঘকাল ধরে আমি শুভকে জানি দেখো এর প্রতি-ষ্ঠানের সকল অনুষ্ঠান যেন ভালোভাবে আমাদের কাগজে ফ্ল্যাশ করা হয়। এমনদিন আসবে যেদিন শুভর কনট্রিবিউশন বাঙালী শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে।'

সুকমলদার ভবিষ্যৎ বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

সে তোমরা বুঝবে শুভদার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। তবে এ হাসি অহমিকার হাসি নয়। যোজন পথের বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছলে মানুষের অন্তরে যে পরি-পূর্ণতার পরিসমাপ্তি আসে তারই ছোঁওয়া শুভদার হাসিতে।

আর একটা কথা তোমারাও হয়ত জানো না আজ রবীন্দ্রনাথের হাজারো উৎসবে সারা কোলকাতা পরিপ্লাবিত—এর মূলে যে কটি মানুষের যথার্থ অবদান আছে সুকমল তাদেরই একজন। রবীন্দ্রমেলার প্রতি-ষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন সুকমলকান্তি ঘোষ। নিজেকে জাহির করা অথবা নিজের কৃতিত্বের ঢাক নিজে পেটানো ওর অভ্যাস নেই বলেই হয়তো এ খবর অনেকে জানে না। আজ রবীন্দ্রসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংগীতের অভিভাবক সেজে অনেকেই যখন মাথার ওপর লাঠি ঘোরান সুকমল নিজেকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে দিয়েছে। আত্ম-প্রচার জিনিসটাই ওর ধাতে নেই।'

রবীন্দ্রসংগীতে গায়কী সম্পর্কে একটা বিতর্ক আজকাল মাঝে মাঝে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এসম্পর্কে আপনার মতামত?"

গায়কী কথাটা আসে গানের ঘরানা থেকে। ওটা হোলো ক্ল্যাসিক্যাল গানের পরিভাষা। এখানে কথাটা হওয় উচিত ঢং বা ভংগি। এ জিনিসটা কোনো বাঁধাধরা সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। প্রত্যেক শিল্পীর মেজাজ ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার ষ্টাইল গড়ে ওঠে। কণিকার গাইবার ভংগি সুচিত্রার চেয়ে আলাদা। হেমন্তর ষ্টাইলের সংগে জর্জের গাইবার ভংগির কোনো মিল নেই। অথচ এঁরা সবাই রবীন্দ্রসংগীতই গাইছেন এবং স্বরলিপি নির্দিষ্ট সুরেই।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেবার সময় আপনি কোন দিকটির ওপর জোর দেন বেশী?"

শৈলজাদার কাছে শেখা শান্তিনিকেতনে শোনা ষ্টাইলের ওপর। শৈলজাদা কবির শেষের দিকের শ্রেষ্ঠ দশ বছরের গানের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন একথা আগেই বলেছি—"

এই খাঁটি শান্তিনিকেতনী ষ্টাইলটি কি?'

ধ্রুপদের কাঠামোয় টপ্পা সংগের মীড়ের অলংকরণ। সংকীর্ণতামুক্ত মন নিয়ে রুচি ও যুগ পরিবর্তনের সংগে নানান মিশ্র রাগ, বাউল, কীর্তন, লোকসংগীতের

[illegible] কবির গানের ডালি ভরে উঠলেও যে গানগুলি একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক তার মধ্যে অলংকরণ ধ্রুপদের মীড় গমক ও টপ্পার স্বরক্ষেপণের মিলনে এমন এক [illegible] গভীর মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে যার তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রসংগীতেই মেলে।

রবীন্দ্রসংগীত গাইবার সময় যে কথাটি সবচেয়ে বেশী মনে রাখা দরকার তা হোলো এ সংগীতের কাব্যধর্মিতা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও সুরকার। সুরের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভারী স্পর্শকাতর ছিলেন কথার সৌন্দর্য বিষয়ে। এখানে এতটুকু গলতি তিনি বরদাস্ত করতেন না। তাঁর গান যারা গাইবে কথার মাধুর্যের বিকাশের প্রতি তাদের লক্ষ্য থাক এই ইচ্ছেটাই তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই:.........তাঁহারা গানের কথার ওপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।

রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে আর যে বস্তুটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি হোলো ভাবের সংগে সংগতি রেখে স্বাভাবিক মৃদু ও তীব্রস্বরের ব্যবহার। কাব্যধর্মী সংগীতে তারসপ্তকের স্বরগুলি তীব্র-ভাবে উচ্চারিত হলে বড্ড শ্রুতিকটু লাগে। কী যেন তবু যদি এইরকম কথায় রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে মীড় প্রয়োগ করেছেন কখনও মনের অস্ফুট প্রশ্ন কখনও বা দ্বিধাকে রূপ দেবার জন্য। কথা বলার মত গাইবার সময়ও এইসব কথার উচ্চারণে জোর দিলে এক্সপ্রেশনেও প্রাণের ছোঁওয়া লাগে।

প্রথমে শ্রোতা হিসেবে পরে শিক্ষকের ভূমিকায় রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিপুল অভিজ্ঞতা আপনার আছে; এসম্বন্ধে কিছু বলবেন না?

শ্রোতা হিসেবে এই কথাই বলব—প্রথমের দিকে পংকজ মল্লিক, কানন দেবী, কনক দাস এবং সায়গলের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত শুনি। পংকজ মল্লিকের সম্বন্ধে কোনোরকম বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে খোলামনেই বলছি অসাধারণ কণ্ঠ। সংগীত-ব্যক্তিত্ব ও অনুভবের শক্তিতে রবীন্দ্রসংগীত তাঁর পরিবেশনায় এমন একটি সরস রূপে পৌঁছেছে যাতে অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। ও'র কণ্ঠে তোমার আসন শূন্য আজি যখন প্রথম শুনি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো।

সায়গলের গানে কণ্ঠমাধুর্য আর [illegible] নিবিড়বোধের মিলনে একটা [illegible] তৈরী হয়ে যেতো। কানন দেবীর কণ্ঠে উচ্চারণ তাছাড়াও শিক্ষার বনেদটা খুব ভালো ছিলো। এঁদের পরের যুগে জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে হেমন্তর একটি বিরাট অবদান আছে একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। হেমন্তের ওপর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে এই কারণে যে তার ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন। সে জানে কোথায় তার অবাধ অধিকার কোথায় নয়। এই পরিমিতিবোধ-টুকু আছে বলেই শিল্পী হেমন্ত তার নিজের জায়গায় সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের গান বা অন্য কোনো গান কোনো গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে থাক এরকম সংকীর্ণ মনোভাবের আমি ঘোর বিরোধী। এ গানে ব্যাপকতা আসুক জনপ্রিয়তার পরিধি বিস্তৃততর হোক যে কোনো রবীন্দ্র অনুরাগীই এটা চাইবেন। কিন্তু সংগে সংগে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রসংগীতের নিজস্ব চরিত্র বজায় না থাকলে জনপ্রিয়তা অর্থহীন। বৈশিষ্ট্যবর্জিত প্রচার অপ-প্রচারেরই সামিল।

অত্যন্ত আনন্দের কথা আজ একই আসরে হেমন্ত মুখার্জি সুবিনয় রায় দুজনেই গাইছেন এবং দুজনের গানই শ্রোতারা আগ্রহের সংগে শুনছেন। কিন্তু সুবিনয় রায়ের এই ধ্রুপদী গান অবধি শ্রোতাদের মনকে পৌঁছে দেওয়ায় পংকজ মল্লিক কানন দেবী সায়গল হেমন্ত সবারই সম্মিলিত অবদান আছে। নাকউঁচু দৃষ্টিভংগি নিয়ে চলে যোগ্য ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করার মত অ-রাবীন্দ্রিক বস্তু আর কিছু নেই।

প্রথমের যুগের শিক্ষার্থীদের সংগে এখনকার যুগের শিক্ষার্থীদের কোনো পার্থক্য আছে?

প্রথমের যুগের সংখ্যায় কম হলেও সত্যিকারের শিল্পী তৈরী হোতো। এখন গায়ক-গায়িকার সংখ্যা বাড়লেও সত্যি-কারের শিল্পীসংখ্যা কম। গানের মধ্যে কতটা রাগের ছায়া থাকবে কতটা কাজ এবং কতটা ভাব এই বোধ না এলে শিল্পীমনের অধিকারী হওয়া যায় না। শিক্ষা নিয়ে মেজে ঘসে শিল্পী তৈরী করার কথা ভেবেই কিন্তু আমি এই মন্তব্য করছি। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রতিভার ক্ষেত্রে। সত্যিকারের প্রতিভার আবির্ভাব ত যে কোনো ক্ষেত্রেই বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

শুভদার অজস্র রিসার্চ ওয়ার্কের মধ্যে তাঁর লেখা রবীন্দ্রসংগীতের ধারা বইখানি শুধু তাঁর সংগীতচিন্তার উজ্জ্বল নজীর নয়—এ বইখানি শান্তিনিকেতনের পাঠ্য-পুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে।

শুভদার মধ্যে যে বস্তুটি আমায় মুগ্ধ করে সেটি হোলো আর্টের ক্ষেত্রের বড় জিনিস ঠিক জায়গায় থামতে জানা। প্রাণবন্ত গান গেয়ে মন ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি গান গাইবার প্রলোভনকে সংযত করে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কারণ গান গাওয়া ও শেখানো দুটো পরস্পরবিরোধী বস্তু। একটিকে সার্থক করে তুলতে হলে অপরটিকে বিদায় দিতেই হয়। এই সংযমের শাসনকে নিজের মধ্যে সত্যি করে তুলতে পেরেছেন বলেই তিনি এমন সার্থক গুরু হয়ে উঠতে পেরেছেন। আবার এই অন্তর দৃষ্টির তাগিদেই এখনও প্রবল কর্মশক্তির অধিকারী হয়েও দক্ষিণীর দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন পুত্র সুদেব গুহঠাকুরতার হাতে। ও'র মত হোলো যথাসময়ে আসন ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী যুগের কর্মীদের তৈরী হবার সুযোগ না দিলে দক্ষিণী গড়ার উদ্দেশ্যই ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার সংগে সংগে দক্ষিণী শেষ হয়ে যাক এটা আমি চাই না। আর ওদের যদি ভুলত্রুটি কিছু ঘটে শুধরে দেবার জন্য আমি ত রইলামই। ক্ষমতা ফুরিয়ে [illegible] পর থেকেও-না-থাকার চেয়ে [illegible] থাকতে থাকতেই না থেকেও-থাকায় আমি বিশ্বাসী।

আজকের রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার এই উজ্জ্বল মুহূর্তেও অনেকের মনে সন্দেহ জাগছে এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে। এসম্পর্কে কি বলবেন?

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই রয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর : এই যে আমাদের নতুন জীবনের চাঞ্চল্য, গানের মধ্যে এর কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই একদিকে গানবাজনার পরে অনাদরও যেমন লক্ষ্য করা যায় আরেকদিকে তেমনই আদরও দেখছি। আজকাল ঘরে ঘরে হার্মোনিয়ম, গ্রামোফোন, পাড়ায় পাড়ায় কনসার্ট। এতে অনেকটা রুচিবিকার দেখা যায়। কিন্তু চিনি জ্বাল দেবার গোড়ার বলকে রসে অনেকটা পরিমাণ গাদ ভেসে ওঠে। সেই গাদ কাটতে কাটতেই রস ক্রমে গাঢ় ও নির্মল হয়ে আসে। আজ টগবগ শব্দে সংগীতের সেই গাদ ফুটছে, পাড়ায় টেঁকা দায়। কিন্তু সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। সুখবরটা এই যে চিনির জ্বাল চড়ানো হয়েছে।

আজকের দিনে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি সকলের উদ্দীপনার প্রবাহ সম্বন্ধেও আমার ঐ একই কথা। বাড়তি কথাটা প্রথমেই বলেছি এ সংগীতের কাব্যমূল্য শিক্ষা-মার্জিত মনকে টেনে নেবেই।

আমার প্রশ্ন শেষ। আপনার নিজের কিছু বলার নেই?

নিজের বলতে আমার কি আছে বল? রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় নেই। তাঁকে নিয়েই আমাদের যা কিছু আস্ফালন, লম্ফঝম্প সবই। তবু তাঁরই সংগে মিশে আছি এইটুকুই আমাদের গৌরব।

সন্ধ্যা সেন

লেখকের ভূমিকায় পাঠক
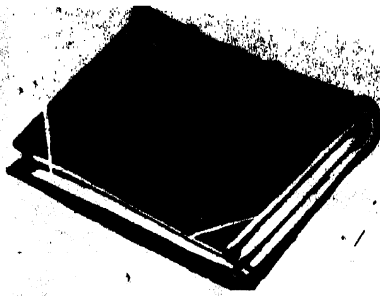
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত মাসিক পত্র 'হারপারস'-এর অন্যতম প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক টনি জোনস এ বছর ১০ জানুয়ারী থেকে এক সময়ের জনপ্রিয় 'হারপার'স উইকলি' পত্রিকাটি নব-কলেবরে প্রকাশ করছেন। পত্রিকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মোট যোলো পৃষ্ঠার ঠিক অর্ধেকটা থাকে পাঠকদের চিঠিপত্র। কেবল জনমতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নয়, পাঠক সমাজের মানসলোকের নতুন চিন্তা-ভাবনাকে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরাই এ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদির আলোচনার মধ্যেই যাতে ঐসব চিঠিপত্র সীমাবদ্ধ না থাকে, এবং পাঠকসমাজ যাতে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষকে নতুন নতুন বিষয়ে পরামর্শ দিতে এবং নিজেদের নির্বাচিত বিষয় সমূহে স্বাধীনভাবে লিখতে উৎসাহিত হ'ন সে উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বিজ্ঞপ্তির সাহায্য নিয়ে থাকেন। প্রথম ছয় মাসে পত্রিকাটি ৪৫,০০০ গ্রাহক সংগ্রহ করেছেন।

শলোখভের 'অর্ডার অব লেনিন' লাভ

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত রুশ কথা-সাহিত্যিক মিখাইল শলোকভের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সোভিয়েত সরকার তাঁকে 'অর্ডার অব লেনিন' প্রদান করবেন—এ কথা আমরা পূর্বেই জানিয়েছিলাম। গত ১৮ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি এ পুরস্কার তাঁকে প্রদান করেছেন বলে জানা গেল। এই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি তাঁর ভাষণে শলোখভকে 'বিপ্লবযুগের বিশ্লেষক' বলে আখ্যা দেন ও শ্রদ্ধা জানান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্র সংবাদ হিসেবে তথা পাঠকবর্গের চিঠিপত্র কলামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার সম্পর্কে যে সব খবর জানা গেল, তা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। বহু বিশ্ববিশ্রুত মনীষী তথা গবেষকের পুণ্যস্মৃতি জড়িত এই বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীটির অবস্থা এক কথায় শোচনীয় হয়ে পড়েছে বললেই হয়। এটা যে কেবল পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য হয়েছে তাই নয়। এই পাঠাগার যাঁরা ব্যবহার করেন, সেই ছাত্র, অধ্যাপক তথা গবেষকদের মমতার অভাবও, পাঠাগারের এই অবস্থার জন্য কম দায়ী নয়। বহু দুর্মূল্য বইয়ের পাতা কে বা কারা ছিঁড়ে নিয়ে গেছেন এবং এভাবে বহু মূল্যবান বই কার্যতঃ অকেজো হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন ভাষা ও বিষয়ে প্রায় চার লক্ষ সত্তর হাজার বই এবং সাময়িকপত্র এই পাঠাগারে আছে বলে জানা গেল। বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বার্থে কর্তৃপক্ষ তথা বিদ্বৎসমাজ এই পাঠাগারটি যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা তথা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন এটাই সকলে আশা করেন।

শরৎ-স্মরণে : মজফ্‌ফরপুরে

গত ১৩ জুলাই রবিবার মজফফরপুরে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশত-বার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার কথা ছিল অমৃত সম্পাদক, সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি মজফফরপুরে যেতে না পারায় বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কে কে মণ্ডল এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। ডঃ মণ্ডল তাঁর ভাষণে শরৎচন্দ্রকে আন্তর্জাতিক স্তরের মহৎ ঔপন্যাসিক বলে উল্লেখ করেন। কবি-সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এই অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে বলেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বাইশটি বছর বিহারের এই অঞ্চলে কাটিয়ে গেছেন। তিনি কেবল বাংলার নন, গোটা দেশের। শরৎচন্দ্রের স্মৃতিকে যথোপযুক্তভাবে রক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সাহিত্য যাতে সুলভে বাংলা ও হিন্দীতে প্রচারিত হয় সেজন্য তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করেন। হিন্দী কবি ডঃ শ্যামানন্দ কিশোর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎবক্তৃতামালা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। রামদয়াল সিং কলেজের হিন্দী বিভাগের প্রধান আচার্য জানকীবল্লভ শাস্ত্রী শরৎচন্দ্রকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক আখ্যা দেন।

সংবাদপত্র মুদ্রণে 'কম্পিউটার'

ব্রিটেনের 'মিরর' গোষ্ঠীর সংবাদপত্রগুলি কম্পোজের জন্য এখন থেকে কম্পিউটারের সাহায্য নেবেন। পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নব-প্রবর্তিত ব্যবস্থার ফলে এতকাল প্রচলিত ধাতব টাইপ বা ব্লকের ব্যবহার প্রয়োজন হবে না। বিজ্ঞাপন ও চিত্রাদিসহ সমস্ত সংবাদ তথা নিবন্ধাদি সরাসরি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ফটো কম্পোজ ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হবে।

ডেভিড হেয়ার দ্বিশত জন্মশতবার্ষিকী

যে সব প্রাতঃস্মরণীয় বিদেশী ভারতবর্ষকে স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করে, শিক্ষা বা সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে নবজাগরণে সাহায্য করেছেন। ডেভিড হেয়ার নিঃসন্দেহে তাঁদেরই একজন। আগামী পয়লা সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মের দ্বিশত বর্ষ পূর্ণ হচ্ছে।

ভারংকার
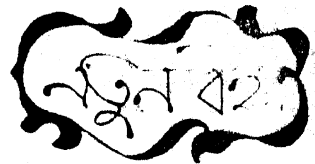
স্বপ্ন হতে বিদায়—নবগোপাল দাস। প্রকাশ ভবন ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। আট টাকা।

নবগোপাল দাসের নতুন উপন্যাসের নায়িকার নাম স্বপ্না। লেখক তাকে নিজেই বলেছেন, "সংস্কারমুক্ত রহস্যময়ী"। কিন্তু পাঠকের মনে হতে পারে, সে যতোটা সংস্কারমুক্ত ততোটা রহস্যময়ী নয়। অথবা, সংস্কারমুক্ত বলেই হয়ত সে অনেকের কাছে রহস্যময়ী। আসলে কমল-বিশাখা-অর্জুনের মতো যারা একটা চলে-আসা সংস্কারের ছকের মধ্যে বাস করে, স্বপ্নার মতো মেয়ে তাদের চোখে রহস্যময়ী হিসেবেই দেখা দেয়। কারণ রেখে-ঢেকে (অথবা তার ভাষায় মন জুগিয়ে) কথা বলা স্বপ্নার ধাতে আসে না। এমন কি জীবনের গোপনীয়তম অভিজ্ঞতাকেও সে অবারিত করে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। বিয়ের আগে তার কুমারীত্ব খোয়াবার ইতিহাস শুনে কমল-বিশাখা তাই স্তব্ধ হয়ে যায় এবং স্বপ্নাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক অর্জুনের মুখ হয়ে যায় ফ্যাকাশে। সত্যেরে লও সহজে—মুখে বলা যতোটা সহজ কাজে করা ততোটা মোটেই নয়। স্বপ্না যেন

এ-কথাটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেই দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছিল।

দাদা টি বি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে দাদার বন্ধু কমল আর তার স্ত্রী বিশাখার কাছে কয়েক মাসের জন্যে থাকতে আসে স্বপ্না। এই কয়েক মাসের জীবন স্বপ্নার কাছে খানিকটা স্বপ্নের মতো ঠিকই, কারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে স্বপ্না কমলের আলিপুরের ফ্ল্যাটে এসে যে জীবনের স্বাদ পায় তা সে আগে কখনও পায় নি। যেন অনিবার্য ভাবেই কমলের জীবনে সংকট ঘনিয়ে আসে স্বপ্নাকে কেন্দ্র করে, কারণ দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে হাজির হয় তরুণ অর্জুন। প্রধানত এই তিনজনকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে কাহিনী। তারপর কমলের লেখক বন্ধু প্রভাতের আবির্ভাবে গল্প অন্য দিকে মোড় নেয়। যে-লেখকের রচনাকে বাস্তব থেকে অনেক দূরের ব্যাপার মনে হয়েছিল, স্বপ্নার মতো শিরদাঁড়াওয়ালা মেয়ে কেমন করে তারই হাতে নিজেকে সমর্পণ করলো তা নিপুণভাবে বলে গেছেন শ্রীনবগোপাল দাস। ভাষায় কোনো অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, কিন্তু পাঠককে টেনে নিয়ে যায় শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস, ৭-ই, লিন্ডসে স্ট্রীট কলকাতা-১৬। চার টাকা।

শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা তিনি তাঁর অভিনয়ের ফাঁকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কাব্য চর্চাও করেন। অভিনয়ে নামার আগেও তাঁর কবিতা ছোট বড় পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখেছি। কিন্তু সেগুলির কথা এখন আমরা ভুলতে বসেছি, তখনি তাঁর একটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হওয়ায় একজন অভিনেতার শিল্পীমানসের আর এক পরিচয় সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত সহজ হল।

কাব্যগ্রন্থটিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে কবিতাগুলি সংকলিত করেছেন কবি। প্রত্যেকটি পর্যায়ে স্বতন্ত্র নামও আছে—'নষ্ট [illegible]', 'ইতস্তত', 'খেলায় তার সঙ্গে, দীর্ঘশ্বাসের করতলে, এ অহল্যা রাজ্যে', 'অরাফ ও প্রতারকের সুখ,' 'জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে' এবং মধ্যাহ্ন!'। প্রত্যেকটি পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট লিরিকগুলির স্বতন্ত্র কোন নাম নেই। বোধ হয় নাম না থেকে সংখ্যার ক্রমে সাজাবার ফলে এক একটি পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবির মন বোঝা সহজ হয়েছে। প্রেম, বিষাদ, প্রকৃতি আত্মমগ্ন, অনুভাবনা, স্মৃতি—এই সবকেই বিষয় করেছেন তিনি কবিতায়। কবি বলেছেন—'পিছনের দিকে তাকাতে সাহস হয় না তোমার ছবি অন্ধকার হয়ে যাবে,' 'শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে আমার ভয় নেই যেহেতু গুণীনের গানে দূরে জলপ্রপাতের হুংকার, তক্ষা তন্ময়ত হয়।' এই জাতীয় একাধিক লাইনে কবির চিত্রকল্পের কাব্যময় অভিজ্ঞতা সহৃদয় পাঠককে তৃপ্ত করে।

মানুষ ও মন। কালী কর। ওরিয়েন্টাল বুক সিন্ডিকেট ৪৪।১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯। সাড়ে সাত টাকা।

বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি কথা প্রায় প্রচলিত প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে—তা হল, বাংলাদেশ গানের দেশ। গীতি কবিতা এই দেশ ও জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যে দেশ এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গানের জন্ম দেয়, সেই দেশেই গানের ইতিহাস রচিত হয়েছে আদি বাংলা চর্যা থেকে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে সুরের উন্মেষ, আজ পর্যন্ত তারই কোমল, মধুর, কখনো বা কঠিন রাগবিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীকালী কর রচিত 'মানুষ ও মন' গীতসংকলনটি পড়ে এমন কিছু কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যায়। আলোচ্য গীতি রচয়িতা দুটি খন্ডে তাঁর গানগুলিকে ভাগ করেছেন। প্রথম খন্ডে 'মানুষ', দ্বিতীয় খন্ডে 'মন'-ই তাঁর গানের বিষয়। বাংলা গান কোন কালেই মানুষ বাদ দিয়ে রচিত হয় নি। একদিকে মানুষ আর একদিকে কবি মন—এই দু-এর উপর নির্ভর করে বাংলা গানের সগৌরব অভিযাত্রা ঘটেছে।

'মানুষ' পর্যায়ের গানগুলি বাস্তবিক অর্থে যথেষ্ট উদ্দীপনামূলক—সে উদ্দীপনা সাময়িক নয়, বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক নয়—চিরকালীন মানবমনে যে যুবজনোচিত বাসনা সক্রিয়—তাকেই গীত রচয়িতা প্রধান আশ্রয় করেছেন। এই কারণেই একটি গানের সিদ্ধান্তে কবি গেয়েছেন— 'সেবা প্রেমের দীক্ষা নিয়ে সংসারে তার জন্ম হয়। স্বরূপ ধর খেয়াল হাত আপন কর্ম সম্পাদনে। এইভাবে 'মানুষ' পর্যায়ে সম্ভবত 'মানুষই' হয়েছে প্রধান ধ্রুবপদ। একটা কথা নিশ্চয়ই মানতে হবে— ম্যান ইজ দি মেজার অফ অল থিংস'। আজকের দিনে মানুষকে সমস্ত কিছুর নিরিখ ধরতে হবে—এই কথাটি শ্রীকালী কর তাঁর গানে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যক্ত করেছেন।

মন পর্যায়ের গান কবির হৃদয়ার্তির সম্যক প্রকাশ ঘটিয়েছে। কবির কাব্য ভাবনা গীতি সুরে অনুভব যে আদৌ কৃত্রিম নয়—মানুষ ও মন—উভয় পর্যায়ের, গানই তা প্রমাণ করে। অকৃত্রিম হৃদয়ার্তি আলোচ্য গ্রন্থের গানগুলির যেমন সম্পদ, তেমনি কবির সচেতন সজাগ শব্দপ্রয়োগ তার পরিচ্ছন্ন সুর-উদ্দীপনের সহায়ক নিঃসন্দেহে'। 'মানুষ ও মন' গ্রন্থটি যে কোন গায়ক-গায়িকার ও সুরকারের সংগ্রহযোগ্য।

হাইনের কবিতা । সম্পাদক— চিত্তরঞ্জন ঘোষ । ভারত গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতি ২৭-জি কলেজ স্ট্রীট কলকাতা—১২। চার টাকা।

জীবিত ও মৃত বাঙালী কবিদের হাইনের কবিতা অনুবাদ দিয়ে বর্তমান সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। অনুবাদকদের মধ্যে আছেন যেমন রবীন্দ্রনাথ থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত বিশিষ্ট কিছু স্বর্গত কবি। জীবিত কবিদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়,, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তরুণ সান্যাল; শঙ্খ ঘোষ, রাম বসু প্রমুখ। সংকলনের সম্পাদক লিখিত দীর্ঘ ভূমিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান। অনূদিত কবিতাগুলি বাঙালী পাঠকদের পক্ষে হাইনের কবিতা বোঝার ও আপন করে নেওয়ার দিক দিয়ে সার্থক। শব্দচয়নে, ছন্দের প্রকরণে এবং চিত্রকল্পকে এদেশীয় করার পক্ষে কবিদের প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য। সংকলনটি অনুবাদ কবিতা পাঠকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার যোগ্য।

কালিদাসের নবমূল্যায়ন । কমলকুমার সান্যাল । সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণি কলকাতা—৬। ছয় টাকা।

বাংলা সাহিত্যে কালিদাস ভাবনা নতুন কোন বিষয় নয়। উনিশ শতকের রেনেসাঁ প্রবাহে কালিদাস নানাভাবে নানাসূত্রে আলোচিত হয়েছেন। কালিদাসের নবব্যাখ্যার চরম করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেও এখনো অনেক উৎসাহী লেখক কালিদাসের নবমূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। কমলকুমার সান্যাল রচিত কালিদাসের নবমূল্যায়ন গ্রন্থটি তারই দৃষ্টান্ত। লেখক ভূমিকা বাদে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্যকে ভাগ করেছেন। কালিদাসের কাল-এর ব্যাখ্যায় লেখক সার্থক। তাঁর অধ্যয়ন অনুসন্ধিৎসা, তাঁর পান্ডিত্য ও মনন, সর্বোপরি তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্ত—বিতর্কের অবকাশ রাখলেও নূতনত্বে সার্থক। লেখক কালিদাস সম্পর্কিত আলোচনায় যে ভাবাবেগে তাড়িত না হয়ে বুদ্ধি যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি বজায় রেখেছেন তা আমাদের আকৃষ্ট করেছে।

কদম—কে ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

কথা ছিল—
প্রত্যেকের মশাল থেকে আগুন নিতে নিতে
প্রত্যেকের মশাল জ্বলবে।
তবু সব ঘর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কেন?

হাওয়ায় কোনো কথাই কদমগাছটার
কানে পেঁাছোয় না।

শরতের রোদ আসবে কখন?

রোমান্তের চঞ্চল বলগুলো
ঝাঁপিয়ে পড়ে না কেন
সবুজ নদীতে

সেইসব নিমন্ত্রণের জন্যেই তো বাঁচতে চেয়েছিলুম
আমরা—
সমাহিত স্পিনোজা যেমন
আতশকাচ ঘষছেন তো ঘষছেন,
নিউটন তাঁর পকেটঘড়িটা গরমজলে ফুটতে দিয়ে
প্রাতরাশের কাঁচা ডিমটার দিকে
নিবদ্ধদৃষ্টি!

জীবনের একটি সেকেন্ডও কেন
ঝাঁপিয়ে পড়ে না অনাত্মতায়?

হাওয়ায় কোনো কথাই কদমগাছটার
কানে পেঁাছোয় না।

মাঝে মাঝে হার হয় ॥

পলাশ মিত্র

মাঝে-মাঝে হার হয়
হেরে যেতে হয়।
বুকের কঠিন হাড়
মাঝে-মাঝে ভেঙে যায়ঃ
সুবিশাল মহীরুহ কখনো বা নত হয়
পথের ধুলোয়।
কখনো [illegible] পাপ আমাদের ছুঁয়ে যায়
আমাদের [illegible] নিঃশ্বাসে
আমাদের [illegible] প্রবঞ্চনা
ললাট লিখন হয়ে থাকে।

মাঝে-মাঝে হার হয়
এ-ও বুঝি জীবনের নবতর স্বর :
হয়তো পথের ধুলো ঘেঁটে পাবো
কোনো মণিহার।

অথচ শীত চলে যায় ॥

প্রদীপ রায়চৌধুরী

একজন নির্ভেজাল পাপী অথবা পুণ্যবান
আমাকে দেখাবে

বিশ্বাসের আলোকবৃত্তে থেকেও
কারো কারো
যৌবন নিষ্ফলা থাকে

যেমন চন্দ্রমল্লিকার বুক জুড়ে
কুঁড়ি আসে না
অথচ
শীত চলে যায়

বিজয়া, তোমার সান্নিধ্যে এসেও
তেমনই
থমকে থাকে
আমার
অভিমানী গৈরিক বিকেল

প্রথম বাঙলা উপন্যাস প্রসঙ্গে

১ শ্রাবণ ১৩৮২ সংখ্যায় 'অমৃতে' শ্রীভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিতর্কিত উপন্যাস 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' আগ্রহসহকারে পাঠ করলাম। এই গদ্য কাহিনীটি যে বাংলা সাহিত্যে (১) প্রথম উপন্যাসের গৌরব, (২) উপন্যাস হিসাবে গণিত হবার যোগ্যতা—কোনটিই অর্জন করতে পারে না—সে-সত্য বিবিধ সমালোচক আগেই উদ্ঘাটন করেছেন। (দ্রষ্টব্য আলোচনা—শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর') শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ, নিতান্তই খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচারক এই গদ্যকাহিনীটি যে অন্যান্য অকিঞ্চিৎকরতার সঙ্গে কাহিনী গৌরবেও (!) একটি ইংরেজী উপন্যাসের ধার-করা ঐতিহ্যের অধিকারী, সে-সত্যকে স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি। অতঃপর তাঁর মতো আমরাও সংগতভাবেই আশা করবো এই গদ্যকাহিনীটি 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার যথার্থ পরিচয়েই প্রতিষ্ঠিত হবে।'

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালের' আত্মপ্রকাশ। যেহেতু 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর ছ' বছর আগে ১৮৫২-য় প্রকাশিত, অতএব তাকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'উপন্যাস আখ্যা দিতে হবে—এ-যুক্তি নিতান্ত নিষ্ফল। উপন্যাস হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলালের অনেক অসঙ্গতি এবং সীমাবদ্ধতা আছে একথা স্বীকার্য তথাপি স্মরণীয় এ-উপন্যাসের মূলে প্রোথিত সে-যুগের জাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি জনসাধারণ এবং তাদের বিশ্বস্ত জীবনাচরণের এক বিশিষ্ট পর্যায়ে। কোনো জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম উপন্যাস যাকে বলবো তার সঙ্গে জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চলিষ্ণু ইতিহাসের নিবিড় যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক, বাস্তবের মূলকে যে স্পর্শ করে থাকে। এ-হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' নিশ্চয়ই প্রথম উপন্যাসের গৌরবের অধিকারী। অপর দিকে একই কারণে এই গৌরব দাবির অধিকার হারায় 'ফুলমণি ও করুণা'। ঔপন্যাসিকের উদার ও ব্যাপক মানসদৃষ্টি, বিস্তৃত জীবনপটে অভিজ্ঞতার বিন্যাস ও উপন্যাসোচিত সমস্যা—উপন্যাসের প্রধান এ-তিনটি সর্তের একটিও পালিত হয়নি যে গ্রন্থে তাকে সংগত কারণেই এ-কালের পাঠক উপন্যাস আখ্যাদানে অক্ষমতা জানাবেন, খুব বেশি হলে 'গদ্যকাহিনী' এ-জাতীয় আখ্যাদান করতে পারেন। এ-কারণেই আচার্য সুনীতিকুমার গ্রন্থটির 'পরিচিতি' অংশে একবারও একে উপন্যাস না বলে সর্বত্রই 'বইখানি' বলে উল্লেখ করেছেন।

ভক্তিমাধববাবু জানাচ্ছেন ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' অনূদিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম। 'The Week' -এর আদ্যোপান্ত ঘেঁটে তিনি প্রমাণ করেছেন, কাহিনীর ক্ষেত্রেও এ-গ্রন্থটি মৌলিকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ। কিন্তু ভক্তিমাধববাবুকে আমাদের প্রশ্ন 'ফুলমণি ও করুণা' যখন উপন্যাস পদবাচ্য হবার অধিকারীই নয়, তখন এ-গ্রন্থটি 'অনূদিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলায় প্রথম' তাঁর এই মন্তব্য কি কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট বলে মনে হয় না? অন্ধ অ-খৃষ্টান বিরোধিতায় যেমন লেখিকা ভারতবর্ষকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেননি, তেমনি সেকালের সৃষ্টিশীল ইংরাজি উপন্যাসের ধারাকেও উপলব্ধি করেননি লেখিকা। আসলে জীবনের কাছে মুলেন্সের কোনো মহৎ জিজ্ঞাসা ছিল না—তাই 'ফুলমণি ও করুণা' যেমন বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মৃত্তিকাসংলগ্ন নয়, তেমনই নয় ইংলণ্ডের সেকালের গৌরবের আকাশে আকাশবিহারী। তার ফল যা হবার তাই হয়েছে—সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসের রাজ্যে তার ঠাঁই হয়নি, নিতান্তই 'গদ্যকাহিনী' হবার এক-কণা গৌরবেই তার সীমাবদ্ধ স্মরণ।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইমামবাজার রোড, হুগলী।

টমাস মান প্রসঙ্গে

অমৃতের ২৫ জুলাই-এর সংখ্যায় বিজয় দেব মহাশয়ের টমাস মান শীর্ষক আলোচনার জন্য সম্পাদক মহাশয় ও প্রবন্ধ লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

টমাস মান সম্বন্ধে যাঁদের পড়াশুনো আছে, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন তাঁর প্রথম দিককার জীবন। স্কুলে ভর্তি করা হলেও কিছুতেই এই স্কুল-জীবন তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। পরিবর্তে তিনি দেশ-বিদেশের বই পড়েছেন। যার জন্য বন্ধুরা তাঁকে ডিঙিয়ে পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্থান দখল করেছে। আর তিনি? তিনি নানা ধরনের বই পড়ছেন। সংগীতচর্চা করছেন। চেষ্টা করছেন কবিতা লিখতে। সবকিছুই করছেন, করছেন না কেবল স্কুলের পড়াশুনা। আর তার জন্য খেতে হচ্ছে বকুনি। এইভাবে চলতে চলতে একদিন তাঁর বাবার মৃত্যু হল। তখন মা বললেন টমাস একটা চাকরির চেষ্টা করতে হয়। এই লেখা নিয়ে কি পেট ভরবে? অগত্যা মায়ের কথায় চাকরি যোগাড় করতে হল একটা বীমা কোম্পানীতে। কিন্তু হায়। শিল্প-জগতে যিনি আত্মমগ্ন তিনি কি কখনও বীমা কোম্পানীর সীমাবদ্ধ জীবনে মনসংযোগ করতে পারেন। তাই স্বেচ্ছায় তাঁকে এই চাকরিতে ইস্তফা দিতে হল। তারপর আবার একটা চাকরি। এবার সামরিক বিভাগে, তাও ছাড়লেন। সবই ছাড়লেন কিন্তু নিজের লেখাগুলো কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না। এই সময় 'সিনপলিসিমাস' পত্রিকায় তাঁর কিছু গল্প প্রকাশিত হয়। এবং এই পত্রিকা থেকেই সর্বপ্রথম তিনি কিছু পারিশ্রমিক পান। প্রথম জীবনের সেই যে সামান্য কয়টি মুদ্রার কথা তিনি জীবনে ভুলতে পারেননি। তাঁর প্রতিভার এ এক নতুন স্বীকৃতি। এরপর তিনি এই 'সিনপলিসিমাস' পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশীদিন জড়িত থাকতে পারলেন না। হেনরিক মানের সঙ্গে পাড়ি দিলেন রোমে। উদ্দেশ্য সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা। আর এইখান থেকেই জন্ম নিল তাঁর প্রথম বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'বাডেনব্রুকস'। পরে ১৯০১ সালে এই উপন্যাসটি দুই খণ্ডে বের হয়। যা সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে অগণিত মানুষের মন জয় করে নেয়।

সত্যি কি অপূর্ব ছিলেন এই মানুষটি, টমাস মান। তাঁর জীবনী, তাঁর উপন্যাস প্রতিটি মানুষেরই মন জয় করে নেয় এক মুহূর্তে।

অমিতাভ ঘোষ
হালিসহর, ২৪ পরগণা।

বিভূতিভূষণ ও পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে

পুষ্পককুমার পাল,
মেওয়া নার্সারী, লক্ষ্ণৌ।

২৫শে জুলাই অমৃতে প্রকাশিত উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়-এর 'বিভূতিভূষণ' শীর্ষক চিঠিটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যে আমাদের মতো অনেকের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। বিভূতিভূষণ বলতে যদি শুধু 'পথের পাঁচালী'কে বোঝায়, তাহলে তাঁর অন্য সৃষ্টিগুলো কি নিরর্থক? কারণ তাঁর 'আরণ্যক' গ্রন্থে বর্ণিত লবটুলিয়া বইহারের অরণ্য প্রকৃতি 'পথের পাঁচালী' ধৃত প্রকৃতি-চেতনা থেকে কোনমতেই নিকৃষ্ট নয়। 'দৃষ্টি প্রদীপ' ও তাঁর ডায়রীগুলোতেও বলিষ্ঠ ও উন্নত মানের প্রকৃতি বিষয়ক রচনা সম্পর্কেও সেই একই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রভৃত ছোট গল্প, উপন্যাস, চিঠি-পত্র ও ডায়রী লেখক বিভূতিভূষণকে শুধু মাত্র একটি বিশেষ গ্রন্থের রেফারেন্স টেনে বিচার করার প্রবণতা মোটেই শ্রেয় নয়। এই ব্যাপারে আমাদের দেশের সাহিত্য সমালোচকদেরও কিছু পালনীয় দায়িত্ব আছে বলে মনে করি।

—বিমলকান্তি ভট্টাচার্য,
জামরুল, [illegible]
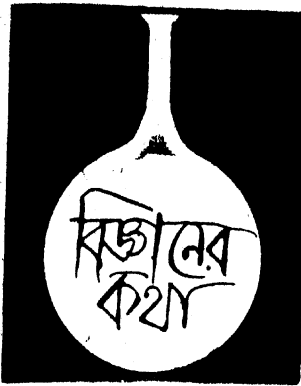
* মহাকাশ-গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
* ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে

এক-নম্বর স্পুৎনিককে আকাশে তোলা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৪ অকটোবর তারিখে। তখন থেকেই মহাকাশ-গবেষণার যুগের শুরু বলা চলে। তারপরে ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে বিশ্বের প্রথম মানুষ য়ুরি গাগারিন কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমা করেন। তারপর থেকে মাত্র চোদ্দ বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে কত অজস্র উপগ্রহ যে পৃথিবীর আকাশে তোলা হয়েছে, কত বিভিন্ন রকমের গবেষণার উদ্দেশ্যে, তা এক বিরাট ইতিহাস। আর শুধু তো পৃথিবীর কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপন নয়, মহাকাশ-অভিযানে গত কয়েক বছরে আরো সব যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গিয়েছে। মহাকাশযানের সাহায্যে খুব কাছের থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে শুক্র-গ্রহ ও মঙ্গলগ্রহকে। মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে মঙ্গল ছাড়িয়ে, বৃহস্পতি ছাড়িয়ে, প্লুটোর দিকে—এবং প্লুটো ছাড়িয়ে নক্ষত্র-লোকের দিকে। অন্যদিকে এই পৃথিবীরই মানুষ পদার্পণ করতে পেরেছে চাঁদের মাটিতে (২১ জুলাই, ১৯৬৯)—মাত্র এই একবারই নয়, চাকাওলা গাড়ি পর্যন্ত চাঁদের মাটিতে নামানো হয়েছে। সব মিলিয়ে মহাকাশ-গবেষণায় এতদিকে এত তৎপরতা যে, অল্পকথায় তার একটা হদিশ দেওয়া এখন এক অসম্ভব ব্যাপার।

গোড়ায় অনেকে বলেছিলেন মহাকাশ-অভিযানের বিরাট খরচের তুলনায় সুফল এতই সামান্য যে এই গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু এখন এই সমালোচনা বন্ধ হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, শুক্র বা মঙ্গল বা বৃহস্পতির কথা যদি বাদই দেওয়া হয়—এমনকি আমাদের নিজস্ব বাসভূমি এই পৃথিবী সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হলেও বাইরে থেকে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করার একটা ব্যবস্থা অবশ্যই চাই। একটি উপগ্রহ থেকে যখন পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করা হয় বা পৃথিবীর আলোকচিত্র তোলা হয়, তখন তার মধ্যে ভূপৃষ্ঠের সামান্যতম ভাঁজ পর্যন্ত ধরা পড়ে। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ যতোই গভীর হোক তার এলাকা [illegible] বা কোথায় তৈল তার সন্ধান আরো ভালোভাবে পাওয়া যেতে পারে উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ থেকে। কোথায় জল দূষিত হচ্ছে, কোথায় ফসল কি রকম—এসব খবরও সোভিয়েত ও মার্কিন, উভয় দেশের বিজ্ঞানীরাই উপগ্রহ থেকে পৃথিবী পর্যবেক্ষণের এই বিশেষ ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় তৎপর। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত প্রায় সাতশো উপগ্রহ আকাশে তুলেছেন বিভিন্ন গবেষণার উদ্দেশ্যে, আমেরিকান বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে সংখ্যায় সম্ভবত আরো কম কিন্তু গবেষণার ব্যাপকতায় সমকক্ষ বা তারও বেশি পৃথিবীর সম্পদ সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্য আমেরিকান বিজ্ঞানীরা প্রথম যে উপগ্রহটি আকাশে তোলেন (১৯৭২ সালের মাঝামাঝি) তার নাম ই-টি-আর-এস ১ (আর্থ রিসোর্সেস টেকনোলজি স্যাটেলাইট)। অন্যান্য উপগ্রহ তো আছেই—যথা, আবহাওয়ার খোঁজখবর নেবার জন্য উপগ্রহ, বিশ্বব্যাপী টেলিভিশন যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য উপগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সোভিয়েত ও মার্কিন উভয় দেশের বিজ্ঞানীরাই এখন গুরুত্ব দিচ্ছেন পৃথিবীর কক্ষপথে মঞ্চ স্থাপন করার ওপরে (স্কাই ল্যাব ও স্যালিয়ুৎ)। এইসব মঞ্চে পৃথিবীর নভশ্চররা ইতিমধ্যেই একাদিক্রমে দীর্ঘকাল কাটিয়ে এসেছেন ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এরূপ মঞ্চ আরো অনেকগুলো তৈরি হতে চলেছে এবং সেই সমস্ত মঞ্চ থেকে পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ একটি পর্যবেক্ষণ অবশ্যই হতে পারবে, তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার, উপগ্রহ থেকে যতো অল্প সময়ের মধ্যে তথ্য সংগৃহীত হয়, ততো অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্লেষণ হয় না। বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রচুর সময় দরকার। যেমন, শোনা যাচ্ছে, তিন বছর আগেকার ই-টি-আর-এস ১ উপগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্লেষিত নয়।

ইতিমধ্যে মহাকাশ-গবেষণায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তা হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমারত অবস্থায় সোভিয়েত সয়ুজ ও আমেরিকান অ্যাপোলোর মিলন। স্মরণ করা যেতে পারে, মহাশূন্যে দুই মহাকাশযান প্রথম সংযোজিত হয় ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে, কিন্তু সেই সংযোজন ছিল একই দেশের দুই মহাকাশ-যানের মধ্যে। তারপর থেকে সংযোজন আরো কয়েকবার ঘটেছে বটে, কিন্তু সেই একই ধরনের—অর্থাৎ, একই দেশের (হয় মার্কিন, নয় সোভিয়েত) দুই মহাকাশ-যানের মধ্যে। সয়ুজ ও অ্যাপোলোর মিলনের মধ্যে দিয়ে এই প্রথম দুই পৃথক দেশের দুই মহাকাশযান সংযোজিত হল। এবং এমন একটি ব্যবস্থা রাখা হল যাতে যে-কোনো এক দেশের মহাকাশযান সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে অন্য দেশের মহাকাশযানের সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে। উল্লিখিত ক্ষেত্রে প্রথমে অ্যাপোলো সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সয়ুজের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, পরে সয়ুজ সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে অ্যাপোলোর সঙ্গে। প্রায় তিন বছর ধরে দুই দেশের বিরাট আয়োজন, প্রস্তুতি, পারস্পরিক বৈঠক, সফর ও পাল্টা সফরের মধ্যে দিয়ে এই যে ব্যাপারটি সংঘটিত হল, তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কেননা, আগামী দিনগুলিতে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত মঞ্চ থেকে গবেষণা চালাবার জন্য বহু নভশ্চরকে আকাশে উঠে আসতে হবে, পৃথিবীর কক্ষপথে বহু মহাকাশযানের পরিক্রমা চলতে থাকবে, সে-সময়ে কোনো একটি মহাকাশযানের বিপদ-গ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকেই। কাজেই এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যে, বিপদের সময়ে যেন যে-কোনো দেশের যে-কোনো মহাকাশযান উদ্ধারকার্যের জন্য আকাশে উঠে আসতে পারে (যেমন সমুদ্রে কোনো জাহাজ থেকে বিপদের সংকেত পাওয়া গেলে দেশের বাছবিচার থাকে না, কাছা-কাছির সমস্ত জাহাজ উদ্ধারকার্যের জন্য ছুটে আসে)। আর মহাকাশে উদ্ধারকার্য চালাতে হলে প্রথমেই দরকার বিপদগ্রস্ত মহাকাশযানের সঙ্গে সংযোগসাধন।

১৯৭৫ সালের বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা—পৃথিবীর কক্ষপথে দুই মহাকাশযানের সম্মিলন (শিল্পীর অঙ্কনে)। এই যৌথ অভিযানে প্রয়োজন হয়েছে এক মহাকাশযানের সংগে অপর মহাকাশযানের সংযোগ (ডকিং), এক মহাকাশযান থেকে অপর মহাকাশযানের নভশ্চরদের যাতায়াত এবং অবশ্যই পৃথিবীর কক্ষে পরিক্রমারত অবস্থায় বিভিন্ন পরীক্ষাকার্য সম্পাদন।

দুই দেশের দুই মহাকাশযানের এই সংযোজনের মধ্যে এক শুভ ভবিষ্যতও নিহিত হয়ে আছে। তা এই যে, এ থেকে মহাকাশ-গবেষণায় এই দুই শীর্ষস্থানীয় দেশের মধ্যে যৌথ উদ্যোগও শুরু হতে পারে। এমনিতেই উপগ্রহ-উৎক্ষেপণ ও মহাকাশ-অভিযান অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ ব্যাপার, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও এই খরচ কখনো কখনো দুর্বিসহ বিবেচিত হয়েছে—অতএব উদ্যোগ যদি যৌথ হয়, তাহলে খরচের দিক থেকে অনেকখানি সুরাহা হবার সম্ভাবনা। উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে মহাকাশ-গবেষণায় অবতীর্ণ হতে পেরেছে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে সহযোগিতার কল্যাণেই।

মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা সর্বক্ষেত্রেই কল্যাণকর, এবং—বর্তমান পরিস্থিতিতে যা তুচ্ছ করার নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতির আবহাওয়া সৃষ্টির পরিপোষক। বিশেষ করে ভারতের পক্ষে এই সহযোগিতার সুফল এমনকি অবিশ্বাসীদেরও বারে বারে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতই যে সর্বপ্রথম মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে সগৌরবে অধিষ্ঠিত তার মূলে রয়েছে এই সহযোগিতা। ভারতে মহাকাশ-গবেষণায় অগ্রগতি অনেকখানি সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতার ফলে। ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্ট আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে ও সোভিয়েত রকেট-উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে। ভারতের দ্বিতীয় উপগ্রহটিও অনুরূপভাবে উৎক্ষিপ্ত হবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সোভিয়েত সহযোগিতা না থাকলে ভারতের পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে ও এমন বিরাটভাবে মহাকাশ-গবেষণায় অবতীর্ণ হওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না।

তেমনি মার্কিন সহযোগিতা না থাকলে ভারতে ১ আগস্ট শুক্রবার থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যে অভূতপূর্ব ও বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ কর্মোদ্যোগ শুরু হতে চলেছে, তা-ও কিছুতেই সম্ভব হত না।

এই কর্মোদ্যোগটি হচ্ছে উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশনের সাহায্যে ভারতের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষামূলক প্রচার। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও (১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা) আলোচনা করেছি। তখনই জানিয়েছিলাম, ভারতের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষামূলক প্রচার চালাবার জন্য যে উপগ্রহটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেটি উৎক্ষেপণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাসা' (ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), নাম স্যাটেলাইট ইন্সট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট (সংক্ষেপে 'সাইট')। উৎক্ষেপণের খরচ পড়েছে সাড়ে কুড়ি কোটি ডলার (অর্থাৎ, দেড়শো কোটি টাকারও অধিক), এক-একটি অ্যাপোলো অভিযানে চাঁদে মানুষ পাঠাবার খরচের প্রায় অর্ধেক।

কেপ কেনেডি থেকে উপগ্রহটিকে আকাশে তোলা হয়েছিল গত বছর ৩০ মে তারিখে, এমন এক উচ্চতায় (৩৬০০০ কিলোমিটার) যাতে উপগ্রহের কক্ষ-পরিক্রমায় সময় লাগে পুরো চব্বিশঘণ্টা। এমনি হলে পরেই পৃথিবী থেকে তাকিয়ে উপগ্রহটিকে মনে হবে স্থির। সাইট এমনি এক স্থির উপগ্রহ।

গত এক বছর ধরে এই স্থির উপগ্রহটি ছিল গ্যালাপাগোস দ্বীপের আকাশে। তখন এই উপগ্রহের আওতায় ছিল গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানকার কাজ শেষ হবার পরে উপগ্রহটিকে [illegible] হয়েছে আফ্রিকার কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের আকাশে। সেখান থেকে উপগ্রহের আওতায় এসে যাচ্ছে ভারতের অতি-বৃহৎ এক অংশ। এই উপগ্রহটির সাহায্য নিয়েই কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ বিহার ও রাজস্থানের পাঁচ হাজার দূর-দূর গ্রামে শিক্ষামূলক টেলিভিশন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতের পক্ষে অভিনব এই পরীক্ষাকার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারতের মহাকাশ-গবেষণা সংস্থা ও আকাশবাণীর যৌথ উদ্যোগে।

'সাইট' কর্মসূচীর যে বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, উল্লিখিত এলাকার গ্রামগুলোতে পাঁচ থেকে বারো বছরের শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক পর্যন্ত সকলের জন্যই কিছু না কিছু শিক্ষামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা তো বটেই, এমনকি কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাও। টেলিভিশনের মাধ্যম ছাড়া দূর-দূর এলাকার এই গ্রামগুলোতে এমনিতে কোনোরকম শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া ভারতের মতো বিরাট একটি দেশে বেশ কিছুকালের জন্য অসম্ভব মনে করা হত। কৃত্রিম উপগ্রহ ও আমেরিকান সহযোগিতার কল্যাণে এই অসম্ভবও অতি সহজে সম্ভব হয়ে গেল।

বিজ্ঞানীরা আশা করেন, মহাকাশ-গবেষণা এবং এই গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সারা বিশ্বের পক্ষেই পরম কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

ক্যানসার বংশগত রোগ হতে পারে

পশ্চিম জার্মানীর গীসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজনন বিজ্ঞানীরা গত পনেরো বছর যাবৎ ক্যানসার রোগে মূল অনুসন্ধানে সচেষ্ট রয়েছেন। [illegible] মধ্যে একদল গবেষক এখন দাবি [illegible]ছেন, এমন সব সাক্ষ্য তাঁদের হাতে এসেছে যা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ক্যানসার রোগ হয়ে থাকে শুধু জীবাণুর দ্বারা নয়, বংশগত কারণেও।

তাঁদের সাক্ষ্য হাজার কয়েক কার্প মাছ। মাইক্রোম্যানিপুলেটর নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে নীরোগ কার্প মাছের শরীরে ক্যানসার রোগাক্রান্ত মাছের শরীর থেকে সংগৃহীত প্রজননগত অংশ প্রবিষ্ট করানো হয়। তারপরে সেই নীরোগ কার্প মাছের শরীরেও দেখা দেয় টিউমার এবং কয়েক মাসের মধ্যেই সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে এই বিজ্ঞানীরা আশ্বাস দিয়েছেন যে, প্রজননগত পাল্টাপাল্টি মিলন ঘটিয়ে ক্যানসার রোগের প্রজননগত কারণ দূর করা যেতে পারে।

অন্যদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ক্যানসার রোগ নাকি ছোঁয়াচে। তবে তাঁরাও আশ্বাস দিয়েছেন, কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যানসার রোগের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কৃত হবে।

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন
ইনক্রিমিন* দিয়ে
ওরে বাবা... দেখেছো!
টপাটপ খাচ্ছে
ঝপাঝপ বাড়ছে
প্রথম দুবছর বাচ্চার বাড়বৃদ্ধি ঠিকমত হওয়া একান্ত দরকার। এই সময়ে তাকে ইনক্রিমিন ড্রপস নিশ্চয়ই দেবেন। তার-পর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন তো দূরের কথা, খেতে দিয়ে যেমন খুশি হয়ে থাকে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে! ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড়কথা—এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
10 ml
Incremin*
drops LYSINE-VITAMINS
TONIC APPETITE STIMULANT

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঝিম্নি বলল, বালু এ সম্বন্ধে মুখ ফুটে একটি কথাও বলেনি ছোটেসাহেব। তবে মেয়ে হয়ে জন্মালে নাকি তারা তৃতীয় একটা চোখ পায়। আমি আমার সেই চোখের দৃষ্টি ফেলে ওর বুকের ভেতরটা দেখে নিয়েছি।

এবার হেসে বললাম, কি দেখতে পেলে?

ঝিম্নি গভীর হয়ে বলল, হাসি নয় ছোটেসাহেব, বালুর চোখের জল তার মনের খবর দিয়ে গেছে। যদি তোমার ওপর তার ভালবাসার টান না থাকত, তাহলে কাজ পাবার লোভে অপমান হজম করে মুখে হাসি ফুটিয়ে চলে যেত। নয়ত চোখে ক্ষোভের আগুন জেলে তৎক্ষণাৎ সে নেমে যেত, ফিরে আর তাকাত না।

একটু থেমে ঝিম্নি আবার বলল, তরুণী একটি মেয়ের কান্না শুধু তার ভালবাসার জায়গায় আঘাত লাগলেই ঝরে ছোটেসাহেব।

আমি ঝিম্নির বিশ্লেষণকে এড়িয়ে আর কোন কথা বলতে চাইলাম না। ঝিম্নির কথাগুলো এমন একটা সত্যকে মেলে ধরল, যা আমার চোখের ওপর আগুনের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। যার ওপর কোন আবরণ দিতে গেলেই তা মুহূর্তে পুড়ে মিথ্যে হয়ে যাবে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ঝিম্নি বলল, একটা কথা রাখবে?

ওর দিকে চাইলাম।

ও বলল, মুখ ফুটে বল—রাখবে?

বললাম, রাখব ঝিম্নি।

ঝিম্নি বলল, বালুকে কাছে বেশী আসতে দিও না ছোটেসাহেব। এ আমার ঈর্ষা বলে যদি তুমি মনে কর, তাহলে আমি বড় ছোট হয়ে যাব। তবে আমি নিজেকে দিয়েই বুঝেছি, তোমার কাছে যে একবার এসে পড়বে তার ফিরে যাওয়া শক্ত হবে।

বললাম, একটা অসহায় পরিবারকে আমি কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম ঝিম্নি।

ও বলল, অন্যভাবে কর। নিজের কাজের সঙ্গে না জড়িয়েও একটি মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করা যেতে পারে।

বললাম, চেষ্টা করব তাই করতে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে জীপের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছিল ঝিম্নি, সেই জীপে করেই ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে তিনটে নাগাদ চলে গেল।

যাবার আগে আমার হাতখানা ওর মুখে তুলে বার বার চুমু খেল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। ওর চোখদুটোতে জলের ছায়া।

বললাম, বড্ড সেন্টিমেন্টাল তুমি ঝিম্নি। এই তো মানালী থেকে নাগগর। কতটুকুই বা পথ।

ও ধরা গলায় বলল, না এলেই বুঝি ভাল ছিল ছোটেসাহেব। জানি না, এইটুকু বুকের ভেতর এত কষ্ট কোথা থেকে আসে।

ওর মুখখানা আমার হাতের পাতায় তুলে ধরে বললাম, তোমার দুঃখগুলো যদি বইতে পারতাম ঝিম্নি, তাহলে কত সুখী হতাম। শুধু জেনে রেখো, সারা দেশ যদি বরফের তলায় চলে যায় তবু কোজি-রি-দেয়ালীর দিনে তোমার ছোটেসাহেব তার ঝিম্নিকে চিরদিনের করে আনতে নাগগরে যাবেই। সেদিন আমাদের সব জমে ওঠা দুঃখ-গুলোকে ভাসিয়ে দিয়ে আসব বিপাশার জলে।

ঝিম্নি বলল, শুধু সেই দিনটির কথা ভাবতে ভাবতে সারা বছরের সব কাজ আমার ভুল হয়ে যাবে ছোটেসাহেব।

বালু আর এল না। তার অভিমানের দুস্তর সমুদ্রটা সাঁতরে সে আর পার হয়ে আসতে পারল না। আমার ফুলদানি বালুর হাতের ছোঁয়া না পেয়ে শূন্য পড়ে রইল।

রোজ সকালে কম্পাউন্ডার শিউশরণজীই আবার রোগীদের লাইনে দাঁড় করাবার [illegible] নিতেন। ওষুধ তৈরীর [illegible] টিকিট ধরে ডাক্তারবাবুর মারফৎ [illegible] পেশেন্টদের ডাক পাঠাতেন। কাজটা অনেক সময় শৃঙ্খলার সঙ্গে হত না। আর ঠিক তখনই বালুর অভাবটা আমার খুব বেশী করে মনে হত।

বাইরের কলে আজকাল আর বড় একটা সাড়া দিই না। অনেক দূরের পথে যাবার ডাক এলে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি। সঙ্গে বালু থাকলে টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে কখন পথ চলা শেষ হয়ে যেত টেরও পেতাম না। কিন্তু দু-একবার ইতিমধ্যে বাইরের কল থেকে ফিরে এসে কেমন যেন শ্রান্ত বোধ করতে লাগলাম।

বালুর পরিবর্তনটা আমার চোখে ইদানীং যে না পড়ছিল তা নয়, কিন্তু আমার কাছে বালু এমন অপরিহার্য হয়ে উঠে-ছিল যে ওর ঐ আকর্ষণের ব্যাপারগুলোকে আমি লঘু করে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

আমার মনের একেবারে গভীরে পাহাড়ে ঘেরা যে সংরক্ষিত সরোবরটি ছিল, যেখানে শুধু আমি আর ঝিম্নি সাঁতার কেটে, ডুবে, [illegible] খেলা খেলতাম, সেখানে

হঠাৎ যেন কার ছায়া ছায়া উপস্থিতি দেখলাম। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ছায়া ফেলে। উঁকি দেয়, আবার সরে যায়। একটা অদম্য কৌতূহল নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখে, কিন্তু ইচ্ছে হলেও নিষিদ্ধ সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জলকে তোলপাড় করে দিতে সাহস হয় না।

হঠাৎ ঝিম্লি এসে পড়ায় সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। কৌতূহলী ছায়া সরে গেল অনেক দূরে।

মনে মনে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়তে লাগলাম। বালুর অসহায় সংসারের কথা মনে পড়তে লাগল। কি কাজ করছে বালু? সে হয়ত এখন বনে জঙ্গলে ঘুরছে লকড়ির সন্ধানে। তাই বেচে সামান্য কিছু পয়সা হয়ত সংগ্রহ করে আনছে। অসুস্থ পণ্ডিতজীর সেবা করছে। তাঁর রামচরিত মানসের আনন্দময় জগৎ থেকে এই নির্মম কঠিন সংসারে বালা তাঁকে নামিয়ে আনতে চায় না।

জুলিয়েন চলে গেছে সারা ভারত টুরে করতে। বেড়িয়ে বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের কাজও দেখাশোনা করবে সে, এই প্ল্যান করেই মিঃ বেনন পাঠিয়েছেন ওকে। জুলিয়েন কাছে থাকলে তার সঙ্গে কথা বলে, পরামর্শ নিয়ে কিছুটা হালকা করে নিতে পারতাম ভারী বুকটাকে।

ঝিম্লি আমার এই অনুক্ত ব্যথার দিনগুলোকে যদি তার চপল উপস্থিতি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারত, তাহলে বুকের মধ্যে জমে থাকা সব বরফ গলে খুশির কুহক হয়ে দিকবিদিক মাতিয়ে ছুটে চলে যেত।

এক একসময় মনে হয়, আমাকে নিঃসঙ্গ করে রেখে জুলিয়েন, বালু আর ঝিম্লি যেন কোথায় লুকিয়েছে। আমি কানামাছির চোখবাঁধা মানুষটার মত অসহায়ভাবে ওদের হাতড়ে বেড়াচ্ছি। ওরা রয়েছে এখনও আমার নাগালের অনেক বাইরে।

খবর আনল ভাগতু। সারা মানালী নাকি ঝাঁক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতির মত হিপি আর হিপিনীতে ছেয়ে গেছে। তারা পাইন ফরেস্ট নদীর তীর থেকে গভর্নমেন্ট বাংলোতে যাবার রাস্তার দুপাশ অধিকার করে নিয়েছে। কম্বল পেতে পাথরের ওপরেই তৈরী করে নিয়েছে তাদের দিনরাতের আস্তানা।

ওদিকে যাইনি কতদিন। জুলিয়েন বাইরে চলে যাবার পর থেকে বাজারের দিকে যাবার বিশেষ কোন আকর্ষণ বোধ করিনি। বাজার ঘুরে ওদের হোটেলে যাবার যে চার্ম ছিল, সেটা আপাতত আর নেই। এখানে পাহাড়ের ওপর যে মুদিখানা রয়েছে, আমাদের দু'তিনটে প্রাণীর প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট। তাছাড়া দোকানীটি ডাক্তার বলে আমাকে দেখা হলেই রোজ নমস্কার করে। আমি ওকে দিয়ে অনেক সময় টুকরো টুকরো প্রয়োজনের জিনিসগুলো বাজার থেকে আনিয়ে নিই।

ভাগতু সেদিন সন্ধেবেলা আর একটা [illegible] [illegible] পথের ধারে টুরিস্টদের জন্যে ছাউনি ফেলে সাময়িকভাবে সস্তা খাবারের যে রেস্তোরাগুলো গড়ে ওঠে, তার একটাতে সে বালুকে রান্না করতে দেখেছে।

আমার কাছে এই মুহূর্তে খবরটি দারুণ চাঞ্চল্যকর হলেও ভাগতুর কাছে মনের উত্তেজনা প্রকাশ না করে বললাম, তুই ঠিক দেখেছিস? কাকে বলতে কাকে দেখেছিস কে জানে!

ভাগতু বলল, আমি নিজের চোখে দেখেছি সাহেব। টুরিস্ট লোকের সঙ্গে কথা বলছে। হাতে চায়ের কেটলি।

বললাম, তা বেশ করেছিস। যা হোক, কোন একটা কাজ করা ভাল।

ভাগতু চলে গেলে বারান্দায় অন্ধকারে চেয়ার পেতে বসলাম। আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করছিল না। নীচে, অনেকখানি নীচে বাজার। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাজার আর হোটেলের আলোগুলো ঝিকমিক করছে। ওরই ভেতর কোন একটা রেস্টরেন্টে টুরিস্টদের জন্যে রান্না করছে বালু। এখন তার দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। কিছুক্ষণ পরেই খাওয়া শুরু হবে, তখন হয়ত ওকেই পরিবেশনের ভার নিতে হবে। ছোট রেস্টুরেন্ট। বেশী লোক রাখবে কোত্থেকে। কাজের শেষে ও হয়ত ছুটি পাবে সেই এগারোটা নাগাদ।

কিন্তু বালু এত রাতে কি একাই কোঠীতে ফিরবে! এই অন্ধকার ভ্যালি পেরিয়ে একটি যুবতী মেয়ে প্রায় মাঝরাতে ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে ফিরে যাবে ঘরে! বালা সাহসী, তবু সাহসের একটা সীমা তো থাকা চাই।

নিজের ওপর রাগ হল। আমি বালুর ভালমন্দের কথা ভাববার কে! আমি তো তার খাওয়া-পরা, ভালোমন্দের দায়িত্ব নিইনি, তবে তার বিপদ-আপদের কথা নিয়ে চিন্তা করবার কি অধিকার আছে আমার। জগতে এই শুকনো সহানুভূতির কি দাম আছে। এগুলোকে অক্ষমের আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে।

ওপরের আকাশের দিকে চোখ পড়ল। রাতের আকাশ ভরে অগণিত নক্ষত্র। কি আশ্চর্য শান্ত আর স্নিগ্ধ! পূব-দক্ষিণের আকাশে জ্বলজ্বল করছে একটি বড় তারা। মনে হল নাগগরের অরণ্য আর তুষার পর্বতের ওপরে যে নীল আকাশ, তারই ওপর তারাটা অতন্দ্র জেগে আছে।

অদ্ভুত একটা তৃপ্তি আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল নাগগরের অরণ্যবাসে নির্বাসিত ঝিম্লি যেন ঐ তারার চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে।

রোজই ভোরবেলা ওঠার অভ্যেস আমার। আগে টাট্টুতে চড়ে অনেকখানি দৌড়ে আসতাম। তারপর ফিরে এসে সূর্যোদয় দেখতাম আমার বাংলোর বারান্দায় বসে। আজকাল ভোরের চক্কর বন্ধ আছে। টাট্টু নিয়ে বেরোই সেই দুপুরে গড়িয়ে অপরাহ্নের দিকে। ভ্যালি পেরিয়ে গিয়ে বসি আমার নির্দিষ্ট জায়গায়।

আজ অনেকদিন পরে ভোরবেলা বেরোলাম। টাট্টু রেখে পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়লাম বাজারের দিকে।

পথের ডানপাশে বিচ্ছিন্ন বসতি, আপেলের বাগান। বাঁদিকে দেওদারের জঙ্গল। বড় বড় কাণ্ড অনেক ওপর পর্যন্ত কংক্রিট পিলারের মত উঠে গেছে। তারপর ঝাঁক ঝাঁক সুঁচোলো সবুজ পাতার সমারোহ ডাল ভরে।

বনের ভেতর ঢুকলে ওপরের আকাশ ডালে পাতায় ঢাকা পড়ে যায়। মাঝে মাঝে এক চিলতে ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ সাদা মেঘ উঁকি দেয়। রোদের সোনা ঝর্ণার মত গলে ঝরে পড়ে ঐ ফাঁকে। তখন বনের কোল জুড়ে কি আশ্চর্য সমারোহ। কোথাও সবুজ ঘাসের ওপর সূর্যের কোমল আলো বিছানো। কোথাও বড় বড় পাথরের শ্যাওলা-ধরা চাঁই-এর ফাঁকে নাকছবির মত নানা রংয়ের ছোট ছোট ফুলে আলোর ঝিকিমিকি খেলা। সবার ওপর গাছের ডালপালাগুলো সোনালী সবুজে জাজিমে কালো সুতোর এমব্রয়ডারী কাজ দেখিয়ে অবাক করে দেয়।

আমি বহুদিন এই সরল বর্গীয় অরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়িয়ে এর রোদ জল ঘাস পাতা ফুলে মেশা এক ধরনের অদ্ভুত মিশ্রিত গন্ধ আঘ্রাণ করেছি। কোন কোন দিন শরতের সকালে কিন্নর-কন্যার মত পার্বতী তরুণীদের বাঁশের তৈরী কিল্তা পিঠে বেঁধে আপেল বাগিচার দিকে দল বেঁধে যেতে দেখেছি এই বনের পথে। তাদের সরল ভীরু চোখ শুধু চলার পথটুকুর ওপর বিছিয়ে থাকত। ছায়ায় আলোয় তারা চলত ঠিক যেন চঞ্চল চকিত হরিণী।

আমি আজ বাজারের পথে নেমে আসতে আসতে ঢুকে পড়লাম অনেক দিনের অদেখা দেওদার বনের ভেতর।

খানিক ভেতরে ঢুকেই বন্যপ্রাণীর মত

কতগুলো বিচিত্র জীবকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলাম। বাইরে আলোর উজ্জ্বলতা থাকলেও দেওদার বন তখনও অস্পষ্ট আলোছায়ায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমি কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে এই জীবগুলোকে দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ডালপালার অজস্র ঝোরকা পথে আলো এসে পড়তে লাগল। সেই আলোয় দেখতে পেলাম ঠিক যেন কতকগুলো শ্বেতশূকর ইতস্ততঃ জড়াজড়ি করে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কোথাও বা মিট সপের হুকে ঝোলানো চাল ছাড়ানো ধাড়ি ছাগলের মত সারে সারে পড়ে আছে। অর্ধ উলঙ্গ হিপি তরুণ-তরুণীরা বনের গভীরে এই প্রান্তরটুকুকে তাদের নিশ্চিন্তে বিশ্রামের জায়গা বলে নির্বাচন করে নিয়েছে।

সেই মুহূর্তে একটা ভয় আমার মধ্যে ধীরে ধীরে কুয়াশার মেঘের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যদি এই মুহূর্তে সেই পাহাড়ী তরুণীরা এসে পড়ে এই পথে! এই আবরণহীন আদিম মানুষগুলোকে যদি ওরা বিকৃত দেহভঙ্গিমায় দেখতে পায়!

আমার আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে ওরা এসে পড়ল। ওদের হাতে ধারালো অস্ত্র। কাঠ সংগ্রহের জন্য ওরা চলেছে বনের গভীরে।

ওরা ওদের পথ ধরে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। শায়িত মানুষগুলোকে এক ঝলক দেখে নিয়ে দ্রুতগতি পাহাড়ী জলধারার মত পেরিয়ে চলে গেল।

কিন্তু আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম ঠিক তাই ঘটল। দলটি বনের গভীরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছে। পেছনে ফিরে আমারই মত গাছের আড়ালে নিজেদের ঢেকে ওদের দেখছে।

প্রথমে কৌতূহল। তারপর তরুণী নাভি থেকে কস্তুরীর গন্ধ উঠে আসবে ধীরে ধীরে। সে গন্ধের টানে পা টিপে টিপে শুধু শিকারী জন্তুগুলোই আসবে না, নিজেদের গন্ধের সন্ধান পেয়ে নিজেরাই একদিন পাগল হয়ে উঠবে ওরা।

নিঃশব্দ পা ফেলে ফেলে ফিরে এলাম বাজারের পথে।

হঠাৎ সরকারী অ্যালুমিনিয়ম হাট-এর সামনে বিরাট বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল: বিদেশী ট্যুরিস্টরা আমাদের জাতীয় অতিথি, তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

বাজার থেকে টুকিটাকি কেনাকাটা করে ফিরতে কিছু দেরী হল আমার। উঠে আসছিলাম, বাঁদিকে ট্যুরিস্ট লজের পথটার ওপর চোখ পড়ল। সাময়িক তাঁবু ফেলে রেস্টুরেন্ট তৈরী করা হয়েছে। ক'টা হিপি বসে চা খাচ্ছে। জায়গাটা খোলামেলা, তাই পরিবেশন-কারিণীকে চিনতে আমার একটুও দেরী হলো না।

ঝকঝকে পোষাক আর হাসিতে বালু ঝলমল করছে। বালু আমাকে দেখছে না, কারণ যেন রোডের দিকে তার চোখ নেই। জাতীয় অতিথিরাই তার সব নজর কেড়ে নিয়েছে। গরমের দিনে রোদ এতখানি অলটিটিউডেও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বালুকে দেখে মনে হল, রোদের সব তীক্ষ্ণতাটুকু যেন ও ওর সর্বাঙ্গে মেখে নিয়েছে।

আমি বালুর দৃষ্টিসীমা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বাংলোর পথে পা বাড়ালাম।

গাছের আড়ালে যখন রেস্টুরেন্টটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন কেমন যেন এক ধরনের অপরাধবোধ আমাকে আহত করতে লাগল। বালুর এই পরিণতির জন্যে কি আমি দায়ী নয়? তার সহজ জীবনযাত্রায় ভাঙন ধরানোর জন্যে আমার অবিবেচনা কি কাজ করে নি?

হঠাৎ মনে হল, বারবার আমি নিজেকে অপরাধী ভাবছি কেন? আমি তো কোন অন্যায় করি নি। বালু আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগেও তার নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই পথ চলেছে। আজও সে সংসার চালানোর জন্যে যে পথ বেছে নিয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজেরই দায়িত্বে। আমি শুধু অকারণ নিজেকে দোষী ভেবে দুঃখ পাচ্ছি।

কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করে নিজেকে অনেকখানি হাল্কা মনে হল। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলাম আমার বাংলোয়।

রোগীরা দাঁড়িয়ে আছে লাইনে। আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা আমাকে নমস্কার করল। মনে মনে লজ্জিত হলাম। অসুস্থ মানুষগুলিকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে গেছি। মনে মনে বললাম, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর, আমিও অসুস্থ। দারুণ একটা মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছিলাম আমি।

রোটাং থেকে কুলু অব্দি, বিপাশার উৎস থেকে বিস্তার পর্যন্ত উড়ে বেড়াল বুভুক্ষু পঙ্গপালের দল। প্রায় একটি মাস পূর্ণ করে মত্ত পঙ্গপালগুলো আবার উড়ে চলে গেল অতিথিবৎসল ভারতের অন্য কোন নগরে।

ভাগতুই খবর বয়ে এনেছিল। ভোরের গাড়ীতে ফিরে গেছে বিদেশী ট্যুরিস্টরা। আরও খবর, পথের ধারের রেস্টুরেন্টটার সব সাজসরঞ্জাম দুপুরেই তুলে নেওয়া হয়েছে।

ভাগতুর হাতে একখানা ফটো দেখে কৌতূহলী হলাম, দেখি ওটা কি?

ভাগতু বোধহয় আমাকে দেখাতেই এনেছিল, তাই বলা মাত্র দারুণ খুশি হয়ে হাতের ফটোটা মেলে ধরল।

ছবিতে ভাগতু দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় কাপড়ের একখানা প্যাগড়ি বাঁধা। হাতে লাঠি।

বললাম, কোথায় ছিল এ ফটো?

ভাগতুর গলায় এবার যেন গর্ব ফেটে পড়ল, সাহেব তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ বিশ্রীরকম রাগ চেপে গেল। বললাম, ফ্যাল্ ফটো। তাই বুঝি ঘন ঘন বাংলোর বাইরে বেরিয়ে যাওয়া হত। ফ্যাল বলছি।

মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে ভাগতুর। সে আত্মরক্ষার জন্যে শেষ অবলম্বনটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল এবার।

কেন, বালুদিদির ফটোও তো তুলে দিয়েছে সাহেব। বালুদিদি আমাকে দিয়েছে একখানা।

ভাগতু কুর্তার পকেট থেকে আর একখানা ফটো বের করে তুলে ধরল আমার চোখের সামনে। এক ফলন্ত আপেল গাছ ব্যাকগ্রাউণ্ডে রেখে রাজপুতানীর পোষাক পরা বালু সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ওর হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে দেখতে লাগলাম। এ কে? এই যুবতীটিকে তো কোনদিন আমি দেখেছি বলে মনে আনতে পারছি না! বালুর চোখ কি এমন করে কোন পুরুষের দিকে উজ্জ্বল ইঙ্গিতে ঝলসে উঠত? চাপা ঠোঁটের হাসিতে কি কোনদিন ফুটে উঠত এমনি আকুলকরা আমন্ত্রণ!

আমি ভাগতুর হাতে ফিরিয়ে দিলাম ঐ যুবতী মেয়েটির [illegible]টোখানা।

হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারের পাতা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। আজ [illegible] সতেরোই জুন। ছোট বরসাত্ শুরু [illegible] গেছে। হাল্কা ধোঁয়ার মত পাত্‌লা পা[illegible] মেঘ উড়ে চলেছে উত্তরের পাহাড় [illegible]না করে। শোবার ঘরে বসে ডালির ওপ[illegible] চোখ পেতে আছি। ঝর্‌ঝির বরসাতের [illegible]ঝিরে চিক দমকা হাওয়ায় দোল খা[illegible] ওপারের পাহাড়ী বারাণী খিলখিলে[illegible]টী পুতুলের মত লোক ঘুরে ঘুরে বতর [illegible] মেতেছে। ঐসব বন্ধ্যা বাদামী রঙের [illegible]ড়গুলোতে লাঙলের ফাল চলে না, [illegible]জ ছড়িয়ে দিয়েই ওরা চলে যায়। প্রকৃ[illegible] খেয়ালে যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

কিছু সময় ঝিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টি ঝরে আকাশটা ঝকঝকে হয়ে গেল। মেঘগুলো তাল তাল ময়লা তুলোর মত তুষার পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। নীল নীল আকাশটা পাটভাঙা বেনারসীর মত ঝলকাচ্ছে। পাইন সবুজ পাতাগুলো ঝলমল করছে। প্রেমিকার মানভাঙা মিষ্টি হাসির মত হলুদ রোদ্দুরটা চোখ জুড়িয়ে একেবারে বুকে এসে লাগল। সারা দেশের চেহারাটা মনে হল আমূল বদলে গেছে।

জুলাইএর প্রথম সপ্তাহ থেকেই অঝোর বর্ষা শুরু। বন্ধ কাচের সার্সির উল্টোদিকটা বৃষ্টির রেণু মেখে ভ্যালির দৃশ্যটাকে ঢেকে ফেলছে বারবার। আমি মাঝে মাঝে জানলা খুলে ওপারের কাচটা মুছে নেবার চেষ্টা করছি। অমনি এপার ওপারের হু হু হাওয়া আমার চাদরখানাকে উড়িয়ে নিয়ে বিছানাকে বে-আব্রু করে দিচ্ছে। দুটো দেয়াল-ক্যালেণ্ডার ভয়পাওয়া পাখির মত সাদা পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কতকগুলো মাসের পাতা ফর্‌ফর্‌ করে উড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে গেল।

(ক্রমশঃ)

নারী স্বাধীনতা ও মেক্সিকোর অধিবেশন
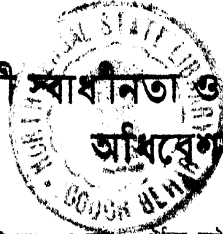
গত ১৯ জুন মেক্সিকো নগরীতে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকেই মহিলা প্রতিনিধিরা অধিবেশনে উপস্থিত হন। যোগদান করেনি সিংগাপুর, ভুটান, কাতার এবং সৌদি আরব। এই জাতীয় মহিলা মহাসম্মেলন প্রথম হল। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন জাতিপুঞ্জের জেনারেল ডঃ কুর্ট ওয়াল্ডহাইম। ডঃ কুর্ট এই সম্মেলনের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করেন এবং স্ত্রী স্বাধীনতা, অধিকার এবং স্ত্রী-পুরুষের সমতারক্ষায় জাতিপুঞ্জের সহানুভূতির আশ্বাস প্রদান করেন। ডঃ কুর্ট আরো বলেন যে, শুধুমাত্র নারী-পুরুষের সমতারক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করাই এই সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—সমাজ কুসংস্কার মুক্ত করে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, সঙ্কীর্ণতার বিলোপ সাধন এবং সাধারণ ও ব্যবহারিক জগতের দৃষ্টি ও চেতনাকে সম্প্রসারিত করতে পারলে সমাজে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন বাধা থাকবে না। এই সম্মেলনে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে কমপক্ষে পাঁচ হাজার মহিলা নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। শ্রীমতী গান্ধী ও মাদাম পেরোন এই সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন আর সে কারণে উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। মহাসম্মেলনে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীমতী বন্দরনায়েক, শ্রীমতী ক্যালেমাটিনা তেরেস-কোভা, শ্রীমতী রবিন, শ্রীমতী সাদাত, শ্রীমতী ভুট্টো এবং শ্রীমতী মারকাস। সবাই এসেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহিলাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি ও ভাব-বিনিময় করতে। মহাসম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য নারী-পুরুষের অধিকারের সমতা রক্ষা করা এবং পৃথিবীতে স্ত্রী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। অথচ এই সম্মেলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আমেরিকার প্রতিনিধিদের সবসময় লক্ষ্য রাজনীতির দিকে এবং সোভিয়েত প্রতিনিধির দৃষ্টি পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার দিকে। মেক্সিকোর অ্যাটর্নী জেনারেল পেদরো ওয়াজেদা পলাদাজু অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতীয় প্রতিনিধির প্রচেষ্টায় ভিয়েৎনাম থেকে আগত প্রতিনিধিকে সম্মেলনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। ইরানের রাজকুমারী ওয়াল্ড হাইমের হাতে বহু অর্থ এই সংস্থার কল্যাণের জন্য দান করেন এবং ইরানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে মহিলাদের সমস্যাগুলির অনুধাবন করার জন্য একটি গবেষণা সংস্থার প্রস্তাব রাখেন।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন পৃথিবীতে নারী ও পুরুষকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চিন্তা করা যায় কিনা এটা এক বিচার্য বিষয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। একজনের অধিকারকে হরণ করে কিংবা পদদলিত করে অপরের অধিকার কোন ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রায় আধা-আধি স্ত্রী ও পুরুষ। প্রত্যেক দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমানভাবে উভয়কেই বিচলিত করে। মহিলারা যত পিছিয়ে থাকুন না কেন দেশের বিবাদ ও সংকটের বোঝা এড়িয়ে গিয়ে কখনই তারা পুরুষের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না।

সম্মেলন আরম্ভ হতে না হতেই পৃথিবীর বিভিন্ন বিবাদমান দেশের প্রতিনিধি মহিলাদের মধ্যে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা, রেষারেষি ও একে অপর দেশের কুৎসা ও নিন্দা প্রচারের প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন থেকে দেখা যায় স্ত্রী অধিকার স্থাপনের জন্য জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টাকে কোন দেশই উপেক্ষা করেন না, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার, কর্তব্য, দায়িত্ব ও ক্ষমতা মাপকাঠির মধ্যে কতদূর সমতা রক্ষা করা সম্ভব এই চিন্তা সকলের মনের এক সংশয় এনে দিচ্ছে। কেউ কেউ চিন্তা করছেন তবে কি সত্যিই নারী-পুরুষ সমান? কি অর্থে সমান সেটা অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। সামাজিক দিক থেকে কতকগুলি সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে মুখে আমরা যাই বলি না কেন কার্যত স্ত্রী ও পুরুষ পুরোপুরি সমতা আনা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধির উক্তিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত প্রতিনিধি বলেছেন যে নারী-পুরুষের সমতা রক্ষা করা উচিত বটে কিন্তু এই সমতা রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে স্ত্রীর রমণীসুলভ বৈশিষ্ট্য ও গুণগুলিকে একেবারেই নস্যাৎ না করে দিতে হয়। নারীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার নারীসুলভ কমনীয়তা ও স্বভাব। নারী-সুলভ কমনীয়তা কিভাবে পুরুষালীর সংগে পাল্লা দিয়ে সমান হতে পারে এই চিন্তা করা খানিকটা অপ্রাসংগিক বলে অনেকের কাছে মনে হয়।

অনেকের মতে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে এই নারীবর্ষের উদ্দেশ্য পুরুষজাতির প্রতি এক জেহাদ ঘোষণা করা। কিন্তু সমাজে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক ও সহায়ক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একে অপরকে বাদ দিয়ে দেশকে সংকটমুক্ত করা এবং প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে কেন স্ত্রী ও পুরুষে সামাজিক অধিকারের বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে! এই বৈষম্য কি এবং এর মূল কোথায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির মধ্যে আজ এই বৈষম্য অনেকাংশে ঘুচে গেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে সেগুলি অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হচ্ছে। পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলি যতদিন পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে না পায়, যতদিন তারা পরনির্ভরশীল তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক সমতার কথা চিন্তা করা চলে না। সেখানে বৈষম্য শুধু নারী-পুরুষের বৈষম্য বলে চিন্তা করলে যথেষ্ট হবে না—সেখানে বৈষম্য পুরুষ ও পুরুষের মধ্যেও যথেষ্ট। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সেদিনই সম্ভব হবে যেদিন পৃথিবী অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

অঞ্জলি চৌধুরী

বহু চিঠি জমা হয়ে আছে, তাই এবারে চিঠির উত্তরই শুধু দেবো। এর মধ্যে এমন অনেক চিঠি আছে যার উত্তর দু-এক সপ্তাহ আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য চিঠির উত্তরের মাধ্যমে। তাই আমার মনে হয় সেগুলি আবার লেখার দরকার নেই! আপনারা সকলেই লিখেছেন যে আপনারা নিয়মিত অমৃতের 'রূপসীর খাতা' পড়েন ও উপকার পাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমনসব প্রশ্ন করেছেন যা 'রূপসীর খাতা' মারফৎ বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমার অনুরোধ যাঁরা নিয়মিত পড়েন তাঁরা যদি একটু কষ্ট করে পাতা উল্টে দেখে নেন তাহলে একই প্রশ্নের উত্তর বারবার দিতে হয় না। অবশ্য যদি বিশেষ কোন প্রশ্ন থাকে যার একটু অদলবদল উত্তর হতে পারে—সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন!

(ক) আলো বসু, বেহালা—আপনার 'রূপসীর খাতা' পড়তে ভালো লাগছে ও উপকার পাচ্ছেন জেনে খুশী হলাম। আপনার প্রথম প্রশ্ন ছুলি কিভাবে সারাবেন।

সাধারণতঃ ছুলি বা ওই জাতীয় মুখে দাগ হওয়ার কারণ হোল ভিটামিন 'সি'-র কমতি ও ত্বকের মধ্যে রোমকূপের মুখে ময়লা ও রস মিশে এক ধরনের ছোপের সৃষ্টি করে থাকে। তবে ছুলি জাতীয় দাগ 'ভিটামিন'সির অভাবেই বেশী হয়ে থাকে। এরজন্য কতকগুলি করণীয় হচ্ছে : (১) মুখ পরিষ্কার রাখা ও (২) ছুলির জায়গাগুলি খসখসে হয়ে যায়—তাকে তৈলাক্ত রাখা।

প্রথমে প্রতিদিন সকালে শশা গোল গোল করে কেটে সেই টুকরোগুলি ছুলির ওপরে লাগিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেই শশা দিয়ে আস্তে আস্তে মুখ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। পরে বড় চামচের এক চামচ অলিভ তেল নিয়ে তাতে একটি পাতি-লেবুর রস দিয়ে এবং সেটা গরম করে ছুলির অংশগুলির ওপর আঙুলের ডগা দিয়ে লাগাতে হবে। বারো থেকে পনেরো মিনিট পরে মুখ ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর মুখ মুছে তার ওপর দুধের সর ও দু-তিন ফোটা মধু ফেটিয়ে মুখে মেখে রাখবেন। কিছুক্ষণ পর সেটা ধুয়ে স্নান করে নেবেন। এছাড়া রাতে শোয়ার আগে মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে কোন ভাল মুখ পরিষ্কার করার ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে মুখ মুছে সামান্য বোরোলীন মেখে শুয়ে পড়ুন। এইভাবে সপ্তাহে তিন-চারদিন করুন এবং পরে সপ্তাহে একদিন করে—খুব ভাল ফল পাবেন। এতে রংও উজ্জ্বল হবে। এছাড়া মাঝে মাঝে 'ভিটামিন সি' খাবেন এবং পাতিলেবুর রস ছুলিতে লাগাবেন।

মাথার চুল ভাল রাখা ও ওঠা বন্ধ করার ব্যাপারে এর আগে আলোচনা করেছি, একটু কষ্ট করে পড়ে নেবেন। সব উত্তর পেয়ে যাবেন।

(খ) এই চিঠিও কলকাতা থেকে এসেছে। আপনি নাম দিতে বারণ করেছেন তাই নাম দিলাম না। তবে একটা কথা না লিখে পারছি না। নিজেকে সুন্দর করে রাখার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। বরং এটা প্রশংসনীয় যে আপনি বেশী বয়সেও এ সম্বন্ধে সচেতন। আপনার প্রথম প্রশ্ন, আপনার হাতের পাতার ওপর ডানায় ও শরীরে ভীষন ময়লা পড়েছে যা ওঠাতে পারছেন না। ফলে আপনার স্বাভাবিক রং ঢাকা পড়েছে। এছাড়া আমার মনে হয় ত্বকের ঔজ্জ্বল্যও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ময়লা পরিষ্কার করার ব্যাপারটা খুব সহজ। তবে পরিশ্রম ও ধৈর্যসাপেক্ষ। মুশুরীর ডাল বেটে তার সঙ্গে একটু তেল ও লেবুর রস মিশিয়ে বেশ করে সমস্ত শরীরে মেখে ডলে ডলে তুলুন দেখবেন কী ভীষন ময়লা উঠে আসবে। দ্বিতীয় দিন কমলা লেবুর খোসা বেটে কাঁচা হলুদ বাটার সঙ্গে মিশিয়ে তাই মেখে ঘষে ঘষে তুলে ফেলুন, তাহলেও শুধু ময়লা উঠবে না রংও পরিষ্কার হবে। এইরকম অন্তত দিন পনেরো করুন। তারপর বেশ করে সামান্য গরম জলে সাবান দিয়ে স্নান করে নেবেন। পরে সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন এরকম করে নিজেকে পরিষ্কার করবেন। আমার বিশ্বাস এতে আপনার রং স্বাভাবিক ও সুন্দর হবেই। পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর মাসে একবার আর একটা কাজ করতে পারেন। একটি ডিমের কুসুম ফেটিয়ে তাতে দু-তিন ফোঁটা মধু, চার-পাঁচ চামচ দুধ, বড় চামচের এক চামচ পরিষ্কার ময়দার সঙ্গে মেখে মুখে ও হাতে মাখিয়ে রেখে তারপর ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলবেন। ত্বক পরিষ্কার চকচকে ও সুন্দর হবেই। এর আগের সপ্তাহে যে খাদ্য তালিকা দিয়েছি সেটা একটু অভ্যাস করলে ত্বক আপনার ভাল হবেই।

এছাড়া রোজ রাতে শোবার আগে মুখ ভাল করে একটু গরম জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে তারপর সামান্য একটু বোরোলীন বা ক্রীম মেখে শোবেন। যে কোন বিলাতি বা দেশী কোম্পানীর রাতের ক্রীম পেলে তাও সামান্য নিয়ে মুখ ম্যাসাজ করে শোবেন। দেখবেন এইটুকু যত্ন নিলে সামান্য কয়েক-দিনের মধ্যেই আপনার ত্বকের সব গোলমাল চলে যাবে। সবশেষে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জেনে যে 'রূপসীর খাতা' পড়ে আপনারা সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন ও খুব উপকার পাচ্ছেন।

(গ) অনুরাধা বিশ্বাস, রানীগঞ্জ—ধন্যবাদ। আপনি যা করতে চাইছেন—অর্থাৎ রং আরও ফর্সা ও সুন্দর, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করলাম। সেইগুলি অনুসরণ করলেই হবে। এছাড়া গত সপ্তাহে যে খাদ্য তালিকা দিয়েছি সেটা একটু পড়ে সেইমত করলে নিশ্চয়ই উপকার পাবেন। সবই যখন লেখা হয়ে গেছে তাই নতুন করে আর কিছু লিখলাম না।

আমার পাঠক-পাঠিকাদের আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের আমার এই বিভাগ ভাল লাগে জেনে।

বরবর্ণি

গুজবে কান দিয়ে মরেছে অবনী। জবাই-করা মুরগার মত অস্থির। কিন্তু কান না দিয়ে উপায় নেই। তিন-তিনজন ফিস-ফিসিয়ে বলে গেল—হয়েছে, পাকা খবর। এই এক পরিস্থিতি চাকরী জীবনে। ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটির বৈঠকের পর সহকর্মীরা কিছুতেই সুস্থির থাকতে দেয় না।

খবরটা কতখানি পাকা টিপে দেখতে অবনী স্টাফ রাশ্চের খোশলা সাহেবের কাছে ছুটেছে। লিফটের জন্যে সবুর সয়নি। সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠবে, এমত মনের ইচ্ছা। অবনীর পঞ্চাশ বছর বয়েস, আট বছর মাত্র চাকরী বাকী। আর ব্লাডপ্রেসার—ডায়স্টোলিক পঁচানব্বই, সিস্টোলিক একশো সত্তর। চার চাঁব্বশ ছিয়ানব্বইটা সিঁড়ি ভাঙার চেষ্টা ঠিক নয়। হার্টফেল করে মারা যেতে পারে। তখন কী হবে মল্লিকার!

এ সব বোঝে অবনী। মরবার সাধ হয়নি। আর অমলিন ভালবাসে সে মল্লিককে। শুধু এই এক প্রমোশনের ব্যাপারে অবুঝ অস্থিরতা। বুক খালি খালি লাগে। সুস্থির হয়ে বসে থাকা যায় না। ও উঠবে সিঁড়ি ভাঙতে ভাংগতে খোশলা সাহেব পর্যন্ত। তখন হাতে হাতে প্রমাণ।

অবনী নিজের সেকশন থেকে বেরিয়েছিল একটি মাত্র জিজ্ঞাসা নিয়ে : আমার ভাগ্যে আছে কী? মোজেক-করা সিঁড়িতে কুড়িয়ে পেল আর একটি : তিনি কী আছেন? ও উপরদিকে তাকাল, যেখানে

অজিত হাজরা

খোশলার আরশ। ফকির দরবেশের মতন মুখ অবনীর। মালিকের কাছে চলেছে। তিনি আছেন কিনা জানা নেই। তবু উঠছে।

দোতলায় উঠে এসেছে অবনী। এখানে দেয়ালের সবুজ রং কাঁচা বয়েসের মত টস-টসে। এ বয়েস ও পঁচিশ বছর হোল ফেলে এসেছে। চাকরীতে ঢুকবার আগে। কলেজে!

অফিস বাড়ির টসটসে সবুজ দেয়াল দেখতে দেখতে অবনীর মনটা উড়ে যায়। উড়ে উড়ে চাঁদমারির মাঠে। ...আই-এস-সি ফাইন্যাল দেওয়ার পর। সাইকেলে টোটো করি চার ইয়ার। হোলির দিন সুশান্তর খেয়াল, সিদ্ধি খেতে হবে। প্রদীপ গলা হাঁকড়াল—কাঁচাদুধ, পোস্তবাটা আর ধুতে-রোর বীজ দিয়ে। —ধুতরো বীজ কী রে। ওতো বিষ! খেলে মরে যাবি। কপালে চোখ তুলল নীহার। সুশান্ত সাহস দিল—দুএকটা খেলে মরে না, ভাল নেশা হয়। সন্ধ্যেবেলা ভর্তি লোটা নিয়ে গোল হয়ে বসেছি চাঁদ-মারির মাঠে। প্রদীপ কতগুলো বীজ ছেড়েছে কে জানে। ভয় করছে, কিন্তু মুখ খুলবার উপায় নেই। গেলাস ঘুরছে হাতে হাতে।

বেশ লাগছে। মরে গেলেই বা কী হয়! আকাশে চাঁদের টিপ। বাতাসে শিরীষ ফুলের গন্ধ। নীহার কী যেন গান গাইছিল। প্রদীপ শার্ট, গেঞ্জি খুলে ফেলল—আহ! কী আরাম। সুশান্তর যত অনাছিষ্টি কথা —ন্যাংটো হ, আরও আরাম পাবি। প্রদীপ কিছুক্ষণ ভাম হয়ে বসে রইল, তারপর কী কাণ্ড! খুলে ফেলল সব। নীহার গান বন্ধ

করে হেসে উঠল—উঃ রে শালা! বারো হাত কাকুড়ের তেরো হাত বীচি। হাসি আর বন্ধ হয় না।

অবনী হেসেই গম্ভীর। পাঁচ বা দশ নয়, কুড়ি বছরের অফিস অ্যাসিস্টেন্ট। নো প্রমোশন। শবরীর চেয়ে বেশী প্রতীক্ষা। আর বুঝি পারে না। মেঝের ওপর স্টীল-ট্রাঙ্ক টানা কিরকিরে অসোয়াস্তি স্নায়ুতে স্নায়ুতে। কতক্ষণ আর হাসবে? বেচারী নার্ভাস পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। একটু একটু হাঁপ ধরছে। তবু ওঠা চাই। সিঁড়ির একপাশে রেলিং। লোটার মসৃণ মাথায় হাত বোলাচ্ছে থমকে থমকে। এখানে দাঁড়ালে চার-তলার লিফট পাওয়া যায়। তবে সাধারণতঃ ভর্তি হয়ে আসে। জায়গা পাওয়া যাবে কিনা বলা যায় না। অবনী দাঁড়াল না। এখনও আটচল্লিশ ধাপ বাকী। কী যে হবে ওর কে জানে!

দোতলা পার হয়ে বারো ধাপ উঠতে তিন ফুট বাই তিন ফুট সমতল ভূমি। এখানে দু কদম হাঁটতে কী আরাম। পকেট থেকে ভাঁজকরা কাগজ খুলে হাওয়া দিচ্ছে নিজেকে। মনে হয়, হয়ে যাবে। কৃষ্ণমূর্তি সাহেব কনফিডেন্সিয়াল রোলে ভালই লিখেছেন পর পর দু বছর। নিজেও খাটতেন, ওকেও খাটাতেন। এরকম লোকের আণ্ডারে কাজ করে আরাম। মূর্তিসাহেব যদি এখন থাকতেন তাহলে ভাবনা ছিল না। এখন কপাল, মূর্তি সাহেব বদলি হয়ে গেলেন। শোনা যায়, ভাটিয়া সাহেবের হাতে গুড়ের বেশী ওঠে না। যাকগে, ক্ষতিকর কিছু না লিখলে বেরিয়ে যাবে।

একটু তাগত ফিরে পেয়েছে অবনী। মনও প্রফুল্ল। প্রমোশন মানে কটা বেশী টাকা মাত্র নয়। ইজ্জতেরও ব্যাপার। পদমর্যাদা বাড়ে। আর শুধু নিজের জন্যে নয়। ও যদি অফিসার হয় মল্লিকা হবে অফিসার গিন্নী। মল্লিকার জন্যে দুঃখ হয় অবনীর। ওর হাতে পড়ে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিছুই পেল না। খ্যাতি প্রতিপত্তি অথবা সন্তান-সন্ততি। এর জন্যে হয়তো মল্লিকার মনে প্রচ্ছন্ন অভি-মান আছে। তাই ও আর হাসে না। অবনীর মনে হয় প্রমোশন হওয়া বড় জরুরী। অন্তত মল্লিকার জন্যে।

সমতলভূমি শেষ হতে অবনী বাকী বারো ধাপের (তেতলা পৌঁছুতে) চড়াই ভাঙছে। এখন যদি খবরটা জানতে পারা যায় বাসায় চলে যাবে। কীভাবে খবরটা দেবে? যখন আপার ডিভিশন থেকে অ্যাসিস্টেন্ট হয়েছিল, পরীক্ষা থাকায় বলতে পেরেছিল, পাশ করেছি। এখন কিছু করেছি-টরেছি নয়, শুধু হয়েছি। তাও বিশ সাল বাদ। মল্লিকা খুশী হবে কী? অবনীর খুশীর রসে মাছি পড়ে যায়।

তেতলায় দেয়ালের রং সুকান্ত যৌবনের মত গোলাপী। এই কান্তি বেশ কয়েক বছর আগে অবনী হারাতে শুরু করে। অ্যাসিস্টেন্ট হবার পাঁচ বছর পর আশাপাখি ওড়াওড়ি করে। তখন মনে হোত কাজ দেখাবে, এখন কাজ যাতে আউট অফ টার্ন প্রমোশন দক্ষতা, বিচার-বিবেচনা--সব ভেরী গুড। লিখবে ওপরওয়ালা। জান দিয়ে কাজ করতো। সব ব্যাপারে সাহেবদের মুখে এক কথা—ডাকো অবনীবাবুকে। শরীরের বারোটা বেজে যাচ্ছে আর ও বলছে, যাক। কেননা সাহেব বলেছেন, আউটস্ট্যাণ্ডিং। নাকের বদলি নরুণ পাওয়ার সে কী আনন্দ! কানের মধ্যে বেজেই চলেছে, তাকডুমাডুম, তাকডুমাডুম। অবনীর চোখের কালি দেখে মল্লিকা বলল, প্রমোশনের দরকার নেই। এমন করলে কতদিন বাঁচবে? কথা কানে গেল না। সেই বাজনা বাজছে। এমন অবনী

বরাবর ছিল না। বিয়ের আগে মল্লিকাকে দেখে কবিতায়, তোমার কোমল বুকে আনো পাষাণের প্রেম, অধরে আনো ক্ষুধা খরতর' এইসব লিখেছিল। যে অবনী এখন ভাবছে মল্লিকার জন্যে প্রমোশন, সেই মল্লিকা বলে-ছিল, প্রমোশনের দরকার নেই।

রক্ত-চাপ-কাতর অবনী দেয়ালের গোলাপী রং দেখে সেইকালে তলিয়ে যাচ্ছে, যখন রাতের মল্লিকা মনে হতো কী দারুণ! এতটুকু সুখস্পর্শের বুদবুদ, কিন্তু এর মৃত্যু নেই। সব মনে পড়ে। ...অবিকল এমনি রং ছিল মল্লিকার গালের। কী নরম! কী মসৃণ! কী ঠাণ্ডা! সেই গালে গাল রাখলে আমি যেন আমি নেই। আর মল্লিকার ঠোঁট! কী লাল! সেই ঠোঁটে ঠোঁট রেখে আমি বুঝতে পারিনি, কী জানি, কী মিষ্টি। মল্লিকা আমার হাতখানা তুলে রাখতো ওর বুকের ওপর। তখন আমি যেন এক শিকারী। নরম পালকে ঢাকা একজোড়া পাখি ধরেছি। তারপর জেনে নি কী আছে অজানা শরীরে।

সেই অবনী এখন আঙুল কামড়াচ্ছে। দোতলায় লিফটের জন্যে দাঁড়ালে ভাল করতো। আর সিঁড়ি ভাঙার তাগত নেই। ফিরে যাবে। দু কারণে। এক, ভাল লাগছে না। দুই, বৃথাই যাওয়া। ভাটিয়া সাহেব ক্ষতিকর কিছু না লিখলেও ভেরী গুড লেখেননি। গুড ইজ নো গুড।

অবনী কিন্তু ফিরে যেতে পারে না। খুব আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকে। এ হয়তো দীর্ঘ অভ্যাসের ফলশ্রুতি। চাকরী করতে এসে অনেক কিছুই ভাল লাগে না। তবু করতে হয়। এইভাবে যন্ত্রের মত অবনী পা ফেলে ফেলে উঠতে থাকে। কিছুই ভাবে না। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মাঝে মাঝে দু-পা এক জায়গায় করছে, হাতও

পড়ে থাকছে রেলিং-এর ওপর। কেননা এটা পাটিগণিতের সিঁড়ি ভাঙ্গার মত সরল ব্যাপার নয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে শরীরের গুরুভার তোলা কঠিন কাজ। অবনী শ্রান্ত ক্লান্ত, তবু থামছে না। কী যে হবে ওর কে জানে!

মাঝতলায় (এখানেও সেই এক চিলতে জমি) প্রেরণাবিহীন অবনী দাঁড়িয়ে। গুজ-রাল পিছু ডাকল—'বাস। ও মুখ ফেরালে সহকর্মী অসভ্যের মত দাঁত ছড়াল—আমি খোশলা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এলাম। মস্তিষ্ক অবসন্ন হলেও অবনী বুঝল, নাজে খেলানার মতলব। ও দেখন-হাসি দিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করল, কিন্তু এত সহজে গুজরালের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। ইতরটা অবনীর কাঁধ চেপে ধরল—ঘোড়ার মুখের খবর আমি তোমাকে দিচ্ছি। একশো আট পর্যন্ত কনসিডার করা হয়েছে। অবনী দমে না গিয়ে চটে যাচ্ছে। তুমি শালা একশো ছয় আর আমি একশো দশ, তাই তোমার একশো আট। ও চুপ করে থাকে।

শেয়ালের মত হেসে গুজরাল চলে গেল। অবনী একশো আট মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। মনের গভীরে সন্দেহ এসে যায়। গুজরাল অয়েলজি এক্সপার্ট। নিশ্চয় ম্যানেজ করে বেরিয়ে গেছে এই লিস্টে। সন্দেহের পর ভয়। ভাটিয়া সাহেব কী করেছেন কে জানে? ভয়ের পর ভাবনা। ভাটিয়া সাহেব মল্লিকার হাতের রসগোল্লা খেতে চেয়ে-ছিলেন খাওয়ানো হয়নি।

আর বারোধাপ মাত্র বাকী। অবনী দাঁতে দাঁত চেপে উঠতে থাকে। এখন সবুজ স্বপ্ন অথবা গোলাপী খোয়াব দেখছে না। অসংখ্য হলুদ সর্ষেফুল। ফুটছে, ফুটছে, ফুটছে! আর ও বুকে কাঠ চেপে হেঁট হয়ে গুণ টানছে। সিঁড়ি ভাঙ্গতে নিজেই ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা।

চারতলায় উঠে এসে অবনীর মাথা ঝিমমারা, গলা শুকিয়ে কাঠ, শরীর ঘামে ভেজা। যেন এক তীর্থযাত্রী পাহাড়ের ওপর মালিকের দোর গোড়ায়। ওর বুকের ভেতর সরু সরু দাঁতে কাটা যন্ত্রণা। বুঝি প্রমো-শনে খবরটা জেনে যেতে পারল না। রেলিং ধরে সামলে না নিলে ঠিক পড়ে যেতো। মাথাটা রেলিং-এর ওপর নামাল আস্তে আস্তে। অনেকক্ষণ শুধু অন্ধকার, তারপর দেখল কত নীচে মাটিতলা, যেখান থেকে অতি কষ্টে উঠে এসেছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ক্লান্ত মস্তিষ্কে অদ্ভুত চিন্তা : পাখির চোখে দেখলে মানুষকে কেমন তুচ্ছ দেখায়! আস্তে আস্তে মাথা তুলে অবনী ওপর দিকে তাকায়। যদিও হাতের রং আকাশের মত সুনীল তথাপি করিডরে এক ঋতু। শীতে পাতা ঝরে না, বর্ষায় জল পড়ে না, বসন্তে ফুল ফোটে না। অবনীর মন কেমন করে সত্যিকারের সুনীল আকাশের জন্যে। আর ক্লান্ত মস্তিষ্কে অদ্ভুত চিন্তা : মানুষের কত মনগড়া দুঃখ। অবনী তাকায় সমুখে পানে। খোশলা সাহেবের নেমপ্লেট দেখা যায়।

করিডরে অবনী হাঁটছে পাঁচজনের সঙ্গে। এদের চারটি শ্রেণী— ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর। অবনী ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। গুজেব ওর প্রমোশন হয়েছে। খোশলা সাহেবের কাছে যাচ্ছে। তিনি দয়া করে বলে দেবেন, ওর ক্লাস টু হয়েছে। অফিসে বড় বিচ্ছিরি নিয়ম। থ্রি থেকে টু হলে প্রমোশন। এবং তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় পনেরো কুড়ি বছর।

মালিকের অভিব্যক্তিহীন দরজার সামনে অবনী স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছে। তবু ভাবছে, শেষ-বারের মত। ভাবিয়া করিবে কাজ, করিয়া না ভাবিবে। হার্টের যা হাল, তেমন কিছু মালিক গম্ভীর স্বরে বললে, চোট সামলাতে পারবে কিনা সন্দেহ। একটি যুবতী সাহেব-এর ঘর থেকে গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে, জানতে পারছে না। যুবতী কী সুন্দর জলফেলি জলতুলি ভংগীতে হেঁটে যায়, দ্যাখে না।

একঋতু করিডরে বাতাসের তেমন দুর্ভিক্ষ নয়, তবু অবনীর শ্বাসকষ্ট। মনে হচ্ছে সব বাতাস কর্নার করে ফেলেছে কোন কালোবাজারী। ও বুকে ভরে বাতাস নিতে চায়, পায় না। বড় কষ্ট।

সাহেবের পিওন ডাকল—বোসবাবু। সাড়া নেই। আবার ডাকতে ক্লাশ-টুশ ভুলে অবনী হাত রাখল সমবয়সী রামদাসের কাঁধের ওপর। দাঁড়াতে পারছে না।

রামদাস অবনীকে সামলেসুমলে সেকশনে নিয়ে এসে বসাল পাখার নীচে। তারপর একগ্লাস কুলারের সুশীতল জল। তারওপর মৃদুস্বরে বলল—সাহেবের কাছে না গিয়ে ভাল করেছেন। একটু আগে গুজ-রালজী এসেছিলেন। আমার সামনেই সাহেব ধমক দিলেন—নিকাল যাইয়ে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে অবনী সম্পূর্ণ সুস্থ। জানালার বাইরের আকাশকে বলছে —খুব বেঁচে গেছি। তারপর নেমে আসতে মাটির কাছাকাছি, অপার বিস্ময় দু-চোখে। কৃষ্ণচূড়া সারা বছর কোথায় যে গা ঢাকা দিয়ে থাকে! আরে! ফুল্ল শিরীষও রয়েছে। ইচ্ছে করলে অবনী এখনই একটা কবিতা লিখে ফেলতে পারে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী ।।

তখন নতুন ধরণের বাঙ্গালা পুস্তকের অভাব লোকে বোধ করিতেছিল। এই সকল পুস্তক প্রথমে ইংরেজরাই লিখিত ও শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইত। লেফটেনান্ট স্টুয়ার্ট নামক এক ব্যক্তি প্রথমে বাঙ্গলা পাঠ রচনা করেন। চুঁচুড়ার পাদ্রী মে সাহেব তৎকালের পাঠশালার প্রচলিত অঙ্কের পুস্তক হইতে উদাহরণ লইয়া পাটিগণিত প্রস্তুত করেন। ঐ উপরোক্ত পাদ্রী মে ও চুঁচুড়ার পিয়ার্সন নামে আর একজন পাদ্রী আর হার্লে নামে বাঁকিপুরে আর একজন ইংরেজ পাদ্রী অনেকগুলি সরল বাংলা পাঠ রচনা করেন।

পিয়ার্সন তৎকালীন ইংলণ্ডে ন্যাশনাল স্কুল সোসাইটীর প্রকাশিত পুস্তকের অনুকরণে কতকগুলি বর্ণমালা, বানান, ফলা প্রভৃতি শিশু পাঠ্য-পুস্তক প্রস্তুত করেন। তখন হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক ডেনসেলেন নামক একজন পর্তুগীজ ছিলেন। এ লোকটি বাংলা জানিতেন ও একখানি ইংরেজী বাংলা পাঠ রচনা করেন।

বাঙ্গালী সদস্যগণের মধ্যে তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন অনেক ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। ইংরেজী, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত এই সকল ভাষাতে ইঁহারা পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা ইংরেজী ও আরবি হইতে অনেকগুলি গল্প বাংলায় অনুবাদ করিয়া বালকদিগের নিমিত্ত পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেন। রামকমল সেন ফরাসী 'লোঘাৎ' অনুকরণে আড়াই হাজার বাংলা কথা লইয়া অভিধান লেখেন। লশন নামে একজন পাদ্রী গোল্ডস্মিথের হিষ্টরি (এ ডে হিস্মরি) অনুবাদ করেন। বাংলা ভূগোল একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক লিখেন। ছাপাইবার খরচ সংকলান করিতে না পারিয়া তিনি সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্থির হইল যে, চারি টাকা হিসাবে একখণ্ড করিয়া এক শত খণ্ড সোসাইটীর অর্থ হইতে ক্রয় করা হইবে। পরে রামমোহন রায় আর একখানি ভূগোল রচনা করেন।

পুস্তক প্রকাশ করিবার আর এক পন্থা ছিল। তখনকার শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রে নানাপ্রকার পুস্তক মুদ্রিত করিতেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে সোসাইটী যে সকল পাঠ্য-পুস্তক উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, বন্দোবস্ত হইল সেই সব কেতাব উচিত মূল্যে কেনা হইবে। নিম্নে একটি তালিকা দিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে সোসাইটীর মতে তখনকার বালকদিগের পক্ষে কিরূপ পাঠ্যপুস্তক উপযুক্ত বিবেচনা হইত। গণিত, লিপিধারা, শুভঙ্কর কৃত আর্যা জমিদারী কাজ, বর্ণমালা, বানান, ফলা, আকোয়াল খতিয়ান, জমাবন্দি, হিতোপদেশ, শাস্ত্র পদ্ধতি জ্যোতিষ, ভূগোল, তলব বাকি, গুরুশিষ্য গোলাধ্যায়।

রামচন্দ্র শর্ম্মা নামে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় অভিধান প্রস্তুত করেন। সোসাইটি বিতরণের নিমিত্ত এই অভিধান দুই শত খণ্ড খরিদ করে। শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ তখন 'দিগদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেন। পাদ্রী মার্সম্যানের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় নম্বর পাদ্রী মার্সম্যান উহা ছাপাইতেন। পাদ্রী লিখিত পত্রে যে সকল সামগ্রী থাকিবার কথা সেই সকলই তাহাতে থাকিত। নমুনাস্বরূপ তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

১। তিন ভাগে পৃথিবীর ইতিহাসের বিশ্লেষণ। প্রথম, সৃষ্টি হইতে জলপ্লাবন, দ্বিতীয়, জলপ্লাবন হইতে যিশু খৃষ্টের জন্ম তৃতীয় যিশু খৃষ্টের জন্মের পর হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস।

২। হস্তের প্রাকৃতিক ইতিহাস। ৩। গৌড় ধ্বংসের বিবরণ।

আরবি ও ফারসি ভাষাতেও পুস্তক লেখা হইত ও ছাপা হইত। এই সকল পুস্তকের নিমিত্ত অনেক টাকা ব্যয় হয়। তারিণীচরণ মিত্র বাংলা শিশুপাঠ্য উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইংরেজী বিভাগ পূর্ব্বে কথিত হিন্দু কলেজের হেডমাস্টার মারের স্পেলিং বুক অনুকরণে একখানি পুস্তক লেখেন; আর বালকদের উপযুক্ত ইংরেজী ভাষায় কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করেন। সোসাইটীর সম্পাদক মন্টেগু 'স্কুল বয়েজ ফ্রেন্ড' নামক ইংরেজী এই রচনা করেন। রামকমল সেন সে সময়ে এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। তিনি জনসনের অভিধানের অনুকরণে ইংরেজী-বাংলা অভিধান লিখিতেছিলেন। এই বৎসর তাহার অংশমাত্র প্রকাশ হয়।

এই সময়েই বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। সোসাইটী স্থাপনের পূর্ব্বেই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরেজী শিখিবার নিমিত্ত তখন আরও অনেক স্কুল ছিল।

ক্ষপণক

(ক্রমশঃ

শিক্ষাক্রমে ক্রীড়া চিকিৎসা

ক্রীড়া চিকিৎসা ও বিজ্ঞান—এই নামে একটি নতুন শিক্ষাক্রম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে চালু হতে চলেছে। আধুনিককালে ক্রীড়াচর্চার ভিত্তি হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই তত্ত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুদিন ধরেই বিষয়টি ঘিরে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। সম্প্রতি সেই চিন্তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

ক্রীড়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসা সম্পর্কে করণীয় কি তা সাব্যস্ত করার ভার দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বিশেষ কমিটি গঠন করেছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর বিশেষ কমিটি এই মর্মে সুপারিশ জানিয়েছে যে বর্তমানে ক্রীড়া চিকিৎসা ও বিজ্ঞান বিষয় একটি সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা হোক, একটি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে, পরে ধাপে ধাপে আরও এগিয়ে ক্রীড়া চিকিৎসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক পঠন পাঠন ও গবেষণা একটি ফ্যাকাল্টির অধীনে নিয়ে আসা হবে।

বিশেষ কমিটিতে বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। অনুমান করা যায় যে কমিটির সুচিন্তিত ও সর্বসম্মত অভিজ্ঞ সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল অনুমোদন করবেন এবং যথাসম্ভব শীঘ্রই এ বিষয়ে সবিস্তার পঠন পাঠন সুরু হয়ে যাবে। সেই শুভদিনের দিকে তাকিয়ে আজ এই অবকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাবার কালে বলি যে এ বিষয়ে সারা ভারতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই পথিকৃৎ হয়ে রইলেন।

ক্রীড়া চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক আগেই অবহিত হয়েছেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হয়তো এ বিষয়ে চিন্তাও করছেন। কিন্তু সুচিন্তিত পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ক্রীড়া চিকিৎসার ফলিত প্রয়োগে এগিয়ে আসতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অন্য পক্ষরা এখনও উদ্যম দেখান নি। কাজেই কলকাতার ভূমিকা স্বতন্ত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ যা ভাবছেন এবং আজ যা করছেন, অন্য পক্ষরা হয়তো ভবিষ্যতে সেই চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের শরিক হবেন।

প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম চালু করার সুপারিশ জানাবার কালে বিশেষ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবে ক্রীড়া চিকিৎসা সংক্রান্ত ফিল্ড ইউনিট স্থাপনের কথাও বলেছেন। ফিল্ড ইউনিট স্থাপিত হলে ক্রীড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ পেয়ে লব্ধ জ্ঞানকে পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন।

ক্রীড়া চিকিৎসা বলতে আমরা কি বুঝি? বুঝি এই যে সক্রিয় ক্রীড়াবিদদের দৈহিক ও মানসিক বিবর্তন ঘিরে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়াস। মানুষ যখন হাত পা গুটিয়ে আলস্যে দিন কাটায় তখন তার মস্তিষ্ক হয়তো সক্রিয় থাকে কিন্তু শারীরিক ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্রীড়ারত ব্যক্তির অবস্থাটা ভিন্নতর। লক্ষ্যে পৌঁছবার সংকল্প সে মনে মনে চিন্তা করে এবং মনের নির্দেশে শরীরকেও খাটায়। এই অবস্থায় শারীরিক প্রক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটে তার যথাযথ মূল্যায়ন করাই ক্রীড়া চিকিৎসার লক্ষ্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে সব সূত্র হাতে আসে তার সাহায্যে ক্রীড়াবিদদের সম্ভাবনার ঠিকানাও জানাজানি হয়ে যায়।

আরও সরলভাবে বলা যায় যে একজন খেলোয়াড়ের শারীরিক সঙ্গতি কতোখানি, মনন কোন বিন্দুতে সীমায়িত, শারীরিক গঠন কোন্ খেলার পক্ষে উপযোগী, ক্রীড়াবিদদের আঘাত ও অসুস্থতার কারণ কি এবং আঘাত-অসুস্থতা নিরাময়ের আশু উপায় কি, এইসব রহস্য উদ্ধারের চেষ্টাই হলো ক্রীড়া চিকিৎসার লক্ষ্য। তবে রহস্যই বা বলি কেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে সত্যোপলব্ধি ঘটানোই হলো মূল লক্ষ্য।

এক কথায়, শিক্ষার বিস্তার ঘটানো, প্রতিরোধ ও শুশ্রূষা এবং উৎকর্ষ সাধন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাই হলো ক্রীড়া চিকিৎসার উদ্দেশ্য। খেলতে গিয়ে আঘাত এড়াতে আঘাত পেলে যথাসম্ভব শীঘ্র সেই আঘাত নিরাময়ের পর আবার মাঠে নামায় সহায়তা করতেই ক্রীড়া চিকিৎসকেরা গবেষণা করে যাচ্ছেন। সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানে উপকৃত হয়ে দেশ বিদেশের খেলোয়াড়েরা ক্রমশই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ক্রীড়া চিকিৎসাকে যাঁরা ক্রীড়াচর্চার আবশ্যিক অনুষঙ্গ বলে মনে করে না তারা কিন্তু এতোটা এগোতে পারে নি। তাদের ধ্যান-ধারণা আদ্যিকালের মানসিকতার বদ্ধ ডোবাতেই আবদ্ধ হয়ে আছে।

চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং যাঁরা মনে করেন যে ক্রীড়া উন্নয়নের উপায়ই হলো ক্রীড়া চিকিৎসা ও বিজ্ঞান চর্চা তাঁদেরই উদ্যোগে ১৯২৮ সালে সুইজারল্যান্ডের সেন্ট মরিজে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চিকিৎসা সংস্থা সংক্ষেপে ফিমস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চিরন্তন নগরী রোমে আপাততঃ এই সংস্থার সদর দপ্তর, স্থাপিত। গোড়ার পর্বে ফিমসের কার্যকলাপ ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে মার্কিন মুলুকেও এর প্রসার ঘটে এবং ষাটের দশকে এশিয়ার প্রথম প্রতিনিধি জাপান ফিমসের সদস্যপদ ভুক্ত হয়।

ফিমসের সংস্পর্শে আসতে ভারত আরও সময় নেয়। সঠিক হিসেবে ১৯৭১ সালে পাতিয়ালায় ক্রীড়া চিকিৎসার জাতীয় স্তরে আলোচনান্তে ভারতে সব প্রথম ক্রীড়া চিকিৎসা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক বছরের মধ্যেই ভারতীয় ক্রীড়া চিকিৎসা সংস্থা ফিমসের আমন্ত্রণক্রমে দু'একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চিকিৎসা সম্মেলনে যোগ দিয়ে আসছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং পাতিয়ালাস্থ নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তন ভারতীয় ক্রীড়া চিকিৎসা সংস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবুও গত

পাঁচ বছরের ফাঁকে ক্রীড়া চিকিৎসা আন্দোলন দেশের সর্বদিকে প্রসারিত হয় নি। পশ্চিম বাংলা সমেত নামমাত্র কয়েকটি রাজ্যেই ভারতীয় ক্রীড়া চিকিৎসা কেন্দ্রের শাখা গঠন করা হয়েছে। আসলে এই আন্দোলনের গুরুত্ব এবং ক্রীড়া চিকিৎসার তাৎপর্য সম্পর্কে এখনও আমাদের ক্রীড়া মহলে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে নি। একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়েই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে দেওয়া যেতে পারে।

কলকাতায় প্রায় সারা বছর ধরেই নানাবিধ খেলাধুলার আসর বসে বলেই মহানগরীতে ক্রীড়া চিকিৎসকদের হাতেনাতে গবেষণা করার অপরিমিত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা এ ব্যাপারে ক্রীড়া চিকিৎসকদের সাহায্য নিয়েছেন বলে শোনা যায় না। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থাগুলি এ বিষয়ে তবুও কিছু চিন্তা করেন। কিন্তু ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ইত্যাদির নিয়ামক সংস্থাগুলি এখনও পুরানো দিনের অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করছেন। মাঠের ধারে ক্রীড়া চিকিৎসা কেন্দ্রকে ঠাঁই দিলে তাঁরা নিজেদের কল্যাণের পথ ওই কেন্দ্র মারফতেই আবিষ্কার করে নিতে পারেন, অথচ এই সহজ ও সর্বসম্মত পথ পরিক্রমণে তাঁদের আগ্রহ নেই।

তবে খেলাধুলার সঙ্গে যাঁরা প্রত্যেক্ষে সংশ্লিষ্ট তাঁদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে সাবেকী ধ্যান ধারণার আড়ালে থেকে যেতে চাইলেও অন্য পক্ষরা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে নেই। পশ্চিম বাংলার ক্রীড়া চিকিৎসা সংস্থা, মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক-ছাত্ররা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের শারীরতত্ত্ব বিভাগের গবেষকেরা এবং আর কেউ কেউ কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শিক্ষককুলেও এ বিষয়ে চিন্তা করছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রীড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাক্রম চালু করে দিলে বোধহয় এই আন্দোলন ঘিরে নতুন করে সাড়া জেগে উঠতে পারে।

ফিম্‌সের সদস্য সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি। ফিম্‌সের উদ্যোগে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়, ভারতীয় ক্রীড়া চিকিৎসা সংস্থার পক্ষ থেকে সম্প্রতি পাক্ষিক প্রকাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র ইণ্ডিয়ান হেলথ-এর বিশেষ বিশেষ সংখ্যাতেও ক্রীড়া চিকিৎসা বিষয়ক সবিস্তার আলোচনা থাকে। সব শব্দের বিচারে বলা যায় যে ক্রীড়া চিকিৎসা আন্দোলনের প্রসার ঘটছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন মহল থেকে উদ্যম দেখানো হচ্ছে। যাঁরা খেলেন, যাঁরা খেলান, যাঁরা ক্রীড়া প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁরা সকাই যদি বিষয়টির গভীরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করতে চান, তাহলেই সার্বিক মঙ্গল। উপযুক্ত ক্রীড়া প্রশিক্ষকেরা এ বিষয়ে সচেতন আছেন। কিন্তু ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থার কর্ণধারদের ঘুম যেন ভাঙ্গার নয়।

পশ্চিম বাংলার খেলাধুলোর সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণকল্পে এ রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে একটি ক্রীড়া পরিষদও গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই পরিষদ ক্রীড়া চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষ কিছু চিন্তা করেছেন বলে শোনা যায় নি। অথচ অন্যান্য অনেক দেশ ক্রীড়া চিকিৎসা ও বিজ্ঞান চর্চায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এমনও দেশ আছে যেখানে ক্রীড়া চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষজ্ঞের অনুমোদন ছাড়া কেউই খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণের সুযোগ বা অধিকার

পায় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ যে পথের মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছেন সেই পথ পরিক্রমণ করা আমেরিকা, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, তুরস্কের পক্ষে পুরানো হয়ে গিয়েছে। ওই সব দেশে ক্রীড়া চিকিৎসা সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে অনেক আগেই। বেলজিয়ামে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়া চিকিৎসা কোর্স চালু রয়েছে। বেলজিয়াম মেডিক্যাল সোসাইটি অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের সুপারিশক্রমে এই শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হচ্ছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোসাইটি অব স্পোর্টস মেডিসিনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৭ সালে। আর তার তিন বছরের মধ্যেই প্রাগের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া চিকিৎসার চেয়ার সৃষ্টি করা হয়। ইস্তামবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৫ সালে ক্রীড়া চিকিৎসা শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়, এই শিক্ষাক্রমের মেয়াদ তিন মাসের। আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রীড়া চিকিৎসা বিষয়ক স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা দেওয়া হয় সকল শিক্ষার্থীদের।

খেলাধুলোর ক্রমোন্নতির কালে আশু ফল পাবার উদ্দেশ্যে আজকাল ক্রীড়াবিদেরা উত্তেজক ওষুধ ও মাদকদ্রব্য সেবন করতে চাইছে, এই ব্যবস্থায় সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও 'ডোপিং'-এ অভ্যস্ত ক্রীড়াবিদদের স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। ক্রীড়াচর্চার মূলে উদ্দেশ্য মানসিক প্রফুল্লতা ও সুস্বাস্থ্য অর্জন করা। কিন্তু 'ডোপিং'-এর কুপ্রভাবে মন ও স্বাস্থ্য, উভয় ক্ষেত্রেই চরম সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে। ক্রীড়া চিকিৎসা বিদ্যার মাধ্যমে 'ডোপিং'-এর কুফল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় বলেই 'ডোপিং' বন্ধে ক্রীড়া চিকিৎসা আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটাই অভিপ্রেত। সব মিলিয়ে বলা যায় যে সুস্থ, স্বাস্থ্যবান এবং দক্ষ ক্রীড়াবিদদের ধাত্রীগৃহই হলো ক্রীড়া চিকিৎসা কেন্দ্র। খেলা খোলা মাঠে হলেও তার প্রারম্ভিক প্রস্তুতির সূতিকাগৃহ হলো চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি। এইসব কেন্দ্রের বাড়বাড়ন্ত ঘটতে সুরু হলেই খেলাধুলোর সার্বিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

অনেককাল আগে খেলাধুলোকে নিশ্চয়ই সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ভুক্ত মুষ্টিমেয় কজনের চিত্তবিনোদনের উপায় বলে মনে করা হোতো। অধুনা ক্রীড়া চর্চাকে জাতি গঠনের নিশ্চিন্ত সোপান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কাজেই আজ আর খাপছাড়া কর্মোদ্যোগের বিশেষ মূল্য নেই। জাতি গঠনের কাজটিকে সম্পূর্ণ করতে হলে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদের প্রতিফলন ঘটাতে হবে নিজেদের কর্মকাণ্ডে, এছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি ধারা ক্রীড়া চিকিৎসা চর্চা। এই ধারাকে জাতির ক্রীড়া জীবনের মূলধারার সংগে যুক্ত করতে হবেই হবে।

আর ক্রীড়া চিকিৎসার লক্ষ্য কি শুধু ক্রীড়া উন্নয়ন? না, জাতির সার্বিক উন্নয়ন? যে ছেলে বা মেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় না, অথচ সুস্থ জীবন যাপন করতে চায়, ক্রীড়া চিকিৎসা তাকেও সর্বতোভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রতিবন্ধীদেরও সুস্থ জীবনের স্বাদ উপহার দিতে পারে ক্রীড়া চিকিৎসকের নির্দেশ ও সুপারিশ।

ক্রীড়া চিকিৎসা এক আধুনিক আন্দোলন বটে, কিন্তু এই চিন্তাধারার উৎপত্তি প্রাচীন আমলেই। ভারতীয় ক্রীড়া চিকিৎসা সংস্থার সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার ফেলো ডাঃ অলোক ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন যে প্রাচীন যুগের ইতালীয় চিন্তানায়ক হেরোদোকাস ও ইককাসকেই পশ্চিমী মতে ক্রীড়া চিকিৎসার পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদের হেরোদোকাস গরম জলে স্নান করার এবং অল্পস্বল্প দৌড় ও মল্লচর্চার উপদেশ দিতেন। অর্থাৎ স্নান ও সীমিত ব্যায়ামের মাধ্যমে তিনি রোগের প্রশমনের উপায় খুঁজতে চাইতেন, হেরোদোকাসের শিষ্য হিপক্রেটস এসব বিষয়ে গুরুর সংগে একমত হতে না পারলেও তিনিও কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম চর্চাকে শারীরিক সুস্থতা ও সক্ষমতা অর্জনের নিশ্চিত উপায় বলে মনে করতেন। ইককাস সুস্থতা ও সক্ষমতা অর্জনে শারীর চালনার নিয়মিত অভ্যাস ও সহজ সরল খাদ্যাভ্যাসের সুপারিশ জানাতেন।

ভারতীয় মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জির অভিমতও প্রায় অভিন্ন; তিনি বলেন যে, ক্রীড়া চিকিৎসা যে সার্বিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে দেয় এই জ্ঞান বহু পূর্বেই অর্জন করা গিয়েছে। প্রাচীন মিশর, চীন, গ্রীস ও রোমে চর্চা এর ছিল। আমাদের ভারতবর্ষে খৃষ্ট জন্মের প্রায় আঠারোশ' বছর আগে প্রচলিত আয়ুর্বেদ নির্দেশিত চিকিৎসা বিদ্যা চর্চা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে সেকালেও ক্রীড়া চিকিৎসার অনুশীলন ছিল, যদিও তখন ওই নামে বিষয়টির পরিচিতি ঘটে নি। শুশ্রুত, ভবতা চরক প্রমুখ প্রাচীন ভারতের দিকপাল চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের রচনা মারফৎ ক্রীড়া চিকিৎসার ঠিকানা জানা যায়।

তবে বিষয়টির উৎপত্তি যেকালেই হোক না কেন সম্প্রতি এই আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা দেশ ভারতবর্ষ যদি এই আন্দোলনের সংগে আন্তরিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়তে পারে তাহলে অতীতের আক্ষেপ মিটিয়ে ফেলার সঠিক রাস্তার সন্ধান পাবে বলেই মনে করা যায়। শুধু অনুশীলন ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সম্পত্তির যথাযথ মূল্যায়নের পর চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় ঘটাতে পারলেই হয়তো লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে। বিজ্ঞানের মোট নির্দেশকে বাদ দিয়ে শুধু অংশ বিশেষকে আঁকড়ে ধরা যে কোনো কাজের কথা নয়, একথা যতো তাড়াতাড়ি আমরা উপলব্ধি করতে পারি ততোই মঙ্গল।

অজয় বসু
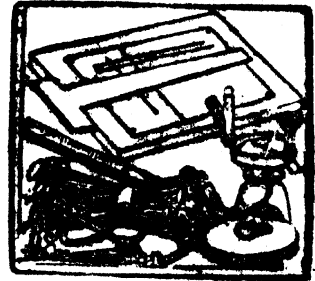
দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। শেষ দিনের বৃষ্টি জয়-পরাজয়ের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের নতুন অধিনায়ক টনি গ্রেগ টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ড সুবিধা করতে পারেনি। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল মাত্র ৮৯—চারটে উইকেট পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি মাত্র ২৭ রান দিয়ে একাই ইংল্যাণ্ডের প্রথম চারটে উইকেট নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক টনি গ্রেগ এবং নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ডেভিড স্টীল পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে দলকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করেন। তাঁদের ৫ম উইকেটের জুটিতে ৯৬ রান উঠেছিল। ৩৩ বছরের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ডেভিড স্টীল ১৬২ মিনিটে ৫০ রান করে আউট হন।

চা-পানের বিরতির ঠিক আগে দলের ২২২ রানের মাথায় অধিনায়ক গ্রেগ ৯৬ রান করে আউট হন। তিনি ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট খেলেছিলেন এবং নটের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ৭৭ রান তুলে দিয়েছিলেন। উইকেট-কিপার নট ৬৯ রান করে আউট হন। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৯টা উইকেট পড়ে ৩১৩ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩১৫ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়াও ইংল্যাণ্ডের পেস বোলিংয়ের ধাক্কায় নাজেহাল হয়েছিল—মাত্র ৮১ রানের মাথায় তাদের ৭ম উইকেট পড়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের দুই পেস বোলার—জন স্নো এবং পিটার লেভার অস্ট্রেলিয়াকে কাবু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত রস এডওয়ার্ডস ৯৯ রান এবং ডেনিস লিলি নট আউট ৭৩ রান করে দলের মুখরক্ষা করেছিলেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে জেফ টমসন (১৭ রান) এবং এডওয়ার্ডস দলের ৫২ রান তুলে পতন রোধ করেছিলেন। ৯ম উইকেটের জুটিতে এডওয়ার্ডস (৯৯ রান) এবং লিলি দলের অতি মূল্যবান ৬৬ রান তুলেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৬৮ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড ৪৭ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ৫ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৩০ (২ উইকেটে)। প্রথম উইকেটের জুটিতে বেরী উড (৫২ রান) এবং জন এডরিচ দলের ১১১ রান তুলে খেলার ভিত খুবই শক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় স্টীল (৪৫ রান) এবং এডরিচ আরও ১০৪ রান যোগ করেছিলেন। জন এডরিচ ৩৩২ মিনিট খেলে তাঁর শত রান পূর্ণ করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এডরিচের এটা ১২শ সেঞ্চুরী—অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৭ম সেঞ্চুরী।

তৃতীয় দিনের খেলায় এডরিচ ১০৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ড ২৭৭ রানে এগিয়েছিল। তাদের হাতে জমা ছিল দ্বিতীয় ইনিংসের আরও ৮টা উইকেট। তৃতীয় দিনে খুবই মন্থরগতিতে রান উঠেছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৪৩৬ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৮৪ রান তুলতে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ১ উইকেট খুইয়ে ৯৭ রান সংগ্রহ করেছিল। জন এডরিচ চতুর্থ দিনে ১৭৫ রানে আউট হন—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় এই ১৭৫ রানই এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান। এডরিচ মোট ৯ ঘণ্টা খেলে তাঁর ১৭৫ রানে ২১টা বাউন্ডারী করেন।

পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৩২৯ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) খেলাটি শেষ হলে দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিত থেকে যায়। খেলার শেষ পঞ্চম দিনে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে একঘণ্টা খেলা বন্ধ ছিল। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৮৪ রান থেকে অস্ট্রেলিয়ার ১৫৫ রান কম উঠেছিল! অস্ট্রেলিয়ার ২য় উইকেটের জুটিতে ম্যাককস্কার এবং ইয়ান চ্যাপেল ১১১ রান তুলেছিলেন। দুই ভাই—ইয়ান চ্যাপেল এবং গ্রেগ চ্যাপেল ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৫১ মিনিটে ৫০ রান সংগ্রহ করেছিলেন ৪র্থ উইকেটের জুটিতে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় উল্লেখযোগ্য রান—ম্যাককস্কার ৭৯ ইয়ান চ্যাপেল ৮৬, জি চ্যাপেল নটআউট ৭৩ এবং এডওয়ার্ডস নটআউট ৫২ রান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ৩১৫ রান (ডেনিস স্টীল ৫০, টনি গ্রেগ ৯৬ এবং নট ৬৯ রান। লিলি ৮৪ রানে ৪, টমসন ৯২ রানে ২, ম্যালেট ৫৬ রানে ২ এবং ওয়াকার ৫২ রানে ২ উইকেট)

ও ৪৩৬ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। উড ৫২, এডরিচ ১৭৫, স্টীল ৪৫ এবং গ্রেগ ৪১ রান। ম্যালেট ১২৭ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২৬৮ রান (রস এডওয়ার্ডস ৯৯ এবং ডেনিস লিলি ৭৩ নটআউট। স্নো ৬৬ রানে ৪ এবং লেভার ৮৩ রানে ২ উইকেট)

ও ৩২৯ রান (৩ উইকেটে। ম্যাককস্কার ৭৯, ইয়ান চ্যাপেল ৮৬, জি চ্যাপেল ৭৩ নটআউট এবং রস এডওয়ার্ডস ৫২ নটআউট। গ্রেগ ৮২ রানে ২ উইকেট)

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার তালিকায় উপস্থিত (আগস্ট ৯) গত বছরের রানার্স-আপ এরিয়ান্স শীর্ষস্থানে রয়েছে—তাদের ১৫টা খেলায় জয় ১১, ড্র ২, হার ২ এবং পয়েন্ট ২৪।

আজ দীর্ঘদিন হল প্রথম বিভাগের লীগ খেলার এই তিন প্রধান দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এর লীগের খেলা হচ্ছে না। সর্বশেষ খেলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ৭ই জুলাই, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ১২ই জুলাই। তিনটি ঘেরা মাঠের গ্যালারী মেরামত কাজের জন্যে উল্লিখিত তিন প্রধান দলের খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছে। ফলে লীগ ও আই এফ এ শীল্ড খেলা নিয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে।

এ পর্যন্ত (আগস্ট ৯) প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় অপরাজিত আছে ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং। তারা শুধু অপরাজিত নয়, এখনও পর্যন্ত একটা গোলও খায়নি। ইস্টবেঙ্গলের ৮টা খেলায় জয় ৮, স্বপক্ষে গোল ২২, বিপক্ষে গোল ০ এবং পয়েন্ট ১৬। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ৯টা খেলায় জয় ৯, স্বপক্ষে গোল ২৯ বিপক্ষে গোল ০ এবং পয়েন্ট ১৮। মোহনবাগানের ৯টা খেলায় জয় ৮, হার ১ (ইস্টবেঙ্গলের কাছে), স্বপক্ষে গোল ১৮, বিপক্ষে গোল ১ এবং পয়েন্ট ১৬। বর্তমানে লীগ তালিকার সর্বনিম্ন স্থানে আছে বালী প্রতিভা—তাদের ১৪টা খেলায় ৫ পয়েন্ট উঠেছে।

প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় এপর্যন্ত 'হ্যাটট্রিক' করেছেন এই ৬ জন খেলোয়াড়: শ্রীকান্ত মল্লিক (ক্যালকাটা জিমখানা), আকবর এবং হাবিব (মহমেডান স্পোর্টিং), পিনাকী মুখার্জি (কুমারটুলি), উলগানাথন (মোহনবাগান) এবং সুভাষ ভৌমিক (ইস্টবেঙ্গল)। এঁদের মধ্যে একমাত্র হাবিব দুটো হ্যাটট্রিক করেছেন।

'গোড়ার দিকে ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে ব্যামোটা আমার এতো দূর গড়াতো না। ভাল ডাক্তারের সংস্পর্শে এলাম শেষ পর্যন্ত কিন্তু বড্ড দেরীতে। মজ্জায় মজ্জায় যে ভুলগুলি জমে গেছে সেগুলি সারানো এই বয়সে রীতিমত শক্ত ব্যাপার। আহা, তখন যদি একজন ভাল কোচ পেতাম!'

সুভাষ ভৌমিক

লাইফ স্কেচের কথা শুনেই সুভাষ কিন্তু বেঁকে বসলেন। না বাপু, রেহাই দাও আমায়। ক্ষ্যামা ঘেন্না করে অধমকে ছেড়ে দাও। দেখতেই তো পাচ্ছ—সীজনটা একদম ভাল যাচ্ছে না, এটুও সুবিধে করতে পারছি না। মাঠে নেমে স্রেফ দু-আনি কুড়োবার দাখিল। এই অবস্থায় আমায় নিয়ে অমৃতে কিছু ফেঁদে বসলে, পেছন থেকে লোকে বক দেখাবে। প্লিজ, ডোন্ট বি এ পার্টি টু ইট।

কিন্তু আমি তো জানি—সবটাই সুভাষের বিনয়। আসলে এই মুহূর্তে কড়া আলোর সামনে উনি আসতে চাইছেন না। চাইছেন খানিকটা আত্মস্থ হতে। সুভাষ ভৌমিককে হাড়ে হাড়ে চিনি তো আমি। চিনি, সেই থেকে যখন তিনি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বাংলা বা ভারতের সুভাষ ভৌমিক হন নি, পরিচয় ছিল স্রেফ ভোম্বল বলে। ভোম্বল সুভাষের আটপৌরে নাম। মা-বাবা, দাদা এবং ঘনিষ্ঠরা সুভাষকে ভোম্বল বলে ডাকেন। ফুটবল মাঠে সুভাষ রাইট উইং লেফট উইং। আবার কখনও বা স্ট্রাইকার। কেউ কেউ বলেন—সুভাষ বুলডোজার। প্রচন্ড ড্যাস, পায়ে ভয়ংকর সট। হেডে ওস্তাদ। অঘটন ঘটানোর ব্যাপারে সুভাষের জুড়ি নেই। অসম্ভব পরিস্থিতির ভেতর থেকে দলকে পার করে নিয়ে আসতে পারেন বোধহয়

আজকাল খড়ের মাঠে ঐ একমাত্র সুভাষই মাঠে নামলে প্রতিপক্ষের দুটি ডিফেণ্ডারকে ব্যস্ত থাকতে হয়—একমাত্র সুভাষকে নিয়ে। ডিফেন্সের শিরঃপীড়ার কারণ সুভাষ সুভাষের এই চরিত্র লক্ষ্য করেই খ্যাতনামা প্রশিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জি ওঁকে ইস্টবেঙ্গলে নতুন ধরে টেনেছিলেন।

নিজের কথা বলতে বলতে সুভাষ কখন যেন থেমে যান। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়বাদল। ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর ভেতর তখন আমরা শুধু তিনটি প্রাণী, সুভাষ, ফুটবল সম্পাদক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য আর আমি। 'আমি এত বড় বড় দলে খেলেছি, খেলছি, বেঙ্গল খেলেছি, ইন্ডিয়া খেলেছি কিন্তু খেলোয়াড় হিসেবে কত অসহায়। বাঁ পা আমার তেমন চালু নয়, হেড বলতে কিছু নেই। অথচ দেখ—ওসব না থাকলে কি ভাল ফরোয়ার্ড হওয়া যায়? আমার এই সব ঘাটতি ধরা পড়ল—প্রদীপদার পাঠশালায় এসে। কিন্তু হায় — বড্ড লেটে। সব কিছু ঠিকঠাক করে আর কতটুকুই বা এগোব? শেষে শেষে বেলা তো অনেক হল।' কথার সুরে আক্ষেপ। অনেক না পাওয়ার বেদনা।

পূর্ণিয়ার কাটিহারের ছেলে সুভাষ। আদি বাসিন্দা পাবনার। বাবা শ্রীভবেশচন্দ্র ভৌমিক রেলের চাকুরে। ভবেশবাবুর ঠাকুরদা থাকতেন রায়গঞ্জে ওকালতির সূত্রে। মায়ের নাম দীপ্তি ভৌমিক। মা-বাবা দুজনই ফুটবলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। বিশেষত বাবা, কারণ এককালে কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে ভবেশবাবুর ঐ অঞ্চলে যথেষ্ট সুনাম ছিল। ব্যাকে খেলতেন। সুভাষের জন্ম কাটিহারে ১৯৫০ সালের ২ অকটোবর, তিথি দশমী। শৈশবের স্মৃতিচারণ করে ভোম্বল থুড়ি সুভাষ বললেন—বাবাকে কাটিহারে খেলতে দেখেছি রেলের মাঠে। নিজের বাবা বলে নয়—সত্যি বলছি বাবা বেশ ভাল খেলতেন। সুভাষরা দু ভাই। বড় ভাই আশিস এম-বি বি-এস বিবাহিত। বিবাহিত সুভাষও। স্ত্রী শুক্লা 'কনোজ ভাণ্ডারে'র খ্যাত শ্রীপিনাকী মুখার্জির বোন। সুভাষের শৈশবের পড়াশোনা রামকৃষ্ণ মিশনে (কাটিহার) এবং হাজারীবাগ সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেছেন কলকাতার চেতলা স্কুল থেকে। বি-এ যোগেশচন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৭২ সালে। গোড়ায় চাকরী করেছেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে। এখন সেন্ট্রাল একসাইজের ইন্সপেক্টর। বসেন স্ট্র্যান্ড রোডের অফিসে। স্ত্রী শুক্লা ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছেন লরেটো থেকে। এম-এ পড়বেন। ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সে (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

সুভাষের কলকাতায় আসার মূলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ব্যাক (বর্তমানে ইস্টার্ণ রেলে) প্রবীর মজুমদারের ভূমিক অনেকখানি। প্রবীর সুভাষের মাসতুতো ভাই। প্রবীর সুভাষকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাঘাদার কাছে। ইতিমধ্যে ১৯৬৬ সালে ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাব সুভাষকে বছরের সেরা স্কুল ফুটবলারের স্বীকৃতি দিলেন। ঐ বছর সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায় (মাদ্রাজ) সুভাষের স্থান হল বাংলা দলে। ১৯৬০ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়নে নিয়ে এলেন বেচুদা। অর্থাৎ নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীএম দত্তরায়। এক বছর স্পোর্টিং ইউনিয়নে কাটাবার পর '৬৮ সালে রাজস্থানে। '৬৯তে ইস্টবেঙ্গল। ৭০ থেকে ৭২ সালে মোহনবাগানে এবং ৭৩ থেকে এ পর্যন্ত আবার ইস্টবেঙ্গলে। জার্সি পাল্টাবার আর প্রশ্নও ওঠে না, ইচ্ছেও নেই।

সুভাষ সর্বপ্রথম বাংলা দলভুক্ত হন ১৯৬৭ সালে জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় (কালিকট)। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও মিলে যায়। '৬৮ সালে বাংলা সিনিয়ার দলেও ঠাঁই হয়। '৬৯ থেকে '৭৩ সাল পর্যন্ত রাজ্য দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। ৭২ সালে গোয়ার আসরে সুভাষ আবার প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত হন। '৭৪ সালে নানা ঝামেলায় পড়ে গিয়ে সুভাষ ট্রায়াল ক্যাম্পে যেতে না পারায় দল থেকে বাদ পড়েন।

ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার প্রথম সৌভাগ্য হয় ১৯৭০ সালে কোয়ালালামপুরে মারদেকা ফুটবলে এবং ব্যাঙ্ককে এশীয় ক্রীড়ার আসরে (ভারতের ব্রোঞ্জ পদক লাভ)। ১৯৭১ সালেও মারদেকায় খেলেছেন। ফেরার পথে পেস্তসুখানও খেলেছেন। ১৯৭১-৭২ সালে গেছেন ভারতীয় দলের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া সফরে। গেছেন '৭৪ সালে তেহরানে এশীয় ক্রীড়ায়। ১৯৭৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় খেলেছেন মার্ডেকা-হালিম কাপে। তার আগে একবার ১৯৭০ সালে তেহরাণ গিয়েছিলেন সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলার হয়ে এশীয় ক্লাব কাপ খেলতে।

সুভাষের জীবনে ফুটবল তা বেশ অনেক দিন গড়াল। অনেক ম্যাচের কথাই মনে পড়ে তাঁর। মনে পড়ে ১৯৭০ সালের এশীয় ক্রীড়ায় (ব্যাংকক) থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের বাছাই পর্বের ম্যাচটির কথা। 'আমরা দু গোলে হারছিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে আমারই দুটি গোল করার সৌভাগ্য হয়েছিল। একটি পয়েন্ট পেয়ে আমরা মূল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিলাম। আর একটি স্মৃতি : আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল। পিয়ং ইয়ং (উত্তর কোরিয়া) দলের বিরুদ্ধে। উত্তেজনা তুঙ্গে। কি হয়, কি হয়। জিতলাম ৩—১ গোলে। প্রথম ও শেষ গোল আকবরের। মাঝখানের গোলটি আমার। আমি রাইট আউটে খেলছিলাম। ফার্স্ট হাফে আমরা ডিফেন্স করছিলাম ইষ্টবেঙ্গল মাঠের উত্তর দিক। লাইনের পাশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বসে আছেন। ওঁকেও দেখলাম আমাদের মত একসাইটেড। আমায় ডেকে বললেন : ম্যাচ জিততেই হবে। যাক প্রাণ, থাক মান। খেলার শেষে সি এমের কি আনন্দ। ইস্টবেঙ্গলের গর্বে ওঁর বুকও ফুলে উঠেছে দেখলাম।

'কিন্তু তেমন আর খেলতে পারছি কৈ? এই তো সেদিন বড় খেলায় ইডেনে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কি যাচ্ছে-তাই না খেললাম। লজ্জায় নিজের মাথাই হেঁট হয়ে যায়। অথচ এই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমি কি কম গোল করেছি? বাবা বোধহয় রেডিওয় রিলে শুনেছিলেন। বিরক্ত হয়ে ১৪ জুলাই চিঠি লিখেছেন : 'ইউ হ্যাভ নো রাইট টু প্লে ব্যাড ফুটবল (খারাপ ফুটবল খেলার তোমার কোন অধিকার নেই)। আইদার প্লে উইথ নেম এ্যাণ্ড ফেম অর গিভ ইট আপ' (সুনামের সঙ্গে খেল অথবা ছেড়ে দাও)। ভাবছি কি করব।'

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

ফুটবলের সফল নেত্রী
নীলি ঘোষ

কালীঘাট মাঠেই চারজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরা মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল, আর বলছিল, কই কেউ তো আসেনি? কালীঘাট তাঁবুতো বন্ধ। বাসের গোলমালে আমার একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। তবু, ওদের দেখে এবং কথা-বার্তার টুকরো শুনে মনে হল, আমার জন্যই হয়ত এরা অপেক্ষা করছে। চারজনের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমরা কি বাংলার— সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, হাঁ, আমরাই প্রমীলা ফুটবল দলের। আজ আমাদের এখানে আসতে বলা হয়েছিল। এই সময় দলের একজন বলল, ওই নীলি। নীলি ঘোষ, আমাদের দলের ক্যাপ্টেন।

সুতরাং কালীঘাট তাঁবুর বাইরে সবুজ মখমলের ওপর আয়েস করে বসে ওদেরও বসালাম।—

—তুমি ফুটবল খেলা শিখলে কি করে? এর আগে কখনও খেলেছ? ফুটবল খেলতে তোমার কোন অস্বস্তিবোধ হয়নি?

—আমি ত অনেকদিন ধরে হ্যাণ্ডবল খেলছি পাইওনিয়ার ক্লাবে। জাতীয় আসরেও বাংলাদলে খেলেছি। এবার বাঙ্গালোরে আমি ছিলুম দলের স্টপার। আমাদের ফুটবল দলের অনেকেই হ্যাণ্ডবল খেলায় সুপটু। সেইজন্য আমাদের পক্ষে ফুটবলের কায়দা-কানুন রপ্ত করতে খুব বেশী কসরৎ করতে হয়নি। হ্যাণ্ডবলে [illegible] দেওয়া-নেওয়া বা বিপক্ষকে পাশ যেরকম

চটপটে মেয়েটি লক্ষ্যভেদ করে—
করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে হবে, ফুটবলের জাই। এখানে কেবল হাতের বদলে পা ব্যবহার করতে হচ্ছে। লক্ষ্ণৌ-এ আমাদের দলের খেলা দেখে অনেকেই বলেছেন, এরা নিশ্চয়ই এক বছরের ওপর অনুশীলন করেছে। এমনকি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ করণ সিং আমার হাতে জাতীয় 'প্রমীলা' ফুটবলে বিজয়িনীর ট্রফি চিনচোর কাপ তুলে দেবার সময় মন্তব্য করেন যে, এদের দলে নিশ্চয় 'ছেলে' খেলোয়াড় খেলেছে। অথচ দেখুন আমরা শ্রদ্ধেয় প্রশিক্ষক সুশীল ভট্টাচার্যের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছি মাত্র বারদিন। প্রতিদিন বেশ কিছু সময় বল খেলার নানারকম কলা-কৌশল শিক্ষাদানের এবং বার বার অনুশীলন করাবার ফাঁকে আমাদের দৌড়, ফ্রী হ্যান্ড পিটি প্রভৃতিও করিয়েছেন। খেলার পদ্ধতির সঙ্গে সমস্ত মেয়েকে উনি প্রধানত শিখিয়েছেন সারা মাঠ ছড়িয়ে খেলতে আর যতদূর সম্ভব ফাঁকায় পাস করতে। এতে আমাদের ক্রীড়া পদ্ধতি অন্য রাজ্য দলের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছিল।

—আগে আগে আমি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেও ফুটবল খেলেছি। তাছাড়া সুশীলদার উপদেশমত খিদিরপুর ক্লাবের ফুটবল প্র্যাকটিসে যোগ দিই। নীলি বলে চলে।

—প্রমীলা ফুটবল দল তৈরীর খবর তুমি কিভাবে পেলে?

—আমার বাবা শ্রীশমীরণ ঘোষই প্রথম এ খবর আমাকে জানান। ৮ জুন মাঠে আসতে পারিনি। পরদিন সুশীলদার কাছে এলে উনিই আমাকে রাইট ইনে খেলার জন্য বেছে নেন।

নীলির বাবা আই টি আই-এর স্টোর-কীপার। মেয়ের খেলাধুলো ও পড়াশোনার দিকে ওঁর খুব যত্ন আছে। আদি বাড়ি বাংলাদেশের বরিশালে। নীলির জন্ম এখানেই, ওরা তিন বোন আর এক দাদা, বর্তমান বাস টালিগঞ্জ পশ্চিম পুটিয়ারী। নীলি এখন দেশবন্ধু কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ব্রজমোহন তেওয়ারী গার্লসের ছাত্রী হিসেবেও সব খেলায় যোগ দিত।

—জাতীয় ফুটবলে তোমাকে যখন অধিনেত্রী করা হল, তখন তোমার কিরকম মনে হল?

—খুব আনন্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে একটি ভয়ও হল। যদি কিছু খারাপ হয়? তবে, সে অনিশ্চয়তার ভয় মহারাষ্ট্র বনাম অন্ধ্রের খেলা দেখেই অনেকখানি কেটে গেল। আমার দৃঢ় ধারণা হল এখানে আমরাই জিতব। কারণ, ওসব দলের তুলনায় আমাদের খেলার কায়দা অনেক সুন্দর। তাছাড়া প্রত্যেকটি খেলার পর সুশীলদা আমাদের সঙ্গে খেলার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতেন। আমাদের দলের ম্যানেজার শেফালীদিও এতে যোগ দিতেন। আমাদের দলের ব্যাকে জুড়ি ডিসিলভা আর লেফট স্টাইকার শান্তি মল্লিকের খেলা খুবই ভাল হয়েছে। বাংলা দল খেলেছে ৪-২-৪ প্রথায়। জানেন, ফাইনাল খেলার দিন আমরা সবাই প্রার্থনা করে মাঠে নেমেছিলাম। ট্রফি জিতবই। এই ছিল আমাদের প্রত্যেকের মনের দৃঢ়সংকল্প। আর প্রথম বর্ষের প্রতি-যোগিতাতেই ট্রফি জিতে আমার তো মনোবল খুব বেড়ে গেছে। জাতীয় প্রমীলা ফুটবলে আমরাই আবার জিতব, এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হয়েছে। আমাদের ছেলেরা যেমন জাতীয় ফুটবলে ইতিহাস গড়ে তুলেছে, আমার ধারণা আমরাও মেয়েদের ফুটবলে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারব।

আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষ উপলক্ষে ভারতে মহিলাদের জন্য গৃহীত নানা রকম কর্মসূচীর সঙ্গে খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও ক্রিকেট এবং ফুটবলে জাতীয় পর্যায়ে প্রতি-যোগিতার আসর বসানো হয়। পশ্চিম বাংলার মেয়েদল বছরের গোড়ার দিকে কলকাতায় জাতীয় ক্রিকেটে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে? গত জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ-এ চিনচোর ট্রফি নামে জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতি-যোগিতা আয়োজন করে উত্তর প্রদেশ মহিলা ফুটবল সংস্থা। দৈনিক সংবাদপত্রে এই প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্রে আরও সংবাদ সংগ্রহ করা। বাংলার মহিলা দল নেত্রী নীলি ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রশ্নোত্তরে জানতে পারলাম লক্ষ্ণৌ-এ এই জাতীয় প্রথম বার্ষিক প্রমীলা ফুটবলে উদ্যোক্তাদের আয়োজন খুব সুষ্ঠু হয়নি। বাংলা দলের অনেক মেয়েই বলেছে যে, ম্যানেজার শেফালীদির চেষ্টায় ভাল হলেও উদ্যোক্তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা তেমন ভাল হয়নি। দিদির ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলেই আমাদের খাওয়ার সমস্যা কমেছিল। আশা করা যায় ভবিষ্যতে উদ্যোক্তারা যোগদানকারী দলগুলির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও উপযুক্ত দৃষ্টি দিতে ভুলবে না। সেই যাই হোক, নীলি ঘোষের অভিমত হচ্ছে, আমাদের যদি আর একটু বেশী সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরা—অর্থাৎ এ যুগের বাঙ্গালী মেয়েরা ফুটবলেও ভারতে শীর্ষস্থান লাভ করে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব।

নীলি তার স্বাভাবিক সপ্রতিভ ভঙ্গীতে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে? ফুটবল খেলার সময় তার মনে কোনরকম আঘাতের ভীতি বা আশঙ্কা দেখা দেয়নি, বা সে ওরকম কোন কিছুই চিন্তা করেনি। খেলাতেই মন সন্নিবিষ্ট ছিল। সাক্ষাৎকারের শেষে এই প্রাণ-চঞ্চল মেয়েটি বান্ধবীদের নিয়ে চলল টাউন মাঠের দিকে ছেলেদের খেলা দেখতে।

বৃষ্টিস্নাত গড়ের মাঠের টাটকা সবুজের ওপর দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান চারটি আগামী দিনের তরুণীর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম, অতীতে একদিন এই ফুটবল মাঠেই দুর্ধর্ষ বিলাতী সেনাদলকে শীল্ড ফাইনালে হারিয়ে বাংলার ছেলেরা পরাধীন ভারতের প্রতিটি স্বাধীনতাকামী তরুণের প্রাণে এক অনবদ্য অভূতপূর্ব প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছিল। আবার ফুটবল মাঠেই বাংলার মেয়েদের এই সাফল্য কি নতুন কোন সামাজিক মুক্তি অভিযানের পথিকৃৎ হবে? সেই শুভদিনে আমিও সাক্ষী থাকব তো?

[illegible]

জীবন্ত কিংবদন্তী

মৃত্যুর পর মনীষীদের মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করা হয় তাঁকে কালোত্তীর্ণ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কারো জীবদ্দশায় তাঁকে প্রস্তরীভূতকরার নজীর প্রায় বিরল বললেই চলে। আজ এমন এক মানুষের কথা বলব যিনি স্বকীয় মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে জীবদ্দশাতেই সুপার হিউম্যানে পরিণত হয়েছিলেন। জীবন্ত কীর্তি কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়ে স্বচক্ষে দেখে গেছেন নিজের প্রস্তরীভূত প্রতিবিম্বকে।

কোন ক্রীড়ামোদী যদি হেলসিঙ্কি গিয়ে থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন সেই জীবন্ত কিংবদন্তীর প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্যকে। অশ্বের মত বেগবান দৌড়রত অক্লান্ত এক মানুষের ছন্দময় গতিকে শিল্পী ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন আন্তরিক নিষ্ঠায়। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের প্রাক্কালে এই খ্যাতিমান জগৎবিখ্যাত দৌড়-বীরের শ্রদ্ধায় স্বদেশবাসী অলিম্পিক ক্রীড়া-কেন্দ্রের মূল প্রবেশদ্বারের পাশে বসিয়ে দিয়েছিলেন জীবন্ত মানুষের মৃন্ময় অবয়বকে।

স্বভাবতঃই কৌতূহল হয় লিজেন্ডারী চরিত্রের আড়ালে আসল মানুষটিকে চিনে নিতে। ইচ্ছে হয় চুলচেরা নিক্তির বিচারে ক্রীড়াখ্যাতিকে বুঝতে। প্রসংগক্রমে রহস্যের জট খুলে যাবে। এবং সব জিজ্ঞাসার উত্তর স্পষ্ট হবে। আপাততঃ মন পিছু হাটছে এই নায়কের কৈশোর জীবনের একটি ঘটনার দিকে।

ফিনল্যাণ্ড বহু কীর্তিমান দৌড়বীরের জন্ম দিয়েছে। এদেশের ছেলেদের এ্যাথ-লেটিকসের প্রতি অনুরাগ জন্মসূত্রেই। এই কিশোরটিরও রক্তে ছিল দৌড়। স্বদেশের নায়করা এ্যাথলেটিক নায়কদের গুণগানে তার উৎসাহে জোয়ার বইয়েছে। নিজেকে প্রতি-ষ্ঠিত করার জন্যে প্রাণপণ একক অনু-শীলন চালাত নিঃসঙ্গ তরুণ। অপ্রাপ্তি অভ্যাসে ট্রেন আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত বাড়ীর সামনে ট্রেন লাইনের ধারে। দ্রুতগতি ট্রেনের সংগে পাল্লা দিতে গিয়ে সে হিমসিম খেয়ে পেছিয়ে পড়ত। রেল যাত্রীদের কেউ কেউ কৌতুকরস উপভোগের জন্যে কাগজ, খাবারের উচ্ছিষ্ট কিংবা কৌতুকমিশ্রিত টীকাটিপ্পনী ছুঁড়ে দিত এই পেছিয়ে পড়া ক্লান্ত তরুণের উদ্দেশ্যে। কয়েক মাস পর কিশোরটি সত্যি সত্যি গতিময় ট্রেনকে প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে যেদিন এগিয়ে গেল সেদিন ত যাত্রীদের চক্ষুস্থির। সকলেরই জিজ্ঞাসা—কে এই ছেলে?

এই ছেলেটির নাম পাভো নুরমী। মাঝারী পাল্লার দৌড়ে একমেবাদ্বিতীয়ম নুরমী দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায়ও কারোর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ট্রাক এণ্ড ফিল্ডে নুরমী ছিলেন এক আশ্চর্য বিস্ময়-কর প্রতিভা।

১৯২০ সালে অ্যান্টোয়ার্প অলিম্পিকে প্রথম আবির্ভাবেই নুরমী এক অসম্ভব অঘটন ঘটিয়ে সারা বিশ্বে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। দশ হাজার মিটার দৌড়ে ও দশ হাজার মিটার ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে প্রথম ও পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে নুরমী বিস্ময় সৃষ্টি করেন। এর ওপর আবার দলগত দৌড় প্রতিযোগিতায় ফিনল্যান্ড প্রথম হওয়ায় অন্যতম অংশ-গ্রহণকারী হিসেবে নুরমী আর একটি স্বর্ণ-পদক হস্তগত করেন। অর্থাৎ এক অলি-ম্পিকেই তিনটি সোনা একটি রূপো জয় করে নুরমী ট্রাক এণ্ড ফিল্ডে সোরগোল তোলেন।

১৯২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে নুরমীর কৃতিত্ব মনে রাখার মত। একটি দুটি নয় পাঁচ পাঁচটি সোনা এক অলিম্পিকে গলায় ঝুলিয়ে নুরমী অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেন। পনেরোশ মিটার, পাঁচ হাজার মিটার, দশ হাজার মিটার, দশ হাজার মিটার ক্রসকান্ট্রি দৌড়ে প্রথম এবং দশ হাজার মিটার দলগত ক্রসকান্ট্রি দৌড়ে শীর্ষস্থানাধিকারী ফিনল্যান্ড দলের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পঞ্চম স্বর্ণপদক জয় করে নুরমী অ্যাথ-লেটিক জগতে লিজেন্ডারী চরিত্রে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই এই অসাধা-রণ প্রতিভাসম্পন্ন নায়ককে ঘিরে নানান জন-শ্রুতি শুরু হয়। কেউ কেউ বা তাঁকে 'উড়ন্ত ফিন' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। অনেকে তাঁকে 'দি কিং অফ দি ট্রাক এন্ড ফিল্ড' বলে ভূষিত করেছেন।

১৯২৮ সালের আমস্টারডামে অলি-ম্পিকে প্যাভো নুরমীকে একটি স্বর্ণ ও দুটি রৌপ্য ব্যাগে পুরে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তিনি দশ হাজার মিটার দৌড়ে প্রথম এবং তিন হাজার মিটার স্টিপল চেজ ও পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন। তখন নুরমির অ্যাথলেটিক জীবনের পড়ন্ত বেলা। তবুও তিনি ফুরিয়ে যাননি। আগের মত সচল ও গতিময় প্রমাণ করার জন্যে নিজেকে কঠিন কষ্টসাধ্য অনু-শীলনের মাধ্যমে তৈরীও করেছিলেন। দুঃখের বিষয় পেশাদারী ঘোষণা করে নুরমীকে ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলস অলিম্পিকে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি।

১৯২০, ১৯২৪, ১৯২৮ এই তিন অলিম্পিকে পাভো নুরমীর সংগ্রহ ১২টি পদক। ব্যক্তিগতভাবে ৭টি সোনা ৩টি রৌপ্য ও দলগত দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার সুত্রে আরও দুটি স্বর্ণ। ১৯৩২ সালের অলিম্পিকে যোগদানে বঞ্চিত না হলে সংগ্রহের অংক অবশ্যই বাড়ত।

দ্বিতীয় দশকে নুরমীকৃত নজীর একে একে যুগের মুছে গেছে উত্তরসূরীদের পাল্লার দাপটে। যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ সেকালে এখনকার মত বিজ্ঞানের কল্যাণে কৈতাদুরস্ত কেতাবী কসরৎ-এর উদ্ভব হয়নি। নুরমী এগিয়েছিলেন সম্পূর্ণরূপে তার ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে। আজকের যুগে জন্মালে নুরমীর নৈপুণ্য কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

'উড়ন্ত ফিন' পাভো নুরমী প্রতি-যোগিতার আসর থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছরের ওপর। স্টপ ওয়াচে ধরে রাখা তাঁর নজীরগুলোও তলিয়ে গেছে পর-বর্তীকালে। গত বছর তাঁর জীবনাবসানও হয়েছে। তবুও আজও আমরা ভুলতে পারিনি নুরমীকে। কারণ ১৯২৪-এর এক অলিম্পিকে পাঁচটি সোনা জয়ের সুবাদে তিনি এখনও অম্লান, অপরাজেয়। এক অলিম্পিকে বড় জোর চারটি স্বর্ণপদক জয়ের তিনটি অতীত নিদর্শন রয়েছে। এঁরা হলেন আলভিন ক্রানজলিন জে সি ওয়েন্স, ও শ্রীমতী ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স। পরবর্তীকালে রন ক্লার্ক, এমিল জ্যাটোপেক, ভ্ল্যাদিমির কুটস, লাসে ভিরেন প্রমুখ বিশ্ব-বিজয়ীরাও কেউই কিন্তু এক অলিম্পিকে পাঁচটি সোনা ব্যাগে পুরে নুরমীর নজীরকে ম্লান করতে পারেননি। এই অর্থে নুরমী আজও অদ্বিতীয়।

প্রশান্ত দাঁ

রাজা

সংলাপ, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা তপন সিংহ

'আপনজন' এবং 'এখনই' ছবিতে যাদের কথা বলা হয়নি, 'রাজা' ছবিটি তাদের নিয়েই। ট্রিলজির শেষের ছবি 'রাজা' নিঃসন্দেহে আগের ছবিগুলির চেয়ে অনেক বাস্তব।

প্রফুল্ল রায়ের 'আলোর ফেরা' কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি এক কথায় বেশ উঁচু দরের। প্রফুল্ল রায়ের রচনা যেমন সুগ্রথিত ও সুন্দর, তেমনি শ্রীতপন সিংহ তাঁর মার্জিত প্রয়োগকর্মের দ্বারা, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে এমন একটি সমাজকে দেখিয়েছেন যার অস্তিত্ব আজ লোপের পথে। অর্থাৎ সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ—সংসারের অভাব পূরণে যারা অসৎ পথগুলির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তবু দেখা যায়, শত অভাবেও মানবিক মূল্যবোধগুলি তাদের মনে বেঁচে থাকে।

রাজা (দেবরাজ রায়) চুরি করতে বাধ্য হয় তার সংসারের জন্যে। মাঝে মাঝে পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে। এইরকম একবার ধরা পড়লে রমলা (আরতি) নামে স্থানীয় এক মহিলা নিজের স্বার্থে রাজাকে ছাড়ায়। রমলার কাজ হল, অভাবাক্রান্ত সংসারগুলো থেকে চাকরীর লোভ দেখিয়ে নিষ্পাপ মেয়েগুলোকে জোগাড় করে তাদের নরকের পথে ঠেলে দেওয়া। জয়া (মহুয়া) মেয়েটি চাকরীর লোভেই রমলার কাছে আসে। রাজার ওপর ভার পড়ে তাকে কলকাতার একটি হোটেলে পৌঁছে দেবার। সরল, নিষ্পাপ জয়াকে রাজার ভাল লাগে। সে পারে না তাকে নরকের পথে ঠেলে দিতে। ফলে রমলার সঙ্গে রাজার সংঘর্ষ বাধে। পরে রমলা নিজেই জয়াকে সেই হোটেলে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে রাজা ছোটে জয়াকে বাঁচাতে। কিন্তু আকস্মিকভাবে পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে জয়া হোটেল থেকে পালাতে সমর্থ হয়। রাজার কাছে জানাতে আসে তার শেষ কৃতজ্ঞতা, কিন্তু এসে দেখে সে মৃত।

রাজা-জয়াকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি চরিত্রগুলিকে (এমনকি কলকাতার শহরতলীর যুব সমাজকেও) পরিচালক যেভাবে দেখিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। কাহিনীও এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। তবে আলোয় ফেরার লেখক রাজাকে যে আশার আলো দেখিয়েছেন—ছবিতে পরিচালক তা দেখাননি। এ ছবিতে সেন্টিমেন্ট অনেক কম। তবে ছবিটি রীতিমত স্মার্ট। ট্রিটমেন্টেও অনেক নতুনত্ব আছে, যেমন বেকার যুবকদের ইণ্টারভিউ, ক্ল্যাশব্যাকে দাদার মৃত্যু, ছবির আরম্ভে স্পোর্টসের দৃশ্য (যা যুবসমাজের প্রতীক) প্রভৃতি।

কলাকুশলীদের কাজ বেশ উন্নত মানের। ক্যামেরায় বিমল মুখার্জির কাজ অত্যন্ত সুন্দর। প্রায় আগাগোড়া আউটডোরে তোলা ছবিটির লোকেশনও চমৎকার। এ-ছবিতে অনেক চরিত্র—প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করেছেন যার কৃতিত্ব পরিচালকেরই প্রাপ্য। তবু বিশেষ ভাল লাগে অনিল চ্যাটার্জির (ফাদার ডোনাল্ডস) অভিনয়। এটি তাঁর জীবনের একটি অবিস্মরণীয় কাজ তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া দেবরাজ ও মহুয়া, শেখর চ্যাটার্জি (পুলিশ), নির্মলকুমার, শিবাজী ব্যানার্জি, শিউলি মুখার্জি ও সন্তু মুখার্জির কাজও প্রশংসনীয়। সুবোধ রায়ের সম্পাদনা ভালো। সংলাপ আর একটু সংযত হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।

মহুয়া রায়চৌধুরী, দেবরাজ রায়

আপনে রং হাজার

দুর্বল ও কাল্পনিক কাহিনীর উপভোগ্য চলচ্চিত্ররূপ!!!

প্রযোজনা : কিং প্রোডাকসন্স

পৃথিবীতে সুনীলের মতো সুখী ব্যক্তি খুব কমই আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রচুর সম্পত্তির মালিক। সময় কাটে সুরা ও সাকী নিয়ে অর্থাৎ তার প্রচুর ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে অনেক সুন্দরী তরুণী। এদের প্রেম ও প্রণয়ের তীরে বিদ্ধ হয়ে, আনন্দের মধ্যে দিন কাটে সুনীলের। সুনীল বুঝতে পারে না, কাকে সে জীবনসঙ্গিনী বেছে নেবে? কারণ প্রায় সকলেই তাকে ভালবাসে না, ভালবাসে তাঁর ঐশ্বর্যকে? ইতিপূর্বে বহুবার ঠকে, সুনীল মদ ও মেয়েদের নিয়ে সময় কাটালেও, সে এখনও অবিবাহিত।

অতঃপর সুনীলের কাকা সুরা ও সাকীর প্রতি ওঁর আকর্ষণ ও কর্তব্য অবহেলা, বিশেষভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে তেমন নজর না দেওয়ায়, সুনীলকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকর

করার আগেই আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। সুনীলের জীবনে আসে মোহময়ী রীতা। কিন্তু আসলে কুচক্রী ভিকিই ওকে সুনীলের কাছে পাঠায় প্রেমের অভিনয় করে সুনীলের অর্থের উপর প্রভাব বিস্তার করতে। এই জন্যেই সম্ভবতঃ ভিকি সুনীলের কাকাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে।

সুনীলের গাড়ীর ড্রাইভার মালাকে আনে, ওদের বাড়ীতে, ওর মাকে সাহায্য করার জন্যে। ধীরে ধীরে সুনীল ও মালা একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। সুনীলের মাও মালাকে আধুনিকা রমণীতে পরিবর্তন করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ভিকি তার এই সৎ বোন মালাকে হত্যা করে, সম্পত্তির মালিক হতে চায়।

কুচক্রী ভিকির পরিকল্পনা, আগে থেকে জানতে পেরে, সুনীল নিজে পঙ্গু সেজেছিল এবং পুলিশকেও পূর্বাহ্নে সতর্ক করে রেখেছিল। ঘটনাস্থলে সুনীলের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভিকি এঁটে উঠতে পারে না।

কাহিনীকার ও পরিচালক রবি ট্যান্ডন, এক সাসপেন্স-ধর্মী কাহিনীর মধ্যে হাস্য ও কৌতুক পরিবেশন করে, ছবিটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে পারতেন। কিন্তু নিজেই কাহিনীকার ও পরিচালক হওয়ায়, গল্পের অবাস্তবতা ও গতানুগতিক ভাবকে এড়াতে পারেন নি। সাম্প্রতিক ছবি 'খেল খেল মে' ছবিটিও একই দোষে দুষ্ট। তবে সুষ্ঠ পরিচালনা, অভিনয় ও আঙ্গিকের কাজে নিজের পারদর্শিতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন, সারা ছবিতেই তার প্রমাণ মেলে।

অভিনয়ে—সুনীল (সঞ্জীবকুমার), মালা (লীনা চন্দ্রা-ভারকর), মা (কামিনী কৌশল) ও ভিকি (ড্যানি)এর কাজ আন্তরিকতাপূর্ণ। অন্যান্য ভূমিকায় বিন্দু, সত্যেন্দ্র কাপুর, আসরাণী, পেন্টাল, সুধীর, ম্যাকমোহন, জানকী দাস, জগদীশ রাজ, শ্যামা, মাস্টার টিটো প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন।

প্রবীণ ভট্টের আলোকচিত্রগ্রহণ এবং গুরু দত্ত ও বামন ভোঁসলের সম্পাদনার কাজ উচ্চাঙ্গের। লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলালের সংগীত পরিচালনা উপভোগ্য। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন।

বরদান

দুর্বল ও গতানুগতিক কাহিনীর অভিনয়সমৃদ্ধ চিত্ররূপ !

প্রযোজনা : শ্রী প্রকাশ পিকচার্স

বনওয়ারীলাল শর্মা সাদাসিদে ধর্মভীরু মানুষ। যজমানী ও পুরোহিতের কাজ করেই সংসার চালান। দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে সংসার। বড় ছেলে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। ছোটছেলে মহেশের ইঞ্জিনীয়ারিং পর্যন্ত শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ই বহন করেছেন বনওয়ারীলাল। ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট হয়ে মহেশ বম্বে গিয়ে চাকুরীর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ২৫০ টাকার চাকুরী নিয়ে নতুন জীবন শুরু করে মহেশ। টাকা পেয়েই মা-বাবার কাছে, প্রথমে ৫০ এবং পরে ৭৫ টাকা পাঠায়। আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, বড় ছেলে শংকর ৩০০০ টাকা পাঠায় মা-বাবার সাহায্যের জন্যে। টাকার পরেই বম্বেতে এক ফ্ল্যাট কিনে, মা, বাবা ও বোনকে নিয়ে গেছে সুন্দর। কিন্তু মহেশ সেখানে গিয়ে থাকতে রাজী হয়নি, বরং প্রয়োজন মা বাবার সঙ্গে দেখা করবে, সুন্দরের টাকার অভাব নেই, ধুমধাম করে প্রৌঢ় বাবার জন্মদিন পালন করে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানায়। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর চৌধুরীকেও নিমন্ত্রণ জানায়। তার একমাত্র মেয়ে লতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে শংকরের ইচ্ছা হোল ওকেই বিবাহ করবে। তাহলে কেবল সুন্দরী রমণীই পাবে না, প্রচুর অর্থের মালিক হতে পারবে। 'লতা' কিন্তু মহেশকে ভালবাসে। প্রথম যেদিন ট্রেনে ওদের আলাপ হয়েছিল, সেদিন থেকেই। মহেশের মায়েরও সম্মতি ছিল, লতাকে পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করায়।

শংকর ব্যাঙ্কের ডিরেকটর চৌধুরীকে মহেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, লতাকে বিবাহ করার ব্যাপারেই কেবল প্রতিবন্ধক হল না, ওর চাকুরীও খতম করে দিল। শংকরের মত ধনীর সঙ্গেই তার একমাত্র কন্যা লতার বিবাহ সম্পন্ন। গোপনে গোপনে শংকর বিবাহের সব ব্যবস্থা শেষ করার পরে, জানতে পারলো চোরাই সোনা আসছে অথচ সেগুলি সংগ্রহ করবার কোন লোক নেই। বাধ্য হয়ে শংকর পিতাকে দামী দামী রত্নসম্ভার সংগ্রহ করতে পাঠায়। পরে বনওয়ারীলাল শর্মা যখন স্মাগলিংয়ের অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন, তখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর বড় ছেলে এক কুখ্যাত স্মাগলার। মহেশ লতাকে উদ্ধার করলো এবং শংকরকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে পুলিশকে সহায্য করল। বিচারে শংকরের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হোল। এবার সকলেই বুঝলো মহেশই তাদের কাছে 'বরদান'।

কাহিনী দুর্বল ও গতানুগতিক, এজাতীয় কাহিনী পর্দায় একাধিকবার রূপায়িত হয়েছে। পরিচালক অরুণ ভট্ট কাহিনীর দুর্বলতাকে সাবলীল পরিচালনার মধ্যে দিয়ে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। ছবিতে রহস্য সৃষ্টি করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উনি সেগুলি কাজে লাগাতে পারেননি। আশা করি ভবিষ্যতে উনি এজাতীয় কাহিনী নির্বাচন না করে, বিজয় ভট্টের মত সর্বাঙ্গ-সুন্দর ছবি করার চেষ্টা করবেন।

অভিনয়ে—মেহমুদ (বন্ধু), ওমপ্রকাশ (বনওয়ারীলাল), ঊর্মিলা ভট্ট (মা), নরেন্দ্রনাথ (শংকর), বিনোদ মেহরা (মহেশ) ও বীনা রায় (লতা) ভাল অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অসিত সেন, জানকী দাস, কৃষ্ণকান্ত, জয়শ্রী টি, মিনা টি, চন্দ্রশেখর ও রত্নাপ অভিনয় যথাযথ। সঙ্গীত পরিচালনায় কল্যাণজী আনন্দজীর সুরসংযোজনা উপভোগ্য।

চিত্রদূত

অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে প্রস্তুত হয়েছেন ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত। এই শট নির্ভুল না হলে আর দ্বিতীয়বার টেক করা যাবে না। তাই যত রকম সতর্কতা নেবার, নেওয়া হয়েছে।

পরিচালিকা চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলেন—স্টার্ট ক্যামেরা—

সহকারী ক্যামেরাম্যান সুইচ অন করে দিয়ে হেঁকে বলল—রানিং—

—অ্যাকশান!

আমি ক্ল্যাপস্টিক বাজিয়ে একটা সাউন্ড দিলাম। অর্থাৎ রাইফেলের গুলীর শব্দের এফেক্ট। বাবু লোহারীর হাত থেকে হঠাৎ রাইফেলটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই তলপেটে হাত চেপে চিৎকার করে উঠলেন—

—মর গিয়া। তারপর মৃত্যুর সঙ্গে শেষবারের মত যুঝতে যুঝতে উনি সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়লেন। পাহাড়ের ঢাল। বাবু লোহারী এবার সত্যিই মরছে।

ভাবুন আমাদের মানসিক অবস্থাটা।

চারিদকের সেই নিঃস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে বাবু লোহারীর প্রবল চিৎকারে—ম্যায় মর গিয়া—ম্যায় মর গিয়া—পুতলী মুঝে মার ডালা—

সার্জেন্ট উধম সিং ঠিক আমারই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখের সামনে বাবু লোহারী মরছে—এ অবিশ্বাস্য। মুহূর্তেই তার চোখ বিস্ফারিত। আমি বুঝতে পারছি যে এই ব্যাপারটাকে খাঁটি নির্ভেজাল একটা ঘটনা হিসাবে ধরে নিয়েছে। এক ঝটকায় অটোমেটিক রিভলবারটি টেনে বের করে ফেলে সে তখন সামনের দিকে ছুটে যেতে উদ্যত—ভুলেই গেছে যে এটা শুটিং হচ্ছে। আমি খপ করে ওর হাত চেপে ধরলাম। উধম সিং সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘুরে তাকাল। আমি চোখের ইঙ্গিতে ওকে আশ্বস্ত করলাম। এটা অ্যাকটিং হচ্ছে ভাই সাহাব—অ্যাকটিং!

শেখর চ্যাটার্জি পাহাড়ের কর্কশ ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে আসছেন। হেভী শরীর। কাঁটা গাছে লেগে গা-হাত পা ছড়ে রক্তাক্ত হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ওই অমানুষিক রক্ত ঠাণ্ডা করা চিৎকার।

রামানন্দ সেনগুপ্ত শেখর চ্যাটার্জির মুভমেণ্ট ধরে ক্ষিপ্র হাতে ক্যামেরা অপারেট করছেন। ওঁর সহকারী জুম লেন্সের মুভমেণ্ট দিচ্ছে। অদূরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কর গুহ। সে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের শব্দ গ্রহণ করছে। কারও চোখের পলক পড়ছে না। আমাদের সঙ্গের সিকিউরিটি ফোর্সের জোয়ানদের অবস্থা শোচনীয়। তারা ঘন ঘন সার্জেন্টের দিকে তাকাচ্ছে। শক্ত হাতে রাইফেল ধরা। ট্রিগারে আঙুল। সেফটি ল্যাচ খোলা। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তারা গুলি চালাবে...

দড়াম করে একটা আওয়াজ হলো।

শেখর চ্যাটার্জি সশব্দে মাটিতে এসে পড়লেন। চারিদিকে ধুলোর ঝড়। জুম লেন্স তৎক্ষণে দুর্দান্ত গতিতে চার্জ করে এগিয়ে গিয়ে মৃত দস্যুর মুখের ওপর চলে গেছে। শেখর চ্যাটার্জি নিঃস্পন্দ দেহে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। রক্তে তাঁর শরীর যেন ভেসে যাচ্ছে।

হঠাৎ রামানন্দ সেনগুপ্ত চিৎকার করে উঠলেন—হি ইজ ফিনিশড—ওকে ধরো ওকে ধরো—

পরিচালিকা শট কাট করবার কথা ভুলে গেছেন। আমি তৎক্ষণে দৌড়াতে আরম্ভ করেছি। দৌড়াচ্ছেন রামানন্দ এবং আরও কয়েকজন। সিকিউরিটির লোকজনও।

ধুলোর পর্দা সরে যেতে দেখা গেল শেখর চ্যাটার্জি জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে আছেন। মুখের দু তিন জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইছে মৃদু গতিতে।

—ডাক্তার ডাক্তার—

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। শেখরদা ব্যাডলি ইঞ্জিয়োর্ড। কেউ একজন ছুটে গিয়ে শহর থেকে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুন।

কোথায় শহর?

আমরা তখন মোরেনা টাউন থেকে চুয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে এক ভয়াবহ বেহড়ের গর্ভে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কেউ যদি গাড়ি ছুটিয়ে চলেও যায় এবং কোন ডাক্তারকে রাজী করিয়ে এখানে নিয়েও আসে—পাক্কা দু থেকে আড়াই ঘণ্টার ধাক্কা। আর তৎক্ষণে...

বললাম—শেখরদাকেই বরং সাবধানে তুলুন। ওঁকেই গাড়ি করে শহরে নিয়ে যেতে হবে—

রামানন্দ সেনগুপ্ত ওঁকে সন্তর্পণে পরীক্ষা করে বললেন অসম্ভব। রাস্তার যা অবস্থা তাতে গাড়ি করে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যাবে না। রঞ্জন তুমি চলে যাও, য কোনভাবে একজন ডাক্তার নিয়ে এসো—

আমি ছুটছি। সঙ্গে সিকিউরিটি উধম সিং। বললে—আমাদের ক্যাম্পে চলে যাবেন। কর্ণেলকে বলবেন — যদি আর্মির ডাক্তার কাণী সাহাবকে পেয়ে যান—নিয়ে চলে আসিবেন।

ঝড়ের মত টাউনে এলাম। সোজা ডাক্তার বোসের দাবাইখানা। কম্পাউন্ডার বললে—ডাকতার সাহাব হাসপাতালমে হ্যায়—গাড়ী ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল। ডাক্তার বোস খবর পেয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, ভদ্রলোক নামে বাঙালি কিন্তু একবর্ণও বাঙলা বলতে পারেন না। পথে যেতে যেতে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললাম। উনি রাগ করলেন। শেখরবাবুর এতটা রিস্ক নেওয়া উচিত হয় নি। অত উঁচু থেকে লাফানো ঠিক হয় নি।

যখন লোকেশানে পৌঁছলাম শেখরদার জ্ঞান ফিরেছে। তবে কথা বলতে পারছেন না। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। গাড়ির সিটে চুপ করে শুয়ে আছেন। ওঁকে ঘিরে উদ্বিগ্ন মুখে আমাদের ইউনিটের সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তারকে দেখে সবাই ছুটে এলেন।

পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে ডাক্তার বোস বললেন, ব্যাপারটা সিরিয়াস। ... হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ই সি জি করতে হবে—

—হার্ট অ্যাটাক?

—হাঁ।

—সর্বনাশ।

তারপর অতি সন্তর্পণে শেখরদাকে গাড়িতে করে শহরে আনা হলো। তারপর হাসপাতালের বেডে। আমাদের কাজ সেদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর্টিস্টের জীবন নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া। হঠাৎ কি হতে কি হয়ে গেল।

সন্ধেবেলা ই সি জি'র রিপোর্ট পাওয়া গেল। নাঃ, খবর ভাল। একেবারে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে বিপদটা। হার্ট অ্যাটাক করে নি তবে শেখরবাবুকে বেশ কয়েকটা দিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে হবে।

সেদিন ক্যাম্পে বসে গল্প হচ্ছিল ডাক্তার বোসের সঙ্গে। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে বেহড়ে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকের লড়াই করে যে সব ডাকাত আহত হয়—তারা কোথায় চিকিৎসা করে? বেহড়ে তো আর ডাক্তার-বদ্যি নেই।

ডাক্তার ঘোস হেসে বললেন—ছোটখাটো আঘাতে ওরা সাধারণত বিচলিত হয় না। কিন্তু বড় গোছের চোট হলে মুস্কিল হয়। ওরা তখন আহত সহকর্মীর চিকিৎসার জন্যে শহর থেকে ডাক্তার তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ধরুন, গুলি তখনও শরীরে ঢুকে আছে, ইঞ্জিয়োর্ড জায়গাটা সেপটিক হয়ে গেছে, আর দু-একদিন দেরী হলে হয়ত গ্যাংগ্রীন ফর্ম করে যাবে—তখন ওরা একেবারে ডেসপারেট হয়ে ডাক্তার ধর-বার চেষ্টা করে…

চম্বলে শুটিং করবার সময় আমি ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছি—প্রত্যেক বড় বড় শহরে দলের মিডিলম্যান আছে। তার মাধ্যমেই ডাকাতরা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। লুটের মাল বিক্রি-বাটা করে। আত্মীয়-স্বজনদের টাকা-পয়সা পাঠায়। অবশ্য এ-সবই গোপনে গোপনে হয়। পুলিশ আজ পর্যন্ত এই সব মিডিলম্যানদের ধরতে পারে নি। পারলে তো এত বড় সমস্যার সুরাহা হয়ে যেত। মূল সাপ্লাই লাইন যদি কাট করা যায় তো ওরা যতই দুর্ধর্ষ হোক না কেন—বেহড়ে স্রেফ শুকিয়ে মরতে বাধ্য।

বলছিলেন এক ডাক্তার ভার্মার গল্প। না মশাই, আপনাদের বলায় বিপদ হচ্ছে, আপনারা দুম করে লিখে দেবেন। বললাম, ঠিক আছে, কখনও যদি লিখি—আসল পরিচয় গোপন করেই লিখব, আই প্রমিজ।

তো শুনুন, সেদিন রাত্তিরবেলা। চেম্বারে রোগী নেই। কম্পাউন্ডারকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। তারপর টাকা-পয়সা ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে সবে বাড়ি ফেরবার উদ্যোগ করছেন। এমন সময় বাইরে একটা জীপ গাড়ি এসে দাঁড়াল। ডাক্তার ভার্মা উৎকর্ণ হলেন। এত রাত্রে আবার কে এলো? বাইরে থেকে মোটা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—অন্দর মে হ্যায় ডাক্তার সাহাব—

—কোন্ হ্যায়?

বলতে বলতে তিনজন দেহাতী মানুষ চেম্বারে এসে ঢুকল। বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা। পরণে মোটা খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি। মাথায় গান্ধী টুপি। প্রত্যেকের কাঁধে একটি করে রাইফেল ঝুলছে। দেখলেই বোঝা যায় এরা সম্পন্ন চাষী। রাইফেল দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। ডাকাতি দমন করবার জন্যে এক সময় মধ্যপ্রদেশ সরকার উদার হাতে গ্রামের মানুষদের বেশ কিছু লাইসেন্স বিতরণ করেছিলেন। তাদের অনেকেই শখ করে রাইফেল কিনেছিল সে সময় বিশেষ করে জোতদার শ্রেণীর মানুষেরা।

ডাক্তার ভার্মা সপ্রশ্নে তাকালেন।

এরা বলল—ডাক্তারবাবু মেহেরবাণী করে একটু যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। রোগীর এখন-তখন অবস্থা—

—কোথায়?

—আজ্ঞে পুরনাম-খোটিয়ায়—

পুরনাম-খোটিয়া মোরেন শহর থেকে পনের মাইলের মধ্যে একটি গঞ্জের নাম।

রাগ অনুরাগ
অপর্ণা সেন

প্রধানত ব্যবসাদার শ্রেণীর বসবাস। কৃষিজাত জিনিসের কেনাবেচা হয় এখানে।

ডাক্তার ভার্মা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বললেন—কিন্তু রাত্রে তো আমি বাইরের কলে যাই না কখনও। তোমরা কাল সকালে বরং এসো—

কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। ওরা বলল—ডাক্তারবাবু, আপনার কোন তকলিফ হবে না। আমরা জীপ এনেছি। আপনি যাবেন, রোগী দেখবেন বাস, সঙ্গে সঙ্গে জীপে করে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব—

—অসম্ভব, আমি যাব না।

—যেতেই হবে ডাক্তারসাহাব। না হলে রোগী মারা যাবে

—সে আমি তার কি করব বলো। তোমরা বরং অন্য কোন ডাক্তার নিয়ে যাও—

ওরা নিঃশব্দে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল পরস্পরের। তারপর ওদেরই মধ্যের একজন এগিয়ে গিয়ে একটানোটের বান্ডিল রাখল টেবিলের ওপর। সবই একশো টাকার নোট। ডাক্তার ভার্মা অবাক।

—চলুন ডাক্তারবাবু। এই রোগীর ইলাজ করলে আপনি অনেক টাকা কামাতে পারবেন।

ডাক্তার ভার্মা নিঃশব্দে একবার ওদের দেখলেন। এতগুলো টাকা—ছেড়ে দিতে মন চাইছে না। বললেন—কী হয়েছে রোগীর?

—পায়ে একটা গোলী লেগেছে—

চমকে উঠলেন ডাক্তার ভার্মা।—গোলী? বাগী (ডাকাত) নয়ত?

ওরা বলল—না হুজুর, আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ক্ষেতিখামার নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটির ফলে গুলী চলছিল। তবে আপোষে সব মিটমাট হয়ে গেছে। আমরা চাইছি না যে এই সব নিয়ে আবার কোতোয়ালী পুলিশ হোক। বুঝতেই তো পারছেন। রিস্তাদার সবাই…হেঁ হেঁ হেঁ—

ওদের বলার ভঙ্গিটা খুবই সরল। সন্দেহ করার মত কোন লক্ষণই ডাক্তার ভার্মা আবিষ্কার করতে পারলেন না। তবুও মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। শেষে হিতে বিপরীত না ঘটে বসে। টেবিলের সামনে একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল হাতছানি দিচ্ছে। ডাক্তার ভার্মা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বেশ চলো। তবে তাড়াতাড়ি আমি ফিরে আসব।

বলে কিছু যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিলেন। নিলেন কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, ইঞ্জেকশন। তারপর ওদের সঙ্গে চেম্বার থেকে বেরিয়ে ডাক্তারখানায় চাবি দিয়ে জীপে চড়ে বসলেন।

অন্ধকারের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ জীপ চলবার পর ডাক্তার খেয়াল করলেন গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে সালা-র দিকে ছুটেছে। ডাক্তার ঘাবড়ে গেলেন।

—গাড়ি কোনদিকে যাচ্ছে?

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

একি, তোমরা পদ্মনাভ-খোটিয়ায় যাবে বলছিলে? এখন উল্টো রাস্তায় যাচ্ছো না?

এবারও কোন জবাব নেই।

—গাড়ি থামাও। আমি যাব না। আমাকে ঘুরে ফিরিয়ে দিয়ে এসো তোমরা

তিনজন তখন পাথরের মত জীপে বসে আছে। ওদের মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, ভাব-বিকার নেই। চুপটি করে বসে আছে। শক্ত হাতে রাইফেল ধরা।

ডাক্তার ভার্মা বুঝলেন উনি ফাঁদে পড়ে গেছেন। এরা নিঃসন্দেহেই বাগী। জীপ যখন সালার দিকে চলেছে তখন বেহড় ছাড়া আর কিছু নয়। ওদিকে লোকালয়ের কোন চিহ্ন নেই। মাইলের পর মাইল শুধু রুক্ষ বেহড়। ডাক্তার বুঝলেন এখানে চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই। বরং তাতে আরও বেশী করে নিজের বিপদই ডেকে আনা হবে।

জীপ গিয়ে দাঁড়াল একটা বেহড়ের সামনে। ওরা চটপট নেমে পড়ল। ডাক্তার ভার্মাকে ওদের একজন গম্ভীর স্বরে বলল—আপনি ভয় পাবেন না। নেমে আসুন। চলুন, আপনার জিনিসপত্র আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ডাক্তার এবার কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন—তোমরা তাহলে বাগী?

শুনে ওরা হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল। হ্যাঁ, আমরা বাগী। পুলিশের দুষমন আমরা। আর শেঠজীদের। সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি আমরা করি না। আপনারও করব না।

চম্বলে এটা সুবিদিত যে বাগীরা প্রায়ই ধনী শেঠদের ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায় করে। আর মুক্তিপণ না দিতে পারলে ওরা গুলি করে মারে। পুলিশ তখন পর্যন্ত এর কোন প্রতিকার

সেবক
নিতু সিং, বিনোদ খান্না

করতে পারে নি। তাছাড়া হাইওয়ে ডাকাতি তো লেগেই ছিল। ডাক্তার ভেবেছিলেন ওরা সেই রকম একটা প্ল্যান করে তাকে ধরে এনেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁর ভুল ভাঙলো। ওরা বাস্তবিকই চিকিৎসার জন্যে ওঁকে নিয়ে এসেছে। ডান পায়ে গুলি লেগেছে একজনের। পুলিশ এনকাউণ্টারে ফেঁসে গিয়ে কদিন আগে ঘটনাটি ঘটেছে। তারপর সেই অবস্থাতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে লোকটি দলের সঙ্গে ঘুরছে। কিন্তু গতকাল থেকে আর পারছে না। শুয়ে পড়েছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। অবিরাম ভুল বকছে। তারপর ওরা হাইওয়ে থেকে একটা জীপ লুঠ করেছে। শহরে গেছে। ডাক্তার ধরে এনেছে।

বলল—টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না ডাক্তারসাহাব। যত চাইবেন পাবেন। কিন্তু ওকে ভাল করে দিতে হবে—

অন্ধকার রাত্রে বেহড়ের মধ্যে মশাল জ্বালিয়ে ডাক্তার ভার্মা রোগীর ক্ষতে ছুরি চালালেন। তার অমানুষিক চিৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বেহড়ের অভিশপ্ত মাটি। বুলেটের টুকরো একটা একটা করে বের করে ক্ষতের জায়গা ভাল করে ড্রেস করে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন ডাক্তার। তারপর দিলেন গুটি কয়েক ইঞ্জেকসন। রোগী কাতরাতে কাতরাতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। রাত তখন প্রায় কাবার। ডাক্তারকে ওরা বলল—চলুন আপনাকে শহরে পৌঁছে দিয়ে আসি। ভোর হবার আগেই আমাদেরও এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে—

পুলিশ চারিদিকে হন্যে হয়ে ডাকাতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুতরাং একটি জায়গায় বেশীক্ষণ থাকা ওদের পক্ষেও বিপজ্জনক ব্যাপার।

—কিন্তু রোগী?

—ওকে আমরা ডুলি করে বয়ে নিয়ে যাব। আপনি শুধু বলুন ওর ঘা শুকোতে ক'দিন লাগবে।

—দিন পনেরো তো বটেই—

—ঠিক আছে। আমরা ব্যবস্থা করব।

ডাক্তার ভার্মাকে ওরা শেষ রাত্রে বাড়ির সামনে এনে ছেড়ে দিয়েছিল। আর ওঁর হাতে তুলে দিয়েছিল একটা প্যাকেট। ডাক্তার ভার্মা জানতেন প্যাকেটে কি আছে। ডাক্তার তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে কিছু ওষুধ এনে ওদের হাতে দিয়ে সেগুলো খাওয়াবার নিয়মকানুন বলে দিলেন।

ওরা চলে গেল।

—তারপর?

—তারপর ডাক্তার ভার্মা আর মোরেনাতে বেশী দিন থাকেন নি। তিনি মধ্যপ্রদেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। কারণ পুলিশ টের পেয়ে গিয়েছিল যে তাঁর সঙ্গে ডাকাতদের একটা যোগসূত্র আছে। পুলিশ ওঁকে হাতে-নাতে ধরবার বহু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। বিপদ বুঝে শেষ পর্যন্ত উনি শহর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হলেন।

এটা একটা মামুলী গল্প। কিন্তু ওরা যেদিন আমাদের শুটিং-এ প্রদীপকুমারের ওপর হামলা করল সেদিন? সেদিনের ঘটনা বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। সেটা আগামী সংখ্যায় বলব।

রঞ্জন মজুমদার

আজকের টালিগঞ্জ পাড়ায় সবচাইতে প্রবীণ আর অভিজ্ঞ শিল্প নির্দেশক বলতে একটি নামই সবার আগে মনে আসে। নামটি হচ্ছে সুনীতি মিত্রের।

১৯৪৫-এ তখন তিনি কলাভবনের ছাত্র। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু খুব স্নেহ করতেন ওঁকে। শান্তিনিকেতনে ঢোকার পেছনেও কাহিনী আছে কিছু। প্রথমটায় শিল্পাচার্য সুনীতিবাবুকে 'সিট নেই' অজুহাতে কলাভবনে ভর্তি করেন নি। পরে সরাসরি কবিগুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থান করে নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র আঁকায় নয়, মঞ্চ পরিকল্পনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সেই সময়। ফাইনাল ইয়ারে এই বিভাগে ডিস্টিংশন পেয়েছিলেন।

একদিন নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডিরেক্টর সৌরীন সেন গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। নন্দলাল বসুকে একজন ছাত্র দিতে বললেন ওঁর সহকারী হিসাবে কাজ করার জন্য। 'শিল্পাচার্য আমার নামটাই রেকমেন্ড করলেন।'

১৯৪৫-এর [illegible] মাসে যোগ দিলেন নিউ থিয়েটার্সে সৌরীনবাবুর সহকারী হিসাবে। প্রথম তিন মাস মাইনে [illegible] ছিলেন বাঁশী টাকা করে। পরে পেয়েছিলেন একশ পঁচাত্তর টাকা [illegible]। [illegible] বাড়ি [illegible] করলেন [illegible]। ভোলানাথ মিত্রের [illegible] সুনীতিবাবুর নাম লেখা হল শিল্প নির্দেশক হিসাবে।

তারপর থেকে তিনি এক টানা ছবি করে গেছেন। ১৯৫৫ নাগাদ যখন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও বন্ধ হল, ফ্রিল্যান্স হিসাবে কাজ শুরু করলেন সুনীতিবাবু। আর এই ইন্ডিপেন্ডেন্টলী কাজ করতে গিয়েই তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারী হয়েছে অনেক। বহু বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করে আর্ট ডিরেকশন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে পেরেছেন নতুনভাবে। নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন প্রচুর।

'কাবুলিওয়ালা' ছবির জন্য খিদিরপুরে কাবুলি রেস্তরায় ঘুরেছেন বহু দিন, চীনা পট্টিতে তাকে যাতায়াত করতে হয়েছে 'নীল আকাশের নীচে' ছবির সময়। সম্প্রতি 'হারমোনিয়ম' ছবির কাজের জন্য রেড এরিয়ায় ঘোরাঘুরি নিয়ে তপনবাবুকে একদিন বলেছিলেন 'এই বুড়ো বয়সে আমাকে ওখানে পাঠাচ্ছো।' কিন্তু তিনি জানেন এটা মস্ত অভিজ্ঞতা।

সুনীতিবাবুর কাজ প্রায় প্রতিটি ছবিতে চোখ ভরে দেখার মত। 'কালা-

সুনীতি মিত্র

[illegible] কয়লা খনি, [illegible] [illegible] বস্তি বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] প্রাসাদ [illegible] [illegible] মেলে।

কাজ পাগল [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] থাকতে। অবসর সময়ে [illegible] নাটকের কাজ করেন। [illegible] তাঁর অবসর বিনোদনের কাজ। সদালাপী, সহৃদয় সুনীতিবাবু যে ইউনিটেই কাজ করুন সবার কাছে সমান প্রিয় তিনি।

নিশীথ

মিত্র সম্মিলনী 'সূর্য বদল'

ইদানিং শুধু কোলকাতায় নয় কোলকাতার বাইরেও যে নতুন ভাবনা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নাটক নিয়ে একটা বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে উঠেছে কোন উপলক্ষ্য ছাড়া সেটা এখানকার দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হয় না। উপলক্ষ্য অর্থাৎ কোন আমন্ত্রিত অভিনয় অথবা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ' বলা বাহুল্য, দুটি ক্ষেত্রেই গন্ডী সীমিত।

অথচ কোলকাতার বাইরে, এমন কি বাংলাদেশের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রতি নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ভাবেই তারা চমক সৃষ্টি করছেন আধুনিক যুগভিত্তিক নাটক সৃষ্টি ও পরিবেশনায়।

ইতিপূর্বে দিল্লীর যাযাবর গোষ্ঠী কোলকাতার দর্শকদের কাছে তার নজীর রেখে গেছেন। বাংলাদেশেরই উত্তরাঞ্চলের একটি দল শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী এখানকার দর্শকদের মধ্যে নাটক পরিবেশন করে বিস্মিত করে গেছেন। কোলকাতার হিন্দী নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী অনামিকা নাট্য গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে তাঁরা পরিবেশন করে গেলেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'সূর্য বদল'।

সূর্য বদলের মূল কাহিনী ও এর চরিত্র যাত্রা দলের অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে অন্তরালে যারা আছেন, যাঁরা নিজস্ব জীবন ও সংসার থেকে বিচ্যুত হয়েও অনিবার্যভাবেই এবং অলক্ষিতেই কখন যেন একটি অদৃশ্য পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদেরই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নিয়ে।

যারা নতুন এক জীবনযাপনে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ব্যক্তি সত্তার কথা ভুলতে পারে না। অন্যদিকে নাদুর মত চরিত্র যাত্রা জীবনের জন্যই যার সব গেছে তবু তিনি এই জীবন ছাড়া অন্য জীবন ভাবতেই পারেন না, যাত্রার দলই যার একমাত্র পারিবারিক গন্ডী এবং প্রাণ—তার মানসিকতা, সততা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এ নাটকে স্থান পেয়েছে।

কাহিনীর দিক থেকে তেমন কোন চমক না থাকলেও এ নাটক দর্শকদের প্রীত করেছিল অভিনয় দিয়ে। এবং অভিনয়ে সর্বাধিক যে দুজন শিল্পী দর্শকদের অবাক করে দিয়েছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে নাদুর ভূমিকায় শিব ভট্টাচার্য এবং একজন বৃদ্ধরূপী অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকরা অনেকদিন মনে রাখবেন।

বিপ্লব বসুর বিষয়ক, শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপাল, দীপক চট্টোপাধ্যায়ের যুবরাজ, রঞ্জিত মজুমদারের ভাস্করও সুন্দর। কিন্তু অভিনয় এবং জেল্লায় যে পরবর্তি শক্তিরাণীর ভূমিকায় প্রিয়ব্রত সেনশর্মা দর্শকদের যেমন আনন্দ দিয়েছে তেমনি সহানুভূতিও কুড়িয়েছে।

নারী চরিত্রে, চম্পা বোস (রাণী) সুন্দর শীলা রায়ের চম্পাকেও ভাল লেগেছে।

এছাড়া দিলীপ রায় সরকার, অজিত চক্রবর্তী, শম্ভু ঘটক, শ্যামল চৌধুরী ও বিষ্ণু দাস (রিপোর্টার) মোটামুটি।

[illegible]। ছবিতে আর ডি বর্মণ দিয়েছেন সুর।

ক'দিন আগে প্রোডিউসার সুদেশ কুমার অফিসে তাঁর নিজের অফিস ঘরেই শ্যুটিং করলেন। স্টুডিওর সেট ফেলে অফিস ঘর করার চাইতে সত্যিকারের কোনো অফিসে শ্যুটিং করা খুব রিয়্যালিস্টিক হবে বলে তাঁর ধারণা। সেদিন তাই তাঁর অফিস ঘরটা কিছুক্ষণের জন্য বদলে গিয়েছিল ফ্লোর হয়ে। স্যুটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন অশোককুমার, সঞ্জীবকুমার, সুলক্ষণা পন্ডিত, তাসম। ছবির নাম 'উলঝন' পরিচালনা করছেন রঘুনাথ ঝালানী।

ঐ অফিসেই সেদিন অশোককুমার একটা বেশ মজার গল্প শোনালেন সবাইকে। কে এক সাংবাদিক নাকি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—'দাদামণি আপনি কোন দলে?' দল বলতে ভদ্রলোক কি বোঝাতে চাইছেন ঠিক বুঝতে না পেরে হাসতে হাসতে অশোককুমার বলেছিলেন—'আমার বাড়ীর আশেপাশে তো কোনো দল টল নেই!' সাংবাদিক ভদ্রলোক অপ্রস্তুতে পড়লেন। বললেন—'না, না আমি সে রকম কোনো দলের কথা বলছি না। বলতে চাইছি আপনি রাজেশ খান্না, না অমিতাভ, না অন্য কারও দলে?' এই প্রশ্ন শুনে তো অশোককুমারের অবাক হবার পালা। তিনি মজা করে উত্তর দিলেন—'আমার তো মনে হয় ওরা সবাই আমার দলে, আমি কারও দলে নই।'

রূপতারা স্টুডিওতে কিছুদিন আগে অর্জুন হিঙ্গোরানির নতুন ছবির কাজ শুরু হোল। ক্ল্যাপস্টিক দিলেন ব্যবসায়ী রাজা, ক্যামেরার সুইচ অন করলেন হিঙ্গোরানির বৃদ্ধা মা রামিবাঈ। মহরৎ শটটি নেওয়া হোল ঋষি কাপুরের ওপর। ছবির অন্যতম নায়ক ধর্মেন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন সেদিন, আর ছিলেন নতুন নায়িকা তমান্না। কে এ নারায়ণের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন এস এম আব্বাস। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কল্যাণজী আনন্দজী। নিয়মিত শ্যুটিং শিগ্‌গির শুরু হবে।

আরও একটা নতুন ছবির শ্যুটিং শুরু হোল ক'দিন আগে নটরাজ স্টুডিওয়। রণধীর কাপুর ছবির নায়ক, নায়িকা নীতু সিং। শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানের ক্ল্যাপস্টিক দিতে উপস্থিত ছিলেন দেব আনন্দ। সাধারণত এই ধরনের অনুষ্ঠানে তিনি কদাচ উপস্থিত থাকেন। সেদিক থেকে বিচার করলে সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল আকর্ষণীয়। ক্যামেরা চালালেন রাজেন্দ্রকুমার। ছবির নাম 'ভালো মানুষ'। অভিনয় ফিল্মসের ব্যানারে এ ছবিখানি প্রযোজনা করছেন হৃষী কোহলি। আর চালনার দায়িত্ব পড়েছে নতুন পরিচালক বিশ্বামিত্রের ওপর।

সঙ্গীত পরিচালনা করবেন আর ডি বর্মণ। ছবির অন্য দুটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করবেন আশরানি ও অরুণা ইরানী।

রাজিন্দর সিং বেদীর নাম পরিচালক হিসাবে 'দস্তাক' ছবির পর নতুন করে বলার প্রয়োজন হয় না। বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর তিনি এবার নতুন ছবি শুরু করেছেন। রাজকমল কলামন্দির স্টুডিওতে তিনি এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান করে মহরৎ করলেন নতুন ছবি 'আঁখ দেখি'র। দুজন অস্পৃশ্য লোককে দিয়ে ক্ল্যাপস্টিক ও ক্যামেরা চালালেন তিনি। ছবির গল্পও দুজন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ের প্রেম কাহিনী নিয়ে। অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে গান্ধীজীর শিক্ষার কথাই প্রচারিত হবে এ ছবির মাধ্যমে। ঐদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কে এ আব্বাস, বলবন্ত গার্গি, ইন্দর-রাজ আনন্দ, রেহানা সুলতান প্রমুখ। জে কৌশিকের সুরে এ ছবির গানগুলি লিখছেন পদ্মা সচদেব। প্রধান দুটো চরিত্রে অভিনয় করবেন দুই নবাগত সুরেশ ভগৎ ও সুমন সিনহা। অন্যান্য চরিত্রে থাকবেন বিপিন গুপ্ত, লীলা মিশ্র, রাম মূর্তি চতুর্বেদী, ভানুমতি, জগদেব বামাত্রি, বিক্রম জং সিং, কুমুদ ত্রিপাঠি ও দীনেশ ঠাকুর।

অভিজিৎ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নতুন থিয়েটার-গৃহ নির্মাণে বিনোদিনী মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। বিনোদিনীর উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে আর কারোর তুলনা ছিল না। নিজের নামে—নিজস্ব থিয়েটার। কত স্বপ্ন। গুরুমুখও বিনোদিনীর পাশাপাশি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিনোদিনীর স্বপ্নকে তিনি সার্থক করে তুলবেনই। সকাল থেকে বেলা ২।৩টা পর্যন্ত রিহার্সেল বসতো। কোনরকমে এক ফাঁকে দুটো খেয়ে নিতেন। অনেক সময় থিয়েটারেও খাবার আসতো। থিয়েটারে এসে শুধু পরিদর্শন কাজেই নয়—কুলি-কামিনদের সঙ্গে হাত লাগাতেন কাজে।

'এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া মাটি বহিয়া পিট ব্যাক সিটের স্থান পূর্ণ করিতাম, কখন কখন মজুরদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক ঝুড়ি-পিছু চারি কড়া করিয়া কড়ি ধার্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতের জন্য রাত পর্যন্ত কার্য হইত। সকলে চলিয়া যাইতেন, আমি গুর্মুখবাবু আর ২।১ জন রাত্রি জাগিয়া কার্য করাইয়া লইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ দেখে কে? অতি প্রস্তুত হইল।'

থিয়েটার গৃহ প্রস্তুত হলো। প্রস্তুতিপর্বের প্রথম থেকে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গিরিশ-শিষ্যরা উৎসাহে অনেক পয়সা ব্যয়ে থিয়েটার বিনোদিনীর কানে গুঞ্জন তুলেছেন : 'তোমার থিয়েটার—তোমার নামে নামাঙ্কিত হবে। মৃত্যুর পরও তুমি বেঁচে থাকবে এই থিয়েটারের মধ্য দিয়ে।'

কিন্তু নামকরণের সময় বিনোদিনীর আড়ালে সবাই গুঞ্জন তুললেন : 'বারবনিতার নামে থিয়েটার! ছোঃ, কোন লোকই ঢুকবে না।'

নানান দিক থেকে নানাভাবে গিরিশচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করে তুলল সবাই। গিরিশচন্দ্র হতবাক! মেয়েটিকে বোঝাবেন কি করে। কি সান্ত্বনা তিনি দেবেন এই বিশ্বাসঘাতকতার। ষড়যন্ত্রজালে আচ্ছন্ন করা হলো গিরিশচন্দ্রকে। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে অসহায়ের মত ছটফট করতে লাগলেন তিনি। কুসংস্কারের শরজাল এমনভাবে বিস্তার করা হলো যে, এ-বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা ছাড়া গিরিশচন্দ্রের অন্য কোন উপায় ছিল না। বললেন অসহায়ভাবে : তোমরা যা ভাল বোঝ করো। আমায় এর মধ্যে জড়িও না। মেয়েটার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারবো না। তবে যা করবার গোপন রেখে করো।'

গিরিশ-শিষ্যরা 'বি' থিয়েটারের পরিবর্তে নতুন নাট্যগৃহকে 'স্টার থিয়েটার' নামে রেজেস্ট্রি করে এলেন। বিনোদিনী তখনই সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় জানতে পারলেন। বিনোদিনীর তখনকার মনোভাবের কথা বিনোদিনীর নিজের কথা থেকেই আমরা জানতে পারি।

'যে পর্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজিস্ট্রি না হইয়াছিল সে পর্যন্ত আমি জানিতাম যে, আমারই নাম হইবে। কিন্তু যেদিন উঁহারা রেজিস্ট্রি করিয়া আসিলেন, তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহখানেক বাকী; আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, থিয়েটারের নতুন নাম কি হইল? দাসবাবু প্রফুল্লভাবে বলিলেন যে 'স্টার থিয়েটার'। এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিটকাল কথা কহিতে পারিলাম না।'

গিরিশ-শিষ্যদের এই বিশ্বাসঘাতকতা—এই কৃতঘ্নতা চিরদিন নাট্য-ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। তাদের কলঙ্কই বিনোদিনীকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় করে রেখেছে চিরকালের চিরমহীয়সী। থিয়েটারের নামের ক্ষেত্রেই নয়—আরো দুটি ক্ষেত্রে গিরিশ-শিষ্যদের হীনতা চিরদিন ধিকৃত হবে। থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তার বেতনভুক শিল্পী হিসেবে বিনোদিনী যাতে বহাল হতে না পারেন, সেজন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জন্য তা

সম্ভব হয়নি। গিরিশচন্দ্রকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে শেষবারের মত থিয়েটারের অংশীদারীত্ব থেকে বিনোদিনীকে বঞ্চিত করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন—পারিবারিক চাপে গুরুমুখ রায় যখন থিয়েটারের স্বত্ব পরিত্যাগ করেন। সে-কথা পরে বলছি।

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের সময় গুরুমুখ রায়ও রুখে উঠেছিলেন। থিয়েটার থেকে বিদায় গ্রহণের সময় চেষ্টা করেও তাঁর পক্ষে বিনোদিনীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। শিষ্যদের জন্য গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর ওপর যে অবিচার করেছিলেন, ইতিহাস তাও কোনদিন ভুলবে না। অবশ্য তিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন শিষ্যদের দ্বারা বার বার অপমানিত হয়ে।

বিনোদিনীর আত্মত্যাগে গুরুমুখ রায়ের অর্থানুকূল্যে ২১ জুলাই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৬৮, বিডন স্ট্রীটে গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ নাটক নিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করলো বাংলার তৃতীয় স্থায়ী নাট্য দেউল 'স্টার থিয়েটার'। অভিনয়ে রইলেন গিরিশচন্দ্র—দক্ষ। অঘোর পাঠক—নন্দী, প্রবোধ ঘোষ—ভৃগু। অমৃত মিত্র—মহাদেব। অমৃত বসু—দধীচি। নীলমাধব চক্রবর্তী—ব্রহ্মা। বিনোদিনী—সতী। কাদম্বিনী—প্রসূতি; ক্ষেত্রমণি—তপস্বিনী। গঙ্গামণি—ভৃগুপত্নী।

বিনোদিনীর মঞ্চ-জীবনের সঙ্গে যে গঙ্গামণির নাম জড়িয়ে আছে, সেই গঙ্গামণিই ভৃগুপত্নী চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। উদ্বোধন রজনীতে নবনাট্য-দেউলকে কেন্দ্র করে উত্তাল তরঙ্গমালার মত জনস্রোত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে প্রতিটি দর্শক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। স্বভাবতঃই নাটকটি অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করে। 'ধ্রুব চরিত্র' মঞ্চস্থ হলো ১৮ আগস্ট। বিনোদিনী আত্মপ্রকাশ করলেন সুরুচি চরিত্রে। সুনীতি হলেন কাদম্বিনী। উত্থানপাদ অমৃত মিত্র আর ধ্রুব চরিত্রে অভিনয় করেন ভূষণকুমারী। ১৫ ডিসেম্বর নলদময়ন্তী নাটকে বিনোদিনী দময়ন্তী আর অমৃত মিত্র নলরূপে বিস্মিত করলেন। গঙ্গামণি রাজমাতারূপে অভিনয় করেন। দক্ষযজ্ঞ ধ্রুবচরিত, নলদময়ন্তী গিরিশচন্দ্রের তিনখানা নাটকই নবনাট্য-দেউলকে জনপ্রিয় করে তার ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করে দেয়। কিন্তু যে থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় এত হাঙ্গামা, সেই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গুরুমুখ রায়কে চিরতরে বিদায় নিতে হয় থিয়েটার থেকে। শুধু থিয়েটার নয়, যে বিনোদিনীর জন্য এত ঝঞ্ঝাট, এত অর্থব্যয়, সেই বিনোদিনীকেও পরিত্যাগ করে কাশীবাসী হন গুরুমুখ রায় আর সেখানেই হয় তাঁর মৃত্যু।

নতুন একটি নাট্যশালার জন্ম দিয়েও গুরুমুখ রায় নাট্য-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য আসনে আসীন থাকতে পারেন নি। কারণ, নাট্য-প্রীতি বা ব্যবসাবুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেননি। নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁর নারীর প্রতি মোহগ্রস্ততা। তবু গুরুমুখ রায়ের ব্যক্তিজীবন নিয়ে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে মন ভরে ওঠে।

জগদীশ মুখোপাধ্যায়

(ক্রমশঃ)

বিবিধ সংবাদ

ইউকো ব্যাঙ্কের তথ্যচিত্র 'ইওর ব্যাঙ্ক'

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের উদ্যোগে এমন একটি ৩৫ মিনিটের তথ্যভিত্তিক ছবি দেখানো হোল যা নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

ছবিটিতে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে ব্যাঙ্কের সহযোগিতামূলক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুন্দরবনের জেলে থেকে জয়পুরের সাইকেল রিকসাওয়ালা এবং আসাম মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব তামিলনাড়ু প্রভৃতি নানা জায়গার বিভিন্ন পেশার মানুষদের ঋণ দিয়ে কিভাবে তাদের জীবিকার্জনে ব্যাঙ্ক সহায়তা করছে তার একটা স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই রঙীন ছবিতে।

পরিবেশনের দিক থেকে ছবিটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি বর্ণাঢ্য। মূলত গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জন্য হলেও সমাজের প্রায় সব স্তরের মানুষেই ছবিটি উপভোগ করবেন।

ছবিটির ক্যামেরার কাজ (কে কে মহাজন শক্তি ব্যানার্জী ও পি ডি নাগাপ্পাম) পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর। শ্রুতিমধুর সংগীত ও আবহসংগীত (অলোক দে) ছবিটিকে যেন প্রাণ দিয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীমৃগাঙ্কশেখর রায়।

কাশীপুর ক্লাবের অনুষ্ঠান ঃ গত ১৯ জুলাই এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাশীপুর রোটারাক্ট ক্লাব-এর অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গত বৎসরের কার্যকরী কমিটির সভাপতি বর্তমান বৎসরের সভাপতির হস্তে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীমতী বেলা দে (বেতার) রোটারাক্ট জেলা

দিলীপ পাঠক সেতার পরিবেশন করছেন।

কমিটির চেয়ারম্যান মণীন্দ্র পোদ্দার, কাশীপুর রোটারী ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি সনৎ চ্যাটার্জী, রোটার‍্যাকট ডি আর. সোমনাথ নাগ ও বর্তমান বৎসরের সভাপতি তপন চৌধুরী ক্লাবের বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের আগামী বৎসরের কর্মসূচী রূপায়ণের নানান দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে হরিৎ মুখার্জী একটি সুন্দর কৌতুক নকসা পরিবেশন করেন।

রঙ্গতীর্থের নতুন নাটক: গত ৫ জুলাই সংস্থা ভবনে প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা রঙ্গতীর্থের নতুন নাটক নাট্যকার পরেশ ঘোষ রচিত 'মানবী ও মুদ্রা'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাট্যকার স্বয়ং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিত্র পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

রূপযানীর কালিন্দী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটকে যে মানবিক মূল্যবোধের আভাস ও সংবেদনশীলতা নিহিত রয়েছে তা যে নাটকের সংলাপে ও সংঘাতে পরিস্ফুট করা যায় তার প্রমাণ রেখেছেন রূপযানী নাট্যসংস্থা ৬ মে মিনার্ভা মঞ্চে। নাটক নির্দেশনায় ছিলেন প্রমথ দাস। নাটকের গতি ও দলগত অভিনয় মনোগ্রাহী। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে পেরেছেন। রথীন রায়ের রামেশ্বর একটি সার্থক চরিত্র-চিত্রণ। নিখিল চৌধুরীর ইন্দ্র রায় ব্যক্তিত্বপূর্ণ। সুব্রত রায়ের কমল মাঝি আর একটি সার্থক চরিত্র-চিত্রণ। ধূর্ত যোগেশ মজুমদারের চরিত্রে কমল মিত্রের চরিত্রোপযোগী চেহারা ও বাচনভঙ্গী। সারী চরিত্রে আশা বোস অনন্যা। এ ছাড়াও সুঅভিনয়ের দাবী করেন মলয় ব্যানার্জি (মিঃ মুখার্জি), অরুণ সেন (মহীন্দ্র), প্রণব মিত্র (অহীন্দ্র), কিরীটি দত্ত (শূলপাণি), বিষ্ণু দে (অচিন্ত্য) শ্রীমতী পাইন (সুনীতি), শৈল দেবী (হেমাঙ্গিনী), আরতি ঘোষ (উমা)।

আলোকসম্পাত, আবহসংগীত দৃশ্য-পরিকল্পনা ও সর্বোপরি শ্রীদাসের নির্দেশনা রূপযানীর তৃতীয় প্রয়াসকে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছে।

বাগবাজার অশোক সংঘ: গত ২ আগস্ট '৭৫ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে সংঘের চতুর্থ বার্ষিকী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে ঘনশ্যাম শিকদারের ভূমিকায় গৌতম ব্যানার্জির বলিষ্ঠ অভিনয় প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। অপর প্রধান চরিত্রে মিসেস প্যাকড়াশীর ভূমিকায় এই নাটকের সুপরিচালিকা শ্রীমতী গীতা ব্যানার্জির অভিনয় এক কথায় অনবদ্য। সুঅভিনয় ও উদাত্ত কণ্ঠের সংগীতের মাধ্যমে 'চৌধুরী-মশাই'কে যথাযথই উপস্থাপিত করেছেন বিশ্বনাথ মুখার্জি। সুনন্দিতা বসুর 'চমৎকারিণী' ও ঝুমকা ব্যানার্জির 'সখির মা' উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে শৈবাল ব্যানার্জি, জহর মুখার্জি, রবিশেখর দাস, সলিল বর্ধন, লালন গুপ্তা, স্মৃতি সেন ও অনরিণা রায় সুঅভিনয়ের গৌরব অর্জন করেন। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা বসু।

উৎসবের প্রথম দিনে (১ আগস্ট '৭৫) সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। ঐদিনই আশীষ চ্যাটার্জির বেহালা (মল্লার রাগ) ও গোপাল পাত্রের রবীন্দ্রসংগীত এবং শিশুশিল্পীদের অভিনীত 'ভাড়াটে চাই' নাটকটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

একটি মনোজ্ঞ সেতারের অনুষ্ঠান: গত ২৩ জুলাই গুরু-পূর্ণিমার দিন প্রখ্যাত সরোদীয়া শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতী ছাত্র দিলীপ পাঠক সেতার বাজিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের যে আনন্দ দেন, তা তাঁদের বহু দিন মনে থাকবে।

শ্রীপাঠক অনুষ্ঠান শুরু করেন বেহাগ দিয়ে। আলাপ, জোড় ও বিলম্বিত গতে বেহাগ রাগের করুণ সুর-মূর্ছনা এবং শিল্পীর দরদী হাতের ছোঁয়া শ্রোতাদের যেন সেদিন সুরের মায়ালোকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি দ্রুত তিন তালে তিলকশ্যাম বাজান।

অনুষ্ঠানে বাগেশ্রী রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত পরিবেশন করেন শ্রীঅমল রায়।

শিল্পীদের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন শৈল বসু ও অজয় দাস।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ॥
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা
র সহায়

ল্যাকমে
এক্সোটিকা
ট্যাল্ক এক্সোটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
ল্যাকমে

১৫ বর্ষ

১৬ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 5th September, 1975 শুক্রবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	চাঁদ	(গল্প)	শ্রীশৈলেন রায়
১০	সাহিত্যের সাজঘরে		শ্রীশাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
১৩	এইবাংলার খবর		শ্রীদেব দত্ত
১৪	বিদেশের কথা		শ্রীপুণ্ডরীক
১৫	রোজনামচা		ফাদার দ্যতিয়েন
১৭	ডবল এজেন্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিক্রমাদিত্য
২২	সুরের আগুন		সন্ধ্যা সেন
২৭	নতুন বই		
২৮	চিঠিপত্র		

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বলে
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৯	স্বপ্ন, ফুলের নাম	(গল্প)	শ্রীগিরিধারী কুণ্ডু
৩৪	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
৩৫	সিলেবলকে 'দল' বলি কেন?		শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
৪১	একলা জেগে	(কবিতা)	শ্রীজয়ন্তকুমার
৪১	কুরুক্ষেত্র	(কবিতা)	শ্রীঅতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১	শর্তকে ডিঙিয়ে	(কবিতা)	শ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য
৪২	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৪৩	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৭	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৪৯	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫২	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৪	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৫	নেপথ্যে		শ্রীনিরীক্ষিৎ
৫৮	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৬০	নাট্যমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৬২	ফ্লোর থেকে বলছি		শ্রীমুসাফির
৬৩	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

আমরা মর্মাহত

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষার প্রতিধ্বনি করে আমরাও বলি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার ও তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তাতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। শেখ সাহেব পৃথিবীর সর্বত্র একজন মহান জাতীয় নেতা এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি অপরিসীম সাহস ও দৃঢ়তায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখি। এই উপমহাদেশে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনে তিনি ছিলেন একজন মহান প্রবক্তা। এমন একজন নেতার শোচনীয় মৃত্যুতে আমাদের মর্মবেদনার শরিক হবেন পৃথিবীর সকল শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক মানুষ।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক যথার্থই বলেছেন যে, এ ধরনের হত্যা মানবিকতার মৌলিক ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামী রাষ্ট্র কুয়ায়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেছেন যে, হত্যাকাণ্ডের সাহায্যে এমন একজন নেতার অপসারণ কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তার আভ্যন্তর রাজনীতিতে মাথা গলাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে যেরকম নৃশংসভাবে হত্যা করা হল তাতে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ মর্মাহত ও বিচলিত না হয়ে পারে না।

বাংলাদেশের আভ্যন্তর রাজনীতিতে কি ঘটছে তার বিচারের দায়িত্ব আমাদের নয়। বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি আমাদের হাইকমিশনারের কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, এ সংবাদ আনন্দের। আমরা জানি শেখ মুজিবুরের আমলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নতুন সরকার দ্বারা বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার সমস্ত আন্তর্জাতিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মেনে চলবেন। এটাও নিশ্চয়ই আশার কথা। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নীতিও অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ আশ্বাসও নিশ্চিতই অভিনন্দনযোগ্য। ভারতবর্ষের মানুষ এ সংবাদ শুনেও আশ্বস্ত হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ তার পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কোনো ধর্মীয় সংজ্ঞা সে গ্রহণ করবে না।

তা সত্ত্বেও সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বঙ্গবন্ধু ও নতুন একটি রাষ্ট্রের জনকের এই নৃশংস হত্যার কথা মনে হলেই মন বিষাদে ও বিক্ষোভে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দুর্দান্ত স্বৈরাচারী পাকিস্তানী সরকার যে অসম সাহসী আত্মনির্ভর 'মানুষটিকে স্পর্শ করতে সাহস পায়নি, পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে থাকার সময়ে যে মানুষটির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য কবর পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল সেই মানুষ তাঁর মাতৃভূমি, তাঁর চিরসাধনার চিরস্বপ্নের সোনার বাংলায় তাঁরই স্বদেশবাসীর হাতে এমনভাবে নিহত হলেন। এই কাপুরুষোচিত হত্যার কোনো ক্ষমা আছে কি? আমরা স্মরণ করতে পারি মাত্র তিন বছর আগে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর নয়নের মণি, তাঁদের মুকুটহীন সম্রাট তাঁদের ভালবাসার ধন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় ফিরলেন। ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সেই ঐতিহাসিক জনসম্বর্ধনার উত্তরে মুজিবের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার অবিস্মরণীয় পংক্তি—দুইই বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির উদ্দেশে—'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি' এবং 'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি'। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ছাড়া মুজিবের অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। সংগ্রামে অকুতোভয় অথচ সহৃদয় ও কোমল প্রাণ এই মানুষটি সকলকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। নৃশংস যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানীদের কিংবা বিশ্বাসঘাতকদেরও তিনি কোনো শাস্তি দেননি। এমন একজন রাষ্ট্রনায়কের এমন শোচনীয় মৃত্যু শোকাবহই শুধু নয়, ভাবতে গেলে অকল্পনীয়ই মনে হয়। আমরা আশা করব নতুন বাংলাদেশ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্যে অবিচল থাকবেন। শান্তিকামী প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের মানুষ আজ এটুকুই প্রত্যাশা করে। আমাদের মৈত্রী যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

চাঁদ

শৈলেন রায়

ওরা দুজন।

নিরিবিলি পরিবেশ। দু-একটা পাখি মাঝ-মধ্যে ডেকে উঠছিল। সূর্য মধ্যগগনে। শরৎকাল। আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ। গাঢ় নীল আকাশ। ওরা পাথরের আড়ালে বসেছিল। পা ঝুলিয়ে বসেছিল। ওদের পর ছুঁয়ে ছুঁয়ে শীর্ণ একটি জলরেখা কুলু কুলু শব্দে বয়ে যাচ্ছিল। ওরা তন্ময় হয়ে নিজ নিজ পায়ের দিকে তাকিয়েছিল; যেন সেখানে কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল।

আসলে ওরা কিছুই দেখছিল না, ভাবছিল। ভাবছিল নিজেদের কথা। নিজেদের কথা ঠিক না, ভাবছিল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে। কী দাঁড়াবে বলতে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ঠিক যে জল দাঁড়াবার কথাটাই ভাবছে ওরা ঠিক তাও না। ওরা ভাবছে, ব্যাপারটা এত দূর পর্যন্ত না গড়ালেও চলতো। আর একটু আগে—এই কলকাতায় থাকাকালীনই ঠিক করা উচিত ছিল। কিন্তু কথবো কথবো করেও কথা হয়নি। হড় হড় করে নীচের দিকে নেমে এসেছে। এসে বসেছে এখানে। পৃথিবীতে এমন নিরিবিলি একটা পরিবেশ যে থাকতে পারে ওদের জানা ছিল না। মাঝে মাঝে নিজেদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে ওরা সচকিত হয়ে উঠছিল। মনে মনে ভয় পাচ্ছিল।

একসময় মেয়েটি বলল, 'তারপর?'

ছেলেটি আরও নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। পাহাড়ি ঝরণার জল খুব ঠান্ডা। পা দুটো অসাড় হয়ে আসছিল। সে চোখ তুলে একবার মেয়েটিকে দেখলো, তারপর দৃষ্টি নত করতে করতে খুব নীচু স্বরে বললো, 'তারপর আর কি?'

'তা-ই তো জানতে চাইছি। এরপর কি হবে? কি হবে মানে কোথায় যাব, কি করবো?'

'দেখি।'

'কি, দেখলে?' তখন থেকেই তো দেখছো।' একটু হেসে, 'নিজের পা।'

ছেলেটিও হাসলো। কথা বললো না।

মাথার ওপর দিয়ে বিরাট ডানা ছড়িয়ে একটা পাখি উড়ে গেল। ওর ঘন ছায়া ওদের ওপর দিয়ে সর সর করে চলে গেল। মেয়েটি ওপর দিকে তাকালো, নিজের মনেই বললো, 'বেশ আছে।'

ছেলেটি নিবিষ্টচিত্তে তখনও পা দেখছিল, হঠাৎ চমকে উঠে বললো, 'কে বেশ আছে?'

মেয়েটি কৌতুকভরা কণ্ঠে বললো, 'তুমি।'

ছেলেটি উত্থিত নিঃশ্বাস চাপতে চাপতে বললো, 'হ্যাঁ আমি।'

'তুমি বেশ নেই?' মেয়েটি ঘাড়ের পাশ দিয়ে ওর দিকে তাকালো। 'উত্তর দাও। বেশ নেই তুমি? মুখ মুছে যে কোন সময় পোষা বেড়ালটির মত মার আঁচলের নীচে আশ্রয় নিতে পার।'

'তুমিও পার।' জলের নীচে পা দুটোকে কী রকম আঁকাবাঁকা দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, অন্য কোন মানুষের পা। ছেলেটি সেই পা দেখছিল।

'না, আমি পারি না।'

'কেন পার না?'

'মেয়েরা পারে না, পারতে দেয় না।'

'কে দেয় না?'

'তোমরা—পুরুষেরা। ছি ছি করো।'

ছেলেটি উত্তর দিল না। অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিল। সিগারেটের প্যাকেটটা ভুলে ফেলে এসেছে। হোটেলের দেরাজে ওরা বন্দী হয়ে রয়েছে। ওদের নিশ্চয় দম বন্ধ হচ্ছে, যেমন হচ্ছে ওর।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে মেয়েটি বললো।

'কি বুদ্ধি?'

'চলো কলকাতায় ফিরে যাই। গিয়ে বিয়ে করি।'

'তোমার যেমন বুদ্ধি!'

'কেন? বুদ্ধির দোষ কি?'

'তুমি এখনও মাইনর। তোমার বাবা মামলা করবে। আমাকে জেলে ঢোকাবে।'

'বেশ হবে। জেলের ঘানি টানবো।' মেয়েটি খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো। কিছুক্ষণের জন্য জলের শব্দ বন্ধ রইলো।

'আমি জেলে গেলে তুমি খুশী হবে?'

'হ্যাঁ হবো। খুব খুশী হবো।' মেয়েটি একটু সরে এল। ওদের দুজনের কাঁধ খুব কাছাকাছি এসেছে। আর একটু হলে এক-দেহে মিশবে।

'বেশ তাই হোক।' ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো।

মেয়েটি ওকে হাত ধরে বসালো। 'উঠো না। এখনও সন্ধ্যে হয়নি।'

ছেলেটি আবার বসে পড়লো। গাঢ় স্বরে ডাকলো, 'রুপা।'

'বলো।' ওদের কাঁধ মিশে গিয়েছে। একে অপরের কাছে আশ্রয় খুঁজছে।

ছেলেটি আবার নীচু স্বরে ডাকলো, 'রুপা।'

মেয়েটি মৃদু হাসলো। ওর ইচ্ছে কর-ছিল খুব জোরে হেসে উঠতে। কিন্তু গাছের পাতায় পাতায় সূর্যের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে. উচ্চস্বরে হাসতে ওর ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল পেছনের পাহাড় থেকে কোন জন্তু-জানোয়ার এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা সামনের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ আগেও যে পাহাড়টাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল ক্রমশই সে একটা জটিল আচ্ছাদনের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলো। ওকে আর চেনা যায় না। কোনদিন কি আর চেনা যাবে না?

মেয়েটি মৃদু স্বরে বললো, 'চলো ফেরা যাক।'

ওরা দুজনে নীরবে হাঁটতে লাগলো। মেয়েটি হঠাৎ গুন গুন স্বরে গান গাইতে লাগলো। ওর আর ভয় করছে না। এক সময় ও বললো, 'দ্যাখো চাঁদ উঠেছে।'

ছেলেটি আকাশের দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর মেয়েটির দিকে তাকালো। তাকিয়েই রইলো।

'কি দেখছো?' মেয়েটির চোখ হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

'চাঁদ।'

'চাঁদ ওখানে। আকাশে।'

ছেলেটি চোখ তুললো না। যেমন দেখছিল দেখতেই লাগলো। ধীরে ধীরে ওর মুখ নেমে আসছে। অস্ফুট স্বরে ও বললো, 'চাঁদ এখানে।'

ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন অন্যজনকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে।

ছেলেটি ফিস ফিস করে বললো, 'আর ভয় করছে না।'

মেয়েটি সেই কথার প্রতিধ্বনি তুললো। 'আর ভয় করছে না।'

সাহিত্যের সাজঘরে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শীলার যখন কবিতা লিখতেন, তখন তার ডেসকের ডালার পেছনে একটা পচা আপেল রাখা থাকতোই। পচা আপেলের ভুরভুর গন্ধে তাঁর লেখায় আনতো মেজাজ। আর অডেন? অডেনের টেবিলের পাশে কাপ কাপ গরম চা না হলে এক লাইনও ওঁর এগুতো না। চা নেই অথচ অডেনের লেখা চলছে, এটা কল্পনার বাইরে। আর স্পেন্ডার? স্পেন্ডার গরম গরম কফির সঙ্গে ধরাতেন সিগ্রেট। স্পেন্ডার যে সিগ্রেট খেতেন, ঠিক তা নয়, কিন্তু কফির সঙ্গে সিগ্রেট নেই, আর স্পেন্ডার কবিতা লিখছেন—এ ভাবা যায় না।

তেমনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চাই নস্যি। ও একটিপ না হলে তিনি লেখা তো দূরের কথা, ফটো তোলারই মেজাজ পান না। এমনি এক মেজাজী সন্ধ্যায় বেশ নস্যিটস্যি নিয়ে, আশুবাবু 'প্রসাদ'-এর উপন্যাসের শেষ পর্ব শেষ করার জন্যে সবে মাত্র কলম ছুঁয়েছেন, সেই সময় সদর দরজায় বেজে উঠলো কড়া। খুট করে দরজা খুলে একজন এসে বললেন—কাকে চাই? — বললুম। — আপনার নাম? — বলুন শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী। — একটু দাঁড়ান।

বাইরের ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে সোফায় বসে চশমার কাঁচের ফাঁকে দু চোখ নাচিয়ে আশুবাবু বললেন—কি, গত রোববার আসো নি কেন? — জয়-বাংলা হয়েছিল। তাই এখন।

এখন? পাগল হয়েছ? দশ মিনিট কেন, দু মিনিটও অসম্ভব। আসছে রোববার সকালে এসো। আমিও বললুম—অসম্ভব। কালই কপি দিতে হবে। দশ মিনিট সময় চাই-ই। ঠিক আছে এখন সাতটা পঁয়তাল্লিশ। আটটায় শেষ। যা বলার খুব শর্টে বলো। শর্টেই শুরু করলুম। যখন বেরিয়ে এলুম তখন ঘড়িতে, নটা। খুব শর্টেই ব্যাপারটা সারা হল যা হোক।

পাঠককে শর্ট কাটেই তাহলে ব্যাপারটা বলা যাক।

কোথায় কোথায় এবার লিখছেন উপন্যাস? —আর বলো না, এবার যে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাতে লেখা তো দূরের, একে একে সবই ক্যানসেল করতে হল। সব?—না করেছি দু-একটা।

যেমন? উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, বেতার জগৎ।

না, না, আর না। শুধু যুগান্তরে লিখতেই হবে বলে-[illegible] শেষ করছি। ঘরোয়াকে কথা দিই নি তবে বলেছি—চেষ্টা করে দেখব। দুটো গল্প। একটা অমৃতে আরেকটা উল্টোরথ-এ।

—আচ্ছা, আশুদা, আপনার কি এটা মনে হয় না, আরো সময় পেলে যে কাহিনী পুজোর তাগিদে শেষ করলেন, মানে করতে হল, তাকে আরো খানিকটা সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করে আরো উজ্জ্বলতর করা যেত? অন্তত গত বছরে 'বেতার জগৎ'এ আপনার উপন্যাস পড়ে আমার এ কথাটা মনে হয়েছিল।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। হয়ত যেতো। কেননা সেখানে সে স্কোপ ছিল। তবে কি জানো, আমি পত্রিকায় উপন্যাসটা দিই একসঙ্গে। কারণ আমি লিখি রস আস্বাদন করে। বারবার পৃষ্ঠা উল্টে পেছনে ফিরে দেখি। ফলে গোটা ছবিটা আঁকতে পারলাম কিনা সেটাই হয়ে ওঠে আমার কাছে মুখ্য ব্যাপার। তাছাড়া ছোট উপন্যাসকে আমি ঠিক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলি না। কখনো কখনো মনে হয় এ বড় গল্পেরই আরো বিস্তারিত রূপ। তবে তারও তো আলাদা স্বাদ, আলাদা গন্ধ বৈচিত্র্য আছে। ধরো সমুদ্রের কোন এক দিককে দেখা। তারও তো আলাদা রূপ আছে, তাই না? তাছাড়া একথাও ঠিক, বড় হলেই যে রসোত্তীর্ণ হবে এর কোনো মানে নেই। যে উপন্যাসটার কথা তুমি বললে, ওখানে ওভাবেই [illegible] আকস্মিক দুর্ঘটনার দরকার ছিল। তা না হলে প্রেমের ঐ উত্তাল ঢেউয়ের কখনো সমাপ্তি ঘটত না। হয়ত তুমি বলবে—এক্ষেত্রে আরেকটু সময় দেওয়া যেত। হয়ত যেতো। কিন্তু তার আগে পুজো সংখ্যাটাও যে বেরিয়ে যেতো। তবে এ উপন্যাস প্রশংসা এনেছে প্রচুর। অজস্র চিঠিপত্র। আর তোমাকে একটা গোপন খবর জানিয়ে রাখি। ফিল্ম-এর দুজন দিকপাল নায়িকা এই চরিত্রে রূপ দেবার ইচ্ছের কথা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ফোনে জানিয়েছেন।

কিন্তু এ ঘটনাও ঘটেছে যে পুজোর উপন্যাস পুজোতে শেষ করতে পারি নি। ভাবতে ভাবতে কখন পুজো চলে গেছে, তবু উপন্যাস ছাড়ি নি। আবার পুজো এসেছে। আবার যথারীতি হাত দিয়েছি। নাঃ, তবু শেষ হয় নি। তোমার কথায় বলতে হয়, সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের জন্যেই রেখে দিয়েছিলাম। তা না হলে একটা উপন্যাসকে শেষ করে দেওয়া খুব কি একটা কষ্টের ছিল? না বোধ হয়। একটার কথা বলি, যেমন ধরো, 'নগর দর্পণে' লেখা এগুচ্ছিল না। যা লেখা হয়েছে তাতে আমি সেই [illegible]

পরিণতি বলতে যা বোঝায়, তখনো ঠিক সার্থকতাবে আসে নি। প্রথমে ৩০ স্লিপ লিখলাম, আর এগোয় না। পরের পুজোয় লিখলাম—আবার ১৫ স্লিপ। তারপর কখন এক সময় এসে গেল বিদ্যুতের মত তার পরিণতি। তখন শেষ করলাম—মাত্র দশ দিনে।

লেখক যদি তাঁর নিজের কাছে তৃপ্ত না হন, শুধু কোনরকমে শেষ করে দেওয়ার মধ্যেই যদি তাঁর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তিনি লেখকই নন। সেই তৃপ্তি না এলে লেখকের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলা উচিত। আসলে কি গোটা ব্যাপারটা একটা টেম্পারামেন্টের। লেখক হিসেবে যে একাগ্রতা নিষ্ঠা এবং জানো, যে অনুভূতি বাণীর রিমঝিম ধ্বনিতে পল্লবিত করে তোলে বাক্যের শরীর। যা আমায় অনুরণিত করে। আর আমার অনুভূতির জগৎ বৃহত্তর হয়ে যদি পাঠক হৃদয় আলোড়িত না করল তাহলে তার সার্থকতা কোথায়? লেখক তো এই সমাজের প্রতিনিধি। একই যন্ত্রণা, একই বিষাদ, ক্লান্ত সময়, প্রেম, ভালবাসার সঙ্গে সে জড়িয়ে। সমাজকে বাদ দিয়ে লেখক হয় কি করে।

ততক্ষণে ক্যামেরাম্যান সুকুমারবাবু তখন ঝপাঝপ ফ্লাশ লাইটে অজস্র ছবি তুলে যাচ্ছেন। মুখ বাঁদিক করুন। ডান দিক করুন, ইত্যাদি।

আচ্ছা আশুদা, আপনি প্লট নির্বাচন করেন কি করে। এটা কিন্তু আমার জানতে খুব ইচ্ছে হয়।

—এই একটা কঠিন প্রশ্ন করেছ। প্লট উঠে আসে হঠাৎ। এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, হঠাৎ—এখান থেকেই হতে পারে। হতে পারে লাইব্রেরীতে পড়তে পড়তে। হয়ত প্যাশের কোন গোলমাল তর্কাতর্কি দেখে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখন যে আইডিয়া এসে যাবে। তা জানি না। আইডিয়া এলে তারপর আশপাশের চরিত্ররা মিলে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়। তবে একটা ব্যাপার জানি, আমার উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হল মানুষ। আমার ৮০।৮৫ খানা উপন্যাসে বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে মানুষের হাজার আদল, তার জীবনের অন্তঃস্থলে দুঃখের যে গোপন নদী বয়ে যায় তার ঢেউ, কিম্বা প্রেমের আগুনে কেমন করে পতঙ্গেরা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এইসব কথা। তাদেরই দর্পণ আমার উপন্যাস, তাই প্রতিটি চরিত্র আমার দেখা। এই এক দেখা বহু হয়ে ওঠে, কলমে। জান শাণ্ডিল্য, তাই মানুষের ছোট-খাটো ত্রুটি, অপরাধ অন্যায় আমার চোখের পর্দা টেনে দেয় না। আমি মানুষের উত্তরণে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস আজও আছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা শুনে আমার মনে পড়ল পৃথিবীখ্যাত জোলা'র কথা। বিশ্বসাহিত্যের জনপ্রিয় এই ঔপ-ন্যাসিক বলেছিলেন—তাঁর সব কাহিনীই প্রায় কোন-না-কোন সত্যি ঘটনার দরজা ছুঁয়ে গেছে। বিশেষ করে এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'নানা'র কথা। 'নানা' বারবনিতা। এবং সে লেখকের কোন কল্পনাপ্রসূত নয়। 'নানা' সত্যিই ছিল ফরাসী শহরের এক নামজাদা পয়সাওলা বেশ্যা। ফ্রান্সের তাবড় তাবড় লোকেরা তার কাছে যেত, তার নাম অবশ্য 'নানা' ছিল না, ছিল লা-পেভা। পেভা বুড়ি হলো। যৌবন গেল ফুরিয়ে। জীবনের প্রান্তে সেই ঘোলাটে চোখে তখন

বুদ্ধদেব গুহ

পেভা দেখত ফেলে-আসা জীবন। থাকে সে তখন শহরতলীর এক পাশে। জোলার সঙ্গে এই পেভার আলাপ হল। একটু একটু করে জোলাকে শোনাল জীবন কাহিনী। জোলার লেখা হল 'নানা' যা জোলাকে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত করেছে। আজ আশু-তোষ মুখোপাধ্যায়ের প্লট নির্বাচন আমাকে পুরনো গল্পটা একবার মনে করিয়ে দিল।

প্রসঙ্গ থামিয়ে বললুম—আচ্ছা আশুদা, এরকম ঘটনা আপনার জীবনে ঘটে নি? নিশ্চয়ই। তাহলে শোনো—একবার ঘরোয়া'র উপন্যাস লিখব ঠিক করেছি। প্লট আসছে না। রাত থেকে দিন গড়িয়ে যায়, নাঃ, সে আর আসে না। একদিন সন্ধ্যায় লেখার টেবিলে বসে আছি। ঝন-ঝনিয়ে ঘরে ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, বলছি।

আমি রামেন্দ্র। —রামেন্দ্র দেশমুখ্য। আমার কবিবন্ধু।—কি করছ?—আর বল কেন, উপন্যাস নিয়ে পড়েছি।

—তোমরা যে কি লিখছো বুঝি না। এই সব নার্সিং হোমের ডাক্তারদের নিয়ে লিখতে পারো না? ওফ, আমি একজন মেডিকেল লাইনের লোক, এত ঘুরলাম, দেখলাম, কিন্তু এই নার্সিং হোম ডাক্তার-দের দেখে আমি তাজ্জব। এরা যে কিভাবে দিনকে রাত, রাতকে দিন করছে। এদের নিয়ে লিখতে পারো না?

—কেন, কি হল অত রাগছো কেন। ব্যাপারটা কি?

—আর ব্যাপার, আমার এক জানাশোনা মেয়েকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। অ্যাদ্দিনে ডাইগোনাইসিস করে এরা বলল ক্যান্সার। ঠিক আছে, তাই সই। শুরু হল ভাই অপারেশন। ভাবতো তারপর দেখা গেল কিছুই নয়, ছোট্ট একটা টিউমার যা অপারেশন না হলেও চলত। তাহলে ভাবো ব্যাপারটা।

ব্যাস, ততক্ষণ আমার ভাবনা, ইন-ফ্লুয়েঞ্জার মত শরীরে সংক্রামিত হয়েছে। পুজোর লেখায় হাত দিলাম।

শুরু হল 'আমি সে ও সখা'।

জানো শাণ্ডিল্য, আসল ব্যাপারটাই হল হৃদয়ের অন্বেষণ। বললুম—তাহলে বলতে হয় প্লট হল ঘট। আর ঘটনা হল প্রতিমার জড়োয়া সাজ।

হ্যাঁ ঠিক তাই। তাই যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন জীবনের নানা বিপর্যয়ে যন্ত্রণা শুরু হয়, দুঃখে যখন আলগোছে ক্লান্তির কোলে মাথা রাখি, তখন কে যেন প্রভুজী হয়ে আমার মাথায় বুলিয়ে দেন নরম স্নিগ্ধ, আশীর্বাদ, স্পর্শ, বিশ্বাস করো শাণ্ডিল্য কখনো এমন হয়েছে, যেন কি একটা ঘোরে লিখে গেছি। কি লিখেছি জানি না। কিভাবে শেষ হল তাও জানি না। শুধু সেই প্রভুজীর পায়ে রেখে দিয়েছি আমার হৃদয়ের অঞ্জলি। এই তৃতীয় পুরুষই আমার জীবনের প্রেরণা, পাথেয়। আমার প্রতিদিনের ক্লান্ত শরীরে তিনি তাঁর মন্ত্র শুনিয়ে বলেন, সামনে এগিয়ে যেতে।

আজ প্লট মাথায় আসবার আগেই প্রকাশকেরা অ্যাডভান্স করে দিয়ে যান। অথচ যে গল্পটা চিরকাল মনে থাকবে তা হল প্রথম উপন্যাস 'কালচক্রে'র কথা।

তখন আমার বয়স আর কত হবে?—২১-২২। তখন তো লেখা কেউ চাইতোই না। নিয়ে গেলে বলত ওসব হবেটবে না। কয়েকজন বন্ধু মিলে টাকা দিয়ে বই বের করল। দ্বিতীয় উপন্যাস সেই নিজের জমান টাকায় 'সত্যাগ্রহী'। বইটা বায়স্কোপ হল। কাটল দুটো মুদ্রণ। রয়্যালটি চাই না বাপু, আসলটা ফেরত দে। এক পয়সাও দিল না পাবলিশার।

দরকার নেই উপন্যাসে। আর নিজেদের টাকায় বের করছি না। তখন এক বড় পাবলিশারের কাছে যাই 'চলাচল'-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে তোমায় নাম বলবো না। তিনি তো পাণ্ডুলিপি নিয়ে না পড়েই ফেরত দিলেন। অন্ততঃ পড়ুন। দূর ও চলবে না। ছোট প্রকাশক সাহস করে ছাপলো—একটা দুটো করে সাতটা মুদ্রণ বেরিয়ে গেল। ফিল্ম হোলো। মোটামুটি নাম হল। এবার সেই প্রকাশক এগিয়ে এলেন—আমি কি করলাম জানো? আমার সেই চলাচলের ৮ম মুদ্রণ তাঁকে দিলাম। প্রকাশক তাতেই এবার রাজী হলেন: পুরো রয়্যালটি সহ যাতে তাঁকে আমি আমার নতুন কোনো উপন্যাস দিই।

একটা কথা আমি সার বুঝেছি। যখন বুঝবো পাঠকের কাছ থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছি পাঠক আর আমাকে চাইছে না। তখন চলে যাব নিঃশব্দে। দীর্ঘ বারো বছর সম্পাদকের চেয়ার আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। নিজেকে ওভাবে জীইয়ে রাখার কোনো মানে নেই। তাই নিজেকেই নিজে বলি—নতুন প্রাপ্তির লোভ যেন আমার পুরনো প্রাপ্তিটাকে সরিয়ে না দেয়।

উত্তরসূরীরা থাকেন আমার সামনে থাকেন* শরৎচন্দ্র অনেক সাহিত্যকে দূরে রেখে সামনে আসেন তারাশঙ্কর। তবে তোমাকে আমার গোপন কথাটা বলে রাখি। আমার প্রিয় পড়ার বিষয় হল—কবিতা। দ্যাখো—আলমারির সাজানো বইগুলো, দেখবে লাইন লেগে দেগে পড়েছি। আমার অনুভবে অস্তিত্বে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। আমার ক্লান্ততা মরুভূমির রুক্ষতার মধ্যে স্নিগ্ধ মরূদ্যানের মতো। পিপাসায় আঁজলা ভরা জল তুলে নিয়ে বলি—'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানে ওপারে'।

•

কি লিখবো না লিখবো, ততক্ষণে আমি ছকে নিয়ে, কাগজপত্তর পেন ব্যাগে ঢুকিয়ে কথার মাঝখানে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা বুদ্ধদেবদা আপনি কবিতাটবিতা পড়েন না?

—পড়ি মানে? লিখি। দেখবে? যেন আমার কথার অপেক্ষায় ছিলেন লেখক।—আসলে স্বপ্নই দেখতাম বড়ো কবি হবো। জানো যখন কলেজে পড়ি তখন আমার কবিতা 'দেশে' বেরিয়েছে?—দেশে? কবিতা?—হাঁ। আরো শুনবে? আমার প্রথম কবিতার বই 'যখন বৃষ্টি নামলো' বেরোয় ১৯৫৬-এ।—একদম জানতুম না। শোনান তো কয়েকটা। বুধদেব গুহ হেসে বললেন—ভালো লাগবে আমার কবিতা? ওতো আধুনিক নয় কিন্তু! সুতো বাধা মোটা ডায়রীটা খুলে আমাকে অবাক করে দিয়ে বুধদেব গুহ একের পর এক কবিতা পাঠ করলেন। মির্জা গালিবের শের-এর মতো তাঁর নিটোল ছন্দে শব্দের মালা গেঁথে পরিয়ে দিলেন গলায়, তখন রাতের গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে।

যাক সে কথা পরে বলবো।

এখন লেখক বুদ্ধদেব গুহকে নিয়ে একটু বলা যাক।

ছোট্ট টুকটুকে একটা ছেলের হাতে রাইফেল গর্জে উঠতো সুন্দরবনের গহনে। তখন আর তার বয়স কতো এই দশ-এগারো। ক্লাস সেভেনের সেই ছেলে তখনই হাতিমার্কা ছাই মলাটের খাতায় হাতে লিখে তার প্রথম বই বের করেছে। ৩২ পাতার উপন্যাস ঐ জঙ্গলের বাঘ মারার ব্যাপার উপন্যাসের মাঝে শিল্পীর নিজের হাতে তেল রঙের ছবি আঁকা হয়েছে। সেই থেকেই শুরু।

—জানো, প্রকৃতিকে মানুষ দুভাবে দেখেছে। বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতিকে কথা বলিয়েছেন। বিভূতিভূষণ আমার প্রিয় সাহিত্যিক, তাঁর ভক্ত হয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কিন্তু একটা ব্যাপার হোলো আজ পর্যন্ত যাঁরা অরণ্যকে তাঁদের উপন্যাসের মূলভূমি করেছেন, তাঁরা সবাই দেখেছেন অরণ্যকে কবির চোখ দিয়ে তাঁদের চোখে প্রকৃতি পরিয়ে দিয়েছে রঙিন চশমা। শুনতে পেয়েছেন দূরে থেকে পাখপাখালি গাছগাছালির শব্দ। কিন্তু আমি জঙ্গলকে দেখেছি তোলপাড় করে! হেতাল গরান সুন্দরীর বন তছনছ হয়েছে আমার পায়ের চাপে। শুয়োর মেরে তার রক্ত পরিষ্কার করে ছাড়িয়ে নিয়েছি চামড়া। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে যন্ত্রণার রং। আমার আগেকার অনেক লেখকের অরণ্যপ্রকৃতিকে দেখা যেন একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখে কবির কল্পনা। যা গড়ে তোলে স্বর্গের সুষমা। আর আমি, সেই সুন্দরীকে ছুঁয়েছি, শুয়েছি, তাকে উল্টেপাল্টে দেখেছি। তাই সে নারী আমার কাছে আজ অচেনা অজানা নয় এই সুন্দরীর সঙ্গে রাত্রিযাপন যে একবার করেছে সে কি কখনো মোহমুক্ত হয় তাই ঘুরে ফিরে আবার কখন চলে আসি তার কাছে, হাওয়ায় ওড়ে তার আঁচল। প্রকৃতি এমনি এক নারী। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার এই দৃশ্যমান জগতই ছিল আমার গল্পের মূল বিষয়।

বললুম—তাহলে তো জিম করবেটের মতো লিখতে পারতো বরাবর। —একেবারে যে ইচ্ছে করেনি তাই বা কি করে বলি। তবে আমায় টানে হেমিংওয়ে। হেমিংওয়ের ব্যক্তিগত জীবনটা ঠিক এইরকমই অ্যাডভ্যাঞ্চারে জড়ানো ছিল। আমি বললুম—তা ঠিক। একজনের আফ্রিকার জঙ্গল আপনার সুন্দরবন। আফ্রিকার জঙ্গলে দু দুবার প্লেন ভেঙে হেমিংওয়ের দারুণ চোট, মাথার হাড় ভেঙেছে চুল পুড়েছে, স্ত্রীর পাঁজরার হাড় ভেঙেছে তবু আফ্রিকার ডাক তাঁর কানে বারবার এসেছে। ছুটে গেছেন অরণ্যে। নোবেল পুরস্কারের প্রায় পৌনে দু লক্ষ টাকার মতো টাকা পেয়ে প্রথমেই সেখানে যাবেন ভেবেছিলেন তার নাম আফ্রিকা।

হ্যাঁ ঠিক তাই। আর তাই ও'র জীবন ও সাহিত্য দুটোই আমাকে টানে। আমার রক্তের মধ্যে মিশে আছে হেমিংওয়ে।

দেখুন তো। পুজোর কথা আলোচনা করতে এসে কোথা থেকে কোথায় চলে এলাম। একটু পুজোর গল্প করুন। পুজোয় একটাই উপন্যাস লিখছি বিজ্ঞাপন তো দেখেছেনই। অমৃতের পটভূমিতে লেখা বেশ বড় একটা নতুন ধরণের কাহিনী দিয়েছি অমৃতে। তাছাড়া গল্প আছে বেতার জগৎ আনন্দমেলা কথাসাহিত্যে এবং খুব শিগগিরই শুরু হচ্ছে অমৃতে ধারাবাহিক উপন্যাস। তিনটে ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন।

পটভূমি প্লট কি নিলেন?

সম্প্রতি যে প্রায় গোটা পৃথিবী ঘুরে এলাম নিঃসন্দেহে সেই হবে আমার উপন্যাসের পটভূমি। এ ধরণের উপন্যাস আমি এই প্রথম লিখছি। তবে যা-ই লিখি। একটা কথা না বললে আমার সব কথাই মিথ্যে হয়ে যাবে। সেই মানুষটি যাঁর প্রেরণা সহযোগিতা তাগিদ না থাকলে হয়তো আমি লেখক হতে পারতুম না তাঁর কথা তো সব সময়েই মনে থাকে। যাকগে শোনো, তুমি তো নিশ্চয়ই বড়োমামাকে চেনো?

—বাঃ সুনির্মল বসুকে চিনবো না? বাংলা শিশু সাহিত্যের তিনি ছিলেন একজন দিকপাল। কে কে না চেনে?

বড়োমামাই আমার লেখা নিয়ে শুরু-তারায় দিতেন। কথাসাহিত্যে লেখার পর একদিন মনোজবাবু (বসু) আমাকে একটা চিঠি নিয়ে আনন্দবাজারে যেতে বললেন।

এই হল শুরু। তারপর 'হলদে বসন্ত' বেরুলো দোল সংখ্যায় কয়েক বছর বাদে। সেই প্রথম চতুর্দিক থেকে আমার জমার খাতায়—সম্মান। আজ পর্যন্ত আমি দশ-বারোটা উপন্যাস লিখেছি।

ইচ্ছে ছিল কবি হবো। বাবা বললেন—সি-এ পড়ো। মনের গোপন দুঃখ মনে চেপে নিয়ে তাই পড়লাম। ইচ্ছে হোতো না একটুও ইচ্ছে হোতো না আমার অংক কষতে পাতার পর হিসেব কষতে। চোখের জলে খাতার পাতা ভিজে যেতো। মা বুঝতেন মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন খোকা এটা পাশ কর তারপর কবিতা লিখবি এই তো কটা দিন। ভাবলুম—তাই হোক। যখন ধরেছি শেষ করি হেরে যেতে আমার ভালো লাগে না।

—তাতো এখন আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে সাফল্যের চূড়ায় দাঁড়িয়ে।

না শাণ্ডিল্য এ বোঝা ক্রমশই ভারী হচ্ছে। আর কুঁজো হয়ে সেই ভার বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দিনে ৮।৯ ঘণ্টা আমাকে হিসেব নিয়ে থাকতে হয়।

—তাহলে লেখেন, পড়েন কখন?

—এটা আমার গোপন ব্যাপার। কারণ আমি বিশ্বাস করি কাজগুলো পরস্পর সাজানো আছে মৌচাকের একেকটা খোপের মতো। যে কোনো মানুষ তার প্রখর নিয়মানুবর্তিতা এবং নিষ্ঠা দিয়ে এই খোপগুলোকে ভরতে পারে। তবে সামাজিক জীবন বলতে আমার কিছু নেই, শুধু কাজ আর লেখা। এছাড়া জীবনে কিছু নেই: এই যে ঘর দেখছো এখানেই আমার বিশ্রাম। রাতের পর রাত কতদিন আমার এখানেই কেটে গেছে।

চারদিকে বই, ক্লাসিক থেকে একেবারে হাল আমলের ইংরেজী বাংলা বই ম্যাগাজিন ঘরটা রঙিন করে রেখেছে।

মনে মনে বলি—বড্ডো লোভ লাগছে বুদ্ধদেবদা ঘরটাকে। এরকম একটা ঘর স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া যায়। হেমিংওয়ে, টমাস মান শেকসপীয়ার ফ্রন্ট থেকে শুরু করে বঙ্কিম, মানিক, বিভূতি পর্যন্ত। সাজানো। আর পাশের ছোট ছোট সাইড টেবিলে আলগোছে পাতা রয়েছে বুনো জানোয়ারের চামড়া।

'বাড়ি-ঘর'-এ আমি যা বলতে চেয়েছি তা হল একটা প্রতীক। অর্থাৎ লাইফ ইজ লাইক এ রিলে রেস। একজন মশাল নিয়ে ছুটে তুলে দেবে আরেক দলের হাতে। কোনো জীবনই থেমে যেতে পারে না। থেমে থাকে নতুন প্রস্তুতি নিয়ে চলার জন্যে। আসলে কি জানো? নর-নারী সম্পর্ক বড় জটিল। আমি দেখেছি আমি মেয়েদের যতটা বুঝি তত বুঝি না ছেলেদের। তাকে খুঁজতে খুঁজতে এক জীবনেও শেষ করা যায় না। আমি এই যে ঘুরে এলাম। দেখলুম—শেষ পর্যন্ত মানুষের গন্তব্য হল প্রকৃতি। প্রকৃতি বাদ দিয়ে চলার আমাদের উপায় নেই। মানুষ যদি মানুষ থাকে প্রকৃতির মধ্যে তাকে আবার ফিরে আসতে হবেই।

আমার উপন্যাস লেখার ব্যাপারটা কি জানো? ঠিক একজন শিল্পী যেমন করে ছবি আঁকে। কোনো নোটবই, কোনো দাগ দিয়ে আগে থেকে লেখার প্রস্তুতি থাকে না। একজন শিল্পী তার ফাঁকা ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক তুলির পোঁচ দেয়। সে জানে না তারপর তারপর কি। যাঁরা অংক কষে লেখেন আমার মনে হয় তাঁরা সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

সে আনন্দ পাওয়া যায় কবিতায়। কথা সাহিত্যকে আমি মনে করি গোলাপ জল। আর কবিতা হল আতর। ছুঁইয়ে দিলে তার সৌরভ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। তাই কবিতা লিখি, হয়তো আরো লিখবো। তাই মনে হয়—এই শান্ত দুপুরে/সুখের অবরোধ। থাকবে কি আর থাকবে চিরদিন/এই সবুজে পাতায় আশাবাদী রোদ/নাচবে কি আর নাচবে চিরদিন?

মনে-প্রাণে মূলত রোমান্টিক প্রেমিক বুদ্ধদেব গুহ ভালবেসেছেন জীবনকে প্রকৃতিকে। আর রক্তের মধ্যে বইয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের বীজ। মহীরুহ তাই এরকম ডালপালা ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে।

—শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
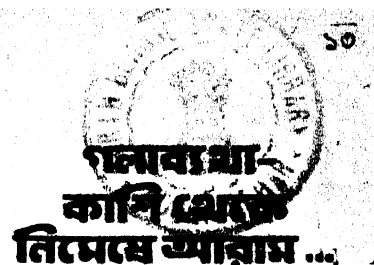
পর্তুগীজ উপনিবেশে গৃহযুদ্ধ

পর্তুগীজ সরকার যেখানে আপন দেশেই টলমল করছে সেখানে দেশের মাটি থেকে বহু দূরে উপনিবেশগুলিতেও তার কর্তৃত্বের রাশ যে আলগা হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পর্তুগালের ভিতরে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে তার প্রতিফলন উপনিবেশগুলিতে হচ্ছে। অ্যাঙ্গোলাতে যে গৃহযুদ্ধ চলছে বাইরে থেকে দেখতে গেলে সেই গৃহযুদ্ধের লড়াকুরা অবশ্যই স্থানীয় রাজনৈতিক দল, কিন্তু তলায় তলায় তারা পর্তুগীজ শাসক গোষ্ঠীর কোন না কোন অংশের সাহায্য বা প্রশ্রয় পাচ্ছে এমন সন্দেহ করার কারণ আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট দ্বীপ টিমরে অ্যাঙ্গোলার ঐ ইতিহাসেরই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অ্যাঙ্গোলার মতো সেখান থেকেও গৃহযুদ্ধের খবর আসছে।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় পর্তুগাল যখন ইউরোপের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে সারা পৃথিবীতে তাদের উপনিবেশ বিস্তার করতে বেরিয়েছিল সেই সময়ে দুনিয়ার অন্যান্য অনেক অংশের মতো টিমরও সে অধিকার করে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ও ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত এই দ্বীপ ১৫৮৬ সাল থেকেই লিসবনের শাসনাধীনে রয়েছে। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পর্তুগালকে অবশ্য এই দ্বীপের পশ্চিম দিকে অর্ধাংশের বেশি ওলন্দাজদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ওলন্দাজরা যখন এশিয়া থেকে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হল তখন পশ্চিম টিমর স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হল। কিন্তু পূর্ব টিমর পর্তুগালের হাতেই থেকে গেল, যেমন চীনের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত ম্যাকাও এখনও পর্তুগীজ উপনিবেশ হিসাবেই রয়ে গেছে।

পূর্ব টিমরের আয়তন প্রায় ১৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ আমাদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের তিনগুণ ও শ্রীলঙ্কার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। এর জনসংখ্যা ছয় লাখের কিছু বেশি। হাজার দশেক চীনা অধিবাসী এখানকার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। চীনাদের পরেই দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পর্তুগীজ বসতকারীরা ও পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত ইউরেশিয়ানরা। দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে কফি ও চন্দন কাঠ।

পূর্ব টিমরের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের নাম হল ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব টিমর (ইউ ডি টি) রেভল্যুশনারি ফ্রন্ট ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিমর ইস্ট (ফ্রেটেলিনা) ও পপুলার ডেমোক্রাটিক অ্যাসোসিয়েশন অব টিমর (অ্যাপোডেটি)। ইউ ডি টি দক্ষিণপন্থী দল, এই দলের পিছনে স্থানীয় পর্তুগীজ বসতিকারী ও ইউরেশিয়ানরা আছে বলে শোনা যায়। ফ্রেটেলিনা বামপন্থী দল। আর অ্যাপোডেটির লক্ষ্য হল ইন্দোনেশিয়ার অংশ হিসাবে পশ্চিম টিমরের সঙ্গে পূর্ব টিমরের সংযুক্তি।

পর্তুগালের নতুন শাসকরা আফ্রিকা থেকে উপনিবেশ গুটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তৎপরতা দেখালেও পূর্ব টিমর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সে রকম কোন তৎপরতা দেখায় নি। (ম্যাকাও সম্পর্কেও পর্তুগাল ও চীন চুপচাপ রয়েছে।) গত জুন মাসে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এক বৈঠকে স্থির হয় যে, ১৯৭৮ সালের অকটোবরে পূর্ব টিমরকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তার প্রস্তুতি হিসাবে সেখানে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে।

হঠাৎ খবর এলো যে, ইউ ডি টি-র সমর্থকরা একটি থানায় হানা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র লুঠপাট করেছে এবং সেই অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তারা পূর্ব টিমরের রাজধানী দিলি-তে বিমানবন্দর ও বেতারকেন্দ্র সহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। তাদের দাবি, অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। তাদের আর একটি দাবি, বামপন্থী ফ্রেটেলিনা দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। পর্তুগীজ শাসকরা ঐ দুই দাবিই প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইউ ডি টি ঐ দ্বীপের স্থানীয় পর্তুগীজ সরকারকে উৎখাত করে দিয়েছে, এই সংবাদও লিসবন সরকার অস্বীকার করেছেন।

পূর্ব টিমরের স্বাধীনতার জন্য ইউ ডি টি দলের যে তর সইছে না তার কারণ অবশ্য এই নয় যে, অন্যান্যদের তুলনায় তারা বেশি জাতীয়তাবাদী অথবা বেশি স্বাধীনতাপ্রেমী। আসলে যে ব্যাপারটা নিয়ে তারা বেশি ব্যস্ত তা হল, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে সেই ক্ষমতা যেন বামপন্থী ফ্রেটেলিনা দলের হাতে না যায়। দক্ষিণপন্থীদের সন্দেহ, অস্থায়ী সরকার গঠনের নাম করে পর্তুগালের বাম-ঘেঁষা প্রধানমন্ত্রী গনসালভেসের সরকার এখনই টিমর দ্বীপে ফ্রেটেলিনার ক্ষমতায় আসার পথ তৈরি করে দিতে চাইছেন। এটা ঠেকাবার জন্যই তাড়াতাড়ি ইউ ডি টি পথে নেমে পড়েছে। ইউ ডি টি-র সমর্থকরা বুঝেছেন যে, পর্তুগালে প্রধানমন্ত্রী গনসালভেসের অবস্থা যখন সঙ্গীন ও সেখানকার ফৌজী অফিসাররা যখন বিভক্ত হয়ে পড়েছেন তখনই আঘাত হানার উপযুক্ত সময়। লিসবনে প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, টিমরে প্রায় প্রত্যেক সৈনিকই কোন না কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে অবস্থা আয়ত্তে আনা কঠিন হচ্ছে।

টিমরের এই গৃহযুদ্ধের সঙ্গে আরও একটি দেশের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। সেটা হল ইন্দোনেশিয়া। পূর্ব টিমরে যাই ঘটুক পশ্চিম টিমরে তার প্রভাব পড়বে। সুতরাং, খুব স্বাভাবিক কারণেই সে পূর্ব টিমরের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। সেখানকার দরিয়ায় সে একটি ডেস্ট্রয়ারও পাঠিয়েছে।

অ্যাপোডেটি নামে টিমরের যে রাজনৈতিক দলটি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে দ্বীপের সংযুক্তি চাইছে তারা জাকার্তার প্রশ্রয় কতখানি পাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়া বলেছিল, পর্তুগীজ টিমরের উপর তার লোভ নেই। কিন্তু ইদানীং টিমরে অ্যাপোডেটির সঙ্গে অন্য দলের সমর্থকদের সংঘর্ষের সংবাদ যেভাবে ইন্দোনেশিয়ার সূত্র থেকে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে তাতে মনে হয়, জাকার্তা এখন এই গৃহযুদ্ধে নিতান্ত নিরাসক্ত দর্শকমাত্র নয়।

পুণ্ডরীক

২১-৮-৭৫

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

শ্যামল একটু হাসল, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'জান কল্পনা, রাজবংশীয় না হলেও আমি রাজদ্রোহী নই। তোমার আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে যখন যতটুকু ভালোবাসা দেবে, সেই ভালোবাসা আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করব...সময় লাগবে জানি; আমরা শুধু দেখব, আমাদের দিক থেকে অনাবশ্যক বাধার যাতে সৃষ্টি না হয়। ওদেরই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা দেখে আমরা ওদের দুঃখের মর্মান্তিকতা বুঝতে চেষ্টা করব...' তারপর একটু থেমে সে বলল, 'আমারও বাড়ির লোকেরা এই বিয়েতে যে সানন্দে মত দেবে, তা না-ও হতে পারে...আমার কথা রাখ : বাড়ির জামা-কাপড় ফেলে দিও না।'

শ্যামলের এই অনপেক্ষিত উদারতা দেখে কল্পনা আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে উঠল। বাবা মাকে—বিশেষভাবে সেই নিরীহ, অকর্মণ্য, স্বপ্নালু বাবাকে—সে আসলে অত্যন্ত ভালোবাসে। অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে সে বলল, 'ঠিকই বলেছ, শ্যামল...ওরা ছাড়তে চায়, ছাড়ুক, আমরা কিন্তু সম্পর্ক ছাড়ব না। কাপড়-চোপড় আমি নেব; তবে বলেছি যখন, ফটিক ওর মায়ের জন্য শাড়িটা নিয়ে যাক।'

সবুজ পেড়ে শাড়ি পরিহিতা দীর্ঘতনু কৃশাঙ্গী শুভ্রবদনা কল্পনার নিরুদ্দেশ যাত্রার সংবাদ পেয়ে দুর্গাপুরের পুলিশ যখন জীপ-এ করে শ্যামলের কোয়ার্টার্সে এল, শঙ্করদা ভদ্রভাবে জানাল : এক, কল্পনা বলুন, খেঁদি বলুন, ঘেঁটু বলুন, এখানে কোনো মেয়ে নেই; দুই, ওয়ারেন্ট না দেখালে পুলিশকে সার্চ করতে দেওয়া হবে না।'

ফটিককে দেওয়া সবুজ-পেড়ে শাড়িটা ছাদে ঝুলতে দেখে পুলিশ বুঝল—ভুল বুঝল—মেয়েটি ওখানে এখনও আছে; উপরিওয়ালার আদেশ মতো তাঁরা নন্দকিশোর রাজাকে খবরটা জানাল। ওদের [illegible] রাজা কোনো কৃতজ্ঞতার বাণী উচ্চারণ না করে অবনীপতিসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, 'উল্লুক!'

ইতিমধ্যে ঘটেছে কি? শ্যামল কল্পনার টালিগঞ্জ নিবাসী মেসোর বাড়িতে মেয়েটিকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে; মেসোমশায় ওঁর রাজকীয় শ্যালীপতিকে জানিয়েছেন, 'তোমার মেয়ে আমার ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে, ছেলেটিও আপাতত আছে; মেয়েটি বাড়ি যেতে চাচ্ছে না।' নন্দকিশোর রাজা ধরণীপালোচিত আদেশ দিলেন : 'বাঁদরটাকে একবার দেখা করতে বল।' কল্পনার খুব ইচ্ছা ছিল না, শ্যামল ওর বাবার সম্মুখীন হয়। বাঁদরটা কিন্তু কেশরীপুঙ্গবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ছাড়ার পাত্র নয়।

নন্দকিশোর রাজা তাঁর কোনো রাজকীয় জন্মে কল্পনাও করতে পারেন নি যে, ছেলেটি আসবে। তাই দরওয়ান যখন জানাল, 'একজন ভদ্রলোক এসেছে—শ্যামল সেনগুপ্ত...' সারা বাড়িটা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ল। মর্মর প্রস্তরের গোল টেবিলের উপর পা তুলে নন্দকিশোর রাজা আলবোলার ধোঁয়ার মধ্যে বসে আগন্তুকের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'নমস্কার। আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

'না।'

'তাহলে নমস্কার...' বলে শ্যামল প্রস্থানে উদ্যত হল।

কল্পনার মা মাটিতে বসে ছিলেন: এই দু'দিনের মধ্যে তিনি বড় বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। শ্যামলকে তিনি শান্ত-ক্লান্ত স্বরে সম্বোধন করে বললেন, 'আমিই আপনাকে ডেকেছি, শ্যামলবাবু; বসুন।' শ্যামল যেই বসতে যাচ্ছে, নন্দকিশোর রাজা বললেন, 'জানেন, কল্পনা কোন্ বাড়ির মেয়ে?'

'দেখুন : জ্ঞানার্জনের জন্য আমি আসি নি, এসেছি শুধু ব্যাপারটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়...'

বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা সম্পাদন করার ভদ্রলোকের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। বিনাবাক্যব্যয়ে গাত্রোত্থান করে কক্ষটিকে তিনি তাঁর রাজকীয় উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করলেন।

অমলাদেবী বললেন, 'আমার মেয়েকে ছাড়ুন।'

'আমি ওকে ছাড়লে আপনার কি লাভ? আর এদিকে দেখুন, অন্য জায়গায় ওর বিয়ে হলে শুধু এক নয়, দুই নয় তিনটি প্রাণীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলবেন'

'তিনটি প্রাণীর? ... মানে, তোমরা...'

'আপনি কি ভাবছেন? আমরা রাজবংশীয় নই বলে ভদ্রতা জানি না?.... তিনজনের কথা বলছিলাম : কল্পনার, আমার—আর যে-ছেলেটিকে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবেন, তারও।'

কল্পনার বয়স অল্প, তোমারও বয়স বেশি নয়... তোমরা কি নিজেদের মনকে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছ? মোহ বলে জিনিস আছে, কথা দাও, এই ছ'মাস তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করবে না।'

ঐ ধরনের প্রস্তাবের জন্য শ্যামল অপ্রস্তুত ছিল না, বলল, 'ছ' মাস কেন? এক বছর বলুন। একটা শর্ত কিন্তু আছে : এক বছর পরে সে নিজেই আমাকে এসে বলবে, 'আমি তোমাকে চাই না' তা যদি না বলে, আপনারা তাহলে কিন্তু আমাদের বিয়েতে মত দেবেন।'

'তা তো ও বলবে না...'

'আর আপনারাও মত দেবেন না, কাজেই তর্কের আর কি প্রয়োজন?'

দেওয়াল-ঘড়িতে চারটে বাজল। অমলাদেবী বললেন, 'আজকে তাহলে থাক, আর একদিন কথা হবে, মেয়েরা স্কুল থেকে আসবে'খন... তোমায় দেখা যেন না পায়!'

এদিকে নন্দকিশোর রাজা ওঁ'র টালিগঞ্জনিবাসী ভায়রাভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের কাছে কান্নাকাটি করলেন : তুই

ভুলিস না, আমরা তোর খারাপ চাই না... আমার সঙ্গে চল্, বাড়ি ফিরে আয়...'

'গেলে মা আবার মারধোর করতে শুরু করবে।'

'তোকে কথা দিলাম, আমি যতদিন থাকি, আমার বাড়িতে কেউই কোনো দিনই তোর গায়ে আর হাত দেবে না।'

কল্পনাকে স্কুলে আর পাঠানো হল না, কোথাও ওকে আর বেরুতে দেওয়া হল না। এক সর্বাঙ্গসুন্দর রাজকুমারের সঙ্গে বাবা-মা ওর সম্বন্ধে ঠিক করলেন। একদিন কল্পনার এক মাসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে উক্ত রাজনন্দনের সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয়। রাজকুমার নিজে থেকে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল, জিগ্যেস করল, 'তুমি কিছু শোননি? আমাদের বিয়ে?'

'এ-রকম অনেকবার শুনেছি।'

'আপত্তি আছে?'

'অপছন্দের কিছু নয়।'

'তাহলে?'

'অন্য কারণ আছে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি, পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে তুমি নাকি কিছুদিন প্রেম করেছিলে, তাতে হয় কি? আধুনিক যুগের ছেলে-মেয়েরা তো ও-রকম করেই থাকে, কিন্তু প্রেম করা আর বিয়ে করা তো এক নয়; জাত, সমাজ, অবস্থা, সব দিক থেকে বিবেচনা করা দরকার।'

'আমি যে ছোটবেলা থেকেই ওকে ভালোবাসি, আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়েছে!'

'মিথ্যে কথা!'

একটু হেসে কল্পনা বলল, 'দ্বিতীয়টা মিথ্যে বটে, তবে প্রথমটা সত্য, ঘোর সত্য।'

রাজকুমার এরপর কল্পনাদের বাড়িতে কত যে অছিলা বের করে এসেছিলেন, তার ঠিকানা নেই। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে সরে পড়লেন।

তখন ঘটল কল্পনার জীবনমঞ্চে অসীমের প্রবেশ। অসীম কল্পনার সেই পিসতুতো দাদা রানার আরেক বন্ধু। না, আজকাল সেই সৌমিত্রের আর পাত্তা নেই; মায়েদের বড় ইচ্ছা সত্ত্বেও ওর সঙ্গে নন্দকিশোর রাজা চৈতালির বিয়ে দিতে রাজি হননি; সৌমিত্র যে—ছি-ছি! কল্পনার পিসির জমিদারির দেওয়ানের ছেলে। চৈতালি স্বভাবে ভীতু। এ-যাত্রায়ও সৎসাহস দেখাতে পারল না, সৌমিত্রকে সে জলাঞ্জলি দিল পিতৃদেবের আত্মাভিমানের শ্রীচরণে।

এদিকে কল্পনার মা-বাবার মতে অসীম ছেলেটি কল্পনার ঐ অবজ্ঞাত রাজকুমারের এক অনুমোদনযোগ্য বিকল্প। তাঁদের প্রালোচনায় রানার সঙ্গে অসীমের হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। ফলে কৌশলে তাঁরা কল্পনাকে ছেলেটির সঙ্গে মেলামেশা করাতে চেষ্টা করলেন; মতলব এইঃ প্রেমে মেয়েটিকে যদি পড়তেই হয়, সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে পড়ুক।

একদিন অসীম এসে দেখে, মাথায় একরাশ পাগড়ি বেঁধে কল্পনা ঝুল ঝাড়ছে। 'দাদা নেই' বলে কাজ করে চলল সে।

'তাতে কি? তোমারই সঙ্গে আমার দরকার—'

এতদিন শ্যামলের সঙ্গে সর্বপ্রকার যোগাযোগ বন্ধ; চিঠি পায় না কল্পনা, দিতেও পারে না, চারিদিকে সুতীক্ষ্ণ পাহারা, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। না, আদর-যত্নের অভাব নেই, আদর-যত্ন কিন্তু সংকল্পপ্রণোদিত—কল্পনা যাতে শ্যামলের কথা ভুলে যায়। অসীমের মধ্যে সে যেন—অবশেষে এক নিঃস্বার্থ বন্ধু কিংবা দাদা পেয়েছে। কিন্তু হায়, অসীম আবার ভুল বুঝতে গেল কেন? ছেলের জাত এক অদ্ভুত জাত বটেঃ কোনো মেয়ের সঙ্গে যেই একটু ভাব হল, ব্যস বিয়ের কথা। সে ভাবতে শুরু করবে, ওর বাগদত্তকে সরাতে চেষ্টা করবে। অসীমকে অবস্থাটা বোঝাতে গিয়ে কল্পনাকে অনেক বেগ পেতে হল অসীম একান্ত মর্মাহত হয়ে পড়ল, আর ওকে যে দুঃখ দিচ্ছে জেনে কল্পনাও দুঃখ পেল কম নয়। হ্যাঁ, তুমি কিনে নিয়ে আসার রাস্তায় ওরই সঙ্গে দেখা হলে, ওরই সঙ্গে বোধহয় মেয়েটি প্রেমে পড়ত।

নন্দকিশোর রাজা একদিন স্থির করলেন এ'দের অধ্যুষিত পাড়াটা শ্যামলের অদৃশ্য উপস্থিতিতে দূষিত। তিনি তাই সপরিবারে টালিগঞ্জে—কল্পনাকে সেই মেসোর বাড়ির পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে—বসবাস করতে শুরু করলেন। নন্দকিশোর রাজা ভাবলেন, বন্দিনী কল্পনার ঠিকানা জেনে নেওয়ার শ্যামলের যো নেই। শ্যামলের কিন্তু ঐ নতুন পাড়ায় রজত নামে এক বন্ধু ছিল। রজতের বোন শিবানী কল্পনার সঙ্গে ভাব করতে এসে বলল, 'ভয় নেই, আমি দূতী! পরশু ১৫ই আগস্ট দুটোর সময় শ্যামলদা আসবে, ঐ যে বাড়িটি উঠছে ওখানে, ওর উপরে এসে দাঁড়াবে, বাড়ির ছাদে উঠতে তো মানা নেই তোমার?'

প্রণয়ীকে দেখতে পেয়ে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে কল্পনা লাফ দিল, পড়ে গেল পচা পানার মধ্যে, ভিজে গেল কাদা-জলে হাঁটু পর্যন্ত। ওর চেহারা দেখে একটু হেসে শ্যামল বলল, 'দেখতে বলেছিলাম, দেখা করতে তো বলিনি। এবার কি করব, বল তো?'

'এবার স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনভাবে কাটাব!'

রজতের বাবা একজন উকিল। তিনি বললেন, মেয়েটির বয়স যখন সঠিক জানা যায় না, তোমাদের কর্তব্য হল থানায় খবর দেওয়া।'

থানার অফিসার বললেন, 'মেয়েটিকে নিয়ে আসুন ওর বাবাকেও ডাকা হোক। মেয়েটি বাড়ি ফিরতে না চায় না হলে এখানেই রাত্রি কাটাবে।'

নন্দকিশোর রাজার অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও কল্পনা বাড়ি ফিরতে চায় না, শুধু বলে, 'মা আমাকে মেরে ফেলবে!' শেষ পর্যন্ত অমোঘ অস্ত্র ছুঁড়ে বাবা বললেন, 'ও-সির মুখচোখ দেখেছিস? ওর কাছে এখানে থাকিস না, লোকটা সুবিধের নয়।'

কল্পনাকে রিকসায় তুলে নন্দকিশোর রাজা রজতের বাবাকে বললেন, 'এই ঘটনার পর মেয়েটিকে আমি বাড়িতে আর বেশি দিন রাখতে পারব না। আপনারা দেখবেন, এক সপ্তাহের মধ্যে যাতে বন্দোবস্ত করা হয়।'

২১শে আগস্ট, রজতদের বাড়িতেই ধর্মশাস্ত্রের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা তথা পশ্চিমবঙ্গের অতিথি নিয়ন্ত্রণের তাবৎ নিষেধ মান্য করে শ্যামল ও কল্পনার শুভ পরিণয় শুভক্ষণে সম্পন্ন হয়। রজতের বাবা সম্প্রদান করেন। শ্যামলের দাদারা আসেন, শ্যামলের বাবা-মা গয়না-কাপড় পাঠান।

ডবল এজেন্ট

বিক্রমাদিত্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঃ আনোয়ার একস! নামটা জানি কোথায় শুনেছি? ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসার তার মনের বিস্ময় প্রকাশ করল।

ঃ আনোয়ার একস ইজিপশিয়ান আর্মির একজন লেফটেনান্ট। জেনারেল আজিজ মাশরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হিকমত ফাহামী জবাব দিল। ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসার এবার বুঝতে পারল যে এই গভীর রাতে নির্জনে আনোয়ার একস কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই হাউস বোটে এসেছেন।

না, মদ গিলবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আসেন নি। কারণ বাজারে সবাই জানতো যে আনোয়ার একস মদ খান না। আনোয়ার একস এসেছেন রেডিও মারফত রমেলের শিবিরে খবর পাঠাবার জন্যে।

ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসার তার মনের সন্দেহের কথা ভাষায় এবং ভাবে প্রকাশ করল না। আবার আসর জমিয়ে তুলল।

আনোয়ার একস হঠাৎ হিকমত ফাহামীকে জিজ্ঞেস করলেন, হাবিবী, রেডিও খুলে দাও। একটু গান শুনি।

হিকমত আপত্তি করল। না, আনোয়ার অনেকদিন বাদে আমাদের গল্পের আসর জমে উঠেছে। আজ আর রেডিও শুনতে ইচ্ছে করছে না।

ঃ শুধু তাই নয়। রেডিওটা ভালো করে কাজও করছে না। হুসেন গফার হিকমত ফাহামীর কথার সঙ্গে একটি লেজ জুড়ে দিল।

ঃ তাই না-কি? দেখি রেডিওটা। বলে অন্য ঘরে যেতে যেতে আনোয়ার একস একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ইনটেলী-

'জেনস অফিসারের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের চাউনি দেখে ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসার বুঝতে পারলেন যে আনোয়ার একস তাকে সন্দেহ করেছেন।

অতি বিচক্ষণ। আনোয়ার একস, তিনি সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে চান না। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে হুসেন গফার এবং স্যান্ডি তাদের কর্তাকে ফাঁকি দিচ্ছে। তারা শুধু সুন্দরী বেলী ড্যানসার হিকমত ফাহামীকে নিয়ে জীবন উপভোগ করতে চায়। আসল কাজ করবার কোন উদ্দেশ্যই তাদের নেই।

একটু বাদে আনোয়ার একস অন্যঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঃ না রেডিও পরীক্ষা করে দেখলুম। চমৎকার, ভালোই কাজ করছে। আনোয়ার একস সাদাত আবার মন্তব্য করলেন।

ঃ আনোয়ার, তুমি বড্ড বেরসিক। কেন আমাদের গল্পে বাধা দিচ্ছ। একটু ধমকের সুরে হিকমত ফাহামী বলল ঃ বসো।

ঃ না, আমার বসবার সময় নেই। আমার একটু কাজ আছে।

আনোয়ার একস সেদিনকার ড্রিংকের আসরে যোগ দিলেন না। চলে গেলেন।

ড্রিংকের আসর যখন ভাঙলো তখন ভোর প্রায় পাঁচটা।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগ এবার গবেষণা করতে লাগল কবে, কখন হুসেন গফার স্যান্ডিও হিকমত ফাহামীকে গ্রেপ্তার করা যায়। আর আনোয়ার একস? তাকে ধরা সহজ কাজ নয়। কারণ ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগ জানত যে আনোয়ার একস ঘোরতর ইংরেজ বিদ্বেষী এবং সাবধানী মানুষ। তাকে ধরা অতি কঠিন ব্যাপার।

ইতিমধ্যে হুসেন গফার হিকমত ফাহামীর সঙ্গে ব্রিটিশ ইনটেলজেনস অফিসারের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠলো। হুসেন গফার প্রতিদিন বেশ মোটা টাকার ব্রিটিশ পাউন্ড তার মারফত বদল করতে লাগল।

কিন্তু কখনই হুসেন এবং তার সহকর্মীদের ধরবার সুযোগ পাওয়া গেল না। ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস আবার তাদের জাল বিস্তার করতে লাগল। কারণ তারা ঠিক করেছিল যখন হুসেন গফার রেডিও মারফত রমেলের শিবিরে খবর পাঠাতে থাকবে তখন পুলিশ হঠাৎ হাউস বোটে গিয়ে হানা দেবে। কিন্তু কখন এই খবর পাঠানো হয়, তা সঠিক জানা গেল না। কারণ প্রতিরাত্রে তারা খবর পাঠাবার সময় পরিবর্তন করছিল।

একদিন খবর পাঠাবার সঠিক সময় জানা গেল।

পুলিশ একদিন একটি সুন্দরী বেলী ড্যানসারকে গ্রেপ্তার করলো। মেয়েটির নাম নাটালি। মেয়েটি প্রচুর মদ খেয়ে একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে মাতলামি করছিল। পুলিশ মাতলামি করবার অভিযোগে নাটালিকে গ্রেপ্তার করলো।

প্রথমে জানা গেল নাটালি ফরাসী, কিন্তু পরে জানা গেল যে সে হোল ইহুদী।

নাটালি বলল ঃ আমি ব্রিটিশ ইনটেলীজেনস অফিসারদের সঙ্গে কথা বলবো।

ঃ কেন? পুলিশ তাকে প্রশ্ন করলো।

ঃ কারণ আমার কাছে গোপন খবর আছে। সে খবর আমি তোমাদের দিতে পারিনে।

এবার নাটালিকে ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের বড় কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হোল।

ঃ আমি ইহুদী স্পাই, বেলী ড্যানসার নই। ইস্রাইলী সিক্রেট অর্গানিজেশনের জন্যে কাজ করছি। নাটালি বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় জবাব দিল।

ঃ মিথ্যে কথা। তুমি রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করছিলে। ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা তার কথায় কান দিলেন না।

ঃ আমাকে বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস না হয় জেরুজালেমে ইরগুণ জোয়াই লুমি'র কর্তাদের কাছে খবর নিন। ওদের জিজ্ঞেস করুন নাটালি কে?

এবার কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা নাটালির কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না। একটু চিন্তা ভাবনা করে জিজ্ঞেস করল ঃ বেশ, তোমার কাছে কি খবর আছে?

ঃ স্যান্ডিকে চেন?

ঃ স্যান্ডি? হোসেন গাফারের বন্ধু?

ঃ হ্যাঁ, স্যান্ডি হোল আমার বয় ফ্রেন্ড। ও আসলে জার্মান স্পাই। প্রতি রাত্রে স্যান্ডি এবং তার বন্ধুরা মিলে রেডিও মারফত জার্মানীতে খবর পাঠায়। নাটালি এবার স্পষ্ট জবাব দিল। তার কথা বলার ভঙ্গী, কন্ঠস্বর শুনে কারুর বুঝতে অসুবিধে হোল না যে নাটালি সত্যি কথা বলছে।

ঃ তুমি সত্যি কথা বলছো তার প্রমাণ কি? আবার কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা নাটালিকে বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করল।

ঃ শোন, স্যান্ডির সঙ্গে আরো তিনজন লোক আছে। এদের দলের সর্দার হোল একজন ইজিপশিয়ান। এই ইজিপশিয়ানের নাম আনোয়ার একস। আর একটি ইজিপশিয়ান মেয়ে কাজ করছে। এই মেয়েটির নাম হিকমত ফাহামী।

নাটালি তার কথা শেষ করতে পারলো না। ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনসের কর্তারা কপট সুরে জিজ্ঞেস করলো ঃ অসম্ভব। হিকমত ফাহামী একজন খ্যাতনামা বেলী ড্যানসার, আমাদের সৈন্যরা ওকে খুব ভালোবাসে।

ঃ হ্যাঁ, হিকমত ফাহামী নামকরা সুন্দরী বেলী ড্যানসার। রূপই হোল ওর সবচাইতে বড় সম্পদ। তার দেহ সৌন্দর্যে আজকাল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বড় বড় জেনারেলরা মুগ্ধ। তাই ওরা সবাই প্রেমে অন্ধ হয়েছেন। ওরা সবাই মন খুলে হিকমত ফাহামীর কাছে গোপনীয় খবর বলে। আর হিকমত ফাহামী সেই সব খবর তার বন্ধুদের দেয়। এটা আমি হলপ করে কথা বলতে পারি। আমি নিজের চোখে স্যান্ডিকে রেডিও মারফত খবর পাঠাতে দেখেছি। আর খবর পাঠাবার সময় সে একটি ইংরেজী বই ব্যবহার করে।

ঃ ইংরেজী বই? উত্তেজিত হয়ে ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলী[illegible] বিভাগের কর্তারা জিজ্ঞেস করলেন বইটির নাম দেখেছ?

ঃ হ্যাঁ, বইটির নাম হোল রেবেকা।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা নাটালির কথা বিশ্বাস করল। নাটালি আরো খবর দিল যে, প্রতিরাত্রে খবর পাঠানো হয়। কিন্তু কোনদিনই এক সময়ে খবর পাঠানো হয় না। আজ রাত দুটোর সময় খবর পাঠানো হবে। এ খবর আমি জানি। স্যান্ডি আমাকে রাত দুটোর সময় হাউস বোটে যেতে বলেছে।

ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগের কর্তারা এবার নাটালির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল যে আর দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সেই রাত্রে দুটোর খানিক পরে হাউস বোটে হানা দিতে হবে।

রাত দুটো দশ মিনিটের সময় ব্রিটিশ আর্মির কাউন্টার ইনটেলীজেনস বিভাগ এবং কায়রো পুলিশ এসে হুসেন গফারের হাউস বোট ঘিরে ধরলো।

পরিস্কার রাত। খানিকটা চাঁদের আলোও আছে। নির্জন প্রান্ত, শুধুমাত্র নীল নদীর জলের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পুলিশের গাড়ীর শব্দ

শুনে হুসেন গফার আর তার সহকর্মীরা সজাগ হয়ে উঠলো।

: কে? হুসেন গাফার বেশ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। তার এই প্রশ্নে খানিকটা ভয়ের রেশ ছিল। সবাই বুঝতে পারলো যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। পুলিশ তাদের হদিস পেয়েছে।

পুলিশ হুসেন গফারের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। জোর করে হাউস বোটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

স্যাণ্ডি রেডিওর সামনে বসেছিল। আর আনোয়ার একাসে রেডিওর কাঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। পুলিশবাহিনী দেখে তারা চমকে উঠলেন। মনে হোল যেন সাপ দেখেছেন। একাসে যেন এক মুহূর্তের ভেতর সমস্ত ব্যাপারটি আঁচ করে নিতে পারলেন। তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেদিন পুলিশ হুসেন গফার, স্যাণ্ডি এবং হিকমত ফাহামীকে মাত্র সন্দেহ করে ধরল। তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু তার পরের দিন রাত্রে আবার গিয়ে দেখতে পেল অপর প্রান্ত থেকে অর্থাৎ রমেলের শিবির থেকে কে জান হুসেন গফার ও স্যাণ্ডিকে ডাকছে :

কনডোর কলিং, এপলার...জবাব দিচ্ছ না কেন? কনডোর কলিং এপলার। তোমরা প্রস্তুত হও। ডেজার্ট ফক্স (রমেলের নাম) শীগগিরই আলম এল হালফা রীজ আক্রমণ করবেন। প্রস্তুত হও। আলম এল

হালফা ব্রীজ শাগিরেই আক্রমণ করা হবে।......

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে পুলিশ আনোয়ার একুস-কে গ্রেপ্তার করল।

বিচারে আনোয়ার একুস-এর শাস্তি হোল জেল। শুধু তাই নয়, ইজিপশিয়ান আর্মি থেকে তার চাকরীও গেল।

•

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আমি আনমনা হয়ে পড়েছিলুম।

আমি যে অনামনস্ক হয়ে পড়েছি সেটা স্যাম্পসনের দৃষ্টি এড়াল না।

: কী ভাবছো পাশা? স্যাম্পসন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

: আনোয়ার একুস-এর কথা ভাবছিলুম। লোকটি ইংরেজ বিদ্বেষী।

: আমরা এ-কথা জানি। সে যাক, এই ব্রাদারহুডের মধ্যে আমাদের কিছু লোকজন আছে। এর মধ্যে আলী মুহম্মদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা দলের নেতা হাসান বান্নাকে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কিছু হবে না। বরং দেশের প্রধান এবং বড় শত্রু হোল ফারুক।

ফারুক? আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে ফারুকের নাম উচ্চারণ করলুম। মনের বিস্ময়কে চাপতে পারলুম না।

আপনারা ফারুককে সিংহাসন থেকে সরাতে চান। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলুম।

হ্যাঁ, ফারুক আমাদের সৈন্যবাহিনীকে এই এলাকা থেকে চলে যেতে বলেছে। না, আমরা এই অঞ্চল থেকে কক্ষনো, কোনদিনও যাবো না। স্যাম্পসন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, পাশা, আমরা তোমার সাহায্য চাই। তুমি হবে আবেদীন প্যালেসে আমাদের এজেণ্ট। কেউ যদি কখনও ফারুকের কাছে মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরোধী কোন কথা বলে, তুমি তার প্রতিবাদ করবে। বরং ওকে বোঝাবে যে, মুসলিম ব্রাদারহুড ইংরেজবিরোধী। না, একবার যদি মুসলিম ব্রাদারহুড দেশের ভেতর শক্তিশালী হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না।

আমি বুঝতে পারলুম এই অঞ্চলে শুধু আরব-ইস্রাইলী যুদ্ধ নয়, গৃহবিপ্লবও ঘনিয়ে আসছে। আমাকে এর জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তাই আজ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে স্যাম্পসনের সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করতে রাজী হলুম।

•

হাসান বান্নার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে স্যাম্পসন একদিন আমাকে মুসলিম ব্রাদারহুডের দপ্তরে নিয়ে গেল। আর এই দপ্তর ছিল মদিনা আল মৈত অঞ্চলে মোকাওম পাহাড়ে।

মদিনা এল মৈত-এর আর এক নাম হোল ডেড সিটি। এখানে কেউ মারা গেলে তাকে কবর দেয়া হয়। এই মদিনা এল মৈতের পাশেই হোল মোকাওম পাহাড়। নির্জন জায়গা। সাধারণত এখানে লোকজন বড় কেউ আসে না। আমি অবশ্য অনেকবার ফারুকের সঙ্গে এই মোকাওম পাহাড়ে এসেছি। কারণ এখানে ফারুকের একটি বাগানবাড়ি ছিল। তিনি তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে জীবন উপভোগ করতে প্রায়ই আসতেন। কাজেই এই এলাকার পথঘাট আমার বেশ জানা ছিল।

আমাদের ইনফরমার আলী মুহম্মদ এসে খবর দিল যে, আনোয়ার একুস প্রতিদিন হাসান বান্নাকে উস্কানি দিচ্ছেন যেন মুসলিম ব্রাদারহুড ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরেজ হোল ইস্রাইলীদের সবচাইতে বড় বন্ধু। অতএব এই এলাকা থেকে ইংরেজদের সরাতে না পারলে দেশে শান্তি হবে না। আর আনোয়ার একুস-এর সঙ্গে আছে আর একটি ধুরন্ধর। তার নাম সালা সালেম (পরবর্তীকালে নাসেরের যুগে সালা সালেমের নাম হয়েছিল ড্যান্সিং মেজর)।

আমি এবং স্যাম্পসন যখন আল আজার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এসে পৌঁছলুম, তখন আরো একটি গুরুত্বের খবর পেলুম। আবার মুহম্মদ আলী এসে স্যাম্পসনকে খবর দিল : বান্না খবর পাঠিয়েছেন আপনি আর এগোবেন না। আনোয়ার একুস এক মিছিল বের করেছেন। ঐ মিছিল গার্ডেন সিটিতে ব্রিটিশ এম্বাসীতে যাবে। তারপর আবেদীন প্যালেসে যাবে। ওরা যদি আপনাকে দেখতে পায়, তাহলে আপনাদের বিপদ হবে।

স্যাম্পসন আমার মুখের দিকে তাকাল। বুঝতে পারলুম যে, সে আমার সাহায্য চাইছে। কারণ যেমন করে হোক আনোয়ার একুস-এর এই মিছিল বন্ধ করতেই হবে। নইলে আজ ব্রিটিশ এম্বাসীর সামনে রক্তপাত হবে।

বিপদে আমার বুদ্ধি খোলে। আজও চট করে মাথায় একটি বুদ্ধি এল। স্যাম্পসনকে বললুম : আপনি ব্রিটিশ এম্বাসীতে গিয়ে ব্রিটিশ এম্বাসাডারকে খবর দিন যে, এম্বাসীর দিকে মুসলিম ব্রাদারহুডের মিছিল যাচ্ছে। ওদের সতর্ক হতে বলুন। আর আমি যাচ্ছি আবেদীন প্যালেসে।

: কেন? স্যাম্পসন যেন আমার কথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারেন না। : কী ব্যাপার পাশা? তুমি কি করতে চাইছো...

আমি কিন্তু মন দিয়ে স্যাম্পসনের কথা শুনছিলাম না। আমি ভাবছিলুম অন্য কথা। ভাবছিলুম এক্ষুনি গিয়ে ফারুককে বলতে হবে: আনোয়ার একুস তাঁর দলবল নিয়ে আবেদীন প্যালেসের কাছে এগিয়ে আসছেন। ওঁরা চান ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ব্রিটিশরা এই এলাকা থেকে সরে যাক। পুলিশকে খবর দিন। যেমন করে হোক এই মিছিল বন্ধ করতে হবে।

স্যাম্পসন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন।

বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ পাশা। আমি এক্ষুনি এম্বাসীতে যাচ্ছি। এম্বাসীর কর্তাদের সতর্ক করতে হবে।

স্যাম্পসন চলে গেলেন। আমি তুর্ক বাজার থেকে সোজা আবেদীন প্যালেসে চলে এলুম। পুলি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার পাশা, তোমাকে অত ব্যস্ত দেখাচ্ছে কেন?

: মুসলিম ব্রাদারহুড এক প্রসেসান বের করেছে। ওরা সমস্ত শহর ঘুরে আবেদীন প্যালেসের কাছে এসে চিৎকার হৈ-হল্লা করবে।

: কেন, ওরা কী চায়? পুলি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জানতুম যে পুলি হলেন ইংরেজ বিদ্বেষী। ওর কাছে আনোয়ার একুস-এর অভিসন্ধির কথা বললে পুলি খুশী হবেন। পুলি একুসকে সমর্থন করবেন। না, পুলির কাছে মনের কথা খুলে বলা যায় না।

আমি পুলিকে একটা মনগড়া কথা বললুম: ওরা তোমার এবং আমার পদত্যাগ চাইছে। ওরা বলছে আমরা দুজনে হলুম ফারুকের শনি। আমরা দুজনে ফারুককে কু-পরামর্শ দিচ্ছি, আবেদীন এবং কুব্বা প্যালেসে বাজারের মেয়েদের নিয়ে আসছি। আর একুস-এর পেছনে কে আছে জানো? জেনারেল আজিজ আল মাসরী। উনি এখনও ফারুকের ড্রাইভার মহম্মদ হোসেনের কথা ভুলতে পারেন নি।

(ক্রমশঃ)

গুরুদেবের গানের শক্তি রয়েছে তাঁর অননুপম ব্যক্তিত্বে। এ গান চলবে সেই জোরেই।

শান্তিদেব ঘোষ
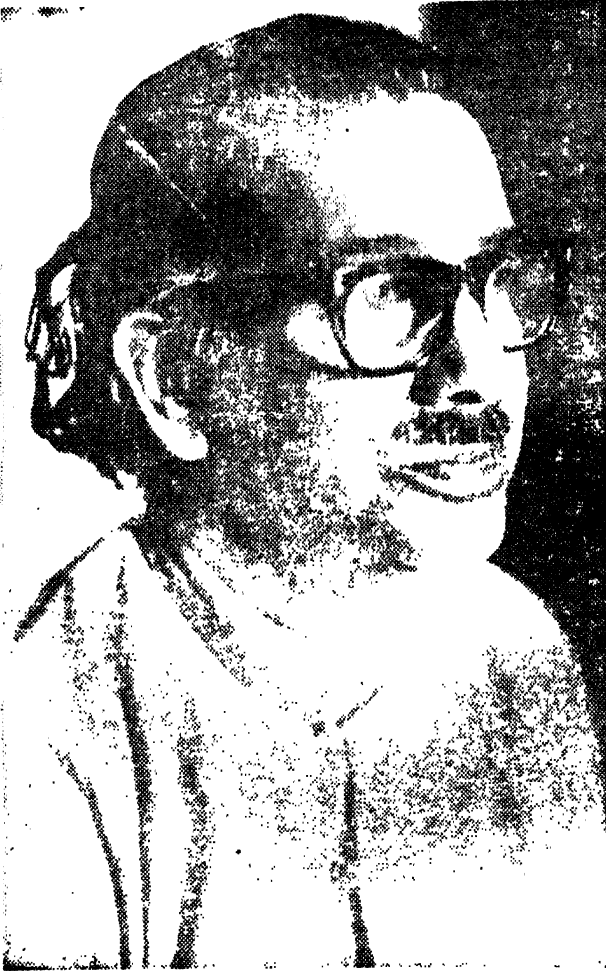
সুরের আগুন

পাণ্ডেলের বাইরেই 'সবার শেষে যা বাকী রয়, তাহাই লব'—কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো একটি ছবি। দিনান্তে বেলায় পথ-ক্ষ্যাপা বাউল হাঁটছেন—লালমাটির পথে। পরনে গৈরিক আলখাল্লা, হাতে একতারা, বিদায়ী সূর্যের অস্ত-আভা প্রতিফলিত তার শুভ্রকেশে। গোধূলির আলো, গৈরিক বেশ, নিষ্পাপ সুরেরেশ সব মিলিয়ে একটা উদাসী বৈরাগ্যভাব যেন মূর্ত। ঐ পথিকই কি রবীন্দ্রনাথ। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ পাবার তৃষ্ণাতেই যার মন ক্ষণে ক্ষণে উদাসী হাওয়ার পথে পথে ঘুরেছে।

...এ গানটি গাইছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। ১৯৬৫ খৃঃ রবীন্দ্র মেলায়। এর আগে এবং পরেও তাঁর গান বহু আসরে শুনেছি, কিন্তু এক কলি দরাজভাসী গানের সাথে এমন ছবি ভেসে ওঠা একমাত্র আর কখনও ঘটেনি। হয়তো সেই মুহূর্তে যিনি গাইছিলেন আর যে শুনছিলো তার মধ্যে কোনো কোনো অদৃশ্য ভাবনার সেতুবন্ধনের ব্যাপার চলছিলো।

তারই কদিন বাদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছে, সেই অভিজ্ঞতাকেই নতুন করে ঝালিয়ে নিলাম—একমাস আগে,—অমৃতের 'সুরের আগুন' এর জন্য।

'আজ কর্মজীবনের অবসানে আর একটা জীবন তার প্রবল দাবী নিয়ে আমার সমস্ত অবসর দখল করে বসে আছে। সেটি হোলো অবিরাম গান গেয়ে যাবার নেশা। গাইতে বসলে এক একটা গান আমায় এমনভাবে পেয়ে বসে—যে কখন ঘণ্টা পেরিয়ে যায় বুঝতেই পারি না। আর গাইতে বসে এমন একটা আনন্দে সারা হৃদয় উপচে পড়ে যে পরাতের বাস্তবের ভারও যেন হাল্কা হয়ে যায়। এ বেশ জীবন। যেন গান নয় খেলা।' আত্মমগ্ন আনন্দের উল্লাস শান্তিদেববাবুর চোখে।

'আপনার কথা শুনে কবিরই একটি গানের কলি আমার মনে আসছে 'সারাদিন হেলাফেলা, এ কি খেলা আপন মনে?'

'অবিকল তাই'—

এ-হোলো সুদীর্ঘ কর্মজীবনের পরের অধ্যায়। সেই অবিরত কর্মরত জীবনের ফসল আজকের এই প্রশান্তি, আর সুরের উদার ব্যাপ্তি, যে জীবনের স্পর্শ আমরাও মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি—যখন তিনি কোনো উপলক্ষ্যে গাইতে আসেন। কিন্তু তার আগের জীবন? তখন কি এমন সুর নিয়ে খেলার কথা ভাবতে পারতেন?- আলোচনার সূত্র ধরে ওঁর সঙ্গে চলে গেলাম শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবনের একেবারে সূরুতে।

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে আজকের অন্যতম সংগীতগুরু শান্তিদেববাবুর জন্ম। মাত্র এক বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে

গেছেন। তারপর থেকেই একটানা সেখানেই। শুধু ও'র জীবনের নয়, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই উনি সেখানে রয়েছেন। তারপর আজ অবধি—শান্তিনিকেতনের কত বিচিত্র অধ্যায়ের পালাবদল—বহুধা অভিজ্ঞতার অভিনব স্বাদের শরিক হওয়ার চমকপ্রদতা এই নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনদর্শনই শুধু নয়,—রবীন্দ্রদর্শনও।

'শান্তিনিকেতনের মোটামুটি তিনটি যুগ বলা চলে। প্রথম যুগ হচ্ছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের'। বলতে বলতে সেই যুগেই যেন শিল্পীর মন নিবিষ্ট হয়ে গেলো 'সে যুগ সত্যিই বড় দারিদ্র্যের,—বড় কষ্টের। আমরা যে কটি পরিবার ছিলাম সে আঁচ আমাদের ওপর দিয়ে গেছে। আমাদের মত করে শান্তিনিকেতনের সংগ্রামী অধ্যায়ের বেদনাকে কেউ অনুভব করেনি, অথচ মজা দেখ'—একটু হেসে বললেন 'তখন কষ্টকে কষ্ট বলে মনেই হোতো না। সে যেন এক তপস্যার যুগ। এই তপস্যা ও স্যাক্রিফাইসের প্রেরণা ছিলেন স্বয়ং গুরুদেব। কেউ ভাবত না—ভবিষ্যৎ কি হবে। সবাই যেন একটা আপনহারা আবেগে কাজ করে যেতো। সেই সৌম্য দেবমূর্তির পানে চাইলেই সকল ক্লান্তি ও নৈরাশ্য কোথায় যে পালাতো। কারণ আমরা যে দেখেছি দিনের পর দিন সকল কায়িক ক্লেশকে উপেক্ষা করে গুরুদেব কি কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে দিবারাত্র কাটাতেন। ও'র একটিমাত্র চাকর ছিলো। লেখাপড়া, কপি-করা, চিঠিপত্র লেখা,—সমস্ত কাজ নিজের হাতে করতেন। রোদ, ঝড়, বৃষ্টির মধ্যে চারিদিক ছোটাছুটি, অর্থ সংগ্রহ, সে যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম—না দেখলে ধারণা করা যায় না।

এইভাবেই চলছিলো। এই কৃচ্ছ্রসাধনের যুগ মোড় নিলো ১৯২১ সালে। কবি নোবেল প্রাইজ পাবার পর অবস্থার একটু উন্নতি হোলো। অবস্থার উন্নতি বলতে আমি আর্থিক উন্নতির কথা বলছি। এ যুগের স্বচ্ছলতা হয়তো আগে ছিলো না। তবে তার জন্য আনন্দের প্রবাহে কোনো বাধা ছিলো না। গুরুদেব সবসময়ই চাইতেন ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠুক। কারণ বাধাহীন বন্ধুত্বের মধ্যেই শিক্ষাগ্রহণ ও দান সহজ হয়ে ওঠে। শেষের দশ বছর খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কবি আগের মত জড়িয়ে থাকতে পারেননি, কিন্তু গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্কে এতটুকুও ছেদ পড়েনি। সকল কাজের মধ্যেই কবির অলক্ষ্য প্রভাব যেন ফুলের মত ফুটে উঠতো।

দ্বিতীয় যুগ হোলো বিশ্বভারতী সোসাইটি সৃষ্টির পরের যুগ। প্রথম যখন সোসাইটি রেজিস্টার্ড হোলো, কবি যেন কিছু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ছাত্রসমাজের এই সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহ যদি নিয়মের নিগড়ে প্রতিহত হয়? এই সময় এণ্ড্রুজ সাহেবকে লেখা চিঠিপত্রে এই আশঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছিলো। ভয় জেগেছিলো, আইনটাই বুঝি বড় হয়ে ওঠে। 'অচলায়তন', ডাকঘর', 'শারদোৎসব'—ঠিক এর আগের যুগের সৃষ্টি। নিয়ম, প্রথা এসবে কবির বড় আতঙ্ক ছিলো। সহজ প্রাণের উচ্ছল গতি অপ্রতিহত থাক—শান্তিনিকেতনের মূলমন্ত্র ছিলো তাই।'

'আপনাদের সকল কাজের আনন্দ, প্রেরণার উৎস ছিলেন তিনিই। তাঁর অন্তর্ধানের পর মনে হোলো না সব শক্তি নিঃশেষ—আর কিছু করার নেই।

'প্রথমটায় তা তো হবেই। কিন্তু গুরুদেবের দেওয়া কাজের দায়িত্ব যেন আপন শক্তিতেই সকলকে চালিয়ে নিয়ে গেলো। চোখের সামনে ত দেখেছি তাঁর কি উদ্বেগ দুশ্চিন্তা এই শান্তিনিকেতন নিয়ে? তাই মনে হোলো যে, শান্তিনিকেতন শুধু তাঁর প্রাণের নয়, ধ্যানের বস্তু, তাকে ভেঙে যেতে দেওয়া হবে না। এই প্রেরণাই শক্তি জাগালো। সেই শক্তির জোরেই আজও চলেছি।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সান্নিধ্যের প্রসঙ্গে বললেন 'পড়াশোনা, গানবাজনা সবই ও'র তত্ত্বাবধানে ছিলো। ও'র পড়াবার পদ্ধতিও ভারী ইনটারেস্টিং ছিলো। শেলী, কীটসের কবিতা আমরা চোদ্দ বছর বয়সেই পড়েছিলাম।'

'চোদ্দ বছর বয়সে শেলী, কীটস? বুঝতে অসুবিধা হোতো না?'

'সেই মজার কথাই ত বলছি। বুঝতে ত পারতামই। আর সেটা এত ভালো করে যা পরিণত বয়েসেও বোঝা মুশকিল। এর মূলে ছিলো গুরুদেবের শিক্ষাপদ্ধতি। উনি ইনটারেস্ট ক্রিয়েট করতেন কিভাবে জান? প্রথমে শেলী, কীটসের ভালো ভালো কবিতা বেছে বেছে শোনাতেন। বাংলা অনুবাদের পর ইংরিজিতে লিখতে হোতো। এইরকম উল্টেপাল্টে লিখে তারপর ও'র হাতে দিতাম কারেকশনের জন্য। প্রোজও তাই।

কবির বিশেষ পদ্ধতি ছিলো ছোটদের শিক্ষার জন্য একটু কঠিন বস্তু দেওয়া। যাতে তারা ভাবতে শেখে। 'সাহিত্য' ধরনের কঠিন ও চিন্তাপ্রধান বই ম্যাট্রিকের দু বছর আগেই আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিলো। শিশুরা যতটা বুঝতে পারে—তার চেয়ে একটু উঁচু স্ট্যাণ্ডার্ডে শিক্ষা দিতে চাইতেন বলে লাইব্রেরীতেও সেই ধরনের বই রাখতেন। ও'র মতে ছোটদের এমন জিনিস দিতে হবে—যা তখনই হয়ত অ্যাসিমিলেট করতে পারবে না, কিন্তু অবোধ্য বিষয়কে বোঝবার চেষ্টাতেই চিন্তাশক্তি জাগ্রত হবে, তারপর হঠাৎ একদিন তাদের অনুভবের দরজাটা খুলে যাবে। এই দরজাটা খোলবার জন্যই কঠিনের ধাক্কার প্রয়োজন আছে।

কবি অনেকসময়ই বলেছেন আমি ওদের জন্য এমন সব গান, নাটক রচনা করছি যা ওদের পক্ষে চট্ করে বোঝাটা হয়ত মুশকিল হবে। যারা বুঝতে পারলোনা আমি তাদের জোর করিনি, চাপ দেইনি, বড়দের শেখাচ্ছি—হঠাৎ একদিন নিজেরাই এসে বলেছে শিখব। নাটকের ক্ষেত্রেও তাই। বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও ছাত্ররা মিলে অভিনয় করবে বলেই নাটক রচনা করতেন,—কিন্তু ঠিক ছোটদের মত করে নাটক লিখতেন না। গীতাঞ্জলি গীতিমালার গানও আমাদের শেখাতেন। সব সময় বুঝতে পেরেছি এমন নয়। কিন্তু না বুঝতে পারলেও একটা অনুভূতি ভেতরে ভেতরে কাজ করেছে। নাটক, অভিনয়, নৃত্যনাট্য গান—সমস্তই তাঁর বিচিত্র আনন্দের অনুভূতির রূপ। এ সবেরই অবতারণা করেছেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা আনন্দের—আবেগ জাগাবার জন্য।

রথীদা সব ভার নেওয়ার পর থেকে কবি তখন থেকেই একটু একটু করে এধার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। যেটুকু যোগাযোগ রাখতেন,—তা ওপর ওপর।

গানে ছোটোবেলা থেকেই দীনুদা কবির দক্ষিণহস্ত ছিলেন। গাইয়ে বললে ও'কে ছোটো করা হয়, গানের মাঝ দিয়ে উনি নাটকে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতেন।'

'গান কিভাবে শেখানো হোতো?'

'গুরুদেব আশ্রমে একজন ওস্তাদ বা যন্ত্রী রাখতেন,—আমাদের গলা তৈরী করবার জন্য। কত দিনের মধ্যে অজস্র গান রচনা করতেন। তারপর দীনুঠাকুর সমেত বিরাট দলকে শেখাতেন।'

'আপনার সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হোলো কিভাবে?'

'ফাল্গুনী, শারদোৎসব—এসব নাটকে বরাবর থেকেছি, অভিনয় করেছি। ছোটোবেলা থেকেই গানের চর্চা হয়েছে ও'রই তত্ত্বাবধানে। সকল উৎসবেই আমার ডাক পড়তো। যখন মাঘোৎসব হোলো আমার মাত্র ছ সাত বছর বয়স। আমিই দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো ছিলাম। আমার মুদ্রা দোষ ছিলো—যখন তখন মাথা চুলকানো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাইতাম। দীনুদা বাজাতেন, হঠাৎ মাথা চুলকে ফেলতাম। আর তাই নিয়ে সকলের কত কৌতুক, মজার খুনসুটি। সেসব আনন্দময় পরিবেশের স্মৃতি বোধহয় সারা জীবনেও ভোলা যাবে না। ১৯২১ সাল থেকে সবসময় সব অনুষ্ঠানেই আমি থাকতাম।

আমার যখন সতেরো আঠারো বছর বয়স গুরুদেব বাবাকে একদিন বললেন একে গানের দিকেই দাও। একজনকে ত ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করা দরকার?

দীনুবাবুর অবর্তমানে যতগুলি নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, আমায় নিয়েছেন পরিচালনার কাজে। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যের সময় থেকেই ও'র সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ঘটলো। এক একদিন চার পাঁচটা করে গান রচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ডেকে শিখিয়েছেন। সে যুগ যেন একটা ভাবের উন্মাদনায় কেটেছে।'

'আপনি ত প্রথমে গানেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন? তারপর—নাচের প্রেরণা এলো কবে থেকে?'

'সে এক ভারী মজার কাহিনী। ১৯২৯ সাল থেকেই হবে বোধহয়। বীরভূমে বাউলনাচ, গুরুদয় দত্তর ব্রতচারী, রাইবেঁশে নাচ দেখে গুরুদেবের দারুণ ভালো

লেগে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শান্তিনিকেতনে আনালেন আর আমায় বললেন—তাঁদের নাচ দেখে এক একটি নাচ তুলতে। সেইসব নাচই 'নবীন' নাটকে জুড়ে দিলেন। আর নাচ শেখার পর আমার মনে হোলো যেন নতুন আনন্দের পাখা গজিয়েছে।

১৯৪০ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে পুরোপুরি নাচ এলো।'

'তার আগের প্রস্তুতিপর্বটা?' 'ও হ্যাঁ, বলি। ১৯১৮ সালে কবি পূর্ব বাংলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেই সময় শিলচরের সমাজ কবিকে মণিপুরী নাচ দেখালো। মণিপুরীর গীতকাব্যধর্মী নাচ কবির খুব মনে ধরে গেলো। তারপর আগরতলার মহারাজও কবির জন্য এক নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সে-সময় কবির মনে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের নাচ শেখাবার বাসনা জাগালো, এবং তাঁরই অনুরোধে আগরতলার মহারাজ শান্তি নিকেতনে নাচ শেখাবার জন্য একজন মণিপুরী গুরু পাঠালেন। আর কবি নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় নানা রকমের গান রচনা করে গানের সঙ্গে নাচের মালা গেঁথে দিতেন।

মেয়েদের হোস্টেল হবার পর থেকে মেয়েদের মধ্যে যে নৃত্যের চল কিছু ছিলো প্রতিমা দেবীর উৎসাহই ছিলো তার প্রধান কারণ। এইসময় শান্তিনিকেতনে এক গুজরাটি মহিলা ছিলেন, তিনি মেয়েদের গুজরাটি ও গরবা নৃত্য শেখাতেন। কাটিহারে গুরুদেব মন্দিরা হাতে একরকমের নাচ দেখে খুব মুগ্ধ হন। এই নাচও শান্তিনিকেতনে আনতে চেয়েছিলেন। ওখানের এক পরিবারকে তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে এনে রেখেওছিলেন।

যাই হোক,—যা বলছিলাম। মণিপুরী গুরুদের মধ্যে শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিলেন আগরতলার বুদ্ধিমন্ত সিং। তিনি ছ-সাত মাস থেকে চলে যাবার পর ১৯২৬ সালে এলেন নবকুমার সিং। এই নবকুমার পর্যন্ত আমরা—ছেলেরা বেশী ঘেঁষতে পারিনি। মেয়েদেরও নাচের দিকে বিশেষ দেখা যেতো না। প্রথম সুপরিকল্পিত নৃত্যনাট্য হোলো ১৯২৬ বা ২৭ সালে, খুব সম্ভব 'নটীর পূজা।'

'ছেলেদের মধ্যে নাচের প্রেরণা এলো কবে থেকে?'

'একবার মাদ্রাজ থেকে একটি ছেলে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থী হয়ে এলো। সে নাচ জানতো। সবাই তার নাচ দেখে অবাক হয়ে গেলো, ছেলেদের নাচও এত সুন্দর হয়? তখন থেকেই ছেলেদের নাচের দিকটা সকলের সামনে উদ্ভাসিত হোলো। এরপর যিনি মণিপুর থেকে এলেন, তাঁর কাছেও আমরা নাচ শিখতে আরম্ভ করলাম।

১৯৩১ সালে নাচ শেখাবার জন্য গুরুদেব আমায় দক্ষিণ ভারতে পাঠাতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ত্রিবাঙ্কুরে শান্তিনিকেতনের একজন এক্স স্টুডেন্টকে চিঠি লেখা হোলো। উত্তরে তিনি জানালেন এখানে একরকম লোকনৃত্য আছে, মুখোশ পরে নাচে। তাকে 'ডেভিল ডান্স' বলা হয়। এখানে এলে দেখাব। ঐ ১৯৩১ সালের মে মাসে মাদ্রাজ চলে গেলাম।

মাদ্রাজে গিয়ে প্রথমটায় নাচের কোনো হদিশই পাইনা। কিন্তু পৌঁছে গেলাম একেবারে নাচের কেন্দ্রে। সে যোগাযোগও এক মজার অভিজ্ঞতা।

ত্রিবাঙ্কুর যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে বসলাম। কিন্তু ভুল করে ত্রিবাঙ্কুরের গাড়ীতে না উঠে উঠলাম কোচিনের গাড়ীতে। আর এ ব্যাপারটা যখন জানতে পারলাম, অথৈ জলে পড়লাম। কি উপায়? সহযাত্রীদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিলেন আর্ণাকুলাম থেকে স্টেশনে যেতে পার। কিন্তু বড় অনিশ্চিত। তারপর আমার নাচ শেখার উদ্দেশ্যের কথা শুনে এক ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন পরের স্টেশনে নামতে। সেখানে আরকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একজন বড় অফিসার থাকেন। তিনি আমার নাচ শেখানোর সকল রকম সুবন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন এ ভরসাও পাওয়া গেলো।

তাঁর কথানুযায়ী পরের স্টেশনে নেমে পড়লাম, স্টেশন মাস্টার একজন কুলি সঙ্গে দিলেন, তার সাহায্যে সেই ভদ্রলোকের বাড়ী পৌঁছলাম। তিনি বাড়ী ছিলেন না। বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমায় দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন। আমি শান্তিনিকেতন থেকে গেছি শুনে অত্যন্ত খুসী হলেন। আবার ঘটনাচক্র কেমন অনুকূলে দেখ। ওঁরই কাছে খবর পেলাম ওখানে বিখ্যাত কবি ভাল্লাথল যাঁকে সবাই 'টেগোর অফ কেরালা' বলতেন—তিনি সবে নাচের ক্লাশ খুলেছেন পাশের গ্রামে। তিনি কানে কম শুনতেন বলে মুদ্রায় কথা বলতেন।

পরের দিন ঐ নাচের স্কুলের সেক্রেটারী সেই গ্রামে আমায় নিয়ে গেলেন, গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে সবে শুরু হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠান। আমি গুরুদেবের কাছ থেকে গেছি শুনে ওঁরা আমায় খুবই সমাদর করলেন। সেই নৃত্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্র কারা জান? গ্রামের চাষী ক্লাস। ওঁরা খাতির করে পাশের গ্রামের জমিদার বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার মন এতে সায় দিলো না। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে, ওদেরই মত করে জীবন যাপন করে একেবারে ওদেরই মন নিয়ে যদি শিখতে নাই পারলাম তাহলে ওদের নাচের বৈশিষ্ট্যটি আমার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে কেমন করে? তাছাড়া জীবনবৈচিত্র্যকে আস্বাদ করবারও একটা আনন্দ আছে তো।

তিনমাস এইভাবে কাটালাম। ওদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা ধারণাও হোলো। সকালবেলা নাচের একসারসাইজ করার পর সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লে গুরু তিলের তেল মাখিয়ে পা দিয়ে দলে দলে সারা শরীর মাসাজ করে দিতেন। সাবান মাখা বারণ ছিলো, তাতে নাকি শরীর গরম হয়। একরকম গাছের ছাল শুকিয়ে গুঁড়ো করে আমরা সবাই মাখতাম। তাতে হোতো কি স্নান করলে তেলটা উঠে যেতো আর শরীরটাও যেন স্নিগ্ধ হয়ে যেতো।

ওরা বেশীর ভাগই খুব লম্বা এবং ওদের নাচে অভিনয়ের সুযোগও খুব বেশী। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ওদের মুদ্রার অঙ্গ এক বিরাট পর্ব। মুদ্রায় হাত দিলেও অধ্যায় অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে না, একথাও বুঝতে দেরী হোলো না, তাই ও-নাচের ছন্দবৈচিত্র্য আর অভিনয়ের অংগটাই যতদূর সম্ভব আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলাম।

তিনমাস বাদে ফিরে এলাম। আমার সবসময় লক্ষ্য ও চেষ্টা থাকতো ঐ সমস্ত বস্তু ভেঙেচুরে কেমন করে গুরুদেবের গানের সংগে জুড়ে দেওয়া যায়। আমার নৃত্যশিক্ষার উদ্দেশ্যও ছিলো তাই। গুরুদেবের গানের নৃত্য রূপায়ণ।

এরপর কোচিনের মহারাজার মাধ্যমে এক নৃত্যগুরু আনানো হোলো। ১৯৩৭ সালে আমি সাউথ ইন্ডিয়া থেকে কেলু নায়ারকে নিয়ে আসি। ও তখন কথাকলি ছাড়া অন্য নাচ জানতো না। শান্তিনিকেতনে এসে মণিপুরী শিখলো। অল্পদিনের মধ্যেই অসম্ভব [illegible]মের তৈরী হয়ে গেলো। এই সময় কেরালার কথাকলি গুরুর সংগে একজন করে মণিপুরী গুরুও রাখা হোতো, তবে 'ভারতনাটাম' কোনো গুরু রেখে শেখানো হয় নি।

ওদেশে উদয়শঙ্কর খুব নাম করার পর একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ওঁর নাচ গুরুদেবের খুব ভালো লেগেছিলো। উদয়শঙ্করের প্রতিভার কাছে ওঁর শুধু বড় আশাই ছিলো না, মস্ত নির্ভরতাও ছিলো। উনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার আগে গুরুদেব ওঁকে এক উচ্ছ্বাস মুখর আশীর্বাণী উপহার দিয়েছিলেন। তার এক জায়গায় ছিলো 'পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাসব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে তেজ হারায়। স্বাস্থ্য হারায় যেমন বাইজীর নাচ। এই পণ্যজীবিনী নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে সমতলতা থেকে উদ্ধার কর।'

নাচে গুরুদেব অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়াটাই পছন্দ করতেন। শঙ্করের নাচে এই অংগটি জোরালো ছিলো বলে-এ নাচ তাঁর মনকে এমন করে ছুঁয়েছিলো। এই

অধ্যায়ে কবিকে নৃত্যনাট্য লেখার নেশায় পেয়ে বসেছিলো। তাই শান্তিনিকেতনে নাচ জমে উঠেছিলো পুরোদমে। এই সমস্ত নাটকে প্রতিমাদেবীর অনুপ্রেরণা ছিলো একটা মস্ত বড় অবদান। উনি হয়তো কোনো কাহিনী নিয়ে চিন্তা করছেন কেমন করে সেটা দিয়ে ব্যালে তৈরী করা যায়। সেই ভাবনাকে কবি নৃত্যে গানে বেঁধে দিলেন। এইভাবেই চিত্রাংগদা চন্ডালিকা শাপমোচন নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি।

সে এক উদ্দীপনার যুগ। গান তৈরী হোলো। এক একদিনে কবি অনেক গান লিখে সুর দিয়ে ফেললেন। গান তোলা হোলো সংগে সংগে নাচও তৈরী হয়ে গেলো। তারপর শেখানোর পালা। খুব খাটতে হোতো সবাইকে। অথচ এতটুকুও ক্লান্ত হতাম না। সবাই তখন সৃষ্টির নেশায় বিভোর।'

"আপনি কোন্ কোন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ?"

তাসের দেশে রাজপুত্র, শাপমোচনে রাজা, চিত্রাংগদায় অর্জুন। একটু থেমে বললেন প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে তার জন্য সবার কি আপ্রাণ চেষ্টা।

নন্দলাল বসু সকলকে নিজের হাতে সাজাতেন। গুরুদেবের পর এরকম বহুমুখী প্রতিভা আমি আর দেখিনি। মামুলী প্রথায় সাজসজ্জা একদম বদলে দিলেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি প্রতিটি বিষয় চিন্তা করতেন। আর নাটকের চরিত্রের সংগে কি সাজ খাপ খায় বসে বসে তারই স্কেচ করতেন।

কবির রূপকনাট্যে একটা মজা লক্ষ্য করেছ ?

'পার্সোন্যালকে ইম্পার্সোন্যাল, ইনডিভিজুয়ালকে ইউনিভার্সালাইজ করার ব্যাপার ?'

'ঠিক তাই। শারদোৎসব, ডাকঘর, ফাল্গুনী, রথের রশি-র বিভিন্ন চরিত্র কোন্ যুগের ? —কোনো বিশেষ যুগের শীলমোহরে এদের চিহ্নিত করা যায় কি ? অথচ রাজা মন্ত্রী গ্রামবাসীকে ঠিক তাদের পরিচয়েই চিনতে ভুল হয় না। গুরুদেব একটা চিন্তাকে সামনে রেখে বিভিন্ন যুগের মানুষদের তাঁর নাটকের জন্য বেছে নিতেন। বিশেষ কোনো যুগের উৎস থেকে বেরিয়ে এলেও সর্বকালে ও দেশে তাদের ব্যাপ্তি।

কবির এই চিরায়ত দৃষ্টিকোণকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নন্দলাল বসু। এই দৃষ্টিভংগির প্রবাহকে অনুসরণ করেই তিনি রং সাজ ও পোষাকের নকসা রচনা করতেন যাতে প্রতিটি চরিত্র হোতো যেমন যুগের ফ্রেমে বিধৃত তেমনই যুগাতীতের চিন্তায় উত্তরিত। বাল্মীকি প্রতিভার বাল্মীকি ও রত্নাকর হাত ধরাধরি করে চলেছে। চিন্তার সংগে সংগতি রেখেই এখানে বেশভূষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এ বোধ নন্দলাল বসুর ছিলো বলেই মঞ্চ পরিকল্পনা চরিত্রের সজ্জা রচনায় তিনি গুরুদেবের ভাবনার দোসর হতে পেরেছিলেন।'

'স্বয়ং কবিগুরুর অভিভাবকত্বে নন্দলাল বসুর সজ্জা পরিকল্পনায় প্রতিমা দেবীর চিন্তার প্রেরণায় আপনারা কবির নৃত্যনাট্য রূপায়ণ করেছেন। এতগুলি বৈপ্লবিক প্রতিভার সমন্বয় ত একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ঘটনা বারবার ঘটে না। তুলনার-ত প্রশ্নই ওঠে না। শুধু জানতে চাইছি কবিগুরু ও উদয়শংকরের মিলিত নৃত্যচিন্তাকে যদি বলি হিমগিরি—তাহলে কোলকাতায় আজকের উপচে পড়া নৃত্যনাট্য প্রবাহকে শাখা নদী উপনদী যে নামই দেওয়া যাক, তার রূপ সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা জানতে ইচ্ছে করে।'

'ওসব আলোচনার মধ্যে যাওয়া কি উচিত হবে ? আবার ভুল বোঝাবুঝি হবে।'

'কেন ভুল বোঝাবুঝি হবে ? আপনি ত এদের গুরুতুল্য। তাছাড়া কবিগুরুর পরিচালনা অথবা ভাবকল্পনার সম্মানের বলে এ'রা কেউ-ই নিজেদের দাবী করেন না। আপনার মতামত এদের কাজে লাগবে বলেই জিজ্ঞেস করছি।'

'আমি খুব বেশী দেখিনি। যা দু-একটি দেখেছি বড় শৌখিনী বলে মনে হয়েছে। অভিনয়ের দিকে নজর নেই। আংগিকে ত নেই-ই। কোনোরকমে স্বরলিপি অনুসরণ করে গান গেয়ে তার সংগে নৃত্যভংগি জুড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। অভিনয়ের মাধ্যমে কবির চিন্তা কতখানি ফুটে উঠলো সে চিন্তার ছায়া কই ? আমরাও প্রথমটা সৌখীন হিসেবেই সুরু করেছিলাম। তারপর কবির ক্রমাগত তত্ত্বাবধানে ও সকলের সমবেত চেষ্টায় অভিনয় গান ও নৃত্যের সংগে টেকনিক এমন করে মিশে গেছে যে আজ আর চেষ্টা করেও আলাদা করা যায় না।'

'এই টেকনিকটা কি ?

'গানের মেজাজটাকে নাচ দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া। কোন কথায় ও সুরে কিভাবে অ্যাকসেন্ট দিলে তার অন্তরের রূপ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে এই বোধ বা ভাগিদেই মণিপুরীর কোমল সুষমা ও কথাকলির নাটারূপের ছায়া আপনা থেকেই নাচে এসে পড়তো, এটাকে ঠিক চেষ্টা করে আনা হোত না। এইটিকেই আমি টেকনিক বলছি।'

এই বোধের অভাবেই গুরুদেবের অমন ভাবসমৃদ্ধ গানও অনেক সময় ভ্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

সুন্দর জিনিসকে ভাল লাগার শিক্ষা যাতে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীরা পান সেদিকে গুরুদেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। সব সময় শ্রেষ্ঠ গুণী সংগীতজ্ঞদের শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন যাতে ভালো গান কি বাজনা শুনে ছেলেমেয়েদের মানস প্রকৃতিতে সত্যিকারের সৌন্দর্যবোধ জেগে ওঠে।

তাঁরই ইচ্ছায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। মনে পড়ে একবার বর্ষামঙ্গল উৎসবে উনি খোল পাখোয়াজ বাজিয়ে মেঘমন্দ্রিত বর্ষার কি রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভাষা যায় না। যে কোনো যন্ত্র একবার বাজাতে বসলেই সময় ভুলে যেতেন। সত্যিকারের সাধকের জাতই আলাদা। খাঁ সাহেবকে দেখে সেই কথাটাই মনে হোতো। পিঠাপুরমের বীণকার সংগমেশ্বর মিশ্রকেও গুরুদেব শান্তিনিকেতনে আনিয়েছিলেন। যেখানে যত গুণীর খবর পেতেন তাঁদের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করে আনতেন ছাত্রছাত্রীদের সংগীতবোধের প্রসারতা বাড়াবার জন্য। আমাদের সবসময় শেখাতেন তাঁদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে। ঠিক প্রাচীন ভারতের আশ্রমবাসীদের মত বিনম্রতা সেবা এসবও শিক্ষার অংগ ছিলো।

গুরুদেবের সংগের শেষ অধ্যায়ের অনেক কথা মনে পড়ে। তিনি তখন রোগশয্যায়। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। আমরা কয়েকজন পালা করে রাত জাগতাম। এক রাতের কথা মনে পড়ে। কবির তখন অর্ধ অচেতন অবস্থা। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন একেবারে অনাবৃত দেহে। ঐ ঘোরের অবস্থাতেই 'বাথরুম যাব' বলে। দাঁড়িয়েছিলেন মিনিটখানেকেরও কম, কয়েক সেকেন্ড মাত্র। আমি হঠাৎ চমকে গেলাম। মনে হোলো সামনে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি। মানুষের অবয়ব তাঁর নয়। সারা অংগপ্রত্যংগ যেন আলো দিয়ে গড়া।

যাঁরা মহামানব কোনো না কোনো সময় অজ্ঞাতেই তাঁরা প্রকাশ হয়ে পড়েন। চেষ্টা করেও আপনাকে গোপন রাখতে পারেন না। সেইরকমই একটা দুর্লভ মুহূর্ত যেন হঠাৎ ঝলকে উঠেই মিলিয়ে গেলো। আমার সারা মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

তারপর থেকে আমি রাত্রে আর ওঁর কাছে থাকতে চাইতাম না। ভয় হোতো। যদি ছুঁয়ে ফেলি ? তখন মনে হয়েছিলো ঐ অপার্থিব সত্বাকে আমার ছোঁবার কোনো অধিকার নেই।

গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর আর এক অধ্যায়। তারপরও ছাত্র শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের মধ্যে তাঁরই প্রভাব অলক্ষ্যে কাজ করে। তবু কিসের যেন একটা অভাব মনকে কারণে অকারণে ব্যথিত করে তুলতো। পৌষমেলায়, দোলে, আরো নানান উৎসবে দূর দূরান্তর থেকে কত অতিথি আসেন। শান্তিনিকেতনের কোনো বাড়ী খালি থাকে না। —নানান জাতি ও ভাষার মিলন কলরোলে গুরুদেবকে অনুভব করি। তিনি ত এইটেই চেয়েছিলেন। যেবার এসব উৎসবে ভীড় কম হয় আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। কারণ পৌষমেলা আমাদের পুজো উৎসবের মতই।'

'আপনাকে যখনই দেখি মনে হয় আনন্দে ভরপুর। এ প্রসন্নতা হয়ত তাঁর সংগ থেকেই পাওয়া। অবশ্য দেখা হয় আর কতটুকু সময়ের জন্যই বা তবু একটা প্রশ্ন মনে জাগে—আপনার মনে কখনও কোনো অভাব বা অপূর্ণতাবোধ জাগেনি ?'

'জ্ঞান হয়ে অবধি কবির সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য ঘটেছিলো। শান্তিনিকেতনের সেই দারিদ্র্যের যুগ থেকে সুরু করে প্রাচুর্যের যুগ অবধি ওঁর সংগে সংগেই ছিলাম। ওঁকে দেখতাম সকলরকম পার্থিব সুখ উপেক্ষা করে কেমন করে নিজেকে কাজের মধ্যে ঢেলে দিতেন। চোখের সামনে তাঁর সেই জীবন দেখে দেখে অজ্ঞাতেই মনটা এমনভাবে গড়ে উঠেছিলো যে কোনো সুখ বা আরামকে বড় করে দেখতে শিখিনি। তাই অভাববোধও জাগে না। মনে আছে 'শ্যামলী'তে মাটির ঘরের চারদিকে খোলা বৈশাখজ্যৈষ্ঠের ধূ ধূ রোদের গরম হাওয়া ঝড়ের মত বয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে বসেই কবি লিখে যাচ্ছেন। সেখানে এক মুহূর্তের জন্য গেলেও যেন গরম হাওয়ায় শরীর ঝলসে যায়। কিন্তু কবির নির্বিকার ভাব দেখে কেউ সে কথা মুখে আনতেও লজ্জা পেতো। আহার করতেন নামমাত্র। এ দৃশ্য সবসময় সামনে দেখছি বলেই মেটিরিয়াল কোনো কমফর্টের কথা ভাবতে পারিনি। এটা তাঁর আশীর্বাদ বলতে পার কিংবা সংস্পর্শের প্রসাদ। এটা কেন হয়েছে কিভাবে হয়েছে বলা মুশকিল; যেমন ধর সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায় বাথার ভৈরবী—শরৎকালের সকালের আলোয় যেন বিদায়-ব্যথার সুর বাজে এটা বাঙালী হৃদয় যেমন বুঝবে অন্য কোনো প্রদেশের লোকের পক্ষে তেমন করে বোঝা সম্ভব নয়।

'প্রথম কবির গান কোলকাতায় ব্যাপক ভাবে গাওয়া হোলো কি তাঁর জয়ন্তী উৎসবে ?'

'হ্যাঁ, তাঁর ৭০ বছরের জন্মোৎসব পালন করা হয়েছিলো। দীনুদা বিবিদি প্রায় ৭০।৭৫ জন শিল্পীকে নিয়ে গুরুদেবের গানের আয়োজন করেন, বেশীর ভাগই শান্তিনিকেতনের বাইরের—কোলকাতার শিল্পী—যাঁদের গান আমরা কেউ শুনিনি। গুরুদেবও শোনেননি, এসব দিকে তাঁর মনে এতটুকুও 'কিন্তু' ছিলোনা। ইয়ং জেনারেশন তাঁর গান গাইবেন, বুঝবেন, এটা তিনি অন্তর থেকেই চাইতেন।

'গানের সম্বন্ধে তাঁর কোনো বিধিনিষেধ ছিলো না ?'

'প্রথম দিকে একেবারেই ছিলো না। তখন তাঁর গান যে কেউ-ই নিজের বা অন্যের সুরে গাইতেন। বার্ক সাহেব তাঁর গান গেয়েছিলেন। উচ্চারণ সুর কোনোটিই সংগীত রসিকের মনহরণ করবার মত নয়। কিন্তু কবি বাধা দেন নি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন এ গানের অনুভূতিটা সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ুক।

১৯২৫ সাল থেকে বিশ্বভারতীর অনুমতি, রয়্যালটি ইত্যাদির প্রবর্তন করা হয় প্রথমতঃ শান্তিনিকেতন গড়বার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিলোই। তাছাড়া এ-গানের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার তাগিদটাও কম নয়।

'এই প্রসংগেই জিজ্ঞেস করছি গায়কী সম্বন্ধে তাঁর কি কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা নকসার ধারণা ছিলো ?'

'একেবারেই না। বিভিন্ন গাছে নানারং ও গন্ধের ফুল ফুটে ওঠার মতই গায়ক গায়িকার কণ্ঠ, সংগীতসংস্কার ও সৌন্দর্যবোধ দিয়ে গড়ে ওঠে তাদের গানের একসপ্রেশন। এখানে কোনো নিয়ম বেঁধে দিলে গানের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগটা নষ্ট হয়ে যায়। —এ সম্বন্ধে গুরুদেবের উদারতা ছিলো আমাদের ধারণার অতীত।

একটি উদাহরণ, সাহানা দেবী ছিলেন এদিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে স্নেহের পাত্রী, তাঁর গাওয়া গান সম্বন্ধে গুরুদেবের অভিমত ছিলো তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে।'

'কিন্তু সাহানা দেবী ত গাইতেন দিলীপ রায়ের ছাঁদের গান ? ওঁর জন্য তিনি সেই ধরনের সুরের গানই রচনা করতেন। শিল্পীর স্বধর্ম কথাটায় উনি ভারী বিশ্বাস করতেন, তার ওপর চাপ দিয়ে স্বভাব বিরুদ্ধ কিছু করার ওপর তাঁর আস্থা একেবারেই ছিলোনা।'

'তাঁর গানের সংগতে পাশ্চাত্য যন্ত্র বা সংগীত প্রয়োগের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে'—'

'এ বিষয়ে একটা কথাই বলতে পারি। ওদেশের জীবনধারা অনুসারেই গড়ে উঠেছে সংগীতচিন্তা। ওদের গানে স্বর প্রয়োগের পদ্ধতি হার্মোনাইজেসন—সবকিছু ওদের সংগীতের একসপ্রেশনের সংগে সুন্দর-ভাবে খাপ খেয়ে যায়। সেইরকম যদি গানের

ভাবের বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে সেখানে ইষ্টার্ন বা ওয়েষ্টার্ন মিউজিক এরকম কোনো জাত বিচার নিরর্থক, আর যদি ভাবের অনুকূল না হয় তবে কোনো মিউজিকেরই সার্থকতা নেই।

পাশ্চাত্য সংগীতের প্রেরণা কবিচিত্তকে দুলিয়েছিলো। দুবার মাত্র ঐ সুরের মাতন লেগেছে তাঁর গানে। ব্যস্ তারপর আর না, আর ঐ দুবারই এমন সহজে গানের ভাবের সংগে সুর মিশেছে যে তাকে আমাদের বলে মেনে নিতে কোনো দ্বিধাই জাগেনা। বাল্মীকি প্রতিভার গানে চরিত্রের প্রয়োজনেই তিনি সি বি, এফ সবরকম স্কেলই ব্যবহার করেছেন—কিন্তু চরিত্রের বক্তব্যের সংগে সুর মিলিয়ে এমনভাবে বিভিন্ন স্কেলের অবতারণা করা হয়েছিলো যে সে সুর কান মন কোথাও প্রবেশে কোনো বাধা ঘটেনি। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ যদি সৃষ্টি করতে কেউ পারে, তাতে আপত্তির কারণ নেই। শুধু দেখতে হবে সৃষ্টির নামে অপসৃষ্টি না হয়।'

বাংলাদেশে (এখনকার বাংলাদেশ অর্থে নয়) রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার প্রসংগে পংকজ মল্লিক, সায়গল, কানন দেবীর ভূমিকা নিশ্চয় স্বীকার্য। কিন্তু সংগে সংগে আরও একটি দিকও চিন্তা করার আছে। কোন সূত্র ধরে কোন বস্তু কখন কি রূপ নেয় সে কথা কেউ-ই বলতে পারে না। —

গুরুদেবের গান নিজের শক্তিতেই চলবে, ও নিয়ে আমাদের মত মানুষের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তিনি যে বীজ রোপণ করে গেলেন, তারই ফসলের প্রাচুর্য দেখে আজ আমরা দিশেহারা। কিন্তু এ-কথা যেন না ভুলি তাঁর গানের শক্তির উৎস রয়েছে তাঁর অনন্যপম ব্যক্তিত্বে। জনপ্রিয়তা সৃষ্টির প্রধান অংশীদার কে এ-বিচার অনেকটা 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি'র মতই।

আজ গুরুদেবের গান দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আরও পড়বে। আমার কেন জানিনা কেবলই মনে হয় এমন একদিন আসবে যেদিন চৈতন্যদেবের মতই গুরুদেব গ্রামে গ্রামেও পুজো পাবেন। যারা যারা তাঁর কাব্য দর্শন কিছুই বোঝেনা (চৈতন্যদর্শন সাধারণ মানুষের মধ্যে কজন বোঝেন ?) তাদের কাছেও তিনি আপনার জন হয়ে উঠবেন।

বাউল গানে দ্যাখোনা ? অনেক হেঁয়ালী আছে। এক কথার অনেক মানে। সেসব গানের মানে বুঝতে হলে আমাদের বই ঘাঁটতে হবে। কিন্তু ওরা সহজ আনন্দে গেয়ে যাচ্ছে। অমনই মুক্ত প্রাণের প্রবাহে তিনি মিশে থাকবেন।'

সন্ধ্যা সেন
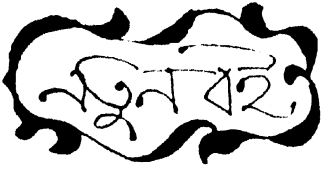
প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। আশা প্রকাশনী, ৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। সাত টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র একালের সাহিত্য-জগতে নতুন কোন পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। তিনি কল্লোল পত্রিকার কাল থেকেই সগৌরবে আপন ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত স্বাতন্ত্র্যে বাংলা কথাসাহিত্যে পদচারণা করে এসেছেন। রবীন্দ্রোত্তর কালে তাঁর ছোট গল্প এক আশ্চর্য সাহিত্যকর্ম। প্রেমেন্দ্রবাবুর বড় কৃতিত্ব তাঁর বলার ভঙ্গি এবং সেই সঙ্গে বক্তব্য উপযোগী সার্থক ভাষা ব্যবহার। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব তাঁর ভাষাতেই সবচেয়ে বড় হয়ে প্রতিফলিত হয়।

এত কথা বলার কারণ, প্রেমেন্দ্রবাবুর সদ্য প্রকাশিত 'প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা' পড়ার অব্যবহিত পরে তাঁর সম্পর্কে নতুন কিছু কথা মনে পড়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক 'প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা' নাম-গল্পটি ছাড়াও 'বেইমান বাটিকারা' নামে একটি রচনা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। নামগল্পটি অনেকটা নভেলেটের মত। এখানে চরিত্র কাহিনীর উত্তমপুরুষ পরাশর বর্মা; হারীন রক্ষিত বারীন দীপিকা মানসী রায়, অধরচন্দ্র বক্সী ইত্যাদি। পরাশর বর্মার গোয়েন্দা-কৃতিত্ব কাহিনীর রহস্যকে ঘনীভূত করেছে। হারীনকে কেন্দ্র করে দীপিকা এবং মানসী রায়ের তৎপরতা, হারীনের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা ও চরিত্র নিহিত নায় আলোচ্য নভেলেটটিকে বাস্তবিক অর্থে রুদ্ধশ্বাস করে তোলে। এই কৃতিত্ব একমাত্র প্রেমেন্দ্রবাবুর লেখনীতেই সম্ভব। 'বেইমান বাটিকারা'র কাহিনীতেও পরাশর বর্মার সেই উদ্ভট কর্মপ্রয়াস ও শেষে রাম সহায়কে শায়েস্তা করার রোমাঞ্চকর কৃতিত্ব বর্ণিত। ধূর্ত, পাষণ্ড রাম সহায় চরিত্র অংকনে লেখকের কৃতিত্ব মুগ্ধ করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা' গ্রন্থটি এক নিশ্বাসে পড়ে গভীর রহস্যময় ভাবনায় নিবিষ্ট করার মত ক্ষমতা রয়েছে।

রান্না, পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী—পারুল সেনগুপ্ত, প্রকাশক : রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। দাম : পনেরো টাকা প্রাপ্তিস্থান : ৮৪ এন বি ব্লক 'ই', নিউ আলিপুর, কলকাতা—৫৩ ডি এম লাইব্রেরী ও নাথ ব্রাদার্স।

'রান্না' নামে একটি শুষ্ক দৈনন্দিন কর্তব্যকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করে যে সত্যিকারের একটি চমৎকার রসসৃষ্টির উৎসে পরিণত করা যায়, উল্লিখিত বইখানিই তার প্রমাণ।

রন্ধনশিল্প জগতে শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্ত নামটি আজ হয়তো আর অপরিচিত নয়। লেখিকার অপর রান্নার বই 'দেশদেশের জলখাবার' কয়েক বছর আগে যখন আমাদের হাতে এসেছিল তখনই তার মৌলিক উপস্থাপনার কায়দাটি আমাদের আকৃষ্ট করে।

জলখাবারের বইখানির পরে অখণ্ড বাংলা তথা আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতে পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জনের বিচিত্র সংকলন 'রান্না, পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী' লেখিকার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। এই সংকলন গ্রন্থেও শ্রীমতী সেনগুপ্ত তাঁর উপস্থাপনার মৌলিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। উপরন্তু সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন এর ব্যবহারিক দিকের প্রতি। রকমারী রান্নার নির্বাচন, সংগৃহীত উপকরণ ও উপকরণের মাপ নির্ধারণ ব্যাপারে নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার বাস্তব দিকটি সব সময়েই চোখের সামনে রেখেছেন।

বাংলা ভাষায় আজকাল অনেক রান্নার বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পারুল সেনগুপ্তের 'দেশদেশের জলখাবারে'র মতই 'রান্না, পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী' নিঃসন্দেহে সেই পুস্তকারণ্যে হারিয়ে যাবার মত জিনিস নয়। এর স্বকীয়তাগুণেই এটি একনিমেষে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেবে বলেই বিশ্বাস। প্রায় পাঁচশত সুনির্বাচিত রান্নার পাশাপাশি একশত মূল্যবান রান্নার সংকেত একে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছে। এরও উপরে বাড়তি আকর্ষণ এর 'বিকল্প ও অনুকল্প' 'পরিভাষা' এবং 'ওজন ও মাপের কথা' নামীয় পরিচ্ছেদ তিনটি।

আমরা লেখিকাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর এই বইখানিরও সাফল্য কামনা করছি এবং সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি, কবে তিনি ভূমিকায় দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত তাঁর নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী 'আধঘণ্টার ঝটিতি রান্না', 'চালের অভাবে গম বা অন্য শস্যের বিচিত্র ব্যবহার, কিম্বা দুর্মূল্যের বাজারে সস্তা ও পুষ্টিকর রান্না' প্রভৃতি মৌলিক রান্নার প্রণালীগুলি আধুনিকাদের হাতে তুলে দেবেন। বর্তমান খাদ্য ও অর্থ সংকটের দিনে এধরনের মৌলিক নির্দেশের সত্যিই বড় প্রয়োজন।

দ্রুত ধাবমান স্বয়ংবরে : আনন্দ ঘোষ হাজরা, শিঞ্জিনী প্রকাশনী, মালদহ। মূল্য : তিন টাকা।

বেশ কয়েকটি চমক জাগানো কবিতা নিয়ে কবির এই প্রথম কাব্য সংকলন। আধুনিকতার নামে শহুর জীবনে যে দুর্বোধ্যতা, সেই মোহপাশ থেকে কবি অনেক ক্ষেত্রে মুক্ত না হওয়ায় বহু কবিতাই তাঁর শেষ পরিচয় রাখতে পারেনি। বিসর্জন, সাপ, আহত-পুরোহিত; নাগরদোলা সুখ-পাঠ্য রচনা। ছন্দ ও শব্দের প্রয়োগে যদিও দুর্বলতা আছে তবুও ভবিষ্যতে কবির হাতে আরো সুন্দর কবিতার জন্ম হবে বিশ্বাস রাখি।

ধ্রুবলোকে পর্যটন (কাব্য সংকলন) **: শ্যামল-কুমার ঘোষ।** লোকায়ত **প্রকাশনী,** ১১।২৩, অশোক এভিন্যু, দুর্গাপুর-৪। তিন টাকা।

শ্রীশ্যামলকুমার ঘোষ একজন তরুণ কবি। ইনি প্রথম গ্রন্থ 'প্রত্নাসিন্ধু হিরণ্য উদ্ধার' কাব্য সংকলনে যে ছন্দ, শব্দ, চিত্র-কল্প ও বিষয়ভাবনায় অঙ্গীকার রেখে-ছিলেন, আলোচ্য সংকলনে তা থেকে আরও পরিণত প্রতিশ্রুতির পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সংকলনভুক্ত সমস্ত কবিতাই সনেট। সনেট রচনায় কবি যে প্রথানুগ না থেকে কিছু অভিনবত্ব আনতে পেরেছেন, গ্রন্থভুক্ত 'ময়ন তদন্ত', 'বিরহের মিলন', 'অভিমান', 'সনেট : নিজের প্রতি' সিরিজের সতেরোটি সনেটই তা প্রমাণ করে। দক্ষ চিত্রকল্প প্রয়োগে কবি যথার্থ অর্থে আধুনিক। অত্যন্ত সংযত বুদ্ধিমান অথচ অনুভূতিপ্রবণ এই তরুণ কবি সনিষ্ঠ কাব্যানুবৃত্তিতে আমাদের তৃপ্ত করেছেন।

সংস্কৃতি পরিক্রমা সম্পাদক অমূল্য চক্রবর্তী কলকাতা-২৯ থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন ত্রিদিব ঘোষ, ডি ডি কার্ভে, খোন্দকার, নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর, নিরঞ্জন হালদার, শৈলেন বন্দ্যো-পাধ্যায়, গল্প লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিতা লিখেছেন আবু ইউসুফ আতাউর রহমান, ডি এ ন্যাটো, মোহিনী-মোহন গাঙ্গুলী ইত্যাদি।

জন্ম নিয়েছে পৃথিবী এবং......! সমর মজুম-দার। প্রকাশক : তরুণতীর্থ **প্রকাশনী।** ১২।২ চকু খানসামা লেন। কলকাতা-৯। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটদের জন্যে এটি একটি গীতিনাট্য। বিজ্ঞানভিত্তিক এই গীতিনাট্যের মধ্যে দিয়ে কিশোরদের সমাজ ও বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। গানগুলি ছন্দময় হওয়ার দরুন এই গীতিনাট্যটি মঞ্চে জমে উঠতে পারে।

শান্তিনিকেতন : সম্পাদনা : রবীন্দ্র ঘোষ। রতন পল্লী। শান্তিনিকেতন। দাম : এক টাকা।

এই সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন : ইন্দ্রজিৎ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন জ্যোতিষ সরকার, রমা-প্রসাদ ঘোষরায়, রাঘেন্দ্র সিংহ, সঞ্জীব কুণ্ডু কবীন্দ্র চৌধুরী, জয় দেবনাথ, জ্ঞানদা চ্যাটার্জি, সুশান্ত মিত্র। গল্প লিখেছেন : সন্ন্যাসী মণ্ডল অমিতাভ ঘোষাল এবং আরও কয়েকজন।

পঙ্কের কাজ ও টেরাকোটা

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ৬ই জুন) তারিখে 'অমৃতে'র চিঠিপত্রে 'পঙ্খের কাজ ও টেরাকোটা' নামে আমার একটি দীর্ঘ আলোচনার প্রতি কয়েকজন সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। গত ৪ জুলাই শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তীর একটি ছোট্ট চিঠি এবং 'অমৃতে'র বর্তমান সংখ্যায় (২২শে শ্রাবণ) প্রকাশিত শ্রীশিবেন্দু মান্নার নাতি-দীর্ঘ পত্রটি পাঠ করে বিষয়টির গুরুত্ব যে কম নয়, তা বেশ বোঝা যায়।

উক্ত সমালোচকদ্বয়ের লেখা পড়ে একটা কথাই মনে হয়েছে, শুধুমাত্র অভিধান গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমার পূর্বোক্ত আলোচনার মূল বক্তব্য বিষয়কে চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা যে সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে আমার বর্তমান আলোচনা থেকে আশা করি তা পরিস্ফুট হবে। সঙ্গে সঙ্গে কথাটি 'পঙ্ক' না 'পঙ্খ' আর শিল্প-শাস্ত্রে টেরাকোটার প্রকৃত অর্থটিই বা কি তাও আমরা একটু খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।

প্রথমে 'পঙ্ক' না 'পঙ্খ' যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা স্থির করা যাক। শ্রীমান্না 'সর্বজনশ্রদ্ধেয়' (শ্রীমান্নার ভাষায়) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে অর্থাৎ 'পঙ্ক' শব্দের চতুর্থ অর্থটি "(বাঙলায়) অট্টালিকার ভিত্তিতে বা তলদেশে লেপনার্থ বালু-কর্দম-মিশ্রণ (বেঃ শাঃ কোঃ)" বলে তার পরে আর একটি অংশ যোগ করে দিয়েছেন—"পঙ্খ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : পঙ্খ অর্থ পঙ্ক (৪) অর্থাৎ পঙ্ক এবং পঙ্খ সমার্থক শব্দ।" আমার প্রশ্ন, শ্রীমান্না এই শেষের ব্যাখ্যাটি কোথায় পেলেন? এটি কি 'সর্বজনশ্রদ্ধেয়' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি না শ্রীমান্নার স্বকপোলকল্পিত? শ্রীমান্না নিশ্চয়ই জানেন এটি বঙ্গীয় শব্দকোষকারের উক্তি আদৌ নয় এবং সেই জন্য এটি তিনি কৌশলে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখেন নি। আমরা বহু চেষ্টা করেও 'পঙ্খ অর্থ পঙ্ক' এই ধরনের কথা বঙ্গীয় শব্দকোষের কোথাও পেলাম না। বরং "......দৃঢ় [illegible] ঠিক পরেই [illegible] আছে—(দ্রঃ 'বজ্রলেপ' বৃহৎসংহিতা ৫৭·৪) "পঙ্কের কাজ"। [বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃ ১২১৪]।" [illegible] বৃহৎসংহিতায় পঙ্ক বলতে বজ্রলেপ বা কাঠিন প্রলেপকে বলা হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' ৯ম ভাগ ১৩০৫ সংস্করণে 'পঙ্ক' শব্দের একটি অর্থ করা হয়েছে 'ভগ্ন ও ক্ষয়-হিতকর' অর্থাৎ পঙ্কের কাজের মধ্যে সৌধের ভঙ্গুরতা বা ক্ষয়রোধ করার ক্ষমতা বর্তমান। সেখানে 'পঙ্খ' বলে কোন শব্দের উল্লেখই নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রীমান্না 'সর্বজনশ্রদ্ধেয়' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত উদ্ধৃতির পর নিজের কল্পিত একটি অর্থ জুড়ে দিয়েছেন।

মোটামুটি প্রায় সব অভিধানেই সৌধ-গাত্রে এক বিশেষ ধরনের অলঙ্করণ বোঝাতে পঙ্ক বা 'পঙ্কের কাজই' বলা হয়েছে কোথায়ও 'পঙ্খের কাজ' বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় শব্দকোষে 'পঙ্খা' বলে একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যা উদ্ভূত হয়েছে সংস্কৃত 'পক্ষ' থেকে, প্রাকৃতে তা হোল 'পংখ' যার অর্থ হোল—ব্যজন, পাখা। অতএব দেখা যাচ্ছে 'পংখ' বলেও একটি শব্দ আছে (অবশ্য 'পঙ্খ' নয়) এবং তার অর্থ আমাদের আলোচ্য অর্থের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। 'পঙ্কের কাজ' কথাটি শুধুমাত্র অভিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যের মধ্যেও এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করও আমাদের আলোচ্য অর্থে 'পঙ্ক' শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

পঙ্কের কাজের মধ্য ফলে লতা-পাতার নকশা বা রেখায় এমন একটা সহজ সুন্দর সাবলীল রূপ ফুটে ওঠে যা মন্দির বা সৌধগাত্রের অলঙ্করণে প্রায়ই দেখা যায় তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি চুনের মসৃণ প্রলেপের গুণে, সুতরাং এ চুন পঙ্কের মতোই কোমল—ব্যবহারের সময় চুন একরকমই থাকত এবং এ থেকেই 'পঙ্কের কাজ' কথাটি চালু হয়ে থাকবে, এমন কথা মনে করলে নিশ্চয়ই ভুল হবে না। অতএব শ্রীমান্না আমার পূর্বপ্রকাশিত আলোচনার উদ্ধৃতিবিশেষ তুলে তা "[illegible] মনে [illegible] মাত্র" বলে যে মন্তব্য করেছেন আমার কাছে তা গ্রহণযোগ্য তো নয়ই, বরং তিনি যে 'পঙ্খ' শব্দের সঙ্গে 'শঙ্খ' শব্দের 'শ্রুতিমধুরের' সাজুয্যের কথা বলেছেন তা একান্তই অর্থহীন। শ্রীমান্নার জানা উচিত ছিল 'পঙ্খ' ও 'শঙ্খে'র 'সাজুয্যে'র থেকে (অবশ্য সাজুয্য বলতে তিনি কি বলেছেন, তা আদৌ স্পষ্ট নয়) বৈপরীত্যই স্পষ্ট করে ধরা পড়ে, শুধুমাত্র ধ্বনির দিক থেকে নয়, ভাষার দিক থেকেও। কারণ শঙ্খ শব্দটি হোল খাঁটি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ আর 'পঙ্খ' (অবশ্য যদি এই শব্দটি আদৌ থাকে) ঠিক কোন শব্দ থেকে এসেছে তা জানা যায় নি।

টেরাকোটা সম্পর্কে শ্রীমান্না আমার পূর্বপ্রকাশিত আলোচনা থেকে একটি অংশ তুলে দেখিয়েছেন অমিয়বাবু যে অর্থে তৈজসপত্রের কথা বলেছেন তা আমি বুঝতে পারি নি। আসলে কিন্তু তা নয়। শ্রীমান্না এখানেও আগের মতো আসল কথাটি চাপা দিতে চাইছেন। পাঠকসাধারণের অবগতির জন্যে অমিয়বাবুর পূর্বপ্রকাশিত রচনা (১৮।৪।৭৫ তারিখে 'অমৃতে' প্রকাশিত 'পঙ্খের কাজ') থেকে সেই অংশটি আবার তুলে দিচ্ছি—"মন্দির টেরাকোটা কথাটা এখন অনেকের কাছেই খুব পরিচিত শব্দ। কেউ কেউ আবার টেরাকোটা বলতে পোড়ামাটির মন্দির সজ্জাকেই বোঝেন (এবং লেখেন)। তাঁদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে টেরাকোটা এই ইতালীয় শব্দটি ইংরাজী ভাষায় গৃহীত হয়েছে এবং এর অর্থ পোড়ামাটি বা তার তৈরি যে কোন জিনিস তা সে মন্দির অলঙ্করণই হোক বা হাঁড়ি-কুঁড়ি বা অন্য তৈজসপত্র হোক।" শ্রীমান্না এখানে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছেন—"অমিয়বাবু কি এখানে ধাতব তৈজসপত্রের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেছেন।" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব জানি না, তবু বলতে হয় শ্রীমান্নার জানা উচিত ছিল 'তৈজসপত্র' শব্দটির অর্থ কি? 'তৈজসপত্র' শব্দটির একমাত্র অর্থ হোল, ধাতুঘটিত পাত্র, মৃন্ময় পাত্র কোন মতেই নয়। কিন্তু উদ্ধৃতিটিতে 'তৈজসপত্র' কথাটি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যই হোল মৃন্ময় পাত্রকে বোঝাবার জন্যে, যা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই অর্থহীন। অতএব আমার পূর্বে উক্তি—"তৈজসপত্র যে কি করে টেরাকোটার অন্তর্ভুক্ত হয় তা বুদ্ধির অগম্য" এতে আমার না বোঝার কিছুই নেই বরং এটা স্পষ্ট—লেখক টেরাকোটার মধ্যে তৈজসপত্রকে টেনে এনে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এটাও ঠিক যে তৈজসপত্র বলতে শুধু ধাতব পাত্রকে বোঝায় অন্য কিছু নয়। অতএব "......তৈজসপত্রাদিকে পটারি এবং পটস্হাউস দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে (শ্রীমান্নার ভাষা)—এই ধরনের প্রয়োগ খুবই বিভ্রান্তিকর।

টেরাকোটার প্রাথমিক অর্থ বেকড আর্থ বা পোড়ামাটি হলেও শ্রীমান্নার ভাষায় "শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ" থেকে 'টেরাকোটা' বলতে পোড়ামাটির অলঙ্করণকেই বুঝতে হবে, নচেৎ 'ব্রিক টেম্পল' ও 'টেরাকোটা টেম্পল' প্রয়োগ দুটির [illegible] স্পষ্ট হয় না। এ সম্পর্কে শ্রীমান্না অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর 'এ সার্ভে অব ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার' বা স্টেলা ক্র্যামরিশের 'ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার' বই দুটির পাতা ওল্টালে আশা করি বুঝতে পারবেন। মাত্র তিন বছর আগে প্রকাশিত ডেভিড ম্যাককাচ্চনের 'লেট মিডিয়েভাল টেম্পলস অব বেঙ্গলে'ও টেরাকোটাকে বারবার সৌধ ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলঙ্করণ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। টেরাকোটা সম্পর্কে অজস্র প্রবন্ধ ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী, ইন্ডিয়ান কালচার, এসিয়াটিক সোসাইটির নানা [illegible] জার্নাল অব দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রভৃতি বহু উচ্চস্তরের গবেষণাধর্মী পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

প্রায় সব প্রবন্ধেই সৌধগাত্রের পোড়ামাটির অলঙ্করণকেই টেরাকোটা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই টেরাকোটা সম্পর্কে বাদানুবাদ এখানেই শেষ হবে আশা করি।

প্রণব রায়
চুঁচুড়া, হুগলী।

স্বপ্ন, ফুলের নাম

গিরিধারী কুণ্ডু

ছবিটা কোথায় গেল?

আক্ষেপ হল অয়নের। নিজে শোনার মত করে ওইরকম বলে ফেলল কয়েকবার—

ছবিটা কোথায় গেল? ছবিটা!

খাটের একপাশে অয়ন চুপচাপ বসে। এখন ওর চোখের সামনাসামনি এঁটে রয়েছে গাঢ় অন্ধকার, ছোপ ছোপ অন্ধকার। কেবল সম্প্রতি চুনকাম করা দেয়াল কি করে যেন সাদা ফরসা হয়ে!

এখনো শীত এসে পৌঁছয়নি গা শিরশিরিয়ে ওঠে না তাই। বরং শিরদাঁড়া বরাবর লম্বালম্বি হয়ে বুকের [illegible] পেট পর্যন্ত ভিজে চুপসে রয়েছে। মুখের গা বেয়ে ক' ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ে। ভীষণ জ্বালাজ্বালা লাগল ঘামে নেয়ে ওঠা এ-শরীর। মনের অস্বস্তি বাড়ল আরো। খুব বিরক্তিতে অয়ন চটপট শরীরের সব দিক মুছে নিল তোয়ালে টেনে।

হঠাৎ এত রাতে হু হু করা বাতাসের এক ঝাপটা এগিয়ে আসায় ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো একসঙ্গে কেঁপে উঠল। অয়ন একবারটির জন্য অমাবস্যা ঘেরা ক্যালেন্ডারের ওপর চোখ তুলে রাখে। আর অনেকক্ষণ ধরে রং হারানো ক্রমশ মুছে আসা ওই স্মৃতি চোখের কাছে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

একটা স্বপ্নের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ঘুমের ভেতরে এতক্ষণ। [illegible] এক টিকটিকি [illegible] অয়নের গায়ের ওপর ফেলে দিতে আচমকা ঘুম গেল ছিঁড়ে। তাই আর খুঁজে পাচ্ছে না কিছুতেই। এ-কথা মনে আসতে হাতড়ে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের পরীকে!

এই ছবিটা—হ্যাঁ ঠিক ওই ছবিটা...সব মনে পড়াতে চাইছে একে একে। চারধারে মাটির বেড় দেয়া। ইঁটরঙা লালচে মাটি। গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সব গাছ। মাঝখানে নীল সাগরের টলটলে জলের ওপর একটুকরো দ্বীপ। দ্বীপটাতে অসম্ভব লাল রং ছড়ানো। আর ওখানেই তাজা ফুলের রঙা সেই হাসপাতাল—কেয়া যেখানে ভরতি ছিল সেদিন।

স্বপ্নের গা স্পর্শ করে বেশ কিছু বিন্দু সাবানের ফেনার মতো [illegible] হয়ে ছড়িয়ে। ও সব বিন্দুরা সমানে ঘুরছে-ফিরছে। একটা ফোঁটা চটপট [illegible] আরেক ফোঁটার সঙ্গে। তারপর আবার

পাশের অন্য ফোঁটায়—এমনিভাবে একের পর এক মিলেমিশে বিশাল এক বিন্দু তৈরি হল! আর সে-ফোঁটার আড়ালে লুকিয়ে রক্তমাখা মাটি...ভিতরকার এক টুকরো দ্বীপ...সমুদ্রের নীল জল...সব কিছু।

ভার সইতে না পেরে বিন্দুটা এক সময় ভেঙে পড়ে নিঃশব্দে, এবার আরো তেজী হয়ে দেখা দিলো পুরনো হওয়া সেদিনের ছবি।

শান্ত পায়ে এগিয়ে এসে কেয়াকে বিবস্ত্র করে রেখে চলে গেল নার্স। দু'পাশে দাঁড়ানো ডাক্তার দুজন সঙ্গে সঙ্গে তিনটে থান চাদর যেমন হয় ওইরকম সাদা কাপড় বিছিয়ে ওর দেহকে ঢেকে ঢেকে দিল। ঠিক তখুনি কেয়ার শরীরের সব দিক অয়নের চোখ টানে নি, আর সে-ও গোটা শরীরকে খুঁটিয়ে দেখেনি, এমন নয়। তবে, কোন ভাবান্তরের বহিঃপ্রকাশ চোখে বা মনে প্রকাশ পেল না। অন্য সময়ে স্বভাবতই যা হয়ে থাকে।

কালো ব্লাডার জাতীয় জিনিসটা ফসফস শব্দে বার কয়েক জোরে চেপে দিতে ক্রমে কেয়ার চঞ্চল শরীর মিইয়ে গেল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল কেয়া। ওর নিমীলিত চোখে-মুখে তখন রীতিমত কষ্ট এবং যন্ত্রণার অপ্রসন্ন ছাপ। অপারেশনের আগে মনে ভয় ধরে যাওয়ার হয়ত যন্ত্রণার এ ছাপ!

অয়নের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার পাল বললেন,

অয়ন, এর পালস দ্যাখো ত।

তাড়াতাড়ি গলায় বলে ফেলে অয়ন।

ঠিক আছে সার।

ধমকের সুরে বললেন তিনি।

না দেখেই বলছ ঠিক আছে! ফাঁকি দেবার ইচ্ছে কেন এত?

এই একটু আগে দেখলাম যে সার।

আমার সামনে ত আর দেখোনি। অপারেশন টেবিলে রোগী থাকলে বারবার পালস, ব্লাড প্রেসার দেখবে।

কেয়ার শরীরে, হাতে হাত রাখে অয়ন। নাড়ীর স্পন্দন গোনার সময় ওর শরীর ভীষণ ঠাণ্ডা ঠেকল। কেয়ার নরম মুখখানা অন্য সময়ের চেয়ে একটু বেশি ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে! চুলের ছাড়া বেণী অপারেশন টেবিলের ধার ঘেঁষে ঝুলে। চুলের চকচকে ভাব কমে গেছে যেন এ দু'দিনে, এমনিতে কিন্তু ওর এক মাথা কালো চুল। যা পশমের মতোই নরম, মোলায়েম।

অজ্ঞান করাবার লোকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—

ডকটর পাল, আপনি শুরু করতে পারেন।

দীর্ঘ হাত এগিয়ে দিয়ে সার্জেন পাল ছুরি তুললেন, সেই সঙ্গে ছুরির ধার পরখ করে নিলেন চোখের সামনে ধরে রেখে। আর এর পরই ডানপাশের তলপেটের কোণে প্রায় ইঞ্চি দেড়েক আঁচড় বসালেন ওই ছুরি দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এক আঁজলা রক্ত উপচে বেরুল। এক আঁজলা রক্ত টপটপ করে বেয়ে পড়তে থাকল কেয়ার কোমরের ধার ঘেঁষে।

অয়ন ধারালো চোখের নিচু চাউনি পাশে ঘুরিয়ে নিল অমনি।

এতদিন বাদেও ওই রক্তাক্ত দৃশ্য—রক্তের কণায় চিকচিকে ভাব! ভেঙে পড়ল চোখে, মুখে আর সারা স্বপ্নের গায়ে। গোটা স্বপ্নে টকটকে লাল রং লাগে মুহূর্তের জন্যে! না—লাল ঠিক নয়, কালোর ওপর লাল প্রলেপ। অগোছালোভাবে জমানো অনেকদিন আগের ছবি লাল লাল দেখতে হয় যেমন, তেমনি!

ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ মাড়িয়ে অয়নের ত্রস্ত দৃষ্টি এর আগের দিনের সন্ধ্যায় ফিরে যায় হঠাৎ-ই। কেয়াকে প্রচণ্ডরকম মনে করিয়ে দিল, আর কি! অয়ন চিন্তায় খুব গভীরে ডুবে যাচ্ছে এখন...

অয়নের চোখ ছুঁয়ে কেয়ার ঝরঝরে সরল সুন্দর চাউনি পড়ে। কেয়া বলছে—

এই, তুমি কাল সামনে থাকবে?

একথা বলছ কেন?

কেয়া আগের মতো-ই মিষ্টি করে বলল,

কাল যে আমার অপারেশন মশাই, তুমি শোনো নি?

জানি সে-কথা।

এই শোনো, আমার না খুব ভয় করছে! কাল আসবে। তুমি না এলে আমি থাকতে পারি না! তুমি কাছে থাকলে আমার মন কত খুশি হয়, সে-কথা নিজের মুখে কতবার আর বলব?

অত ভয় পাচ্ছ কেনো কেয়া? অ্যাপেনডিকস অপারেশন কি আবার একটা অপারেশন! এর চেয়ে কত কঠিন কঠিন অপারেশন হাসপাতালে রোজদিন হয়। সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছে ভাল হয়ে। সকাল দশটায় অপারেশন হলে, চার-পাঁচ ঘণ্টা পরই জ্ঞান ফিরে পাবে।

একটুতে অভিমান কেয়ার। তবু কেমন যেন এক অভিমান মেশানো সুরে গলার স্বরে।

কাছে থাকবে না ত! যাও, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের কাটাকুটি।

অয়নও বলে,

তুমি যদি এরকম ভাবো, তো হলে আলাদা কথা।

হঠাৎ মনে হয়, কেয়ার চোখের পাতা ভিজে গিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে এই বুঝি!

অয়ন বলল তাই,

এই কেয়া, এসব আবার কি হচ্ছে! কাঁদলে টাঁদলে আমি আর তোমাকে দিনে চব্বিশবার করে দেখতে আসব না কিন্তু!

বারবার দেখতে আসার কথা মনে লেগে যায় কিশোরী কেয়ার।

আসবে না ত আসবে না। অত বড় মুখ করে দেখতে আসার কথা বারবার মনে করিয়ে দেবার কি আছে?

অয়ন ভাবে, ও বলে দিক, ঠিক আছে আমি চলি, তোমার রাগ নিয়ে তুমি একা থাকো।

এরকম কথা বলা ঠিক নয় এখন। অন্তত আজকের রাতে। কেয়া দুঃখ পাবে। সামান্য এ আঘাত ওর স্নায়ু-কোষের গোড়ায় পৌঁছে গিয়ে অশান্তি করে তুলবে। তাই স্নায়ুর ওপর চাপ বেড়ে চলবে—কি হয়, কি না হয়। সারারাত চিন্তা করতে থাকবে। ঘুম নেবে আসবে না ওর বড় বড় ফুটফুটে দু'চোখে! শরীর এবং মন দুই-ই ভেঙে পড়বে অপারেশনের আগে। কেয়া আবার একটু নার্ভাস ধরনের। এতসব ভেবে নিয়ে অয়ন চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

ওয়ার্ডের সবাইকার ধারণা, অয়ন পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু এ কলেজ হাসপাতালে ওর ডাক্তারী পড়ার শেষ বছর এটা।

কেয়া ঘনিষ্ঠতার আসল রহস্য অপ্রকাশ রাখতে ওকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছে সকলের কাছে।

অয়ন আর কেয়া বারান্দায় ঘনভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সবেমাত্র সিগারেটের মুখে আগুন ছুঁইয়েছে, এমনি সময় গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো এক ডাক্তারের মুখোমুখি হতে হল। অমনি ও সিগারেট শরীরের পেছনে নিয়ে লুকিয়ে ফেলে।

জানতে চান ডাক্তার ভদ্রলোক।

খবর কি অয়ন! বল?

ঘাড় নেড়ে অয়ন জানায়,

এই ত দাদা চলে যাচ্ছে।

ডাক্তার এবার এগিয়ে যেতে যেতে বললেন,

তোমার পেশেন্ট ভাল আছে, কি বল?

সায় দিল অয়ন।

হ্যাঁ।

কথা বলতে বলতে সে-ডাক্তারকে ওয়ার্ডের ভেতর পা ফেলতে দেখে কেয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে একটু। বলে উঠল তাই।

আমি যাই। সুভাষদা বেডে না দেখতে পেলে বকাবকি করবেন।

কেয়া দু'দিন এখানে থেকেই সবার নাম জেনে ফেলেছে। অয়ন বলল,

এখুনি সুভাষদা ... কে তোমাকে কথা বলতে দেখে গেছে। আবার বকাবকি করবেন কেন? তবে, একটা ভুল করে ফেললাম মনে হচ্ছে।

কেয়ার গলায় অস্বস্তি ফুটে উঠল যেন। জানতে চায়,

কি ভুল।

এখানে সিগারেট খাওয়ার অবজেকশন আছে মনে হয়।

কেয়া। খেতে গেলে কেন তাহলে? নিচে নেবে খেতে পারতে মশাই।

দু আঙুলে টোকা মারার কায়দায় অয়ন বেসিনের দিকে ছুঁড়ে দিল সিগারেটের শেষ অংশটুকু।

কেয়া হুট করে জামার ওপরকার পকেটে এক হাত ঢুকিয়ে দিতে প্রসন্ন মুখে অয়ন বলে।

পকেটে আবার হাত ঢোকালে কেন?

দেখছি, কি আছে তোমার পকেটে!

আবার সামান্য হাসি দেখা দেয় অয়নের ঠোঁটে।

পকেট দেখতে গিয়ে কেউ বুকের কাছে চিমটি কেটে বসে? উঃ লাগছে! বলছি, হাত বার করে নাও শিগগির।

বেশ একটু শক্ত গলায় বলল শেষের কথাগুলো।

পকেট থেকে বাসের একটা টিকিট আর কলম শুধু হাত আলগা করে বাইরে নিয়ে আসে কেয়া। তারপর-ই অয়নের দিকে পেছন ফিরে দেয়ালের ওপর ওটা বসিয়ে কিছু লিখে ওকে দেখাতে দেয়।

ও টিকিটটায় লেখা—কাছে থাকবে না কাল?

অয়নও ওর দেখাদেখি পকেট থেকে আরেকখানা বাসের টিকিট তুলে নিল। তাড়াতাড়ি লিখল—

আসব, আসব। তোমাকে না দেখে আমিও কি থাকতে পারি এক মুহূর্ত!

ঠিক এমনি সময় আলো গেল নিভে। ওয়ার্ড থেকে ঈষৎ ভারী গলায় হাসি ভেসে এল।

অপ্রত্যাশিত এই আলো চলে যাবার পেছনে কোন কারণ খুঁজে পেলো না ওরা। আজকাল এখন-তখন আলো চলে যাওয়া মাথা ধরার কারণ নয়, কেয়া অয়নের খুব কাছে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারের ভেতরই ও অয়নকে চেষ্টা করল ছুঁতে। ধরতে পারে না তবু। অয়ন বলে,

এই, এসব পাগলামী করবে না, কেউ দেখে ফেলবে। সবাই আমার চেনা এখানে।

লজ্জাহীন গলায় কেয়াও অনায়াসে বলে দিল।

বেশ করেছি। আমার যা ইচ্ছে, তাই করব। তোমার তাতে কি! অন্ধকার আছে জেনেইত তোমাকে স্পর্শ করলাম।

অয়ন এ-কথায় তবু নিরাপদ বোধ করল না। একে এই অন্ধকার, তার ওপর মনের ভেতরে কাঁচা বয়সের বিক্ষুব্ধ সব চিন্তা।

আজ মনে হচ্ছে অয়নের, সেদিন হাত-খানা ধরে ফেললে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে নিতে পারত না কেয়া।

অপারেশনের পরের দিন ইচ্ছে করে ও সারা সকাল দুপুর দেখা করতে যায়নি কেয়ার সঙ্গে। রাত তখন নটা, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে অয়নকে দেখা গেল ওয়ার্ডে।

কেয়া শুধু ঘুমোতে পারেনি, ওর খাটের পাশে আয়া বসে। চিত হয়ে শুয়ে আছে। ধবধবে পায়ের পাতা বিছানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর কোমরের ওপরকার অংশ উঠে আছে, শরীরের বাকী অংশ চাদরে শুধু ঢাকা।

আয়া বোধহয় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল পিঠের ধারে। পায়ের শব্দে সামান্য চমকে গেল কেয়া।

কেয়া অয়নকে দেখে খুশি নয়, তাই শরীর উল্টে ফেলে শোবার জন্যে অনর্থক চেষ্টা করল শুধু। শুতে পারল না ওভাবে। কাটা জায়গায় লাগছে হয়ত। আগের মত বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে রইল। চোখ সম্পূর্ণ বোজা মুখ লুকোবার।

অয়নের ওপর ও ভীষণ রেগে, তা বোঝা গেল সহজেই।

পিঠে হাত রাখে অয়ন, তবু কেয়া চুপ করে। শুধু আনত চোখ তুলে গভীর-ভাবে তাকিয়ে ওর দিকে।

এই, কি হল তোমার! কথা বলবে না?

কেয়ার সারা মুখ ভিজে উঠেছে। বড় বড় দু-চোখ ঠেলে আবার জল গড়াচ্ছে সমানে। বাঁধ ভাঙলে জলের তোড় ছুটে আসে যেমন!

অন্য সময়ের মতো খুব আগ্রহ ফুটে উঠতে চায় না। তবু কেয়া বলল,

সারাটা দিন আসোনি কেন?

গম্ভীর শোনাল অয়নের গলার স্বর।

এ কদিন তোমাকে নিয়ে দৌড়োদৌড়ির অন্ত ছিল না। আর তাছাড়া থাকবে ত পাঁচ ছদিন। এরপর তুমি কোথায়, আমি কোথায়। কি হবে মায়া বাড়িয়ে মিছিমিছি! এই অয়ন মিত্রকে তুমি মনে রাখবে তারপর?

এতসব বলল ঠিকই। তবে কেয়ার প্রশ্ন এড়াবার জন্যে আবার বলে,

আমাদের পরীক্ষা নিয়ে ঝামেলা চলছে। ইউনিভার্সিটি যেতে হয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। সে জন্যে আর দুপুরে আসা হয়নি।

আয়া কেনো যেন বাইরে চলে গেল উঠে।

অয়ন সবরকম খোঁজ নিল—কাটা জায়গার অবস্থা কি রকম? ব্যথা রয়েছে কিনা! বমির ভাব আর হয়েছিল, না—হয়নি! বিকেলে কে কে দেখতে এসেছে? অয়নের এক বন্ধু জয়ন্ত, যে কেয়ার কাকু হয় সম্পর্কে, সে এসেছিল।

অয়নের চোখের ইশারায় চোখ মুছে ফেলল কাপড় টেনে। ভিজে গলায় ওর এত সব প্রশ্নের উত্তর দিল। আর বলল,

মা তোমাকে কাল বিকেলে দেখা করতে বলেছে।

কেয়ার মা দেখা করতে বলেছেন? দেখা করার কারণ কি হতে পারে ভাবিয়ে তুলল ওকে।

কেয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল এর পরের দিন। একটু দেরি হলেও বিকেলে দেখা করতে গেল কেয়ার মার সঙ্গে। সামান্য হাসি ছড়িয়ে বললেন তিনি।

তুমি অনেক করেছ আমার মেয়ের জন্যে। তুমি কাছে না থাকলে সব কিছু এত তাড়াতাড়ি আমাদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। উনি ত সারাদিনই দোকানে পড়ে থাকেন।

তারপর একটু থেমে নিয়ে বললেন,

আমার ত ইচ্ছে, তোমাদের বাড়িতে আমার এ মেয়েকে দিয়ে দেবো। অসুখ, অসুখ করে মেয়েটা যা জ্বালায় রোজদিন!

যেই একথা কেয়ার মা বলে বসলেন, অমনি কেয়া ওর দু হাতের পাতা চোখের সামনে মেলে ধরে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা মুখ লুকিয়ে ফেলল! আর অয়নের? অয়নের বুকের মধ্যে গভীর সমুদ্রের ঝড় বইছে রীতিমত!

হাসপাতাল থেকে চলে যাবার দিন খুব সকাল সকাল অয়ন দেখা করতে এসে বলল শুধু।

বাড়ি চলে গেলে কত মনে থাকবে, দেখব!

খুশিতে ঝকঝকে দেখায় কেয়ার মুখখানা। বলল ও, চলে যাচ্ছি বলে এত রাগ তোমার! হাসপাতালে কি কেউ থাকতে আসে? গোঁসা করা কেন?

অয়নও ভার ভার গলায় বলতে থাকে—

আমার মনে হয় না তুমি মনে রাখতে পারবে!

ধমক দেয় কেয়া,

যত সব বাজে চিন্তা তোমার। এত ভাবো কেন?

আর ওদের দুজনের কথা এগোয় না। আমাদের পাওনা মিটিয়ে কেয়ার মা-বাবা কেয়াকে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বারবার ওর মা অয়নকে যেতে বললেন, শুধু দাঁড়িয়ে থেকে ওদের তিনটে মুখ অবহ্য হয়ে যেতে দেখল অয়ন।

যাবে না যাবে না ভাবা সত্ত্বেও সাত-দিনের মাথায় কেয়াদের বাড়ি যাবার রাস্তায়, অন্ধকার সরু গলির মুখে জয়ন্তকে দেখে ফেলল। ওর তখন কলেজ স্ট্রীট যাবার
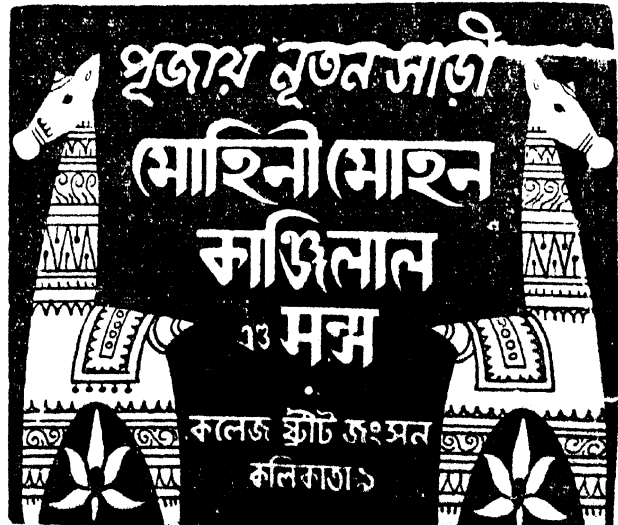
ভীষণ তাড়া। দু একটা কথা সংক্ষেপে সেরে ও চলে গেল।

এদিকে অয়ন বাড়ির চৌকাঠে পা রাখে ঠিকই, কিন্তু কেয়া কোথায়? ও কি অয়নকে এড়িয়ে চলতে চাইছে এখন? আসলে তখন যে কেয়া চোখের আড়ালে রইলেও মনের ভেতরে বড় রকমের এক যুদ্ধ চলছিল ওকে পাবার জন্যে!

হাড় জিরজিরে চেয়ারে বসতে দেখে ঝরঝরে গলায় বলে ওঠে কেয়া।

এখানে নয়, এখানে এসে বসো।

তারপরই ভুরু দুটোর ইশারায় বিছানায় এসে বসতে বলছে ওকে অয়ন তা বুঝল।

আলগোছে দৃষ্টিতে কেয়ার দিকে তাকাতে কেয়া ফিসফিসে গলায় বলে,

এই!

কি?

তুমি বলে বলেছ—আমার মা-বাবাকে একদিন না একদিন সব চিঠিগুলো দেখিয়ে দেবে, সত্যি তাই করবে? যদি তুমি দেখাতে চাও তাহলে আমাকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে দাও। তারপর সব দেখিয়ে দিও।

কেয়ার এসব কথা শুনতে ভাল লাগলেও কেনো যেন ন্যাকা ন্যাকা ঠেকল ওর কানে।

কেয়ার মা হেঁকে বললেন ওপিঠের ঘর থেকে।

তোমরা গল্প করো। এক্ষুনি আমি চা আনছি।

কিছু পরে অয়নের হাতে চায়ের কাপ গুঁজে দিয়ে তিনি সহজভাবে জানতে লাগলেন ওর ব্যক্তিগত খোঁজখবর, এমন কি অয়নরা ক'ভাই, ও সবার বড় কিনা—ওর বাবা কি করেন—ক'তলা বাড়ি—দাদু ঠাকুমা এখনও বর্তমান, না ও'রা গত।

অয়ন বেশিক্ষণ রইল না, চলে আসার সময় কেয়া দরজার কোণে এসে দাঁড়িয়ে থেকে বলছে,

এই, একদিন বেড়াতে যাবে?

কোথায়?

যেখানে তুমি নিয়ে যেতে চাইবে, সেখানেই।

তাহলে কালই হোক না বেড়াতে যাবার ব্যাপারটা।

বাধা দিয়ে বলে ওঠে কেয়া।

কাল, না—না কাল নয়, পরশু তুমি ঠিক পৌনে দশটায় ইন্টালী সিনেমার কাছে দাঁড়াবে। আমি আসব।

রসিকতা করার জন্যে আবার জানতে চায় অয়ন।

কাল নয় কেনো?

রোজ আমাকে যে মাসী স্কুলে দিতে যায়, নিয়ে আসে, ওকে বলতে হবে আগে। তবে ত যেতে পারব মশাই।

কথা রাখতে কেয়া ঠিক দিন ঠিক সময়ে সিনেমা হলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঝোলা ব্যাগ একটা কেয়ার কাঁধে। ওতেই কেয়ার যাবতীয় বই।

এক শব্দও কথা বলাবলি হল না। দুজনে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। গাড়ির ড্রাইভার ওদেরকে আয়না দিয়ে স্বচ্ছন্দে দেখছিল। গন্তব্য স্থান জেনে নিয়ে সে জায়গায় পৌঁছে দিল সহজেই।

কেয়া আর অয়ন ভিকটোরিয়ার স্মৃতিসৌধ পেছনে রেখে নরম ঘাসের বুক মাড়িয়ে পা পা এগিয়ে সবুজ ঘাসের বিছানায় বসলো ধুপ করে। স্মৃতিসৌধ এখন সূর্যের গনগনে রোদ পেয়ে রীতিমত উজ্জ্বল! সারা আকাশ ঝকঝকে তকতকে; একখণ্ড সাদা ছেঁড়া মেঘের অংশ ছাড়া সর্বত্র নীল রং পড়ে!

চমক লাগানো চোখে অয়ন তাকিয়ে। সত্যি সত্যি যেন চমকে ওঠে কেয়ার বুক।

এই, কি দেখছ অমন করে!

তোমাকে।

আহা, বেশি বেশি! আমাকে নতুন করে দেখার কি হল? রোজই ত দেখো।

হালকা স্বর বাজল অয়নের গলায়।

তুমি এত সুন্দর তা কোনদিন চোখে পড়েনি যে, তাই দেখছি।

জিভ ভেঙাল কেয়া। আলগোছে অয়নের মুখ ঠেলে বলে—

মাথা সরাও, দেখি একটু। ইস কি ভালো দেখাচ্ছে না! কিছু বলো না।

কি আর বলব।

উঠে দাঁড়ায় কেয়া। তারপরই সূর্যমুখী ফুলের বাগানের দিকে খুশি পায়ে দৌড়তে লাগল। অয়ন একবারটির জন্যে ভাবে, কেয়া কি যে না, স্থির হয়ে বসতে পারে না একটুও। খালি দৌড়োদৌড়ি স্বভাব!

কেয়ার সিল্কের হলুদ শাড়ির ফিনফিনে আঁচল বাতাসে সমানে ভাসছে...বারবার মুখের ওপর ঝাপটা মেরে ঢেকে রাখতে চাইছে। এ ফুল—ও ফুলের পাতা গালে ছুঁইয়ে আদর করতে ও ব্যস্ত। অয়ন এ নির্জন মুহূর্তে আবিষ্কার করে, কেয়ার মনে বসন্ত এসে গেছে! ডাকল কেয়াকে তবু ও ফিরে আসে না। অয়ন তাই এলোমেলো পায়ে হেঁটে যায় ওর কাছাকাছি।

হঠাৎ অবাক হওয়া গলায় কেয়া জিগ্যেস করল।

এই, ফুলের নাম ড্রিম ফ্লাওয়ার হয় না কি গো?

আঁতকে ওঠে অয়ন এ কথায়। হুট করে বুঝতে পারে না কেয়ার এ-কথার অর্থ।

অয়ন বলে,

ফুলের নাম যে স্বপ্ন হয় তা ত জানতাম না। তবে—হ্যাঁ, কেউ ফুলকে স্বপ্নে ঠিকই দেখে। এই যেমন আমি তোমাকে রোজ রাতে স্বপ্নের মধ্যে চোখের সামনে ফুলের মতো ফুটে উঠতে দেখি।

বেশি সময় নষ্ট করেনি অয়ন-কেয়া।

পরপর আরো কদিন কেয়াদের বাড়ি গেল অয়ন। সেদিন চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে স্থির দৃষ্টে চেয়ে থাকলেন কেয়ার মা। ভয়ে আচ্ছন্ন মনে হল তাঁর চোখের পলক।

অয়ন একটা প্যাকেট ধরিয়ে দেয় কেয়ার মাকে। অমনি তিনি বলে উঠলেন—

তুমি ওষুধের দাম নাও না কেন? আজও অনেক টাকার ওষুধ কিনে এনেছ মনে হচ্ছে।

হাসতে হাসতে অয়নও বলে,

ও, এই কথা। নেবো, পরে নিয়ে নেবো সব একসঙ্গে, আপনার কাছে আপাতত জমা থাক।

আঁতকে উঠলেন কেয়ার মা।

না, এটা ভাল দেখায় না, কেয়ার বাবা শুনতে পেলে রাগারাগি করবেন আমার সঙ্গে।

এই প্রথম কেয়ার মা-কে কেমন দেখল অয়ন। একটু যেন অবশভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও।

কেয়ার লেখা ছোট্ট এক চিঠি এসে হাতে পড়ে সাতদিনের মাথায় মাথায়। কেয়ার নাকি বিয়ের কথা চলছে, তাই এ চিঠি।

কেয়ার বয়স ষোল শেষ হতে চলেছে। এখনো ও নাবালিকা। স্বেচ্ছায় কেয়া অয়নের কাছে এসে দাঁড়াতে চাইলেও এর পক্ষে গ্রহণ করাতে অনেক বাধা, আর সোজাসুজি বলতে গিয়ে ওর বাবা মাকে বেঁকে বসতে দেখলে সেটাই লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

তবু জয়ন্তকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করল অয়ন। জয়ন্ত শুধু ঠান্ডাগলায় বলে,

দাদা-বৌদির ইচ্ছে অন্য রকম। রাগ পাতালে বৌদি দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে যা বলেছিল, তা ভুলে যাও। আর, তোমার মতো ছেলে এরচেয়ে কত সুন্দরী মেয়েকে হাতের কাছে পাবে।

একথা বলেই ভীষণ জোরে হেসে উঠেছিল জয়ন্ত। অয়ন সেদিন নিশ্চিত জেনে ফেলে স্বার্থের জন্যে মানুষ মানুষকে

অনেক কথাই ত বলে থাকে, তাকে সত্যি বলে ভেবে নেওয়াটা ঠিক নয়।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল, গম্ভীর মানুষ, কেয়ার বাবার গমগমে গলার স্বর এগিয়ে এসে ওর পা থামিয়ে দিল।

এই যে অয়ন, কি বয়স তোমার। এর মধ্যেই প্রেম করতে শিখেছ? নিজের কেরিয়ার ঠিক করো আগে, তারপর প্রেমের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে। হুঁ—

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক অন্ধকার সরু গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অয়ন শুধু স্থির মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর যখন মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল, তখন মধ্য রাত, কলকাতার চোখে ঘুম নেমে আসছে। গাড়ি নেই রাস্তায়। পা পা হেঁটে ফিরে এলো বেনিয়াপুকুরের উনষাট নম্বর বাড়ির তিনতলায়।

একটা ব্যথা, একটা গোপন যন্ত্রণা মনের মাটিতে দীর্ঘ ছ'বছরে ক্রমশ বড় হয়ে শাখা-প্রশাখা আর মোটা শেকড় ছড়িয়ে দিব্যি বেঁচে আছে। মেয়েদের ভালবাসা প্রেম প্রেম খেলা ছাড়া ওর কাছে বিশেষ আর কিছু নয়! তবু এক এক সময় স্মৃতিগুলো সব ছুটন্ত ক্রুশ হয়ে পা দাপায়, রক্ত ক্ষরিয়ে ক্ষরিয়ে ভিজিয়ে তোলে দু'চোখের পাতা, সারা মুখ! স্বপ্ন শুধু নতুন করে ফিরিয়ে আনে কেয়ার নরম মুখখানা। আর তারপরই অয়নের সাতাশ বসন্তের সুন্দর মনটাকে তছনছ করে রেখে যায়, আর কি।

(পূর্ব্বে প্রকাশিতের পর)

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার প্রথম বৎসরে (১৮১৭) চাঁদা হইতে ১৭,১৮২ টাকা উঠে। তখন কোম্পানীর কাগজের সুদ শতকরা ৫্ টাকা ছিল। প্রথম বৎসর সংগৃহীত টাকা হইতে সাড়ে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কেনা হয়। পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়, হাতে দুই হাজার টাকা মজুদ থাকে। তখন পর্যন্ত সোসাইটীর নিজের ছাপাখানা হয় নাই। প্রায় সমস্ত ছাপার কাজ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের ছাপাখানা হইতেই সম্পন্ন হইত। ৫০০০্ টাকা যে খরচ হয় তাহার ১,৫০০ টাকা আরবি, ফারসি কেতাব কিনিতে লাগে। পাদ্রী কাগজ 'দিগদর্শনের' নিমিত্ত ৪০০ টাকা, বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত ৫০০ শত টাকা ও বাকি অফিসাদিতে খরচ হয়।

যে টাকা উঠিত তাহা ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকগণ দিলেন। মুসলমানদাতৃগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। প্রথম দুই এক বৎসর হিন্দুদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বরং তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। প্রথম বৎসরে যে যে হিন্দু ভদ্রলোক চাঁদা দেন তাহাদের নাম জানিতে অনেকেরই মনে কৌতুহল জন্মিবে। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও এককালীন প্রদত্ত চাঁদা ও বার্ষিক দেয় সাহায্যের তালিকা দিলাম।

নাম	এককালীন প্রদত্ত চাঁদা	বার্ষিক দেয়
কালীকিঙ্কর ঘোষাল	২০০্	৫০্
গৌরহরি বসাক	২৫্	৫্
জয়কৃষ্ণ সিংহ	১০০্	৫০্
উমানন্দ ঠাকুর	১০৫্	৫্
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস	১০০্	...
ধরণীধর (ঢাকা)	৫্	২্
জীবনকৃষ্ণ রায় (ঐ)	১০০্	৩্
জগমোহন দাস (ঐ)	৫্	২্
নবকুমার দাস (ঐ)	৪্	১্
নীলাম্বর পণ্ডিত (চট্টগ্রাম)	১০্	...
পূর্ণচন্দ্র (ঢাকা)	৭্	২্
পুষ্বরাম দেব (ঐ)	১৫্	৬্
পুরুষরাম দেব (ঐ)	১৫্	৬্
রামকমল সেন	৩২্	৮্
রামকৃষ্ণ দেব (ঢাকা)	১৫্	৬্
রামনাথ বাচস্পতি	৩২্	...
রসময় দত্ত	২৫্	...

১৮১৭ সালে ৬ই মে তারিখে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সালে কলিকাতায় আর দুইটি শিক্ষা সংবন্ধে অনুষ্ঠান হয়। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে কলিকাতা 'ডাইওসিজান কমিটি' নাম দিয়া একটি কমিতি গঠিত হয়। তদানীন্তন সরকারী খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্মচারী লাট পাদ্রী এ কমিটির সভাপতি হন। প্রধানতঃ পাদ্রীগণ লইয়াই এই কমিটী গঠিত হয়। এদেশীয় লোকদিগের জন্য স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে বিবেচনা করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন গঠিত হইল তখন স্থির হইল যে, বাঙ্গালা প্রদেশের নিবাসীগণের মধ্যে আবশ্যকীয় জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত এই কমিটী কর্তৃক স্কুল স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

ফলে কোন কাজ হয় নাই। দেশীয় খৃষ্টান ও ইউরোপীয় বালকগণের শিক্ষার সাহায্য ইহার প্রধান ও একমাত্র কার্য হইল। হিন্দু অথবা মুসলমান বালকদিগের নিমিত্ত এই কমিটি কোন স্কুল স্থাপন করিয়াছিল এরূপ স্কুলের নাম আমাদের জানা নেই।

সেই বৎসর (১৮১৮ সালে) সহরে শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সদস্যগণের চেষ্টায় ও উদ্যোগে সেই বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে একটি সভা আহূত হয়। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। স্থির হইল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী নাম দিয়া একটি সমিতি গঠিত হইবে।

কমিটির সদস্যদিগের মধ্যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সভ্যগণের নাম অধিক দেখা যায়। হ্যারিংটন লার্কিন্স, আর্মস্ট্রং, মণ্টেগু, পাদ্রী কেরি, পাদ্রী ইয়েটস, পাদ্রী টাউনসন সভার সভ্য হন। ডেভিড হেয়ার কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সদস্য ছিলেন। এই সভায় তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েন। হিন্দু বাঙ্গালী চারিজন লইবার কথা ছিল। এই বৎসর রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসময় দত্ত এই দুইজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

স্কুল সোসাইটীর কার্য্য করিবার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ হইল। সোসাইটী গঠনের তিন মাসের মধ্যে ৯,৮৯০্ টাকা চাঁদা ও ৫০৬০ টাকা বার্ষিক দেয় বাবদ আদায় হইল। এ দেশীয় লোকেরা, প্রধানতঃ হিন্দুরা, অনেক টাকা প্রদান করেন।

স্কুল সোসাইটীর তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, কতকগুলি স্কুল খোলা হইবে, এইগুলিকে সোসাইটী পরিচালন ও প্রতিপালন করিবে। দ্বিতীয়, দেশী স্কুলগুলিকে (পাঠশালা) সাহায্য দেওয়া হইবে ও সেগুলির সংস্কার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যাহাতে ইংরেজী ও উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইবে এরূপ স্কুল খোলা হইবে।

প্রথম ট্রেনিং স্কুলের কথা উঠিয়াছিল। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট নামে এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানে কতকগুলি স্কুল খুলিয়াছিলেন। সেই স্থানে টেইলার্ড নামে একজন ইংরেজ ও পাঁচজন বাঙ্গালী গুরুমহাশয়ের কাজ শিখিবার নিমিত্ত গমন করেন। তখন চুঁচুড়ায় ও তাহার নিকটস্থ স্থানে মে, পিয়ার্সন প্রভৃতি পাদ্রীগণের পরিচালিত অনেকগুলি বাঙ্গলা স্কুল ছিল। এই সকল স্কুলগুলি বাঙ্গালীরা প্রথম (১৮১০ সালের পূর্ব্বে) স্থাপন করেন, এগুলি পাদ্রীগণের হস্তগত হয়। ১ ১৫ সালে গভর্ণমেন্ট ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। স্থির হইল বর্দ্ধমান ও চুঁচুড়াতে এই সকল স্কুলে ভাবী গুরুমহাশয়গণ শিক্ষকতা কার্য্য শিখিবেন। আরও স্থির হইল যে ১৮২০ সালের প্রারম্ভে উপরে যে তিন শ্রেণীর স্কুলের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রেগুলার স্কুল খোলা হইবে। এই সংকল্প কার্য্যে বিশেষ পরিণত হয় নাই। সোসাইটী কলিকাতায় পাঁচটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। আরপুলি লেনের স্কুল তন্মধ্যে একটি; সময়ে ইহা ডেভিড হেয়ারকে দেওয়া হয়। কেষ্ট বন্দ্যো (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) এই স্কুলে পড়িতেন। এতদ্ব্যতীত সোসাইটী অনেকগুলি কলিকাতায় স্থিত এ-দেশীয়দিগের কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুল পরিদর্শন করিতেন। ১৮২১ সালে ৪৪টি এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পরিদর্শিত স্কুল ছিল। স্কুল সোসাইটীর কার্য্যপ্রণালীর কথা পরে লেখা হইবে।

(ক্রমশঃ)

সিলেবল্‌কে 'দল' বলি কেন

প্রবোধচন্দ্র সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

অমূল্যবাবু পরোক্ষে আমাকে প্রশ্ন করেছেন—'সিলেবল' অর্থে 'দল' শব্দটি ব্যবহারের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারা কি জানেন যে ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্রে 'দল' শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে?' এরকম গুরুজনোচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও অসম্মানজনক। আমি যা জানি তাই বলা আমার কর্তব্য, অন্যে কি জানে না জানে সে প্রশ্ন তোলার অধিকার কারও নেই। অন্ততঃ ষাট বৎসর পূর্বে ইস্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপায় সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে মনে খানিকটা আগ্রহ এবং কিছু জ্ঞানও জন্মেছিল। ফলে একখণ্ড ছন্দোমঞ্জরী কিনে নিয়ে সংস্কৃত টীকা ও বাংলা অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃত ছন্দের আরও পরিচয় লাভের জন্য চেষ্টিত হয়েছিলাম। তখনই দেখেছিলাম পথ্যাবক্ত্র ও বিপুলার ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে আছে যথাক্রমে 'দল' ও 'শকল' শব্দ। বুঝতে কোনো কষ্ট হল না যে, এই দুটি শব্দ একই অর্থে, অর্থাৎ 'খণ্ড' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। টীকাতেও তার সমর্থন পাওয়া গেল। অবশ্য এসব স্থলে খণ্ড বা অংশ বলতে অধিকাংশই বুঝিয়েছে। কিন্তু ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে দল শব্দটি যে একমাত্র 'অর্ধাংশই' বোঝায় তা নয়। যেমন প্রাকৃত 'দণ্ডকল' ছন্দে (প্রাকৃত পৈঙ্গলসূত্র ১।২৭৯) 'দল' শব্দের অর্থ সংশয়াতীত রূপেই চতুর্থাংশ। দণ্ডকল ছন্দের মূল সংজ্ঞাসূত্রেই প্রথম পংক্তিতে যাকে বলা হয়েছে 'দল', দ্বিতীয় পংক্তিতে তাকেই বলা হয়েছে 'পদ'। আর, চারটি 'দ্বাত্রিংশন্মাত্রিক' দল (বা পদ) নিয়েই দণ্ডকল ছন্দ গঠিত হয়। টীকাকার রাও 'দল' শব্দের অর্থ করেছেন পদ, পাদ বা চরণ। এরপরে আর লেশমাত্রও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভারতীয় ছন্দশাস্ত্রেও 'দল' শব্দের অর্থ অংশ বা খণ্ড সে অংশ অর্ধাংশও হতে পারে, চতুর্থাংশও হতে পারে।

অমূল্যবাবু জানিয়েছেন— 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের একজন প্রবীণ অধ্যাপক বলেন যে মন্ত্রের ছন্দ সম্পর্কে 'দল' শব্দের ব্যবহার আছে। 'দল' শব্দের অর্থ ছন্দোবন্ধের এক-একটি চরণ। বৈদিক গায়ত্রী ছন্দে থাকে তিনটি অষ্টাক্ষর দল।'—এই মূল্যবান তথ্যটির জন্য আমি অমূল্যবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি যদি এই তথ্যের উৎস নির্দেশ করতেন, অর্থাৎ বৈদিক ছন্দ সম্পর্কে কোথায় 'দল' শব্দের প্রয়োগ আছে তা যদি জানাতেন তা হলে আরও উপকৃত হতাম। অধিকাংশ বৈদিক ছন্দে থাকে চার পদ, পাদ বা চরণ (বস্তুতঃ পদ বা পাদ শব্দের একটি অর্থই হল চতুর্থাংশ, স্মরণীয় পোয়া বা পাও শব্দের অর্থ), আর গায়ত্রী ছন্দে থাকে তিন পাদ। তাতে বোঝা যায় বৈদিক সাহিত্যের রচনা ভেদে দল মানে হয় তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ। অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে যে 'দল' শব্দের দ্বারা রচনা ভেদে ছন্দোবন্ধের দ্বিতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ সূচিত হয়, একথা আগেই বলা হয়েছে।

মনিএর উইলিঅমস ও ভোলাশংকর ব্যাসের উক্তিকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলে ধরে নিয়ে অমূল্যবাবু বলেছেন—ছন্দঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত 'দল' শব্দের অর্থ হেমিস্টিক অর্থাৎ হাফ লাইন অফ ভার্স, ভাষান্তরে অর্ধালী অর্থাৎ ছত্রের বা অর্ধভাগ। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি, এ বিষয়ে উক্ত দুই জনের একজনও সর্বতোভাবে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা যায় না। মহামনীষী মনিএর উইলিঅমসের অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার সবিস্ময় শ্রদ্ধার অন্ত নেই। তা বলে তাঁর সমস্ত উক্তিকেই নির্বিচারে মেনে নেবার মানসিকতাও আমার নেই। আমি বিশ্বাস করি মহামনস্বীদেরও ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। 'দল' বলতে অনেক সময় শ্লোকার্ধ বোঝায় বটে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। বস্তুতঃ দ্বিপাদ শ্লোক অর্থাৎ দ্বিপদীর ক্ষেত্রে 'দল' শব্দের দ্বারা স্বভাবতঃই শ্লোকার্ধ বোঝায়, কিন্তু চতুষ্পাদ ছন্দের ক্ষেত্রে 'দল' শব্দের দ্বারা সূচিত হয় শ্লোকের চতুর্থাংশ, যেমন—ঝুল্লণা দ্বিপাদ ছন্দ (কাপলেট ডিসটিকল), তাই এ ছন্দের প্রসঙ্গে দল মানে হয় ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশ। ঝুল্লণার প্রতি দলে (অর্থাৎ পাদে) থাকে ১০+১০+১৭=৩৭ মাত্রা। পক্ষান্তরে, দণ্ডকল চতুষ্পাদ ছন্দ (কুয়াড্রুপ্লেট, টেট্রাসটিক), তাই এই ছন্দের প্রসঙ্গে দল মানে ছন্দোবন্ধের চতুর্থাংশ। দণ্ডকল ছন্দের প্রতি দলে (অর্থাৎ পাদে) থাকে ৪×৪+৬+৭×২+২=৩২ মাত্রা।

বৈদিক গায়ত্রী ত্রিপাদ ছন্দ (ট্রিপলেট ট্রাইসটিক), আর অমূল্যবাবুই বলেছেন—এ ছন্দে থাকে 'তিনটি অষ্টাক্ষর দল'। তাঁর এই উক্তি অবশ্য-স্বীকার্য। সুতরাং একথাও স্বীকার করতে হবে যে, গায়ত্রী ছন্দের প্রসঙ্গে দল বলতে বোঝায় ছন্দোবন্ধের তৃতীয়াংশ। মোট কথা—দ্বিপাদ, ত্রিপাদ ও চতুষ্পাদ ছন্দ-ভেদে দল মানে হয় যথাক্রমে ছন্দোবন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ। সুতরাং 'দল' শব্দের অর্থ সব ক্ষেত্রেই ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশ বা 'অর্ধালী' এমন অভিমত অভ্রান্ত বলে স্বীকার্য নয়।

মনিএর উইলিঅমসের মতে ছন্দশাস্ত্রে ব্যবহৃত 'দল' শব্দের অর্থ হেমিসটিক এবং অমূল্যবাবু তাই মেনে নিয়েছেন। আমার ইংরেজি ভাষার জ্ঞান অতি সামান্যই। তাই ভয়ে ভয়ে নিবেদন করছি, যেসব ছন্দের ক্ষেত্রে দল মানে হয় ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশ, সেসব ক্ষেত্রেও দলকে হেমিসটিক বলা যায় কি না সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। অমূল্যবাবু হাকলি ও মধুভার ছন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। দুটিই দ্বিপাদ ছন্দ। সুতরাং এ দুই ছন্দেই ছন্দোবন্ধের অর্ধাংশকে দল বলতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এ দুই ছন্দের প্রসঙ্গেও দলকে হেমিসটিক বলা যায় কি? অমূল্যবাবু নিজেই বলেছেন, হেমিসটিক মানে হাফ লাইন অফ ভার্স। অকসফোর্ড অভিধানেও তাই আছে। আর ওই অভিধানেই আছে ভার্স মানে মেট্রিকাল লাইন অর্থাৎ ছন্দ পংক্তি, পাদ বা চরণ। সুতরাং হেমিসটিক মানে হয় ছন্দপংক্তির বা চরণের অর্ধাংশ। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ সংস্কৃত-অধ্যাপক অমূল্যবাবুকে জানিয়েছেন—'দল শব্দের অর্থ ছন্দোবন্ধের এক-একটি চরণ', চরণের অর্ধাংশ নয়। তাই যদি হয় তবে দলকে হেমিসটিক বলা যায় কি করে? আমি মনে করি এ ক্ষেত্রে উক্ত প্রবীণ সংস্কৃত-অধ্যাপকের অভিমতই স্বীকার্য, মনিএর উইলিঅমসের অভিমত স্বীকারযোগ্য নয়। হাকলি, মধুভার, ঝুল্লণা প্রভৃতি দ্বিপাদ

ছন্দোবন্ধ (ডিসটিক) গায়ত্রীর ন্যায় ত্রিপাদ ছন্দোবন্ধ (ট্রিসটিক) এবং দন্ডকল্প প্রভৃতি চতুষ্পাদ ছন্দোবন্ধ (টেট্রাসটিক), সব ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটি ছন্দপংক্তি বা চরণকেই বলা যায় দল। অর্থাৎ সর্বত্রই দল মানে হয় চরণ অর্থাৎ পুরো লাইন অফ ভার্স, হাফ লাইন বা হেমিসটিক নয়। সুতরাং কোনো ক্ষেত্রেই এবং কোন অর্থেই দলকে হেমিসটিক বলা যায় না— ভার্স মানে চরণ বা ছন্দপংক্তি হলেও না, ভার্স মানে চরণ সমবায় অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ বা শ্লোক হলেও না। অমূল্যবাবু বলেছেন, বৈদিক গায়ত্রী ছন্দে থাকে তিনটি অষ্টাক্ষর দল। আমার জিজ্ঞাসা, গায়ত্রী ছন্দের এই তিনটি দলকে তিনটি হেমিসটিক বলা যাবে কি?

মনিএর উইলিঅমস ছান্দাসিক নন, তাই ছন্দশাস্ত্রোক্ত দল শব্দের অর্থনিরূপণে তাঁর ভুল হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু তিনি যখন 'দলনির্মোক' শব্দের অর্থ লেখেন লিফ-শেডিং, ভূর্জবৃক্ষ, তখন স্বীকার করতে হবে স্বক্ষেত্রেও তাঁকে সর্বতোভাবে অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়। তাঁর জানা উচিত ছিল 'দলনির্মোক' শব্দের দল মানে গাছের পাতা নয়, গাছের ছাল। বস্তুতঃ মহামনস্বীদেরও ভুল হতে পারে, অভ্রান্ত কেউ নয়। সকলের কথাই সশ্রদ্ধ ও নিরাসক্তচিত্তে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন জিজ্ঞাসু গবেষকের কর্তব্য। নির্বিচারে গ্রহণ বা বর্জন সবক্ষেত্রেই অবাঞ্ছনীয়।

ভোলাশংকর-প্রমুখ আধুনিক ব্যাসদের উক্তিকেও অভ্রান্ত বলে মেনে নেবার কোনো কারণ দেখি না, কারণ আধুনিককালীন ব্যাসবাক্য তো আসলে পাশ্চাত্য ভাষ্যবাক্যেরই প্রতিধ্বনিমাত্র। পূর্বে বলেছি মনিএর উইলিঅমসের মতো অবিশেষজ্ঞের পক্ষে ছন্দশাস্ত্রে প্রোক্ত দল শব্দের অর্থনিরূপণে ভ্রান্তি ঘটা বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রাকৃত পৈঙ্গলম্ গ্রন্থের সম্পাদক ও ব্যাখ্যাতা ভোলাশংকরবাবুর বোঝা উচিত ছিল যে, ছন্দশাস্ত্রে দল শব্দের দ্বারা 'অর্ধালী' অর্থাৎ শ্লোকার্ধ বা চরণার্ধ বোঝায় না, বোঝায় পুরো চরণ, পদ বা পাদ। কিন্তু তিনি বারবারই এই ভুল করেছেন। কারণ তিনি লক্ষ করেন নি যে, প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে 'দল' শব্দটি কোনো বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে পদ বা চরণ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে, আর ভাষ্যের এই তিন শব্দে বোঝায় পংক্তি-সমষ্টি শ্লোকাংশ অর্থাৎ ছন্দপংক্তি (ভার্স লাইন)। চরণ, পদ ও দল যে সমার্থক শব্দ, মালা ও চুলিআলা ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভোলাশংকর নিজেই তা স্বীকার করেছেন। মালা ও চুলিআলা, দুটিই দ্বিপাদ ছন্দ। সুতরাং স্বভাবতঃই এ ক্ষেত্রে চরণ, পদ ও দল শব্দের দ্বারা শ্লোকার্ধই সূচিত হয়। পক্ষান্তরে, চতুষ্পাদ দণ্ডকল ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে দল ও পদ এই দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে দল ও পদ শব্দের মানে শ্লোকের চতুর্থাংশ, অর্ধাংশ নয়। ভোলাশংকর এটুকু লক্ষ করেন নি। যেমন, দ্বিপাদ চুলিআলা ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে 'দল' নেই, আছে 'পদ'। তাই ভোলাশংকর অনায়াসেই বলতে পেরেছেন—'য়হাঁ পদ কা অর্থ দল য়া অর্ধালী হৈ'। অনুরূপভাবে চতুষ্কল দণ্ডকল ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রে উক্ত অভিন্নার্থক দল ও পদ শব্দ সম্পর্কে অনায়াসেই বলা যেত—'য়হাঁ দল ঔর পদ কা অর্থ চতুর্থাংশ হৈ।' কিন্তু এস্থলে তিনি নীরব। কারণ তিনি নির্বিচারে মনিএর উইলিঅমসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বীকার করে নিয়েছেন দল মানে হেমিসটিক আর হেমিসটিক-এর অনুবাদ করেছেন অর্ধালী। কিন্তু হেমিসটিক শব্দের অর্থ যে চরণার্ধ, শ্লোকার্ধ বা পুরো চরণ নয় তা ভেবে দেখাও নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছেন। পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের প্রতি নির্বিচার শ্রদ্ধার এই পরিণাম।

কিন্তু অমূল্যবাবুর ন্যায় ভাষাবিৎ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিও যে, উক্ত দুই পণ্ডিতের ভ্রান্তিটুকুকে সম্বল করে পরের 'ভ্রান্তি-নিরসনে' ব্রতী হলেন, সেটাই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কি হেমিসটিক, ডিসটিক, টেট্রাসটিক প্রভৃতি শব্দের যথার্থ তাৎপর্য কি তাও ভেবে দেখেন নি? আর, প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের মতে 'দল' শব্দের অর্থ যে 'ছন্দোবন্ধের এক একটি চরণ' একথা জেনে এবং মেনে নিয়েও তিনি কি করে মনিএর উইলিঅমস ও ভোলাশংকর ব্যাসের উক্তির নজিরে দলকে হেমিসটিক অর্থাৎ হাফ লাইন অফ ভার্স (চরণার্ধ) বলে স্বীকার করে নিলেন, সেটা আরও বিস্ময়ের বিষয়।

আমি আবার বলছি, আমার ইংরেজি ভাষার জ্ঞান অতি অগভীর। যদি কেউ বর্তমান প্রসঙ্গে আমার কোনো সম্ভাবিত ভুল দেখিয়ে দেন তবে কৃতজ্ঞচিত্তে তা মেনে নেব এবং উল্লিখিত মন্তব্য সানন্দে ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাহার করে নিতে দ্বিধা করব না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অমূল্যবাবুর 'নয় মাত্রার ছন্দ' প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের মাত্রা' নামে যে প্রবন্ধ (উদয়ন ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ) লেখেন তাতে প্রাকৃত ঝুল্লণা ও দণ্ডকল ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছিল। ঝুল্লণা ছন্দের যে সংজ্ঞাসূত্র ও সংস্কৃত টীকা রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন, সে-দুটিতেই দল শব্দের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই দলকে বলেছেন 'রূপকল্প'। আমার 'ছন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) পাদটীকায় আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছি—'দল' মানে ছন্দের বৃহত্তম বিভাগ বা চরণ (পৃ ১০৯) আর সংজ্ঞা পরিচয়-বিভাগে বলেছি—পূর্ববর্তীর বিভাগ (অর্থাৎ ছন্দ পংক্তি বা চরণ) অর্থে দল শব্দের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় না, কারণ এটি পারিভাষিক শব্দ নয় (পৃ ২৪৫)। তাছাড়া দল শব্দটিকে সিলেবল অর্থে পারিভাষিক শব্দরূপে প্রয়োগ সম্পর্কে আমার মতামতও ওই গ্রন্থের সংজ্ঞাবিভাগে নানা স্থানে প্রকাশ করেছিলাম। অমূল্যবাবু 'ছন্দ' গ্রন্থের আমার কৃত সম্পাদনার যথেষ্ট প্রতিকূল সমালোচনা করেছিলেন। বোধ করি তখন প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে 'দল' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আমার মতামত ও অর্থনিরূপণ অমূল্যবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল কিংবা উপেক্ষণীয় বলে বোধ হয়েছিল। নতুবা ছন্দশাস্ত্রোক্ত দল শব্দের অর্থ যে 'চরণ' তার সমর্থনে প্রবীণ সংস্কৃত-অধ্যাপকের অভিমত সংগ্রহে তিনি সচেষ্ট হতেন না এবং 'সিলেবল' অর্থে 'দল' শব্দটি ব্যবহারের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা কি জানেন যে, ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্রে শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—এ রকম অশোভন উক্তি করতেও সাহসী হতেন না।

৪

মোট কথা, 'দল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত আসল অর্থ যে অংশ বা খণ্ড তা সংস্কৃত, বাংলা বা হিন্দী সব অভিধানেই সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত। অধিকন্তু 'দ্বিদল' শব্দটিও অভিধানে পাওয়া যায়। মনিয়ের উইলিঅমসের মতে এ শব্দটির অর্থ এসেন্সিয়ালি ইন টু, আপ্তের মতে হ্যাভিং টু পার্টস আর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'দ্বিদল' মানে 'ভাগদ্বয়যুক্ত'। তাই যদি হয় তবে দ্বিদল ত্রিদল, চতুর্দল শব্দ ইত্যাদি রকম প্রয়োগ অসিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হতে পারে না।

শৈশবকালে পরম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ পড়েই আমার বিদ্যারম্ভ হয়েছিল, আকার-ইকার শেখার আগেই এই বইএ পড়েছিলাম—'সরস দল পনস-ফল'। সে কথা আজও মনে আছে। ছন্দ ও মিলের গুণেই এই উক্তিটি (আরও অনেক উক্তির মতোই) আমার শিশুমনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, তখন তার অর্থবোধের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিনি। ইস্কুলের উচ্চতর পর্বে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয়লাভের পর সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম 'দল' মানে খণ্ড, আর এখানে তার মানে পনসফলের অর্থাৎ কাঁঠালের কোয়া। অথচ কোনো অভিধানে বা সাহিত্যে 'দল' শব্দের এই অর্থ পাওয়া যায়নি; তবু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রই স্বীকার করবেন যে, এখানে 'দল' শব্দটি অতি সুপ্রযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ কাঁঠালের কোয়া অর্থে 'দল' শব্দ ব্যবহার করে মদনমোহন ভাষারীতি কিছুমাত্র লঙ্ঘন করেননি। এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কারণ প্রসঙ্গ বা বিষয়ভেদে শব্দের তাৎপর্যভেদ হয়, এটি একটি সর্বস্বীকৃত সত্য। তাই পর্ব শব্দের মূল অর্থ (দুই সন্ধির মধ্যবর্তী অংশ) বাঁশ বেত ইক্ষু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ, শরীরের অঙ্গ, মহাভারতাদি গ্রন্থ, ইতিহাসের কাল, সোপানপঙ্‌ক্তি, ছন্দপঙ্‌ক্তি ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন তাৎপর্য পরিগ্রহ ক'রে। 'দল' শব্দের মূল অর্থও (অংশ, খণ্ড) তেমনি বিষয় বা প্রসঙ্গ ভেদে বিভিন্ন তাৎপর্য বহন করতে পারে। যেমন বেণুদল, সৈন্যদল, বীজদল, ফুলের দল, পণস-দলের দল, ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের দল। এই নীতি অনুসারে পূর্বাগত সাহিত্যিক নজির বা অভিধানিক প্রয়োগ না থাকলেও নূতন নজির স্থাপনে কোনো বাধা নেই, অর্থাৎ পুরাতন শব্দের মূল অর্থ'কে নূতন ক্ষেত্রে নূতন তাৎপর্যে অনায়াসেই ব্যবহার করা যেতে পারে, ব্যবহৃত হয়েও থাকে। এ বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। এই সূত্র অনুসারেই কালিদাস সিঁড়ির ধাপকে বলেছেন পর্ব, সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-পঙ্‌ক্তির যতিবিভাগকে বলেছেন পর্ব, আর মদনমোহন কাঁঠালের কোয়াকে বলেছেন, দল, প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রীরা শ্লোকের অংশকে বলেছেন দল। আমি এই নীতি অনুসারেই শব্দের উচ্চারণ বিভাগকে বলেছি 'দল'। অপরাধ হয়েছে বলে মনে করিনে। কারণ তাতে 'দল' শব্দের মূল অর্থ ব্যাহত হয় নি। শব্দের আসল অর্থকে বিকৃত না করে তাকে নূতন ক্ষেত্রে নূতন তাৎপর্যে প্রয়োগ করার অধিকার আমারও আছে, যেমন ছিল মদনমোহনের ও সত্যেন্দ্রনাথের।

এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমারের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেন—'মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে বিশেষ পরিভাষার যে প্রয়োজন আছে, একথা মানতেই হবে। রামমোহন বাংলা ব্যাকরণশাস্ত্রের নূতন পরিভাষা রচনা করে মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।'—ব্যাকরণকার রামমোহন, 'মনীষী স্মরণে', পৃ ৪। রামমোহন বাংলা ছন্দ-আলোচনাতে সিলেবল্-বোধক নূতন পরিভাষা রচনার আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন, কারণ বাংলা 'অক্ষর' ও ইংরেজি সিলেবল্ যে অভিন্নার্থক নয় একথা তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন। তাঁর রচিত সিলেবল্-এর প্রতিশব্দ 'ধ্বন্যাঘাত', এই শব্দটি সুব্যবহার্য নয় বলে আজকের দিনে গ্রাহ্য না হতে পারে, কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনার যে প্রয়োজন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আমি রামমোহনের আদর্শ অনুসরণ করেই সিলেবল্ অর্থে 'দল' শব্দটি বেছে নিয়েছি। তাতে সুনীতিকুমারের উল্লিখিত নীতিসূত্রটিও লঙ্ঘিত হয়নি। প্রয়োজনবোধে রামমোহন কোনো কোনো সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দকে পূর্বোপূর্বের সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার না করে কিছু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন, যেমন 'কারক' শব্দটি। রবীন্দ্রনাথও তেমনি 'মাত্রা' শব্দ-টিকে সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ না করে তার আভিধানিক অর্থে (ইউনিট অফ মেজার অর্থে) ব্যবহার করেছেন। আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'দল' শব্দটিকে সিলেব্‌ল্ অর্থে, মানে শব্দের উচ্চারণ বিভাগ অর্থে প্রয়োগ করে থাকি। সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে খণ্ড বা শকল-বোধক 'দল' শব্দটি পদ, পাদ বা চরণের প্রতিশব্দ রূপেই ব্যবহৃত হয়, কোনো বিশেষ পারিভাষিক অর্থে নয়। আর 'দল' শব্দের প্রয়োগও অতি বিরল। এটি যদি পারিভাষিক শব্দ হত তবে এটির প্রয়োগ এত বিরল হত না। আমি 'দল' শব্দের ধাতুগত খণ্ড-অর্থ বজায় রেখে এবং শব্দের উচ্চারণ বিভাগ অর্থে গ্রহণ করে এই শব্দটির উপরে পারিভাষিকতা আরোপ করেছি। আমি জানি বিচক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন তাতে ভাষাগত বা পরিভাষা রচনার নীতি-গত কোনো অপরাধ হয়নি। তাছাড়া, তাতে ব্যবহারগত কোনো অসুবিধাও দেখা দেয়নি। কারণ বাংলায় ছন্দের পদ, চরণ বা পংক্তিকে, এমনকি শ্লোকার্ধ বা অর্ধালীকেও কখনও 'দল' বলা হয় না। বরং ছন্দের চরণকে, কিংবা যুগ্মকের (কাপলেটের) অর্ধাংশকে বাংলায় 'দল' নামে চিহ্নিত করতে গেলেই বিভ্রান্তি ঘটবে। পক্ষান্তরে আমি অন্ততঃ পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—দল, মুক্তদল ও রুদ্ধদল, এই তিনটি শব্দ ব্যবহারের ফলে ছন্দ বোঝা এবং বোঝানো অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। ছন্দ-ব্যাকরণ আগে যাদের কাছে আতঙ্কজনক ছিল, এখন তাদের পক্ষেও সহজবোধ্য ও আগ্রহের বিষয় হয়েছে। কবি-ছান্দসিক নীরেন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, এক হিসাবে এই তিনটি শব্দ হচ্ছে ছন্দশাস্ত্রের 'সব-খোল চাবি'—('কবিতার ক্লাস' তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ৯৪)। আশা করি তাতে

ছন্দোজ্ঞ পাঠকসমাজের কাছে অত্যুক্তি-অপরাধে অভিযুক্ত হব না।

বাংলা ভাষায় বর্তমানে খণ্ডার্থে 'দল' শব্দের প্রয়োগ নেই বলা চলে। কিন্তু এক সময়ে যে ছিল তার প্রমাণস্বরূপ দলা, ডেলা, ঢেলা, ঢিল প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যায়। আভিধানিক ও ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন এসব শব্দ খণ্ডার্থক দল শব্দ থেকেই উৎপন্ন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। শব্দকল্পদ্রুমে আছে : দলনী—লোষ্ট্রম 'ডেলা' ইতিভাষা; দলিঃ—লোষ্ট্রম 'দলা' ইতি 'ডেলা' ইতি চ ভাষা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে আছে : ডেলা (সং দল)—শুষ্ক মৃত্তিকা 'খণ্ড', ঢিল। সুনীতিকুমারের ও ভি বি এল গ্রন্থে আছে : ঢেলা ডিল—ক্লড, পিস অফ স্টোন। যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাংলা শব্দকোষে আছে : ঢিল (সং দলি, দলনী)—মৃৎখণ্ড, পাটি কালভাঙ্গা ইট। আসলে বলা উচিত পাটিকালের টুকরো। 'ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়' কথার অর্থ—ঢিল (ইটের টুকরো) মারলে পাটকেল (আস্ত ইট) খেতে হয়। এগুলি ছাড়া ডাল (শাখা), দাইল-ডাইল-ডাল' (পালস্) প্রভৃতি শব্দও খণ্ডার্থক 'দল' থেকে উৎপন্ন। ডাইল (সং দল)—দলিত (খণ্ডিত) মুগ, মসুর ইত্যাদি। ও ডি বি এল এ আছে ডাল, ডাইল (দাইল, দালি) এসপ্লিট পালস (দালিত)। হিন্দী 'দালিয়া' শব্দের অর্থ খণ্ড খণ্ড করা গম (গমের খুদ), আর 'দলদার' মানে মোটা দল (টুকরো)-ওয়ালা)। বাংলায় অনুরূপ শব্দ দলুয়া (দলো চিনি)। যোগেশচন্দ্রের বাঙ্গালা শব্দকোষে আছে : দলুয়া—সং দল (খণ্ড)+উয়া। দলুয়া শব্দের আসল অর্থ মোটা গুঁড়ো-ওয়ালা চিনি।

বোঝা যাচ্ছে, এককালে খণ্ড বা টুকরো অর্থে 'দল' শব্দের প্রয়োগ বিরল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে 'দল' নানা তদভব শব্দে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। খণ্ড অর্থে মূল 'দল' শব্দের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। এখন যদি এই খণ্ডার্থক দল শব্দটিকে সিলেবল-বাচক শব্দাংশ অর্থে প্রচলিত করা যায় তাহলে তা ভাষাগত ঐতিহ্যবিরুদ্ধ হবে না, অধিকন্তু তাতে নূতনত্বের সুফলও পাওয়া যাবে। বর্তমান প্রসঙ্গে শব্দটি সম্পূর্ণ নূতন এবং নূতন বলেই পূর্বসংস্কারজাত ভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। নূতন পারিভাষিক শব্দের এই একটা বিশেষ গুণ। এই শব্দটির আর একটি বড় গুণ এই যে, এটি দ্ব্যর্থতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, ফলে ছন্দের প্রসঙ্গে এটির কোনো দ্বিতীয় অর্থে গৃহীত হবার আশংকা নেই। পর্ব শব্দটিও সমভাবে এই সমস্ত সুবিধা বা গুণের অধিকারী। 'অক্ষর' সম্বন্ধে তা বলা যায় না। 'অক্ষর' শব্দ দ্ব্যর্থতামুক্ত নয়, পূর্বাগত বিভিন্ন সংস্কার এ শব্দের পারিভাষিক অর্থগ্রহণে পদে-পদেই ভ্রান্তি ঘটায়। তাই ছন্দের আলোচনায় আমি 'অক্ষর' শব্দ পরিহার করা সর্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

৫

অমূল্যবাবু বলেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে সিলেবল্ অর্থে 'শব্দ-পাপড়ি' কথাটা 'একবার' মাত্র ব্যবহার করেছিলেন। আমি তো অন্ততঃ চারবার পেয়েছি—চারবার মানেই বারবার। প্রত্যেকবারই ইংরেজি সিলেবল্ শব্দটিও দিয়েছেন তার সঙ্গে। তাছাড়া, সিলেবল্ বোঝাবার জন্য 'অক্ষর' বা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি। এটা তাঁর সতর্কতারই পরিচায়ক। অমূল্যবাবু আরও বলেছেন—'হয়তো সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই 'শব্দ-পাপড়ি' কথাটার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কেহ কেহ সিলেবল্-র প্রতিশব্দ হিসাবে 'দল' শব্দটি ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ একটা রূপক হিসাবেই 'শব্দ-পাপড়ি' কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলেন।' অমূল্যবাবুর এই উক্তিতে আমি কৌতুক বোধ করেছি। অবশ্য 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'-র মতো স্বল্পশ্রুত ছোট্ট 'হয়ত' শব্দটির জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কৌতুক বোধ করেছি কেন বলছি। আমি তো ইস্কুলে পড়ার সময়েই পণ্ডিত মশায়, সংস্কৃত ব্যাকরণ, আপ্তের অভিধান ও ছন্দোমঞ্জরীর কৃপায় 'দল' শব্দের আসল অর্থ যে খণ্ড তা জেনেছিলাম। 'সৈন্যদল' শব্দের ব্যাসবাক্য নিরূপণ করতে গিয়েই বোধ হয় এ বিষয়ে আমার প্রথম চেতনা হয়েছিল। কাজেই আমার ধারণা হয়েছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে 'দল' শব্দের ধাতুগত অর্থ অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলায় 'দল' শব্দের খণ্ডার্থ অধুনা প্রচলিত না থাকায় প্রথম থেকেই এটিকে তার মৌলিক অর্থে চালাতে গেলে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে এ আশঙ্কা ছিল মনে। তাই কিছুকাল ইতস্ততঃ করে পরে একটু একটু করে চালাতে চেষ্টিত হই। প্রথমে তিন-চারবার শুধু দ্বিদল ও ত্রিদল শব্দ-দুটি চালালাম ইংরেজি প্রতিশব্দসহ। রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনও পাওয়া গেল। আর কারও কাছ থেকে কোনো আপত্তি শোনা গেল না। এভাবে প্রায় ষোলো-সতেরো বছর ওই দুটি শব্দই (দ্বিদল-ত্রিদল) চলল ইংরেজি প্রতিশব্দসহ। মনে রাখা দরকার এই দীর্ঘকাল আমি 'দল' শব্দের ধাতুগত ব্যাখ্যা দেবার কিংবা কোনো রূপকার্থের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। বিশেষজ্ঞ পাঠকের সংস্কৃত ভাষাবোধের উপরেই ছিল আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভর। তারপরে যখন সংস্কৃতজ্ঞ-অসংস্কৃতজ্ঞ-নির্বিশেষে সকলের অভিমত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই (১৩৫৫ সাল) তখন সত্যেন্দ্রনাথের 'শব্দ-পাপড়ি' কথাটার উল্লেখ করি অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের বোধগম্যতার অনুরোধে, সংস্কৃতজ্ঞদের জন্য নয়। পূর্বেই বলেছি বিশেষজ্ঞদের অভিমত-সংগ্রহের এই প্রচেষ্টা আমার পক্ষে আশানুরূপ ফলপ্রদ হয়নি। 'দল' সম্বন্ধে অভিমত পেয়েছিলাম মাত্র দুজনের কাছ থেকে। একজন পরলোকগত অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তিনি ভাল সংস্কৃত জানতেন। তাই তিনি রূপকার্থের অভিযোগ করেন নি। তাঁর যেটুকু আপত্তি তা অন্যরকম। তাঁর বক্তব্য এই—বাঙলায় দল শব্দটি অংশার্থ অপেক্ষা সমূহার্থেই গ্রহণ করে বেশি, সুতরাং বাংলায় সাধারণতঃ 'শব্দদল'

শব্দের অংশ না বুঝাইয়া শব্দের সমূহও বুঝাইতে পারে। অবশ্য পারিভাষিক অর্থে চালু হইয়া গেলে বোধ হয় এই দ্ব্যর্থতার গোলমাল নাও থাকিতে পারে।' তাঁর এই অভিমত সর্বতোভাবে সত্য। আসল কথা এই যে, তিনি 'দল' শব্দের অংশার্থ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তবু ভুল বোঝার অবকাশ কোথায়, সে বিষয়ে তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পরে আমি তাঁকে বলেছিলাম, যদি 'শব্দদল' না বলে 'শব্দের দল' কিংবা প্রয়োজনমত শুধু 'দল' বলি (যেমন—'দ্বিদল শব্দ', কিংবা 'এই শব্দে দল আছে দুটি' ইত্যাদি) তাহলে কি ভুল বোঝার অবকাশ থাকবে? তিনি বলেছিলেন, বিনা দ্বিধায় ওরকম ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে দ্ব্যর্থতার কোনো সম্ভাবনা নেই। তখন (১৯৪১ মার্চ) থেকে 'দল' শব্দটি এইভাবে ব্যবহার করছি। কারও বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বলে শুনিনি। এ বিষয়ে অধ্যাপক ভবতোষ দত্তও তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন। 'দল' শব্দের অংশার্থ সম্বন্ধে তিনি শশীবাবুর মতো সচেতন ছিলেন না। তাই তিনি অমূল্যবাবুর মতই এ শব্দটির রূপকার্থতার প্রসঙ্গ তুলে কিছু আপত্তি জানিয়েছিলেন— ব্যবহারোপযোগী (হ্যান্ডি) বলে 'দল' শব্দটি সুন্দর। শব্দটি ছোটো, শুনতেও ভালো। এর সম্বন্ধে আপত্তি শুধু এই হতে পারে: শব্দটি ডায়রেক্ট নয়। এটার ব্যবহার হচ্ছে রূপকার্থে (ফিগারেটিভ) এ প্রসঙ্গে তিনিও সত্যেন্দ্রনাথের 'পাপড়ি' শব্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। বস্তুত 'দল' শব্দটি অভিধেয়ার্থে মানে বাচ্যার্থে এ ডাইরেক্ট অর্থেই শব্দাংশ বা সিলেবল বোঝাতে পারে। ফুলের (এমন কি পণসাদি ফলেরও) স্বাভাবিক অংশকে যে-কারণে বলা হয় 'দল' ঠিক সেই কারণেই উচ্চারিত শব্দের স্বাভাবিক অংশকেও 'দল' বলা যেতে পারে। তাতে আপত্তির কোনো হেতু থাকতে পারে বলে মনে করি না। তাছাড়া সাদৃশ্যহেতু শব্দের অর্থবিস্তার সব ভাষারই একটা স্বীকৃত নীতি। শুধু বাচ্যার্থ নিয়ে থাকলে ভাষার পঙ্গুতা ও মানুষের চিন্তার প্রকাশক্ষেত্রের সংকীর্ণতা ঘুচত না। পত্র বা পাতা আজকাল আর শুধু গাছের সম্পত্তি নয়। চিঠিপত্র, কাগজপত্র, তাম্রপত্র, ভূর্জপত্র (বল্কল), অক্ষিপত্র (চোখের পাতা) পায়ের পাতা, লোহার পাত ইত্যাদি স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এসব পত্র বা পাতা আর রূপকার্থক বলে গণ্য হয় না, বাচ্যার্থক বলেই স্বীকৃত হয়। পরিভাষা-রচনার ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যসূচক শব্দ একেবারে অচল নয়। যথাক্রমে ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দশাস্ত্রের ফুট, পদ বা চরণ এবং ত্রিপদী-চৌপদী মূলতঃ সাদৃশ্যসূচক হলেও এখন বাচ্যার্থের অধিকারী হয়েছে। আর মূলতঃ যা ছিল দেহাঙ্গবোধক প্রসঙ্গ ও প্রয়োগভেদে এখন তা-ই তিন ভাষায় তিন অর্থ বোঝায়। অনুরূপভাবে 'দল' শব্দটি বাংলায় সিলেবল অর্থেই রূঢ় হয়েছে। সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দে 'দল' মানে শ্লোকাংশ হলেও বাংলায় তাকে শব্দাংশ অর্থেই স্বীকার করে নিয়েছি। 'দল' শব্দ সংস্কৃত-প্রাকৃতে অপারিভাষিক, পদ বা চরণের প্রতিশব্দ মাত্র; বাংলায় 'দল' পারিভাষিক, অন্য কোনো শব্দের প্রতিরূপ নয়। স্মরণীয়, সংস্কৃত-প্রাকৃতে 'পদ' শব্দ ছন্দপংক্তি-জ্ঞাপক আর বাংলা 'পদ' মানে ছন্দপংক্তির বিভাগ, সমগ্র ছন্দপক্তি নয়। যেমন—ত্রিপদী বা চৌপদী পংক্তি।

উপরে বলেছি শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমাকে জানিয়েছিলেন 'বাংলায় দল শব্দটি অংশার্থ অপেক্ষা সমূহার্থই গ্রহণ করে বেশী।' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষেও বলা হয়েছে 'বাংলায়' দল শব্দের অর্থ 'সমূহ, সমবায়'। তাতে মনে হয় তাঁর মতে ছাত্রদল, দস্যুদল প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত প্রয়োগসম্মত নয়। বস্তুতঃ কোনো সংস্কৃত অভিধানে 'দল' শব্দের সমূহার্থের উল্লেখ দেখিনি সংস্কৃত সাহিত্যেও সমূহার্থক দল শব্দ পাইনি। তাই জানতে ইচ্ছা হয় বঙ্কিম-রচিত বন্দেমাতরম গানের 'দ্রুমদল-শোভিনীং' ও 'রিপুদলবারিণীং' এবং রবীন্দ্রনাথের 'অতিথিবালতঅরুদল' প্রভৃতি শব্দকে সংস্কৃত রীতিসম্মত বলে স্বীকার করা যায় কি? হয়তো অর্বাচীন সংস্কৃত বা প্রাকৃতে দল শব্দের সমূহার্থক প্রয়োগ দেখা দিয়েছিল। যদি তা-ই হয় তবে কখন থেকে ও কিভাবে দল শব্দের এই অর্থান্তর ঘটল এবং বাংলায়ও স্বীকৃত হল তা অনুসন্ধানের বিষয় বলেই মনে করি।

৬

অমূল্যবাবু বলেছেন, 'তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) সিলেবল অর্থে 'দল' কথাটি কখনও প্রয়োগ করেন নাই। অন্য কোনও ছন্দোবিদ বা লেখকও পূর্বে করেন নাই। কোনও অভিধানে এই প্রয়োগের সমর্থন পাওয়া যায় না।...অতএব সিলেবল-এর প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।' এই উক্তির প্রথম তাৎপর্য এই যে, আভিধানিক বা অন্যবিধ পূর্ব নজির না থাকলে কোনো নতুন পারিভাষিক শব্দ রচনা করা অনধিকারচর্চা। তাই যদি হয় তবে প্রথমেই সুনীতিকুমারের রচিত অনেকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষাকে বাতিল করে দিতে হয়। তা ছাড়া রামমোহন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা বিষয়ে যেসব নূতন পরিভাষা রচিত হয়েছে সবই অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এমন কি সত্যেন্দ্রনাথের 'পর্ব' শব্দটিও বর্জন করতে হয়। তাঁর উক্তির দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, সত্যেন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো ছন্দোবিৎ (কিংবা লেখক) যদি আমার পূর্বে 'দল' শব্দটি প্রয়োগ করতেন তাহলে অমূল্যবাবুর কোনো আপত্তি থাকত না। অমূল্যবাবু নিজের অভিরুচি অনুসারে কার রচিত পরিভাষা গ্রহণ করবেন আর কার পরিভাষা বর্জন করবেন সে বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। তবে আমার একটা বিশ্বাস আছে যে, নূতন পরিভাষা কাউকে-না-কাউকে বিনা নজিরেই প্রথম প্রবর্তন করতে হয়। আমার এ বিশ্বাসটা অমূলক কিনা তার বিচার অন্যরাই করুন। 'দল' শব্দটা আমিই প্রথম প্রবর্তন করেছি একথা আমি কবুল করেছি। ছন্দোবিৎরা নিজের ইচ্ছামতো এ শব্দটা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। অন্যের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায় বা ক্ষমতা আমার নেই। 'কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ'—জাতীয় অভিমানও আমার নেই। অমূল্যবাবু বা অন্য কেউ 'দল' শব্দের চেয়ে সুষ্ঠুতর কোনো পরিভাষা উদ্ভাবন করলে আমি সানন্দে মেনে নিতে রাজী আছি। ছন্দাসিকরা দল শব্দটা স্বীকার করে নিলে আমার কীর্তির খাতায় একটা মোটা অঙ্ক জমা পড়বে এমন প্রত্যাশা আর স্বীকৃত না হলে আমার জমার অঙ্ক শূন্য হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা আমি করি না। কিন্তু ওই বে-নজির ও বেয়াবা খুদে শব্দটা সমালোচকের তর্জনী কম্পনে ভীত হয়ে আপন দখল ছেড়ে পালাবে এমন কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নতুন পরিভাষা রচনায় শ্রেণীবিন্যাসের কতকগুলি স্বীকৃত নীতি ও সূত্র আছে। ছন্দশাস্ত্রের পরিভাষা রচনা ও শ্রেণীবিন্যাসের কাজে হাত দেবার পূর্বে এই নীতিসূত্রগুলি ভাল করে অধিগত করে নিতে চেষ্টিত হয়েছিলাম। ওই শিক্ষারই অন্যতম ফল ওই খুদে 'দল' শব্দটি। আমার শিক্ষার ফলাফল নির্ভর করছে আমার সমালোচক পরীক্ষকদের বিচার বিবেচনার উপরে। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু জানিয়ে রাখতে পারি যে, পরীক্ষার ব্যাপারে আমি বরাবরের মতো এখনও গীতার 'মা ফলেষু কদাচন' নীতির পক্ষপাতী। কিন্তু কর্মে আমার যে অধিকার আছে তার থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

'দল' সম্পর্কে আমার সর্বশেষ মতামত ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের ৪১৮-১৯, ৪২২-২৬, ৪৭৭ এবং ৪৭৯ পৃষ্ঠায়। ওই গ্রন্থের সব বক্তব্য বর্তমান আলোচনায় পুনরাবৃত্ত হয়নি। আগ্রহী পাঠক প্রয়োজন মতো ওই পৃষ্ঠাগুলি দেখে নিতে পারেন। তারপরেও যদি কোনো পাঠকের মনে এ বিষয়ে কোনো সংশয় বা প্রশ্ন থাকে তবে এই পত্রিকা-যোগে জানালে আমি যথাসাধ্য আমার বক্তব্য স্পষ্টতর করতে চেষ্টিত হব। কিন্তু যিনিই এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করুন তাঁর কাছে আমি শিষ্টরীতিসম্মত ভাষা ও যুক্তিনিষ্ঠতা প্রত্যাশা করব। কারণ অসংযত ভাষা প্রয়োগে ও অপর পক্ষের তথ্য যুক্তি খণ্ডন না করে তার সিদ্ধান্তকে পরোক্ষে ও এক-তরফা ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা (যা'কে বলে এক কথায় নস্যাৎ করা) সত্য নিরূপণের সদুপায় নয়। তা ছাড়া যেসব ক্ষেত্রে তর্ক-যুদ্ধে উগ্রতেজ, শেষ যুদ্ধে গালি নীতি অনুসৃত হয়, সেসব স্থান থেকে দূরে থাকাই আমি সংগত মনে করি।

জানেন,
এমন কিছু জিনিস
আছে যা
বিনীও
বদলাতে চায় না!
ভাগ্যিস!
কিছু জিনিস কখনো বদলায় না!
আজকাল স্বাভাবিক, সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের
প্রকাশ দেখেও তৃপ্তি! আর ভাল লাগে বিনীর
অপরিবর্তনীয় উচ্চ মান।
স্থায়িত্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক — ফ্যাশানের
চূড়ান্ত — অপূর্ব সমন্বয়... বিনীর অবদান!
স্বচক্ষে দেখুন — অজস্র রঙের মেলা,
অসংখ্য ফ্যাশানের বাহার! বিনীর
টেরীন ব্লেন্ডসের পোষাক
তৈরী করিয়ে
আনন্দ পাবেন।
ফ্যাশানে দুরন্ত অথচ টেঁকসই —
এমন কাপড় যা শুধু বিনীই বানাতে পারে।
বিনী 'টেরীন' ব্লেন্ডস্
Interpub/BB/55/75 Ben

একলা জেগে ॥

জয়ন্তকুমার

ঘরের মধ্যে একলা জেগে প্রহর গুনি।
মাঝে মাঝে টেলিফোনের আওয়াজ আসে,
বহুদূরের আলাপ শুনি—
কতদিন যে দেখা হয় না, জয়ন্ত রে,
এখনও তুই আগের মতই দূরে রইলি?

আশ্চর্য সব দূরের মানুষ টেলিফোনের প্রান্ত ধরে কাছে আসে,
ফিসফিসিয়ে কথা বলে, যেন শহর
ঘুমের মধ্যে জেগে থাকে মধ্যরাতে—
জয়ন্ত রে, এখনও তুই আগের মতই দূরে রইলি?

দূরে থাকার সকল প্রশ্ন বাতিল ক'রে
কাছে আসার চেষ্টা করি।
তখন আবার টেলিফোনের রং নাম্বার,
অলীক মানুষ অলীক কণ্ঠে প্রশ্ন করে—
জয়ন্ত রে, এখনও তুই আগের মতই দূরে রইলি?

মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আমন্ত্রণের চিঠি পাঠাইনি
কারো বিয়ের, জন্মদিনের, কিংবা কোনো মহোৎসবের।
মন পড়ে, এসব কথা মনে পড়ে—
জয়ন্ত রে, এখনও তুই আগের মতই দূরে রইলি?

শর্তকে ডিঙিয়ে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

দেখার নিজস্ব কিছু শর্ত থাকে
আমি সেই শর্তকে ডিঙিয়ে
মানবিক হতে যাই
রিরি করে হেসে ওঠে রোদ
মসৃণ সবুজ ঠোঁটে থমকে ওঠে
বশম্বদ টিয়া।

জ্যোৎস্না থেকে রস নিঙড়ে
জ্যোৎস্না-সার
অথবা নিখাদ কান্না
ছুঁড়ে দিয়ে বলতে পারি—
আমি এইভাবে জীবনকে দেখি।
দেখাব নিজস্ব কিছু শর্ত থাকে
ক্ষমি নয়, ফুটিফাটা মাঠে মাঠে
ঝরাধান খুঁজে ফেরে স্বপ্নের শালিখ,
দুঃখের নদীতে
ময়ূরপঙ্খিকে খোঁজে লহনা খুল্লনা
বাতাসে বাহিত হয় সম্মিলিত
গলিত শব ও ছাতিমফুলের ঘ্রাণ।
আমি এই শর্তকে ডিঙিয়ে
ঘোরানো সিঁড়ির মাথা থেকে
জীবনকে ঠেলে দিই।

নাটকে যা হাততালি পায়
জীবন তা ফিরেও দেখে না।

কুরুক্ষেত্র ছেড়ে ॥

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইখানে শুইয়ে দিও. জলা দুপুর, সবুজ মাঠ
অসমতল জমির ওপর
বাঁশবন, বিদ্যুৎ চমকে যাওয়া ঠান্ডা হাওয়ায়
সামান্য দুঃখবোধের মতন
অস্বচ্ছ পিছুটান
শ্যাওলা-জমা স্মৃতি-ফলক, বৃষ্টিতে ম্লান স্তব্ধ উলুখড়

এখানেই শুইয়ে দিও, তাহলে বোধহয়
মৃত্যু-মুহূর্তে
আমার তেমন কোনো কষ্ট হবে না

আজ বছরের প্রথম বৃষ্টি এলো, ঝড়হীন
সরলরেখার মত ঋজু
দুকূলে ঝাপসা করে, যেন শুরু হবে অভিনয়
ধূসর পর্দা সরে গেলে সবুজ পৃথিবী
দাসী থেকে পুনর্বার রাজরাণী হবে

দেবি, এইখানে রেখে ধনুর্বাণ
বিস্তৃত পৌরুষ ছেড়ে চলে যাবো শস্যহীন ঘরে

আমাকে শুইয়ে দিও এখানেই, তাহলে আমার
মৃত্যু-মুহূর্তে
হয়ত তেমন কোনো কষ্ট হবে না।

না। মনে করা যাক, দুটি পাম্প একযোগে একটি নলের মধ্যে তরল পদার্থ ঠেলে দিচ্ছে—এক্ষেত্রে একটি অপরটির সহায়ক, পুরো কাজটি হচ্ছে অংশে অংশে ভাগ হয়ে।

জীবের শরীরে নিজস্ব হৃৎপিণ্ডটি সরিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি হৃৎপিণ্ড পুনঃস্থাপন করার চেয়ে নিজস্ব হৃৎপিণ্ডটি রেখে দ্বিতীয় আরেকটি হৃৎপিণ্ড জুড়ে দেওয়াটা অনেক কম বিপজ্জনক, কৃৎকৌশলের দিক থেকে আরো সহজ, কার্যকারিতার দিক থেকে আরো ফলপ্রদ।

অসুবিধেও আছে—বাড়তি অঙ্গ চাইলেই পাওয়া যায় না। দাতার প্রশ্নটি সব সময়েই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কাজেই এমন যদি সম্ভব হয় যে জন্তুজানোয়ারের অঙ্গ মানুষের শরীরে বসানো যাচ্ছে তাহলে আর কোনো সমস্যাই থাকে না। প্রফেসর দেমিখভের গবেষণায় এই দিকটিও অন্তর্ভুক্ত। তিনি আশা করেন, কিছুকাল পরে মানুষের শরীরে একটি বাড়তি পাম্প হিসেবে কাজ করার জন্য অনায়াসেই শুকরের হৃৎপিণ্ড বসানো চলবে। এবং সেই জোড়া হৃৎপিণ্ড নিয়ে মানুষটি আরো অনেক বেশি দিন বাঁচবে।

কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ

মহাশূন্যে আপোলো-সয়ুজ সম্মিলন ঘটানোর কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মনুষ্য মহাকাশ-অভিযানের কোনো পরিকল্পনা নেই। আগামী কয়েকটি বছর ধরে মহাকাশ-গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রয়াস নিবদ্ধ থাকবে পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস-স্টেশন স্থাপনে এবং স্পেস স্টেশন ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে শাটল-সার্ভিস চালনায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এরোনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)-এর প্রশাসক ডঃ জেমস সি ফ্লেচার সম্প্রতি (২৯ জুলাই) মার্কিন কংগ্রেসে মহাকাশ-গবেষণায় ভবিষ্যতের কর্মসূচীর কিছু আভাস দিয়েছেন। তিনি জানান, আশা করা হচ্ছে মার্কিন স্পেস শাটল চলতে শুরু করবে ১৯৮০ সাল থেকে।

'নাসা'-র সহকারী অধিকর্তা ডঃ ডোনাল্ড পি হার্থ জানাচ্ছেন, মহাকাশ-গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সেরা উপায় হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থায়ী একটি স্পেস-স্টেশন এবং চাঁদের মাটিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি ঘাঁটি স্থাপন। দুটি কাজই এই শতকের মধ্যে হওয়া সম্ভব এবং হবেও। তবে চাঁদ ছাড়িয়ে অন্য কোনো গ্রহে মানুষের উপস্থিত হবার সম্ভাবনা এই শতকে নেই, আগামী শতকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মহাকাশ-গবেষণার কর্মসূচী গভীরভাবে সম্পর্কিত দেশের ও বিশ্বের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে। ভবিষ্যতের মহাকাশ-গবেষণা অবশ্যই সারা বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হবে। বিশেষ করে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতিবছর দুই-শতাংশ হারে বাড়ছে। এমনি বাড়তে বাড়তে আগামী ৫০০ বছরের মধ্যে তিনগুণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তখন খাদ্যের প্রয়োজন হবে এখনকার চেয়ে আরো ছগুণ অধিক। মহাকাশ-গবেষণা এক্ষেত্রে সহায়ক হবে আবহাওয়া ও জল সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ঋতু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা সারা বিশ্ব উপকৃত হবে।

তৃতীয় বিষয়, গ্রহ উপগ্রহ ও আবহমণ্ডলের উদ্ভব কি ভাবে?—এই প্রশ্নের জবাব। আমাদের এই বিশ্বের বয়স ১৫০০ কোটি বছর, আমাদের এই সূর্যের বয়স ৫০০ কোটি বছর। এই দুটি ঘটনার বিবর্তনের হদিশ জানা যাবে মহাকাশ-গবেষণা থেকে। কেননা স্থায়ী স্পেস-স্টেশন স্থাপনের পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই প্রথম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বিশ্বকে অবলোকনের সুযোগ পাবেন। সে তুলনায় বায়ুমণ্ডলের ভিতর থেকে এতদিনকার বিশ্ব-অবলোকন ছিল কালো ও নোংরা কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখার সামিল।

চুইংগাম

গাম চেবানোর অভ্যেস আমাদের দেশেও বাড়ছে—তবে, বলাই বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে খিদে নিয়েই থাকে, অপুষ্টি তো বটেই, তাদের পক্ষে চুইং গাম কেনাটাও যেমন বিলাসিতা তেমনি এই স্বাদহীন পুষ্টিহীন খাদ্যবস্তুহীন পদার্থটি অনবরত চিবিয়ে চলাটাও নিরর্থক। তবুও, যদি কারও ধারণা থাকে যে গাম চেবানোটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তা দূর করা দরকার। চিকিৎসকরা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, চুইং গাম চেবানোর অভ্যেস একটি বদ অভ্যেস। এ থেকে অজীর্ণতা ও পেটের অন্যান্য গোলমাল দেখা দেয়, মানসিক দুর্বলতা ঘটতে পারে, এমনকি পাগল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

সবাই এই মতের সমর্থক নন, ভিন্ন মতাবলম্বীরাও আছেন। তাঁদের ধারণা, চুইং গাম চেবালে মুখের গ্রন্থি থেকে প্রচুর লালা নিঃসরিত হয়, যা হজমের সহায়ক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদের বিশ্বাস, চুইং গাম চিবিয়ে চললে পেশীর টান দূর হয় ও নিঃসঙ্গতা কাটে (কোনো কোনো ধূমপায়ী যেমন সিগারেটকে সাথী মনে করে)। তাঁরা আরও বলেন, চুইং গাম চেবালে নাকি একঘেয়ে কাজ করতেও ক্লান্তি বোধ হয় না।

চুইং গামকে বলা চলে আমেরিকার অবদান। খোদ আমেরিকায় এই পদার্থটি প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮৬০-এর দশকে। তারপরে কিছুদিনের মধ্যেই গোটা দেশে চুইং গাম চেবানোর অভ্যেস প্রায় একটা নেশার মতো হয়ে ওঠে। এখন অবশ্য কমের দিকে, কিন্তু এখনো ও-দেশে বছরে ৩,০০০ কোটি পীস চুইং গাম বিক্রি হয়ে থাকে। তুলনায় আমাদের দেশে চুইং গামের বিক্রি প্রায় নগণ্য। কিন্তু বছরে বছরে এমন হারে বাড়ছে যে বিগত শতকের আমেরিকাকে ধরে ফেলাও অসম্ভব নয়। তাই আবার বলা দরকার, চুইং গাম চেবানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর; চুইং গাম চেবালে অজীর্ণতা ও পেটের গোলমাল হয়, মানসিক দুর্বলতা ঘটতে পারে, এমনকি পাগল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

একটা কিছু চেবানোর অভ্যেস মানুষের কাছে নতুন নয়। সেই প্রাচীনকালেও মানুষ ঘাস ও পাতা চেবাত। গ্রীকদের অভ্যেস

ছিল একজাতীয় গাছ থেকে পাওয়া রজন চেবানো। হাজার বছরেরও আগে মধ্য আমেরিকার মানুষেরা 'চিক্‌ল' গাম চেবাত। বলা হত, এই গাম চেবালে গলা কখনো শুকোয় না—বিশেষত গ্রীষ্মকালে। তারপরে ক্রমে ক্রমে গাছের রজন থেকে চর্বণীয় গাম তৈরি করে বাজারে বিক্রি করাটা রেওয়াজ হয়ে ওঠে।

এখন বাজারে যে চুইং গাম বিক্রি হয় তার মধ্যে আছে শতকরা ২০ ভাগ গাম (এই পদার্থটিকেই চিবিয়ে চলতে হয়), শতকরা ৬০ ভাগ চিনি ও ১৯ ভাগ সিরাপ (মিষ্টি করবার জন্য, তবে এই মিষ্টত্ব অল্পক্ষণই থাকে) এবং ১ ভাগ পিপারমেণ্ট জাতীয় সুগন্ধ। এই যে ২০ শতাংশ গাম এটি তৈরি হয় নানা গাছের রস নানা অনুপাতে মিশিয়ে (কখনো কখনো এমনকি ২৫ রকম গাছের রস)। গাম তৈরির গাছের জন্য বিখ্যাত তিনটি জায়গা হচ্ছে মেক্সিকো গুয়াতেমালা ও ব্রিটিশ হন্ডুরাস। ভারতেও কিছু কিছু হয়ে থাকে, কিন্তু গাম তৈরির জন্য তার ব্যবহার নেই।

আসলে ব্যাপারটা কি? চুইং গাম মুখে দেবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মিষ্টত্ব ও সুগন্ধ ফুরিয়ে যায়। থাকে পড়ে খানিকটা রবারের মতো পদার্থ কাদার মতো নরম। যতই চেবানো যাক সেই পদার্থটির ক্ষয় নেই। অতঃপর শুধু চিবিয়ে খাওয়া শুধুই চিবিয়ে যাওয়া—স্বাদ ও গন্ধ কিছু না থাকা সত্ত্বেও। সিগারেট মুখে দিয়ে অনেকে যেমন নিজেদের স্মার্ট ভাবতে পারে (ফলে এমনকি ফটো তুলতে হলেও হাতে বা মুখে একটি জ্বলন্ত সিগারেট চাই), তেমনি একটি মানসিকতা এই অবিরাম চিবিয়ে চলার মধ্যে থেকেও পাওয়া সম্ভব। কিন্তু মনে রাখা দরকার তার জন্য চড়া দামও দিতে হচ্ছে। আর একথাও ঠিক স্মার্ট হবার জন্য যদি কারও অনবরত একটা রবারসদৃশ পিণ্ড চেবানোর দরকার হয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে সে ইতিমধ্যেই মানসিক দুর্বলতার শিকার। যে মানুষ রকেটে চেপে মহাশূন্যের যাত্রী হচ্ছে—তার কৃতিত্বই তো তার স্মার্টনেস। আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি এমনকি কোনো আমেরিকান নভশ্চরও সঙ্গে করে চুইং গাম নিয়ে গিয়েছেন।

নভশ্চরের খাদ্য

চুইং গাম অবশ্যই নয়, কিন্তু জানার কৌতূহল হতে পারে সয়ুজ ও অ্যাপোলোর নভশ্চররা মহাশূন্যে খাবার জন্য কী কী খাদ্য সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন? এবারে মস্কোর বিদেশী সাংবাদিকদের শুধু চোখে নয়, চেখে দেখানো হয়েছে নভশ্চরদের জন্য সারাদিনের খাদ্য কী কী ছিল। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী সাংবাদিকরা য়ুরি গাগারিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁদের স্বাগত জানান প্রধান সোভিয়েত নভশ্চর আলেক্সি লিওনোভ।

নভশ্চরদের জন্য খাদ্য গ্রহণের আয়োজনটি ছিল এই রকম: প্রথম প্রাতঃরাশে মাংসের প্যাটি 'বোরোদিনস্কি' রুটি, 'প্রলিন' মিণ্ট, কফি ও দুধ। দ্বিতীয় প্রাতরাশে কারাণ্ট ও মধু সহযোগে দই। মধ্যাহ্নভোজে জর্জিয়ার সুস্বাদু সুপ খারচো, মুরগির মাংস, শুকনো খেজুর ও বাদাম। নৈশভোজে মাংসের প্যাটি রুটি ও 'রোশিস্কি' পনীর।

অ্যাপোলোর মার্কিন নভশ্চররা সয়ুজের সোভিয়েত নভশ্চরদের নিমন্ত্রণে সয়ুজের কামরায় যে মধ্যাহ্নভোজ খেয়েছেন তার মেনু ছিল উল্লিখিতরূপ।

জাল সই ধরার যন্ত্র

ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড গবেষণা ইনস্টিটিউটে উদ্ভাবিত ইলেকট্রনিক কলম। আবিষ্কর্তা হচ্ছেন ডঃ হিউইট ক্রেন। কলমটি যুক্ত রয়েছে একটি কম্পিউটার-ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাক্ষরকারীর কলমের গতি, কলমের ওপরে প্রদত্ত চাপ ইত্যাদি এই কম্পিউটারে ধরার ব্যবস্থা আছে। অন্যথা হলেই সংকেত ফুটে ওঠে—জাল।

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন গরু

পেনসিলভানিয়ার একটি গোরু ১৯৭৪ সালে মোট দুধ দিয়েছে ৫০৭৫৯ পাউণ্ড বা মোটামুটি ২৩,০৩১ কিলোগ্রাম। অর্থাৎ দিনের হিসেবে ৬৩ কিলোগ্রামেরও অধিক। গোরুটির নাম কোরিন, সে হলস্টাইন জাতীয়। এ-জাতীয় গোরু বছরে সাধারণত ১৩,০০০ পাউণ্ড দুধ দিয়ে থাকে। কোরিন দিচ্ছে তার প্রায় চারগুণ। নব বছর বয়সের ও ১,৬০০ পাউণ্ড ওজনের কোরিন-কে দুধ দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গণ্য করা হয়। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে তাকে উচ্চ-সম্মানিত করা হয়েছে এবং তাকে দেখার জন্য সেখানে প্রচুর জনসমাগম হয়। সঙ্গের ছবিতে যেমনটি দেখা যাচ্ছে এমনভাবে কোরিনকে বিজয়ীর মঞ্চে তোলা হয়েছিল কিনা জানা যায়নি, কিন্তু ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে 'স্প্যান' পত্রিকায়।

অয়স্কান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আবার সেই পুরোনো জালিতে আমরা দুজনে পাশাপাশি চলেছি। পূর্ণচাঁদের রুপোলী থালাখানা পাহাড়ের মাথায় পাইন গাছের ডালে যেমনি আশ্চর্যভাবে আটকে আছে। বালুর পাশাপাশি চলতে চলতে গভীর এক আত্মতৃপ্তিতে আমার মন ভরে উঠছে। হয়ত এটা যৌবনেরই ধর্ম। পরিণত বয়সে যাকে বিচার করে আমরা বাতিল করে দিই যৌবনে তাই আমরা ধুলি ঝেড়ে তুলে নিই অনেক সমাদরে।

বালুর কোঠীতে ঢোকার আগে শুধু বললাম কোন গ্লানি মনে রাখতে নেই বালু। মনে রাখা মানেই তাকে পুষে রাখা। মনের পাপ মনই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবে। মাথা উঁচিয়ে পথ চলবে।

বালু হঠাৎ এক কান্ড করে বসল। আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে ওর কপালে ছুঁইয়ে নিলে।

নাগগর থেকে চিঠির আশা করছিলাম কিন্তু কুলুর স্ট্যাম্প লাগানো চিঠি এল আমার হাতে। অবশ্য চিঠি যে ঝিমির তা ঠিকানার লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছিল।

চিঠি পড়ার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। আমি জানি না চিঠিতে কি আছে তবু মনে হল একটা অভাবিত কিছু আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে এ চিঠিতে। আমি যেন ভাগ্যের পাশা হাতে তুলে নিয়ে বসে আছি কি দান পড়বে তা একেবারে আমার অজানা। কিন্তু এই শেষ দানটিতেই নির্ভর করছে আমার নিশ্চিত হারজিৎ।

চিঠি খুললাম। তার আগেই মনকে আমি প্রস্তুত করে নিয়েছি।

প্রথম সম্বোধনের ভাষাই ঝিমি পাল্টে দিয়েছে :

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

রিপ্ ভ্যান উইংকল্ এর মত দীর্ঘদিন একটা আশ্চর্য ঘুমের জগতে কাটিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি আমার চারদিকের সবকিছু পাল্টে গেছে। কতকগুলো অদ্ভুত স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম। আর স্বপ্নগুলোকে সত্যি বলে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ভেবে বসেছিলাম। ঘুম ভেঙে দেখি তারা কখন নিঃশব্দে সরে গেছে কিন্তু আশ্চর্যভাবে পাল্টে দিয়ে গেছে আমার পুরনো জগতটাকে।

স্বপ্নের স্মৃতিগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে আমার কোন কান্না নেই। তবে আমি এত-কাল যে জীবনটাকে ভুলেছিলাম তাকে আবার কে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে?

আমার পাদুটো আড়ষ্ট হয়ে আসছে যখন ভাবছি আবার কদিন পরে নাগগরের চড়াই ভেঙে আমাকে ওপরে উঠতে হবে। আবার ঢুকতে হবে আমার ঐ কোয়ার্টারে। যেখানে একদিন আমি আমার সব খুইয়েছি, সেখানে জানিনে কোনদিন আর নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব কিনা। প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আমাকে সব হারানোর কান্না কাঁদতে হবে। আমার বিভীষিকার সে রাতগুলো কতদিন আমাকে কাটিয়ে যেতে হবে তা কে বলে দেবে ?

আজ কারো ওপর কোন অভিযোগ আমার নেই যদি থাকে সে শুধু নিজের ওপর। জীবনে সরল বিশ্বাসে সবকিছুকে মেনে নিলে যে কোন মুহূর্তে সবস্ব হারানোর সম্ভাবনা থাকে। পরিতৃপ্ত সুখী জীবনের স্বপ্ন বোধহয় দেখতে নেই, তাহলে ওটা চিরদিন স্বপ্নই থেকে যায়।

জীবন নিয়ে যে বেপরোয়া জুয়া খেলে যেতে পারে হয়ত কোনদিন তারই জেতার সম্ভাবনা থাকে। অন্তত হারলে তার বুকখানা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় না। কারণ সে জানে সে খেলোয়াড়। ভাল-বাসার খেলায় এক জায়গায় হারলে অন্য জায়গায় জেতার জন্যে তাকে লড়াই করে যেতে হবে।

নাগগরের ফরেস্ট গার্ডের ছোট্ট কোঠীতে আমি ইদানীং প্রায়ই পড়ে থাক-তাম দেখে বুড়ো গার্ড হেসে বলত আমার তো ছুটির সময় হয়ে এল এবার চাকরিটা তুই নিয়ে নে বেটী তাহলে এ কোঠীও তোর হয়ে যাবে।

এবার ফিরে গিয়ে যখন আর ওপথে পা মাড়াব না, তখন বুড়োই হয়ত নেমে আসবে নীচে। জিজ্ঞেস করবে আমার না যাবার কারণ। ওর প্রশ্নের জবাব আমি আর কোনদিনও খুঁজে পাব না।

ভাগ্যের সবচেয়ে বড় কৌতুক যখন সব দোর ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে তখন সম্পূর্ণ অজ আমি চাকরীর কাছে গৃহ-প্রবেশের জন্য আকুল আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

শুধু অনুরোধ আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের স্মৃতিগুলো আর কোনদিন কোন-ভাবেই আমাকে মনে করিয়ে দিও না। আমাকে আমার দুঃখগুলো আমার মত করেই বইতে দাও।

।। একটি অতি নির্বোধ মেয়ে ।।

চিঠিখানা বিকেলের ডাকে এসেছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে শেষবেলার রোদ এসে পড়েছে বিছানায় চিঠির পাতায়।

কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমার নেই। বড় ক্লান্ত লাগছে। নির্জনে একদিন

খেলা শুরু হয়েছিল সমস্ত মন নিবিষ্ট হয়ে সে খেলা খেলে চলেছিল কিন্তু হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠতেই চমকে উঠলাম। ভুল তো আমি কিছু করিনি। তবে হুইসলটা বাজল কেন? প্রশ্ন নয় অনেক পরিচালকের ভুল একটা বাঁশির সংকেতে আমি হেরে গেলাম। এবারের মত খেলা আমার শেষ।

বসে আছি উত্তরের জানালার দিকে চোখ পেতে। ছোট্ট স্রোতধারাটি বুক ভরে জল নিয়ে ছুটে চলেছে পাইনের সবুজ পাতা-গুলো হাওয়ায় কাঁপছে থিরথির করে। পাইন পাহাড়ের মাথায় শেষসূর্যের সোনা গলে ঝরে পড়ছে। কত যুগ ধরে প্রকৃতির বুকে চলেছে এমনি নিরন্তর খেলা। এরা কেউ তো সরে যায় নি খেলার আসর থেকে। আমাকেই শুধু সরে যেতে হল।

যার হৃদয় আছে যার অভিমান আছে সেই শুধু পারে না উঁচু গলায় প্রতিবাদ জানাতে। সে জানে জীবনের এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিবাদ চলে না। প্রতিবাদ সেখানে শুধু নিজের কাছেই হার মানা।

জীবনের মুখোমুখি যখন আর একটি মানুষ এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে মুহূর্তেই চিনে নিতে হয়। সেই প্রথম দেখায় যদি তাকে চেনা না যায় তাহলে সারাজীবন ধরে মোটা মোটা সাইকোলজির বই উল্টে পরীক্ষা চালালেও তাকে আর চেনা যাবে না।

ঝিমি যদি নাগগিরের মত্যশীতল পাহাড়ের কোলে আমার বুকের ছড়ানো উত্তাপ তার বুকের মধ্যে ভরে নিতে না পেরে থাকে তাহলে সূর্যের সমস্ত উত্তাপ ঢেলে দিলেও তাকে হয়ত আর কোনদিন উত্তপ্ত করে তোলা যাবে না। বুকের ভাষা কেউ কাউকে শিখিয়ে দিতে পারে না নিজ-কেই তার পাঠোদ্ধার করে নিতে হয়।

এই মুহূর্তে কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যে ঘরে আমি বসে আছি সেটা আমার ঘরই নয়। আমি এই পাহাড়ী দেশে বেড়াতে এসে উঠেছি এই হোটেলে। এর পাহাড় পর্বত নদী অরণ্য মানুষ সবই দেখা হল এখন সব পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে নিজের ফেলে আসা পুরাতন আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া।

অসংলগ্ন ভাবনার ভারে আমার দিন-গুলো যখন এমনি মন্থর আর রাতগুলো বড় ক্লান্ত তখন এক সন্ধ্যায় ঝড়ের মত আমার ঘরে এসে ঢুকলো জুলিয়েন।

আমার সেই মুহূর্তে মনে হল ও যেন বন্ধ ঘরের ভেতর একরাশ প্রাণের হাওয়া বইয়ে দিলে। আমি বিষণ্ণতার অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে তিলে তিলে ব্যথার প্রহর গুন-ছিলাম ও যেন এসে সব কটা দরজা জানালা খুলে দিয়ে বলল নাও কত হাওয়া নেবে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকার পর ও হঠাৎ বলে উঠল অসম্ভব এ কখখনো হতে পারে না মুখার্জী।

ম্লান হেসে বললাম দাঁড়িয়ে রইলে যে বোসো।

ও বসলে আবার বললাম কি হতে পারে না জুলিয়েন?

জুলিয়েন হাত নেড়ে বলল, আমি বাস থেকে নেমেই মদনলালের মুখোমুখি হয়ে-ছিলাম। স্কাউন্ড্রেলটা সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে বালুর সম্বন্ধে একটা কেচ্ছা আমাকে শুনিয়ে দিলে। ওর নাক আমি উড়িয়ে দিতাম। ব্যাটা পালিয়ে বেঁচেছে।

বললাম ঠিকই শুনেছ।

জুলিয়েন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল থামো। ডাক্তার মুখার্জীকে চিনতে আমার আর বাকি নেই। তুমি আর নতুন করে আমাকে চেনাতে যেও না।

সেই মুহূর্তে গভীর একটা ব্যথা আমি বুকের ভেতর বোধ করতে লাগলাম। জুলিয়েনের চোখ যে সত্যকে মুহূর্তে চিনে নিল আমার ঝিমির চোখ ঝাপসা হয়ে গেল সেখানে।

বললাম ঝিমিও আমাকে যেখানে অপ-রাধী সাব্যস্ত করল সেখানে তুমি আমাকে বেকসুর মুক্তি দিতে চাও!

জুলিয়েন মুখ নীচু করে রইল কতক্ষণ। একসময় বলল তোমার মুখ থেকে সবটুকু ঘটনা আমি জানতে চাই মুখার্জী,

বালু-ঘটিত সমস্ত ঘটনা পর পর সাজিয়ে শোনালাম জুলিয়েনকে। সঙ্গে সঙ্গে বালু সম্বন্ধে আমার ধারণার কথাও জানিয়ে দিলাম। এখনও যে বালুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে সেটুকুও মনে কোনরকম দ্বিধা না রেখেই বলে গেলাম।

জুলিয়েন বলল, বালু হঠাৎ একটা ভুল করে ফেলতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন আমি ওকে দেখেছি আমার বাগানের কাজে। এমন একটা সাচ্চা মেয়ে আমার চোখে খুব কমই পড়েছে মুখার্জী।

বললাম, তোমার ধারণার সঙ্গে আমার সবকিছু আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে জুলিয়েন।

প্রস্তাবটা এল জুলিয়েনের মা মিসেস বেননের কাছ থেকে। সব শুনে আমি স্তম্ভিত। চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকে জুলিয়েন আমার সঙ্গে কি রসিকতা শুরু করলে! একটু দূরে বসে জুলিয়েন চোখ টিপে টিপে হাসছিল।

মিসেস বেনন প্রথমে আরম্ভ করলেন, ডাক্তার, আমি খুবই দুঃখিত যে জুলিয়েন না থাকায় বালুর ব্যাপারে সব দোষটা তোমার ওপরেই এসে পড়েছে।

আমি ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

আবার মিসেস বেনন তাঁর কথার জের টেনে বললেন, জুলিয়েন আমাদের ব্যাপারটা যদি আগে জানাত, তাহলে আমরা বালুকে ঐ অবস্থায় ঘরে এনেই রাখতাম। ও ট্যুর থেকে ফিরে এলে ব্যবস্থা করতাম বিয়ের। তুমি জানো মুখার্জী, আমার নব্বই বছরের শাশুড়ী এ দেশেরই মেয়ে।

আমার বিস্ময় তখন চরমে উঠেছে। বালুঘটিত সব দোষটাই জুলিয়েন নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে কখন। সে ইতিমধ্যে তার পরিবারকে রাজী করিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার মাথার ওপর, যে মেঘ জমে অজস্র বর্ষণ আর বিদ্যুত আমাকে বিব্রত করে তুলছিল তাকে বিপরীত হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

আমি বললাম, বালুকে কি আপনারা বেনন পরিবারের একজন করে নিতে চান?

(আগামী বারে শেষ হবে)

দৌড় নায়ক কুটস

পাভো নুর্মি, এমিল জ্যাটোপেক ও ভ্ল্যাডিমির কুটস—এই রথী তাঁদের জীবন মধ্যাহ্নে দূরপাল্লার দৌড়ের আসরে অবিসংবাদী নায়করূপে স্বীকৃত ছিলেন। যুগ-ধারক নুর্মি ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে এবং জ্যাটোপেক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ট্র্যাকের জীবন্ত বিস্ময়। আর জ্যাটোপেকের পর দূরপাল্লার সুনির্দিষ্ট ট্র্যাক জুড়ে বসেন রুশ অ্যাথলিট ভ্ল্যাডিমির কুটস।

শেষ পঞ্চাশের দশকে আন্তর্জাতিক ট্র্যাকে আর বিশেষতঃ দূরপাল্লার দৌড় ঘিরে অনেক প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। যথা বৃটেনের গর্ডন পিরি, ক্রিস চ্যাটাওয়ে, ডেরেক ইবটসন [illegible], হাঙ্গেরির স্যান্ডর ইহারোস, [illegible], যোসেফ কোভাক্স, অস্ট্রেলিয়ার [illegible] টমাস, ডেভ পাওয়ার এবং জার্মানীর হার্বার্ট শেড। এঁদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ে দূরপাল্লার দৌড়ে হয় বিশ্ব-রেকর্ড আর না হয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার রেকর্ড ভেঙেছেন। কিন্তু এত [illegible] একাসনে সকলকে অ্যাথলিটদের পেছনে ফেলে রেখে একেবারে সামনের আসনটি দখল করে নিতে যাঁর অসুবিধে হয়নি তাঁরই নাম ভ্ল্যাডিমির কুটস। নিঃসন্দেহে [illegible] কুটস চ্যাটাওয়ে, গর্ডন পিরি এবং সতীর্থ আলেকজান্ডার আনুফ্রিয়েভের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে কুটস ছিলেন তাঁর কালে একমেবাদ্বিতীয়ম। জ্যাটোপেকের পর কুটসের মতো দূরপাল্লার দৌড়কে আর কেউই প্রভাবিত করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

অবিস্মরণীয় অ্যাথলিট এই ভ্ল্যাডিমির কুটস। গত ১৬ আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেছেন। সক্রিয় অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসর নিয়েছেন কবে। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অ্যাথলেটিক্স তাঁকে ছাড়তে চায় নি। উত্তরজীবনে প্রশিক্ষক কাজে জড়িয়ে থাকার কালেই কুটস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বলাবাহুল্য, মস্কো থেকে প্রচারিত কুটস বিয়োগের খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়তেই দুনিয়ার অ্যাথলিট মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সেই শোকচ্ছায়া সরে যাবার আগে পরলোকগত ক্রীড়াপ্রতিভা ভ্ল্যাডিমির কুটসের স্মৃতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

কুটসের সেরা কীর্তির স্বাক্ষরে মেলবোর্ণ অলিম্পিকের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে আছে। এই আসরে তিনি দশ হাজার ও পাঁচ হাজার মিটার দূরপাল্লার দৌড়ের দুটি বিভাগেই জয় করেছিলেন। এমিল জ্যাটোপেকের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি হেলসিঙ্কিতে জ্যাটোপেক প্রতিষ্ঠিত দুটি বিভাগেই অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙে দেন। তাছাড়া এই দু বিভাগেই তিনি একাধিকবার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন ও গড়েছেন। উত্তরসূরীরা কুটসের রেকর্ড বিশেষতঃ দশ হাজার মিটার দৌড়ের নজির অতিক্রম করতে সময়ও নিয়েছেন যথেষ্ট।

দূরপাল্লার দৌড়ে জ্যাটোপেককে সরিয়ে দিয়ে রাজাসন দখল করে নিলেও কুটস জীবন পরোক্ষে জ্যাটোপেকেরই মন্ত্রশিষ্য। জ্যাটোপেকের কাহিনী পড়তে পড়তে, ছায়াছবি ও টেলিভিশনে জ্যাটোপেককে দৌড়তে দেখে মনে মনে ভাবতেন, ওঁর মতো যদি দৌড়তে পারতাম! তার আগে দৌড়ের প্রতি কুটসের আদৌ মন ছিল না। নৌবাহিনীতে থাকার কালে বিজয় দিবস উৎসবে বাহিনীর তিন হাজার মিটার দৌড়ে মাঝে মধ্যেই যোগ দিতেন। তখন তেমন সংকল্পে অনুশীলনও করতেন না। জ্যাটোপেককে জিততে দেখার পরই কুটস দৌড়ের নিবিড় অনুশীলনে মন দেন এবং বছর দুয়েকের মধ্যেই হাতেনাতে সুফল ফলতে শুরু হয়ে যায়।

১৯৫৩ সালে বিশ্ব যুব উৎসব ক্রীড়াভূমিতে কুটস বুখারেস্টের ট্র্যাকে জ্যাটোপেকের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রথম সুযোগ পান। অমন একজন দিকপাল দৌড়বীরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে বলে কুটস সেদিন মনে মনে নানান অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই অঙ্গীকারের বাস্তব রূপায়ণে চোয়াল কষে নিজের সমস্ত সামর্থ্য সংহত করে দৌড়ের সময় সারা পথটাই এগিয়ে ছিলেন! কিন্তু শেষ একশ মিটার থাকতে জ্যাটোপেক যেন পেছন থেকে উড়ে এসে এগিয়ে গিয়ে সামনের জায়গাটুকু নিজের দখলে এনে ফেললেন।

মনে মনে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যাঁকে প্রথম সুযোগে তাঁর কাছে হেরে যেতে কুটস কিন্তু দুঃখিত বা হতাশ বোধ করেন নি। বরং পরাজয়ের এই খোঁচাতে তিনি উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। আরও অনুপ্রাণিত চিত্তে সাধনায় জড়িয়ে পড়েন। আর তারই পরিণামে পরের বছরে সুইজারল্যান্ডের বার্নে ইউরোপীয় অ্যাথলেটিকসের পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে জ্যাটোপেক, চ্যাটাওয়েকে পেছনে ফেলে রেখে এই বিভাগের নব রেকর্ডটি [illegible] যান।

দিন দশেক পর লন্ডনের হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে লণ্ডন বনাম মস্কোর দ্বৈত ক্রীড়ার আসরে চ্যাটাওয়ে বিশ্বরেকর্ড (১৩ মিঃ ৫১.৬ সেঃ) গড়ে পাঁচ হাজার মিটারে এক [illegible] ব্যবধানে কুটসকে হারিয়ে দিলেও হপ্তাদশেক বাদে প্রাগের এক অনুষ্ঠানে কুটস চ্যাটাওয়ের হাত থেকে বিশ্বরেকর্ডটি আবার ছিনিয়ে নেন।

নামডাক হবার পর কুটসকে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জে হার মানাতে পেরেছিলেন চ্যাটাওয়ে ছাড়া আর যে মাত্র একজন অ্যাথলিট তিনি হলেন গর্ডন পিরি। তবে মেলবোর্ন অলিম্পিকে পাঁচ ও দশ হাজার দূরপাল্লার দুটি দৌড়েই কুটস পিরিকে নতিস্বীকারে বাধ্য করেন। মেলবোর্নে দশ হাজার মিটার দৌড়ের সময় মাঝপর্বে ট্র্যাক থেকে সরে গিয়ে কুটস পিরিকে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু পিরির পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। তাঁর মতলব ছিল, সারাক্ষণ কুটসের ছায়ায় থেকে গিয়ে একেবারে শেষপর্বে কুটসকে ডিঙিয়ে যাওয়া। কিন্তু কুটস পিরিকে সে সুযোগ দেন নি। বারেবারে নিজের গতি বাড়িয়ে পিরিকে

স্ত্রী রাইসার সঙ্গে কুটস এক আনন্দঘন মুহূর্তে

সময়ের আগেই পিরিকে আরও জোরে ছুটতে বাধ্য করিয়ে তাঁকে একেবারে নিঃস্ব করে দেন। ফলে পিরিও শেষচক্রের আগেই পরিশ্রমভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এমনি সে ক্লান্তি যে সারাক্ষণ কুটসের পিছু ধাওয়া করলেও পিরি শেষপর্যন্ত সাতজনের পর নিজেকে সমাপ্তি রেখায় টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে জোড়া সোনা পাবার পর কুটস অপরাজিত নায়ক হিসেবেই সক্রিয় অ্যাথলেটিকস থেকে অবসর নেন। পরের অধ্যায়ে তিনি ছিলেন ক্রীড়া শিক্ষক। তাঁর প্রেরণাতেই উজ্জীবিত হন রুশ তরুণ পিটার বোলোতনিকভ, যিনি রোম ওলিম্পিকে দশ হাজার মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক অর্জন করতে পারেন।

ভরা যৌবনে কুটস দৌড়তেন ঘড়ির কাঁটার নির্দেশ মেনে। এক এক চক্কর নির্দিষ্ট সময়ে দৌড়তে পারলে বাঁধা সময়ের মধ্যে পুরো পথ অতিক্রমে সফল হওয়া যায়। এবং সেই পরিকল্পনা অনুসরণে রেকর্ড ভাঙা ও গড়াও সম্ভব হয়। এই ধারণায় অ্যাথলিটদের দীক্ষা দিয়েছিলেন পাভো নুরমি। জ্যাটোপেক, কুটস, বোলোতনিকভ, মারে হলবার্গ, লাসে ভিরেনেরা নুরমি প্রদর্শিত সেই পথই পরিক্রমণ করেছেন। তবুও বলা যায় যে কুটসের দৌড় পরিকল্পনা সামান্য ভিন্নতর।

মূল লক্ষ্য ঘড়ির কাঁটার দিকে থাকলেও সাধারণতঃ তিনি দৌড় আরম্ভেই এগিয়ে যেতেন এবং সময় সময় আচমকা গতি বাড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উদ্দেশ্যে চমকদার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তেন। সেই চ্যালেঞ্জে সাড়া দিতেন যাঁরা বর্ধিত গতির টানে তাঁদের প্রাণশক্তি যেতো ফুরিয়ে। যেমন ফুরিয়ে গিয়েছিল পিরির সামর্থ্য মেলবোর্ন ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে। সমাপ্তি রেখায় এসে পৌঁছাবার মুহূর্তে কুটস ডানহাতটি তুলে ধরতেন। শেষ-মুহূর্তে হাত তোলা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হাত তুলতেন কেন? জয়ের আনন্দ প্রকাশে, না দর্শকদের অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে? কে জানে!

যন্ত্রবৎ হাত তোলা এবং মেশিনের মতো মাপা পদক্ষেপে ছুটে চলার দৃষ্টান্ত দেখে ডাঃ রজার ব্যানিস্টার এক সময় বলেছিলেন 'কুটস হলেন নির্দয় দৌড়-যন্ত্র! দৌড় পরিকল্পনা রচনায় চিন্তাভাবনা করেন না। আসলে তিনি চিন্তাশীল নন। ব্যানিস্টার দৌড় বিশেষজ্ঞ। মাইল দৌড়ে চার মিনিটের বাধা প্রথম ভেঙেছিলেন তিনিই। তাঁর অভিমতে আস্থা রেখে মেলবোর্নের এক সংবাদপত্রের শিরোনামে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল 'যন্ত্র কি চিন্তাশীল মানুষদের হার মানাতে পারবে?'

মেলবোর্নে দু দুটি প্রতিযোগিতা জয় করে কুটস নিজের আচরণের মাধ্যমেই উচ্চারিত প্রশ্নের সাফ জবাব দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পূর্ব অভিমত সংশোধনে বাধ্য করিয়েছিলেন ডাঃ রোজার ব্যানিস্টারকে। ব্যানিস্টার পরে লেখেন 'আমারই ভুল হয়েছিল। কুটস নিষ্প্রাণ মেসিন নন। কুটস চিন্তাশীল। তাঁর মননের অভিব্যক্তি যন্ত্রবৎ নিখুঁতত্বে পৌঁছে গেছে। প্রতিযোগিতা শেষ করার পর মুখে হাসি নিয়ে কুটস যখন আর এক পাক দৌড়তে থাকেন তখনই তাঁর মধ্যে মানবিক আবেদনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। দশ হাজার মিটার দৌড়ে বিড়াল আর ইঁদুরে লুকোচুরি খেলা হয়েছে। কুটস বিড়াল আর পিরি মূষিক। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটে গেছে।

হারকে ঘৃণা করতেন। গতিবেগ বাড়াতে বা ব্যক্তিগত ক্রীড়ামানের উন্নয়ন ঘটাতে কুটস মুখ বুজে পরিশ্রম করতেন। শারীরিক কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। সাধনায় ছিলেন ধ্যান-মগ্ন; নিজের জগতেই তিনি বাস করতেন। লক্ষ্য ছিল জয়। আর সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকার প্রয়াসে তিনি ইস্পাতকঠিন মনোবল সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।

সংগ্রাম কি বস্তু সে সম্পর্কে তাঁর সত্যোপলব্ধি ঘটেছিল। যেহেতু তাঁর কৈশোর কাটে যুদ্ধের আবহাওয়ায়। বয়স যখন মাত্র চোদ্দ তখন জার্মান হানাদার জন্মভূমির অংশ-বিশেষ ইউক্রেন দখল করে নেয়। ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত অ্যালেকসিনো গ্রামে ১৯১৭-এর ২রা ফেব্রুয়ারী কুটস ভূমিষ্ঠ হন। যুদ্ধের সময় বার দুয়েক তাঁকে বন্দী শিবিরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর ওপরে দৈহিক নির্যাতনও করা হয়। চোখের সামনে নাৎসী অত্যাচারের অনেক ছবি স্পষ্ট হয়ে ছিল। তাই মনটাও কঠিন ধাতে তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এই মানসিক কাঠিন্য উত্তরপর্বে প্রতিযোগিতার সময়ে কাজে লাগে।

তবে ওপরে ওপরে যতোই কাঠিন্যের প্রলেপ থাকুক না কেন ভেতরটা ছিল স্বাভাবিক সরল ও আবেগমণ্ডিত। সোভিয়েট স্পোর্ট পত্রিকার যে তরুণী রিপোর্টার নামডাক হওয়ার পর কুটসের ইন্টারভিউ নিতে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন কুটস তাঁরই সঙ্গে প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে তাঁকেই নিজের ঘরণী করে নেন।

কুট্‌সের সহধর্মিণী শ্রীমতী রেইস কদিন আগে স্মৃতিচারণ করার সময় বলছিলেন, ভ্যাডিমির হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে নিতো। যেন একেবারেই আত্মনিমগ্ন। সেখানেও এই ভাবান্তর দেখে জিজ্ঞাসা করি হয়েছে কি? কোনো জবাব পাই না। খবরাখবর নিয়ে শুনি যে পাঁচ হাজার মিটার-দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডটি ইহারোস কেড়ে নিয়েছে। তাই ভ্যাডিমিরের মানসিক সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

কদিন ধরে আর কথাবার্তা নেই। শুধু মনে মনে মৌন চিন্তা। দিন কয়েক পর এক সন্ধ্যায় বলশয় থিয়েটারে চিচায়ভোস্কির সঙ্গীত শুনছি দুজনে গিয়ে। হঠাৎ ভ্যাডিমির আমার কানে মুখ রেখে বলে উঠলো, দেখো, বিশ্বরেকর্ড আমি আবার ছিনিয়ে নেবোই নেবো। শুনে আমি চমকে উঠলাম। সেই সঙ্গে এতোদিনের মৌনতার যথার্থ কারণও পেলাম খুঁজে। সপ্তাহখানেক পরেই ভ্যাডিমির বেলগ্রেডে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ে দিল। মস্কোয় বসে খবরটা শোনার সময় আমার কেবলই বলশয় থিয়েটারের সেই সান্ধ্য কাহিনীর স্মৃতি মনে পড়ছিল। সত্যিই, সাধনায় এমন একাগ্রতা না থাকলে কি আর কেউ বিশ্বশ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি পেতে পারে।

মেলবোর্নের পথে বিমান ছাড়ার সময় কুট্‌সের খেয়াল হয় যে তিনি তাঁর রানিং স্যু সঙ্গে নিতে ভুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিমান ছেড়ে বাড়ী ফিরে চললেন। শ্রীমতী রেইসা বলছিলেন, যাত্রারম্ভে ফিরে যাওয়া যে অশুভ, তা আমি ভ্যাডিমিরকে মনে করিয়ে দিলাম। কিন্তু সে তার গোঁ ছাড়বে না। স্পাইক আঁটা নিজের জুতো জোড়া তার চাইই। ওতেই যে সে অভ্যস্ত।

শ্রীমতী রেইসার কথায় ভ্যাডিমির পরের দিন মস্কো ত্যাগ করে মেলবোর্নে পৌঁছেই চিঠি লিখে জানালো, কুসংস্কারে বিশ্বাস রেখো না। ভ্যাডিমির তার কথা রেখেছিল। একটিতে নয় মেলবোর্নে সে জিতেছিল দুটি প্রতিযোগিতায়। অসাধারণ প্রত্যয় আর আত্মপ্রত্যয়ের অপরাজেয় পরিচয় রেখেই ভ্যাডিমির সেদিন কুসংস্কার জয় করে সংস্কারের ভূতকে মন থেকে তাড়াতে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছে। আত্মপ্রত্যয় যাদের নিটোল দুনিয়াটা তো তাঁদেরই।

অজয় বসু

হেডিংলের ট্র্যাজেডি

বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে অ-ক্রিকেট-সুলভ আচরণের নজীর হয়ে রইলো লীডসের (ইয়র্কশায়ার) হেডিংলে। রাতের অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পীচ খুঁড়ে (ছ' ইঞ্চি চওড়া, তিন ইঞ্চি গভীর) দিয়ে, তেল ঢেলে একদল বিবেক-হীন মানুষ ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচটি চতুর্থ দিনেই ভণ্ডুল করে দিতে পেরেছে। পঞ্চম তথা শেষদিনের খেলা চালানো ঐ পীচে আর সম্ভবই হয়নি। পঞ্চম দিনের প্রভাতে দুই অধিনায়ক—টনি গ্রেগ ও ইয়ান চ্যাপেল পীচের দশা দেখে কপাল চাপড়ালেন। দুই শিবিরের প্রথিতযশা কর্মকর্তা আর খেলোয়াড়দের মুখে শুধু একটি কথাই উচ্চারিত হোল—'ক্রিকেটের আজ বড়ো দুর্দিন।'

হেডিংলের পীচ খোঁড়ার উদ্দেশ্য কি রাজনৈতিক? অসম্ভব নয়, বরঞ্চ ঘটনা পরম্পরায় সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাত হাজার সাতশো স্টার্লিং ডাকাতির অভিযোগে কারারুদ্ধ জর্জ ডেভিসের সমর্থকরা পীচ খোঁড়ার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। ন্যায্য বিচার দাবী করেছেন তাঁরা ডেভিসের।

দর্শকদের হামলায় পীচ নষ্ট করে দেওয়ার নজীর পৃথিবীতে যে নেই তা নয়, তবে সেজন্য ইতিপূর্বে খেলা কদাচিৎ পণ্ড হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ টেস্টে পীচ নষ্ট করা হয়েছিল কিন্তু খেলা ভণ্ডুল হয়নি (১৯৬৯ সালে করাচীতে ইংল্যাণ্ড-পাকিস্তানের টেস্ট ম্যাচটি দাঙ্গার জন্য পরিত্যক্ত হয়েছিল)।

বিধ্বস্ত পীচ পরীক্ষার পর ইংল্যাণ্ডের দলনায়ক টনি গ্রেগ দুঃখের সঙ্গে বলেছেন: 'ইয়ান চ্যাপেল এবং আমি পীচ দেখে মর্মাহত হয়েছি। এমন ঘটনা অকল্পনীয়, লজ্জাকর তো বটেই। আমাদের জয়ের সম্ভাবনা ছিল খুবই বেশী। ম্যাচটা হাতছাড়া হয়ে গেল বলে না—ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থেই আমি একথা বলছি।'

চতুর্থ দিন পর্যন্ত খেলার গতিবিধি নিজ নিজ আয়ত্তে আনার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কি লড়াই-ই না হচ্ছিল! দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯১ রান করে ইংল্যাণ্ড এগিয়েছিল ৪৪৪ রানে। রানের ঐ অংকটি বিলক্ষণ স্ফীত হলেও, অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বিন্দুমাত্র মুষড়ে পড়েনি, বরঞ্চ কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সসম্মানে সংগ্রাম চালিয়েছে। চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসের তিনটি উইকেটের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার ২২০ রান সংগ্রহ ঐ সংগ্রামী আচরণেরই নিদর্শন। বলা বাহুল্য এই খেলার ফলাফল নিয়ে বিশ্ব জুড়ে উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত ছিল না [illegible]।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হেডিংলের টেস্ট পরিত্যক্ত হওয়ায় অ্যাসেজ অস্ট্রেলিয়ার হাতেই রয়ে গেল। প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় (পরিত্যক্ত) টেস্ট অমীমাংসিত থাকায় চতুর্থ টেস্টে ইংল্যাণ্ড জয়ী হলেও অস্ট্রেলিয়ার হাতেই অ্যাসেজ থাকবে।

অভিশপ্ত তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর: ইংল্যাণ্ড: প্রথম ইনিংস ২৮৮; অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস ১৩৫; ইংল্যাণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস ২৯১ (স্টীল ৯২; ম্যালেট ৫০ রানে ৩, গিলমোর ৭২ রানে ৩, লিলি ৭৮ রানে ২): অস্ট্রেলিয়া: দ্বিতীয় ইনিংস : ৩ উই: ২২০ (ম্যাক্‌কসকার ৯৫ অপরাজিত, ওয়াল্টার্স ২৭ অপরাজিত)।

শেষ টেস্টে ইংল্যাণ্ড দল

ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ তথা শেষ টেস্ট ম্যাচ শুরু হচ্ছে আগামী ২৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার থেকে ওভালে। ইংল্যাণ্ড দলে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন : টনি গ্রেগ (অধিনায়ক), জিওফ আর্ণল্ড, ফিল এডমণ্ডস, জন এড্রিচ, এ্যালান নট, ক্রিস ওল্ড, গ্রাহাম রুপ, জন স্নো, ডেভিড স্টিল, ডেরেক আণ্ডারউড, ব্যারী উড ও বব উলমার। বাদ পড়েছেন ফেল্চার ও হ্যাম্পশায়ার।

ঘরোয়া ফুটবল লীগ

কলকাতার সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবল লীগে ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। গত সপ্তাহে ইস্ট-বেঙ্গল টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৩—১ গোলে (মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথম গোল) এবং ভ্রাতৃ সংঘকে ৪—০ গোলে হারিয়েছে। মহামেডান স্পোর্টিং হারিয়েছে উয়াড়ীকে ৫—০ এবং বি এন আরকে ২—০ গোলে। মোহনবাগান হাওড়া ইউনিয়নকে ৪—০ গোলে এবং পোর্ট কমিশনার্সকে ২—০ গোলে পরাজিত করেছে। ১৩টি ম্যাচ খেলে মহামেডানের পয়েন্ট ২৬, ১২টি খেলে ইস্টবেঙ্গলের ২৪। মোহনবাগানেরও ২৪ পয়েন্ট, তবে একটি ম্যাচ বেশী খেলে।

মণি বন্দ্যোপাধ্যায়

"আলেয়ার পেছনে ছুটে লাভ কি? অনেক শিক্ষাই তো হোল এই ক'বছরে। কলকাতার মাঠে আমরা হরবখতই ভুল করি বড়ো ক্লাবের ডাকে ছুটে গিয়ে। বিচার করি না নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কে, হিসেব করি না ভবিষ্যতের। যোগ্য না হয়ে আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো মূর্খতারই নামান্তর। আমি ও-দলে নেই আর। একবার ভুল করেছিলাম, দ্বিতীয়বার আর নয়।"

গোবিন্দ দাস

সবে সিজন সুরু। চারদিকে একটা থমথমে অনিশ্চয়তার আবহাওয়া। কলকাতার সিনিয়ার ডিভিসন লীগ এত দেরীতে সুরু হোল বলেই হয়তো এই অনিশ্চয়তা। ঠিক এরই মাঝখানে গতবারের 'রানার্স আপ' এরিয়ান্স খেলতে নামলো। খেলা তো হচ্ছে কিন্তু এরিয়ান্সের গোল কৈ? খেলোয়াড়েরা উদভ্রান্তের মত সারা মাঠে 'চষে' বেড়াচ্ছেন আর গ্যালারীতে বসে সমর্থকেরা মাথার চুল ছিঁড়ছেন। মাঠের যখন এই চেহারা কর্মকর্তাদের যখন [illegible] যাওয়ার জোগাড় ঠিক সেই মুহূর্তে এরিয়ান্স গোল করলো—গোটা গ্যালারীতে [illegible] নামলো। সবাই বললেন। 'আজ গোবিন্দই রক্ষা করলেন।'

হ্যাঁ, গোবিন্দই রক্ষাকর্তা। গোবিন্দ অর্থাৎ গোবিন্দ দাস এরিয়ান্সের স্ট্রাইকার। মাথায় খাটো, রোগা, ছিপছিপে চেহারা। এ ছেলে যে ফুটবল খেলে শুধু খেলে না, রীতিমত মাঠ কাঁপিয়ে খেলে সে কথা দূর থেকে দেখলে বিশ্বাস করতেই মন চাইবে না। কিন্তু বিশ্বাস করতে না চাইলেও বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ আজ কলকাতার মাঠে সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু কলকাতাই বা কেন এশীয় ফুটবলের আসরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্যও হয়েছে দু-দু—দুবার। একবার ব্যাংককে আর একবার কুয়েতে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত [illegible] ঘরের এক পরিবারে গোবিন্দের জন্ম। বাবা মা সাত ভাই এবং দুটি বোন নিয়ে কালীঘাটে চন্দ্র মণ্ডল রোডের বাড়ীটি তো বাড়ী নয় মস্তবড়ো এক জাহাজ। জন্ম থেকে কুড়িটি বছর ঐ বাড়ীতেই মাথা গুঁজে রয়েছেন ওঁরা সবাই মিলে। আশা—পট পরিবর্তন ঘটবে সংসারের

চাকা চলাবে গড়গড়িয়ে। সেদিন বাবা পান্না-লালবাবু মা আরতি দেবীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটবে। সাত ভাইয়ের চোদ্দ হাত এক সঙ্গে চন্দ্র মণ্ডল রোডের বাড়ীর আঁধার ঘোচাবে।

আর পাঁচজন যেভাবে ফুটবল সুরু করে শৈশবে গোবিন্দের ফুটবলের সুরু হয়েছিল প্রায় সেইভাবেই। পাড়ার ফুটবল উৎসাহীদের এবং মেজদা রবি দাসের সক্রিয় সাহচর্যে গোবিন্দ শৈশবে ফুটবলে মেতে ওঠেন। প্রথম পাঠ পাড়ায় পরবর্তী প্রশিক্ষণ সুবার্বন ক্লাবে ভ্রাতৃসংঘে গগনবাবুর কাছে মহামেডানের মমতাজ হোসেন মহম্মদ হোসেন এরিয়ান্সের শচীন হালদার বীরেন গুহ ও অশোক মিত্রের কাছে। এঁদের পরিচর্যায় বল ধরা (রিসিভিং) মারা (সুটিং) এবং জায়গা নেওয়ার (পজিসন) ব্যপারে গোবিন্দের ক্ষমতা এবং তৎপরতা বাড়ছে দিন দিন। গোবিন্দের সবচেয়ে বড়োগুণ এই যে মাঠে নেমে তিনি মুহূর্তের জন্যও আত্মকেন্দ্রিক হন না। যেটুকু খেলেন তার সমস্তটুকুই উৎসর্গ করেন নিজের দলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। কারণ তিনি জানেন ফুটবল আজ এককের চেয়ে দলগত সংগতির ওপরই বেশী নির্ভরশীল। গোবিন্দের বিশ্বাস যে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বর্তমান যুগে কালে ভাদ্রে কার্যকর হলেও দলগত বা সমষ্টিগত সংহতি ফুটবলের গোড়া এবং শেষ কথা। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে আজ ঐ ভাবেই চিন্তা করতে হবে নচেৎ ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

স্কুলে খেলার সময় থেকেই গোবিন্দ ঐ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভবনে যখন পড়তেন তখনও যে ধ্যান-ধারণা ছিল ফুটবল সম্পর্কে আজ ১৯৭৫ সালে এরিয়ান্সের স্ট্রাইকার হিসেবেও তা অপরিবর্তিত। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভবন থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার পর গোবিন্দ ঢুকেছেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে। আর্টসে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছেন। খেলাধুলার সঙ্গে লেখাপড়াও চালিয়ে যেতে আগ্রহী তিনি। কারণ বাঁচার মত বাঁচতে হবে তো— এখন তো শুধু দিন যাপনের গ্লানি।

গোবিন্দ কলকাতার মাঠে প্রথম খেলতে এসেছিলেন ১৯৭২ সালে সুবার্বন ক্লাবের হয়ে স্ট্রাইকার রূপেই। খেলা দেখে ১৯৭৩ সালে দলে টানলেন ভ্রাতৃসংঘের কর্ণধার এবং স্কটিশচার্চ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক জেদ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ওরফে গগনবাবু। ১৯৭৪ সালে মহামেডান স্পোর্টিং গোবিন্দকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। ১৯৭৫ সালে চলে এলেন এরিয়ান্স ক্লাবে। পরের তাঁবু? এ প্রশ্নের গোবিন্দ কোন উত্তর দেননি সরাসরি। শুধু বললেন॰ অন্যায়ার মোহে সীমিত সামথ্য বাঙ্গালী ছেলেরা পর্বত প্রমাণ ভুল করে ফেলেন। আমি আর ভুলের ফাঁদ নিজেকে জড়াচ্ছি না। অনেক শিক্ষা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক বিশ্বজিৎ দাসের দাদা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কর্মী গোবিন্দ এক নিঃশ্বাসে সব বলে গেলেন।

একেবারে হক কথা। কারণ বয়স তেমন কিছু বেশী না হলেও পোড় খেয়ে খেয়ে গোবিন্দ আজ এই মুহূর্তে রীতিমত অভিজ্ঞ। গোবিন্দ জুনিয়ার বাংলা খেলেছেন খেলেছেন ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়ে এশীয় যুব ফুটবলও তাই ও'র কথা হয়তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৭৩ সালে গোবিন্দ কৃষ্ণনগরে জাতীয় জুনিয়ার ফুটবলের আসরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৪ সালে কোয়েম্বাটুরে জাতীয় জুনিয়ার ফুটবলে গোবিন্দ ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ দলের অধিনায়ক। পশ্চিমবঙ্গ ঐ আসরের চ্যাম্পিয়ন। ক্রীড়া কৃতির স্বীকৃতিতে তাঁর ১৯৭৪ সালে ব্যাংককে আয়োজিত এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ভারতীয় দলেও স্থান হয়ে যায়। ভারত ঐ বছর এশীয় যুব ফুটবলের যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন (ভারত ও ইরাণ)। পরের বছরের এশীয় যুব ফুটবলেও ভারতীয় দলে ডাক পড়লো গোবিন্দের। গেলেন কুয়েতে। ভারত অবশ্য কুয়েতে কোয়ার্টার ফাইনালের বেশী এগোতে পারেনি। ব্যাংককে হংকংয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি এখনও গোবিন্দের স্মৃতিতে পটে উজ্জ্বল। ভারত হংকংকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর হারিয়ে ছিল ৩—২ গোলে। জয় সূচক গোলটি করেছিলেন গোবিন্দই।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

চম্বল দেশের এক আশ্চর্য্য কাহিনী

আরতি ভট্টাচার্য - বিবেক চ্যাটার্জি

—বুলেট চাই, তাজা বুলেট। এমন কিছু বুলেট চাই যা আবার থ্রী-নট-থ্রী রাইফেলে লোড করা যাবে না। ধরুন পয়েন্ট টু-টু অথবা মাস্কেট। আর তাও যদি না পাওয়া যায় তো নিদেন পক্ষে টি এম জি বুলেট—

বলতেই সিকিউরিটী ফোর্সের ক্যাপ্টেন ধর্মা মুখ টিপে হাসলেন। তারপর বললেন—বুঝেছি আর বলতে হবে না। আগামীকাল আপনারা নির্ঘাৎ ঠাকুর মান সিংয়ের ছেলে তহশীলদারকে নিয়ে শুটিং করতে চাইছেন। তাই না?

—হ্যাঁ।...কি করে বুঝলেন?

ক্যাপ্টেন ধর্মা কোমরে হাত রেখে অন্ধকার বেহড়ের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন—আপনারা যখনই অড সাইজ বুলেটের কথা বলাবলি করছিলেন, তখনই বুঝে ফেলেছি। এই মারাত্মক ভুলের জন্যেই তো তহশীলদার সিংকে ধরা পড়তে হল। না হলে জ্যান্ত অবস্থায় ওকে কি কেউ ধরতে পারতো! অসম্ভব...

আমার স্মরণ হচ্ছে, সেদিন আমরা কুখ্যাত সালা লোকেশানে ছবির শুটিং করছি। কমপক্ষে মাইল খানেক জায়গা ঘিরে রেখে আমাদের পাহারা দিচ্ছে মোরেনার ফিফথ্ ব্যাটেলিয়ান সিকিউরিটী ফোর্সের জোয়ানরা। ভয়ে এমনিতেই আমাদের বুক টিপ্ টিপ্ করছে। সুদূর কলকাতা থেকে আমরা কিছু বাঙ্গালী এসেছি চম্বলের বিভীষিকার রাজত্বে। এখানে যখন তখন একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। ডাকাতরা কোথায় যে ওৎ পেতে বসে আছে কে জানে। নইলে সিকিউরিটী ফোর্সের জোয়ানরা-ই বা অমন অ্যামবুশ করে হাতিয়ার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে কেন? কথাটা মনোতোষ আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেল।

তাকিয়ে দেখি তারেব্বাস। সর্বনাশ আর কাকে বলে! একটা উঁচু জায়গায় সিকিউরিটী ফোর্সের মেশিনগানার তার হাতিয়ার বেহড়ের দিকে তাক করে বসিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছে। কি ভাই, গুলি চলবে নাকি: মেশিনগানার আমাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

আজ তহশীলদারকে ধরা দিতে হবে। নবকুমার দাস সেজেছে সেটা। আর রূপা সেজেছে পংকজ। সঙ্গে একদল ডাকাত। শুটিং শুরু হবার আগে আমরা ওদের জামা প্যান্ট খানিকটা করে ছিঁড়ে দিলাম। তারপর তাতে ঢেলে দেওয়া হলো নকল রক্ত অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন। আসলে পুলিশের এনকাউন্টারের ধাককা সামলাতে না পেরে ওরা এখন পালাচ্ছে। আর পেছনে ছুটে আসছে পুলিশের লোকেরা। তহশীলদারের পায়ে বুলেট ইনজুরী। সেখান থেকেগল্ গল্

করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। হিমোগ্লোবিন দাঁড়াচ্ছিল না বলে নবকুমার হঠাৎ এক কান্ড করে বসল। পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে ডান পায়ের হাঁটুর কাছে খানিকটা জায়গা চিরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আসল রক্ত বেরিয়ে এল। আমি স্তম্ভিত। —এটা কি করলে?

নবকুমার তখন যেন চরিত্রের মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গেছে। গম্ভীর মুখে বলল—রক্ত বের করে দিলাম। এতে কাজটা ভালই হবে মনে হচ্ছে।

আমি আর ওকে ঘাঁটাতে সাহস পেলাম না। তখন মাথার ওপর মধ্যপ্রদেশের জ্বলন্ত সূর্য যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নবকুমারের দিকে আর তাকানোই যাচ্ছে না। হাতে শক্ত মুঠোয় ধরা রাইফেল। ঘামে ধুলোয় বালিতে আর রক্তে সর্বাঙ্গে মাখামাখি। চুল রুক্ষ। চোখ দুটি জবাফুলের মত রাঙা। ছেলেটি এমনিতেই বদরাগী। বেছে বেছে ওকেই তহশীলদারের ক্যারেকটারটা দেওয়া হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে নির্বাচনটা তখনই ঠিকই হয়েছিল।

তহশীলদার সামান্য খোঁড়াচ্ছে। একটা বুলেট ওর পায়ের খানিকটা চামড়া কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। নবকুমার সেই অনুযায়ী খুঁড়িয়ে হাঁটার ব্যাপারটা প্র্যাকটিশ করে নিয়েছিল। আজ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—সেটা সে ভালই রপ্ত করেছে। আর রূপা? চম্বলের সমস্ত ডাকাতদের মধ্যে একমাত্র সেই নাকি ছিল রীতিমত রোমান্টিক। গান বাজনা শুনতে বড় ভালবাসত। কিছু টাকা জমলেই সে ছদ্মবেশে চলে যেত বেনারাস, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বোম্বে অথবা কলকাতায় গিয়ে বাঈজীদের মাইফেলে কাপ্তেন সেজে বসে যেত। তারপর জমানো টাকা ফুরিয়ে গেলে ফিরে যেত বেহড়ে।

পঙ্কজ সেই রূপার চরিত্রে রূপ দিচ্ছিল। প্রথম দিকটায় ও ধরতে পারে নি—চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো। পরে যখন বুঝল তখন আর ওকে পায় কে! চমৎকার অভিনয় করতে আরম্ভ করল।

সেদিন সারা লোকেশানে পুলিশ বনাম ডাকাতদলের মুখোমুখি সংঘর্ষ দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল আমাদের চিত্রগ্রহণ। পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করছিল আমাদের সঙ্গের সিকিউরিটী ফোর্সের জোয়ানরাই। পরিচালিকার ইঙ্গিতে ওরা বাগীদের ধাওয়া করে বেহড়ে নেমে পড়তেই আমাদের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

তহশীলদার আর রূপার নেতৃত্বে ডাকাতরা বিদ্যুৎ গতিতে পালাচ্ছে। চারিদিকে গুলি ছুটছে। আর আমরা বেহড়ের তিনটি জায়গায় মুভী ক্যামেরা বসিয়ে রেকর্ড করে চলেছি সেই লাইফ-ড্রামা।

অভিনয় করতে করতে আমাদের অভিনেতারা বেহড়ের রুক্ষ কর্কশ পাথুরে

নেপথ্যে

শক্তি ব্যানার্জি

একদিন না বলে বাবার টাকা নিয়ে যে কিশোর একখানা ভাঙা ক্যামেরা কিনেছিল ছবি তোলার জন্য, আজ সেই কিশোর তারুণ্যে উপনীত। ছবি তোলার নেশা আজ তাঁর পেশা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলা ছবির জগতে সেই তরুণ চিত্রগ্রাহকের খ্যাতিও কম হয়নি। 'নিমন্ত্রণ' এবং 'স্ত্রীর পত্র' ছবিতে কাজের জন্য বি-এফ-জে-এর পুরস্কার পেয়েছেন তিনি দু-দুবার। রাজ্য সরকারও তাঁর কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন গত বছর।

ফিল্ম লাইনে গেছে জানতে পেরে প্রথমটায় বাবা-মার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সব সময়ই ভাবতেন 'ছেলে বুঝি বখে গেল।' কিন্তু না, তা হয়নি। 'রবীন্দ্র সদনে 'নিমন্ত্রণ' ছবির জন্য যেদিন পুরস্কার পেলাম সেদিনই বাবা-মা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, ছেলে আমার সত্যিই বখে যায়নি।' বললেন শক্তি ব্যানার্জি।

সত্যি কথা বলতে কি, 'নিমন্ত্রণ' ছবি থেকেই আজকের খ্যাতিমান চিত্রগ্রাহক শক্তি ব্যানার্জি প্রকৃত ব্রেক পেয়েছেন। আগেকার ছবিগুলোয় তাঁর (অন্বিতীয়া, দুরন্ত চড়াই) ক্ষমতার পরিচয় ছিল ঠিকই, কিন্তু 'নিমন্ত্রণ' ছবি তাঁকে ফটোগ্রাফী সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করারও সুযোগ এনে দিয়েছে। এজন্য তিনি পরিচালক তরুণ মজুমদারের কাছে কৃতজ্ঞও বটে।

শক্তিবাবু হাতেকলমে কাজ শিখেছেন মুরারী ঘোষের কাছে। কিন্তু টুকটাক কাজ করেছেন আরও অনেক পরিচালক-ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে, স্ট্যান্ড-বাই হিসাবে কার-না-কাজ করেছেন তিনি? কানাই দের অন্য ছবির স্যুটিং পড়ে গেছে, ডাকো শক্তিকে। দিলীপরঞ্জন মুখার্জি ব্যস্ত এখন, অমনি শক্তির ডাক এসেছে কাজের।

এমনিভাবে পরের হয়ে কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতার ঝুলি তাঁর ভারী হয়েছে ক্রমশ ঠিকই, আবার সেই সঙ্গে তিক্ততা দু-এক জায়গায় হয়নি এমন নয়! একবারতো এমন অবস্থা হয়েছিল যে সিনেমা লাইন ছেড়েই দেবেন ভেবেছিলেন। স্টিল ফটোগ্রাফারের কাজ করবেন ঠিক করে এনলার্জার টার্নার কিনেও ফেলেছিলেন।

না, শেষ পর্যন্ত তিনি সে সিদ্ধান্ত বদলালেন। শুরু হোল স্বাধীনভাবে কাজ 'অশ্বিতীয়া' ছবিতে। এক সময় টেকনিসিয়ানস স্টুডিওর অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে (আসলে তখন তিনি রামানন্দ সেনগুপ্তের কাছে কাজ শিখতেন)। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল। ওঁকে ইউনিটে কাজের অফারও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নেননি তখন তিনি।

বোধহয় তখন থেকেই মনে মনে জিদ ধরেছিলেন ভালো ক্যামেরাম্যান তাঁকে হতেই হবে। হয়েছেনও আজ। সাধনায় তাঁর আন্তরিকতা ছিল বলেই আজ শক্তিবাবুর কাজ সকলের কাছে স্বীকৃত, সম্মানিত।

ক্যামেরায় তিনি হাত দিলে যে অভাবনীয় কাজ করতে পারেন তার প্রমাণ রয়েছে 'স্ত্রীর পত্র' আর 'ছেঁড়া তমসুক' ছবিতে। আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে 'অজস্র ধন্যবাদ', 'দর্পণ', 'দুষ্টু মিষ্টি', 'কটাক্ষ', 'ছোট্ট নায়ক' ছবিগুলোয়। শেষ ছবিখানার তিনি পরিচালকও বটে। ভবিষ্যতে আরও ছবি পরিচালনার ইচ্ছে আছে।

কলকাতার স্টুডিওয় যন্ত্রপাতির অভাবের কথা তুলতে এই প্রথম একজন কুশলীকে বলতে শুনলাম—'যন্ত্রপাতির অভাব আছে বলেই বোধহয় এত খেটে মন দিয়ে কাজ করতে পারছি। তাছাড়া ভালো ভালো ইকুইপমেণ্টস থাকলেই কি ভালো কাজ হয়?'

হয়নাতো নিশ্চয়ই, হলে আরও অনেক শক্তি ব্যানার্জিকে আমরা পেতাম। তাঁর জীবনের এই সাফল্যের পেছনে যে নামটি তিনি সবসময় করেন সেটি হচ্ছে অক্রূর কর। গুরুত্বপূর্ণ বহু ব্যাপারে শক্তিবাবু পরামর্শ নেন অক্রূর করের কাছে। শ্রীকর তাঁর কাছে প্রায় 'গড ফাদার'এর মত।

নিরীক্ষিৎ

কাঁকর বোঝাই মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ছে আবার সামলে নিয়ে দৌড়চ্ছে। আবার লাফিয়ে পড়ছে। টেনে হিঁচড়ে ছেঁচড়ে এগোতে গিয়ে হাত-পা কেটে-কুটে রক্তারক্তি হচ্ছে। হঠাৎ দেখি স্টেনগান হাতে রূপা একটা টিলা লাফিয়ে পার হচ্ছে। প্র্যাকটিশ না থাকলে এক্ষেত্রে যা হয়। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর তাতেই ডানহাতের কনুইয়ের চামড়া উঠে গেল খানিকটা। তহশীলদার ঠিক ওর পেছনেই ছিল। টাইমিং করে একলাফে ওকে ডিঙিয়ে টিলাটা অনায়াসে পার হয়ে গেল সে। একটা জ্বলন্ত বুলেট এসে বিঁধে গেল তহশীলদারের পায়ে। তৎক্ষণাৎ মর্মান্তিক একটা আর্তনাদ করে উঠে তহশীলদার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাটিতে আছড়ে পড়ল। —ম্যয় মর গিয়া রূপা—

আমাদের জন্ম ক্যামেরা ততক্ষণে তহশীলদারের চীৎকারে পেছন ঘুরে কাণ্ড দেখে সে থমকে দাঁড়াল। অন্যান্য সঙ্গীরা তখন ওকে পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে থমকে দাঁড়ানো মানেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা। পুলিশ হন্যে হয়ে ছুটে আসছে। আর আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট।

রূপা এক লাফে তহশীলদারের পাশে এসে বসে পড়ল। তহশীলদার দু হাতে পা চেপে ধরেছে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। যন্ত্রণায় ওর মুখ বিকৃত। ঠাকুর মান সিংয়ের ছেলে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে পড়বে? অসম্ভব। রূপা দেখল, তহশীলদার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছে। ওর উত্থানশক্তি চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্তে রূপা কি যেন ভাবল। তারপর চোখের পলকে তহশীলদারকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেহড়ের সেই সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে সামনের দিকে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করল।

এবার আমাদের পালা।

আমরাও ঝড়ের মত অনুসরণ করে চললাম ওদের। ছুটছে আর্টিস্টরা। ছুটছে ক্যামেরা। ছুটছে সাউন্ড। লাইটের সরঞ্জাম। ফার্স্ট এইডের বাক্স। আর আমাদের ঘিরে রেখে চতুর্দিক থেকে সেই গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে সিকিউরিটী ফোর্সের লোকজন। কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে গিয়ে হাত-পা কেটে-ছড়ে একাকার হচ্ছে সবার। কিন্তু সেদিকে বুঝি ভ্রূক্ষেপই নেই কারো। মনোতোষ আর গৌর দৌড়চ্ছে ডেটলের বোতল নিয়ে। ছুটতে ছুটতেই ওরা সকলের হাতে ডেটলে ভেজানো তুলো এগিয়ে দিচ্ছে। এর-ওর হাতে।

সিকিউরিটী ফোর্সের ওপর কর্ণেল সাহেবের কড়া হুকুম ছিল—শুটিং-এর জন্যে একমাত্র পরিচালিকার অনুমতি ছাড়া কেউ তার রাইফেল বা অন্য হাতিয়ারে আসল বুলেট বা পাক্কা রাউণ্ড লোড করতে পারবে না। এখন শুধু ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার চলবে। ফলে আমাদের সঙ্গে যে-সব জোয়ানরা

উত্তমকুমার - আরতি ভট্টাচার্য

আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করছিল—তারা ঘন ঘন তাদের রাইফেলের চেম্বার পরীক্ষা করে নিচ্ছিল। কি জানি মনের ভুলে যদি আসল বুলেট লোড হয়ে যায়! আর এখানে একবার সে ভুল হলে আর রক্ষে নেই। চারিদিকে যে রেটে গুলি-গোলা চলছে তাতে সামান্য ভুল-ভ্রান্তি ঘটলে একেবারে জীবনান্তকর পরিস্থিতি হতে পারে।

মেশিনগানার নীহাল সিং তার জীবনে বহু এনকাউন্টারে গুলি চালিয়েছে। সবাই বলল নির্ভুল টার্গেটে গুলি চালিয়ে ও নাকি বহু ডাকুর ভবলীলা খতম করেছে। লোকটির চরিত্রে নাকি ভয় ডর বলে কোন কথা নেই। আর ওর মুখ দেখে মনের কথা আঁচ পাওয়া বড় কঠিন কাজ। অথচ এমনিতে কিন্তু বেশ ফুর্তিবাজ লোক। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকার ডিউটী পেয়ে খুব খুশী। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে আমায় অনেক এনকাউন্টারের রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়ে দিল।

কথায় কথায় হঠাৎ বলল—জানেন বাবুজী, চম্বলে একটা প্রবাদ চালু আছে—

—সেটা কি ভাই?

—সেটা হচ্ছে যে মানুষ একবার রাইফেল হাতে বেহড়ে নেমে যায়, সে আর কখনও সভ্যজগতে ফিরে আসেনা। আর অ্যামুনেশান ফ্যাক্টরীতে একটা বুলেটের গায়ে তার নাম অমনি খোদাই হয়ে যায়। তারপর একমাস, দু মাস, দু বছর বড় জোর তিন বছর—বাছাধনকে সেই বুলেটে ঘায়েল হয়ে এর মধ্যে মরতেই হবে একদিন। কোন পরিত্রাণ নেই। কত বড় বড় বাগী দেখলাম। যাদের আতঙ্কে এখানকার মানুষ থর থর করে কেঁপেছে তারাও শেষ পর্যন্ত এই অপঘাত মৃত্যুকে এড়াতে পারল না। ধরুন না, একটা মামুলী এনকাউন্টারে ফেঁসে ছ্যাঁদা হয়ে মরে পড়ে রইল এই বেহড়ের মাটিতে। কপাল আর কাকে বলে! তাই বলি আজ মোহর সিং (তখনকার দুর্ধর্ষ ডাকাত) যতই ঝামেলা করুক, ব্যাটাকে মরতেই হবে। কি জানি—হয়ত আমার হাতেই ওর মরণ নাচছে। এই যে দেখছেন আমার মেশিনগানটা, এটা আমার বড্ড লায়েক ছেলে। খুব অনুগত। আমি যা বলব, যেমন বলব—তাই শুনবে।

ওদিকে আহত তহশীলদারকে কাঁধে নিয়ে স্টেনগান হাতে রূপা দৌড়চ্ছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে সর্বাঙ্গ দরদর করে ঘামছে। কনুই কেটে বেরিয়ে আসা রক্ত বেহড়ের রুক্ষ মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তবু থামলে চলবে না। যেভাবেই হোক—সিকিউরিটী ফোর্সের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতেই হবে। মাথার ওপর দিয়ে শিস দিয়ে পুলিশের বুলেট বেরিয়ে যাচ্ছে। যায় যাক। পালাও পালাও।

তার কাঁধে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তহশীলদার সিং। তার ক্ষতস্থান থেকে অনর্গল রক্ত ঝরছে আর সেই রক্তে রূপার খাকী শার্ট ভিজে লাল হয়ে উঠছে। কিছুদূর যেতেই তহশীলদার হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে—এ বৃথা চেষ্টা। পুলিশ তিন দিক থেকে তাদের আজ ঘিরেছে। বেহড়ের রক্তপিপাসু মাটি আজ তাজা রক্ত খুঁজছে। অতএব। তার পালিয়ে যাবার আর কোন উপায় নেই।

—রূপা, আমাকে নামিয়ে দাও—

রূপা অবাক। —কেন?

—এই জন্যে যে তোমাকে বাঁচতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের দুজনকেই মরতে হবে। তার চেয়ে আমাকে ফেলে দিয়ে তুমি পালাও—

—অসম্ভব। দাউ (ঠাকুর মান সিং) যখন তোমার কথা জানতে চাইবে—আমি তাকে কি জবাব দেব?

তহশীলদারের চোখে জল। —পিতাজীকে বলবে—সে দুশমনের সংগে লড়াই করে মরেছে। ইজ্জতের সংগে মরেছে। পিতাজী খুশী হবে—

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট বেরিয়ে গেল। রূপা তহশীলদারকে নিয়ে সংগে সংগে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ওরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। তহশীলদার উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—রূপা বোকামী করো না। পালাও। আমাকে একটা রাইফেল আর গুলি দিয়ে যাও। আমি এ পাশটা গার্ড করছি। আমি পাল্টা গুলি চালিয়ে পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখব। আর সেই সময়ের মধ্যে তুমি ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু রূপা তাতে রাজী নয়।

—পালাতে হলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পালাব। তোমাকে এভাবে ফেলে রেখে আমি যেতে পারি না তহশীলদার—

তহশীলদার ক্ষিপ্ত হয়ে বলছে—না আমার জন্যে আমি দলের কাউকে জান দিতে দেব না। তুমি পালাও, পালাও বলছি, এখনও সময় আছে।

শেষে নিরুপায় হয়ে রূপা ওকে বেহড়ের একটা মাটির খাদে বসিয়ে হাতে একটা রাইফেল আর কয়েক রাউণ্ড বুলেট থামিয়ে দিয়ে বলল—এই রেখে গেলাম, ঈশ্বর সাক্ষী—

রূপার মত দুর্ধর্ষ ডাকাতের চোখে জল।

তহশীলদার চীৎকার করে বলল—তুই একটা আওরৎ—চোখের জল ফেলছিস্‌—জান নিয়ে এখন পালিয়ে যা—

রূপা শেষবারের মত ওকে দেখে নিয়ে দ্রুত চলে গেল। আর চম্বলের সন্ত্রাস দাউ মান সিং-এর বড় ছেলে ডাকু তহশীলদার আহত পঙ্গু দেহে বসে রইল মৃত্যুর অপেক্ষায়।

সিকিউরিটী ফোর্সের কয়েকজন জোয়ান এসব দেখে অভিভূত। আসলে তহশীলদার এনকাউণ্টারে তারাও ছিল। তাদেরই একজন বলল—অবিকল এই রকমই ঘটেছিল সেদিন। রূপা মহারাজ তহশীলদারকে বেহড়ের একটা সরু গলির মুখে বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়েছিল। রেখে গিয়েছিল একটা রাইফেল আর কিছু কার্তুজ...বলতে বলতে সেই অড সাইজের বুলেটগুলো নবকুমারের পাশে রেখে দেওয়া হল। মাথার ওপর সূর্যের গনগনে আগুন বাতাসে যেন হালকা ছড়াচ্ছে। এখন তহশীলদারের চেহারা আরও ভয়ংকর। চোখ দুটো স্থির অকম্প। হাতে রাইফেল।

নিঃস্তব্ধ বেহড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাড়া করে আসা পুলিশের বুটের শব্দ শোনা গেল। আর সংগে সংগে অ্যালার্ট হয়ে গেল তহশীলদার। রাইফেলের চেম্বারে এবার বুলেট ঢোকাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু

উৎপল দত্ত - স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়

একি? এ যে অন্য বুলেট! এ বুলেট তো এই রাইফেলের নয়। সর্বনাশ। একটার পর একটা বুলেট সে রাইফেলের চেম্বারে ঢোকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। একটাও লাগছে না। লাগছে না, লাগছে না, লাগছে না। হায় ঈশ্বর!

পুলিশের অ্যাডভান্স পার্টির নজরে পড়ার সংগে সংগে ওরা পিছিয়ে গিয়ে পজিশন নিয়ে নিল। কালান্তক যম বসে আছে ওখানে। ওয়াকি-টকিতে মেজর সাহেব হেড কোয়ার্টারকে বললেন—একটা বাগী সামনে রয়েছে। মনে হচ্ছে হার্ডকোর। কি করব?

হেড কোয়ার্টার তৎক্ষণাৎ পরামর্শ দিয়েছে—ওকে সারেণ্ডার করতে বল। নো প্রোভোকেশান। ও গুলি না চালালে আমাদের জোয়ানরা গুলি চালাবে না। লোকটাকে জ্যান্ত ধরতেই হবে।

মেজর দূর থেকে চেঁচিয়ে তহশীলদারকে বললেন—আর কি, সারেণ্ডার কর। তাহলে অন্তত জানে বাঁচবে—

তহশীলদার কোন জবাব দিল না। কটমট করে তাকিয়ে রইল।

আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ টের পেয়ে গেল যে ওর রাইফেলে নিশ্চিত কোন গণ্ডগোল আছে। গুলি ও আর চালাতেই পারবে না। ও এখন নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ মাত্র।

ব্যস, চোখের পলকে জোয়ানরা ওকে ঘিরে ফেলল। একটা বুলেটও খরচ করতে হলো না। তারপর যখন জানা গেল যে ধৃত ডাকাত হচ্ছে স্বয়ং তহশীলদার সিং, পুলিশের মধ্যে যেন উল্লাসের স্রোত বয়ে গেল।

আর অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হলো বলে তহশীলদার রাগে দুঃখে ক্ষোভে তখন প্রায় উন্মাদ। চীৎকার করে সে শুধু বলেছে—আমাকে তোমরা গুলি করে মারো। দয়া করে গুলি করে মারো। গুলি করে মারো—

তহশীলদারের চীৎকারে পুলিশের লোকেরা আদৌ বিচলিত হয়নি। তহশীলদার মরতে চেয়েছিল ভিন্ন কারণে, চম্বলের ডাকুরা তাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করবে। কোন ডাকাত জীবিত অবস্থায় কখনও পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। সেটা মোটেও সম্মানজনক নয়। অথচ কেউ বিশ্বাস করবে না রূপা তাকে ভুল কার্তুজ দিয়ে গিয়েছিল। ফলে সে না পেরেছে আক্রমণ করতে না পেরেছে আত্মরক্ষা করতে। মামুলী চুহার মত সে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে তহশীলদারকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে একটা জীপ শহরের পথে যাত্রা করল। তারপর থেকে তহশীলদার আর বেহড়ে ফিরতে পারেনি। আজও সে আগ্রার সেন্ট্রাল জেলে বন্দী দশায় দিন কাটাচ্ছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে তার।

গোয়ালিয়র টাইমসের গোবিন্দ শর্মা আমাকে বলেছিলেন—ফেরবার সময় যদি পারেন তো একবার তহশীলদারের সংগে দেখা করে যাবেন। লোকটির মতি-গতির কতটা পরিবর্তন হয়েছে সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। যে মানুষ একদিন হাসতে হাসতে অন্যের প্রাণ নিয়েছে সে আজ অন্যের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে জেলের হাসপাতালে সেবাব্রতের কাজ নিয়েছে। দিন-রাত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা নিয়ে আছে...।

রঞ্জন মজুমদার

সুহাসিনী মুলে

বিশপ লেফ্রয় রোডের দোতলায় ৬ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা খুলে যে তরুণীটি সামনে দাঁড়ালো তাকে 'ভুবন সোম'এর গৌরী বলে প্রথমটায় চিনে নিতে একটু অসুবিধে হবার কথা। মুখের আদলে খুব একটা বদল হয়নি বটে, কিন্তু উনসত্তর সালের কিশোরী আজ তরুণীতে পরিণত। চেহারায় ও চাকচিক্যে অনেক আপ-টু-ডেট তিনি এখন। কথায় ইংরেজী বলার ঝোঁক বেশী। বেশ-ভূষায় আধুনিকার ছাপ সুস্পষ্ট।

এই মুহূর্তে তিনি আমার সামনের সোফায় বেশ রিল্যাক্সিং ভঙ্গিতে বসে আছেন। পা দুটো মুড়ে পাশের চেয়ারে তুলে দিয়েছেন আধশোয়া হয়ে। পরনে সুতির একটা বেল বটস আর বুশ শার্ট। হাতাও গোটানো। চোখে-মুখে কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে ওঠার ছাপ ছড়ানো। হাতে একখানা বই, বোধহয় পড়ছিলেন।

আসলে আমি গিয়েছিলাম ইন্টারভিউর দিন ঠিক করতে। উনি বললেন—'আমিতো ঘন্টা দুয়েক বাড়ীতে আছি। অসুবিধে না হলে আমি রাজী।' ছবি তোলার জন্য ফটোগ্রাফারকে ডাকার প্রস্তাব করতে খুব হালকা করে বললেন—'ছেড়ে দিন আজ'। মাথার এলো চুলগুলোকে আরও একটু এলোমেলো করে দিলেন। 'এ অবস্থায় কি ছবি তোলা যায় নাকি!'

সুতরাং ছবি তোলা হোল না তখন। মুলতুবি রইল। শুরু হোল ইন্টারভিউ। সুহাসিনী মুলে জাতে মারাঠি হলে কি হবে ও'র বাংলা কথা শুনলে বুঝতেই পারবেন না যে ও'র মাতৃভাষা কি? কাচের মত স্বচ্ছ বাংলা বলছেন আমার সঙ্গে। ভাষার প্রতিটি নুয়্যান্সগুলোও তাঁর জানা। বললাম—'বাংলা এত ভালো শিখলেন কি করে?' গৌরী নয়, সুহাসিনী মুক্তোর মত দুপাটি দাঁত ঈষৎ বিস্ফারিত করে জানালেন—কলকাতায় তো ছিলাম প্রায় বছর খানেক। এখানে বাঙালী বন্ধু কম আছে নাকি আমার? তারপর দিল্লী বম্বে যেখানেই পড়াশুনো করেছি সেখানেই বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতো খুব। তাদের সঙ্গে থেকে থেকেই শিখেছি।'

তবে এখনও বাংলা পড়ার ব্যাপারে তিনি একবারে কাঁচা। এখনও ইন্ডিয়া ল্যাবের এডিটিং রুম বা ক্যান্টিনে বসে কাজের ফাঁকে সময় চুরি করে বসে পড়েন বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়'টি নিয়ে। হাতের কাছে যাঁকে পান তাঁকেই ডেকে জিজ্ঞেস করেন কোন শব্দটা কি— সত্যজিৎ রায়ের ইউনিটের প্রায় সকলেই এখন ও'র বাংলার মাস্টার। কথা শুনে মনে হোল বাংলা শেখার প্রচণ্ড ঝোঁক রয়েছে ও'র।

'ভুবন সোম'-এর অস্বাভাবিক সাফল্য সুহাসিনীকে ঐ একখানা ছবি দিয়েই প্রায় তারকার পর্যায়ের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফিল্ম লাইনের রঙিন হাতছানিতে তিনি তখন সাড়া দেননি। মার পরামর্শে চলে গিয়েছিলেন কানাডায় মাস কম্যুনিকেশন পড়বার জন্য। পাঁচ বছরের কোর্স। প্রথম দু' বছর জেনারেল কোর্স পড়ার পর সুহাসিনী স্পেশালাইজড বিষয় নিলেন—টি-ভি।

মন্ট্রিলে তিন বছর হাতে-কলমে কাজ করার পর দেশে ফিরেছেন গত বছর ডিসেম্বরে। কি করবেন—কি করবেন না ভাবছেন। এমনি সময় সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে কাজ করার অফার পেয়ে চলে এলেন কলকাতায়। অবশ্য ইতিপূর্বে গত জানুয়ারীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময় দিল্লীতে পরিচয় হয়েছিল দু'জনের। জুরী বোর্ডের লিয়াঁস সেক্রেটারী হিসাবে সুহাসিনী ছিলেন ও'দের সঙ্গে।

'মানিকদার সঙ্গে কাজ করাটাও তো একটা অভিজ্ঞতা। অনেক কিছু শেখা যায়। গলায় বিনয়ী ছাত্রীর সুর। জানতে চাইলাম—বিশেষ কি শিখলেন, যদি বলেন?

চঞ্চল চোখে কি বলবেন সেই ভাবনা জাগল বুঝি। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেশ গম্ভীর সুরে বলে উঠলেন—'ফিল্মে ডিটেলের কাজের যে কতখানি গুরুত্ব তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। মানিকদা এই কাজগুলো খুব যত্নের সঙ্গে করেন।' কথাটা শেষ করে 'জন অরণ্য' ছবির সেটের একটা ঘটনা শোনালেন।

একখানা ঘরে ডেট-ক্যালেণ্ডার আছে একটি, তাতে তারিখ দেখাতে হবে ধরুন ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল। একজন সহকারী সাল-তারিখ তো ক্যালেণ্ডারে পটাপট বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বারটা নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল। ঐ সালের ২১ এপ্রিল কি বার ছিল সেটা সঠিক না জেনে সত্যজিৎ রায় যে-কোনো বার করে দিতে রাজী নন। উনি বললেন—'ছবি দেখতে বসে দর্শকরা এগুলোও মার্ক করে ভয়ানক। জানোনা তো, ভুল কোনো বার দেখানো হলে দেখবে ঠিক চিঠি আসবে!' তখন আর করা কি যায়! অংক কষে ঠিক দিনটা বার করে তবে ছাড়। এই ধরনের ডিটেলের কাজ সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর ক'জনই বা করেন।

সুহাসিনী বললেন—'বলুন না, এই শিক্ষাটাই বা কম কিসে?'

—নিশ্চয়ই! ছোটখাট ডিটেলের ওপর ছবির অনেকটা নির্ভর করে তা বটেই।

মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হেসে বললেন —'বাঃ, তা থাকবে না কেন?' মৃণালবাবুর সঙ্গে এই কলকাতায় থাকতে দেখা হয়েছে একাধিকবার। তিনি ওঁকে বলেওছেন—পরের ছবিতে তোমার কাজ হতে পারে, করবে তো?'

সুহাসিনী জানালেন গররাজি হবার কোনো কারণ নেই। ডাকলেই কাজ করবেন। তবে সহকারী পরিচালকের কাজ তিনি 'মানিকদা'র সঙ্গেই করবেন। 'জন-অরণ্য' শেষ, পরের ছবিতেও করার ইচ্ছে।

মৃণাল সেন সুহাসিনীকে এনেছিলেন পর্দায়। 'ভুবন সোম' থেকে তিনি খ্যাতিও কম পাননি। তাই যখন প্রশ্ন তুললাম 'মৃণাল সেনের সঙ্গে অ্যাসিস্টান্ট থাকলেন না কেন?'

আসন করে বসা পা দুটো নীচে নামিয়ে বাঁ দিকের জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশে দৃষ্টি ফেললেন একবার। প্রশ্নটার জবাব দেবেন কিনা বা কি দেবেন এই ফাঁকে ভেবে নিলেন বোধহয়।

আলগা হাসি মুখে ছড়িয়ে বললেন—'জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে তো আমি চুপচাপ বসেই ছিলাম। মানিকদা বললেন কাজ করতে। চলে এলাম। তাছাড়া তখন মৃণালদাও কোনো ছবি করছিলেন না। এখনও শুরু করেননি। ও'র সঙ্গে কাজ না করার আর কোনো কারণ নেই।'

'জন-অরণ্যে' ছোটখাটো কোনো রোল করছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে জানলাম—করেননি। এ-ছবিতে ও'র করার মত কোনো চরিত্রও অবশ্য নেই, 'দু-একটা সিনে হাত না পা কি যেন দেখিয়েছি পর্দায়, ব্যস!'

অভিনয় নিয়েই যখন ফিল্মে আসা, তখন ঐ লাইনেই তিনি স্টিক করে থাকতে পারতেন। প্রোডিউসাররা এসেছিলেনও বহু অফার নিয়ে, কিন্তু তিনি ডিক্লাইন করেছেন সব প্রোপোজাল। ডিরেকটর হবার বাসনা তাঁর অনেকদিনকার। কানাডায় টি-ভি ট্রেনিং নিয়ে আজ তিনি ছবি পরিচালনায় হাত পাকিয়েছেন। তার ওপর সত্যজিৎ

রায়ের ইউনিটে কাজ করার অভিজ্ঞতা তো জমছে ঝুলিতে।

স্বাধীনভাবে এখনি তিনি শুরু করছেন না কাজ, আরও পাকা হয়ে তবে তিনি নামবেন। 'তাড়াহুড়ো করার কি আছে? ছবি না-হয় কিছুদিন বাদে করব। আগে ভালো করে সব দেখেশুনে নিই।' শুনেছিলাম টি-ভি-তে নাকি উনি যোগ দেবেন। এই সম্পর্কে জানতে চাইলে সুহাসিনী বললেন—'নট ইয়েট ডিসাইডেড। এখন তো ফিল্মে কাজ করছি।'

ফিল্ম সম্পর্কে সুহাসিনীর ইণ্টারেস্ট শুরু নিজের বাড়ী থেকেই। মা শ্রীমতী বিজয় মূলে ভারতীয় ফিল্মের সঙ্গে জড়িত অনেক দিন। এই কলকাতায় তিনি বেশ কিছুদিন সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজও করেছেন। ছোটবেলা থেকেই দেশ-বিদেশের ছবির সঙ্গে পরিচয় তাঁর। ছবির সিরিয়স দর্শক যেমন তাঁকে বলা যায় আবার হাল্কা ছবিও তাঁর কাছে দেখার অযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে ওঁর সহাস্য মন্তব্য—'হিন্দী ছবি অনেকটা মুখোমিষ্টির মত, মাঝে-মধ্যে স্বাদ না নিলে মুখটাই বিস্বাদ হয়ে যায়।'

বাংলা ছবিও ইতিমধ্যে দেখেছেন কয়েকটা। বাংলা তো বোঝেন ভালোই, কাজেই অসুবিধে হয়নি। বাংলা ছবি সম্পর্কে ওঁর মত—'মন্দ নয়। সব ছবিইতো আর সমান পর্যায়ের হতে পারে না!'

সুহাসিনীর হবার কথা ছিল অভিনেত্রী, সেভাবে ব্রেকও পেয়েছিলেন ভালো ছবিতে। কিন্তু হলেন না। সুহাসিনী আজ ডিরেকটর হবার স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্ন সফল হবার পথও অনেকটা পরিষ্কার। অভিনয় সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মন্তব্য—'ভালো রোল পেলে করব নিশ্চয়ই।'

—আর ডিরেকটর?

নিশ্চয়ই সেটা ভেবে দেখব।

অভিনয়ের চর্চা অবশ্য তিনি এখন করছেন না। তিনি মনেও করেন অভিনয়-চর্চার ব্যাপার। পাঠক্রম অনুযায়ী পড়াশুনো করে অভিনয় শেখা যায় না।

যদি মোবাইল ফেস থাকে আর ফিলিংস খবে ফাইন হয়, তাহলে যে-কোনো লোকের পক্ষে অভিনয় করা মোটেই কঠিন নয়।'

—আপনি কি মনে করেন আপনার এই যোগ্যতাগুলো আছে? মুচকি হাসলেন প্রশ্নটা শুনে। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে চট করে উত্তর দিলেন—'নিশ্চয়ই আছে।'

গোধূলির আলো তখন সুহাসিনীর সারা মুখ জুড়ে। জানালাগুলো সব খোলা।

ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। আড্ডায় জমে গিয়ে বোধহয় আলো-আঁধারির কথাটা খেয়াল হয়নি। সামনের রাস্তা দিয়ে হুস-হাস করে গাড়ীর শব্দ আসছে কানে। আশপাশের বাড়ীতে আলো জ্বলছে।

কাজের লোকটি বাইরে থেকে এসে হঠাৎ আলো জ্বালতে মনে হলো 'সত্যিই তো সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।' সুহাসিনীই এক-রাশ লজ্জা ছড়িয়ে বলে উঠলেন—'আলোই জ্বালিনি, দেখুন তো কি অবস্থা! ভেরি সরি!'

আর একটু বাদে তিনি হয়ত চলে যাবেন রবি ঘোষের বাড়ী ওখানে জমাটি আড্ডা বসে রোজ। এখন কলকাতায় সুহাসিনীর ঐটিই বোধহয় একমাত্র গপ্পের জায়গা। সারাদিন সুটিং অ্যাটেন্ড করে ক্লান্ত শরীর ও মন একটু বিশ্রাম চায়। তারওপর সুহাসিনী এখন টগবগে তরুণী। সুতরাং আড্ডা ইজ দি মাস্ট। আর রবি ঘোষের ডেরায় আড্ডা মানে ইনটেলেকচুয়াল জমাটি। সেখানে তো যাবেনই।

আসার সময় বললাম—'কোথায় যাবেন এখন—রবিদার বাড়ী?'

মুচকি হাসলেন। ফরসা গালে খুশীর ঢেউ তুলে বললেন—'দেখি।'

নির্মল ধর

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় 'কিছুক্ষণ' বিভাগে রবি ঘোষের সাক্ষাৎকারের দুই জায়গায় (পৃঃ ৬০) 'মাতাল' ক্লাব ছাপা হয়েছে। মাতাস ক্লাব পড়তে হবে।
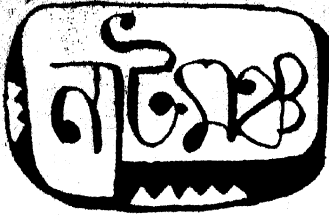
নান্দীকার এর বলিষ্ঠ নাটক 'আন্তিগোনে'

'নান্দীকার'-এর সাম্প্রতিক নাটক 'আন্তিগোনে' বাংলার নাট্যমঞ্চে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এর বিষয়বস্তু বা কাহিনী, বক্তব্য এবং সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ অভিনয় নাটকটিকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে।

এ নাটকের পটভূমি প্রাচীন গ্রীসের থেবাই নামক একটি রাজ্য। সময় রাজা অয়দিপাউসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের একটি দিনের ভোর থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

রাজা অয়দিপাউস ভাগ্যতাড়িত মানুষ। মধ্যযৌবনে তিনি একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন এবং স্বীয় মাতার গর্ভে চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। যার দুটি পুত্র দুটি কন্যা। এই ভয়াবহ তথ্য জানার পর তাঁর মাতা ও স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। লজ্জায় ঘৃণায় ও অনুশোচনায় রাজা অয়দিপাউস স্বর্ণ শলাকা দিয়ে নিজের দু'চোখ অন্ধ করে দেন ও রাজ্য থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নেন এবং পরবর্তীকালে সেই অবস্থায়ই মারা যান।

রাজা অয়দিপাউসের মৃত্যুর পর থেবাইয়ের সিংহাসন নিয়ে দুই পুত্র এতিয়োক্লেস ও পলিনেসেস-এর মধ্যে বিবাদ শুরু হোল। বিবাদ থেকে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে উভয়েরই মৃত্যু হোল পরস্পরের হাতে। সেই সুযোগে রাজা হয়ে বসলেন রাজা অয়দিপাউসের শ্যালক ক্রেয়ন। ক্রেয়ন যুদ্ধে এতিয়োক্লেসের পক্ষ নিয়েছিলেন। তাই রাজা হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন মৃত এতিয়োক্লেস দেশপ্রেমিক ও শহীদ। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার সমাধি হবে। আর পলিনেসেস দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। অতএব তার মৃতদেহ উন্মুক্ত রাজপথে পড়ে থাকবে—ভবিষ্যত বিদ্রোহীদের যথোচিত শিক্ষাদানের জন্য। অর্থাৎ তাকে দেখে থেবাইবাসী বুঝবে বিদ্রোহ করার কি মূল্য।

এটা গল্পের পূর্বাভাস। নাটকের শুরু এরপর থেকে।

রাজা অয়দিপাউসের দুই কন্যার প্রথম জন ইসমেনে আবেগতাড়িত, ভীরু এবং কিঞ্চিৎ বিলাসী। আন্তিগোনে স্বভাবে কিছুটা বিপরীত। সে সাহসী এবং স্পষ্টবক্তা। তার ইচ্ছে পলিনেসেসের রাজপথে পড়ে থাকা মৃতদেহ কবর দেওয়া হোক। তার প্রথম কারণ সে আন্তিগোনের ভাই এবং রাজপুত্র, দ্বিতীয়ত তাকে সমাধিস্থ না করা হলে তার আত্মা স্থিতি ও শান্তি লাভ করবে না।

কিন্তু রাজার আদেশ অমান্য করলে মৃত্যু। তবু সে গোপনে পলিনেসেসের মৃতদেহকে কবর দিতে গেল এবং রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ল। রাজা ক্রেয়ন শুনে প্রথমটা বিস্মিত এবং চমকিত হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়েও স্নেহবশত আন্তিগোনেকে না থেকে নিরস্ত হতে বললেন। কিন্তু আন্তিগোনে সংকল্পে অটল। তাই শেষপর্যন্ত রাজা ক্রেয়ন তার ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ আন্তিগোনেকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। সে খবর শুনে সারা থেবাইবাসী আড়ালে রাজাকে ধিক্কার দিল।

অন্যদিকে আন্তিগোনের সঙ্গে আর একজন যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করল সে তার প্রেমিক ও ক্রেয়নের পুত্র হীমন। সে পিতার সামনেই তলোয়ার দিয়ে আত্মহত্যা করল। সেই খবর শুনে ক্রেয়নের স্ত্রীও ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করলেন। এত শোক ক্রেয়ন স্তব্ধ বিস্ময়েই হজম করলেন। কারণ সে রাজা, স্বেচ্ছায় সে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে, শোক বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সে কর্তব্যচ্যুত হতে পারে না।

এই কাহিনীর অনেকটাই মঞ্চের আড়ালে সংঘটিত হয়েছে। নাটক প্রাধান্য পেয়েছে প্রধানত ক্রেয়নের সঙ্গে আন্তিগোনের যুক্তিতর্ক ভিত্তিক কথোপকথন, আন্তিগোনের সঙ্গে হীমনের প্রেম ও বাক্যালাপ, দুই বোনের প্রতি ধাই-মার সস্নেহ ব্যবহার ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে নান্দীকারকে ধন্যবাদ যে তাঁরা দর্শকের মনে আলোড়ন সৃষ্টির জন্য মঞ্চে নিষ্ঠুর দৃশ্যের অবতারণা করেন নি। অথচ সে সুযোগ তাঁদের একাধিক ছিল।

এ নাটকের মূল চরিত্র নাজা কেয়ন ও আন্তিগোনের চরিত্রে রূপদান করেছেন যথাক্রমে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেয়া চক্রবর্তী। ক্রেয়নের রাজোচিত ব্যক্তিত্ব আপাত্র কাঠিন্য এবং ভিতরে ভাবটুকু অজিতেশবাবুর অভিনয়ে আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট। তাঁকে যেমন মানিয়েছিল তেমনি তিনি দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। কিছু দৃশ্যে মনে থাকে তাঁর চোখের চাহনি অভিব্যক্তি এবং মুভমেণ্টস ভুলবার নয়।

কেয়া চক্রবর্তীর আন্তিগোনে ঋজু নির্ভীক এবং স্বতোৎসারিত আবেগে সঞ্চারিত। তিনি ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য বিদ্রোহে স্থির লক্ষ্য এবং ক্রেয়নের সঙ্গে যুক্তি বা তর্কযুদ্ধে নির্ভীক, অন্যদিকে হীমনের কাছে প্রেম নিবেদনে আবেগ তাড়িত এবং ধাই-মার সংস্পর্শে শিশুসুলভ মনোভাবটি আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেয়া চক্রবর্তী যে অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রতিভাময়ী 'ভালো মানুষ'-এর পরে আর একবার প্রমাণ করলেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি যেন 'ভালো মানুষ'-এর শান্তাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আন্তিগোনে দেখে তা যেন মনে হোল। হয়তো বা তা তাঁর অজানিতেই।

বীণা মুখোপাধ্যায়ের ইসমেনে সুন্দর। আর আবেগপূর্ণ অভিনয়ে দর্শকদের আপ্লুত করেছেন ধাই-মা রূপী লতিকা বসু।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের হীমন ভাল।

বর্ণালী চক্রবর্তীর প্রথম প্রহরী প্রথমাংশে চমৎকার। সেই অনুপাতে অন্য দুই প্রহরীর অভিনয় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ।

অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় বিনাশ্রত।

পরিমল মুখোপাধ্যায়ের সূত্রধার আন্তরিক। বিশেষ করে সহজ ভাষায় অভিব্যক্তিতে কাহিনীটি বলে যাওয়ার মধ্যে মুন্সিয়ানা আছে। তবে একাধিকবার সূত্রধার হিসেবে তাঁর মঞ্চে আগমন নাটককে জুড়ে দেওয়ার পক্ষে হয়তো সহায়ক হয়েছে তবু যেন মনে হয়েছে নাটকের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে দর্শকমনে কিছুটা বিঘ্নতারও সৃষ্টি হয়েছে। ঐ কথাগুলি কি কুশীলবের মুখ দিয়ে সংলাপের মাধ্যমে বলে দেওয়া যেত না? (নাটক : সোফোক্লেস ও জাঁ আনুই। ভাষান্তর: চিত্তরঞ্জন ঘোষ।) কুমার রায়ের মঞ্চ পরিকল্পনায় নাটকে নির্দিষ্ট সময়ের গ্রীক স্থাপত্য ও তার পরিবেশটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কালীপ্রসাদ ঘোষের আলো নাটকের গতিকে তীব্র গতিময় হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। শক্তি সেনের রূপসজ্জা এবং পোশাক পরিকল্পনা সময় ও চরিত্র অনুযায়ী। হিমাংশু পালের শব্দ প্রয়োগ নাটকে গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত চরিত্রহীন নাটকের একটি দৃশ্যে অসীম দত্ত (সুকুমার), অচ্যুতকুমার সিনহা (সতীশ), স্বরাজ মজুমদার (রাখাল) ও জগদ্বন্ধু ভাণ্ডারী (ঠাকুর)-কে দেখা যাচ্ছে।

এমন একটি মঞ্চের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নাটক উপহার দেবার জন্য নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে অজস্র সাধুবাদ জানিয়েও তাঁর ভাষাতেই বলি, এ মন ভরানোর নাটক ভাববার মত নাটক এবং অনিবার্যভাবেই বিশিষ্ট ও রুচিবান দর্শকদের জন্য এ নাটক। তাই টিকিট ঘরের সার্থকতা না এলেও এমন নাটক পরিবেশন এবং দর্শন করার আলাদা একটা প্রয়োজন আছে। 'আন্তিগোনে' অনিবার্যভাবেই সেই মর্যাদায় চিহ্নিত।

অমৃতবাজার পত্রিকা' এডিটোরিয়াল স্টাফের 'চরিত্রহীন'

সম্প্রতি একটি অপেশাদার ভাল নাটক দেখার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। গত ২৫ আগস্ট সকালে অমৃতবাজার পত্রিকার এডিটোরিয়াল স্টাফ স্টার মঞ্চে পরিবেশন করলেন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' নাটকটি। এটি তাদের সপ্তম বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান। এই বছর শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয় করা বা পরিবেশনের আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এই বছরই সারাদেশব্যাপী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে। সেই জন্যও এই নাটক পরিবেশনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

'চরিত্রহীন' নাটক হিসেবে দুরূহ সন্দেহ নেই। এর প্রায় সব চরিত্রই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল। কিন্তু এঁরা দর্শকদের অবাক করে দিয়েছেন সেই সব চরিত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে। অথচ এঁরা প্রায় কেউই নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন না। এর জন্য অভিনেতারা ছাড়া আর যাঁর প্রশংসা প্রাপ্য তিনি এ নাটকের নির্দেশক দিলীপ মৌলিক। তাঁর পরিশ্রম সার্থক।

অভিনয়েও টিম ওয়ার্ক লক্ষণীয়। শিল্পীদের মধ্যে একটা সহযোগিতার মনোভাব থাকায় সমগ্র নাটকটি বাস্তব রূপ নেবার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

গোপাল মুখোপাধ্যায়ের শিবপ্রসাদ, প্রকাশ ঘোষের উপেন, নিশীথ বড়ালের দিবাকর, প্রশান্ত বসুর বেহারী, জগদ্বন্ধু ভাণ্ডারীর ঠাকুর ও অচ্যুত সিনহার সতীশ সার্থক চরিত্র-চিত্রায়ণে চিহ্নিত। শ্যামল দেব জ্যোতিষ, জ্যোতি রশ গুপ্তের শশাঙ্ক, অর্ণব ঘোষের অনঙ্গ ডাক্তার, দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বিপিন, বিমল দের মতিলাল, সত্যেন বসুর ভুবন সুন্দর।

এছাড়া অবিনাশ দে (মোতিহার), স্বরাজ মজুমদার (রাখাল), অসীম দত্ত (সুকুমার), দিলীপ দত্ত (থানেদার) ও কালীনারায়ণ-এর কালীচরণ দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

স্ত্রী ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী নমিতা সিংহ, শ্রীমতী অঞ্জনা বড়াল, শ্রীমতী নন্দিতা ঘোষ, শ্রীমতী কল্পনা দে ও শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় স্ব স্ব চরিত্রে সার্থক।

সংগীত নির্দেশনায় পান্না সেন ও আবহ সংগীত পরিচালনায় বিভাস মুখোপাধ্যায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আলোর কাজ সুন্দর। মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় জ্যোতিপ্রসাদ ঘোষ সার্থকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। বেংগল গ্রামাসের রূপসজ্জা চরিত্রানুগ।

এই প্রসঙ্গে আরো কজনের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। অন্তরালে থেকেও যারা নাটকটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁরা হলেন জ্যোতিশ বসু, দেবদাস ব্যানার্জী ও জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মাননীয় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতি যেমন কুশীলবদের উৎসাহ জাগিয়েছে তেমনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি মর্যাদা লাভ করেছে।

নাট্য সমালোচক

টালিগঞ্জের দু নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওটি এখন পুরোপুরি সুসংগঠিত। কিছুদিন আগের সেই করুণ দৈন্যদশা বেশ কিছুটা যেন কমেছে।

দু নম্বর স্টুডিওতে ছবি তোলার জন্যে এমন মূল্যবান একটা টেকনিক্যাল সরঞ্জাম আছে, যা আমার বিশ্বাস, ভারতের আর কোথাও নেই। আর সেটি হচ্ছে ছবির ব্যাক প্রোজেকশান সিস্টেম!

গত সপ্তাহে স্টুডিওতে ঢুকে দেখি দুটি ফ্লোরেই ছবির শুটিং হচ্ছে। যার একটিতে ব্যাক প্রোজেকশান শট নিচ্ছেন ক্যামেরাম্যান-পরিচালক দীনেন গুপ্ত—তাঁর 'নিশিমৃগয়া' ছবির। আর অপরটিকে 'এরই নাম প্রেম' বলে একটা নতুন ছবির শুটিং হচ্ছে।

স্মরণ থাকতে পারে আমি ইতিপূর্বে এখানে 'নিশিমৃগয়া' ছবির বিবরণ দিয়েছি। অতএব গেলাম 'এরই নাম প্রেম' ছবির সেটে।

ছবিটি পরিচালনা করছেন নবাগত পরিচালক শ্রীবীরেশ্বর। এটিই তাঁর প্রথম ছবি: নিজের কাহিনী এবং চিত্রনাট্য। এই ছবির সহকারী ক্যামেরাম্যান অনিল ঘোষ আমার সংগে বীরেশ্বরবাবুর আলাপ করিয়ে দিলেন।

তখন শট হচ্ছিল দিলীপ রায় ও মন্মথ মুখার্জিকে নিয়ে। শুনলাম—সেটটা হচ্ছে জলপাইগুড়ির আধুনিক হোটেলের।

'এরই নাম প্রেম' গল্পটা শুনলাম। সিনেমার ভেতর সিনেমার গল্প। কুনালকুমার একজন খ্যাতনামা নায়ক। সে জলপাই-গুড়িতে একটা ছবির আউটডোর শুটিং করতে এসেছিল। ছবিতে তার একটা ঘোড়ায় চড়ার দৃশ্য ছিল। আর সেটা চড়তে গিয়ে নায়ক হঠাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসে। নায়কের অ্যাকসিডেন্টের ফলে সে ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে গেল। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর করলেন। সেই রাত্রেই কুনালের শরীরে একটা অপারেশন করতে হলো। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে কুনাল অব্যাহতি পেল। তারপর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে জানতে পারল এক অজ্ঞাতনামা মহিলা রক্তদান করার ফলে তার জীবন রক্ষা পেয়েছে। কুনাল তার কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে সেই মহিলার অনেক অনুসন্ধান করল। কিন্তু কোথাও তাঁর হদিশ পাওয়া গেল না। এমন কি হাসপাতালের স্টাফেরা পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে কোন খবরাখবর দিতে পারল না।

পরিচালক বীরেশ্বরবাবু বললেন—এরপর নায়কের পূর্ব-স্মৃতিচারণের সিকোয়েন্স। মানে আমরা ফিল্মের প্রচলিত ভাষায় যাকে বলি 'ফ্ল্যাশব্যাক প্রথা'।

কুনাল এই জলপাইগুড়িরই ছেলে। অল্পবয়সে অনাথ হয়ে সে কলকাতায় চলে যায় ভাগ্যান্বেষণে। সেখানে এক মেসে দয়ালবাবু নামে জনৈক সহৃদয় ভদ্রলোক তাকে আশ্রয় দেন। গান-বাজনার প্রতি কুনালের বরাবরই ঝোঁক ছিল। কলকাতার দয়ালবাবুর নিরাপদ আশ্রয়ে এসে কুনালের গান-বাজনার প্রতি আগ্রহটা বেড়ে গেল। কুনালের গান শুনে সবাই মুগ্ধ হতো।

ইতিমধ্যে এক বড়লোকের মেয়েকে গান শেখাবার চাকরী জোগাড় করে ফেলল কুনাল। তার নাম ভাস্বতী। গানবাজনায় ভাস্বতীও অনেক সিরিয়াস। ফলে দুজনের মনের মিল হতে বেশী দেরী হলো না।

এখন ভাস্বতী যে কলেজে পড়তো সেখানে পংকজ নামে একটি ছেলে ছিল সহপাঠী। মেয়েদের নিয়ে হৈচৈ করতে ভালবাসত পংকজ। বড়লোকের ছেলে। টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই। তার ওপর পৈত্রিক ব্যবসা ছিল ফিল্মের। পংকজ চেয়েছিল ভাস্বতীকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে। কিন্তু ভাস্বতী পংকজকে কখনও তার কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। পংকজকে সে বরাবরই এড়িয়ে চলেছে।

এখন ভাস্বতীর জীবনে নতুন নায়কের আবির্ভাব হতে দেখে পংকজ রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল। তাই নিয়ে অনেক নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত কুনালের সংগে ভাস্বতীর বিয়ে হয়ে গেল।

পংকজ তখন এক কুটিল চাল চেলে বসলো। কুনালকে সে ফিল্মে নামবার আহ্বান জানালো। কুনাল চিরদিনই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। পংকজের আহ্বানে সে ফিল্মে নায়ক হিসাবে যোগ দিয়ে বসল। ফলে, পংকজ যেটা চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাই হলো। অর্থাৎ তাদের সংসারে দারুণ অশান্তি দেখা দিল।

তারপর একের পর এক নাটকের ঘনঘটা। কুনাল লেখা নামে জনৈকা অভিনেত্রীর সংগে জড়িয়ে পড়ল। এদিকে সহ্য করতে করতে ভাস্বতী একদিন সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করল।

তারপর থেকে কুনাল ভাস্বতীকে অনেক খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও হদিশ পায়নি। কুনাল এখন অনুতপ্ত। সে ভাস্বতীকে ফিরে পেতে চায়। ফিরে পেতে চায় তাদের ভালবাসার রঙিন দিনগুলিকে। কিন্তু মানুষ যা চায়, সবসময় তা পায় না, এই হচ্ছে ট্রাজেডি।

কুনাল এসেছিল জলপাইগুড়িতে যত না ছবির টানে তার চাইতে অনেক বেশী প্রাণের টানে। এখানকার মাটিতে বাতাসে জলে মিশে আছে তার বাল্যকালের স্নিগ্ধ দিনক্ষণগুলি। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ঘটিয়ে বসেছে বিরাট একটা অ্যাকসিডেন্ট।

[illegible] বিধাতা কণিকা মজুমদার/সোমা দে

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ। এখন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, জলপাইগুড়ির হোটেলের একটি ঘরে বসে ছবির প্রযোজক সুবিমলবাবু আর নায়ক কুনাল কথা বলছে। কম্পোজিট শট। দুজনের হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। সুবিমল জানতে চাইছে—কী ব্যাপার মশাই, আবার ভাবতে বসলেন নাকি? না রাতের খাওয়া-দাওয়াটা ভাল হলো না—!

কুনাল বলে—না না, খারাপ হবে কেন?

সুবিমল : আহা তাই তো। আমি তো বেশ জমিয়ে খেলাম মশাই। পাহাড়ী হরিণের মাংস, বুঝলেন কিনা—শুধু সেই জন্যই তো পয়সা খরচা বেশী হলেও একটা দিন ওখানে পড়ে আছি। ইয়ে আপনার শরীর খারাপ বোধ করছেন না তো?

কুনাল : না না, আমার শরীর ঠিক আছে। এছাড়া জলপাইগুড়ি আমার নিজের জায়গা। আমার জন্মস্থান। এতদিন পরে সুযোগ যখন পেয়েই গেলাম তখন বুঝতেই পারছেন, যত ঘুরেফিরে দেখছি ততই আনন্দ হচ্ছে। ছোটবেলায় এইসব পথ ধরেই তো ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে...

কুনাল অবশ্য তখনও ভাবছিল সেই রহস্যময়ী মহিলার কথা যিনি নিজের শরীরের রক্ত দান করে কুনালকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। কে তিনি? তিনি কেমন দেখতে? কোথায় তিনি থাকেন? এইসব প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল কুনালের। জানতে তাকে হবেই।

—তারপর? কুনাল দেখা পেল সেই মহিলার? আমার প্রশ্নের জবাবে মৃদু হাসলেন বীরেশ্বরবাবু। —নিশ্চয়! না হলে নাটক মিলনান্তক হবে কি করে। কুনাল একে একে সবাইকে ফিরে পাবে। দয়ালবাবুকে। জাহ্নবীকে। আরো অনেককে।

হঠাৎ দিলীপ রায় উঠে দাঁড়ালেন।

সংগে সংগে তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন পরিচালক।

দিলীপ রায় বললেন—বীরেশ্বরবাবু, আমার যাবার সময় হয়ে এলো যে—

সংগে সংগে কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলেন বীরেশ্বরবাবু। —হ্যাঁ। আপনার তো আজ আবার থিয়েটার। ঠিক আছে। তাহলে এটাই আজকের মত লাস্ট শট করা যাক।

সংগে সংগে ফ্লোরে ব্যস্ততা দেখা দিল। ক্যামেরাম্যান তাঁর মিটার ধরে দ্রুত আলোক সম্পাত করাতে লাগলেন। পরিচালক তাঁর সহকারীদের নিয়ে চিত্রনাট্যের খাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসছি, বীরেশ্বরবাবু বললেন, স্যার, আজ একটু তাড়া রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। প্লীজ আর একদিন আসবেন...

ঘাড় নেড়ে আমি ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়ছে ধীরে ধীরে।

'এরই নাম প্রেম' ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপারোপ করছেন মাধবী চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি, মন্মথ মুখার্জি, সমিত ভঞ্জ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে প্রমুখ শিল্পী।

চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা এবং সংগীতপরিচালনা করছেন যথাক্রমে সুবোধ ব্যানার্জি, মধু ব্যানার্জি, সঞ্জিত সেন ও সত্যদেব। নেপথ্যে গান গেয়েছেন শ্যামল মিত্র, পিন্টু ভট্টাচার্য ও আরতি মুখার্জি।

মুসাফির

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। পরমানন্দে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব এলেন চৈতন্যলীলা দেখতে। অভিনয় দেখছেন আর [illegible] সমাধিস্থ হচ্ছেন।

হরি নাম বল, হরি বিনা নাই,
হরি বল পাপ হবে ক্ষয়,
হরি নামে পাপ ভস্ম হয়,
তুলা যথা অনলে পরশে।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শচীমাতার কাছে বিদায় নিতে বিনোদিনীর কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদ না নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে—কৃষ্ণ নাহি পাবে।'

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হন। অভিনয় শেষে অন্যান্য শিল্পীদের সংগে বিনোদিনী যখন ঠাকুরকে প্রণাম করেন, তিনি আশীর্বাদ করে বলেন : 'মা তোর চৈতন্য হোক'।

পতিতা বিনোদিনী পেলেন মুক্তি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে। চৈতন্যলীলা দেখার পর ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের মতামত চাইলে বলেন, 'আহা, আসল নকল এক দেখলাম গো।'

চৈতন্যলীলা দেখে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'হরিবোল হরিবোল' বলে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। ফাদার লাফোঁ, রেইজ অ্যান্ড রায়ত সম্পাদক শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, কর্ণেল ওলকট পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন, তদানীন্তন কালের বিভিন্ন বিদগ্ধজন ও পত্র-পত্রিকা চৈতন্যলীলার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। অভিভূত অভিমত রেখে যান চৈতন্য চরিত্রে নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর অলৌকিক অভিনয়ের।

২২ নভেম্বর এলো প্রহ্লাদ চরিত্র। হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন যথাক্রমে অমৃত মিত্র আর বিনোদিনী। অভিমত চাইলে ঠাকুর বলেন গিরিশচন্দ্রকে : "দেখলাম, সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন।" ১৪ ডিসেম্বর ঠাকুর প্রহ্লাদ চরিত্র দেখেন। এদিন অমৃতলালের বিবাহ-বিভ্রাটও অভিনীত হয়। ঠাকুর কিন্তু বিবাহবিভ্রাট দেখেন না। বিবাহবিভ্রাটে বিনোদিনী অভিনয় করেন-কারফরমা চরিত্র।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী নিমাই সন্ন্যাসে বিনোদিনী নিমাই চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী বৃষকেতুর পুনরাভিনয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব উপস্থিত থাকেন এবং অভিনয় দেখেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গিরিশচন্দ্র দিলেন প্রভাস যজ্ঞ। বিনোদিনী অভিবাদন জানালেন সত্যভামা চরিত্রে। ১৯ সেপ্টেম্বর এলো বুদ্ধদেব চরিত। গোপারূপে দেখা দিলেন বিনোদিনী। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ জুন, মঞ্চস্থ হলো বিল্বমঙ্গল। চিন্তামণি চরিত্রে অভিবাদন জানালেন বিনোদিনী। বিল্বমঙ্গল চৈতন্যলীলার মতই মাতায় দেশ। কিন্তু এবার পাগলিনী চরিত্রে গঙ্গামণির কণ্ঠে গীত—

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে
যেখানে যাই, সেথায় পাছে;
আমায় বলতে হয় না জোর করে।

গানখানি সকলের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যেতে লাগলো। গঙ্গামণির প্রশংসায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিই অভিমান হলো বিনোদিনীর।

২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল বাজারে বিনোদিনী অভিনয় করলেন রঙ্গিণী চরিত্রে।

১৮৭৪ থেকে ১৮৮৬ মাত্র ১২ বছর অভিনয় করে নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী অলৌকিক অভিনয় প্রতিভায় যতখানি যশের অধিকারিণী হয়েছিলেন, শতবর্ষের ইতিহাসে অন্য কোন অভিনেত্রীর পক্ষেই তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বেঙ্গল থিয়েটার—বেঙ্গল থিয়েটার থেকে পুনরায় গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে ন্যাশনাল থিয়েটারে—ন্যাশনাল থেকে স্টার থিয়েটারে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাইশনে গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে যোগদান করে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে স্টার থিয়েটার থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর বেঙ্গলবাজার মঞ্চস্থ হয়। বেঙ্গলবাজারে রঙ্গিণী চরিত্র বিনোদিনী অভিনীত শেষ মৌলিক নতুন চরিত্র। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতেও বেঙ্গলবাজার বা অন্যান্য নাটকে বিনোদিনীর অংশ গ্রহণ করা স্বাভাবিক। বিশেষত স্টার থিয়েটারের পরবর্তী নাটক রূপ সনাতনে বিশাখা চরিত্রে বিনোদিনীই নির্বাচিতা হন এবং রিহার্সেলও দেন। বিনোদিনী থিয়েটার থেকে অবসর গ্রহণ করবেন—একথা জেনেই গিরিশচন্দ্র কিরণবালাকে বিশাখা চরিত্রে এবং বিনোদিনী অভিনীত অন্যান্য চরিত্রে তৈরী করে নেন। রূপসনাতন ২১ জুন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। তাই অনুমান করা যায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মার্চের পূর্বে বিনোদিনী মঞ্চ জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি।

রূপ ও রঙ্গ পত্রিকার আমার অভিনেত্রী জীবন সম্পর্কে যে অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়—তা লিখেছিলেন স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাই বিনোদিনীর মূল রচনা থেকে রূপ-রঙ্গ পত্রিকার রচনাশৈলীতে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি পার্থক্য আছে তথ্যেও। অবিনাশচন্দ্র চেয়েছিলেন বিনোদিনীর জীবনটিকে কেন্দ্র করে তার আত্মজীবনীর মধ্য দিয়ে নাট্যশালার ইতিহাসের একটি দিককে লিপিবদ্ধ করে রাখতে। তা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। অন্যতম কারণ পরবর্তীকালে রূপ ও রঙ্গের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। রূপ ও রঙ্গ ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। আর্ট থিয়েটারের পরিচালকদের অনেকেই পত্রিকার সম্পাদনার সংগে জড়িত ছিলেন। যেমন নির্মলচন্দ্র, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অনেকে। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন, জানকীনাথ বসু। ১২৪।২।১ মানিকতলা স্ট্রীটস্থিত গদাধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা যেসব উদ্ধৃতি ব্যবহার করবো তা 'আমার কথা' মূল গ্রন্থ থেকেই। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেই বিনোদিনীর মঞ্চ জীবনের শুরু। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী। ন্যাশনাল থিয়েটারেরও ভুবনবাবু অন্যতম উদ্যোক্তা। গঙ্গার ধারে ভুবনবাবুদের বাড়ীতে নীল দর্পণের সময় থেকেই রিহার্সেল বসতো। 'সতী কি কলঙ্কিণী' নাটকের সময় গ্রেট ন্যাশনাল মেয়ে নিয়ে অভিনয় শুরু করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত [illegible] অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু বহু সৌখীন সম্প্রদায় যাঁরা যাত্রা ঢপ বা কীর্তনের বা নাচের দল করতেন—তাঁদের সঙ্গে মেয়ে থাকতো। এই সব দল থেকে অনেকে থিয়েটারে আসতেন। বেঙ্গল থিয়েটারও অভিনেত্রী নেবার সময় এদের সাহায্য নিয়েছিলেন। গ্রেট ন্যাশনালেও। মদনমোহন বর্মণ ছিলেন একজন নৃত্য শিক্ষক ও অপেরা মাস্টার। সতী কি কলঙ্কিণীর সময় তিনি গ্রেট ন্যাশনালে যুক্ত থাকেন। বিনোদিনীদের বাড়ীতে তখন গঙ্গা বাইজী ভাড়াটে। বয়সের পার্থক্য থাকলেও গঙ্গা বাইজী বা গঙ্গামণির সংগে বিনোদিনীর সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং উভয়ে উভয়কে গোলাপ বলে ডাকতো। পূর্ণ মুখোপাধ্যায় আর ব্রজনাথ শেঠ একটি সৌখীন সম্প্রদায় থেকে সীতার বিবাহ গীতিনাট্য অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন আর এই উপলক্ষেই তাদের গঙ্গামণির কাছে যাতায়াত। গঙ্গামণির গৃহেও তাদের নৃত্যগীতের [illegible] বসতো। বিনোদিনী [illegible] শুনতেন। সংগীত বা অভিনয়ে বিনোদিনীর আগ্রহ গঙ্গামণির [illegible] [illegible]। বিনোদিনীদের আর্থিক দুরবস্থার কথা শুনেই পূর্ণবাবু আর ব্রজবাবু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১০ টাকা মাইনেতে ভর্তি করিয়ে দেন। বিনোদিনীর বয়স তখন এগার বছর। বিনোদিনীর প্রতি সকলেই সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাজকুমারী [illegible] [illegible] পয়সায় [illegible] [illegible] নিয়েছিলেন। রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মীমণি, নারায়ণী প্রভৃতির নাম খ্যাত ও প্রতিপত্তি দেখে তাদের সমকক্ষ হবার স্বপ্ন বিনোদিনী দেখে বসে। তাই পরম আগ্রহ ভরে অভিনয় শিক্ষা করতে থাকেন। ধর্মদাস সুর, অবিনাশ কর, মহেন্দ্রলাল বসু, রাধাগোবিন্দ ও রাধামাধব কর, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃত মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), এবং অন্য অভিনেত্রীরা বিনোদিনীকে ভালবাসতেন। প্রয়োজন মত উপদেশ দিতেন।

(ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়
শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।
সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খ্রী

অতিরিক্ত বিমান

অমৃত

১৫ বর্ষ — ১৭ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 12th September, 1975 — শুক্রবার, ২৬ ভাদ্র, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	পঞ্চপাল	(গল্প)	শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১২	সাহিত্যের সাজঘরে		শ্রীশাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
১৫	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৬	বিদেশের কথা		শ্রীপুণ্ডরীক
১৭	প্রথম প্রবাস	(উপন্যাস)	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
২০	আমি সুন্দর হতে চাই	(কবিতা)	শ্রীবেলা সেন
২০	এখন সবই স্মৃতি	(কবিতা)	শ্রীরুদ্রেন্দু সরকার
২০	মহুয়া	(কবিতা)	শ্রীরজত মিশ্র
২১	হিপি আন্দোলনে ভাটা		শ্রীদিলীপ মালাকার
২৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীজরৎকারু
২৫	ডবল এজেন্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিক্রমাদিত্য
২৯	চিঠিপত্র		

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩০	গুপ্তিপাড়া কি লুপ্ত হবে?		শ্রীমিহির গঙ্গোপাধ্যায়
৩২	মলিন ছায়া	(গল্প)	শ্রীগৌতম গুহ
৩৬	রূপসীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৩৭	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৪০	আজকের কলাকার ও মমতা শঙ্কর		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৪৪	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৪৭	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৪৮	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅমর
৫০	দেশ বিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫১	প্রেক্ষাগৃহ		শ্রীচিত্রদূত
৫২	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৪	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৫৭	স্টুডিও সংবাদ		
৫৮	নাট্যমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৬২	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

চাই বন্যানিয়ন্ত্রণ

পাটনা শহর যখন এক বুক জলের তলায় তখন দক্ষিণ বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশেষ করে সাঁওতাল পরগণায় চলছিল খরা। ওড়িশায় এবার বন্যায় বহু অঞ্চল ভেসে গেছে, মানুষের মৃত্যুও হয়েছে। ক'বছর আগে এই ওড়িশায় অনাবৃষ্টির ফলে খরায় মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না। আসামে এমন বছর বাদ যায় না যে সময় ব্রহ্মপুত্র তার দুর্দান্ত স্রোতে সব ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চল প্রায় প্রতি বছর বানে ভাসে। এমনকি মরুস্থলী রাজস্থানেও বন্যা হয়। প্রকৃতির এই বিচিত্র ব্যবহার আমাদের দেশে! পাটনার বন্যা তো সব আশংকাকে ছাপিয়ে গেছে। একটা রাজধানী শহর, যেখানে রাজ্য সরকারের সদর দপ্তর, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস এবং বহু লোক যেখানে প্রতিদিন জীবিকার জন্য আসা-যাওয়া করে, সেখানে সর্বত্র এক বুক জল এবং জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়া এক অস্বাভাবিক ঘটনা। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পাটনার বন্যা ছোট বড় কাউকে বাদ দেয়নি। স্বয়ং রাজ্যপাল জলবন্দী হয়েছিলেন রাজভবনে। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের একতলায় জল। জি. পি. ও. পুলিশ হেডকোয়ার্টার, আকাশবাণী, বিমানঘাঁটি, হাসপাতাল কোনো কিছুই বন্যার জল থেকে রক্ষা পায়নি। সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে লাগাতে হয়েছিল উদ্ধারের কাজে, ত্রাণের কাজে।

সারাদেশ এই অভূতপূর্ব ঘটনায় উদ্বিগ্ন। বিপন্ন পাটনাবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে সবাই। প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শন করেছেন বন্যার্ত অঞ্চল। সর্বপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিবেশী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার সরকারের সাহায্যে পাঠিয়েছেন এক লক্ষ টাকা। বন্যার প্রাথমিক আক্রমণে সর্বত্র দেখা দিয়েছিল উদ্বেগ ও আশংকা। ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাস ও সংকট পার হবার সংকল্প। কিন্তু যার জন্য এত বড় একটা কান্ড ঘটতে পারল সেই সতর্কতার অভাবই হল দুর্দশার অন্যতম কারণ। শোণ নদীর বাঁধ ভেঙে এই বিপর্যয় ঘটায়। তার সংগে যুক্ত হয় গঙ্গার জলস্ফীতি। বিহার, ওড়িশা বা উত্তরপ্রদেশে কোথাও বন্যার জল ধীরে ধীরে এগোয়নি, আকস্মিকভাবেই তা দুকূল প্লাবিত করেছে। তার ফলে সর্বত্রই সরকার এই প্রাকৃতিক শত্রুর আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়েছেন। [illegible]ভাবে এর মোকাবিলা করবেন তার জন্য প্রস্তুত যথেষ্ট ছিল না বলে মনে হ[illegible]। বন্যার জল আসছে কিংবা নদীর জলস্ফীতি ঘটতে পারে এ সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রীয় সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতর আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। যাতে গ্রামাঞ্চলের লোকদের সময় থাকতে স্থানান্তরিত করা যায় অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায়। কেন্দ্রীয় সরকার এমন কথাও ভেবেছেন, বন্যার আক্রমণ যে-সমস্ত এলাকায় প্রতি বৎসর হয় সেখানে গ্রামাঞ্চলে পাকা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা যায় কি না। সাধারণত পাকা স্কুল বাড়ি প্রভৃতি জায়গাতে বন্যার্তরা আশ্রয় নেয়। কিন্তু যেখানে ধারে কাছে কোথাও দোতলা পাকা বাড়ি নেই সেখানে জাতীয় সড়কই সম্বল। কিন্তু খোলা আকাশের নিচে এভাবে মানুষ কি করে বাঁচে? আমাদের গ্রামাঞ্চলে বন্যার্তদের রক্ষা করা এক কাজ এবং তাদের সুস্থ রাখা এবং আশ্রয় দেওয়া তার চেয়েও জটিল কাজ।

নদী শাসনের জন্য ভারতবর্ষে বহু বাঁধ নির্মিত হয়েছে, নির্মিত হয়েছে বহু জলনিকাশী খাল। জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে তাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্য দায়িত্বগুলো সম্পন্ন হলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ আশানুরূপ হচ্ছে না। প্রকৃতির কাছে কি আমরা একেবারে অসহায় হয়েই থাকব? বন্যা সম্পূর্ণ রোধ করা না গেলেও তার নিয়ন্ত্রণ করা কি এতই অসাধ্য? এবারে পাটনায় যে ক্ষতি হল তা পূরণ করা সহজ কথা নয়। ওড়িশা, উত্তর-প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ক্ষতিও হয়েছে অনেক। এ সবই আকস্মিক এবং হিসাবের বাইরে। তার জন্য আমাদের সীমিত সম্পদ থেকেই ব্যয় করতে হবে। বন্যার্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসন জাতীয় দায়িত্ব সন্দেহ নেই। তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের ভাবতে হবে দীর্ঘমেয়াদী বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কথা যার দ্বারা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে। বন্যা এবং খরা এই দুই প্রাকৃতিক অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করাই হবে এখনকার দায়িত্ব।

কলকাতায় আবার বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়েছে। রাস্তাঘাট এবং সব সবুজ মাঠ যদি কোথাও থাকে প্রায় খালবিলের মতো। উত্তর থেকে হাওয়া এলে জানালা দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ থেকে হাওয়া এলে দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের সময় দক্ষিণের হাওয়া প্রবল। গাড়ি ঘোড়া বাস ট্রাম ভিজতে ভিজতে চলে যায়। কখনও সার সার থেমে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ চুরমার করে দিয়ে বজ্রপাতের শব্দ নেমে আসে। তখন কেউ হুইস্কি গলায় ঢেলে বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে ভালবাসে। ক্যাবারেগুলোতে মধ্য যামিনীতে উদ্দাম নৃত্যমালা। কলকাতায় যে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে গেল, একেবারেই তখন তা বোঝা যায় না।

দেবদারু গাছটা ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকাল থেকে বৃষ্টি। সারারাত বৃষ্টি গেছে। রাস্তায় জল জমছে। বাড়ছে। লোকজন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, মেয়েরা শাড়ি তুলে, ছেলেরা প্যান্ট ভিজিয়ে জল ভেঙে যাচ্ছে। কলকাতার এ-সময়ের চেহারা কেমন পাল্টে যায়। নরকের মতো হয়ে যায়। এবং দেবদারু গাছটার নীচে যে সংসারটা ছিল সেটা থাকে না। কোথাও উধাও হয়ে যায়। এবং জল নামতে শুরু করলে, হাইড্রেন খুলে ফেললে দেখা যায় শহরের ওপর সব কাক উড়ছে। এ-সময়টাতে শহরে বোধ হয় কাকের উপদ্রব বাড়ে।

সকালে বিকেলে এভাবে বৃষ্টিপাতের ভেতর যখন কলকাতা ভিজছিল, যখন, রাস্তায় মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে এবং যখন সূর্য আর দেখা যাবে না বলে সবাই কোলাহল করছে তখন ফ্ল্যাট বাড়ীর জানালায় একটা দুঃখী মুখ দেখা গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে। দেবদারু গাছটার নীচে জল উঠে এসেছে। ছেঁড়া নেকড়া, হাঁড়ি-পাতিল ভাঙা এবং দূরে সে টের পেল গাড়িবারান্দার নীচে সেই সংসারের বুড়ো মানুষটি হাঁটু মুড়ে পরিত্যক্ত রোয়াকে বসে শীতে কাঁপছে।

দুঃখী মেয়েটা বেশ সুখে ছিল। বাবা এই সুন্দর ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছে। মা এখন আরও যুবতী হয়ে উঠছে। সিঁ
দিয়ে নেমে গেলে রোজ সেই দেবদা
গাছ। একেবারে পরিপাটি সংসারের বাই
বিস্ত্রী সাংঘাতিক কিছু। সে যে প্রথম দেখ
এমন, সে যে আর কখনও ভিখিরী অথ
ফুটপাথবাসিনীদের দেখেনি তা নয়। কি
এখানে সে রোজ সকালে উঠে যখন স্কু
যায়, দেখতে পায় বছর দু বছরের বাচ্চ
পড়ে থাকে গাছের নীচে। ঘুমোচ্ছে। কি
কখনও বসে বসে খেলা করছে। ওর
বোনটা বসে বসে উকুন মারছে। এবং য
স্কুল থেকে সে বেণী দুলিয়ে ফেরে দেখ
পায়, কোত্থেকে সেই মেয়ে এবং মা সং
করে এনেছে বাজার পচা পটল, পেয়
কুমড়ো, মাছের পচা নাড়িভুঁড়ি, পাঁঠার মা

কলকাতা জীবাণু অনুপ্রবেশে ওর পেট গুলিয়ে ওঠে। সিঁড়ি ভাঙার সময় সব সুখ কান্না ... কেড়ে নেয় আর। সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বাথরুমে ঢুকে যায়। জল বমি করে ফেলে।

মা দৌড়ে আসে। রাণু আবার বমি করছিস।

—পেটটা আবার গুলিয়ে উঠল।

এভাবেই মেয়েটার অসুখটা আরম্ভ হয়ে যায়। ডাক্তার হাসপাতাল, হাসপাতালে গেলে কমে যায়, এবং বাড়ি ফিরে এলেই আবার কেমন তার অসুখ। —মা তুমি পাচ্ছ না!

—কি পাব!

—কেমন একটা গন্ধ!

—না তো।

সত্যনারায়ণ বাড়ি ফিরে শুনতে পায়, মেয়েটা আবার খাচ্ছে না। খাবার দেখলেই বমি করে ফেলে।

কি গন্ধরে বাবা! জানালাটা মা বন্ধ করে দাও।

সত্যনারায়ণ মোটামুটি হিসেবী মানুষ, সামান্য ক্লার্ক থেকে বড়বাবু অফিসের। এবং টাকা লেনদেনের ব্যাপারে চতুর। স্ত্রীর অভাব অনটন সে একেবারেই রাখে নি, যা যা চাই ফ্ল্যাট বাড়ি এবং ফ্রিজ নতুন গড রেজের আলমারী, এবং হিসেবী বলে এক মাত্র মেয়ে রাণু। সংসারের কোথাও সে হিসেবের বাইরে নয়। পুত্রসন্তানের যে ইচ্ছে ছিল না, এমন নয়, কিন্তু যা হয়ে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে সে আর যায় নি। সে একটি হবার পরই সব থামিয়ে রেখেছে, এবং গতকাল এই শহরে বৃষ্টিপাতের ঠিক আগে সে দেখে এসেছিল, দেবদারু গাছটার নীচে, বৌটা আবার একটা বাচ্চা দিয়েছে। এই নিয়ে কটা বাচ্চা। সে ঠিক গুনে বুঝতে পারে না। ওদের কটা বাচ্চা, সে টের পায় না। বৌটার সঠিক স্বামী কোনটা! সে দেখতে পায়, তিন-চারজন পুরুষ, পরনে লুঙ্গি, কানে বিড়ি গোঁজা, গলায় তাবিজ, এবং সূর্যাস্তের মুখে তারা কোথায় চলে যায়। আবার সে কখনও দেখে বেশ আরামে বৌটার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে একটা বুড়ো মতো মানুষ। শহরের বাস ট্রাম তেমনি যায়। রাস্তায় লোকাভাব থাকে না, কলেজ এবং স্কুল ছুটি হলে সব সুন্দর সুন্দর দিদিমণিরা কত সব ফিসফাস কথা বলতে বলতে চলে যায়। সত্যনারায়ণ ভেবে পায় না এখন বৌটার কটা বাচ্চা। একটা দুটো না দু সহস্র। এবং যা হয়, সে রাস্তায় কোন অপোগণ্ড দেখলেই ভেবে ফেলে সেই বৌটার পেট থেকে বাচ্চাটা বের হয়েছে।

সত্যনারায়ণ দরজা জানালা সব বন্ধ করে রাখে। বলে, পাচ্ছিস।

—হ্যাঁ বাবা।

—কোথা থেকে আসে!

রাণু তখন চুপচাপ, শুয়ে থাকে। আর কিছু বলে না।

এক টুকরো আপেল, কদানা আঙুর এবং ন্যাসপাতি এনে দেয় মালতী। বলে, খা, খাতো মা। না খেলে বাঁচবি কি করে।

এই খাওয়া নিয়ে সংসারে এখন কত অশান্তি। মেয়েটা কিছুতেই কিছু খেতে চায় না। কেমন ভেতর থেকে তার দুর্গন্ধ উঠে আসে তখন। বাবার এত আশ্বাস, মার এমন যত্ন, তার কাছে তখন অত্যাচার মনে হয়। সে চিৎকার করে ওঠে কখনও, তোমরা সবাই মিলে কেন আমাকে মেরে ফেলতে চাও। আমি কি করেছি!

মালতী আর পারে না। ডাক্তার মজুমদার বললেন, খাওয়াতেই হবে। অসুখটা কি ঠিক তো ধরা যাচ্ছে না। সবই তো করালেন। ট্রপিক্যালে রেখে দেখলেন। কোথাও কেউ শরীরে কোন ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছে না।

এবং এভাবে দিন দিন মেয়েটা যখন শুকিয়ে যাচ্ছিল, এবং সংসারে সত্যনারায়ণ যখন চতুর কথাবার্তা বলতে আর একদম সাহস পায় না, অথবা কোন বিল পাশ করে দেবার ব্যাপারে একটা মোটা অঙ্কের টাকা হাতে এসে যায়, সে আর আগের মতো মালতীর হাতে দিয়ে ভরসা পায় না। কেবল মনে হয় কোথাও কোন দুর্গন্ধ উঠছে, সে ভেতো মানুষ বলে, মালতীর চর্বি জমেছে বলে টের পাচ্ছে না। মেয়েটার ভেতর এখনও সে-সব দুর্গন্ধ জমা হয় নি, বাইরের সামান্য অন্ধকার চেহারা তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

সত্যনারায়ণ বলল, রাণু তোমার কিছু হয় নি। ওটা তোমার ম্যানিয়া।

রাণু ও-পাশ ফিরে শুয়ে আছে। পাখা ঘুরছে। কোথাও রেডিওতে বিবিধভারতী হচ্ছে, কোথাও কেউ পেট ভরে খেয়ে বড় ঢেকুর তুলছে এবং জানালা দিয়ে সেই অতীব গন্ধটা সারা বাড়ি ছেয়ে ফেলছে কেউ টের পাচ্ছে না। ওর হাই উঠছিল। জানালাটা বন্ধ করে দিলে ভাল হত। অথচ বন্ধ করে দিলেই কেমন দমবন্ধ ভাব। সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। কপাল ঘামে। শরীরের শুচিতা কেমন নষ্ট হয়ে যায় তার। তখন চিৎকার করতে থাকে, মা আমাকে কোথাও নিয়ে চল। এ-ভাবে এখানে থাকলে মরে যাব।

মালতী হতাশ গলায় তখন বলে, রাণু তোমাকে নিয়ে পুজোর ছুটিতে গোপালপুর চলে যাব, আর কটা দিন, বাবার ছুটি হলেই আমরা চলে যাব। চলে গেলেই তুমি আর গন্ধটা পাবে না। তুমি নিরাময় হয়ে যাবে।

রাণু আবার চুপ করে থাকে। কথা বলে না। এমন সুন্দর মেয়েটা, কি ভারী চোখ তার, আর হাত-পা লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, চুল বড় হয়ে যাচ্ছিল। শরীরে সব অমোঘ নিয়তিরা বাড়ে দিনে দিনে। তখন কিনা একটা অসুখ। কিছুই খাওয়ানো যায় না। যতটা খায় তার চেয়ে বেশী বমি করে দেয়। উগরে দেয় যেন। ভেতরে কোন দৈত্য বাসা বেঁধেছে। সুখী মেয়েটাকে এমন দুঃখী করে রেখেছে এবং একদিন চোখের ওপর বুঝতে পারে মেয়েটা মরে যাবে।

সত্যনারায়ণ সেদিন দেবদারু গাছটার নীচে এসে থমকে দাঁড়াল। একটা মরা পায়রার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। পায়রা না ডাহুক, না কাক, সে আর এখন সঠিক কিছু বুঝতে পারছে না। বাতাসে সব পালক উড়িয়ে নিয়েছে। কেমন একটা পচা দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগতেই ওপরে জানালায় দেখল রাণু দাঁড়িয়ে দেখছে। আর তখনই কেন জানি ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, লাথি মেরে এই বৌটির হাঁড়ি পাতিল, ছেঁড়া কাঁথা কাপড়, পলিথিনের বাকস সব ফেলে দেয়। দুর্গন্ধ টেঁকা যাচ্ছে না। কতদিন পর ওর চোখের ওপর এই সব বেআইনী ইতর মনুষ্যকুলের নোংরা তৈজসপত্র তাকে গিলে খাচ্ছিল। রাণু কোন দিন বলে নি, বাবা, ওখানে গন্ধটা আছে। তুমি ওদের দূর করে দাও।

আর সত্যনারায়ণের মাথায় কেমন রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যায়। সে চিৎকার করে উঠল, রাণু তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ, যাও ভিতরে যাও! অথচ ... দেখছে, পাঁচ-সাতটা অপোগণ্ড শিশু সেই ছেঁড়া পায়রার মাংস ভারী যত্নের সঙ্গে ভাঙা এনামেলের প্লেটে কেটে কেটে রাখছে। সাদা ফ্যাকাশে মাংসের টুকরো। পচা গন্ধটা অবিরাম সুখ দিচ্ছিল যেন। সামান্য হলুদ লঙ্কা বাটা মাখিয়ে, একটু আগুনের দরকার, কোথা থেকে প্লাইউডের একটা ভাঙা বাকস টানতে টানতে নিয়ে আসছে। বুড়ো মানুষটা দা দিয়ে কোপাচ্ছে কাঠ, আর দু-তিনটে ইঁটের ওপর হাইড্রেনের জল তুলে সেদ্ধ করছে বৌটা, ওরা নোংরা শালপাতা এনে বাসি রুটি ভাগ করে বসে আছে। মাংসটা পোড়া সেদ্ধ। পচা গন্ধটা ওদের পেটে খিদের উদ্রেক করছিল। জুল জুল চোখে তাকিয়ে আছে সব কটা জীব। সামান্য হলেই হামলে পড়বে। পোড়া চিমসে মাংস পোড়া গন্ধ। মেয়েটা তখন জানালায় নেই। অবিরাম গন্ধবাহী বাতাস দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় সে যেন কোন শ্মশানে। মানুষের পোড়া মাংসের চামসে গন্ধের মতো উঠে এলে একদণ্ড সত্যনারায়ণ আর দাঁড়াতে

পড়ছে না। সে সোজা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে দরজা জানালা বন্ধ করে দেবার সময় দেখতে পেল বাবুদের। তারপর অক্ষরে বমি করে দিল অবশ্য।

মালতী দরজায় গোড়ায় দাঁড়িয়ে অবাক! লম্বা এই বমি সত্যনারায়ণের, সে কেমন অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথা বলতে পারছে না। রাণুর মতো একেবারে সোজা এমন একটা ঘটনা, কেউ আর এক-জনকে আক্রমণ করবে এ-সংস্কারে সে কখনও ভাবে নি।

চোখে মুখে জল দিয়ে সত্যনারায়ণ বের হয়ে এসে বলল, কি হয়েছে! তুমিও গন্ধ পাচ্ছ'ত? সংসার কি যে হবে!

সত্যনারায়ণ বলল, গন্ধ!

—কিসের গন্ধ!

—বারে পাচ্ছ না!

—না তো।

ঠিক রাণু যে-ভাবে বজির্টাম করে চোখে-মুখে জল দিয়ে দাঁড়াত, কথা বলত, এবং শূন্যতা ফুটে উঠত চোখে, সত্য-নারায়ণ ঠিক ঠিক হুবহু একইভাবে কথা বলছে।

মালতী বলল, তোমরা আমাকে পাগল করে দেবে? কিসের গন্ধ—আমি তো পাচ্ছি না।

—পাবে। বলে সে বসার ঘরে সোজা ঢুকে ডায়াল করল, হেলো, সুকুমার আছে?

—সুকুমার? আছে ধরুন।

সুকুমার বলল, কি দাদা, আমি সুকুমার বলছি।

—তোমার দাদাকে একটা খবর দিতে পার? যাতে একটা ব্যবস্থা হয়।

—কেন কি হয়েছে?

—আর বলো না, নীচে আমাদের দেব-দারু গাছটার নীচে যা সব হচ্ছে না! দেশে কি মানুষ নেই! তোমার দাদা তো একজন কর্তা ব্যক্তি।

—কি হচ্ছে বলবেন তো!

—পঙ্গপাল!

—পঙ্গপাল! কোথাকার!

—জানি না। বাড়ীতে টেঁকা যাচ্ছে না। আমরা সবাই এবার মরে যাব। হতাশ গলায় বলে যেতে থাকল সত্যনারায়ণ।

—এই তো সেদিন কিনলেন! এত তাড়া-তাড়ি হুজ্জোতি আরম্ভ হয়ে গেল। বুঝিয়ে বলুন না ওদের।

—কোন লাভ হবে না। তুমি একবার অবশ্যই আসবে, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

—কি হয়েছে বলবেন তো।

—না এলে বলা যাবে না।

সুকুমার এল সন্ধ্যের একটু আগে। সারাক্ষণ সুকুমার আসবে ভেবে সত্যনারায়ণ জানালায় মুখ রেখে দাঁড়িয়েছিল। দেবদারু গাছটার নীচে এখন সেই বৌটা তার পঙ্গ-পাল নিয়ে বসে রয়েছে। একটা খঞ্জনী বাজিয়ে বুড়ো লোকটা গান ধরেছে। ছোট দুটো ছেলে বুড়োটার চার পাশে টুইন্ট নাচছে। রাস্তায় গাড়ি রিকশা তেমনি, নির্বিকার মানুষজন, এমন একটা পোড়া চামড়ের গন্ধ ছড়াচ্ছে অথচ কেউ টের পাচ্ছে না। ওর তো সেই গন্ধটা সেই যে নাকে লেগে রয়েছে আর যাচ্ছে না। শনিবার বলে সকাল সকাল ছুটি। বেলা বড় রকমের গাঁও মেরে উঠেছিল, একদণ্ড অফিসে সে দেরী করে নি। সোজা বাড়ি ফিরে মালতীর হাতে গোছা গোছা টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কে একাউন্ট কিভাবে জমা দিতে হবে, এবং মালতীর জন্য আর দুটো নতুন ডিজাইনের অলংকার এ-ভাবে ভেবেছিল, হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে রাতে একটা থিয়েটার সেরে আসবে। রাস্তার মেয়েটা বাড়ির পাহারায়। রাণু শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়বে। রাণু আজকাল একটু একটু খেতে পারছিল। বেশ নিরাময়ের ছবি আবার যখন ফুটে উঠছিল চার পাশে, তখনই সে একটা পোড়া চামড়ে দুর্গন্ধে বমি করে দিল। সিঁড়ির গোড়ায় যারা থাকে, অর্থাৎ একতলার ফ্ল্যাটে, ওরা গন্ধটা পাচ্ছে না। পেলেও বোধ হয় আসছে যাচ্ছে না খুব একটা। সে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিল, গন্ধটা আপনারা পাচ্ছেন না! ওরা কেমন নির্বিকার মুখে তাকিয়ে দেখছিল, সত্য-নারায়ণকে। লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মেয়েটা তার কতদিন থেকে একটা গন্ধ পাচ্ছিল, এবার সে পেতে শুরু করেছে।

সে বলেছিল, পাবেন, আপনারাও পাবেন। বাড়ির সামনে এই সব বেওয়ারিশ মাল, অখাদ্য কুখাদ্য এনে জড়ো করছে, না পেয়ে যাবেন কোথায়।

এবং বৌটার খোলা বুকে একটা নতুন বাচ্চা, এই মনে হয় দু-চার দিনও হয় নি, একেবারে বুকের ভেতর মুখ লাগিয়ে রেখেছে। হাত-পা কাঠি কাঠি, সবুজ শরীরটা, আজ কি কাল, যেমন রাণু হবার সময় সে হাসপাতালে গিয়ে একদিনের বাচ্চা রানুকে দেখেছিল, চামড়া কোঁচকানো, এবং চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। আর তখনই জানালার নীচে সুকুমার, সে প্রায় স্বর্গ পাবার মতো চিৎকার করে বলল, এসে সুকুমার! পাশে দেখছ?

সুকুমার চারপাশে তাকাল। সে এমন কিছু দেখতে পেল না। কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই, কেউ বাস চাপাও পড়ে নি, কোন মৃতদেহ বাড়ির পাশে কেউ ফেলে রেখে যায় নি, বরং বুড়োটা তার দুই নাতি নিয়ে, দুজন যুবক ছোঁড়া, এবং কিছু বেশী বয়সের দু-তিনটে মানুষ গোল হয়ে কলকাতার আকাশ পরিষ্কার দেখে খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরেছে। পাশে পোস্টাফিসে আলো জ্বালা হয়ে গেছে। আকাশের মাথায় ভাঙা চাঁদ। দেবদারু গাছটা ভারী সজীব। সুন্দর মতো এক যুবতী স্বামীর সঙ্গে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে আছে। পান খেয়ে রাঙা ঠোঁট উল্টে পাল্টে দেখছে। কোথাও কিছু সে অস্বাভাবিক দেখতে পেল না। সত্যদার মেয়েটার ক'মাস থেকে কি একটা অসুখ, কখনও ভাল হয়ে যায়, কখনও বিছানা থেকে একেবারে উঠতেই পারে না—এসব খবর সে পেয়েছে। দু-চারবার সে দেখেও গেছে। কি একটা গন্ধ পায় সংসারে। একটা অসম্ভব ভারী আবহে মানুষ, সামান্য একটুতেই ঘাবড়ে যায়। এমন একটা বয়সে বালিকার স্বামী কৌতূহলী হয়ে যায়। মহাকোলাহলে কত কিছু দেখে বুঝবার স্বভাব। আর কিশোরী মেয়েটি দুপুর বালিকার মতো জানালায় দাঁড়িয়ে থাকছে। ভেতরে আসলে সবই অসুখ হয়তো, বড় হতে গেলে কিছু অসুখ শরীরে আসবেই—সে এই সব ভেবে সিঁড়ি ভেঙে যত উঠছিল তত মনে হচ্ছিল, সত্যনারায়ণদা, ভারী মনোকষ্টে পড়ে গেছে।

সুকুমার বলল, কিছু তো দেখলাম না!

—কিছু না?

—না তো!

—তোমাদের চোখ নেই! তোমরা এত ভোঁতা মেরে গেছ।

সুকুমার অবাক। চোখ মুখ ভয়ঙ্কর রকমের ভীতু, ভূতটুত দেখলে এমন চোখ মুখ হবার কথা। সুকুমার মনে মনে বলল, তোমার মাথাটা গেছে। চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছ—ধরা পড়ে যাবে ভয়ে শালা তুমি এমন মুখ করে রেখেছ। পাগলামী করলেও রেহাই নেই। এবারে চাঁদ সত্য কথাটা বলে ফেল।

সুকুমার বলল, কেমন আছে দাদা?

—দু দিন বেশ ছিল, আজ আবার খেতে পারছে না গন্ধে।

—অনেক খোঁজ করলেন!

হঠাৎ কেমন অসহায় মানুষের মতো চেপে ধরল সুকুমারের হাত। বলল, তুমি বাঁচাও। তুমিই পার।

সুকুমার বলল, আপনি বসুন তো। উতলা হবেন না। বৌদি বৌদি! সে দরাজ গলায় ডাকলে, মালতী এসে দাঁড়াল সামনে। ওরও চোখ মুখ কেমন শুকনো। সেই নির্মল হাসিটুকু নেই।

—আপনাদের কি হয়েছে?

—জানি না ভাই। আর ভাল লাগছে না।

সত্যনারায়ণ বলল, থানায় তোমার দাদাকে একটা খবর দিতে হবে।

—কেন?

—দেবদারু গাছটা সাফ করা দরকার।

—গাছে কি হয়েছে?

—গাছের নীচে সব পঙ্গপাল। অখাদ্য কুখাদ্য খায়।

—খাচ্ছে খাক না। আপনার কি তাতে?

—নীচে যা তা সেদ্ধ করে খাবে, আর ওপরে আমরা থাকব! সে কখনও হয়? গন্ধ! বলেই যেন ছুটে বের হয়ে গেল সত্যনারায়ণ!

মালতী বলল, বুঝলেন!

—হুঁ বুঝছি। দেখি। এদের সরানো যায় কিনা।

সত্যনারায়ণ ফিরে এসে বলল, যা হয় কর একটা ভাই। আমরা না হলে মরে যাব। দু দিন বাদে ঠিক মালতীও বমি করে দেবে। তখন আমরা তিনজন, আমি বলছি, কেউ বাদ যাবে না, পাশের ফ্ল্যাট, নীচে সবাই। আস্তে আস্তে সবাই পাবে। সবাই মরবে। একটা কিছু করো।

সুকুমার প্রথমে ওর দাদার কাছে গেল। ওর দাদা বলল, আইনে নেই। তাড়াবার

[illegible]

—[illegible] কি জানি কোথায় আছে।

[illegible] সকালের [illegible]।

—[illegible]! তোমাদের জন্য ভদ্রলোকেরা আর শহরে থাকতে পারবে না। সব অকর্ম-কুকর্ম করে বেড়াচ্ছ, আমরা বুঝি জানি না!

যেলোগুলো সব পোঁটলাপুঁটলি মাথায় নিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। হাঁড়ি-পাতিল বুড়ো মানুষটা। চুল সাদা, কানি পরনে, নাকের ভেতরে বড় গর্ত, কান বড় এবং লোমে ভর্তি। বুড়ো মানুষটা, দু বছরের বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলে আরও দু-চারজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। এবং যা হয়ে থাকে বেশ সোরগোল পড়ে গেল। আর তখন যায় কোথায়। দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওরা দৌড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। নিমেষে দেবদারু গাছটার চার পাশ কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। কিছু ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল, পোড়া ইঁট, দুর্গন্ধময় কিছু ছেঁড়া কানি, আর সব পচা জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট হাড় মাংস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। সত্যনারায়ণ জমাদার ডেকে জায়গাটা সাফ করে ফেলল, গঙ্গা জলে ধুয়ে দিল। শরীরে এবং চার পাশে যা কিছু আছে তার ওপর ওডিকোলন ছিটিয়ে এবং রাম রাম বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। তারপর দরজা জানালা খুলে দিল সব। রাণুকে নিয়ে জানালায় একবার দাঁড় করিয়ে বলল, পাচ্ছিস?

রাণু নাক টেনে বলল, না বাবা।

—এখানে?

—না বাবা।

—এদিকে আয়। দ্যাখ তো...?

—না বাবা।

তারপর সত্যনারায়ণ ভাল করে ঘর বারান্দা ধুয়ে দিতে বলল, রান্নার মেয়েটিকে। যেখানে যা কিছু আছে সব তাতেই গন্ধটা লেগে আছে ভেবে জল দিয়ে একেবারে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। মাছ মাংস রান্না হল না। নিরামিষ আহার করল সত্যনারায়ণ। সত্যনারায়ণ এবং রাণু আজ কত দিন পর যেন পেট ভরে ভাত খেল।

আর আশ্চর্য সে রাতে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল। এবং নাক ডাকতে থাকল। কিছুক্ষণ পর নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ যেন তাকে ডাকছে। —অমা দেখ এসে কি ব্যাপার। সে উঠে গেল জানালায়। আবার নতুন কারা আসছে। এবার একজন দুজন নয়। সে দেখল, গাছটার নীচে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। চার পাশ থেকে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসছে। মাথায় হাঁড়ি পাতিল, সে একটা নয়, একেবারে সার দিয়ে এবং সবার কোলে বাচ্চা। পাঁচটা সাতটা করে অপোগণ্ড, উলঙ্গ প্রায় তারা সব, চুল শনের মতো, এবং অভাবী মানুষ। ওদের সঙ্গে আছে সব পচা শাকসব্জি, উচ্ছিষ্ট খাবার। পচা পরিত্যক্ত মাছ-মাংসের হাড়।

[illegible] তিতিয়ে যেতে হচ্ছে। [illegible] গন্ধ নাকে এসে লাগছে। [illegible] যারা আছে [illegible]। [illegible] ওপর একটা [illegible] আসছে [illegible] দিকে [illegible] আমির [illegible] জাতি এসে এমন সন্ধ্যায় কলকাতার [illegible] জুড়ে বসতে চাইছে। রাণু [illegible] প্যালেস ফ্ল্যাটে; নীচের ফ্ল্যাটে এবং সর্বত্র সেই অক অক জল বমি। প্রায় মহামারীর মত সব শহরকে গ্রাস করছে। এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত ওদের সার। সে রাণু মালতীর হাত ধরে শহর লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। প্রায় আধমরা হয়ে আসছে। চোখ মুখ ছিটকে বের হয়ে যাবার মত। যেন এবার তারা কোণঠাসা করে মারবে

[illegible] আলোতে সে [illegible] গাছটা একাকী। নীচে একটা [illegible] শুয়ে আছে। গাছটার নীচে কেউ চলে আসে নি। কলকাতা আবার নিরিবিলি নিজের ভেতর ডুবে আছে। কলকাতা আছে কলকাতাতেই।

সাহিত্যের সাজঘরে

অন্নদাশঙ্কর রায়

ওঁকে নিশ্চয়ই কেউ রাজত্বে ধরেছে। তা না হলে তো ওঁর এত দেরী হওয়ার কথা নয়। ততক্ষণ চলুন এর বাড়ি ঘুরে আপনাদের দেখিয়ে আনি। বিদুষী শিল্পী লীলা রায় দোতলায় নিয়ে গেলেন। পুরো ঘরটাই একটা লাইব্রেরী। আমি এত সংগ্রহ এর আগে কখনো দেখি নি। মাঝখানে দুটো টাইপ রাইটার মুখোমুখি চাপা। এটা কেনা ১৯৩১-এ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। নিজে হাতে উনি লেখার কপি বাংলা ইংরেজীতে টাইপ করে পাঠান। ঘরের তিন কোণে রাখা ইজি-চেয়ার তাক থেকে বই নিয়ে ওখানেই বসে পড়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেন। – বুঝেছেন আমরা ওঁকে ডিসটার্ব করি না। কোনো নেশা নেই চা-পান বিড়ি সিগেট কিছু না, এমন কি এত বছর যে বিদেশে ছিলেন এক ফোঁটা বিশেষ পানীয় পর্যন্ত ঠোঁটে ছোঁয়ান নি।

—আপনার সঙ্গে আলাপ হল কি করে?

—লন্ডনে। চিঠিপত্রে। ওকে দেখি আমি এখানে এসে। এ-সব কথা থাক পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বয়সে নাতি-নাতনিরা সব আছে। উনি আমাকে নিয়ে কিছু লেখেন নি, ওঁর শিল্প জগত সম্বন্ধে আমি কোনো মতামতও প্রকাশ করি না। ওঁর যুক্তি উনি লেখায় রাখেন। প্রকাশযোগ্য না হলে দেন না। আমি সঙ্গীতের ছাত্রী ছিলাম, সাহিত্যে অনুরাগ ওঁর থেকেই আসে। ভারতবর্ষের গ্রাম আমাদের ভালো লাগে। ভালো লেগেছে ঢাকা, ময়মনসিং, কুষ্টিয়া, চাটগাঁ।

ওপর থেকে নেমে এলাম।

সত্যিই পথে একজন আটকে দিয়েছিল কথায়। চলুন ওপরে যাই। আমার স্টাডিতে।

কোথায় লিখছেন উপন্যাস?

—অমৃত, যুগান্তর, আনন্দবাজার 'দেশে' গল্প লিখছি। উপন্যাস আমার কাছে কেউ চায় না। চাইলেও হয়তো দিতে পারতাম না। কারণ যে উপন্যাস আমার ভাবনায় আছে তা দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ। দু-চার কথায় একে শেষ করা যাবে না। ১৯৪০ থেকে '৪৭ পর্যন্ত আমাদের জীবনে এবং জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, এই সময়কে উপজীব্য করে ভাবছি নতুন উপন্যাসে হাত দেবো। এটা ভেবেছিলাম ১৯৩৮-এ। শুধু ভারত-বর্ষের কাঠামো বদল নয়। সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিবর্তন সেটাই চিহ্নিত হবে। কারণ আমি মনে করি রিভলিউশান বা রাজনৈতিক পালাবদল হলেই যে সমাজ বদলে যাবে, এর কোনো মানে নেই। সুখ ওভাবে আসে না। সেই জন্যেই জাপানে শিল্প বিপ্লব এবং আমেরিকাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেও জনজীবনে সুখ আসবে না। প্রাচীন ভারতবর্ষকে গুরু করা আমি ছেড়ে দিয়েছি। তাতে দেখেছি একটা ক্ষুদ্র প্রদীপের শান্তি হয় বিচ্ছিন্ন আত্ম-কেন্দ্রিক। সুতরাং সুখ-এর কোনো ডেফিনেশান নেই। দু' হাজার বছর আগে নচিকেতা যমের কাছে ওই একই কথা তুলেছিল। সেটাই তো শেষ কথা।

উনি বলছিলেন, আর আমি শুনছিলাম। ক্রমে দেখলুম ব্যাপারটা বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। এবারে পুজোয় নামা যাক।

—পুজোর উপন্যাসের কথা থাক। আজকের যা লেখা হচ্ছে তা লোকে পড়ছে আবার পুরনো খবরের কাগজের মতো ফেলে দিচ্ছে। কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না, বলে কি যেন একটা পড়ে-ছিলাম। আসলে কি জানেন? টাকার ব্যাপারটা উপন্যাসে ঢুকে গেছে। অবশ্য কিছু কিছু হয়তো উতরে যাচ্ছে।...অথচ জেমস জয়েস কিভাবে উপন্যাসের জন্য দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন। উপার্জন ছিল না, সুইজারল্যান্ডে ইংরেজী শিখিয়ে কিছু পয়সা রোজগার করেছেন। এক ভদ্রমহিলা ওঁকে মাঝে মাঝে টাকা জোগাতেন। এভাবেই সৎ কাজে কোনো না কোনোভাবে টাকা এসে যায়। আর এখনকার ঔপন্যাসিকরা? এই লিখে গেলাম, টাকা এলো, বাড়ি হল গাড়ি হল। আর তাব ক্ষেত্র তৈরীও রয়েছে। দ্রুত উপন্যাস বেরুচ্ছে। সময় কোথায়।

তাহলে বলতে চান অল্প সময়ে সার্থক কিছু সম্ভব নয়? কিন্তু যাঁর

মর্নিক মাউন্টেনের কথা তোলা যায়? ছোট্ট বই। সাত দিনে শেষ করেছিলেন টমাস মান।

—হ্যাঁ, কিন্তু তার প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘদিনের।...অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। গোড়ামী আমার নেই, তবে কি জানেন? উপন্যাস আর গল্প তো এক নয়। উপন্যাসে একটা বিরাট ক্যানভাস থাকে, বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে যিনি দেবতা ছিলেন উপন্যাসের শেষে হয়তো তিনি রাক্ষস হয়ে গেলেন। এভাবেই তো নানা চরিত্রের ভিড় ও দর্শন উপন্যাসে বিরাট ক্ষেত্র গড়ে তোলে।

আপনার 'রত্ন ও শ্রীমতী'র জন্যে বন্দরে জানি কুড়ি বছর ধরে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছে করে।

না, রত্ন ও শ্রীমতী শেষ করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি পাহাড়ের কাছে হেরে গেছি এবং সেই থেকে লেখা বন্ধও আছে। 'সত্যাসত্যে'র কথা ধরুন। এ উপন্যাস আমি ভেবেছি ইউরোপে। পশ্চিমকে বাদ দিয়ে পূর্ব সম্পূর্ণ হবে কি না এ নিয়ে তর্ক করা চলে। কিন্তু ইউরোপে না গেলে যে আমি অপূর্ণ থাকবো সেটা ছিল আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার সে বয়সে ইউরোপ যাত্রা আমার জীবনে পরিপূর্ণতার প্রয়োজনীয় একটি উপলব্ধি।

বললুম—তাই 'পথে প্রবাসে'র মতো একটা অমূল্য গ্রন্থ আমরা পেয়েছি।

হ্যাঁ যা বলছিলাম—'সত্যাসত্যে'র কথা। এই বিশালতা উপন্যাসের খাতিরেই দরকার ছিল। ধরা যাক বাদলের মতবাদ। যে মতবাদে বাদল বিশ্বাসী ছিল, কালের বিবর্তে তার ভঙ্গী, জীবন, দর্শন সব কিছু পাল্টে সে নতুন মতবাদে স্থিত হয়েছে। এটাকে দেখাতে গেলে তার ক্ষেত্র দরকার ছিল, দরকার ছিল বিস্তৃতি, ঘটনার। এটাতো এদিন ওদিন হয় না। কিংবা উজ্জয়িনী। পতিপ্রাণা এই কুলবধূ, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল [illegible]গামিনী। স্বামীকে সে স্বামী বলে

গ্রহণ করছে না। এই যে বিরাট আত্মপ্রত্যয়, চরিত্রের উত্তরণ তাতো দুচার পাতায় আঁকা যায় না।

কি খুঁজছিলেন আমাকে দেবার জন্য। পাচ্ছিলেন না। আমি দেখছিলাম—প্রবীণ একজন সাহিত্যিককে, যাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল লেখাতে যদি হয়তো বীরবলের মতো [illegible] প্রণাম [illegible] [illegible] করেছিল বীরবল, রবীন্দ্রনাথ, [illegible] জী [illegible] লেখার

স্টাইল। যিনি মনে করেন—স্টাইল হচ্ছে—Personality clothed in words. আর এই অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' পড়ে সেদিনের দুর্ধর্ষ সেই বীরবল তরুণ লেখকের মাথায় মুকুট তুলে দিয়ে বলেছিলেন—'এবার থেকে তুমিই লিখবে, আমরা পড়বো।' অন্নদাশঙ্কর আজো লিখছেন। [illegible]র প্রথম সারির একজন আই সি এস, একদিকে প্রাচ্যযুগ থেকে সারা

পৃথিবী ঘুরেছেন, খুঁড়েছেন নিয়েছেন জীবন. তুলেছেন সময়ের ছবি। লিখেছেন কবিতা, সনেটের মতো ছন্দের ছন্দে লিখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে গান্ধী পর্যন্ত ব্যক্তিত্বকে বাঙময় করেছেন কলমে। বিনয়, সৌজন্যবোধ, সংযম তাঁকে পাকা সোনার মতো উজ্জ্বল করে তুলেছে।

•

তখন আমার বয়স কতো। আমার কাছে তখন পৃথিবী মানে বাবা মা, আকাশ, বিশ্বাস, ভালোবাসা। তখন মহাশ্বেতা দেবী 'ঝাঁসীর রাণী' লিখেছেন। সালটা বোধহয় ১৯৫২-'৫৩ হবে। ঘুরেছেন বুন্দেলখণ্ড, ঝাঁসী, বরোদা। ঝাঁসীর রাণীর ভাইপোর নাতির সঙ্গে কথা বলেছেন। পড়তে শিখেছেন মারাঠী। চলেছে তথ্যসংগ্রহ। তখন ডাকু মান সিংহের সময়, স্থানীয় লোকেদের সে নামে ভয়ে বুক কাঁপে। পুলিশ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে—অচেনা লোককে বিশ্বাস করবে না। কেউ ডাব, পান দিলে খাবে না, শরবৎও না। তখন একজন অজানা অচেনা মহিলা পথে পথে ঘুরছেন, তথ্যসংগ্রহ করছেন। ঘাঁটছেন নানারকম পুঁথি, অপ্রকাশিত গ্রন্থ হাতড়াচ্ছেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বইয়ের পাতায় চোখ রেখেছেন দিনের পর দিন। বের হল 'ঝাঁসীর রাণী'। তিন বছর পরিশ্রমের ফসল তুলে দিলেন পাঠকের হাতে। প্রশংসিত হল বই। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার আর সুরেন সেনের মতো ব্যক্তি তথ্যের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে এ বইয়ের কথা বললেন। পাঠক পেলো বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবীকে।

—তখন থেকেই ইতিহাস, ইতিহাস আর ইতিহাস। তখন থেকেই শাসনযন্ত্র, রাজবৃত্ত থেকে আমায় আকর্ষণ করে জনজীবন। আমি শেষবারের মতো কলম আঁকড়ে বলে যাবো মানুষের কথা। সেই নিরন্ন, পাঁজরা বের করা, দুঃখী মেহনতী মানুষের কথা। হিউ এন সাঙ ভারতবর্ষে এসে দেখেছিলেন—একজন মানুষ খালি গায়ে পাঁজরা বের করা নেংটি পরা একটা জমিতে লাঙল দিচ্ছে। আজো গ্রামবাংলায় সেই মানুষ, একাই ছবি তোলে পড়ছে না? তাই আমার উপন্যাসে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে নানা জাতের, নানা ভাষার, নানা আদলের মানুষ।

—আমার কাছে ক্রিয়েটিভ রাইটিং অর্থাৎ সৃজনশীল মৌলিক সাহিত্য মানে, তাই। কারণ আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে চাই মানুষের কাছে, সৎ থাকতে চাই। যাতে পাঠক বুঝতে পারেন আমার মধ্যে অসততা ছিল না। আর আমি যা লিখতে চাই তাই নিয়েই আমার কাজ। সেইজন্যেই লিখি আমার সাধ্যমত সততা দিয়ে। বলতে চাই, না বলা পর্যন্ত আমার উপায় নেই। যন্ত্রণা জিওল মাছের মতো আমার শরীরে রক্তে খেলা করে। তাই কোনো পুরস্কারের জন্যে নয়; আমার বিশ্বাস আমার দেখা চরিত্র আমি উপস্থাপিত করবো। সাহিত্যে তাকেই আমি সংগ্রাম বলি।

তাই আমার 'নটী'।

তাই আমার অষ্টাদশ শতকের পট-ভূমিকায় লেখা 'আঁধার মানিক'। বর্গীর হাঙ্গামায় যখন মানুষজনেরা কলকাতার দিকে এগুলো, যখন গড়ে উঠলো কলকাতা, তখন ইংরেজের নজর গেল কলকাতার দিকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা করতে এসেছিলো। বর্গীরা ঘোড়ায় চড়ে আসতো, বড় নদী পেরুতে তাদের অসুবিধে। তাই কলকাতা ছিল এক অর্থে নিরাপদ। কোম্পানি থেকে বলে দেওয়া হল—তোমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছো, এক ছটাক জমির দিকে হাত বাড়াবে। কিন্তু ইতিহাস ক্রমশ নতুন লেখা হল।... এতো জানার ব্যাপার। প্রতিটি বইয়ের এই জানার জন্যে আমাকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। আমার—'কবি বন্দ্যোঘাটি গাঞীর জীবন মৃত্যু'-র জন্য বাংলা অক্ষরে উড়িয়া ভাষায় লেখা একটা বংশাবলী চরিত দিতে হয়েছিল। উপন্যাসকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে তাও আমার জরুরী মনে হয়েছিল। এভাবে উপন্যাসে আমি মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতাকে ভেঙে গদ্যে রূপান্তরিত করেছিলাম।

আমার কাছে উপন্যাস হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এর জন্যে আমাকে মিশতে হয়েছে চাষী, মজুরের সঙ্গে। তুলে নিতে হয়েছে তাদের হাজার হাজার কথা, ভাষা। কারণ আমি মনে করি বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তারাশঙ্করই গ্রামবাংলার মানুষের ভাষা আর শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বাকীসব লোকাকী তাদের লেখা গ্রামের, মানুষের কথা। আমি 'গণদেবতা', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' 'পঞ্চগ্রাম' এপিক নভেল বলে বিশ্বাস করি। এরপর আমার সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র কথা মনে পড়ে।

এই জীবন, যন্ত্রণা বিষাদ যা আমাদের রক্তে রন্ধ্রে জড়িয়ে রয়েছে, আর মানবজাতির উত্থানের ইতিহাস, তাদের সংগ্রাম, এসব যদি সাহিত্যে চিহ্নিত না হয় তাহলে সমাজের প্রতি কি প্রতিশ্রুতি পালন করলাম? 'অরণ্যের অধিকার'-এ বিরসা মুণ্ডার বিদ্রোহের ইতিহাস আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলো। সার্কাসের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস 'প্রেমতারা'র জন্যে দিনের পর দিন সার্কাস পার্টির সঙ্গে ঘুরতে হয়েছিল। তাই 'হাজার চুরাশীর মা' শুধু নয় 'বায়েন', 'পিণ্ডদান', 'জলসত্র', 'সাঁঝ সকালের মা' সবই সেই [illegible] ইতিহাস। পুজোয় লিখছি 'অমৃতে' গল্প। প্রসাদে উপন্যাস, বেতার জগতে [illegible] গল্প।

কোনো প্রচার নয় অনেক পাঠকের জন্যে নয়। আমি কে [illegible] নিয়েছি, আমার না লিখে উপায় নেই বলে। তাই শক্ত চেয়ারে বসে শক্ত কাঠে পিঠ দিয়ে আমি লেখার তাগিদে সারো চোদ্দো ঘণ্টা পর্যন্ত একনাগাড়ে লিখেছি। তাই কি পাবো না পাবো আশা করি না।

উনি থামলেন। মনে মনে আমি বললাম—আশা আমরাও করি না মহাশ্বেতা দেবী। আমরা জানি, কি শিল্পে, কি সঙ্গীতে কি লেখায় জাতশিল্পীরা সে আশা করেন না। আশা করেন নি 'গগা'—ছবিগুলোকে পর্যন্ত শেষ জীবনে ভালো করে দেখে যেতে পারেন নি। আশা করেননি 'বাখ'। আশা করেন নি বোদলেয়ার। কিন্তু শিল্প সেখানে কাদের আসন স্থায়ী। সাহিত্যের ইতিহাস তা বলে না। তাই বাংলা সাহিত্য যদি সত্যভাষী হয় তবে আগামীকালে মন্ত্রের মতো ঝলসে উঠবে। প্রেমতারা, অরণ্যের অধিকার, 'নটী' 'অমৃত সঞ্চয়' 'কবি বন্দ্যোঘাটি গাঞীর মৃত্যু'। কাল কখনো মিথ্যে বলে না।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা

দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতো এই বাংলার নানা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশৃঙ্খলা মোটেই বিরল নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায় তার পথসন্ধানের জন্যে রাজ্যপাল (তিনি এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও) ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এক বৈঠক ডেকেছিলেন। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে, রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছে। এটাকে শিক্ষাক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। এই অবস্থার অবসানের জন্যে চাই বলিষ্ঠ ব্যবস্থা। তার সঙ্গে চাই সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক—সকলের সহযোগ। মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর সমস্যা বিরাট। আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কয়েক বছর আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো। অধিকাংশ ছাত্রই শৃঙ্খলাপরায়ণ। কিন্তু কিছু [illegible]।

অবস্থার উন্নতির জন্যে এই সম্মেলনে কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সব রকমে সাহায্য করবেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-কথাও মনে করিয়ে দেন যে, ছাত্রদের কিছু-কিছু ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ আছে। সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ-জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-কল্যাণের জন্যে একজন বিশেষ 'ডীন' নিয়োগের প্রস্তাব করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির একমাত্র মাপকাঠি হবে পূর্ববর্তী পরীক্ষায় কৃতিত্ব—এই মর্মে একটি আইন তৈরি করা যায় কিনা তা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন বলে এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। তবে পশ্চাদপদ শ্রেণী বা পশ্চাদপদ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষায় পাইকারি টোকাটুকি বন্ধ করার জন্যেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশে সমাজবিরোধীদের ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। ইনভিজিলেটরদের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। দরকার হলে টোকাটুকি বন্ধ করার জন্যে গ্রেপ্তার করাও হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে যে আচরণবিধি তৈরি হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, তাঁদের বছরে অন্তত তিনশ ক্লাস নিতে হবে। তাঁদের নির্দিষ্ট কয়েক ঘন্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অ-শিক্ষক কর্মচারীদের জন্যে সর্বত্র সমান বেতনক্রম চালু করা হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা নিয়েও আলোচনা হয়। ঠিক হয়েছে, নতুন করে কোনো খরচ বাড়াবার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

হলদিয়ার উন্নয়ন

হলদিয়া যে ক্রমশ একটা বিরাট শিল্পনগরী হয়ে উঠছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বন্দর, তেল শোধনাগার, নানা কারখানা, এ-সব তো হয়েছেই। সেই সঙ্গে যদি আরও কারখানা বা পেট্রোলভিত্তিক রসায়ন শিল্প গড়ে ওঠে তবে তো সব মিলিয়ে হয়ে দাঁড়াবে বিরাট ব্যাপার। কিন্তু শুধু কিছু কল-কারখানা গড়ে উঠলেই কোনো এলাকার উন্নয়ন হয় না। কল-কারখানা গড়ে উঠলেই জনসংখ্যা বাড়ে। সেই সব মানুষের নানা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে দরকার পরিকল্পিত উন্নয়নের। হলদিয়ার উন্নয়নের জন্যে রাজ্য সরকার একটি সর্বাত্মক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এর জন্যে মোট খরচ হবে ১৭৬ কোটি টাকা। অবশ্য এটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, রূপায়িত হতে লাগবে বিশ বছর। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন। দিল্লি থেকে একটি পর্যবেক্ষকদল সরেজমিনে সব কিছু দেখার জন্যে এই রাজ্যে এসেছিলেন। সেই দল সুপারিশ করেছেন, হলদিয়ার উন্নয়নের জন্যে আপাতত তিন কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের উদ্দেশেই এই সুপারিশ। চার বছর ধরে এই সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে—প্রথম বছরে ৫০ লাখ, দ্বিতীয় বছরে দেড় কোটি এবং তৃতীয় আর চতুর্থ বছরে ৫০ লাখ টাকা করে। রাজ্য সরকার অবশ্য হলদিয়ার উন্নয়নের জন্যে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু টাকা খরচ করেছেন। শিল্প, পূর্ত, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি দফতর মারফৎ গত আর্থিক বছরে এক কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের জন্যও বরাদ্দ করা হয়েছে এক কোটি ৩৬ লাখ টাকা। এদিকে কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী বলেছেন, আগামী বছরের মাঝামাঝি হলদিয়া ডক চালু হতে পারে।

বাড়তি বিদ্যুৎ

এতদিন পর্যন্ত আরো অনেক রাজ্যের মতো পশ্চিম বাংলারও ভাবনার কারণ ছিল বিদ্যুতের ঘাটতি। আর এখন সরকার ভাবনায় পড়েছেন বাড়তি বিদ্যুৎ নিয়ে। অবশ্য এই বাড়তিটা হচ্ছে রাতের বেলায়। আর একটু-আধটু বাড়তি নয়, রীতিমতো ১৫০ মেগাওয়াট। সাঁওতালডিহিতে দ্বিতীয় ইউনিট থেকে যখন বিদ্যুৎ মিলবে তখন এই বাড়তি বিদ্যুতের পরিমাণ ২৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত পৌঁছবে। রাতে এত বিদ্যুৎ বাড়তি হয়ে যাচ্ছে, কাজে আসছে না, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তেল জ্বালিয়ে চুল্লী চালু রাখতে হচ্ছে। এটা নিতান্তই বাজে খরচ। পরদিন আবার যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন সুরু হয় তখন কয়লা জ্বালাবার ব্যবস্থা করতে হয়। এই তেল বদলে কয়লা দিতে কিছুটা সময় লাগে। তখন বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যায়। তাই সকালের দিকে লোডশেডিং অনিবার্য হয়ে পড়ে। কাজেই এই বাড়তি বিদ্যুৎ কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার পথসন্ধান চলছে। একটা পথ হলো, আরো বেশিসংখ্যক কল-কারখানায় রাতের শিফট চালু করা। তা হলে বিদ্যুতের কিছুটা সদ্ব্যবহার হয়। এ-জন্যে রাজ্য সরকার কারখানার মালিকদের কিছু-কিছু সুবিধে দিতেও রাজি। যেমন, দিনের বেলা বিদ্যুৎ ব্যবহারে কড়াকড়ি শিথিল করা। কিন্তু তবু মালিকদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা বলছেন, রাতের শিফটে কাজ চালু করার কয়েকটি অসুবিধে আছে। এর জন্য শ্রমিকদের বাড়তি টাকা দিতে হবে। রাতের শিফটে দিনের তুলনায় উৎপাদনও নাকি কম। এ-বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন বণিকসভার আরো আলোচনা হবে।

[illegible]

শ্রীলঙ্কার রাজনীতি

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী শ্রীমাভো বন্দরনায়ক তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তাঁর দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বিরোধীরা নাক সিঁটকে তাঁকে রান্নাঘরে ঢুকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অন্যরা বলেছিলেন, তিনি বরং তাঁর সন্তানদের দেখাশুনা নিয়েই থাকুন। কিন্তু তাঁর বিরোধীরা শ্রীমতী বন্দরনায়ককে ঠেকাতে পারেন নি। গত প্রায় ১৫ বছর যাবৎ তিনি তাঁর দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

সম্প্রতি তিংকোমালিতে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে শ্রীমতী বন্দরনায়ক নারী হিসাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁকে যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল, সেই পুরানো কথাগুলি আবার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ-দেশের সব স্ত্রীলোকেরই এ কারণে গর্ববোধ করা উচিত যে, পুরুষরা সকলে মিলে যে নারীকে রান্নাঘরে পাঠাতে চেয়েছিলেন, সেই নারী দেশকে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছেন।'

শ্রীমতী বন্দরনায়কের সেই নেতৃত্বের সামনে সম্প্রতি আর একটি পরীক্ষা এসেছে। এবার তাঁকে যে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে, সেটা অবশ্য ঠিক নারী-পুরুষ লড়াই নয়, লড়াই তাঁর সরকারেরই এক অংশীদারের সঙ্গে।

শ্রীলঙ্কার পাঁচ বছরের পুরানো এই যুক্তফ্রন্ট সরকারের তিন অংশীদার হল শ্রীলংকা ফ্রিডম পার্টি লংকা সমসমাজ পার্টি ও কমানিস্ট পার্টি। দেশের আইনসভায় শ্রীলংকা ফ্রিডম পার্টির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, মোট ১৫৭টি আসনের মধ্যে প্রায় ৯৭টিই তাদের। শ্রীমতী বন্দরনায়ক এই পার্টির নেত্রী। লংকা সমসমাজ পার্টির সদস্যরা ট্রটস্কিপন্থী। আইনসভায় এই পার্টির সদস্য সংখ্যা মাত্র ১৮। শ্রীলংকাই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে ট্রটস্কিপন্থীরা শাসন-ক্ষমতার ভাগীদার। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি হয়তো তাদের নিজের জোরেই সরকার চালাতে পারে, কিন্তু লঙ্কা সমসমাজ পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে তারা দেশের সরকারের একটা বামপন্থী চেহারা দিয়েছে।

লঙ্কা সমসমাজ পার্টির সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বড় শরিক শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির সম্পর্কটা কিছুকাল যাবৎই ভাল যাচ্ছিল না। ট্রটস্কিপন্থীদের উগ্র বাম রাজনীতির সঙ্গে ফ্রিডম পার্টির মধ্যপন্থী রাজনীতির মিলমিশ হচ্ছিল না। ট্রটস্কিপন্থীরা আরও 'প্রগতিশীল নীতি' গ্রহণ করার জন্য ফ্রিডম পার্টির উপর চাপ দিচ্ছিলেন। অন্যদিকে ফ্রিডম পার্টির নেতারা যুক্তফ্রন্টের ছোট শরিকদের এভাবে প্রগতিশীলতায় জাহির করা পছন্দ করছিলেন না।

শ্রীলঙ্কা সরকারে লঙ্কা সমসমাজ পার্টির তিনজন মন্ত্রী আছেন। দলের নেতা ডঃ এন এম পেরেরা হচ্ছেন অর্থমন্ত্রী, ডঃ কলভিন আর ডিসিলভা হচ্ছেন বাগিচা দপ্তর ও সাংবিধানিক ব্যাপার সংক্রান্ত মন্ত্রী এবং লেসলি গুণবর্ধন হচ্ছেন পরিবহনমন্ত্রী। দেশের প্রায় সব ট্রেড ইউনিয়ন এই দলের হাতে। সে হিসাবে তারা সরকারের মধ্যে সরকারকে বিব্রত করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে এবং সেই ক্ষমতা ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে না। গত ডিসেম্বর মাসে ডঃ পেরেরা নিজের সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভের আয়োজন করেন। এই বিক্ষোভ আটকাবার জন্য শ্রীমতী বন্দরনায়ক কারফিউ জারির হুকুম দিয়েছিলেন।

সম্প্রতি এই দুটি ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছে। যদিও বিরোধের মূলে রয়েছে শ্রীলঙ্কার চা-বাগিচাগুলি, তাহলেও এটাকে ঠিক 'চায়ের কাপে তুফান' বলা যায় না। কেননা এই বিরোধ সে-দেশের ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্টের ভিতর ইতিমধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা দিতে পারে।

চা-বাগিচা (ও রবার বাগিচা) শ্রীলংকার অর্থনীতিতে বড় স্থান অধিকার করে আছে। চা ও রবারই হচ্ছে সে-দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য। অথচ বড় বড় বাগিচাগুলি বৃটিশ মালিকদের হাতে থাকায় জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হচ্ছিল। এজন্য সম্প্রতি চা-বাগিচাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কিভাবে কার্যকর করা হবে, তা নিয়ে দুই শরিকে বিরোধ বাধল। শ্রীলংকা ফ্রিডম পার্টি ও শ্রীমতী বন্দরনায়ক এ-ব্যাপারে কতকটা সতর্কভাবে অগ্রসর হতে চান। তাঁরা বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে ও বে-সরকারি মালিকদের পুরো খেসারত দিয়ে চা-বাগিচাগুলি সরকারের হাতে নিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী। এ-ব্যাপারে কোনরকম হঠকারিতা করলে বিদেশের অর্থসাহায্যকারীরা হাত গুটিয়ে নিতে পারে বলে শ্রীমতী বন্দরনায়ক ও তাঁর অনুগামীদের আশঙ্কা আছে।

অন্যদিকে, লঙ্কা সমসমাজ পার্টি কোনরকম আলাপ-আলোচনার তোয়াক্কা না করে ও বিনা খেসারতে চা-বাগিচাগুলি অধিকার করে নিতে চায়।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিল, সেটা হল, চা-বাগিচাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর সেগুলি সরকারের কোন্ দপ্তরের অধীনে আসবে। ট্রটস্কিপন্থীদের দাবি, বাগিচাগুলিকে তাঁদের দলভুক্ত ডঃ কলভিন ডি-সিলভার অধীনে দেওয়া হোক। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই দাবি অন্যায় নয়। কেননা, ডঃ সিলভা বাগিচা দপ্তরেরই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। কিন্তু শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির ভিতরে কথা উঠল, এমনিতেই ট্রটস্কিপন্থীরা তাঁদের শক্তির তুলনায় বেশি আস্কারা পাচ্ছেন, এর উপর আবার তাঁদের হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাগিচাগুলি তুলে দেওয়া ঠিক হবে না। লংকা সমসমাজ পার্টির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়ার জন্য ফ্রিডম পার্টির ভিতর থেকে চাপ আসতে থাকে। যাঁরা এই চাপ দেন, তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ও পার্টির যুব শাখার নেতা আনুরা-ও আছেন।

ঘটনাক্রমে ট্রটস্কিপন্থীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়ার সুযোগ শ্রীমতী বন্দরনায়কের হাতে এসে যায়। চা-বাগিচা দখল করার প্রশ্নে লংকা সমসমাজ পার্টি প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রচার চলছিল, সেটা বন্ধ করার জন্য শ্রীমতী বন্দরনায়ক ঐ দলের নেতা ডঃ পেরেরাকে পত্র দেন। এই পত্রের উত্তর এল ডঃ কলভিন ডি-সিলভার কাছ থেকে। তিনি লিখলেন, শ্রীমতী বন্দরনায়ক ডঃ পেরেরার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। শ্রীমতী বন্দরনায়ক ডঃ কলভিন ডি-সিলভাকেও একটু কথা লিখলেন। একটি জনসভায় তিনি বললেন, পাঁচ বছর একসঙ্গে মিলে সরকার চালাবার পর সরকারের একটা অংশ যেভাবে প্রকাশ্য গালিগালাজ আরম্ভ করেছে, [illegible] আর চলতে দেওয়া যায় না। তিনি [illegible]লেন, সরকার কয়েকদিনের মধ্যেই [illegible] কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তা[illegible] পরিচয় পেয়ে ডঃ পেরেরা নরম হলেন। [illegible]নি প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লিখে মামুলিভাবে কছুটা দুঃখপ্রকাশ করলেন। রাষ্ট্রায়ত্ত বাগিচাগুলি বাগিচা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার দাবিও তাঁর দল ছেড়ে দিল।

কিন্তু শ্রীমতী বন্দরনায়ক সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বললেন, সমসমাজ পার্টির মন্ত্রীদের বর্তমান দপ্তর ছেড়ে অপেক্ষাকৃত গৌণ দপ্তরের ভার নিতে হবে। সমসমাজ পার্টি এতে রাজি হল না। তারা জানিয়ে দিয়েছে যে, শ্রীমতী বন্দরনায়কের সরকারে তারা থাকবে না, তবে বাইরে থেকে সরকারের 'প্রগতিশীল নীতিগুলি' সমর্থন করে যাবে।

শ্রীলংকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত শ্রীমতী বন্দরনায়কের আয়ত্তে আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সমসমাজ পার্টি শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে নিজেদের প্রভাবকে শ্রীমতী বন্দরনায়কের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির ভিতরকার বামপন্থী অংশটিকেও তারা নিজেদের সঙ্গে পাওয়ার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে, কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন শ্রীমতী বন্দরনায়ক পাবেন বলে আশা করতে পারেন।

পুণ্ডরীক

১৮-৮-৭৫

উপন্যাস

প্রথম প্রবাস

বুদ্ধদেব গুহ

এক

বোম্বে থেকে লুফৎহানসার উড়ান কাল খুব সকালে। একটানা না থেমে ফ্রাঙ্কফার্ট।

বোম্বেতে ইতিপূর্বে কাজে এসেছি অনেকবার। এবার অকাজে। কলকাতা থেকে বোম্বে—ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের উড়ান মাত্র ঘণ্টা তিনেক লেট ছিল। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করলাম। শহরে অনুপস্থিত এক বন্ধুর গাড়ি ও তার সেক্রেটারী—ছিপ-ছিপে সুন্দরী একটি পার্শী মেয়ে, নাম জারীন, নিতে এসেছিলেন সান্টা-ক্রুজে। তখন শেষ বিকেল। সেপ্টেম্বর মাস। ভ্যাপসা গরম।

জারীন আমাকে তাজ হোটেলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কাল শেষ রাতে গাড়ী আসবে বলে গেলেন।

টান-টান করে হোটেলের ঘরের পর্দা সরিয়ে কাঁচের মধ্যে দিয়ে বোম্বের রাতের আলো দেখছিলাম।

মনটা খারাপ লাগছিল। বেশ বেশী খারাপ। অথচ সে মুহূর্তে আনন্দিত হওয়ারই কথা ছিল। দু মাসের জন্যে বিদেশ যাচ্ছি, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। কত দেশে পা রাখব—কত লোকের সঙ্গে মিশব, চোখ খুলে পৃথিবীর শরীর দেখব, কান খুলে হৃৎস্পন্দন শুনব—নিজের বুকের মধ্যে, চেতনার মধ্যে, মস্তিষ্কের কোষে কোষ সমস্ত পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপকে রুপোলি নূপুরের মত ঝুমঝুমির মত বাজাব।

ভেবেছিলাম।

কিন্তু তবুও দুঃখ হচ্ছিল।

চিরকলে মধ্যবিত্ত বাঙালী বোধহয় কখনও শক্ত হতে জানে নি। শক্ত করতে পারে নি নিজেকে। বাইরের মুখোশটা শক্ত করতে পারলেও ভিতরটা শামুকের অভ্যন্তরের মত চিরদিন তার তুলতুলই রয়ে যায়। বাঙালী বোধহয় চিরটাকালই বাঙালী থেকে যায়। একটুতেই তার মন খারাপ হয়। যখন খুব আনন্দিত হবার কথা ঠিক তখনই কোল-কাতার ফেলে-আসা বাড়ি, বয়স্ক বাবা, ভগ্নস্বাস্থ্য মা, বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন বাড়ির বিভিন্ন ঘরে বসে-শুয়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা অনেককে বারবার মনে পড়ে। যাদের ভালো বাসা, ভালো ব্যবহার পেয়েছি, পাই প্রতি-নিয়ত; যাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অনেক সময়ই খারাপ ব্যবহার করি এবং করেই পরমুহূর্তেই নিজেই কষ্ট পাই এমন প্রত্যেককেই মনে পড়ে—বারবার। নিরুচ্চারে মন বলে—ভালো থেকো তোমরা সব। তোমরা সকলে খুব ভালো থেকো।

এই মন খারাপটা আসলে অমূলক। কারণ, দূরত্ব মনে করলেই তা দূরত্ব। যাত্রার সময়ের হিসাবে কখনও কখনও শিয়ালদা থেকে ট্রেনে বহরমপুরে (একশ তিরিশ মাইল) যেতে যে সময় লাগে সেই সময়ে দমদম থেকে ফ্রাংকফার্টে গিয়ে পৌঁছনো যায়। বহু হাজার মাইল দূরে না ভেবে মাত্র বারো ঘণ্টা দূরে ভাবলেই মন খারাপের আর হেতু থাকে না। তাছাড়া, এ কথাটা প্রায়ই সত্যি যে, বাংলার অন্য প্রান্তে বোনের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে যত-না দেখা হয়, যে-বোনের বিয়ে হয়েছে সুদূরে ন্যু-ইয়র্কে তার সঙ্গে দেখা হয় তার চেয়ে বেশী। কোনো বিপদ-আপদে বা দোল-দুর্গোৎসবে বাংলার বোন গরুর গাড়ী, সাইকেল রিকসা, ট্রেন এবং ট্যাকসির মাধ্যমে বাড়ি এসে পৌঁছতে যে সময় নেয়, ন্যু-ইয়র্কের বা টোকিওর বোন তার চেয়ে আগে এসে পৌঁছে যায়। তবু, সব জানা সত্ত্বেও মন খারাপ লাগে দূরে যেতে—অল্প কিছুদিনের জন্যে হলেও।

অন্ধকার থাকতে তৈরী হয় নিয়ে শেষ রাতে হোটেলের লবীতে এসে দাঁড়ালাম। আমি যে লিফটে নাবলাম সে লিফটেই লুফৎহানসা কোম্পানীর দুজন এয়ার হোস্টেস—হলুদ আর নীল উর্দিফর্ম পরে নামল। তখন পর্যন্ত তাদের সুন্দর চেহারাই চোখ পড়েছে—গুণাবলী চোখে পড়ল অনেক পরে—প্লেনের মধ্যে।

ভোরের মিষ্টি সামুদ্রিক হাওয়া অন্ধ-কারের আড়াল থেকে ছুটে আসছিল চোখে-মুখে, গাড়ীর মধ্যে। সান্টা-ক্রুজে পৌঁছিয়ে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করলাম আগে। তারপর কাউন্টারে-বসা একজন মোটাসোটা হাসিখুশী পার্শী ভদ্রমহিলা আমাকে ছাপ্পান্নটি টাকার বিনিময়ে তেলচিটে আটটি ডলার দিলেন। এবং তিনি নিজে যতই হাসিখুশী থাকুন না কেন, আমাকে বিলক্ষণ অখুশী করলেন। এই আটটি ডলার সম্বল করে আমায় পাড়ি দিতে হবে ফ্রাঙ্কফার্ট—সেখান থেকে লানডান। যেহেতু আমি একজন সাধারণ নাগরিক, যেহেতু আমি পাট বা চা বা নর-কঙ্কাল বা অন্যকিছু রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারি না সেইহেতু আমার বরাদ্দ এই করুণ এবং হাস্যোদ্দীপক ছাপ্পান্ন টাকার সমতুল বিদেশী মুদ্রা।

ইমিগ্রেশানের পর কাস্টমসের অবজ্ঞা ভিজিটরের ব্যক্তিগত হাতব্যাগ ইত্যাদি পরীক্ষা-টরীক্ষার পর এমবার্কমেন্ট লবীতে গিয়ে বসলাম।

ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। পুজোর আগের সোনালী রোদে ছেয়ে গেছে টারম্যাক। তবে এখানের রোদকে কোলকাতার রোদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। বিশেষ করে এই সময়ের রোদ। বাংলায় 'এখন শরৎ আলোর কমলবর্ণে বাহির হয়ে বিরাজ করে, যে ছিল মোর মনে মনে।'

একটু পরই উড়ান ঘোষিত হল। টার-ম্যাকের উপর বাস গড়িয়ে চলল। তারপর ডি-সি—টেন প্লেনে উঠে পড়লাম।

ডাকোটা, এ্যাভ্রো, ফকার ফ্রেন্ডশিপ, স্কাইমাস্টার, ক্যারাভিল, বোয়িং ৭৩৭ ইত্যাদি সমস্ত প্লেনে চড়া এক আর ডি-সি—টেন'এ চড়া আর এক। ঢুকতেই মনে হল, গান শুনতে বুঝি কোনো হলে এসে পৌঁছলাম।

এই ফাঁকে বলে নিই, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে যে, পাঠক যদি খুব কালেভদ্র হন তাহলে অধমকে ক্ষমা করবেন। কারণ লেখক একজন সামান্য লোক। বিদেশ যাত্রা তার এই প্রথম। এমনকি স্বদেশেও জাম্বো জেটে কখনোই চড়ার সৌভাগ্য হয়নি তার এর আগে। এ কথাও উপক্রমণিকায় বলে রাখা ভাল যে, যাঁরা আকছার বিদেশ যান বা সেখানেই যাঁদের শ্বোরসীপাড়া এ লেখা তাঁদের জন্যে একেবারেই নয়। বরং যাঁরা কখনও যাননি এবং ভবিষ্যতেও যাঁদের

যাওয়ার আশা ক্ষীণ বা একটুও নেই—তাঁদের কথা মনে করেই এই পাতা ভরানো। যাঁরা বিদেশে যান নি এবং যাবেন না, তাঁরা যদি এ লেখা পড়েন তাহলেই নগণ্য লেখক বিশেষ পুরস্কৃত হবে। তালেবরদের জন্যে বা বিদেশ সম্বন্ধে পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতমন্য পাঠকদের জন্যে অনেক পণ্ডিত ও বিদগ্ধ লেখক আছেন। তাঁদের জন্যে এই মূর্খ লেখকের নামচা নয়।

প্রথমেই ফার্স্ট ক্লাসের ডেক। পিছনে ইকনমি ক্লাস। তাও পরপর তিনটি ভাগ আছে। যখন সিনেমা দেখানো হয় তখন একই সঙ্গে তিনটি জায়গায় দেখানো হয়। ষোলো মিলিমিটারের প্রজেকটর বোধহয় ঐ বিরাট প্লেনের পুরো দৈর্ঘ্য সামলাতে পারে না, তাই এই ব্যবস্থা। তাছাড়া, কোট ইত্যাদি রাখবার ওয়ার্ডরোব ত আছেই। তাদেরই গায়ে পর্দা টাঙিয়ে ছবি দেখানো হয়।

সব প্যাসেঞ্জারের সীট দেখে বসতে বসতে, কোট খুলে রাখতে, আরো সব বড় বড় ও টুকিটাকি প্রস্তুতিপর্ব সমাধা হতে হতে প্রায় পনের কুড়ি মিনিট লাগল। অত লোক এক প্লেনে গেলে ঐ সময় লাগাই স্বাভাবিক। সবাই চেপে-চুপে, টায়-টায় বসে পড়ার পর রৌদ্রালোকিত টারম্যাকে ট্যাকসিইং করে জটায়ুর মত প্লেনটা প্রধান রানওয়ের দিকে এগিয়ে চলল। প্রধান রানওয়েতে পড়ে, গতি বাড়িয়ে দেখতে দেখতে বোম্বের মাটি ছেড়ে একটা চক্কর মেরে আরব সাগরের নীল জলের উপরে উড়ে এল। তারপরই জেটপ্লেনসুলভ অবলীলায় সোজা মেঘ ফুঁড়ে নীচের পৃথিবীকে চোখ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টায় ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগল। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট উপরে উঠে সমান্তরাল রেখায় চলতে লাগল। কিন্তু সেদিন পেঁজা কাপাস তুলোর মতো কয়েকখণ্ড নরম হালকা মেঘ ছাড়া আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল। তাই কিছুক্ষণ পরই শুধু মাথার উপরের এবং পাশের চারদিকে মহাশূন্যতাজনিত নীল এবং আরব সাগরের গভীরতার জলজ-নীলে মিলে এক আদিগন্ত নীলিমা শুধু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমই নয়, ঈশান, নৈঋতও সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। তার মধ্যে একটি রূপোলি পাখির মত উড়ে চলতে লাগল ডি-সি—টেন প্লেনখানি।

এতক্ষণ পর ভিতরে চাইবার অবকাশ হল। ভেবে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে সত্যি সত্যি 'আম্মো' যাচ্ছি। কিন্তু চারপাশের সহযাত্রীদের দেখে ও দ্রুত সঞ্চারিণী নীলচক্ষু ব্লন্ড ও ব্রুনেট কেশশালিনী এয়ার হোস্টেসদের দেখে অবিশ্বাস করারও উপায় ছিল না।

আমার পাশেই এক অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক বসেছিলেন। সিডনী থেকে আসছেন। তাঁর সঙ্গে খুব আলাপ জমে গেল। ভদ্রলোক পিস্তল-শুটিং-এ অস্ট্রেলীয় চ্যাম্পিয়ান। নানাবিধ পিস্তল, ব্যালিস্টিকস্ এবং শুটিং কম্পিটিশান সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দিলেন তিনি।

ইতিমধ্যে খাওয়ানোর অত্যাচারও শুরু হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে এত এত খাবার দেওয়া হয় যে নেহাৎ হ্যাংলা বা রাক্ষস ছাড়া কারো পক্ষেই সে খাবারের যথার্থ সম্মান করা সম্ভব নয়। তবু, চোখ চেয়ে দেখলাম সবাই-ই খেয়ে চলেছেন। কিছুই করবার নেই, তাই-ই বোধহয় সকলেই খাওয়াতে মনোনিবেশ করেছেন।

ব্রেকফাস্টের সঙ্গে অস্ট্রেলীয়ান মাখন, ড্যানিশ চীজ, জার্মান সসেজ, গরম গরম এবং মাখনের চেয়েও নরম ব্রেকফাস্ট রোলস। গরম ডিম ভাজা, ফিঙ্গার চিপস, নানা রকম ফল এবং চা অথবা কফি।

ব্রেকফাস্টের পর কফির পেয়ালা শূন্য করে অত্যন্ত পুলকিত হওয়া গেল, এ কথা জেনে যে, এখানে পাইপ খাওয়া চলতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো উড়ানেই পাইপ খেতে দেওয়া হয় না। কেন দেওয়া হয় না জানি না। এখানে কেন দেওয়া হয় তাও জানি না। কিন্তু ভাগ্যিশ হয়।

এই পাইপ-খাওয়া ব্যাপারটা স্বদেশে এখনও চালিয়াতি ও দম্ভ ও উচ্চমন্যতার শরিক বলে গণ্য হয়। পাইপ এখনও সমাজতন্ত্রে সামিল হয়নি। কেন যে হয়নি একথা ভেবে অনেক বিনিদ্র রাত কাটিয়ে বার বার আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে, এ জন্যে বাংলা ছায়াছবি দায়ী মুখ্যত। দ্বিতীয়তঃ দায়ী, পাইপ খাওয়ার সর্বপ্রকার গুণাবলী সম্বন্ধে সাধারণের অপার অজ্ঞতা। ছায়াছবির কথা এই কারণে মনে পড়ে, কারণ সেই প্রমথেশ বড়ুয়ার আমল থেকে জমিদারের কুঁড়ে, দুশ্চরিত্র, বাপের পয়সার বসে বসে খাওয়া হাঁদা ছেলেরাই, যাদের একমাত্র কাজ ছিল বিলিয়ার্ড খেলা, হুইস্কি খাওয়া এবং স্নানরতা গ্রামের মেয়েদের শালীনতা নষ্ট করা, তারাই শুধু পাইপ খেয়ে এসেছে। এবং তাদের প্রত্যেককে পাইপ খেতে দেখে দেখে পাইপ-খেকোদের সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গবাসীদের মনে যে, তাদের মানুষ-খেকোদের চেয়েও বেশী ঘৃণা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে বলি যে, পাইপ খাওয়া ব্যাপারটা যে, যে-কোনো ব্রাণ্ডের সিগারেট খাওয়ার চেয়েও অনেক সস্তা ও স্বাস্থ্যকর একথা অনেকেই জানেন না। তাছাড়া যাঁরা বিবাহিত লোক, তাঁদের পক্ষে পাইপ শান্তিরক্ষার জন্যে প্রায় অপরিহার্য বলেই মনে হয়। স্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধটা দাঙ্গার পর্যায়ে যাতে না পৌঁছয় সে জন্যে মতবিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই পাইপখেকোরা পাইপ-খোঁচাখুঁচি ভরাভরি নিয়ে পড়তে পারেন। তাতে মানও বাঁচে, কুলও থাকে। পরিশেষে এও বলি যে, পাইপখেকোদের মস্ত সুবিধে যে পাইপ কাউকে অফার করতে হয় না, অতএব ট্যাঁকের পয়সা ও অন্যের স্বাস্থ্যরক্ষাও হয় তাতে, নিজের হিতের সঙ্গে সঙ্গে।

গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়ার পর জমিয়ে পাইপ ধরিয়ে বসেছি, এমন সময় ইয়ার-ফোন নিয়ে এল এয়ার হোস্টেসরা। ভাড়া দু ডলার। ইয়ারফোনে কান লাগিয়ে ফোর-চ্যানেলড্ মিউজিক শোনা যাবে এবং সিনেমা যখন দেখানো হবে, তখন ইংরিজী, ফরাসী, জার্মান ও স্প্যানীশ ভাষায় সিনেমার কথা অনূদিত হয়ে কানে আসবে।

কিন্তু দু ডলার ত অনেক টাকা। তাছাড়া পকেটে মাত্র আটটি ডলার আছে। ডলার কটি সেন্ট-মাখানো কাগজে মুড়িয়ে অতি সযত্নে পার্সের ভিতরের ঘরে রেখেছি। কোনো সুন্দরীর চিঠিকেও এর আগে এত যত্নে রাখিনি কখনো। কিন্তু নিরুপায়। এই দুর্মূল্য আট ডলারের একটি ডলারও খরচ করার সাহস এখন আমার নেই। এই যথাসর্বস্ব খরচ করে ফেললে যে মাসতুতো ভাই আমার লানডানে থাকে এবং যে আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্ছে, সে যদি দৈবাৎ হিথ্রো এয়ারপোর্টে না আসে তাহলে ট্যাকসি করে যে তার বাড়ি পৌঁছবো সে সংস্থানও রইবে না। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে, সে না এলে ঐ টাকায় তার বাড়ি থেকে মাইল দশেক আগে গিয়ে ফুটপাথে স্যুটকেস হাতে নেমে পড়তে হত। তারপর কি করতে হত এখনকার মত সে প্রসঙ্গের অবতারণা না করাই ভাল।

যাই-ই হোক, ঠিক করলাম, আপাততঃ চলচ্চিত্রের বোবা-যুগেই বাস করা যাক। বিনি-পয়সায় যতটুকু দেখা যায় তাই-ই দেখব; পয়সা ছাড়া শোনা যখন যাবেই না। অনেকে বিনি-পয়সায় পেলে দাদের মলমও খান—তাঁদের কথা স্মরণ করে বোবা-যুগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবো না বলেই মনস্থ করলাম।

ব্রেকফাস্টের পরই, ট্রলিতে করে চলমান ডিউটি-ফ্রি শপ নিয়ে এয়ার হোস্টেসরা পাশ দিয়ে ঘুরে গেল। পাইপের টোব্যাকো, সিগারেট, হুইস্কী, পারফ্যুম ইত্যাদি ইত্যাদি। চোখ খুলে একবার দেখে আবার চোখ ঘুরিয়ে নিলাম।

ব্রেকফাস্ট বন্ধ হওয়ার পরই আরম্ভ হল ছবি দেখানো। পশ্চিম জার্মানীর একটি ছবি। কিশোর প্রেমের। তবে আমরা কিশোর প্রেম বলতে যা বুঝি এ তেমন নয়। আমাদের কিশোর প্রেম মানে বাছুর-প্রেম। কিশোরীর ফ্রকের কোণা উড়ে গেল হাওয়ায়—এক ঝলক ফর্সা হাঁটু চোখে পড়ল—কিশোরের বুকের মধ্যে দিয়ে রাজধানী একসপ্রেস চলে গেল ধকধকিয়ে। বাড়ি গিয়ে ধপাস করে বালিশ আঁকড়ে শুয়ে পড়ল সে, নইলে নেহাৎ কবি প্রকৃতির ছেলে হলে, খাতা-কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসে গেল।

কিন্তু এ-ছবি সেরকম নয়।

একটি উর্দু শায়ের শুনেছিলাম, মাজিদ মিয়ার কাছে, কৈশোরের বর্ণনায়।

'আভি লড়কপন ভি হ্যায়,
শাবাব ভি হ্যায়,
হায়া কি পরদোমে ও সোঁখ্‌বে
নকাব ভি হ্যায়।'

অর্থাৎ, এখন মেয়েটির ছেলেমানুষী চপলতাও আছে, আবার যুবতীসুলভ লজ্জাও ছেয়ে এসেছে। শৈশব ও যৌবন যেন দুটি ঘর। দু' ঘরের মধ্যে একটি পর্দা টাঙানো। হাওয়া এসে পর্দায় দোল দিচ্ছে। একবার এ-ঘর, একবার ও-ঘর। তারই নাম কৈশোর।

কিন্তু জার্মান ছবির কিশোর নায়কের বয়স তেরো কি চোদ্দ এবং কিশোরীরও তাই-ই। নিভৃতে তারা দুজনে দুজনকে চোখের নিমেষে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলে তারপর বাৎস্যায়নের বইতে যা যা করণীয় বলে লেখা আছে, তার সবকিছুই এমন পটুতার সঙ্গে করে ফেলল যে, এ-ব্যাপারে এই বালখিল্যদের পাণ্ডিত্য রীতিমত অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। বোঝাই গেল যে, সিনেমার কিশোর নায়কের দু'-গুণ বয়স হওয়া সত্ত্বেও, এ-অধমের এ-বাবদে জ্ঞানগম্যি বড়ই কম। তড়িৎ-ঘড়িৎ পাইপ ভরলাম আবার। ছবি দেখে রীতিমত আপসেট।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই দাগ কাটল না এখানের অন্য কারো মনেই। প্লেনে কম করে পনের-কুড়িজন শিশু ছিল। শিশু বলতে যাদের বয়স দশ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। তারাও অম্লান বদনে কেউ মায়ের কোলে বসে আঙুল চুষতে চুষতে, কেউ লাল প্লাস্টিকের বল কোলে নিয়ে অত্যান্ত [illegible] হয়ে এ-ছবি দেখে গেল। কেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!

ছবি শেষ হতে না হতেই প্রি-লাঞ্চ ড্রিংকস সার্ভ করার আয়োজন শুরু হল। বিনি-পয়সায় নানারকম ফ্রুট-জুস, কোকা-কোলা, এ্যাপল-সাইডার ইত্যাদি পাওয়া যায়। পয়সা দিলে নানারকম কান্টিনেন্টাল রেড ও হোয়াইট ওয়াইন, নানারকম বীয়ার ও এল জার্মানীর লাগার বীয়ার—আরাম্বা-বরম। এবং অন্যান্য যে-কোনো পানীয়।

বিনি-পয়সায় বলেই হয়তো টোম্যাটো-জুস ভারী ভাল লাগল।

ইতিমধ্যে এয়ার হোস্টেসদের এবং আমাদের সেকশনে যে ফ্ল্যাইট-পার্সার ছেলেটি ছিল, তাদের কর্মক্ষমতা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছিলাম। কী তড়িৎ-গতিতে, হাসিমুখে ও কী সুষ্ঠুভাবে যে তারা তাদের কাজ করছিল, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রায় তিনশ'জন লোকের দেখাশোনা, মাত্র চারজন মেয়ে ও দু'জন ফ্ল্যাইট-পার্সার যে আন্তরিকতার সঙ্গে ও যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করছিল, তাতে পুরো জার্মান জাতটার উপরে শ্রদ্ধা না জন্মিয়ে উপায় ছিল না। তাদের পটভূমিতে আমাদের ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনসের (এয়ার-ইণ্ডিয়ার নয়), এয়ার-হোসটেসদের কথা মনে আসছিল। এ নয় যে, তাঁরা কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁরা যেন কলের পুতুল অথবা বহুদিন ধরে কোষ্ঠ-কাঠিন্যে ভোগা রোগিণী। তাঁরা হাসেন অতীব কষ্ট করে। ঘাড় বেঁকিয়ে অন্যদিকে ফিরে হাতজোড় করে যেমন করে তাঁরা 'নমস্তে' বলেন, তা দেখে, প্যাসেঞ্জারদেরই হাসি আসে। অথচ তাঁরা নিজেরা হাসতে জানেন না। এত টাকা মাইনে দিয়ে, এমন সুন্দর সাজ-পোশাক পরিয়ে এমন রামগড়ুরের ছানাদের কেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে রাখা হয় তা সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। হয়ত অসাধারণ বুদ্ধিরও বাইরে।

মনে হয়, এর একমাত্র প্রতিকার প্রতিযোগিতার। একচেটিয়া উদ্যোগের কুফল সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সরকার সচেতন হয়েছেন—এ আনন্দের কথা, কিন্তু মাঝে মাঝে সরকারের উচিত নিজের আঙিনায় চেয়ে দেখা। এখন যেমন দেখছেন। একচেটিয়া উদ্যোগের কুফলগুলি সরকারী উদ্যোগসমূহে প্রায়শঃই বড়ই নগ্ন ও প্রতিকারহীনভাবে প্রকট। যে-কেউই দেশকে ভালবাসে, তার চোখে এটা খারাপ ঠেকে।

কিছুক্ষণ পর মাইক্রোফোনে ক্যাপ্টেন বললেন যে, আমরা এখুনি ইরান ও টার্কি পেরিয়ে এলাম। ভাবতেই ভাল লাগছিল যে, সত্যি সত্যিই এ কম্পণীর একজনের মতো এলেছি! ক্যাপ্টেন আরও বললেন যে, কয়েকঘণ্টা পরে ইয়োরোপের ভূখণ্ড দেখা যাবে—আলপ্‌স্‌-এর বরফাবৃত চূড়োও দেখা যাবে।

এই আজ সকালেই বোম্বেতে ছিলাম! ব্রেকফাস্ট খেলাম, বোবা-ছবি দেখলাম, লাঞ্চ খেতে-না-খেতে কোথায় এসে পড়লাম! পৃথিবীটা সত্যিই বড় ছোট হয়ে [illegible] হাতের মুঠোয়। এই বিজ্ঞানের দিনে! [illegible] সুখী হওয়া উচিত কি দুঃখী হওয়া উচিত তা চট করে বলা মুশকিল।

লাঞ্চ খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই চা। তারপর আবার প্রি-ডিনার ড্রিংকস। বাইরে তখন খটখটে রোদ।

প্লেনে উঠেই ঠিক করেছিলাম যে, যতবারই খেতে দিক না কেন, আমার নিজের ঘড়ি দেখে সেই সময়মতই খাবো। আমার ঘড়িতে খাবার সময় না হলে খাবোই না। তাই ডিনার দিলেও, ডিনার এলেও খেলাম না।

(ক্রমশঃ)

এখন সবই স্মৃতি ॥

শুভ্রেন্দু সরকার

হয়তো যা চাওয়ার ছিল পাওয়া হয়নি
হয়তো যা পাওয়ার ছিল চাওয়া হয়নি
হয়তো ভাবনা ছিল
ইজেলটাকে ঘড়ির মত দাঁড়িয়ে রেখে ঠিক
কিন্তু রং-মিলান্তির মিল হবার আগেই
হাতের তাস ফুরিয়ে গেল

মেহেদি পাতার রং
মেয়েদের ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল
এই রোদ-জল-হাওয়া কোথায় ছিল
সত্যিই কি আকাশ এমন মুক্তো ঝরে প্রসব করল
সান্ত্বনা মনের জানালায় গেরস্থ পাখীর মত উঁকি মারে

এখন সবই স্মৃতি কিংবা ঢেউ
অগস্ত্য মুনির জল শুষে নেবার মত
স্মৃতির জলও শুষে নেয় সময়
পেন্ডুলামের মত বিবেকটাও হয়ত নড়ে
ঠিক না বেঠিক ঠিক না বেঠিক

যা যাবার তাকে যেতে দিতে হয়
নক্ষত্রই টুকে রাখবে সূর্য ঘড়ির সঠিক সময়।

মহড়া ॥

রজত মিশ্র

রাতের নাটক শেষে চুপিসাড়ে বাড়ি ফিরে আসা

বরফ কুচির মতো সাদা ভাত
নিঝুম ঘরে মুখোমুখি একা
কিছুক্ষণ টেবিলের এপারে ওপারে
লাস্যময়ী নায়িকার আদ্যন্ত জরিপ।

এসব কদাচ নয় চূড়ান্ত কল্পনা।

দক্ষ অভিনেতা তবু
সামান্য চালের ভুলে
ছিবড়ে চুল লোল জিহ্বা গলিত হৃদয়
প্রকটিত হয়ে গেলে নায়িকার চোখে
বিবর আশ্রয়ী আজ আমি
পরাজিত এবং ভিলেন।

বহু দীর্ঘ রজনীর পোড় খাওয়া দক্ষ নট
জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় আজও দেখাতে পারি নি
এমত বিশ্বাসে
একা ঘরে সারারাত বিচিত্র সংলাপ
নিশ্চিত নায়ক হবো জেনে
মাথায় পরচুল দেবো
গলিত হৃদয়ে দেবো রঙের পালক
কাল ভোরে প্রসাধন শেষে
দু' ঠোঁটে মাখাবো নন্দন হাসির কলপ।।

আমি সুন্দর হতে চাই ॥

বেলা সেন

জীবনে সুন্দরকে পেতে চেয়ে
নিজেই নির্বাসিত হয়ে আছি
জীবন থেকে।
ছিন্নমূল লতার মত, শূন্য থেকে
কত আর আহরণ করা চলে ক্লোরোফিল?
আমি সুন্দর হবো এইটুকু বাসনার সংগে
কত যে বিরোধ এই জটিল কুশ্রী সময়েরও,
বাগানের সব কয়টি ডালিমে
বিচ্ছিরি পোকার কামড়;
মাটিতে পিঁপড়ের চাঁই,
তবু রক্তে কেন অফুরন্ত কামনা
সুন্দরের দিকে।

প্যারিসের রাস্তায় সান-মিউঙ-মুনের দলের চেলারা গান গাইছে।

হিপি আন্দোলনে ভাটা

সব আন্দোলনেরই এক একটা হুজুগে যুগ আসে। সেই হিসেবে হিপি যুগ চলেছে এক যুগ ধরে। হিপি আন্দোলনে এখন ভাটা। হিপি আন্দোলনের জোয়ারে ইউরোপ-আমেরিকার লাখ-লাখ যুবক-যুবতী তাদের মন-প্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছিল। এখন ভাটার টানে তারা অন্যদিকে মন দিচ্ছে। তাই বলে হিপি আন্দোলন একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে এটা ভাবা ঠিক হবে না।

দশ বছর আগে বার্লিনে, রোমে, লন্ডনে, প্যারিসে হিপি রাজ দেখে কত লেখাই না লিখেছিলাম। ইউরোপ-আমেরিকার প্রাচুর্যের দেশে যুব সমস্যা এক ধরণের আর আমাদের দেশে যেখানে দারিদ্র্য চরমে সেখানে যুব সমস্যা আরেক ধরনের। পশ্চিমের প্রাচুর্যে বিপথগামী হিপি দলের জোয়ারে গা ভাসিয়েছিল লাখ-লাখ যুবক-যুবতী। তাদের মন ফেরাতে একদল গড়ল হরে-কৃষ্ণ আন্দোলন। আমেরিকায় যাদের বলা হয় কৃষ্ণ-চৈতন্য সংস্কৃতি। হিপিদের একটি দল ওই দলে ভেড়ে। তাদের অনেকে গাঁজা-ভাঙ নেশা ছেড়ে হরে-কৃষ্ণ নামে মেতে ওঠে। তবে অনেকে আবার নেশা-ভাঙয়ের লোভে হরে-কৃষ্ণ দলে ঢুকে সুবিধে করতে পারে নি।

আমেরিকার কথাই স্বতন্ত্র। সেখানে ব্যবসা ছাড়া কথা নেই। হরে-কৃষ্ণ আন্দোলনে কয়েক ব্যক্তি নামাবলি, গঙ্গার জল, ধূপ কাঠির ব্যবসায়ে মোটা টাকা কামায়। তাই নিয়ে মার্কিন পত্রিকায় বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা ভাবলাম, হরিনামে বুঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্লাবিত হয়ে গেছে। আসলে কি তাই? কিছু কিছু যুবক-যুবতী মনে প্রাণে হরিনাম সংকীর্তন করেছে বটে কিন্তু অধিকাংশই এক নতুন হিপি আন্দোলনে মেতে ওঠে। বৈষ্ণবদের মুক্ত জীবনকে তারা নারী মুক্তি আন্দোলনের এক অধ্যায়রূপে ব্যাখ্যা করে যৌন জীবনের প্রচার কার্য চালিয়েছে। তারই আকর্ষণে বহু মার্কিন ও ইউরোপীয় যুবক-যুবতী হরেকৃষ্ণ সংস্কৃতির দিকে ঝোঁকে।

কিছুদিন আগে নিউজ উইক ও টাইম পত্রিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি হরেকৃষ্ণ দলকে অভিযুক্ত করেছে যে, তারা হরেকৃষ্ণ সংস্কৃতির নামে মোটা রকমের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু হিপিদেরও আড্ডা জমছে সেখানে। এক কথায় গাঁজা-ভাঙের চোরাই চালানের ডিপোতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু লোক ধরা পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম গুরুও নাকি এদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের নিয়ে অনুসন্ধান চালায় আমাদের সি. বি. আই। সি. বি. আই ধরেছে কয়েকজনকে। বাল যোগীশ্বর তাদের মধ্যে একজন।

হিপিদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, প্রাচুর্যময় জীবনে ভোগেরও একটা সীমা আছে। অধিক ভোগের পর হল ছাড়া বাউণ্ডুলে জীবন যাত্রার দিকে ঝোঁকে এক দল। তারাই পরে চিহ্নিত হল হিপি বলে। হিপিদের বাউণ্ডুলে জীবনের সঙ্গে বৈরাগ্যের কিছু সাদৃশ্য আছে। ভোগের পর ত্যাগ। এটাই বোধহয় নিয়ম। তাই বলে হিপিরা সর্ব ত্যাগী নয়। অনেকে ঐশ্বর্যের বদলে গাঁজা-আফিমে ডুবে থাকতে চেয়েছিল। তার জন্যে অনেক ধনীর দুলাল হিপি মুঠো-মুঠো টাকা উড়িয়েছে।

সব দেশের তরুণ ও যুবক দল প্রথম দিকে থাকে রোমান্টিক। অনেকের আবার *এ্যাডভেঞ্চারের। তারই প্রেরণায় কেউ* সেজেছিল হিপি কেউ বা ঢুকেছিল হরে-কৃষ্ণ দলে। এদের অগ্রদূত ছিল বিটলস্ গাইয়ে জর্জ হ্যারিসন। জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে মহেশ যোগীর নাম উচ্চারিত হয়েছিল বেশ কিছুকাল। সে আন্দোলনে এখন ভাটা। বিটলস্ দল বৈরাগ্য ছেড়ে আবার গানের আসরে নেমেছে। শোনা যায় ওদের জমান টাকার পরিমাণ এখন নিচের দিকে। টাকার সন্ধানে ওরা আবার গানের বাজার জাঁকিয়ে তুলেছে।

হিপি আন্দোলন রোধ করতে ইউরোপ-আমেরিকায় বহু ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয় একই সময়ে। ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্ট কেউ তখন পিছিয়ে ছিল না। কয়েকদিন আগে কলকাতায় রাস্তায় আলাপ হল কয়েকজন বিদেশী তরুণ-তরুণীর সঙ্গে। এরা পোশাকে-আসাকে হিপি নয়। চাল-চলনে হিপি। কিন্তু নেশা-ভাঙ করে না। বাউণ্ডুলে ভাবটা আছে। এরা নিজেদের পরিচয় দেয় 'চিলড্রেন অব গড' বলে। খ্রিশ্চিয়ান ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন। হিপিদের বিপথ থেকে ফেরান এদের কাজ। তাছাড়া ওদের মতে এ-দেশের তরুণ সমাজের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করা। গঠনমূলক কাজ করা এদের প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানা গেল। এরা সমাজ সেবা করতে চায় কলকাতায়। এরাই বলছিল, হিপি আন্দোলন পশ্চিমের যুবক-যুবতীদের বিপথে নিয়ে গেছে। কত শক্তির কত অমূল্য জীবনেরই না অপচয় হয়েছে।

আমি অন্ততঃ একটি ঘটনা জানি, ফরাসী দেশের এক সেনাপতির মেয়ে হিপি হয়ে নেপালে গিয়েছিল। সেখানে সে যথেচ্ছাচারভাবে জীবন যাপন করে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এক চায়ের দোকানে আশ্রয় নেয়। সেনাপতির মেয়ে একবেলা অন্নের জন্যে দেহ বিক্রি করে দিন কাটাচ্ছিল। পরে সে খবর দেশে পৌঁছতে ওদের দেশে তাই নিয়ে সংবাদ-পত্রে তোলপাড়। পরে তাকে দেশে ফেরত পাঠান হয়। এমনি কত ঘটনা ঘটেছে।

পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন আরেক যুব আন্দোলন দানা বাঁধছে। কয়েক মাস আগে লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, আমস্টারডামে দেখা দিয়েছে সুন মিউঙ মুন-এর 'নিউ হোপ' আন্দোলন। এটিও এশিয়া থেকে রপ্তানী করা হয়েছে ইউরোপ আমেরিকায়। দক্ষিণ কোরিয়ার মিঃ সুন-মিউঙ-মুন এই নব আন্দোলনের প্রবর্তক। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে মনে করেন। তাঁর দুনিয়ায় [illegible]

[illegible] ব্যর্থ হয়েছেন। কম্যুনিজমকে ধ্বংস করতেই হবে। এবং সেটা পারবে তাঁর আন্দোলন। ইতিমধ্যে মিঃ মুন বিশ লাখ ডলার জোগাড় করেছেন। তিনি নাকি উত্তর কোরিয়ার কিম ইল সুঙকে গদি থেকে হটাবেন। কোরিয়ায় কম্যুনিজম রোধ তিনিই করবেন। এখন তিনি নিউইয়র্কে একটি বিরাট বাড়ীতে আছেন রাজার হালে। ধর্মপ্রচারক কেন রাজার হালে থাকে এই প্রশ্নের জবাবে মিঃ মুন বলেছেন আমেরিকার মত বড় দেশের লোক এখানে নতুন কিছু প্রচার করতে হলে বড়লোকি ভাব দেখাতে হয়। নইলে কেউ কথা শোনে না।

যাই হোক মিঃ মুন তাঁর দলের ছেলে-দের বিয়ে দেন পাত্র-পাত্রীর ছবি দেখে। তিনি যোটক বিচার করে বিয়ে দিয়ে থাকেন। তার ওপরে কেউ কথা বলে না।

সন-মিউঙ-মুন আন্দোলনের কার্য-ক্রমের মধ্যে গান গাওয়া, নাচা ও অপেরা করা একটি প্রধান কাজ। এদের রচিত গান-[illegible] মহড়া দিয়ে আজকাল [illegible] সংগীত [illegible] সামনে। [illegible] এই আন্দোলন নানা বাধাতেই বহু সমাজ সেবক এর প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ফরাসী পুলিশ তাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে। এশিয়ায় সন-মিউঙ-মুন আন্দোলন স্থান পেয়েছে মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, নেপাল ও কোরিয়ায়।
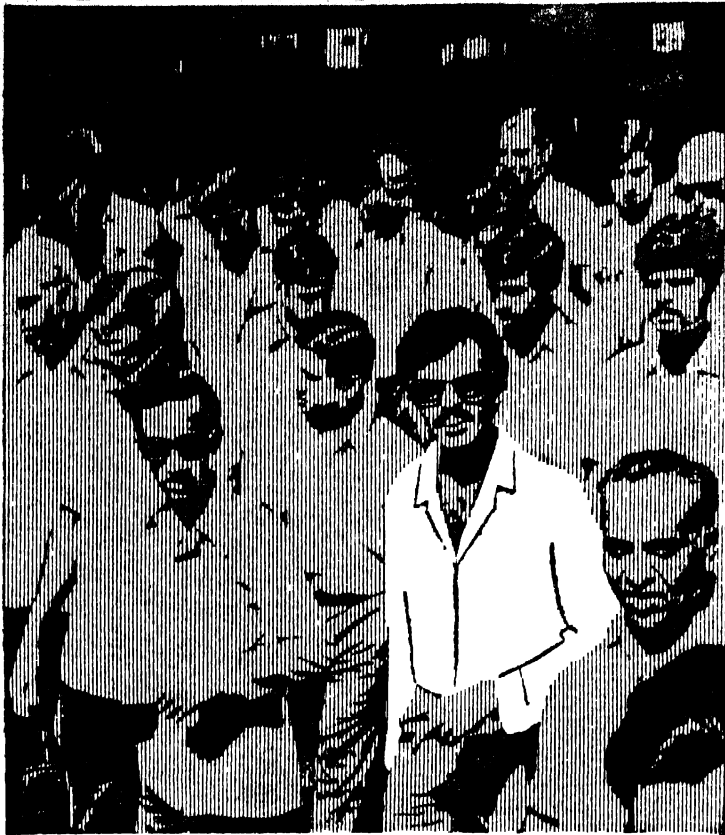
দিলীপ মালাকার

জলপ্রপাত, একতারা ও ওয়াইল্ডার

আমেরিকার জনপ্রিয় নাট্যকার থর্নটন ওয়াইল্ডার ৭৮ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন, কিন্তু এখনো নতুনতর সৃষ্টির ধ্যানে বিভোর। সম্প্রতি তাঁর জন্মতিথি উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'আপনি লেখা বন্ধ করবেন কবে? ওয়াইল্ডার উত্তরে বললেন : যখন বুড়ো হবো। —বুড়ো হবেন কবে?— যখন বন্ধু-বান্ধবেরা বলবে। —বুড়ো হলে লেখা বন্ধ করে কি করে সময় কাটাবেন? —যেভাবেই হক একটা জলপ্রপাতের কাছাকাছি গিয়ে বাড়ী করবো, আর তারপর একটা একতারা নিয়ে বসে পড়বো।' ওয়াইল্ডার রচিত নাটকের সংখ্যা অনেক। তবে তার মধ্যে দু'খানা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে : আওয়ার টাউন (১৯৩৮) এবং দি স্কীন অব আওয়ার টীথ (১৯৪২)। ওয়াইল্ডারের প্রথম নাটক দি ট্রামপেট শ্যাল সাউন্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। তিনি তিনবার পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন এবং জাতীয়-গ্রন্থ-পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৮ সালে তাঁর 'দি এইটথ ডে' নাটকের জন্য। 'আওয়ার টাউন' একখানা পারিবারিক নাটক। 'দি স্কীন অব আওয়ার টীথ'-এ ওয়াইল্ডার নানা বিচিত্র আইডিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কয়েকটি দৃশ্যের মাধ্যমে একেবারে তুষার যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা বিবাদ ও সমস্যা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা আলোচিত হয়েছে। নাট্যকার বলতে চান যে, মানুষের জীবনে এমন বহুবারই হয়েছে যখন দেখা গেছে আর কোন আশাই নেই, মানবসমাজের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু ঠিক সেই রকম মুহূর্তে, কি এক আশ্চর্য শক্তির প্রভাবে মানুষ নিজেকে বাঁচাবার উপায় উদ্ভাবন করে ফেলেছে।

বিশ্বে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্থান

ইউনেস্কোর একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে, পৃথিবীতে সংখ্যার দিক থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্থান চতুর্থ। প্রথম স্থান অধিকার করেছে চীন ১৯০৮ খানা সংবাদপত্র নিয়ে। দ্বিতীয় স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, সে দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৭৬১ খানা। পশ্চিম জার্মানী ১০৯৩ খানা সংবাদপত্র প্রকাশ করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ বিষয়ে ভারতের স্থান চতুর্থ। ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৮২১ খানা।

কৃতী গবেষকদের জন্য পুরস্কার

ভারতের জাতীয় উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভিন্ন বিষয়ে মৌল আবিষ্কারের জন্য ১৪টি পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া সাতটি আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হয়েছে মর্যাদার সার্টিফিকেট।

'লোটাস' সাহিত্য পুরস্কার

আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতির আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার 'লোটাস' ১৯৭৫-এর জন্য নিম্নলিখিত কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দকে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে : কবি ফৈয়জ আহ্‌মেদ ফৈয়জ (পাকিস্তান); কবি মহম্মদ আল জওহারিরি (ইরাক) এবং সাহিত্যিক চিনওয়া আচেবে (নাইজিরিয়া)। একটি বিশেষ পুরস্কারের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার কবি কিম চিজি হা-র নামও ঘোষিত হয়েছে।

মহাকাশ-গবেষণা স্মারক গ্রন্থ

সয়ুজ-অ্যাপোলো যুক্ত মহাকাশ অভিযানের কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ সোভিয়েত-মার্কিন যুক্ত মহাকাশ-গবেষণা গ্রন্থ 'বুনিয়াদি মহাকাশ জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা।' গত ১৫ বছরে মহাকাশ অভিযান ও গবেষণার ক্ষেত্রে দুই দেশের বিজ্ঞানীদের যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, এই গ্রন্থে তার বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে।

৪০টি ভাষায় প্রগতি প্রকাশনীর বই

মস্কোর জনপ্রিয় সাহিত্য প্রকাশ সংস্থা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ৪০টি ভাষায় বিভিন্ন বই প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন ও চিরায়ত রুশ সাহিত্য থেকে গাগারিনের ভূ-প্রদক্ষিণের অভিজ্ঞতা—আমি পৃথিবীকে দেখেছি' পর্যন্ত—সমস্ত ধরনের বই-ই তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। পৃথিবীর ১০০টি দেশে তাঁদের প্রকাশিত বইগুলি জনগণ নিজেদের ভাষায় পড়তে পারেন।

পুরুলিয়ায় শিশু সাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ শাখার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে গত ১৫ই ১৬ই ও ১৭ই আগস্ট পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হল। কবিতা পাঠ, বক্তৃতা ও সেমিনারে ডি পি পট্টনায়েক, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য সুধীর বেরা, উৎপল হোমরায় শান্তি সিংহ কুশল হোমরায় প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন। মহীশূর সেন্ট্রাল ইনস্টিট্যুট অব ইণ্ডিয়ান ল্যাংগোয়েজের খ্যাতনামা অধ্যাপক মণিরুজ্জামান 'শিশুর ভাষা এবং শিশুগঠনে শিশু-সাহিত্যের ভূমিকা' বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। **জলংকার**
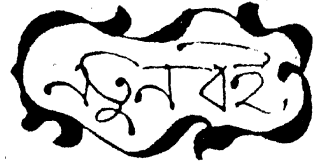
নাট্যকার : (উপন্যাস) সতীকান্ত গুহ : বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা—৯। দাম আট টাকা।

'নাট্যকার' একালের সামাজিক অবক্ষয়ের ও সম্ভাব্য জাগরণের রূপকোপন্যাস। হয়তো একালের নয়, চিরকালেরই। কেননা, মহৎ ঔপন্যাসিকদের রচনায় এই যন্ত্রণা ও আলোড়নের ছবি ও তার থেকে নতুন পৃথিবী গঠনের আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির প্রকাশ আমরা বার বারই দেখেছি। মহৎ ঔপন্যাসিকের হাতে ব্যক্তি বড় সামাজিক পটভূমিকায় দুঃখ-যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে। ব্যক্তির মাত্রাও সেখানে অনেক বড়। নিঃসঙ্গ হয়ে জীবনের নাটকে কেউ খেলতে নামে। খেলতে চাইলেও পারে না। উপন্যাসের প্রথমেই দেবপ্রিয়-র পূর্ব-জীবনের বিন্যাসে এই কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যারিষ্টার ঋষি মৌলিকের মুখে।

তারপর নাটক শুরু হয়েছে। একটি হোটেল সেই নাটকের রঙ্গভূমি। জীবনেরই রূপক। জীবনে দু দণ্ডের শান্তি-সুখভোগ করতে সবাই আসে, সবাই এসেছেও তাই এই হোটেলে। ঔপন্যাসিক ইঙ্গিতও করেছেন এই হোটেল অসম্ভব কল্পনায় পড়ে মায়াবী রাতের সঙ্গে এক হয়ে গেছে

জীবন প্রতি মুহূর্তে অতীত হয়ে প্রতি মুহূর্তে বর্তমান। যারা জীবনের প্রতি-মুহূর্তের এই সন্ধিলগ্নকে মেনে নিয়েছে তারা রসময় বস্তু নয়। কিন্তু যাদের রক্তে অবুঝ জীবন দোলা লাগিয়েছে তারা ব্যাধিত। ক্ষয়ের গন্ধেই তাদের আত্মচেতনা জাগে। তাদের নিয়েই এই নাটক। শুধু এই নাটকের যিনি নেপথ্য পরিচালক ও নাট্যকার (তিনি অবশ্য আরও বড় নীতি-নিয়মের পরিচালকের অধীন — অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন) তিনি এই ক্ষয়ের নাটকের সবটা না হলেও অনেকটাই ঊর্ধে। আর নায়ক দেবপ্রিয় এই নাটকের জালে জড়িত হয়ে পড়লেও নিরাসক্তির দীক্ষা নিয়েছেন পরিচালকের কাছে। কাজেই ভয়ঙ্কর নিয়তির টানে তিনি জড়িয়ে পড়লেও আত্মসচেতনতার ও নিরাসক্তির দীক্ষায় তিনি নাট্যকারের প্রতিবেশী—ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'সহ-নাট্যকার।'

আর তাতে সকলেই এই নিরাসক্তি ও দূরদৃষ্টির অভাবে জীবনের ভয়ংকর খেলায় জড়িয়ে পড়েছে। সেই জড়িয়ে পড়ার মূলে একদিকে পুরুষের চিরকালীন দুর্বলতা, অন্যদিকে নারীর দুর্জয় সম্মোহন। মিসেস চ্যাটার্জি, স্টুয়ার্ড, মিসেস রস ও মিস্টার রস, মিসেস চ্যাটার্জির ছেলে গৌতম এই নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্র। মিসেস চ্যাটার্জির সম্মোহন, স্টুয়ার্ডের অপ্রতিরোধ্য দুর্নিবার আকর্ষণ, মিসেস রসের নিরুপায় আত্মসমর্পণ, মিস্টার রসের বুদ্ধি-বিবেচনার অপমৃত্যু ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, মিসেস চ্যাটার্জির ছেলে গৌতমের মাতৃদ্বেষ ও বুদ্ধি-বিবেচনাহীন জিঘাংসা-বৃত্তি (আজকের সামাজিক পটে যে বৃত্তির নগ্ন প্রকাশ সহজেই বোধগম্য) সমস্ত কিছু মিলে এই হোটেল নামক জীবনে সম্মোহন, আত্মসমর্পণ, সম্ভোগ-বিকার, একাধিক আত্মহত্যা ও একটি শোচনীয় মাতৃহত্যায় যথেষ্ট বিস্ফোরকের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

কারণ জীবনের এই রূপ (হোটেল) হলো আবরণ। আবরণ জীর্ণ হয়, খসে পড়ে। আবার নতুন রূপান্তর, নতুন আবরণ। যারা এই রূপান্তর মানে না তারা গৌতমের মতোই স্রষ্টা আগরওয়ালের সামনে বলে : 'বুঝি না। মানি না। তোমার রহস্য নিয়ে তুমি থাকো। আমার পথে আমি যাই।' এদিকে আসন্ন ধ্বংসের মুখে সৃষ্টির পদ-ক্ষেপ শোনা যায়। মিসেস রসের স্বপ্নে ও উপলব্ধিতে, আগরওয়ালের ধ্যানস্থ উচ্চারণে, দেবপ্রিয়র মনে রূপান্তরের সূক্ষ্মবোধে তার প্রকাশ।

তাই হোটেলের ধ্বংসস্তূপের ওপরে নতুন সৃষ্টির সূর্য ওঠে। সৃষ্টির সাধনায় এগিয়ে যায় চারটি মানুষ। দুঃখের আগুনে যারা দগ্ধ হয় নি, দীপ্ত হয়েছে। সৃষ্টির রহস্যবোধে যারা নিরাসক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। যাদের তপোভঙ্গ হয়েছে নতুন তপস্যার জন্যে,

একালে আত্মকেন্দ্রিক বিষণ্ণ স্বগতোক্তির প্রচলিত ঔপন্যাসিক রীতির মধ্যে সমাজের ভাঙা-গড়ার সমস্যায় ব্যক্তির কঠিন পরীক্ষাকে রূপকের আবরণে প্রকাশ করে ঔপন্যাসিক মানুষের রুগ্ন আত্মকেন্দ্রিকতাকে সরিয়ে দিয়ে মহৎ বিশ্বাসের ছবি নিয়ে এলেন।—যুগসংকটে মহৎ কবি-শিল্পীর দায়িত্বই তিনি পালন করলেন। বইটি শেষ করে উদ্বোধিত পাঠকের কানে মিসেস রসের সেই অ্যাপোক্যালিপটিক্যাল উচ্চারণ সৃষ্টির প্রথম ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে ওঠে : 'চোখ মেলে চাও। দ্যাখো, তোমরা আর নেই। তোমরা মুক্ত। আকাশে যেমন নতুন তারা ওঠে, তোমরা তেমনি এক এক করে জীবনের নতুন আকাশে উঠবে। মানুষের ঘরে জন্ম নেবে। এখন থেকে তোমরা ঈশ্বরের মানুষ। তিনি তোমাদের সব।'

ঈশ্বরিত মানুষের এই রূপকারকে ধন্যবাদ জানাই।

উজ্জ্বল মজুমদার

জীবনের কলরব। শক্তিপদ রাজগুরু। পূর্বাচল কলকাতা-৯। দাম আট টাকা।

শক্তিপদ রাজগুরুর সাম্প্রতিক উপন্যাস জীবনের কলরব-এ সুস্থির অনুভবের চিহ্ন পাওয়া গেল।

অ্যাডভোকেট দর্পনারায়ণ দত্ত মারা যাবার পর বাড়ির পুরনো ভৃত্য নটবর তার নিজের গ্রামে চাষবাস দেখা সত্ত্বেও কি মায়ায় যেন আটকে গেছে দয়াময়ীর সংসারে। বড় ছেলে শরতের কন্ট্রাকটারির ব্যবসা। মেজ ছেলে বসন্ত মস্ত চাকরী করে আর গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করে। বড় মেজর বিয়ে দিয়ে গিয়েছেন দর্পনারায়ণ বাবু। বড় বৌ নিভার মতে এ বাড়িটা গোয়াল ছাড়া অন্য কিছু নয়। উনি নিজের ব্যাপারটাই ষোলআনা ভাল জানেন। মেজ গিন্নী রেবা সব সময় চড়া গলায় মন্তব্য করতে অভ্যস্ত। সেজ ছেলে হেমন্ত কেমন গোত্রছাড়া। টেনেটুনে পরীক্ষায় পাশ করত। ওস্তাদী গান শুনে শুনে একদিন গানের জগতেই নিজেকে ডুবিয়ে দেয় সে। ছোট ছেলে প্রদীপ অবশ্য পড়াশুনায় খুবই ধারালো। ছোট মেয়ে মিলি, মুকের স্বপ্ন দেখে সে—সুবিনয়কে পাবে বলে। এদের নিয়েই দয়াময়ীর সংসার।

আপনভোলা অসহায় শিল্পী হেমন্তকে মিতা ভালবেসে ফেলে। এই বড় বাড়ির অন্তরের নীরব দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকার দেখা সত্ত্বেও সব দুঃখ কষ্টকে সহ্য করার ব্রত নিয়ে মিতা একদিন হেমন্তের জীবনে যুক্ত হয়ে যায়। মিলি, প্রদীপ দয়াময়ীর মন জয় করে ফেলতে মিতার বেশি সময় লাগে না। বড় মেজ আর ওদের বউদের স্বভাব আর অন্তরের বিকৃতিটা ধরে ফেলতে প্রদীপেরও দেরী হয় না।

এই মিতা অবশ্য ক্ষুণ্ণ হয় যখন সে হেমন্তকে অর্থের জন্যে বোম্বাই গিয়ে হিন্দী ছবিতে গান গাইতে হবে শোনে। তবু ছোট ভাই ছোট বোনের হাসি মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতে ওর সুর প্রতিবাদ-ই থেমে যায়।

কাহিনীর শেষ এখানেই নয়, বড় ছেলে শরৎ দয়াময়ীকে দিয়ে কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে গোপনে বাড়ি বিক্রীর মতলব আঁটতে থাকে। সে-কথা দোকানদারের মুখ থেকে শুনে চমকে ওঠে প্রদীপ।

শরৎ-বসন্ত—এ মানুষ দুটোর মর্যাদা আর মনুষ্যত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায় যখন মেজ বৌকে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা যাবার কথা শরৎ শোনে। এর প্রতিবাদ অবশ্য প্রদীপ করছে রূঢ় ভাষায়। তাই অভাবের ভেতর দিন কাটালেও সে পাঁচ হাজার টাকা হাতের মুঠোয় পেয়েও টাকার জন্যে বিবেককে বেচতে পারল না বড়দার কাছে।

লেখক শক্তিপদ রাজগুরু সহজ ভাষায় গল্পের গতি যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি। (রবীন্দ্র সংখ্যা)। সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু। ১০ কিরণ-শংকর রায় রোড। কলকাতা-১। দাম দু' টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকার একাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্র সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গঠনমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধ পত্রিকাটির নতুন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। চলতি সংখ্যায় অধ্যাপক অরুণ বসুর লেখা 'রবীন্দ্র সমালোচনার নতুন অধ্যায়' এবং অধ্যাপক উজ্জ্বল মজুমদারের লেখা 'বিদেশে রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়' প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন সনাতন গোস্বামী অমিয়কুমার মজুমদার জীবনমুখোপাধ্যায় শেঠ সান্ত্বনা মজুমদার এবং রামবল্লভ তেওয়ারী। প্রচ্ছদ এবং ছাপা উন্নতমানের।

অনুভব। জয়ন্ত কুমার সম্পাদিত। উলথা প্রকাশন। ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ। আন্ডার গ্রাউন্ড-২। কলকাতা-১২। দাম ৬০ পয়সা।

গৌতম ভট্টাচার্য 'সৃষ্টির থেকে স্রষ্টাদের নিয়ে লেখাটাই আকর্ষণীয়' বলে মনে করেন। তাই এই সংখ্যায় সামগ্রিকভাবে অনেক কবি এবং চিহ্নিত অর্থে বিশেষ কয়েকজন পরিচিত কবির সম্পর্কে কিছু ঘনিষ্ঠ উচ্চারণ রেখেছেন। খুব একটা আক্রমণাত্মক না হলেও লাইনগুলো কেমন যেন স্যাটায়ারিক্যাল। এই সংখ্যায় গৌতমবাবু মণীন্দ্র রায় কৃষ্ণ ধর গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং প্রশান্ত দাস সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন। অনুভবের এই সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত শিবশম্ভু পাল এবং আরও অনেকে। 'একটি নিছক গদ্য কবিতা' লিখেছেন তপনকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়। ছাপা প্রচ্ছদ খুবই ভালো।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হয়তো আমার কথাগুলো পুলি বিশ্বাস করতে পারলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: অসম্ভব। আমি জানি একস ও সালা সালেম এই দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াতে চান। আমি খবর পেয়েছি যে ও'রা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তাই মিছিল বের করেছেন।

আমি হেসে বললুম : পুলি, তুমি এখনও শহরের অনেক খবর রাখো না। এই শহরে কি ঘটছে না ঘটছে সেই খবর সংগ্রহ করবার জন্যে আমি ইনফরমার রেখেছি আলী মহম্মদ আমার বিশ্বস্ত লোক মুসলিম ব্রাদারহুডের বড় বড় কর্তাদে সংগে এর খুব ঘনিষ্ঠ ভাব আছে। আল মহম্মদ আমাকে বলেছে যে, আর একটু বাদে একস তাঁর দলবল নিয়ে আবেদী প্যালেসের কাছে আসবেন।

: কিন্তু ফারুক তো এখানে নেই।

: তিনি কোথায়?

: কুব্বা প্যালেসে গিয়েছেন।

: কেন?

আমার কথা শুনে আনতানিও প
হাসলেন। বললেন : কারণ আর কিছু
ফারুকের একজন নতুন বান্ধবী জুটেছে
: নতুন বান্ধবী? আমি আনতা
পুলির কথা শুনে বিস্মিত হলুম। বু
পারলুম যে, ফারুকের ব্যক্তিগত প্রে
জীবনের খবরাখবর আনতানিও প
আমার কাছে গোপন রাখতে চায়। আ
সম্প্রতি আমি বেশ একটু রাজনীতি ক
শুরু করেছিলুম। এবং কেন রাজনী
করছিলুম তার কারণ হয়তো ব্যাখ্যা ক
বলতে হবে না। আমি ফারুকের ব

পড়ে সবাই আসল আরব ইস্রাইলী যুদ্ধের কথা ভুলে গেল।

আবার আমি জেরুজালেম থেকে ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্সের বড়কর্তা ইসর হেরেলের তার পেলুম : পাশা, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইজিপ্টের আর্মি হাসিসের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে! এরা কখনই যুদ্ধ করতে পারবে না।

লড়াই শুরু হবার আগে আমাকে আর একটা নোংরা কাজ করতে হোল।

ফারুক একদিন আমাকে ডেকে বললেন, পাশা, ফ্রন্ট লাইন আর্মির জন্যে আমাদের ষাট হাজার ওভারকোট দরকার।

: আপনি কোন চিন্তা করবেন না মালেক। আমি ঠিক সময়ে মাল সাপ্লাই করবো। আমাদের বলা হোল প্রতিটি শীতের কোটের জন্যে ছয় ডলার করে দেয়া হবে। এই টাকা থেকে সম্রাট দুই ডলার পাবেন। আমার প্রাপ্য এক ডলার। এর থেকে কিছু অংশ জেনারেল মুহম্মদ হুসেনকে দিতে হবে। বাকি তিন ডলার দিয়ে জিনিস কিনতে হবে।

এই কাজটি খুব সহজ ছিল না। কারণ এই তিন ডলারের মধ্যে শুধু জিনিস কেনা নয়, এই জিনিস কেনার দরুণ যে খরচ হবে সেই টাকাও ব্যয় করতে হবে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলুম যে দুই ডলারের মধ্যে আমাকে এই কোট কিনতে হবে।

এবার ভাবতে লাগলুম মাত্র দুই ডলারের মধ্যে কি ধরনের কোট কেনা যায়? জেনারেল মুহম্মদ হুসেন তার মনের আশংকা প্রকাশ করলেন। পাশা, ইম্পসিবল, ... যে পুকুর চুরি। তুমি কি কোট সাপ্লাই করবে, না বস্তা সাপ্লাই করবে।

আমি মৃদু হেসে জবাব দিলুম : দুইই করব। আপনি শুধু আমার মালগুলোকে সার্টিফিকেট দিন।

: নিশ্চয় নিশ্চয়, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছো কেন?

আমি জানতুম যে ফারুকের ভূতপূর্ব ... আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না। আর আমি হাসিস সাপ্লাই ... মুহম্মদ হুসেনকে বেশ বশ করে রেখেছিলুম। কাজেই আমি জানতুম যে ... মাল সাপ্লাই করতে আমার কোন বেগ পেতে হবে না।

অবশ্য এই ওভারকোট সাপ্লাই করতে ... বিশেষ বেগ পেতে হোল না।

আমি বেরুটে আমার এক পরিচিত ... সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম।

বিচিত্র শহর বেরুট। এ শহরে সব ... পাওয়া যায়। আর এই শহরের দোকানীদের ... নাই বা বললুম। যদি কখনও ওদের ... হ্যান্ডশেক করেন তাহলে পরে হাতের ... আঙুল গুণে দেখবেন। হয়তো ... পাবেন একটি আঙুল চুরি হয়ে ...। কিন্তু আমি ছিলুম ওদের চাইতে ... না ধুরন্ধর। কি করে জেরুজালেমের দোকানীকে বশ করতে হয় আমার ভালই জানা ছিল।

দর্জীর নাম জন কারামে।

আমি জন কারামেকে গিয়ে বললুম, আমার ষাট হাজার শীতের ওভারকোট চাই। আমার কথা শুনে কারামে আনন্দে উৎসাহে নাচতে শুরু করলো। বাপস, ষাট হাজার ওভারকোট সাপ্লাই করা কি চাট্টিখানি কথা? অনেক টাকা মুনাফা থাকবে যে!

কারামে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, হাবিবী, তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো বলতে পারছিনে। ধন্যবাদ, থ্যাংকস মেরসি, শুক্রন। না পাশা, এই ওভারকোট বিক্রি করে আমি যে মুনাফা করব সেই টাকা থেকে আমি তোমাকে দশ হাজার ডলার দেবো।

আমি আর একবার মনে মনে হিসেব করলুম, ষাট হাজার ওভারকোট থেকে আমি এক ডলার করে পাবো। অর্থাৎ আমার রোজগার হোল ষাট হাজার ডলার আর জন কারামে আমাকে দেবে দশ হাজার ডলার। মোট একুনে সত্তর হাজার ডলার। একেই বলে কিসমৎ।

আমি কারামের দিকে আমার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম : সত্যি কথা বলছো? কিলমি...এল...সরফ...এক জবান।

: কিলমি এল সরফ, এক জবান। জন কারামে বেশ হেসে জবাব দিল। কিন্তু জন কারামে কি জানতো যে আমি তাকে কত দাম দেবো!

: কিন্তু কারামে প্রথমেই তোমাকে স্পষ্ট বলে নিতে চাই যে প্রতিটি ওভারকোট বাবদ আমি তোমাকে মাত্র দুই ডলার দেবো।

: হোয়াট? কি বলছো? মাত্র দুই ডলার! ইত্তনেন ডলার। মুসকোয়াস— অসম্ভব। ইনতে মগনু, ইনতে শয়তান— তুমি পাগল, শয়তান...

এই বলে জন কারামে ঘরের মধ্যে জোরে চিৎকার করতে লাগলো। অসম্ভব পাশা। আমি দুই ডলারে তোমাকে কোন ওভারকোট সাপ্লাই করতে পারবো না। ইমপসিবল।

আমি বেশ খানিকক্ষণ কারামের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালুম। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললুম : হাবিবী, বুলবুল তোমার কথা বলছিল।

: বুলবুল? নামটা শোনার সংগে সংগে কারামের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। আমার মুখে সে যেন বুলবুলের নাম শুনবে কল্পনাই করেনি।

এইখানে বুলবুলের একটু গৌরচন্দ্রিকা দেয়া প্রয়োজন।

বুলবুল ছিল জেনারেল মুহম্মদ হুসেনের বোন। এই বুলবুলের সংগে আমার গভীর প্রেম হয়েছিল। অন্তত এইটেই ছিল বুলবুলের ধারণা। কিন্তু পাশা কোনদিন প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কারবার করে না, কিংবা বিশ্বাসও করে না। পাশা শুধু পয়সা চেনে। মানি...মানি।

আমার কথামতো বুলবুল লোকজনের সঙ্গে প্রেম করতো। হেলিওপোলিসে সে আমি একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়েছিলুম। এখানে বুলবুল বড় বড় আর্মি এবং সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে প্রেম করত। আমি লুকিয়ে ওদের প্রেমলীলা দেখতুম। ছবি তুলতুম, ওদের মিষ্টি বুলি টেপ রেকর্ড করতুম। এইসব নোংরা কাজ করবার একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য হোল : ব্ল্যাকমেলিং। আমাকে এই ব্ল্যাকমেলিং-এর কাজ করতে শিখিয়েছিলেন পুলিনি।

জন কারামে একদিন নাইট ক্লাবে বুলবুলকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল। আর প্রেমের আসর আমার হেলিওপলিসের ফ্ল্যাট বাড়ীতে জমে উঠলো।

বাস, সেই সংগে জন কারামে আমার ফাঁদে পা দিল। আমি বুলবুল আর জন কারামের অনেকগুলো নগ্ন ছবি তুলেছিলুম। ওদের প্রেমের আলাপ আলোচনা টেপ রেকর্ড করেছিলুম। কিন্তু জন কারামেকে আমার এইসব কাজকারবারের কিছুই জানতে দিইনি।

আজ ঐসব জিনিসগুলো ব্যবহার করবার সুযোগ পেলুম। আর ব্ল্যাকমেল করতে আমার মনে কোন সংশয়, দ্বিধা, লজ্জা হত না।

আমার মুখে বুলবুলের নাম শুনে জন কারামের মুখ শুকিয়ে গেল। আমি কি বলতে চাইছি?

বুলবুল! বুলবুল কি বলেছে? উৎকণ্ঠিত হয়ে কারামে আমাকে প্রশ্ন করলো।

: কিছু না। শুধু আমাকে একগুচ্ছ ছবি দিয়েছে। তোমার আর বুলবুলের ছবি। কায়রোর হেলিওপলিস ফ্ল্যাট বাড়িতে এইসব ছবি তোলা হয়েছিল।

আমি জানতুম যে জন কারামে বিবাহিত। সর্বনাশ! কারামের বউ যদি জানতে পারে যে কারামে এবং বুলবুল এক সংগে নগ্ন ছবি তুলেছে, তাহলে কি হবে? ঝগড়া, বিবাদ, ডিভোর্স!

আমি কারামেকে ছবিগুলো দেখালাম। দেখতে পেলুম কারামের মুখ পাংশুটে হয়েছে।

: বেশ বল, আমায় কি করতে হবে? যন্ত্রের মত সে আমায় প্রশ্ন করল।

: কিছু না, আমার ষাট হাজার ওভারকোট কিনতে হবে। প্রতি কোটের দাম বাবদ তুমি দুই ডলার পাবে, আর আমার শেয়ার হল দশ হাজার ডলার। আমার কণ্ঠস্বর সতেজ, দৃঢ়।

: হাবিবী, বেরুটে দুই ডলারে বউ কেনা যায়, কিন্তু কোট একেবারেই অসম্ভব।

: নট এ পেনী মোর। আমি আবার অবিচলিত কণ্ঠে বললুম।

: বেশ, বুলবুল যখন বলেছে তখন আপনি কোট পাবেন। কিন্তু আমি আপনাকে আগেই সতর্ক করছি। এ কোট গায়ে দেয়া যাবে না।

(ক্রমশঃ)

শরৎ সংখ্যা প্রসঙ্গে

শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যায় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'পথের দাবী'র প্রকাশন প্রসঙ্গ পড়লাম। রচনাটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান এবং যেহেতু তিনি ছিলেন পথের দাবীর প্রথম সংস্করণের প্রকাশক সেইহেতু তথ্যগত কোন ভুল থাকার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি উমাপ্রসাদবাবু ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত জানতে চাই।

উমাপ্রসাদবাবু লিখেছেন, 'নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে সরকারী হুকুমনামার অপেক্ষায় থাকি। কাজ ত হতে। এখন গভর্নমেন্ট যে শাস্তি দিতে চায় দিক। কিন্তু আশ্চর্য! ও তরফ থেকে কোন সাড়া শব্দের প্রকাশ নেই। বিস্মস্ত লোকমুখে শোনা যায় বই বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রস্তুত, লেখক প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগও আনা হবে কিনা সরকারী মহলে তারই শলা পরামর্শ চলে।.........

পূজোর ছুটি আসে। মধুপুরে চলে যাই। সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রচারের বিলম্ব দেখে কারো কারো মনে ধারণা হয়, বই তাহলে বাজেয়াপ্ত করলো না।.........

অবশেষে কলকাতা থেকে বড়দার চিঠিতে খবর আসে,—১২ই জানুয়ারী ১৯২৭ সালে লেখা,—পথের দাবী প্রোসক্রাইব হয়েছে আর কিছু হবে কিনা সংবাদ পাই নি। কাল বোধহয় গেজেট হবে। আজ বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। বাড়িতে কোন বই নেই বলায়, তাঁরা জানান, অন্ততঃ একখানা কপি কোন মতে জোগাড় করে তাঁদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে, নইলে প্রকাশকের বাড়ি থেকে একেবারে শূন্য হাতে ফেরা চলে কি করে! অগত্যা ছোটবোনের বাড়ি থেকে এক কপি বই এনে তাঁদের হাতে দেওয়া হয়।

এইভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় পরিসমাপ্তি ঘটে।'

উমাপ্রসাদবাবুর লেখা থেকে দেখা যায় পথের দাবী ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন ১৯২৭ সালের ১২।১৩ জানুয়ারী।

এই পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে আছে 'পথের দাবী পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ৩১ আগস্ট, ১৯২৬ (ভাদ্র ১৩৩৩)।

ঐ মাসেই ইংরাজ সরকার বইটি রাজদ্রোহাত্মক অপরাধে বাজেয়াপ্ত করে।... '

শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১৩ খণ্ড) পৃঃ ৪৫১ (৩য় সং) আছে—'পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় (পথের দাবী) ৩১শে আগস্ট, ১৯২৬ (ভাদ্র ১৩৩৩) ঐ মাসেই ইংরাজ সরকার কর্তৃক রাজদ্রোহাত্মক অপরাধে বাজেয়াপ্ত হয়।'

সুতরাং প্রকৃত পক্ষে কোন সময়ে পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হয় এ বিষয়ে সংশয় দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা আলোকপাত করলে বাধিত হব।

চণ্ডী ঘোষ
হাওড়া।

(২)

শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা অমৃতে হিরন্ময়ী দেবীর প্রসঙ্গে রাধারাণী দেবী বলেছেন—'আনুষ্ঠানিক বিবাহিতা না হলেও শরৎদা তাঁকে (হিরন্ময়ী দেবীকে) বিবাহিতা স্ত্রীরই পূর্ণ সম্মান দিতেন।' (পৃষ্ঠা ৬১)। কথাগুলির ভেতর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কি এই নয় যে হিরন্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' প্রথম খণ্ডে সব সংশয়ের নিরসন করেছেন। হিরন্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী, বেহালার মণীন্দ্রনাথ রায়, শরৎচন্দ্রের জীবনীলেখক গোপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং উত্তর পান যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। মণীন্দ্রনাথ রায় শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেও একই উত্তর পান। শরৎচন্দ্রের ভাগ্নী পারুললতা দেবী বলেছেন—'বিয়ে হিন্দুমতেই হয়।' (শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা অমৃতে বীরেন্দ্র দত্তের লেখা—পৃষ্ঠা ৯২।) শরৎচন্দ্র তাঁর উইলে হিরন্ময়ী দেবীকে স্ত্রীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছেন। বিয়ে না হলে তিনি তাঁকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিতেন কি? হিন্দুমতে বিয়ের নথিপত্রে কোনো প্রমাণ থাকে না, এক্ষেত্রেও তা নেই। কিন্তু বিয়ে হয় নি এমন প্রমাণ আছে কি? সে প্রমাণের অভাবে এঁদের বিয়েকে অস্বীকার করার অর্থ এঁরা দুজনেই অসত্য প্রচার করেছেন এই কথা বলা নয় কি? আমরা শরৎচন্দ্র ও হিরন্ময়ী দেবীকে যেটুকু দেখেছি ও জেনেছি তাতে তাঁরা দুজনেই একযোগে এই অসত্য প্রচারে রতী হয়েছিলেন এমন কথা বলতে আমরা প্রস্তুত নই।

রাধারাণী দেবী এক জায়গায় বলেছেন—আর শরৎদা বারবার রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে তদারক করছেন। নির্দেশ দিচ্ছেন মুড়োটা ডালে দিচ্ছ ত? কাঁটা-চচ্চড়িতে একটু ঝাল দিও ভাল করে। আর মাছের ডিমের অম্বল? হচ্ছে ত? বাঃ! বাঃ! (পৃষ্ঠা ৬০)।

অভ্যাগতদের তৃপ্তি সাধনে উৎসুক শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলির মধ্যে যেন এমন আভাসও পাওয়া যায় যে তিনি নিজেও এই ধরনের রান্না খেতে ভালবাসতেন। আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু নিয়েই—বিশেষ করে কাঁটা-চচ্চড়িতে একটু ঝাল দিও ভাল করে—তাঁর এই উক্তিটি নিয়ে। আমরা জানি শরৎচন্দ্রের অর্শ ছিল এবং ঝাল খেলে তিনি পরে খুব কষ্ট পেতেন বলে সযত্নে ঝাল খাওয়া পরিহার করে চলতেন। আমাদের বাড়ীতে তিনি যখন আসতেন তখন তাঁর জন্যে ঝালবিহীন রান্নার ব্যবস্থা করা হত। এই ঝাল খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তিনি খুব রসিয়ে একটি গল্প বলতেন। একবার এক পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনি নিমন্ত্রিত হন। পূর্ববঙ্গীয়দের একটু বেশী পরিমাণে ঝাল খাওয়ার প্রসিদ্ধি আছে। সেখানে খাওয়ার পরদিন সকালে তাঁর যে দুর্ভোগ হয়েছিল—গল্পটা তাই নিয়েই। সেই শরৎচন্দ্র বলছেন—কাঁটা-চচ্চড়িতে একটু ঝাল দিও ভাল করে, দেখে মনে হচ্ছে তাঁর অসুখের কথা কি তখন তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন?

(২) নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র দত্তের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন (পৃষ্ঠা ৬৯)—

প্রশ্ন—শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর সময় তিনি (হিরন্ময়ী দেবী) কোথায় ছিলেন?

উত্তর—শিবপুরের বাড়ীতে।

নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়ের এই উত্তরে অবাক হতে হয়। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র তাঁর শিবপুরের বাসাবাড়ী ছেড়ে সামতাবেড়ে তাঁর নিজের বাড়ীতে চলে যান। শিবপুরের বাসাবাড়ীতে বাস করা সেইখানেই শেষ। নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র দত্ত—উভয়ের অবগতির জন্যে জানাই, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে হিরন্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে ছিলেন (তখন মনোহর পুকুর রোড এখন অশ্বিনী দত্ত রোড)। তাঁদের, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎ-পরিচয়' (শেষের দিকটা) ও 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' (দ্বিতীয় খণ্ড) পড়ে দেখতে বলি।

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
মুপশ্রী, বারমাসিয়া,
বৈদ্যনাথ দেওঘর।

গুপ্তিপল্লী কি লুপ্ত হবে?

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

'সখী, অমন করে মন কর না ভারী;
আসছে পুজোয় কিনে দেব এল-পাড়েরই শাড়ী।'

চৌদ্দ বছরের নোঙর-ছেঁড়া কিশোর মথুর দাসের কাঁচ গলার এই শাকামীতে পথ সখীর মিয়ান মুখে কিছুটা উজ্জল হয় কৌতুকে।

ছাপা শাড়ীতে যৌবনের সিংহদ্বারে পৌঁছান শরীর-সামলান ঐ মেয়ের দল কালনায় কলেজ সেরে ডাউন নলহাটি প্যাসেঞ্জারে ঘরে ফেরে। মথুর দাস পেশাদার ভিখারী। বারহারোয়া লুপই তার কর্মক্ষেত্র।

বাউল সুরে মথুর দাস তার অজানা সখীকে এই আশ্বাসবাণী শোনাতে সখীরা আঁচলে মুখ গুঁজে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ল। কোন কোন যাত্রী চোরা চোখে এই দৃশ্য দেখে পুলকিত হলেন।

বোঝা গেল অজস্র মানুষ আর মালের ভিড়, শিশুর কান্না ফেরিওয়ালার চীৎকার এবং ট্রেনের চিমেতালে তাদের মনে যে ক্লান্তিটুকু জমেছিল, তার কিছুটা ধুয়ে পড়ল মথুর দাসের গানে।

আমার মনের ভার কিন্তু নামল না। বসন্তের অপরাহ্নে মন এমনিতেই কিছুটা হু-হু করে। সেই বিষণ্ণতাকে আরও করুণ করে তুলেছে। পাঁচশ বছরের পুরান এক স্মৃতির দীর্ঘ কালোছায়া।

সেই স্মৃতি আজও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি। আজও তাকে দেখা যাবে যদি কেউ নেমে পড়েন বারহারোয়া লুপের ছোট্ট স্টেশন গুপ্তিপাড়ায়।

স্টেশনে নেমে রিকসাওয়ালাকে বলবেন, কালীতলায় যাব।

গুপ্তিপাড়ার কালীর নাম দেশকালী। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে দক্ষিণ দেশীয় এক পরিব্রাজক চলেছিলেন এই পথে। সে-যুগেও হুগলী জেলার এই অঞ্চল ছিল বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান।

ব্রাহ্মণ আচার্যেরা তখন এই গ্রামের ঘরে ঘরে ন্যায় বেদান্ত স্মৃতি ও দর্শনের চর্চায় ব্যস্ত। বন্দ্যো ভট্টাচার্য চিত্তোলচট্ট উপাধি-ধারী ঐসব পণ্ডিতদের নামডাক ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-দেশান্তরে। পূর্বে গোয়ালিয়রের এক দেশীয় রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন এখানকার সাতবাহন ভট্টাচার্য।

সাতবাহনের ছেলে চিরজীব অধ্যাপনা করতেন কাশীতে। ১৭৭৩ সালে হিন্দু আইন নথিভুক্ত করার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস যে এগারজন পণ্ডিতকে খুঁজে বার করেছিলেন, তার মধ্যে ছিলেন গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার।

বৈদ্যরাও পিছিয়ে ছিলেন না। মজুমদার রায় উপাধিধারী কবিরাজরা নিজগুণে আদর পেতেন নবাব দরবারে। সেকালে এই গ্রামের বীরাচারী তান্ত্রিকরা ছিলেন খুবই নামী।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধনপতি সওদাগর এই গুপ্তিপাড়ার পাশ দিয়ে ভাগীরথী বেয়ে যেতেন বাণিজ্যে।

দক্ষিণ দেশীয় ঐ পরিব্রাজক ছিলেন শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের শৈব্য সন্ন্যাসী। নাম সত্যদেব সরস্বতী। পথশ্রমে ক্লান্ত সত্যদেব এসে থামলেন দেশকালীর মন্দিরে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের শীতল ছায়া। পাশেই গঙ্গার পুণ্য স্রোতধারা। এ হেন মনোরম পরিবেশে সত্যদেব একটু বিশ্রাম নিতে বসলেন।

কিছুক্ষণ পরে একটি ইঁট টেনে নিলেন। তারপর সেটি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এই পথ দিয়ে গ্রামের বধূরা রোজ গঙ্গার জল আনতে যান। আজও যাচ্ছিলেন। ইঁট মাথায় দিয়ে এক সাধুকে শুয়ে থাকতে দেখে এক বধূ বলে উঠলেন, দেখ দিদি দেখ। সাধু হয়েছেন, এদিকে আবার আরামের সখটি ষোল আনা।

এই কথা বলে বধূরা এগিয়ে গেলেন ঘাটের দিকে। মুখরা … ঠেস-দেওয়া কথা যেন সাধু সত্যদেবের মনের বন্ধ দরজায় একটি আঘাত দিয়ে গেল। তিনি ভাবতে বসলেন, তাই তো এ আমি কি করেছি! আমি না সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কিন্তু তবু নরম বালিশে মাথা দিয়ে শোবার সখ! মনে মনে এইসব ভেবে নিয়ে ইঁটটাকে সরিয়ে রাখলেন তিনি।

তারপর কঠিন মাটিতে মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়লেন। বধূরাও জল নিয়ে ফিরলেন। দৃশ্যের এই পরিবর্তনটুকু তাদের শাণিত চোখ এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে শাণিত জিভ থেকে আবার ছুটে এল আর একটি কঠিন বাক্যবাণ।

দিদি, দেখ দেখ। মহারাজের রাগটিও আঠার আনা।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন সত্যদেব। ঠিকই তো বলেছেন ঐ গ্রাম্য নারী। আমি নাকি সাধু। মনের মধ্যে লোভ, ক্রোধ রিপু সুপ্ত সর্পের মত সুযোগের অপেক্ষায় কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। এই নিয়ে আমার সাধনার বড়াই।

সত্যদেব স্থির করলেন অবার নতুন করে সাধনা শুরু করবেন তিনি। নতুন করে আসন পাতবেন এখানে। যে গ্রামের নারীরা পর্যন্ত রিপু শাসনের গুহ্যতত্ত্বে এত পারদর্শী, সেখানে অনেক কিছু শেখার আছে তার।

কালক্রমে শৈব সত্যদেব সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন দারুময় মুরারিকে। নাম রাখলেন বৃন্দাবন চন্দ্র। জোড়বাংলা ধরনের এই প্রাচীন মন্দির আজও রয়েছে সেখানে সত্যদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠের মধ্যে।

মঠে পৌঁছে যাবার আগেই এ-কাহিনী আগন্তুকের শোনা হয়ে যায়। দূর থেকেই দেখা যায় মন্দিরের চূড়া। একটি নয়, অনেকগুলি। বৃন্দাবনচন্দ্রের নিত্য সেবার জন্য সম্রাট আকবর দান করেছিলেন পনের নম্বর তৌজী।

বাংলার মসনদে যখন নবাব আলীবর্দী, তখন সেরেস্তাদার একদিন হুজুরে নালিশ জানাল, পনের নম্বর তৌজীর খাজনা দীর্ঘদিন ধরে বকী পড়ে আছে। হুকুম হল, বেঁধে আন সেই বেয়াদব মালিককে।

লোক মুখে এই ভয়ঙ্কর খবর শুনে চিন্তায় পড়লেন মোহান্ত মধুসূদনানন্দ। তারপর এক মতলব বার করলেন।

বৃন্দাবনচন্দ্রের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এ-পথ দিয়ে পাইক-বরকন্দাজ এসে পৌঁছাল মঠে। ও-পথ দিয়ে মোহান্ত হাজির হলেন মুর্শিদাবাদের দরবারে। সঙ্গে আর একটি কাঠের মূর্তি। আসল মূর্তি রয়ে গেছে গুপ্তিপাড়া মঠের গুপ্ত কক্ষে। জোড়বাংলো মন্দির এখন ফাঁকা।

নবাব আলীবর্দি বুঝলেন, বৃন্দাবনচন্দ্র রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া কোন বদমাশ নন, তিনি এক হিন্দু দেবতা।

নবাবের হুকুমে মুক্তি পেলেন নকল বৃন্দাবনচন্দ্র। নবাবের ইচ্ছায় মঠের মধ্যে এক নতুন মন্দিরে স্থান পেলেন তিনি।

আদি বৃন্দাবনচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেন নতুন আর এক মন্দিরে। যেমন তার দৈর্ঘ্য, তেমন তার প্রস্থ। মূল মন্দিরকে বেড় দিয়ে কয়েকটি গুপ্ত কক্ষ। সেইসব ঘরের দরজা বন্ধ করার কৌশলটিও দেখার মত।

গুপ্তিপাড়া মঠের সর্বকনিষ্ঠ মন্দিরটিই কিন্তু প্রাচীন বাঙালী শিল্পকলার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরটির চারদিকের দেওয়াল জুড়ে অজস্র পোড়ামাটির কাজ।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা শক্ত নয় যে, পোড়ামাটির পুতুলগুলি পুরাণের কিছু কিছু কাহিনী বর্ণনা করে চলেছে নিঃশব্দে। তাদের মধ্যে এখনও অনেকগুলি যেন জীবন্ত।

সত্যবান রাম, আদর্শ অনুজ লক্ষ্মণ নারী জাতির আদর্শ সীতা এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান এই মন্দিরের বিগ্রহ। বিধর্মীদের হামলা থেকে বিগ্রহ রক্ষার ব্যবস্থাও ছিল এই মন্দিরে।

মন্দিরটি দোতলা। কিন্তু তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। দোতলায় যাবার পথটিও অপরিচিত কারো খুঁজে পাবার কথা নয়।

পল্লীর শান্তশ্রী এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিগুলি যাদের টানে তাদের কাছে একটি ছুটির দিন কাটিয়ে যাবার পক্ষে এটা একটা ভাল জায়গা।

সত্যদেব সরস্বতী মঠ প্রতিষ্ঠার আগে পনের নম্বর তৌজীর অন্তর্গত এই গ্রামের কি নাম ছিল তা জানা যাচ্ছে না। তবে এটা জানা যাচ্ছে দু'শ' ষোল বছর আগে বাংলাদেশে বারোয়ারী পুজোর চল ছিল না।

স্থানীয় ব্রাহ্মণরা ১৭৫৯ সালে স্থির করেন গ্রামে মা জগদ্ধাত্রীকে আবাহন করবেন। মায়ের আবাহনে, আরতিতে সবার অবাধ অধিকার স্বীকার করলেন তাঁরা। সমস্ত ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে নির্বাচিত করা হল।

সেই থেকে এদেশে চালু হল এক নতুন উৎসব—বারোয়ারী পুজো। তারও আগে অবশ্য এই জায়গা গুপ্তিপাড়া নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল।

সত্যদেব বৃন্দাবনচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পর এলাকাটির নাম লোকমুখে হয়ে যায় গুপ্ত বৃন্দাবন। তাই থেকে হয় গুপ্ত বৃন্দাবনপল্লী।

গ্রামের নাম এত বড় হয় কি করে। তাই শেষ পর্যন্ত জায়গাটির নাম দাঁড়াল গুপ্তিপাড়া।

শৈবের মন্দিরে বৈষ্ণব ভক্তদের আদর দেখতে হলে আপনাকে আসতে হবে এখানে। হিন্দু দেবস্থানে পারসিক রীতির কারুকার্য—তাও দেখতে পাবেন এখানে।

অনাদরে অবহেলায় এহেন স্থানের খ্যাতির মূলই আজ বিপন্ন। শিল্পসমৃদ্ধ, মন্দিরগুলি সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। মঠের সম্পত্তি যেন বেওয়ারিশ লুঠের মাল। মঠের বর্তমান দণ্ডিস্বামী অসহায়ের মত দেখছেন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বৃন্দাবনপল্লী লুপ্ত হতে চলেছে।

ঐতিহ্যের সেই আসন্ন অপমৃত্যুর কথা ভেবে মনটা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে।

রোজ রোজ খেতে পারি না বাপু। এ প্রান্ত থেকে ফোনে কথা কটা উচ্চারণ করতে পারল না বিধু। পরিবর্তে বলল—যাচ্ছি।

টেবিলে মুখোমুখি হলে রমেনকে বলল—রোজ এমন করে মদ খাওয়াও, আমি খাই কি করে?

—তাতে কি, তাতে কি, খাও না। বাড়তি কিছু টাকা পেলাম তাই।

বাড়তি টাকা বলতে 'ঘুষ' বোঝাতে চাইছে রমেন। রমেন এ-সব কথা খোলাখুলি বিধুকে জানাতে ভালবাসে। বিধুকে তার ভাল লাগে। কোনো রকম দুষ্টু মতলব তখন আসে না। সাধু সুবোধ মানুষ বলতে যা বোঝায় বিধু অনেকটা তাই। এক কথায়, রমেন জানে, বিধু তার বিপরীত। সে প্রমথ আর বিধু এই তিন বন্ধুর মধ্যে বিধুরই রোজগার কম। সরকারী অফিসের সাধারণ কর্মচারী সে। ব্যক্তিগত জীবনে বেশ সুখী। যদিও অবিবাহিত তবু নির্বিবালির সংসার। মা ভাই আর এক বোন—এঁদের নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটায়। তবে দুশ্চিন্তা কিছুমাত্র নেই তা সত্যি নয়। বোনটিকে নিয়ে তার কিছু দুশ্চিন্তা আছে বই কি। দুই বোনের মধ্যে বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। অপর বোনটিরও বয়স অনেক হল তবু পাত্রস্থ হয়নি। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু হল না। অথচ মেয়েটি যে খুব একটা খারাপ দেখতে তাও নয়। ভদ্র ভব্য আচার-বিচার ভাল। এই বোনটিকে নিয়েই বিধুর যা একটু চিন্তাভাবনা। এখন অবশ্য বিয়ের আশা ছেড়েও দিয়েছে সে এক রকম। কেবল মদ্যপানের ঝোঁকে মাঝে মধ্যে বোনটির বিয়ে হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করে ফেলে, এই যা।

রমেনের সেন্টিমেন্ট কম। বুদ্ধিও যে বেশি তা-ও নয়। নিত্য মদ্যপান করে মগজ সর্বদা অচল থাকে। টেন্ডার দেওয়ার ব্যাপারে যা একটু মগজ খাটাতে হয় তার।

কত পার্সেন্ট রাখতে হবে, বে-আইনী টাকার ভাগবাটোয়ারায় কার কত থাকবে—এই হিসেবের দায়িত্বটুকুই যা একটু ঝামেলা পাকায়। সেটুকু চুকে গেলেই ব্ল্যাক নাইট ঠান্ডা সোডা ঢেলে আরাম করে পান কর। এমন ঝঞ্ঝাটবিহীন জীবনের প্রশংসা করতে গিয়ে রমেন বলে—আমি ভাই সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না। চাকরি করি, আর ফূর্তি ফলাতে এই যা। সামনের টেইটুম্বুর গেলাসের দিকে নির্মল নির্দেশ করে। মুখটাকে যতদূর সম্ভব সাধু সাধু করে ছেড়ে ছেড়ে বলে—এছাড়া আর কোনোরকম নোংরামি করতে দেখেছ?

প্রমথ ও রমেনের জীবনের বিধু যেটুকু জানে সেটুকুতেই মাথাপিছু আধ-ডজন কেলেংকারীর খবর সে রাখে। অজানা খবর আরও কত আছে কে জানে। পুরুষ মানুষের জীবনে আধ ডজন সংখ্যাটা নিন্দনীয় কিনা স্থির সিদ্ধান্তে না আসতে পারলেও, রমেনের ওকালতি যে সবটুকু সমর্থনযোগ্য নয় এটা বুঝতে দেরি হয় না বিধুর। তা বলে তার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করে না সে। মদের টেবিলে বিরোধিতা বর্জনীয়। সে চুপ করে থেকে গ্লাসে চুমুক দেয়।

এই সময় পেট মোটা একটি লোকের আবির্ভাবে তারা দুজনেই হকচকিয়ে গেল। লোকটি বিনা অনুমতিতেই বসে পড়তে রমেন বলল—ও, আপ। কানোরিয়াজী। বসুন, বসুন।

বিধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ঠিকাদার কানোরিয়াজী। আর এ আমার ফ্রেন্ড বিধুনাথ মল্লিক।

পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা বিধু সন্দিগ্ধ। লোকটা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। না মিশেও সে বুঝতে পারে এর জগতের এমন কিছুই নেই যা বিধুর জগতের সাদৃশ্যপূর্ণ। হাত তুলে তবু নমস্কার করল বিধু। কানোরিয়া সোনার দাঁতে ঝিলিক তুলে গদগদ স্বরে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলল—নমস্তে নমস্তে—। ঠিকাদারী কাজ নিয়ে রমেনের সঙ্গে বিস্তর কথাবার্তা চলল দুজনের। অধিকাংশ কথাই বিধুর কাছে দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট। ঠিকাদার রমেনকে দারুণ তোষামোদ সুরু করল। কেন, কি কারণে বুঝতে না পারলেও মনে হল রমেনের হাতে এমন শক্ত অস্ত্র আছে যার প্রয়োগে ঠিকাদারের প্রচন্ড ক্ষতি হতে পারে। কী অস্ত্র, কেমনভাবে তার প্রয়োগ হতে পারে সে সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই, জ্ঞানলাভ করার ইচ্ছেও নেই—ব্যবসায়িক সব ব্যাপারেই বিধুর চিরকালই আগ্রহ কম। দ্বিতীয়ত আগ্রহ প্রকাশ করা রমেন নিজেও পছন্দ করে না। এ ব্যাপারটা ইতিমধ্যে বার কয়েক যাচাই করে দেখেছে সে।

কানোরিয়া ঘন ঘন রমেনের দু হাঁটুতে হাত রাখতে লাগল আর রমেন তার নিজের দু' হাত আলগোছে তুলে গ্লাস কিজিয়ে, মাপ কিজিয়ে' বলে তাকে ফিরিয়ে দিল।

এমন দৃশ্য দেখার পর রমেন সম্পর্কে বিধুর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সীমা রইল না। হাতে পায়ে ধরার মত মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে রমেন আজ পর্যন্ত কখনো সে ভাবতে পারে নি। কারণ, আলোচনা করে দেখেছে রমেন মদ আর রমণী ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কিছুই খবর রাখে না। অবশ্য বিধুর ভাবনাতেও ত্রুটি ছিল। অর্থবান অথচ মূল্যবান নয় এমন কী করে হয়। মনে মনে নিজের মূর্খামিকে ভেংচি কাটল সে। তারপর এক চুমুকে গ্লাস শূন্য করে উঠে পড়ে বলল—আজ চলি রমেন।

...'কোথা যাবো সখা'...অগম্য গমনের এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়ে শরীর দুলিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে গেল।

কাচ ঘেরা এমন সুন্দর বার কাম-রেস্তোরায় রমেনের এই পেঁচি মাতলামো বিধুর বিশ্রী লাগল। তবু বিনা প্রতিবাদে কোনক্রমে ট্যাকসিতে চাপিয়ে রমেনকে বাড়ি পৌঁছে দিল। তার সংসর্গ বর্জন করার এক ক্ষুদ্র সংকল্পও যে তার মনে উদয় হল না তা নয়। ট্যাকসিতে বসে রমেন আরও কিছু অভদ্রতা করল। আবোলতাবোল অনেক কথার বুলি কাটল। মূর্খ লোকটা তার স্থূলত্ব সত্ত্বেও এক সৌখীন বাসনা প্রকাশ করে ফেলল—সে অর্থাৎ রমেন একটি সুদর্শনা, তন্বী, হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পারে এমন এক রমণীকে সত্বর চায়। মেয়েটি যে কে তা-ও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল। বিধু চমকে উঠল। তার অনূঢ়া বোন সম্পর্কে এমন অবৈধ চিন্তা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ করতে পারে ভেবে একান্ত মর্মাহত হল।

বিধুর সংকল্প যে কত ক্ষণস্থায়ী তা বিধু আগেও দেখেছে। বন্ধু রমেন সম্পর্কে তার পূর্বের সংকল্প একই রকম ক্ষণস্থায়ী হল। এছাড়া প্রমথও বোঝাল মদ্যপানের পরবর্তী অবস্থা মানে অজ্ঞান অবস্থা। সেই অবস্থায় রমেন যে নির্লজ্জ বাসনা প্রকাশ করেছে তার প্রতি কিছুটা উদাসীন হওয়াই ভাল। সজ্ঞানে কোনোদিন যদি সে এমন কিছু বলে বা ঘটায় স্বয়ং প্রমথ উপযুক্তভাবে হস্তক্ষেপ করবে। এই মর্মে

আশ্বাস পেয়ে বিধু খানিকটা নিরস্ত হল, মনে সান্ত্বনাও পেল কিছুটা। অনৈতিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অন্তত আরেকজন সোচ্চার হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিধু মাস তিনেক গা ঢাকা দিল রমেনের সঙ্গ থেকে।

পরে যেদিন সেই বার-রেস্তোরায় দুই বন্ধু ফুর্তি করতে গেল সেদিন আবার কানোরিয়াজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। পান অনুষ্ঠান কিছুটা এগুলে এবার দেখল রমেন কানোরিয়াজীকে কাকুতি-মিনতি করে চলেছে আর কানোরিয়াজী 'মাপ কিজিয়ে, মাপ কিজিয়ে' বলে রমেনকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

পূর্বেকার দৃশ্যটা মনে ছিল বিধুর। আজকের অত্যাশ্চর্য এই বিপরীত দৃশ্য কীভাবে কী কারণে সম্ভব তা বুঝতে না পেরে অবাক দৃষ্টিতে দৃশ্যটা উপভোগ করতে লাগল। তাছাড়া, রমেন যে বিপদের গাড্ডায় পড়েছে এ ব্যাপারটা তাকে স্বাভাবিক কারণেই আমোদিত করছিল।

প্রমথ এল কিছু পরে। প্রমথের বিপুলে মোটা হাতের দিকে তাকিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা সাধুবাদ জানাল বিধু। প্রমথর এই দুর্বলতাটা জানা আছে তার। স্বাস্থ্য আর দৈহিক শক্তি—এই দুটোর প্রশংসা শুনতে পেলে প্রমথ সবচেয়ে খুশি হয়। আজ আগেভাগে প্রমথকে খুশি করে রাখল বিধু, পাছে রমেনের পয়সায় মদ খেয়ে বিধুর কাছে পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়। সংশয় তবু রয়েই গেল বিধুর। কী জানি কী আছে বরাতে আজ—দুরু দুরু বুকে ভাবতে লাগল।

ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেও কানোরিয়াজী শেষ পর্যন্ত রমেনের প্রস্তাব মেনে নিল। সবটা না হলেও খানিকটা তো বটেই। কারণ এর পরেই কানোরিয়াজীর গাড়িতে চেপে লাউডন স্ট্রীটের একটা অতি সুদৃশ্য পশ্চিমী ধরনের বার-হোটেলে চলে এল তারা। কচি কচি দুর্বাঘাসের উপর হিন্ডেলিয়ামের হাল্কা চেয়ার টেবিল পেতে দিয়ে গেল। সামনে বিশাল কাঁচের দেয়াল, দেয়ালের ওপাশে আলো জ্বলা হলঘরের মাঝখানে গানের স্বরলিপির মতো একটা সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে দোতলায় উঠে গেছে, মনে হচ্ছিল বুঝি কোনো অপ্সরালোকে।

দু' মিনিট বাদেই ওই সিঁড়িতে হাল্কা পা রেখে ধীরে ধীরে নেমে এল দুটি মেয়ে। কী আশ্চর্য তারা তাদেরই সঙ্গে টেবিলের পাশে এসে বসল।

কথাবার্তা হৈ-হল্লার মধ্যে আজ প্রথম মনে হল বিধুর যে রমেন একটি তিনতলা বাড়ি তৈরি করে ফেলেছে এবং কানোরিয়াই এ ব্যাপারে সব আর্থিক ও নির্মাণ দায়িত্ব নিয়েছিল। কী কারণে নিয়েছিল কেবল অনুমান করতে পারল বিধু।

উপস্থিত সবাই হাঁ করে মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। রমেনকে মনে হল সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছে। সম্বিৎ ফিরে এলে প্রমথকে বলল নিচু গলায়—খেতে না পেলে এ-সব করবেই।

মেয়ে দুটি শিক্ষিতা। অন্তত কথাবার্তায় শিক্ষাহীনতার কোনো ছাপ নেই।

প্রমথ বলল—লেখাপড়া জানে, চাকরি করলেই পারে।

রমেন বলল—আইবুড়ো মেয়ে এ লাইনে নামবেই।

—নামবেই? বিধু সবিস্ময় প্রতিবাদ জানাল।

—নামবেই।

বিধু তর্ক করল না। তার নিজের অনূঢ়া বোনের কথা মনে হতেই সহজলভ্য নীরবতার খোলে নিজেকে গুটিয়ে নিল। কে জানে কখন তার বোন রমার কথাই বলে বসে কে জানে?

প্রমথর দিকে একবার তাকাল ভীরু চোখে। প্রমথ সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝেছে মনে হল না। সে যেন এই বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট একটা মীমাংসা খুঁজছে বহুদিন ধরে। মেয়ে দুটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রশ্ন করতে লাগল সে।

—আপনারা কি অভাবে পড়ে এইসব করছেন। না কি বাপ মা বিয়েটিয়ে দেন নি বলে।

কানোরিয়া হস্তক্ষেপ করল। —ক্যো ফালতু বাত করতা হ্যায়—। পিজীয়ে পিজীয়ে—বলে বিয়ারের গ্লাশ এগিয়ে দিল মেয়ে দুটির দিকে।

•

ফেরার পথে গা ঘিন ঘিন করছিল বিধুর। প্রমথ রমেন দুজনেই তার পাশে বসে আছে। সারা দেহ দিয়ে যতক্ষণ পারে যত রকমে সম্ভব মেয়ে দুটিকে ভোগ করেছে। তারই বিবরণ সামান্য কিছু শুনতেই গুম মেরে গেল সে। কিছুটা ভয়ও পেয়ে গেল। মনে মনে ভাবল ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার নিজেরই বা কি করবার আছে। রমেনের কাছে এ জীবন তো একান্ত স্বাভাবিক। কেবল প্রমথ। প্রমথর এই পদস্খলন সে ভাবতে পারে নি এতদিন। তার মনে হচ্ছিল দুর্গন্ধময় নরকের অন্ধকারে ডুবে থাকার এক কুৎসিত প্রবণতা এই দুটি যুবকেরই খুব বেশি রকম আছে।

বালিগঞ্জে সার্কুলার রোড এর আর্মি ক্যাম্পের খোলা মাঠটা আসতেই দুজনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। প্রমথ বলল—নাঃ আর শালা এ-সব নোংরামি করব না।

রমেন বলল—ঠিক বলেছিস। আমার শালা এইসব চীজ ভাল লাগে না। ভদ্রঘরের তাজা জিনিস হয়, সে ভিন্ন কথা।

প্রমথ বলল- ঠিক বলেছিস।

ভয়ে উত্তেজনায় সারা শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল বিধুর এক মুহূর্তে।

তার বোনের প্রসঙ্গ সে মুহূর্তে এল না বটে, কিন্তু পরিবর্তে যে অসহায় ভদ্র গৃহস্থ মেয়েদের সর্বনাশ করে লালসা চরিতার্থ করেছে রমেন এ-যাবৎ তারই গল্পে কণ্টকিত হচ্ছিল বিধু, আর প্রমথ তোবা তোবা বলে প্রশস্তি জানাচ্ছিল।

রমেন ভীষণ চিৎকার করছিল। ভীষণ বেসামাল। প্রমথকে একবার কাছে টেনে ফিসফিস করে সে কথা জানাল বিধু। প্রমথ বিশেষ আমল দিল না।

বলল—আরে ঠিক আছে।

হঠাৎ রমেন বলে বসল—চল আজ বিধুর বাড়ি যাই।

প্রমথ বিব্রত বোধ করতে লাগল। বিধু গম্ভীর হয়ে গেল।

প্রমথ বলল—কেন শালা নিজের বাড়ি যাও না।

রমেন উত্তরও দিতে গেল।

—এ্যাই চুপ কর। কড়া গলায় ধমক জানাল প্রমথ। কাঁধ ধরে বার দুই সজোরে ঝাকুনিও দিল। রমেন একটু হকচকিয়ে গেল বটে কিন্তু অনুতপ্ত মনে হল না।

প্রমথ বলল—ড্রাইভার রোক্কে।

ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল। প্রমথ গাড়ি থেকে নেমে পাশের এক গাছের গায়ে প্রস্রাব করল। রমেন বলল—এ্যাই আমিও নামব। সেও প্রমথকে অনুসরণ করল।

এই সময় ফাঁকা ট্যাক্সিতে বসে থেকে এক সময় মনে হল বিধুর এই মুহূর্তে এদের সংগ বর্জন করে চলে যাওয়াই ভাল। মুখের উপর প্রতিবাদ করতে না পারার দরুন তার সারা বুক জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। সে নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে পা চাকা দিল। ছুটে দিলে রমেন প্রমথর নজরে পড়বে। তাই খানিকক্ষণ লুকিয়ে রইল রাস্তার উপরের একটা ইলেকট্রিক মিটার বক্সের পিছনে।

ফিরে এসে ওরা বিধুকে না পেয়ে অবাক হয়ে গেল প্রথমে। তারপর ভাবল বিধু বোধহয় পান সিগারেট কিনতে গেছে। কিন্তু দু-চার মিনিট পরেও যখন দেখল বিধু এল না তখন রমেন প্রমথকে বলল—চল দাঁড়িয়ে লাভ নেই। ফোকটে মাল খাবে আবার বাড়তি মিটার খরচাও দিতে হবে। দূর, চল উঠে পড়ি।

প্রমথ আপত্তি জানাল, বলল—তাই কি হয়। তুই এমন সব আজেবাজে কথা বলিস না।

—কি বললাম আবার।

—ওর বোনটাকে উদ্দেশ্য করে কেচাইন করতে গেলি।

—কেচাইন করলাম কোথায়। করতে চাইলাম বল।

—বিধুর সামনে তাই বলে বলতে গেলি।

—আরে ভাই, আমার ঐ একটাই তো ড্র ব্যাক।

—একটা ড্র ব্যাক? হাজার হাজার ড্র ব্যাক শালার।

—হেঃ হেঃ হেঃ—ঠোঁট দুবে ফাঁক করে হাসতে লাগল রমেন। পরে প্রমথর সমর্থন পাবার আশায় অশ্লীল ইঙ্গিত করল।

এ মুহূর্তে প্রমথকে কী রকম নিরস্ত্র দেখাল। রসালো জিক্তে রঙীন আলোচনা চলল।

বিধু আর অপেক্ষা করতে পারল না। পিছন ফিরে সে সোজা দৌড় লাগাল।

বিধুকে ওরা দেখতে পেল কিছু পরে। ততক্ষণে বিধু বেশ কতকটা দূরে চলে গেছে।

—বিধু-বিধু—ডাকতে লাগল প্রমথ। রমেনও ডাকল—বিধু-বিধু। ড্রাইভারকে বলল—গাড়ি ঘুরাও।

বিধু বুঝতে পারছিল রমেন প্রমথ গাড়ি নিয়ে তার পিছনে আসছে। সে পাশের একটা চোরা গলিতে পা ঢাকা দিল।

গলিটা ছোট, গাড়ি ঢোকে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গলির মুখোমুখি গাড়িটা দাঁড় করিয়ে হেড লাইট জেলে গলি আলোকিত করে ফেলল। নিভন্ত গলিটা মুহূর্তে জ্বলে উঠল। গলির ভিতরে যাতায়াতকারী লোকজন তৎক্ষণাৎ সচকিত হয়ে উঠল। একটা বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল বিধু। যতটা পারল দরজার গায়ে পিঠ চেপে সে আত্মগোপন করার চেষ্টা করল।

আরও কিছুক্ষণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে বার কয়েক হাঁক পাড়ল প্রমথ আর রমেন। কোনও সাড়া দিল না বিধু।

গাড়িটা চলে গেল।

বিধু এবার সন্তর্পণে অজ্ঞাত গলিটার অভ্যন্তর প্রদেশে গলি অনুসরণ করতে করতে এগিয়ে গেল। গলিটা গিয়ে আরেক রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। সেখানে একটা ট্যাক্সি আলো জেলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে পিছু হটল সে আবার। দেখল সেই গাড়িটা এখন এক নরখাদক জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে—দুই রক্ত চোখ জ্বলছে মুখে গড় গড় আওয়াজ করছে ক্রমাগত।

বিধুও মরিয়া হয়ে পড়ল। কিছুতেই সে এই নোংরা বন্ধুদের আশ্রয়ে ধরা দেবে না। রাগে দুঃখে বেদনায় তার দেহ মন আত্মা ওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাচ্ছে। পারলে বিধু নিজে একটা নরখাদক পশু হয়ে ওদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।

গলির মাথার উপরের আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে দেখল বারকয়েক। দূষিত ক্ষতের মত নক্ষত্রে ছেয়ে গেছে আকাশের গা। তারই নিচে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় মনে হল সেই আকাশের গা বেয়ে একটা ঘৃণ্য গলিত দুর্গন্ধ চুঁইয়ে পড়ছে গোটা শহরটায়।

গলির বাসিন্দা গুটিকয় ছোট ছেলে-মেয়ে বিধুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। যেন তারা বিধুর প্রবন্ধ আঁচ করতে পেরেছে। এমন কি তাদের দু' একজনার চোখে সমবেদনার আলোও বুঝি উঁকি দিল বারকয়েক।

বিধুর চোখে এক সময় কয়েক ফোঁটা অশ্রু উপচে উঠল যেন। কিন্তু সে ভেবে পেল না তার এই অক্ষম অশ্রুর ফোঁটাগুলো কোন স্থানে বিসর্জন দেবে।

ইঁদুরের সুড়ঙ্গের মত আলো বাতাস-হীন বদ্ধ গলিটার ভিতরে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিকারী গাড়িটার নিষ্ক্রমণের জন্য শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করতে লাগল সে একমনে।

বহু চিঠি জমা হয়ে গেছে। তাই এবারেও কিছু চিঠির উত্তর দিয়ে নিই। আপনাদের মধ্যে অনেকে আমাকে বহুদূরে থেকেও চিঠি দিচ্ছেন, সেজন্য ধন্যবাদ। আপনারা এই বিভাগটির জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন ও প্রশংসা করেছেন সেজন্য আমি গর্বিত বোধ করছি। রূপসীর খাতা বিভাগটি আপনাদের ভাল লাগছে জেনে অমৃত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন ওঁদের আপনাদের ধন্যবাদ জানালাম।

আমার একটি অনুরোধ আছে। সেটা হোল আপনারা যখনই চিঠি লেখেন দয়া করে তারিখটাও সঙ্গে দিয়ে দেবেন। তাহলে উত্তর দেবার সময় তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে সুবিধে হবে। আর একটি অনুরোধ আপনারা অনেকেই ঠিকানা সমেত খাম বা পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছেন ব্যক্তিগত উত্তরের জন্য। কিন্তু যদি মনে কিছু না করেন এরকম পাঠাবেন না। কারণ আমার পক্ষে ব্যক্তিগত উত্তর পাঠানো সম্ভব নয়। আপনাদের নাম না দিয়েই তো আমি অনেক সময় উত্তর দিয়ে থাকি। তাহলে আর অসুবিধা কিসের। তাছাড়া আমার মনে হয় সৌন্দর্য ও রূপ সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন তাঁদের ক্ষেত্রে লজ্জাই বা কিসের?

(১) অনুরোধা চ্যাটার্জি, দুর্গাপুর—অহেতুক লজ্জার কারণেই আমাদের দেশের মেয়েদের রূপলাবণ্যের বিকাশ সম্ভব হয়না ঠিক কথা। আপনার প্রশ্ন সুন্দর সুঠাম শরীর কি কি ভাবে করা যায়। এ প্রশ্ন কিন্তু বহুবার এসেছে এবং এবারেও আছে। জলপাইগুড়ি থেকে শেলী রায়, বর্ধমান থেকে অঞ্জনা সেন এঁরা সবাই একই প্রশ্ন করেছেন, তবে একটু এদিক ওদিক করে। তাই এই ব্যাপারে আলোচনা করছি। প্রতিদিন নিয়মিত কতকগুলি ব্যায়াম অভ্যাস করলে শরীর সুন্দর ও সুঠাম হবেই। মহিলাদের সৌন্দর্য বহুলাংশেই নির্ভর করে শরীরের সৌন্দর্যের ওপর বিশেষ করে বুকের সুডৌলতার ওপর।

রাত্রে ঢিলে জামা পরে শোয়া উচিত। ঘুম থেকে উঠেই বিছানার উপুড় হয়ে সোজা শুয়ে পড়বেন। তারপর হাতের পাতা দুটি বুকের নিচে জড়ো করে কোমর থেকে ওপরের অংশ উঁচু করে তোলার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কোমর থেকে নীচের অংশ সোজা হয়ে থাকবে। যখন তুলবেন তখন নিশ্বাস ভেতরের দিকে টানবেন ও যখন ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামবেন তখন নিঃশ্বাস ছাড়বেন। এই রকম অন্ততঃ চার পাঁচ মিনিট করবেন। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের তেলোতে একটু পাউডার নিয়ে দুই হাত দিয়ে বুকের নীচে বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে চেপে চেপে তুলে ওপরের দিকে চাপ দেবেন। এরকম অন্ততঃ পনেরো কুড়ি বার করবেন। তারপর সোজা দাঁড়িয়ে দুই হাত শরীরের পাশে ঝুলিয়ে দিন। একটু পরে ধীরে ধীরে হাতটা দিয়ে বুকে চেপে সামনের দিকে সোজা করে ধরুন এই অবস্থায় চার পাঁচ মিনিট থাকুন। সব শেষে হাত দুটি সোজা শরীরের দুপাশ দিয়ে মাথার ওপর তুলে ধরে থাকুন যতক্ষণ সম্ভব। এগুলি নিয়মিত করলে শরীরের ওপরের অংশ সুঠাম ও সুন্দর হবেই।

যাঁদের বুক শরীর আন্দাজে ছোট তাঁরা এর সঙ্গে আর একটা কাজ করবেন। যেমন স্নানের সময় দু বালতি জল রাখবেন। একটিতে খুব গরম অপরটিতে খুব ঠান্ডা। তোয়ালে ভিজিয়ে বুকে একবার গরম ও একবার ঠান্ডা এইভাবে বারে বারে দিতে হবে। এতে বুক স্ফীত হয়। এছাড়া 'ফেমিনিক পদ্ধতি' কার্যকরী হয় শুনেছি—তবে আমার প্রত্যক্ষ জানা নেই। এগুলি করে দেখুন ফল কি হোল জানাবেন।

ইভা নন্দী—আপনি যে সমস্যার কথা লিখেছেন তা আপনার ছোটবেলা থেকে ভুল ভাবে পোশাক পরা ও জামা পরার কারণেও হতে পারে। কিম্বা ঝ্যাংেরর দোষেও হয়। এখন যে ব্যায়ামগুলি লিখলাম তার শেষের গরম ঠান্ডা ব্যাপারটি ছাড়া বাকী সব করবেন। আর নীচের জামা এমনভাবে পরবেন যার ফলে অনেক অসুন্দরতা ঢাকা পড়ে যায়। অর্থাৎ নীচের জামা এমনভাবে পরবেন যাতে আপনার পুরো বুক ঢাকা থাকবে—অর্থাৎ কাপ সাইজটা ঠিক মতন আছে কিনা দেখে নেবেন। আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণত নীচের জামা শরীরের তুলনায় ছোট পরেন—ফলে মাংস ও চর্বি ফুলে ফুলে থাকে ও পিঠে বিশ্রীর খাঁজ পড়ে যায়। এই জন্য নীচের জামা সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ওপরের ব্লাউজ শরীরের সঙ্গে চেপে বসা দরকার। আপনি এমন করে ব্লাউজ বানাবেন যার ফলে আপনার প্রায় কোমর ছোঁবে, কিন্তু গলা বড় ও নীচু হবে।

(২) শ্রীমতী চিত্রা শীল, কলিকাতা—আপনি যত্নসহকারে ত্বক ভাল করেছেন জেনে খুশি হলাম। কাঁধে পিঠে ও ওপর হাতের মেচেতার জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় পাউডার ম্যাসাজ করা। আর মনে রাখবেন, সব সময় ম্যাসাজের নিয়ম নিচে থেকে ওপরে ত্বক ও মেদ চেপে চেপে টানতে হয়। কখনও ওপর থেকে নিচে টানবেন না। তাহলে মেদ ঝুলে যাবে। পিঠ ও কাঁধে ডান দিক থেকে বাঁদিক ও বাঁদিক থেকে ডানদিক দুই হাত দিয়ে গোল করে ম্যাসাজ করতে হবে। হাতের ওপরের দিক ম্যাসাজ করার সময় দু' হাত দিয়ে চেপে চেপে গোল গোল করে চাপ দিয়ে করতে হবে। ওপর হাতের জন্য আর একটি ব্যায়াম হোল হাত দুটি মাথার সঙ্গে ঠেকিয়ে সোজা ওপরের দিকে তুলে রাখা যতক্ষণ সম্ভব। এছাড়া ভাপ দিয়ে গরম করে ঘাম ঝরাতে পারলেও ভাল হয়—যাকে ইংরাজীতে বলে 'স্টীম বাথ'। আশাকরি এবারেও আপনার উপকার হবে। আপনার এই বিভাগ ভাল লাগে জেনে সুখী হলাম।

(৩) ইন্দুলেখা রায়, বেহালা—আপনি বরফ ম্যাসাজ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। বরফ ম্যাসাজ সাধারণত দুই শ্রেণীর ত্বকে হয়। (ক) যাঁদের রোমকূপ বড় ও খোলা। (খ) মুখে গোটা ও দাগ থাকে। একটি রুমালে বরফ বেঁধে সেটা গোল গোল করে মুখের ওপর, গলার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, বরফ ম্যাসাজের পর কোন কিছু ব্যবহার করা চলবে না। অন্তত এক ঘণ্টা পরে কিছু মাখা চলতে পারে। আর শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘষে মোছাও চলবে না। থুপে থুপে জল শুষে নিতে হবে। তবে একটা কথা, খুব একটা ভাল মতন আলোচনা না করে বরফ ম্যাসাজ না করাই ভাল।

(৪) লীনা দাস, নিমতা—আপনার চিঠির বিষয়বস্তু পড়ে প্রথমেই একটা কথা মনে করিয়ে দিই, স্নো ও ফেস পাউডার কখনও ব্যবহার করবেন না। ওই জন্যই আপনার ত্বক খসখসে ও তাতে মসৃণতা কম। আমি বহু আগে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে পাউডার ও স্নো যথাসম্ভব ব্যবহার না করাই উচিত। বাকী যা কিছু করেন সব ঠিক আছে। আর একটা কথা বোরোলীন দিনের বেলায় মাখবেন না, বিশেষ করে রোদে বেরোলে। তাহলে বিপরীত ফল হবে। মেকআপ করার সময় কোন তরল ফাউন্ডেশনের সঙ্গে বোরোলীন মিশিয়ে সেটা খুব মসৃণভাবে মুখে মেখে নেবেন। তারপর লিপস্টিকের রং আঙ্গুলের ডগায় মিলিয়ে সেটা গালে ও নাকের পাশে দিয়ে দেবেন সুন্দর করে মিলিয়ে তারপর আর পাউডার দেওয়ার দরকার নেই। গরমকালে পাউডারের পাফটা ঝেড়ে শুধু সেটা একটু বুলিয়ে নিতে পারেন। এতে মুখ তেলতেলে ও মসৃণ দেখাবে। রাত্রে মাঝে মাঝে তুলোয় দুধ লাগিয়ে মুখে থুপে থুপে মাখলেও ভাল ফল পাবেন।

[illegible]
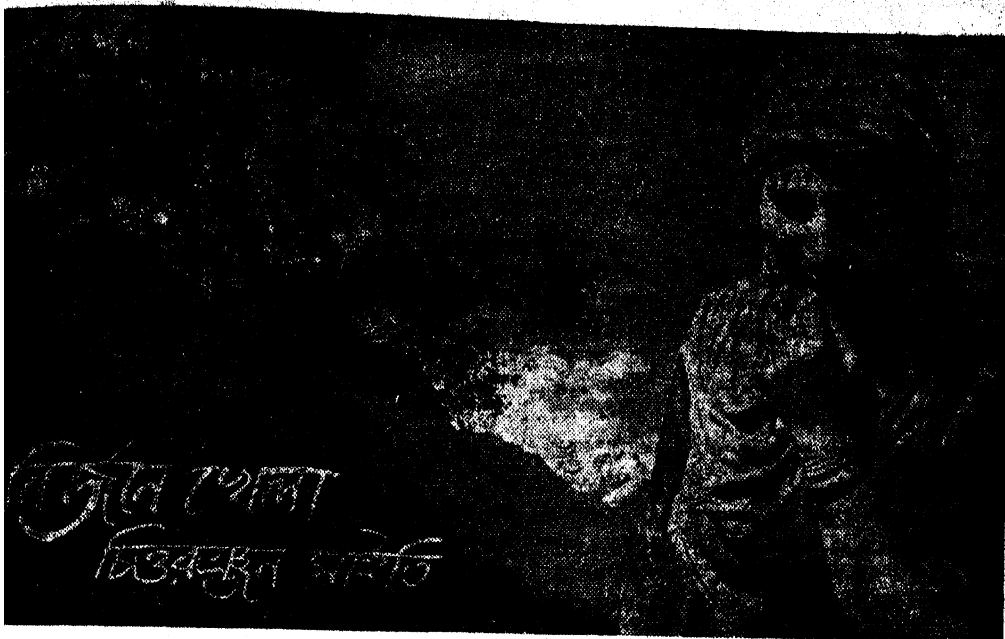
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মিসেস বেনন বললেন, নিশ্চয়ই। ায়কে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয় বাবা।

এই প্রথম মিসেস বেনন আমাকে 'মাই ন' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি এবার লেন, তুমি জুলিয়েনের বন্ধু, তাই লুর পিতাজীর কাছ থেকে তোমাকেই ম্মতিটা আদায় করে আনতে হবে। আর তামাকে একটা কথা বলে রাখি বাবা, লু তার বাবাকে যাতে নিজের কাছে রেখে া করতে পারে সে ব্যবস্থাও আমি করে ব।

বললাম, এব্যাপারে আশা করি পন্ডিত- ীর মত পেতে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি আর লিয়েন। ওদের কোয়ার্টারের আড়ালে সেই ওকে ধরলাম, ভেতরে ভেতরে প্ল্যান- না এতদূর গড়িয়ে নিয়ে গেছ! বালুর ঐ বেধ ছেলেটাকেও নিজের বশে চালিয়ে তে বাধল না?

জুলিয়েন বলল, ঐ হিপি ব্যাটাছেলে- ক যদি পেতাম, তাহলে বাচ্চাসমেত কে ওর ঘাড়েই চাপাতাম। ওর ভবঘুরে র ঘুচিয়ে বালুর কোঠীর দোয়ালে ওকে বাঁধার দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিতাম। আমি ওর কথা শুনে অনেকদিন পরে খুলে একচোট হেসে নিলাম।

জুলিয়েন বলল, তুমি তো আমাকে চেন ুখার্জী, আমি ঠিক তাই করতাম। ব্যাটা দিনে নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার বাইরে চলে । ওকে খুঁজে পাওয়াই দায় হবে। তাই টার ভার নিজেই বইব ঠিক করলাম। পান্ডিতজী সঙ্গে সঙ্গেই মত দিলেন। লন, আমার বালুর মা কানেতের মেয়ে বাবুজী। আমার মেয়ে বেনন পরিবারে গেলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোজ আমি চোখের জল ফেলতাম, আর রঘুনাথজীর কাছে প্রার্থনা জানাতাম যেন অতি দ্রুত আমার দিন ফুরিয়ে আসে। আমি এই দুনিয়া ছেড়ে সরে না গেলে আমার বালু কোনদিন সংসারী হতে পারবে না।

বললাম, আপনাকে এ পৃথিবী থেকে না সরিয়ে রঘুনাথজী নতুন একটা পথ তৈরী করে দিলেন।

পন্ডিতজী পাশে পড়ে থাকা রামচরিত মানসখানা মাথায় ঠেকিয়ে কাঁপতে লাগলেন।

মুশকিল হয়েছিল বালুকে নিয়ে।

ওকে ভ্যালিতে ডেকে এনে সব বুঝিয়ে বললাম।

বালু সব শুনে বলল, জীবনে একটা ভুল করেছি ঠিক, কিন্তু কোন মানুষকে তো আমি ঠকাই নি বাবুজী। জুলিয়েন সাহেবকে আমি জান গেলেও ঠকাতে পারব না।

বললাম, ঠকানোর কথাই উঠছে না বালু। জুলিয়েন সব জেনেই তোমাকে বেনন পরিবারে নিতে চাইছে।

বালু বলল, মানুষ যদি অন্যায়ের জন্যে আঘাত করে বাবুজী, তাহলে তাকে সহ্য করা যায়। কিন্তু কৃপা করলে তাকে সইতে পারা যায় না।

বললাম, জুলিয়েন অন্য ধাতের মানুষ বালু। ওর খেয়ালের সঙ্গে তোমার কিছুটা পরিচয়ও আছে। কিন্তু ও এমন বড় একটা হৃদয় নিয়ে জন্মেছে, যার নাগাল আমরা কেউ কোনদিন পাবো না। ও মানুষকে দূরে ঠেলে ফেলে দেবে, কিন্তু কৃপা দেখাবে না। আর হাত যদি সে বাড়ায় একবার, তাহলে তার ঐ চওড়া বুকের মাঝখানেই টেনে নেবে।

মানালীর অপূর্ব আলোকিত একটি সন্ধ্যা। বেনন পরিবার আজ জুলিয়েনের বিয়েতে পার্টি দিচ্ছেন। ছোট্ট টাউনের প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত। মদনলালকে জুলিয়েন নিজে গিয়ে ওয়েডিং কার্ড দিয়ে এসেছে। মদনলাল এসেছে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। না এসে জুলিয়েনকে অপমান করবে, যাতে এমন অতিরিক্ত মাথা কার কটা আছে।

লোকটা এখন বসে বসে রোস্ট চিবোচ্ছে আর দামী মদ গিলছে। মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে পিটপিট করে।

মিঃ লী সপরিবারে কুলু থেকে এসেছেন। তিনিও মিঃ বেননের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন। অতি অন্তরঙ্গ দুই পরিবার। জুলিয়েনের মুখে শুনেছিলাম, নিমন্ত্রণ পত্র কুলুতে চাচাজীর কাছেও পাঠানো হয়েছিল। তিনি নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন এবং নবদম্পতির জন্যে উপহার পাঠিয়েছেন বাহকের হাতে।

এক সময় আমার কাছে এসে মিঃ লী বললেন, ডাঃ মুখার্জী, আমার উপহার দেওয়া টাট্টু তোমাকে অসুখী করেছে কি?

বললাম, আপনার দেওয়া উপহারে শুধু আমিই নই, মানালীর বহু লোকই উপকৃত হচ্ছে।

মিঃ লী হেসে বললেন, তাহলে বলো ইয়াং ম্যান, উপহার নির্বাচনে আমারও কিছুটা কৃতিত্ব আছে।

হেসে বললাম, হাজার হাজার বার।

মিস লী এক ফাঁকে এলেন আমার সামনে। মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বললেন, চিনতে পারছেন?

বললাম, সম্মানীয় লী পরিবারের মানুষজনকে কি এত সহজে ভোলা যায়।

তাঁদের শিল্পবোধ, সম্ভ্রান্ত আচরণ মনে গাঁথা হয়ে আছে।

মিস লীকে কেউ চাপা গলায় ডাকতেই উনি চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। যাবার সময় আস্তে বললেন, মিঃ মুখার্জী, যদি কিছু মনে না করেন তো একদিন আমাদের ওখানে উইক এন্ড কাটালে দারুণ খুশী হব।

হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। আমিও দাঁড়ালাম। সজ্জিত গেটের ভেতর দিয়ে ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে এগিয়ে আসছে বর-বধূ। জুলিয়েন পরেছে এ দেশীয় কুলুবাসীদের পোশাক। জরির কাজ করা কুর্তা, সাদা পাজামা, মাথায় টুপি।

সুদেহী জুলিয়েনকে মনে হচ্ছে কুলুর সম্রাট!

পাশে নতমুখী বালু। আমি তাকে আর চিনতে পারছি না। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ওয়েডিং ড্রেসে বালুকে কোন রাজ পরিবারের উপযুক্ত বধূ বলে মনে হচ্ছে।

ওরা পরস্পর ওদের জাতীয় পোশাক বদলে নিয়েছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

বালুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, আড়ষ্টতার কোন চিহ্ন নেই। একটা কৃতজ্ঞতা-ভরা মিষ্টি হাসি ওর মুখে চোখে মাখানো।

আমি মনে মনে বালুকে শুভ কামনা জানালাম।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অনুষ্ঠান শুরু হল। মিঃ আর মিসেস বেনন দু-দিকে ধরে নব-দম্পতির সামনে হাজির করলেন নব্বুই বছরের বৃদ্ধা জুলিয়েনের পিতামহীকে। ধবধবে সাদা চুল পরিপাটি করে বেঁধে তার ওপর সোনালী স্কার্ফ জড়ানো। দামী ঘাঘরা, চোলি আর সুধানে ঝলমল করছে ছোট্ট দেহটি।

বৃদ্ধা সবার সামনে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন। ওরা নত হয়ে ওঁর পা স্পর্শ করল।

আজ থেকে সত্তর পঁচাত্তর বছর আগের একটি ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল। ক্যাপটেন বেনন আজকের জুলিয়েনের মতই তরুণ। তিনি পনের বিশ বছরের একটি সুন্দরী তরুণীকে তাঁর পাশে নিয়ে এমনি ব্যাঙ্কোয়েট হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

পার্টি ভেঙে গেলে আমি জুলিয়েন আর বালুর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বালুর চোখ দুটো আমার দিকে চেয়ে অসীম কৃতজ্ঞতায় করুণ।

আমি বাইরে এসে বাংলোর দিকে পা বাড়িয়েও থেমে গেলাম। আজ এখুনি ওখানে ফিরতে কেন জানি না ইচ্ছে করল না। আমি মানালসু নদীর ধারে চলে এলাম। কাঠের পুলের ওপর দাঁড়িয়ে চাঁদের আবছা আলোয় নদীর জলপ্রবাহের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমি বিশেষ কোন একটি কথা ভাবছিলাম না। অনেকগুলো এলো-মেলো টুকরো কথা মনে জেগে উঠে আবার হারিয়ে যাচ্ছিল। কথাগুলোর ভেতর অর্থের কোন মিল ছিল না, কিন্তু সবগুলোর ভেতর কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার সুর বাজছিল।

কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ কাঁধের ওপর কার ছোঁয়া পেয়ে চমকে ফিরে দাঁড়ালাম।

জুলিয়েন!

ও পোশাক বদল না করেই চলে এসেছে। বলল, অনুষ্ঠান এই মাত্র শেষ হল। তোমার খোঁজে বাংলোতে গিয়ে দেখি, তুমি নেই। ভাবলাম তুমি নিশ্চয়ই তাহলে নদীর ধারে এসেছ, তাই এখানেই চলে এলাম।

বললাম, আজ এভাবে চলে এসে ভাল করো নি জুলিয়েন। অনুষ্ঠানের প্রথম রাতটি পুরোপুরি বালুর জন্যে রাখা উচিত ছিল তোমার।

জুলিয়েন ওর চিরাচরিত সুরে বলল, থামো মুখার্জী, মনুবিবরানা দয়া করে আর কোরো না। এখানে সামনের অনেকগুলো রাত বালুর জন্যে জমা আছে আমার, কিন্তু আজকে তোমার এই নিঃসঙ্গ রাতে কেউ তোমার পাশে থাকবে না, এ হতেই পারে না। তোমার ভাবনার কারণ নেই, আমি বালুর অনুমতি নিয়েই এসেছি।

এতক্ষণ শুধু বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিলাম, এই মুহূর্তে একটা ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ল আমার হৃদপিন্ডের ওপর। এ ব্যথার জন্ম বন্ধুর হৃদয়ের উত্তাপে।

আমি শুধু জুলিয়েনের হাত-খানা আমার হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম। আমরা দুজনে নদীর তীর ধরে বাকী রাতটুকু হাতে হাত রেখে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিলাম।

এখন রোগী যেন ভেঙে পড়ছে আমার চেম্বারে। দূর দূর থেকে নানা ধরণের রোগী আসছে। সার্জারীতে এম এস ডিগ্রিটা রয়েছে, তাই এই ছোট্ট টাউনেও কঠিন অপারেশনের রোগীর ভীড় সব সময় লেগেই আছে।

জুলিয়েন আর বালু তো উঠে পড়ে লেগেছে। রোজ আমার চেম্বার আসা চাই। জুলিয়েন হয়েছে আমার পাবলিসিটি অফিসার। সারা কুলু ভ্যালির প্রান্তে প্রান্তে সে ছড়িয়ে দিয়েছে আমার নাম।

আমি মানালীর ভ্যালিতে বসে মাঝে মাঝে ভাবি, কি বিচিত্র মানুষের মন। যে মানুষগুলো একদিন মিথ্যা সামাজিক অপবাদের অজুহাতে আমার ছায়া মাড়াত না, আজ তারাই সম্ভ্রমে মাথা নইয়ে রেখেছে।

কাজের ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে একরকম থাকি, কিন্তু নির্জনে কখনো ভ্যালিতে এসে বসে থাকলে মনের অনেক গভীর থেকে একটা ব্যথার সুর উপত্যকা থেকে উঠে আসা কুয়াশার মত আমার চেতনার চারদিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সূর্যের শেষ আলোটুকু তুষার পাহাড়ের চূড়া থেকে আবীর রঙ মুছে নিয়ে চলে যায়। ধূসর ছায়া নামে দিগন্তে। আর তখন আমাকে ঘিরে এক আশ্চর্য করুণ রাগিনী বাজতে থাকে। পৃথিবীতে যত ব্যথার রাগরাগিনী আছে, তারা যেন একই সঙ্গে বেজে বেজে ওঠে। আমি কোন কোনদিন সম্মোহিতের মত সেই ব্যথার সাগরের ঢেউ দুহাতে সরাতে সরাতে বাংলোতে ফিরে এসে অবশ দেহটা বিছানায় ছড়িয়ে দিই।

বরফ বরফ আর বরফ। কদিন ধরে সমানে বরফ পড়ছে। পাইন আর সিডারের বনে উঠেছে হাওয়ার হাহাকার। আমি যখন নিঃসঙ্গ বাংলোতে বসে থাকি, তখন কান পাতলে বুকের ভেতর শুনতে পাই এমনি একটা গোঙানির শব্দ। ঝড়ের একটানা বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ।

গত ডিসেম্বরের এমন দিনগুলোতে আমি ছিলাম কুলুতে। রাতের ঘরগুলো ঝিমিয়ে উত্তপ্ত করে রাখত সমস্ত রাত ধরে হীটারটা জ্বালিয়ে দিয়ে। তারপর সারারাত ধরে বসে বসে আমরা কথা বলতাম। সে

সংলাপন কথায় জগতের কোন ধর্মশাস্ত্র বা হাকাব্য রচনা করা যায় না, কিন্তু দুটো দেয়কে একমাত্র সেই যোগসূত্রহীন কথাই াছে টেনে এনে বেঁধে দিতে পারে।

ক'দিন কোলি-রি-দেয়ালীর সুর দগেছে হাওয়ায়। পাহাড়ী দেশের টিকায় টকায় চলেছে নাচের মহড়া আর দীপ জ্বালানোর আয়োজন। টাটু নিয়ে পথে রোলেই গানের কলি কানের ভেতর দিয়ে কবারে বুকে এসে বাজছে।

হঠাৎ একদিন কি হল আমার, আমি নেক বুঝিয়েও নিজেকে ধরে রাখতে ারলাম না। ভাগ্তুকে ক'দিন বাইরে যাচ্ছি ল বেরিয়ে পড়লাম আমার টাটু চৈতককে গী করে। আমি পথে বিশ্রাম করতে রতে কখনো বিপাশার কূল ধরে কখনো বা াহাড়ের কোল বেয়ে এগিয়ে চলতে াগলাম। শেষে কোলি-রি-দেয়ালীর দিনটিতে সে পৌঁছলাম নাগ্গরের দেওদার বনে রা পাহাড়ের প্রান্তে।

আমি দূরে থেকে দেখলাম মেলার য়োজন। দোকানপাট, লোকজনের মিছিল। রা দ'পুরে ঘুরলাম নদীর বাঁকে বাঁকে। দখা হল সেই গাদ্দী দলটির সঙ্গে। দ্দীরা আমার দিকে কলি এগিয়ে দিলে র গাদ্দানরা উপহার দিলে চোখের াউনি। আমি ওদের সঙ্গে পুরো একটি ছর পরে গাদ্দী ভাষায় কথা বলতে ওরা বে খুশি হয়ে উঠল। আমাকে ছাড়তেই য় না। তবু আমাকে চলে আসতে হল।

ওদের কাছে আমি সে রাতের মত রেখে লাম আমার চৈতককে।

অপরাহ্ণের হলুদ আলোয় আমি সেই াশ্চর্য পাহাড়ে উঠে এলাম। ঝোরার স্রোত মনি বেরিয়ে আসছে পাহাড়ের মাঝ য়ে। আমি পাহাড়ের নীচে হলুদ সর- ানের ক্ষেত দেখলাম। ঝোরার জল অঞ্জলি র হাতে তুলতেই মনে হল ঝিম্রির গলায় যেন চেঁচিয়ে উঠল। আমাকে বারণ করল জল খেতে।

আমি চমকে পেছনে ফিরে কাউকে দেখতে লাম না।

এবার কে যেন আমাকে ইশারা করল ঐ হার ভেতর থেকে। আমি অন্ধকার গুহার তর ঢুকে জলের ধারায় পা ডোবাতে বাতে এগিয়ে চললাম।

সেই শিলাটি তেমনি পাতা আছে, ানে আমি আর ঝিম্রি বসেছিলাম গত সম্বরে। আমি বসলাম। মনে হল আমার জানালার ভেতর ঢুকে পড়েছে ঝিম্রি। ার সারা শরীরে তার উত্তাপ ছড়িয়ে ছে।

এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। আরও অনেক- খানি এগিয়ে আলো দেখতে পেলাম। ঐ তো সেই মেলা। ঐ তো নাচের আসর। সাদা পোশাকে সজ্জিত পুরুষেরা বৃত্ত রচনা করে ঢেউ তুলে তুলে বৃত্তের মাঝে এগোবার চেষ্টা করছে, আবার ফিরে আসছে। বৃত্তের কেন্দ্রে রঙীন পোশাকে ফুলের পাপড়ির মত ফুটে আছে মেয়েরা।

কে যেন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, তোমাকে না এতখানি এগিয়ে যেতে বারণ করেছি।

আমি পিছিয়ে এলাম। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

গত ডিসেম্বরের মত এবার কোলি-রি- দেয়ালীতে কিন্তু ঝড় উঠল না।

সন্ধ্যার আগেই মেলা ভেঙে গেল। ছায়া ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শীত যেন পাহাড়ের গুহা গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল হায়েনার কামড় নিয়ে।

আমি রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর পথে উঠতে লাগলাম। আমার বিশেষ শীত বোধ হচ্ছিল না। মনে হল আমি আমার কথা রাখতে এসেছি।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম। পথের ওপর একফালি আলো এসে পড়েছে। কাঠের কেল্লা। খোলা জানালার পথে দেখা যাচ্ছে, মদনলাল তেমনি ড্রিংক করে চলেছে। একটু পরে সম্ভবতঃ মদনলালই কেল্লার মন্দির থেকে হাউই ছাড়ার নির্দেশ দেবে।

আমি দু'একটা কুহুলের শব্দ শুনতে শুনতে উঠে এলাম ঝিম্রির কোয়ার্টারের কাছাকাছি। আমি জানি, একটা নেশার ঘোরে আমি নাগ্গরে চলে এসেছি। ঝিম্রি নেই, জনপ্রাণী নেই, কেউ থাকতে পারে না। তবু এসে দাঁড়ালাম ওর কোয়ার্টারের মুখোমুখি।

একি! এক টুকরো আলো বন্ধ ঘরের রন্ধ্র দিয়ে সোনার কাঠির মত এসে পড়েছে পথে।

আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে চোখ পাতলাম সেই রন্ধ্রপথে।

ঝিম্রি, আমার ঝিম্রি বসে আছে!

আমি চীৎকার করে ডেকে উঠলাম, 'ঝিম্রি ঝিম্রি ঝিম্রি।

আশ্চর্য, আমার গলা দিয়ে এক বিন্দু স্বর বাইরে বেরিয়ে এল না।

ঝিম্রি তেমনি ফায়ার প্লেসে আগুন জেলে বসে আছে। প্রপাতের মত খোলা চুলে তার মুখ আর হাতের অনেকখানি ঢাকা।

আমি মুখে একবার উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলাম, আমি আমার কথা রেখেছি ঝিম্রি। কোলি-রি-দেয়ালীর দিনে নাগ্গরকে আমি ভুলি নি।

হঠাৎ হাউই উঠল-আকাশে। ঝিম্রি উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ঠেলে খুলে দিল জানালাটা। অমনি উঠোনে ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সোনার ঈগল।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ঝিম্রির ঘৃণা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি সেই আলোর সীমানাটুকু দ্রুত পার হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নামতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হল দূরাগত ধ্বনির মত একটা শব্দ বেজে উঠল, ছোটেসাহেব, ছো-টে সা-হে-ব!

এ কি ঝিম্রির কণ্ঠস্বর! আরও দ্রুত আমি নীচে নামতে লাগলাম। বড় বিপজ্জনক পথ। আমার আত্মাভিমান সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে আমাকে উৎরাইয়ের পথে টেনে নিয়ে চলল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! শব্দটা কি এগিয়ে আসছে আমাকে অনুসরণ করে? সে ডাক কি সারা পাহাড় জুড়ে কান্নার মত ছড়িয়ে পড়ছে? ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে? কোন্‌দিকে পালাব? কিছু বুঝতে না পেরে আমি বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে ডাক যেন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। একেবারে আমার বুকের ভেতর বাজছে।

উপত্যকা থেকে অজস্র আলোর রেখা টেনে অন্ধকার আকাশের বুকে উঠে আসছে হাউই। আকাশ ভরে আলোর ফুল ফুটছে, আবার ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে পাপড়ি- গুলো। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এই উৎসব দেখতে লাগলাম।

— শেষ —

বাবা-মার সঙ্গে

আজকের কলাকার মমতাশঙ্কর

মমকে দেখেছি অনেকবার। কিন্তু মমতাশঙ্করকে প্রথম দেখলাম সীতা-স্বয়ংবরায় শ্রীরামচন্দ্ররূপে — যেখানে তিনি মহাকাব্যের মহানায়ক। এখানে তিনি নৃত্যাভিনয়ের কুশলী কলাকারই নন সীতা-কান্তের রাম হয়ে উঠেছেন। অন্তরের অতল ধ্যানলোকে রাম সত্য হয়ে না উঠলে প্রতিটি পদক্ষেপে ভঙ্গীতে চাউনিতে সংযত আত্ম-প্রকাশে রাম এমন জীবন্ত হয়ে উঠতেন না। দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের মত রামের দেব-মহিমা এমন করে দর্শকচিত্তে ভাবগরিমায় নিষ্কম্প দীপটি জ্বেলে দিতে পারত না।

চোখের সামনে এখনও ভাসছে রামের পথ চলার সেই দৃপ্ত মর্যাদা গম্ভীর রূপটি। রাম হাঁটছেন অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে একই ভূমিতে। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন সবার সঙ্গে সমান তালে চলেও তিনি সবার থেকে আলাদা—সবার প্রতি তাঁর স্নিগ্ধ সহাস হাসির উত্তর আছে প্রসন্ন উদার ব্যবহার কিন্তু সবার মধ্যে থেকেও তিনি যেন কারো মাথাই নেই। তাঁর দৃষ্টি উর্ধ্বে সর্বাই অনাকে কে।

মনে পড়ে আর একটি দৃশ্য। বশিষ্ঠের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণ যাচ্ছেন রাক্ষস নির্মূল করে ঋষিদের তপোবনকে আকণ্টকশূন্য করতে। পথে একটা নালা বা ঝোপ জাতীয় কিছুকে অতিক্রম করবার জন্য এক লাফ দিলেন। চলতি বাংলায় তাকে লাফানোই বলে। কিন্তু একটি পা পিছনে রেখে অন্যটি এগোনর মনোহর ভঙ্গী আর দুটি পায়ের এক লহমার জন্য শূন্যে সর্বাস্থিতির সেই গতির ছবি দেখে মনে হয়েছিল রাম যেন মাটিতে পা রেখে হাঁটছেন না—সবার থেকে অনেক ওপরে মহাশূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন—ত্রিভুবনের রাজরাজেশ্বর হয়ে। মানুষের সংসারে মানুষের জীবনে জীবন যোগ করতে এলেও ভগবান মাঝে মাঝে তুচ্ছ ঘটনার দর্পণে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেন। অসতর্ক মুহূর্তে ঝলকে ওঠে তাঁর জ্যোতি-র্ময় উদ্ভাস। এমনই এক অনুভূতিকে আস্বাদ করলাম সীতার সঙ্গে রামের প্রথম দর্শনের মুহূর্তে। সীতা মহাদেবের মন্দিরে যাবার আগে সখীদের সঙ্গে পুষ্প-চয়নে রত। সেইখানে অকস্মাৎ রামের প্রবেশ। রামকে দেখে সীতার লজ্জাগ্রস্ত পলায়ন। রামও পুরুষোচিত সংকোচে চলে যাচ্ছেন। যাবার আগে এক মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সীতাকে দেখলেন। সে দৃষ্টির মধ্যে ঝরে পড়ল করুণাঘন অন্তরের মমতাভরা কোমলতাই শুধু নয়—তার মধ্যে মিশে ছিল যেন জমাট বাঁধা বিষণ্ণতা। কেন? অন্তর্যামী রাম যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন—রামের ভাবী জীবনসঙ্গিনী সীতাকে আজীবন কি দুঃসহ দুঃখের মধ্য কাটাতে হবে। এমনই ছোট-বড় সব কিছুর মধ্যে রামকেই যেন দেখি। যতবার সীতা-স্বয়ম্বরা দেখি ততবারই। আর ততবারই মনে হয় তাই ...! মম আমাদের সে মম আর নাই ...

এখানে সেখানে নানান শো-এ পার্টিতে মমকে যখন দেখি তখন অতি সরল লজ্জা নম্র এক কিশোরী এবং সেই কিশোরীকে বালিকা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মধ্যে যেন ও হারিয়ে যায়। কিন্তু স্টেজে? একশ নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে দাঁড়ালেনও এবং যে কোন কোণেই দাঁড়াক মমকে মমতা-শঙ্কররূপে চোখে না পড়ে উপায় নেই। সচেতন প্রয়াস ছাড়াই সেখানে ও এক ও অনন্য। চিত্রাঙ্গদা যুগছন্দ কিংবা উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের আরো আগের প্রযোজনা পরিচয়-এর (১৯৬৬তে) কথাই ধরব না যখন ও আরো ছোট বয়সের দিক থেকে অপরিণত কিন্তু নাচ শুরু করতে না করতেই রূপকথার সেই সোনার কাঠির স্পর্শের মত চেতনার মতই ওর মধ্যে কে যেন জেগে ওঠে। না চিনে উপায় নেই এই মেয়েই মমতাশঙ্কর উদয়শঙ্করের মেয়ে।

সেদিন মম-র সঙ্গে গল্প করতে করতে জানতে চাইলাম নাচ সম্বন্ধে ওর ধারণা

ধারণার খবর। আনন্দ যত সপ্রতিভ, যাকে বলে স্বল্পবক্তা মন একেবারেই তার উল্টো। এধার দিয়ে মেয়ে পেয়েছে বাবার স্বভাব। নাচ দিয়ে নিজের বক্তব্যকে বলতে যতখানি পটু ঠিক ততখানি লাজুক কথায় প্রকাশ করতে। আনন্দ পেয়েছে মায়ের ধারা। নিজের শিল্পকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এঁকে দিতে পারে শুধু সঙ্গীত দিয়ে নয়। কথা দিয়েও। কিন্তু কথা বলছি—এ সচেতনতা যখন মন থেকে মুছে যায় তখন ওর কথাও হয়ে ওঠে নাচের মতই উপভোগ্য।

আমি নাচ ছাড়া নিজেকে ভাবতেই পারি না। হঠাৎ কোনো বাজনা শুনলে আমার সারা মন যেন আপনা থেকেই নেচে ওঠে। আমি কখন নাচ সুরু করে দিই বুঝতে পারি না। অনেক সময় এমন হয় পাশের বাড়ী কি সামনের বাড়ী থেকে রেডিওতে কোনো গান কি সেতার বেজে উঠলো—আমার পা দুটোও অমনিই চঞ্চল হয়ে উঠলো। যা মনে আসে নেচে চলি। হুঁশ থাকে না আমার চারপাশে কে বা কারা আছেন। হঠাৎ একসময় দেখি মা দাদা দিদিমা বৌদি সবাই দাঁড়িয়ে আমার নাচ দেখছেন এমন করে যেন আমি কতবড় একটা হিরোইন। তখন এত লজ্জা করে।

আমি নাচি না নেচে পারি না বলে। কিন্তু আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের এত অভাব কি বলব। সবসময়ই স্টেজে নাচবার আগে মনে হয় আমি পারব না। এ আমার দ্বারা হবে না। মা দাদা গুরুজী (রাঘবন) যখন জোর করেন ঠিক হবে—নিশ্চয় হবে—আমার কান্না পায়। যা পারব না তার জন্য এত জেদাজেদি করা কেন? কিন্তু—বড়রা যে ভুল বলেন না সে কথা বুঝতে—পারি নাচ সুরু করবার সংগে সংগেই। আপনি সীতা স্বয়ংবরার রামের নাচ দেখে এত উচ্ছ্বসিত? কিন্তু ঐ রামের রোল আমায় দেওয়া হবে শুনেই আমি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম কি বলব।

রাম তোমার নৃত্যজীবনে একটা দিক-চিহ্ন এক বিস্ময়কর প্রতিভার—অন্তত আমাদের চোখে। যারা উদয়শংকর কালচারাল সেণ্টারের সুরু থেকেই তোমার নাচ দেখে আসছি।

আমার নিজের কাছেও তাই। জ্ঞান হবার আগেই আমার কানের মধ্যে সব-সময় ঢুকছে সুর। চোখের সামনে নাচ। বাড়ীতে সবসময় নাচের রিহার্সাল—অর্কেস্ট্রা কম্পোজিশন এই সবই চলছে। মা বাবাকে দেখতাম সবসময় নাচের আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করতে কখনও কাগজে এঁকে স্টেজে কে কোথায় কিভাবে দাঁড়াবে সেইসব প্যাটার্ণ তৈরী করছেন—কখনও ছাত্রদের ছেলেমেয়েদের নাচ শেখাচ্ছেন। এই সব দেখতে দেখতে—কখন যে আমার মধ্যে নাচ এসে গেলো বুঝতেই পারিনি। বাবা সেদিন একটা মুভি দেখাচ্ছিলেন—চার কি পাঁচ বছর বয়সে আমি নিজের মনে দারুন নাচছি কত-রকম ভংগীতে ছন্দে। আমাকে না জানিয়ে বাবা ছবি তুলে রেখেছিলেন। দেখতে এত মজা লাগছিলো। আমার এখনও মনে আছে আমার বয়স তখন ছয় কি সাত হবে: শো-এর সময় স্টেজে মা-বাবার নাচ হচ্ছে আর আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ওঁদের নকল করে নাচছি। আমার মনে হোতো অডিটোরিয়মের সবাই আমার নাচই দেখছেন।

উদয়শংকর কালচারাল সেণ্টার যখন সুরু হোলো আমি ভর্তি হলাম ছোটদের দলে। কিন্তু আমার সবসময় ইচ্ছে করত আমি বড়দের সংগে নাচি। মা বারণ করতেন। রাঘবনজী কিন্তু আমার মতেই সায়

দিতেন। মাকে বলতেন দিননা একটু নাচতে। —ওর যখন এত ইচ্ছে। নাচতাম। একটুও কঠিন লাগত না। খুব আনন্দ হোতো ১৯৬৬-তে পরিচয়-তে তারপরে অর্ঘ্য—বাসবদত্তা-তে নেচেছি। তখনও নাচটা খেলারই মত মনে হোতো। সিরিয়াস হলাম সীতা স্বয়ংবরায় রামের রোলে। তখন মনে হোলো নাচকে আর খেলা ভাবা চলবে না। কেমন একটা গম্ভীর গম্ভীর ভাব অজানতেই এসে গেলো আমার ভাবনায় চলায় বলায়। মনে হোলো আমি এখন আর ছোট নেই।

রামের ভূমিকায় যখন নাচি ভুলে যাই আমি 'রাম'। তখন মনে হয় আমি যেন রামায়ণের সেই অযোধ্যার মানুষ। লক্ষ লক্ষ প্রজা, পুরবাসীর দায়িত্ব আমার ওপর। অভিষেকের দিনে স্টেজ থেকে অডিটোরিয়ম দিয়ে হাঁটবার সময় যখন সবাই 'জয় জয় রাম' ধ্বনি দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে যায় মনে হয় ওদের নিয়ে আমি যেন অযোধ্যার পথ দিয়ে হাঁটছি। অডিটোরিয়মে আমার কত বন্ধু বসে থাকে। তাদের পাশ দিয়ে চলে যাই কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ে না। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকি।

শো-এর শেষে ব্যাকস্টেজে যখন বড়রা দেখা করতে আসেন (দিদিমা এবং তাঁর বয়সীরাও) আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে ও'রা বাধা দেন 'পা ছুঁয়ো না, তুমি এখন রাম' বলে হাতজোড় করে আমায় প্রণাম জানান। আমার চোখে জল এসে যায়।

ঠিক এই রকমই একটা অসহায় কান্নার ভাব আসত যখন 'প্রকৃতি আনন্দ'-র শেষ দৃশ্যে বাবা বুদ্ধ সেজে দাঁড়াতেন আর স্টেজের সবাই উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করত। তখন মনে হতো 'বাবা' যেন আমার মিষ্টি বাবা নন—স্বর্গের দেবতা। আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তখন এত কান্না পেতো কি বলব।'

'আর যুগছন্দ? ওটাও তো একটা নতুন একসপেরিমেন্ট?

যুগছন্দ নতুন একসপেরিমেন্টই। ঠিক যেন একটা মজার খেলার মত—ওঃ, সন্ধ্যাদি বলতে ভুলে গেছি। অমৃতে সীতা স্বয়ংবরার আপনি খুব সুন্দর একটা রিভিউ লিখেছিলেন। বাবা সেটা পড়ে সেই পাতাতেই মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন—'একটি মেয়ের নাচ দেখলাম সীতাস্বয়ংবরার রামের ভূমিকায়। ভারী সুন্দর নেচেছে। সে খুব বড় ড্যান্সার হবে।'—আমার কাছে অমৃতের সেই কাগজটা এখনও আছে।—সেই ছোট্ট কাগজে লেখায় বাক্ত মতামতই নিশ্চয় তোমার কাছে সবচেয়ে দামী অভিজ্ঞতা?

ঠিক বলেছেন। বাবার সেই লেখা আমার কাছে একটা স্মরণীয় আনন্দের ঘটনার মত। আর একবার। ১৯৭০ সালে শংকরস্কোপ শুরু হবার আগে আমি ভারতনাট্যম নেচেছিলাম। সেদিন ছিলো বাবার জন্মদিন। বাবা দেখে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন 'আমি আমার সন্তানের জন্য গর্বিত।' সেদিন আনন্দে আমার ঘুম আসেনি।

তারপর?— যুগছন্দর কথা কি বলছিলে?

ওঃ হ্যাঁ, জানেন যুগছন্দ ত আমাদের চারপাশে যা দেখি সেই জীবনকেই নাচের মধ্য দিয়েই দেখানো? তাই মনে হয় এতে যেন নাচছি না। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের চেনা মানুষগুলোকে অন্যকে চেনাচ্ছি। এটা ঠিক ক্যারিকেচার নয়। খানিকটা খুনসুটির মত করে পিছনে লাগা, নকল করা। এর কোনো নাচই শেখানো নয়। যে যেমন খুসী নেচেছি

দার মিউজিকের ছন্দকে অনুসরণ করে। ...ভাবিক [illegible] হাসিখুশী—এইগুলো ...চ হয়ে উঠেছে। [illegible] 'আজ ইট ইজ' ...সুন্দর [illegible] এই আশ্চর্য ...কনিক বাবাই। আমার মা নাচ কম্পোজ ...রবার সময় এই টেকনিকই মেনে চলেন। ...রো ওপর কোনো কিছু চাপান না। যাকে ...মন খুশী নাচতে বলেন। তবে লয় ঠিক ...কা চাই। শুধু নাচের শেষে দেখিয়ে দ্যান ..., মুভমেন্টে যার ছন্দ ও ভঙ্গী যাচ্ছে কি ...রলে সেটা আরো সুন্দর হতে পারে। ...ক্ষার দিক থেকে মার কাছে আমি যে কত ...ণী বলতে পারি না।

মা যখনই সুযোগ হয়েছে আমায় বাইরে ...য়ে গেছেন। আমি তিনবার আমেরিকা ...ছি—ইউরোপ ৬ মাস বয়সে প্রথম, তারপর ...বশ কয়েকবার। প্যারিসে মডার্ন ব্যালে ...আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিলো। বিশেষ ...রে 'ওল্ড অ্যান্ড ইয়ং' টাইটেলের একটি ...লে। জিগোরাস ফিলিং নাচকে কি দারুণ-...বে জীবন্ত করে তোলে। ব্যুগছন্দে ঐ ...স্পিরিট আমায় খুব উদ্দীপ্ত করেছিলো।

শুনলাম তুমি ফিল্মে যোগ দিচ্ছ? সত্যি?

হ্যাঁ। সে-ও এক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। গত এক বছর ধরে নানান ডিরেক্টার এ-বিষয়ে মাকে অনেক অনুরোধ জানিয়েছেন—আমায় যেন রোল অফার করে। মা কিছুতেই রাজী হননি। কিন্তু মৃণালবাবু বিশেষ করে আমারই জন্য একটা স্টোরি লিখিয়েছেন প্রেমানন্দকে দিয়ে। এতে যে নাচ আছে তা নয়। তবে খুব লিরিক্যাল আর নায়িকার প্রত্যেকটি জেসচার হবে নাচেরই মত। প্রথমতঃ, প্রেস্টিজ ফিল্ম, দ্বিতীয়তঃ আদাবওয়ে স্টাইল ভাব—এই দুটি কারণেই মা রাজী হলেন।

হঠাৎই ও বলে উঠলো, একদিক দিয়ে আমি খুব লাকি, আবার অন্য দিক দিয়ে আমার চেয়ে আনলাকি কেউ নেই।

আনলাকি কেন?

এক সময় আমার মনে সন্দেহ আসে—আমি উদয়শংকর-অমলাশংকরের মেয়ে বলেই কি সবাই আমার এত প্রশংসা করছেন জাস্ট টু প্লিজ মাই পেরেন্টস? এমনও ত হতে পারে আমার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিভাবান শিল্পী আছেন যাঁরা আমার মত সুযোগ পান না বলেই নাম করতে পারছেন না। আমি খুব সহজেই যে-কোনো বড় স্টেজে নাচতে পারি। যে-কোনো দেশের গুণীগুণীর সুবিধা পেতে পারি, বিরাট পার্সোন্যালিটিকে নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে পারি। এ-চান্স কি সবাই পায়? পেলে তাঁরাও বিখ্যাত হোতো। সেইজন্য আমাদের ইনস্টিটিউশনে কেউ ক্লাস দেখতে এলে আমি সব সময় মা-কে বলি—আগে থেকে আমার পরিচয় দিও না। লেট মি সি ফার্স্ট হোয়াট দে সে এবাউট মাই ডান্স।

পরীক্ষার ফলাফল কেমন?

ভালই। মম হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে যায় তবু দ্বিধা জাগে আমার নাম সত্যিই কি আমার যোগ্যতায়, না, মা-বাবার মেয়ে বলে?

এই অসাধারণ আত্মবিশ্লেষণের শক্তিই চিনিয়ে দিলো শিল্পী মমতাশঙ্করকে।

সন্ধ্যা সেন

নারী বর্ষে

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে মহিলাদের ক্রীড়াঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত ঘটালে মনে হতে পারে যে ওই মহলটি আজ রীতিমতো সংগঠিত। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেয়েরাও অধুনা মহা উৎসাহে খেলাধূলার চর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁদের ক্রীড়ামানের উন্নয়ন ঘটছে অবিশ্বাস্যভাবে। সময় সময় মিশ্র আসরে আবির্ভাব ঘটিয়ে মেয়েরা ছেলেদের ওপরও টেক্কা দিয়ে বসছেন।

এ সব দৃষ্টান্তই এগিয়ে যাওয়াকালের প্রতীক। নারী প্রগতির সঙ্গে সুসমঞ্জস। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে খেলাধূলার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে, নিছক চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে ক্রীড়া অনুশীলনের সুযোগ মহিলারা সহজে হাতে পাননি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবেই তাঁদের স্বাধিকার অর্জন করতে হয়েছে।

সার্বিক ক্রীড়া চর্চার মূল প্রেরণা এসেছে যে দেশ থেকে, যে দেশের মাটিতে সর্বজনীন ক্রীড়া ও ওলিম্পিকের জন্ম সেই দেশের ইতিহাস সাক্ষী যে সেই দেশেও একদা মেয়েদের ক্রীড়া চর্চার অধিকার ছিল না। ইতিহাস ও প্রাগৈতিহাসিক কিংবদন্তী বলে রেখেছে যে প্রাচীন গ্রীসে ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগ দেওয়া তো দূরে থাকুক, দর্শক আসনে উপবিষ্ট থাকার অধিকারটুকুও মহিলাদের ছিলনা। সে আমলে গ্রীকেরা ওলিম্পিক ক্রীড়াকে ধর্মানুষ্ঠান রূপে গণ্য করতো। অথচ ধর্মাচরণে নারীর কোনো অধিকার ছিল না।

উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত রাজাজ্ঞার অনুশাসন ছিল অমোঘ। ওলিম্পিক আসরে কোনো নারী উপস্থিত থাকলে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হোত। এমন নির্দয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কিন্তু পুরাকালে সব গ্রীক ললনা ওলিম্পিক আসরে উপস্থিত থাকার [illegible] [illegible]

পারেন নি। শোনা যায় খৃষ্ট-জন্মের ৩১৬ বছর আগে ৯৬তম ওলিম্পিক আসরে মুষ্টিযোদ্ধা পুত্রের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করতে ক্যালিপাত্তেরিয়ার রোডসের এক গৃহবধূ পুরুষের ছদ্মবেশে দর্শক আসনে উপস্থিত ছিলেন। পুত্র ওলিম্পিক বিজয়ীর সম্মান পেতেই জননীর আবেগ আর বাঁধ মানতে চায় নি। দু হাতে জড়িয়ে ধরে জননী স্নেহ-চুম্বনে কৃতী পুত্রকে বিজয় অভিনন্দন জানাতে থাকেন। আর সেই মুহূর্তে তাঁর ছদ্মবেশের স্বরূপ জানাজানি হয়ে যায়।

মারাত্মক অপরাধ। বিধর্মীসুলভ পাপাচরণ। হয়তো এই পাপেই পিসিডোরাস জননী ফেরনিসকে প্রাণে মেরে ফেলা হোত। কিন্তু ওলিম্পিক ক্রীড়ায় তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে চেয়ে গ্রীক শাসনকর্তা সেই অপরাধকে ক্ষমা করে দেন। অভিযুক্তা জননীর পুত্র ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পিসিডোরাস এবং তাঁর পিতা হলেন তত্তোধিক বিখ্যাত ডায়গোরাস, যিনি ৭৯তম ওলিম্পিক ক্রীড়ায় সেরা মুষ্টিযোদ্ধার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। দু দুজন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে রক্ত সম্পর্কে জড়িত এই গ্রীক ললনা সেদিন অব্যাহতি পেয়ে যান।

তবে এই দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রীস মহিলামহলকে ওলিম্পিক তথা ক্রীড়া চর্চা সম্পর্কে বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তারই পরিণামে অদূর ভবিষ্যতে [illegible] [illegible]

আরও একটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন ঘটে যেখানে কর্মী, সংগঠক এবং প্রতিযোগিনীরা ছিলেন শুধুই নারী। মহিলাদের এই স্বতন্ত্র ক্রীড়ানুষ্ঠান হেরেয়া নামে চিহ্নিত হয়েছিল। ওলিম্পিকের রীতি অনুসারে হেরেয়ার আয়োজন ঘটতো প্রতি চার বছর অন্তর। মহিলাদের এই ক্রীড়াযজ্ঞের নেত্রী ছিলেন সুবিখ্যাতা হিপ্পোডেমিয়া।

নিষেধাজ্ঞা জারী করেও মেয়েদের খেলাধুলোয় বঞ্চিত করে রাখার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবার পর অমন্যোপায়ে পুরুষ সমাজ শেষ পর্যন্ত ওলিম্পিক অঙ্গনের দরজা মহিলাদের উন্মোচন উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ফলে এই আসরেই দ্রুত দৌড়ে এক গ্রীক তরুণী চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পান। ১২৮ তম ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের বিজয়িনী তিনি। নাম বেলিসিকো, নিবাস ম্যাসিডোনিয়া। ইতিহাস স্বীকৃত ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তালিকার প্রথম মহিলা সম্ভবতঃ এই বেলিসিকাই। তবে প্রাচীন গ্রীসের ক্রীড়াজীবনের অনেক তথ্যই কালের জীর্ণ ভগ্নস্তূপের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে বলে এ সম্পর্কে সত্যে পৌঁছানো কঠিন। মোটামুটি ধারণা এই যে হিপ্পোডেমিয়া মহিলাদের জন্যে হেরেয়া অনুষ্ঠানের প্রবর্তন ঘটানোর আগেও হয়তো মহিলারা খেলাধুলোয় অংশ নিতেন। খৃষ্টপূর্ব ১২৫৫ সালের রাজকুমারী অ্যাটলানটার রথ চালনায় সংশয়াতীত পাকা হাত ছিল। তাছাড়া পরবর্তীকালে উদ্ধারপ্রাপ্ত ওই সময়কার কয়েকটি স্থাপত্য নিদর্শনের মাধ্যমে মহিলাদের ক্রীড়াচর্চার বিষয় সমর্থিত হয়েছে। এই সব নিদর্শন ক্রিটের অধিপতি মিনসের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে।

আধুনিককালে ওলিম্পিক ক্রীড়া পুনরুজ্জীবিত হলে এই অনুষ্ঠানের গোড়ার পর্বে ক্রীড়াভূমিতে মেয়েরা উপস্থিত থাকেন নি। আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রথম অনুষ্ঠান হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে মহিলাদের ক্রীড়াচর্চা অবশ্য নিষিদ্ধ ছিল না। তবে এথেন্সের ক্রীড়াসূচীতে মহিলাদের জন্যে স্বতন্ত্র বিভাগীয় অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাঁরা অংশ নিতে পারেন নি। তবে বলাবাহুল্য যে এথেন্সের ওলিম্পিক স্টেডিয়ামের দর্শক আসনে তাঁরা হাজির ছিলেন।

তবে শুধু এথেন্সেই নয়, চার বছর পর প্যারিসে দ্বিতীয় ওলিম্পিক ক্রীড়া উপলক্ষেও প্রতিযোগিতার আসরে কোনো মহিলাকে দেখতে পাওয়া যায় নি। ঠিক ঠিক হিসাবে আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার তৃতীয় অনুষ্ঠান কেন্দ্র সেন্ট লুইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দেই মহিলাদের সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেখা যায়। সেন্ট লুইতে মহিলাদের তীর ছোঁড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রতিযোগিতা জয় করে মার্কিণ তরুণী এম সি হাওয়েল একাই দু দুটি স্বর্ণপদক পান।

সেন্ট লুইতেই সুরু! তারপর ওলিম্পিক ক্রীড়াসূচীতে ধীরে ধীরে মহিলাদের বিভাগীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন ঘটতে থাকে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহিলাদের সাঁতার এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মহিলাদের অ্যাথলেটিকসের আয়োজন ঘটায় ওলিম্পিক আঙিনায় মহিলা ক্রীড়ার জোয়ার বইতে থাকে। ক্রমে কালান্তরে এই আসরেই মহিলাদের অসিচালনা, জিমনাস্টিকস, ভলিবল ইত্যাদি খেলাধুলোর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যক্তিগত সাফল্যের অবিমিশ্র পরিচয়ে বিশ্বক্রীড়া ওলিম্পিকের অ্যাথলেটিক ট্র্যাকের ধারে প্রথম সাড়া জাগিয়ে তোলেন মার্কিণ তরুণী মিলড্রেড ডিডরিকসন। তিনি ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলস অ্যাথলেটিকসে দুটি সোনা ও একটি রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন। মিলড্রেড ছিলেন সত্যকারের চৌকশ ক্রীড়াবিদ। উত্তরপর্বে সাঁতার, স্কেটিং, টেনিসেও হাত পাকিয়েছিলেন এবং গলফ খেলতে নেমে সর্বশ্রেষ্ঠার স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

অ্যাথলেটিকসে মহিলাদের সম্ভাবনার যে প্রতিশ্রুতি মিলড্রেডের মধ্যে দেখা গিয়েছিল ১৯৩২ সালে, ১৯৪৮-এ সেই সম্ভাবনা পূর্ণতায় প্রতিভাত হয়। ক্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েনের সাফল্য ঘিরে। ওলন্দাজ গৃহবধূ শ্রীমতী ফ্যানি লণ্ডন ওলিম্পিকে একাই অ্যাথলেটিকসে এক গণ্ডা স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কোনো মহিলা ওলিম্পিকের অ্যাথলেটিকসের এক অনুষ্ঠানে এতগুলি স্বর্ণপদক সংগ্রহে সফল হন নি। তবে অ্যাথলেটিকসে মহিলারা যে পিছিয়ে থাকার পাত্রী নন এ কথার প্রমাণ রাখতেই বুঝি অস্ট্রেলীয় তরুণী মারজোরি জ্যাকসন-ও বেটি কাথবার্ট, নিগ্রো উইলমা রুডোলফ এবং পূর্ব জার্মাণীর রেনেট স্টেচার ক্যানির ধারা অনুসরণে এক একটি ওলিম্পিকে অ্যাথলেটিকসে একাধিক স্বর্ণপদক জয় করেছেন।

সাঁতারে মহিলাদের সাফল্যের কথা তো সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে মহিলা সাঁতারের আন্তর্জাতিক মান প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। তাছাড়া একেবারে কৈশোরেই অনেকে জগতজোড়া নাম কিনে নিচ্ছে। ওলিম্পিক পুলে মহিলা সাঁতারুদের মধ্যে অনেকেই একার সামর্থে একাধিক স্বর্ণপদক নিজের ব্যাগে পুরতে পেরেছেন। যথা অস্ট্রেলিয়ার শেন গোল্ড (তিনটি সোনা, একটি রূপো একটি ব্রোঞ্জ), হল্যাণ্ডের হেনরিকা মাস্তেনব্রোয়েক, জার্মাণীর ইনগ্রিড ক্রেমার এবং মার্কিণ মুলুকের হেলেন ম্যাডিসন, এথেলডু ব্রেবর্টি, প্যাট ম্যাককরমিক ডেব্রি মেয়ার সিকলব ও মেলিসা বেলোটি। অস্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেজার ছিলেন স্বল্পপাল্লার সাঁতারে একমেবাদ্বিতীয়ম। পরপর তিনটি ওলিম্পিকে এই বিভাগে তিনি ছিলেন অপরাজিতা।

পাশাপাশি রয়েছে মহিলা জিমন্যাস্টদের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। প্রদর্শনী জিমন্যাস্টিককে শিল্পের পর্যায়ে তুলে ধরে অলগা করবুট, ল্যারিসা ল্যাতিনিনা (রাশিয়া), ক্যারিন জানস্ (পূর্ব জার্মানী), ভেরা ক্যাসলাভাসকায়া (চেক) এক এক ওলিম্পিকে মুঠো মুঠো স্বর্ণ সঞ্চয় করেছেন। এঁদের মধ্যে জিমন্যাস্টিক মহলে ভেরা ক্যাসলাভাসকা ও ল্যারিসা ল্যাতিনিনার নাম অবিস্মরণীয়। একা ভেরা পর পর দুটি ওলিম্পিকে সাতটি এবং ল্যারিসা ছটি স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের বাইরে টেনিস, গলফ, হকি, টেবল টেনিসেও মেয়েরা সংশয়াতীত নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। টেনিসে লোটি ডড, সুজেন লেংলেন, হেলেন উইলস মুডি, মরিন কনোলী, মার্গারেট কোর্ট, বিলি জিন কিং এবং টেবল টেনিসে এঞ্জেলা রোজেনু, গিজি ফারকাসের নাম তো কিংবদন্তী তুল্য। সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে তাঁরা বারেবারে দুনিয়াকে দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের প্রতিষ্ঠায়।

কাল যতো এগিয়ে চলেছে মেয়েরা ততোই ক্রীড়াঙ্গনের দিকে ঝুঁকছেন। তাঁদের ক্রীড়ানুরাগ এমনই ব্যাপক চেহারা নিচ্ছে যে, যেসব আসরে এতোদিন পুরুষদেরই একচেটিয়া অধিকারে ছিল সেখানেও মেয়েরা তাঁদের আবির্ভাব ঘটাতে চাইছেন। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হলো ফুটবল মাঠে। ক্রিকেট মাঠে তো তাঁরা আছেনই সাবেক আমল থেকেই।

একদা রীতিমতো পরিশ্রম সাপেক্ষ ক্রীড়াচর্চার মধ্যে দূরপাল্লার সাঁতার বা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার অন্যতম। কিন্তু এই দুস্তর জলরাশির চ্যালেঞ্জ অতিক্রমেও মেয়েরা কুণ্ঠিত নন। ইংলিশ চ্যানেলের চ্যালেঞ্জ মেয়েরা অতিক্রম করেছেন সেই ১৯২৬ সালেই। পথিকৃৎ মার্কিণ তরুণী গারট্রুড এডারলি। আমাদের ঘরের মেয়ে আরতি সাহা (বর্তমানে গুপ্তা) চ্যানেল উত্তরণে সফল ও স্মরণীয়। পঞ্চাশের দশকে মার্কিণ সাঁতারু ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক চ্যানেলকে জয় করেন দুদিক থেকেই। উত্তরকালে আরও কতোজন মহিলা যে এক পাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে ইংলিশ চ্যানেলের অপর পাড়ে গিয়ে উঠেছেন তার ঠিক ঠিকানা কি!

ক্ষেত্র বিশেষে দক্ষ মহিলা ক্রীড়াবিদ মিশ্র প্রতিযোগিতার আসরে পুরুষের সামর্থ্যকেও নতি স্বীকারে বাধ্য করিয়েছেন। এমন অসামান্য কৃতিত্বের নজীর প্রথম গড়েন ডেনমার্কের শ্রীমতী লিজ হার্টেল। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে ওলিম্পিক অশ্বারোহণের মিশ্র প্রতিযোগিতাতে শ্রীমতী হার্টেল রৌপ্য-পদক যখন পান তখন তিনি একাধিক সন্তানের জননী।

পর্বতারোহণ, মোটর রেসিংয়ের মতো অনুষ্ঠানেও মেয়েরা অধুনা দলে দলে যোগ দিচ্ছেন। এক কথায় যেসব খেলাধুলায় বিপদের ঝুঁকি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কেও মহিলারা আজ পিছিয়ে নেই। নেহাৎ প্রকৃতির নিয়মে শারীরিক গঠন উপযুক্ত নয় বলেই বুঝি তাঁরা মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লক্রীড়া সম্পর্কে আগ্রহ দেখান না। তবে এই দুটি ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমের নজীর আছে বৈকি। বেশ কিছুকাল আগে আমাদের দেশেই হামিদা বানু নামে এক মহিলা কুস্তিগীরের কথা শোনা গিয়েছিল। এবং পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে মুষ্টিযুদ্ধের বিচার ভার পাওয়ার উদ্দেশ্যে দু একজন মহিলা লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করেছেন বলে শুনেছি। সে আবেদন অগ্রাহ্য করা হলে তাঁরা কোর্ট-কাছারিতে ছুটতেও কসুর করেন নি।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে প্রগতির সংগে তাল রাখতে মহিলারাও আজ ক্রীড়াংগনের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝুঁকছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে তাঁরা হয়তো সর্বক্ষেত্রে ক্রীড়াচর্চায় প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। বিশেষতঃ অনগ্রসর বা উন্নয়নকামী দেশগুলিতে। তবে তাঁদের ক্রীড়ানুরাগ যে পুরুষের মতোই সহজাত ও সাচ্চা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেখানে সুযোগ মিলেছে সেখানে ক্রীড়ামানোন্নয়নে তাঁরা যথার্থই আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। এই সনিষ্ঠ চেষ্টার সূত্রে মহিলা মহলে সাঁতার, জিমন্যাস্টিকস ও অ্যাথলেটিকসের মান যে কতোটা উঁচুতে উঠেছে তা ভাববার বিষয়।

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে খেলাধুলায় মহিলাদের আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে দিকে দিকে ব্যাপক মহিলা ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমন একটি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান আমাদের ভারতবর্ষেও হবে। আশা করা যায় যে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মহিলা ক্রীড়ার ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং সার্বিক মানোন্নয়নের পথও হবে প্রশস্ত।

— নিরঞ্জন দত্ত

দর্শক

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত শনিবার (আগস্ট ৩০) ইডেন উদ্যানে আয়োজিত এ-বছরের দ্বিতীয় প্রদর্শনী ফুটবল লীগ খেলায় মোহনবাগান ৩—১ গোলে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিং দলকে হারিয়ে লীগ খেলার তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করেছে। বর্তমানে মোহনবাগানের ১৫টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট উঠেছে। এপর্যন্ত মোহনবাগান হেরেছে একটা খেলায়—ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০—১ গোলে। মোহনবাগান তার ১৫টা খেলায় ৪০টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছে—ইস্টবেঙ্গল, চন্দ্র মেমোরিয়াল এবং মহমেডান স্পোর্টিং প্রত্যেকের কাছে একটা করে। মহমেডান স্পোর্টিংও ১৫টা খেলে ২৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তাদেরও হার একটা খেলায়—মোহনবাগানের কাছে। মহমেডান স্পোর্টিং সব থেকে বেশী গোল দিয়েছে—বর্তমানে তাদের গোল সংখ্যা ৪৪। তারা গোল খেয়েছে ৪টি—ইস্টার্ন রেলদলের কাছে ১ এবং মোহনবাগানের কাছে ৩ গোল। গত বছরের রানার্স-আপ এরিয়ান্সও সংগ্রহ করেছে ২৮ পয়েন্ট—মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে তিনটে ম্যাচ বেশী খেলে। তারা এপর্যন্ত তিনটে খেলায় হেরেছে।

গত পাঁচ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দলের অবস্থা সব থেকে ভাল। তাদের ১৩টা খেলায় ২৬ পয়েন্ট উঠেছে। বর্তমান একমাত্র তারাই লীগের খেলায় অপরাজিত আছে। তারা ৩৮টা গোল দিয়ে মাত্র ২টো গোল খেয়েছে—টালীগঞ্জ অগ্রগামী এবং এরিয়ান্সের কাছে। মোহনবাগানের কাছে মহমেডান স্পোর্টিং দলের পরাজয়ে ইস্টবেঙ্গলের লীগ জয়ের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়ে গেছে। প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় নবাগত বালী প্রতিভা আগামী বছর দ্বিতীয় বিভাগে খেলবে।

উল্লেখযোগ্য গোলদাতা

জহর দাস (মোহনবাগান) ১৬, আকবর (মহমেডান স্পোর্টিং) ১৪, হাবিব (মহমেডান স্পোর্টিং) ১১, বিমল দাস (ই আই আর) ১১, সুভাষ ভৌমিক (ইস্টবেঙ্গল) ১০ এবং অমল চৌধুরী (এরিয়ান্স) ৯।

লীগ খেলার তালিকা

(আগস্ট ৩১ পর্যন্ত)

	খে	জ	ড্র	হা	স্ব	বি	প
মোহনবাগান	১৫	১৪	০	১	৪০	৩	২৮
মহঃ স্পোর্টিং	১৫	১৪	০	১	৪৪	৪	২৮
এরিয়ান্স	১৮	১৩	২	৩	৩৬	১১	২৮
ইস্টবেঙ্গল	১৩	১৩	০	০	৩৮	২	২৬

হ্যাট-ট্রিক

আকবর এবং হাবিব (মহমেডান স্পোর্টিং), পিনাকী মুখার্জি (কুমারটুলি), উলগানাথন এবং জহর দাস (মোহনবাগান), সুভাষ ভৌমিক (ইস্টবেঙ্গল), বিমল দাস (ই আই আর) এবং উৎপল নিয়োগী (পোর্ট কমিশনার্স)। এই আটজন খেলোয়াড়দের মধ্যে হাবিব দুবার হ্যাট-ট্রিক করেছেন।

তৃতীয় এশিয়ান স্যুটিং প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে সুবাং স্যুটিং রেঞ্জে আয়োজিত তৃতীয় এশিয়ান স্যুটিং প্রতিযোগিতায় চীন দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। তাদের মোট স্বর্ণপদক সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩।

এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল এই তেরটি দেশ ঃ চীন, ভারত, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইরাক, জাপান মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড। এদের মধ্যে চীন, উত্তর কোরিয়া, ইরান এবং ইরাকের যোগদান এই প্রথম।

১৯৬৭ সালে টোকিওর প্রথম প্রতিযোগিতায় জাপান এবং ১৯৭১ সালে সিওলের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয়া দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।

বছরের সেরা হকি খেলোয়াড়

প্রাক্তন অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় লেসলি ক্লডিয়াসের দ্বিতীয় পুত্র হেনরি ক্লডিয়াস এ-বছরের (১৯৭৫) বাংলার শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় হিসাবে 'কে ডি ঘোষ ট্রফি' লাভ করেছেন। এ-বছরের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় তিনি বাংলা হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন।

সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড

ন্যাশনাল অপেশাদার অ্যাথলেটিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি সাঁতার আমেরিকার ব্রুস ফারনিস ২ মিনিট ০৬-০৮ সেকেন্ডে শেষ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ঐ আসরেই পুরুষদের ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতার (হিট) আমেরিকার জিম মণ্টগোমারি ৫০-৫৯ সেকেণ্ডে শেষ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেন।

দ্রুততম সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের বিপক্ষে এসেকস কাউন্টি দলের রবিন হবস ৪৪ মিনিটে শত রাণ করেছেন। প্রথম ৫০ রাণ ৩২ মিনিটে এবং শেষ ৫০ রান মাত্র ১২ মিনিটে ১৫টি বল খেলে। তার এই শত রানে ছিল ১২টি বাউণ্ডারী এবং ৬টি ওভার-বাউণ্ডারী। তাঁর ১৪ বছরের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে এটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। অল-রাউণ্ডার হবসের বয়স ৩৩। তিনি এপর্যন্ত (১৯৬৭—১৯৭১) ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।

রবিন হবসের এই সেঞ্চুরী ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে পঞ্চম দ্রুততম সেঞ্চুরী। ১৯২০ সালে সারে কাউন্টি দলের পার্সী ফেনডার নরদামটন দলের বিপক্ষে ৩৫ মিনিটে যে সেঞ্চুরী করেছিলেন, তা আজও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় দ্রুততম সেঞ্চুরী হিসাবে রেকর্ড হয়ে আছে। ৫৫ বছর পর রবিন হবসই ৪৫ মিনিটের কম সময়ে এই প্রথম শত রান করলেন।

আমেরিকার পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতা

আমেরিকার পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী সুইডেনের বিয়রন বর্গ ৬—৩, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে শীর্ষ বাছাই আর্জেন্টিনার ভিলাসকে পরাজিত করেন। ১৯ বছরের বর্গ গত বছরের ফাইনালে নেদারল্যাণ্ডসের টম ওক্কারকে হারিয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে ভিলাস এবং বর্গ পরস্পর ৯বার খেললেন। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে বর্গের জয় ৫বার এবং ভিলাসের জয় ৪বার। জুন মাসে ফরাসী টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে বর্গের কাছে স্ট্রেট সেটে ভিলাস হেরে গিয়েছিলেন।

শান্তি মল্লিক

চন্দ্রিমা সরকার

রাইট উইং চন্দ্রিমা সরকার

—আমাকে একটা কথার জবাব দিতে পারেন? আমাদের এই বাংলা দেশে ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে সেই কবে একশ বছর হতে চলল। অথচ এতদিন আমরা মেয়েরা কেন এ খেলা শেখবার সুযোগ পাইনি!

প্রশ্নটি করল পশ্চিম বাংলার মহিলা ফুটবল দলের রাইট উইং চন্দ্রিমা সরকার। আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে এবার জলপাইগুড়িতে মেয়েদের প্রথম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ দলে খেলার সুযোগ পেয়ে চন্দ্রিমা ভারী খুসী। ও বর্তমানে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের একাদশ ক্লাসের ছাত্রী।

ওর প্রশ্ন শুনে আমার মনে এক লহমায় ভারতে তথা এই কলকাতায় ফুটবল খেলার ইতিহাসের কিছু কিছু ব্যাপার মনে

ড়েল। সত্যিইত আমাদের এই বাংলাদেশে ফুটবল খেলাও আজ নতুন নয়। হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল বা টেবল_টেনিস, ব্যাডমিন্টনের তুলনায় ফুটবল এদেশে অনেক অনেক আগে থেকে চলছে। অথচ ঐ সব খেলায় মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে ফুটবলের বেলায় তা হয়নি। আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের খেলাধুলোয় যোগদানে বহু বাধার প্রাচীর খাড়া করা হয়েছিল। আস্তে আস্তে সেসব সরে যাচ্ছে। মেয়েরাও যে খেলার মাঠে আসার অধিকারিণী সে সত্য ক্রমে স্বীকৃতি পাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশে ফুটবল খেলা চলছে অনেক কাল। কলকাতায় সাহেব গোরারা সৈনিকদের জন্য প্রথম ফুটবলের সূত্রপাত। কলকাতার মাঠে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল কিছু আগে থেকে শুরু হলেও ঠিকভাবে সংগঠনের মাধ্যমে রীতিমত ফুটবলের আসর বসে ১৮৯৩ সালে—আই এফ এ শীল্ড। সেই ১৮৯৩ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে এই শীল্ডের খেলা কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার গর্ব এই শীল্ড। পরাধীনতার যুগে দাম্ভিক ইংরাজ শাসককুলের চণ্ডশাসনে সারা দেশের মানুষের জীবন ও চিন্তাধারা যখন বিদেশীয় অবমাননা আর অসম্মানের কশাঘাতে জর্জরিত তখন একমাত্র ফুটবল মাঠে আমাদের ছেলেরা বিদেশীর সমকক্ষ হবার স্পর্ধা দেখিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে খেলার মাঠের বিশেষ করে ফুটবল মাঠের অবদানের বিষয়ে এখনও ধারাবাহিক গবেষণা হয়নি। ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই কলকাতায় মোহনবাগান ফুটবল দল যখন ইংরেজ গোরাদল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ২—১ গোলে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হল, সেদিন সেই জয়কে অনেকেই ভবিষ্যতে শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে আরও বড় জয়লাভের ভূমিকারূপে দেখেছিলেন। তাঁদের সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বয়সও কম নয়। এর শুরু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে—যে বছর ইউরোপে ফ্রান্সের ব্যারন দ্য কুবার্তে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার আসর বসাবার উদ্দেশ্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন তখন থেকে। এই লীগেও তখন ইউরোপীয় ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ও ইংরেজ গোরা দলেরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। ভারতীয় ফুটবল দলের লীগ জয় করতে সময় একটু বেশী লেগেছে। কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে প্রথম ডিভিসনে উঠে এসেই প্রথম খেলায় বিগত তিনবারের লীগ বিজয়ী ডারহাম এল আই গোরাদলকে গুণে গুণে ৩—১ গোলে হারিয়ে ময়দানে তথা সারা দেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার রেশ মিলিয়ে যেতে অনেক বছর লাগে। শুধু প্রথমবারই নয় মহামেডান স্পোর্টিং ঐ ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ একটানা পাঁচবার লীগ বিজয়ী হয়ে আর এক অনন্য কীর্তির স্বাক্ষর রাখে। সেসময় বৃটিশ গোরাদলে ইংলণ্ডের অনেক নামী খেলোয়াড় খেলেছে। অনেকের ক্রীড়া চাতুর্য আজও প্রবীণদের মনকে নাড়া দেয়। তাই ত্রিশ দশকে নবাগত মহমেডান দলের কৃতিত্বও ভারতের ফুটবলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।

এত কথা বলছি কারণ কলকাতা তথা বাংলাদেশ ভারতীয় ফুটবলে শীর্ষাসীন হবার পিছনে বহুজনের দীর্ঘ সাধনার কঠোর শ্রমের আর অর্থব্যয়ের কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। ফুটবল বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। বাংলা থেকেই এই খেলা আজ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাই বাংলার মেয়েরাও যে তাদের ভাইদের দেখাদেখি ফুটবলে দক্ষ হয়ে উঠবে এ স্বাভাবিক। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় এতদিন এদিকে কারও নজরই পড়েনি।

—বলুন তো অনেক আগে থেকে যদি আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রচলন থাকত তাহলে আমরা নিঃসংকোচে ফুটবল মাঠে নামতে পারতাম। কিন্তু সেই কবে এদেশে ছেলেদের ফুটবল শুরু হয়েছে তার এত বছর পরে আমরা খেলার সুযোগ পেলাম।

চন্দ্রিমাও পাইওনীয়ার ক্লাবে হ্যাণ্ডবল খেলে। এই মেয়েটিও ৭২-এ পুণায় আয়োজিত জাতীয় হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে স্থান পেয়েছিল। পরের দুবার জয়পুরে ও ব্যাঙ্গালোরেও বাংলা দলে চন্দ্রিমার যাবার কথা কিন্তু অনিবার্য কারণে ওর আশা সফল হয়নি।

---

১৫ সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবিটি শান্তি মল্লিকের নয়। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হল।

চন্দ্রিমার মতে হ্যাণ্ডবল ও ফুটবল খেলায় একই রকম শারীরিক দক্ষতা ও বুদ্ধির প্রয়োজন। কেবল একটা হাতে অন্যটা পায়ে। চন্দ্রিমা বাড়ীর কাছে মাঠে ফুটবল অনুশীলন করে, তাছাড়া পাইওনীয়ার ক্লাবে ফুটবল খেলে। ওর বাড়ী প্রতাপাদিত্য রোডে। ওরা ছ ভাই তিন বোন। বাবা শ্রীমনোরঞ্জন সরকার রিটার্নিং অফিসের কর্মচারী।

—আমিও পাইওনীয়ার ক্লাবের প্রশিক্ষক হরিদাসদার কাছ থেকে রাজ্যে মেয়েদের ফুটবল দল গড়ার কথা জানতে পারি। খবরের কাগজ দেখে চলে আসি এই কালীঘাট মাঠে। কারণ আগেই বলেছি নিয়মিতভাবে ফুটবল খেলার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। তাই প্রতিদিন সকালে আসতে লাগলাম এখানে সুশীলদার কাছে প্রশিক্ষণ নিতে। উনিই আমাকে রাইট আউট বা এখনকার ভাষায় রাইট স্ট্রাইকারের জায়গায় খেলার উপদেশ দেন এবং আমাকে সেইভাবে তৈরী করেন।

লক্ষ্ণৌতে প্রথম প্রথম আমাদের কেউ আমলই দেয়নি। ক্ষীণজীবী বাঙ্গালী মেয়েরা আবার কি ফুটবল খেলবে এই রকমই ছিল ওখানকার দর্শকদের মনোভাব। কিন্তু বোধহয় দুটো ম্যাচে—মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৩ গোলে আর দিল্লীর বিরুদ্ধে একই ব্যবধানে জয়ী হবার পর আমরা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠি। আমাদের ক্রীড়ারীতি দেখে কেউ বিশ্বাসই করেনি যে আমাদের এই প্রস্তুতির পিছনে মাত্র বারদিনের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনই মূলধন। মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান ও বিদর্ভের মেয়েরা ত পরিষ্কার বলেছে যে আমরা নাকি এক বছর যাবৎ অনুশীলন করেছি। তাহলেই বুঝতে পারছেন আমাদের খেলা অন্য সব দলের তুলনায় কত ভাল হয়েছিল?

—যদি স্কুল কলেজে মেয়েদের ফুটবলের প্রচলন হয় তাহলে খেলবে?

—নিশ্চয়ই আমরা সবাই খেলব। আমিত সেজন্য তৈরী আছি। কলেজে মেয়েদের ফুটবল দল তৈরী হলে খুব ভাল হয়।

—তোমার ভয় করে না বা খেলার পর কোন রকম শারীরিক অস্বস্তি অনুভব কর না?

—না, না। এখানে ত একটানা অনুশীলন করেছি। তাছাড়া আমি নানারকম খেলাধুলোয় যোগ দিই। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় বর্শা ছোড়া, একশ মিটার দৌড়, ব্যালেন্স ও ব্লাইণ্ড রেসে প্রথম হয়েছি। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তঃজেলা ক্রীড়ানুষ্ঠানে আমি একশ মিটার দৌড়ে প্রথম হই। এতদিন স্কাউটেও ছিলাম। তাছাড়া পাইওনীয়ার ক্লাবে তিন বছরের ওপর হ্যাণ্ডবল খেলছি।

—আচ্ছা লক্ষ্ণৌ-এ চিপ্পোর ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের যতগুলি রাজ্য যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে কোন দলের খেলা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগল?

—বিহারের মেয়েদের খেলা খুব ভাল। ওদের দলে দুটি বাঙ্গালী মেয়ে একটু বেশীক্ষণ নিজেদের পায়ে বল রাখে বটে কিন্তু খেলে বেশ ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেমি ফাইনালে বিহার আমাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামল না, ওয়াক ওভার দিল।

এদেশে পুরুষের বহু খেলা এখন মেয়েরাও খেলছে। ভলিবল, হকি, বাস্কেট বল, ক্রিকেট সব ক্ষেত্রেই মেয়েরা এগিয়ে এসেছে। দরকার এখন উপযুক্ত উৎসাহ ও মজবুত সংগঠনের। ফুটবলেও এ রাজ্যের মেয়েরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্রিকেটের মত সম্মানের অধিকারিণী হয়েছে। আশা করা যায় এদের এই সাফল্যকে স্থায়ী করার জন্য এবং এদের ক্রীড়াকুশলতার উন্নতি সাধনের জন্য আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন। যাতে এদের উৎসাহ অভাব ও অনটনের কবলে পড়ে অকালে স্তিমিত না হয়ে যায়। আর যেন খেলার মাঠের সাফল্য এদেশের মেয়েদের সামনে সামাজিক মুক্তির নতুন স্বর্ণদ্বার খুলে দেয়।

অজয়

হকির বাজীকর

'হকির যাদুকর' বলতে একটি বিশেষ নাম মনে পড়ে। মিশমিশে কাল, খর্বাকৃতি সেই মানুষটির ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নাম না বললেও এই মানুষটিকে চিনে নিতে এক নিশ্বাসের বেশী সময় লাগে না।

ধ্যানচাঁদ হকির যাদুকর। দক্ষ বাজিকরের মত সেই কতকাল আগে স্টিকের যাদু খেলা থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। কিন্তু আমরা এখনও তাঁর ঐন্দ্রজালিক যাদুর স্পর্শ মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নি। হকির কথা উঠলেই প্রসঙ্গক্রমে শিল্প-সুষমামণ্ডিত এই যাদুকরের নাম এসে পড়ে। ধ্যানচাঁদ ও হকি যেন একই মুদ্রার দু পিঠ। একটিকে টানলে স্বভাবতই অন্যটি এসে যায়। হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদকে আজ হকির কিংবদন্তী বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

ধ্যানচাঁদ যাদুকরে পরিণত হয়েছিলেন অনেক কারণে। স্টিকে বল নিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে এত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারতেন এঁকে-বেঁকে যে অবিশ্বাস্য মনে হত। প্রচণ্ড গতিময়তার মধ্যেও স্টিকের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম লীলায়িত কারুকর্মে এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। তাঁর খেলার প্রথা প্রকরণে ছিল স্বকীয়তার সুস্পষ্ট ছাপ। ধ্যানচাঁদের পরিচ্ছন্ন শিল্পচাতুর্য প্রতিপক্ষের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিত, স্টিকের ভেল্কী রসিকের মনকে এক আনন্দঘন অজ্ঞাত স্বাদরসে ভরিয়ে দিত। মাঠশুদ্ধ লোক ক্রীড়ারত ধ্যানচাঁদকে দেখে ভাবত তিনি নিশ্চয়ই জন্মগত ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী। তা না হলে কি একজন মানুষের পক্ষে ছাতার লাঠির মত একটা বাঁকা দণ্ড দিয়ে ঐ অভিনব অবিশ্বাস্য শিল্প সৃষ্টি সম্ভব। ধ্যানচাঁদ নিশ্চয়ই সুপার হিউম্যান। কিংবা তিনি যাদু জানেন। ম্যাজিকওয়ালার মত মন্ত্রতন্ত্রের বলে বাজীমাৎ করে দেন।

ধ্যানচাঁদের পদবী ঠাকুর। না, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ছেলে তিনি নন। তিনি ঝাঁসির ঠাকুর পরিবারের সন্তান। বীরত্বের জন্যে ঝাঁসি চিরকালই খ্যাত। অন্যেরাও যে কত সাহসী ইতিহাসের পাতায় তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ঝাঁন্সির রাণী। যাক সে কথা। ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী ধ্যানচাঁদকে পনের বছর বয়সে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে হয় বাবার নির্দেশে। বাবাও ছিলেন একজন সিপাই।

ধ্যানচাঁদের প্রথম বিদেশ সফর ১৯২৬ সালে, নিউজিল্যাণ্ড সফরকারী সৈনিক একাদশে তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক। ১৯২৮ সালে আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে উত্তরপ্রদেশ মূলত ধ্যানচাঁদেরই অবদানে। এই খেলায় অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্যে ধ্যানচাঁদকে দেওয়া হয়েছিল সেরা সেন্টার ফরোয়ার্ডের স্বীকৃতি। ধ্যানচাঁদ তাঁর সমগ্র খেলোয়াড় জীবনে দেশ-বিদেশ থেকে সহস্র কণ্ঠের যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পেয়েছেন তার সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর নিজেরই বলা চলে। কারণ হকি জীবনের উন্মালগ্নে কেবলমাত্র সৈন্য বাহিনীর বর্ষীয়ান খেলোয়াড় তেওয়ারীজীর কাছেই তিনি সামান্য শিক্ষা নিয়েছিলেন।

১৯২৮ সালে ভারতীয় হকির স্বর্ণ যুগ শুরু। স্বর্ণ জয়ের ইতিহাসে ধ্যানচাঁদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিকে সর্বাধিক গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ধ্যানচাঁদ, ১৯৩২ -এ লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের পর কয়েকটি দেশে সৌজন্যমূলক সফরের খেলায় ভারতের দেওয়া মোট ২৬২টি গোলের মধ্যে ধ্যানচাঁদের একক অবদান ছিল ১০১টি।

১৯৩৫ সালে ধ্যানচাঁদ পুনরায় নিউজিল্যাণ্ড গিয়েছিলেন সরকারী সফররত ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হয়ে। এই সফরের ৪৮টি খেলায় ভারত গোল করেছিল ৫৪৪টি। তার মধ্যে ধ্যানচাঁদ দিয়েছিলেন ২০২টি গোল। এমনি করে একের পর এক স্টিকের যাদুমন্ত্রে গোলের বন্যা বইয়ে ধ্যানচাঁদ হকির যাদুকরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

প্রচারবিমুখ বিনম্র নায়কটি ছিলেন প্রত্যক্ষ, স্পষ্টবাদী। আচার আচরণ কুসুমের মত কোমল হলেও প্রয়োজনে ইস্পাতের মত কঠিন হতে দ্বিধা করতেন না। ১৯৩৫ সালের ভারতীয় দলে ঠাঁই পেয়েছিলেন তাঁর অনুজ রূপ সিং। রূপ সিং-এর কোন এক ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি সবার সামনে কঠোর ভর্ৎসনায় মুখর হয়ে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করতে কুণ্ঠিত হন নি।

দাদার মত রূপ সিংও ছিলেন জাত হকি খেলোয়াড়। সবুজ ঘাসের বুকে স্টিকের স্পর্শে শিল্প সৃষ্টিতে দাদার সমকক্ষ না হলেও একজন প্রথম শ্রেণীর পাকা হকি খেলোয়াড়রূপে তাঁর সুনাম দেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশে পৌঁছেছিল। মিউনিখ অলিম্পিকের উদ্যোক্তারা নামী খেলোয়াড়দের স্মৃতি হিসেবে রাস্তা পার্ক সাঁকো প্রভৃতির নামকরণের জন্যে তামাম দুনিয়া থেকে বাইশজনকে বেছে নিয়েছিলেন। এই বাইশজনের একজন হচ্ছেন বিখ্যাত ভারতীয় হকি খেলোয়াড় রূপ সিং। তারই নামে মিউনিখের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। রূপ সিং ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলস ও ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে ভারতীয় দলে গিয়েছিলেন। দু বারই ভারতীয় অলিম্পিক বিজয়ী দলের সদস্য হিসেবে রূপ স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। হকি বোধহয় ঝাঁন্সির এই পরিবারের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। ধ্যানচাঁদের সুযোগ্য পুত্র অশোককুমারও সুদক্ষ হকি খেলোয়াড় হিসেবে সর্বজন পরিচিত।

১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অদ্বিতীয় নায়ক ধ্যানচাঁদ। অলিম্পিক বিজয়ী দলে মাঠের ভেতরে ও বাইরে অধিনায়কের ভূমিকা যে ছিল সবচেয়ে বড় তা বলাই বাহুল্য। ফাইন্যালে জার্মানী ভারতের কাছে ৮—১ গোলে পরাজিত হয়েছিল। ধ্যানচাঁদ একাই করেছিলেন ৬টি গোল। ১৯২৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৬—এই তিন অলিম্পিকে ভারতের দেওয়া মোট ১০২টি গোলের মধ্যে ধ্যানচাঁদের ব্যক্তিগত গোলসংখ্যা ৪৬টি।

সেনা বাহিনীতে একজন নগণ্য সিপাই হিসেবে যোগদান করলেও উত্তরপর্বে পদোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে হাসি-খুশী সহজ সরল মানুষ। জীবনযাত্রা প্রণালী সাদামাটা, অমায়িক ব্যবহার। কাছে গেলে মনেই হয় না দেবাত্মা হিমালয়ের মত এক বিরাট বিশাল প্রতিভার সামনে দাঁড়িয়ে আছি কিংবা কথা বলছি।

যাদুকর ধ্যানচাঁদ দেশ ও বিদেশে অগণিত মানুষের কাছ থেকে অসংখ্য প্রশংসা ও অভিনন্দন কুড়িয়েছেন। সমসাময়িককালে ধ্যানচাঁদের গ্ল্যামার হলিউডের কোন প্রখ্যাত চিত্রতারকার চেয়ে কম ছিল না। বরং তাদেরই আয়োজিত এক প্রীতি খেলায় হকির এই মহানায়ককে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরা ধন্য হয়েছিলেন। হকির এই দেবদূতকে ঘিরে অনেক উপাখ্যান ও অলৌকিক ঘটনা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ আজ কিংবদন্তীর মানুষে রূপান্তরিত।

প্রশান্ত দাঁ

মিলী

মাতৃহীন মিলীকে ফ্ল্যাটবাড়ির প্রত্যেক বাসিন্দাই নিজের মেয়ের মতো ভাবেন। মিলীদের ছোট সংসারে আছেন বাবা, দাদা, বিধবা পিসিমা। প্রতিবেশীদের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দলের সর্দার মিলী। সে কলেজ থেকে ফিরেই ওদের সঙ্গে খেলাধুলো নাচগান প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তখন মিলী ভুলে যায়, সে অসুস্থ। রক্তশূন্যতার রোগে ভুগছে।

ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদের উপরে ছোটদের নিয়ে মিলী যে নাচগানের মহড়া চালায়, সেটা হঠাৎ একদিন বন্ধ করে দিলেন ফ্ল্যাটের নতুন বাসিন্দা শেখর। মিলী সে ব্যাপারে শেখরকে অনুরোধ করেও কোন ফল না পেয়ে ছোটদের শিখিয়ে দেয় ক্ষমা চেয়ে নেবার জন্যে শেখরের কাছে। এই ঘটনার পরই মিলীর প্রতি শেখর আকর্ষণ বোধ করে। একবার সামান্য আহত হলে মিলীই এসে তাকে সুস্থ করে তোলে। এরই মধ্যে একদিন আচমকা মিলীর অসুখটা বেড়ে যায়। ডাক্তার বাঁচার আশা দেয় না, তাঁর ধারণা, এবার সুস্থ হয়ে উঠলেও তার শেষের দিন আগতপ্রায়।

শেখর অসুস্থ মিলীকে প্রতিদিন ফুলের তোড়া উপহার পাঠিয়ে দেয়। একদিন নিজেই মিলীকে দেখতে এল এবং স্পষ্টই বললে মিলীকে সে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। মিলী টেলিফোনে ডাক্তারের সঙ্গে বাবার কিছু কথা শুনে জানতে পারে তার অনিবার্য মৃত্যুর কথা। সে তাই বিবাহে রাজী হয় না। শেখর ইতিমধ্যে ব্লাড লিউকোমিয়া রোগের এক স্পেশালিস্টের সঙ্গে দেখা করে বিদেশে একজন বিশেষজ্ঞের কথা জানতে পারে এবং মিলীকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্যে সেখানেই চলে যায়।

বিমল দত্তের কাহিনী ও চিত্রনাট্যের পরিণতির সঙ্গে 'ছুটি' বা লভ স্টোরির সঙ্গে কোন মিল নেই। পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জি পরিচালনা, দৃশ্য রচনা, মিকসিং, কাটিং, মন্তাজ ও সম্পাদনায় তাঁর আগের ছবিগুলির চেয়ে আরো পরিণত ও বুদ্ধিদীপ্ত। একাধিক দৃশ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মেলে। অভিনয়ে সুন্দর অভিনয় করেছেন মিলীর ভূমিকায় জয়া ভাদুড়ী, শেখরের চরিত্রে অমিতাভ বচ্চন বলিষ্ঠ। অশোককুমারের মিলীর পিতা এ ছবির সম্পদ। কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। সংগীত পরিচালনায় এস ডি বর্মণ প্রশংসনীয়।

জয়া ভাদুড়ী

কামশাস্ত্র

যৌন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা-
মূলক চলচ্চিত্র হিসাবে
অভিনন্দিত হবে !!!
(প্রযোজনা : আর্ট ফিল্মস)

স্বামীকে নিজের বশে রাখতে না পেরে কামনা দেবী ক্রোধে আত্মহারা হয়ে এক বাইজীকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে নিজের স্বামীকেই হত্যা করলেন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোল। প্রকৃতপক্ষে কামনা দেবীর উপযুক্ত যৌন-শিক্ষার অভাবেই এই জন্য দায়ী। উনি স্বামীকে বশীভূত করতে পারেননি বলেই অঘটন ঘটলো তাঁর জীবনে। দুই মেয়ে মমতা ও অলকার জীবনেও এ-ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্যে ওঁর ভাইকে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মানুষ করার জন্যে তিনি অনুরোধ করলেন।

মমতা এখন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে হাসপাতাল তৈরী করেছে সাধারণ লোকেদের জন্যে এবং অলকা জার্মান থেকে যৌন-শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে দেশে ফিরে দিদির হাসপাতালেই সকলের সেবা করে। মমতা অশোককে ভালবাসে, দুজনের বিয়েও প্রায় স্থির। কিন্তু অশোক কামনার বশবর্তী হয়ে গোপনে একাধিক রমণীর প্রতি আকৃষ্ট। এমন কি এক তরুণী তারই সন্তানের মা হতে চলেছে অথচ অন্যদিকে অশোক তারই মার প্রতি আকৃষ্ট। ঘটনাটা জানতে পেরে মমতা তাকে সেই সন্তানসম্ভবা তরুণীকে বিয়ে করতে অনুরোধ করল। একন্য সে তার প্রেমকেও বিসর্জন দিতে রাজী হোল। এবং মমতা ও অলকার সাহায্যে অশোক সেই অভাগিনীকে বিয়ে করতে বাধ্য হোল।

পরিচালক প্রেমকাপুর তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'কামশাস্ত্রে' গতানুগতিক ধারায় নরনারীর যৌন-সম্পর্ককে পর্দায় সরাসরি উপস্থিত না করে পরামর্শ, বক্তৃতা, চার্ট এবং নকসার সাহায্যে ছবিটিকে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টায় ত্রুটি রাখেননি। অভিনয়ে মনীষা, অলকা, মৃণাল মুখার্জি এবং কামনা দেবীর চরিত্রে উর্মিলা ভাট সুন্দর অভিনয় করেছেন। সম্পাদনার কাজে দুর্বলতা থাকলেও, কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। ব্রিজভূষণের সংগীত-পরিচালনা ছবির মুড সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

চম্বল উপত্যকার সন্ত্রাস ছিল দস্যু নেত্রী পুতলী। ওখানে শুটিং করতে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের মুখে আমি বহুবার একথা শুনেছি, পুতলীর নৃশংসতার কথা বলতে গিয়ে লোকে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। পুতলী মেয়ে হলে হবে কি, অসম্ভব বুদ্ধি ধরতো। বাবু লোহারির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দল যখন ভেঙে গেল, তখন পুতলী কৌশলে সেই ভাঙন রোধ করেছিল। তবে তার আগে সে নিজের হাতে বাবু লোহারিকে খুন করেছিল। ঠিক যে কায়দায় বাবু লোহারি চম্বলের অন্যতর সন্ত্রাস—সর্দার সুলতান সিংকে হত্যা করেছিল। পুতলী সেই একই কায়দায় বাবু লোহারিকে খতম করেছিল। পুতলী আসলে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিল। কারণ বাবু লোহারির বেইমানীতে চম্বলের বেহড়ে শেষনিঃশ্বাস ফেলবার আগে সুলতান সিং পুতলীকে বলে গিয়েছিল সে যেন এই হত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়। নাহলে সুলতান সিংয়ের আত্মা শান্তি পাবে না। তার অতৃপ্ত আত্মা চিরদিন এই অভিশপ্ত বেহড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

আর কিভাবে সেই প্রতিশোধ নিতে হবে, তা-ও বলে গিয়েছিল সুলতান সিং। বাবু লোহারির বুক চিরে ওর কলজেটা পুতলী যেন উপড়ে বের করে নিয়ে আসে। তারপর সেই কলজের রক্ত চম্বলের মাটিতে ছিটিয়ে দিতে থাকে পুতলী। সুলতান সিংয়ের অতৃপ্ত আত্মা সেই রক্ত পান করবে। তবেই তার মুক্তি।

আর পুতলী অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করেছিল। খুন হয়ে যাবার আগের মুহূর্তেও বাবু লোহারি বুঝতে পারেনি যে পুতলী একটা ভয়ংকর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে। তার কাছে হেসে হেসে প্রেম করেছে, বিশ্বস্ততার অভিনয় করেছে। আমরা যেদিন এই দৃশ্যের শুটিং করলাম, সেদিন মঞ্জু দের অভিনয় দেখে সিকিউরিটি ফোর্সের জোয়ানরা স্তম্ভিত।

ক্যামেরার সামনে বাবু লোহারির মৃতদেহ পড়ে আছে। আর পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করতে করতে পাহাড় থেকে নেমে আসছে পুতলী। তীব্র জিঘাংসায় তার দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। চিৎকার করে সে তখন সুলতান সিংয়ের আত্মাকে আহ্বান করছে। এসো এসো, দু হাতের আঁজলা ভরে বেইমানের রক্ত পান করে তুমি তৃপ্তিলাভ করো।

এসব কথা ভাবতে আজ এত বছর পরেও আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। সিকিউরিটি গার্ডের শক্ত হাতে ধরা রাইফেল মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এমন একটা ঘটনা তার কাছে রীতিমত অপ্রত্যাশিত।

পুতলী হিংস্র বাঘিনীর মত তখন বাবু লোহারির মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। দু হাতে ওর বুকটা ফেড়ে ফেলেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। পুতলী দু হাতে সেই রক্ত পান করছে। আর চিৎকার করছে। সমস্ত দেহ রক্তে মাখামাখি। মেশিনগানার নীহাল সিং এ-দৃশ্য সইতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে নিল। আতঙ্কে তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে। দু একজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আমাদের কান্ড-কারখানা দেখছিল, এবার তারা ভয়ে ভয়ে সরে পড়ল।

তবু আমাদের আয়োজন নকল রক্তের, হিমোগ্লোবিনের। মঞ্জু দে-কে তখন আর যেন চেনা যাচ্ছে না। রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছে দস্যুরাণী পুতলী বাঈ। দলের অন্যান্য ডাকাতরা এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব। স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে বাবু লোহারিকে দলের কেউ পছন্দ করতো না ঠিকই, কিন্তু তাকে খুন করে পুতলী বাঈ যে হঠাৎ এই রকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে—এটা তারাও কল্পনা করতে পারেনি।

চম্বলের পুলিশ রেকর্ড আমি ঘেঁটে দেখেছি, তাতে বলা হয়েছে পুতলী ওই ঘটনার পর চরম নৃশংস প্রকৃতির রমণীতে রূপান্তরিত হয়। এর পর পুতলী যত-গুলো ডাকাতি করেছে, সর্বত্রই সে অকারণে মানুষ খুন করেছে। আসলে খুন করে সে অদ্ভুত একধরনের আনন্দ পেত। মেয়েদের শরীর থেকে অলঙ্কার পুতলী নাকি খুলে নিত না—ছিঁড়ে নিত। কানের দুল সে কান সমেত উপড়ে নিত। ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাত কেটে নিয়ে চুড়ি আর বালা-তাবিজ বের করে নিত। ভিকটিম যখন যন্ত্রণায় চিৎকার করতো, পুতলী তখন হি হি করে হাসতো। তিল তিল করে মৃত্যুযন্ত্রণা দিতে দিতে এক সময় ভিকটিমের বুকে ছুরি চালিয়ে দিত বা ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দিত এক কোপে। এসব দেখে ওর দলের লোকেরা পর্যন্ত আতঙ্কে শিউরে উঠতো। তারা পুতলীর নির্দেশ অমান্য করবার সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল।

অথচ গোড়ায় পুতলী এ-রকম ছিল না। সাধারণ এক নাচনেওয়ালী মেয়ে ছিল সে। বড়লোকের মাইফেলে মুজরো খেটে তার গ্রাসাচ্ছাদন হত। একদিন সুলতান সিং তাকে লুঠ করে এনেছিল চম্বলের বেহড়ে। সবাই বলে, দলের সবাই এতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু সুলতান সিং তাদের আপত্তি গ্রাহ্য করেনি। সে তখন দলের নেতা। পুলিশ তার মাথার ওপর বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে, সোজা ব্যাপার নয়। পুলিশের টাকার অঙ্ক যত বাড়বে—ততই প্রেস্টিজ। সবাই পরামর্শ দিয়েছিল—ঠিক আছে, লুঠ করে এনেছ যখন তখন কয়েকদিন ভোগ দখল করে ওকে ছেড়ে দাও। ও ওর নিজের জায়গায় চলে যাক—

—না, ও আমার সঙ্গে থাকবে—সুলতান বিরাট এক হুঙ্কার দিয়ে ওদের সবাইকে সেদিন স্তব্ধ করে দিয়েছিল—ওকে আমি পুষব—

—কিন্তু ডাকাতের দলে মেয়েমানুষ পুষলে দল ভেঙে যাবে। মেয়েমানুষ বড় সাংঘাতিক জিনিস সর্দার—

—সে আমি বুঝব। যে আমার সঙ্গে বেইমানী করবে, আমি তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারব কুত্তার মত। আমার মেয়েমানুষের দিকে যে 'বুরা' নজর দেবে, আমি নিজের হাতে তার দু' চোখ উপড়ে নেব...

বাবু লোহারি তখন সর্দারের বিশ্বস্ত অনুচর। শয়তান প্রকৃতির লোক। পেশাদার খুনী বলতে যা বোঝায়—লোহারি গ্রামের বাবু ছিল যথার্থ সেই প্রকৃতির মানুষ। সুলতান সিং বাবু লোহারিকে খুব বিশ্বাস করত। ওর কূটবুদ্ধির কাছে সবাই হার মানত। বড় বড় ডাকাতির প্ল্যান দিত বাবু লোহারি, সুলতান পরীক্ষা করে দেখেছে তার একটাও ব্যর্থ হয়নি। তারপর পুলিশের হামলা থেকে দলকে কৌশলে বাঁচাবার বুদ্ধি সব সময় বাবু লোহারিই যুগিয়ে এসেছে। আর সুলতানের সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বাবু লোহারিই একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুতলীর দেহের ওপর।

সে এক ভয়ংকর ইতিহাস। মোরেনার বহু লোকের মুখে আমি পুতলীর এই কাহিনী শুনেছি। রুদ্ধশ্বাস হয়ে শোনারই মত সে-সব কাহিনী। পুলিশের দপ্তরে বহু নথিপত্রে সে-সব ঘটনার সমর্থন রয়েছে, যার কিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে সব অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

ধর্ষিতা হয়ে পুতলী প্রথমে এসেছিল রূপা মহারাজের কাছে, সাহায্যের আশায়। রূপাকে সে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছিল। রূপা-ও তাকে বহিনের মর্যাদা দিয়েছিল। লোকে বলে থাকে কথা, নির্জন বেহড়ে রূপা হাতের কাছে রূপসী (?) বাঈজীকে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে—এটা ভাবা যায় না। রূপা ছিল মদ আর মেয়েমানুষে প্রবলভাবে

অসহ্য পুরুষ। ডাকাতির বেশীর ভাগ টাকা সে ওদিকেই খরচ করত। পুতলীকে সে ছেড়ে দিয়েছে? অসম্ভব। পুতলীকে দল তৈরী করতে সে যথাসাধ্য ঠিকই করেছিল, কিন্তু তার বিনিময়ে পুতলীকে অনেক কিছু দিতে হয়েছে। সোনাদানা, টাকা পয়সা এবং দেহ। মূল্য অবশ্য বড়। কলেই পুতলীর দল গড়ে দিয়েছিল। সে-দলে অজয় সিং ছিল পুতলীর বিশ্বস্ত অনুচর। আর এমনই ঘটেছিল সুলতানের মৃত্যুর পর। পুতলীর বাবু লোহারিকে খুন করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অনেক পরে।

চম্বলের বেহড়ে আমরা দিনের পর দিন এইসব ঘটনা নিয়ে চিত্রগ্রহণ করেছি। তখনও পুতলীর হাত কাটা পড়েনি। পুতলী তখন ঘাঘরা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরতে আরম্ভ করেছে। হাতে তার সাবাক্ষণ একটা পয়েন্ট টু-টু বন্দুক। থলেতে বোঝাই কার্তুজ। পুতলীর হাতের টিপ দিনে দিনে অসম্ভব ভাল হয়ে উঠেছে। শত্রু নিধন করবার সুযোগ পেলে পুতলীর চাইতে খুশী আর কেউ হয় না। সুলতান সিং নিজের হাতে ওকে বন্দুক চালাতে শিখিয়েছিল। পুতলীর নিশানাও ওর নিজের হাতে স্থির করে দিত। তারপর একদিন মানুষ খুন করাতে শেখালো।

একটা গ্রামে ডাকাতি করতে গিয়েছিল সুলতান সিং। প্রচুর সোনাদানা টাকা পয়সা লুঠ করে ফেরার পথে সুলতান সিংয়ের হঠাৎ কি যে হলো, দলের একটা বুড়োকে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে পুতলীর হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিয়ে বলল—ওকে গুলি করে খতম করো—

ভয়ে কেঁপে উঠেছিল পুতলী। নিজের দলের লোককে সুলতান খুন করতে চাইছে? কেন?

—ও পুলিশের স্পাই, আমি টের পেয়ে গেছি—

বুড়োটা চিৎকার করে আপত্তি করেছিল—না না, আমি স্পাই নই, বিশ্বাস করো সর্দার—

সুলতান তার কোন কথাই শোনেনি। সে শুধু পুতলীকে বলল—তুমি গুলি চালাও—নিশানা সোজা রেখে ওর হৃৎপিণ্ড ছাঁদা করে দাও পুতলী।

পুতলী আতঙ্কে কাঁপছিল থরথর করে।

সুলতান হুঙ্কার ছেড়ে আবার বলেছিল—যা বলছি তাই করো পুতলী। বেইমানকে খুন করলে কোন পাপ হয় না। আমি তোমাকে বলছি। [illegible] নিশানায় গুলি চালাও—

গুড়ুম!

সঙ্গে সঙ্গে মর্মভেদী একটা চিৎকার করে সেই বুড়োর কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে সুলতান সিংয়ের সেকি উল্লাস পেরেছে পেরেছে, পুতলী নিশানায় অব্যর্থ গুলি চালাতে পেরেছে, সাবাশ পুতলী, সাবাশ বাঈজী—

ঘটনার অনেক পরে পুতলী জানতে পেরেছিল যে সুলতান প্ল্যান করেই এটা করেছিল। এবং বাবু লোহারির পরামর্শেই। ওকে দিয়ে খুন করিয়ে সুলতান সিং পুতলীকে পুলিশের চোখে ক্রিমিন্যাল করে তোলবার ফন্দি এঁটেছিল। এতে করে পুতলীর সভ্যজগতে ফিরে যাবার সমস্ত পথই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন নুরাবাদ লোকেশানে দাঁড়িয়ে আমরা যখন 'অভিশপ্ত চম্বল'এর শুটিং করছি, তখন পুতলীর একটা হাত কাটা পড়েছে। কেমনভাবে ওর হাতটা কাটা পড়েছিল—মোরেনায় আমি তার রোমাঞ্চকর বিবরণ শুনলাম।

ঘটনাটা ঘটেছিল ভিণ্ড জেলায় এক দুর্গম বেহড়ে। পুতলী সদলবলে তখন একটা গ্রামে ডাকাতি করে দ্রুত ফিরে যাচ্ছিল বেহড়ের অলিগলি ধরে, কিন্তু ওদিকে যে পুলিশ ফাঁদ পেতে পথের মাঝখানে ওরই জন্যে অপেক্ষা করছে—তা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেনি।

বেলা তখন এগারোটা।

পুলিশ বেহড়ের অলিগলিতে অ্যামবুশ করে রয়েছে। সেই পুতলীরা ওদের রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার—ফায়ার!

অতর্কিত এইরকম একটা আক্রমণের জন্যে পুতলী তৈরী ছিল না। হকচকিয়ে গিয়ে ওরা বেশ কিছুটা পেছনে হটে গিয়ে আত্মরক্ষা করল।

তারপর আরম্ভ হলো পাল্টা আক্রমণ। পুলিশ দশ রাউণ্ড চালায় তো এরা মাত্র এক রাউণ্ড। পুলিশ এক কদম অ্যাডভান্স হয় তো এরা পিছিয়ে যায় দশ কদম। তারপর পুতলী দলের লোকদের পালাতে নির্দেশ দিল। আর পুলিশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবার জন্যে কল্লা সিং কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে রুখে দাঁড়াল পুলিশের বিরুদ্ধে। ওরা এক ঝাঁক পাঠায় তো পাল্টা এরা পাঠায় আর এক ঝাঁক।

মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে বুলেট বেরিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন গর্জন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুতলী বেহড়ের একটা নিরাপদ জায়গায় আধশোয়া হয়ে পুলিশের মোকাবিলা করছিল, এমন সময় সে হঠাৎ তীব্র একটা আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়ল। বাঁ হাতের বাহুমূলে একটা বুলেট এসে সোজা ঢুকে গেছে। রক্তে জামা কাপড় ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় হাত যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। পুতলী ছটফট করতে করতে মাটিতে গড়াতে লাগল।

ওদিকে পুলিশ বাহিনী ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে। মেশিনগানের আওয়াজে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠছে। কল্লা সিং প্রমাদ গুনলো। জোরে দেখালো, দলের লোকেরা এতক্ষণে নিরাপদ জায়গায় নিশ্চয় পৌঁছে গেছে বা যাচ্ছে, অতএব আর প্রতিরোধ করার অর্থ হয় না। কারণ অ্যামুনেশান দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। কল্লা সিং তখন নেত্রীর খোঁজে ছুটলো। এসে দেখে পুতলী রক্তাক্ত শরীরে মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। কল্লা আর দেরী করল না। তৎক্ষণাৎ পুতলীকে কাঁধে চাপিয়ে ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। তখন পুতলীর বেহুঁশ অবস্থা। ক্ষত থেকে অনবরত রক্ত বেরিয়ে এসে কল্লার শরীর রক্তাক্ত করে তুলছে।

অবাক কাণ্ড, শেষ পর্যন্ত ওরা পুলিশের জাল কেটে পালাতেও সক্ষম হলো। যেহেতু ওদের নিরাপদ ঠিকানায় ঠিকই পৌঁছে দিল—পুলিশের পক্ষে যেখানে পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

তারপর?

কয়েকদিন বেহুঁশ হয়ে খাটিয়ায় পড়ে ছিল পুতলী। গাছগাছালির চিকিৎসায় খানিকটা কাজ হলো বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতটাকে বাঁচানো গেল না। গ্যাংগ্রিন ফর্ম করে যাচ্ছিল। পুতলী তাই ছদ্মবেশে মোরেনায় এসেছিল চিকিৎসার জন্যে। মোরেনায় এসে পুতলী বাকি এক মাসের বেশী মোরেনা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়েছে। লোকে ধরে নিয়েছিল, একটা পাগলী। চলন্ত গাড়ি থেকে রেলের তলায় পড়ে গিয়ে ওর হাত কেটেছে। রেলের ডাক্তারই চিকিৎসা শুরু করেছে। তারপর উপায়ান্তর না পেয়ে গোটা হাতটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে ডাক্তার—যা পাগলী, বেঁচে গেলি এবার। আর কখনো গাড়িতে উঠবি না—কেমন?

পাগলী হিহি করে হেসেছে—না, আর উঠব না।

যা লুকিয়ে থেকে পাগলী হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ। সবাই ভাবল—পালিয়েছে। বাঁচা গেল। ওর উৎপাতে প্ল্যাটফর্মে চলাফেরা করা ক্রমে দায় হয়ে উঠছিল......

কিন্তু তার দিন পনেরোর মধ্যে পুলিশের সদর দপ্তরে খবর এসে পৌঁছেছে—পুতলী মরেনি, পুতলী মরেনি, পুতলী মরেনি......

কারণ ভিণ্ড জেলার দুটি গ্রামে সে আবার ডাকাতি করেছে। মানুষ খুন করেছে। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সী ইজ অ্যাট লার্জ। এটাই প্রমাণ।

সেই সংবাদ ভয়ংকর। যারা ভেবেছিল এনকাউণ্টারে ফেঁসে পুতলী মরেছে, তারা আবার শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াল। হারামী বেঁচে আছে তাহলে? সত্যনাশ!

আবার সাজ সাজ রব।

পুলিশের কেল্লায় বন্দ্র আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। বার্তা ছুটলো চারিদিকে—পুতলী বেঁচে আছে...ওকে ধরো...পুতলী বেঁচে আছে...ওকে ধরো...জীবিত অথবা মৃত ওকে ধরো...যেমনভাবেই হোক ওকে খতম করো...ডেঞ্জারাস বিপজ্জনক...পুতলীকে ধরো......

উজ্জ্বল মজুমদার

তরুণ মজুমদার

শুধু টালিগঞ্জ বলি কেন, বৌবাজার স্ট্রীট বা ধর্মতলা স্ট্রীটের পরিবেশক পাড়ায়ও 'যাত্রিক' নামের বিশেষ গুরুত্ব ছিল একসময়। এখনও যে সেই জনপ্রিয়তা নেই তা বলা যাবে না, কিন্তু 'যাত্রিক' সম্পর্কে ইমেজ এখন পাল্টে গেছে অনেক। চলচ্চিত্র মহলে একটা সময় 'যাত্রিক' বলতে বোঝাত তরুণ মজুমদার, দিলীপ মুখার্জি আর শচীন ব্যানার্জিকে। এককথায় থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আর কি! আর এখন 'যাত্রিক' হয়েছে 'ওয়ান ম্যান শো'র ব্যাপার, দিলীপ মুখার্জি যার মধ্যমণি। যাত্রিকের সুখ দুঃখ সম্মান-অসম্মান সব কিছুই এখন তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

দলটা ভাঙল কেন—প্রশ্নটা রাখতে তরুণ মজুমদার একটু ভূমিকা করলেন প্রথমটায়। জানালেন যাত্রিকের জন্ম-ইতিহাস। পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে তখন ওঁরা তিনজনই কাজ করছেন। তিনজনেরই মনে স্বপ্ন পরিচালক হবার। ওঁদের এই অকথিত বাসনার কথা জানতেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

তিনজন মিলে যখন একজন প্রোডিউসার যোগাড় করলেন তখন উত্তম-সুচিত্রা হেল্পিং হ্যাণ্ড না বাড়িয়ে আর থাকতে পারেননি। তৈরী হোল 'চাওয়া-পাওয়া'। পাক্কা কমার্সিয়াল ছবি। সুপার হিট হয়েছিল ছবিখানা।

পরের ছবি 'স্মৃতিটুকু থাক'। এটিও সুপার হিট। যাত্রিক উঠল তুঙ্গে। শুরু হোল 'কাচের স্বর্গ'। যাত্রিকের তিন নম্বর ছবি এখনও বোধহয় যাত্রিকের সেরা ছবি ওটি।

'দলের মধ্যে অমিলের শুরু এই ছবি তৈরীর সময় থেকেই।'

আবার বলতে শুরু করলেন তরুণবাবু, 'অমিল বলতে যা মনে করছেন ব্যাপারটা ঠিক তা ঘটেনি। উই রেসপেক্ট ইচ আদার ভেরি মাচ—এখনও। পার্থক্য ছিল ছবি তৈরীর কাজে। অন্য কিছু নয়। একে অপরের প্রতি যথেষ্ট নাইস ছিলাম আমরা। কোনোদিন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি।' বলে একটু থামলেন। একটা সিগারেট ধরালেন আবার। এই ফাঁকে ডায়রীতে টুকতে লাগলাম আমার প্রয়োজনীয় পয়েণ্টগুলো।

'জানোতো ছবি করার ব্যাপারটা কখনও কম্প্রোমাইজ করলে হয় না। দলে আমরা তিনজন, স্বাভাবিকভাবেই তিনজনের চিন্তাধারা সবসময় এক হয় না, আমাদের ক্ষেত্রেও হয়নি। কাজের প্রতিটা স্টেজে আমাদের প্রত্যেককে নানাভাবে কিছু ছাড়তে হয়েছে। এর ফলে বেশী মার খেয়েছে ছবিটাই। আসলে ক্রিয়েটিভ ব্যাপারে কোনো সমঝোতা চলে না। সেটা দল তৈরীর প্রথমটায় খেয়াল করিনি। কারণ ছবি পরি-

চালনা করব এইরকম চিন্তায় প্রায় পাগল ছিলাম তখন।

'ছবি সম্পর্কে তখন চিন্তাও ছিল অন্যরকম।। 'কাচের স্বর্গ' ছবি থেকেই মানসিকভাবে আমরা যেন আলাদা হয়ে পড়ছিলাম। মনে হয়েছিল এভাবে কাজ করে নিজেদের উন্নতি তো হবেই না, বরং ক্ষতি হবে। অবশ্য এর পরও আমরা ছবি করেছি। কিন্তু বেশীদিন নয়।'

দল ভেঙে ইনডিভিজুয়্যাল ছবি করার তাঁর উপকার কম হয়নি। তিনি মনে করেন, দলের অন্য সদস্যদেরও নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়নি। এঁর ভেতরে মনে সেই-আলাদাই তরুণবাবুর কাছে এখন একেবারে আলাদা ধাঁচের। ছবি করা তাঁর কাছে খাওয়া-পরার জন্য যতখানি প্রয়োজন, আরও বেশী প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য।

আর সেই কারণেই এক সময়ে যিনি প্রায় বোল্তা টাইপের গ্রামের ছেলে ছিলেন আজ তিনি বাংলা ছবির জগতে একটা জায়গা করে নিতে পেরেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ভাবতেন জীবনটা সরলরেখার মত সাবলীল হবে, স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাবে ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু কলকাতা-শহরে এসে প্রথমটায় যে রিসেপশন পেয়েছিলেন তিনি, তাতে তাঁর সেই স্বপ্ন-কল্পনা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। অনেক কষ্টে অনেকগুলো দিন কেটেছে এই নিষ্ঠুর কলকাতায়। ভাগ্যের হাতে প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। কিন্তু আশাহত হননি। ভাগ্যচক্রে আবর্তিত হতে হতেও উদ্যম হারাননি। ওঁর আঁকার হাত ছিল ভালো। ঐ ক্ষমতাকে সম্বল করেই সিনেমা পাবলিসিটির কাজ শুরু করেছিলেন।

এরপর ঘটনা ও সময় অনেক পেরিয়েছে। প্রায় ভেঙে পড়া কল্পনা আর আশাগুলো ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠেছে। যাত্রিক দলে কাজের অভিজ্ঞতা পাথেয় করে একদিন একলা পথেই যাত্রা শুরু করলেন। প্রথম ছবি 'আলোর পিপাসা' সুপার হিট না হলেও প্রযোজককে বিমুখ করেনি।

একলা পথের সেই শুরু থেকে এখনও তিনি চলেছেন। অবশ্য এখন আর তিনি একা নন। অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে কোন এক মধুর লগনে মন বদলের পর মালা বদল করে টালিগঞ্জের একান্তে একখানা মাথা গোঁজার দুতলা আস্তানাও করে নিয়েছেন। দুজনেই আছেন সেখানে।

সারা বাড়ী জুড়ে বেশ শান্ত পরিবেশ। কোনো হৈ-চৈ নেই। অন্তত যে রোববার সকালে আমি গিয়েছিলাম সেদিন ছিল না। তরুণবাবুও সেই কথা বললেন—' বাড়ীতে তো আমরা মাত্র দু-তিনটে মানুষ। সারাটা দিন পড়াশুনো আর গল্প করেই কাটে। বাইরে খুব একটা বেরোই না। বাইরের সোস্যাল লাইফ আমাদের নেই-ই বলতে পার। মাঝে মধ্যে হঠাৎ কখনও ইচ্ছে হলে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। যতদূর মন চায় চলে যাই। আর এই ছোটখাট আউটিংগুলো

[illegible]
জয়শ্রী রায়

আমার খুব ভালোও লাগে, কাজে আসে। পথের মাঝে কোনো চটি-ফটিতে খেয়ে নিলুম, ব্যাস! চলল এইভাবে ক'টা দিন। তারপর বাড়ীর জন্য মন কেমন করলে গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিই কলকাতার দিকে।'

তবে এমন বেপরোয়াভাবে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ খুবই কম পান তরুণবাবু। প্রায় সারাটা বছরই তো ব্যস্ত থাকেন ছবির নানা কাজ নিয়ে। সময়? সময়ের বড় অভাব!

•

শুধুমাত্র ধর্মতলা স্ট্রীটের পরিবেশক মহলে নয়, দর্শকের মধ্যেও নায়কদের নিয়ে যেমন এক ধরনের হিরো হিরো ইমেজ তৈরী হয়, বাংলা ছবির কয়েকজন পরি-চালকদের সম্পর্কেও দর্শকের কাছে ঐ ধরনের একটা ইমেজ আছে। ভালো, পরিচ্ছন্ন, এন্টারটেইনিং ছবির পরিচালক হিসাবে তরুণ মজুমদারের নাম দর্শকরা করেন। তরুণ মজুমদার সম্পর্কে তাই এক ধরনের ইমেজও তৈরী হয়েছে।

এই ঘটনার কথা তুলতে তরুণবাবু বললেন—'পাবলিকের কাছে আমার একটা ইমেজ তৈরী হয়েছে—এটা নিশ্চয়ই আনন্দ-সংবাদ এবং সেটা নিশ্চয়ই ভালো লাগে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে একটা জিনিস খুব সন্ত্রস্ত করে, তা হোল পাবলিকের কাছে সেই ইমেজটাকে ধরে রাখতে পারব কিনা। কারণ, সাধারণ দর্শক, যাঁরা আমার এই ইমেজ তৈরীর মূলে, সবসময়ই রিলিফ পাওয়ার ছবি চান। অন্য ধরনের কোনো ছবি করতে গেলেই এঁদের সম্পর্কে প্রচন্ড চিন্তা হয় আমার। গল্প নির্বাচন থেকে ছবি তৈরীর শেষ পর্যায় পর্যন্ত প্রতি পদে এঁদের কথা ভাবতে হয় আমাকে। তাই যেখানে কিছু ছবির কোনো দৃশ্যে আরও বেশী ফাইনার টাচ দিতে পারলে ছবিখানা দারুণ হতে পারত, আমি জানি, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের বাহবাও পেতাম, কিন্তু

রাজবংশ
উত্তমকুমার / প্রেমানারায়ণ
অমৃত ফটো

এই সাধারণ দর্শকের কথা ভেবে তা করতে পারি না।'

তবে যতদূর জানি 'সংসার সীমান্তে' ছবিতে তিনি কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, সাধারণ দর্শকের কথা মনে রেখেই করেছেন—বললেন, 'দেখি দর্শকরা কি বলে!' গলায় আশার সুর। আশাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনও।

ইতিমধ্যে ওপর থেকে খবর এলো জগৎ মুরারী ফোন করছেন। দু' মিনিট সময় চেয়ে উঠে গেলেন তিনি। পড়ার ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলুম এই ফাঁকে। সারাটা দেয়াল জুড়ে অনদিকে লম্বা বুক কেস। বই-এ ঠাসা। রবীন্দ্র ও শরৎ গ্রন্থাবলী থেকে সাহিত্য আকাদেমির অভিধান পর্যন্ত আছে। সিনেমার বই-এর উপস্থিতির কথা বলাই বাহুল্য। অভিধানের পাতায় একটা আলগা কাগজ, খুলে দেখি তাতে কয়েকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লেখা। শব্দগুলো দেখে মনে হোল 'সংসার সীমান্তে'র চিত্রনাট্য লেখার সময় বুঝি এগুলির দরকার হয়েছিল।

একটু বাদে তিনি এলেন। চুলগুলো ঠিক করতে করতে বসলেন চেয়ারে। কড়া পাওয়ারের চশমাটা পাঞ্জাবীতে মুছে আবার পরে নিলেন। একটু কাৎ হয়ে বসে বলে উঠলেন—কি নিয়ে কথা হচ্ছিল যেন...

ঃ নতুন করেই শুরু করুন না—বললাম।

হেসে উঠলেন তরুণবাবু। আগের কথা হারিয়ে শুরু হোল নতুন কথা। নতুন করে। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি অতীতে চলে যাচ্ছিলেন বারবার। অতীতের ভুলচুকের কথা বলতে গিয়ে বললেন—'প্রথম দিকে ট্র্যাশ সাবজেক্ট নিয়ে ছবি করেছি কয়েকটা। বড় ভুল করেছি। সিনেমা তো এক্সপ্রেস করার একটা ভালো মিডিয়াম। এই ব্যাপারটাই তখন মাথায় আসেনি।'

এখন তাই তাঁর ছবি করার মুডটাই আলাদা। উত্তম-সুচিত্রার মত স্টার নিয়ে ছবি এক সময় তিনি করেছিলেন ঠিকই, এবং তাঁদের সাহায্য ছাড়া আজ তিনি দাঁড়াতে পারতেন কিনা সেটাও ভাববার মত। তাহলেও এখন আর তিনি স্টারদের নিয়ে ছবি করবেন না। অনেক অসুবিধে হয়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলের কারণ জিজ্ঞেস করায় জানলাম—স্টারদের না নিয়ে কি ছবি করা যায় না? করছি তো এখন।'

নিজের স্ত্রী সন্ধ্যা রায় বাংলা ছবির জগতে স্টারের পর্যায়ে নিশ্চয়ই পড়েন। তাই বললাম—আপনার স্ত্রী তো খুব ছোট স্টার নন, তাঁকে নিয়ে তো কাজ করছেন?

—সন্ধ্যা স্টার হলেও আমার ছবিতে কাজের সময় ও আমার কথামতই কাজ করে। কোনো স্টারি-ইমেজ আমি রাখতে দিই না।

ঃ পরিচালনা করার সময় সন্ধ্যা রায়কে নিয়ে আপনার কি সুবিধে বা অসুবিধে হয়?

প্রশ্নটা শুনে হাসলেন তিনি। একটু জোরেই হাসলেন। হাসতে হাসতেই প্রথমটায় বললেন—'কি বলি বলো তো?'

ঃ বলুন কিছু শুনি।

এবার হাসি থামালেন। সিরিয়স হলেন একটু।

জবাব পেলাম—'গল্পের শুরু থেকেই সন্ধ্যা এমনভাবে ইনভলভড্ হয়ে যায় যে, চরিত্রটা সম্পর্কে ওকে আমার নতুন করে কিছু বোঝাতে হয় না। স্ক্রিপ্ট লেখার সময় তর্ক-বিতর্কও কম হয় না। নানাভাবে চরিত্রগুলোকে দেখার সুযোগ হয় ওর। ফলে হয় কি—ফ্লোরে গিয়ে সন্ধ্যাকে আর কিছু আমায় বলতে হয় না। ও সবই জানে।'

ঃ এটা তো আপনার সুবিধেই হলো, অসুবিধে নেই কিছু? কেন জানি না, আবার হেসে উঠলেন তিনি।

—এবার তাহলে ঘরোয়া কথা বলতে হয়।

ঃ সেটা কি রকম?

—ধরুন হঠাৎ রাত্রিবেলা ঘুম থেকে ঠেলে তুলে ও আমায় জিজ্ঞেস করছে—এই, আজকের ঐ গানের শটটা ঠিক দিয়েছি তো! বুঝুন ঠ্যালা। মাঝ-রাত্রিতে হঠাৎ ওর মনে পড়েছে শট-এর কথা।' কথা থামিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'অভিনেত্রীর স্বামী, তায় আবার পরিচালক হবার এইটেই অসুবিধে।'

হাসি তখন আমাতেও সংক্রামিত।

নির্মল ধর

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত
জন অরণ্য
আরতি ভট্টাচার্য/রবি ঘোষ

সম্প্রতি টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে বিখ্যাত সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে 'চাঁদের কাছাকাছি' ...বির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবিটি ...রিচালনা করছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। চিত্রনাট্য ...চনা করেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। ছবির ...ধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্বয়ং ...মকুমার। পাগলা গারদ থেকে পলাতক ...ক রোগীর ভূমিকায় তাঁকে এই ছবিতে ...ভিনয় করতে দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে ...প দিচ্ছেন মিঠু মুখোপাধ্যায়, সত্য ...ন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপ্লব চ্যাটার্জি প্রভৃতি ...ল্পী। ছবির চিত্রগ্রহণ করছেন অনিল ...প্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রবীন ...টোপাধ্যায়।

যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত 'স্নো ফকস ...বারে' ছবির চিত্রগ্রহণ চলেছে টেকনি...য়ান্স স্টুডিওতে। এতে অভিনয় করছেন ...মকুমার, মিঠু মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, ...শতবরণ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝুমুর ...লী, শমিতা বিশ্বাস, কল্যাণী মণ্ডল, ...া দে, কল্যাণ চ্যাটার্জি প্রমুখ শিল্পী। ...ছবির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও সঙ্গীত ...চালনা করছেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত, ...ন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং নচিকেতা ঘোষ। ...্য পরিচালনা করছেন বোম্বের বপ্পীপ্রসাদ। ...া দে এই ছবিতে মোট সাতটি গান প্লে-...ব্যাক করেছেন।

যাত্রিক গোষ্ঠীর 'অধিকার' ছবির চিত্র-...ণের কাজ প্রায় শেষ। মহাশ্বেতা দেবীর

এই কাহিনীতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপারোপ করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখার্জি, নন্দিতা বসু, ছায়া দেবী, অনাদি ব্যানার্জি, গীতা দে, মাস্টার অর্ঘ্য প্রভৃতি শিল্পী। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ।

এখন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে 'রাজবংশ' ছবির চিত্রগ্রহণ চলছে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন অসীম সরকার। পরিচালনা করছেন পীযূষ বসু। এ-ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, প্রেমা নারায়ণ। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ।

পরিচালক-প্রযোজক সলিল দত্তর 'সেই চোখ' ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত। কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালক নিজেই লিখেছেন। এতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, মহুয়া রায়-চৌধুরী, বাসবী নন্দী, সুলতা চৌধুরী, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, শ্রাবণী বসু, শিউলী মুখার্জি, কল্যাণী অধিকারী, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, উৎপল দত্ত, পার্থ মুখার্জি ও হরিধন মুখার্জি। এ-ছবির সঙ্গীত পরিচালনা, সম্পাদনা ও চিত্রগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে নচিকেতা ঘোষ, অমিয় মুখোপাধ্যায় ও বিজয় ঘোষ।

স্বদেশ সরকারের পরিচালনায় ত্রিমূর্তি শিল্পমের 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' ছবি এখন মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে। সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা এই ছবির মুখ্য কয়েকটি ভূমিকায় রূপদান করেছেন সন্ধ্যা রায়, আরতি ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর দে অনুপকুমার রবি ঘোষ চিন্ময় রায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে ও ছায়া দেবী। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিমল করের লেখা 'অসময়' ছবির কাজ সম্প্রতি শেষ করেছেন পরিচালক ইন্দর সেন। এ-ছবির বেশীর ভাগ দৃশ্য হাজারিবাগ রোডের আউটডোরেই গৃহীত হয়েছে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অপর্ণা সেন মহুয়া রায়চৌধুরী দীপঙ্কর দে পার্থ মুখার্জি কল্যাণ চ্যাটার্জি দেবিকা দাস অজিত চ্যাটার্জি (ছোট) অনিল চ্যাটার্জি ও স্বরূপ দত্ত। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে এই ছবিটি নির্মিত হচ্ছে। আনন্দশংকর ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন।

বর্তমানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে 'অদ্ভুত নীহারিকা' ছবির চিত্রগ্রহণ চলছে। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার হচ্ছেন যথাক্রমে ডাঃ বিশ্বনাথ রায় এবং শ্যামল গুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা করছেন সুশীল মুখার্জি। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সোমা দে সুমিত্রা মুখার্জি দীপ্তি রায় চিন্ময় রায় রবি ঘোষ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপল দত্ত রাধামোহন ভট্টাচার্য হারাধন ব্যানার্জি তরুণকুমার প্রভৃতি শিল্পী।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এখন 'বনশ্রী বাসু' নামে একটি ছবির শুটিং করছেন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করছেন সুধীন দাশগুপ্ত। চিত্রগ্রহণ করছেন দীপক দাস। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনিল চ্যাটার্জি দীপঙ্কর দে রবি ঘোষ শেখর চ্যাটার্জি এবং সুমিত্রা মুখার্জি।

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের কাহিনীতে 'সবুজ নক্ষত্র' নামে একটি ছবির কাজ শুরু হচ্ছে। এতে অভিনয় করছেন উৎপল ছায়া দেবী সত্য ব্যানার্জি ঝুমুর গাঙ্গুলী গীতা দে প্রভৃতি শিল্পী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সাজাহান নাটকের একটি দৃশ্য

শিশিরকুমার ইনসটিটিউটের ৫৫তম বার্ষিক অনুষ্ঠান

সাজাহান

বিগত ১৮ আগস্ট ১৯৭৫ স্টার থিয়েটারে শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের ৫৫-তম বার্ষিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। মঞ্চোপরি মহাত্মা শিশির-কুমারের প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত ছিল। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সংগীতের পর সাধারণ সম্পাদক সুধীরকুমার বসু সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন।

প্রধান অতিথি রূপে কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শংকর-প্রসাদ মিত্র মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইনস্টিটিউটের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মূল সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথি ইন-স্টিটিউটের পরিচালক কর্মীবৃন্দ এবং পল্লীবাসীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসন-এর উদ্যোগে রংগনায় অভিনীত 'টাকার রং কালো' অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন চিত্তানন্দ রায়চৌধুরী, মুকুল-কান্তি ঘোষ, সুশীল মুখার্জি, অলোককৃষ্ণ মিত্র বরুণ দত্ত বিমল দে, অসীমরতন গাংগুলী ও শ্রীমতী তপতী সরকার। তাছাড়া শ্রীমান কুণালকান্তি ঘোষকে গীটার বাদ্যের জন্য মিহিরলাল গাংগুলী এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্স নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসনের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক অভিনীত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, মাননীয় প্রধান বিচার-পতি, শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ শ্রীপ্রফুল্ল-কান্তি ঘোষ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু শ্রীতুলসীকান্তি দে বিশ্বাস শ্রীপ্রতাপ রায় এবং আরো বহু বিদগ্ধজন অনুষ্ঠান শেষে অভিনয় দেখে সভ্যদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পরিচালনা ও নামভূমিকায়—মিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় সহ-পরিচালনা ও ঔরংজেব—সুধীর মুস্তাফী। নৃত্য পরিচালনা ও জাহানারা চরিত্রে—গীতশ্রী দেবী। সংগীত—সুবোধ মল্লিক। আলো ও মঞ্চ—বিভাস মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য অভিনয়াংশে: কুণালকান্তি ঘোষ (দারা)। গৌতম সরকার (সোলেমান)। মুকুলকান্তি ঘোষ (দিলদার)। অসীমরতন গাংগুলী (জয়সিংহ)। শ্যামসু দে (মোরাদ) বরুণ ঘোষাল (সুজা), কুণাল-কান্তি ঘোষ (সিপার), ভোলানাথ ব্যানার্জি (যশোবন্ত সিংহ) সবিতা মুখার্জি (নাদিরা) জ্যোৎস্না দত্ত (পিয়ারা), শিখা ভট্টাচার্য (জহরত) চিত্রিতা মণ্ডল (মহামায়া) দীপালী মান্না উমা দাস বন্দনা বিশ্বাস শোভা দাস লিলি গাঙ্গুলী (নর্তকী ও চারণীগণ) ও সুশীল মুখার্জি তরুণ কর বিমল দে বরুণ দত্ত বিভাস দাস গৌতম সেনগুপ্ত শীতল দাস বিভাস মুখার্জি অলোক মিত্র প্রভৃতি ছিলেন। গীতাংশে ছিলেন গুরুদাস ধাড়া। তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রীতুলসীকান্তি দে বিশ্বাস ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাজাহান চরিত্রের অভিনয়ে বিভিন্ন অভিনেতাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দৈহিক অভিব্যক্তির আশ্রয় নিতে দেখা গেছে—এবং এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়ে এসেছে। যেমন পঙ্গুত্বকে বোঝাতে গিয়ে হাতের কম্পন। মিহিরবাবু এদিক থেকে পূর্বসূরীদের অনুসরণে যেমন সার্থকতায় পরিচয় দিয়েছেন—তেমনি বাচন ভংগীতে তার মধ্যে কারো প্রভাব পরিলক্ষিত হতে দেখিনি বলেই তাঁর অভিনয় অতি-নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট হয়নি। পিতৃ-হৃদয়ের দৌর্বল্য—অসহায় পংগু সাজাহানের মধ্যে সম্রাট্ সাজাহান মিহিরবাবুর অভিনয়ে ফুটে উঠেছে।

সুধীর মুস্তাফী দরবার দৃশ্যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মবিশ্বাসের দোহাই দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির কুটিলতা সুধীর বাবু সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুকুল-কান্তি ঘোষের দিলদার সহজ স্বাভাবিক এবং সরস। সিপার চরিত্রে শ্রীমান কুনাল-কান্তির অভিনয় অপূর্ব। ইদানীংকালে শ্রীমতী গীতশ্রী জাহানারা চরিত্রে বহু নাট্য-মোদীদের খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়েছেন। বর্তমান অভিনয়েও সেই খ্যাতি অম্লান আছে। জ্যোৎস্না দত্তের পিয়ারা গানে অভিনয় অপূর্ব। দারা সোলেমান সিপার মহম্মদ যশোবন্ত এবং জয়সিংহ চরিত্রের শিল্পীদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছোট-বড় প্রতিটি চরিত্রে প্রতিজন শিল্পী যথাযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এজন্য পরিচালক মিহির গাঙ্গুলীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

সংগীতাংশ প্রশংসনীয়। প্রথমেই গুরুদাস ধাড়া গীত 'প্রেমের সমাধি তীরে' সংগীতটির মধ্য দিয়ে নাটকের উপস্থাপনায় পরিচালকের কাব্যিক মনের পরিচায়ক গুরুদাস ধাড়ার অপূর্ব কণ্ঠ—বিভাস মুখোপাধ্যায়ের আলোক সম্পাত পরিচালকের কল্পনাকে মূর্ত করে তুলেছে।

শীলভদ্র

গত ১৮ই আগস্ট স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'সাজাহান' নাটকে শায়েস্তা খাঁর ভূমিকায় শ্রীবিমল দে অভিনয় করেন। অভিনয়ের দু-একদিন পরে তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পথে দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সম-বেদনা জানাচ্ছি ও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

অন্ধকারের নীচে সূর্য নাটকের দৃশ্য

কিংকুট-এর দু'টি নাটক

বেশ কিছুকাল পূর্বে কিংকুট নাট্য থার একটি নাটক দেখে ভাল লেগেছিল। প্রতি এঁদের দু'টি নাটক 'আলোয় ফেরা' ক্ষক) ও 'অন্ধকারের নীচে সূর্য' দেখে হোল চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে এরা ও ভাল নাটক উপহার দিতে পারবেন। 'আলোয় ফেরা' (রচনা বৈদ্যনাথ দার) অশুভ শক্তির শিকার কয়েকটি পাদপ তরুণের অনিশ্চিত উৎক্ষিপ্ত নের কাহিনী। যারা ভালোভাবে বেঁচে তে চেয়েও তার সুযোগ পায়নি। তবু স্বপ্ন দেখেছে সুন্দর জীবনের। এবং ঘটেছে দলের শুরুর সঙ্গে দুস্থ দরিদ্র আদর্শে নিষ্ঠ মাস্টারমশাইর দেখা র পর। তিনিই তাদের বলেছেন 'আলোয় র ঠিকানা। জেলে বসেও নিতু তাই দেখতে পেরেছে। সে আবার সুন্দর জীবনে ফিরে যেতে পারবে। কাল সমাজ তখন তাকে নিয়ে গর্ব র।

মোটামুটি 'আলোয় ফেরা'র এই বক্তব্য। কার নাটকের সূত্রপাতটি বড় করেছেন। স্টেজে একদিকে নাটক হচ্ছে অন্যদিকে সদ্য সৃষ্টিকরা চরিত্র অভিনয় দিয়ে তা প্রকাশ করে যাচ্ছে। মনে হয় নাটকের বাঁধুনি কোথায় যেন টা আলগা মনে হয়েছে। যেমন শেষের নিতুকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেও তার দিয়ে যে সব কথা বলিয়েছেন তা যেন বা সিচুয়েশনের সঙ্গে সমতা রাখতে নি।

তবে এই ত্রুটি অনেকাংশে ঢেকে গেছে নেতাদের আবেগের জন্য।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় বৃদ্ধ রমশাই রূপী শ্যামল রায়চৌধুরীর। এঁর মঞ্চে প্রবেশ ধীর স্থির গতিবিধি ও প্রায় অন্ধ চোখের চাহনির সঙ্গে ঋজু ভঙ্গীতে সংলাপ বলা, তিনি যে পাকা অভিনেতা সেটাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সমগ্র নাটকটিকে তিনিই যেন পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন।

এর পরেই নাম করা যায় নিতুর ভূমিকাভিনেতা অমিতাভ দত্তের। খুবই আবেগ দিয়ে অভিনয় করেছেন তিনি। বিশেষ করে কান্নার দৃশ্যগুলিতে। তবে একটি কথা। ভবিষ্যতে উচ্চারণের দিকে নজর রাখবেন। সেই সঙ্গে মুখভঙ্গীর প্রতি। এই দুটিই শ্রুতি ও দৃষ্টিকটু লাগছিল। নিতুর দুই চেলার (দেবাশীষ রায় ও সুভাষ সাহা) ভোলভারী সুন্দর কিন্তু মঞ্চে যেন একটু আড়ষ্ট মনে হয়েছে।

গৌতম দত্ত উকিল টাইপ চরিত্র হিসেবে সুন্দর। নাট্যকার (অরবিন্দ ঘোষ) স্বচ্ছন্দ। অন্যান্য ভূমিকায় শ্যামল রক্ষিত, পৃথ্বীশ মুখার্জী ও গৌতম সেন স্বাভাবিক।

বিজয়কুমারের মেকাপ (বিশেষ করে (মাস্টারমশাই) ও দ্বিতীয় নাটকে রিপোর্টারের মেকাপ) নিখুঁত। তার হাতের স্পর্শে যেন উভয় নাটকের চরিত্রগুলি স্বাভাবিক রূপ নিয়েছিল।

তীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গীত রচনা ও দেবু চট্টোপাধ্যায়ের সুর নাটকের সহায়কই হয়েছে। নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন দিলীপ কর ও শ্যামল রক্ষিত। সম্পাদনা প্রয়োগ ও পরিকল্পনার (শ্যামল রায়চৌধুরী-কৃত) দিক থেকে অবশ্য দ্বিতীয় নাটক 'অন্ধকারের নীচে সূর্য' (রচনা অগ্নিদূত) অনেক পরিণত। বক্তব্যের দিক থেকেও দর্শককে আবেগ সিঞ্চিত করেছে।

অভিনয়ে ছোট-বড় মেজো তিন ভাইয়ের ভূমিকায় দিলীপ কর, শম্ভু মিত্র ও শ্যামল রক্ষিত এবং কৃষ্ণচন্দ্র দাসের অফিস বস ও গৌতম দত্তর বড়বাবু সুন্দর। অজিত দে (বাবা), শ্যামাপদ মুখার্জী ও বিশ্বনাথ মুখার্জী (দুই প্রেমিক) একটু আড়ষ্ট মনে হলেও আন্তরিক। ধীরা লাহার মা ও তাঁর মেয়ের ভূমিকায় (রমা) মীনা দাশ স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন।

শ্যামল রায়চৌধুরীর পশ্চিমবঙ্গ বাবু (রিপোর্টার) অভিনয়ের গুণে যেন বাস্তব রূপ নিয়েছিল।

এ নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র দাস এবং আবহসঙ্গীতে শম্ভুনাথ দে ও প্রবীর সাহা।

নব মঞ্চের হাসির নাটক

পুরনো যুগের নাটক অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ইদানিং একদম কমে এসেছে। এর একটা বড় কারণ বোধহয় একালের তুলনায় সেকালের নাটক অনেকটা স্থূল আবেগ প্রবণ এবং বক্তব্যের দিক থেকে কালাতীত বলে সে যুগের নাটক এখন আর তেমন অভিনীত হয় না।

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ
দীপংকর / আবৃত্তি / অনুপকুমার

প্রায় অনায়াসেই তিনি জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। দর্শককে তিনি প্রচুর আনন্দও দিয়েছেন।

এর পরেই নাম করতে হয় শ্রীসুভাষ ভৌমিক (ঘটক), কানু রায়চৌধুরী (দাদা) ও পার্থপ্রতিম (সুনীল)-এর। এ'রা কয়েকটি করে সুন্দর মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন দর্শককে। এছাড়া গৌতম আঢ্য (রজা) ও গোপী কিষেণ সরাফ (পুরুত)-এর অভিনয়ও ভাল।

এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় মঞ্জুন হাজরা অলক ভট্টাচার্য, সনাতন নস্কর, যোগেন্দ্র এ্যান্টনী, শ্যামল কুমার ও বিশ্বজিৎ সেন মানিয়ে নিয়েছেন। স্ত্রী চরিত্রে শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জী, মিলি দে, কৃষ্ণা দাস ও বুলা গুপ্ত ভাল। অন্ধ মেয়ে কুমারী পুতুল দাসের সুরেলা কন্ঠের গান দর্শকদের মন ভরিয়েছে।

তবু এমন অনেক নাটক আছে যা এখনও দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। দীনবন্ধু মিত্রর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' তেমনি একটি নাটক। এই নাটকটি সেই আমলের মঞ্চে ও নাট্য সাহিত্যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

এ কথাটা আবার নতুন করে মনে হোল নবমঞ্চ নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক তার পুনরভিনয় দেখে।

এ নাটকে তৎকালীন সামাজিক প্রথা এবং গ্রাম্য কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তির একটা স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যখন মরবার আগেও বৃদ্ধরা (বিশেষ করে ব্রাহ্মণ) কুমারী ও দরিদ্র উদ্ধারের নাম করে যুবতী মেয়েকে বিয়ে করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করত না। এবং সমাজ ও পরিবেশ তা মেনেও নিত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও তেমনি একটি চরিত্র। যার ঘরে একটি বয়স্ক বিধবা ও একটি কচি বিধবা মেয়ে রয়েছে।

নাটকটি আপাতে হাস্যরসাত্মক ও উপভোগ্য হলেও এর অন্তরালের নিষ্ঠুরতাটুকু এখনও দর্শক মনকে বিষণ্ণ করে তোলে।

মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন পরিচালক অনিল গুহ। একটি দুরূহ টাইপ চরিত্রকে

বিল্বমঙ্গল : সোমা/সমিত

লোকতীর্থের দুটি নাটক

আজকালকার নাটকে শুধু মাত্র তার পরিবেশের দিক থেকেই স্বতন্ত্র সৃষ্টির চেষ্টা নয় বরং বলা যায় বক্তব্য প্রকাশটাই এখন নাটকের মূল উদ্দেশ্য। সেখানেই বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারগুলি তাঁদের স্বকীয়তা রক্ষার চেষ্টা করে থাকেন।

সেদিক থেকে লোকতীর্থ কিন্তু আদৌ পেছিয়ে নয়। অথচ এ'দের পরিবেশিত (বিশেষ করে প্রথম নাটকটি) নাটকের বক্তব্য ভাল লেগেছে :

প্রথম নাটকটির বক্তব্য সংসারে উপেক্ষিত কয়েকটি বেকার অথচ উচ্চাভিলাষী যুবককে

অপর্ণা
স্বরূপ দত্ত

...রই এক মিঃসন্তান প্রৌঢ় দম্পতি ...তে স্থান দিয়ে এবং সেই সংগে তাদের ...হ দিয়ে কি করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ...প্রেরণা জোগালো এবং কি করে তারা ...ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করল তাই ...ই 'পঞ্চমিত্র' নাটক।

সমস্ত নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে ...মেজাজে অর্থাৎ হাসি ঠাট্টা গান প্রণয় ...দের মাধ্যমে। সব মিলে নাটকটি যেমন ...ভাগ্য তেমনি ভাববাহক।

মূল চরিত্রে (প্রৌঢ় নবনী চাকলাদার) ...দের (নাট্যকার ও পরিচালক) নয় এ নাটকের সম্পদ। তিনি একটি ...চরিত্রে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ ...ছেন। সেই সংগে প্রভাতভূষণের গান। ...া সন্দীপ ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু রায় ...মুখার্জী প্রশান্ত ব্যানার্জী অঞ্জন ...লী স্বপনকুমার রায়চৌধুরী নাটকটিকে ...ন্ত করে তোলার পক্ষে সহায়ক ...ন।

...রী চরিত্রে মিত্রা মজুমদার ও স্বপ্না সুন্দর। প্রথম নাটকের তুলনায় দ্বিতীয় 'ওরা আলো চায়' বেশ দুর্বল। ...র বিষয়বস্তু ভাল কিন্তু অভিনয় সেই ...য় নিষ্প্রাণ। মনে হয়েছে অভিনেতাদের ...অনুশীলনের অবকাশ ছিল।

শিয়ালদহ বয়েজ ক্লাবের নাটক

...শিয়ালদহ বয়েজ ক্লাব তাঁদের বার্ষিক উপলক্ষে নেতাজী মঞ্চে পরিবেশন ...ন উৎপল দত্ত রচিত দেশাত্মবোধক 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। এই ধরনের ...করা সাধারণ সংস্কৃতি সংস্থার পক্ষে কাজ সন্দেহ নেই। তবু শিয়ালদহ ক্লাবের সভ্যরা রীতিমত নিষ্ঠার সঙ্গেই ...টি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের উপহার ...ছেন এবং আনন্দও দিয়েছেন।

...অভিনয়ে দর্শকদের সর্বাধিক প্রশংসা ...ছেন যথাক্রমে অলোক সরকার ...(...ন কিচলু), সমীর চ্যাটার্জী (...ইয়ালাল), বাসুদেব দাসরায় (মকবুল ...) নবারুণ সেন (মাইকেল আরউইং) ...দ গাংগুলী (ডায়ার) এবং দুটি নারী আবেগের সংগে অভিনয় করেছেন ...তালুকদার ও নমেলা সরকার।

...র পরেই নাম করতে হয় দীপক ...সঞ্জিত সিনহা রাম রথীন সাহা,

দীপক বসু মজুমদার, হিমাংশু বোস সমীর দাস, বরুণ ব্যানার্জী ও বিকাশ রায়ের।

অন্যান্য ভূমিকায় প্রদীপ তরফদার, অমর নাথ পাল বরুণ ব্যানার্জী শ্যামাপ্রসাদ দত্ত পুষ্কর ভৌমিক অমিতাভ চক্রবর্তী শান্তনু সেনশর্মা সন্টু ভট্টাচার্য মাধব ব্যানার্জী এবং জনতা ও পুলিশের ভূমিকাভিনেতারা তাঁদের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেননি।

নাটকটির পরিচালক শ্রীপংকজ ঘোষ।

নট নাট্যমের অভিনয় : গত ১৫ আগস্ট আরামবাগ নট-নাট্যম আরামবাগ রামমোহন হলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নহবত' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকটিতে প্রথম থেকেই একটি বিয়ে বাড়ীর আবহাওয়া ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে নানান কারণে নাটকের গতি ব্যাহত হলেও শেষ অংশে নাটকের ট্র্যাজিক সুরটি পরিচালক ফাল্গুনী মজুমদার সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সমস্ত নাটকটিতে

[illegible] : উত্তম/অপর্ণা]

ফুলশয্যা
অনিল চ্যাটার্জি/সাবিত্রী

কেষ্টার ভূমিকায় প্রণব দের সচ্ছল অভিনয় চোখে পড়ে। এছাড়াও বড়জামাই রূপে করুণা ভট্টাচার্যের অভিনয় ছিল নাটকটির বড় আকর্ষণ। নাটকটির টিম ওয়ার্ক মোটামুটি। অন্যান্যদের মধ্যে তপন দে শম্ভু দে তাপস ভট্টাচার্য রাজু সামন্ত মলিনা দে ও ছবি নাগের অভিনয় যথাযথ। নাটকটির আলোকসজ্জায় ছিলেন শক্তি বাগ।

আর্ট থিয়েটার ব্যারাকপুর

সম্প্রতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান মারফৎ কাঁচরাপাড়ার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা আর্ট থিয়েটারের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হোল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন প্রখ্যাত নাটাকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিন অভিনীত হয় 'মারীচ সংবাদ'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় দিন পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। উভয় দিনের নাটকই দর্শকদের প্রশংসা কুড়োয়। দুটি নাটকই পরিচালনা করেন সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোনার হরিণ নাট্যাভিনয় : ত্রিবেণী টিস্যুজ এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে সদস্যগণ কর্তৃক ক্লাব মঞ্চে নাট্যকার শচীন ভট্টাচার্যের 'সোনার হরিণ' মঞ্চস্থ করেন। নাট্যোৎকর্ষতায় মফঃস্বলের নাট্যানুরাগীরা মোটেই পেছিয়ে নেই এ সত্যের স্বাক্ষর অভিনেতারা রেখেছেন। দলগত অভিনয়ে শিল্পীদের কুশলতা নাটকটিকে সফল করতে পেরেছে। নাটকটি পরিচালনা করেন অজিত চক্রবর্তী।

মিলনী সংঘের অনুষ্ঠান

বর্ধমানের জোগ্রামের 'মিলনী সংঘ' তাদের ৩০তম বার্ষিকী উৎসবে যথাক্রমে 'ভগবাজী', 'মানুষ পেলাম না' ও 'হাসির হাটে কান্না' এই তিনটি যাত্রা মঞ্চস্থ করলেন।

সুনির্দেশনা এবং সংস্থার শিল্পীদের দলগত প্রচেষ্টায় সমগ্র বিচারে তিনটি নাটকই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য (রসিকলাল ও অনুপম) সুনীল চট্টোপাধ্যায় (নিশীথ), লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী (অতনু কৈবল্য মিত্র) ও ভারতী ব্যানার্জীর (প্রতিমা অতসী ও লক্ষ্মীবাই) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই চরিত্রানুগ সুন্দর অভিনয় করেন।

নাট্য সমালোচক

এল পি ডিস্কে দ্বিজেন মুখোপা[ধ্যায়]

এবারের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে এ[কটি] এল পি ডিস্ক প্রকাশিত হয়েছে। [শিল্পী] দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের। বারখানি [গানের] মধ্যে ৬খানি পূজা বিষয়ক বাকী প্রেমসংগীত। সবগুলি গানই [...] নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। নির্বাচনও সুন্দর। বিশেষ উল্লেখ[যোগ্য] দার 'সফল করহে প্রভু' 'দুরে রজনীর লাগে।'

[...] রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

সম্প্রতি অবনমহলে মঞ্চস্থ [...] প্রতিষ্ঠানের এক সান্ধ্য আসরে [...] নাথের গান ও নজরুল গীতি শোনা[ন] চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বাণী ঠাকুর, [...] ও ঊর্মিলা বসু (রবীন্দ্রসংগীত) এবং ঘটক ও অখিলবন্ধু ঘোষের কণ্ঠে [...] রবীন্দ্রসংগীতে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও ঠাকুর তাঁদের গানে (সেদিন দ[...] ফুলে ফুলে এবং খেলার সাথী [...] ছেড়ে) আপনাপন মানে সমাসীন [...] কিন্তু সকলের মনোযোগ আকর্ষণ [...] নবাগতা ঊর্মিলা বসু। ইনি [...] 'নাগো' 'এই যে ধরে' 'ছায়া ঘনাই[ছে]' 'ধীরে ধীরে পরাণ খুলে'। সু[...] কণ্ঠ সুন্দর এবং পরিবেশনা সম্প্র[...] মিলিয়ে ইনি এক নতুন আশ্বাস[...] বসুর দুটি গান (মোর ভাবনারে [...] কোথায়) সুগীত।

নজরুলগীতিতে মনে অবিস্মরণী[য় ছাপ] রেখেছেন অখিলবন্ধু ঘোষ। রাগাশ্রি[ত] স্বরশুদ্ধতা ও সুরপ্রয়োগের [...]

ধানদোন্ত
সুন্দর, রাজকাপুর ও যোগিতাবালী

...রের স্বচ্ছ গতি সব মিলিয়ে ...আসর জমজমাট করে তুলেছিলো। ...নান 'শূন্যে এ বুকে' এবং 'আমায় ... ভুলতে'।

... ঘটক পরিবেশিত 'করুণ কেন' ...হারা পাখি' সুখশ্রাব্য।

...ত্তে ছিলেন স্বপন মুখোপাধ্যায়।

বিদেশ থেকে

...ন একাডেমিক একসচেঞ্জের ...ছ' মাসের জন্য সাংস্কৃতিক সফরে ...ন স্বনামখ্যাত তবলাবাদক শংখ ...গত ছ'মাসে বহু একক ও ...নুষ্ঠানে তিনি গুণী সমাজের ...কর্ষণ করেছেন ভারতীয় তাল-...ত্তি। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির ...ট হোলো পিটার হ্যামেলের পরি-...ণ্ডিয়ান আর্ট কাউন্সিল সংস্থার ...উৎসব। পিটার ও-দেশের নামকরা ...রিতা। ভারত সফরকালে ...মার ভক্ত হয়ে গেছেন এবং তাঁর ...শীকৃত পিটারের আনন্দ অর্কেস্ট্রা ... এক কেন্দ্রমণি হয়ে ওঠে।

এছাড়া রিয়াস স্টুডিওয় উইক এন্ড ইণ্ডিয়ান শীর্ষক একটি প্রেস্টিজ প্রোগ্রামে তাঁর একঘণ্টার একক তবলালহরা অনুষ্ঠান প্রচারিত ও প্রশংসিত হয়েছিলো। শংখ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে বিশেষ পরিবেশনযোগ্য সংবাদ হচ্ছে ও-দেশের অভিজাত সরকারী প্রতিষ্ঠান 'দাদ' তাঁর সবকটি অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে সামনের বছর সপরিবারে তাঁকে এক বছরের জন্য ফেলোসিপ দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ঐ সংস্থারই অনুরোধে শংখ-বাবু দশ মাত্রার একটি তাল রচনা করে বাজিয়ে শোনান। সেই অনুষ্ঠানকে অভি-নন্দন জানিয়ে ঐ তালের ও'রাই শংখতাল নামকরণ করেছেন।

বেংগল কালচারাল এসোসিয়েশনের আহবানে ২৬শে জুন আমেরিকা যাত্রা করে-ছিলেন প্রখ্যাত গীটারশিল্পী বটুক নন্দী। দুমাসের সফরে ইনি নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, নিউজার্সি, মেরীল্যাণ্ড, ধেট্রয়েট, ওয়াশিংটন, কানাডা, টোরোন্টো, মন্ট্রিয়ল এবং আরো অনেক বড় বড় শহরে গীটারে রবীন্দ্রসংগীত, 'নিশিপদ্ম' চিত্রের গান এবং অন্যান্য ছায়াছবির গান বাজিয়ে শুনিয়েছেন। বিদেশী বাঙালীদের ত কথাই নেই, বিদেশী শ্রোতারাও ওদেশীয় যন্ত্রে ভারতীয় সংগীতের সুর শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। কানাডাবাসীরা ভারতীয় সংগীত এবং বাংলা ছবির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং ও-দেশে বাংলা ছবির সুপ্রশস্ত সম্ভাবনা আছে বলে বটুকবাবু মনে করেন।

ঐ একই সংস্থার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে চার মাসের জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী স্বপন গুপ্ত। শিকাগো, নিউইয়র্ক, বোস্টন, ওয়াশিংটন, টরোন্টো ছাড়াও আরও বহু জায়গায় এ'র গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেছে। লণ্ডনের বহু অনুষ্ঠানে এবং বি বি সি-তে প্রচারিত অনুষ্ঠানেও ইনি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন। ঐ সংস্থাই আহবান জানিয়েছিলেন ধীরেন বসুকে নজরুল-গীতি গাইবার জন্য। এক মাসের সফর শেষ করে তিনি দেশে ফিরেছেন গত ১৫ই আগস্ট। মন্ট্রিয়াল, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, বলটিমোরে ও নিউইয়র্কের সংগীত-সমাজ এই প্রথম নজরুল-গীতি শুনে স্বাদবৈচিত্র্যে চমৎকৃত হয়েছেন। ওয়াশিংটন তরুণ ...

নিশিকুটুম্ব
সৌমিত্র/অপর্ণা

আমেরিকা থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার ও সংগীতানুষ্ঠানও প্রচারিত হয়েছিলো।

রূপনারায়ণপুরে শ্যামা

সম্প্রতি রূপনারায়ণপুরের স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে শ্যামা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন কোলকাতার সংস্থা সুরমন্দির। আহ্বায়ক কুলটি যুবগোষ্ঠি। সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় এ-নৃত্যনাট্যের উপভোগ্য রূপ দিয়েছেন বালকৃষ্ণ মেনন (বজ্রসেন), শক্তি নাগ (কোটাল), সন্দীপ ব্যানার্জি (উত্তীয়) ও সুচন্দ্রিমা রায় (নৃত্যে), সুশীল মল্লিক (বজ্রসেন), সন্তোষ সেনগুপ্ত (কোটাল), সমীপেন্দ্র লাহিড়ী (উত্তীয়) ও কৃষ্ণা মিত্র (শ্যামা) সংগীতে।

দীপক চৌধুরী
সেতারে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা

একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে দীপক চৌধুরীকে একক সেতারবাদনের আসরে নিবেদন করলেন শ্রী সংসদ। পটদীপের আলাপ দিয়ে তরুণ শিল্পী অনুষ্ঠান শুরু করলেন। ভীমপলশ্রীর সংগে এ-রাগের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুই-ই যোগ্যতার সংগে শিল্পী মেলে ধরেছেন। মীড়ের ... আলাপের ধ্রুপদী আংগিকে রবিশং... শিষ্যের শীলমোহর অনুভূত। ত্রুটি ... না কোথাও। প্রয়োজন শুধু আর ... পরিণতবোধের। অভিজ্ঞতার সংগে ... এ-বিকাশও নিশ্চয় ঘটবে। তানের ... খুবই তৈরী, লয়-দক্ষতায় ইনি আলাউ... ঘরাণার উত্তরসূরী।

তুলনামূলক বিচারে আভোগীর ... অনেক সুসংবদ্ধ। চার-তালকা সো... গতে ঘরাণার বৈশিষ্ট্য সুঘোষিত। ... ঘোষের তবলাসংগত এ-অনুষ্ঠানের ... প্রদ আকর্ষণ।

লোকান্তরিত সংগীত সেব... চণ্ডীচরণ সাহা

গত বুধবার (২৭শে আগস্ট) ... সি সি সাহা ট্রেডিং হাউসের ম্যা... ডিরেকটর শ্রীচণ্ডীচরণ সাহা ৭৪ ... বয়সে পরলোকগমন করেন। গ্রামোফো... ইলেকট্রনিকের ক্ষেত্রে তিনি পুরোধা... ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান ... জিক্যাল প্রোডাকট্‌স—ভারতীয় ... প্রথম প্রতিষ্ঠান। অল ইণ্ডিয়া রেডিও ... ইলেকট্রনিক এসোসিয়েশনের ... পতি ছিলেন, এছাড়াও বহু ... প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক সংস্থার ... জড়িত ছিলেন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য ... ক্লাব (কলিকাতা), বেংগল ন্যাশনাল ... টাইল মিল, ভারত ইলেকট্রিক্যাল ... ণ্টাল মুভিটোন। আজীবন সংগীত ... শিল্পীসেবায় তিনি সমর্পিত প্রাণ ... পংকজ মল্লিক, সায়গল, শচীনদেব ... সুধীরলাল, সুপ্রভা সরকার ও রা... দত্ত প্রমুখ শিল্পী সংগীতজগতে ... অবদান।

তিনি রেখে গেছেন শোকার্ত... পত্নী দুই পুত্র এবং তাঁর অগণিত ... মুগ্ধ ভক্ত।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান ... নিঃসংগতাবোধ

রবীন্দ্রভারতীর বিচিত্রাভবনে ডাঃ ... ভট্টাচার্য পরিকল্পিত ও বিশ্লেষিত ... গানে রবীন্দ্রনাথের নিঃসংগতাবোধ ... বস্তুর গভীরতায় খুব চিত্তগ্রাহী হয়... এ-অনুষ্ঠানের সার্থকতার এক বড় ... দাবীদার ডাঃ অরুণ ভট্টাচার্য—তাঁর ... ভাবানুসারী গান নির্বাচনের ... উল্লেখযোগ্য একক সংগীত শোনাল... বসু (সাঁঝ আঁধারে একেলা ঘরে), ... চ্যাটার্জি (ছায়া ঘনাইছে), ... গুপ্ত (আমার দিন ফুরালো), ... (শ্রাবণের গানে), মধুমাধবী ভট্টাচার্য ... রহ সাথে)। সমবেত গানের মধ্যে ... যোগ্য 'তিমিরময় নিবিড় নিশা ... ঝরঝর মুখর দিনে।'

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৬

অমৃত

অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

১৫ বর্ষ

১৮ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 19th Septemver, 1975 শুক্রবার, ২ আশ্বিন, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	প্রাপ্তি	(গল্প)	শ্রীহীরক রায়
১২	সাহিত্যের সাজঘরে		শ্রীশাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
১৫	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৬	বিদেশের কথা		শ্রীপুণ্ডরীক
১৭	প্রথম প্রবাস	(উপন্যাস)	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
২২	রাজলক্ষ্মী	(কবিতা)	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
২২	কে অমল	(কবিতা)	শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত
২২	দুটি কবিতা		শ্রীবিনোদ বেরা
২৩	সুরের আগুন		শ্রীসন্ধ্যা সেন
২৯	ডবল এজেন্ট	(উপন্যাস)	শ্রীবিক্রমাদিত্য

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৩	চিঠিপত্র	
৩৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রীজরৎকারু
৩৬	যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু	শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
৩৮	পুনশ্চ	শ্রীক্ষপণক
৩৯	শীতল পাহাড়ের গুহায় (গল্প)	শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য
৪১	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৫	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীঅজয় বসু
৪৮	খেলাধুলো	শ্রীদর্শক
৪৯	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৫০	মাঠের নায়ক	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২	দেশবিদেশের খেলা	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৩	সিনেমাটিক টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৭	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৫৮	নেপথ্যে	শ্রীনিরীক্ষক
৬০	ফ্লোর থেকে বলছি	শ্রীমুসাফির
৬২	নাট্যমঞ্চ	
৬৩	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৬৪	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

নতুন এগারো বারো ক্লাশ

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্ব এই বৎসরেই সমাপ্ত হল। আগামী বৎসর থেকে দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক স্কুল আলাদা পরীক্ষা দেবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তৈরি হবে এগারো-বারো ক্লাশের আলাদা স্কুল। কোনো কোনো জায়গায় কলেজেও এই দুই ক্লাশ পড়াবার অনুমতি দেওয়া হবে। পুরনো এগারো ক্লাশের সিলেবাস থেকে নতুন উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস আলাদা। এমনকি পুরনো ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে যেভাবে পড়ানো হত, এখানে তার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ জানিয়েছেন। পুরনো ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এই পাঠক্রম চালু করা সহজ কথা নয়। কাজটা যেমন কঠিন তেমন গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা হয়েছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোর অদলবদল করেও এতদিন ঠিক মনোমত ফল পাওয়া যায়নি। এগারো ক্লাশে বিভিন্ন শাখা যে পাঠক্রম চালু করা হয়েছিল, তার একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, সাধারণ ছেলেরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভিড় না করে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় চলে যাবে। কিন্তু দেখা গেল সে-পথ রুদ্ধ। ছেলেরা কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে ভিড় করতে লাগল ডিগ্রীর জন্য এবং ডিগ্রী দেখিয়ে দাবি করতে লাগল চাকরি যা সুলভ নয়।

এই অবস্থায় আবার শিক্ষা-কাঠামোর পরিবর্তন করা হচ্ছে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। বর্তমানে যে এগারো ক্লাশের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে তার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রস্তুতি। নতুন সিলেবাস তৈরি করতে হবে এবং সেই সিলেবাস অনুযায়ী লিখতে হবে নতুন বই। এখনো তার অধিকাংশ কাজই বাকী। সিলেবাস যদি বেশ আগে তৈরি না হয়, তাহলে বই লেখা হবে কখন? তাড়াহুড়া করে বই লেখানো হলে তার মান আশানুরূপ হবে না এবং তা পড়ে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ খুব যে উজ্জ্বল হবে না তা বলা বাহুল্য। বইপত্র ছেড়ে কোথায় এই নতুন দুই ক্লাশ পড়ানো হবে তাই এখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ জানিয়েছেন যে, আগামী বছর এই শিক্ষাক্রম চালু করতে প্রায় ৮০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরকার হবে। শিক্ষা পর্ষৎ চান, যেসব প্রতিষ্ঠানে এগারো-বারো ক্লাশ চালু হবে, সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বাড়ি বা বাড়ির পৃথক অংশ ছেড়ে দিতে হবে। তার প্রিন্সিপাল বা প্রধান হবেন আলাদা এবং সেই দুই ক্লাশে পড়াবার জন্য পার্ট-টাইম শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে।

অনেক স্কুলই হয়তো এগারো-বারো ক্লাশের দায়িত্ব নিতে চাইবেন। তবে শিক্ষক নিয়োগ বা প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। সমান শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা [illegible] চাইবেন উচ্চতর মাধ্যমিক ক্লাশে পড়াতে। তার জন্য কি পৃথক বেতন হার [illegible] করা হবে? প্রধান শিক্ষকও কি আলাদা হারেই বেতন পাবেন? এসব প্রশ্নের ফয়সালা আগেই হয়ে যাওয়া দরকার। এবং এগারো-বারো ক্লাশের জন্য বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা যোগ্যতাসম্পন্ন, তাঁদের নতুনভাবে ইণ্টারভিয়ু নিয়ে পড়াবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাতে বঞ্চিত শিক্ষকরা যোগ্যতা দেখাবার একটা সুযোগ পাবেন।

কোঠারি কমিশন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। এটাই হল ভারতের শিক্ষার প্রধান সমস্যা। কোনো দেশেই শুধুমাত্র কেতাবী পড়ার জন্য কলেজে ও য়ুনিভার্সিটিতে ভিড় বাড়াতে দেওয়া হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়ন বা আমেরিকা কোথাও সাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এতে রাষ্ট্রের অর্থেরই অপচয় হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষাই হল সামাজিক লক্ষ্যপূরণের উপায়। আমাদের দেশে হাতে-কলমে কাজ শেখার প্রতি তথাকথিত বাবু-শ্রেণীর মানুষের একটা অনীহা আছে। এখন অন্যান্য শ্রেণীতেও তা সংক্রামিত হচ্ছে। চাষীর ছেলে কলেজে পড়ে ডিগ্রী নিয়ে গ্রামে তো যাবেই না, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফার্মিং-এর প্রতিও আগ্রহ দেখাবে না। হোয়াইট-কলার চাকরির প্রতি মোহ বাড়ছে। কিন্তু তেমন চাকরি আর কতজনকে দেওয়া যায়? বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে পারলে বাস্তবিকই শিক্ষাক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনা যাবে। এগারো-বারো ক্লাশের নতুন পাঠ্যবিধির এই দিকটির প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। গতানুগতিক পথে ডিগ্রী নেওয়া আর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিন আর নেই। নতুন সমাজ গঠনে নতুন দিনের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই আজ প্রত্যাশিত।

প্রাপ্তি

হীরক রায়

সন্ধ্যেবেলা ও-বাড়ীর দোতলার ঘরের আলোটা জ্বললেই আমার বুক ছমছম করে উঠত। আমার চোখ ঘুরে ফিরে ঐ ঘরে গিয়ে পড়ত।

বাড়ীটা দূরে নয়। কাছেই। ছোট জমির ওপর দোতলা বাড়ী। দোতলার বারান্দায় টবে ঝোলানো লতা গাছ আছে। বহুদিন রং হয়নি। পলেস্তারা খসে পড়েছে এখানে সেখানে। দিনের বেলা সব জানালায় পর্দা টাঙানো থাকে। বাতাসে অল্প অল্প দোলে। ভেতরের কিছু নজরে আসে না।

বেলা দশটার মধ্যে ও-বাড়ী ফাঁকা হয়ে যায়। তখন থাকে শুধু রাঙা মাসীমা। রাঙা মাসীমার সঙ্গে আমার কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। সবাই ঐ নামে ডাকে তাই আমিও ডাকি। বাড়ীর সকলে স্কুল কলেজ কিংবা অফিসে যেতে সুরু করে সকাল নটা থেকে। আর একটু বেলা বাড়লে কাপড় কাচার ছপছাপ শব্দ ওঠে। তারপর আবার সব চুপচাপ।

আমাদের বাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা আমি নিজেই যে জানি না তা কবুল করছি। জানতে পারিনি তার কারণ সামনের ঐ বাড়ীটা। এক সঙ্গে কি দুটো বাড়ীতে নজর রাখা যায়। আমি ওদের বাড়ীর সব কথা বলতে পারি. কে কোন রং-এর জামা পরে অফিসে কিংবা স্কুলে গেছে তাও। কারণ ওরা যেই বের হয় আমার নজর সঙ্গে সঙ্গে ওদের ছুঁয়ে যায়। এক নজর দেখেই আমি চোখ নামিয়ে নিই। শুধু একজন তখন যায়—আমি তাকিয়ে থাকি যতক্ষণ তাকে দেখা যায়।

সে অবশ্য বড় কেউ নয়। আবার খুব ছোটও নয়। কিন্তু ভারিক্কি ভঙ্গী আছে। গম্ভীর গম্ভীর ভাব করে-আমি বেশ বড়—একথা প্রকট করতে চায়। তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থাকে। বই খাতায় ঠাশা।
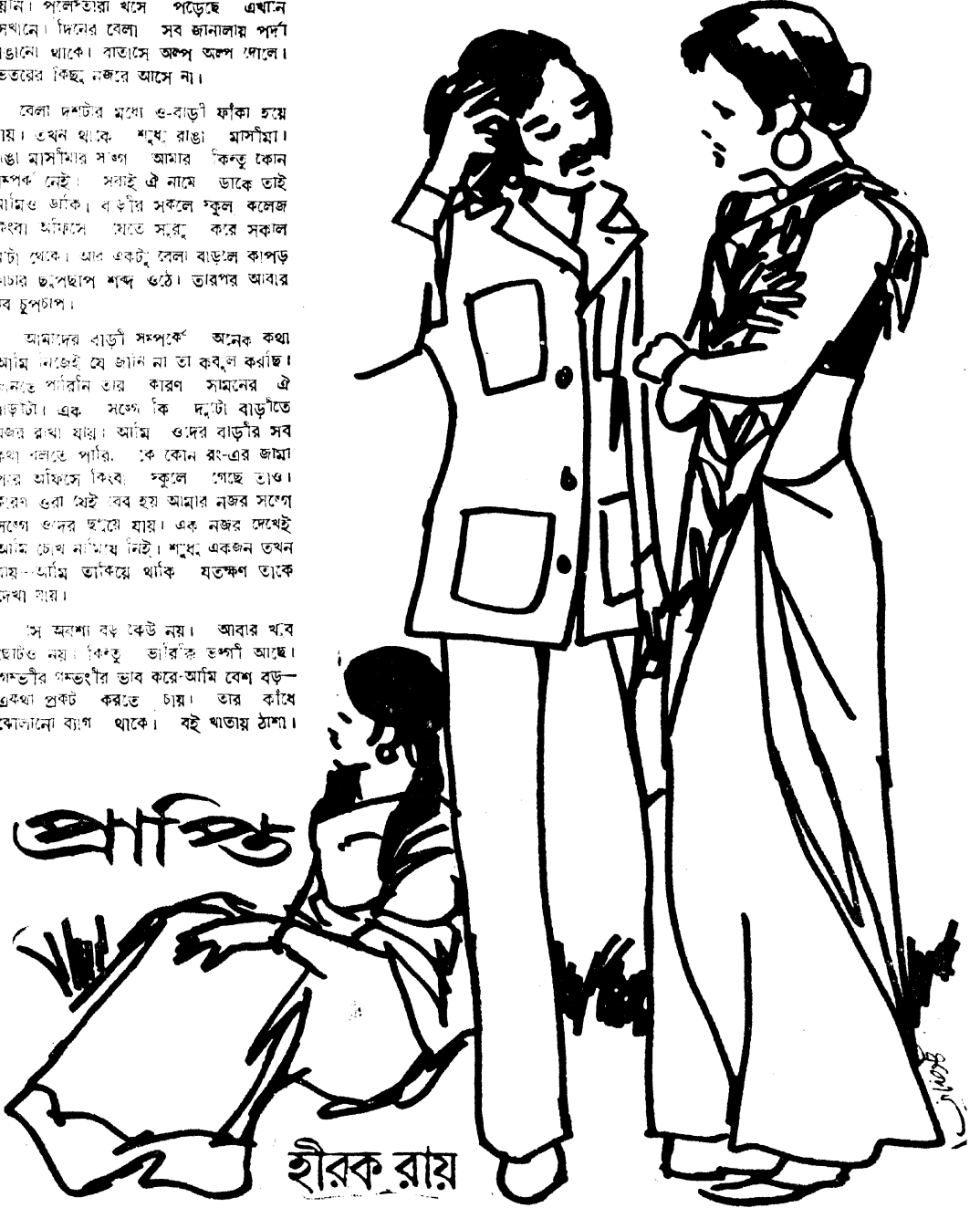
আড়চোখে আমার জানলার দিক নিরীহ ভঙ্গিতে তাকায়। তারপর দার্শনিকের মত রাস্তা দিয়ে হাঁটে। তখন ওর হাঁটা দেখলেই আমার হাসি পায়। কারণ ও যত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে আমার চোখে ও তত‌ই অস্বাভাবিক হয়। একবার প্যান্টের পকেটে হাত দেয়, একবার মাথার চুলে হাত দেয়। আমি দেখি আর হাসি।

ওর সঙ্গে আমার ভাব আছে। ও আমাকে ডেকে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে। কিন্তু সেসব কিছুই করে না, শুধু গম্ভীর ভঙ্গী করে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে আমাকে হাসায়। আমি কতবার চিনুকে বলেছি, হ্যাঁরে চিনু, তোর দাদা আমাকে দেখলে এত গম্ভীর হয় কেন র?

চিনুটোও খুব পাজী। খিলখিল করে হেসে বলেছে, কেন বল ত?—একটু থেমে বলেছে, দাদা না তোকে ইয়ে করে।

সত্যি বলছি, আমার মধ্যে কোন ব্যাপার ছিল না, ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরব ধরব করছি। আমার এখন শরীর ভার হচ্ছে। ফ্রক পরলে পাড়ার ছেলেরা বিশ্রিভাবে তাকায়। মুখে চুকচুক শব্দ করে। আমি সব সময় নিজেকে ঢেকে ঢুকে রাখি। কিন্তু চিনটাই সব গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছে। ওর মুখে ইয়ে করে 'ইয়ে করে' শুনতে শুনতে আমার কেমন যেন ইয়ে হয়ে গেছে। ওকে দেখতে না পেলে মন কেমন উসখুস করে। ওর বেরোনোর সময় এটা ওটা খোঁজার ভান করে আমি জানলার কাছে কাছে থাকি। আমি অবশ্য কাউকে এসব কথা বলি না। এমন কি চিনুকেও না।

একদিন চিনুর শরীর খারাপ, শুয়েছিল। আমি খাটের পাশে বসে গল্প করছিলাম। চিনুর দাদা হঠাৎ ঘরে ঢুকে 'সরি' বলে বের হয়ে গেল। আমিতো অবাক! বললাম, কিরে চিনু, তোর দাদা কাকে সরি বলে গেল?

পায়ের চাদরটা সরাতে সরাতে চিনু হাসল। ঠোঁটের একটা কোণ দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। তারপর বলল, কাকে বলল জানি না। কিন্তু কেন বলল জানি।

আমি বললাম, কেন বলল বল তো?

চিনু হাসতে হাসতে বলল, দাদা যে তোকে 'ইয়ে' করে।

আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। সমস্ত রক্ত যেন মুখে উঠে এল। কান গরম লাগল, আমি চোখ নামিয়ে বললাম, যাঃ, অসভ্য।

চিনু ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, ওমা, তোরও তো দেখছি ইয়ে হয়ে গেছে। তুইও তা কমন লজ্জা লজ্জা করছিস।

মেয়েরা মেয়েদের সব কথা বুঝতে পারে। চিনু আমাকে ঠিকই বুঝেছিল। কিন্তু মুখে বললুম অন্য কথা। বললুম, চিনু, তোর দাদা এসব শুনলে কি ভাববে বল ত?

চিনু বলল, দাদা আবার কি ভাববে, সব শুনে তোরই মত চোখ নামিয়ে নেবে। বাব্বাঃ। তোদের পেটে পেটে এত?

শোন কথা! আমার নাকি পেটে পেটে এত! ওই বলে বলে আমাকে করে দিল এরকম। এখন বলছে এই কথা। আমার নয়, চিনুরই পেটে পেটে অনেক বদ বুদ্ধি। তা নইলে ভর দুপুরে বেলা 'এক্ষুনি আয়' বলে ডেকে পাঠায় আর এই কথা বলে!

সেদিন দুপুর বেলা আমি শুয়ে শুয়ে একটা সিনেমার বইএর পাতা ওল্টাচ্ছি এমন সময় চিনুদের বাড়ীর ছোট ছেলেটা এসে বলল, আপনাকে দিদি এক্ষুনি ডাকছে।

আমি বললাম, কেনরে?

বলল, জানি না, এক্ষুণি ডাকছে।

আমি গিয়ে দেখি চিনু আলমারী থেকে আচার বের করছে। আমাকে দেখে আঙুল তুলে কোন শব্দ করতে নিষেধ করল। তারপর আমরা দুজনে ছাদে গিয়ে বসলাম।

আচার খেতে খেতে চিনু বলল, তোকে এক্ষুণি কেন ডাকলাম বলত?

আমি বললাম, কেন?

চিনু বলল, এক্ষুনি একটা দারুণ মজা হয়েছে।

আমি বললাম, এক্ষুণি মানে?

চিনু বলল, এক্ষুনি মানে একটু আগে।

আমি শোনার জন্য চুপ করে রইলাম। চিনু বলল, জানতে চাইলি না কি মজা?

আমি বললাম, শুনতেই তো এলাম, বল।

চিনু বলল, আজ একটু আগে দাদাকে ডেকে বললাম, দাদা শোন আমি আর টুনু আজ বেড়াতে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

দাদা বলল, বিকেলে হলে যেতে পারি।—আমি চুপচাপ দেখছি দাদা আর কিছু বলে কিনা। একটু পরে বলল, আচ্ছা চিনু শোন, একটা কথা বলব?—আমি বললাম, বল না!—দাদা বলল, সেদিন দুপুরে তোর ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, তুই আর টুনু তখন কথা বলছিলি। টুনু কিছু ভাবেনিতো?— আমি বললাম, কেন ভাববে কেন! আমার ঘরে তুমি ঢুকেছ তাতে টুনু কিছু ভাববে কেন? আমার কথা শুনেনা দাদা কেমন থতমত খেয়ে গেল, বলল, না। ভাববে কেন? তবে ভাবতেও তো পারে।—আমি ত বুঝলাম কেসটা কি? মুখে বললাম, ধ্যাৎ কিছু ভাববে না। দাদা বলল, সে তুই বুঝবি না। এই বলে চিনু চোখ সরিয়ে বলল, কিরে টুনু কি রকম বুঝছিস টুঝছিস

আমি উদাস ভাব করে বললাম, আগা-পাস্তালা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

চিনু চোখ পাকাল, ওরে আমার ভাল মানুষ রে। উনি কিছু বোঝেননি। যাক গে শোন। ঠিক বিকেল পাঁচটায় সেজে-গুজে চলে আসবি কিন্তু, চিনু আমার বুক আর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করে দুষ্ট হাসি হাসল। আমি ওকে মুখ ভেংচে চলে এলাম। পেছন থেকে চিনু আবার বলল, ঠিক সময় আসিস কিন্তু।

সত্যি বলছি, আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। যত সময় যাচ্ছিল ততই বাড়ছিল। আমি চোখে সুন্দর করে কাজল দিলাম। আমার চোখ দুটো ভেসে উঠল। কপালে কাজল দিয়ে ত্রিশূলের মত একটা টিপ পড়লাম। ঠোঁটেও খুব হাল্কা রং লাগালাম। পাউডারের কৌটোটা টানতেই মনে হল, চিনু পেছনে লাগবে এত সাজলে। আমি তাড়াতাড়ি কপালের টিপ আর ঠোঁটের রং মুছে ফেললাম। চোখের কাজলটা শুধু তুলতে পারলাম না। আমার চোখটা ভেসেই রইল।

রং-এর মধ্যে ফিকে গোলাপী আমার বেশী পছন্দ। আমার গায়ে মানায় ভাল। আজ আমি আমার ভাল লাগা শাড়ীটা পরলাম। শাড়ী পরলে আমাকে বেশ বড় দেখায়। আয়নায় এপাশ ওপাশ নিজেকে দেখে কথাটা আবার আমার মনে এল।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজতেই আমি চিনুদের বাড়ী পৌঁছে গেলাম। চিনু তখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মুখে পাউডার পাফ বুলোচ্ছিল। আয়নায় আমাকে দেখতে পেয়ে ও চোখ কপালে তুলল। বলল, আমি যাব না বাবা। তুমি যাও দাদার সঙ্গে। যা সেজে এসেছ! তোমার পাশে আমাকে চাকরানীর মত লাগবে।

আমি ত চিনুর কথার ধরণ ধারণ জানি। তাই আমি কিছু না বলে হাসছিলাম। হঠাৎ দেখি চিনুর দাদা সন্তু হাতের ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে হাজির। আমি যে ঘরে আছি তা যেন খেয়ালই করল না। চিনুর দিকে তাকিয়ে বলল, কি রে তোদের হল?

চিনু বলল, তোদের মানে? আমার প্রায় হয়ে এসেছে এটুকু বলতে পারি।

চিনুর দাদা হাসল। আমার দিকে আড়চোখে তাকাল। চিনুকে বলল, আর একজনের যে হয়ে গেছে সে আমি দেখেছি। তোর কথাই জানতে চাইছি শুধু।

আমার কানে যেই "আর একজন' কথাটা গেছে অমনি আমার বুকের মধ্যে আবার হাতুড়ির ঘা, আবার আমার মুখে ছলকে এল রক্ত। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

চিনুর বজ্জাতির শেষ নেই। ওর পাউডার মাখা হয়ে গিয়েছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে উঠে ও ওর দাদার দিকে এগিয়ে গেল। আমার দিকে ঘুরে বলল, এই আমরা ভাইবোনে কথা বলছি। তুই কিন্তু শুনবি না।

মুখে বললাম, শুনতে আমার বয়ে গেছে। —আসলে সামনের বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে আমি কিন্তু কান খাড়া করে ছিলাম ওরা কি বলে তা শোনার জন্য। চিনু ওর দাদাকে বলল, এমনভাবে বলল যাতে আমি শুনতে পাই। —দাদা, টুনু আজ দারুণ সেজেছে না!

চিনু পাছে আরও কিছু বলে ফেলে এই ভয়ে আমি বলে উঠলাম, দেখ চিনু এমন করলে আমি আর খেলব না বলে দিচ্ছি। —খেলব না এই কথা বলা আমার মুদ্রা দোষ। আমি যখন তখন বলে ফেলি। আমার কথা শুনে চিনুর দাদা হেসে ফেলল। আর চিনু বলল, না, না, এখন তোমাকে খেলতে হবে না। এখন বেড়াতে চল।

বেড়াতে ত যাব কিন্তু কোথায় যে যাব তা কেউই জানতাম না। আমি না, চিনু না, চিনুর দাদাও না। রাস্তায় এসে চিনুর দাদা চিনুকে বলল, কোথায় যাবি?

চিনু আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, কিরে কোথায় যাবি?'

আমার মুখে এসেছিল, কোথায় যাব? —সামলে নিয়ে বললাম, বেড়াতে।

চিনু হেসে ফেলল। বলল, ঠিক বলেছিস, কিন্তু কোথায় বেড়াব বলত?

চিনুর দাদা সন্তু চিনুকে ধমকাল, তুই কিচ্ছু জানিস না, আমি তোদের একটা দারুণ জায়গায় নিয়ে যাব।

আমি ওর দিকে ঘুরে তাকালাম। চিনু জিজ্ঞাসা করল, কোথায় রে দাদা?

চিনুর দাদা গম্ভীর মুখে বলল, ভাবছি।

আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না, চিনুও খিলখিল করে হেসে উঠল।

চিনুর দাদা খুব চটে গেল। বলল, এত হাসির কি হয়েছে! এইজন্যই তোদের সঙ্গে

বেড়াতে চাই না। একদম ম্যাচিওরিটি নেই।—ওর সেই ভারিক্কী ভঙ্গী আবার আমাকে হাসাল। আমি মনে মনে হাসলাম।

সামনের বাসটা আসতে চিনুর দাদা হাত তুলল। আমরা হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। বাসে উঠে চিনু বলল, কোথায় যাচ্ছিরে দাদা?

চিনুর দাদা কোন উত্তর না দিয়ে কণ্ডাকটারকে বলল, তিনটে টিকিট কুড়ি পয়সার।

বাস খানিকটা এগোতেই আমি বললাম, এমা, এদিকে আবার বেড়াবার জায়গা কোথায় রে চিনু?

চিনু বলল, তুই জানিস না। দাদা জানে।

সন্তু যে কি রকম জানে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলুম। গড়িয়া পার হয়ে একটা ক্ষেতের পাশে আমরা নেমে পড়লাম। সামনে ছোট একটা চায়ের দোকান। একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। কাপ নয়। ভাঁড়ে চা খেতে দেয়। একজন বুড়ো লোক নেকড়া বাঁধা ছাকনিতে চা ঢেলে দেয় আর একটা খালি গা ছোট ছেলে ভাঁড় এগিয়ে দেয়। চিনুর দাদা সেই বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। চিনুকে বলল, তোরাও বস। বেড়াবার আগে একটু চা খেয়ে নিতে হয়।

চিনু আমার কানে কানে ফিসফিস ক'রে বলল, আমার চোখ ফেটে কান্না আসছে রে! এখানে কোথায় বেড়াব? কোথায় ফুচকা খাব?

আমি হাসলাম তেতো হাসি। বললাম, ফুচকা কেন খাবি? কাঁচ ধান তার চেয়েও ভাল খাবার। তোর দাদা যে দারুণ জায়গায় এনেছে।

আমরা ফিসফিস গুজগাজ করছি, এমন সময় চিনুর দাদা বলল, বল চিনু জায়গাটা কি চমৎকার। সবুজ ধানক্ষেত। নীল আকাশ।—চা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, নে, চা খা।

চিনু মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল, চা খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বললাম, কি চমৎকার জায়গা। সবুজ ধানক্ষেত। এখানে কি চা খেতে ইচ্ছা করে?

চিনুর দাদা বলল, বল টুনু। চিনুটা এখনও একেবারে ছেলেমানুষ। কোন সেন্স ডেভেলাপ করে নি।

চিনু হঠাৎ উঠে পড়ল। বলল, তোমরা বেড়াও। আমি পরের বাসেই চলে যাব।

আমি বললাম, কি বলছিস। আমি কি একা থাকব নাকি?

—কেন তোমারও তো ধানক্ষেত চমৎকার লাগছে।—চিনু ঝলসে উঠল।

আমি বললাম, যাঃ, তুইও বুঝিস না, আমিতো ঠাট্টা করলাম।

চিনুর দাদা ঠক করে হাতের ভাঁড় ফেলল। বলল, ওঃ। ঠাট্টা, ঠিক আছে। আমি জানতাম ছেলেমানুষদের সঙ্গে বের হলে ঝামেলা আছে। যাইহোক, শোন, আমার এখানে ভাল লাগছে। আমি ক্ষেতের পাশে গিয়ে বসছি। তোমাদের যা ইচ্ছে করতে পার। কিন্তু মনে রেখ ফেরার পয়সা আমার কাছে আছে। বাসে উঠে ভাড়া না দিলে কানে ধরে নামিয়ে দেবে।—কথা শেষ করে চিনুর দাদা চায়ের দাম দিয়ে হন হন করে হেঁটে ধানক্ষেতের পাশে বসে পড়ল।

চিনু উঠে দাঁড়াল। মুখ কাল করে বলল, চল, আমরা ওপাশে যাই। দাদার কাছে যাব না।

আমি বললাম, চল।

চিনু বলল, আচ্ছা বলতো দাদাটার কি আক্কেল! ধর আমাদের যদি হঠাৎ খিদে-টিদে পেত তবে কি করতাম?

আমি কিছু না বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা পা নানাচাচ্ছিলাম। চিনু বলল, কিরে টুইস্ট করছিস নাকি? একটু থেমে বলল, কি জায়গা বলত? একটা ছেলে নেই। সেজেগুজে যে এলাম কে দেখবে বলত?

আমি অকারণে ফিক করে হেসে ফেললাম।

চিনু বলল, খুব যে পুলক দেখাচ্ছ। তোমারতো পুলক হবেই। তোমারওতো ইয়ে হয়েছে। যাও তুমি ওপাশে গিয়ে বস।

আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম। বললাম, চিনু সব সময় এক কথা ভাল লাগে না।

চিনু বলল, বুঝি বুঝি। আমি সবই বুঝি বাবা। দাদা যে কেন এখানে এল, কেন যে তুমি এত খুশী খুশী সবই বুঝি।

আমি চিনুর কথার উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। দেখলাম, চিনুর দাদা ধানক্ষেতের দিকে বেচারী বেচারী মুখ করে তাকিয়ে আছে। ইচ্ছে হল ওর কাছে যাই, চিনুর জন্য পারলাম না। আড়চোখে চিনুর দিকে তাকালাম। ওর মুখ গোমড়া। আমার মায়া লাগল। বললাম, যা হবার তাতো হয়েই গেছে চিনু। এখন আর মন খারাপ করে লাভ কি?

চিনু কথা বলল না। আমার থেকে আরও একটু দূরে সরে গেল।

আমি হঠাৎ কেমন সাহসী হয়ে উঠলাম। চিনুর দাদার দিকে একা একাই এগিয়ে গেলাম। বললাম, বলছিলাম কি! অন্য কোথাও গেলে হয় না, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আলো আছে এমন কোন জায়গায় গেলে আর একটু বেশী সময় বেড়ান যেত।

বলার সময় আমার অন্য কোন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু আমার কথা শেষ হতে যেই সন্তু তাকিয়েছে অমনি সেই হাতুড়ির ঘা ঢক করে পড়ল বুকে। ও যে কেমন করে তাকাল কি বলব? কারণ একজোড়া চোখ নিষ্পলক আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে কিছু বলল না। আমি যেন শুনতে পেলাম, তুমিও এরকম বলছ টুনু?—মনে হল, আমার ওপর ও একেবারে নির্ভয়, নির্ভর ছিল আমি চোখ নামিয়ে বললাম, আমি কি করব? চিনুইতো কেমন করছে।

সন্তু এবারও কিছু বলল না। সেইরকম অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওর নাকের পাটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের তারা নিষ্পলক।

চিনু হঠাৎ আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বলল, বাবাঃ। কারো যে মুখে কথা নেই, কি হয়েছে রে তোদের।

আমি কিছু বললাম না, মাথা নিচু করে রইলাম। চিনুর দাদা [illegible] আস্তে বলল, কি আর হবে? তোদের একজনতেই যা মুখ-ভার! মেজাজ কি আর ঠিক রাখা যায়?

চিনুরও বোধহয় এই গুমোট পরিবেশ আর ভাল লাগছিল না। ও হাসতে চেষ্টা করল। বলল, এই কথা? এখন কিন্তু ভালই লাগছেরে দাদা। আমার হাত ধরে চিনু হঠাৎ টান দিল। বলল, এই টুনু, আয় আমরা আলের ওপর দিয়ে ছুটে আসি।

চিনু আলের ওপর দিয়ে ছুটে চলল। ওর পিছু পিছু আমি। সামনে ছিল আখ ক্ষেত তারপরে ধান ক্ষেত। চিনু আর একদিকে ছুটতে ছুটতে বলল, সামনে একটা কুলগাছ দেখছি, চল কুল খাই।

আমি বললাম, দাঁড়া। একটা বড় কচু পাতা নিয়ে আসি। কুড়িয়ে রাখব। তুই ততক্ষণ কুল কুড়োতে থাক।

আলের ওপর দিয়ে ছুটে রাস্তার পাশের কচু গাছের সামনে দাঁড়াতেই সন্তু

খপ করে আমার হাত ধরল। ওর মুখ গম্ভীর। বলল, আলের ওপর দিয়ে ছুটছ কেন! জান না, আলে কাল কেউটে থাকে।

আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলাম, বললাম, কেউটে আমাদের কিছু করবে না।

সন্তু আমার হাত ছাড়ল না। বলল, তবু যদি করে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ আবার সে-রকম হয়ে গেছে, পলক পড়ছে না। আমার ভীষণ লজ্জা লাগল। আমি কিছু না বলে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আলের ওপর দিয়ে চিনুর কাছে ফিরে চললাম। ছুটতে ছুটতে তাকিয়ে দেখলাম দাগ পড়ে গেছে হাতে। চিনুর দাদা বড় জোরে ধরেছিল।

চিনুর কাছে পৌঁছতে চিনু বলল, কিরে কচুপাতা কৈ?

আমার খেয়াল হল, আরে তাইতো! একদম ভুলে গেছি। সামলে নিয়ে বললাম, অ্যাঃ। নোংরা। তার চেয়ে আঁচলে কুড়িয়ে নিই বরঞ্চ।

আমরা দুজনে আঁচল ভর্তি করে কুল কুড়োলাম। কুটুস কাটুস শব্দ করে কুল চিবোতে চিবোতে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে এলাম।

তখন সন্ধ্যে নামছে। চিনুর দাদাকে আচ্ছা দেখাচ্ছিল, কাছে আসতে স্পষ্ট হল। চিনু বলল, নে রে দাদা। কুল খা। —আমার দিকে ঘুরে বলল। —না থাক। তোমাকে দেবে টুনু।

চিনুর দাদা চিনুর দিকে হাত বাড়াল। মজা করার জন্য আঁচল থেকে কুল দিলাম আমি। চিনু চোখ পাকাল। আমি জিভ ভেংচলাম, চিনুর দাদা দাঁত দেখিয়ে হাসল।

অনেক দূরে বাঁকের মুখে একটা আলো আমরা দেখতে পেলাম। আলোটা এগিয়ে আসছিল। চিনুর দাদা বলল, বাস আসছে।

বাস এল। দাঁড়াল। আমরা উঠলাম। ফিরে এলাম।

চিনু বলল, বল টুনু, বেড়ানোটা মন্দ হয়নি, তাই না?

আমি বললাম, তাত হল। কিন্তু এই কুলগুলো নিয়ে এখন কি করব বলতো?

চিনু বলল, দিয়ে দে দিয়ে দে। আমি ওসব লুকিয়ে রাখব।

আমি আঁচল উপুড় করে সব কুল দিয়ে দিলাম। আঁচল তুলতে গিয়ে হাতটা শিরশির করে উঠল। সন্তু তখন ছিল না। বাড়ী চলে গিয়েছিল। কিন্তু ও যেখানে ধরেছিল, সেখানে তখনও অস্পষ্টভাবে সেই দাগটা যেন ছিল। চিনু খেয়ালও করল না।

আমি সেদিন রাত্রে অনেকবার সেই জায়গাটুকুতে হাত বুললাম। ব্যথা ছিল না। বেদনা ছিল না, দাগটাও মিলিয়ে গিয়েছিল। তবু আমি বারবার হাত বুলোলাম। ভীষণ ভাল লাগছিল বুলোতে।

সন্তুর চোখ দুটো হঠাৎ যেন আমার সামনে ভেসে উঠল। কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকায়। ওরকমভাবে তাকালে আমার বুক শিরশির করে ওঠে। ও তাকালেই করে। অথচ বলি না। কাউকে না। চিনুকেও না। ওকেও বুঝতে দিই না।......

একটু আগে চিনুর টেবিল থেকে টুনুর ডাইরিটা নিয়ে এসেছিলাম। এইমাত্র পড়া শেষ হল। ছেলেবেলায় মা বলেছিলেন সন্তু তোকে চাঁদ এনে দেব। মা পারেন নি। চাঁদের অর্ধেকটা আজ আমার হাতের মুঠোয়। বাকি অর্ধেকটা টুনুদের বাড়ীর জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজকে ওর চুলটা বড় এলমেলো।

সাহিত্যের সাজঘরে

নিমাই ভট্টাচার্য

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিটা সিধে সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দিকে যাবে, এটাই কথা ছিল। সুতরাং সর্দারজীর হাতে স্টীয়ারিং আলগা, পায়ে পুরো এ্যাক্সিলেটর চাপা। হুহু করে এগিয়ে চলেছে ট্যাক্সি। গিরিশ পার্কের কাছে এসে হঠাৎ সওয়ারী বললেন—মোড় নিতে হবে। তখন ঘড়িতে কটা হবে?

এগারোটা? তা তো হবেই।

প্রায় রাজেন্দ্রপুরে একটি বাড়ির দরজায় টুকটুক কড়া নড়ে উঠলো—ব্রজ আছে নাকি?' বিশ্বকল্যাণীর কর্ণধার ব্রজকিশোর মন্ডল একটু অবাক হয়ে খিল খুলে দেখেন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে খ্যাতিমান সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য।

আরে দাদা, এখন?

দিল্লী থেকে এই এলাম ব্রজ।

স্ত্রী ধীরা দেবী তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে গিয়ে অল্প সময়ে দাদার জন্যে নিয়ে এলেন—পরোটা, আলুভাজা, বেগুন ভাজা, আলু পোস্ত। গ্রেট ইস্টার্নের রাতের ডিনার ছেড়ে পরম তৃপ্তিতে খেয়ে গল্পগুজব করে, আবার ট্যাক্সিতে চাপলেন।

এই হলেন মানুষ নিমাই ভট্টাচার্য, যাঁর লেখার অন্তরালে এমন একটা উদার হৃদয় লুকিয়ে আছে, যা বাইরের শক্ত চটই পর দেখে ভেতর বোঝবার একটুও উপায় নেই। আর এই না বুঝেই, এই মানুষটা সম্বন্ধে অনেকে ভুল বোঝেন, কিন্তু নিমাইবাবু আজও সেই উদার হৃদয়, শিশুর সারল্য নিয়ে সাহিত্যের খেয়া পারাপার হচ্ছেন। এমন পারার দলে অল্প কজনই আছেন।

তাই আজো দেজ'র সুধাংশুশেখর দে'র বিয়েতে না এলে সুধাংশু কষ্ট পাবে বলে, এক রাতের জন্যে প্লেনে উড়ে আসেন দিল্লী থেকে কলকাতায়। টাইফয়েড হলে বাড়ি এসে খবর নিয়ে যান—ভালো আছ তো?

ভবানীপুরের বুবু? সর্বনাশা পোলিওতে দুটি পা কেড়ে নিয়েছে কিন্তু কেড়ে নিতে পারেনি ওর লেখাপড়া শেখার তীব্র আগ্রহ। বুবু চিঠি লিখল, নিমাইদা, ভাইফোঁটায় আসুন। খুব খুশী হবো, মনে মনে শান্তি পাবো। বুবু আশা করেনি কিন্তু সত্যি সত্যি ভাইফোঁটার দিন নিমাই ভট্টাচার্য হাজির। কী বুবু, ভাইফোঁটা দেবে না? হাসিতে, আনন্দে বুবু ফেটে পড়ল।

ঐ, ঐটুকু আনন্দ, খুশি দেবার জন্য নিমাইবাবু দিল্লী থেকে কলকাতা এসেছিলেন।

এই চারিত্রিক গুণ নিমাইবাবুর প্রতিটি উপন্যাসে স্পষ্ট ছবি এঁকে যায়।

আচ্ছা নিমাইবাবু, পুজো সংখ্যার উপন্যাস তো ছোট আকারে বেরোয়। দিল্লীতে থেকে কলকাতার প্রুফ, সংশোধন বাড়ানো, এসব করেন কি করে?

এসব ঐ ব্রজ জানে। বরঞ্চ ব্রজকে জিজ্ঞেস করুন। ব্রজবাবু বললেন—আমরা পুরো বইটার দুটো প্রুফ তুলে একটা দিল্লীতে পাঠিয়ে দিই। ধরুন, মেমসাহেবের কথা। এইভাবে প্রথম প্রুফ দিল্লীতে পাঠানো হোলো। উনি গোটা প্রুফটার যেখানে যেখানে বাড়াবার কথা, সেখানে লাইনের মাঝখানে নতুন লাইন না যোগ করে প্রতিটি প্যারার শেষে স্মারক চিহ্ন দিয়ে এক দুই দিয়ে এভাবে শুধু মার্কা করে গেলেন। পরে আলাদা কাগজে ঠিক যেখানে যেখানে বাড়াবার কথা, তার পাশে নম্বর দিয়ে উপন্যাস বাড়িয়ে গেলেন। এতে হোলো কি জানেন, প্রেস কোনো ঝামেলায় পড়লো না, অথচ আমরা নিশ্চিন্ত মনে গোটা বইটা ছাপতে পারলুম। শুধু মেমসাহেব, ককটেল কেন, নিমাইবাবুর সব বইই এভাবে কলকাতায় ছাপা হয়। কলকাতায় তো আর আসা হয় না, এলে দু'তিন দিন। হোটেলে থেকে আবার উড়ো। দিল্লীতেই নিমাইবাবু এখন স্থায়ী বাসিন্দা।

—এভাবেই তো সাফল্য এগুচ্ছেন, এভাবেই তো পুজো সংখ্যার লেখা, তাই না?

—কোথায় কোথায় এবার লিখছেন?

—বিজ্ঞাপন তো দেখেছেন, 'অমৃতে'—'ইনকিলাব'। লেখাটায় একটু নতুন কথা, নতুন আঙ্গিকে বলার চেষ্টা করেছি। 'প্রসাদে'ও একটা উপন্যাস দিতে হচ্ছে—'বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত।' গল্প?

—গল্প? তা গোটা কয়েক তো লিখতে হচ্ছেই। যেমন ধরুন 'যুগান্তর-এ' নব কল্লোলে, উল্টোরথে, সিনেমা জগৎ-এ। আর গজেনদার 'কথা সাহিত্যে'। আর যদি সম্ভব হয়, তবে দেব সাহিত্য কুটীরের ছোটদের পুজো বার্ষিকীর জন্যে ভাবছি একটা গল্প লিখবো। —তাছাড়া দেখুন, সময় কোথায়। এই তো পুজো সংখ্যা যেতে না যেতেই পৌষালী সংখ্যার জন্যে কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হবে। সেটা শেষ হতে না হতেই নববর্ষ সংখ্যার উপন্যাসের তাড়া। তারপর সেটা শেষ করার আগেই মাথায় রাখতে হবে আবার পুজোর উপন্যাস।

—ভাবছি কি জানেন,—লিখতে লিখতে সারা না হয়ে যাই। এর উপর আবার চলছে ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রস্তুতি। ২।৪ পাতা এর মধ্যেই লিখতে শুরু করেছি। তাহলে অবস্থাটা একবার ভাবুন!

শুধু উপন্যাস নয়। একজন দক্ষ সাংবাদিক হিসেবে দেশের সারা খবর রাখতে হয় হাতের মুঠোয়। দৈনিক বিশ্বামিত্রের জন্য তাঁকে সময় দিতে হয় বেশ খানিকক্ষণ। তাই তাঁর দেখা জগৎ রঙিন চশমা পরে নয়, একেবারে উদোম স্পষ্ট করে দেখা। দিল্লী কলকাতার তথাকথিত হাই সোসাইটি, এন-ডি-সি থেকে ককটেল মেমসাহেব থেকে পার্লামেন্ট স্ট্রীট। যার অচেনা, অজানা পথ চলমান হয়ে ওঠে আমাদের দোরগোড়ায়। অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে তাদের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাই, দর্পণের সামনে।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নিমাইবাবুর [illegible] ব্যাপারটা আমাকে একটু অবাক করে দেয়। ভাবা যায় না, একজন লেখক পিকাডিলি সার্কাস লিখতে গিয়ে লণ্ডনের পিকাডিলি সার্কাসে ছিলেন। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে [illegible] ঘুরেছেন পিকাডিলির রাস্তায় [illegible] বলেছেন—পথে, ঘাটে, রেস্তোরাঁয়।

[illegible] উপন্যাস ছিল— [illegible]। [illegible] আগে বাঁকুড়ার [illegible] হাসপাতালের [illegible] [illegible]। [illegible] তারপর কুষ্ঠরোগী [illegible] তারপর [illegible] ইতিহাস, [illegible] আরো কত কি! এরপর [illegible] দিল্লী থেকে [illegible] রাঁচী থেকে [illegible] বাঁকুড়া। বিহার-উড়িষ্যার [illegible] শহর-গ্রাম। অসংখ্য কুষ্ঠরোগীর দুঃখের কাহিনী শুনলেন [illegible] কাছে। এত কষ্টের পর যুগ যুগ উপেক্ষিত পুরুলিয়ার মানুষ ও হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে সমস্ত মনপ্রাণ নিঙড়ে লেখা হলো '[illegible]'।

তাই বারবার নতুন মুখ নতুন জীবন নিমাই ভট্টাচার্যের কলমে শব্দময় হয়ে ওঠে। এভাবেই তাঁর জনপ্রিয়তা পাঠক মহলে উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর এখন সব বইই, বই পাড়ার হিট বই।

নতুন বই সম্পর্কে এই এক্ষুণি সেই খবরটা আবার কানে এলো।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

লেফট রাইট, লেফট রাইট, কুইক মার্চ...। নৌ বিভাগের ভদ্রা জাহাজের ডেকে শিক্ষানবিশীদের প্যারেড শেষ হোলো। ডবল মার্চ শেষ করে প্রায় ছ ফিট লম্বা স্বাস্থ্যবান উজ্জ্বল এক তরুণ আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে উঠে এলেন ডেক-এ। পূর্ববঙ্গের দেশ গাঁ মাটি ছেড়ে আসা উদ্বাস্তু ছিন্নমূল এই তরুণের তখন বাঁচার সংগ্রামে টিঁকে থাকার প্রশ্ন। রুটির জন্যে লড়াই। মালবাহী জাহাজে তাঁর কাজ হল বেলচা দিয়ে আগুনে কয়লা ঠেলে দেওয়া মানুষটার সহকারী। জাহাজ চলছে। রাতদিন দিনরাত একমাস দুমাস কখনো আড়াইমাস। দুচোখের সামনে পেছনে, শুধু জল আর জল। এর মধ্যেই হাতাহাতি লড়াই শাস্তি, সন্দেহ, পাপ। শুধু একজন তাকিয়ে আছে স্বপ্ন নিয়ে। সেও তাদেরই একজন—তার চোখে ছবিগুলো মুছে গেল না। সে ভাবছে বাড়ি গিয়ে কখন গল্প বলবে এই ভয়ংকর [illegible]। ফিরে এসে অলৌকিক জলযানের গল্প। বন্ধুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো মুখের দিকে। অ্যাতো ভালো গল্প বলে অতীন। সেই লোকটি আজকের প্রখ্যাত তরুণ লেখক, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

—গল্প লিখবো এ আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাববো, এটা তো কল্পনাতেই ছিল না। গল্প পড়া, গল্প করা এ নিয়েই ছিলাম আমরা বহরমপুরের কজন বন্ধু। একজন তার মধ্যে কবিতা লিখতো। তার কবিতা আবার কলকাতার কাগজে ছাপা হয়। তখনকার একটা কাগজে কেন আমাদের এই বন্ধুর কবিতা ছাপা হচ্ছে না, জানতে আমরা কয়েকজন দল বেঁধে গেলাম একদিন সম্পাদকের বাড়ি। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, দুম করে বন্ধুটি বলে বসলো—এই আমার বন্ধু অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লেখেন। —গল্প লেখেন? সত্যি? আমাদের কাগজের জন্য গল্প দিন না।—আমি তখন যে কি বলবো, বুঝতে পারছিলাম না। গল্পের [illegible] কখনো [illegible] আর আমি [illegible] কিনা গল্পকার! — কি করলি বলতো, আমি এখন

কি করি? —কি আর করবি, গল্প লেখ।—আমি? —নয় কেন? আমাদের যেসব গল্প বলিস, তাই লিখে যা না। ঠিক যেভাবে তুই বলে যাস্। কাগজ পেন্সিল নিয়ে সেই বসে গেলাম। গল্প আর আসে না। কাটি, ছিঁড়ি দোমড়ানো কাগজ পাকিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিই। তারপর শেষ পর্যন্ত খাড়া হোলো একটা। তাই কাগজে বন্ধু নিয়ে দিয়ে এলো। ছাপাও হোলো। তখন উল্টোরথ পত্রিকা থেকে তরুণ লেখকদের গল্প প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বন্ধু কলকাতায় যায়। গল্পটা বগলে নিয়ে ও ছুটলো কলকাতায়। আমি তখন ভালো করে শহর চিনি না, পত্রিকাগুলোর অফিস তো নয়ই। আমার বন্ধুর তখন উত্তেজনা। গল্প জমা পড়েছে প্রায় ৪০০। কি হয় কি হয়। হিট হোলো। এলো ৪০ জন। বন্ধু কলকাতায় গিয়ে খবর আনলো। তুইও আছিস। আবার নির্বাচন, এলো এবার ৯জন।—তুইও আছিস রে অতীন! এবার ফাইনালে, বন্ধু সোজা উল্টোরথের অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো গল্পটার রেজাল্ট। তৃতীয়। গল্পটা পড়ে বিচারকেরা নির্ঘাৎ জেনে গেছেন, নাম টাম চরিত্র যা আছে, তাতে হান্ড্রেড পার্শেন্ট বিদেশী গল্প থেকে নেওয়া। এবং তাই মনে হতেই সংগে সংগে থার্ড! বন্ধুর তখন মনের যা অবস্থা, চরম উত্তেজনায় দৌড়ে এলো এখানে। বললো—খাওয়া অতীন, তোর গল্প সারা বাংলায় প্রাইজ পেয়েছে। ফিরে পেলুম কি একটা প্রত্যয় জানি না, মনে হল এতো অজস্র চরিত্রের মিছিল আমার সামনে। এদের নিয়ে তো আমি লিখতে পারি। এই দোলাচল মনেই তখন শুরু করলাম লেখা। এরপর ঋণ স্বীকার করতে হয় অমৃতের কাছে। ও'রা আমাকে প্রায় নিজে থেকে ডেকে এনে উপন্যাস লিখিয়েছেন। এর আগে উপন্যাস লেখার ব্যাপারটাই আমার সেরকম-ভাবে আসবে বলে ধারণা ছিল না। আমার একমাত্র গোপন চাবিকাঠি ছিল সেইসব চরিত্রে। আর ফেলে আসা আমার গ্রাম, তার মাটি, জীবন, নিপীড়িত সমাজব্যবস্থা।

—কিভাবে উপন্যাস শেষ করেন?

শাণ্ডিল্য, তোমাকে একটা কথা শুধু বলি—উপন্যাসের প্রথম আর শেষ আমার তৈরী থাকে, মনে। তবু বারবার দেখেছি—আমি যে চরিত্রের কথা কখনো আগের জন্যে ভাবিনি, এমন সব চরিত্রের কেউ যেন হঠাৎ ঝপ্ করে ছাদ ভেঙে লাফিয়ে পড়ে উপন্যাসের ঘরে। তা এসেই যখন পড়লো তখন একটা জায়গা করে দিতে হয়। জায়গা পেয়ে কখনো কখনো সে বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত এমন শরীর নিয়ে আসে, যাকে ছাড়া তখন উপন্যাসে, অন্য কিছু ভাবা যায় না।

এইভাবে বিশ্বাস অবিশ্বাস, পাওয়া না পাওয়ার উঁচুনিচু পথ বেয়ে অতীন বন্দ্যো-পাধ্যায়ের উপন্যাস যেন নতুন ভূমির উৎস সন্ধানে নিয়তই খুঁজে চলেছে দিক দিগন্তে। আমার সামনে তাঁর উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে এমন দুর্লভ চরিত্ররা এসে হাজির হয়, যাদের আমি চিনি না, জানি না। অথচ জানা যেন উচিত ছিল। আর একটা নিটোল কবি মন নিয়ে, চল্লিশ ইঞ্চি খোলা বুক, আর যন্ত্রণার রঙে ডোবানো কলমে অলৌকিক এক জলযান থেকে নেমে এসেছে এমন একজন মানুষ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর চোখ বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ছবি এঁকে যাচ্ছে—সেই ফেলু শেখের কবরে মাইজলা বিবির মোমবাতি জ্বালা, কৃষ্ণযাত্রা, লাঙল বন্ধে অষ্টমীস্নান, দশেরা উৎসব। পাখির ডানা-ঝাপটানির শব্দ, আর দুপারের চরে বাবলা পিটকিলা গাছে ছেঁড়া ঘুড়ির স্পন্দনে ভেসে যাওয়া নৌকো। যেন এক দীর্ঘ কবিতা।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

সাঁওতাল ডিহির বিদ্যুৎ

সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন সুরু হলো জন্মাষ্টমীর দিনে। ইউনিটটি চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। প্রথম ইউনিটটির মতো দ্বিতীয়টিতেও ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হওয়ার কথা। বিদ্যুৎ-ঘাটতি যে-রাজ্যের সমস্যা (রাতের বেলা বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়ার ব্যাপারটা সাময়িক সমস্যা সৃষ্টি করেছে যদিও) সেখানে বিদ্যুৎ তৈরির নতুন একটি ইউনিট চালু হওয়া রীতিমতো সুখবর। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সাঁওতালডিহি থেকে বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া গেলেও এখনও মোটেই আত্মসন্তুষ্টির সময় আসে নি। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ তৈরির ক্ষমতা এখন পৌঁছলো ৬৬৮ মেগাওয়াটে। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, সব মিলিয়ে এই রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ২০০ মেগাওয়াটের মতো। এই ঘাটতি বাড়বে বৈ কমবে না। কল-কারখানার জন্যে নতুন-নতুন লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। তাদের বিদ্যুৎ দরকার। চাষের কাজেও বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। সব কটি উৎপাদন কেন্দ্রে পুরো ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ তৈরি করা যাচ্ছে না। এর কারণ অনেক। মাঝে মাঝে কোনো কোনো ইউনিটে যন্ত্রপাতি বিকল হয়। কখনো দেখা দেয় কয়লার অভাব, কখনো বা ফার্নেস তেলের অভাব।

রাজ্য সরকার বিদ্যুতের উৎপাদন দ্রুত বাড়াতে চান। কিন্তু সে-পথে প্রধান বাধা টাকাকড়ির অভাব। সাঁওতালডিহিতে মোট চারটি ইউনিট চালু হওয়ার কথা। প্রতিটি ইউনিট ১২০ মেগাওয়াট করে (অর্থাৎ মোট ৪৮০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ তৈরি করবে। প্রথম দুটি ইউনিট চালু হতে দেরিই হয়ে গেছে। তৃতীয় ইউনিটটি ১৯৭৭ সালের মার্চে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঐ বছরেরই ডিসেম্বরের মধ্যে চতুর্থ ইউনিটটি চালু করতে চান বিদ্যুৎ পর্ষদ। আরো যে-সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে সেগুলো যাতে যথাসময়ে চালু হয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সরকার। এ-বছরের যোজনায় যে-সব বিদ্যুৎ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত সেগুলো সম্প্রতি পর্যালোচনা করে দেখেছেন যোজনা কমিশন।

শিক্ষায়তনে শৃঙ্খলা

অফিস-কাছারিতে তো বটেই, শিক্ষায়তনেও যাতে শৃঙ্খলা **ফিরে আসে তার জন্যে সরকার নানা ব্যবস্থা নিতে সুরু করেছেন।**

রাজ্যপাল ডায়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সম্মেলনে যে-সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সেগুলো কার্যকর করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতেই ছাত্রদের কলেজে ভর্তি করা হবে, উপাচার্য সম্মেলনের এই সিদ্ধান্ত যাতে কঠোরভাবে মেনে চলা হয় তার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি এই নির্দেশ না-মেনে ছাত্র ভর্তি চলতে থাকে তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সব ছাত্রকে পরীক্ষায় বসতে দিতে না-ও পারে। এদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদও অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়েছে নিয়মশৃংখলা কঠোরভাবে মেনে চলতে। পর্ষদের এক সার্কুলারে বলা হয়েছে, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে হাজিরা দিতে হবে। স্কুল ছুটির আগে স্কুল ছেড়ে যাওয়াও চলবে না। ছাত্রদেরও দেরি করে আসা চলবে না। নির্দিষ্ট সময়ের পর পনের মিনিট পার হয়ে গেলে আর ছাত্রদের ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ছাত্রদের পড়াশুনা কেমন হচ্ছে, তার রিপোর্ট অভিভাবকদের কাছে নিয়মিত পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য রাজ্য সরকার শিক্ষকদের পাওনা মেটানো এবং অন্যান্য অসুবিধে দূর করতেও উদ্যোগী হয়েছেন। প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য যে নতুন বেতনহার ঘোষিত হয়েছে তা চালু করতে দেরি হচ্ছে। সরকার তাই আপাতত প্রত্যেক শিক্ষককে আগ-কিছু টাকা দেবেন। তাছাড়া শিক্ষকদের যাতে অনাবশ্যক ছাঁটাই করা না হয় সেদিকেও সরকার লক্ষ্য রাখবেন।

কয়লার সন্ধান

পশ্চিম বাংলার অন্যতম সম্পদ হলো কয়লা। অশোধিত তেলের দাম চড়া হওয়ায় এখন নতুন করে কয়লার কদর হয়েছে। আর ঠিক এই সময়েই নতুন করে সন্ধান পাওয়া গেছে কয়লার ভাঁড়ারের। বাঁকুড়া জেলার মেজাহিয়া এলাকায় মাটির নিচে লুকিয়ে আছে কোটি কোটি টন কয়লা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞদের হিসেব, অন্তত ২৯ কোটি টন কয়লা আছে ঐ এলাকায়। তার মধ্যে ১৮ কোটি টন কয়লা তুলতে কোনোই অসুবিধে নেই। এর জন্য ঐ এলাকাতেই কালিদাসপুরে একটি কলিয়ারির কাজ চালু হবে অল্প দিনের মধ্যে। এ-বিষয়ে রাজ্যের অর্থ ও উন্নয়ন মন্ত্রী শংকর ঘোষ রাজ্য যোজনা পর্ষদ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আর কয়লাখনি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। দ্রুত যাতে কয়লা তোলার কাজ সুরু হতে পারে সেজন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজ্যের ভূমি সদ্ব্যবহার দপ্তরের মন্ত্রী গুরুপদ খাঁ হয়েছেন এই কমিটির সভাপতি। পুরুলিয়ার মাথুকুণ্ডা এলাকাতেও কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে কয়লার মজুতের পরিমাণ এক কোটি টনের কাছাকাছি। সেখানেও কলিয়ারি স্থাপনের কাজ সুরু হচ্ছে। বাঁকুড়া, অন্ডাল আর রাণীগঞ্জের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কিনা সে-প্রস্তাবও ভেবে দেখা হচ্ছে।

দেবদত্ত

ডি ভ্যালেরার চিরবিদায়

আমাদের দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছেন বিদেশের যেসব নায়ক তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আয়ারল্যান্ডের ইমন ডি ভ্যালেরা। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কামাল আতাতুর্ক, সান ইয়াত সেন প্রভৃতি দেশনায়কের সঙ্গে একই আসনে ডি ভ্যালেরাকে বসিয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা ও সৈনিকরা তাঁর কাছ থেকে জলন্ত দেশপ্রেম ও অসীম সাহসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

একদিক থেকে দেখতে গেলে, অন্যান্যদের তুলনায় ডি ভ্যালেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি হিসাবে ভারতবর্ষের মানুষের নিকটতর ছিলেন। কেননা, ডি ভ্যালেরার দেশের মানুষ ও আমাদের দেশের মানুষ একই সংগ্রামের শরিক ছিলেন। সেই সংগ্রাম ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

স্বাধীন আইরিশ জাতির যিনি স্রষ্টা, আয়ারল্যান্ডের যিনি পিতৃপ্রতিম নেতা, পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের একুশ বছর যিনি আপন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও চৌদ্দ বছর রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন বিরানব্বই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুতে একটি ঐতিহাসিক যুগের শেষ হল।

"সারা জীবন আমি আয়ারল্যান্ডের জন্য যথাসাধ্য করেছি। এখন আমি যাওয়ার জন্য তৈরী।" —মৃত্যুর প্রাক্কালে উচ্চারিত এই কথাগুলি ডি ভ্যালেরার মতো মানুষের মুখেই মানায়—বহির্বিশ্বের কাছে যে মানুষের নাম দীর্ঘকাল ধরে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

ডি ভ্যালেরার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। শুধু বৃটিশ শাসকের সঙ্গেই নয়, তাঁর এককালের সহকর্মীদের সঙ্গেও তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। শুধু বৃটিশ রাজশক্তিই তাঁকে বিদ্রোহী হিসাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে নি, তাঁর নিজের সৃষ্ট সিন ফিন দল থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে এবং ঐ দলের অন্য নেতারা তাঁকে জেলে দিয়েছেন। তাঁর নিজের দেশ সম্পর্কে ডি ভ্যালেরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন পুরোপুরি সফল হয়নি। তাঁর দেশ খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করেছে। আয়ারল্যান্ডের উত্তর অংশ আলস্টার আজও বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হতে পারে নি। উপনিবেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত করে চিরকালের জন্য তাকে দুর্বল করে রাখার যে সাম্রাজ্যবাদী খেলা পরবর্তী কালে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বার বার দেখা গেছে আয়ারল্যান্ডেই তার প্রথম সফল পরীক্ষা হয়েছে।

আইরিশ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যাঁর নাম এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন মার্কিন নাগরিক। ১৮৮২ সালের ১৪ অকটোবর তারিখে নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আইরিশ রক্ত তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মা-র কাছ থেকে। তাঁর বাবা ছিলেন স্প্যানিশ। ছোট বেলায় তিনি আয়ারল্যান্ডে চলে আসেন এবং ডাবলিনে লেখা পড়া শেখেন। তরুণ বয়সেই তিনি আইরিশ বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৬ সালে আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে বৃটিশ শাসকদের যে সংঘর্ষ হয় ('ইস্টার অভ্যুত্থান') সে সম্পর্কে গ্রেপ্তার করে তাঁকে জেলে পাঠান হয় ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে ঐ মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হয়। ১৯১৭ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। বৃটিশ সরকার আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তির আদেশের আওতায় আনেন। ডি ভ্যালেরা এ আদেশের বিরোধিতা করে ১৯১৮ সালে আবার কারারুদ্ধ হন। পরের বছর তিনি জেল থেকে পালান। এরপর আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে ডি ভ্যালেরার স্থান স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। তিনি আইরিশ রিপাব্লিকান ব্রাদারহুডের ও সিন ফিন দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে সিন ফিন দল আইরিশ জাতীয়তাবাদের মুখপত্র হয়ে ওঠে। আইরিশ ভাষায় 'সিন ফিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শুধু আমরা নিজেরা'।

ডি ভ্যালেরার ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে বৃটিশ সরকার কৌশল করে কিছু লোক খাড়া করেছিলেন। এই লোকগুলি ১৯২১ সালে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি করে এলেন। চুক্তির দ্বারা 'আইরিশ ফ্রি স্টেট' গঠিত হল। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে সে দেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কতকটা স্বীকার করে নেওয়া হল মাত্র। সেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে আলাদা করে দেওয়া হল। ডি ভ্যালেরা এই চুক্তির বিরোধিতা করলেন। তাঁর বিরোধিতার বড় একটা কারণ ছিল, নতুন চুক্তিতে আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্যের বৃটিশ রাজসিংহাসনের অধিকারীর নামে শপথ গ্রহণ করতে হবে বলে নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। বৃটিশ সরকার আয়ারল্যান্ড থেকে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন বলেও চুক্তিতে স্থির হল। ডি ভ্যালেরা এই সর্তেরও বিরোধিতা করলেন। কিন্তু তাঁর এককালের সহকর্মীরা অনেকে এ চুক্তিতে সায় দিয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষমতার আসনে গিয়ে বসলেন। আয়ারল্যান্ডে এ সময় চুক্তির সমর্থক ও চুক্তির বিরোধীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে ডি ভ্যালেরা তাঁর নিজের দেশের সরকারের হাতে বন্দী হলেন। ইতিমধ্যে আপোষকামীরা 'ডেইল' নামে পরিচিত আইরিশ পার্লামেন্টকে দিয়ে চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিলেন। এভাবে মুক্তিকামী আয়ারল্যান্ডের নেতা তাঁর আপন দেশের মুক্তির প্রাক্কালে রাজনীতির মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তিনি ফিয়াসাফেল ('আয়ারল্যান্ডের সৈনিক') নাম দিয়ে নিজের একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। এর এক বছর পরে ডি ভ্যালেরা তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বদল করে বৃটিশ রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে রাজি হলেন। এর পর 'ডেইল'-এ প্রবেশ করতে তাঁর আর বাধা রইল না। পাঁচ বছর কাল তিনি বিরোধী দলের নেতার আসনে ছিলেন। ১৯৩২ সালে ডি ভ্যালেরা আইরিশ ফ্রি স্টেটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন।

১৯৩৭ সালে ডি ভ্যালেরা একটি সংবিধান তৈরি করে গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিলেন। নতুন সংবিধান চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার প্রতি আনুগত্য ঘোষণার নিয়ম বাতিল হয়ে গেল। দেশের নতুন নাম হল আয়ার এবং ডি ভ্যালেরা হলেন প্রধানমন্ত্রী। বৃটেনের সঙ্গে উপনিবেশিক সম্পর্ক ছিন্ন করে আয়ার পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

ডি ভ্যালেরা [illegible] কখনও ভুলে নিতে পারেন নি এবং কোনো ইংরেজকে কখনও ক্ষমা করতে পারেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি আয়ারল্যান্ডকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ডি ভ্যালেরা কখনও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আবার কখনও বিরোধী দলের নেতা হিসাবে তাঁর দেশের রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তাঁর ফিয়াসাফেল দল পরাজিত হলে ডি ভ্যালেরা সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সে সময়ে তিনিই ছিলেন পৃথিবীর প্রবীণতম রাষ্ট্রপ্রধান।

আজীবন লড়াই করেও ডি ভ্যালেরা দেশবিভাগ রদ করতে পারেন নি। ইংরেজ তার সাম্রাজ্য ছেড়ে আসার আগে সে দেশে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে যে বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে এসেছিল তার বিষময় ফল থেকে আজও বিভক্ত দেশের দুটি খণ্ড মুক্ত হতে পারে নি। তবু, ইমন ডি ভ্যালেরা স্বাদেশিকতার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষদের চিরকালের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

পুণ্ডরীক

উপন্যাস

প্রথম প্রবাস

বুদ্ধদেব গুহ

দেখতে দেখতে বারো-তেরো ঘণ্টা সময় কেটে গেল। প্লেন ক্রমশঃ নীচে নামতে লাগল। এয়ার-হোস্টেস আর ফ্লাইট-পার্সাররা নানা-রঙা ছোট ছোট তোয়ালে বীজাণুমুক্ত করে সিদ্ধ করে গরম অবস্থায় প্রত্যেককে স্টেইনলেস স্টীলের সাঁড়াশী করে তুলে দিয়ে গেল। ঐ দিয়ে মুখ হাত, গলা-ঘাড়, সব মুছে নেওয়ায় মনে হল ক্লান্তি দূর হল। সত্যি সত্যিই হল কিনা জানি না। এই ন্যাপকিন দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্লান্তি দূর করানো—তাই-ই মনে হলো যে ক্লান্তি দূর হলো।

দেখতে দেখতে প্লেন ফ্র্যাঙ্কফার্ট এয়ারপোর্টের উপরে উড়ে এল। দূরে দেখা গেল সারি সারি গাছের মধ্যে মধ্যে অটোবান দিয়ে সাঁই-সাঁই করে বিচিত্রবর্ণ সব গাড়ি ছুটে চলেছে।

ফ্র্যাঙ্কফার্টে ল্যাণ্ড করে প্লেন এসে লুফৎহানসা এয়ারওয়েজের টার্মিনালের সামনে দাঁড়াল।

আমারই মত যাঁরা কখনও দেশের বাইরে যান নি, তাঁদের প্রথমে খুবই অবাক লাগে দেখে যে, বেশীর ভাগ বিদেশী এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় না। প্লেন থামলে, ট্র্যাকটর বা ছোট অথচ শক্তিশালী কোনো গাড়ী প্লেনকে টেনে নিয়ে এমনভাবে দাঁড় করায় যে, প্লেনের দরজার সঙ্গে একটি সেণ্ট্রালি-হিটেড অথবা দেশভেদে এয়ার-কণ্ডিশানড্ প্যাসেজওয়ের মুখে এসে একেবারে সেঁটে যায়।

প্লেন থেকে বেরিয়ে তাই একটুও ঠাণ্ডা লাগল না। সেই প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে হেঁটে এসে টার্মিনালের ভিতরে পৌঁছলাম।

তখন ফ্রাঙ্কফার্টে দুপুর বারোটা। যদিও আমার ঘড়িতে প্রায় বিকেল চারটে বাজে।

লুফৎহানসার টার্মিনাল থেকে একই সঙ্গে প্রায় ত্রিরিশ-চল্লিশটা প্লেন ছাড়ার বন্দোবস্ত আছে। টার্মিনালের মধ্যেই এস্কালেটর রয়েছে অনেক। উঠছে, নামছে। বিভিন্ন পথ। প্রত্যেকটি পথই উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত—ঝকঝকে, তকতকে। এত পথ যে, মনে হয় পথ হারিয়ে যাবো। তাছাড়া এই প্রথম বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ার অপরিচিতিজনিত ভয়মিশ্রিত অস্বস্তিও যে ছিলো না, তা নয়।

কাউন্টারে শুধোতেই জার্মান মেয়েটি ভাল ইংরিজীতে বলল, তুমি এ-১৫ নম্বর গেটে চলে যাও, সেখান থেকে তোমার লানডানের প্লেন ছাড়বে।

এ-১৫ খুঁজে বের করতে ত প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা—। যেহেতু লানডানের প্লেনটা আর কুড়ি মিনিট পরেই ছেড়ে যাবে, তাই উৎকণ্ঠারও হেতু ছিল। সবচেয়ে বড় হেতু, পকেটের বিশল্যকরণী—আট ডলার।

জীবনে প্রথম এসকালেটরে পা দিয়েই মনে হল এই পা পিছলে আলুর দম হলাম বুঝি। কেবলই মনে হচ্ছিল যে, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই বুঝি এই বাঙালের দিকেই ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে। আমি যে নিতান্তই একজন আকাট তা বুঝি আমার গায়ের গন্ধেই টের পাচ্ছে সকলে। যাই-ই হোক, অনেকবার এসকালেটরে উঠে নেমে, অনেক পথ সুটকেস হাতে হেঁটে-দৌড়ে শেষ পর্যন্ত এ-১৫ গেট খুঁজে পেলাম।

চেক-ইন করে গিয়ে-প্লেনে উঠলাম—বোয়িং। কোলকাতা-দিল্লী-আগ্রা-বোম্বেতে যে প্লেন চলাচল করে। ডি সি টেন-এর পরে এই প্লেনকে এত ছোট বলে মনে হচ্ছিল যে, সে বলার নয়।

প্লেনে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্চ দিল খেতে। আমার ঘড়িতে তখনও ডিনারের সময় হয়নি, তবুও প্রায় আটঘণ্টা আগে আগের প্লেনে লাঞ্চ খাওয়াতে এই প্লেনের লাঞ্চকে ডিনার মনে করে খেয়েই ফেললাম।

পশ্চিম জার্মানীর সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান দেশের উপর দিয়ে প্লেনটা উড়তে লাগল। নীচে সবুজ ক্ষেত, কারখানা, বাড়ি-ঘর। অন্য রঙের, অন্য ধাঁচের। আমাদের দেশে প্লেনের জানালায় বসে নীচের দৃশ্য একরকম লাগে আর এখানে অন্য রকম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেনটা ইংলিশ চ্যানেলের উপরে উড়ে এল বিভিন্ন ইয়োরোপীয়ান দেশের উপর দিয়ে। নীচে ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলের মধ্যে অসংখ্য জাহাজ দেখা যাচ্ছিল।

নীচে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এই চ্যানেল পেরিয়েই জার্মানী আক্রমণ করেছিল এ্যালায়েড ফোর্সেস একদিন। তারও আগে ডেক, হাকিনস, আরো কতজনার দৌরাত্ম্যর স্থান ছিল এই জলভূমি। কতবার এখানে ইংল্যান্ডের ভাগ্য নির্ণয় হয়েছে। ছবি দেখেছি 'দ্য লংগেস্ট ডে', 'দ্য ব্যাটল অব বৃটেন', উইনস্টন চার্চিলের মেমোয়ার্স-এর 'দ্য ফাইনেস্ট আওয়ার'। সব একই সঙ্গে মাথায় মধ্যে ঝিলিক মারছিল।

"Never in the history of mankind, so many had owed, so much to so few—" রয়্যাল এয়ার ফোর্সের পাইলটদের উদ্দেশ্য পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে চার্চিল তাঁর দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একথা বলেছিলেন।

ছোটবেলা থেকে বহু বই পড়েছি, বহু ছবি দেখেছি এপর্যন্ত এই ইংলিশ চ্যানেল সম্বন্ধে, কিন্তু সশরীরে সেই ঐতিহাসিক নীল জলরাশির উপর দিয়ে চলেছি মনে করেই রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

আরও রোমাঞ্চ হচ্ছিল এই ভেবে যে, আমি সত্যিই কত ভাগ্যবান। ভগবানের অপার করুণা না হলে কি এখানে আসতে পারতাম? আমারই পরিচিত, আমার চেয়ে সর্বদিক দিয়ে যোগ্যতর কত শত লোকের জীবনেও ত এই সুযোগ আসে না, আসেনি। কারুণ কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত অন্তর সে-মুহূর্তে এক নীরব মুগ্ধতায় ভরে গেল। ভরে রইল অনেকক্ষণ।

ইংরেজরা যে নিয়মবদ্ধ ও নিয়মানুবর্তী জাত তা আকাশ থেকে দেখলেও বোঝা যায়। যেই ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে প্লেনটা ইংল্যান্ডের উপর এলো, অমনি সমস্ত বাড়ি-ঘর কলকারখানা সবকিছুরই মধ্যে একটা দারুণ শৃঙ্খলা চোখে পড়ল। কোনো কিছুই অগোছালো দেখাচ্ছিল না উপর থেকেও।

হঠাৎ ঘোর ভাঙতেই দেখি, প্লেনটা নীচে নামছে।

মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই লান্ডানের হিথ্রো এয়ারপোর্টের উপর এক চক্কর লাগিয়েই বোয়িং প্লেনটা নেমে এলো টারম্যাকে।

সত্যি সত্যিই লান্ডানে এসে পৌঁছলাম। ঐতিহাসিক লান্ডান। কুইন মেরীর—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের—উইনস্টন চার্চিলের—ডিপিন্সের—হবেকরকম-হরে-রামের লান্ডান।

॥ ২ ॥

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছিল। হিথ্রো এয়ারপোর্টের টারম্যাকের পাশে রানওয়ের মাঝে মাঝে সেপ্টেম্বর মাসের সবুজ সতেজ ঘাস গজিয়ে আছে। একঝাঁক নরম সী-গাল সেই সবুজ তৃণভূমি ও কালো টারম্যাকের সীমানায় বসে আছে। কেউ ডানা নাড়ছে, কেউ একমনে দেখছে সামনে, কেউ ঠোঁট দিয়ে চিকন ও মসৃণ পালক, নিজের ডানা পরিষ্কার করছে।

প্লেনটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক প্যাসেঞ্জার ব্যাপেই এসে থামল।

আজকের লান্ডানেও যতটুকু শৃঙ্খলা বর্তমান, তা অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ। টার্মিনাল বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়তেই দেখলাম, তাবৎ পৃথিবীর যাবৎ কোণ থেকে

> ✻
>
> আগামী সংখ্যা থেকে
> ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে
> নতুন উপন্যাস
>
> **নীল আকাশের স্বপ্ন**
>
> লিখেছেন
> মানসী মুখোপাধ্যায়
>
> ✻

আসা শ'য়ে শ'য়ে সাদা-কালো-হলুদ-বাদামী-লাল মানুষে ভিতরটা গিজগিজ করছে। কত প্লেন যে উড়ছে নামছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রতি মিনিটেই নাকি ওঠা-নামা এখানে।

লম্বা লাইন পড়েছে। ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি নেই। আমাদের দেশে, লাইনে না-দাঁড়ানোকেই আমরা এখনও বাহাদুরী বলে মনে করি। জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই মামা-কাকা, চেনা-শোনা খোঁজ করে যাতে সকলের সঙ্গে একীভূত না হতে হয় এই চেষ্টাতেই আমরা সচেষ্ট থাকি। আগেই বলেছি, আকাশ থেকেই হোক, কি মাটিতে নেমেই হোক, প্রথমেই বৃটিশ মানুষজনের যে-দিকটা চোখে পড়ে, তা হল নিয়মানুবর্তিতার দিক।

হলুদ অক্ষরে লেখা জ্বলছে—ব্রিটিশ পাসপোর্টস, কমনওয়েলথ পাসপোর্টস, অন্যান্য পাসপোর্টস। তিনটি ভিন্ন লাইন।

কমনওয়েলথ পাসপোর্টসের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক সামিল হলাম বলব? সামিল হওয়া বলাটাই বোধহয় সপ্রতিভতার লক্ষণ।

কাস্টমস অফিসারদের সুন্দর করে ব্রাশ-করা নেভী-ব্লু ও কালো ব্লেজার। পিতলের বোতামে বোধহয় রোজই ব্রাসো লাগিয়ে পালিশ করেন এঁরা। একেবারে ঝকঝক করছে। কালো চামড়ার জুতো—তাতেও মুখ দেখা যায় এমন পালিশ।

এত লোক একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, এত অফিসার ডেস্কে ডেস্কে কাজ করছে কিন্তু কোথাও কোনো চেঁচামেচি নেই। সকলেই ফিসফিস করে কথা বলছে। এক-মাত্র পশ্চিমী লোকেরাই ফিসফিস করে, মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এমন করে কথা বলতে পারে যাতে অন্যকে চেঁচিয়ে গালাগালি বা অপমান করতে পারে। আমাদের এই আজন্মলালিত বিদ্যা দেখে, যাকে প্রায় মজা বলে, ওদের মধ্যে আন্তরিকতা কম। কেউ বলে সেকেলে, ওদের মুখে যেরকম অভিব্যক্তি, কেউ কুশলেও সেরকম। আমরা পরের লোকেরা গলায় গ্রামের সঙ্গে আন্তরিকতার মাত্রা বুঝি বেঁধে রেখেছি। আন্তরিকতা যতই খাঁটি, গলার স্বর ততই উদারা—মুদারা—তারায় প্রতি দ্রুত ধাবমান।

এ-ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না—তবে কোনো আমেরিকানের মগজে এই ভাবনাটা কোনোক্রমে ঢুকিয়ে দিতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি বা ফোর্ড ফাউন্ডেশান থেকে গ্রান্ট নিয়ে তিনি একটি পোর্টেবল টাইপরাইটার, প্রচুর কাগজ ও বল-পয়েন্ট পেন সঙ্গী করে প্লেনে প্লেনে এবং বড় বড় হোটেলে হোটেলে ঘুরে ঘুরে প্রাচ্য দেশের সব জায়গা ঘুরে হয়ত গ্রাফ-সহযোগে আন্তরিকতা ও স্বরগ্রামের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত পেপার সাবমিট করে ডক্টরেট হবেন।

একজন ইয়া-ইয়া পাকানো গোঁফওয়ালা ডাকসাইটে কাস্টমস অফিসার কমনওয়েলথ পাসপোর্টস-এর লাইনের মাথায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে এক-একজন ইমিগ্রেশান অফিসারের ডেস্কে পাঠাচ্ছিলেন—যেমন যেমন ডেস্ক খালি হচ্ছিল। ভদ্রলোকের চেহারা দেখেই আমার মনে হল ইনি নিশ্চয়ই হাই-ল্যান্ডার্স দলে ফুটবল খেলতেন। বাবা যখন মোহনবাগানের গোলকীপার ছিলেন, আমার জন্মের আগে, তখন এরাই বোধহয় বুট-সমেত পদাঘাত করে বাবার হাঁটুর মালাইচাকি ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, যার পর তাঁর খেলাই ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ভদ্রলোকের জবরদস্ত চেহারা, লালমুখ ও পুরুষ্টু গোঁফের দিকে আমি কটমটিয়ে তাকিয়েছিলাম, এমন সময় উনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মিনমিনে গলায় আমাকে আঙুল দিয়ে একটি ফাঁকা কাউন্টারের দিকে যেতে নির্দেশ দিলেন। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে কাউন্টারে উপস্থিত হতেই দেখি, একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ইয়াংম্যান মেয়েদের মত লম্বা বাবরি চুল ও ঘুতনী সমান জুলপী নিয়ে টুলে বসে আছেন। মুখে

শারদীয় অমৃত ১৩৮২

এ সংখ্যার একটি বিশেষ লেখা

রবীন্দ্রনাথের মডেল চিন্তা

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি নাড স্টাডিসহ অন্যের যেসব মডেলে তিনি নিজের কবিতার লাইন ব্যবহার করতে দিয়েছেন তার কয়েকটি প্রতিলিপি। রচনা : দিলীপ মালাকার

●

৫খানি উপন্যাস ১টি দীর্ঘ আখ্যায়িকা

আশাপূর্ণা দেবী নিমাই ভট্টাচার্য, চাণক্য সেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন এবং বুদ্ধদেব গুহ।

●

সে : একটি বড় গল্প সতীকান্ত গুহ

●

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত নাটক

অসম্পূর্ণ এই পাণ্ডুলিপির একাধিক ফ্যাকসিমিলিসহ
আলোচনা : গোপাল রায়

●

সুদীর্ঘ বড় গল্প

কালীদহ : নাট্যজগতে বিখ্যাত শম্ভু মিত্রের প্রথম গল্প

●

গল্প প্রায় কুড়িটি, লিখেছেন : অন্নদাশঙ্কর রায় বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, প্রফুল্ল রায়, পরিমল গোস্বামী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, শৈলেন রায়, দেবল দেববর্মা, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, লীলা মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুমথনাথ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং আরও অনেকে।

নিবন্ধ : বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল মজুমদার, বিশু মুখোপাধ্যায়, এবং আরও অনেকে।

●

সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ও আর্টপ্লেট

দাম : ৭·৫০, ডাকমাশুল ১·৫০

ভাবান্তর নেই। হাতে বায়রো—বল-পয়েন্ট পেন।

আমার কাগজপত্র দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে হুমম্ হুমম্ করছিলেন। কোথায় থাকব? কতদিন থাকব? কেন মরতে এখানে এলাম? এখান থেকে কোন চুলোয় যাব ইত্যাদি তাবৎ বিরক্তিকর প্রশ্ন একের পর এক গুলতির পাথরের মতো আমার দিকে ছুঁড়ছিলেন।

আলী সাহেবের ভাষায় যাকে বলে 'গাঁক গাঁক করে ইংরিজী বলা', তেমনি ইংরিজীতে আমি ক্রমান্বয়ে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম।

ইন্টারভ্যুতে বসতে হবে এই ডিসটার্বিং ভাবনার ভয়ে জীবনে যখন কারো চাকরীই করলাম না, তখন এদের দেশ দেখতে এসে এত কৈফিয়ৎ দিতে বিরক্ত লাগছিল। স্পনসরশিপ সার্টিফিকেট দেখালাম, বললাম, ভায়ার আমার নিজের ফ্ল্যাট আছে, মানে বহুদিন হলো সে রয়েছে এ-পোড়া দেশে। সেই-ই নেমন্তন্ন করে আমাকে এনেছে। তাবৎ খরচা-খরচ সব তার।

এত কিছু সত্ত্বেও বুকের মধ্যে একটু যে দুর-দুর করছিল না এমন নয়, কারণ কিছুদিন আগেই আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক লাণ্ডানে বেড়াতে আসবার জন্যে দমদম থেকে এয়ার-ইণ্ডিয়ার উড়ানে এসেছিলেন। দমদমে তাঁর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সকলে বিস্তর ফুলটুল এবং একগাদা টলটলে চোখের জল ফেলে বিদায় দিয়েছিলেন।

চোখের জল আকছার ফেলেন বলেই বোধহয় বাঙালী মেয়েদের চোখ এমন উজ্জ্বল।
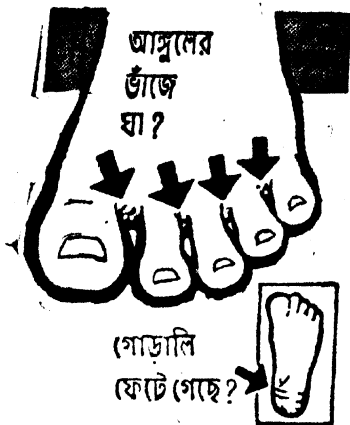
যাই-ই হোক, সে ভদ্রলোক লানডানে নেমেই আবার পত্র পাঠ পরের প্লেনে কোলকাতা ফিরেছিলেন কারণ তাঁকে ইমিগ্রেশান ডিপার্টমেন্ট লানডানের মাটিতে পা দিতে দেয় নি।

বিপদটা সে জন্যে হয়নি।

বিপদটা হয়েছিল, ফিরে গিয়ে কি বলবেন সেই কারণে।

অতএব তিনি কাউকে কিছু না বলে দমদমে নেমেই সটান ট্যাক্সি নিয়ে মধ্যমগ্রামে তার এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে পনেরোদিন প্রচুর মশার কামড় ও বাগানের আম খেয়ে কাটিয়ে একদিন ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তার শালী তাঁকে দেখা মাত্রই বলেছিল, জামাইবাবুকে একেবারে সায়েবের মত দেখাচ্ছে।

দেখাবেই।

কারণ বাগানের রোদে হাওয়ায় তাঁর ফ্যাকাশে কৃষ্ণ বর্ণ এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বেগুনের গাঢ় বেগুনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আমিও কোন ঝুঁকি নিই নি। আমার ফেরার টিকিট বোম্বাই-এর ছিল। জারীনকে বলে এসেছিলাম যে, আমি কোনো কারণে হঠাৎ ফিরে এলে বন্ধুর ফ্ল্যাটে বেশ কদিন থাকতে পারি—বন্ধু থাকুক আর নাই থাকুক একথা যেন সে বন্ধুকে বলে রাখে।

যাই-ই হোক, অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর, 'উইশ ইউ আ নাইস টাইম ইন লানডান' বলে ছেলেটি ভাবলেশহীন মুখে এক চিলতে ক্যাস্টর-অয়েল গোলা হাসি ফুটিয়ে আমাকে ছুটি দিলেন।

এবার কাসটমস। তার আগে মাল নেওয়া। সমস্ত ইনকামিং ফ্লাইটের মাল একই সঙ্গে লুকোনো কনভেয়র বেল্টে করে এসে একটা সদা-ঘূরন্ত চাকতির মধ্যে পড়ছে। যখন যে ফ্লাইটের মাল আসছে তখন সে ফ্লাইটের নম্বর ভেসে উঠছে টেলিভিশানে। ইতিমধ্যে ইতি-উতি তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলাম যে, প্রত্যেকেই একটা করে ট্রলি টেনে নিয়ে আসছেন কোথা থেকে। দু একজনকে দেখলাম ঐ ট্রলিতে মাল বোঝাই করে মাল নিয়ে কাসটমস ব্যারিয়ারের দিকে এগোলেন। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আমিও একটা ট্রলি নিয়ে এলাম এবং এমন ভাবে পাইপ-মুখে স্যুটকেশ ভরা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে কাসটমস ব্যারীয়ারে এলাম যে, আমার নিজেরই মনে হতে লাগল যে বাল্যাবস্থা থেকেই আমি হীথ্রো এয়ারপোর্টে যাওয়া-আসা করে থাকি।

কাস্টমসের লোকেরা কিছুই দেখলেন না। ফ্র্যাঙ্কফার্ট থেকে ওড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ফর্ম দিয়েছিল ভর্তি করার জন্যে—সেটা ইমিগ্রেশান ডিপার্টমেন্টে জমা করতে হয়েছিল। কাস্টমস-এ শুধু জিজ্ঞেস করল, কোনো ... কিছু আ...

নেই, শুনেই ছেড়ে দিল।

একজন সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে এ বড় কম আশ্চর্যের কথা নয়। সরকারী কর্মচারীরা, সে কাস্টমসেরই হোক, পুলিশেরই হোক বা ইনকাম-ট্যাক্সেরই হোক,—সকলে প্রত্যেক নাগরিককে ভদ্রলোক বলে মানে, তাদের সহজাত সততায় বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে ভদ্র ও ন্যায্য ব্যবহার করে, কথায় কথায় হাতে মাথা কাটে না, এ-কথা হঠাৎ দেশ ছেড়ে বাইরে এলে বিশ্বাস করাও কষ্ট হয়।

কাস্টমসের ব্যারীয়ার পেরিয়ে বাইরে এসে দেখি লোকে লোকে লোকারণ্য। একে অন্যের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছে, কেউ বা কাউকে চুমু খাচ্ছে—অনেকদিন পরে দেখা হওয়া বন্ধু-বান্ধবী, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের হাতে হাত রেখে, গায়ে গায়ে লেপ্টে শীতার্ত পৃথিবীতে অন্যের কাছ থেকে নেওয়া উষ্ণতায় ভর দিচ্ছে একে অন্যকে।

কিন্তু ভায়া কোথায়?

চতুর্দিকে চেয়েও আমার ভায়ার দর্শন মিলল না। তখন আমার প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। শেষে কি তীরে এসে তরী ডুববে? চিঠি লিখেছি—ট্রাঙ্ক-কল করেছি, তবুও ভায়া এলো না কেন? দিশী ভাইকে কি কাটাতে চায়?

আসবার আগে তিনমাস ধরে প্রচণ্ড পাঁয়তাড়া কষতে হয়েছিল। অফিসের কাজকর্ম গোছানো, পুজো সংখ্যার লেখা শেষ করা—এমনকি বিনোদন সংখ্যার জন্যে একটি উপন্যাসের কপি আসার আগের রাতে শেষ করে দমদম এয়ারপোর্টে হস্তান্তরিত করেছি। গত এক মাসে চারঘণ্টার বেশী ঘুমুতে পারিনি—অফিসের ও লেখার এত কাজ ছিল।

তারপরও কি এই অবস্থা?

লবীর এক কোণায় স্যুটকেস ও বোঁচকা-বুঁচকি রেখে, নতুন করে পাইপটাতে তামাক ভরে এখন গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় টাক পড়া, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িওয়ালা চশমা-নাকে সাহেবী এক্‌জিকিউটিভ স্যুটপরা এক ভদ্রলোক আমার দিকে করমর্দনের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। চেনা সম্ভব ছিল না আমার মাসতুতো ভাইকে। এমনকি পিস-তুতো বা পিসী-তুতো ভাই হলেও চেনার কথা ছিল না। তার চেহারার যে এত পরিবর্তন হয়েছে এক বছরে তা না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

টবী বলল, সরী বড়দা, গাড়ী পার্ক করতে দেরী হয়ে গেল।

আমি তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছি। ঠিক লোকের সঙ্গে করমর্দন করছি কিনা সে-বিষয়ে তখনও সন্দেহ হচ্ছিল।

হঠাৎ ও বলল, কি খাববার? আমাকে চিনছ না নাকি?

আমি হেসে ফেলে বললাম, সন্দ সন্দ লাগছিল।

কি কারবার কথাটা টবী 'খী খারবার' এর মতো করে বলে। শুনে খুব মজা লাগছিল।

টবী আমার হাত থেকে ট্রলিটা কেড়ে নিয়ে আমাকে নিয়ে চলল পাশের পার্কিং লটে।

ব্যাপার দেখে বুঝলাম যে, গাড়ী পার্ক করতে দেরী হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়। একটা চারতলা বিরাট বাড়ী—সারি সারি শয়ে শয়ে গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পার্কিং ফী আছে। কোলকাতায় কুড়ি পয়সা পার্কিং ফী দিতেই আমাদের অবস্থা কাহিল হয়, এখানের পার্কিং ফী সাংঘাতিক। তবে এদের রোজগারও আমাদের তুলনায় অনেক বেশী। এরা প্যাউন্ডকে টাকা বলে এবং টাকার সমান-মূল্য মনে করেই খরচ করে অথচ প্যাউণ্ডের মূল্য আমাদের টাকার চেয়ে কুড়িগুণ বেশী।

চারতলায় পৌঁছে ট্রলি থেকে স্যুটকেস ইত্যাদি গাড়ীর বুটে তুলে নিয়ে ট্রলিটা ওখানেই ফেলে রাখল টবী।

আমি শুধোলাম এটা পৌঁছে দিতে হবে না?

ও বলল, না! এয়ারপোর্টের লোক এসে মাঝে মাঝেই নিয়ে গিয়ে আবার ভিতরে জড়ো করে রাখবে।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়েই এমন জোরে গাড়ী ছুটোল টবী যে, সে বলার নয়। আমার রীতিমত ভয় করতে লাগল। ওর গাড়ীটা কালচে-নীল-রঙা একটা ফোর্ড কর্টিনা। আজকালকার সব বিদেশী গাড়ীরই পিক-আপ এত ভাল যে, গাড়ীতে বসামাত্রই সাঁ করে স্পীড তোলা যায়—আবার যে কোনো সময়ে পঞ্চাশ-ষাট মাইল স্পীডেও ভ্যাকুয়াম ব্রেক থাকাতে এক-মুহূর্তে গাড়ী দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। গাড়ীগুলো আমাদের দিশী গাড়ীর চেয়ে অনেক বেশী ভারীও বটে।

আমি বললাম, কি করছিস। আস্তে চালা, ভয় করছে।

টবী হাসল, বলল খী খারবার। আস্তেই ত চালাচ্ছি। মোটে ষাট মাইলে যাচ্ছি। বেশী আস্তে চললে আবার পুলিশ ধরবে।

ওকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে না পেরে বললাম, আসবার আগেই আমার বুকে একটা ব্যথা হয়েছিল, প্লিজ আস্তে চালা।

ও আবার বলল, সে কি? জানতাম না ত! 'খী খারবার' এই বয়সেই এসব কি? বলেই, গাড়ী আস্তে করল, মানে পঞ্চাশ মাইলে নামাল স্পীডোমিটারের কাঁটা।

গাড়ীতে হীটার চলছে, কাচ বন্ধ। এত হাজার মাইল, এত সমুদ্র, এত পাহাড় এত নদী জঙ্গল পেরিয়ে এলাম কিন্তু এ পর্যন্ত স্বাভাবিক হাওয়া ও আব-হাওয়ার একটুও স্বাদ পেলাম না। বাঁদিকের কাচটা নামাতেই হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসতে লাগল। হাওয়ায় কোনো আর্দ্রতা নেই, শুকনো মচমচে ঠান্ডা। বড় ভাল লাগল।

টবী বলল, এতখানি উড়ে এসেছ, তাই শরীর গরম হয়ে গেছে। তা বলে কাচটা খুলে রেখো না, ঠান্ডা লেগে যাবে রুদ্রদা।

কাচটা তুলে দিতে দিতে বললাম, মহা ঝামেলায় পড়লাম দেখছি, উড়ে এসে।

প্রায় আধঘন্টা পর আমরা এসে টবীর ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম। স্মিতা এসে দরজা খুলল। ছোট্ট সাজানো-গুজোনো ফ্ল্যাট। ওদের বাড়্তি ঘর নেই, তাই আমি খাওয়ার ঘরে শোব। খাওয়ার টেবলের পাশে একটু নীচু ডিভান তার উপর সুন্দর প্যাস্টেল-রঙা কম্বল পাতা।

যদিও ওদের ঘড়িতে তখন বাজে পাঁচটা—আমার ঘড়িতে গভীর রাত।

একটু পরেই সন্ধ্যে নেমে এল। সন্ধ্যে নামতেই পর্দা সরিয়ে দেখলাম, দিকে দিকে হলুদ হয়ে গেছে আকাশ যেন। সোডিয়াম-ভেপার ল্যাম্পগুলোর আলো ভারী নরম, স্বপ্নময়। কুয়াশার পক্ষে ভাল বলে এরা রাস্তার সব আলোই বদলে ফেলে সোডিয়াম-ভেপার ল্যাম্প লাগিয়েছে। তাই রাতের লানডানকে ফিস-ফিসে-কথা-বলা একটা মিষ্টি হলুদ বাসন্তী পাখি বলে মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

রাজলক্ষ্মী ॥ সাধনা মুখোপাধ্যায়

মনে পড়ে বৈঁচি ফলের মালা গাঁথার আড়ালে
ছিল শুধু শৈশবের ভালো লাগা
একদিন যৌবনের ভরা জোয়ারের রাতে মুজরোয় সেই ভালো লাগা
লুটিয়ে পড়েছে এক দুনির্বার প্রণয় জ্বালায়
বিপদে যে আড়াল করেছে রেখে স্নেহময় পক্ষপুটে
ঘন মমতায় জননী প্রতিমা
পীড়ায় শুশ্রূষারতা নিপুণ সেবিকা এক
অন্তরে প্রীতির নেই সীমা
বিভিন্ন ভূমিকায় কখনো প্রেমিকা আর কখনো জীবন সঙ্গী
অথচ বিধবা নারী পূর্ণ নিষ্ঠাবতী
অপরাধী হয়নি সে কখনো যে বিবেকের কাছে
নিজের বিচারে সে যে কোনদিন হয়নি অসতী
পিয়ারী ও রাজলক্ষ্মী মিলে মিশে একটি একাঙ্গী স্রোত
গঙ্গা যমুনা
বহে চলে একই লক্ষ্যে প্রেমবতী স্নিগ্ধ প্রভা মৃদু মীড়
মৃদু কলস্বনা
দারুণ যৌবনকে সে কৌটোর ভোমরার মতো নিবিড় বর্ম এক
স্তম্ভের আড়ালে
গোপন করেছে রেখে দয়িতের করস্পর্শ লেগে যায় পাছে
যাকে সে সর্বস্ব দিল শুধু দেহ ছাড়া
কিম্বা সে হৃদয়ের দারুণ গভীরে পৌঁছেছিল এই মর্মতার
প্রেমের আনন্দ ধারা
মেদমজ্জা স্থূলতায় নস্যাৎ হয় যে ধুলোয়
প্রেমের রহস্যঘন গভীরতা দেহদানে সমস্ত ফুরায়

কে অমল ! মলয় [illegible] দাশগুপ্ত

কে অমল আশ্বিনের মতো উঁকি [illegible] যাও ?

ক্লান্ত দিনযাপনের পালা সাঙ্গ হ[illegible] হাত ধরে
চলে যাবো পাহাড়তলীর পথে, এ[illegible] বেলা
পড়ে আসবে—শুনতে পাচ্ছি মাদ[illegible] বোল

কে বাজায় কতো দূরে দ্রিমি দ্রিমি, [illegible] আর চাঁদ
মুখ দেখালে আলোছায়াঘননীল স্বপ্নের [illegible]রে
বাঁধ ভেঙে যায় দ্যাখো কুলছাপানো জলে অতল
যাদু জানে. যাদু জানে বুকের ভিতরে ঢেউ
ভেঙে ভেঙে প্রহর ঘনায় !

দু'টি কবিতা ॥ বিনোদ বেরা

হয়তো কোথাও আছে :

হয়তো কোথাও আছে বিদ্যুৎ বরণী এক নারী
আমি তাকে কখনো দেখিনি
হয়তো বা কোনদিন দেখবো না তাকে,
তবু তার কথা ভেবে আমার দুপুর
মেঘলা উদাস হয়ে আসে।

মনে হয় অপেক্ষার অস্থিরতা বাতাসে জেগেছে.
মনে হয় যবনিকা সরে যাবে দেখা দেবে হয়তো হঠাৎ
মেঘের জানলায় এক বিদ্যুৎ বরণী—রাঙা
দারুণ সুন্দর এক মুখ,
সুশ্রী সেই মুখখানি অতি স্বাভাবিক মনে হবে—
হয়তো কোথাও আছে, আমি তাকে এখনো দেখিনি।

ঘন হতে থাকি :

লবঙ্গলতার কুঞ্জে সর্বাঙ্গে হলুদ ফুল ফুটিয়ে অচেনা
কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো অহংকারে ডাগর হয়ে গো ?
কি নাম ? কোথায় বাড়ি ? এখানে কি করে এলে ? আমি
যত প্রশ্ন করি তুমি উত্তর না দিয়ে শুধু হাস হেলেদুলে।
বোকা বনে গিয়ে খুব সাংসারিক প্রয়োজন ভুলে
তোমার কৌতুক রঙ্গ বোঝার বাসনা নিয়ে আমি মনে প্রাণে
ঘন হতে থাকি ক্রমে—ঘনতর তোমাকেই কেন্দ্র করে নারী।।

[illegible] আনমনা।

১৯৪১ সালের ৬ এপ্রিল। হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাকটস কোম্পানীতে স্বামী শিবানন্দের রেকর্ড চেক করছিলেন নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশান্ত মহলানবীশের সঙ্গে রেকর্ডিং রুমে ঢুকলো ফুটন্ত পদ্মের মত এক ফুটফুটে কিশোরী। দুটি চোখে প্রতিভার দীপ্তি। প্রফুল্লবাবু বললেন 'চন্ডীবাবুর সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। শৈলজাদা এখনি আসছেন। আজ রাজেশ্বরীর রেকর্ড হবে।'

ডিভাইন লাইফ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দ বার্গসেঁর ফিলজফি আলোচনা করছিলেন। খুব মন দিয়ে শুনছিলো মেয়েটি। আর ঐ প্রসঙ্গ তার মনকে কি প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে তারই পরিচয় যেন লেখা ছিলো তার উৎসুক দুই চোখে।

'স্বামীজীর আলোচনা তোমার এত ভাল লাগছে? নিশ্চয়ই তুমি ফিলসফি পড়েছ?' জিজ্ঞেস করেন অভিজ্ঞ নীরদবাবু। জানা গেলো বি-এতে তার ফিলসফি ছিলো। শুধু তাই নয়। নম্রনত মেয়েটির জড়তা হীন স্পষ্ট কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো মর্মগহনের বাণী 'দর্শনকে ভাল না বাসলে সঙ্গীতকে ভালবাসা যায় না'।

বেশ কয়েক মুহূর্ত নীরদবাবু কাজ ছেড়ে তাকিয়ে রইলেন সেই দীপ্তিময়ীর বিশ্বাসদৃঢ় মুখের দিকে। রেকর্ড হোলো 'বসন্ত দিনের প্রথম কদম ফুল' 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে'।

প্রথম রেকর্ড হতে না হতেই হিট। প্রথম দুবার মোমের থালা থেকে প্রসেস করে আনা হোলো। সুরের বিশুদ্ধতায় সবাই মুগ্ধ। কিন্তু নীরদবাবু একটু খুঁতখুঁত করেন দু এক জায়গায় উচ্চারণে দুটি থাকার দরুন। 'মা তুমি সঙ্গীত, দর্শন সাহিত্য এত ভালবাস, তোমার মুখে ভুল উচ্চারণ (সে যে কোনো ভাষারই হোক) অমার্জনীয়।'

শান্ত সুরে রাজেশ্বরী বলেন, 'আর একবার রেকর্ড করুন'। এবারে একেবারে নিখুঁত। কে বলবে শিল্পী বাঙালী নন?

'এতবড় বিদুষী, শিল্পী কিন্তু বাধ্যতায়

[illegible] জাস্টিস। পাঞ্জাবের গৌরব মাদবে। হিন্দুস্থানী তাদের মুখ্যভাষা। রাজেশ্বরী দত্ত শুধু শিল্পীই সুকণ্ঠী নন, মেধাবী ছাত্রীও। লাহোর ইউনিভার্সিটিতে ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন। কম্বিনেশন? ম্যাথমেটিকস ও ফিলসফি। অদ্ভুত!

একের পর এক রেকর্ড হতে লাগল 'শেষ গানেরই রেশ', 'ওগো শোনো কে বাজায়', 'ওগো আমার চির-অচেনা', 'এখন আমার সময় হোলো', 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি', 'কিছুই ত হোলোনা' 'পিপাসা নাহি মিটিল', 'আমার মাথা নত করে', 'দিন যাহারে', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'মন দুঃখের সাধন', 'আজি কমল মুকুল দল', 'যে কেহ মোরে নিয়েছ সুখ' 'এ মোহ আবরণ', 'আজি যে রজনী যায়' 'ফুল বলে'—আরো কত গান।

কিন্তু হায়—অনুশীলন, ধ্যান-ধারণা, কণ্ঠসৌন্দর্যে যখন শিল্পী পূর্ণতায় টলমল করছেন ঠিক সেই সময়েই দীর্ঘ বিরতির যবনিকা পড়লো রেকর্ডের ধারাবর্ষণে।

১৯৪৩ থেকে হঠাৎ বিধান এলো ছ' বছরের মধ্যেই সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের ডিস্ক মুক্ত করতে হবে। এতবড় দায়িত্ব গ্রামোফোন কোম্পানী ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানীর পক্ষে পালন করা সম্ভব ছিলো না। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিন্দুস্থান কোম্পানীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বন্ধ।

কিন্তু ১৯৫৫ সাল অবধি এই পরিকল্পনা যখন কার্যকরী হোলো না ডাঃ প্রশান্ত মহলানবীশের আনুকুল্যে হিন্দুস্থান কোম্পানী আবার তার পূর্ব অধিকার ফিরে পেল। দীর্ঘ বার বছরের মধ্যে রাজেশ্বরী দত্তর আর কোনো রেকর্ড হয়নি। তার আগে শেষ রেকর্ড হয় 'প্রিয় বান্ধবী' কথাচিত্রের গান 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে' এবং 'ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী', 'এখন আমার সময় হোলো'।

এই দীর্ঘ বার বছর, যখন যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ তাঁর কণ্ঠ, পরিণত ধারণায় হৃদয় পূর্ণ, প্রকাশ বৈভবে

[illegible]

১৯৫৭ সালে ওঁর স্বামী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ইউরোপের নানান ইউনিভার্সিটিতে লেকচারশিপে যাত্রা করেন। রাজেশ্বরী হলেন তাঁর সহযাত্রী। সেই সময় তাঁর অনেক গান রেকর্ড করে রেখেছিলেন নীরদবাবু—এরই মধ্যে ছিলো 'চিরসখা হে ছেড়োনা'। 'বুঝি ঐ সুদূরে' গানটি ব্রহ্মসঙ্গীত নাম দিয়ে রেকর্ড করতে হয়েছিলো। কারণ বিশ্বভারতী থেকে ও গানের কোনো প্রকাশিত স্বরলিপি ছিলো না। সাহানা দেবী অবশ্য একটা রেকর্ড করেছিলেন তবে কোন সুরে তাও জানা যায়নি। কারণ সে রেকর্ড এখনও বেরোয়নি।

১৯৬৯-এ হিন্দুস্থান কোম্পানীতেই টেপ করে রাখা হয় 'অনন্ত সাগর মাঝে' 'তুমি যেওনা', 'আমার যদি বেলা' এবং 'নীলাঞ্জন ছায়া' (এ-গান এখনও রেকর্ডে প্রকাশিত হয়নি)। ...১৯৪৪-এ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শুধু প্রেরণালক্ষ্মী নয় গৃহলক্ষ্মীও হয়েছিলেন রাজেশ্বরী দত্ত। স্মরণপটে স্বর্ণলগ্ন হয়ে আছে জীবনের এই অধ্যায়গুলি। পূর্বরাগের রঙের প্লাবনে ভেসে যাওয়া প্রাণচঞ্চল মুহূর্তগুলি মিলনের ভরা জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে শান্ত হয়ে আসে। তারপর পরস্পরকে নতুন করে জানার পালা। রসে বৈদগ্ধ্যে, সুরে, কাব্যে জীবনের পাত্র কানায় কানায় ভরে ওঠার আশ্চর্য অনুভূতি। সমমর্মীর হাত ধরে সাহিত্যে, বিহার। শেলী, কীটস, বায়রন, রবীন্দ্রনাথ, যেন নতুন রসে নতুন অনুভূতিতে প্রাণময় হয়ে ওঠেন—সুধীন্দ্রনাথের উপলব্ধির আলোয়। জীবনের এক অভিনব পট-পরিবর্তন। নিরালা মুহূর্তে অন্তরতম সত্তায় পাওয়া, সুরের স্পর্শে কাব্যের, শিল্পীর সঙ্গে রসিকের শুভদৃষ্টির আবীর রাঙানো রঙিন নিমেষ। এ সৃষ্টিতে উভয়েরই সমান ভূমিকা।

কিন্তু বাড়ীতে সাহিত্যিক, কবির সমাগমের উজ্জ্বল সান্ধ্য সভায় আপন স্বাতন্ত্র্যে ঝংকৃত, গভীরবোধের আলোয় যখন দীপ্তিমান জ্যোতিষ্কের মত ঝলকে [illegible] সেই [illegible] আন্তর সম্পদ, মুগ্ধ হওয়ার পালা রাজেশ্বরীর। এ হেন দিশারী পেয়েছিলেন বলেই শিল্পীর দূরভিসারী মন নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে যেমন সহজ হয়েছিলো, তেমনই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ওড়া সহজ হয়েছিল ভাবের আকাশেও। কাপের পর কাপ কফি নিঃশেষ হোতো, অ্যাসট্রের অঙ্গার ধারণের ক্ষমতাও শেষ—শুধু শেষ হোতো না সতীর্থ সাহিত্যিকদের সঙ্গে সরস আলোচনা। এ যেন নিজেকে নতুন করে জানা।

সে-সব দিনের স্মৃতি শুধু ফাল্গুনের গানেই বেজে ওঠার নয়, সে যে যৌবন-বেদনারসে ভরে ওঠাও। সঙ্গীহারা সেই

[illegible]? সেই যাদুকরী সুরঝংকার [illegible] অনন্য [illegible] যখন [illegible] ... [illegible] ... তাই [illegible] ... [illegible] ... তাঁর [illegible] ... জল-টলমল চোখ দুটির দৃষ্টি দূরে আজও [illegible]।

রাজেশ্বরী দত্তই একমাত্র শিল্পী একই দিনের তিনটি বেতার অধিবেশনে যিনি যথাক্রমে খেয়াল, ঠুংরী এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত সমান দক্ষতায় পরিবেশন করেছেন, প্রতিটি সংগীতের স্বাতন্ত্র্যবৈশিষ্ট্য ও চরিত্র-গৌরব অনাহত রেখে। এবং বিভিন্ন ধারার এই সংগীত সংগমের তীর্থগামিনী হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এক সুরবিহারী সৌন্দর্য দ্যুতির আঙিনায়।

ইনি শান্তিনিকেতনে সংগীতশিক্ষার্থী-রূপে ছিলেন ১৯৩৮ থেকে ৪২ অব্দ অবধি। কবির জীবনাবসানের কিছু আগে পর্যন্ত। এ নিয়ে কবির আক্ষেপ ছিল শুনেছি। 'মেয়েটি সু-কণ্ঠের অধিকারিণী। কিন্তু শারীরিক অসমর্থতার জন্য একে আমার শিখিয়ে পাওয়া হোলো না' একথা তিনি প্রায়ই বলতেন অন্তরঙ্গমহলে।

'ছোটোবেলা থেকেই গানে আগ্রহশীলা হলেও আমার জীবনে যথার্থ সংগীত এলো শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপর্বে (১৯৩৮ থেকে ৪২ সাল) শান্তিনিকেতনে সংগীত-শিক্ষার শুরু থেকে শেষ অবধি একটা নতুন বিশ্বাস ও সংগীতচেতনার মধ্যে যেন ঘটেছিল হৃদয়ের এক বিস্ময়কর জাগরণ।

তার আগে কাহিনি কি আর? আমার গানের ভান্ডার ছিলো গ্রামোফোন রেকর্ডের স্তূপ। মীরার ভজন, রাগপ্রধান এবং বিশেষ করে ঠুংরী নানাশিল্পীর রেকর্ড থেকে তুলে একটু সুর, একটু কথার ইঙ্গিতে স্বপ্ন রচনা—এই নিয়েই খুশী থাকতে হোতো।

শান্তিনিকেতনে ওয়াজেলওয়ার তালিম দিতেন রাগসংগীতে আর রবীন্দ্রসংগীত শেখাতেন শান্তিদা। আমার প্রথম সংগীত-গুরু এঁরাই এবং সুসংবদ্ধভাবে শিক্ষা শুরু হোলো এঁদেরই কাছে।

গুরুদেবের গানের অপরূপ ভংগী ও সুর আমার মনের মধ্যে যেন বিপ্লব ঘটালো আর যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, এ-গান যেন আমায় সম্মোহিত করে রেখেছিলো ঐ গানের রসগ্রহণের দুর্বার আকর্ষণে আমি শান্তিনিকেতনে যাবার প্রথম তিন মাসের মধ্যেই বাংলা শিখে ফেললাম। সব সময় কেমন একটা ট্রান্সের মত থাকতাম—আর মন্ত্রের মত জপতাম 'আমার আর হবে না দেরী'। কি করে হবে? আমি যে তাঁর ভেরী শুনেছিলাম। কথা ও সুরের মিলন-সুষমা থেকে যে চিত্ত-উতল সৌন্দর্য ঝরে, তাকে আর কারো গানে ত এমন করে প্রত্যক্ষ করিনি? কয়েকটি গান ('প্রতিদিন আমি', 'এ কি করুণা করুণা-ময়', 'পথ দিয়ে কে যায়গো চলে', 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি') আমার মনকে এমন করে নাড়া দিয়েছিলো যে, সময় নেই অসময় নেই, আমি ও-গান বিভোর হয়ে গেয়ে চলতাম, বারবার গাইতাম, না গেয়ে পারতাম না বলে।

রবীন্দ্রসংগীতে আমার প্রথম গুরু শান্তিদা এবং শান্তিনিকেতনে থাকার শেষ দিন অবধি আমি তাঁরই শিষ্যা ছিলাম। সংগীত যেন ওঁর সহজাত সম্পদ। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম ওঁর স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল গাইবার ভংগীতে।

এছাড়া ইন্দুদির (ইন্দুলেখা ঘোষ) কাছেও আমি গুরুদেবের অনেক গান শিখেছিলাম। ইন্দুদির মধুর কণ্ঠ ও গাইবার ভঙ্গীতে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। গুরুদেবের উচ্চাংগ সংগীত-ধর্মী গানের সঙ্গে তিনিই আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর কাছেই প্রথম 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে', 'কখন দিলে পরায়ে', 'অশ্রুভরা বেদনা' শুনে বিস্ময়ে মন দুলে উঠেছিলো। এ-গানের প্রতি কেমন এক অজানা আকর্ষণ বোধ করতাম আর মনে হতো এই ধরনের গানের জন্যই [illegible] কত যুগ ধরে ছিল্প পিপাসিত। অধীর হয়ে উঠলাম আরও অনেক এইরকম টপ্পা অঙ্গের গান শেখবার জন্য।

আর মনের ঠিক এইরকম আকাঙ্ক্ষার মুহূর্তেই আমি শৈলজাদার কাছে শিক্ষার সুযোগ পেলাম। ওঁর যত্নে ও আন্তরিক শিক্ষকতার প্রসাদে অনেক গান শেখা হোলো। শৈলজাদার পরিচালনা ও তত্ত্বা-বধানেই আমার রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম রেকর্ড হয়েছিলো। গুরুদেবের গানের প্রতি প্রগাঢ় তৃষ্ণার প্রেরণা জাগাবার জন্য ঋণী আমি আর এক গুণীর কাছেও, তিনি হলেন খুকুদি (অমিতা সেন)। তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের গানের সঙ্গে সংগীত-রসিকমাত্রেরই পরিচয় আছে। খুকুদির আকস্মিক করুণ মৃত্যুর আগে তাঁর কাছেও কিছুদিন গান শেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

১৯৪২-এর শেষের দিকে শান্তি-নিকেতন থেকে চলে আসার কয়েকদিন আগে শৈলজাদা আমায় একটি রেকর্ডে শোনালেন মালতী ঘোষালের দুটি গান—'কে বসিলে আজি' ও 'হৃদয়বাসনা পূর্ণ হোলো'। ক্ল্যাসিক্যাল ধাঁচের প্রতি আমার অনুরাগ লক্ষ্য করেছিলেন বলেই বোধহয় শৈলজাদা এ-দুটি গান আমায় শোনাবার জনাই বাজিয়েছিলেন। মালতী ঘোষালই এ-দুটি গান প্রথম রেকর্ড করেন। এ-ধরনের গান আর তার অলংকরণে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্যের বাহার প্রত্যক্ষ করবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

রবীন্দ্রনাথের গানের ঐশ্বর্যভান্ডার অফুরন্ত—এ-কথা কে না জানে? কিন্তু এই ধরনের সুরের ইন্দ্রধনু যেন এক আশ্চর্য প্রকাশের মত সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই মুহূর্তে সংকল্প নিলাম এ-গান আমায় শিখতেই হবে। শৈলজাদার কাছেই জানলাম এ-ধরনের গান হোলো টপ্পা অঙ্গের গান, ক্ল্যাসিক্যাল গোষ্ঠিরই, তবে পুরোপুরি বলা চলে না। ক্ল্যাসিক্যাল ঢ-এর টপ্পাকে বাংলা গানে এনে সৌন্দর্যের পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন [illegible]বাবু, তাঁর অসামান্য প্রতিভার যাদুকরী শক্তিতে। তাঁর গান থেকেই এই ধরনের অলংকার গ্রহণ করে গুরুদেব এক বিস্ময়কর রূপলোকের দ্বার খুলে দিয়েছেন।

এই ধরনের আংগিকে গাইতে শিখে-ছিলাম প্রথম ইন্দুদির কাছে। তখন কিন্তু জানতাম না যে, এই ধরনের গানের নামই টপ্পা। সত্যি কথা বলতে কি মালতী ঘোষালের গান শোনার আগে টপ্পার নামই জানতাম না। এই কথাটির ওপর এত জোর দিচ্ছি এই জন্য যে, আমার কানে এসেছে কোলকাতার অনেকেরই ধারণা যেহেতু আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, এবং টপ্পার জন্ম পাঞ্জাবের মাটিতেই, সেই কারণেই টপ্পার ঢং আমার আগেই জানা ছিলো, হোক না সে টপ্পার রূপ বাংলা টপ্পার চেয়ে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কিন্তু এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হতে পারে না।

একটু আগেই বলেছি মালতী ঘোষালের গানের আগে টপ্পার নামও শুনিনি। টপ্পার নকশা নিয়ে আমার গান

চিহ্নিত হওয়ার পরেও অনেকদিন অবধি আমার ধারণা ছিলো টপ্পা একান্তভাবে বাংলাদেশেরই সম্পদ (তখন বাংলাদেশ বলতে শুধু ঢাকাকেই বোঝাতো না)। অনেক পরে ক্ল্যাসিক্যাল গানের নানান ধারা নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে এই তথ্যটি হৃদয়ঙ্গম হোলো যে, টপ্পার মূল উৎস পাঞ্জাবের। নিধুবাবু প্রবর্তিত বাংলা টপ্পার প্রকৃতি মূল টপ্পার চেয়ে অনেক আলাদা। আপন বৈশিষ্ট্যে এ যেন এ এক স্বতন্ত্র রসলোক সৃষ্টি করেছে—গানের মধ্যে এনেছে অধরা মাধুরীর আভাস। এই ধরনের টপ্পাই আমি শুনেছি। শিখেছি, গেয়েছি। পাঞ্জাবী টপ্পার সঙ্গে আমার গানের কোনো সম্পর্কই নেই। আমার গানের আলোচনায় এই কথাটির যেন উল্লেখ থাকে। প্লিজ।'

'রবীন্দ্রসংগীত রয়েছে আপনার হৃদয় জুড়ে। কিন্তু গভীরতর চেতনায় আছে ক্ল্যাসিক্যাল গানের বিরাট ব্যাপ্তির প্রতি মুগ্ধতা। রবীন্দ্রনাথের টপ্পা অঙ্গের গানে এই উচ্চাঙ্গ সংগীতের ছায়া দেখছেন বলে অজ্ঞাতেই ঐ ধরনের গানই আপনার মনকে এমন করে অভিভূত করেছে। মার্গসংগীতের মুক্ত আকাশে আপনার মনটা খুঁজে পায় তার সত্যিকারের এক্সপ্রেশন, আপনার গান সম্বন্ধে এই আমার ইম্প্রেশন—ইফ আই অ্যাম নট রং'।

'ইউ আর কোয়াইট্ কারেকট। মালতী ঘোষালের গান শোনার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের এই ক্ল্যাসিক্যাল আঙ্গিকের গান শেখবার জন্য দারুণ আগ্রহ জেগেছিলো এ-কথা একটু আগেই বলি নি?'

'বলেছেন।'

'কিন্তু মুস্কিল হোলো এ-গানের সিদ্ধ গুরুর দেখা পাই কোথায়?'

১৯৪৩ সাল থেকে বিবাহোত্তর জীবন অবধি আমার কোলকাতাতেই কেটেছে। এ-সমস্যার কথা শান্তিদাকে জানাতে তিনি রমেশবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) সন্ধান দিলেন এবং তাঁর কাছে শেখবার নির্দেশও দিলেন। উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত, ধ্রুপদ ও খেয়ালে রমেশবাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম, তাঁর সান্নিধ্যে আসার পরে। উনি আমায় বেশ কয়েকটি নিধুবাবুর টপ্পা এবং সেই রকমের সুরের রবীন্দ্রসংগীত ত শেখালেনই। সেই সঙ্গে শেখালেন টপ-খেয়াল, টপ-ঠুংরী এবং অন্যান্য ধরনের ক্ল্যাসিক্যাল গান। এই শিক্ষার অধ্যায়টি বড় আনন্দের ছিল। রমেশবাবু অত্যন্ত উদারচিত্তের মানুষ এবং আমার প্রতি অকৃপণ স্নেহে অবারিত করে দিলেন তাঁর গানের ভাণ্ডার। আমিই স্বরলিপির বই দেখে পছন্দমত গান নির্বাচন করতাম। সেইসব গান একসঙ্গে তুলতাম। আর সেই সময় সুরের বৈশিষ্ট্য কোথায় রয়েছে ক্ল্যাসিক্যাল গানের চরিত্র, কোথায় রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা—এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন, গানের রূপ যেন ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠতো। তারপর আমরা গাইতাম সুবোধ নন্দীর তবলা সঙ্গতে। আড়াঠেকা মধ্যমান ইত্যাদি কঠিন তালের ছন্দে সুবোধবাবুর অসাধারণ দখল ছিলো। তার ওপর ছিলো শিল্পবোধের দিব্যদৃষ্টি, যার প্রসাদে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সংগীতে উচ্চাঙ্গ তালের মানের সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রকৃতি ও এক্সপ্রেশনের লাবণ্যও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

'রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও আপনার খেয়াল, ঠুংরীও যা শুনেছি, সে ত রীতিমত তালিমী বস্তু। এ-শিক্ষা কি রমেশবাবুর কাছে?'

'না। ক্ল্যাসিক্যাল গানের ওপর ছিলো আমার মনের সহজ টান-এ্যান্ড মাই প্যাসন ফর ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক নেভার এ্যাবেটেড। রমেশবাবুর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম এ-তৃষ্ণাকে যেন আরো উদ্দাম করে তুলল। আর তারই তাড়নায় গেলাম যামিনীবাবুর কাছে। যামিনী গাঙ্গুলীর মত গুরু পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। অমন ট্রেনার হয় না। ওঁর কাছে একাদিক্রমে ১৯৫৯ সাল অবধি শিখেছি। মাঝে মাঝে অবশ্য ইউরোপ যেতে হোতো। তখন দু'-তিন বছর গ্যাপ পড়তো। ভারতীয় রাগের মধ্যে ভাবের ঐশ্বর্য, আঙ্গিকের তুলনাবিহীন সৌন্দর্য, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি প্রতি প্রহরের মেজাজের সঙ্গে সংগীত রেখে অন্তহীন রাগ আবার প্রতি রাগে ভারতীয় কনভেনশন বজায় রেখেও শিল্পীর কল্পনার বিস্তার, সৃষ্টির অজস্র সম্ভাবনা—এসব সম্বন্ধে তিনিই আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন।'

'এমন সুবিস্তৃত শিক্ষা, রেওয়াজ ও জিজ্ঞাসু অন্তর নিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা করেছেন, এ-সংগীতকে ভালবেসেছেন বলেই ত? তবু রবীন্দ্রসংগীতই একান্ত আপন হয়ে উঠলো কেমন করে?'

'ক্ল্যাসিক্যাল গানের প্রতি আমার ভালবাসা গভীর এ-কথা সত্যি হলেও রবীন্দ্রসংগীত আমার মনের আকাশকে এমন এক বিচিত্র আবেগে রাঙিয়ে তুলছিলো যে, এ গানের জন্য আমি আলাদা এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করতাম। মনের অতলে একটা সদাজাগ্রত চেতনা কাজ করতো। এ-চেতনার জন্ম উচ্চাঙ্গসংগীত থেকেই। রাগসংগীতের অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে যে উপলব্ধির আলো জেলে দিয়েছিলো, সেই আলোতেই রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ স্বরূপকে চিনেছি। ভালবেসেছি, আর তাকে প্রাণভরে গ্রহণ করতে পেরেছি। একে অপরের সহায়তা করেছে বলেই সংগীতের দুটি ধারা মেলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে আমার কাছে একটি পরিপূর্ণ রূপলোক হয়ে উঠেছে।'

'আর একটু বিশদভাবে বলুন না? ভারী সুন্দর লাগছে এ প্রসঙ্গ।'

কেমন ওঁর উন্মনাভাবের হাসিতে কেমন এক অপার্থিব ছোঁয়া লাগে—'যেমন ধর রাগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিলো বলে শুধু বুঝতেই পারতাম না যেন, দেখতে পেতাম কি রকম মনোহর কৌশলে, স্পর্শকাতর চিত্তের পেলব ছোঁয়ায় কোনো বিশেষ রাগাশ্রিত গানে গুরুদেব এমন একটি স্বর ব্যবহার করেছেন যে, স্বর ঐ রাগে প্রয়োগ করাটা রাগশাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু ঐ ভিন্নগোত্রীয় স্বরটি ঐ রাগের অন্তর্গত না হয়েও তার ভাবের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। ঠিক যেন পরদেশী সেঁইয়ার মত মধুর। রবীন্দ্রনাথের মত যুগবিপ্লবী প্রতিভা ছাড়া এমন সৃষ্টি আর কার কল্পনায় আসতে পারত?'

ধরনা তাঁর পূরবী রাগের গানগুলির কথা। 'সন্ধ্যা হোলোগো ওমা'—কোমলের সঙ্গে শুদ্ধ ধৈবতের মীড়, মূর্ছনা, শ্রুতিতে পূরবীর অকূলবিবাগী ঔদাস্য কি নিবিড়ভাবে এখানে মূর্ত? আবার 'ডেকো না আমারে ডেকো না'-তে পূরবীর সঙ্গে শ্রীর মিলনে ক্ষুব্ধ অভিমানের সুরটি কি এমন মধুর হয়ে বাজতে পারতো যদি না রবীন্দ্রনাথের মত অলোকসম্ভব রূপকারের হাতে পড়তো। এ গেলো একদিক। আবার ভাবের দিক দিয়েও দেখ ঐ পূরবী রাগাশ্রিত চারটি গানের আলাদা সেন্টিমেন্টের বৈচিত্র্য। 'আজি এ-আনন্দসন্ধ্যা'-তে প্রার্থনার আকুতি, 'তুমি ত সেই যাবেই চলে'-তে সমর্পিত চিত্তের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা, আর 'ডেকো না আমারে ডেকো না' বললামই ত ক্ষুব্ধ অভিমানের সুর। একই রাগে এমন ভাবের বামধনু প্রত্যক্ষ করিয়েছেন ঐ একটি মানুষই। সুরের সঙ্গে কাব্যের অকল্পনীয় মিলনের কি সাবলাইম প্রকাশ। এর তুলনা কোথায়? রাগরাগিণী যখন শৃংখল হয়ে গতিরোধ করতে চেয়েছে, তাকে তিনি ভেঙেছেন। রাগের সর্বব্যাপী অনুভব তাঁর কাছে সত্য হয়ে উঠেছিলো বলেই—তার নির্দিষ্ট গণ্ডীকে অতিক্রম করা শক্তির ডাকেও তিনি সাড়া দিয়েছেন। কারণ, সে-শক্তি এগিয়ে নিয়ে যায়।

আর এসব কথা এমন করে বুঝেছি ত উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষা পেয়েছিলাম বলেই। তাই ঠিক কোনটা আমার প্রাণের বেশী কাছের—সে-কথা বলা কঠিন।

এই প্রসঙ্গেই বলি আর একটি কথা। জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত কবিরই একটি গানের কলি তাঁর রচনা সম্বন্ধেও সত্য হয়ে উঠেছে। 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না'। আমাদের মনের অনেক ছোট্ট অনুভূতিতে ধ্যানের আয়নায় সৌন্দর্যের যে ক্ষণিক প্রতিবিম্বন ঘটে, পলাতক বলেই বুঝি তারই জন্য মন চিরউদাসী। দৃশ্যমান বস্তুর জগতের চেয়ে তাদের সত্যতা কিছু কম নয়। গভীরের জন্য আমাদের বুকে ছাড়াদুরাশা দুলিয়ে দিতে পারে তাঁরই গান।

আমার সারা সত্তা বারবার এইসব গানকেই যেন প্রদক্ষিণ করে বেড়াতে চায়। এ-ব্যাকুল তৃষ্ণা বোধহয় আমার মরণ মুহূর্ত না এলে মিটবে না।

বিদেশে আমি গুরুদেবের এইসব গানই গাই। আর এদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে, রবীন্দ্রনাথের গান—মানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরের অনুকরণজাত জোড়া 'মেলানো কোনো সহজ, লঘু, বস্তু নয়। দুর্ভাগ্যবশত এই-রকম ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এ-দেশের অনেককেই খুশী থাকতে দেখেছিলাম। আমার সান্ত্বনা এই যে, এ-বিষয়ে আমার উদ্যম ব্যর্থ হয়নি। এ-বোধ আলোর প্রকাশের মতই তাদের চেতনায় দ্বার খুলে দিয়েছে আর অবসান ঘটাতে পেরেছে তাদের ভ্রান্ত ধারণার।

রবীন্দ্রসংগীতের এই চরিত্রগৌরব দিয়েই প্রভাবিত তার অনন্য গায়কী। আজকাল মনের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিবাদ গর্জে ওঠে আধুনিক গানের ঢঙের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের নিজস্ব ভঙ্গিকে মিশিয়ে একাকার করে ফেলার বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রসংগীতের মৌলিক পরিবেশন-শৈলীকে যথাসম্ভব অবিকৃত করে না রাখলে ভাবীকালের মানুষ রবীন্দ্রনাথের গানের বিশিষ্ট ভঙ্গিকে চিনবেন কেমন করে? তার রসাস্বাদনেও ত বঞ্চিত হবেন। যেসব গায়করা আধুনিক ভঙ্গির ছাঁচে ফেলে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দেন তাঁদের কোনো সাধারণ সংগীত-সভায়, রেডিওতে অথবা রেকর্ডে গাইতে দেওয়া উচিত নয়। এখনও রবীন্দ্রসংগীতের অনেক প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য বিশারদ আছেন—আমার মনে হয়, এদিকে তাঁদের দৃষ্টি দেওয়া এবং এ নিয়ে আন্দোলন তোলা উচিত।

আমার মনের মত শিল্পী? বড়ে আলি আকবর, রবিশংকর, বিলায়েৎ খাঁন—কণ্ঠসংগীতে অনেকের গানই ভালো লাগে কিন্তু সবার ওপরে কেশরীবাঈ। রবীন্দ্রসংগীতে শান্তিদা, ইন্দুদি, খুকুদি, সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত দশ বছর আমি দেশছাড়া। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নতুন যেসব শিল্পীরা আসরে এসেছেন, তাঁদের কারো গানই শোনা হয়নি। কাজেই যাঁদের গান শুনে এসেছি, তাঁদের পরের যুগের শিল্পীদের কথা কিছু বলা আমার সম্ভব নয়

রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীগোষ্ঠীর বাইরে আরো তিনজন শিল্পীর গাওয়া কবির গান —রসিকসমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন, এঁরা হলেন—পংকজ মল্লিক, কানন দেবী ও সায়গল। ওঁদের গান আমার খুব ভালো লাগে। ওঁদের আশ্চর্য কন্ঠসৌন্দর্য ও গাইবার অননুকরণীয় ভঙ্গীর এমন একটা আবেদন আছে যাকে অস্বীকার করা যায় না। পংকজবাবুর গলাটা দারুণ। কানন দেবী ও সায়গল কটি গান গেয়েই সবার চিত্ত জয় করে নিয়েছেন। তবু আমি নির্দ্বিধায় বলব—এ দুজন আমার ফেভারিট শিল্পী-তালিকাতেই পড়েন, তাঁদের গাওয়া উচ্চাঙ্গ-লঘুসংগীত ও ভাবসংগীতের অনন্যতার কারণে, ওঁদের গায়কী অতুলনীয়।' সকল প্রশ্ন উত্তরিত, তবু সব ছাপিয়ে মনের তারে বেজে ওঠে বিরহিনীর অশ্রু-উচ্ছল দৃষ্টির সঙ্গে একটি উচ্চারণ—'ওঃ, আই ক্যান নট থিংক ক্যালকাটা আদারওয়াইজ। আই ক্যান নেভার।'

সংধ্যা সেন

ডবল এজেন্ট

বিক্রমাদিত্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

: প্রয়োজন নেই। আমি শুধু চাই গুনলে যেন ষাট হাজার কোট হয়। আমি ইজিপশিয়ান আর্মিকে ষাট হাজার কোট সাপ্লাইর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু কণ্ট্রাক্টের ভেতর কোন শর্ত নেই, এই কোট কোন ঋতুতে ব্যবহার করা হবে—শীতে না গ্রীষ্মে। অতএব আপনি ঐ দুই ডলারের মধ্যে মাল সাপ্লাইর বন্দোবস্ত করুন। আর একটা কথা মনে থাকে যেন। আমার দশ হাজার ডলার আগাম দিতে হবে।

দুদিনের মধ্যে কারামে আমাকে একটি ওভারকোট দেখালেন। কোটের নমুনা দেখে আমি আতঙ্কিত হলুম। এই কোট গায়ে পরা তো দূরের কথা এমনকি হাতে তুলে ধরা যায় না।

কোটের নমুনা জেনারেল হুসেনকে দেখালুম।

সেদিন খুব সকাল থেকে জেনারেল হুসেন হাসিস খাচ্ছিলেন। নেশাটা যখন খু রঙীন হয়ে এল, আমি গিয়ে ওকে কো দেখালুম।

উনি কোট দেখে বুঝতে পারলেন আমি ওকে কি জিনিস দেখাচ্ছি, কোট বেচব না যেন্ডুও।

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম ওভারকোটের একটি নমুনা এনেছি। এ উনি এই কোট মঞ্জুর করলেই হয়।

: কোট! আমার কথা শুনে জেনা হুসেন বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কি কোট! এই কোট দিয়ে কি হবে?

ঃ কিন্তু আর হবে। আমি যে এই কোট ইজিপশিয়ান আর্মিকে সাপ্লাই দেবার কন্ট্রাক্ট নিয়েছি।

ঃ এই কোট কে পরবে? মালেক...

ঃ না, আর্মির সৈন্যরা। সীনাই প্রান্তে আমাদের সৈন্যদের জন্যে কোট চাই।

ঃ চমৎকার কোট। বলে জেনারেল হুসেন কোটটা হাতে নিয়ে ঝাড়া দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কোটের হাত দুটো খুলে গেল।

আমরা সবাই অপ্রস্তুত বোধ করলুম। জন কারামে যে এমন রদ্দি মাল সাপ্লাই করবে কল্পনা করিনি। স্বীকার করি, যে-কাপড় দিয়ে এই ওভারকোট তৈরি করা হয়েছিল, সেই কাপড় ছিল রদ্দি মাল, কিন্তু ওভারকোটের সেলাই যে এত নিকৃষ্ট হবে ভাবিনি। আমি হাসবো না কাঁদবো ভেবে পেলুম না।

কিন্তু জেনারেল হুসেন আমাকে আশ্বাস দিলেন। বললেন, চলবে। এ দিয়ে কাজ চলবে। তবে এর সেলাই যেন শক্ত হয়।

আমি বুঝতে পারলুম যে মাল পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছে।

আমি আশ্বস্ত বোধ করলুম। হেসে বললুম, থ্যাংক ইউ জেনারেল। আর একটা কথা। আপনার জন্যে কিছু কড়া পাকের হাসিস এনেছি।

ঃ বেশ বেশ, চমৎকার। ঐ হাসিস পাঠিয়ে দিও। আর একটা কথা পাশা। আমরা আর্মির জন্যে কিছু বেল্ট কিনতে চাই। ভাল শক্ত বেল্ট।

আমি ইতিমধ্যে হাসিসের হুঁকো নিয়ে এলুম। এক টান দিয়ে দেখুন জেনারেল। আমেজ আসবে। আমি হুঁকোটি বাড়িয়ে দিয়ে বললুম।

হুঁকোতে টান দিয়ে জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, কত সস্তা রেটে এই বেল্ট সাপ্লাই করতে পারবে পাশা?

ঃ জেনারেল, আপনি চামড়ার বেল্ট না কাপড়ের বেল্ট চান, না...

ঃ না কি? জেনারেল হুসেন তার রঙীন চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

ঃ যদি আপনি এই ডিল থেকে কিছু লাভ করতে চান তাহলে আমি কার্ড বোর্ডের বেল্ট সাপ্লাই করতে প্রস্তুত আছি।

ঃ কার্ড বোর্ডের বেল্ট, কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে জেনারেল হুসেনের রঙীন চোখের আমেজ যেন ছুটে গেল। আমি কি

পাগলের প্রলাপ বকছি? কার্ড বোর্ডের যে বেল্ট হয় একথা তিনি কখন শোনেনই নি।

ঃ হ্যাঁ, আজকাল কার্ড বোর্ডের বেল্টের খুব প্রচলন হয়েছে। আর এই কার্ড বোর্ডের বেল্ট দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এ কাপড়ের বেল্ট নয়। তবে এ মাল বেশীদিন টিঁকবে না।

ঃ কতদিন টিঁকবে? আবার জেনারেল হুসেনের উৎসুক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

ঃ বড় জোর তিন মাস।

ঃ ব্যস ব্যস, ঐতেই চলবে। তোমাকে আর বলতে হবে না। আমাদের এই যুদ্ধ বড় জোর এক মাস চলবে। তুমি এই কাপড়ের বেল্ট সাপ্লাই কর। আর এই ডিল থেকে আমাকে পঁচিশ হাজার ডলার দেবে।

ঃ ডিল। আমি জেনারেল হুসেনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললুম।

ঃ ডিল। কিন্তু......

ঃ কিন্তু কী?

ঃ আমি এই ডিলের কথা মালেক ফারুক কিংবা আন্তোনিও পুলিকে জানাতে চাইনে। তাহলে ও'রা আমাদের লাভ থেকে একটা শেয়ার নেবেন। এই টাকার শেয়ার পাবো শুধু তুমি আর আমি।

জেনারেল হুসেনের প্রস্তাবের ভেতর আমি যুক্তি খুঁজে পেলুম। কারণ ওভারকোট মাল সাপ্লাই থেকে আমাকে বেশ একটা অংশ ফারুকের সুইস ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টে জমা দিতে হয়েছে। অতএব আমার লাভের অংশ ছিল কম। কিন্তু যারা পাশাকে চেনে তারা জানে আমার খাঁই কত বেশী।

আমি এবার আর একটি অভিনব প্রস্তাব করলুম।

ঃ জেনারেল আমাদের দলের ভেতর আরো দুজনকে টানতে হবে।

ঃ মানে? জেনারেল মুহম্মদ হুসেন যেন আমার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

ঃ মানে আর কিছুই নয়। আমরা যে নিকৃষ্ট মাল ইজিপশিয়ান আর্মির কাছে বিক্রি করছি, এই অভিযোগ যেন কেউ না করতে পারে। আমরা অর্ডিনান্স ডিপোর ইন্সপেক্টরকে আমাদের দলের ভেতর টানবো। ওরা ইন্সপেকশন রিপোর্টে দেবে যে, ভাল মাল আমরা ডেলিভারী দিয়েছি। আর ওদের রিপোর্টে যদি এই কথা লেখা থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কেউ দুষতে পারবে না। একেবারে নিরপেক্ষ রিপোর্ট।

ঃ চমৎকার আইডিয়া! জেনারেল হুসেন আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করে বললেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার আসল উদ্দেশ্য কী বল তো পাশা?

ঃ কিছু না। আমি শুধু বেশী প্রফিট চাই।

ঃ তারও একটা পথ আছে। যদি মাল সাপ্লাই না করে লিখে দিই যে মাল পেয়েছি আর তারপর তুমি পেমেন্ট নিয়ে গেলে, তাহলে খরচ হলো না—পয়সাও রোজগার করলে। কেমন আইডিয়া?

আমি নাক সিঁটকে বললুম ঃ খুব বাজে আইডিয়া। ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। যাক, এবার বলুন আমার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করবেন কিনা।

ঃ তুমি কী ধরনের লোক চাইছিলে?

ঃ বিশ্বাসী, কিংবা হেরোন খায়। আমি এবার কথায় জোর দিয়ে বললুম।

ঃ একটা লোকের কথা মনে পড়ছে। নাম মেজর শাবন্দর। লোকটি বিশ্বাসী। আর কর্নেল আব্বাস শুনেছি হেরোন খান...।

বেশ, আমি ওদের কাছে তার পাঠাচ্ছি। ওরা এসে তোমার বেল্টগুলো ইন্সপেক্ট করবে।

*

জেনারেল হুসেনের নির্দেশে দুর্দিনের মধ্যে মেজর শাবন্দর এবং কর্নেল আব্বাস বেরুটে এলেন। আমি প্রতিদিন ওদের কাছে গিয়ে একটা কাগজে লিখিয়ে নিতুম, মাল পেয়েছি এবং ইন্সপেকট করেছি। সব মালই উপযুক্ত অর্ডার মাফিক দেয়া হয়েছে।

আমার বেল্ট সাপ্লাই-এর কাজকর্ম করতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগল। কিন্তু এই কয়েকটা দিন মেজর শাবন্দর এবং কর্নেল আব্বাসের খাঁই মেটাতে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল।

যাই হোক শেষদিন আমি গেলুম মেজর শাবন্দর এবং কর্নেল আব্বাসের কাছে। একটা বড় লম্বা কাগজে ওদের নাম সই করতে বললুম।

ঃ কী? কর্নেল আব্বাস তার ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ঃ কিছুই না। আপনারা এই কাগজে সই করলে আমি আমার পেমেন্ট পাবো।

মেজর শাবন্দর বেশ সেয়ানা লোক। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা তো আপনার সব কাজ করে দিয়েছি। এবার আমাদের ক্যাশ কিছু দেবেন না!

ঃ ক্যাশ! আমি চোখ তুলে মেজর শাবন্দরের পানে তাকালুম। লোকটি কী পাগল? ওদের জন্যে এত টাকা খরচ করলুম আর এখন কিনা ক্যাশ টাকা চাইছে। কিন্তু কাগজে সই না করা অবধি আমাকে চুপ করে থাকতে হবে, ওদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে। আমি পকেট থেকে একটি চেক বই বের করলুম।

ঃ আপনারা ঐ কাগজে সই করুন, আর আমি চেক বইতে সই করছি।

ওরা এবার খস খস করে কাগজে সই করে দিলেন। আমি দুটো চেকে তিনশো ডলারের অঙ্ক বসিয়ে সই করে দিলুম। তারপর বললুম, ব্যাঙ্ক থেকে চেক দুটো ক্যাশ করে নিন। কিন্তু খবরদার, আপনারা আর একটি দিনও বেরুটে কাটাবেন না। কারণ পুলিশ আপনাদের কীর্তিকলাপের খবরা-খবর পেয়েছে।

ঃ পুলিশ! মেজর শাবন্দর এবং জেনারেল আব্বাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ হ্যাঁ, পুলিশ। আপনারা এই বেরুট শহরে জেলে এবং [illegible] করছেন সেটা কী কারণে [illegible] থাকে? সবই তো আইন বিরোধী কাজ। আর আপনারা এখানে দেরী করলে জেনারেল হুসেন আপনাদের আজই কায়রো ফিরে যেতে বলবেন।

আমার কথা শুনে ওদের দুজনের মুখই আলুর মত হোল। বেরুটের পুলিশের কথা শুনে ওরা চিন্তিত হতেন না, কিন্তু জেনারেল হুসেনের আদেশ অমান্য করবার মত সাহস ওদের ছিল না।

আমার সঙ্গে ওরা কোন বাদানুবাদ করল না। যে টাকার চেক পেল তাতেই ওরা খুশি হোল। চেক ভাঙাতে ওরা ব্যাঙ্কে গেল।

ওদের কোন টাকা দেবার কোন ইচ্ছে বা সঙ্কল্প আমার ছিল না। ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যাঙ্কের কর্তাদের টেলিফোন করলুম ঃ স্টপ পেমেন্ট। ওদের টাকা দেবেন না।

এর পরবর্তী কাহিনী হয়তো আর খুলে বলতে হবে না।

●

আমি বেরুটে বেশী দিন থাকতে পারলুম না। কারণ ফারুকের কাছ থেকে টেলিফোন পেলুম ঃ পাশা, এক্ষুনি কায়রো চলে এসো। তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।

ফারুকের টেলিফোন পেয়ে আমি চিন্তিত হলুম। কী ব্যাপার? হঠাৎ সম্রাট আমাকে স্মরণ করলেন কেন? তাহলে কি নাদিয়া সুলতান তার জীবনের দুর্বল মুহূর্তে খুলে বলেছে যে আমি ফারুকের সঙ্গে প্রতারণা করছি কিম্বা আমি হলুম গুরিমির চর এবং ইস্রাইলী স্পাই?

না, অসম্ভব! নাদিয়া সুলতান একথা কখনই ফারুককে বলতে পারে না। কারণ তাহলে ফারুক জানতে পারবেন যে নাদিয়া সুলতানের আসল নাম হোল লিলি কোহেন। আর সে হলো ইস্রাইলী স্পাই।

তাহলে উনি কী কারণে আমাকে কায়রোতে ডেকে পাঠিয়েছেন?

এইসব কথা নিয়ে আমি যখন চিন্তা ভাবনা করছি তখনই জেরুজালেম থেকে খবর পেলুম ঃ লাকি স্ট্রাইক। (আমার কোড নাম) ওয়ান্টেড আর্জেন্টলি ইন জেরুজালেম। এই তার পাঠিয়েছিলেন ইস্রাইলী ইন্টেলীজেন্সের কর্তা ইসর হেরেল।

আমি এক বিরাট সমস্যায় পড়লুম। কোথায় যাবো?

কায়রো?

না, জেরুজালেম?

আমি জানতুম যে একবার কায়রো ফিরে গেলে জেরুজালেমে যাওয়া একেবারে অসম্ভব হবে।

অতএব অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করলুম যে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথমে জেরুজালেম যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ যে কোনদিন, যে কোন মুহূর্তে লড়াই বাধতে পারে। আর একবার লড়াই শুরু হলে আমি সহজে, অন্ততঃ প্রকাশ্যে জেরুজালেমে যেতে পারব না। আমাকে ছদ্মবেশে জেরুজালেম যেতে হবে।

আমি ফারুককে বললুম ঃ আমাকে বেরুটে কন্ট্রাক্টের কাজ শেষ করবার জন্যে আর কয়েকদিন থাকতে হবে।

ফারুকের কাছ থেকে কোন জবাব পেলুম না।

অতএব জেরুজালেমে এলুম। হয়তো জেরুজালেমে এসে এক মস্ত বড় ভুল করলুম।

কারণ সেদিন যদি জেরুজালেমে না আসতুম তাহলে আমার পরবর্তী জীবনে আনোয়ার পাশা কে এবং কি তার কাজকর্ম এ নিয়ে চিন্তাভাবনা কিম্বা গবেষণা প্যালেস্টাইন গেরিলা বাহিনী করতো না।

এই জেরুজালেমে এসেই আমি সর্বপ্রথম লুলুর দেখা পেলুম। অবশ্য সেদিন আমি লুলুকে চিনতে পারিনি। কিন্তু লুলু আমাকে চিনেছিল যে, আনোয়ার পাশাই হোল ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের 'আওয়ার ম্যান ইন আম্মান।'

কিন্তু সে আর এক দীর্ঘ কাহিনী। সেটা বরং পরে বলা যাবে।

●

য়ুনাইটেড নেশনসে প্রস্তাব পাশ হবার আগে আরব দেশগুলোর মধ্যে তুমুল আন্দোলন সুরু হোল। কায়রো, বেরুট ও দামস্কাস শহরে ইংরেজ বিরোধী মিছিল বেরুতে লাগলো। ওদের সবার স্লোগান ছিল ঃ প্যালেস্টাইন ভাগ হতে দেবো না। 'আমরা লড়াই করবো।'

লড়াই!

ওদের এই স্লোগান শুনে আমার মনে মনে হাসি পেল। ওরা কী পাগল হয়েছে! লড়াই করবে কী করে? হাতিয়ার কোথায়?

আমি জানতুম যে এইসব মিছিলের বড় নেতা হলেন আমার বন্ধু, ফারুক। উনি আরব দেশগুলোর নেতা হবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু আরব জনসাধারণ কী জানে এর ওদের চল্লিশ বছরের মত লড়াই করবার হাতিয়ার নেই? কারণ আমি ইজিপশিয়ান আর্মির জন্য বন্দুক কিনেছি, [illegible] কিনেছি...আরো কত কী। কিন্তু যুদ্ধের সময় ঐ বন্দুক, ফিল্ড গান কী কাজ করবে? কিছুই না। আর যে সব প্লেন আমি ইজিপশিয়ান আর্মির জন্য কিনেছি সেই প্লেন দিয়ে যুদ্ধ করা অসম্ভব। আমি জানতুম যে ফারুক এইসব জনসাধারণকে সোজা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যাচ্ছেন।

আমি যেদিন তেল আভিভে এসে পৌঁছলুম সেদিন শহরে দারুণ উত্তেজনা ছিল। শুনলুম সেদিন শহরে আরব গেরিলাদের সঙ্গে ইস্রাইলী গেরিলা দল ইরগুন জোয়াই লুমি এবং স্টার্ণ গ্যাঙের বেশ বড় রকমের একটা [illegible] হয়ে গেছে।

তখন ইস্রাইলের সব চাইতে বড় দুটি দলের নাম ছিল ঃ হিসতাদ্রুত-দি জেনারেল ফেডারেশন অব লেবর অর্থাৎ শ্রমিক সংঘ। আর একটি রাজনৈতিক দলের নাম ছিল লেবর পার্টি, হিব্রু ভাষায় একে বলা হোত 'মাপাই'। এই দুই দলে মিলে একটি নতুন ডিফেন্স অর্গানিজেশন তৈরী করেছিল এবং এই দলের নাম ছিল 'হাগানা'। হাগানা শুধু শরণার্থীদের দেখাশোনার তত্ত্বাবধান করত না, হাগানা উগ্রপন্থী কাজকর্মও করতো। আর হাগানার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ইরগুন জোয়াই লুমি এবং স্টার্ণ গ্যাঙ।

ইরগুন জোয়াই লুমি এবং স্টার্ণ গ্যাং-এর কাজ ছিল আরব গেরিলাদের সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করা। এই তিনটি দলের বিবিধ কাজকর্ম দেশের ভেতর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রসঙ্গে

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী আজ সারাদেশে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হতে যাচ্ছে। তাই কথাশিল্পীর স্মৃতি পাঠকের মনে চিরজাগরূক রাখতে 'অমৃত'র এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে ধন্যবাদযোগ্য। পাঠক, বিশেষত বাংলাদেশের পাঠকমনে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে নানা কথা জানবার আগ্রহ চিরদিনের। কথাশিল্পীর এই শতবর্ষপূর্তিতে তাঁর রচনা সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে একথা সকলেই জানেন। কিন্তু বাঙলা দেশের পাঠকসমাজের বহু মূল্যবান সেই রচনা সামগ্রী ক্রয়ের সামর্থ প্রায় অনেকেরই নেই। তাই স্বল্পমূল্যে স্বল্পপরিসরে প্রকাশিত পত্রিকার শরৎ স্মৃতিকথা নিঃসন্দেহে আমার মত বহু পাঠকের মন জয় করবে।

পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়ের ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র অজিত ঘোষের শরৎ সাহিত্যে নারী, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পথের দাবীর প্রকাশন প্রসঙ্গ সত্যই অতুলনীয়।

বিদ্যুৎ রায়চৌধুরী
চুঁচুড়া হুগলী।

(২)

আপনাদের 'শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যা' পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আজ যখন দেশের চতুর্দিকে পালিত হচ্ছে 'শরৎ-জন্মশতবার্ষিকী', ঠিক সেই সময়ে 'অমৃত' এই মূল্যবান সংখ্যাটি আমাদের উপহার দিয়ে তার পুরনো ঐতিহ্যকে অব্যাহিত রেখেছে; সত্যিই এটা গর্বের বিষয়।

এই 'শরৎ-শতবার্ষিকী' সংখ্যাটি খুবই মূল্যবান। এর প্রতিটি রচনাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। 'পথের দাবী প্রকাশন প্রসঙ্গে—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়', 'পাণিত্রাসে শরৎচন্দ্র স্মৃতিচারণ সাক্ষাৎকার—বীরেন্দ্র দত্ত', 'শরৎদা প্রসঙ্গে—রাধারাণী দেবী', 'শরৎচন্দ্র নিকট আত্মীয়ের চোখে—শ্রীনন্দদুলাল মুখোঃ', 'শরৎচন্দ্রের স্মৃতিজ্যোৎস্না—শ্রীদিলীপকুমার রায়', 'শরৎ-সাহিত্যে নারী—শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ', 'শরৎকাহিনী মঞ্চে ও পর্দায়—কালীশ মুখোঃ', 'শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়', এছাড়া মন্মথ রায় রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ও শরৎচন্দ্র রচিত 'কাশীনাথ' উপন্যাস এবং শ্রীসুধীর সান্যাল অঙ্কিত প্রচ্ছদ এই সংখ্যার মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে এবং পূর্ণাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে দেশে কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারে মাত্র দু' টাকায় এইরকম একটি অপূর্বসুন্দর সংখ্যা ভাবাই যায় না। 'অমৃত'র এই সহৃদয় সাহসিকতা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। আমরা ভবিষ্যতে এইরকম স্বল্পমূল্যে কোন মূল্যবান সংখ্যা পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

জগজ্জ্যোতি বড়ুয়া,
খাতড়া, বাঁকুড়া।

(৩)

গতকাল ২৯-৭-৭৫ সন্ধ্যায় জগুবাজার, হাজরা রোড, রাসবিহারী রোড তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এক কপি শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যা 'অমৃত' পেলাম না। পরে এলগিন রোডের মোড়ের একটি স্টল থেকে সংগ্রহ করেছি।

আজ সকাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক পড়ে ফেলেছি। সম্পাদনা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আমার মনে হয় এর দ্বিতীয় সংস্করণ করবার জন্যে আপনাদের দিক থেকে প্রস্তুত থাকা উচিত। তা না হলে অনেকেই এ-সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারবে না।

গোপালচন্দ্র রায়, রাধারাণী দেবী, দিলীপকুমার রায়ের লেখা কটি এবং সম্পাদকীয় ও নতুন লেখকদের আর রবীন্দ্র-শরৎ পত্র দুখানি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রায় এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করলাম।

প্রণবকৃষ্ণ গোস্বামী
কলিকাতা—৩৩।

বিনোদিনীর আমার কথা প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় ২৫ জুলাই (১৯৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিনোদিনী : ভ্রান্তি নিরসন' শীর্ষক রচনাটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা'-র যে সংস্করণটি উপলক্ষে সম্পাদকদের ভুল ভ্রান্তির উল্লেখ শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর রচনায় করেছেন ও পাঠক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তা [illegible] [illegible]

[illegible] ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' নামে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণটি আমরা প্রকাশ করি। এই সংস্করণটিও নির্ভুল নয়। [illegible] পাঠক সম্প্রদায় সংস্করণটির খবর প্রথমাবধিই রাখেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় যদি এই সংস্করণ প্রকাশের আগে ভুলগুলি দেখাতে সচেষ্ট হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই সর্বশ্রেণীর পাঠকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হতেন। বিনোদিনী দাসী ও সেকালের রঙ্গালয় সম্পর্কে প্রত্যেক পরবর্তী গবেষকই এই সংস্করণটির উপর যে কিছু পরিমাণে নির্ভর করে থাকেন তা সাম্প্রতিক বইপত্র খুললেই শ্রীমুখোপাধ্যায় দেখতে পেতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রকাশিত বইখানির পরবর্তী সংস্করণে আরো পরিমার্জনা ও নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটাও স্বাভাবিক। গবেষণার ক্ষেত্রে যে বিনয় দরকার তা ভুলে গেলে অনেক সময় নতুন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

যাই হোক, আমরা আশা করি আপনার পত্রিকায় রচনাটির পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হওয়ার আগে শ্রীমুখোপাধ্যায় ছয় বছর আগে প্রকাশিত 'আমার কথা'র বর্তমান সংস্করণটি দেখে নেবেন। তাঁর ভ্রান্তি নিরসনের জন্যই এই চিঠি।

ইন্দ্রনাথ মজুমদার,
(প্রকাশক)
কলকাতা-৯।

'সুরের আগুন' প্রসঙ্গে

অমৃতের গত ১১ জুলাই সংখ্যায় সুরের আগুন সংযোজনায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক সম্বন্ধে অনন্য নিবন্ধটি পাঠ করে মুগ্ধ হলুম। এই অতুলনীয় সুরস্রষ্টা সত্যই বাঙালীর গৌরব। রবীন্দ্রসংগীতে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি তিনি লাভ করেছেন এবং সংগীতে তাঁর দান অতুলনীয়। গান পরিবেশনের সময় তাঁর সাধক মূর্তি দেখার সৌভাগ্য অনেকের হয়েছে। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের মাতা দুর্গাপুরীর একান্ত কৃপা তিনি লাভ করেছিলেন এ-কথা হয়ত অনেকের জানা নেই। পূজনীয়া দুর্গামার সান্নিধ্যে সংগীত পরিবেশনের সময় তিনি আত্মসমাহিত হয়ে যেতেন। উৎসব উপলক্ষে আশ্রমের বিরাট সমাবেশ তাঁর সুরের আগুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন। মনে হয় দুর্গামার আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদে শ্রীযুক্ত মল্লিক সংগীত পরিবেশনের সময় এরূপ ভাবতন্ময় হয়ে যেতেন এবং সংগীতের গভীর ভাব তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে পরিবেশিত হত। তিনি আরো অধিক দিন বেঁচে থেকে আমাদের আনন্দ দিন এই কামনা।

—[illegible] পাঠক, [illegible]

বাংলা বইয়ের যথেষ্ট অনুবাদ হচ্ছে না কেন?

বিগত পনেরো-ষোলো বছরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত বহু বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কেবল ইংরেজী অনুবাদের কথাই আমরা বলছি না, প্রতিবেশী ভাষাগুলির কথাও প্রসঙ্গত আলোচ্য। আজকের দিনে যে কোনো ভালো হিন্দী বই প্রকাশের দু'-এক বছরের মধ্যে ইংরেজী ছাড়াও, একাধিক ভারতীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়ে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকেই বাঙালীর জীবনে যে গতিহীনতা প্রকট-রূপ ধারণ করেছে, আলোচ্য ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে মূল লেখক, যোগ্য অনুবাদক ও উদ্যোগী প্রকাশক—সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। প্রসঙ্গতঃ ইংরেজী বইয়ের বিপণনের সমস্যার কথা উঠতে পারে। বোম্বাই দিল্লী ও মাদ্রাজের প্রকাশকেরা এ বিষয়ে অগ্রণী বলে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজী বইয়ের বিপণন ব্যবস্থা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাংলার প্রকাশকরা এদিকে এগিয়ে এলে—তাঁদের নিজেদের একটা 'বাজার' সৃষ্টি হতে খুব বিলম্ব হবে বলে মনে হয় না। এই উদ্যোগকে সার্থক করে তুলতে হলে রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারেরও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। অন্ততঃ প্রথম দিকে এ বিষয়ে উদ্যোগী প্রকাশকদের অনুদান হিসেবে সরকারী সাহায্য, কিম্বা অন্ততঃ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে সাহায্য করা প্রয়োজন। হয়ত ন্যাশন্যালাইজড ব্যাঙ্কগুলিও এ সম্পর্কে কিছু করতে পারে।

পরলোকে সাংবাদিক-লেখক অমল হোম

গত যুগের শক্তিধর সাংবাদিক ও জনপ্রিয় লেখক অমল হোম গত ২৩শে আগস্ট পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯। তিনি দীর্ঘকাল হৃদ্‌রোগ পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। অবিভক্ত ভারতে বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রভাবশালী সংবাদপত্রসমূহ, যথা ক্যালকাটা বেঙ্গলী ফরওয়ার্ড, প্রগতি এবং প্রবাসী মডার্ণ রিভিউ এবং ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট; পাঞ্জাবের 'পাঞ্জাব ট্রিবিউন' এবং এলাহাবাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রভৃতি কাগজের সঙ্গে তিনি কখনো লেখক হিসেবে, কখনো বা সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র প্রবর্তিত 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর প্রথম সম্পাদকরূপে তিনিই নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে তিনখানা সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল: রামমোহন রায়—দি ম্যান এন্ড হিজ ওয়ার্ক, সাম অ্যাসপেক্টস অব মডার্ন জার্নালিজম এবং পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ।

রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় সত্যজিৎ রায়ের জীবনী

ভারতীয় চিত্র পরিচালক, শিল্পী ও লেখক শ্রীসত্যজিৎ রায় যে বহির্জগতে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তা আমরা সকলেই পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানি। কিছুদিন পূর্বে শ্রীরায়ের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ আমরা পরিবেশন করেছি। সাম্প্রতিক একটি সংবাদে জানা গেল যে, আইডা সোফিয়ান নামে এক রুশ লেখিকা খাস রুশ ভাষায় তাঁর একখানা জীবনী রচনা করছেন। শ্রীরায়ের অপর একখানি জীবনী রচিত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়। রচনা করছেন রবার্ট ওয়াকার।

আন্তর্জাতিক প্রকাশন ক্ষেত্রে ভারতের স্থান

ইউনেস্কোর এক সাম্প্রতিক বিবরণীতে জানা যায় যে, পৃথিবীর প্রকাশন শিল্পে ভারতের স্থান অষ্টম। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী স্তরে পরিচালিত প্রকাশন সংস্থাগুলি এবং বে-সরকারী পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির বিগত কয়েক বছরে প্রকাশিত নানা বিষয়ের বইয়ের সংখ্যাগুলি এই পরিসংখ্যান-এ ধরা হয়েছে। ভাষা হিসেবে দেখা যায়, এখনও এদেশে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক, তারপরে হিন্দীর স্থান।

মার্কিন পুস্তক প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমী অব আর্ট এন্ড কলচার ভবনে বিগত ২৭ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মার্কিন দেশে প্রকাশিত পুস্তকের একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীর মূলে উদ্যোক্তা ছিলেন বিড়লা অ্যাকাডেমী অব আর্ট এন্ড কালচার এবং ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। আমেরিকার মুদ্রণশিল্পের প্রথম পর্যায় ৫১টি মুদ্রণের নমুনাও প্রকাশিত পুস্তক প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

রামনগর সাধারণ গ্রন্থাগারে শরৎ-স্মরণ

দক্ষিণ ২৪-পরগণার পাঠাগারের উদ্যোগে সম্প্রতি রামনগর সাধারণ পাঠাগারে বিশিষ্ট সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের নানা দিক সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ তাঁর আলোচনায় শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন এবং নারী প্রগতি বিষয়ে তাঁর ধারণার কথা উল্লেখ করেন। ডঃ উত্তমকুমার দাশ তাঁর ভাষণে শরৎ সাহিত্যে নারী চরিত্রের স্বরূপ বিষয়ে ভাষণ দেন। তিনিই ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি।

শরৎ-সাহিত্যের প্রচার সম্পর্কে

ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই শরৎচন্দ্রের রচনাগুলি অনূদিত হয়েছে। এ-কাজ হয়েছে বা এখনো হচ্ছে প্রধানতঃ বে-সরকারী উদ্যোগে। শরৎচন্দ্রের রচনা বাংলা ভাষায় যেমন সর্বাধিক বিক্রীত হয়ে থাকে, তার অনুবাদ প্রকাশ করেও কখনো কোনো প্রকাশকের লোকসান হয়েছে বলে শোনা যায় নি। তাই বলা যায় যে, কেবল সংসাহিত্যের প্রচারের স্বার্থেই নয়, ব্যবসা হিসেবেও এটা লাভজনকই হবে। এ-বছর শরৎ জন্মবার্ষিকী শুরু হচ্ছে। এই উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য নানা সরকারী এবং বে-সরকারী উদ্যোগের কথাও প্রচারিত হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রকে প্রচারের, অর্থাৎ শরৎ-সাহিত্য প্রচারের কোনও পরিকল্পনার কথা আজ পর্যন্ত জানা গেল না। এ বিষয়ে সরকারের অনেক কিছুই করণীয় আছে বলে আমরা মনে করি। ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় শরৎচন্দ্রের কিছু কিছু রচনা অনূদিত হয়েছে বলে জানা যায় কিন্তু আজকের পৃথিবীতে শরৎচন্দ্রের একটি বইও অনূদিত হয়নি এ-রকম বহু ভাষাই রয়েছে, প্রসঙ্গত পূর্ব-ইয়োরোপীয় বলকান ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির ভাষার উল্লেখ করা যেতে পারে। রুশ জার্মান ইংরেজ বা মার্কিন সরকার তাঁদের দেশের প্রথম সারির লেখকদের কীর্তি প্রচারের জন্য যা করে থাকেন, ভারত সরকার তা করবেন—সুধী সমাজ এটাই আশা করেন। মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হলে কিছু না কিছু সুফল পাওয়া যাবেই।

—প্রবংকার,
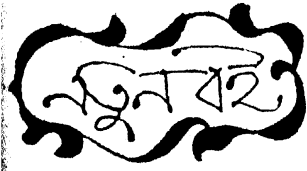
শরৎচন্দ্র : দেশ ও সমাজ। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈতানিক। ৪ লালা লাজপত রায় সরণি। কলকাতা-২০। পাঁচ টাকা।

'শরৎচন্দ্র : দেশ ও সমাজ' গ্রন্থটিতে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকটা সমালোচক এবং সমাজতাত্ত্বিকের ভূমিকা নিয়েই দেশ ও সমাজের প্রেক্ষিতে শরৎ-সাহিত্যকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পরীক্ষা করতে চেয়েছেন সামাজিক অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে শরৎ-সাহিত্য কতখানি সচেতন ছিল।

শরৎচন্দ্রের সমাজ সচেতন কলমে দেশ ও সমাজ ব্যবস্থার বিফলতা, বিকৃতি এবং নিপীড়িত মানুষের মর্মস্পর্শী যন্ত্রণার ছবি স্পষ্ট করেই আঁকা হয়েছে। চীৎকার সোরগোলে নয়, তীক্ষ্ন এবং এক ধরনের শাণিত উচ্চারণে অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের সুর আছে। এই সুরটিই গ্রন্থকার যথেষ্ট নিষ্ঠার সংগে আমাদের স্পষ্ট করে শোনাতে চেয়েছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ মূল্যায়ন শ্রেণী, সমাজ বা দেশগত মূল্যায়নের বাইরে মানুষের চিরকালের মৌলিক সমস্যাগুলির সংগে যুক্ত। মানুষ যেহেতু দেশ বা সমাজের সমকালীন কাঠামোর মধ্যে বাঁধা, সেই কারণে কাঠামোর ছবিটিও মানুষের পাশাপাশি অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে—অবশ্যই তা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোয় আলোকিত হয়েই। সেই আলোতে কাঠামোর প্রকৃতি প্রকৃতির ছবিটিও গ্রন্থকার ধরার চেষ্টা করেছেন। শরৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের প্রতি—একটি না দেখা দিকের প্রতি এই মননশীল গ্রন্থটি বিশেষ আলো ফেলতে পারবে বলেই বিশ্বাস। ছাপা পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদেও সংযত রুচির ছাপ আছে।

শরৎ প্রসংগ। অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ। ভাব ও লেখা। ১০-এ তেলিপাড়া রোড। কলকাতা-১২। দাম পনের টাকা।

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'শরৎ প্রসংগ' বইখানি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। প্রবন্ধ লেখকের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত, কবি নরেন্দ্র দেব এবং শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখের নাম রয়েছে। স্বয়ং সম্পাদক লিখিত শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক দীর্ঘ রচনাটি প্রচুর তথ্য সংবলিত। এছাড়া তাঁরই লেখা 'গ্রন্থপঞ্জী' এবং 'জীবনপঞ্জী' অংশটিও বিশেষ মূল্যবান।

স্বল্প পরিসরের একটি প্রবন্ধের মধ্যে শরৎচন্দ্রের বিরাট প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন অসম্ভব। তবুও সুনির্বাচিত এই প্রবন্ধগুলি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বিশেষ বিশেষ দিককে নিশ্চয়ই আলোকিত করতে পারবে। ছাপা, প্রচ্ছদ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

ঈদ-উল-ফিতর। সবিতা সেনগুপ্ত। এস সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

প্রথমেই বলে নিই বইটি সুখপাঠ্য।

অন্যতমা চরিত্র মেহেরুন্নিসার চিন্তা-ভাবনার সূত্র ধরে লেখিকা ঈদ-উল-ফিতরের কী বাণী তা জানিয়েছেন, বলেছেন, এ বাণী ও বিধান হচ্ছে 'প্রেম বিলাতে হবে সবাইকে তোমার ভোগের পেয়ালায় সকলেই হিস্যাদার। সবাইকে অংশ দাও তোমার হৃদয়ের ধনের।'—(পৃঃ ৯০)। বইটির নামকরণ করা হয়েছে এই বিধানের উপর নির্ভর করে। আসলে বইটির বক্তব্যই হচ্ছে এই।

হিন্দী কবি নিরালার নাম অনুসারে গড়ে উঠেছে একটা টাউনশিপ, নাম নিরালা-নগর। একটি তালাব বা জলাশয়ের কিনারে এই বসতি। এখানে বাস করেন অনেক মানুষ—কর্মসূত্রে এখানে তাঁদের সম্মিলন। হিন্দু, মুসলিম শিখ ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন আছেন, তেমনি আছেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষও। এঁদের নিয়েই এই কাহিনী।

মুখ্য বা প্রধান দুটি চরিত্র হচ্ছে প্রমীলা মালহোত্রা ও মেহেরুন্নিসা কবীর। দেশ বিভক্ত হবার সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে মানুষের জীবনে, অনেক পরিবার বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে যার ক্ষত এখনো অনেকের মিলায় নি—প্রমীলা মালহোত্রা এমনি একটি চরিত্র যার মনে এখনো সেদিনকার বেদনা জেগে আছে। এই জন্যেই মেহেরুন্নিসা কবীরের প্রতি সে একটু বীতরাগ। কিন্তু প্রমীলার ছেলের মনে সে গ্লানি নেই, সে নিয়মিত কবীর-চাচার বাড়ি যায়, মেহেরুন্নিসার ছেলেদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করে আসে। এই রকম অনেক ঘটনা।

ঘটনার সংগে সংগে শ্রীমতী সবিতা সেনগুপ্ত তাঁর এই বইটিতে অনেক প্রকার চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কোনো চরিত্রই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় নি। তাঁর এই বইয়ের চরিত্রগুলি প্রধানতই মহিলা। মহিলাদের মধ্যে যত রকম জটিলতা ও জটিলতা হতে পারে বেশ মনস্বিতার সংগে লেখিকা তা আমাদের দেখিয়েছেন। সূক্ষ্ম শক্তির পরিচয়ও এতে অজস্র।

ভারতের সকলেই আবার এক-প্রাণ নিয়ে একত্বে পরিণত হোক—এ ইচ্ছে আমাদের সকলের। লেখিকার এই বইটিকে সেই একত্বের একটা ঐকতান হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বইটি সকলের পড়ে দেখা উচিত।

গ্রন্থটির উপসংহার অতি মনোরম হয়েছে। এই চিত্রটি অনেক দিন চোখে ও মনে লেগে থাকার মতো। আর, মনে থাকবে সপ্তয়-মমতাজ উপাখ্যান।

লেখিকা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বাস করেছেন, বিভিন্ন প্রকার মানুষের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ তাঁর ঘটেছে, বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাও তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছেন। এই জন্যেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে, তাই হয়ে উঠতে পেরেছে প্রাঞ্জল। পার্শ্বচরিত্রগুলিও মনে রাখার মতো।

—সুশীল রায়

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

মুখর। (প্রথম বর্ষ ২য় সংকলন)। সম্পাদক দ্বিজেন ঘোষ। ৯৭ বেলেঘাটা মেন রোড। কলকাতা-১০। এক টাকা।

পত্রিকাটি নতুন হলেও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কবিতা গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছু লেখা পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারবে।

চারপেজী (১ম সংখ্যা)—আত্মপ্রকাশ সাহিত্য সংস্থার পক্ষে তপন ভট্টাচার্য কর্তৃক শিবরামবাটী বলরামবাটী হুগলী থেকে প্রকাশিত। পঁচিশ পয়সা।

ভালো কয়েকটি গল্প কবিতা কিছারই আছে। আর আছে লেখার নীচে লেখকদের চিত্তাকর্ষক পরিচিতি। লিখেছেন বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মণ্ডল, মনোরঞ্জন দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, সিদ্ধার্থ বসু, নির্মলেন্দু ঘোষাল, জ্যোৎস্না সিংহরায় প্রমুখ।

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কলকারখানার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হচ্ছে শহরের আকাশ

নাগরিক ও সভ্য মানুষের মত নোংরা জীব নাকি নেই আর ভূ-ভারতে! কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা (একোলজিস্ট) বলেন, অরণ্যবাসী উপজাতি বা পশু পাখিরা যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করে তাদের আরণ্য-পরিবেশ; কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ যে কোন জনপদের দিকে একবার চোখ ফেরালে দেখা যাবে আকাশ-জোড়া ধোঁয়াশা বা বিষাক্ত, শ্বাসরোধী গ্যাসের কুহেলী, পথের ধারে ক্রমবর্ধমান আবর্জনা ও উচ্ছিষ্টের স্তূপ! অর্থাৎ, সভ্য মানুষ নানা প্রাকৃতিক ও শিল্প সম্পদ ব্যবহার বা ভোগের ফলে নিত্য উৎপাদন করে চলেছে রাশি রাশি ক্ষতিকারক আবর্জনা; আর সেই আবর্জনায় কলুষিত হয়ে উঠেছে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ। উদাহরণ-স্বরূপ বলা চলে, বর্তমানে মার্কিন দেশের প্রায় ৩০০ শহর, ঐ দেশের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, দূষিত আবহাওয়ার শিকার! সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, আবহাওয়া তথা পরিবেশের প্রধান শত্রুটি ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে অদৃশ্য থেকে মরণ-বাণ হানেন। বড় বড় শহরের বাতাসে যে সব বিষাক্ত গ্যাস নিত্য ছড়িয়ে পড়ে তাকে চোখে দেখা যায় না। অথচ দূষিত বায়ুর মধ্যে ঐ জাতীয় গ্যাসের অনুপাত শতকরা ৮৫ শতাংশ; আর দৃশ্যমান ধোঁয়া-কালীর অনুপাত মাত্র ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ! শহরের পথে পথে আসলে নিত্য মরণ-বীজ ছড়ায় মোটর, লরী, বাস, ট্রাক; তারা ছড়িয়ে দেয় মারাত্মক কার্বন মোনক-সাইড, না-পোড়া হাইড্রো কার্বন কণা আর নাইট্রোজেন অকসাইড! ডিরক ভ্যান সিকল তাঁর 'দি একোলজিক্যাল সিটিজেন' গ্রন্থে হিসেব কষে দেখিয়ে দিয়েছেন, একটি বাস প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ অকসিজেন 'ধ্বংস' করে তাতে অন্ততঃ ১১৩৫ জনের ঐ সময়ে নিঃশ্বাস গ্রহণের কাজ চলে যেতো! আসলে বাতাসে অকসিজেনের নিত্য যোগান দিয়ে যায় যে গাছপালা তাদেরও আমরা নির্বাসিত করেছি শহরের চতুঃসীমা থেকে! যে দু' চারটি কোনক্রমে টিকে আছে তাদের সাধ্য কি ঐ গতিশীল, বিষোদ্গারী যন্ত্র-দানবের সঙ্গে পাল্লা দেয়। সিকলের মতে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়া কার্বন মোনক-সাইড গ্যাস শুষে নিতে হলে প্রত্যেক মোটর-মালিককে অন্ততঃ পথের ধারে পুঁততে হবে ২৮টি বৃক্ষ! জন ও যান-বহুল জাপানের শহরগুলিতে টোকিও-ইয়োকোহামা হাঁপানীর (বিষাক্ত গ্যাস আঘ্রাণজনিত এলার্জি) হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে পরে গ্যাস-মুখোশ! টোকিও-র দশ জায়গায়, কর্মব্যস্ত পথের মোড়ে স্থাপন করা হয়েছে, দশটি বৃহৎ অকসিজেন ট্যাঙ্ক! প্রয়োজনবোধে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ ও পথচারী তার থেকে নির্মল অকসিজেন আঘ্রাণ করে আসে! পরিবেশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম মটের মতে, আশী সাল নাগাদ দূষিত বাতাসের প্রকোপে পৃথিবীর বড়ো বড়ো শহরগুলিতে দেখা দেবে মহামারী; মারাত্মক টাইফয়েড, কোলাইটিস, হেপাটাইটিস, যক্ষ্মা, হাঁপানী, কর্কট রোগে আক্রান্ত হবে লক্ষ লক্ষ মানুষ! তাই এখনই প্রতিরোধ গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন।

আসলে, সভ্যতার অগ্রগতির তালে তালেই বাড়ছে পরিবেশ দূষিতকরণের সমস্যা। বিষাক্ত গ্যাস, ধোঁয়া, ধুলো, রাসায়নিক, তেল-কালীর গ্রাস থেকে জল হাওয়াকে মুক্ত করার জন্যে নানা প্রচেষ্টাও চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু নাগরিক, সুসভ্য মানুষের ভোগ-বিলাসই যে তার প্রধান বৈরী! কারণ সমীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে মার্কিন দেশের একজন নাগরিক দৈনিক গড়ে আবর্জনা 'উৎপাদন' করেন ১৯০০ গ্রাম, ব্রিটেনের নাগরিক ৬৮০ গ্রাম, আর ভারতের ৫০০ গ্রামের মত। অর্থাৎ মার্কিন দেশের অধিবাসীরা প্রতি বছরে যে ১৬০ লক্ষ টন ভোগসামগ্রী ব্যবহার করেন তার থেকে আবর্জনা সৃষ্টি হয় ৫৫ লক্ষ টনের মত! ঐ আবর্জনার শতকরা ৫৬ শতাংশ ভাগ কাগজ, ১৮ শতাংশ ভাগ কাঁচ, ১৪ শতাংশ ভাগ ধাতুদ্রব্য, ৭ শতাংশে কাঠ, ৩-৫ শতাংশ প্লাস্টিকজাত দ্রব্য! ঐ আবর্জনার স্তূপ নিয়ে কি করা হবে তা এক মহাসমস্যা!

লণ্ডন থেকে কলকাতা পর্যন্ত সব শহরেই প্রতিদিন উনান জ্বলে বেশ কয়েক কোটি, বিভিন্ন ধাতু ও রাসায়নিক শিল্প কারখানাগুলি আকাশে উগরে দেয় নানা বিষাক্ত গ্যাস; বিমান ও মোটরে পোড়ানো হয় হাজার হাজার গ্যালন হালকা হাইড্রো কার্বনজাত জ্বালানী; এ ছাড়াও জ্বালানো হয় কোক কয়লা, ভারী তেল, গ্যাস উপজাত আবর্জনা। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে ধোঁয়ায় ও গ্যাসে।

নদী, নালা, পুকুর ও সমুদ্রকেও বিষাক্ত করে দিচ্ছে নানা রাসায়নিক আবর্জনা

বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

বিষাক্ত সমুদ্রে জলের শিকার

বিভিন্ন কারখানা অব্যবহৃত, পরিত্যক্ত, অপজাত তেল, রাসায়নিক ছড়িয়ে দিচ্ছে নদী ও সমুদ্রে। এই বিষাক্ত রাসায়নিকের সংক্রমণে আজ ২৪৬৪ মাইল দীর্ঘ মিসৌরী নদী পরিণত হয়েছে 'বিশ্বের বৃহত্তম নর্দমায়'! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মিসিসিপি ও উইনকোনসিন নদীকেও ঘোষণা করেছেন 'বিপজ্জনক'রূপে। ১৯৭০ সালেই আমেরিকায় নদী ও সমুদ্র উপকূলে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে জমা করা হয়েছিল প্রায় ১ লক্ষ পাউন্ড অব্যবহৃত পারদঘটিত রাসায়নিক। ঐ রাসায়নিক জলে মিশে মাছের জীবনকে করেছে বিপন্ন! আর ১৯৫৩ সালে মিনামাটা উপসাগরের তীরবর্তী জাপানী জেলেরা পারদের দ্বারা সংক্রামিত মাছ খেয়ে পড়েছে মহামারীর কবলে। ঐ কারণেই ইংল্যান্ডের কালডার নদীর মাছ আজ আহারের অযোগ্য। ভারতেও এ সমস্যা আছে। রাসায়নিক সংক্রমণে বহু নদীর মাছ যে মারা পড়েছে তা হয়তো অনেকেই কাগজে পড়েছেন। ইতিমধ্যে আরও একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে গভীর সমুদ্রে তৈল উত্তোলনের ফলে সামুদ্রিক মাছ-পাখির জীবনও আজ বিপন্ন। কারণ জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তেল, তেলের গাদ বা অন্যান্য অপজাত আবর্জনা।

বর্তমানে আমরা যে কোন জিনিসই কিনি না কেন বিক্রেতা তা আমাদের হাতে তুলে দেন আকর্ষণীয় (দু তিন প্রস্থ) মোড়কে মুড়ে। কিন্তু জিনিসটি ব্যবহার বা ভোগের পর ঐ মোড়ক বা আধারের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন কাগজ, টিন, দস্তা, প্লাস্টিক, কাচ বা পলিথিনে তৈরী ঐ মোড়ক বা আধার আমরা ফেলে দিই আবর্জনারূপে। ঐ পরিত্যক্ত বাকসো শিশি, টিউবের স্তূপ ক্রমই বাড়তে থাকে। ঐগুলিকে নতুন করে কাজে লাগানোর চেষ্টা কম দেখাই হয়। এমনকি উচ্ছিষ্ট আবর্জনা থেকে মিশ্র সার তৈরীর কথাও আমরা সবে ভাবতে শুরু করেছি। এছাড়া ফলের খোসা, বাদামের শুটি, মলমূত্র যত সহজে মাটির সঙ্গে মিশে যায়, সিন্থেটিক প্লাস্টিক কিন্তু তেমনভাবে জারিত, রূপান্তরিত হয়ে জৈব বস্তুর অঙ্গীভূত হয়ে যায় না। তাই ঐ জাতীয় 'বায়ো-ডিগ্রেডেবল' বস্তু শুধু ক্ষতিকর আবর্জনাই বাড়িয়ে তোলে! সৃষ্টি করে নানা সমস্যা।

খনি অঞ্চলে (বিশেষত কয়লা, অভ্র পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি), রাসায়নিক ও ধাতু-শিল্পের সন্নিহিত এলাকায়, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি গ্রাম-শহরগুলিতে পরিবেশ খুব সহজেই দূষিত হয়ে পড়ে। বড় বড় শহরেই সবচেয়ে প্রকট এ সমস্যা। যেমন নিউইয়র্ক শহরের সবচেয়ে ঘনবসতি-পূর্ণ অঞ্চল হচ্ছে ম্যানহাটন; সে এলাকার বাতাসে ধূলিকণা ও সালফার ডাই অকসাইডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি; প্রতি বছরে ঐ অঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৫০০০ টন সালফার ডাই অকসাইড মিশ্রিত ধূলো আকাশ থেকে ঝরে পড়ে! পাঁচ লক্ষ মানুষের বসতি যে শহরে তেমন জনপদের দৈনিক প্রয়োজন হয় প্রায় ৯৫০০ টন জ্বালানী, (৩০০০ টন কয়লা, ২৮০০ টন তেল, ২৭০০ টন প্রাকৃতিক গ্যাস) ২০০০ টন খাদ্য, প্রায় ৫৫০ টন পেট্রল, ডিজেল আর ১৫০,০০০ গ্যালন জল; অথচ ঐ শহর দৈনিক 'আবর্জনা উৎপাদন' করে ১৩০,০০০ গ্যালন ময়লা জল, ২০০০ টন আবর্জনা, ৩৫০ টন কার্বন মোনকসাইড কণিকা, ১০০ টন সালফার ডাই অকসাইড, ৫০ টন নাইট্রোজেন অকসাইড, ৫০ টন অব্যবহৃত হাইড্রো কার্বন, ১৫০ টন ধূলো।

পরিবেশ দূষিত হওয়ার সমস্যা শুধু শহরে নয়, গ্রামেও আছে। একালের কৃষকেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন রাসায়নিক কীটনাশক, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক আগাছানাশক ঔষধ। যার সবটা মাটির সঙ্গে মিশে যায় না, বরং পড়ে থাকে কিছু ক্ষতিকারক অবশেষ। এছাড়া উৎপাদিত শস্য, ফলমূলের মধ্যেও তার বিষক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত হয়। বৃষ্টির জলে ধুয়ে ঐ সব রাসায়নিক অবশেষ গিয়ে পড়ে নদী-নালায়। নদীনালা থেকে সমুদ্রে। আবার ঐ জল বাষ্পীভূত হয়ে আকাশকেও কলুষিত করে তোলে।

তাই বলা চলে বিষাক্ত আবহাওয়ার সমস্যা সমস্ত মানুষেরই সমস্যা। এর হাত থেকে আশু পরিত্রাণের পথ না বাতলাতে পারলে ভাবীকালে হয়তো মানুষকে সর্বদা গ্যাস-মুখোশ পরেই থাকতে হবে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটী)

এখন স্কুল বুক সোসাইটী কি করিতেছিল দেখা যাউক। দ্বিতীয় বৎসরেও (১৮১৮) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী প্রথম বৎসরের ন্যায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। চুঁচুড়ায় পাদ্রীদিগের 'স্কুল প্রেস' নামে ছাপাখানা ছিল। শ্রীরামপুরে পাদ্রীদিগের 'তমোহর প্রেস' ছিল। কলিকাতা পাদ্রীদিগের 'মিসন প্রেস' ছিল। তখন বাঙ্গালীরাও ছাপাখানা খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় সেই বৎসর 'বেঙ্গালি স্পেলিং বুক' ছাপা হয়। রাধাকান্ত দেব এই পুস্তকখানি সংকলিত করেন। তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ইঁহাদের রচিত নীতিকথা প্রথম ভাগের এই বৎসর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। জনকতক পাদ্রী ও রামকমল সেন নীতিকথার দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। বর্দ্ধমান হইতে তারাচাঁদ দত্ত 'মনোরঞ্জন ইতিহাস' লেখেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের 'দিগদর্শন' পত্র এই বৎসর বাঙ্গালা এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা-ইংরেজী এই তিন প্রকারে প্রকাশ হয়। সোসাইটী সাড়ে তিন হাজার খণ্ডের গ্রাহক হয়েন। ফেলিকস কেরি পাদ্রী কেরীর পুত্র 'বিদ্যাহারাবলি' অথবা 'বেঙ্গালী এনসাইক্লোপিডিয়া' লিখিতে আরম্ভ করেন।

•

তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কালিকুমার রায় বাঙ্গালা ভাষায় খুসনবীশ ছিলেন। তাঁহারই হস্তলিপি কপার প্লেটে খোদিত হইয়া বাঙ্গালা লেখার আদর্শ ছিল। তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান ছাপার অক্ষর হইয়াছে। যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত, তাহাদের অধিকাংশই উর্দ্দু ও হিন্দিতে অনুবাদ করা হইত। তারিণীচরণ মিত্র এই অনুবাদ করিতেন। পাদ্রী ইয়েটস কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই বৎসর (১৮১৮) এক খণ্ড সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কয়েক খণ্ড ইংরেজীতে লিখিত স্কুলের পাঠ্যপুস্তক এই বৎসরও প্রকাশিত হয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর অনুকরণে ১৮১৮ সালে নভেম্বর মাসে ঢাকা স্কুল সোসাইটী গঠিত হয়।

•

পাদ্রীরা এদেশে কমা সেমিকোলোন প্রভৃতি চিহ্ন প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা ছেদ উঠাইয়া বিন্দুর ব্যবহার করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সফল হয় নাই।

উপরে পাদ্রীগণের প্রকাশিত দিগদর্শন কাগজের উল্লেখ করিয়াছি। সোসাইটী ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই কাগজখানি পাঠ্যপুস্তক ছিল। ইহা হইতে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রশ্ন দেওয়া হইত। প্রশ্নের উদাহরণ কয়েকটি দিলাম।

কতদিন পর্য্যন্ত চুম্বক পাথরের বিষয় জানা গিয়াছে?

ইহার গুণ কি?

কে আমেরিকা আবিষ্কার করে?

কখন ঈশ্বর পৃথিবীতে জলপ্লাবন প্রেরণ করেন?

প্রাচীন রোমে কি কারণে জ্ঞানালোক নির্ব্বাপিত হয়?

স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মকে কে প্রথমে প্রবর্ত্তিত করে? ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় যে সকল ইংরেজ অঙ্কিত মানচিত্র আছে তন্মধ্যে রেনেল সাহেবের (১৭৭৬) সিট ম্যাপ অফ দি লোয়ার প্রভিন্সেস ও তাঁহার কৃত বঙ্গ এটলাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১১ সালে এরো স্মিথ সাহেবের ম্যাপ প্রকাশিত হয়। এই সকল মানচিত্রে বাঙ্গালা নাম ইংরেজীতে লিখিতে অনেক সময় বিপদ ঘটিত। রামগড় হইতে 'রাগমার', পাথুরিয়াঘাটা হইতে 'পেটার গোটা', কেদারপুর হইতে 'খিদিরপুর', কাঁঠালবাড়ী হইতে "কেল্টার বোর', হরচন্দ্র গাড় হইতে 'হিচাহেন গোর' আর শিবগঞ্জ হইতে 'শিপ গানস'।

কলিকাতা স্কুল সোসাইটী ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সহিত সেকালের শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একে অপরের কাজে সাহায্য করিত, উভয়েরই মোটামাটি এক উদ্দেশ্য ছিল। নবগঠিত স্কুল সোসাইটী শীঘ্রই কর্ম্মক্ষেত্রে নামিল, মন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ হইল।...কলিকাতায় সে সময়ে যতগুলি পাঠশালা ছিল তাহাদের তালিকা প্রস্তুত হইল। গুরুমহাশয়দিগের নাম, নিবাস, সম্প্রদায় পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা বেতন এ সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তালিকা প্রস্তুত হইল। দেখা গেল চিতপুরের পুল হইতে রক্ততলা (এখনকার ক্যাথিড্রালের নিকট—যাহাকে বির্জিতলা বলে) ইহার মধ্যে প্রায় দুই শত পাঠশালা আছে। প্রতি পাঠশালায় গড়ে ২১ জন করিয়া ছাত্র ছিল। তাহা হইলে দেখা যায় তখন কলিকাতায় চারি হাজার মাত্র ছাত্র পড়িত। এই অল্প সংখ্যা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে এ বিস্ময় দূর হইবে। সে সময় যাহারা কলিকাতায় থাকিত প্রায় সকলেই মফঃস্বলবাসী, কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় আসিত। প্রায় সকলেই দেশে স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া আসিত।

স্থির হইল পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিন রাধাকান্ত দেবের বাটীতে এই অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে ৪২ জন গুরুমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহার মধ্যে ১৭ জন উপস্থিত হন। ইহাদের প্রত্যেককেই সোসাইটীর কিছু কিছু পুস্তক উপহার দেওয়া হয়।

কলিকাতাস্থিত পাঠশালাগুলি নিয়মিতরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার চারিজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গ্রহণ করেন। সমুদায় সহর চারিভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশ পরিদর্শন করিতে এক একজন প্রতিশ্রুত হন। রাধাকান্ত দেব, দুর্গাচরণ দত্ত, রামচন্দ্র ঘোষ ও উমানন্দ ঠাকুর এই কাজের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহারা নিয়মিতরূপে এ কার্য্য করিতেন। স্কুল পরিদর্শন পরীক্ষা ও পারিতোষিক এই সকল বাবং বাৎসরিক খরচ দুই সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

স্কুল সোসাইটীর তৃতীয় উদ্দেশ্য উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল স্থাপন আপাততঃ স্থগিত রহিল। তবে স্থির হইল প্রতি বৎসর ২০টি করিয়া বালক তৎকালীন বাঙ্গালীদের কর্ত্তৃক স্থাপিত হিন্দু কলেজে পাঠান হইবে ও তথায় তাহারা শিক্ষালাভ করিবে। এই কাজের নিমিত্ত মাসিক দেড় শত টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

(ক্রমশঃ)

রূপদক

হয়। বর্তমান স্বামীর রোলটা করছে সুমিত্রারই রিক্সার সংগী সেই ছোকরাটি। ছেলেটার গোঁফদাড়ি কিছুই গজায়নি। সুমিত্রার মনে হল লাভ সিনগুলোয় ছোকরাটি যেন বড় বেশী সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে। সাধারণতঃ এই সব সিনগুলোর ভাড়াকরা ফিমেলদের ওপর সখের অভিনেতা ছোকরারা এজাতীয় চেষ্টা করেই থাকে। এটুকু ফিমেলদের মেনে নিতেই হয়. কিন্তু এ ছোকরাটি যেন বড় বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। বিশেষ করে প্রেমালিঙ্গনের দৃশ্যগুলোয়তো ছোকরা এত বেশী জোরে বুকের মধ্যে জাপটিয়ে ধরছিল যে সুমিত্রার ভীষণ খারাপ লাগছিল। ছেলেটির মুখের দিকে তাকাবেও ঘেন্না করছিল।

সুমিত্রা ভাবল। কিন্তু নিজে কিছু বলল না। শুধু ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই টের পেল আবার ওর মাথার যন্ত্রণাটা চাগাড় দিয়ে উঠেছে। ওর সিনগুলোর ফাঁক ফোকে গিয়ে দু-এক গেলাশ ঠান্ডা জল খেয়ে ফাঁকা জায়গায় বসে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে সিনগুলো কোনরকমে ম্যানেজ দিয়ে গেল। কিন্তু ওর লাস্ট সিনটা সেরে আসর থেকে বেরিয়েই কয়েক পা এগোতে না এগোতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরতে সুমিত্রা দেখল তেরপল ঘেরা মেকাপ রুমে একটা চাটাইয়ের ওপর সে শুয়ে আছে। চারপাশে ক্লাবের ছেলেরা তার দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুমিত্রা ধড়ফড় করে উঠে বসল। উঠে বসেই নিজের দিকে চোখ পড়তেই বুঝল এতক্ষণ এতগুলো পুরুষের সামনে আগোছাল হয়েই সে পড়ে ছিল। দেখল শাড়িটা বুক থেকে সরে গিয়ে কোমরের কাছে পড়ে আছে। কে যেন গেলাশে করে একটু গরম দুধ এনে দিল ঝিম ধরা অবস্থায় কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দুর্বল হাতে গেলাশটা ধরে মৃদু মৃদু চুমুকে দুধটা খেয়ে গেলাশটা রাখার সময়েই শুনতে পেল, কে যেন বলল—'আপনাদের ফিমেলের জ্ঞান ফিরেছে" আর একজন 'হ্যাঁ' দিতেই কজন সুমিত্রার সামনে এগিয়ে এল। সুমিত্রা চিনতে পারল পানফলপাড়া নাট্য সমিতির দলবল। তাদের মধ্যে পান্ডাগোছের একজন বলল—"সন্ধে থেকেই বসে আছি। এতক্ষণ কিছু বলিনি কেননা গন্ডগোল করলে বাবা কল্কেশ্বরের আসরে ব্যাঘাত ঘটত। তাম্পর আসর ভাংগতে শুনলুম সুমিত্রারাণী ফেলেন্ট হয়ে গেছে। —তা যাইহোক এবার কাজের কথা হোক, আমাদের লাস্ট রিয়াসালের দিন এলে না যে, প্রম্পস দিয়ে হিরোইনের রোল সারতে হল। আর অ্যাকটোরদের মুড মেজাজ নষ্ট হয়ে সব একসা। অথচ তুমি ঐদিন আমার জন্যে করকরে পাঁচটা টাকা গাড়ি ভাড়া নিলে। আমাদের কাছে পাঁচটা টাকার দাম অনেক। পাঁচটা টাকার দাম নেই এই বাজারে? দাও টাকাটা ফেরত দাও।' সুমিত্রার মনে পড়ল টাকাটা দিয়ে ও কিলো দেড়েক চাল কিনেছিল। আর ওর ব্যাগে এখন কয়েকটা খুচরো পয়সা মাত্র পড়ে আছে। সুমিত্রা নির্বাক। অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল। —"এমন চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না টাকাটা ফেরত দাও। নইলে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাব। তাম্পর আমাদের ওখানে নিয়ে গিয়ে যা ব্যবস্থা করার করব।' পানফলপাড়ার পান্ডাটা এবার সুমিত্রার গায়ের কাছে সরে এল। সুমিত্রা লোকটার মুখ থেকে একটা ভকভকানি গন্ধ টের পেল। লোকটা নেশা করেছে। এবার সুমিত্রা শুনতে পেল বাবা কল্কেশ্বরের সেই ছোকরার গলা সে পানফল পাড়ার লোকটাকে উসকে দিল—ওকে নিয়েই যান। ফল ভোগ করুক। ঠিক এই সময়ে বাবা কল্কেশ্বরের একজন পান্ডা বলে উঠল —"যা হবার তো হয়েছে। আজকের মত ওকে রেহাই দিন। যাত্রার দিন যা করার করবেন।" ঠিক এই মুহূর্তে সুমিত্রা নিজেকে আর সামলাতে পারল না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। পানফলপাড়ার পান্ডাটা বলে উঠল—'আবার ন্যাকামি হচ্ছে। ঠিক আছে আজ তোমায় ছেড়ে দিলুম আসরে যদি ডোবাও তখন হবে। পানফলপাড়ার ওরা চলে গেল।

সুমিত্রা ততক্ষণ কোনরকমে বসে ছিল। এবার আর পারল না। একরাশ ক্লান্তি আর অবসন্নতায় ভেঙ্গে পড়ল। আস্তে আস্তে চাটাইয়ের ওপর গা এলিয়ে দিল। ওর চোখের পাতা দুটো আস্তে আস্তে বুজে এল। —ঘুম - ঘুম - ঘুম। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল—একটা গুহা। গুহার ভেতরে আবছা অন্ধকার ঠান্ডা পাথরের মেঝে। সেই ঠান্ডা পাথরের ওপর গা এলিয়ে দিল। ঠান্ডা পাথরের শীতল স্পর্শে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে ঘুমোতে চাইল তখন সুমিত্রা।

হো-জাতির বিয়ে ব্যবস্থা

নানা বৈচিত্র্যে গড়া আমাদের দেশ। আচার আচরণ চলন-বলনে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে নানা পার্থক্য। আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে দেখতে গেলে দেশের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে কত শত ভাষা যেগুলি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ না করলেও কথ্যভাষা হিসেবে তার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। ভারতে এমনি একটি ভাষার কথা বলে অন্তত পাঁচ-ছ লাখ অধিবাসী যাদের ভাষার নাম মুণ্ডারী, বিহারের সিংভূম জেলায় এদের বাস আর মুখ্যজীবিকা হিসেবে এরা বেছে নিয়েছে কৃষি ও শিকার। কোথাও কোথাও এরা নিজেদের শারীরিক শক্তিতে গর্ববোধ করে নিজেদের লাড়ুকা অথবা যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে ভালবাসে। শরীরের গঠন প্রণালীর দিক থেকে এদের সংগে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের সংগে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। লতা-পাতা গুল্ম ছাওয়া বাঁশ দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ঘরে এদের বাস। পূর্ব-পুরুষদের নানা অলৌকিক শক্তিতে এদের বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর। তৈজসপত্র আর আসবাবপত্রের জাঁকজমকে এখনও এদের বিশেষ কৌতূহল নেই। অঘ্রাণের শেষে নতুন ফসল এদের মনে এনে দেয় সারা বৎসরের উল্লাস উৎসাহ-উদ্দীপনা। সভ্যতার আলো এদের মধ্যে কিছুটা ছড়িয়ে পড়ায় পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষায় কিছু পরিবর্তন এনেছে। তবুও গহনা হিসেবে মেয়েদের বন্য ফুলের গহনা সবচেয়ে প্রিয়। তামা ও রুপোর গয়না সুন্দরী হো মেয়েদের আকর্ষণ করে।

হো-জাতিরা কিলি নামে কয়েকটা গোত্র বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের গোত্র গাছপালা ও প্রাণীর নাম থেকে নেওয়া হয়েছে—যেমন হিন্দুরা বিভিন্ন মুনি ঋষির নামে নিজেদের গোত্রের নামান্তর করে থাকে। হো-জাতিরা যেসব গাছপালা ও প্রাণীর নাম অনুযায়ী নিজেদের গোত্রের নামকরণ করে থাকে সেগুলিকে তারা দেবতা হিসেবে পুজো করে।

হো-জাতিদের মধ্যে এক গোত্রে বিয়ে করা নিষিদ্ধ, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পূর্ণ যৌবনেই মেয়েদের বিয়ে হয়। উভয়পক্ষে অভিভাবকদের মধ্যে কথাবার্তা ও যোগাযোগ হওয়ার পর এই বিয়ে পরিণতি লাভ করে। এ বিয়ের নাম হো-দের ভাষায় আণ্ডি বিয়ে। এই বিয়েতে সাধারণত উভয়পক্ষের যোগাযোগের সেতু হিসেবে ঘটককে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য আণ্ডি বিয়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন কমে আসছে। বিয়েটা সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব পুরোহিতের। পুরোহিত ভগবানের কাছে নবদম্পতির মিলন ও সুখী জীবনের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। কোন কোন হো ডিকু ব্যবস্থা অনুযায়ী বিয়ে করে থাকে। এ পদ্ধতিতে পুরোহিত শালগ্রাম শিলা অথবা বিষ্ণুর মূর্তি সংগে নিয়ে আসে। বিয়ের প্রাথমিক কাজকর্ম সমাধা হলে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বর কনেকে সিঁদুরের তিলক লাগিয়ে দেয় এরপর শুরু হয় কন্যার বরকে প্রদক্ষিণ করার পালা। উপজাতীয় প্রথায় বন্ধু আত্মীয়-স্বজনের খাওয়াদাওয়ার পর বিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রাচীন হিন্দুদের আসুর বিয়ের মতো এই উপজাতিদের মধ্যেও আর একপ্রকার বিয়ের প্রথা প্রচলিত আছে—যার উৎস হল জোর করে বিয়ে করা। এ বিয়েতে স্ত্রী-লোকের সম্মতি নাও থাকতে পারে মেলা অথবা বাজারে কোন হো-কন্যাকে 'পছন্দ করে জোর করে তার কপালে লাল ছোপ লাগিয়ে হো পুরুষ তাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করতে পারে। পুরনো ভাল লাগা কোন মেয়েকে হো পুরুষ এভাবে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সমাজে এধরনের বিয়ে বৈধ বলেই স্বীকৃতি পায়। আবার পুরুষের অসম্মতিতে স্ত্রীলোক জোর করে তাকে পতিত্বে বরণ করতে পারে। অবশ্য এজন্য স্ত্রীলোকটিকে কম অত্যাচার ও অপমান সহ্য করতে হয় না। উমা যেমন কৃচ্ছ্রসাধন করে মহাদেবকে স্বামী হিসেবে লাভ করে-ছিলেন অনেকটা সেরকমই হো মেয়েদের কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়। হো-কুমারী ঈপ্সিত স্বামী লাভ করার জন্য ভাবী স্বামীর বাড়ীতে ধর্ণা দেয়। ভাবী স্বামীর হয়তো প্রথমে এ বিয়েতে তেমন সম্মতি থাকে না। ভাবী শাশুড়ী তখন নানারকম অত্যাচারে অপমানে ভাবী পুত্রবধূকে গঞ্জনা দিতে থাকে। এতসব অত্যাচার সহ্য করে একসময়ে সে সেই বাড়ীতে বধূ হিসেবে প্রবেশের অনুমতি পায়। আসামের গারো উপজাতি-দের মধ্যেও এধরনের বিয়ের চলন আছে।

উপজাতীয় প্রথায় বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এ হো-রা আধুনিক জগতের আইনসংগত বিয়ে থেকে বিচ্যুত নয়। তাই দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে কোন ফাটল ধরলে কিংবা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি যদি অবিশ্বাসের পাত্র-পাত্রী হয় তবে তারা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইনের পথে পা বাড়াচ্ছে। বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কোন সম্পর্ক থাকে না। তারা ইচ্ছেমত আবার বিয়ে করতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদের পরে পুনরায় বিয়েকে সংগাবিবাহ নামে আখ্যা দেওয়া হয়।

হোদের মধ্যে বিধবা বিয়েরও চলন রয়েছে। এদের বিবাহ পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই বিধবা বিবাহ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে—যেমন বড় ভাই-এর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে ছোট ভাই বিয়ে করতে পারে। বিধবা বিবাহের এই রীতি সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে লেভিরেট নামে খ্যাত। ছোট ভাই-এর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে কোনমতে বড়ভাই পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারে না। বহুপতি কিংবা বহু পত্নী বিবাহ এদের মধ্যে প্রচলিত নেই। এছাড়া অন্যান্য অনেক উপজাতিদের মতো ক্রশ কাজিন ম্যারেজ (মামাতো পিসতুতো ভাইবোনে বিবাহ) অথবা প্যারালাল কাজিন ম্যারেজ-এর (খুড়তুতো জাঠতুতো বা মাসতুতো ভাইবোন বিবাহ) এদের মধ্যে রেওয়াজ নেই।

হো-দের বিয়ে ব্যবস্থা ভাল করে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বর্তমানে হিন্দু সমাজের বিয়ে [illegible]র সংগে অনেক-খানি মিল খুঁজে [illegible]ওয়া যায়। এদের আণ্ডি বিবাহের মতো বিয়ে হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত। সগোত্রে বিয়ে হিন্দু সমাজেও নিষিদ্ধ। অবশ্য বিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুদের সংগে এদের কিছুটা পার্থক্য আছে। যেমন এদের সমাজে বিয়ে অনুষ্ঠানে ছেলেরা কন্যাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে থাকে— হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী বিয়েতে শুধুমাত্র মেয়েরাই স্বামীকে প্রদক্ষিণ করে। হিন্দু সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের জটিলতা অবশ্য ওদের সমাজে নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশই ওদের জীবন-যাত্রার প্রতি স্তরে একটা সরলতা এনে দিয়েছে তাই বিয়ে ব্যবস্থাকে এরা খুব একটা ভারাক্রান্ত করে তোলেনি। তাছাড়া হো উপজাতিদের মধ্যে কুসংস্কারও খুবই কম তাই যতই সভ্যতার আলোকে এরা আসবে এবং আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হবে এদের সমাজব্যবস্থাও তত দ্রুত উন্নত হবে।

। অঞ্জলি চৌধুরী

যে রীতির বিকলপ নেই

ভাল জাতের ফুটবল খেলতে হলে, প্রকরণগত উৎকর্ষে পৌঁছাতে হলে 'ওয়ান টাচ' পদ্ধতিতে খেলা দরকার—কথাটা একালের বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলে থাকেন। মুখে মুখে প্রচার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। 'ওয়ান টাচ' ফুটবল বলতে বোঝায় কি? 'ওয়ান টাচে'র অর্থ হল বল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা সতীর্থের উদ্দেশ্যে ঠেলে দেওয়া। অর্থাৎ বিনা কালক্ষেপে খেলার গতি অক্ষুন্ন রাখা অথবা গতি বাড়িয়ে দেওয়া। খেলা থামালে বা গতি ভঙ্গ করলে দীর্ঘসূত্রতার সুযোগে বিপক্ষ দল নিজের ক্রীড়া পদ্ধতির ফাঁক-ফোকর ভরাট করার সুবিধে পেতে পারে এই ধারণাতেই পাওয়া মাত্রই বল অন্যত্র ঠেলে দেওয়ার সুপারিশ জানান হয়।

ক্রীড়ামানের উৎকর্ষ সাধনে যাঁরা 'ওয়ান টাচ' পদ্ধতির সমর্থক তাঁদের অভিমত একেবারে যে অযৌক্তিক তা নয়। কারণ উন্নততর ক্রীড়া পদ্ধতির পরম বৈশিষ্ট্য হল অনুষ্ঠানের অকৃত্রিম গতি। এই গতি বজায় রাখতে হলে সত্যিই তাড়াতাড়ি বল ঠেলা দরকার; বিপক্ষকে ফাঁদে ফেলতে, তার হাতের সময় কেড়ে নিয়ে সেই সময়কে নিজের প্রয়োজনে খাটানো। কিন্তু ওঁদের অভিমতের যাথার্থ মেনে নিয়েও বলতে চাই যে এই বক্তব্যের সবটুকুই কিন্তু যুক্তিভিত্তিক বা অভ্রান্ত নয়।

জাতের ফুটবল খেলতে হলে সময় সময় বিনা কালক্ষেপে বল ছেড়ে বা ঠেলে দেওয়া যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন ভিন্নতর পরিস্থিতিতে পায়ে বল রাখা এবং ড্রিব্‌ল করে বিপক্ষের প্রতিরোধে ফাটল সৃষ্টি করা। একপক্ষকে রুখতে অপরপক্ষ বুদ্ধি খাটিয়েই প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ে রাখে। সেই পাঁচিল ভেদ করতে অন্য পক্ষকে মাথা খাটাতে হয়। ড্রিব্‌ল করে বাধাদানকারী কাছের খেলোয়াড়টিকে নিজের কাছে টানতে না পারলে অথবা এপাশ-ওপাশ সরাতে না পারলে অপরের প্রতিরোধব্যূহে ফাটল ধরান শক্ত। শক্ত কাজটিকে সাধ্যায়ত্ত করার প্রয়োজনেই ড্রিব্‌ল পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটান হয়েছে।

শুধু তাৎক্ষণিক বল দিয়ে নিয়ে খেলার চেষ্টা করা হলে সপ্রতিভ প্রতিপক্ষকে ফাঁদে জড়ান যে কঠিন তা জেনেই দক্ষ দল ওস্তাদ ড্রিবলারের সামর্থের ওপর নির্ভর করে থাকে। এপারেজনে গড়া দুটি দলের মধ্যে গুণগত পার্থক্য গড়ে দেন এই জাতীয় ড্রিবলাররাই। ভাল ফুটবল খেলে বলে পরিচিত যে কটি দলের কথা আমাদের এখনই মনে পড়ে, তাদের দিকে অনুসন্ধানী

দৃষ্টি মেলালেই বোঝা যাবে যে সেই সব দলে ওস্তাদ ড্রিবলার আছেন বা ছিলেন। ড্রিব্লিং এক ধরনের আর্ট। ফুটবলের অন্যতম প্রাথমিক স্কিল! এই শিল্পকলা যাঁদের অধিগত যুগে যুগে তাঁরাই সাধারণ খেলোয়াড়ের অনুপাতে অধিকতর দক্ষ বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এবং তাঁদের শিল্প কৃতির কল্যাণে তাঁদের দলও বাস্তব পরিস্থিতির বেড়া টপকে লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে।

'ওয়ান টাচ' পদ্ধতিতে খেলার গতি ক্ষুণ্ণ হয় না। সুবিধা এইটুকুই। আর অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতি প্রতিপক্ষের কাছে দিবালোকের মত প্রকাশমান। চোখ খোলা রাখলে বিপক্ষ দল এই পদ্ধতির পরবর্তী চাল কি হবে তার ঠাওর পেতে পারে। অঙ্কল বা মানুষ আগলে যে দল প্রতিরোধ বাহিনী সাজায় সেই দলের সামনে 'ওয়ান টাচ' ফুটবল বিশেষ কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী ড্রিবলাররা এই ব্যূহকে ঠকিয়ে দিতে পারেন। যেহেতু কোন দিক থেকে ব্যূহের দড়ি কেটে ধস নামিয়ে তাঁরা যে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন তার আন্দাজ আগেভাগে পাওয়া মুস্কিল।

'ওয়ান টাচ' ফুটবল খেলেন যাঁরা তাঁরা স্বল্প মূলধনের কারবারী। পাশ পাশ, চিপ চিপ, বলে কিছু মন্ত্র তাঁদের কানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই উচ্চারিত শব্দের মোহে তাঁরা যন্ত্রবৎ বল পাওয়া মাত্র ছেড়ে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফুটবল খেলা তো যন্ত্রের কর্ম নয়। চালু খেলায় পরিস্থিতি নিত্যই নতুন নতুন মোহনার সামনে এসে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির ডাক পড়ে। তাই যন্ত্র নয়, মানুষই হলো ফুটবল মাঠের জীবন্ত নায়ক। এই উপলব্ধি সত্য হয়ে আছে বলেই এখনও ফুটবল খেলা হয় এগারোজন করে মানুষে গড়া দুটি দলের মধ্যে। মানুষের বদলে কম্পিউটারকে ওই মাঠে এখনও ঠাঁই নিতে সাদরে ডাক দেওয়া হয় নি।

কলকাতায় ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র গড়ের মাঠে ইদানীংকালে 'ওয়ান টাচ' ফুটবলের রথ গড়গড়িয়ে ছুটিয়ে দেওয়ার জন্যে যেন সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। এরই ফাঁকে অন্য মতকে প্রতিষ্ঠিত করায় সম্প্রতি এই সার্থক উদ্যম দেখে রূপান্তরিত মানসিকতার সন্ধান পেয়েছি। দৃষ্টান্তটি আশাপ্রদ। আশ্বাসজনক। সৃষ্টিধর্মিতার স্পর্শে এই মানসিকতা সদ্য ফোটা ফুলের মত তাজা গন্ধ ছড়াতে পেরেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

ভাল জাতের ফুটবল খেলার প্রয়োজনে ড্রিব্লিংয়ের যে বিকল্প নেই, বহু পরীক্ষিত এই সত্যের প্রতিষ্ঠায় সম্প্রতি (গত ৩০শে আগস্ট ইডেনে) মোহনবাগান যেটুকু করতে পেরেছে তা উল্লেখযোগ্য এবং অর্থবহ। 'ওয়ান টাচ' পদ্ধতির মোহ ভুলে মোহনবাগান সেদিন বৈতরণী পারের কড়ি হিসেবে মেনে নিয়েছিল ড্রিব্লিংয়ের শিল্পকলাকে আর তাতেই তারা মহামেডানের প্রতিরক্ষকতার বেড়া ডিঙিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

মহামেডানের বিরুদ্ধে মোহনবাগানকে ড্রিব্লিংয়ে নেতৃত্ব দেন শিশির গুহ দস্তিদার শিশির এমন কিছু নামী ফুটবলার নন। অকারণ বেশীক্ষণ পায়ে বল রাখেন, খেলার গতি ক্ষুণ্ণ করে ফেলেন বলে তাঁর কিঞ্চিৎ অপযশও আছে। কিন্তু যা কিছু তাঁর দুর্বলতা সেদিন ইডেনে তা সবই তাঁর গুণে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেদিনেও শিশির গতি মন্থরতার আবেশ ছিঁড়ে ফেলতে পারেন নি। চানও নি। যেহেতু বর্ষণসিক্ত ইডেন ছিল একান্তই মন্থর। এই মাঠে অস্বাভাবিক গতিতে খেলা সম্ভবপর ছিল না। আর তার প্রয়োজনই বা কি ছিল? যখন অন্য কেউই তেমন জোরে ছুটতে পারছিলেন না? যা প্রয়োজন ছিল তা হল বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিজের মুঠোর মধ্যে রেখে দেওয়া। শিশির সে প্রয়োজন কি অসাধারণ মুন্সীয়ানাতেই না মিটিয়ে দিয়েছেন! বল পাওয়ার প্রথম মুহূর্তেই তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে পরিপাটি। মাথা খাটিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে, পায়ের টানে তিনি প্রতি মুহূর্তেই সামনের সাজান বাধা ডিঙিয়ে মহামেডানের প্রতিরোধ ব্যূহকে ফালাফালা করে দেন। যত সময় এগিয়েছে শিশিরের খেলা যেন ততোই খুলে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে সেদিনের আসরে মোহনবাগানকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর করে তুলতে এই একজন ফরোয়ার্ডই বহুজনের ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন। এই মরশুমের অন্য লগ্নে যাঁদের আমরা ঝিমিয়ে থাকতে দেখেছি, শিশিরের কার্যকর মূর্তি দেখে অনুপ্রাণিত চিত্তে তাঁরাও সেদিন বুক চিতিয়ে খেলেছেন। একজনের সৃষ্টিধর্মী আচরণের কল্যাণে পুরো একটি দলের উজ্জীবন কি করে সম্ভব ওই দিনের অভিজ্ঞতাই তার মস্ত প্রমাণ। মোহনবাগানের জনকয়েক খেলোয়াড়, চলতি মরশুমের অগুন্তি আসরে যাঁদের অস্তিত্বের ঠাওর পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁরাও সেদিন অসামান্যের ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছেন। তাঁদের প্রেরণার উৎসও ছিলেন ওই শিশিরই।

দিনের হিসেবে শিশির সেদিন ইডেনে ছিলেন সর্বোত্তম ফরোয়ার্ড। আর তাঁর পাশে তেমন মানানসই হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম স্ট্রাইকার জহর দাস। জহর এ বছরে অনেক গোল করেছেন। আবার সময় বিশেষে অনেক সহজ পরিস্থিতির সুযোগ করেছেন হাতছাড়া। এক কথায় রীড়ারও জহরের আচরণে স্বৈরবিরোধিতার লক্ষণ অস্পষ্ট নয়। এই স্ববিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্যে গন্ডা গন্ডা গোল করেও জহর কিন্তু দল অনুরাগীদের মনে তেমন আশা সঞ্চারিত করতে পারেন নি। এবং নিজেও পান নি তেমন নাম। সব দেখেশুনে আমার মনে হয় যে, জহর সম্পর্কে কোথায় যেন কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি প্রশ্রয় পাচ্ছে। জহর তেমন ফরোয়ার্ড নন পারিভাষায় যাকে বলে স্কিমার। আসলে তিনি হলেন শিকারী। সতীর্থদের খেলার রাস্তা বুদ্ধি করে তিনি নিজে তেমনভাবে গড়ে দিতে না পারলেও গোল করার সুযোগগুলো ছোঁ মেরে হাতিয়ে নিতে পারেন। তিনি জাত ফরোয়ার্ড নন। তবে কোন জাত স্কিমারের সহায়তা পেলে তিনি যে যথাযথই এক যোগ্য স্ট্রাইকারের জাতে উঠে যেতে পারেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওই শনিবার শিশিরকে পাশে পেয়েই জহরের খেলা জাতে উঠে গিয়েছিল। জহরের মধ্যে মস্তিষ্কের তাগিদ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হলেও তাঁর শারীরিক সঙ্গতি যথেষ্ট। শরীরটিকে তিনি পুরোপুরিই খাটান। দরকারে আরও খাটাবার সামর্থ ধরেন। শারীরিক সঙ্গতি আছে বলেই তিনি এক

বাঘ্যপদ সম্প্রীদায়। অহয়ের গণোবলী পাঁচার সঙ্কেত ভ্যাজর্ষ যা আইকার সন্ধান জৌমিকের সঙ্গে তুলনীয়। যদিও সেদেশ সরুবেদের সামর্থ আরও বেশী।

এই জহর ও শিশিরকে রুখতেই মহামেডান দলের সমস্ত সামর্থ সেদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সব সঙ্গীতের বিনিময়ে মহামেডান সেদিন পায়ের তলায় শক্ত জমির ঠিকানা খুঁজে পায় নি। তবে বর্ষায় ইডেনে শক্ত জমি মিলবেই বা কি করে? বালিবর্জিত এঁটেল মাটিতে তৈরী এই ক্রিকেট মাঠ এক পশলা বৃষ্টি নামলেই চতুর্দিকে জমে ওঠে হড়হড়ে কাদার হুল্লোড়। নড়তে চড়তে, দৌড়তে গেলেই পা পিছলে কাদা মাথামাখি। বর্ষায় ইডেনে ফুটবল খেলা অসম্ভব। অথচ অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার জন্যেই প্রশাসন খেলোয়াড়দের পিঠে সজোরে চাবুক কষাচ্ছে। আর সেই চাবুকের ঘায়ে খেলোয়াড়েরা মাঠে নেমে ছোটাছুটি করতে বাধ্য হলেও তাঁদের প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যেতে বিলম্ব ঘটছে না। যে ব্যবস্থা খেলোয়াড়দের ওপর এমন নিপীড়ন চালাচ্ছে সেই ব্যবস্থা যে নির্দয় ও হৃদয়হীন, তাতে আর সন্দেহ কি। যত তাড়াতাড়ি এই আয়োজনের বিরোধিতা করা হয়, খেলোয়াড়দের পক্ষে ততই মঙ্গল। মাঝে মাঝে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হয় বটে। কিন্তু সেই প্রতিবাদ সব পক্ষের সম্মিলিত চেষ্টার জোরদার আন্দোলনের চেহারা ধরতে পারে না। ১৯৭৩ সালে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাব অতি সঙ্গত কারণেই ইডেনে শীল্ড ফাইনাল খেলতে রাজী হয় নি। ফলে শীল্ড ফাইনালকে অন্যত্র সরান হয়েছিল। পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাবের রীতি অনুসরণে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান দল যদি শক্ত হতে চায় তাহলেই ব্যবস্থা বদলায়। এবং বাইশ জোড়া ফুটবল বুটের পদাঘাত থেকে ইডেনের ক্রিকেট ঐতিহ্য আত্মরক্ষা করতে পারে। ক্রিকেট উদ্যান ইডেন কলকাতার গর্ব। কিন্তু সম্প্রতি ফুটবলের রাহু যেভাবে তাকে গিলে ফেলতে এগিয়েছে তা দেখে ভয় হয় যে অদূরভবিষ্যতে মহানগরীকে এই গর্বের ধন হাতছাড়া না করতে হয়।

বর্ষায় ইডেনে খেলার চেষ্টা করতে হলেই অনেক বাড়তি মেহনত বাড় পেতে দিতে হয়। মোহনবাগান সেদিন এই মেহনত হাসিমুখে সয়েছিল। কিন্তু পরিশ্রমভারে মহামেডানের কাঁধ নিয়েছিল নুয়েছে। বাড়তি পরিশ্রম মহামেডান দলের জোশটা যে কেমন ঘুরে ঘুরে খেয়ে ফেলেছিল প্রথম পঁয়ত্রিশ মিনিটে তার টাওর পাওয়া যায় নি। খেল পরে, দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সময়। লাকির মন ও তাজা প্রাণশক্তি সম্বল করে মহামেডান প্রথম পর্বে প্রায় সমান তালেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়। একটি গোল খেয়ে চোখের নিমেষে সেই গোল পরিশোধ করে মহামেডান তার সমর্থকদের মনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধেই মোহনবাগানের আক্রমণের খোড়ো হাওয়ায় এক ফুঁয়ে সে দীপশিখা নিভে যেতেই মহামেডান দলানুরাগীদের মনে আশা ভঙ্গের যন্ত্রণা চাগিয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ার্ধে শুধু মোহনবাগানই খেলেছে। জান বাঁচাবার তাগিদে মহামেডান শুধু ঠেকা দিয়ে গেছে। সে ঠেকা সাধ্যপক্ষী অবলয়ীর ঠেকা নয়। তাই বহুল প্রচারিত এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের রূপে ঐশ্বর্য ঘিরে সঙ্গীতের মূর্ছনা জাগার যে সম্ভাবনা ছিল তা পূর্ণ হতে পারে নি। এক কথায়, দ্বিতীয় পর্বে খেলাই জমে নি। মোহনবাগানের একপেশে আধিপত্যের জোয়ারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে যায় জলো এবং বড় খেলায় বড় কিছু না পাওয়ার আপশোষে যথার্থ রসিক চিত্তও অস্থির হয়ে ওঠে। খেলাটি ঘিরে খেলার আগে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাষ একদিন উঠিছিল সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিছক কাগুজে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই পর্যবসিত হয়ে যায়।

মোহনবাগানের কাছে মহামেডানের পরাজয়ে ইস্টবেঙ্গলের লীগ জয়ের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মোহনবাগানকে হারাবার সময় থেকেই ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ প্রশস্ত হয়ে পড়েছিল। লীগ জয়ের জটিল প্রশ্নের জট খুলে গেছে বলে এই মুহূর্ত থেকেই অনেক দলানুরাগী মাঠে যাওয়ার নিরুৎসাহ বোধ করছিলেন। তবু মানতে হয় যে, মোহনবাগান ও মহামেডানের খেলা দেখতে ইডেনে কিন্তু বেশ ভিড় জমেছিল। লোকে লোকে লোকারণ্য প্রায়। এত বড় জমায়েৎ ঘটবে তা বোধহয় আশা করা যায় নি।

এক আধটি ছোটখাট অপ্রীতিকর ঘটনা গ্যালারীতে যে ঘটে নি তা নয়। তবে সামগ্রিক খতিয়ানে বলা যায় যে, মাঠের পরিবেশ ছিল মোটামুটি সুশৃঙ্খল। শুধু আক্ষেপের এই যে রেফারীর পরিচালন পদ্ধতি সেদিন উঁচু মানে উঠতে পারে নি। ছোটখাট ত্রুটির কথা না হয় অনুল্লই রইল কিন্তু মোহনবাগানকে অন্যায়ে দু'বার কেন যে পেনাল্টি কিকের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হল, সেইটিই প্রশ্ন। দু দুবারই রেফারী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আসলে ভাবের ঘরে চুরি করা ছাড়া অন্য যে কিছুই নয়, তা বোধহয় হলপ করেই বলা যেতে পারে।

অজয় বসু

দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

ওভালে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার শেষ চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে, অস্ট্রেলিয়া ১—০ খেলায় (ড্র ৩) 'কাল্পনিক অ্যাসেজ' জয়ী হয়েছে। ইংল্যাণ্ড এই চতুর্থ টেস্ট খেলাটি ড্র করলে অস্ট্রেলিয়ার বাড়াভাতে ছাই পড়ার মত অবস্থা দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই খেলাটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৫৩২ রাণ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) সংগ্রহ করে এবং ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৯১ রাণে শেষ করে ৩৪১ রাণে এগিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া জিততে পারলো না প্রধানত ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় বব উলমারের বলিষ্ঠ ১৪৯ রাণের জন্য। নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় উলমার পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে আট ঘন্টা ব্যাট করেন এবং দলকে বিপদমুক্ত করে সব শেষে আউট হন। এই নিয়ে উলমার দুটো টেস্ট ম্যাচ খেললেন।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, আগের তিনটি টেস্টেই অস্ট্রেলিয়া টসে হেরেছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সূচনায় বিপর্যয় দেখা দেয়—মাত্র ৭ রাণের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া একটা উইকেট খুইয়ে ২৮০ রাণ সংগ্রহ করেছিল। প্রথম দিনের খেলায় ইয়ান চ্যাপেল ১৪২ রাণ এবং রিক ম্যাককস্কার ১২৬ রাণ করে অপরাজিত থাকেন। তাঁদের অসমাপ্ত দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ২৭৩ রাণ উঠেছিল। ম্যাককস্কার টেস্টে এই প্রথম সেঞ্চুরী করলেন। তিনি ১২৬ মিনিটে তাঁর শত রাণ পূর্ণ করেন—বাউণ্ডারী করেন ১২টা। অপরদিকে ইয়ান চ্যাপেলের সেঞ্চুরীটি ছিল—টেস্ট খেলায় তাঁর ত্রয়োদশ সেঞ্চুরী।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া তার প্রথম ইনিংসের ৫৩২ রাণের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ম্যাককস্কার (১২৭ রাণ) এবং ইয়ান চ্যাপেল ২৭৭ রাণ তুলে দিয়েছিলেন। ইয়ান চ্যাপেলের দুর্ভাগ্য, মাত্র ৮ রাণের জন্যে তিনি ডাবল সেঞ্চুরী হাতছাড়া করেন। তিনি ৪৪২ মিনিট ব্যাট করে তাঁর ১৯২ রাণে ১৭টা বাউণ্ডারী করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি ২৫ মিনিটে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১৯ রাণ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ১৬৯ (৮ উইকেটে)। তখনও ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের আরও ১৬৪ রাণের প্রয়োজন ছিল। এদিকে হাতে জমা ছিল মাত্র দুটি উইকেট। তৃতীয় দিনে অতি মন্থর গতিতে রাণ উঠেছিল। এডরিচ তাঁর ১২ রাণ করতে দু ঘন্টার বেশী সময় নিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের একমাত্র ডেভিড স্টীল দলের বিপর্যয়ের মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৩১ রাণ করে নট আউট থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা এক কথায় ইংল্যাণ্ডকে দুরমুস করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ওয়াকার ৬৩ রাণে ৪, লিলি ৪৪ রাণে ২ এবং টমসন ৪৫ রাণে ২টো উইকেট পেয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। আলোর অভাবে খেলা ৭৫ মিনিট দেরীতে আরম্ভ হয়েছিল। তা ছাড়া একই কারণে একাধিকবার খেলা বন্ধ ছিল এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগে খেলা শেষ হয়েছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ১৯১ রাণের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের শেষ দুটো উইকেটে ২২ রাণ উঠেছিল ২০ মিনিটের খেলায়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৫৩২ রাণের থেকে ৩৪১ রাণের পিছনে পড়ে ইংল্যাণ্ড ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং একটা উইকেট খুইয়ে ১৭৯ রাণ সংগ্রহ করে। অসমাপ্ত দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১০২ রাণ তুলে এডরিচ (৯১ রাণ) এবং স্টীল (৫২ রাণ) অপরাজিত থেকে যান। এই দিন এডরিচ তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৫০০০ [illegible] [illegible] করেন।

পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ৩৩৩ (৪ উইকেটে)। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৫৩২ রাণের থেকে তখনও ইংল্যাণ্ডের ৮ রাণ কম ছিল। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের অনমনীয় দৃঢ়তার দরুন অস্ট্রেলিয়া এই দিনে মাত্র তিনটে উইকেট পেয়েছিল। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে স্টীল (৬৬ রাণ) এবং এডরিচ দলের ১২৫ রাণ তুলেছিলেন ১৮৮ মিনিটের খেলায়। এডরিচ ৬ ঘন্টা ১০ মিনিট খেলে ৯৬ রাণ করেছিলেন। চার রাণের জন্যে তিনি সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। তিনি টেস্টে এ পর্যন্ত ১২টা সেঞ্চুরী করেছেন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দাঁতে দাঁত দিয়ে রূপ (৭৭ রাণ) এবং উলমার দলের অতি মূল্যবান ১২২ রাণ যোগ করেছিলেন। খেলার উপযুক্ত আলো না থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের ৬৫ মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়। উলমার ৩৭ রাণ করে নটআউট থেকে যান।

শেষ ৬ষ্ঠ দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস চা-বিরতির সময় ৫৩৮ রাণের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস প্রায় ১৫ ঘন্টা স্থায়ী ছিল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে শেষ আউট হয়েছিলেন বব উলমার। ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে তিনি বরাভয় মূর্তি ধারণ করে ৮ ঘন্টা ধরে খেলেছিলেন এবং অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত রকমের আক্রমণ কচুকাটা করে ১৪৯ রাণ করে শেষ আউট হয়েছিলেন। টেস্টে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী এবং প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এই ১৪৯ রাণই তাঁর সর্বোচ্চ রাণ। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে নট (৬৪ রাণ) এবং উলমার ১৫১ রাণ তুলে দলকে বিপদমুক্ত করেছিলেন।

শেষ ৬ষ্ঠ দিনের বাকি সময়ের খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ১৯৮ রাণের দরকার ছিল। এ কাজ [illegible]ও অসাধ্য ছিল। এদিকে আবার আলোর অভাবে খেলাও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গড়ায়নি। ৩০ মিনিট আগে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৪০ রাণের মাথায় (২ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৫৩২ রাণ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ম্যাককস্কার ১২৭, ইয়ান চ্যাপেল ১৯২, এডওয়ার্ডস ৪৪ এবং ওয়ালটার্স ৬৫ রাণ। ওল্ড ৭৪ রাণে ৩ এবং গ্রীগ ১০৭ রাণে ৩ উইকেট)।
ও ৪০ রাণ (২ উইকেটে)

ইংল্যাণ্ড : ১৯৯ রান (উড ৩২ এবং স্টীল ৩৯ রাণ। লিলি ৪৪ রাণে ২, টমসন ৫০ রাণে ৪ এবং ওয়াকার ৬৩ রাণে ৪ উইকেট)

ও ৫৩৮ রাণ (এডরিচ ৯৬, স্টিল ৬৬, রূপ ৭৭, উলমার ১৪৯ এবং নট ৬৪ রাণ। লিলি ৯১ রাণে ৪ এবং ওয়ালটার্স ৩৪ রাণে ৪ উইকেট)

অনেক স্কুল (ছেলেদেরও) সারা পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় আছে, যাদের খেলাধুলার কোন ব্যবস্থাই নেই। শহরের স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেক সময় মাঠের অভাবের অজুহাত খাড়া করেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বা মফঃস্বল শহরে তো ফাঁকা মাঠের অভাব নেই। সেসব ক্ষেত্রে কেন ছেলে বা মেয়েদের স্কুলে খেলার ব্যবস্থা হয় না? বিংশ শতাব্দীর ৭০ দশকের শেষ পর্বে এসে আমরা আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষ পালন করছি খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। মেয়েদের সমানাধিকারের দাবীতে কলরবও খুব উচ্চস্বরে হচ্ছে। অথচ স্কুল জীবন থেকেই মেয়েরাও যাতে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাধীন দেশের আধুনিক যুগের প্রাণচঞ্চল জীবন ধারার উপযুক্ত হতে পারে; বিদ্যা-বুদ্ধি স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য ও সপ্রতিভার সামনের সারিতে এগিয়ে আসতে পরে, সেদিকে কেন ভাল করে নজর দেওয়া হচ্ছে না? শৈশব বা বাল্য বয়স থেকে খেলাধুলারও চর্চা হওয়া যে দরকার এ সত্যতা এখন সবাই উপলব্ধি করেন। সেদিন একটি স্কুলের ছাত্রীর মুখে শুনলাম, তাদের 'দিদি' মানে শিক্ষিকা ক্লাসে বলেছেন, স্কুলে খেলাধুলার ব্যবস্থা না থাকলেই বা তোমরা বাইরে নানা খেলায় যোগ দিয়ে কাপ মেডেল নিয়ে এস, তাহলেই আমরা খুব খুসী হব।' ভারী মজার কথা। স্কুলে খেলাধুলার ব্যবস্থা করবেন না। বাইরে থেকে মেয়েরা কাপ মেডেল জিতে আনলে 'খুসী' হয়ে ছুটি উপভোগ করবেন। এই রকম মানসিকতার অবসান ঘটিয়ে বিধিবদ্ধভাবে সব স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়া শিক্ষণের ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই দরকার।

পশ্চিম বাংলার মেয়েরা যে ক্রিকেট ও ফুটবল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, সেকথা এতদিন কি আমরা জানতাম? কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সেই মুষ্টিময় কজন মহিলাকে যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছেন এরাজ্যের মেয়েদের ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় উৎসাহিত করতে। সংগঠনের ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে না এলে আমাদের কিশোরীদের ক্রীড়া-প্রতিভার কথা অজানাই থেকে যেত। আশা করি, স্কুল-কলেজের মেয়েদের ক্রীড়া-শিক্ষণের ব্যাপারেও মহিলারা অগ্রণী হবেন। তাহলেই চন্দনা মুখার্জীর মত আরও অনেক চৌকস খেলোয়াড়ের হদিশ পাওয়া যাবে।

চন্দনা প্রথমে ক্রিকেট খেলার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ক্রিকেট সংস্থার সংগঠন-কারিণীদের সংস্পর্শে আসে। সেই-সূত্রেই ফুটবল খেলার সুযোগও পায় এবং এতেও নিজের কুশলতা সপ্রমাণ করে দলে স্থান পেয়েছে। চন্দনাও বলে, প্রথম বছরই জাতীয় ফুটবলে বিজয়ী হওয়ায় আমাদের মনের জোর খুব বেড়ে গেছে।

চন্দনাও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা শ্রীজ্যোতিরঞ্জন মুখার্জী রেলের চাকুরিয়া। ওরা তিনভাই, দুই-বোন। চন্দনার দিদি অরুণা মুখার্জী সুভাষ জলাধারে সাঁতার কাটে, আর মেজদা এয়ারফোর্সে ক্রিকেট খেলে।

—স্কুল-কলেজে যদি ছেলেদের মত মেয়েদেরও ক্রিকেট ফুটবলের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় তাহলেই আমাদের খেলার মান আরও উঁচু হবে। আমরা ঐ দুটি খেলাতেও খুব রপ্ত হয়ে উঠতে পারব। জানেন, লক্ষ্ণৌএ আমাদের খেলার ধরণ দেখে অনেক বিশ্বাসই করেনি যে, আমরা মাত্র বারদিনে এই রকম খেলা রপ্ত করেছি। ওখানে সবাই বলেছে—তোমরা নিশ্চয়ই এক বছর ধরে খেলছ। পশ্চিম বাংলায় নিশ্চয়ই মেয়েদের ফুটবল খেলাও অনেকদিন চলছে। তাহলেই দেখুন, আরও সুযোগ পেলে হয়ত আরও ভাল ভাল খেলোয়াড় পাওয়া যাবে, যারা প্রমীলা ফুটবলেও পশ্চিম বাংলার খ্যাতি ছড়িয়ে দেবে সারা ভারতে।

—চিণ্ডার ট্রফিতে তোমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল খেলল কারা?

—বিদর্ভদল। ওরা লীগ পর্বে অন্য-গ্রুপে প্রথম হয়। ওরা বেশ আক্রমণাত্মক খেলা খেলছিল। তাছাড়া লীগপর্বে উত্তর-প্রদেশ দল বেশ বেগ দিয়েছিল। তবে, উত্তরপ্রদেশের মেয়েরা ঠিক আইনমাফিক খেলছিল না। বড্ড ফাউল করছিল। আমাদের ফরওয়ার্ডদের হাত টেনে ধরছিল, কেউ বা পিছন থেকে চার্জ করছিল, ধাক্কা মারছিল। কিন্তু ওদের রেফারী সেগুলো ধরছিলেন না। আমাদের দলের ফরওয়ার্ডরা বল পাশ করায় বা বিপক্ষকে কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় খুবই সফল হয়েছে। কারণ, আমরা ত সারা মাঠে বল পাঠিয়েছি, খেলোয়াড়রাও খুব ছড়িয়েছিল। তাই বিপক্ষ রক্ষণভাগের হাফ বা ব্যাকরা আমাদের ফরওয়ার্ডদের সামলাতে পারছিল না। রাজস্থান ত প্রথম পনের মিনিটেই ৩—০ গোলে পিছিয়ে পড়ে খেলা থেকে অবসর নিল। তবে, অন্য খেলাগুলো হকি মাঠে হওয়ায় আমাদের ফরওয়ার্ডরা আক্রমণের তুলনায় বেশী গোল করতে পারেনি। এর কারণ আমরা অভ্যাস করছি বড় মাঠে বড় গোলপোস্টে। তাই লক্ষ্ণৌতে আমাদের গোলের নিশানা ঠিক হচ্ছিল না।

—বেশ। তাহলে তুমি কি ঠিক করেছ, ক্রিকেট, ফুটবল দুইই খেলবে?

—হ্যাঁ। আর সেই সঙ্গে সুভাষ ময়দানে (সল্ট লেকে) এথলেটিক চর্চাও চালিয়ে যাব। আপনারা একটু জোর করে লিখুন না, যাতে স্কুলে স্কুলে আমাদেরও ফুটবল, ক্রিকেট হকি খেলার ব্যবস্থা ভাল করে হয়।

আশ্বাস দিয়ে আমি চেষ্টা করব। এই সব মেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি এখনও সফল হবে না?

অময়

'বড়ো খেলোয়াড়দের বাইরের চালচলনের অন্ধ অনুকরণ করলেই বড়ো খেলোয়াড় হওয়া যায় না। তাঁদের আসল গুণাবলী অধ্যয়ন করা চাই। আমার হাঁটা চলা অমুকের মত বলেই যে একদিন সেই খেলোয়াড় হবো—তা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। তাঁদের মত হতে হলে তাঁদের মতই নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও ফুটবলে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে, অন্যথায় আমি স্রেফ অপদার্থ বলেই অভিহিত হবো।'

দিলীপ সরকার

বাপ-মায়ের চোখের মণি, একমাত্র সন্তান দিলীপ সরকারের সঙ্গে বর্ষামুখর সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল ময়দানের তাঁবুতে বসে বসে। কতো বা বয়স হবে দিলীপের কিন্তু কথাবার্তায় কি অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়! অহমিকাশূন্য আত্মপ্রত্যয়, শিষ্টতায় নুয়ে পড়া বাইশ বছরের তরুণ রাইটব্যাক দিলীপ। মেদ বর্জিত ছিপছিপে লম্বা এ্যাথলীট সুলভ চেহারা।

কলকাতা সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় তরুণের আস্তা খিদিরপুরের রাইটব্যাক দিলীপ। দুটি পায়েই প্রায় সমান সামর্থ। ট্যাকলিং পরিচ্ছন্ন। উঁচু বল হেড করে ডিফেন্ডিং জোন থেকে সরিয়ে দেওয়ায় অসাধারণ সপ্রতিভ, সতর্ক। নিজের পজিসন সম্পর্কেও তাই। চার-দুই-চার প্রথার খেলায় ব্যাক শুধু ডিফেন্ডারই নন, অফেন্সের ভূমিকাও ঐ ব্যাকের রয়েছে আক্রমণকারীদের পাশে পাশে। দিলীপ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন।

দিলীপ সরকারের জন্ম ১৯৫৩ সালের ৩০ এপ্রিল কলকাতা মিলিটারী হাসপাতালে। বাবা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার তখন মিলিটারীতে ছিলেন, এখন আছেন ফুড কর্পোরেশনে। পোষ্টিং ভুবনেশ্বরে। মা শ্রীমতী পুষ্পরাণী সরকার দিলীপকে নিয়ে থাকেন বেহালার পি।২৭ সাগরমান্না রোডের বাড়ীতে। চাকরী গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপে (ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর)।

স্কুলে পড়ার সময়েই ফুটবলে হাতে খড়ি, কিন্তু তখন খেলার প্রথম পাঠ ভাল করে কারও কাছে তেমন পান নি। পেলে হয়তো দিলীপ এরই মধ্যে অন্য দিলীপ হয়ে উঠতে পারতেন। বেহালা স্কুল থেকে বিজ্ঞান নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারী (১৯৬৯) পাশ করার পর ভর্তি হন বেহালা কলেজ। ফুটবলের সঙ্গে পড়াশুনাও চলে সমান গতিতে। ১৯৭৩ সালে বেহালা কলেজ থেকে দিলীপ বি এস সি পাশ করেন। স্কুলে পড়ার সময় দক্ষিণ কলকাতা স্কুল লীগ এবং কলেজের ছাত্র হিসেবে আন্তঃ কলেজ এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলও খেলেছেন। কলকাতার হয়ে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় (পূর্বাঞ্চল) ফুটবলের পাটনার আসরে (১৯৭১) দিলীপ ছিলেন স্ট্যান্ড-বাই। নামকরা এবং প্রভাবপ্রতিপত্তিওয়ালা কলেজগুলির প্রার্থীদের ভীড়ে তাঁর পক্ষে পাটনায় খেলার সুযোগ করা সম্ভব হয় নি। সেজন্য অবশ্য আজকের দিলীপ সরকারের কোন ক্ষোভ নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।

আমাকে কলকাতার মাঠে প্রথম আনেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শ্রীউমা চৌধুরী '৬৯-৭০ সালে। দু-বছর খেললাম জুনিয়ার ইস্টবেঙ্গলে। কখনও হাফব্যাক, কখনও ইনসাইড। পরের বছর পাকড়াও করলেন তখনকার খিদিরপুরের কোচ কোকোদা (শ্রীঅচ্যুত ব্যানার্জি)। মাজাঘষা করে, প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, মাপ মত কেটে ছেঁটে আমায় পাকাপাকিভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি খিদিরপুরের রাইটব্যাকে। ১৯৭১, ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এই তিন বছর খিদিরপুরে খেলে আমি নিজেকে বোধহয় একটু [illegible] ভেবে বসলাম। [illegible] গেলাম

দিলীপ সরকার

বড়ো ছাতার নীচে—ইস্টবেঙ্গলে। পরের বছর ফিরে এলাম খিদিরপুরে কিন্তু ততক্ষণে আমার 'গুরু' কোকোদা খিদিরপুর থেকে সরে গেছেন।

নিজের কথা বলতে বলতে দিলীপ বললেন : ফুটবল মাঠে যে আবার নামতে পারবো, সে সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছিল ১৯৭২ সালে মেয়ো রোডে মোটর দুর্ঘটনার পর। তারিখটা এখনও মনে আছে ২৯ এপ্রিল অর্থাৎ আমার জন্মদিনের ঠিক আগের দিন। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে গিয়ে একেবারে গাড়ীর তলায় চলে গেলাম। ডান পা, পায়ের পাতায় দারুণ চোট হোল। হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হোল দীর্ঘদিন। তারপর আস্তে আস্তে ভাল হোলাম। বলা বাহুল্য সে বছর লীগ খেলতেই পারি নি। শীল্ডে খেললাম কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে নয়—সেদিন আমার পার্ট-টু পরীক্ষা ছিল। ১৯৭৪ সালে ইস্টবেঙ্গলে এসে পেলাম পি. কে, ব্যানার্জিকে। ফুটবলের নতুন ধারাপাত হাতে পেলাম। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ওপর আমার একটু মোহ আছে। বাবা কৃষ্ণনগরের লোক হলেও মা আমার খাঁটি ময়মনসিংহের 'বাঙাল'। বলেও নিজের ঠাট্টায় নিজেই মুচকি হাসলেন দিলীপ। সাতটি ম্যাচ খেললেন সেবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে। শুধু লীগেই নয়, ডি সি এম ফুটবলেও দিলীপ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন দ্বিতীয়ার্ধে—বিকল্প খেলোয়াড় হিসেবে। ডি. সি. এম, ডুরাণ্ড বা রোভার্স খেলার অভিজ্ঞতা অবশ্য দিলীপের ১৯৭২।৭৩ সালেই হয়েছিল। খিদিরপুরে থাকার সময়। কুইলনে জাতীয় জুনিয়ার ফুটবলে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন '৭১-৭২ সালে (কুইলনে, বাংলা তৃতীয়) এবং '৭২-৭৩ সালে (কৃষ্ণনগরে, বাংলা তৃতীয়)। সে বছর ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এশীয় জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় দিলীপ ছিলেন ভারতীয় দলে স্ট্যান্ডবাই।

দিলীপের জিজ্ঞাসা : আর কতদিন স্ট্যান্ডবাই হয়ে কাটবে, বরাত কবে খুলবে, বলতে পারেন?

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

টেনিসে চেক তরুণের কেরামতি

লন টেনিসের এত রমরমা অবস্থা কোনকালে ছিল না। নগদ পুরস্কারের পরিমাণের দিক তাকিয়ে এখন অনায়াসে টেনিসকে অর্থোপার্জনের অন্যতম সেরা খেলায় আখ্যায়িত করা যায়। গলফ মোটর রেসিং ফুটবল মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতির মত পেশাদারী টেনিসে টাকার অংক দিন দিন বাড়ছে। এইত এ বছরের ২৬ এপ্রিল বাইশ বছরের মার্কিন তরুণ জিমি কোনরস কেবলমাত্র সিজার্স প্যালেসে তিরিশ বছর বয়স্ক নিউকম্বকে হারিয়ে পাঁচ লক্ষ ডলার উপার্জন করলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এবারের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট নগদ পুরস্কারের অংক গিয়ে ঠেকেছে—১১৬,৭২৫ পাউন্ড।

এখন উইম্বলেডন টেনিস ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে। ১৮৭৭ সালে এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে যে উদ্দীপনার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল আজও তা অম্লান। উইম্বলেডনকে টেনিস খেলোয়াড়দের তীর্থভূমি বলা যায়। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যে কোন টেনিস খেলোয়াড়ের জীবনে এক পরম লগ্ন। আর বিজয়ী হওয়া ও শ্রেষ্ঠত্বের চরম স্বীকৃতি। এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

সর্বদেশের সর্বকালের টেনিস খেলোয়াড়দের চোখে একই স্বপ্ন—উইম্বলেডন জয়। এর চেয়ে গৌরবের ও সৌভাগ্যের আর কি হতে পারে একজন টেনিস খেলোয়াড়ের জীবনে। উইম্বলেডনের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ আর্থার অ্যাশ এবার উইম্বলেডন জয় করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। জয়ের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে একত্রিশ বছরের অ্যাশ বলেছেন—উইম্বলেডন জিতে এতদিনে আমার স্বপ্ন কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে।

নব নায়ক আর্থার অ্যাশ-এর এই কথাগুলো আমার কাছে খুব চেনা ঠেকছিল। স্মৃতি [illegible] টেনে পেছনে মনে [illegible]। ১৯৭৩ সালে। [illegible] উইম্বলেডন [illegible] জান কোদেস বিজয়ী হয়ে অ্যাশ-এর মত একই উত্তর দিয়েছিল। আজ আমার আশৈশব স্বপ্ন সত্য হয়েছে। আমি ধন্য। আমি আনন্দিত। উইম্বলেডন জয়ের স্বপ্ন সমস্ত টেনিস খেলোয়াড়ই দেখেন। আজ আমার সে স্বপ্ন সত্যি হয়েছে।

টেনিসের আসরে জান কোদেসের ভূমিকা একটা বিরাট কিছু না হলেও একটি বিশেষ কারণে মনে রাখার মত। যেমন আর্থার অ্যাশ প্রথম উইম্বলেডন বিজয়ী অশ্বেতকায় পুরুষ তেমনি জান কোদেসও যুদ্ধোত্তরকালে উইম্বলেডন খেতাবে ভূষিত একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়ান তরুণ। অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার বাঘা বাঘা টেনিস তারকাদের হাত থেকে টেনিসে অনগ্রসর এই তরুণের পক্ষে উইম্বলেডন ছিনিয়ে নেওয়া নেহাৎ সহজ কথা নয়।

বিশেষতঃ ১৯৭২-৭৩এর কালে রড লেভার জন নিউকম্ব প্রমুখ খ্যাতিমানেরা নিভু নিভু করেও নিজেদের জ্বালিয়ে রেখেছিলেন অহরহ। তখন আর্থার অ্যাস ও টম ওক্কার বয়সে তরুণ। ধাপে ধাপে উঠে আসছিলেন স্বীকৃতির সিঁড়ি বেয়ে। মনে হয়েছিল এরাই বুঝি টেনিস কোর্টে নতুন কালের হাওয়া বইয়ে দেবেন। কিন্তু পরিবর্তে অকস্মাৎ উল্কার মত আবির্ভূত হয়ে জান কোদেস নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একেবারে সামনের সারিতে।

সেবার এবং তার আগের বার জান কোদেস রোল্যান্ড গ্যারস কোর্টে ফরাসী টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। ইতালীয় টেনিসের ফাইন্যালে অল্পের জন্যে রড লেভারের হাতে হেরে যান। তবে কোদেসের জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৭৩ সালে টেনিসের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান উইম্বলেডন লাভ। যে কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল লেখা থাকবে ক্রীড়া পরিসংখ্যান কেতাবে।

কোদেসের উইম্বলেডন জয়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। প্রাক চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রায় প্রতিটি খেলায় তাঁকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। [illegible] ন্যালে ভারতের [illegible] বিজয় অমৃতরাজের বিরুদ্ধে লড়াই [illegible]। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার এই খেলায় আক্রমণ প্রতি আক্রমণের ঘাত প্রতিঘাতে [illegible] আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোদেস বিজয়ী হন। সেমিফাইনালে রজার টেলর ও ফাইনালে মেত্রেভেলীকে হারালেও এই ম্যাচটি ছিল উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় কোদেসের সেরা খেলা। পুরুষদের সিংগলসে চ্যাম্পিয়ান হয়ে জান কোদেস পেয়েছিলেন ৫০০০ স্টার্লিং। আর রাশিয়ার মেত্রেভেলী ভাগে পেয়েছিলেন ৩০০ স্টার্লিং।

ইস্পাতের মত দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন বেঁটে খাটো শক্ত চেহারার মানুষ জান কোদেসের ক্রীড়াচাতুর্যে অনেক উল্লেখনীয় গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তবে কোদেসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা লন কোর্ট। কে বা গ্র্যাভেল কোর্টে যতটা স্বাচ্ছন্দে খেলতে পারেন লন কোর্টে ঠিক ততটাই অনভ্যস্ত বলা যায়। যার জন্য ফরেস্ট হিলস কিংবা উইম্বলেডন-এর মত লন কোর্টে তাঁর ক্রীড়ামানের বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে তাঁর সূক্ষ্ম মানের কারুকার্য ও জোরালো সুইং জড়ানো সার্ভিস দর্শকদের মনের মণিকোঠায় অনেকদিন জীবন্ত হয়ে থাকবে।

প্রশান্ত দাঁ

পুতলী শুধু একা নয়, লাখন সিং, রূপা সিং, অমৃতলাল এবং রতন সিংয়ের মত দুর্ধর্ষ বাগীরা চম্বলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে তখন। আর পুলিশও মরিয়া হয়ে এই সব বাগীদের শায়েস্তা করতে চাইছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। মোরেনা আর ভিন্ড—এই দুটি জেলায় ধনী শেঠের দল আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে। কখন যে হামলা হবে, কেউ জানে না।

এরই মধ্যে খবর এলো—না, পুতলী মরেনি। পুতলী বেঁচে আছে। শহর থেকে ইলাজ করে বেহড়ে ফিরে গিয়ে আবার দল গড়ে তুলেছে। এবং যথারীতি ডাকাতি নরহত্যা এবং অবাধে লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। পুলিশ যখন হন্যে হয়ে পুতলীর খোঁজ করছে ওদিকে সেই পুতলী তখন হিংস্র বাঘিনীর মত ছোটেলালকে খুঁজে ফিরছে। ছোটেলালকে তার চাই। ছোটেলালের বেইমানিতে তার হাতে কাটা পড়েছে। সুতরাং ছোটেলালকে পাকড়াও করে তাকে নিজের হাতে খুন করা ছাড়া পুতলীর মনে কোন শান্তি নেই।

কে এই ছোটেলাল?

মোরেনাতে আমরা যখন শুটিং করতে যাই, তখন ওখানকার এক তরুণ স্কুল মাস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার নাম তমন্না। সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ওর খুবই উৎসাহ। ফলে ও প্রায়ই আমাদের সঙ্গে লোকেশানে আসত। তমন্না সঙ্গে থাকায় আমাদেরও খুব উপকার হতো। স্থানীয় গ্রামবাসীদের ও আমাদের হয়ে বুঝিয়ে বলত। খুব মিশুকে প্রকৃতির ছেলে বলে আমাদের ইউনিটে সকলের সঙ্গে ওর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একদিন শুটিং-এর লাঞ্চ ব্রেকে তমন্নাকে ছোটেলাল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা তমন্না ভাই, ছোটেলাল লোকটা কে?

শুনে প্রথমে ও বুঝতেই পারেনি, পরে পুতলীর আক্রোশের কথা উল্লেখ করতে তমন্না বলল—ছোটেলাল লোকটা ছিল একটা মামুলী স্পাই। প্রত্যেক গ্রামেই পুলিশের 'মুখিয়া' থেকে থাকে—ছোটেলাল ছিল সেই রকমই একজন মুখিয়া। তবে এই লোকটা ছিল ডাবল এজেন্ট। গোপনে যেমন পুলিশকে খবর বিক্রি করত, তেমনি বাগীদের হয়েও কাজ করত। লোকটা কিভাবে যেন পুতলীর খুব বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে। অথচ পুতলীর দলের লোকেরা কিন্তু এই ছোটেলালকে একদম সহ্য করতে পারত না। কিন্তু পুতলীর পেয়ারের লোক বলে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। তারও একটা কারণ ছিল। পুতলী যখন বাইজী ছিল তখন এই ছোটেলাল ওর মায়ের হয়ে দালালির কাজ করত। কোথায় কোন রইস আদমী মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে টাকা ওড়াচ্ছে, ছোটেলাল এইসব খবর খুব রাখত, তারপর সেই রইস আদমীকে বলে-কয়ে পুতলীর জন্যে মুজরো আদায় করে আনত। পুতলীর মা ছোটেলালকে এ-বাবদ কমিশন দিত। তারপর সেই পুতলী যখন বাগী হয়ে চম্বলের বেহড়ে ঢুকে গেল ছোটেলাল ভাবল—এই মওকা, পুতলীকে হাতে রাখতে পারলে ফোকটে টু-পাইস কামিয়ে নেওয়া যাবে। তাই সে বহু চেষ্টায় একদিন পুতলীর সঙ্গে দেখা করল।

পুতলী তো বেহড়ে ছোটেলালকে দেখে অবাক। —তুমি এখানে কি করতে এসেছো?

ছোটেলাল এক গাল হেসে মিথ্যে করে জবাব দিল—তোমার মা আমায় পাঠিয়েছে। এখানে তোমার দেখ-ভাল করবার জন্যে।

পুতলী রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল—আমাকে দেখ-ভাল করবার জন্যে অনেকেই আছে এখানে—তোমাকে আমার কোন দরকার নেই। তুমি এক্ষুনি চলে যাও। নয়ত মরবে।

ছোটেলাল ভয় পেয়ে মিন মিন করে বলল—তোমার মেয়ে তান্নোর দিব্যি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখো, তোমার উপকারই হবে—

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তান্নোর কথা পুতলীর মনে পড়ে গেল।

নিজের সন্তানকে পুতলী আজ কত দিন হলো দেখেনি। কচি কচি হাত দুটো দিয়ে শিশু তান্নো তার ডাকাত মা-কে আদর করেছে—সেই স্পর্শ পুতলী আজও স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। মা কি তার সন্তানকে কখনও ভুলে যেতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে পুতলীর মুখ অনেকটা কোমল হয়ে এল। সামান্য চুপ করে থেকে সে বলল—ভয় নেই, আমরা তোমায় মারব না ছোটেলাল, কিন্তু এই বেহড়ে পুলিশ যদি তোমায় কখনও দেখতে পায় তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের গুলীতেই মরবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

মধ্যপ্রদেশের পুলিশের রিপোর্টে লেখা আছে যে, পুতলী সন্তান-সম্ভবা হয়ে বেহড় থেকে মোরেনাতে তার মায়ের কাছে ফিরে এসেছিল। তারপর পুতলী যে কন্যা-সন্তান প্রসব করে—পরে জানা যায় সেটি আসলে সুলতান সিংয়ের সন্তান। খবর পেয়ে সুলতান সিং গোপনে গোপনে মোরেনাতে এসেছিল নিজের মেয়েকে দেখতে। টের পেয়ে পুলিশ ফাঁদ পেতেছিল। কিন্তু, ধূর্ত সুলতান সিং সে ফাঁদে পা দেয়নি; পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল সে-যাত্রা। তারপর পুতলীর পালা। পুলিশ পুতলীকে ডবল এজেন্ট হিসাবে কাজ করবার জন্যে নানাভাবে প্রলুব্ধ করেছিল। কিন্তু পুতলী মুখে হ্যাঁ বললেও মনে মনে রাজী হয়নি।

তারপর তান্নোকে ওর দিদিমার কাছে রেখে দিয়ে পুতলী একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

ছোটেলাল ইনিয়ে-বিনিয়ে তান্নোদের দুঃখের কাহিনী বলেছিল একদম না খেয়ে মরছে তান্নো আর তার দিদিমা। বাড়ির আর কোন রোজগার নেই। কোত্থেকে খাওয়াবে তান্নোকে? একটা ফ্রক পর্যন্ত কিনে দিতে পারে না। তান্নোর দুর্দশা দেখলে চোখে জল এসে যায়। তাছাড়া তোমার মেয়ে বলে পুলিশও ওকে যখন-তখন হেনস্থা করে....

সব শুনে পুতলী ওকে কিছু টাকা দিয়ে বলেছিল—এই টাকা কটা আমার মায়ের হাতে দিয়ে বলো—এবার থেকে নিয়মিত টাকা পাঠাব আমি। তান্নোর যেন কোন কষ্ট না হয়।

ধূর্ত ছোটেলাল সেই টাকা গায়েব করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তান্নোর দুঃখের মনগড়া কাহিনী বলে ছোটেলাল প্রায়ই পুতলীর কাছ থেকে এটা সেটা আদায় করে নিয়ে যেত। পুতলী ওকে একদম সন্দেহ করেনি। সে রকম অবকাশও দেয়নি ছোটেলাল। পুতলীর টাকায় সে নিজের গাঁয়ে জমি-জিরেত কিনে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছিল ছোটেলাল। গাঁয়ের লোকেরা ছোটেলালকে ভয় করত। কারণ তারা জেনেছিল—এর সঙ্গে পুতলীর যোগসাজশ আছে।

এই ব্যাপারটা ঘটনাচক্রে পুলিশের কানে যেতে তারা গোপনে ছোটেলালের সঙ্গে যোগাযোগ করল। পুলিশ দেখে ছোটেলাল তো ভয়ে কেঁপে অস্থির। তারপর যখন সে শুনলো—পুলিশ তাকে টাকা দিয়ে খবরা-খবর সংগ্রহ করতে চায়—ছোটেলালের তখন লোক ডাঁট! প্রথমে সে পুতলীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকারই করল। ভেবেছিল এইভাবে সে পুলিশের দেওয়া টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে নেবে। কিন্তু পরে যখন বুঝল এতে উল্টে তারই বিপদ হতে পারে, পুলিশ ইচ্ছ করলে তাকে যখন তখন কোন ডাকাতির মামলার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পারে—তখন ছোটেলাল ধাতস্থ হ'ল। এবং পুলিশের স্পাই হিসাবে কাজ করতে রাজী হয়ে গেল। পুলিশ তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা হবে। কাক পক্ষীতেও টের পাবে না।

উচ্চাভিলাষী ছোটেলাল তখন শুধু পুতলীর দলের গতিবিধির সংবাদই নয়, অন্যান্য দলের খবরাখবরও পুলিশকে যোগান দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তাতেও কিছু লাভ হলো না পুলিশের। কারণ চম্বলের ডাকাতরা কখনও একটা বিশেষ জায়গায় আস্তানা করে থাকে না। তারা সব সময়ই মুভিং। আজ এখানে তো কাল বিশ মাইল দূরের বেহড়ে। রাত্রে শুধু বিশ্রামের জন্য কয়েক ঘণ্টা একটা জায়গায় থাকে। তারপর ভোর হতে না হতেই তারা বেরিয়ে পড়ে। যার যার জিনিস তার তার কাছেই থাকে। থলেতে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা এবং ওষুধপত্র। কাঁধে রাইফেল। এই নিয়ে তারা চলেছে মাইলের পর মাইল। প্রয়োজন মত লোকালয়ে ঢুকে ডাকাতি করে আবার বেহড়ে চলে যাচ্ছে। খিদে লাগলে বেহড়ের মধ্যে মধ্যে যে-সব গ্রাম—সেখানে হাজির হয়ে গ্রামবাসীদের উপর চাপ দিয়ে ভোজ খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার নেমে পড়ছে বেহড়ে। স্থায়ী ঠিকানা বলতে বাগীদের কিছু নেই। ফলে স্পাইয়ের মারফৎ খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়েও সুবিধা করতে পারল না। কারণ তার বহু আগেই বাগীরা সরে পড়েছে সে ঘটনাস্থল থেকে। পুলিশের ছোটাছুটিই সার।

পুতলী ছোটেলালের হাতে মাসে মাসে টাকা পাঠাত তার মাকে। ছোটেলাল সেই টাকার বেশীর ভাগটাই গাব করে দিয়ে খুব সামান্য টাকাই দিত পুতলীর মাকে। আর পুতলীর সম্পর্কে খুব উল্টোপাল্টা কথা বলে আসতো বুড়িকে। বুড়ির মন খারাপ হয়ে যেত। নাতনীকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলত। মায়ের মন তো। বুড়ি তাসোকে খারাপ পথে যেতে দেয়নি। লেখাপড়া শিখিয়ে সত্যিকারের ভাল মেয়ে হিসাবে মানুষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু টাকার অভাবে সেটা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না বলে সে ছোটেলালের মারফৎ পুতলীকে সংবাদ পাঠিয়েছে। কিন্তু ছোটেলাল প্রতিবারই এসে বলেছে—পুতলী বলেছে বাইজীর মেয়ে বাইজীই হবে। লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ? মা যেন তাসোকে বাইজীর ট্রেনিং দিয়ে যায়। তাতে আখেরে করে খেতে পারে মেয়ে। লেখাপড়া শেখালে তাসো না খেয়ে শুকিয়ে মরবে...।

সামন্ত : ধীরাজ, স্নেহলতা

পুলিশ ছোটেলালের সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই সেবারের স্ট্র্যাটেজী তৈরী করেছিল। নিশ্চিত সংবাদ ছিল—পুতলী লছমীপুরা বস্তিতে হরমোহন শেঠের দোকানে ডাকাতি করে কুঁয়ারী নদী পার হয়ে চলে যাবে শেষ রাতের মধ্যে।

পুলিশ সেই মত জাল বিছিয়ে ঘাঁপটি মেরে বসেছিল। শুধু লছমীপুরা বস্তির রাস্তাটা খোলা রেখেছিল। আর এমনভাবে অ্যামবুশ করেছিল যাতে বাগীরা সন্দেহ করতে না পারে।

হরমোহন শেঠের বাড়িতে বিনা বাধায় ডাকাতি করে পুতলী সদলবলে পালাচ্ছিল। কোন তাড়াহুড়া ছিল না। সবাই ধীরে সুস্থে বেহড়ের গলির পর গলি পার হচ্ছিল। খানিকটা এগুলেই কুঁয়ারী নদী। ওই জায়গাটাতে সামান্য ভয়ের ব্যাপার আছে। কারণ নদীর এপারে মাইল দুয়েক দূরে একটা পুলিশের আউটপোস্ট। তারপর রয়েছে টহলদার বাহিনী। এই মাইল দুয়েক ফাঁকা জায়গা পার হতে পারলে আর ভয়ের কিছু নেই। পুতলী দলের আগে আগে চারিদিকে সতর্ক চোখ রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে লুটের মালপত্র বয়ে নিয়ে আসছিল কয়েকজন। সবাই খুব উৎফুল্ল। প্রচুর জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। এগুলো বিক্রি করতে পারলে প্রত্যেকের ভাগে মোটা অঙ্কের টাকা আসবে। ওদিকে পুবের আকাশ ক্রমেই ফরসা হয়ে আসছে। অদূরে কুঁয়ারী নদী দেখা যাচ্ছে। ভোরের আবছা আলো-অন্ধকারের মধ্যেই নদী পার হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু তার আগেই পুলিশের এক ঝাঁক গুলি ওদের অভ্যর্থনা জানাল। একজন ডাকাত তীব্র আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চিরদিনের জন্য। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য ওরা কেউ প্রস্তুত ছিল না। ওরা হতভম্ব হয়ে যেই থমকে দাঁড়িয়েছে, অমনি পুলিশের একটা দল অ্যাডভান্স করে খানিকটা এগিয়ে গেল।

পুতলী চীৎকার করে বলে উঠল—ভাগো ভাগো, পুলিশ পিছে পড়া, জান লেকে ভাগো, জলদি ভাগো......

অন্যমা গল্পটা বলছিল—পুলিশ বলেছে সে নাকি এক ভয়ংকর এনকাউন্টার হয়েছিল। পুতলী তার সমস্ত দল নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গুলির বিরুদ্ধে পাল্টা গুলি চালিয়ে পুলিশকে থমকে দিয়েছিল ওপাশে। অন্ততঃ পক্ষে দু' ঘন্টা সে পুলিশকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আর সেই সুযোগে বাগীরা একে একে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। তিন দিক থেকে একযোগে আক্রমণ করেও পুলিশ সুবিধা করতে পারেনি। বেহড় হচ্ছে অন্য একটা জগৎ। সেখানে বাগীরা যত দ্রুত নিজেদের নিরাপদ করতে পারে—ততটা পারা পুলিশের কম্মো নয়। এর প্রতিটি অলিগলির সংগে বাগীদের নিবিড় সম্পর্ক। পুলিশ সেখানে হার মানতে বাধ্য। পুলিশ যখন বেহড়ে নামে তখন এই গোলকধাঁধায় যাতে পথ না হারিয়ে ফেলে—সেজন্য প্রতিটি গলির মোড়ে ছোট ছোট ফ্ল্যাগ পুঁতে রেখে যায়। এই ভয়ংকর গোলকধাঁধায় একবার পথ হারিয়ে ফেললে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। মাইলের পর মাইল—শত শত মাইল ধরে এগিয়ে চলেছে এই বেহড়। একটা গলি থেকে বেরিয়েছে আর একটা গলি। সেই গলি থেকে বেরিয়েছে আর একটা সংকীর্ণ উপ-গলি। সেই গলি ধরে ধরে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে আরও কতকগুলো গলি বেরিয়েছে মূল গলি থেকে। এগিয়ে হয়ত যাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু ফেরার সময়? তখন আসল পথ কিভাবে চেনা যাবে? সব গলিই তো এক রকম দেখতে!

•

মোরেনা থেকে গুলীবিঁধা হাত অ্যাম্পুট করে বেহড়ে ফেরবার আগেই পুতলী সব জানতে পেরেছিল। ছোটেলালের সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ছোটেলাল তাকে ঠকিয়েছে। তার মা-কে ঠকিয়েছে। তাম্নোকে ঠকিয়েছে। রক্তের বিনিময়ে সংগ্রহ করা টাকা গায়েব করেছে। তারপর পুলিশের কুত্তা-র (বাগীরা স্পাইদের কুত্তা বলে আহ্বান করে) কাজ করে সদলবলে তাকে ফাঁসিয়েছে। আজ এই যে হাত কাটা পড়ল—এটার জন্যেও দায়ী হচ্ছে বেইমান ছোটেলাল। অতএব যে কোন উপায়ে এর প্রতিশোধ নিতে হবে। ছোটেলালকে টুকরো টুকরো করে কাটলেও পুতলীর রাগ যাবে না। গুষ্ঠী সমেত ওকে জ্যান্ত কবর দিতে পারলেই যেন প্রাণে শান্তি আসবে কিছুটা।

পুতলী জেনে এসেছে—তাম্নো ক্রমেই তার মা-দিদিমার পেশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বুড়ি মহাজনের কাছ থেকে টাকা কর্জ নিয়ে কোন গতিকে টিকে আছে। বাড়িটা বন্ধক পড়েছে। সামান্য দু' চারখানা সোনার গহনা যা ছিল, জীবন বাঁচানোর তাগিদে সে-সব ইতিমধ্যেই চলে গেছে।

স্নেহলতা।

তাম্নোর এখন বাইজীর পেশা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। নেচে গেয়ে লম্পট বড়লোক শেঠজীদের মনোরঞ্জন করে যদি সে ভদ্রাসনটা কোন গতিকে বাঁচাতে পারে। মোরেনা রেল স্টেশনে পাগলীর ছদ্মবেশে গুলীবিদ্ধ পচে যাওয়া হাতের অসহ্য যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করতে করতে পুতলী ক্রমে ক্রমে এইসব সংবাদ জেনেছে; আর নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করেছে। একবার সে বেহড়ে ফিরে যাক—তারপর কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয়—বাঘিনী পুতলী বাই তা ভাল করে জানে। বাবু লোহারির ছাতি ফাঁড় ফাঁড়কে পুতলী রক্ত পান করে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে!

এইতো গত বছরের কথা: আমি হাজারিবাগের জঙ্গলে বিশ্বজিতের ছবি 'রক্ততিলক' এর আউটডোর শুটিং করছিলাম। বিশ্বজিতের এই ছবিতে আমি প্রধান সহকারী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছিলাম। এ-ছবির চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছিল চম্বলের দুই দস্যুনায়ক—রূপা ও অমৃতলালের কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে।

আগেই বলেছি—রূপা ছিল চম্বলের সব চাইতে সুদর্শন এবং রোমান্টিক নেচারের ডাকাত। তবে হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। মেয়েমানুষের দিকে বড্ড ঝোঁক ছিল রূপার। ডাকাতি করতে গিয়ে লুটপাটের ফাঁকে সুন্দরী মেয়ে দেখতে পেলেই রূপা তাকে ধর্ষণ করত। কিন্তু জীবনে মারত না। তারপর হাতে টাকা পয়সা জমে গেলে রূপা দল ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্যে এখানে-ওখানে

নিরুদ্দেশ হয়ে যেত। শরাব আর বাইজী নাচিয়ে জমানো টাকা নিঃশেষ করে রূপো আবার বেহড়ে ফিরে আসত।

আর রূপোর এই ব্যাপারটাকে দলের কেউ বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু যেহেতু ঠাকুর মান সিং রূপোকে অসম্ভব ভালবাসত, এমনকি নিজের ছেলের চাইতেও ক্ষেত্রবিশেষে বেশী—সেজন্যে রূপোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কেউ অভিযোগ করতে সাহস পেত না। ঠাকুর মান সিং রূপোর চারিত্রিক দুর্বলতার সব কথাই জানত। ওকে নানা-ভাবে শোধরাবার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে আর ইল্লত যায় না ধুলে কথাটা যেন সার্থক করে রূপো যে-কে-সেই রয়ে গিয়েছিল।

আর অমৃতলাল ছিল ভয়ংকর নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। হাসতে হাসতে মানুষকে খুন করতে অমৃতলালের জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। ডাকাত জীবনের গোড়ার দিকে অমৃতলাল ডাকাতি করতে গিয়ে সন্দেহভাজন মানুষের নাকের ডগাটুকু কেটে দিত। পরে যখন সে দেখল, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে নাককাটা লোকগুলো আবার নাকের ডগা ফিরে পাচ্ছে তখন অমৃতলালের সে কি আক্রোশ। তখন সে পুরো নাকটা কেটে দিতে শুরু করল। তারপর শুধু নাক নয়, সেই সঙ্গে দুটো কানও।

ভিণ্ড জেলায় আপনি যদি কখনো দেখেন একজন লোকের নাক এবং কান বলতে কিছু নেই জানবেন সেটা অমৃত-লালেরই একটা মহান কীর্তি।

কুইন সাহেবকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল অমৃতলাল। পারো তো আমায় ধরো। অমৃতলালের ছিল বড্ড সন্দেহবাতিক। দলের বহু লোক সামান্যতম অপরাধের জন্যে ওর হাতে খুন হয়ে গিয়েছে। তবে একটা ব্যাপারে অমৃতলাল খুব সৎ ছিল। লুটের ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে অমৃতলাল চুলচেরা হিসেব করে সকলের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিত। ফলে দলের লোকেরা ওকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করত। অমৃতলাল মুখে যা বলত কাজে তার কোন অন্যথা করত না। আর ডাকাতি করার ক্ষেত্রে ও কোন দয়া-দাক্ষিণ্য করত না।

ভেংগেচুরে তছনছ করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত লুকনো টাকা পয়সা গহনা-গাঁটি বের করে তবে ছাড়ত। এই ব্যাপারে সে ছিল ভীষণ নির্দয়। লোককে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে খতম করত অমৃত-লাল। বিশেষ করে পুলিশের কুত্তা হিসাবে যদি কাউকে তার সন্দেহ হতো, অমৃতলাল তাকে এমন সাংঘাতিকভাবে খুন করত যা নাকি লেখাও অসম্ভব ব্যাপার। পাক্কা স্যাডিস্ট বলতে যা বোঝায়—অমৃতলাল ছিল যথার্থ তাই।

রক্ততিলক ছবিতে অমৃতলালের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল শম্ভু ভট্টাচার্য। চম্বলে দীর্ঘদিন ঘোরাঘুরি করে আমি বাগী অমৃতলাল সম্পর্কে যেসব কাহিনী শুনে-ছিলাম শম্ভু ভট্টাচার্যকে আমি দিনের পর দিন সে-সব বলে গেছি। অমৃতলাল খুব স্বল্পভাষী ছিল। ঈগলের মত চাউনী ছিল। গায়ে ছিল অসুরের শক্তি। ওর রাইফেলের

বহ্নিশিখা
উত্তমকুমার

নিশানা ছিল একেবারে অব্যর্থ। অসম্ভব দ্রুত চলতে পারত লোকটা। স্বল্পাহারী ছিল। আর ছিল নিরামিষাশী। ঠাকুর দেবতার ওপর ছিল অচল ভক্তি। সন্দেহ-প্রবণতা ছিল অসম্ভব রকম।

শম্ভু ভট্টাচার্য এটা দিনের পর দিন প্র্যাকটিশ করেছে। শম্ভু এমনিতেই স্বল্পবাক; এই রূপ [illegible] সময় ওর কথা-বার্তা যেন একেবারে শোনা যেত না। শুটিং-এর সময় ক্যামেরার পরে শম্ভু যখন লোকেশানে এসে দাঁড়াত, আমাদের দিকে তাকাত, তখন আমাদেরই কেমন যেন ভয় করত। মনে হত ভেতরে ভেতরে শম্ভু কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ও যেন এখুনি কারও উপর লাফিয়ে পড়ে ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

হাজারিবাগের ঘন নিবিড় নিস্তব্ধ জঙ্গলে এটা মনে হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি চম্বলের যে রূপ দেখেছি হাজারিবাগের জঙ্গলে সেই রূপটিও দারুণভাবে উপস্থিত। এখানেও বনবিভাগের কর্মীরা বন্দুক হাতে নিয়ে আমাদের পাহারা দিয়েছে। বাঘ—বাঘ—বাঘ! ঝোপের পেছন থেকে কখন যে অতর্কিতে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—কে জানে? চম্বলে ছিল রাইফেলধারী বাগীর ভয়। আর হাজারিবাগে বাঘের। সে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

সোমা দে

শরতের ভরা সরোবরের মত মুখখানা টল-টল করছে কানায় কানায়, লালিত্যের বাড়তি ভারে গলা দুটো ফেটে পড়ছে যেন। আর চোখ? পদ্মপাতার হাওয়া-দোলানো এক-দু' ফোটা শিশির যেন। চঞ্চল, অস্থির, কিন্তু গভীরও।

এখনও ম্যাক্স ফ্যাক্টর লাগেনি গালে। চুলের বাঁধন তখনও খোলা হয়নি। ছোট্ট আয়নাটি বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাত দিয়ে চোখের ওপরের পাতায় রং বোলাচ্ছেন। কখনও ব্রাশ দিয়ে, কখনও হাত দিয়ে। মেক-আপ-ম্যান গুণদা এসে রংয়ের বাকসটা রেখে গেলেন সামনে। ভুরু কুঁচকে, চোখের পাতা নাচিয়ে চলল রং মাখার পালা।

সামনে বসে চেহারার বদল লক্ষ্য করছি। সোমা দে 'সুদূর নীহারিকা' ছবির রূপা হয়ে যাচ্ছেন। পোশাক বদল হয়নি এখনও। বাড়ীর পোশাক এখনও গায়ে। নামাবলী-ছাপা শাড়ী, ম্যাচিং ব্লাউজ আর আলগা করে বাঁধা খোঁপায় সোমা দে এখনও সোমা দে-ই আছেন।

আজ এই মুহূর্তে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর মেক-আপ-রুমে বসে থাকার কথা নয় আমার। কথা ছিল রোববার সকাল সোমা দে-র লেক গার্ডেনস-এর বাড়ীতেই ঘরোয়া আড্ডা বসবে। কিন্তু তা হলো না। অতএব...।

'লাঞ্চ আওয়ারের পর সুটিং' জানিয়েই দিয়েছিলেন আমাকে তিনি। সেইমত দুপুরে উপস্থিত। দরজার পরদা সরিয়ে চোখে চোখ পড়তেই 'আসুন আসুন' শব্দ দুটো কানে এলো। তারপর সহাস্যে কুশল বিনিময়।

সোমা দে-র সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল গত বছর ঠিক এমনি সময়েই, পুজোর কিছু আগে। লেক গার্ডেনস-এর ফ্ল্যাট তখন নতুন সাজে সাজছে। বিবেক চ্যাটার্জির সঙ্গে বিবাহ-মিলন পর্ব শেষ। অবশ্য তখনও কাউকে এ-খবর জানাননি। তাই বললাম—'অনেকদিন পর দেখা। আপনার নিশ্চয়ই অনেক খবর জমেছে। বলুন কিছু, পাঠকদের জানাই।'

সলাজ হাসিতে উত্তর পেলাম—'না তেমন খবর আর কই, তবে আমার কোনো পরিবর্তন দেখছেন কি?'

কি পরিবর্তনের কথা বলতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না। বললাম—'হ্যাঁ, চেহারায় তো বদল দেখতেই পাচ্ছি, আর অ-দেখা বদল তো আমার চোখে পড়ার কথা নয়। তার কথা বরং আপনার কাছ থেকেই শুনি।'

'চেহারায় বদল?' চমকে উঠলেন বোধহয়। জিজ্ঞেস করলেন, 'মোটা, না রোগা—কি হয়েছি?'

—মোটা বলব না, তবে বেশ সুন্দর লাগছে—এটা বলতে পারি। অবাক হলেন আমার উত্তরে।

'সেকি! সবাই তো বলছে আমি নাকি রোগা হয়ে গেছি'—চকিতে আমার দিকে তাকালেন, হাতে চোখের পাতায় বোলানোর ব্রাশ। কাজ বন্ধ।

রমেশ যোশী

ছোটবেলা খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে আমেদাবাদ থেকে এসেছিলেন কলকাতায়, নেহাৎই বেড়াতে। ফিল্ম লাইনের কিছু লোকের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে পরিচয় থাকায় একদিন ম্যাডান স্টুডিওয় সুটিং দেখতে গেছেন। একজন পরিচালকের রমেশ যোশীকে দেখে পছন্দ হয়ে গেল। ছবিতে অভিনয় করার জন্য বললেন, কিশোর রমেশ তক্ষুনি রাজী।

আর সেই থেকেই আছেন তিনি কলকাতায়। বন্ধুবৎসল আলাপচারী এই ভদ্রলোককে দেখে আমেদাবাদের ছাপ বিন্দুমাত্র পাওয়া যাবে না। 'কথাবার্তায়, পোষাকে-আশাকে পাক্কা বাঙালী বনে গেছেন। ম্যাডান স্টুডিওয় 'বীরকিশোরী' 'ইম্পিরিয়াল মেইল' ছবি দুটো করার পর চলে এলেন সম্পাদনা বিভাগে কাজ শেখার জন্য। 'মুভি-ক্যামেরা-মুভিওলা-ছবি তোলার কাণ্ডকারখানা, খুব ফ্যাসিনেটিং লাগত আমার।'—বললেন রমেশবাবু। ফিল্ম কর্পোরেশনে শওকত হোসেন রিজভীর কাছে শুরু করলেন কাজ হাতে-কলমে।

বড়ুয়া সাহেব তখন এন-টি ছেড়েছেন। 'শাপমুক্তি' শুরু হয়েছে। সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করলেন ও'র সঙ্গে। পরে 'মায়ের প্রাণ' ছবিতে অভিনয়ও করেছেন। এরপর অর্ধেন্দু চ্যাটার্জির সঙ্গে অল্প কিছুদিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শুরু হোল স্বাধীনভাবে কাজ।

'সালটা বোধহয় পঁয়তাল্লিশ হবে এখন ঠিক মনে পড়ছে না। হিরন্ময় সেনের 'বর্মার পথে' আর হিন্দী ছবি 'তপস্যা' দিয়ে হাতেখড়ি হোল সম্পাদক রমেশ যোশীর। সুনাম হোল এস ডি নারাং-এর 'অপরাজিতা' ছবি থেকে। সম্পাদনার টেবিলে বসলে রমেশবাবু একবারে বদলে যান। ফিল্ম কাটা-ছেঁড়ার মধ্যেও যে তাঁর কতখানি শৈল্পিক চেতনা কাজ করে, তা ঋত্বিক ঘটকের যে-কোনো ছবি দেখলেই বোঝা যায়।

রমেশবাবুর মতে 'সম্পাদনা হোল সিনেমার শ্বাসপ্রশ্বাস, ব্রিদিং ছাড়া আমরা কি বাঁচতে পারি? ছবির ক্ষেত্রে সম্পাদনাও ব্রিদিং-এর মতোই এবং সম্পাদনার কাজটাও তাঁর কাছে বায়ু গ্রহণের মত অপরিহার্য।

ইতিমধ্যে পরিচালনার কাজেও হাত দিয়েছেন তিনি। একাধিক ছবির বেনামী পরিচালকও বলা যায় তাঁকে। অসমাপ্ত 'অপরাজিতা' ছবিখানা শেষ করার দায়িত্ব পড়েছে রমেশবাবুর ওপর। শুধুমাত্র ফিচার ফিল্ম নয় ডকুমেন্টারি ছবির সম্পাদনাও করেন তিনি। যেদিন দেখা করতে গেছি, সেদিনই দু-তিনজন

প্রোডিউসার তাঁকে ছবির কাজের কথা বললেন। হাসিমুখে নিরাশ করলেন না কাউকে। বম্বে থেকে সবে ফিরেছেন সেদিন, সন্ধ্যেবেলাতেই কাজ শুরু করলে ভালো হয় এমনি অবস্থা।

এপর্যন্ত রমেশবাবুর ক্রেডিটে আছে একশোরও বেশী ছবি। বললাম—সেরা কাজ কোন ছবিতে বলতে পারেন?

—সেটা কি করে বলি বলুন! ঋত্বিকবাবুর সব ছবি করেছি, মৃণাল সেনের 'পুনশ্চ', 'আকাশকুসুম'... তরুণ মজুমদারের 'সংসার সীমান্তে', দীনেন গুপ্তের প্রায় সব ছবি—এর মধ্যেই ভালো কাজগুলো ছড়িয়ে আছে।'

সত্যিই। গুণীর গুণ ছড়িয়ে থাকে সব কাজে, এক জায়গায় নয়।

নিরীক্ষক

বললাম—'ছাড়ুন ওসব। কাজ কেমন লাগছে বলুন, বছর তিনেক হলো তো!'

আমার ভুল ধরিয়ে বলে উঠলেন—'না, তিন বছর এখনও হয়নি, আড়াই বছর। ছবি হয়েছে বোধহয় খান সাতেক।'

হারায়ে খুঁজি, জন্মভূমি দুখানা ছবিতেই সোমাকে দর্শকরা দেখেছেন ট্র্যাজিক রোলে। আজকের সুটিং-এর ছবি 'সুদূর নীহারিকা'তেও তাঁর একই ধরনের চরিত্র। ট্র্যাজিক রোলেই এখন তাঁর তিআশু। যারবধূ, বন্দীবিধাতা, নয়নশ্যামা আগামী তিনটে ছবিতেও তাঁর চরিত্র বিয়োগান্তক।

বললাম—'টাইপড হয়ে যাচ্ছেন তো!'

—কি করব বলুন। অফার তো ঐরকমই আসছে।

নানা ধরনের চরিত্র পাচ্ছেন না বলে দুঃখও আছে তাঁর, 'এমন চরিত্র চাই যাতে আমার কিছু করার সুযোগ আছে, তা নইলে ভাল লাগে, বলুন?' অভিযোগটা অসত্য নয়।

'কাজ কেমন লাগছে?' প্রশ্নটার জবাব কিন্তু পাইনি এখনও বলতে সোমা দে হাতের কাজ বন্ধ করে আমার দিকে ঘুরলেন।

স্থির চোখে তাকিয়ে বলে উঠলেন—'ফিল্মে আমার কাজ করতে আসা তো হঠাৎই। অভিনয় আমার রক্তে, অভিনয় ছাড়া বাঁচতাম না—এসব দু-চারটে বাঁধা বুলি বলে কি লাভ? তার চাইতে বরং স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করেই বলি।'

—নিশ্চয়ই, হিপোক্র্যাসি আমারও পছন্দ নয়।

ইতিমধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটর রাণাবাবু এসে কি পোশাক হবে, কবরী কি ছাঁদে বাঁধতে হবে, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে গেলেন। মনোযোগ দিয়ে সব শুনে সোমা দে বললেন—'ঠিক আছে, আমার মনে আছে কন্টিনিউটি।'

আরামের ভঙ্গিতে পা-টা টেবিলের তলায় চালিয়ে দিয়ে একটু কাৎ হয়ে পড়েছেন চেয়ারে। হাতের আয়না টেবিলে। চোখে ব্রাশ বোলানো শেষ। চুলে চিরুনির আঁচড় পড়ছে এখন।

'প্রথম প্রথম এই ফিল্মের জগতের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারতাম না। কিরকম একটা ডিসট্যান্স থাকত। এখন ছ'-সাতখানা ছবিতে কাজ করতে গিয়ে আস্তে আস্তে যেন সেই ডিসট্যান্সটা কমে আসছে' —এক বিনুনী করে চুলটা আলগা খোঁপায় গুছিয়ে নিয়েছেন আর বলছেন—'কাজটাও খারাপ লাগছে না আর। এখনও ঠিক নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়িনি বটে কিন্তু ভালো লাগছে বেশ।'

এটাই নিয়ম। কারও নেশা পেশা হয়, কারও পেশা নেশা হয়। সোমা দে-র ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সত্যটাই প্রযোজ্য। তাই অভিনয় সম্পর্কে তাঁর জানার কৌতূহল মেটেনি এখনও। সুযোগ আর সময় পেলেই বই নিয়ে বসে পড়েন। অভিনয় সম্পর্কে বই। এই ব্যাপার নিয়েও দেখলাম তিনি বিন্দুমাত্র হিপোক্রীট নন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, 'খুব বেশী বই পড়েই বা হবে কি? তাছাড়া সব বই কি আমি বুঝতে পারি একা পড়ে? বাংলা ছবিতে সাধারণতঃ যে-ধরনের চরিত্র করতে হয়, সবাই করেন, তার জন্য প্রচণ্ড খেটে পড়াশুনোর দরকার আছে কি? আমার তো মনে হয় না।' তবুও নিজেকে তৈরীর জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু তিনি পড়েন নিশ্চয়ই।

বিদেশী ছবিতে যে-ধরনের চরিত্র আছে বা থাকে সেখানে অনুশীলনের প্রয়োজন এবং করেনও অনেকে। সোমা দে স্বীকারও করলেন সেই কথা। বিদেশী

ছবির আগ্রহী দর্শক তিনি। বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাবের শোতে নিশ্চয়ই আপনারা কেউ দেখেছেন ওঁদের দুজনকে?

দুজন বলতে আমি মীন করছি বিবেক চ্যাটার্জিকে আর কি। 'সুখী গৃহকোণ শোভে দুইজন' ক্যাপশন ওঁদের সংসারকে দেওয়া যায়। দুজনের ভাবনা-চিন্তা আর টেম্পারামেন্টের খুউব মিল। ভোর চারটেয় উঠে শেয়ালদা ছুটতে হয় বিবেকবাবুকে। ওখান থেকে টিটাগড়ে। ডিউটি সকাল সাতটার মধ্যে। এই নিয়ে কোনো ঝামেলাও নেই। সোমা যত রাতেই ফিরুন, ভোর-রাত্রিতে উঠে স্বামীকে দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়াতে ভুলে যান না কখনো। দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংই এরকম।

অভিনয়ের ব্যাপারেও বিবেকবাবুর কাছ থেকে সব সময়ই কো-অপারেশন পেয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে বলি, বিবেকবাবু একটা ছবিতে অভিনয় করেছেন, নাম-করা ছবি—মৃণাল সেনের 'এক আধুরি কাহানী'। ছবিটা শিগগীর রিলিজও করবে বোধহয়।

স্বামীর অভিনয় সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন—'না, ও আর কাজ করবে না। চাকরীটা নিয়েই খুব অসুবিধে হচ্ছে। অত সকালে বাড়ী থেকে বেরোনো, বুঝতেই পারছেন।'

ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি একটা বিজনেস শুরু করেছেন। ইচ্ছে আছে বিজনেস দাঁড়ালে চাকরী হয়তো বা ছেড়েই দেবেন। এখনই নয় অবশ্য। অনেকদিন আগে, সোমা যখন ওয়াই ডবলু সি এ-র হোস্টেলে থাকতেন, তখন বিবেকবাবু একদিন আমায় বলেছিলেন—একটা ছবি করার ইচ্ছে আছে।

সেই প্রসঙ্গে কথা উঠতেই সোমা বললেন—'এখনও ফাইন্যাল নয় কিছু, তবে প্ল্যান ড্রপড হয়নি।'

—আপনি থাকছেন নিশ্চয়ই!

হাসতে হাসতে বলে উঠলেন—'না না, আমি থাকছি না—অন্য ধরনেরই ছবি হবে সেটা।'

এবার এলেন পরিচালক সুশীল মুখার্জি নিজে। হাতে স্ক্রিপ্টের খাতা। ঝটিতি ঢুকলেন ঘরে। বসে পড়লেন ঘরটায়। খাতাটা খুলে কোন দৃশ্যের স্যুটিং হবে ঝর-ঝর করে পড়ে গেলেন। মুভমেন্ট, ক্যামেরা পজিশন সবই বলে গেলেন তিনি। আবার পট করে উঠেও গেলেন।

প্রসঙ্গ পাল্টে আমরা এলাম বাংলা ছবির কথায়। বাংলা ছবির সমস্যার কথা, ডেটোরিয়েশনের কথা। সোমা বললেন—'আসল ব্যাপার কি জানেন, গল্প সিলেকশন হচ্ছে না ঠিকমত, বেশ জমাটি গল্প সহজ সরল সাধারণ মানুষের মত করে বললেই ছবি লাগতে পারে। বেশী প্যাঁচ-পয়জার-কেরামতি করলেই মুশকিল।'

'আজকে বোধহয় বাংলা ছবিতে এই সাদা-সিধে চিন্তারই বড় অভাব, নইলে ছবিগুলো ভালো হচ্ছে না কেন?' গলায় অভিযোগের সুর তুললেন। কয়েকটা ছবির নাম করেও তিনি বললেন, ঐসব ছবির সাকসেসের মূল কারণ হোল এই সিমপ্লিসিটি।

আলোচনা বেশী দূর এগোতে পারল না। আবার ঢুকলেন রাণাবাবু। গয়নার প্যাকেটটা সামনে রেখে বললেন—'দেখুন সব ঠিক আছে কিনা, নাকের মুক্তোটা নিয়ে আসছি একটু বাদে।' প্যাকেটে সবই ইমিটেশন গয়না। কানের দুল, হার সব। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সোমার চুল দেখে তিনি মন্তব্য করলেন—'ম্যাডাম, সিঁথিটা সোজা করে নিন।'

একটু বাদে এলেন গুণদা। হাতে মুক্তোটা। সোমা দে বললেন 'না, ওটা তো নয় মনে হচ্ছে গুণদা, এর চাইতে একটু বড় ছিল সেটা, রংটাও কেমন পাল্টে গেছে!' গুণদা হাজারো প্রমাণ দেখিয়ে কনভিন্স করলেন সোমাকে। নাকে লাগান হোল সেটি।

রাণাবাবুর নির্দেশমত চুলের বাঁধন খুলতে হোল আবার। গুণদাই এসে দুটো টাসল লাগিয়ে বিনুনীকে একটু মোটা করলেন। চিরুনি চালিয়ে সোমা নিজেই

সোমা দে

সিঁথি সোজা করে নিলেন। মুখে রং মাখা শুরু হবে এবার। উঠবো উঠবো করছি। বুঝতে পেরে সোমা বললেন—'কি ব্যাপার, চললেন নাকি?'

কথা শুনেই মনে হোল তিনি বোধহয় কিছু বলবেন, বাকি আছে কিছু বলার।

* *

সত্যিই বাকি ছিল কিছু বলার। 'বলুন তাহলে শুনি'—বলে কাঁকরে বসতে হোল আবার। শুনলাম ওঁর বক্তব্য। বললেন—'অভিজ্ঞতা আমার খুবই কম, ফিল্ম লাইনে এসেছিও কম দিন। তবুও আমার যা মনে হয় সেটাই বলছি।'

বুঝতে পারছি বাংলা ছবির সমস্যাই আলোচনার বিষয় হবে। হলোও তাই।

সোমা দে বলে চললেন—'বাংলা ছবির অবস্থা খারাপ হবার অন্যতম কারণ আমার মনে হয় কিছু অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ লোকের এই লাইনে আসা। গল্প নির্বাচন ও চিত্রনাট্য রচনা একটা ছবির সাকসেসের মূল কথা। এই দুটো কাজেই কিছু 'নবীন' পরিচালক একেবারে অনভিজ্ঞ হাতে এসেছেন। ফলে গল্প সিলেকশন ভালো হচ্ছে না, চিত্রনাট্যও তথৈবচ। এইসব এলিমেন্ট-দের সরানো দরকার সবার আগে। একজন লোক যাঁর পক্ষে শুধু পরিচালনার কাজটাই অস্বস্তিকর, তিনি যদি গল্পকার, চিত্রনাট্যকার, সংগীত পরিচালক একসঙ্গে সব-কিছু হতে চান, তাহলে ছবিখানার কি অবস্থা হয় বুঝুন! এতো কাজ করার ক্ষমতা কি সকলের থাকে, না পারে সবাই?' একটানা কথাগুলো শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

বললাম—'ঠিক আছে, এই কথা লিখে দেবো তো?'

—'নিশ্চয়ই লিখবেন, লেখার জন্যই তো বললাম।'

নির্মল ধর

তপন সিংহের হারমোনিয়াম : সোনালী গুপ্ত, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা

[illegible] : দীপংকর দে ও সোমা দে। পরিচালনা : রথীশ দে সরকার। অমৃত ফটো
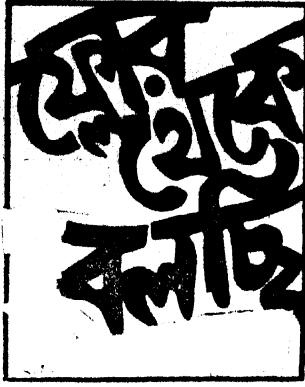
জ্ঞানেশ মুখার্জি টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে এখন দুখানি ছবি তৈরী করছেন। 'দস্যু সর্দার রত্নাকর' এবং 'বনশ্রী বাসু'। সেদিন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে 'বনশ্রী বাসু' নিয়ে আলাপ আলোচনা হল। কথায় কথায় 'বনশ্রী বাসু' ছবির গল্পটি উনি আমাকে খুলে বললেন। একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গায়িকা বনশ্রী বাসুর। এক গানের আসরে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ, তারপর প্রেম। এবং বিবাহ। প্রেম হচ্ছে জীবনের একটা পর্যায়। কিন্তু বিবাহোত্তর জীবন আর একটা। একটার সঙ্গে অপরটির মিল প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথমটা হচ্ছে মন দেয়ানেয়ার ব্যাপার, রঙীন ফানুসে ভর দিয়ে অনেক সুখ স্বপ্ন দেখা। কিন্তু অপরটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কঠিন বাস্তব, জীবনধারণের প্রাত্যহিক অভ্যাসগুলি। বনশ্রী বাসুর ডাক্তার স্বামীর সময় বড় কম। সারাদিনই তাকে জটিল চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় নিজের চেম্বারে এবং হাসপাতালে। যখন তিনি ঘরে ফেরেন, সমস্ত দিনের কর্মক্লান্তিতে তখন আর তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করার মুড থাকে না।

বনশ্রী এটা যেন আশা করেনি। একজন মানুষের জীবনে বিয়ে পূর্ণতা এনে দেয়। কিন্তু জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার ব্যাপারটা তো খুব সহজ নয়। এর জন্যে অনেক কিছুই স্যাক্রিফাইস করার দরকার পড়ে। কিন্তু ক'জন পারে তেমন-ভাবে অপরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে? সহনশীল হতে? উদার হতে? যারা পারে তারা জীবনে সুখী হয়। আর যারা তা পারে না, আজীবনকাল অশান্তিকে বয়ে বেড়ায়।

বনশ্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুমিত্রা মুখার্জি, আর ডাক্তারের চরিত্রে রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই শক্তিমান শিল্পী। একদিন খুব সকাল সকাল ডাক্তার হাসপাতালে বেরোচ্ছিলেন, হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে একজন ছুটে এসে বলল—ডাক্তারবাবু, শিগগির একবার চলুন—

—কেন কি হয়েছে?

প্রথমে সে কিছুই বলতে চায় না। পরে বলল—একজন আত্মহত্যা করবে মনস্থ করে—

এইটুকু শুনে ডাক্তার ছুটে গেলেন! তারই পাশের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে। পৌঁছে দেখলেন, বাস্তবিক অ্যাটেম্পট টু সুসাইড! সুদর্শন তরুণ যুবক। ডাক্তার তাড়াতাড়ি কয়েকটি ইঞ্জেকশন দিয়ে হাসপাতালে ফোন করলেন—এখুনি রুগীকে ওখানে ট্রান্সফার করতে হবে, নইলে একে বাঁচানো যাবে না...

এরই মধ্যে ডাক্তার আবিষ্কার করলেন, অবিবাহিত এই ছেলেটির টেবলের ফটো স্ট্যান্ডে তার স্ত্রী বনশ্রীর একটি ছবি রয়েছে। ফটোটি উনি নিজের পকেটে রেখে দিলেন। তারপর রুগীকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে গেলেন।

এর পর সমস্ত ব্যাপারটা ফ্ল্যাশব্যাকে বলা হয়েছে। বিবাহের পর প্রায় নিঃসঙ্গ বনশ্রী যখন দেখল তার সমস্ত জীবনটা একটা রুটিনের মধ্যে বাঁধা হয়ে গেছে তখন তার ভেতরের শিল্পীসত্ত্বা যেন বিদ্রোহ করে উঠতে চাইল। কিন্তু যা চাওয়া যায়, তা সব সময় পাওয়া যায় না। মনে মনে সে তার স্বামীর ত্রুটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল। উঁহু! তার স্বামী তাকে অসম্ভব ভাল-বাসেন। তার ব্যবহার নিষ্কলুষ। স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রতি যে দায়িত্ব, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাই তার নেই। তাহলে? শুধু সান্নিধ্য দিতে পারেন না বলেই কি বনশ্রী তার ব্যস্ত ডাক্তার স্বামীকে অভিযুক্ত করবে?

ইতিমধ্যে পাশের বাড়ির সেই তরুণ ছেলেটির সঙ্গে বনশ্রীর আলাপ হলো। সুদর্শন। বুদ্ধিমান এবং মার্জিত রুচি-সম্পন্ন মানুষ। বনশ্রীর খুব ভাল লাগল ওকে। ক্রমে ওদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হলো। ওরা পরস্পরকে চেনে এবং ভালবাসে। এতে কোন অপরাধ নেই, বনশ্রী ঠিক এইরকম একটা জীবনের স্বপ্ন দেখে থাকবে। তবে অনেক পরে সে তার বাঞ্ছিত আকাঙ্খার মুখোমুখি হয়েছে। এখন সে কি করবে? সে যে এখন অন্যের স্ত্রী!

ছেলেটি বনশ্রীকে চেয়েছে। কায়মনো-বাক্যে চেয়েছে। সে চাওয়ার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। ছেলেটি বলে—যেখানে তুমি সুখী নও, সুখী হতে পার না, দরকার কি আজীবন সেই গ্লানি বয়ে বেড়িয়ে। তুমি তোমার বর্তমান স্বামীকে ডাইভোর্স করে চলে এসো। তারপর আমরা বিয়ে করব। এবং সুখের সংসার গড়ে তুলব।

এই ব্যাপারে বনশ্রীও মনে মনে একমত। সত্যি যেখানে কোনদিন সুখী হওয়া যাবে না, কি দরকার সেখানে পড়ে থাকার। আর সুখী ভবিষ্যৎ যখন তাকে হাতছানি দিচ্ছে—তখন সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার চলে আসাই উচিত। নইলে একূল ওকূল দুকূলই হয়ত শেষ পর্যন্ত চলে যাবে......

ছেলেটি একটা দিনক্ষণ স্থির করে বলে দিয়েছিল—এদিন তুমি না এলে আমি কিন্তু আত্মহত্যা করব।

বনশ্রী ভেবেছিল, এটা কথার কথা।

কিন্তু ছেলেটি যে সত্যিই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবে—এটা সে ভাবেনি। সেদিন ছেলেটির ঘরে বনশ্রীর ফটোটা দেখে ডাক্তার সবই বুঝতে পারলেন। কিন্তু তিনি মৌন রইলেন।

আর এই দিনটিই ছিল ওদের বিয়ের বর্ষপূর্তি উৎসব। সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বনশ্রী পই পই করে তার

স্বামীকে বলে দিয়েছিল—আজ তুমি একটু আগে ফিরে আসবে—

—কেন? আজ কি এমন ব্যাপার?

বনশ্রী ভ্রূ-ভঙ্গী করে বলেছিল—আজ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি—

—ওঃ...কিন্তু আজই যে গোটা কয়েক জরুরী অপারেশন কেস রয়েছে আমার—

বনশ্রী ওকে বাধা দিয়ে বলেছে—আমি কোন কথা শুনতে চাই না। অন্তত একটা দিন তুমি আমার কথা রাখো—এটা আমি দেখতে চাই—

ডাক্তার সহাস্যে বলেছিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, আমি আসব—

আর সেইদিনই কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাধা পড়ল, একটার পর একটা। আত্মহত্যার কেস; তাও আবার বাড়িরই পাশে। সেখান থেকে হাসপাতাল। ছেলেটি যখন কিছুটা সুস্থ হলো, ডাক্তার তার সঙ্গে কথা বললেন। তার মনে কোন খেদ নেই। তিনি জানেন—দিস ইজ লাইফ। ওয়ান হ্যাজ টু টেক ইট ইজি। না হলেই কমপ্লিকেশান। [illegible]। [illegible]। তিল তিলে নিজেকে অসুখী করে তোলা।

ডাক্তার কিন্তু তার ডিউটি ভোলেন নি। যে ছেলেটি তার সব কিছু শেষ করে দিতে উদ্যত, তার স্ত্রীকে ঘরছাড়া করতে প্রোভোকেশান [illegible] ডাক্তার ইচ্ছে করলেই কিন্তু সে সব [illegible] [illegible] বলে [illegible] পারতেন। কারণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু ডাক্তার তার কোন [illegible] [illegible] করলেনই না, বরং [illegible] চিকিৎসায় প্রায় প্রাণহীন দেহে নবজীবনের সঞ্চার করলেন।

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখেন নিমন্ত্রিত অতিথিরা চলে গেছে। কে আর তার জন্য অনিশ্চিত বসে থাকবে। ডাক্তারকে দেখে বনশ্রী ক্ষোভে ফেটে পড়ল। অভিযোগ করল। রাগে দুঃখে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলল। ডাক্তার কিন্তু একটাও কথা বললেন না।

বনশ্রী যখন ক্লান্ত হলো তখন পকেট থেকে সেই ফটোগ্রাফটা বের করে শান্ত ভঙ্গীতে ডাক্তার টেবিলের ওপর রাখলেন।

বললেন—এই ছেলেটির জন্যে আজ ফিরতে এমন দেরি হয়ে গেল। এ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওকে আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।

ছবিটি দেখে বনশ্রী চমকে উঠল।

ছেলেটির পাশে খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে বনশ্রী বাসু দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বনশ্রী এবার ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারল। তারপর যেন আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ল। —হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এর সঙ্গে প্রেম করেছিলাম। ঠিক কথা। কিন্তু এর জন্যে তুমি দায়ী। এ যতটুকু আমার জন্যে, আমার আনন্দের জন্যে ভাবে, তুমি তার কতটুকু ভাব? আর কতটুকু করো?

ডাক্তার প্রতিবাদ করলেন না। বনশ্রী যদি জানত সারাদিন তাকে কী করতে হয়, কত মানুষ কত রকমের প্রত্যাশা নিয়ে তার কাছে আসে এবং কতভাবে তাদের সেইসব প্রত্যাশা পূরণ করতে হয়—তাহলে বনশ্রী এসব বলতে পারত না। বলা ওর পক্ষে সম্ভবও হতো না। তিনি শুধু একজন স্বামী নন, একজন চিকিৎসকও সেইসঙ্গে। তাঁর সামাজিক দায়িত্ব অন্য ধরনের। যার সঙ্গে ধ্যানধারণায় অন্তত বনশ্রীর কোন মিল নেই।

রাত গভীর হয়। ক্রমে উপলব্ধির একটা বিশেষ স্তরে এসে বনশ্রী তার ভুল বুঝতে পারে। তার মনের সব ধোঁয়াটে ভাব কেটে যায়। সে অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামীর মুখোমুখি হয়।

আসেশ মুখার্জি আমাদের দেশের একজন কৃতবিদ্য নাট্যকার অভিনেতা, তার তোলা বনশ্রী বাসু যদি ব্যতিক্রম না আনতে পারে তাহলে তিনি আর পাঁচজনের মধ্যে স্বতন্ত্র হবেন কিভাবে? মনে হয় সেই ব্যতিক্রম এই ছবিতে আসছে। কাহিনী এবং চিত্রনাট্য শেখর চ্যাটার্জির লেখা। ছবিতে বনশ্রীর প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন দীপঙ্কর দে। চিত্রগ্রহণ করছেন দীপক দাস। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

মুসাফির

অগ্নিগর্ভ লেনার একটি দৃশ্য

যাত্রা থিয়েটার থেকে প্রমোদকর বিলোপ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে এখন থেকে যাত্রা ও থিয়েটারের ওপর থেকে প্রমোদ কর উঠিয়ে দেওয়া হোল। এই নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রযোজ্য হবে।

গত ২৭ আগস্ট বুধবার মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাংবাদিকদের এই সুসংবাদটি দিয়ে বলেন, এ পর্যন্ত প্রমোদ করের আওতা থেকে পাঁচটি রঙ্গমঞ্চকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। এখন থেকে সেটা সমস্ত যাত্রা ও থিয়েটার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে—একমাত্র যে সব নাট্যানুষ্ঠানে ক্যাবারে দৃশ্য থাকবে তাদের ছাড়া।

এই প্রমোদকর মকুব করার ঘোষণাকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

কেতন-এর 'অগ্নিগর্ভ লেনা'

লেনা সাইবেরিয়ায় অবস্থিত একটি সোনার খনি। ব্রিটিশ এর মালিক। সেই পটভূমির ওপর নাটক এই 'অগ্নিগর্ভ লেনা।' ঘটনাকাল ১৯১২ সালের মাঝামাঝি সময়। বক্তব্য শ্রমিকের ওপর মালিক শ্রেণীর অত্যাচার ও তার প্রতিবাদ। ঐ সময় শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য মালিকপক্ষ তাদের ওপর গুলি চালালে রাশিয়ার ছাত্র, কৃষক ও মজদুরদের মধ্যে যে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয় নাটকে তারও ভূমিকা আছে। (নাটক শ্যামাকান্ত দাস)।

এ দেশের নাটকে বিদেশী ভাবনার উপস্থাপনা বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত নও সম্পূর্ণ বিদেশী পটভূমিকার ব্যবহার (অনূদিত নাটক ছাড়া) বোধহয় এদেশে খুব বেশী দিন নয়। সেই জন্যই অর্থাৎ নাটকে নির্দিষ্ট ও উল্লিখিত পটভূমি, তার মানুষ, তার জীবনযাপন ইত্যাদি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শক সম্যক ওয়াকিবহাল নয় বলেই বোধহয় সে সব নাটক তার বক্তব্য বা বর্ণচ্ছটা ছাড়া, তাদের মনে তেমন নাড়া দেয় না।

সেদিক থেকে কেতন প্রযোজিত 'অগ্নিগর্ভ লেনা' কিছুটা ব্যতিক্রম বলা যায়। এ নাটকের কিছু কিছু চরিত্রের অভিনয়ও লক্ষ্য করার মত। বিশেষ করে পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাদার, বিমল দত্তর টেরেসচেংকো দর্শকদের খুশী করেছে।

অন্যান্য চরিত্রে দুর্গাশঙ্কর চক্রবর্তী, বিনয় দাশগুপ্ত, শঙ্কর সাহা, নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, দেবাশিষ চৌধুরী, নির্মল মুখোপাধ্যায়, তপন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন কর, অসিত মুখোপাধ্যায়, নিমাই দে, তপন ঘোষ, দেবাশীষ চক্রবর্তী, শান্তিপদ ... চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মানিকলাল ... আশুতোষ ভট্টাচার্য, এস কুলাচারী, ... মিত্র, তপতী রায় ইত্যাদির অভিনয় ... ক্ষেত্রে উতরে না গেলেও প্রচেষ্টা লক্ষ্য ক... গেছে।

চরিত্রগুলির মেক-আপ সাজ সুন্দ... যা পটভূমি রচনায় নিশ্চয় সাহায্য করেছে... আলোকসম্পাত ও শব্দপ্রক্ষেপণ ... দাস সুন্দর। নাটকটির নির্দেশনায় ... শঙ্করপ্রসাদ ঘোষ ও ...

অনামিকার-এর হিন্দী নাটক

কলকাতায় এখন প্রায় নিয়মিতই হিন্দী নাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। ... এখানকার বাঙালীরা বড় একটা ... রাখলেও সেটা খুবই সীমিত। তাই ... ভাষাভাষী ... দর্শকরাই ... পৃষ্ঠপোষক

সম্প্রতি অনামিকা সংস্থা যে নাটক দর্শকদের উপহার দিলেন ... নাম ... একটি একাঙ্ক। প্রসিদ্ধ ... নাট্যকার আগস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ ... নাটকে হিন্দীতে রূপান্তরিত নাটকের (বিনয় ... গুপ্তা ও পবন মস্করা-কৃত) চরিত্র ... তিনটি। প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী ... লোকের বয়ে যাওয়া আদুরে মেয়ে, ... একটা প্রচণ্ড শূন্যতা ও ফ্রাস্ট্রেশানে ভো... এবং সেই বাড়ির এমন দুটি ঝি ও চাক... যারা একদিন ঘর বাঁধবে এমন ... বাসনা মনে পোষণ করে। মাত্র এই তিন... চরিত্রই একঘণ্টার নাটকটিকে জমিয়ে রা... বস্তুত এমন স্বচ্ছন্দ অভিনয় ... দেখা যায় না বললেও অত্যুক্তি হয় ... বিশেষ করে জুলীর ভূমিকাভিনেত্রী ... অভিনয় দর্শকদের বহুদিন মনে থাক... একটি অতি আধুনিকা এবং শূন্য... যন্ত্রণায় বিদ্ধ কুমারীর মানসিক ... ইত্যাদি তাঁর অভিনয় প্রায় ...